...মৃত জনে দেহ প্রাণ'

সূচীপত্র

বাথগেটের
নিও-গোল্ডেন
ক্যান্থারাইডিন
কেশ-তৈল
চুলের গোড়া শক্ত করে এবং
চুলকে সতেজ ও মসৃণ রাখে
বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা-১
UPCO

[রাজপুত চিত্র অষ্টাদশ শতাব্দী]

কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী

ব্লক ও মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

# ॥ শারদীয়া দেশ পত্রিকা ॥

॥ মহালয়া • ১৩৬৪ ॥

## মাতৃপূজা

বাঙালীর ঘরে মা আসিতেছেন। বাঙলার আকাশ উত্তপ্ত করিয়া জ্বালামালা-মেখলায় অগ্নিবর্ণা জননীর দুরন্ত খেলা শুরু হইয়াছে। একবার নয়ন মেলিয়া দেখো। ঈষৎ-সহাস অমল মায়ের অধরের মধুর হাসি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। উন্মাদিনী জননী। তাঁহার উন্মুক্ত জটাজালের আঘাতে মেঘমণ্ডল খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইতেছে। বিদ্যুদ্দামের বিস্ফোরণে মুহুর্মুহু বজ্রের গর্জন ভৈরব ভীষণ। তাঁহার পদভরে পৃথিবী টলমল, সপ্তসমুদ্রের জল উচ্ছল। বিশ্বজননীর বেগ-ভ্রমণের বিক্ষেপে ভূধর-শিখর প্রকম্পিত। মায়ের এমনই তাপ, অসম্ভূত মাতৃস্নেহের এমনই আবর্ত-গতি, বৈপ্লবিক তাঁহার রীতি। দুর্বল আমরা, তাঁহার এইরূপ রুদ্রলীলার স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী মহাঘোরা যোগিনী মায়ের সন্তানতাপের প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। কিন্তু এই ভয় কাটাইতে না পারিলে জয় নাই। শক্তিস্বরূপিণী তিনি। দুর্বল যাহারা, তাহারা মাতৃপূজায় অধিকারী নহে। এই দুর্বলতা দূর করিতে হইলে চাই ভক্তি। ভক্তির মূলে প্রাণরসের প্রত্যক্ষ সংবেদন থাকা প্রয়োজন। মায়ের তেমন বেদনা একদিন বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে প্রাণময় উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। বাঙালী হৃদয়ের রক্ত মায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। মাতৃপ্রেমের জ্বালায় সে জ্বলিয়াছিল, খেলিয়াছিল আগুনের খেলা। বাঙালী সেদিন পথের বাধা মানে নাই, ঘরের হিসাব রাখে নাই। জয় মা বলিয়া দুর্গমের সাধনায় সে ঝাঁপ দিয়াছে। সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য মায়ের উদগ্র আগ্রহের আগ্নেয় স্পর্শ যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এবং সেই অনুভূতিতে উদ্দীপিত মনোবলে মায়ের আর্ত, পীড়িত সন্তানের অশ্রু মুছাইবার জন্য আমাদের তাজা প্রাণে একবার সাড়া জাগে, তবে অগ্নিময়ী জননীর শ্রীবিগ্রহ আমাদের দৃষ্টিতে জীবন্ত হইয়া ফুটিবে। মৃণ্ময়ী জননী আবার চিন্ময়ীরূপে দেখা দিবেন। মাতৃ-মাধুর্যে আমাদের মনের সকল অবীর্য দূর হইবে। আমাদের হৃদয়ে জন্মিবে ভক্তি, বাহুতে জাগিবে শক্তি। দুর্গতি-হারিণী দুর্গা সন্তানদলকে কোলে লইয়া বঙ্গের অঙ্গণ আলো করিয়া দাঁড়াইবেন। দিব্য তাঁহার রূপের ঠমকে বিশ্ব-চরাচরে চমক খেলিবে। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে মহাশক্তি সঞ্চারিত হইবে। দৈত্যদর্প-নিসূদনী জননীর কৃপায় দেবশক্তির জাগরণ ঘটিবে। তাঁহার খড়্গাঘাতে পড়িবে, মরিবে, নির্মূল হইবে অসুরের দল। দেবত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া, আমরা সেদিন দেবীর অর্চনার অধিকার অর্জন করিব। আমাদের মাতৃ-পূজা সার্থক হইবে।

## মীরাবাঈ

কণ্ঠ ভরি নাম দিল, গান দিল মীরা,  
কণ্ঠ হতে ফেলে দিল মোতিমালার হীরা।  
মুখে বাণী শুনিনি যে,  
মনে মনে সুর বাজে,  
বাজে তার শিরা উপশিরায়।  
শান্তি তার দেহে মনে,  
শান্তি তার দুনয়নে,  
একতারা সঙ্গীতে অধীরা॥

১৭ অঘ্রাণ  
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# রাজমহিষী

পরশুরাম

হংসেশ্বর রায় খুব ধনী লোক। রাধানাথপুরে তার যে জমিদারি ছিল তা এখন সরকারের দখলে গেছে, কিন্তু তাতে হংসেশ্বরের গায়ে আঁচড় লাগে নি। কলকাতায় অফিস অঞ্চলে আর শৌখিন পাড়ায় তাঁর ষোলটা বড় বড় বাড়ি আছে, তা থেকে মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয় হয়। তা ছাড়া বন্ধকী কারবার আর বিস্তর শেয়ারও আছে। হংসেশ্বরের বয়স পঞ্চাশ। তাঁর পত্নী হেমাঙ্গিনী সংসারে অনাসক্ত. বিপুল শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে ঔষধ আর পুষ্টিকর পথ্য খেয়ে গল্পের বই পড়ে দিন কাটান আর মাঝে মাঝে বাড়ির লোকদের ধমক দেন — যত সব কুঁড়ের বাদশা জুটেছে। এঁদের একমাত্র সন্তান চকোরী, সম্প্রতি এম. এ পাস করেছে।

কলকাতা হংসেশ্বরের ভাল লাগে না। তাঁর যে সব শখ আছে তার চর্চার পক্ষে রাধানাথপুরই উপযুক্ত স্থান, তাই ওখানেই তিনি বাস করেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাগান আছে, গরু আর হাঁস-মুরগিও আছে। কৃষিজাত দ্রব্য আর পশুপক্ষীর যত প্রদর্শনী হয় তাতে তাঁর আম কাঁঠাল লাউ কুমড়ো গরু হাঁস মুরগিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। সম্প্রতি তিনি পশ্চিম পঞ্জাবের গুজরানওআলা থেকে একটি ভাল জাতের মোষ আনিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধুকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছে। তিনি মোষটির নাম রেখেছেন রাজমহিষী। কিছু দিন আগে তার প্রথম বাচ্চা হয়েছে। আগামী ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাটল শো-তে তিনি এই মোষটিকে পাঠাবেন। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন তালদিঘির রায়সাহেব মহিম বাঁড়ুজ্যে, তাঁর একটি মুলতানী মোষ আছে। হংসেশ্বর আশা করেন তাঁর রাজমহিষীই রাজ্যপাল গোল্ড মেডাল পাবে!

হংসেশ্বরের মেয়ে চকোরী কলকাতায় তার মামাদের তত্ত্বাবধানে থেকে কলেজে পড়ত। এখন পড়া শেষ করে রাধানাথপুরে তার বাপ-মায়ের কাছে আছে, মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের জন্যে কলকাতায় যায়। চকোরী লম্বা, রোগা, দাঁত বড় বড়, চোয়াল উঁচু, গায়ের স্বাভাবিক রঙ ময়লা। সর্বাঙ্গীণ পরিপাটী মেক-আপ সত্ত্বেও তাকে সুন্দরী বলে ভ্রম হয় না। চকোরীর হিংসুটে সখীরা বলে, রূপে তো আহা মরি বিদ্যাধরী, গুণে মা মনসা, শুধু ওর বাপের সম্পত্তির লোভে খোশামুদেগুলো জোটে।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হেমাঙ্গিনীর কিছুমাত্র চিন্তা নেই, হংসেশ্বরও ব্যস্ত নন। তিনি বলেন, চকোরী হুঁশিয়ার হিসেবী মেয়ে, বোকা-হাবার মতন চোখ বুজে বাজে লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়বে না, চটক দেখে বা মিষ্টি-মধুর বুলি শুনেও ভুলবে না। তাড়াহুড়োর দরকার কি, আজকাল তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের পরে মেয়েদের বিয়ের রেওয়াজ হয়েছে। চকোরী সুবিধে মতন নিজেই যাচাই করে একটা ভাল বর জুটিয়ে নেবে।

চকোরীর প্রেমের যত উমেদার আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নাছোড়বান্দা হচ্ছে বংশীধর। সম্প্রতি সে পি-এচ. ডি ডিগ্রী পেয়ে টালিগঞ্জ কলেজে একটা প্রোফেসারি পেয়েছে, বটানি আর জোওলজি পড়ায়। তার বাবা শশধর চৌধুরী দু বছর হল মারা গেছেন। তিনি উকিল ছিলেন, হংসেশ্বরের কলকাতার সম্পত্তি তদারক করতেন। বংশীধরের মামার বাড়ি রাধানাথপুরে, সেখানে সে মাঝে মাঝে যায়। চকোরীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তার পরিচয় আছে, হংসেশ্বরকে সে কাকাবাবু বলে।

পুজোর ছুটিতে বংশীধর রাধানাথপুরে এসেছে। একদিন সে চকোরীকে বলল, স্মার দেরি কেন তোমার

লেখাপড়া শেষ হয়েছে, আমারও যেমন হক একটা চাকরি জুটেছে। এখন আর তোমার আপত্তি কিসের? তুমি রাজী হলেই তোমার বাবাকে বলব।

চকোরী বলল, ব্যাপারটি যত সোজা মনে করছ তা নয়। আমার তরফ থেকে বলতে পারি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়, বেশ শান্তশিষ্ট, যদিও নামটা বড় সেকেলে, বংশীধর শুনলেই মনে হয় সাপুড়ে। কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খাবার মেয়ে আমি নই। বাবাকে যদি রাজী করাতে পার তবে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। তবে বাবা লোকটি সহজ নন, নানা রকম ফেচাং তুলবেন। তোমার যদি সাহস আর জেদ থাকে তাঁকে বলে দেখতে পার।

পরদিন সকালে হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর সবিনয়ে নিবেদন করল যে তার কিছু বলবার আছে। হংসেশ্বর তখন তাঁর মোষের প্রাতঃকৃত্য তদারক করছিলেন। বংশীধরকে বললেন, একটু সবুর কর। তার পর তিনি রাজমহিষীর পরিচারককে বললেন, এই গোপীরাম, বেশ পরিষ্কার করে গা মুছিয়ে দিবি, খবরদার একটুও কাদা যেন লেগে না থাকে। একি রে, নাকের ডগায় মশা কামড়েছে দেখছি, ওর ঘরে ডিডিটি দিস নি বুঝি?

গোপীরাম বলল, বহুত দিয়েছি হুজুর, কিন্তু দিদি দিলে মচ্ছড় ভাগে না। আপনি যদি হুকুম করেন তবে আমার গাঁও থেকে চারঠো বগুলা মাঙাতে পারি।

— বগুলা কি জিনিস?

—বগ-পাখি হুজুর। গোহালে রাখলে মখ্খি মচ্ছড় পাঁতিংগা মকড়া সব টপাটপ খেয়ে ফেলবে, ভইসী আর তার বচ্চা বহুত আরামসে নিদ যাবে।

— বগ থাকবে কেন, পালিয়ে যাবে।

—না হুজুর, ওদের পংখ একটু ছেঁটে দিব, উড়তে পারবে না। পন্দ্র দিন বাদ গাঁও সে আমার এক চাচা আসবে, বলেন তো বগুলা আনতে লিখে দিব, চার বগুলায় বিশ টাকা আদাজ খর্চা পড়বে।

— বেশ, আজই লিখে দে।

গোপীরামকে আরও কিছু উপদেশ দিয়ে হংসেশ্বর তাঁর অফিস-ঘরে বংশীধরকে নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন তার পর বংশী, ব্যাপারটা কি হে?

মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, অনেক দিনের একটা দুরাশা আছে, তাই আপনার সম্মতি ভিক্ষা করতে এসেছি।

হংসেশ্বর বললেন, অ। চকোরীকে বিয়ে করতে চাও এই তো?

বংশীধর সভয়ে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

হংসেশ্বর বললেন, শোন বংশী, আমি স্পষ্ট কথার মানুষ। পাত্র হিসেবে তুমি ভালই, দেখতে চকোরীর চাইতে ঢের বেশী সুশ্রী, বিদ্যাও আছে, যতদূর জানি চরিত্রও ভাল। কিন্তু তোমার আর্থিক অবস্থা তো সুবিধের নয়। কলকাতায় একটা সেকেলে পৈতৃক বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেখানে তোমার মা দিদিমা ভাই বোন ভাগনেরা গিশগিশ করছে, সেই ভিড়ের মধ্যে চকোরী এক মিনিটও টিকতে পারবে না। তারপর তোমার আয়। মাইনে কত পাও হে? দু শ? পরে আড়াই শ হবে? খেপেছ, ওই টাকায় চকোরীকে পুষতে চাও? তার সাবান ক্রিম পাউডার পেণ্ট লিপস্টিক সেণ্ট এই সবের খরচই তো মাসে আড়াই শ-র ওপর। তুমি হয়তো ভেবেছ মেয়ে-জামাইএর ভরণপোষণের জন্যে আমি মাসে মাসে মোটা টাকা দেব। সেটি হবে না বাপু।

বংশীধর বলল, আমি গরিব হলেই বা ক্ষতি কি কাকাবাবু? চকোরী আপনার একমাত্র সন্তান, সে যাতে সুখে থাকে তার জন্যে আপনি অর্থসাহায্য করবেন এ তো স্বাভাবিক। আপনার অবর্তমানে ওই তো সব পাবে।

— অবর্তমান হতে ঢের দেরি হে, আমি এখনও চল্লিশ বছর বাঁচব, তার আগে এক পয়সাও হাতছাড়া করব না। মেয়ে যদ্দিন আইবুড়ো তদ্দিন আমার খরচে নবাবি করুক আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়ের পর সমস্ত ভার তার স্বামীকে নিতে হবে। আর, যদিই বা তোমাদের খরচ আমি যোগাই তাতে তোমার মাথা হেঁট হবে না? বাপের মাইনের গোলাম স্বামীর ওপর কোনও মেয়ের শ্রদ্ধা থাকে না। আমিই বা চ্যারিটি-বয় জামাই করতে যাব কেন?

বংশীধর কাতর স্বরে বলল, তবে কি আমার কোনও আশা নেই?

— আশা থাকতে পারে। তুমি উঠে পড়ে লেগে যাও যাতে তোমার রোজগার বাড়ে। তোমার মাসিক আয় আড়াই হাজার হলেই আমার আর আপত্তি থাকবে না।

—অত টাকা আয়ের তো কোনও আশা দেখছি না। আর, চকোরী কি তত দিন সবুর করবে?

— সবুর করবে কিনা আমি কি করে বলব? তুমিই ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পার। হাঁ, আর একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার। চকোরীকে ভাঁওতা দিয়ে রাজী করিয়ে যদি আমার অমতে তাকে বিয়ে কর তবে আমার সমস্ত সম্পত্তি হরিণঘাটায় দান করব, গো-মহিষ-ছাগাদি পশু আর হংস-কুক্কুটাদি পক্ষীর উৎকর্ষকল্পে। আর, চকোরী আমার সম্পত্তি পেলেই বা তোমার কি সুবিধে হবে? সে অতি ঝানু মেয়ে, কাকেও বিশ্বাস করে না, ব্যাংকের চেকবুক তোমাকে দেবে না, বিষয় যা পাবে তাতেও তোমাকে হাত দিতে দেবে না। বড় জোর তোমার সিগারেটের খরচ যোগাবে আর জন্মদিনে কিছু উপহার দেবে, এক সুট ভাল পোশাক, কি রিস্টওয়াচ, কিংবা একটা শার্পার-নাইণ্টি কলম। চকোরীকে বিয়ে করার মতলব ছেড়ে দেওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

বংশীধর বিষণ্ণ মনে চলে গেল। বিকাল বেলা তার কাছে সব কথা শুনে চকোরী বলল, বাবা যে ওই রকম বলবেন তা আমি আগে থাকতেই জানি।

বংশীধর বলল, চকোরী, তোমার বাবার সম্পত্তি তাঁরই থাকুক, আমার তাতে লোভ নেই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাস তবে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না? প্রেমের জন্যে নারী কি না ছাড়তে পারে? যদি ভালবাসা থাকে তবে আমার সেকেলে ছোট বাড়িতে আর সামান্য আয়েই তুমি সুখী হতে পারবে।

চকোরী হেসে বলল, শোন বংশী। প্রেম খুব উঁচুদরের জিনিস, আর তোমার ওপর আমার তা নেহাত কম নেই। কিন্তু টাকাহীন প্রেম আর চাকাহীন গাড়ি দুইই অচল, কষ্টের সংসারে ভালবাসা শুকিয়ে যায়। 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝখানে, ধনদৌলত চাই না শুধু চাইব ধনের মুখপানে'—এ আমার পোষাবে না বাপু। তোমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে বাবা অবশ্য অনেকটা বাড়িয়ে বলেছেন, আমাকে একবারে হার্টলেস রাক্ষসী বানিয়েছেন। কিন্তু আমি অতটা বেয়াড়া নই। তবে বাবা নিতান্ত অন্যায় কিছু বলেন নি। আমি বলি কি, তোমার ওই প্রোফেসরি ছেড়ে দিয়ে কোনও ভাল চাকরির চেষ্টা কর। বাবার সঙ্গে মন্ত্রীদের আলাপ আছে, ওঁকে ধরলে নিশ্চয় একটা ভাল পোস্ট তোমাকে দেওয়াতে পারবেন। প্রথমটা মাইনে কম হলেও পরে আড়াই-তিন হাজার হওয়া অসম্ভব নয়।

—তত দিন আমার জন্যে তুমি সবুর করে থাকবে?

—গ্যারাণ্টি দিতে পারব না। অক্ষয় প্রেম একটা বাজে

কথা, ভবিষ্যতে তোমার আমার দুজনেরই মতিগতি বদলাতে পারে। যা বলি শোন।—একটা ভাল সরকারী চাকরির জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে বাবাকে ধর। কিন্তু এখনই নয়, ওঁর মাথার এখন ঠিক নেই, দিনরাত ওই মোষটার কথা ভাবছেন। বাবার গুপ্তচর খবর এনেছে, তালদীঘির সেই মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী মোষ নাকি রোজ সাড়ে কুড়ি সের দুধ দিচ্ছে, আমাদের রাজমহিষীর চাইতে কিছু বেশী, যদিও দুটোই সমবয়সী তরুণী মোষ। বাবা তাই উঠে পড়ে লেগেছেন, রাজমহিষীকে কাপাস বিচির খোল, চীনাবাদাম, পালং শাগ, কড়াইশুঁটি, গাজর, টোমাটো, নারকেল-কোরা, কমলানেবুর রস, এই সব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়াচ্ছেন, ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্সও দিচ্ছেন। এগজিবিশনটা আগে চুকে যাক। রাজমহিষী যদি গোল্ড মেডাল পায়, তবে বাবা খুব দিলদরিয়া হবেন, তখন তাঁকে চাকরির জন্যে ধরবে।

আর এক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গ-গবাদিপশু-প্রদর্শনী, কিন্তু হংসেশ্বর মহা বিপদে পড়েছেন। রাজমহিষী খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছে, দুধও নামমাত্র দিচ্ছে। যত নষ্টের গোড়া ওই গোপীরাম, রাজমহিষীর প্রধান সেবক। সে তার ইয়ারদের সঙ্গে রাসপূর্ণিমায় মেলায় গিয়ে খুব তাড়ি খেয়ে হাংগামা বাধিয়েছিল, পুলিস এলে তাদের সঙ্গে বীরদর্পে লড়ে একটা কনস্টেবলের মাথা ফাটিয়েছিল। তার ফলে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় চালান দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তাকে খালাস করাবার জন্যে হংসেশ্বর অনেক চেষ্টা করলেন, কলকাতা থেকে ভাল ব্যারিস্টার পর্যন্ত আনালেন। আদালতে তিনি প্রার্থনা করলেন, মোটা জরিমানা করে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হক। কিন্তু হাকিম তা শুনলেন না ছ মাস জেলের হুকুম দিলেন। তখন ব্যারিস্টার বললেন, ইওর অনার, এই গোপীরাম যদি জেলে যায় তবে শ্রীহংসেশ্বর রায়ের সর্বনাশ হবে। তাঁর বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ন বফেলো রাজমহিষী গোপীরামের বিরহে খাওয়া বন্ধ করেছে। না খেলে সে আগামী ক্যাট্‌ল শো-তে দাঁড়াবে কি করে? অতএব ইওর অনার দয়া করে মোটা জামিন নিয়ে আসামীকে এক মাসের জন্যে ছেড়ে দিন, প্রদর্শনী শেষ হলেই সে জেলে ঢুকবে। কিন্তু হাকিমটি অত্যন্ত একগুঁয়ে আর অবুঝ, কোনও আবদার শুনলেন না। তাই গোপীরাম এখন জেলে রয়েছে।

হংসেশ্বর পূর্বে বুঝতে পারেন নি যে মোষটা গোপীরামের এত নেওটা হয়ে পড়েছে। এখন তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। গোপীরামের সহকারীরা কেউ ভয়ে এগোয় না, কাছে গেলেই রাজমহিষী গুঁতুতে আসে। শুধু হংসেশ্বরকে সে কাছে আসতে আর গায়ে হাত বুলুতে দেয়, কিন্তু তিনি খুব সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়াতে পারলেন না।

হংসেশ্বরের এই সংকট শুনে বংশীধর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি তখন এক ছড়া সিংগাপুরী কলা মোষের নাকের সামনে ধরে লোভ দেখাচ্ছেন আর খাবার জন্যে অনুনয় করছেন, কিন্তু মোষ ঘাড় ফিরিয়ে নিচ্ছে।

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমি কোনও সাহায্য করতে পারি কি?

"অ। চকোরাকে বিয়ে করতে চাও এই তো?"
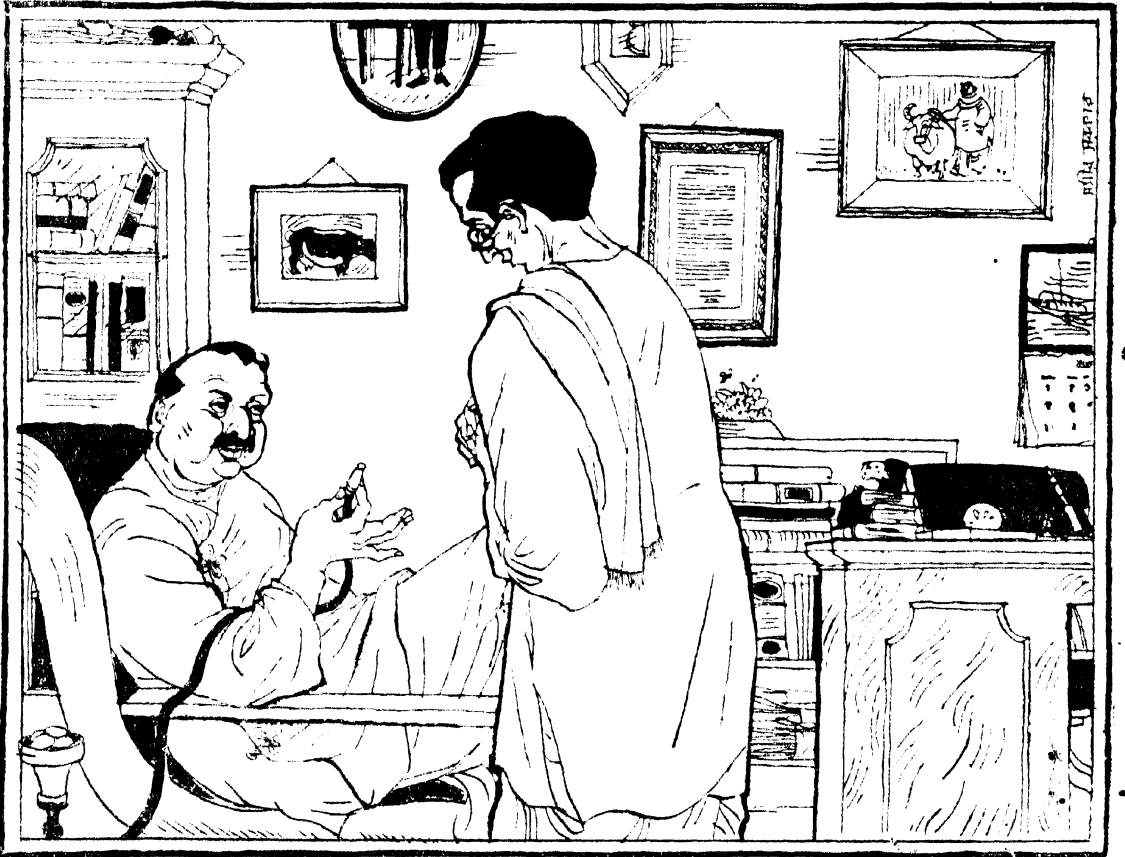
হংসেশ্বর খেঁকিয়ে বললেন, গুঁতো খাবার ইচ্ছে হয় তো এগিয়ে আসতে পার।

হঠাৎ বংশীধরের মাথায় একটা মতলব এল। হংসেশ্বরের কাছ থেকে সরে এসে সে গোপীরামের সহকারীদের সঙ্গে কথা কয়ে রাজমহিষী সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে নিল। তার পরদিন ভোরের ট্রেনে সে বর্ধমান জেলে গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার উদ্দেশ্য শুনে জেলার খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন।

রাধানাথপুরে ফিরে এসেই হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, ভাববেন না, আপনার মোষ যাতে খায় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

হংসেশ্বর বললেন ব্যবস্থাটা কি রকম শুনি? তুমি ওকে খাওয়াতে গেলেই তো গুঁতিয়ে দেবে।

—আমি নয়, আপনিই ওকে খাওয়াবেন। গোপীরামের সঙ্গে দেখা করে আমি সব হদিস জেনে নিয়েছি। ব্যাপার হচ্ছে এই।—মোষটাকে খাওয়াবার সময় গোপীরাম তার গায়ে হাত বুলিয়ে একটা গান গাইত। সেই গানটি না শুনলে রাজমহিষীর আহারে রুচি হয় না।

—এতো বড় অদ্ভুত কথা।

—আজ্ঞে, রুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ একেই বলেছেন কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্স। আপনাকে গানটি শিখে নিতে হবে।

হংসেশ্বর বললেন, গান-টান আমার আসে না। যাই হক, গানটা কি শুনি?

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমারও একটা কণ্ডিশন আছে। আগে কবুল করুন—মোষ যদি আগের মতন খায় তবে আমাকে খুব মোটা বকশিশ দেবেন।

—কি চাও তুমি? চকোরীর সঙ্গে বিয়ে?

—চকোরীর কথা পরে হবে। আপনার তিনখানা বাড়ি আমাকে দেবেন, ব্রাবোর্ন রোডের সেই আট-তলাটা, চৌরঙ্গীর ছ-তলাটা, আর সাদার্ন অ্যাভিনিউএর তেতলাটা।

—ওঃ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ছোকরা! ওই তিনটে বাড়ি থেকে মাসে আমার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আসে তা জান?

—আজ্ঞে জানি বইকি। কিন্তু ওর কমে তো পারব না কাকাবাবু। ওই আয় যখন আমার হবে তখন চকোরীর সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনার আর আপত্তি থাকবে না। আপনারও কিছু সুবিধে হবে, ইনকম ট্যাক্স আর প্রপার্টি ট্যাক্স কম লাগবে।

—তুমি এত বড় শয়তান তা জানতুম না। যাই হক, যখন অন্য উপায় নেই তখন তোমার কথাতেই রাজী হলুম। রাজমহিষী যদি পেট ভরে খায় তবে তোমাকে ওই তিনটে বাড়ি দেব। কিন্তু যদি না খায় তবে তুমি এ বাড়ির ত্রিসীমায় আসবে না।

—যে আজ্ঞে।

—কথা তো দিলুম, এখন গানটা কি শুনি?

—আজ্ঞে, শোনাতে লজ্জা করছে, গানটা ঠিক ভদ্র সমাজের উপযুক্ত নয় কিনা। কিন্তু অন্য উপায় তো নেই, আমার কাছেই আপনাকে শিখে নিতে হবে। গোপীরামের গানটা হচ্ছে—

'সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে,
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে।
ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয়, ঝমে ঝমে ঝঁর।

—ও আবার কি রকম গান?

—গানটার একটু ইতিহাস আছে গোপীরাম আগে দারভাঙ্গায় থাকত। সেখানে একটা পাগল বাঙালীদের বাড়ির সামনে ওই গানটা গাইত, তবে তার প্রথম লাইনটা একটু অন্যরকম—সোনামুখী বাঙালিনী পাগল করেছে। এই গান শুনলেই বাড়ির লোক দূরে দূরে করে পাগলটাকে তাড়িয়ে দিত। গোপীরাম গানটা শিখে এসেছে, শুধু বাঙালিনীর জায়গায় রাজভঁইসী করেছে। আপনি আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শিখুন, আজ রাত দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল চলুক।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় রাজী হয়ে হংসেশ্বর গানটা শেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বংশীধর বার বার সতর্ক করে দিল—রাজমহিষী নয় কাকাবাবু, বলুন রাজভঁইসী, আমায় নয়, বলুন হামায়। উচ্চারণটা ঠিক গোপীরামের মতন হওয়া দরকার। হাঁ, এইবার হয়ে এসেছে, আর ঘণ্টাখানিক গলা সাধলেই সুরটি আয়ত্ত হবে।

সকাল বেলা হংসেশ্বর বললেন, দেখ বংশী, রাজমহিষীকে খাওয়াবার সময় তুমি আমার পিছনে থেকে প্রম্‌ট করবে, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে গুঁতিয়ে দেবে না। আর একটা কথা—শুধু তুমি আর আমি থাকব, আর কেউ থাকলে আমি গাইতে পারব না।

বংশীধর বলল, ঠিক আছে, অন্য কারও থাকবার দরকারই নেই।

দু বালতি রাজভোগ বংশীধর রাজমহিষীর জন্যে বয়ে নিয়ে গেল, হংসেশ্বর তা গামলায় ঢেলে দিলেন। বংশীধর পিছনে গিয়ে বলল, কাকাবাবু, এইবার গানটা ধরুন।

মোষের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হংসেশ্বর মধুর স্বরে বললেন, লক্ষ্মী সোনা আমার, পেট ভরে খাও, নইলে গায়ে গত্তি লাগবে কেন, দুধ আসবে কেন, সেই মুলতানীটা যে তোমাকে হারিয়ে দেবে। হুঁহুঁহুঁ—

—সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে—

মোষ ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। বংশীধর ফিসফিস করে বলল, থামবেন না কাকাবাবু, বেশ দরদ দিয়ে বার বার গাইতে থাকুন, শেষ লাইনের সুরে ভুল করবেন না, ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয় ঝমে ঝমে ঝঁর—নিনি ধাপ্‌পা পা মা মাগ্‌গা গা রে সা।

তাল-মান-লয় ঠিক রেখে হংসেশ্বর তিনবার গানটা শেষ করলেন, তারপর চতুর্থবার ধরলেন—সোনামুখী রাজভঁইসী ইত্যাদি।

সহসা মোষ মাথা নামিয়ে গামলায় মুখ দিল। তার পর সেই নির্জন প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু মন্দ আওয়াজ উঠল—চবং চবং চবং। রাজমহিষী ভোজন করছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। পনরো দিনের মধ্যেই রাজমহিষীর বপু গজেন্দ্রাণীর তুল্য হল, গায়ে স্বল্প লোমের ফাঁকে ফাঁকে নিবিড় আলতা-কালির রঙ ফুটে উঠল, বিপুল পয়োধর থেকে প্রত্যহ পঁচিশ সের দুধ বেরুতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনীতে সে মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী এবং অন্যান্য প্রতিযোগিনীদের অনায়াসে হারিয়ে দিল। রাজ্যপাল তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন, কৃষিমন্ত্রী সন্তর্পণে এক ছড়া রজনীগন্ধার মালা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজমহিষী প্রসন্ন হয়ে সেই অর্ঘ্যটি গ্রহণ করে চিবুতে লাগল।

বংশীধরের নতুন আবদার শুনে হংসেশ্বর বললেন, আবার চাকরির শখ হল কেন? আমার বুকে বাঁশ দিয়ে তো যত পেরেছ বাগিয়ে নিয়েছ।

বংশীধর বলল, আজ্ঞে, একটা ভাল পোস্ট না পেলে যে আমার সেল্‌ফ-রেসপেক্ট থাকবে না। লোকে বলবে, ব্যাটা শ্বশুরের বিষয় পেয়ে নবাবি করছে।
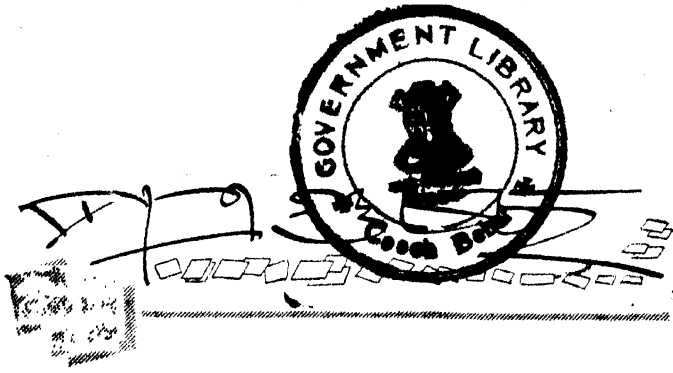
## প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

১

55|1 Old Baliganj 1st Lane
21|2|22.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। গান—মায় স্বরলিপি আমার স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি। তিনি তো পেয়ে খুব খুসি হয়েছেন।

লেখার অভ্যাস আমার এমনি ছুটে গিয়েছে যে একখানা ভালোরকম চিঠি লেখাও আমার দ্বারা আয়ত্তসাধ্য হয়ে উঠছে না। প্রথমত কলম ছুঁতেই অপ্রবৃত্তি হয়, তার পর কলম হাতে নিলেই দেখতে পাই আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। মন কলমের ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করতে চায় না। মনের এ অবস্থা বেশি দিন থাকলে আমি অবশ্য লেখক হিসেবে বাতিল হয়ে পড়ব।—তাই মনে ভাবছি একটা mechanical লেখা ধরব অর্থাৎ সেই জাতের লেখা যার ভিতর মনের খাটুনির চাইতে শরীরের খাটুনি বেশি।—শুনতে পাই যোগী আসন করে বসলেই তার চিত্তবৃত্তি আপনা হতেই রুদ্ধ হয়ে আসে। এই থেকে আশা করছি যে লেখকের আসনে বসলে আমার চিত্তবৃত্তি মুক্ত হয়ে লেখনীর মুখ দিয়ে ছুটে বেরবে। জানইত আমাদের নব spiritualityর মূলে আছে অশন ও বসন অতএব আসনও থাকা উচিত। ভেবো না আমি চালাকি করছি। আমার এতকাল বিশ্বাস ছিল যে দেহের সঙ্গে আত্মার একটা যোগাযোগ থাকলেও খাওয়া পরার উপর আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে না। এখন দেখছি এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। আজকাল আমি বদলে বদলে হরেক রকম কাপড় পরি—ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেরও বদল হয়। ইংরাজি কাপড় বহুকাল পরেছি কিন্তু তাতে মনে কি চরিত্রে ইংরেজ হতে পারিনি। কিন্তু লুঙ্গি পরলেই টের পাই মনটা অমনি রুমের বাদশা ওরফে তুর্কির সুলতানের লুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। খদ্দরের ধুতি আজও পরিনি। কিন্তু খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে দেখেছি, সেকে ও লেফাপায় মোড়বামাত্র বুকের রক্ত জল হয়ে যায়, অন্তরের লোহিতসমুদ্র প্রশান্ত-মহাসাগরে পরিণত হয়। সুরেন আমাকে একটি Gandhi Cap উপহার দিয়েছেন। সেটি এক ঘণ্টা কাল মাথায় তুলে রাখবার পর দেখি যে কান একেবারে কালা হয়ে গেছে। বাইরের কোনও বাণী আমার কানে আর প্রবেশ করছে না। রবিবাবু মহাশয়কে আমার বধিরতার সম্বাদ নিজ মুখেই দিয়েছি, কিন্তু তার জন্মের কারণ তাঁর কাছে চেপে গিয়েছি। কেননা Gandhi Cap শিরোধার্য করেছি শুনলে তিনি হাসতেন। "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ" এ কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ এবার হাতে হাতে পেয়েছি। আমি হচ্ছি লেখক। আজীবন আমার fools-cap নিয়েই কারবার অতএব Gandhi Cap ধারণ করবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। এখন থামা যাক্ কলম আর বেশি চালালে এ চিঠির নীচে বীরবল সই করতে হবে। বীরবলের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে প্রমথ চৌধুরীর লেখার ওজন কখনও বাড়বে না। তাই মনে করছি এবার এমন একটা লেখা ধরব যার ভিতর বীরবল আর হাত চালাতে পারবে না। Bergson হয়েছে আজকাল আমার ধ্যান ও জ্ঞান। এখন শুধু পড়েই চলেছি—আশা করছি আসছে মাসে লেখা শুরু করতে পারব। বার্গসন-দর্শনের উপর প্রবন্ধগুলো যদি ওৎরায় তাহলে বিশ্বভারতীতেও একবার গিয়ে সেগুলি পড়ে আসব। যতদূর সম্ভব বিষয়টাকে সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করব, কিন্তু মনে রেখো বর্গসনের দর্শন হচ্ছে বেজায় শক্ত। যার অন্তরে কবি ও দার্শনিকের মিলন হরগৌরীর মিলন না হয়েছে—তার কাছে বার্গসনের কোনও মূল্য নেই।

আমার শরীর যে আজও টিকে আছে এই তে-পাতা চিঠিই তার প্রমাণ।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

২

55|1 Old Baliganj 1st Lane
28|3|22.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দু-দুখানা চিঠির উত্তর পাওনা আছে। আজকাল visitorএর উপদ্রবে কোনও কাজ করা হয় না। প্রায় প্রত্যহই সকাল বেলাটা লোকের সঙ্গে ভদ্রতা করতে কেটে যায়। Laotze বলেছেন যে "তুমি যদি কারও কাছে না যাও ত সকলে তোমার কাছে আসবে"। কথাটা যে কতটা পাকা তা আজকাল টের পাচ্ছি। সে যাই হোক আজ সকালটা ফাঁক্ পেয়েছি তাই তোমাকে লিখতে বসেছি।

আমার শেষ চিঠিটা তোমার ভাল লেগেছে—শুনে খুসি। আমি দেখছি যা কিছু খাতির নদারৎ ভাবে লিখি, লোকে তারই খাতির করে। পাঠকের মন-জুগিয়ে লেখার প্রধান দোষ এই যে, তাতে পাঠকের মন-জোগানো যায় না। এর থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, যে লেখক যত ব্যক্তিগত তিনি তত সামাজিক। এই দিক থেকে দেখলে "সোঽহং" কথাটার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

আজকে দেখতে পাচ্ছ আমার কলমের মুখ দিয়ে দার্শনিক বুলি সব টপ্ টপ্ করে বেরচ্ছে। আমি হঠাৎ এতটা দার্শনিক হয়ে উঠলুম কিসে? দেদার ফিলজফি পড়ছি বলে নয়,—শ্রীমতী-র আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে। তিনি দুদিন আর্ট-সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুদিনই আমি উপস্থিত ছিলুম। শ্রোতারা একবাক্যে বল্লে যে, বক্তা চমৎকার বক্তৃতা করেন। তার পর টের পেলুম যে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোক বক্তৃতার এক বর্ণও বুঝতে পারেননি। সুতরাং শ্রোতাদের "চমৎকার" শব্দের অর্থ "অনর্গল"।

দর্শনশাস্ত্র-মার্গে যিনি জীবনে কিছুমাত্র ক্লেশ করেননি, তাঁর পক্ষে ইংরাজি 'চেক' বললেও অত্যুক্তি হয় না—আর বলা বাহুল্য যে সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই ফিলজফির ক, খ-র সঙ্গেও পরিচয় নেই।

এখন উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনতে চাও। সত্যসত্যই বেশ বলেন। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপে আজকাল যা বলা কওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে এঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। শুধু তাই নয় সে দেশে এ যুগে আর্টের যে সব নবশাখা বেরিয়েছে সে সকলের আবির্ভাবের মানসিক কারণ কি তাও তিনি জানেন। যদিচ বক্তা বরাবর আধ্যাত্মিক শব্দ ব্যবহার করেন, আমি তার বদলে মানসিক শব্দ ব্যবহার করছি। কারণ.

তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায় যে নব-আর্টের মূলে intellectual, spiritual নয়। আর্টকে analyse করে এক-এক দল তার এক-একটা উপাদান নিয়ে, তার উপরই তাঁদের আর্ট গড়ে তুলতে চাচ্ছেন। এর ভিতর পুরোনোর বিরুদ্ধে যতটা বিদ্বেষ আছে—নূতনের প্রতি ততটা অনুরাগ নেই। হতে পারে আমি ভুল বুঝেছি। কিন্তু ভুল যে করেছি এ কথা আমি সহজে স্বীকার করব না। কেননা আর্টের গায়ে যখনই কোনও টিকিট মারা হয়—সে টিকিট impressionistই হোক—আর expressionist হোক, cubistই হোক আর futuristই হোক, তখনই দেখতে পাওয়া যায় যে—আর্টের জাতিভেদের সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে—অর্থাৎ একটা নামের অথবা concept-এর অধীনে বহুকে আনবার চেষ্টা হচ্ছে অথচ এ ক্ষেত্রে ওরূপ classification অসংগত, কেননা প্রতি আর্টিস্টিক সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব আছে। আর্টের ইতিহাস natural history নয়, তার ভিতর genus, species-এর কোনও স্থান নেই। আসল কথা যা একাধারে impression ও expression নয় তা আর্ট নয়—আর futurism নাম শুনলেই Time-এর কথা মনে হয় আর Cubism-এর নাম শুনলেই Space-এর কথা মনে পড়ে। এ দুটো জিনিস যে দর্শনের অধিকারভুক্ত তা বলাই বাহুল্য। আমরা তাকেই আর্ট বলি যা Time and Space-এর বহির্ভূত। Cubism-এর কারবার শুনলুম তিন dimension নিয়ে। Solid geometryর উপরে যদি আর্টকে দাঁড় করাতে হয়, তবে আর এক ধাপ চড়ে Einstein-এর Theoryর উপরই তাকে দাঁড় করাইনে কেন? Fourth dimension-এর আর্ট যে spiritual হবে সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই।

আমার কথা ভুল বুঝো না। এই সব নতুন দলের ভিতর আর্টিস্ট থাকতে পারে এবং আমার বিশ্বাস আছে—আছে। আমি সুধু বলতে চাই যে এ-যুগের লোকের মনোজগতে দাঁড়াবার যে স্থান নেই সেই স্থান তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আশা করি মানুষ শীঘ্রই একটা নতুন কোনও বিশ্বাস খুঁজে পাবে। Clarte পেয়েছি। ব্যাপারটা কি জানো। মানুষের ভবরোগের light-cure.

আজ তবে বিদায় হই। দেখো যেন আমার বিদ্যে...কাছে ফাঁস করে দিয়ো না।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩

20 Mayfair, Baliganj
24/5/22.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আজকে বড় কাজে, ভাল করে চিঠি লিখতে পারব না সুধু দু-কথায় তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই "বিজলী"তে [illegible] কেন mail letter লিখছি।—

মধ্যে অনেক দিন লেখা ছেড়ে দিইছিলুম তার ফলে কলম ধরতে আর প্রবৃত্তি হত না। তার পর মনে করলুম লেখার অভ্যাসটা ঐ "বিজলীর" মারফৎ ফিরে আনি। যেভাবে পাঁচজনকে চিঠি লিখি সেইভাবে "বিজলী"তেও চিঠি লিখি। ও লেখা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। আর ঐ লেখার ফলে আমার হাতও খুলে গেছে। এ হপ্তায় সুধু "বিজলী"তে নয়, "আত্মশক্তি" ও "শঙ্খে"ও বীরবলের চিঠি বেরবে। মাসিকপত্র থেকে সাপ্তাহিক পত্রে অবরোহণ করবার অন্য কারণও আছে। আমি এদানিক নেহাৎ কুণো হয়ে পড়েছি। তাই মনে করলুম যে দেশের লোকের সংগে যোগাযোগ রাখবার ও একটা উপায়। হপ্তা হপ্তা সংবাদপত্রে লিখলে টাটকা টাটকা নিন্দা প্রশংসাও পাওয়া যাবে। এক দলের লোক আমার লেখা পড়ে যেমন খুসি হচ্ছেন, আর এক দলের লোক তেমনি চটছেন। তিনখানি কাগজে আমাকে নিয়মিত গাল দিচ্ছে অপরপক্ষে আবার তিন চারখানি, লেখার জন্য আমার কাছে উমেদারী করছে। এ ত গেল নিজের কথা —এসব লেখার আসল উদ্দেশ্য economics politics প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের একটু ভাবতে শেখানো। আমি দেশের লোককে এই শেখাতে চাই যে নিজে ভাবতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা। আমার কলম মানুষকে ঘুমতে দেয় না—তার খোঁচা খেয়ে লোকে জেগেই ওঠে। আর আসল জাগরণ হচ্ছে মনের জাগরণ—দেশের লোকের সে জাগরণের যদি একটু সাহায্য করতে পারি তাতে ক্ষতি কি?

এবার বিজলীতে "রূপম" কাগজের উপর এক হাত নিয়েছি। Indian art সম্বন্ধে অনেক কথা ক্রমে দেখছি বুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ Indian খুঁজতে খুঁজতে art এর কথা এরা ভুলে যাচ্ছে। তুমি শুনে খুসি হবে যে আর্ট সম্বন্ধে দু-কথা বলতে "বিজলী"র দলই আমাকে অনুরোধ করে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাঙালীর মন এখন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের আর কোনও দেশী সংবাদপত্রে ও বিষয়ে লেখার demand নেই। আমি ও প্রবন্ধে art-criticদের একটু "কড়কে" দিয়েছি। আশা করি ও লেখার কেউ প্রতিবাদ করবে, তাহলেই আমার যা বক্তব্য আছে তা আর একটু ফলাও করে লিখতে পারব।

এইবার "সবুজপত্রের" জন্য লিখতে সুরু করব। একটি প্রকান্ড প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছে আছে। জানি সে প্রবন্ধ তোমাদের ভাল লাগবে। তা যে কি? তা এখন বলব না।

গল্প অবশ্য লিখব কিন্তু আর মাস দুই পরে।—আজ তবে এখানেই শেষ করি। বাড়ির লোক স্নানের জন্য তাড়া দিচ্ছে। তোমার পদ্য দুটি আসছে সংখ্যায় সবুজ-পত্রে ছাপব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
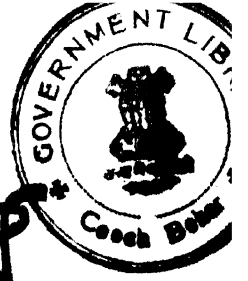
মজলিসে সে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। শান্তিপুরে অশান্তি হ'তেই পারে—কারণ শান্তিপুরে রক্তমাংসের মানুষেরা বাস করেন এবং তাঁদের শান্তিপুরেও—অন্নাভাব বস্ত্রাভাব অর্থাভাব প্রভৃতি যাবতীয় অভাব দেশের অন্যত্র যেমন আছে—তেমনই আছে। শান্তিপুরে অশান্তি নয়—শান্তির নামে অশান্তি। মানুষের স্বভাবের মধ্যে চিরকালের একটি নৈয়ায়িক আছেন। কোন সমস্যা উপস্থিত হলেই আপন-আপন ন্যায়বোধ অনুযায়ী সমস্যার আলোচনায় দুই বা ততোধিক পক্ষে ভাগ হয়ে গিয়ে বিনা ফিয়েই প্রথমে ওকালতি—পরে ক্ষেত্রবিশেষে দাঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, বিশ্বের শান্তির কথা উঠেছিল একান্ত নিরীহভাবে—তা থেকে প্রচণ্ড তর্কে যে প্রায় যুদ্ধ উপস্থিত হল।

কথাটা তুলে ফেলেছিল—ডাক নাম বেজো—ভাল নাম অশোক; ছোকরার মেজাজটা মিষ্টি এবং প্রকৃতিতে বেশ রসিক। কিন্তু বদমেজাজ যেমন সবারই থাকে, ওরও আছে। গেল মাসের আন্তর্জাতিক কাগজ পড়ছিল, পড়তে পড়তে বন্ধ ক'রে বললে—সাধু! সাধু! আচ্ছা লিখেছেন। একেবারে যাকে বলে—ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়া।

পানু—ওর ছোট ভাই—সে বেশ পাণ্ডা লোক—কলেজ ইউনিয়নের খুঁটি—শরীরটা অসুস্থ, তা না হলে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াতো, সে বললে—কে? কাকে?

—শচীন সেন গুপ্ত। অ্যামেরিকার পর্দা ফাঁক ক'রে দিয়েছেন। অ্যামেরিকাই যে যুদ্ধবাজ প্রমাণ করে দিয়েছেন। একেবারে সব ফ্যাকচুয়াল ডাটা দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাশিয়া অ্যাটম বোমা থাকতেও যুদ্ধ চায় না। তার শান্তি-কামনা জেনুইন। এমন কি হাঙ্গেরীর দাঙ্গা সম্বন্ধেও প্রমাণ ক'রেছেন যে, ওটা নিতান্তই কৃত্রিম—একদল লোককে ঘুষ দিয়ে তৈরী করা। রাশিয়া ত্বরিতগতিতে অল্প রক্তপাত ক'রে দমন না করলে বিশ্বযুদ্ধ হ'তে পারত। পড় না কলম্বো সম্মেলন প্রবন্ধটা; প্রায় তিরিশ পাতা।

সিধু—অর্থাৎ সিদ্ধার্থ তৃতীয় ভাই বললে—থাম থাম। আসল কথা বললে চটে যাবে তুমি।

—চটবই তো, নিরপেক্ষ লোক সম্পর্কে যা তা বললে নিশ্চয় চটব।

—বেশ! যুগান্তরের বিবেকানন্দবাবুর অ্যামেরিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়েছ? প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে বলেন নি তিনি প্রকৃতই শান্তিকামী?

সন্তু সব থেকে বড় জাঠতুতো ভাই—গভর্নমেণ্টের গেজেটেড অফিসার এবং বয়স যা তা থেকে অনেক বিজ্ঞ কথা কয়—সে খবরের কাগজ পড়ছিল—এবার মুখ তুলে বললে—ওরে বাপ! যত মুনি তত মত! ও হ'ল অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। এক অন্ধ হাতীর পায়ে হাত বুলিয়ে বললে—হাতী থামের মত গোল। একজন লেজ নেড়ে দেখে বললে—দূর, দড়ির মত।

সন্তুর ছোট ভাই কটু—ইঞ্জিনীয়ার কিন্তু বড় বদমেজাজী। তার দাড়ি বড় শক্ত—কামাতে বড় কষ্ট হয়। সে কামাচ্ছিল—এবার ক্ষুরটা বাঁ হাতে ধরেই দু' হাত নেড়ে প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল—তবে আর কি সন্তু-বাবুর লজিক অনুসারে শান্তি হ'ল হাতী। পৃথিবীতে রাজ্যে রাজ্যে হাতী পুষলেই শান্তি এসে যাবে। এবং বোধ করি সন্তুবাবুর হিরো জহরলাল দেশে দেশে সেই কারণেই হাতী উপহার পাঠাচ্ছেন।

তারপর বললে—ভারী দোষ তোমার। এমন ক'রে বিজ্ঞ কথা ব'লে কথা চাপা দাও! অথচ শান্তির দরকার বোধ হয় আদি-যুগ থেকে একাল পর্যন্ত আজই সবচেয়ে বেশী। জীবন একেবারে থাক্ হয়ে গেল! আর ওই শান্তি শান্তি ক'রে যে আন্দোলন তার সম্পর্কেও আলোচনা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আই কল ইট এ ধাপ্পাবাজী—

বেজো ফোঁস ক'রে উঠল—হোয়াই?

দাঁতে দাঁত টিপে কটু একেবারে বিস্ফোরিত হয়ে গেল—হো-য়া-ই?

—ইয়েস; হোয়াই?

—সার—দেন—মানে তা হলে যারা দেশে রক্তাক্ত বিপ্লবের নামে ধেই ধেই ক'রে নৃত্য ক'রে—হাতের মুঠি বন্ধ ক'রে বাতাসে ঘুষি মেরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে চেঁচিয়ে এক গা ঘেমে—দু গেলাস জল খেয়ে জলের বাজারে দুর্ভিক্ষ লাগায়—তারা কেন সেখানে দলে দলে? হোয়াই? টেল মি।

—টেল মি?

—ই—য়ে—স। টেল মি।

—গণঅভ্যুদয় আর সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ এক হল?

—হ্যাঁ হে—রক্তপাত যে দুইয়েই। রক্তপাত মানেই অশান্তি! ও তো গরু কাটা পাঁঠা কাটা। বড় আর ছোট। এবং এ বলে ওটা অন্যায়, ও বলে এটা অন্যায়। অ্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত লাগাও দাঙ্গা। বন্ধ করবে তো দুটো-ই কর, তবে বুঝি। যে পাঁঠা গরু মাছ কিছু খায় না—কিছু হত্যার পক্ষপাতী নয়—তার কথা শুনতে পারি। অন্যের নয়, টিকি থাকলেও নয়, নুর থাকলেও নয়।

বেজো এবার বলে—আপনাদের কাকা কালেলকর তো একেবারে নিরামিষ, গান্ধী-পন্থী—তিনি এবার কলম্বো সম্মেলনে গিয়ে কি বলেছেন পড়ুন!

—কি বলেছেন?

—বলেছেন, শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে আমার এতদিন ভ্রান্ত ধারণা ছিল—

বাধা দিয়ে ইঞ্জিনীয়ার বললে—কাকা কালেলকরকে নমস্কার। কিন্তু তিনি একথা যদি বলে থাকেন—তবে তাঁর কথা আমি মানি না। নো—নেভার। ইউ সি—কারুর দোহাই আমার কাছে চলবে না। নো।

—আপনার চারটে হাত গজিয়েছে।

—তোমার শিঙ গজিয়েছে বুঝতে পারছি—এবার গুঁতিয়ে পেট ফাটিয়ে রক্তপাত করে তুমি শান্তি শান্তি করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বেড়াবে।

—এই এই! কি হচ্ছে তোমাদের? ঘরে ছুটে এসে ঢুকল ভেটকী—মানে সন্তু কটুর কনিষ্ঠা সহোদরা; বাপের আদরের দুলালী এবং ইঞ্জিনের সিগন্যালের মত বাবার সিগন্যাল। ভেটকী আসা মানেই বাবা আসছেন।

—মাই গড! চুপ করহে সব। দ্যাট ক্যাণ্টাঙ্কারাস অটোক্র্যাট ইজ কামিং। স্টপ!

—উঁহু! ভেটকী বললে—অটোক্র্যাট নয়। দি গ্রেটেস্ট ডেমোক্র্যাট; সুইট ওল্ডম্যান দাদু।

—দাদু?

—হ্যাঁগো ত্রিকাল দাদু। দি ভেটার্ন স্টোরী টেলার!

সব অশান্তি মুহূর্তে মিটে গেল। আনন্দরোল উঠল—দাদু দাদু গল্প গল্প!

স্থূলকায় নধর ভুঁড়ি প্রসন্ন কান্তি ত্রিকাল দাদু এসে ঘরে ঢুকলেন। কি গো! শান্তি শান্তি করে অশান্তি কেন এত?

—ছেড়ে দিন ওকথা। ওসব আপনি বুঝবেন না। শান্তির নামে ইণ্টার-ন্যাশানাল পলিটিকস! আন্তর্জাতিক রাজনীতি। ওসব যাক আপনি গল্প বলুন।

ত্রিকালদাদু গল্প বলেন। ওই তাঁর পেশা। বাংলা দেশের অতীতকালের এক-খানি মূল্যবান কাঁথাশিল্পের শেষ নমুনার মত সেকালের গল্পবলিয়েদের বোধ করি শেষ জন। ভাগবত কথকদের মত, আসর করে গল্প কথকতা করতেন, গল্পটি বলতে শুরু করলে বেতালপঞ্চবিংশতির মূল গল্পের সঙ্গে দশ বিশ পঁচিশটি অন্য গল্প বলে তারপর মূল গল্পটি শেষ হত। মূল গল্পটি সুতো বাকীগুলি ফুলই বল মণিমুক্তোই বল—তাই। কিন্তু সে আর শোনে কে? সে দেশ কাল অতীত হয়েছে। তবুও এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর অনেক দিনের। এইসব ছেলেদের সূতিকাগারের সামনে গোটা পরিবারের আসর পেতে গল্প বলে-ছেন। গল্প সবই প্রায় জানা; কিন্তু জানা গল্পও ত্রিকালদাদুর মুখে পুরনো হয় না, সুগায়কের কণ্ঠের গানের মত। প্রতিবারই নতুন। আরও গুণ আছে ত্রিকালদাদুর, তিনি গল্প বানাতেও পারেন। তবে একালের তরুণ তরুণী বা এ কালের সমস্যা নিয়ে নয় এবং টেকনিকও তাঁর একালের লেখক-দের মত নয়; ও তাঁর নিজস্ব। সে টেকনিকে গল্পগুলো কোকটেলস না টেল না অ্যানেক-ডোট না সর্ট স্টোরী না উপন্যাসধর্মী সে বলতে পারেন সমালোচকেরা—এ বাড়ির শ্রোতারা তার বিচার করতে চায় না, ওরা খাঁটি ভোজনরসিক খাইয়ের মত খাঁটি গল্প-শুনিয়ে লোক—ওরা জিভে টোকার মেরে হাত চেটে পাত চেটে পেটভর্তি করে খাওয়ার মত গল্প শোনে। ত্রিকালদাদু মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এসে প্রায় উদয় হন—অনির্দিষ্ট তিথিতে আগন্তুক অতিথির মত। শুধু একটি ঠিক থাকে—সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত যে বারেই আসুন, রাত্রিটা থেকে যান। আর রবিবার এলে রাত্রে থাকেন না এমন নয় তবে কখনও কখনও সন্ধ্যের আগেই চলে যান। অর্থাৎ গল্প একটা না শুনিয়ে যান না। প্রয়োজন মত মণিমালার কারবার করেন—আবার একটি মণি বা মুক্তো কি পান্না এও তাঁর আছে—সেটিকে সকলের মাঝখানে নামিয়ে দেন। একটি গল্পেই একদিনের পালা শেষ করে বলেন—গল্প হল সত্যি যে বলে সে মিথ্যেবাদী, যে শোনে সে হল ভাবগ্রাহী জনার্দন। জয় জনার্দন।

একটি টিপ নস্য নিয়ে ত্রিকালদাদু বললেন—তোদের তো বেশ জমে উঠেছিলরে। বড় বড় কথা। তার মধ্যে গল্প কেন? শান্তি অশান্তি নিয়ে গভীর তত্ত্ব ভাই; বেজো ভাই মধ্যে মধ্যে বলে—কল্যাণ কল্যাণ। আবার বলে মূল্য মূল্য মানে মূল্য কি? তা—

বাধা দিয়ে বোন ভেটকী বললে—ও নিয়ে মীমাংসা রাশিয়া করুক, আমেরিকা করুক, নেহরু পঞ্চশীল নিয়ে ছুটে বেড়াক; তা নিয়ে সম্মেলন হোক—যারা বক্তৃতা করেন করুন, বেজো চেঁচাক—শান্তি চাই, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক বলে, পৃথিবীতে শান্তি আসুক; কিন্তু আমাদের এই রবিবারের সকালের মেজদা আর বেজোর তকরারের অশান্তির একমাত্র উপায় তোমার গল্প। গল্প বল। আমি সুরু করে দিই—কি বল?

—বহুত আচ্ছা। তাই দে শুরু করে।

ভেটকী শুরু করলে মিহিগলায়—সে এক মস্ত বড় বন। ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়—পাতা পড়লে কুলো হয়। কিন্তু তাই বা করে কে? জনমানব নাই। থমথম করছে অন্ধকার; সনসন করছে বাতাস, ঝরঝর করে ঝরছে পাতা, আর কলকল করছে পাখী, সুরে বেসুরে—মানে কেউ গাইছে গান—কেউ করছে মারামারি, আর উঠছে জন্তুর কোলাহল, হরিণ ছুটছে দড়বড় করে, বাইসন—

বাধা দিয়ে ত্রিকালদাদু বললেন—কি—কি?

—বাইসন! বাইসন! মানে ভয়ঙ্কর বুনো মোষ।

—আচ্ছা।

—নেকড়েরা চেঁচাচ্ছে—গণ্ডার জলা ঘাসের মধ্যে ঘুরেছে, দুটোতে হয়তো লড়াই লাগিয়েছে। হাতীর দল মড়মড় করে ডাল ভাঙছে। মধ্যে দল বেঁধে কুক দিচ্ছে; দুটো চারটে দাঁতাল ক্ষেপেছে; চীৎকার করে ছুটছে, লড়াই করছে, বনের ওই হরিণ-টরিনগুলো পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে।

ত্রিকালদাদু বললেন—বহুত আচ্ছা। কিন্তু এইবার ভাই বাস্ করো। এইবার আমি ধরব।

হেসে ভেটকী বললে—কিন্তু মনে রেখো সে বনে মানুষ কোথাও নাই। এমন কি ধারেকাছেও নাই। না-মুনি, না ঋষি, না ব্যাধ, না মৃগয়ারত রাজা রাজপুত্র, না কাঠ কুড়ুনী, না ডাইনী, না পরী কেউ না। বুঝেছ?

ত্রিকাল দাদু বললেন—না। নাই। সে বনে নানান পাখী, নানান জন্তু—কিন্তু হাতী পর্যন্ত। ব্যাস। বাঘ নাই সিংহ নাই।

—মানে।

—গল্পের মানে নাই। বনে মানুষ নাই তুমি বলে দিয়েছ কিন্তু বাঘ সিংহ আছে তা বলনি। তার আগেই গল্পটা ধরে নিয়েছি। মানে—তখন বিধাতা পুরুষ মাটির পৃথিবী গড়েছেন গাছপালা লাগিয়ে-ছেন, পাখী ছেড়েছেন, হরিণ বুনোমোষ নামটা কি বললি ভাই?

—বাইসন।

—হ্যাঁ বাইসন গড়েছেন, নেকড়ে গণ্ডার হাতী গড়েছেন। বাঘ গড়েন নি, সিংহ গড়েন নি, মানুষ, বনে কেন, পৃথিবীর কোথাও নেই মানে গড়েন নি। বনেও নেই—যেখানে সমতল পৃথিবী সবুজ ঘাসে ভরা—নদী বইছে কুলকুল করে—সেসব জায়গায় শুধু ঘাস, আগাছা—আর তার মধ্যে কীট-পতঙ্গ আর ছোট ছোট জানোয়ার খরগোস, ইঁদুর, টিকটিকি গিরগিটী, সাপ, ব্যাঙ।

ইঞ্জিনীয়ার বেজোর দিকে তাকিয়ে বললে—ছুঁচো গড়েছেন।

বেজো তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—বাঁদর গড়েছেন।

—হ্যাঁ। রাত্রে ছুঁচো কিচকিচ করে—দিনে বাঁদরেরা খ্যাক খ্যাক করে। আর কোলাহল কোলাহল কোলাহল। কলহ কলহ কলহ। ক্ষুধার খাদ্য নিয়ে কলহ, আশ্রয়ের স্থান নিয়ে কলহ, লজ্জা করিসনে ভাই ভেটকী, মেয়েদের উপর অধিকার নিয়ে কলহ; কলহ থেকে যুদ্ধ, তর্জন থেকে গর্জন, প্রচণ্ড গর্জন, প্রবল আর্তনাদ; পৃথিবীর বুক পদভরে থরথর করে কাঁপে সপ্ত স্তরের আকাশলোকে নীলাভ শান্তি-সুষমা ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে; বিধাতাপুরুষের দুয়ারে আছড়ে গিয়ে পড়ে ঝড়ের সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। বিধাতা বসে মৃদু মৃদু হাসছিলেন খুব আত্মতৃপ্ত হয়েই, বুঝেছ না, অর্থাৎ কি সৃষ্টিই করেছি আমি। এবং ভাবছিলেন এইবার একছিলম দা-কাটা তামাক মৌজ করে সেবন করে নাসিকায় সর্ষপ তৈল সিঞ্চন করে বেশ একটি লম্বা দিবানিদ্রা দেবেন। বেশ পরিশ্রম হয়েছে—অনেক তৈরী করেছেন তো! মানে উৎপাদন।

এখন মেশিন চালু হয়ে গেছে দিব্যি, ফুল থেকে ফল হচ্ছে, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে ফের অঙ্কুর, ওদিকে পতঙ্গে পাখীতে পাড়ছে ডিম, ডিমে দিচ্ছে তা, ডিম ফেটে হচ্ছে বাচ্চা, জন্তুর হচ্ছে ছানা; সে তো ভাই ইঞ্জিনীয়ার তোদের কলের ব্যাপার, টিপে দিল্লি বিজলীর বোতাম ঘুরতে লাগল কল—এপাশে দিলি তুলোর গাঁট—ওপাশে বেরিয়ে এল কাপড় হয়ে।

ইঞ্জিনীয়ার বললে—এত সোজা নয় ত্রিকালদাদু, একটা কলে হয় না—

—হলরে হল। এখানেও কি ব্যাপার একটা রে? অনেক। ক্ষিদের কল—কামের কল—তার আবার উপকল ধর গিয়ে গন্ধের কল, রূপের কল শব্দের কল অনেক কলরে। সে ইঞ্জিনীয়ারিং হয়তো তোর মাথায় ঢুকছে না; বোঝাতে গেলে গল্প মোড় ফিরে টালীগঞ্জ যাবার কথা—টালায় চলে যাবে। শুধু ইশেরায় বলি ভাই—নাতবউ সাজগোজ করে গন্ধতেল দিয়ে কেমন নতুন ছাঁদে খোঁপা বাধে, আবার পাউডার মাখে—সেন্টেও ফোঁটা দুই গায়ে যখন ঢালে তখন নিচেরতলা থেকে মন তোর উপরতলায় ছোটে না? যাক্ ওকথা ওইখানেই থাক।

এখন যা বলছিলাম। বিধেতাপুরুষ হাই তুলতে তুলতে বলতে যাচ্ছিলেন—মিছেরাম তামাক সাজ বেটা! হঠাৎ ওই প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলেন; হাই তুলতে গিয়ে তোলা হল না—হাঁ করে চোখ ছানাবড়া বসে রইলেন হাতের তুড়ি হাতে রইল, নধর ভুঁড়ির ভেতর ওই শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল।

—অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে দাদু। বললে সন্তু।

—তুই ভাই নেহাত একালের রসিক; সবকালের নয়।

—কেন?

—তা হলে ওটা অশ্লীল ভাবতিস না। ওর মানেটা ঝলিক খেলা উঠত ভাবতিস। তাতেই তো শব্দে না কি?

বেজো বললে—ব্র্যাভো ত্রিকালদাদু! ওয়াণ্ডারফুল!

দাদু বললেন—বেঁচে থাক ভাই! এক-সঙ্গে তুই শান্তি শান্তি বলেও চেঁচাস—আবার ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জয় রক্তনিশান বলতে পারিস—তুই ঠিক বুঝেছিস। তারপর শোন। মিছেরাম হুঁকো হাতে আসতেই বিধাতা বললেন—ও কি রে?

—কি?

—ওই চীৎকার? সর্বনাশ বিষ্ণুর নিদ্রা-ভঙ্গ হবে যে! মহাদেবের গাঁজার মৌজ ভাঙলে রক্ষে থাকবে না।

মিছেরাম বললে—তোমার কীর্তি। ছিষ্টি করেছ—সেখানে মারামারি-কামড়াকামড়ি-রক্তারক্তি এ ওকে ধরে খাচ্ছে—ও এর গর্ত গুহা কেড়ে নিচ্ছে—এ ওর পরিবার নিয়ে টানাটানি—তা নিয়ে খুনজখম; আবার কোন কারণ নেই এ ওকে দেখলে গর্জন করে ওকে আক্রমণ করছে—এই ব্যাপার! মানে তোমার ছিষ্টি কিসের জন্যে করেছিলে জানি না—

—চোপরও বেকুব! কিসের জন্যে? আনন্দের জন্যে।

—তা—আনন্দ কোথায় বলতো ঠাকুর?

—কেন? শান্তিতে?

—তবে—এত অশান্তি যেখানে সেখানে আনন্দ কোথায় বল? তোমার ছিষ্টির মানে পালটে গেছে। ব্যাকরণে তোমার ভুল হয়েছে।

বিধাতা একবার তাঁর স্টুডিয়োর বাইরে এসে শো রুম মানে পৃথিবীর দিকে চারটে মুখ চারদিকে ফিরিয়ে বারোটা চোখে—মানে দেবতাদের তিনটে চোখ—তিন চারে বারোটা, বারোটা চোখে দশ দিক দেখে নিলেন। তারপর বললেন—নিয়ে আয় তো ক্ষিতাপ-

ভেঙে মরুদবোমের বেশ একটা ভাল তাল্। নিয়ে আয়!
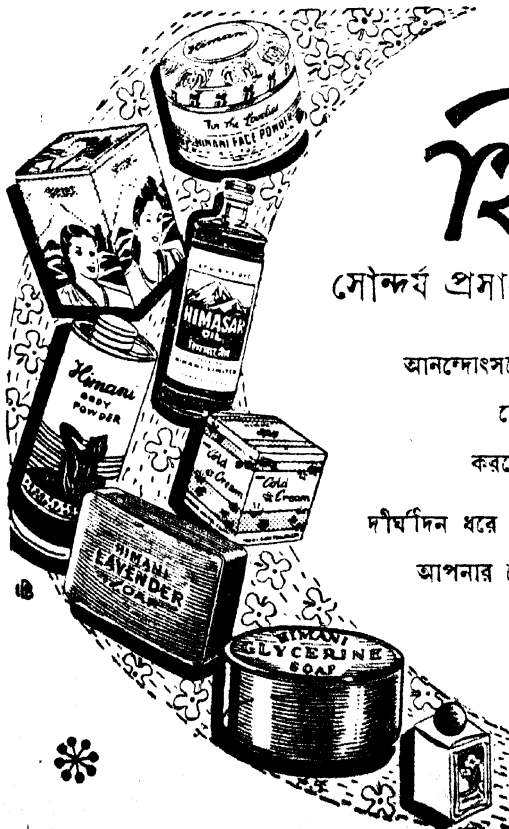
মিছেরাম বললে—আবার উপদ্রব ছিষ্টি করবে?

—মিছেরাম!

—বড্ড রেগেছ তুমি। তোমার কচ্ছ খুলে গেছে। এখন থাক।

—মূর্খ! সৃষ্টি প্রেরণা! নিয়ে আয় উপাদানের তাল।

মিছেরাম আর আজ্ঞা লংঘন করতে সাহস করলে না। সেও রাগ করে একতাল উপাদান এনে থপ্ করে ফেলে দিয়ে বললে—ওই নাও!

বিধাতা গড়তে বসে গেলেন। গড়লেন—এক জীব। গতি দিলেন—বিক্রম দিলেন—শক্তি দিলেন—সব চেয়ে ধারালো নখ দিলেন—দাঁত দিলেন, তেজ দিলেন, ক্রোধ দিলেন, মহাগর্জন দিলেন—তারপর রঙ দিলেন—উজ্জ্বল হলুদ রঙ—তার উপরে—পাশেই পড়েছিল—পোড়া তামাকের গুল—কি খেয়াল হল—চার আঙুলে সেই তামাকের গুলের কালি নিয়ে টেনে দিলেন ডোরা দাগ! তারপর গন্ধ। গায়ে দিলেন—বিকট উগ্রগন্ধ। অর্থাৎ যাকে দেখলে ভয় হয়, যার গর্জনে ভয় হয়, যার গায়ের গন্ধে ভয় হয়—যার তেজে অভিভূত হতে হয়, যার শক্তির আঘাতে মৃত্যু হয় মুহূর্তে, তেমনি এক জীব। অন্য জীব দূরের কথা, হাতীর মাথাও যার দাঁতে নখে ভেঙে যায় তেমন ভয়ংকর বলশালী।

জীবটা হুংকার দিয়ে উঠল—কো-হুম? অর্থাৎ কো-হং! হুম—গর্‌র? অর্থাৎ কিংকরব?

বিধাতা বললেন—তুমি ব্যাঘ্র। জীবেদের মধ্যে সব থেকে বলশালী বিক্রমশালী হলে তুমি। জীব জগতে বড় কলহ—সকলে শক্তি-মদে মত্ত হয়ে মারামারি করছে। তুমি সব চেয়ে বলশালী—এদের তুমি শাসন করবে। তোমার ভয়ে সব শান্ত থাকবে। যাও।

বাঘ মারলে এক লাফ। এবং সঙ্গে সঙ্গে দিলে হুংকার। পড়ল এসে ঝপ করে বনের মধ্যে এবং পড়বি তো পড়্ এক দাঁতাল হাতীর মাথায়!

তারপর সে এক প্রলয় কাণ্ড। চীৎকারে এত দিন আকাশলোকের সপ্তস্তরের শান্তি ব্যাহত হচ্ছিল—এবার দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল! সর্বনাশ! এর চারটে স্তর পরেই অর্থাৎ ষোড়শ স্তরে গোলকে বিষ্ণু এবং তার চার স্তর পরেই রুদ্র।

ব্রহ্মা তাকিয়ে দেখলেন—হাতী গণ্ডার নেকড়ে হরিণেরা পরস্পরের সঙ্গে কলহে দ্বন্দ্বে রক্তারক্তিতে যে ভীষণতার এবং যে নির্মমতার সৃষ্টি করেছিল বাঘ একা তার থেকে বহুগুণে বেশী ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তার শক্তি তার তেজ তার বিক্রম প্রচণ্ড হিংসায় সে প্রায় রুদ্র তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছিলেন শাসন করতে; কিন্তু শাসনের মধ্যে রক্তশোষণের আস্বাদনে সে মহাহিংস্রক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অনুপরমাণুতে বিচিত্র সংযম ও শৃংখলায় প্রলয়ংকরী মহাশক্তি মনোহর ছন্দে নৃত্যরতা মনোরমা রূপ ধারণ করে আনন্দ উল্লাসকে পরমানন্দে শান্ত ও সমাহিত করে মানস সরোবরের মত অক্ষয় অমৃত হ্রদে পরিণত করেছেন—যে অমৃতের কল্যাণেই সৃষ্টির স্থায়িত্ব; সেই শক্তি জীব-দেহের মধ্যে চেতনা পেয়ে গতি পেয়ে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে শুধু লোভে ক্ষোভে কামে ক্রোধে ধ্বংসের উল্লাসে রঙ্গিনীর মত তাণ্ডব নৃত্যে নিজেকে ক্ষয় করতে শুরু করেছে। থাকবে না। এ সৃষ্টি থাকবে না। কিন্তু চিন্তার অবসর নাই। অবিলম্বে বাঘকে দমন করতে না পারলে গেল সৃষ্টি গেল। বসে গেলেন তিনি আবার সৃষ্টি করতে। বাঘকে দমন করতে হবে। উপাদানের তাল নিয়ে চলতে লাগল তাঁর হাত। অত্যন্ত ক্ষিপ্র-বেগে। অভ্যাস বসে—অভ্যস্ত হাতে আবার তৈরী হ'ল এক চতুষ্পদ। বাঘের চেয়েও শক্তিশালী অবয়বে আকৃতিতে তার থেকেও ভীষণরূপে গাম্ভীর্যশালী। নখর দন্ত তার চেয়েও প্রখর। গলায় তার পুঞ্জ পুঞ্জ কেশর, চোখে তার অগ্নিময় দ্যুতি—কণ্ঠে তার বজ্রনাদী গর্জন। বললেন—তুমি সিংহ। তুমি বাঘের স্বৈরাচারকে দমন করে পশুরাজত্ব লাভ কর। যাও! সিংহ বনভূমে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলহ কোলাহল আরও প্রবল হয়ে উঠল। লোক পিতামহ বুঝলে সিংহ এবং বাঘে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে। দমন কার্য চলছে। যাক, এবার শান্তি ফিরবে। ওঁ শান্তি!

হঠাৎ যেন সব টলমল করে উঠল। কি হ'ল? তাকিয়ে রইলেন—পৃথিবীর বুকের উপর রূপময়ী প্রাণশক্তির দিকে। কীট-পতঙ্গ থেকে ব্যাঘ্র সিংহ পর্যন্ত জীবকুলের মধ্যে যে রূপ ব্যক্ত হয়েছে তার উপর।

দেখলেন জীবদেহের মধ্যে সেই শক্তি ভয়ংকরতর আক্রোশ উল্লাসে—অট্টহাস্য করছে। সমগ্র জীবকুলকে পৃথকভাবে না দেখে অখণ্ডরূপে দেখলে—মুহূর্তে বুঝা যায় যে, নিজের দেহে নিজেই সে দংশন করছে, এবং সেই রক্ত পান করে সে উন্মাদিনী আত্মঘাতিনী হতে চায়। সে কি বিভীষিকাময়ী মূর্তি জীবনময়ী মহাশক্তির। দেখলেন—নেকড়ে যা করেছিল—গণ্ডার যা করেছিল জলে কুম্ভীর যা করে, বাঘ যা করছে, সিংহও তাই করছে। প্রচণ্ড চীৎকারে নখ দন্তের শস্ত্রে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে।

ঠিক এই সময়ে শ্যামাভ জ্যোতিতে ব্রহ্ম-লোকের রক্তাভ শোভে বিচিত্ররূপে মনোহর এবং স্নিগ্ধতর হয়ে উঠল। উদ্বিগ্ন মধুর কণ্ঠের বাণী ধ্বনিত—পিতামহ!

—বিষ্ণু!

আবির্ভূত হয়েছেন বিষ্ণু।—হ্যাঁ পিতামহ। এ কি হচ্ছে? আনন্দ কোথায় গেল? আকাশের স্তরে স্তরে লোকে লোকে, লোক লোকান্তর থেকে আনন্দ যে পৃথিবীতে সূর্যাস্তের সঙ্গে আলোকের বিলীন হওয়ার মত বিলীন হয়ে যাচ্ছে!

—কি করব বিষ্ণু। আনন্দের বশে—চেয়েছিলাম আকারহীন অবয়বহীন—আনন্দময়ী শক্তিকে সৃষ্টি বৈচিত্র্যে পৃথিবীকে বর্ণে গন্ধে শব্দে স্পর্শে অরূপকে রূপে প্রকাশ করব। অব্যক্তকে রূপে রসে অপরূপে ব্যক্ত করব। কিন্তু এ কি হ'ল? চেয়ে দেখ সৃষ্টির দিকে!

বিষ্ণু বললে—দেখেছি পিতামহ! তাই তো বলছি এর উপায় করুন!

উপায় তো একমাত্র ধ্বংস বিষ্ণু! সে উপায় তো আমার হাতে নয়। সে তো রুদ্রের হাতে। তিনি নিশ্চয় জাগছেন। বলতে বলতে পিতামহ ব্রহ্মার চোখেও দুটি বিন্দু জল এসে গড়িয়ে পড়ল—অবশিষ্ট উপাদান পিণ্ডের উপর।

—আপনি কাঁদছেন পিতামহ?

—মমতায়! এ যে আমারই সৃষ্টি বিষ্ণু! ধ্বংস হয়ে যাবে?

—না। সৃষ্টি আপন গতি পেয়েছে। সে গতিতে সে আপনি চলবে। যেটুকু অসম্পূর্ণ আছে সেইটুকু আপনি শেষ করুন। খানিকটা উপাদান তো এখনও অবশিষ্ট রয়েছে দেখছি। ওটুকুতে আর কি করবেন করুন—তারপর আপনার দায় শেষ।

—আবারও সৃষ্টি করব? কি করব? শক্তিমানের পর মহাশক্তিমানের সৃষ্টি করে অশান্তি দেখ। আবার সৃষ্টি!

—না ক'রে তো উপায় নেই আপনার। উপাদান যতক্ষণ অবশিষ্ট, ততক্ষণ আপনাকে কাজ করতেই হবে। কে জানে এ অশান্তি অসম্পূর্ণতার জন্য কি না? সম্পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণুর দিকে। ওদিকে হাত চলতে লাগল। গড়লেন নকল করলেন—বিষ্ণুর মূর্তির দুই হাত দিয়ে আর দুই হাত দিতে যাচ্ছেন কিন্তু—; এ কি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ব্রহ্মা। বিষ্ণু বললেন—কি হল?

ব্রহ্মা বললেন—আর উপাদান নেই। সব নিঃশেষ। মাত্র একটি বিন্দু অবশিষ্ট আছে—তাতে তো আর দুটি হাত হবে না।

—না হোক। চার হাত হলে ও দেবতা হয়ে যেত। তোমার মাটির পৃথিবীতে ওকে মানাতো না। ও-ও যেতে চাইত না থাকতে চাইত না। স্বজাতির প্রথম এবং

[ অবশিষ্ট অংশ ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]
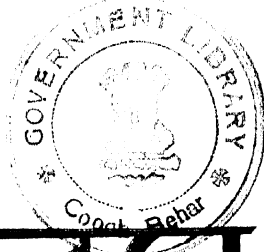
**প্যা**রিসের এক সর্ববিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশ-খানেওলা' বা ভোজন-রসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী। অন্ততঃ ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয়,—দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক।

প্যারিস-গুর্মের কনস্তান্তিনোপল্ (কনস্টান্টিনোপল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন-রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ঐ মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়ে-ছিলেন তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তাঁর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন।

সে ভোজের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে কখনো ইয়োরোপীয় সংগীত শোনেনি তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন। তাঁর হজ্ সমাপন হয়েছে— তিনি তো আর সিন্সোফিয়া মসজিদ দেখতে কনস্তান্তিনিয়া আসেননি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কি রকম খেলে?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব', অপূর্ব। এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনো খাইনি। তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষ লাভ করেছে।'

এবম্প্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু......'

সবাই বললে, 'কিন্তু......?'

'পদ ছিল বড্ড বেশী।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ যখন বলে 'ওঃ, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—'

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভালো রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেশে পৌঁছবেন কি করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনা কালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমার বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দ-সই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও'?

কাগজে পড়েছি ডাচেস্ অব উইনজার কখনো সুপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকী পদ মানুষ ভালো করে খাবে কি করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভালো পাচক নেই বলে আমি পারত-পক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করিনে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্গী'—তদাভাবে উস্টার সস্ + চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদাভাবে চীনা চিলি সস্—তদাভাবে এক চিমটি লাল লংকা গুঁড়ো + প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভালো করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোল-মরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন)। এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা উত্তেজক মাত্র।

তবে রেস্তরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তরাঁর তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহ-স্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা আস্ত স্নব্। রেস্তরাঁয় সে আশংকা নেই।

এবং ভালো রেস্তরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্ল্ দোৎ (table d'hote) বা ফিক্সট্ দামে ফিক্সট্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু' টাকাতে আছে, (১) সেলেরি সুপ, (২) রোস্ট মাটন, (৩) পুডিং; আড়াই টাকাতে, (১) সেলেরি সুপ, (২) বয়েল্ড্ ফিশ্, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং এবং তিন টাকাতে আছে, (১) সেলেরি সুপ, (২) বয়েল্ড্ ফিশ্ (৩) রোস্ট চিকেন্, (৪) পুডিং কিংবা আইস ক্রীম।

এই তাব্ল্ দোৎ বাৎলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডোমকে বাঁশ-বনে ভালো বাঁশ বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কি হয়! ঐ ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন ম্যাডাম তখনো মনস্থির করতে পারেন নি কোন সুপ তার বিম্বা-ধর ছুঁয়ে কম্বু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা ঠাকুরের পাইস হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয়, আর কখনই বা টক, সে তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমা-দের সময়ে পাইস্ হোটেলে তাব্ল্ দোৎও থাকতো। ঐ জিনিস সে দিন রান্না হয়েছে লাটে; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে রেস্তরাঁ যদি আবার উন্নাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁৎকে উঠলেন, কিন্তু ঐটেই হয়তো খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন 'কি বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দা ভো ভিয়েনো-ওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই,

'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কি করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ঐ বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে—'ভিনার স্নিৎসেল্', অর্থাৎ ভিয়েনা-পদ্ধতিতে রান্না 'স্নিৎসেল্'। 'স্নিৎসেল্' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরিজিতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাঙলায়, 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনো হদিস ওতে নেই। শুয়োরেরও স্নিৎসেল্ হয়, চীনদেশে হয়তো কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনি-ঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তা হলে গণ্ডারের স্নিৎসেল্ খেতেন।

আমি ইংরিজি জানিনে। মুসলমান মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরিজিতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ্' না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়োরের মাংস এমন কি ঐ মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেনুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করিনি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তও করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজানাতে খেলে পাপ হয় না'। কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলো, অজানাতে খেলেও স্বাদে ভালো লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরিজি রেস্তরাঁ বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু' একজন বিলেত-ফের্তা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি বয় যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফের্তাকেই এ-ক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা ইংলিসস্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে যে-সব খাবার সংকামনা নিয়ে সে রেস্তোরাঁয় এসেছিল!

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসের' নির্ঘণ্ট যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্ট্ করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করবো না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করবো। সুখাদ্যের জিল্টিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী রান্না বললে কি বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালী রান্না এক রকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাঙলার রান্নাতে এন্তের তফাং। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউণ্ড ইন্ এভ্রি পার্ট্, এক্-সেপ্ট্ ইন্ দি হর্ন'—ঠিক সেই রকম পশ্চিম বাঙলার রান্নাতে 'শুগার ইন্ এভ্রি থিং এক্সেপ্ট্ ইন রসগোল্লা!'

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরী মোগলাই'ও প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিণ্ডির শেখরা দিল্লীর কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলাই' রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চাঁদনী চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতায় এসে পৌঁচেছে:

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে;—

(১) আফগানী নান্‌। কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান-রুটির (ফার্সীতে 'নান্‌' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্‌-রুটি' তাই হুবহু পাঁউ-রুটির মত, কারণ পর্তুগীজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্‌ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মত ক্রিস্‌প্‌। (ঐ দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্য 'চীজ্‌ এ্যান্ড বিস্‌কিট্‌'ও খাওয়া যায়)। এই নান্‌ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্‌প্‌ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু'চার দিন খাওয়ার পরই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

ক। (২) তন্দুরী মাছ। মাঝারী সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুৎরো করে, মশলাদি মাখিয়ে তন্দুর-(আভ্‌ন্‌)-এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালো মত রান্না হয়নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ। আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবী-দের এই 'তন্দুরী ফিশ্‌' অবদানটি মুক্ত-কণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্‌। এতে প্রায় কোনো মশলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ জিনিস যত খুশী খান অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান সহযোগে খাবেন—ছুরিকাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিস্‌রী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটু খন গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কুফ্‌, নরগিস্‌ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরুল্লিখিত এক, দুই এবং তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাত্তাই মোগলাই রেস্তরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনো কোনো রেস্তরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

খ। এবার ভেজার পালা

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও, এবং মটর পোলাও। ফিশ পোলাও অল্প রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশী। যাঁরা ঝাল খেতে ভালোবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্‌ৎ' — অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণত মটনের হয়)—খাবেন। দিল্লী-ওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্‌ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরো ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাক-ওলা-গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফজ্রী, রওগন জুশ, শাহী কুর্মা, এবং লাটের মাল চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি তো রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিম্বা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পেলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিম্বা চিকেন কারি খাই। কারণ মটন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গোবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না, গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সব সময়ই ওটা আলাদ করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কি হয়?

এক ইংরেজ স্নাব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারো উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কি চাই। নিশ্চয়ই সুপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপর আঙুল নামালেন অনেকখানি নিচে। ভাবলেন মাছ, মাংস আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সুপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসীরা বাইশ রকমের সুপ রাখে।

খেয়েছে। এখন কি করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুডিঙ্‌ কিম্বা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথ-পেক্‌!!
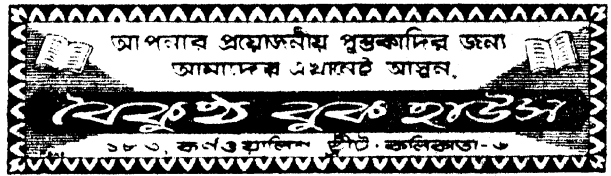
হারিয়ে গিয়েছে প্রতিভা সেনের সেই ছোট্ট হাতব্যাগটি, রোজই অফিসে যাবার সময় আর অফিস থেকে ফেরবার সময় যে হাতব্যাগটি প্রতিভা সেনের হাতে ঝুলতো, কিংবা কোলের উপর পড়ে থাকতো। রঙীন চামড়ার ছোট্ট হাল্‌কা হাতব্যাগ, তার উপর এমবস করা ছোট্ট একটি সাদা তাজমহল। এই তো মাত্র তিন মাস আগে লখনউ-এ বেড়াতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ কুটির শিল্প প্রদর্শনীর একটা স্টল থেকে ব্যাগটাকে কিনেছিল প্রতিভা।

ছুটির পর অফিস থেকে বের হয়ে ডাল-হাউসি-বালিগঞ্জ ট্রামে ভিড় ঠেলে ওঠবার পরেও ব্যাগটা হাতেই ছিল। মনে পড়ে প্রতিভার, ট্রামটা মোড় ফিরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ভিতর দিয়ে যখন চলতে শুরু করলো, তখনও এই ব্যাগটা প্রতিভার কোলের উপর ছিল।

নতুন আংটিটা আঙ্গুলে বড় বেশি ঢিলে হয়েছে; তাই আঙ্গুল থেকে প্রায় পড়-পড়ও হয়েছিল একবার। আংটিটাকে আঙ্গুল থেকে খুলে নিয়ে ব্যাগের ভিতরে কখন ভরেছিল প্রতিভা, তাও স্পষ্ট করে মনে পড়ে। ট্রামটা তখন ত্রিকোণ পার্ক পার হয়ে ছুটে চলেছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই। গড়িয়া-হাটার মোড়ে নামবার সময় ব্যাগটা হাতে ছিল বলে মনে পড়ছে না। মনে হয়, ভুল করে ট্রামের সীটের উপরেই ব্যাগটাকে রেখে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে প্রতিভা।

উদ্বিগ্ন হয়ে ট্রাম ডিপোতে একবার ফোনও করেছিল প্রতিভা। কিন্তু জানা গেল, কোন হারানো লেডিজ-ব্যাগ ডিপোতে জমা হয়নি।

তবে তো কোন সন্দেহই নেই যে, কেউ একজন ব্যাগটাকে পেয়েছে আর নিয়ে চলে গিয়েছে। ব্যাগের ভিতরে নতুন আংটিটা আছে। সৎ মানুষের হাতে পড়লে আংটি-সুদ্ধ ব্যাগটাকে পাওয়া যাবে। আর, কোন অসতের হাতে পড়লে সবই যাবে। আংটিটা ফেরত আসবে না, ব্যাগটাও না।

আক্ষেপ করে প্রতিভা; ব্যাগের ভিতরে আংটিটাকে না রাখলেই ভাল হতো। কারণ, আংটিটা ছাড়া ঐ ব্যাগের মধ্যে আর যে-সব বস্তু আছে, এই পৃথিবীর দুটি মানুষ ছাড়া আর কারও কাছে সে-সব বস্তুর কোন দাম নেই। দুটো চিঠি, আর একটা ফটো। প্রতিভার নামে অফিসের ঠিকানায় জয়ন্ত রায়ের যে চিঠিটা কাল এসেছে, সেই চিঠি। জয়ন্তর কাছে প্রতিভার লেখা যে চিঠিটা আজই পোস্ট করবে বলে ভেবে রেখেছিল প্রতিভা, সেই চিঠি। আর প্রতিভা সেনের নিজের একটি হাফ পোস্ট-কার্ড সাইজের ফটো।

কিন্তু সত্যিই ব্যাগটা কোন সৎ লোকের হাতে পড়েছে, এমন সৌভাগ্যও যে আশা করতে পারা যাচ্ছে না। যদি তাই হতো, তবে কি এই তিনদিনের মধ্যেও কোন ভদ্র-লোক এসে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে যেতেন না? অন্তত চিঠি দিয়ে তো জানাতেন যে, অমুক ঠিকানায় লোক পাঠিয়ে আপনার ব্যাগ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। কার ব্যাগ, এবং কোন্ অফিসে সে কাজ করে, তার পরিচয় তো

ব্যাগের ভিতরের একটি চিঠির ঠিকানাটা দেখলেই বুঝে ফেলা যায়।

যারই হাতে পড়ুক ব্যাগটা, সে কিন্তু প্রতিভা সেনের জীবনের সব চেয়ে বেশি মায়াময় ও গোপন-করা একটা ঘটনার পরিচয় জেনে ফেলেছে। আশ্চর্য নয়, প্রতিভা সেনেরই পরিচিত কোন মানুষ, কিংবা কোন আত্মীয়স্বজনের হাতে ব্যাগটা পড়েছে। কি বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল! হাওড়ার শিবপুরে থাকে, এবং অনেক টাকা হাতে নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে নেমেছে যে জয়ন্ত রায়, তার সঙ্গে ডালহাউসি স্কোয়ারের মুর এণ্ড মরিসনের হেড অফিসের প্রতিভা সেনের অল্পদিনেরই চেনা-শোনা ও মেলা-মেশার ইতিহাস ভালবাসার আবেগে মধুর হয়ে উঠেছে, এই ঘটনা যদি কোন পরিচিত বা আত্মীয় মানুষ জানতে পারেন, তবে? বিয়েটা হয়ে যাবার পর জেনে ফেললে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিয়ের আগে জেনে ফেললে যে লজ্জারই ব্যাপার হয়ে যায়। যদি বিয়ে শেষ পর্যন্ত না হয়, তবে তো ঘটনাটা প্রতিভার জীবনের একটা বিদ্রূপের, একটা গ্লানির গল্প হয়ে আত্মীয়দের আর পরিচিতদের মুখে মুখে ঘুরবে। শুধু লজ্জায় নয়, ভয়ও পায় প্রতিভা।

এই ডোভার লেনে কাকার যে বাড়িতে থাকে প্রতিভা, সে বাড়িতে মুখ-চোরা মেয়ে বলে প্রতিভার যে একটু দুর্নামগোছের সুনামও আছে। কাকিমা বিয়ের কথা বললেই প্রতিভা শুধু একটা লাজুক হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্যি বিয়ে করতে চায় কি না চায় মেয়েটা, কাকিমা স্পষ্ট করে কিছু বুঝতেও পারেন না। কাউকে বিয়ে করবে বলে মনে মনে কোন অনুরাগের কাণ্ড করে বসে আছে কিনা, তাও বোঝা যায় না। সেই মেয়ে যদি হঠাৎ এভাবে ধরা পড়ে যায়, যদি কোন লোক বাড়িতে এসে কাকিমার হাতেই হারানো ব্যাগটাকে দিয়ে যায়, তবে বাড়ির লোকের বিস্ময় দেখে প্রতিভাকে বিব্রত হতে হবে বৈকি। কেউ কেউ হয়তো বিরক্ত হয়ে একটা মন্তব্য করে বসবেন, ভাল করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ কোথাকার কার সঙ্গে এসব কাণ্ড করে বসলো প্রতিভা?

অফিস কামাই করে তিনদিন ধরে এক অদ্ভুত প্রতীক্ষার আকুলতা নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে প্রতিভা সেন, যদি কেউ ব্যাগটা ফেরত দিতে আসে! কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। কেউ আসে না। আর বুঝতে কিছু বাকিও থাকে না। কোন চেনা মানুষের হাতে নয়, কোন অপরিচিত সৎ মানুষেরও হাতে নয়; নিতান্ত এক অসৎ লোভী মানুষের হাতে পড়েছে ব্যাগটা; এবং সেই অসৎ এতক্ষণে প্রতিভা সেনের জীবনের প্রথম অনুরাগের অদৃষ্টলিপি, সেই দুই চিঠিকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আবর্জনার মত পথের ধুলোর উপর ফেলে দিয়েছে। আর, আংটিটাকে বাজারে বেচে দিয়ে টাকা গুনছে আর হাসছে।

ব্যাগ ফেরত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হয়। ধরা পড়ে যাবার যে ভয় করেছিল প্রতিভা, সে ভয় যখন আর নেই, তখন আর ক্ষতিই বা কিসের? আংটিটা গেল; একশো দশ টাকার ক্ষতি মাত্র। কিন্তু জয়ন্ত রায় আর প্রতিভা সেনের জীবন যে ভাল-বাসার বন্ধন চিরকালের মত স্বীকার করে নেবার জন্য তৈরী হয়েছে, সে ভালবাসা তো ঐ দুটি চিঠি মাত্র নয়। সে ভালবাসা যে প্রতিভা সেনের ভাবনায় নীরব কলরবের মত বাজছে। সে ভালবাসা যে জয়ন্ত রায়ের জাগা চোখেও স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত রায়কে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

সেই কথাই তো ঐ চিঠিতে লিখেছিল জয়ন্ত রায়। আর দেরি করতে চায় না জয়ন্ত। জয়ন্তর ইচ্ছা, এই মাসেই যে কোন একটি দিনে বিয়ে হয়ে যাক। এই ইচ্ছার কথাটুকু লিখতে গিয়ে জয়ন্তর কলম যেন একটা অভিমানের বিদ্রোহ ঢেলে দিয়েছে।—এখনও যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে প্রতিভা, আমাকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হতে পারবে না, তবে স্পষ্ট করে সে-কথা জানিয়ে দিও।

কি অদ্ভুত সন্দেহ! উল্টো সন্দেহ। এতদিন যে প্রতিভা সেনের মনেই এই সন্দেহ ছিল; পৃথিবীতে এত সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে থাকতে জয়ন্ত রায়ের মত মানুষ কেন প্রতিভা সেনের মত মেয়েকে ভালবেসে ফেলে?

এই মুর এণ্ড মরিসনের অফিসেই ম্যানেজারের কেবিনে জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে একদিন প্রতিভা সেনের দেখা। একটা ফাইল নিয়ে ম্যানেজারের কেবিনে প্রতিভাকে সেদিন উপস্থিত হতে হয়েছিল। সেই যে দেখা, সেই দেখার বিস্ময় আর অনুভব আর ক'দিনের আলাপ ও পরিচয়ের পর যেদিন আরও নিবিড় হয়ে প্রতিভা সেনের আর জয়ন্ত রায়ের মুখ রঙীন করে দিল, সেদিনের পর আর কেউ কোনদিন কারও কাছে মনের ইচ্ছা গোপন রাখতে পারেনি।

মুখোমুখি দেখা কমই হয়েছে; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বরং মুখে যে-কথা বলতে গেলে নিঃশ্বাসটা লজ্জা পেয়ে বিচলিত হয় সে-কথা চিঠির পাতায় অনায়াসে লিখে দিয়ে জয়ন্তর ভালবাসার মন সুরভিত করে দিয়েছে প্রতিভা। জয়ন্তের চিঠির কথাগুলিও যেন ভাল-বাসার আবেদনময় ঝংকার।

একবছরও হয়নি, কিন্তু আর কি-ই বা জানবার আছে? নিজের মনের অনুভবের সত্য তো আর অস্বীকার করতে পারা যায় না। তাই, জয়ন্তর শেষ চিঠির উত্তরে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে প্রতিভা। —বেশ তো, এই মাসের যেদিনে তোমার ইচ্ছে, সেদিনেই বিয়ে হয়ে যাক; আমার একটুও আপত্তি নেই।

কিন্তু, কি বিশ্রী ব্যাপার; এই চিঠিটাই হারানো ব্যাগের সঙ্গে হারিয়ে গেল? চিঠির উত্তর যেতে দেরি দেখে জয়ন্ত বোধ হয় ভেবেছে, প্রতিভা সেন নিশ্চয় জয়ন্তর ভাল-বাসার দাবী প্রত্যাখ্যান করতে চায়।

আজই অফিসের টিফিনের ছুটির সময় জয়ন্তর চিঠির উত্তর আবার নতুন করে লিখতে হবে। আর একটি দিনও দেরি করা উচিত নয়।

(২)

টিফিনের সময় হবার আগেই, অফিস ঘরে নিজের টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে যখন মনে বড়-বড় যোগ-বিয়োগ করছে প্রতিভা সেন, তখন ডাকপিয়ন এসে অতি ক্ষুদ্র একটি রেজিস্টার্ড পার্শেল প্রতিভা সেনের টেবিলের উপর রাখে। প্রতিভারই নামে এই পার্শেল এসেছে

খুলতেই প্রতিভা সেনের নিবিড়কালো চোখ দুটো যেন একটা ভয়াতুর বিস্ময়ের ছোঁয়ায় চমকে কেঁপে ওঠে। সেই আংটিটা এসেছে। শুধু আংটিটা; সেই সংগে ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা কয়েকটা কথা। —পার্শেলের উপর লেখা, প্রেরকের নাম-ধাম সবই ভুয়ো জানবেন। আপনার আংটিটা ফেরত দেওয়া উচিত বলেই ফেরত দিলাম।

এই ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা চিঠিতে লেখকের কোন ভুয়ো নামও নেই, শুধু একটা শূন্যতা।

কিছু বুঝতে পারে না প্রতিভা। একটা বিশ্রী রহস্য বলে মনে হয় বলেই ভয় পায়। এ কেমন অদ্ভুত ধরণের সৎ লোক? অগোচর রাজ্যের এই হিতাকাঙ্ক্ষী? আংটিটা, যেটার দাম আছে, সেটাই ফেরত দিল, আর যেগুলির কোন দামই নেই, সেই চিঠি দুটো আর ফটোটা, সেগুলি ফেরত দিল না?

একটা নতুন উদ্বেগ; নতুন অস্বস্তি। মনে হয়, ভয়ানক ধরণের কোন অসতের হাতে পড়েছে ব্যাপারটা। প্রতিভা সেনের জীবনের ভালবাসার এই ঘটনাকে নিয়ে একটা জঘন্য কৌতুকের খেলা খেলতে চায়; নইলে দুটি মানুষের ভালবাসার দুটি চিঠিকে, আর এক নারীর ফটোকে আটক করে হাতের কাছে কেন ধরে রাখলো লোকটা?

বিশ্রী একটা ছায়া চোখের উপর যেন কামড় দেবার জন্য বার বার কাছে ছুটে আসছে। মুখ কালো করে বুকের ভিতরে আর্ত নিঃশ্বাসের দুরু-দুরু শিহরটা চাপতে চেষ্টা করে প্রতিভা। এবং, এই আতঙ্কের মধ্যেই আবার হঠাৎ শান্ত হয়ে গম্ভীর মুখে ভাবে; অন্তত এইটুকু বোঝা গেল, একশো দশ টাকা দামের একটা আংটির সোনার জন্য লোকটার মনে কোন লোভ নেই। অসৎ লোক না হতেও পারে।

ভাবতে গিয়ে বোধহয় প্রতিভা সেনের মনের যুক্তি-বুদ্ধির ছন্দও এলোমেলো হয়ে যায়। চুপ করে বসে এই রহস্যের বুকটাকে যেন কল্পনা করতে চেষ্টা করে প্রতিভা। সত্যিই কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নয় তো?

টিফিনের সময় পার হয়ে যায়; জয়ন্তর চিঠির উত্তরে নতুন করে চিঠি লেখা আর হয় না। কি আশ্চর্য, এই রহস্যটা এসে প্রতিভা সেনের ভালবাসার জীবনের চরম ইচ্ছার ঘোষণাকে অন্তত আজকের মত বোবা করে রেখে দিল। কালও প্রতিভার চিঠি না পেয়ে জয়ন্ত রায় একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে সন্দেহ করবে, প্রতিভা সেনের ভালবাসার মুখরতা হঠাৎ মুখ বন্ধ করলো কেন?

যাক্ গিয়ে, কাল চিঠি দিলেই তো চুকবে; সবই জানবে আর বুঝবে জয়ন্ত, কেন শেষ চিঠির উত্তর পেতে একটু দেরি হয়ে গেল।

(৩)

অফিসের ঠিকানায় আবার একটা চিঠি এসেছে; সেই অগোচর রাজ্যের এক অদ্ভুত হিতাকাঙ্ক্ষীর বেনামী চিঠি। বেশ বড় করে লেখা লেফাফাবন্ধ একটি চিঠি।

চিঠি পড়ে প্রতিভা। পড়া শেষ হয়। সংগে সংগে প্রতিভা সেনের নিবিড় কালো চোখের তারা থেকে যেন একটা দুঃসহ জ্বালার সাদা ছাই উড়তে থাকে। এই জ্বালা নিজের মনের উপর একটা তপ্ত ধিক্কারের জ্বালা। আর এই ধিক্কার যেন নিজেরই মনের একটা অন্ধতার উপর ধিক্কার। একি ভয়ানক বিদ্রুপের গান গাইছে হিতাকাঙ্ক্ষীর চিঠিটা!

...জয়ন্ত রায়ের কাছে লেখা আপনার চিঠিটা আমি নিজেই ডাকে দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দিইনি। কেমন যেন মনে হলো! সন্দেহ হলো, আপনি ভুল করছেন না তো? তাই খোঁজ নিলাম, জয়ন্ত রায় কে, এবং কেমন মানুষ?

......খোঁজ নিয়েই বড় ভয় পেয়েছি। তাই

বাধ্য হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি। জয়ন্ত রায়কে বিয়ে করা আপনার উচিত নয়। জয়ন্ত রায় মোটেই সচ্ছল অবস্থার মানুষ নয়। অনেক টাকা নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে নেমেছে জয়ন্ত রায়, একথা নিছক মিথ্যা কথা। জয়ন্ত রায় রেস খেলা ছাড়া আর কোন কাজই করে না।

......জয়ন্ত রায় এর আগে তিনবার বিয়ে করেছে এবং পত্নীত্যাগ করেছে। জয়ন্ত রায়ের নামে অনেক পাওনাদারের মামলা চলছে। শিবপুরে যে বাড়িতে থাকে জয়ন্ত, সে বাড়ি জয়ন্তর বাড়ি নয়। এবং ভদ্রলোকের থাকবার বাড়িও নয়। ওটা জুয়ার আড্ডা।

......আমার কথা যদি অবিশ্বাস করেন, তবে অন্তত একবার হাওড়া পুলিশের কাছে খোঁজ নেবেন। তখন বুঝতে পারবেন যে, আমি একটি কথাও মিথ্যা বলিনি, এবং বাড়িয়েও বলিনি।

বাড়ি ফিরে গিয়ে এই চিঠি হাতে নিয়ে কাকিমার কাছে কেঁদে পড়ে প্রতিভা। এবং ঠিকই, পরদিনই হাওড়া পুলিশের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এসে কাকা বললেন—খুব বেঁচে গিয়েছে প্রতিভা। জয়ন্ত রায় একটা অমানুষ।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে কাকাও যেন একটা বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন। —তব, ভাবতে ভাল লাগছে জয়া, এরকম সৎ নিঃস্বার্থ ও হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষও আছে।

কাকিমা—কার কথা বলছো?

কাকা—এই যে, চিঠি লিখেছেন অথচ নাম দেননি যে ভদ্রলোক!

কাকিমা—আংটিটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাকা—আশ্চর্য মানুষ। দেখতে ইচ্ছে করে।

প্রতিভা সেনেরও যে দেখতে ইচ্ছে করে! দুদিন পরে একলা ঘরে বসে নিজেরই মনের ভাবনার মধ্যে এই সত্য অনুভব করে প্রতিভা। এমন করে আড়ালে থেকে অকারণে প্রতিভা সেনের জীবনের এত বড় উপকার করে দিল যে, সে মানুষকে চোখে দেখবার জন্য মন মাঝে মাঝে বড় বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এই সত্য অনুভব করেও কোন লজ্জা পায় না প্রতিভা।

জয়ন্ত রায় একবার টেলিফোনে কথা বলেছিল। প্রতিভা সেন শুধু একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করে দিয়েছে। কোন কথা বলতে চাই না।

অফিসে বসে কাজ করতে করতেই আনমনা হয়ে যায় প্রতিভা। টেলিফোনে কি সেই মানুষটির গলার স্বর কোন দিন শুনতে পাওয়া যাবে না? কাছে এসে দেখা দিতে যদি বাধা থাকে, থাকুক। না আসুক। কিন্তু টেলিফোনে কথা বলতে কি বাধা থাকতে পারে? একবার শুধু বললেই তো হয়, আমি আপনার উপকার করেছি। সেই মুহূর্তে প্রতিভাও তার মনের সব ব্যাকুলতা গলার স্বরে ঢেলে দিয়ে বলে দিতে পারবে, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু কে জানে, প্রতিভা সেনের কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ নেবারও লোভ আছে কিনা ভদ্রলোকের মনে?

কিংবা, হয়তো প্রতিভা সেনের মত মেয়েকে ঘৃণাই করেন ভদ্রলোক? ভালবাসতে গিয়ে সত্য মিথ্যার বোধ হারিয়ে ফেলে, ভাল-মন্দ ঠাহর করতে পারে না যে মেয়ে, তাকে ঘৃণা করে আর ভয় না করে পারবেনই বা কেন?

কিন্তু ভদ্রলোকেরও কি আর একটা সত্য জানতে ইচ্ছে করে না? জানতে পারলে যে নিজেই সুখী হবেন, তাঁরই চিঠির পুণ্যে প্রতিভা সেনের জীবন একটা মরণ থেকে বেঁচে গিয়েছে। জয়ন্ত রায়কে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভদ্রলোকের চিঠির অনুরোধ জয়ী হয়েছে। প্রতিভা সেনের অন্ধতা ঘুচে গিয়েছে।

জানতে পেরেছেন নিশ্চয়। যিনি এত খোঁজ নিতে জানেন, তিনি কি আর এটুকু খোঁজ না করে আছেন? কিন্তু কই? এই সামান্য কথাটাও তো লিখলেন না যে, দেখে সুখী হলাম, জয়ন্ত রায় নামে দুর্ভাগ্যটা আপনার জীবনের ক্ষতি করতে পারলো না।

জানতে কি ইচ্ছে হয় না ভদ্রলোকের, প্রতিভা সেন আবার কোন ভুল করলো কিনা? সে মানুষের মনে এমন ইচ্ছে দেখা দেবে না, হতেই পারে না। মনে হয়, আড়ালে থেকেই খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু খোঁজ নিতে হলে যে প্রতিভা সেনকে দেখবারও দরকার হয়ে পড়ে; সত্যিই কি, এই অদ্ভুত ভদ্রলোক আড়ালে থেকে প্রতিভাকে দেখছেন?

প্রতিভার মনের একটা সন্দেহ; কিন্তু সন্দেহটা যেন প্রতিভার মুখের উপর আলো ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে। না; সন্দেহ কেন হবে? বিশ্বাস করতেই যে ইচ্ছে করে, প্রতিভার আসা-যাওয়ার উপর, প্রতিভার চোখের চাহনির সব কৌতূহলের উপর, প্রতিভার মুখের সব লজ্জামাখা শিহরণগুলির উপর চোখ রেখে আনাগোনা করেন ভদ্রলোক। প্রতিভার জীবনকে ভুলের ভয় থেকে আগলে রাখবার জন্য একটা মায়াময় শাসন, একটা সতর্ক উপকার প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ একটু দূরে দূরে থাকে বোধ হয়। হয়তো মাঝে মাঝে খুব কাছাকাছি এসে প্রতিভার চোখের উপর দিয়েই চলে যায়। তার ছায়া প্রতিভার গায়ের উপর পড়ে, তার নিঃশ্বাসের বাতাস প্রতিভার গায়ে লাগে; কিন্তু তাকে চিনতে পারে না প্রতিভা। চেনবার উপায় নেই। কিন্তু কোনদিন কি চিনে ফেলতে পারা যাবে না?

যেমন অফিসের শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে, তেমনি বাড়িতে, ঘরের নিভৃতে চুপ করে বসে থাকা অলস অবসরতার মধ্যে, ভাবনাগুলি যেন প্রতিভা সেনের মনের ভিতরে ছটফট করতেই থাকে। নিজেরই উপর রাগ করে প্রতিভা। এটাও যে একটা নতুন আপদ হয়ে উঠলো। দূরে ছাই! ভাবতে ভাবতে শেষে হিস্টিরিয়ায় না ধরে বসে!

আবোল-তাবোল চিন্তার গ্রাস থেকে রেহাই পেতে চায় প্রতিভা। কিন্তু বুঝতেই পারে না, কি চেষ্টা আর কেমন চেষ্টা করলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। নিজের উপর আরও রাগ হয়, যখন বুঝতে পারে যে, মনটাই ভাবনাগুলিকে ছাড়তে চায় না। হিস্টিরিয়ার আর বাকি কি?

(৪)

সেদিন কাকিমাও হঠাৎ প্রতিভার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি-যেন ভাবনা করলেন বলে মনে হলো। কাকিমার চোখের রকম দেখে সন্দেহ করে অন্য ঘরে যাবার জন্য প্রতিভা এগিয়ে

যেতেই কাকিমা গম্ভীর হয়ে বলেন—মিছিমিছি তোমার এত ভাবনা করা ভাল দেখায় না প্রতিভা। আবার কি যে ভাবছো, কে জানে?

না, ঠিক ভাবনা নয়। গুমরে রয়েছে প্রতিভা সেনের মন। হিতাকাঙ্ক্ষীর তুচ্ছতা যেন প্রতিভার সুন্দর মুখটাকে অপমান করেছে। প্রতিভার সুন্দর মুখেরও যে যথেষ্ট অহংকার আছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আর মিছিমিছি একটা বই হাতের কাছে টেনে নিয়ে, অলস ও উদাস হয়ে বসে থাকে প্রতিভা। সত্যিই তো, একেবারে মিছিমিছি! কাকিমার অভিযোগ একটুও মিথ্যে নয়। প্রতিভার জীবনের সেই হিতাকাঙ্ক্ষীর বোধহয় শুধু আত্মাটাই আছে, অবয়ব নেই। তাকে দেখতে পাওয়া যাবে, তাকে চিনে ফেলবে আর ধরে ফেলবে প্রতিভা, এই আশা যে নিতান্ত অবাস্তব আশা।

রাগ হয় সেই ভদ্রলোকেরই উপর; ভদ্রমহোদয় তাঁর উদারতার গর্বে নিজেকে একেবারে অদৃশ্য করে রেখেছেন বলেই না প্রতিভা সেনের ভাবনাকে বৃথা ভাবনা বলে মনে করেন কাকিমা; আর প্রতিভার আশা প্রতিভার নিজেরই কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়।

অফিসে যাবার সময় হতে এখনো অনেক বাকি আছে; তবু মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে তোয়ালে হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার মিররের কাছে একবার দাঁড়ায় প্রতিভা।

চমকে ওঠে, তারপর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে প্রতিভা। ভিতরের ঘরে কাকার সঙ্গে কথা বলছেন কাকিমা।—প্রতিভা যার কথা ভেবে উতলা হচ্ছে, সে দেখা দিতে আসবে বলে মনে হয় না।

কাকা—আঁ? কার কথা ভাবছে প্রতিভা?

কাকিমা—ঐ সেই, যাকে চেনে না প্রতিভা, হারানো আংটিটা পাঠিয়েছে যে।

কাকা—কিন্তু তারও তো একবার এসে দেখা দেওয়া উচিত ছিল। এরকম একটা রহস্য হয়ে থাকবার দরকার ছিল না।

কাকিমা—বোধ হয় প্রতিভাকে পছন্দই করে না।

কাকা—কি অদ্ভুত কথা বলছো? যাকে কোনদিন চোখে দেখলোই না, তাকে পছন্দ বা অপছন্দ করবে কেমন করে?

কাকিমা—আমার মনে হয়; প্রতিভাকে একবার না একবার দেখেছে।

কাকা—প্রতিভাকে দেখলে পছন্দ করবে না; এটাও যে বিশ্বাস হয় না। দেখে থাকলে পছন্দ হয়েছে। এবং পছন্দ হয়েও যে আসতে পারছে না, সেটা হলো লজ্জা; নয় তো ভয়।

আবার চমকে ওঠে প্রতিভা। ভয়ের চমক নয়; লজ্জার চমকও নয়। একটা উল্লাসময় আশার চমক। মিররের দিকে তাকিয়েও আশ্চর্য হয় প্রতিভা। মুখের চেহারাটা যে সব লজ্জার মাথা খেয়ে এক মুহূর্তেই বদলে গিয়ে হাসছে। যেন প্রতিভার হৃৎপিণ্ডটাই হাসছে। আর মনটাও একটা উতলা খুশির নিঃশ্বাসের সঙ্গে লুটোপুটি করছে। কোন সন্দেহ নেই, হিতাকাঙ্ক্ষী মশাই প্রতিভা সেনের মুখটাকে আড়াল থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েই সরে যান।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও প্রতিভা সেনের এই নতুন কল্পনার ছবিটা মনের ভিতর হেসে হেসে মাতামাতি করতে থাকে। অদৃশ্য হিতাকাঙ্ক্ষীরও মনের একটা গোপন কীর্তিকে যেন এতদিনে ধরে ফেলতে পেরেছে প্রতিভা। আর চিনতে বাকি কি? একশো দশ টাকা দামের আংটিটা ফেরত দিতে পারে, কিন্তু ফটোটা ফেরত দিতে পারে না। ইস্, কী নির্লোভ মন!

কিন্তু, সে কি এই লজ্জা আর ভয়ের জন্য চিরকাল নিজেকে প্রতিভার কাছে অচেনা আর অধরা করে রাখবে? প্রতিভা সেনের জীবনটাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে চিরটা কাল শাস্তি দেবে? এই মানুষটার মনেও কি হিস্টিরিয়া আছে? প্রতিভার ফটোটা চিরকাল বুকের কাছে লুকিয়ে রাখবে আর চোখের কাছে তুলে নিয়ে দেখবে, অথচ প্রতিভার জীবন্ত চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলবে না? অদ্ভুত লজ্জা আর অদ্ভুত ভয়।

টেবিলের উপর হাত পেতে, আর সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর যখন ঘড়ির দিকে তাকায় প্রতিভা, তখন বুঝতে পারে প্রতিভা, ঘড়িটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কারণ চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে। শাস্তির পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোকের বোকা ভয় আর বোকা লজ্জার জনাই এই শাস্তি।

কিন্তু...তাকে কি কোনদিন চিনে ফেলতে পারবে না প্রতিভা? কেন পারবে না? আবার মাথা ঝুঁকিয়ে, হাতের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে যেন একটা প্রতিজ্ঞার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে প্রতিভা। তাকে চিনতে হবেই। না চেনা দিয়ে যাবে কোথায়? প্রতিভা সেনের চোখও চারদিকের সব ছায়া, সব মুখ, সব দৃষ্টি আর সব নিঃশ্বাসের শব্দের উপর পাহারা রাখবে। দেখা যাক্, তাকে চিনতে পারা যায় কিনা?

আফিসে যাবার আগে আজ যেমন সাজে নিজেকে সাজায় প্রতিভা, মনে পড়ে না, তেমন সাজে সুষমার বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার দিনেও নিজেকে সাজিয়েছিল কিনা। মিররের দিকে তাকিয়েও মনে মনে স্বীকার করে প্রতিভা, প্রতিভার এই মুখের ছবিও এর চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে কোনদিন ফুটে ওঠেনি। ভাগ্যের লীলাকলার রকম দেখেও মনে মনে একটা দুঃখের হাসি হেসে ফেলে প্রতিভা। ভাগ্যটা যেন প্রতিভাকে ঘাড়ে ধরে এক অদ্ভুত হয়রানির অভিসারে পৃথিবীর পথের উপর ছেড়ে দিচ্ছে।

ছোট্ট সাদা তাজমহল আঁকা সেই রঙীন চামড়ার ব্যাগ, যে ব্যাগ প্রতিভা সেনের জীবনে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছে, সেই ব্যাগটি তো আর নেই। প্লাস্টিকের নতুন একটি স্যেডিজ-ব্যাগ কিনেছে প্রতিভা। সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে অফিস যাবার সময় রোজই যেমন, আজও তেমনই বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারটার উপর কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রতিভা।

হঠাৎ শিউরে ওঠে প্রতিভা সেনের সুন্দর মুখ আর নিবিড়কালো চোখ। একটি মোটর গাড়ি মন্থর চালে চলতে চলতে রাস্তার ওপাশের গাছটার কাছে, এবাড়ির গেটের ঠিক ওদিকে এসেই থেমে যায়। গাড়ি ড্রাইভ করছেন যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোক গাড়ির ভিতরেই চুপ করে বসে, তাঁর চশমাপরা দুই চোখ একেবারে অপলক করে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে থাকে।

চোখের সামনে মিরর নেই, তাই বুঝতে পারে না প্রতিভা, কি নিবিড় কৌতূহলের ভারে অলস হয়ে টলমল করছে প্রতিভার চোখ! মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারে না প্রতিভা। ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করবার শক্তিও নেই বোধ হয়। অচেনা কোন ভদ্রলোকের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকলে চোখ দুটো যে বেহায়া হয়ে যায়, এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও এই মুহূর্তে প্রতিভা সেনের চেতনা থেকেই যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে।

মোটর গাড়িটা আবার মন্থর চালে চলতে চলতে তারপর যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে উধাও হয়ে যায়।

আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে মিররের সামনে

দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম স্পঞ্জ করে প্রতিভা। ধূর্ত হাসির শিহর চাপতে গিয়ে বার বার ছটফট করে ওঠে। পাউডারের পাফ চটপট দু'বার ঘাড়ে আর গলায় বুলিয়ে নিয়েই বের হয়ে যায়।

(৫)

সেদিনের পর মাত্র আর দুটি দিন পার হয়েছে, ট্রামের ভিড়ের মধ্যেই দেখতে পায় প্রতিভা, দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক; আর দু চোখ অপলক করে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যদিও ভদ্রলোকের সাজটা সেদিনের সাজের মত নয়; সেদিন ভদ্রলোকের গলায় একটা নীল রং-এর টাই ঝুলছিল। আজ আদ্দির পাঞ্জাবী, গলাটা খোলা। কিন্তু মুখটা যাবে কোথায়? সেই সুশ্রী ঝকঝকে মুখ, আর দু'চোখ অপলক করে তাকাবার অভ্যাস?

গড়িয়াহাটার মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় যখন সেই ঝকঝকে মুখটিকে দেখবার জন্য খোঁজ করে প্রতিভা সেনের চোখের প্রখর চাহনি, তখন প্রতিভার চোখ দুটোই হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে যায়। কে জানে কখন আর কোথায় নেমে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রতিভা সেনের চোখের এই বিষণ্নতাই আবার, মাত্র দুটি দিন পার হয়ে যেতেই প্রসন্নতা হয়ে যায়। ফুটপাথ ধরে হেঁটে অফিসের প্রবেশ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পায় প্রতিভা, ফুটপাথের গা ঘেঁষে রাস্তার উপর একটা থমকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভিতরে নীল রং-এর টাই ফুরফুর করে উড়ছে। সেই ঝকঝকে মুখে সেই অপলক দৃষ্টি। প্রতিভা সেনের সারা মুখ জুড়ে প্রসন্নতার হাসি মিষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সে হাসি মুখ ঘুরিয়ে লুকিয়ে অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়ে প্রতিভা।

আরও কতবার ট্রামে দেখা হলো। সিনেমা হাউসের গেটের কাছেও দেখা হলো। লেক রোডে সুষমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল প্রতিভা। কি আশ্চর্য, সেখানেও; সুষমাদের বাড়ি থেকে বের হতেই দেখতে পায় প্রতিভা, বেশ একটু দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুচকুচে কালো গাড়ি, তার ভিতরে সেই ঝকঝকে মুখ। বেশ দূরে থেকে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক; যেন মুগ্ধ হয়ে দূরে স্বপ্নলোকের একটা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রতিভার চোখে একটা মৃদু ভ্রূকুটি যেন দুঃসহ অভিমানের শিহরের মত কাঁপতে থাকে। প্রতিভা সেনের ফটো লুকিয়ে রাখতে ভয় নেই, লজ্জা নেই; যত ভয় কাছে এসে একটা কথা বলতে? ভদ্রলোকের ইচ্ছা, প্রতিভা আগে কথা বলুক। প্রতিভা আর কত বেহায়া হবে বলে আশা করছে এই অদ্ভুত হিতাকাঙ্ক্ষী? ছিঃ!

কিন্তু এরকম একটা অকারণ লুকোচুরির খেলাও যে অসহ হয়ে উঠছে।

তবু এই অসহ অবস্থাকেই যেন অসহায়ের মত আরও অনেকবার সহ্য করে প্রতিভা। সহ্য করতে বাধ্য হয়। ট্রামেতে আরও কতবার কাছাকাছি দেখা হয়েছে। সেই গাড়ি আরও কতবার ডোভার লেনের এই বাড়ির ছায়া পার হতে গিয়েই মন্থর হয়েছে, থেমেছে, আর চলে গিয়েছে। কথা বলবে বলে প্রতিভা নিজেই চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারেনি।

ঘরের নিভৃতে বসে চুপ করে ভাবতে গিয়ে প্রতিভার চোখের পাতা ভিজে যায়; কাকিমাও দেখে ফেলেন; এবং দুঃখিত স্বরে ধমক দেন—তোমার হলো কি প্রতিভা? মিছিমিছি; ছিঃ।

মুখে বলতে পারা যায় না; কিন্তু লিখবেই বা কি করে? এই ঝকঝকে মুখের নাম-ধামের কোন পরিচয়ই যে জানে না প্রতিভা।

হেস্তনেস্ত করবার একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছটফট করতে করতে একটা অদ্ভুত চেষ্টার চেহারা প্রতিভার কল্পনায় ফুটে ওঠে। এই নতুন ব্যাগটাকেও একবার ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেললে কেমন হয়? ব্যাগ আটক করে রাখবার লোভ আর অভ্যাস আছে যার, সে কি আবার এই হারিয়ে ফেলা ব্যাগ আটক করবে না? আর, লোভীর মত ব্যস্ত হয়ে ব্যাগ খুলে ভালবাসার চিঠি পড়ে ফেলবে না?

কাণ্ডটা হিস্টিরিয়ারই মত একটা কাণ্ড। কিন্তু সে কাণ্ড শেষ পর্যন্ত একদিন করেই ফেললো প্রতিভা।

ট্রামেতে প্রতিভার সীটের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ভয় আর লজ্জার সেই মানুষ; সেই ঝকঝকে মুখ, সেই গলাখোলা আদ্দির পাঞ্জাবি!

ব্যাগটাকে সীটের উপরে ফেলে রেখে দিয়ে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে যায় প্রতিভা সেন।

—আপনার ব্যাগ ফেলে যাচ্ছেন। ঝকঝকে মুখের এতদিনের বোবাপণা হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুনতেই পায় না প্রতিভা। চলন্ত ট্রামের জানলা দিয়ে ব্যাগটাকে বাইরে তুলে ধরে ডাকতে থাকেন হিতাকাঙ্ক্ষী—আপনার ব্যাগ!

কিন্তু দেখতেই পায় না প্রতিভা।

একি কাণ্ড কাণ্ড হয়ে গেল। প্রতিভার অভিমানের চিঠি এই হারিয়ে ফেলা ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এতক্ষণে পড়ে ফেলেছেন হিতাকাঙ্ক্ষী।—আপনাকে চিনতে পেরেছি। বুঝতেও পেরেছি সব। কিন্তু বুঝতে পারি না, এত ভয়ই বা কেন আপনার; আর এত লজ্জাই বা কেন? যদি আমাকে চিরকাল দেখবার ইচ্ছে থাকে, তবে অনায়াসে কাকার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতে পারেন। তাতেও যদি লজ্জা লাগে, তবে আপনার বাড়ির মানুষকে বলুন। আমাকে আর শাস্তি দেবেন না, এই অনুরোধ।

এই চিঠি পাওয়ার পরেও যদি ঐ ঝকঝকে মুখ ঠাট্টা করে হেসে ওঠে? কিংবা প্রতিভা সেনের এই বেহায়া দুঃসাহসের কায়দা দেখে আরও ভয় পায় এবং অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে? প্রতিভা সেনের জীবন যে ব্যর্থ ভালবাসার একটা পঙ্কিল কবর হয়ে পৃথিবীতে পড়ে থাকবে।

বাড়ি ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে একা ঘরের ভিতরে বসে আর চোখ মুছে মুছে যেন বুকের ভিতরের একটা ভয় মুছে ফেলতে চেষ্টা করে প্রতিভা।

(৬)

ডোভার লেনের বাড়িতে ছোটখাট একটা ব্যস্ততার উৎসব। কাকা ব্যস্ত, কাকিমা ব্যস্ত; এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে চেয়ারের উপরে চুপ করে বসে থাকে যে প্রতিভা সেন, তারও বুকের সব নিঃশ্বাস ব্যস্ত।

এরই মধ্যে কাকিমা একবার এসে প্রতিভাকে ধমক দিয়ে হেসে গিয়েছেন—সৌম্যেন তোমাকে বিয়ে করতে চায়; আর তুমিও চাও; এই সোজা কথাটা আমাকে বলতে তোমার কি বাধা ছিল প্রতিভা? এ তো একটা সুখবর, এর চেয়ে ভাল সুখবর হয় না।

ভবানীপুরের নরেশ এটর্নির ছেলে ডাক্তার সৌম্যেন, যে সৌম্যেন ভিয়েনা থেকে ফিরে এসে এখন নিজেই একটা ক্লিনিক করেছে এবং এরই মধ্যে বেশ ভাল পশারও করেছে; সেই সৌম্যেন এখন ডোভার লেনের এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে বসে কাকা আর কাকিমার সঙ্গে গল্প করছে। সৌম্যেনের মা-ও এসেছেন। কবে বিয়ে হবে, সেই দিনও স্থির করা হয়ে গিয়েছে।

ভয় ছিল প্রতিভার, এইবার ঐ ভীতু আর লাজুক হিতাকাঙ্ক্ষী নিশ্চয় প্রতিভার সঙ্গে একটা না একটা কথা বলতে আসবেই। হয়তো এই ঘরের ভিতরেই এসে দাঁড়াবে। কাকিমাকে যে-রকম খুশি দেখা গেল, তাতে সন্দেহ করতে হয়, কাকিমা নিজেই সৌম্যেনকে এই ঘরের দিকে নিয়ে এসে আর ফেলে রেখে চলে যাবে।

ভয় হয় প্রতিভার, ভীতু লোকের একবার ভয় ভাঙলে বড় বেশি দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। যাকগে, হোক না একটু দুঃসাহসী। তাতেই বা ভয় কিসের?

প্রতিভাকে ডাকতে এলেন কাকিমা।—সৌম্যেন ডাকছে।

—কোথায়?

—বাইরের বারান্দায়। তুমিই সৌম্যেনের চা নিয়ে যাও প্রতিভা।

চা নিয়ে যায় প্রতিভা; আর, প্রতিভার এত দিনের অভিমানও যেন সৌম্যেনের একটা আহ্বানে মুছে যায়। সৌম্যেনই আগে কথা বলেছে—এস।

সৌম্যেনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেরই মুখের হাসির লজ্জায়, আর নিবিড়-কালো চোখের ভীরু মুগ্ধতায় বিব্রত হয় প্রতিভা। আস্তে আস্তে বলে—আজ আর বেশিক্ষণ বসতে বলো না, অলবিলম্ব হচ্ছে।

সৌম্যেন হাসে—এস...হ্যাঁ, একটি কথা অন্ততঃ শুনে যাও।

প্রতিভা—বল।

সৌম্যেন—আমি সত্যিই যেন এতদিন পাগল হয়ে গিয়ে মনে মনে তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারিনি যে, তুমিও...।

প্রতিভা—আমি তো তোমারও আগে, তোমাকে দেখবারও আগে......।

সৌম্যেন—কি?

প্রতিভা—ভালবেসেছি। ...এবার যাই।

ডোভার লেনের বাড়ির এই বাস্তুতার উৎসব শেষ হয়ে যেতে আর বেশি দেরি হয়নি।

যাবার আগে সৌম্যেনের মা প্রতিভার হাত ধরে বলে গেলেন—এবার চাকরি ছাড়তে হবে প্রতিভা।

দুপুর হয়; বই পড়তে বসে প্রতিভা সেনের চোখ ঠিক যখন একটা ঘুম-ঘুম আবেশে মজে আসতে থাকে; তখন কাকিমা নিজেই এসে একটা চিঠি প্রতিভার হাতের কাছে রেখে দিয়ে চলে যান। একটা খামের চিঠি। ডাকে এসেছে চিঠিটা।

কার চিঠি? প্রতিভার চোখের ঘুম-ঘুম আবেশ যেন একটা কাঁটার খোঁচা খেয়ে ছিঁড়ে যায়। হাতের লেখাটা যে চেনা মনে হয়।

হিতাকাঙ্ক্ষীর চিঠি।—দেখে খুশি হলাম। নিশ্চিন্ত হয়েছি। এবার আপনি ভুল করেননি। আমি এবারও খোঁজ নিয়েছি। ডাক্তার সৌম্যেন মিত্র অতি সজ্জন, অতি চমৎকার চরিত্রের মানুষ। সৌম্যেন ডাক্তারের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে খুবই ভাল হয়। সৌম্যেন ডাক্তার যদি রাজি থাকেন, তবে আপনিও রাজি হবেন, এই অনুরোধ করি।

চিঠিটাকে আঁকড়ে ধরে, আর একটা ভয়ানক আর্তনাদকে বুকের ভিতরেই চেপে রেখে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে প্রতিভা। হিতাকাঙ্ক্ষী; কি ভয়ানক এই রক্তমাংসহীন, অদৃশ্য অশরীরী হিতাকাঙ্ক্ষী! আড়ালে থেকে প্রতিভা সেনের অভিমানের পদ-বিক্ষেপের উপর চোখ রাখছে; প্রতিভা সেনের নির্ভুল ভালবাসার উপর শুভকামনার বর্ষণ করছে।

প্রতিভা সেন যে মনে মনে এই হিতাকাঙ্ক্ষীরই বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী যেন প্রতিভাকে আদর করে তুলে নিয়ে সৌম্যেনের বুকের উপর রেখে দিল।

কিন্তু না। আবার পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হিতাকাঙ্ক্ষীরই অনুরোধ মাথা পেতে বরণ করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সৌম্যেনও তো মিথ্যে নয়; মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। আড়াল থেকে দেখে সুখী হোক হিতাকাঙ্ক্ষী।

( ৭ )

মাত্র পাঁচটি দিনের অদেখার পালা শেষ হয়ে যাবার পর সৌম্যেনের সঙ্গে প্রতিভার আবার যেদিন দেখা হয়, সেই দিনটি হলো বিয়ের দিন। সময়টা সন্ধ্যা। আবার এই বাড়িতে একটা ব্যস্ততার উৎসব জেগে ওঠে।

হাতে হাত রাখা শুভ পরিণয়ের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রার চলে যান। তারপরেও ঘরের ভিতরে সৌম্যেনের সঙ্গে নানা আত্মীয়জনের আলাপের কলরব বাজতে থাকে। আর, প্রতিভা বোধহয় এই সন্ধ্যার নতুন মনটাকে নিয়ে একটু একলা হবার জন্য বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

বারান্দার উপর সেই বেতের চেয়ারে বসে রাস্তার ওপাশের গাছের ছায়াটার দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে যায় প্রতিভার ঐ তো, ঐ সেই গাছের ছায়া, যার দিকে তাকাতে গিয়ে সৌম্যেনের ঝকঝকে মুখ প্রথম চোখে পড়েছিল।

একটি লোক গেটের দিক থেকে এগিয়ে এসে বারান্দার উপরে ওঠে। রোগা-রোগা চেহারা, অথচ বেশ সুশ্রী এক ভদ্রলোক বয়সও বেশি হবে না; সৌম্যেনের চেয়ে কিছু কমই হবে বলে মনে হয়। ভদ্রলোকের সাজটাও বেশ পরিচ্ছন্ন। কাকারই কাছে কোন মামলার কাজে এসেছেন বোধহয়।

চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভিতরে চলে যাবার জন্য প্রতিভা এগিয়ে যেতেই সেই যুবক ভদ্রলোক বলে—আমি আপনারই কাছে এসেছি।

চমকে ওঠে প্রতিভা। —আমার কাছে?

খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো একটা বস্তু প্রতিভার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে হাসে—এই নিন আপনার ব্যাগ।

প্রতিভার চোখ থরথর করে কেঁপে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিভা—আপনি?

—হ্যাঁ। এইবার ফেরত দেওয়া উচিত বলে মনে হলো; তাই নিয়ে এলাম।

প্রতিভার গম্ভীর স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়—এতদিনের মধ্যে কেন ফিরিয়ে দিয়ে যাননি? কি অসুবিধা ছিল? এলেন না কেন? আসতেই তো পারতেন।

—আসা উচিত হতো না।

—কেন?

—আমি সামান্য মুহুরির চাকরি করি।

মাথা হেঁট করে প্রতিভা। প্রতিভার মুখের উপর যেন একটা বোবা কান্নার নিঃশব্দ জ্বালা লালচে হয়ে ফুটে উঠেছে। বিড়বিড় করে প্রতিভা—আসেননি, ভালই করেছেন।

ব্যাগটা খোলে প্রতিভা। হ্যাঁ, আছে, সে ভয়ানক ভুলের চিঠি দুটো আছে। ফরফর করে চিঠি দুটো ছিঁড়ে দিয়ে ব্যাগের ভিতরে আবার কি-যেন খোঁজে প্রতিভা—ফটোটা কই?

মুহুরি মানুষের চোখ দুটো হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। —ও হ্যাঁ, ভুল হয়েছে মাপ করবেন। ফটোটা কালই ফেরত পাবেন ডাকে পাঠিয়ে দেব।

প্রতিভা—ফেরত দিতে চান আপনি?

—না।

ভেজা চোখ মুছতে মুছতে ছটফট করে বলে ওঠে প্রতিভা—তাহলে ফটো আপনারই কাছে থাক্।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
টিকে থাকাই জীবন নয়।
'একটা গাড়ি কিনতে পারেন না'

তবুও পাদানি ও দরজার ভিড় ঠেলে নিরঙ্কুশ ঔদাসীন্যে উঠে পড়ল সুকণ্ঠী। যেতে যখন হবেই তখন ভয়-ভবিষ্যৎ না ভেবেই যেতে হবে।

কিন্তু দাঁড়াবে কি করে? ধরবার অবলম্বন কি? অবলম্বন বোধ হয় একটু-মাত্র আশা কেউ তাকে সিট ছেড়ে দেবে।

আজকের যুগেও এমন আশা কেউ করে নাকি? সমান স্বাধীনতা নিয়েছ সমান দায়িত্ব নেবে না? আসরে নেমে আবার ঘোমটা টানা কেন? দয়া চাও কোন লজ্জায়? যদি ফুলের কুঁড়িই হবে হাটে-বাজারে রোদে-বৃষ্টিতে নেমেছ কেন? হাট-বারে সাঠ নেই।

মহানুভব কে খুঁজছে? দু-একটা মিনিমুখো বোকাসোকা লোকও তো থাকতে পারে।

আশ্চর্য, আকার রাজ্যে পাথরেও ফুল ফোটে।

পাশের লোককে বিপন্ন করে দাঁড়িয়ে পড়ল পরাশর। পাশের লোককে প্রসন্ন করে বসে পড়ল সুকণ্ঠী।

যেখানে সুকণ্ঠীর নামবার কথা তার আরো তিনটে স্টপ পেরিয়ে পরাশরের বাড়ির গলি। তিনটে স্টপ পেরিয়েই নামল। বদান্যতার বদলে যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানায় না তার কেমনতরো রীতি-নীতি!

নামতেই সুকণ্ঠী বললে, 'একটা গাড়ি কিনতে পারেন না?'

এ কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি।

'গাড়ি কেনা মানেই তো যন্ত্রের অধীন হয়ে যাওয়া।' বললে পরাশর। 'তখন বাস-ট্রাম, ফার্স্ট ক্লাশ-সেকেন্ড ক্লাশ রিকশা-সাইকেল—আনন্দময় পদব্রজ—সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। তা ছাড়া আজকের এই রোমাঞ্চ? তোমাকে এই সিট ছেড়ে দেওয়া?'

সুকণ্ঠী হাসল। বললে, 'তার চেয়ে একটা স্মুথ লিফট্ পেলে বেশি সুখ।'

পরদিন অফিস-টাইমে সুকণ্ঠীর বাস-স্টপের কাছে একটা ট্যাক্সি এসে থাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল।

পরাশর নামল গাড়ি থেকে।' উন্মনস্ক সুকণ্ঠীর কাছে গিয়ে বললে, 'একটা গাড়ি আছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিই। তোমার আপিস তো আমাদেরই পাড়ায়।'

গোটা চারেক বাস ছেড়ে দিয়েছে সুকণ্ঠী। এমন গণ্ডারের মত ভিড় ছুঁচ গলাবারও সাধ্য নেই। তাম্রনেত্রে তাকিয়ে আছে পশ্চিমের দিকে। আর মনে-মনে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময়ে এই দৈবাগত নিমন্ত্রণ।

যেমন অভ্যাস, গায়ের আঁচল মৃদু শাসন করে সুকণ্ঠী বললে, 'মন্দ কি।'

তারপর দু পা এগিয়ে গাড়ির সামনে এসে বললে, 'ট্যাক্সি!'

যেন খুব সম্ভ্রান্ত নয়, এমনি কটাক্ষ। ভাড়াটে-ভাড়াটে গন্ধ, কেমন যেন অকুলীন। তোকে দেখলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সি করে যেতে, আপিসের কোনো মেয়ে যদি বলে, কেমন নিশ্চয়ই টোকো শোনাবে। তবু বন্ধ গুমোটের মধ্যে এক ঝলক বাসন্তী হাওয়ার মতই মহাভাগ এই ট্যাক্সি।

পরাশর বললে, অফিস টাইমে এই ট্যাক্সি জোগাড় করাও বা কি কঠিন।'

আরো কঠিন, তাক বুঝে ঠিক সময়ের সুচাগ্রমূলে গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হওয়া। তার মানে কতক্ষণ আগে থেকে মিটার নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুকণ্ঠীদের গলির মোড়ে, কতক্ষণে দেখা যায় তার শাড়ির পাড়, তার ব্যাগের স্ট্র্যাপ, তার এগিয়ে-আসার ঢেউ।

সুকণ্ঠী আগে ঢুকল ট্যাক্সিতে। পরে পরাশর।

কেমনতরো হয়ে গেল। পরাশরের ডাইনে হয়ে গেল সুকণ্ঠী। শুধু মুখ বাড়িয়ে ডাকত আর সরে বসে জায়গা দিত, সুকণ্ঠী বাঁয়ে থাকত। বাঁ-টাই সমীচীন, শাস্ত্র ও আইনসম্মত। আর, অনেক অভিজ্ঞতার ফল থেকেই আইন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট হয়ে হরিশ মুখার্জি রোডের মোড় ঘুরল ট্যাক্সি।

'ঘুরপথে চলতে বললেন কেন?' একটু কি কুণ্ঠিত হল সুকণ্ঠী।

'চৌরঙ্গিতে ক্ষণে-ক্ষণে শুধু রক্ত চক্ষুর আস্ফালন।' একটু যেন ঘেঁষে বসল পরাশর। 'আর লাল চোখ যদি একবার তোমার দিকে তাকায় বারেবারেই তাকায়। তুমি একটা স্মুথ রান চেয়েছিলে, না? জীবনে যদিও স্মুথ রান কোথাও নেই, তবু লাল চোখ যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল।'

তবু পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসছে না সুকণ্ঠী। হাঁটু দুটো কেমন কাঠ করে বসে আছে। কনুইটা কেমন কোণ তোলা। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা পাশ থেকে সরিয়ে এনে বসিয়েছে কোলের উপর।

লোয়ার সার্কুলার রোড ঘুরে ক্যাজারিনা এভিনিউতে পড়েছে ট্যাক্সি।

চোখ না মেলেও দেখা যায়। চুপ করে থেকেও কথা হয়। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে মুখ বুজে শুধু কাছাকাছি বসে থাকাও যে দেখা আর কথা বলা এ কে জানত।

সেদিনের সেই মফস্বলের মেয়েটিকে মনে-মনে আবার রচনা করল পরাশর।

এক বৃষ্টি-থামা সন্ধ্যায় লণ্ঠনের টানে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসেছে, নানা মাপের নানা রঙের পোকা। তাই বসে-বসে দেখছিল পরাশর আর ভাবছিল এত যেখানে পোকা তখন কে বলে এ পৃথিবী শুধু মানুষের জন্যে।

একজনের হাতে একটা মোটা খাতা, গোটা কয় কলেজের মেয়ে এসে হাজির।

ওদের মধ্যে যে মেয়েটি অচপল সে খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেছি। আপনি যদি একটা লেখা দেন—'

স্বাস্থ্যে শ্রীতে ডগমগ মেয়েটি। যেন ঝকঝকে একটা করাতের পাত।

খাতাটা বাড়িয়ে দিল না হাতখানিই বাড়িয়ে দিল কে জিজ্ঞেস করবে।

উৎসাহে উথলে উঠছে। আগ্রহ দূরে থাক, এতটুকুও কৌতূহল দেখাল না পরাশর। খাতাটাও একবার দেখল না পৃষ্ঠা উল্টিয়ে। নিহাসা গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি তো কবিতা লিখি। আর সে শুধু প্রেমের কবিতা।'

'লিখবেন।' এতটুকু অপ্রতিভ হল না মেয়েটি।

'মুখের দিকে তাকাল পরাশর। দেখল লজ্জায় গাঢ় পদ্মরাগ সুকণ্ঠীর চোখের কোণে বিশ্রাম করতে বসেছে।

সে কবিতা আর লেখা হয়নি। সে পত্রিকা মুছে গেছে। সমস্ত শহরটাই মুছে গেছে মানচিত্র থেকে।

কিন্তু মনের চিত্র থেকে মোছে যায়নি সেই মেঘমাখানো সন্ধ্যা, সেই মিটিমিটি লণ্ঠনের আলোয় অনেক পোকার মধ্যে একটি মানুষী প্রজাপতি। আর রক্তে-মাংসে যে-প্রেমের কবিতা লেখা হবে না তারই অব্যক্ত গুঞ্জরণ।

আকাশের দেশ নেই, প্রেমেরও বয়স নেই।

ফেলে-আসা গাঁ-শহরের অধিবাসীদের মাঝে-মাঝে সভা হয়, একত্র মেলামেশার জন্যে। যেহেতু এককালে সে-শহরে পরাশর অধিষ্ঠিত ছিল এবং সৌহার্দ্যে সকলের সঙ্গে প্রায় একাত্ম ছিল, তারও নিমন্ত্রণ হল।

তেমনি এক সভায় সুকণ্ঠীর সঙ্গে দেখা।

'আমাকে চিনতে পারেন?' সুকণ্ঠীই এসেছিল এগিয়ে।

'তুমি, তুমি সেই সু, সু—শরীরের কি যেন একটা অংশ—সুদতী, সুভ্রূ, উঁহু, সুকেশী—না, না, সু—সুকণ্ঠী নও?' রঙিন উত্তেজনায় সুন্দর হয়ে উঠেছিল পরাশর।

'আশ্চর্য, এখনো মনে আছি দেখছি।' সুকণ্ঠী চোখ না নামিয়েই বললে।

'ঠিক বলেছ, মনে আছে নয় মনে আছি।' দর্শনের মধ্যে স্পর্শনের সুর মেশাল পরাশর। 'বনে-জনে সুখ নেই, মনেই সুখ।'

তাজা ডগালে শাকের মত লকলক ছিল, এখন একেবারে দাঁড় পাকিয়ে গিয়েছে। দয়াহীন দারিদ্র্যের ঝড় দাগ কেলে-কেলে

বয়ে গেছে দেহের উপর দিয়ে তা ঠাহর করলেই বোঝা যায়। কাছে বসে কথা কয়ে কিছু খবরও জানা গেল, সেই পুরোনো খবর। বাবা উকিল ছিলেন, বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে থাকতে পারলেন না। কিছুই আনতে পারেননি, বাড়িঘরেরও খদ্দের নেই। এখানে কে চেনে, প্র্যাকটিস জমাবার কথা ভাবাও পাগলামি। তবু দুপুরে, ঘুমে-গরমে পচে মরার চাইতে আদালতে ঘোরাফেরা করেন, অন্ধিসন্ধি যদি এক-আধটা মিলে যায় কখনো। দুখানা ঘরে যে একটা বাসা নিয়েছেন তাকে একটা বাক্স বললেই ঠিক হয়। যা চাকরি একা সুকণ্ঠীই করছে। তার সঙ্গে একটু রাজনীতি বা কাজনীতি না মিশিয়েই বা উপায় কি। ফোকটে যদি দুটো টাকা মাইনে বাড়ে সে ফিকির কে না দেখে।

'তোমার পিঠ-পিঠ যে ভাই ছিল সে কি করছে?'

'ভুগছে।'

'অসুখ?'

'রাজ-অসুখ। রাজযক্ষ্মার চেয়েও মারাত্মক।'

'সে কি?' চমকে উঠেছিল পরাশর।

'হ্যাঁ, সে অসুখের নাম বেকারি। সমর্থ ছেলে, বি-এ পাশ, একটা চাকরি জুটছে না।'

বিয়ে যে হয়নি তা তো হাতে-মাথেই বোঝা যাচ্ছে। কি করেই বা হবে? সময় কই? স্বাস্থ্য কই? টাকা কই?

একজনের চোখের উঠোনে আরেকজনের চোখের রোদ খেলা করেছিল অনেকক্ষণ।

যে ছবির চোখ একবার তোমার চোখের দিকে তাকিয়েছে তাকে দূরে-সামনে যে কোণ থেকেই দেখ না কেন, সব সময়েই সে তাকিয়ে থাকবে চোখের দিকে। তেমনি যাকে একবার ভালো লেগে গিয়েছে, সব অবস্থাতেই সে জাগিয়ে রাখবে সেই ভালো-লাগার আলো—যে আলো মাটিতেও নেই সমুদ্রেও নেই।

সভা শেষে, ভেঙে যাবার আগে আবার একটু দেখা হল। এ ওর ঠিকানা বললে। এত কাছে? অলক্ষ্যে যেন আরো একটু কাছাকাছি হল। একদিন যেয়ো না। তোমার ভাইকে—কি না জানি নাম—ধ্রুব জ্যোতিকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। দেখি কি করতে পারি।

ভাইকে কিছু বলে নি, নিজেই একদিন দেখা করতে গিয়েছিল সুকণ্ঠী।

একটা একাণ্ড একান্নবর্তী বাড়ি, বড়-ছোট অনেক আত্মীয়-পরিজন নিয়ে একত্র আছে পরাশর। ভাড়াটে বাড়ি, এখানে-ওখানে অনেকগুলি কোঠায় অনেক শিশু বুড়ো ছোকরা-ছুকরির হিজিবিজি।

'নিজের একটা আলাদা বসবার ঘর নেই তাই এসে এই প্যাসেজটাতেই বসি।' বললে পরাশর।

'থাকেন কোথায়?'

'মানে শুই কোথায়? ঐ তেতলার এক কোণে। অদৃষ্টে কোনো রকমে জুটেছে একখানা।'

'আলাদা একটা ফ্ল্যাট নেন না কেন?'

'একের পক্ষে পাঁচজনের মানে পাঁচের পিঠে চড়ে একান্ন হওয়াই সুবিধে।'

সুকণ্ঠী হাসল, কিন্তু আলাপ জমল না। কেমন বাজার-বাজার আপিস-আপিস শোনাল। কত মাইনে সুকণ্ঠীর, বাড়তি-আদায় কিছু আছে কি না, মরা নদীতে কি করে চালায় গাধাবোট—এই সব। পরাশর আরো কত উঠেছে মই বেয়ে, আকাশ প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়—ছি ছি, তার হিসেব।

কি রকম যেন প্রার্থী-প্রার্থী মনে হল নিজেকে। সুকণ্ঠী উঠে পড়ল।

'কই আমাকে একদিন যেতে বললে না তোমাদের বাড়ি?' পরাশর এগিয়ে দিল দু পা।

'তবু তো আপনাদের বাড়িতে একটা প্যাসেজ আছে বসবার, আমাদের বাড়িতে তাও নেই।'

'ভালোই তো। পথেই তা হলে আমাদের ঘর-দোর।'

ট্যাক্সি রেড রোডে পড়েছে।

গতিটাকে একটা গভীর শান্তির মত মনে হল পরাশরের। প্রগাঢ় নিষ্ক্রিয়তার শান্তি। গল্পটা কিভাবে শেষ হবে মনে যখন ঠিক-ঠিক এসে যায় তখন লেখকের যে শান্তি সেই শান্তি সুকণ্ঠীকে এখন পাশে নিয়ে। মনে-মনে লেখার সমাপ্তি খুঁজে পাবার পর যেমন আর লিখতে ইচ্ছে করে না তেমনি যেন ওকে নিয়েও পরাশরের আর কিছু ইচ্ছে নেই।

সামান্য একটা ফুল ফোটাবার জন্যে মৃত্তিকার কত দীর্ঘ ও ধীর আয়োজন চলে। মানুষেরই ধৈর্য নেই, আয়ু নেই, ভবিষ্যৎ নেই।

'কই তোমার ভাই তো এলো না।'

'আমি ওকে বলিনি কিছু—'

'সে কি? আমার আপিসে কত দিক থেকে কত রকম ভেকেন্সি হয়—'

'ওর হবে না। আর যখন হবে না তখন আমার কাছে ও আপনার নিন্দে করবে। আপনাকে অযোগ্য অক্ষম বলবে। এ আমি সইতে পারব না।'

সুকণ্ঠীর বাঁ হাতখানির দিকে তাকাল পরাশর। দুর্বল, দরিদ্র, পরিত্যক্ত। আস্তে আস্তে ধরবে না ছোঁ মেরে তুলে নেবে ভাবতে লাগল।

পরিশ্রমের কাঠিন্যে লেখা ঔৎসুক্যের নরম কবিতা।

পরাশরের হাতের মধ্যে সুকণ্ঠীর হাত—খানি ভয়ে কুঁকড়ে রইল—ভিজে পাখির মত গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল।

খটখটে রোদ, দুদিক থেকেই ধাবন্ত মোটর। আগাপাশতলা-বোঝাই একটা এক্সপ্রেস দোতলা বাস কাটিয়ে গেল ট্যাক্সি।

'আপিস থেকে ফিরতে তোমার বুঝি খুব দেরি হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গানের টিউশানি থাকে।'

'তোমার গলা কি আশ্চর্য সুন্দর, যেন সোনা ঢালা—'

প্রশংসা করলে কোন মেয়ে না সুখী হয়? তবু সুকণ্ঠী, খুশি হয়েও হাতের দিকে কড়া নজর রেখেছে। হাত নিয়েই পরাশর শান্ত থাকে কি না, না এলাকার বাইরে চলে আসে। শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললে, 'চর্চাই করতে পারি না। পারমিসিটি নেই—'

পুরুষের স্বভাব কি কিছুতেই যাবে না?

হাত ছেড়ে দিয়েছে হাত। কাঁধের উপর উঠে এসেছে।

মুহূর্তে পরাশরের সান্নিধ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক কোণে ছিটকে পড়ে তীক্ষ্ন আর্তনাদ করে উঠল সুকণ্ঠীঃ 'এই, রোকো। রোকো—'

এমনটি কোনোদিন শোনেনি ড্রাইভার। গাড়ি আস্তে করল।

একটা টুকরো-করা সেকেণ্ডের এক কণিকা ভুল হয়েছে মারে। পিচে বল পড়বার আগেই ব্যাট হাঁকড়ে বসেছে।

কিন্তু তাই বলে শালীনতাকে বিসর্জন দেওয়া কি উচিত হবে? বর্বরতার প্রতি-রোধে আবার শালীনতা কি। তবু ব্যাণ্ডেজটা শিল্কের হওয়াই তো ভালো। ব্যাণ্ডেজ কোথায়? এ দগদগে ঘা।

পরাশর সহজ হবার চেষ্টায় বললে, 'এইখানে নেবে পড়লে বিপদে পড়বে যে।'

'না, আমি এইখানেই নামব। পায়ে হেঁটে যাব।' কোণের কাছে লেপটে গিয়ে সুকণ্ঠী দুঃখে রাগে থরথর করে কাঁপছে।

'এখানে ট্যাক্সি কোথায়? বাস কোথায়? হঠাৎ নেমে পড়লে চলতি গাড়ির লোকেরা ভাববে কি।'

'অন্যে কি ভাবে বয়ে গেল। আমি কি ভাবছি তা কে ভাবে।' মেরুদণ্ড খাড়া করে বসল সুকণ্ঠীঃ 'এই, রোকো। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি।' ব্যাগ হাটকাতে বসল নিচু হয়ে।

'এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চলো, নামিয়ে দেব। সেটাই ডিসেণ্ট হবে। সেখানে বাস-ট্রাম যাহোক কিছু একটা পেয়ে যাবে সহজে।' নিশ্চল নিরুদ্বেগ মুখে বললে পরাশর।

বিপদে বুদ্ধি হারানো কাজের কথা নয়।

এটুকু পথ রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধতায় সহ্য করা ছাড়া উপায় কি। গায়ের আঁচল ঘন করে বসল সুকণ্ঠী।

তাই এখনো বিয়ে করেনি। এমনি উড়ে-ঘুরে বেড়াবার মতলব। বলে, যন্ত্রাধীন হব না। বাস ট্রাম ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড ক্লাশ রিকশা সাইকেল—যখন যা হাতের কাছে চলে আসে তাই লুফে নেবে। কিন্তু আমি ছ্যাকড়া গাড়ি নই।

চিত্তরঞ্জনের মোড়ের কাছে ট্যাক্সি থামল। ঝটকা মেরে নেমে পড়ল সুকণ্ঠী।

পরাশরকে খানিক এগিয়ে গিয়ে নামতে হল। কি নাজানি করে ফেলে মেয়েটা। নখে-দাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি, ট্রাম-বাসের তলায় না ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেলেঙ্কারির ভয় বলে বালাই কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। কে জানে, হয়তো বা রেওয়াজ হয়েছে আজকাল, থানায় না ডাইরি করে বসে।'

না, সুস্থ-শান্ত ভঙ্গিতে তেরো নম্বর বাসেই উঠল সুকণ্ঠী। পরাশর আরেকটা ট্যাক্সি নিল।

সন্ধ্যায়ও রাগ মরেনি সুকণ্ঠীর। বাড়ি ফিরে এসে ছোট য়্যাটাচি কেসটা খুলে বসল। দৈনিক পত্রিকার কটা কাটিংস জমিয়েছিল সুকণ্ঠী, যেখানে-যেখানে পরাশরের বক্তৃতার সারাংশ বেরিয়েছিল তার টুকরো। কটা ছবি। কটা বিজ্ঞাপন। অন্যের থেকে ভিক্ষে করে আনা অটোগ্রাফের পৃষ্ঠা।

ধারালো নখে সব ছিঁড়তে বসল সুকণ্ঠী। টুকরো-টুকরো করে। তাতেও জ্বালা মিটছে না। ছেঁড়া অংশগুলি আবার ছিঁড়ল, কুচিকুচি করে ছিঁড়ল। মনে মনে ভাবল অনেক বেঁচে গিয়েছি—এক-একবার ইচ্ছে হত চিঠি লিখি—ভাগ্যিস লিখিনি। জঞ্জাল জড়ো করিনি বেশি।

দেশলায়ের কাঠি জেলে পোড়াতে বসল সে ছিন্নস্তূপ।

সেদিন খবরের কাগজ খুলতে গিয়ে চোখে পড়ল বড় অক্ষরে কি একটা সংবাদ বেরিয়েছে পরাশর সম্বন্ধে। চোখে পড়তেই ঝলসে উঠল। পরে ভাবল, কোনো কেলেঙ্কারির সংবাদ হয়তো। কিংবা কে জানে, হয়তো মোটর চাপা পড়েছে। নয়তো বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা। পড়ে দেখতে ক্ষতি কি।

বিপরীত সংবাদ।

কতক্ষণ পরেই দুটি ছোকরা এসে হাজির। আমাদের সভায় আপনি যদি দুটি গান গান।

উৎফুল্ল হল সুকণ্ঠী। এভাবেই তো পাবলিসিটি হবার সুযোগ। বললে, 'আপনারা কারা?'

কত দিনের পুরোনো ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তার বিবরণ দিল ছোকরারা। কারা-কারা সব সভাপতি হয়ে গিয়েছেন, দৈর্ঘ্যে পরিধিতে কত বড় সব জাঁকালো জাঁদরেল। কত ফিল্ম-স্টার, রেডিও-আর্টিস্ট গান গেয়েছেন এখানে, কত নৃত্য-ভারতী দেখিয়ে গিয়েছেন ললিতকলা।

'কিসের সভা?'

'আমরা পরাশর রায়কে সংবর্ধনা দিচ্ছি।'

'কে পরাশর রায়?'

'সে কি কথা? এত বড় একজন সাহিত্যিক, জনপ্রিয়তার সব চেয়ে উঁচু চুড়োয় যার বাসা—'

'ও, শুনেছি বটে।' মুখ গম্ভীর করল সুকণ্ঠী। 'কিন্তু এও শুনেছি লোকটা অত্যন্ত বাজে, রোথো, থার্ড ক্লাশ—'

'চামড়া ও চরিত্র যার যার নিজের ব্যাপার।' এক ছোকরা হাই তুলল, আরেক ছোঁড়া তুড়ি মারল। 'ওসব কে দেখে? দেশ সম্মান দেবে প্রতিভাকে।'

'মাপ করুন। যার-তার সভায় গান গাইতে পারব না।' রাগে পুড়তে লাগল সুকণ্ঠী।

এত বড় একটা পাবলিসিটির সুযোগ এমনি করে গোল্লায় পাঠাবে? প্রসাদের ফুলকে এমনি করে পায়ে দলবে? উপায় কি তা ছাড়া? গানের চেয়ে মান বড়।

বলে কিনা গলা যেন সোনা-ঢালা। যদি পারতাম, গালাগাল দিয়ে সিসে ঢালা করে দিতাম।

একটা শ্রাদ্ধ বাড়িতে হঠাৎ সেদিন দেখা। কোন এক দূরসম্পর্কিত লোকের বাড়িতে কাজ, সেখানে ও লোকটার নিমন্ত্রণ হতে পারে কে জানত। সম্পর্কের কত শেকড় যে চারদিকে ছড়িয়েছে তার ঠিক নেই।

গদগদকণ্ঠে শোকভক্তি ঢলঢল গান গাইছিল সুকণ্ঠী। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে। জমাট হয়ে আছে স্তব্ধতা। এমন সময় ঘরে ঢুকল পরাশর।

মুহূর্তে গান গেল থেমে। সুকণ্ঠী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাতাস যেন উড়ে গিয়েছে ঘর থেকে। গা-মাথা কেমন ঘুরতে লেগেছে। সাঁ করে ছুটে চলে গিয়েছে পাশের ঘরে। বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল ঢালতে শুরু করেছে।

কি হল, ডাক্তার ডাকো। ভিড় সরিয়ে দাও।

পরাশর বেরিয়ে গেল।

না, সুস্থ হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। বাড়ির বাইরে এসে শুনতে পেল পরাশর, সুকণ্ঠী আবার গান ধরেছে।

'আপনারা একজন ঠিক করুন। হয় গাইয়ে নয় বলিয়ে।' প্রোগ্রামটা হাতে করে ছুঁলও না সুকণ্ঠী। উপর-উপর চোখ বুলিয়েই বললে।

'আপনার সঙ্গে বক্তার ক্ল্যাশ হচ্ছে কোথায়?'

'ভীষণ হচ্ছে। আপনাদের রুচির সঙ্গে হচ্ছে।' ঝাঁজিয়ে উঠল সুকণ্ঠী।

'কিন্তু পরাশরবাবুর নাম যে কার্ডে ছাপা হয়ে গেছে। ওঁকে এখন বাদ দিই কি করে?'

'তাহলে আমাকে বাদ দিন। আমার নাম, গায়কের নাম তো আর ছাপা হয় না।'

'ওরে বাবা, আপনাকে বাদ দিলে সভা তো ফাঁকা মাঠ। আগে গাইয়ে পরে কইয়ে।'

'তাহলে যে সভায় ওরকম সভাপতি সে সভায় আমি গাই না।'

মাথা চুলকোতে লাগল ছোকরারা। 'তা হলে কি করে ম্যানেজ করা যায়?'

'খুব যায়। নিতে লোক পাঠাবেন না। লোক না পাঠালে যায় কখনো সভাপতি? নিজের থেকে গাড়ি ভাড়া করে?'

'তা মন্দ বলেন নি। লোকই পাঠাব না। আর এদিকে সভায় ঘোষণা করে দেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিংবা বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে থেঁৎলে থেঁৎলে কাটার মধ্যেও আনন্দ আছে।

জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। লোক যাবে না। থেকে-থেকে শুধু মোটরের হর্ন শুনবে। একটাও দাঁড়াবে না দরজায়। হদিসও পাবে না কেন এই প্রত্যাখ্যান।

ধারালো অস্ত্রের উলটো পিঠ দিয়ে ফাটিয়ে-ফাটিয়ে মারার মধ্যেও সুখ কম নয়।

'দিদি, আমার একটা চাকরি হয়েছে।' ধ্রুবজ্যোতি চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল।

বলিস কি?' আনন্দে প্রায় পাখা মেলল সুকণ্ঠী। 'কত মাইনে?'

'স্টার্টিং তো ভালোই। প্রায় আশাতীত। একশো কুড়ি টাকা।'

'সত্যি?' ভাইকে প্রায় আদর করে সুকণ্ঠী।' কোথায়, কোন অপিসে?'

অপিসটার নাম করল ধ্রুব।

'কি করে পেলি?'

'য়্যাপ্লাইও করিনি, কোথায় আবার খোঁজ পাব! পরাশরবাবু নিজের থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিলেন।'

'কে?' যেন হুংকার করে উঠল সুকণ্ঠী।

'পরাশরবাবু। সেই যিনি—সেই যে—'

জ্বলন্ত একটা উনুন নিবে গিয়ে তাতে যেন গোবর লেপা হয়ে গেল। সুকণ্ঠী গলা মোটা করে বললে, 'ওখানে তোমার চাকরি করা হবে না ধ্রুব।'

'কেন?'

'ওখানকার এসোসিয়েশন ভালো নয়।'

পেটের ভাত প্রায় চাল হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। ধ্রুবজ্যোতি মন খুলে হাসল। বললে, 'চাকরির আবার এসোসিয়েশন! ভূতের আবার জন্মদিন!'

'পরাশরবাবু লোকটা শঠ, ভণ্ড, জঘন্য —' যেন শব্দসম্পদ বেশি নেই সুকণ্ঠীর। অসহায়ভাবে হাত ছুঁড়ল শূন্যে। বললে, ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না।'

'সূচনায় এটা কি তারই পরিচয় দিচ্ছে?'

'যারা প্রতারক তারা সূচনায় এমনি ছদ্মবেশ পরে। ভালো করবার ছলে সর্বনাশ করে। তোমাকে চাকরি দিয়েছে গূঢ় কোনো শত্রুতার উদ্দেশ্যে।'

'এরকম শত্রুর সংখ্যা দেশ জুড়ে বৃদ্ধি পাক।' আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল ধ্রুব। 'বেকারির নিপাত হোক।'

'তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ও এই সুযোগে এই বাড়িতে আনাগোনা শুরু করবে।'

'বলো কি, আসবে আমাদের বাড়ি?'

'আসবে? এলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেব না?'

'সে কি কথা? তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'শুধু ঝগড়া হলেই কি দরজা বন্ধ করে দেয়?'

'তবে কোনো দুর্ব্যবহার?' চিরুনি ছেড়ে দিয়ে শুধু আঙুলে মাথা চুলকোতে লাগল ধ্রুব।

'ধ্রুব!' গর্জন করে উঠল সুকণ্ঠীঃ 'যদি এ চাকরি তোমার করতেই হয় তবে এ বাড়িতে তোমার থাকা হবে না বলে দিচ্ছি। হয় তুমি আলাদা নয় আমি আলাদা হয়ে যাব। কালসাপকে বাস্তুসাপ হতে দেব না।'

বাবা এসে মাঝে পড়লেন। ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। তিনি বললেন, আগেই দড়িকে সাপ ভাবা কেন? আর সাপ ফণা তুললেই বা ভয় কিসের? পাথর হতে পারলে সাপের ছোবলে কি হবে।'

পাথরই হতে হবে। বাড়ির সঙ্গে ছিন্ন করতে হবে সম্পর্ক।

কোথাও কোনো একটা মেয়ে হস্টেলে জায়গা পায় কিনা তারই জন্যে ঘোরাঘুরি করছে সুকণ্ঠী। ঠিকানাটা না বদলানো পর্যন্ত শান্তি নেই। শুধু বাড়ির ঠিকানা নয়, পাড়া, মহল্লা, বাস-রুট। কোনদিন ধ্রুবর খোঁজে বাড়িতে এসে ওঠে চোরের মত তার ঠিক কি।

'জানো দিদি, পরাশরবাবু পড়ে গিয়েছেন।'

সুকণ্ঠী মুখ ফিরিয়ে রইল। কত লোকেই তো পড়ে-মরে তাতে কার কি মাথাব্যথা!

'সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে স্লিপ করেছেন।'

'মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে?' রি-রি করে উঠল সুকণ্ঠী।

'অতটা হয়নি। পায়ে চোট লেগেছে—'

'ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যায়নি?'

'বলা যায় না কি হয়।'

'অমন লোকের অমন কিছু না হলে প্রকৃতির নিয়ম বলে কিছু থাকে না।' সুকণ্ঠী সর্বজ্ঞ দার্শনিকের মত বললে।

'হাসপাতালে আছেন। এক্স্‌রে রিপোর্ট পেলে তবে বোঝা যাবে।'

এই, এই হচ্ছে অসুবিধে। রোজ তার খবর সরবরাহ করছে ধ্রুব। এমনি করে তার অস্তিত্বের শারীরিক অনুভবটা বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন চলেছে।

'বিশেষ ভাবনার কিছু নেই বলেছে ডাক্তার। সিম্পল ফ্র্যাকচার। প্ল্যাস্টার করে দিয়েছে। মাসখানেকের ধাক্কা।'

'মোটে?' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সুকণ্ঠীর। উষ্মাটা যে চাপা দেবে চট করে এমন কোনো কথা খুঁজে পেল না।

'আজ আবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম—'

'যেখানে খুশি তুমি যাও, চুলোয় হোক গোল্লায় হোক নরকে হোক—আমাকে জানাবার কোনো দরকার নেই। হাসপাতালে রুগী খালি একটা নয়।'

'জানো দিদি', সেদিন বিমর্ষ মুখে ধ্রুব এসে বললে, 'পরাশরবাবু আমাকে বাইরে বদলি করে দিয়েছেন—'

উত্তরে জিগগেস করা উচিত, কোথায়? কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাসের সঙ্গে সুকণ্ঠীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলঃ 'বাঁচলাম!'

'বাঁচলে?'

'তা ছাড়া আবার কি। সব সময় আর খবর জোগান দেওয়া চলবে না। কাজের জ্বালার নিবারণ হবে।'

ধ্রুব গেল বাবাকে বলতে। রামমোহনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মফস্বলে গেলে তো বিষম ক্ষতি। কিছুই তখন তুলে তো পাঠাতে পারবে না সংসারে।

'না, না, একা থাকতে শেখাই তো ভালো।' সুকণ্ঠী সহজ-স্পষ্ট স্বরে বললে, 'আত্মীয়দের আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে পড়ে থাকায় কোনো বাহাদুরি নেই। খোলামেলা জায়গায় স্বাবলম্বনের স্বাধীনতায় থাকা অনেক ভালো।'

এ একটা কাজের কথা হল? যে করে হোক এ বদলি রদ করাতে হবে।

'তুমি একবারটি যাবে দিদি? তুমি যদি একটু বলো—' মিনতিম্লান মুখে ধ্রুব কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আমি? আমি যাব?' বোমার মত ফেটে পড়ল সুকণ্ঠী।

বুঝতে পেরেছি, মনে-মনে গণনা করতে বসল, সব কারসাজি। চাকরি দেওয়া বদলি করা তদবিরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সবই শাণিত ষড়যন্ত্র।

অগত্যা রামমোহনবাবু ছেলেকে নিয়ে নিজে গেলেন দরবার করতে।

'বাবা, তোমার যাবার কি হয়েছে? তুমি কেন ছোট হতে যাবে?' সুকণ্ঠী বাধা দিতে এল।

রামমোহনবাবু শুনলেন না। শুধু বললেন, 'আমার তো মনে হয় দিতে জানাটাই চালাকি নয়, নিতে জানাটাও চালাকি।'

মফস্বলই যেন বহাল থাকে। রাগে জ্বলতে লাগল সুকণ্ঠী। এত কথা তাহলে উঠতে পায়না সংসারে। পরাশরের জ্বলন্ত স্মারক চিহ্নের মতই যেন জেগে আছে ধ্রুব। সব সময়ে যেন তারই সমৃদ্ধি আর ঔদ্ধত্যের গন্ধ বয়ে বেড়াচ্ছে। ও চলে যাক, সরে যাক চোখের সামনে থেকে। নিত্যনতুন কথার নিবৃত্তি হোক, মনে-জাগিয়ে-রাখার ঘা শুকোক। গা-জুড়োনো হাওয়া দিক।

'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল দিদি।' ধ্রুব ফিরে এসে বললে, 'বদলি কিছুতেই রদ করতে রাজি হলেন না।'

'আমার কথা কিছু বলেছিলে বুঝি?' যেন মাথার উপর খড়্গ তুলল সুকণ্ঠী।

'না, তোমার কথা বলতে হয়নি। কিন্তু মনে হয় বুঝতে পেরেছেন। নইলে প্রায় ঐ কথাগুলিই বললেন কি করে?'

'কোন কথা? কোন কথা আবার বলেছিলাম আমি?'

'বললে, আত্মীয়দের আঁকড়ে মাথা গুঁজে পড়ে থাকার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। ওরকমভাবে থাকতে গেলেই নানারকম ক্ষুদ্রতা, নানারকম কলহ। বিরোধের মধ্যে আলাদা হলে জোড় লাগে না, কিন্তু এমনি আলাদা থাকতে শিখলে আত্মীয়রা আলাদা হয় না।'



'এসব আমি কিছু বলিনি। এসব মোটেই আমার মনের কথা নয়।' চাপা আক্রোশে গজরাতে লাগল সুকণ্ঠী। 'তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের জব্দ করা, নাকাল করা, আমাদের সংসারের আয় কমিয়ে দেওয়া—'

ধ্রুব কান চুলকোতে লাগল।

কে জানে হয়তো বা দুর্বল, অভিভাবক-হীন করে ফেলা। হাতের কাছে একটা খাটিয়ে-পিটিয়ে ভাই ছিল, উঠতে-ছুটতে পারত, তাকে সরিয়ে দেওয়া। মনে-মনে আবার গণনা করতে বসল সুকণ্ঠী। গভীর, সুগভীর ষড়যন্ত্র।

রাগে-রোষে দগ্ধ হতে লাগল সুকণ্ঠী। কোথায় শীতলসিঞ্চন আছে, মনোহর সরোবর আছে যেখানে ডুবতে পারলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, মনের জ্বালা যায়।

বৃষ্টি, বৃষ্টি নামল সেদিন। আপিস-আদালত ভাঙো-ভাঙো, এমন সময়। একটা সমুদ্রকে যেন আকাশে তুলে এনে সহসা উপুড় করে দিয়েছে। বৃষ্টিতে ফোঁটা থাকে, রেখা থাকে, দুটো রেখার মধ্যে খানিকটা বা ফাঁক থাকে। এ বৃষ্টির মধ্যে কোনো ফোঁটা নেই রেখা নেই ফাঁক নেই। এক সমুদ্র জল একসঙ্গে নেমে পড়েছে। যেন বাঁধ-ভাঙা বন্যা, কারু ধার-না-ধারা ধারাপাত।

আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সুকণ্ঠী। তাড়াতাড়ি একটা বাস ধরতে হয়।

প্রায় ছুটে একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বাস কোথায়? যা দু-একটা আসছে গন্ধমাদন হয়ে আসছে। হাত তুললেও দাঁড়াচ্ছে না। ভিতরের তাগিদে যদি বা কখনো দাঁড়াচ্ছে, পিল পিল করে লোক ছুটছে হানা দিতে। পৌঁছুবার আগেই ভিজে একসা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার ফিরে আসছে স্বস্থানে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সুকণ্ঠী। মুষলধার শুনেছে, এ শতঘ্নীধার। কোথাও বিরাম নেই, দয়ামায়া নেই। কি করে বাড়ি ফিরবে ভেবে কূল পাচ্ছে না। নিঃসহায় দুশ্চিন্তায় সমস্ত শরীর ভারী হয়ে উঠেছে। জলের সাদা পর্দা যেমন ঘিরে আছে শূন্যকে, তেমনি সুকণ্ঠীকে ঘিরে আছে আতঙ্কিত অনিশ্চয়।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—বহুজনের সঙ্গে সুকণ্ঠীও হাত তুলল।

ভালো করে দেখেনি কেউ, একটা লোক আছে ভিতরে। সবাই নিরস্ত হল কিন্তু ট্যাক্সি নিরস্ত হল না। সুকণ্ঠীর কাছে দাঁড়াল, কার্ব ঘেঁষে। দরজা খুলে দিল ভিতর থেকে। আর, আশ্চর্য এক মুখ হাসি নিয়ে ভিতরে ঢুকল সুকণ্ঠী।

উঠতে-উঠতে বললে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

'বর্ষায় সমস্ত হিসেব মুছে যায়। কুম্ভকর্ণের মত অসম্ভবেরও ঘুম ভাঙে।' বললে পরাশর।

'হবে।' দরজা বন্ধ করল সুকণ্ঠী।

বেশ মেলে-ঢেলেই বসেছে মাঝখানে। ভঙ্গিটা আর কাঠ-কাঠ নয়, কাঠগোলাপ-কাঠগোলাপ। বেশ অনায়াসেই ডান হাত-খানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল পরাশর।

'ভিজে গিয়েছ দেখছি।'

'ও কিছু নয়—'

জনে-মানে যে শহর ঝলমল করছিল সে কেমন এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। অবাস্তবতার ছায়ামাখানো অন্যরকম পোশাক পরেছে। বাড়িঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, যেন কোন পরিত্যক্ত পাষাণের রাজ্য। দোকানের সাইনবোর্ডগুলি যেন অন্য কি কথা কইছে, অসময়ে যে কটা আলো জ্বলে উঠেছে তা যেন কোন অনির্দেশের হাত-ছানি। লোকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে বা যারা পথ ভাঙবার চেষ্টা করছে সব আরেক কোন অজানা দেশের বাসিন্দে। সবাই কেমন অসতর্ক, অন্যমনস্ক। কিছু আসে যায় না, সবাই কেমন নিয়মের বাইরে, নিষেধের বাইরে, রুল-টানা রুটিনের বাইরে।

ট্যাক্সি থেমে পড়ল। আর যাবার পথ নেই।

জলে জলময় রাস্তা। রাস্তা তো নয়, ডহরপানির খাল। দস্তুরমত ঢেউ দিয়েছে, আশে পাশের দোকান বাড়ির দেয়ালে গিয়ে লাগছে। কোমরডুব জল ঠেলে যাচ্ছে কেউ-কেউ, ছেলেরা নৌকো ভাসিয়েছে, কাগজের কাঠের। কেউ কেউ বা সাঁতার কাটছে, জল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। এখানে-ওখানে বিগড়ে আছে মোটর। বোঝাই হয়ে রিকসা চলেছে ছপ্পর তুলে।

'কি বিপদই না হত ট্যাক্সিটা না পেলে।' বললে সুকণ্ঠী।

'বিপদ তো এখনও।' বললে পরাশর। 'ট্যাক্সি আর যাবে না। এঞ্জিনে জল ঢুকেছে। কতক্ষণে জল নামবে ট্যাক্সি চলবে কে জানে।'

তবু যেন এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই সুকণ্ঠীর। এই অজস্র বর্ষণ, পথঘাট ডোবানো বাড়িঘর ভোলানো জল, এই অনিশ্চয়ে থেমে থাকা—কিছুই যেন দুরূহ নয়।

কলকাতাই যেন নয় আর কলকাতা। যেন কোন আরেকটা জায়গা। নদীর ধারে একটা নৌকো বাঁধা। একটা ছাতিম গাছ ভিজছে নিঝুম হয়ে। কোথায় বসে কাঁদছে একটা নিরালা পাখি।

যেন এটা বাড়িফেরা কেরানির বিকেল নয়, ঘুমে-অঘুমে মেশা মস্ত মধ্যরাত।

দুষ্মন্ত আসছেন রথে চড়ে কণ্বমুনির আশ্রমে—রথটা যেন রিক্সা—

মাইসনের পোর্সিলেন ফ্যাক্টরি দেখা হল। অনেক পুরানো, জগৎজোড়া নাম। পোর্সিলেনের আবিষ্কার আঠারো শতকের গোড়ায়, ঠিক তার পরের বছর এই ফ্যাক্টরির পত্তন। ভিজিট-বুকে টলস্টয় ও বিস্তর গুণীজ্ঞানীর নামসই। প্রথম লড়াইয়ের আগে মাইসনের মালের খুব চল ছিল ভারতে। মেঞ্জেল নামে এক জর্মন ফ্যাক্টরির তরফে কলকাতায় থাকতেন। বুড়ো মানুষটির সঙ্গে আলাপ হল। অনেক কাল ছিলেন, খাসা ইংরেজি বলেন। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন : আহা, ভারি সুন্দর জায়গা। শরীর অপটু হয়েছে—এ জীবনে আর যাওয়া হবে না তোমাদের কলকাতায়।

কিন্তু মাইসনের গল্প আজ নয়। বড্ড তাড়া। থিয়েটারে শকুন্তলা পালা। সাড়ে-সাতটায় আরম্ভ, আর এখন আমরা শ' চারেক মাইল দূরে। ফ্যাক্টরি দেখে শুনে বেরুতে দেরি হয়ে গেল—তার উপরে বেরিয়ে দেখি, কী সর্বনাশ, মোটরে স্টার্ট নিচ্ছে না। পদে পদে বাধা পড়ছে।

যাবো কার্ল-মার্কস-স্তাদে। শহরের নাম-করণ নতুন, আগের নাম চেমনিজ (Chemniz)। কার্ল মার্কস্ জর্মন দেশের—শহরের সঙ্গে নাম জুড়ে দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ দেমাক দেখানো। ভারী-শিল্পের জন্য নামডাক জায়গাটার; থিয়েটারও বেশ বনেদি। রবীন্দ্র-নাথ এসেছিলেন এই চেমনিজে। দুনিয়ার যে তল্লাটে যাচ্ছি, শুনতে পাই, তিনি এসে গেছেন আগেভাগে। আর কোন ভাবনা থাকে না। 'টেগোরে'র দেশেরই মানুষ গো আমি—তাঁর ভাষাতেই লিখি। দু-কথায় আপন হয়ে পড়ি।

ইদানীং এই এক মাস ধরে থিয়েটারে 'শকুন্তলা' হচ্ছে। হাউসফুল রোজই। ভারতের লেখকরা এসেছে শুনে থিয়েটারের কর্তারা পালাটা দেখাতে চান। বইটই পড়ে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যা-কিছু জানা। ভুল-ত্রুটি নিশ্চয় আছে। ভারতের মানুষদের দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবেন। পালাটা লোকে খুব নিয়েছে, একটা বছর নির্ঘাৎ চলবে। যতদূর সম্ভব, অতএব নিখুঁত করে

## ॥ মনোজ বসু ॥

নিতে চান। তারপরে বার্লিন শহরেও দেখিয়ে আসবার মনন আছে। এবং সুবিধা হলে জর্মনির বাইরেও।

আমাদেরও দেখবার লোভ। জর্মনির সংস্কৃত-চর্চা বিস্তর দিনের। সংস্কৃত কাব্য-নাটক-দর্শন নিয়ে জর্মন পণ্ডিতের গবেষণা আমাদেরই কতজনের চোখ খুলে দিল। সেই তাঁরা কালিদাসের সেরা নাটক স্টেজে করছেন—জর্মন সাহেব-মেমরা ঋষি সাজছে, আশ্রমকন্যা সাজছে—কি রকম মোটমাট দাঁড় করালেন, দেখতে লোভ হয় না কার বলুন?

কিন্তু হরেক বাধা। বার্লিন থেকে বেরিয়ে পড়েছি দুটো মোটর এবং দোভাষী ইত্যাদি নিয়ে। ঘুরে ঘুরে দেশ দেখছি। শকুন্তলা দেখা হবে, গোড়ার প্রোগ্রামে ছিল। বেরুবার মুখে বাতিল হল। উজান পথ—বহুত ভাল ভাল জায়গা নাকি বাদ পড়ে যাবে এই একটা জিনিস দেখতে গেলে।

কিন্তু থিয়েটারের ওঁরা বন্দোবস্ত সারা করে বসে আছেন। আকাদেমি-অব-আর্টসের নিমন্ত্রণে আমরা এসেছি, তাঁরা মুরুব্বি। ফোন করেছেন তাঁদের বারম্বার, বার্লিনে লোক পাঠিয়েছেন। ধরাধরির ফলে প্রোগ্রাম আবার পালটাল। আরও জানা গেল, আকা-দেমির কর্তরা শিল্প-সাহিত্যে দিক্‌পাল বটে, কিন্তু ভূগোলে আনাড়ি। কার্ল-মার্কস-স্তাদ প্রায় পথেই পড়ে—মাত্র শ' খানেক মাইলের এদিক-ওদিক।

যাত্রাপথে এখন আবার এই নতুন বাধা। দুটো গাড়ির একটা বিগড়েছে। ড্রাইভার বেকুব। নিজের বিদ্যের যথাসাধ্য করে অতঃ-পর মাথা চুলকায়ঃ খানাপিনা সারতে লাগুন, গাড়িটা একবার কারখানায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। রয়ে-বসে কিছু লম্বা করে খাবেন, তার মধ্যে এসে যাবো।

বড় হোটেল এ-পাড়ায় দেখছিনে। ফ্যাক্টরিতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছি। হাঁটবার তাগত নেই—সামনের মাথায় যা পাওয়া গেল; অন্নপূর্ণার নাম স্মরে ঢুকে পড়ি সেখানে। শুধুমাত্র গো-শূকর নয়, আলাদা দু-এক পদও থাকে যেন মা-জননী।

যতদূর পারি, গড়িমসি করে খাওয়া গেল। তবু শেষ হয়ে যায় এক সময়। গাড়ির পাত্তা নেই। খালি টেবিল কোলে নিয়ে কাঁহাতক থাকি? ছোট হোটেল—জায়গা সংক্ষিপ্ত, খদ্দের এসে দাঁড়িয়ে থাকছে। লীবার্গ তদারকিতে আছে—আধখাওয়া করেই বেরিয়েছে। ঘামতে ঘামতে ছুটে এসে বলে, উঠুন।

গাড়ি ঠিক হয়ে গেল?

না হবার কি আছে? গাড়ি ঠিক হবেই। বসবার জায়গার ব্যবস্থা করে এলাম।

…জলবালে জল দিচ্ছিল। মহৈশ্বর্য রাজা দুষ্মন্তকে দেখে বিহ্বল বিমুগ্ধ হয়ে গেছে শকুন্তলা। পিছনে স্মিতহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে সখী প্রিয়ম্বদা

যতক্ষণ খুশি বসবেন—সারাদিন সারারাত্রি বসলেও কেউ কিছু বলবে না।

পোয়াটাক গিয়ে এক বাড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি তো উঠছিই। দোতলার সিঁড়ির মুখে তরুণী। মধুর হেসে জর্মানিতে সম্ভাষণ করে উপরমুখো হাত দুলিয়ে দিলেন। তেতলার সিঁড়িতে পুনশ্চ একটি। তিনিও হাসলেন এবং হাত দোলালেন। উঠতে উঠতে নাভিশ্বাস উঠেছে, স্বর্গলোকে নিয়ে তুলছে নাকি অহর্নিশি ও সমস্ত কাল থাকবার যেখানে পাকা ব্যবস্থা?

চার্চ এবং তৎসহ ইস্কুল। চার তলায় কমিটি-রুম—সেই ঘর দেখিয়ে দিল। সিংহাসনবৎ চেয়ারখানি প্রেসিডেন্টের। দু-দিকে লম্বা টেবিল—টেবিলের ধারে সারিবন্ধ চেয়ার, মিটিঙের সময় মেম্বার মশায়দের বসবার জন্য। ঘরে পৌঁছে দিয়েই লীবার্গ গাড়ির তল্লাসে ছুটল। সাড়ে-সাতটায় না পৌঁছলে প্রোগ্রাম মাটি। আমাদের অপেক্ষায় থিয়েটার বন্ধ থাকবে না। একটা দিন চেপে বসে আগামীকাল দেখে যাবেন সে উপায় নেই। ভিন্ন জায়গায় আলাদা প্রোগ্রাম। সেখানকার মানুষ তোড়-জোড় করে আছে। আজকে না হলে 'শকুন্তলা' বাদ পড়ে গেল এ-যাত্রায়।

টেবিল দুটোয় দু-জন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিৎ হলেন। এবং অচিরে নাসাধ্বনি। আমার উপায় কি—এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খান চারেক চেয়ার জুড়ে কায়ক্লেশে তার উপর পড়লাম। বিদেশে ঘুরে ঘুরে সদভ্যাস হয়েছে, সময়ের অপব্যয় হতে দিইনে। অবসর পেলেই খাওয়া ও ঘুম—এই দুটো বাজে ঝামেলা যতদূর পারি চুকিয়ে রাখি। তা নিতান্ত খারাপ হল না। শুধুমাত্র ঘুম নয়, দেড়খানা দু-খানা স্বপ্নও তার মাঝে। দুমদাম করে সিঁড়ি ভেঙে আসছে—পদদাপেই বুঝছি লীবার্গ।

উঠুন, উঠে পড়ুন—

ঘড়ি দেখে মুখ শুকাল: আঁ, দু-ঘণ্টা কেটে গেছে?

ড্রাইভার বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। বলে, উঠে পড়ুন দিকি। তারপরে দেখবেন।

ড্রাইভারের পাশের সিটে আমি। জর্মানিতে এই নিয়ম করে নিয়েছিলাম। সামনে বসে নজর ছড়িয়ে দেখা যায়, পিছনের গহ্বরে জুত হয় না। কিন্তু আজকে আর নজর মেলে ভরসা রাখিতে পারি না, ক্ষণে ক্ষণে চোখ বুজি। নক্ষত্র-বেগে ছুটছি। জর্মানির অটো বান অর্থাৎ মোটর ছোটানোর রাস্তা—কিন্তু এই বাঁধা রাস্তার উপরে কতক্ষণ আর! গাড়ি-মানুষে তালগোল পাকিয়ে পড়ে যাব রাস্তার পাশে—মানুষ ভিড় করে এসে দেখবে, পিণ্ডাকার লোহালক্কড় দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

সীমাহারা মাঠ, উঁচু-নিচু ঢেউ-খেলানো। মাঝে মাঝে লম্বা-চূড়া গির্জা। গির্জা দেখলেই গ্রাম বুঝবেন সেখানে, গির্জাকে ঘিরে মানুষের বসবাস। টালি-ছাওয়া ঘর-বাড়ি—চাল ফুঁড়ে চিমনি উঠেছে। গরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে—সাদার উপরে কালোর ছোপ-ছোপ। সব গরুর প্রায় ঐ চেহারা, গোটা অঞ্চল ঘুরে দেখলাম। চাষের-কাজ করছে চাষীরা। আজ্ঞে হ্যাঁ—সাহেব চাষী, মেম চাষী। ঘাস বাছছে, বীজ বুনছে। সর্ষেফুল—হলদে হলদে ফুলে মাঠ ভরে আছে। ক্ষেতের মাঝে সারি সারি কাঠ পুঁতে দিয়েছে, আঙুরগাছ লতিয়ে উঠছে। আমাদের পানের বরজে যেমন কাঠি পুঁতে দেয়।

স্ফূর্তিবাজ ড্রাইভার। ঐ জোরে গাড়ি ছেড়ে তার সঙ্গে রেডিও খুলে দেয়। দিয়ে চাবি ঘোরায়। কথাবার্তা-বক্তৃতাদি শুনবে না—গান। পছন্দসই গান যতক্ষণ না পাচ্ছে, চাবি ঘোরাতে লাগল। বার্লিন স্টেশনে পেল না তো ভুবনের আর যে স্টেশনে পাওয়া যায়। মনের মতো গান হল তো স্টিয়ারিং-চাকায় তাল দিতে শুরু করেছে। স্পীডোমিটারের কাঁটা ওদিকে হু-হু করে উঠে যাচ্ছে—আশি একশ একশ-বিশ...। বুঝুন। দশটা দিন এমনি গাড়ি ছুটিয়েছি ছোকরার সঙ্গে। তবু বহাল-তবিয়তে বেঁচে বিস্তর জর্মান গীত শুনে ফিরে এলাম। আমাদের অনেকগুলো নাম-করা সিনেমা সুরের সঙ্গে হুবহু মিল। কী কাণ্ড দেখুন, সুর চুরি করে মেরেছে। শুনলাম নাকি জর্মন লোকসংগীত। আমাদের সিনেমার সুর তবে দেখছি একশ দু-শ বছর আগে থাকতে মেরে দিয়ে বসে আছে।

ফ্যাক্টরি দেখা যায় অনেক। কার্ল-মার্কস-স্তাদের কাছাকাছি তবে নাকি? ইস্পাতের ফ্যাক্টরি—চোঙা দিয়ে লাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে টাটানগরের মতো। প্রাচীন ধাঁচের খিলান-করা মস্ত মস্ত পুল—পুলের উপরে রাস্তা, নিচেও রাস্তা। ঘ্যাস করে গাড়ি থামল রাস্তার প্রান্তে গিয়ে। ড্রাইভার হি-হি করে হাসে: কী মশাইরা পৌঁছানো

যাবে না যে! অঢেল সময়, কফি খেয়ে নিন স্ফূর্তি করে, কিম্বা আর-কিছু খান। কষ্ট হয়েছে।

কষ্ট আমাদের না হোক, ইঞ্জিনের খুব হয়েছে। জুড়িয়ে নেওয়ার দরকার। অবোলা মেশিন, তাই এত খাটানো গেল। মানুষ হলে এই সোসালিস্ট দেশে বুঝতে পারতেন। থামিয়ে দিয়েছে, হাসফাস করছে তবু বিষম।

কফিখানার গায়ে পোস্টার আঁটা। বড় বড় হরফে শকুন্তলার নাম এবং স্বর্গ-মর্তের উপমা দিয়ে গোটে নাটকের তারিফ করেছিলেন, তার কয়েক ছত্র। পোস্টার দিয়ে মানুষ ডাকাডাকি করছে—এসে পড়েছি অতএব।

১৭৮৯ অব্দ—প্রায় তো পৌনে দু-শ বছর। সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা নাটকের ইংরেজি তর্জমা ছেপে ফেললেন। ফরাসি-বিপ্লবের আমল—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আলোয় মানুষ নতুন চোখে সব দেখছে। দুবছর পরে জর্জ ফরস্টার জর্মনে নাটকের তর্জমা করে গ্যেটেকে এক কপি পাঠালেন। গোটে লাফিয়ে উঠলেন—ভুবনের যাবৎ সাহিত্যের সর্বোত্তম মানিক যেন হাতের মুঠিতে পেয়ে গেছেন। চার লাইনে কবিতা লিখে ফেললেন—সে অপরূপ লেখার অনুবাদ হয় না : কুঁড়ি আর পরিণত ফল, প্রথম আবেগ আর পরিণত আবেশ, পরিতৃপ্তি আর পরিপূর্ণতা, স্বর্গ আর মর্ত—একটি কথায় যদি বলতে হয়, সে হচ্ছে এই শকুন্তলা। এবং তাতেই আমার সব বলা হয়ে গেল।

কবিতাটা এক মাসিকে ছেপে দিলেন। গ্যেটে হেন মহাগুণী এমন বললেন—চতুর্দিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল : কে বটে হে কবি কালিদাস, কী বস্তু এই নাটক শকুন্তলা? কাগজে কাগজে আলোচনা শকুন্তলা নিয়ে। একাধিক পণ্ডিত প্যারিসে গিয়ে সংস্কৃতের পাঠ নিচ্ছেন মূল সাহিত্যের রসাস্বাদের জন্য। ভারত সম্বন্ধে বিস্তর লোক কুতূহলী—ইন্ডোলজির ক্লাস খুলল য়ুনিভার্সিটিতে। গোটে নিজে বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন, ফাউস্টের মধ্যে তার কিঞ্চিৎ পরিচয়। শকুন্তলার শুরুতে সূত্রধারের আবির্ভাব—নটীকে আহ্বান করে তিনি নাটক সম্বন্ধে বলছেন: অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে, কিন্তু নিজ শক্তিতে ভরসা করতে পারছেন না। ফাউস্টেও এই ব্যাপার—সূত্রধার এসে কবি ও বিদূষককে ডাকলেন: নিজের উপর আস্থা নেই, তাঁদের উভয়ের সাহায্য চাইছেন।

জোন্সের ইংরেজি থেকে প্রথম—তারপরে মূল-সংস্কৃত থেকেও শকুন্তলার তর্জমা হয়েছে জর্মন ভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্যের জয়-জয়কার ওদেশে। সকলের সেরা হলেন কালিদাস, সে অবশ্য বুঝতেই পারছেন। কালিদাসের কাব্য-নাটকের বিস্তর তর্জমা ও ভাষ্য। শকুন্তলার তর্জমা ও ভাষ্য অন্ততপক্ষে বিশখানা। বিক্রমোর্বশী নাটকও থিয়েটারে হয়ে গেছে ১৮১৭ অব্দে। নাম দিয়েছিল 'সম্রাট ও নর্তকী'।

রাজা দুষ্মন্তের রাজসভায় রাজা ও বিদূষক। রাজাসনের দুপাশে ভারতের পুরানো স্থাপত্যের দুই নারীমূর্তি

লড়াই জর্মনিকে তছনছ করে গেছে—তার মধ্যেও কিন্তু ভারত-চর্চা অব্যাহত চলছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম। বার্লিনে জাঁকিয়ে আছেন ডক্টর রুবেন—য়্যুনিভার্সিটিতে তাঁর নিজ বিভাগে প্রায় এক টোল সাজিয়ে বসেছেন। গিয়ে মনে হল, সেই হলটার ভিতরে আমার অত্যন্ত আপন জায়গা। যতেক ছাত্রছাত্রী চেহারায় সাহেব-মেম, মনে মনে ভারতের মানুষ। আলাপ-পরিচয়ের জন্য পাগল। প্রাচীন ভারত পুঁথিপত্রে জানে; হাল আমলের ভাষাগুলো—বিশেষ করে হিন্দী আর বাংলা জানবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। হিন্দীর জন্য আছেন একজন লক্ষ্ণৌবাসী, ডক্টর আনসারি; দুর্ভাগা বাংলার কেউ নেই। আর দেখলাম লাইপসিগে অশীতিপর ঋষি-তপস্বী অধ্যাপক ওয়েলার। বর্ষীয়সী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যাপক মশায় পায়ে হেঁটে হোটেলে এলেন ভারতের মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে। মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম তাঁর কাছে। আচ্ছা, সংস্কৃতে অধিকার থাকলেই কি চেহারায় আচরণে চিত্তের ঔদার্যে আমাদের সেকালের ভোগ-বিরাগী পণ্ডিত হতে হবে? অধ্যাপক ওয়েলারেরও হিন্দিভাষী সহকারী আছেন—শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী। বাংলা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

পণ্ডিত মানুষদের ছেড়ে সাহিত্যিকের কথা বলি। আমাদের কি বিপদ শুনুন। বার্লিনে আমাদের সান্ধ্য আড্ডা জমেছে আধুনিক এক কবির বাড়ি। উভয় জর্মনির অনেক লেখক জুটেছেন। যেমন হয়ে থাকে—কবিতা-পাঠ, উচ্চাঙ্গের কথা-বার্তা এবং যথোচিত খানাপিনা। আসর পাতলা হয়ে গেলে কবি মশায় লাইব্রেরি দেখাতে উঠলেন। বিশেষ একটা ঘর নয়—উপর তলায় নিচের তলায় সর্বত্র বই। ঘরে বারান্ডায় সিঁড়িতে। এক মানুষের জীবনে অত বই পড়া যায় না। প্রকাণ্ড এক শেলফের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি আমাদের নিয়ে। বইয়ে ঠাসা, চামড়ার উত্তম বাঁধান। একখানা দুখানা বের করে এনে সামনে ধরছেন। বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে—চলিত অচলিত নানান সংস্কৃত বই, জর্মন ভাষায় টীকা-টিপ্পনী। এই সমস্ত পড়ে থাকেন কবি। ভারতের মানুষ বলে আমাদের সম্ভবত সংস্কৃতে দিগ্‌গজ বিবেচনা করেছেন। হয়তো বা বলেই বসলেন কোন দুরূহ শ্লোকের ব্যাখ্যা করে দিতে। সুবোধ পাঠক মশায়দের সদুপদেশ দিয়ে রাখি, জর্মনির গুণীজ্ঞানী সমাজে যাবেন তো সংস্কৃত রপ্ত করে নিন আগেভাগে। অথবা পানভোজনের পরে লাইব্রেরি দেখানোর সময় হলেই মাথাধরা বা

স্বর্গলোকে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলা ও পুত্র ভরতের মিলন দৃশ্য

অমনি-কিছু রচনা করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হবেন। নতুবা মান বাঁচানো দায়।

কার্ল-মার্ক্স-স্তাদে হোটেলের সামনের রাস্তায় থিয়েটারের এক ব্যক্তি বিচলিতভাবে পদচারণা করছেন। মোটর থামতে না থামতেই গ্রেপ্তার করলেন। হাতঘড়ি দেখে বলেন, জিনিসপত্র যে যার ঘরে ফেলেই তালা দিয়ে নেমে আসুন। কফি পথে সেরে এসেছেন ভালই—অঙ্কের শেষে পর্দা পড়লে আর একদফা ভাল মতো হবে।

ডিরেক্টর কেসলার বুড়া হয়ে পড়েছেন, শুধুমাত্র নামে আছেন, আসছে বছর অবসর নিচ্ছেন। সহকারী ফ্রেয়ার (Paul Herbert Freyer) তখন ডিরেক্টর হবেন। এখনও তিনি সব করেন, শকুন্তলার পুরোপুরি ব্যবস্থা তাঁরই। কর্মিষ্ঠ যুবাপুরুষ—থিয়েটারের ফটকে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, পথ দেখিয়ে আমাদের ভিতরে এনে বসালেন। হল ভরতি, কালো মানুষ ক'টির দিকে ঔৎসুক্যভরে সকলে তাকাচ্ছে। পুরো এক হাজার সিট—তার মধ্যে পয়লা সারিতে গোণাগুণতি এই কখানা রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। ফ্রেয়ার ওরই মধ্যে মনে করিয়ে দিচ্ছেন : খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন কিন্তু। বিস্তর খেটেছি। কুড়িটা তর্জমা মিলিয়ে মিলিয়ে নাটক বানানো—মূল থেকে যাতে বেশি ফারাক না হয়। তবু ভয় ঘোচে না—শিব গড়তে গিয়ে বানর না গড়ে থাকি।

দোভাষিণী লিজেল বার্লিন থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আর ঐ লীবার্গের কথা তো বলেছি। লিজেল ইংরেজি করে দিল ফ্রেয়ারের কথাগুলো। আমার পাশের সিটে বসেছে। ফ্রেয়ার নিজেও এই লাইনে।

দেরি করে ফেলেছে আমাদের খাতিরে পাঁচ মিনিট। ধবধবে সাদা পর্দা, উইংসের চিত্রণে সাদামাটা কতকগুলো রেখা। চোখ প্রসন্ন হল—সাদা রঙের প্রাচুর্যে পুণ্য পবিত্র পরিবেশ আনতে চেয়েছে। আলো নিভে গেল। বিশাল হল উৎকর্ণ হয়ে আছে, সুঁচ পড়লেও শোনা যাবে বোধ হয়। লিজেলের কানে কানে বলি, রোজ তুমি আমাদের বোঝাও, আজকে চুপচাপ থাকো। আমি তোমায় বুঝিয়ে দেবো পালা।

পর্দা ঠেলে তরুণ ঋষি বেরিয়ে এলেন। ইনি কণ্ব-শিষ্য শার্ঙ্গরব সেজেছেন ক্ষণপরে টের পাওয়া গেল। উদাত্ত কণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ করলেন। বিশাল হল থমথম করছে। মৃদু বাজনা। কনসার্ট ওদেরই, কিন্তু দুড়ুমদাড়াম ঢক্কা-নিনাদ না হয়ে সানাইয়ের মতন মোলায়েম আমেজ পাচ্ছি।

সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ। মূল-নাটক পড়া আছে, হুবহু মিলে যাচ্ছে। জর্মন না জানলেও বক্তব্য মোটামুটি বুঝতে আটকায় না। ঐ নটীই হল শকুন্তলা। সুন্দরী মেয়ে, নামটাও সুন্দর—রোজমেরি (Rosemarie Schnabl)।

পর্দা সরে গেল। তিন দিক ঘেরা কাপড়ের সিন। কণ্বের তপোবন তো জানি, কিন্তু সিনে দেখছি নিখুঁত ভারতীয় রীতিতে আঁকা হাতীর পিঠে রাজা, নৃত্যপরা অপ্সরী, হরিণ ইত্যাদি। বন বলতে যা বোঝেন, তার কিছু নেই। আমাদের থিয়েটারে পুরোপুরি বন এঁকে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার প্রয়াস করে। এদের উদ্দেশ্য তা নয়—শুধুমাত্র একটা ভারত-পরিবেশ রচনা করেছে; দর্শকদের যেন ডেকে বলছে, একটা ভারতীয় কাহিনী আসছে, মনে মনে তৈরি হও তার জন্যে।

সে না হয় হল। কিন্তু কী করে বুঝি যে জায়গাটা হল তপোবন, রাজবাড়ি নয়? দুটো গাছ বসিয়ে দিয়েছে স্টেজের মাঝ-খানে, একটা গাছ আলবালে ঘেরা। সত্যি-কারের জীবন্ত গাছ নয়, আঁকা গাছ—গাছের ইঙ্গিত। বাস, হয়ে গেল, আর কিছু মাথা ঘামানোর নেই। ঐ গাছের অনেক গুণ ধরে নেবেন। অর্থাৎ দুটো মাত্র নয়, অগণ্য গাছ। আবার এই সিনের কাজের শেষে রাজসভায় তো আসবেন? কিচ্ছু নয়—স্টেজের ঐ জায়গাটুকু পর্দায় ঢেকে গাছ সরিয়ে ঐখানে রাজাসন বসিয়ে দিল, পিছনে কারুমণ্ডিত দেয়ালের একটুকু। হয়ে গেল রাজসভা। দৃশ্য বদল হল—কিন্তু পশ্চাৎ-পটে হাতী-হরিণ-অপ্সরার চিত্র যেমন-কে-তেমন রয়ে গেছে। অংক শেষ হয়ে পুরো স্টেজে পর্দা পড়লে, পশ্চাৎপট সেই তখন শুধু বদলাবে।

চুপ, চুপ! রাজা দুষ্যন্ত আসেন ঐ রথে চড়ে। এটা দৃষ্টিকটু। বলে এসেছি, এখন গিয়ে নিশ্চয় আর সে-বস্তু দেখবেন না। রথটা যেন রিক্সা—স্টেজের উপরে একজন রিক্সা টেনে আনল। দুষ্যন্ত ধনুর্বাণ তুলে তার উপরে চেপে আছেন। ঘুরেন-মঞ্চ, কলকাতার থেয়েটারে যেমন ধারা দরকার মাফিক মঞ্চ ঘোরানো চলে। কলকাতায় মঞ্চ ঘোরাই দৃশ্য পালটাতে। ঘর আছে, মঞ্চ ঘুরিয়ে দেখাই গাছতলা। দেখাই পথ। এখানে দৃশ্যই হল গোটাকতক সঙ্কেত মাত্র; দৃশ্য পালটানো অতিশয় সোজা, সে তো আগে শুনলেন। ঘুরেন-মঞ্চ এরা দৃশ্যের পরিধি বাড়ানোর কাজে লাগায়। দুষ্যন্তের রথ এগোচ্ছে, স্টেজও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে নেপথ্য থেকে রথ এগোবার জায়গা অবারিত করে দিচ্ছে। ঘোরার ফলে আলবালে-ঘেরা গাছ ক্রমশ উল্টোদিকে উইংসের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। পর্দা টেনে ঢেকে দিন ঐটুকু। শকুন্তলা এবং অনুসূয়া-প্রিয়ম্বদা সেই আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। স্টেজ আরও খানিকটা পাক দিতে চোখের সামনে এসে পড়ল তারা। তিন সখীর হাতে তিনটি পাত্র, গাছে জল দিচ্ছে। সত্যিকারের জল-ঢালাঢালি নেই, শুধু ভঙ্গিমা। দুষ্মন্ত রথ থেকে নেমে দু-চোখ ভরে মুগ্ধ হয়ে দেখছেন, আর বিস্তর স্বগতোক্তি ছাড়ছেন। কোন্ জায়গায় এসেছি বিবেচনা করুন একবার। পাড়াগাঁয়ের যাত্রার আসর নয়। তামাম ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স আর জর্মনি —এই দুটো হল খানদানি জায়গা; হিটলার তার উপরে আর্য-আর্য করে কিছুকাল মাথা ঘুলিয়ে দিয়ে গেলেন। হাজার দর্শকের মধ্যে কুল্যে আমরা এই পাঁচটি কৃষ্ণাঙ্গ। হেন স্থানে, দেখুন দেখুন, আড়াই-গজি স্বগতোক্তিগুলো শ্রোতারা কান বাড়িয়ে মজে গিয়ে কেমন গোগ্রাসে শুনছে।

শকুন্তলা ও সখীদের অতি স্বল্পবেশ

—বক্ষোবাস ও কটিবল্কল। হাড়-কাঁপানো শীতের দেশে রাত্রিবেলা প্রায় খালি গায়ে অভিনয় করছে। ঋষিদেরও ঐ গতিক। সে তুলনায় রাজা দুষ্মন্তের কিছু বেশি কাপড়-চোপড়। কিন্তু অহরহ পশমি কোট-পাৎলুন ও ওভারকোটে সমাবৃত হয়ে থাকেন, তার কাছে কিছুই নয়। বাবরি চুল দুষ্যন্তের, একটুকু সুঁচোল দাড়ি। শকুন্তলার কপালে বড় লাল ফোঁটা. অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার কালো ফোঁটা। কিন্তু পায়ে জুতা সকলের। সর্বত্যাগী ঋষিরাও জুতা ছাড়তে পারেননি। মহামুনি কণ্ব-দুর্বাসাও। স্যাণ্ডেল—চামড়ার ফিতেয় পায়ের গোছার সঙ্গে বাঁধা। দোষ নেবেন না। পুরাণ বলতে প্রাচীন গ্রীক-রোমকদের কথা বোঝে ওরা। কালিদাসের বর্ণনায় যা নেই, সে সব নিজেদের পুরাণ থেকে নিয়েছে। বিধবার মতো খালি হাত মেয়েদের—চুড়ি নেই। না শকুন্তলার, না সখীদের। পতিগৃহে যাবার সময় শকুন্তলা বল্কল ছেড়ে কাপড় পরল—উত্তম সিল্কের কাপড়, কিন্তু পাড়বিহীন। আমরা মানা করে এসেছি। সহযাত্রিনী উমা রাও একটা লাল-পাড় শাড়ি ও গোটাকয়েক কাচের চুড়ি দিয়ে এলেন রোজমেরিকে। এবারে গিয়ে দেখবেন, শকুন্তলার খালি পা, চুড়ি-পরা হাত, পাড়ওয়ালা শাড়ি পরনে। এবং ঋষিরাও আশা করি, খালি পায়ে তপোবনে বিচরণ করবেন।

কিন্তু বাইরের টুকিটাকি ছেড়ে দিন। প্রাণঢালা কী অভিনয় যে করল! হেলা-ফেলার কেউ নয়—ধীবর-দোবারিক অবধি। সকলের সেরা শকুন্তলা—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আঠাশে যে দেখে এসেছি, মাস চারেক তো হতে চলল—চোখ বুজলে কিশোরী মেয়েটা নানা মূর্তিতে মনে ভেসে বেড়ায়। নিরীহ নিষ্পাপ আশ্রম-বালা, বনে-জঙ্গলে লালিত, জনালয় দেখেনি—মহৈশ্বর্য রাজাকে দেখে বিহ্বল বিমুগ্ধ হয়ে গেছে। রাজসভা থেকে অবমানিত হয়ে বেরুচ্ছে, তখন আবার কী মূর্তি সেই মেয়ের! শেষ অঙ্কে স্বর্গধামে ছেলে নিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়াল, দুঃখ-দহনে মাতৃত্ব-সুষমায় তখন তার এক ভিন্ন চেহারা। 'শকুন্তলা'র এত জয়-জয়কার, অনেকখানি তার রোজ-মেরির অভিনয়ের গুণে। অথচ মেয়েটা পড়ে লাইপজিগ শহরে অভিনয়-শেখার ইস্কুলে। মোটে কুড়ি বছর বয়স। শেখা শেষ হয়নি। ইস্কুল থেকে টেনে এনেছে প্রথম এই পার্ট করতে।

দুষ্মন্ত প্রেমে পড়েছে। আংটি পরিয়ে দিল শকুন্তলার আঙুলে। পরিয়ে—ছি-ছি, কী কান্ড করে দেখুন,...তোমাদের ম্লেচ্ছ কান্ডবান্ড আমাদের দেশে চলে না বাপু! আংটি পরিয়ে দুষ্মন্ত চুম্বন করতে যাচ্ছিল, ঋষির কণ্ঠস্বরে চট করে সরে দাঁড়াল। ঋষি খুব বাঁচিয়ে দিলেন সময়-মতো এসে পড়ে। নমস্কারটা কিন্তু আচ্ছা শিখেছে! খাঁটি ভারতীয় কায়দায়। ঋষি করছেন, রাজা করছেন, শকুন্তলা-অনুসূয়া-প্রিয়ম্বদা করছে—যার যেমনভাবে উচিত, হাত জোড় করে মাথা মাটিতে ঠুকে টপাটপ নমস্কার সেরে যাচ্ছে।

পরের দৃশ্যে বিদূষককে দেখছি। গাছের গায়ে পা তুলে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। দুষ্মন্তের বিলাপ শুনে বিস্তর কষ্টে হাসি ঠেকাচ্ছে—খি-খি আওয়াজ তুলে সামনে থেকে ছুটে পালায়। কী সব বলছে—আমরা বুঝিনে, প্রেক্ষাগৃহ বারম্বার হাসিতে ফেটে পড়ে। ছুটোছুটি ব্যাপারটাও ইঙ্গিতে দেখাল। হাঁটছে—জোরে, আরও জোরে—রীতিমতো দৌড়ানো। পা ফেলানো দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে. দেহভঙ্গিতেও দ্রুত চলনের লক্ষণ। ব্যস, এইটুকু। রয়েছে কিন্তু এক জায়গাতেই।

রাজকক্ষ নিতান্তই সাদামাঠা। দুষ্মন্ত ও বিদূষক ছাড়া অন্য কেউ নেই। কঞ্চুকী বা দোবারিক দেখা দিচ্ছে কদাচিৎ। চলে যাবার সময় হাত দিয়ে অর্ধেকখানি পর্দা টেনে দিয়ে গেল একবার। জর্মন-থিয়েটারে অনেক পালা দেখেছি,—'শকুন্তলা'রই শুধু এই রকম ব্যবস্থা। মঞ্চ ঘুরে গিয়ে সেই পর্দার পিছন দিক সামনে এলো। বিরহাতুরা শকুন্তলা—পদ্মপত্রে বাতাস করছে দুই সখী। গায়ের সাদা রং ময়লা করবার জন্য কী যেন মেখেছে মেয়েগুলো। বেদনায় ভরা অতি-মোলায়েম কনসার্ট—হলের নিচে-উপরে সর্বত্র গুঞ্জরণ করে ফিরছে। সেই কোমল সুরের উপর যেন মুগুর হেনে ঋষি দুর্বাশা সহসা আবির্ভাব ঘোষণা করলেন। অভিশাপ দিলেন শকুন্তলাকে। রবি বর্মার বিখ্যাত ছবিতে যেমন দেখেছেন, অবিকল তাই।

দুষ্মন্তের রাজসভা। রাজাসনের দু-পাশে ভারতের পুরানো স্থাপত্যের দুই নারী-মূর্তি। সাঁচির প্যাটার্নে রাজবাড়ির ফটক. স্টেজের এক দিকে। অন্যদিকে মন্দির। পিছনে অন্তঃপুরের ইঙ্গিত। রাজবধূ হংসপদিকার গান ভেসে এসে পরিবেশ অশ্রুকরুণ করে তুলছে।

অঙ্ক শেষে চা খেতে বসেছি ফ্রেয়ারের সঙ্গে। প্রোগ্রাম দিয়েছে, এতক্ষণে উল্টে-পাল্টে দেখার ফুরসৎ পেলাম। ভারতের বিভিন্ন দৃশ্যের চারখানা ফোটো। গ্যেটে, হার্ডার ও ফরস্টার—তিন গুণীর অভিমত, শকুন্তলা নিয়ে প্রথম যাঁরা নাড়াচাড়া করলেন। কালিদাস কি করে জর্মনিতে হাজির হলেন, তার মোটামুটি ইতিহাস লিখেছেন ডক্টর রুবেন। আর একজন কালিদাসের সাহিত্য-পরিচয় দিয়েছেন। তারপরে বিস্তৃত নাট্যকাহিনী-বিশেষ ব্যাপারের ছবি। আঁকা ছবি—দেখে সন্দেহ হতে পারে কোন ভারতীয় শিল্পীপ্রধানের চিত্রকর্ম। ভারতীয় থিয়েটার সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা রয়েছে প্রোগ্রামের সর্বশেষে।

ঘণ্টা বাজে। হল অন্ধকার। তাড়াতাড়ি যে যার সিটে গিয়ে বসেছি। মহামুনি কণ্ব দেখা দিলেন এতক্ষণ পরে। ও হরি, সূত্রধার হয়ে ইনিই একবার এসে গেছেন। এবারে পাকা দাড়ি এঁটে এসেছেন, তাই গোড়ায় ঠাহর হয়নি। শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি যাবে। জল-চৌকির উপর আর-একটা বসিয়ে তদুপরি আর-একটা—উঁচু আসন বানিয়ে দিল শকুন্তলার। জুতো-পরা পায়ে আলতা কি করে দেয়—তুলি দিয়ে লম্বালম্বি রেখা আঁকল পায়ের গোছার উপর। বাকল ছেড়ে পুরো মাপের কাপড় পরবে—স্টেজের উপরে বোধ করি আধ মিনিটের মধ্যে দেহ বেড় দিয়ে কাপড় পরিয়ে দিল। এই জায়গাটায় কবিকল্পনার সঙ্গে মেয়েটার যেন পুরো-পুরি মিল। গাছে জল দিতে সখী-দের বলে যাচ্ছে। হরিণ-শিশু আঁচল ধরে টানছে—সত্যিকার কোন জীব নয়, শকুন্তলা ভঙ্গিটা দেখাল শুধু। আর্যা গৌতমী ও ঋষি দু-জনের সঙ্গে সঙ্কোচভরে শকুন্তলা রাজসভায় এসে দাঁড়াল। দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানে সেই কন্যা ফণিনীর মতো মুহূর্তে যেন ফণা তুলে ওঠে।

মর্ম-ছেঁড়া দৃশ্যের পরেই হালকা হাসি। গুমট কেটে গিয়ে মানুষ নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। রাজবাড়ির গেটের সামনে জেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। বুড়ো মানুষ মাছের পেটে আংটি পেয়েছে, কিন্তু কে শোনে তার কথা। ঘা-গুঁতো দিচ্ছে—পুলিস যেমনধারা চোরকে করে। নগরপাল আংটি নিয়ে রাজার কাছে গেল। ফিরল হাসতে হাসতে, ভারি টাকার থলি হাতে। টাকা দেখে জেলে আঁকুপাঁকু করছে। নগর-পাল ইতিমধ্যে থলির কয়েকটা টাকা ফেলল নিজের কোমরের খাঁজে। আর যত প্রহরী সবাই জেলেকে ঘিরেছে, টাকার ভাগ চায়।

দুষ্মন্তের কক্ষ। স্তম্ভে হাতী আঁকা। আংটি দেখে রাজার মনে পড়ে গেছে, হা-হুতাশ করছেন। প্রচুর স্বগতোক্তি। একটা মেয়ে প্রায় অজন্তার ভঙ্গিতে এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে—স্বল্পবাস। আর একটি নাচছে ভারতীয় ঢঙে। রাজা প্রবোধ মানেন না, নর্তকীদের বিদায় করে দিলেন। হেন-কালে মাতলি এলো স্বর্গধামে দৈত্যের অত্যাচারের খবর নিয়ে।

পুষ্পক রথ ছুটেছে আকাশ দিয়ে। মজার পরিকল্পনা। ক্ষীণ আলো। রথ খানিকটা উঁচুতে তুলে দিয়েছে মঞ্চ থেকে। চাকা আওয়াজ তুলে বিপুলবেগে ঘুরছে। রথ অবশ্য নড়ছে না। উপর থেকে থোকা

খোকা আঁকা-মেঘ ঝুলিয়ে দিয়েছে এদিকে-সেদিকে। রথের নিচেও কিছু মেঘ।

স্টেজের খানিকটা পর্দায় ঢেকে দিল। জোরালো আলো দিল। স্বর্গলোকে ও'রা পেঁ'াছে গেছেন। স্টেজ ঘুরে গিয়ে দেখলাম শকুন্তলা ও শিশু-পুত্র ভরত। মিলন। সামনে থেকে একটুকু পর্দা খসে পড়ল। ইন্দ্র ও শচী। দেবরাজ আশীর্বাদ করলেন।

আড়াই ঘণ্টা লাগল। ফ্রেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, খাতির-যত্ন করছেন। বললেন, ভিতরে চলুন যাই। আমাদেরও সেই ইচ্ছা। মেক-আপ তুলতে অভিনেতারা ঘরে ঢুকে গেছে। রোজমেরি এবং আর দু-পাঁচটি আছে মাত্র স্টেজে।

দুষ্মন্ত একলা নয়, আমরা সবাই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি শকুন্তলা—

বয়সে ছেলেমানুষ তো—অঙ্গে এখনো থিয়েটারের সাজ-পোশাক, অভিনয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আশ্রম-বালিকার মতোই বিহ্বল চোখে তাকায়। সিজেল মানে করে দিল তো খিলখিল করে হেসে ওঠে। কত খুশি যে হয়েছে! শেকহ্যান্ড করল, দু-হাত জুড়ে নমস্কার করল, আর কি করবে ভেবে পায় না।

হোটেলে ফিরেছি। থিয়েটারের ও'রাও সব আসছেন ধোওয়া-মোছা সেরে। তার আগে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিই তাড়াতাড়ি। গেরো খারাপ—ফাঁকা টেবিল দেখে নিয়ে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় একদল এসে পড়লেন। কফি-ঘরে গিয়ে দু-এক ঢোক কফিই চলুক তাহলে—বসতে না বসতে বড় দল এসে গেল। মানুষ কি একটা-দুটো—গোটা থিয়েটার ভেঙে এসেছে, লাউঞ্জে গিয়ে গমগমে সভা জমানো ছাড়া গতি নেই। সাড়ে-দশটা ঘড়িতে। এখন নিবেদন জানাচ্ছেন, পালাটা কিসে আরও ভাল করা যায়, তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ ছাড়ুন। কালিদাসের দেশস্থ বলে আমাদের বিশেষ তালেবর ঠাউরেছে। এমন মওকা আমরাই বা ছাড়ব কেন? সে রাত্রের কথাবার্তা শুনলে আপনারা চমকে যেতেন : অভিনয়ের পাকা জহুরি আমরা সবাই, ঐ কর্মই যেন করে আসছি এতাবৎ। অবধান করে ওরা শুনছে। অতঃপর দ্বিতীয় নিবেদন : তোমরা তো হামেশাই শকুন্তলা করে থাক। সেটা কি প্রকার—সবিশেষ বর্ণনা করো, শিখে রাখি। সকলে মুখ তাকাতাকি করে উত্তরের ভার অধমের ঘাড়ে চাপালেন : ইনি কলকাতার লোক। পেশাদারি থিয়েটার যা-কিছু কলকাতায় আছে। বাংলা থিয়েটারের বয়সও বিস্তর। এঁর বই থিয়েটারে হয়ে থাকে, ইনি বলুন।

অতএব আমি মুখে মুখে গল্প বানাতে লাগলাম। অভ্যাস আছে, সে তো জানেনই। কালিদাসের দেশস্থ হয়ে কোন লজ্জায় বলি, শকুন্তলা আমাদের দেশে কল্‌কে পান না। বলছি, তোমরা মূলের সঙ্গে মিল রেখে এবং পুরানো পদ্ধতি আগাগোড়া মেনে নিয়েও আশ্চর্য রকম নাটক জমিয়েছ। আমাদের পেশাদারি থিয়েটার নাটকের মধ্যে কিঞ্চিৎ মেলোড্রামার আমদানী না করে দর্শকের সামনে এগোবার ভরসা পায় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে যাই বলো বাপু, তোমাদের সংস্কৃত গানগুলো যথোচিত হয় নি।

তৎক্ষণাৎ তৃতীয় নিবেদন : দুটো-একটা শ্লোক নির্ভুল গেয়ে শুনিয়ে যাও।

রাও মশায় কবি। হিন্দী কবিতা শুধু-মাত্র কলমে লেখার বস্তু নয়, গলা ছেড়ে গাইতে হয়। তিনি থাকতে ডর কিসের? ঐ হিন্দীর ধাঁচে কালিদাসের একখানা শ্লোক গেয়ে তিনি হোটেলসুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।

হাল আমলের ভারতীয় নাটক কিছু করতে চাই। হ্যাঁ মশায়, কালকুত্তায় এত থিয়েটার—দিও না খান কয়েক ভাল নাটক পাঠিয়ে। ইংরেজিতে পাঠিও, তর্জমা করে নেবো।

পঞ্জাবের এক লেখক ইংরেজি নাটক পাঠিয়ে দিব্যি বাহবা নিচ্ছেন। এবং অর্থও। বাঙালী নাট্যকারের না পারবার হেতু নেই। সে যা-ই হোক—ঘাড় নেড়ে বারকয়েক 'নিশ্চয়' 'নিশ্চয়' বলে কালকুত্তার পশার তো অক্ষুণ্ণ রেখে যাই আপাতত।

দুষ্মন্ত সাজেন, ভদ্রলোকের নাম হল টিমারম্যান (Hans-Theo Timmermann) এখন ষোল-আনা সাহেব—যে চেহারা যে পোশাকের জীবগুলিকে আমরা এই পৌনে দু-শ বছর শত হস্ত দূরে সমীহ করে এসেছি। শকুন্তলা - অনুসূয়া - প্রিয়ম্বদা সকলেই ঠোঁটে-রং বব-করা চুল রীতিমতো মেমসাহেব। এই যে ছবিগুলো দেখছেন, ঠাহর করে করেও এর সঙ্গে ও'দের আদি-চেহারার মিল পাবেন না। দুষ্যন্তকে বলি, গণতন্ত্রী দেশে তোমায় দেখলাম দুর্ধর্ষ সম্রাট একটি। অনেক শতাব্দীর অভ্যাস কিনা—ছাড়তে চাইলে কি হবে, রক্তের মধ্যে কিছু থেকে যায়। থিয়েটারে তাই অমনধারা নিখুঁত সম্রাট হলে।

হাসাহাসি চলল। ডিরেক্টর কেসলার রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। 'টেগোরে' এসেছিলেন, তখন যুবা আমি। তাঁর আশে পাশে ঘুরতাম।

আর কোথা যাবে! সকলে ধরে বসল, বলুন তাঁর কথা।

আশ্চর্য কণ্ঠ—অমন মিষ্টস্বর আর কখনো শুনি নি। সৌম্য চেহারা—দুধের রঙের দাড়ি। অনেক করে বলা হল, কিন্তু 'টেগোরে' বক্তৃতা করলেন না। 'ডাকঘর' অভিনয় করলেন। ক'টা দিন মাত্র ছিলেন, সে স্মৃতি আজও মনে জ্বলজ্বল করে।

গল্প চলেছে তো চলেইছে। দূরবাসী আপনজনেরা এক জায়গায় মিলেছি। একটা বাজলে তখন হুঁশ হল।

খানাঘরে বড় আলো সবগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। ফাঁকা চেয়ার-টেবিল। আধ-অন্ধকারে জন-দুই লোক খুটখাট করে বাসনপত্র গোছাচ্ছে।

আমাদের কি হবে?

বৃদ্ধ বয় দু-পাটি দন্ত বিস্তার করে ঘাড় নাড়ল।

গরম চাচ্ছিনে বাপু, বাসি-ঠাণ্ডা যদ্যপি কিছু থাকে—

খুঁজে-পেতে মিলতেও পারে কিছু। কিন্তু খুঁজবে কে? তারা [illegible] শুয়ে পড়েছে।

নিশিরাত্রে থিয়েটারওয়ালাদের মোটরে তুলে দিয়ে খালি পেটে কয়েকটা ঢেকুর তুলে আমরাও অগত্যা [illegible]।

“ঘরেঘরে তো নাছোড়বান্দা হয়ে বসিস, কিন্তু তোদের কাছে গল্প করে সুখ নেই, শুধু হাস্যাস্পদ হওয়া। তোরা ভূতে বিশ্বাস করবি না, ওঝায় বিশ্বাস করবি না; সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস করবি না, দৈবে বিশ্বাস করবি না,—বিশ্বাস করব না, এযুগের তোদের হয়েছে একটা জিদ; নোট বুক থেকে সায়েন্স আর কিসের গোটাকতক বুকনি মুখস্থ করে......”

নুটু আপত্তি করল—“যুগ টেনে কথা বলেন, ঐটে গায়ে লাগে দাদু। তাহলে আমায়ও বলতে দিন—আপনাদের যুগে ছিল সব কিছুতেই চোখ বুজে বিশ্বাস করবার একটা জিদ, ভূতে-ওঝায়-সাধুতে-অসাধুতে, সম্বল শাস্ত্রের গোটা কতক বাঁধা বুলি...”

শিবকালী মুখটা ঘুরিয়ে একটু আড়ে চেয়ে পা দুটো নামিয়ে চটিতে সাঁদ করাতে যাচ্ছিলেন, সবাই চেপে ধরল; নুটুও সামলে নিয়ে বলল—“সবটুকু বলতে দিন আমায়, রেগে উঠলেন!...... বলছিলুম, আপনাদের বিশ্বাস আর আমাদের অবিশ্বাস এই দুটো বাদ দিয়ে দিন, হাতে তো ফাঁকা জিদটুকু ছাড়া কিছুই রইল না।”

হরেন বিড়ির বাণ্ডিল এনে সামনে রেখে দেশলাই জ্বালল, শিবকালী একটা বিড়ি টেনে নিয়ে দাঁতে চেপে নুটুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—“বিশ্বাসের তোরা কি দেখেছিস যে......”

সবাই কথা জড়াজড়ি করে বলে উঠল—“কিছু দেখিনি দাদু—ওটার কথা ছেড়ে দিন, ওতো আরও দেখেনি—দেখিনি বলেই তো এই অবস্থা—বিশ্বাস কি নিয়ে দানা বাঁধবে বলুন না। —আপনি বলুন দাদু—শুনলেও [illegible] বদলায়......”

কাঠিটা নিবে গিয়েছিল, শিবকালী হরেনের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে আবার একটা জেলে বিড়িটা ধরালেন, ফিরিয়ে দিয়ে একটান টেনে বললেন—“ঐ জিদই হোল বিশ্বাস, বিশ্বাসের তো একটা করে ল্যাজ গজায় না। আমি এই জিনিসটা ধ্রুব-সত্য বলে জেনেছি, এইতেই শেষ পর্যন্ত আমার মঙ্গল, সুতরাং তোমরা যত যাই করো এর থেকে আমি এক চুল নড়ছি নে—এই হচ্ছে বিশ্বাসের গোড়ার কথা......”

“তাহলে দাদু......” নুটু আবার উসখুস করে উঠছিল, শিবকালী হাত উঁচিয়ে বললেন—“আগে গল্পটা শোনো শেষ পর্যন্ত, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তখন তর্ক কোর' নাস্তিকের মতন। এমন কিছু বানিয়ে বলাও নয়। দীন বাচস্পতির নাতি-নাতনীরা এখনও বেঁচে রয়েছে, একদিন গঙ্গাটুকু পেরিয়ে ওপার থেকে সত্যি মিথ্যে যাচাই করে এসো বরং।

যখনকার কথা বলছি সে সময় ও'র মতন পণ্ডিত এ তল্লাটে ছিল না। বাংলারও চেহারা তখন অন্যরকম। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী, বড়লাটের আড্ডা, সারা-ভারত বাংলায় এসে মাথা নোয়াচ্ছে। তার মধ্যে একদিকে রয়েছে যত রাজা-রাজড়া—মাইসোর থেকে নিয়ে কাশ্মীর, তার মাঝে রাজপুতানার ছোট বড় যতগুলি। বিদ্যে-বুদ্ধি: প্রতিপত্তি ধনদৌলত—বাংলার বোলবোলাও তখন দেখে কে?

সবাই এসে এইখানে জড়ো হচ্ছে, এতে একটা সুবিধে এই হোত যে নাম কেনবার জন্যে বাংলার ছেলেকে বাইরে গিয়ে দরবার করতে হোত না। বাঙালীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে সবাই হা-পিত্যেস করে থাকত, অবিশ্যি শিবকালীর [illegible] নয় নুটু বাগচির সঙ্গেও নয়, সম্পর্ক পাতাবার যুগ্যি এমন বাঙালীর সঙ্গে। এ-কান সে-কান হতে হতে বাচস্পতি মশাইয়ের কথাটা জয়পুরের কানে উঠল। মহারাজ সভাপণ্ডিত করে নিলেন। বাচস্পতি মশাই বললেন—তা করো কিন্তু তুমি যে বলবে গঙ্গা ছেড়ে সেই মরুভূমির মধ্যে এসে বাস করো, সেটি পারব না বাপু। তাই হোল, রাজা যখন আসতেন, কলকাতা থেকে জুড়িগাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াত, বাচস্পতিমশাই দরবারী পোশাক পরে উঠতেন গিয়ে। রোজ নয়, যেদিন মহারাজের দরবার করবার ফুরসৎ বা ইচ্ছে হোত।

নির্লোভী গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিন-খানি মেটে ঘর, বাইরে একটি ছোট আট-চালা, এইটুকু নিয়ে পৈতৃক ভদ্রাসন। আট-চালাটিতে গুটি পাঁচেক ছাত্র নিয়ে একটি টোল বসিয়েছিলেন, এর বেশি ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মী ঢেলে দিলে আর করবেন কি করে? মেটে ঘর গিয়ে চকমেলানো বাড়ি উঠল, চণ্ডীমণ্ডপ, ওদিকে টোলের জন্যে আলাদা পাকা দালান—পুকুর, বাগান; সেই অনুপাতে কাজকর্মও, দোল-দুর্গোৎসব; বাচস্পতি বাড়ি, জমিদার বাড়ির জেল্লাকেও হার মানিয়ে দিলে।

টাকার সঙ্গে সঙ্গে সবই আস্তে আস্তে বদলালো; এমন কি তখনকার নতুন হাওয়ার কিছু কিছু দোষ, মানে তখনকার আধুনিকতা আর কি—তাও ঢুকল বাড়ির মধ্যে—অবিশ্যি ছেলেমেয়েদের মধ্যে—সবই বদলালো, বদলালো না শুধু বেচারামের বিধবা পিসী। বেচা ছিল জাতে বাগদি। পুরনো জিনিস সবই আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল—যা
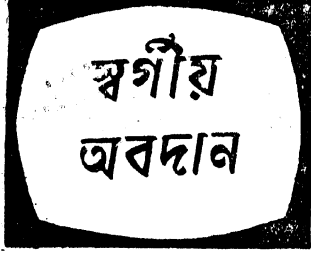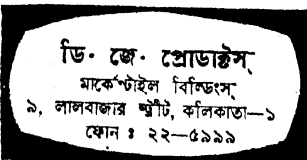
সব নাকি চকমেলানো বাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ, দোল-দুর্গোৎসব, নতুন স্টাইল—এসবের সঙ্গে মানায় না—কিন্তু বেচারামের পিসীকে কোন মতেই ছাড়লেন না বাচস্পতি মশাই......

সবাই হাঁ করে চেয়েছিল, হারান বলল—"অত বড় জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত হয়েও দাদু?"

"এসব ক্ষেত্রে জ্ঞান বুদ্ধি কি কিছু কাজে আসে ভাই? ও যেমন তোমার দীন বাচস্পতি তেমনি তোমার কিনু গোপ, কি হীরু পরামানিক। বেচুর পিসীকে কোন-মতেই ছাড়লেন না বাচস্পতি মশাই। এমনকি —অবিশ্যি শোনা কথা, সবতো আর চোখে দেখিনি—রাজার ছেলে না নাতির বিয়েতে একবার নাকি জয়পুরে যেতে হয়েছিল বাচস্পতি মশাইকে সেই একবার কটা দিনের জন্যে গঙ্গা ছেড়েছিলেন—তা সেখানেও নাকি বেচারামের পিসীকে পুরুষের বেশে সাজিয়ে......"

নন্টু মুখটা একটু সিঁটকে বলল—"আর গঙ্গার দেশে না ফেরাই উচিত ছিল তাঁর; এতই যদি......"

খিঁচিয়ে উঠল হারান—"আচ্ছা রোমান্স-টুকু ঠিক যেখানে জমে আসছে সেইখানটিতে এমনি করে টুকে না দিলে তোর চলে না?... এখান থেকে জয়পুর দাদু, সেতো চাট্টিখানি কথা নয়—এরোপ্লেনের যুগ নয় যে সাজিয়ে সুজিয়ে টুপ করে তুললুম, ঘণ্টা কয়েক সবার চোখে ধুলো দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার যে বেচারামের পিসী সেই বেচারামের পিসী।......রেলে, তাও তখনকার রেল—ধিকির ধিকির করতে করতে......"

"রেলই বা তখন অতদূর কোথায় রে বাপু? দিল্লী পর্যন্তও পৌঁছোয়নি বোধ হয়, তারপরই উট ভরসা। একবার যেতে হোলে কম করেও বোধ হয় দিন পনেরর ধাক্কা। তবে কথা হচ্ছে, বেচারামের পিসীকে একবার দুখীরামের মেসো করে সাজিয়ে দিলে ও দু হপ্তা কেন, বছর খানেক ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে থেকে চিনে ফেলবেন এমন মরোদ তো আজ পর্যন্ত জন্মাল না। রংটা আমার গায়ে আর এক পোঁচ চড়ালে যেমন হয়। টিয়ে পাখির মতন টিকলো নাক, চোখ দুটো গর্তের মধ্যে যেন জ্বলছে। এদিকে ছ'ফুটের জোয়ান; যখনকার কথা তখন বয়স প্রায় সত্তরের কাছকাছি; কিন্তু একটু ঝোঁকে নি, সিধে, যেন বাঁশের লাঠিটি। গলার আওয়াজ ছিল যেন......"

সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে, হারাণ একটু ব্যাজার হয়েই বলল—"থাক, ও তো বুঝলুম দাদু; নিয়ে গিয়েছিলেন কি করতে? অস্পৃশ্যও তো। সে যুগের কথা বলছি..."

"নিয়ে গিয়েছিলেন ওর টোটকার জন্যে। তখন তোদের এখনকার মতন নাস্তিকতায় তো ছেয়ে যায়নি দেশটা, ওদিকে খনার বচন আর এদিকে টোটকা এই দুটো নিয়ে চলছে। গাঁয়ের বুড়ি মাত্রেই টোটকায় এক এক জন খালিফা, তার মধ্যে বেচারামের পিসী আবার ছিল সবার ওপরে। তার কারণ ছিল, টোটকার মোটামুটি ফরমুলাগুলো অনেকেই জানত, কিন্তু ওর মতন অমাবস্যের রাতে এলোচুলে গেরো দিয়ে মাঝ শ্মশান থেকে গাছগাছড়া আনবে কে? সোজা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি—আজকাল বড় বড় ওষুধগুলোর ফরমুলা তো বাজারে ছেড়ে দিয়েছে, সব কোম্পানীই করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে তারতম্য আছে তো? বেচারামের পিসী ছিল পার্ক ডেভিস।

এর থেকে তোরা যেন মনে করে বসিসনি বাচস্পতি মশাই নিত্যি রোগ নিয়ে পড়ে

পুরুষের বেশে সাজিয়ে...

থাকতেন। তোদের এ যুগে বড় বড় ওষুধের কোম্পানীগুলো চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন দিয়ে নিত্যি তোদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে A থেকে Z পর্যন্ত ভাইটামিনের কোন কোন গুণের ঘাটতি হয়েছে খুঁজে দেখ, নয়তো গেলি—তাইতেই তোরা নিত্যি একটা না একটা কিছু নিয়ে পড়ে আছিস; সে যুগে ও'দের অত করে শোনাচ্ছেই বা কে, শোনবার ফুরসৎই বা কোথায়? ভোরে গঙ্গাস্নান, আহ্নিক পুজো, টোল, তারপর শাস্ত্র আলোচনা—কটা ভাইটামিন আছে তার খোঁজ রাখবার সময় কোথায় যে তার মধ্যে কটার ঘাটতি হয়েছে তার হিসেব রাখবেন। নীরোগ নির্বিরোধী মানুষ, ক্বচিৎ কখনও সর্দি বা মাথাটা একটু টিপটিপ করল, কিংবা বয়স হয়েছে, দাঁতের গোড়াটা একটু কনকন করে উঠল, ব্যস। ইচ্ছে হোল, বেচুর পিসীর কাছ থেকে একটা টোটকা আনিয়ে নিলেন, গঙ্গার জল ছিটিয়ে খেয়ে নিলেন; সারবার

হোল সাব্লল, না কিছু ভোগ আছে, সেটুকু কেটে গেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।... বাড়িতে কবিরাজের যাওয়া আসা ছিলই—যেমন সব বাড়িতেই ছিল সেকালে; তারপর লক্ষ্মীর কৃপা হতে পাশকরা এলোপ্যাথ আর নাম করা হোমিওপ্যাথের আমদানিও হতে লাগল, যুগটা আস্তে আস্তে পালটাচ্ছে তো, কিন্তু ঐ, ও'র ঘরের চৌকাঠের বাইরে পর্যন্ত। এই করে করে চলল, তারপর ঐ যা বললুম, বিশ্বাসের কথা। যে কখনও ভোগেনি, সে যখন পড়ে, মনে হয় না তো আর কখনও উঠবে; বাচস্পতি মশাইয়েরও তাই হোল, একেবারে যাকে বলে হাতপা মুড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

এ যখনকার কথা বলছি তখন ও'র বয়েস একাত্তর পেরিয়ে গেছে, এই সময় একটা ফাঁড়া ছিল কুষ্ঠীতে, এইটে পেরিয়ে গেলে আবার বছর দশেক বাঁচবেন।

বাচস্পতি মশাই অসুখে পড়েছেন, কথাটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, তা থেকে সমস্ত গ্রামে, তা থেকে সমস্ত তল্লাটটায়। যাওয়া-আসা, খোঁজ-খবর নেওয়া, এটা করো, ওটা করো—নানান রকম চিকিৎসার পরামর্শ, রীতিমতো একটা সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু পরামর্শ নিচ্ছে কে? এখনি যেমন বললুম—ডাক্তারের রেওয়াজ তখন বেশ চলে গেছে দেশে, অভাবও নেই, সেরামপুরে তখন নীলমণি লাহিড়ীর বোলবোলাও, গঙ্গার এপার ওপার পশার জমিয়ে বসেছেন। হালিসহরে রয়েছেন নিখিল পাল, খোদ প্রতাপ মজুমদারের হাতে গড়া হোমিওপ্যাথ—বাড়িতে ডাকলে ষোল টাকা ফি—তখনকার যুগে; কিন্তু না ডাকলে তো গায়ে পড়ে চিকিৎসা করতে পারেন না। তা ডাকছে কে? রুগীর কাছে কথা তুললেই শুধু বেচুর পিসী আর বেচুর পিসী।

বেচুর পিসীর বয়েস তখন তিরাশি চলছে। এর মধ্যে বেচারাম গেছে মারা, তাতে শরীরটা আরও কাবু করে দিয়েছে। একটা খাটুলি করে চারজন লোক নিয়ে এসে দরজার কাছটিতে রকে বসিয়ে দেয়। সব স্বকর্ণে শোনে, আবার খাটুলি করে চলে যায়......"

"আর টোটকা......দিয়ে যাচ্ছে?" একটু অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল গোবিন্দ।

শিবকালী বললেন—"বাপু হে, একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে তর্ক তুলেছিলে, সেই বিশ্বাসের গল্প বলছি আমি, সবচেয়ে আশ্চর্য যেটা জানা আছে। অসুখ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে টোটকা পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠেছে বেচুর পিসীর হাতেই হোক, শেমোর মাসীর হাতেই হোক, এরকম তো আখছারই হোত কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বাসের এমনকি আছে? দীন বাচস্পতি অসুখে পড়লেন নবমীর দিন। বেচারামের পিসীকে তখুনি আনানো হোল।

—"তাহলে দ্যাও না তুলে ডাক্তার বদ্যির হাতে বাপু, ট্যাকার তো অভাব নেই"

দেখে শুনে বললে—বে'কা অসুখ, বাসি ওষুধে তো কাজ হবে না, অমাবস্যায় গিয়ে টাটকা ওষুধ তুলে নিয়ে আসতে হবে।"

গিন্নীরা জিগ্যেস করলে—হ্যাগা, ততদিন টিকবে তো রুগী, বেচুর পিসী?

বয়েসও হয়েছে, তার ওপর বেচুটা গিয়ে এদানি খিটখিটে হয়ে পড়েছিল বুড়ি, মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—'তাহলে দ্যাও তুলে ডাক্তার-বদ্যির হাতে বাপু, ট্যাকার তো অভাব নেই, আমি যা তা দিয়ে জেনেশুনে তো মেরে ফেলতে পারি না মানুষটাকে।'

বাচস্পতি মশাইকে বলতে তিনি আরও চটে গেলেন—কেন ওসব কথা বলা হয়েছিল ওকে? সবাই যখন জানে উনি বেচুর পিসীর ভিন্ন অন্য কারুর ওষুধ মুখে দেবেন না—তা একটা অমাবস্যা গিয়ে যদি পরের

লোকটাকে কলকাতায় ছুটিয়ে দেওয়া হোল

অমাবস্যার জন্যেও সবুর করে থাকতে হয়।

অসুখ শরীর, খিটিমিটিতে মাঝখান থেকে অসুখটা আরও বেড়েই গেল। নবমী থেকে দশমী, দশমী থেকে একাদশী দ্বাদশী অসুখ বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার-বদ্যি ধরায় কার সাধ্যি? অতবড় মানুষটা বেঘোরে যাবে? চারিদিক থেকে যাঁরা প্রাচীন, বিজ্ঞ, যাঁদের কথা চলবে, সবাই এসে বোঝালেন, গ্রামের জমিদার অন্নদা চৌধুরী তিনিও নিজে এসে বোঝালেন—কিছু ফল হোল না—সেই অমাবস্যা আসবে, বেচুর পিসী টাটকা ওষুধ তুলে নিয়ে আসবে তারপর। আবার বিশ্বাস করবার লোকও তো আছে, দেশটা তখনও তো একেবারে নাস্তিক হয়ে যায়নি—তারা বললে—দেখোই না একটু ধৈর্য ধরে, আগে তো এরকম আখছারই হোত, একালেই কেন আর হয় না—তা দেখোই না বাচস্পতি মশায় কেমন করে একালের মুখে চুনকালিটা মাখিয়ে দেন।

একটা হৈহৈ পড়ে গেল বাচস্পতি মশাইয়ের অসুখ নিয়ে। ক্রমেই রোগ যাচ্ছে বেড়ে, তারপর রুগীর ঐ জিদ—জিদই বল, কি বিশ্বাসই বল—কারুর বুদ্ধি আর কাজ দিচ্ছে না, তখনই ঐ অন্নদা চৌধুরীই জমিদারী বুদ্ধি বাৎলালেন—মহারাজাকে খবর দাও, তিনি কোন ব্যবস্থা করলে সেটা আর ঠেলতে পারবেন না, আর তিনি রাজোচিত ব্যবস্থা ছেড়ে কিছু টোটকার দিকে যেতে চাইবেন না।

তাই করা হোল, বাচস্পতি মশাইয়ের জন্যে রাজপুত ঘোড়সওয়ার সমেত একটা জয়পুরী ঘোড়া দিয়েছিলেন মহারাজ, লোকটাকে কলকাতায় ছুটিয়ে দেওয়া হোল।

লাটসায়েব তখন সিমলায়, কাজেই সব বড় বড় রাজারাজড়াও সেখানে। কলকাতার বাড়ির যে এজেন্ট মহারাজকে সে জরুরী তার করে দিল, সেখান থেকে জরুরী তারেই হুকুম এল—যা চিকিৎসা পণ্ডিতমশাই করাতে চান তাতে যতই খরচ হোক, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হোক।

পণ্ডিত মশাই যে এদিকে বেচারামের পিসীকে ধরে বসে আছেন, এজেন্ট আর কি করে জানবে? ওদিকে সময়ও নেই, এদিকে এই জরুরী তার, রাজারাজড়ার কাণ্ড জানেই, এজেন্ট নিজে অত বাছাবাছির মধ্যে না গিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে করলে একটা ব্যবস্থা—তা উপযুক্ত ব্যবস্থাই বলতে হবে বৈকি।

তার পরদিন দুপুরের একটু আগে জোয়ারের সঙ্গে খেয়াঘাটে কলকাতা থেকে তিনটে বজরা নৌকো এসে ভিড়ল—এক বজরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, এক বজরা হোমিওপ্যাথ, এক বজরা কবিরাজ—হেঁজি পেঁজি নয় সব নাম করা—সঙ্গে তাদের নিজের নিজের ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জাম—একটা সোরগোল পড়ে গেল, এপার থেকে

নৌকো করে সব ছুটল তামাশা দেখতে। কবরেজদের চণ্ডীমণ্ডপে তোলা হোল, অ্যালোপ্যাথদের টোলের দালানটায়; হোমিও-প্যাথরা বললে আমরা অত রকমারি গন্ধর মধ্যে থাকতে পারব না, খেয়াঘাটের পাশেই তাদের তাঁবু তুলে দেওয়া হোল। তোদের মতন ফিচলেমি করবার লোকেরও তো অভাব ছিল না—কিছু একটা হুজুগ পেলে একদল ঐ করতেই থাকত, তারা বললে—অ্যালোপ্যাথ আর কবরেজরা ঐদিক থেকে ঠেলে দেবে—এরা খেয়া পার করাবার জন্যে ঘাটি আগলে রইল।

তা থাক, কিন্তু ওদের মানছে কে? বাচস্পতি মশাই তখন প্রায় বাকশক্তিহীন, কথাটা কানে তুলে দেওয়া হল। কোন-রকমে ঠোঁট নেড়ে যেন কত দূরে থেকে নিতান্ত মিহি আওয়াজে দুটি কথা বলতে পারলেন— বেচারামের পিসী।

তখন ঐ অন্নদা চৌধুরীই কড়া হয়ে উঠলেন—এমন চরম অবস্থাতেও রোগীর মত নিতে হবে? শুরু করে দাও চিকিৎসা। বোধ হয় হোতই দেওয়া, কিন্তু তখন আবার সমস্যা দাঁড়াল—কোন্ চিকিৎসা—হোমিও-প্যাথি, কবরেজি না অ্যালোপ্যাথি? তোরা সব বিশ্বাস করিস না, কিন্তু এইখানেই দেখে নে সেই ওপরওলার কারচুপিটা—একটা লোক দাঁতে দাঁত চেপে তার বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছে। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, যুঝল, যেই তার ক্ষ্যামতা লোপ পাবে আর তার বিশ্বাসে ঘা দেবে? ঐ এজেণ্টকে দিয়ে আগে থাকতেই তার পথ মেরে রাখলেন।

এইসব মতামত গোলমালের মধ্যে রাতও হয়ে গেল, অমাবস্যা পড়ে গিয়েছিল বিকেলেই, অন্ধকারটা একটু জমাট হয়ে আসতেই বেচারামের পিসী ডুলি করে বেরিয়ে পড়ল। পাড়ার ঘোষাল গিন্নী সম্পর্কে ভাজ হন, এসে কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—"বাচপোত ঠাকুরপো, বেচুর পিসী বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণ বিশ্বাস নিয়ে রইলে এতগুলোর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে, আর একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে; সবাই দেখুক....."

পড়েছেন পর্যন্ত এই প্রথম একটু হাসি ফুটল মুখে। হাতটাও কি বলবার ভঙ্গিতে যেন একটু তুললেন। ঘোষাল গিন্নী, যারা ঘরে দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে চেয়ে বললেন—'ঐ নাও।......আছি ধৈর্য ধরে, ভাবতে হবে না।'

চৌধুরী বাড়ির দেউড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বেচারামের পিসী এসে উপস্থিত হোল। তিরাশী বছরের বুড়ী, এদিকে ঝিমিয়েই থাকত, কিন্তু সে রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরে কি চেহারা হয়েছে! শণের নুড়ির মতন যে কগাছা চুল আছে মাথায়, সবগুলো এলো করা, চোখ দুটো জ্বলছে, নাকের ডগাটা যেন আরও ধারালো হয়ে চকচক করছে; থমথমে ভাব, কারুর সঙ্গে কোন কথা নয়। শুধু ঘোষালগিন্নী যখন বললেন—একটু তরস্ত করে নাও বেচুর পিসী, রুগী এলিয়ে পড়েছে—তখন মুখটা একটু বেঁকিয়ে বললে—'এলিয়ে যাবে কোথায় শুনি?' লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুটখুট করে দোরের কাছটিতে গিয়ে বসল। হামানদিস্তে, খল, গঙ্গাজল সব তোয়েরই ছিল—নিজেই ওষুধ ধুলে, বাছলে, কুটলে, তারপর খলে মধু দিয়ে গুলে বললে—'খাইয়ে দ্যাওগে।' সেই রকম খুটখুট করে নেমে এসে ডুলিতে উঠে বললে—'তোল।'......বাড়িতে গিয়ে কি সব তুকতাকও করত।

ঘাড় ধরে ঠিক মিনিট পনেরো, তারপরেই দেখতে দেখতে......

"সেরে উঠলেন দাদু?" সবাই দম বন্ধ করে বসেছিল, এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

বাধা পেয়ে শিবকালী অবাক হয়ে সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন একটু, তারপর যেন বুঝতে পারছেন না এইভাবে বললেন—"তোরা কী রে-! একাত্তর বছর বয়েস, তার-ওপর কুষ্ঠীতে লেখা, একটা কঠিন ফাঁড়া যাচ্ছে; কলকাতার তা-বড়, তা-বড় ডাক্তার বদ্যি ভীড় করে বসে রয়েছে, একবারটি ঘুরেও চাইলে না—নেহাৎ কালে না ধরলে এসব দুর্মতি হয় কারুর? আবার জিগ্যেস করছিস—সেরে উঠলেন দাদু?......বিশ্বাস নিয়ে নাস্তিকের মতন তর্ক করছিলি, তার কিরকম দেখলি তাই বল।"
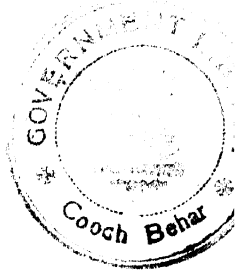
**কালিদাস**—কবি, তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

**রবীন্দ্রনাথ**—আমাকে লজ্জা দিয়ো না মহাকবি। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা। কবি-মাত্রেই মানুষের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তোমার মতো মহাকবি মহৎ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

**কালিদাস**—সেই তো দুঃখ কবি। মানুষে আমাকে মহাকবি বলে স্বীকার করলো কই?

**রবীন্দ্রনাথ**—স্বীকার করলো না! ভারতের মহাকবি বলতে তিনজন, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস।

**কালিদাস**—মহাকবি কালিদাস! মহাকবিই বটে নইলে আর কার নামে জীবন কথা ব'লে কতকগুলো উদ্ভট অশিষ্ট অলীক কাহিনী প্রচার সম্ভব। শোনোনি?

**রবীন্দ্রনাথ**—শুনেছি বই কি। আদি কবি বাল্মীকির নামেও তো রত্নাকর দস্যু অপবাদ চাপিয়েছে লোকে।

**কালিদাস**—তিনি ঋষি তাঁর প্রাণে অনেক সহ্য হয়। কিন্তু আমি যে লৌকিক কবি মাত্র।

**রবীন্দ্রনাথ**—ও গল্পগুলো লৌকিক কবির প্রতি লোক সম্মান।

**কালিদাস**—সম্মান। ঐ অপমানকর কাহিনীগুলো।

**রবীন্দ্রনাথ**—তোমার কাছে সেই রকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু আবার বলছি ওগুলোর সৃষ্টি তোমাকে অসম্মান করবার উদ্দেশ্যে নয়।

**কালিদাস**—তবে?

**রবীন্দ্রনাথ**—তোমাকে সম্মানিত করবার আশাতেই।

**কালিদাস**—ঐ স্থূল রূঢ় গ্রাম্য গুজব গুলো?

**রবীন্দ্রনাথ**—গুপ্ত সম্রাটগণ যখন রাজ্য পরিদর্শনে বের হতেন তখন জনপদের শিল্পিগণ তাঁকে যে গ্রাম্য বসন উপঢৌকন দিতো তা কি রাজ অঙ্গে স্পর্শকটু লাগতো না?

**কালিদাস**—অবশ্যই লাগতো।

**রবীন্দ্রনাথ**—তবু তো সম্রাটগণ সাদরে তা গ্রহণ করতেন।

**কালিদাস**—অবশ্যই করতেন।

**রবীন্দ্রনাথ**—সামান্য প্রজার অকিঞ্চিৎকর উপহারের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেতেন তার সরল হৃদয়ের সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা।

**কালিদাস**—নিশ্চয়। কতবার বিশ্রম্ভালাপের সময়ে মহারাজকুমারও ঠিক এই কথাই আমাদের বলেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে কাহিনীগুলোর কি সম্বন্ধ?

**রবীন্দ্রনাথ**—তুমি নিতান্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েছ বলেই বুঝতে পারছ না নইলে তোমার মতো হৃদয়বেত্তার না বোঝবার কথা নয়।

**কালিদাস**—ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও।

**রবীন্দ্রনাথ**—লোকে জানে কবিত্ব এমন একটা দুর্লভ দৈবগুণ যা চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করবার নয়—ও বস্তু হঠাৎ নামে আকাশ থেকে বজ্রাগ্নি শিখায়।

**কালিদাস**—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

**রবীন্দ্রনাথ**—তোমার কবিত্ব আকাশসম্ভব বৈদ্যুৎ, বাণীর কিরীট-স্খলিত শতদলের পরাগ, ও বস্তু নয় দিঙনাগের প্রভৃত শ্রম জলপুষ্ট জ্ঞানবিটপী ওর প্রকৃতিই স্বতন্ত্র এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছে লোকে ঐ গল্পগুলো তৈরি ক'রে।

**কালিদাস**—তাই ব'লে মূর্খ বানাবে?

**রবীন্দ্রনাথ**—পাত্র পূর্ণ করবার আগে যে শূন্য ক'রে নিতে হয়।

**কালিদাস**—যে শাখায় বসেছি সেটাকেই করছি ছেদন।

**রবীন্দ্রনাথ**—কবি যে সাধক! সাধক কি সংসার শাখা ছেদন করেন না?

**কালিদাস**—মূর্খের হ'ল পত্নীর কাছে লাঞ্ছনা!

**রবীন্দ্রনাথ**—পাত্নীব্রত্যকে জীবনের চরণ নির্ভর ব'লে যিনি দেখিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে এ অপবাদের সার্থকতা কি বুঝতে পারলে না?

**কালিদাস**—বুঝিয়ে দাও।

**রবীন্দ্রনাথ**—এ-ও সেই পাত্র শূন্য ক'রে ফেলে পূর্ণ করবার চেষ্টা। তোমার কাব্যে পত্নীকে টেনে নিয়ে গিয়েছে আদর্শের চরমে

—তাই ঐ গল্পটিতে পত্নীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে বাস্তবের চরমে। শূন্য পাত্র যে কত শূন্য তাই হ'য়েছে দেখানো। পূর্ণ পাত্র যে কতপূর্ণ হতে পারে দেখেছে তারা তোমার কাব্যে। খেদ ক'রো না কবি এই জন্যেই ক্রৌঞ্চবিরহী কবিকে বানিয়েছে লোকে পাষাণ হৃদয় দস্যু। করুণার উৎস যদি পাষাণভেদ করতে না পারে তবে তাঁর মাহাত্ম্য কোথায়? রত্নাকর দস্যুর চালচিত্রের পটে উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে উঠেছেন করুণার বাণী মূর্তি, যেমন অজ্ঞানের কালো পট খানার উপরে অধিকতর দীপ্যমান হ'য়েছে তোমার শুক্রতারা রূপিণী প্রতিভা।

**কালিদাস**—হয় তো তোমার কথাই সত্য। তোমার নামেও কিছু বানিয়েছে নাকি?

**রবীন্দ্রনাথ**—এখনও না বানিয়ে থাকলে কালে বানাবে, হয়তো ইতিমধ্যে লোক রসনা সরস হ'য়ে উঠেছে।

**কালিদাস**—ভালই হবে, অপবাদের ঘাটে সতীর্থরূপে পাবো ভারতের চতুর্থ মহাকবিকে।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু তোমার দুঃখের কারণ তো এখনো শুনতে পেলাম না।

**কালিদাস**—তুমি আমার সেই দুঃখ দূর ক'রে দিয়েছ।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিসের দুঃখ?

**কালিদাস**—আত্মগ্লানির দুঃখ।

**রবীন্দ্রনাথ**—আত্মগ্লানি! তোমার?

**কালিদাস**—আত্মগ্লানি এবং আমার

**রবীন্দ্রনাথ**—আর একটু খুলে বলো

**কালিদাস**—সেই ভালো। এ পর্যন্ত লোকে আমাকে সম্ভোগের কবি, মিলন মাধুর্যের কবি, শৃঙ্গাররসের কবিমাত্র বলে স্বীকার করেছে, তার বেশি আমার কোন দাবী স্বীকার করেনি। একি মহাকবির লক্ষণ?

**রবীন্দ্রনাথ**—নিশ্চয়ই নয়।

**কালিদাস**—মহাকবির দৃষ্টি জীবনের ক্ষেত্রবিশেষে মাত্র আবদ্ধ নয়। মহাকবির মহদ্দৃষ্টি—সে দৃষ্টি আর জীবন সমব্যাপক।

**রবীন্দ্রনাথ**—আমি তো ব্যাখ্যা করেছি তোমার সেই জীবনদৃষ্টির, বোঝাতে চেষ্টা করেছি তোমার জীবনতত্ত্বকে।

**কালিদাস**—সেই জন্যই তো কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তোমার কাছে। সহৃদয় মল্লিনাথ অবশ্য সরস টীকা করেছেন কিন্তু তিনি তো কবি নন, আলঙ্কারিকমাত্র। তিনি আমার কাব্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার বেশী দাবী কি আমার নেই? তুমি পাঠকের চোখ টেনে নিয়েছ আমার কাব্যের অন্তর্লোকে।

**রবীন্দ্রনাথ**—সে চেষ্টা করেছি বটে

**কালিদাস**—চেষ্টা! সহৃদয় ব্যাখ্যার এমন [illegible]

অপেক্ষা করেছিলাম তোমার মতো প্রতিভাবান্ সুহৃদের আশায়।

**রবীন্দ্রনাথ**—মহৎ সৃষ্টির অপেক্ষা।

**কালিদাস**—তা বটে। বনস্পতির তাড়া নেই, যত ত্বরা ওষধির।

**রবীন্দ্রনাথ**—মহাকবি, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কারণ কত গুরুতর তা কেবল আমি জানি। আমি ভারতবর্ষকে বুঝেছি তোমার কাব্য প'ড়ে।

**কালিদাস**—এ যে নূতন কথা!

**রবীন্দ্রনাথ**—নূতন হ'তে পারে কিন্তু অলীক নয়।

**কালিদাস**—কেমন?

**রবীন্দ্রনাথ**—ভারতবর্ষকে বুঝবার আশায় কত মহাজনের স্বারস্থ না হ'য়েছি। পড়েছি ইতিহাস, ইতিহাস কেবল তথ্য পরিবেষণ করে, সত্যে পারে না পৌঁছতে। গিয়েছি বাস্তবের দরজায়, সেখানে শুধু অদ্যতনের স্তূপ, নেই চিরন্তনের সংবাদ। উপনিষদের অরণ্যছায়ায় পেলাম বটে আভাস, কিন্তু সে তো কেবল তত্ত্ব, জীবনের সত্য আছে বটে কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কোথায়, কোথায় রক্ত-মাংসে সঞ্জীবিত মানুষ! এমন সময়ে দেখলাম তোমার কাব্যকে নূতন দৃষ্টিতে, যা খুঁজে মরছিলাম পেলাম।

**কালিদাস**—কি পেলে শুনি, নিজের সত্য পরের মুখে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

**রবীন্দ্রনাথ**—প্রথমেই ঋতুসংহারের কথাই ধরা যাক্

**কালিদাস**—ও কাব্যখানা নিতান্ত কৈশোরের রচনা, তখন কেবল কাব্যের নিজস্ব রীতিটাকে পেয়েছি, তখনো পাইনি জীবনের নীতিকে, ওতে সৌন্দর্য আছে সত্য নেই। সত্যে সৌন্দর্যে মিলে ঘটেনি ওর দ্বিজত্ব লাভ।

**রবীন্দ্রনাথ**—হাঁ অনেকটা আমার সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মতো। কিন্তু তোমার ঐ অপরিণত কাব্যে দেখলাম প্রকৃতিকে জড়পদার্থ মাত্র মনে করা হয়নি, রঙ্গমঞ্চের মনোরম যবনিকা-মাত্র মনে করা হয়নি, তাকে প্রাণবন্ত ক'রে মানুষের দোসর ক'রে তোলা হ'য়েছে। মানুষের জীবনে যে ঋতুচক্র নিত্য আবর্তিত হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখেছ তুমি নিসর্গের ঋতু মেখলায়, নিসর্গের সত্য মানবজীবনের সত্য হ'য়ে উঠেছে।

**কালিদাস**—কবি ছাড়া এমন সহৃদয় দ্রষ্টা আর কোথায় পাবো?

**রবীন্দ্রনাথ**—তারপরে নূতন দৃষ্টিতে পড়লাম তোমার মালবিকা, বিক্রম, কুমার, শকুন্তলা, মেঘদূত, রঘু। দেখলাম সমস্ত কাব্যের তলায় বইছে একই স্রোতের রেখা, বুঝলাম তোমার জীবনতত্ত্ব।

**কালিদাস**—কিভাবে প্রতিভাত হ'য়েছে তোমার জীবনে শুনি

**রবীন্দ্রনাথ**—সত্যিই ব্যাখ্যা তুমি একটি

সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছ—মানুষের ঘরে মানবশিশুর আবির্ভাব।

**কালিদাস**—যখন লিখছিলাম বুঝিনি পরে বুঝেছি।

**রবীন্দ্রনাথ**—চলার সময়ে পায়ের দিকে দৃষ্টি থাকে, চলার অবসানেই কেবল পথের সাকুল্য বোধ জন্মায়।

**কালিদাস**—মালবিকাতে তত্ত্ব ফোটাবার সুযোগ পাইনি। ওটা লিখতে হ'য়েছিল মহারাজার অনুরোধে একটা উৎসব উপলক্ষ্যে। তখনো রাজসভায় আসন হয়নি সুপ্রতিষ্ঠিত, চমৎকার সৃষ্টির দিকেই ছিল মনোযোগ। ও কাব্যখানা অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে লেখা।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু তাই বলে সৌন্দর্যের প্লাবন কিছু কম নয়।

**কালিদাস**—প্লাবন বলেই তো ফোটেনি ওতে শতদল। কুমার আর শকুন্তলা হচ্ছে সৌন্দর্যের মানস সরোবর, ফুটেছে তাতে সত্যের শ্বেতপদ্ম। কিন্তু তোমার কথাও ভুল নয়, মালবিকা, বিক্রম, কুমার ও শকুন্তলা একই সূত্রের বিন্যাস। ধাপে ধাপে পরীক্ষা ক'রে চলতে হ'য়েছে, পথের নিশানা ব'লে ছিল না কিছু

**রবীন্দ্রনাথ**—সে কথা সত্য। কাব্যের পরিণাম হয় বিবাহে নয় মৃত্যুতে। তোমার কাব্য অনুসরণ করেনি সে চিরচিহ্নিত পথ—তোমার কাব্যের পরিণাম শিশুর জন্ম-গ্রহণে।

**কালিদাস**—ঠিক তাই। মালবিকাতে বললাম মানবকন্যার কথা কিন্তু এলো না শিশু। বিক্রমে বললাম শাপভ্রষ্ট অপ্সরীর কথা, স্বর্গের অধিবাসিনী অথচ দেবতা নয়। এলো শিশু। কিন্তু মন বললে—না, না, এ ঠিক হ'ল না। আমি চাই মানুষের ঘরে মানবপুত্র। আবার পরীক্ষা শুরু হ'ল কুমারে। এবারে নিসর্গে আর দেবতায় গাটছড়া বাঁধা হ'ল, মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়কন্যা উমার বিবাহ। কুমার চেয়েছিলাম পেলাম কিন্তু পেলাম না মানবকুমার। পরীক্ষার সাফল্য ঘটলো শকুন্তলায় এবারে মানুষের ঘরে পূর্ণ মানবের ঘটল অভ্যুদয়, এক সঙ্গে বাঁধা পড়লো স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষ, তপোবন আর জনপদ, বিশ্বামিত্রের শান্ত তপস্যার সমুদ্রে সঙ্গতা অপ্সরী মেনকার উদ্দাম যৌবন-তরঙ্গিণী মুখে দেখা দিল কোমল অকলঙ্ক শকুন্তলারূপী কন্যাভূমি। এতদিন যা সন্ধান করছিলাম পেলাম।

**রবীন্দ্রনাথ**—মহাকবির যোগ্য ব্যাখ্যা।

**কালিদাস**—তারপর নূতন আর কিছু বলবার ছিল না, রঘুতে নিজের পুনরাবর্তন করেছি। রঘু হচ্ছে আমার কাব্যগুলির যোগফল—অঙ্কপাত আগেই হ'য়ে গিয়েছিল ওতে কেবল তার সমষ্টীকরণ।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু মেঘদূতে

**কালিদাস**—হাঁ মেঘদূতে। ওতে একবার

নিজের কল্পনাকে দিয়েছিলাম ছুটি, পাঠশালাপলাতকার আনন্দে ফিরেছে সে যেথানে সেথানে নূতন নূতন পতঙ্গের পাথার ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু সে-সব ইঙ্গিতও তো আকস্মিক নয়। রামগিরি আর অলকা, যা হ'য়েছে আর যা হওয়া উচিত, মর্ত্যের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখ আর চিরানন্দ, এ সমস্ত কি বাঁধা পড়েনি মেঘদূতের বিদ্যুতের রাখীতে।

**কালিদাস**—এখন বুঝতে পারছি বাঁধা পড়েছে কিন্তু কখনো বিচার করতে মন সরেনি। জলের পরিমাপ চলে কিন্তু ফেনার? মেঘদূত আমার কাব্যপ্রবাহের ফেনপুঞ্জ।

**রবীন্দ্রনাথ**—ফেনপুঞ্জের মূল্য নির্ধারণ হয়তো মুদ্রায় সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে একেবারে বিচারের বহির্ভূত নয়। উত্তরমেঘ আর সূর্যবংশের আদর্শ নৃপতিগণের রামরাজত্ব কি এক সূত্রে বাঁধা নয়? দুটি স্থানেই তুমি অংকিত করেছ utopia বা আদর্শ লোকের চিত্র। যক্ষের অলকা আর সূর্যবংশের অযোধ্যা একই চিত্রের এপিঠ-ওপিঠ। তাই নয় কি?

**কালিদাস**—এমন ক'রে ভাবিনি বিশেষ মেঘদূতের বেলায়। আগেই বলেছি মেঘদূতে আমার ছুটি-পাওয়া কল্পনা যথেচ্ছ বিহার করেছে। পতঙ্গের পাথা অনুসরণ ক'রে সে যদি ফুলের বনে গিয়ে থাকে তবে অন্যায় হয়নি। তবে রঘুবংশের বেলায় যা বলেছ ভুল নয়। রঘুবংশের স্বর্ণপাত্রে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত। আদর্শ নৃপতি, আদর্শ রাজত্ব অংকন করবার ইচ্ছা নিয়ে নেমেছিলাম ঐ কাব্য রচনায়। দেখাতে চেষ্টা করেছি কোন্ কোন্ গুণে একটা রাজবংশ সার্থকতার শিখরে ওঠে, কোন্ কোন্ গুণে ক্রমে সেই রাজবংশের পতন হয়। কাজটা যে খুব কঠিন ছিল এমন নয়—স্বচক্ষে দেখেছি শ্রেষ্ঠ গুপ্ত সম্রাটগণকে আবার স্বচক্ষে দেখতে হ'য়েছে তাদের অপদার্থ উত্তরপুরুষগণকে যখন উন্নতি-শিখর থেকে গুপ্তবংশের রথ দ্রুত নেমে যাচ্ছিল অধঃপাতের দিকে। রঘুবংশ কাব্য গুপ্তবংশের কাহিনী।

**রবীন্দ্রনাথ**—আমিও সেই দৃষ্টিতেই দেখেছি তোমার কাব্যখানা।

**কালিদাস**—তাইতো তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম, বললাম যে তুমি আমাকে সম্ভোগের কবি অপবাদ থেকে উন্নীত করেছ তত্ত্বদর্শী মহাকবি পদবীতে।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু শুধু রঘুতে নয় সমস্ত কাব্যে আছে আদর্শ রাজ চরিত্র চিত্রন চেষ্টা।

**কালিদাস**—আছে বই কি! অগ্নিমিত্র চরিত্র [illegible] মুখে চেয়ে অংকিত। পুরূরবা মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেমের কৈবল্যে আদর্শ নৃপচরিত্রের কোঠায় পৌঁছতে পারলোনা। তারপরে অংকিত করলাম মহাদেব চরিত্র। তিনি আদর্শ পুরুষ হতে পারেন কিন্তু আদর্শ মানুষ নন, তিনি যে দেবতা। তারপরে এলো দুষ্যন্ত! হাঁ দোষে-গুণে প্রেমে ত্যাগে বীর্যে করুণায় আমার আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তারপরে এ'কে গিয়েছি দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি রঘুবংশের শেষ দিকে কাব্যের প্রতি আমার আর তেমন মনোযোগ ছিল না, অনেক-স্থলেই লেখনী চলেছে প্রতিভা চলেনি, আবার অনেকস্থলে মনুসংহিতাখানা সম্মুখে খুলে ধরে লিখে গিয়েছি।

**রবীন্দ্রনাথ**—এমন শিথিলতার হেতু?

**কালিদাস**—বার্ধক্য আর গুপ্তবংশের দুরবস্থা মনকে পীড়িত করছিল। তা ছাড়া রামচন্দ্রের ও সীতার অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনেই প্রকৃতপক্ষে কাব্যের সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল। বাকিটুকু কেবল নিয়মরক্ষা মাত্র।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু পরিত্যক্ত অযোধ্যা-পুরীর বর্ণনায় প্রতিভার চরম বিকাশ কি হয়নি।

**কালিদাস**—অবশ্য হ'য়েছে। কিন্তু ও যে আমার চোখে-দেখা! পরিত্যক্ত অযোধ্যা যে হৃতগৌরব উজ্জয়িনী।

**রবীন্দ্রনাথ**—তা বটে।

**কালিদাস**—কিন্তু গোড়াকার প্রসঙ্গের বিশদ উত্তর এখনো পাইনি। ভারতবর্ষবোধে আমার কাব্য তোমাকে কিভাবে সাহায্য করেছে বুঝিয়ে বলো।

**রবীন্দ্রনাথ**—আমাদের দেশে সমাজের যে গুরুত্ব এমন অন্য দেশে নয়। অন্য দেশে সে গুরুত্ব রাষ্ট্রের, তাই সেথানে স্বভাবতই রাজার স্থান সকলের উপরে। এ দেশ সমাজকেন্দ্রিক, এখানে সেই প্রাধান্য নারীর। তোমার অংকিত ঔশীনরী, ধারিণী, উমা, শকুন্তলা, সীতার কাছে রাজন্যগণ নিতান্ত ম্লান।

**কালিদাস**—এ বিচার ভুল নয়।

**রবীন্দ্রনাথ**—কিন্তু আরো আছে। আমাদের দেশ যেমন সমাজকেন্দ্রিক, আমাদের সমাজ তেমনি নারীকেন্দ্রিক। এখন সে নারীকে তো বিলাসিনী হ'লে চলে না, প্রণয়িনী হ'লে চলে না, এমন কি গৃহিণীমাত্র হ'লেও চলে না—তার পক্ষে অত্যাবশ্যক জননীপদ। এই জন্যেই তোমার কাব্যে শিশুর আবির্ভাব অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। এই জন্যেই তোমার সমস্ত কাব্য নামত না হ'লেও বস্তুত কুমারসম্ভব।

**কালিদাস**—চমৎকার! ভারতবর্ষের এই সত্যটিকে তোমার মতো কবি ব্যতীত ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে পারতো আর কে?

**রবীন্দ্রনাথ**—আর ভারতবর্ষের এই মর্মটিকে তোমার মতো মহাকবি ব্যতীত উদ্ঘাটিত করতে পারতো কে?

**কালিদাস**—এই উদ্ঘাটনের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হ'য়েছে দেড় হাজার বছর। আমি স্রষ্টা তুমি আবিষ্কর্তা। সময় বিশেষে সৃষ্টির চেয়ে আবিষ্কারের মূল্য অধিক।

**রবীন্দ্রনাথ**—তোমার এই প্রশংসা অগ্রজ কবির আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করলাম।

**কালিদাস**—কবিস্বর্গে অগ্রজ অনুজ নেই, সকলেই এখানে সমজ—সকলেরই এখানে সমান আসন, সমান আদর, সমান স্থান এবং সমান বয়স।

# অগ্নিযুগের মা
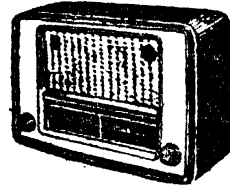
বঙ্কিমচন্দ্র সেন

আচার্য বিনোবা ভাবে সর্বজনমান্য পুরুষ। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সোভিয়েট বিপ্লব মুখ্যত বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এজন্য তাহার মূলে সামাজিক মূল্য ছিল না; অথচ এই মূল্য মানেই বিপ্লবের সার্থকতা। আচার্যজী এক্ষেত্রে সামাজিক মূল্য বলিতে সমষ্টি চেতনাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই চেতনা সমগ্রের জন্য আপকে আশ্রয় করিয়া বৃহৎ কল্যাণের অখণ্ড একটি আদর্শকে প্রাণধর্মে জীবন্ত করিয়া তোলে। আদর্শ এখানে রূপ পায়। ফলত আদর্শের এই রূপটি জাতির দৃষ্টিতে জ্বলন্ত হইয়া না জাগিলে অর্থাৎ রূপ ধরিয়া না ফুটিলে বিপ্লবের পথে জাতি অভীষ্ট সিদ্ধির উপযোগী পর্যাপ্ত গতিবেগ মনের মূলে লাভ করে না। সেক্ষেত্রে সাময়িক আক্ষেপ বা বিক্ষেপের মধ্যেই তাহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। শক্তির এই সাময়িক উদ্দীপ্তির কোনই মূল্য নাই এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কারণ, শক্তির যেখানে প্রকাশ, সেখানে প্রাণধর্মের বিলাস কিছু পরিমাণে থাকেই কিন্তু মানব-সভ্যতার অভ্যুন্নতির পক্ষে ইহার গতি বিলম্বিত, এমন কি বিড়ম্বিত হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ ঘটে।

প্রাণধর্মে প্রোজ্জ্বল বৃহৎ আদর্শের প্রত্যক্ষতার এমন বল, সমাজ-চেতনার মূলে দৃষ্টির এইরূপ ক্রান্তদর্শী স্বচ্ছতা আবার আধ্যাত্মিকতার উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। সমষ্টি-বেদনায় উদ্দীপ্ত সেই অনুভূতির ব্যাপ্তি-শীল শক্তি জাতীয় চিত্তকে পরম ত্যাগের পথে রূপের রসের ছন্দোময় আকর্ষণে নূতনকে লড়িবার তুলিবার প্রেরণায় দুর্গমের অভিসারে উচ্চকিত করে। এক্ষেত্রে তাহাকেই আধ্যাত্মিকতা বলা হইতেছে। প্রত্যুত বৃহতের বেদনার আশ্রয়ে অন্তর রসকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মানব-ধর্মের এই যে জাগরণ ইহার গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না; এমন পরিস্ফুর পরাভব মানে না। পরিসর পদ্ধতিতে অন্তর রসের স্ফূর্তি ইহার রীতি। তাহার অগ্নিময় সংবেগে তাহার মানব-কণ্ঠ হইতে সর্ববাধা জয়ের যে ঘোষণা উদ্গীত হয় তাহাকে স্তব্ধ করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই। সে বাক্ পরম বলে অর্থে প্রতিপত্তি লাভ করে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বাঙলা দেশেই সর্বপ্রথমে আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এদেশে ছোট খাটো রকমের বিদ্রোহ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে; কিন্তু বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জ্বলদগ্নি শিখা এই বাঙলা দেশের আকাশকেই প্রথমে উত্তপ্ত করে। সেই উত্তাপ ভাবকে সংস্থিতি দিয়া সর্বভারতীয় শক্তি জাগায়। ইহার মূল কারণটি খুঁজিতে গেলে বাঙালী জাতির অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধনার উৎস-মুখেই আমা-দিগকে যাইতে হয়। বস্তুত সমষ্টি চেতনা বা আত্মভাবনাকে আশ্রয় করিয়াই বাঙলার বুকে মানব-মুক্তির দুরন্ত বীর্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

ভারতের তত্ত্বদর্শিগণ একদিন এদেশের আকাশে বাতাসে সনাতন এক সুমহান্ সত্যের প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—

'যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য
সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।'

এই উত্তুঙ্গ তুহিনাচল এবং তাহার শৃঙ্গ রাজি যাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, গঙ্গা, যমুনা সিন্ধু, গোদাবরী সরস্বতীর অর্ঘ্যোপচিত সমুদ্রকে/আমরা যাঁহার কৃপায় লাভ করিয়া মহাসৌভাগ্যবান্, দশদিকে যে দেবতার বাহু সম্প্রসারিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকে আমরা অর্চনা করিব?

বৈদিক ঋষির এই বাণী বাঙলার অন্তরে ধ্বনি তুলিয়া যজ্ঞাগ্নি আহরণে বাঙালীকে প্রণোদিত করে। বাঙালীর অঙ্গনে দেবী দশভুজা দুর্গারূপে কতদিন পূর্বে আবির্ভূতা হন, মহিষমর্দিনী কবে এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয় এবং গণপতিকে সঙ্গে করিয়া লীলা-লাবণ্য অঙ্গে মাখিয়া মধুর ভঙ্গীতে দেখা দেন, ঐতিহাসিকগণের তাহা বিচার্য, কিন্তু ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্য রাজ-নীতিকদের ভাষায় স্বদেশপ্রেম বলিতে প্রভুত্বস্পর্ধী যে বস্তুটি বুঝায়, দেবীর এমন আবির্ভাবের মূলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাহা না থাকিলেও সমষ্টি চেতনাগত আত্মভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। বাঙলার সাধক বিশ্বের যিনি জননী তাঁহাকে আপন করিয়া উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন এবং এই উপলব্ধির মূলে সমত্ববোধ যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে সচেতন ছিল, একথাও স্বীকার করিতে হয়। এই বোধটিই বাঙালীর সাধনার সামাজিক মূল্য। অগ্নি-যুগে বাঙালীর সাধনায় এই সামাজিক মূল্যবোধ ঔজ্জ্বল্য লাভ করে এবং দুর্নিবার শক্তির সঞ্চার-সামর্থ্য দীপ্তি পায়। মাতৃ-ভাবনায় বাঙালীর অন্তর গলাইয়া মজাইয়া দীর্ঘদিনের পরাধীনতাজনিত সংস্কারমুক্ত বাঙালীর চিত্তে অগ্নিময় জ্বালামালার মেখলায় মণ্ডিতা হইয়া মা দেখা দেন। স্ফুরশ্চন্দ্রকলা অমল ধবল স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুকুটের আভায় দিক আলো করিয়া তিনি এদেশের সাধকদের নিকট প্রকট হন। মায়ের অপরূপ সেই রূপের ঠমকে, এখানে চমক জাগে; বাঙলায় জাতীয় জীবনের উদ্বোধন ঘটে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন হইতে বাংলার এই নবজাগরণের সূচনা। রাজর্ষি রাম-মোহন বাঙালীর অন্তরে বহ্নিবীজ বপন করেন। সমষ্টি চেতনার আত্মভাবনা তখন হইতে এখানে দানা বাঁধিতে শুরু হয়; মন্ত্রবীর্য গূঢ়ভাবে কাজ করিতে থাকে। স্মরণ, মননের পথে অন্তর-রসে মাতৃবীজ উল্লসিত হইয়া পরিশেষে মন্ত্র-চৈতন্যে বিলসিত হয়। বাগভব মন্ত্রবীজ বৈখরী হইতে মধ্যমা, মধ্যমা হইতে পশ্যন্তি, পরে পরান্তরে উপাগত হইয়া প্রত্যক্ষতার পরম বলে জীবন্ত হইয়া সাধকের কণ্ঠ হইতে মহামন্ত্র স্বরূপে উদ্গীত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। 'বন্দেমাতরং' এই মন্ত্র। ইহা শুধু কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি মাত্র নয়, পরন্তু আত্মসম্বন্ধের ছন্দে

প্রাণেন্দ্রিয়ময় মনোরম বিগ্রহের রসোল্লসিত উদয়ের অনুভূতিতে পরাভবের সকল গ্লানিকে অতিক্রম করিবার পক্ষে শক্তিময় মন্ত্র এইভাবে মূর্তি পায় এবং মূর্ত হইয়া খেলে এবং তাহার মহিমা খোলে।

বাংলার অগ্নিযুগের যাঁহারা সাধক, তাঁহারা মন্ত্রের সাধনায় অগ্নিবর্ণা মায়ের সন্তান-স্নেহের পরম তাপটি অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই তাপের প্রভাবে তাঁহারা মাকে আত্মভাবে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন মাকে। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যতীর্থে মানব-দেবতা মায়ের ব্যথার বিগ্রহ স্বরূপে জাগিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়াছেন। "আমার মাকে কি দেখেছিস তোরা বল সত্য কোরে? ভক্ত সাধক আবেগভরে এই আকুতি ব্যক্ত করিয়া সকলের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। সোমা হইতে সৌম্যেতরা জননীর সন্তান শ্রেণীর এ এক লীলা। তাঁহার অপর লীলা রুদ্রা হইতে রুদ্রতরা। সকলের মূলে রহিয়াছে দর্শন, মাকে দেখা। এই দর্শনই বাঙ্গালী জাতিকে ধারণ এবং পোষণ করে এবং ইহারই ফলে বাঙ্গালী বলিষ্ঠ অভিনব ধর্মে সম্প্রতিষ্ঠা পায়।

বাংলার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই ধর্মে জাতিকে উদ্দীপ্ত করেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন—আমি প্রচার করিতে চাই এমন ধর্ম যাহাতে মানুষ তৈয়ারী হয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে জাতিকে ডাকিয়া বলেন,—হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারত-বাসী। ভারতবাসী আমার ভাই। ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার রক্ত। মাতৃভাবনার আগ্নেয় প্রেরণা স্বামীজীর রসনাকে আশ্রয় করিয়া জাতির অন্তর জ্বালাইয়া তোলে। স্বামীজীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা নিবেদিতা অগ্নিময়ী মায়ের অনুধ্যানে বাংলার বুকে হোমানল প্রজ্বলিত করেন। আরম্ভ হয় আগুনের খেলা। সেই আগুনে কার্যত ভগিনী নিজেকে আহুতি দেন। মৃত্যুরূপা মায়ের এই মেয়ের হাতে এদেশের মাতৃযজ্ঞের আয়ুধ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। মাতৃমন্ত্রপূত বলির খড়্গ নিবেদিতা বাংলার সন্তানদের হাতে তুলিয়া দেন।

গুরুতত্ত্বে সাধনা না করিলে মন্ত্র চৈতন্য ঘটে না। দ্বিদলে এই সাধন। একদিকে কর্ম, অপর দিকে জ্ঞান। এক দিকে সুরথ, অপর দিকে সমাধি। দুইয়ে মিলিয়া মন্ত্রে শক্তির স্ফূর্তি, মায়ের উদ্বোধন। বাংলার মাতৃসাধনা দুইটি দলে বিকাশ লাভ করে। এক দলে সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী; অপর দলে সাক্ষাৎ সম্পর্কে রাজনীতির গতিতে সাধনশক্তি সম্প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অবদান এই দুই দলের সংযোগসূত্রে শক্তিকে সংহত করে। শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র তাঁহার সম্পাদিত 'ধর্ম' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিপিনচন্দ্রের রচিত মাতৃবন্দনা-গীতি 'সহে না সহে না জননি, এ যাতনা আর সহে না' এবং অশ্বিনীকুমারের 'অগ্নিময়ী মা আমাদের' এই সব গান বাঙ্গালীর অন্তরে প্রাণশক্তির তরঙ্গ তোলে। বাংলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্ত এই সাধক দলের অবদানের অপরিম্লান মহিমা ভারতের মুক্তিতে অলঙ্ঘ্যবীর্য সঞ্চার করে।

এইভাবে বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবের মূলে সমষ্টির তাপভূয়িষ্ঠ ভাবানিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা উৎস স্বরূপে কাজ করিয়াছে। রাক্ষসের অত্যাচার এবং উপদ্রব তপঃপ্রবন্ধ সেই যজ্ঞাগ্নির ঔজ্জ্বল্য পরিম্লান করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম বাঙ্গালীকে রক্ষা করিয়াছে এবং জাতির মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছে।

বিপ্লবের বহু প্রকার ব্যাখ্যাভাষ্য আমরা আজকাল শুনিতে পাই। রাজনীতিক বিপ্লব, অর্থনীতিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব প্রভৃতি। কিন্তু এইসব বিপ্লবের প্রচেষ্টায় প্লবধর্ম কতটা রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তর হইতে প্রাণরস উৎসারিত হইয়া সমষ্টি চেতনাকে ইহা কতটা বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে ইহাই প্রশ্ন। ফলত এইসব পরিকল্পনা যদি বিভিন্ন মতবাদের কতকগুলি সূত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে এবং জাতির সমষ্টি-চেতনা জীবন্ত আদর্শের ধৃতি বা সংহতিতে জোর না পায়, তবে পথের বাধা অতিক্রম করিতে ঐগুলি কতটা সাফল্য লাভ করিবে, এ সম্বন্ধে স্বতই সন্দেহের উদয় হয়।

পথে বাধা আসিবেই, আমরা তজ্জনিত দুঃখকে অতিক্রম করিব কোন্ বলে? এদেশের সাধকেরা বলিয়াছেন—সমগ্রের জন্য তপস্যাতেই সুখ, এই যে সুখ ইহা আত্যন্তিক। এই সুখ দুরন্ত দুঃখকেও জয় করিবার সামর্থ্য দান করে। এজন্যই তপস্যার মাহাত্ম্য। শ্রুতি বলেন—তপস্যার দ্বারা দেবগণ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তপস্যার প্রভাবেই আমরাও ঋষিত্ব অমৃতত্ব অধিগত হইব। তপস্যার পরম প্রভাবে আমাদের শত্রুদল নির্জিত হইবে। কিন্তু কোথায় সেই তপস্যা? নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে সমগ্রের কল্যাণ-কল্পে বিসর্জন দিবার মত কোথায় আমাদের অন্তরের তাপ? এই অভাব পূর্ণ করিতে আমাদিগকে সন্তানের তাপে দীপ্যমানা দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হইতে হইবে। সকলের যিনি মা, তাঁহাকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে তাঁহাকে; তাঁহার বেদনা সমগ্র অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। এই ধর্ম ভয়াবহ পরধর্ম হইতে আমাদের উদ্ধার সাধন করুক, দেবীর চরণে ইহাই প্রার্থনা।
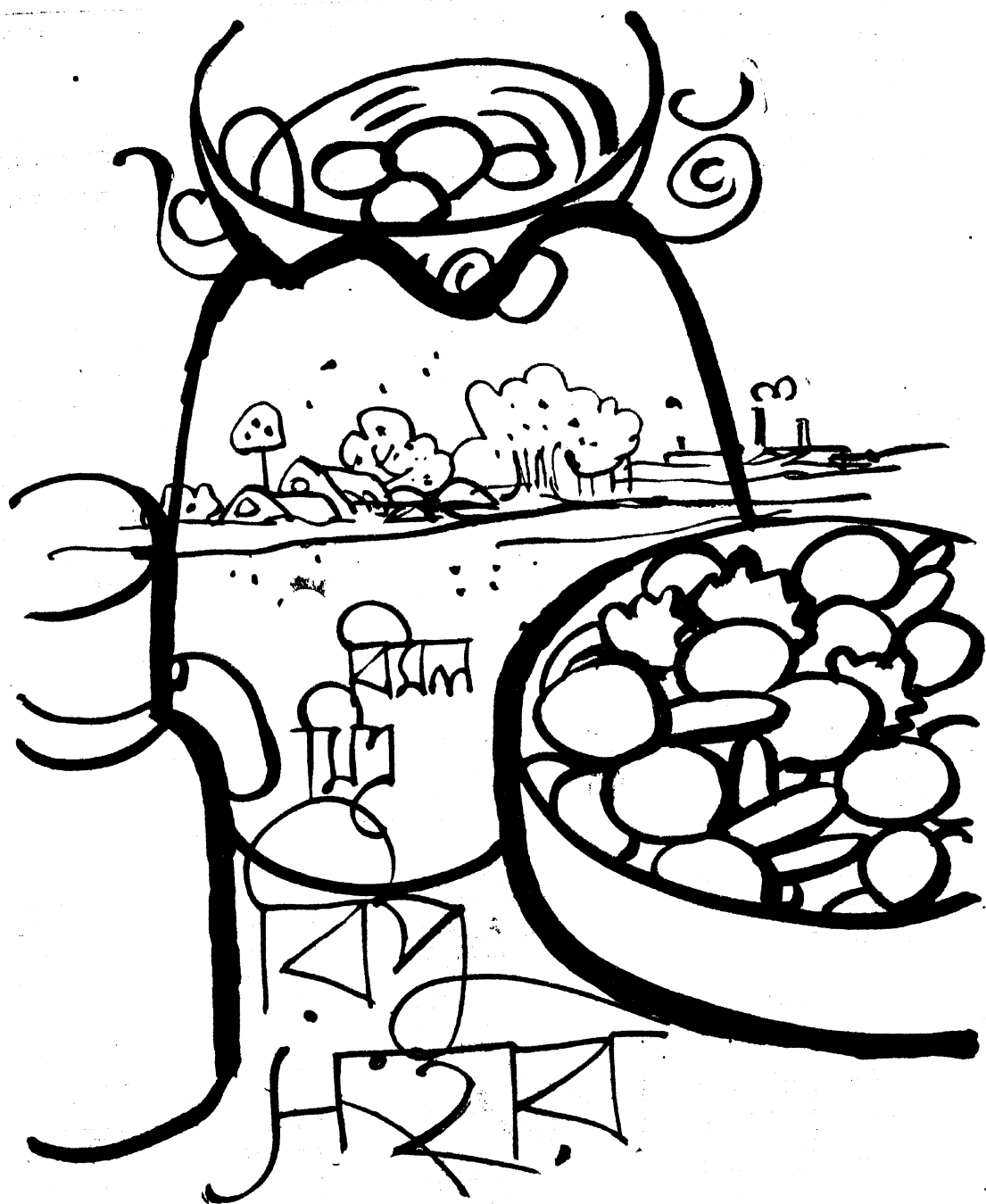
কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়। হাঁটা রাস্তায় মাইল দশেক। প্রথমে পড়বে বাদামতলা। তারপর এই বাদামতলা থেকে আরো মাইল তিনেক দূরে রসুলপুর। এই বাদামতলার গল্পই বলবো আমি। আপনারা যদি কখনও এই বাদামতলায় যান, দেখবেন সামনেই এক ভাঙা মন্দির। মন্দিরের ইঁট-কাঠ ভেঙে পড়ছে এখন। তার পাশেই এক বিরাট বটগাছ। আর সেই বটগাছটার তলাতেই এক শ্বেতপাথরে বাঁধানো ছোট একটা স্মৃতিস্তম্ভ। এমন কোনও বিখ্যাত লোকের স্মৃতিস্তম্ভ সেটা নয়। কোনও বড়-লোকের স্মৃতিস্তম্ভও নয়। সামান্য একজন তেলেভাজাওয়ালা—পটুয়াথালির গোবিন্দ সরকার, তারই নাম ধাম লেখা সামান্য একটু পরিচয় আর নিচে নাম লেখা আছে কোন্ এক কাঞ্চনকামিনী দেবীর।

আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করবেন—ও কাঞ্চন-কামিনী কে?

ওরা বলবে—তা জানি না—

তারপর জিজ্ঞেস করবেন—গোবিন্দ সরকার কে?

ওরা বলবে—গোবিন্দ সরকার এই বট-গাছতলায় বসে তেলেভাজা ভাজতো, বেগুনি ভাজতো, ফুলুরি ভাজতো—

তা সত্যিই গোবিন্দ সরকার তেলেভাজা

ভাজতো বটে ওখানে। গোবিন্দ সরকারের বেগুনি ফুলুরি আলুর চপের নাম-ডাকও ছিল বেশ। দূর-দূর থেকে মটরগাড়ি চালিয়ে গোবিন্দর তেলেভাজা খেতে আসতো সবাই ওখানে। কলকাতার বড়লোকদের ছেলেরা ওর তেলেভাজার তারিফ করতো। রসুলপুরের বাগানবাড়িতেও বাবুদের আড্ডায় ওখান থেকে তেলেভাজা যেতো।

কিন্তু কাঞ্চন-কামিনী?

সেই কাঞ্চন-কামিনীর গল্পই বলি এবার।

ওই বাদামতলাতেই আমি গোবিন্দ সরকারকে প্রথম দেখি। তখনও গোবিন্দ সরকার বেঁচে।

বাদামতলার মোড়ে এসেই গাড়ি থেমে গেল। গঞ্জ মতন একটা জায়গা। রাস্তার একপাশে ক'টা চালাঘর। সমস্ত রাত গাড়ি চালিয়ে এখানে এসে ভোর হলো। লোক-জনের বিশেষ চিহ্ন নেই। মোড়ের মাথায় একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। আশে পাশে চেয়ে দেখলাম। দীনবন্ধু বললে—আগে এই বাদামতলায় প্রায়ই আসতাম—আগে একবার এখানে এসেছিলাম মনে হচ্ছে—

বললাম—এখন চা পাওয়া গেলে ভালো হতো ভাই—

দীনবন্ধু বললে—শুধু চা কেন, গরম গরম তেলেভাজাও এখেনে পাওয়া যায়—

কথাটা বলতে-না-বলতে নজরে পড়লো। বটগাছের তলায় একজন লোক এই ভোরেই তোলা উনুন নিয়ে বসে গেছে। তখনও ভিড় জমেনি। পাশে কিছু চেলা কাঠ, বেগুনি-ফুলুরির সরঞ্জাম। লোকটা একমনে ফুটন্ত কড়ায় খুন্তি নাড়ছে।

গাড়িটা কাছে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দীনবন্ধু ডাকলে—ওহে, ও তেলেভাজাওলা—কী যেন তোমার নামটা?

লোকটা মুখ তুললে। বললে—আমার নাম গোবিন্দ সরকার আজ্ঞে।

মনে আছে সেদিন গোবিন্দ সরকারের চোখটা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। করমচার মত লাল টকটকে চোখ, একেবারে গাঁজাখোরদের মত। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া অগোছালো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। যতদূর মনে আছে সেই চেহারা দেখেই আমার চা খাওয়ার নেশা চলে গিয়েছিল।

বললাম—দরকার নেই চা খেয়ে, চল বরং এর পরে অন্য কোথাও খেলেই চলবে—

দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলে—গরম আলুর চপ হবে হে?

গোবিন্দ বললে—হবে আজ্ঞে—

অল্প-অল্প শীত পড়েছে। সারা জায়গাটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মাথার ওপর বটগাছের ডালপালার আচ্ছাদন, আর দূরে কয়েকটা ডোবা, আগাছা, ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর, আর তার ওপাশে ধান ক্ষেত। কলকাতা থেকে মটরে আসার পথে প্রথম বিশ্রামের জায়গা এই বাদামতলা। যারা হাঁটা পথে আসে, যারা সাইকেল চড়ে আসে, তারা অনেক পরিশ্রমের পর এইখানে এসে প্রথম একটু জিরিয়ে নেয়। কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে বটগাছের তলার মাচাটায় একটু বসে। নন্তা ময়রার দোকান থেকে এক পয়সার বাতাসা কিনে এক ঘটি জল চেয়ে খায়। তারপর ঘাম-টাম শুকোলে আবার সাইকেলে উঠে চলতে শুরু করে। যারা চণ্ডী ঘোষের ইঁট-খোলায় কাজ করে তারা এই বটগাছতলায় এসে যে-যার পোঁটলা খুলে ছাতু ভিজোয়। খোরাকির ফাঁকে কিছুটা গড়িয়ে নেয় গামছা পেতে। আর যেদিন কুলুইচণ্ডীর মেলার সময় যাত্রাগান হয়, সেদিন আশেপাশের দশ বারোটা গ্রামের লোক এই বাদামতলার বট-গাছের তলায় এসে জড়ো হয়। সারাদিন উপোষ করে মায়ের পুজো দিয়ে পেসাদ নিয়ে ডোবা থেকে জল খায়, নন্তা ময়রার দোকানের পাটায় বসে চিঁড়ে মুড়কি আর টকো দই দিয়ে ফলার মাখে। তারপর সমস্ত রাতভোর বদন অধিকারীর পালাগান শুনে সকাল বেলা যে-যার গাঁয়ে চলে যায়।

তা বাদামতলা এখন আর সে-বাদামতলা নেই। এ এককালে নাকি ছিল এদিককার বড় গঞ্জ। গঙ্গা তখন এই নন্তা ময়রার দোকানের কোল ঘেঁষে রসুলপুরের ইস্কুল-বাড়ির ওপর দিয়ে একেবারে মাতলার মোহানায় গিয়ে মিশতো সে-সব এখন আর চেনা যায় না। নিচু খাদ মতন যা ছিল তার ওপরেই চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলা হয়েছে। কটাই সান্যেলের পটলের ক্ষেত হয়েছে। এখন শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে করুণাময়ীর ঘাটের জল বেড়ে যখন বান্ আসে তখন জল ওঠে এদিকে। এই বটতলা-বরাবর জল জমে। তারপর যেদিন পিচের রাস্তা হ'লো একেবারে মাতলা পর্যন্ত বড় বড় বাগান-বাড়ি হ'লো কলকাতার বড়লোকদের, তখন থেকে এদিকে জল আর তেমন জমে না বটে, কিন্তু এখানকার লোকদের মাছধরার সুবিধে হয়। দুদিকে দুজন গামছা ধরলে বড় বড় চিংড়ি ধরা পড়ে। পুকুরে আর মাছ ছাড়তে হয় না। বাদামতলার লোকজন তখন সে-ক'দিন পেট ভরে মাছ খেতে পায়।

দীনবন্ধু এতক্ষণে একটা সিগ্রেট ধরালে। বললে—দু' কাপ চা-ও করে দিতে হবে গোবিন্দ, অনেক দূর থেকে আসছি আমরা—

গোবিন্দ সরকার পুরোন লোক। সে জানে। কলকাতার বাবুরা গোবিন্দর তেলেভাজা খেতে এই এতদূরে এসেছে এককালে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার তেল পুড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছে এই বাদামতলায়। এসে এই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গরম গরম বেগুনি ফুলুরি খেয়েছে। আর শুধু কি বাবুরা! সঙ্গে মা-জননীরাও আসতো। তেনারা তেলেভাজা খেয়ে কত আশীর্বাদ করে গেছে গোবিন্দকে। রসুলপুরের বাগানবাড়ি যাবার এইটেই তো একমাত্র পথ। ওই কলকাতা থেকে ভোর-ভোর বেরিয়ে আলো ফুটতে না ফুটতে এই বাদামতলায় এসে একবার চায়ের তেষ্টা পেত। আর চায়ের সঙ্গে গরম গরম তেলেভাজা। বেগুনি ফুলুরি পেঁয়াজ-বড়া—

গোবিন্দ হাতা খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলতো—পেঁয়াজ-বড়া খাবেন না দাদা-বাবুরা?

—পেঁয়াজি? বেশ, বেশ,—তা বেশ কড়া করে ভাজা চাই কিন্তু—

গাড়ির মধ্যে মা-জননীরাও থাকতো। গাড়ি ভর্তি। সিল্কি শাড়ি পরা। আর কী সব গয়না! গয়নায় মোড়া দেহ। আর কী সব রূপ মা-জননীদের। চক্ষু জুড়িয়ে যায় দেখলে। কলকাতার লোক সব, কথা-বার্তাও তেমনি। এক টাকার নোট দিয়ে ভাঙানি নিতো না দাদাবাবুরা। বলতো—ও আর তোমায় ফেরৎ দিতে হবে না গোবিন্দ—তোমার বখশিষ ওটা—

একজন বলতো—তেল তোমার খাঁটি বটে তো?

গোবিন্দ জিভ্ কেটে বলতো—কী যে বলেন মা-জননী, আপনাদের চরণের দাস বলে কি নরকের ভয়ও নেই আজ্ঞে?

আর একজন সাবধান করে দেয়—দেখো গোবিন্দ, ফি শনিবারে খাচ্ছি, যদি পেট খারাপ হয় তো তোমাকে পুলিসে দেব বলে দিচ্ছি—

তাতেও গোবিন্দ রাগে না। বলে—কী যে বলেন মা, পেটের দায়ে দোকান করছি বলে কি অধর্ম্ম করতে পারি?

তারপর তেলেভাজা চা খেয়ে টাকা দিয়ে বাবুরা হাওয়া-গাড়ি চালিয়ে হুস্‌স্ করে চলে যেত রসুলপুরের দিকে। রসুলপুরেই সব বাবুদের বাগানবাড়ি। কুঞ্জকানন, মহারাজ-মঞ্জিল, নানারকম নাম। কয়েক বিঘে নিয়ে এক-একটা বাগান-বাড়ি। মালিকরা সদলবলে আসে সপ্তাহে একদিন কি বড়জোর মাসে দু'দিন। তবু তার জন্যে মালী আছে, খানশামা আছে, মেথর, বাবুর্চি আলো, পাখা, গরু বাছুর সব মোতায়েন থাকে।

নতুন আসে যারা তারা জিজ্ঞেস করে—হাওয়া-গাড়িগুলো কোথায় যাচ্ছে রে বুধো?

বুধো বলে—সব রসুলপুরের বাগান-বাড়িতে!

সকাল বেলা উঠেই গোবিন্দ উনুন কড়া নিয়ে ভাজতে বসে। বিশেষ করে শনিবার-রবিবারে। বাবুরা এক-একদিন দু' টাকা তিন টাকার কেনে। কেউ কেউ ঠোঙা নিয়ে গাড়িতে খেতে খেতে যায়।

দীনবন্ধু বললে—এ গোবিন্দ কি আজকের লোক! আগে কলকাতা থেকে তেলেভাজা খেতে এই বাদামতলায় এসেছি. এখন লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে—

কিন্তু বেগুনি আলুর চপগুলো দেখে কেমন অভক্তি হলো। দীনবন্ধু মুখে দিতে যাচ্ছে এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে ওদিক থেকে একজন দৌড়ে এসেছে। বললে—বাবুমশাই, খাবেন না, খাবেন না—

হঠাৎ কী যে হলো। মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নন্তা ময়রার দোকানের দিক থেকেই দৌড়ে এল লোকটা। দীনবন্ধু বললে—কেন? কী হয়েছে?

আস্তে আস্তে আরো কয়েকজন লোক তখন এসে জুটেছে সামনে। ভালো করে সকাল হয়েছে। সেদিন সেই সকালবেলাতেই বাদামতলার গোবিন্দ সরকারের দিকে আবার চেয়ে দেখলাম। লোকটা তখনও নির্বিকার। আপন মনেই কড়ার ওপর খুন্তি নেড়ে চলেছে। সত্যিই তখন তাকে দেখতে ভয় লাগলো। লাল করমচার মত চোখ দিয়ে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর নিজের মনেই কাজ করতে লাগলো আবার।

দীনবন্ধু হাতের ঠোঙাটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেগুনি আলুর চপগুলো মাটিতে পড়তেই কোথা থেকে কাকের দল ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল সব।

নন্তা ময়রা বললে—কী সব্বনাশ হতো বলুন দিকিনি—কেউ আর খায় না—যাকে দেখি তাকেই আমরা বারণ করে দিই, একজন বাবু তো খেয়ে বমি করতে করতে অস্থির, শেষে...

আর একজন বললে—চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না বাবু মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

দীনবন্ধু বললে—তা তোমরা ওকে ওখানে ভাজতে দাও কেন? উঠিয়ে দিতে পারো না—

নন্তা ময়রা বললে—শোনে না বাবুমশাই, উঠিয়ে দিইছি কতবার, তবু ঘুরে ফিরে এসে বসবে, আমরা কেউ দেখবার আগেই উনুন নিয়ে বসবে এখানে, কিছুতে কারো কথা শুনবে না—তাই দেখতে পেলেই সবাইকে বারণ করে দেই—

মনে আছে তার অনেকদিন পরে আবার একদিন রসুলপুরে যাবার পথে ওই বাদামতলায় গিয়েছিলাম। সেদিনও গোবিন্দ সরকারকে দেখেছিলাম। বটগাছের তলায় ঠিক সেই জায়গাটায় বসে আছে। সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, সেই করমচার মত লাল-লাল চোখ, খর-দৃষ্টি।

সেদিনও গোবিন্দ সরকারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চারদিকে বটফলের রাজত্ব। দূরে নন্তা ময়রার দোকানের সামনে বাঁশের মাচা। দোকানের ঝাঁপ তখন বন্ধ। খুব সকাল। কিছু দূরে মাঠের ওপর চণ্ডী ঘোষের ইঁট-খোলার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গল্ গল্ করে। আরো দূরে প্রান্তরটা উঁচু-নিচু হয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কটাই-সান্যালের পটলের ক্ষেত ছেড়ে কিছু বাদা-বন। তারপর নীল আকাশ। নীল আকাশের গায়ে কয়েকটা বক্ মাতলার দিকে উড়ে চলেছে। সেই বাদামতলার নিঃসঙ্গ আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে রসুলপুরে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। নন্তা ময়রার কথাই কানে এসে ভাসতে লাগলো কেবল—চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না বাবুমশাই, মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

একদিন বহুকাল আগে এখানে এই বটতলায় এসে যেদিন প্রথম দাঁড়িয়েছিল,

গোবিন্দ সরকার, এই নন্তা ময়রাই সেদিন আশ্রয় দিয়েছিল। মাথা গোঁজবার একটা চালার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল।

কুলুইচণ্ডীর মেলায় তখন লোকজন হতো খুব। তালপাতার বাঁশি, খেজুর-পাতার কোস্তা, বাঁশের ধুচুনি, বেতের ধামা, খই, চিঁড়ে, চিনেমাটির বাসন, নাগরদোলা, মাটির হাঁড়ি কলসী—সে একেবারে এলাহি কাণ্ড। তারপর দু'দিন বাদেই সব ফরসা। কিন্তু ওই দু'দিনেই লাল হয়ে যেত বাদাম-তলার ব্যাপারীরা। কলকাতা থেকে মহাজনরা আসতো সস্তার জিনিসপত্তোর খরিদ করতে। নন্তা ময়রা দুহাতে মিষ্টি বেচে কুলিয়ে উঠতে পারতো না। ভিয়েন বসতো সাতদিন আগের থেকে। গজা আর শুখনো খাবারগুলো সেই সময়ে তৈরি রাখলে এক মাস দু' মাস চলে। দিনরাত তখন দোকান খোলা। নন্তা ময়রার দোকানে বাড়তি লোক নিতে হয়।

—একটা কাজ দেবেন বাবু?

ভিয়েন তখন চড়েছে সবে। পুরোদমে কাজ চলছে। দোকানের পেছনে মস্ত বড় উনুনে গজাগুলো ভেজে তোলা হচ্ছে চুবড়িতে। গজার কড়া নামলে রসবড়া হবে। তারপর জিলিপি। ভোরের দিকে ছানার মুড়কি হবে বলে ছানা বাটা হচ্ছে। নন্তা ময়রা বলছে—বেশ মিহি করে বাট্ ক্ষেত্তোর—মিহি করে বাট্—রসুলপুরের বাবুরা খেতে খারাপ হলে দাম দেবে না—

ক্ষেত্তোর বললে—বাবুরা বলছেন কেন বড়বাবু, বলুন বিবিরা—

নন্তা ময়রা বললে—ওই একই কথা হলো, বিবিদের জন্যেই তো বাবুরা আসে রসুলপুরে, তা আর জানি না—

তারপর একটু থেমে বলে—বিবিদের খেতে যদি ভালো লাগে তো পাঁচ টাকা সের দিতেও কসুর করবে না বাবুরা, তা জানিস্।

তা জানে সবাই। ক্ষেত্র জানে, নন্তা ময়রা জানে, বাদামতলার তাবৎ ব্যাপারী কারো জানতে আর বাকি নেই। বড় বড় লোক সব। পয়সা ওড়াতে বাগান-বাড়িতে ফুর্তি করতে আসে। বড় বড় হাওয়া-গাড়ি। যমদূতের মতন সব চেহারা। কিন্তু ভেতরে ফুর্তিবাজ সব ছোকরা। সঙ্গে থাকে বিবি। মাঠের হাওয়ায় তাদের সিল্কের রঙিন শাড়ির আঁচল, মাথার খোঁপার চুল, বুঝিবা প্রাণও ওড়ে। হো হো হি হি করে হাসে। হেসে গাড়ির মধ্যে লুটোপুটি খায়।

বলে—গাড়ি থামালে কেন এখানে? এ কোন্ জায়গা গো?

সঙ্গের বাবু বলে—একটু জিরিয়ে নিচ্ছি—

—তা গায়ে হাত দিয়ে বাঁঝি জিরেন হচ্ছে—বলে বাপের হুজ্জা করে হাসতে হাসতে গাড়ির পেছনে এলিয়ে পড়ে। তারপর ভেতরেই হুল্লোড় পড়ে যায়। হাসাহাসির শব্দ শোনা যায় দূর থেকে।

—ওই দেখো, কেউ দেখে ফেলবে!

বাবুটি বলে—এখেনে কে দেখবে, কেউ নেই—

মেয়েটি বলে—ওই তো বটগাছতলায় কত লোক, মিষ্টির দোকান থেকে কে চেয়ে দেখছে এদিকে—

বাবুটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সুরে বলে—দূর, ওরা গাঁয়ের লোক, দেখলেই বা, ওরা মানুষ নাকি?

বাবুরা বিবিরা কেউ মানুষ বলেই মনে করে না এদের। এই বাদামতলার ব্যাপারী-দের, কি চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলার কুলী-মজুরদের। কিম্বা ওই গোবিন্দ সরকারকে।

নন্তা ময়রা কিন্তু হেঁটোর কাপড় তুলে মাচায় বসে লক্ষ্য করে সব। বাদামতলার আদি অকৃত্রিম ব্যাপারী নন্তা ময়রা।

এই বাদামতলায় আর কেউ মিষ্টির দোকান দিতে পারে না। কেরোসিনের দোকান করেছে ভোলা ঘোষ, মুদির দোকান করেছে শ্রীপদ হাজরা, হারিকেন লম্ফর দোকান করেছে শশী কারিগর, বাদামতলায় সব কারবারের ব্যাপারী আছে। কিন্তু মিষ্টি খাবারের একচেটিয়া কারবার নন্তা-ময়রার। মেলায় মহোৎসবে নন্তা ময়রা মিষ্টি বেচে লাল হয়ে যায়। কাঁচা পয়সা কোঁচড়ে ভরে নিয়ে বাড়ি যায়। বলে—কারবারে আর সুখ নেই তেমন—

মেলার পর তখন আবার রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকে নন্তা ময়রা। তখন আর ভিয়েন দেখবার তত তাগিদ্ নেই। গাঁয়ের লোক নুন কিনতে আসে কেরাসিন কিনতে আসে, চাল ডাল মশলা কিনতে আসে। আর কদাচিৎ কদাচিৎ বাতাসাটা মুড়কিটা কিনে নিয়ে যায়।

নন্তা ময়রা বলে—ভালো সন্দেশ তৈরি হয়েছে, নেবে না কাঁচির মা?

কাঁচির মা বলে—শুধু শুধু সন্দেশ খেতে যাবো কেন বাছা, আমাদের কি অসুখ করেছে?

—তা সন্দেশ না খাও, ভালো জিলিপি করেছি, নাও না!

কাঁচির মা আঁচলের খুঁটে পেরো বাঁধতে বাঁধতে বলে—আর জিলিপির দরকার নেই, নোলা বেড়ে গেলে শেষকালে সামলাবে কে?

এমনি সময় গোবিন্দ এল।

—একটা কাজ দেবেন বাবু?

নন্তা ময়রা প্রথমে গা করেনি তেমন। বিক্রী-পাটা নেই, কারিগরের রোজ ওঠে না। ভাণ্ডের গুড় পিঁপড়েতে খাচ্ছে। তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। মিলিটারির লোকজন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে যেত। সোঁ সোঁ শব্দ করে চলদে রং-এর গাড়িগুলো রসুলপুরের বাগানবাড়িতে গিয়ে জড়ো হতো। রসুলপুরের পোড়ো বাড়িগুলো আবার তারা সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে ছাউনি করেছিল। তখন বউ-ঝিরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতো না ভয়ে। বেশি মিলিটারি দেখলে নন্তা ময়রা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকতো। নইলে কখন হুড়মুড় করে দোকানে ঢুকে সব লুঠপাট করে নেবে ঠিক নেই। শ্রীপদ হাজরার দোকানে খদ্দের আসতে ভয় পেতো। ইঁটখোলার কুলী-মজুরদের মেয়েছেলেরা লরী দেখলে পালিয়ে যেত মাঠের দিকে। সে-সব দিন গেছে। এখন রসুলপুরের বাগানবাড়িগুলো আবার জমে উঠেছে। বাগানবাড়ির মালিকরা আবার গাড়ি চালিয়ে আসতে শুরু করেছে। চাল-ডাল-কেরোসিনের খদ্দের বাড়ুক আর না-বাড়ুক, নন্তা ময়রার কিছু খদ্দের বেড়েছে। তার নোনতা খাবারের খদ্দেরের ভিড় হয়। গরম সিঙাড়া কচুরির চাহিদা বেড়েছে। বাবুরা বিবিরা রাত কাটায় ওখানে। কয়েক-দিন দু হাতে টাকা ছড়ায়। গাঁয়ের লোক মুরগি বিক্রী করে মোটা লাভে। পাঁঠা বিক্রী করে চড়া দামে। কিন্তু শুধু মুরগী পাঁঠা হলেও সব অভাব মেটে না। আরো অনেক জিনিস চাই। সৌখীন জিনিস সব। সিগারেট পান-বিড়ি সব রসুলপুরেই মেলে। মাল-টালও সঙ্গে করে আনে কলকাতা থেকে। গাড়ির গদির তলায় সার-সার বোতল সব সাজানো থাকে। সেটা সহজে ফুরোয় না। ফুরোলে রসুলপুরের বাগানবাড়ির মালীরা জোগান দেয়। কোথা থেকে জোগান দেয় তা কেউ জানে না। কিন্তু চাট্?

চাট্ কিনতে এখানে আসে এই বাদাম-তলায়। আগে ছিল নন্তা ময়রার খাস্তা সিঙাড়া কচুরি। এখন হয়েছে তেলেভাজা। গোবিন্দ সরকারের আলুর চপ্ ফুলুরি বেগুনি, পেঁয়াজি, পাকাউঁড়ি—

যার কিছু বিক্রী হয় না, সে গিয়ে বিক্রী করে আসে রসুলপুরে।

বশির মিয়ার একটা খাসী ছিল ঘরে। বড় আদরের খাসী। ভেবেছিল, ভাল দর পাবে, তাই সময় থাকতে বেচেনি। তারপর দর নেমে গেল। পনেরো টাকা থেকে একেবারে দশ টাকায়। সেই খাসী বশির রসুলপুরে গিয়ে কুড়ি টাকায় বিক্রী করে এল বাবুদের কাছে।

দু' হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট তুলে বললে—এই দেখুন বড়বাবু, এক কুড়ি টাকায় বেচে এলাম—

নন্তা ময়রা বললে—হেড্ মালীকে কত দিতে হলো?

বশির বললে—মিলে আট গণ্ডা পয়সা, কিন্তু বাদামতলায় ও কে কিনতো ওই দরে?

হু হুঁ করে হয়ত রসুলপুর থেকে গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাদামতলায় বটগাছতলায় [illegible] দুপুরবেলা। নন্তা ময়রা তখন গামছা পেতে সবে দোকানের সামনের মাচায় শুয়েছে।

গাড়ি আসতেই নন্তা ময়রা ঘাড় কাত্ করে দেখে। গাড়িতে বাবু নেই বিবিরাও নেই! শুধু মতিলাল একলা। কাননকুঞ্জের হেড্ মালী মতিলাল।

—হেড মালীযে, কী চাই আবার?

—আজ্ঞে বড়বাবু, সাত টাকার সিঙাড়া।

নন্তা ময়রাকে তখন উঠতে হয়। ক্ষেন্তোরকেও উঠতে হয়। কাঁচা ঘুমে উঠে আবার উনুনে কয়লা দিতে হয়, ময়দা মাখতে হয়। আর ঘণ্টা দু' এক পরেই শুরু হ'তো ভাজা। কিন্তু ততক্ষণ দেরি সইবে না রসুলপুরের বাবুরা আর রসুলপুরের বিবিরা।

নন্তা ময়রা খুন্তি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে—এই অবেলায় সিঙাড়া কী হবে হেড্ মালী? ভাত দিয়ে খাবে নাকি?

ভাত! এই দুপুর বারোটার সময় ভাত খায় নাকি বাবুরা!

মতিলাল বললে—এই তো সবে ঘুম থেকে উঠলো সব—এইবার চা হবে কিনা—

—এখন চা হবে তো ভাত খাবে কখন বাবুরা?

হেড্ মালী বলে—এই চায়ের পর মাংস চড়বে, খেতে খেতে সেই যার নাম বিকেল!

হেড্ মালী বহুদিনের লোক। বড়বাবুর আমল থেকে আছে কানন-কুঞ্জে। কানন-কুঞ্জে তখনকার দিনে বড়বাবুর ফুর্তিতে মাল এনে দিয়েছে, তেলেভাজা, সিঙাড়া, কচুরি এনে দিয়েছে। পেঁয়াজ কুচিয়ে আদা কুচিয়ে কাঁচালঙ্কা নুন দিয়ে মুড়ি সাজিয়ে দিয়েছে তেল মেখে। বড়বাবুর মোসাহেবরা আসতো, বড়বাবুর মেয়েমানুষরা আসতো। বড়বাবুর ঘোড়ারগাড়ি ছিলো। ফিটনগাড়ি ছিলো। অনেকদিন নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতা থেকে আসতেন। তখন নিজের হাতে হেড্ মালী বাগান তদারক করেছে, ঘর-দোর-ঝাড়-লণ্ঠন পরিষ্কার রেখেছে। মাঝে মাঝে কলকাতার হাতীবাগানের বাড়িতে তরি-তরকারী বয়ে দিয়ে এসেছে। থোড়, মোচা, গোলাপফুল, শাকসব্জী, ফুলকপি—বাগানের ফল ফুলুরি বড়মা-র কাছে ঝুড়ি ভর্তি দিয়ে এসেছে। বড়মা'র কাছে পুজোর পার্বনী নিয়ে এসেছে।

—আর তোমার ছোটবাবু?

মতিলাল বলে—ছোটবাবুর আমল আলাদা একেবারে। এখন তো তরিতরকারী হাটে বেচতে হয় তার হিসেব দিতে হয়। একটা পয়সা এদিক-ওদিক হলে কৈফিয়ৎ তলব হয়—অথচ মোসাহেব মেয়েমানুষদের জন্যে পয়সার হিসেব থাকে না। এই তো সাত টাকার সিঙাড়া যাচ্ছে, কতক খাবে, কতক ছড়াবে, হয়ত এই সিঙাড়া নিয়ে ফুট-বল খেলা শুরু হয়ে যাবে!

নন্তা ময়রা বলে—বলো কি হেড্ মালী? ফুটবল?

—তা ফুটবল খেলা হয় বৈ কি মাঝে-মাঝে! মতির ঠিক থাকে কি বড়বাবু? মাল খেলে কি বাবুদের মতির ঠিক থাকে? যখন হয়ত খেয়াল হবে তখন হয়ত আবার হুকুম হবে—যা মতি আর সাত টাকার সিঙাড়া ভাজিয়ে নিয়ে আয়—এই দেখুন না, সাত টাকার সিঙাড়ার জন্যে দু' টাকার তেল পুড়ে গেল মটরের। অথচ দেখুন গে—

মতিলাল আবার বলে—অথচ দেখুন গে, আমার এক টাকা মাইনে বাড়াতে বললে ধমক শুনতে হয়!

নন্তা ময়রা বলে—আজ নতুন একটা মুখ দেখছিলাম বাবুর সঙ্গে—ও কে?

মতিলাল বলে—ওই-ই তো নতুন আমদানী ছোটবাবুর।

—কোত্থেকে আমদানী হলো গো?

হেড্ মালী বলে—কে জানে কোত্থেকে, বাড়িতে থাকতে এক পয়সার তেল চুলে মাখতে পেতো না, এখন গন্ধ তেল চাই মাথায়, পায়ে আলতা চাই, সিল্কের শাড়ি বেলাউস্ চাই—ছোটবাবুর পেয়ারের মেয়ে-মানুষ, কিছু বলতেও পারি না—

নন্তা ময়রা বলে—তা দেখতে তো তেমন ভালো নয়, কীসে মজলো তোমার ছোটবাবু?

—ওই কথা বলে কে? ওই ওনারই আবার সোহাগ কত! রাগ করলে ছোটবাবু আবার ও'কে খাইয়ে দেন, পায়ে ধরে আবার সাধ্যি সাধনা করেন!

নন্তা ময়রা দেখেছে এক-একদিন।

যখন ছোটবাবুর বড় মটরগাড়িটা যায়, দূর থেকে বাজনা শুনেই নন্তা ময়রা বুঝতে পারে কানন-কুঞ্জের ছোটবাবুর গাড়ি আসছে। মাচার কাছে এসে দাঁড়ালে দেখা যায়, বাদামী রং-এর বিরাট গাড়িখানা। নতুন মেয়েটাকে নিয়ে ছোটবাবু আসছে। চুল উড়ছে, খোঁপা উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। আর উড়ছে ছোটবাবুর সিগারেটের ধোঁয়া।

—একটা কাজ দেবেন বাবু?

নন্তা ময়রা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ছোটবাবুর নতুন মেয়েমানুষটার কথাই হয়ত ভাবছিল। হঠাৎ পাশ ফিরে দেখে বললে—কে তুই? কোত্থেকে আসছিস? নাম কী?

—আজ্ঞে আমার নাম গোবিন্দ সরকার!

—বাড়ি কোথায়?

—পাকিস্থানে।

—কে আছে তোর?

গোবিন্দ সরকার বললে—ছিল সব, এখন কেউ নেই!

—নেই কেন? গেল কোথায় সব?

গোবিন্দ সরকার বলতে গিয়ে কেমন যেন থেমে গেল। তারপর বললে—না, আমার কেউ নেই বড়বাবু—

নন্তা ময়রা বললে—এখানে কাজ হবে না বাপু, অন্য জায়গায় দেখ—

অন্য জায়গা আর কোথায়? শ্রীপদ হাজরার দোকানেও ওই একই উত্তর। কেউ-ই কাজ দেয় না। কারোর কাছেই কাজ নেই। কাজ অত সস্তা নয়। বাদামতলা কি আর কলকাতা! বাদামতলায় কাটাই বা খদ্দের। ওই চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলায় যাও। কিম্বা কটাই সান্ন্যালের খামারে যাও। আর নয়ত রসুলপুরের বাগান-বাড়িতে মালিকদের কাছে যাও। সেখানে কাজ পাবে। বড়লোক বাবুরা সব। ঝোঁকের মাথায় তোমাকে কাজ দিলেও দিতে পারে।

কিন্তু চণ্ডী ঘোষ ঝানু ব্যবসাদার। বললে—কী কাজ জানো তুমি?

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে ঘর ছাইতে পারি, বেড়া বাঁধতে পারি—

—ঘর ছাইতে তা এখানে কী? ইঁট-খোলার কাজ জানো?

—আজ্ঞে না!

কটাই সান্নন্যালেরও ওই এক কথা। ভাতের দাম আছে। ভাত অত সস্তা নয়। ভাতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লড়াই লেগে গেছে। শুধু দু' মুঠো ভাত হে। সেই ভাতের জন্যেই আজ হাহাকার চারদিকে। তোমার মুখ দেখে কে কাজ দেবে? কলকাতায় যাও—সেখানে রাস্তায় ভাত ছড়ানো আছে।

কলকাতায় যেতে গোবিন্দ সরকার রাজি হয়নি।

বলেছিল—কলকাতায় যাবো নি বড়বাবু। খেতে না পাই সে-ও ভালো, তবু কলকাতায় যাবোনি—

—কেন, কলকাতায় যেতে তোমার দোষ কী শুনি?

গোবিন্দ সরকার সে-কথার উত্তর দেয়নি। আবার হাঁটতে হাঁটতে নন্তা ময়রার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। নন্তা ময়রা তখন খেয়ে-দেয়ে পান চিবোচ্ছে। বললে—কী হলো গো? কটাই সান্যাল কী বললে?

গোবিন্দ বললে—হয়নি, কলকাতায় যেতে বললে—

—তা আমিও তো তাই বলছি, কলকাতাতেই যাও না—সেখেনে ভাতের ছড়াছড়ি—দোরে দোরে এমন ভিক্ষে করতে হবে না—

গোবিন্দ সরকার বলেছিল—না, কলকাতায় আমি যাবোনি আজ্ঞে—

নন্তা ময়রার কেমন কৌতূহল হলো। বললে—কেন, কলকাতায় যেতে তোমার দোষ কী শুনি?

হঠাৎ গোবিন্দ সরকার যেন বাঘের মত রেগে উঠলো।

—না যাবোনি আমি কলকাতায়, আপনার কী? আপনি আমায় কাজ দেবেন তো দিন, নইলে উপোষ করবো আমি, মরবো, এখেনে বটগাছতলায় পড়ে থাকবো, আপনার কী?

শ্রীপদ হাজরাও সেই কথাই বললেন। বললেন—ভালো কথাই তো বলছে তোমাকে সবাই বাপু। কাজের জন্যে এসেছ বাদাম-তলায়? এখানে কী কাজ গজাচ্ছে?

—আপনারা ইচ্ছে করলেই গরীবকে একটা কাজ দিতে পারেন!

শ্রীপদ হাজরা বললেন—না পারিনে—তোমার মতন বে-আক্কেলে লোক তো দেখিনি হে! ভালো কথা বলছি তবু শুনছ না—

এমনি করেই দোরে দোরে ঘুরে গোবিন্দ সরকারকে কাজ যোগাড় করতে হয়েছিল। শুধু দরজায় দরজায় ঘুরেই কাজ হয়নি। এই তেলেভাজার দোকান করতে আরো অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। সে এক কাহিনীই বটে।

তখন বোশেখ মাস। বাদামতলার বাসিন্দেরা কোনও রকমে টিকে আছে মাটি কামড়ে। চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলায় কাজ-কর্ম হালকা। লোক-জন মজুর মিস্ত্রির অভাব নেই, কিন্তু খদ্দের হয় না তেমন। মাঝে-মধ্যে দু' একটা খদ্দের, তাদের চাহিদা মিটিয়েও পেট ভরে না, মজুরি পোষায় না। কটাই সান্ন্যালের খামারে কেরষাণ-মজুরের দল শুধু তামাক খায় আর গল্প করে। বিষ্টি নেই কোথাও। ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে, অথচ দরও হু হু করে পড়ছে। মাল বেচেও ঘরে পয়সা ওঠে না সান্ন্যাল মশাই-এর। নন্তা ময়রার দোকানেও খদ্দের জোটে না। নন্তা খদ্দের সামনে দিয়ে গেলেই ডাকে। বলে—ও কাঁচির মা, ভালো সন্দেশ করে-ছিলুম- নেবে নাকি? সস্তা দরে দিতাম—

শ্রীপদ হাজরা মশাই ডাকেন গণেশ পাড়ুইকে। বলেন—পাড়ুই মশাই চাল কোত্থেকে কিনছেন আজকাল?

গণেশ পাড়ুই বলেন—ও-সব আমার ছেলেই দেখছে আজকাল, খবর রাখিনে—

শ্রীপদ হাজরা বলেন—সস্তার চাল এসেছে, ভাবলেম যদি দরকার থাকে আপনার—

তা এইরকম ডেকে ডেকে খদ্দের এনে কি আর কারবার চালানো যায়! বাদামতলার বাজারে হাটবারে যখন বেচা-কেনার পর পাহাড় হয়ে থাকে মালের, তখন শ্রীপদ হাজরা মশাই হুঁকো মুখে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবেন। দিনকাল যা হলো, তাতে আর কারবার করে খেতে হবে না কাউকে। চালের দর হু হু করে পড়ছে। তবু খদ্দের নেই। কাজ-কর্ম জুটছে না কারো। ক্ষেতে-খামারে লোকজন বসে বসে তামাক খায় আর মজুরি নেয়। বিষ্টি না হলে আর ভরসা নেই।

হঠাৎ গণেশ পাড়ুই মশাই বললেন—দেখেছেন হাজরা মশাই—দেখেছেন?

শ্রীপদ হাজরা বললেন—কী?

—আর কী? এবার সব ফরসা! আর টিঁকতে হবে না এখেনে।

—কেন?

আশে পাশে লোক জমে যায়। ক্ষেত্তোর যাচ্ছিল পাশ দিয়ে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়লো। নন্তা ময়রা বাঁশের মাচার ওপর বসে সব দেখছিল। হঠাৎ শ্রীপদ হাজরার দোকানের সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে এল। বললে—কী হলো কী, হাজরা মশাই?

আর কী হলো! সবারই নজর তখন ঊর্দ্ধ-দিকে। সবাই হতাশার ভঙ্গিতে উঁচুতে চেয়ে আছে। নন্তা ময়রাও দৃষ্টিকে অনু-সরণ করে দেখলে। কুলুই চণ্ডীর মন্দিরের মাথার ওপর, সর্বনাশ!

শ্রীপদ হাজরা মশাই বললেন—আর কী! এবার কারবার গুটোও নন্তা—

নন্তা ময়রারও মুখে কথা নেই।

গণেশ পাড়ুই মশাই বললেন—তোমরা তখন ছোট, সেই সময়ে আর একবার কুলুই চণ্ডীর মন্দিরের মাথায় শকুন বসেছিল—সে সব তোমরা দেখনি—

না দেখুক কিন্তু ফলাফলটা জানে সবাই। সেবারও ঠিক এমনি এক বোশেখ মাসে শকুন বসেছিল মন্দিরের মাথায়। আর ঠিক তার পরেই বাদামতলার গ্রামে আগুন লেগে সমস্ত বাড়ি ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। একখানা আস্ত বাড়ি বলতে আর কিছু ছিল না। করুণা-ময়ীর ঘাট তখন জলে টই-টম্বুর। কিন্তু সেখান থেকে জল আনে কিসে! আশে-পাশের ডোবাগুলো পর্যন্ত তখন শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। জলের ব্যবস্থা হলো না। ঘর-বাড়ি সব সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে-ছিল। আজ এতদিন পরে আবার শকুন দেখে তাই চমকে উঠলো সবাই! কী হবে! কী হবে এবার?

গণেশ পাড়ুই নন্তা ময়রার দিকে চাইলেন।

নন্তা ময়রাও শ্রীপদ হাজরার দিকে চাইলে।

শ্রীপদ হাজরা চাইলে ইঁটখোলার চণ্ডী ঘোষের দিকে। চণ্ডী ঘোষ চাইলে কটাই সান্ন্যালের দিকে! কিন্তু কোনও সমাধান কারো কাছ থেকে এল না। গ্রামের মুরুব্বিরা যখন সামনে রয়েছে, বাদামতলার অন্য অধি-বাসীদের তখন আর ভাবনার কিছু নেই।

তবু যে-যার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

গণেশ পাড়ুই বললেন—কখন থেকে আছে ওটা?

নন্তা ময়রা বললে—আমি তো এই এখন দেখলাম পাড়ুই মশাই!

গোবিন্দ সরকার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে এসে বললে—আমি পরশু থেকে দেখছি বড়বাবু!

পরশু! তা পরশু থেকে দেখছিস বলিস্ নি কেন? মজা পেয়েছিস? কে তুই?

সকলের চোখ গিয়ে পড়লো গোবিন্দ সরকারের ওপর। এতদিন ভালো ক'রে নজর দেয়নি কেউ ওর দিকে। ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারা মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছে সবাই। যেন বাদামতলাতেই ঘোরাঘুরি করছে ক'দিন। এর-ওর কাছে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে দু' মুঠো খাচ্ছে। এতদিন কেউ বিশেষ নজর দেয়নি গোবিন্দ সরকারের দিকে। নজর দেবার দরকারও হয়নি। এখন যেন সবাই আবিষ্কার করলে নতুন করে। বললে—কোথা থেকে আসছিস তুই?

গোবিন্দ বললে—কলকাতা!

—দেশ কোথায় তোর?

—পোটোখালি!

—তা এখানে কী করতে এলি?

—আজ্ঞে, কাজের ধান্দায়, পেটের জ্বালায়!

—তা পেটের জ্বালায় এত জায়গা থাকতে এলি বাদামতলায়? কলকাতা থেকে চলে এলি কেন?

গোবিন্দর চোখ দু'টো বাঘের মত জ্বলে উঠলো বুঝি আবার। কিন্তু তখুনি আবার তা নিভে গেল।

—বল্, কলকাতা থেকে চলে এলি কেন?

—কলকাতা ভাল্লাগে না!

ক্ষেত্তোর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। ঝাঁপিয়ে পড়ে গোবিন্দর চুলের মুঠি ধরলে। বললে—তা ভালো লাগবে কেন, কলকাতা সোনার জায়গা কি না, ভালো লাগবে বাদামতলা,—নিশ্চয় কোনও মতলোব্ আছে এর বড়বাবু—

বলে গোবিন্দর গালে থাপ্পড় মারতে যাচ্ছিল। বাধা দিলেন পাড়ুই মশাই। বললেন—এখন ওসব থাক্, শকুনের কী করবে তাই আগে বলো নন্তা—বাদামতলা যে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তা ভেবেছো?

কথাটা ভাববার মত। আবার আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলে সকলে। ফুট্‌ফুটে রোদ উঠেছে চারদিকে। কুলুই চণ্ডীর মন্দিরের গায়ে কালো শ্যাওলার দাগ সবুজ হয়ে ফুটে উঠেছে। ফাটলের ফাঁকে অশ্বত্থগাছের একটা চারা রোদ লেগে ঝক্ ঝক্ করছে। আর মন্দিরের মাথায় লোহার চক্র আর ত্রিশূলের ঠিক চূড়ার ওপর শকুনটা নিশ্চিন্ত মনে বসে আরামে রোদ পোয়াচ্ছে, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

—এখন উপায়?

ক্ষেত্তোর বললে—ঢিল মারবো বড়বাবু?

বড়বাবু বললে—দূর, মায়ের মন্দিরে ঢিল ছোঁড়া? প্রাণের ভয় নেই তোর?

কে একজন ছোকরা বললে—আগুন জ্বাললে কেমন হয়?

তা মন্দ নয় কথাটা! গণেশ পাড়ুই বললেন—তা জ্বালা যায়, কিন্তু মায়ের গায়ে যেন আঁচ লাগে না, দেখিস্—

নন্তা ময়রা বললে—পুরুত মশাই কী বলেন?

অনন্ত ভট্টাচার্য মশাই বললেন—আগুন জ্বালাতে পারো, তবে মায়ের রোষ নিবারণের জন্যে হোম স্বস্ত্যয়ন করতেই হবে, গায়ে দেবরোষ লেগেছে, সহজে ছাড়বে না—

তা হোম স্বস্ত্যয়ন যা কিছু করতে হয় হোক, আপাতত আগুন জ্বালা হলো। ডোবার ধার থেকে শুকনো পাতার জঞ্জাল এনে জড়ো করা হলো। সেই পাতার স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দিলে ক্ষেত্তোর। দাউ দাউ ক'রে আগুনের শিখা গিয়ে ঠেকলো বট-গাছে—তারপর উত্তুরে হাওয়া লেগে ধোঁয়া গিয়ে উঠলো মন্দিরের চূড়োয়। ক্ষেত্তোর চীৎকার করে উঠলো—জয় মা চণ্ডীকে—জগদম্বে—

কিন্তু কোথায় কী! শকুনটা যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। সবাই মন্দিরের চূড়ো লক্ষ্য ক'রে চেয়ে ছিল। যদি উড়ে যায় ধোঁয়ার গন্ধে!

—ও উড়বে না বড়বাবু, আমি বলছি উড়বে না।

—কে রে তুই?

সবাই চেয়ে দেখলে কথাটা বলেছে গোবিন্দ সরকার। গোবিন্দ সরকার তখনও উঁচু দিকে চেয়ে আছে। সেইদিকে চেয়ে চেয়েই বলছে—ও কিছুতেই উড়বে না বড়-বাবু,—আমি বললাম উড়বে না—

গণেশ পাড়ুই কথাটা শুনে রেগে গেছেন। বললেন—তুমি কে হে শুনি, বড় লায়েক হয়েছ দেখছি—

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে আমি তো কিছু খারাপ কথা বলিনি, বলিছি ও বেটা উড়বে না—

অনন্ত ভট্টাচার্য বললেন—আলবৎ উড়বে, ওর বাপ উড়বে, স্বস্ত্যয়ন করলে উড়ে পালাতে পথ পাবে না বাছাধন—

গোবিন্দ বললে—তা হলে ওড়ান আপনারা —হোম করুন—স্বস্ত্যয়ন করুন—

গণেশ পাড়ুই বললেন—তা তুই যে অত কথা বলছিস্ তুই ওড়াতে পারবি?

নন্তা ময়রা বললে—কী করে ওড়াবে তুমি শুনি?

গোবিন্দ বললে—কেন, মন্দিরের মাথায় চড়ে—

—তোর প্রাণের ভয় নেই? এ বলে কি?

গোবিন্দ সরকার হেসেছিল সেদিন। বলেছিল—আমার কে আছে শুনি যে, প্রাণের ভয় থাকবে আমার—

তা সেদিন সেই গাঁ শুদ্ধ লোকের চোখের সামনে তর তর ক'রে গোবিন্দ ওই মন্দিরের একেবারে চূড়োয় গিয়ে উঠেছিল। সবাই তখন অবাক হয়ে দেখছে। গণেশ পাড়ুই মশাই নিশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলেন। নন্তা ময়রারও নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। লোকটা পাগল নাকি!

শ্রীপদ হাজরা মশাই অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললেন—বাহাদুরি আছে হে লোকটার—

...থর থর করে কাঁপতে লাগলো সবাই। হিম হয়ে এল শরীর। নিশ্চয় বজ্রাঘাতে মরবে ও। পক্ষাঘাতে হবে! কষ্ঠ হয়ে মরবে। এখনি হয়ত পা পিছলে আত্মঘাতী হবে। কিন্তু লোকটা তখন মন্দিরের গা বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। আর বেশি দূরে নয়। শকুনটাও তখন আরামে বসে রোদ পোয়াচ্ছে এক মনে।

ক্ষেত্তোর চীৎকার করে উঠলো—জয় মা চণ্ডীকে—জগদম্বে—

আর তারপরেই শকুনটা গোবিন্দর তাড়া খেয়ে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে প্রথমে গেল চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলার দিকে। তারপর এক পাক খেয়ে কটাই সান্যালের পটলের ক্ষেতের উপর দিয়ে পশ্চিম পানে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কেউ তাকে দেখতে পেলে না।

একটা নিশ্চিন্তের হাঁফ ছাড়লো সবাই। তবু তখনও ভয়, হয়ত নামতে গিয়ে পড়ে যাবে পা পিছলে। কিন্তু না, পড়লো না পা পিছলে। আস্তে আস্তে যেমন উঠেছিল, তেমনি অক্ষত শরীরেই নেমে এল লোকটা।

গণেশ পাড়ুই বললেন—সাবাস্—সাবাস্ ছোকরা—কী নাম তোমার? থাকো কোথায়?

অনন্ত ভট্টাচার্য মশাই বললেন—কিন্তু বংশ থাকবে না ওর, এই বলে রাখলাম—নির্বংশ হবে ও—

গোবিন্দ হাসলো শুধু একটু। বললে—বংশ আমার নেইও পণ্ডিত মশাই, আমার কেউ নেই আজ্ঞে—

অনন্ত ভট্টাচার্য বললেন—ওই হাসিই সব্বনাশী হবে, তাও বলে রাখছি, কুলুই চণ্ডীর রাগ যে-সে রাগ নয়—

তা সেই গোবিন্দ শেষে কাজ পেল এক-দিন। শ্রীপদ হাজরা মশাই দিলেন একটি টাকা। নন্তা ময়রাও দিলে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা, গণেশ পাড়ুই, চণ্ডী ঘোষ, কটাই সান্যাল সবাই কিছু কিছু ক'রে দিলে। সেই পয়সা দিয়ে গোবিন্দ সরকার মাটির গামলা কিনলে, বেসন কিনলে। তোলা উনুন তৈরি করলে। তেল কিনলে, কয়লা ঘুঁটে কিনলে। কিনে বসলো এই বটতলায় বেগুনি ভাজতে। বেগুনি ভাজা হলো, তারপর হলো আলুর চপ্, তারপর হলো ফুলুরি।

নন্তা ময়রা বললে—দেখি, কেমন তেলে-ভাজা ভাজতে পারিস্ তুই—দে দিকি এক-খানা, খেয়ে দেখি—

শ্রীপদ হাজরা মশাইকেও দুটো আলুর চপ্ বেগুনি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এল গোবিন্দ। বললে—খেয়ে দেখুন আজ্ঞে, এখনও বৌনি করিনি—

বাদামতলার তাবৎ লোক এল দেখতে। নতুন তেলেভাজার দোকান হয়েছে। দেখি গো, দু' পয়সার বেগুনি। আমায় দেখি আলুর চপ্ তিন পয়সার। বেশ মচমচে হয়েছে তো? ছেলে-মেয়েরা এল কিনতে বাড়ি থেকে। কাঁচির মা সওদা করতে এসে বললে—কে জানে বাপু, নিতে তো বলছো, নতুন লোক, দশজনে খাক্, ভালো বলুক, তবে নেব—

নন্তা ময়রা দূর থেকে বললে—নাও কাঁচির মা, তুমি নির্ভয়ে নাও—আমি নিজে খেয়ে দেখেছি—

তা প্রথম দিন মন্দ বিক্রী হলো না। পয়সা আধলা আনি দু'আনি মিলিয়ে প্রায় দু' টাকা লাভ হলো। রসুলপুরের বাবুরা গাড়ি থামিয়ে নিয়ে গেলেন আলুর চপ্ কিনে।

জিজ্ঞেস করলেন—ভালো হবে তো হে?

গোবিন্দ সরকার বললে—আজ্ঞে খেয়ে খুশী হলে তবে না-হয় দাম দেবেন।

ছোটবাবু কিনে নিয়ে গেলেন দু' টাকার তেলেভাজা। সঙ্গে মেয়েমানুষ আছেন। তিনিও খেয়ে চেখে দেখলেন।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন খেলে গো?

ছোট ছোট দাঁত। ঠোঁটে রঙ মাখানো। এলো খোঁপা কাঁধের ওপর লটকাচ্ছে। বললেন—জমবে ভাল।—

—তা হলে দাও দু' টাকার!

দু' টাকার তেলেভাজা গেল সঙ্গে। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে আবার গাড়ি এল হেড্ মালীকে নিয়ে। বললে—আরো দু' টাকার তেলেভাজা চাই, বাবুদের খুব ভালো লেগেছে—

দোকান খুব জমে গেল। দু' দিনেই গোবিন্দর নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়লো চার-দিকে। তখন কাঁচির-মাকে আর ডেকে বেচতে হয় না। সওদা করে যাবার পথে নাতনীর জন্যে তেলেভাজা কিনে নিয়ে যায় আঁচলে বেঁধে। ভোর থেকেই লোক জড়ো হয় বট-গাছতলায়। তখনও শীত কাটেনি ভালো ক'রে। রোদ ওঠেনি তখনও বটগাছের মাথায়। কানা হরিপদ হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ায়। একেবারে উনুনের ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। তখনও আঁচ ওঠেনি উনুনে। তারপর এসে জোটে ক্ষেত্তোর। আসে খ্যাঁদা পালিত, আসে হৃদয় হালদার।

হৃদয় হালদার বলে—আজ এত দেরি কেন গোবিন্দ দা?

খ্যাঁদা পালিত বলে—বেশ ক'রে লংকা-বাটা দিয়েছ তো গোবিন্দ দা? কালকের আলুর চপে মোটে ঝাল দাওনি—

কানা হরিপদ বলে—অত ঝাল দিলে রসুলপুরের বাবুরা আর তেলেভাজা কিনবে তোমার?

হৃদয় হালদার বলে—ইঃ কিনবে না, বাবুরা মালের সঙ্গে কী খাবে শুনি?

গোবিন্দ সরকার তখন আপন মনে তেলে-ভাজা ভেজে খুন্তিতে তুলছে। হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবার অবস্থা। চুক্ চুক্ করে শব্দ হয় জিভের। ঠাণ্ডার দিনে গরম [illegible] তেলেভাজা খেয়ে জিভের আড় ভেঙে আসে। তারপর নন্তা ময়রার দোকানে গিয়ে ভাঁড়ে

ভাঁড়ে চা নিয়ে আসে ওরা। সকালবেলা গরম চায়ের সঙ্গে গরম তেলেভাজার রসে আড্ডা জম্‌জমাট হয়ে আসে। কাজ কর্ম নেই কারো। গোবিন্দ সরকারকে ঘিরে নিষ্কর্মা একদল ছেলের ভিড় জমে ওঠে রোজ। তারপর সে ভিড় পাত্‌লা হ'লে তখন বেচাকেনার পাট বন্ধ ক'রে গোবিন্দ সরকার ঘরে যায়। নন্তা ময়রার দোকানে গা ঘেঁষে ছোট একটা চালা মতন। সেখানেই রান্না-বান্না, খাওয়া শোওয়া।

অন্ধকার রাত্রে বাদামতলা নিঝুম, নিথর। শ্রীপদ হাজরার দোকানের ভেতরে বসে হাজরা মশাই চশমাটা চোখে দিয়ে তখন খেরো-খাতা নিয়ে বসেন। সরষের তেল তিন ছটাক, খয়ের দু' পয়সা, তিন গোছ পান, ঘি পাঁচ ছটাক। খুচরো হিসেবের ভিড়ে শ্রীপদ হাজরা মশাই থই পান না এক-এক সময়। নন্তা ময়রার দোকানের টেমিটাও টিম্‌ টিম্‌ ক'রে জ্বলছে তখন। নন্তা ময়রা খালি গায়ে, বাঁশের মাচার ওপর বসে হাওয়া খায়, আর ভেতরে ক্ষেত্তোর তখন বিরাট উনুনটার ওপর ভিয়েনের কড়া চাপিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আসে। সকালবেলার রোদে, খাস্তার গজা আর বাটা সন্দেশের আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু তখন বাদামতলার অন্যদিকে নিঝুম। শুধু কয়েকটা বড় বড় মটরগাড়ি জোর আলো জ্বালিয়ে কলকাতার দিক থেকে এসে রসুলপুরের দিকে সোঁ সোঁ ক'রে চলে যায়। বাদামতলার বটগাছটার মোটা মোটা পাতায় শুধু একবার ঝাপ্‌টা লেগে আবার কিছু-ক্ষণের জন্যে সব চুপ হয়ে যায়।

বললাম—কিন্তু কাঞ্চন-কামিনী? ওই কাঞ্চন কামিনী দেবী?

নন্তা ময়রা বললে—আজ্ঞে বাবুমশাই, তখন কি জানতুম গোবিন্দ সরকারের কেউ আছে? আমরা জানি কেউ নেই ওর, ও নিজেও বলেছে সে-কথা কতবার—সে তো পরে জানলাম সব—

—কী ক'রে জানলে?

নন্তা ময়রা বাঁশের মাচার ওপর ধুলো ঝেড়ে বসতে বসতে বললে—বসুন আজ্ঞে এখেনে আয়েস করে—

বাদামতলার ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি কখনও। দীনবন্ধুরা গেছে ফুর্তি করতে রসুলপুরের বাগানবাড়িতে। মল্লিক-দের ছোটবাবু, মেজবাবু, সেজবাবু সবাই গেছে। কলকাতার ছোকরা বাবুমহলের রসুলপুরের যাতায়াত ছিলই। শুধু যুদ্ধের সময় কিছু কমেছিল—এই যা! তারপর যুদ্ধ যখন থেমে গেল, তখন গোরা-পল্টনরা আবার চলে গেল রসুলপুর ছেড়ে। আবার বাদামতলার রাস্তা দিয়ে হু হু করে গাড়ি আসে, গাড়ি যায়। নন্তা ময়রা মাচায় বসে শুধু দেখে। আর দরকার হ'লে বাবুরা সিঙাড়া নিম্‌কি কচুরি গরম-গরম ভাজিয়ে নিয়ে যায়। কিংবা হেড্‌ মালী মতিলাল এসে বাবুদের জন্যে ভাজিয়ে নিয়ে যায়। আর তারপর যখন বাগানবাড়ি আরো জম্‌-জমাট হয়ে উঠলো তখন গোবিন্দ সরকার তেলেভাজার দোকান খুলে ফেলেছে।

—ওই দ্যাখ্‌ গাড়ি আসে—

হৃদয় হালদার, কানা হরিপদ, খ্যাঁদা পালিত সবাই চেয়ে দেখে। মুখের তেলে-ভাজা মুখেই আট্‌কে রইল। সবাই দেখলে, কলকাতার দিক থেকে সাঁ সাঁ করতে করতে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। এই ছোট্ট এতটুকু সরষের দানার মতন। তারপর সেই দানাটাই বড় হতে হতে একেবারে বৃহৎ আকার নেয়। শব্দ কানে আসে। তারপর একেবারে সামনে এসে ব্রেক ক'ষে দাঁড়ায়, তখন সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে এসেছে। আর গাড়ি থেকে নেমে আসে ছোটবাবুর উর্দিপরা ড্রাইভার।

তারপর কেনা হয়ে গেলে আবার গাড়ি ছেড়ে দেয়। ড্রাইভার একটা হেঁচ্‌কা শব্দ করে আর গাড়িটা ঝিক ঝিক করে মিলিয়ে যায় রসুলপুরের দিকে। তারপর আবার আর একটা গাড়ি আসে! আবার একটা। কেউ থামে, কেউ থামে না। কিন্তু একবার গোবিন্দ সরকারের তেলেভাজা খেলে আবার খেতে হয়।

কানা হরিপদ বলে—তোমার তেলেভাজায় আপিং মেশাও নাকি গোবিন্দ দা?

হৃদয় হালদার বলে—রসুলপুরের বাবুরা তো বড়লোক, এত তেলেভাজা খায় কেন বলু দিকি? মাংসের চপ্‌ খেলেই পারে—

খ্যাঁদা বলে—তা বললে শুনছিনে, মাংসের চপ্‌ আমি খেয়েছি—খেতে তেমন ভালো নয় কিন্তু—

কানা হরিপদ বললে—কী রকম খেতে রে খ্যাঁদা?

খ্যাঁদা বলে—ঠিক মেটে আলুর মতন, কী রকম যেন মেটে-মেটে গন্ধ—

হৃদয় হালদার বলে—মালের সঙ্গে না খেলে ও তো মেটে-মেটে লাগবেই—এই যে তেলেভাজা খাচ্ছি, এই তেলেভাজাই আবার মালের সঙ্গে খেলে অন্যরকম সোয়াদ হতো—

—তুই মাল খেয়েছিস্‌? মিথ্যে বলবার আর জায়গা পাসনি হৃদে?

হৃদয় বলে—আল্‌বৎ খেয়েছি—

—কোথায় খেলি?

হৃদয় বলে—কেন, রসুলপুরের হেড্‌ মালী মতিলালকে জিজ্ঞেস করিস্‌—খেয়েছি কি খাইনি—এমনিতে নোন্‌তা নোন্‌তা

লাগে, কিন্তু চাট্-এর সঙ্গে ভারি জমে মাইরি, খেলেই মনে হয় যেন মরে যাচ্ছি—গরম আলুর চপটা মুখে পুরে কানা হরিপদ তখন চিবোচ্ছে। বললে—মরতে তোর বড় সাধ রে হৃদে?

হৃদয় বললে—দূর, মরতে যাবো কোন্ দুঃখে, কিন্তু নেশাটার কথা বলছি—

খ্যাঁদা বলে—ওই নেশাতেই মরবি তুই হৃদে, ওই ঢুক্-ঢুক্ করতে-করতেই একদিন পিপে পিপে খেতে ইচ্ছে করবে, তখন আসবে মেয়েমানুষ—

হৃদয় হালদার মেয়েমানুষের নাম শুনেই তেতে উঠেছে, বেগুনিটা গিলে ফেলেই গান ধরলে—

বাঁশরী পরশি হৃদে
মরমে রহিল বিঁধে
এ তো স্বর নয়, শর গো—

হঠাৎ গোবিন্দ সরকার খেঁকিয়ে ওঠে। বলে—থাম্ তোরা, মেয়েমানুষের নাম করতে পারবিনে আমার সামনে—থাম্—

ছোক্‌রারা তবু থামে না। হাসে আর মজা পায়।

বলে—আচ্ছা গোবিন্দ দা মেয়েমানুষের কথা শুনলে এত ঝাঁঝিয়ে ওঠ কেন বলো তো? সংসারে ও ছাড়া আর আছে কী মাইরি?

হৃদয় হালদার বলে—গোবিন্দ দা আমাদের কলির ভীষ্মদেব গো—

কানা হরিপদও টিপ্পুনি কাটে। বলে—তোমার মনে রস-কষ নেই তো তোমার হাতে এত রস কোত্থেকে এল গোবিন্দ দা? মাইরি, আলুর চপ নয় তো যেন রসবড়া!

হৃদয় হালদার আবার সুর করে গায়—

বাঁধা যার কাছে মন—
আছে তার কাছে প্রয়োজন,
সে বিহনে প্রাণে বাঁচিনে বাঁচিনে—
কতকাল আর প্রবোধি বচনে,
মন না মানে বারণ—।

কিন্তু শ্রীপদ হাজরা মশাইকে দেখলেই ওদের গান বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। নন্তা ময়রাকে আসতে দেখলেও আড্ডা ভেঙে যায়। দল বল সরে গিয়ে আড়ালে চলে যায়। সবাই চাঁদা করে ব্যবসা-পত্তোর করে দিয়েছিল গোবিন্দকে—তাই জিজ্ঞেস করে—কেমন চলছে তোমার গোবিন্দ?

গোবিন্দ বলে—আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদে আর কোনও কষ্ট নেই—

—ঘরে তক্তপোষ কিনেছ দেখলাম!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে সবই হয়েছে!

নন্তা ময়রা বলে—তাহ'লে—এইবার একটা বিয়ে হলেই হয়ে যায়, ঘর হলো, এবার ঘরণী হোক্—

একথায় গোবিন্দ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ। মুখের আদলটা একেবারে কঠিন কর্কশ হয়ে ওঠে। কপালের শিরগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। গোবিন্দ উনুনের সামনে মুখ নিচু করে একমনে বেগুনি ভাজে।

বললাম—কিন্তু কাঞ্চন-কামিনী? ওই যে কাঞ্চন-কামিনী দেবী? ও কে?

—ওর গল্পই তো বলছি। তখন কি জানতাম মশাই।

তা নন্তা ময়রাই বা কেন, কেউই জানতো না। ও শ্রীপদ হাজরা, চণ্ডী ঘোষ, কটাই সান্যাল, গণেশ পাড়ুই, অনন্ত ভট্‌চায্যি, এমন কি কাঁচির মা-ও জানতো না। জানলো পরে, অনেক পরে। যেদিন গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা। বিরাট গাড়ি। তার ভেতর থেকে নেমে এল একটি মেয়ে। বিচিত্র সাজগোজ, সিল্কের ফিনফিনে শাড়ি। হাতে, কানে, নাকে হীরে-মুক্তো। ঝলমল করছে মেয়েটা। একেবারে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবার মত চেহারা। আর মেয়েমানুষ নয়ত যেন আগুন। যেখানে ছোঁবে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। সে কি মেয়ে। নন্তা ময়রা যেন চিনতে পারলে চেহারাখানা দেখে। যেন রসুলপুরের ছোটবাবুর সঙ্গে গাড়িতে দেখেছে একে। বাঁশের মাচায় বসেছিল নন্তা ময়রা। গাড়িটা কলকাতা থেকে আর সোজা রসুলপুরের দিকে গেল না। একেবারে কুলুইচণ্ডীর মন্দিরের সামনে বটগাছের তলায় এসেই থামলো। তারপর ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিলে। ঝপাং করে একটা শব্দও হলো দরজা বন্ধ করবার। আর চোখের সামনে যেন জগদ্ধাত্রী মূর্তি। এলো করা চুল, কপালে সিঁদুরের টিপ, সদ্য স্নান করা চেহারা। দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়।

নন্তা ময়রা একলা মেয়েমানুষ দেখে এগিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিও তাকে দেখে আসছিল সামনের দিকে। কাঞ্চন-কামিনী বললে—এইখানে বসে একজন তেলেভাজা ভাজতো না?

নন্তা ময়রা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু...

—এ জমিটা কার?

তখন কাঞ্চন-কামিনীকে দেখে আরো কয়েকজন লোক দৌড়ে এসেছে। হৃদয় হালদার, কাণা হরিপদ, খ্যাঁদা পালিত, অনন্ত ভট্টাচায্যি সবাই জড়ো হয়েছে। যেন রাজরানীকে দেখছে।

অনন্ত ভট্‌চায্যি এগিয়ে গেলেন। মুখ সামনে এনে বললেন—মায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

কাঞ্চন-কামিনী কিন্তু সে-কথার উত্তর দিলে না।

বললে—আমি জিজ্ঞেস করছি, এ জমিটা কার?

অনন্ত ভট্‌চায্যি বললেন—আজ্ঞে, এ-জমি, এই কুলুইচণ্ডীর মন্দির, এই বাদামতলা সবই জমিদারের—

কাঞ্চনকামিনী বললে—কোন্ জমিদার?

অনন্ত ভটচায্যি মশাই বললেন—সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে থাকেন।

—নাম ধাম তাঁর?

নামধাম জেনে নিয়ে চলে গেল কাঞ্চনকামিনী। আর তার কিছুদিন পরেই মিস্ত্রি মজুর এল। ইঁট, চুণ, সুরকি, শ্বেতপাথর এল। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

হৃদয় হালদার বললে—চিনতে পারলি হরিপদ?

খ্যাঁদা পালিত বললে—আমি চিনতে পেরেছি—

গণেশ পাড়ুই মশাই বললেন—ওই গোবিন্দই তো সেবার মায়ের মন্দিরের চূড়োয় উঠেছিল শকুন তাড়াতে?

অনন্ত ভট্টাচায্যি মশাই বললেন—তোমরা তখন আমার কথায় কান দাওনি বাবাজী, আমিই বলেছিলাম ওর সর্বনাশ হবে, মহাপাতক হবে ও, মায়ের রাগ যে-সে রাগ নয়—এখন বোঝ—

নন্তা ময়রা বললে—আমার যেন মনে হলো কোথায় দেখেছি মাগীটাকে—

হৃদয় হালদার বললে—এই বাদামতলাতেই দেখেছি—

—কবে? কখন?

তা সত্যিই তখন কেউ ভাবেনি যে, এমন কাণ্ড হবে। তখন কে-ই বা চিনতো গোবিন্দ সরকারকে! গোবিন্দ সরকার নিজেই বলেছিল কেউ নেই তার। সেই কথাই সবাই বিশ্বাস করেছিল।

তেলেভাজার দোকানের সামনে বসে হৃদয় হালদার বলতো—কলকাতা ছেড়ে কেন মরতে এখেনে এলে গোবিন্দদা? কী সুখ?

গোবিন্দ সরকার তেলেভাজা ভাজতে ভাজতে হাসতো শুধু। কিছু বলতো না।

—কলকাতায় কত হরেক মজা, কত রস—আর এখেনে একলা ঘরে শুতে তোমার ভালো লাগে?

গোবিন্দ সরকার তবু কিছু বলতো না। আপন মনে বেগুনিগুলো তুলে তুলে চুবড়িতে রাখতো।

খ্যাঁদা পালিত বলতো—চলো গোবিন্দদা একদিন কলকাতা ঘুরে আসি—

গোবিন্দ বলতো—দূর তোরা যা, আমি আর কলকাতায় যাবো না—

—কেন, কলকাতার ওপর তোমার অত রাগ কেন গো?

গোবিন্দ সরকার কোনও কথা বলতো না। চুপ করে থাকতো।

খ্যাঁদা পালিত বলতো—তোমায় বলতেই হবে কেন কলকাতার ওপর এত রাগ তোমার—বলতেই হবে—

গোবিন্দ সরকার বলতো—কলকাতার বাঘ আছে—

—বাঘ ?
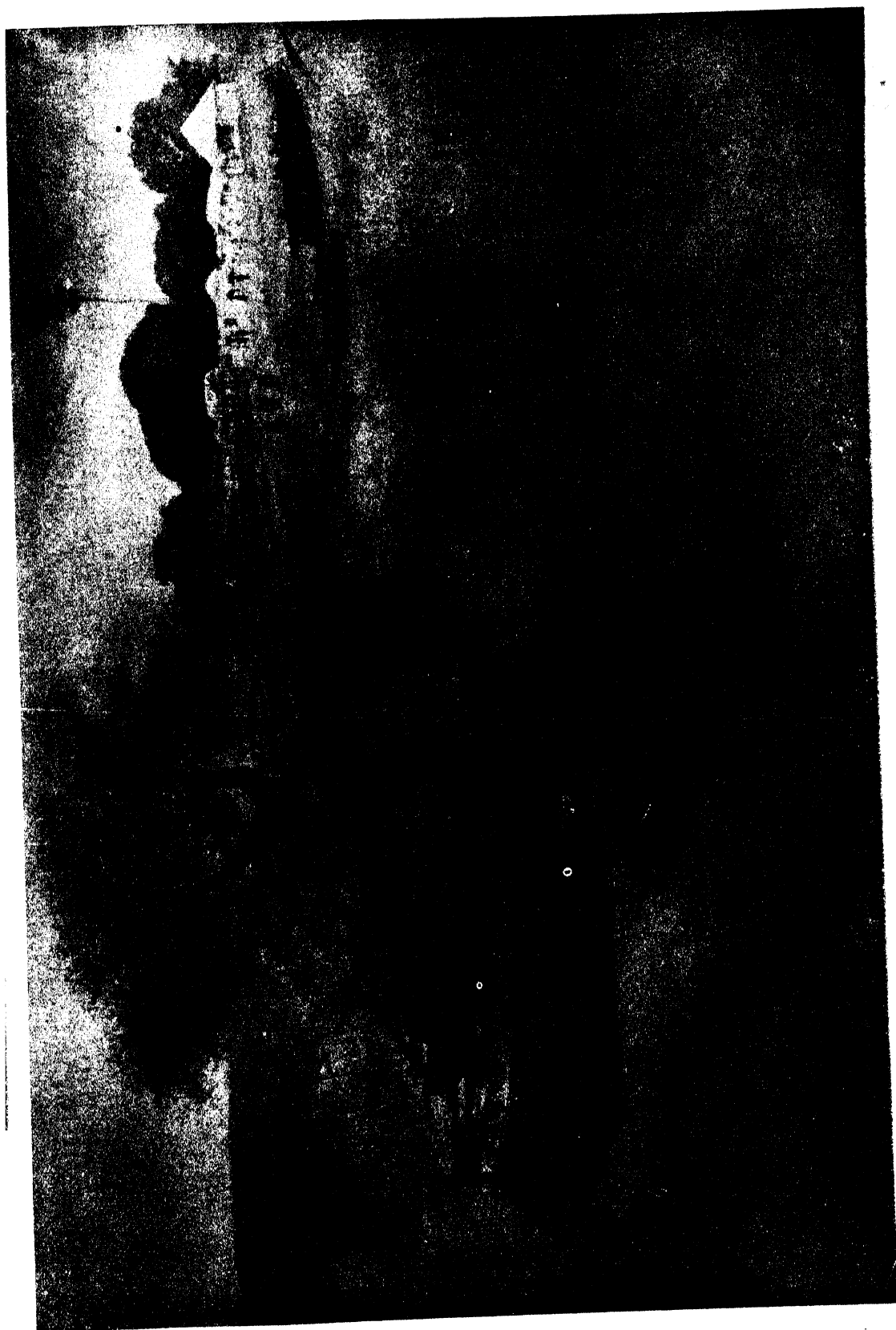
অবাক হয়ে যেত খাঁদা পালিত, কানা হরিপদ আর হৃদয় হালদারের দল। বলতো—বাঘ ? বাঘ কোথায় পেলে তুমি কলকাতা শহরে।

আছে রে, বাঘ আছে, সব এক-একটা আস্ত বাঘ, মানুষ খেকো বাঘ—

কানা হরিপদ বলতো—আমি তো কালীঘাটে পুজোর সময় গেছি বাঘ তো দেখিনি—

গোবিন্দ সরকার বলতো—বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাস্, দেখবি বাঘে কামড়াবে—তারপর পালিয়ে এসে এই বাদাম-তলায় বসে তখন তেলেভাজা ভাজবি আমার মত—

হৃদয় হালদার বলতো—তোমাকে বাঘে কামড়েছে গোবিন্দদা ?

—ওরে বাবা, বাঘে কামড়ায়নি, বলিস কি! বুকটা দেখলে বুঝতে পারতিস্—

—দেখি তোমার বুক দেখি ?

—সে বুকের একেবারে ভেতরে, দেখাতে পারিনে, কামড়ে একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে—

এর পর আর বেশি কথা বলে না কেউ। নন্তা ময়রার দোকান থেকে সবাই ভাঁড়ে করে চা এনে চুমুক দিয়ে খেতে শুরু করে। গোবিন্দ সরকারের কথায় চায়ের আমেজটা যেন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়।

হৃদয় হালদার একদিন কথাটা বার করবার জন্যে আস্তে আস্তে বললে—আচ্ছা গোবিন্দদা, তুমি বুঝি বিয়ে করেছিলে ?

গোবিন্দ সরকার হৃদয়ের দিকে কট্‌মট্ করে চাইলে একবার। তারপরেই তেলেভাজার গরম কড়াটা মাটিতে নামিয়ে বললে—মেলা বাজে বকিসনে, আমি তোর ইয়ার ?

বলল—তারপর ?

নন্তা ময়রা বললে—তা তখনও আমি কাঞ্চন-কামিনীকে দেখিনি মশাই। ঠিক সেই সময়। তখন একদিন মেলা বসেছে। কুলুই চণ্ডীতলায়। দলে দলে লোক আসছে গাঁ-গঞ্জ থেকে। ক্ষেত-খামারের কাজ ফেলে চাষীরা আসছে মেলায় সওদা করতে। সন্ধ্যে বেলা। মেলা বিকেলের দিকেই পাতলা হয়ে আসে। দূর-দূর থেকে আসে সবাই, রাত-বিরেতে অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে পারবে না। ওদিকে কালীগঞ্জ, মগ্‌রা, বাবুইহাটি, তিল-জলা, চাংড়িপোতা থেকে সব হেঁটে হেঁটে কেউ বা গরুর গাড়িতে মেলা দেখতে এসেছে। বউ ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি সংগে করে এনেছে। বিক্রী-পাটা তখন একটু হালকা। খালি গায়ে মাচাটার ওপর বসে সারা দিনের পর একটু হাওয়া খাচ্ছি—হঠাৎ ওদিক থেকে একজন লোক সামনের দিকে এগিয়ে এল। এসে বললে—পটুয়া-খালির গোবিন্দ সরকার এখেনে কোথায় থাকে বলতে পারেন ?

খোঁড়া নিতাই তখন মন্দিরের সামনে প্রাণপণে ঢাকের ওপর কাটি চালাচ্ছে। কথাটা ঠিক যেন শুনতে পেলাম না। আরো কাছে সরে গিয়ে বললাম—কাকে খুঁজছো ?

লোকটার চেহারায় জলুস আছে দেখলাম। বোঝা যায়, কলকাতা শহরের লোক। চুল ছাঁটা, ফতুয়া পাঞ্জাবী ছাতি জুতো দেখে আর সন্দেহ থাকে না যে কলকাতা থেকে আসছে লোকটা।

তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম—কাকে খুঁজছো বললে ?

লোকটি বললে—গোবিন্দ সরকার, পোটো-খালির গোবিন্দ সরকার।

দেখিয়ে দিলাম গোবিন্দ সরকারের চালা-খানা। বললাম—বটগাছের ওই পুব-দক্ষিণ কোণের চালাটা—দরজা ঠেল গিয়ে—

লোকটা চলে গেল গোবিন্দর ঘরের দিকে। ওদিকে তখন খোঁড়া নিতাই নেচে নেচে ঢাক বাজিয়ে চলেছে—কুড়ুর তাক্, কুড়ুর তাক্, কুড় কুড় তাক্—। রাজ্যির লোক এসে গোল হয়ে বাজনা শুনছে। কাচির মা নাতি-নাতনি নিয়ে দেখছে। হৃদয় হালদার, কানা

হরিপদ আর খাঁদা পালিতের দল দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েছেলেদের দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসাহাসি করছে। শ্রীপদ হাজরা মশাই হুঁকো নিয়ে দোকানের সামনে বসে গণেশ পাড়ুই মশাই-এর সংগে দিনকালের কথা আলোচনা করছেন। অন্ধকার হবো হবো। মাটিতে বেসাতি ছড়িয়ে যারা বিক্রী করছিল, তারা একে একে কুপি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মেলা ভেঙেই গেছে বলতে গেলে। বটফলগুলো লোকের পায়ের চাপে চ্যাপটা হয়ে সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে আছে। অনন্ত ভটচায্যি মশাই মন্দিরের বাইরে এসে বাতাসা প্রসাদ বিলোচ্ছেন—

এমন সময়......

এমন সময় হঠাৎ হৈ চৈ হল্লা শুরু হলো পূব-দক্ষিণ কোণাকুনি।

—বেরোও, বেরোও হারামজাদা, বেরোও এখেন থেকে—

গোবিন্দ সরকারের গলা। গোবিন্দ সরকার তো এমন চেঁচিয়ে কথা বলে না কখনও। কারো কথাতেই থাকে না কখনও। নিজের দোকান নিয়েই আছে। হঠাৎ সেই গোবিন্দ এমন ক্ষেপে উঠলো কেন!

বাঁশের মাচা থেকে লাফিয়ে সামনে গিয়ে দেখি এক অবাক কাণ্ড। গোবিন্দর ঘরের সামনে গোবিন্দ মারমুখী হয়ে তেড়ে এসেছে লোকটার দিকে। লোকটা পালিয়ে যেতে পথ পাচ্ছে না।

গোবিন্দ বলছে—বেরোও এখেন থেকে, বেরিয়ে যাও—হারামজাদা—

লোকটা বলছে—আমার কথাটা ভালো করে শোন তুমি, গোবিন্দ!

গোবিন্দ সে-কথা শুনবে না। বলে—আমি শুনতে চাইনে কোনও কথা, সুবাসী আমার কেউ নয়—

—তা সুবাসীর মরার খবরটা তোমাকে দেব না তো কাকে দেব?

—সুবাসী আমার কেউ নয়, কেউ ছিল না কোনওকালে,—সুবাসীর নাম করতে পারবি না আমার কাছে—

লোকটা বলে—তা খবরটা তোমাকে দেওয়া দরকার মনে হলো তাই এলাম—তা কী এমন অপরাধ করেছি শুনি?

গোবিন্দ বলে—যদি সুবাসীর নাম উচ্চারণ করিস তো তোকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলবো অক্ষয়, এই বলে রাখছি—সুবাসী মরুক ঝরুক, সুবাসী গোল্লায় যাক, জাহান্নামে যাক, আমার কী! সুবাসী কে আমার? কেউ নয়—আমার কেউ নেই সংসারে, আমি কলকাতা ছেড়ে বাদামতলায় এসে আছি, তাতেও তোদের সহ্য হচ্ছে না অক্ষয়? আমি কি তোদের জন্যে গলায় দড়ি দেব বলতে চাস?

—তা তুমি যা ইচ্ছে করো, আমার কী! তোমায় খবরটা দিতে হয়, তাই আসা—

গোবিন্দ বলছে—তা এবার বেরিয়ে যা—অক্ষয় যেন কেমন রেগে উঠলো এবার। বললে—তা তোমার রাগ কেন অত আমার ওপর শুনি?

গোবিন্দ বললে—রাগ হবে না? তোরাই তো যত নষ্টের গোড়া, তোরাই তো সুবাসীকে ফুসলে ফুসলে পথে বসালি—রাগ হবে না তোদের ওপর?

—তা সুবাসীকে গান শেখাবার বেলায় মনে ছিল না তখন?

চীৎকারে মেলার লোকজন তখন জড়ো হয়েছে গোবিন্দর ঘরের সামনে। কাণা হরিপদ, খাঁদা পালিত, হৃদয় হালদার সবাই জড়ো হয়েছে। শ্রীপদ হাজরা, গণেশ পাড়ুই মশাইও এসে গেছেন। অনন্ত ভটচায্যি মশাইও নামাবলি গায়ে এসে তাজ্জব ব্যাপার দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গোবিন্দ বললে—কী? কী বললি তুই অক্ষয়?

—বলছি, যখন সুবাসীকে নাচ শেখালে গান শেখালে, তখন মনে ছিল না?

গোবিন্দ বললে—তোরাই তো তখন সুবাসীকে নাচিয়ে তুলেছিস, তখন আমি মানা করলে শুনতো?

অক্ষয় বললে—তা তুমি কেন গৌর বেটাকে ঘরে আশ্রয় দিলে? তখন তো ভাবলে বেশ দু' পয়সা আসছে, পরের ঘাড় ভেঙে সংসার চলে যাচ্ছে—

—তোরাই তো বললি, ওর কেউ নেই, তোমার ঘরে থাকতে দাও গোবিন্দদা,—

—তা গৌর যদি না থাকতো তোমার ঘরে তো, খেতে কী শুনি? তুমি তখন তো মুড়ি তেলেভাজা বেচে চার গণ্ডা পয়সাও রোজগার করতে পাচ্ছো না, দুটি প্রাণীর চলতো কীসে শুনি—আর ওই গুণধরীকে নিয়ে?

—মুখ সামলে কথা বলবি অক্ষয়, সুবাসীকে তুই মা বলে ডাকতিস, পরকালেও তোর গতি হবে না—তা জানিস—?

—পরকালে কি তোমার গতিই হবে ভেবেছ? সুবাসীর পাপের অন্ন তুমি খাওনি?

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো গোবিন্দ। দোরের খিলটা খুলে নিয়ে উঁচু করে ধরলে। বললে—তোকে আস্ত পুঁতে ফেলতে পারি আমি জানিস—তোরা কলকাতার ছেলে, আর আমি গাঁয়ের মানুষ—

বলে খিলটা অক্ষয়ের মাথা লক্ষ্য করে ফেলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ধরে ফেললে নন্তা ময়রা।

গোবিন্দ সরকার তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বললে—ছেড়ে দিন বড়বাবু, ওই অক্ষয় আমাকে এত বড় কথা বলে, আমি সুবাসীর পাপের অন্ন খেয়েছি!

—খেয়েছিসই তো, পাপের অন্ন খাসনি তুই সুবাসীর? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারিস তুই খাসনি?

গোবিন্দ তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—তোরাই তো আমাকে বাসা দিলি, খাতির করে তোদের পাড়ায় থাকতে দিলি ব্যবসা করে দিলি—সব তো সুবাসীর জন্যে, নয়?

নন্তা ময়রা তখনও গোবিন্দর হাত দুটো ধরে আছে। কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

নন্তা ময়রা গোবিন্দর দিকে চেয়ে বললে—ব্যাপারটা কী? সুবাসী কে?

গোবিন্দ সরকার কোনও উত্তর দিলে না। অক্ষয়ের দিকে চেয়েও জিজ্ঞেস করলে নন্তা ময়রা—কে হে? সুবাসী কে?

অক্ষয় বললে—ওকেই জিজ্ঞেস করুন না বাবু, ওই-ই বলুক না, সুবাসী ওর কে?

গোবিন্দ আবার লাফিয়ে উঠলো।

—তোর মুখ ভেঙে দেব অক্ষয়, সামলে কথা বলিস—

অক্ষয়ও সোজা লোক নয়। বললে—সুবাসীর পাপের অন্ন খেয়ে তোর মুখও সোজা থাকবে না গোবিন্দ—এই বলে রাখলাম—

—তা তোরাই তো সুবাসীকে রাতের বেলা বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যেতিস, থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতিস, যেতিস না?

অক্ষয় রুখে উঠলো। বললে—আমি নিয়ে যেতুম, না গৌর, তোর ঘরের লোক?

—গৌর হলো আমার ঘরের লোক? এই কথা তুই বললি?

গোবিন্দ আবার বললে—গৌর হলো আমার ঘরের লোক? গৌর বামুনের ছেলে, কলকাতার লোক, আর আমি হলাম কায়েত, পাড়াগাঁয়ের লোক, গৌর কীসে আমার ঘরের লোক হলো?

অক্ষয় বললে—তা ঘরের লোক না হলে গৌর সুবাসীকে শাড়ি কিনে দিত কেন?

গোবিন্দর মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে এল কথাটা শুনে। যেন হঠাৎ চোখ দিয়ে জল পড়বার উপক্রম হলো। মনে হলো গোবিন্দ যেন এখনি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলবে। নন্তা ময়রা সেই দিকে চেয়ে তার হাত দুটো হঠাৎ ছেড়ে দিলে।

বললে—সুবাসী কে গোবিন্দ?

গোবিন্দ এবারও সে-কথার উত্তর দিলে না।

অনন্ত ভটচায্যি মশাই এতক্ষণ সব অবাক হয়ে শুনছিলেন। কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। গণেশ পাড়ুই মশাইও চুপ করে শুনছিলেন সব। হৃদয় হালদার, কাণা হরিপদ, খাঁদা পালিতও শুনছিল। ইঁটখোলার চণ্ডী ঘোষ এতক্ষণ কিছুই দেখেন নি। হঠাৎ ভিড় দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন—এখানে কী হয়েছে হাজরা মশাই?

অনন্ত ভটচায্যি মশাই বললেন—আমি তখনই বলেছিলাম, সর্বনাশ হবে ওর, মহাপাতক হবে, মায়ের মন্দিরে চড়েছে, মায়ের রাগ যে-সে রাগ নয়—

—তবু ব্যাপারটা কী শুনি?

অক্ষয়ের দিকে চেয়ে নন্তা ময়রাও বললে —সুবাসী কেহে? কে সুবাসী?

গোবিন্দ সরকার তখন হঠাৎ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কাঠের খিলটা নিয়ে তেড়ে এসেছে অক্ষয়ের দিকে। বলে—আমার ঘর জ্বালিয়ে আমাকেই আবার খবর দিতে এসেছে, বেরো হারামজাদা, বেরো এখান থেকে—সুবাসী মরুক ঝরুক, আমার কী! আমার কী রে হারামজাদা—বেরো এখেন থেকে—বেরো—

কথাটা বলেই খিলটা নিয়ে তেড়ে এল অক্ষয়ের দিকে। কিন্তু নন্তা ময়রা ধরে ফেলবার আগেই লাঠিটা গিয়ে মাথায় পড়েছে অক্ষয়ের। কিন্তু অক্ষয় তার আগেই ভিড় ঠেলে একেবারে বাদামতলার বাইরে গিয়ে হাজির।

গণেশ পাড়ুই বললেন—ব্যাপারটা কী হে নন্তা, কিছুই তো বুঝছিনে—

নন্তা ময়রা বললে—কী হে গোবিন্দ, ও লোকটা কে? কোত্থেকে এল?

অনন্ত ভটচায্যি মশাই বললেন—আমি তোমাদের তখনই বলেছিলাম বাবাজী, ওর মহাপাতক হবে, সর্বনাশ হবে, হবেই সর্বনাশ, দেখে নিও—

হৃদয় হালদার বললে—সুবাসী কে গো গোবিন্দদা?

গোবিন্দ সরকারের তখন কোন দিকেই কান নেই। গজ্ গজ্ করতে করতে বলছে—হারাজমাদা আমায় সুবাসীর মরার খবর দিতে এসেছে, সুবাসী মরেছে তা আমার কী। আমার ভারি মাথা ব্যথা সুবাসীর জন্যে—দূর—দূর—

হঠাৎ গোবিন্দ সরকার যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে হাসতে লাগলো।

নন্তা ময়রা চাইলে শ্রীপদ হাজরা মশাই-এর মুখের দিকে। শ্রীপদ হাজরা মশাই চাইলেন গণেশ পাড়ুই মশাইএর মুখের দিকে। হৃদয় হালদার চাইলে কাণা হরিপদর দিকে। কাণা হরিপদ চাইলে খ্যাঁদা পালিতের মুখের দিকে।

অনন্ত ভটচায্যি মশাই শুধু নীরবতা ভাঙলেন হঠাৎ। বললেন—মায়ের রাগ যে-সে রাগ নয়, তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা বিশ্বাস করোনি তখন—

কিন্তু গোবিন্দ সরকার ততক্ষণ নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু কাঞ্চন-কামিনী? কাঞ্চন-কামিনী দেবী? যে ওই শ্বেত-পাথরের স্তম্ভটা করে দিয়েছে? সে কে?

নন্তা ময়রা বললে—সেই তার কথাই তো বলছি আজ্ঞে। কাঞ্চন-কামিনী কে কি আমরাই চিনতাম, না চিনতাম সুবাসীকে। কে যে সুবাসী আর কে যে কাঞ্চন-কামিনী তখনও জানি না। আর গোবিন্দও কি কিছু বলে।

কিন্তু আসল কাণ্ডটা তারপরেই ঘটলো কি না।

আসল ঘটনা ঘটবার আগেই হৃদয় হালদার দৌড়তে দৌড়তে এল পরদিন। বললে—বড়বাবু গোবিন্দদা চলে গেছে—

নন্তা ময়রা বললে—সে কিরে? কোথায় চলে গেছে?

সত্যিই গোবিন্দ সরকার চলে যাবার জন্যে তৈরি। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়েছে। জিনিসপত্র বলতে কী আর আছে। দুখানা ধুতি, গামছা, ফতুয়া একটা। আর মাটির গামলা, উনুন খুন্তি কড়া, ওসব থাকলো। নিয়ে যাবার মত কিছু নয়। সংসার আর করবে না। এখানে এই বাদামতলাতেও সংসার গড়ে উঠেছিল আস্তে আস্তে। কাণা হরিপদ খ্যাঁদা পালিত হৃদয় হালদার যেমন রোজ আসে ভোরবেলা তেমনিই এসেছিল। অন্যদিন ভোরে এসেই তেলেভাজা তৈরি পায়। হাতে গরম জিভে গরম তেলেভাজার সঙ্গে সকালবেলার আসর জমে ওঠে। আজ কিন্তু বাদামতলা ফাঁকা। ভোরবেলাই গোবিন্দ সরকার উঠেছে। কেউ টের পায়নি। অন্যদিনের চেয়ে বেশি ভোরে। সকাল থেকেই মেঘলা-মেঘলা ছিল। বৃষ্টি বুঝি ভেঙে পড়বে। ডোবার ধারে সারারাত ব্যাঙগুলো গলা ফাটিয়ে ডেকেছে। চান সেরে নিয়েছে গোবিন্দ সেই সকালে। তারপর ভেবেছিল কুলুই চণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে একবার মাকে পেন্নাম করে আসবে। দূর? কী হবে পেন্নাম করে! জাগ্রত দেবতা না ছাই। সুবাসী মরুক ঝরুক, কী আসে যায় তাতে। সুবাসী বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাসতো, বায়স্কোপই দেখুক। এখন মজা করে থিয়েটার দেখুক, বায়স্কোপ দেখুক, কেউ কিছু বলতে আসবে না। বলা-কওয়ার বাইরে চলে গেছে সে। ওই অক্ষয়, ওই গোর, ওরাই তোর আপন-জন হলো রে! ওরাই তোকে খাওয়াক পরাক স্বগ্যে নিয়ে যাক। কেউ দেখতে আসবে না। শাড়ি পেয়েছে গয়না পেয়েছে, বাবুদের সঙ্গে হাওয়া-গাড়িতে ঘুরছে। যতদিন যৌবন আছে, দেখুক বায়োস্কোপ। পরুক গয়না গাঁটি। আমি আর নেই ওতে। আমার সংসারে আর দরকার নেই। ঘেন্না ধরে গেছে। পই পই করে বারণ করলেও যে শোনে না তার মরণ হওয়াই ভালো। মরুক ঝরুক, আমার কী। বাতাসীকে যে এ-সব দেখতে হয়নি, তাই তার কপাল। ঠাকুর দেবতাকে পেন্নাম করে তো রাজা হবে লোক!

ভিজে কাপড়েই ঘরে এল গোবিন্দ সরকার। বাদামতলায় তখন আবছা আবছা অন্ধকার। নন্তা ময়রা, শ্রীপদ হাজরা মশাই, কারো দোকানের ঝাঁপ তখনও খোলেনি। বটগাছের তলায় ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা বটফল পড়ে আছে। হঠাৎ কোথায় দূরে মেঘ ডেকে উঠলো। গুড় গুড় করে আওয়াজ হলো একবার। দক্ষিণ

দিকটায় আকাশটা একেবারে কালো হয়ে আছে। এখনি বৃষ্টি এল বলে।

এবার আর শহর ঘেঁসা জায়গা নয়। এমন জায়গা যেখানে অক্ষয় পৌঁছিতে পারবে না, গৌর টের পাবে না। সুবাসীর নাম কেউ জানবে না। সুবাসীর নাম উচ্চারণ করাও পাপ যে।

গোবিন্দ তখন বেরিয়ে পড়েছে দক্ষিণ দিকের পথ ধরে আর তখনই সবাই এসে হাজির।

নন্তা ময়রা বললে—যাবে আর কোথায়, আছেই কোথাও কাছাকাছি—

হৃদয় হালদার বললে—আমি তো অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি, নিশ্চয় চলে গেছে—

শ্রীপদ হাজরা মশাইও ছুটে এসেছেন। বললেন—কী হলো?

গণেশ পাড়ুই মশাইও এদিকে এসেছিলেন বেড়াতে। শুনে বললেন—মায়ের মন্দিরের চুড়োয় উঠেছিল—সে?

অনন্ত ভট্টাচার্য্যি মশাই পুজো করতে আসছিলেন। তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—আমি তোমাদের তখনি বলেছিলুম—মহাপাতক হবে, সর্বনাশ হবে ওর—তখন তো তোমরা বিশ্বাস করোনি কেউ—মায়ের রাগ কি যে সে রাগ—!

তখন ওদিকে আরো কালো করে মেঘ করে এসেছে। সেই দিকে চেয়ে শ্রীপদ হাজরা নিজের দোকানের দিকে ছুটলেন। নন্তা ময়রা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ছুটলো। অনন্ত ভট্টাচার্যি মশাইও মেঘ দেখে নিজের কাজে ছুটলো। গণেশ পাড়ুই মশাই আগেই বাড়ির দিকে ফিরে গেছেন।

কাণা হরিপদ বললে—সুবাসী কে রে খাঁদা? টের পেলি কিছু?

খাঁদা পালিত বললে—গোবিন্দদা কি বিয়ে করেছিল নাকি রে? বলেছিল কিছু?

হৃদয় হালদার বললে—ও যাবে কোথায়! ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, দেখিস্—ওদিকে তিনদিন ধরে খুব বিষ্টি হয়ে সব ভেসে গেছে—যাবার তো রাস্তাই নেই—

কাণা হরিপদ বললে—তা কলকাতার দিকের রাস্তা তো খোলা—

—কলকাতায় যাবে! ক্ষেপেছিস।—কলকাতার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা, জানিস না—ও নিশ্চয়ই রসুলপুরের দিকে গেছে—

আর বলতে-না-বলতে বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। প্রথমে বটগাছের মাথায় চট্ পট্ শব্দ। তারপর ধুলো উড়িয়ে কানা করে দিলে চোখ। তীরের ফলার মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জোরে এসে গায়ে বেঁধে। দিনের বেলাতেই রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বাদামতলায় ছড় ছড় শব্দ করতে করতে জল জমে পুকুর হয়ে এল। সে এক বৃষ্টি বটে। কাজ-কারবার বন্ধ ক'দিনের জন্যে। কুলুই চণ্ডীর মন্দিরের সামনে পৈঁঠের নিচে কল্ কল্ করে জলের স্রোত বইতে লাগলো।

হৃদয় হালদার চালার নিচে দাঁড়িয়ে বললে—এমন দিনে গরম তেলেভাজা হলে ভারি জমতো রে—

কাণা হরিপদ বললে—গোবিন্দদা কোথায় গেল বলতো মাইরি—

খাঁদা পালিত বললে—আমার কাছে এখনও তিন টাকা পেত ভাই—

সেই একটা লোক, কেমন করে কীসের জ্বালায় এমন সুখের ব্যবসা ছেড়ে কোথায় গিয়ে রইল—তাই ভাবতে লাগলো সবাই। কেন গেল? দেনা তো কিছু ছিল না তার, বরং পেত কিছু কিছু সকলের কাছেই। তবু আর কিছু না হোক, বৃষ্টির দিনে গরম তেলেভাজার কথা মনে পড়লেই যেন গোবিন্দর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

নন্তা ময়রা বললে—বোকা মানুষ ছিল বটে লোকটা, কিন্তু তার জন্যে কেমন মন-কেমন করছে রে ক্ষেত্তোর—

ক্ষেত্তোর বললে—আমিও তো তাই ভাবছি বড়বাবু? লোকটা মন্দ ছিল না—

—কিন্তু এমন না বলে করে গেল কোথায়?

শ্রীপদ হাজরা মশাই তামাক খেতে খেতে বললেন—বিষ্টি বাদলার দিনে একটা শ্যাল-কুকুরও বাইরে বেরোয় না হে—

—ওই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া, ওই যে কলকাতা থেকে এসেছিল।

—কিন্তু ওই যে সুবাসী-সুবাসী করছিল, সুবাসী কে বলুন তো বড়বাবু?

—বউ-টউ হবে বোধ হয়!

খাঁদা পালিত বললে—আমি বলছি সুবাসী ওরই বউ, পালিয়ে গিয়েছে—

—কা'র বউ?

খাঁদা পালিত বললে—গোবিন্দদা'র বউ, আবার কার!

বৃষ্টি ছাড়লো একটু দুপুর বেলার দিকে। তখন বাদামতলার ডোবার চার-পাশে ব্যাঙগুলো আরো জোরে ডেকে উঠলো। ডোবার কচুর ডাঁটাগুলো সতেজ হয়ে উঠলো আরো। প্যাচ্প্যাচে পেছল হয়ে উঠলো ডোবার পৈঁঠের ধাপ ক'টা। নন্তা ময়রা উঁকি মেরে দেখলে বাইরে।

বাদামতলায় জনপ্রাণী নেই। হৃদয়ের দলটা এতক্ষণ গোবিন্দর চালাটার নিচে বসে বিড়ি খাচ্ছিল, এবার বৃষ্টির ঝাপটা কমতে যে যার বাড়ি ফিরে উঠেছে। এ-বৃষ্টিতে খদ্দের আর কেউ আসবে না।

জোর গলায় ডাকলে—হাজরা মশাই আছেন নাকি?

—কে? নন্তা? হাজরা মশাই ঝাঁপের আড়াল থেকে উত্তর দিলেন!

—কী করছেন?

—এই করবো আর কী, তামাক খাচ্ছি।

নন্তা বললে—খবর শুনেছেন? রসুলপুরের রাস্তা ভেসে গিয়েছে—

—কে বললে?

নন্তা ময়রা বললে—ক্ষেত্তোর এলো যে, রাস্তা একেবারে পুকুর সমান হয়ে গেছে, ওদিকের কুলপীতে বান এসে সব নাকি ডুবে গেছে—

—তা হলে চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলা?

নন্তা ময়রা বললে—ওদিকের কুলপীর ধার ঘেঁষে বৈকুণ্ঠপুর ওবধি কিছু আর ডুবতে বাকি নেই—হাজরা মশাই, কাটাই সান্যালের পটলের ক্ষেত চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলা কিছু আর দেখা যাচ্ছে না, সব শুনেছি জলের তলায়—

শ্রীপদ হাজরা মশাই বললেন—সেই সেবারের অবস্থা হবে নাকি?

সেবারেও এমনি হয়েছিল। এই বছর দুই হলো এমনি হচ্ছে। কুলপির জল একটু বৃষ্টি হলেই একেবারে টইটম্বুর হয়ে ওঠে। সেই জল প্রথমে বৈকুণ্ঠপুর তারপর বাঘমারি তারপর তিলজলা, সব ভাসিয়ে একেবারে বাদামতলার দক্ষিণ-পুরের কিনারা পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। ঘরবাড়ি সব ছেড়ে লোকজন রসুলপুরের ডাঙায় গিয়ে ওঠে। ওদিকে রসুলপুর আর এদিকে এই বাদামতলা—এই দুটো জায়গা শুধু জেগে থাকে। মাঝখানে শুধু জল। জলের স্রোতে ভিটে, ভিটের চালা, গাছ পালা, গরু বাছুর পুকুর ছাগল সব ভেসে আসতে থাকে। এমনি হচ্ছে বছর দুই ধরে। সেই সময়ে কংগ্রেসের লোক, রামকৃষ্ণ মিশনের লোক এসে জড়ো হয়। তারা চিঁড়ে, গুড়, ওষুধপত্তোর, কাপড় বিলি করে। খালি নৌকো নিয়ে যায় দলে দলে। তারপর নৌকো ভর্তি লোক নিয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কংকালগুলো উপোসী মানুষের ভিড় জমে যায় সারা অঞ্চলটা জুড়ে। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসে। ওষুধ পড়ে, হাসপাতাল হয়। লঙ্গরখানার সামনে টিকিট নিয়ে দলে দলে লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ায়। বান আসার পরেও দু' মাস তিন মাস ধরে এমনি চলে। তারপর বানের জল যখন নেমে যায়, তখনও চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলাটা কাদা-মাটিতে বোঝাই হয়ে থাকে। তখন সাপের উৎপাত আর রোগের মহামারী বাড়ে। গণেশ পাড়ুই মশাইএর মেজ ছেলেটা সেবারে সেই অসুখে মারা গেল। কাঁচির মা ছোট নাতনীটা সেবারই শোথ হয়ে ভুগে ভুগে মরলো। কাণা হরিপদর ছোট ভাইটা ডোবায় সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরলো সেইবার। এমনি করে কেটেছে দু' দু' বছর। বাদামতলার লোক বানের কথা ভাবলেই কেমন আঁৎকে ওঠে ভয়ে।

শ্রীপদ হাজরা মশাই আবার বললেন—সেই সেবারের মত অবস্থা হবে নাকি নন্তে?

সন্ধ্যে বেলার দিকে বৃষ্টির তেজ যেন বাড়লো আবার। খবর এল রসুলপুরের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

বাগান বাড়ির দু'চারজন বাবুদের গাড়ি গিয়ে মাঝপথে আটকে গিয়েছিল—তারপর আবার কোনওরকমে ফিরেছে। রসুলপুরের ওদিকে নাকি কিছু রাস্তা বন্ধ। কলকাতায় খবর গেছে। বৈকুণ্ঠপুর থেকে লোক সরানোর ব্যবস্থা হবে। তারপর বাঘমারির আর তিলজলার লোকদেরও সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সোঁ সোঁ করে কয়েকটা গাড়ি যেন সামনের আলো জ্বালিয়ে চলে গেল। সারা বাদামতলায় ঝাঁ ঝাঁ অন্ধকার। জোনাকির ঝাঁক এসে জমাট বেঁধেছে বটগাছটার তলায়, কুলুই চণ্ডীর

মন্দির-গোড়ায়। ডোবাগুলো ভেসে একাকার হয়ে মাঠে ঠেকেছে। তার ওপর কচুগাছগুলো মাথা তুলে হুঁশিয়ারি করছে কেবল।

নন্তা ময়রা চেঁচিয়ে বললে—কী করছেন হাজরা মশাই!

হাজরা মশাই বললেন—কী আর করবো তামাক খাচ্ছি—

—আর কিছু খবর টবর পেলেন?

হাজরা মশাই বললেন—শুনেছ গণেশ পাড়ুই মশায়ের নতুন গোয়াল-শালাটা ধসে পড়েছে—

নন্তা ময়রা বললে—শুনছি, ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসবে নাকি কাল—

—কে বললে?

—ক্ষেত্তোর।

কিন্তু ভোর না হতেই কেমন যেন ফরসা হয়ে এল সেদিন। টিনের চালে জল পড়াটার শব্দ আর শোনা গেল না! নন্তা ময়রা ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরের আকাশের পানে চেয়ে দেখলে। তেমন কালচে ভাব আর নেই আকাশের। কেমন যেন ঘোলাটে নীলচে-নীলচে আভা। বৃষ্টি বুঝি থেমে গেল। নাগাড়ে ক'দিন ধরে জল পড়ে পড়ে এখন বুঝি একটু থামলো। ভোর না হতেই টোকা মাথায় দিয়ে নন্তা এসে দোকানের ঝাঁপ খুললো। তখন

বাদামতলা আগের দিনের বৃষ্টির দাপটে থম্ থম্ করছে। ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙ ডাকছে অনবরত। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে নন্তা। শ্রীপদ হাজরা মশাই আসেননি এখনও। কুলুই চণ্ডীর মন্দির-গোড়ায় তখনও স্যাঁত স্যাঁতে জল-কাদা। বটফল আর বটপাতায় সারা জায়গাটা একশা হয়ে গেছে। আর ওদিকে গোবিন্দর ঘরখানার সামনে তাদের একটা ছাড়া গরু বুঝি রাত কাটিয়ে ছিল—নোংরা করে দিয়েছে। কালকেই দরজাটায় শেকল লাগিয়ে একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল নন্তা। আর তার ওদিকে ডোবাটার ধার ঘেঁষে ঈশান চৌধুরীর কাঁচা ইটের পাঁচিলটা ধসে পড়ে আছে। কখন পড়েছে টের পায়নি কেউ।

হঠাৎ মনে হলো...

নন্তা ময়রা আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। ঠিক যেন বিশ্বাস হলো না। ঝাপসা অন্ধকারে সামনের আলোটা দেখে বোঝা গেল একটা মটর গাড়ি। গাড়িটা চলছে না, কল বিগড়ে খারাপ হয়ে গেছে। এমন সময় গাড়িটা এখানে কেন! আস্তে আস্তে নন্তা ময়রা এগিয়ে রাস্তার দিকে গেল। আলো দুটো জ্বালিয়ে বিরাট একখানা গাড়ি রাস্তাটা এড়িয়ে যেন বটগাছের তলায় এসে দাঁড় করিয়েছে।

নন্তা ময়রা আরো সামনে এগিয়ে গেল। ভেতরে যেন সিগ্রেট খাচ্ছে কেউ। দু'জন। দুজনই সিগ্রেট খাচ্ছে।

—কে?

ভেতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল। গলাটা শুনেই নন্তা ময়রা চমকে উঠলো।

ছোটবাবু!

নন্তা ময়রা বললে—আমি নন্তা ময়রা আজ্ঞে—

—নন্তা ময়রা কে?

—আজ্ঞে আমার ময়রার দোকান আছে এই বাদামতলায়, হুজুরকে আমি চিনি খুব, হুজুরের হেড মালী মোতিলাল আমার দোকান থেকে সিঙাড়া কচুরি নিয়ে গেছে কতবার!

ছোটবাবু গাড়ির ভেতর নড়ে বসলেন। পাশের মেয়েমানুষটিও নড়ে বসলো। ছোটবাবু পোড়া সিগারেটটা টেনে বাইরে ফেলে দিলেন। ভিজে জলে পড়ে ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হলো। তারপর আবার একটা সিগারেট ধরালেন। এবার দেশলাই-এর মৃদু আলোকে অন্ধকারটা পাতলা হতেই নন্তা ময়রা ছোটবাবুর মুখটা দেখতে পেলে। পাশের মেয়েমানুষটির মুখও দেখা গেল এক মুহূর্তের জন্যে। নতুন মুখ। এ-মুখ তো আগে দেখেনি কখনও। একে আবার কবে জোটালেন ছোটবাবু! কালো রং। কিন্তু চটকদার চেহারা। ঠোঁটে রং মাখা মুখ, কাজল আঁকা ভুরু। কানের দুল জোড়া ঝিক্‌মিক করে উঠলো।

—একটা আলো আনতে পারো তুমি, এই হারিকেন টারিকেন—?

—আজ্ঞে খুব পারি।

নন্তা ময়রা দৌড়ুল। রসুলপুরের দিক থেকেই আসছে গাড়িখানা, হয়ত বাগানবাড়ি থেকে আসবার পথে বানের জলে আটকে গিয়েছিল। দোকানে গিয়ে ডাকলে—ক্ষেত্তোর, ও ক্ষেত্তোর—

ক্ষেত্তোর ভেতরেই ঘুমোয়। বললে—বড়বাবু?

বৃষ্টি বাদলের রাত্রে ঘুমটা একটু গাঢ় হয়েছিল বেশ। শেষরাত্রেও ঘুম ভাঙেনি তাই। ধড়মড় করে জেগে উঠলো!

নন্তা ময়রা বললে—হারিকেনটা জেলে দে তো—

গাড়ির মধ্যে ছোটবাবু বললেন—এবারে ফুর্তিটাই মাটি হয়ে গেল বৃষ্টির জন্যে—কী কাণ্ড বল দিকিনি—বোতলটায় আছে কিছু, না শেষ হয়ে গেছে?—

ছোটবাবু বোতলটা নিজেই উপুড় করে গলায় ফেলে দেখলেন। একটা ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। দূর হোক ছাই। এবারকার ফুর্তিটাই মাটি। ছোটবাবু ভেবেছিলেন, কামিনীকে নিয়ে নিরিবিলি বেশ ফুর্তি করবেন ক'টা দিন। কিন্তু এমন বান এলো। শেষে রসুলপুরেই ডুবে যেত আর কি।

কামিনী তখনও ভিজে শপ্ শপ্ করছে। এক কোণে হেলান দিয়ে বললে—গাড়িটা নতুন না পুরোন গো?

ছোটবাবু বললেন—গাড়ির দোষ কী বলো, জলে যে আটকে পড়িনি এই তো ঢের—অন্য গাড়ি হলে এতক্ষণ...

কামিনী বললে—তা বলে চাল দিয়ে এত জল পড়বে কেন?

ছোটবাবু বললেন—আজকালকার গাড়িগুলোই এমনি—কমিশন টমিশন কেটে উনিশ হাজার টাকা গুনে দিয়েছি, জানো—

একটু থেমে ছোটবাবু বললেন—একটু গা ঘেঁষে বসো না, শরীরটা গরম হয়ে যাবে খন তোমার—

কামিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো অন্ধকারের মধ্যেই। বললে—এত বিষ্টিতেও তোমার গরম কাটলো না বুঝি—?

—এ গরম কি বৃষ্টিতে কাটে?

ছোটবাবু সরে এলেন একটু। বললেন—মাইরি কামিনী, বৃষ্টির সাধ্যি নেই কাটায়—

কামিনী আরো পাশে সরে গেল। হাসতে হাসতে বললে—না বাপু, আমার বাপের সাধ্যি নেই তোমার গরম কাটায়—এ তোমার ওই মালের গরম নিশ্চয়—

কামিনী আবার বললে—এখন আজকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচি—

ছোটবাবু খোসামোদ করে আরো গায়ের কাছে ঘেঁষে এলেন। বললেন—রাগ করলে নাকি?

—রাগ করবো না? উনিশ হাজার টাকা দিয়ে পচা গাড়ি কিনতে পারো আর আমার

বলাতেই যত টাকা কম পড়ে তোমার—

ছোটবাবু তোয়াজ করতে লাগলেন। বললেন—বৃষ্টিতে দেখছি তোমার মেজাজ বিগড়ে গেছে কামিনী—

কামিনী বললে—না গো, আমাদের মেজাজ অত পলকা নয়—আমরা তো ঘরের বউ নই, আমাদের আখেরের কথা ভাবতে হয়, তাই দু'টো কড়া কথা বলে ফেলি—

ছোটবাবু বললেন—তা তোমারই বা দোষ কী, আমারই মেজাজ বিগড়ে যাবার যোগাড়—

কামিনী বললে—এখন গাড়ি যদি না চলে? এখেনেই আটকে থাকে?

ছোটবাবু বললেন—একটু সকাল হলেই লোকজন ডেকে ঠেলবার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও না—

কামিনী বললে—ততক্ষণ বাঁচলে তো!

—বালাই ষাট, এ-কথা বলতে আছে মাইরি?

কামিনী বললে—তা তোমার যা কাণ্ড, দেখে তো ভরসা হয় না—এক কাপ চা পেলে [illegible] হোত।

ছোটবাবু বললেন—দাঁড়াও না, লোকটা হারিকেন আনতে গেছে, ওকে দিয়ে চা আনাচ্ছি—

হঠাৎ কামিনী বললে—তোমার সেই রংগ-লালের কী খবর গো?

—রংগলাল! হঠাৎ রংগলালের কথা মনে পড়লো যে এখন?

—না এমনি, তোমার বন্ধু লোক তো!

ছোটবাবু বললেন—বন্ধু না ছাই, বেটা দালাল [illegible] চিনলে কী করে?

কামিনী খিল খিল করে হেসে [illegible]— কিন্তু বেশ মজার লোক [illegible] তখন বয়েস কম ছিল, আমাকে প্রথম [illegible] বায়োস্কোপ দেখালো, [illegible] ওরই সঙ্গে [illegible]

ছোটবাবু আবার [illegible] বললেন—[illegible]

একশেষ, কেবল ভদ্রলোকের মেয়েদের [illegible] [illegible] তার মতলোব—

কামিনী বললে—না তা ওর কিন্তু [illegible] নেই—

—কেন? রংগলাল আমার কত টাকা খেয়েছে জানো? ওকে পেলে আমি চাবুক মেরে ওর পিঠের চামড়া তুলে দেব—

হঠাৎ কামিনী চারদিকে দেখে বললে—হ্যাঁ গো, এ-জায়গাটার নাম কী? যাবার সময় এখেনে গরম তেলেভাজা খেয়েছিলাম, না?

ততক্ষণে [illegible] ময়রা দৌড়তে দৌড়তে হারিকেন নিয়ে হাজির হয়েছে। [illegible]— একটু দেরি হয়ে গেল হুজুর—হারিকেনে তেল ছিল না—

ছোটবাবু বললেন—তোমাদের এখানে লোকজন পাওয়া যাবে—আমি পয়সা দেব—

—লোকজন?

—এই গাড়িটা জল পার হয়ে এসেছে তো,

মেশিন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, একটু ঠেলতে হবে।

নন্তা ময়রা বললে—একটু সকাল হোক, আমি লোকজন ডেকে সব জোগাড় করে দেব হুজুর—আপনি কিছু ভাববেন না—

পাশ থেকে কামিনী বললে—একটু চায়ের বন্দোবস্ত করতে পারবে গো?

—সে কি কথা দিদিমণি, এখুনি করে আনছি—

বলে নন্তা ময়রা আবার দৌড়ে গেল দোকানের দিকে। আবার ডাকলে—ক্ষেত্তোর—ও ক্ষেত্তোর—টপ্ করে দু' কাপ চা কর দিকিনি—

ক্ষেত্তোর বললে—কে এসেছে বড়বাবু?

নন্তা ময়রা বললে—সেই যে ছোটবাবু একটা নতুন মেয়েমানুষ জুটিয়েছে, সে এসেছে—বানের জলে গাড়ি আটকে পড়ে গেছে এখেনে—

কামিনী বললে—হ্যাঁ গো, সেই যে সেদিন ভোরে তোমার সঙ্গে তেলেভাজা খেয়েছিলাম, সেরকম পাওয়া যাবে না?

ছোটবাবু বললেন—দাঁড়াও না, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

কামিনী বললে—বেশ গরম গরম আলুর চপ্ দিয়ে চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—

হঠাৎ নন্তা ময়রা দৌড়তে দৌড়তে আবার এল। হাতজোড় করে বললে—চা হয়ে গেছে হুজুর, এখানে এনে দেব? যদি অনুমতি করেন—

তারপর গাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখে বললে—এখানে কি চা খাবার সুবিধে হবে দিদিমণির—?

কামিনী বললে—তুমি তেলেভাজা খাওয়াতে পারবে আমাদের?

তেলেভাজা! নন্তা ময়রা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো।

—আজ্ঞে...

ছোটবাবু বললেন—আমি মোটা বখ্শিস্ দেব, সেবার সেই তেলেভাজা খেয়েছিলাম, সেই রকম গরম গরম—

নন্তা ময়রা একটু বিরক্ত হয়ে উঠলো, বললে—আজ্ঞে সে-রকম তেলেভাজা তো হবে না, যে লোকটি ভাজতো, সে হঠাৎ চলে গেছে!

—চলে গেছে?

নন্তা ময়রা বললে—আপনারা যদি একটু দয়া করে বসেন এসে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি হুজুর, হুজুরের কোনও কষ্ট হবে না, এখেনে এই জল-কাদার মধ্যে...

সেই জল-কাদার মধ্যেই সেদিন নন্তা ময়রা ছোটবাবু আর কামিনীকে গোবিন্দর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। মাটির ঘর। তা হোক, একটা তক্তপোষ আছে। শুকনো খট্খটে। চাবি খুলে ঘরে বসিয়ে নন্তা বলেছিল—একটু অপেক্ষা করুন হুজুর, আমাদের গাঁয়ে এসেছেন—একটু আপ্যায়ন না করে কি ছাড়তে পারি—

তা শেষ পর্যন্ত ছোটবাবু, ছোটবাবুর মেয়েমানুষ, দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বসেছিল গোবিন্দর ঘরে!

সেদিন তেলেভাজা খাইয়েছিল নন্তা ময়রা। তেমন হয়নি। গোবিন্দর হাতের তেলেভাজার মত হয়নি অবশ্য। কিন্তু ভালো লেগেছিল ছোটবাবুর। দিদিমণি নিজের ব্যাগ খুলে বখ্শিস্ দিয়েছিল ক্ষেত্তোরকে। ক্ষেত্তোরই চা তেলেভাজা হাতে করে পরিবেশন করেছে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে। ছোটবাবুর নতুন মেয়েমানুষ। ছোটবাবুও রসুলপুরের বড় খদ্দের। তাকে খাতির করলে বাদামতলার ব্যাপারীদের লাভ বই লোকসান নেই।

তক্তপোষের ওপর বসিয়ে নন্তা ময়রা বলেছিল—একটু আয়েস করে বসুন দিদিমণি—আমি লোকজন ডেকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—

একটু ফরসা হতেই সকলে এসে হাজির। শ্রীপদ হাজরা এসে সব দেখে শুনে বললেন—ভাগ্যিস গোবিন্দর ঘরখানা ছিল, তাই একটু আদর আপ্যায়ন করা গেল—

বৃষ্টিতে তখন বসে-ধসে গেছে চারদিক, রসুলপুরের জল তখনও নামেনি। বৈকুণ্ঠপুর, বাঘমারি, তিলজলার জলও কিন্তু আর বাড়েনি বিশেষ। খবর আসতে লাগলো একে একে। ডোবার ধারের পাঁচিলটার যেটুকু বাকি ছিল, ভোরের দিকে তা-ও ধসে গেল একবার ঝপাং করে। কিন্তু বৃষ্টি ধরে গেছে। শুধু ভিজে মাটির ওপর তখনও বটফল ছড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে। কুলুই-চণ্ডীর মন্দিরের পৈঁঠের নিচে জল সরে গেছে। শ্রীপদ হাজরা মশাই আবার দোকানের ঝাঁপ খুলেছেন, ক্ষেত্তোর আবার বিরাট কড়াটায় জিলিপি চড়াচ্ছে। হৃদয় হালদার, খ্যাঁদা পালিত, কাণা হরিপদ আবার অভ্যেস মত সকালবেলাই এসে জুটেছে। ছোটবাবুর বিরাট গাড়িটা দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। এমন দিনে ছোটবাবুর গাড়ি এখানে কেন! তবে কি কোনও ফিস্ট বেধেছে! সঙ্গে মেয়েমানুষ আছে নাকি।

সামনে নন্তা ময়রাকে দেখেই হৃদয় হালদার জিগ্যেস করলে—বড়বাবু, ছোটবাবুর গাড়ি দেখছি যে?

নন্তা ময়রা তখন একবার দোকান একবার গোবিন্দর ঘর যাতায়াত করছে।

—আর দুটো বেগুনি দেব দিদিমণি?

ছোটবাবু বললেন—ওহে, এবার কয়েকটা লোক যে দরকার হবে, গাড়ি ঠেলবে—

—আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ততক্ষণ আরাম করে চা খান, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দেখুন না—

বলেই নন্তা ময়রা আবার দোকানে ছুটলো।

পথে কাণা হরিপদ বললে—বড়বাবু, ছোটবাবুর সঙ্গে কেউ আছে নাকি?

নন্তা ময়রা হাত নেড়ে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—আছে রে বাবা, আছে, মেয়েমানুষ আছে, মেয়েমানুষ ছাড়া ছোটবাবু বাদামতলায় কী নেমন্তন্ন খেতে এসেছে?

—কী রকম দেখতে বড়বাবু?

কাণা হরিপদ বললে—দূর, অত অধৈর্য হোস্ কেন, যখন ঘর থেকে বেরোবে, তখন দেখবো—

খ্যাঁদা পালিত বললে—ভাগ্যিস গোবিন্দদা নেই, নইলে বড়বাবু কোথায় বসাতো ওদের?

নন্তা ময়রা আরো গোটাকতক কচুরি ভাজিয়ে দৌড়তে দৌড়তে দিতে যাচ্ছিল। ওদের দেখে বললে—হ্যাঁরে, তোরা কি মেয়েমানুষ কখনও দেখিস্ নি? এত আদেখ্লেপনা কেন তোদের?

তারপর একটু থেমে বললে—একটা কাজ করতে পারবি খ্যাঁদা?

—কী কাজ বড়বাবু?

—পারবি কিনা তাই বল্না বাপু! পয়সা পাবি, বখ্শিস্ দেবে ছোটবাবু—

তা ছোটবাবুর পছন্দের তারিফ আছে বলতে হবে। সকালবেলা আলোতে চেহারাটা আরো ভালো করে দেখা গেল। সত্যি, চটকদার চেহারা, হাঁসের মত কথা [illegible] সময় ঘাড় নড়ে। আর কথা বললেই বাহার খোলে মেয়েটার। হাতের চুড়ি, কানের দুল আর শাড়ির আঁচলা, সব মিলিয়ে যেন

়নের হল্‌কা। রং কালো হলে কি হবে, ফরসা রংকে হারিয়ে দেয়।

ছোটবাবু বললেন—বেশ কাটলো যা হোক নবেলাটা—মনে থাকবে বহুদিন—

নন্তা ময়রা বললে—আজ্ঞে আপনার হেড ী মতিলাল আমাকে চেনে, আমার দোকান কতবার কচুরি সিঙাড়া নিয়ে গেছে ুরের জন্যে—

—বেশ, আবার তোমার দোকান থেকেই বো! জানা রইল—

নন্তা ময়রা বললে—হুজুর, আমার গানে নোনতা ছাড়া ভালো সন্দেশও বন, আমি কলকাতার নবীন ময়রার কাছে রগর হয়ে কাজ শিখেছি, আমার বাবা ণ্ঠপুরের জমিদারবাবুর পেয়ারের ময়রা। হুজুর, জমিদারবাবু বাবার তৈরি দশ খেয়ে তবে ভোরবেলা জল গ্রহণ তেন—

—বেশ বেশ ভালো ভালো—

কামিনী জিজ্ঞেস করলে—এ ঘরটা কার? থাকে এতে?

—আজ্ঞে থাকে না কেউ এতে, থাকতো ী তেলেভাজাওয়ালা—

ওদিকে বৃষ্টির তেজ বুঝি একটু কমলো। দল লোক জুটে গেছে। তারা গাড়ি দলে।

খাঁদা পালিত নন্তা ময়রাকে দেখে বললে—বাবু, আমরা রেডি এবার—খবর দিন—

কাণা হরিপদ বললে—দেখবেন বড়বাবু, ছোটবাবুকে বলে দিন আমরা তিনজন আলা, আর ওরা সব অন্য ব্যাচ—আমাদের ট আলাদা কিন্তু—

হৃদয় হালদার বললে—না রে, বখ্‌শিস্‌ ক চাই না-দিক, ও-গাড়ি ঠেলতেও তো নিন্দ—

আর তারপর ছোটবাবু বাইরে এলেন। কামিনীও বাইরে এল। একদল লোক যেন লছে। কামিনী আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। ছোটবাবু হ্যাণ্ডেল বলেন।

নন্তা ময়রা সামনে গিয়ে বললে—ঠ্যাল্‌ ঠ্যাল্‌ তোরা—আমার কথা মনে রাখবেন হুজুর—

ক্ষেত্তোর পয়সার জন্যে গাড়ি ঠেলতে এসেছিল। চিৎকার করে উঠলো—জয় মা চণ্ডীকে—জগদম্বে—

আর গড়্‌ গড়্‌ করে গাড়িখানা চলতে চলতে একেবারে ডোবার ধার পেরিয়ে চণ্ডী মায়ের ইঁটখোলা বরাবর গিয়েই ঘ্যাচাং করে উঠলো। একটা ধাক্কা দিলে হঠাৎ। আর কেমন গুড় গুড় করে আওয়াজ উঠলো একরকম।

ক্ষেত্তোর বললে—এই চলেছে—চলেছে—কিন্তু ছোটবাবু চালাতে গিয়েও একবার থামিয়ে দিলেন গাড়িটা। তারপর পাঞ্জাবীর বাঁদিকের পকেটে হাত দিলেন।

ক্ষেত্তোর উঁচিয়ে ছিল। কিন্তু কাণা হরিপদ তার আগেই ছোঁ মেরে নিয়েছে দশ টাকার নোটটা।

হৃদয় হালদার বললে—তোমাদের সব আট আনা করে, আমাদের এক টাকা—

—কেন? কে বুঝি একজন প্রতিবাদ করলে।

খাঁদা পালিত বললে—তোমাদের অন্য ব্যাচ্‌, আমাদের আলাদা—

ক্ষেত্তোর অনেকক্ষণ ধরে গাড়িখানার দিকে চেয়ে রইল। পলাশডাঙা পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে বাঁদিকে চলে গেছে। তখন আর দেখা গেল না। সবাই আবার ফিরতে লাগলো। বখ্‌শিসের জন্যে নয়, কিন্তু সবারই মনে হলো, গাড়িটা চলে না-গেলেই যেন ভালো হতো। আরো কিছুক্ষণ ঠেলতে পারা যেত তা হলে। ও-গাড়ি ঠেলতে কষ্ট হয়ে হাঁপিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলেও যেন আরাম। এমনি।

গাড়ি চালাতে চালাতে ছোটবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। কামিনীকেও একটা ধরিয়ে দিলেন।

কামিনী সিগারেটে টান দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বললে—দূর, কী সিগারেট!

—কেন?

—একেবারে ভিজে গেছে, ও খেয়ে মরবো নাকি?

ছোটবাবু টান দিলেন আর একটা। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—নতুন ধরেছ কিনা—আমাদের জিভে ভিজেই সই—

—নতুন বোল না, পাকা ঝুনো হয়ে গেছি।

—কদ্দিন খাচ্ছো?

—সেই রংলাল ধরিয়েছিল শখ করে, তখন থেকেই চলছে।

তারপর একটু থেমে বললে—অথচ দাদা সিগারেট খেত বলে বাবা কী বকুনিটাই না দিত—

—তোমার বাবা?

কামিনী হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—অবাক করলে দেখছি, ঘরের বউ নই বলে কি আমার বাবাও থাকতে নেই?

ছোটবাবু বললেন—না, তা বলছি না—

—না গো, তুমি তো ভারি বেনের ছেলে, আর আমি বামুনের মেয়ে, তা জানো!

ছোটবাবু হাসলেন। বললেন—তা এতই যখন টান্‌, তখন এ-লাইনে কেন এলে শুনি?

—কেন এলুম?

—হ্যাঁ শুনিই না, কেন এলে?

—আমরা না এলে তোমাদের কী গতি হোত শুনি, পাড়াপড়শীর মেয়ে-বউ নিয়ে তো টানাটানি করতে!

ছোটবাবু বললেন—ও বাবা, এত মাল খেয়েও জ্ঞান তো তোমার দেখছি টন্‌টনে!

কামিনী বললে—আজ কিন্তু আমার কাছে আর গাড়ি পাঠিও না,—

—কেন?

—তিন দিন ঘুমোতে দাওনি, আজ আমি ঘুমোব—

ছোটবাবু বললেন—দর বাড়াচ্ছ বুঝি?

কামিনী বললে—দর-টর বুঝি না বাপু, টাকার জন্যে তো প্রাণ দিতে পারি না!

গাড়ি এবার দমদমের বাজারের কাছে আসতেই কামিনী হঠাৎ বলে উঠলো—ওই যাঃ...

—কী হোল?

কামিনী বললে—গাড়ি ফেরাও—গাড়ি ফেরাও—

ছোটবাবু অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—কোথায়?

কামিনী বললে—বাদামতলায়—শিগ্‌গির—

ছোটবাবু গাড়ি ঘোরালেন। বললেন—বাদামতলায় আবার কেন?

—চলো না, একটু শিগ্‌গির করে চলো লক্ষ্মীটি—

বললাম—তারপর?

নন্তা ময়রা বললে—তারপর সেই কাণ্ড! আমরা তো ওসব জানি না। বৃষ্টি কমলে আমরা তখন দোকান খুলেছি। শ্রীপদ হাজরা মশাইও দোকানের ঝাঁপটা পুরোপুরি খুলে দিয়েছেন। গণেশ পাড়ুই মশাই ক'দিন বৃষ্টির জন্যে বেরোতে পারেন নি। তিনি এসে তামাক খেতে বসেছেন। খাঁদা পালিতের দলটা ফিরে এসে গেছে। এক টাকার কচুরি কিনে ভাগ করে খেতে বসেছে। ক্ষেত্তোর সেই মাত্র জিলিপির কড়াটা নামিয়ে গজাটা উনুনে বসিয়েছে। একটু পরেই রসে ফেলা

হবে। কাঁচির মা নাত্‌নির হাত ধরে বাতাসা কিনতে এসেছে।

কাণা হরিপদ দৌড়ে এসে খবর দিলে—বড়বাবু, গোবিন্দদা ফিরেছে! চাবিটা দিন—

গোবিন্দ! অবাক কাণ্ড! কোথায় গিছলো!

কাণা হরিপদ আবার দৌড়ে চলে গেল। বললে—কোথায় ছিলে এতদিন গোবিন্দদা?

গোবিন্দ সরকারের চেহারা দেখে সবাই …ক হয়ে গেছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। খাওয়া-দাওয়া হয়নি। কিরকম শুকিয়ে এসেছে শরীরটা।

তালাটা খুলে গোবিন্দ ঘরে ঢুকলো।

খ্যাঁদা পালিত বললে—আর একটু আগে এলে না গোবিন্দদা? আগে এলে মজা হোত একটা!

—কেন?

হৃদয় হালদা বললে—এখনও গন্ধ পাচ্ছি যে—

—কীসের গন্ধ?

কাণা হরিপদ বললে—তোমার এই ঘরে এই তক্তপোষে এতক্ষণ শুয়ে ছিল, এইখানে বসে চা খেয়েছে, তেলেভাজা খেয়েছে—তুমি আগে এলে দেখতে পেতে—

গোবিন্দ সরকার অবাক হয়ে গেছে। বললে—কে? কে আমার ঘরে এসেছিল?

হৃদয় হালদার বললে—ছোটবাবুর ...

নন্তু ময়রা হঠাৎ ঘরে ঢুকেছে। গোবিন্দ তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—আমার ঘরে কে এসেছিল বড়বাবু?

—আর কে, ছোটবাবু, আর ছোটবাবুর মেয়েমানুষ। বিষ্টিতে ভিজে একশা, বললাম—গোবিন্দ সরকারের ঘরটা রয়েছে, ওখানেই বসুন—তা এইখানে বসলো, চা খেল, তেলে-ভাজা করে দিলুম, তেলেভাজা খেল,—

হৃদয় হালদার বললে—চেহারাটা কী রকম তাই বলুন বড়বাবু!

—রং কালো হলে কী হবে, চটক্ আছে চেহারার! মিহি গলা, ছোটবাবুর পছন্দ আছে—তোমার নাম করলুম, বললুম—গোবিন্দ একটু বাইরে গেছে, আবার আসবে—! তা কোথায় গিছলে তুমি শুনি?

হৃদয় হালদার বললে—আমরা ভাবলাম, আর বুঝি তুমি ফিরবেই না গোবিন্দদা!

খ্যাঁদা পালিত বললে—আমি তখনি জানতাম ফিরতেই হবে, গোবিন্দদা যাবে কোথায়! বৈকুণ্ঠপুর, বাঘমারি, তিলজলা সব ডুবে গেছে, রাস্তা বন্ধ—আর কলকাতায় তো আর যাবে না গোবিন্দদা!

নন্তু ময়রা বললে—দেখে নাও তোমার ঘর গোবিন্দ—যেমন-কে-তেমন আছে—ছোট-বাবুর মেয়েমানুষ তোমার ঘর দেখে তারিফ করছিল। আমায় জিজ্ঞেস করছিল কা'র ঘর এটা। আমি বললাম—পোটোখালির গোবিন্দ সরকারের—আমাদের এখানে তেলে-ভাজা ভাজে—

তারপর যাবার আগে বললে—তা হলে কাল থেকে আবার আরম্ভ করে দাও—আবার যেন মাথা-খারাপ করে বেরিয়ে যেও না না-বলে-কয়ে—

গোবিন্দ সরকার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

বললে—তোরা যা এখন—আমি একটু শোব—কাল সকালে আসিস—

বললাম—কিন্তু কাঞ্চন-কামিনী?

নন্তু ময়রা বললে—আগে শুনুনই তো, গোবিন্দ তো গেল নিজের ঘরে। আমি চলে এসেছি নিজের দোকানে। শ্রীপদ হাজরা মশাইও দোকানের খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। ক্ষেত্রোর গজা নামিয়ে তখন বাতাসার গুড় জ্বাল দিচ্ছে—এমন সময় হৈ হৈ কাণ্ড! চিল্লা, চীৎকার, মারামারি। আমি তো অবাক হয়ে গেছি।

হৃদয় হালদার তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ডাকলে—বড়বাবু, শিগ্‌গির আসুন—

শ্রীপদ হাজরা মশাই চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে কী হচ্ছে হে? অত গোল-মাল কীসের?

তা গোবিন্দর তখন সত্যিই মাথার ঠিক ছিল না। মাথা ঠিক রাখার কথাও নয়। এমন হবে কে জানতো! তখন সবে গোবিন্দ ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। হৃদয় হালদার, কাণা হরিপদ আর খ্যাঁদা পালিত চলে যেতেই গোবিন্দ তক্তপোষটার ওপর একটু গড়িয়ে নিতে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়লো। প্রথমটায় কেমন একটু অবাক হতে হলো। মেয়েদের ব্যাগ, এ জিনিস এখানে আসে কী করে! কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো। ছোটবাবুর মেয়েমানুষ এখানে এসে বসেছিল। বড়বাবু বলেছে। কী খেয়াল হলো কে জানে। ভারি বাহারে ব্যাগ। সুবাসীর হাতে ঠিক এইরকম ব্যাগই দেখেছে।

চীৎকার করে গোবিন্দ বললে—এ ব্যাগ্ এখানে কার রে খ্যাঁদা?

ওরা বোধ হয় চলে গিয়েছে। কেউ উত্তর দিলে না।

একবার মনে হলো—ব্যাগটা গিয়ে বড়-বাবুকে দিয়ে আসাই ভালো। যার ব্যাগ্ সে-ই এসে নন্তু ময়রার দোকান থেকে নিয়ে যাবে।

অক্ষয় বলেছিল—তুমি সুবাসীর পাপের অন্ন খাওনি?

সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গিয়েছিল অক্ষয়ের কথাটা শুনে। এত বড় কথা বললে অক্ষয়! গোর বেটা বস্তিতে ছিল, সে কি গোবিন্দ নিজে নেমন্তন্ন করে এনেছিল তাকে। মুড়ি ফেরি করে করে বেড়াত রাস্তায়—তাতে পয়সা রোজগার করেছে গোবিন্দ দস্তুর মত। ঘরভাড়া, কাপড়, জামা, ধোপা, নাপিত সবই চালিয়েছে। সংসার কে চালাত শুনি! কে তার মুখ দেখে পয়সা দিয়েছে। এত বড় কথাটা বললে অক্ষয়! এত বড় কথাটা বলতে পারলে! সুবাসী যে চলে গিয়েছিল—সে কি গোবিন্দ তাকে বায়স্কোপ দেখাতে পারেনি বলে! না পেট ভরে খাওয়াতে পারেনি বলে!

গোর বলেছিল—আমি কিছু জানিনে দাদা, সুবাসী কোথায় গেছে তা আমি কী করে জানবো!

—তা তুই জানবি নে তো কে জানবে? তুই-ই তো ঘরের ভেতরে থাকিস্! সুবাসীকে গন্ধতেল কিনে দিস্, থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাস্—দেখাস্ না?

—তুমি কেন সুবাসীকে যেতে দাও ওর সঙ্গে?

—কখন যায়, আমি কী করে টের পাবো? আমাকে কি বলে?

কিন্তু আশ্চর্য! সুবাসী যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোরও পালালো। তারও আর পাত্তা পাওয়া গেল না কোথাও।

ব্যাগটা আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন হঠাৎ মুখটা খুলে গেছে। সুবাসীর ব্যাগটায় কখনও হাত দেয়নি গোবিন্দ। কিন্তু মুখটা খুলে যেতেই হঠাৎ কতকগুলো নোট বেরিয়ে এল। একটা দুটো নয়, অজস্র! টাকাগুলো তুলতে গিয়েই গোবিন্দ কেমন যেন সাপ দেখে ভয়ে পিছিয়ে এল। পাপের টাকা! পাপের টাকা এগুলো! সুবাসীর পাপের টাকা খেয়েছে সে। এ-ও সেই পাপের টাকা! কলকাতার পাপ, শহ

পাপ, বায়োস্কোপের পাপ! ছোটবাবুর পাপ, ছোটবাবুর মেয়েমানুষের পাপ! সুবাসীর পাপ!

মাথাটা গরম হয়ে এল গোবিন্দর। মনে হলো, কলকাতার পাপ কেন এই বাদামতলায়তেও তার পেছু নিয়েছে! গোবিন্দ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে গেল। হঠাৎ দরজা খুলতেই এক কান্ড।

সামনেই সুবাসী দাঁড়িয়ে!

সুবাসীই তো! কোনও ভুল নেই। কোনও সন্দেহ নেই, ঠিক সেই রকম ঘুরিয়ে কাপড় পরা। সেই রকম খোঁপায় ঝুমকো-কাঁটা, রেশমী শাড়ি, পায়ে জুতো, ঠোঁটে রঙ। ওই রঙ মাথা নিয়ে কতদিন সুবাসীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে গোবিন্দ! বায়োস্কোপ যাবার সময় এই রকম সাজ-গোজ করতো ঠিক সুবাসী! সুবাসীই তো! আর কেউ নয়।

দাওয়ার ওপর থেকে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো গোবিন্দ।

লাফিয়েই চুলের ঝুটি ধরে ফেলেছে সুবাসীর।

—হারামজাদী! আমার মুখ পুড়িয়ে আমারই ওপর দরদ দেখাতে এসেছিস তুই! এত বড় আস্পর্ধা—

ছোটবাবু সামনে চীৎকার করে এগিয়ে এলেন।

—এই রাস্কেল!

নন্তো ময়রাও অবাক হয়ে গেছে।

গোবিন্দ কামিনীর চুলের মুঠি তখনও ছাড়েনি। চীৎকার করে বলছে—আমাকে তুই টাকা দেখাস্ সুবাসী, আমার দুঃখু ঘোচাবার জন্যে তুই টাকা দিয়ে গেছিস্—তুই ভেবেছিস্ সুবাসী, আমি তোর টাকার তোয়াক্কা করি—

হৃদয় হালদার এতক্ষণ দেখছিল। বললে—গোবিন্দদা করছো কি, কাকে মারছো? ছাড়ো—

গোবিন্দর যেন সে-কথা কানে গেল না। বললে—তুই ভেবেছিস্ সুবাসী তোর পাপের অন্ন আমি খাবো, তুই আমার মেয়ে হয়ে এ-কথা ভাবতে পারলি?

ছোটবাবু আর সামলাতে পারলেন না। আবার গিয়ে গোবিন্দকে বাধা দিতে চাইলেন —এই রাস্কেল, উল্লুক কোথাকার—ছাড়্—

কিন্তু কামিনীই বাধা দিলে। হাত উঁচু করে ইঙ্গিত করলে—থাক্—

কামিনীর মনে হলো—মারুক ও। আরো মারুক তাকে। হোক তার অচেনা—তবু যেন কামিনীর নিজের বাবাই তাকে শাসন করছে আজ। কামিনী ঘাড় গুঁজে মাথা নিচু করে রইল। তার খোঁপা খুলে গেছে, চুলে টান পড়েছে। থর থর করে কাঁপছে লোকটা। [illegible] দুটোও লাল হয়ে উঠেছে রাগে। হয়ত সুবাসী তার মেয়ে। সুবাসীকে হয়ত তার মতই দেখতে! কে জানে! কামিনীর মত সুবাসীও হয়ত বাপকে ছেড়ে পালিয়েছিল।

—বল্ সুবাসী, তুই কেন পালিয়ে গেলি? আমি তোর গরীব বাপ বলে?

কামিনীর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো ঝর ঝর করে!

—আমি মুড়ি বেচে তোর শাড়ি কিনে দিইনি? বায়োস্কোপ দেখাতে পারতুম না বলে তুই বাপকে ছেড়ে গেলি? তোর একটুকু মায়া হলো না রে সুবাসী? তুই কি পাথর? আমি যে তারপর থেকে সাতদিন খাইনি, ঘুমোইনি!

কামিনীর মনে হতে লাগলো, এমনি করে কি তার বাবাও কেঁদেছে! এই লোকটার মত সাতদিন সাতরাত না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে কাটিয়েছে!

—তুই ভেবেছিস আমি তোর পাপের অন্ন খাবো! আমাকে তুই টাকা দেখাতে এসেছিস সুবাসী!

তারপর হঠাৎ কী যে হলো, গোবিন্দ কামিনীর চুল ছেড়ে দিলে। দিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো হাউ হাউ করে।

আর কামিনী গোবিন্দর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

গোবিন্দ সেই মুখ ঢেকেই বলতে লগালো —তোর জন্যে পাড়ার লোক আমাকে গঞ্জনা দেয় সুবাসী,—আমি ঘর ছেড়ে বাদামতলায় এলাম—এখেনেও তুই আমাকে জ্বালাতে এসেছিস্—

—আমাকে ক্ষমা করো বাবা! আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল!

—তুই মরলি নে কেন সুবাসী, তাতেও যে আমি এর চেয়ে কম কষ্ট পেতাম! তুই আমার মুখ পোড়ালি কেন মা? আমার যে কলকাতায় যাবার মুখ নেই রে আর—

বলে আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো গোবিন্দ! কাঁদতে কাঁদতে কখন যে মানুষটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খেয়াল ছিল না। মনে হলো গোবিন্দ যেন আর সহ্য করতে পারছে না। এবার পড়ে যাবে!

কামিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—একে আপনারা কেউ একটু ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে শুইয়ে দিন্ না—

তারপর বললে—এর কেউ নেই এখানে?

নন্তা ময়রা বললে—ও তো একলাই থাকে এখানে দিদিমণি—কে আছে ওর তা-ও কেউ জানি না আমরা—বলেও নি কখনও আমাদের—

গোবিন্দকে ধরাধরি করে আমরা সবাই শুইয়ে দিয়ে এলাম ঘরে। ছোটবাবুর মেয়েমানুষ হলে কি হবে, কী সেবা যত্ন যে করলে গোবিন্দর কী বলবো। ডাক্তার ডাকালে, ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা করালে। শেষে সন্ধ্যেবেলা চলে গেল।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ও কি কেউ হয় তোমার?

কামিনী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—চলো, তোমার খুব নাকাল হলো—কী বলো।

ছোটবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। কামিনীকেও একটা দিতে গেলেন, কিন্তু কামিনী বললে—থাক্, এখন আর খেতে ভালো লাগছে না—

নন্তা ময়রা বললে—তা কে যে সুবাসী, কে যে কামিনী তা-ও আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি। পরে গোবিন্দর যখন মাথা খারাপ হয়ে গেল, তখনও ও উনুনটা নিয়ে বসতো গিয়ে বাদামতলায়। কেউ গাড়ি থামিয়ে তেলেভাজা কিনতে এলে আমরাই গিয়ে সাবধান করে দিতাম। ছোটবাবু তখন অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে রসুলপুরে আসতেন। বারে বারে তাঁর মেয়েমানুষ পালটায়—ওটা ছোটবাবুর বরাবরের স্বভাব। কিন্তু কামিনী দিদিমণি একলা আসতেন। এসে গোবিন্দর খাওয়া-দাওয়ার খরচ দিয়ে যেতেন। সে একেবারে অন্যরকম চেহারা তখন। তারপর গোবিন্দ মারা যাবার পর আবার একদিন এলেন। এসে এই জমিটুকু জমিদারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এখনও আসেন, আপাদ-মস্তক চাদরে ঢাকা, খালি পা, সে সিগারেট-খাওয়া রঙ মাখা চেহারা আর নেই। আগেকার সেই মানুষকে আর চেনাই যায় না! এসে মাঝে মাঝে ওখানে ফুল ছড়িয়ে দেন, প্রেণাম করেন —তারপর আবার চলে যান।

বললাম—কখনও জিজ্ঞেস করেন নি, গোবিন্দ সরকার ওঁর কে হতো?

—না তা করিনি। তবে উনি নিজেই বলেছেন।

—কী বলেছেন?

নন্তা ময়রা বললে—কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, নিজের বাবাকে বড় কষ্ট দিয়েছি কিনা তাই সুবাসীর বাবাকে সেবা করে যদি কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়।
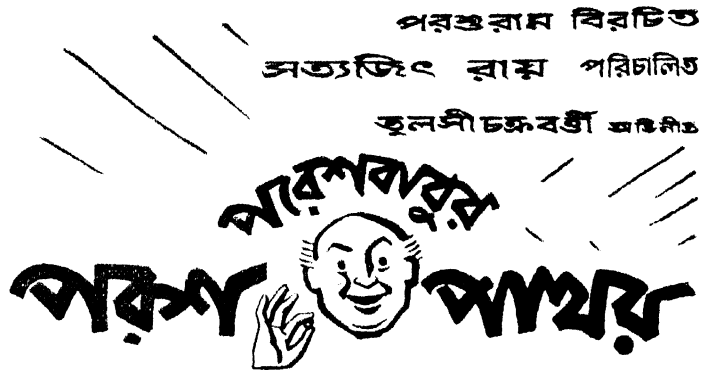
ইন্দ্রাণী কুমার নিরঞ্জন চৌধুরী বাহাদুরের প্রথম সন্তান এবং শেষ সন্তানও বলা চলে, কেননা নিরঞ্জন চৌধুরীর আর কোনো সন্তান হয়নি।

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন দুই ভাই। দুই ভাইয়ের বাড়ী পাশাপাশি অথবা একটা বাড়ীই দুই ভাগ হয়ে দুটি বাড়ী হয়েছে। যখন পুরঞ্জন ও নিরঞ্জনের বাবা রাজা বাহাদুর নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জীবিত ছিলেন তখন এই দুই বাড়ীই ছিল প্রকাণ্ড একটা বাড়ী; সেই বাড়ী যেন দিনরাত লোকজনে গম্ গম্ করতো। আস্তাবলে অষ্ট দশটা তেজী ঘোড়া, আর পিলখানায় একটা হাতীও ছিল। কিন্তু সেদিন এখন আর নাই।

না থাকুক, এখনও যা আছে তা অন্যের কাছে পর্বত। এই চৌধুরীপাড়ায় চৌধুরী-দের সারি সারি যেসব অট্টালিকা, তার মধ্যে এই বাড়ীটিই সবচেয়ে জমকালো, আর নিরঞ্জন চৌধুরী এবং পুরঞ্জন চৌধুরীই সব শরিকদের মধ্যে বেশী ধনবান। তার দুটি কারণ, প্রথম কারণ সুরার সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া আর পাল্লা দিয়ে সেরা সেরা বাইজী আনা আভিজাত্যের এই যে দুটি বিশেষ লক্ষণ এ'দের পরিবারে, সেদিকে তিনপুরুষ থেকেই ততটা উৎসাহ ছিল না। নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রাজা বাহাদুর হয়ে-ছিলেন বটে, কিন্তু মিতব্যয়ী ছিলেন। বৎসর বৎসর দুর্গোৎসবে যে-বৎসর তাঁর পালা পড়তো সে-বৎসর তিনদিন ধরে কাঙ্গালী-ভোজন আর যাত্রা থিয়েটার সবই হ'ত, কিন্তু লক্ষ্ণৌ থেকে কোনবারই বাইজী আনা হয়নি।

এ'দের যিনি পূর্বপুরুষ ছিলেন, তিনি, কোম্পানীর আমলে কিভাবে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন এবং কেবল সম্পত্তিই নয় 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাবের অধিকারী হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সত্য ও মিথ্যা অনেক কাহিনী আছে। বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে সেসব কাহিনীর যোগা-যোগও আছে। কাহিনী সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, চৌধুরী বংশের সম্পত্তি যে বিপুল সম্পত্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই। বহুভাগে বিভক্ত হয়েও সে-সম্পত্তির জাঁক-জমক এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনও ঠাকুর বাড়ীতে ঘটা ক'রে দোল, রাস ও রথযাত্রা হয়, তবে অতিথি অভ্যাগতের আনাগোনা আর নাই।

একই বংশ, কিন্তু বংশধরগণের রীতি-প্রকৃতি এক নয়, জীবনযাত্রা প্রণালীও এক নয়, তথাপি আজও এই বংশ বাংলার এক বিশেষ অভিজাত বংশরূপে খ্যাতির অধিকারী—অবশ্য এই খ্যাতিকে একদিক দিয়ে কুখ্যাতিও বলা চলে।

( ২ )

পাশাপাশি বাড়ী এবং সহোদর দুই ভাই। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব ছিল না। দুই ভাই একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। পুরঞ্জন চৌধুরী ছিলেন জাঁকজমকপ্রিয়। রাজা খেতাব পাওয়ার জন্য বহু অর্থ অপব্যয় করে-ছিলেন, সুরা ও সুন্দরী বারবিলাসিনীর উপরও তাঁর কিছু কিছু অনুরাগ ছিল। মাসে একবার করে তিনি উচ্চপদস্থ সাহেব-দের পার্টি দিতেন। অতি অল্পবয়সে বিবাহ হয়েছিল এবং কয়েকটি পুত্রসন্তানও আছে। নিরঞ্জন চৌধুরী গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অপব্যয় পছন্দ করতেন না, কিন্তু সদ্ব্যয় ছিল। পূজোর তিনদিন থিয়েটার বা বাইনাচের আসরে যোগ দিতেন না, সেজন্য তাঁহার অসামাজিক বলে দুর্নাম ছিল। বাবা ও মা থাকতে তাঁর বিবাহ হয়নি, কেননা সে সময় তিনি কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হননি, সেজন্য কিছু বেশী বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়। এবং বিবাহের পরও অনেকদিন পর্যন্ত স্ত্রী লীলার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা যায়নি। সম্প্রতি সেই শুভদিন আগতপ্রায়। দুয়ারে সানাই এবং বাড়ীতে ডাক্তার ও লেডি ডাক্তারের আনাগোনা চলছে।

গুরুজনেরা বললেন, "নিরঞ্জনের সবই বাড়াবাড়ি, চিরকাল এ বাড়ীতে ধাই আর ধরণী বাঁধা আছে, কখনও লেডি ডাক্তার ডাকা হয়নি। আর ছেলে হোক, তবে তো সানাই বসবে, ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তার ঠিক নেই, আগেই সানাই এসে হাজির হ'ল!"

ছেলে হ'ল না; মেয়েই হ'ল, কিন্তু পরমা সুন্দরী মেয়ে। নিরঞ্জন আশা করেছিলেন বংশধর ছেলেই হবে তাঁর, কিন্তু মেয়ে

হয়েছে ব'লে যে দুঃখিত হয়েছেন তাও মনে হল না, স্ত্রীকে বললেন "লীলা চেয়ে দেখ কি মেয়ে হয়েছে তোমার, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।"

পুরঞ্জন চৌধুরীর স্ত্রী ঠাকুরের কাছে মানত করেছিলেন যেন তাঁর দেওরের ছেলে না হয়ে মেয়েই হয়। তিনি মানত করে-ছিলেন কি তাঁর স্বামীই মানত করেছিলেন তা অবশ্য বলা যায় না; যা হোক, দেখা গেল ভারে ভারে পূজার সামগ্রী যাচ্ছে গৃহ-দেবতা গোবিন্দের মন্দিরে। বড় বৌরাণী বললেন, "পুজো দেব না কেন, ছেলে আর মেয়েতে তফাৎ কি? আর ছোটবৌ ভালয় ভালয় দুটো দুঠাঁই হয়েছে সেটাও ভগবানের দয়া।"

( ৩ )

মেয়ে বটে, কিন্তু অতি আদরের মেয়ে। নিরঞ্জন চৌধুরী মেয়েকে যেন চোখের আড়াল করতে চান না। মেয়ের জন্য এল দোলনা-খাট, এল পেরাম্বুলেটার গাড়ী, এল গাড়ী-টানা বাচ্চা চাকর। কিন্তু মেয়ে হ'ল বোবা।

কত আশার প্রথম সন্তান, সেই সন্তান হ'ল কিনা বোবা। বাপ মায়ের দুঃখের কি সীমা আছে? কত পরীক্ষা করানো হ'ল, বড় বড় ডাক্তার আনা হ'ল, কিন্তু না দেখা গেল মেয়ের কানে কোনো শব্দই যায় না। তবে আর সে কথা বলতে শিখবে কি করে?

মনের দুঃখে লীলা শয্যা গ্রহণ করলে, মন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরও ভেঙে পড়লো। মেয়ের দিকে আর সে চাইতেই পারে না, চাইলেই যেন তার দুঃখ-সমুদ্র উথলে ওঠে।

আত্মীয়স্বজন বললেন, "সূতিকা হয়েছে।" ডাক্তাররা বললেন, "ক্ষয়রোগ।" আর সে ক্ষয় আর কিছুতেই পূরণ হল না, জন্মের পর বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই বোবা মেয়ে মাতৃহীনা হ'ল।

( ৪ )

দাসীর কোলেই মানুষ হতে লাগলো ইন্দ্রাণী। নিরঞ্জন চৌধুরী বড় একটা বাড়ীর ভিতরেই আসেন না, বাইরের লাইব্রেরী ঘরেই দিনরাত কাটান, সেখানেই তাঁর খাবার দিয়ে আসে বামুনঠাকুর, রাত্রে একটা সোফার উপর হয়তো শুয়ে পড়েন, হয়তো কোন কোন দিন পায়চারী করে করেই তাঁর রাত কেটে যায়।

শোবার ঘরে লীলার একটা অয়েল পেণ্টিং ছিল, একদিন কি মনে করে নিরঞ্জন বাড়ীর ভিতর এসে শোবার ঘরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর অনাথা মা-হারা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে ঘরের মেঝেতে, গায়ে হাতে ধুলো-বালি মাখা, কতকগুলো খেলনা আশেপাশে ছড়িয়ে আছে, বোধহয় খেলা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে জনপ্রাণী নাই, কিন্তু লীলার ছবির দৃষ্টি যেন মেয়ের মুখের উপরেই রয়েছে।

দাসী বোধহয় বারাণ্ডায় ছিল, কুমার বাহাদুর যে ঘরে এসেছেন জানতে পারেনি, অন্য একজন দাসীর সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে ছিল, হঠাৎ কানে ডাক এল "পার্বতি!"

কি সর্বনাশ! বাহাদুর যে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে!

দাসীকে কোন তিরস্কারই করলেন না নিরঞ্জন চৌধুরী। মাহিনা করা দাসী, সে যদি তার কর্তব্য সম্বন্ধে সব সময় সচেতন না থাকে, কি থাকতে না পারে তার তাতে যতটা অপরাধ তাঁর নিজের তার চেয়ে কত বেশী অপরাধ এ বিষয়ে, এই উপেক্ষিতা মাতৃহীনা মূক শিশুটির দিকে চেয়ে সেই কথাই তাঁর মনে হয়েছিল।

তিনি কি করবেন? মেয়ের জন্য আবার কি বিয়ে করবেন? সৎমা কি কখনও মায়ের মত হয়? না হ'তে পারে?

কিন্তু গৃহিণীহীন গৃহ, সে তো দাস-দাসীরই রাজত্ব। গৃহ নয়, সে যেন শ্মশান। নিরঞ্জন চৌধুরীর কি মনে হয়েছিল কে জানে; কিন্তু আবার এই উৎসবহীন পরিজনহীন নিরানন্দ গৃহে উৎসবের আয়োজন দেখা গেল, আবার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নূতন বধূর আগমন হল, বোবা মেয়ের নতুন মা।

নিরঞ্জন চৌধুরী ফুলশয্যার রাত্রে মেয়ে এনে শোয়ালেন খাটের উপর, তাঁর নব-বিবাহিতা স্ত্রী সুরমার মুখের দিকে চেয়ে তার মুখের ভাব একবার লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন, "এই বোবা মেয়েটাকে নিজের মেয়ে বলে নিতে পারবে কি?"

সুরমা একটিও কথা বললে না, তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো, জল পড়তে লাগলো ফুলশয্যার ফুলের বিছানায়, আর ফুলের মত ছোট্ট মেয়েটির গায়ের উপর।

( ৫ )

দিনের পর দিন চলে গেল, সুরমা এক-দিনের জন্যও আর বাপের বাড়ী গেল না, বলতো "মেয়ে কার কাছে রেখে যাব?" যদি কেউ বলতো "মেয়ে সঙ্গে নিয়েই বাপের বাড়ী যাও না"—তখন বলতো "না সে হয় না, উনি যে মেয়ের জন্যই বাড়ীতে মন টিঁকিয়ে আছেন।"

সুরমা, চৌধুরী বাড়ীর নূতন ছোট বৌরাণী,—দাসদাসীরা তাঁর আড়ালে আব্-ডালে নিন্দাও করতো বটে, আবার সুখ্যাতিও করতো। বলতো, "বাবা, বৌরাণীর যেন শতচক্ষু, সব দিকেই নজর, চুণ থেকে নুনটি পর্যন্ত একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই, বামুনঠাকুর বলে মিথ্যে নয়, রান্নাঘরের খবর শোবার ঘর থেকেই বৌরাণী যেন যাদু-মন্ত্রে জানতে পারেন; ঠাকুরের আর এক মুঠো চালও সরাবার উপায় নেই।"

আবার তারাই বলতো, "আহা, কি মায়ার শরীর আমাদের বৌরাণীর, এমনটি আর দেখতে পাবেনি। —ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, দাসী চাকর যেন ও'র পেটের ছেলে-মেয়ে, কারো একটু অসুখ হলে নিজেই দশবার খবর নিচ্ছেন। আর টাকা পয়সা বিপদে আপদে ও'র কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ কোনদিন শুধু হাতে ফেরে না।"

মেয়ের জন্য কালা বোবা স্কুলের মাস্টার রাখা হল, আর সুরমা নিজেই সব সময় ঠোঁট নেড়ে নেড়ে মেয়েকে কথা উচ্চারণ করতে শেখাতো। প্রথম যেদিন ইন্দ্রানী "মা!" শব্দটি উচ্চারণ করতে পারলো, সুরমা মেয়ে কোলে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো লীলার অয়েল পেণ্টিং ছবির সম্মুখে, বার বার তাকে দিয়ে উচ্চারণ করালো "মা!" "মা!" "মা!"

( ৬ )

এর পর দু' বছর যেতে না যেতে হঠাৎ যেন এক বজ্রাঘাত সব কিছু ভেঙে চুরে দিয়ে গেল। নিরঞ্জন চৌধুরী মারা গেলেন! কি যে তাঁর অসুখ হল ডাক্তারেরা ধরতে পারলেন না, এক একজন এক একরকম মত দিলেন, তবে একবিষয়ে সকলেই এক-মত যে, রোগটি বড়ই কঠিন। নিরঞ্জন সুরমাকে বললেন, "এবার বোধহয় ডাক এসেছে লীলার কাছ থেকে। মেয়ে আর স্বামী দুই তুমি দখল করে নিয়েছ, তাই বুঝি ও ভাগ ভাগি করে নিতে চায়।" বলে হাসতে লাগলেন সুরমার মুখের দিকে চেয়ে।

সুরমা তাড়াতাড়ি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, "ছি, ছি, দিদির নাম নিয়ে অমন যা তা বোলো না। তিনি কি 'ভাগ' 'দখল' এ সবের মধ্যে ছিলেন? মেয়েও তাঁর, স্বামীও তাঁর, আমার উপর ভার দিয়েছেন তিনিই।"

নিরঞ্জন গম্ভীরস্বভাব ছিলেন অথচ কৌতুকপ্রিয়ও ছিলেন। তাই সেদিন একটু কৌতুকের ভাবেই সুরমাকে কথাটা বলে-ছিলেন। আর সেইদিনই রাত্রে তিনি মারা গেলেন।

এবার সুরমার উপর সমস্ত ভারই পড়লো। মেয়ের ভার, বিষয় সম্পত্তির ভার, বাড়ির মর্যাদা রক্ষার ভার। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রক্ষার ভারও এর মধ্যেই আছে। সুরমা মেয়েকে ছেলের মত পোশাক পরিয়ে ঝিকে সঙ্গে দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাঠাতো, কিন্তু ভাসুরের কোন ছেলেকে সেজন্য ডেকে পাঠাতো না।

বড় বৌরানী বলতেন, "কথায় বলে 'ভাঙে তো মচকায় না', ছোটবৌর দেখি ঠিক তাই। মেয়ে হয়ে পুরুষের ধারা ধরছে। ভাসুরেরও তোয়াক্কা রাখে না। থাকবে না, এ দম্প থাকবে না, বলে 'অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে ভেঙে যাবে।' সম্বল

তো ঐ বোবা মেয়ে, কে ওই বুবিকে বিয়ে করবে?"

কিন্তু বিয়ে করবার লোকের অভাব হবেই বা কেন? অত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী তো ঐ বোবা মেয়েই। তাতে আবার মেয়ে পরমাসুন্দরী। তেরো বছরে পড়তে না পড়তে বাড়িতে ঘটক ঘটকীর আসা যাওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মেয়ের বাড়ি থেকেই সাধারণত সম্বন্ধ আসে, এখানে উল্টো হ'ল, ছেলের বাড়ি থেকেই সম্বন্ধ আসতে লাগলো।

ইন্দ্রাণী এখন কিছু কথা বলতেও পারে, লিখতে ও পড়তেও শিখেছে। এক-জন মাস্টার কালা-বোবা-প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে রোজ সন্ধ্যায় আসেন ইন্দ্রাণীকে কথা বলা ও লেখাপড়া শেখানোর জন্য। মাস্টার যতক্ষণ থাকেন সুরমাও ততক্ষণ মেয়ের কাছেই থাকেন, কিন্তু তারই মধ্যে কি যে অঘটন ঘটে গেল, মনে হল মেয়ে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েছে।

সুরমা আড়ালে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে ইশারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন। সরলা বালিকা, ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। এদিকে বিয়ের সমস্তই ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি আইন পড়ছে, মধ্যবিত্ত ঘরের সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ছেলে। সুরমার ছেলেটিকে খুবই পছন্দ হয়েছে।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরই আটদিন যেতে না যেতে বাড়িতে ডাক্তার এলেন এবং জানালেন মেয়ের হার্টের অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং যত শীঘ্র হয় তাকে কোন স্বাস্থ্য-কর স্থানে যেতে হবে।

ইন্দ্রাণী বর পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাকে জড়িয়ে ধরে সে বার বার উচ্চারণ করতে লাগলো 'জামাইবাবু'। দাসদাসীদের মুখের ঐ 'জামাইবাবু' কথাটা তাঁদের ঠোঁটনাড়ার ভঙ্গি দেখে সে শিখে নিয়েছে। সুরমা মেয়ের মনের কথা বুঝলেন, বুঝলেন, এই নূতন পাওয়া বন্ধুটিকে ছেড়ে মেয়ের বিদেশে যেতে মোটেই ইচ্ছা নাই, কিন্তু তবু তাঁর মেয়েকে নিয়ে বিদেশে যেতেই হল। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার-বাবু, বাড়ির পুরোনো ম্যানেজারবাবু আর টুনি বলে একটি মেয়ে। ডাক্তারবাবু এ-বাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক, তিনি এ-বাড়ির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, একরকম আত্মীয়ই হয়ে গিয়েছেন।

টুনি সম্পর্কে চৌধুরী বাড়িরই ভাগ্নী। টুনির মা কবে যে বিধবা হয়ে চার পাঁচ মাসের মেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন চৌধুরী বাড়িতে, সে কথা আজ আর কারও মনে নাই। কবে যে টুনির মা মারা গিয়েছে, কবে যে পাঁচজনের দয়ায় তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে আর সে কবে যে বিধবা হয়েছে তাও এখন হয়তো কারও মনে পড়ে না। তবে প্রবীণারা এখনও তাকে সহানুভূতি জানিয়ে বলেন, "আহা, ছুঁড়ি বিয়ের পনেরো দিন যেতে না যেতেই বিধবা হল, সেই অবধি মেয়েটার দিন কাটছে এর দুয়ারে তার দুয়ারে খাটুনি খেটে।" নিরঞ্জন চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে প্রায় দু বৎসর সে সেখানেই আছে। ছোট বৌরানী এই আশ্রয়হীনাকে যত্ন করে নিজের ছোট বোনের মত রেখেছেন।

টুনির অনেক গুণ, সে নিরলস, বুদ্ধি-মতী, সব জায়গায় মানিয়ে চলতে জানে, আবার তার দোষও অনেক, বিধবার আচার আচরণ কিছুই মানবে না, সকলের মুখের উপর টক্ টক্ করে উত্তর দেয়, এবং একটু বেশী বাচাল। ছোট বৌরানী টুনিকেই সঙ্গে নিলেন কেন কে জানে। বরং যশোদা কি পার্বতীকে সঙ্গে নিলে বিদেশে তাঁর অনেক কাজে লাগত। কিন্তু টুনি ধরে বসল যে, সে সঙ্গে যাবেই, পশ্চিমে গিয়ে তীর্থ করা তার অনেকদিনের ইচ্ছে।

জামাইকে সুরমা বুঝোলেন যে, ডাক্তাররা যেরকম ভয় দেখালেন, তাতে তিনি আর দেরী করতে সাহস পেলেন না। না হলে কি মেয়ের বিয়ের পরই এমন করে ঘরবাড়ি ছেড়ে বিদেশে যান। জামাইকেও তিনি সঙ্গেই নিতেন, কিন্তু এই বিষয়েই ডাক্তাররা বড় কড়া, তাঁরা বিশেষ করে বারণ করেছেন, বলেছেন যেন এখন কিছুদিন মেয়ে জামাইয়ের দেখাশোনা না হয়।

প্রায় নয়মাস পরে সুরমা মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেন। ডাক্তারবাবু বাড়ির ডাক্তার, বৌরানী তবুও তাঁকে এ কয়মাস মাসে হাজার টাকা করে বেশী দিয়েছেন।

টুনি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ফিরল না, ছোট বৌরানী বললেন, সে এক যাত্রীদলের সঙ্গে বদরীনারায়ণ তীর্থে গিয়েছে, তার ফিরতে দেরী হবে।

( ৭ )

পাঁচ বৎসর পরের কথা। সুরমা মেয়েকে একটি বাড়ি করে দিয়েছেন, জামাই সুরেশ্বর হাইকোর্টে ওকালতী করে, তাহার পশারও মন্দ নয়। ইন্দ্রাণীর একটি ছেলে তিন বছরের এবং কোলে একটি মেয়ে। মেয়ের অল্পদিন আগে ঘটা করে ভাত দেওয়া হয়েছে এবং নাম রাখা হয়েছে বকুলবালা।

টুনি প্রায় বৎসর দুই তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একটি সুন্দর ছেলে, ছেলেটির বয়স বছর পাঁচ। টুনি বলল, দ্বারকায় এই ছেলেটিকে সে পেয়েছে। এর বাবা রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম যশোধর মিশির। সস্ত্রীক তীর্থ করতে গিয়ে দ্বারকায় তাঁর পত্নীবিয়োগ হল, ছেলেটি তখন চার মাসের শিশু। যশোধর আর গৃহে ফিরলেন না, সন্ন্যাস গ্রহণ করে হরিদ্বারে চলে গেলেন। তাঁর একান্ত অনুরোধে টুনি এই শিশুটির ভার নিয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে, তা হোক টুনি তাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করবে, এবং এই ছেলে নিয়ে সে সংসারী হবে। তার অদৃষ্টে তো ঘর-সংসার ছিল না, সংসারের সাধও কোনদিন মেটে নি।

সকলেই দেখতে পায় যে টুনি বেশ এখন স্বচ্ছলভাবেই থাকে, বোধহয় মিশিরজী তাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছেন। টুনি আজকাল পুরঞ্জন চৌধুরীর বাড়িরই নীচেতলার একটা ঘরে থাকে। টুনি বলে "ভাড়া দিয়ে আছি।" "ভাড়া দিয়ে যদি থাকবি তবে আর কি ঘর মিললো না? পুরঞ্জন না তোকে রাত দুপুরে শিয়াল কুকুরের মত দূরে দূরে করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিন ছোট বৌ যদি আশ্রয় না দিত তবে সে রাত্রে যেতিস কোথায়?" রঙ্গিনী মাসীমা একদিন টুনির মুখের উপরেই কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। টুনি একটু হাসলো, কিন্তু কোন উত্তরই দিল না।

ভুবনেশ্বরী ঠাকুরানী নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের মাসীমা, তিনি একদিন সুরমাকে বললেন, "আচ্ছা বৌমা টুনির ব্যাপার কি বল দেখি, আজকাল দেখি বড় বৌমার সঙ্গে ওর একেবারে দহরম মহরম চলছে। ওই বড়বৌই তো একদিন রাঁধুনে বামুনের সঙ্গে বদনাম দিয়ে টুনিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

সুরমা ম্লান হেসে বললেন, "মাসিমা, বট্‌ঠাকুরের ওপরেই সন্দ হয়েছিল দিদির, তাই বামুনের নাম নিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। জানেন তো, বড়দিদির একটু সন্দ বাই আছে।"

( ৮ )

ইন্দ্রাণী এখন মস্ত এক গিন্নী। কিছু কথাও সে অস্পষ্ট বলতে পারে, লেখাপড়াও বেশ শিখেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাস পড়েছে। ইন্দ্রাণী ও সুরেশ্বর যেন এক-প্রাণ, পিঠাপিঠি ভাইবোনের মত রাগারাগিও হয়, দণ্ডে দণ্ডে, আবার ভাবও হয় দণ্ডে দণ্ডে। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে তারা মনের আনন্দে আছে। মাঝে মাঝে সুরমা আসেন মেয়ের বাড়ি, এটা সেটা হাতে নিয়ে, আবার ইন্দ্রাণীও যায় মায়ের কাছে প্রতিদিনই। মা নইলে তার একদিনও চলে না।

ইন্দ্রাণী একটি কাকাতুয়া পুষেছে। পাখীটা যখন তখন বলে "জামাইবাবু! জামাইবাবু!" ইন্দ্রাণী অবশ্য শুনতে পায় না, কিন্তু তবু বেশ জানে পাখীটা কি বলছে।

( ৯ )

এই সুখের ঘরে একদিন হঠাৎ আগুন লাগল। সেদিন সুরেশ্বর বন্ধুদের স্ত্রীর হাতের রান্না খাওয়াবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল, ইন্দ্রাণী রান্নাঘরেই ছিল, হঠাৎ সুরেশ্বর তাকে টেনে নিয়ে গেল পাগলের মত, লেখা একটা চিরকুট তার সম্মুখে ধরল। তাতে লেখা ছিল "টুনি মাসির কাছে যে ছেলে থাকে, সে কি তোমারই ছেলে? জবাব দাও।"

ইন্দ্রাণী অবাক। কার ছেলে তা সে কি জানে? মার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সুরেশ্বরের লেখা কাগজটি দেখাল। দেখল, মার চোখ দিয়েও ঝর ঝর করে জল পড়ছে।

( ১০ )

কোর্টে মোকদ্দমা রুজু হয়েছে, বড়-বাবু পুরন্দর চৌধুরী নালিশ করেছেন, "যেহেতু নিরঞ্জনের কন্যা ইন্দ্রাণী বসু কুমারী অবস্থায় সন্তান সম্ভাবিতা হইয়াছিল সেই হেতু এই অসতী কন্যা চৌধুরী বংশের উত্তরাধিকারিনীরূপে গণ্য হইতে পারে না। বিষয়ের উত্তরাধিকারী পুরঞ্জনের ছেলেরা।"

প্রধান সাক্ষী টুনি। সেই এই জারজ সন্তানটিকে পালন করেছে। ছেলেটিকেও কোর্টে হাজির করা হয়েছে।

টুনি শপথ করে সাক্ষ্য দিল যে, এই ছেলেটি ইন্দ্রাণীর ছেলে। অবশ্য পুত্র প্রসবের সময় ইন্দ্রাণী অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, কেননা তাকে যন্ত্র দিয়ে প্রসব করাতে হয়েছিল। ছোট বৌ-রানীর অনুরোধেই সে ছেলের ভার নিয়েছিল, এবং সে-জন্য ছোট বৌরানী তাকে নিয়মিত টাকাও দিতেন। মণি-অর্ডারের কুপনগুলি হারিয়ে যাওয়াতে সে দেখাতে পারল না।

ইন্দ্রাণী তিনদিন বিছানা হতে ওঠেনি। মুখে জলবিন্দুও স্পর্শ করেনি। সুরেশ্বর কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, উপরে যাওয়াও বন্ধ করেছে।

ছেলেমেয়ে দুটি যেন মাতৃপিতৃহীন অনাথ। এক মুহূর্তে এক সাজানো সংসার এভাবে শ্মশান হয়ে গেল।

এমন সরস মোকদ্দমা, সুতরাং কোর্টে ভিড়ের অন্ত নাই। পুরঞ্জন শহরের খ্যাতনামা এটর্নীকে মোকদ্দমার ভার দিয়েছেন। এটর্নীর পরম বন্ধু এক পত্রিকা-সম্পাদক তাঁকে লিখলেন, "ধীরেন, এত বিদ্যার কি এই পরিণাম? টাকা কি এতই মিষ্ট? তাই তুমি একটা বোবা মেয়ের সর্বনাশ করতে চাও, যে স্বামী-পুত্র নিয়ে মনের আনন্দে সংসার করছে? শত ধিক্ তোমার বিদ্যায় আর তোমার আইনের জ্ঞানে।"

ইন্দ্রাণীর কাছে সুরেশ্বর এই কয়দিন একবারও যায় নি। বন্ধুরা তাকে অনেক বুঝিয়েছে, "সুরেশ্বর করছো কি পাগলের মত? এতে যে ওদেরই কথা প্রমাণ হয়ে যাবে।" তবুও সুরেশ্বর উপরের ঘরে ইন্দ্রাণীর কাছে যায় নি। তিন দিনের দিন যখন চোখের জলে ভেজা একটুকরো কাগজ রামা চাকর তাঁর হাতে এনে দিল, তিনি দেখলেন, কাগজে ইন্দ্রাণীর হাতের লেখা "তোমাকে—খোকাখুকিকে ছেড়ে যেতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, তবু যেতেই হল—" তখন সুরেশ্বর লাফিয়ে উঠে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটলো, "ইনু, আমার ইনু মাণিক, কি করেছো, কি করেছো তুমি?" এই বলে ভূপতিতা ইন্দ্রাণীর উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইন্দ্রাণী আফিম খেয়েছে। কিন্তু বেশী আফিম সংগ্রহ করতে না পারায় প্রাণে বেঁচে গেল এ-যাত্রা।

আর, মামলার রায়ও বেরুল। ইংরেজ চিফ্ জাস্টিসের মন্তব্য এই: "মামলাটি মিথ্যা একটি সাজানো মোকদ্দমা। বয়স হিসাব করিয়া দেখা গেল মেয়েটির বয়স তখন মাত্র বারো বৎসর। বার বৎসরের একটি শিশু, সন্তানসম্ভবা বা অসতী হইতেই পারে না।" মোকদ্দমা আনয়নকারীদের উপরও তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেছেন তিনি।

দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু টুনির পালিত সেই ছেলেটি—সে ছেলেটির কথা ইন্দ্রাণীর বার বার মনে হয়। সেই সুন্দর ছেলেটিকে ইন্দ্রাণীও তো নিমন্ত্রণবাড়িতে দেখেছে। রাজপুতের পোশাক। মাথায় বাঁধা পাগড়ীতে কি সুন্দরই তাকে দেখায়।

সুরমা দারুণ জ্বরে শয্যাগতা ছিল, তাহার উত্থানশক্তি ছিল না। মোকদ্দমার রায় বেরিয়ে যাবার পর সে কোনমতে লাঠি ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে মেয়ের বাড়িতে এল। দুয়ারে নেমে একটি কথাই [illegible] পেরেছিল, "আমার খুকি বেঁচে আছে তো!"

তখনও মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েনি। সেই সময় ইংরেজদের এদেশে আগমন ঘটল। কে জানত, সেই আগমনই একদিন ঈশানকোণের মেঘের মত মোগলের সারা সৌভাগ্য আকাশ ঘন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলবে!

ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই। এই ভাগ্যবিপর্যয়ের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। কিন্তু ইংরেজরা সেই প্রথম যুগেও—যে সময় শাহানশাহ বাদশাহের প্রতাপ ছিল যথেষ্ট। এদেশে এসে বেশ একটা গুছিয়ে বসবাস করতেন এবং খানিকটা আত্মনির্ভর হয়েই থাকতেন, খুব বেশি মোগল সরকারের নির্ভর করতেন না। আজকের দিনে কোনও বিদেশী কোম্পানী এলে রক্ষণাবেক্ষণ, শান্তি শৃংখলা, যাতায়াত এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য স্থানীয় সরকারের উপরই নির্ভর করেন। ইংরেজের কুঠিতে এবং ফ্যাক্টরীতে ঠিক সেরকম নির্ভর সেযুগে ছিল না। তাই যদি হবে তাহলে ইংরেজরা কেল্লা গড়তেন কি করে, সৈন্য সামন্ত রাখতেন কি করে? আবার সেই সৈন্যসামন্ত রাজ্যের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতই বা কোন সাহসে? এখন কি কল্পনা করা যায়, বিদেশী কোনও কোম্পানী আত্মরক্ষার্থে কলকাতায় কেল্লা তৈরী করে বসবাস করবেন, সেই কেল্লার মধ্যেই থাকবে তাঁদের ফ্যাক্টরী ও আফিস, তার জন্য থাকবে তাঁদের নিজস্ব সেনাদল, মতবিরোধ হলে সেই সেনাদল ভারত সরকারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতেও ইতস্তত করবে না? কিন্তু এ সব কথা আজকের দিনে কল্পনাতীত হলেও সেকালে এই ছিল জীবন্ত সত্য। ক্ষীণ-ভূয়িষ্ঠ দুর্বলহস্ত মোগলশক্তি বা স্থানীয় শাসকেরা এই ব্যাপারে আপোষরফা করতে ইতস্তত করেননি, স্বচ্ছন্দেই মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি, দরকার হলে ফরাসী অথবা ইংরেজ সেনাদলের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

এইভাবে থাকতে হলে অরক্ষিতভাবে খুব খোলামেলা অবস্থায় থাকা চলে না। [illegible]জন্য গোড়া থেকেই ইংরেজরা থাকতেন একটু সংরক্ষিতভাবে। তাঁদের আস্তানাকে সাধারণভাবে বলা হত স্টেশন (Station)। তার মধ্যে থাকত শাসনকর্তা ও দলবলের বসতবাড়ি, তার সঙ্গে থাকত ফ্যাক্টরী। ইংরেজদের সম্ভবত প্রথম স্টেশন সুরাটের বর্ণনায় পাই১, সুরাটের স্টেশনের মধ্যে প্রধান ছিল ফ্যাক্টরী। পাথরে গড়া বাড়ি, বড় বড় কড়িকাঠ ও কাঠের কাজ, প্রত্যেক তলা অন্তত দেড় ফুট মোটা, উপরে নীচে বারান্দা। তার মধ্যে প্রেসিডেন্টের থাকবার বিরাট জায়গা। ছাদের উপর অনেকগুলি পতাকাদণ্ড। উঠোনে ব্যবসায়ীদের ভিড়, জিনিসপত্র আনা-নেওয়া কেনা-বেচার কলরব। আশে পাশে ছিল ফ্যাক্টরদের (যাঁরা ফ্যাক্টরি চালাতেন) বাসস্থান। স্থানীয় স্টেশনের প্রেসিডেন্ট এদের উপর কড়া নজর রাখতেন, যেমন কড়া নজর রাখতেন সেনা-দলের উপরে। কবে কতটুকু মদ্যপান করা হবে, সন্ধ্যার মধ্যে সকলকে স্টেশনে ফিরতে হবে, কে কাকে বিবাহ করবে, এ সব বিষয়েই কড়া নজর ছিল। এদেশী মহিলাকে বিবাহ করা সাহেবদের চলত না—কেউ বিবাহ করতে চাইলেও তার অনুমোদন মিলত না। কিন্তু কেইড লিখেছেন, ১৬৮৫ সালে কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী, খুব সুপুরুষ একজন ইংরেজ যুবা অভিজ্ঞার রাণীর এমন সুনজরে পড়লেন

1. Kincaid: **British Social Life in India 1608—1937, pp. 9-10.**
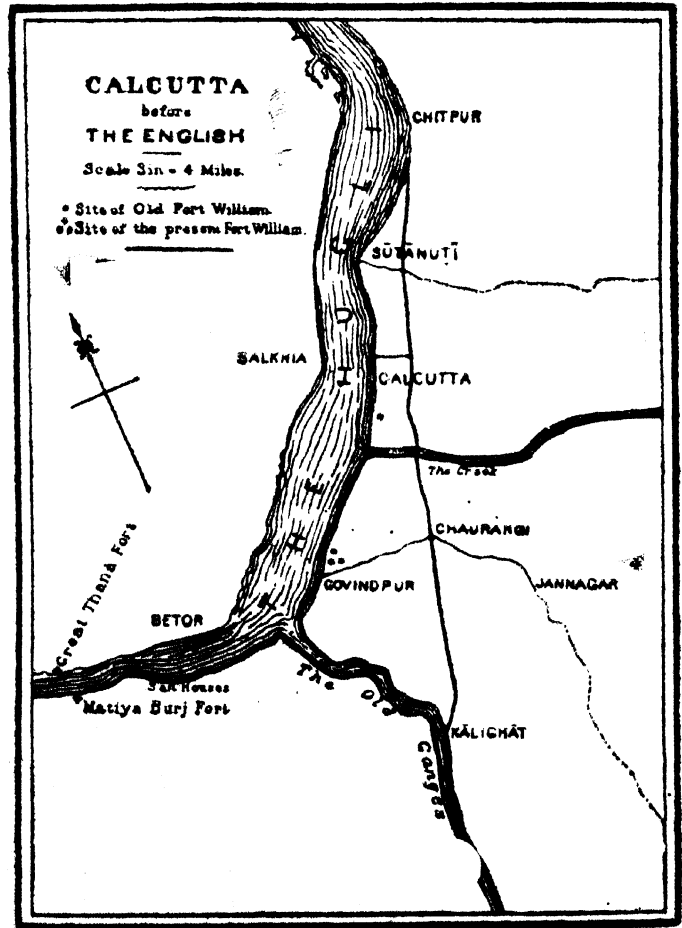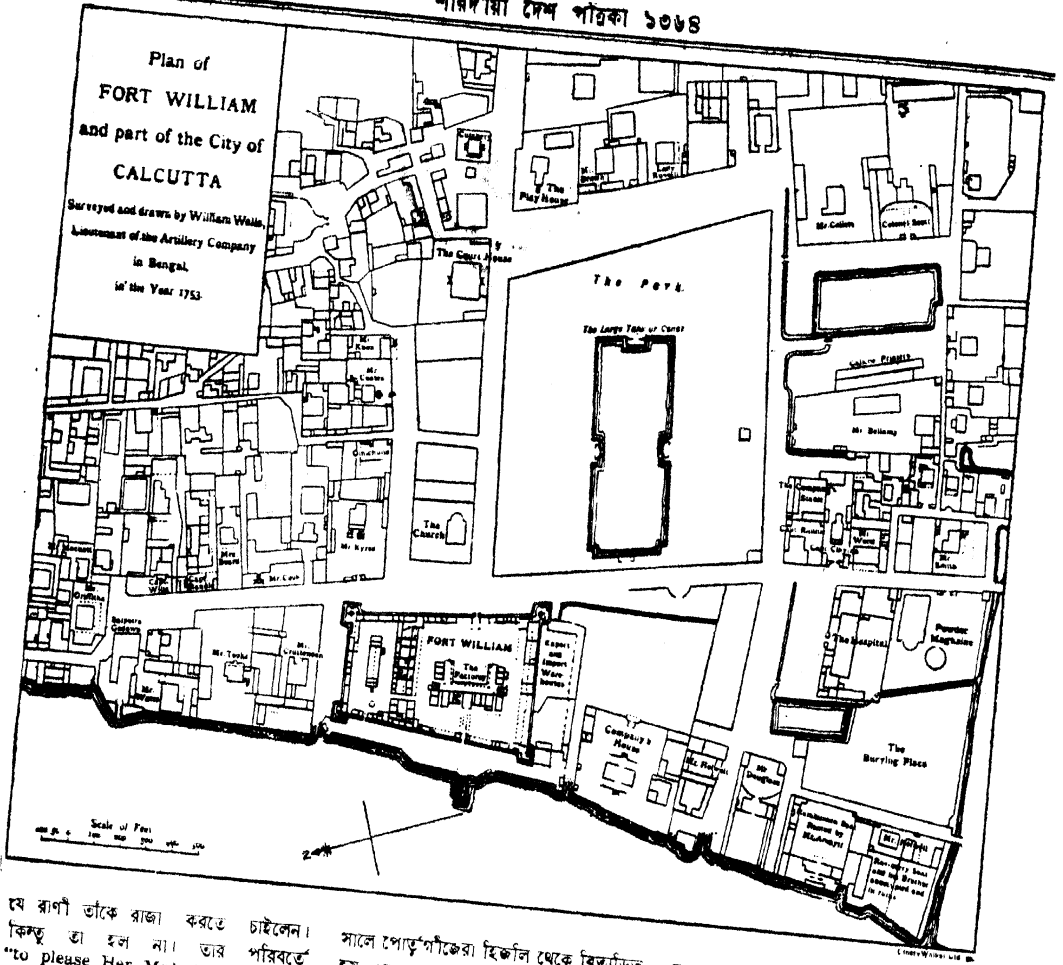
যে রাণী তাঁকে রাজা করতে চাইলেন। কিন্তু তা হল না। তার পরিবর্তে "to please Her Majesty he treated her with the same civility as 'Solomon' did the Queen of Ethiopia or Alexander the Great did the Amajonian Queen, and satisfied her so well that she made him some presents." ২

আবার সেনাদলের উপর কড়া নজরের একটি কাহিনী বলি। কলকাতায় ক্যাপটেন বেলিউ-এর একজন সৈন্য কথায় কথায় কবিতা উদ্ধৃত করতেন। সে কথা জানাজানি হলে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়, এরকম ছন্নছাড়া উদ্ভট খেয়াল তার কেন হয়। তিনি ভয়ে ভয়ে কৈফিয়ৎ দিলেন— ওটা তাঁর স্বভাব। "স্বভাব?—হুঁ, দেখছি এ আবার দার্শনিকতা হচ্ছে—সে আরও খারাপ।" "Huh, philosophising eh? That is worse still!"৩

॥ ২ ॥

এবার কলকাতার কথা বলি। ১৬৩৬ সালে পোর্তুগীজেরা হিজলি থেকে বিতাড়িত হয় এবং ক্রমে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তাদের ব্যবসাতেও মন্দা পড়ে। ইংরেজেরা ছিলেন দক্ষিণে, মাদ্রাজ থেকে এগোতে এগোতে তাঁরা বালেশ্বর অবধি যাতায়াত করছিলেন। এই দিকে তাঁদের নজর স্বভাবতঃই পড়ল। কিন্তু তার জন্য কোম্পানীর দরকার ছিল আরও কিছু ফ্যাক্টর ও রাইটারের (writer—কেরাণী) এবং অল্প জলে চলতে পারে এরকম ৮০ বা ১২০ টনের দু-একখানি জাহাজ। ৪ সে যাই হোক, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ইংরেজেরা ক্রমে কলকাতার দিকে এগোতে লাগলেন। ১৬৫০ সালে লায়নেস জাহাজ প্রথম হুগলীর দিকে চলল। ১৬৫২ সালে ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটনের সহায়তায় ৩০০০ টাকার বদলে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি ইংরেজেরা পেলেন।৫ সুতরাং বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় কাউনসিল স্থাপনার দরকার হয়ে পড়ল। ১৬৫৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি ডেস্‌প্যাচ হতে জানতে পারা যায়, হুগলী বালেশ্বর কাশিমবাজার ও পাটনায় কাউনসিল স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় জব চার্ণক কাশিমবাজারের কাউন্‌সিলের চার নম্বর কর্মকর্তা ছিলেন।

এই জব চার্ণকের নাম সকলেই জানে, কেননা কলকাতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জব চার্ণকের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কলিকাতার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তখন কলিকাতা গণ্ডগ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একথা সত্য যে, কলকাতা, শহর হিসেবে, পুরনো নয়। ইংরেজের বাণিজ্য লক্ষ্মীর সঙ্গেই শহর হিসেবে কলকাতার অভ্যুদয়। পূর্বেই বলেছি, যেখানেই ইংরেজদের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল সেইখানেই তাঁরা সুরক্ষিত আড্ডার মধ্যে থাকতেন। কলকাতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাংলার প্রথম গভর্নর হয়েছিলেন উইলিয়াম হেজেস্ (William Hedges); তাঁর ডায়েরী থেকে জানা যায়, বিশেষ অনুমতি না পেলে কেউ ফ্যাক্টরির বাইরে থাকতে পারত না। ফ্যাক্টরির মধ্যে জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত; সকালে নটা দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত কাজ

2. Ibid p. 37.
3. Ibid; p. 136.

4. Wilson: **Early Annals of the English in Bengal, p. 19.**
5. ঐ ২৭ পৃঃ

বিকেলে চারটে পর্যন্ত। যখন কোনও জাহাজ আসত তখন ব্যস্ততার সীমা থাকত না। স্থানীয় উৎপাদক ও ইংরেজ ব্যবসাদারের মধ্যে যোগসূত্র ছিল এদেশী দালাল। কোম্পানীর তরফে এরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সস্তায় জিনিস কিনত। এই সব কাজ চালাবার জন্য একটা সুরক্ষিত আড্ডা দরকার। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে কলকাতাই সেই আড্ডায় পরিণত হল। সেটা অনেকখানি আকস্মিক।

উইলসন সাহেবের বই-এ স্পষ্ট লেখা আছে ইংরেজের আর পূর্বেকার দিন ছিল না যখন তাঁরা মোগল শাসনের উপর নির্ভরশীল ব্যবসাদার ছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা বিক্রম প্রকাশ শুরু করেছেন :

The first period [of English advance into Bengal] put forward the policy of entirely peaceful industry. The second exhibited the opposition between this policy and the policy of force and retaliation. The third period gives us their reconciliation. Already a policy has been found in which both militarism and industrialism are combined. The Court in its last despatches has decided to establish a fortified station in Bengal to maintain its trade there. The question at issue is the site of this station. Industrialism would have been content to remain at Hughli, militarism demanded the violent seizure of Chittagong, the former seat of piratical hordes and now an important Mogul city. But the English have to find a place where both principles may be satisfied. Convinced that a fortified settlement is their only adequate safeguard, they have to fix on the best site for it. This they do, not by any immediate intuition, nor by mere haphazard as fancy strikes them, but, after many experiment, many attempt to settle at different points on the river Hughli. The man who conducted them through their strange experiences safe to the goal . . was Job Charnock. ৬

নিরীহ ব্যবসাদার ইংরেজেরা আর নন। কামানের আড়ালে রচিত হবে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আগমন-পথ। ভয়প্রদর্শন ও চাটুকারিতার অপরূপ সম্মিলন। সেই সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন জব চার্ণক। সেই আগমন পথের কেন্দ্রস্থল হল কলকাতা। আর সেই কলকাতার কেন্দ্রস্থল হল ফোর্ট ও রাইটার্স বিলডিংস্। সে কথা একটু পরে বলছি।

জব চার্ণকের কাহিনী এক অদ্ভুত কাহিনী। চার্ণক এসেছিলেন কলকাতায় বোধ হয় ১৬৫৫ বা ১৬৫৬ সালে। তাঁর প্রথম উল্লেখ, পূর্বেই বলেছি কাশিমবাজারের কাউনসিলের মেম্বার হিসেবে পাওয়া যায়। (১৩ই জানুয়ারী, ১৬৫৮: জব চার্ণক চতুর্থ মেম্বর, বেতন কুড়ি পাউন্ড।) কাশিমবাজার হতে তিনি পাটনা গেলেন সেখানেই বোধ হয় তিনি এক ভারতীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশিমবাজার ফ্যাক্টরীর কর্তা হলেন। ১৬৮৬ সালে তাঁর হাতে কিছু সেনাদল ও নৌবাহিনী দেওয়া হল।

নবাবের সেনাদলের সঙ্গে তাঁর লড়াই-এর কথার পুনরুল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই। হুগলীতে একটি ছোট ঘটনা উপলক্ষ্য করে আগুন উড়লো। প্রথমে জয় হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হটতে হল। চার্ণক পালিয়ে চলেছিলেন হিজলীর দিকে—পথে নামলেন সুতানুটিতে। আর নড়লেন না। সে হল ১৬৮৬ সালের শীতকাল। এদিক ওদিক লড়াই চলল বটে, কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার আসতে হল সেই সুতানুটি। কলকাতার গোড়াপত্তন হল।

৩

ইংরেজরা ছুতো খুঁজছিলেন কি করে কলকাতায় একটা কেল্লা গড়া যায়। ১৬৯৬ সালে চেতুয়া-বরদা পরগণায় শোভা সিং বিদ্রোহ করলেন, বর্ধমান আক্রমণ করে বর্ধমানাধিপতি কৃষ্ণরামকে নিহত করলেন, কিন্তু তাঁর কন্যার হাতে শেষ পর্যন্ত নিজেই প্রাণ হারালেন। কিন্তু সেইটেই হল ইংরেজদের সুবর্ণ সুযোগ। এই হাঙ্গামা যদি কলকাতার উপর এসে পড়ে তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন, এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা কেল্লা গড়বার অনুমতি চাইলেন। প্রথমে কিছুটা গড়িমসি করলেও ষোল হাজার টাকা উপঢৌকন পাবার পর নবাব সরকার অনুমতি দিতে আর দেরী করলেন না।৭ সে হল ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজরা কেল্লা গড়তে লেগে গেলেন। ১৬৯৩ সালেই স্যার জন গোলডসবরো কেল্লার চৌহদ্দি মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলেন, এখন তা গড়া আরম্ভ হল। ক্রমে ক্রমে কেল্লার বুরুজ হল, দেওয়াল হল। সেই কেল্লার ভিতরে ফ্যাকটরীর গুদামঘর প্রভৃতি রইল। ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর ব্যবসা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্থানের অকুলান হল। তখন বাইরের দিকে নজর পড়তে শুরু হল।

কলকাতা তখনও জঙ্গলপূর্ণ ও ফাঁকা। শহর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। বাড়িঘর

6. Wilson: **Early Annals of the English in Bengal,** pp. 91-92.
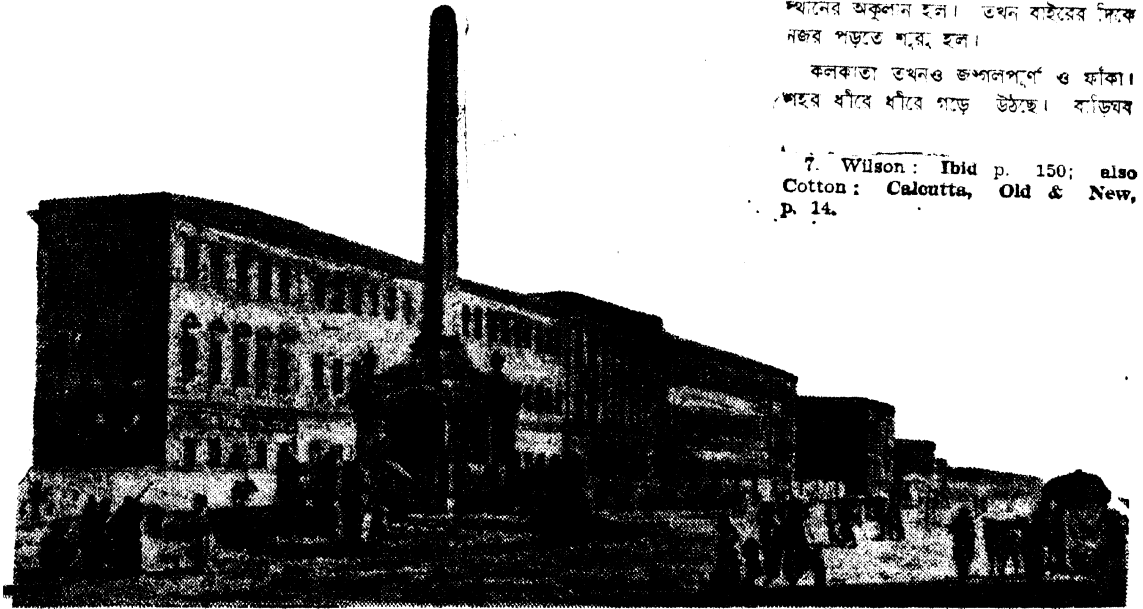
7. Wilson: **Ibid** p. 150; **also Cotton: Calcutta, Old & New,** p. 14.

হলওয়েল মনুমেন্ট (১৭৮৪) ও রাইটার্স বিল্ডিংস

হতে অনেক সময় লেগেছিল। ১৭৫৩ সালের একটা নক্‌শা এখানে দেওয়া গেল। বর্গির হাঙ্গামার পর থেকেই ইংরেজরা ক্রমে সুতানুটি ছেড়ে চৌরঙ্গীর দিকে সরে আসছিলেন। ঐ নক্‌শায় যে এলাকাটি দেখানো হয়েছে তা বর্তমানের ক্যানিং স্ট্রীট, হেস্টিংস স্ট্রী, মিশন রো ও গঙ্গার চতুঃ-সীমার মধ্যবর্তী। মধ্যেকার বড় পুকুরটি লালদীঘি। তার পাশের কাছারী, জনশ্রুতি অনুসারে, সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী। যে কাছারীর বিগ্রহদের দোললীলার সময় আবিরের রঙে পুকুরের জল লাল হয়ে যেত বলেই নাকি লালদীঘি নামের উদ্ভব।

ফোর্ট তো হল, তার মধ্যে শাসনকর্তাদের বাসস্থানও হল, ফ্যাক্টরি ও ফ্যাক্‌টরদেরও ব্যবস্থা হল, কিন্তু রাইটার্সরা (কেরাণী, বর্তমান ভাষায় কারণিক) যায় কোথায়? তাদের জন্য একটা রাইটার্স বিল্ডিং তো দরকার। কটন লিখছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কেল্লার মধ্যেই কয়েকটি বাড়ি ঠিক করা ছিল এই কারণিকদের জন্য, সেই আদি রাইটার্স বিল্ডিং।৮ কিন্তু এখানে বেশিদিন কুলালো না। অথবা অন্য কারণে নতুন রাইটার্স বিল্ডিং দরকার হল। কোম্পানীর বড়কর্তারা অনেক সময়ই বেনামে ব্যবসা করতেন। বাড়ি করে কারণিকদের ভাড়া দিলে কিছু আয় হতে পারে কোনও কর্তাব্যক্তির—একারণ হতেও নতুন বাড়ির দরকার অনুভূত হতে পারে।

যাই হোক কলকাতার কালেক্টরেটের নথি-পত্র খুঁজলে দেখা যায়, বর্তমান সরকারী মহাকরণের জমি লীজ নেওয়া হয়েছিল ১৭৭৬ সালের অক্টোবর মাসে। লায়ন সাহেবের (যাঁর নামে Lyon's Range) লীজ নেওয়া হয়েছিল, যদিও সন্দেহের কারণ আছে লায়ন সাহেব বেনামদার, তাঁর পিছনে ছিলেন লাট-কাউন্সিলের মেম্বার স্বয়ং বারওয়েল সাহেব। এই পাট্টাটীর ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে পাট্টাটি অবিকল তুলে দিচ্ছি—

A pottah is hereby granted unto Mr. Thomas Lyons for the purpose of erecting a range of buildings for the accommodation of the junior servants of the Company for two pieces or parcels of waste ground to the north of the Great Tank, situated or lying and being between the Old Fort, the Great Tank, the Court-house, and the new Play-house, and separated by the great road leading from Mr. Holwell's monument by the south front of the Court-house to the Salt Water Lake, and known by the name of Great Bungalo Road, agreeable to the annexed plan of the said two pieces of ground which are distinguished by the red colour, bounded by the red lines A B C D in No. 1, and E F G H in No. 2, and are of the following dimensions—

No. 1 in Dhee Calcutta lying to the southward of, and parallel to, the Great Bungalo Road, is a regular piece in length from east to west or D to B 214 yards, and breadth from north to south or from B to A 35 yards, containing six bighas and four cottahs of the Hon'ble Company's coomar or untenanted ground, the rent sicca rupees 18-9-7 per annum.

No. 2 in Bazar Calcutta, lying to the northward of the same road, the side G E parallel to the road is in length 214 yards, the opposite side H F is in length 218 yards, the east end G H is in breadth 92 yards, and the west end E F is in breadth 69 yards, containing ten bighas thirteen cottahs and eight chittacks of the Hon'ble Company's coomar or untenanted ground, the rent sicca rupees 32-0-5.

The boundaries as follow—To the eastward or from C to H, a road of 60 feet width parallel to the west front of the Court-house, and the angle at H to be cut off, so as to leave the road in that part of it at the same breadth of 60 feet till its junction with the north road. To the westward or from A to F, a line drawn from the west end of the Play-house at right angles with the Great Bungalo Road. To the south, or from C to A, a road of 15 feet wide leading from the north-east angle of the railing of the Great Tank towards the Old Fort, parallel to and at the distance of 35 yards from the Great Bungalo Road. To the northward from F to H a road 52 feet wide leading from the south railing of the Play-house by Mr. Huggins' house to the China Bazar.

The Great Bungalo Road, 100 feet wide, passing in its present direction between B and E the west end, and D and G the east end of the said two pieces of land, a line drawn from Mr. Holwell's monument to pass through the middle of the road.

To preserve uniformity and prevent nuisances permission is given to Mr. Lyons' to rail in the manner described in the plan by the yellow colour and lines those two pieces of land which terminate to the westward of the two pieces granted to him. In the cutcherry of the Calcutta Division, this eighteenth day of November, 1776.

A description of the same two pieces of land is given in the deed of trust, dated the 15th day of June 1787, referred to in page (20).

"All those two several pieces or parcels of ground situate, lying, and being on the north side of the Great Tank in the town of Calcutta, containing by estimation 16 bighas 17 cottahs and 8 chittacks, as the same two several pieces or parcels of ground are therein described to be lying and being intersected by the great road leading from Holwell's monument by the south front of the Court-house to the Salt Water Lake, and bounded to the eastward by a road running parallel with the west front of the Court-house; to the west-ward by the road running parallel to the walls of the Old Fort; to the southward by a road of fifteen feet leading from the north-east angle of the railing of the Great Tank towards the Old Fort; and to the northward by a road leading from the south railing of the Play-house by the house then in the occupation of James Huggins, merchant to the China Bazar, and also all that new row or range of buildings there lately erected and built upon the most northern of the two said several pieces of land containing 19 messuages or tenements or separate sets of apartments with the out-houses thereto belonging then let or rented to the United

৮. "Within the fort was cut into two unequal sections by a floor of low buildings running east and west, damp and unhealthy, and known as the long row, in which were housed the young gentleman of the Company's service. These were the Writers' Buildings of the first half of the eighteenth century.—Cotton p. 431.

Company of merchants of England trading to the East Indies by virtue of a certain indenture of lease, bearing date on or about the first day of September then last past for the term of four years at a monthly rent of two hundred Arcot rupees for each set of apartments."
(Excerpt from pp. 32-33 of "An Historical Account of The Calcutta Collectorate" by Reginald Craufuird Sterndale).

কি করে ফের এই জমি বারওয়েলের হাতে ফিরে গেল তা জানা যায় না, কিন্তু ১৭৮০ সালে দেখা যায় বারওয়েলই জমির মালিক। সেই বছরই বাড়ি তৈরি শেষ হয় এবং সে বাড়ি পাঁচ বছরের জন্য গভর্নমেণ্ট লীজ নেন। ফ্রান্সিস লিখে গেছেন—
Mr. Barwell's house taken for five years by his own vote. Mr. Wheler and I declare we shall not sign the lease."

সে সময় এই বাড়িতে ১৯টি আবাস ছিল। থাকার জায়গা ছাড়া প্রত্যেক আবাসে অফিসঘর প্রভৃতিও ছিল। প্রত্যেকটির মাসিক ভাড়া ছিল ২০০ আর্কট টাকা। ১৭৮৫ সালে সরকার হুকুম জারী করলেন যে সমস্ত রাইটারদের মাসিক বেতন তিনশ টাকার কম, তাদের "নতুন বাড়িতে" কোয়ার্টার দেওয়া হবে এবং অন্য বাড়ির ভাড়ার বদলে তাঁরা ভাতা পাবেন মাসিক একশ টাকা। প্রত্যেকে আধখানা কোয়ার্টার পাবেন। যখন মাইনে তিনশ টাকা হবে, তখন তাঁরা পুরো কোয়ার্টার পাবেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রাইটার্স বিলডিঙ এইভাবেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছিল। ব্লেচিনডন লিখছেন
For nearly fifty years Writers' Buildings continued in the use for which it was originally intended, and maintained a reputation for fast living and extravagance of every kind, which was only natural under the circumstances.

তরুণ বয়সের রাইটার বিলেতের আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ছ মাস জাহাজে আটক থেকে ভারতে পদার্পণ করেই বাঁধন ছিঁড়ে ছুটত, গা ভাসিয়ে দিত উদ্দাম আবহাওয়ায়, আত্মীয়পরিজন বা সমাজের ভ্রূকুটিভঙ্গের কোনও ভয় ছিল না। ১৮০৩ সালে লর্ড ভ্যালেন্সিয়া লিখেছিলেন, "এইসব ছোকরারা বেশির ভাগই ঘোড়া রাখে, এমন কি রেসের ঘোড়াও রাখে, খুব খানা-পিনা হৈ হুল্লোড় করে।" রাইটার্স বিলডিঙে তখন স্যাম্পেনের সান্ধ্য-ভোজের খ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত, তার প্রকোষ্ঠগুলি বেপরোয়া গানে মুখরিত থাকত। ক্রমে হাওয়া বদলে গেল। কোম্পানীর চাকরিতে প্রবেশ করবার বয়ঃসীমা বাড়ান হল, রাইটারদের কলকাতায় থাকার সময় কমানো হল এবং ক্রমে কোয়ার্টার দেওয়ার নিয়মও উঠে গেল। ফলে রাইটারেরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অথবা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর রাইটার্স বিলডিঙ প্রায় খালি পড়ে রইল। তারপর শুরু হল এখানে সরকারী আফিস। সেই সময় এর সামনের দিকটায় অদলবদল করা হয়। পূর্বে ছিল সাদামাটা দেওয়াল ও জানলা। তার বদলে থাম বারান্দা মূর্তি প্রভৃতি বসিয়ে রাইটার্স বিলডিঙকে বর্তমান রূপ দেওয়া হল—যা এখন সবাই দেখেন।

॥ ৪ ॥

সেই রাইটার্স বিলডিঙ!

তরুণ কেরানীদের বসবাসের জায়গা নয়, কলম-পেশার জায়গা। সে কেরানীদের জায়গা নয়, যারা কিছুদিনের জন্য 'হোম' থেকে আসত, এখানে কিছু অর্থোপার্জন করে দেশে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখত। এ একেবারে নিয়মের পাকে পাকে বাঁধা সরকারী সর্বোচ্চ দপ্তরখানা। বাংলার শাসনকেন্দ্র। বড়কর্তাদের কর্মস্থল। আর এই বড়কর্তারা জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন না, ছিলেন সাগরপারের শাসকদলের কড়া প্রতিনিধি। সেপাই শান্ত্রী পাহারায় থমথম করত রাইটার্স বিলডিঙ। অথচ তার মধ্যেই কি অসম সাহসে বাঙালী যুবক সিমসনকে হত্যা করে গেল। রাইটার্স বিলডিঙের বহু পুরানো কর্মচারীর মুখে তার বর্ণনা শুনেছি। দুপুর বেলা, গমগম করছে অফিস। তেতলার একটি ঘর থেকে ঐ কর্মচারীটি শুনতে পেলেন দোতলায় সিমসন সাহেবের ঘরে হঠাৎ বজ্রগর্জনে আওয়াজ তুলল অগ্নিনালিকা। প্রথমবার সকলের ঠিক ঠাহর হয়নি। কিন্তু পিস্তল বারবার গর্জে উঠল, ছাদের লোহার বড় বড় কড়িতে গুলী বাজতে লাগল ঝনঝন; সেই সঙ্গে কড়কড় বাজডাকা আওয়াজ, মনে হল যেন ঘরবাড়ি কাঁপছে। দৌড়ে এল লোকজন চারপাশ হতে, অনেক লোক আবার ভয়ে ঘর থেকে বেরোল না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সিমসনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে।

রাইটার্স বিলডিঙের নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহে এরকম চাঞ্চল্য খুব কমই ঘটে থাকে;



Blechynden : Calcutta, Past & Present, p. 190.

বস্তুত আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ। পূর্বেকার রাইটার্স বিলডিঙের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু তবু অনুমান করা কঠিন নয় যে সেকালের রাইটার্স বিলডিঙের জীবনধারা এখনকার মতোই, অথবা এখনকার চেয়েও, নিস্তরঙ্গ ছিল। বিশেষত তখন গভর্নমেণ্ট ছিল শাসন ও শৃঙ্খলার নামান্তর, কাজ ছিল সামান্য, তার গতি ছিল শ্লথ এবং বাঁধাধরা। কাজের আয়তন এখন বিপুল পরিমাণ বেড়েছে, তার চেহারাও নানারকম, বহুবিধ লোকের যাতায়াতে এখনকার রাইটার্স বিলডিঙ অনেক বেশি ভরতি। তবু বিদগ্ধ সন্ধানীর চোখে ধরা পড়বেই, এ সবের আড়ালে রাইটার্স বিলডিঙের চাঞ্চল্যহীন নিরুত্তাপ ধারা মন্দগতিতেই বয়ে চলেছে। এই রাইটার্স বিলডিঙের বেদপুরাণ হল সেক্রেটেরিয়েট ম্যানুয়াল। তার বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই সব কাজের ধারা চলে। এই বিরাটকায় পুঁথিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আছে কিভাবে কাজ করতে হবে। দু'একটা নমুনা দিই। রেজিস্ট্রার ও হেড অ্যাসিস্টাণ্টের করণীয় কি, এসম্বন্ধে খুব সুদীর্ঘ নির্দেশ আছে। এ'রাই হলেন আসল কারণিক, এ'দের জোরেই ফাইল চলে, সেইজনাই এ'দের এত কদর। সেইসঙ্গে কাগজ আসা মাত্র কি ভাবে ফাইল আরম্ভ করতে হবে, ফাইল কি ভাবে সাজাতে হবে, তলায় কি ভাবে মোটা বোর্ড দিয়ে ফাইল বাঁধতে হবে, কতখানি চওড়া ফিতে (বিখ্যাত red-tape) দিয়ে ফাইল বাঁধতে হবে, ইত্যাদির সবিস্তার বিধিব্যবস্থা স্মৃতির বিধানকেও হার মানিয়ে দেয়।

তবু এ হেন গুরুগম্ভীর রাইটার্স বিলডিঙেও মধ্যে মধ্যে দু'চারটি মজার ঘটনা ঘটে থাকে। একটির উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। বাংলা সরকার মধ্যে মধ্যে Livestock census নিয়ে থাকেন। অনেককাল আগে ইংরেজ আমলে একবার সেই সেনসাসে দেখা গেল, রিটার্ণে লেখা আছে মেদিনীপুর জেলায় কোন এক ইউনিয়নে হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে চারটি Rhinoceros (domesticated) আছে। জলপাইগুড়ির জঙ্গল নয়, বিস্তীর্ণ ধান-চাষের এলাকা, তার মধ্যে একটা আধটা নয়, একেবারে চার চারটে গণ্ডার। তাও আবার পোষমানা! তাজ্জব ব্যাপার। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। খোঁজ খোঁজ। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল সেই গ্রাম্য চৌকিদার। ধমক খেয়ে সে বলল তার সীমানায় সে কোনও গণ্ডারেরই হিসেব তো দেয় নি। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, সে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে তালিকায় দিয়েছিল চারটে রাজহাঁস। তিনি অল্প ইংরেজী জানতেন, বাংলা না লিখে তার ইংরেজী লিখে দিলেন, কিন্তু Gander না লিখে ভুল বানানে লিখে দিলেন Gandar তার উপরের হাকিম ভাবলেন, এর ইংরাজী লেখার শখ তো খুব, বাংলা কথাটা বাংলায় না লিখে আবার ইংরেজী অক্ষরে লিখেছেন। তিনি আবার সেটাকে ইংরেজী ব্যাকরণ-সম্মত অনুবাদ করে নিয়ে লিখে দিলেন Rhinoceros। তার উপরের হাকিম ভাবলেন যখন ঐরকম চাষের এলাকায় আছে তখন সে গণ্ডার নিশ্চয়ই পোষ মানা, অতএব ব্র্যাকেটে জুড়ে দিলেন domesticated তারপর আর সে রিপোর্ট আটকায় কে? বঙ্কিমচন্দ্রও ডেপুটি ছিলেন, এসব তত্ত্ব খুব ভালই বুঝতেন, তাই সেকালেই লিখে গিয়েছেন "রিপোর্ট কমিশ্যনরীতে গেল। কমিশনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ......গভর্নমেণ্টে গেল।" তার ফলে দুবার অনূদিত হয়ে রাজহংস গণ্ডারে পরিণত হয়ে গেল, কিন্তু কারণিকদের চোখ না এড়ানোতেই শেষ পর্যন্ত ঘটল মুশকিল।

সেই রাইটার্স বিলডিঙ! কালে কালে তার চেহারা বদলাবে, কত লোক আসবে কত লোক যাবে, কত স্মৃতি জড়িত হয়ে যাবে তার কক্ষে কক্ষে, শেষকালে হয়তো সে একদিন কালের অতলগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। হয়তো যখন দিনান্তে রাইটার্স বিলডিঙে কর্মমুখরতার উপর স্তব্ধতার অন্ধ যবনিকা নামে রাতের গভীর অন্ধকারে নিঃঝুম রাইটার্স বিলডিঙ সেই কথা ভাবে।

GOVERNMENT

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**
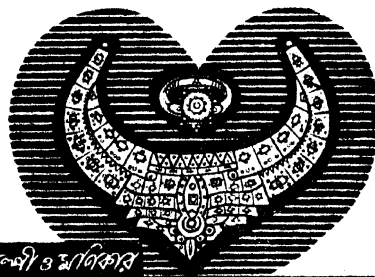
দরজা জানলা ভেজাও যত না,
আকাশ-ই তোমায় খুঁজবে!
পাল্লা, সার্সি, ফাটলে ফুটোয়,
কত কাঁথা কানি গুঁজবে!
উঁকি দেবে, দেবে, দেবে-ই;
যত-ই ভাবো না কিছু নেই,
একদিন ঠিক শিরায় শোণিতে
ছটফটে ছোঁয়া বুঝবে।

যেখানেই কেন রওনা হও না,
ঘরে-ই নিজের ফিরবে!
তেপান্তরে-ও হারাতে চাইলে
সেই দেয়ালে-ই ঘিরবে!
ছাদে ঢাকা দেবে, দেবে-ই;
যত-ই ভাবো না কিছু নেই,
হেঁসেলে, গোয়ালে, আসরে, বাসরে
মামুলী ছক কে ছিঁড়বে!

নিরুদ্দেশের পাল তুলে তবু
নিজের-ই সীমায় দুলবে!
যেখানে-ই কেন উধাও হও না,
প্রাণ তার বেড়া তুলবে!
বেড়া দেবে, দেবে, দেবে-ই;
যত-ই ভাবো না কিছু নেই,
ছাড়া পেতে ছোটো যেখানে, খুঁটির
বাঁধন কি করে খুলবে!

যে-ঘাটেই কেন নোঙর ফেল না,
সাগর তবুও ডাকবে!
তরী ছেড়ে যদি তরু হও তবু
ঝোড়ো হাওয়া ডালে লাগবে!
নাড়া দেবে, দেবে, দেবে-ই;
যত-ই ভাবো না কিছু নেই,
ফসলের জল ঢালে যে, সে-মেঘই
মোহ-মুদ্গর হাঁকিবে!

## তুমি আলো

**জীবনানন্দ দাশ**

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায়!
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায়।
হয়তো আলোর ছায়া নেই;
আলো তুমি তবুও তো—
আলো তুমি ছায়ারও মনেই;
বাহিরে বিশাল ঐ পৃথিবীর জাতীয়তা অ-জাতীয়তায়
তুমি আলো।
তুমি আলো
যেইখানে সাগর-নীলিমা আজ মানুষের সন্দেহে কালো,
ভাইরা ব্যথিত হ'লে ভাইদের ভালো,
মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়।

**মণীশ ঘটক**

যতো মেঘ ছিল জড়ো হয়ে এলো ভাদ্রের নভোতলে
অভিসার অভিলাষী ললনার কপট কৌতূহলে
ঘোমটা কাহারো আধখানা ঢাকা, কারো মুখে আধো আলা
সীমন্তে কারো তপনের ছটা লোহিত আবীর ঢালা

এলোমেলো ছোটে—হঠাৎ হাওয়ায় শাড়ীর আঁচল দোলে,
ললনার রূপ মিলায় সুনীলে ঘোর বর্ষণ রোলে।
রবি মুখ ঢাকে, পবন গরজে, ধূসর আকাশপট,
জটায় গঙ্গা ধারণ করিছে উন্নতশির বট।

ভাদ্রের ধারা সহসা নিঃস্ব। সহসা স্তব্ধ বায়ু।
উচ্ছ্বাসে বিভাবসু উৎসাহে পুনর্লব্ধ আয়ু।
পুনরায় অভিসারিকা মেঘের সাথে শুরু হয় খেলা
রঙ্গে ভঙ্গে রসতরঙ্গে আলিঙ্গনের মেলা।

রৌদ্রস্নাতা হর্ষিতা ধরা বহে বুক পাতি স্নেহে
রতিঅবসরে যেমনে কামিনী উত্তাপ বহে দেহে।

## চিরঋণী

বিষ্ণু দে
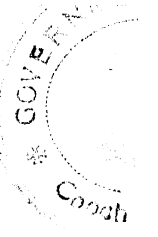
পৌঁছলুম ভোরের আকাশে,
তখনও জড়ানো রাত্রি গাছে ঘাসে মাটিতে পাথরে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বাজে নুড়ির স্বরদ আর জলের সেতার
নানান্ কলিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোমলে কড়িতে পাশ কেটে
আশাবরী যোগিয়া তোড়ীতে।

ডাইনে ঝোপের ডাকে ঢুকে দেখি একটি ঝলক
শুধু দুটি চোখ জ্বলে আসন্ন সন্ত্রাসে স্থির
ঘৃণায় ও ভয়ে নিষ্পলক সম্বৃত চিতার দুটি চোখ।

সারাদিন জরিপের অরণ্যরোদন।
বাংলোয় ঘনায় রাত্রি,
তামা দিয়ে লোহা দিয়ে গড়া অন্ধকার
অথচ ভিতরে ছোটে শত সরীসৃপের সংশয়।

চলে গেছে খিদ্মদগার তার দূর গ্রাম্য ঘরে।
আমি একা ব'সে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের আশায় যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে।

আর থেকে থেকে মুহূর্তের অবশ অসাড়
স্তব্ধতার অতল সাগরে
ডুবে যাই আর ভেসে উঠি, তাকাই দুয়ারে খিল কিনা।

যখন ঝিঁঝির বাণী মাঝরাতের মৈহারী রাগিণী
ধরে ধরে প্রায়,
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
কাচের ওপারে একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী॥

## জর্নাল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

মেঘে মিশে এ-আকাশ বুঝি
ঝরে যায় শীতল ধারায়।
কী আগুন ছিল যে তারায়
ভুলুক ভুলুক তার মন;
জল নাও, তোমাকেই খুঁজি
কদম্বের প্রৌঢ় আয়োজন॥

॥ দুই ॥

সব কাজ ভিজে যায় বর্ষার সকালে।
তোমাকে যে মনে পড়ে, তা-ও ভিজে-ভিজে—
যেন বৃষ্টি ছিল চুলে, শাড়িতে-সেমিজে—
ফুল-গাছে স্মৃতি জল ঢালে—
যা ফুটুক হেনা-যুঁই-বেল
তার গন্ধে যদি আসে তোমার বিকেল॥

॥ তিন ॥

মনে পড়ে প্রতীক্ষার মন।
তাই কি এখনো চন্দ্র বিকেলের আলোতে চন্দন,
আকাশ-আকুল-করা হাওয়া?
সব আছে, আসে সাথে-সাথে;
শুধু নেই যেন রাত্রি পাওয়া
একটি ফুলের মতো অম্লান তোমাতে॥

## শ্রীমতী

দিনেশ দাস

তুমি তার দেহ ছোঁও,
সে তো ছোঁয় তোমার হৃদয়।
অতল অথই
হৃদয়ের হ্রদ তার ছুঁতে পারো কই?

তুমি তার বুক ছোঁও। সকল সময়
সে তো ছুঁয়ে তোমার হৃদয়।
হঠাৎ আশ্বিনে-ঝড় তোমাকেই ঘিরে
সে-মেয়ে সহজে
দু'ডানার ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলে' তোমাকেই খোঁজে,
শুধু তার পাখি-চোখ ভিজে ওঠে সবুজ শিশিরে।

দু'ঠোঁটে লেবুর কোয়া নিটোল সরস,
তুমি নিতে পারো তার কতটুকু রস?
বন্য বিছানায়
সোনার আপেল দুটি কতটুকু টোল খায়?
সে তো শুয়ে সমুদ্রের মত এক শুভ্র সমারোহে,
তার ঢেউয়ে তুমি যাও গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে
ভেসে যাও ফেনায় ফেনায়।

তবু রাতে হঠাৎ কখন,
শ্রীমতীর চোখের আলোয়
আলো হ'য়ে ওঠে গৃহকোণ:
আশ্বিনের কালো-ঝড় মুছে গিয়ে
ফুরফুরে সাদা হাওয়া হিমের গুঁড়োয়।
দুধের বাটির মত টলটলে আকাশের চাঁদ ওঠে
আশা, শান্তি, অনন্ত আলোয়।

# যেতে যেতে

**সুভাষ মুখোপাধ্যায়**

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাঘরা।

সে নদীর দু'দিকে দুটো মুখ।

একমুখে সে আমাকে আসছি ব'লে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি ক'রে আসি
অমনি ক'রে যাই।

বুঝিয়ে দিল
আমি থেকেও নেই
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়।
তারপর কানের কাছে
ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—

দেখলে!
কাণ্ডটা দেখলে!
আমি কিন্তু কক্ষণো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম।
কাল রাতের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।'.....

গল্পটার কোন মাথামুণ্ডু নেই ব'লে
বুড়োধাড়িদের একেবারেই
ভাল লাগল না।
আর তদুপরি
গল্পটা বানানো।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম:
'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে

দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর।
সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি;
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো ক'রে ব'সে আছে
এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা।'.....

লোকগুলোর চোখ চক চক ক'রে উঠল।

তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম—

'তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে আঙুলে জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম:
তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।

'শুনে সে বলল:
এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ ক'রে ব'সে আছি।'
বুড়োধাড়িরা আগ্রহে উঠে ব'সে
জিজ্ঞেস করল: তারপর?

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ার ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম—

'তারপর? কী বলব—
সেই রাক্ষসীই আমাকে খেলো।'

# না-বলা কথাটি

**রেখা দত্ত**

কঠিন যে কথা বলা, তা-ও বলা হয়ে গেল আজ;
কি করে সম্ভব হ'ল জানিনে তা, দুর্বল সমাজ
যেখানে পিছিয়ে পড়ে সে থেকেই যাত্রা হ'ল শুরু—
সংস্কার-আবদ্ধ প্রাণ মিথ্যা ভয়ে করে দুরু দুরু।

সত্যের অমূল্য মূল্য চিরদিন তুমি প্রভু দাও,
মিথ্যাকে ভাঙার মন্ত্র তুমিই ত' সর্বদা শিখাও
এবং আমাকে ক্ষমা করে থাকো—এ চির আশ্বাসে।
না-বলা কঠিন কথা বলা হয়ে গেল অনায়াসে।

তুমি যে মহান্ তাই হাসিমুখে নীচে নেমে এসে
অন্ধকারে হাত ধরে নিয়ে যাও আলোকের দেশে,
তুমিই অভয় দাও, দাও প্রাণভরা ভালবাসা
সে লোভে সংসার মাঝে বারে বারে ঘুরে ফিরে আসা।

সুতরাং দেহ-মন তোমার প্রসাদে হ'লে খাঁটি
স্বাভাবিক ভাব বলি ভয়ানক না-বলা কথাটি ॥

## অপমৃত্যুর সাক্ষী

**হরপ্রসাদ মিত্র**

আলোটা টিমটিমে,
ঘাট-টা নির্জন,
রাস্তা ঝিম্‌ঝিম্‌।
কে যেন এলো সেই
ঠান্ডা জলেতেই
ডুবতে, মরতে।
কারণ, জীবনের নোঙর হারিয়েও বৃথাই ভাসতে
আদৌ চায়নি সে।
বেকার দুনিয়ার
একটি শূন্য।

জন্ম-মরণের অথৈ পারাবারে উঠছে বুদ্বুদ,
রেকাবে বেতো পায়ে ঠান্ডা রক্তের কেবলই ঝিন্‌ঝিন্‌।
'আমি তো অক্ষম, তোমরা সাক্ষীই'—কে যেন বললে।
কপালে ভিজে হাওয়া, সামনে তমসার গভীর মৌন।

'ভালো তো বাসতাম, ভালো তো বাসতাম'—ঘুরলো কান্না;
রাতের আবছাতে হঠাৎ চিঁহি-চিঁহি ঘোড়াটা ডাকলো।
'আমি তো নির্ব্যাজ, আমি তো নির্দোষ'—বুড়ো সে ঘোড়াটা;
বল্‌গা খোলা তার,—কারণ দেরি নেই সেটারও মরতে।

তখন নদীটার নিকষ দর্পণে জোনাকি লাখে-লাখ।
অনেক জগতের সাক্ষী আকাশের নিচে সে ঘোড়াটা।
মনেও পড়েনাক কবে সে ছিল কোন্‌ তাতার যোদ্ধার!

## যদি সে আকাশ পাই

**মণীন্দ্র রায়**

মানুষের পাখা নেই।
শূন্যতার পটে তাই নিজের হৃদয়
সামান্যই দেখে সে চিত্রিত।
অথচ মাটিতে জন্মে মাথা তার উঁচুতে, কাজেই
আকাশের প্রেমে নির্বাচিত।

এ-ডাক কোনো-না-কোনো মুখোমুখী দিনে
টোকা দেয় মায়াবী আঙুলে।
আর অকস্মাৎ দেখি বিপুল কামনা
হাতির উল্লাসে নেমে মনের দীঘিতে
জলক্রীড়া করে শুঁড় তুলে।

তখন থাকে না ভয়। সব অন্ধকার
অন্য কারো অস্তিত্বের ময়ূর কলাপ
মেলে ধরে। মেঘে মেঘে কাটে যত বেলা,
মনে হয় একা নই আর!

এবং পৃথিবী আজ
যদিও প্লোবের মতো ডোরাকাটা বিরোধী রেখায়,
সবারই পরমা গতি ঘরে,
দেখেছি তবুও কতো অন্তরীক্ষ পাশাপাশি মনে
—যখনি জানালা খোলে ঝড়ে!
যদি সে আকাশ পাই, মুখ দেখি প্রেমের দর্পণে॥

## অশেষ

**অরুণকুমার সরকার**

যৌবন যায়। যৌবনবেদনা যে
যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাত সাগরের দোলানি।
চেনামুখ আর দেখায় না কফিখানা;
নূতন শহর, পথঘাট নয় জানা,
বন্ধুরা মৃত, অপরিতৃপ্ত, গোঙানি।
তবু মুলে মুলে কার আঙুলের দোলানি

নবীন যুবক, বিদেশী তোমার ভাষা।
যুবতী, হৃদয়ে রেখেছ তো ভালোবাসা?
আমরা ছিলাম গত দশকের শিকলে।
মিছিলে সভায় আকুল সন্ধ্যাগুলি
যুদ্ধে, আত্মহননে গিয়েছে ভুলি
স্বাভাবিকতার কথিত সহজ সরলে।

শুধু পথ খোঁজা। স্বচ্ছ ডাইনে বাঁয়।
জারুল বকুল অবাক কলকাতায়
মাঝে মাঝে তবু হেসেছে চটুল নয়নে।

সেই নিমেষের অশেষ উত্তরীয়।
সব রমণীকে মনে হত রমণীয়
যাদুকরদের মেলা বসে স্লেত স্বপনে।

যদিও রঙীন মুহূর্তটুকু আঁচরে
অদৃশ্য ফের দুর্ভাবনার তিমিরে
যেখানে অর্ধসত্য ছলনা চাতুরি,
বুঝেছে অনেক গভীর রাতের মন
সেটুকুই ছিল আমাদের যৌবন
বাকিটুকু শুধু সমর-প্রভুর চাকুরি।

যুবক-যুবতী গুঞ্জন কলরব
হঠাৎ খুশির বেদনার সৌরভ
এনেছ আবার এ-কোন্‌ ভোরের কুয়াশা।
যৌবন যায়। যৌবনবেদনা-যে
যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে
মুলে মুলে কার বাসনাকরুণ দুরাশা।

# নিজের বাড়ী

**নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই শান্ত উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার—
সব-ই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
ইচ্ছেমতন জানলা-দুয়ার খুলতে,
ইচ্ছেমতন সাজিয়ে তুলতে
শান্ত, সুখী, একান্ত এই বাড়ি।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, চেয়ার, টেবিল,
আলমারিতে সাজান বই, ঘোমটা-টানা নরম আলো,
ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,
আলনা জুড়ে কাপড়-জামার
সুবিন্যস্ত সমারোহ, সব-ই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
দেয়ালে লাল হলুদ রঙের কাড়াকাড়ি
মুছে ফেলতে সাদার শান্ত টানে।
এই যে বাড়ি, এই ত আমার বাড়ি।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই ঠাণ্ডা উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার,
আলমারিতে সাজান বই,
ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,
টবের গোলাপ নরম আলো,
আলনা জুড়ে কাপড়-জামার
শৃঙ্খলিত সমারোহ, সব-ই আমার, সব-ই আমার।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে
হঠাৎ কোথাও চলে যাব।
ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,
যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে
বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
ওই যে বাড়ি, ওই ত আমার বাড়ি।

**রাম বসু**

কেঁদে উঠে চলে গেল আহত দিনান্ত
ক্রমশ বিলীয়মান ব্যর্থতার করুণ চিৎকার
অন্ধকার জমে স্তরে স্তরে
পাথরের ওপর পাথর।

পাখীদের সঙ্গ ধরে গাছ
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো জোড়া লেগে গহনার নাও
পাল তোলে উত্তরের মুখে, অবস্থান জুড়ে
রহস্যমদির এই ঘন অন্ধকার
জন্মাবার আশ্চর্য সময়।

যে সময় এতক্ষণ গরম ধাতুর মত
পুড়িয়েছে মাঠ বন মানুষের হাড় ও শহর
সে-ও এই অন্ধকারে জন্মান্তরে হ'ল
লোনা জলে টলমল গভীর সাগর
উজ্জ্বল মাছের মত ইচ্ছা স্বপ্ন খেলা করে দূরে।

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী, বস ওই পাথরের শ্যাওলার ধারে
মাটির জলের গাঢ় অন্ধকারে অন্ধ হয়ে গিয়ে
নিজেদের গভীরে তাকাও;

সেখানে প্রকাণ্ড লোক
ছায়া তার ছুঁয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ো থেকে সাগরের জল
কোমল কাদার মধ্যে পা ডুবিয়ে ছড়ায় হাওয়ায় বীজ
সেখানে নায়িকা তার রঙ যার পাতার মতন
ফেনার সৌরভ মুখে, দুই উরু ঘুমন্ত শশক
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে গান গেয়ে তুলে নেয় দান।

নিজের ভেতরে এই শুদ্ধ নগ্ন অন্ধকারে এসে
সময়ের অভিশপ্ত ক্রীতদাস ক্রীতদাসী বোঝ
কি করে ঘুমিয়ে থাকো ঝিনুকের ভেতরে গোপনে।

# তীর্থশিলা

**সুনীল চট্টোপাধ্যায়**

ঝরে যায় অঞ্জলির জল
শঙ্খশ্বেত শূন্য বেদীমূলে;
এক তৃষ্ণা কণ্ঠের সম্বল,
ব্যর্থ হবো, যদি যাও ভুলে।

সারাদিন সিক্ত শিলাময়
দলিত যে আরক্ত চন্দন,
যদি না সে সুরভিত [illegible]
হয় কোনো পূর্ণ আলিম্পন,—

এ-বন্ধনমোচন আমার
তবে তো সুদূরপরাহত,
রূপহীন শেষ অভিসার
হবে শুধু পাথরে প্রহত।

অঞ্জলির সাগরের জল,
মন্ত্রময় আকাশের স্বর,
চন্দনের ব্যথিত সম্বল
নাও; রাখি বেদীর উপর।

## শিকার

**গোবিন্দ চক্রবর্তী**

নীল শূন্যে ধাঁ-ধাঁ-করা সূর্য-উজাড়িত।
সে-ও ধ্যান করে, তবু
এই সূর্যাতীত
আরো এক নিবিড় নীলিমা।

স্বাতী-রেবতীর অন্তঃপুরে
কোনোদিনও যদি যায় জানা,
তারপরও র'য়ে যাবে—র'য়ে যাবে, র'য়ে যাবে
আরো ঢের নক্ষত্রের আকাশ অজানা;
হে রহস্য, তবু তুমি দূরে—চির দূরে।

দূরের দিগন্ত স'রে যায়—
মহাসাগরের জলে সাগর হারায়,
কত দ্বীপ-দ্বীপান্তর—মানুষ ও মহাদেশ
হয়নিক' আজো আবিষ্কার,
শ্রান্ত-ক্লান্ত আর ভোলা-দিক
ফিরে ফিরে আসে শুধু বিষণ্ণ নাবিক
বারবার পরাস্ত-শিকার।

এ শিকার, এ মৃগয়া হবে না, হবে না তবু শেষ।
ইতিহাস মূঢ়-মূক, সৃষ্টি নিরুদ্দেশ।
একই ধ্যানে আবর্তিত
ভবিষ্যৎ কি অতীত
সূর্য-স্বাতী-মানুষের উদ্দাম উদ্দেশ।

স্তব্ধ-করা সর্ব ক্ষুধা-দ্বিধা ঃ
মেলে-ধরা অভিনব, আশ্চর্য অভিধা—
আসেনাক' তথাপি আদেশ।

## প্রেমের কবিতা

**আনন্দ বাগচী**

রোদ্দুর যে-কথা বলে কানে কানে, ছায়া তাকি জানে,
কে মানস সুরধুনী পারে, আর কে এই শহরে
নিষ্ঠুর গদ্যের মত চালু আছে দশটায় পাঁচটায়,
চলেছে কর্মের স্রোত হয়ত বা মর্মের উজানে,
মৃত্যুর করুণ ছবি মাকড়সার জালে এসে পড়ে,
রোববারের বুকে কেউ বিলম্বিত লয়ে গান গায়।

কিছু বুঝি, কিছু তার বুঝি না বা, জনপদ বধূ
নাটকের অন্তরঙ্গে জন্মজন্মান্তর মালা গাঁথে
কেন; কার হাতে বাজে পৌত্তলিক কালের ডমরু
কেন সে দাঁড়ায় এসে ঘোর ঘনঘটা ধারাপাতে?
কি সুখ বেদনা পেয়ে, ব্যথা দিয়ে কি যে,
না ঘুমিয়ে সারা রাত, আশ্চর্য চোখের জলে ভিজে!

দিন আর রাত্রি যেন পরস্পর নায়ক নায়িকা
বুকে শূন্য ফুলদানী, চোখে অর্ধনারীশ্বর ছায়া॥

## আনন্দ ভৈরবী

**প্রমোদ মুখোপাধ্যায়**



কখনো রোদ্দুরে আর কখনো বৃষ্টিতে
তোমারই স্মৃতির সুর সাধি।
কতদিন গান ভুলে পথে পথে ঘুরি পরবাসী,
শুনিনা তোমার নাম আর কারো মুখে;
সবাই ভুলেছে সুর, ঊর্ধ্বশ্বাস ক্লান্তির পাড়ায়
বেতালা চীৎকারে মাতে; এ আসরে নেইক সঙ্গত,
তাল-কাটা এ-জীবনে মূর্ছাহত তোমার রাগিণী।

কিন্তু তুমি ভোলোনি তো। তাই মনে-পড়ার মতন
হঠাৎ ঘনায় মেঘ, ফুল্লরার বারমাস্যা গান
ভেসে আসে সজল হাওয়ায়,
সকল জনম ভরে আমার বুকের মাঝখানে
বাজো তুমি বৃষ্টির ঝঙ্কারে।

মুগ্ধ বাউলের মত আমি ছুটি সকলের কাছে—
বেঁধে নিই একতারার তার,
সকলের দোরে দোরে তোমারই স্মৃতির সুর সাধি'
মত্ত ভ্রমরের মত কখনো গুণ্‌গুণ্ করি কানে
মেঘের দাপট এনে কখনো বা মন্দ্রিত কণ্ঠেই
শোনাই কাহিনী—তুমি একদিন যা ছিলে, যা হবে।

বলি আমি তোমার কথাই—
প্রথম বর্ষার মত রিমঝিম শব্দের গুঞ্জনে,
বলি আমি সব অন্ধকার
সোনা রোদে ছেয়ে দিয়ে, ছেয়ে দিয়ে সমস্ত সংসার।

এই ভালোবাসা যেন অঙ্গে অঙ্গে প্রতি রোমকূপে
ফোটার উচ্ছ্বাস আনে; আমি যেন মঞ্জরিত তরু,
কিম্বা যেন একতারা; জানি তুমি, কেড়ে নাও সবই—
নিষ্ঠুর দরদে তবু আমার বুকের তারে তারে
বাজাও, বাজাও তুমি মন-মাতানো আনন্দভৈরবী।

## নদী

**দেবদাস পাঠক**

এ কোন্ দুরন্ত নদী দিনরাত মনের খেয়ালে
ভাঙে আর গড়ে তার দুই পার। চারটি দেয়ালে
কী করে পড়বে বাঁধা সেই নদী—নদী নয় মন,
যখন শ্রাবণে তার কূলে কূলে নেমেছে প্লাবন।

কখনও শান্ত তার স্থির জলে আকাশের মুখ
ভেসে ওঠে। নটী নয়, ধীরস্রোতা জীবনের সুখ
হয়তো পেয়েছে খুঁজে আশ্বিনে, থেমে গেছে ঢেউ,
এ-নদী সে-নদী নয়, দেখে আর চিনবে না কেউ।

তার সাথে ঘর করি, সে-মেয়ের নদী-মন যার,
এই সে খুশির ঢেউ ছলোছলো, এই মুখ ভার।
কতটুকু জানি তার—কতটুকু! শুধু সারা বেলা
পারে বসে থাকি আর দেখি তার নদী-নদী খেলা।

## দিবাস্বপ্ন

**অরবিন্দ গুহ**

দৃষ্টির সম্মুখে দেখি উদ্ভাসিত নব মহাদেশ,
বিশুষ্ক শরীর শোনে হৃদপিণ্ডের উল্লসিত ধ্বনি;
সমুদ্রের লবণাক্ত স্রোতাবর্তে ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লেশ
নিমেষে বিলুপ্ত হলো। এই সেই ইন্দুনিভাননী।

এই সেই মহাদেশ? আবিষ্কারকের অনুভূতি
আমাকে বিভ্রান্ত করে: চোখে দেখি বিচিত্র দীপালি;
আজ যেন ধন্য হয় পৃথিবীর প্রত্যেক প্রসূতি:
সব বন্ধ্যা বৃক্ষ হোক অবিলম্বে অতিপুষ্পশালী।

তারুণ্যের আকর্ষণে গৃহহীন; সমুদ্রের স্রোতে,
রক্তে, তীব্রতায় পলে-পলে সম্মিলিত পরমায়ু;
আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষার শরশয্যা হ'তে
যা প্রত্যক্ষ করি তা কি সুখস্পর্শ দিব্যগন্ধ বায়ু?

দিবাস্বপ্ন। চিত্তমোহ। আজ আমি খণ্ডিত, বহুধা।
সম্মুখে অখণ্ড সিন্ধু—ক্ষমাহীন ক্ষুধাহীন ক্ষুধা॥

## বৃদ্ধ নট

**বটকৃষ্ণ দে**

আমার সংসারে আমি, আর আমার মন। মুখোমুখি
ব'সে ব'সে সুখ দুঃখ গল্পে সল্পে সময় কাটাই,
কখনো সকালে দেখি জানালায় দেয় উঁকিঝুঁকি
কাঁচা-হলুদের রোদ, হাসিখুশি; আমিও পোহাই
স্মৃতির নির্জন সুখ!
আমি ও সে: দুজনে একদিন
যুগল বিহঙ্গী হয়ে ভেসেছি ইচ্ছার ডানা মেলে,
কখনো আঁধার রাত্রে প্রেমের প্রদীপ শিখা জেলে
হেঁটেছি দুজনে। বসন্তের মাসে, মধুর রঙীন
দুটি প্রজাপতি মন পাপড়ি-মৃণালে নাম লিখে
বসন্ত বাসর রচেছিলেম জীবন-মাঙ্গলিকে!

আজ? বার্ধক্যের স্মৃতি-সর্বস্ব হৃদয়! ম্লান চোখে
সমুদ্র-বিস্ময়! ভাঙা শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক, শামুক,
এধারে ওধারে দেখি! ভাবি, সময়ের কল্পলোকে
কোনটা সত্য, উত্তর-ঝড়ের স্মৃতি, না কি পূর্বসুখ?

## উদযান

**গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

তাকে দেখলাম—জলস্তম্ভে, উচ্চৈঃশ্রবা যেন,
কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের আলোর বল্গা তার—
ঊর্ধ্বে জ্বলেই মেলে দিলো পাখা বিপুল আকাঙ্ক্ষার!
জিজ্ঞাসি ভয়ে, 'উর্বশী, তুমি আকাশে উধাও কেন?'

ইথারে ইথারে রেখে গেলো গান সূর্যমুখীর ঝাড়,-
মাটিতে ছড়ালো চূর্ণ নগর, এবং আমার হাড়।

## উত্তরণ

**সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত**

রহস্যের কিছু থাক, খুলোনা অন্তিম যবনিকা
কী হবে ছড়িয়ে মুক্তো আমাদের এই উলুবনে
তুমি দেবে ফুলহার ছিন্ন হবে চকিতে সে-ক্ষণে;
আবরণ ছিন্ন ক'রে আলো তবু দাও বারে বারে।

হয়ত তোমার আশা ঋজু ধাতু কঠিন ইস্পাতে
দৃষ্টির অমোঘ দুর্গ উচ্চশির তাকাবে আকাশে
শিলাখণ্ডে চারুমূর্তি দীপ্ত হবে অমর্ত্য উদ্ভাসে
তোমার সৃষ্টির পথ খুঁজে পাবে মানব-শিল্পীরা।

তারা-ত জেলেছে আলো; তবু এক জড় অহঙ্কার
অদ্ভুত শরীর নেয়—তারি সেই ছায়া—অন্ধকারে
পিশাচের নৃত্য চলে স্বর্ণলঙ্কা জ্বলেছে হাজার
ত তুমি আলো দাও, তারা চলে অমেয় আঁধারে।
তোমার সৃষ্টির নদী নিরবধি কোটি কল্প শেষে
লেছে আশ্চর্যধারা, উত্তরণ সে-কোন নিমেষে?

## দ্বিতীয় সন্ধি

**দুর্গাদাস সরকার**

প্রথমে লজ্জিত হল। তারপর নত হল মুখ
হঠাৎ আমাকে দেখে। পায়ে পায়ে ভারী নীরবতা।
কণ্ঠের চঞ্চল ছন্দ স্তব্ধ, কেন বন্ধ হল কথা
তখনই জানবে বলে পাশে তার প্রেমিক উৎসুক।
ললাটে এয়োতি-চিহ্ন। আবৃত বুকের অগ্রভাগে
আরেক গোপন চিহ্নে গুপ্ত আছে প্রথম বেদনা।
একটি প্রাণের কুঁড়ি, তার সূক্ষ্ম নিগূঢ় চেতনা
নিহিত রয়েছে সত্যে বিবাহিত প্রেমিকের রাগে।
একদা সে সত্য ছিল, ছিল ঋণী আমারি প্রেমেই।
বসন গড়াতো তার। চম্পক অঙ্গুলি নমনীয়
আমার আঙুলে রেখে পরিয়ে সে দিত অঙ্গুরীয়।
কখনো মিলেছি তার প্রেমে হার মেনে নিমেষেই।

আজ সে লজ্জিত, নত। নীরব কথায় থরথর।
এক-পা এগোয় যদি—এক পায়ে পিছনে মন্থর।

## চিহ্নহীন

**উৎপলকুমার বসু**

দূরে যাওয়ার দুঃখ নেই।
তবু চলে আপন ছায়া দেখে
বেদনা কত গভীর হয়ে বাজলো।
দূরে যাওয়ায় দুঃখ নেই? শুনে অবাক
ভাঙা বাড়ি—রুগ্ণ বোন।

খাঁচায় বসা বহুদিনের পাখি
নতুন শেখা এই কথাটি
প্রতিবেশী নীল আকাশকে বলে
উড়ে যাওয়ায় দুঃখ নেই।

## একজন মৌলভী আমায়

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

এযেন গুল্মোর ডাল, আর আমি একটি বউল,
তার বেশি নই,
আমাকে বোলো না তুমি বোলো না রসুল,
আমি ফুটে উঠি আমি পথের ধুলোয় পড়ে রই।

আল্লা বুড়ো আল্লা এই গুল্মোরের গাছ,
তাঁর খুব উঁচু ডাল মহম্মদ পয়গম্বর,
দুজন দাঁড়িয়ে, দেখি চাঁদ আর সূর্য দুই তাজ
তাঁদের মাথায়, কিন্তু আমাকেই নিয়ে যায় ঝড়।

খোদার ইমান আমি কখনো রাখিনি,
হিসাব দিতে যে হবে, আমায় অথর্ব
করে দেবে ব'লে যেন একজোট পাপের ডাইনি;
এক-একা দিনে আমি তিনবার নমাজ পড়বো।

দিনে তিনবার, আমি একবার দুই হাত তুলে
তাকে বুকে নেবো, আমি তারপর হ'য়ে যাবো শিশু,
তাঁর বুকে যাবো ব'লে একেবারে হ'য়ে যাবো নিচু,
আমি যাঁর একটি বউল, সেই একটি বউলে

তাঁর বুক ভরে দেবো, আমায় কি ভাবো,
আল্লা আমি হাসিমুখে হঠাৎ কবরে চ'লে যাবো॥

## অসুখ

**প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়**

এই তো রোদ্দুর কাঁপে বিকেলের বিবর্ণ দেয়ালে।
জানালার ফাঁক দিয়ে উড়ে আসে কয়েকটি চড়ুই
তারপর ফিরে গিয়ে দোল খায় করবীর ডালে
টেবিলে শুকার শুধু একগুচ্ছ মল্লিকা ও জুঁই।

পড়ন্ত রৌদ্রের রেখা নিভে আসে, সন্ধ্যার আলোর
ভরে যায় সারা ঘর। সারা ঘরে আলো-অন্ধকার।
বিশীর্ণ শয্যায় শোয়া যুবকের শুধু মনে হয়—
এই নিয়ে তিন দিন, এলো না সে তবু একবার।

## আশ্বিন

**শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

নাম-না-জানা পাখির ডাকে সকাল হ'ল। আলো
স্মরণ থেকে মুছলো সে-জল অন্ধ অলস নিশির গোপন ব্যথা।
ছেঁড়া মেঘের নৌকাগুলি নিরুদ্দেশের রোমাঞ্চে স্বর্ণিল।
পথের মোড়ে হাওয়ার হাঁকাহাঁকি।
অকারণের শিউলীসুবাস গুনগুনিয়ে উঠলো রোদের মুখে।
কে আসে ওই জরির সাজে, গতবারের নতুন নিয়ে হওয়া
এই মেয়ে কী ফিরছে গাঁয়ে অধীর পায়ে খুশির জোয়ার তুলে—
একটি টানে ঘোমটা ঠেলে দিয়ে?

## ক্লান্তকাব্য

**মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্**

অধুনা মনের ক্লান্তিই শুধু আছে
বিকেলের নদী শোনায় না আর গান;
প্রগাঢ় প্রেমের প্রজ্ঞাহীনের কাছে
প্রতিদিনকার অমেয়-অভিজ্ঞান।

গোলাবী আকাশে সন্ধ্যার ছায়া নামে,
প্রজাপতি তার রঙছুট্ ডানা নাড়ে;
আহত-হৃদয় জৈবিক সংগ্রামে
ক্লান্ত তবুও দুঃসহতার ভারে!

ছুটবো কখন মায়াবী ডানার পিছে?
অথবা শুনবো দোয়েলের বাঁকা শিস্
সোনালী রুপালী রং রেখা হলো মিছে,
পলাতক মন শ্রান্ত অহর্নিশ!

গোধূলি যদিও রহস্য নিয়ে আসে—
অনুভূতিহীন হৃদয়ের সাড়া নেই;
নিষ্ফলতার করুণ হাহা-শ্বাসে—
মন্থনে মন হারিয়ে ফেলেছে খেই!

## নিশি-ডাক

**ফণিভূষণ আচার্য**

প্রতীক্ষাকে বুকে বেঁধে পড়ে থাক সে রমণী একান্ত আঁধারে,
এবং সূর্যকে বলি: ও-পথে যেয়ো না তুমি, পাছে
হঠাৎ রক্তের ঝড়ে যদি সে ভয়ার্ত বুকে অসহায় যৌবনের ভারে
চমকে ওঠে। তবু ভালো সে এখন প্রতীক্ষাকে
বুকে বেঁধে একান্ত আঁধারে পড়ে আছে।

আট্‌পৌরে শাড়িতে তার অঙ্গখানি ঢেকে রাখা দায়
নিরন্ত অঙ্গারে পুড়ে মুখ তার পোড়ামাটি পুতুলের মতো
নির্বিকার। স্নান সারে, অন্ধকারে চুল তার বাঁধে অবেলায়
নিতান্ত হেলায় এক নিস্তব্ধতা দিয়ে তার
দেহ থাকে বিলিপ্ত সতত।

হে শর্বরী, ক্ষমা করো, তুমি তাকে ঢেকে রাখো বুকে
যন্ত্রণার জিহ্বা যেন স্পর্শ তাকে করে না আগুনে
নিজেকে সে খুঁজে খুঁজে নির্জন প্রাচীরে মাথা ঠুকে
প্রতীক্ষাকে বুকে বেঁধে পড়ে থাক অন্ধকারে
সে রমণী অনন্ত ইচ্ছার জাল বুনে।

তবুও নিঃসঙ্গ ইচ্ছা ঘুরে ফিরে তার ভাঙা কুঁড়েটার পাশে
নির্জন পাখির মতো অন্ধকার ফুঁড়ে যেন ডেকে ওঠে,
তার কলস্বরে
চমকে উঠে সহসা সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে
ঘরের বাহিরে ছুটে আসে
কি জানি কি সর্বনাশে আঁধারে নিজেকে তার
বড়ো ভয় করে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

চল্লিশ বছর কাটিয়া যাইবার পর কোনও গুপ্ত কথারই আর ঝাঁঝ থাকে না, ছিপি-আঁটা বোতলের আরকের মত অলক্ষিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বিশেষত গুপ্তকথার স্বত্বাধিকারী যদি সামান্য লোক হয়। আমার তরুণ বয়সের বন্ধু ঘড়িদাস অসামান্য লোক ছিল না; তাই চল্লিশ বছর আগে তাহার গুপ্তকথায় যে বিচিত্র চমৎকারিত্বের স্বাদ পাইয়াছিলাম, তাহা হয়তো বহু পূর্বেই পানসে হইয়া গিয়াছে। সে এখন কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কিনা, কিছুই জানি না। সম্ভবত মরিয়া গিয়াছে; কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বয়স এতদিনে সত্তরের কাছাকাছি হইত। এত বয়স পর্যন্ত কয়জন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকে? তাই ভাবিতেছি, ঘড়িদাসের গুপ্তকথা এখন প্রকাশ করিলে অন্যায় হইবে না।

বাংলা দেশের প্রত্যন্তভাগে মধ্যমাকৃতি একটি জেলা-শহরে তখন বাস করিতাম। রাস্তায় মোটর গাড়ির চেয়ে ঘোড়ার গাড়ি বেশি চলিত; রাত্রে কেরোসিনের বাতি জ্বলিত। রেডিওর নাম তখনও ভারতবর্ষে কেহ শোনে নাই।

ঘড়িদাসের আসল নাম হরিদাস। তাহার একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান ছিল, তাই স্বভাবতই সকলে তাহাকে ঘড়িদাস বলিয়া ডাকিত। আমি যদিও ঘড়িদাসের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট ছিলাম, তবু তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আমার বয়স তখন ছিল উনিশ-কুড়ি; তাহার কাছে আমি দাবা খেলিতে ও সিগারেট খাইতে শিখিয়াছিলাম।

বাজারের মণিহারী পটির একপাশে ঘড়িদাসের দোকান ছিল। সামনে পিছনে দুটি ঘর। সামনের ঘরে দোকান, পিছনের ঘরে ঘড়িদাস বাস করিত। মনে আছে, তাহার বাসার ভাড়া ছিল সাড়ে চার টাকা। একবার তাহাকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সগর্বে বলিয়াছিল—'হাফ পাস্ট ফোর।' ঘড়িদাসের বিদ্যা ছিল স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত, কিন্তু সে সুবিধা পাইলেই ইংরেজি বলিত।

ঘড়িদাসের মা-বাপ ছিল না। এক মামা ছিল, কলিকাতায় চাকরি করিত; মাঝে মধ্যে ঘড়িদাসকে চিঠি লিখিত। তাহার বাসার আত্মীয়স্বজন কাহাকেও কখনও দেখি নাই। সকালবিকাল সে দোকানে একটি দেরাজ-যুক্ত জলচৌকির সম্মুখে বসিয়া ঘড়ি মেরামত করিত; বাকি সময়টা পিছনের ঘরে শুইয়া কাটাইত। আমার সহিত তাহার আলাপের সূত্র, পরীক্ষার আগে আমার এলার্ম ঘড়িটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার কাছে মেরামত করাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। সে মেরামত করিয়া দিয়াছিল, পয়সা লয় নাই। লোকটিকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। তারপর হইতে দুপুর বেলা অবসর থাকিলে তাহার ঘরে গিয়া আড্ডা দিতাম। লুকাইয়া ধূমপান ও দাবা খেলা চলিত।

একদিন জ্যৈষ্ঠের আম-পাকানো দুপুর-বেলা ঘড়িদাসের দোকানে গিয়াছি। দুপুর বেলা যদি কোনও খদ্দের আসে, এইজন্য সদরের দরজা ভেজানো থাকে। আমি তাহার দোকানঘর পার হইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম; সে তক্তপোষে লম্বা হইয়া একখানা পোস্টকার্ড পড়িতেছে। আমি বলিলাম—'এ কি ঘড়িদা, তোমাকে চিঠি লিখল কে? প্রেমপত্র নাকি?

ঘড়িদাস হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিল 'প্রেমপত্রই বটে। মামা কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছে, আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে।'

বলিলাম—বেশ তো, লাগিয়ে দাও। আমি বরযাত্র যাব।'

ঘড়িদাস বলিল,—'তুই ক্ষেপেছিস! যা আমার চেহারা, বৌ শেষকালে ছাঁদনাতলা

থেকে abscond করুক আর কি! ওসবের মধ্যে আমি নেই বাবা।'

বস্তুত ঘড়িদাসের চেহারা মনোমুগ্ধকর নয়। কালো রোগা লম্বা দেহ, হাড় বাহির করা মুখ, নাকটা মুচড়াইয়া একদিকে বাঁকিয়া আছে, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। তাছাড়া তাহার পা দুটোর দৈর্ঘ্যও সমান নয়, তাই সে বেশ একটু খোঁড়াইয়া চলে। এরূপ গুণী পাইয়া কোন মেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে সে সম্ভাবনা কম।

ঘড়িদাস চিঠিখানা বালিসের তলায় রাখিয়া বলিল,—'আয়, এক দান খেলা যাক।'

বিছানার উপর দাবার ছক পাতিয়া ঘুঁটি সাজাইতে সাজাইতে সে বলিল,—'মেয়েমানুষ ভারি ডেঞ্জারাস্, বিয়ে হয়েছে কি পট করে বাচ্চা! আমার মামার সাত মেয়ে তিন ছেলে, মাইনে পায় কুল্লে দেড়শো টাকা। মানে গড়পড়তা সাড়ে বারো টাকা per head! বাপস্! আমি একলা মানুষ, আমারই মাসে ত্রিশ টাকা খরচ!'

সে আমাকে একটা কাঁচি সিগারেট দিল, নিজে একটা ধরাইল। খেলা আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর লক্ষ্য করিলাম, অন্য দিন যেমন পাঁচ-সাত দান দিবার পরই সে আমার ঘুঁটি টিপিয়া ধরে আজ তাহা পারিতেছে না। মামার চিঠিখানা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে তাহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাৎ হইয়া গেলাম। ঘড়িদাস ঘুঁটিগুলি কৌটার মধ্যে ভরিতে ভরিতে বলিল,—'শশা, একটা কুকুরছানা জোগাড় করতে পারিস?'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কুকুরছানা কি হবে?'

সে বলিল,—'পুষব। বেশ একটা তুলতুলে লোমওলা কুকুরছানা। জানিস তো কুকুর হচ্ছে মানুষের best friend.'

আমি বলিলাম,—'কুকুর তুমি পুষো না, ঘড়িদা, ভারি ঘরদোর নোংরা করে। তার চেয়ে পাখী পোষো, কোনও ঝামেলা নেই।'

'পাখী!' ঘড়িদাস চিন্তা করিয়া বলিল, —'মন্দ বলিস নি। টিয়া পাখী! রাধা কেস্ট পড়বে। কিম্বা এক খাঁচা মুনিয়া পাখী—'

তখন আমার বয়স কম ছিল, ঘড়িদাসের পশুপক্ষী- প্রীতির মর্মার্থ বুঝি নাই।

আর একদিন দুপুরবেলা এমনি খেলিতে বসিয়াছি। সে দিনটা বোধ হয় ঘড়িদাসের জীবনে সব চেয়ে স্মরণীয় দিন। খেলিতে খেলিতে দুজনেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম; যে অবস্থায় দাবা-খেলোয়াড় 'কাদের সাপ?' প্রশ্ন করে আমাদের তখন সেই অবস্থা। তাই বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে প্রবেশ করিলেও মন পর্যন্ত পেঁছায় নাই। হঠাৎ যখন চমক ভাঙিল তখন ঘাড় তুলিয়া দেখি, একটি যুবতী শয়ন কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুজনে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সেকালে পথেঘাটে ভদ্রশ্রেণীর যুবতী চোখে পড়িত না, কদাচিৎ চোখে পড়িলে মনে হইত বুঝি অলৌকিক আবির্ভাব। হৃদয় রসায়িত হইত, কল্পনা জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়া দিত। এই যুবতীটি কিন্তু আমাদের অপরিচিত নয়, শহরের পথে বিপথে বিদ্যুচ্চমকের মত তাহাকে বহুবার দেখিয়াছি। সিভিল সার্জন সুব্রত ঘোষালের কন্যা প্রমীলা।

প্রমীলা ঘোষাল সত্যই সুন্দরী ছিল, কিম্বা আমরা অবরুদ্ধ কৌমার্যের চক্ষু দিয়া

প্রমীলা...স্মিত কটাক্ষপাত করিল।

তাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। মনে হয় তাহার গায়ের রঙ ফরসা ছিল, চোখে ছিল প্রগল্‌ভ চটুলতা; আর সারা গায়ে ছিল ভরা যৌবন। এ ছাড়া তাহার চেহারার সমস্তই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। তাহার একটি ছোট্ট মোটর-গাড়ী ছিল, সেটি নিজে চালাইয়া সে যখন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত তখন মনে হইত যেন একটা রোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই নিজে মোটর গাড়ী চালানোই ছিল তখন এক অপরিমেয় বিস্ময়। তাছাড়া জনশ্রুতি ছিল, সে সাহেবদের ক্লাবে গিয়া বলডান্স করে। সব মিলিয়া প্রমীলা ঘোষাল এক পরম রমণীয় রোমান্টিক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কল্পনাবিলাসী যুবকেরা ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিত।

এমন যে প্রমীলা ঘোষাল, সে ঘড়িদাসের শয়ন কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা নির্বাক, নিষ্পলক, প্রায় নিষ্পন্দ। তারপর বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,—'ঘড়িদাস কার নাম?'

ঘড়িদাস সূচীবিদ্ধবৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'আমি—মানে—আমি হরিদাস—'

প্রমীলা তাহার পানে চাহিয়া মুচকি হাসিল,—'কড়া নেড়ে সাড়া পেলুম না, তাই ভেতরে ঢুকেছি। আপনি ঘড়ি মেরামত করেন?'

ঘড়িদাস বলিল,—'হ্যাঁ—আমি—হ্যাঁ।'

প্রমীলা বলিল,—'আমার রিস্ট-ওয়াচটা চলছে না, আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন?'

ঘড়িদাস বলিল,—'রিস্ট ওয়াচ! হ্যাঁ পারব—নিশ্চয় পারব।'

প্রমীলার কব্জি হইতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিতেছিল, সে তাহা খুলিয়া ছোট্ট একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া ঘড়িদাসের হাতে দিল। ঘড়িদাস নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিল, দম দিয়া দেখিল, তারপর বলিল,—'মেন্-স্প্রিং ভেঙে গেছে।'

প্রমীলা বলিল,—'ও।—তা আপনি মেরামত করতে পারবেন তো? নৈলে আবার কলকাতা পাঠাতে হবে।'

'না না, আমি পারব।'

'আমার কিন্তু শিগ্‌গির চাই।'

'কাল পরশুর মধ্যে ঘড়ি মেরামত করে আমি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

প্রমীলা তাহার প্রতি স্মিত কটাক্ষপাত করিল,—'আপনি আমার বাড়ি চেনেন? ভালই হল, বাড়িতেই পৌঁছে দেবেন। বিল নিয়ে যাবেন, টাকা চুকিয়ে দেব।'

ঘড়িদাস কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। প্রমীলা একটু ঘাড় হেলাইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল, তারপর ফিরিয়া বলিল,—'ঘড়িটা দামী, দুশো টাকা দাম। আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, হারিয়ে টারিয়ে যাবে না তো?'

'না না, কোনও ভয় নেই—'

'আচ্ছা। কাল পরশুর মধ্যে নিশ্চয় যেন পাই।'

প্রমীলা খুট্‌খুট্ জুতার শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, ঘড়িদাস তাহার পিছন পিছন গেল। আমি ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইলাম, প্রমীলার মোটর চলিয়া গেল। তারপর ঘড়িদাস ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষের পাশে বসিল। তাহার মুঠির মধ্যে ঘড়িটা ছিল, মুঠি খুলিয়া সম্মোহিতের মত সেটাকে দেখিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—'ঘড়িদা, তোমার খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে দেখছি, প্রমীলা ঘোষালও নাম জানে!'

ঘড়িদাস একবার চোখ তুলিয়া ফিকা হাসিল, তারপর আবার ঘড়ির প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাজিটা শেষ করবে নাকি?'

[illegible]

একদিন খেলা শেষ করা যাবে।' বলিয়া ঘড়িদাস দোকানঘরে তাহার জলচৌকির সামনে গিয়া বসিল। চৌকির উপর কয়েকটা ঘড়ির অস্ত্রতন্ত্র ছড়ানো ছিল, সেগুলা এক পাশে সরাইয়া প্রমীলার ঘড়ি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিন দুপুরে ঘড়িদাসের কাছে যাই নাই। সন্ধ্যার পর পড়িতে বসিয়াছি, ঘড়িদাস আসিয়া উপস্থিত। মাথার চুল উস্কখুস্ক, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, নাকটা যেন আরও বাঁকিয়া গিয়াছে; খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—'ওরে শশা, সর্বনাশ হয়েছে, ঘড়িটা চুরি গেছে।'

'কোন্ ঘড়ি? প্রমীলা ঘোষালের ঘ...

'হ্যাঁ। এখন আমি কি করি?'

'চুরি গেল কি করে?'

'দুপুরবেলা কে ঘরে ঢুকে চু... নিয়ে গেছে। আমি শোবার ঘ... ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

'পুলিসে খবর দিয়েছ?'

'ও বাবা, পুলিসে খবর ... হয়তো আমাকেই ধরে হাজ... সিভিল সার্জনের মেয়ের ঘড়ি...'

'তবে কি করবে?'

'কি করব ভেবে পাচ্ছি ন... না।'

আমি কি বলিব ভাবিয়া

তখন ঘড়িদাস নিজে... দাম দিয়ে দেওয়া।... দাম দু'শো টাকা...

জিজ্ঞাসা ক... দিতে পারবে?'...

'কোথায় ?...

বাড়িয়ে টাক...

'তাহলে...

ঘড়িদ...

বলিল...

...হেব মফঃস্বলে ...ছেন। এই প্রথম ...প্রতিভাবান বাঙালী ...আগেই বিলেত থেকে ... উত্তীর্ণ হয়েছেন ...র্থনা করবার জন্যে ...বীণ অবাঙালী সাব- ...সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ...ব), থানার দারোগা, ...আর এসেছেন ... সাব-ডিভিশনাল ...একজন। স্টেশনের ...কার দাঁড়িয়ে আছে। ...র, একটি এস পির। ...য় ধনী ব্যবসায়ী ... এই তৃতীয় কামরাটি ...করছে। কারণ এটি ... ব্যবহারের বিশেষ ...

সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

...ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশন মাস্টার টিকিট কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও প্রতীক। লাল-পাগড়ি পুলিস, দারোগা, এস পি, এস ডি ও এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে আড়ময়লা-জামা-কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব ডিভিশনাল অফিসারের সামনে প্রগলভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস ডি ও, এস পি এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে' একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচিমুখ, নেহাৎ ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ মুখ থেকে। নেবেই এস ডি ও এবং এস পির সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছু দূর এসেই জিতেনবাবুকে দেখতে পেলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক হয়ে গেল সবাই।

এস ডি ওর দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব
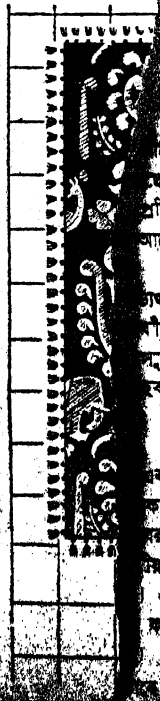
বললেন, "ইনি আমার বাবা—"। এস ডি ও এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরানীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হ'ল বলে ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস পি বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা জানতেনই না। বেশ অবাক হলেন। কিন্তু টুপিটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচার সম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট স্যর—"

এস পি তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস-ডি-ও সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস-পি বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাক বাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস-ডি-ও বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার আপিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো আজকাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল ফর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে' রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন সে কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও তাই না কি। তাহলে যাও তুমি ও'দের সঙ্গেই। কমিশনার সাহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না থাক, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস পি সাহেবের গাড়িতে চ'ড়ে চলে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

তাঁর পিছু পিছু এস-ডি-ও সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে পত্রে সজ্জিত যুগল মারোয়াড়ীর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে চলে যেতে হল। তোমার গাড়ির আর দরকার হ'ল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়িও চলে গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই যথাসাধ্য সাজিয়ে ছিলেন তিনি। চুনকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু পাতা আর রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে অলংকৃত করেছিলেন। একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। দু'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন এই উপলক্ষে।

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসেছিলেন।

"সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিস সায়েব টেনে নিয়ে গেল তাকে"

"তাই না কি—"

হতাশ হ'লেন দু'একজন, কেউ কেউ অবাক হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু'একজন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চলে' গেলেন একে একে।

সবাই চলে যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে' বসে রইলেন বারান্দার উপর খানিক-ক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন সে এসে তার কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

২

গভীর রাত্রি থমথম করছে চতুর্দিকে। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন

"বাবা—বাবা—"

দুয়ারের কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক ক'রে উঠে বসলেন জিতেনবাবু। এতরাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু—!"

"আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সায়েব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এতরাত্রে কি করে' এলি তুই—"

ঋক্‌বেদের যুগ থেকে শুরু করে ভারতের নাট্যশাস্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে নাচ ও গানের আলোচনামূলক কোন পূর্ণাঙ্গ বই না থাকায় তখনকার নাচের বিষয়ে সে-রকমের পরিষ্কার কোন ধারণা করা যায় না। তবুও তখনকার বৈদিক, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও শিল্পকলার ভিতরে নৃত্যকলার যে-সব উল্লেখ পাই তার থেকে তখনকাব সমাজে নৃত্যগীতের সমাদর বা চর্চা কি রকমের ছিল তার খানিকটা অনুমান করতে পারি। সেই সব থেকে সংগ্রহ করে তখনকার যুগের নাচের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

ঋক্‌বেদের (২০০০—১৫০০ খৃঃ পূর্ব) একটি সূক্তে আছে, উষা নর্তকীর মত রূপ প্রকাশ করছে। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, নর্তকীদের সেদিনের সমাজে সম্মান ছিল। ঋক্‌বেদে 'নৃত্যমানো অমর্ত্য' ও 'অগম নৃত্যের' কথা দুটি পাওয়া যায়। এর অর্থ হল অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা যে নাচ, তাই। আর এক ঋষি ঋক্‌বেদে বলেছেন, "আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্যগীত করে থাকি বলেই আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু পেয়েছি। কৃষ্ণ যজুর্বেদ-এ আছে মার্জালীয় অগ্নি জ্বলছে, তার চারিদিকে দাসী কন্যারা জলের কলসী মাথায় নিয়ে মাটিতে তালে তালে পা ঠুকে নাচছে। নাচের সঙ্গে গানও আছে। সে যুগের মেয়েরা গান [illegible] আসত
[illegible]

ব্রাহ্মণ বলছে যে, কতগুলি বৈদিকসূত্রের প্রধান অংশ ছিল নৃত্যগীতবাদ্য। যজ্ঞে পুরোহিতেরা নাচতেন। মহাব্রতের যজ্ঞে তরুণীরা যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে নাচত শস্য-উৎপাদন ও বৃষ্টি আনার জন্যে। এই উপলক্ষে পুত্রবতী সধবারাও নাচত। মন্দিরা বাজিয়ে নাচের উল্লেখও পাওয়া যায়। সে যুগে বীণাযন্ত্রের সঙ্গে নাচের একটি বিশেষ যোগ ছিল বলেই অথর্ববেদের ঋষি প্রশ্ন করেছেন যে, কে মানুষকে নাচ ও বীণা যন্ত্র দিল।

শুক্ল-যজুর্বেদের বাজসেনীয় সংহিতায় সূত শব্দের অর্থে বলা হয়েছে যে, যারা নাচে আর যারা গান করে তারা শৈলুষ। কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঠিক এর উল্টোটি আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, সূতেরা গান গায়, শৈলুষরা নাচে। কৌষিতকী ব্রাহ্মণ নৃত্যগীতবাদ্যকে বিশেষ কলা হিসেবে উল্লেখ করেছে। মৈত্রায়নীয় উপনিষদের এক স্থানে নট নিজের সাজের পরিবর্তন নিজেই করছে এবং নিজেই নিজের দেহে রং লাগাচ্ছে এই কথা বলা হয়েছে।

[illegible] শিবের প্রদোষনৃত্য

গৃহ্য সূত্রে বিবাহ উৎসবে চার বা আটটি বিবাহিতা নারীর নৃত্যের উল্লেখ আছে। সেইসব নৃত্যের সঙ্গে থাকত নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। সোমরস তৈরী করতে জানলে ও নাচে পারদর্শিতা লাভ করলে সে যুগের মেয়েদের সহজেই বিয়ে হ'ত বলে জানা যায়। কাত্যায়ন সূত্রের দ্বারা আমরা জানতে পাই যে, পিতৃমেধ যজ্ঞে নাচ গান বাজনা অবশ্য করণীয় বিষয় বলে গণ্য হ'ত। শতপথ ব্রাহ্মণ ও অনুপদ সূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে শিলালি নামে একজন নটসূত্রকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি (৩০০ খৃঃ পূর্ব) 'নৃৎ'—নৃত্য শব্দের ব্যাখ্যাকালে শিলালি ও কৃশাশ্ব নামে দুইজন নটসূত্রকের নাম উল্লেখ করেছেন। শিলালি ও কৃশাশ্ব শব্দ দুটি থেকে শৈলাল ও কর্শাশ্ব শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি। এই দুই শব্দের অর্থ নট। মহর্ষি কাত্যায়ন লিখিত বার্তিকে শৈলাল শব্দ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন শিলালি প্রায় চার হাজার বছর আগেকার নটসূত্রকার। বাজসনেয় সংহিতায় সূত ও শৈলূষ শব্দ পাই। শৈলূষ শব্দে নট বোঝায়।

পাণিনির পূর্বে নট শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। বৈদিক সাহিত্যেও নেই। পাণিনিতে শব্দটি এইভাবে আছে, 'নটদের ধর্ম বা শিক্ষারীতি'। কিন্তু পাণিনির সময় নৃত্য ও নাট্যে কোন পার্থক্য ছিল কি না জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় 'নট' ধাতুর অর্থ অভিনয় করা। পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে নট্ ধাতুর উল্লেখ আছে।

নৃত্যগীতযুক্ত নাটকের অভিনয় ভারতের একটি অতি প্রাচীন রীতি। প্রাচীন যুগের 'নট' অভিনয় ছাড়াও নৃত্য-গীত-বাদ্যে অভিজ্ঞ ছিল। নটী শব্দটি স্ত্রীলোক সম্পর্কে ব্যবহৃত হলেও নৃত্যগীত অভিনয় পটিয়সীদের প্রসঙ্গেই এই শব্দটির প্রয়োগ হ'ত। বৈদিকযুগের সাহিত্যে নাটকের পরিচয় আছে। যেমন ঋকবেদের যম ও যমীর বাদানুবাদ এবং পুরুরবা ও উর্বশীর কথোপকথন, উত্তর-প্রত্যুত্তরের ঢং-এ লেখা দেখে পণ্ডিতেরা বলেন যে, এরই উন্নততর রূপ হল পরবর্তী যুগের নাটক। যজ্ঞে পালা অভিনয়ও হ'ত। সোমব্রত নিয়ে কলহের অভিনয় দেখানো হ'ত। পণ্ডিতেরা নানা রকমের প্রমাণ থেকে অনুমান করেন যে, স্বর-সংযোগে এ-সব গাওয়া হ'ত এবং অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয় করা হ'ত লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টায়। কিন্তু নাটক বা নাট্য-শালার কোন উল্লেখ সে যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না বলেই পণ্ডিতেরা চিন্তিত। একমাত্র মৌর্য যুগে স্থাপিত, বর্তমান শিরগুজা অন্তর্গত রামগড় পাহাড়ে 'সীতাবেঙ্গা' ও যোগীমারা নামে যে গুহা আছে সে দুটি খৃষ্ট জন্মের প্রায় দু' থেকে তিন শত বছর পূর্বের একটি নাট্যশালা বা নৃত্যশালা। [illegible]

ঘুঙুর পরিধানরতা নর্তকী (পার্শ্বনাথ মন্দির, খাজুরাহো)

করেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখছেনঃ "গুহাতে নাচ গান আমোদের কথা কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঔরঙ্গাবাদে একটি বৌদ্ধ গুহাতে নাচের ছবি আছে। নাসিকে নাচগানের দুইটি গুহা আছে। জুনাগড়ের উপর কোট গুহাতেও নাচগান হইত। কুদা ও মহাড়ের গুহাতেও নাচগান হইত। এই দুটি গুহার তিন ধারে বসিবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়।

"রঙ্গালয়ে যক্ষলিপি থাকিবার নিয়ম। সীতাবেঙ্গা গুহার লিপি যক্ষলিপি বলিয়া অনুমান করা হয়। লিপিটি আছে ঢোকবার উত্তর পাশে গুহার মাথায়। ভিতরে ৬ ফুট উঁচু। মাঝে মাঝে ৬ ফুটের কম। গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারিপাশে উঁচু বেদী। গুহার প্রবেশ পথ ১৭ ফুট চওড়া। গুহাটি ৪৪½ ফুট। মাঝে ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া, ৬ ফিট উঁচু। চারিদিকে পাথর কাটা উঁচু মঞ্চাসন। তিনদিকে দুই সারি মঞ্চাসন। ভিতরের অংশ বাহিরের অংশের চেয়ে দুই ইঞ্চি উঁচু। যে দিকটার সম্মুখে প্রবেশ-পথের দিকে দুই সারি মঞ্চের (ডাব্‌ল বেঞ্চ) সেই দিকটা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। প্রবেশ পথের পশ্চাদ্‌ভাগের মঞ্চগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু; প্রাচীরের দিকে ছোট ছোট পাথরের কাটা মঞ্চাসন আছে। এই ক্ষুদ্র পাথরকাটা ডিম্বাকার নাট্যশালার সম্মুখে রঙ্গপীঠ স্থাপনের জন্য প্রচুর স্থান আছে। মঞ্চাসনে ৫০।৬০ জন দর্শকের বসিবার জায়গা হয়। অভ্যন্তরদেশে ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া একটি আয়ত চতুরাকৃতিবিশিষ্ট স্থান। তিনদিকেই পাথরকাটা সুপ্রশস্ত বসিবার জায়গা: এগুলি ২॥ ফুট উচ্চ, ৭॥ ফুট প্রশস্ত। সম্মুখভাগ কয়েক ইঞ্চি মাত্র নীচু করিয়া আসনগুলি চাতালের আকৃতি বিশিষ্ট করা হইয়াছে। প্রবেশপথের নিকটস্থ ভূমি আসনের কোণের ভূমির চেয়ে কিছু নীচু।"

যোগীমারা গুহার একটি প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে যে, সেটি হল দেবদীন্না নামে রূপদক্ষ এক পুরুষের সুতনুকা নামে একটি দেবদাসীর প্রতি প্রেম নিবেদনের স্পষ্ট উক্তি। দেবদাসীদের স্বাভাবিক বৃত্তি হল নৃত্যগীত ও অভিনয়। গুহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেইরূপ কোন এক নিপুণা নটীর পরিচয় চিরস্থায়ী করে রাখবার ইচ্ছায় তার প্রেমিক ঐ কাজ করেছেন।

কৌটিল্য হচ্ছেন খৃষ্ট পূর্ব ৪০০ বছর আগেকার লোক। তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে তখনকার দিনের নাচগানের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিবরণ বেশ কিছু পাই। তিনি লিখছেন, রাজপ্রাসাদে নৃত্যগীতাদিকলা-নিপুণা গণিকাকে যেন নিযুক্ত করা হয় প্রাসাদের নৃত্যগীতাদির সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার প্রধানা পরিচারিকারূপে। প্রাসাদের অন্যান্য গণিকারা তারই কথামত নিযুক্ত হবে এবং তারই তত্ত্বাবধানে প্রাসাদে বাস করবে। এছাড়া রাজধানীতে অন্যান্য গণিকা, নটী, নর্তকীদের গীতবাদ্য নৃত্য ও অভিনয় এবং আরো নানা রকমের কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে রাজসরকার থেকে উপযুক্ত বেতন দিয়ে গণিকা নিযুক্ত করতে হবে, সে নির্দেশও তিনি দিচ্ছেন। অর্থশাস্ত্রের একস্থানে আছে যে, নট্ অর্থাৎ নাচগান অভিনয় যাদের পেশা, রাজা যেন তাদের শিক্ষার জন্যে গণিকাপুত্র বা রঙ্গোপজীবীদেরই আচার্যরূপে নিযুক্ত করেন। অন্যদেশ থেকে নট ও নর্তকীরা যখন নাচগান অভিনয়াদি দেখাতে আসবে তখন তাদের কাছ থেকে যেন কর আদায় করা হয়।

বুদ্ধদেবের জন্মকাল খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ শতকে। তখন নাটক অভিনয়াদির প্রচলন খুবেই ছিল বলে জানা যায়। আমোদপ্রমোদের জন্য সর্বদাই সুন্দরী নর্তকীদের নিযুক্ত করা হত এবং তারা রাজ অন্তঃপুরেই বাস করত। এ-কথা বুদ্ধদেবের জীবনীতেই আছে। যৌবনে বুদ্ধদেবের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বহু নর্তকী নিযুক্ত করা হয় এবং তারা বুদ্ধদেবকে ঘিরে যে নাচ ও গান করেছিল তারও বর্ণনা পাই। মৌদ্‌গল্যায়ন, কাত্যায়ন, উপতিহাসা প্রভৃতি বুদ্ধের শিষ্যারা যে নাটকের অভিনয় করতেন বৌদ্ধ গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধজাতকে দেখি বড় বড় উৎসবে নৃত্যগীতবাদ্য হত। কার্তিকী পূর্ণিমা ছিল সে যুগে নৃত্য-গীতবাদ্যের একটি বড়রকমের উৎসব রাত্রি। ভট্টজাতকে উল্লেখ আছে যে, বোধিসত্ত্বের ছেলের কাছ থেকে নৃত্যগীতবাদ্যকারেরা প্রচুর অর্থ আদায় করত। তিনি ছিলেন নৃত্যগীতপ্রিয় এবং বিলাসী।

এ-যুগের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধজাতক সাহিত্যে গানবাজনার সঙ্গে গন্ধর্ব বা গান্ধর্ববিদ্যা শব্দের বিশেষ যোগ লক্ষ্য করেন। বৈদিক সাহিত্যে কোথাও গন্ধর্বদের গীতবাদ্যপটু সম্প্রদায় বলা হয় নি। সেখানে নৃত্যগীত-প্রিয়রূপে গন্ধর্বস্ত্রী অপ্সরাদের কথাই বলা হয়েছে। জাতকের যুগে গন্ধর্ব বলতে বোঝাতো গীতবাদ্যপ্রিয় এক সম্প্রদায় বিশেষকে এবং সেই সময়েই গন্ধর্বদের শব্দটির সৃষ্টি হল। যাকে বলা চলে নাচ গান বাজনার শাস্ত্র। এই যুগে বৌদ্ধরা যে ১৮টি শিল্পকলাকে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য করেছিল তার একটি ছিল গান্ধর্ব বিদ্যা।

গুপ্তিলজাতকে দেখি বোধিসত্ত্ব গুপ্তিল-কুমার নামে এক গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে গুপ্তিল গান্ধর্ব নামে বিখ্যাত হলেন। মুসিল নামে অপর একটি গন্ধর্বের সঙ্গে তার বাজনায় প্রতিযোগিতা হয়। গুপ্তিলের বাজনার সময় বহু অপ্সরা নৃত্যে যোগ দিয়েছিল। উচ্ছিষ্টজাতকে আছে বোধিসত্ত্ব নটকুলে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন এবং গন্ধর্ব বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

দীঘনিকায়, মহাবংশ এবং ধম্মপদ কথায় নর্তকী ও নাচের উল্লেখ আছে। বৈশালী নগরে আইন ছিল যে, নৃত্যগীত ও বীণা বাজনায় দক্ষ সুন্দরী মেয়েরা বিয়ে করতে পারবে না। জাতকে নাটকাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নটেরা অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্যাদি দ্বারা দর্শকদের চিত্তরঞ্জন করত তা জানা যায়। আবার এও জানা যায় যে, তুর্ফানে প্রাপ্ত, খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকের খ্যাতনামা বৌদ্ধ আচার্য অশ্বঘোষের দ্বারা রচিত 'শারীপুত্রপ্রকরণ' একটি বিখ্যাত

নৃত্যরতা নর্তকী (আদি নাথ মন্দির, খাজুরাহো)

নাটক এবং আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন নাটকের নমুনা হিসেবে এটি বিখ্যাত। তুর্ফানে নামহীন আরো দুটি নাটকের অংশ পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা তা দেখে স্থির করেছেন একখানি হলো রূপক, অপরখানি গণিকা-ব্যাপার নিয়ে লেখা। বৌদ্ধযুগের প্রথমদিকে **সমাজ** শব্দের অর্থ ছিল নাট্যাভি-নয়। 'সমাজ' শব্দটি ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ সাহিত্য ও বাৎসায়নের কামসূত্রে নাট্যাভিনয় অর্থে উল্লেখ আছে। অশোকের লিপিতে আছে, সমাজে নৃত্যগীত ও অন্যান্য আমোদ লোকেরা পেত। বাৎসায়নের কামসূত্রে নির্দেশ আছে যে, পক্ষান্তে বা মাসান্তে, দিনে সরস্বতী মন্দিরের পুজারীরা সমাজের ব্যবস্থা ও অন্য জায়গা থেকে অভিনেতাদের আনিয়ে যেন অভিনয় করায়। এই অভিনয়ের নাম ছিল 'প্রেক্ষণম্'। কণ্বের জাতকে দেখি সে সময়ে নটদের একটা দল ছিল, তারা নানা গ্রামে ও শহরে, অভিনয় করে বেড়াতো এ-যুগের মত মজুরো নিয়ে।

খৃষ্টপূর্ব যুগের পাথরে কাটা বা অন্যান্য ধাতুতে তৈরী মূর্তিতে নৃত্যকলার কিছু

মর্দলবাদক ও বীণাবাদিনী (দুলাদেব মন্দির, খাজুরাহো)

পরিচয় পাই। যেমন মহেঞ্জোদারোর ব্রঞ্জের একটি নারী মূর্তিকে সকলেই নর্তকীর মূর্তি বলে মনে করেন। হরাপ্পায় হাত পা ও মাথা ভাঙা পাথরের যে পুরুষ মূর্তিটি পাওয়া গেছে, তা দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সেটি একটি নর্তকের নৃত্যমূর্তি। সেখানে কয়েকটি মাটির সিলও পাওয়া গেছে। তার গায়ে খোদাই করা আছে নারী ও পুরুষের নৃত্যভঙ্গী।

শুঙ্গ যুগে স্থাপিত (১৮৫-২৯ খৃঃ পূর্ব) ভারুত স্তূপের গায়ে দুটি ভিন্ন রকমের নৃত্যের দৃশ্য দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিতে দেখতে পাই সারিবদ্ধভাবে চারিটি নর্তকী, তার বাঁ দিকে বসে বাজাচ্ছে একদল মেয়ে বাদিকার দল। আর একটি পাথরে দেখা যায় স্বামীকে খুসি করবার জন্যে স্ত্রী তার সামনে নাচছে। অন্যত্র আছে কিন্নর-নরনারীর আনন্দের নাচ। নাগরাজের মাথার উপরে নাচছে নাগস্ত্রীরা। এক জায়গায় আছে আগে পিছে দু'জন করে দাঁড়িয়ে দুই সারিতে চারটি মেয়ে, তাদের সামনেই আছে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি আর একটি নর্তকীর মূর্তি। এরই ডানদিকে বসে বাজাচ্ছে জনা ছয়েক মেয়ে। এদের মুখ দেখা যায় না। বাজাচ্ছে পিছন ফিরে। উড়িষ্যার উদয়গিরি পাহাড়ের গুহার মাথায় লম্বালম্বিভাবে পাথরের উপরে খোদাই করা যে কাহিনী আছে তার ডানদিকের শেষ অংশে দেখি একটি নর্তকী নাচছে। তার বাঁ পাশে বসে চারটি মেয়ে যন্ত্র বাজাচ্ছে। সাঁচী স্তূপের উত্তর প্রবেশ তোরণে খোদিত আছে কুশী নগরের মল্লদের নাচগানের দৃশ্য। বোম্বাই প্রদেশের 'কার্লা' ও 'ভাজা' নামে দুটি বৌদ্ধ গুহার প্রবেশদ্বারে দেখতে পাই দুই রকমের দুটি নর ও নারীর নৃত্যভঙ্গী। এগুলি সবই খৃষ্ট পূর্ব যুগের সৃষ্টি।

নাট্যশাস্ত্রের কিছু আগে স্থাপিত অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপে একটি জাতকের গল্প খোদাই করা আছে, তাতে দেখি নৃত্য ও গীতের একটি সুন্দর দৃশ্য। আর একটিতে আছে যে, যে-শ্বেতহস্তিটি স্বপ্নে মায়াদেবীর গর্ভে স্থান গ্রহণ করেছিল, সে রথে চড়ে পৃথিবীতে আসছে। তার চারিদিকে নৃত্যগীত ও বাজনার সমারোহ। অজন্তার দশ নম্বর গুহাভ্যন্তরে যেসব দেয়ালচিত্র আজও দেখা যায় সেগুলি খৃষ্ট পূর্ব প্রথম

নৃত্যভঙ্গিতে মন্দির পূজারী ও পূজারিনী (খাজুরাহো)

শতাব্দীতে আঁকা; এই হল পণ্ডিতের মত। সেই দেয়ালচিত্রের একস্থানে আছে নর্তকীরা নাচছে বাদিকাদলের সঙ্গতের সঙ্গে বোধি-বৃক্ষের তলায়।

রামায়ণ ও মহাভারতে নৃত্যগীতনিপুণা অপ্সরী, কিন্নরী, গণিকা, দাসী ও নর্তকীদের বর্ণনা পাই প্রচুর।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকালে যে উৎসব হয় তাতে গান করে গন্ধর্বরা, অপ্সরীগণ নৃত্য করে, আর নগরীর ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজপথগুলি সবই নট নর্তকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রামায়ণে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, যাতে নট ও নর্তকেরা সন্তুষ্ট হয়, সেই রকমের উৎসবগুলি ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকর সমাজগুলি অরাজক দেশে বৃদ্ধি পায় না। সে যুগে সৈন্যদের মধ্যে যে একপ্রকার নাচ ছিল রামায়ণে তার বর্ণনা পাই। তখনকার দিনের রাজারা যুদ্ধযাত্রার সময়ে সঙ্গে নট ও নর্তকগণকে নিতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন সূত্রধার, নট ও নর্তকগণকে যজ্ঞে আহ্বান করতে। বালীরাজার ও রাবণ রাজার অন্তঃপুরের নৃত্যগীতনিপুণা নর্তকীদের নানাপ্রকার বর্ণনা রামায়ণে পাই।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা নট নর্তকাদি দেখে সময় কাটাতে লাগলেন। বিরাট পর্বে দেখি অর্জুন বিরাট রাজাকে বলছেন, 'আমি গীতবাদ্য ও নৃত্য করে থাকি।' বিরাটরাজা তার উত্তরে বললেন, 'তুমি আমার কন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীগণকে তৌর্যত্রিক (নৃত্য, গীত ও বাদ্য) বিদ্যার শিক্ষাদান কর।' বিরাট রাজপ্রাসাদে একটি নর্তনশালা অর্থাৎ নাট্যশালা ছিল। সেখানে নাচ শেখানো হত। দ্রোণকে সেনাপতি করার পর সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তবগীতি ও জয়ধ্বনির সঙ্গে সৈন্যরা যে নেচেছিল তার কথাও আছে। মহাভারতের যুগে যুদ্ধশিবিরে নর্তকদের রাখা হত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় নর্তকগণের নৃত্যাভিনয় দ্বারা সভার শোভা বর্ধন করা হয়।

মোটামুটিভাবে এই হল নাট্যশাস্ত্র রচনার আগেকার ভারতবর্ষের নানা যুগের নাচ বা নৃত্যাভিনয়ের পরিচয়। এইসব সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই অনুমান করতে পারি যে, নাচ গান বাজনা খুবই উন্নত ছিল, তার বিশেষ চর্চা হত, সেই সব যুগের মানুষের সমাজে নৃত্য-গীত একটি আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য হত এবং তখনকার সমাজ এইসব কলার শিল্পীদের খুবই সমাদর করত। কিন্তু এত সমাদর সত্ত্বেও পেশাদারী নর্তক ও নর্তকীর জীবনযাত্রার দ্বারা উদ্ভূত সমাজের নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখে একদল সব সময়েই পেশাদার নর্তক ও নর্তকীদের ঘৃণা করেছেন। তাদের নিন্দা করতে গিয়ে নৃত্য-গীতবাদ্যের প্রতিও বিরূপ ছিলেন। তাদের

নানাপ্রকার বিরুদ্ধ উক্তিই একথার সাক্ষ্য দেবে।

স্নাতকদের পক্ষে নৃত্যগীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠানে যোগদান বা তার অনুশীলন বৈদিক যুগে নিষিদ্ধ ছিল। বেদে আছে নচিকেতা যমকে বলছে যে, ধন ঐশ্বর্য ইত্যাদি ভোগবিলাস ক্ষণস্থায়ী, মানুষের ইন্দ্রিয় সকলের তেজ নষ্ট করে। অতএব তোমার নৃত্যগীত তোমারই থাক।

কৌটিল্য নিজেও যে নট ও নর্তক সমাজের লোকদের ভাল চোখে দেখেননি তাঁর অর্থশাস্ত্র বইটিতে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। সেই শাস্ত্রের গণিকাধ্যায় অংশে গণিকাদের জীবনযাত্রা ও পেশা বিষয়ে নানাপ্রকার নিয়ম ও আইনকানুনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এই নিয়মগুলি সমানভাবে পেশাদার নট-নটী ও নর্তক-নর্তকীদের বেলায়ও প্রযুজ্য। অর্থাৎ গণিকা ও নটনটী সকলকেই তিনি একদলের বলে মনে করতেন। কোন জনপদে পেশাদারী নাট্যশালা, নট, নর্তক, গায়ক, বাদকের দলকে স্থায়ীভাবে বাস করতে দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। তার কারণ হল এদের আবহাওয়ায় গ্রামবাসী পুরুষেরা নিজ নিজ কর্মে অবহেলা করবে। নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি কোন জনপদবাসীরা স্ত্রীলোকদের দিনের বেলায় বা রাত্রে কেবল স্ত্রীলোকদ্বারা বা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের দ্বারা প্রযুজ্য কোনপ্রকার নাট্যাদি দেখে তাহলে তাদের দন্ড দিতে হবে এই বিধান তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, জনপদে নট নর্তকাদিরা বর্ষাকালে বাস করবে, কারণ এই ঋতুতে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত অভিনয়াদি

কার্লা গুহায় নৃত্যভঙ্গিমায় নট ও নটী

দেখানোর বড় অসুবিধা। কিন্তু তাই বলে সেই সময় জনপদবাসীদের কাছে নৃত্যগীতাদির প্রদর্শনীর দ্বারা তাদের সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চেষ্টা করলে এই নট ও নর্তকরা আইনত দণ্ডার্হ হবে। আর একস্থানে বলেছেন যে, কুশীলব কর্ম অর্থাৎ নট ও নর্তকাদি কর্ম করবে কেবল শূদ্রেরা। কৌটিল্যের এই সব অনুশাসন থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে নট নর্তকাদি কর্মকে তখনকার লোক ভালবাসত। কিন্তু তাদের প্রভাব থেকে সমাজকে বাঁচাবার প্রয়োজনে ঠেকাতে হয়েছিল।

বৌদ্ধযুগের গোড়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন নাচ, গান, বাজনা ও অভিনয়াদিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। রামায়ণে বলা হয়েছে যে, দশবিধ কামজ দোষের মধ্যে পড়ে নৃত্যগীতবাদ্য। সম্রাট অশোক তাঁর এক শিলালেখনে 'পেক্ষা' অর্থাৎ নাটকাভিনয় দর্শন নিষেধ করেছিলেন। মহাভারতের এক গল্পে আছে যে, বিত্তসঞ্চয় রক্ষাকারী পুরুষেরা স্বত্বর হয়ে আনর্তবাসী নট নর্তক ও গায়কগণকে নগর থেকে বের করে দিলেন। মনুসংহিতার নির্দেশ হল, ব্রহ্মচারী যেন নৃত্যগীত না করে অথবা বাজনা না বাজায়। গীতবাদ্য উপজীবী ও যারা নটবৃত্তি করে তাদের অন্ন গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। একস্থানে বলা হয়েছে যে, নট ও নর্তকরা নীচ লোক। এইরূপ আরো নিন্দার কথা নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে।

সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতের নৃত্য আন্দোলনের এই পরিচয়টুকু থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বৈদিক সাহিত্যে পেশাদারী নৃত্যের চেয়ে অপেশাদারী নাচের উল্লেখই বেশী। তেমনি পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে ও শিল্পে অপেশাদারী নৃত্যের চেয়ে পেশাদারী নাচের কথাই অধিক বলা হয়েছে।

'পালা বলছি এখান থেকে! শয়তান কোথাকার!" কাস্তে তুলেছে শীতল কুকুরটাকে ভয় দেখানর জন্য।... 'বাবু-ভাইয়াদের' বাড়ির হাতায় ছাড়া, কাস্তে দিয়ে কাটবার মত বড় ঘাস পাওয়া যায় না। আজেবাজে লোকের গরু-ছাগলে খেয়ে যায় খোলা মাঠের ঘাস।...... যারা বেঁধে গরুকে ঘাস খাওয়ায় না, গরু বাঁধে শুধু দুধ দুইবার সময়—দেখতে পারে না শীতল দু চক্ষে ওই সব 'খাড়-কেলাসী' লোকদের!...বাবু-ভাইয়ারা আবার খুরপি দিয়ে ঘাস ছিলতে দেয় না হাতার মধ্যে; বলে, ধুলো উড়বে। নে বাবা, ভগবান তোদের দু হাত ভরে দিয়েছে—যা বলিস তাই সাজে! জমি থেকে ধুলো উড়বে না তো কি আটাময়দা উড়বে?...কত রকমের লোক যে আছে দুনিয়াতে! হাতার ঘাসে খুরপি চালাতে না দিলেই কি আর ভদ্রলোক হওয়া যায়। অন্যের কাটা ঘাসের অর্ধেক যারা চায়, তারা আবার ভদ্রলোক কিসের!...তবে তার নিজের কথা আলাদা। তার কাছ থেকে ঘাসের অর্ধেক আজ পর্যন্ত কোন বাবুভাইয়া চায়নি। ...একবার কাটা ঘাসের ভাগ চেয়ে যেন দেখে তার কাছে! তা ছাড়া সে নিজের অভিজ্ঞতায় জানে যে, কেউ তাকে চটাতে চায় না—ভালবাসুক আর না-ই বাসুক। ......না না, বাবুভাইয়ারা তাকে ভয় করতে যাবে কেন—ভালবাসে। ভাল না বাসলে কেউ কি বাইরের লোককে নিজের হাতার মধ্যে ঢুকতে দেয় রাতদুপুরে? সে তো চিরকাল ঘাস কাটে রাত্রিতে—ভাটিখানা থেকে ঘুরে আসবার পর। তাই না লোকে বলে যে সে জন্তুজানোয়ারদের মত, দিনের চেয়ে রাত্রির অন্ধকারে ভাল দেখতে পায়।...ভুলে কাস্তেটা ফেলে এলে বাবু-ভাইয়ারা পরের দিন ডেকে ফেরত দেয়।... ভাল না বাসলে কি আর উকিলসাহেব পরশু দিন ও কথা বলতেন। তিনি বলেছিলেন, "বর্ষার জঙ্গলে রাত্রিতে ঘাস কাটিস শীতল;— কোন দিন সাপের কামড়ে মরবি।"...আরে, সাপও জঙ্গল থেকে এসেছে, মানুষও জঙ্গল থেকে এসেছে।...

কুকুরটা তার সঙ্গে খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে। সে ছোট ছোট বোঝা করে যে ঘাস কেটে রাখছে, কুকুরটা সেগুলোকে ছিটিয়ে ফেলছে, তার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে।

"খেলা পেয়েছিস—না? পালা বলছি! শুনছিস না তবু! দাঁড়া, ধরে তোর হাড়-গোড় ভাঙছি!"

ধরতে গেলে কুকুরটা পালায় না। চিত হয়ে পা চারখানা আকাশের দিকে তুলে দেয়। একটু আদর চায়। ছোট ছেলে-পিলেদের যেমন করে 'আশ-মোড়া পাশ-মোড়া' দেয়, তেমনি করে শীতল, কোণা-কুনি দুটো করে পা এক এক সঙ্গে দুমড়ে ধরছে কুকুরটাকে।

—"এবার কেমন জব্দ! আর করবি? আবার হাসা হচ্ছে—বদমাশ কোথাকার!"

নিশ্চয়ই সে কুকুরের হাসি চেনে? কুকুররাও যে তাকে নিজেদেরই একজন বলে ভাবে তাতে ভুল নাই। গায়ের গন্ধ থেকেই হবে বোধহয়। সে পারতপক্ষে স্নান করে না—লোকে বলে নেশার রঙ কেটে যাবার ভয়ে। ময়লা চিরকুট কাপড়-খানাকে কাচে না কেন তা' সে-ই জানে। ওই কাপড়ের গন্ধ, গায়ের ঘামের গন্ধ, অষ্টপ্রহরের গাঁজার গন্ধ, আর সাঁঝের পরের মদ তাড়ির গন্ধ, সব মিলিয়ে কি যেন একটা আপন আপন জিনিস খুঁজে পায় কুকুররা তার মধ্যে।

"আচ্ছা আর এখন না। অনেক হয়েছে। আমার আজকে বড় তাড়াতাড়ি। এখনই জজ সাহেবের বাড়ি যেতে হবে। চুপটি করে শুয়ে থাক।"

কুকুরটাকে দুটো চাপড় মেরে সে আবার ঘাস কাটতে বসে।

"জিমি। জিমি!"

উকিলবাবু কুকুরটাকে ডাকছেন বাঁধবার জন্য। কান খাড়া হয়ে উঠেছে জিমির। কম্পাউণ্ডের পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে গেল ধরা না দেবার মতলবে।

শীতলের ঠোঁটের কোণে দুটো রেখা

পড়ল—ত্রস্ত চাউনি আর ধূর্ত হাসি থেকে সে মতলব বুঝেছে কুকুরটার। উকিলবাবুর ছেলে হাতে শিকল নিয়ে জিমির খোঁজে সেখানে এসে দেখে যে, শীতল গভীর অভিনিবেশের সংগে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ঘাস কাটছে।

"আজ এখন যে?"

রাতে মদের দোকান থেকে ফেরবার পর আরম্ভ হয় তার ঘাস কাটা। সারারাত মাঝে মাঝে ঘুময়, মাঝে মাঝে গাঁজা খায়, মাঝে মাঝে ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাস কাটে। কিন্তু শীতল আজ এসেছে সকাল বেলায়।

—"জজসাহেবের বাড়িতে এখনই যে ঘাস দিয়ে আসতে হবে আজ।"

জজসাহেব কথাটার উপর দরকারের চেয়েও একটু বেশী জোর দিয়ে বলা।...... বাবুভাইয়াদের সংগে সে অনেক কাল কাটিয়েছে। দেখেছে তো। কার বাড়ির জন্য ঘাস, সেইটা শোনবার পরই তাঁদের কথার ঝাঁজ মরে আসে। সবাই জজসাহেবের নামে কাবু। উকিল, মোক্তার, আমলা সবাই ঝুঁকে সেলাম করে জজসাহেবকে। করবে না? আরে জজসাহেব যে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় হাকিম—কলেক্টর সাহেবের চেয়েও বড়। সেই জজসাহেবের এজলাসের 'পাংখা-পুলার' সে, তার উপর সাহেবের বাড়িতে ঘাস দেয়। তাই না সাহেবের সংসারের খবর, উকিল মোক্তাররা কত সময় তার কাছে জিজ্ঞাসা করে। সেইজন্যই না অন্য 'পাংখাপুলার'রা হিংসা করে; চাপরাসীরা সমীহ করে কথা বলে। আমলারা পর্যন্ত খাতির দেখায়—মেমসাহেবের কাছে গিয়ে শীতল আবার কার নামে কি লাগাবে সেই ভয়ে।

"এত তাড়াতাড়িটা কিসের আজ?"

"ছুটির দরখাস্ত দেবো, মেমসাহেবের কাছে।"

আরদালীরা মুন্সেফ, সাবজজের স্ত্রীদের মাইজীই বলে চিরকাল। তাই স্বামী জজসাহেব হবার পর থেকে মেমসাহেব কথাটা বেশ ভাল লাগে জজপত্নীর। মেমসাহেব লোক ভাল। সস্তায় ঘাস দিয়ে সে প্রথম খাতির জমায় মেমসাহেবের সংগে। অবশ্য ড্রাইভার সাহেবের সুপারিশও ছিল। জজগৃহিণী আধপাগলা লোকটাকে মধ্যে মধ্যে খেতে দেয়। সাহেবের একটা পুরনো কামিজও শীতকালে দিয়েছিলেন। ছিঁড়ে ঝুলিঝুলি হয়ে গেলেও এই গ্রীষ্মকালেও শীতল ছাড়েনি সেটাকে।

"কালকে তো রবিবার রে।"

"এ কি তোর উকিল মোক্তার পেয়েছেন! গভর্নমেণ্টের চাকুরেরা কি বিনা অনুমতিতে রবিবারে সদর থেকে বাইরে যেতে পারে?"

উকিলবাবুর ছেলে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করে—

"ক' দিনের ছুটি?"

"একদিনের। শুধু সোমবারের।"

"কেন রে?"

"দেশে যাব।"

"মোটে একদিনের জন্য?"

"হ্যাঁ জরুরী কাজ। আজকে শনিবার—আজ যাব আর মংগলবার সকালে ফিরে আসবো।"

"বাড়ি কোথায় রে তোর?"

"শাপুর-পটৌরী। নাম শোনেননি? এখান থেকে যেতে রেলগাড়িতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"

"তুই আবার দেশে যাস নাকি? শুনি তো যে তুই আর তোর বন্ধু কখনও দেশে যাস না।"

"ঠেলায় পড়লে শীতলের বাপকে পর্যন্ত যেতে হয়—এ তো শীতল। আমার কথা বাদ দেন, কিন্তু ও লক্ষ্মীছাড়াটার যে বউ আছে, মেয়ে আছে, তবু যায় না।"

এত এখানকার জীবন-পরিবেশের সংগে এই বিচিত্র লোকটি জড়ানো যে, শীতলের যে আবার অন্য কোথাও একটা দেশ থাকতে পারে, একথা এখানকার লোকে ভুলে গিয়েছে। শুধু ওর বন্ধুর মারফৎ লোকে এক সময় শুনেছিল যে ছেলেবেলায় শীতল কুমোরের কাজ করত, তারপর ওর বউ ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন থেকে আর বড় একটা দেশে যায় না সে।

"তোর কপালে ওটা কিসের দাগরে? পড়ে-টড়ে গিয়েছিলি?"

শীতল হাসল।

"ইয়ার-দোস্তের হাসিঠাট্টায় চোট লেগে গিয়েছে।"

"তোর ইয়ার-দোস্ত বলতে তো জজসাহেবের ড্রাইভার নথুনী।"

"হ্যাঁ, সেই শালাটার কথাই বলছি!"

একটু এগিয়ে গিয়ে সে থাবড়ি খেয়ে বসল নতুন জায়গায় ঘাস কাটতে। জানিয়ে দিল যে, সে ও প্রসংগের আলোচনা করতে চায় না, উকিলবাবুর ছেলের সংগে।

শীতলের পায়ের দিকটা ঠিক স্বাভাবিক আকৃতির না। এক পা ছড়িয়ে আর এক পা দুমড়ে থাবড়ি খেয়ে না বসলে সে ঘাস কাটতে পারে না।

উকিলবাবুর ছেলে একটু অবাক হয়, তাকে নথুনীর সম্বন্ধে ও রকম ভাষায় কথা বলতে দেখে। বয়সে ছোট হলেও নথুনীই শীতলের একমাত্র বন্ধু। একজনকে না হলে আর একজনের চলে না; সকলে বলে মাণিকজোড়। নথুনীর পদমর্যাদা বাড়াবার জন্য অন্য লোকের সম্মুখে শীতল তাকে ড্রাইভার সাহেব বলে ডাকে।

...রাত্রিতে ঝগড়া হয়েছে বোধহয় দুইজনের মধ্যে।...

"জিমি! জিমি!"

কুকুরের খোঁজে চলে গেল উকিলবাবুর ছেলে।

কাছারিতে ঘড়ি বাজছে ঢং ঢং করে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট—শীতল আটবার মাটিতে কাস্তে ঠুকে গোনে। আটটা বেজে গেল এরই মধ্যে! চোখের উপর হাত রেখে সে সূর্যের দিকে তাকাল একবার। তারপর সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। একটু যেন হাতের ভর দরকার হল ওঠবার সময়। এতক্ষণে দেখা গেল তার সম্পূর্ণ চেহারাটা। কোমরের থেকে নীচের অংশটা উপরের অংশ থেকে অনেক ছোট। হাঁটুর কাছটা একটু বেরিয়ে এসেছে, ধনুকের মত। পায়ের ফাঁক ফাঁক আঙুলগুলোও ভিতরের দিকে বাঁকানো—পা ফেলবার সময় বুড়ো আঙুলের ডগা দুটো যেন ঠেকতে চায়। বসা অবস্থায় তাকে বেঁটে বলে মনে হয় না; কিন্তু দাঁড়ালেই বোঝা যায় যে সে বেঁটে। পায়ের দিককার দুর্বলতা পুষিয়ে দিয়েছে, উলকিতে ভরা শরীরের উপর দিকটা। এতখানি চওড়া বুকের পাটা। কাঁধের আর হাতের পেশীগুলো ঢেউখেলানো ইস্পাতের মত। একরাশ রুক্ষ বাবরি চুলে ভরা মাথাটা সিংহের মাথার মত দেখায়। আর তাকানো মাত্র বোঝা যায় যে অসীম শক্তি লোকটার গায়ে; এক ফালি কাস্তের বদলে যেন এর হাতে একটা গদা থাকলে মানানসই হত; মাথায় ঘাসের বোঝার বদলে গন্ধমাদন পর্বত। সাধে কি আর পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে ভয়ে চোখ বুজে ফেলে।

শীতল ঘাসের বোঝা নিয়ে হেলতে দুলতে চলেছে। পিছনে দুটো কুকুর। আরও একটা কুকুর ছুটে এল গন্ধ পেয়ে। লেজ নাড়াতে নাড়াতে গা শুঁকছে তার।

"কি রে বদমাশ! কাছারি? উকিল বালিস্টার হবার শখ বুঝি?"

শীতলকে দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে। একজন বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।......দেখে দুঃখ হয় আবার হাসিও আসে।

"শীতল! ও শীতল!"

একটি বড় ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে।

"শীতল, এটা আমাদের আমগাছতলায় শুকনো পাতার নীচে থেকে পেয়েছি।"

হাতে একখানা মরচেপড়া কাস্তে। কাঠের বাঁটের প্রায় সমস্তটাই উই-এ খেয়ে গিয়েছে। ছেলেটা জানে যে এ কাস্তে শীতলের না হয়ে যায় না। কত কাস্তে

যে ওর কত জায়গায় গোঁজা আছে তার ঠিক নাই। রাতদুপুরে ঘাস কাটবার পর বেশ গুছিয়ে লুকিয়ে রাখে। নেশা কাটবার পর পরের দিন সকালে আর মনে থাকে না। তখনই হয় বিপদ। অস্থির হয়ে এ-বাড়ি, সে-বাড়ি খুঁজে বেড়ায়—আর অনর্গল অজ্ঞাত চোরের উদ্দেশে গালি পাড়ে। তারপর কি করে যেন নতুন কাস্তে কিনবার পয়সাও জুটিয়ে নেয়। নেশা আর কাস্তের জন্য পয়সা চুরি-চামারি যেমন করেই হক, তাকে জুটিয়ে নিতেই হয়।

একগাল হেসে সে ছেলেটির হাত থেকে কাস্তের ফালাটা নেয়। কাটা-কাটা দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে হলদে হলদে দাঁত-গুলো বেরিয়ে আসে। বনমানুষের মত মুখখানা আরও কুৎসিত হয়ে উঠেছে কপালের দাগটার জন্য।

"পাকা ইস্পাত এটা। জজসাহেবের হাওড়াগাড়ীর স্প্রিং থেকে তয়ের করিয়েছিলাম এটাকে। খোকাবাবু তুই বড় হলে জজসাহেব হ'স, বুঝলি!"

"জজসাহেবের ড্রাইভার নিশ্চয়ই তোকে গাড়ির স্প্রিংটা দিয়েছিল?"

গম্ভীর হয়ে গেল শীতল। মরচেধরা কাস্তেখানাকে দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে আবার চলতে আরম্ভ করে। ...যাক, এখান পেয়ে ভালই হ'ল! তার যে আজ পয়সার দরকার। কাল পরশু যে রোজগার বন্ধ থাকবে।...রেলের টিকিট অবশ্য সে কখনও কেনেনি আজ পর্যন্ত। আর ছোট কলকেতে টান মারতে দেবার লোক এক আধটা জুটেই যায়, রেল-গাড়িতে।......তবু ভালই হ'ল বলতে হবে!......

পাশের বাড়ির জানালায় দিদি ভয় দেখাচ্ছে দুষ্টু ভাইকে।

"চুপ কর বলছি! দেবো ধরিয়ে শীতলের কাছে! শীতল ধরে নিয়ে যা তো খোকাকে, ঘাসের বোঝার মধ্যে ভরে! তখন থেকে কাঁদছে!"

হলদে দাঁতগুলো বার করে শীতল এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

"কি খোকা—কাছারিতে যাবি আমার সঙ্গে? পান খাওয়াব তোকে সেখানে, পানের দোকানে।"

যেন মেলা দেখাতে নিয়ে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। এই হচ্ছে শীতলের আন্তরিক আদরের ভাষা। কোন ছেলেপিলে আজ পর্যন্ত তার এই আদরের ডাকে সাড়া দেয়নি। শুধু পাড়ার কুকুরগুলো তার দৌলতে আদালতের কম্পাউন্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

তার আদরের ঘটায় দিদির কোলে খোকার কান্না বেড়ে গেল।

"আরে খোকা খোকাবাবু—তোকে টেকিস হ'তে হবে না—তোকে জজসাহেব করে দেবো—কাঁদিস না।"

শীতল তাড়াতাড়ি হাঁটছে। আর বেশী সময় নাই।

"কি রে শীতল! তোর কপালে ওটা কিসের দাগ রে? দূর থেকে প্রথমে ভাবলাম বুঝি আবার কপালেও নতুন করে উল্কির ছবি আঁকালি।"

...আবার চেনা লোক। এখানে সবাই তার চেনা।...আজ তার তাড়াতাড়ি কি না, তাই আজ সবার দরদ উথলে উঠেছে!... কপালের এই দাগটার সঙ্গেই যে তার এখন তাড়াতাড়ি হাঁটবার সম্বন্ধ।...কাজের পথে কত বাধা!...

"সেই হতভাগাটার কাণ্ড।"

"কার?"

"কার আবার! যেন বুঝতেই পারছিস না! ওই বজ্জাত নথুনীটার!"

লোকটা অবাক হ'ল নথুনীকে ড্রাইভার সাহেব না বলায়।

"হনহনিয়ে চললি যে। দাঁড়া, দাঁড়া! চিলম ধরাই। এক দণ্ড দাঁড়িয়ে চিলমে দুটো টান মেরে গেলে তোর রাজকাজের কোন ক্ষতি হবে না। চাকরি তোর এমনিও যাবে, অমনিও যাবে। আর ক'টা দিন?"

শহরে নতুন ইলেকট্রিসিটি এসেছে। আদালতঘরে টানাপাখার বদলে 'ইলেকট্রিক ফ্যান'এর ব্যবস্থা হচ্ছে। তারই উল্লেখ।

"আরে চাকরির আমি থোড়াই পরোয়া করি! বেঁচে থাকুক আমার ঘাসকাটা; বেঁচে থাকুক আমার বাবুভাইয়ারা। বছরের মধ্যে পাঁচ মাসের তো চাকরি। বাকি সময় যে পেশকার সাহেবের বাড়িতে এক বেলা খেতে দেয়, সেও এই ঘাস দেবারই খাতিরে। বুঝলি? কাল এই কথা থেকেই তো নথুনীটার সঙ্গে কথাকাটা-কাটির আরম্ভ।"

......লোকটা যখন কোমর থেকে কলকেটা বার করেছে, তখন আর চলে যাওয়া ভাল দেখায় না। আলাপ-পরিচয়, ভাব-ভালবাসা বলেও তো একটা জিনিস আছে।......

"ঝগড়া হয়েছে নাকি কাল তোর বন্ধুর সঙ্গে? তোদের ভাবও বুঝি না, আড়িও বুঝি না। ও তো তোদের লেগেই আছে। সেবার তো তোদের তিন মাস মুখ-দেখাদেখি ছিল না।"

মুখখানা একটু কাঁচুমাচু হয়ে গেল শীতলের। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ের অতীত লোকটা শুধু এই প্রসঙ্গটা উঠলেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আগের জজসাহেবের বন্ধুরা একবার বেড়াতে এসেছিলেন এখানে। গাড়ির মধ্যে তাঁরা একখানা কম্বল ফেলে গিয়েছিলেন। পরের দিন খোঁজ পড়ে। নথুনী জজসাহেবের বকুনি আর জেরায় বলে দিয়েছিল যে সেটা সম্ভবত শীতল চুরি করেছে। দুই বন্ধুতে মিলে কম্বলখানাকে বেচে নেশার খরচ জুগিয়েছিল এ কথাটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছিল। এই থেকে দুই বন্ধুতে সেবার মাস তিনেকের ছাড়াছাড়ি হয়।

সন্ধ্যার মুখে এ রকম ছোটখাটো চুরির নজির শীতলের বিরুদ্ধে আরও আছে। কেউ খোঁটা দিলে সে সেসব অভিযোগ জোর গলায় অস্বীকার করে না। হলদে দাঁতগুলো বার করে জবাব দেয় যে, ঠিক সন্ধ্যার মুখে করা কাজের জন্য দায়ী শীতল দাস নয়—বোতল দাস।

"বেশী বাজে বকিস না, বুঝলি।"

ছোট কলঙ্কের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে, অতটা মনের জোর সকাল বেলার শীতল দাসেরও নাই। দাঁড়ালে কথা বলতেই হয়। কথায় কথা বাড়ে। ছোট চিলমের পরিবেশে প্রাণের কথা বেরিয়ে আসে। কার কথা আবার—ওই লক্ষ্মীছাড়া নথুনীটার। কাল রাত্রিতে সেটাও এই চাকরির কথাই তুলেছিল। বলেছিল, "শীতল, এতকাল তো পাখা টেনে জজ উকিল ব্যারিস্টারকে হাওয়া খাওয়ালি—এবার থেকে নিজে হাওয়া খেয়েই থাকিস।"

রাত্রিবেলায় মদের দোকান থেকে ফেরবার পর তারা বসেছিল জজসাহেবের বাংলোর 'আউট হাউস'-এর সম্মুখে। বলেছিল হাসিঠাট্টার সুরেই।

শীতল পাল্টা জবাব দিয়েছিল—"এর পরের কোন জজসাহেব যদি হাওয়াগাড়ির বদলে হাওয়াই-জাহাজ রাখে, তা হলে তোরও কি দশা হয় দেখিস না।"

"যাই হোক, তোর মত ঘাস কেটে খেতে হবে না।"

কে যে কখন কোন্ মেজাজে থাকে। শুনেই মেজাজ বিগড়ে গেল শীতলের।

"হবে। আলবৎ হবে! এই আমি বলে রাখলাম হবে! আমার ঘাসকাটা নিয়ে তুই ঠাট্টা করিস? জজসাহেবের হাওয়াগাড়ির চাকার ময়লা ধুতে পাস বলে? শঙ্করজী মহাদেব উপর থেকে সব দেখছেন। আমার এতকালকার তেল না মাখবার যদি কোন পুণ্য হয়ে থাকে, তা হলে বলে দিচ্ছি যে, তোরও চাকরি থাকবে না। বিনা মাইনের ড্রাইভারীর চাকরিও থাকবে না—মোহাফেজখানার 'পাঞ্চি'র জালিয়াতি চাকরিটাও থাকবে না। বাবারও বাবা আছে। জজসাহেবের উপরও লোক আছে। আমি নিজে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে হাইকোর্টে দরখাস্ত দেবো, তোর জালিয়াতির বিরুদ্ধে!"......

মোহাফেজখানার চাকরির ব্যাপারটা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত; কিন্তু আদালতের সবাই জানে। 'রেকর্ড-রুম'এর 'পাঞ্চিং ক্লার্ক' নামের একটা পদে কাগজ-কলমে নথুনী চাকরি করে। সে মাইনে পায় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ওই কাজের জন্য, যদিও সে রেকর্ড-অফিসে কোনদিন যায়নি। আর যে কোন জজসাহেব আসুনে, নথুনী বিনা মাইনেতে তাঁর মোটরগাড়ি চালায়। জজসাহেবদেরও পয়সার সাশ্রয়; আর আমলারাও এই ব্যবস্থায় জজসাহেবকে খুশী করতে পেরে নিজেদের নির্বিঘ্ন মনে করে। কত জজ এলেন, গেলেন—কেউ এ ব্যবস্থায় আপত্তি করেননি। তস্মিন তুষ্টে, আদালতের বিচিত্র জগৎও তুষ্ট।

এই 'পাঞ্চিং ক্লার্ক'এর কাজেরই উল্লেখ করেছিল শীতল বন্ধুকে চাকরি খাওয়ার হুমকি দেখিয়ে।

শুনে নথুনীর মাথা গরম হয়ে ওঠে।

"তুই আমার বাপ তুলে কথা বলিস!"

আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে শীতল। শরীরের উপর দিকটা

"আরজি আছে হুজুরের কাছে।"

ভারী, পায়ের দিকটা দুর্বল; তাই ধাক্কার টাল সামলাতে পারেনি সে। চোট বেশী কিছু লাগেনি। শুধু কপালটা ঠুকে গিয়েছিল, এক টুকরো ইটের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে বোতল দাস শীতল দাসে ফিরে এসেছিল।

এই গরমাগরমির বাজারেও শীতল রাগ করতে ভুলে গেল। অবাক হয়ে যায় সে রোগাপটকা নথুনীর দুঃসাহস দেখে। হ'ল কি লোকটার? এত মাথা গরম! এ তো ভাল লক্ষণ নয়। নেশা-হওয়া লোককে সে দূর থেকে দেখে চিনতে পারে। নথুনীটার নেশা তো লাগেনি। তবে? রগচটাও তো নয় সে। তবে?...... একটু উড়ু উড়ু ভাব সে লক্ষ্য করছে কিছুদিন থেকে তার বন্ধুর ভিতর। ওই মেথরের ঘরের সম্মুখের কাঁঠাল গাছটার নীচে যখন তখন বসে বসে আড্ডা মারা আরম্ভ করেছে। মেথরের ঘরটা অন্যান্য চাকরবাকরদের ঘর থেকে অনেক দূরে। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকবার দরকার কিসের?......হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো!......ঠিকই তাই। এইজন্যই সে এত রগচটা হয়ে যাচ্ছে।......

অদ্ভুত শীতলের যুক্তির ধারা।

"তোর সব বদমাশি আমি বার করছি, দাঁড়া! ভাবিস যে আমি কিছু বুঝি না!"

এই পর্যন্তই ঘটেছিল কাল রাত্রে। তখনই শীতল মত স্থির করে ফেলেছিল।

দুটো মোক্ষম টান মেরে শীতল ছোট কলকেটা দিল লোকটার হাতে।

"আচ্ছা, আর একদিন এসব গল্প হবে। আজ আমার বড় তাড়াতাড়ি। জজসাহেবের বাড়ি যেতে হবে।"

ঘাসের বোঝাটা মাথায় তুলবার সময় লোকটা সাহায্য করতে এলে সে বলে—"না না। শীতল দাস এখনও অত কমজোর হয়নি রে।"

কুকুর তিনটেকে তখনও পিছনে পিছনে আসতে দেখে সে হেসে আকুল।

"পালা! পালা! আমি এখন কাছারি যাচ্ছি না। যাচ্ছি জজসাহেবের বাংলায়। তোরা সেখানে গেলে ব্যস, আর দেখতে হচ্ছে না। দড়াম্! দড়াম্! দেবে জজসাহেব বন্দুক দিয়ে গুলি করে! হ্যাঁ!"

ঘাসের বোঝা উঠনে ফেলে সে মেমসাহেবকে আদাব করল।

"কি রে শীতল?"

"আমার আরজি আছে হুজুরের কাছে।"

তারপর সে হুজুরের কাছে ছুটির আরজি পেশ করে। ঘাস-দেওয়া থেকে ছুটি দুই দিনের, আর এজলাসে পাখাটানার কাজ থেকে ছুটি একদিনের। বাড়ি যাবে সে। এ দুদিন ড্রাইভার নথুনীকে বললেই সে ঘাস ছিলে এনে দেবে।...... আমার দোস্ত সে, আর আমি জানি না তাকে? রোজ আমাকে কত ঘাস ছিলে দেয়।......

"সে না হয় হ'ল; কিন্তু পাখাটানার কাজ থেকে ছুটি দেবার মালিক কি আমি?"

"মেমসাহেব, আপনিই আদালতের সব। সাহেবের স্টেনো যতীনবাবু তো এখন বাইরের বারান্দায় রয়েছেন। তাঁকে আপনি একবার বলে দিলেই হয়ে যাবে।"

সে বাড়ি যাচ্ছে শুনে তাকে মেমসাহেব চার আনা পয়সা দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচুর জেরা সত্ত্বেও সে বলল না—হঠাৎ বাড়িতে তার কি কাজ পড়ল।

আসবার সময় আদাব করে সলজ্জভাবে হেসে বলে এসেছিল যে, দেশ থেকে ফিরে এসেই তার দেশে যাবার কারণটা মেমসাহেবকে বলে যাবে। আর একবার মনে করিয়ে দিয়েছিল, নথুনীকে দিয়ে ঘাস আনাবার কথাটা।

লোকে ভাবে এক, হয় আর। ভেবে গিয়েছিল দুই দিনের মধ্যে ফিরবে; ফিরল এগারো দিন পর, সঙ্গে নিয়ে নথুনীর স্ত্রী আর মেয়েকে। বেশ লাগে প্রথম থেকেই সাত বছরের মেয়েটাকে—তাকে দেখে ভয় পায়নি কি না। নথুনীর বউকে আনতেই সে গিয়েছিল। তারা শাপুর-পটৌরীতে ছিল না। বহুদিন থেকে নথুনী টাকা পাঠায় না, তাই তাদের বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। এইজন্যই শীতলের ফিরতে দেরী হ'ল।

......এই হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া নথুনীর ওষুধ। যতদিন মনে পড়েনি একথা ততদিন যা হয়েছে তা হয়েছে; কিন্তু এখন আর সে সব চলবে না।......

তারা এখানকার স্টেশনে এসে পৌঁছল দুপুর বেলায়। স্টেশন থেকে আদালত মাইল তিনেকের পথ।......অতটুকু মেয়ে এই খাঁ খাঁ রৌদ্রে পারবে কেন এতটা পথ যেতে! কাঁধের উপর মেয়েটাকে তুলে নেয় শীতল। আর এক কাঁধে নথুনীর বউ-এর পুঁটলিটা। যেন মেলা দেখতে চলেছে।

"চল না, কাছারিতে তোকে জজসাহেব দেখাব। তোর বাপ আবার কাছারির দোকান থেকে দহিবড়া কিনে খাওয়াবে, ফুলুরি কিনে খাওয়াবে, পান বিড়ি খাওয়াবে। দেখিস না।"

বাপের কথা মনে নাই মেয়েটার। সলজ্জ কৌতূহলের একটা মৃদু হাসি ক্ষিদেয় কাতর মেয়েটার শুকনো মুখে ফুটে উঠল। নতুন নতুন লাগে শীতলের। নথুনীর বউএর কৃতজ্ঞতাভরা চাউনিটাও।

মনে মনে হাসে শীতল। অবাক করে দেবে ড্রাইভার সাহেবকে। তারপরে নথুনীর বউ আর মেয়েটাকে মেমসাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও অবাক করে দিতে হবে। ......ওই কাছারি! এসে গেল এইবার।

কই? কই?

এই এসে পড়েছি এইবার আমরা। ওই যে গাড়িবারান্দা দেখছিস না? ওইখানেই আছে জজসাহেবের গাড়ি। চেনা পরিবেশ। লোকজনের অধিকাংশই চেনা। তবু এখন কারও দিকে তাকাবার ফুরসত নাই শীতলের। ......কিন্তু এ কি? গাড়ি-বারান্দার নীচে গাড়ি তো নাই! অসুখ? বাড়ি গিয়েছেন টিফিন খেতে? মহকুমা শহরের আদালত দেখতে যান নাই তো? ......কাছারির হইচইও যেন একটু কম কম লাগছে আজ! কেন?

একজন চাপরাশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই শুনতে পেল ব্যাপারটা। আগেকার জজসাহেব বদলি হয়ে গিয়েছেন। নতুন জজসাহেব এসেছেন চার পাঁচদিন হল। খুব কড়া মানুষ।

ফিস ফিস করে বলা। এখানে দাঁড়িয়ে এর চেয়ে বেশী কথা বলবার সাহস কোন চাপরাশীর নাই।

"ড্রাইভারসাহেব কোথায়?"

"আর ড্রাইভারসাহেব! দেখ গিয়ে, মোহাফেজখানায় যদি থাকে তো। ন ঘরকা, ন ঘাটকা। না ড্রাইভার না পাঞ্চিং-ক্লার্ক।"

নথুনীর সঙ্গে দেখা হতে সে তো চটে আগুন। তার মাথায় এখন সমূহ বিপদ। "নতুন হাকিম সাদা চামড়ার সাহেবের বাবা। নতুন এ লাইনে এসেছে। আগে ছিল এস-ডি-ও না ম্যাজিস্ট্রেট কি যেন। তিরিক্ষি মেজাজ। এরই মধ্যে ডিক্রিজারি মুহুরাবকে সাসপেন্ড করেছে; ইংরাজিতে ছাড়া কথা

খট্ খট্ খট্ খট্!

বলে না; চাপরাশীকে বলে চ্যাপাসী; পেশকার সাহেবের সঙ্গে পর্যন্ত একটা হিন্দী বলেন নি; নীলবাঙলার পেরী-সাহেব সেরিস্তায় বসে নথি দেখছিল বলে তাকে পুলিসে দিয়েছে; স্টেনোগ্রাফার যতীনবাবু একটা বানান ভুল করেছিল বলে সে কথাটা পাঁচশবার খাতায় লিখিয়ে তবে ছুটি দিয়েছে; এইবার বোধ হয় কান ধরে ওঠ-বস করাবে কেরানীদের। সাক্ষীদের এজাহার হাতে লেখে না—টাইপ করে।"

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে শীতলের চোখ।

"বলিস কি! খট্ খট্ খট্ খট্? এজলাসের মধ্যে? তাজ্জব কথা! কত জজ-সাহেব দেখেছি এর আগে। এ একেবারে কলম ধরেই না?"

"না।"

"কলম নাকচ করে দিয়েছে জেলার সব-চেয়ে বড় হাকিম?"

নতুন জজসাহেবের উগ্র মেজাজের পরিচিতিতে যত গুলি খবর কানে এসেছে, তার মধ্যে এইটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে শীতলের। ক্ষণিকের জন্য সে নথুনীর মেয়ে বউএর কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। দুটো কুকুর অনেকদিনের পর তাকে খুঁজে পেয়ে পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে, সেদিকে তার খেয়াল নাই......নাম? খট্ খট্ খট্ খট্......বাপের নাম? খট খট খট খট! জাত? খট খট খট খট। পেশা? খট খট খট খট।........অ্যাঁ! বলিস কি!......এতো লাল টকটকে সাহেবের বাবা রে!........

আরও কত খবর জজসাহেবের সম্বন্ধে। রাত্রিতে ঢোল-করতাল বাজিয়ে গান হচ্ছিল বাঙলার কাছের দুসাধটুলীতে; ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে তাদের ঢোল ফুটো করে দিয়ে এসেছে সাহেব। ........হরিহর-প্রসাদ উকিল 'আর্গুমেন্ট' করবার সময় এক কথা দুবার বলেছিল বলে তার ভাল আপীল খারিজ করে দিয়েছে।

দায়রা কেসের সাক্ষী এক দারোগাকে, ডিগ্রেড করবার জন্য পুলিসসাহেবের কাছে লিখেছে, ইংরাজি কম জানে বলে।......বয়স বেশী নয়; বিয়ে করেনি এখনও সাহেব। এ কয়দিনে একবার শুধু সাহেবকে একটু হাসতে দেখা গিয়েছে—সেও ইংরাজিতে হাসি। পেশকারবাবুকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করেছিল—এ জেলার বেশীরভাগ লোকের চাপদাড়ি গজায় না কেন? থুতনির নীচে গোটাকয়েক চুলওয়ালা দাড়িতে লোককে একটু চোর চোর গোছের দেখতে লাগে। এই বলে মুচকে হেসেছিল সাহেব।

আরও কত খবর গত পাঁচদিনের মধ্যে জমা হয়েছে। কিন্তু সে সবের কোন মূল্য নাই শীতলের কাছে। এক কান দিয়ে শুনছে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। খট খট খট খট! এজলাসের মধ্যে! শুধু ওই একটা জিনিস থেকে সে নতুন জজসাহেবকে বুঝে গিয়েছে।

এর পর হল কাজের কথা। যে রকম কড়া লোক সাহেব, তাতে সম্ভবত তাঁর মোটর ড্রাইভারের কাজ কিছুতেই নথুনীকে করতে দেবেন না। ওঁর গাড়ি এখনও এখানে এসে পৌঁছয়নি। আজকালের মধ্যে পৌঁছে যাবে। রেকর্ড অফিসের 'পাঞ্চিং ক্লার্ক'এর চাকরিটাও নথুনীর পক্ষে রাখা অসম্ভব, কেননা সে নিজের নামটা পর্যন্ত দস্তখত করতে জানে না। আর এরকম বাঘাসাহেবের কাছে তার হয়ে গিয়ে কেউ দুটো কথা বলে আসবেন, সে বুকের পাটা সেরিস্তাদারবাবুরও নাই। সেইজন্য নথুনী ভাবছে নিজে থেকেই কথাটা বলবে জজ-সাহেবের কাছে— চাকরি তো নইলে এমনিও থাকবে না, অমনিও থাকবে না। এখনও সে জজসাহেবের বাঙলার আউটহাউসেই আছে। সাহেব তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না; দেখে থাকলেও ভেবেছে, আগেকার জজসাহেবের ড্রাইভার কোন কাজের জন্য থেকে গিয়েছে—দুদিন বাদে চলে যাবে। এই অবস্থায় তার স্ত্রী ও মেয়েকে সে কি করে জজসাহেবের বাড়ির 'আউট-হাউস'এ নিয়ে গিয়ে রাখে?

"এরই মধ্যে শীতল, তুই এইসব আপদ নিয়ে এসে জুটোলি।"

দেখা গেল, শীতলও অনুতপ্ত হতে জানে। অনবরত সাহেব খট খট খট খট করে সাক্ষীর এজাহার লেখে। অবস্থা সত্যিই গুরুতর। ভুল করেছে সে এদের এনে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক বুঝতে না পারলেও, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে নথুনীর বউ ও মেয়ের।

একটু কাঁচুমাচু হয়ে শীতল বন্ধুকে আশ্বাস দেয়—"আরে তার জন্য ভয় কিসের। না হয় তাড়িখানায় ঘুগনিই বেচবি, আমিই না কোন চার পয়সার কিনব রোজ!" বলে, কিন্তু জোর পায় না। কথাটায় প্রাণ নাই, ফাঁকা আশ্বাস।

নথুনীর স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে গিয়ে শীতল তখনকার মত ওঠাল পেশকারবাবুর বাড়ির বাইরের বারান্দায়।

পরের দিন শীতল জজসাহেবের এজলাসে পাখা টানতে গেল। সেখানে অন্য লোক কাজ করছে। তবে টানাপাখা উঠে যাবে; ইলেকট্রিসিটির তার লাগানো হয়ে গিয়েছে দেয়ালে; এখন এ কয়দিনের জন্য কেউ আর তার উপর কড়া হতে চায় না। যে ছোঁড়াটা তার জায়গায় কাজ করছিল, তারও সাহস নাই শীতলকে চটায়।

শীতলের কৌতূহল, নতুন জজসাহেবকে একবার নিজে চোখে কাজ করতে দেখবে। চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন সে করতে চায়। দুহাতের আঙুলে ঠুকে সাক্ষীর এজাহার লিখবে? কলেক্‌টরের চাইতেও বড় যে জজসাহেব, টেবিলের উপর তার সম্মুখে থাকবে টাইপ করবার যন্ত্র? উকিলের জেরার উত্তরে শুনবে, আর খট খট খট খট? ...অ্যাঁ?...

জজসাহেব এজলাসে ঢোকেন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায়। আজ পাঁচ মিনিট দেরী হয়েছে। আরদালী ফিস ফিস করে খবর দিয়ে গেল,—আজ ও'র মোটরগাড়ি এসে পৌঁছেছে কিনা স্টেশনে—তারই

প্রথমেই আরদালী এসে টাইপ করবার যন্ত্রটা রেখে গেল টেবিলের উপর। উঠে দাঁড়িয়েছে শীতল।......জুতোর শব্দ। আসছে! ......পেশকারবাবু আর গাউনপরা উকিলের দল উঠে দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে সেলাম করছে সবাই সাহেবকে। সাহেব চেয়ারে বসে মাথার উপরের টানাপাখার দিকে তাকালেন; তারপর 'পাংখা-পুলার'এর দিকে। অদ্ভুত চেহারার লোকটাকে তিনি দেখছেন ভাল করে। চোখোচোখি হল সাহেবের সঙ্গে। এতক্ষণে শীতলের মনে পড়ে যে, সাহেব আর তাঁর টাইপ করবার যন্ত্রটাকে দেখবার মানসিক উত্তেজনায় সে পাখা টানতে ভুলে গিয়েছিল। তাকাচ্ছে সাহেব তার দিকে। কড়া চোখ। চটেছে বোধ হয়। ভুল শোধরাবার জন্য শীতল প্রাণপণ শক্তিতে দড়ি ধরে টানতে আরম্ভ করে। পাখা যে প্রায় ছাত পর্যন্ত ঠেকছে, সেদিকে তার খেয়াল নাই। পেশকারবাবু পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কি কতকগুলো কাগজ নিয়ে যেন। সাহেব কিন্তু এখনও তারই দিকে তাকিয়ে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে সে। ঢাকনাটা খোলবার জন্য, টাইপ করবার যন্ত্রটার উপর হাত দিয়েছে সাহেব। পেশকারবাবুকে কি যেন বললে। গাউনপরা উকিলের দলও পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। সকলের মুখে একটু যেন কৌতুকের হাসি। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে নাকি সাহেব? মেজাজ বিগড়ে গেল তার। অজানতে নিজের দাড়ির উপর একবার হাত বুলিয়ে নিল। তার দাড়ির কথা বলছে নাকি সাহেব? সে তো এ জেলার লোক নয়—তার তো চাপদাড়ি। তবে? এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা, পেশকারবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—"সাহেব বলছেন তোমার কাপড়-জামা অত নোংরা কেন?

"এই জামাটা হুজুর একজন জজ-সাহেবের। হুজুর যদি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা উর্দি মঞ্জুর করিয়ে দেন, তাহলে এ অধমের বড় সুবিধা হয় কাপড়-জামা পরিষ্কার রাখবার।"

উদ্‌গত হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন উকিলবাবুরা। সাহেব টাইপরাইটার যন্ত্রটার উপর ঝুঁকে পড়েছেন। শীতল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখা টানছিল—এখন টুলটাতে বসল। অন্যদিকে নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে সে পাখা টানছে আস্তে আস্তে। জানিয়ে দিতে চায় যে, এইসব 'খাড়কেলাসী' আঙুলে দিয়ে খট খট করনেওলা চাকরি-খানেওয়ালা জজসাহেবের সে পরোয়া করে না। তার দিকে তাকালে এবার সে-ও সাহেবের দিকে কটমট করে তাকাবে। ভাবে কি সাহেব তাকে? আর কটা দিনেরই বা চাকরি! অত খাতির কিসের! ইংরাজিতে ফুটানি দেখাচ্ছে শয়তান সাহেবটা ওই খট খট শব্দর মধ্যে দিয়ে। আদালতভরা এত-গুলো লোককে বাঁদর নাচাচ্ছে ওই খট খট শব্দটা করে। নথুনীকে চাকরি না দেওয়া, উকিলদের অপদস্থ করা, স্টেনোগ্রাফারকে অপমান করা, দারোগার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা, সব কিছুর মূলে ওই খট খট খট খট শব্দটা। মুহূর্তের মধ্যে সাহেবের সব শয়তানীর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই কানে-বিষ-ঢালা শব্দটা।

নথুনীটার সঙ্গে দেখা হল না বিকালে। স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি সে। এড়িয়ে চলছে। ওটার সঙ্গে পেরে ওঠা যাচ্ছে না কিছুতেই।

ভেবেছিল নথুনীর সঙ্গে মদের দোকানে অব্যর্থ দেখা হবে সন্ধ্যাবেলায়। কিন্তু সেখানেও হতাশ হল শীতল। সেখানে

দেখা হল জজসাহেবের মেথরের সঙ্গে; সেও ঠিক বলতে পারল না নথুনীর খবর। মেথরটা এসেছে একা—অর্থাৎ স্ত্রীকে সঙ্গে আনেনি। লক্ষ্মীছাড়া নথুনীটা ভেবেছে কি! ওটাকে ঠান্ডা করতে কতক্ষণ। কার পাল্লায় পড়েছে জানে না!

শীতল দাস তখন বোতল দাস। কাস্তেটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে জজসাহেবের কম্পাউন্ডে ঘাস কাটতে। রাত নটার সময় জজসাহেব নিশ্চয়ই নিজের কামরাতেই থাকবে।

প্রকান্ড কম্পাউন্ড। বহু বছরের সম্পর্ক তার এই কম্পাউন্ডটার সঙ্গে; এর প্রতিটি অংশ তার খুঁটিয়ে জানা। ......হ্যাঁ, আলো জ্বলছে সাহেবের ঘরে। সে গিয়ে বসে আউটহাউস থেকে খানিকটা দূরে। কাস্তে হাতে আছে বটে, কিন্তু ঘাসকাটা এখন তার উদ্দেশ্য নয়। সে এসেছে লক্ষ্মীছাড়া নথুনীটার চালচলন পরখ করতে। ওটাকে বোধ হয় বেশ করে কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম না দিলে চলবে না। বউ মেয়ে এখানে পড়ে রয়েছে—একবার গিয়ে দেখা করল না। চাকরি যাবার ভয়ে এত কি মন খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, দুপা হেঁটে বউ-মেয়ের কাছে যেতে পারে না! মদের দোকানে না যাওয়াটা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

চোখ দুটো তার জ্বলছে। অন্ধকারেও সে দেখতে পায়। তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ মেথরের ঘরের দিকে। আজ কুপীটা পর্যন্ত জ্বলছে না সে ঘরে। এখানকার সকলের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। যদি নিজে পথ চিনে ফিরে আসবার অবস্থা থাকে, তাহলে মেথর ফিরবে রাত দশটায়। ঘাস কাটবার শব্দ হবার ভয়ে শীতল হাত গুটিয়ে বসে আছে।

বহুক্ষণ এইভাবে বসে থাকে। একদিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অন্ধকারটা যেন আরও ঘন হয়ে ওঠে; তখন একবার করে চোখ বুজে নিলে ঝাপসা ভাবটা বুঝি একটু কাটে। এ কি? অন্ধকার যেন একটু নড়ল। ......নড়ল কেন?......নড়ন্ত কম-অন্ধকারটুকু তাড়াতাড়ি এগুচ্ছে মেথরের ঘরের দিকে।

হতভাগা!

উঠে দাঁড়িয়েছে শীতল। হাত আর কাঁধের পেশীগুলো তার ফুলে উঠেছে। জজসাহেবের বিলাতী কুকুরটা মেথরের ঘরের দিক থেকে তার গায়ের গন্ধ পেয়ে ছুটে এল। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে চলেছে মেথরের ঘরের দিকে। কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—বুঝতে চেষ্টা করছে ব্যাপারটা।

এর পরের ব্যাপারটুকু বেশী সময় নেয়নি। আর সেটুকু সংক্ষেপে বলাই ভাল। তার হাতের এক ঝটকায় যে লোকটা মেথরের ঘর থেকে বাইরে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সে লোকটা নথুনী নয়—জজসাহেব।

পরের দিন এগারটার সময় আদালত একেবারে সরগরম। গুজ গুজ করে কথা হচ্ছে, এখানে সেখানে। শীতলের দর বেড়েছে আজকের বাজারে। সকলেই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়—উকিল, আমলা সবাই। অনেক কথা জানতে চায়—আরও বিশদভাবে জানতে চায়—জেনে নিজের নিজের গায়ের ঝাল মিটোতে চায়। যেটুকু না বললে নয়, তার অতিরিক্ত কিছুই শীতলের মুখ থেকে বার করা গেল না।

"আজ সাহেব ঠান্ডা। আজ আর এজলাস ঘরে খট খট খট খট করে ফুটানি মারবে না।" অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

সে যা ভেবেছে তাই বলেছে। খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দটা এজলাসঘরে না হলেই, আদালত ঠান্ডা। চিরকাল যেমন চলে আসছিল তেমনি চলবে। ডিক্রিজারি মোহরারের চাকরি যাবে না, স্টেনোগ্রাফারকে পাঁচশবার বানান লিখতে হবে না, উকিল-বাবুরা আর্গুমেন্ট করবার সময় এক কথা পাঁচবার বলতে পারবেন, আমলারা নথি দেখিয়ে টাকা নিতে পারবে।

এই উত্তেজনাময় পরিবেশে, কখন থেকে যেন সকলেরই মনে শীতলের যুক্তিহীন মতটা সংক্রমিত হয়েছে। ক্ষণিকের জন্য সাহেবের বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্বেষ গিয়ে কেন্দ্রিত হয়েছে তাঁর টাইপ করবার যন্ত্রটার উপর। যে আধপাগলা লোকটাকে কেউ কোন-দিন আমল দেয়নি, আজ তার অনায়াস সম্মোহন, আদালতসুদ্ধ লোককে তার ধরনে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছে। পাখার দড়ি হাতে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে শীতল দরজার দিকে।...ওই যন্ত্রটার উপরই নথুনীর, আর তার স্ত্রী ও মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।...উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছে শীতলের চোখেমুখে। সে সকলকে বলেছে বটে যে সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু শেষমুহূর্তে আত্ম-বিশ্বাস একটু হারিয়েছে। ভরসা পাচ্ছে না। ...আসছে! সাহেবের খাস আরদালী! এখনই সাহেব আসবে। আমলাদের নজর আরদালীটার উপর।

...ঠিক যা ভেবেছিল শীতল!...ঠিক তাই!...আরদালীটা জজসাহেবের টেবিলের উপর এনে রাখল একটা ছোট ক্যাশবাক্স। শুধু এইটা!...আজ আর খট্ খট্ খট্ খট্ যন্ত্রটা আনেনি!...আর কোন চিন্তা নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। নথুনীটার চাকরি নিশ্চয়ই থাকবে; সাহেব নিশ্চয়ই আজ পেশকারবাবুর সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলবে; রাতের ভজনগানের ঢোল আর কেউ ফুটো করবে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে শীতল।

জজসাহেব এজলাসে এসে ঢুকলেন। চাউনির ঝাঁজ মরেছে। বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ জড়ানো। সাধে কি আর খট্ খট্ খট্ খট্ বন্ধ!

...সাক্ষীর নাম? খট্ খট্ খট্ খট্। ...বাপের নাম? খট্ খট্ খট্ খট্। ...পেশা? খট্ খট্ খট্ খট্। ...আজ এই প্রথম হাসি এল শীতলের, কালকের এজলাসের সেই কথা ভেবে।

# অয়মারম্ভঃ

অবধূত
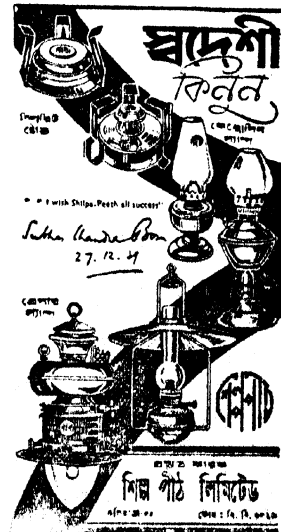
এই হল আরম্ভ।

এ আরম্ভটা আরম্ভ হয়েছিল নাকি মহাসমারোহে। তিনদিনের পথ নৌকোয়, সেখানে মানুষ পাঠিয়ে পায়ের ধুলো আনানো হয়েছিল সার্বভৌম ঠাকুরের। ইঁদুরে তোলা মাটি পাঠিয়ে সেই মাটি পায়ে ছুঁইয়ে আনা হয়েছিল। শুধু সার্বভৌমের নয়, আরও একাদশজন বাছা বাছা ব্রাহ্মণের পদধূলি যোগাড় করা হয়েছিল। সেই ধূলি ঠেকানো হয়েছিল নবজাতকের কপালে। বড় আশায় এই সমস্ত করা হয়েছিল, দ্বাদশটি বাঘা ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কিছুতেই বিফল হবে না, এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না তাঁদের মনে, যাঁরা এত কাণ্ড করেছিলেন ষেটেরা পুজোর দিন।

এ সব কথা আমার জানার কথা নয়। ছ' দিন বয়সে কি হয়েছিল না হয়েছিল তা' আর কে মনে ক'রে রাখতে পারে। ছ' দিন বয়সে মন জন্মেছিল কিনা তাই এখন মনে নেই। কিন্তু দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ যে আমি গোল্লায় পাঠিয়েছি, এ কথাটি আমাকে দ্বাদশ লক্ষবার শুনতে হয়েছে গুরুজনদের মুখে। শুনে শুনে ওটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে আমার। একরকম বিশ্বাসই হয়ে গিয়েছে যে, আমার যা হওয়া উচিত ছিল তা' যে হতে পারি নি, এর জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী।

দায় এড়াবার দায়ে প'ড়ে এ কাহিনী শোনাতে বসি নি আমি। কিংবা জবাবদিহি করতেও চাচ্ছি না কোনও কিছুর জন্যে। এ কথাও বলছি না যে, ষেটেরা পুজোর দিন থেকে অবিরাম যে আশীর্বাদধারা ঝরে পড়েছে আমার মাথায়, সে আশীর্বাদগুলো নেহাতই জলো ছিল। বরং বলব, শুভই ত' হয়েছে। যা হয়েছে, তা' আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গুরুজনদের মনের মত না হতে পারে, কিন্তু এ রকম ছাড়া অন্য রকম আমি হতামই বা কেমন ক'রে। হওয়ার উপায় ছিল কোথায়? ইচ্ছে হয়েছে এক রকম, সঙ্কল্প করেছি আর এক রকম, আর সেই সঙ্কল্পটা, কার ইচ্ছেয় বলতে পারি না, কাজে পরিণত হয়েছে আর এক রকম। কেন যে এরকমটা হল, কি ক'রে যে কি হয়ে গেল, তাই আজ ভাবছি ব'সে ব'সে।

জানি, আমার এই অনর্থক ভাবনা শুনে কারও কোনও লাভ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই বিন্দুমাত্রও। শুনতে শুনতে ব্যাজারও ধ'রে যাবে হয়ত অনেকের। তা' ছাড়া আমি যে নিজেই ঠিক করতে পারছি না, কোথা থেকে আরম্ভ করব শোনাতে। ষেটেরা পুজোর দিন থেকে শোনাতে পারলে হয়ত শোনানোর মত শোনানো হত, কিন্তু সে ত' সম্ভব নয় কিছুতেই। প্রথমত, প্রথমের অনেকগুলো বছর অনর্থক অপচয় হয়ে গেছে। তখন যে কি করেছি বা কি করিনি তা' আজ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। দ্বিতীয়ত, লজ্জাও করছে কেমন একটু একটু। যখন উলঙ্গ থাকতাম অথবা উদম অবস্থার স্মৃতি, এই রকমের নাম দিয়ে একটা কাহিনী খাড়া করতে পারা যায় হয়ত। সে কাহিনীর মালমসলাও হয়ত জোটানো যায় অতি বৃদ্ধা পিসী মাসী যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকেন, তাঁদের খুঁজে বার ক'রে। কিন্তু তাতে ফলটা হবে কি! উদম অবস্থায় চোখ দিয়ে ভয়ানক পিঁচুটি পড়ত, ভয়ানক খোস পাঁচড়া হত সর্বাঙ্গে, বা খাবার জিনিস দেখলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতাম, এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার অতি গুহ্য তাৎপর্য শুনিয়ে খামকা কেন খেলো করতে যাবো নিজেকে। তাই ত' খুঁজে মরছি আরম্ভটা আরম্ভ করব কোনখান থেকে!

যাঁরা একান্ত আপনার জন, অকপটে আমার মঙ্গল কামনা করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একদল বলেন—রক্ষে কর এবার, আর তোমার নিজের কাহিনী শুনিও না বাপু। বড্ড একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। তা' ছাড়া, একটু লজ্জাও করে না তোমার। এভাবে নিজেকে সকলের সামনে খুলে মেলে ধরতে একটু ঘেন্নাও হয় না তোমার! আর একদল, তাঁরা হয়ত আমার চেয়েও বে-শরম, তাঁরা বাহবা দেন। বলেন—চালাও, আরও বলে যাও, কবে কোথায় কোন্ ফাঁকে কার সঙ্গে কি করেছিলে। কিছু ছেড় না, এক অক্ষরও বাদ দিও না, কি অধিকার আছে তোমার ফাঁকি দেবার-?

দু' পক্ষের কথাই মাথা হেঁট ক'রে শুনি। শুনি আর ভাবি, ভাবি কোনখান থেকে আরম্ভ করা যায়, কতটুকু রাখা যায়, কত-টুকুই বা বাদ দেওয়া যায়। যাঁরা বলেন, নিজের কাহিনী আর শুনিও না বাপু, তাঁদের জন্যে একটা জবাব মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছি। কিন্তু বলতে সাহস হয় না। বললে বলতে পারতাম যে, কই, এ

পর্যন্ত নিজের কাহিনী ত' একটুও শোনাই নি কোথাও। অপরের কথাই ত' বলতে চেয়েছি, বলতে চেষ্টা করেছি তাদের কাহিনী যাদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখার মত দেখার সুযোগ মিলেছে যাদের এ জীবনে। শুধু চোখের দেখা নয়, মনের দেখা দেখেছি যাদের। আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হলে বলতে হয়, যাদের মন দেখতে পেয়েছি, তাদের কথাই ত' শোনাতে চেয়েছি এ পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, নিজেকে বাদ দিয়ে কারও কথাই যে শোনাতে পারি না। যাকে দেখেছি, তাকে কি অবস্থায় দেখেছি, কোনখানে দেখেছি, এমন কি কি পে'চালো পর্ব ঘটেছিল যার দরুণ তাদের মনের ছোঁয়াও পেয়েছি আমি, এ সমস্ত বলতে গেলে যে নিজের কথাও এসে পড়ে। চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তা' হয়ত রঙ্‌ তুলি দিয়ে হুবহু আঁকাও যায়। কিন্তু চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না তা' যে দেখতে হয়—ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে। সে ছবি রঙ্‌ তুলিতে ফোটানো যায় কিনা, জানি না। কিন্তু কালি কলমের সাহায্যে সে ছবি আঁকতে গেলে ঘটনাগুলোকেও যে অবিকৃত অবস্থায় ছ'কে যেতে হয়। সে সময় আমি নামক ব্যক্তিটিকে বাদ দিই কেমন করে!

বাদ যদি দিতেই হয় নিজেকে, তা'হলে সবটুকুই যায় বাদ পড়ে। সব কিছুই প্রাণ খুলে বলা যেমন সম্ভবও নয়, নিরাপদও নয়, তেমনি আমার দেখা মানুষদের আমি দেখলুম কেমন ক'রে, সেইটুকু না শোনাবার কায়দা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। এ রকম অবস্থায়—এক করা যায়, রামবাবুর শ্যামবাবুর মুখ থেকে যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনটি ক'রে শোনানো অর্থাৎ রাম-বাবু শ্যামবাবুকে আমদানি করতে হয়। এটাও যে একটা আগাপাস্তলা ফাঁকিবাজি। মুশকিল আর কাকে বলে! কোন্‌ পক্ষকে যে সন্তুষ্ট করি, কোন্‌খান থেকে যে আরম্ভ করি, কি দিয়েই বা করি আরম্ভ, এ এক মহাসমস্যা বটে!

অনেকদিন আগে এই রকমের এক ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলাম। এক দূরসম্পর্কের দাদা, চাকরি করতেন লাহোরে। মাইনেও পেতেন যেমন, উপরিও ছিল তেমনি। মানে দাদা বেশ শাঁসালো গোছের ছিলেন। হঠাৎ তাঁর শখ চাপলো একটি বিয়ে করবার। বাঙলা দেশে পাত্রী দেখা আরম্ভ হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সকলে চেষ্টা করতে লাগলেন একটি সর্বদিক থেকে চমৎকার পাত্রী জোটাবার। দাদা জানতেন যে, আমি কলকাতায় থাকি তখন। আমার কাছে চিঠি লিখলেন, অমুক ঠিকানায় গিয়ে অমুকের মেয়েটিকে দেখে পত্রপাঠ সকল সমাচার জানাও। চিঠির সঙ্গে পাত্রী দেখার খরচও এল। পরিমাণ আমার তখনকার তিন মাসের খাওয়া পরার মোট খরচের চেয়ে ঢের বেশী।

এমন দাদার অনুরোধ ঠেলা যায় না। কাজেই একদিন ছোট রেলে চেপে পাত্রী দেখতে রওয়ানা হলাম।

সকালেই গেলাম সেখানে। তাঁরা আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। পাত্রী দেখানো হবে বারবেলা বাদ দিয়ে সেই বিকেলে। দুপুরে বিশ্রাম করার জন্যে একখানা ঘরে বিছানা দেওয়া হল। আহারটা একটু চাপ গোছের হওয়ার দরুণ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ উঠে বসতে হল ধড়মড়িয়ে। আলোতে ঘুম হবে না বলে দরজা জানলা সব বন্ধ ছিল। কিন্তু দিনের বেলা তাতেও যথেষ্ট আলো ছিল ঘরে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ডুরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার বিছানার পাশে।

হাঁ করেছিলাম কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্যে। জিজ্ঞাসা আমায় করতে হল না। মেয়েটি ফিসফিস ক'রে বললে—"দেখুন, পালান এখনই আপনি।"

সবিস্ময়ে বললাম, "তার মানে!"

খুব তাড়াতাড়ি খুব চাপা গলায় সে বললে—"আপনার দাদার জন্যে এ মেয়ে দেখবেন না।"

আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন!"

সংক্ষিপ্ত জবাব হল—"সে মেয়ের পেটে বাচ্চা আছে।" বলেই সে পাশের দরজা একটুখানি ফাঁক ক'রে স'রে পড়ল।

কি ফ্যাসাদেই যে প'ড়ে গেলাম, কি বলব। পালাব না থাকব, তাই ভাবতে লাগলাম। পালিয়েই বা কি লাভ হবে আমার। তার চেয়ে যেমন মেয়ে দেখতে এসেছি, তেমনি মেয়ে দেখে চলে যাই। তারপর দাদাকে সব লিখে পাঠাব। ব্যাস্‌—

সুতরাং যথাসময়ে মেয়ে দেখলাম। এবং মেয়ের বাঁ গালের নিচের দিকে একটি তিল দেখলাম। তিলটি দেখেই মাথাটা কেমন ঘুরে গেল আমার। কিছুই বললাম না। জিজ্ঞাসাও করলাম না মেয়েটিকে কিছু। অবশ্য এমনিতেই কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না আমি। মেয়ে দেখতে গিয়ে কি জিজ্ঞাসা করা উচিত, তা' আমার জানা ছিল না তখন, সে বয়সও হয়নি তখন আমার।

তিলটির কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম। যে মেয়েটি অন্ধকার ঘরে আমায় পালাবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিল তার গালেও ঠিক ঐ তিলটি দেখেছিলাম আমি। মুখখানি ভাল ক'রে দেখতে পারি নি, কিন্তু দেখেছিলাম তিলটি। কারণ বাঁ গালের ঠিক সেই জায়গাটুকুতে এসে পড়েছিল টাকার মত গোল একটু আলো। বোধ হয় কোনও জানলায় বা অন্য কোথাও একটা গর্ত ছিল। সেই গর্ত দিয়ে এসেছিল ঐ আলোটুকু।

অনেক কথা ভাবতে হল আমায়। যে পালাতে বললে সে মেয়ে কে! কি স্বার্থ আছে তার আমাকে পালাতে বলার মধ্যে! হিংসে হতে পারে, ভাংচি দেওয়া হতে পারে, জ্ঞাতিগুষ্টির শত্রুতাও হতে পারে। কত কীই না হতে পারে, দুই সখীতে ঝগড়াও হতে পারে। যার বিয়ের কথা হচ্ছে তার বিয়েটা পিছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রও হতে পারে। কিংবা এ সমস্ত হয়ত নাও হতে পারে, সত্যিই একটা ভদ্রলোকের ছেলে একটা গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে, এটা সহ্য করতে না পেরেই হয়ত ঐ কুমারী মেয়েটি সাবধান করতে এসেছিল আমাকে। কিন্তু ঐ তিলটা! কি করে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি! স্পষ্ট দেখেছিলাম শুধু তিলটাই, সেই টাকার মত গোল তীব্র আলোয়। কিছুতেই সেটা ভুল হতে পারে না। আবার সেই তিলটাই দেখলাম পাত্রীর গালের ঠিক সেই জায়গাটাতেই। ব্যাপার কি! ও বাড়ির বা ও গ্রামের সব ক'টি আইবুড়ো মেয়ের বাঁ গালের নিচের দিকেই ঐরকম এক একটি তিল আছে নাকি!

অনেক ভেবে ঠিক করলাম যে, দাদাকে ওসব কথা লিখে কি হবে। লিখে দিলাম—পাত্রী দেখেছি। একটুও পছন্দ হয় নি আমার। ভাবতেই পারি না যে, আমার সর্বগুণসম্পন্ন দাদার বৌ অতটা যা তা হবে। চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কত মেয়েই ত' রয়েছে দেশে, করুক না আর একটাকে বিয়ে দাদা। কি দরকার ও রকম একটা বিশ্রী ব্যাপারে মাথা দেবার আমাদের। আর এমনই কি আহা মরি মেয়ে যে এত মাথা ঘামাতে হবে, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে সত্যিই গর্ভ হয়েছে কি না। চুলোয় যাক্‌ গে।

কিন্তু চুলোয় গেল না ব্যাপারটা। মাস দুই পরে নিমন্ত্রণের চিঠি পেলাম। তারপর দাদা নিজেই চলে এলেন কলকাতায়। বাড়ি ভাড়া ক'রে খুব ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। এবং বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাঁ গালের নিচের দিকে সেই তিলটি।

যথাসময়ে দাদা বৌ নিয়ে লাহোর চলে গেলেন। বছর খানেক খোঁজ রাখলাম বৌদির ছেলেপুলে হল কি না। হল না শুনে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে দাদা বৌদির কথা ভুলেই গেলাম।

তার বছরখানেক পরে আবার দাদাকে দেখলাম কলকাতায়। দাড়ি গোঁফ রুক্ষ চুল নানান জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছেন দাদা নিজের মুখ মাথায়। আবার কপালে লাগিয়েছেন এক খণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় হাতে বেঁধেছেন রুদ্রাক্ষের মালা। চাকরি ছেড়ে সাধন ভজন করছেন। কারণ বৌদি অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেছেন।

আমায় দেখে দাদা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন—"হাঁরে, তোকে যে বড্ড বিশ্বাস করতাম রে হতভাগা। শেষ পর্যন্ত তুই এই করলি।"

কি করেছি তা' বুঝতে পারলাম দাদা যখন আমাব হাতে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠিখানি পড়ে বুঝলাম, সত্যিই কত বড় অন্যায় করেছিলাম আমি, পাত্রী দেখতে গিয়ে যা ঘটেছিল তা' দাদাকে না জানিয়ে।

বৌদি আত্মহত্যা করার আগে সেই চিঠিখানি দাদাকে লিখে গেছেন। লিখেছেন যে, বিয়ের আগেই তিনি জানতে পারেন যে, দাদা মদ খান। জেনেছিলেন বলেই যে ছোকরা পাত্রী দেখতে গিয়েছিল তাকে নিজে মুখে বলেন যে, পাত্রী গর্ভবতী। তাতেও বিয়ে বন্ধ হল না। বৌদির মা বাপ জামায়ের টাকা দেখলেন। কিন্তু মাতাল তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা ছাড়া পরিত্রাণ পাবার অন্য কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না তিনি।

চিঠিখানি পড়া হলে দাদা বললেন—"কেন তুই সব কথা জানালি না রে হতভাগা। কেন আমায় এতবড় দাগাটা দিলি।"

দাদা অবশ্য দাগার ঘা শুকিয়ে যেতে আর একটি বিবাহ করলেন। সে বৌদির বাবা মদ খেতেন ব'লে তিনি আত্মহত্যাটা করলেন না। দাদা আবার দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, চুল ছেঁটে লাহোরে ফিরে গেলেন।

কিন্তু আমি রইলাম ভয়ানক মনমরা হয়ে। আগের সেই তিলওয়ালা বৌদিটির আত্মহত্যার দরুণ নিজেকেই দায়ী মনে হতে লাগল। সব কথা খুলে লিখলে কি ক্ষতিটা হত আমার? তারপরও যদি দাদা বিয়ে করতেন আর বৌদি আত্মহত্যা করতেন তা'হলে এই বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম যে, আত্মহত্যার কপাল নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। কিন্তু তা' ত নয়, মোক্ষম চেষ্টা করেছিলেন তিনি নিজেকে বাঁচাবার। কুমারী মেয়ের পক্ষে সব থেকে নিদারুণ কলংকটা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন নিজেকে। শুধু আমিই বাদ সাধলাম। সব কথা খোলসা ক'রে লিখলাম না দাদাকে।

আচ্ছা, এই যে কাহিনীটি শোনালাম, এ থেকে আমি নামক হতভাগাটিকে বাদ দেব কি ক'রে? দাদা যদি আমায় পাত্রী দেখবার কথা না লিখতেন তা'হলেই হাংগামা চুকে যেত। আমাকে জড়িয়ে এ কাহিনী আমার শোনাতে হত না। কেন—কলকাতায় নন্দু ছিল, ছোট পিসী ছিলেন, হরিশ কাকা ছিলেন, এদের কাউকেও ত' পাত্রী দেখবার কথা লিখতে পারতেন দাদা। খামকা আমাকেই বা লিখতে গেলেন কেন? আর যখন বারণ ক'রে পাঠালাম ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে, তখন বিয়েই বা করতে গেলেন কেন? সবচেয়ে কি ভাল হত না, যদি দাদা আমার কথা শুনে ঐ গালে তিলওয়ালা মেয়েটিকে বিয়ে না করতেন? যদি শুনবেনই না আমার কথা তবে আমার ওপর পছন্দ অপছন্দের ভারই বা দিলেন কেন?

যাক্ গে, যা হবার ছিল হয়ে গেল। ও রকম একটা উড়ো আপদে জড়িয়ে পড়া আমার কপালে লেখা ছিল বলেই ঘটল। কিন্তু এ থেকে একটা কথা আমি নির্ঘাত বুঝতে পারলাম যে, জড়িয়ে পড়ার দায় থেকে যতই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি না কেন, পালিয়ে বাঁচবার পথ কোনও দিকে একটু খোলা নেই। ষেটেরা পুজোর দিন থেকে 'শুভ হোক, মংগল হোক' ব'লে যত আশীর্বাদই যিনি করেছেন সব নিষ্ফল হয়ে গেল শুধু আমার দোষেই নয়। আমার কপালের সংগে আর পাঁচজনের কপাল এক সুতোয় গাঁথা ছিল এবং আজও তাই আছে ব'লেই একা আমার শুভ হতে পারছে না। মঙ্গল কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁতে পারছে না আমাকে। আর সেই কাহিনী শোনাতে গেলেই শুনতে হয়— "আর তোমার নিজের কেচ্ছা অত ক'রে শুনিও না বাপু।" না হয় নাই বা শোনালাম, কিন্তু পরের কথা শোনানোও তা'হলে খতম করতে হবে। অনিবার্য আমি যে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছি আমার দেখা শোনার সংগে। সেই আমির হাত এড়াই কেমন করে!

আবার আর এক বিপদ হচ্ছে যে, আমার আগাগোড়া সব দেখা শোনাই শোনাবার উপযুক্ত কি না, তা' বিচার করতে হবে। বিচার করতে গেলে দেখা যায়, সত্যিই কিছু নেই শোনাবার। জন্মেছি, বড় হয়েছি, পাঁচজনের আশীর্বাদে কোনও রকমে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে আর শোনাবার কি আছে। কিছুই নেই, সত্যি কিচ্ছু নেই। আমি জন্মাবার আগেও এ জগৎ ছিল, আমি মরে যাবার পরেও থাকবে। এর শোক দুঃখ কান্না হাসি দেবত্ব পিশাচত্ব সবই থাকবে, আগে যেমন ছিল। রোদ বৃষ্টি দিন রাত শীত গ্রীষ্ম—চাঁদের আলো ফুলের গন্ধ এ সমস্ত ঠিক টিঁকে থাকবে যেমন টিঁকে আছে। থাকব না শুধু আমি, আর থাকবে না আমার মত আর কয়েকটি মানব মানবী। তাই আমার শোনানোর গরজ এত তাদের কথা। আমার দেখা মানব মানবীরা যদি টিঁকে থাকত চিরকাল, তবে দায় প'ড়ে ছিল আমার তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে। কিন্তু তারাও যে আমার মত টিঁকবে না এখানে। তাদের অনেকে ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে, অনেকে যাব যাব করছে, বাকী সকলে যদিও টিঁকে আছে কোনওমতে, কিন্তু আছে একেবারে যাওয়ার পরের অবস্থায়। অর্থাৎ মরে বেঁচে আছে। অথচ আমি জানি যা আমি সাক্ষী আছি, তারা কেউ তাদের এই পরিণতির জন্যে দায়ী নয়। শুভ তাদেরও হতে পারত, বেঁচে থাকার মত তারাও বেঁচে থাকতে পারত, যদি না খামকা কতকগুলো উড়ো ফ্যাসাদ এসে জুটত সকলের কপালে।

উদম অবস্থার কাহিনী বা উৎপীড়িত হতাম যখন বা স্বপ্ন দেখার বছর ক'টা পেরিয়ে এসে আমি আরম্ভ করব। যখন থেকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা শুরু হল তখন থেকেই না চলছে গোলমাল, জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব কিছুতে। তার আগের কথা থাক। ওটা আমারও যেমন, মাধু তেলীর তেমনি। এমন কি, যে বলদটা চোখে ঠুলি পরে মাধুর ঘানিতে ঘুরছে, সেটাও যখন বাচ্চা ছিল তখন মাঝে মাঝে মারধোর খেত বটে, কিন্তু এভাবে অষ্টপ্রহর চোখে ঠুলি এ'টে মাধুর মর্জিতে ঘুরে মরতে হত না ওকে। বদলটার বাপ মা গুরুজনেরা কে কি আশীর্বাদ করেছিল, বলা মুশকিল। কিন্তু ওটা একটা সর্বাংগসুন্দর বলদ হোক, যাতে ওর মালিক দু' পয়সা পায় ওর বিনিময়ে, এটুকু ওর মালিক নিশ্চয়ই কামনা করত। ওকে বেচে সে লোকটা কত পেয়েছে, বা উচিত পেয়েছে কিনা, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ও যে চোখে ঠুলি এ'টে ঘানি টেনে মরছে সারাজীবন, এটা ত' চাক্ষুষ সত্য। কাজেই ওর কপালে শুভ কামনা মঙ্গল প্রার্থনা কতটুকু ফলেছে এইটেই বিচার্য।

আমার সেই লাহোরী দাদার গালে-তিলওয়ালা বৌটি—স্বামীর মদ খাওয়া সহ্য করতে না পেয়ে আত্মহত্যা করলেন। এর জন্যে কে দায়ী হবে? সেই মেয়েটির ষেটেরা পুজোর দিন থেকে কতজনে কতভাবে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাই বা কে বলতে পারে!

যাক্, বৌদি কিন্তু আত্মহত্যা করেন নি। দাদা ওটা রটিয়েছিলেন কেন দাদাই জানেন, বৌদি কিন্তু পালিয়েছিলেন। পালিয়ে তিনি বাইজীও হন নি, সন্ন্যাসিনীও হন নি। এমন কি নার্স স্কুল মাস্টারনী বা দেশ উদ্ধারকারিনীও হন নি। তিনি একজনকে বিয়ে করেছিলেন। সে ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। নিজে [illegible] স্ত্রী নিয়ে যেমন ঘর করতে হয় তেমনি সংসার করেছিলেন। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সমেত ও'দের স্বামী স্ত্রীকে আমি আবার দেখেছিলাম একবার হরিদ্বারে। কিন্তু তখন আমি স্বামিজী মহারাজ হয়ে গিয়েছি। অর্থাৎ ষেটেরা পুজোর দিন থেকে যত আশীর্বাদ যতভাবে পড়েছে মাথার ওপর তার ফল ফলতে আরম্ভ হয়েছে। কাজেই তখন চিনেও তাঁকে চিনলাম না। ও'রা আমায় ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে আমার আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

সবাই ঘরে ফিরে যাবার গরজে মরছে, আমার কিন্তু সে গরজ নেই। কারণ আমার ঘরই নেই।

কেন, কি করে ঘর হারালাম আমি, সেইটুকুই শোনাতে চাই আমি। তাই দিয়েই আরম্ভ হবে আমার শোনানো।

১৯১৭ সাল। রাত দশটার পর তখন দিল্লী প্যাসেঞ্জার ছাড়ত। ঘণ্টা দেড়েক আগেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, পাছে জায়গা পাওয়া না যায়। একে পুজোর ভিড়, তায় হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে স্বাভাবিক জনতার বিচিত্র সমাবেশ। বলা বাহুল্য, বালক-চিত্ত দিশেহারা হয়েছিল। কিন্তু ঐ ফাঁকে আশে-পাশে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকে ঘিরে যাত্রীদের ব্যস্ততা, হুইলার কোম্পানির স্টলে সাহেবদের জটলা, ইণ্টার ও থার্ড ক্লাস কামরার সামনে মিঠাইওয়ালা, পান-সিগরেটওয়ালা এবং ফেরিওয়ালাদের ক্ষিপ্র হস্তনৈপুণ্য, মেয়েদের কম্পার্টমেণ্টের সামনে অনেক পুরুষের ভিড়, কুলীদের কলরব, ফার্স্ট ক্লাস কামরার দরজায় চুরুট-মুখে লালমুখদের দীর্ঘ দেহ আর কালো-বুক লাল-রঙা এঞ্জিনগুলোর অসহিষ্ণু ফোঁসফোঁসানি যে মনকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল, সে কথা আজ চল্লিশ বছরের ব্যবধানে একটুও ম্লান হয়নি। যাচ্ছিলুম বেশি দূরে নয়—ঝাঝায়। কিন্তু তুচ্ছ সফরের সামান্য রেলপথটুকু দীর্ঘায়ত হয়ে উঠেছিল যাত্রার উত্তেজনায়। বহুদূরের যাত্রী—মাদ্রাজ, করাচী, বোম্বাই, হয়তো বিলাত যাত্রীদের সান্নিধ্যে একটি ভীত-চকিত নির্বাক্ বালকের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। বারে বারেই লোলুপ বিস্মিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল স্তূপাকার লগেজের ওপর, গায়ে যাদের বিচিত্র তক্‌মা-আঁটা অভিজ্ঞতা, জড় পদার্থ হয়েও যারা নানা দেশের রেল ও জাহাজ কোম্পানির লেবেল লাগিয়ে নগণ্য দ্বিপদ গৃহবাসীর চেয়ে ঢের বেশি পদমর্যাদা অর্জন করেছে।

সেই থেকেই শুরু। আজও একেবারে থামিনি, যদিও এখন ভ্রমণের আনন্দের চেয়ে আরামের চিন্তাটাই বড় হয়ে উঠেছে। এক মাস আগে থেকে খরচের হিসাব লেখা আর হয় না, হাতে-হাতে টাইম-টেবল ঘোরে না এবং আসানসোল থেকে মোগলসরাই পর্যন্ত স্টেশনগুলোর পর পর নামও মুখস্থ নেই। ভয়ও যৎকিঞ্চিৎ বেড়েছে। নানা রকমের ভয়—ট্রেন ছাড়বার সময়ে অন্যত্র উপার্জনরত অন্তর্হিত পোর্টার-পুঙ্গব আবির্ভূত হবে কিনা, জংশন স্টেশনে ট্রেন-বদলের মার্জিন কতটুকু, চীনাবাদাম ও লেবুর খোসা প্রভৃতি ময়লা সাফ্ করবার জন্য পরের স্টেশনে সুইপার আসবে কি না, সকাল ছটায় যেখানে ট্রেন থামবে, সেখানকার প্রাতঃকালীন চায়ের বর্ণ ও আস্বাদ কি প্রকার, কামরায় সহযাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বভাব এবং মালপত্রের উচ্চতা ও আয়তন, সংলগ্ন স্নান ও শৌচাগারের দুর্দশার মাত্রা ইত্যাদি। এর ওপর আছে বিশেষ বিশেষ গাড়িতে রেস্তরাঁ-কারের অভাব, ভেণ্ডারের রান্নায় অকথ্য ঝালমশলা, পার্শ্ববর্তী নিরীহ গেরুয়াধারী আসলে ধূর্ত জুয়াচোর কি না—এই সব ব্যাপারে নানাবিধ অস্বস্তিকর জল্পনা।

তবু না বেরিয়ে, না বেড়িয়ে থাকাও যায় না। ভ্রমণের নেশাগ্রস্ত পুরোপুরি যাযাবর মানুষ নই। কিন্তু ভ্রাম্যমানের ডায়েরি না লিখলেও মনের ডায়েরিতে দেখছি অনেক কথাই জমা হয়ে রয়েছে। কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট। অভিজ্ঞতার চেয়ে মনের খোরাকটাই যেন বেশি কাম্য সঞ্চয়। তাই সময়ের দূরত্বে আয়াসলব্ধ আনন্দের চেয়ে অনায়াস-অর্জিত দেশ-দেশান্তরের বর্ণিত কথাই এখন লাগে ভালো। অর্থাৎ ভ্রমণের চেয়ে কাহিনীটাই এখন লোভনীয় মনে হয়। কিন্তু কোন্ ধরনের কাহিনী? যে কাহিনী মাত্র আত্মকথন, অর্থাৎ তথ্য-সমাবেশের ছদ্মবেশে সত্য অথবা সত্যকল্প অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম অথবা প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন না কি নিভৃত আলাপন? এক কথায়, শুধু ভ্রমণ, না কি যে ভ্রমণ সাহিত্যের পর্যায়ে উঠেছে?

বলা বাহুল্য, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যতই বাস্তব হোক না কেন, দেশ-বিদেশের খবর এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্যে যতই পূর্ণ হোক না কেন, তাতে মনের খোরাক পাওয়া যায় না। সেটা হয় 'রিপোর্টাজ', নয় অহং-সর্বস্ব স্মৃতির ভাবালুতায় পরিণত হয়ে যায়। মনে হয়, লেখক গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ছবিতে দ্রষ্টব্য পদার্থ এবং আশপাশের দৃশ্য থাকলেও, ফোকাসটা নিজের ওপরই নিবদ্ধ। আর এক ধরনের ভ্রমণকাহিনী পড়লে মনে হয়, একটি যান্ত্রিক অথচ সচেতন কণ্ঠ গম্ভীর স্বরে বলছে, 'খবর বলছি।' উড়ো জাহাজে চড়ে দশ পনের দিনে বিদেশ-বিভূঁই দেখে আসার যে সব বৃত্তান্ত আমরা আজকাল হামেশাই পড়ে থাকি, সেগুলো যে সাহিত্য-পদবাচ্য নয়, একথা বলে দেবার দরকার করে না। বিমান ঘাঁটি থেকে ট্যাক্সি চড়ে কোন্ পথে এসে কোন্ হোটেলে ওঠা গেল, কি ধরনের খাদ্য মিলল, জিনিসপত্রের দাম কি রকম, দূতাবাসে কাদের সঙ্গে দেখা হল, কাস্টমস বিভাগের কড়াকড়ি আর ছাড়পত্রের হাঙ্গামা নিয়ে কি ভাবে বিব্রত হতে হল আর তারই মধ্যে কোনও বিদেশীর সহৃদয়তা কিংবা বিদেশিনীর স্বচ্ছ দৃষ্টি মনের মণিকোঠায় কেমন করে অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল,—এই ধরনের ট্যুরিস্ট কাহিনী সকল দেশের পত্রিকাতেই ছাপা হয়ে থাকে। এ সব রচনার পাঠক-পাঠিকা আছে বৈ কি! 'মনসা মথুরাং' পাড়ি দেওয়ার মধ্যে এক রকম পরস্মৈপদী তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং যাদের জন্য এ সব লেখা, তাদের কাছেও এ সব রচনার একটা আংশিক সার্থকতা আছে। কিন্তু এগুলো রচনাও নয়, সাহিত্যও নয়। নিশ্চিন্ত আরামে আর নামকরা লোকেদের

সংগে ঘোরা-ফেরা, দেখা-শনোর বৃত্তান্ত বঞ্চিত মধ্যবিত্তের মনে সুড়সুড়ি লাগায়, চোখে ঘনায় দীর্ঘ সফরের স্বপ্ন। কিন্তু শুধু সাংবাদিকতায় মন ভরে না, যদিও জানি উচ্চাংগের সাংবাদিকতা সাহিত্যেরই নিকট-আত্মীয়।

বিলাত আজকাল নিজের ঘর-বাড়ির মতন আর চীন-ভারত তো এ-পাড়া, ও-পাড়ার সামিল। কিন্তু অধিকাংশ লেখায় যা দেখতে পাই, তা হয় উচ্ছ্বাস নয় প্রাসংগিক-অপ্রাসংগিক কথায় ভরতি। দেখার আনন্দ যদি ভাবপ্রবণতা সৃষ্টি করে, তা হলে সেটা জাগ্রত দৃষ্টিকে ক্ষুণ্ণ স্তিমিত এবং কিছুটা আবিল করে তোলে। নির্মোহ সমালোচক-দৃষ্টির বিচার মাত্রই সাহিত্য, এমন কথা বলি না। কিন্তু রূপকথার ভাষায় চমক দেবার চেষ্টায় কিংবা অতিরিক্ত রোমাণ্টিক পরিবেশ তৈরি করার মধ্য দিয়ে যেটা ফুটে ওঠে, তাকে 'আহ্লাদেপনা' বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পাঠকের সংগে অন্তরংগতা স্থাপনের চেষ্টাটা নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ এই 'ইণ্টিমেসি' অর্থাৎ লেখার হার্দ্য গুণটি সাহিত্য-সৃষ্টিরই অনুকূলে। যেমন ধরা যাক্, মুজতবা আলির 'দেশে-বিদেশে' অথবা তাঁর শেষ রচনা 'জলে ডাঙায়'। দু খানি বইয়েই আছে কথকতার সুর, মজলিশী ঢঙ। প্রথম বইয়ে সুর ও আবহাওয়া এত সুন্দর মিশেছে এবং তার সংগে দৃশ্য আর চরিত্র বেমালুম এক হয়ে গেছে, যে জোড়ের কাজ ধরা যায় না। বাগ্‌বাহুল্য থাকলেও শিল্পকর্মটা এক হিসেবে সূক্ষ্ম এবং জোরালো। ফলে 'দেশে-বিদেশে' সাহিত্যের কোঠায় পৌঁচেছে। 'জলে-ডাঙায়' গ্রন্থকার আরও বেশি সচেতন কিন্তু মুষ্টি শিথিল হয়ে গিয়েছে। তাই খণ্ডচিত্রগুলি মনোরম এবং আংশিকভাবে সফল হয়েও বইখানি সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত, তার বেশি নয়। কেন নয়, মুজতবা আলি নিজেই সেটা জানেন। একটা নতুনত্ব যখন রীতি-হিসাবে পুনরাবৃত্ত হয়, তখন শুধু জলুস কমে, তা নয়। মুদ্রাদোষে পরিণত হবার আশঙ্কাও থাকে। আর তাই-ই হয়েছে। অথচ লোহিত সাগরের উপকূলে নিয়ে তিনি এমন সব প্রসংগের অবতারণা করেছেন, সেগুলি শুধু মজার উদ্রেক করে না, লেখকের দৃষ্টিভংগী ও ইতিহাস-বোধেরও পরিচয় দেয়। এক একটি বর্ণনা, যেমন ছেড়ে-আসা বন্দরের আলোর মালা, নাবিকদের ভবঘুরে জীবন, চমৎকার লাগে পড়তে। সাহিত্যের আমেজ, যাযাবর জীবনের মায়াঞ্জন লাগে চোখে। কিন্তু পরমুহূর্তেই লেখকের দুর্দমনীয় ছেলেমানুষিতে, মজা করব বলে চতুরালি দেখানোর চেষ্টায়, নেশাটুকু কেটে যায়—জমতে পায় না। প্রাথমিক কাব্যবোধের প্রসন্নতাটুকু লুপ্ত হয় অবান্তর পরিহাসে। কাজেই দোষটা এক হিসেবে লেখকের নির্বাচিত ভংগিমায় আর কিছুটা তাঁর মানসিক গঠনে। গাম্ভীর্যটা পাপ—একথা মনের মধ্যে সর্বদা কাজ করতে থাকলে, সাহিত্যে শুধু সীরিয়সনেস-এর অভাব ঘটে না, সাহিত্যও কিছু পরিমাণে 'ভ্যালগা-রাইজ্‌ড্' হয়ে আসে।

সরস্বতী লঘুপদা হোন মধ্যে মধ্যে, ক্ষতি নেই। কিন্তু সরস্বতীর স্বাভাবিক গতি-ছন্দ চপল ও নৃত্যপরায়ণ হলে, তাঁকে নিয়ে পাঠককে বেশ বিব্রত হতে হয়। যেমন ধরা যাক্, মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম'। বইখানিতে সুখ্যাতির অনেক বস্তু আছে বলেই এর ত্রুটিগুলো বড় হয়ে দেখা দেয়। মনোজবাবু নতুন চীনের যে রূপটি উদ্ঘাটিত করেছেন, তাতে তাঁর অবেক্ষণ-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। কতদিনের জড়তা, সামন্ত-ধর্মী সমাজ, সামরিক দলাদলি, অভ্যন্তরীণ আর্থিক বিশৃংখলা, শ্বেতকায়দের ছলনাময় শোষণ প্রভৃতি কঠিন বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এবং শতাব্দীর পাষাণভার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন চীন এখন কেমনভাবে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-চিন্তায় আর আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়তায় শান্তি এবং গঠনের পথে এগিয়ে চলেছে, এ বইয়ে তার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাবে। বিশেষ করে, যুবশক্তির উত্থান আর নতুন দেশের আশা এবং বলিষ্ঠ কর্মসূচীর যে প্রত্যক্ষ পরিচিতি মনোজবাবু উপস্থিত করেছেন পাঠকদের সামনে, তাতে তাঁর সুস্থ এবং কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিভংগীর প্রশংসা না করে উপায় নেই। অভিজ্ঞতা যেখানে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ, সেখানে যথাযথ চিত্রণ অনেকটাই নির্ভর করে বর্ণনাভংগীর উপর এবং সে বর্ণনা ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। শ্রেষ্ঠ ভ্রমণসাহিত্যে এই ব্যক্তিগত সুর আর অন্তরংগ আলাপনটাই হল মস্ত আকর্ষণ। কিন্তু সেই প্রসংগে এটাও মনে রাখতে হবে, সত্যিকারের শিল্পী একটু প্রচ্ছন্ন, একটু নৈর্ব্যক্তিক এবং একটা স্বচ্ছ দার্শনিক দৃষ্টির অধিকারী না হলে, তাঁর রচনা তথ্যবহুল, উচ্ছ্বাসময় অথবা বর্ণনাসর্বস্ব হয়ে ওঠে। স্মৃতির আলোড়ন ফেনিল হয়ে উঠলে অথবা কথনভংগী বেশি অন্তরংগ হয়ে উঠলে, সূক্ষ্ম বা স্পর্শকাতর পাঠকচিত্তে তার একটা প্রতি-ক্রিয়া হবেই। এবং সে প্রতিক্রিয়া লেখকের অনুকূলে হয় না। তার কারণ, এই ধরনের পাঠক গায়ে-হাত-দিয়ে কথা বলাটা ঠিক বরদাস্ত করে না। মনে করে, লেখক ঘুরিয়ে নিজের কথাই বেশ বলে নিচ্ছেন। মনোজবাবু ভুল করেছেন স্টাইল-নির্বাচনে। এ স্টাইল তাঁর নিজস্ব নয়। অবশ্য বিষয়বস্তুর খাতিরে স্টাইলের পরিবর্তন ঘটে না যে তা নয়। কিন্তু সে পরিবর্তন এতটা উগ্র নয়। হওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বেও মনোজবাবু কিছু ভালো বই লিখেছেন এবং সেখানে তাঁর রচনানীতি বৈশিষ্ট্যবর্জিত ছিল না। একটা চলতি ধুয়োর মোহে তিনি এমন একটি সুলভ, চপল এবং কিশোর-জনোচিত সব কিছুতেই অবাক হবার ভংগী আমদানি করলেন যে, তাতে সাহিত্যগুণ অনেকটাই খণ্ডিত হয়ে গেল। ঢঙই আসল জিনিস নয়। সেটা জনপ্রিয়তার পেশাদার ঘটক হলেও, সংহত দৃষ্টি আর সংযত প্রকাশটাই হল বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে অন্তরংগতার যথেষ্ট অবকাশ পেলেও এবং বিস্ময়পূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রচুর নমুনা পেয়েও তাঁর ভাষাকে গদগদ করেন নি। অন্নদাশংকরের যুবক-দৃষ্টিতেও অনেক বেশি তীক্ষ্ণতা ও সংযম ছিল। অথচ বিশুদ্ধ সাহিত্য নিয়ে কারবার করছি, এ মনোভাব নিয়ে তাঁরা কলম ধরে-ছিলেন, তা বলা চলে না। তা হলে, বর্তমান সাহিত্যের আসরে প্রচলিত রীতির বাজার-মূল্যটাই কি বড় মাপকাঠি? আসর-জমানো কথকই কেবল মালা পরবেন, আর আসন ছেড়ে লেখক গিয়ে দাঁড়াবেন কানাচে? সৈয়দ মুজতবা আলি থেকে রূপদর্শী আর মনোজ বসুর মতন প্রবীণ সাহিত্যিক থেকে নবীনতম পর্যটক যদি একই ভংগীতে একই ভাষায় লিখতে শুরু করেন, তাহলে 'ঠাকুমার ঝুলি'ই বাঙলা সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় আদর্শ গ্রন্থ হয়ে থাকা উচিত।

অথচ পনের কুড়ি বছর আগে, যখন এই ধরনের ভাষা ও ভংগী আমদানি হয়নি, সাহিত্য-সৃষ্টিও হয়েছে এবং তার মধ্যে দু' একখানি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনীও ছিল। তার কারণ, তখন তথাকথিত রম্য-রচনার ধারা ও সুর প্রবর্তিত হয়নি। আমা-দের চলতি ভাষারই রকমফের দিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে এবং উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-সাহিত্যের নমুনা অত্যন্ত সংখ্যালঘু হলেও তাদের মধ্যে 'রম্যতা'-গুণের অভাব ছিল না। 'জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুরাতনপন্থী এবং সনাতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে রচিত হলেও, এই প্রসংগে তার নামোল্লেখ না করলে ত্রুটি হবে। যদিও আমরা এই ভাষায় এখন আর লিখি না এবং মনের ভাব আর দৃশ্যের বর্ণনা ঐ ভাবে লিপিবন্ধ করতে সংকোচ বোধ করি, তবু বাংলা ভাষায় লিখিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে অগ্রণী হিসাবে এ বই উল্লেখযোগ্য। নগাধিরাজ হিমালয় ভারতবাসীর কাছে একটি বিশেষ অর্থে মহিমমণ্ডিত। দেবতাদের আবাসস্থল, শুভ্র পবিত্রতার প্রতীক, আর অধ্যাত্মসাধনার দুর্গম লক্ষ্য হিসাবে হিমালয় পর্বত আমাদের সমগ্র চৈতন্যকে মুগ্ধ এবং আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমাজ ও মানব-মনের যুগাতীত স্মৃতি যে ঐতিহ্যধারায় পুষ্ট ও প্রবৃদ্ধ, তার পিছনে রয়েছে হিমালয়ের বাস্তব অস্তিত্ব এবং সে অস্তিত্ব নিরাসক্তিতে, দূরস্থতায় ও বহু আয়াসের দুর্লভতায় পূত এবং শুদ্ধ। বহু দিনের ধর্মবিশ্বাস, সমাজরীতি ও লোকাচার হিমালয়ের ভাব-কল্পনাকে সমৃদ্ধ করেছে, তীর্থযাত্রীকে আকৃষ্ট করেছে সহস্র

পথকষ্ট সত্ত্বেও। তাই হিমালয়কে নিয়ে এত বিভিন্ন রকমের চেষ্টা, চিত্রণ ও কল্পনা। কালিদাস থেকে রোয়েরিখ, অতীশ দীপঙ্কর থেকে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় আর জলধর সেন থেকে প্রবোধ সান্যাল সকলেই ঐ মহান হিমবান পর্বতের উত্তুঙ্গ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কেউ এঁকেছেন ছবি, কেউ লিখেছেন কাব্য, কেউ বা শুধুই ঘুরে বেড়িয়েছেন অনুসন্ধিৎসায়। যাত্রার পদ্ধতি বদলেছে, যাত্রীর দৃষ্টিতে ও মনোভাবেও পার্থক্য অনেক। তবু পরমতীর্থ হয়ে আজও রয়েছে হিমালয়। আর সেই হিমালয় ভ্রমণ শুধু স্বদেশী নয়, বহু বিদেশী রচনারও বিষয়বস্তু হয়েছে। তবে সমুদ্রের চেয়ে পাহাড়ই আমাদের জাতীয় মনকে বেশি কাছে টানে।

কিন্তু সব ভ্রমণ-কাহিনীই সাহিত্য নয়, বলা বাহুল্য। কোনোটাতে থাকে অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়াচ, কোনোটাতে বা দৃশ্যবস্তুর সবিস্তার বর্ণনা আবার কোথাও বা নেপথ্যদর্শন কিংবা স্বগতোক্তি। শেষেরটির প্রতিই আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব, যদিও একথা ঠিক যে ভ্রমণকাহিনী যদি 'অবজেক্টিভ' না হয়, বাস্তব ও প্রত্যক্ষকে ছেড়ে পরোক্ষ চিন্তা আর মনোরাজ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলে বৈচিত্র্যহীনতা আসতে বাধ্য। নিভৃত আলাপ, সরস জল্পনা এবং সূক্ষ্ম মন্তব্য আমরা চাই। কিন্তু সেগুলো যেন প্রাসঙ্গিক হয়, পাণ্ডিত্য আর ভূয়োদর্শনের উগ্র নমুনা না হয়। হিমালয়-প্রসঙ্গে যে কোনো ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এই দুটি বিপরীত কোটির একটির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ার স্বাভাবিক আশঙ্কা রয়েছে। হয় যাত্রীদের কথা আর পথের কষ্ট, নয়তো আধ্যাত্মিক ভাবনা। এ দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রাখা শিল্প-সংযমের পরিচয়। যাকে বলে সামঞ্জস্য-জ্ঞান, তারই অপর নাম 'সেন্স অব্ হিউমার'। এই জ্ঞান থাকলে, কোথায় থামতে হয়, কতটা বলা শোভন, সে বোধ জন্মায়। নইলে রচনা হয়ে যায় মাকড়সার জাল-বোনা, কয়েকটি কথার পুনরাবৃত্তি। রসজ্ঞান থাকলে, পুনরুক্তি আর অতিরঞ্জনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই কারণেই উচ্চাঙ্গের আত্মজীবনী আর ভ্রমণকাহিনী ভালোভাবে লিখতে পারা সত্যিই কঠিন কাজ। ব্যক্তিক নিবন্ধ ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, কল্পনা-জল্পনাকে কেন্দ্র করে, অথচ তার ঊর্ধ্বে উঠে নৈর্ব্যক্তিক রসসঞ্চার করে তখনই, যখন লেখক বড় জিনিসের সন্ধান পান এবং সেই বৃহৎ বক্তব্যকে ব্যক্তিগত সুরের মাধ্যমে, ছোট-খাটো পরিবেশেই, সূক্ষ্মতায় ও সংযমে পরিস্ফুট করতে পারেন। সেইজন্যই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর আত্মজীবনী আর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সংখ্যা এত কম। যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাসসুন্দরী আর প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথা বা জীবনস্মৃতি-সম্ভার মুষ্টিমেয়, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণকাহিনী যে আঙুলে গোনা যাবে, তা সহজেই অনুমান করা চলে। এই সব রচনায় শিল্পীর সত্তাই হল আসল দ্রষ্টব্য। পারিবারিক সংবাদ কিংবা বিদেশের জলবায়ুটা মুখ্য বিবেচনা নয়। এগুলো উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য হল সজাগ দৃষ্টি, গভীর অনুভূতি এবং চিকণ তুলির সাহায্যে বিচিত্রবর্ণ একটি মনের প্রকাশ। রঙ থাকবেই, কিন্তু গাঢ় প্রলেপ নয়। বিভিন্ন দেশের সমাজ, রীতি-নীতি, দর্শনীয় বস্তু, হরেক রকমের মানুষ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, —এ সব খুঁটিনাটি হল 'ডীটেলের ব্যাপার। কিন্তু তথ্যের বহুল সমাবেশ, রঙ আর বার্নিশ যদি আসল ছবিটাকেই ঢেকে ফেলে, তা হলে সেটা শিল্পকর্ম হয় না। সেটা হয় কিশোরসুলভ অ্যাডভেঞ্চার, শিল্পীর 'এক্সপীরিয়েন্স' নয়। অভিজ্ঞতা যখন সত্তার অঙ্গীভূত হয়ে মনের সঙ্গে বেমালুম এক হয়ে যায়, তখনই সে অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক বা আর্টিস্টিক মূল্য। অন্যথায় কিছুই নয়। বড় শিল্পী ও সাহিত্যিকের মানস-আকাশের এক টুকরো দেখতে পাওয়া এবং তাকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেই 'কম্যুনিকেশনের' শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে এসেছে, পথকষ্ট লোপ পেয়ে দৈহিক যোগাযোগ সহজ করে এনেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে বিজ্ঞানী মনের প্রসার বাড়েনি, পাঠক আর লেখকের চিত্তসংযোগ সফল হয়ে ওঠেনি। যেটা হচ্ছে সেটা আংশিক সংঘাত। লেখক বড় বেশি মনোরঞ্জনের চেষ্টায় আছেন, গল্পের গতি আর রোমান্সের আমেজ মিশিয়ে। ফলে সত্যিকারের ভাব-বিনিময় হচ্ছে না, বাড়ছে কেবল কথা আর কথা।

বাংলা ভাষায় ভ্রমণ-সাহিত্য প্রথম জাতে উঠল রবীন্দ্রনাথের কলমের গুণে। আমাদের সাহিত্যের যে সব বিভাগ তিনি লেখনী দিয়ে স্পর্শ করেছেন, সেগুলি খাঁটি সোনা হয়েছে, এ কথা সকলেরই জানা। উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, কথিকা, গীতিকা, নাটক ও প্রহসন—এগুলি তো আছেই। চিঠিপত্র, সমালোচনা আর প্রবন্ধেও তাঁর বক্তব্য 'সেন্স অব ফর্ম'-এর মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্ম মর্মস্পর্শী মন্তব্য আর রসিকতার দীপ্তি, এই ত্রিগুণ তাঁর কাব্যধর্মী মনকে লাগাম টেনে ধরেছে। অনুভূতির ব্যাপ্তি, কল্পনার বিশালতা এবং আবেগের স্পন্দন—কোনোটিরই অভাব ছিল না তাঁর মানসগঠনে। কিন্তু গদ্য সাহিত্যের ঐ তিনটি ফর্মে তিনি যে অঙ্গ-কৌশল ব্যবহার করেছেন, তাতেই বোঝা যায় তাঁর মননশক্তির তীক্ষ্ণতা ও সংযম। ভ্রমণ-সাহিত্যেরও প্রথম সংস্কার এবং রুচিবান্ রূপমার্জনা তিনিই করে গেলেন এবং কত সাবলীল শক্তিতে সে কাজ সম্পন্ন হল, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল 'ছিন্নপত্র', 'যাত্রী', 'জাপান যাত্রীর পত্র' আর 'রাশিয়ার চিঠি'। এ বই ক'খানির মূলে কথা প্রকৃতি নয়, বিদেশও নয়—যদিও প্রকৃতির খণ্ডচিত্র আর বিদেশী সমাজ ও মানুষ সেখানে উদার পরিপ্রেক্ষিত অথবা আনত পটভূমির কাজ করেছে। পদ্মা থেকে পিটাসবর্গ, বোরোবুদুর থেকে কিয়োটো, বিচিত্র ও বিভিন্ন পরিবেশে কবি বেড়িয়েছেন, অনেক কিছু নতুন সুন্দর ও শিক্ষণীয় জিনিস দেখেছেন। কিন্তু যা চোখে পড়ল, ভালো লাগল অথবা লাগল না, সব কিছুই কবির মনে গুঞ্জন তুলেছে এবং ভাবনার ফুল ফুটিয়েছে। সে সব গুঞ্জনের রেশ মিলিয়ে যাবার আগে, চিন্তার পেলব দলগুলি ঝরে যাবার আগে, এক শিল্পীর হাত আর সন্ধানী চোখে তাদের ধরে রেখে গেল চিঠিতে আর ডায়েরির পাতায়। সুতরাং দীর্ঘ পথের পথিক ও চিরযাত্রী যে রবীন্দ্রনাথকে এখানে পাই, সে রবীন্দ্রনাথ একাধারে অন্তরঙ্গ খেয়ালী পুরুষ, সমাজসভ্যতার শিক্ষার্থী, সংস্কৃতির সমন্বয়সাধক আর কৌতূহলী শিল্পী। প্রকৃতির সন্তান হয়েও নিসর্গ তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে নি, তার কারণ ভ্রাম্যমান রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, প্রকৃতির ঋণের চেয়ে সমাজ ও সভ্যতার কাছে মানুষের দেনা কিছু কম নয়। কর্মী ও ভাবুক শিল্পী এখানে 'বহিরঙ্গকে বর্জন করে' সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। আর দেখাতে পেরেছেন এইজন্য যে, তিনি বিদেশ অথবা প্রকৃতিকে নিয়ে মহাভারতী কথা ফাঁদেন নি, চিঠি ও জার্নালের আকারে মনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব য়ুরোপের সেরা সাহিত্যিক মুন্সিয়ানার সঙ্গেই তুলনীয়।

বাংলা সাহিত্যে একদিকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর একদিকে আলোকচিত্রময়, অবান্তর ও অশুদ্ধ উদ্ধৃতিপূর্ণ গাইড-বুক জাতের বই বাদ দিলে, ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে যা পাঠযোগ্য রইল, তা প্রায় নগণ্য। অথচ ভারতের মতন বিচিত্র দেশে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ কিছু কম নয়। ডেভিস্-এর মতন অনাসক্ত, নির্ভেজাল ভবঘুরের বিনা টিকিটে সাগর-পাড়ি এবং মালগাড়ির ভিতর লুকিয়ে গোটা দেশকে চষে বেড়ানো কারুর কারুর কাছে অসম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু অত সুস্থ সহজ জীবন-দৃষ্টি নিয়ে অমন চমৎকার বই লেখা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। এই দৃষ্টির কিছু নমুনা, এই স্বচ্ছ রসবোধ আর ছন্নছাড়া জীবনের বিচিত্র সঙ্গীদের কিছু পরিচিতি পাওয়া যায় 'মরুতীর্থ হিংলাজে'। অবধূতের যাযাবরত্ব মেকি পদার্থ নয়, অন্তত এ বইয়ে। তাঁর ছবিগুলিতে হয়তো কিছু রেখাবাহুল্য আছে, কিন্তু মানুষগুলি জীবন্ত আর অভিজ্ঞতাও বিচিত্র এবং সরস। তাই কাহিনীর একটানা গতি, মনের নির্লিপ্ততার মধ্যে উষ্ণতার আভাস, কৌতুকবোধ, বর্ণনা আর মানবিক সহানুভূতি—সব ক'টি মিলে একখানি মনোজ্ঞ ও সুপাঠ্য বই

তৈরী করেছে। আরও একটা কারণ আছে। 'পিকারেস্ক' রচনার একটি নিজস্ব আবেদন আছে আর আছে প্রকৃত যাযাবর জীবনের উপর অহেতুক প্রীতি, যেটা আমাদের অবদমিত মনের ও অতৃপ্তির নিরন্ধ্র প্রকাশ। কিন্তু প্রীস্টলি সাহেবের 'ইংলিশ জার্নি'র মতন বই আমাদের সাহিত্যে লেখা হয়নি, একথা ভাবতে খারাপ লাগে। তিনি শুধুই পথিক, একটি বিশিষ্ট মনের পথিক, গড্ডলিকা-যাত্রী নন্। তবে আমাদের দেশেও খাঁটি মুসাফির আছেন। একজন কাঁধে হ্যাভারস্যাক নিয়ে, আহার-আশ্রয়ের দুর্ভাবনা ছেড়ে তীর্থ-পরিক্রমা করেন। মন পড়ে আছে মন্দিরের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যশিল্পে এবং সেই সঙ্গে জ্ঞাত-অজ্ঞাত উপজাতির সমাজ-রীতির তথ্য-আহরণে। নির্মল বসু যখন 'পরিব্রাজকের ডায়েরি' লেখেন, তখন তিনি পরিব্রাজক তো বটেই, ভাষারও সহজ সাধক। আর একজন যান গঙ্গোত্রি আর যমুনোত্রির সন্ধানে কিংবা হিমালয়-পারে কৈলাস ও মানসতীর্থে। তিনিও যাত্রী, অধিকন্তু শিল্পী। কিছুটা নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় হিমালয়ের তীর্থপথিক হোন অথবা তন্ত্রাভিলাষী সাধুসঙ্গসন্ধানী হোন, তিনি লিখতে জানেন। পেশাদারী লিখিয়ে কিংবা সচেতন সাহিত্যিক নন্ বলেই বোধ হয় তাঁর রেখাচিত্রগুলি উজ্জ্বল। দুঃখের বিষয়, এঁরা ঐ ধরনের বই আর লেখেন নি। হয়তো সেটা ভালোই। প্রথম খ্যাতির অক্ষম জের টেনে চলার মতন ক্লান্তিকর আর কিছু নেই।

কিন্তু ক্লান্তিহীন খ্যাতিরও সাধক রয়েছেন আমাদের সাহিত্যে। তিনি প্রবোধ সান্যাল। এবং সে খ্যাতির অনেক অংশই তাঁর প্রাপ্য আর কিছুর জন্য না হোক্, অন্তত তাঁর নিষ্ঠার জন্য। হিমালয়ের যে আকর্ষণের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সে আকর্ষণ মর্মে মর্মে অনুভব না করলে তেত্রিশ বছর ধরে কোনও মানুষে নিজেকে তার আদর্শের কাছে বাঁধা রাখতে পারে না। সংসারী লোক তিনি, কিন্তু গৃহীর অন্তরেও বৈরাগ্যের সুর বাজে এবং সে সুর যখনই স্পষ্ট হয়ে ধ্বনিত হ'তে থাকে, তখনই তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয় চির-পরিচিতের আড়ালে, যে অপরিচয় আপনার স্বাতন্ত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে, তারই সন্ধানে। প্রবোধ সান্যাল এই সুপ্রাচীন হিমালয়কে অনেক-ভাবে দেখেছেন, পশ্চিম থেকে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত তার বিভিন্ন রূপ জানতে চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টা আজও থামে নি। দুর্গম পথ আজ অনেকখানি সরল হয়ে এসেছে কিন্তু হিমালয়-রহস্য নিঃশেষিত হয়নি। ভূবিজ্ঞানে হিমালয় কনিষ্ঠা, তাই কিশোরীর লীলা আর হৃদয়-রহস্য সকল সৌন্দর্যবিদের ধ্যানবস্তু। প্রবোধ সান্যাল যখন হিমালয়ের একটি অংশ নিয়ে তাঁর প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে' রচনা করেন, তখন সে বই পাঠকমহলে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। তাতে প্রথম প্রণয়দৃষ্টির আবেশ ও মোহ ছিল বেশি এবং ভাবপ্রবণ রোমান্টিক অতিরঞ্জন থেকে তা মুক্ত ছিল না। তবু ভালোবাসার সজীবতার জন্যই সে মুগ্ধ দৃষ্টি প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রবোধ সান্যাল যে প্রকৃত ভ্রাম্যমাণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। নইলে বছরের পর বছর তিনি এক দুর্নিবার টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন না। য়ুরোপের একাধিক পর্যটক যদি আল্‌পস্ নিয়ে মেতে থাকতে পারেন,—ম্যাটারহর্ন য়ুং-ফ্রাউ, সিলভারহর্ন চূড়ার অনির্বচনীয় সৌন্দর্য যদি তাঁদের বারে বারেই কাছে টেনে নিয়ে আসে, তা হলে ভারতীয় মুসাফির হিমালয়ের অফুরন্ত রহস্য বুঝবার ও বোঝাবার যে চেষ্টা করবেন, তাতে বিচিত্র কিছু নেই। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছিল গল্প ও ভ্রমণের মিশ্রণ, তাতে ছিল নাটকীয়তার রস। পরবর্তী গ্রন্থ 'দেশান্তর' আরও সহজ ও স্বচ্ছ দৃষ্টির আমদানি করল। সর্বশেষ গ্রন্থ 'দেবতাত্মা হিমালয়' হল অন্য জাতের বই। একে হিমালয়-জিজ্ঞাসা তথা ভারত-জিজ্ঞাসা বলাও চলে! পাঁচশো পৃষ্ঠা ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ, এবং তার বিভিন্ন রূপের চিত্র-উদ্ঘাটন। বহু চিত্রে শোভিত এবং দুটি খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থ মহাভারত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবোধ সান্যাল যখন বলেন হিমালয়কে জানা ও চেনা এক জন্মে কুলোয় না, তখন তিনি সত্য কথাই বলেন। কারণ তিনি জানেন, হিমালয় শুধু ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতীক নয়, আমাদের সমস্ত ধ্যানধারণা, ধর্মবিশ্বাস ও সুদূরে কামনার অধরা মূর্তি নয়। সে হল অনন্ত জ্ঞানের মূল উৎস, যে জ্ঞান দুস্তর, নিভৃত সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত। আর এই অনন্ত লাভের ব্যাকুলতা যে মানুষকে নিত্যনিয়ত আকর্ষণ করে, মুক্তি দেয় না, সুস্থির স্বস্তির মাঝে ঐশী অতৃপ্তির সূচনা করে, সে শুধুই যাযাবর নয়। তার একটি বিশেষ দৃষ্টি আছে,

যে দৃষ্টি সরণশীল—এক কথায় গতিই যার ধর্ম। গতি-স্রোত উৎসারিত হচ্ছে স্থাণু পর্বতের অজানা গহবর ও কন্দর থেকে এবং সে স্রোত জীবন ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে আবহমান কাল থেকে। এইটি হল হিমালয়-দর্শন ও ভারত-দর্শনের মূল কথা। সেই মূল কথাটি নানা শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। এই দীর্ঘায়ত পর্বত-প্রাচীরে যেমন বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রস্তর-স্তর, গ্রন্থখানিতেও তেমনি পুরাণ আখ্যান জনশ্রুতি ইতিহাস রাজনীতির নানা আলোচনার বিন্যাস এবং অনেক স্থলেই এ বিন্যাস সরস ও মধুর হয়েছে। মাধুর্যের অপর একটি কারণ, প্রবোধ সান্যালের ভাষা। কিন্তু মুশকিল হয় এই অতিপ্রবাহ ভাষারই জন্য। যে তত্ত্ব তিনি সন্ধান করেছেন, যে রূপ তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন, সেটা শুধু সুব্যক্ত নয়, অতি-ব্যক্ত। ফলে পাঠকের ভাববার, বুঝবার এবং মিলিয়ে দেখবার অবকাশ হয় না। যেখানে তিনি মানুষ এঁকেছেন, খণ্ডচিত্র এঁকেছেন, বর্ণনা করেছেন—এক কথায় গল্পের আমদানি করেছেন, সেখানে তিনি প্রকৃতিস্থ। কিন্তু যেখানে তিনি মনোদর্পণে কল্পনার ছায়া ফেলেছেন, সেখানে কিছু ছায়াময় নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ গ্রন্থে একাধিক ত্রুটি, তা না বললে সত্যের অপলাপ হয়। তাই পাঠ-শেষে পাঠকের মনে হয়, এ যেন ছেদহীন আত্ম-সংলাপ। যে কথা আরও অল্প পরিসরে বলা চলত, তা টেনে টেনে অনেক পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উপমায় অলঙ্কারে পুনরুক্তিতে অতি-সজ্জিত এ বই একদিক থেকে যেমন পাঠকদের আনন্দ দেবে, আর একদিক থেকে অন্য ধরনের পাঠকের মনে জাগাবে অতৃপ্তি। তথ্যের দিক থেকে ত্রুটি অর্থাৎ অনৈতিহাসিক উক্তিগুলোকে বড় করে দেখবার দরকার নেই। তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন লেখক নিজেই। তবে তত্ত্বকথা আর আত্মকথা, দুটোতেই মাত্রাধিক্য ঘটেছে। তাই ভাষার আবিলতা ও চিন্তার ফেনিলতা অনেক জায়গায় অবাঞ্ছনীয় আবর্তের সৃষ্টি করেছে। বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয়, মন্দাকিনী আর অলকনন্দা, নীলগঙ্গা আর সিন্ধু, বাগমতী আর কোশীতে কোনও পার্থক্য নেই। সেই একই স্রোত, একই ফেনা। কিন্তু শিল্পকর্মে এ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে লেখকের নিষ্ঠাকে—যে নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় অখণ্ডের রূপসাধনা সম্ভব হয়। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে বিশাল হিমালয়ে আছে আদিম ও নৈসর্গিক বিস্ময়-ব্যাপ্তি, আছে 'এপিক কোয়ালিটি'। প্রবোধ সান্যালের মনে ও কলমে লিরিকের ধর্ম। তিনি রচনা করতে গেলেন মহাকাব্য! এইখানেই অসংগতি।

হিমালয় নিয়ে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্প্রতি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কেদার-বদরিকার তীর্থ-মাহাত্ম্য শুধু যে কমেনি, তা নয়। ভ্রমণের আনন্দ, দেখার আনন্দও বাঙালীকে ঘরকুণো অপবাদ থেকে মুক্ত করেছে। এদের মধ্যে শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' আর উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ' উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রন্থে খুচরো চিন্তার চমক আছে আর আছে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মনের মোহ-মুক্ত দৃষ্টি, যদিও সচেতনতার উগ্রতা মাঝে মাঝে স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ করেছে। উমাপ্রসাদের বইখানি আরও সহজ, সরস শিল্পের পরিচয় দেয়। তিনি খুব সংযত লেখক। ছোট্ট বই, ছোট্ট পরিধি এবং সেটা ইচ্ছাকৃত। তথ্য আর ভাবনার স্তূপ থেকে কয়েকটি কথা ও চিন্তার বিচক্ষণ নির্বাচন। শিল্পকর্মে গ্রহণ-বর্জনের গুরুত্ব কতখানি, তা বোঝা যায় এই ধরনের রচনা থেকে। ফলে, যে একই বিষয়বস্তু মহাকাব্যের উপজীব্য, তাকে নিয়েই আবার আঁট-সাঁট সনেট লেখা যায়। এবং সেই নিরলঙ্কার অথচ সুন্যস্ত পদ-রচনায় লেখকের দক্ষতা সব চেয়ে প্রমাণিত হয়।

শুধু তীর্থ বা তীর্থপ্রসঙ্গ নিয়ে যে চমৎকার বই লেখা যায়, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল রানী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ'। দৃশ্য তখনই দ্রষ্টব্য হয়, যখন দৃষ্টি আর দর্শন হয় অভিন্ন—দৃষ্টির প্রসাদ আনে স্বচ্ছ সরস দার্শনিকতা। এ বইয়ে সে দৃষ্টি আছে, কেবল খুঁটিয়ে দেখা মেয়েলি দৃষ্টি নয়। আর আছে বলেই পরিবেশ মানুষ সব অনুষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠান সব মিলে একটি অখণ্ড চিত্র হতে পেরেছে। মৃদু রসিকতার অভাব নেই। আবার রসজ্ঞানের উপস্থিতি অতিবর্ণনকে দূরে পরিহার করেছে। কুম্ভ শুধুই পূর্ণ হয় না, যদি সে কুম্ভে পয়োধারার ইঙ্গিত না মেলে। রানী চন্দ সে ইঙ্গিতে কার্পণ্য করেননি।

ভ্রমণ-সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর নামোল্লেখ করছি সবশেষে, যদিও তাঁর 'সমুদ্রতীর' এবং 'আমি চঞ্চল হে' অনেক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে। দুটি কারণে—প্রথমত, এগুলি স্বতন্ত্র ও নূতন রীতিতে লেখা আর দ্বিতীয়ত, বুদ্ধদেবের কবিতা, গল্প নিয়ে আলোচনার আধিক্যে তাঁর প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-সাহিত্যের 'মেজাজ' নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। আমার মনে হয়, ভ্রমণ-শিক্ষিত ভ্রাম্যমানের উপযুক্ত মেজাজ তাঁরই আছে। লেখক হিসাবেও তিনি 'মুডের' উপর এবং বিশেষ মুহূর্তের বিশিষ্ট প্রেরণায় আস্থাবান্। ঠিক এ-জাতের অন্য কোনো বই আমাদের ভ্রমণ-সাহিত্যে নেই। কেননা, এ দু'খানি বইয়ের ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, দৃষ্টি-কোণ সবই আলাদা। চিত্তের যে পটভূমিকায় অবসরভুঞ্জন শিল্পভাবনায় উন্নীত হতে পারে, বুদ্ধদেবের মনের আকাশে সেই পাখা-মেলা আলসাটাই হ'ল রচনার উৎস, পটভূমি ও প্রেরণার কেন্দ্র। এর মধ্যে ভ্রমণ-পঞ্জী নেই, সংবাদসেবী সমাজের পরিচয় নেই, সমালোচনা বা তির্যক ব্যঙ্গের ছিটে-ফোঁটা নেই। আছে খেয়াল, ছুটির 'মুড'। তিনি দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও শিল্পকলা দেখতে যাননি, গিয়েছিলেন ছুটি উপভোগ করতে পুরী, ভুবনেশ্বর, গোপালপুর এবং ওয়ালটেয়ারে। সেখানকার কয়েকটি আনন্দ ও উৎসাহঘন দিনের স্মৃতি মর্মরিত হয়েছে অন্তরঙ্গ সুরে। এইটুকুই। তবু সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ি, গোরুর গাড়ি, অন্ধকারে উঁচু-নীচু পথ কিংবা ঘুম-জড়ানো চোখে একটি নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত মালগাড়ির অকারণ ঘোরা-ফেরা—এইগুলোই তাঁর কল্পনা ও অনুভূতিকে নিবিড় করে তুলেছে। যদি সত্যি কথা নির্ভয়ে বলা চলে, তা হ'লে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আমাদের সাহিত্যে শুধু দু'খানি সত্যিকারের 'ট্র্যাভেলগ' লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর আর বুদ্ধদেব। পৃথক্ সুর ও পৃথক্ দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখা ও দেখা। কিন্তু সমানভাবেই উত্তীর্ণ ও উপভোগ্য।

প্রসঙ্গত, বিদেশী সাহিত্যের কথা এসে যাচ্ছে উপসংহারে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। যে-দেশে ভ্রমণ হ'ল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ, পর্বত আর সমুদ্র-অভিযান হ'ল স্বধর্মাচরণ, সেখানে একাধিক উচ্চাঙ্গ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিত হবে, তা বলা বাহুল্য। ভ্রমণেরও ঐতিহ্য আছে, থাকা দরকার। নইলে তা নিয়ে সাহিত্য-রচনা সম্ভবপর নয়। পুরানো ক্লাসিকগুলির কথা ছেড়ে [illegible]

ম্যান্ডেভিল ও মার্কো পোলো, হ্যাকলুয়্যট এবং প্যাচার্স, ভলতেয়ার ও মরিংস, স্মলেট ও ইয়ং, বার্টন ও লিভিংস্টোন, স্পীক এবং স্ট্যানলি। ওদিকে স্কট ও শ্যাকলটন থেকে স্মাইথ ও শিপ্টনের অভিযান-কাহিনীর কথাও বাদ দিতে হয়, কেননা, এগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা এবং যদিও এদের কিছু সাহিত্যগুণ আছে, অ্যাডভেঞ্চারের নিজস্ব আবেদন সে গুণ-বৃদ্ধির সহায়তা করেছে। কিন্তু লরেন্স স্টার্নের 'সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি'র মতন বই, অমন অনুভূতি আর স্ফূর্তিময় সংক্ষিপ্ত সাহিত্যপ্রচেষ্টা বিদেশী সাহিত্যেও বেশি নেই। কিংবা বরোর 'ল্যাভেংরো', কিংলেকের 'ঈওথেন' অথবা স্টীভনসনের 'ট্রাভলস্ উইথ এ ডংকি'র মতন অতি উপভোগ্য ভ্রমণ-কাহিনীও বিরল। শেষোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে পাহাড়ে জঙ্গলে শীতে বৃষ্টিতে একটি অবাধ্য ও মজার সঙ্গীকে নিয়ে বারো দিনের যাযাবর জীবন-বৃত্তান্ত। এ সব বইয়ে তত্ত্বকথা, পারিপার্শ্বিকের প্রাধান্য নেই। আছে লেখকের ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি ভাষায় কত ধরনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত! এক দিকে লরেন্সের 'টোয়াই লাইট ইন্ ইটালি' অপর-দিকে অলডাস হাক্সলির 'জেস্টিং পাইলেট' অথবা 'বিয়ণ্ড দী মেক্সিক বে'। পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গী, পৃথক্ ভাষা-কৌশল কিন্তু সমান উপভোগে কোনো বাধা নেই। যদি শিল্প-দর্শন-সংস্কৃতির সরস ও সূক্ষ্ম আলোচনা ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে মেশানো পছন্দ করেন, তা হ'লে সিটওয়েল ভ্রাতৃ-যুগলের রচনা পড়ুন—'সাদার্ন ব্যারোক' কিংবা 'দী ফোর কণ্টিনেণ্টস্'। একটি হোটেলের চার দেয়ালের মধ্যেই চারটি মহা-দেশের সিল্যুয়েৎ ভেসে উঠবে। যদি দক্ষিণ সমুদ্রের আকর্ষণ বড় হয় আপনার কাছে, তা হলে পড়ুন কনর‍্যাড, ম'ম এবং অসবার্ট সিটওয়েলের লেখা 'এসকেপ উইথ মী'। দেখবেন, মানুষ আর প্রকৃতি বইয়ের পাতায় জীবন্ত হয়ে হাত মিলিয়েছে। ওদিকে অরণ্য আর মরুভূমিকে নিয়েও কত ভালো বই-ই লেখা হয়েছে। ফ্রেয়া স্টার্ক এবং রসিটা ফর্বেস উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টি না করলেও তাঁদের রচনায় প্রসাদগুণের অভাব নেই। আবার শুধু ব্রেজিলের দুর্ভেদ্য জঙ্গল নিয়েই অতি-সুপাঠ্য একাধিক ভ্রমণকাহিনী রচিত হয়েছে, যেমন টমসিলসনের 'দী সী অ্যাণ্ড দী জ্যাঙ্গল', জুলিয়ান ডুগিড-এর 'দী গ্রীন হেল' অথবা পিটার ফ্লেমিং-এর 'দী ব্রেজিলিয়ন অ্যাডভেঞ্চার'। একই বিষয়, কিন্তু নূতন ও স্বতন্ত্র ভঙ্গী। কারুর দৃষ্টি বহির্মুখী, কারুর বা অন্তর্মুখী। আর যদি ভ্রমণ ও দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতির মিশ্রণে রুচি থাকে, তা হ'লে পড়তে হয় ডাউটি-র 'অ্যারেবিয়া ডেজার্টা' এবং টি ঈ লরেন্স-এর 'সেভন পিলার্স অব্ উইজডম'। পেতে হলে পড়তে হয় শ্বেন হেডিন ও রোয়েরিখ্-এর ভ্রমণ-কাহিনী। যদি চান অ্যাডভেঞ্চার, তিমি-শিকারের রোমাঞ্চ কাহিনী কিংবা দক্ষিণ মেরুর বৈজ্ঞানিক পরিচয়, পড়ুন স্কট এভান্স এবং ওয়্যানির বই কিংবা জুলিয়ন হাক্সলির 'আফ্রিকা ভিয়্যু' —যাতে নৃতত্ত্ব ও প্রাণিবিজ্ঞানের সাহিত্যিক পরিবেশন পাবেন।

তাই মনে হয় বিদেশী ভাষায় ভ্রমণ-সাহিত্যের যে খোরাক, তার তুলনা দেশী ভাষায় নেই। গ্রাহাম গ্রীন থেকে জ্যপেরি, ম্যারিস ব্যারিং থেকে ঈভলিন ওয়াও, অ্যাডেন ও ম্যাক্নীস্ থেকে অ্যাডমিরল বার্ড—কত বিভিন্ন লেখকের হাতে ভ্রমণ-কাহিনী কত বিচিত্র রূপই নিয়েছে। কেউ বা দার্শনিকতার আভাস দিয়েছেন, কেউ বা নিপুণ শ্লেষ। কারুর লেখা ডায়েরির আকার, কারুর বা চিঠির ফর্ম। কেউ আত্মসমাহিত গম্ভীর, কেউ বা অদম্য উৎসাহে বহির্বিশ্বের পরিচয়-ব্যগ্র। এই ধরনের নানা প্রচেষ্টায়, নানা পরীক্ষাতেই সাহিত্যের ও শিল্পকৌশলের উন্নতি হয়। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় এবং আঙ্গিকে দু-চারখানি বই সুপাঠ্য হতে পারে, এই পর্যন্ত। যেমন সুনীতি চট্টো-পাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত', যেখানে শিল্প-সমাজ-সংস্কৃতির বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা ও বর্ণনা আছে, কিন্তু পুরোপুরি সাহিত্য তাকে বলা চলে না। সর্বাঙ্গীণ বিবর্তন সম্ভব নয়, যেখানে শিক্ষা রুচি এবং সাহসের দৈন্য। বাংলা সাহিত্যে মাত্র কয়েকখানি ভ্রমণ-কাহিনী উল্লেখযোগ্য, নিশ্চয়ই। কিন্তু সত্যিকারের 'ট্রাভেলগ' লিখতে হলে মনের যে প্রসার ও সংযত চিন্তার প্রয়োজন, যে ভাষা ও ভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষার দরকার, তার সজাগ অথবা উদ্বুদ্ধ দৃষ্টির প্রয়োজন, ঠিকমত চর্চা যে এখনও ভালোভাবে হয়নি, সেটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনা করার মানে উন্নাসিকতা নয়। ক'খানা বাংলা বই হাতে নিলে তাদের রূপ ও মেজাজ আমাদের মন ভরাতে পারে? ক'খানা বই শেষ করলে তারা নিজে থেকেই বলে ওঠে— '......this is no book, who touches this touches a man'?

ভালো ট্রাভেলগ পড়তে ইচ্ছা করাটাই স্বাভাবিক। না পাওয়াটা দুর্ভাগ্য। বর্তমান জীবনের জটিলতা, দৈন্য এবং অসন্তোষ এড়াতে হলে ভ্রমণের মনোমত বই নিয়ে তাতে ডুব দেওয়া দরকার—যেখানে স্লেটের পাহাড়, বরফের চোখ-ঝলসানো দীপ্তি, ময়লা মেঘের মজ্জা-জমানো হাওয়া এবং ঝড় আর করকাপাতে মনের অসহ্য গুমোট ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নয়তো গাঢ় সবুজ আর নীল-মাখা চাঁদোয়ার নীচে ঘোর অরণ্যে শ্বাপদ-বিপদের অফুরন্ত সম্ভাবনায় দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাও যদি না মেলে, অপরের চোখ নিয়ে, অপরের মেজাজ দিয়ে অবসর-মুহূর্তগুলোকে সোনালি তবকে মুড়ে দিতে পারাও একটা সৌভাগ্য। আর সে সব মুহূর্ত দৈব উপভোগের সামগ্রী, রসিয়ে-তারিয়ে তাদের আস্বাদ নিতে হয়। অতৃপ্তির মনশ্চরণটুকুই পাঠকসাধারণের সম্বল। তবে সেই 'মনসা মথুরা'-যাত্রা যেন সঙ্গতি, সৌন্দর্য আর সাহিত্যের পথ দিয়েই শুরু ও শেষ হয়।

ঘোড়সওয়ার

শিল্পী : রামকিংকর

# ছায়াসঙ্গিনী

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

সব কথা আজকে আমি খুলে বলব। নইলে আর আমি সময় পাব না।

ভারী আশ্চর্য লাগছে একটা জিনিস ভাবতে। এতদিন সবাই আমাকে দেখেছে—রূপো রঙের আলোয় কত মানুষের মুগ্ধ চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠেছি আমি। অথচ, আমার অস্তিত্ব যে কোথাও আছে কেউ সে-খবর জানত না। যখন চলে যাব তখনও কেউ জানবে না আমি কোনোদিন ছিলুম।

বোধ হয় হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। এবার সব স্পষ্ট করেই বলব। কিছু আর আড়াল রাখব না। এতদিন আড়ালে আড়ালেই তো ছিলুম। অনস্তিত্বের এই ছদ্মবেশের অন্তরালে এখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে না-থাকার অভিনয় এতদিন ধরে করে আসছি, এইবারে সেইটেকেই সত্য করে তুলব।

আবরণ তবে সরেই যাক।

আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। ঠাকুর্দার টোল ছিল—ছেলেবেলার স্মৃতির ভেতরে সে-সব এখনো আবছা হয়ে আছে। এখনো স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শামুকের খোলাভর্তি নস্যি নিয়ে ঠাকুর্দা ছাত্রদের পড়াতে বসেছেন—চিৎকার করে কী যেন বোঝাতে চাইছেন আর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকিতে বাঁধা একটা জবাফুল এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে।

কালের হাওয়ায় বাবা স্কুল কলেজে পড়লেন। অফিসে চাকরি নিলেন। কিন্তু সংস্কৃত চর্চার অভ্যাস তাঁর গেল না। বাড়িতে নিজে সংস্কৃত পড়তেন, বাংলা পুরাণ পড়তেন—আমাদেরও পড়াতেন। আমরা দু ভাই—দু বোন। চারজনের মধ্যে আমি তৃতীয়।

ভাইয়েরা স্কুলে গেল—কলেজেও গেল তারপরে। কেবল আমাদের দু' বোনের ব্যাপারেই অদ্ভুত রকমের রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেন বাবা। আমাদের স্কুলে যেতে দিলেন না। বাড়িতে বসেই আমি সংস্কৃতের গোটা দুই পাশ করে ফেললুম। আর শিখলুম সীতা-সাবিত্রী হওয়ার নির্ভুল শাস্ত্রীয় পন্থা।

ফস্‌কা গেরো ছিল ওইখানেই।

সিনেমায় আমরা যেতে পেতুম বই কি। তবে বাছা বাছা বই ছিল। ধর্মমূলক, পৌরাণিক, উপদেশপূর্ণ। একদিন ওইরকম একটা কী ছবি দেখতে গিয়েই আমার প্রথম আত্মদর্শন হল।

আমার বয়েস তখন পনেরো। বাবার শাস্ত্রীয় শাসনে আর কিছু না হোক—উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যে আমার শরীর ভরে উঠেছিল। তা ছাড়া লম্বাটে গড়নের জন্যেও বয়েসের চাইতে আমাকে বেশ বড়ই দেখাত।

আমরা দু বোন ছবি দেখতে গিয়েছিলুম দূর-সম্পর্কের এক দাদার সঙ্গে। বাবা তাকে খুব বিশ্বাস করতেন। আজকে তার পুরো নামটা আর বলবার দরকার নেই, ডাক নাম মনুদাই বলি।

তখন ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলেছে, মনুদা বাইরে গেছে পান খেতে। আমরা দু বোন চুপ করে বসে আছি—হঠাৎ একটা কথা কানে উড়ে এল।

—দ্যাখ্—দ্যাখ্—তাকিয়ে দ্যাখ্ ওদিকে—

মেয়েদের সহজ সংস্কারে আমরা টের পাই। অনেক দূরে লুকিয়ে বসে পেছন থেকে কেউ চোরা চাউনি ফেললেও তা আমাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। বুঝতে পারলুম আমাদের লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখলুম সামনের দিকে গুটি-কয়েক ছোকরা। কলেজের ছাত্র হওয়াই সম্ভব। তাদের দৃষ্টি ঘুরে আছে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমারই মুখের ওপর। একজন বলছে, ওই লাল-শাড়িপরা মেয়েটিকে দেখেছিস রে? প্রায় অবিকল এক চেহারা! হঠাৎ দেখলে মনে হয়—মিতালী দেবী বসে রয়েছে।

শুনে আমার মুখ রাঙা হয়ে গেল। কিন্তু আমার ছোট বোন্ বারো বছরের খুকু হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, কী হাসছিস তুই অসভ্যের মতো!

খুকু হাসি বন্ধ করলে, কিন্তু চোখদুটো ওর চকচক করতে লাগল। চাপা গলায় বললে, ওরা কিন্তু ঠিকই বলেছে দিদি। হঠাৎ তোকে দেখলে মিতালী দেবীই মনে হয়!

আমি আরো লাল হয়ে বললুম, ছিঃ—চুপ কর।

আলো নিভে এল। ছবি আরম্ভ হবে আবার। পান চিবুতে চিবুতে নিজের জায়গায় ফিরল মনুদা। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

কিন্তু তারপরে ছবিতে আমার আর মন বসল না। রক্তের মধ্যে কোথা থেকে ছোট একটা ঢেউ উঠে পড়ল। আমার এই পনেরো বছর বয়েসের মধ্যে অনেক সংস্কৃত বই পড়েছি আমি —নিজের ছোট এই জীবনটুকুর ভেতরে ছোট বড় অনেক দোলা লেগেছে অনেকবার। কিন্তু এ যে আজ কী হল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। একটা আশ্চর্য উত্তেজনায় আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগল—মনে হতে লাগল একটা চাপা জ্বরের উত্তাপ ফুটে উঠছে শরীরে।

ছবি দেখে রাস্তায় বেরিয়ে অন্যমনস্কের মতো চলেছি, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে খুকু বললে, জানো মনুদা—কী একটা মজা হয়েছে আজকে?

—কিসের মজা রে?

—জানো, দিদিকে দেখে কয়েকটা ছেলে বলছিল—

আমি রাগ করে বললুম, চুপ কর, বাঁদর মেয়ে।

খুকু বললে, বা-রে, দোষের কথা তো কিছু বলেনি। ওরা বলছিল, দিদি নাকি ঠিক ফিল্মস্টার মিতালী দেবীর মতো দেখতে।

আমি আরো রাগ করে বললুম, ছাই।

মনুদা একবারের জন্যে থেমে দাঁড়ালো—দুটো চোখ সম্পূর্ণ করে মেলে ধরল আমার দিকে। তখন আমার মুখের ওপর পথের ইলেক্‌ট্রিক লাইট আর আকাশের জ্যোৎস্না একসঙ্গে একটা অদ্ভুত আলো ফেলেছিল। সেই আলোর মায়ায় আর আমার পনেরো বছরের লাবণ্যে মনুদাও বোধ হয় আমাকে নতুন করে দেখল।

অদ্ভুত ধরাগলায় মনুদা বললে, খুব অন্যায় বলেনি কিন্তু।

খুকু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

—কেমন, দেখলি তো দিদি।

আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ে—সেই অহমিকা আমার ভেতরে ফণা তুলল। বললুম, এ-সব যা-তা বোলো না মনুদা। শুনলেও অপমান হয়।

অল্প একটু হেসে মনুদা বললে, আমার ওপর রাগ করা মিথ্যে। দোষ তাকেই দে টুনু—যে তোদের দুজনকে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছে!

আমি জবাব দিলুম না। হনহন করে আগে আগে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। টের পাচ্ছিলুম, যতটা জোরে হাঁটছি—সে তুলনায় হাঁপাচ্ছি অনেক বেশি।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। শুধু বাড়িতে ঢোকার মুখে খুকুকে শাসিয়ে বললুম, একথা যদি আর কাউকে বলবি, তা হলে গলা টিপে দেব তোর।

খুকু ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা।

কিন্তু খুকুকে শাসন করলেও নিজের মনের গলা তো টিপে বন্ধ করতে পারি না। সারারাত আমি ঘুমুতে পারলুম না। আমার রক্তে যন্ত্রণার মতো কী যেন খেলে বেড়াতে লাগল। আমার চেহারা অবিকল একজন ফিল্মস্টারের মতো দেখতে! আমাকে দেখে লোকে মিতালী দেবী বলে ভুল করতে পারে। ছিঃ—ছিঃ! মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে আমি—এ লজ্জা রাখব কোথায়!

অথচ, শুধুই কি লজ্জা! তার সঙ্গে কোথায় যেন একটা সুখ মিশে আছে—নেশা-জড়ানো একটা উত্তেজনা লুকিয়ে আছে কোথাও। আচ্ছা, আমি যদি সত্যিই মিতালী দেবীর মতো নামকরা ফিল্মস্টার হতুম—কী হত তাহলে? মিতালী দেবীর এত নাম—কাগজে কাগজে তার ছবি, শুনেছি, অনেক টাকাও সে রোজগার করে। সে কি খুব সুখী?

তারপরেই নিজেকে আমি তীব্রতম ধিক্কার দিলুম। আমি মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে—কিছুদিন পরে উপাধি পরীক্ষা দিয়ে 'সরস্বতী' হব—এ-সব আমি কী ভাবছি! ফিল্মের মেয়েরা যে কত খারাপ—সে-কথা কতজনের মুখে কতবারই তো শুনেছি। শেষ পর্যন্ত আমি কিনা—

বিছানা ছেড়ে উঠে এলুম। জানলার ঠিক সামনেই সপ্তর্ষি। পনেরো বছরের স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টিতে আমি দেখলুম বশিষ্ঠের পাশেই অরুন্ধতীর সতী-প্রদীপ জ্বলছে—ধ্রুবলোক থেকে তিমিরগহন পার হয়ে আমার মাথার ওপর আলোকের কণায় কণায় ঝরছে শুচিস্মিত আশীর্বাদ। আমি মহিম্ন স্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলুম নিঃশব্দে।

দিন কয়েক ভালোই কাটল। ঠিক করলুম, আর সিনেমায় যাবো না। মনের ভেতরে যে ছোট্ট ঢেউটা উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে এল একদিন।

কিন্তু সিনেমায় যাওয়ারও দরকার হল না। আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গা খুব দূরে নয়। বাবার সঙ্গে ভোরে গঙ্গাস্নান করতে যাই রোজ। সেদিনও গিয়েছিলুম।

স্নান করে যখন ফিরছি—তখন সামনে লাল হয়ে সূর্য উঠছিল। নিজেকে আমি দেখিনি—তবু জানতুম আমাকে সেদিন কেমন দেখাচ্ছিল। আমার পনেরো বছরের শাদা-শান্ত কপালে চন্দনের ফোঁটার ওপর সূর্যোদয়ের লাল আলো পড়ে অরুন্ধতীর সিঁদুরের মতো মনে হচ্ছিল; আমার পরনের গরদের শাড়িটারও ছিল শ্বেতচন্দনের রঙ; আমার দুখানি পা যেন পথের ওপর লক্ষ্মীর পদলেখা এঁকে দিচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়েই কে যেন কাকে বললে, ওই মেয়েটিকে দেখেছ?

বাবা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন, শুনতে পেলেন না। কিন্তু শব্দভেদী বাণ এসে ঠিক আমার বুকে বিঁধল। কে বলছিল আমি জানি না—তাকিয়েও দেখিনি। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই আমার পা থমকে দাঁড়ালো।

সেই গলা আবার বললে, হঠাৎ দেখলে কী মনে হয় বলো তো?

আর একটি অলক্ষ্য স্বর বললে, ঠিক যেন "যৌবন-যমুনা" ছবিতে মিতালী দেবী। গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসছেন।

আমার রক্তে এবার আর ছোট একটুখানি তরঙ্গই জাগল না—হঠাৎ যেন ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। আমি দ্রুত পায়ে নিজের বুকের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললুম। আকাশে তখনও সূর্যের লাল রঙ—কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলুম, আমার কপাল থেকে অরুন্ধতীর সিঁদুর মুছে গেছে।

সারাটা দিন যেন কিছুতেই আর মন বসতে চাইল না। বাবার কাছে পড়তে গিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষি ভুল করে বসলুম যে বাবা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দিন তবু একরকম গেল, রাতটাই অসহ্য। কপালের দু পাশে দপদপ করতে লাগল—চোখের পাতা যতই বন্ধ করতে চাই, ততই কে যেন তা জোর করে টেনে রাখল। আশ-পাশের বাড়ি থেকে, বাইরের পথ থেকে প্রত্যেকটা খুটিনাটি শব্দ অস্বাভাবিক জোরালো হয়ে এসে আমার কানের পর্দায় ঘা দিতে লাগল। আমি আবার জানলার পাশে এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু আজ আর আকাশে সপ্তর্ষি দেখা যাচ্ছিল না—ধ্রুবতারাও নয়, একটা ছাইরঙা ভুতুড়ে মেঘে ঢাকা পড়ে ছিল সব।

সেইদিন থেকেই নিজের কাছে আমি হারতে আরম্ভ করলুম।

জোর করেও ঠেকাতে পারলুম না—কিছুতেই না। আমার বই গেল, উপাধি পরীক্ষা গেল, এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা সব গেল। যে-মুহূর্তেই হাল ছেড়ে দিলুম, সেই থেকেই আর কোথাও এতটুকু সংশয় রইল না। বাবার চোখ এড়িয়ে, খবরের কাগজ আর এখান-ওখান থেকে মিতালী দেবীর ছবি জোগাড় করতে লাগলুম। আর ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিলিয়ে দেখতুম আমাদের দুজনের মিল কতখানি। আমার হাসিতেও অমনি করে গালে টোল পড়ে কি না—আমি [illegible]

উঠলে আমার মুখেও অমনি ক্লান্ত বেদনা ছড়িয়ে পড়ে কি না, আমার চোখের তারাতেও অমনভাবে মনের আলো ঝিকিয়ে ওঠে কি না!

শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠল। মনুদাকে চুপিচুপি ছাদে ডেকে নিলুম।

—আমাকে মিতালী দেবীর ফিল্ম দেখাবে মনুদা?

মিনিটখানেক মনুদা চুপ করে চেয়ে রইল আমার দিকে। ওর মুখের ওপর কতগুলো অদৃশ্য রেখা ফুটে উঠেছে বলে আমার মনে হল।

মনুদা বললে, মিতালী দেবী তো ধর্ম-মূলক ছবিতে নামে না।

—যাতে নামে তাই আমি দেখব।

—কিন্তু মামা তো তোকে যেতে দেবেন না।

নিজের ওপর আমার তখন আর কর্তৃত্ব ছিল না। নির্লজ্জ স্পষ্ট ভাষায় বললুম, তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

তারপরে শুরু হল মিথ্যার পালা। চিড়িয়াখানায় যাওয়ার নামে, মনুদাদের বাড়ি যাওয়ার নামে, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্নের নামে। বাবা মনুদাকে বড় বেশি বিশ্বাস করতেন।

আর আমি? মিথ্যার পথে একবার যখন পা দিলুম—তখন আর ফেরবার পথ কোথায়? কখনো কখনো খারাপ লাগত না তা নয়—কিন্তু সেই মুহূর্তেই হয়তো পর্দার ওপর মিতালী দেবীর ছবি ফুটে উঠত। এইমাত্র হয়তো নায়ক তার নীরব প্রেমকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠুরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, আর অসহ্য যন্ত্রণায় বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিতালী। তার সেই যন্ত্রণা আমার হৃৎপিণ্ডকেও যেন দলে-মুচড়ে একাকার করে দিত। শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে আমিও প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করতুম।

আর তার মধ্যেও কানে আসত।

ঃ আশ্চর্য—ঠিক এক চেহারা!

ঃ যমজ বোন নয় তো?

ঃ দ্যাখ্ না জিজ্ঞেস করে—সত্যিই বোন নাকি?

আমি ভাবতুম—বোন নয়, আমরা এক। কার যেন অদ্ভুত খেয়ালে দুটো আলাদা শরীরে ভাগ হয়ে গেছি আমরা। ওর দুঃখ, ওর আনন্দ, ওর ভালোবাসা—সব আমার। রাত্রে চমকে উঠতুম এক-একদিন। আচমকা মনে হত, জানলা দিয়ে তরুণকুমার এসেছে আমার ঘরে, আমার কপালে তার হাত রেখে গভীর গলায় বলছে, আমায় ক্ষমা করো মাধবী। আমি তোমায় ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আর অভিমান করে থেকো না—এসো আমার সঙ্গে।

শুধু একটা কথা কোনোদিন ভাবিনি। আমার মনের ছোঁয়াও কি মিতালী পায়? পায় কোনোদিন?

নেশার ঘোরে দিন কেটে যাচ্ছিল। ঘা পড়ল শেষ পর্যন্ত।

সিনেমা দেখে বেরিয়েছি। তরুণকুমারের কোলে মিতালীর মৃত্যুদৃশ্য তখনো চোখে নয়—বুকের মধ্যে বিঁধে আছে। আমার দু কান ভরে তখনো বাজছে তরুণকুমারের কান্নাঃ ফিরে এসো রমা—তুমি ফিরে এসো—

আকাশভাঙা বৃষ্টি পড়ছে তখন। হল থেকেই বেরিয়েছি আর সেই সময় কোথা থেকে বাবাও ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিলেন লবীতে।

লুকোবার কোনো জায়গা নেই—মিথ্যে বলবার মতো ফাঁক নেই এতটুকুও। বিস্ময় আর বেদনার বোবা দৃষ্টিতে বাবা কেবল একবার আমার দিকে তাকালেন। একটা কথাও বললেন না। বাইরের বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমস্ত অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে গিয়ে আমিও দাঁড়িয়ে রইলুম সেইভাবেই। মনুদা এর মধ্যে কোন্ দিকে যে ছিটকে সরে পড়েছিল সে আমি জানি না।

বৃষ্টি থামলে বাবা আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, টুনু, যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

বললুম, চলো।

বাড়ির পথে আমাকে একটা কথাও বললেন না। কৈফিয়ৎ চাইলেন না, ধিক্কার দিলেন না, গালমন্দও করলেন না। সংসারে এমন বিশ্বাসঘাতকতাও আছে—যার জন্যে ক্ষোভ করবার, নালিশ করবার শক্তিও মানুষ হারিয়ে ফেলে। শুধু নিঃশব্দে প্রায় কুঁজো হয়ে বাবা পথ চলতে লাগলেন।

পথে কিছু বলেন নি, বাড়িতেও না। কোনো কথা জানতে দিলেন না মাকেও। কেবল পরদিন খেতে বসে বললেন, আজ অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হবে। একবার কালীঘাটে যাব। রাধিকা চাটুয্যের বড় ছেলে এবার এম-এ পাশ করে ভালো চাকরি পেয়েছে। ভাবছি টুনুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাড়ব।

আমি দরজার পাশে বসে বাবার জন্যে সুপুরি কুচোচ্ছিলুম। একটুর জন্যে আমার আঙুলে জাঁতির চাপ পড়ল না।

মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি কথা! তুমি যে বলেছিলে, কাব্য-ব্যাকরণ পাশ না করিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে না?

বাবা বললেন, তা বলেছিলুম বটে। কিন্তু সুপাত্র পেলে আর দেরি করে লাভ কী! তা ছাড়া টুনুর যে বিয়ের বয়েস হয়নি তা-ও তো নয়। আমাদের পরিবারে ন' বছরে গৌরীদান হত বরাবর। তুমিও তো বারো বছরে এ-সংসারে এসেছিলে, মনে আছে সে কথা?

শাড়ির আঁচল দাঁতে চেপে, মা কী বলেন তাই শোনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মা কিন্তু অতি সহজেই মেনে নিলেন বাবার কথা। একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না।

—বেশ তো, ভালো ছেলে যদি হয়, দেখো না কথাবার্তা কয়ে। আর মেয়ে তো আমাদের লক্ষ্মীর প্রতিমা। স্বভাবচরিত্রে, রূপেগুণে এমন মেয়ে কলকাতায় আর একটিও নেই।

বাবা সংক্ষেপে বললেন, হুঁ!—ওই ছোট্ট শব্দটুকুর ভেতরে যে কতখানি বেদনা, ঘৃণা আর ব্যঙ্গ মিশে আছে, সেটা অনুভব করে আমার ঘরের মেঝেয় একেবারে মিশে যেতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু আর আমি কী করতে পারি? ধরা যখন পড়েছি—তখন আর ফেরবার পথ নেই। যা করবার আজই করতে হবে। এক্ষুনি।

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনুদাকে আমি চিঠি লিখলুম। তারপরে মা যখন তেতলায় পুজোর ঘরে গেছেন, আর খুকু স্নান করতে গেছে কলে, তখন টুপ্ করে রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের লেটার বাক্সে চিঠিটা ছেড়ে দিলুম।

বাবা মনুদাকে বড় বেশি বিশ্বাস করতেন। অত বিশ্বাস করে ভালো করেননি।

...কিন্তু এ-সব তো ভূমিকা। এ আর বাড়িয়ে লাভ কী। বাইরে কোথায় যেন ঘড়ির শব্দ হচ্ছে—রাত বারোটা। বেশি সময় আমি আর দিতে পারব না। যা বলবার এখুনি বলে নিতে হবে।...

অফিস থেকে ফিরে বাবা টিউশন করতে গেছেন। দোতলায় পুজোর ঘরে মা সন্ধ্যের শাঁখ বাজাচ্ছেন। সেই সময় আমি ঘর ছাড়লুম।

সমস্ত রাত কেঁদেছি। নিজের কাছে নিজে প্রার্থনা করেছি—মুক্তি দাও, এই সর্বনাশের নেশা থেকে আমায় মুক্তি দাও। পরের দিনটা জ্বর হয়েছে বলে বিছানায় পড়ে থেকেছি, কিছু খাইনি। তবু পারলুম না। আমার এতদিনের সব শিক্ষা—সব সংস্কার কোথায় ভেসে চলে গেল।

মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে আমি। কত সতীর কত পবিত্র রক্ত বইছে আমার শরীরে। তবুও আমার ঘর ছাড়তে হল।

মনুদা পাকা লোক। ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল। আর সেই ট্যাক্সিতে ছিল আর একজন অচেনা মানুষ। কোটপ্যাণ্ট-পরা, চোখে নীল চশমা।

মনুদা আমার কানে কানে বললে, ভয় নেই। উনি আমাদের নিয়ে যাবেন। লাইনেরই লোক।

ট্যাক্সি চলল। পেছনে পড়ে রইল সেই রাস্তা—যে রাস্তা দিয়ে প্রত্যেক দিন আমি গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসতুম। পড়ে রইল সেই বাড়ি—যে বাড়িতে মা এখনও সন্ধ্যার শাঁখ বাজাচ্ছেন।

ট্যাক্সি এসে থামল টালীগঞ্জের এক প্রকাণ্ড

বাড়ির সামনে। গিয়ে উঠলুম তারই তেতলার এক ফ্ল্যাটে।

ফিল্ম ডিরেক্টার দত্ত একটা ছোট টেবিলের সামনে নীল আলো জেলে কী যেন লিখছিলেন। আমাদের দিকে ভালো করে না তাকিয়েই বললেন, বসুন।

আমরা বসলুম। একটা সোফার নরম গদির মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এতক্ষণ পরে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হল আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের নিচে সোফার গদি নেই, মেজে নেই, কিছুই নেই; আমাকে যেন কেউ একরাশ পেঁজা তুলোর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে, আর আমি আস্তে আস্তে তার ভেতর দিয়ে অতলান্ত শূন্যতায় নেমে চলেছি। ঘরের ভেতর কোথায় যেন ফুল আছে—কোথাও ধূপের কাঠি জ্বলছে—গন্ধ পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না। ওই গন্ধের সঙ্গে আমাদের পুজোর ঘরের গন্ধ এক হয়ে গিয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে অবশ করে আনল।

হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ তীব্র আলো এসে আমায় জাগিয়ে দিলে। লেখা শেষ করে দত্ত উঠেছেন, জোরালো আলোটা জেলে দিয়েছেন। আমি নড়েচড়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বসলুম।

দত্ত দু পা এগিয়ে এলেন। মিনিটখানেক অপলক চোখে রইলেন আমার দিকে। তারপর বিস্ময় আর হতাশা মেশানো গলায় বললেন, একি কাণ্ড করেছ অনিল!

সেই নীলচশমাপরা ভদ্রলোক, অনিলবাবু বললেন, কেন স্যার—আমার তো ভালোই মনে হল।

—ভালো!—ডিরেক্টার বললেন, একে দিয়ে কী হবে? এ যে মিতালীর নকল। একে কে চান্স দেবে? আসল থাকতে নকলকে নেবে কে?

এক মুহূর্তে আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। যে-কথাটা আমার অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল সে-কথা বুঝতে পেরেছি অনেক দেরিতে। কিন্তু এখন আমি কোথায় দাঁড়াব? যে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি সেখানে তো আর আমার ফিরে যাওয়ার পথ নেই।

আমার পনেরো বছরের চোখের সামনে সারা পৃথিবীর আলো নিভে গেল। আমি প্রথম আত্মহত্যার কথা ভাবলুম।

ডিরেক্টার জানলায় পিঠ দিয়ে আবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপনার নিজের যদি কোনো চেহারা থাকত, আমি আপনাকে সুযোগ দিতুম। কিন্তু ভগবান আপনার সে-পথ বন্ধ করে রেখেছেন। ফিল্ম লাইন আপনার নয়—আপনি ফিরে যান।

আর্তনাদ করে উঠল মন্দা।

—ফিরে যাবে কী করে? বাড়ি থেকে যে পালিয়ে এসেছে।

—বাড়ি থেকে পালিয়ে!—ডিরেক্টার চমকে উঠলেন: ছিঃ ছিঃ—এ কী করেছেন!—সমস্ত মুখে তাঁর বিব্রত বিরক্তি ফুটে বেরুল: কিন্তু আমি কী করি বলুন তো? খামোকা আমাকে এমন বিশ্রী ফ্যাসাদের মধ্যে ফেললেন কেন?

আমি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলুম। না—কাউকেই আমি ফ্যাসাদে ফেলতে চাই না। আমার পথ খোলাই আছে। গঙ্গার কালো জল জীবনের সব কালোকে মুছে দিতে পারে। আমি ঠিক খুঁজে নিতে পারব গঙ্গা কোন্ দিকে।

ঠিক তক্ষুনি কে যেন বললে, আসতে পারি মিস্টার দত্ত?

গলার স্বর নয়—সেতারের তারে যেন ঝঙ্কার উঠল। বিদ্যুৎ ছুটে গেল আমার মাথার ভেতরে। ও গলা আমি চিনেছি। শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছি।

দরজার পর্দা সরিয়ে মিতালী ঢুকল।

দত্ত হেসে উঠলেন: আরে কী কোয়েন্সিডেন্স্! এসো মিতালী—এসো। একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।

ইচ্ছে করছিল, এই ঘর থেকে পাগলের মতো এই মুহূর্তে আমি ছুটে পালিয়ে যাই। চিড়িয়াখানার জীবের মতো সকলের কৌতুক আর কৌতূহলভরা দৃষ্টির আমি শিকার হতে চাই না। আমিও মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে, আমারও নিজের একটা মহিমা আছে—আমারও একটা মর্যাদা আছে। কিন্তু তবুও আমি যেতে পারলুম না। এতদিন যাকে আমার একাত্মা বলে জেনেছি, স্বপ্নে কল্পনায় যার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজেছি, আজ প্রতিদ্বন্দ্বীর জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকে আমি দেখতে লাগলুম। আজ মনে হল, মিতালী যদি পৃথিবীতে না থাকত, তা হলে ওর সব সম্মান—সব সৌভাগ্য আমিই পেতুম। আগে থেকেই ডাকাতের মতো এসে মিতালী আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

আমি মিতালীকে দেখছিলুম।

ঝলমলে শাড়ি, ঝক্‌ঝকে গয়না—মুখের ওপর রঙের পুরু প্রলেপ। ওর সঙ্গে আমার মিল কোথায়?

চমক ভাঙল দত্তের গলার স্বরে।

—এঁকে দেখছ তো মিতালী? অবিকল তোমার চেহারা?

—তাই নাকি? —তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ কপালে মিতালী আমার দিকে তাকালো। আমি সইতে পারলুম না—মাথা নামিয়ে নিলুম। মিতালী বললে, ওমা—কী হবে!

দত্ত হেসে উঠলেন। বললেন, বেশ হয়েছে। তুমি যদি মিথ্যে নিজের দর বাড়াতে চাও—কন্ট্রাক্টে গোলমাল করো, তা হলে এঁকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব। লোকে টেরও পাবে না।

—বেশ তো, তাই করবেন।—বলে হেসে উঠেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল মিতালী। আমার পাশে এসে বসে দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, তোমার নাম কী ভাই?

আমি কথা বলতে পারলুম না। আমার চেতনা যেন আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। মিতালীর গায়ের একরাশ তীব্র সুগন্ধির ঘূর্ণির মধ্যে আমি হারিয়ে গেলুম। অস্পষ্ট গলায় নিজের নামটা বলেছিলুম কিনা আমার তাও আজ আর মনে নেই।

অনেক দূর থেকে বাঁশীর মতো মিতালীর গলা শুনতে পেলুম: একটা কাজ করুন না মিস্টার দত্ত। পরশু আউটডোরে যাচ্ছেন তো? সবই তো লংশটে নিচ্ছেন? আমার বদলে এঁকে নিয়ে যান না। আমি দিনকয়েক রেস্ট্ নিই।

দত্ত যেন চমকে উঠলেন।

—তোমার লংশটগুলো?

মিতালী বললে, ক্ষতি কী! ক্লোজ-মিড্ সব তো ফ্লোরেই নেবেন। লংশটগুলো ওঁকে দিয়েই চালিয়ে দিন না?

—আর ভয়েস?

—ডাবিং করবেন।

কতগুলো দুর্বোধ্য শব্দ স্বপ্নের ঘোরে আমার কানে আসতে লাগল। তারই মধ্যে দেখলুম, দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করলেন বারকয়েক। যেন নিজের সঙ্গেই কথা কইলেন: ডুপ্লিকেট? তা আইডিয়াটা নেহাৎ মন্দ নয়। হলিউডেও আছে।

ডুপ্লিকেট! শব্দটা পরিষ্কার কানে এল। জানতুম না—ওই শব্দটাই আমার ভবিষ্যৎ। আমার পরিণাম।

আর সেইদিন থেকেই আমি মুছে গেলুম। মুছে গেলুম পৃথিবী থেকে।

আমি ফিল্মে নামলুম।

আমি? না—আমি নই। রুপো রঙের পর্দায় কতবার কতভাবে আমি ঝলমল করে উঠেছি। অথচ কোথাও আমি ছিলুম না। কত রূপে কতবার আমি দেখা দিয়েছি, অথচ কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে আমার নতুন পথের যাত্রা শুরু হল।

সেই প্রথমবারের কথাই মনে পড়ছে।

সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ী নদী থেকে স্নান করে উঠেছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল—গায়ের রক্ত জমে যেতে চায়। অথচ, কিছুতেই নিস্তার নেই। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে আমাকে ভিজে গায়ে থাকতে হল, তিন-চারবার নানাভাবে উঠে আসতে হল জল থেকে।

শীতে কষ্ট পাচ্ছিলুম—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তার চাইতেও অনেক বেশি লজ্জা, অনেক বড় অপমান আমাকে দাঁতে দাঁত চেপে সইতে হয় সেদিন। সেই স্নানের দৃশ্যটাকে তাত করে ফিলমে তোলবার একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল। ছবির গল্পে দরকার থাক আর নাই থাক, আমার শরীরকে ভাঙিয়ে

একদল দর্শকের রুচিকে খুশি করাই ছিল দৃশ্যটির লক্ষ্য।

সে অপমানও সহ্য করেছিলুম। সন্ধ্যার শঙ্খ শুনতে শুনতে যেদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলুম—সেদিন থেকেই জানতুম পিছল পথে পা দিয়েছি। কিন্তু এ জ্বালার সঙ্গে আরো বড় জ্বালা ছিল। আমার দেহের মোহে তন্দ্রাজড়ানো চোখে ওরা মিতালীকেই স্বপ্ন দেখবে—আমাকে নয়! ওদের প্রীতিতে, ওদের শ্রদ্ধায় আমার ঠাঁই নেই—ওদের বাসনা-সঙ্গিনীও আমি হতে পারব না।

সেই শুরু।

জঙ্গলের পথ দিয়ে, কাঁটাবনের মধ্য দিয়ে আমাকেই ছুটতে হয়েছে—মিতালী রাজি হয়নি। কাঁটায় হাত-পা ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরেছে দরদরিয়ে। আর সেই সময় গাছের ছায়ায় বসে জাপানী পাখা দিয়ে হাওয়া খেয়েছে মিতালী। তারপর পর্দায় সেই ছবি যখন ফুটে উঠেছে—তখন দর্শকেরা মিতালীর জন্যেই চোখের জল ফেলেছে—আমার জন্যে নয়।

ক্রমে ফিল্ম লাইনের অন্তরঙ্গ মহলে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। না—আমার নয়। মিতালীর ডুপ্লিকেটের নাম। আমি ছায়ার মতো সব ছবিতে ওকে অনুসরণ করতে লাগলুম। ও দশ হাজার পনেরো হাজারে কণ্ট্রাক্ট সই করত—আমি পেতুম—কখনো তিন শো, কখনো পাঁচ শো।

অভ্যস্ত হয়ে এলুম। অস্তিত্বহীন এই অস্তিত্বের বেদনাও সব সময়ে মনে থাকত না। কেবল মধ্যে মধ্যে এক-একটা আকস্মিক আঘাতে যন্ত্রণা টনটনিয়ে উঠত।

সহানুভূতিভরে মিতালী বলত: বেচারীকে সারা জীবন ডুপ্লিকেট করেই রাখবেন নাকি? একটা চান্স দিন না এবার।

লীলাভরে হেসে ডিরেক্টার কিংবা প্রোডিউসার বলতেন, তা হলে তোমার গতি হবে কী? তুমি তো একেবারে বেকার হয়ে যাবে।

হাই তুলে মিতালী বলত: না হয় হলুমই বেকার। বিস্তর ছবিতে কাজ করেছি—অনেক তো হল। এবার আপনারা ছুটি দিন আমায়।

—তা হলে তোমার নামের কপিরাইটটাও ছেড়ে দেবে তো?

—বেশ তাও দেব। —বলেই ফস্ করে আমার গলা জড়িয়ে ধরত মিতালী: টুনু আমার সই। ওর জন্যে সব আমি স্যাক্রিফাইস্ করতে পারি।

কথায় কথায় গলা জড়িয়ে ধরা মিতালীর স্বভাব। প্রথম প্রথম রোমাঞ্চ হত—কিন্তু গা ঘিন ঘিন করত তার পর থেকে। মনে হত একটা সাপ আমার গলায় পাক দিচ্ছে—তার সর্বনাশা ফাঁস থেকে নিজেকে কিছুতেই আমি ছাড়াতে পারছি না—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে।

মিতালী আমার জন্যে নিজেকে স্যাক্রিফাইস্ করবে! আমি জানি, মিতালী জানে, সবাই জানে। রসিকতা। অথচ কী নিষ্ঠুর—কী যে হৃদয়হীন! যেদিন মিতালী থাকবে না—সেদিন আমিও একটা সাগরের বুদ্বুদের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাব। যদি আজ মিতালীর মৃত্যু ঘটে, তা হলে ওর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সহমরণে।

আর তখনই বুকের ভেতরটা জ্বালা করত। বিষক্রিয়া শুরু হত রক্তে। মিতালীর ওপরে একটা অসহ্য ঘৃণায় আমি যেন হিংস্র হয়ে উঠতুম।

আরো ছিল। তরুণকুমারের সঙ্গে যখন শুটিং করতে হত—তখন।

লংশটে তার হাত ধরে এগিয়ে এসেছি কতদিন। কিন্তু যে মুহূর্তে ক্যামেরা মুখোমুখি হয়েছে, তখন তরুণকুমার প্রেমের কথা বলেছে মিতালীকেই। কাঁটাভরা বনের পথ দিয়ে রক্তঝরা পায়ে ছুটতে ছুটতে পাথরের ওপর আমি আছড়ে পড়েছি। কিন্তু তরুণকুমার যার মাথা কোলে তুলে নিয়ে ভালোবাসার সব কথা উজাড় করে দিয়েছে—সে আমি নই।

বাসর সাজাতে হয়েছে আমাকে—আর সেই বাসরের রানী হয়েছে মিতালী।

কতদিন আউটডোর শুটিংয়ে গিয়ে আমি আর মিতালী রাত কাটিয়েছি এক ঘরে। হয়তো জানলা দিয়ে দেখা দিয়েছে সেই পুরোনো সপ্তর্ষি। হয়তো বশিষ্ঠের পাশে জ্বলেছে অরুন্ধতীর সতী প্রদীপ, হয়তো ধ্রুবনক্ষত্রের কিরণকণা পবিত্রতম শিশিরের মতোই আমার মুখের ওপরে আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়তে চেয়েছে। আমি সহ্য করতে পারিনি। জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।

আর ঘুমন্ত মিতালীর দিকে ক্ষুধিত বাঘিনীর মতো জ্বলন্ত চোখ মেলে রেখে ভেবেছি, এই রাতে আমি ওকে ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারি—সরিয়ে দিতে পারি আমার এই অদ্ভুত ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এরই জন্যে পৃথিবীতে আমি থেকেও নেই। আমার শারীরিক সত্তার মতো মনটাও এরই জন্যে শূন্য আর নিরর্থক হয়ে গেছে। এই মিতালীই আমার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। যে সম্মান, যে অর্থ, জীবনের সবচেয়ে বড় যে সার্থকতা—সব কিছু থেকে এ-ই তো বঞ্চিত করেছে আমাকে।

আমি আমার পথের কাঁটা এখুনি সরিয়ে দিতে পারি। এই মুহূর্তেই পারি। না—তবুও আমি পারি না। আমি জানি, মিতালীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সহমরণে।

...দুটো বাজল। বাইরে সেই ঘড়িটা আমার সঙ্গে বসে জাগছে। দিনের আলো ফুটলে আমি আর জেগে থাকব না। ও জেগে থাকুক। ওর চোখে কখন শেষ ঘুম আসবে, সে-খবর শুধু ওই জানে।...

স্টুডিয়োতে শুটিং চলছিল। আমার কোনো কাজ ছিল না—টাকার জন্যে এসেছিলুম। মিতালীর মতো আমি ভাগ্যবতী নই। আমার বাড়িতে কেউ চেক নিয়ে পৌঁছে দেয় না। সেজন্যে আমাকেই ঘোরাঘুরি করতে হয়।

ফ্লোরে মিতালীর কাজ হচ্ছিল। সেখানে দাঁড়াতে আমার ভালো লাগল না। টাকাটাও পেতে একটু দেরী হবে। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। স্টুডিয়োর বাগানের নিরিবিলি এক কোণায় যেখানে কতগুলো আইভি একটা বসবার জায়গাকে ঢেকে রেখেছে, আমি সেখানে এসে বসলুম। দেখতে লাগলুম, সামনের একটা শিউলী গাছে একজোড়া বুলবুলি তাদের বাসা বাঁধছে।

দেখছিলুম আর বুকের ভেতরটা কিরকম লাগছিল। কোনো কারণ ছিল না—তবু কখন আমার চোখে জল এল।

—একি—টুনু! চুপচাপ বসে বসে কাঁদছ এখানে?

আমি চমকে উঠলুম। তরুণকুমার। চোখের জল মুছে ফেললুম তৎক্ষণাৎ।

—আপনি এদিকে?

—ফ্লোরের গরমে মাথা ধরে গিয়েছিল।

একটু হাওয়া খেতে বাগানে বেরিয়েছিলুম। দূর থেকে আবছাভাবে ঝোপের আড়ালে তোমাকে দেখে এগিয়ে এলুম।

আমি ঠাট্টা করে বললুম, ভারী নিরাশ হলেন তরুণদা। এসে দেখলেন আমি মিতালী নই।

তরুণকুমার আমার পাশে বসে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে বললে, না—সে ভুল আমি করিনি। বাগানের ভেতরে এসে একা কী করে বসে থাকতে হয়—মিতালী তা জানে না। ও হলে আরো সাত আটজনকে জমিয়ে এনে এখানে হাসি গল্পের আসর বসিয়ে দিত। তোমার মতো চোখের জল ফেলত না।

এ-সব কেন বলছে তরুণকুমার? এ তুলনা কেন? আমি ওর মুখের দিকে তাকালুম।

আর তরুণকুমারও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন দুটো কালো রঙের তারা ফুটে রইল আমার চোখের সামনে। তারপর বললে, মিতালী ছবিতে খুব কাঁদতে পারে। কিন্তু জীবনে কোথাও ওর কান্না নেই। আর তোমাকে দেখলে কী মনে হয় জানো? তোমার চোখদুটো এত তরল যে, হঠাৎ একদিন ফোঁটাকয়েক শিশিরের মতো টপ টপ করে ওরা ঝরে পড়তে পারে।

সাজিয়ে সাজিয়ে ও-সব ছবির ডায়ালগের মতো কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছেন? আমি কি খুশি হব? কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলুম, আমার চোখ আবার জলে ভরে আসছে। বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না। হয়তো এখনি সত্যি সত্যিই ওরা তরুণকুমারের পায়ের ওপর টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে!

দু আঙুলে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা ধরে রেখে তরুণকুমার আবার বললে, আমি ভাবি টুনু, মিতালীর তো আর সবই আছে। শুধু এই রকম চোখ যদি থাকত! যদি তোমার চোখ দুটো ওকে তুমি দিতে পারতে!

আমার চোখের জল সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে এল। তরল হয়ে যারা গড়িয়ে আসছিল, হীরের মতো কঠিন হয়ে গেল তারা। আমাকে দিতে আসেনি তরুণকুমার—কিছুই দিতে আসেনি। মিতালীর পাওনা থেকে একটি কণাও সে আমাকে দেবে না। তার বদলে আমার চোখ দুটোকে সে কেড়ে নিতে এসেছে। শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে ডাকাত যেমন তার সোনার হারছড়া নিয়ে গিয়ে নিজের রাত্রির সঙ্গিণীকে উপহার দেয়!

আমি তক্ষুণি উঠে দাঁড়ালুম। তিক্ত স্বরে বললুম, বেশ তাই হবে। মরবার সময় উইল করে যাব, আমার চোখ দুটো যেন মিতালীকে উপহার দেওয়া হয়।

—রাগ করলে নাকি? বোসো টুনু, বোসো—

কিন্তু আমি বসতে পারলুম না। বাগান থেকে সোজা বেরিয়ে এসে, স্টুডিয়োর গেট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে এলুম। টাকাটার জন্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলুম না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লুম। কত দেব আমি—কত আর মিতালী কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে? আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব, আমার স্বপ্ন, আমার বাসনা—সবই তো সে নিঃশেষে লুট করে নিয়েছে। বাকী আছে আমার কান্না—আমার চোখ। তাও নেবে? তারপর? তারপর আমার কী হবে? এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে আমি বইব কী করে?

অথচ তখনও মিতালী এক গাল হেসে ঝুপ করে আমার পাশে বসে পড়বে। সাপের মতো দুটো হাত দিয়ে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরবে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে, আর আধো আধো আদুরে গলায় বলতে থাকবে: টুনু আমার সই। ওর জন্যে আমি সব করতে পারি।

পৃথিবীতে এমন কুৎসিত অপমান এর আগে বুঝি কেউ কাউকে করেনি।

আমি হিংস্রভাবে বালিশের ওপর নখ্ বসিয়ে দিলুম। মনে হতে লাগল একটা বুনো জন্তুর মতো ধারালো নখের আঁচড়ে আমি যেন কার নরম গলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলছি!

কিন্তু এ তো একদিনের কথা নয়। এই যন্ত্রণা—এই জ্বালা—এ যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি সহজ হয়ে উঠলুম। তাকিয়ে দেখলুম, টেবিলের ওপর 'কল-কার্ড' পড়ে আছে। চার দিন পরে কাশী যাওয়ার প্রোগ্রাম—কয়েকটা আউটডোরে মিতালীর ডুপ্লিকেটের কাজ করতে হবে।

সে পরশুর কথা। কিন্তু আজ আমি ঠিক করে ফেলেছি। কাশী আর আমি যাব না। ডুপ্লিকেটের ভূমিকায় অভিনয় আমার শেষ হয়ে গেছে।

বিকেলে তরুণকুমার এসেছিল।

—শোনো, সুখবর আছে। এই পাঁচ বছর পরে শেষে রাজী হয়েছে মিতালী।

—কিসে রাজী হয়েছে?—আমার হৃৎপিণ্ড চমকে উঠল।

—আমাকে বিয়ে করতে। আসছে মাসের সাতুই। রেজেস্ট্রি হবে ওই দিন। রাত্রে প্রীতি-ভোজ। —হলদে রঙের একটা চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, যেয়ো কিন্তু।

আশ্চর্য হলুম? না। খুব বেশি আঘাত পেলুম? তাও না। আজ তিন বছর ধরে মনে মনে আমিও এই দিনের জন্যেই তো প্রতীক্ষা করছিলুম। হয়তো আধো ঘুমে স্বপ্নের মতো এ-কথাও ভেবেছি, মিতালীর ভেতর দিয়ে তরুণকুমারকে আমিও পাব—হয়তো মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথাও ওর মনে পড়বে।

হাসবার চেষ্টা করে আমি বললুম, নিশ্চয় যাব।

তরুণকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার গোড়ায় গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। কী ভেবে, সেদিনকার মতো আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে তোমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে বিয়ে করতে পারলে মন্দ হত না। —তারপর খানিকটা দুর্বোধ্য হাসি হেসে বললে, সে উপায় যখন নেই—তখন মাঝে মাঝে আসতে হবে তোমার কাছে। মিতালীর বুকে কান্না নেই—সে চোখের জল ফেলতে জানে না। যখন চোখের জলের জন্যে প্রাণ ছটফট করে উঠবে, তখন তোমার কাছেই আমাকে আসতে হবে টুনু।

তরুণকুমার চলে গেল। বাইরে মোটরের শব্দ শুনতে পেলুম।

ব্যাস্—এই পর্যন্তই। আর নয়। আর আমি সইতে পারব না। দুঃখ দেবে একজন, আর কান্না দেব আমি? পর্দার অভিনয়ে মুক্তি নেই—জীবন ভরে এমনিভাবে আমাকে ডুপ্লিকেটের কাজ করে যেতে হবে? আমার বুক ফাটা চোখের জলে নিজের জ্বালা জুড়িয়ে আর একজনকে সান্ত্বনা দেবে তরুণকুমার?

আমি পারব না। এতদিন পরে বুঝেছি এইবারে সব শেষ করে দেওয়ার সময় এসেছে। নিজের অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে এইবারে সম্পূর্ণ মুছে দিতে হবে।

উত্তরের জানলা খোলা। আজ দেখতে পাচ্ছি সপ্তর্ষিকে—দেখছি বশিষ্ঠের পাশে ধ্যানমগ্না অরুন্ধতীকে। মনে পড়ছে, আমি মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে। আমাকে সংস্কৃত পড়াতে পড়াতে বাবা বলছেন, আমার মেয়েকে আমি এ-যুগের মৈত্রেয়ী করে তুলব। ব্রহ্মবাদিনী। যেনাহং নামৃতাস্যাম্—

রাত শেষ হয়ে আসছে। সেই ঘড়িটায় চারটে বাজল। একটু পরেই যাব গঙ্গাস্নান করতে। আকাশে লাল হয়ে সূর্য উঠবে—আমার কপালে ছড়িয়ে পড়বে সতীসিঁদুর। আমার আর সময় নেই।

**সায়নাইড খেয়ে শেষ রাত্রে আত্মহত্যা করেছিল মেয়েটি। এই চিঠিটা চাপা দেওয়া ছিল নীলরঙের ছোট শিশিটার তলায়।**

# শেষ হাসি

সমরেশ বসু

অল্প দু' চারখানি নৌকোর যাতায়াত শুরু হয়েছে সবে। কালীনগর-গঞ্জের এটা মরসুম নয়। নতুন ধান ওঠেনি এখনো। আসল কারবার ধানের, তারপরে গরু, ভেড়া ছাগল। এই বর্ষার সময়ে সেটাও কম। ভেড়ি বাঁধের গায়ে সারি সারি, রাশি রাশি নৌকো যেন চিত হয়ে পড়ে ঝিমোয় এসময়ে। হাসনাবাদ থেকে গোসাবা যাতায়াতের পথে যখন কোম্পানীর লঞ্চ ঢেউ তুলে দিয়ে যায়, তখন বেকার নৌকোগুলি যেন বড় বিরক্ত হয়ে খানিকক্ষণ দোলে। তারপর জল শান্ত হয়ে যায়, নৌকোগুলি ঝিমোয় আবার। গঞ্জের মানুষগুলিও। কারবার তেজী না থাকলে তাদের দেহ-মনেও মন্দা লাগে। তবুও আজ হাটের দিন। আনাজ তরিতরকারি উঠবে কিছু। আশেপাশের মানুষেরা নিজেরা বেচা-কেনা করবে।

গঞ্জ থেকে খানিকটা নিরালা দক্ষিণে, নদীতে বিনজাল পাতে ঈশান। কালীনগরের উত্তরে, পশ্চিমপাড় আখড়াতলায় মানুষ সে। কিন্তু চিরকালই এগিয়ে এসে জাল পাতে, মাছ ধরে।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। বর্ষার একটু ধরন হয়েছে কয়েকদিন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের পোড়া আকাশ এখন চকচকে নীল। অনেক বৃষ্টি গেছে, গোটা আকাশখানি জলে ধুয়ে ফিরে পেয়েছে আসল রং। সূর্যের আলো পড়লে চোখ রাখা যায় না, নীলের এত ঝকমকানি। আকাশের এদিকে ওদিকে আসে শাদা মেঘের টুকরো। এ মেঘ ভিনদেশী আসে দূর থেকে, যায় দূরে উধাও হয়ে যেখান দিয়ে যায়, সেখানকার মনগুলিও যেন কেড়ে নিয়ে যায়। কোথায় যেন ডাক দিয়ে যায়।

বাতাসের গতিক বোঝা যায় না। কখনো বাঁধের দু' পাড় ধরে গেঁয়োগাছের বনে বাতাস শনশনিয়ে যায়। কখনো যায় থমকে। কে যেন তাকে ধরে রাখে অ-দূর সমুদ্রের কোলে।

আশেপাশে গ্রামের চিহ্ন কম। অধিকাংশই আবাদ অঞ্চল। যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজের বিস্তার। আর ভেড়িবাঁধের সুদূর প্রহরা। নোনা জলে বুক চেপে আছে দাঁড়িয়ে।

নদীর নাম বেতনি। ইছামতীরই ফালি ফ্যাকড়া। এখানকার লোকেরা বলে পেতনি, পেতনি নদী। রূপে সে ভয়ংকরী নয়, কিন্তু অশরীরী মায়াবিনী নানান বেশে ফিরছে তার ক্ষুধার্ত অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে। রাজত্বটি যেন তার। তার রীতিবিরুদ্ধ অনাচার যে করে, তাকে সে মারে। কখনো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারে গোটা আবাদের মানুষকে। কখনো একলা পেলে খায় ঘাড় মটকে। তাই গোটা নদীর পাড় জুড়ে বাঁধ। তার নোনা জল একটু চুঁইয়েও যাতে ঢুকতে না পারে মানুষের আস্তানায়। সে ফসল খায়, আর নিদেন তিন বছরের মতো মাটিকে দিয়ে যায় বন্ধ্যা করে।

এ জলকে স্পর্শেও ভয়। তাই কেউ পায়ের পাতা ডুবিয়েও দাঁড়ায় না এক দণ্ড। সে তার লকলকে জিভ দিয়ে যেমন খোঁজে বাঁধের ফুটো ফাটল, তেমনি খোঁজে মানুষ। সংসারের সেরা জীব, বড় মিষ্টি তার মাংস। পেলে গরাস ভরে যতটা পারে, ততটাই নিয়ে যায়। বাকিটুকুতে প্রাণ যদি থাকে, সেটুকু থাকে শুধু বিভীষিকার মারে খাবি খাওয়া।

বাঁকা স্রোতের পাকে পাকে, ছোট ছোট ঢেউ চলকানির কোনখানে সেই হিংস্র ভয়াল কামট ওত পেতে আছে কেউ জানে না। কোন দিক দিয়ে কুমীর রাজকীয়। অন্ততঃ কাছাকাছি এসে সে জানান দেয় একবার। কামট যখন ধরে, তখনো টের পাওয়া যায় না। দেখাদেখি দূরের কথা। তাই সে থাকে মানুষের কাছে কাছে, তার তীক্ষ্ণ করাতের মতো দাঁতে দাঁত চেপে, ধূর্ত চোখের সতর্ক সন্ধানে, চতুর চলাফেরায়।

জোয়ারের জলে ঈশান বিনজাল পাতে আর এদিকে ওদিকে তাকায়। উত্তর-দক্ষিণে নদী, পুবে পশ্চিমে আড় নৌকো। জাল পাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে, আর তাকায় দূরে অদূরে, যেখানেই জল একটু বেশী চলকায় ঢেউয়ের মাথায়, যেখানেই একটু বেশী শিউরে ওঠে বাতাসে। তীক্ষ্ণ শিকারীর চোখে, উৎকর্ণ হয়ে কী যেন খোঁজে সারা পেতনির জলের জোয়ারের কলকলানিতে, আর দাঁতে দাঁত চাপে। যেন কামটেরই মতো। কেন? মাছ আসবে জালে, এমন করে তাকাবার কি আছে?

কালো চকচকে শরীর ঈশানের। তল-পেটের গভীর খাদ থেকে, চওড়া বুকটা যেন হঠাৎ পাথরের চাংড়ার মতো উঠেছে ঠেলে। শক্ত ঘাড়ের ওপর, চড়ানে এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মুখ, শ্যাওলা-কালো কামটের মতো ছোট ছোট চোখ দুটির চাউনি টের পাওয়া যায় না। কোনদিকে তাকিয়ে আছে। মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁচকানো চুল।

জলের এদিকে ওদিকে দ্যাখে, তারপরে হঠাৎ ব্যাকুল অবাক চোখে ফিরে তাকায় আকাশের দিকে, ভেড়ি বাঁধের সীমানায়। আবার জাল পাতে। বিন জাল, গহীন তলে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ায় নিঃশব্দে। ওপরে ভাসে ছোল, জালের সীমানা চিহ্ন।

গেঁয়ো গাছ মাথা কাটে বাতাসে। রাই-জঙ্গলের বুক ভাসিয়ে পেতনিও ফেঁপে ফুলে ওঠে। অস্পষ্ট ভেসে আসে পশ্চিম-পাড় গয়ারামারির মোটরের ভেঁপু।

ঈশান থেকে থেকে চমকায়। কী যেন নড়ে উঠল পুবের ওই বাঁকা স্রোতের জলে। আবার ফিরে তাকায় পশ্চিমে কিসের যেন শব্দ হল ওখানে, পাড় ঘেঁষে। না, কিছু

য়। জোয়ার এসেছে। মাঝে মাঝে বাতাস একটু দুরন্ত হয়ে নাড়া দিয়ে যায়।

ঈশানের সর্পচক্ষু কেমন যেন ধকধক জ্বলে। বাঁশের ফালি পাটাতনের ফাঁক দিয়ে বার করা, ধারালো বর্শার এক হাত ফলাটার দিকে তাকায়। ঝকমকে সুতীক্ষ্ম মস্ত বর্শা, ভাদুরে রোদও যেন কেটে খান খান হয়ে যায় তার ধারে। আবার জাল পাতে ঈশান।

পশ্চিম পাড় থেকে আসা একটি নৌকো যায় কাছ ঘেঁষে। গঞ্জে যায়, মোচা, কাঁচকলা, আর কেওড়া ভরতি চুপড়ি। কেওড়া এক রকমের টক ফল, অম্বল রান্না হয়। নৌকোটির হালে যে বুড়ো বসেছিল, সে ডেকে বলে, ঈশান নিকি গো?

মুখ না তুলে জবাব দেয় ঈশান, হাঁ।

বুড়ো আবার বলে, গোন তালি তিন দণ্ড আগেই এইসেছে, অ্যাঁ?

ঈশান জাল পাতে আর শুধু শব্দ করে হুঁ।

গোন বলতে জোয়ার বোঝায়।

এবার একটি মিষ্টি মেয়ে-গলায় ডাক শোনা গেল, অ ঈশানদাদা, ছোট মাছ পেলি আমারে একখান দেবা?

ঈশান ফিরে তাকায়। সেই অন্ধ মেয়েটা। লোকে বলে কানী। নাম বিমলা থেকে বিমলী। থাকে পশ্চিমপাড়ে। ভিক্ষে করতে আসে রোজ গঞ্জে। পাড়ে এসে বসে থাকে। যাকে পায়, তাকেই পার করে দিতে বলে। এপারে ওপারে, দু পারেই।

চোখের সামনে ছোট থেকে বড় হল মেয়েটা। ছ' থেকে আঠারোয় উঠেছে। ছেউটি পেতনির টান ভাটার জলে এসেছে জোয়ার। একটা হাত সরু আর ছোট, কানী বিমলী কেমন যেন মায়াবিনীর মায়া মেখেছে সর্বাঙ্গে। তবে ভিক্ষে করতে বসেও রেহাই নেই। সব সময়েই চেঁচাচ্ছে, 'আ মলো বিষ্টাখেগোর ব্যাটা, গায়ে হাত দ্যায় কোন ঢ্যামনা। তোর মার গায়ে দিত্তি পারস না? তারপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে কাঁদে। হাটের দিনে একটু দেরি হয়। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের ঝোঁকে, বাঁধের আড়ালে কিংবা গেমো গাছের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছে কয়েকবার। যেমন ছাড়া হাঁস-মুরগী ছোঁ মেরে নিয়ে যায় শেয়ালে। বিমলী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে, অ'গো মা'গো দ্যাখ আমার কী কইরেছে। হেই ভগমান, ওরে কামটে খায়না গো, হেই ভগবান, আমার কী দিলে গো-গতরে, আমারে শকুনে খায়।

কাঁদে, দাপায়, চুল ছেঁড়ে, আবার শান্ত হয়। হেসে কথা বলে বেশ লোকের সঙ্গে, 'ও করালী খুড়ো, যদি দুটো পয়সা দিলা, ত' আমারে এটটু উত্তোর বেলে বসাইয়ে দে' যাও। খুড়ি ভাল আছে তো? মাজ বিকালে কেমন্?' আশেপাশের সব লোকের সঙ্গেই তার ভাব।

ঈশান মুখ ফেরাতে গিয়ে আবার ফিরে তাকায়। যেন চমকে ফিরে তাকায় তার ছোট ছোট সাপ-খপিস্ চোখে। কী যেন ভাবে কানী বিমলীর দিকে চেয়ে। তারপর বলে গোঙানির সুরে, তা' পেলি পরে দেখা যাবেনে।

বিমলী হাসে। গর্তে বসা চোখ দুটির অন্ধকারে পেত্নির জলের ঘোলা-নীল আভা যেন চিকচিক করে। পরনে একখানি আট-হাত পুরনো ডুরে শাড়ি। বাতাসে সেটি উড়ু উড়ু করে। হাত দিয়ে কাপড় সামলে বলে, দেবা ঈশেনদাদা? তা'লি আজ নিচ্ছয় কইরে মাছ পাবো।

ঈশান জবাব দেয়না। কিন্তু জাল পাততে পাততে, আড় চোখে তাকায় বিমলীর দিকে। পাথুরে কপালে বেয়ে গাছের শিকড়ের মতো কয়েকটা শির ফুলে ওঠে। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে ফিরে তাকায় জলের দিকে। বিন্ জাল পাতে পুবে পশ্চিমে ছড়িয়ে। হাল রাখে কোলে, অর্থাৎ পায়ে।

পেতনি নদী হাসে জোয়ারের গরবে।

যে নৌকোটি হাটে গেল, তার হালে-বসা বুড়ো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সন্সার বড় তাজ্জব জায়গা। এ ঈশেন কী মানুষ ছেল, আর কী মানুষ হল। হেইসে, গেইয়ে, নেইচে, কুঁদে ঈশেন মাতাইয়ে রাখত সবারে। সকলের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা, হাটের দিনে কত নকশা কইরেছে, হেইসে মরছে সবাই। জালে জাল-খানি পেইতে এখনো গঞ্জে এইসে বসে, ত্যাখনো বইসত। এখন মুখে রা কাড়ে না, ত্যাখন কত লম্ফঝম্প, গাল্প-গপ্পো। গোন গিয়ে ভাটা পইড়ত, তবু জাল তুইলবার কথা মনে থাকত না।

কানী বিমলীর নিঃশ্বাস পড়ে। দক্ষিণা বাতাস তার রুক্ষ চুলের গোছা উড়িয়ে দিয়ে যায়। ছোট আর বড়, দুটি হাত দিয়ে চুল সামলাতে গেলে, আট হাত কাপড়খানি অকুলান হয়ে পড়ে। বলে, হ্যাঁ, সেই ব্যাপার-খানার পরে, না ঠাকুর্দা?

—হুঁ।

ভেড়ি বাঁধের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাতাস আসে। পেত্নির জল ফোলে। শুধু দু-জনের কেউই দেখতে পায় না, ঈশান দূরে থেকে একনজরে তাকিয়ে আছে বিমলীর দিকে।

বুড়ো আপন মনেই বলে, বড় সোহাগী বউ ছেল সে ঈশেনের। যশোরের মেইয়ে, বউটি বড় দামাল ছেল। সংসারে বাপ-মা নেই, ঈশেনের। বউ একলা ঘরে থাকতে পারে না। বলে, 'তুমি যাবা মাছ মারতি, আমি বইসে থাকব বাঁধের উপরে।' তা তাই করত ঈশেন। বউকে বাঁধে বসাইয়ে রেইখে জাল পাততো। তা'পরে বউ নে' ঘুইরে বেড়াইত গাঙে গাঙে। সেই নে'ও কত কথা, হাসি, মস্করা। তা' ও দুটির কোন পেত্যায় ছেল না।......তা একদিন দুটিতে কী যেন খুনখুটি ঝগড়া হল, সে পীরিতের খুনসুটি। রাতদিনই হচ্ছে। সেদিন জাল তুইলে লোকো বাঁধে ভিড়াইয়ে বউকে ডাকল, 'আয়।' বউ বাঁধের উপর দে হাঁটা দিল। বইললে, 'আজ আখড়াতলা তক হেঁইটে যাব, লোকোয় ওটব না।' ঈশান বইললে, 'আসবি তো আয়, না হ'লি সত্যি সত্যি লোকো ছেইড়ে দেব।' বউ ঠোঁট টিপে হেইসে বইললে, 'দ্যাওগে।' ঈশেনও তো সেইরকম। দিলে লোকো ছেড়ে। একজন বাঁধে, আর একজন জলে। বেলা ত্যাখন যাই যাই করে। পেত্নিতে ভাটা পইড়েছে। ঈশেন লগি মারছে। দুজনাই দুজনারে দেখতি পাচ্ছে। তবু ঈশেন বারে বারেই ডাকে, 'আয় বলতেছি, না হলি আজ তোর কপালে দুঃখু আছে। তা' কে শোনে। বউ মাঝে মাঝে গেমো গাছের আড়ালে পড়ে। আবার দেখা দেয় আর টিপে টিপে হাসে। ঈশেনকে খ্যাপায়। তা'পরে ঈশেন লোকো নে' সইরে গেল মাঝ নদীতে। বইললে, 'তবে তুই থাক, আমি ওপারে যাচ্ছি।' ত্যাখন বউ লেইমে এইল গেমো গাছের আড়াল থেইকে। খিলখিল কইরে হেইসে ডাক দিল, 'এইস, নে' যাও।' দূর যশোরের মেইয়ে। খলবল কইরে নেইমে এইল পেত্নির কোমর জলে। জানতো কিন্তুন মানে ছেল না বউয়ের, পেত্নির জলে পেত্নির মায়া আছে। ঈশেনের অবস্থাটা ভাবো। চীৎকার দিলে, আলো সব্বোনাশী, শীগগির ডাঙায় ওঠ, শীগগির।' আর উইঠতে হল না। ঈশেন দেখল, বউকে কে টেইনে নে' যাচ্ছে জলের তলায়। তা'পর আবার ভাইসলো। ত্যাতক্ষোনে হাল মেইরে এইয়েছে ঈশেন। টেইনে তোললো বউকে। দ্যাখে, তল পেটের কাছখান থেইকে একখান উরুত-শুদ্ধ পা নেই। যে ছেল জলের তলায়, সে ছেল তক্কে তক্কে। নাবালের এই গ্যাতো নদী, সবখানে সে হাঁ কইরে আছে। বাগে পেইলে ছাড়ান নেই।.....তা' কামটের কাটা, পচন ধরে সঙ্গে সঙ্গে। বউটা মইল। তা' ঈশেনও হাসি ভুইলে গেল। এখন যেন কেমন কেমন লাগে। গোনে পাতে বিন জাল, কচাড় জাল টানে পাতে। আর ওই চুপচাপ গাঙে বইসে থাকে, না' হলি গঞ্জের বাঁধে।......

ভাদুরে রোদে বিমলীর চোখের গর্ত চিকচিক করে পেত্নির ঘোলা-নীল জলের মতো। বড় উদাসিনী দেখায়। যেন চুপি চুপি বলে, হ্যাঁ, চ'ক থাকতিও মানুষ এমন কইরে মরে ঠাকুর্দা। আমি বেঁইচে থাকি।

দুজনে শুধু দেখতে পায় না, জাল পাতা সাঙ্গ করে, ঈশান দূরে থেকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে কানী বিমলীর দিকে। আর সাপ-খপিস চোখ দুটি জ্বলে ধকধক করে। কী যেন আঁচে মনে মনে। তারপর চমকে ফিরে তাকায়

জলের দিকে। কী যেন পাক খেয়ে যায় ওই দূরে উত্তরের জলে? কিসে যেন ঝটকা দিল দক্ষিণের কোলে? তীক্ষ্ম ফলা বর্শাটার দিকে চোখ পড়ে ঈশানের।

না, কিছু নয়। সমুদ্রের জোয়ার আসে পেত্নির বুক ফাঁপিয়ে। বাতাসে মাথা কোটে গেমো বন।

ঈশান নৌকোর মুখ ফেরায় গঞ্জের দিকে। কিন্তু জলের এদিকে ওদিকে তাকায় বারে বারে। সেই খিলখিল অন্তিম হাসি শোনে নাকি বউয়ের? ছায়া দ্যাখে নাকি সেই সোহাগীর, পেত্নির জলে। মন বুঝি কাঁদে।

না। ঈশান খোঁজে জলের সেই অদৃশ্য শমনকে। যাকে কখনো দেখা যায় না, কিন্তু যে আছে তারই কাছে কাছে, ছায়ায় ছায়ায়। শ্যাওলা-রং সেই ভয়াল চতুর হিংস্র যম, বিশাল দেহ আর কুতকুতে চোখ। সে চোখ মিটমিট করে হাসে আর দ্যাখে ঈশানকে। তাই ভাবে ঈশান। একবার কি ভাসে না ওপর জলে? ভীরু ঢ্যামনা! লুকিয়ে ফিরিস গহীন জলের অন্ধকারে।

কালো পাথুরে চোয়ালের ওপরে কুত-কুতে চোখ জ্বলে দিবানিশি ঈশানের। যেন হিংস্র কামটেরই মতো।

মনটা আজকে এসে ঠেকেছে এইখানে। শোধ চায় ঈশান, জীবনের একটা প্রতি-শোধ। একটা কামটকে চায় সে হাতের কাছে, যে এক গরাসে খেয়ে নিয়েছে সেই শেষ খিলখিল হাসি, সেই শেষ ডাক, শেষবার আসার বায়না।

ঘরে গেলে থাকতে পারে না। বউ যেন হেসে ছুটে আসে বক্ষলগ্ন হতে। আর সতর্ক সন্ধানী হিংস্র শমন তাকে কোথায় টেনে নিয়ে অদৃশ্য হয়। আখড়াতলা থেকে আসবার পথে ফিরে যাবার অন্ধকারে ও জ্যোৎস্না রাতে, গেমোবনের তলায়, পেত্নির জলে সেই হাসি শোনে ঈশান। ডাক শোনে, 'এইস, নে' যাও।' বুক ফাটে না, জল আসে না চোখ ফেটে। জানে, সে আছে কাছে কাছে। মানুষের গন্ধ পায়, সেই গন্ধে গন্ধে ফেরে। বর্শাটার ফলায় হাত দ্যায় ঈশান। কোথায়! ওই যে জল ওখানে একটু ফুলে উঠছে, ওখানে? নাকি, ওই যে স্রোতটা ল্যাজের ঝাপ্টা দিয়ে যায়, ওখানে! কোথায়।

শোধ চায় ঈশান। সেই নেশাই ভুলিয়ে রেখেছে সোহাগী বউয়ের সব শোক। এই নেশাটা কাটলে সে ঘরে গিয়ে মাথা কুটে দাপিয়ে মরে যাবে হয়তো। এখন শোক নয়, শোধ চায়। যদিও বউ বাঁধের উপরে উপরে ফেরে, হাসে, খুনসুটি করে, চুল এলিয়ে পাগলি সাজে, তার আঁচল ওড়ে বাতাসে। যদিও চোখের কোণে ডাকে ইশারা করে। পেত্নির জল কলকল করে, গোঙানো বাতাস শনশনিয়ে মরে। ওসব যে খেয়েছে, তাকে চায় ঈশান।

তাকে চায়, তাই মাছ মারার আছিলায় বিন জাল পাতে গহীন জলে। বিন জাল যায় সেই পাতালে। জোয়ারে বিন ভাটায় কচাড়। ওই দুই জালে কখনো সখনো ধরা পড়েছে কামট। গভীর জলের জানোয়ার। আড় মাছের আকৃতি, শ্যাওলা-কালো রং, ওজনে পাঁচ থেকে দশ মণ, কিন্তু বিন্দু বিন্দু চোখ। চামড়া শুয়োরের মতো মোটা। তাই দেশী কামারের গড়া দেশী লোহার বর্শা নেয়নি সে। কামটের গায়ে তো বিঁধবে না। গঞ্জের মহাজনকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছে ইস্পাতের বর্শা। তীক্ষ্ম তার ধার। রোদও কাটে খান খান হয়ে।

ধরা পড়লে আদিবাসীরা তার মাংস খায় হাঁড়িয়ার সঙ্গে। ঈশানও খাবে কামটের মাংস। তারও মাংস মিষ্টি, কেননা সে মানুষ খায়।

পেত্নির এই জলে কতদিন ঘুরেছে ঈশান বউ নিয়ে। সোহাগী বউয়ের লোক-লজ্জা কম ছিল। কত দিন রাত্রি সে হেসে হেসে শিউরে তুলেছে পেত্নির বুক। তার কত প্রেমকূহর একেবারে নির্বাক করেছে পেত্নির কলকলানি। আর পেত্নির রংএ রং মেশানো সেই হিংস্র কামট হয়তো তখন ভেসে উঠে দেখেছে তার সতর্ক চোখে।

সেই একটি শোধ চায় ঈশান। এই নেশাটা গেলে, এদেশে কেমন করে বাঁচা যায়, এই পেত্নির ধারে, বাঁধের পাড়ে, গেমোবনের বাতাসে, সেটা জানে না ঈশান।

গঞ্জের বাঁধে এসে নোঙর করল নৌকো। ওই দেখা যায় কানী বিমলী বসেছে, আনাজ হাটের সামনে। আপন মনে হাসছে। ছোট হাতখানি বের করে ভিক্ষে চায়। আসল হাতটি দিয়ে শরীর আর কাপড় সামলায়। ডাঙার কামটেরা বড় বেশী চেতন এনে দিয়েছে ওর দেহ ও মনে। ওর অন্ধ জীবনের একটা নিরালা কোণ আছে। একটু নিরালা ঠাঁই নেই তার যৌবনের। সে-ই না বিমলীর দুঃখ। গেমো গাছে বাতাস আসে, পেত্নির জল কলকল করে। বাঁচার জন্যে ভিক্ষে করে বিমলী। তবু বাঁচায় কেন সুখ নেই?

বিমলীর বুক উজিয়ে নিঃশ্বাস পড়ে, অন্ধ, এক হাত ছোট বিমলী। ওর জোয়ার-ঢেউ শরীরের মায়াবিনী রূপ দেখে সবাই।

তার দিকে অমন অপলক সতর্ক সন্ধানী হিংস্র চোখে কী দ্যাখে ঈশান।

শোধের নেশায় দ্যাখে। পাপ ঢুকেছে এখন শোধের নেশায়।

ও নেশায় মধ্যরাতে, পেত্নির জোয়ারে নৌকোয় নিয়ে গিয়েছিল দশ মাসের ছাগল। দূর দক্ষিণে গিয়ে তাকে ফেলেছিল কামটের টোপ করে। নৌকোয় বাঁধা ছাগলের শরীর ডুবেছিল। ছাগলটা ডাকতে পারেনি। খাবি খেয়ে মরেছিল। ঈশান বল্লম হাতে সারা রাত কাটিয়েছে পেত্নির বুকে। আর যেন দেখেছে, চতুর জানোয়ার কেবলি পাক খাচ্ছে আশেপাশে, টোপ গিলছে না।

শেষরাত্রে শুধু দপ্‌দপ্‌ করেছে ঈশানের কামট-হিংস্র চোখ। গালাগাল দিয়েছে অশ্লীল ভাষায়। তারপর মরা ছাগল ছেড়ে দিয়েছে জলে। পেত্নি তখন ভাটা-মুখে গেছে নেমে।

দুপুরে দেখেছিল, দুটি শিং শুদ্ধ সেই ছাগলের আধ-খাওয়া মুন্ডুটা ভেসে এসেছে জোয়ারে। যার টোপ্‌ সে খেয়েছে ঠিক।

জলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ঈশান। মনে হয়েছিল, নৌকোর পাশে পাশে আছে সে। হাসছে মিটমিট করে। শুধু দেখা যায় না।

কিন্তু আখড়াতলার শূন্য ঘরে কার সোহাগের আগুনে যেন পুড়িয়ে মারে অষ্ট-প্রহর। পেত্নির বুক থেকে কেবলি ডাক ভেসে আসে, 'এইসো, নে যাও।'

তারপর কিছুদিন পরে, প্রথম রাত্রের ঝোঁকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নৌকোয় গঞ্জের একটা কোঁদো কুকুরকে। ফেলে দিয়ে-ছিল নিয়ে দূর দক্ষিণের বাঁকে। কুকুরটা যতবারই সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে গেছে, নৌকো বেয়ে আড়াল করেছে ঈশান। অসহায় কুকুরটা জলে ঘেউ ঘেউ করতে পারেনি। কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে নির্বোধের মত তাকিয়েছে ঈশানের দপ্‌দপ্‌ চোখের দিকে।

ঈশান আতিপাতি করে খুঁজেছে পেত্নির প্রতিটি তরঙ্গে, প্রতি স্রোতের বাঁকে। কোথায় সেই পলাতক শমন।

মাঝ রাত্রে মরতে মরতে গঞ্জের কুকুরটা ভিন্ন পাড়ে গিয়ে ঠেকেছিল। আর কোনদিন গঞ্জে আসেনি। ঈশানের মনে হয়েছিল, ধূর্ত কামট ঘুরেছে তারই নৌকোর পাশে পাশে। আর মিট্‌মিট্‌ করে হেসেছে তার কুতকুতে চোখে।

আজ দ্যাখে ঈশান বিমলীকে। ভাবে, খেয়া পার করতে নিয়ে যাবে আজ কানীকে। কী সুখে বাঁচে ও এই সংসারে। ওকে দিয়ে শোধ নেবে ঈশান আজ রাত্রে। তাই দ্যাখে সাপের মত চোখে।

নেংটি-পরা ঈশান। নেংটির টাঁক থেকে বার করে একটি আনি। এগিয়ে গিয়ে হাতে দেয় বিম্‌লীর। বিম্‌লী আনিটি আঙ্গুলে অনুভব করে খুশি হয়ে বলে, কে গা, কে তুমি?

সবাইকেই বলে। যদি চেনা মানুষ হয় তার। হাটের ভিড়, কে-ই বা দেখে ফিরে। যদি দ্যাখে তবে ভাবে, ফোঁসলাচ্ছে কানীটাকে। যেন গোঙা স্বরে জবাব দেয় ঈশান, আমি ঈশেন।

খুশি আর ধরে না বিমলীর, ওমা, তুমি পয়সা দিলে? আ আমার কি কপাল গো। সেই ছ' মাস আগে দিছিলে।

শুনতে চায় না ঈশান। সরে যেতে চায়। ভাবতে চায়, কীভাবে কাজ হাসিল করবে।

বিমলী ডাকে, ও ঈশেনদাদা, শোনো, শুইনে যাও একবারটি।

—বল্।

—কাছখানে এইস। এইয়েছ?

হাঁটুতে হাত দেয় ঈশানের। বলে ফিস্-ফিস্ ক'রে, সক্কাল বেলা আইস্তে না আইসতে, পোড়ারমুখো বেন্দা আড়তদারটা কি বলছে জান? বলে, অ' বিমলী, কী কী সুখে তুই ভিখ্ মাগিস্। আমার আড়তে এইসে থাক, সব পাবি। আমি বইললাম, দূরে হও, দূরে হও, খচ্চর মিনসে। তা' ঈশেন-দাদা, হাটে-গঞ্জে মানুষ নেই গো। এত লোকের সামনে খপ্ কইরে আমার গায়ে হাত দিল, শরীলে আমার ব্যথা করে।

বলে কাঁদে বিমলী। ফিসফিস করে অভি-শাপ দেয়। কিন্তু কার কাছে দুঃখ করে বিমলী? তার অদৃশ্য শমনের কাছে?

ঈশান কি বলবে ভেবে পায় না। দ্যাখে বিমলীর দিকে। বলে, হুঁ!

বিমলী কেমন একটু আশ্বস্ত সুখের সুরে বলে, তোমার রাগ হচ্ছে ওদের ওপরে, না? থাক, রাগারাগি কইরোনা য্যান!

সরে আসে ঈশান।

এটা আবাদের গঞ্জ। আশেপাশে গ্রাম নেই, গৃহস্থ নেই। পেতনি নদীর ধারে যেন খা-খা করে। কাছে কাছে আছে কিছু আদিবাসীদের ভাঙাচোরা ঘর। চাষের মরসুম গেলে বেকার হয়ে যায়। তখন পেটে-খাবার ভাত পচিয়ে নেশা করে মেয়ে-পুরুষ। কতগুলি কালো কালো মেয়ে-পুরুষ, কতগুলি শুয়োর আর গঞ্জের বিদেশী কারবারী ব্যাপারী। তাদের জন্য কয়েক ঘর দেহজীবিনীর বাস।



জলে আছে সর্বনেশে নোনা আর হিংস্র কামট। পাড়ে আছে বেশ্যা ব্যাপারী আদিবাসী। এখানে গা বাঁচিয়ে বাঁচতে চায়, গায়ে-জল-লাগা বিমলী। তাও চোখ থাকলে কথা ছিল। বিমলী কানী। কেঁদে কেঁদে বলে, হেই ভগমান, আমি মরিনে কেন?'

কোচড় ভরে মুড়ি নিয়ে বাঁধের উপরে এসে দাঁড়ায় ঈশান। মুড়ি চিবুতে চিবুতে তাকায় দূর জলে। পেতনির জল অকূল হচ্ছে। ফুলছে আরো। হাটের দিন আজ। লোকজন আসছে। ঈশান যেন দ্যাখে, শ্যাওলা-কালো জানোয়ারগুলি আজ বড় বেশী ঘোরাফেরা করছে এখানকার জলে। সতর্ক সন্ধানে ওতপেতে আছে, যদি একটা কেউ জলে পড়ে। যতো মানুষ, ততো খাবার তো। করাত-হিংস্র দাঁত কড়মড় করে পেতনির অতলে।

ছাগলের টোপ ফসকে গেছে। বৃথা গেছে কুকুর-টোপের হয়রানি। সেরা টোপ দেবে এবার ঈশান। মানুষের অঙ্গ, মেয়েমানুষের শরীর। ঝাপাঝাপি করবে অথৈ জলে। নোলা ছোঁকছোঁকানো যম না এসে যাবে কোথায়, একবার দেখবে।

দপ্দপ্ করে জ্বলে ঈশানের চোখ। আবার দ্যাখে বিমলীর দিকে। হ্যাঁ, গায়ে গতরে মাংস আছে কানীটার। পুষ্ট, নিটোল মাংস।

নিরালায় যায় ঈশান বাঁধের উপর দিয়ে। নৌকোগুলি এত দোলে কেন কিনারায়? জল ফোলে, তাই। পেতনি বাড়ে, অতল হয়, সে আসে তলে তলে।

গেমো বন ঘন হয়, পূবে বাতাস তার ঘোটি মোচড়ায়। গঞ্জের দেহপসারিণীরা ছুটে আসে বাঁধে। কামটের মতো। দেখতে আসে, লোকের যাওয়া আসা কেমন হচ্ছে। এখন যেন তারা আবাদের গঞ্জে নির্বাসিতা। মরসুমে কারবার জমে।

বাঁধের উপর এসে হাসে খিল্খিল্ করে। কেন? কোন্ মাঝিকে দেখল পেতনির জলে। নামবে নাকি কোমর জলে? বলবে, এইসো নে যাও?

আবাদের মাঠ ভেঙে বাতাস আসে পূবে-সাগরের। পেতনির কোমর জলে কেউ হাসে নাকি খিল্-খিল্ করে। কোনো সোহাগী?

না। শুনলে পরে, বাঁচে কেমন করে ঈশান। সে শোধ চায়।

—কী দ্যাখো গো ঈশেনদাদা।

জিজ্ঞেস করে একটা মেয়ে। সকলেই চেনাশোনা। বউ মরার পর মানুষটা মেয়ে পাড়ায় যায়না। সেইটা এক বিস্ময়। বড় বিস্ময়, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

ঈশান বলে, জাল দেখি।

জাল দ্যাখে ঈশান। ওই দেখা যায়, বিন-জালের ছোলু ভাসে। আট্কা পড়বে নাকি একটি আজ। বিন্জালের বাঁধনে দাঁত খুলতে পারবে না। বেরিয়ে যাওয়ার উপায় কম।

কিন্তু আটকা পড়েনা একটাও। টোপ্ চায়।

হাটের মধ্যে ফিরে আসে ঈশান। বিমলীকে দ্যাখে। একটু বেলায়, ময়রার দোকান থেকে গরম জিলিপি নিয়ে আসে কিনে। ঠোঙা দেয় বিমলীর হাতে। বলে, খা, তোর জন্যে আনছি।

বিমলীর চোখের অন্ধকারে বিস্মিত খুশী উপচে পড়ে। বলে, কেন গো ঈশেনদাদা।

ঈশান মাথা তুলে নদীর দিকে তাকায়। চোখ যে বড় দপ্দপায়। দিলাম, খা।

টোপ মজায় ঈশান। বিমলী যেন কী ভেবে মিটি-মিটি হাসে। আঁচলখানি টেনে দেয় বুকে ভাল করে। বলে, তুমি খাবা না ঈশেনদাদা।

ঈশান জবাব দেয়, খেইয়েছি। তোর জন্যে আনছি ওগুলোন।

কানী বিমলী সলজ্জ হেসে জিলিপি খায়।

ঈশান গোঙাস্বরে আস্তে আস্তে বলে, অ-বিমলী।

—আঁ?

—তোরে আজ আমি পার কইরে দিয়া আসবেনে, অ্যাঁ?

একটু অবাক হয়ে হাসে বিমলী। বলে, দেবা, সত্যি? তবে বড় নিশ্চিন্ত হই ঈশেনদাদা।

ঈশানের দাঁতে দাঁত বসে। বলে, দ্যাব। বিকেলে, রহমানের আড়তের কাছে বইসে ভিক্ষে করিস্, ওখেন থেইকে নে' যাব।

বিমলী ভাবে, কেন, অত নিরালায় কেন? আবার হাসে মিটি-মিটি। বলে, আচ্ছা। যা বল।

ঈশান বাঁধের উপর যায়। রোদ বড় চড়া। পেতনি ঝিকি-মিকি করে। বাতাসটি বড় আরামের।

দুপুরে জাল তুলতে গিয়ে, জাল বড় ভারী লাগে ঈশানের। ওকোড় কাছি টানে, জাল উঠতে চায় না, এত ভারী। ঈশানের দু' চোখ হিংস্র উল্লাসে জ্বলজ্বল করে। পড়ল নাকি, পড়ল একটা জালে? কানী বিমলীর ভাগ্য নিয়ে?

আরো জোরে টানে ঈশান। জাল উঠে। গড়ান গাছের গুঁড়ি একটা প্রকাণ্ড। জালের কোলে আটকেছে।

হতাশ ক্রুদ্ধ চোখে যেন দ্যাখে ঈশান, ধূর্ত কামট পাক খায় তারই নৌকোর আশেপাশে।

বিন্ জাল তুলে, কচাড় জাল পেতে, আবার গঞ্জে ফেরে ঈশান!

মরসুমের হাট নয়। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভাঙন ধরে।

রহমানের ধানের আড়ত বন্ধ। এখন ধান
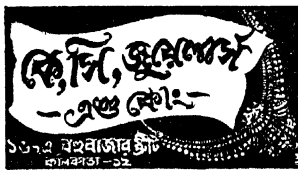
নেই! লোকজন কম এদিকে। বিমলী বসে আছে এক কোণে!

এদিক-ওদিক দ্যাখে ঈশান। কারুর নজর নেই এদিকে। কে-ই বা দ্যাখে। ঈশান ডাক দেয়, চল্ বিমলী।

বিমলী যেন হুতোশে ছিল। মিঠে-ব্যাকুল গলায় বলে, এইসেছ? বড় ভয় পেইয়েছিলাম, কী জানি, ভুইলে গেলে কিনা!

নেংটি পরা ঈশান, কোমরে বাঁধা গামছা। নিকষ কালো মূর্তি, এখন যেন আরো শক্ত দেখায়। বিমলীর হাত ধরে নিয়ে যায় বাঁধের উপর। গেমো গাছের গোড়ায় বাঁধা ছিল নৌকো। বিমলীকে তুলে, বাঁধন খুলে ঈশান নৌকোয় ওঠে।

এখনো ভাটা চলেছে। পেত্নি হাসছে খিল্‌খিল্ ক'রে। যাবার বেলায় হাসে, আসার সময় চুপি চুপি আসে। অদৃশ্যে জিভ্ বাড়িয়ে বাঁধের ফাটল খোঁজে। আর খোঁজে মানুষ।

গোমা গাছ বড় বড় নিশ্বাস ছাড়ে যেন। বাঁধের মাথায় চাঁদ উঠেছে পঞ্চমীর। অস্পষ্ট আলো-ছায়ায়, গাছ, বাঁধ, জল, সবই যেন কেমন আড়িপাতা লুকিয়ে থাকার মতো রহস্যে ভরা।

ঈশানের পাথুরে কপালের ছায়ায়, কোন্ গর্তে ঢোকা অপলক দুটি ছোট ছোট চোখ। নৌকোয় উঠে বিমলীর হাত ধরে আবার বলে, হালের কাছে, গলুয়ে গে' বসবি চল্।

হালের কাছে? কেন? ঈশানের কাছে কাছে বসতে হবে? পেত্নির জলের মতো হাসি চিক্‌চিক্ করে বিমলীর ঠোঁটে। বলে, চল।

ঈশানের নজর পড়ে না বিকেলে কোন্ ফাঁকে কানী বিমলী আজ চুল বেঁধেছে তেল জল লাগিয়ে। দেখেনি, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে কখন। এখন ডুরে শাড়িটি বড় বেশী ছোট লাগছে তার। কেন? শরীর কি আরো ফাঁপল।

বিমলীকে গলুয়ে বসিয়ে, নিজে তার পিছনে বসে হাল ধরে ঈশান। কোমর থেকে গামছাখানি খোলে নিঃসাড়ে। মুখ না বাঁধলে চেঁচাবে বিমলী। মুখ বেঁধে, কোমরে দড়ি বেঁধে, গলুয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে। তাই কাছে কাছে রাখতে চায়।

গামছাটা কোলের উপর রেখে, নৌকোর মুখ দক্ষিণে ঘোরায় ঈশান।

এখনো দু'চারটি নৌকো এদিক-ওদিকে যাতায়াত করে। গয়ারমারির শেষ মোটরের ভোঁপু আসে ভেসে।

ঈশান জলের দিকে তাকায়। ঘাড়ে কপালে দপ্‌দপ্ করে শিরা উপশিরা। উঁচু ভ্রূর তলায় জ্বলে এখন সাপ-খপিস চোখ। দ্যাখে, ভীরু যম এসেছে আজ তার নৌকোর ছায়ায়। মরণের ভয় ডিঙিয়ে এসেছে আজ আসল টোপের লোভে। ওই যেন পাক খায়

গামছাটা তুলে নেয় হাতে

শ্যাওলা কালো বিশাল শরীরের ঝাপটায়। দ্যাখে কুতকুতে চোখে, করাত-দাঁতে দাঁত ঘষে।

মনে মনে বলে ঈশান, আয়, একটু দূরে আয়। জীবনের এই একটা শোধ চাই আজ। আর কিছু না।

দূরে যায় ঈশান। নামে পেত্নির টানে। পাটাতনের পাশ থেকে টেনে বের করে সুদীর্ঘ বর্শা। কুহকী জ্যোৎস্নায়, বড় বেশী হিংস্র দেখায় ইস্পাতের বর্শা-ফলা।

যেন ভুলেই গেছল, হঠাৎ চমকে ওঠে বিমলীর গলার স্বরে, কী কর ঈশেনদাদা?

কী করে ঈশান? বলে, নৌকো বাই।

নৌকো বায়? বৈঠার শব্দ নেই, নৌকো দোলে না কেন? বড় যে এক বর্শা যায়। কমলী মিটিমিটি হাসে কুহকী জ্যোৎস্নার মতো। বলে, ওপারে যাবা না ঈশেনদাদা?

চমকায় ঈশান। তীক্ষ্ন চোখে তাকায় বিমলীর দিকে। কেন, চোখে কি ঠাহর পায় নাকি কানী? বলে, তাই তো যাই। কেন?

বিমলী সলজ্জ হেসে বলে, পুবে বাতাসটা মুখে লাগে, মনে নেয়, দক্ষিণে চইলাছি।

ঈশান বলে, জাল পেইতেছি একটু দূরে। একবার দেইখে যাব।

—অ!

বিমলীর চোখের কোণের অন্ধকারে চাঁদের কণা চিক্‌চিক্ করে।

ঈশানের হিংস্র চোখ চমকায়। কী অসে পাক খেয়ে ওই দক্ষিণের বড় বাঁকে। কী যেন চলুকে ওঠে নৌকোর তলায়।

এসেছে তারা। দলে দলে এসেছে মানুষের গন্ধ পেয়ে। সেই শেষ খিল্‌খিল্ হাসিটা খেয়ে এসেছে, গিলে এসেছে শেষ ডাকটা, 'এইস, নে' যাও।...এইস, নে' যাও।'...

সেটা ভাবতে চায় না ঈশান। তা' হ'লে বাঁচা যায় না। শোধ চায়। জীবনের এই একটা শোধ। এই জন্যে সে বেঁচে আছে। আদি-বাসীরা তার মাংস খায়। ঈশানও খাবে।

বাঁধ নির্জন, পেত্নির বুক নিরালা, গেমোবনে বাতাস ডাকে।

মাথায় রক্ত ওঠে ঈশানের। গামছাটা তুলে নেয় হাতে।

বিমলী ডাকে, ঈশেনদাদা?

গলাখানি যেন বড় মিষ্টি বিমলীর মায়াবিনীর কুহক মাখা। ঈশান শব্দ করে।

হুঁ!

—চাঁদ উইঠেছে, না?

বড় চমকায় ঈশান। কানী না বিমলী? বলে, টের পাস্ কমনে?

বিমলী বলে, আইজকে যে পঞ্চমী শোনলাম?

—হ্যাঁ, চাঁদ উইঠেছে।

পেত্নি নাচে, হাসে কল্‌কল্ করে। সমুদ্রের অন্ধকারে যায় কিনা, তাই। বাঁধের কোল থেকে জল নেমেছে। সেখানে মাটি চক্‌চক্ করে।

কিন্তু দেরী হয়ে যায় যে! জোয়ার পড়লে, আবার উত্তরে টেনে নিয়ে যাবে। চারদিকে সুপ্তি। ডাঙায় ডাকে ঝিঁঝিঁ। আর, এই তো ঘিরে ধরেছে তারা ঈশানের নৌকোর চারদিক। যেন লাজের ঝাপটা মারে ক্ষুধা ও লোভের তাড়নায়।

দুটো টোপ গেছে, এ টোপ ফস্‌কাতে দেবে না ঈশান।

ঈশান, প্রায়-উলঙ্গ সেই সমুদ্রের আদিম অধিবাসী, চোখে যার ক্রুদ্ধ জিঘাংসা ধক্‌ধক্‌ জ্বলে। দু' হাতে গামছা তুলে বিম্‌লীর মুখ বাঁধতে যায়।

—ঈশেনদাদা।

থমকে যায় ঈশান।—হ্যাঁ।

বিম্‌লীর সারা মুখে কৌতূহল। বলে, পিঠে কী ফেইল্‌লে আমার?

টনক বড় খাড়া কানীর। ঈশান বলে, কিছু না, গামছাখানা পইড়ে গেছে।

কিন্তু রাইমংগলের মোহনা যে অনেকক্ষণ পার হয়ে এসেছে জোয়ার। সময় যায়।

বিম্‌লীর মুখে জ্যোৎস্না যেন বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে। বলে, ঈশেনদাদা তোমার পরাণটায় বড় দুঃখু, না?

—কেন?

—আমি জানি। তাই তুমি রা' কাড়ো না।



কে যেন ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে ঈশানের বুকে, ওরে মুখ বাঁধ, শীগ্‌গির বাঁধ। দেখিসনে, তোর সোহাগী বউয়ের শেষ হাসি, শেষ ডাক—খাওয়া শমনেরা ধরা দিতে এসেছে। ঘুরছে আশেপাশে, মানুষের গলার স্বরে, জীবন্ত মাংসের গন্ধে।

চকিতে বর্শাটা তুলে নেয় ঈশান। কিসের ছায়া ওটা জলে?

কিছু না, পেত্নির বুকে জ্যোৎস্নার খেলা।

বিম্‌লী বলে, কী কর ঈশেনদাদা।

—বৈঠাটা সরাইয়ে রাখি।

হাল ছেড়ে দিয়ে, আর একটু এগিয়ে আসে ঈশান বিম্‌লীর দিকে। মজা টোপ, পচে না যায়। আর দেরী করা যায় না।

বিম্‌লী বলে, দূরে বনের বাতাসের মত, তাই তো বলি ঈশেনদাদা, সন্সারে ভাল মানুষের মরণ হয়। আমাকে কেন খায়না কামটে?

ঈশানের চমকানিতে নৌকোটা শুদ্ধ যেন কেঁপে ওঠে। তার গোঙা স্বর বড় তীক্ষ্ণ শোনায়; কেন!

পেত্নির মায়া জল গড়ায় বিম্‌লীর চোখের গর্তে। বলে, আমি লুলো কানী।

অস্থির হ'য়ে গামছাটা পাকায় ঈশান। দ্যাখে, কানী বিম্‌লীর বাঁধা চুল বড় চক্‌চক্‌ করে। ঠোঁট লাল।

আর পেত্নির জলে লোভী কামট লোভার্ত হ'য়ে ফেরে। ঈশানের হাতে তারা আজ প্রাণ দিতে এসেছে।

পেত্নি থম্ খায়। জোয়ারের ধাক্কা লেগেছে অদূরে। সময় যায়। টোপ বুঝি ফস্‌কায়।

ঈশান গামছা তুলে নিয়ে যায় বিম্‌লীর মাথার উপর দিয়ে।

বিম্‌লী সরে আসে ঈশানের কোলের কাছে। কুহকী জ্যোৎস্নার বিষণ্ণতা যায়, মিট্‌মিট্ হাসে। বিম্‌লী বলে, ঈশেনদাদা, আমার গলায় বড় লাগে।

—অাঁ?

—হ্যাঁ, গামছার পাকে বেন্ধে ফেইলছ আমারে। এট্টুসখানি আস্তে বান্ধো, না' হ'লি যে বড় লাগে?

—অাঁ?

বিম্‌লী হাসে খিল্‌খিল্ ক'রে। ঈশানের পায়ে হাত দেয়। তারপর হঠাৎ গুন্‌গুন্ ক'রে ওঠে,

মন যদি দিলে
তবে মনের মানুষ নাই কেন।
এতই কাঁদালে যদি,
আজ ভালবাসা কেন।
এ পরাণে কী আছে আর,
কী বা দেখ আর বার,
আগুনের আঁচ নেই
ফুঁ দিয়ে ছাই ওড়াও কেন।

পেত্নি নদীর বুকে জোয়ার আসে চুপি-চুপি। গেমোবনে বাতাস বড় শন্‌শন্ করে। নদীর সর্বাঙ্গ শিউরোয়। বাঁধের ঢালুতে চাঁদ যায় গড়িয়ে। আর মানুষের গন্ধে গন্ধে ফেরে, ভয়াল করাল মাংস লোলুপ কামট। চোখে তার রক্তের তৃষ্ণা। সোহাগী বউয়ের শেষ হাসি খেয়ে এসেছে সে।

আর শেষ ডাক, এইস, নে' যাও!

কিন্তু ঈশান কী করে। সময় যায় না?

কানী বিম্‌লী বলে মায়াবিনী সুরে, ঈশেনদাদা তোমার হাতের বাঁধন এট্টুস্ আল্‌গা কর গো, বড় শক্ত।

ব'লে বিম্‌লী মাথাটি এলিয়ে দেয় ঈশানের শক্ত বুকে। বাঁধন আল্‌গা হয় ঈশানের।

বাতাসে যেন বড় সোহাগ উথ্‌লোয়। বিম্‌লী বলে, দম বন্ধ নাকি তোমার ঈশেনদাদা।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—জলে আমি কামট দেখি।

—কামট!

—হ্যাঁ।

চমকে উঠে, মুখ ফেরাল বিম্‌লী ঈশানের দিকে। বলে, কপালে আমার গরম জল পইড়লো। তোমার শরীল বড় কাঁপে। ঈশেনদাদা তুমি কাঁদছ?

হ্যাঁ, কালো পাথরটা যেন কিসের দমকে কাঁপে। জলে ল্যাজ আছড়ায় কামট। কিন্তু বাতাসে যেন সোহাগের ডাক! ঈশান ফিস্‌-ফিস্ করে বলে, কাঁদি না লো বিম্‌লী, এ পেত্নির মায়া।

কি বোঝে বিম্‌লী, কে জানে। তার চোখে জল আসে।

তারপর জোয়ারের ধাক্কা টের পেয়ে বলে, চল, তোরে রেখে আসি।

বিম্‌লী মিষ্টি করুণ সুরে বলে, রাত হইয়েছে অনেক। কে নে' যাবে বাড়িতে! গঞ্জে রেইখে যাবা?

ঈশান একটু চুপ ক'রে থাকে। দূরে জলে তাকায়। নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে বলে, গঞ্জে যদি রেইখে যাব, তবে তোরে পেত্নির জলে ফেইল্লাম না কেন? আখড়তলা যাবি বিম্‌লী?

আখড়াতলায়? ও, সেখানে ঈশেনদাদার বাড়ি। বিম্‌লীর বড় অকুলান লাগে ডুরে-শাড়ি। শরীর তার এত বাড়ল কখন; কবে? নিরন্তর চোখের গর্তে কুহকী জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করে।

ঈশান বৈঠা টানে। পাটাতনের ওপর ইস্পাতের বর্শাটা একটু ম্লান দেখায়। ফলাটা যেন বড় টানা চোখের ফাঁদের মতো চক্‌চক্ করে। কিন্তু পলাতক কামটরা যেন আজ সত্যি বড় হতাশক্রোধে দাঁত কড়মড় করে পেত্নির অতলে।

ঈশান ভাবে, বড় খিল্‌খিল্ করে হেসেছে আজ বিম্‌লী। আরো না জানি কত হাসবে।

# গণতন্ত্র ও সমাজ-বিবর্তন

অম্লান দত্ত
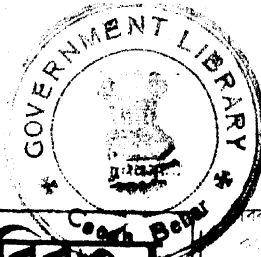
( ১ )

সমাজবিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে শিক্ষণীয় বস্তু আছে। এ-বিষয়ে পরস্পর বিরোধী নানা তত্ত্ব বা থিওরী এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের সংগে মিলিয়ে দেখলে সত্য নির্ধারণে সুবিধা হবে, একথা সন্দেহাতীত।

এই অর্ধশতাব্দীতে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশ বৎসর আগের ব্রিটেন, বা আমেরিকা, বা সুইডেনের সংগে আজকের ব্রিটেন-আমেরিকা-সুইডেনের পার্থক্য সামান্য নয়। পঞ্চাশ বৎসর আগে আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি ছিল নগণ্য, আজ মার্কিণ শ্রমিকের সাংগঠনিকশক্তি অসামান্য। শ্রমিক আন্দোলনের সংঘবদ্ধ শক্তিকে গণনার মধ্যে না-নিয়ে যাঁরা মার্কিণ পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিচার করতে বসেন তাঁরা আজকের মার্কিন সমাজকে চেনেন না। সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সংগে সংগে গড়ে উঠেছে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ব্রিটেন-সুইডেনে দেশব্যাপী সমবায় সংগঠন এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই বিশেষ অংগ হিসাবে স্বীকৃত। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য দেশব্যাপী বহু বিচিত্র আয়োজনও এই আন্দোলনের আর একটি দিক। সাধারণ মানুষকে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ করবার ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনসাধনে সরকারী নীতিকে প্রয়োগ করবার প্রয়াস ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।

সামাজিক সাম্য এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা এখনও বলা চলে না। বহু ক্ষেত্রে অসাম্য প্রকট। মার্কিন দেশে নিগ্রোদের সমস্যা সুবিদিত। আর শ্রমিক-দলের শাসন সত্ত্বেও ব্রিটেনে সম্পত্তির বণ্টনে অসাম্য প্রবল। কিন্তু এসব দেশে গত অর্ধ-শতাব্দীতে সামাজিক সাম্যের দিকে অগ্রগতি অনস্বীকার্য। সম্পত্তির বণ্টনে গভীর অসাম্য আছে বটে; কিন্তু সম্পত্তি থেকে আয়লাভের পথ সংকুচিত হয়েছে। পারিবারিক আয় বণ্টনের এক হিসাবে প্রকাশ যে, ব্রিটেনের শতকরা যে পাঁচভাগ পরিবারের আয় সর্বোচ্চ, দেশের মোট পারিবারিক আয়ে তাদের অংশ ছিল ১৯১৩ সালে শতকরা ৪৩ ভাগ, আর ১৯৪৭ সালে শতকরা ২৪ ভাগ। আয়কর বাবত দেয় অংশ আয় থেকে বিয়োগ না করেই এই হিসাব।* অর্ধ শতাব্দী আগে ব্রিটেন-আমেরিকায় উচ্চবিত্তদের আয়ের উপর যে হারে কর ধার্য হত নিম্ন মধ্যবিত্তদের আয়ের উপরও প্রায় সেই হারই ধার্য ছিল। আজ সর্বোচ্চ আয়ের উপর করের হার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং ক্ষেত্র-বিশেষে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে; বেকার-ভাতা এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্রমশ উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের সমস্ত দাবী পূর্ণ না-হলেও দাবী পূরণের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হচ্ছে।

জনসাধারণের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এই অগ্রগতি সম্ভব হত না। কিন্তু ব্রিটেন-আমেরিকা-সুইডেনে গণতন্ত্রের এই অগ্রগতি বিপ্লবের পথে ঘটেনি, বরং সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের পথেই ঘটেছে। **

সমাজ বিবর্তনের একটি বিকল্প ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় মার্ক্সীয় দর্শনে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীগত সম্পর্কের সংগে উৎপাদিকা শক্তির বিরোধ ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে; আর বিপ্লবের পথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ভিতর এই বিরোধের অবসান। এ-বিষয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কমূলক আলোচনায় কোনো এক ইতালীয় মার্ক্সবাদী মতপ্রকাশ করেছেন যে, শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদিকা শক্তির ক্রম বিবর্তনের ফল মাত্র নয়; বরং, যে-হেতু শ্রমই উৎপাদিকা শক্তি, অতএব শ্রমিক সংঘবদ্ধতা উৎপাদিকা শক্তির ক্রম বিবর্তনেরই সাক্ষাৎ প্রকাশ। স্বীকার করে নেওয়াই সংগত যে, শ্রমিক আন্দোলনে উৎপাদিকা শক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের যুগ্ম প্রতিফলন লক্ষণীয়। আর শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে এ-কথাই সুস্পষ্ট যে, উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদন সূত্রে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্কেরও বিবর্তন ঘটেছে এবং গণতান্ত্রিক সমাজে এই দুই বিবর্তন কম-বেশী সমান্তরাল ধারায় চলেছে।

শাস্ত্রশাসিত পরিবর্তন অসহিষ্ণু সমাজে নূতন চিন্তাধারার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমপরিবর্তন সম্ভব হয় না; এ-দুয়ের ভিতর বিরোধ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজে নূতন চিন্তা ও সমস্যার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বিত সংস্কার ঘটে; ফলে পুঞ্জীভূত অসামঞ্জস্যের শোধনের জন্য বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশ-তিরিশ বছর পূর্বেও যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা বিপ্লবের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল সংস্কারের পথেই সেই সমস্যা আজ অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিপ্লববাদী তর্ক তুলবেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, আর এই ভিত্তির আমূল পরিবর্তন যে-দিন প্রয়োজন হবে সে-দিন কি সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করে বিপ্লবের পথ অনিবার্য হবে না? কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যেমন ক্রমপরিবর্তন সম্ভব, সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারেরও তেমনই। সম্পত্তির উপর কর, বা সম্পত্তির একাংশে মৃত্যুর পর সরকারী অধিকার প্রবর্তন, আজ সংস্কারপন্থী কার্যক্রমের অংগবিশেষ; অথচ ঊনিশ শতকী দৃষ্টিতে এ-ধরণের কার্যক্রম ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৌল অধিকারে অসহ্য হস্তক্ষেপ। সম্পত্তির অধিকার বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী সুচিহ্নিত কোনো সম্পদের নিয়োগ অথবা ব্যবহারের অধিকার। এই অধিকারকে অন্যান্য বহু অধিকারের মতই সামাজিক নানা সর্ত ও দায়িত্ব দিয়ে বেষ্টন করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে সমাজের অধিকারকে সম্পত্তির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত করা সংস্কারপন্থিতার বিরোধী নয়। শিল্প থেকে অংশীদারদের লভ্য আয় সীমায়িত করে দেওয়া কোনো সংস্কার-বাদী সরকার নিজের অধিকার বহির্ভূত মনে করেন না; বিশেষ কোনো শিল্প সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়ে পূর্বতন অংশী-

---

*Simon Kuznets. "Economic Growth and Income Inequality", The American Economic Review, March, 1955.

**ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোয় গণতন্ত্র অসম্ভব একথা আধা-সত্য মাত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না; কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিতর থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হওয়া সম্ভব এবং ধনতন্ত্রের ক্রমান্বিত সংস্কারের ভিতর দিয়ে এই আন্দোলন ধাপে ধাপে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

দারদের একটা বার্ষিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দিলে, অবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে না; আর বর্তমান অংশীদারদের মৃত্যুর পর এই বার্ষিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া, অথবা মৃত্যুকালীন শুল্ক হিসাবে সম্পত্তির একটা বড় অংশ সরকারী তহবিলে হস্তান্তরিত করা, কিছু বৈপ্লবিক ব্যাপার নয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় বৈপ্লবিক পদ্ধতি ছাড়াও ধাপে ধাপে ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব।

অপরপক্ষে যে-সব দেশ এক ধাক্কায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে তাদের বৈপ্লবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এর উদাহরণও এই অর্ধশতাব্দীতে কম নেই।

অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯২১ সালের আরম্ভ পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজবার এক বৈপ্লবিক সাধনা চলছিল। পুঁজিপতিদের সমাজে অর্থনৈতিক কাজকারবার চলে বাজারে লেনদেনের সাহায্যে, টাকার মাধ্যমে। নূতন কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে এসব কিছুই থাকবে না, টাকার ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে মালমসলা ও উৎপাদন-দ্রব্যের গতি নির্ধারিত হবে, এমন একটা ভাবনা বৈপ্লবিক উৎসাহের সংগে কার্যে পরিণত করবার প্রয়াস চলছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা চালানো সম্ভব হল না। তৎকালীন অর্থনৈতিক দুর্গতি অংশত গৃহযুদ্ধের অনিবার্য ফল, আর অংশত এই বৈপ্লবিক অসাধ্য সাধনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরিণতি। অল্পকালের ভিতর মোট উৎপন্নের পরিমাণ ভয়ংকরভাবে কমে গেল। সেই সংগে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব, যাতে না কি পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। দেশময় সাধারণ মানুষের বিরোধিতার ফলে এই বৈপ্লবিক সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হল।*

১৯২১ সালে নূতন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হল। টাকার প্রচলন, বাজারে লেনদেন, কাজ কারবারের পরিচালনায় কারবারী হিসাব নিকাশ ইত্যাদির প্রবর্তনের ফলে সোভিয়েত অর্থনৈতিক পুনরভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। বৈপ্লবিক কল্পনাবিলাসিতা পরিহার করে আজ হয় তো স্বীকার করা সহজ যে, বিভিন্ন দেশে টাকার প্রবর্তন এবং বাজারে লেনদেনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শুধু কয়েকজন পুঁজিপতির স্বার্থে নয়, বরং সমাজের প্রয়োজনে—অর্থাৎ, সামাজিক সম্পদের বিনিয়োগে হিসাব রেখে, প্রয়োজনের সংগে সরঞ্জামের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবার প্রয়োজনে। বাজারে কোনো দ্রব্যের মূল্য কখনও ন্যায্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও, কোনো জটিল সমাজে লেনদেনের যন্ত্র হিসাবে বাজারের উপযোগিতা সাধারণভাবে স্বীকার্য। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা শিল্পের জাতীয়করণের সংগে সংগে এই প্রয়োজন লুপ্ত হয় না। সোভিয়েত দেশে অবশ্য স্ট্যালিনী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে টাকার ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদন পরিকল্পনা বাজারের মাধ্যমে, অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে, নির্ণয় করবার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে নি। কিন্তু পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে আজ শিল্পের জাতীয়করণ সত্ত্বেও বাজারের ভিত্তিতে অর্থনীতি চালু করবার ব্যবস্থা বহুদূর অগ্রসর; এবং সোভিয়েত দেশেও ভবিষ্যতে সেদিকে ঝোঁক দেখা দেওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।

বাজারের অর্থনীতি থেকে একটি মূল শিক্ষা গ্রহণীয়। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় বহু শতাব্দীর পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যে-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে, নূতন যুগে, অর্থাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগে সংগে, তাদের ত্রুটি চোখে পড়ে। যে-সব প্রয়োজন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও বিনা আড়ম্বরে সিদ্ধ করে চলে সাময়িকভাবে সে-সব প্রয়োজন থেকে দৃষ্টি ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়; যেদিকে ত্রুটি সে দিকটাই হয় তো সমগ্র চেতনাকে অধিকার করে বসে। এ অবস্থায় মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনই সংস্কারপন্থিতা। রক্ষণশীলতা এখানে নিরর্থক, কারণ পরিবর্তন আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লববাদও প্রায়শ নিরর্থক; কারণ অহেতুক ক্ষয়ের পথে, নানা আতিশয্য অতিক্রম করে বিপ্লবী প্রয়াসও সেখানেই ফিরে আসে সার্থক সংস্কারপন্থিতার ঝোঁক যেদিকে।

সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করে কেউ হয় তো বলবেন যে, আতিশয্য অতিক্রম করেও ঐ ব্যবস্থা যেখানে পৌঁছেছে, বা পৌঁছবার চেষ্টা করছে, তার সংগে সংস্কারপন্থী সমাজবাদীদের সাধনায় মৌলিক প্রভেদ আছে। সোভিয়েত দেশে কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ চাষপ্রথা, শিল্পের ক্ষেত্রে সামগ্রিক জাতীয়করণ পাশ্চাত্য সমাজবাদীদের কার্যক্রমে স্থান পায় না।

কিন্তু সোভিয়েত যৌথ চাষপ্রথা এবং শিল্পের সামগ্রিক জাতীয়করণ সমাজবাদী আদর্শের দিক থেকে প্রয়োজন অথবা বাঞ্ছনীয় কি না, এটাও বিচার্য। পূর্ব ইউরোপের যে-দেশেই যৌথ খামার থেকে চাষীদের বেরিয়ে আসবার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেখানেই চাষীরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। কম্যুনিস্ট যৌথ চাষপ্রথা শুধু-যে জোরজুলুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, বাধ্যতার ভিত্তিতেই শুধু এ-ব্যবস্থা চালু রাখা যায়। বাধ্যতামূলক যৌথ চাষপ্রথায় উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে একথাও আজ যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের

* প্রত্যাহারের পর লেনিন ইত্যাদিরা অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ-অবস্থা ওঁরা বৈপ্লবিক নীতির দিক দিয়ে গ্রহণ করেননি, গৃহযুদ্ধের অবস্থার বিপাকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র। অথচ গৃহযুদ্ধ যখন প্রায় অবসিত সেই অবস্থাতেও এই ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করবার উদ্দেশ্যে অন্তত দুটি নূতন ডিক্রী জারি করা হয়েছিল; আর যতদিন গৃহযুদ্ধ চলছিল ততদিন বহু কম্যুনিস্ট নেতার বিবৃতিতে এ-কথাই বারবার শোনা গেছে যে, এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কম্যুনিস্ট বৈপ্লবিক আদর্শ দিনে দিনে মূর্তিমান হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে পোলানির "The Logic of Liberty" পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা অবশ্য পাঠ্য।

কম্যুনিস্ট নেতারা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করছেন। চাষের ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের স্থান আছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক চাষের যে-সমন্বয়ের কথা যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটো কিছুদিন আগে বলেছেন সেই বাঞ্ছিত সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে সোভিয়েত দেশে নয়, বরং সংস্কারপন্থী হল্যাণ্ড-ডেনমার্কে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেকটা অনুরূপ কথাই বলা চলে। স্ট্যালিনী ব্যবস্থায় শিল্প-পরিচালনার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয়করণ অতিরিক্ত-ভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, একথা অনেকেই আজ স্বীকার করছেন। এ-প্রসঙ্গে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে যে নূতন চিন্তাধারা সরকারী দমন-নীতি সত্ত্বেও আশান্বিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই নূতন চিন্তাধারায় প্রধান প্রস্তাব এই যেঃ মূল শিল্পগুলিতে রাষ্ট্রের অব্যাহত কর্তৃত্ব থাকবে; কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ চাষপ্রথার অবসান ঘটবে; ছোট শিল্পে ব্যক্তিগত পরি-চালনা গ্রাহ্য হবে; শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকদের, এবং রাষ্ট্রের উপর জনসাধারণের, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; আর দেশময় চিন্তার স্বচ্ছন্দ এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে।* রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সাধারণ কাঠামোর ভিতর ব্যক্তি-গত উদ্যোগ ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের ভিত্তিতে এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের এই আদর্শ আজ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর যতই মৌলিক সমর্থন লাভ করবে, ততই এই আন্দোলনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সংস্কারপন্থী সাম্যবাদীদের সহযোগিতা ও ঐক্যের ভিত্তি প্রশস্ত হবে। পাশ্চাত্ত্য সাম্য-বাদী ও পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট আন্দো-লন বিভিন্ন পথে হয় তো অনুরূপ আদর্শের দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে।

( ২ )

ঘটনার পর প্রায় যে-কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গেই উক্ত ঘটনার সামঞ্জস্য দেখানো কৌশলী তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ঘটনার পূর্বে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞের যে-প্রত্যাশা তার সঙ্গে পরবর্তী তথ্যের তুলনাতেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের যথার্থ পরীক্ষা; এবং এই পরীক্ষায় যদি কোনো অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে তা হলে তদনুযায়ী

---

* আপাত সদৃশ একটা ব্যবস্থাকে পুরনো-পন্থী কম্যুনিস্টরা "উচ্চতর" সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগুবার পথে 'ট্যাকটিক্যাল' বা কৌশলমূলক ধাপ হিসাবে সমর্থন করে থাকেন। কিন্তু এই পুরনো পরিকল্পনার সঙ্গে নূতন প্রস্তাবের পার্থক্য মৌলিক। প্রান্তোক্ত পূর্ব ইওরোপে উদ্ভূত এই নূতন চিন্তাধারা এখনও মস্কোর আশীর্বাদ লাভ করেনি।

আদিতত্ত্বের সংশোধন বিবেচক বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য।

ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্ভাবনামাত্র নেই, মার্ক্সের আদি চিন্তায় এই ধারণা একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত স্বরূপ। গণতন্ত্রের অভাবে সাম্যবাদী আন্দোলন বিপ্লবমুখী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধনতন্ত্রের যে-যুগে মার্ক্সীয় বিশ্বদর্শনের উৎপত্তি সে-যুগ, অন্তত মার্ক্সের জন্মভূমিতে, গণতন্ত্রের যুগ নয়। মার্ক্সের চিন্তায় বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা তাই তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তত্ত্বকে পিছনে ফেলেই জীবন এগিয়ে চলে। মার্ক্সের যৌবনের ইউরোপের সঙ্গে তাঁর বার্ধক্যের ইউরোপের পার্থক্য বিস্তর। আর এই প্রভেদের মূলে আছে তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিস্তার।

১৮৪৮ সালের বিখ্যাত ইস্তাহারে মার্ক্স লিখেছিলেন:

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social relations."

অর্থাৎ, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক উচ্ছেদের ফলে। অথচ ১৮৭২ সালে আমস্টারডামে এক বক্তৃতায় মার্ক্সকে বলতে হল:

"We must take account of the institutions, customs and traditions of various countries, such as the United States and Great Britain—and if I know your institutions better I should perhaps add Holland—where the workers will be able to achieve their aims by peaceful means. But this will not be the case in all countries."

অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, আমেরিকায় শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ পথেই তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। আরও প্রায় বিশ বৎসর পর এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন:

"With (the) successful utilisation of universal suffrage, an entirely new method of proletarian struggle came into operation." ("The Class Struggles in France, 1848-50"), ভূমিকা, অর্থাৎ, গণভোটের প্রবর্তনের ফলে সর্বহারা মজুর শ্রেণীর সংগ্রামের একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ খুলে গেছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে শুধু গণভোটের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয় নি; এ-যুগেই ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে শৈশব অতিক্রম করে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে বলা চলে। পরবর্তী যুগের ক্রমবর্ধমান সমাজ সংস্কারের দিকনির্দেশও পাওয়া যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই। উদাহরণত, ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯১৩ সালের ভিতর জার্মানী ও ব্রিটেনে সামাজিক বীমা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তনে রাষ্ট্রের তৎপরতা লক্ষণীয়।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংস্কারপন্থী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি রুশ বিপ্লবের পরোক্ষ ফল মাত্র, এ ধারণা যুক্তিসহ মনে হয় না। গত অর্ধ শতাব্দীতে সংস্কারপন্থী আন্দোলন পশ্চিম ইউরোপে যে-আকৃতি ধারণ করেছে উনিশশতকের শেষভাগে বা বর্তমান শতকের গোড়াতেই তার মূল লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং যে সাংগঠনিক শক্তির ফলে এই আন্দোলন তার লক্ষ্যের দিকে এগুতে পেরেছে তার ভিত্তিও এ-যুগেই স্থাপিত হয়েছে। আবার একথাও কখনও কখনও শোনা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আধুনিক সংস্কারপন্থী প্রগতি সম্ভব হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায়। কিন্তু সংস্কারপন্থিতার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ক্ষীণ, বহুক্ষেত্রে কাল্পনিক। আমেরিকায় অর্থনৈতিক সংস্কারের স্মরণীয় যুগ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের শাসনকাল: রুজভেল্টের আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী বলা চলে না। নরওয়ে-সুইডেন-নিউজীল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সংস্কারপন্থী নীতি উল্লেখযোগ্য: এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুপস্থিত। এমন কি, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও সমাজ সংস্কারে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এটলীর নেতৃত্বে, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগে নয়, বরং সংকোচনের যুগে। আমেরিকা-ব্রিটেন - নরওয়ে - সুইডেন - নিউজীলাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকল দেশেই সংস্কারপন্থী নীতির মূলে যদি কোনো একটি শক্তি কার্যকরী হয়ে থাকে তবে তা ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

গণতান্ত্রিক পথে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে সংস্কারপন্থী একটি নূতন যুগের আবির্ভাবকেই মার্ক্স পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন। তবু একথা বললে সম্ভবত ভুলই করা হবে যে, মার্ক্স জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপ্লববাদ ত্যাগ করেছিলেন। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক দর্শনের সঙ্গে বিপ্লববাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে-নূতন যুগের আবির্ভাব মার্ক্সের শেষবয়সের উক্তিবিশেষে প্রচ্ছন্ন সেই যুগের বৈশিষ্ট্য তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করলেও তাঁর দর্শনচিন্তার ভিত্তিতে স্থান পায় নি। মার্ক্সীয় দর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি ধনতন্ত্রের আদি পর্বের বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমিত। মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের ক্রম অবনতি, বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা, ধনতন্ত্রের আশু বিনাশ ইত্যাদি মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণী ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধগম্য। আর অপেক্ষাকৃত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক প্রত্যাশা বারবারই ব্যর্থ হয়েছে এবং মার্ক্সবাদীদের যুক্তিকৌশল নিয়োগ করতে হয়েছে ঘটনার পরবর্তীকালে ঘটনার সঙ্গে থিওরীর সমঞ্জস্য প্রদর্শনের বক্র চেষ্টায়।

শুধু পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রেই মার্ক্সীয় প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় নি; বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গেও মার্ক্সীয় প্রত্যাশার সংগতি নেই। সোভিয়েত ব্যবস্থার যে স্বৈরাচারী অধঃপতন আজ ক্রুশ্চোভের প্রচারগুণে কম্যুনিস্ট মহলেও স্বীকৃত সে-অধঃপতন কি মার্ক্সবাদীরা আশা করেছিলেন? এ বিষয়েও তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের অসামঞ্জস্য চিন্তনীয়, এবং আদি তত্ত্বের সংশোধন প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় তত্ত্বের শুধু একটি দিক নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব। মার্ক্সীয় চিন্তায় শ্রেণীর সংজ্ঞা সম্পত্তির মালিকানা দ্বারা নির্ধারিত: সম্পত্তিবানের সঙ্গে সম্পত্তিহীনের সংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রাম। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের সঙ্গে আমলাতন্ত্র ( bureaucracy ) অথবা অত্যাচারপরায়ণ অন্য কোনো গোষ্ঠির দ্বন্দ্ব শ্রেণীসংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত নয়, কারণ আমলা গোষ্ঠির ক্ষমতা মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে কয়েকটি কথা ভেবে দেখবার আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, মালিকানা বলতে সম্পত্তি সংক্রান্ত কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি বোঝায়, এবং এই অধিকারগুলি প্রয়োজনমত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে সংকুচিত করা যায় বা নানা সর্ত দ্বারা বেষ্টিত করা যায়। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাও শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমলাতন্ত্র যেখানে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের একটি যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়েছে সেখানেও প্রয়োজন জনসাধারণের স্বার্থে আমলাগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারগুলিকে গণস্বার্থরক্ষী সর্ত দ্বারা কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার লোপ পেলে আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার আর কোনো "বাস্তব" ভিত্তি থাকে না, সোভিয়েত দেশের অভিজ্ঞতার পর এ-ধরনের অলস থিওরীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে আশা করি অনেকেই আজ ইতস্তত করবেন। যে-কথাটা এখনও পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন তা হ'ল এই যে, সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে আমলা গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য, এমন কোনো সাধারণ তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে দুই-ই সাধ্যায়ত্ত এবং শান্তিপূর্ণ সংস্কারের পথে সাধনীয়; যে-সমাজে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংগঠন দুর্বল, সেখানে দুই-ই দুঃসাধ্য এবং বিপ্লবের আশংকা বাস্তব।

চীনদেশের কম্যুনিস্ট নেতা মাও ৎসে-তুং-এর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাও বলেছেন যে, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (contradictions) সম্বন্ধে

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থাই মুক্ত নয়; তবে ধনতান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক (antagonistic)—অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিলোপ ছাড়া এই দ্বন্দ্বের অবসান নেই—আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৈরিতাবিহীন (non-antagonistic)—অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতরই শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাদপ্রতিবাদের সমন্বয় সাধন সম্ভব, যদি-না প্রতিপক্ষ "প্রতিবিপ্লবী" হন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উদাহরণ হিসাবে মাও গণতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার (centralism) এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারী আমলাগোষ্ঠীর বিরোধিতার উল্লেখ করেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ইতিহাসে বৈরিতাভিত্তিক উৎপাদন-প্রথার অন্তিম পর্যায়।* এদিকে সোভিয়েত ও অন্যান্য কমুনিস্ট দেশে নেতৃস্থানীয়দের ভিতরে, এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনগণের, বিরোধ সন্দেহাতীতভাবে প্রকট। মার্ক্সীয় আদি তত্ত্বের সঙ্গে সোভিয়েত তথ্যের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই মাও ৎসে-তুং-এর বিবৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, বা পূর্ববর্তী কোনো সমাজ ব্যবস্থায় অনুরূপ দ্বন্দ্ব ছিল, একথা তথ্য হিসাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব; কিন্তু ইতিহাসে ধনতন্ত্রই অন্তর্বিরোধসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থার শেষ উদাহরণ, এ ধরনের সিদ্ধান্ত বা ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো তথ্যগত বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, থাকা সম্ভবও নয়। একপ্রকার শূন্যগর্ভ বাক্যের মারপ্যাঁচে মার্ক্সীয় তার্কিক এই বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মোহ সৃষ্টি করতে পারেন বটে; কিন্তু এ ধরনের চিন্তায় ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন এবং সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না, মোহই বাড়ে। অতীতের মত ভবিষ্যৎ সমাজেও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তন দুই-ই থাকবে। এবং সমাজতন্ত্র বলতে যদি আমরা কোনো রূপরেখাহীন নিরাকার আদর্শ না-বুঝে বাস্তব একটি সমাজ ব্যবস্থাই বুঝি তবে এই নূতন সমাজ ব্যবস্থাও একদিন পরিবর্তনের স্রোতে অন্তর্হিত হবে। কি-ধনতান্ত্রিক কি-সমাজতান্ত্রিক কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের অভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান আশা করা যাবে না। "সাম্যবাদী" সমাজে নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আমলা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্রের অভাবে "বৈরিতামূলক" আকার ধারণ করাই স্বাভাবিক। "সমাজতান্ত্রিক" হাঙ্গেরীতে জনসাধারণ ও শাসক গোষ্ঠীর ভিতর দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক আকার ধারণ করবার প্রধান কারণ এই যে, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ সেখানে খোলা ছিল না—আজও নেই।

ইতিহাসে "ডায়ালেকটিকস্"-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে দু'একটি কথা ছাড়া এ-অধ্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পক্ষের যুক্তি প্রতিপক্ষ নস্যাৎ করে দেন; আর যুক্তির এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সমন্বয়ের নূতন সূত্র। চিন্তার এই দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনের ধাঁচে অনেকে সমাজ বিবর্তনকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাদপ্রতিবাদের দ্বন্দ্বমূলক গতির সঙ্গে সমাজ বিবর্তনের গতি তুলনীয় এ ধারণা হয়তো বুদ্ধিজীবী মহলে আদৃত অন্যতম কুসংস্কারস্বরূপ।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়। সমাজ বিবর্তনের গতি-প্রকৃতির নিকটতম উপমা হয়তো পাওয়া যাবে কোনো বিচ্ছিন্ন বাদপ্রতিবাদের দ্বন্দ্বমূলক ছন্দে নয়, বরং মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের যুগযুগব্যাপী ক্রমবৃদ্ধিতে। এবং যদিও কোনো কোনো দার্শনিক বিচ্ছিন্ন বাদ-প্রতিবাদের দ্বন্দ্বের ধাঁচে চিন্তার ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন, তবু একথাই হয়তো বাস্তব যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে শৈশব পেরোলেই, বাদপ্রতিবাদ চলে প্রধানত প্রান্তীয় প্রশ্ন নিয়ে। কোনো নূতন আবিষ্কার সাময়িকভাবে যতই যুগান্তকারী মনে হোক-না কেন, এবং পুরনো তথ্যের উপর তাতে যতই নূতন আলোকপাত হোক-না কেন, বাদপ্রতিবাদের চাঞ্চল্য যখন স্তিমিত হয় তখন একথাই সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাকে যে, ঐ বিশেষ আবিষ্কারটির ফলে জ্ঞানের প্রান্তদেশ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয়েছে অথবা ধৈর্যের সঙ্গে পূর্বে আবিষ্কৃত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সত্য একটি নূতন সংহতি লাভ করেছে।

সমাজের বিবর্তন অবশ্য সর্বাংশে জ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সমাজজীবনে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকার ফলে সামাজিক আলোড়নের আপাতনাটকীয়তা বেশী। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও নেতৃত্বের যোগাযোগে বিপ্লব ঘটে থাকে এবং এই বিশেষ সংযোগের বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দায়িত্ব। কিন্তু বিপ্লব অনিবার্য, বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক দেশগুলির ইতিহাসের সাক্ষ্য এই দ্বান্দ্বিক সূত্রের স্বপক্ষে নয়। বরং এ কথাই সুস্পষ্ট যে, যে-দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যত দুর্বল সে-দেশের প্রগতি প্রচেষ্টায় বিপ্লবের ভূমিকা তত প্রাধান্য লাভ করবার সম্ভাবনা। আরও সুস্পষ্ট এই যে, সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনে ধারাবাহিকতার দিকে একটা ঝোঁক আছে; এবং এই ধারাবাহিকতার সূত্র যখনই খণ্ডিত হয় তখনই ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রে, সাময়িক আতিশয্যকে বহু ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে সংশোধন ক'রে, আবারও সমাজ তার স্বাভাবিক বিবর্তনের কক্ষপথেই ফিরে আসে।

যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্যের প্রান্ত স্পর্শ ক'রেই সার্থক সমাজ সংস্কার। অবশ্য যুগ বিশেষে প্রান্তিক সংস্কারও একের পর এক এতো দ্রুত পরম্পরায় সাধিত হতে পারে যে, পারম্পর্য রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও—এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজ প্রগতির ধারা চালিত হওয়া সত্ত্বেও—পরিবর্তনের একটা লয়গত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা ক'রে "বিপ্লব" শব্দটি হয়তো এখানে ব্যবহার করা চলে; বিপ্লব ও ধারাবাহিকতা এক্ষেত্রে বিপরীতার্থক শব্দ নয়।

( ৩ )

গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য সমাজ ব্যবস্থার মূল, অর্থাৎ, মানবিক নীতিগুলিতে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন, এবং যুগ বিশেষের স্বার্থ অথবা অজ্ঞানতা প্রসূত যে-সমস্ত ধারণায় এই মূল নীতি আচ্ছন্ন অথবা বিকৃত সেই ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা সমাজ সংস্কারকের অন্যতম কর্তব্য। নীতির বিচারে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, অথচ মূল নীতির প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পরীক্ষামূলকভাবে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি—সমাজ সংস্কারকের পক্ষে এ দুই-ই এক সঙ্গে আবশ্যক। এ-বিষয়ে গান্ধীজীর উদাহরণ স্মরণীয়। গান্ধীজী আপোষ আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন ব'লে তাঁর প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে; কিন্তু মূল নীতির প্রতি তাঁর অটল বিশ্বস্ততা হয়তো তাঁর সমালোচকেরাও স্বীকার করবেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-বিষয়ে আলোচনার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। এদেশে অর্থনৈতিক উন্নতির বিরাট পরিকল্পনা চলেছে। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিও আমাদের আনুগত্য।

*"The bourgeois relations of production are the last antagonistic form of the social process of production" (Critique of Political Economy).

আমরা প্রকাশ করে থাকি। অথচ যে-দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকার প্রধান কার্য-নির্বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, সে-দেশে ক্ষমতার পৌনঃপুনিক হস্তান্তর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে—যদি-না শাসকদল ও বিরোধী দলের ভিতর কার্যক্রমের প্রভেদ সামগ্রিক এবং দুস্তর না-হয়ে প্রান্তিক হয়।

ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রশ্ন বাদ দিয়েও মূল সমস্যাটি আলোচনা করা যায়। অর্থ-নৈতিক দ্রুত উন্নতির জন্য দেশে উৎপাদন যন্ত্র, অর্থাৎ কলকারখানা, কলাকৌশল ইত্যাদি গড়ে তোলা প্রয়োজন। আয়ের একটা বড় অংশ ভোগ্যবস্তুর চাহিদা মিটাবার কাজে ব্যবহার না-ক'রে উৎপাদন যন্ত্র নির্মাণ করবার কাজে নিয়োজিত করা আবশ্যক। কৃষকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের একটা অংশ যাতে খাদ্যবস্ত্রে ব্যয় না-হয়ে জলসেচ, জমিতে সার, বিদ্যুৎ সরবরাহের আয়োজন ইত্যাদিতে প্রযুক্ত হয় সে-ব্যবস্থা করতে হবে। যে-পরিমাণে এসব কাজের খরচ সরকারকে বহন করতে হবে, সে-পরিমাণে চাষীর আয়ের উপর কর ধার্য করাও আবশ্যক হবে। চাষের ক্ষেত্রে যে-কথা প্রযোজ্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। বর্ধিত আয় যাতে অংশীদারদের মুনাফা এবং মজুরদের মজুরী বাবত ব্যয় হয়ে না যায়, একটা বড় অংশ যাতে শিল্পের প্রসারে খরচ করা হয়, সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সোভিয়েত দেশে একনায়কতন্ত্রের পথে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সেদেশে পুঁজিপতি শ্রেণীকে নির্মূল করা হয়েছে, শ্রমিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত ক'রে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম যুগে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অবনত করা হয়েছে*, চাষীদের জোরজুলুম ক'রে যৌথ খামারে সংঘবদ্ধ ক'রে তাদের উদ্বৃত্ত আয় বাধ্যতামূলকভাবে হস্তগত করা হয়েছে। জনসাধারণের পুঞ্জিত অসন্তোষ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে গণতান্ত্রিক বিরোধিতার অধিকারের অভাবে এবং স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে।

গণতান্ত্রিক সমাজে স্ট্যালিনী পথ অগ্রাহ্য। অথচ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশ-ব্যাপী সহযোগিতা প্রয়োজন। বিরোধী দল যদি কৃষকের উপর কর ধার্য হলেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন**, অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না-রেখে দ্রুত মজুরী বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন, অথবা পুঁজিপতিরা যদি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সহায়তামূলক সম্পর্ক রক্ষা না-করেন, তা হলে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াই সম্ভব। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমা-লোচনারও প্রয়োজন আছে। এ অবস্থায় শাসক দল ও বিরোধী দল উভয়ই যদি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে দলীয় স্বার্থকে সংযত করতে প্রস্তুত থাকেন এবং আপনাপন নীতিতে অবিচলতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রান্তীয় প্রশ্নের উপর বাদপ্রতিবাদ নিবদ্ধ ক'রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন, তবেই সমাজ পরিবর্তনের এই যুগে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার যে-দেশগুলিতে আজ গণতন্ত্রের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সে-দেশগুলিতে অবস্থার জটিলতার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। এদেশগুলির প্রত্যেকটিই ধর্ম, জাতি অথবা ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ব্যক্তির পরিচয় এখানে গোষ্ঠীর পরিচয়ে; ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার চেয়ে সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্যই প্রবল। এ অবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন দলের শক্তিশালী হবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। দলীয় দ্বন্দ্ব এখানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বাহনে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। দেশ বিভাগের আগে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্রমশই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্র-দায়িক বিরোধে পরিণতি লাভ করছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বর্ণ (caste) এবং ভাষার ভিত্তিতে বিরোধ—বিশেষত হিন্দী ভাষাভাষীদের সঙ্গে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের বিরোধ—প্রবল হয়ে উঠেছে। নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা আজ অনেকের কাছেই লজ্জার বিষয়; কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের মুখোশ-পরা সাম্প্রদায়িক কলহে এখনও উৎসাহের অভাব নেই। দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির আপোষ-হীন তিক্ততা সাম্প্রদায়িক বা উপজাতীয় কলহের সঙ্গে যুক্ত হলে গৃহযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের পরিণামস্বরূপ একনায়কতন্ত্রের দিকেই দেশ এগিয়ে যাবে। এ ভয় যুদ্ধোত্তর ব্রহ্ম, মালয়, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ইত্যাদি সকল দেশেই অল্পাবিস্তর বর্তমান।

যিনি গণতান্ত্রিক তিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্য ও কল্যাণের পথ ব্যক্তির নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়; কোনো যাজক গোষ্ঠী বা পেশাদারী দীক্ষাদাতা ব্যক্তির মুক্তি এনে দিতে পারেন না। গণতান্ত্রিক আরও বিশ্বাস করেন যে, পরস্পরবিরোধী আংশিক সত্যের দ্বন্দ্ব ও যোজনার ভিতর দিয়েই বিচিত্র সত্যকে জ্ঞানে ও ব্যবহারে পূর্ণতররূপে লাভ করা যায়। কিন্তু দলীয় বিরোধ যখন ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে উন্মুক্ত করে না, বরং ব্যক্তির মুক্তি ও সামাজিক কল্যাণ উভয়কেই ছদ্মবেশী সাম্প্রদায়িক আনুগত্যে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়, তখন গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে রক্ষা করবার জন্যই বিকল্প বিন্যাসের কথা ভাবতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দলীয় রাজনীতিতেই গণতন্ত্রের চরম বিকাশ, একথা মনে করবার কারণ নেই। বরং দলোত্তর রাজনীতিই গণতন্ত্রের উচ্চতর আদর্শ। সাংস্কৃতিক সংগঠনের অবাধ অধিকার অবশ্য গণতান্ত্রিক সমাজে মৌলিক, এবং যতদিন শাসক দলের রাজনৈতিক সংগঠনের অধিকার স্বীকৃত ততদিন বিরোধী দলের তুলনীয় অধিকারও অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু গণতন্ত্রের মৌল সর্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা, দলীয়তা নয়। দলোত্তর গণতন্ত্রে আজকের দলগুলি নির্বিশেষে বে-সরকারী সমিতি বা "ক্লাবে"র সমপর্যায়ভুক্ত হবে; নির্বাচনকালে প্রতি-দ্বন্দ্বীদের পরিচয় হবে তাঁদের ব্যক্তিগত যোগ্যতায় ও মতামতে; বিধানসভায় তাঁরা স্বীকৃত হবেন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন গণ-প্রতিনিধি হিসাবে, যাঁদের বাগ্-বিতণ্ডা ও যুক্তমন্ত্রণার ভিতর দিয়ে দেশের বিধান প্রণীত হবে। আর এই বিধান অনুযায়ী কার্য নির্বাহ হবে দলনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের সাহায্যে। নির্দলীয় রাজনীতির এই আদর্শ আজ অভিনব, এমন কি কাল্পনিক, মনে হতে পারে; মনে হতে পারে যে, বিধান সভা যেখানে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র সেখানে পরস্পরসম্বদ্ধ কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অসম্ভব। কিন্তু সামাজিক সম্বদ্ধতার ভিত্তি দলীয়তা নয়। পরিবারে, পঞ্চায়তে, পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সভায় যে-নীতি দ্বারা যৌথ জীবন দীর্ঘ-কাল যাবত পরিচালিত হয়ে এসেছে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনায় সে-নীতি কার্যকরী না-হবার কোনো মৌলিক কারণ নেই। আর গণতন্ত্রের এই বিকল্পরূপ প্রতিষ্ঠানগতভাবে স্বীকার করে নিতে যদি বাধা থাকে তা হ'লে অন্তত একথা স্বীকার করতেও কি বাধা আছে?—যে, দলীয় রাজনীতিও সফল হতে পারে শুধু সেই সমাজেই যেখানে গণতন্ত্রের একটি দলোত্তর ঐতিহ্য দলীয় বিরোধকে একটি অনুক্ত মাত্রার ভিতর নিয়ত সংযত রাখছে। যুক্তি, সহনশীলতা এবং সমাজকল্যাণের আদর্শ সমন্বিত গণতন্ত্রের এই দল-নিরপেক্ষ ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করা গণতান্ত্রিকমাত্রেরই কর্তব্য। শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রগতির অন্য রাস্তা নেই।

---

* সোভিয়েত অর্থনীতি বিশারদ অধ্যাপক বার্গসন লিখেছেন :

"The industrial workers with an average money wage could buy 10 p.c. less goods in 1952 than in 1928."

অবশ্য একই সময় বিনামূল্যে প্রাপ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অন্যান্য কোনো কোনো বিষয়ে মজুরদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

** বলা বাহুল্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কর অন্যায় হতে পারে এবং তার বিরোধিতাও প্রয়োজন হতে পারে।

আপনারা রসিক মানুষ, আপনাদের কাছে এবার ধীরে-সুস্থে গল্পটা বলি। অরসিকদের কাছে বলতে গিয়ে খুব এক দফা নাজেহাল হওয়া গেছে। সেই কতকাল আগে বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের এক রত্ন বলে গিয়েছিলেন, বাপুহে, অরসিকের কাছে কদাপি রসের নিবেদন করতে যেয়ো না। বললে কি হবে, সদুপদেশ ক'জনের মনে থাকে? আমি আড্ডাধারী কথক মানুষ, একবার কথা বলবার লোক পেলেই হ'ল—রসিক অরসিক সুবোধ নির্বোধ বিচারের খেয়াল থাকে না। সেজন্যে ভুগতেও হয়। এদিকে গল্প শোনার শখ আছে। শুধু শখ থাকলেই তো হয় না, গল্প শোনার আর্ট জানতে হয়। আপনারা ভাবেন গল্প বলাটাই বুঝি একটা আর্ট, আমি বলি গল্প শোনাও একটা আর্ট।

এই তো দেখুন না, সবে মুখ থেকে বের করেছি—আমাদের সুমিত্রা দেবী—বাস, আর যাবে কোথায়, পাঁচশজন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, এ্যাঁ, কে, কে? কার কথা বললেন, সুমিত্রা গাঙ্গুলী? আমাদের অমুকবাবুর স্ত্রী? বুঝুন এবার, গল্প বলার ফ্যাসাদ দেখুন। আরে বাপু, একটি সুন্দরী রমণীর কথা বলছি—তার আবার পরিচয় কি? যাঁর এতটুকু রসজ্ঞান আছে তিনিই জানেন, সুন্দরী রমণীমাত্রই স্বনামধন্যা, স্বামীর পরিচয়ে তার পরিচয় নয়। নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—এই হ'ল প্রকৃত রসিকজনের কথা। সংসারী মানুষ বলে, কার কন্যা, কার স্ত্রী। আর রসিক মানুষ বলে, তুমি সুন্দরী, সেই তোমার একমাত্র পরিচয়, আর কোন পরিচয় চাইনে। হ্যাঁ অমিট রায়কে বলব রসিক মানুষ। লাবণ্যকে বলেছিল, তুমি অনন্যা, আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।

অবশ্য এত কথার পরেও বাস্তবকে স্বীকার করে নিতেই হয়। স্ত্রীলোকের প্রধান গৌরব অবশ্যই তার রূপ, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপে ভাটা পড়ে। পুরুষের গৌরব তার পদমর্যাদা, সেটা আবার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। যে ছিল মুন্সেফ, সে হয়েছে সবজজ, আর সেদিনের ছোকরা উকীল এখন হয়েছে পাবলিক প্রসিকিউটর। এদিক থেকে পুরুষ নারীকে হার মানিয়েছে। তোমার গরবে গরবিনী আমি—এটি নিশ্চয় বিগত-যৌবনা নারীর উক্তি। তখন স্বামীর পরিচয়েই পরিচয়—ডেপুটিবাবুর স্ত্রী কিম্বা সরকারী উকীলের গিন্নী। অবশ্য রূপসী তোমার রূপে—কথাটা নিতান্তই মিথ্যা। স্বামীর রূপে স্ত্রী রূপসী হয় না। তবে হ্যাঁ, স্বামীর রূপেয়ার জোরে রূপের জৌলুস অর্থাৎ সাজসজ্জার বহরটা বাড়ে বৈকি।

যাক্, এসব তো গেল বাজে কথা। বলে ফেললাম কি, এসব শ্রোতারা ক'এ কেষ্ট দেখেন। যেই না বলেছি সুমিত্রা দেবী অমনি ধরে ফেললেন আমাদের র—গাঙ্গুলীর সুন্দরী স্ত্রীটি। গোল গোল চোখ পাকিয়ে সে কি কৌতূহল, হ্যাঁ হ্যাঁ কি হয়েছে বলুন তো, কেচ্ছাটা শুনি। ওদের যত বলি, আরে না না, উনি নন, ওঁর কথা বলছি না—ওরা ততই বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে হাসে—ভাবটা যেন আমাদের মশাই ফাঁকি দিতে পারলেন না। মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, দেখুন, আমি যখন আমার কাহিনীতে একটি সুন্দরী রমণীকে এনে হাজির করেছি, তখন তিনি অমুক-বাবুর স্ত্রী হতে যাবেন কেন? স্ত্রী যদি হতেই হয় তো আমারই স্ত্রী হবেন। অমন সুন্দরী রমণীটি আমি হাতছাড়া করব কেন? বলা বাহুল্য এ কথায় কোন ফল হয়নি। ওদিক থেকে এরা বেশ সেয়ানা। ভেবেছে নায়িকাটি যদি আমার স্ত্রী হন, তবে কেচ্ছাটা তেমন জমবে না। কারণ আপন স্ত্রীর কেচ্ছা কে আর নিজ মুখে খুলে বলতে যায়।

আমার অভ্যাস তো জানেন—ডালপালা ছড়িয়ে অনেক আজেবাজে কথার ভেজাল মিশিয়ে বলতে না পারলে আমি গল্প বলে আরাম পাইনে। ওদের তাড়া খেয়ে আমার অমন সাধের গল্পটির যা দশা হ'ল, সে আর

কি বলব। ওরা তো শুনতে চায় না। বলে, রাখুন আপনার বাজে কথা, কি হল তাই বলুন। অর্থাৎ আর কিছু বলতে হবে না, ছেঁটেকেটে মোদ্দা কথাটুকু, শুধু কেচ্ছাটুকু বললেই ওরা খুশি। আরো মজা কি জানেন, ওদের কারণ চেনা-জানা মানুষ না হলে কেচ্ছা জমে না। অপরিচিত মানুষের কাহিনী আর কাল্পনিক কাহিনী ওদের মতে এক। আপনারা লিখিয়েরা যে গল্প লেখেন, সেগুলো বানানো কথা কিনা সেজন্যে আপনাদের গল্পে ওদের মন ওঠে না। আমার গল্পের উপর ওদের বিষম ভক্তি। তার কারণ ওরা মনে করে আমি লোকের হাঁড়ির খবর রাখি আর নামধাম বদলে দিয়ে নির্জলা সত্যি ঘটনা গল্প বলে চালিয়ে দিই। রকম দেখে হাসি পায়। আসলে স্ত্রীলোকের গল্প পেলেই এরা মনে করে একটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারী কিছু আছে। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়। যে কাহিনীটা বলছি সেটা খুবই একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এমন ব্যাপার নিত্য ঘটে, কেউ তার খোঁজ রাখে না। মানুষের বাইরের ক্রিয়াকলাপ তো চোখেই দেখি, কিন্তু মনের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে, সে খবর কে রাখে? বসুমতীর পৃষ্ঠদেশে যা ঘটছে, তা সকলেরই দৃষ্টিগোচর, কিন্তু ধরিত্রী দেবীর দেহাভ্যন্তরে যে দারুন কান্ড চলছে, একটা ভূমিকম্প কিম্বা অগ্ন্যুদ্গার না হলে সেটি জানবার কোন উপায় নেই। বিশেষ করে রমণীর মন——

নাঃ থাক্, অতখানি ভূমিকা করতে গেলে আপনাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। অতএব গল্পটা অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। গোড়াতেই সুমিত্রা দেবীর নাম করেছি। নামই যথেষ্ট হাত ধামের প্রয়োজন ছিল না, জাতি-গোত্রেরও নয়—বিশেষ করে উনি যখন পরমাসুন্দরী রমণী। তবু গল্পের খাতিরে আরো কিছু বলে নিতেই হয়। এর স্বামী মৃগাঙ্ক মিত্তির মস্ত পসারওয়ালা উকীল। এককালে মৃগাঙ্কও সুপুরুষ ছিল, এখন বিরাট পুরুষ। পশার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়ি বেড়েছে, টাক পড়েছে। পঞ্চাশ পূর্ণ হতে এখনও দু-তিন বছর বাকী, কিন্তু দেহভার এবং টাকের বিস্তৃতি মিলে বয়স যেন দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। সুমিত্রার হয়েছে উল্টো, ওর বয়স বাড়তেই চায় না। কে বলবে চল্লিশ পার হয়েছে দু-তিন বছর আগে। শরীরের আটসাঁট বাঁধুনি, মুখের লাবণ্য অটুট। এই কিছুদিন আগে খুব ঘটা করে ওর মেয়ের বিয়ে হল। বিয়ের আসরে লোকে চাপা গলায় বলাবলি করছিল—মেয়ে বেশি সুন্দরী কি মা বেশি সুন্দরী বলা শক্ত হে—সাজিয়ে দিলে এঁকেও যে কনে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ওর আপন স্বামীর মুখে এ ধরনের কথা ও হামেসাই শোনে।

সেদিন বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে স্বামী-স্ত্রীতে বেরোবে। মৃগাঙ্ক বললে, জান, তোমাকে সঙ্গে করে বেরোতে আজকাল আমার লজ্জাই করে। সুমিত্রা বললে, কেন? সঙ্গিনী হবার যোগ্য নই বুঝি?

কেন বলব? সবাই মনে করে তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সুমিত্রা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, আহা, তাও যদি দ্বিতীয়পক্ষের মতো একটু আদর সোহাগ পেতাম। উকীলের আদর মক্কেলকে দিয়ে থুয়ে তবে তো। বলতেই মৃগাঙ্ক স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে এমন কান্ড করলে যে, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকেও হার মানতে হয়। আলগা খোঁপা পিঠ ছাপিয়ে নেমে এল, সদ্যকৃত প্রসাধন বিপর্যস্ত হ'ল। সুমিত্রা কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বললে, দেখ তো কি করে দিলে! থাক্, তুমি একলাই যাও, আমি সঙ্গে যাই, তা তো তুমি চাও না। মৃগাঙ্ক হাসতে হাসতে বললে, তুমি কেন আমাকে চটিয়ে দিলে? আমি নাকি আদর করতে জানিনে। সুমিত্রা আরক্ত মুখে হেসে বলল, অনভ্যাসের আদর কিনা, তাই এমন লণ্ডভণ্ড ব্যাপার।

মৃগাঙ্ক আর সুমিত্রা আদর্শ দম্পতি, দুজনেই একে অন্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। আত্মীয়-বন্ধু সকলের ঈর্ষার পাত্র। ধনে মানে কৃতিত্বে কোনদিকে কমতি নেই। সবরকমে সুখী, মেয়েটিকে সুপাত্রে অর্পণ করেছে, একমাত্র ছেলে এই সবে এখানকার সরকারী কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সেই সুমিত্রা কিছুদিন থেকে স্বামীকে বলছে, ওগো, চোখে যে চালশেতে ধরল। খবরের কাগজ পড়া যায় না, চিঠি লিখতে গলদঘর্ম। অবশ্য আসল অসুবিধেটা হয়েছে উপন্যাস পড়ার বাতিক নিয়ে। গল্প উপন্যাস ছাড়া ওর দিন কাটে না। স্বামী কোর্টে, ছেলে কলেজে, মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে—সারা দুপুরে বসে বসে ও কি করে? মৃগাঙ্ক ওর কথা কানেই তোলে না, আসল কথা কাজের ভিড়ে ওর খেয়াল থাকে না। সুমিত্রা স্মরণ করিয়ে দিলে ঠাট্টা করে বলে, ও তোমার মনের ভুল। কোষ্ঠী মিলিয়ে কারো চালশে হয়? তোমাকে দেখলে কে বলবে তোমার তিরিশ পেরিয়েছে। সুমিত্রা এবার সত্যি সত্যি রাগ করে বললে, তোমার রসিকতা এখন রাখ। চোখ নিয়ে আমার সত্যি ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে। আজকেই চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল। মৃগাঙ্ক বুঝতে পারলে, আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না। স্ত্রীলোকের মাথায় একবার যদি কিছু একটা ঢুকল তো গৃহস্থালিতে সেটাই একটা ইমারজেন্সি অবস্থার সৃষ্টি করে। অতএব সেদিন বিকেলেই সুমিত্রাকে নিয়ে চশমার দোকানে হাজির হতে হল। চালশের চশমা ফিট করিয়ে নিতে বিশেষ বিলম্ব হয়নি। সুমিত্রা খুব খুশি। লাইব্রেরী থেকে গল্প, উপন্যাস এসে জমে আছে, কাঁহাতক চোখ রগড়ে রগড়ে পড়া যায়, পড়ে আরামই বা কোথায়? বাড়ি পৌঁছে স্বামীকে বললে, দেখ তো, এইটুকুর জন্যে আজ কতদিন ধরে তোমাকে খোসামোদ করছিলাম।

মৃগাঙ্ক হঠাৎ মুখ-চোখ খুব গম্ভীর করে বললে, তুমি তো বলছ এইটুকু, আসলে অনেকটুকু। এতদিন তোমার কথায় কান দিইনি কেন জান? নিজ হাতে তোমাকে বুড়ি সাজিয়ে দিতে মন সায় দেয়নি। এই চালশে জিনিসটা কি, বার্ধক্যের সূচনা তো? আগেই তো শাশুড়ী হয়ে বসেছ, এখন চালসের চশমা নিলে—বাস্, এবার রিটায়ার কর—বেশ বুঝতে পারছ যে, জীবনের প্রধান অধ্যায় শেষ হয়েছে?

হঠাৎ এ ধরনের কথা সুমিত্রা আশা করেনি। কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। মৃগাঙ্কই বলতে লাগল, আগে তোমাকে দেখে হিংসে হত। বুড়ো হবার বেলায় শুধু আমি, আর তোমার বেলায় অক্ষয় যৌবন। হেসে বলল, তা ভালই হল, সুন্দরী বউ ঘরে রেখে মনে কোনকালে সোয়াস্তি ছিল না। এখন থেকে একটু স্বস্তিতে থাকা যাবে। এবারে একটি গুরুঠাকুর জুটিয়ে যদি মালা জপে বসে যেতে পার তবে একেবারেই নিশ্চিন্দি।

মৃগাঙ্ক কথাগুলো হাল্কা সুরেই বলছিল, কিন্তু সুমিত্রার মনে প্রত্যেকটি কথা যেন কেটে কেটে বসতে লাগল। তাই তো, এত কথা তো সে ভেবে দেখেনি। সত্যি সত্যি তাহলে বার্ধক্য এসে গেছে। কই, ঘরে-বাইরে সবাই যে বলে, গত দশ বছরের মধ্যে আমার চেহারার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। আমার বয়সী আর সব গিন্নীদের কারো বা চুলে পাক ধরেছে, কারো বা কোমরে বাত ধরেছে আর একেক জন মুটিয়ে যা ধুমসি হচ্ছেন। আমার তো এর কোনটাই হয়নি। ওঁর যত সব বাজে কথা। বুড়ো হয়েছি বললেই হ'ল। আর বার্ধক্য কি শুধু শরীরে আসে? মনেও আসে। আমার মনে তো কোথাও এতটুকু ঘুণ ধরেনি।

পুরুষেরা কাজেকর্মে ভুলে থাকে। মেয়েরা, বিশেষ করে এই ধরনের গিন্নীবান্নিরা—যারা একেবারে হাত-পা ঝাড়া, কাজকর্মের বালাই নেই—এদের মনে কেউ যদি একটা কথা ঢুকিয়ে দিল তো সেটা আর কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। আজ কদিন ধরে সুমিত্রার মনে ঐ একটা কথাই নিরন্তর পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। দিনের মধ্যে কতবার যে সে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে। বাজে কথা— বললেই হ'ল বুড়ো হয়েছি............ আয়নায় নিজ মূর্তির দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। ওর হাসির এই বিশেষ ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর দেখতে। ও

বেশ ভালো করেই তা জানে। তাকিয়ে দেখতে দেখতে আপন মনেই হঠাৎ বলে উঠল, হুঁ ইচ্ছে করলে এখনও কত জনের মাথা ঘুরিয়ে—পরমুহূর্তেই নিদারুণ লজ্জায় ওর সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ছি ছি ছি, কি সব ছিষ্টিছাড়া কথা মনে আসছে। মরণ আর কি—খুব করে নিজেকে চোখ রাঙিয়ে দিলে, কসে মনের কান মলে দিল। ফের এমন কথা মনে এনেছ তো—

আপনারা খুব অবাক হচ্ছেন। ভাবছেন, সতী-সাধ্বী স্ত্রী এমন কথা মনে স্থান দেবে কেন? সংস্কার যায় না ম'লে। অত্যন্ত সেকেলে মন বলে অতি সামান্যতেই আমাদের পিলে চমকে ওঠে। নইলে সতী-লক্ষ্মী স্ত্রীলোকরা যে ইস্পাতের তৈরি নয়, একথা আমরা সবাই জানি। রক্ত-মাংসের আস্তরণের মধ্যে মনটা মুহূর্তের জন্যে যদি একটু এদিক-ওদিক করে, তাতে সতীত্ব খোয়া যায় না। ও জিনিসটা অত ঠুনকো নয়। আমি সামান্য মানুষ, আমার কথা তো লোকে মানবে না, অথচ যদ্দুর মনে পড়ছে—হ্যাঁ, বোমা রোলাই হবেন—কোথায় যেন বলেছেন, অতিশয় সাধ্বী যে স্ত্রীলোক, তাঁরও মনের গহনে কোন নিভৃত মুহূর্তে এমন কোন চিন্তার উদয় হতে পারে, যার উচ্চারণ মাত্র তিনি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যাবেন। তেমন দুটো একটা মুহূর্ত সকল স্ত্রীলোকের জীবনেই আসতে পারে। তাতে এমন কি ক্ষতি! একবার গোটা মানুষটাকে জেনে নিলে এক আধ মুহূর্তের মানসিক পদস্খলনে কিছুই যায় আসে না। বরং ঠিকভাবে দেখতে শিখলে এতে রমণীর রমনীয়তা বাড়ে বই কমে না। সমাজের চোখে দোষণীয় বলে এইসব অসতর্ক মুহূর্তের ইতিহাস মেয়েরা কখনো মুখ ফুটে বলে না। রমণীমনের সবচাইতে রমণীয় মুহূর্তগুলি পুরুষের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। কেউ যদি এই অজ্ঞাত মুহূর্তগুলির সন্ধান নিতেন, তবে মানব-মনের সবচাইতে রোমাঞ্চকর ইতিহাস রচিত হ'তে পারত। অবশ্য তেমন তেমন লেখকেরা কল্পনার সাহায্যে সেই অজ্ঞাত ইতিহাসের অনুসন্ধান করেছেন। ফ্রয়েডীয় শাস্ত্রও এ বিষয়ে সাহায্য করেছে। তবে সে শাস্ত্র কতখানি বিজ্ঞানসম্মত, আজ পর্যন্ত তার মীমাংসা হয়নি।

এই আবার বাজে কথা এসে গিয়েছে। একবার প্রশ্রয় দিলে বাজে কথার স্রোতে আসল কথাটা ভেসে যাবে। হ্যাঁ, সুমিত্রা নিজেকে মনে মনে খুব ধমকিয়েছে, কিন্তু বিকেলবেলায় যখন চুল বাঁধতে বসে, তখন আগের চাইতে ঢের বেশি সময় লাগায়। সাজসজ্জায় প্রসাধনে ইদানীং যে অবহেলা এসেছিল সেটি এখন সযত্নে পুষিয়ে নিচ্ছে। সেদিন মৃগাঙ্ক কোর্ট থেকে ফিরেছে। ঘরে ঢুকেই স্ত্রীর দিকে এক নজর তাকিয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি? সুমিত্রা বললে, কই, না তো!

তোমাকে দেখে কেমন যেন মনে হচ্ছিল, বেরোবার জন্যে সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছ।

মুহূর্তের জন্যে সুমিত্রার মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠেছিল, যেন কি একটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বললে, সাজগোজ আবার কোথায় দেখলে। তুমি দেখছি আমাকে বুড়ি-গিন্নী না বানিয়ে ছাড়বে না।

মৃগাঙ্ক বললে, আমি বানাতে যাব কেন। তুমি নিজেই তো বুড়ি-গিন্নী সাজবার জন্যে অস্থির। কই তোমার চালশের চশমাটি গেল কোথায়? ওটা যে বড় পরতে দেখি না!

বাঃ সারাক্ষণ চোখে একটা ঠুলি বেঁধে বসে থাকব নাকি? হেসে বলল, ও তো শুধু তোমার সংসারের হিসেব লিখবার সময় ব্যবহার করি।

আপনাদের কাছে চুপি চুপি বলছি, আসলে সুমিত্রা চশমাটা এখন পারৎপক্ষে ব্যবহারই করছে না। বই পড়া চিঠি লেখার কাজ যতটা সম্ভব চশমা ছাড়াই করছে। নেহাৎ যখন অসুবিধা বোধ করে, তখনই বাধ্য হয়ে চশমাটা চোখে পরে। সুমিত্রা বেশ বুঝতে পেরেছে জীবনটা এতদিন একটা সোজা মসৃণ রাস্তায় চলে চলে এখন একটা মোড়ের মাথায় এসে পৌঁচেছে। এবার যে দিকটায় বাঁক ঘুরবে, শুধু রুক্ষ ধূসর প্রান্তর—এতটুকু শ্যামলতা নেই, রং নেই, সুবাস নেই। জীবনের প্রধান অধ্যায় শেষ হল, এখন শুধু পিছনের দিকে তাকানো, আর বসে বসে অতীতের জাবর কাটা।

একলা ঘরে দুপুরবেলায় বসে বসে সুমিত্রা এসব কথা ভাবছিল। হঠাৎ চমকে দিয়ে দুম্-দাম্ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছেলে মৃণাল হাঁক দিয়ে ডাকলে, মা—ঘরের দোরে এসে যথাসম্ভব চাপা গলায় বললে, মা, শীগগির ওঠো। আমাদের একজন প্রফেসর তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

প্রফেসর? কে, কার কথা বলছিস্? আমি তো তোদের প্রফেসর কাউকে চিনিনে।

ইনি নতুন এসেছেন, তোমাকে চেনেন বললেন।

নাম কি, শুনি।

এই মুশকিল করলে। আমরা কি মাস্টার

মশায়দের নাম জানি নাকি—এস রায়, আমাদের টাইম টেবিলে তো তাই লেখা—

সুমিত্রা নামটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল—এস রায়—সুশীল রায়, সুবোধ রায়, সুধীর রায়—কই আমার চেনা-জানা এমন নাম তো কই মনে পড়ছে না। কি যে তুই ছেলেমানুষ। না বলে-ক'য়ে একেবারে বাড়ি নিয়ে এলি। তা তোকে উনি চিনলেন কি ক'রে শুনি।

অসহিষ্ণু মৃণাল বলে উঠল, আঃ, সে পরে হবে। তুমি এখন তাড়াতাড়ি যাও তো, আমি ও'কে নিচে বসিয়ে রেখে এসেছি। আর শোন, আমার আজ ম্যাচ খেলা আছে, এক্ষুনি বেরোবো। আমার খাবারটাবার ঠিক করে রেখেছ তো?

সুমিত্রা আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেবে গেল। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই যে লোকটি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে বোধ করি ক্ষণিকের জন্যে সুমিত্রার একটু খটকা লেগেছিল। পরমুহূর্তেই বলে উঠল, সুপ্রকাশদা না?

চিনতে পারলে তাহলে?

না চিনবারই কথা। কতকাল দেখা হয়নি ভেবে দেখ তো, বোধ করি কুড়ি বাইশ বছর হবে। তবে তোমার চেহারার খুব বেশি বদল হয়নি দেখছি।

তুমি তো মোটেই বদলাওনি, ঠিক তেমনটি আছ। ভেবেছিলাম গিন্নীবান্নি হয়ে খুব বুঝি জাঁদরেল চেহারা হয়েছে।

সুমিত্রা হেসে বলল, তেমন জাঁদরেল সংসারের গিন্নী হলে চেহারাও জাঁদরেল হ'ত। আমার তো ছোট্ট ঐটুকু সংসার, কাজেই চেহারাটা ঠিক গিন্নীবান্নির মতো হয়নি।

হ্যাঁ, তোমার তো ঐ এক ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে শুনলাম।

এই কয়েক মাস আগে মেয়ের বিয়ে হ'ল। তা তোমার খবর বল দেখি শুনি। এখানে এসেছ কদ্দিন? সরকারী কলেজে চাকরি নিয়েছিলে সেটা যেন শুনেছিলাম। কলকাতায় আমাদের পাড়া ছেড়ে তোমরা চলে গিয়েছ, তাও তো কতকাল হয়ে গেল। আবার যে দেখা হবে ভাবিনি।

সুপ্রকাশ বলল, আজকেই তো তোমার ছেলের সংগে কথা বলতে গিয়ে পরিচয়ের সূত্রটা পাওয়া গেল। মৃগাঙ্কবাবুর নাম করতেই চিনতে পেরেছি।

ও'র সংগে তো তোমার পরিচয় নেই। দেখাসাক্ষাৎ কি কখনো হয়েছে?

সুপ্রকাশ হেসে বলল, তা হয়নি, তবু পাশের বাড়ির জামাই তো, নামটা মনে থাকবারই কথা। [illegible] তোমরা যে এ শহরের বাসিন্দে, তাও জানা ছিল।

চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে সুমিত্রার মুখ ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠল। হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, তুমি একটু বস সুপ্রকাশদা। ছেলের নাকি ম্যাচ খেলা আছে, তার খাবারটা দিয়ে আসি। তোমার জন্যেও চা পাঠাচ্ছি। সুপ্রকাশ বলল, না, আজ আমি উঠি। বাড়ি তো চিনে গেলাম, আরেকদিন আসা যাবে। মৃগাঙ্কবাবুর সংগে এসে আলাপ করে যাব।

সে তো আসবেই। বস তুমি, আমি এই এলাম বলে। কয়েকখানা বই ম্যাগাজিন হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও তুমি ততক্ষণ এইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখ।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সুমিত্রা ভাবছিল, আশ্চর্য, কুড়ি বাইশ বছরের মধ্যে ভুলেও কোনদিন মনে পড়েনি। অথচ এই সুপ্রকাশদার সংগে একবার আমার বিয়ের কথাও হয়েছিল, তবে কথা মাত্রই। একবার উল্লেখ হয়েই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সুপ্রকাশ তখন খুব নাম-ডাকের ছাত্র। বি-এ'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এ পড়ছে। তখনই কথাটা উঠেছিল, কিন্তু সুমিত্রার বাপ-মায়ের পছন্দ হয়নি। সুপ্রকাশের বাবা সামান্য চাকরি করতেন, অবস্থা সচ্ছল ছিল না। আর সেই সময়টাতেই মৃগাঙ্কর সংগে বিয়ের প্রস্তাবটা এল। মৃগাঙ্কদের আবার তেমনি নামডাকের পরিবার। তিন পুরুষের ওকালতি ব্যবসা। বাপ সরকারী উকীল, রায়বাহাদুর খেতাব। ছেলেও দেখতে অতিশয় সুপুরুষ। মৃগাঙ্কর সংগে সুপ্রকাশের তুলনা চলে? বলা বাহুল্য, বাড়িশুদ্ধ লোকের মুখে মৃগাঙ্কদের কথা শুনে শুনে সুমিত্রার মনও ঐ দিকেই ঝুঁকেছিল।

খাবার টেবিলে মৃণাল তখন খেতে বসে গিয়েছে। সুমিত্রা ফিরে আসতেই জিগগেস করল, উনি চলে গেলেন নাকি, মা?

না, যাননি, ও'র জন্যে চা পাঠাচ্ছি।

তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে?

পেরেছি বৈকি। কলকাতায় এক সময় আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকতেন। আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল। তা সে তো কুড়ি একুশ বছর আগের কথা, তবু দেখেই চিনতে পেরেছি।

মৃণাল খুব উৎসাহের সংগে বলে উঠল, জান মা, উনি খুব ভাল পড়ান। ছেলেরা এরই মধ্যে ও'র খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। আর খেলায় খুব ইন্টারেস্ট। রোজ খেলার মাঠে হাজির থাকেন।

তাই নাকি, তাহলে তো তোর মতো উনিও এখন খেলার মাঠের দিকে ছুটবেন।

চাকরকে দিয়ে তাড়াতাড়ি চা খাবার পাঠিয়ে দিল। মৃণাল বললে, তুমি ওখানে [illegible]ও না, উনি একলা বসে আছেন। [illegible]

[illegible]

সুমিত্রা এসে [illegible], ছেলে বলছিল তোমার নাকি খেলা দেখার খুব নেশা। তাই তাড়াতাড়ি চা পাঠিয়ে দিলুম।

হ্যাঁ, খেলা দেখার নেশা আছে বৈকি। চাএ চুমুক দিয়ে বললে, সেজন্যেই তো তোমার খেলোয়াড় ছেলের সংগে অত তাড়াতাড়ি আলাপ হয়ে গেল।

খানিক বাদে মৃণাল খেলার পোশাক প'রে ঘরে এসে ঢুকল। সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, মাস্টারমশায় আমি যাচ্ছি, আপনি তো নিশ্চয় আসচেন মাঠের দিকে।

হ্যাঁ, আসব বৈকি। তুমি এগোও, তোমার দেরি হয়ে যাবে।

খেলার পোশাকে মৃণালকে চমৎকার দেখায়। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ছেলের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা মনে মনে রীতিমতো গর্ববোধ করছিল। সংগে সংগে মেয়ের কথাও মনে হ'ল—তাইতো প্রতিমাকে আজকে চিঠি লেখার কথা ছিল, লেখা হয়নি—প্রতিমা নামেও যেমন, দেখতেও তেমনি। স্নেহে গর্বে সুমিত্রার মন পুলকিত হয়ে উঠল—আমার যেমন আছে, এমন আর কার। ভাবতে ভাবতে একটু বোধ করি অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিল।

সুপ্রকাশের কথায় হঠাৎ চমকে উঠল, আচ্ছা এবার তবে উঠি। পরিপাটি চা খাওয়া হ'ল আর কি চাই।

সুমিত্রা বলল, সে তো হ'ল। আবার করে আসবে বল। কোন খবরই তো জিগগেস করা হল না। বাসা কোন্ দিকটাতে? এর পরে যেদিন আসবে, সেদিন বৌদিকে সংগে নিয়ে আসবে তো? ছেলেপেলে কটি? সবাইকে নিয়ে এসো, বুঝলে?

সুপ্রকাশ খুব এক চোট হেসে নিল, বাবাঃ এক নিঃশ্বাসে কত প্রশ্ন করে ফেললে, কোনটার জবাব দিই? সুপ্রকাশ স্বভাবতই একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সুমিত্রা লক্ষ্য করছিল কথার মাঝে মাঝে ও যখন হাসে, তখন সে হাসিটা বড় বিষণ্ণ দেখায় আর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় চোখে অসীম ক্লান্তি। ঈষৎ হেসে বলল, হ্যাঁ, আবার আসব বৈকি, তবে তোমার বৌদিকে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।

কেন?

খুব সোজা কারণ। বৌদিই নেই।

সুমিত্রা অবাক হয়ে বলল, নেই? তুমি বিয়ে করনি সুপ্রকাশদা? কেন?

বিয়ে না করার খুব যে একটা সঙ্গত কারণ আছে এমন নয়। তবে হ্যাঁ, বলতে পার সাহসে কুলোয়নি।

হুঁ, বিয়ে করতে সাহসে কুলোয়নি এমন কথা আমি কোনকালে শুনিনি। কেমন ধারার পুরুষ মানুষ তুমি?

ঠিক বলেছ। পুরুষ তো নই, কাপুরুষ। এত পরীক্ষা পাশ করলে, এত বিদ্যে এত বুদ্ধি আর এইটুকু সাহস হ'ল না।

সুপ্রকাশ ঈষৎ হেসে বলল, কি করব বল, একটি মেয়ের সঙ্গে একবার বিয়ের কথা হয়েছিল। শুনেছি আমাকে তার পছন্দ হয়নি।

কথাটার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সুমিত্রার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। হাল্কা সুরে কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে বলল, বাজে বোকো না সুপ্রকাশদা। বাঙলাদেশে প্রত্যেক ছেলের অন্তত একশোটা করে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। কত সম্বন্ধ আসে, কত সম্বন্ধ ভাঙে। হেসে বলল, লোকে বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

সুপ্রকাশ বলল, তা কেন, হবার হলে এক কথাতেই হয়ে যায়।

যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক করে পারব না। ওদিকে কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেল। আবার কবে আসচ বল, ও'কে তোমার কথা বলে রাখব।

সুপ্রকাশ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এই যে কোনদিন। তবে তোমার বৌদিকে সঙ্গে আনতে পারব না, সেইটি মনে রেখো। বলে সশব্দে হেসে উঠল।

*　　*　　*

সুপ্রকাশ আজকাল প্রায়ই এ বাড়িতে আসে। এদের সঙ্গে বেশ একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মৃগাঙ্ক থেকে শুরু করে এদের সবারই ওকে বেশ ভাল লেগেছে। মৃণালের তো কথাই নেই—সে মাস্টার মশায়ের বিষম ভক্ত। সেদিন কলেজ থেকে এসে মৃণাল এক নতুন খবর দিলে। জান মা, আমাদের মাস্টারমশায় একজন কবি, নানান পত্রিকায় ও'র কবিতা বেরোয়। এই তো এ সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় ও'র কবিতা বেরিয়েছে। মৃগাঙ্ক উপস্থিত ছিল, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, তাই নাকি? কবিতা পড়বার সময় মৃগাঙ্কর নেই, গল্প উপন্যাসই কালেভদ্রে পড়ে। ওসব কর্তব্য সে স্ত্রীর উপরে ছেড়ে দিয়েছে। সুমিত্রাও শুনে খুব অবাক। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ একজন সুপ্রকাশ রায়ের কবিতা আমি মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় দেখেছি। এ যে আমাদের সুপ্রকাশদা, সে আমার কখনো মনেই হয়নি। আমি গল্প উপন্যাস নিয়েই থাকি, কবিতা পড়ার ঝোঁক তেমন নেই। তা এখন থেকে সুপ্রকাশ রায়ের কবিতা মাঝে মাঝে পড়ে দেখতে হবে।

মৃগাঙ্ক বলল, ওকে দেখলে একটু কবি কবি বলে মনে হয় বটে। মৃণাল চলে গেলে স্ত্রীকে বলল, বিয়ে-থা করেনি কিনা। কবিতা লিখে খেদ মিটাচ্ছে। ইন্‌হিবিশন থেকেই বেশিরভাগ কবিতার জন্ম। পড়ে দেখো নিশ্চয় প্রেমের কবিতা লেখে।

সুমিত্রা হেসে বলল, তুমি কোনকালে কবিতা পড় না; কিন্তু কবিতার জন্মরহস্যটি দেখছি জেনে রেখেছ। হঠাৎ কি ভেবে যে কথাটা বলি বলি করেও এতদিন মৃগাঙ্ককে বলা হয়নি, সে কথাটাই বলে ফেললে। বলল, জান সুপ্রকাশদার সঙ্গে একবার আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তাই নাকি, কই কোনদিন তো বলনি।

বলবার মতো কিছুই নয়। বিয়ের উল্লেখ মাত্র হয়েছিল—বলে সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু মৃগাঙ্ককে বলল। তোমাকে বলব কি, আমিই ভুলে গিয়েছিলাম। একি আজকের কথা, কুড়ি বাইশ বছর হয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, তুমি ভুললে কি হবে, ও কিন্তু ভোলে নি। এখন বেশ বুঝতে পারছি কেন বিয়ে করেনি, আর কেনই বা কবিতা লিখছে। ঠাট্টার সুরে বলল, আহা কতকাল পরে আবার দোঁহাতে দেখা হ'ল। দেখো আবার একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ো না। অবশ্য প্রেমে পড়ার বয়স আর কারোই নেই। বলে হো হো করে হাসতে লাগল।

তোমার ঐ ফৌজদারি আদালতের রসিকতাগুলি এখন ছাড় তো: বলে সুমিত্রা রীতিমতো রাগ করে উঠে চলে গেল।

*　　*　　*

বাতাসের বেগ, জলের স্রোত, আর স্ত্রীলোকের কৌতূহল রোধ করা বড় শক্ত। কবিতায় খুব যে সুমিত্রার রুচি ছিল এমন নয়। তবু সুপ্রকাশের কবিতা পড়ে দেখবার কৌতূহল কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। কি লেখে, কেমন লেখে দেখাই যাক না। সত্যি সত্যি প্রেমের কবিতা লেখে নাকি? অনেক খুঁজেপেতে পাঁচ ছ'টি কবিতা বের করা গেছে, কিন্তু পড়ে সুমিত্রার চক্ষুস্থির। এ আবার কেমন ধারার কবিতা—মিল নেই, ছন্দ নেই, এ তো গদ্যই বলা যেতে পারে। কঠিন কবিতা বলতে আগে বুঝত মাইকেলের কবিতা—বিদঘুটে বিদঘুটে শব্দের ব্যবহার, তবু তার বক্তব্যটা বোঝা যেত। কিন্তু এ বস্তুটা কি? এ তো এক-রকমের ধাঁধা। এক একটি কবিতা বার বার ক'রে পড়েও সে তার মর্মোদ্ধার করতে পারল না। আর মিল নেই বলে পড়েও আরাম নেই।

সুপ্রকাশের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া করবে বলে ও কোমর বেঁধে আছে। দেখা হতেই বলল, তুমি লুকোলে কি হবে, আমরা জেনে ফেলেছি যে, তুমি কবিতা লেখ। সুপ্রকাশ একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দাঁড়াও তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। কবিতাই যদি লেখ তবে সেটা সৌষ্ঠবে শ্রবণে যাতে কবিতা হয় সেটা তো দেখা উচিত। আমি কবিতার মস্ত বড় সমজদার নই, তবু বলব, কবিতাকে তোমরা বড় বেশি আটপৌরে ক'রে তুলেছ। আমার মতে কবিতা হবে অলঙ্কৃতা বনিতা।

সুপ্রকাশ এতক্ষণে বলল, আচ্ছা তবে বলি, শোন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে সুরে তালে মিলে ছন্দে এমন সুডোল কবিতা লিখে গিয়েছেন যে, তাই পড়ে পড়ে তোমাদের রুচিবিকৃতি ঘটেছে। এখন আর ভারি ওজনের জিনিস তোমাদের মুখে রোচে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা পড়ে শোনাতে ভালবাসতেন, কোন কোন কবিতায় সুর লাগিয়ে তিনি গেয়েছেনও। ও'র কবিতা প্রধানত শোনবার জন্যে, পড়বার জন্যে নয়।

সুমিত্রা রেগে উঠে বললে, বাজে বোকো না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝি আমরা পড়ে আরাম পাই না।

উঁহু, নিজে নিজে পড়ে আরাম পাও না, তুমিও আবার অপরকে পড়ে শোনাতে চাও। ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে কেউ নিজেকে ঘুম পাড়ায় না, ওটা অপরকে ঘুম পাড়াবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অতিমাত্রায় ধ্বনি সচেতন। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—আমরা তা চাইনে। আমরা
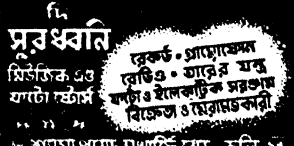
চাই, আমাদের কবিতা মগজের ভিতরে দিয়া মরমে পশে।

বুঝেছি। তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করে বিশেষ ফল হবে না। আমি শুধু বলছিলাম যে, কবিতা জিনিসটা কায়মনোবাক্যে কবিতা হবে। তোমাদের কবিতার কায়া, মনন এবং বাক্য অর্থাৎ ভাষা কোনটাই কবিতার উপযোগী বলে আমার মনে হয় না। যাক্, একটা কথা একেবারেই বুঝতে পারিনে, মিল ছন্দের বালাই তোমরা তুলে দিলে কেন?

সুপ্রকাশ বলল, ও তোমার ভুল ধারণা। মিল ছন্দ আমাদের কবিতায়ও আছে, তবে একটু ঢিলে গোছের। সময়ে রুচি বদলায়। এককালে আমাদের মেয়েরা খুব এ'টে কপাল উ'চিয়ে চুল বাঁধত। সেটা একালের পছন্দ অনুযায়ী ছিল। এখন আমাদের মেয়েরা আল্‌গা খোঁপা বাঁধে, সেই আমাদের বেশ লাগে। আধুনিক কবিতা ঠিক সেইরকম, মিল ছন্দের সেই বজ্র আঁটুনি আর নেই। আমাদের কবিতার খোঁপাটা আমরা খুব ঢিলে ক'রে বাঁধছি কিম্বা মোটে বাঁধছি-ই না, আল্‌গা চুল এলিয়ে দিচ্ছি।

সুমিত্রা হেসে বলল, কথাটা খুব কায়দা ক'রে বলেছ। দুঃখের বিষয়, আমি তোমার বি এ ক্লাশের ছাত্রী নই যে, তোমার সব কথাই বিনা বাক্যে মেনে নেব। তবু তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করছি এও কবিতা লেখার একটা ধরন। কিন্তু আমি বলব, অ-মিল কবিতা লেখার অধিকার তারই, মিল এর উপরে যার সচ্ছন্দ এবং নিঃসন্দেহ অধিকার আছে। নইলে তোমাদের এই 'মেড্-ইজি' প্রণালীতে লেখা কবিতাকে আমি কবিতা ব'লে স্বীকার করতে রাজি নই।

সুপ্রকাশ বলল, অর্থাৎ আমি যথার্থই কবি কিনা সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে। তাল মাত্রা বজায় রেখে মিল দিয়ে কবিতা লিখে তবে সেটি সপ্রমাণ করতে হবে। তথাস্তু, যথা আজ্ঞা তব, ব'লে সুপ্রকাশ সেদিনের মত বিদায় নিলে।

এর কিছুদিন পরে কবি সুপ্রকাশ রায়ের একটি কবিতা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল। সুমিত্রা জানত যে, সুপ্রকাশ অবিলম্বে তার কবিত্বের প্রমাণ জাহির করবে। দেখে সত্যি অবাক হ'ল যে, এ কবিতার চলন বলন আলাদা। ছন্দটা একটু নতুন ধরনের, তাহ'লেও পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় না, ভাষাটাও খুব দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে না। তবু কবিতা পাঠে অপেক্ষাকৃত অনভ্যস্ত বলেই প্রথম বারে মানেটা অস্পষ্ট ঠেকেছে, দ্বিতীয় বারে অর্থটা স্পষ্টতর হ'ল আর তৃতীয় বার পড়তে গিয়ে সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। বুঝতে বাকি থাকে না কবিতাটি একটি অতিশয় ভীরু প্রেমিকের ততোধিক ভীরু প্রণয় নিবেদন। তালে মিলে ছন্দে কবিতা লিখে সুমিত্রার কাছেই উপস্থিত করা হয়েছে সে তো সুস্পষ্ট কিন্তু এই নিবেদনটি কার কাছে? ভয়ে সুমিত্রার বুক কে'পে কে'পে উঠতে লাগল। চোরের মতো আরেক বার কবিতাটির উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পত্রিকাটি কতকগুলো বই-এর তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিলে। পাছে মৃগাঙ্ক বা আর কারো চোখে পড়ে যায়, এই ভয়।

দু'দিন পরে স্বয়ং কবি এসে যখন খবর পাঠাল তখন ওর সমুখে হাজির হতে সুমিত্রার কেমন বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। সঙ্কোচকে প্রশ্রয় দিলেই বাড়ে। জোর করে মন থেকে সঙ্কোচটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুমিত্রা এসে ঘরে ঢুকল। খুব সহজভাবে হেসে বলল, এই যে কবিবর, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ।

সুপ্রকাশও হেসে বলল, তাহ'লে তোমার দরবারে আমি কবি বলে সাব্যস্ত হয়েছি। ভুল করেছি, গোড়াতে একটা পুরস্কার দাবি করে রাখা উচিত ছিল।

কথাটা কোন্ দিকে আবার মোড় নেয় এই ভয়ে সুমিত্রা আগের মতোই সহজভাবে বলল, আবার কি পুরস্কার চাই, কবিকে কবি বলে স্বীকার করাই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। হ্যাঁ, এই তো দিব্যি সুন্দর মিষ্টি কবিতা লিখতে পার। মিছিমিছি কেন ছন্দছাড়া লক্ষ্মীছাড়া কবিতা লিখছিলে।

লক্ষ্মীছাড়া জিনিসের প্রতি তোমাদের মমতা বেশি এই ভেবেই লক্ষ্মীছাড়া কবিতা লিখতুম। আসলে দেখছি লক্ষ্মীমন্তর দিকেই তোমাদের ঝোঁক।

কথাগুলো বে'কে বে'কে কেবলই ওর দিকে ধাওয়া করছে। সুমিত্রা ওর কথাকে সোজাসুজি আমল না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বললে, ছন্দটা কিন্তু বেশ হয়েছে। একটু নতুন ধরনের মনে হ'ল। জানিনে, আমি আজকালের কবিতা বেশি পড়িনি তো, এরকম হয়তো আরো লেখা হয়েছে।

সুপ্রকাশ বললে, না না এ ছন্দ একেবারেই আমার নিজের আবিষ্কার। তোমাদের মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করে অমর হয়েছেন। আমার এই ছন্দের জোরে কবি মহলে আমারও আসন পাকা হবে।

সুমিত্রা হেসে বললে, মাইকেলের মতো তুমিও তাহ'লে অমর না হয়ে ছাড়বে না।

সত্যি বলতে কি, ওরকম অমর হতে আমি চাইনে। বারোয়ারী মনে ঠাঁই লাভের লোভ আমার নেই। তার চাইতে বরং এক আধ-জনের মনে—

কথাটা চাপা দেবার জন্যে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তা বেশ, তোমার ছন্দটা কি শুনি।

বলব? কিছু মনে কোরো না। ছন্দটার নাম দিয়েছি সুমিত্রাক্ষর ছন্দ।

সুমিত্রা পলকের জন্যে চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিলে। কেউ আর কথা বলছে না। নীরবতাটা অত্যন্ত লজ্জাকর হয়ে উঠতে পারে ভেবে সুমিত্রাই যতটা সম্ভব সহজ সুরে বললে, বোসো, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসছি। দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে এল। ও যেন নিজের কাছ থেকেই নিজে পালাতে চায়। চাকরকে চা করতে বলে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে একটা কিসের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। সেটাকে আনন্দের শিহরণ বলে স্বীকার করতে সে কিছুতেই রাজি নয়। পাছে বেয়াড়া মনটা সেরকম কিছু কবুল করে বসে এইজন্যে মনকে সে শাসাচ্ছে। চা, জলখাবার চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিয়ে সে ওখানটাতেই বসে রইল। মনের ভেতরটা এমন এলোমেলো হয়ে আছে, তাকে শান্ত সংযত করতে কতক্ষণ লেগে গিয়েছে, তার খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বসবার ঘরে ঢুকে দেখে অতিথি চলে গিয়েছে। চা-এর পাত্রটি শূন্য, কিন্তু খাবারের প্লেট যেমন ছিল, তেমনি পড়ে আছে। বোধ করি তার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে একা একাই চা খেয়ে সুপ্রকাশ চলে গিয়েছে।

সুমিত্রা আপন মনে বলে উঠল, ভালই হয়েছে। খুব একটা সঙ্কট-মুহূর্তে নিজের মনকে সংযত রেখেছে ভেবে নিজেকে সে বাহবা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মন যেন তাতে সায় দিল না। জীবনে অন্তত একটি দিন কোনো একজন কবি তার স্তুতি গান করেছে সে স্তুতির মূল্য সে দেয়নি, কবিকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই কৃপণতা করে কী তার লাভ হ'ল। কেন, একটু মুখের হাসিতে কিম্বা চোখের চাউনিতে, ভাবে কিম্বা আভাসে কবিকে যদি সে পুরস্কৃত করত, তবে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। এমন শুভ মুহূর্ত জীবনে ক'দিন আসে? নিজের অজান্তে বুক থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

* * *

এই তো গল্প। দেখলেন তো এমন কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। কিন্তু যেই না গল্প শেষ করা অমনি আমার সেই শ্রোতারা চারদিক থেকে একেবারে ছে'কে ধরল। হ্যাঁ মশায়, গোড়ায় তো বললেন না, এখন বলুন না ভদ্রমহিলা কে? আজে-বাজে কথা বলে কোন রকমে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছি। আসল কথাটা এখন আপনাদের কাছে বলছি। ওদের কাছে বললেও ওরা বিশ্বাস করত না। এই ক'দিন আগে আমার স্ত্রী চালশের চশমা নিলেন। একটার পর একটা কাঁচ বদলে বদলে চশমা ফিট করাতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। আমি বসে বসে তাই দেখছিলাম আর এমনি একটা গল্পের ছায়া আমার মনে এসেছিল।

# ইংরেজী ব্যক্তিত্ব

রঞ্জন
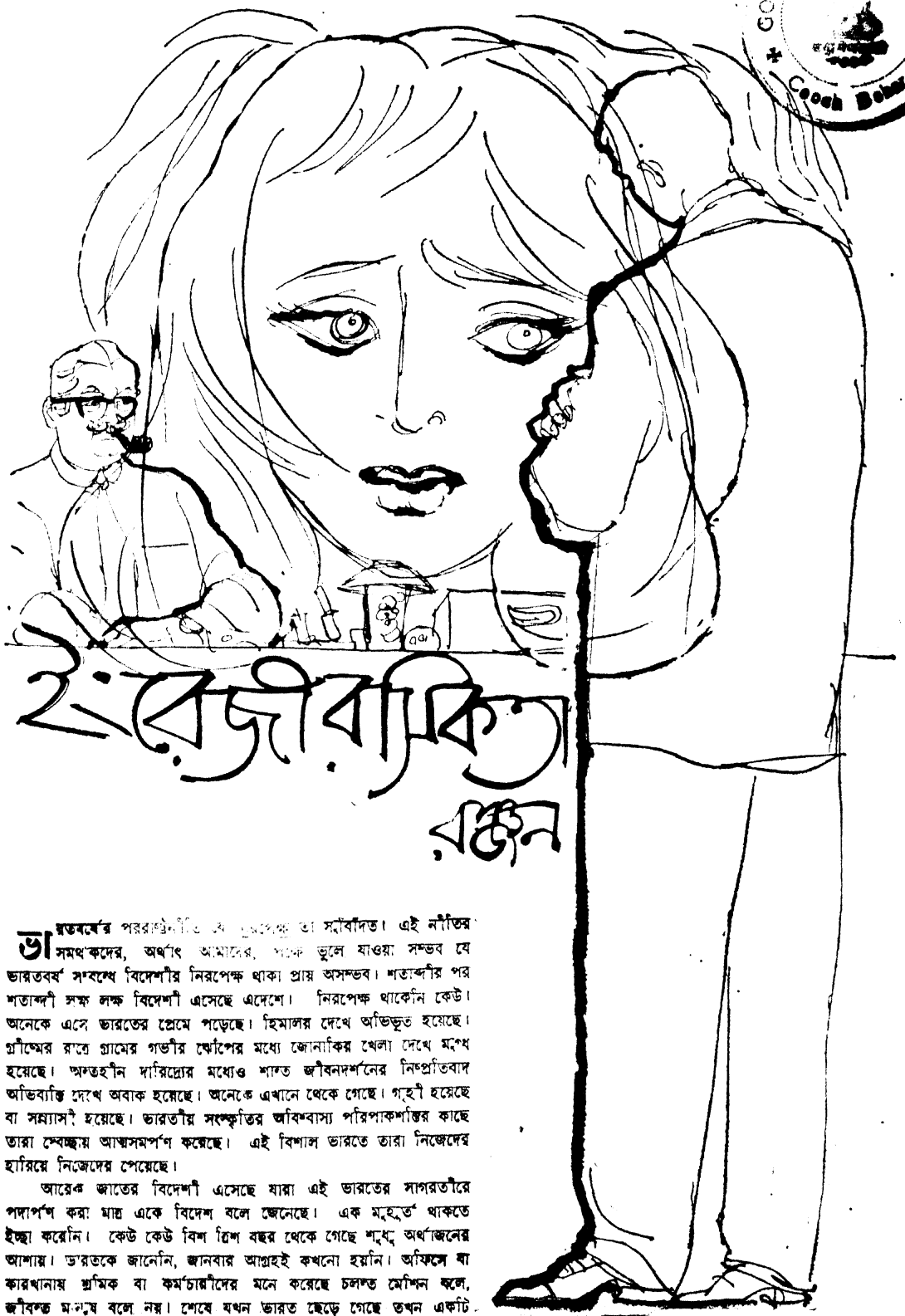
ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি যে নিরপেক্ষ তা সর্ববিদিত। এই নীতির সমর্থকদের, অর্থাৎ আমাদের, পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীর নিরপেক্ষ থাকা প্রায় অসম্ভব। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ বিদেশী এসেছে এদেশে। নিরপেক্ষ থাকেনি কেউ। অনেকে এসে ভারতের প্রেমে পড়েছে। হিমালয় দেখে অভিভূত হয়েছে। গ্রীষ্মের রাত্রে গ্রামের গভীর ঝোপের মধ্যে জোনাকির খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছে। অন্তহীন দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্ত জীবনদর্শনের নিষ্প্রতিবাদ অভিব্যক্তি দেখে অবাক হয়েছে। অনেকে এখানে থেকে গেছে। গৃহী হয়েছে বা সন্ন্যাসী হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অবিশ্বাস্য পরিপাকশক্তির কাছে তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। এই বিশাল ভারতে তারা নিজেদের হারিয়ে নিজেদের পেয়েছে।

আরেক জাতের বিদেশী এসেছে যারা এই ভারতের সাগরতীরে পদার্পণ করা মাত্র একে বিদেশ বলে জেনেছে। এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা করেনি। কেউ কেউ বিশ ত্রিশ বছর থেকে গেছে শুধু অর্থার্জনের আশায়। ভারতকে জানেনি, জানবার আগ্রহই কখনো হয়নি। অফিসে বা কারখানায় শ্রমিক বা কর্মচারীদের মনে করেছে চলন্ত মেশিন বলে, জীবন্ত মানুষ বলে নয়। শেষে যখন ভারত ছেড়ে গেছে তখন একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়েনি এদেশের জন্য, এদেশের কারো জন্য। বোম্বাই থেকে

জাহাজে ওঠা মাত্র মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে দেশের ছবি, স্কটল্যান্ডের কোনো গ্রাম বা ম্যাঞ্চেস্টারের কোনো গীর্জা। গত ত্রিশ বছর? দীর্ঘ একটা দুঃস্বপ্ন।

টম জনসন—যে সেদিন দমদম থেকে প্লেনে করে চিরদিনের জন্য ভারত থেকে এবং আরেকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে—এদেশে এসেছিল একটা পুরোনো ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসে সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। দ্বিতীয় যে শ্রেণীর বিদেশীর উল্লেখ করেছি তাদের দেখে টম শিউরে উঠেছিল। শুধু টাকার জন্য একটা দেশে বাস করব, কাজ করব, ত্রিশ বছর ধরে? অথচ একদিনের জন্যও দেশটাকে আপন বলে ভাবব না? দরকার নেই তার টাকায়। তার দেশে এখন নেই বেকার সমস্যা। সে ফিরে যাবে। ভারতবর্ষের দোষ নয়, তার দোষ নয়। দুজনে মিলল না। এই সিদ্ধান্তে টম পৌঁছোল কলকাতায় আসবার তিন মাস পরে।

অথচ কণ্ট্রাক্ট তার তিন বছরের।

একদিন সুযোগ বুঝে টম কথাটা তুলল তার বড়ো সাহেব সার কেনেথ উইলিয়ামসের সঙ্গে। সার কেনেথ কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, "ও কিছু নয়। তোমার বয়সে একটু হোমসিক হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দেখবে দুদিনে সয়ে যাবে। তখন তুমিই আমাকে এসে বলবে, ছুটিতেও দেশে যেতে ইচ্ছে নেই।"

টম ছাড়ল না, "কিন্তু আমার এদেশ ভালো লাগছে না সার।"

"দাঁড়াও, তোমাকে আমি স্যাটারডে ক্লাবের মেম্বার করে দেব। সুইমিং ক্লাবে যাও নিশ্চয়ই।"

"যাই মাঝে মাঝে। কিন্তু—"

"কাম, কাম, বি এ ম্যান।"

এমন পার্টিতে যা হয়ে থাকে, আলোচনা অসমাপ্ত রইল। দুজনে ছিটকে পড়ল হলের দুই প্রান্তে। তারপর যার সঙ্গেই দেখা হয় একই কথা।

"উঃ, কী ভীষণ গরম, তাই না?"

অবশ্যম্ভাবী উত্তর, "হ্যাঁ, কিন্তু হীট নয়, এই হিউমিডিটাই অসহ্য।" কথাটা শুনতে শুনতে টমের কান ক্লান্ত হয়ে গেছে।

মিসেস স্মিথ বলে এক স্থূলাঙ্গিনী বর্ষীয়সী মহিলা ছোট মেয়ের মতো হাসতে হাসতে তাঁর কোনো পরিচিতের কানে কানে বলছিলেন, "জানো, জন কোম্পানির বিলু সেদিন কী কান্ড করেছে?"

"টেল মি, প্লীজ!"

"ছি ছি, সেদিন একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে গেছে সুইমিং ক্লাবে। আমি তো অবাক!"

"নতুন এসেছে বুঝি এদেশে?"

"হবে। তবে ছাড়া পাবে না। আমি বলে দিয়েছি ওর বড়ো সাহেবকে।"

"ভেরি রাইটলি টু।"

টম হলের আরেক দিকে চলে গেল এই রকমের গসিপ এড়াতে। বৃথা যাওয়া, বৃথা আশা।

"আই সে, জর্জকে দেখেছে কেউ সম্প্রতি? জর্জ ম্যাকনীল?"

"না তো!"

"আমি অবশ্য বাজে গুজবে কান দিইনে, কিন্তু কে যেন সেদিন বলছিল জর্জকে নাকি ঘন ঘন ফ্রী স্কুল স্ট্রিট অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে।" তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ কাশি। প্রতিবেশিনীর মূর্চ্ছার অভিনয়। টম এ রাস্তার নামও শোনেনি। এই রসিকতার অর্থ বুঝেছিল সে অনেক দিন পরে।

আরো একমাস কেটে গেল অফিসের কাজে আর সন্ধ্যার নিঃসঙ্গতায়। অবাঞ্ছিত অবস্থান মনের মধ্যে জমিয়ে তুলল অভিমান, যেমন নিজের উপর তেমনি এই দেশটার উপর।

নিরুপায় হয়ে টম আবার বড়ো সাহেবের কাছে হাজির হোলো।

"গুড মর্নিং, সার।"

"গুড মর্নিং, টম।"

"আমি সত্যি আর পারছি না। আমি হোমসিক নই। দেশে আমার কেউ নেই বললেই চলে। বাবা যুদ্ধে মারা গেছে, মা বিয়ে করেছে আরেকজনকে। একমাত্র ভাই ক্যানাডায়। আমি আসলে ইন্ডিয়াসিক।"

"কিছুদিন পরেই মনসুন ভাঙবে। তখন এত খারাপ লাগবে না। নইলে দার্জিলিং যেতে পারো দিন দশেকের জন্য।"

"প্রশ্নটা আবহাওয়ার নয়। গরমে আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে—"

"যেমন হচ্ছে?"

"সব কিছুতে। এভরিথিং সীমস সো আটারলি আটারলি রটন্ ইন দিস কান্ট্রি। সো ডিমরালাইজিং। আমার এসব বলা উচিত নয়। এদেশটার আমি কতটুকুই বা জানি? কিন্তু এই চার মাসে আমার জানবার কৌতূহল পর্যন্ত জন্মাল না। ওই যে গেটে স্টুলের উপর বসে বসে দরওয়ানটা ঝিমোচ্ছে, কাউন্টারের পিছনে বসে বাবুরা পান চিবোচ্ছে আর বাঙলায় কী বলছে ওরাই জানে, এ কোন সভ্য দেশে অফিসে সম্ভব? এই পরিবেশে থেকে আমি কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। আমার ইংরেজ সহকর্মীরাও কি স্বদেশে তেমন ফাঁকি দিতে সাহস করত যেমন এখানে দেয়? যা বলছিলুম, ডিমরালাইজিং। মরা জানোয়ারের মাংসও রেফ্রিজারেটরে না রাখলে পচে যায়। আমি জীবন্ত, আর ঈশ্বর জানেন এ দেশটা আর যাই হোক রেফ্রিজারেটর নয়। আমি বলছি আপনাকে আমি পচে যাচ্ছি। আর কিছুদিন এদেশে থাকলে আমি মানুষই থাকব না। ওই বাবুদের মতো কুঁড়ে হয়ে যাব, ওদেরই মতো মিথ্যা কথা বলতে শিখব। তখন না পারব দেশে ফিরে যেতে না পারব মানুষ হয়ে এখানে থাকতে। আমাকে এই অধঃপতন থেকে আপনি রক্ষা করুন।"

টমের উত্তেজনা সার কেনেথের কাছে একান্তই অতিকৃত, প্রায় অস্বাভাবিক, বলে মনে হোলো। কই, তিনি নিজে তো এদেশে আছেন বাইশ বছর হতে চলল। অসুবিধা কিছু কিছু আছে বৈকি কিন্তু পুরস্কারও কি নেই? এমন কি মন্দ দেশ এই ভারতবর্ষ? বিলেতে কেনেথ উইলিয়ামসকে কে চিনত? এখানে তিনি বড়ো সাহেব। নামের আগে একটা হ্যান্ডল্ এবং ব্যাঙ্কে মোটা টাকা নিয়ে দেশে ফিরবেন। তখন তিনি স্বদেশেও পূজিত হবেন। কেরীয়ার গড়বার এমন সুযোগ তাঁর দেশের ছেলেরা আজকাল নিতে চাইছে না কেন? সার কেনেথের মনে সন্দেহ রইলা না, ওয়েলফেয়ার স্টেটের এই ছেলেরা অকর্মণ্য। ফুল এমপ্লয়মেন্ট এদের মাথা খেয়েছে।

কিন্তু সার কেনেথের মেলা কাজ। টম জনসনের কাঁদুনি শোনবার তাঁর সময় নেই। তিনি কিঞ্চিৎ রূঢ়তার সঙ্গেই বললেন, "আই অ্যাম সরি, টম; তোমার জন্যে কিছু করতে পারি বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমি ফিরে যেতে চাই।"

"আর তো বছর আড়াই মাত্র। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"আমি অতদিন থাকতে চাইনে। আমি এ চাকরি চাইনে।"

"তোমার কণ্ট্রাক্টটা আরেকবার ভালো করে পড়ে দেখো। ইট উইল বি এ ভেরি একসপেনসিভ বিজনেস টু রিজাইন নাউ। ফিরে যাবার খরচা শুধু নয়, আসবার খরচা এবং অন্যান্য খরচা তোমাকে তাহলে রিফান্ড করতে হবে।"

"যদি বলি আমার শরীর ভালো নেই?"

"ডাক্তারকে দিয়ে তা বলানো শক্ত হবে।"

"যদি আমি ভালো করে কাজ না করি?"

"তাহলে খুলনা বা নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়ে দেব। সেখানে আড়াই বছর কাটানোর চেয়ে কলকাতাই কি ভালো নয়?"

"যদি—"

"আমার আর সময় নেই, টম। চেম্বারে একটা মীটিঙে যেতে হবে দশ মিনিট পরে।"

ধন্যবাদ দিয়ে টম আপন ঘরে ফিরে এলো। গত চার মাস সে ভারতে আসার মতো নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিয়েছে। এখন তার নৈরাশ্য সম্পূর্ণ হোলো। আগামী ত্রিশ বত্রিশ মাস তার এই কলকাতায় কাটাতে হবে। প্রতিদিন এই সহরের সহস্র কুশ্রীতা উত্তরোত্তর দুঃসহ হয়ে উঠবে। তবু উপায় নেই। একবার একটা চুক্তিতে সই করেছে বলে জীবনের তিনটে বছর এই কলকাতার [illegible]

থাকতে হবে। যে দেশটাকে শুধু ভালো লাগেনি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করতে হবে। কাজে মন থাকবে না তাই কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ ঘটবেই। হয়তো শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হবে অকর্মণ্যের অপবাদ নিয়ে। টম হাতে মাথা রেখে ভবিষ্যৎ আড়াইটে বছরের শাস্তির কথা ভাবতে লাগল। দুপুরে যখন অফিসের লাঞ্চরুমে খেতে গেল তখন নিজেকে আরো বেশি একাকী মনে হোলো। ঘরে ফিরে এসেও কোনো কাজ করতে পারল না। দু'চারটে দস্তখত ছাড়া। প্রায় যখন পোনে পাঁচটা বাজে তখন তার ঘরে এলো মিস ডরিস লোপেজ।

"আপনি যে কাল বলেছিলেন লণ্ডন অফিসের জন্য ওই রিপোর্টটা আপনি আজ ডিক্টেট করবেন?"

"একদম মনে ছিল না। বসুন।"

ডরিস বসে রইল। টমের মাথায় কিছু আসছিল না। কাজে মন ছিল না বলেই বোধহয় টম এই প্রথম ডরিসের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। না, এ তো একটা ডিক্টাফোন আর টাইপরাইটারের সমন্বয় মাত্র নয়।

রঙ ফ্যাকাশে শাদা নয়, অলিভের মতো। উজ্জ্বল। চোখ দুটো কালো, টানাটানা। চুল ছাঁটা কিছুটা অড্রে হেপবার্নের মতো। মুখের ছেলেমানুষী ভাবটাও ওই অভিনেত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোশাকের পারিপাট্যে পাশ্চাত্ত্য রুচির পরিচয় আছে, কিন্তু দেহে আছে প্রাচ্য লাবণ্যের কমনীয় ব্যাপ্তি। সত্যি করে কোনো পর্তুগীজ জলদস্যু এসে ডরিসের পরিবার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল কিনা আজ তা বিস্মৃত অতীতে হারিয়ে গেছে। টমের ঐতিহাসিক গবেষণায় আগ্রহ ছিল না। কিন্তু লোপেজ নামটি মনে করে টম ভুলে যাওয়া জলদস্যুর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

ডরিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল টমের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে। হাতের ছোট খাতাটা আর পেন্সিলটা নাড়ছিল আস্তে। রঙ-করা লম্বা নখগুলি ওর লম্বা আঙুল-গুলির উপর আদৌ হিংস্র মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ কিছু না ভেবে টম বলল, "রিপোর্ট কাল হবে।"

ডরিস উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হোলো। দরজার কাছে গেলে টম বলল, "একটু ঘুরে দাঁড়ান তো।"

অনুরোধ ডরিস রক্ষা করল কিছু না ভেবেই। সে কিছু বলতে পারবার আগেই টম বলল, "য়ু আর লুকিং ভেরি চার্মিং টু-ডে।"

"থ্যাংক য়ু, মিস্টার জনসন।"

"কল মি টম।"

ডরিস অবাক হয়ে গেল। এই সুদর্শন মধ্যবয়স্ক যুবক সহজেই অফিসের সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওরা নিজেদের মধ্যে টমকে নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে। সে আলোচনায় ডরিস সাধারণত যোগ দেয়নি। সে রিয়ালিস্ট। তার বন্ধু ডেভিড ডি'সুজা ট্রামওয়েজে কাজ করে। আকাশে হাত বাড়িয়ে সে নিরাশ হবে না। সে জানে সে সুন্দরী হলেও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাই টম যে অফিসের কোনো মেয়েকে কোনো দিন ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি তা আর যারই মনোবেদনার কারণ হোক ডরিস তা নিয়ে ক্ষোভ করেনি। কিন্তু আজ টমের কী হলো?

টম বলল, "আজ সন্ধ্যায় আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তবে—"

ডরিসের দেখা করবার কথা ছিল ডেভিডের

সঙ্গে। তারপর ওদের ছবি দেখতে যাবার কথা টাইগারে। কিন্তু সে কথা মনে আসবার আগেই টম বলল, "—তবে আজ আসুন না কোনো একটা চায়ের দোকানে। আমি কোয়ালিটিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করব সাড়ে সাতটায়। প্লীজ, ডোণ্ট সে নো। আমি ভয়ানক একা।"

টমকে সত্যি বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। বিষণ্ণতার কারণ যে ডরিস নয় তা ডরিসের মনে হবার কথা নয়। সে রাজী না হয়ে পারল না।

বাড়ি ফিরেই ডরিস মাকে জিজ্ঞাসা করল তার নতুন ফ্রকটা ধোবা দিয়ে গেছে কিনা।

"আজ তো দেবার কথা নয়।"

"কিন্তু আজই আমার চাই যে!"

মা একটু বিস্মিত হলেন ডরিসের আচরণে। বুড়ীর একমাত্র নির্ভর এই মেয়ে। ১৯৪৬-৪৭-এ যখন ওদের চেনাশোনা অনেকে ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছিল তখন ডরিসের মার ভয়ের অন্ত ছিল না। ও চলে গেলে তাঁর উপায় হবে কী? ডরিস যায়নি এবং ডেভিডের সঙ্গে বন্ধুত্বে তিনি খুশি হয়েছেন এই কথা ভেবে যে তাহলে ডরিস আর বিলেত যাবার কথা ভাববে না, মাকে ছেড়ে যাবে না। আজ আবার নতুন কোনো বিপদের সূচনা হচ্ছে না তো?

"মামি, তুমি রহিমকে বলো না একটু ধোবার কাছে যেতে!"

ডরিস নিজেই রহিমকে ডেকে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে সাতটার মধ্যে জামা নিয়ে ফিরতে বলল। তারপর অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে অন্য একজোড়া জুতো পরিষ্কার করতে বসল। বাথটাবে জল ভর্তি করল। নতুন সাবান বের করল। গুণ গুণ করে কি একটা ছবির গানের সুর গাইতে লাগল।

"মা, আমি আজ অফিসের টম জনসনের সঙ্গে বেরোচ্ছি। ডেভিড এলে বলে দিয়ো ছবিতে আরেকদিন যাওয়া যাবে।"

মা টম জনসনের কথা এর আগে শুনেছিলেন। তবু সব কিছু অত্যন্ত বিস্ময়কর ঠেকল। মা বললেন, "অফিসের কাজ কি?"

"না, অন্তত টম জনসন নিজে তা নিশ্চয়ই মনে করছেন না। তিনি ভাবছেন, অফিসের ফিরিঙ্গী মেয়ে একটা। দোষ কী তাকে নিয়ে একটু খেতে? খরচাও বেশি নেই, কেননা আমাকে নিয়ে তো ফারপোয় বা গ্র্যাণ্ডে যাওয়া যাবে না। বড়ো জোর পার্ক, টেম্পলবার বা আইসাইয়া। কোনো শনিবার বিকালে হয়তো অলিম্পিয়া। কোনো রবিবার সকালে হয়তো শেরি বা শেরবাজাদ—যদি আগে থেকে জানা যায় যে সার কেনেথ বা উপরের কেউ ওখানে সেদিন যাচ্ছেন না। কিন্তু টম জনসন, জানেন না, আমি সে সবের মেয়ে নই। আমি বাবুদের বরদাস্ত করতে পারিনে বটে, কিন্তু সাহেবদের জন্য আমার সময় অল্প। পায়ে ধরে প্রেম হয় না।"

ডরিসের মার কাছে এর সব কথা স্পষ্ট মনে হোলো না। হয়তো ভয়ও হোলো, টম জনসনের সঙ্গে অবিনীত ব্যবহার করলে চাকরিটা থাকবে কিনা। না থাকলে তাঁর নিজেরই বা কী অবস্থা হবে? তিনি জীবনে অনেক দেখেছেন, শিখেছেন ধৈর্যধারণ। অনেক সময় সব চেয়ে ভালো করণীয় কিছু না করা। সব চেয়ে ভালো বক্তব্য কিছু না বলা।

পরে রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় ডরিস যখন মার হাতে পাঁচটি একশো টাকার নোট এনে দিল তখনও মা কিছু বললেন না। বার্ধক্যের অশান্তি অনেক। শান্তি এই যে অনাবশ্যক চাঞ্চল্য মনকে পীড়িত করে না। মা নোটগুলি বালিশের তলায় রেখে আবার ঘুমুতে লাগলেন। তিনি জানতেন মন্দ কিছু হচ্ছে না, হলে তা এমন মন্দ যার উপর তাঁর হাত নেই।

ডরিস মাত্র একুশ থেকে বাইশে পদার্পণ করেছে কি করেনি। সে সারারাত ভাবল, এ কী জুয়া খেলল সে? জিতলে সেটা কেমন জয় হবে? হারলে সে পরাজয় তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

পরদিন সকালে টম যখন অফিসে এলো তখন সাড়ে ন'টাও বাজেনি। কোট খুলবার আগেই শব্দ হোলো টেলিফোনে—ক্রিং ক্রিং...

টম যখন তার বড়ো সাহেবের ঘরে প্রবেশ করল তখন ঘরটাই শুধু ঠান্ডা ছিল, তার অধিকারীর মেজাজ নয়। টম যে "সুপ্রভাত" বলেছিল তার উত্তরে সে পেয়েছিল শুধু "প্রভাত।" সার কেনেথ অযথা ব্যাকাব্যয় না করে সেদিনকার "স্টেটসম্যান" কাগজটা প্রায় ছুঁড়ে দিলেন টমের মুখের উপর। লাল কালিতে দাগ দেয়া জায়গাটায় দেখা গেল।

**ENGAGEMENTS**

JOHNSON-LOPEZ: The engagement is announced between Thomas Wilfrid Johnson, son of the Rev. Peter Jones Johnson of Nottinghamshire, and Doris Diana Lopez, daughter of the late Mr. Alfred K. Lopez and Mrs. Lopez formerly of the Bengal Nagpur Railway, Khargpur, now in Chowringhee Lane, Cal. The marriage will take place on a date to be announced later.

বলা বাহুল্য, টম জনসনের বা ডরিসের অজ্ঞাতে এ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। তবু টম এমন একটা মুখের ভাব করল যেন এই-মাত্র বজ্রপাত হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা নয়, বিজ্ঞাপনের কারণটা।

সার কেনেথ ঘরের একদিক থেকে আরেক-দিকে পায়চারি করছিলেন। বাগ্‌দত্ত পুরুষের মতো নয়, মাতৃসদনে অপেক্ষামান স্বামীর মতো প্রায়। সিগারেটটা ছাইদানে পিষে তিনি বললেন, "অন্তত একটা ভারতীয় মেয়েও কি জুটল না তোমার?"

"আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, সার।"

"বেশ, বুঝিয়ে বলছি। আমরা প্রথম কনট্রাক্টে বিয়ে করতে কাউকে উৎসাহ দিই না।"

"বুঝেছি, কিন্তু আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, এটা আমার শেষ কণ্ট্রাক্ট।"

"আই শুড থিংক ইট ইজ! আই অ্যাশিওর য়ু ইট ইজ। কিন্তু তাই বলে একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে?"

"তা ঠিক, আমি নিজেও কখনো ভাবতে পারিনি। অথচ কাল যখন ওর সঙ্গে দেখা হোলো তখন—"

"ও সব রোমাণ্টিক ননসেন্সের জন্য আমার সময় নেই। তোমার পক্ষে সব চাইতে অনারেবল কাজ এখন হবে কাজ ছেড়ে দেয়া।"

টম এই দরাদরির জন্য প্রস্তুত ছিল। সে বলল, "আমার কণ্ট্রাক্টে আছে যে আমি এখানে পৌঁছোবার এক বছরের মধ্যে বিয়ে করতে পারব না। ডরিস রাজী হয়েছে, সে পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।"

"ডরিস রাজী হয়েছে, অ্যাজ ইফ দ্যাট মেকস দি স্লাইটেস্ট ডিফারেন্স টু ম্যান অর বীস্ট!"

"প্লীজ, সার—"

"আই অ্যাম সরি। আমি কোনো মহিলা সম্বন্ধে অপমানসূচক কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু এখনই তো সবাই জানবে যে আমার এক ইংরেজ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এক ফিরিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে! শেম!"

"আই অ্যাম সরি, সার। কিন্তু—"

"কিন্তু কিছু নেই আর। তুমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে আমারই বাধ্য হয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।"

টমের হৃদয় এতে ভেঙে পড়ার কথা নয়। সে বলল, "এই কোম্পানি ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে কিন্তু এ ছাড়া যদি অন্য উপায় না থাকে তবে আমি কোম্পানিকে অযথা বিব্রত করতে চাই না নিশ্চয়ই।"

"বিব্রত যা করবার তা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে, থ্যাংক য়ু।"

"আমি দুঃখিত।"

"আমার শতাংশ সহস্রাংশও দুঃখিত যদি তুমি হয়ে থাকো তবে তুমি আমার কথা শুনবে। এ মেয়েটিকে আজই বলো তুমি ভুল করেছ, তুমি ভালো করে না ভেবে বিয়ের প্রস্তাব করেছ, তার বিজ্ঞাপন দিয়েছ। এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা এতে অভ্যস্ত।

ইংরেজ মেয়েদের মতো ওরা সেন্টিমেন্টাল নয়। দু'দিন পরে দেখবে, ডরিস ওই চৌরঙ্গী লেনেরই কোনো ছোকরার সঙ্গে কোথাও জিটারবাগ নাচছে। তোমার কথা মনেও নেই।"

"ডরিসের চরিত্র সম্বন্ধে এসব মন্তব্য আমার মনঃপূত না হলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আশা করি।"

"ডরিস কে তাও আমি জানিনে। মহারানী ভিক্টোরিয়া হয়তো তাঁকে মাথায় তুলে রাখতেন। আমি ভাবছি তোমার ভবিষ্যতের কথা। তুমি ওকে ত্যাগ করো। কালই স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দাও যে এনগেজমেন্ট ভেঙে গেছে।" কণ্ঠে ক্ষমাসুন্দর উদারতার স্বর এনে সার কেনেথ যোগ করলেন, "তাহলে আমি পুরোপুরি ভুলে যাব যে তুমি এই মারাত্মক ভুল করতে বসেছিলে। হেড অফিসকেও কিছু জানাবার দরকার নেই। যদি তাইতে তোমার সুবিধা হয় তাহলে তোমাকে কয়েকদিনের জন্য ছুটিও দিতে পারি। দার্জিলিং ঘুরে এসো, আবার কাজে মন দাও।"

"ছুটি আমিও চাইব ভাবছিলাম। ডরিসকে নিয়ে আমি কয়েকদিনের জন্য শিলং যাব ভাবছি।"

"শিলং ডরিসকে নিয়ে?" সার কেনেথ প্রায় রাগে ফেটে পড়লেন। এমনিতেই ভদ্রলোকের ব্লাড প্রেশার বেশি। "তুমি তাহলে তোমার কেরীয়ারের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর?"

"ডরিসকে না পেলে আমি কোনো কাজ উপযুক্তভাবে করতে পারব না।"

"ডোণ্ট ট্রাই দ্যাট ডিউক অব উইণ্ডসর স্টাফ্ অন মি, টম।"

টম কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে নিরুপায়।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। সুয়েজ বন্ধ থাকায় প্যাসেজ পাওয়া শক্ত হোলো তিন মাসের আগে। এই তিন মাস কী হবে? টম আর ডরিস রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সারা বিশ্বকে জানাবে যে, সার কেনেথের ফার্মে এই অনাচার হয়েছে। হতেই পারে না। তিনি টেলিফোন করলেন দু' তিনটে এয়ার লাইনের অফিসে। কোম্পানি জাহাজের ভাড়ার বেশি দেবে না। অন্তত দেবার নিয়ম নেই। সার কেনেথ স্থির করলেন, তিনি হেড অফিসে স্পেশ্যাল কেস করবেন। আসল দোষ তো ওদেরই যে এমন অব্যবস্থিতচিত্ত যুবককে ওরা কলকাতা পাঠিয়েছে। না হলে তিনি নিজে বেশি খরচাটা দিয়ে দেবেন। তবু তাঁর কোম্পানির—ও নিজের— এ কলঙ্ক তিনি সহ্য করবেন না যে, টম জনসন একটা ফিরিঙ্গি মেয়েকে তার ভাবী বধূ বলে সব জায়গায় পরিচয় করিয়ে দেবে। আর জনুজনের পরিচয় তো কোম্পানির পরিচয়।

অনেক চেষ্টা ক'রেও সার কেনেথ টমকে তৎক্ষণাৎ স্বদেশে ফিরিয়ে পাঠাবার পথ পেলেন না। (একবার তাঁর এমনও মনে হোলো যে, বৃটেনের পক্ষে মিশর আক্রমণ সত্যি ভুল হয়েছে—অন্তত এই টমের জন্য!) স্থির হোলো, টম জনসন পরদিন থেকে আর অফিসে আসবে না। পাঁচটা এয়ার লাইনে বলা রইল একটা সীট খালি পেলেই সেটা টম জনসনকে দেবে। তার আগের দিনগুলি? সার কেনেথের আশঙ্কার সীমা রইল না।

এবার তিনি ভয় দেখাবার পথ পরিহার ক'রে উপদেষ্টার ভূমিকা চেষ্টা করলেন, "শোনো টম, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তোমার কণ্ট্রাক্ট শেষ ক'রে দিতে বাধ্য হচ্ছি।"

"না, না, পুরো দায়িত্ব আমার। দোষ হলে তাও।"

"তোমার বয়সে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। আমি বুঝি। আমাকে সংরক্ষণশীল ও নীতিবাগীশ বুড়ো ব'লে ভুল করো না। তোমার স্ত্রীকে তুমি দেশে নিয়ে গেলে খুব বেশি সামাজিক অসুবিধা না হতেও পারে। অন্তত আমি আশা করি হবে না। কিন্তু এখানে তা চলে না। তোমাকে আমি চলে যেতে বলছি শুধু অফিসের কথা ভেবে নয়। তোমার নিজের জন্যও। এখানে পদে পদে তোমাকে অপমান সহ্য করতে হবে এই বিয়ের জন্য। একদিন হয়তো মনে হবে, প্রেমের জন্য এই মূল্য বড়ো বেশি হয়ে গেছে: আর সামাজিক সম্প্রীতি পেতে হলে তোমাকে নীচে নামতে হবে।"

সার কেনেথের এই নতুন ভূমিকার কৌতুকের পরিমাণ কম ছিল না। কিন্তু টম ভক্তিভরে তাঁর উপদেশামৃত পান করছিল, কেননা, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কেন মিছে তর্ক করা? আবার দম নিয়ে সার কেনেথ বললেন, "আই হ্যাভ এ সারপ্রাইজ ফর য়ু।"

"তাই নাকি?"

"প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের আইন অনুযায়ী কোম্পানির দেয়া অংশ তোমার পাওনা নয়, কিন্তু আমি ট্রাস্টিদের বলব, ওটা তোমাকে দিয়ে দিতে। আর টিকেট এবং তিন মাসের মাইনে।"

"আমি আপনার কাছে সত্যি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

"নট অ্যাট অল, টম, থিংক নাথিং অব ইট। শুধু একটা অনুরোধ করব।"

"নিশ্চয়ই।"

"প্যাসেজ না পাওয়া পর্যন্ত খুব বেশি বেরুবে না, বিশেষ করে তোমার বাগ্‌দত্তাকে নিয়ে। আমি বলি কি, তোমরা বাইরে কোথাও চলে যাও। এয়ার লাইন থেকে খবর পেলেই আমি তোমায় টেলিফোন করব।"

"এ সম্বন্ধে অবশ্য আমি ডরিসকে জিগ্যেস না করে আপনাকে কথা দিতে পারছি না। কিন্তু আপনার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখব।"

"ওয়েল। আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। কোম্পানি তোমার প্রতি অন্যায় কিছু করেনি। আমি নিশ্চয় জানি, তুমিও কোম্পানির কোনো ক্ষতি করবে না।"

"নিশ্চয় না।"

তিন মাস নয়, প্রায় সাড়ে তিন মাস লেগে গেল প্যাসেজ পেতে। নানা রঙের এই দিনগুলি টম ও ডরিসের কেটেছে শিলঙে, দার্জিলিঙে, কিছু কলকাতায়। ওরা হেঁটে গিয়েছিল গ্যাংটক। তখন ডরিসের সেবা করেছে টম, পায়ের জন্য গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করেছে নিজে হাতে। পায়ে ব্যথা নিয়েও পরদিন সকালে ডরিস টমের জন্য শুধু কফি করেনি, রুটি ও টোস্ট করে দিয়েছে।

টম পাদ্রীর ছেলে। কিন্তু তার সহজ পরিহাস যে কোনো "পরিস্থিতি" অনায়াসে সহজ করে দিত। অন্তরঙ্গতা বাদেও যে দু'জন এত কাছে আসবে ডরিস তা ভাবতেও পারেনি।

একদিন জলাপাহাড়ে দাঁড়িয়ে টম ডরিসকে বলল, "আমি ওই এভারেস্টের নাম বদলে

মাউণ্ট ডরিস রাখলুম।" তার আগে এর নাম এলিজাবেথ রাখবার কথা হয়েছিল। টম ডরিসকে সাম্রাজ্ঞী করল।

এই রকমের অতিশয়োক্তিতে ডরিস হাসত, খুশিও হত। ভাবত, সবটা হয়তো পরিহাস নয়। তবু বলত, "তুমি হাসাতেও পারো, টম!"

"ইংরেজ জাতটাকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে তার সেন্স অব হিউমর। আর কী আছে আজ ইংল্যাণ্ডের? কিচ্ছু না।"

কলকাতায় ফিরে এসে টম অফিসের চাম্মারিতে উঠল না। তার আগেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল জায়গাটা। উঠল একটা হোটেলে। ডরিস দীর্ঘ ছুটি নিয়েছিল। সারাদিন থাকত টমের হোটেলে। টেলিফোন যখন বেজে উঠল তখন ডরিস টমের পাশে বসে।

"হ্যালো!"

"স্পীক হিয়ার টু সার কেনেথ, প্লীজ!" টম সোজা হয়ে বসল।

"টম, এইমাত্র আমাদের ট্র্যাভেল এজেণ্ট টেলিফোন করেছিল। কাল রাত এগারোটায় একটা ফ্লাইট আছে। কলকাতার একটা বুকিং কে ক্যানসেল করেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে যে, আমরা ওটা নিতে রাজী। তোমার নিশ্চয়ই সব কিছু প্রস্তুত?"

"কালই?"

"আই অ্যাম এফ্রেড সো। আমি তাহলে ওদের বলে দিচ্ছি। তুমি আজই বিকেলে গিয়ে টিকেট নিয়ে আসবে ওদের অফিস থেকে। ওয়েল, গুড লাক অ্যাণ্ড গুড বাই!"

"গুড বাই, সার!"

ডরিস সার কেনেথের কথা শোনেনি। কিন্তু তার জানতে বাকি ছিল না কে টেলি-ফোন করেছে, কেন, এবং সে কী বলেছে। টমের ঘাড়ের উপর থেকে তার অবশ হাতটা যেন আপনি পড়ে গেল। টম তার দিকে তাকিয়েছিল। ডরিসের সাহস ছিল না টমের দিকে তাকাবার।

কেউ কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে টম উঠে জামা-কাপড় পরতে লাগল। ডরিস কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও টম অপরাধীর মতো জবাবদিহি করতে লাগল। প্রথমে তার যেতে হবে একবার "স্টেটসম্যান" অফিসে। তারপর, টিকিট আর নাইটব্যাগ তুলে নিতে হবে ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস থেকে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়। ডরিস কি অপেক্ষা করবে টম ফিরে না আসা পর্যন্ত? না কি সে ডরিসকে নামিয়ে দিয়ে যাবে চৌরঙ্গী লেনে?

টমের দিকে না তাকিয়ে ডরিস বলল, "কিন্তু চৌরঙ্গী লেন তো তোমার পথে পড়ে, না, টম!"

টমের বুঝতে বাকি ছিল না, ডরিসের দৃশ্যত সামান্য উক্তির তাৎপর্য একাধিক। সে চুপ করে রইল।

ডরিস বলল, "তুমি যাও। আমি এখন উঠতে পারব না।" সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল। টম রাত্রের চোরের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ফিরে এসে টম অনেকবার বলল, এক সঙ্গে বেরুবার জন্য। ফারপোয় না গ্র্যাণ্ডে। না কি থ্রী হানড্রেডে যাবে একবার শেষবারের মতো? না, ডরিসের মত বদলানো গেল না কিছুতেই। সেই রাত্রে প্রায় বারোটার সময় টম ডরিসকে পৌঁছে দিল চৌরঙ্গী লেনে।

বিদায়ের আগে ডরিস প্রতিশ্রুতি দিল, পরদিন রাত্রে সে দমদম যাবে না। টমের অফিসের তিন চারজন বন্ধু হয়তো যাবে তাকে তুলে দিতে। ডরিস সেখানে বিব্রত বোধ করতে পারে। ডরিসের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তার কানের একেবারে কাছে এসে টম অতি আন্তরিক কণ্ঠে বলল, "এবং তুমি যেখানে বিব্রত বোধ করতে পারো, এমন সামান্যতম সম্ভাবনাও যেখানে আছে, সেখানে তোমাকে যেতে বলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে।"

ডরিস আবার কথা দিল, দমদম সে যাবে না।

কিন্তু তার পরেও অনেকগুলি অন্তহীন ঘণ্টা যে অবশিষ্ট ছিল। টমের সারাদিন কাটল নানা জায়গায় বিদায় নিতে। এখানে ওখানে দুয়েকটা ক্লাবের বিল শুধতে। ডরিসের রাত কেটেছে নিদ্রাহীন ক্রন্দনে। দিন প্রায় কাটতে চায় না ক্রন্দনহীন ব্যথার ভারে।

সন্ধ্যার দিকে ডেভিড এলো। সে জানত সব ইতিহাস, সব মানে যতটুকু আর সবাই জানত। কিন্তু ডরিসের মার জন্য মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে আসত খবর নিতে। ভুলেও কখনো ডরিসের নাম করত না। জানত, ডরিসের মাও মেয়ের খবর অল্পই জানতেন।

ডরিস ডেভিডের সঙ্গে এখন কীভাবে কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। ডেভিডকে সে তো প্রায় ভুলে গেছে। তার স্কুটারটা বাড়ির সামনেই ছিল। হঠাৎ বলল, "তোমার স্কুটার কেমন চলছে?"

"ফাইন, ফাইন, ডরিস। চড়ে দেখবে একবার?"

ডরিস কিছু না বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল স্নানের ঘরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে এসে বলল, "চলো আজ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে দূরে, অনেক দূরে।"

অনুগত ডেভিড হাতে চাঁদ পেল। ওরা যখন গিয়ে দমদম পৌঁছোল তখন রাত দশটার কাছাকাছি। বিমান বন্দরের উপরের আকাশে ম্লান চাঁদ উদাসীন, বিষণ্ণ, ক্লান্ত। ডরিস দূর থেকে দেখল, টম বারের কাছে তিনজন বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে। টম সত্যি সুদর্শন। কিন্তু ডরিস তাকে দেখা না দিয়ে ডেভিডের হাত ধরে কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। ডেভিড অর্ডার দিল একটা বীয়ারের, একটা শেরির।

বন্ধুপরিবৃত টমের পরিহাসপটুত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বোধ হয় দেখা গিয়েছিল সেদিন রাত্রে দমদমে। সে নিজে না হেসে বন্ধুদের হাসাচ্ছিল আরো বেশি।

একজন জিজ্ঞাসা করছিল, "তারপর লেডি উইলিয়ামস কী বলল?"

"কী আর বলবেন? আশা প্রকাশ করলেন আমার বিবাহিত জীবন যেন সুখের হয়। যদিও কথাটা এমনভাবে বলেছিলেন যেন কারো শ্রাদ্ধবাসরে বক্তৃতা দিচ্ছেন।"

হা—হা—হা।

"হিয়ার ইজ ওয়ান ফর করাচি!"

"বাট টেল আস, টম, ডরিস কবে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে জয়ন করছে?"

"কে?"

"ডরিসই নাম নয়? তোমার বাগদত্তা?"

"ও ইয়েস, শী ইজ এ ভেরি ফাইন গার্ল, ভেরি ফাইন।"

"হিয়ারস ওয়ান ফর বেইরুট!"

"যাক, কাল সকালে যখন সবাই জানবে তখন বলেই ফেলি তোমাদের। সার কেনেথ যাতে আমাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন সেই জন্যই এই এনগেজমেণ্টের ঘোষণা।" পকেটে হাত দিয়ে টম একটা কাগজের টুকরো বের করে এক বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, "কালকের কাগজে এটা দেখতে পাবে। প্রথম ঘোষণা বেরিয়েছিল ডরিসের সম্মতি নিয়ে, এটাও তাই বেরুবে। আই মাস্ট সে শী স্যার্টেনলি কেপ্ট হার পার্ট অব দি ডীল টু দি লাস্ট।"

বিজ্ঞাপনটা ছোট।

**NOTICE**

The engagement is cancelled and the marriage will not take place between Thomas Wilfrid Johnson of Nottinghamshire and Doris Diana Lopez of Chowringhee Lane, Cal.

হঠাৎ লাউডস্পীকারে ঘোষিত হোলো প্লেনের আসন্ন বিদায়ের কথা। এখনই কাস্টমস ছাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি টম তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেল কাস্টমস ঘরের দিকে। জিনিসপত্র সেখানে আগেই জড়ো ছিল। ঘরে ঢুকবার আগে অর্ধসমাপ্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সেটাকে টম জুতোর তলায় সজোরে পিষে নিবিয়ে দিল। একবার ফিরেও তাকাল না কোনো দিকে, সোজা গিয়ে উঠল প্লেনে।

প্লেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে ডরিস উঠল। দমদম আর কলকাতার মধ্যে দূরত্ব যে এত বৃহৎ তা সে সেদিন সন্ধ্যায়ও বুঝতে পারেনি যেমন এখন বুঝল।

**ছিন্নপত্র** রবীন্দ্রনাথের অতি সুপরিচিত গ্রন্থ; ১৩১৯ সালে উহা প্রকাশিত হয়। এই পত্রগুলির অধিকাংশ হইতেছে 'সাধনা' যুগের রচনা অর্থাৎ ১২৯৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০২ কার্তিক (১৮৯২-১৮৯৫) পর্যন্ত চারিটি বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির স্বর্ণময় যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; এই পর্বের মধ্যে সাধনার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার ছোট গল্পগুলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া সর্বশ্রেণীর সমালোচকদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশী বৎসর জীবনের ষাট বৎসরের মধ্যে ৯০টি গল্প লেখেন। তন্মধ্যে সাধনার এই চার বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন ৩৮টি। সুতরাং সাধনার পর্বটিকে ছোটো গল্পের পর্ব বলা যাইতে পারে। কিন্তু গল্পই তাঁহার একমাত্র সাহিত্যসৃষ্টি নহে; গল্প ছাড়া সোনার তরী ও চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ, গোড়ায় গলদ ও ব্যঙ্গ কৌতুক, পঞ্চভূতের কাল্পনিক ডায়ারি ও য়ুরোপযাত্রীর বাস্তবিক ডায়ারি, বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ কথা, নানা শ্রেণীর গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি রচনা-সম্ভারে এই পর্বটি পূর্ণ; এমন নিবিড় সাহিত্য-সমারোহ সচরাচর চোখে পড়ে না। এইসব রচনার সহিত বাংলা দেশের সমসাময়িক শিক্ষিত পাঠকের পরিচয় ঘটে, রচনার রসাস্বাদ প্রত্যক্ষভাবেই উহাদের গোচরীভূত হয়। কিন্তু কবি-জীবনের নিঃসঙ্গমানসের অধিকৃত ও নিখুঁত চিত্রের সন্ধান তাঁহারা পান নাই—সেইটি পাইয়াছিল পরবর্তী যুগের পাঠকরা; তাঁহার আকরগ্রন্থ হইতেছে 'ছিন্নপত্র'।

সাধনা বন্ধ হইয়া যাইবার বারো বৎসর পরে বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রমানসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল ঐ গ্রন্থের দুইটি প্রবন্ধ হইতে—জলপথে (পৃঃ ২৮০—৩০৬) ও স্থলে (পৃঃ ৩০৭—৩১৩)। কিন্তু সে রচনার পটভূমি তখন অজ্ঞাত ছিল। কাহাকে লিখিত, কেন লিখিত, কোথা হইতে রচনাগুলি গৃহীত ও সংকলিত তাহার কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই; এইভাবে আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

অতঃপর ১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র নামে গ্রন্থ প্রকাশিত* হইলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকরা কবির মানস-জীবনের এক নবতর সত্তার সন্ধান পাইল। এই সময়েই কবির 'জীবনস্মৃতি'ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই দুইখানি গ্রন্থ যুগপৎ প্রকাশন আমাদের মতে বিশেষ অর্থপূর্ণ। আমাদের মতে 'ছিন্নপত্র' জীবনস্মৃতিরই অনুক্রমণ বা পরিশিষ্ট। জীবনস্মৃতি যেখানে আসিয়া থামিয়াছে, ছিন্নপত্র যেন তাহারই পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জীবনস্মৃতিতে কবি 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত আসিয়া আর

* ছিন্নপত্র-প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিলাইদহ, নদীয়া। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে মুদ্রিত ১৩১৯ বৈশাখ। পৃঃ ২৩৩। আমাদের ব্যবহৃত সংস্করণ ১৩৩৫, ভাদ্র মাসে মুদ্রিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৯।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

শিলাইদহের প্রজাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

অগ্রসর হন নাই; ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে 'মানসী' হইতে তাঁহার কাব্য স্বকীয়তা বা সৃষ্টিধর্মী হইয়াছে। ইহার পূর্বের যুগ প্রস্তুতির পর্ব, সেইটুকু মাত্র জীবনস্মৃতির বিষয়। কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ অব্দে। কবির বয়স তখন ২৫ বৎসর। ছিন্নপত্রের প্রথম পত্র ১৮৮৫-র অক্টোবরে লেখা ও শেষ পত্র লেখা ১৮৯৫-র ডিসেম্বরে। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত লিখিবার পর জীবনস্মৃতি যে তিনি আর লিখিবেন না, তাহার কারণ এই পর্ব হইতে তাঁহার পত্রধারার মধ্যে তিনি আত্মকথা বলিতে শুরু করেন; মানসী-পর্বের অনেকগুলি চিঠি প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি অনেককে লেখা। 'ছিন্নপত্র' সম্পাদনকালে সেগুলি যদি কবির হস্তগত হইত তবে তিনি নিশ্চয়ই এই গ্রন্থ মধ্যে তাহাদের সন্নিবেশিত করিতেন এবং আমরা 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্যন্ত পর্বের একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন জীবনভাষ্য পাইতাম; তবুও আমরা ছিন্নপত্রে তাঁহার কড়ি ও কোমল-উত্তর দশ বৎসরের জীবনেতিহাসের যে উপাদান পাইয়াছি, তাহা প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের আর্টিস্ট ও ক্রিটিক সত্তার যুগ্মরূপ এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রকট। রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের ও কর্মজীবনের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ উপাদান জীবনীকারের পক্ষে অপরিহার্য সম্পদ হইয়াছে।

জীবনস্মৃতির সূচনাংশে কবি লিখিয়াছিলেন, "এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার পরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই, মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়াছে, তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।"

ছিন্নপত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। দশ বৎসর নানা স্থানে, নানা অবস্থায় যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, যাহা পড়িয়াছেন, যাহা ভাবিয়াছেন তাহারই সংগ্রহালয় যেন এই পত্রগুচ্ছ। তাহার মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ভাবরূপে ফুটিয়াছে, তাহাকে সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য জ্ঞানে চয়ন করিয়াছেন—সেগুলিকে কাটিয়া-কুটিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন; আমরা সেইজন্য বলিয়াছি যে ছিন্নপত্র জীবনস্মৃতির পরিশিষ্ট পরবর্তী দশ বৎসরের আত্মকথা—স্মৃতিকথা নহে।

১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র যখন প্রকাশিত হয়, তখন পত্রগুলি কাহাকে লেখা, তাহা কোথাও বিবৃত হয় নাই। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনী লইয়া গবেষণাদি করিলেন, তাঁহাদের পক্ষেই এইসব তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ছিন্নপত্রের মুদ্রিত সংস্করণের (১৩৩৫-এর সং) প্রথম আটখানি পত্র (২৭ পৃষ্ঠা) লিখিত হয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। তারপর ২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, ১২৯৪ আশ্বিন হইতে ১৩০২ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কালের মধ্যে পত্রগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত; ১৪ বৎসর হইতে ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইন্দিরা দেবী এই পত্রগুলি পান। এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রথম পাঁচ বৎসরে (১২৯২-৯৭) লিখিত পত্র ছিন্নপত্রের ৭৪ পৃষ্ঠা ও সাধনা পর্বের (১২৯৮-১৩০২) চারি বৎসরে ২৪৪ পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। সেইজন্য আমাদের মতে এই পত্রগুলি সাধনার যুগের সৃষ্টিরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নাম দেন 'ছিন্নপত্র'; আমরা বলিব ইহা কবির কড়চা বা রোজনামচা বা ডায়ারি—পত্রাকারে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের বিরাট গদ্য-সাহিত্যের একটা বড় অংশ হইতেছে তাঁহার পত্রধারা। আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত হইতে লিখিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' হইতে আরম্ভ করিয়া সত্তর বৎসর বয়সে লিখিত 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত বিরাট পত্রসাহিত্য তাঁহার গদ্য-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশ। ইহারা নামেমাত্র পত্র বা চিঠি; কারণ এইসব ক্ষেত্রে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি অনেক সময়েই গৌণ—সম্মুখে মনের মতো কেহ নাই—যাহার সহিত ভাববিনিময় বা নিজের ভাবনারাজি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন—তাহার অভাবে গরহাজিরা বন্ধু, আত্মীয়, শিষ্যের নিকট মনের কথা বলিয়া যাইতেছেন; কিন্তু সেসব রচনা পাবলিকের উদ্দেশে লিখিত অর্থাৎ পত্রগুলি সদ্য সদ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্যই রচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধাকারে মতামত ব্যক্ত না করিয়া পত্রাকারে অনেক সময়ে নিজ মতামত কেন লিখিতেন, তাহার কারণ নানা স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯১২ সালে বিলাত হইতে যে পত্রধারা লিখিয়াছিলেন, তাহা সদ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; সেই হইতে এই ধারার প্রবর্তন।

কিন্তু আমাদের আলোচ্যপর্বের পত্রধারা রচনাকালে কবির মনে সদ্য সেসব প্রকাশনের কোন ভাবনা ছিল না; কেবলমাত্র মনের কথা ব্যক্ত করিবার আনন্দেই সেগুলি লিখিত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, দিনের পর দিন পত্র লিখিতেছেন, ডায়ারির মতো; অথচ ঠিক যে ডায়ারি, তাও বলিতে পারা যায় না। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' যথার্থ ডায়ারির মতো করিয়া লেখা; বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই ডায়ারির যে মূল খসড়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাকে রোজনামচা বলা যায়; কিন্তু কবির সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিতে সেগুলি যেভাবে লিখিত সেভাবে প্রকাশযোগ্য মনে হয় নাই। সাধনা পত্রিকায় যে সংশোধিত পাঠ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইল, তাহা ডায়ারি আকারে থাকিলেও, তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্যরূপেই পুনর্লিখিত হইয়াছিল। উভয় পাঠ মিলাইলেই তাহা পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হইবে। এই গ্রন্থকে যথার্থ ডায়ারি বলা চলে। কিন্তু 'যাত্রী' গ্রন্থের একাংশের নাম পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি—উহা প্রায় দিনের পর দিন লিখিত হইলেও উহাকে যথার্থভাবে 'ডায়ারি' বলিতে পারি না; কারণ কেহ ডায়ারি লিখিয়া সদ্য সদ্য মাসিক পত্রিকায় পাঠায় না। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' রচনার দুই বৎসর পর সংশোধিত পরিবর্জিত আকারে মুদ্রিত হয়—সদ্য প্রকাশভাবনা

রচনাকালে ছিল না। এই দুই ডায়ারির এইখানেই পার্থক্য। ১৯১২ সাল হইতে লিখিত পত্রধারা সদ্য প্রকাশনের জন্য রচিত, সেইজন্য এইসব রচনার মধ্যে কবির আত্ম-চেতন ভাব খুবই স্পষ্ট। যে পত্র একজন প্রিয় ব্যক্তির জন্য লিখিত, আর যে পত্র মাসিক পত্রিকার সহস্র চক্ষুর জন্য লিখিত, এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে গুণগত ভেদ আছে। ডায়ারি লেখার জন্য 'পঞ্চভূতে' শ্রীমতী দীপ্তি অনুরোধ করিলে গ্রন্থকার বলেন, 'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন।' উহা যেন দুইটি লোককে সৃষ্টি করে। এই লইয়া পঞ্চভূতের পরিচয় অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

ডায়ারি লিখিবার বিরুদ্ধে কবি যত যুক্তিই দিয়া থাকুন, 'ছিন্নপত্র' এক হিসাবে তাঁহার দৈনিক কড়চা বা রোজনামচা। ইহাতে ঘটনার প্রাচুর্য না থাকিলেও জীবনীকারের পক্ষে এগুলি জীবন-ইতিহাসের পর্যাপ্ত আকর বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই পত্রধারার বৈশিষ্ট্য ঘটনা সরবরাহের খানি-গুণের নহে, ইহার সুপ্রতিষ্ঠ স্থান হইতেছে রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তন-ইতিহাসের আকরস্বরূপে। আর পরিশোধিত ছিন্নপত্র বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে উপভোগ্য। সেইজন্য বহুবার পাঠ করিলেও ছিন্নপত্র ম্লান হয় না। ইহার মধ্যে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবন-যৌবনের, পরিচ্ছন্ন দেহমনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা ও অনুভাব কিভাবে ধীরে ধীরে নানা বর্ণে, শতদলের কোরকের ন্যায় প্রতি-দিন প্রস্ফুটিত হইতেছে—তাহার সন্ধান পাই।

এই পত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট মমতা ছিল। শিলাইদহ হইতে কবি ইন্দিরা দেবীকে (২২ বৎসর) লিখিতেছেন (১৮৯৫, মার্চ ১১॥১৩০১ ফাল্গুন ২৮):

"আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্স মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়, কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, সেটা এক একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব, এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার চিঠিগুলো দিস্—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য-সম্ভোগ-গুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, তাহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন পূর্ব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত-জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকাভাবে ফিরে পাব—আমার গদ্যে-পদ্যে কোথাও আমার সুখ-দুঃখের দিনরাত্রি গুলি এরকম করে গাঁথা নেই।"

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের যাবতীয় চিঠি ইন্দিরা দেবী দুইটি খাতায় নকল করিয়া এক সময়ে খুল্লতাতকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৩১০ সালে আলমোড়া হইতে সতীশচন্দ্র রায়কে এই চিঠির খাতা দুইখানি মোমজামা দিয়া মজবুত করিয়া মুড়িয়া রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইবার জন্য পত্র দিতে দেখি।*

বোধ হয় এই দুইখানি খাতা হইতে অংশ চয়ন করিয়া বিচিত্র প্রবন্ধের জলপথে ও স্থলে পরিচ্ছেদ রচিত হয়। অতঃপর ১৩১৯ সালে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন; এই সংস্করণে অনেক চিঠির অংশ-বিশেষ সাধারণের সমাদরযোগ্য নহে বলিয়া পরিবর্জন করেন। সেই খাতা দুইখানি হইতে বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছিন্নপত্র মূল অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। (১৩৫১-১৩৫২)।

উত্তরবঙ্গ বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যক্তিকে যে অজস্র পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা যদি কখনো কালানুক্রমিক সাজাইয়া প্রকাশিত হয়, তবে একজন কবি, মনীষী ও কর্মীর জীবনের যে অপূর্ব ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ সম্পদ-রূপে সমাদৃত হইবে। 'ছিন্নপত্র' সম্পাদন কালে যদি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলির সন্ধান পাইতেন, তবে হয়তো সেগুলির বহু অংশ এই গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত করিতেন; কারণ এই যুবক সাহিত্যিকের সহিত এই সময়ে (এবং পরেও) বহু পত্র বিনিময় হয়। এইসব পত্রে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতা অতি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মানস-সুন্দরী' কবিতা লিখিবার কয়েকদিন পরে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "চিঠিতে এমন সকল আভাস ইঙ্গিত নিয়ে ফলাতে হয়—কেবল ভাবের চিকিমিকিগুলি মাত্র—যে, সে প্রায় কবিতা লেখার সামিল বল্লেই হয়।" একথা অতি সত্য—এ যুগের পত্রগুলি সেই সৌধশিখরেই উঠিয়াছে। সেইজন্যই বলিয়াছি যে, এই দশ বৎসরের পত্রগুলি কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত করিয়া তাহাদের ব্যাপক ও গভীর আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাই হইবে জীবনস্মৃতির অনুক্রমণ ও পরিশিষ্ট।

* খাতা দুইখানি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে আছে।

# দৈন্য

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়াটার্সে কখনও বোধ হয় অন্ধকার হয় না।

সারা রাত চারপাশে অসংখ্য ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। ফিকে হলুদ আভা লুটোপুটি খায় প্রত্যেক ঘরে। জানলার গা ঘেঁষে সার্চ লাইটের আলো সরে সরে যায়। আচমকা থেমে থেমে জাহাজের বাঁশি বাজে। অনেকক্ষণ।

তখন ঘুমন্ত শমিতার মুখে সার্থক জীবনের এক আশ্চর্য রঙ লেগে থাকে। আর বিলাস আর ঐশ্বর্য এক সঙ্গে মিশে জোরালো গন্ধ ছড়ায় কমাণ্ডার দত্তরায়ের দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর থেকে।

সেই গন্ধের কেমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে। ঘুমন্ত শমিতার দেহ গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে কাছে চলে আসে কমাণ্ডারের। কিন্তু একপাশে কাত হয়ে বালিশে ঘাড় গুঁজে থাকে কমাণ্ডার। নড়ে না। শুধু অস্বাভাবিক শব্দ করে মুখ দিয়ে।

দিনের বেলা আলোর ধমকে চোখ ঝলসে যায় এখানে। এত আলো যে দু-একটা জানলা দরজা ভেজিয়ে কড়া রোদের তাপ বাঁচাতে হয়। অমনি ঝলমলে আলোর মতো মানুষের ভিড় হয় সারা দিন। টেলিফোন বাজে। মোটরের শব্দ হয়। জীবনের ঝকমকে রূপ দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে থাকে শমিতা।

বয়-বেয়ারার হাতের দোলায় টুং-টাং শব্দ করে বিরাট আলোর ঝাড়। এক কণা ধুলো থাকে না কোথাও। সন্ধ্যেবেলা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক ফুৎকারে দপ করে এক সঙ্গে সেই কোয়াটার্সের সব আলোগুলি নিভে গেল। শমিতার মুখের ওপর মিশকালো পশুর রঙের মতো এক মুঠো অন্ধকার ছুঁড়ে দিয়ে গেল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

ধাক্কা লেগে ও আছাড় খেয়ে পড়ল। বিকট অন্ধকার ঘর ভরে দিল বিশ্রী তিক্ততায়।

জাহাজের বাঁশি-বাজা রাত যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয় শমিতার। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পা দিয়ে ঠেলে সাড়ি দূরে সরিয়ে দেয়। বালিশ উঁচু করে খাটে ঠেস দিয়ে হাঁপায়। গলা শুকিয়ে গেছে। আস্তে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ও জলের গ্লাশ তুলে নেয়। খালি। কখন জল খেয়েছে মনে পড়ে না। গ্লাশটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে।

স্বামীকে জাগাতে চায়। বার দু-এক ঠেলা মারে। অনেক রাতে ফিরেছে কমাণ্ডার দত্তরায়। ককটেইলের ঘোর কাটেনি এখনও। শমিতার ধাক্কা খেয়ে বিরক্ত হয়। গোঁ-গোঁ করে। সাড়া দেয় না।

এখন রাত কত কে জানে।

সকাল বেলা জ্বর একটু বাড়ল। আরও বাড়বে। তারপর ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে। আর উঠতে পারবে না শমিতা। মরে পড়ে থাকবে। কমাণ্ডার খবর পাবে অনেক পরে। তবু জাহাজের বাঁশি বাজবে। কেউ শুনবে। কেউ শুনবে না।

বেরোবার আগে স্ত্রীর কপালে হাত দিয়ে শরীরের তাপ পরীক্ষা করল কমাণ্ডার দত্তরায়, কর্নেল ঘোষালকে খবর দিয়েছি। উনি আজই আসবেন।

যন্ত্রের মতো শমিতা বলে উঠল, দরকার নেই।

তাকে আদর করে দত্তরায় বলল, শুধু শুধু কষ্ট পাবে কেন? কর্নেল ঘোষালের চেয়ে বড় ডাক্তার আর কেউ নেই। উনি এলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে।

তুমি আজ বেরিও না।

দত্তরায় হাসল, তিন-তিনটে জাহাজ এসেছে। কী কাজের চাপ এখন বুঝতেই তো পার, কঠিন দায়িত্ব বহন করবার গর্বে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কমাণ্ডারের।

তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

আবার হাসল দত্তরায়, ক্যাপ্টেন কোণ্ডারের কোয়াটার্সে পার্টি আছে। অফিস থেকে সোজা চলে যেতে হবে সেখানে, স্ত্রীর চুলে আঙুল চালিয়ে একটু চুপ করে থেকে কমাণ্ডার বলল, আজ থেকে তোমার জন্যে রাতের নার্সের ব্যবস্থাও করি, কি বল?

দরকার নেই, নীরস স্বর কাঁপল শমিতার।

কমাণ্ডার দত্তরায় ঘড়ি দেখল। সময় হয়ে গেছে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। নার্সকে ইশারায় ডেকে উপদেশ দিল সব সময় শমিতার কাছে থাকবার। পরিচর্যার যেন কোন ত্রুটি না হয়। পাকা নার্স। এসব কথা বলবার কোন দরকার নেই। তবু বলল কমাণ্ডার।

ঠিক এই সময় ওরা চলে গেল, কর্কশ গলার স্বর দত্তরায়ের, আনগ্রেটফুল! এখন ওরা থাকলে কত সুবিধা হত তোমার!

নাম করবার দরকার হয় না। শমিতা এক মুহূর্তে বুঝতে পারে কাদের কথা বলছে তার স্বামী। কিন্তু কোন সুবিধা হত না ওরা থাকলে। আরও যন্ত্রণা হত। আরও জ্বর বাড়ত। ওদের আর সহ্য করতে পারত না শমিতা। কিছুতেই না।

না না, নিস্তেজ স্বরে শমিতা বলে উঠলো, ওরা চলে গিয়ে ভাল হয়েছে। ওদের কথা বোল না আমায়।

কথা শুনে ভ্রূকুটি করে দত্তরায়। আর একবার ঘড়ি দেখে। উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, খুব বিরক্ত করত বুঝি তোমায়?

ভী—ষ—ণ, টেনে টেনে শমিতা বলে। হাঁপায়। আর কথা বলতে চায় না। পাশ ফিরে শোয়।

কই, আমায় কিছু বলনি তো? তাহলে আরও আগে বিদায় করে দিতাম।

চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে তারী

জুতোর শব্দ করতে করতে কাজে বেরিয়ে যায় কমাণ্ডার দস্তরায়। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে নিচেই অপেক্ষা করছে।

শমিতা মোটরের শব্দ শোনে। আবার অনেক রাতে ফিরে আসবে। টলবে। স্বর জড়িয়ে যাবে। যন্তের মতো দু-একটা প্রশ্ন করে খবর নেবে শমিতার শরীরের। তারপর পড়ে থাকবে তার পাশে। মড়ার মতো। ভোর অবধি।

রোজই এমন হয়।

খুব ভোরে ওরা এসেছিল। বাইরের একটিও আলো নেভানো হয়নি তখনও। গেটে রাতের প্রহরী চলে যায়নি। অন্য আর একজন সবে এসে দাঁড়িয়েছে।

যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। শুধু উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা। শমিতার চিঠি পেয়েই চলে এসেছে। কদিন থাকবে ঠিক নেই। কবে চাকরি পাবে তাও বলা যায় না।

শমিতাকেই চিঠি লিখেছিল বিকাশ। কি একটা কাজ করত জামসেদপুরের কারখানায়। চাকরি গেছে হঠাৎ। খুব অসুবিধার মধ্যে আছে অনিলা আর সে। যদিও শমিতা ওদের কাউকেই দেখেনি, ওদের কথা কখনও শুনেছে কিনা তাও বিকাশ জানে না। তবুও কমান্ডার দস্তরায় ওর দাদা আর সম্পর্কটা খুব বেশি দূরেরও নয়। তাই কলকাতায় এসে শমিতার বাড়িতে কিছুদিন থেকে ও একটা চাকরির চেষ্টা করতে চায়। যদি দয়া করে শমিতা কলকাতায় আসবার অনুমতি দেয়, তাহলে বলা বাহুল্য, বিশেষ উপকার করা হয় ওদের।

আপত্তি করেছিল কমান্ডার দস্তরায়, কি দরকার ওসব দায় ঘাড়ে নেবার? তোমারই অসুবিধা হবে।

চিঠিটা উল্টেপাল্টে আর একবার ওপর-ওপর পড়ে শমিতা থেমে থেমে বলেছিল, আমাকে লিখেছে অত করে! আমি বলি, আসতে যখন চেয়েছে, থেকে যাক না এখানে কয়েক দিন—

কয়েক দিন? অবজ্ঞার রেশ ফুটে উঠল কমান্ডারের কথায়, চাকরি জোগাড় করা সোজা নাকি ওসব লোকের পক্ষে। কতদিন থাকবে কোন ঠিক নেই।

তবু—

তা ছাড়া ওই রকম দুঃস্থ আত্মীয়কে আমি কারোর কাছে পাঠাতে পারব না— আমার পরিচয়ও দিতে দেব না। ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাই ডিফিক্যাল্টিজ?

খুব বুঝি, ওদের কাছে নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কথায় একটু জোর দিল শমিতা, তোমার পরিচয় দিয়ে কোথাও পাঠাবার দরকার কি। নিজেই একটা কিছু খুঁজে নেবে এখন। সে-কথা আমি না হয় ওকে সময় মতো কায়দা করে জানিয়ে দেব?

দেশলাই-এর ওপর সিগ্রেট দিয়ে টুকটুক শব্দ করে বলেছিল কমান্ডার দস্তরায়, বোকা-বোকা চেহারা, নোংরা পোশাক-আশাক। বয়-বেয়ারা ড্রাইভারের সামনে মান রাখা মুশকিল হবে ওরা এখানে এসে থাকলে।

কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে, কমান্ডারকে আশ্বাস দিয়েছিল শমিতা, আমি সব ঠিক করে নেব। একটা ঘর যখন খালি পড়েই আছে এখন—সম্পর্ক দূরের হলেও তোমার ভাই আর ভাইএর বউ তো বটে।

হুঁঃ, মুখ দিয়ে শুধু একটা অদ্ভুত শব্দ করেছিল কমান্ডার দস্তরায়। কোন উত্তর দেয়নি শমিতার কথার।

প্রথম দর্শনেই হতাশ হল শমিতা।

যেমন ভেবেছিল তার চেয়েও দীন। যেমন শুনেছিল তার চেয়েও মলিন। চেয়ে থাকা যায় না! তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। মায়া হয়। করুণা হয়। কৃপা করতে সাধ জাগে।

শীর্ণ করুণ চেহারা অনিলার। গায়ে সাধারণ সাদা সাড়ি। প্লাস্টিকের লাল চুড়ি হাতে। কানে কিছু নেই। গলায় কিছু নেই। পায়ে এক পাটি চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়া।

ময়লা রঙিন সার্ট পরেছে বিকাশ। দাড়ি কামায়নি। চুল কাটেনি অনেক দিন। খাট ধুতিতে কাদা লেগে আছে।

রাস্তার কুকুর-বেড়ালের দিকে মানুষ যেমন দৃষ্টিতে তাকায় তেমন নির্বিকার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে শমিতা বলল, এস তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

ওরা এল শমিতার পিছনে পিছনে। ভয়ে ভয়ে। আস্তে আস্তে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে। রাস্তার কুকুর-বেড়ালের মতোই।

ঘর খুলে শমিতা বলল, এই যে, পাখির স্বরের মতো পিক্ করে সুইচের শব্দ হল। পাখা আছে।

সবই আছে সে-ঘরে। খাট। আলমারী। ড্রেসিং টেবিল। আলনা। মোড়া। চেয়ার। দেয়ালে টাঙান বিলিতি ছবি। লাল কার্পেট।

অহংকার ভর করল শমিতার হাসিতে, এই ঘরে থাকবে তোমরা।

সে ভেবেছিল ওরা চমকে যাবে ঘরে ঢুকে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখবে আসবাব। নিজেদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতায় গলে যাবে শমিতার কাছে।

কিন্তু ওরা তাকিয়ে দেখল না ঘরের কোন জিনিসের দিকে। কথা বলল না একটিও। যেমন ধীর পায়ে ঢুকেছিল, ঠিক তেমন করে ঘরের শেষ প্রান্তে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। দুজনেই। তাকিয়ে রইল পুরোনো গাছ-গুলির দিকে। সবুজ ঘাসভরা মাঠের দিকে। যেখানে পথ সরু হয়ে বেঁকে গেছে সেই দিকে।

একটু জোরে বলে উঠল শমিতা, বিছানার চাদর আছে তোমাদের?

ঘরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে অনিলা বলল, দরকার নেই।

বিকাশ বলল, দরকার নেই।

কিন্তু বিছানায় কি পাতবে তোমরা? বিকাশ বলল, আমার ধুতি আছে।

অনিলা বলল, আমার ছেঁড়া সাড়ি আছে।

ধুতি-সাড়ি পাতবে ওরা দামী গদি-তোষকের ওপর। এ-ঘরে দাঁড়িয়ে ওরা এমন কথা বলে কেমন করে। আশ্চর্য। কিছু নেই ওদের। কে জানত ওরা এত গরিব। খালি হাতে, এক বস্ত্রে এসে উঠেছে এখানে। অবাক হয়ে গেল শমিতা। বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কত পাখি ডাকে এখানে!

হাওয়ার কী জোর এখানে!

পাখার দরকার নেই।

কিছু দরকার নেই।

ঘরে থাকবারও দরকার নেই। কত জায়গা, ঘুরে বেড়াবার। কত বড় বারান্দা। কত উঁচু ছাদ। ওরা বেরিয়ে এল। দেখল। দেখাল। আকাশ। কৃষ্ণচূড়ার ডাল। ফুলের বাগান। ফলের গাছ। জাহাজের বাঁশি শুনল। শোনাল।

হাসি ফুটে উঠল শমিতার মুখে। এমন তো কখনও দেখেনি ওরা। তাই দিশাহারা হয়ে পড়েছে—কাঙালের মতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরদিন রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শমিতা। বিস্ময়ের একটা থমথমে আভা ফুটে উঠল মুখে। দেখেনি কখনও। ভাবেনি কখনও। এখানে ওরা বেমানান। এ-বাড়ির নিয়ম জানে না ওরা।

বাবুর্চি আসে বেলায়। কমাণ্ডার জাগে দেরিতে। ভোরে উঠে স্টোভে চা করে শমিতা স্বামীর ঘুম ভাঙায়। এমন হয়ে আসছে চিরদিন। স্বামীদের রান্না-ঘরে ঢোকার অভ্যাস নেই বলেই তো জানে শমিতা।

কিন্তু বিকাশ অনিলার সঙ্গেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। স্টোভ জ্বলছে। কেটলি বসানো হয়েছে তার ওপর। হাত বাড়িয়ে চায়ের সরঞ্জাম অনিলার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে বিকাশ। অনিলা কথা বলছে অনর্গল। কথা শুনতে শুনতে হাসছে বিকাশ। কাছে এগিয়ে আসছে অনিলার। হাত ধরছে। চুল ঠিক করে দিচ্ছে। অনিলা সরে যাচ্ছে। চোখ রাঙিয়ে ঠেলে দিচ্ছে বিকাশকে।

শমিতা দেখল অদ্ভুত অস্বাভাবিক এই দৃশ্য সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে।

দেখল আর ভাবল, হয়তো বেকার বলেই এ সম্ভব। হয়তো দরিদ্রের অবসর যাপনের রীতিই এমনি। সে তো জানে না ওদের দৈনন্দিন জীবনধারণের নিয়ম-কানুন।

রান্নাঘরে এসে ভদ্রতা করে শমিতা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বুঝি খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস?

না উঠে উপায় কি বৌদি, কারখানায় চাকরি করতাম যে—

বাধা দিয়ে অনিলা বলল, দরকার নেই অমন চাকরির। অত পরিশ্রম করলে শরীর থাকে নাকি মানুষের!

হেসে বলল বিকাশ আমার শরীর ঠিকই ছিল। কিন্তু আমার জন্যে ভাবনা করে এটুকু দুর্বল হল অনিলার।

তোমার হার্টের অসুখ বুঝি?

না না, ওঁর কথা শুনবেন না। কোন অসুখ আমার নেই।

সেই সাড়ি। সেই সার্ট। কেমন করে এক কাপড়ে দিন কাটায় ওরাই জানে। হয়তো কাটাতে পারে অনেক দিন। ভাবতেও খারাপ লাগে শমিতার। ঘেন্না করে।

একটু ইতস্তত করল শমিতা, আমার কয়েকটা সাড়ি পাঠিয়ে দেব তোমার ঘরে? একেবারে নতুন—

দরকার নেই, নিজের সাড়ি দেখিয়ে অনিলা বলল, এই তো সাড়ি আছে। কাল থেকে একটাই তো পরে আছ।

এটাই তো পরি, খিলখিল করে হেসে উঠল অনিলা, রোজ রাত্তিরে কেচে দিই। ভোরের আগে হাওয়ায় শুকিয়ে যায়। কালও কেচে ছিলাম।

অসম্ভব কথা শোনে শমিতা। বিশ্বাস করতে পারে না। অনিলার সাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকাশের সার্টের দিকেও।

তুমিও তাই কর নাকি বিকাশ? তোমার দাদার সার্ট-প্যাণ্ট ব্যবহার করবে? অনেক বাড়তি আছে।

দরকার নেই, পাঞ্জাবি আছে আমার একটা। বিয়ের সময় পেয়েছিলাম।

বিয়ের সময়? কৌতূহলী হয়ে শমিতা হেসে উঠল, ক বছর বিয়ে হয়েছে তোমাদের?

ছ বছর। দাদার বিয়ের আগে আমি বিয়ে করেছিলাম।

শমিতার হাসি নিভে যায় হঠাৎ। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। এত অবান্তর কথা না বললেই চলত। এসব জেনে কি লাভ হবে তার।

তবু যাবার সময় ও বলে যায়, বাথরুমে নতুন মাজন রেখে এসেছি তোমাদের জন্যে। ওটা তোমরা ব্যবহার করবে।

দরকার নেই, বিকাশ বলল, কাঠ-কয়লার এত ছাই এই যে—ওতেই আমরা কাজ চালিয়ে নিই।

অনিলা বলল, আমাদের জন্যে একটুও ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বিকাশ বলল, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

নিজের শোবার ঘরে আবার ফিরে এল শমিতা। ক্লান্তি জড়ানো চাপা আলোয় ঠাসা গুমোট ঘর। পর্দা সরানো হয়নি এখনও। সূর্যের আলো চোখে লাগলে ঘুমতে পারে না কমাণ্ডার দত্তরায়।

এই—টিপয়ের ওপর চায়ের কাপ রেখে কমাণ্ডারের কপালে হাত দিয়ে ডাকল শমিতা।

জোরে তার হাত চেপে ধরল কমাণ্ডার। টেনে খাটে বসাল। আদর করল। বুকের ওপর টেনে নিল।

এই—ওরা আছে—

হোয়াট দি হেল্ ডু আই কেয়ার, দৃঢ় আলিঙ্গনে শমিতার শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল কমাণ্ডার।

ওরা আসবার দিন কয়েক পর আবার একটা নতুন জাহাজ এল। প্রায়ই আসে। শুধু কমাণ্ডার দত্তরায় একা নয়, গঙ্গায় নতুন জাহাজ লাগলে শমিতাও সমান ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জাহাজের বড় বড় কর্মচারীদের কাছ থেকে নানা তথ্য জেনে নেয় কমাণ্ডার—বুঝিয়ে দেয় নতুন কাজ। আর বয়-বেয়ারাদের ব্যস্ত করে তোলে শমিতা। সারা বাড়ি নতুন করে সাজায়। ওই জাহাজের
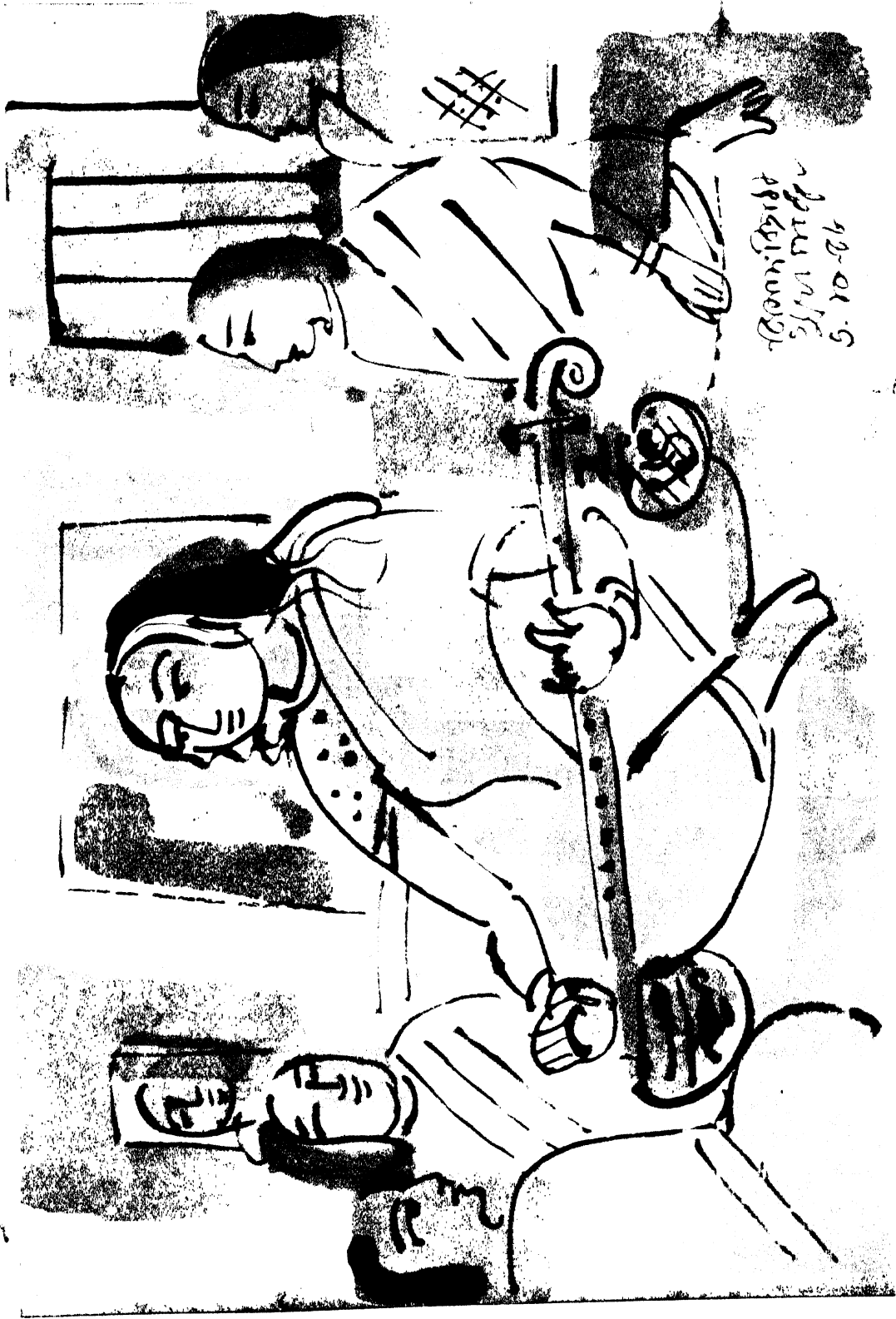
অফিসাররা সন্ধ্যেবেলা আসবে। আজ শমিতার বাড়িতে পার্টি। সে ওদের অভ্যর্থনা করবে। ওদের সঙ্গে নানা গল্প করে হাসাবে। নিজে হাসবে। অভ্যেস হয়ে গেছে শমিতার। উত্তেজনায় শিরাগুলি কাঁপে। প্রসাধনের নিপুণ তুলি বুলিয়ে ঝলমলে সন্ধ্যায় জ্বালিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে নিজের শরীর। হুইস্কির কটু গন্ধের মতো একটা ঝাঁঝ নিজেরও রোমকূপ থেকে বের করতে চায়। শমিতার ঘরে অনেক গন্ধ কাঁপে তেমন সন্ধ্যায়। উগ্র মধুর কিংবা অদৃশ্য কোন ফুলের গন্ধের মতো. দূরান্তের সুবাসের মতো—ঠিক বোঝা যায় না। চেনা যায় না। কিন্তু তবু নেশা লাগে শমিতার। হয়তো নিজের গন্ধে নিজেই দিশা হারায়।

অন্ধকার নেই। কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টার্সে সন্ধ্যা জ্বলছে। আলোর ঝাড়ে অসংখ্য মূল্যবান বালব্ বন্দী বিদ্যুতের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। অনেক গেলাশ, অনেক বোতল, অনেক রঙীন কাঁচের বাসন শব্দ করছে, গান গাইছে, তরঙ্গ তুলছে বেগবান জীবনের। শমিতাকে টানছে, ভোলাচ্ছে, চঞ্চল বিভোর করে তুলছে এই ঘরের সব কিছু—নরনারীর প্রলাপ আর উচ্ছ্বাস আর উদ্দাম কলরব। জীবনের। ঐশ্বর্যের। অহংকারের। আড়ম্বরের। মিসেস কোণ্ডারের সাদা জর্জেট। নাগার-করের জ্বলজ্বলে চোখ। মাথুরের প্রসারিত হাত। রাজেশ্বরীর পাতলা গোলাপ-ঠোঁট। শেম্পসনের হাসি। আর স্কট-ল্যাণ্ডের পানীয়ের সেই পরিচিত পুরানো দীর্ঘ গুণগান। শমিতা শোনে। শোনায়। ভোলে। ভোলায়। কাঁপে। কাঁপায়। আশ্চর্য আবেগে। অদ্ভুত খুশিতে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া কলকল ঝরনার মতো সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। রাতের নিঝুম প্রহর কাঁপে। তবু শমিতার ড্রয়িংরুমে অন্ধকার হয় না। আনন্দের ক্লান্তি জ্বলে।

কিন্তু কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টার্সের একটিমাত্র ঘরে তখনও আলো জ্বালা হয়নি। সব আলোর পাহারা এড়িয়ে শুধু সেই ঘরে অল্প অল্প অন্ধকার জমে আছে।

আজ ওদের ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ। দীন বেশে মলিন মুখে কোন অতিথির সামনে ওরা যেন না পড়ে। কঠিন নির্দেশ দিয়েছে কমাণ্ডার দত্তরায়। ওদের কথা শমিতার মনে পড়ল সকলের শেষে—খাওয়ার পাট চুকিয়ে প্রত্যেকে বিদায় নেবার পর। সামান্য কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে বটে ওদের জন্যে। কোন রকমে দুটো প্লেটে খাবার সাজিয়ে শমিতা এল ওদের ঘরে।

এ কি, আলো জ্বালনি কেন?

অনিন্দ্য হেসে বলল, দরকার নেই।



বিকাশ হেসে বলল, দরকার নেই।

আলো না জ্বালালেও বাইরের আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় টেবিলটা স্পষ্ট দেখা যায়। ঠক ঠক শব্দ করে দুটো প্লেট নামিয়ে রেখে শমিতা বলল, তোমাদের খাবার।

কথা বলল না কেউ। তবু অকারণে হঠাৎ শমিতার মনে হল আলো-অন্ধকারের দুজন মানুষ যেন একসঙ্গে আপন মনে এবারেও গুঞ্জন করে উঠল, দরকার নেই।

ক্লান্ত শরীর টেনে ছাদে এসে দাঁড়াল শমিতা। কয়েক মুহূর্ত। সামনের কদম গাছে জোর ইলেকট্রিকের বাঁকা রেখা পড়েছে। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পুরু ডালের ওপর দুটো পাখি বসে ঝিমোচ্ছে। যথেষ্ট অন্ধকার নেই। আলোর রেখা বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাদের। তবু মাঝে মাঝে আদিম উল্লাসে তাদের শব্দ করছে পাখি। ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে আর একটার। শমিতা তাকিয়ে রইল। এক দৃষ্টিতে। অন্য মনে। আলো—অন্ধকারে। গাছের ওই দুই পাখির কিছু দরকার নেই। বনের হরিণ-হরিণীর কিছু দরকার নেই। হ্রদের হংস মিথুনের কিছু দরকার নেই।

আবার শমিতা ফিরে এল ড্রয়িংরুমে। সোফায় হেলে পড়ে আছে কমাণ্ডার দত্তরায়। হাত ঝুলে কার্পেট ঠেকেছে। অনেক খালি সোডার বোতল জমেছে টেবিলের তলায়। ছাইদানে ফেলা সিগ্রেট নেভানো হয়নি বলে পাখার হাওয়ায় হু হু করে বাকি পোড়া সিগ্রেট নতুন করে জ্বলছে।

আর চোখ জ্বালা করা ধোঁয়া এসে লাগছে শমিতার নাকে।

এই—

ডার্লিং, প্লিজ টেক মি টু বেড, জড়ানো স্বরে বাঁ হাত বাড়িয়ে দেয় কমাণ্ডার।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শমিতা তাকে দাঁড় করায়। তাকে আঁকড়ে ধরে কমাণ্ডার। তার কাঁধে ভর দিয়ে পক্ষাঘাতের রুগীর মতো চলে শোবার ঘরের দিকে। অসতর্ক পায়ের ধাক্কায় টেবিল থেকে গেলাশ গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। ঝনঝন শব্দ হয়। পাখিরা ভয় পায়। কড়া আলোয় শমিতার চোখেও ধাঁধাঁ লেগে যায়।

কমাণ্ডার দত্তরায়ের সঙ্গে মাসের মধ্যে অনেকবার শমিতাকেও বাইরে যেতে হয়। অফিসারদের বাড়িতে শুধু নয়, নতুন জাহাজ এলে জাহাজেও। বিলিতি নাচের বাজনার তালে তালে সেখানেও জলের ওপর অপরূপ সন্ধ্যা ঝলসায়। তা ছাড়া আয়োজন এক। সরঞ্জাম এক। ধরনটাও ঠিক বাড়ির ককটেইলের মতোই।

নতুন জাহাজের পার্টি শেষ হতে দেরি হল বেশ। ক্যাপ্টেন স্যানয়কে গুড নাইট জানিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরতে অনেক রাত হল শমিতা আর কমাণ্ডার দত্তরায়ের।

আজ শমিতার ইচ্ছে করছে কমাণ্ডারকে বুকে চেপে ধরে থাকতে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। বাহু উদগ্রীব হয়ে উঠছে। বুড়ো ক্যাপ্টেনের অনুরোধ অবহেলা করতে না পেরে শমিতাকেও জিন আর লাইম নিতে হয়েছে অনেকবার। গুম হয়ে গেছে

কমাণ্ডার। রোজই হয়। তাকে শুইয়ে অনেকবার আদর করল শমিতা। কোন সাড়া না পেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে একা একা আস্তে আস্তে ছাদে চলে এল। সেই কদম গাছের কাছে এসে দাঁড়াল—সেদিন যেখানে দুটো পাখি দেখেছিল।

কোন পাখি নেই আজ গাছে। চাঁদের আলোর জোর আছে। ম্লান হয়ে গেছে চারপাশের সব কৃত্রিম আলো। থেমে থেমে নতুন জাহাজের একটানা বাঁশি বাজছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় নেশা ছুটে গেল শমিতার। কঠিন আঘাতে বোবা হয়ে গেল। প্রকৃতির উন্দাম আলোয় ছাদের অন্য প্রান্তে অনিলা আর বিকাশকে দেখল শমিতা। রেলিংএ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। সাদা সাড়ির রঙ মিশে গেছে জ্যোৎস্নার রঙে। ওরাও মিশে গেছে। এক হয়ে গেছে। নির্জ্জনে। বাঁশির শব্দে। চাঁদের আলোয়।

এতটুকু কৌতূহল নেই আজ শমিতার চোখে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলতে লাগল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চোরের মতো পালিয়ে এসে হাঁপাতে লাগল। মদের উৎকট গন্ধ-ভরা বুক চিরে কথা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে শমিতার। হাতে সোনার বালার দরকার নেই। কানে হীরের ফুলের দরকার নেই। গলায় দামী নেকলেসের দরকার নেই। রোজ নতুন নতুন ফিনফিনে সাড়ির দরকার নেই। কিছু দরকার নেই। শুধু দরকার—

কিন্তু কমাণ্ডার দত্তরায় তখন একেবারে বেহুঁশ।

সকাল বেলা চা খাবার পর বিকাশকে ডেকে বলল কমাণ্ডার, চাকরি-বাকরির কিছু সুবিধা করতে পারলে? অনেক দিন তো বসে রইলে চুপচাপ?

বিকাশ কাশল, বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। অনিলার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে কদিন থেকে—

সেকথা কানে তোলা দরকার মনে করল না কমাণ্ডার, তোমার মতো লোকের পক্ষে চাকরি পাওয়া খুব শক্ত আজকাল। কত কোয়ালিফায়েড ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিগ্রেটের হালকা ধোঁয়া ছেড়ে কমাণ্ডার বলল, হাউএভার, একটা ব্যবস্থা করেছি আমি। কাল থেকে ডকে তোমার চাকরি হয়ে যাবে। আজ দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে তুমি কমাণ্ডার মেননের সঙ্গে দেখা করো—

চমকে উঠে বিকাশ বলল, আজ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই আফটার লাঞ্চ। না হলে ওটা ফিল্‌ড্‌ ইন হয়ে যাবে।

কি একটা কথা বলতে চাইল বিকাশ। কিন্তু বড় কঠিন মনে হচ্ছে কমাণ্ডারের মুখ। এক মনে খবরের কাগজ পড়ছে। কিছু বলতে পারল না বিকাশ। সন্ধ্যেবেলা আগুন জ্বলে উঠল সেদিন।

কমাণ্ডার দত্তরায় গর্জ্জন করে উঠল, ইরেসপনসিবল ইডিয়ট! কেন যাওনি তুমি মেননের সঙ্গে দেখা করতে? হি ওয়েটেড ফর ইউ টিল ফোর।

নির্ব্বিকার স্বর বিকাশের, আমি দমদমে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরি হয়ে গেল—

ইওর ডমডম বি ড্যামনড। আজই সেখানে না গেলে চলত না তোমার? কি এমন দরকার পড়েছিল?

বিকাশ বলল, না, আজ না গেলে চলত না। কাল সারা রাত খুব কষ্ট গেছে অনিলার। হার্টের অসুখের টোটকা ওষুধ আনতে আমি দমদম গিয়েছিলাম—

সাট আপ ইউ ইম্বেসিল, বিকৃত মুখে চিৎকার করে উঠল কমাণ্ডার দত্তরায়, মুখ দেখতে চাই না তোমাদের। কাল সকাল বেলা উঠে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। আগ্‌লি ভ্যাগাবণ্ড কোথাকার!

উত্তেজনাহীন শান্ত স্বরে বিকাশ বলল, বেশ তাই যাব। সে আর দাঁড়াল না সেখানে।

কোথায় আর যাবে। চাকরি নেই। যাবার জায়গা আছে নাকি কোথাও। শমিতা ভাবল, কাল সকালে রাগ পড়ে যাবে কমাণ্ডারের। ওরাও থেকে যাবে। যেমন আছে তেমন। কিন্তু পরদিন ভোর বেলা দরজা খুলে শমিতা দেখল ওরা দাঁড়িয়ে আছে তার শোবার ঘরের ঠিক সামনেই। যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে শমিতার দরজা খোলবার অপেক্ষায়। জিনিসপত্র তো আর কিছু নেই। দুজনের হাতে শুধু দুটো প্যাকেট। শমিতাকে প্রণাম করে হাসিমুখে অনিলা বলল, আমরা চললাম। অনেক বিরক্ত করে গেলাম আপনাকে। কিছু মনে রাখবেন না।

বিকাশ হেসে বলল, দাদাকেও বলে দেবেন।

অবাক হয়ে অনিলাকে জিজ্ঞেস করল শমিতা, কিন্তু কোথায় যাবে তোমরা?

কথার ওপর বেশ জোর দিল অনিলা, উনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে। সঙ্গে তো রইলেন ভাবনা কি!

বিমূঢ় দৃষ্টিতে অনিলার দিকে তাকিয়ে রইল শমিতা। বেকার স্বামীর ওপর ভরসা করে নির্ভরের এত বড় আশ্বাস কেমন করে পায় এই রোগা মেয়েটা।

ওরা চলে গেল। প্রথম দিন যত ভোরে এসেছিল ঠিক তত ভোরে। যেমন করে এসেছিল ঠিক তেমন করে। ভয়ে ভয়ে। আস্তে আস্তে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে। রাস্তার কুকুর-বেড়ালের মতো নয়। গাছের দুই পাখির মতো। বনের হরিণ-হরিণীর মতো। হ্রদের হংস-মিথুনের মতো। সবুজ ঘাস ভরা মাঠ পেরিয়ে, পুরানো গাছের পাশ দিয়ে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওরা এগিয়ে গেল গেটের দিকে। শমিতা দেখল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ।

তিনটে নতুন জাহাজ এসেছে। সারা রাত বাঁশি বাজবে। শমিতা ঘুমতে পারবে না। যন্ত্রণায় ছটফট করবে।

উঠে দাঁড়াল শমিতা। সমস্ত শরীর কাঁপছে। ব্যস্ত হয়ে কাছে এল নার্স। জানতে চাইল কি চাই। উঠতে বারণ করল। কোন বাধা মানল না শমিতা। কোন বারণ শুনল না। টলতে টলতে জোর করে চলে এল সেই ঘরে—যেখানে ওরা ছিল।

শূন্য চোখে ঘরের চারপাশে তাকাল শমিতা। দেয়ালে-দেয়ালে এখনও উত্তাপের আমেজ লেগে আছে। শমিতার গায়ের তাপের মতো যন্ত্রণার উত্তাপ নয়, ত্রিভুবন ভরানো এক মধুর উত্তাপ। সে বোধ হয় বুঝতে পারে বেকার স্বামীর ওপর ভরসা করে রোগা মেয়েটা নির্ভরের এত বড় আশ্বাস কোথা থেকে পায়।

কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টারের দৃঢ় দেয়াল পেরিয়ে ওরা চলে গেছে। জাহাজের বাঁশি আর শুনতে পাবে না। কিন্তু বাঁশি আছে ওদের সঙ্গে। সে-বাঁশি ওরা বাজাবে যখন যেখানে থাকবে সেখানে। ভোরে সকালে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে সন্ধ্যায় রাত্রে মধ্যরাত্রে শেষ রাত্রে—সর্বক্ষণ। ছ বছর ধরে যেমন বাজিয়ে এসেছে তেমন করে। বাঁশি নেই শমিতার। ও বেরিয়ে যেতে পারবে না ওদের মতো। বিকট যন্ত্রণায় শুধু জাহাজের বাঁশি শুনবে। নিজে বাঁশি বাজাতে পারবে না কোনদিন।

চণ্ডীপুরের মাঠে রায়দের জমির ধান কাটতে নেমেছিল মতি মিঞা, মবদুল শেখ আর বিহারী মণ্ডল। মাঠ তো নয়, সমুদ্র। এবার কার্তিকের শুরুতেই লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে। কিন্তু মাঠে জল এখনো তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে। কোমর জলে নেমে তিনজনে ধান কাটছিল। বিঘা তিনেকের ছোট জমি। কতই বা ধান হবে। তাই বেশি কৃষাণ ওরা নেয়নি। অযথা ভাগীদার বাড়িয়ে লাভ কি। একেই তো কর্তাদের অর্ধেক বরাদ্দ বাঁধা আছে। সামনেই লম্বাটে ডিঙি নৌকো। ধান কেটে কেটে তাতেই রাখছিল তিনজনে। আশেপাশে এমন ডিঙি নৌকো অনেক আছে। আরো কয়েকখানা জমির ধানও পেকেছে। কাজী আর শিকদারদের জমিতেও ধান কাটা শুরু হয়েছে। কাজ করতে করতে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছিল চাষীরা। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে, পেটে জ্বলছে ক্ষিদে। তবু কারো হাত কামাই নেই, মুখ কামাই নেই। দু বছর বাদে এবার ধানের খন্দ ভালো হয়েছে। কেটে ঝেড়ে তুলতে না পারলে বউ ছেলে খাবে কি। খাওয়া-পরায় বড় কষ্ট। তিনজনের মধ্যে মতি মিঞার হাতই বেশি চলছিল। গোছে গোছে ধান কেটে রাখছিল নৌকায়। ধান তো নয়, সোনা। কোথায় লাগে এর কাছে বাবু ভুঁইয়াদের পরিবারের গলার সোনা, কানের সোনা। মতি মিঞার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মুখের কালো চাপ দাড়ির রঙ এখন কটা। কিছু কিছু পেকে সাদাও হয়েছে। মাথার কোঁকড়ানো বাবড়ি চুলও অর্ধেকের বেশি পেকেছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা মতি মিঞার। ছড়ানো পিঠ, চেপ্টা বুক। পিঠও খালি নয়, বুকও খালি নয়। পিঠভরা দাদ আর বুকভরা লোম। মতি মিঞা বলে, 'মেঞ্যারা, দাউদে আমার কোন ঘেন্নাপিত্তি নাই, অসোয়াস্তিও নাই। আমি মলম ফলম কিছু লাগাই না। দাউদ আমি পুষি। আমার বিবির জন্যে পুষি। ঘরে যদি পছন্দসই, মনের মতন বিবি থাকে দাউদে ভয় কি তোমার। কিন্তু একটা কথা। তার পরনে শাড়ি আর প্যাটে দানাপানি পড়ন চাই। নইলে সে তোমারে আস্ত রাখবে না। তোমার মুখের দাড়ি আর বুকের লোম সবটাই না ছেঁড়বে।'

ভারি রসিক মতি মিঞা। বয়স যত বাড়ছে তত যেন রসের ফোয়ারা ছুটছে। তবু যদি চালে টিন আর গোলায় ধান থাকত মতি মিঞার। তাহলে ফোয়ারা আর ফোয়ারা থাকত না। সমুন্দুর হত। আর তাতে গাঁ-শুদ্ধ লোক সাঁতার কাটত। কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্টে আছে মতি মিঞা। গোড়ার দিকে কতকগুলি মেয়ে হয়েছে, শেষের দিকে ছেলে। সব মিলিয়ে গুটি দশেক। বাপকে সাহায্য করবার বয়স তাদের হয়নি। তাকে একাই খেটে খেতে হয়।

কিন্তু মাঠে তো ঘরের বিবি নেই, নিজের হাতেই এখানে দাদ চুলকিয়ে নিতে হচ্ছিল মতি মিঞার। মাঝে মাঝে পায়ের থোড়া থেকে জোঁকও ছাড়াতে হচ্ছিল। তবু তার কাঁচি যত জোরে চলছিল তেমন আর কারও নয়। মবদুল এদের মধ্যে বয়সে ছোট। তেইশ-চব্বিশ বছরের বেশি হবে না তার বয়স। লম্বা ফর্সাপানা চেহারা। থুতনির ডগায় কালো দাড়ি। জোয়ান বয়সের ছেলে। কিন্তু আজ যেন তার হাত নড়ছিল না। বড় আনমনা দেখাচ্ছিল তাকে। মতি মিঞা তা লক্ষ্য করে বলল, 'কি রে মবদুল, তোর হইছে কি আইজ? কাজে বুঝি মন লাগছে না নাকি ক্ষিদে লাগছে। তামুক খা, তামুক খা।'

তামাক আগুন হুঁকো কলকের ব্যবস্থা নৌকোতেই আছে। বিহারী মণ্ডল নৌকোর কাছে গিয়ে তামাক সাজতে শুরু করল। তার চেহারা বেঁটে খাট, বয়স চল্লিশের কাছে। কল্কেয় আগুন তুলতে তুলতে সে হেসে বলল, 'মেয়াভাই, তামাক খাওয়াইয়া আইজ আর ওয়ারে চাংগা করতে পারবা না। আইজ ওয়ার বিবির ব্যথা ওঠছে। ঘরের খুঁটি ধইরা কাতরাইতেছে সে। আইজ কি আর ধান কাটায় ওয়ার মন লাগে?'

মতি মিঞা উৎসুক চোখে মবদুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাচাই নাকি?'

মবদুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ।'

'এই পেরথম পোয়াতী?'

'হ।'

মতি মিঞা এবার একটু উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'দাইটাইর ব্যবস্থা কইরা আইছিস তো?'

মবদুল বলল, 'তা করছি। মা আছে, আমার বড় বুইনও আইছে। তবু—'

বিহারী হুঁকোয় টান দিয়ে হেসে বলল, 'তবু আমাগো মবদুলের ভাবনা যায় না। ও নিজেই যেন পোয়াতী হইয়া রইছে। ব্যথাটা যেন ওয়ারই।'

মতি মিঞা সহানুভূতির সংগে বলল, 'হাইসো না মণ্ডল, হাইসো না। পেরথম পেরেথম ওই রকম হয়। যে পোয়াতী সে নিজের ব্যথা ছাড়া আর কিছু টের পায় না। যে সোয়ামী তার দুইজনের ব্যথা সইতে হয়।'

বিহারী হেসে উঠল, 'ও ভাই মতি মিঞা, তোমারও কি সেই দশা হয় নাকি?'

মতি মিঞা স্বীকার করে বলল, 'হয়। কিন্তু এখন আর ততটা না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কষ্ট আমি পাইছিলাম ওই মবদুলের মত বয়সে। নিজের পরিবারের জন্যে না, পরের পরিবারের জন্যে।'

বিহারী মণ্ডল বলল, 'তাই নাকি?' বড় মজার কথা তো। রসের কথায় ক্ষিদে-তেষ্টা দূর হয়। কও শুনি।'

মতি মিঞা সংগে সংগেই আরম্ভ করল না। নীরবে নিজের মনে ধান কাটতে লাগল। খানিকটা সময় নিল কালের সাগর পাড়ি দিয়ে বহুদূরে ফেলে-আসা তার সেই প্রথম যৌবনের উপকূলে পৌঁছতে। বিহারী তাড়া দিয়ে বলল, 'কও কও, আরম্ভ কর।' মতি মিঞা বুঝতে পারল তার দুজন সংগীই ধানে কাস্তে চালাতে চালাতে কান আর মন তাকে সমর্পণ করে রেখেছে। কিষাণরা গল্প বড় ভালোবাসে।
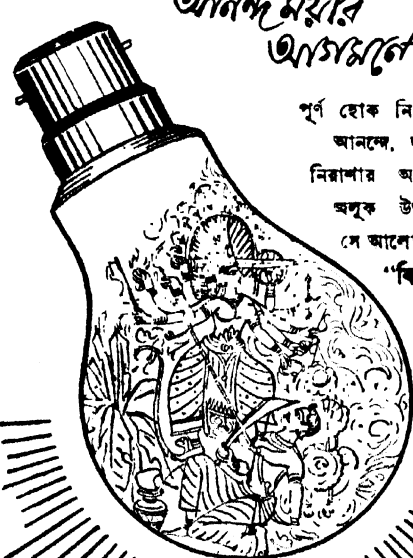
মতি মিঞা আরও এক গোছা ধান নৌকোয় তুলে রেখে আস্তে আস্তে আরম্ভ করল, 'সে বড় সরমের কথা মণ্ডলভাই। কইলাম তো তখন ওই মবদুলের মতই বয়স আমার। মবদুলের চাইতেও ছোট। গায়ে গতরে রক্ত তখন টগবগ করে। সেই বয়সে আমি একজনকে ভালোবাসছিলাম। না আমাগো জাতের ধর্মের কেউ না, তোমাগো জাতের তোমাগো ধর্মের, তোমাগো গুষ্ঠীরই মাইয়া। এখন আর নাম করতে দোষ নাই। বদন চৌকিদারের ছোট মাইয়া তুফানী। সেই তুফানী আমার শিরায় শিরায় রক্তের তুফান ছুটাইছিল।'

অথচ তুফানীকে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে মতি মিঞা। বয়সেও মেয়েটা তার চেয়ে দশ-বার বছরের ছোট। আম জাম আর খেজুর কুড়াতে মতি মিঞাদের বাগানে আসত। বদন চৌকিদার আর মতি মিঞার বাপ রজ্জাক সিকদার প্রতিবেশী ছিল দুজনে। রজ্জাকের গরু বদনের বাড়ির কলাগাছে কি লাউ কুমড়োর মাচায় এসে মুখ লাগাত, আবার বদনের গরু ছাগলও রজ্জাকদের মুলো আর মরিচের ক্ষেত মুড়ে খেত। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিত না। ঝগড়াঝাটি হত। গালাগাল দিয়ে দু-পক্ষই দু-পক্ষের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করত। কিন্তু মিলমিশ হতেও বেশি দেরি লাগত না। দুজনের গলায়-গলায় ভাব ছিল। রজ্জাক আর বদনের। তারা প্রায় একই ধরনের চাষী গৃহস্থ। একসংগে মাঠে খাটত, বর্ষার সময় এক নৌকোয় হাটে যেত। তাদের চালচলন শোয়াবসা সব একরকম ছিল। শুধু পুজো আর্চার সময় বদন পৈতেধারী পুরুত ডাকত আর রজ্জাক তিন ওক্ত নামাজ পড়ত, বিয়ে-সাদির সময় মোল্লা-মৌলবীকে ডেকে আনত। অন্য কোন ব্যাপারে তারা আলাদা ছিল না।

বলতে বলতে সংগীদের দিকে তাকিয়ে মতিমিঞা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'সেই দিন-কাল আর নাই মণ্ডলভাই। কালে কালে দেশের কি হালই হইল। ভাগভেন্ন হইয়া তছনছ হইল দেশ। কারো কোন লাভ হইল না।'

মতিমিঞার বাপ আর বদনরা যে আলাদা জাত ধর্মের তা বুঝতে তার সময় লেগেছিল। বুঝবার পরেও মানতে চায়নি ওই তুফানীর জন্যেই যে মন অত অবুঝ হয়ে উঠেছিল, তা তার টের পেতে বাকি ছিল না। এদিকে তুফানীও আস্তে আস্তে ডাগর হয়েছে। ছেলেছোকরাদের দিকে তাকায় আর ফিক ফিক করে হাসে। কিন্তু ভেবে হাসবার মত বুদ্ধি ওই ন-দশ বছরের মেয়ের তখনও হয়নি। কিন্তু তা

লাগে মতিমিঞার। যেমন টুকটুকে রঙ, তেমনি গড়ন, তেমনি মুখের শ্রীছাঁদ। টানাটানা নাক চোখ। পাতলা ঠোঁট, সাদা ফুলের মত দাঁতের সারি। মতিমিঞা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। দুজনের বাড়ির মাঝখানে যে বড় বাগানটা ছিল, যে বাগান এখন রায়রা কিনে নিয়েছে, সেই বাগানে আম জাম কুড়োতে তুফানী এলে আগের মত, মতিমিঞা আর তাড়া করত না। বরং হাতের ইশারায় কাছে ডাকত। কিন্তু তুফানী বড় সেয়ানা মেয়ে। সে আরো সরে গিয়ে ভেংচি কাটত। হেসে পালিয়ে আসত বাড়িতে। ঘরে তার মা ছিল না, ছিল দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসী। লোকে বলাবলি করত রাত্রে সে-ই মা সাজে তুফানীর। কিন্তু তার নিজের চরিত্র যাই হোক, বড় জাঁদরেল মেয়েমানুষ ছিল তুফানীর সেই পিসী। যেমন কাঠ-খোট্টা চেহারা তেমনি স্বভাব। সে বড় একখানা দা আর মুড়ো ঝাঁটা উঁচিয়েই রাখত। তার ভয়ে ও বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁষতে পারত না। কিন্তু মতি-মিঞাদের সংগে ছিল আলাদা সম্পর্ক। তারা বদনের দরকারের সময় সাহায্য করত, ধান ধার দিত, শস্য বোনা কি কাটার সময় বেগার দিত, ধান মলনের সময় জোড়া বলদ দিয়ে সাহায্য করত। চৌকিদারের বাড়িতে মতি আর তার বাবার আলাদা খাতির ছিল। তা দেখে মতির স্বজাতের পড়শীরা ঠাট্টা করত, 'চকিদার তোরে জামাই করবে মতি।'

মতি চটে উঠে বলত, 'করবেই তো। তোরা শালারা জ্বইলা পুইড়া মর।'

কিন্তু জ্বলে পুড়ে মরতে হল মতিকেই। দুদিন বাদে তুফানীর বাপ আর পিসী পাশের গ্রাম পীরপুরের বনমালী ভক্তের সংগে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। ভক্তদের অবস্থা ভালো। চাষের জমি ছাড়াও মিস্ত্রীর কাজকর্ম করে। ঘর তোলায় ওদের বেশ নামডাক। এই সব দেখে-শুনেই বদন মেয়েকে ও ঘরে দিল। টাকা পেল পাঁচ কুড়ি। কিন্তু নাম যেমন আছে বদনের জামাইর দুর্নামও তেমনি। বয়স বেশি, নেশাভাঙ করে। গোপনে কোথায় রাঁড়ও রেখেছে। এ সব কথা শুনে মতি-মিঞা মনে মনে বড় খুশি হল। বেশ হয়েছে, আচ্ছা জব্দ হয়েছে ওরা। শুধু দুঃখ হত তুফানীর মুখের দিকে চেয়ে। সে মুখ কেমন যের ভার-ভার। সে মুখে সেই আগের মত ফিক ফিক হাসি আর নেই। বিয়ের পর তুফানীর পিসী তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল। বলল, 'মাইয়া বড় হউক, ফলটল দেখুক তখন পাঠাব। এখন দেব না। তোমাগো জোয়ান তো এক অসুর। এখন দিলে কাচাই গিলা খাবে।'

এই নিয়ে জামাইর সংগে বদন চৌকি-দারের বেশ মনকষাকষি হল। কিন্তু মেয়েকে ওরা ছাড়ল না।

পিসী যখন গাঙের ঘাটে নাইতে গেছে তেমনি এক ফাঁক খুঁজে মতিমিঞা এসে দেখা করল তুফানীর সংগে।

'কি তুফানী, কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'সোয়ামী নাকি তোরে মাইর ধইর করে?'

'না না। কেডা কইল?'

মতিমিঞা বলল, 'কবে আবার কেডা। কয় আমার মন। তোর মুখ দেইখা কয়।'

তুফানী অস্বীকার করে বলে, 'তোমার চউখ দেখতে জানে না মেঞা।'

ছেলেবেলা থেকেই তুফানীর চোখেমুখে কথা।

মতিমিঞা বলল, 'তয় বুঝি সোয়ামী খুব আদর যত্ন করে?'

তুফানী বলল, 'তা তো করেই। কার সোয়ামীই বা তা না করে?'

মতিমিঞা বলল, 'সে আদরের এমনই ঠেলা যে, পরাণ সামলানো দায়।'

তুফানী লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল। একটু বাদে বলল, 'তুমি এখান থিকা চইলা যাও মতিমিঞা। ও সকল কথা তুমি কইও না। আমার শোনা পাপ।'

মতিমিঞার মনে মনে বড় রাগ হল। সে তো তুফানীর কাছে আর কিছু চায় না, শুধু শুনতে চায় বিয়ের পর সে সুখী হয়নি। তার এই সুখী-না-হওয়াতেই সুখ মতিমিঞার। কিন্তু ওইটুকু সুখও তুফানী তাকে দিতে নারাজ। সে কেবল বলে, 'তুমি যাও, তুমি চইলা যাও।'

যেতে তো চায় মতিমিঞা। কিন্তু যেতে পারে কই। তুফানীর মুখ তাকে টানে। দিনের মধ্যে দু-একবার ওই মুখখানা দেখতে না পারলে কাজকর্মে সুখ নেই, খেয়ে বসে স্বস্তি নেই। মতিমিঞার মনে হয়, বিয়ের পর তুফানীর মুখ যেন আরও বেশি সুন্দর হয়েছে। কি করে হল? সে কি ওর সিঁথির সিঁদুরে? গা-ভরা রুপোর গয়নায়? গলার সোনার হারের চিকচিকানিতে নাকি মনের দুঃখ আর অশান্তির আগুনে ওর দেহকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করেছে। কিন্তু তুফানী ওকে ভিতর থেকে যতই টানুক, বাইরে থেকে দু হাত দিয়ে কেবলি ঠেলে,

বলে, 'আইস না, আইস না। ভালো-বাইস না, বাইস না। জাইত মান নিয়া আমারে শান্তিতে থাকতে দাও।'

তুফানীর আরও বয়স বাড়ে, ও পুরো মেয়েমানুষ হয়ে ওঠে। রূপের গরিমায় দেহ যেন ফেটে পড়ে। আর তা দেখে দেখে হিংসায় ঈর্ষায় বুক ফাটে মতি-মিঞার।

বাপ বলে, 'মতি তুই সাদি কর।'

মতি বলে, 'বাজান এখন না।'

মা বলে, 'ক্যান?'

মতি বলে, 'আমার মন লয় না।'

মা বলে, 'ভরানাইশা, পোড়াকপাইলা, তোর মন যে কোথায় পইড়া আছে তা কি আর আমার বোঝন বাকি? আউ বাবা ছিঃ! পরের বউর পাছে পাছে অমন ঘুরে ঘুরে করিস না। মানুষ তাতে নষ্ট হয়, গোল্লায় যায়। তুই একবার মুখের কথা খসা বাজান আমি একটা ক্যান তিনডা মাইয়া তোরে আইনা দেই।'

মতি বলে, 'ও কথা কইও না মা। আর যা কবা তাই শোনব, কিন্তু বিয়া-সাদিতে আমার মন নাই।'

মতির মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তোরে যে রোগে ধরছে, কারো সাধ্য নাই সারায়। এখন আল্লার দোয়া ভরসা।'

বনমালী মাঝে মাঝে অনেক দূরে দূরে মিস্ত্রীর কাজ করতে যায়। বড় বড় ঘর তোলে। স্ক্রু বল্টু দিয়ে শক্ত করে করো-গেটের টিন লাগায়। ঢালা পেটে। দুই-তিনজন মিস্ত্রী তার হুকুমে কাজ করে। ফিরে যখন আসে বউর জন্যে তেল, সিঁদুর, আলতা আর লাল নীল হলদে রঙের বাহারের শাড়ি আনে। কিন্তু এত করেও বউর মন পায় না। বনমালী গাঁজা খায়, নেশায় তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে থাকে, গলার স্বর খসখস করে। তুফানীর এ সব পছন্দ হয় না। সে বলে, 'তুমি ওই নেশাভাঙ ছাইড়া দাও।'

বনমালী মুখ ভেংচিয়ে ধমক দেয়, 'দূর শালী। গ্রামগঞ্জে কোন্ শালা গাঁজা না খায় শুনি। নেশা না করলে এত খাটা যায়? এত পয়সা কামান যায়? আসলে মন রইছে তোর সেই মোছলার কাছে। আমারে তোর পছন্দ হবে ক্যান? আমি যা করি তাই খারাপ। আমি দুনিয়া ভইরা ঘর তুইলা বেড়াই আর ওই মোছলা তলে তলে আমার ঘর ভাঙে। বড় হাতুড়ি দিয়া ওর মাথা ভাঙব তবে ছাড়ব। বাটাইল দিয়া নাক চউখ তুইল্যা ফেইলা মুখখানারে লেপা পোছা কইরা দেব।'

তুফানী স্বামীকে থামায়, 'চুপ কর, চুপ কর। তুমি কি পাগল হইলা।'

স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়া অবশ্য মতি-মিঞা কোনদিন আড়ি পেতে শোনেনি। কিন্তু পীরপুরের বনমালীদের বাড়ির ধার দিয়ে তো আরো পাঁচ ঘর পাড়াপড়শী আছে তারাই এ গাঁয়ে এসে গল্প করে। আর সেই গল্প সাতখানা হয়ে মতিমিঞার কানে যায়। নিজের নিন্দা মন্দ শুনে রাগে অবশ্য টগবগ করে মতি। কিন্তু যে বনিবনাও হচ্ছে না এই গোপন খবরটা ওই সব গাল গল্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। আর মতি তা শুনে খুশি হয় আর ভবিষ্যতের ভরসায় থাকে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তুফানী একদিন তার কাছে ধরা দেবে, তার ঘরে এসে উঠবে, তার বিবি হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতের সেই সুখস্বপ্ন দেখে মতিমিঞা। রাত্রেও দেখে, দিনেও দেখে। ঘুম আর জাগরণ তার ওই এক স্বপ্নে একাকার হয়ে যায়।

তাই বলে মতিমিঞা যে নিজাম পাগলা হয়ে বাউল-বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায় তা নয়। গেরস্থ ঘরের ছেলে সে। সব কাজই তাকে করতে হয়। মাঠের কাজে খাটে। লাঙল চালায়, ধান পাট বোনে, কাটে ধোয়, শস্য ঘরে তোলে। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না বাপ-বেটায় দুজনে মিলে ঘরামির কাজ করে, মাটি কাটে, কাঠ চেলা করে, বড় বড় গাব গাছ ধারালো কুড়ুলের ঘায়ে চিল চিল হয়ে যায়। বাপের চেয়ে অনেক বেশি জোয়ান হয়েছে মতিমিঞা। গায়ে গতরে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে মতির বাজান সুখের হাসি হাসে। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'হারামজাদা, তুই তোর বাবার বাবা

হইছিল। এবার আমার মারে আইনা দে। আমি নাতিপুতির মুখ দেখি।'

মতি বলে, 'সবুর বাজান। আর দুইটা দিন সবুর কর। আর দুইটা পয়সার মুখ দেইখা লও আগে।' বলে আর মনে মনে আর একখানা মুখ ধ্যান করে। কবে সেই চাঁদের মত মুখ নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে ধরতে পারবে। বেহেস্তের সুখ পাবে ছেঁড়া কাঁথার তলায়। তাকে ছাড়া চৈত মাসের মাঠের মত মতির এত বড় লম্বা চওড়া বুকখানা যে খাঁ-খাঁ করে। মাঠ ফেটে চৌচির হয় তা সবাই দেখে, কিন্তু বুক ফেটে যে চৌচির হয় তা চোখে পড়ে কজনের। দুই-একজন দোস্ত শুধু মনের ব্যথা বোঝে মতিমিঞার। সেখেদের রহিমুদ্দিন, খাঁদের কাজল সর্দার তাকে প্রায়ই বলে, 'মতিভাই, তুমি একবার হুকুম দাও, ওই গাইজাল মাইজমরা মিস্ত্রীর পরিবারকে আউড়া কোলে কইরা নিয়া আসি। আইনা তোমার কোলে ফেলাইয়া দিই।'

লোভে মতির চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে। কিন্তু পরক্ষণেই মরা মাছের চোখের মত তা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তুফানী যে সাঁতাই তা চায় একথা তো সে কোনদিন বলেনি। বরং মতি এসব ইঙ্গিত দেওয়ায় সে উল্টো কথাই বলেছে। 'খবরদার মেঞা, ওদের কথা কইয়ো না। ও কথা শোনাও পাপ।' কিন্তু মতিকে দেখলে তুফানী যে জোয়ারের গাঙের মত আহ্লাদে উছলে ওঠে, তুফানী যে তার সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে, সেজেগুজে তার সামনে দাঁড়াতে ভালোবাসে, নানা ছলে মাথার আঁচল ফেলে দিয়ে শজারুর কাঁটা দিয়ে বাঁধা খোঁপাটি তাকে দেখাতে ভালোবাসে, বাপের বাড়িতে যাবার সময় কাঁচ পোকার টিপ যেদিন পরে সেদিন লক্ষ্মীর আসনের জন্যে ফুল দুর্বা তোলার ছল করে পথের ধারটিতে এসে দাঁড়ায়। এসব কি কোন পুরুষের চোখে না পড়ে পারে?

মতিমিঞার দোস্তরা বলে, 'মেঞাভাই, মাইয়ামানুষ নিজের মনের কথা নিজেই টের পায় না। তারা কেবল ঢাকে, কেবল ঢাকে। ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকে, ধরম শরম দিয়া মন ঢাকে। যে পুরুষ জোর কইরা সব পর্দা টাইনা সরাইতে পারে, বেপর্দা করতে পারে যে, মাইয়া মানুষ তার। ওরা চায় জুয়ান মরদরে। ওরা ডাকাইতের দিকে কাইত হইয়া শোয় মেঞা-ভাই, পায়ের তলায় যেমি বিড়ালরে যাও পাও দিয়া লাথি মারে। তুমি তোমার পথ বাইছা লও। হয় ডাকাইত হও, না হয় পোষা কুকুর-বিড়াল হইয়া আইটা কাটা খাইয়া থাক।'

এ তো কেবল দোস্তদের কথা নয়, মতিমিঞারই একটা মন [illegible] ভাব হয়ে

ঠোকাঠুকি করে। মন স্থির করতে পারে না মতিমিঞা।

মাঝে মাঝে বনমালী শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসে। তুফানী যখন থাকে তখনই আসে। মাঠে-ঘাটে, জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে মতিমিঞার সঙ্গে যখনই তার চোখাচোখি হয়, মনে হয় সে যেন কট কট করে তাকায়। চোখ দুটো লাল টক টক করে। হতে পারে গাঁজার জন্যেই অমন হয়। চোখে রাগ থাকলেও বনমালী কিন্তু মুখে হাসে, বলে, 'কি মেঞাসাহেব, দিনকাল কাটতেছে কেমন।'

মতিমিঞা বলে, 'ভালো।'

কিন্তু বনমালীর চাপা হাসি আর গাঁজা খাওয়া গলার তামাশা মস্করা শুনে রাগে তার গা জ্বলে যায়।

বনমালী বলে, 'ভালো হইলেই ভালো। এবার আম কাঁঠালের ফলন্টা বেশ ভালোই হইছে, না? পাকা কাঁঠালের গন্ধে গ্রাম-গঞ্জ ছাইয়া গেছে। আমার বাড়িতেও কাঁঠাল গাছ আছে মেঞা। একটা গাছে যা কাঁঠাল তা তোমারে কব কি। দেখতে যেমন বড়, ভিতরের কোয়াগুলিও তেমনি রসখাজা। দেখলে তোমার জেহবা দিয়া টস টস কইরা জল পড়বে মেঞা। আমাগো ওদিকে একটা কটা আছে। তারও জল পড়ে। শালার কটা রোজ আমার ঘরের চালে আইসা একবার কইরা হানা দেয়। কিন্তু কাঁঠালের ধারে কাছে যাইতে পারে না। শক্ত জাল দিয়া খুব কইরা ছিরা রাখছি। শালার কটা আসে আর ফিরা-ফিরা যায়। আইচ্ছা জব্দ। কি বল মেঞাসাব?'

বনমালী হাসে আর মুখ টিপে টিপে হাসে। ওর কথার মানে যে কী তা বুঝতে বাকি থাকে না মতিমিঞার। গায়ের রাগে হাত দুটো নিসপিস করে। ইচ্ছা করে তড়াক করে গিয়ে টিপে ধরে ওর গলা। যা লিকলিকে চেহারা একখানা। একবার ধরলেই ভবলীলা সাঙ্গ। কিন্তু কেন যেন হাত ওঠে না মতিমিঞার, মনে মনে এত গজরানি, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। বনমালীর বিদ্রুপ তার বুকে বর্শার মত বেঁধে। মতিমিঞা ভাবে আর একটু

স্পষ্ট করে কথা বলুক আর একটু সুযোগ তাকে দিক বনমালী আর সেই অজুহাতে মতি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলুক। কিন্তু বনমালী বড় সেয়ানা। সে মতি মিঞার চোখের ভাবভঙ্গি দেখে আর কথা বাড়ায় না আর এগোয় না, এক দু পা করে পিছোতে থাকে। মতিমিঞা মনে মনে বলে, 'যা শালা, বাইচা গেলি।'

তারপর ঘটল সেই চূড়ান্ত ঘটনা। সে ঘটনা নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত মতিমিঞাদের পাড়ায়, ঘাটে মাঠে লোকে গালগল্প করেছে, জটলা করেছে, গুজব ছড়িয়েছে, পরাণ শীল ছড়া পর্যন্ত বেঁধেছিল। সেই ঘটনার দিন এল।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মা পুজো। সে পুজো হিন্দুদের ছুতোর কামাররাই করে। কিন্তু সেই উপলক্ষে নদীতে যে নৌকা বাইচ হয়, তাতে মুসলমানরাও যোগ দেয়। তাদের নৌকাই বরং বেশি থাকে। যাদের অবস্থা বড় শখও বড় তারা নিজেরাই নৌকা কেনে। আর যাদের শখ আছে, কিন্তু টাকার জোর নেই তারা পরের নৌকায় বৈঠা বায়। গুণতিতে তারাই বেশি, দলে তারাই ভারি। মতিমিঞাও সেই দলে। নৌকা না থাকলে কি হবে বইঠাখানা তার নিজের। তার গায়ে যেমন জোর মনে তেমনি কলকৌশল। 'বাইছা' হিসেবে সবাই তার নাম করে। ভিন গাঁ থেকে লোকে তাকে বায়না করতে আসে। তারা বলে, 'মেঞা, তুমি আমাগো নায় আইস। মান নাই মার কাছে, মান নাই গাঁর কাছে। তোমারে আমরা টাকা দেব, কাপড় দেব, উড়নি দেব।' কিন্তু প্রতিবেশী মেহের মুন্সীর ছেলে সোনা মুন্সীর সংগে তার লেংটা বয়স থেকে দোস্তি।

তাদের আছে নৌকা। সোনা মুন্সী মতিমিঞাকে অত সব দেয় না, কিন্তু জিতলে পরে ভাই বলে দোস্ত বলে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাকে কি ছেড়ে যাওয়া যায়। মতিমিঞা মুন্সীদের নৌকোতেই বেশিরভাগ ওঠে। কোন কোনবার বন্ধুকে বলে কয়ে বাইরে যায়। নাম যশ একটু বাড়িয়ে নেবার জন্যে। মনে মনে ভাবে, তার যশ তুফানীর শ্বশুরবাড়িতে তার কানে গিয়ে পৌঁছুক, তার কানের সোনা হোক, গলার হার হয়ে থাকুক। যশ চায় মতিমিঞা। কিন্তু সোনা মুন্সী সেবার তাকে ছাড়ল না, হাত ধরে তার নৌকোয় নিয়ে তুলল। সেবার নদীতে খুব নৌকা হয়েছিল। পঞ্চাশ ষাটখানা তো হবেই। আর সেই বাইচ দেখবার জন্যে বিশ পঁচিশখানা গাঁয়ের লোক জড় হয়েছিল কুমার নদীর তীরে। তীরে মানে নৌকায়। বর্ষার সময় ডাঙা বলে কোন পদার্থ নেই। সব জল আর জল। মাঠ ঘাট হাট বাজার সব জলের নিচে। কিন্তু মানুষ তো আর মাছ নয় যে জলের নিচে থাকতে পারবে, ডাঙা তার চাই-ই। ডিঙি নৌকো, পানসি নৌকো, দাঁড়ের নৌকো এক নৌকোই কত রকমের। আবার ছোটর দিকে যাও, কলার ভেলা, তালের ডোঙা তাও আছে। কোন রকমে একটা কিছুকে ধরে একটুখানি জলের ওপর ভেসে থাকতে পারলেই হল। তাহলেই রাজা। ডাঙার রাজা মানুষ। কোন রকমে মাথাটা জাগিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারলেই তাকে আর পায় কে।

তুফানীর কথা ভুলে গিয়ে মতিমিঞা সংগীদের কাছে সেদিনের নৌকা বাইচের বর্ণনা আরম্ভ করল। চেয়ে দেখল সংগীদের হাতের কাস্তে সমানে চলছে। তাদের ডিঙি নৌকোখানা সোনার বরণ পাকা ধানে বোঝাই হয়ে এল বলে। মতিমিঞা হেসে বলল, 'আর এক ছিলুম তামুক খাও মণ্ডল ভাই। তেমন বাইচ আইজকাল আর হয় না। হবে কেমনে। মাইনষের মনের সেই ফুর্তিই নষ্ট হইয়া গেছে। আর তত মানুষই বা কই। হিন্দুরা চইলা গেল। কতজনে না বুইঝা গেল, বিনা ডরে ডরাইল। কানা হইয়া গেল দেশটা। কানা ছাড়া কি। হিন্দু আর মোছলমান একই সুন্দরী মাইয়া মাইনষের সুর্মা পরা দুই চউখ। এক চউখ কানা হইয়া গেলে কি আর এক চউখের শোভা থাকে। সেকালে খুব নৌকা বাইচ হইত। মানুষের মনের আনন্দ আহ্লাদ যেন গাঙের জলে গইলা গইলা পড়ত। সেবারও খুব ফুর্তি হইছিল। সকাল থিকাই মুন্সীগো নাও ধোওয়া পাকনা শুরু করলাম। সে কি নাও একখানা। ষাইট হাত লম্বা। আর তার কি বাহারের গলুই। দুই পাশে বড় বড় বিশ পঁচিশটা কইরা পিতলের চউখ। মাইনষে সোনার চউখে সেই দিকে চাইয়া থাকত। দেখত সোনা। খাজুরের সলতা দিয়া আমরা বাইছারা সেই নাওরে ঘইষা ঘইষা চকচক কইরা ফেললাম। তেল পরাইলাম, সিন্দুর পরাইলাম। নাও তো না যেন মাইয়া, তরী তো না যেন পরী। আর সে কি রাঙা গলুই মেঞা ভাই। জলে নামাইয়া দুই চাইরখানা বইঠা ছোয়াইলেই সে নৌকার লম্বা সরু গলুই থরথর থরথর কইরা কাপে। যেন ষোল বছরের মাইয়া পোলার উছলা বুকের ডগা। বাইছারা মিলা নাও নিয়া চললাম ঘাটে। আসল বাইচ ডাঙগার বন্দরে। গাঙে আর জল বইলা কিছু নাই সব নৌকা। বন্দরে বাড়িঘর দোকানপাট বইলা কিছু নাই। সব কালা কালা মাথা। পঞ্চাশ হাটের মানুষ আইসা এক ঘাটে জোটছে। ভিড় হবে না। পুলিসের বোট ঘোরতে লাগল।
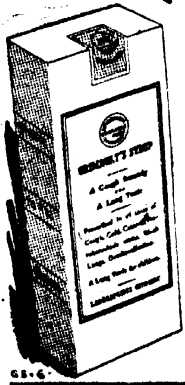
বিবাদ বিসংবাদ লাগলে তারা থামাবে। মুন্সেফবাবু, বড় বড় উকিলবাবুদের মাইয়া পোলারা পানসিতে ওঠল বাইচ দেখবার জন্যে। অন্য দিন তাদের দেখলে মানুষ ভুলুক টুলুক দেয়। কিন্তু আইজ নৌকার দিকেই মাইনষের চউখ। আইজ আর নাওয়ের চাইয়া সেরা মাইয়া কেউ নাই। খুব জোর বাইচ হইছিল সেবার মণ্ডল-ভাই। মবদুলের মনে না থাকলেও তোমার একটু একটু মনে থাকবার কথা। ষাইট পঁয়ষট্টিখান বাছারি নৌকা নামল। ছোটখাট নৌকা আর সেদিন গোণে কেডা। খোদার দোয়ায় অমরাই জেতলাম। পাচখানা সেরা বাইছের নৌকার ভিতর থিকা মুন্সীগো নাও তরতর কইরা বাইর হইয়া আসল। মুন্সেফবাবুর বড় কলসটা আমরাই পুরস্কার পাইলাম। সোনা মুন্সী নাচতে নাচতে আমারে আইসা জড়াইয়া ধইরা কইল, 'দোস্ত, এ কলস তোমার। এ নাওয়ের তুমিই বড় বাইছা।' দুইজনে ঘামে নাইয়া উঠছি। গায়ের সেই ঘাম আর মনের সেই আহ্লাদ যেন আঠার মতো আমাগো দুই-জনরে লাগাইয়া রাখল। খুব ফুর্তি কইরা আমরা ফিরা চললাম। বাইছরা কেউ গান গায়, কেউ নাচে, কেউ তাল দেয়, কেউ হৈ হৈ করে। দশ টাকার মিঠাই কিনা দিছে সোনা মুন্সী। তাতে তো প্যাট ভরে না। চিড়া গুড়ও আছে। খাইতে খাইতে গান গাইতে গাইতে চলছি। কাপুইড়া সদরাদির মোল্লাদের ঘাটের কাছাকাছি আইসা ঘটল এক কাণ্ড। পীরপুরের তালুকদারগো নৌকার গলুই অমাগো নৌকার ওপর উইঠা পড়ল। তারা বলে, 'তোগো দোষ', আমরা বলি, 'তোগো দোষ'। শুরুতে তর্কাতর্কি, গালাগালি। তারপর দুই নৌকার খোলের ভিতর গুণাই রামদাও, সড়কি, বর্শা, কাউরা বাইর হইয়া পড়ল। আমরা বাইছারা কেউ বইঠা থুইয়া দাও নিলাম, বর্শা নিলাম, কেউ কেউ বইঠারেই অস্তর করলাম হাতের। কাইজা খুব একচোট হইল। খুন কেউ হইল না। তবে জখম খুব হইল। তালুক-দাররাও মোছলমান। এ কাইজা হিন্দু-মোছলমানের কাইজা না। পীরপুর চণ্ডী-পুরের কাইজা। ও নৌকায় হিন্দুও আছে, মোছলমানও আছে। এ নৌকায়ও তাই। তারপর আন্ধারে ঠিক তাহত করতে পারলাম না, ও নৌকার এক কাউরা আইসা আমার ঠিক কান্ধের ওপর পড়ল। আর একটু হইলেই গলাডা এফোড় ওফোড় হইয়া যাইত। খুব জোর লাগছিল ভাই। সেই পেরথম কাইজা, সেই পেরথম জখম। পানিতে পইড়া যাইতেছিলাম, সোনা মুন্সী আইসা জড়াইয়া ধরল। এবার আর নাচতে নাচতে না। এবার আর ঘাম না, রক্ত। আমাদের নৌকায় আরো জন দশেক জখম হইল। বাইচে আমরা জেতলাম, কিন্তু কাইজায় আমরা হাইরা গেলাম। সোনা মুন্সী আমারে ধইরা আইনা আমার মায়ের কাছে দিয়া গেল। দশা দেইখা মার সে কি কান্দন। আমার সেই কান্ধের ঘাও শুকাইতে তিন মাস লাগছিল। দাগ? হ দাগ এখনও আছে। পরে শোনলাম, পীরপুরের সেই নৌকায় বনমালীও ছিল। তার উসকানিতেই নাকি—। সাচা-মিছা জানি না, লোকে তাই কওয়া-কওয়ি করতে লাগল।

সেই কাজিয়ার পর কাঁধের ঘায়ের জন্যে মতিমিঞা সারা বর্ষাকালটা ভুগেছিল। গোড়ার দিকে খুব জ্বর হত, যন্ত্রণা হত। প্রায় সারা রাত চীৎকার করত কষ্টে। তার-পর আস্তে আস্তে সব কমে আসতে লাগল। মা আগে কাছে নিয়ে বসে থাকত। এখন কাজকর্মে যায়। বাপও কাজে বেরোয়। পাট কাটে, পাট ধোয়। একা একাই করে। মতিমিঞা এই সময়টায় বিছানায় পড়ে থাকায় ভারী লোকসান হল সংসারের। শুয়ে শুয়ে সে তুফানীদের খোঁজখবর করে। চৌকিদারের ঘরেও অসুখ বিসুখ। থানা থেকে সে ছুটি নিয়েছে। সে আর তুফানীর পিসী দুজনেই ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছে। ওষুধ পথ্য দেওয়ার কেউ নেই। তুফানী পীরপুরে শ্বশুরঘর করছে। তার নাকি ছেলেপুলে হবে। তাকে তারা বেশি পাঠাতে চায় না।

অনেক বলে কয়ে তুফানীর পিসী তাকে কদিনের জন্যে আনিয়েছে। সাধ দেবে মেয়েকে। পাঁচ মাসে দিতে পারে নি, সাত মাসে দিতে পারে নি, এই ন' মাসেও যদি

মা দেয় কখন দেবে। মেয়েকে নতুন শাড়ি কিনে দেবে, পিঠে পায়েস করে খাওয়াবে। হিন্দুদের যা নিয়ম। একথা শুনে মতির মা এক হাঁড়ি দুধ পাঠিয়ে দিল। ক্ষীরের মত মিষ্টি আর ঘন দুধ দেয় তাদের কালো গাইটা। সেই গাইয়ের দুধ। সেই দুধের পায়েসে সাধ খেল তুফানী। পাড়ার মেয়েরা উলু দিল। কল কল কল কল কল কল। মতি শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি মা।' মতির মা হেসে বলল, 'ও বাড়ির তুফানী সাধ খায়। জোকারে জোকারে সেই কথা পাড়া ভইরা জানাইতেছে। বাজান, তুই এবার শাদি কর।'

দিন দুই পর সেদিন বিকালবেলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে মতিমিঞা। সেও এই কার্তিক মাস। মাঠের ধান পেকেছে। কেউ কাটছে, তাদের নাবী ফসল, তারা এখনো কাটতে শুরু করেনি। বর্ষার জল শুকোতে শুরু করেছে, তবে এখনো পুরোপুরি শুকোয়নি। সারা পাড়াটা নিস্তব্ধ। হাট-বার। পুরুষেরা সবাই হাটে গেছে। মেয়েরা যার যার ঘরের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ মতিমিঞার চোখে পড়ল বাঁশের সাঁকো বেয়ে একটি মেয়ে পা টিপে টিপে গুটি গুটি এগোচ্ছে। সাঁকোর নীচে এখন আর অথৈ জল নয়, হাঁটু পর্যন্ত ঘোলা জল। তার ভিতর থেকে ছোট ছোট মাছ চাঁদা-চুঁচড়ো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মতিমিঞা দূর থেকেই মেয়েটিকে চিনতে পারল। তাকে সে এতকাল ধরে দেখে আসছে শুধু রক্তমাংসে নয়, রাত্রের খোয়াবেও যাকে সে দেখেছে, তাকে সে চিনতে পারবে না? সাঁকো পার হয়ে তুফানী মতিমিঞাদের পারে চলে এল। বাড়িতে ঢুকবার পথে এক ঝাড় মোরগবল্লী গাছ। লাল ফুলে গাছ ভরে গেছে। এই ফুল তুফানী ছেলেবেলায় বড় ভালোবাসত। এ ফুল হিন্দুদের কোন পুজোয় লাগে না। শুধু দেখতে বাহার বলে তুফানী সেগুলি নিত। আজও লোভ সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল তুফানী ছিঁড়ে নিল। তা দেখে মতিমিঞাদের লাল আর কালো মেশানো বড় মোরগটা তুফানীর দিকে কক কক করতে করতে এগিয়ে গেল। হয়ত ভাবল তার ঝুঁটিটাই বুঝি তুফানী ছিঁড়ে নিয়েছে। একটু এগিয়েই গোবরলেপা উঠান। এক-ধারে হলদে রঙের পাকা ধানের আঁটি। মলন দেওয়ার জন্য জড়ো করে রেখেছে মতির বাবা। সেই ধানের আঁটির পাশ দিয়ে পাকা ধানের রং গায়ে আর মুখে মেখে হিন্দুদের লক্ষ্মী প্রতিমার মত তুফানী মতিমিঞাদের নতুন তোলা টিনের ঘরখানায় এসে ঢুকল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকল, 'মতি!'

আর তুফানীর মুখে নিজের সেই নাম শুনে মতিমিঞার বুকের মধ্যে তুফান ডেকে উঠল। রক্তের মধ্যে তা দাপাদাপি শুরু করল। এতকাল বাদে ফের তার কাছে কেন এসেছে তুফানী। এবার কি তার ধরা দেওয়ার সাধ হয়েছে? মতির দিকে মন ঝুঁকেছে?

মতিমিঞার বাপ গেছে হাটে, মা গেছে সিকদার বাড়িতে চিড়া কোটতে। তক্তাপোসের পাতলা কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে মতি আজ একাই শুয়ে আছে। ছেঁড়া কাঁথার তলায় লাখ টাকার স্বপ্ন কি আজ সত্য হয়ে উঠল?

মতি সাড়া দিয়ে বলল, 'এই যে আমি, এইখানে আইস।'

তুফানী হেসে বলল, 'বাব্বা, দিনেও ঘরের মধ্যে তোমার অন্ধকার?'

মতি বলল, 'হ তুফানী। দিনেও আমি রাইতের আন্ধার নিয়া বাস করি। তারপরে এতকাল পরে কি মনে কইরা? বইস।'

নিজে উঠে বসে মতি হাত দিয়ে তক্তা-পোশের ধারটা তুফানীকে দেখিয়ে দিল। রোগীর বিছানা। বেশ একটু ময়লা হয়েছে। বিড়ির আগুনে চাদরের খানিকটা জায়গা পুড়ে গেছে। ঘরদোরের হাল দেখে মতির নিজেরই সরম হল। ও তো জানে না তুফানী আজ আসবে। তাহলে ওর জন্যে ফুলের শয্যা বিছিয়ে রাখত।

অনুরোধ সত্ত্বেও তুফানী বসল না। একটু দূরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমারে দেখতে আইলাম।'

মতিমিঞা বলল, 'কি দেখতে আইলা? কাতরার কোপে মইরা গেছি না আছি, তাই?'

তুফানী বলল, 'কি যে কও মইষের মত মানুষটা দুই এক কোপ খাইলেই যদি মরে তা হইলে জাইত থাকে নাকি? সাইরা ওঠ, আর কত কাইজা করবা, কোপ খাবা, কোপ দেবা—।'

মতিমিঞা দেখতে লাগল তুফানীকে। ওর মুখে পাকা ধানের রঙ, শাড়িতে কাঁচা ধানের বরণ।

তুফানী একটু হেসে বলল, 'শিগ্‌গির আর আমার আসা হবে না। আটকা পইড়া যাব। ওরা আমারে আটকাইয়া রাখবে। তাই দেখতে আইলাম। শোনলাম অসুখ, শোন-লাম জখমে খুব কাবু হইছ। শুইনা এত ভাবনা হইছিল। এখন তো আর জ্বরজারি নাই? কি কও?'

মতিমিঞা বলল, 'আছে কি না আছে? দেখনা গায়ে হাত দিয়া? নাকি ছুইতেও দোষ?'

তুফানী গায়ে হাত দিয়ে দেখল না। শুধু হাতের সেই ফুলগুলি মতিমিঞার বিছানার ওপর রেখে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, 'তোমার ফুল তোমারেই দিয়া গেলাম।'

মতিমিঞা লক্ষ্য করল সেই রাঙগা রাঙগা মোরগবল্লী ফুলের রঙ তুফানীর সিঁথির সিঁদুরে, তার কপালের গোল ফোঁটায়, তার পানের রসে আর রঙে রাঙানো তুলতুলে দুটি ঠোঁটে। তুফানী নিজেই এক মোরগ-বল্লী।

ধান কাটা বন্ধ রেখে মতিমিঞা তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না মণ্ডলভাই, আমি তার হাতখানা সংগে সংগে চাইপা ধরলাম। কইলাম আমার ফুল আমিই নিলাম তুফানী। আমি আর তারে ছাইড়া দেব না।

সে কইল, কি কর মেঞা, কি কর। তোমার কি আক্কেল বুদ্ধি সব গেছে। আমি কইলাম, আক্কেল বুদ্ধি নিয়া ভালোবাসার মানুষরে পাওয়া যায় না, সব খোয়াইয়া, তারে পাইতে হয়। আমি একটানে তার বুকের কাপড় উদলা কইরা ফেললাম। তুফানীর আমারে থামাবার শক্তি ছিল না, চেঁচামেচি করবার শক্তি ছিল না, বোধ হয় সরমে বাইক্য বন্ধ হইয়া গেছিল। সে হাত দিয়া নিজের চউখ ঢাকল। কিন্তু আমার চউখ ঢাকবে কেডা। তখন যে সাক্ষাৎ শয়তান ঢোকছে আমার শরীলে। সে আমার সব লাজ-লজ্জা হইরা নিছে। এতদিন আমি কেবল দূর থিকাই দেইখা আইছি। ধরি নাই, ছুই নাই, স্বাদ নিই নাই। আমি এক জোড়া পাকা বেলের কাছে কাউয়া হইয়া রইছি। আইজ তা ক্যান থাকব! আইজ ক্যান ছাইড়া দেব? আমি ছাড়লাম না, ধরলাম। আমি দুই হাতে দুই সোনার বাটি তুইলা ধরলাম। তুফানীর

মুখে কথা নাই। ও যেন মাটি হইয়া গেছে, পাথর হইয়া গেছে। কিন্তু আমি মাটি না, পাথর না, আমি আগুন, আমি তুফান। আমি আর এক টানে তার শাড়ির সবটা খুইলা ফেললাম। প্যাট তো না একটা উপুড় করা ধামা। সোনার ধামা। কিন্তু আমি তখন সোনার তামা দেখছিলাম, পেতল দেখছিলাম ভাই। হিংসায় আমার বুকটা জইলা ওঠল, পুইড়া ওঠল। কাতরার কোপটা এবার- আর কান্ধে না, পিঠে না, এক্কেবারে বুকের মইধ্যেখানে আইসা বেন্ধুল। পরের পোলা প্যাটে নিয়া, জয়-ঢাকের মত প্যাট নিয়া ও আমার সংগে আইজ তামাসা করবার জইন্যে আইছে। ওয়ার তামাসা আমি ছুটোইয়া দেব। আমি চউখ তুইলা ফের ওপরের দিকে চাইলাম। পাকা বেল, সোনার বেল। আমি জোরে খুব জোরে টিপা ধরলাম দুই বোঠা। আর যেই না ধরা দুই দিক থিকা দুই দুধের ধারা ছুইটা আসল। আমার চউখের মধ্যে গেল, মুখের মধ্যে গেল, জেহ্বায় লাগল। আমার মুখ দিয়া বাইর হইয়া গেল, আল্লা, আল্লা। এবার তুফানী হাইসা ফেলল। সে চউখের ঢাকনি তুইলা নিয়া আমার দিকে হাইসা চাইল, হাইসা কইল, 'কল্লা কি মেঞা। ও যে শিশুর খাইদ্য, পোলাপানের সুধা।' আমার পিঠে যেন বেত পড়ল, ঘোড়ার পিঠে যেন চাবুক পড়ল মণ্ডলভাই। কিন্তু চাবুক খাইয়া ঘোড়া আর ঝড়-তুফানের মত দৌড়াইল না। ঠায় খাড়াইয়া রইল। আমি আস্তে আস্তে তারে ছাইড়া দিলাম। হাত সরাইয়া নিলাম, চউখ সরাইয়া নিলাম। মুখ ফিরাইয়া কি যেন কইতে গেলাম, কথা বাইরাইল না। তুফানী শাড়ি-খানা কুড়াইয়া নিয়া ফের পরল, পইরা আস্তে আস্তে চইলা গেল। আমি যে তারে অত সহজে ছাইড়া দিছিলাম সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে, আমি কিছু করবার আর বাকি রাখি নাই। কিন্তু এই ধান হাতে কইরা, আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া সূয্যি সাক্ষী কইরা তোমারে আমি কইতেছি মণ্ডলভাই, আমি তার আর কোন ক্ষেতি করি নাই। তবু তো সে রইল না।

তুফানীর সোয়ামী বনমালী আর তার বাপ দুইজনেই হাট থিকা একসংগে আসল। বউর জইন্যে বনমালী ময়ূর মার্কা গন্ধ তেল, নতুন নীলাম্বরি শাড়ি নিয়া আইছে। নিয়া আইছে গরম গরম এক সের জিলাপি। তুফানী জিলাপি বড় ভাল খায়। সাধন্তির সাধ, কত জিনিসই তার খাইতে ইচ্ছা করে। বাইছা বাইছা মাছ-তরকারি, পান-সুপারি সব নিয়া আইছে। কিন্তু আইসা দেখে বউ নাই ঘরে। অমনিই তার মুখ অন্ধকার। পিসী, সে গেল কোথায়? পিসী কাঁথা মুড়ি দিয়া জ্বরে কাঁপে। সে কয়, আছে ধারে-কাছেই। যাবে আর কোথায়। তুমি বইস, জিরাও, হাত-মুখ ধোও, পান তামুক খাও। সে আইল বইলা। কিন্তু বনমালী তারে তাল্লাস কইরা আর কোন জায়গায় পাইল না। তারপর দেখল সাঁকোর ওপর দিয়া পা টিপা টিপা আসতেছে। নয় মাইসা পোয়াতী আসতে কি আর পারে। পায়ের তলায় একটা বাশ। আর হাতে ধরবার জন্যে সরু একটা তল্লা বাশ মাথার ওপর দিয়া বান্ধা। ধইন্য সাহস ছিল তুফানীর। আমি যেমন তার পার হইয়া আসা দেখছিলাম, তেমনি পার হইয়া যাওয়াও দেখছিলাম। তারপর আর দেখলাম না। কেবল একটা চীৎকার শোনলাম। সে চীৎকারে আকাশ ফাটে, পিরথিমি ফাটে, মানুষের বুক কি তার চাইয়া শক্ত মণ্ডল ভাই, শালার হারামী শুয়োরের বাচ্চা বোনা মিস্ত্রী করল কি জান? মাইয়াডারে সাঁকোর ওপর থিকা নামতে দেওয়ার তর সইল না তার। নামতে না নামতেই সে আইসা তার চুলের মুঠ ধরল। আহা কি চুলের গোছাই না তার ছিল। যেমন গোছে বড়, তেমনি লম্বায় বড়, আর কি মিশমিশে রঙ। চুল তো না আষাঢ় মাইসা আকাশ-ছাওয়া মেঘ। দেইখা চউখ জুড়াইয়া যায়। সেই চুল ধইয়া বোনা শালা তারে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল। এসব কথা আমি পরে শুনছি। ঘরে নিয়া আউলাপাথারি এই লাথি। লাথির পর লাথি, লাথির পর লাথি। চকিদার আইসা এক হাত ধরল তার বুইন কাথার তলা থিকা কাপতে কাপতে উইঠা আইসা আর এক হাত ধরল, 'কর কি জামাই কর কর কি। পোয়াতী মাইয়ার গায়ে লাথি মার, এ কি আক্কেল তোমার।' জামাই কইল, 'মোছলা ওয়ারে পোয়াতী করছে। ওয়ার প্যাট আমি খসাইয়া ছাড়ব।' চকিদার তখন আইসা সাধের জামাইর ঘাড় ধরল, চউখ রাঙগাইয়া কইল, 'খবরদার, আমার মাইয়া আমি মোছলারেই দেব। তবু তোমার মত ডাকাইতকে দেব না। আমার বাড়ির থিকা এখনই তুমি বাইর হইয়া যাও।' বনমালী সেই রাইতেই চইলা গেল। কিন্তু তুফানীর ব্যথা আর যায় না। সারা রাইত সারা দিন যাতনায় ছটফট করতে লাগল মাইয়া। দাপাইতে লাগল। চকিদার দাই আনল, ডাক্তার আনল। ওষুধ দিল, ইনজিক্শান দিল। তারপর সব শান্তি হইল সন্ধ্যার সময়।
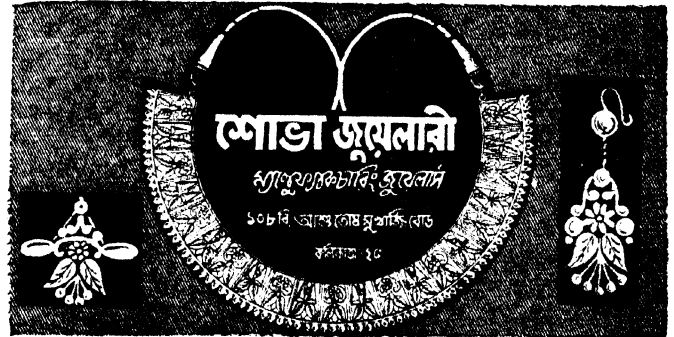
তুফানী আর কাতরাইল না, আর কথা কইল না।"

মবদুল আর বিহারী দেখতে পেল মতি-মিঞা ভিজে হাতের পিঠ দিয়ে দুটো ভিজে চোখ মুছে নিচ্ছে।

চৌকিদার থানা পুলিস কিছু করল না। কেলেংকারীর ভয় তারও আছে। সেই রাত্রেই মেয়েকে তারা কালীখোলার শ্মশানে নিয়ে গেল। তুফানী ফের মাথায় সিঁদুর পরল, পায়ে আলতা পরল, তারপর বুড়ো বাপের কাঁধে উঠে চলল তার নিজের দেশে। যে দেশে কেলেংকারীর ভয় নেই, জাতজন্মের ভয় নেই। মতিমিঞা ছুটে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তার বাপ তাকে যেতে দিল না, বলল, 'ওরা এখন ক্ষ্যাপা কুত্তার মত হইয়া রইছে। তোরে দেখলে আর থোবে না।' ঝাড়া দিয়ে বাপের হাত ছাড়িয়ে নিল মতিমিঞা, কিন্তু মায়ের হাত ছাড়াতে পারল না।

তারপর শেষ রাত্রে ঘুমন্ত বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মতি-মিঞা। ঘাটের ছোট ডিঙিখানা খুলে নিল। সারা পাড়াটা নিঝুম। চৌকিদার বাড়িও শান্ত। অনেক হৈচৈ আর কান্নাকাটির পর তুফানীর বাপ আর পিসিও বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়েছে। খালের ভিতর দিয়ে ডিঙি নৌকোখানা নিয়ে চলল মতিমিঞা। হাত যেন অবশ। বৈঠা জলে পড়ে কি না পড়ে। এতো আর সেই বাইচের নৌকো নয়। ঘোষেদের জংলা ভিটে ঘেঁষে জোলাদের পোড়ো ভুতুড়ে মসজিদটার ধার দিয়ে, ভেসাল পাতা জেলেদের ঘাট পেরিয়ে মতি-মিঞা হিন্দুদের কালীখোলার শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। একবার শেষ দেখা দেখবে। এখন আর দেখবার কিছু নেই। চিতায় জল ঢেলে লোকজন নিশ্চয়ই অনেক আগে চলে এসেছে। তবু মতিমিঞা সেই মাটিটুকু ছুঁয়ে দেখবে, খানিকটা ছাই লুকিয়ে লুকিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। তারপর কাল ভোরে যাবে পীরপুরে। বোনা শুয়োরকে খুন করে তবে ছাড়বে। আর তার ভয় কিসের। জেল ফাঁসিকে সে আর ডরায় না।

মতিমিঞা ডিঙি ভিড়িয়ে রাখল ঘাটের কাছে। গাঙের তীরে শ্মশান। বর্ষার সময় জলে ডুবু ডুবু হয়। কোন কোনবার তলিয়েও যায়। কার্তিক মাসে জল অনেক সরে গিয়ে তুফানীর জন্যে জায়গা করে দিয়েছে। কতকগুলি পোড়া কাঠ আর একটি নতুন মাটির কলসী। আর কিছু নেই। শ্মশানের ওপর উত্তর দিকে ছোট একখানি টিনের ঘর, হিন্দুদের কালীমন্দির। আর তার সামনা-সামনি দক্ষিণ দিকে একখানি দোচালা ঘর। শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা। বৃষ্টি বাদল নামলে সেখানে এসে তারা দাঁড়ায়। তামাক বিড়ি টানে।

ঘাটে ডিঙিখানা রেখে মতিমিঞা চিতার দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখল ছায়ার মত কি যেন একটা সেখানে নড়াচড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে মতিমিঞার সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল। সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল, গা কাঁপতে লাগল থর থর করে।

তখনকার সেই অবস্থাটার কথা সংগীদের কাছে বর্ণনা করে মতিমিঞা বলল, 'শ্মশানে যখন আসছিলাম, তখন গোয়ারের মত ছুইটা আসছিলাম। তখন মনের মইধ্যে ডয়-ডর কিছু ছিল না। প্রাণডা কেবল তুফানী তুফানী কইরা অস্থির হইছিল। আমিও তুফানের মতই ছুইটা আসছিলাম। কিন্তু আইসা চিতার ওপর সেই কালা ছায়া দেইখা আমার রক্ত একেবারে ঠান্ডা হিম হইয়া গেল। এ তো আর কিছু না শ্মশানের ভূত। হিন্দুগো দেবদেবতা মানা আমাগো নিষেধ। মানলে গুণা হয়। কিন্তু তাই বইলা কি ভূতপ্রেত আমাগো ছাইড়া দেয়? না তাগো না মাইনা পারি? কোন একখানা অস্তর আমার হাতে নাই। ফকিরের এক টুকরা গাছগাছড়া পর্যন্ত নাই সাথে। বোঝ মনের অবস্থাডা। তবু কোন রকমে খোদার নাম নিয়া সাহসে ভর করা চকিদারের মতই একটা হাক দিলাম, কেডা? ওখানে কেডা? সেও কাপা কাপা গলায় চি চি কইরা ওঠল কেডা? তুমি কেডা? গলা শুইনা তখন আমি ব্যাপারটা বোঝতে পারলাম। ভূত না প্রেত না, এ তো সেই শালার পীরপুরের বনমালী। সেও বোঝল, সেও আমারে চেনল। বোঝতে পারলাম সেও যে জন্যে আইছে, আমিও সেইজন্যে আইছি। বোঝতে পারলাম সেও যা চায়, আমিও তাই চাই। ডাক ছাইড়া কান্দতে চাই মন্ডলভাই, লাজ-লজ্জা ছাইড়া চিল্লাইতে চাই। তারপরে সেই গাঙের ধারে, শেষ রাইতের আন্ধারে সেই নতুন চিতার ওপরে আমরা দুইজনে দুই-জনের দিকে টাউ হইয়া চাইয়া রইলাম। আমাগো পায়ের নিচে তাপ, বুকের মধ্যে তাপ। তুফানীর চিতা নেবল, কিন্তু আমরা দুইজন জ্বলতে লাগলাম। একজন হিন্দু একজন মোছলমান, একজন সোয়ামী একজন জার, একজন খুনী আর একজন লুচো বদমাইস, কিন্তু দুইজনেই খাড়াইয়া খাড়াইয়া সমানে পোড়তে লাগলাম। তারপর রাইত ভোর হইলে গাঙে নাইমা একটা কইরা ডুব দিয়া যার যার গ্রাম-ঘরে ফিরা আসলাম।

অনেকদিন বিবাগী হইয়া এদেশে ওদেশে ঘোরলাম। উত্তর দক্ষিণ কোন দিক বাদ রাখি নাই। পাচ বছরের মধ্যে আর বিয়া-সাদি কিছু করলাম না। তারপর মার মাথা কোটা-কুটির চোটে সবই করতে হইল। ঘর-সংসারে থাকতে গেলে মানুষরে সবই করতে হয় মন্ডলভাই। বনমালীও বিয়া করছে, তারও ছাওয়াল পাল হইছে। তবে বেশি না, গন্ডা খানেক।

আমার বউডা ভাই বছর-বিয়ানী। বিয়াইয়া বিয়াইয়া তার আর সাধ মেটে না। বেরক্ত কইরা মারল। কিন্তু যখন পোয়াতী হয়, আমি তারে খুব আদরযত্ন করি। যা খাইতে চায় আইনা দেই। তারপর আতুড়-ঘরে যাইয়া যখন সে গোঙায়, ঘরের খুটি ধইরা কাতরাইতে থাকে, কোকাইতে থাকে, আমার সেই তুফানীর কথা মনে পড়ে। পরানডা হু হু কইরা ওঠে। কি আর করব, উপায় তো কিছু নাই। ঘরের দুয়ারে খাড়াইয়া খাড়াইয়া আনমনা থাকবার জন্যে তামুক টানি, মনে মনে আল্লার নাম করি আর আমার বিবির কাতরানির মধ্যে আমার সেই পেরথম ভালোবাসার গোঙানি শুনি। সে গোঙানির শেষ নাই মন্ডলভাই, দুনিয়াদারিতে গোঙানির শেষ নাই।'"

ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভরা নৌকোয় উঠল। সূর্য হেলে পড়েছে। মবদুল লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নৌকো-খানা খালের ভিতরে নিতে লাগল। কিসের একটা ভয় আর আশংকায় তার মনটা যেন কুঁকড়ে রয়েছে। একটু পরে সে মনের কথাটা খুলেই বলল, একটু হেসে মতি-মিঞার দিকে তাকিয়ে সে বলে ফেলল, 'আপনার ওই কেচ্ছা আইজ না কইলেই ভালো করতে বড়মেঞা।'

মতিমিঞা চমকে উঠে মবদুলের দিকে তাকাল, 'ক্যান রে?'

তারপর তার আশংকার কথাটা বুঝতে পেরে বলল, 'ওঃ! তোর ভয় নাই মবদুল, আল্লার দোয়ায় কোন ভয় নাই। তুই গিয়া ছাওয়ালের মুখ দেখবি। সে আমার অপয়া নারে, তার পয় আছে। সে ভারি পয়মন্তী।'

এরপর আর কেউ কোন কথা বলল না। সরু খালের ভিতর দিয়ে ধান বোঝাই নৌকো গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলল।

# বিষ
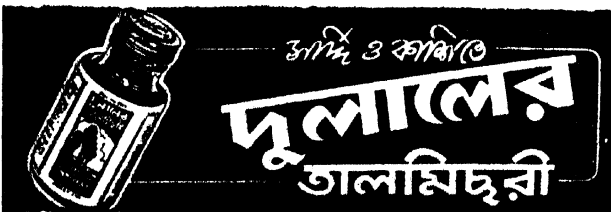
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

'ওটা বন্ধ করে দাও, মা।'

'কেন, ভাল লাগছে না?'

'ন্—না ঃ।'

চারুশীলা উঠে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসলেন। কি একটা সেলাই করছিলেন। কিন্তু তখনই সেটা আবার হাতে নেন না। সেটার দিকে চোখ যদিও,—তাকিয়ে একটু সময় ভাবেন।

'খেলা খুব ভাল হচ্ছে বলে মনে হয় না, শুনলাম তো কতক্ষণ।'

চারুশীলা চোখ তুলে ছেলের মুখের দিকে তাকান।

'কার খেলা ছিল?'

'এরিয়ান্স রাজস্থান।'

'তা শেষ তো হয়নি, শেষ না হলে খেলার হার-জিৎ বোঝা যায়?' চারুশীলা ম্লান হাসলেন।

মাধব মার চোখের দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্ষীণ গলায় হাসল।

'না তা অবশ্য বোঝা যায় না, লাস্ট হুইসেল পড়ার সময়ও গোল হতে পারে।' বলে মাধব দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। আধশোয়া হয়ে বসে হাতের তেলোর ওপর চিবুক রেখে খেলার খবর শুনছিল, রেডিও বন্ধ হতে মাথাটা বালিশের ওপর এলিয়ে দিল। চারুশীলা কথা না বলে সেলাইটা হাতে তুলে নেন।

'মা!'

'কি।' চারুশীলা আবার চোখ তুললেন কি বলতে গিয়ে ছেলে থেমে আছে।

'কি বলছিলি?'

'না, এমনি, হঠাৎ মনে পড়ল।'

'কি মনে পড়ল?' চারুশীলা প্রশ্ন না করে পারেন না।

'আচ্ছা হরিয়াল বেশি সবুজ না টিয়া পাখি? কার সবুজ বেশি সুন্দর—হ্যাঁ তোমার কাছে তোমার চোখে।'

চারুশীলা অবাক হয়ে ছেলের মুখ দেখেন, একটু সময় প্রশ্নটা ভাবেন, তারপর অবশ্য আর অবাক হন না, শান্ত ঠান্ডা গলায় হাসেন ঃ 'কি জানি আমি তো অত ভাল করে দেখিনি, কোনটা ঠিক—

'আহা দ্যাখনি সেটা কথা নয়, তার জন্যে কিছু না,—এখন এখানে ঘরে বসে অবশ্য তুমি হরিয়াল টিয়া কোনোটাই দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু একটু বাইরে গেলে, আমি বলছি শহরের বাইরে চলে গেলে তুমি ওদের অনায়াসে দেখতে পাও,—নয় কি?'

মাথা পেয়ে চারুশীলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন, মুহূর্তের জন্য, তারপর মনে পড়ে কার জন্য মাথা নাড়া, কে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে মুখে বলেন, 'হ্যাঁ।'

'আমি তো আর কোনোদিন দেখব না, দেখতে পাব না। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার মনে আছে কি না।' থেমে

মাধব ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল, থুতনিটা সিলিং-এর দিকে তুলে ধরা। প্রশস্ত সুঠাম কপালে দুটো রেখা গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। যন্ত্রণার চিহ্ন অস্বস্তির দাগ—যেন কি মনে করার চেষ্টা করে মনে আনতে না পেরে ও এমন ছটফট করছে। চারুশীলা বোঝেন। বুঝতে পেরে তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের পিঠ দিয়ে তা মুছে ফেললেন।

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।' মাধবের মুখ প্রসন্ন হ'ল, কপালের রেখাগুলো সরে গেছে। 'হরিয়ালই দেখতে বেশি সুন্দর, আমি রঙের কথা বলছি, সবুজ, কিন্তু টিয়ার মতন নয়, অত কাঁচ কাঁচা সবুজ না, কেমন হলদে হলদে সবুজ, না মা?'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।' চারুশীলা বড় করে বলেন, 'ঠিক মনে আছে তোর, হরিয়ালই দেখতে বেশি সুন্দর।'

একটু সময় চুপ থেকে মাধব আবার ভাবে। সিলিং-এর দিকে তুলে ধরা থুতনি। স্বামীর মুখের আদল। কপাল ও থুতনিটা এক রকম। বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা ধাক্কা অনুভব করেন চারুশীলা। সাত বছর আগে স্বামী স্বর্গীয় হয়েছেন। রংপুর কালেক্টরীতে চাকরি করতেন। মাধব সবে চোদ্দয় পা দিয়েছে। সেকেন্ড ক্লাশে পড়ে। পড়াশোনায় ভাল। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পরীক্ষায়। একটা অংক ভুল না করলে জগদীশবাবুর ছেলের ওপরে ওর নম্বর থাকত। হ্যাঁ, সেজন্যই সেদিন চোখের সামনে দপ্ করে আলোটা নিভে। পিঠে একটা কার্বাংকল হয়ে স্বামী মারা যান। যাওয়ার পরও চারুশীলা মনে করেননি সব আশা ফুরোলো। ছেলেকে নিয়ে চারুশীলা এখানে ভাইয়ের বাসায় চলে আসেন। কলকাতার স্কুল থেকে মাধব প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করল। গেজেটে মাধবের নামের পাশে স্টার দেখা গেল। দেখে সবাই খুশি, মামা মামী মামার ছেলেমেয়েরা। চারুশীলা মনে মনে ঠাকুরকে ডাকলেন। তাও তিনি শুনলেন। পনেরো টাকা জলপানি পেল মাধব। বাড়িতে ধুমধাম পড়ে গেল। চারুশীলার কাকা সুরেশবাবু এত খুশি এত গৌরব বোধ করলেন যে অফিসের চার পাঁচজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে মাছ-ভাত খাওয়ালেন, আর বার বার বললেন, 'অসময়ে ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর বুকটা ভারি দমে গিয়েছিল, আমি বোনের মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। কিন্তু আজ আবার আমি বুকে বল পাচ্ছি মনে জোর পাচ্ছি। আমার ভাগ্নে আমার মুখ উজ্জ্বল করল আমার বোনের দুঃখ সুত্য এবার ঘুচবে।' বন্ধুরা দাদার কথায় সায় দিয়েছিল ঃ 'নিশ্চয়

নিশ্চয় সংসারে যাঁরা সং যাঁরা সাধু তাঁরা পৃথিবীতে তা ছাড়া মন্দ কিছু তো আনতে পারেন না। ত্রৈলক্যবাবু অসময়ে গেছেন, কিন্তু কি রেখে গেলেন স্ত্রীর জন্য আপনারা পাঁচজন আত্মীয়ের জন্য। ব্যাংক-ব্যালেন্স ফ্যালেন্স তো বড় কথা না। ছেলেটি যে ভাল হয়েছে একটি রত্ন হয়েছে সেটাই বড় কথা আশার কথা, গাছ মরলে কি হয়—ফলকে কেউ মারতে পারে না, বিশ্বের কোনো দুষ্ট শক্তিই একে সংহার করার ক্ষমতা রাখে না।' দরজার আড়ালে থেকে চারুশীলা শুনলেন। নিজে একদিন অফিস কামাই করে দাদা মাধবকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন। কিন্তু কে জানত, কে জানে এমন করে চারুশীলার কপাল পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সারাদিন বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে থাকে, তাই চোখটা একটু খারাপ হয়েছে—ও কিছু না। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে একটা চশমা করিয়ে দিলেই হবে। অল্প বয়স। হয়তো কিছুকাল নিয়মিত চশমা চোখে রাখলে দোষটা আপনা থেকে সেরে যাবে। অনেকেরই গেছে। পরে আর চশমা লাগে না। মাধবের চশমা নেওয়া হল। কিন্তু পড়াশোনা একেবারে বন্ধ রাখলে চলে কি। সামনে পরীক্ষা। বি এ ফাইন্যাল। খারাপ চোখ নিয়ে চলল পড়াশোনা। আর একবার ডাক্তার দেখিয়ে পাওয়ার বদলানো হল। উঃ সে কি অসম্ভব পুরু কাচ। একদিন চোখের সামনে ছেলের চশমাজোড়া ধরে গিয়ে চারুশীলার মনে হয়েছিল তাঁর চোখ যাবে। ভয়ে ভয়ে চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চারুশীলা কতক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিলেন। মানুষের চোখের ব্যারাম সম্পর্কে নানারকম কথা শুনেছিলেন তিনি। ভয়ে দুর্ভাবনায় তাঁর বুকের ভিতরটা এক একবার হিম হয়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষায় পাশ করল মাধব। মোটামুটিরকম। কিন্তু তা তো কথা না। চোখ? একদিন বিকেলে এই ঘরে বসে কাগজ পড়তে পড়তে মাধব হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠলঃ 'মা! মা!': চারুশীলা বাথরুমে ছিলেন। ছুটে বেরিয়ে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেনঃ 'কি হল? কি হয়েছে—আলো কমে গেছে এখন কাগজ পড়ার কি দরকার?' চারুশীলা ধমক দিলেন। কিন্তু সেই অল্প আলোয়ও চারুশীলার চোখে পড়ল মাধবের দু'হাত থরথর করে কাঁপছে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছেঃ 'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে মা, সব অন্ধকার লাগছে—সত্যি কি রাত হল, তুমি সুইচটা টেপ তো—' ত্রস্ত কম্পিত পায়ে চারুশীলা ছুটে গেলেন দেয়ালের সুইচ বোর্ডের কাছে, জ্বাললেন আলো, ঘাড় ফেরালেন : 'এখন, এখন কেমন লাগছে, দেখছিস।' 'না না মা—উঃ সব—

পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। বাকি জীবনের মত চারুশীলারও চোখের আলো নিভল। কাঁদলেন, আজও কাঁদছেন। আজ চার বছর। চিকিৎসা যা করার তার চূড়ান্ত হয়েছে। গত আশ্বিনেও চোখ অপারেশন করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি,—স্বামীর লাইফ ইন্সিওরের পাওয়া দু হাজার টাকা এবং চারুশীলার গায়ের গয়নাগাটি যা তোলা ছিল (মাধব বিয়ে করলে বৌকে দেবেন ঠিক করে রেখেছিলেন) সব গেছে। খাচ্ছিলেন অবশ্য দাদারটাই, এখনও খাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও যে সুরেশবাবু বিধবা বোন ও তার একমাত্র সন্তান এমন অসহায় অন্ধ হয়ে ঘরে বসে থাকলে দু মুঠ ভাত দিতে কুণ্ঠিত হবেন তা না। ছেলেদের আমলে কি হবে না হবে তা নিয়ে চারুশীলা অবশ্য আজও মাথা ঘামান না। না, দাদা যতখানি করেছেন এবং এখনও করছেন তার তুলনা হয়না। কটা ভাই অতটা করে চারুশীলা জানেন না।

'মা!'

'কি?'

'একটা জিনিস আজও আমার চোখে লেগে আছে, একটা সন্ধ্যার ছবি।'

'বলো।' দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন চারুশীলা। বরং শব্দ করে হাসলেন। 'কোথাকার সন্ধ্যা,—কলকাতার? রংপুরের?'

'উঁহু।' মাধব মাথা নাড়ল। 'সেবার আমরা ফার্স্ট ইয়ারের ক'জন বন্ধু মিলে মধুপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম, মনে আছে তোমার।'

'কেন মনে থাকবে না, গ্রীষ্মের ছুটিতে, না?'

'ধেৎ!' মাধব ক্ষীণ গলায় হাসল।

'আমার কিছুই মনে নেই তোমার, সব ভুলে বসে আছো—হা-হা।'

অপ্রস্তুত হয়ে চারুশীলা একটু ভাবলেন।

'গড্‌ফ্রাইডের ছুটি ছিল সেটা। চারদিকে তখন ভীষণ পক্স্ হচ্ছিল,—তুমি বারণ করেছিলে বাইরে যেতে—মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। খুব সুন্দর জায়গা, এসে বলেছিলি।'

'আহা তা তো বলেইছিলাম, একবার না বহুবার। না,—আমি বলছিলাম এখন মধুপুরের একদিনের একটা সন্ধ্যার কথা, উঃ দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। চৈত্রমাস এলোমেলো হাওয়া মহুয়ার গন্ধে ভুর ভুর করছে চারদিক—না, আমি কিন্তু সে সব বলব না,—শোন মা, আমার দিকে তাকাও—'

'তাকিয়েছি, তুই বল।'

'আমার মনে হয় তুমি আমাকে দেখছ না, সেলাই করছ।'

'না রে, আমি তো কখন সেলাই রেখে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। হ্যাঁ, কি বলছিলি?'

'বিকেল বেলা, চার বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছি, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে গেছি, সেই পুবে পাহাড়ের ধারে। একটা টিলতে নদী আছে সেখানে, জলের চেয়ে বালি বেশি, তোমায় বলেছি।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তার ওপর চৈত্র মাস, বুঝতেই পার, ধূধূ করছে নদীর বুক,—রমেন কবিতা টবিতা লিখত—বলল, হতাশ প্রেমিকের মত দেখাচ্ছে পাহাড়ী নদীটাকে। শুনে সবাই হাসলাম। বীরেন সংশোধন করে বলল, নদী স্ত্রীলিঙ্গ—সুতরাং হতাশ প্রেমিকা হবে। আবার হাসির ধুম। সব বললেও এ-কথাটা তোমায় আমি বলিনি কোনোদিন,—আজ অবশ্য আমি বড় হয়েছি, বেশ বড় ছেলে তোমার,—চব্বিশ বছর বয়স কি কম মা, এখন আর এ সব বলতে লজ্জা করা উচিত না, কি বলো?'

নরম গলায় মা একটুখানি হাসলেন কেবল।

'কত আর বয়স তখন আমাদের—তখনই এ সব আলোচনা টালোচনা চলত হি—হি।'

চারুশীলা এবারও কোনো কথা বললেন না

'হ্যাঁ, যাকগে, কি বলছিলাম, সন্ধ্যার দৃশ্য—পিছনে আগুন ছড়ানো পলাশের জঙ্গল আর ওদিকে কুমকুম ছিটানো পশ্চিমের আকাশ,—দৃশ্যটা দেখে সত্যি আমরা কতক্ষণ কোনো কথা বলতে পারিনি। এত রং পৃথিবীতে আছে!'

চারুশীলা স্থির চোখে ছেলের মুখ দেখেন। চুপ থেকে আবার কি ভাবছে ও। কপালে কুঞ্চন। যেন আবার একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে—মাথায়? বোঝা শক্ত। চারুশীলা কি করে বুঝবেন সব রং সব আলো চোখের সামনে থেকে মুছে যাওয়ার যন্ত্রণা কেমন, কোথায় ওর লাগছে বেশি। উঠে ছেলের বিছানার পাশে বসে চারুশীলা তার কপালের ওপর আস্তে একটা হাত রাখলেন। একটু সময় মাধব মার হাত ধরে রইল।

'দুধটা তো খাওয়া হয়নি, এখন খাবি?'

'সে রকম যেন ক্ষুধা হচ্ছে না আজ,'—মাধব একটু থেমে পরে বলল, 'বরং ভিটামিন বড়িটা দাও খেয়ে ফেলা যাক।'

'দুধ খেয়ে তো ওটা খাবার কথা।' বিড়বিড় করে বললেন চারুশীলা তারপর উঠে টেবিল থেকে একটা শিশি নিয়ে এলেন।

'দাও।' হাত বাড়িয়ে মাধব শিশিটা নেয়, আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্দাজে ছিপিটা খুলে ফেলে, তারপর একটা বড়ি বার করে সেটা মুখে ফেলে দেয়। 'নাও।'

শিশি হাতে নিয়ে এবার চারুশীলা ছিপি আঁটেন তারপর সেটা টেবিলে রেখে আসেন।

'একটা সিগারেট দাও মা।'

শিয়রের পাশ থেকে বাক্সটা তুলে চারুশীলা সিগারেট বের করে ছেলের হাতে দেন। মাধব সেটা ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে অপেক্ষা করে। চারুশীলা দেশলাই জ্বেলে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেন। আগে মার সামনে সিগারেট খেত না মাধব। এই অবস্থায় পড়েও। চারুশীলা বাথরুমে কি পাশের ঘরে গেছে টের পেলে সিগারেট বের করে নিজেই হাতের আন্দাজে তা ধরিয়ে টানত,—কিন্তু একদিন বালিশের অড় পুড়ে ফেলে মাধব তা বন্ধ করেছে। ঘরে ঢুকে টের পেয়ে চারুশীলা ছেলেকে ধমকালেন। 'আমার সামনে তুই সিগারেট খাবি, আমাকে ঘরে রেখে সিগারেট খেলে দোষ নেই কিছু।'

তারপর মাধব আর সংকোচ করেনি। তবে মামাবাবু এঘরে আসছেন টের পেলে হাতের সিগারেট ফেলে দেয়।

'ক'টা বাজে মা, সন্ধ্যা হ'ল?'

'না এখনো যেন একটু আলো আছে।' চারুশীলা ছেলের শিয়রের দিকের জানালার কালো পর্দার ওপর চোখ রাখেন। ঘরে যাতে কড়া আলো না আসতে পারে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী দরজায়ও পর্দা ঝুলছে। তাই ভিতরটা দুপুর সন্ধ্যা একরকম।

'বেণু মণ্টু খেলা দেখে ফিরে এলো মা?'

'মনে হয় না।' চারুশীলা কান খাড়া করে ধরলেন। 'কারও গলা শুনছি না তো।' বেণু মণ্টু দাদার দুই ছেলে। ফার্স্ট ইয়ারে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। আজ বড় খেলা ছিল তাই মাঠে গেছে। 'আহা সোমেশ ব্যানার্জি কী চমৎকার স্কোর করলে—' 'রাধেশ নন্দী পর পর দুটো ভাল শট ফেরালে বলে ওদের ইজ্জত বাঁচল, না হলে আরো দুটো পয়েন্ট নষ্ট হত'—'পি পাল লাস্ট মোমেণ্টে হেড্ করে গোলটা দিলে তো' ইত্যাদিতে এখনি ঘর-বারান্দা মুখর হয়ে উঠবে। খেলার খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা খবর বলতে বলতে বেণু মণ্টু এ ঘরে চলে আসবে। ভিতরে একটা অস্বস্তি নিয়ে চারুশীলা এসময়টার অপেক্ষা করেন। অবশ্য কান পেতে মাধবও মামাতো ভাই দুটির কথা শোনে। 'উঃ আজ মাঠে কি ভিড়!' 'বাস্-এ প্রণবের সঙ্গে দেখা হল মাধদা।' 'কে, অ প্রণব রায়'—মাধব দুভায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে। 'আমার বন্ধু—তোমায় বলেছিলাম মা, ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমার কথা কিছু বললে প্রণব?' 'না অত ভিড় গাড়িতে কথা বলা যায়?' মণ্টু ঘাড় নাড়ে। মাধব কথা না কয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'হ্যাঁ, ভাল কথা মাধুদা—' উত্তেজিত হয়ে বেণু বলে, 'আজ বাস থেকে নেমেছি, দেখলাম আলপনা রায়কে—বাব্বা কী স্টাইল, একটা সিফন পরা, তাই তো মনে হল, কালো কুচকুচে রং ব্লাউজ গায়ে—অদ্ভুত ফর্সা রং তাই মানিয়েছে খুব। কানে এত বড় দুটো ঝুমকো—খোঁপায় ডালপাতা সমেত একটা লাল গোলাপ। আমি তো দেখে অবাক,—ছবিতে ত এবার দেখেছি—কিন্তু আজ দেখলাম গাড়িতে বসা, হ্যাঁ একেবারে চোখের সামনে, প্রকাণ্ড হলদে রঙের গাড়ি,—নিজের গাড়ি হবে, ট্রাফিকের ভিড়ের জন্য স্প্ল্যানেডে একটু সময় দাঁড়িয়েছিল।' মাধব নীরব। চারুশীলা নীরব। মাঠে ঘাটে রাস্তায় আর

সুমিত্রা বলেন
ঠিক যাহা চেয়েছি
তাই আমি পেয়েছি
আজানুলম্বিত মম ঘন কেশরাশি
কামদেব রাণী দেখে হাসে ঈর্ষাহাসি
এমনি কেশের রাশি তুমিও পাইবে,
কে, এম, পির নারিকেল তৈল
যদি ব্যবহার করিবে।
জীবনের সুরু হ'তে জীবনের শেষ,
শুভ্র কভু হ'বেনাকো তব কৃষ্ণ কেশ।
কে,এম,পি
মার্কা
নারিকেল তৈল
KMP
COCOANUTOIL
গ্যারাণ্টি ১০০% খাঁটি
½ পাঃ ১ পাঃ ২ পাঃ ও ৫ পাঃ
'সিল' করা টিনে এখন সর্ব্বত্র
পাওয়া যায়।
ফোন
প্রস্তুতকারক
পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্
১নং, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

কি কি দেখে এল বলা শেষ করে দু ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে চারুশীলা স্বস্তি-বোধ করেন। মাধব ক্ষীণ গলায় হাসে। 'বেশ বকতে শিখেছে দুটি ভাই, কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়।' একটু থেমে মাধব পরে আস্তে আস্তে বলেঃ 'রাস্তায় বেরোলেই কত হাজার মানুষ যে ওদের চোখে পড়ে—' ঠিক এই সময় চারুশীলা মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকান। মাধব হাসল বটে, কিন্তু. দেয়াল ঘেরা বিষণ্ণ অন্ধকারে শুয়ে মামাতো ভাইদের মুখে শোনা বাইরের পৃথিবী মনে পড়ে তার বুকের মধ্যে কি রকম করছে চারুশীলা নিজের বুকের প্রত্যেকটা শিরা দিয়ে তা উপলব্ধি করে স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

'তুমি কি এখনি আহ্নিক করতে উঠবে মা?'

'না, একটু দেরি আছে।'

'তুমি তো আমার গল্পটা শুনলে না।'

'তুই বল না, আমি শুনতেই বসে আছি যে।'

'কিন্তু অন্যদিকে তুমি তাকিয়ে আছো—আমাকে দেখছ না।'

'আশ্চর্য!' ছেলের কথায় চারুশীলা ব্যথা বোধ করেন। 'আমি সারাক্ষণই তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বিশ্বাস কর।'

চারুশীলা ভাল করে ছেলের দিকে ঘুরে বসেন।

'কি জানি,' বিড় বিড় করে মাধব নরম গলায় বলল, 'আমার যেন মনে হয়েছিল একটু আগে তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলে।'

'না।' গলায় সবটুকু স্নেহ ঢেলে দিয়ে চারুশীলা আবার ছেলের কপালের ওপর হাত রাখেন। কপাল থেকে সরিয়ে হাতটা কাঁধের কাছে নেন, তারপর সেই হাত দিয়ে তিনি ওর পিঠ পরীক্ষা করেন। 'খুব ঘাম হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, চাদরটা কেমন আঠা আঠা লাগছে পিঠে।'

হাত বাড়িয়ে চারুশীলা একটা তোয়ালে টেনে আনেন। 'পাশ ফিরে শো তো বাবা, আমি মুছে দিই পিঠটা—'

মাধব পাশ ফিরে শোয়।

'পাখাটা চালিয়ে দেব?' চারুশীলা প্রশ্ন করেন।

'দাও।'

চারুশীলা উঠে হাত বাড়িয়ে টেবিল-ফ্যানটা চালিয়ে দেন। সুরেশবাবুর বাড়ির কোনো ঘরে পাখা নেই। সব সময় ঘরে আটকা আছে বলে তিনি ভাগ্নের জন্য এই পাখা ভাড়া করে এনেছেন। কিন্তু তা হলেও মিটারের অতিরিক্ত খরচের কথা ভেবে চারুশীলা খুব সাবধানে সেটা ব্যবহার করেন।

'এতক্ষণ বেশ লাগছিল।' মাধব নিজের

হাত বাড়িয়ে মাধব শিশিটা নেয়

চুলের মধ্যে হাত গুঁজে দিল। 'সন্ধ্যেবেলাটায় কেমন গুমট গুমট লাগে বিশ্রী লাগে।' কথা না বলে চারুশীলা তোয়ালে দিয়ে ছেলের কাঁধের নিচ পিঠ কোমর বগল দুটো ভাল করে মুছে দেন। 'লুঙ্গিটা এখন ছাড়বি? আমি তো বাথরুমে যাব ধুয়ে আনব।'

'নাঃ থাক্, দুপুরে তো পরেছি এটা। ধোয়া লুঙ্গি না?'

'হ্যাঁ,' চারুশীলা তোয়ালেটা সরিয়ে রেখে আলস্যভঙ্গের হাই তুললেন। 'কাল বিকেলে যেটা ছেড়েছিলি ধুয়ে রেখেছিলাম, সেটাই তো দুপুরে পরা হয়েছে।'

'তবে আর কি।' বিড়বিড় করে মাধব বলল, 'আমি অন্ধ হয়ে তোমার কাজ বাড়িয়েছি মন্দ না!'

'ছিঃ কি বলছিস!' চারুশীলা ধমক দেন। 'কি এমন কাজ আমার বেড়ে গেল তোর জন্যে। তা ছাড়া সারাদিন বসে থেকে আমি করব কি, বিধবা মানুষ, ওদেরটাও তো সব সময় ধরতে ছুঁতে পারিনে। আর একটা কথা—'

'কি কথা বলো মা, থামছ কেন।' গলার একরকম বিকৃত সুর করে মাধব হাসল। চারুশীলা কেমন চমকে উঠলেন, একটু ভয় পেলেন। কথাটা তো নতুন না, আজ প্রথম তিনি বলছেন না, মাধব আঁচ করেছে যদিও ঠিক—কিন্তু তা হলেও—

'বলো।'

'ওরকম করছিস কেন।' চারুশীলা নিজেকে শক্ত করেন। 'তাছাড়া মিথ্যা কি, তুই কি অন্ধ হয়ে জন্মেছিলি বড় যে অন্ধ অন্ধ বলিস। চোখ খারাপ হয়েছে, চিকিৎসা তো এখনো বন্ধ হয়নি, নিশ্চয় সারবে, হয়তো সময় লাগবে, হয়তো একটু বেশি সময়—'

'তাই ভাল, তোমার বিশ্বাস বিশ্বাস মা,—' বালিশের ওপর মাথাটা নেড়ে নেড়ে তেমনি বিকৃত স্বরে, ঠাট্টার সুরে, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাধব হাসতে লাগলঃ 'আমি যদি তোমার সেই সাত বছরের ছেলেটি থাকতাম তখন একথা বললে— হা-হা—'

চব্বিশ বছরের যুবক! যখন তোয়ালে দিয়ে ছেলের পিঠ মুছে দিচ্ছিলেন ঘাড় মুছে দিচ্ছিলেন চারুশীলার হাত কাঁপছিল। এতো কথা ছিল না, এর ভার নিত আর একজন। ষোল বছরের একটি মেয়ে, সতেরো বছরের একটি তরুণী, খুব বেশি যদি হ'ত তো না হয় উনিশ কুড়ি বছরের কোনো যুবতী। কিন্তু তা আর হল কোথায়। কাঁথা অয়েল ক্লথ ধোয়াতে ধোয়াতে চারুশীলা মাধবের দেড় বছর বয়সের সময় যে অসহায়তা, ভয়, দুর্ভাবনা অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে দিন সপ্তাহ মাস বৎসর . গুণে গুণে কাটাতেন আজ ছেলের চব্বিশ বছর বয়সে তাই করছেন।

'মা, আমার গল্পটা শুনবে।'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ না হয় এমনভাবে নিশ্বাস ফেলে চারুশীলা মেরুদাঁড়া সোজা করে বসলেন। একটা ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বসে কাটিয়ে তাঁরও ক্লান্তি এসেছে, বিশ্রী একটা মাথাধরা ভাব সব সময়। 'বলো, আমি শুনছি।'

'না, বলছিলাম এক একটা ছবি চিরকালের মতন যেন চোখে লেগে আছে। সূর্যাস্তের আবির খেলা দেখলাম আমরা, পলাশবনের আগুন দেখে শেষ করলাম। চারদিক অন্ধকার

হয়ে গেল। চারবন্ধু উঠব উঠব করছি, হঠাৎ পূব দিকে চোখ পড়াতে আর ওঠা হল না। এত বড় চাঁদ মা।' দু হাত শূন্যে তুলে ছেলেমানুষের মতন মাধব চারুশীলাকে চাঁদের আকৃতি দেখাল। 'রং? মনে হচ্ছিল রুপোর থালায় কে হলুদ মাখিয়ে রেখেছে।'

'পূর্ণিমার পরদিন থেকে চাঁদ ঐ রং ধরে।'

'তাই হবে।' মাধব মাথা নাড়ল। 'পূর্ণিমার পরদিন যেন ছিল সেটা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তো চাঁদ উঠল দেখলাম।' একটু থেমে মাধব বলল, 'তারপর শোন মা। কি খেয়াল হতে আমরা পলাশবনের দিকে ঘাড় ফেরালাম। আর চেনা গেল না। মনে হচ্ছিল অন্য কোনো ঝোপঝাড়। ফুলটুল কিচ্ছু ফোটে না। কিন্তু পাশেই আর দুটো গাছ চোখে পড়ল। ইউকিলিপটাস। এর কাণ্ড সাদা তো। হলুদ হলুদ জ্যোৎস্নায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল গাছ দুটোকে। দেখে তখনি সেই রমেন ছোঁড়ার কাব্যরস জাগল। বলল, দুটি তন্বী কিশোরী। চাঁদের আলোয় নিরিবিলি বনের ধারে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে —হা-হা।'

আবার এত জোরে ও হেসে উঠল যে চারুশীলা চমকে ওঠেন।

'মনে পড়ে সেদিনের সেসব কথা সেই দৃশ্যগুলো—শুয়ে শুয়ে ভাবি।' মাধবের হাসির বেগ কমল। 'রমেন উপমাটা সুন্দর দিয়েছিল, না মা?'

'হ্যাঁ।' শান্ত গলায় চারুশীলা সায় দেন। 'তোদের রমেন এখন কোথায়, কি করছে?'

'জানি না, বোম্বে টোম্বের দিকে আছে, হ্যাঁ, চাকরিই করছে শুনেছিলাম। বি এ পরীক্ষার আগেই চাকরি পেয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাধব পরে বলল, 'বেরোতে পারিনে, বন্ধু-বান্ধব কেউ আসেও না যে সকলের খোঁজ-খবর পাব।'

চারুশীলা কথা বললেন না। একটু পর তিনি আস্তে আস্তে খাট ছেড়ে উঠলেনঃ 'এইবেলা আমি আহ্নিকটা সেরে আসি বাবা।'

'যাও, দেরি কোরোনা।'

'আমার এখনি হয়ে যাবে।'

চারুশীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মাধব কান পেতে রইল। বাইরে কোনদিকে যেন একটা কাক শেষ বারের মতন ডাকতে ডাকতে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। রাস্তায় ঘুঘনী-ওয়ালা এসেছে, ছোট ছেলেদের কলরব শোনা যাচ্ছে। যেন একটা মোটর গাড়ি চলে গেল। ট্যাক্সী? প্রাইভেট কার? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বেণু মণ্টু ফিরল কি। না, মামাবাবু। ভারি জুতোর শব্দ। এদিকে আসছেন। দরজার দিকে শব্দটা এগিয়ে আসছে। 'মাধু ভাল আছো?' 'হ্যাঁ, মামা-বাবু, অফিস থেকে এই ফিরলেন?' 'হ্যাঁ বাবা, একটু বাজার করে আনতে হ'ল দেরি হয়ে গেল।' 'মাছ?' 'হ্যাঁ, মাছ এনেছি, সবাই খাক না খাক তোর জন্য তো দু টুকরো আনতেই হবে। মাছ কি বাজারে আছে। আর কি অগ্নিমূল্য! হ্যাঁ, ইলিশই আনলাম, কি করি। চারু কোথায়?' আহ্নিক করতে ছাদে গেছেন।' 'আচ্ছা আমি এখন যাই, সন্ধ্যার পর তোর পাশে এসে আমি বসব একবার—গল্প করব।' 'আচ্ছা।' মাধব ক্ষীণ হাসল। জুতোর শব্দ ওদিকে সরে গেল। মামিমার গলা। 'আলু?' 'হ্যাঁ, আলু আনা হয়েছে।'

'মাধু!'

'মা!'

'আমার হয়ে গেছে, আমি এসেছি।'

'এসো, এইবেলা ভাল করে আমার পাশে একবার বসো তো বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। গল্প কর। একলা শুয়ে থাকতে এমন খারাপ লাগে।'

'একটু দুধ খেয়ে নে এইবেলা।'

'না না মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না। মামাবাবু মাছ এনেছে। রান্না হোক। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।'

'দেরি হবে যে।'

'হোক দেরি। তুমি এসো এখানে।'

চারুশীলা ছেলের পাশে বসলেন।

'পা গুটিয়ে বসেছো!'

'হ্যাঁ রে, বাবা।'

'কই দেখি।' মাধব হাতড়ে হাতড়ে পরীক্ষা করল মা পা গুটিয়ে বসেছে কি না। 'ঠিক আছে।' নিশ্চিন্ত হয়ে পরে হাতটা সে সরিয়ে নিলে। চারুশীলা আবার একটা চোরা দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন।

'মা!'

'বলো।'

'আচ্ছা, ফর্সা মেয়ের গায়ে কালো জামা সুন্দর লাগে। লাল রংটাও তো খুব মানায়, না?'

'হ্যাঁ।' চারুশীলা ঢোক গিললেন। 'গায়ের রং ফর্সা হলে সব রংই মানায়।'

'তাই।' একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল মাধব। একটু সময় চুপ থাকল, পরে আস্তে আস্তেঃ 'আমাদের কলেজের রেবাকে মনে পড়ছে। দুধের মতন শাদা রং। তার ওপর পরত টুকটুকে লাল ব্লাউজ। কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাত মেয়েকে।'

চারুশীলা কোনো মন্তব্য করলেন না।

'আচ্ছা মা, শ্যামলা রং, কি যেন নাম—আঃ মনে পড়ছে না—সুমিতা? সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ত। সায়ান্স। সুমিতা, চামেলী, রুমা? এখন মনে পড়েছে। কি আশ্চর্য! কলেজের বিখ্যাত শ্যামলা রঙের সুন্দরী মেয়ে দময়ন্তীর নাম আমি মনে করতে পারছিলাম না। চোখের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও কি নষ্ট হয়ে গেল। দময়ন্তী পরে আসত স্বর্ণ-চাঁপা রঙের শাড়ি। রংটা চোখের ওপর ভাসছে। চমৎকার মানাত। আর মনে আছে ওর খোঁপা। কপাল কানের ওপর থেকে টান টান করে সব চুল একত্র করে নিয়ে কালো পাথরের বাটির মত এত বড় খোঁপা। লম্বা ঘাড়। তাই আরো সুন্দর লাগত।'

'সেই মেয়ের কি—' কি যেন একটু ইতস্তত করে চারুশীলা পরে প্রশ্ন করলেন, 'বিয়ে হয়ে গেছে?'

মাথা নাড়ল মাধব।

'জানি না—কি করে খবর পাব,—কারো সঙ্গে দেখা করার কারওর দেখা পাবার অবস্থা কি আমার আছে।' চুপ থেকে মাধব অল্প হাসল। 'আচ্ছা মা, এখন যেমন মেয়েরা পঞ্চাশ রকমের বেণী খোঁপা বাঁধে তোমাদের আমলে কি এত ছিল?'

'না, আমরা দু এক রকমের সাদাসিধে খোঁপা বেণী করতাম।' চারুশীলা মৃদুগলায় হাসলেনঃ 'এটা আধুনিক যুগ।'

'তবে এটাও একটা আর্ট—শিল্প, চুলের হরেকরকম সাজগোজ করা।' মাধব থামল, তারপর বলল, 'রুমার চুল ছিল একটু লালচে রঙের, কিন্তু তা-ও যেন ভাল লাগত দেখতে। রংটা ভাল ছিল তো, গোলাপের মত টকটক করত মুখখানা।

কি একটু চিন্তা করে চারুশীলা আস্তে আস্তে বললেন, 'বাবা, আমি একটু ওদিকে যাই,—কিচ্ছু করব না, তোমার মামিমা একলা রান্নাবান্না করছেন, একটু ঘুরে দেখে আসব শুধু।'

যে কথা বলতে চাইছিস মাধব তা মনে

আটকে গেল। একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'উঠব বাবা?' চারুশীলা ফের অনুমতি চাইলেন।

মাধব হাতড়ে হাতড়ে মার পায়ের ওপর একটা হাত রাখল। শুধু রাখল না একটু শক্ত করে ধরে রইল।

'মা!'

'কি।'

'আজ দু তিন দিন ধরে এটা হচ্ছে,—তুমি কাছে না থাকলে একলা থাকলে মন এমন খারাপ লাগে। বিশ্রী।'

ছেলের হাতের ওপর হাত রাখলেন চারুশীলা, শান্ত গলায় বললেন, 'কেন মন খারাপ করবি; চিকিচ্ছে তো এখনো বন্ধ হয়নি, নিশ্চয়ই—'

'সে কথা বলছিনে, খারাপ মানে খুব খারাপ খারাপ চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকে জট পাকাতে থাকে।'

চারুশীলা হঠাৎ কিছু বুঝতে পারেন না। চুপ করে থাকেন।

'বুঝলে মা, তখন আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না, মাথাটা কেমন গরম হয়ে নিজের চুল নিজে ছিঁড়ি নিজের হাত নিজে কামড়াই,—উঃ!'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন চারুশীলা। একটা আতঙ্কের পিণ্ড বুকের মধ্যে গলার কাছটা যেন চেপে ধরে তাঁর। চোখ না, অন্য চিন্তা, অন্য বিশ্রী বাজে ভাবনায় মাথা গরম হয়ে ওঠে, অস্থির করে তোলে আমাকে—তবে কি। যেন কিছু একটা আঁচ করতে পেরে সংযত কোমল স্বরে চারুশীলা বললেন, 'যখন এমন হয়, তখন ভগবানকে ডাকবে মনের অস্থিরতা থাকবে না।'

'বুজরুকী।' গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করল মাধব। 'ভগবান তোমাদের জন্যে মা, আমার না, আমার যদি ভগবান থাকত তবে কি আর চোখের এ-দশা হয়—বলো, চুপ কেন, আমার কথার উত্তর দাও।' যেন একমত হতে না পেরে মার ওপর রেগে গিয়ে মাধব চারুশীলার পা থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

চারুশীলার বুকের ভিতর চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

'মা!'

'মাধব!'

'কথা বলছ না কেন, তুমি কি বোবা।'

চারুশীলা আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন।

'আর কি-ই-বা বলবে।' যেন নিজের মনে বলতে লাগল মাধবঃ 'পাঁচ বছরের খোকা তো নই, চব্বিশ বছরের ছেলের মনকে কি বলে তুমি শান্ত করবে তা-ও একটা কথা বটে।'

চারুশীলা নীরব।

মাধব অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'যাও, এখানে ভূতের মতন বসে থাকলে কি হবে। মামিমা একলা হাতে ওদিক সামলাচ্ছেন ঘরে একটু দেখে এসো গে—যাও।'

তবু চারুশীলা উঠছেন না, উঠতে শক্তি হারিয়েছেন।

'যাও, দেখি না একলা কিছুক্ষণ থেকে, যদি সেই খারাপ চিন্তাগুলো আসে তোমার ভগবানকে আজ ডেকে দেখি মন শান্ত হয় কি না বাজে ভাবনাগুলো দূর হয় কি না পরীক্ষা করা যাবে।' বিদ্রূপের সুরে মাধব হাসল। 'যাও ওঠ।'

চারুশীলা খাট ছেড়ে উঠলেন।

ঘর ছমছম করছে অন্ধকারে।

'আলোটা জেলে যাব?' শেড্ পরানো ছোট একটা টেবিল-ল্যাম্প এনে দিয়েছেন সুরেশবাবু এ-ঘরের জন্য। দরকার হলে চারুশীলা জ্বালেন।

'দরকার নেই।' তেমনি অসহিষ্ণু স্বর মাধবের। 'তুমি কি ঘরে থাকছ এখন যে এটা ওটা করতে আলোর দরকার। আমি আলো দিয়ে করব কি—যাও।'

চারুশীলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। দশ মিনিট পর কি তারও একটু আগে কেমন যেন ব্যস্ততা একটা খুশির ভাব নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। 'মাধব! মাধব!'

ছেলের কোনো সাড়া পেলেন না চারুশীলা। একটু অবাক হলেন, তা হলেও সেটা গায়ে না মেখে চাপা উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, 'ও-বাড়ির গীতা গান গাইছে, শুনেছিস, দাঁড়া আমি পর্দাটা সরিয়ে দিই।' বলতে বলতে তিনি জানালার কাছে সরে গেলেন। কিন্তু পর্দা সরাবেন কি জানালার দুটো পাল্লা বন্ধ এবং হাত দিয়ে টের পেলেন, ছিটকিনিটা পর্যন্ত বেশ ভাল করে আটকে দেওয়া হয়েছে! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চারুশীলা। কি করে ওটা বন্ধ করতে পারল ও! এক পা এক পা করে চারুশীলা ছেলের বিছানার পাশে এলেন। 'মাধব! মাধব!' সাড়া নেই। হুমড়ি খেয়ে বিছানার ওপর পড়ে হাত বাড়িয়ে চারুশীলা টের পেলেন মাধব বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ছেলের কপাল ধরতে গিয়ে চারুশীলার হাতে জল ঠেকল, গরম জল। 'তুই কাঁদছিস বাবা!' স্পষ্ট কান্নার ফোঁপানি শুনলেন তিনি। 'হ্যাঁ' বিকৃত কণ্ঠস্বর মাধবের। মার হাতটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠলঃ 'খবরদার জানালা খুলো না, তুমি যাও— তুমি সরে যাও এখন এখান থেকে, তুমি কি একটু সময় আমায় একলা থাকতে দেবে না।'

কি যেন বুঝলেন চারুশীলা, কি যেন বুঝলেন না। বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে পরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

# আলো

দীপ্তি লণ্ঠন কখনও খারাপ হয় না আর এর ব্যবহারে ২০ ভাগ কেরোসীন খরচ কম হয়। এই লণ্ঠন গঠনে মজবুত আর দেখতে সুন্দর।

## আরো আলো

ভারতের জীবন স্পন্দিত হয় তার গ্রামে। দুশো বছরেরও বেশী এই গ্রামগুলি অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে ছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই অন্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হচ্ছে। এই উৎসবমুখর দিনগুলিতে 'দীপ্তি' শুধু আপনার গৃহই আলোকিত করবে না আপনার মনেও এনে দেবে নূতন আলো।

লক্ষ লক্ষ গৃহ আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস: ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এষ্টেট

# লাবণ্যের এনাটমি

ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

দিন দিন যে রকম হালচাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে কোন কিছুই আর মানুষের হাত থেকে রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। এ পৃথিবীর তাবৎ জিনিসের উপর মানুষের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে। সব কিছুকে অন্তর্বাহির খুঁটিয়ে না দেখলে যেন আর তার মন সরে না। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক জিনিসকে, তা স্থূলই হোক আর সূক্ষ্মই হোক, টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে চুরে মেজে ঘষে যতক্ষণ যাচাই করা না হচ্ছে ততক্ষণ তার মাথা ঠান্ডা হয় না। মানুষের এ একরকম নেশা এবং পেশা, একসঙ্গে দুই-ই বলা চলে। খন্ড করে অংশ দেখার গ্রীক্ নাম হলো anatomy—ana অর্থে asunder আর temnein হলো to cut—তাহলে দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম : পৃথক করে কেটে ফেলা—এনাটমি দেখা।

সব কিছুরই এনাটমি হতে পারে। অতি কাছের চেয়ারটার, টেবিলটার, দোয়াতটার, কলমটার, কাগজটার; আর নয়তো অতি দূরের ওই সূর্যটার, ওই চাঁদটার, ওই শুকতারাটার, ওই ঝিরঝিরে বাতাসটার। এই তিল তিল করে ভেঙ্গে দেখার ফলে নানান জিনিসের মর্মমূলে কিসের সমাবেশ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই দিক দিয়ে দেখলে ওলকপির এনাটমির সঙ্গে ফুলকপির এনাটমির প্রভেদ আছে অনেক। যেমন লাউ-চিংড়িকে এনাটমাইজ করলে দেখতে পাওয়া যাবে কিছু লাউ আর কিছু চিংড়ি। আর রসমালাই-এর এনাটমিতে আছে রসগোল্লা আর মালাই। মর্মচ্ছেদ করলেই বোঝা যায় আলু আর শাঁখালু এক নয়, যেমন এক নয় মানুষ আর বনমানুষ। মাংসের সিঙ্গাড়ায় এনাটমির দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে দেখতে হয় পুরের পরিমাণে কতটুকু মাংসের সার পদার্থ আর কতটুকু অন্য ভুষিমাল। পাগল ছাড়াও চাঁদের এনাটমি বার করতে অনেকে আগ্রহী—যেখানে পাহাড় আছে কি খাদ আছে কি বরফ আছে, এই সব কথা জানবার পাগলামি। জলেরও এনাটমি বার করা হয়েছে যদিও তা জলের মত অত সোজা নয়—তাতে দিব্যি আছে দুটি করে হাইড্রোজেন আর একটি করে অক্সিজেন। শুধু অণু কেন, প্রত্যেকটি পরমাণুর ভিতরে কি আছে, তা জানবার পথ পরিষ্কার হচ্ছে। অ্যাটমের এনাটমিতে জানা যায়—তার মাঝখানে রয়েছে প্রোটন আর নিউট্রন আর তাদের চারদিকে দিনরাত ঘুরছে ইলেকট্রন। কটা

সিঙ্গাড়ার এনাটমি

ইলেকট্রন কটা প্রোটন কটা নিউট্রন দিয়ে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অ্যাটম তৈরী, সেই কথাটাই জ্ঞাতব্য। মনের এনাটমিতেও হাত পাকাতে অনেকে বদ্ধপরিকর—সেখানে কতটা স্নেহ, কতটা প্রেম, কতটা রাগ, কতটা অভিমান এই সব কত কিছুর জঞ্জাল আছে তা তলিয়ে দেখবার নতুন উৎসাহ এসেছে। যা নিয়ে মন তোলপাড়।

এ সব এনাটমির কথা থাক। মানুষের দেহে ঝকঝক চকচক নয়নাভিরাম যে জিনিসটি আছে, যেটাকে সাধুজন সৌন্দর্য বা চারুতা বা মনোহারিতা আখ্যা দেন, তারও যে একটা কিছু এনাটমি গোছের জিনিস হয়, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন? অবশ্য লাবণ্যের এই এনাটমি বার করতে গেলে দরকার হবে বুদ্ধির ছুরি, বিবেচনার ফরসেপস ও উপলব্ধির ক্ল্যাম্প। তা না হলে এক পা-ও এগোনো যাবে না। এ সব অস্ত্রশস্ত্র পেয়েও যদি আপনি অপারেশন ফিল্ডএ নামতে অনিচ্ছুক হন, মনে মনে ভাবেন, 'লাবণ্যর' এনাটমি এক 'অমিতের' হাতেই মানায়! তাহলে বলতে হয় লাবণ্যই কি একটা, না অমিত একটা—এ তামাম পৃথিবীতে ঘরে ঘরে দেশে দেশে কত লাবণ্য আছে, কত অমিত আছে। সাদায় মিশে কিম্বা কালোয় মিশে, বেঁটেতে কিম্বা লম্বাতে। অমিত থাক—লাবণ্যই বিচার্য এখানে।

লাবণ্য সম্বন্ধে দেখা যায় নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন, লাবণ্য মানে উর্বশী-লক্ষণ। এমন লোক আছেন (হয়তো

তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়) যাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিতে চান এই বলে যে, ও সব রূপমাধুরী মা ছাই; স্রেফ চোখের গলদ। চোখের ভুল হলেও হতে পারে, কিন্তু দেহের পক্ষে এটা মোটেই কোন ভুল নয়। যেমন একদল ভাবেন লাবণ্য হল নেহাৎ চাতুর্য-বিভ্রম, তেমনি আর একদল মধ্যপন্থী আছেন। যাঁরা লাবণ্য-টাবন্য মানেনও বটে, আবার মানেনও না। এ'দের অবস্থাটাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ'দের মতে লাবণ্য হল দেহের মলাট, বই-এর মলাটের মত কিছুদিন তেলচুকচুকে থাকলেও চিরকাল এসব কোন দেহকেই ঘিরে থাকে না। তিন কাল এককালে গিয়ে ঠেকলে, এরও অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো নিদারুণ নিষ্করুণভাবেই একদিন বলেছিলেন—মেয়েছেলের রূপলাবণ্য বয়সের সঙ্গে শুকিয়ে নারকেলের ছোবড়া হয়ে যায়। সত্যি-মিথ্যের কথা এখানে উঠছে না—বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় এ কথা আছে। এ ছাড়া যাঁরা নিজেদের লাবণ্য-বিশারদ বলে মনে করে থাকেন, যেমন কবি, লেখক ও প্রেমিক, তাঁদের যদি চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করা যায়—আচ্ছা, বলুন তো লাবণ্য জিনিসটা আসলে কি? সেখানে কতটুকু প্রোটিন, কতটুকু ফ্যাট, কতটুকু লাইপয়েড মজুত আছে? নিশ্চিত দেখতে পাবেন, সে সব বিষয়ে তাঁরা জানতে এতটুকু উৎসুক নয়। কারণ তাঁদের লাবণ্য নিয়ে কারবার স্রেফ অন্য লাইনে। লাবণ্যের কাব্যিক ব্যাখ্যা যদি শুনতে চান তো দেখবেন যে, এত বড় বড় ফিরিস্তি দিচ্ছেন যে মাথা ঘুরে যাবে। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য, এত কিছু বলে যাচ্ছেন, কিন্তু ধরা ছোঁওয়ার ভিতর আসছেন না। এত বলছেন কিন্তু কিছুই বলছেন না। স্রেফ ইঙ্গিতের ভিতর দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন—আসল জিনিসটা যে কি সেইটেই উহ্য রেখে যাচ্ছেন কায়দা করে। এই যেমন লাবণ্যটা কি বোঝাতে গিয়ে তাঁরা বললেন——মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্ব-মিবান্তরা; টলটলে সাদা মুক্তার ঢলঢলে ছায়াটি যেমন, লাবণ্যও তেমন সমগ্র দেহের স্নিগ্ধতা। নিন, এখন এর থেকে কি বুঝবেন বুঝুন। অথচ কেমন সুন্দর কথার ফাঁদই না ফাঁদা হল।

এই সব দেখে শুনে আমি আর অন্য কারুর নয়—একমাত্র বিজ্ঞানীদের রাস্তা নিতেই প্রস্তুত। কারণ ও'রা কথা অনেক সাফ সাফ বলেন এবং যা জানেন না, তা নিয়ে কিছু বলার জন্যেই বলেন না। অন্তত সোজা কথাকে বাঁকা করেন না, আর বাঁকাকে সোজা। কিন্তু তাবলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লাবণ্য ব্যাখ্যা একেবারে জলবৎতরলং একথা আমি বলছি না। লাবণ্য মানেই লবণ সম্বন্ধীয় কিছু। গোবিন্দদাস যাই বলুন না কেন—'ঢলঢল

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তর

কাঁচা অঙ্গের লাবণী বহিয়া যায়'—আসলে লাবণ্য হল দেহের নোনতা কিছু। নুন ছাড়া যেমন সর্বকিছু আলুনি তেমনি লাবণ্য ছাড়া রূপ নিষ্ফল। নোনতা হোক আর যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল লাবণ্যটা সলিড কিছু না লিকুইড? ঠাণ্ডা না গরম? স্বচ্ছ না ঘোলাটে? সে কথা বলার আগে একটা গল্প বলি। আমার ঠাকুমার যে মূর্তি দেখতে পাই, তার সঙ্গে তাঁর আগেকার ছবির কোন মিল নেই—দুজনে যেন দুজন লোক। অথচ ও'র এই অশীতি বছরের শরীরই আগে কি না সুন্দর দেখিতে ছিল, দেখলেই আশুতুষ্ট। এখন যখন সাদার উপর কালো ডোরা কাটা পাথরের সিঁটের উপর বসে, মাথা নীচু করে, চোখ কাছে এনে সলতে পাকান, সে দৃশ্য দেখলে দেওয়ালের ওই মাধুরী মূর্তির সঙ্গে কোন যোগাযোগ পাওয়া যায় না। অমন টিকল নাক এখন যেন অনেক খর্ব হয়ে গেছে। আগের কালের নাকছাবির ফুটোটুকু খুব নজর করলে হয়তো চোখে পড়বে, অব্যবহারের দোষে সেটিও মজে গেছে। অবশ্য আজ যদি ঠাকুরদা বেঁচে থাকতেন, তাহলে দেখা যেত ঠাকুরদার শুকন গাল। বয়সের সঙ্গে দেহের দৌলত কর্পূর হয়ে উবে যায়। কোন চুলোয় যায় জানিনে, তবে নিশ্চিত দেহ ছেড়ে চলে যায়। দেহের রম্যতা আর থাকে না। খুব কচি বয়সেও এ রম্যতা থাকে না, বুড়ো বয়সেও না। শুধু জীবনের মাঝদরিয়ায় রূপলাবণ্যের ঝড়-তুফান ওঠে। ব্যালজাক লাবণ্যকে উঠতি বয়সের গুণ হিসাবে বলতে গিয়ে যৌবনের সময়কার কথা বলে বলেছিলেন—
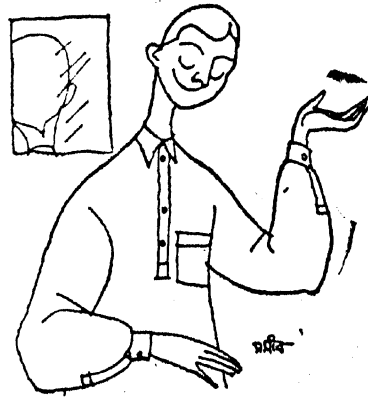
en ete de jouvenee.

কোন সৌভাগ্যজনেরই হেপাজতে রূপ-লাবণ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে থাকে না। ঠিক একটা পদ্ম ফুলের পাপড়ি খোলার মত দেহে লাবণ্যের বিকাশ ঘটে একটু একটু করে যৌবনের সমাগমে। তারপর যৌবনের অন্তে সব দফা একেবারে রফা। এক কেবল শোনা যায় স্বর্গের উর্বশী চিরকালের রূপসী হয়ে রইলেন। তাঁর বয়স বাড়লেও তিনি বুড়ি হলেন না—চিরকালের খুকী হয়ে রইলেন। তার কারণ স্বয়ং ইন্দ্রমহারাজ নাকি উর্বশীর রূপ-লাবণ্যকে তাঁর স্বর্গীয় সেফটি ভল্টে গচ্ছিত রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কলির কোনখানের কোন ব্যাঙ্কই মানুষের রূপযৌবন এমন করে আগলে রাখতে পারে না—বয়সের টানে একসময় না একসময়ে তা ফেল পড়বেই পড়বে।

প্রকৃতির এমনি বিধান যে, কৈশোরের ধাপ পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের দেহে নতুন কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। যৌবনের নবোচ্ছ্বাসে তনুতে তনুতে হিল্লোল খেলে যায়—যার ফলেই লাবণ্যের সূত্রপাত। সর্বপ্রথম পিনিয়াল ও থাইমাস, এই দুটি গ্ল্যাণ্ড বিনষ্ট হয় এবং অপর আর একটি গ্রন্থিহীন গ্ল্যাণ্ড (মস্তিষ্কের ভিতরে) পিটুইটারি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। এবং এই পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডই দেহের অন্যত্র রক্তের ভিতর দিয়ে রাসায়নিক দূত পাঠিয়ে 'যৌবন-পাক সম্যাক' এই কথা প্রচার করে থাকে। পিটুইটারির প্রথম ও প্রধান কাজ হল পুরুষের বেলা শুক্রাশয় (টেসটিস) এবং রমণীর বেলা ডিম্বাশয় (ওভারি)-এর ঘুম ভাঙ্গায় ও কর্মতৎপর করে তোলে। যৌবনের কৃপায় ধুলোমুঠো সোনামুঠো হয়ে যায়।

লাবণ্য বলতে denovo কিছু তো নয়, এরও কতকগুলো উপাদান আছে। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের নতুন কারিগরিতে সেইসব লক্ষণ একটি একটি করে প্রকাশ পায়। আসল কথা যৌবনে পা দেওয়ার আগে থেকেই দেহের মধ্যে বলতে গেলে একটা

যৌবনের নবোচ্ছ্বাস

বড় রকম রাসায়নিক বিপ্লব ঘটে যায়, সেই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হল দেহের রূপ এবং লাবণ্য। দেহের একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য, একটা অদ্ভুত কান্তি দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক কে যেন ঘামতেল দিয়ে নাক-চোখ-মুখ-কান-গলা-হাত-পা মুছে দিয়ে গেল। তা না হলে এত ঝকঝকে চকচকে দেখায়! এটি হর্মোনের কৃপায় সম্ভব হয়। সারা দেহে পালিশ দিয়ে গেছে।

যৌবনের সূচনা থেকেই দেহের আনাচে-কানাচে চর্বি জমতে শুরু করে। এই চর্বি হল লাবণ্যের একটা মস্তবড় প্যাকিং মেটিরিয়াল। মাটির প্রতিমা তৈরি করতে যেমন খড়ের প্যাকিং দিতে হয়, এও তেমনি রক্তমাংসের প্রতিমার ভিতরও চর্বির প্যাকিং না থাকলে তা নিটোল এবং সুগোল হয় না। তনুদেহের নিটোল বলনটি তৈরির জন্যে চর্বির যত্রতত্র জমায়েত একান্ত প্রয়োজন। যার ফলে দেহকে মনে হয় সুমধা, পরিপূর্ণ এবং কমনীয়। শরীরের ভিতর চর্বি-জমা নির্ভর করে স্ত্রী-হার্মোন এসট্রোজেনের উপর। পুরুষ দেহে চর্বি অপেক্ষা মাংস পেশীর গঠনের লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং এই মাসেলসের গঠন ও প্রকাশ

চর্বির যত্রতত্র জমায়েত
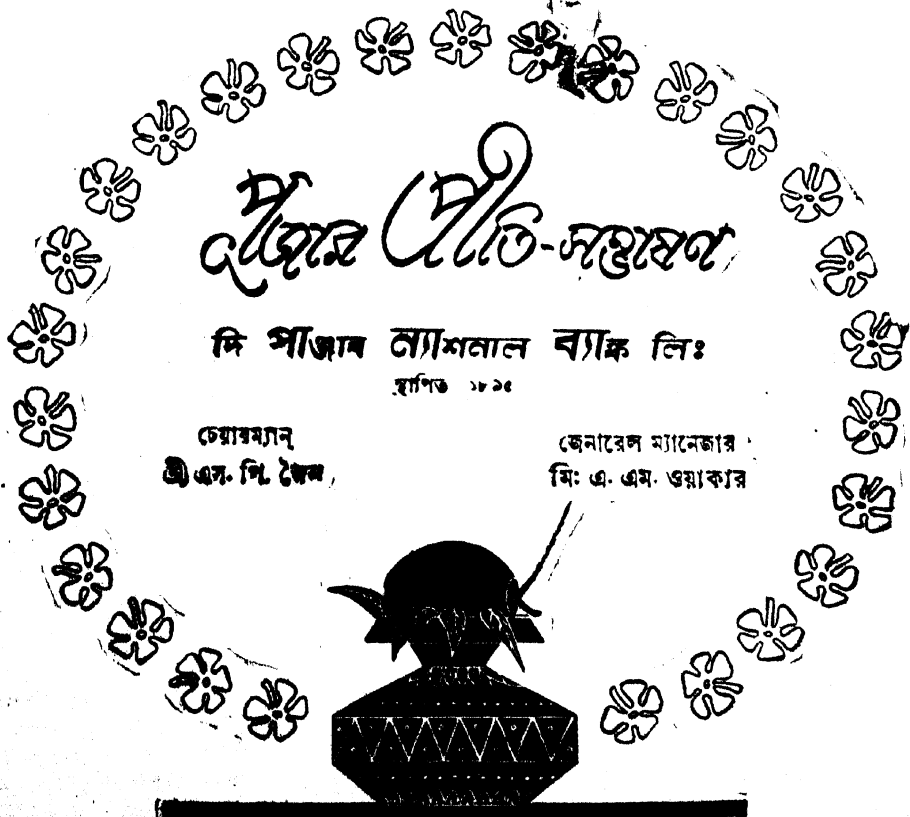
নির্ভর করে পুং হর্মোনের উপর। এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা হচ্ছে। অপরিণত বয়সে পুরুষের দেহে স্ত্রী-হর্মোন ইনজেকশন করালে মাংসপেশী সাধারণভাবে বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে না। তেমনি আবার এর উল্টো দিকটাও দেখা সম্ভব হয়েছে। শিশু অবস্থায় যদি পুং হর্মোন স্ত্রী-দেহে দেওয়া যায়, তাহলে সেখানে মাংসপেশী পুরুষোচিত আকার পায় ও বলিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

কেশসম্ভার লাবণ্যের আর একটা বড় পরিচায়ক। চুল উঠে গিয়ে মাথা গড়ের মাঠ হয়ে গেলে কেউ আর তখন বলে না—আঃ লোকটার কি টেকো লাবণ্য। টেকো হওয়া মানে লাবণ্য তেতো হয়ে যাওয়া। তাহলে বুঝতে পারা যায় শরীরের মধ্যে কেশকারী পদার্থ যৌবনের সময় লাবণ্যের রসদ জুগিয়ে যায়। কিন্তু কেমন করে। রক্তর স্রোতের সংগে ভিতর থেকে এই কেশকারী পদার্থের সমাগম হয় চামড়ার নীচে প্রত্যেকটি কেশ-মূলের ভিতর। প্রত্যেকটি কেশমূলে শেষ হয় একটি করে প্যাপিলাতে যেটি দেখতে অনেকটা ফাঁপা বাল্বের মত। রক্তস্রোত এইখানে কেশ তৈরির পদার্থগুলো নিয়ে আসে। দেখা গেছে রক্তের সংগে আঠারো রকমের পদার্থের আমদানী হয়। তার মধ্যে টাইরোসিন, ট্রিপটোফেন ও সিসটিন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। কোন কারণে যদি রক্তস্রোত প্রতিক্ষণে কেশের প্যাপিলার

ভিতর ঢুকতে না পারে, তাহলে কেশ বর্ধন বন্ধ হয়ে যায় এবং অবশেষে মাথার জমি চেঁচেপুঁছে একেবারে সাফ। তখন এই তেল দাও ঐ তেল দাও, এই ট্রিটমেণ্ট কর, ঐ ট্রিটমেণ্ট কর। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে রক্তস্রোত যেন সব বাধাবন্ধন এড়িয়ে কেশকারী পদার্থ চুলের প্যাপিলার ভিতর পৌঁছে দিতে পারে। যৌবনের সময় রক্তের ভিতর এই কেশকারী পদার্থ দেহের জায়গায় জায়গায় ঘোরাফেরা করে এবং দেহকে কেশসমৃদ্ধ করে তোলে। বিশেষজ্ঞরা এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, শরীরে কেশ উৎপাদন হর্মোনের ফলেই হয়ে থাকে।

কখনও কখনও দেখা যায় (সাধারণত বেশী বয়সে) দু-চার জন বিগত যৌবনা রমণীর মুখে গালে স্পষ্ট দাড়ি-গোঁফের ছাপ। এই সব বৈলক্ষণ্য সাধারণত ঘটে থাকে শরীরের মধ্যে হর্মোনের অঘটন থেকে।

গায়ের রং নিয়ে যে এত বড়াই করা হয়, সেটা নির্ভর করে ত্বকের ভিতর কি পরিমাণ মেলানিন পিগমাণ্ট আছে। সাধারণভাবে বলা চলে পুরুষের শরীরে মেয়ের চেয়ে বেশী মেলানিন পিগমাণ্ট থাকে এবং তাই গায়ের রং আরও গাঢ় দেখায়। সূর্যরশ্মির সঙ্গে দেহে মেলানিন কম-বেশী হওয়া সম্বন্ধ আছে। সূর্যরশ্মি যত গায়ে পড়বে, সেখানে তত মেলানিন দেখতে পাওয়া যায়। তাই ঠাণ্ডা দেশের স্ত্রী-পুরুষের দেহে মেলানিন বেশী দেখা যায় না। কারণ শীতের দেশে রুদ্দুরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু উষ্ণদেশে এর উল্টোটাই ঠিক।



লাবণ্য হল কাঁচা সোনা—বয়সে তা বিকিয়ে যায়

কেশ গুচ্ছ ছাড়াও লাবণ্যের আরও অন্য উপকরণ আছে। সেলের সজীবতা এবং প্রাণময়তা যখন পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তখন ওই হাসিটুকুও মিষ্টি লাগে; কারণ তখন হাসলে পরেই এত এত মুক্ত ঝরে! চলনে বলনে কথনে অপরূপ এক লোভন-মায়ার মমতা। কোন স্বপ্নজড়িত চক্ষে কোন রাঙা কপোলখানি দেখে কোন কপোলকল্পনা করা হয়েছে, তা কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বাইরে। কিন্তু একখানি ছোট্ট তিল, মুগ্ধচোখে তা লাবণ্যের তাল হয়ে উঠতে পারে। তালের যেমন এনাটমি আছে, তেমনি তিলেরও আছে। তিলের খানদানি বৈজ্ঞানিক নাম হল মেলানোমা। এ একরকম নির্দোষ টিউমার যেখানে বেশী পরিমাণে মেলানিন বা কালো পিগমেণ্ট জমায়েত হয়। এই সঙ্গে আঁচিলের কথাটা সেরে নেওয়া যায়—এটি হল প্যাপিলোমা; ত্বকের উপর ছোট টিউমার, এগুলি মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু মারাত্মক ধরনের টিউমার হলে তখন আর এ নিয়ে রূপের বালাই থাকত না, ছুরির লড়াই শুরু হয়ে যেত। লাবণ্যকে নিটোল দেহাভরণ হিসাবে দেখতে গেলেও এর ব্যতিক্রম আছে। গালে টোল খেলে তখন আহামরি কি ডিম্পল, এমন ধারণা হয়। কিন্তু ঘোর যৌবনের মাঝে দেহের অন্যত্র টোল খেলে লাবণ্যহানি হয়েছে, এমন কথাই প্রচারিত হবে। মানুষের চোখ খুঁজে খুঁজে লাবণ্যের সংজ্ঞা নিজেরাই আবিষ্কার করছে। তাই এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এমন একটি অভিমত, সুচিন্তিত কিনা জানিনে বহুলোকের মুখে মুখে চলে আসছে যে, লাবণ্যটাবণ্য সব শরীরের ব্যাপার, নেহাৎই skin deep। শরীরের ভিতরে অর্থাৎ মজ্জা কাণ্ডে এর কোন যোগ নেই। কিন্তু যিনি সাতকাণ্ড লাবণ্যের এনাটমি পড়েছেন, তিনি অন্তত একথা সহজে মেনে নিতে চাইবেন না; তা তাঁর নিজের লাবণ্য কমই থাক আর বেশীই থাক। কারণ লাবণ্যটা দোষই হোক আর গুণই হোক, আসলে এটি তৈরি শরীরের অন্দরমহলে নানান রাসায়নিক সংঘটনে। বত্রিশ নাড়ি এর পরিপাকের জন্যে দায়ী, শুধু বাইরের চামড়াটুকু নয়। এর প্রস্তুতিতে যেমন জীবনের হাজার কল-কব্জার নড়চড় লাগে, তেমন বার্ধক্য এলে এর অপসরণেও নানা রাসায়নিক অবদান ও উপাদানের প্রভেদ দেখা যায়। ধীরে ধীরে লাবণ্য তৈরির একটা প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। যার ফলে দেহের সাজান বাগান শুকিয়ে যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ঘটনা হয়তো পিটুইটারির অক্ষমতাকে বলা চলে। ক্রমশ শরীরের আনাচে কানাচে লাবণ্যের ভাটা পড়ে, যৌবনের দীপ্তি যায় ক্ষুণ্ণ হয়ে। প্রাণি-দেহের মধ্যে হর্মোনের শ্লথতা এসে পড়ে। হর্মোনের বৈগুণ্যে ধীরে ধীরে একটি একটি করে অযৌবনের পর্দা নেমে আসে। কণ্ঠ-স্বরের মধুরতা চলে যায়, কথা কর্কশ হয়। চামড়ার বজ্রবাঁধনি শিথিল হয়ে যায়। ফলে দেহের নিটোল ভাবখানা খানখান হয়ে যায়। চামড়ার নীচে চর্বির পলস্তারা লোপ পায়, চামড়া কুঁকড়ে যেতে শুরু করে। দেহের কমনীয়তা চলে গিয়ে কাঠ কাঠ দেখতে হয়। কেশসম্ভার আর সম্ভার থাকে না—কেশ পদার্থের অভাবে চুল পাতলা হয় বা উঠে যায়। চোখের ঔজ্জ্বল্যের অভাবে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিরর্থক হয়ে পড়ে। হাসি আর হাসি থাকে না। তিল তিল করে মেদমজ্জা দিয়ে সারা দেহ ঘিরে যে ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ক্রমে ক্রমে জোড় খুলে যায় তনুশ্রী অপহৃত হয়। দেহের আকাবাঁকা সব লাইন আর আঁকাবাঁকা থাকে না। ছাঁচে ঢালা সব জিনিসের সিমেট্রি নষ্ট হয়ে যায়। দেহের হাটে লাবণ্য হল কাঁচা সোনা—বয়সে তা বিকিয়ে যায়। বিগত যৌবনে জীবনের সুখস্বপ্নময়তার প্রলেপ চোখ থেকে সরে যায়; অপসৃয়মান চারিমার চার-পাশে তখন স্মৃতিখানি ঘুরে ঘুরে করে, যা ছিল আহা তা হারিয়ে গেছে। এখন মৌচাক খালি।

অবশ্য লাবণ্যের এ এনাটমি গ্রের এনাটমির মত কখনও যে সম্পূর্ণ করে বলা হবে, সে আশা করা চলে না। কারণ দেহের দরবারে আমরা সবাই এক একজন পাকাপোক্ত এনাটমিস্ট। এত জোড়া চোখ দিয়ে কবে কোথায় কেমন করে কার লাবণ্যের উপর ছুরি বসিয়েছি এবং তার থেকে কি কি এনাটমির সত্য আবিষ্কার করেছি, তার সমস্ত কথা এ-বিজ্ঞানে জানা সম্ভব নয়। সে আর একরকম বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু; তা শিখতে আর যাই হোক, প্রাণিবিদ্যা আয়ত্ত করতে হয় না, বয়স হোলেই আপনা আপনি দেখবার চোখ খুলে যায়।

# সুর্মা

রমাপদ চৌধুরী
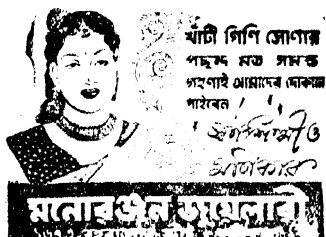
গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে পায়চারী করতে করতে বিলিতি পত্রপত্রিকার স্টলগুলো দেখছিলাম। পত্রপত্রিকা নয়, দেখছিলাম মলাটের বিচিত্র ছবিগুলো। ছবিগুলোর মধ্যে শালীনতার হয়তো অভাব থাকতে পারে, কিন্তু যে জিনিসটির প্রাচুর্য আছে তা হ'ল স্বাস্থ্য।

গত একমাস দেড়মাস ধরে অসুখে শয্যাশায়ী থাকার পর সবে একটু আধটু চলেফিরে বেড়াবার হুকুম পেয়েছি ডাক্তারের। কিন্তু স্বাস্থ্যটা ফিরে পাই নি। কোনদিন যে সেটা ছিলও না, মলাটের ছবিগুলোর দিকে তাকালে তাই মনে হয়। আর মনে হয়, ওদের মেয়েদের তুলনায়......

সে কথা থাক্। ওটা মনের এই সাময়িক দুর্বলতার জন্যেও হতে পারে। নিজের যেটা অভাব অপরের মধ্যে আমরা হয়তো তারই প্রাচুর্য দেখতে পাই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, শুধু ছবির লোভেই পত্রিকাগুলো দেখছিলাম তা নয়। আসলে মনে মনে একটা কিছু বিষয় খুঁজছিলাম, যা নিয়ে গল্প লেখা চলে। আর তাও যদি না পাই তো একটা ইংরেজী গল্পের প্রায় তর্জমা করে নিজের নামে চালিয়ে দিলে দোষ কি!

অর্থাৎ গল্প একটা লিখতেই হবে। বছরান্তে পাঠকরা অন্তত একটি ভালো গল্প চায় আর আমি চাই ভালো হোক্ আর না

হোক্‌ পাঠকের সামনে নামটা অন্তত একবার এই মরসুমে তুলে ধরতে। পাঠকের স্মরণ-শক্তি নাকি খুবই কম, চোখের আড়াল হ'লেই মনের আড়ালে চলে যেতে হয়।

মতটা আমার নয়। কয়েকজন হিতা-কাঙ্ক্ষী বন্ধুর। আর তাঁরাই বলেছেন চোখের আড়াল না হ'তে।

এতদিন অবশ্য আমার ধারণা ছিলো, কুঁড়েমির জন্যেই নাকি লিখতে পারি না, লেখার মত গল্প মনের মধ্যে সদাসর্বদাই ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম হাতে কলম নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও এক লাইন লেখা যায় না। এমন কি, কি লিখবো তা ভেবে পাওয়াও দুষ্কর।

তবু লিখতে হবে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে গ্রাণ্ড হোটেলের সামনে পায়চারী করছিলাম। এমন সময় একখানা সাদা ধবধবে দামী গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম।

আর পর মুহূর্তেই সমস্ত শরীরে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল।

সুর্মা না?

হ্যাঁ, সুর্মাই। কিন্তু এ যেন সেই সুর্মা নয়, যাকে আমি চিনতাম। রতনলাল যাকে বিয়ে করে এনেছিলো সে সুর্মা ছিল সুশ্রী, ছিমছাম। আর গঙ্গাধরের সঙ্গে, গঙ্গাধরের পাশে পাশে যাকে হেলেদুলে হোটেলে ঢুকতে দেখলাম সে শুধু রূপসী নয়— অপ্সরী।

এত রূপ? এমন পরিপূর্ণ যৌবনের জোয়ার যেন আগে দেখি নি। দামী পোশাক-পরিচ্ছদে, জড়োয়া গহনার ছটায়, লাল রেশমের উজ্জ্বল আগুনে এক ফালি বিদ্যুতের মত সকলের চোখ ঝলসে দিয়ে অদৃশ্য হ'ল সুর্মা।

আর সঙ্গে সঙ্গে রতনলালকে মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়বারই কথা। পাঁক থেকে সুর্মাকে তুলে এনেছিলো সে, কিন্তু পঙ্কজাকে শতদলের মত ফুটিয়ে তুলতে পারে নি।

আবার পাঁকে ফিরে গিয়েই এমন রূপ, এমন যৌবন নিয়ে পুষ্পমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে সুর্মা।

সমস্ত মন বিস্বাদ ঠেকলো। কেমন একটা বিতৃষ্ণায় বিদ্বেষে মন বিষিয়ে উঠলো সুর্মার বিরুদ্ধে। আশ্চর্য, যাকে পাপের পথ থেকে তুলে এনে নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলো রতনলাল, যার জন্যে সমস্ত জীবনটাই তার নষ্ট হয়ে গেলো, সেই সুর্মা এমন উচ্ছলভাবে হাসতে হাসতে গঙ্গাধরের গায়ে ঢলে পড়ে কি করে? কিংবা এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক, এটাই বুঝি সম্ভব।

রতনলালকে আমরা সকলেই নিষেধ করে-ছিলাম। শোনে নি সে। বিশ্বাস করে নি। কিন্তু আমরা জানতাম, সুর্মার রক্তেও সেই পাপের বিষ আছে। সেই বিচিত্র নেশা।

কিন্তু সেদিন বিশ্বাস করে নি রতনলাল। সুর্মার অভিনয়কে সত্য ভেবেছিলো।

গান শেখাতো রতনলাল। গানের একটা ছোটখাটো ইস্কুলও ছিলো ওর। নিজেরই ছোট ফ্ল্যাটে।

জন দশ বারো ছাত্রছাত্রী আসতো ওর কাছে, পালা করে গান শিখে যেত সকাল দুপুর সন্ধ্যায়।

সুর্মাও একদিন এসে হাজির হয়েছিলো। একাই।

অকুণ্ঠিতভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্ন করেছিলো, আমাকে গান শেখাবেন?

সম্মতি জানিয়েছিলো রতনলাল, তার বিস্ময় গোপন রেখে। মাসিক দক্ষিণার অংকটা জানিয়েছিলো তাকে।

সুর্মা লজ্জিত হাসি হেসে বলেছিলো, টাকার জন্যে নয়। আমাকে শেখাবেন কি না বলুন।

—কেন শেখাবো না? বিস্মিত হয়েছিলো রতনলাল।

উত্তর এসেছিলো; আপনার ছাত্রছাত্রীরা যদি আপত্তি করে?

—কেন? আপত্তি করবে কেন?

—না, তাই বলছি। মানে......

অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে সুর্মা নিজেই তাকে রেহাই দিয়েছিলো। স্পষ্ট করেই বলেছিলো, ও ভদ্রঘরের মেয়ে নয়। অর্থাৎ ওর মা শরীরের বেসাতি করে।

সবটুকু শুনে হয়তো পিছিয়ে আসতো রতনলাল। কিন্তু সুর্মার সুন্দর একজোড়া চোখের মধ্যে কি যেন মোহ ছিলো, তার সলজ্জ হাসিতে ছিলো কি এক নেশা।

আপত্তি জানাতে পারে নি রতনলাল। আপত্তি জানাবার মত মনের জোর হারিয়ে ফেলেছিলো সে।

তখনও সবটুকু পরিচয় জানতো না ও। আমরাও জানতাম না।

রতনের কাছেই ধীরে ধীরে শুনলাম সব।

বয়েস যখন অল্প ছিলো তখন ওর মা ছিলো বারবনিতা। আর এই অনাচারী জীবনেই অনাহূতের মত এসেছিলো সুর্মা।

সুর্মা জানতো একই পথে তারও জীবন কাটবে। জানতো, জন্মগত কলঙ্ক দূর করার উপায় নেই।

আমরা তাই সাবধান করতাম। বলতাম, ভুল করছিস রতন, সুর্মাকে তোর ইস্কুলে নিয়ে ভুল করছিস।

হাসতো রতনলাল। বলতো, সুর্মার গলার কাজ তোরা শুনিস নি। আমার এ ইস্কুলের যদি কোনদিন নাম হয় তো ওর জন্যে। ওর মত গলা ক'জনের আছে।

রতন বোধ হয় মনেপ্রাণে তা বিশ্বাসও করতো। তা না হ'লে সব কাজ ভুলে এমনভাবে সুর্মাকে তৈরী করার নেশায় ডুবে যাবে কেন। সুর্মা যেন শুধু একজন ছাত্রী নয়। সুর্মার খ্যাতি যেন রতনের খ্যাতি। সুর্মার সাফল্য মানে রতনের সাফল্য।

এমনিভাবে সুর্মাকে গড়েপিটে তৈরী করার নেশায় যখন রতন একেবারে মশগুল হয়ে গছে সেই সময়েই অঘটন ঘটে গেলো।

কি করে যেন জানাজানি হয়ে গেলো, সুর্মা ঘৃণ্য এক বারবণিতার মেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে কানাঘুষো শুরু হ'লো ছাত্রছাত্রীদের। দু' একজন দু' একজন করে ছাত্রছাত্রীদের ইস্কুলে আসা বন্ধ হ'লো। কারও কারও বাপ মা এসে জবাবদিহি চাইলে।

বললে, হয় ও মেয়েটাকে তাড়ান, আর নয়তো আমার মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো।

হাসলো রতন। বললে, তা সম্ভব নয়। সুর্মার জন্য যদি ইস্কুল উঠেও যায় তবু সুর্মাকে ছেড়ে দিতে পারবো না আমি।

আমরা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, যাঁরা আপত্তি করছেন তাঁদের কোন দোষ নেই। ভদ্রঘরের মেয়েরা সুর্মার পাশে বসে গান শিখবে। এ কি করে সম্ভব!

হাসলো রতন। বললেন, ইস্কুল চলবে ইস্কুলের নিয়মে ছাত্রীদের নিয়মে নয়।

একে একে সত্যিই সকলে ছেড়ে চলে গেলো। রবিবার সকালে আর বিকেলে এত যে ভিড় হ'ত, একদিন গিয়ে দেখি ঘর খাঁ খাঁ করছে।

জিগ্যেস করলাম, কি খবর রতন? কি হ'লো?

সব কথা খুলে বললে রতনলাল।

বললাম, কিন্তু এ পাগলামি করে কি হবে? ইস্কুল উঠে গেলে চালাবি কি করে?

চুপ করে রইলো রতন। তারপর ধীরে ধীরে বললে, সুর্মাকে বিয়ে করছি আমি। সুর্মাকে নিয়ে অন্য পাড়ায় উঠে যাবো, আবার নতুন করে ইস্কুল খুলবো।

বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। না, সুর্মাকে রতন বিয়ে করবে বলে নয়। এতদিনের ধৈর্য আর পরিশ্রম দিয়ে গড়া ইস্কুলটা উঠে গেলো তবু সুর্মাকে রতন ছাড়তে পারলো।

না বলেও নয়। এমন একটা আঘাতের পরেও, এমন একটা ব্যর্থতার পরেও রতন আবার নতুন করে দাঁড়াবে স্বপ্ন দেখছে ব'লে। আশ্চর্য একটা সামান্য বারাঙ্গনার মেয়ের প্রেম কি মানুষকে এতখানি মনের জোর দিতে পারে!

হয়তো পারে। সত্যিই একদিন ঘটা করে সুর্মাকে বিয়ে করে বসলো রতনলাল। আর আমি, গঙ্গাধর, আরো পাঁচজন বন্ধু চেষ্টা করে খানিকটা হৈ চৈ করলাম। চেষ্টা করলাম সুর্মাকে খুশি করতে, সুর্মাকে বোঝাতে যে আমাদের কাছে মানুষের মনটাই বড়ো, দেহের শুচিতা নয়। দেহের যদি বা তো জন্মের নয়।

সুর্মা খুশি হ'লো। এতগুলি বন্ধু পেয়ে। বন্ধুদের আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে। ওর মনের মধ্যে যে সঙ্কোচ ছিলো, যে দুর্বলতা—তা মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো।

একদিন নিজের মুখেই তা প্রকাশ করে ফেললো সুর্মা। চোখ ছল ছল করে উঠলো ওর। গলা ভিজে এলো কৃতজ্ঞতায়।

বললে, সত্যি, আপনাদের মত মানুষ হয় না।

—কেন? হেসে উঠে গঙ্গাধর প্রশ্ন করলে।

ছলছল চোখে সুর্মা বললে, আমি কত ছোট, কত নীচ ঘরের মেয়ে, তবু আপনারা......

আমরা চেষ্টা করে হেসে উঠলাম সশব্দে।

মানুষের বাইরের চেহারাটাই সব নয়। কত উঁচু ঘরের মেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে, আর সুর্মা সহজ জীবনের পঙ্কিলতা ছেড়ে উঠে আসতে চায়। দারিদ্র্যকেও ভয় পায় না।

গঙ্গাধর হেসে উঠে বললে, মনটা আমাদের আরো নীচ।

গঙ্গাধর সেদিন সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছিলো। তখন বুঝতে পারি নি, ভেবে-ছিলাম বিনয় হয়তো। কিন্তু দুটো বছর যেতে না যেতে দেখলাম গঙ্গাধর সত্যিই নীচ।

বড়লোকের ছেলে গঙ্গাধর। টাকার অভাব নেই। তাই আমরা ভেবেছিলাম রতনকে নতুন করে দাঁড়াতে সাহায্য করবে সে।

বলেছিলাম সে-কথা। শুনে হাসলো গঙ্গাধর। বললে, দাতব্য করার মত টাকা নেই ভাই আমার। তা ছাড়া একটা ইয়ের মেয়েকে বিয়ে করে রতন আমাদের মুখেও চুনকালি দিয়েছে, তাকেই কিনা সাহায্য করতে বলিস?

শুনে চমকে উঠেছিলাম। সুর্মার কাছে গঙ্গাধর যেন ভদ্রতার প্রতীক, বিনয়ের অবতার। অথচ মনের গোপনে তার এতখানি ঘৃণা? এত জ্বালা?

বললাম, সুর্মার ওপর তোর এত রাগ কেন বলতো?

—রাগ? না, দুঃখ, রতনের জন্যে। গঙ্গাধর বললে, একটা পয়সা রোজগার নেই, ধার করে চলে, আর সুর্মা......

কথাটা রাগে আর শেষ করতে পারলো না গঙ্গাধর। কিন্তু বুঝতে বাকী রইলো না আমার। কারণ খবরটা আমারও অজানা ছিলো না। আর ব্যাপারটা আমার কাছেও খারাপ লেগেছিলো, মনে হয়েছিলো নির্বুদ্ধিতা।

মাস কয়েক পরেই শুনলাম যার আসবার কথা ছিলো সে এসেছে।

আরও কিছুদিন পরে তাকে কোলে নিয়েই এসে হাজির হ'লো সুর্মা। দেখে প্রথমটা চিনতেই পারি নি। সে-চেহারাই যেন নেই। যেন বহুদিন ধরে রোগে ভুগে ভুগে শুকিয়ে গেছে, গাল বসে গেছে, চোখের কোণে কালি। কোলের ছেলেটাও মূর্তিমান ক্ষুধা যেন।

বহুদিন খবর রাখিনি সুর্মার। দেখলাম, চেহারাও বদলে গেছে একেবারে। তবু ওর চোখের দৃষ্টিতে কি যে আছে, দু'বার তাকাতেই চিনতে পারলাম।

বললাম, কি খবর?

শক্ত হয়েই দাঁড়িয়েছিলো সুর্মা, শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বিষণ্ণ এক ফালি হাসি হেসে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলো।

পড়লাম। রতনের চিঠি। এই চিঠিখানা রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছে সে।

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে রতন। চোখের সামনে স্ত্রী পুত্রকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছে সে, তাই নিরুদ্দেশ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যদি আবার কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ফিরে আসবে এইটুকু সান্তনা দিয়ে চিঠি রেখে গেছে রতন।

সুর্মা ধীরে ধীরে বললে, সাতটা দিন অপেক্ষা করেছি। ভেবেছিলাম নিজেই ফিরে আসবে, কিন্তু এলো না।

—তবে?

সুর্মা হাসলো।—এবার আমাকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সুর্মার সামনেই রতনের নামে একটা রূঢ় গালাগালি দিয়ে বসলাম। ম্লান হেসে সুর্মা বললে, ওর দোষ কি বলুন। আমার জন্যেই তো ইস্কুলটা গেল, আমার জন্যেই তো এত দুঃখ কষ্ট! উত্তর দিতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, তোমার জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে, পৃথিবীতে প্রেমের আকর্ষণটাই সবচেয়ে বড়ো।

পরের দিন গঙ্গাধরকে খবরটা দিতেই গাড়ি নিয়ে ছুটলো সে তখনই। বললে, রতনটা একটা স্কাউণ্ড্রেল। এভাবে অসহায় অবস্থায়— না, না, সুর্মার এ বিপদে তাকে আমাদেরই দেখা উচিত।

বলে চলে গেলো গঙ্গাধর।

তারপর বহুদিন আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। একদিন রতনের সেই একতলার বাসাতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে না পেলাম সুর্মাকে, না রতনকে। দেখলাম দরজায় একটা বড়ো তালা ঝুলছে।

তারও কিছুদিন পরে শুনেছিলাম কথাটা। শুনেছিলাম পাঁক থেকে যাকে তুলে এনে পদ্মের মর্যাদা দিয়েছিলো রতন, সে আবার নাকি পাঁকেই ফিরে গেছে। গঙ্গাধরের আশ্রয়ে আছে সুর্মা। কে একজন বললে, বেহায়ার হদ্দ। দেখিসনি তো, সকলের সামনেই ঢলাঢলি করে সুর্মা। অবিশ্বাস করিনি। বারবনিতার মেয়ের পক্ষে এ আর অসম্ভব কি।

মনে মনে ভাবলাম, ওরা বুঝি বদলায় না। বদলাতে পারে না নিজেদের। কি এক বিষ আছে ওদের রক্তে, কি এক কুৎসিত নেশা। কিন্তু গঙ্গাধর? সে তো আরও নীচ আরও......

এতদিন শুনেই আসছিলাম, চোখে দেখলাম এই প্রথম।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে বিলিতী পত্রিকা দেখছিলাম। শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। দামী সাদা রঙের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো। নেমে এলো সুর্মা আর গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের গায়ে হেসে ঢলে পড়তে পড়তে হেলেদুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সুর্মা।

সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল। যাকে পাঁকের জীবন থেকে তুলে আনতে চেয়েছিলো রতন, যাকে মর্যাদা দেবার জন্যে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করলো রতন, তার এ হাসি এ অনাচার অসহ্য লাগলো।

কিন্তু রূপটাও অসহ্য। এত সুন্দর সুর্মা? এমন অপ্সরীর মত স্থির যৌবনা?

মনের মধ্যে সারাক্ষণ গুণগুণ করলো শুধু একটি নাম। সুর্মা, সুর্মা। পুরানো দিনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে শুনলাম, কে একজন অপেক্ষা করছে বাইরের ঘরে।

প্রথমটা চিনতে পারিনি। খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি। রোগা পোড়া পোড়া চেহারা। দুটো কোটরের মধ্যে হলুদ রঙা একজোড়া ক্ষুধার্ত চোখ।

—চিনতে পারছিস?

চমকে উঠেছিলাম। গলার স্বর শুনে মনে পড়ে গেলো।

—কে, রতন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—পারলাম না ভাই, পারলাম না। রতন হাসলো। বললে, ভেবেছিলাম নিজের পায়ে আবার দাঁড়াবো, তারপর ফিরে আসবো সুর্মার কাছে।

সুর্মার নাম শুনে অস্বস্তি বোধ করলাম। মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যটা।

তবু প্রশ্ন করলাম, গিয়েছিলি সুর্মার কাছে? জানিস ও কোথায় এখন?

হাসলো রতন।—জানি। সব খবরই রাখতাম। গিয়েছিলাম দেখা করতে। আজ সকালেই।

—দেখা করলো? উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

মৃদু হেসে চুপ করে রইলো রতন। তারপর বললে, আমাকে জড়িয়ে ধরে সুর্মার সে কি কান্না। না দেখলে বিশ্বাস করবি না।

শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম।

রতন বোধহয় বুঝতে পারলো। বললে, না রে, সুর্মাকে ভুল বুঝিস না, তুই অন্তত ভুল বুঝিস না।

কি বলবো এ-কথার উত্তরে।

রতন বললে, চলে আসতে চেয়েছিলো সুর্মা। সব ছেড়ে। আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিলো।

—তারপর? একটু অবিশ্বাসের সুরেই প্রশ্ন করলাম।

রতনের চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। বললে, আমারই দোষ।

—কেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

রতন বললে, নীচ মন আমাদের। বললাম সুর্মাকে, তোমার টাকাকড়ি গয়নাপত্তর' সব নিয়ে চলো, আমরা নতুন করে জীবন শুরু করবো, ইস্কুল করবো আবার......

দু হাতে মুখ লুকিয়ে রতন বললে, কি বললো জানিস?

—কি?

বললে, দুঃখকষ্টকে আমি ভয় পাই না। চলো যেমন ছিলাম তেমনি থাকবো আমরা, দুঃখ নিয়ে থাকবো, তবু তার মধ্যে অনেক সুখ।

আমি বললাম, নিয়ে এলি না কেন?

রতন উত্তর দিলো, সাহস হয় না রে। কিছু টাকাকড়ি না পেলে, সুর্মার গয়নাগুলো পেলেও ইস্কুল না হোক ব্যবসা শুরু করতে পারতাম। কিন্তু কি বললে জানিস? বললে, গঙ্গাধরের একটা কানাকড়িও নিয়ে আসবে না।

—কেন?

রতন হাসলো। বললে, আমিও বুঝতে পারিনি প্রথমে। সুর্মা বললো কি জানিস? বললো, আমাকে যে এত দিয়েছে, এত বিশ্বাস করেছে, তাকে আমি ঠকাতে পারবো না। সুর্মা কি বললো জানিস, বললো ভালবাসার চেয়ে কৃতজ্ঞতা অনেক বড়ো।

বললাম, তোর মনটা সত্যিই বড়ো নীচ রতন। সোনাদানার লোভ না রেখে তাকে তুই ফিরিয়ে আনলি না কেন? নয় আগের মতই দুঃখে কষ্টে থাকতিস?

রতন হাসলো।—ভাবলাম, গঙ্গাধর অনেক করেছে ওর জন্যে, জীবন বাঁচিয়েছে সুর্মার সুর্মার ছেলের। সুর্মা তো ঠিকই বলেছে ভালোবাসাই তো সব নয়, কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা কথা আছে। অকৃতজ্ঞ হতে বলছিস আমাকে?

বলেই উঠে দাঁড়ালো রতন।

বললাম, কোথায় যাচ্ছিস?

—দাঁড়া আসছি। বলেই বেরিয়ে গেলো রতন।

বসে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে বাইরে এসে এ-পাশ ও-পাশ তাকালাম। কোথায় রতন? আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু রতন আর ফিরলো না।

সে যুগ আর নেই
প্রাচীনকালে দেবতারা কোনএকসময় ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে, সুন্দরী মেনকাকে নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁর চিত্তবিভ্রম ঘটিয়ে, তপস্যাভঙ্গ করে ক্ষমতা হরণ করতে।
লাস্যময়ী মেনকা তাতে অবশ্য সফলতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু পুজনীয় ঋষির পক্ককেশ ও শ্বেত শ্মশ্রুর দ্বারা মেনকা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এরকম একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।
কিন্তু যুগ এখন বদলে গেছে ; একালের আধুনিকারা পাকাচুল মোটেও পছন্দ করেন না।
মসৃন কালো ও চকচকে চুলের জন্য
লোমা
ব্যবহার করুন।
লোমা সর্বত্র প্রশংসিত—চুল কালো করে।

# সুধাময়

বিমল কর

আমার বন্ধু সুধাময় আমার শেষ চিঠি দিয়েছিল মাস পাঁচেক আগে। তখন ওর মন খুব অস্থির; নিজের সঙ্গে অদ্ভুত রকমের এক বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করছিল। আমি তা জানতাম। চিঠিতেও খাপছাড়াভাবে সে-সব কথা কিছু কিছু ছিল। কিন্তু এমন কোনো কথা ছিল না, যা থেকে মনে করা সম্ভব, মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম ছেড়ে সুধাময় হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে।

ওর শেষ চিঠির জবাব দিয়ে আমি মাস খানেক পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। সচরাচর দিন পনেরো অপেক্ষা করলেই ফিরতি জবাব আসত। উত্তর পাইনি। উদ্বিগ্ন হয়ে আবার চিঠি দিয়েছি, অপেক্ষা করেছি। তারপর আবার। শেষে টেলিগ্রাম। ডাক্তার মুখার্জির চিঠি থেকে শেষে জানতে পারি, সুধাময় মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, ফিরবে কি ফিরবে না—কেউ জানে না।

পাঁচ মাস পরে কাল সুধাময়ের দু-ছত্রর এক চিঠি পেলাম। ঠিকানা নেই কোনো। কোথায় আছে তাও লেখেনি। পোস্ট অফিসের সিলের ছাপ থেকেও স্পষ্ট কিছু বোঝবার উপায় নেই। রেলের মেল-সার্ভিসে ফেলা চিঠি। খুব সম্ভব দিন তিনেক আগে নাগপুরে এই চিঠি ফেলা হয়েছে।

সুধাময় লিখেছে ঃ তোমার লেখা একটা গল্প হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। ওয়েটিংরুমে বসে মাঝরাতে সেই লেখা পড়লাম। মালা-বদলের রূপকথা কি প্রেম? না চোখে বান ডাকলেই প্রেম হয়? প্রেম কি তুমি জান না বা সঠিকভাবে বোঝো না। তবু, কেন লেখ? প্রেমের উপলব্ধি যদি কোনো দিন হয় তোমার, তবে লিখো, নচেৎ নয়। আশা করছি, তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। ইতি সুধাময়।

সুধাময়ের চিঠি অপ্রত্যাশিত। এবং বলা বাহুল্য, নাটকীয়। আমার পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত আমি আহত হয়েছি। তবু, একটু যে খুশী বা নিশ্চিন্ত না হয়েছি এমন নয়। সুধাময় বেঁচে আছে—আমাকে মনে রেখেছে—এটুকু জানাও কিছু কম নয়।

কিন্তু সুধাময়কেও একটা বিষয় আমার জানানো দরকার। তার ঠিকানা জানলে কাজটা চিঠি দিয়ে সারতে পারতাম। গত্যন্তর-হীনতার সেই বন্ধুর জন্যে আমার আর একটা গল্পই লিখতে হচ্ছে। তার চোখে

পড়বে এ-আশা আমার অল্প। তবু, বলা যায় না, যে-নাটক নাগপুরের কাছাকাছি কোনো রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে মাঝ-রাত্রে একবার ঘটেছে—হয়ত আবার কোনো এক সকালে বা দুপুরে মন্থরগতি কোনো ট্রেনের কামরায় সেই নাট্যদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। চোখে পড়লে, আমি জানি, সুধাময় আমার লেখা পড়বে, সমস্ত মন দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিংবা এমন যদি কখনও হয়—আপনাদের কেউ যদি এ-গল্প পড়েন, অন্তত ভাসা-ভাসাভাবেও মনে থাকে এই গল্প, এবং এমন কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—যার নাম সুধাময়, প্রায়-চল্লিশ বয়স, টকটকে ফরসা, একটু রোগা চেহারা, ভীষণ ধারালো নাক, মেয়েদের মতন টলটলে গভীর চোখ, অথচ নিবিড় দৃষ্টি, জোড়া ভুরু, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, কপালের ডান পাশে একটা বড় মতন আঁচিল—অনেক চুল মাথায় আর মুখে সব-সময় শান্ত হাসি লেগে আছে—না, একটু ভুল হল, এক সময় এই হাসি অবশ্য লেগে থাকত, এখন হয়ত তা নিভে গেছে—হ্যাঁ, এ-রকম কাউকে দেখতে পেলে সময়মতন একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তার নাম কি সুধাময় বিশ্বাস, মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ামে থাকত?

আমার বন্ধু সুধাময় তার পরিচয় গোপন রাখবে না। আমি জানি। মিথ্যে কথা সে বলে না, কপটতা অপছন্দ করে। তা ছাড়া এমন কোনো কারণ নেই, নিজের নাম কিংবা পরিচয়ের মতন তুচ্ছ একটা ব্যাপারের জন্য সে রহস্যের আশ্রয় নেবে।

"আপনার কথা আমি শুনেছি।" সুধা-ময়কে বিস্মিত করে আপনি বলতে পারেন তখন, "আপনার বন্ধুর কাছ থেকে। তিনি একটা গল্প লিখেছিলেন আপনাকে নিয়ে। গল্পটা কিছু নয়, কিন্তু আপনি মশাই ভীষণ ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। আপনি নাকি জীবনে......। দেখছেন প্রথমেই একেবারে জীবনে চলে যাচ্ছি আপনার। না, সেটা উচিত নয়। তার আগে মোটামুটি আপনার পরিচয় যা পেয়েছি তা বলা দরকার। কে জানে, আপনার লেখক বন্ধু কতটা রঙ চড়িয়েছে বা আলকাতরা মাখিয়েছে গায়ে। তেমন হলে সবটাই বাজে, মনগড়া ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

"যতদূর মনে পড়ছে আপনি, সুধাময়-বাবু, খুব সুন্দর এক দিনে জন্মেছিলেন।

কোজাগরী পূর্ণিমায়। বাংলা দেশের কোজাগরী পূর্ণিমা যে কী আমার পক্ষে তা বর্ণনা দিয়ে বলা অসম্ভব। আপনাদের দেশের বাড়ির গা ছুঁয়ে নদী বয়ে গিয়েছিল। এ-পাশে তিনমহলা বাড়ি; ও-পাশে ধু-ধু চর আর সবুজ গাছপালা। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে, সেই ফিনকি-ছোটা জ্যোৎস্নায় নদীর জল যখন রূপোর পাতের মতন ঝকঝক করছে, কলকল একটা শব্দ উঠে বাতাসে মিশ খেয়ে গেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জোনাকি উড়ছে, কেমন এক আশ্চর্য গন্ধ, চর আর বুনো লতাপাতা ফুটফুটে আলোয় ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের ঘোরে ফিসফিস করে উঠছে—বিশ্বচরাচর শান্ত, স্তব্ধ, সমাহিত—তখন দোতলার পুব-দক্ষিণের সবচেয়ে বড় ঘরটিতে কচি গলার একটা কান্না কাঁকিয়ে উঠল। নদীর দিকের খোলা জানলা দিয়ে কোজাগরীর বাঁধ-ভাঙা আলো চামর দোলাচ্ছে ঘরে; উত্তরের দিকে 'জন্মসুখী' প্রদীপ। আপনার মার গায়ে তখনও লক্ষ্মীপুজোর শাড়ি। কোরা গন্ধ উঠছে।

আপনার পিসি ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার ভাইকে বলল, দাদা—খোকা হয়েছে।

আপনার বাবা তখন তেতলার শোবার ঘরের সামনে নদীর-দিকে-মুখ-করা টানা বারান্দায় একা চুপচাপ বসে। সুন্দর, শান্ত, স্তব্ধ এক বিশ্বের লীলা দেখছিলেন তন্ময় হয়ে।

'তোর বৌদি ভাল আছে?'

'হ্যাঁ।'

'খোকা?'

'বলো না; পেট থেকে পড়তে না পড়তেই কী কান্না! গলা চিরে ফেলল।' আপনার পিসি শুভসংবাদের ফুলঝুরিটি জ্বালিয়ে দিয়ে ধড়ফড় করে ফিরে যাচ্ছিল।

'শোন, সুবর্ণ—!' আপনার বাবা ডাকলেন পিসিকে, হাত দিয়ে জ্যোৎস্না-আকুল নদী চর বন আকাশ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এরই কোথাও থেকে ও এসেছে কি না—তাই বড় লেগেছে। অত কান্না। ভাবছে বুঝি অত আনন্দ অত সুধা থেকে কেউ ওকে কেড়ে নিয়ে এসেছে। বড় হলে বুঝতে পারবে এ-সবের সঙ্গেই সে আছে। তখন আর কাঁদবে না।'

আপনার উনিশ বছরের পিসি তার দাদার এত তত্ত্বকথা বুঝল না। বোঝার গরজও ছিল না তার। চলেই যাচ্ছিল আবার, আপনার বাবা বললেন, 'সুবর্ণ, তোর ভাইপোর নাম থাক সুধাময়।'

'বা! বেশ নাম; কী সুন্দর নাম হয়েছে দাদা।' পিসি যেন নামটা আঁতুড়ঘরের দরজায় পেঁছে দিতে ছুটে চলল।

জন্ম থেকেই আপনি সুধাময়।

মা বাড়িতে আদর করে কখনো কখনো ডাকত, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকান্ত। নামটা আপনার পছন্দ ছিল না, বাবারও নয়, পিসির তবু বা একটু ছিল। ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীর যে পট ছিল, তাতে লক্ষ্মীর চেহারাটা ছিল বামুন দিদিমণির মতন। তেমনি মোটাসোটা, ভারিক্কী। পানের বাটা আর ভাঁড়ারের চাবির গোছা সব সময় হাতের কাছে রেখে সে বসে থাকত। এই বামুন দিদিমণিকে আপনার ছেলেবেলা থেকেই তেমন পছন্দ হত না। পটের লক্ষ্মীর সঙ্গে দিদিমণির চেহারার মিল যদিও বা ভুলতে পারতেন, কিন্তু পায়ের তলার বিরাট প্যাঁচাটি কিছুতেই সহ্য হত না।

'প্যাঁচায় চড়ে লক্ষ্মীঠাকুর কেন ঘুরে বেড়ায়, মা?' আপনি শুধোতেন মাকে।

মা বলত, 'ওমা ও যে বাহন রে!'

বাহন কি কে জানে! তবে এই বাহনটি যে বিশ্রী তাতে আর কথা ছিল না। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, এক বোনকে ভীষণ অপছন্দ হলেও অন্য বোনকে আপনার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। সরস্বতী। সরস্বতী ধবধবে সাদা, সুন্দর; পায়ের তলায় কী চমৎকার হাঁস, পদ্মফুল; হাতে বই, বীণা।

'সরস্বতীকে বিয়ে করব' বলে একদিন কী ভীষণ আব্দার যে জুড়েছিলেন আপনি সে-কথা আপনার মা কিংবা বাবা বোধ হয় শেষ বয়সেও ভুলতে পারেননি।

'তোমার ছেলের পয়সাকড়ির ওপর টান থাকবে না, দেখছ ত পুণ্য। আমার মতনই

হবে শেষ পর্যন্ত।' আপনার বাবা বলতেন।

'তাতে আর ভালটা কি হবে; এই সর্বস্বই ত যাবে।' মা জবাব দিতেন। 'সব বিলিয়ে টিলিয়ে বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

'তা কেন, আমি কি বৈরাগী হয়েছি?'

'হওনি যা কি! নেহাত শ্বশুরঠাকুর থাকতে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই। নয়ত বিয়েটাও কি করতে নাকি।' আপনার মা, পুণ্যময়ী বলতেন ঈষৎ যেন ক্ষুব্ধ হয়ে। তারপর ভবিষ্যতের ভাবনা তুলে দিতেন কথার কটা টুকরো দিয়ে। 'যে-বয়সে ছেলে হল সেটা এমন কোনো কাঁচ বয়েস নয় আমাদের। খানিকটা মানুষ করে যেতে না পারলে কি যে হবে বুঝতে পারছ ত!'

'মানুষই ত করছি। দেখছ না, রোজ নিজে দু-বেলা পড়াই ওকে।'

'দেখছি। পাঁচ বছরের ছেলে—সকাল-সন্ধ্যে ছাদে দাঁড়িয়ে বাপের সঙ্গে হাত জোড় করে গান গেয়ে প্রার্থনা করছে, 'তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে, নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে॥' পুণ্যময়ী একটু হাসেন।

'এর চেয়ে তোমার লক্ষ্মীর পাঁচালী বা সত্যনারায়ণের ছড়া শেখালে কোন্ ভাল শিক্ষা হত?' আপনার বাবা শুধোন স্মিত হাসি হেসে।

'জানি না। ঠাকুর-দেবতায় অন্তত ভক্তি হত।'

'ভক্তি শিখতে হয় না, ওটা এমনিতেই আসে, সংস্কারের সঙ্গে। এই যে আমায় তুমি অত ভক্তি করো, এ কি কেউ শিখিয়েছিল?' আপনার বাবা একটু হাসি-হাসি মুখ করে মায়ের দিকে চেয়ে থাকেন; তারপর বলেন, 'ভক্তিতে দরকার নেই; ও ভালকে ভালবাসতে শিখুক। ওটা শিখতে হয়।'

'আমাকেও শিখতে হবে নাকি?' পুণ্যময়ী হাসেন, আড়চোখে স্বামীকে লক্ষ্য করে।

বাবাও হেসে ফেলেন।

আপনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মা বলেন, 'তোর বাবা কাকে বেশি ভালবাসতে শেখাচ্ছে রে সুধা; আমাকে, না তোর বাবা নিজেকেই?'

'তোমাকে। পিসিকেও আমি অনেক ভালবাসি। টুনটুনিকেও।' টুনটুনি বেড়াল ছানা।

পুণ্যময়ী হাসতে গিয়েও হাসতে পারেন না। চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

আপনার ছেলেবেলার কথা আরও যেন কি কি আছে সুধাময়বাবু। হরি বাউল, মধু মাস্টার, অমৃত পণ্ডিত..., সব আমার মনে পড়ছে না। মোটামুটি এই, বাল্যশিক্ষাটা হয়েছে বাড়িতে। মনের বাইরের দিকটা তৈরি করছিলেন বাবা, ভেতরটা মা। এক-জনের শিক্ষায় কৌতূহল এবং বিস্ময় দিন-দিন বাড়ছিল; অন্য জনের প্রভাবে এমন একটা নরম স্বভাব গড়ে উঠছিল যা পুরুষ-চরিত্রে অল্পই দেখা যায়। বাবা আপনাকে এক ধরনের সুন্দর নিঃসঙ্গতা শিখিয়েছিলেন মা আত্মগত মাধুর্য। এখানে বড় একটা বিরোধ ছিল না। বরং বলা যায়, আপনি যদি সেতু হন, তবে এঁরা ছিলেন দু দিকের দুই ভূমি। সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণতা।

বিরোধ ঘটল অন্য জায়গায়। মা চাইতেন, ছেলে তাঁর রক্তমাংসের মানুষ হোক, সংসারের আর পাঁচজনের মতন—তবে মাথায় উঁচু। ডাক্তার হতে চায় ত তাই হোক, জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায় ত তাই হোক; বিয়ে-থা ঘর-সংসার করুক। কিন্তু এ কি সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করছে সুধা? আজ কল-কাতায় পড়তে গেল ত কাল ছেড়েছুড়ে চলে গেল বেনারস। বেনারসে মাস ছয়েক কাটতে-না-কাটতে আবার কলকাতা।

'একটা কিছু ত তাকে করতে হবে।' মা বলেন অনুযোগের গলায় স্বামীকে।

'না করলেই বা কি! আমাদের যা আছে তাতে ওর একার জীবন বেশ কেটে যাবে।' বাবা জবাব দেন।

'জীবন কাটানোই কি বড় কথা?'

'কখনোই নয়। তবে জজ ব্যারিস্টার হওয়াতেও হাতে স্বর্গ পাওয়া নয়।'

'সুধা ছন্নছাড়া হয়ে থাক, এই কি তুমি চাও?'

'সুধা সুধার মতন হোক এইটুকু শুধু আমি চাই। সে বড় হয়েছে। আমার মর্জি-মতে, আমার ভালমন্দ বোঝার ওপর তাকে আমি চালাতে চাই না। সে হবে জবরদস্তি। পিতৃত্বের ছোট বেড়া থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছি, পুণ্য। আমাদের সম্পর্ক রাজা প্রজার নয়। আমি আধিপত্য করব না, তার ফসলের ভাগ চাইব না।'

পুণ্যময়ী স্বামীর এই মুক্তিতত্ত্ব বুঝতেন না। কিছুতেই মাথায় ঢুকত না।

এই সময় ছেলেকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখলেন পুণ্যময়ী। তাতে অনেক কথা; নানা উপদেশ অনুরোধ। শেষে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও থাকল : সুধা, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। তোমার পিতৃপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে তোমার পর আরও একজনের যে থাকা দরকার। সব দিক বিবেচনা করা কি তোমার কর্তব্য নয়? বাবা সুধা, আত্ম-সুখী হয়ো না, তাতে কষ্টই পাবে।

পুণ্যময়ীর চিঠির জবাব দিল সুধাময় তিন গুণ দীর্ঘ করে। তাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা। স্বামীর নানারকম হেঁয়ালি যেমন পুণ্যময়ীর দুর্বোধ্য লাগত এবং সে-সব তত্ত্বকথার সঙ্গে সংসারের কোনো কিছুকে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব ছিল, সুধাময়ের চিঠিরও প্রায় নিরানব্বইটা কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। সুধা এম এ পরীক্ষা দিচ্ছে না এই খবরটা ছাড়া বাকি যা বুঝলেন তাতে পুণ্যময়ী নিঃসন্দেহ হলেন, সুধা বিয়ে করবে না।

"আমি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছি, মা। আমার মনে শান্তি নেই। কী ভীষণ অতৃপ্তি যে! আমার সুখ কিসে, কেমন করে তা পাব, কে জানে। বাবার কাছে শিখেছি, যা ভাল তাকে ভালবাসতে পারলে আনন্দ। আমার মনে আনন্দ কই! কত ভাল জিনিস দেখছি, ভালও লাগছে, কিন্তু কই তেমন আনন্দ ত হয় না। আমি পারছি না...... ভালবাসতে পারছি না।......তুমি বুঝতে পারবে কি মা, আমি কত নিঃসঙ্গ আর একা-একা রয়েছি। আমায় এখন একাই থাকতে হবে।......"

চিঠি থেকে বোঝা গেল ছেলে পাগল হয়েছে। তার বাবার চেয়ে বেশি। উনি তবু সংসার বাদ দেননি, ছেলে সবকিছুই বাতিল করছে।

ছেলের চিঠি স্বামীর সামনে ফেলে দিয়ে পুণ্যময়ী বললেন, 'সুধাকে একবার এখানে আসতে লেখ; অনেকদিন দেখিনি।'

সুধাময়কে বাড়ি আসতে লেখা হল। তখন প্রচণ্ড বর্ষা। নদীর জল তট ছাপিয়ে অনেকখানি উঠেছে। দেশের বাড়ির ভিত অনেক আগেই জলে ডুবেছে। তার ওপর চার দিন ধরে সমানে একটানা বৃষ্টি। জল বেড়েই চলেছে। নদীর-দিকে-মুখ-করা লম্বা টানা বারান্দার উত্তর কোণের খানিকটা কেমন করে যেন ধসে গেল। সেই সঙ্গে বাবাও। ঘোলা জলের তোড়ের সঙ্গে ভাসা দেহটা অনেকখানি চলে গিয়েছিল। গিয়ে আটকে ছিল জামরুল গাছের গায়ে।

সুধাময় বাড়ি এসে পৌঁছল যখন, বাবার দেহটা ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িতে যেন সেই ছাই উড়ছিল। বাবার সেই বসার ঘরটা কী অদ্ভুত ফাঁকা, আলমারির বইগুলো যেন বাবার সঙ্গে শেষ কথা বলে চিরকালের মতন চুপ করে গেছে, শোবার বিছানাটি পর্যন্ত নিঃসঙ্গ করুণ!

সুধাময় অনুভব করতে পারছিল, কোন জিনিস তার খোওয়া গেল, কিন্তু বলতে পারছিল না। এ-সংসারে তার সবচেয়ে নিকট বন্ধু, একান্ত শ্রদ্ধার মানুষ এবং সেই মহৎ শিক্ষকটিকে সুধাময় হারিয়েছে—যাকে কোনোদিন হারাতে হবে এ-যেন তার চিন্তায় আসেনি। নিজেকে ভীষণ অসহায়, সম্বলহীন মনে হচ্ছিল সুধাময়ের। অদ্ভুত রকম শূন্য, নিঃসঙ্গ।

"আমরা যে-জগতে বাস করি সে-জগতে অনিত্যতার একটি নিষ্ঠুর নিয়ম আছে। আমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। যে-ঘরে আমরা রাত কাটাতে এসেছি, যদি সে-ঘরের দীপশিখা সব সময় বাতাসে কাঁপে, নিভু-নিভু হয়—তবে আর আশ্বাস কোথায়? যে কোনো সময় অন্ধকার আসতে পারে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যে ক' মুহূর্ত আছি—আমরা কি মানুষের মতন বাঁচতে পারি? না ভাই, পরিমল—তা সম্ভব নয়। আমরা হুড়োহুড়ি করে, দাপাদাপি করে সুখ অর্থ সম্মান ঘর বাড়ি আধিপত্য যা পাই যতটা পারি লুঠে নিতে চাইছি। কী শোচনীয় অবস্থা! মর্মান্তিক স্থিতি!" সুধাময় দেশের বাড়ি থেকে কলকাতার বন্ধু পরিমলকে এক চিঠিতে লিখল।

জবাবে বন্ধু লিখেছিল : "ভাই সুধা, দিনে দিনে তুমি বড়ই দার্শনিক হয়ে উঠছ। আমি জানি, তোমার মনের ছাঁচই অমন। তবু একটা কথা তোমার বোঝা দরকার, ছটফট করার চেয়ে শান্ত হয়ে সবদিক ভেবে দেখা ভাল। আমি যতদূর জানি, তুমি মনের শান্তি, নিরুদ্বিগ্ন স্থৈর্যের পথচারী। যারা এত বিচলিত-হৃদয় তারা কি গভীরতম কোনো সত্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে? অত হতাশ হয়ো না, চঞ্চল হয়ো না—নিজেরই ক্ষতি হবে।"

দীর্ঘ দু বছর সুধাময় দেশের বাড়ি ছেড়ে নড়ল না। পুণ্যময়ীর অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যেন একপাশের ডানাকাটা এক অসহায় পাখির মতন পড়েছিলেন। করুণ, শোকাবহ, হৃতশক্তি। হয়ত এতোটা হত না যদি তাঁর অন্য ডানাটিও সবল থাকত। কিন্তু সুধাময় তাকেও আড়ষ্ট, অনড় করে রেখেছে। পুণ্যময়ীর বার বার মনে হত, স্বামীর মৃত্যু ঠিক স্বাভাবিক নয়। যেন নিজের এবং স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, সম্ভবত সেই বিচ্ছেদের দায়ভাগ থেকে সরে দাঁড়াবার জন্যে তিনি ওই জলের মধ্যে সরে দাঁড়ালেন। স্বামী তাঁর মৃত্যুবিলাসী ছিলেন না, পুণ্যময়ী জানতেন, কিন্তু যে বিশ্বচরাচরকে তিনি ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন—হয়ত সেই অখণ্ড জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াকে তিনি মৃত্যু বলে ভাবেননি।

পুণ্যময়ী দেখতেন, সুধার নিঃসঙ্গতা কী গভীর। ওর কাছে এই সংসার যেন ইঁটকাঠ ছাড়া কিছু নয়। ও অস্থির, ও চঞ্চল; ওর চোখে অনবরত শুধু প্রশ্ন আর ব্যাকুলতা। বই আর কাগজ কলম থেকে

তার মাথা যখন ওঠে—তখন মনে হয় একটা ক্লান্ত অসুস্থ শিশু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ উঠে বসেছে, চোখ তুলে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে।

এই সময় সুধাময়ের একটা রোগ দেখা দিল। থাকে থাকে, হঠাৎ ছুটে আসে পুণ্যময়ীর কাছে। মুখে ভীষণ এক উদ্বেগ আর ভয়। 'মা, দেখ তো আমার জ্বর এসেছে কি না! মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

পুণ্যময়ী তাড়াতাড়ি গা কপাল দেখেন ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। পরীক্ষকের হাত নয় তা সান্ত্বনার হাত। কী অপূর্ব কোমলতা মাখানো। 'জ্বর কই; গা বেশ ঠাণ্ডা! তোর এই জ্বর জ্বর ছাড় ত! শরীর যে ভেঙে যাচ্ছে এমনি করে।'

'উঁহু, কী একটা হয়েছে মা।' সুধাময়ের মুখে দুশ্চিন্তা, গলার স্বরে এক ধরণের হতাশা, 'শরীরটা সেই জন্যেই খারাপ হয়েছে। রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারি না ভাল করে।'

'সারাদিন ঘাড় গুঁজে বসে থাকবি, না হয় হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবি—এতে কি আর ঘুম হয়?'

পুণ্যময়ীর কথা যেন কানেই তোলে না সুধাময়। বলে, 'ঘাড়ে চোখে সবসময় ব্যথা, মাথার মধ্যে যেন কিচ্ছু নেই বলে মনে হয়—ফাঁকা। আমার কি ব্রেন প্যারালেসিস হবে মা?'

'কি বলিস তুই—?' পুণ্যময়ী ভয় পেয়ে যান যেন।

প্রায় সাত আট মাস একটানা সুধাময় মৃত্যু ভয় ভোগ করল। চোখ আর মাথা মাথা করে যেত। প্রতিদিন বিছানায় শুতে গিয়ে ভাবত এই ঘুমই হয়ত শেষ।

এমন সময় পুণ্যময়ী অসুখে পড়লেন। সুখ তাঁর কি-ই বা ছিল! তবু, শরীরটা বিছানা নেয়নি এতদিন। আসলে, অনেক আগেই তাঁর শয্যা নেওয়া উচিত ছিল, সেই তখন থেকে, যখন সকালে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করত না, উঠলে মনে হত কী অবসাদ, কী ক্লান্তি, গায়ে ঘাম-গন্ধ—সারা রাত যেন ঘেমেছেন, দুপুর থেকে চোখ জ্বালা মাথা টিপ-টিপ, ঘুস-ঘুসে জ্বরভাব, রাত্রের দিকে আস্তে আস্তে আরও তাপ আরও ঘোর। রাত্রে ঘুমের মধ্যে ঘাম হয়ে জ্বরটা যেত। অতটা বোঝেননি পুণ্যময়ী হয়ত, কিংবা বুঝলেও নিজের জন্যে—এই তুচ্ছ জ্বর-জ্বরভাব আর দুর্বলতার জন্যে কাউকে উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বিগ্ন করতে চাননি। এই জ্বর বাড়ল। কাশি নিত্যকার হল; বুকে ব্যথা দেখা দিল; এবং ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরল কাশিতে। শয্যা নিতে হল তখন।

কলকাতার বাবার আগেই বোঝা গেল, এ যক্ষ্মাব্যাধি।

সুধাময় ভয় পেল। ভীষণ ভয়। পুণ্যময়ী যেন ভয়ংকর এক আতংক। সুধাময়ের মনে হত এ-বাড়ির প্রতিটি কক্ষে যক্ষ্মার বীজাণু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, সর্বত্র একটা কাশির ধাক্কা-খাওয়া-বাতাস নিঃশব্দে তাকে শাসাচ্ছে। দেওয়ালে, দরজায়, চৌকাটে, থালায়, বাসনে, খাবারে যক্ষ্মার অদৃশ্য নোংরা বীজাণু ওত পেতে আছে সুধাময়ের জন্যে। ফুটন্ত জল ছাড়া সুধাময় জল খেত না, আগুনের মতন গরম দুধ, প্রথমে ক্লোরিন তারপর প্যাটাশপারম্যাংগানেটের জলে তার বাসনপত্র খাবারদাবার ঘণ্টাখানেক ডোবান থাকত। তবু মনের খুঁতখুঁত যেত না সুধাময়ের। খেতে বসে হঠাৎ থালা ছেড়ে উঠে যেত, শুতে গিয়ে আচমকা মাথার বালিশ চাদর সব টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিত বাইরে। 'আমারও হবে—আমি বাঁচবো না।' সুধাময় ঘরের মধ্যে ক্ষোভে যন্ত্রণায় ভয়ে চিৎকার করে উঠত। যেন মৃত্যু তাকে চিঠি পাঠিয়েছে আসছি বলে। আর যার আসা অবধারিত।

পুণ্যময়ীর ঘরের মধ্যে ঢুকত না সুধাময়। তাহার সাহস হত না; চৌকাটের কাছে দাঁড়াত দিনান্তে এক-আধবার, হাতে অ্যান্টিসেপটিক লোশন মাখানো রুমাল। মার সামনে মুখে চেপে থাকতে সংকোচ হত, তবু সুযোগ পেলেই মুখে চাপত। নিঃশ্বাস যতক্ষণ পারে বন্ধ করে রাখত, যেন মার ঘরের হাওয়ার বীজাণু না বুকে চলে যায়।

সুধাময়ের ইচ্ছে হত এ-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

রোগের হাত থেকে শুধু নয়, মনের হাত থেকেও সুধাময় বাঁচতে চাইছিল। এ-বাড়ি তার অসহ্য লাগত, অসহ্য লাগত নিজেকেই, নিজের স্বার্থপরতাকে। সুধাময় সব সময়ই ভাবত, নিজের আয়ুর ওপর তার এই মোহ পশুর মতন। দুঃখ ভোগের ভয়ে, কিংবা মৃত্যুর আশংকায় তার ব্যবহার দিন দিন হীনতর হয়ে উঠছে। ইতরের মতন; অমানুষিক। আমার আয়ু কি আমার মার চেয়ে মূল্যবান? সুধাময় ভাবত। আর এই চিন্তা তাকে কুরে কুরে খেত যে, সাতাশ বছর ধরে যে-মার নিরঙ্কুশ স্নেহ সে একা ভোগ করেছে—; এবং অসীমা ভালবাসা, আজ সেই অসহায় মুমূর্ষু বেচারী মার কাছ থেকে সে ছুটে পালাতে চাইছে। যেন এই মা আর মৃত্যুর মধ্যে কোনো তফাত নেই। কী সাংঘাতিক! আমি কি মানুষ? সুধাময় বিছানায় উঠে বসে মাঝরাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। ছেলেমানুষের মতন।

'আমি আমার মাকে ভালবাসতাম। আমি তাকে ভালবাসি। মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি ছাড়া মার আর কেউ, কেউ নেই। আমাকে আমার মার পাশে নিয়ে চল, মার মাথার কাছে, কোলের পাশে।' সুধাময় আকুল হয়ে কাকে যেন বলত। বাবাকে কি!

তারপর এক সকালে পুণ্যময়ীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সুধাময়। প্রথম শীতের হিম-কুয়াশা ধোয়া রোদ এসে পড়েছে পুণ্যময়ীর পায়ের কাছে।

'মা, কালই আমরা কলকাতা যাব।

এখানে আর নয়। এ-সব ডাক্তার দিয়ে কিছু হবে না।'
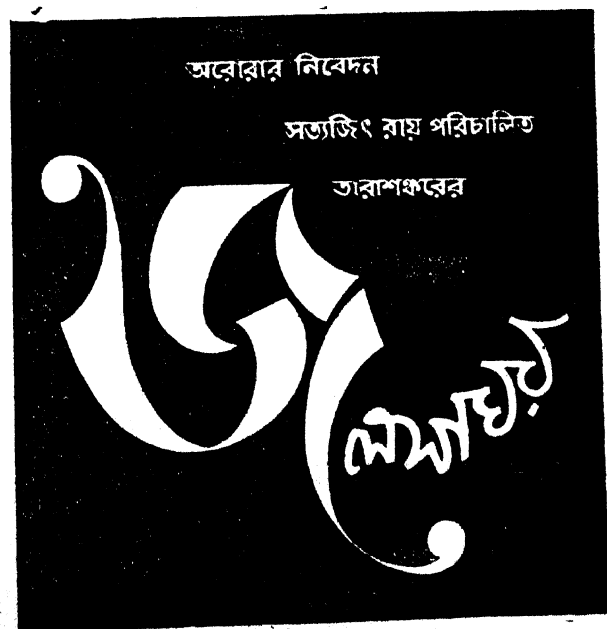
পুণ্যময়ীর যে যাওয়ার ক্ষমতা আর নেই সুধাময় তা বুঝল না।

'কা—ল? কালই যেতে হবে?' পুণ্যময়ী যেন অদ্ভুতভাবে হাসলেন, 'দেখি!'

সুধাময় মার পাশটিতে বসল।

'এখানে বসলি! ওঠ্ ওঠ্......' পুণ্যময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন।

মাথা নাড়ল সুধাময়, সে উঠবে না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সাতাশ বছরের দার্শনিক ছেলে। মার হাত টেনে নিল, মার পায়ে মাথা রাখল, মার গায়ে মুখ ঘষল শিশুর মতন।

সুধাময় জিতে গেল। জেতা তার উচিত ছিল। শৈশব থেকে যে-ছেলে শিখেছে আনন্দই একমাত্র সত্য, ভালবাসাই সব—সে-ছেলে আনন্দ আর ভালবাসার রাজ-পথ খুঁজতে গিয়ে গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আত্মসুখ আর আনন্দ যে এক নয় এ-কথা বোঝেনি, ধরতে পারেনি নিজেকে পশুর মতন রক্ষা করা ভালবাসা নয়। মৃত্যু একটা নিয়ম, আঘাত যে অভিজ্ঞতা এ-সব তার জানা ছিল না। ধীরে ধীরে সব জানা হল। সুধাময় বুঝতে পারল, নিজেকে দুর্গের মধ্যে রক্ষা করায় আনন্দ নেই, তাতে আত্মা বাঁচে না—চিতায় ওঠা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। নিজেকে ভাঙতে হবে, যেমন করে ফলফুলের এক একটি বীজ নিজেকে ভাঙে, টুকরো হয়ে যায়—অথচ তাতে সে শেষ হয় না, একটি অঙ্কুর হয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে সবুজ চারা, তারপর শত প্রশাখা-পল্লব-ঘন বৃক্ষ।

সুধাময় ভয়কে জয় করল। মৃত্যুকে উপেক্ষা।

সকালে গোছগাছ শেষ হয়েছিল। দুয়ারে দাঁড়িয়ে গাড়ি। বাড়ির ডাক্তার সঙ্গে যাবে কলকাতা। বামুন দিদিমণির ভাইঝি লতিকা যাবে পুণ্যময়ীর সেবাশুশ্রূষার জন্যে। সব তৈরি। নদীর চরে রোদ টকটক করছে। ঝাঁক বেঁধে পাখি উড়ছে আকাশে। নীল একটা মেঘ মাথার ওপর শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুধাময়ও তৈরি। কিন্তু পুণ্যময়ী তৈরি হতে পারলেন না। হয়ত হতে চাই-ছিলেন না। রক্ত উঠল অনেকটা; মাথা টলে পড়ল।

তারপর পাঁচটা দিন কাটল। ছ'দিনের দিন সকাল। সুধাময় মার ঘরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত জানলা খোলা, রোদে রোদে ঘর ভেসে যাচ্ছে। বিছানার ধবধবে চাদরের ওপর মা শুয়ে। চোখের পাতা বন্ধ। বালিশের একপাশে মাথা একটু হেলে রয়েছে। সাদা সিঁথির ওপর এক ফোঁটা জল।

কা—লকেই যেতে হবে? পাঁচ দিন আগে মা বলেছিলেন—সুধাময়ের মনে পড়ল। ঠিক এই সময় বোধ হয়।

সুধাময় আস্তে পায়ে মার পাশে এসে বসল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেক-ক্ষণ। বুকের হাড়গুলো কুচো কুচো হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল, পিষে পিষে যেন জল হয়ে যাচ্ছিল, আর সেই জল গলার কাছে এসে থর-থর করে কাঁপছিল। চোখ ঝাপসা-ঝাপসা। সুধাময় দু হাত দিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরল। বুকে মাথা মুখ চেপে ধরল। চুমু খেল। গালে গাল দিয়ে কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এতক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ ছিল—এইবার কান্নার একটা দুঃসহ রোল স্তব্ধতাকে সিক্ত করে দিল।

কখনো কখনো এ-রকম কোনো বাড়ি চোখে পড়ে—ফাঁকা ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, নির্জন নিস্তব্ধ, গায়ে শ্যাওলা, সুপুরি আর নারকল গাছের ঝাঁকড়া মাথা অন্ধকার আড়াল দিয়ে। এমন শূন্য স্তব্ধ বাড়ির নিজস্ব একটি সৌন্দর্য আছে। পুণ্যময়ীর মৃত্যুর পর সুধাময়ের অবস্থাটা ওই রকম দেখাচ্ছিল। ও একা—নিঃসঙ্গ, শান্ত অথচ যেন সমাহিত। মায়ের মৃত্যুর পর সে ভীত অধীর অস্থির হল না, আগে বাবার মৃত্যুর পর যেমন হয়েছিল। একটা গভীর অনুশোচনা এবং দুঃখ তাকে কিছুকাল খুবই উন্মনা করে রেখেছিল, আস্তে আস্তে যা কেটে গেল একসময়।

অন্তরে সুধাময় এবার পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছিল। মনের তরঙ্গ ক্রমশই শান্ত থেকে আরও শান্ত হয়ে আসছিল। একটি প্রাচীন অথচ নিরিবিলি সুন্দর ঘরে চন্দনের মিষ্টি-গন্ধ ধূপ জেলে দিয়ে কোনো তন্ময় শিল্পী যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের মাধুর্য উপভোগ করতে চাইছিল।

কিছু দিন এইভাবে কাটল। সুধাময় এই সময় কিছু কিছু 'আত্মচিন্তা' লিখতে শুরু করেছিল। এতে তার নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি মোচন হত, মনের অনেক জটিল-গ্রন্থি চিন্তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত। আর কলকাতার বন্ধু পরিমলকে সেই সব চিন্তার টুকরো পাঠাত চিঠিতে।

সুধাময় যে জীবনকে ভালবাসত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে-ভালবাসা, ওই বয়সেই, এত ব্যাকরণসম্মত হয়ে উঠেছিল যে, তার মধ্যে চঞ্চল আবেগময় একটি স্বাভাবিক ছন্দ একেবারেই বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আনন্দের প্রকারভেদ সম্পর্কে সুধাময়ের নিজস্ব মতামত হয়ত দীন ছিল না কিন্তু তা ওর নিজস্ব উপলব্ধ অভিজ্ঞ-তার দ্বারা পরীক্ষিত নয় বলে, প্রায়ই কৃত্রিম মনে হত।

এমন সময় কিছু দিন চোখ নিয়ে ভীষণ ভুগতে হল সুধাময়কে। দিনের বেলাতেও তার কাছে সব ঝাপসা দেখাত, চোখে অসহ্য ব্যথা হত, মাথা ধরে থাকত। কিন্তু এমন পাগল ও, কলকাতায় এসে চোখ দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করত না। তখন ওর মাথায় এই ভূত চেপেছে যে, নিজের মন ও ইচ্ছার কাঠিন্য এবং একাগ্রতা দিয়ে শারীরিক যন্ত্রণাকে সে অগ্রাহ্য, উপেক্ষা এবং পরাস্ত করবে।

এর ফলে লাভ হল এই, চোখের গোল-মালে এক ব্যাধি যখন পাকা হল, প্রায়-অন্ধ অবস্থা তখন তাকে কলকাতায় আসতে হল। সাড়ম্বর চিকিৎসা শুরু হল তারপর। কিছু দিন এর কাছে ওর কাছে ছুটোছুটি। শেষে এক বিলিতি কায়দার নার্সিংহোমে—টানা এক মাস চোখে ঠুলি এঁটে শুয়ে থাকতে হল।

চোখ সারল। চশমা নিতে হল বেশি পাওয়ারের। কিন্তু সুধাময় আর দেশের বাড়িতে ফিরে গেল না। ভবানীপুরের দিকে ছোটখাট নিরিবিলি সুন্দর এক ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে শুরু করল।

এক একটা সময় আসে যখন মন কি করছে কেন করছে কিছুর জন্যে তৈরি থাকে না। যা ভাল লাগে করে এবং করে আরাম পায়। সুধাময়ের বোধ হয় তখন মনের তেমন একটা অবস্থা। অনেকদিন ধরে ভেতরে ভেতরে, ওর অজ্ঞাতেই এক রকমের ক্লান্তি জমে উঠছিল। যদি বা ক্লান্তি নাও
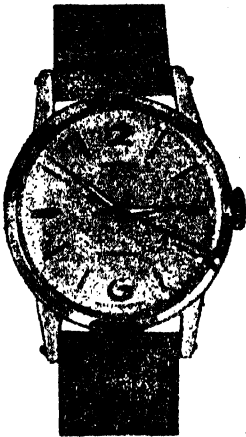
হয়, তবে গন্ডগোল ত নিশ্চয়ই। তার ওপর সম্প্রতি অসুস্থতার একটা একঘেয়েমি বিরক্তি গেছে। একটু হাঁপ ছাড়তে চাইছিল সুধাময়, হয়ত বা দীর্ঘ দিনের বাঁধা ছক থেকে বেরিয়ে এসে কিছু নতুনত্ব খুঁজছিল, খানিক বৈচিত্র্য। আমরা যাকে বলি 'ফুর্তি'—তেমন কোনো ফুর্তির ওপর তার ঝোঁক ছিল না। সিনেমা-থিয়েটার, মদ, হোটেল-কাফে, রেসের মাঠ—এ-সব তাকে টানেনি। অন্য রকম এক লঘুতা দিয়ে মনের গভীর রঙে সে চুমকি বসাতে শুরু করেছিল। কলকাতায় তার পরিচিত যে ক'জন মানুষ ছিল, এতোদিন পরে খোঁজ নিয়ে নিয়ে তাদের বাড়ি যাওয়া শুরু করল। তাদের নিজের বাড়িতে গল্পগুজব করতে ডাকতে লাগল। সুন্দর চায়ের সঙ্গে রমণীয় খাদ্য পরিবেশনে আপ্যায়িত করতে লাগল সকলকে। সুধাময়ের ফ্ল্যাটে বেশ একটা আড্ডা জমে উঠল।

এই ঘরের মধ্যে কেমন করে যে একদিন উড়ে এল এক অপরূপ পাখি! কি করে এল, কে আনল—কিংবা সুধাময় নিজেই তাকে কোথাও গিয়ে আবিষ্কার করল—পরে সে-কথা সুধাময়ের মনে থাকল না। এইটুকু শুধু সে জানত, বিভূতি মজুমদারের কোন সম্পর্কের বোন হয়। নাম, রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরী যেন অগ্নিশিখা। রূপের এত দীপ্তি সুধাময় আগে দেখেনি। ওর মা সুন্দরী ছিলেন—অসাধারণ সুন্দরী—তাঁর রূপ ফেটে পড়ত, কিন্তু রাজেশ্বরীর রূপ নিশ্চল হয়ে আছে। মনে হয় কোনো, কী যেন এক সৌন্দর্য ওর শরীরের মধ্যে জ্বলছে, ভীষণ উজ্জ্বল। স্ফুলিঙ্গের মতন দীপ্ত, দাহ্য। চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর দিকে তাকালে। বোধের স্নায়ুগুলো ঘোলাটে হয়ে যায়।

সুধাময় সেই রূপের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত, বিভ্রান্ত হয়েছিল। মনে মনে এই সৌন্দর্যের রহস্য আবিষ্কার করবারও বুঝি চেষ্টা করত। পারত না। ব্যর্থ হয়ে নিজেকে বলত, আকস্মিকতা ছাড়া এ সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না।

মেয়েটি ছিল দীর্ঘাঙ্গী। সাগর ঢেউয়ের মাথায় যেমন দীর্ঘ বক্র সুচ্ছন্দ একটি গতিশীল ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে রাজেশ্বরীর দীর্ঘ অঙ্গে তেমনই এক জীবন্ত ভঙ্গিমা। নিখুঁত অবয়ব। অশ্বত্থপল্লবের ডৌলে গড়া মুখ। সুসম কপাল। কাজলের বাঁকা টান দিয়ে ঘন ভুরু দুটি যেন কেউ এঁকে দিয়েছে। দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ। শ্বেতপাথরের মতন সাদা অক্ষিপট। মেঘ-কালো চোখের তারা। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল; যেন দুটি অন্ধকারের বিন্দু জ্বলছে। চোখের তলায় কিসের এক উজ্জ্বতা। অবোধ্য ভাষায় হাসছে। স্নিগ্ধজ্যো নাক, স্ফুরিত ওষ্ঠ। বাঁকা রেখা কোথাও যদি এতটুকু কেঁপেছে। চিবুকটি নিটোল এবং এক ধরনের ঘন আভায় রঙ লেগে আছে।

রাজেশ্বরীর অজস্র কালো ঘন নরম চুলের মধ্যে মুখের সম্পূর্ণ ছবিটি বসন্তের মোহিনী মায়ার মতন। তীব্র অথচ আত্মবিভোর। কুহকী মৃগীর মতন রাজেশ্বরীর অঙ্গে তার যৌবন যে লীলা করছে—সুধাময় তার দুর্বল চোখ দিয়েও তা দেখতে পেয়েছিল। এবং সেই দুধমাখা জবাফুলের মতন রঙ, ননী-কোমল তনু, কৃশ কটি, অপরূপ বাহুবল্লরী ভালো লেগেছিল সুধাময়ের। মুগ্ধ হয়েছিল বেচারী যুবক দার্শনিক।

রাজেশ্বরী আসত যেন রাজহংস। গর্বিত, সতর্ক, সচেতন। পোশাকে তার ইচ্ছাকৃত পরিপাটি চোখে পড়ত। কখনো আসত সোনালী কিংবা গভীর নীল সরু পাড়ের সাদা ধবধবে শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে, কখনো উজ্জ্বল গভীর রঙে অঙ্গকে শিখার মতন জ্বালিয়ে। গলায় দুলত সরু হার, বুকের ভাঁজে মুক্তো বসানো সুন্দর একটি লকেট হৃদপিণ্ডের ওপর যেন কাঁপত সামান্য। পঞ্চমীর চন্দ্রকলার মতন বঙ্কিম উরোজ। মকরবালা পরা দুটি হাত। একটি আঙটি অনামিকায়; বেদনার দানার মতন রঙ তার পাথরটির।

রাজেশ্বরীর কোথাও পাথরের জড়তা ছিল না। না মুখে না মনে। অহেতুক নম্রতা তাকে লজ্জাবতী লতা করেনি যেমন, তেমন ফোয়ারার জলের মতন অনর্গল বাহারী জলধারা হয়ে সে উছলে পড়ত না। সংযত, সভ্য, শালীন। কথা বলত একটু মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায়। হাসত ততটুকু ধ্বনি তুলে যতটুকুতে মাধুর্য আছে অথচ চপলতা নেই। ওর মধ্যে এক ধরনের সহানুভূতি এবং কোমলতা ছিল যা মানুষকে তৃপ্ত করে। ভাল গাইতে পারত; বুদ্ধির ধার মুড়ে কথা বলতে জানত, আর জানত নিজেকে মনোরম করে রাখতে।

সুধাময়ের সঙ্গে রাজেশ্বরীর পরিচয়ের পর, খুব দ্রুত না হলেও একটু তাড়াতাড়ি ওদের দুজনের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠছিল। রাজেশ্বরী প্রায়ই আসত, সুধাময়কে নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়াত, গান শোনাত, সদালাপে খুশী করত।

সুধাময়ও যে খুশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

একদিন, তখন সবে বিকেল শেষ হচ্ছে, সুধাময়ের লেখক বন্ধু পরিমল সবে সুধাময়ের ফ্ল্যাটে পা দিয়েছে—দেখতে পেল ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

'বেরুচ্ছো?' শেষ ধাপে নেমে এলে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে পরিমল বলল।

'হ্যাঁ; তুমিও চলো।'
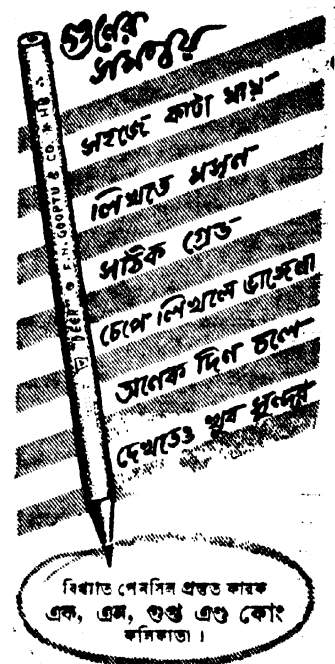
'[illegible], কোথায়—?'

'আমিও তা জানি না; ও জানে—।' সুধাময় রাজেশ্বরীকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল।

'যাবেন, চলুন না'—রাজেশ্বরী বলল, 'বেড়াতে যাচ্ছি একটু।'

পরিমল মাথা নাড়ল। বলল, 'না; আমি আজ বড় ক্লান্ত; মন-মেজাজও ভাল নেই। সুধাময়, আমি বরং ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করি গে, যদি কেউ আসে, গল্পগুজব করব।'

'মৃণাল আসতে পারে। তুমি যাও ওপরে, চা-টা খেয়ে বিশ্রাম করগে। আমাদেরও খুব দেরি হবে না।'

দেরি বাস্তবিকই হয়নি। ঘণ্টা দেড়েক পরে সুধাময় একা ফিরে এল।

'ওরা কেউ আসেনি?'

'না। একা বসে বসে তোমার কথাই ভাবছি।'

'আমার কথা—?' সুধাময় একটা সিগারেট তুলে নিল পরিমলের প্যাকেট থেকে। সোফায় বসল। অনভ্যস্ত আঙ্গুলে সিগারেট ধরিয়ে হাস্যকর ভাবে টানতে লাগল।

'রাজেশ্বরীকে তুমি ভালবেসে ফেলছ যেন?' পরিমল বলল, বলে বন্ধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

সুধাময় কথাটা শুনল। পরিমলের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ক মুহূর্ত। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল। তারপর বলল, 'জানি না।'

পরিমল একটু কি ভাবল। সুধাময়ের 'জানি না' যে গোপনতা বা এড়িয়ে যাওয়া নয় এ-সত্য তার জানা ছিল। বললে, 'রাজেশ্বরী তোমায় মুগ্ধ করেছে।'

'তাতে কি! খুব ভাল ম্যাজিক দেখেও তো মানুষ মুগ্ধ হয়।'

পরিমল পাল্টা জবাব দিতে পারল না। আবার খানিক ভাবল। বলল, 'ও তোমায় খুব আকর্ষণ করেছে, আমি ভেবেছিলাম।'

'ঠিকই ভেবেছ। কিন্তু সেটা রাজেশ্বরীর আকর্ষণ ক্ষমতা, আমার তাতে কোন গুণ আছে?' সুধাময় এবার একটু হাসল।

'তুমি তর্ক জুড়লে আবার?' পরিমল হতাশ হ'ল।

'সঠিকভাবে কিছু জানতে হলে কোথাও রহস্য রেখে লাভ নেই পরিমল। বহু পুরুষ মানুষ আছে তারা পতিতালয়ে যায়। কেউ কেউ ধরাবাধা একটি মেয়ের কাছে। তারা আকর্ষণ বোধ করে ব'লেই যায়। সেটা কি ভালবাসা?' সুধাময় সোফার ওপর আরাম ক'রে বসল। যেন এবার তর্কটা জমবার সময় হয়েছে।

পরিমল অসহায় বোধ করছিল এবং বিব্রত। ঠিক এ-ভাবে প্রেম নিয়ে তর্ক করতে সে অস্বস্তি এবং অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবু খানিকটা ভেবে একবার শেষ চেষ্টা করল পরিমল, শুধলে, 'তোমার কি কখনো মনে হয় না রাজেশ্বরীর সঙ্গে মিলন হ'লে তুমি খুশী হবে।'

'হয়, আজও হয়েছে। তেষ্টা পেলে আমি এক গ্লাস জল খাই। তাতে তেষ্টার অস্বস্তি মেটে, ভাল লাগে। তাতে বোঝা যায়, জল তেষ্টা মেটায়। কিন্তু জল কি, তা কি বোঝা যায় পরিমল? মিলনের ইচ্ছাটা তেমনি। ওটা ভালবাসার লক্ষণ, কিন্তু সার কথা নয়।'

রাজেশ্বরী সুধাময়কে মুগ্ধ করেছে, আকর্ষণ করছে; সুধাময়ের মনে মিলন কামনাও আছে—তবু যদি এই মুগ্ধতা, আকর্ষণ, মিলন-কামনা ভালবাসা না হয়—তবে ভালবাসা কি?

সুধাময় বলেছিল, প্রেম আনন্দ। 'যা আমার আনন্দ, যাতে আমি আনন্দিত, অন্তত যার আবির্ভাবে আমার আনন্দ জেগে ওঠে—আমি তাকেই ভালবাসা বলি।'

পরিমলের একটা ভুল ভাঙল। কিংবা বলা যায় পরিমলের মনে একটা খট্‌কা এবার লাগল। ও ভেবেছিল, সুধাময় রাজেশ্বরীর প্রেমে পড়েছে। এই প্রথম প্রেম এসেছে সুধাময়ের জীবনে। তাকে অবহেলা করতেও পারবে না। এবার ওই আকাশমুখী বন্ধু মাটিতে নেমে দাঁড়াবে। এতে ভাল হবে। কিন্তু সুধাময়ের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝলো, রাজেশ্বরী সম্পর্কে সুধাময়ের অনুভূতি এখনও স্পষ্ট নয়।

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে পরিমল বললে, 'তুমি সোনা বলতে সোনার তাল বোঝো। ওটা মূল্যবান, সঞ্চয় ক'রে রাখার মধ্যে অবশ্য হিসেবীপনা আছে, কিন্তু ব্যবহারে ওটা অচল। সোনার তাল গলিয়ে তাকে অলংকার করতে হয়। রাজেশ্বরীর মকরবালা দুটো, গলার হারটি ক' ভরি সোনার ডেলা হয়ে বাক্সে বন্দী থাকলে তাতে কি তার গলায় হাতের সৌন্দর্য বাড়ত না তোমার চোখ জুড়তো? আনন্দ, প্রেম—এ-সব আইডিয়ার নিরেট তাল নিয়ে মানুষের চলে না। তোমাকে তা ভেঙে গলিয়ে কাজে লাগাতে হবে।'

সুধাময় খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল। তারপর হেসে বলল, 'আচ্ছা পরিমল, তুমি কি নিঃসন্দেহ যে, রাজেশ্বরীকে বিয়ে করলে আমার সব অভাব মিটে যাবে?'

'কোনো স্ত্রীই স্বামীর সব অভাব মেটাতে পারে না। শুধু স্বর্গফলের চিন্তায় তুমি কিছু পাবে না, সুধা। রাজেশ্বরী অসংখ্য মানুষ নয়, অসংখ্য গুণের সমষ্টিও নয়—একটিমাত্র মানুষ—কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারলে, তার ভালবাসা পেলে—তুমি

সাংসারিক জীবনে সুখী হবে, শান্তি পাবে। আমার ত তাই মনে হয়।'

সুধাময় কোনো জবাব দিল না।

সুধাময়ের স্বভাব ছিল পরীক্ষকের। সে হৃদয়-তুফান বিশ্বাস করত না। রাজেশ্বরীকে ভালবেসেছে কি না—মনে মনে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আরও কয়েক মাস কাটল। তারপর একদিন......

সেই একদিনে কি ঘটেছিল সেটা সুধাময়ের মুখের কথায় বলা ভাল। সুধাময় নিজেই পরিমলকে বলেছিল: "পরশু বিকেলে রাজেশ্বরী এসেছিল। টকটক লাল গোলাপের মতন শাড়ি পরে, ধবধবে সাদা জামা, গলায় হাতে জরির কাজ। ওর চুল এলোমেলো, রুক্ষ, ফাঁপানো ফোলান। যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তখন শেষ গোধূলি। ঘরের বাতি আমি জ্বালালাম না। রাজেশ্বরী জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। খানিকটা আলো, আঁচের মতন রঙ—রাজেশ্বরীর গালে এসে পড়ছিল। অল্প একটু সেই আলো থাকল, তারপর সরে গেল। অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। সব ঝাপ্‌সা। ......আমি উঠে রাজেশ্বরীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর একটু অন্ধকার হল। রাজেশ্বরীর নিশ্বাসের শব্দ আমার কানে আসছিল, গালে লাগছিল। আমার হাত, আমার শরীর, আমার চোখ রাজেশ্বরীকে দেখছিল না, দেখতে পাচ্ছিল না; একটা গোটা মানুষের বদলে আমি তার কতক টুকরো টুকরো অংশকে দেখছিলুম, যা আমায় লুব্ধ করছিল, আমাকে আর সবকিছু ভুলিয়ে দিচ্ছিল। ওর গায়ের একরকম ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম—তীব্র—শরীরের কোথায় যে তা লুকিয়ে ছিল। আমার শরীর ওকে পীড়ন করবার জন্যে পাগল হচ্ছিল। আমি কেমন এক ধরনের বন্য-প্রবৃত্তি বোধ করছিলুম। রাজেশ্বরী......। যাক, শেষ পর্যন্ত আমি রক্ষা পেলাম। কে যেন আসছিল—তার পায়ের শব্দ, শুনতে পেয়ে আমি সরে গেলাম। বাতি জ্বালালাম ঘরের। রাজেশ্বরী যেন আগুনের শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আবার সম্পূর্ণ করে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু পরে রাজেশ্বরীকে আমি বললাম, তুমি বাড়ি যাও। আমায় ক্ষমা কোরো।...... রাজেশ্বরী হয়ত কিছু বলত, কিন্তু ততক্ষণে তোমার গলার সাড়া পাওয়া গেছে। এদিকের দরজা দিয়ে রাজেশ্বরী চলে গেল। ও আর আসবে না।

পরিমল, রাজেশ্বরীর রূপ, তার অমন দেহ আমি উপভোগ করতে পারতাম। বিয়ে করেই। কিন্তু, কে বলতে পারে—রাজেশ্বরীর রূপ, তার দেহই এতোদিন আমার আনন্দের উৎস ছিল না! এবং ভোগ দখলের পর একদিন আমি ক্লান্ত হব না, আমার আনন্দ উবে যাবে না! ওকে ভোগ করার জন্য যখন পাগল হয়েছিলাম—তখন রাজেশ্বরী কেন হারিয়ে গেল, তার বদলে ওর শরীরের কতকগুলো অংশই কেন আমার চোখ মন বোধ আবেগকে আচ্ছন্ন করল। যতই বলো, দেহের কোনো কোনো অংশ একটা পরিপূর্ণ মানুষ নয়। আমি কি পরিপূর্ণ মানুষকে ভালবাসতে চাইছি না পরিমল! তবে—?" সুধাময়ের অন্তর হাহাকার করে উঠেছিল।

রাজেশ্বরী পর্ব শেষ হল। সুধাময়ের মনে সেই যে সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সে দ্বন্দ্ব আর সহজে নিরসন হ'ল না।

বছর দুই কাটল। সুধাময় ঘুরে বেড়াল বাইরে বাইরে। তারপর আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে এল, মন শান্ত হল, আবার ফিরল সে কলকাতায়। তখন ওর অবস্থা বানের জল সরে যাওয়া নদীর চরের মতন। পলিমাটি পড়ে গেছে। ফসল বুনলে সোনা ফলবে হয়ত।

এই সময় সুধাময়ের প্লুরিসি মতন হল। খুব যে একটা ভুগেছিল তা নয়, তবু বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। সেরে উঠে বাইরে গেল জলবায়ু বদলাতে। আর তারপর একদিন কি করে যে মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ামের হাতছানি তাকে টেনে নিল কে জানে! না, হয়ত ভুল হল এ-কথা বলা, মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম না টানলেও ওই ধরনের একটা কিছু তাকে টানতোই। কেননা সুধাময় তখন বৃহৎ সংসারে, বৃহৎ মায়ায়, ভালবাসায় এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চাইছিল।

মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম থেকে সুধাময় প্রথম যে চিঠিটি লিখেছিল পরিমলকে তা বড় সুন্দর। তার প্রথমেই ছিল এই কথা: "ভাই পরিমল, আমি এখানে আতুরজনের শারীরিক সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করছি না; আমি ওদের হতাশ ক্লান্ত অসুস্থ মনের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছি। মৃত্যুভয় ওদের মনের রক্ত শুষে নিয়েছে; ওরা কী অসহায়, ভগবানকে ভাবে পরমগতি, ভাগ্য ছাড়া আর কোথাও আস্থা রাখে না। ওদের মন শূন্য, সেখানে কিছু সম্বল চাই, বাঁচার তীব্র বাসনা শুধু নয়, বিশ্বাস। আমি ওদের সেই বিশ্বাস জোগাব। আমি এতদিন পরে নীড় ছেড়ে আকাশে ঝাঁপ দিতে পারলাম। আমি কি আজ সুখী নয়!"

সুধাময় সুখী হয়েছিল। যে কর্তব্য ও দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নিয়েছিল তার মধ্যে কোথাও খাদ রাখে নি। দেশের বাড়িঘর জমিজমা সব বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা প্রায় সবই দিয়ে দিয়েছিল স্যানেটোরিয়ামে। পুণ্যময়ীর নামে কোনো বেড হয় নি—তবে পুণ্যময়ীর নামে তার সন্তান টাকাটা দিচ্ছে এ-ভাবে ওটা স্যানেটোরিয়ামের তহবিলে জমা পড়েছিল। বাকি সামান্য কিছু টাকা যা ছিল তাই দিয়ে স্যানেটোরিয়ামের চৌহদ্দির পাশেই দুটো ছোট ছোট মাটি আর পাথর মেশান ঘর করে নিয়েছিল সুধাময় নিজের জন্যে। মাথার ওপর কাঠের তক্তার ছাদ। স্যানেটোরিয়ামের কিছু খুচরো অফিস-কাজ করে দিত—তার বদলে ওর খাওয়ার চাল ডাল দুধ শাকসব্জিটা পেত স্যানেটোরিয়ামের ভাঁড়ার থেকে। কুকারে রান্না করে নিত সুধাময় নিজেই। এবং তৃপ্ত হয়ে খেত।

পরিমলকে বার বার ডাকছিল সুধাময়। 'এসো একবার এখানে, দেখে যাও—কী সুন্দর জায়গায় কেমন সংসার পেতে বসেছি। কত আনন্দে আছি।'

পরিমল একবার নয় বার দুই গেছে সেখানে। সত্যি, চমৎকার জায়গা। পাহাড়ী ঢলের ওপর ছোট্ট স্যানেটোরিয়াম। ওপরের চেহারায় দারিদ্র্য আছে, ভেতরে তার ধনের অভাব নেই। দুটি মাত্র ডাক্তার—কয়েকজন নার্স, জনা বিশেক পেশেণ্ট, দু একজন অন্য কর্মচারী—কিন্তু কী সদয়, সহানুভূতিশীল, যত্নময় ব্যবহার। পরিবেশটিও চমৎকার—উত্তরে শালবন, দক্ষিণে ঢালু জমি ঢেউ ভেঙে ভেঙে নেমে গেছে—সবুজ, মখমলের মত নরম যেন; পশ্চিমে আকাশপটে হেলান দিয়ে পাহাড়চূড়ো দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল মেঘের মতন। পুবে অনেকটা দূরে ক্ষেতখামার। সূর্য উঠত সোনার জল ছড়িয়ে, আমলকি বন থেকে হিমের গন্ধ ভেসে আসত। বুনো পাখি ডাকত। শালবনের কাঠ কেটে বয়েল গাড়ি যেত দুপুরে আর বিকেলে, চাকায় শব্দ উঠত করুণ, অথচ সুন্দর, বয়েলের গলার ঘণ্টা বাজত ঠুন ঠুন করে। গোধূলিতে পাহাড়ছোঁয়া আকাশে সূর্য অস্ত যেত। কী যে রঙ—যেন কোনো অনন্ত পুরুষ প্রতিদিন তার বুক থেকে এক সমুদ্র রক্ত এখানের রক্তহীন পাংশু কাতর রুগীদের বুকে ঢেলে দিয়ে যেত।

পরিমল যে ক'বার মিহিরপুর স্যানেটোরিয়ামে গেছে—দেখেছে, সরল শান্ত জীবন এবং আপন আদর্শ নিয়ে সুধাময় প্রতিবারেই যেন আরও শুদ্ধ, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়ে উঠছে আত্মায়। স্যানেটোরিয়ামের রুগীরা সকলেই তার যেন পরিজন, সকলেই সুধাময়কে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে, সুধাময়ের ব্যক্তিত্বের আভা নিজেদের মনে মেখে নয়। ছোট বড়, ছেলে মেয়ে—কারুর কাছেই সুধাময় অনাত্মীয় নয়।

সকালে সূর্য উঠে গেলে সুধাময় স্যানেটোরিয়ামের অফিসে যেত। কোনোদিন দু একটা কাজ থাকত কি থাকত না—দ্বারোয়ানে চিঠি নিয়ে এলে সব চিঠি বাছত, সাজাত—তারপর হাতে করে চলে যেত ওয়ার্ডে চিঠি বিলি করতে। সকালে

প্রীতিজনের সংগে এইভাবে সাক্ষাৎ শেষ হত। ফিরে এসে অফিসে হিসেবের খাতা খুলে আঁকজোক—কিংবা চিঠিপত্র লেখা। তারপর বাড়ি। দুপুরে আবার ওয়ার্ডে ঘুরত। কারুর চিঠির জবাব লিখে দিত, কাউকে বই পড়ে শোনাত, কাউকে বা ওর সরু মেঠোসুরে গলায় থেমে থেমে বাউল গান শুনিয়ে দিত, নানান গল্প হাসি। একবার একটি ছেলে বছরখানেক ছিল এখানে। —মাত্র বারো বছর বয়স—সুধাময় তার সংগে লুডো পর্যন্ত খেলেছে—দুপুরে ভোর। কত যে বকবক করে গল্প করেছে। সে বাড়ি যাবার সময় তাকে একটা ক্যারাম বোর্ডও কিনে দিয়েছিল সুধাময়।

বিকেলে মোটামুটি সুস্থ রোগীরা বেড়াত—স্যানেটোরিয়ামের সামনে কিংবা বাইরেও। তাদের কারোর সংগে আজ, কারোর সংগে কাল সুধাময়কে দেখা যেত। বিকেল পড়ে এলে সুধাময় নিজের ঘরে গিয়ে বসত। বসার ঘরটি ছোট। তক্তপোষ আর মাদুর পাতা, হ্যারিকেন লণ্ঠন, মাটির ফুলদানিতে বনো ফুল, একধরনের গাছের শক্ত শক্ত আঠা ধুনোর মতন পুড়ত। চমৎকার গন্ধ। দু একজন করে ধীরে ধীরে একটি ছোট দল এসে বসত তক্তপোশের ওপর। বীরেনবাবু, পশুপতি, অমল, কমলা, শোভনাদি, সুধীন......এমনি সব। সুধাময় তাদের মুখোমুখি বসে এ-কথা সে-কথার পর আস্তে আস্তে জীবনের গল্পে চলে যেত:

জীবন কোনোদিন শূন্যে গিয়ে থামে না। তবে দুঃখ? হ্যাঁ, দুঃখ আছে। আছে বলেই আশা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে তার সংগে যুঝতে হবে। কর্মফল ভাগ্য ঠাকুর দেবতা—এ-সব কোনো কাজের কথা নয়, সত্যও নয়। আমাদের জীবনটা একটা ছাঁট রঙীন কাগজ নয়, আর তাতে সরু কাঠি আঁটা নেই—যে আমরা নিছক ঘুড়ি—সুতো দিয়ে বাঁধা। অন্য কারও হাতে লাটাই আছে—তার খেয়াল খুশিতে আমরা উড়ছি, নামছি, গোঁত্তা খাচ্ছি—তারপর একবার সুতো-কাটা হয়ে ভেসে যাচ্ছি! না, জীবন ঘুড়ি নয়। অথবা গালে হাত তুলে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে, আকাশের দিকে মুখ করে ভগবান ভগবান করে কেঁদে কঁকিয়ে ছটফট করে শেষ করে দেবার জন্যে নয়।

তবে জীবন কি?

আয়ুকে রক্ষা করার ইচ্ছা, আত্মাকে রক্ষা করার ইচ্ছা, মুক্তির পিপাসা, প্রেম আর আনন্দ। সংকে রক্ষা করো, সত্তাকে রক্ষা করো—জীবন পূর্ণ হবে।

জীবনের সব অংক সব সময় মেলে না। হয়ত কখনোই মেলে না, কদাচিৎ কিংবা ব্যতিক্রম ছাড়া। সুধাময় ভেবেছিল, তার অংক মিলে গেছে, সে অনেক পথ হাতড়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে।

মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ামে বছর ছয় মনের ভরা আনন্দে এবং শান্তিতে কাটাবার পর হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল—; সুধাময়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ সুন্দর জীবনে যেন কিসের এক জোয়ার এসে লাগল। সাধ্য ছিল না তার একে প্রতিরোধ করে।

ফিমেল ওয়ার্ডের সি ব্লকে একটি রুগী এল, নাম হৈমন্তী। মাত্র বছর বিশ বয়স। রোগা, মাথায় ছোট, রঙ শ্যামল। হৈমন্তীর মুখ ছোট, গালের হাড় ফুটে উঠেছে, চোখ দুটি কেমন যেন—ক্লান্ত বিষণ্ণ গভীর অথচ কিসের এক ছায়ায় স্নিগ্ধ। নাকের ডগাটি একটু টোল খাওয়া, পাতলা পাতলা দুটি ঠোঁট, মুখের পাশে গোল হয়ে আশ্চর্য এক হাসি ফুটে আছে। মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল।

সুধাময় মাঘ মাসের এক সকালে চিঠি বিলি করতে এসে এই নতুন-আসা রুগীটিকে দেখেছিল। এবং কয়েক মুহূর্ত আর চোখ ফেরাতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল, ও যেন এক হিমভেজা ছোট্ট পাখির দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর অনুভব করল—একটি আশ্চর্য নিস্তব্ধতা তার এবং হৈমন্তীর ব্যবধানটুকুর মধ্যে কিসের এক বুনন গাঁথছে। সুধাময়ের কেমন একটু ভয় ভয় লাগল, নিশ্বাস তার থেমে গিয়েছিল তা মনে হল এবং কপালে যেন সূর্যের তাপ এসে লাগছে অনুভব করল।

সুধাময় সরে গেল। কিন্তু অল্প কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। সুধাময় অজ্ঞাত এক বেদনা বোধ করতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন কিছু সে হারিয়ে ফেলেছে—এমন কিছু যা খুঁজে না পেলে আর সে যেতে পারবে না।

বিকেলে হৈমন্তীকে আবার দেখল সুধাময়। তখন বিকেল পড়ে গেছে। স্যানাটোরিয়ামের বাগানে মোরগফুল ঝুঁটি নাড়ছিল, মালি জল দিচ্ছিল গাছে, ঘন বাসন্তী রঙের গাঁদার ঝোপে একটা বাতাসের ঘূর্ণি পাক খাচ্ছিল।

সুধাময় অফিসঘরের দিকে চলে গেল—আস্তে আস্তে। ফিরল খানিক পরে। সি ব্লকের পশ্চিমের জানলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। সুধাময় কেমন যেন আচ্ছন্নের মতন তাকিয়ে থাকল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশ-পটে সূর্যডোবার শেষ আভাটুকু নিভু নিভু। পাখির কাকলি হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ যেন। সুধাময়ের মনে হল, বিহংগহীন আকাশের দিকে সে তাকিয়ে আছে—সমুদ্রের ধূসরতা নেমেছে সামনে, একটি নিঃসঙ্গ ম্লান নক্ষত্র পশ্চিমের আকাশে। এ যেন এক অনন্ত বিচ্ছেদের অথচ কী এক আনন্দের মিলন-মুহূর্ত। ও কত দূর, কত অস্পষ্ট তবু যেমন করে অন্ধকার বাতাসে ঝরে পড়ছে, তেমনি হৈমন্তী তার নরম দৃষ্টি, ক্লান্ত কালো ভুরু, চুলের গন্ধ নিয়ে এই নির্জনতার মধ্যে সুধাময়ের সত্তার সংগে মিশে যাচ্ছে।

সুধাময় নিজেও প্রথমে বিস্ময় এবং বিচলিত বোধ করেছিল। ভেবেছিল, এ-এক গভীরতম করুণা, অস্বাভাবিক মমতা মায়া, কিংবা ভ্রম। জীবনের এতটা পথ দক্ষ নাবিকের মতন সে অতিক্রম করে এসেছে—ঝড়ে ঝাপটায় আকর্ষণে মোহে তার আত্মা লক্ষ্যহারা হয়নি। হঠাৎ তবে কেন একটি ক্লান্ত নিভু নিভু নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আজ মনে হচ্ছে, হালের মুখ ফেরাতে হবে—ওই নক্ষত্রের তলায় কোনো অপূর্ব আলো আছে, কোনো মাটি—ফলফুল ভরা কোনো আশ্চর্য শান্তির দেশ।...ভুল, এ আমার ভুল; আমি ভুল করছি—সুধাময় ভাবছিল, নিজেকে নিজে সহস্রবার বলছিল আর নিজেকে দিয়ে অসংখ্যবার অংক কষে দেখছিল।

ওর অংকের ফল বার বার মিলে যাচ্ছিল। কোনো ভৌতিক রহস্য কিছুই ঝাপসা দেখাচ্ছিল না। এ ভালবাসা; আমি ভাল-

বেসেছি হৈমন্তীকে—সুধাময় স্পষ্ট অনুভব করেছিল; সমগ্র চেতনায় এই বোধ ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল।

সুধাময় অনুভব করত, হৈমন্তীকে সে ভালবাসে এই চিন্তাতেই আশ্চর্য এক আনন্দ আছে। হৈমন্তীর কাছে গেলে তার সঙ্গে কথা বললে, ওর পাশে দাঁড়ালে তাকে ভাবলে এক আনন্দের আস্বাদে সমস্ত মন অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরে ওঠে। তুমি আমায় তোমার কোন্ শিখা নিয়ে যে জ্বালিয়ে দাও হৈমন্তী, আমি জানি না। আমি শুধু আমার আলোকে দেখি। সুধাময় মনে মনে বলত। হৈমন্তীকে উদ্দেশ করে।

আর সুধাময় বুঝেছিল, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে রূপে যে হৈমন্তী অত্যন্ত সীমিত—সেই হৈমন্তীই অন্য এক অদৃশ্য অথচ অখণ্ড অস্তিত্ব নিয়ে সমগ্রভাবে অরণ্যের মতন তাকে অধিকার করে রয়েছে। প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখাটুকু চোখে পড়ে, পড়ে না তার আলোর ভুবন—অথচ এর চেয়ে সত্য আর কি! যাকে ভালবাসি সে ত অমনই, সে তার দেহ নিয়ে যতটুকু আছে তার চারপাশের অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে যে তারও বেশি আছে। হৈমন্তীর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কীটদষ্ট ফুসফুসের নিশ্বাস — তার সমগ্র অস্তিত্ব নয়, সামান্য অস্তিত্ব—ওর সন্ধ্যা চাঁদের আলোর মতন। খণ্ড দৃশ্য রূপের মধ্যে যতটুকু অখণ্ড বিস্তার তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক পূর্ণ।

পরিমলকে সুধাময় তার জীবনের এই নব অনুভূতি এবং আনন্দের কথা জানিয়েছিল। সগৌরবে। লিখেছিল: 'মানুষকে পূর্ণতার পথে যেতে হয় এক একটা পথ দিয়ে। এই রকম পথকেই গুণীজনে বলেছেন আনন্দ। সত্তার পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমি—আমার এই প্রেম সেই পূর্ণতাকে অনুভব করা—আনন্দ তাকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছে। আমার সব দ্বন্দ্ব মিটেছে। আর কোনো সংশয় নেই।'

এ এক মর্মান্তিক এবং নিষ্ঠুর পরিহাস যে, নিঃসংশয় মন মাত্র চার মাস পরে আবার সংশয়ে পীড়িত হয়ে উঠবে। এবার আরও তীব্র, আরও দুঃসহ, আরও করুণতম।

হৈমন্তী প্রথম যখন এসেছিল—মনে হত ওর আয়ুর প্রদীপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মিহিরপুর স্যানেটোরিয়ামের মুখার্জি ডাক্তারের হাতযশ বলতে হবে, অল্প দিনেই এই নিভন্ত অবস্থাটা আশ্চর্যভাবে সামলে নিয়ে হৈমন্তী ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। ও যে বাঁচবে, এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে—এ-আশা প্রায় সত্য বলেই মনে হয়েছিল।

হৈমন্তী সুধাময়কে বলত, 'আমার এত ভীষণ বাঁচার ইচ্ছে—এ আমি নিজেই জানতুম না।'

'ছিল; তবে ঝিমধরা পাখির মতন পাখা গুটিয়ে।' সুধাময় স্নিগ্ধ হেসে বলত, 'তোমার সে-জড়তা এখন কেটে গেছে।'

হৈমন্তীর চোখে নরম হাসির আভা উঠত। তাকাত, যেন সুধাময়কে বলছে, কি করে কাটল তা আমি জানি। তুমিও জানো।

'আমার নিজের কাছে সবই আশ্চর্য মনে হয়।' হৈমন্তী আস্তে আস্তে জবাব দিত। তারপর চুপ করে দূরের আমলকি গাছের দিকে তাকিয়ে থাকত অনেকক্ষণ। শেষে বাতাস চলার সুরে বলত, 'এখন কোনোদিন শরীর একটু খারাপ হলে এত কষ্ট হয়, ভয় হয়।' বাকিটা আর বলতে পারত না। স্পষ্টই অনুমান করা যেত বাকি কথা এই: এখন যদি চলে যাই, যা হারাবো, তা অমূল্য।

সুধাময় আনন্দে অধীর হয়ে উঠত। কিছু বলত না।

কিন্তু এ কি হল? যে-প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—হঠাৎ যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা তার ওপর আছড়ে পড়ল। ওকে নিভিয়ে না দিয়ে নিরস্ত হবে না। হৈমন্তী আবার জীবনমৃত্যুর সীমানায় গিয়ে পড়ল।

সুধাময়ও কাতর হয়ে উঠল। হৈমন্তী চলে যাবে। সে আর থাকবে না। এই স্যানেটোরিয়ামে নয়, এই জগতে নয়? ওই ছোট শীর্ণ শান্ত স্নিগ্ধ দেহটি শূন্যে মিশে একাকার হয়ে যাবে!

চিন্তাটা দুঃসহ। সুধাময় ভাবে আর ভাবে। তার শরীর কত যেন ক্লান্ত মনে হয়, মন বিষণ্ণ; ভীষণ এক বেদনা এবং শূন্যতার বোধ তাকে সারাদিনমান আর রাত্রিতে তাড়া করে বেড়ায়।

সুধাময় তখন নিজেকে প্রশ্ন করল—এ-রকম কেন হয়? কেন হবে? হৈমন্তী আমার কাছে শুধু ত দেহবদ্ধ সত্য নয়—সে যে দেহবিহীন এক বিরাট অস্তিত্বও। ও আমার আলোর ভুবন, আমার আনন্দের জ্বলনকাঠি। যতক্ষণ তার দেহটুকু আছে ততক্ষণ কি আমার আনন্দ সত্য হয়ে আছে, যে-মুহূর্তে ওর দেহকে মৃত্যু চুরি করে নেবে—আমার আনন্দ অসত্য হয়ে দাঁড়াবে! ভালবাসা ত তা নয়, হৈমন্তীর নিশ্বাস গুণে ভালবাসার আয়ু যে নয়। তবে?

তবে কেন এই অসহ্য দুঃখ, ভয়, বেদনা, হাহাকার! হৈমন্তী চলে যাবে—যেতে পারে—এই চিন্তায় আমি কেন শঙ্কিত, বেদনার্ত, শূন্য হয়ে যাচ্ছি।

"আমার আনন্দ শতখান হয়ে ভেঙে গেল। পরিমল, আমি বৃথাই বলেছিলাম, আর আমার সংশয় নেই—! বিরাট সংশয় আমাকে কাঁটার মত সর্বক্ষণ বিঁধছে। রাজেশ্বরীর মধ্যে, তার দেহের বাইরে, আলোর ভুবন খুঁজেছিলাম, পারিনি, হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সারবস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম। কে জানত—তার দেহের সঙ্গে এত গভীরভাবে সে-অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার ভালবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত। একে ভালবাসা বলি না। যে আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর—সে-আনন্দ মিথ্যে।" পরিমলের কাছে শেষ চিঠিতে লিখেছিল সুধাময়।

তারপর--?

সুধাময় তারপর মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ম ছেড়ে চলে গেল। কেন—কে জানে? হয়ত এত সংশয়, এই দুঃসহ বেদনা তার সহ্য হয়নি। সে নতুন করে তার বিশ্বাসকে খুঁজতে বেরিয়েছে কিংবা তার সেই অদ্ভুত আনন্দকে।

সুধাময়ের গল্প এখানে শেষ। আমি, পরিমল, তার কথা আর কিছু জানি না। যদি আপনাদের কেউ এ-গল্প পড়েন এবং সুধাময়ের দেখা পান, তাঁকেও এখানে শেষ করতে হবে কাহিনী। কিন্তু কে জানে, হয়ত, আপনার এত কথা মনে থাকবে না, কিংবা থাকলেও সময় থাকবে না এত কথা বলার। খুবই স্বাভাবিক অবশ্য। তবে, হাঁ, যদি কোনোদিন সুধাময়ের সঙ্গে দেখা হয়, তাকে বলবেন, তার লেখক বন্ধু পরিমলের বড় ইচ্ছে সুধাময় যেন জানায়, সে কি তার সমস্ত জীবনে সেই সুধাকে পেয়েছে যার জন্যে ওর এত আকুলতা, এত ঘাট ছেড়ে ঘাটে যাওয়া? এত তন্ন তন্ন আঁতিপাতি করে খুঁজে, এক বন্দর ছেড়ে আর এক বন্দর—এমনি করে সে চলতে চলতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনটির শুরুতে অন্তত কোন তফাত ছিল না।

ভোরটা ছিল বোবা-বোবা, ভিজে-মতন, যে ভোরে জানালার তিন হাত দূরের চেনা শিউলি গাছটাও অনেক দূরে সরে গিয়ে, কুয়াসার আড়ালে অচেনা একটু ভয়ের মত ঝাপ্সা হয়ে জমে থাকে।

কুয়াসা কাছের জিনিসকে দূরে ঠেলে দেয়, অপার্থিব, রহস্যগুণ্ঠিত করে তোলে। আর, দূরের জিনিসকে একেবারে লেপে মুছে, নিরাকার-মিছে করে দেয়।

সেদিনও দিয়েছিল।

গলির আলো নিবেছে, পাশের বস্তিতে চৌকিদার-মোরগটা চেঁচিয়ে উঠেছে। পাঁচটা। গায়ে আরেকটু কাঁথা জড়িয়ে শোওয়া যাক। ও-পাশের ফ্ল্যাটে নতুন আমদানী ভাড়াটেদের ঘরে আলো জ্বলে উঠল, বিয়ের উমেদার আধ-বুড়ি কুমারী মেয়েটার এখনই তারস্বরে সার্গমবাজি শুরু হবে: সাড়ে পাঁচ। গোটা তিনেক হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পিছনের ডোবাটায় গিয়ে নামল। সারারাত ধরে নির্জলা-উপোসী কলতলাটার বুক সুতো-সরু জলের ছোঁয়ায় তিরতির করে উঠল, অতএব ছ-টা। আর না, এবারে উঠতেই হবে।

কেননা, একটু পরেই ঠিকে ঝি এসে দরজায় হানা দেবে। তার আবার মিনিটের সবুর সয় না, দরজা খোলা না পেলে রক্ষা নেই, কড়কড় কড়া নেড়ে জানান দেবে পাড়া-সুদ্ধ লোককে। দোতলায় মেজ জায়ের অনিদ্রা ব্যামো, হয়ত সকালের দিকে তিনি একটু চোখ বুজেছেন, খান খান ঘুমের ফলে ভাঙা মেজাজ নিয়ে তিনিই হয়ত আলুথালু হয়ে নীচে ছুটে আসবেন।

তার আগেই কুসুমকে উঠতে হবে। ঢালাই লোহার কারখানাটায় একশো কুকুর এক সঙ্গে কেঁদে উঠে সাতটা বাজিয়ে দেবার আগেই।

গলায় আঁচলের বেড় দিয়ে পূবের ঈষৎ-লালচে আকাশকে গড় করবার সময়ও কিন্তু মনে হয়নি যে, এ-দিনটি অন্য কোন দিনের চেয়ে একটুও আলাদা হবে। গরু যেমন ঠুলি-পরা চোখে ঘানির চারদিকে ঘোরে, এ-বাড়ির দিনগুলোও তেমনি অমোঘ কোন নিয়মে একটি নির্দিষ্ট পরম্পরার খুঁটিকে প্রদক্ষিণ করে।

উনুনটা ভিজে-ভিজে, ভাল করে জ্বলতে চায়নি। হাঁটু ভেঙে ফুঁ দিতে গিয়ে কুসুমের চোখে জল এসে গেছে। মানি ঝি ছাই-মাখা হাতের পিঠ গালে ঠেকিয়ে অবাক হবার ভঙ্গি করে বলেছে, 'ওমা ছোট বউদি, কাঁদছ?'

'কই, না ত।'

হাল্কা গলাতেই কুসুম বলেছে বটে,

কিন্তু জ্বলে গেছে মনে মনে। হারামজাদীর সব ন্যাকামি। কাঁদ—ছ? মনে মনে কুসুম শব্দটাকে ভেঙে-ভেঙচে আবৃত্তি করেছে, তা'তে রাগটা আরও তেজী হয়ে উঠেছে। ন্যাকামি। উনুনে আঁচ দিতে হলে নাকের জলে চোখের জলে যে মিশ খেয়ে যায়, জানেন না যেন।

জানে না আবার, সব জানে। আসলে ওটা ঠাট্টা হল। মানিঝি, অনেকদিন থেকেই কুসুম লক্ষ্য করেছে, তার সংগে অন্তরঙ্গ হতে চায়, ফাজলামো করতে এগিয়ে আসে। মনে মনে কুসুমকে সে তার সমান দরের মানুষ বলেই জানে। এ-বাড়ির অন্য কোন বউ-ঝিকে ত জল-তোলা, উনুন ধরান, চা-তৈরি করার কাজে দেখতে পায় না। রোজ ভোরে তার সংগে যার চার চক্ষুর মিলন হয়, সে কুসুম। সে যখন ছাই, শালপাতা আর বাসনের কাঁড়ি নিয়ে কলতলায় বসে, কুসুম তখন উনুন ধরায়। সুতরাং, মানি ঝি মনে মনে হিসাব ক'রে নিয়েছে, সে আর কুসুম এক জাতেরই মানুষ, দু-জনেই ঝি, তবে কুসুম মোটামুটি ফর্সা কাপড় পরে কিনা, অতএব একটু উপরের ক্লাসের ঝি।

কে তাকে কী চোখে দেখে, সব টের পায় কুসুম, মুখে কিছু বলে না, উনুনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভাবে। তাই বলে কাঁদে না।

কান্না কুসুমের কবে শুকিয়ে গেছে।

আবার উনুনের মত হঠাৎ দপ্ করে কোন দিন জ্বলবে না। কুসুমের জ্বলুনিও কবে শেষ হয়ে গেছে!

কুসুম যে ঝি, একটু উঁচু ক্লাসের ঝি, এটা ত সে কবেই টের পেয়ে গেছে। যেদিন লাল-চেলি আর মুকুট পরে এ-বাড়িতে প্রথম পা রেখেছিল, সেদিন না হোক, তার দিন-কতক পরেই। প্রথম দিন অবশ্য অনেক আলো জ্বলেছিল, চোখে ধাঁধা লেগেছিল। তা একটু লাগতে পারে বইকি। ঘন-ঘন উলু আর শাঁখে কানে কোন ছোট কথা আসেনি। কড়ি আর চাল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে করতে মনে হয়েছিল, গোটা জীবনটাই বুঝি এমনি খেলা-খেলা। ননদ-জায়েদের কেউ এসে কানে-কানে ফিস ফিস করেছিল, কেউ সাজিয়ে দেবার ছলে গালে টোকা দিয়ে পরখ করেছিল নরম কিনা; তখন কিছু বোঝা যায়নি। কুসুম ভেবেছিল, সে-ও বুঝি এদেরই একজন।

তা-যে নয়, সেটা টের পেয়েছে জোড়ে ফিরে এসে। দেখেছে, বাড়তি লাইটগুলো ডেকরেটরেরা কবে খুলে নিয়ে গেছে; পাড়ার কুকুরগুলোকে মেটে গেলাস আর কলাপাতা চেটে চেটে খেতে দেখে গিয়েছিল, আজ একটি এঁটোপাতাও পড়ে নেই। সন্ধ্যার পর এ বাড়িতে মিটমিটে কয়েকটা আলো জ্বলে, একটা ছেলেদের পড়ার ঘরে, একটা হেঁসেলে, আর একটা বড়জার ঘরে। অন্য কোথাও আলো জ্বলতে দেখলেই বিধবা ননদ এসে নিবিয়ে দিয়ে যায়। মিটার চড়বে। সেই নিবু নিবু আলোয় কুসুম টের পেল, লাল চেলিটা যেমন একদিনের, বধূত্বের জলুস তেমনি দিন সাতেকের। একটা বিয়ের পরদিন থেকেই তোরঙের নিচের ভাঁজে চাপা পড়ে রঙ খোয়াতে শুরু করে, বুনুটটুকুও কবে খসে যায় কেউ টের পায় না। আরেকটাও ওপরের খোলসের মত খসে পড়ে। সাধারণ একটি মেয়ে দুদিনের জন্যে রানীর পোশাক পরে বটে, কিন্তু সেটা ধার-করা। অভিনয়ের পরে খুলে দিতে হয়। স্টেজটা কম সময়ের, আসল সংসারটা আঁকা সীনের পিছনে, সাজঘরে। সেখানে রঙচঙে সব পোশাক খুলে ফেলে গায়ে আটপৌরে শাড়ি তুলতে হয়। রূঢ় হাতে ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে হয় সব রঙ, শেষ অবধি সব মুছে সিঁথিতে হয়ত সামান্য একটু সিঁদুরের ছোঁয়া টিকে থাকে।

কুসুম তখনই জেনেছে, মাঝারি আয়ের যৌথ পরিবারে কয়েকটি অলিখিত নিয়ম থাকে। তার মধ্যে একটি হ'ল এই যে, যে-বৌয়ের স্বামীর রোজগার সবচেয়ে কম, সে উঠবে সকলের আগে। উনুনে আঁচ দেবে, সেই আঁচের ধোঁয়া ঘুম ভাঙাবে অন্য ঝি-বৌদের; তারপর চায়ের পেয়ালার ধোঁয়া বাড়ির ছেলে আর বাবুদের।

ডাক্তার ভাসুরের স্ত্রী বড়-জা যে-নিয়মে উকিল ভাসুরের স্ত্রী মেজ-জাকে একদিন রান্নাঘরে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সেই নিয়মেই মেজদি কুসুম আসবার দিনকতক পরেই ছুটি নিলেন।

কেননা, প্রমথ বেকার, এটা ধরে, সেটা ধরে, আয়ের কিছু ঠিক নেই।

হেঁসেলে কুসুমকে বসিয়ে দিয়ে মেজদি বলেছিলেন, নাও ভাই, এবারে রানীগিরি কর।

রানীগিরিই বটে। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যখন চোখ ছল-ছল করে, পিঠে টান ধরে, তখন ঝাপসা আধো-অন্ধকার ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে অসম্ভব সব ভাবনার পাগলামি কি আজও কুসুমকে পেয়ে বসে না? একবারও কি মনে হয় না, এই কাঠের পিঁড়িটা আসলে তার সিংহাসন, চ্যাপটা পিতলের হাতাটা রাজদণ্ড, এই ছোট, চাপা, সেঁতসেঁতে হেঁসেলে কুসুম মহারানী? পাতে পাতে মেপে মেপে সে শাক-তরকারী-ডাল পরিবেশন করে না, করুণা বিতরণ করে।

আজগুবী কল্পনা, অদ্ভুত, কিন্তু মাঝে মাঝে চারপাশের এই চাপা দেয়ালটাকে এক মন্তরে উড়িয়ে দিতে কার না সাধ যায়। না-হয় মন্তটা মিথ্যাই।

তাই, মানি ঝি যখন গায়ে-পড়ে ন্যাব-করা গলায় বলেছে 'কাঁদছ', কুসুম অহেতুক বেশি মাত্রায় চটে গেছে। নইলে কথাটার মধ্যে দোষ ধরবার কিছু ছিল না। দোষ বলবার ধরনে।

'ছোটবাবু আজ এখানে নেই, না বউদি?'

কুসুম সংক্ষেপে বলেছে, 'না।'

'চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে শুনলুম? যাক, তবু ভাল যে এতদিনে হুঁশ হ'ল। কোথায় গেছে, জান?'

কুসুমের মনে হয়েছে, চীৎকার করে বলে যে, তুমি থাম, তুমি আর সই নও, কিন্তু ভীরুতা বা ভদ্রতায় আটকেছে। 'শোনপুরে।'

'সে আবার কতদূর।' নাম শুনিনি ত।'

মুশকিল এই, শোনপুর যে ঠিক কোথায় বা কতদূর, কুসুমেরও জানা নেই। জানা নেই বলেই সে চটেছে আরও বেশি। শোনা-কথার ভরসায় আন্দাজে বলেছে, 'অ—নেক দূর। বড় রেল, ইস্টিমার, তারপর ছোট রেলে যেতে হয়।'

'কবে ফিরবে?'

'জানি না।'

মানি ঝির মুখ বন্ধ করবার জন্যেই কুসুম আরও জোরে জোরে চায়ের কাপে চামচ নেড়েছে।

দোতলার বারান্দায় বড় জায়ের মেয়ে মানসীর মুখ দেখা না গেলে মানি ঝি হয়ত থামত না।

'খুড়িমা, জল গরম হয়েছে?'

উপর দিকে ঘাড় তুলে চেয়ে কুসুম দেখতে পেয়েছে মানসীকে। জোরে জোরে ব্রাশ ঘষছে, মুখভর্তি ফেনা, তারই অনেক-খানি শব্দ করে ফেলেছে উঠোনে, আর একটু হলেই চৌবাচ্চাটায় ছিটে লাগত, কুসুম মনে মনে বলেছে অসভ্য মেয়ে, মুখে আনতে সাহস পায়নি, কোন দিনই পায় না অতি মিহি, ভয়ে-ভালমানুষ গলায় বলেছে, 'এক্ষুণি হবে।'

'হয়নি বুঝি এখনও?'

'এতক্ষণ বটঠাকুরের চা করলুম যে।'

থমথমে মুখ মানসীর, গলাটাও যেন ভারি-ভারি। হয়ত ঘুমে, হয়ত রেগে গেছে বলে। রাগ করে আরও খানিকটা ফেনা উঠোনে ফেলেছে।

'কেতলিটা তুমি ওপরে পাঠিয়ে দাও খুড়িমা, গার্গল করবার মত গরম জল আমি নিজেই স্টোভে করে নিতে পারব। তোমার যখন অনেক কাজ—'

ভয়ে-ভয়ে কেতলিটা তাড়াতাড়ি উনুনে বসিয়ে দিয়েছে কুসুম। আড়চোখে চেয়ে দেখেছে, মাথা নীচু করে বাটনা বাটছে বটে মানি ঝি, কিন্তু ঠোঁট টিপে হাসছে।

বড় ভাসুর কাগজ পড়ছিলেন, চায়ের বাটিটা অভ্যস্ত হাতে টেনে নিয়েছেন, এক চুমুক মুখে দিয়েই কাপটা সরিয়ে বলেছেন, 'চিনি কি ফুরিয়ে গেছে বৌমা?'

লজ্জায় কুসুমের মাথা কাটা গেছে।

বড় ছোট এ-বাড়ির মানুষ, পান থেকে চুনটুকু খসলে ক্ষমা করতে জানে না।

মেজ-জা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে বলেছেন, 'বুসার দুধটা জ্বাল দিয়েছ ত ছোট বউ?''

'দুধ ত আসেনি, মেজদি।'

'তোমার মেয়ে চুকচুক করে কী খাচ্ছে তবে, পিটুলিগোলা?'

'কালকের বাসি দুধ, একটুখানি বেঁচে-ছিল মেজদি।'

'বাসি দুধ বুঝি?' মেজ-জা ফিসফিস করেই বলেছেন, কিন্তু ফিসফিস গলাও বাড়িশুদ্ধ লোকের কানে যেতে পারে, শুধু ঠোঁট-নাড়ার প্রক্রিয়াটি জানা থাকা চাই। কুসুমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বারান্দার কোণে বসে খুকু এখনও শুকনো দুধের বাটিটার চাঁচি-মাটি চাটছিল, ভেবেছে বাটিটা কেড়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ঠাস করে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দেয় দেয়ালে, কাঁদুক ও, কেঁদে কেঁদে সারা হক, ওর কপালটা সুপুরির মত শক্ত হয়ে উঠুক।

যে-নিয়মে এ-বাড়িতে কুসুমের সব কাজ সামলাতে হয়, সেই নিয়মেই তার বেকার স্বামী প্রমথ নিত্য বাজার করে। আজ প্রমথ নেই, বড় জার ছেলে পটল বাজারে যাবে। পটলের হাতে ফর্দ তুলে দিলেন বড়দি, কুসুমকে বললেন, 'ওকে টাকা দিয়ে দাও, ছোট বউ।'

টাকা? কুসুমের কাছে কবে আবার টাকা থাকে। টাকা ত বড়দিই রোজ দেন প্রমথকে।

বড় জাও বুঝেছেন কুসুমের কাছে টাকা নেই। মুখখানা তাঁর ধীরে ধীরে কালো হয়ে এসেছে। 'ছোট ঠাকুরপোকে কাল বাজারে যাবার সময় দশ টাকার একখানা নোট দিয়েছিলুম, তা-থেকে বুঝি একটা পয়সাও বাঁচেনি ছোট বউ?'

বেঁচেছে কি না, তাই বা কুসুম কোথা থেকে জানবে। সে শূন্য চোখে চেয়ে থেকেছে। আঁচল থেকে খুলে তিনটে টাকা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বড় বউ বলেছেন, 'অথচ কাল শোনপুরে যাবার নাম করে ঠাকুরপো ও'র কাছ থেকে গুনে গুনে পাঁচটা দশ টাকার নোট নিয়ে গেছে, ছোট বউ।'

দুপ-দাপ করে বড় বউ উপরে উঠে গেছেন, আর অসাড় অবশ শরীরটা নিয়ে নিতান্ত যান্ত্রিক অভ্যাসেই পিঁড়িতে বসে খুন্তি নেড়ে গেছে কুসুম। ভিজে শাক থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে, আঁচল হাওয়ায় কাঁপছে। না, হঠকারী কিছু কুসুম করবে না, করতে পারবে না, করতে চায় না।

এই নিগ্রহ ত নতুন কিছু না। এটাকে ত সে তার শাঁখা, নোয়া, এয়োতি চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। এ সব না থাকলেই বরং অস্বস্তি হত, মনে হত কোথায় যেন হিসাব মিলছে না, আজকের সকালটা অন্য সব সকাল থেকে আলাদা মনে হত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আলাদা হলও।

বেলা বাড়তে না বাড়তে একটু একটু মেঘ জমেছে, আকাশের রঙ বদলে গেছে, কিন্তু সেজন্যে নয়।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হতে কুসুমের মনে পড়েছে, ছাতে অনেক কাপড় শুকোতে দেওয়া আছে। সব তুলে তুলে জড়ো করে রাখছিল চিলেকোঠায়, হঠাৎ কুসুম দেখতে পেয়েছে বড় ভাসুর ফিরে আসছেন। হাতে খবরের কাগজ, সেটা দিয়ে মাথা আড়াল-করা, তাড়াতাড়ি পা ফেলছেন, কিন্তু এমন সময়ে ত উনি কোনদিনই ফেরেন না!

কুসুমের মনে পড়েছে, সদর দরজা বন্ধ; তাড়াতাড়ি নেমে এসে খুলে দিয়েছে, সরে দাঁড়িয়েছে একপাশে, ওর চোখে চোখ পড়তে বড় ভাসুর কেমন যেন চমকে উঠেছেন, লুকোতে গেছেন হাতের কাগজ, তারপর কোন দিকে না চেয়ে সোজা উঠে গেছেন উপরে।

এত তাড়াতাড়ি উনি ত কোনদিন সিঁড়ি ভাঙেন না।

কী জানি কী ভেবে কুসুমও পিছে-পিছে উপরে উঠে এসেছে। হয়ত সামান্য মেয়েলী কৌতূহল। কিংবা অন্তর্যামীই হয়ত বুকের ভিতরে থেকে সব টের পাইয়ে দেন।

উপরে উঠে দেখেছে দরজা ভেজান, অবোধ শিকলটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। কুসুম যেন জানত, ভেজান থাকবে। কারণ

নেই, তবু বুকের ভিতরটা শিকলটার মতই থেকে থেকে কেঁপে উঠেছে। কুসুম কান পেতেছে কপাটে। ওরা চাপা, দ্রুত গলায় কথা বলছে। কিন্তু প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছে কুসুম।

'স্টীমার-ডুবি? কাল রাত্রে? কই সকালের কাগজে ত ছিল না।'

'টেলিগ্রাম দুপুরে বেরিয়েছে। দানাপুর এক্সপ্রেসের প্যাসেঞ্জার নিয়ে এই একটা স্টীমারই গঙ্গা পাড়ি দেয়। চড়ায় ঠেকে জাহাজ চৌচির হয়ে গেছে।'

'সব নাম বেরিয়েছে?'

'আস্তে। ছোট বউমার কানে এখনই যেন কিছু না যায়। নাম সব বেরোয়নি। সব লাশের কিনারা হয়নি ত। হলে বেরোবে আস্তে আস্তে।'

ঠিক তখনই ভয়ে-রক্তে একাকার হয়ে কুসুমের মনের মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। ধপ করে কুসুম বসে পড়েছে বারান্দায়, দরজার বাইরে ধুলোয়। শব্দ পেয়ে বড়দি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসেছেন, ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন, আর কথা বলতে হয়নি, অমন ভারিক্কি গিন্নী মানুষ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছেন।

কুসুমের চোখে তখনও জল আসেনি।

পর পর কী ঘটেছে, তাও ভাল করে টের পায়নি।

যেন মনে পড়ে, অনেকগুলো পায়ের শব্দ নানা দিক থেকে ওর কাছে এসে থমকে থেমেছে। নিঃশব্দ বোবা মুখের সারি, সকলেরই চোখে জল। কে যেন ওর পিঠে হাত রেখেছে। —বউ, ওঠ।

কিছু বোঝেনি কুসুম, জিজ্ঞাসা করেনি কেন, তবু উঠেছে। হাত ধরাধরি করে ওরা ওকে পৌঁছে দিয়েছে ঘরে। সহানুভূতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে ঢেকে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। কোলের কাছে এনে দিয়েছে খুকিকে।

এরা কারা। এই যে একজন ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করছেন, আরেকজন হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন কপালে, কুসুম কি এদের জানে। কী জানি, কিছু মনে করতে পারছে না, সব যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছায়া, চিনি-চিনি না-চিনি। এরা সবাই ওকে ঘিরে আছে কেন। ওরা কি চেপে ধরবে কুসুমকে, একটু একটু করে পিষে দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে ওকে? না-না, এই ত ওদের মুখ মায়া-মলিন, চোখ কান্না-কোমল। কার জন্যে কান্না, কুসুমের? কী হয়েছে কুসুমের। কিছু ত হয়নি। এই ত সে দিব্যি শুয়ে আছে, দেখছে শাদা দেয়ালগুলো বুকের পাখা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। গেল বটে, কিন্তু কী যেন নিয়ে গেল। কী। কী। ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল, হাতের উপরে ভর দিয়ে হঠাৎ উঠে বসতে গেল কুসুম। আর তখনই দুটি ঠাণ্ডা হাত ওকে জড়িয়ে ধরল, অতি-মৃদু, অতি-সহৃদয় গলায় কে বলল, 'উঠো না কুসুম, আর একটু শুয়ে থাক।'

কুসুম? এ-নামে এই পাঁচ বছর এ-বাড়িতে কেউ ত তাকে ডাকেনি? চোখ মেলে কুসুম দেখল, বড়-জা। ওর মাথাটি কোলের ভিতর টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলছেন, 'উঠো না কুসুম।'

কুসুম? আর কান্না ধরে রাখা যায়নি, বড়দির কোলের ভিতরে মুখ ডুবিয়ে কুসুম বলে উঠেছে, 'আমার যে সব ফুরিয়ে গেল, দিদি।'

'কুসুম শক্ত হও। খুকুর দিকে চাও। এখনই ভেঙে পড় না। সব খবর পাওয়া যায়নি ত। উনি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন। উনি ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাক।'

সব কথা বোঝেনি, সব কথা কানেও গেছে কি না সন্দেহ, কুসুম অনেকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকেছে। তারপর ধীরে ধীরে, নিস্তেজ গলায় বলেছে, 'তোমরা সবাই যাও। আমি একটু একা থাকব।'

ঢালাই লোহার কারখানায় একশো কুকুর গলা মিলিয়ে কেঁদে উঠতেই কুসুম চোখ মেলেছে। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেছে। মাথাটা এখনও ভারি, শরীরেও দুঃসহ যন্ত্রণা, জলের পিপাসা শুকিয়ে শুকিয়ে গলার কাছে কাঁটার মত শক্ত হয়ে ঠেকে আছে। কিন্তু আর সব ফাঁকা, শাদা, একেবারে শূন্য।

সে কোথায়। তার শোবার ঘরে? কিন্তু কারখানা ছুটি হল, বেলা গড়িয়ে গেছে, সে এখনও শুয়ে কেন।

সব কাজ এখনও বাকি না? উনুনে ধরাতে হবে না? ইস্কুল-কলেজ থেকে ওরা সব এখুনি ফিরবে, ওদের খেতে দিতে হবে না?

পা টলছে, তবু দেয়াল ধরে কুসুম কোন-মতে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু পারল না, বিছানাতেই ওকে বসে পড়তে হল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কে। বালিশের উপর ওর মাথা নুইয়ে দিয়ে বলল, 'উঠছ কেন, কুসুম, আরেকটু শুয়ে থাক না।'

মেজদির গলা।

অস্ফুট গলায় কুসুম বলতে গেল, 'কিন্তু, মেজদি, শিকেলের কাজকর্ম সব যে বাকি। ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরান, ঠাকুরকে জল-মিষ্টি দেওয়া, প্রদীপ দেখান—'

মেজদিকে বলতে শুনেছে, 'ছি ভাই ছি। আমরা কি পশু। কোন কাজ পড়ে থাকবে না, সব আমরা কজনে মিলে হাতে-হাতে করে নেব। দিদি, আমি, মানসীও আছে। এই দেখ, মানসী তোমার জন্যে দুধ গরম করে এনেছে, খেয়ে ফেলে আরেকটু শুয়ে থাক দেখি।'

কুসুম চেয়ে দেখেছে, গরম দুধের গেলাস হাতে মানসী এসে দাঁড়িয়েছে। জল-ভরা

চোখ। এই মেয়েটিই কি আজ সকালে তাকে ধিক্কার দিতে উঠোনে শব্দ করে দাঁত-মাজা ফেনা ছিটিয়ে দিয়েছিল? বিশ্বাস হয় না। ধোঁয়া নেই, জ্বালা নেই, আজকের সন্ধ্যা এমন নরম, কালো, সুন্দর হল কী করে। আর চারপাশের চেনা মানুষগুলো কি মন্ত্রবলে আলাদা হয়ে গেল। ভেবেছে কুসুম, কেবলি ভেবেছে। কিনারা পায়নি, কেঁদেছে। কেঁদে ঘুমিয়েছে।

আসল কান্নার পালা ছিল এরও পরে, কুসুম নিজেও জানত না।

একতলায় রাস্তার ধারে কুসুমের ঘর। বড়দি নিজে শুতে চেয়েছিলেন। কুসুম বলেছে, দরকার নেই। তবে মানসী আসুক? বড়দি বলেছেন, আজ একা শুতে নেই কুসুম, ভয় পাবে। কুসুম তাতেও রাজি হয়নি। —না দিদি, না। সব ভাবনা ঘুচে গেছে, আমি ভয় পাব কী। শুধু একটু ঘুমোব।

শেষ পর্যন্ত মানি ঝি দরজার বাইরে মাদুর পেতে শুয়েছে।

সেই ভয় পেতে হল। আরও কান্না কাঁদতে হল।

ভয় এল মাঝরাতের কাছাকাছি একটা সময়ে। জানালা ঠকঠক শব্দ শুনেছিল ঠিকই, কুসুম ত আর ঘুমোয়নি। প্রথমে ভেবেছিল বাতাস। কিন্তু বাতাস কি এমন চুপ পায়ে আসে, এমন গুনে গুনে টোকা দেয়? তবে। বুকের উপরে হিম হাত দুটি জড়ো করে কুসুম শুয়েছিল, একটা একটা করে টোকা গুনেছিল। মনে মনে বলছিল, সব তো গেছে আমার আবার ভয় কী, তাই চেঁচায়নি। তারপর টোকা থেমে গেছে, কুসুম শুনতে পেয়েছে, অতি নীচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। চেনা গলা। বিদ্যুতের ছোঁয়া ছড়িয়ে গেছে সমস্ত দেহে। কুসুম উঠে বসেছে। নিশিতে-পাওয়া গলায় বলেছে, 'যাই'; আচ্ছন্ন অভিভূতের মত ছিটকিনি খুলে দিয়েছে।

কপাট আলগা হতেই প্রথমে দমকা হাওয়া তারপর সেই হাওয়ার পিছে পিছে যে চৌকাটে এসে দাঁড়িয়েছে, তার অবয়বের আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, তবু কুসুমের চিনতে ভুল হয়নি, পা থেকে মাথা অবধি একবার থরথর করে কেঁপে উঠেছে, আহ্লাদ - অবিশ্বাস - আতঙ্কমেশান কণ্ঠে কুসুম বলে উঠেছে, 'তুমি?'

আগন্তুক এগিয়ে এসে ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। তার বুকে মুখ লুকিয়ে কুসুম শুনতে পেয়েছে, 'আমি। আমিই ত। প্রমথ। ভয় পেয়েছিলে?'

কুসুমের না-বাঁধা চুলে আঙুল বুলিয়ে প্রমথ বলে গেছে, 'সত্যিই আমি। ভূত নই। আলো জ্বালিয়ে দাও, দেখবে আমার ছায়া পড়েছে। ভূতের কি ছায়া পড়ে?'

প্রমথর বুকে মুখে রেখেই একেবারে ছোট্ট খুকিটির মত গলায় কুসুম বলেছে, 'না।'

'আলো জ্বালবে না?'

'আমার আলোর দরকার নেই।' হাত বাড়িয়ে প্রমথর চুল ছুঁয়েছে কুসুম, চোখের পাতায় নরম দুটি আঙুল রেখেছে। তারপর নাক, ঠোঁট, গলা পেরিয়ে হাত রেখেছে রোমশ বুকে, সজোরে আঁকড়ে ধরে ঘ্রাণ নিয়েছে। নিঃশব্দ থরথর পরীক্ষা সাংগ হলে বলেছে, 'তুমি, তুমিই ত। তুমি, তুমি, তুমি।' যেন ওই 'তুমি' কথাটা মন্ত্রের মত, ওর মধ্যে সব ভরসা লুকান আছে।

অনেক পরে কুসুম ধীরে ধীরে বলেছে, 'তবে যে—খবরের কাগজে......সব মিথ্যে?'

মিথ্যে কেন। স্টীমার-ডুবিটা সত্যি। সেই স্টীমারে প্রমথ ছিল এও ঠিক। সকলের সংগে সেও ছিটকে পড়েছিল জলে, ভাসছিল, ডুবছিল, ফের ভাসছিল। অন্ধকার রাত্রি, কী খরস্রোতের টান, সেই টানে কত-জন তলিয়ে গেল, আকাশের তারা, যাদের ছায়া-চর থাকে জলের নীচে, ছাড়া সে-হিসাব কেউ রাখে না। অনেক দূরে একটা আলোর বিন্দু, মজ্জমান চেতনা নিয়েও প্রমথ বুঝেছে ওই বিন্দু হল তার প্রাণ, প্রাণের প্রতীক, ওখানে পোঁছতে হবে, ওকে ছুঁতে হবে। একটি ইচ্ছার ফলকে সমস্ত শক্তিকে গ্রথিত করে প্রমথ ঘোলা জল ঠেলে ঠেলে সেদিকে এগিয়ে গেছে।

'তারপর?' কুসুম রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে।

তারপর আর মনে নেই। সেই বিন্দুটা বুঝি ছিল মাঝি নৌকো, তারা কখন এসে তাকে তুলে নেয়, তাকে এবং আরও ক-জন যাত্রীকে, কিছু মনে নেই। ভোরবেলা মাঝিরা তাদের পোঁছে দিয়েছে পাড়ে; তার কাছাকাছি কোন রেল স্টেশন নেই। কিন্তু একটা গঞ্জ আছে। মাঝিরা গরম দুধ দিয়েছিল, দয়াপরবশ হয়ে একটা ধুতি দিয়েছিল পরতে; গঞ্জের ডাক্তারবাবু ওকে একদিন হাসপাতালে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রমথ বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যাকুল, কিছুতে রাজি হয়নি। ডাক্তারের কাছে কিছু পয়সা চেয়ে নিয়ে বাসে উঠে বসেছে। তারপর কী করে নানা শহরে-বাজারে বাস-বদল করতে করতে বাড়ি এসে পৌঁছল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। সবটা সবিস্তারে বলল না প্রমথ। —'আজ আমি বড় ক্লান্ত। কাল শুনো। সকালে সবাইকে ডেকে যখন যমের দুয়ার থেকে মানুষ-ফেরার গল্প বলে তাক লাগিয়ে দেব, তখন। কেমন?'

কুসুম ধরা-ধরা গলায় বলেছে, 'শুনে আমার দরকারও নেই। তুমি ফিরে এসেছ এই ঢের।'

হাত বাড়িয়ে হঠাৎ আলোটা জেলে দিয়েছে প্রমথ। কুসুমের পুর্ণায়ত চোখে চোখ রেখে বলেছে, 'তুমি বুঝি আজ সারাদিন কেঁদেছ?'

'বা-রে, কাঁদব না?' কুসুম অবাক হয়ে অনর্গল গলায় বলে গেছে, 'তুমি কী-যে।

জান, খবরটা শুনেই বটঠাকুর পাটনা রওনা হয়ে গেছেন? বড়দি মেজদি ও'রা সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা আমাকে আগলে রেখেছেন, মাথা তুলতে দেননি; সংসারের সব কাজ আজ ও'রাই হাতে হাতে সেরেছেন, আমাকে কিছু ছ'ুতে হয়নি, জান?'

'তবে ত তোমার আজ ছুটি গেছে।' প্রমথ ঠাট্টার সুরে বলেছে।



'ছুটিই তো।'

এর পরেই সেই কঠিন পরীক্ষাটা এসেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেলে প্রমথ হঠাৎ ওর মুখখানা দু-হাতে টেনে নিয়ে বলেছে, 'সারা দিন অনেক ত কে'দেছ কুসুম, এবারে একটু হাস।'

'হাসব? আচ্ছা হাসি।' কিন্তু সেই মুহূর্তে কী মনে পড়ে গেছে, থরথর করে কে'পে উঠেছে সারা শরীর, চেষ্টা করেও কুসুম হাসতে পারেনি। চোখের কোলে জল এসেছে, ঠোঁট, চিবুক, চোয়াল বে'কে দুমড়ে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু এক রত্তি হাসি ফোটেনি। অক্ষমতায়, লজ্জায় করুণ মুখ-ছবি দু-হাতে ঢেকে কুসুম কোনমতে বলেছে, 'আলো নিবিয়ে দাও।'

তারপর, অন্ধকার ঘরে একটি মেয়ের পাশে শুয়ে শ্রান্ত প্রমথ অনেক—অনেকক্ষণ ধরে তার অবিরল কান্নার ধ্বনি শুনেছে। মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়েও সেই কান্না থামাতে পারেনি, প্রমথ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

আবহাওয়াটা লঘু করে দিতেই হয়ত এক সময়ে বলে উঠেছে, 'এতক্ষণে বুঝেছি। ভেবেছিলে আপদ গেছে, আমি আবার ফিরে এসেছি এটা তোমার ভাল লাগছে না, তাই কাঁদছ, না?'

প্রমথর মুখে হাত-চাপা দিয়ে কুসুম ভিজে গলায় বলেছে, 'ছি।'

'তবে কাল থেকে ফের সংসারের সব খাটুনির ভার এসে ঘাড়ে পড়বে, সেই ভয়ে বুঝি?'

কুসুম আবার বলেছে, 'ছি। তুমি কি আমাকে এমনি ভাব?'

প্রমথ এবার অস্থির, রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছে, 'তবে কী, তবে কী। কেন এই অর্থহীন কান্না।'

কুসুম কিছু বলেনি। বলতে চেয়েও পারেনি। গুছিয়ে বলতে শেখেনি বলেই পারেনি। যদি বলে, সে কাঁদছে বড়-জা, মেজ-জা আর মানসীর কথা ভেবে, তাহলে প্রমথ কি বুঝবে, না বিশ্বাস করবে?

অথচ সত্যিই তাই। কুসুম আজই প্রথম জেনেছে, পৃথিবীর লোক ভাল-ও হতে পারে। এমন কি, যে-মানুষগুলো খারাপ, সময়ে সময়ে তারাও আলাদা হয়ে যায়; অন্যের শোকে কাঁদে, পাশে এসে দাঁড়ায়। যেমন আজ বড়দি-মেজদিরা দাঁড়িয়েছিল। কুসুম কে'দেছে এই জানার আনন্দে।

আবার দুঃখেও। আলাদাই হল যদি, এত অল্প সময়ের জন্যে হল কেন। মাত্র এক দিনের জন্যে কেন। সংসারের খাটুনির ভয়ে নয়, রাত পোহাতেই যে-মানুষগুলো আবার সেই সামান্য আর হিংসুটে আর ছোট হয়ে যাবে, তাদের করুণা করেও কুসুম কে'দেছে।

কিন্তু এ-সব কথা বুঝিয়ে বলা ত সহজ নয়। কে'দে-কে'দেই সে একটি কান্নার মানে বলতে চেয়েছে কি সাধে!

ভক্ত কবীরের পাঁচ শত বছর পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

ঘরের ঠিকানা হোলো না গো
প্রাণ তবু করে যাই যাই।

কবীর বলেছিলেন :

নাব্ ন জানু, গাঁও কা
প্রাণ কহে জীব জাব।

কাশীধাম চিরদিনই বহু পণ্ডিতজনের চরণধূলিতে ধন্য। আমি যাঁদের মহাগুরু বলে সন্ধান করেছি তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন নিরক্ষর। একথা ভুললে চলবে না কাশী নিত্যকালের সাধনার ভূমি। পণ্ডিতজনের কৃপাদৃষ্টিতে ধন্য হয়েও আমি অশেশব ঐ নিরক্ষর সহজ মানুষদের সন্ধানেই ঘুরেছি।

ভক্ত কবীর তো উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন :

সংস্কৃত কূপ জল কবীরা
ভাষা বহতা নীর
যব চাহো তবাই ডুবো
শান্ত হোয় শরীর।

অর্থাৎ ওরে কবীর সংস্কৃত হ'ল কূপজল। অনেক ব্যাকরণের খোঁড়াখুঁড়িতে যে জল মেলে তা আমাদের দেশে কূপজলের মতো কৃপণ ও দুরারাধ্য। আর ভাষা হ'ল প্রবহমান জলধারা। শরীর যদি তপ্ত হয়ে থাকে, যদি ধুলো, বালি, মলিনতা আক্রমণ করে থাকে, তবে ঝাঁপ দিয়ে পড় সেই সহজ জলধারায়। সব তাপ জুড়োবে এবং সব ধুলো-বালি ধুয়ে-মুছে পবিত্র হবে।

কবীরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল এই সব সহজ মানুষদের মধ্যে এমন বস্তু কি আছে যার জন্য তোমার মতো লোক খুঁজে বেড়ায়। কবীর বললেন :

না কাগজ গ্রন্থ লেখনী
লেখ অক্ষর নোঁহি কোয়
সর্বত্র দীশৈ সহজ ছাঁচ চ
অস দীক্ষা দে মোয়।

অর্থাৎ আমি কাগজ খুঁজে বেড়াই না। জীবনহীন কাগজ গ্রন্থ, কলম, লিপি কি কোনো অক্ষর আমি খুঁজে বেড়াই না। সেই জীবন্ত গুরুকেই আমি খুঁজি, যিনি এমন সহজ দীক্ষা দিতে পারেন যে, যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই প্রত্যক্ষ মেলে সহজ তত্ত্বের উপলব্ধি।

যুগে যুগে এই সদ্গুরুই আমাদের দেশে এসে ধন্য করেছেন। দীন দরিদ্র কেউ এই মহোৎসবে বাদ যায়নি।

কবীরের মতো এমন শক্তি কোথায় পাব। তবু শান্তিনিকেতনে এসে কবিগুরুকে দেখলাম—যিনি পাণ্ডিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যিনি সর্বশাস্ত্র-মর্ম জেনেও সেই সহজ গুরুর সন্ধান চিরদিনই করেছেন। এই সব বিষয়ে কবীর প্রভৃতির বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করেছি—সেই সময়টা আমার বৃথা যায়নি। তখন আমার উপজীব্য ছিল কবিগুরুর সাধনা-ধন্য সব বাণী। শান্তিনিকেতনে এসে এমন একটি স্থান পাওয়া গেল যেখানে বহু শাস্ত্র ও বাণীর সন্ধান পেয়েও প্রাণময়ী জীবন্ত বাণীর খোঁজ একেবারে শেষ হয়ে গেল না।

পূর্ববঙ্গে নৌকাতেই লোক চলে। সেখানে লগী হাতে অনেক দূরপথ বেয়ে হঠাৎ একদিন ভিতরের এই বাণী শোনা যায়, আর লগী ঠেলব না, এবার লগীটা মাটিতে পুঁতে নৌকার গতিকে স্থিত করে নিতে হবে। নৌকার মাঝির মতো, বলতে হবে, এতদিনে পারা গড়া হ'ল।

শান্তিনিকেতনে ঠাঁই মিলল, কিন্তু ঘোরাঘুরি বন্ধ হ'ল না।

হিন্দীতে একটি কথা আছে, 'গেঁহু কা সাথ ঘুণভী পিষা যায়।' অর্থাৎ গমের মধ্যে অনেক পোকামাকড় থাকলেও তাদের ধরে পিষবার উৎসাহ মানুষের হবে কিসে। তবে গম পিষতে গেলে আপনি আপনি ঘুণকেও পিষ্ট হতে হয়।

দেশবিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আহ্বান আসত। এবং আমার মতো অনেক জনও সেই সমাদরের অংশ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। গমের সঙ্গে ঘুণের পিষ্ট হওয়া।

১৯২৪ সালের কথা। চীনের ভ্রমণের পালা শেষ হয়ে গেল। এমন সময়ে একদিন জাপানের বিশিষ্ট কয়েকজন লোক, চীনদেশস্থ জাপানের প্রতিনিধি সহ এসে কবিগুরুর কাছে হাজির। জাপানে যাওয়ার আমন্ত্রণ।

কবিগুরুর সেক্রেটারি এলম্‌হার্স্ট সাহেব তখন তাঁদের বোঝাতে যান। জাপানে কবিগুরুর অনেক ভক্তের মধ্যে এঁরা কয়েকজন বেশ নামকরা। তবু এঁদের কারো কারো মনে এই ভাবটা হয়ত ছিল যে, কবিগুরু জাপানে যেতে চাইছেন না তার মূলে হয়ত একটু অভিমান আছে।

কিছুদিন যাবৎ কবিগুরুর মনে এই ভাব ছিল যে জাপান যদি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার উর্ধ্বে না উঠতে পারে, তবে এশিয়াবাসীদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। এই নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ও কবি নগুচির মধ্যে কিছুদিন একটু লেখালেখিও চলেছিল। বক্তৃতাতেও তিনি একথা বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যেও একটু সঙ্কোচ ছিল। কবিকে তাঁরা জানালেন যে, জাপানে এখনো তাঁর প্রতি যে পরিমাণ শ্রদ্ধা আছে তা অপরিমেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন :

'আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। সময় এসেছে। এই শুভলগ্নে জাপান যদি পথ দেখাতে পারে অর্থাৎ যদি সমস্ত প্রাচ্যদেশে সাধনার নবদীক্ষা দানের ভার নিতে পারে তবেই সবাকার কল্যাণ। আর তা না হলে সমস্ত প্রাচ্যদেশের কপালে অনেক দুঃখ দুর্গতি আছে।

শেষে জাপানবাসী ভক্তদের কাছে কবির হার মানতে হল।

কবিগুরুকে জাপানে নেবার জন্য একেবারে নতুন একখানি জাহাজ সাংহাই বন্দরে এসে হাজির।

আমাদের জাপান-যাত্রা শুরু হ'ল। ১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকাল, অর্থাৎ জাপানে তখন অপূর্ব বসন্তকাল। জাহাজে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। সারাদিন জাহাজের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ঘুরে বেড়ানোই আমাদের একমাত্র কাজ।

জাহাজের কাপ্তান থেকে নিম্নতন খালাসী পর্যন্ত সবাই সেবায় সর্বদা হাজির।

বসন্তের অপরাহ্ণ। সুন্দর হাওয়া দিয়েছে। আমাদের গন্তব্যস্থল জাপানী বন্দর নাগাসাকী। কাপ্তান বললেন, আজ শেষরাত্রি থেকে জাপানের আশেপাশের ছোট ছোট দ্বীপ দেখা যাবে।

জাহাজের কাপ্তান তো সর্বদাই তাঁর মাতৃভূমি জাপানের নব নব রূপ দেখেন। তবু তাঁর কি উৎসাহ। একবার দেখেছিলেন একটি শিশু মায়ের ঘোমটা তুলে তুলে দেখছে। এক-একবার মায়ের ঘোমটা সরে যাচ্ছে—আর মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখে শিশুটির কি আনন্দ! আজ এই কাপ্তানটির

সমুদ্র সৈকত — শিল্পী—নন্দলাল বসু

স্বদেশ দেখবার ব্যাকুলতায় সেইদিনের কথাই মনে পড়ে।

রাত্রে শুতে যাবার সময়ে কাপ্তেনকে বলে রেখেছিলাম যে, আপনার মাতৃভূমির প্রথম দৃষ্টিপাতের আনন্দ থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

শেষরাত্রি। আমাদের দু-তিন জনকে তিনি ডেকে তুললেন। অর্থাৎ আমি ও কলাগুরু নন্দলাল আর বিদ্বৎপ্রবর কালিদাস নাগ—এই তিনজনকে কাপ্তেন সাহেব ডাক দিলেন। কাপ্তেনের ডাকে তাঁর সর্বোচ্চ দূরবীক্ষণাগারে গিয়ে বসা গেল।

জাপান থেকে চীনদেশে যাঁরা আমাদের নিতে এসেছিলেন তাঁর মধ্যে একজনের নাম সান ও সান। তিনি অনেকদিন শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন। বাংলা ভালো বলতে পারেন। আমাদের পুরাতন বন্ধুদের একজন।

ভোর হ'ল। ছোট ছোট সব জাপানী দ্বীপ দেখা যেতে লাগল। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য তার বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। ছোট্ট হয়তো একটি দ্বীপের টুকরো, তারি মধ্যে পার্বত্য একটু গাছ যা কিছু সমস্তই অতি সুন্দর আর অতি

এরই মধ্যে কখন গুরুদেব আমাদের মধ্যে এসে বসেছেন।

সান ও সান আমাদের আনন্দময় বিস্ময় দেখে তৃপ্ত।

সান্ ও সান্‌কে বললাম, ভারতেও তো দেখছো যে এই রকম সব ছোট ছোট দ্বীপ, আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। কিন্তু সেখানে দুর্লভ হ'ল আমাদের মনের একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা।

কাপ্তান সাহেব বেশ একটু তৃপ্তির সহিত বললেন, এই যে আমাদের দেশে এসেছেন এর মধ্যে আমাদের একটুও অবহেলা নেই। এর মধ্যে এমন এক আঙুল জমিও নেই যাকে কেউ আরো বেশি সুন্দর করতে পারতেন।

কবিগুরু বলেছিলেন, এ'রা সব দিক দিয়ে নিজেদের শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে আপন দেশকে আপনারাই সৃষ্টি করেছেন। এ-ও এক রকমের সৃষ্টি দ্বারা দেশপুজা।

দুপুরে আমরা নাগাসাকী বন্দরে গিয়ে পৌঁছলাম। জাহাজ যখন তীরের কাছে এসেছে তখন তীর থেকে আমাদের দেখে একজন স্বাগত বাণী বললেন, সুন্দর বাংলা ভাষায়। শোনা গেল, "নমস্কার, আসুন ডাকছেন। চলুন তাঁর কাছে।" একটু যত্ন করে দেখা গেল, যিনি স্বাগত বাণী বললেন তিনি আমাদের পুরাতন আশ্রমবন্ধু কুসুনে তো সান। এক সময়ে তিনি আমাদের আশ্রমে ছিলেন।

এর পর থেকে আতিথ্যের ভার নিলেন জাপানী মেয়েরা। যিনি আমাদের সেবার জন্য এলেন তাঁর নাম কুমারী টমী ওয়াডা। শুনলাম, তাঁর চালনায় ১৫ লক্ষ নারী দেশের সেবায় সর্বদা প্রস্তুত। বিখ্যাত টোকিওর ভূমিকম্পে একটি দিনের চেষ্টায় প্রায় দশ হাজার নিরাশ্রয় শিশু ও শান্তিহীনদের আশ্রয়ের পাকা ব্যবস্থা এ'রা করে দিয়েছেন।

একদিন এই কুমারী টমী ওয়াডাকে কবিগুরু বলেছিলেন, "তোমরাই যথার্থ দেশপুজক, কারণ পুজার যে দেবতা তাকে সৃষ্টি না করলে ঠিক পুজো করা চলে না। আমরা, যারা দেশের জন্য কিছুই করিনি তারা তাদের পুজার দেবতাকে কোথায় পাব? শুধু দেশ দেশ বলে তামসিকভাবে চেঁচালে তো দেবতার আবির্ভাব হয় না। কাজেই দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে

তখন নিমফুল ফোটা শেষ হয়ে গিয়েছে। নিমফলের লোভে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ারা কলশব্দে আকাশ ভরিয়ে দিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের এদিকে ক্ষণবসন্তের শেষ ক্ষণটুকু বড় মনোরম। ঝরা নিমফুলের গন্ধে কেমন নেশা লাগে।

চওড়া পিচঢালা রাস্তার ধারে মিলিটারী ছাউনি—আর্টিলারি-ডিপো ও রেকর্ড-অফিস। মিলিটারী আরও অফিস অনেক আছে, কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের আসল পরিচয় সাধারণের কাছে ঐ রেকর্ড-অফিসের নাম-ডাকে। কাছারির পথে বিজলী ও টেলিফোন-অফিস পেরিয়ে আর্টিলারি-ডিপো ও রেকর্ড-অফিসের শুরু। এক নজরে শেষ হবে না, এত বড় কম্পাউন্ড আর এতগুলো ব্যারাক; এক নিঃশ্বাসে গোনা যাবে না সে-কম্পাউন্ডের ধারে ধারে মহানিমের সারি! তাদের ফুল-ফোটা শেষ হয়ে ক্যাপসুলের মত ফল ধরেছে ডালে ডালে।

রোজকার মত আজও এসে কম্পাউন্ডের মাঝখানে টার্গেট প্র্যাকটিসের মাঠটার এক-ধারে নিমগাছের ছায়ায় বসেছে লখিয়াবাঈ। বেলা দশটা বেজে গিয়েছে ডিপো-অফিসের পেটা-ঘড়িতে, রেকর্ড-অফিসের বাবুরা কাজে বসছেন।

লখিয়া টিনের হাতবাক্সটা খুলে সেলাই-ফোঁড়াই-এর সরঞ্জাম বার করলে। ধূলি-ধূসর মাঠটার দিকে চেয়ে দেখলে। রোদের তাপ এখন ক্রমে বাড়বে। ফাল্গুন চলে গিয়েছে। টার্গেট প্র্যাকটিসের নিশানাটা ক্ষতবিক্ষত।

অনেক জোড়া মোজা জড় হয়ে আছে সামনে। সে আসবার আগেই কাজ জমা হয়ে গিয়েছে রিপুকর্মের জন্যে। লখিয়া জানে। এতদিন ধরে কাজটা এমনভাবে করে আসছে, বুঝিয়ে কিছু বলবার দরকার হয় না—এক-রঙা এতগুলো মোজার জোড়ারও কোন গোলমাল হয় না। যার-যার জিনিস ঠিক-ঠিক পেয়ে যায় রিপুকর্ম শেষ হলে। জোড়া পিছু 'ঢাই আনা' মজুরি, সে যেমন মেহনত হক। এতটুকু থেকে এত বড় সব ছেঁড়া টেঁকে, বুনে, ঢেকে দিতে হয় লখিয়াকে। কাজের ফাঁকি চলে না। দেশী মিলিটারী-গুলো ভারী হুঁশিয়ার। আজ না হলে কাল এসে খুঁত ধরে খিচ খিচ করবেঃ কেয়া, এইসা বনয়া! মুফত্?

টানাটানিতে ছেঁড়া আরও বেড়ে যাবে। কাজ বাড়বে লখিয়ার। তার হয়ে বিনা প্রতিবাদে ত্রুটি সংশোধন করে দেয় লখিয়া।

মোজাগুলো থরে থরে সাজিয়ে রাখল লখিয়াবাঈ। কার কতটা জোড়াতালি-রিপুর দরকার আন্দাজ করলে। সেই মত কাজ শুরু করবে। অলিভগ্রীন মোজাগুলো মাটির বোঝা যেন! নাড়লে-চাড়লে ধুলো ওঠে। ছুঁচের মুখে সুতো জড়িয়ে যায়। একজোড়া মোজা কতকাল চালাবে এরা? নোংরা মোজা যত সব!

লখিয়া এক-একটা মোজা নিয়ে টিনের বাক্সটার উপর আছড়ে আছড়ে ধুলো ঝাড়তে লাগল। ধুলোয় ধুলো হয়ে গেল হাত-মুখ, কাপড়-চোপড়। 'ঢাই আনা' মজুরির কত খোয়ার! আবার তর্ক। কী হাল করে রেখেছে মোজাগুলোর সব! একটু যত্ন নিলে আরও কতদিন চলত সে-খেয়াল নেই! বাপের জন্মে দেখেছে কখনও যে, ব্যবহার জানবে? রাগ হয় লখিয়াবাঈএর।

একই মাপের মোজা সব, একই রঙ। তবু মোজায় হাত দিয়ে মনে মনে মালিকের চেহারাটা আন্দাজ করতে পারে লখিয়া—পায়ের মাপ, পায়ের গোছও। বয়েস? হাঁ, বয়েসও বলে দিতে পারে লখিয়া মোজা-মালিকের চেহারা না দেখে।

এ-মোজাজোড়াটা নেহাত কোন ছেলে-মানুষের! এদিক-ওদিক এতটুকু বাড়েনি, কেমন ঢলঢলে, চোপসান মোজাটা! কার জিনিস কাকে যেন দেওয়া হয়েছে পরতে। নতুনও মনে হচ্ছে মোজাটা, কী রিপুকর্ম করবে এর? সাথী কারও সঙ্গে চলে এসেছে বোধ হয়।

তবু ভাল করে নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা করে দেখলে লখিয়া, যদি কোথাও ফুটো-ফাটা থাকে। বলা যায় না, ছেলেমানুষের জিনিস! শেষটা হাই-মাই করবে—কাল এসে মেজাজ দেখাবে! মিলিটারী মেজাজ!

মনে মনে হেসে মোজাজোড়াটা একধারে সরিয়ে রাখলে লখিয়া! ছেলেমানুষের কত শখ! সবাই মোজা সারাচ্ছে, তাই দেখে সেও পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কী সারবে তা বুঝল না।

সবদিন মিলিটারীরা নিজেরা আসে না মোজা হাতে করে এই নিমতলায় লখিয়া-বাঈএর রিপুকর্মশালায়। এ-ব্যারাকের হেড ঝাড়ুদার বুধনের মারফত মোজাগুলো এসে জড় হয় লখিয়ার জন্যে আগেভাগে। বেলাশেষে কাজ চুকে গেলে ঐ বুধনই মজুরির পয়সা সংগ্রহ করে আনে। নগদ পয়সা, মোজা পিছু 'ঢাই আনা'!

একলা-একলা একমনে মাথা নিচু করে সেলাই করতে করতে আশপাশের কোন খেয়ালই থাকে না লখিয়ার। কখন নিমের ছায়া সরে গিয়ে পিঠের উপর রোদ এসে পড়ে, আবার সে-রোদও সরে যায় কখন, কিছুই টের পায় না লখিয়া। হাতের কাছে তখনও কত কাজ মোজা সারার—চোখে-কানে বুঝি কিছু দেখতে পায় না লখিয়া! ছুঁচ ঠেলে-ঠেলে আঙুলের ব্যথারও বুঝি আর

সাড় থাকে না। এমনি অনন্যমনা হয়ে পড়ে মোজা রিপু করার কাজে।

তারপর যদি কখনও চোখ তুলে সামনে চায়, মাথার উপর নিমগাছটায় তোতার চেঁচামেচিতে অন্যমনস্ক হয়, দুপুর রোদের তেজটা কাঁসা-ঝকঝক চোখ-ধাঁধানি লাগে, সেই অস্পষ্টতায় মনে হয়, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

লখিয়া চোখ নামিয়ে নেয়, নিচু মাথা আরও নিচু করে দাঁত দিয়ে ছুঁচের পিছনের সুতোটা কেটে দেয়। কুট করে। মাথার উপর তোতাগুলো চেঁচামেচি করে, নিমগাছটা বুঝি চষে ফেলে নিমফলের জন্যে। নখ-চঞ্চুর আঘাতে কচি নিমপাতা ঝরে পড়ে।

বুধন খিড়ি ফাঁকে ফাঁকে কখন সরে পড়ে। বলেও যায় না। সামনে টালি-ছাদ মিলিটারী ব্যারাকগুলো খাঁ-খাঁ করে। রেকর্ড-অফিসের বাবুরা কাজের মধ্যে কখন ডুবে যায় অতলান্ত। ঠং করে একটা ঘণ্টা বাজে আর্টিলারি-ডিপোর পেটা-ঘড়িতে।

ছুঁচে সুতো পরিয়ে লখিয়া আড় চোখে চেয়ে দেখে, তখনও দাঁড়িয়ে আছে ঠায় লোকটি তার দিকে চেয়ে। লোক নয়, যুবক। নওজোয়ান!

অসাবধানে পরান সুতোটা খুলে যায় ছুঁচের মুখ থেকে। বার বার চেষ্টা করে সুতোটা পরাম যায় না আর ছুঁচের মুখে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা লখিয়ার।

নওজোয়ান এগিয়ে আসে। স্মিত মুখ-খানা, দীপ্ত চোখের কৌতুকে। বললে, "কেয়া, বনতা নেহি?"

সাড়া না করে মুখ গুঁজে বৃথা চেষ্টা করে লখিয়া। ছুঁচের চোখ সহস্র যেন।

নওজোয়ান বললে, "দিজিয়ে, হম্ বনয়াগ! আঁখ পর আঁখ রাখ কী! সুঁই—"

কথা শেষ হল না। সুতো-পরান ছুঁচটা তুলে ধরে হাত ঘুরলে লখিয়া বাঈ।

নওজোয়ান বুঝি অপ্রস্তুত বোধ করলে।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে মোজা সেলাই করতে লাগল লখিয়া। এক ঝলক বাতাস উঠে টার্গেট-প্র্যাকটিসের মাঠটায়, ধুলোর ঘূর্ণি উঠল। তোতার ঝাঁক উড়ে চলে গেল আর কোনখানে।

তারপর অনেকক্ষণ আর্টিলারি-ডিপো ও রেকর্ড-অফিসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে নীরবতাটা নিদাঘশান্ত, রাত্রিগভীর মনে হয়। লখিয়া একমনে হাতের মোজা রিপু করছে আর নওজোয়ান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, কোন্ আগ্রহে কে জানে।

অন্যদিন বুধন থাকলে কাজ করতে করতেও গল্প করে লখিয়া। হাত মুখ দুই চলে তার। অসুবিধা হয় না, বরং ভালই হয় কাজ। বুধনের যেমন গল্পের শেষ থাকে না, লখিয়ারও তেমনি হাত চলার বিরাম থাকে না।

কে জানে কতক্ষণ নওজোয়ান অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তার কাজের তদারক করবে! কী চায় ও? আলাপ! তার সঙ্গে?

মনে পড়ছে লখিয়া বাঈএর এমনি আলাপের কথা। ডিপো-অফিস তখন জমজমাট। কত সৈনা আসত যেত, কত কত মুল্লুক থেকে। কত বিচিত্র তাদের বেশ, তাদের পদভরে মেদিনী কাঁপত অষ্ট-প্রহর আর্টিলারী ডিপো অফিসের আর সেদিন নেই। ইংরেজ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসংখ্যা কত কমে গেল ছাউনিতে—কত ব্যারাক খালি পড়ে রইল।

কত সাল হয়ে গিয়েছে, ঐ তোতার ঝাঁকের মত কোথায় তারা চলে গিয়েছে। লখিয়া শুনেছে দপ্তরখানা এখান থেকে নাকি উঠে যাবে। আর কোথাও ছাউনি হবে, এ-রাজ্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে।

তখন ছেঁড়া মোজা রিপু করত না লখিয়া। কী করত, বুঝি ভুলে গিয়েছে আজ। সন্ধ্যে হলে সদরবাজার থেকে সাজগোজ করে লখিয়া এদিকে চলে আসত রোজ। আর্টিলারি ডিপো-অফিসের গেটের পাহারাদার খট করে স্যালুট দিয়ে সরে দাঁড়াত। লখিয়াবাঈ মলমল-দোপাট্টার ভাঁজ খুলে আলতো মাথার উপর চাপিয়ে বেণী দুলিয়ে সামনে এগিয়ে যেত। কোন্ ব্যারাক তার লক্ষ্য, সে-ই জানে। আর্টিলারি-ডিপোর সব সান্ত্রীই সেদিন লখিয়াকে চিনে রেখেছিল। হুকুমদারের হুমকি দিত না কেউ! ভুলেও। যৌবনমদে মত্তা লখিয়া-বাঈকে পয়চান করবে না কে? ডিপো-অফিসের কর্তা তখন ক্যাপ্টেন গ্রাহাম, দোর্দণ্ডপ্রতাপ!

সে রামও নেই, সে রাজত্বও নেই। ডিপো-অফিসেরই বা কী হাল হয়েছে। মেহেদির বেড়া কত ফাঁক হয়ে গিয়েছে। যেখানে মাছি ঢুকতে ভয় পেত, সেখানে বেওয়ারিশ গোরু ঢুকছে—কে আসছে, কে যাচ্ছে কেউ খোঁজ রাখছে না! ক্যাপ্টেন গ্রাহামের দিন চলে গিয়েছে, গ্রাহামও ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তপ্ত বাতাস দীর্ঘনিশ্বাসে মিলে গেল। লখিয়াবাঈ চমকে চেয়ে দেখলে। তারও দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে বুঝি!

আর কদিন পরে গাছতলায় বসা যাবে না। উল্টোপাল্টা বাতাস উঠবে, আঁধি-তুফানের দিন শুরু হবে। সারা গরমি-ভোর লখিয়ার হাতে কোন কাজ থাকবে না। ডিপো-অফিস সৈন্যশূন্য হয়ে ঝিমুবে। আবার শুরু-শীত থেকে শেষ বসন্ত পর্যন্ত লখিয়ার হাত চলবে, ছেঁড়া মোজায় রিপু-কর্ম! ভাঙা হাটে লোক মরে—কেনাবেচা হবে। বুধন কাজ সংগ্রহ করে আনবে, কত কাজ চটপট! ডিপো-অফিসে কোন সৈনাই স্থায়ী নয়, আসে যায়! কেউ ছুটির জন্যে, কেউ ছাড়া পাবার জন্যে, কেউ পেন্সনের জন্যে, আবার কেউ রিজার্ভে! রেকর্ড-অফিসে কাগজপত্তর ঠিক করে নিতে হয়—অ্যাকাউণ্টের বাবুরা হিসাব মিটিয়ে দেয়।

বড়জোর দু সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ! তারপর কে কোথায় যাবে, তার ঠিক নেই। দূর থেকে, এই নিমগাছতলা থেকে লখিয়া মোজা রিপু করতে করতে চোখ তুলে দেখে সেই সৈনিকদের। কত বিচিত্র মুখ আর দেহধারী এইসব দেশরক্ষীর দল! রেকর্ড-অফিসে স্বল্প অবস্থানের অবসরে কত আশ্চর্য মনে হয় তাদের। যেন কত ঘরের লোক ওরা। মিলিটারী হুজুরের ভয় নেই।

নওজোয়ান সৈনিক হাসলে। সুতোর গুলিটা তুলে দিয়ে বললে, "উড় যাতা!"

মাথা তুলে লখিয়া বললে, "যানে দেও!"

নওজোয়ান বললে, "কাম কৈসা চলে?"

দাঁত দিয়ে সুতো কেটে, মোজাটা সামনে বাড়িয়ে লখিয়া জিজ্ঞেস করলে, "কিসকা? আপকা হ্যায়?"

নওজোয়ান হেসে বললে, "কৌন সালা? হামারা নেহি!"

লখিয়া মোজাটার মধ্যে হাত পুরে পাঁচ আঙুল ফাঁক করে পরীক্ষা করলে। মিলেছে রিপুটা একেবারে রঙ-এ রঙ।

মোজাসুদ্ধ হাতটা ঘুরিয়ে লখিয়া বললে, "তব! কিসকা?"

নওজোয়ান হাসলে। "হামারা!"

লখিয়া বললে, "দিলল্লাগি!"

নওজোয়ান বললে, "সচ্!"

গম্ভীর হয়ে লখিয়া মোজা জোড়াটা হাঁটুর তলায় ঘাঘরার মধ্যে রেখে দিলে। মাথা নিচু করে রিপু করতে লাগল। যেন কেউ নেই, কথা কইবার অবসর নেই তার।

নওজোয়ান মিটি মিটি চাইতে লাগল। নিমতলার অনেকটা ছায়া রোদ খেয়ে ফেলেছে। কাজ শেষ না হলে ঐ রোদে বসে মেয়েমানুষটা মোজা সেলাই করবে। পায়ে-পরা যত সব ছেঁড়া মোজা মিলিটারীদের। কী দাম ওগুলোর?

নওজোয়ান যেন ঝাঁকিয়ে উঠল, "দেগা কি নেই? হামারা মোজা......মগদ্ হোগিয়া......দেও-ও বাপিস্!"

লখিয়া নির্বিকার। যেন কথা কানেই ওঠে না, মিলিটারী বলে খাতির করে না সে। অনেক মিলিটারী দেখেছে লখিয়া জীবনে। এ ত দেশী, কত অমন লালমুখোকে তাই ভারী ভয় করত লখিয়াবাঈ! ছোকরা চোখ রাঙাচ্ছে, মোজা দাও! ভড়কি দেবে!

আবার হুমকি দিলে নওজোয়ান। কপট।

অনেক কষ্টে যেন মাথা তুললে লখিয়া, "আঁখ দেখাতা কাহে? তুমসে লিয়া হায়? ঠিক টাইমসে মিল্ যায়েগী! যাও—"

কথাটা ঠিক, কার মোজা কে নিয়েছে

কাকে দিয়ে শেষে গুনেগার দেবে! উচিত নয় এমনি চড়াও হয়ে হামলা করা।

কিন্তু নওজোয়ান অত সহজে গেল না। খানিক অন্যমনস্ক হয়ে এদিক ওদিক দেখলে।

লখিয়াও বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নিমডালের ফাঁকে রোদের ঝিলমিলিটা চোখের উপর পড়ে ছুঁচের ফোঁড়ে বিভ্রম ঘটাচ্ছিল। মাথা নেড়ে নেড়ে হাতের সেলাইএর উপর থেকে রোদ সরাতে চেষ্টা করে লখিয়া।

হঠাৎ চিলের মত ছোঁ মেরে লখিয়ার গায়ের উপর পড়ে হাঁটুর তলা থেকে মোজা-জোড়াটা বার করে নিলে নওজোয়ান।

সামলে নিয়ে লখিয়াবাঈ গর্জন করে উঠল, "সরম নেহি বেকুফ! উল্লু—"

দূরে থেকে দশটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে নওজোয়ান ছুটে পালাল। তার মোজা তাকে ফিরিয়ে দেবে না কেন। বললেই অমনি হল! তুই নিজে পরবি নাকি?

রেগে পয়সাগুলো নওজোয়ানের পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে লখিয়া বললে, "চোর! ডাকু! উল্লু!"

গাছতলায় বসে তারপর খানিক নিজের মনে কাঁদলে লখিয়া। মিলিটারীটা তাকে অপমান করেছে, গায়ে হাত দিয়ে ঘাঘরা টেনেছে। আজ নালিশ জানাবার কেউ নেই লখিয়ার এই আর্টিলারি-ডিপো ও রেকর্ড-অফিসে। মোজা সেলাই করে যে পেট চালায়, তার কথার সত্যতা বিশ্বাস করবে না কেউ। উঞ্ছবৃত্তি করা, সদর বাজারের অজ্ঞাতকুলশীলা লখিয়া!

বেলাশেষে বুধন এসে দেখলে তখনও অনেক জোড়া মোজা পড়ে আছে। লখিয়া কেমন গুম হয়ে বসে আছে।

বুধন জিজ্ঞেস করলে, "তবিয়ত আচ্ছা নেহি?"

লখিয়া উত্তর দিলে না।

"বহুত কাম পড়া রহা হ্যায়! কেয়া বাত্?" বুধন সচেষ্ট করতে চেষ্টা করলে।

তবু লখিয়া নিরুত্তর।

এ-ব্যাপারে বুধনের দায়িত্বই বেশী। তাড়া দিয়ে বললে, "বহুতে জরুরী কাম থা! মিলিটারী লোক চলা যায়েগা—"

অস্ফুটে লখিয়া বললে, "যানে দেও।"

"রপু নেই হোগা? তুমনে কহা, ফির কেয়া বাত্?"

ঝাঁপিয়ে উঠল লখিয়া, "নকরানী নেহি, ঢাই আনেমে খত নেহি লিখে—লে যাও মোজা, হাটাও!"

দু হাতে মোজাগুলো জড় করে বুধনের দিকে ছুঁড়ে দিলে লখিয়া। রিপুর কাজ সে আর করবে না, তার খুশি।

আর্টিলারি-ডিপোর ব্যারাকের হেড্ ঝাড়ুদার অবাক হয়ে লখিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল। পেট চলে না যায়, তার আবার রোয়াব দেখ না। কী আছে তোর, কী দিয়ে চালাবি এই বাজারে?

বুধন কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলে, "কী করবি?"

লখিয়া বললে, "ভিখ্ মাঙব।"

বুধন মাথা নাড়লে, "ও ত তোর যোগাই! বুড়ি রেন্ডী কাঁহাকা!"

লখিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল, "খবরদার!"

মোজাগুলো সংগ্রহ করে বুধন উঠে গেল। এইবার মাগী মরবে। বুড়ো বয়েসে ভিমরতি! খেতে পাচ্ছিল না, কাজটা বলে-কয়ে সে জোগাড় করে দিয়েছিল, বেশ কামাচ্ছিলও—এখন আবার রঙ্গ ধরেছে!

ব্যারাকের দিকে যেতে যেতে নিজের মনে বুধন হাসলে, এখানে কি মেয়েমানুষের অভাব মিলিটারী বাবুদের? কত চাই। বুধন এনে দেবে। তা বলে ঐ শুকনো মড়া—আরে ছো-ছো!

মর মাগী, ভিখ্ মেগে খা হাটে-বাজারে—লাথি-ঝাঁটা খা! বুড়িয়া!

না, ভিখ মাঙতে বেরয়নি হাটে-বাজারে লখিয়া। পরের দিন আবার তেমনি এসে নিমগাছতলায় সেলাইএর সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। মিলিটারীদের পায়ে দেওয়া ছেঁড়া-কাটা মোজা রিপু করছে। মাথা নিচু করে, নিবিষ্ট মনে।

অদূরে বসে হেড-ঝাড়ুদার বুধন বিড়ি ফুঁকছে, আর ফুট কাটছে। লখিয়ার মেজাজটা সে আজও বুঝতে পারল না। বেশ কাজ করে, করছেও, মধ্যেখান থেকে কী হয়, বেঁকে বসে। কাজ নিয়ে বুধন আতান্তরে পড়ে।

বুধন জিজ্ঞেস করলে, "কাল তোর হঠাৎ কী হয়েছিল, অমনি ভিখ্ মাঙবি বলছিলি?"

লখিয়া উত্তর দিলে না। কালকের কথা আবার আজকে তোলা কেন। কাল কাল!

বুধন বললে, "তোর দুঃখটা কী? মাঝে মাঝে তুই যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাস লখিয়া!"

কালকের কথা শুনতে চায় না লখিয়া আর। যেমন বুদ্ধি ঝাড়ুদারটার, তার দুঃখের খবর জানতে চায়। কী তার পেয়ারের লোক রে। কাজ যোগাড় করে দেয় বলে মাথা কিনে রেখেছে।

দাঁত দিয়ে সুতো কেটে চোখ তুলে লখিয়া বললে, "আমার দুঃখের তুই কি বুঝিবি রে বুড়ো ডেকরা।"

বুধন মাথা নেড়ে গা দুলিয়ে হেসে বললে, "বুঝিরে বুঝি! বলেই দেখ্ না—কী দুঃখ তোর!"

লখিয়া বললে, "তোকে বলি, আর তাই নিয়ে তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া কর!" —

বড় পেয়ার করত মিলিটারী লোকরা লখিয়াকে

বুধন অবাক হয়ে বললে, "তোর দুঃখু নিয়ে আমি ঝগড়া করব? এ কেয়া বাত্!"

কথা ঘুরতে লখিয়া বললে, "কুছ্ নেহি, ছোড়্ দো! আজ কাম থোড়া হ্যায়—দু'চার আউর লে আও।"

মোটা বুদ্ধি হলেও এটুকু বুঝি বুঝতে পারে বুধন। কেবল কাজের সঙ্গেই সম্পর্ক তার। আজ নেহাত দায়ে পড়েছে, তাই লখিয়া তার কথায় কিছু কান দিচ্ছে। আর্টিলারি ডিপো-অফিসে সে কম দিন কাজ করছে না, অনেক দেখেছে এখানে মিলিটারী লোকদের কাজ-কারবার—অনেক অনেক লখিয়াকেও তার দেখা আছে। সব জানে, সব বোঝে বুধন। মাথার চুল তার সাদা হয়ে গিয়েছে ডিপো-অফিসের ব্যারাক ঝাট দিতে দিতে। তার হাত দিয়ে অনেক ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদারনী বহাল হয়েছে, বরখাস্ত হয়েছে। দুঃখু বোঝে না সে?

নোকরানী!

সদরবাজার থেকে একদিন মা-মরা মেয়েটাকে বুধনই সঙ্গে করে এনেছিল ডিপো-অফিসে মিলিটারীদের পায়ের ধুলো ঝাড়বে বলে। বিশ সাল হয়ে গিয়েছে, এতটুকু মেয়ে, ঘাঘরা-পরা, শুয়োরের ল্যাজের মত ছোট্ট বিনুনি মাথায়, রুক্ষ চুল বাদামী! বুধনের পিছন-পিছন ঘুরত, চাচাজী চাচাজী বলে, ছাগল-ছানার মত চেঁচাত! পুচকে ছানা, হাতের ঝাড়ুর ভারে নড়তে পারত না।

এক সাল দুই সালেই ফনফনে হয়ে উঠল 'বিটিয়া'। আওরাৎ! চাচাজীকেই খোঁজ করে বাসায় নিয়ে যেতে হয়। এই দেখ, এই নেই, কাজ করতে এসে ব্যারাকের কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় লখিয়া—কার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে!

আধার খুঁটে খেতে শিখে চিড়িয়া আর মানত না বুধনকে। ফুড়ুক-ফুড়ুক করে উড়ে বেড়াত এ-ডালে ও-ডালে, এ-গাছে সে-গাছে। বড় পেয়ার করত মিলিটারী লোকরা লখিয়াকে।

স্বজাতের ছেলে দেখে বিয়ে দিতে চেয়েছিল বুধন লখিয়ার। অভিভাবকগিরি ফলাতে চেয়েছিল। লখিয়া রাজী হয়নি, সাদি? উঁহু!

স্বজন-বন্ধুর গালমন্দ শুনে সদরবাজার ছেড়ে চকবাজারে উঠে গিয়েছিল লখিয়া। বুধন বদলি হয়ে গিয়েছিল রিমাউণ্টের ডিপোয় তিন মাইল দূরে! লখিয়ারই কাজ।

আর্টিলারি-ডিপোর কর্তাই তখন লখিয়ার মুঠোর মধ্যে। চকবাজারে ঘন-ঘন তার যাওয়া-আসা। ঝাড়ু ধরে না লখিয়া আর। গ্রাহাম এল, গ্রীন এল, বুকলেস্ এল—সবাই মজল। দিশী-বিলিতী সমান! লখিয়ার কাজ হল সেজে থাকা।

সেই লখিয়া! যুদ্ধের বাজারে কী না করেছে মিলিটারীগুলোর সঙ্গে। হন্যে হয়ে গিয়েছিল সব। জাত-বেজাত, দিনরাত খেয়াল ছিল না। ছাউনি সরগরম। গ্রাহ্যই করত না লখিয়া, চিনত না পুরনো স্বজন-বন্ধুদের। মাটিতে পা পড়ত না দেমাকে। ঠমক কত! তোর 'দুঃখু' বুঝবে কেন বুধন? হা রে দুনিয়া!

বুধন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, "আর কাজ নেই। ঐ-ই শেষ।"

রাগটা ধরতে পারে লখিয়া। বললে, "আর নেই! সচ্?"

তেমনি রাগতভাবে বুধন বললে, "ঝুটা বাত বলি না।"

না ত না। কাজের অভাব হবে না, আজ নেই কাল হবে। আবার কোন্ মুল্লুক থেকে এক ঝাঁক মিলিটারী এসে পড়বে তার ঠিক কী। রেকর্ড-অফিসে একদিন না একদিন তাদের আসতেই হবে কাগজ-পত্তর ঠিক করতে—রঙরুটই হও, আর ছাটাই-ই হও। আর্টিলারি ডিপো ও রেকর্ড অফিসের ঘাস-জল খেতেই হবে। ছেঁড়া মোজা লখিয়াকে দিয়ে রিপু করিয়ে নিতে হবে।

খানিক চুপ করে বসে থেকে বুধন বললে, "এ-অফিস উঠে যাচ্ছে, ডিপো বন্ধ হয়ে যাবে!"

দাঁত দিয়ে সুতোটা কাটতে গিয়ে লখিয়া থেমে গেল, ঘাড় কাত করে আড়-চোখে চেয়ে বললে, "কে বললে?"

গম্ভীর হয়ে বুধন বললে, "বিগডার সাহেব।"

লখিয়া অবিশ্বাসের সুরে বললে, "তুই শুনলি কী করে? তোকে বলেছে? তোর সঙ্গে পরামর্শ করেছে?"

রেগে গেল বুধন, চড়া সুরে বললে, "করেছেই ত! তোর মত!"

ছুঁচের মুখে সুতো পরিয়ে লখিয়া একটা নিঃশ্বাস টানলে দীর্ঘ করে। [illegible] মত! অতি নগণ্য সে আজ! মিলিটারীদের পায়ের মোজা সেলাই করে জীবিকা [illegible]

করে। হেড ঝাড়ুদার বুধন তার চেয়ে অনেক দরের লোক আজ। কর্তাব্যক্তিদের সলাপরামর্শ তার কানে আসে।

চোখের সামনেটা কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। ধুলোর ঝড় উঠেছে বুঝি, তোতার ঝাঁক ভয়ে চেঁচাচ্ছে! আকাশ-ভরা রোদ ঘোলাটে।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব! কী নাম? মনে পড়ছে না লখিয়ার। এ-জীবনে অনেক দেখেছে, যৌবনে অনেক দিয়েছে। সেদিন সামান্য মুখের কথায় হয়কে নয় করেছে লখিয়া! ঐ বুধন ঝাড়ুদার জানে না সে-কথা?

আজ ছুঁচ ঠেলে ঠেলে হাতের আঙুল দড়ি হয়ে গিয়েছে, দাগড়া দাগড়া হয়ে শিরা ফুলে উঠেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

লখিয়া বললে, "কোথায় যাচ্ছে উঠে?"

গম্ভীর মুখে বুধন বললে, "অনেক দূর! আর এক দেশ—"

লখিয়া চুপ করে মোজা সেলাই করতে লাগল। গত দশ বছরে অমন অনেকবার অফিস উঠবার কথা হয়েছে, আজও ওঠেনি। ঠিক তেমনি না চললেও তার পেট চলার মত চলে যাচ্ছে আজ পাঁচ বছর! যেখানেই যাক, মিলিটারী লোক যাবার আগে ছেঁড়া মোজা রিপু করিয়ে নিতে ভুলবে না। সরকার থেকে আর মাগনা পোশাক মেলে না। গাঁটের পয়সা খরচ করে সাজ কিনতে হয়। পাঁচ টাকা ভাতায় বছরে আর পাঁচ জোড়া মোজা কিনতে হয় না!

বুধন বললে, "বড় মুশকিল হবে, দেশ-ঘর ছেড়ে আমরা কোথায় যাব! নোকরি ছাড়তে হবে এবার!"

বাঁকা সুরে লখিয়া বললে, "কেন, উন্নতি হবে! জাঁদরেল সাহেবের খাস চাপরাশী হবি!"

বুধন ফুৎকার দিলে, "স্বর্গে গেলেও বুধনকে সেই ঝাড়ু ঠেলতে হবে! বুড়ো-হাবড়ার আবার উন্নতি! রেখে দে!"

হঠাৎ টার্গেট-প্র্যাকটিসের মাঠ থেকে ধুলোর ঘূর্ণি গোঁ-গোঁ করতে করতে ছুটে এল, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ডিপো-অফিসের ব্যারাকগুলো চষে ফেললে। ষাঁড়ের লড়াই যেন!

লখিয়া মোজাগুলো আঁকড়ে ধরে মাটিতে মুখ গুঁজে রইল। তুফান চলে গেল।

ধুলো ঝেড়ে উঠে দেখলে লখিয়া, বুধন বুড়ো পালিয়েছে ঝড়ের মধ্যে! তোতার সবুজ পালক খসে পড়েছে অনেকগুলো নিমতলায়।

হাত বাড়াতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলে লখিয়া। মুখোমুখি এক জোড়া পা কখন এগিয়ে এসেছে। মিলিটারী!

"তুম?" লখিয়া চোখে [illegible] করলে।

হেসে নওজোয়ান তোতার পালক বাড়িয়ে ধরে বললে, "লেও,—আউর—"

কালকের পয়সাটাও বাড়িয়ে ধরলে।

লখিয়া উত্তর করলে না। নওজোয়ান পাশে এসে বসল।

তারপর কতদিন বুধন এসে দেখেছে, লখিয়া মোজা রিপু করছে আর নওজোয়ান মিলিটারীটা নিমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বকর বকর করছে। নাকি গল্প কত দেশ-বিদেশের! বুড়িয়া লখিয়া তন্ময়!

খাঁ-খাঁ রোদ্দুরেও ঐ এক ভাব। বড় নেওটা হয়ে পড়েছে নওজোয়ান মিলিটারীটা! মুখে কিছু বলতে পারে না, গা জ্বালা করে বুধনের। বুড়ো বয়েসে কীর্তি করবে লখিয়া! দুধের বাচ্চার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি রাতদিন! মার বয়েসী তুই, সে-খেয়াল আছে রে মাগী!

ছুঁচের মুখে সুতো পরিয়ে মাথা নেড়ে লখিয়া বললে, "কোথায় বললে তোমার দেশ? মাদ্রাজ! অনেক দূর?"

নওজোয়ান হাসলে, "অ-নে-ক দূ-র্-র্! যাবে সেখানে?"

অকারণে লখিয়া লজ্জা পেলে। চুপ করে সেলাই করতে লাগল অন্যমনে।

নওজোয়ান বললে "খুব ভাল দেশ আছে, এরকম নয়—এত গরমি নয়!"

তেমন গরম এখনও পড়েনি, এতেই এত! লখিয়া চোখ তুলে বললে, "খুব ঠাণ্ডি বুঝি তোমার দেশ? বরফকা মাফিক?"

অপ্রস্তুত নওজোয়ান বললে, "তা বলে, তোমার দেশের মত নয়!"

লখিয়া কপট রাগ করে বললে, "তবে আমার দেশে আস কেন তোমরা?"

হেসে নওজোয়ান বললে, "তোমরা রাগ করবে বলে।"

মাথা নেড়ে লখিয়া বললে, "এস না তোমরা তা হলে!"

আরও অনেক কথা, যে-কথার মানে হয় না; আর অনেক আলাপ, যে-আলাপের কোন সূত্র নেই। পরস্পরের পরিচয় অনেক আগেই নেওয়া হয়ে যায়। লখিয়া যেন নতুন করে আস্বাদ পায় জীবনের আর একবার। এত বলবার মত গল্প যে ছিল, গত দশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে লখিয়া ভাবতে পারেনি।

শহরের ছাউনি, পথ-ঘাট হঠাৎ সেদিন রাতারাতি যেন বদলে গিয়েছিল। সদর-বাজার, চকবাজারের রাস্তাটা কেমন নির্জন হয়ে গেল। ব্রিটিশের সঙ্গে মিলিটারীরাও যেন কোথায় চলে গেল। যাবার আগে ক'টা টাকা বকশিশ করেছিল বুঝি বুকলেশ। বলেছিল, তোমার জাত-ভাই আসছে। এবার-ত মজা! বাই-বাই!

কী মজার কথা ভেবে বলেছিল কম্যাণ্ডার

সাহেব, সে-ই জানে; তারপর দিন বড় খারাপ পড়েছিল লখিয়ার। চকবাজারে মিলিটারী আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সদরবাজারে হামলা করত মিলিটারী পুলিশ হামেশা। ছাউনির পিছনের গলিতে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল—জংলা গাছ-গাছালিতে ভরে গিয়েছিল রাস্তাটা। সে বড় দুর্দিন গিয়েছে লখিয়ার, যা ছিল একে একে সব শেষ পেটের দায়ে। তারপর একদিন চকবাজার ছেড়ে পুরনো সদরবাজারে ফিরে এল লখিয়া। বুঝি যৌবনও চলে গিয়েছে। দুঃখের ঘর সে করবে না। আবার দিন ফিরে আসার কথা লখিয়া ভেবেছিল কি না কে জানে, আবার যৌবন?

পরন্তু একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, আজ দিনটা বড় মিষ্টি। সব ফুল শেষ হয়নি, নিমফুলের গন্ধে নেশা আছে। টার্গেট প্র্যাকটিসের মাঠে ধুলো মরে গিয়েছে। ধুলো-বালিতে যেন সর পড়েছে।

দশটা বাজল, এগারটা বাজল। বারটাও বুঝি বাজবে এখনি। রোদ চড়-চড় করছে, নিমের ডালে কাঁপন শেষ হয়ে গিয়েছে। স্থির বিচ্ছুরণ! লখিয়া কয়েকবার বসবার স্থান পরিবর্তন করলে। সামনে ব্যারাকে অবস্থা, খাঁ খাঁ!

বুকটা হু-হু করে উঠল লখিয়ার। কোনো জনমানিষ্যি দেখা যাচ্ছে না। সেই আগের বছর আগে এমনি খাঁ-খাঁ মনে হয়েছিল এক-দিন আর্টিলারি-ডিপো ও রেকর্ড-অফিস। মিলিটারিরা সব চলে যাচ্ছে, ডিপো-অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। আর নাকি এখানে ছাউনির দরকার নেই।

আজ তা হলে সে আসবে না! আসবার হলে এতক্ষণ কখন আসত। লখিয়া কাজে বসবার আগেই এসে সামনে দাঁড়াত। লখিয়া না দেখার ভান করলে, চুপ করে দাঁড়িয়ে বুটের ডগায় মাটি খুঁড়ত। এমন করত জায়গাটা, যেন একটা বন্যপশুকে বেঁধে রাখা হয়েছে খোঁয়াড়ে। মাটি চষে ফেলেছে অস্থিরতায়!

তারপর থেকে বুধন আর আসে না। কাছে বসে না, গল্প করে না, মিলিটারিদের ছেঁড়া মোজাও আর সংগ্রহ করে আনে না। অল্প স্বল্প কাজ যা ঐ নওজোয়ান এখন এনে দেয়। ক্ষোভ নেই লখিয়ার। অচল ত নয়। বুধনের রাগের সে কী ধার ধারে। মনে করে, সে না সাহায্য করলে আর কাজ জোগাড় হবে না! বুড়ো ঝাড়ুদারের স্পর্ধা দেখ না।

একদিন ঝগড়াও করেছে বুধন সদর-বাজারে। আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছে লখিয়া, "যা যা, তোর মদতকে কেয়ার করি না। ছেঁড়া মোজায় লখিয়া আর তালি দেবে না!"

বুধন বলেছিল, "তোর কী আছে যে করে খাবি?"

লখিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিল, "যাই থাক না, তোর সে-খবরে দরকার কী!"

"আছে বৈকি! চেহারাটা দেখে নিস আর্শিতে! কী ভস্‌বির রে! মরে জন্মে আয় একবার!"

ধুলো-মুঠো ছুঁড়ে দিয়ে দরজায় খিল দিয়ে সারারাত কেঁদেছিল লখিয়া। বুধন যা বললে, তা কি সত্যি? কিচ্ছু নেই আর লখিয়া বাঈএর? যৌবন শেষ!

বার বার ব্যারাকটার দিকে চেয়ে দেখল লখিয়া! বারটার ঘণ্টায় চমকে উঠল ডিপো-অফিসের প্রাঙ্গণ। সে আজ আর এল না।

মোজা রিপুই করতে হবে লখিয়াকে চিরকাল। আর যারা আসবে, আবার যারা আসবে, তাদের পায়ের ছেঁড়া মোজা জোড়া লাগাতে হবে। 'চাই আনা' মজুরিই তার প্রাপ্য কেবল। মুখের কথায় পথ-চাওয়া বৃথা! কী লাভ?

পড়-পড় বেলায় নেকড়া-বাঁধা পোড়া রুটির নাস্‌তা করলে লখিয়া। বুভুক্ষু কুকুরীর শুকতলা চিবোন যেন। লোটার জলে গলা ভিজিয়ে নিলে লখিয়া।

তারপর সূর্য যখন মিলিটারি ব্যারাক-গুলির টালির ছাদের ওপারে নেমে গেল, ছায়া নামল টার্গেট-প্র্যাকটিসের মাঠে দীর্ঘ হয়ে, তখন যেন বিশেষ উৎকর্ণ হয়ে উঠল লখিয়া! আড় চোখে আর একবার দেখে নিলে চারদিক, কেমন স্তব্ধ চরাচর। নিমফল খেয়ে তোতারা উড়ে গেছে, নিমফুলের গন্ধ আর উঠছে না।

বুকের কাঁচুলি আলগা করে এক জোড়া মোজা বার করলে লখিয়া। নীল পশমের মোজা, বুকের তাপে নরম! গাঢ় করে ঘ্রাণ নিলে মোজাজোড়াটার লখিয়া।

না, খুঁত নেই কোন বোনার। কলের মত নিখুঁত হয়েছে হাতে বোনা! এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ছায়া-ছায়া আলোয় পরীক্ষা করে দেখলে লখিয়া মোজাজোড়াটা। ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠল লখিয়া। সে বুঝি এসেছে! আসছে।

তাড়াতাড়ি হাঁটুর তলায় ঘাঘরার মধ্যে মোজাজোড়াটা লুকিয়ে ফেললে লখিয়া।

বুধন দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টিটা কেমন উদগ্র যেন।

লখিয়া সাড়া করলে না, মাথা নিচু করে সেলাইএর সরঞ্জাম গোছাতে লাগল। এবার উঠবে।

নিষ্ঠুর পরিহাসের মত খবরটা শোনালে বুধন, আর্টিলারি-ডিপোর হেড ঝাড়ুদার। মিলিটারি লোক সব আজ ভোরে চলে গিয়েছে, রেকর্ড-অফিস শিগগির উঠে যাবে। এখানে আর কিছু থাকবে না। মিলিটারির নামগন্ধও না।

লখিয়া কোন উত্তর করলে না।

বুধন খ্যাক্‌-খ্যাক্‌ করে হেসে বললে, "নিয়ে নে মোজাগুলো, তোর লাভ!"

লখিয়া কিছু বললে না।

একটু বুঝি মনে মনে ব্যথা বোধ করে বুধন। বৃথা পরিশ্রম হল মেয়েমানুষটার। বললে, "আমায় দে, পুরনো বাজারে বেচে দেব, যা পাওয়া যায়!"

লখিয়া মাথা নাড়লে। না। বুধনের কথায় তার বিশ্বাস হয় না। তার নতুন বন্ধুত্ব ওর সহ্য হচ্ছে না, লখিয়া জানে।

খানিক চুপ করে থেকে শাণিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক সন্ধান করে বুধন জিজ্ঞেস করলে, "চট করে কী যেন লুকিয়ে ফেললি ওখানে।"

গম্ভীরভাবে লখিয়া বললে "কিছু না।"

কাছে এসে হেসে বুধন বললে, "আমার সঙ্গে দিল্‌লাগি করছিস্‌ তুই! আমি তোর কী করেছি মাইরি?"

কড়া সুরে লখিয়া বললে, "ভাগ, জ্বালাতন করিস না বলছি!"

বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ ছোঁ মেরে মোজা-জোড়াটা বার করে নিয়ে চোখের উপর ঘুরিয়ে বুধন বললে, "বাঃ, বেশ মোজা ত। বুনেছিস খাসা মোজাটা! আমাকে দে, দরে বিক্রী করে দেব!"

কাড়তে হাত বাড়ালে লখিয়া। বুধন সরে গেল। লখিয়া গালাগাল দিলে।

নীল পশমের মোজাটা নেড়ে-চেড়ে বুধন বললে, "আরে আবার আংরেজী যে, লাল হরফ। বাঃ বাঃ বেশ!"

লখিয়া মিনতি করলে, "আমায় দিয়ে দে বুধন, তোর পায়ে পড়ি।"

বুধন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ইংরেজী অক্ষর-গুলো পড়তে লাগল। কে-ইউ-এম্‌-এ-আর-এস্‌-ডাবল্‌-এ-এম্‌-আই!

"কার নাম রে? কাকে দিবি!"

লখিয়া পাথর হয়ে যায়, তার দৃষ্টি পড়ে না। এতক্ষণে তার বিশ্বাস হয়, উপহার নেবার লোক তাকে না জানিয়েই চলে গিয়েছে। আম্বালায় কি বাঙ্গালোরে।

অতঃপর সত্যি রেকর্ড-অফিস বন্ধ হয়ে গেলে ছেঁড়া মোজা রিপু করতে আর

দুই বোন। কণিকা ও মণিকা। খুব হাসিখুশি, খুব স্মার্ট, আর খুব চটপটে।

যতীন দাস রোড এলাকায় তাদের খুব খাতির। সহজ আর স্বাভাবিক বলেই শুধু নয়, লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে এতটুকু দেমাক নেই।

ধনী পিতার এই দুই নন্দিনী নিজেদের নিয়েই বিব্রত যদি থাকত, তাহলে তাদের বাধা দিত কে? কিন্তু তারা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিব্রত থাকতে ভালবাসে।

সবই ভালো, কিন্তু চাঁদের মধ্যেও যেমন আবছা ছায়ার চিহ্ন আছে, বড়বোন কণিকার মধ্যেও আছে তেমনি একটা ছায়া। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই তাকে বিয়েতে সম্মত করাতে পারলেন না তার বাবা তার মা। কারণ কিছু বলে না কণিকা, শুধু বলে, ভালো লাগে না।

বড়বোন বিগড়ে আছে, তাকে ডিঙিয়ে ছোটরও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারা যায় না। এ-বিষম সমস্যার কোনো সমাধানই পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতে।

কণিকা বলল মণিকাকে, বাবা-মার হয়তো বিশ্বাস যে আমি কাউকে পছন্দ করে রেখেছি। দূর! পছন্দ করব কাকে? বাবাকে তো বলা যায় না, বাবা যে পুরুষ। পুরুষগুলোকে ঘেন্না লাগে আমার। আই হেট দেম।

কণিকা হেসে-হেসে দুলে-দুলে বলল, এই, এই। এই আমার পেট্—

কণিকার হবি মাত্র একটা। কুকুর পোষা। তার মধ্যে বেড়ালের বাচ্চার মত এই ক্ষুদে পিকিনিজ কুকুরটা তার কাছে তার প্রাণের চেয়ে যেন দামী।

বলে, একে নিয়েই মশগুল থাকব। পুরুষদের চেয়ে এরা অনেক ভালো।

এ-বছর যেমন গরম পড়েছে এমন গরম এর আগে কখনো পড়েনি, এবারের মত কড়া শীতও বুঝি পড়েনি আগে। প্রত্যেক বছরই আমাদের এইরকম মনে হয়। শীত বা গরম সত্যি সত্যি যদি ঐভাবে বাড়তে বাড়তে চলত, তাহলে এ-দেশ এতদিনে মেরু হয়ে যেত কিংবা হয়তো-বা মরু।

কিন্তু এ-দেশ এ-দেশই রয়ে গেছে। আমাদের এত জল্পনা-কল্পনা সত্ত্বেও।

এদেশের আবহাওয়ার এমন আমূল পরিবর্তন ঘটে নি। বাংলার বর্ষা কিংবা বর্ষার বাংলা—এই চেহারাতেই এ-দেশকে দেখতে আমরা শিশুকাল থেকে অভ্যস্ত, এবং আশা করা যায়, জীবনের শেষকাল পর্যন্ত এই চেহারাতেই দেখব।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, শীত বা গ্রীষ্মের কথা এখানে আসছে না, এই বর্ষার বাংলায় সেদিন যেভাবে বর্ষা নেমেছিল, তেমন বৃষ্টি আর কোনো দিন নামেনি।

কুমারী কন্যার এলায়িত এলোচুলের সঙ্গে শ্রাবণের ঘনকালো মেঘের তুলনা কবিরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু, ও-দুয়ের মধ্যে কোনো মিল যেন পাওয়া যায় না। মনে হয়, ভুলক্রমে ও-উপমাটা লেখা হয়ে গেছে, আসলে তুলনা দিতে হবে, মেঘের সঙ্গে না, মেঘের অজস্র ধারার সঙ্গে। ঐ এলোচুলের মত রেখায় রেখায় নেমে আসে জল—জলের ধারা; ওর সহস্র ধারা একত্র হয়ে নামে বৃষ্টি। আর সেই সহস্র রেখা এলায়িত হলেই কি হয়ে ওঠে না সেই কন্যাটির এলোচুলের বন্যা?

তর্কে কোনো লাভ নেই। তর্ক করতে কণিকাও চায় না। কিন্তু, আকাশে মেঘ

দেখেই সে বুঝেছিল বৃষ্টি নামবে, তবুও কেন পথে নামা হল এই তার প্রশ্ন। পথে নেমে ভালো হল কি মন্দ হল—সে তর্ক এখন থাক, আগে ঐ প্রশ্নটার জবাব দিক অরবিন্দ।

কিন্তু অরবিন্দ জবাব দিতে রাজি না। জবুথবু হয়ে সে এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। শুধু মনে-মনে ভাবে এ তো বেশ, এ তো মন্দ না, এ তো ভারি মজা।

ছোট্ট সংকীর্ণ একটা অস্থায়ী শেড। ইঁটের উপর ইঁট রেখে এক মানুষ উঁচু তিনটি প্রাচীরের মতন করা, উপরে করগেটের টিন ফেলা। মেঝের উপর স্তূপ করে ঢালা চুন আর সিমেণ্টের কয়েকটা বস্তা; ওপাশে এক চাপ বালি, কিছু শুরকি, নারকেল দাঁড়ির আঁড়িল; আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে চুনকাম করার জন্যে পাট দিয়ে তৈরি মোটা ব্রাশ।

বাড়ি উঠছে পাশেই। এ-আয়োজন সেই বাড়ির জন্যেই। আকাশে মেঘের ঘটা দেখে মিস্ত্রীরা কাছে-ভিতে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু অরবিন্দ আর কণিকার মাথা গুঁজবার আর কোনো আশ্রয় হল না, তারা এসে এইখানে শেডের নীচে দাঁড়াল। হয়তো ভেবেছিল, একপশলা বৃষ্টি হয়েই এক্ষুনি থেমে যাবে বর্ষণ। অথচ কে জানত, এ-বৃষ্টি অত শিগগির থামবার নয়। যেভাবে আজ এ-বৃষ্টি নামল, তেমন বৃষ্টি এর আগে আর কোনো দিন নামেনি।

সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর এপারে বড় বড় ইমারতের মিছিল, ওপারে বড় বড় গাছের প্রসেশন। বৃষ্টির দাপটে উন্মাদ আর দিশেহারা হয়ে উঠেছে ওই গাছেরা, আকাশের গায়ে আকুলভাবে মাথা কুটছে আর পায়ের নীচের মাটির বাঁধন ছিঁড়ে মুক্তি পাবার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিপুল আগ্রহে যে-মাটি ওদের চেপে ধরে আছে, তার কবল থেকে ওরা মুক্ত হতে পারবে, এমন সাধ্য কি।

হুংকার দিয়ে উঠছে বাজ। আগুনের তীর ছুটোছুটি করছে আকাশময়। চৌচির হয়ে যাচ্ছে মেঘের চাপ। নতুন উদ্যমে নামছে বৃষ্টি। আগুনের তীর যতই চারদিকে ছুটোছুটি করছে, বাতাসও ততই ফুঁসে দিয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

রাস্তা জলে থৈ-থৈ। রাস্তার ওপারে লেকের জলে বৃষ্টির ধারাপাতে মনে হচ্ছে, লেক যেন টগবগ করে ফুটছে।

কণিকা বলল, এ কী করলেন আপনি?

অরবিন্দ ঢোক গেলার চেষ্টা করে বলল, কিছু না, চুপ।

সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, মাথায় করগেটের টিন ঠেকছে, পা রাখার জায়গা নেই, চুনের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে পা।

বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই সেই আলোয় কণিকা অরবিন্দের চোখের চাউনিটা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দেখতে পেল না। চোখ নামাতেই দেখতে পেল, দুটি ক্ষুদে-ক্ষুদে চোখ জুলজুল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

তার গায়ে হাত বুলিয়ে কণিকা আদর করে বলল, রাজা!

বুকের গরমে বেশ আরামেই আছে সে, এই ডাক শুনে সে আবার জুলজুল করে তাকাল কণিকার মুখের দিকে।

কণিকার গা যেন শিউরে উঠল। কী কাণ্ড হল আজ! রাজা আজ সব দেখেছে, সব দেখেছে। নিজের হাতই বুঝি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে ইচ্ছে হল কণিকার।

অরবিন্দ রাজার গলার চেনটা হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, এটাকে নামিয়ে দিলে হয় না?

কণিকা উত্তর দিল না। নিজের পায়ের দিকে তাকাল। কোথায় নামিয়ে দেওয়া হবে এটাকে। পায়ের নীচে তো কেবল চুন-বালি আর শুরকি। দুটো পা রাখারই জায়গা নেই যেখানে, সেখানে চারটে পা রেখে দাঁড়ানো বুঝি খুব সুবিধে।

তর্কের মধ্যে যেতে চায় না অরবিন্দ, কিন্তু ভাবতে তার ভারি আরাম লাগছে, কী ভয়ংকর আশীর্বাদের মত আজ এসেছে এই বৃষ্টিটা।

অরবিন্দ বলল, এ-বৃষ্টি না থামলে বেশ হয়।

ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছে কণিকার। পুরুষদের বিশ্বাস যে করতে নেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে এই লোকটা। কোথাকার কে একটা মানুষ, তার এত বড় স্পর্ধা। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কণিকা।

কড়কড় শব্দে ডেকে উঠল বাজ, মুখের রূঢ়তা মুখেই মিলিয়ে গেল কণিকার, চমকে উঠল সে। অরবিন্দ তার হাতটা চেপে ধরে বলল, ভয় নেই।

চুনের মধ্যে গেঁথে গেছে পা, সরে দাঁড়ানো গেল না, কণিকা একটু হেলে দাঁড়াতেই অরবিন্দ তার শরীরটা নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে নিশ্বাস ফেলল, বলল, বড় ভীতু আপনি। যে-বাজের শব্দ মানুষ শুনতে পায়, সে-বাজে কোনো ভয় নেই।

—তার মানে?

—মানে? কণিকার কাঁধের উপর চাপ দিয়ে অরবিন্দ বলল, শব্দ শোনার আগেই যে মানুষ অক্কা পায়। শব্দ যখন শুনতে পেলাম, তখনই বুঝলাম, বাজটা মাথায় পড়েনি।

—কিন্তু। কণিকা বলল, বজ্রাঘাত হওয়াই বুঝি ভালো ছিল। যা করলেন আজ আপনি আমাকে!

চমকে উঠতে গিয়েই থমকে গেল অরবিন্দ। ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হল কাছে-ভিতেই কোথাও, তার তীব্র আলোর ছটা ছিটে এসে পড়ল কণিকার মুখে, মুখটা ঝলসেই গেল বুঝি। অরবিন্দ তার মুখের উপর হাত বুলিয়ে বলল, ভয় নেই।

গায়ে-গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে রইল দুজন। যেন, দুজন বহুকালের চেনা ও চিরকালের আত্মীয়। কিন্তু এদের চেনা-জানা এই তো মাত্র সেদিনের। এবং সে পরিচয় নির্বাধ নয়, ভদ্রতার আর সৌজন্যের আল দিয়ে বাঁধা সে-পরিচয়। আজ এই বিপুল বর্ষণের জলোচ্ছ্বাসে সে-আলে ফাটল ধরে নিমেষে তা গলে ধুয়ে একেবারে একাকার হয়ে গেল।

এমন বর্ষাও নামেনি আগে, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটেনি তাদের জীবনে। কোথায় সেই যতীন দাস রোড আর কোথায় এই কেয়াতলা। কারো সঙ্গে কারো চেনা নেই, জানা নেই, পরিচয়ের কোনো কথা নয় কারো সঙ্গে, এমন যে তারা দুইজন, আজ এই দুর্যোগের বিকেলে তারাই এসে বন্দী হয়ে গেল এই ছোট শেডে। এই ছোট শেডে ধরে না এমনি বৃহৎ ঘটনাও ঘটে গেল আজ তাদের জীবনে।

রাজার গালে আস্তে একটা চড় দিয়ে কণিকা বলল, তুই যত নষ্টের মূল, তোরই জন্যে—

তার কথা শেষ করতে দিল না অরবিন্দ, বলল, ছি ছি—ও বেচারা কি করল। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই ও। ওকে মারধোর করে লাভ কি। কিন্তু ওর উপর আমার রাগ হচ্ছে অন্য কারণে।

—কি সে কারণটা?

—ও আগলে আছে আপনাকে। আপনার সর্বাঙ্গ যেন পাহারা দিচ্ছে।

মাথা নীচু করল কণিকা, বলল, বড় বেহায়া আপনি।

অরবিন্দ বলল, নামিয়ে দিলে হয় না ওটাকে?

—না, হয় না।

না হল। একটা বসন্তেই মানুষের জীবন শেষ নয়, একটা বর্ষাতেই তেমনি মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার শেষ নয়।

অরবিন্দ বলল, যাই মনে করুন, এ—
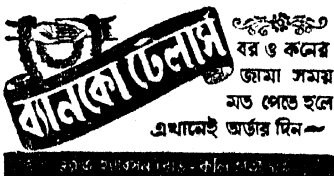
বিকেলটা কিন্তু ভুলতে পারা যাবে না। এই ছোট শেড, এই বৃষ্টি, এই নিবিড় লোকালয়ের মধ্যেও এমন নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়, আর আর আর—

কণিকা তার মুখের দিকে তাকাল না।

অরবিন্দ বলল, আর এমন, কি যেন সেই অ্যাডজেকটিভটা, কি যেন বলে বাংলায়? —আর সেই রকমের আপনি।

গুঁড়ো গুঁড়ো জল উড়ে এসে পড়েছে চুলে। মনে হচ্ছে যেন মুক্তোর চূর্ণ ছড়িয়ে আছে কণিকার মাথায়। অরবিন্দ কণিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বুঝি ভয় দেখাবার জন্যেই বলল, যদি কেউ দেখে ফেলে?

—বয়ে গেছে। নড়ে দাঁড়াল কণিকা।

অরবিন্দ বলল, আপনার রাজা কিন্তু সব দেখেছে।

কণিকা উত্তর দিল না। কিন্তু রাজা জুল-জুল করে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

দম নিয়ে দম নিয়ে ঝেঁপে ঝেঁপে নামছে বৃষ্টি, এ-বৃষ্টি ছাড়ার কোনো আশা বুঝি নেই। এর মধ্যে এইভাবে এই চুনের গন্ধ ভোগ করে আর অপেক্ষা করে থাকা যায় কতক্ষণ?

কণিকা বলল, চলে যাই। হোক বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতেই চলে যাব। পথে রিকশা কি ট্যাক্সি যাহোক একটা কিছু পেলে—

কথা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

একটু পরে চাপা ও কাঁপা গলায় অরবিন্দ বলল, না। এখন না। তাড়া কি আমাদের, তাগাদাই বা কী? এইভাবে একটা দিন যদি কেটে যায়, যাক না।

কণিকা বুঝি রেগেছে, কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, বেশ মজা পেয়েছেন, তাই না?

কণিকার এই কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে যেন সম্বিৎ ফিরে এল অরবিন্দের। সে ভীতু ও ভীরু, সে লাজুক ও মুখ-চোরা। কিন্তু, এ কী, হঠাৎ আজ সে এ কী হয়ে গেল। এ কী দুঃসাহস তার?

ওদিকে গাছের মিছিল, এদিকে সার সার ইমারতের প্রসেশন। চারদিক তাকাতে তাকাতে মাথা নীচু করে তারা বেরিয়ে পড়ল এই ছোট শেডের আশ্রয় থেকে।

রাজার সর্বাঙ্গ আঁচল দিয়ে আড়াল করে বৃষ্টির ধারা থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে হাঁটু জলে নেমে পড়ল তারা। কে বলবে এটা একটা কুকুর, বেড়ালের বাচ্চার মত ছোট্ট হয়ে কণিকার বুকের তাপে গা রেখে গলার মধ্যে গড়গড় করে আদরে আওয়াজ করতে লাগল রাজা।

কোনো দিকে কোথাও গাড়ি ঘোড়া কিছু নেই। অবশেষে গড়িয়াহাট রোডের গোল-পার্কের কাছে এসে একটা রিকশা পাওয়া গেল।

কণিকাকে রিকশায় তুলে দিয়ে অরবিন্দ বলল, আবার দেখা হচ্ছে কবে?

রিকশার পর্দা নামিয়ে দিয়েছে কণিকা, পর্দার ভিতর থেকেই বলল, বলতে পারিনে।

মনোহরপুকুর রোড ধরে টুংটুং শব্দে এগোতে লাগল রিকশা। বৃষ্টির চিকের আড়ালে অরবিন্দকে অদৃশ্য করে দিয়ে রিকশাটা চলে গেল।

যতীন দাস রোডে রিকশা যখন পৌঁছুল, সন্ধ্যা তখন নেমেছে। গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকে, বাগানটা পাক খেয়ে কণিকা উঠল বারান্দায়, চাকরটা হাঁ করে তাকাল তার মুখের দিকে। তাকে রিকশার ভাড়া দিয়ে দিতে বলে সে উঠে গেল উপরে।

মা এগিয়ে এলেন, বললেন, ব্যাপার কি কণা?

—পরে শুনো, মা। সে ভারি ভয়ানক কাণ্ড।

রাজাও ভিজে গেছে। কণিকা বলল, তুমি একে দেখো মা। আমি জামা-কাপড় ছাড়ি।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল কণিকা। ডিমের আকারের মস্ত আয়নাটার মধ্যে থেকে কে যেন তাকাচ্ছে তার দিকে, কণা সেই দিকে চেয়ে বলল, দূর বাঁদরি।

দেরাজ টেনে শাড়ি-সায়া বের করল। ভিজে কাপড় ছেড়ে দিল মেঝের উপর, আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়েই যেন চমকে উঠল, একি, জামাটা ছিঁড়েছে?

ধ্যেৎ। গা থেকে খুলে জামাটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়।

তোয়ালে টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গ মুছল, আর নিজের ছায়া দেখতে লাগল আয়নায়। নিজেকে এমনভাবে দেখার কৌতূহল কখনো তার হয়নি, কিন্তু আজ কেন-যেন ভারি মজা লাগছে দেখতে।

দরজার কড়া নেড়ে মা ডাকলেন, কণা।

—যাই মা।

তাড়াতাড়ি নিজেকে তৈরি করে নিয়ে সে দরজা খুলেই বলল, উ, কী বৃষ্টি। লাইফে দেখিনি, মা। জীবনে আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা পেয়েছি, নতুন স্বাদ। সে কী মজা, তোমাকে কি বলব।

—খুব ভিজেছিস বুঝি?

—থুব কী বলছ মা। ভীষণ—ভীষণ। সাংঘাতিক ভিজেছি। বৃষ্টির মধ্যেও যে এত মজা আছে কে আগে জানত।

মা বললেন, নিজে ভিজলি, ভেজ। রাজাটাকেও ভেজালি। এই তো, এক মাসও হয়নি, ভিজে গিয়ে বেচারার সে কী নাকাল।

এদিকে মায়ে-ঝিয়ে গল্প হচ্ছে যতীন দাস রোডে, ওদিকে কেয়াতলার তিনতলার ফ্ল্যাটে অরবিন্দ চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে মাথার নীচে দু হাত দিয়ে সিলিঙের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কংক্রিটের ছাদ, কড়িকাঠ নেই—কি গুনছে বলা কষ্ট।

তার মনে হচ্ছে জ্ঞান-ট্যান কিছু ছিল না তার। তার মনে হচ্ছে সবই বুঝি স্বপ্ন। এমন ঘটনা ঘটা কি সম্ভব? বিশেষ করে তার জীবনে?

তার জীবন, সে তো সাধারণ একটা জীবন নয়; একটা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব জীবন তার। তার জীবন যদি স্বাভাবিক হবে, তবে তার এই চৌত্রিশ বছরের জীবন্ত জীবনটা সে কি এই নিরিবিলি ফ্ল্যাটের মধ্যে এমনিভাবে আটক রাখে?

বিয়ে করার শখ একবারমাত্র তার জেগেছিল, তখন তার বয়স বাইশ কি তেইশ। বেড়াতে গিয়েছিল গিরিডিতে। জ্যাঠামশায়ের কাছে। সে বাড়িতে কাজ করত এক সাঁওতালনি, তার এক মেয়ে ছিল, নাম তার রূপা। যেমন কালো রং, তেমনি সুন্দর দেখতে, দাঁতগুলো তেমনি সাদা। অরবিন্দ মনে মনে ভেবেছিল, বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে গেলে বেশ হয়। একদিন রূপাকে বলেছিল, রূপা, তুই কলকাতা যাবি? রূপা বলেছিল ক্যানে?

সে কেনর জবাবও দিতে পারেনি অরবিন্দ, তার শখও গেছে নিবে।

নতুন করে তার কোনো দিন কোনো শখ জাগেনি। যখনি মনের মধ্যে জাগা-জাগা হয়েছে তখনই ঐ শব্দটা বেজে উঠেছে কানের মধ্যে—ক্যানে?

কেমন আতঙ্ক হয়ে গেছে তার। সেই আতঙ্ক এই দশ বারো বছরে বেড়ে তিল থেকে তাল হয়েছে। এখন মেয়েদের কথা মনে পড়লে ভয় বললে ঠিক বলা হয় না, ত্রাস হয় তার।

তাই, যেদিন তার বোনকে সঙ্গে নিয়ে কণিকা এসে হাজির হল তার ফ্ল্যাটের দরজায়, অরবিন্দর শরীরের রক্ত জমে যেন হিম হয়ে গেল।

—আপনার নাম অরবিন্দ সরকার?

—হাঁ। কোত্থেকে আসছেন?

—যতীন দাস রোড থেকে। আপনি কি এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে?

এক টুকরো কাগজ এগিয়ে ধরল মেয়েটা, অরবিন্দ নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টিটা মাত্র বাড়িয়ে দিয়ে দেখল কাগজের টুকরোটা, বলল, হাঁ।

মেয়েটার মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, আমাদের কুকুর। নিতে এসেছি। আপনার এখানেই আছে তো?

চট করে এ কথার জবাব দিতে পারল না অরবিন্দ। ভালো করে সে তাকাতেও পারল না এই আগন্তুক মহিলা দুটির দিকে। তিনতলার এই ফ্ল্যাটে একেবারে একা থাকে সে। একা থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পদার্পণ তার কাছে অচিন্তনীয় ও অসম্ভব ঠেকে। বিশেষ করে সে সব ব্যক্তি যদি হয় মেয়ে। আর তার বরাতই এমনি যে, যে-ব্যাপারে সে অনভ্যস্ত সেই রকমের ব্যাপারই তার জীবনে ঘটবে। যারা কুকুর পোষে তাদের উপর বরাবর তার চাপা বিদ্বেষ আছে। তার বক্তব্য এই যে, কুকুর পোষাটা এক ধরনের দাস-মনোবৃত্তি, এক রকমের অনুকরণ-প্রবৃত্তি। বিদেশীদের কাছ থেকে এই কায়দাটা কেনা হয়েছে—বিশ্রী রুচির এটা একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের দেশের যে আবহাওয়া ও যে পরিবেশ, আমাদের মন যে শান্তি দিয়ে ও যে রুচি দিয়ে গড়া, তার পক্ষে হরিণই মানান-সই। কুকুর-কালচারটা একটা কদর্য কালচারেরই নমুনা বলে মনে করে অরবিন্দ। এ-হেন যে অরবিন্দ, তার বরাতে কিনা এসে জুটল একটা কুকুর! এবং, সেই জীবটিকে আশ্রয় দিয়ে আরাম দিয়ে আদর দিয়ে এই কয়দিন ধরে পালন করছে সে?

আর তার উপরে আজ আবার এ কী। তার দরজায় সশরীরে এসে দাঁড়িয়েছে দুটি মহিলা! ওসব সে বরদাস্ত করতে পারে না, ওসব আর ভালোও লাগে না তার। যে বয়সটাকে লোকে কাঁচা বয়স বলে, সে সময়ে ওসব সম্বন্ধে একটু কৌতূহল বা একটু আগ্রহ তার ছিল অবশ্য, কিন্তু সে বয়সও এখন নেই, সে সময়ও নেই, সে রুচিও নেই। অতএব আগ্রহও নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরঞ্চ একটু ভয়ই জন্মে যাচ্ছে ওসব সম্বন্ধে।

আশ্চর্য, ওদের কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অরবিন্দ। ভদ্রতা বা সৌজন্যের কথাও বুঝি মনে পড়েনি তার। ভিতরে ডাকতে হবে কিনা, ভিতরে গিয়ে বসতে বলতে হবে কিনা—সব বিবেচনা যেন তার গোলমাল হয়ে গেছে।

মাথা একটু তুলে অরবিন্দ বলল, ব্যাচিলারের ডেন এটা, আপনাদের ভিতরে আসতে বলতে সংকোচ হচ্ছে।

ছোট বোন মণিকা বলল, লজ্জা সংকোচ করে দরকার নেই, আমাদের জিনিসটা দিয়ে দিলেই আমরা পালাই।

এতক্ষণে অরবিন্দ বলল, জিনিসটা যে আপনাদের তার প্রমাণ তো আমি চাইতে পারি? কি বলেন?

বড় বোন বলল, বটেই তো। চলুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া হয় না। আপনার ঘরে বসায় আপত্তি নেই তো?

অরবিন্দ একটু হেসে বলল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনাদের আপত্তি হবে কিনা ভাবছিলাম। এইজন্যেই এতক্ষণ সে-প্রস্তাব করতে ভরসা পাইনি।

ওরা ঘরে গিয়ে বসল। এটা অরবিন্দের বৈঠকখানা। পাশের ঘরটা শোবার। দুই ঘরের মাঝখানের দরজা।

অনাড়ম্বর ঘর। মাত্র [illegible] খানা কাঠের চেয়ার ঘরের মধ্যে ছড়ানো, আর একটা তেপায়া। দেয়ালে দুই ইঞ্চি পুরু কাঠের ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে মস্ত একটা মুখ, সে মুখটা—

অরবিন্দ বলল, ওটা আমারই ছবি। দশ বছর আগের। চেহারা তখন অন্যরকম ছিল।

ছোট বোন বলল, অনেক ভালো ছিল।

ধমক দেওয়ার মত করে তার দিকে তাকাল বড় বোন।

অরবিন্দ বলল, পরিচয়টা হয়ে যাক। কতদূর থেকে আসছেন আপনারা?

—বেশি দূর না। দেশপ্রিয় পার্কের কাছেই। যতীন দাস রোডে। আমার নাম মণিকা—বসু ছিলাম, এই কয়েকদিন হল মিত্র হয়েছি।

বলে সে হাসল, বলল, আর এ আমার দিদি কণিকা।

হাত তুলে নমস্কার জানাল অরবিন্দ। ওরাও প্রতিনমস্কার করল। কিন্তু তার কেমন অদ্ভুত লাগছে। বড় বোনের সিঁথি সাদা, ছোটটার লাল। কিন্তু এর পিছনে কোনো করুণ ট্র্যাজেডি আছে তবে যে সে-বিষয় কিছু বলল না।

কী করে জানবে অরবিন্দ। বড়বোনের জেদ, তাই তাকে বাদ দিয়ে ছোটর বিয়েরই ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাদের বাবা-মাকে।

কিন্তু যে জন্যে আসা। কণিকা'ই যেন সেজন্যে একটু বেশি অধৈর্য। বলল, ও কই?

অরবিন্দ বলল, আছে।

মণিকা মন্তব্য করল, কিন্তু আছে বললেই তো হবে না। প্রমাণ দিতে হবে বললেন না। আর কে জানে, আমাদের কুকুরটাকেই আপনি পড়ে পেয়েছেন কিনা। আমাদের কুকুরটার নাম রাজা। দেখতে ছোট—এইটুকু, গায়ে বড় বড় রোঁয়া। আমাদের কুকুরটা হচ্ছে পিকি-নিজ, সিমলা থেকে বাবা কিনে এনেছিলেন ওর মাকে। আমাদের নেবার মিস্টার অপরেশ পাকড়াশি কোল-মার্চেণ্ট, নাম শুনেছেন হয়তো, তাঁরও একটা পিকিনিজ আছে—সেই হচ্ছে রাজার বাবা রাজার বয়স এখন মাত্র—

আঙুলের কড় গুণে হিসেব করে মণিকা বলল, আট মাস।

অরবিন্দ বুঝতে পারছে তার জিম্মায় এখন যেটা আছে সেটা এটাই। কিন্তু এরা তাদের জিনিস নিয়ে যাবে তাতে আপত্তি জানানো যাবে না। অথচ অরবিন্দর মনটা টনটন করতে লাগল। আজ দশ-বারো দিন হল সে তার বাড়ির নীচের তলার নালার মধ্যে কুড়িয়ে পায় এটাকে—তখন বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে, একটা কাতর কেঁউ-কেঁউ শব্দ শুনে এগিয়ে গেল সে। দেখল, অসহায় জীবটি জলে ভিজে প্রায় আধমরা হয়েছে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই খিঁচিয়ে উঠছে, তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল নির্ঘাৎ। নীচের ফ্ল্যাটের দস্যি ছেলে হীরু এগিয়ে এসে বলল, থামুন। ধরে দিচ্ছি আমি।

মোটা তোয়ালে দিয়ে তাকে চেপে ধরে উপরে নিয়ে এল হীরেন্দ্রনাথ।

থরথর করে তখন কাঁপছে কুকুরটা। ঘরে ঢুকে তার ভয় বুঝি একটু কমেছে—চারদিক চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছিল।

তোয়ালে দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিল অরবিন্দ। কুকুর-পরিচর্যা যে কদর্য রুচির নমুনা, সে-কথা তার মনে হল না তখন।

হীটার জেলে তোয়ালে তাতিয়ে তাতিয়ে সেঁক দিতে লাগল তাকে। একটু গরম পেয়ে আদর পেয়ে খাবার পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে পোষ মেনে গেল বাচ্চা কুকুরটা। আদর করে ডাকার আর কোনো নাম না পেয়ে অরবিন্দ বলল, বিলি।

জুলজুল করে তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল কুকুরটা।

দু-দিনের মধ্যেই এই ফ্ল্যাটের—যাকে অরবিন্দ বলে ব্যাচিলারের ডেন—বিলি হয়ে গেল তার পাকা বাসিন্দে। অরবিন্দের নিঃসঙ্গ জীবনটা এতটুকু জীবের চলাফেরায় হয়ে উঠল জীবন্ত।

এইজন্যেই হঠাৎ এখন মনটা টনটন করে উঠেছে তার।

অরবিন্দ বলল, কুকুর পুষিনি কখনো। ওদের কি নাম রাখতে হয় জানি নে। আমি ওর নাম দিয়েছি বিলি।

হেসে উঠল মণিকা, বলল, বিলি যে রাখেন নি, এই ঢের।

আলাপে সময় কেটে গেল অনেকটা। এমন সময় বাজার থেকে ফিরল ব্রজ।

অরবিন্দ বলল, এত দেরি হল কেন রে? এঁদের একটু চা করে দে।

আপত্তি জানিয়ে উঠল একসঙ্গে দুজনে—মণিকা আর কণিকা। মণিকা বলল, আলাপ-পরিচয় হল, আর একদিন এসে নিজে হাতে চা বানিয়ে খেয়ে যাব। আজ বিদায় দিন আমাদের।

দরজা ফাঁক করে ব্রজ পাশের ঘরে চলে গেল।

অরবিন্দ বলল, ডাকুন। ডাকুন নাম ধরে।

কণিকা ডেকে উঠল, রাজা, রাজা।

চেনা গলায় নিজের আসল নাম অনেক-দিন শোনেনি, ওই ডাক শোনা মাত্র বিদ্যুতের বেগে ছুটে দরজার ফাঁক দিয়ে এ-ঘরে চলে এল রাজা। একমুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়েই ঝাঁপ দিয়ে উঠে পড়ল কণিকার কোলে। কোলের মধ্যে বসে কণিকার গায়ে মাথা ঘষতে লাগল। কত আনন্দ হয়েছে, কত ফুর্তি হয়েছে, কত উল্লাস এসেছে তার মধ্যে তা জানাবার জন্যে সে ব্যাকুলভাবে তাকাতে লাগল কণিকার ও মণিকার মুখের দিকে।

অরবিন্দের চোখের কোণ একটু ভিজে উঠল বুঝি, বলল, দেখুন, পশুর প্রাণেও মমতা আছে।

কণিকা বলল, মানুষের প্রাণেও আছে। নইলে রোজ কাগজের পাতা উল্টে-উল্টে খুঁজতাম না; আর আজ সকালে বিজ্ঞাপনটা দেখেই ছুটে আসতাম না। যাক্ গে, প্রমাণ চেয়েছিলেন, পেলেন তো?

মণিকা জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি হল কেন কাগজে ওটা দিতে? আরো আগে দিলে আপনিও রেহাই পেয়ে যেতেন, আমরাও এতদিন উদ্বেগে কাটাতাম না।

অরবিন্দ পায়ের উপর পা তুলে বসে কি যেন ভাবছিল, বলল, গাফিলি। আজ দেব কাল দেব করতে দেরি হয়ে গেছে। মাপ করবেন।

কাজ হয়ে গেছে। ওরা এবার উঠতে চায়। অজস্র ধন্যবাদ দিতে চায় অরবিন্দকে। এটাকে তারা খুঁজে পাবে, ঐ আশাই তাদের ছিল না। বিয়ে-বাড়ির ভিড়ে সকলে নিজে-দের নিয়েই মত্ত—এই ফাঁকে কখন-যে এটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে কে জানে বলুন।

মণিকা বলল, আর, কোনো উৎসব-আয়োজনের মধ্যে যদি বৃষ্টি নামে, তা হলে কী ঝঞ্ঝাট বাধে বুঝতেই পারছেন।

মণিকার সিঁথির নতুন সিঁদুরের দাগ আগুনের মত গনগন করতে লাগল জানলার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায়।

ওরা উঠে দাঁড়াল। অরবিন্দও দাঁড়াল।

হঠাৎ একটা ডাক দিল অরবিন্দ—বিলি।

ডাক শোনা মাত্র কণিকার কোল থেকে লাফ দিয়ে পড়ে অরবিন্দর পায়ে তার সারাটা গা ঘষতে লাগল রাজা।

অরবিন্দ বলল, দেখুন। মায়া-মমতা আমা-দেরই একচেটে নয়। এই কয় দিনেই কী রকম পোষ মেনে গেছে দেখুন।

মণিকা আঁচলটা কাঁধের উপর টেনে নিয়ে বলল, তা তো বটেই।

সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। রাজাকে আবার কোলে তুলে নিয়েছে কণিকা। সেখান থেকে একদৃষ্টে রাজা চেয়ে আছে অরবিন্দের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, তার চোখে যেন দু টুকরো কষ্ট জেগে উঠেছে। চলে যাচ্ছে সে, কিন্তু কথা জানে না তাই কিছু বলে যাচ্ছে না।

অরবিন্দ ঐ দিকে চেয়ে ছিল কিছুক্ষণ, এবার বলল, গাফিলির কথা বলছিলাম, কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। আসলে বিজ্ঞাপন দেবার ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছে ছিল না, একে ছেড়ে দিই। কিন্তু চুপচাপ রেখে দেওয়াটা কেমন দেখায় মনে করে মনকে বুঝ দেবার জন্যে একটু দেরি করেই ছোট্ট একটু বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছিলাম কাগজে। ওটাও যে চোখে পড়বে আপনাদের কে জানত।

অরবিন্দ আবার ডাক দিল, বিলি। বিলি।

কণিকার কোলের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল রাজা।

বিদায় নিয়ে এক ধাপ দু ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে মণিকা যেন সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, বেশ তো। মাঝে-মাঝে নিয়ে আসব আপনার কাছে। আমার আবার কখন বম্বে চলে যেতে হয় ঠিক নেই, আমি না থাকলেও এ তো রইল। দিদি নিয়ে আসবে। আর আপনিও তো যেতে পারেন বেড়াতে।

নীচে নেমে এল ও'রা তিনজন। অজস্র ধন্যবাদ জানাতে জানাতে বিদায় নিল ও'রা। গাড়িটা মনোহরপুকুর রোডে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে।

ওরা চলে গেল। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল অরবিন্দ। একটা বিরাট বোঝাও যেন নেমে গেল তার ঘাড় থেকে। বোঝা নেমে গেল বটে, কিন্তু তার বুকের একটা পাশ একটু যেন টনটন করছে, অন্য পাশটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

এই ফ্ল্যাটটা ভরাট করে রেখেছিল ওই ক্ষুদে জীবটা।

বড় ভদ্র এরা। সৌজন্যবোধ এদের আছে। মণিকা আর কণিকা দুই বোন রাজাকে নিয়ে দেখা করতে এসে গেল কয়েক দিন বাদেই।

রাজাকে কোলে নিয়ে অনেক আদর করল অরবিন্দ। রাজাও চোখ বুজে সে-আদর যেন উপভোগ করল বেশ প্রাণ দিয়েই।

আরও কয়েক দিন বাদে রাজাকে নিয়ে কণিকা এল একা। বলল, মণিকা পরশু চলে গেছে বম্বে। এও কেমন ছটফট করতে লাগল, তাই নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছেন। চলুন।

—কোথায়?

—লেকে। একটু বেড়াই চলুন। ঘরের মধ্যে বসে থেকে থেকে কেমন দম আটকে যায়।

কণিকার কেমন আশ্চর্য লাগল কথাটা, বলল, এমন খোলামেলা ঘর, এমন অফুরন্ত হাওয়া—এতেও দম আটকায় আপনার?

উত্তর দিতে পারল না অরবিন্দ। আসলে, এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলাকে নিয়ে বসে কথা বলতে গেলেই তার দম আটকে আসে। জিভ ওঠে শুকিয়ে। ব্রজ তো থাকে রান্নাঘরে বন্দী।

ওরা নীচে নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে কেয়াতলা রোড ধরে, সাদার্ন অ্যাভিনিউ ক্রস করে ওপারে গিয়ে ঢোকে লেকে। সরু চেনে বাঁধা রাজা তিরতির করে আগে আগে দৌড়য়।

এইভাবে দু-এক দিন মাত্র চলেছে। তার-পরেই হঠাৎ একদিন নামল ঐ বৃষ্টি। তারা প্রস্তুত ছিল না, বৃষ্টির অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেল তারা। কী করে, উপায় না দেখে তারা আশ্রয় নিল ঐ শেডে।

এমন বৃষ্টিও নামেনি কখনো, এমন অসম্ভব ঘটনাও বুঝি ঘটেনি কোথাও।

অরবিন্দ মর্মাহত, অরবিন্দ লজ্জিত, অরবিন্দ অনুতপ্ত। ছি, নিজের উপরে নিজে সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সে। তার আশ্চর্যই বোধ হচ্ছে, এত সাহস এও ভরসা এত শক্তি সেদিন হঠাৎ সে পেল কোথা থেকে। ঠিকই বলেছিল সেদিন কণিকা, ঐ কুকুরটাই যত নষ্টের মূলে। যাক, হারিয়ে যাক, নিরুদ্দেশ হয়ে যাক আবার ঐটে।

আবার কোনোদিন দেখা হয়ে গেলে কী করে সে তাকাবে কণিকার চোখের দিকে তাই ভাবছে অরবিন্দ। তার আচরণের জন্যে পুরুষ-জাতটার উপরেই বুঝি ঘৃণা ধরে গেছে কণিকার। ও আর আসবে না।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলতেই, আশ্চর্য, কোলে-কুকুর কণিকা এসেছে।

কাঠের চেয়ারে বসে পড়ল কণিকা, বলল, উঃ, যা বড় বড় সিঁড়ি, হাঁফ ধরে গেছে।

কী কথা বলবে অরবিন্দ কিছু খুঁজে পাচ্ছে না, কান গরম হয়ে উঠেছে তার, বুঝি ঘামও হচ্ছে, আস্তে বলল, মাপ করবেন আমাকে।

—কেন বলুন তো! কণিকা সামনের দিকে একটু ঝুঁকল, বলল, কী ব্যাপার?

অরবিন্দ বলল, সেদিন ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি।

হেসে উঠল কণিকা, বলল, সে হুঁশ হয়েছে তো? অন্যায় বলে অন্যায়। ঐ চুনের মধ্যে দাঁড় করিয়ে আমার পায়ের যা দশা করে-ছিলেন। চুনে আর জলে হেজে গিয়েছিল পা। রাত্রে, উ, সে কী জ্বালা। কিছু নেই

হাতের কাছে, কী করি—শেষে আঙুল দিয়ে তুলে তুলে সারা পায়ে স্নো মাখ।

—খুব কষ্ট দিয়েছি আপনাকে। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে রেসপনসবল হচ্ছে ও, ওই রাজা।

রাজা তার নাম শুনে কণিকার কোল থেকে নেমে চলে এল অরবিন্দর কাছে।

হেসে উঠল কণিকা, বলল, এটা একটা জয়েণ্ট প্রপার্টি হয়ে উঠেছে। এটাকে নিয়ে কী করা যায় এখন?

কেমন-যেন আশ্চর্য লাগছে, অদ্ভুত লাগছে, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে অরবিন্দের। কণিকা কত সহজ হতে পেরেছে, কিন্তু অরবিন্দের জড়তা কাটছে না কিছুতে। ও বুঝি ঐ বৃষ্টির জলেই সেদিনের সব ঘটনা ধুয়ে-মুছে ফেলতে পেরেছে। তা না পারলে সেদিনের ঘটনার মধ্যে কেবল পায়ে স্নো মাখার কথাটাই তুলত না।

অরবিন্দ উঠে দাঁড়াল, বলল, চলুন।

—কোথায়?

—লেকে। এখানে বড় অস্বস্তি ঠেকছে।

কণিকা ঝুলন্ত দুটি চুল কানের পিছে সরিয়ে দিয়ে বলল, আবার ঐ লেক? লজ্জা নেই বুঝি? ওসবের মধ্যে আমি নেই। আর ভিজতে পারব না জলে। , আবার ভিজলে নির্ঘাৎ নিমুনিয়া।

ঐ রাজাটাই হয়েছে একটা উৎপাত। আর দয়াও নেই, মায়াও নেই, মমতাও নেই ওর উপর। এখন একটু যে কোলে নিয়ে আছে এ কেবল ভদ্রতা। এটা আবার হারিয়ে যায় তো বাঁচা যায়, তা হলে এই যে একটা মেকি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অচেনা মানুষের সংগে এই সম্পর্কটা বাতিল হয়ে যেতে পারে।

দূরের একটা চেয়ারে অরবিন্দ বসে আছে চুপ করে, কোনো কথা বলছে না। কি কথা বলতে হয়, কি কথা এখন বলা যায়—মনে মনে যেন কেবল তাই খুঁজছে। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

অবশেষে সে বলল, আর চাইনে ওটাকে দেখতে। আর নিয়ে আসবেন না।

চমকে ওঠার মত করে তাকাল কণিকা, বলল, কেন বলুন তো? কী দোষ করেছে এ?

—কি করেছে জানি নে। ওটাকে হারিয়ে ফেলুন। নিরুদ্দেশ হয়ে যাক ওটা।

অরবিন্দের অস্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে কণিকা। আজ সে অনেক রকম কথা ভেবে এসেছিল। লোকটাকে নানা-ভাবে অপদস্থ আর বিব্রত করবে, এই মতলব ছিল তার। কিন্তু এখানে এসে দেখছে আব-হাওয়া একেবারে আলাদা রকমের। এসে দেখছে একটা আলাদা জাতের মানুষ এই অরবিন্দ।

কণিকা উঠে দাঁড়াল, বলল, চলি তাহলে। নমস্কার। ঠিকই বলেছেন, একে আর রাখা না। এবার বিদায় করব একে।

কণিকার গলা একটু যেন ধরা-ধরা শোনাল। কথা বলতে বলতে সে বেরল ঘর থেকে। সংগে সংগে বেরিয়ে এল অরবিন্দও।

কণিকা বলল, হারিয়ে ফেলেও কি রেহাই আছে? আবার হয়তো বেরবে একটা বিজ্ঞাপন।

—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ। কি বললেন যেন। তিন ধাপ নেমে এল অরবিন্দ।

কথাটা ঠিকই শুনেছে অরবিন্দ। কণিকা আর ফিরে উচ্চারণ করল না ও-কথা। ধীরে ধীরে নামতে লাগল।

কিন্তু কথাটার মানে কি দাঁড়াল? আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে রাজা, আবার কেউ কুড়িয়ে পাবে তাকে, আবার কেউ—

বিচলিত হয়ে উঠল, বিব্রত হয়ে উঠল, ব্যথিত হয়ে উঠল অরবিন্দ।—না, তা হতে পারে না; তা হতে দিতে পারা যাবে না।

অরবিন্দ নামতে নামতে ডাকতে লাগল, শুনুন, শুনুন।

মাঝসিঁড়িতে থমকে দাঁড়াল কণিকা, বলল, কি?

চাপা গলায় অরবিন্দ বলল, হতে পারে না। হারিয়ে ফেলা যাবে না।

কণিকার কোলের মধ্যে থেকে রাজা জুল-জুল করে তাকাচ্ছে অরবিন্দের দিকে।

কণিকা জিজ্ঞাসা করল, কার কথা বলছেন?

হঠাৎ এ-কথার উত্তর দিতে পারল না অরবিন্দ, কণিকার চোখের দিকে একবার চেয়েই চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, রাজার কথা।

—কেন?

বহুদিন বাদে আবার ঐ এক প্রশ্ন বেজে উঠল তার কানের মধ্যে। এর উত্তর দিতে সেদিনও সে পারেনি, আজও পারল না।

রাজার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অরবিন্দ বলল, উপরে আসুন।

নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল কণিকা।

অরবিন্দ আবার বলল, উপরে আসুন। সিঁড়ির মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না।

রাজাকে কোলের মধ্যে ধরে কণিকা তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে অরবিন্দ বলল, কই, এসো।

কণিকা অরবিন্দের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার সম্বোধনটা শুনে একটু বুঝি চমকই লাগল তার।

এদের পাশ কাটিয়ে বাজারের থলে হাতে নিয়ে সন্তর্পণে ব্রজরঞ্জন নেমে গেল নীচে।

অরবিন্দ আবার বলল, এলে না?

একলা বসে— শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

[ ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

প্রধান লক্ষণ অবয়বে এবং আকারে। ওরা আমাদের মত হয়েও আমাদের মত নয়; উপাদানেও নয় আকারেও নয়। কিন্তু ওই একতিল উপাদান যে বেঁচেছে পিতামহ। ওটুকু ওর কোথাও দিয়ে দিন।

ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টির সর্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখলেন। তাইতো এই তিলটিকে কোথায় দেবেন? দিলেই যে বাহুল্যের খুঁত হয়ে যাবে। হাতে তিল পরিমাণ উপাদান!

স্থান আছে এক বক্ষগহ্বরে আর মাথায় করোটীর অভ্যন্তরে। উদরে স্থান নেই, সেখানে শক্তি ক্ষুধারূপিণী হয়ে গহ্বরটি পূর্ণ করে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের অগ্নির মত জ্বলছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেখানে ধক ধক করছে সেইখানে আছে স্থান আছে। আর মাথার মধ্যে আছে। দু ভাগে ভাগ করলেন, সেই তিলটিকে। কিন্তু বড় শক্ত হয়ে গেছে। কি করে তাকে নরম করবেন? জল কোথায়? কমণ্ডলু উপুড় করলেন, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। ওঃ দুই চোখের পাতা এখনও একটু একটু অশ্রুর সজলতায় সিক্ত হয়ে আছে। সেই সিক্ততাটুকু অতি সন্তর্পণে আঙুলের ডগায় নিয়ে একটি ভাগকে নরম করলেন এবং হৃদপিণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বললেন—হৃদয় দিলাম তোমাকে! তারপর অবশিষ্ট অর্ধতিল। আর জল নাই। চোখের পাতাতেও নাই। মহাশিল্পী বিধাতা—বিষ্ণুর চৈতন্যময় জ্যোতির কাছে সেটুকুকে ধরলেন, সেই জ্যোতির প্রাণময় উত্তাপে সেটুকু গলে নরম হল। সেটুকু মাথার মধ্যে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু পিতামহ দেখুন দেখুন, নূতন সৃষ্টি তোমার কাঁদছে। ব্যথা দিয়েছ তুমি।

নূতন সৃষ্টি বিষণ্ণ হেসে বললে—না। পৃথিবীর ওই যন্ত্রণার চীৎকারে আমার বুকের ভিতরটা টনটন করছে। তাই কাঁদছি। হে পিতামহ! যে করুণায় তুমি সৃষ্টি ধ্বংস হবে বলে কেঁদেছিলে—আমি হৃদয় দিয়ে সেই বেদনা অনুভব করছি।

বিষ্ণু বললেন—পিতামহ তোমার সৃষ্টি বাক্য বলছে।

সৃষ্টি বললে—হে বিষ্ণু তোমার চৈতন্য তোমার দীপ্তির উত্তাপের সঙ্গে আমার মাথায় চেতনার স্তরে স্তরে সঞ্চারিত। স্বর ব্যঞ্জনায় বিচিত্র হয়ে বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমি বোধশক্তি পেয়েছি!

বিষ্ণু বললেন—তুমি সেই চৈতন্য বলে বোধিকে প্রাপ্ত হও। যাও পৃথিবীতে। পৃথিবীর অরণ্যের মধ্যে তমসাচ্ছন্ন ওই আদিম জীবনের মধ্যে উন্মত্ত নৃত্যে উন্মাদিনী প্রাণশক্তিকে নূতন রূপে প্রকাশ কর। লোভরূপিণীকে তপস্বিনী কর, ক্রোধরূপিণীকে অক্রোধরূপিণীতে পরিণত কর, ভয়ংকরীকে অভয়া রূপে ব্যক্ত কর, কামরূপিণীকে প্রেমময়ীত্বে অভিষিক্ত কর, মৃত্যুভীতা অথচ মৃত্যু উৎসবে তাণ্ডব নৃত্যরতাকে অমৃত তপস্যায় রত কর।

মানুষ এল সেই অরণ্যে।

সে অরণ্যের বৃক্ষলতা থেকে জীবজগতের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাদের অঙ্গের উত্তাপে, প্রবৃত্তির প্রভাবে—সর্বত্র এক মহামোহ। অন্ধকারের স্পর্শে, বায়ুর স্পর্শে, মাটির স্পর্শে সেই মহামোহ সঞ্চারিত হয়।

ত্রিকাল দাদু বললেন—ভাই কখনও সুরা-বিপণীতে গিয়েছ? সেখানে ঢুকলে যেমন মুহূর্তে আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে ঠিক তেমনি মানুষ সেখানে এসে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওই জীবজগতের মত ওই ধর্মে।

আশ্রয় করলে সে বৃক্ষশাখা গুহা গহ্বর।

নখ দাঁত তারও বড় হল। প্রখর হল।

অস্ত্র আবিষ্কার করলে সে গাছের ডাল।

বড় বড় পাথরের চাঁই। চতুর পশুর মত বসে থাকল। উদরের মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত ক্ষুধারূপিণী দাউ দাউ করে জ্বলছে। চোখের দৃষ্টিতে তার প্রতিফলন। এল একটা হরিণ। ঝপ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তাকে আঘাত করল পাথর দিয়ে এবং কাঁচা মাংস খেতে লাগল রাক্ষসের মত। হরিণটার অন্তিম আর্তনাদ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে আছড়ে পড়ল।

ব্রহ্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হ. হায়! হায়! সব ব্যর্থ!

আবার একটা আর্তনাদ!

এবার সে একটা বাঘকে মেরেছে পাথরের আঘাতে। অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুড়েছিল।

আবার আর্তনাদ! এবার সিংহ পড়েছে একটা গর্তের মধ্যে এবং মানুষ তাকে খুঁচে খুঁচে মারছে।

আবার আর্তনাদ। এবার মর্মান্তিক!

...ঃ। এবার মানুষ আর একটা মানুষকে ...রেছে। একটা বাঁশের আঘাতে। একটা ...শকে সে অস্ত্র করেছে। মৃত মানুষটার ...ঙ্গে ছিল একটি মানুষী, ওকে হত্যা ক'রে সে তাকে বেঁধে গুহার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

সব ব্যর্থ! সব ব্যর্থ! হে বিষ্ণু!

—পিতামহ! স্মরণ মাত্রেই বিষ্ণু এসেছেন।

—সব ব্যর্থ বিষ্ণু, সব ব্যর্থ!

—তাই তো পিতামহ! বলতে বলতে একটি সুর কানে এসে ঢুকল। বিষ্ণু সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখুন, দেখুন পিতামহ দেখুন!

—কি দেখব?

—সুর শুনছেন না? এখন দেখুন।

তাই তো এ তো পরম বিস্ময়! জ্যোৎস্না-লোকে ওই মানুষীটিকে পাশে নিয়ে বসে—লোকটি সেই বড় বাঁশটার একটা খণ্ড কেটে নিয়ে বাঁশী ক'রে তাতে সুর তুলেছে!

আহা—হা!

পরের দিন বিষ্ণু নিজেই ছুটে এলেন—পিতামহ! দেখুন পিতামহ—দেখুন!

ব্রহ্মা দেখলেন—পরমাশ্চর্য!

ওই লোকটি একটি পাকা ফল সংগ্রহ ক'রে খাবার উপক্রম করে মুখের কাছে তুলেও খাচ্ছে না। স্থির দৃষ্টিতে কি দেখছে।

ব্রহ্মা দেখলেন—একটু অন্ধকারের মধ্যে একটি অতি দুর্বল—অতি ক্ষুধার্ত মানুষ পড়ে আছে। তার উঠবার শক্তি নাই। কিন্তু কি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি তার চোখে! মানুষটি তাকে দেখছে। দেখতে দেখতে সে এগিয়ে গেল তার দিকে। ব্রহ্মা বুঝলেন—ওকে হত্যা করে শত্রু নিঃশেষ ক'রে তবে খাবে। কিন্তু না তো! এ কি পরম বিস্ময়! লোকটি তার মুখের ফলটি তার হাতে দিয়ে বললে—তুমি খাও!

দুজনের চোখেই জল পড়ল। দুই লোকেই। স্বর্গ লোকে পড়ল ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর—মর্ত লোকে পড়ল—দুটি মানুষের!

তারপর আরও বিচিত্র কথা।

একা মানুষ—দশের সঙ্গে মিলল। এক একটা এলাকার মধ্যে দেশ গড়লে। বহু বিবাদ, বহু মনান্তর, তবুও আশ্চর্য, বিবাদ করে ব্যথা পায়। খতিয়ে দেখে কার অন্যায়। নিজের অন্যায় হ'লে ক্ষমা চাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, চাইতে সব সময় পারে না, কিন্তু পারলে মনে হয় মানস সরোবরে স্নান করে দেহ স্নিগ্ধ হল। কেউ আবার ক্ষমা না চাইতেই ক্ষমা করে। মধ্যে মধ্যে আকাশের স্তরে স্তরে তখন আপনি ধ্বনি ওঠে—ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।

তবু অশান্তির শেষ নাই।

মনের ভিতর বনের অন্ধকার কেটেও কাটে না।

হৃদয় ভালবাসতে যায়—কিন্তু পারে না; রাধার অভিসারের পথে যেমন জটিলা কুটীলা চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে বলত—কোথায় যাবি লা বউ? খবরদার! তেমনি করেই বাধা দেয়—স্বার্থ আর অবিশ্বাস! মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে জটিলা—আর বুদ্ধির মধ্যে থাকেন কুটীলা। হৃদয় কাঁদে রাধার মত!

মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়, শুধু পরিচয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে চোখের দরজায় অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে, জটিলা উঁকি মারে। কুটীলা পিছন থেকে বলে—বউলো—ঘরের দরজা বন্ধ কর। খবরদার। তারপর ডাকে—দাদা গো—খেঁটে নিয়ে বেরিয়ে এস।

হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে আসে—গায়ের জোরের দাদা।—কে—রে? চোর?

তাই যুদ্ধ বেধে যায় মানুষে-মানুষে। সেই বনের প্রথম যুগের অন্ধকার তাদের ঘিরে। মানুষে মানুষে যুদ্ধ হয়, মানুষের দলে দলে যুদ্ধ হয়। একদল আর একদলকে দাস ক'রে ভাবে এই তো পেয়েছি এদের। হৃদয়ের ধর্মে সে তাকে আপনার ক'রেই চায়, না ক'রলে বুকে তার অশান্তির আগুন জ্বলে, সে সেই জ্বালায় অন্যকে জোর ক'রে দাস ক'রে পেয়ে খুশী হতে চায়—ভাবে—এই তো পাওয়া হ'ল। কিন্তু তা হয় না।

একদল মানুষ ভাবে। কেন? কেন এমন হচ্ছে? একদল ভাবে না। তারা বনের দিকে তাকিয়ে বলে—এই তো নিয়ম। এমনি করেই তো সিংহ বাঘ-হাতী বনের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেছে! এই তো স্ব—ভাব!

যারা ভাবে তারা বের করলে—ন্যায়ের পথে শান্তি অন্যায়ের পথে অশান্তি! তারা হল সুর।

যারা মানলে না—তারা হল অসুর। তাদের মধ্যে বনের অন্ধকার বিক্ষুব্ধ চৈতন্য দীপ্তিকেও নিষ্প্রভ করে দিল। পশুর স্বভাব হল তাদের স্ব—ভাব। কত যুদ্ধ হল সুরে অসুরে! কিন্তু সুর হারিয়ে দিলে অসুরদের। তারপর আবার একদল অসুর হল রাক্ষস। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হল মানুষদের। রাক্ষসরাও হারল।

তারপর শুধু মানুষ।

শান্তির জন্য সে সংসার ছেড়ে নির্জনে—বনে পাহাড়ে গিয়ে বসল। কোলাহল নাই—কলহ নাই; স্তব্ধতার প্রশান্তি! এই শান্তি! আকাশলোকের নীল মহিমার দিকে তাকিয়ে সন্ধান করতে চাইলে—কোথায় ওখানে শান্তির প্রবাহ উদাস বৈরাগ্যে বেয়ে যাচ্ছে! কত তপস্যা!

কোথায় শান্তি? মনে তার মহিমার প্রকাশ হয় কই? একজনের মনে হয় তো সমাজের জীবনে—জগতের জীবনে তার প্রকাশ কই?

জগতের জীবনেও চলে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তারই তপস্যা। অন্যায়কে দমন করে—অন্যায়কারীকে নাশ ক'রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করার মহা আয়োজন করে সে। কুরুক্ষেত্র হয়। অধার্মিককে নাশ কর ধার্মিককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর; ধর্মের মধ্যে ন্যায়ের মধ্যে শান্তি, শান্তি মহনীয় মহিমায় প্রকাশিত হবে—বর্ষান্তে শরতের আকাশের নীলের মত, শরতের শস্য শ্যামলা কোমলা-ধরিত্রীর বুকের মত!

তাতেও হয় না। অধার্মিকের নাশ হয়—অধর্মের নাশ হয় না। সে যায় না। শাসনে সে শীতের ভুজঙ্গের মত বিবরে আত্মগোপন করে থাকে; আবার শাসনের দুর্বলতায় শাসকেরই মানসলোক থেকে উত্তপ্ত ঋতুর ভুজঙ্গের মত নির্মোক ত্যাগ

করা নাগের মত বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়ায়।

সে বিষনিঃশ্বাস আকাশের সকল স্তরে জর্জরতার তরঙ্গ তোলে। ব্রহ্মাও তার স্পর্শে জর্জরিত হয়ে চোখের জল ফেলে বলেন—সব ব্যর্থ হল! হায় মানুষ!

বিষ্ণু এসে দাঁড়ান।—পিতামহ!

—বিষ্ণু! আমার সঙ্গে কাঁদতে এসেছ? না আমার ব্যর্থতায় রহস্য করতে এসেছ?

—না পিতামহ। পৃথিবীর নতুন সংবাদ এনেছি।

—ধ্বংস হচ্ছে পৃথিবী? অশান্তির উত্তাপ অগ্নি হয়ে জ্বলে উঠেছে?

—না। এক রাজপুত্র গৃহত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে গিয়েছিল—

—সে তো বহু মুনি ঋষি তপস্বী—গৃহত্যাগ ক'রে পৃথিবীতে শান্তি নেই—শান্তি মৃত্যুর পরপারে ঘোষণা ক'রে স্বর্গলোকে এসেছে। আর একজন আসবে। তাতে শান্তি কোথায়? আমার বেদনা তাতে বাড়ে বই কমে না বিষ্ণু!

—না পিতামহ; সে চৈতন্যকে দীপ্ততর করেছে, বোধ তার বোধিতে পরিণত হয়েছে। সে সেই বোধি নিয়ে স্বর্গে না এসে—ফিরে গেল মানুষের মধ্যে। সব মানুষ শান্তি না পেলে তার শান্তি নাই। নিজের স্বর্গপথকে রুদ্ধ করে ফিরল। ওই শুনুন কি বলছে। নূতন বাণী পিতামহ। এই বাণীই যেন আমার অন্তরে অন্তরে এতদিন ভাষাহীন সঙ্গীত রাগিণীর আলাপের মত ঝঙ্কার তুলেছে। পিতামহ ফুলের গন্ধের মধ্যে এই বাণী যেন ঘুমিয়ে ছিল, রূপের মধ্যে সুষমার মত আভাসে ব্যক্ত ছিল। আজ সে প্রকাশ পেল—পিতামহ ওই শুনুন।

ব্রহ্মা কান পেতে শুনলেন।

অপরূপ বাঙময় সংগীত উঠছে—আকাশের স্তরে স্তরে তার প্রতিধ্বনির মূর্ছনা হ্রদের জলের উপর মৃদু বায়ু হিল্লোলে কম্পনের মত কম্পন বয়ে যাচ্ছে।

'বাণীময় সঙ্গীত!—নহি বেরেন বেরানি
সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মতি এস ধম্ম
সনন্তনো।'

সে সঙ্গীত বেজেই চলেছে। বেজেই চলেছে। কখনও কম—কখনও বেশী। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে কত অশান্তির ঝড় উঠল; কত হিংসা চীৎকার করে উগ্র হয়ে উঠল—আবার নিস্তেজ হল।

এরই মধ্যে মানুষের শান্তির তপস্যা সমানে চলেছে।

মহাপ্রকৃতি একে একে রূপ থেকে রূপান্তরে চলেছেন। মহামষীবর্ণা উলঙ্গিনী কালী থেকে শুভ্র হয়ে হলেন নীলাভ বর্ণা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা তারা।

তারপর হলেন ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

আবার হলেন ছিন্নমস্তা—ধূমাবতী! হবেন কমলা।

মানুষের মধ্যেই হবেন। শান্তিকে সৃষ্টির রূপ দেবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। সে চৈতন্য এবং হৃদয় নিয়ে এসেছে। তার মহাপ্রকাশ হবেই।

ইঞ্জিনীয়ার এবার আর থাকতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ। হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—শান্তির তরে নাচেরে! এই সব বাজে গল্প আর বলবেন না। রাম নামের জন্যে গান্ধী এ যুগে চলল না। মরে ভূত হয়ে গেল।

ভেটকী বললে—ও কথা বলো না মেজদা! গান্ধী তো ভূত হয়ে আছে! স্টালিন মরে ভূত হয়ে রেহাই পায়নি। তাঁর ভূতকে তাড়িয়ে ছেড়েছে!

ইঞ্জিনীয়ার বললে—আমি গান্ধীকেও মানি না। স্টালিনকেও মানি না। জহরলালকে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে মানি—নইলে তাঁকেও মানি না। গান্ধীর শান্তি চরকা। স্টালিনের শান্তি—আয়রন্ কার্টেন, জহরলালের শান্তি হাতী। আইসেনহাওয়ার ক্রুশ্চেভের শান্তি খাস অ্যাটম বোমা। পড়ে শান্তি আসবে। ত্রিকালদাদুর ব্রহ্মা মন্ত্র পড়াবেন—বিষ্ণু শ্রাদ্ধ করবেন। শ্রাদ্ধ শেষে পিণ্ডিভাগ করে সরিয়ে বলবেন, পিণ্ডগয়ং গচ্ছ-গয়ং গচ্ছ! ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। সমস্ত পৃথিবীটাই তখন ধুলো হয়ে সূর্যের চারিদিকে একটা আণবিক কুহেলিকার মত হিল্ হিল্ ক'রে কাঁপবে!

ত্রিকালদাদু হেসে বললেন—না। তা হবে না। সংসারে কেউ মিথ্যা নয়। ওরা সবাই সত্য। মানুষ সত্য যে!

ভেটকী বললে—ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। ও নাস্তিক। আপনি গল্পটা শেষ করুন দাদু!

দাদু বললেন—এ গল্পের শেষ নেই ভাই। এ গল্প চলছে। শেষ হবে মানুষের মধ্যে মহাশক্তির কমলা রূপের মহাপ্রকাশে! সেই তার লক্ষ্য। ভেটকী ভাই, তুই আমাকে শুনিয়েছিলি, তোর তো রবি কবির বাণী কণ্ঠস্থ। শুনিয়ে দে তো—সেই যে—মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগে লিখেছিলেন। সেই যে—"মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ—"

সন্তু চোখ বুজে শুনছিল—সেই বলে গেল—ভেটকী তার সঙ্গে যোগ দিলে—সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ—"

ত্রিকালদাদুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

চোখ মুছে বললেন—রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর সেই এক সঙ্গে ছবিটা কই ভাই—প্রণাম ক'রে রবিবারের আসরের পালাটা শেষ করি! গল্পে যদি মন না উঠে থাকে ভাই তবে বুড়ো বলে ক্ষমা ঘেন্না ক'রে নিস। আরে ইঞ্জিনীয়ার তোমার চোখে পড়ল কি? কচলাচ্ছ যে?

—কুটো পড়েছে দাদু!*

* একটি রবিবারের সকালের মজলিসের আলাপের অনুলিপি। গল্প নয়। ইতি

বোম্বাই-পুনা রাস্তা; ওপারে ডেহু রোড স্টেশন, এপারে পাকা-ভিত, টালির ছাউনি-দেয়া মিশনারী স্কুল।

স্টেশনটি মজবুত, রাস্তাটি নির্জন আর পরিচ্ছন্ন, স্কুলটি এখনও নাবালক।

জীপ গাড়ি থামাল ক্যাপ্টেন নিবারণ দাশগুপ্ত, ঘড়ি দেখল, পুণা থেকে ডেহু রোড উনিশ মাইল, আধ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে একটা খোঁড়া কুকুর পর্যন্ত চাপা দিতে পারেনি সে, মানুষ ত দূরের কথা! মুখ ফিরিয়ে গাড়ির পিছনে তাকাল, রাইফেল-ধারী কয়েকজন সিপাহী লাফিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়, রাইফেল রাখল কাঁধের উপর, পড়ন্ত বিকেলের আলোয় বেয়নেট চোখ রাঙিয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন নিবারণ দাশগুপ্ত আঙ্গুলে উঁচিয়ে নির্দেশ দিল, 'ক্যাম্প!'

এক পাক ঘুরে জুতোর সঙ্গে জুতোর ঠোক্কর মেরে রাইফেলে থাবা মারল সৈনিকরা, কাঁধে রাইফেল থাকলে 'স্যালুট' করার রীতি নেই। আর একবারও ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় লোক চারটি এগিয়ে গেল তাঁবুর দিকে।

এখানে জীপ থামাবার কথা নয়। তাঁবু খাটানো হয়েছে আরও একটু এগিয়ে, ডেহু পাহাড়ের নিচে,—যেখানে কয়েকদিন আগে সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে কিছু জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

স্কুলটার পিছনে অস্থায়ী ঘের-দেওয়া জমিটার দিকে তাকাল নিবারণ দাশগুপ্ত। এদিকটা আরও নির্জন, নির্জনতা তার ভাল লাগবে না এমন কি কথা আছে? জমিটা রুক্ষ, তবু মনে হল তার—একটু ঘরোয়া সারল্যের ইঙ্গিত যেন রয়েছে এখানে, হয়ত একটিমাত্র নিঃসঙ্গ কৃষ্ণচূড়া গাছই এর কারণ। বিনা রক্তপাতে জমি দখল করা গেছে, ব্যাপারটা শুনতে ভাল! তবু সেদিন এখান থেকে পুনা ফিরে যাবার আগে তাকে চেপে ধরেছিল সেই নৈরাশ্য, আর একটা চাপা রাগ; তেমন কিছু অন্ধকারও হয়নি সেদিন, অথচ জীপের কাছে মানুষ আসা দূরের কথা, গলার ক্ষীণতম শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়নি সে। এক দৌড়ে পুনা, হেড লাইটের আলোয় উড়ন্ত পোকার কাতরানি ছাড়া আর কিছুই নয়, এমন কি একটা বেখাপ্পা লাফ পর্যন্ত দেয়নি গাড়িটা। পুনা হেডকোয়ার্টারে গিয়ে কর্নেল লেল্যান্ডকে নাড়া দেবার মত একটা খবরও তার ছিল না।

'হ্যাঁ, জমি দখল করা হয়ে গেছে, সার, সান্ত্রী মোতায়েন রাখা হয়েছে। কেনো পর্যন্ত সাড়া দেয়নি।' স্যর শব্দটা বাদ দেবার চেষ্টা করেও পারেনি বলে নিজের উপর বিরক্ত হয়েছিল সে।

'কোনো পাহাড়ী ইঁদুরের উৎপাত?'

নিবারণ দাশগুপ্ত উত্তর দিতে যাচ্ছিল, লেল্যান্ডের গলার স্বরে বিদ্রূপ আর লাল গোঁফের নিচে ঠোঁট-বাঁকানো ঘৃণা তাকে চাবুক মারল। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে হাতলের উপর পা তুলে দিয়েছিল লেল্যান্ড; দপ্তর নয় সেটা, বিশ্রামাগার, কুরসীরও অভাব ছিল না, তবু ক্যাপ্টেন দাশগুপ্তকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়েছে; লেল্যান্ড, লেল্যান্ড এমন বিদ্রূপ করবার কে? ইংল্যান্ডে কোনো অখ্যাত কলেজে

তোমার মূল্য নিরূপিত হয়নি; দাঁড়াও, লড়াইটা থামুক।

লেল্যান্ডের বিদ্রূপটা সহ্য করতে পারেনি সে। 'তুমি যাকে পাহাড়ী ইঁদুর বলে উপহাস করছ—তাকে কি বলা হয় জান?'

'কোথায়?'

'ইতিহাসে, মহারাষ্ট্রে?'

'কি?' লেল্যান্ড আরও বিশ্রী করে হাসল হলদে দাঁতের সারি দেখা গেল তার, আর ঘরের বাতাসে মৃদু হুইস্কীর গন্ধ।

'ক্রিয়েটার অফ্ এ নিউ নেশন।'

লেল্যান্ড জোরেই হাসল। পা নামাল চেয়ারের হাতল থেকে, সোজা হয়ে বসল

বার করে হাত বাড়িয়ে বলল, 'হ্যাভ্ এ সিগারেট ক্যাপ্টেন।'

কাছেই চেয়ার। লেল্যাণ্ড অধ্যাপক, তবু যুদ্ধের শুরুতেই কর্নেল? বড় জোর এক-জন নির্বাহ লেফটেনাণ্ট হওয়া উচিত ছিল তার। চেয়ারটার দিকে চোখের কোণ থেকে তাকাল নিবারণ। ডেহ্ রোড থেকে প্রায় রাজ্য জয় করে আসছে সে। ভারত সরকারের গোলাবারুদের ডিপো তৈরি হবে, নির্বিবাদ অবস্থিতির বন্দোবস্ত করে এসেছে, কে লিখবে এ যুদ্ধের মেময়রস্?

'নো, থ্যাংকস্!'

লেল্যাণ্ডের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত; সকালের কামানো পুষ্ট গালে হালকা, নীল শ্যাওলার রং ধরেছে, তবু বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোয় রক্তোচ্ছ্বাসটা গোপন রইল না। ঠোঁটের বাঁ দিকে সিগারেট রাখল সে, নিবারণের দিকে না তাকিয়ে সিগারেটটা আবার হাতে নিল, পরীক্ষা করল ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে আবার রাখল ঠোঁটে, দেশলাই বার করল ট্রাউজারের বাঁ পকেট থেকে, উপর দিকে ছুঁড়ে মারল, খপ করে ধরে ফেলল ডান হাতে: কিন্তু সেই মৃদু হাসিটা বজায় রেখেছে এতক্ষণ, নিবারণ জানে, তার জন্যই। লেল্যাণ্ড সাবধানী-হাতে আবার সিগারেটটা রাখল ঠোঁটের বাঁ দিকে, আবার নিল হাতে; মুখ তুলে বলল, 'আসলে তোমাদের এই বীর ইন্দুরটি একটি তস্কর সর্দার: দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, লোভী আর উচ্চাভিলাষী। বাট্ দি জোক্ ইজ্—' সিগারেট মুখে রাখল লেল্যাণ্ড, ধরাল, একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া বার করল, 'সিদ্ধির সঙ্গে যখন মিশানো থাকে ভগবৎপ্রেম, ব্রাহ্মণে ভক্তি আর গো-রক্ষার আদর্শ—তখন সেই বীরকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করা খুবই স্বাভাবিক।'

লেল্যাণ্ডের গলার উত্তাপটা অনুভব করেছিল নিবারণ, আর—সেই মুহূর্তে বিরুদ্ধ বক্তব্যও মুখে এসেছিল তার। কিন্তু লোকটার ছেলেমানুষীরও পরিচয় সে পেয়েছে। অন্তত চার-পাঁচ বার রোজার গল্প করেছে লেল্যাণ্ড, সতী যে শুধু ইণ্ডিয়াতে ছিল তা নয়, ইংল্যাণ্ডে এখনও আছে, যেমন তার স্ত্রী রোজা। নিবারণ হাসেনি; মনকে আশ্বাস দেওয়া, আশ্বস্ত করা! আট হাজার মাইলের ব্যবধান বা হুইস্কীও যে-আশংকা ঝাপসা করতে পারেনি, কাঁটার মত অনুক্ষণ যা মনকে বিঁধেছে—তার বিরুদ্ধে বক্তৃতার ঝংকার!

'ডেহ্ রোডেই ক্যাম্প কর তোমার', লেল্যাণ্ড বলেছিল, 'ডিপোর পত্তন শুরু কাল থেকেই, ট্রাকের অভাব হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট দাখিল করবে। দ্যাটস্ অল্, ইউ ক্যান গো।'

নিবারণ টুপিতে হাত ঠেকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে; তবু একবারও তার মনে হয়নি সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নিলে ভাল করত সে।

ডেহ্ রোডের পাহাড়ী নির্জনতায় তাঁর নির্বাসন, সে জানে। পুণা হেডকোয়ার্টারে থাকবার বাসনাটা লেল্যাণ্ডকে ব্যক্ত করে ফেলেছিল একদিন।

স্টীয়ারিং হুইল থেকে হাত সরিয়ে নিল নিবারণ, পা ছড়িয়ে দিল আরও একটু। ডেহ্ রোডে কয়েকজন গ্রামীণের জমি অধিকার করেছে সে, লোকগুলির নিষ্ফল আবেদন পৌঁছেছে তার কানে, আক্রোশটা

যায়নি; নিবারণ জানে—ওখানে তার নিজের থাকবার ব্যবস্থা করা মানে তার মেজাজের উপর বলাৎকারের ব্যবস্থা। মাল পৌঁছাতে আরম্ভ হোক আগে, তখন মনকে তৈরি করে নেবে। কিন্তু কোথায় যেন বাধা পেল মন। লাল গোঁফের নিচে হলদে-দাঁত-বার করা হাসিটা কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারছে না!

জীপ থেকে নামল সে। স্কুলটার দিকে তাকাল। রাস্তায় অশ্বত্থ গাছের নিচু শাখাটায় শালিক ডাকছে, চোখ তুলে দেখল সেই মুরুব্বি ঢঙে গলা নাচানো। লোহার নিচু গেট খুলে নিবারণ ভিতরে ঢুকল। স্কুল-কোটার সামনে কয়েক হাত জমির উপর বাগান-তৈরি-খেলার চিহ্ন! ফুলের স্বপ্ন দেখবারও সময় পাবে না গাছগুলো, অতি রুক্ষ জমি, অতি জ্বলন্ত সূর্য!

শেষ ঘরটায় পর্দা ঝুলেছে। লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল সে খাতে পাকা মেঝেয় জুতোর শব্দটা বেশ জোরেই প্রতিধ্বনিত হয়। দরজাটা খোলা পর্দাটা মন্থর হাওয়ায় দুলছে। পর্দার বাইরে লোক এসে প্রশ্ন করার পক্ষে জুতোর শব্দটা যথেষ্ট। শব্দটা আরও জোরে করতে পারত সে, চৌত্রিশ বছর বয়সেও যে-ক্লান্তিটা দেখা দেয় মাঝে মাঝে—সেটা যে শারীরিক ক্লান্তি নয়, এটা সে অনুভব করে।

আরও দু'এক মিনিট অপেক্ষা করল ক্যাপ্টেন নিবারণ দাশগুপ্ত, আরও জুতোর শব্দ করল; কোনো ফল হল না। সিগারেটের প্যাকেট বার করল, সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়িয়ে দিল পর্দায়; কাপড়টায় আগুন ধরে উঠল, আর পরমুহূর্তেই ঘরের মধ্যে চেয়ার উল্টে পড়ল, পর্দার অন্য পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল সাদা আলখাল্লা-পরা একটি লোক, গলায় ঝুলছে রুপোর ক্রুশ, কোমরে বাঁধা কালো রেশমের দড়ি; ডান হাতের ছোট বাইবেলটার মধ্যে তর্জনী ঢোকানো; এবার নিবারণের দিকে আর একবার জ্বলন্ত পর্দার দিকে হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে মুখটা উঁচিয়ে নির্গত ধোঁয়ার তরঙ্গে ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত বলল, 'ডোণ্ট বি এ ফুল, কাণ্ট ইউ সি, ইটস্ বার্নিং?'

খর্ব আকার স্থূল দেহ গোল মুখ পুরু ঠোঁট ছোট নাক ঘন ভ্রূ ওল্টানো চুল, আর কাঁচের গুলির মত চক্‌চকে চোখ, যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতি স্থির দৃষ্টি—বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। নিবারণ ওর দিকে তাকিয়ে হাসির একটা ভঙ্গী করল, অত্যন্ত যত্ন-করে-ছাঁটা সরু মসৃণ গোঁফের প্রান্তে হাসির ঈষৎ সংকেত মাত্র! হাত বাড়িয়ে লোহার হুক থেকে ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে পর্দাটা খুলে ফেলল সে, আগুনটা নিবিয়ে ফেলল জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে; ডাণ্ডাটা ফেলে দিল উঠানে। তখনও ধোঁয়া গুমরে উঠছিল। জুতোর ঠোক্কর দিয়ে একদা-পর্দার অবশিষ্টটুকু মাটিতে নামিয়ে দিল সে।

বাইবেলটাকে দু' হাতে আঁকড়ে ও বলে উঠল, 'খ্রাইস্ট!' তাকাল রাস্তায় জীপের মাড্‌গার্ডে ছিটকে-পড়া সূর্যের আলোর দিকে।

নিবারণ বলল, 'নেভার মাইণ্ড খ্রাইস্ট, তুমি কে?'

'আমি ঈশ্বরের একজন অধম দাস, এই স্কুলের শিক্ষক ফাদার জোসেফ রমন।'

'এত অল্প বয়সেই ফাদার? ইংরেজী ছাড়া আর কোন্ ভাষায় কথা বলতে পার তুমি? বাংলা বলতে পার?'

'তুমি বাঙালী?'

'তুমি ব্যাংকাটা রমনের কেউ হও নাকি?'

'ব্যাং কাটা? কে ব্যাং কাটা?'

'যে রমণ-রশ্মি আবিষ্কার করেছিল।'

'না।'

'তোমাদের স্কুলের পিছনের জমিটায় আমি তাঁবু খাটাব, জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে, কাল সকালেই।'

ফাদার জোসেফ রমণ পুরু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তা কি করে হবে?'

'সহজ, কাল ভোরবেলা দেখতে পাবে।'

গোল চোখ ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট হয়ে উঠল: 'এই ত ডেহু পাহাড়ের নিচে জমি দখল করেছ তোমরা, কিছু লোকের নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে তাতে, জমির ফসল থেকে—'

'থাম, তোমার বক্তৃতা শোনবার সময় নেই আমার! জাপানী বোম্বেটেরা বর্মা-সীমান্তে পেশীছেছে তার খবর রাখ? লণ্ডনে সেদিন বোমায় দু হাজার লোক মারা গেছে, আর আহত হয়েছে আট হাজার।'

রমণ বাঁ হাতে গলায়-ঝুলেনো ক্রুশটা একবার স্পর্শ করল, বলল, 'এসো, ঘরে বসবে।'

'সময় নেই।'

'তোমরা এখানে তাঁবু খাটালে হল্লা হবে, শান্তি-ভঙ্গ হবে।'

'পৃথিবীতে কোথাও যখন শান্তি নেই, তুমি কোন্ যুক্তিতে শান্তি দাবী কর?'

'আমরা শান্তির দূত।'

'তোমরা পলাতক। মৃত্যু আর নরকের ভয় দেখিয়ে তোমাদের যত প্রতিপত্তি!' রমণের পুরু ঠোঁট কেঁপে উঠল: 'পুরুত আর পাদরী, সন্ন্যাসী আর সাধুবাবা—এরা সবাই মানুষের ভয়ের সুবিধে নিয়ে নির্বিবাদে রাজত্ব করে চলেছে, তোমরা ম্যাকিয়াভেলির চাইতেও শঠ।'

দূর-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে চোরা বাতাস ছিটকে এল এদিকে, নিবারণের কপালে মুখে গলায় পিছলে গেল সে-বাতাস। সাপের মত চঞ্চল স্নায়ু তার বেদিয়া-বাঁশীর ক্ষণিক-মূর্ছনায় তন্দ্রাহত হয়ে এল।

'ম্যাকিয়াভেলি?'

'হ্যাঁ, একজন সেকেলে ইতালীয় কূট রাজনৈতিক।'

জোসেফ রমনের মসৃণ, ছোট কপালে তিনটি সরল রেখা ফুটে উঠল, 'কুমারী চন্দ্রিকা বাইকে জিজ্ঞেসা করতে হবে।'

'ঈশ্বরের একজন অধম দাসী নাকি?'

'এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।'

'কুমারী?'

'হ্যাঁ, কুমারী।'

'ইন্‌টারেস্‌টিং!' নিবারণ আবার সিগারেট বার করল, 'হ্যাভ এ সিগারেট, ফাদার!' লেল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ল তার, দেশ-লাইয়ের কাঠির মত ফস্ করে জ্বলে উঠল ভিতরটা।

'নো, থ্যাংকস্।'

অধম দাসটিকেও সে পাঠাবে নির্বাসনে। এ বাড়িটায় ভাল অফিস হতে পারে, রিক্রুটিং অফিস, কিংবা একটা ক্লাবই বা মন্দ কি?

সিগারেট ধরিয়ে নিবারণ বলল, 'চন্দ্রিকা বাই-এর তোয়াক্কা করি আমি একথা মনে করো না ফাদার!'

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল তারা, সিগারেটের ধোঁয়া বার করবার জন্যে একটু মুখটা ফিরানো বুঝি বা শোভন ছিল, নিবারণ ভ্রূক্ষেপ করল না: ধোঁয়া লেগে কাঁচের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, তবু পলক পড়ল না চোখে! 'চল, ঘরে বসবে, আমি তোমায় ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারি কিংবা ফ্লাস্কের চা।'

'না, ওসব পানসে আতিথেয়তায় আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।'

বাইবেলটা আরও জোরে চেপে ধরল ফাদার জোসেফ রমন।

সিগারেটে আড়াইখানা টান দিয়ে নিবারণ বলল, 'ওয়েল! দ্যাটস্ দ্যাট, কাল সকালে তাঁবু পড়বে।' পিছন ফিরল সে।

'তোমার জন্য প্রার্থনা করব আমি।'

নিবারণ ঘুরে দাঁড়াল, হাসল, সংক্ষিপ্ত হাসির একটু ঝঙ্কার মাত্র!

দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নামল সে, কয়েক হাত কাঁচা মাটির উঠোন, লোহার গেট, তারপর নির্জন বোম্বাই-পুনা রোড। বাঁ দিকে খানিকটা ঢালু জমি, রুক্ষ কর্কশ; তারপর রেল লাইন পার হয়ে ডেহু বাজার, বাজার ছাড়িয়ে গাঁও, বসতি। নিবারণ জীপে উঠল, স্টার্ট দিল গাড়িতে। নিরীহ
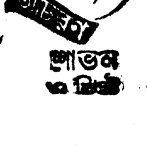
নিদ্রালস জন্তুটা হঠাৎ যেন জেগে উঠল, কেঁপে উঠল, রেগে উঠল। গাড়িটার আচমকা একটা লাফে ছন্দপতনের নিমেষ-বিতৃষ্ণায় নিবারণ প্রায় ধৈর্য হারাচ্ছিল, বিরক্ত হল, বলল, ' ড্যাম ইট।' সংকল্প করল এমন শপথ আর কখনও ব্যক্ত করবে না, লেল্যাণ্ডের কথার প্রতিধ্বনি করবার অধঃপতন কেন হবে তার? পায়ের চাপে অ্যাক্সিলেটর ডুবিয়ে দিল সে; মর্মান্তিক চাবুকের ঘায়ে জন্তুটা ক্ষেপে উঠল যেন। ক্ষতি নেই, হাতের মসৃণ চাকাটা স্টিয়ারিং হুইল নয়, ক্ষ্যাপানো জন্তুর কেশর।

নিবারণ গাড়ি থেকে নামতেই সান্ত্রীরা স্যালুট করল। পড়ন্ত সূর্যের আলো ঠিকরে পড়েছে ডেহু পাহাড়ের গায়ে। এই সেই জায়গা—যেখানে গোলাবারুদের গুদোম তৈরী হবে, এখনও এখানে সেখানে উষ্ণ বাতাসে দুলছে কলঙ্কিত ফসল। কাঠের খুঁটির সঙ্গে কাঁটা তার আটকাচ্ছে কয়েকটি সান্ত্রী। আজ রাত্রি নামবার আগেই শেষ করতে হবে কাঁটা তারের বেড়া, ক্যাপটেন সাহেবের হুকুম। রাস্তার উপর গুটি কয়েক মিলিটারী লরি, বেড়ার ওপাশে তিনটি তাঁবু, আরও সরঞ্জাম নামানো হয়েছে মাটিতে, কয়েকটি পেট্রোম্যাক্স আলো। এই ধূলি-বিকীর্ণ রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে বোম্বাই-পুনা রোডে। কাছেই চিল্‌কী নদী, খবর শুনেছে নিবারণ, চোখে দেখেনি। লোক জটলা করছে দূরে দূরে, চিল্‌কী নদীর পাড় থেকে গ্রামের শুরু। কিন্তু এসব চলবে না, লোক জমতে দেওয়া হবে না আশেপাশে, এটা তামাসার জায়গা নয়, নিবারণ হাঁক দিল, প্রায় ছ ফুট লম্বা কৃশদেহ সুবেদার লিঙ্গরাজ কোন্ অদৃশ্য স্থান থেকে সামনে এসে দাঁড়াল, কপালে হাত ঠেকাল তলোয়ারের মত।

'এখানে কি তামাসা দেখানো হচ্ছে?' একটা পা মাডগার্ডের উপর তুলে দিয়ে বলল নিবারণ, 'ভিড় হাটাও।'

সুবেদার লিঙ্গরাজ বাদামী-তেল-শাসিত ঢেউ-খেলানো ঘন চুল নাচিয়ে দৌড় মারল; ইশারা করল দুজন সান্ত্রীকে। নিবারণ কয়েক পা এগিয়ে একটা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। হাওয়া বইছে এতক্ষণ পরে; দূরে পাহাড়ের পিছনে দেখা যাচ্ছে আধখানা গোলাপী সূর্য, ক্রোধ-ক্লান্ত সূর্য!

লিঙ্গরাজের চীৎকার আর বেয়নেটের হুমকিতে লোক পালাচ্ছে!

ফিরে এসে সে বলল, 'আর ঘণ্টা দুয়েক, স্যার,' পকেটে হাত ঢুকাল সে, কিন্তু রুমালটা বার করে ঘর্মাক্ত কপালে একবার বুলিয়ে নেবার সাহস পেলে না, হাত বার করে আনল।

নিবারণ সিগারেটের প্যাকেট বার করে

কাল সকালে সাড়ে আটটার মধ্যে পুনো

হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট নিয়ে যাবে, আমি তৈরী করে রাখব।'

'ইয়েস্ সার।'

হুকুম তামিল করা হয়েছে। হিসেব-করা চৌহদ্দির চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া খাটানো শেষ। তাঁবুর বাইরে লোহার খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে নিবারণ, দূরে পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বলছে, রাস্তার ওপাশে উনুন জ্বলছে দুটো, রান্নার তোড়জোড় চলছে, উনুন থেকে ছিটকে আসছে স্ফুলিঙ্গ, হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার আনন্দ; নিবারণ ঘড়ি দেখল, সাড়ে আটটা বাজে! উজ্জ্বল আলোটা চোখকে পীড়া দিচ্ছে, খাটের প্রান্তে তার কোর্তা, টুপি আর বেল্ট; গেঞ্জিটা গা থেকে খুলে ফেলতে গিয়ে হাত নামিয়ে নিল সে। সৈনিকদের মৃদু কথা আর টুকরো হাসির শব্দ! গাছের নিচে আগুনের আভা, তার ওপারে ঘন অন্ধকার। হয়ত ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ডাকুক, কান পেতে শোনবার মত এমন কিছু নয়। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল সে, পোর্টম্যান্টো খুলে পা-জামা আর চটি জোড়া বার করবার ইচ্ছেটা উঁকিঝুঁকি মারছিল, থাক, এখন নয়, কে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢোকে! ফিতে খুলল সে, কিন্তু জুতো জোড়া রইল পায়ে। তবু যেন ঝিঁঝিঁর শব্দ শোনা যায়, গাছের শাখায় মৃদু, অস্পষ্ট মর্মর, আর পাহাড়ী বার্তাবহ বাতাসের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলবার ষড়যন্ত্র। মাথা নাড়া দিল সে, সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল পাশ থেকে, মাটিতে জুতোর ঠোক্কর মেরে ধুলো ওড়াল; তবু এ-মুহূর্তে মনে পড়ল ঃ অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসেনি, সন্ধ্যার আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা দিয়েছে, একটিমাত্র দূর, নির্জন নক্ষত্র, তারপর ক্ল্যাকস্টন হর্ন, সিপাইদের চীৎকার, মিলিটারী ট্রাকের ঘড়ঘড়, আর মনকে বিক্ষিপ্ত করবার অনেক রকম সমারোহ এখানে। তারও পরে মাঝে মাঝে তাকিয়েছে সে আকাশের দিকে, ভিড়ের মধ্যে কখন হারিয়ে গেছে তার প্রথম-দেখা নক্ষত্র; —আর আজও এই নির্জন রাত্রে সেই তাপটা কি না শিখায়িত হয়ে উঠছে বার বার।

'খানা তৈয়ার সাব।'

বিরক্তিটা থামাতে হল নিবারণকে, নিজের উপর এমনি বিরক্তিতে দিনের পর দিন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তার মন। এমন সস্তা ব্যাপারে আর কত দিন মেতে উঠবে সে! খেতে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

আরও পরে অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে ঘুম আনবার চেষ্টা করল সে; তাঁবুর বাইরে গাছের মাথায় পাহাড়ী বাতাসের ডানা-ঝাপটানি; সেন্ট্রির বুটের শব্দ! তারই এক জন্মদিনে হীরের আংটিটা উপহার দিয়েছিল রমলা! ড্যাম ইট্ বলে উঠতে যাচ্ছিল সে, তার বদলে বলল, চুলোয় যাক; না, আরও ভালো জাহান্নমে যাক। কাল সকালে ঘুম ভাঙলেই নূতন মানুষ সে।

সকাল হল, ঘুমও ভাঙল। অস্থায়ী গোলামখানা থেকে সে চিল্কী নদীতে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল। নদীতে সাঁতারও কাটল কয়েক মিনিট। ভাঙা ঘাটে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছল সে, জাঙিয়া খুলে পাজামা পরল, গ্রামের পুরুষেরা—যারা ঘাটে এসেছিল—তারা দেখাল অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ, মেয়েদের চোখে দেখা দিল কৌতুক আর বিস্ময়।

তাঁবুতে ঢুকে ক্যাপ্টেন নিবারণ দাশ-গুপ্ত পাজামাটা খুলে ছুঁড়ে মারল খাটিয়ার উপর, হাঁক দিল, 'অর্ডারলি!'

জুতোর সঙ্গে জুতোর খটাখট্ শব্দ হতেই নিবারণ পিছন ফিরে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে খাকি প্যান্টটা তুলে নিয়ে বলল, 'ব্রেকফাস্ট, জলদি!'

'ইয়েস্ সার।' আবার জুতোর ঠোক্কর, স্যালুট!

প্রাতঃরাশ শেষ করতে করতেই পোশাক পরে ফেলল সে। জীপ তৈরী ছিল, এক দৌড়ে মিশনারী স্কুলটার পিছনে; জীপ থেকেই দেখতে পেল তার নির্দেশ মত তাঁবু দাঁড়িয়ে গেছে, কাঠের খুঁটিতে দড়ির প্রান্ত-গুলিও বাঁধা শেষ। লম্বা লিঙ্গরাজ দু'পা ফাঁক করে, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফাদার রমনের সঙ্গে কথা বলছে।

জীপ থেকে নামল নিবারণ, এগিয়ে গেল, লিঙ্গরাজ পা জোড়া করে হাত ঠেকাল টুপিতে, রমন বলল, 'গুড মর্নিং ক্যাপটেন।'

নিবারণ বলল, 'মর্নিং টু ইউ!' হাসল সে। সকাল বেলা মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি অনুভব করল, নিজের উপর কিছুটা খুশি না হয়েও পারল না।

জোসেফ রমনের হাতে বাইবেল, পরিষ্কার কামানো গাল, গোল চোখে অসীম ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা, বলল, 'আমি তোমায় এখনও অনুরোধ করছি, এখান থেকে তাঁবু

গ্নটিয়ে নাও, ছেলেমেয়েদের পড়াশনোর ক্ষতি হবে, তাদের মনোযোগ নষ্ট হবে! তাঁব্ ফেলবার জায়গার অভাব নেই ডেহ্ তল্লাটে।'

আসছিল, নিবারণের মনে একটা নীল নির্লিপ্ত আসছিল, একটা শান্ত ঔদার্য উঁকিঝ্ঁকি দিচ্ছিল, মনে মনে না বলে সে পারল না: এই গণ্ডারটা সব পণ্ড করে দেবে। কিন্তু তব্ সে হাসল, সে জানে খ্ব বেশি রকম না হাসলে তাকে খ্ব একটা ভিলেন-এর মত দেখায় না; গলাটা নরম করেই সে বলল, 'এসো, ফাদার, তাঁব্র মধ্যে দ্টো চেয়ার টেনে বসা যাক, দ্একটা উচ্চ-মার্গের বাণী শ্নাও, মনটা সিক্ত হয় কি না একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

দিনটা ভাল ছিল, ভাল না যাবার কোনো কারণও ছিল না, তব্ ফাদার রমন নিবারণকে বলল, 'আমি তোমায় মিনতি করছি!'

আর হাসবার চেষ্টা করল না নিবারণ, উত্তর দিল, 'তোমার নির্ব্দিধতা আমি কেমন করে ক্ষমা করি? বল।'

'আমি তোমার ঈশ্বরের নামে আদেশ দিচ্ছি!'

নিবারণ ঘড়ি দেখল, ম্খ ফিরিয়ে লিঙ্গরাজকে বলল, 'আর আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা চাই, তারপর প্ণা হেড কোয়ার্টার, আমার তাঁব্তে রিপোর্ট আছে, আমি একট্ ঘ্রে আসছি, আমার জিনিসপত্র এখানে দিয়ে আসবে, একজন সেণ্ট্রি; ক্লিয়ার?'

লিঙ্গরাজ বলল, 'ইয়েস স্যর।'

জীপে গিয়ে উঠল নিবারণ, একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ি ছোটাল।

বাইবেলটা দ্হাতে আঁকড়ে ফাদার জোসেফ রমন ফিরে এল তার ঘরে, দরজায় ন্তন পর্দা ঝ্লেছে।

ঠিক আধা ঘণ্টা পরেই ধ্লো উড়িয়ে ফিরে এল নিবারণ। জীপ থেকে দেখল তাঁব্ তৈরী, রাইফেল ঘাড়ে সেণ্ট্রি ঘ্রে বেড়াচ্ছে সামনে। আর দেখল—অতি স্বচ্ছন্দে সাইকেল চালিয়ে আসছে একটি মারাঠি তর্ণী। ইঞ্জিনটাকে থামিয়ে দিল সে, গাড়ির সামনের কাঁচটাকে তুলে দিল হাত দিয়ে, র্মাল দিয়ে কপালটা ম্ছল একবার। স্কুলের কাছে এসে সাইকেল থামাল সে, ঠেকিয়ে রাখল গেটে; দ্রত্ব খ্ব বেশি নয়, তর্ণী মেয়েটি তাকাল, প্রথমে দেখল জীপ গাড়িটা, তারপর আরোহীকে; দেখে না দেখবার ভান ও করল না, নকল তাচ্ছিল্যের অভিনয়ও নয়, আঙিনা পার হয়ে স্কুল-বাড়িতে উঠল সে।

নিবারণ নামল জীপ থেকে, তাঁব্র সামনে এল, সিপাহীটি চলা থামিয়ে রাইফেলে থাপ্পড় মারল। তাঁব্র মধ্যে তার সব জিনিসপত্র এসে গেছে; খাটিয়া, দ্টি লোহার চেয়ার, লেখবার টেবিল পর্যন্ত! রিভলবার আঁটা বেল্টটি খ্লে সে ঝ্লিয়ে রাখল দড়িতে, কাঁধে তিন ফ্ল লাগানো শার্ট খ্লে রাখল চেয়ারের পিঠে। কৃষ্ণচ্ড়া গাছটার নীচেই তাঁব্ খাটানো হয়েছে, রোদের তাপ বাড়তে দেরি হবে, গেঞ্জিটা গায়েই রাখল সে। লোহার খাটিয়ার উপর প্র্ কম্বল, চাদর পাতা; নিবারণ জ্তোশ্দ্ধ চীৎ হয়ে শ্রে পড়ল দ্টো হাত মাথার নীচে দিয়ে, চোখ ব্জল; রাখ তোমার য্দ্ধ! আর একটি বরফ-য্গ আসা পর্যন্ত মান্ষ লড়াই করবে; অতএব ডেহ্ রোডে গোলাবার্দের গ্দাম তৈরী নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। রমলার পাতলা ঠোঁট, সাদা দাঁত, কালো ভ্র্, সর্ আঙ্গ্ল, লেল্যাণ্ডের হলদে দাঁত আর চেয়ারের হাতলের উপর পা ছড়িয়ে দেয়া; লিঙ্গরাজের তেলে-ভিজা ঢেউ-খেলানো চুল আর কঠিন ঋজ্ দেহে দাস-মনোব্ত্তির নমনীয়তা; জোসেফ রমনের দ্ধ-মাখন-প্ষ্ট-মেদ আর বাইবেলের মত সরল নির্ব্দিধতা—নিবারণ হাঁক দিল, 'সেণ্ট্রি!'

মাথা নিচু করে রাইফেল সামলে সিপাহীটি তাঁব্তে ঢ্কল, নিবারণ বলল, 'আভ্হি যাও।'

সিপাহী বেরিয়ে গেল।

ওর পায়ের শব্দটা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আবার চোখ ব্জল সে। আর সে নিজে? নিজে কি? হলদে দাঁতের পিছনে আবেগ আছে, বিদ্যা ত আছেই; ঢেউ-খেলানো চুল আর কালো চামড়ার নীচে আর কিছ্ না থাক, একটা নির্মম কাঠিন্যের ইঙ্গিত ত অন্তত রয়েছে; বাইবেলে যার সে ত মর্মান্তিক

তুমি এদের ক্ষমা ক'রো; সে-বাইবেল যার হাতে—তবু ত তার জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে, স্থিতি আছে, আর রমলা!

তাঁবুর দরজায় পায়ের শব্দে আবার চোখ মেলল সে, মারাঠি তরুণীটি ফিরে যাচ্ছিল, নিবারণ সোজা হয়ে বসে বলল, 'শোন, যেও না।'

ফিরে দাঁড়াল মেয়েটিই। সহজাত হাসির আভায় উজ্জ্বল মুখ, হাত জোড় করে বলল, 'নমস্তে!'

নিবারণ নিজের উপর বিস্মিত হল, সেও হাত জোড় করে বলে ফেলল, 'নমস্তে!'

তাঁবুর খোলা প্রান্তে হাত রেখে দাঁড়াল মেয়েটি। দীর্ঘাঙ্গিণী, সঠাম গড়ন; মাঝখানে সিঁথি, দু'পাশের চুল একটুও ফাঁপানো নয়, কানের দু'পাশে টেনে বাঁধা; আর বিনুনী-করা চক্রাকার খোঁপাটির কিছু অংশ কানের নীচে গলার দু'পাশ দিয়ে চোখে পড়ে। 'মাপ কিজিয়ে, আপ—'

'বরং তুমি আমায় মাপ কর,' ইংরেজিতে বলল, নিবারণ, 'হিন্দী আমার আসে না, যে-দু একটা কথা জানি তার সাহায্যে তোমার সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব, আর তা এমনই বিকৃত যে হাসতে হাসতে তোমার পেট ব্যথা হয়ে যাবে, এমন সুন্দর মেয়ে তেমন হাসলে সহ্য করব কি করে?'

'তোমার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন', ও উত্তর দিল ইংরেজিতে।

নিবারণ দাঁড়াল, বলল, 'তুমি কি ভিতরে আসবে না? অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে? তুমি কি চন্দ্রিকা বাই? অনুগ্রহ করে ভিতরে এসো, এই চেয়ারটায় বোস।'

'হ্যাঁ, আমি চন্দ্রিকা বাই, ধন্যবাদ।' এগিয়ে এসে একখানি চেয়ারে বসল সে, হাতলহীন চেয়ার, একটি পায়ের উপর আর একটি পা তুলে দিল, পায়ে খোলাপুরি চটি, নিবারণ চকিতে তাকাল, লাল, গোলাপী গোড়ালি, আধ ইঞ্চি সরু হলদে পাড় মিহি সাদা শাড়ি, ব্লাউজটা অর্গাণ্ডি কি বারগ্যাণ্ডি, সাদা, কাপড়টা ঠিক মনে পড়ল না তার; আসবাব-পত্রের দিকে চোখ ফিরাল সে, ব্লাউজের নিচে বডিসটিও একটি ছোট জামা; সৌষ্ঠব ব্যাহত হয়নি, মনে মনে মন্তব্য করল সে।

'মনে হল তুমি বিশ্রাম করছ,' চন্দ্রিকা বাই বলল, 'কিংবা হয়ত ঘুমাচ্ছিলে, তাই চলে যাচ্ছিলাম।'

নিবারণ মুখ ফিরাল, তাকাল, আসলে কিছুই ত দেখছিল না সে. 'না, বিশ্রাম করিনি, ঘুম ত দূরের কথা। চোখ বুজে শুয়ে থাকলে যদি বিশ্রাম হত, আহা! যদি ঘুম হত—তাহলে আমার চাইতে সুখী কে? সত্যি কথা বলতে কি—বিশ্রাম আমি কোনো অবস্থাতেই করতে পারি না, সকালে চোখ মেলে মনে হয় এক ঘণ্টাও ঘুমোইনি, সেই ক্লান্তি, সেই নৈরাশ্য—কিন্তু তোমায় বলছি কেন?'

'সে তুমি জান। তোমার মনে কাঁটা আছে, ক্ষোভ আছে, অবিশ্বাস আছে, যার জন্যে শান্তি নেই তোমার মনে, নিজেকেও ক্ষমা করতে পারছ না।' চন্দ্রিকা বাইয়ের হাতে কোনো অলংকার নেই, কানে, গলাতেও নয়; বাঁ হাতের কব্জিতে নিকেল-পালিশ হাত-ঘড়ি শুধু।

নিবারণ বলল, 'চমৎকার ইংরেজি বলতে পার তুমি!'

'এই প্রশংসায় লাভ নেই, লোভও নেই; মাতৃভাষার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু হিন্দী আরও ভালো বলতে পারি। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে আমাদের, তুমি—'

'আমাদের মানে তোমার এবং ফাদার রমনের ত? ফাদারের নামটা না জড়ালেও তোমার বক্তব্যের মূল্য পেতে, বল।'

'তুমি আমাদের স্কুলে অনধিকার প্রবেশ করেছ, পর্দায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছ, ফাদারকে রূঢ় কথা বলেছ তাঁর ধর্মকে অপমান করেছ, তারপর এই বেআইনী তাঁবু; —জানতে ইচ্ছে করে যুদ্ধের হাওয়া কি সবাইকে অমানুষ করে তুলেছে?'

ওর গলার শব্দটা ভাল, অত্যন্ত ভাল, শুধু কানে মধুর নয়, মনেও মধুর লাগে।

'মানুষ অমানুষ বিচারের কি তোমার মাপকাঠি তা জানি না, তবে তোমার মন-গড়া মনুষ্যত্বের গুণে আমার একটিও নেই, স্বীকার করছি।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে ত মনে হয় তুমি একজন রীতিমত ভদ্রলোক।' শরীরের ভঙ্গিটাকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে চন্দ্রিকা বাই চেয়ারের পিঠে ডান হাতটা বুলিয়ে দিল, ওর দিকে না তাকিয়েও নিবারণ বুঝতে পারল ওর উন্নত বক্ষ আরও স্পষ্ট, আরও উদ্ধত হয়ে উঠেছে; গলার স্বরে যদি না কিছু উত্তাপ অনুভব করা যায়, কই দীর্ঘায়ত কালো চোখে ত কোনো উত্তাপ নেই! ওর মামীরও রং ছিল এমন, আঁচল দিয়ে মুখ ঘষলে গালের রক্তাভা মিলিয়ে যেতে অনেকক্ষণ সময় লাগত, তার উপর এমন কালো চোখ, ভাল, খুব ভাল; না, কলহ আর নয়!

সাহেই, নিবারণ একটু হাসল, বলল, 'সেটা তোমার চোখের ভুল, তোমার মত নীল শিরা আমার কৈ? রক্তটা হয়ত লাল, কিংবা লাল কি?'

না, এসব কথা নিবারণ বলতে চায়নি, কেন তার এই ঝগড়া করার স্বভাব? চন্দ্রিকা বাই-এর মত মেয়ের সঙ্গে সে কি না দুটো ভাল কথা, দুটো মিষ্টি কথা বলতে পারল না! ডেহ্রু রোডে থাকাটা সহনীয় করে তুলবার এমন সুযোগটা সে কি না মাঠ করে দিল?

'তুমি এখান থেকে তাঁবু সরিয়ে নাও, অনুরোধ করছি, যুদ্ধ করতে যখন তুমি নিজেকে বাধ্য করেছ, তখন তুমি যুদ্ধ কর, আপত্তি নেই; কিন্তু আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, তাই তোমায় অনুরোধ করছি তুমি দূরে যাও, অনুরোধ করছি তোমায়।'

নিবারণ দাঁড়িয়ে বলল, 'প্রথমে অনুরোধ, তারপর মিনতি, তারও পরে ঈশ্বরের নামটা জড়াতে ভোলোনি ফাদার, কি কৌতুক!

তাঁবুর দরজার কাছে ফাদার রমন কখন এসে দাঁড়িয়েছে, চন্দ্রিকাকে চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকতে দেখে রমনের চোয়ালের পেশীতে তরঙ্গ খেলে গেল কয়েকবার, নিবারণের শেষের কথাগুলি সে শুনেছে নিশ্চয়; ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিবারণ বিস্মিত হল, বাস্তবিক কৌতুক বোধ করল সে, হৃদ্যতার সুরে ডাকল, 'এসো, ফাদার, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসো, আমন্ত্রণ করছি! বোস চেয়ারে!' সাহেব, সে যেন খুশি হয়ে উঠল এক নিমেষে। পৃথিবীতে সখ্যের মূল্য কম নাকি? সৌহার্দ্যের মূল্য কম না কি? সে কি স্নেহ করতে পারে না? ভালবাসতে পারে না?

ভিতরে ঢুকল না রমন, সাদা আলখাল্লার নীচ থেকে একটা পা একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে অপরূপ ঘৃণাভরে সে তাকাল নিবারণের দিকে; ওকে ভ্রূক্ষেপ না করে চন্দ্রিকার উদ্দেশে বলল, 'কফি তৈরী করলাম তোমার জন্যে, কফি যে জুড়িয়ে গেল! এখানে বসেছো তুমি? অপমান হজম করছ? আমি যেখানে পারলাম না সেখানে তুমি কি করবে?'

মৃদু হাসির আভাসে এই প্রথম চন্দ্রিকা বাই-এর ঠোঁট দুখানি আলগা হয়ে আসছিল, হয়ত এবার ভাল করে দেখা যেত বেল ফুলের কুঁড়ির মত দুসারি দাঁত, কিন্তু তার আগেই নিবারণ পরিষ্কার হেসে উঠল; আর এ-মুহূর্তে এমন হাসতে পারার জন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দিল সে; অতি একান্ত চোখে তাকাল সে চন্দ্রিকার দিকে, ওর চোখের উপর চোখ রেখে বলল, 'আহা! এমন সকালে কফিটা জুড়িয়ে দিতে দিলে তুমি?' অনেক দিন এমন আহ্লাদিত হয়নি তার মন, 'আচ্ছা বলতে পার মিস্ চন্দ্রিকা বাই, এন্টনী অস্ত্র ত্যাগ করেছিল কি জন্যে?'

শুধু একটুও হাসতে পারল না রমন, হাসির একটি রেখা পর্যন্ত নয়; চন্দ্রিকা হেসে উঠল; হাসির ভঙ্গিটা অনেকদিন মনে

থাকবে নিবারণের, যুদ্ধের পরে যদি মৃত্যু না ঘটে, তখনও।

'পারি, ক্লিওপ্যাট্রার জন্যে!'

'আমি তাঁবু সরিয়ে দূরে যাব কার জন্যে?' জিজ্ঞাস করল নিবারণ।

'আমার জন্যে!' চন্দ্রিকা এবারে ডান পা-টা তুলে দিল বাঁ পায়ের উপর।

ফাদার জোসেফ রমনের পুরু ঠোঁট কেঁপে উঠল, চোয়ালের পেশী তরঙ্গায়িত হল বার কয়েক।

কিন্তু নিবারণের মুখে যে-কথাগুলি ভিড় করল—তা বলতে সময় লাগল তার, রমনের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও একটি সত্য ধরা পড়ল তার মনে, হাসিমুখে কেন জানি সে বলে উঠতে যাচ্ছিল, ক্যাইন্ট! কিন্তু বলল, 'বেশ তাই হবে, মিস্ চান্দ্রিকা, কিন্তু কাল।' নিবারণ বসল খাটিয়ার উপর।

রমন তাঁবুর বাইরে মুখ ফিরাল, চন্দ্রিকা বলল, 'এক সেকেণ্ড দাঁড়াও, ফাদার, আমি আসছি।'

কিন্তু রমন দাঁড়াল না, চলে গেল।

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কতদিন একসঙ্গে কাজ করছ?'

'তিন বছর।'

'তুমিও কি খৃস্টান?'

'না, আমি হিন্দু।'

'ও তোমার প্রতি অনুরক্ত। আমার কিন্তু একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'খাও।'

নিবারণ হাত বাড়িয়ে দাঁড়েতে ঝলানো জামার পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিল, তাড়াতাড়িই একটা সিগারেট ধরাল সে।

'তোমার কাছে এটা কিন্তু আশা করিনি ক্যাপ্টেন।' চন্দ্রিকা বাঁ পা দোলাল।

'কি?' মুখের কাছ থেকে সিগারেট নামিয়ে জিজ্ঞেস করল নিবারণ।

'এত সমারোহের পরে তোমার এই পেছিয়ে যাওয়া, এটা তোমার স্বভাব নয়।'

'আমার স্বভাব তুমি জানলে কি করে?'

'জেনেছি। মিথ্যে অহংকারে বেলুনের মত ফুলে আছ তুমি!'

নিবারণ হেসে উঠল বেশ জোরে, 'না, তুমি আর আমায় চটিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু ভাব একবার, তুমি এ-কথা বলবে! তা বল; তোমাকে দেখে সব বিরোধ আমার শেষ হয়ে গেছে, এমন কি নিজের সঙ্গে পর্যন্ত।'

'অর্থ বিচার করে বলছ এ-কথা? না, বলারই জন্যেই বলছ?'

'যা অনুভব করছি তাই বললাম।'

পায়ের উপর থেকে পা নামাল চন্দ্রিকা বাই, দাঁড়াবার আগেই নিবারণ বলল, 'আর এক মিনিট বসবে না?'

'না।' চন্দ্রিকা দাঁড়াল।

নিবারণও দাঁড়াল; 'আর আসবে না?'

'না।'

চন্দ্রিকা বাই চলে গেল; নিবারণের ইচ্ছা হল তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু বাঁ হাতের নিচে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে।

রাস্তায় মোটরসাইকেল থামল, লিংগরাজ নিশ্চয়।

নিবারণ জ্বলন্ত সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

'আসতে পারি?'

নিবারণ তাকাল, বলল, 'হ্যাঁ।'

লিংগরাজ ভিতরে এল।

'কি খবর? রিপোর্ট পৌঁছে দিয়েছ? কার্নেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

প্রশ্নগুলিই জিজ্ঞেস করল নিবারণ, উত্তর শুনবার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, ছিদ্র দিয়ে আলোর একটা লম্বা পেন্সিল ঢুকেছে তাঁবুর মধ্যে, সেদিকে ধোঁয়া ছুঁড়তে লাগল সে।

'একটি মহিলাকে তাঁবু থেকে বেরুতে দেখলাম।' লিংগরাজ বলে ফেলল; সারা মুখে ঘাম আর সাদা ধুলো।

নিবারণ আরও ধোঁয়া ছাড়ল, হাসল; সত্যি! রাগ থেকে, প্রাধান্য থেকে, বিরোধ আর দুশ্চিন্তা থেকে কত সহজে সে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে, কত সহজে, কত স্বচ্ছন্দে 'সুবেদার সাব, একটা চেয়ারে বোসো, রুমাল দিয়ে মুখটা মোছ, পকেটে চিরুনী থাকে ত চুলটা আঁচড়ে নাও, আটত্রিশ মাইল বাইক চালিয়ে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়নি। বিকেলে আবার যেতে পারবে ত?'

লিংগরাজ বসল না, পা বদলাল। আর— শুয়ে শুয়ে নিবারণের মনে হল, হুকুম করা তার রীতি, অনুরোধ করা নয়, প্রশ্ন করা নয়। আলোর পেন্সিল অতিক্রম করে নীল ধোঁয়া উঠছে উপরে।

'অনেক কাজ', বলল লিংগরাজ, 'দুটোর আগেই মালের কনভয় এসে পৌঁছাবে, আর—'

'আর কি?'

'কার্নেল সায়েব ভয়ানক রেগে গেছে, বলছিল—তোমার যাওয়ার কথা ছিল সার!'

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'কত বড় কনভয়?'

'সতেরোখানি ট্রাক।'

'আমি আসছি, তুমি যাও, ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে সেণ্ট্রিটাকে পাঠিয়ে দাও।'

লিংগরাজ চলে গেল।

নিবারণ উঠে পড়ল, জামা গায়ে দিল।

কাজের জায়গায় পৌঁছাল নিবারণ, তারপর অন্তহীন তদারক, নির্দেশ, উপদেশ; পাঁচ মিনিট বসবার সময় পেল না সে; রোদের গরমে সব ঝলসে যাচ্ছে, দূরে পাহাড়ের চূড়াগুলি চারিদিক আগুন ছড়াচ্ছে যেন, কানের দু' পাশ দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে জামার নিচে; গেঞ্জি, মোজা, আনডারউইয়ার গায়ের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; নিবারণ বসল না, থামল না, গাছের নিচে বা তাঁবুর মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে জিরিয়ে নিল না সে, এক গ্লাস জলেরও প্রয়োজন বোধ করল না, ধূমপান পর্যন্ত নয়। দুটোর সময় 'কনভয়' এসে পৌঁছাল, ধুলোয় দিকবিদিক অন্ধকার, ক্যাপটেন নিবারণ দাশগুপ্ত পকেট থেকে রুমালটা পর্যন্ত বার করল না।

স্কুলের পিছনে সে যখন তার তাঁবুতে ঢুকল তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। তোলা-জলে স্নান করল সে, পোশাক বদলাল, বসল খাটিয়ার উপর পা ঝুলিয়ে, অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাল, হাওয়া দিচ্ছে নির্জন বোম্বাই-পুনা রোডে আঁধার ঘনিয়ে

এল। সেন্‌ট্রি তাঁবুর দড়িতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। আর একটু পরে রিপোর্ট লিখতে বসবে সে; ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না আর। লিঙগরাজকে বিকেলে পাঠিয়েছে পুনায়, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরবে সে; তার নিজেরই যাওয়া হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু সময় পেল কোথায়?

রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টা বাজল, নিবারণ খেয়াল করল না।

সেন্‌ট্রি বলল, 'এক আউরৎ ভেট্ মাংতা সার!'

নিবারণ দাঁড়াল, তাঁবুর বাইরে এল; চন্দ্রিকা বাই।

'দাও, সাইকেলটা ঠিক করে রাখি।' নিবারণ হাত বাড়িয়ে সাইকেলের হাতল ধরল। এক লাফে সেন্‌ট্রি এগিয়ে এল, তাঁবুর খুঁটিতে ঠেকিয়ে রাখল সাইকেল।

নিবারণ বলল, 'চল, তাঁবুর মধ্যে গিয়ে বসি।'

'চল।' বলল চন্দ্রিকা বাই।

চন্দ্রিকা চেয়ারে বসল; নিবারণ হ্যারি-কেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে বসল খাটিয়াতে; 'তুমি যে আসবেনা বলেছিলে?'

'এলাম ত!' খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, শাড়িটা লাল রং, হয়ত রেশম, জামাটা সাদা।

'কত দূরে তুমি থাক?' অন্ধকারে চলাফেরা করতে অসুবিধে হয়না তোমার?'

'কিসের অসুবিধে?' ছোট একটু হাসল চন্দ্রিকা বাই, 'খুব দূরে নয়, মাইল দুই হবে।'

'নির্জন পথ, অন্ধকার রাত্রি; কত রকম বিপদ ঘটতে পারে; বল!'

চন্দ্রিকা বাই উত্তর দিল না তৎক্ষণাৎ, একটু পরে বলল, 'আত্মার আর কি বিপদ বল?'

'আত্মা মানে?' নিবারণ চঞ্চল হয়ে উঠল।



'তোমার সমস্ত কথা, কাজ আর চিন্তার বাইরে তোমার যে সত্তা—তাই তোমার আত্মা!'

নিবারণ হাসল, 'দোহাই তোমার, এমন চমৎকার সন্ধ্যাটি বাণী ছড়িয়ে নষ্ট করে দিওনা, সহজ কথা বল, তোমার কথা বল, একান্তই তোমার কথা।'

'আমার কথা?'

দূর থেকে মোটারের শব্দ শোনা গেল; মিলিটারি ওয়াগন, সন্দেহ নেই। নিবারণ তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাল একবার, লরি যাচ্ছে কোথায় রাত্রে? বোম্বাই? না, জাহান্নামে? হেড লাইটের আলো দেখা গেল রাস্তায়, গাড়ি দুটো থেমেছে, নিবারণ তাঁবুর বাইরে এল, মুখ ফিরিয়ে চন্দ্রিকাকে বলল, 'তুমি বোস!'

হেড লাইট জ্বলছে, গাড়ি একটা নয়, দুটি; প্রথমে জীপ তারপর ছোট ওয়াগন। জীপ থেকে নামল মিলিটারি পুলিস আর কর্নেল লেল্যাণ্ড, আলোর পাশে দাঁড়াল ওরা, নিবারণ আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরাল। ওয়াগন থেকে নামল আরও জন কয়েক, তাদের মধ্যে কয়েক-জনকে চেনা গেল, ক্যাপটেন হুকুম সিং, তার পিছনে সুবেদার লিঙগরাজ আর ফাদার জোসেফ রমন। নিবারণ সিগারেটে টান দিল।

লিঙ্গরাজ আঙ্গুল দিয়ে পথ দেখিয়ে দিল।

নিবারণ তাঁবুর মধ্যে এল, জামাটা গায়ে দিয়ে নিল সে।

বাইরে টর্চের আলো আর বুটের শব্দ।

চন্দ্রিকা বাই বলল, 'ওরা তাঁবুর মধ্যে আসছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কি চলে যাব?'

'বসো, যাবে একটু পরে।'

প্রথমে ঢুকল লেল্যাণ্ড, পিছনে পুনা হেড কোয়ার্টারের ক্যাপটেন হুকুম সিং, তারপরে ঢুকল লিঙগরাজ আর রমন। নিবারণ সিগারেটটা মুখে রেখে হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিল;

লেল্যাণ্ড বলল, 'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হল!' চন্দ্রিকা বাই-এর দিকে তাকাল সে; মুখ ফিরিয়ে নিল, আবার তাকাল।

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'কি অভিযোগ?'

'স্যাবোটাজ, কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা, অ্যাণ্ড—' লেল্যাণ্ড আবার তাকাল চন্দ্রিকার দিকে, চুলে ফুলের মালাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশ্বাসটা আরও জোরে টানছিল সে ঘ্রাণটা ভাল করে পাবার জন্যে। 'এলাকা ছেড়ে এখানে তাঁবু খাটাবার তোমার উদ্দেশ্য কি? এটা ঘোরতর বেনিয়ম!'

নিবারণ বলল, 'উদ্দেশ্য হচ্ছে সারাদিন কাজের পরে একটু নির্জনতা।'

রমন হাত তুলে বলল, 'দ্যাট্স্ এ লাই!'

চন্দ্রিকা বাই বলল, 'ফাদার প্লিজ!'

'এমন অফিসার আর্মির কলংক!' রমনের গলার শব্দটা আরও উঁচু হয়ে উঠল, 'তোমাকে যা রিপোর্ট করেছি—তার একটিও মিথ্যা নয় কর্নেল,' লিঙ্গরাজকে দেখিয়ে 'এই ভদ্রলোক তার সাক্ষী দেবেন, তা ছাড়া নিজের চোখেই ত দেখলে!'

লেল্যাণ্ড নিবারণকে বলল, 'সুতরাং চল, যাওয়া যাক।'

সিগারেটে আরও একটা টান দিল নিবারণ, আস্তে আস্তে ধোঁয়া বার করে বলল, 'কোথায়?'

লেল্যাণ্ডের চোখ জ্বলছিল, কাঁপা-গলায় সে বলল, 'পুনা, কোয়ার্টার গার্ড।'

নিবারণ হাসল, সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, 'চল!'

সামনে গোরা মিলিটারি পুলিস, তারপর নিবারণ, পিছনে অন্যান্য সবাই।

চন্দ্রিকা বাই সাইকেল নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াল। গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে, হেড লাইট জ্বলছে।

জীপের পিছনের আসনে লেল্যাণ্ড আর নিবারণ। লেল্যাণ্ড বলল, 'ক্যাপটেন, আই ওয়াণ্ট দ্যাট উম্যান, এ্যাণ্ড ইউ ডোণ্ট ওয়াণ্ট এ কোর্টমার্শাল্ অর্ এ স্যাক্!'

নিবারণ চাপা গলায় উত্তর দিল, 'ড্যাম ইউ লেল্যাণ্ড, শী ইজ নট্ ফর্ সেল!'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, সাইকেল নিয়ে চন্দ্রিকা বাই একটু এগিয়ে এল, নিবারণ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কোথায় পাব আমি?'

গাড়ির গতি বাড়ল, আর বাড়ল ইঞ্জিনের শব্দ।

চন্দ্রিকা বাই বলল, "এখানে, এই ডেহু রোডে!'

হেড লাইটের তীব্র আলোয় দূরের জিনিস এগিয়ে আসছে সামনে, কিন্তু পিছনের সব কিছুই পড়ে রইলনা পিছনে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
মূল্য তিন টাকা
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

সবার উপরে মানুষ সত্য...
বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁর অনুপম কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গেলেন প্রেমের অমৃত বাণী। মানুষের মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সারাজীবনের কাব্য-সাধনার সত্য বস্তু। তাই প্রচার করলেন 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'।
★ তাঁর এই বাণীর মধ্যে যে ইঙ্গিত তাকেই লক্ষ্য করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়োজিত হয়েছে মানব কল্যাণে। গত ষাট বর্ষাধিক যাবত মানবধর্মী এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে এর কর্মীবৃন্দ। তাই হাজার হাজার ধবল-কুষ্ঠ ও অন্যান্য কঠিন কঠিন চর্মরোগ-গ্রস্ত রোগী এখানকার চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়ে ফিরে পেয়েছে তাদের নূতন জীবন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা ঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া, ফোন ঃ ৬৭-২৩৫৯
শাখা ঃ—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

## ॥ সূচীপত্র ॥

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শিল্পী রাম মহারানা, ওড়িশা

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥
সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌ

বাঙ্গালীর ঘরে মা আসিতেছেন। দশভুজা সিংহবাহিনী জননী। তাঁহার বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বিদ্যাদায়িনী বাণী, সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলদর্পী কার্তিকেয়। ভুবন আলো-করা মায়ের রূপ; কিন্তু সে খেলা খুলিল কই, শরতের স্বর্ণাভ সৌরকিরণে হরিতে হিরণে মায়ের সে লীলা মেলিল কই। সন্তানস্নেহে উন্মাদিনী জননী। নিবিড় মেঘ-সমাচ্ছন্ন তাঁহার জটাজুটজাল হইতে সঘন বিদ্যুদ্দামের চমক ছুটিতেছে। দিগন্তে বজ্রের গর্জন মুহুর্মুহু ভূকম্পন। মন্ত্রবর্ণা জননী। যে মন্ত্রের ছন্দে তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়াকাশে মনোময় মাধুরীতে বিলসিত হইয়াছিলেন, সে সাধনা তবে কি ব্যর্থ হইয়াছে? মাতৃপূজায় বাগর্থের অপ্রতিপত্তি ঘটিতেছে তাই এই অনর্থ। বাংলার মাতৃসাধক সন্তানের দল মায়ের সেবায় আত্মাহুতি : বলিবীর্য দেশ এবং জাতির মনো-মূলে সঞ্চার করিয়াছিলেন, আমরা প্রাণরসে তাঁহার অগ্নিময় স্পর্শটি অনুভব করিতেছি না। মায়ের সন্তানদের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিবার অনুভূতির ব্যাপিশীলা দীপ্তিতেই মাতৃপূজার পুণ্যময় প্রতিবেশ গড়িয়া উঠে। জনগণের দুঃখ দূর করিবার দুরন্ত আগ্রহে দেবীর অনুগ্রহ মিলে। সমষ্টি মনের পুষ্টি সাধন করিয়া দেবী সন্তানকে সর্ববিধ নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সমররঙ্গে অবতীর্ণা হন। মায়ের আবির্ভাবের সেই অগ্নিমেখলায় দুষ্ট দৈত্যদল পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরে। প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় মায়ের এমন উদয়কে জয়যুক্ত করিবার জন্য আমরা যেন স্বার্থ ও সংকীর্ণতার সর্ববিধ বন্ধন হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে পারি, তবেই মায়ের মুখ দেখিয়া আমাদের বুক ভরিবে; আমাদের মাতৃপূজা সার্থকতা লাভ করিবে।

# রবীন্দ্রনাথের চিঠি

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু,

শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে লেখায় চিহ্ন বর্জন সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করেছি। নিত্য ব্যবহারে আমার এ মত চলবে না তা জানি। এটা একটা আলোচনার বিষয় মাত্র। চিহ্নগুলোর প্রতি অতিমাত্র নির্ভরপরতা অভ্যস্ত হলে ভাষায় আলস্য-জনিত দুর্বলতা প্রবেশ করে এই আমার বিশ্বাস। চিহ্ন সঙ্কেতের সহায়তা পাওয়া যাবে না এ-কথা যদি জানি তবে ভাষার আপন সঙ্কেতের দ্বারাতেই তাকে প্রকাশবান করতে সতর্ক হতে পারি; অন্তত আজকাল ইংরেজির অনুকরণে, লিখিত ভাষাগত ইঙ্গিতের জন্যে চিহ্নসংকেতের অকারণ বাড়াবাড়ি সংযত হতে পারে। এই চিহ্নের প্রশ্রয় পেয়ে পাঠসম্বন্ধে পাঠকদেরও মন পঙ্গু হয় প্রকাশসম্বন্ধে লেখকদেরও তদ্রূপ। কোনো কোনো মানুষ আছে কথাবার্তায় যাদের অঙ্গভঙ্গী অত্যন্ত বেশী। সেটাকে মুদ্রাদোষ বলা যায়। বোঝা যায় লোকটার মধ্যে সহজ ভাব-প্রকাশের ভাষাদৈন্য আছে। কিন্তু কথার সঙ্গে ভঙ্গী একেবারে চলবে না এ-কথা বলা অসঙ্গত তেমনি লেখার সঙ্গে চিহ্ন সর্বত্রই বর্জনীয় এমন অনুশাসনও লোকে মানবে না।

বাংলাসাহিত্যে নাটক আজও প্রাধান্য পায় নি, একথা নিঃসন্দেহ। কারণ কি, সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। মনে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাধারার মধ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করব। সে ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। বিনা তাগিদে লিখব শরীরে মনে সে উদ্যম নেই। অতএব অধ্যাপকদের উপরই মীমাংসার ভার রইল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধ্যাপনার আদর্শ উচ্চদরের নয়। অন্যদেশের অধ্যাপকদের পরিচয় পেয়েছি; তাঁরা কেবল হাটের মাল বহন করেন না, ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করেন। এখানকার অধ্যাপকদের লেখা সমালোচনা পড়েছি; বাঁধা মতের পণ্য নিয়ে ছাত্র পড়াতে তাঁদের মন অভ্যস্ত; ইস্কুল মাস্টারির গণ্ডি তাঁরা পেরোতে পারেন নি। য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের রচিত আলোচনা তো পড়েছ, তার মধ্যে মতামতের চেয়ে বড়ো জিনিষ হচ্ছে তার শক্তি, তার অনুপ্রেরণা। এই শক্তির একটা কারণ সেখানকার পাঠকেরা ছাত্রশ্রেণীর নয়, তাদের বুদ্ধিবিদ্যাকে নাবালকের মতো গণ্য করা চলে না। সুশিক্ষিত চিন্তাশীল পাঠকেরাই বলবান ও মূল্যবান চিন্তার প্রবর্তনা করে। ইতি ৩।৩।৩৭

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ তার যথোচিত উত্তর দেবার মতো শক্তি ও সময় আমার নেই।

গোরা উপন্যাস সম্বন্ধে আমার কোনো লেখায় কোনো সংশয় প্রকাশ করেছি বলে মনে পড়ে না—করবার কোনো কারণ ঘটে নি।

ললিতা বিনয়ের বিবাহে সামাজিক বিঘ্ন কী ঘটতে পারে, সে কথা গোরা নভেলে বিচার্য বিষয় নয়, যে দুর্নিবার আবেগে তারা মিলিত হয়েছে সেইটের মনস্তত্ত্বঘটিত সত্যতাই লেখক কল্পনা করেছে, তার থেকে তাদের সন্তানদের কী দুর্গতি হতে পারে সেই সামাজিক তত্ত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার স্থান উপন্যাস নয়।

আর্টই আর্টের পরিণাম এ-কথা বলতে বোঝায় আনন্দই আনন্দের পরিণাম। আনন্দের পরিণাম বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়, হিতোপদেশ নয়। সকাল বেলায় ভৈরোঁ গান শোনা হয়তো স্বাস্থ্যের অনুকূল, কিন্তু আরোগ্যতত্ত্বই ভৈরোঁ গানের চরম তত্ত্ব এ-কথা না বলে বলা উচিত গানের মধ্যেই গানের চরমতা আছে। জাপানে যখন ছিলেম একজন পুরাতন চৈনিক চিত্রকরের আঁকা একটি অত্যাশ্চর্য বাঘের ছবি দেখেছি। আমি নিশ্চিত জানি সেই ছবি এঁকে তিনি অহিংস নীতি প্রচার করতে চাননি—প্রাণী বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না ছবির মধ্যেই আছে তার প্রমাণ, —কারণ তাতে বাঘের প্রকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে, আকৃতির হয়তো বৈষম্য ছিল। মুখ্য কথা এই যে, এ-ছবি আঁকতে তাঁর আনন্দ, ছবি দেখতে আমার আনন্দ। এই কথাটাকে realismএর লক্ষণ বলা একেবারেই চলে না—ideaকেই ideaর লক্ষ্য বলে স্বীকার করে বিশুদ্ধ idealism—utilitarianism তা করে না। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৯৩৫

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ওঁ

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পূর্বের কোনো চিঠি আমার হাতে পৌঁছয় নি। পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে বলেই সকল চিঠি আমার হাতে আসে না।

আমার জীবনের ইতিহাস আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হবে না। ইচ্ছাও নেই সময়ও নেই। আমার রচনার মধ্যে দিয়েই আমার জীবনের যেটুকু প্রকাশ পায় আমি বোধ করি পাঠকদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। মানুষ হিসাবে নিজেকে আমি বিশেষভাবে আলোচ্য বলে মনেই করি নে।

আমার সম্বন্ধে অন্যেরা যা লিখেছে তা নিঃসন্দেহই নির্ভরযোগ্য নয়।

আমি অনেককাল নিরামিষাশী ছিলাম—এখনো মাঝে মাঝে ছেড়ে দিই। রুচি নেই আমিষে, শরীরের প্রয়োজনে খেতে হয়। মন তাতে প্রসন্ন হয় না। ইতি ২২ কার্তিক ১৩৩৯

[অপ্রকাশিত পত্রত্রয় শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস লাহিড়ীকে লিখিত]

বক্রেশ্বর দাস সরকারী গুণ্ডা দমন বিভাগের একজন বড় কর্মচারী। শীতের মাঝামাঝি এক মাসের ছুটি নিয়ে নববিবাহিত পত্নী মনোলোভার সঙ্গে সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে বুড়ো চাকর বৈকুণ্ঠ আছে। এঁরা গণেশমুণ্ডায় লালকুঠি নামক একটি ছোট বাড়িতে উঠেছেন। জায়গাটি নির্জন, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর।

বক্রেশ্বরের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, মনোলোভার পঁচিশের নীচে। বক্রেশ্বর বোঝেন যে তিনি সুদর্শন নন, শরীরে প্রচুর শক্তি থাকলেও তাঁর যৌবন শেষ হয়েছে। কিন্তু মনোলোভার রূপের খুব খ্যাতি আছে, বয়সও কম। এই কারণে বক্রেশ্বরের কিঞ্চিৎ হীনতাভাব অর্থাৎ ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে।

প্রভাত মুখুজো মহাশয় একটি গল্পে একজন জবরদস্ত ডেপুটির কথা লিখেছেন। একদিন তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন না তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক দেখা করেন। ডেপুটিবাবু তা জানতে পেরে স্ত্রীকে যথোচিত ধমক দেন এবং আগন্তুক লোকটিকে আদালতী ভাষায় একটি কড়া নোটিস লিখে পাঠান। তার শেষ লাইনটি (ঠিক মনে নেই) এইরকম।—বারাদিগর এমত করিলে তোমাকে ফৌজদারি সোপর্দ করা হইবে। সেই ডেপুটির সঙ্গে বক্রেশ্বরের স্বভাবের কিছু মিল আছে। দরিদ্রের কন্যা অল্পশিক্ষিতা ভাল মানুষ মনোলোভা তাঁর স্বামীকে চেনেন এবং সাবধানে চলেন।

জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে। বিকেল বেলা মনোলোভা বললেন, চল চম্পীদিদির সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি ওই তিরিসিংগা পাহাড়ের কাছে লছমনপুরায় আছেন, চিঠিতে লিখেছিলেন আমাদের এই বাসা থেকে বড় জোর সওয়া মাইল।

বক্রেশ্বর বললেন, আমার ফুরসত নেই। একটা স্কীম মাথায় এসেছে, গভরমেণ্ট যদি সেটা নেয় তবে দেশের সমস্ত বদমাশ শায়েস্তা হয়ে যাবে। এই ছুটির মধ্যেই স্কীম লিখে ফেলব। তুমি যেতে চাও যাও, কিন্তু বৈকুণ্ঠকে সঙ্গে নিও।

—বৈকুণ্ঠর ঢের কাজ। বাজার করবে, দুধের ব্যবস্থা করবে, রান্নার যোগাড় করবে। আর ও তো অথর্ব বুড়ো, ওকে সঙ্গে নেওয়া মিথ্যে। আমি একাই যেতে পারব, ও তো তিরিসিংগা পাহাড় সোজা দেখা যাচ্ছে।

—ফিরতে দেরি ক'রো না, সন্ধ্যের আগেই আসা চাই।

লছমনপুরায় পৌঁছে মনোলোভা তাঁর চম্পীদিদির সঙ্গে অফুরন্ত গল্প করলেন। বেলা পড়ে এলে চম্পীদিদি ব্যস্ত হয়ে বললেন, যা যা শিগ্‌গির ফিরে যা, নয়তো অন্ধকার হয়ে যাবে, তোর বর ভেবে সারা হবে। আমাদের দুটো চাকরই বেরিয়েছে, নইলে একটাকে তোর সঙ্গে দিতুম। কাল সকালে আমরা তোর কাছে যাব।

মনোলোভা তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। মাঝপথে একটা সরু নদী পড়ে, তার খাত গভীর, কিন্তু এখন জল কম। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর আছে, তাতে পা ফেলে অনায়াসে পার হওয়া যায়। নদীর কাছাকাছি এসে মনোলোভা দেখতে পেলেন, বাঁ দিকে কিছু দূরে চার-পাঁচটা মোষ চরছে, তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শিংওয়ালা জানোয়ার কুটিল ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। মোষের রাখাল একটি ন' বছরের ছেলে। সে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি বলল বোঝা গেল না। মনোলোভা ভয় পেয়ে দৌড়ে নদীর ধারে এলেন এবং কোনও রকমে পার হলেন, কিন্তু ওপারে উঠেই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না, পায়ের চেটোয় অত্যন্ত বেদনা।

চারিদিক জনশূন্য, সেই রাখাল ছেলেটাও অদৃশ্য হয়েছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আতঙ্কে মনোলোভার বুদ্ধিভ্রংশ হল। হঠাৎ তাঁর কানে এল—

—একি, পড়ে গেলেন নাকি?

লম্বা লম্বা পা ফেলে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি একজন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষ, পরনে ইজার, হাঁটু পর্যন্ত আচকান, তার উপর একটা নকশাদার শালের ফতুয়া, মাথায় লোমশ ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপি।

মনোলোভার দুই হাত ধরে টানতে টানতে আগন্তুক বললেন, হেঁইও, উঠে পড়ুন। পারছেন না? খুব লেগেছে? দেখি কোথায় লাগল।

হাত পা গুটিয়ে নিয়ে মনোলোভা বললেন ও আর দেখবেন কি, পা মচকে গেছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। আপনি দয়া করে যদি একটা পালকি টালকি যোগাড় করে দেন তো বড়ই উপকার হয়।

—খেপেছেন, এখানে পালকি তাঞ্জাম চতুর্দোলা কিছুই মিলবে না, স্ট্রেচারও নয়। আপনি কোথায় থাকেন? গণেশ-মুণ্ডায় লালকুঠিতে? আপনারাই বুঝি আজ সকালে পৌঁছেছেন? আমি আপনার পায়ে একটু মাসাজ করে দিচ্ছি, তাতে ব্যথা কমবে। তারপর আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারবেন। যদি মচকে গিয়ে থাকে, চুনে-হলুদ লাগালেই চট করে সেরে যাবে।

বিব্রত হয়ে মনোলোভা বললেন, না না আপনাকে মাসাজ করতে হবে না। হেঁটে যাবার শক্তি আমার নেই। আপনি দয়া করে আমাদের বাসায় গিয়ে মিস্টার বি দাসকে খবর দিন, তিনি নিয়ে যাবার যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

—পাগল হয়েছেন? এখান থেকে গিয়ে খবর দেব, তারপর দাস মশাই চেয়ারে বাঁশ বেঁধে লোকজন নিয়ে আসবেন, তার মানে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ততক্ষণ আপনি অন্ধকারে এই শীতে একা পড়ে থাকবেন তা হতেই পারে না। বিপদের সময় সংকোচ করবেন না, আপনাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছি।

—কি যা তা বলছেন!

—কেন, আমি পারব না ভেবেছেন? আমি কে তা জানেন? গগনচাঁদ চক্কর, গ্রেট মরাঠা সার্কাসের স্ট্রং ম্যান। না না, আমি মরাঠী নই, বাঙালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী পদবীটা ছেঁটে চক্কর করেছি। সম্প্রতি টাকার অভাবে সার্কাস বন্ধ ছিল, তাই এখানে আসবার ফুরসত পেয়েছি। আজ সকালে আমাদের ম্যানেজার সাপুরজীর চিঠি পেয়েছি—সব ঠিক হয়ে গেছে, দু হপ্তার মধ্যে তোমরা পুনায় চলে এস। জানেন, আমার বুকের ওপর দিয়ে হাতি চলে যায়, দু হন্দর বারবেল আমি বনবন করে ঘোরাতে পারি। আপনার এই শিঙি মাছের মতন একরত্তি শরীর আমি বইতে পারব না?

—খবরদার, ও সব হবে না।

—কেন বলুন তো? আপনি কি ভেবেছেন আমি রাবণ আর আপনি সীতা, আপনাকে হরণ করতে এসেছি? আপনাকে আমি বয়ে নিয়ে গেলে আপনার কলঙ্ক হবে লোকে ছিছি করবে?

—আমার স্বামী পছন্দ করবেন না।

—কি অদ্ভুত কথা! অমন রামচন্দ্রী স্বামী জোটালেন কোথা থেকে? বিপদের সময় নাচার হয়ে আপনাকে যদি বয়ে নিয়ে যাই, তাতে আপত্তির কি আছে? আপনার কর্তা বুঝি মনে করবেন আমার ওপর আপনার অনুরাগ জন্মেছে, আমার স্পর্শে আপনি পুলকিত হয়েছেন, এই তো? একবার ভাল করে আমার মুখখানা দেখুন তো, আকর্ষণের কিছু আছে কি?

পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড টর্চ বার করে গগনচাঁদ নিজের শ্রীহীন মুখের ওপর আলো ফেললেন, তারপর বললেন, দেখুন, লোকে আমার মুখ দেখতে সার্কাসে আসে না, শুধু গায়ের জোরই দেখে। আমরা এই চাঁদবদন দেখলে আপনার স্বামীর মনে কোনও সন্দেহই হবে না।

মনোলোভা বললেন, কেন তর্ক করে সময় নষ্ট করছেন। আপনার চেহারা সুশ্রী না হলেও লোকে দোষ ধরতে পারে।

—ও, বুঝেছি। আপনার চিত্তবিকার না হলেও আমার তো আপনার ওপর লোভ হতে পারে—এই না? নিশ্চয় আপনি নিজেকে খুব সুন্দরী মনে করেন। একদম ভুল ধারণা, মিস চমৎকুমারী ঘার্পাদের কাছে আপনি দাঁড়াতেই পারেন না।

—তিনি আবার কে?

গগনচাঁদ চক্কর তাঁর ফতুয়ার বোতাম খুললেন, আচকানেরও খুললেন, তার নীচে যে জামা ছিল, তারও খুললেন। তারপর মুখে একটি বিহ্বল ভাব এনে নিজের উন্মুক্ত লোমশ বুকে তিনবার চাপড় মারলেন।

মনোলোভা প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রণয়িনী নাকি?

—শুধু প্রণয়িনী নয় মশাই, দস্তুরমত সহধর্মিণী। তিন মাস হল দুজনে বিবাহবন্ধনে জড়িত হয়ে দম্পতি হয়ে গেছি।

—তবে মিস চমৎকুমারী বললেন কেন? এখন তো তিনি শ্রীমতী চক্কর।

—আঃ, আপনি কিছুই বোঝেন না। মিস চমৎকুমারী ঘার্পার্দে হল তাঁর স্টেজ নেম, আমেরিকান ফিল্ম অ্যাকট্রেসরা যেমন পঞ্চাশবার বিয়ে করেও নিজের কুমারী নামটাই বজায় রাখে, সেইরকম আর কি। চমৎকুমারী হচ্ছেন গ্রেট মরাঠা সার্কাসের লীডিং লেডি, বলবতী ললনা। যেমন রূপ, তেমনি বাহুবল, তেমনি গলার জোর। একটা প্রমাণ সাইজ গরু কিংবা গাধাকে টপ করে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে পারেন। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত কানে চেপে অন্য হাতে তম্বুরা নিয়ে ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে পারেন। মহারাষ্ট্রী মহিলা, কিন্তু অনেক কাল কলকাতায় ছিলেন, চমৎকার বাঙলা বলেন। আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত করিয়ে দেব। চমৎকুমারীকে দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে আমার হৃদয় শক্ত খুঁটিতে বাঁধা আছে, তার আর নড়ন চড়ন নেই।

—আপনি আর দেরি করবেন না, দয়া করে মিস্টার দাসকে খবর দিন।

—কি কথাই বললেন! আমি চলে যাই, আপনি একলা পড়ে থাকুন, আর বাঘ কি হুড়ার কি লক্কড় এসে আপনাকে ভক্ষণ করুক। শুনতে পাচ্ছেন? ওই শেয়াল ডাকছে! আপনার হিতাহিত জ্ঞান এখন লোপ পেয়েছে, কোনও আপত্তিই আমি শুনবো না। চুপ, আর কথাটি নয়।

নিমেষের মধ্যে মনোলোভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গগনচাঁদ সবেগে চললেন। মনোলোভা ছটফট করতে লাগলেন। গগনচাঁদ বললেন, খবরদার হাত পা ছুঁড়বেন না, তা হলে পড়ে যাবেন, কোমর ভাঙবে, পাঁজরা ভাঙবে। এত আপত্তি কিসের? আমাকে কি অচ্ছুত হরিজন ভেবেছেন না সেকেলে বঠ্‌ঠাকুর ঠাউরেছেন যে ছুঁলেই আপনার ধর্মনাশ হবে? মনে মনে ধ্যান করুন—আপনি একটা দুরন্ত খুকী, রাস্তায় খেলতে খেলতে আছাড় খেয়েছেন, আর আমি আপনার স্নেহময়ী দিদিমা, কোলে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

আপত্তি নিষ্ফল জেনে মনোলোভা চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। গগনচাঁদ হাতের মুঠোয় টর্চ টিপে পথে আলো ফেলতে ফেলতে চললেন।

বক্রেশ্বর দাস দুজনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, একি ব্যাপার?

গগনচাঁদ বললেন, শোবার ঘর কোথায়? আগে আপনার স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিই, তারপর সব বলছি। এই বুঝি

আপনার চাকর? ওহে বাপু, শিগ্‌গির মালসা করে আগুন নিয়ে এস, তোমার মায়ের পায়ে সেক দিতে হবে।

মনোলোভাকে শুইয়ে গগনচাঁদ বললেন, মিস্টার দাস, আপনার স্ত্রী পড়ে গিয়েছিলেন, ডান পায়ের চেটো মচকে গেছে। চলবার শক্তি নেই, অথচ কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না, কেবলই বলেন, লে আও পালকি, বোলাও দাস সাহেবকো। আমি জোর করে এঁকে তুলে নিয়ে এসেছি। অতি অবুঝ বদরাগী মহিলা, সমস্ত পথটা আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে এসেছেন।

মনোলোভা অস্ফুট স্বরে বললেন, বাঃ, কই আবার দিলুম!

বক্রেশ্বর একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এখন গরম হয়ে বললেন, তুমি লোকটা কে হে? ভদ্রনারীর ওপর জুলুম কর এতদূর আস্পর্ধা?

—অবাক করলেন মশাই। কোথায় একটু চা খেতে বলবেন, অন্তত বিঞ্ছিং থ্যাংকস দেবেন, তা নয়, শুধুই ধমক!

—হু আর ইউ? কেন তুমি ওঁর গায়ে হাত দিতে গেলে?

—আরে মশাই, ওঁকে যদি নিয়ে না আসতুম তা হলে যে এতক্ষণ বাঘের পেটে হজম হয়ে যেতেন, আপনাকে যে আবার একটা গিন্নীর যোগাড় দেখতে হত।

—চোপরাও বদমাশ কোথাকার। জান, আমি হচ্ছি বক্রেশ্বর দাস আই-এ-এস, গুণ্ডা কণ্ট্রোল অফিসার, এখনি তোমাকে পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করতে পারি?

—তা করবেন বইকি। স্ত্রী যন্ত্রণায় ছটফট করছেন সেদিকে হুঁশ নেই, শুধু আমার ওপর তম্বি। মুখ সামলে কথা কইবেন মশাই, নইলে আমিও রেগে উঠব। এখন চললুম, নির্মল মুখুজ্যে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বক্রেশ্বর তেড়ে এসে গগনচাঁদের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললেন, অভি নিকালো।

গগনচাঁদ বেগে চলতে লাগলেন, বক্রেশ্বর পিছু পিছু গেলেন। কিছুদূর গিয়ে গগনচাঁদ বললেন, লড়তে চান? আপনার স্ত্রী একটু সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর লড়বেন। যদি সবুর করতে না পারেন তো কাল সকালে আসতে পারি।

বক্রেশ্বর বললেন, কাল কেন, এখনই তোকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি। জানিস, আমি একজন মিড্‌লওয়েট চ্যাম্পিয়ন? এই নে, দেখি কেমন সামলাতে পারিস।

গগনচাঁদ ক্ষিপ্রগতিতে সরে গিয়ে ঘুষি থেকে আত্মরক্ষা করলেন এবং বক্রেশ্বরের পায়ের গুলিতে ছোট একটি লাথি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে বক্রেশ্বর ধরাশায়ী হলেন।

গগনচাঁদ বললেন, কি হল দাস মশাই, উঠতে পারছেন না? পা মচকে গেছে? বেশ যা হক, কর্তাগিন্নীর এক হাল। ভাববেন না, আপনাকেও তুলে নিয়ে গিন্নীর পাশে শুইয়ে দিচ্ছি, তারপর ডাক্তার এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

বক্রেশ্বর বললেন, ড্যাম ইউ, গেট আউট ইঁহা সে।

—ও, আমার কোলে উঠবেন না? আচ্ছা চললুম, আর কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বক্রেশ্বর বেশ শক্তিমান পুরুষ, ভাবতেই পারেন নি যে ওই বদমাশ গুণ্ডাটা তাঁর প্রচণ্ড ঘুষি এড়িয়ে তাঁকেই কাবু করে দেবে। শুধু ডান পায়ের চেটো মচকায় নি, তাঁর

"এই নে, দেখি কেমন সামলাতে পারিস"

কাঁধও একটু থেঁতলে গেছে। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, বৈকুণ্ঠ, ও বৈকুণ্ঠ।

প্রায় পনরো মিনিট বক্রেশ্বর অসহায় হয়ে পড়ে রইলেন। তারপর নারীকণ্ঠ কানে এল—অগ্‌গে ব্বাঈ! হে কায়? কায় ঝালা তুমহালা? —ওমা, এ কি? কি হয়েছে আপনার?

বক্রেশ্বর দেখলেন, কাছা দেওয়া লাল শাড়ি পরা মহিষ-মর্দিনী তুল্য একটি বিরাট মহিলা টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বক্রেশ্বর বললেন, উঃ বড্ড লেগেছে, ওঠবার শক্তি নেই। আপনি—আপনি কে?

—চিনবেন না। আমি হচ্ছি চমৎকুমারী ঘাপার্দে, গ্রেট মরাঠা সার্কাসের বলবতী ললনা।

—আপনি যদি দয়া করে ওই লালকুঠিতে গিয়ে আমার চাকর বৈকুণ্ঠকে পাঠিয়ে দেন—

—আপনার চাকর তো রোগা পটকা বুড়ো, আপনার এই দু-মনী লাশ সে বইতে পারবে কেন? ভাববেন না, আমিই আপনাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

—সেকি, আপত্তি?

—কেন, তাতে দোষ কি, বিপদের সময় সবই করতে হয়। ভাবছেন আমি অবলা নারী, পারব না? জানেন, আমি একটা পুরুষ্টু গাধাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়তে পারি?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বক্রেশ্বর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চমৎকুমারী খপ করে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, ওকি, অমন কুঁকড়ে গেলেন কেন, লজ্জা কিসের? মনে করুন আমি আপনার মেসোমশাই, আপনি একটা পাজী ছোট ছেলে, আপনার চাইতেও পাজী আর একটা ছেলে লাথি মেরে আপনাকে ফেলে দিয়েছে, মেসোমশাই দেখতে পেয়ে কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

চমৎকুমারী তাঁর বোঝা নিয়ে হনহন করে হেঁটে তিন মিনিটের মধ্যে লালকুঠিতে পৌঁছলেন এবং বিছানায় মনোলোভার পাশে ধপাস করে ফেলে বক্রেশ্বরকে শুইয়ে দিলেন। বক্রেশ্বর করুণ স্বরে বললেন, উহুহু বড্ড ব্যথা। জান মনু, আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম, ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন, গ্রেট মরাঠা সার্কাসের স্ট্রং লেডি মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দে।

মনোলোভা অবাক হয়ে দু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

নির্মল ডাক্তার তাঁর কম্পাউণ্ডারকে নিয়ে এসে পড়লেন। স্বামী-স্ত্রীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ও কিছু নয়, দুজনেরই পায়ে একটু স্প্রেন হয়েছে। একটা লোশন দিচ্ছি, তাতেই সেরে যাবে। তিন-চার দিন চলাফেরা করবেন না, মাঝে মাঝে নুনের পুঁটলির সেক দেবেন। মিস্টার দাসের কাঁধে একটা ওষুধ লাগিয়ে ড্রেস করে দিচ্ছি।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার চলে গেলেন। চমৎকুমারী বললেন, আপনাদের চাকর একা সামলাতে পারবে না, আমি আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে তারপর যাব।

বক্রেশ্বর করজোড়ে বললেন, আপনি করুণাময়ী, যে উপকার করলেন তা জীবনে ভুলব না।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, তা ভুলবে কেন, ওই গোদা হাতের জাপটানি যে প্রাণে সুড়সুড়ি দিয়েছে। যত দোষ বেচারা গগনচাঁদের।

বক্রেশ্বর বললেন, ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলুম, আপনার স্বামী মিস্টার চক্করও এখানে আছেন। কাল বিকেলে আপনারা দুজনে দয়া করে এখানে যদি চা খান তো কৃতার্থ হব। আমার এক শালী কাছেই থাকেন, তাঁকে কাল আনাব, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। আমার তো চলবার শক্তি নেই, নয়তো নিজে গিয়ে আপনাদের আসবার জন্যে বলতুম।

চমৎকুমারী বললেন, কাল যে আমরা তিন দিনের জন্যে রাঁচি যাচ্ছি। শনিবারে ফিরব। রবিবার বিকেলে আমাদের বাসায় একটা সামান্য টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছি। চক্করের বন্ধু হোম মিনিস্টার শ্রীমহাবীর প্রসাদ, দুমকার ম্যাজিস্ট্রেট খাস্তগির সাহেব, গিরিডির মার্চেণ্ট সর্দার গুরমুখ সিং এঁরা সবাই আসবেন। আপনারা দুজনে দয়া করে এলে খুব খুশী হব। কোনও কষ্ট হবে না, একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আসবেন তো?

বক্রেশ্বর বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, হেই মা কালী, রক্ষা কর।

ক্লান্তির শান্তি — শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
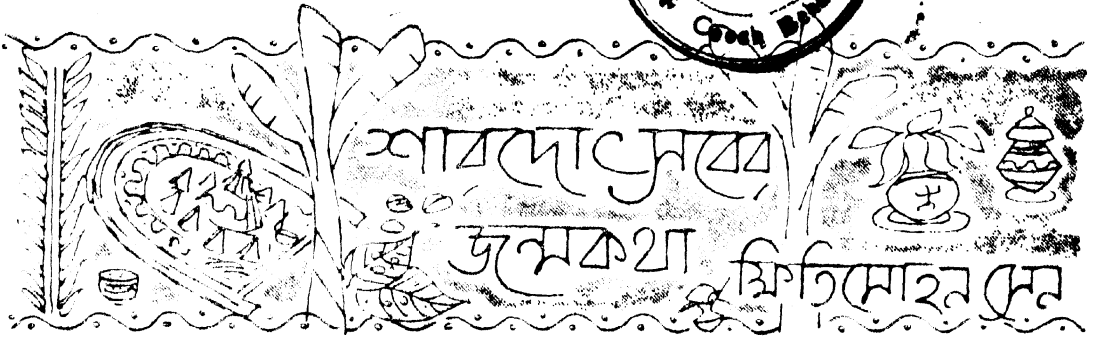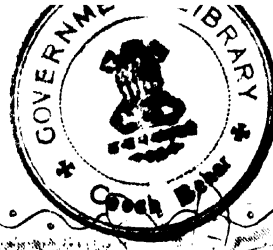
সেদিনকার কথা মনে পড়ে। ১৯০৮ সালের আষাঢ় মাস। শান্তি-নিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছি। আর আজ ১৯৫৮। অর্ধশতাব্দী অতীত।

জীবনের দীর্ঘকাল যদিও এই শান্তি-নিকেতনেই কেটেছে, তবু আমাদের পক্ষে শান্তিনিকেতনের বা কবিজীবনের সব কিছুই জানবার সুবিধা ছিল সেকথা বলা ঠিক হবে কি?

রবীন্দ্র-রচিত বিপুল সাহিত্য পড়ে আছে। তা থেকে বড় রকমের জীবনী রচনা করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি ছিলাম এমন জিনিসের খোঁজে যার সন্ধান শুধু লেখা সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। গভীরতর জীবন সম্পর্কে কবির নিজের কথার সায় না পেলে নিশ্চয় করে কিছু বলা সংগত নয়।

যখনি কোনো সুযোগ পেয়েছি কবির কাছে গিয়ে বসেছি। যেকথার আলোচনা হ'ত বা যেসব কথা আপনি বেরিয়ে পড়ত, সে তো সহজলব্ধ। এ ছাড়া কবিকে তাঁর আত্মজীবনের গভীর দিকটার জন্য প্রশ্নও করতে হয়েছে। কবি নিজে এ-বিষয়ে খুব সাবধান ছিলেন।

* * *

তিনি ইচ্ছে করলে দেশের গুরু, বহু লোককে শিষ্য করে নিতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ অপরূপ সুন্দর ছিলেন। অপূর্ব রাগবিদ্যা, তাঁর গলার স্বর ও সুর সবই তাঁকে মহাগুরুর স্থানে বসাতে পারত। কিন্তু এবিষয়ে কবির মন অত্যন্ত শুচি ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে বলতেন, আপনি আমাকে চেলা করে বের হয়ে পড়ুন। দেখুন দেশশুদ্ধ এতে কি কাণ্ডটাই না করে। আমি তাতে বলেছি আমার সাহায্যের কোনো দরকার হবে না।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের যে ঘনিষ্ঠতা সে সম্পর্কে আমাদের নিজেদেরও সংকোচ ছিল। গুরুদেবকে নিজেদের সুবিধার বা কৌতূহলের জন্য 'বকাচ্ছি' ভাবতেও মনের মধ্যে একটা খটকা বা বেদনা অনুভব করেছি। অনেক সময় অনেক সুযোগ জেনেশুনেই ত্যাগ করেছি।

* * *

একদিন মৃচ্ছকটিক নাটকের একটি শ্লোক কবি উচ্চারণ করলেন। বসন্তসেনার অপরূপ রূপযৌবন দেখে মনে না হয়ে যেত না, 'হে সুন্দরী, তোমার যে অপূর্ব রূপ তা দিয়ে ব্যবসা চালানো যায়।

"এই যে সর্বনেশে রূপ নিয়ে তুমি পথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ সেটাই তো তোমার সৌন্দর্য-ব্যবসার পণ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন তোমার আর ভালো মন্দ বিচার করা চলবে না।"

বহসি চ ধন হার্যাম পণ্য ভূতম শরীরম
সমমুপচর ভদ্রে সুপ্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ।

এরপর কবি অসময়ে একদিন ডেকে পাঠালেন। তাঁর জামার বিরাট পকেটে একটি খাতা—তাতে সুচারু ও 'সুন্দর'-ভাবে কাটাকুটি শিল্পও আছে। বড়ো বড়ো উচ্চ ওস্তাদী গানের মূল এবং ভাঙা পদগুলি খাতায় লেখা। বাকী সব পাতায় নিজের লেখা গান আর কবিতা। এ খাতাটি গীতাঞ্জলির অমূল্য পাণ্ডুলিপি। আমাকে দিলেন, বললেন—

বহসি চ ধন হার্যাম পণ্য ভূতম শরীরম্
সমমুপচর ভদ্রে সুপ্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ।

এই সঙ্গে শারদোৎসবের পাণ্ডুলিপিটিও দিলেন।

* * *

শারদোৎসব নাটক আশ্রমের আদিতম ঋতু উৎসবের বই। শরৎকালের কয়টি গানের সুত্রে গাঁথা নাটকটি তৈরী।

আমি শান্তিনিকেতনে এসেছি বৈশাখে, কাজে যোগ দিলাম আষাঢ় মাসে।

একদিন কবির সঙ্গে কথায় কথায় ঋতু উৎসবের প্রস্তাব উঠল। তখন চলেছে ঘনঘোর শ্রাবণ-ভাদ্র মাস।

জমিদারীর একটা জরুরী কাজে গুরুদেবকে হঠাৎ শিলাইদহে চলে যেতে হল। ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবিত কাজে আমি খানিকটা অগ্রসরও হলাম। উৎসবের জন্য বৈদিক সংহিতা থেকে সাহায্য পেলাম। রামায়ণ থেকেও প্রচুর উপকরণ মিলে গেল। ঋতুসংহার প্রভৃতি ভাণ্ডারও লুঠ করা গেল। সর্বশেষে এলো রবীন্দ্রনাথের রচিত অতুলনীয় বর্ষার সব গান। শিলাইদহ থেকে প্রতিদিনই চিঠিপত্র আসা-যাওয়া করছে।

কবির অসাধারণ উৎসাহ, কিন্তু আটকে পড়েছেন, কিছুতেই আসতে পারছেন না। কাজের চাপে তিনি একদিন লিখতে বাধ্য হলেন, বর্ষার ঋতু উৎসবে আমাকে এবারে বাদ দিন। বর্ষা ঋতু উৎসবে আপনাদের নিরাশ করলেম বটে, কিন্তু পরে শরতের উৎসবে এর ক্ষয়ক্ষতি সব ভরে দেওয়া যাবে।

বর্ষার উৎসবের আয়োজনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি শিক্ষকের দল খুব মেতে উঠলেন। আশ্রমবালকদের উৎসাহের তো কথাই নেই। সর্বক্ষণই তাদের কণ্ঠে গান চলেছে দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার প্রভৃতি শিক্ষকদের লেখা চিঠিপত্রে বর্ষা উৎসব আয়োজনের বিবরণী পড়ে তার উত্তরে গুরুদেব দূর থেকে আমাদের সঙ্গে প্রতিদিনই যোগ রেখে চলতেন। আমাদের উৎসব সফল হল।

* * *

আকাশে বাতাসে সর্বত্র তার জয়বার্তা ঘোষণা করে শরৎ এল। এমন দিনে কবি শিলাইদহ থেকে ফিরলেন। শরৎশোভার কয়েকটি অপূর্ব গান তিনি ছেলেদের মধ্যে দিয়ে দিলেন—

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা

* * *

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা

দিবারাত্রি এই সঙ্গীত সুরে সুরে আকাশে ধ্বনিত হচ্ছে।

এত গান, এত সুরের বন্যায় চারিদিক প্লাবিত, তবু ছেলেদের মন ওঠে না।

তারা বললে, গান তো আছে, অভিনয় কই?

গুরুদেব উত্তর দিয়ে বললেন, এবারে গানই হোক, অভিনয় পরে আর একবারে হবে।

ছেলেরা অনুনয় করলে, বললে, তাতে চলবে না। অভিনয় না হলে আমাদের তৃপ্তি হবে না।

বালকেরা আমাদের শরণাগত হল। যদিও কবিগুরু শিক্ষকদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু ছেলেরা নাছোড়বান্দা, তারা গুরুদেবকে ধরলে, অভিনয় ছাড়া শারদোৎসব মনেই লাগবে না। দিনেন্দ্রনাথ একবার কবিকে ভরসা দেন, আবার ছাত্রদেরও নিরুৎসাহ করেন না। এ অবস্থা দেখে কবি অনুযোগ করলেন, "দিনু, এ তোর কি কাণ্ড! এদিকে আমাকে ভরসা দিচ্ছিস, অভিনয় ছাড়া শুধু গানেই উৎসব হবে, আবার ওদের উস্কিয়ে দিচ্ছিস। এ কিরকম কাণ্ড?"

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেত-ফেরত। কিন্তু এমন খাঁটি স্বদেশী মানুষ দুর্লভ। হয়তো এইজন্যই তাঁর পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দিনু সাহেব নামেই ডাকতেন।

গুরুদেবের অনুযোগের পর দিনু সাহেব গান ধরলেন—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে
চারিদিকে হাসিরাশি, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।

এ হল সন্ধ্যেবেলার কথা। রাত্রিতে যখন আমরা ওর কাছ থেকেই ফিরছি, তখন কবি যে কথাটি বললেন তা বড়ো খাঁটি কথা। বললেন, আপনাদের মতো যাঁরা শিক্ষাগুরু, তাঁদের আমি মানাতে পারি। কিন্তু এই ছেলেগুলোর আবদার তো উপেক্ষা করা চলবে না দেখছি।

* * *

প্রতিদিন প্রভাতে কবি তাঁর সকাল-বেলাকার আহ্নিক শেষ করে আশ্রমের চারদিক একবার ঘুরে বেড়িয়ে যান। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের নিয়ম।

প্রভাত হল। কিন্তু কই—দোতলা থেকে কবির নামবার নাম নেই। ভৃত্য উমাচরণ এসে আমাদের খবর দিল, বাবুর আজ এ কি হল? বাবুমশায় এ সময়ে তো লিখতে বসেন না। তিনি কাগজপত্র নিয়ে বসে গেলেন। আজকে একটা কিছু নতুন কাণ্ড ঘটবে নাকি?

সকাল গেল। মধ্যাহ্নও যায়। ছোট্ট সাদা বাড়ি দেহলীর দোতালায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসে কবি লিখেই চলেছেন। স্নান নেই, খাওয়া নেই—ক্রমাগতই লিখছেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, গুরুদেব দপ্তর ছাড়লেন।

সকলকে ডেকে বললেন, আমার লেখা হয়ে গেছে।

অর্থাৎ শারদোৎসব পালাটি, অভিনয়ে আর গানে ভরপুর হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

তিনি বললেন, আপনারা আসুন, আমি শোনাই।

একটি বালক, নরেন্দ্রনাথ দাস। মনে পড়ে তার বাড়ি খুলনা জেলার দশালি গ্রামে। সে বললে, আপনি সারাদিন খাননি। স্নান-খাওয়া সেরে নিন। ওপরে গেলে কজন আর বসতে পাবে ওখানে? আপনি বরং নীচে আমাদের বীথিকা ঘরে এসে বসুন। আপনার স্নান-খাওয়া শেষ হতে হতে আমরা শ্রোতাদের দল ভালো করে জায়গা করে গিয়ে বসি।

বীথিকাঘরে ঢুকেই দেখি, গণিতের শিক্ষক জগদানন্দ রায় প্রথম দিকেই বসে গেছেন।

গুরুদেব স্নানাহার শেষ করে এলেন। এসে বসে পড়তে আরম্ভ করলেন।

কী অপূর্ব পড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে কী তার গান! সবই কবি একলা করছেন—কখনো গান গেয়ে কখনো পাঠ করে।

নাটক পড়া চলেছে। এক একটি পাত্র প্রবেশ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি চারটি কথা শুনেই শ্রোতার দল ঠিক করে নিচ্ছেন, আশ্রমের কাকে কি সাজানো যায়।

বাল্যকালে কাশীতে আমার পিতৃদত্ত নাম অল্প লোকেই জানতেন। ঠাকুর্দা নামেই আমি সর্বত্র পরিচিত ছিলাম। এমন কি, আমার কলেজের সাহেব অধ্যাপকদের মধ্যেও। ভেবেছিলাম, শান্তিনিকেতনে গেলে এই নাম ঘুচবে।

যেদিন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে এসে কাজে যোগ দিলাম সেদিনই অগ্রজপ্রতিম কাশীর ভূপেন সান্যাল মহাশয় সর্বসমক্ষে আমাকে ডাক দিলেন ঐ নামেই। বিধু-শেখরও সেখানে উপস্থিত। এ যেন হর-কোপানলে দগ্ধ হবার আগে মদনকে ভস্ম না করবার জন্যে প্রার্থনা। এই বাণী আকাশপথে আসতে যেটুকু সময় লাগে তারি মধ্যে মহাদেবের রুদ্রনেত্রজাত বহ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। আমারও সেই অবস্থা।

ঠাকুর্দা বলেই গুরুদেব তাঁর দপ্তরে আমাকে সামিল করে নিলেন।

শারদোৎসব নাটক পাঠ হয়ে গেলে তিনি বললেন, অভিনয় করতে অসুবিধে হবে না। ঠাকুর্দা তো তৈরী হাতের কাছেই।

নাটকের ঠাকুর্দা মানুষটি সংগীতময়। সত্যিকারের একটি ঠাকুরদাদাকে কবি বালককালে দেখেছেন। তিনি রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বউঠাকুরাণীর হাটে তিনি বসন্ত রায় নামে পরিচিত। চিরকুমার সভায় তাঁরই মতো একজন রসিকদা। শারদোৎসবের ঠাকুর্দা পাত্রটি একটি অপূর্ব রচনা। এই রকম একখানি অংশ আমার জন্য তৈরী হওয়ায় আমি একেবারে অথই জলে পড়লাম।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, দিনু সাহেব এবং কবি প্রভৃতি আগেই একটা গোপন চুক্তি করেছিলেন। এবারে তাঁরা নিজেরা অভিনয়ে নামবেন না। শান্তিনিকেতনে আমাদের শিক্ষকদের বিদ্যে সাধ্যি কতদূর সেইটেই পরখ করে নেবেন।

আশ্রমে এসে প্রথম দিকেই দিনু সাহেবের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা। এরকম মজলিসী লোক বড়ই দুর্লভ। সন্ত কবিদের এবং আউল বাউলদের গান যে আমার বিশেষ প্রিয়, সেটা জেনেছিলেন।

গান আমার খুব প্রিয়, তাই বলে রঙ্গ-মঞ্চে একটা গীতিময় যোগ্যতা দেখানোর মতো মূর্খতা আমি কখনোই ভাবতে পারিনি। বিশেষত এই ঠাকুরবাড়ির আওতায়, যেখানে গান চিরদিন মহা সাধনার বস্তু হয়ে দিবা রাত্র বিরাজ করছে।

এই যে-সময়ের কথা বলছি সে এক অপূর্ব যুগ। সেদিনের অনেক কথাই এখন মনে আসে। সেই স্মরণটিও একটি সুন্দর আনন্দময়।

কবি যেমন সৃষ্টিময় যুগটি রচনা করলেন, তেমনি যুগটিও তাঁকে রচনা করল।
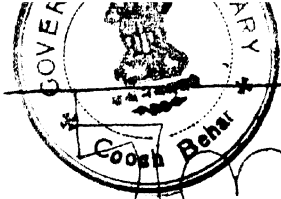
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

দেবতোষ চৌধুরীর উপন্যাসটি আমায় সমালোচনা করতে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ-বইয়ের সমালোচনা করা আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল না। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে মার্জনা করবেন।

বইটি ফেরত পাঠাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন এ-বইটি সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমি অনিচ্ছুক তাও না জানিয়ে পারছি না।

দেবতোষবাবু, অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে যাকে আমাদের ভাষায় বলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বই বেরুতে না বেরুতে সংস্করণ শেষ হয়ে যায় না বটে, কিন্তু রসিক ও বিদগ্ধ পাঠক মহল তাঁর লেখার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। গত তিন বছরে তাঁর তিনটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'কালো জল' বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর থেকে আমিও তাই অন্যান্য বহু অনুরাগী পাঠকের মত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করেছি। কিন্তু বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে সত্যি কথা বলতে গেলে হতাশ ঠিক নয়, কেমন যেন বিমূঢ় হয়েছি।

এই বিমূঢ়তার কথা সমালোচনায় লেখা যায় না, অন্তত লিখতে ইচ্ছে করে না। তবু আপনি সহৃদয় ও বিবেচক জেনে আমার মনের বিহ্বলতার কারণগুলি আপনার কাছেই নিবেদন করছি। এ আলোচনা নেহাৎ ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছেই লেখা। আশা করি, কোনদিন তা প্রকাশ পাবে না।

'কালো জল' নামটি থেকেই শুরু করা যেতে পারে। সমস্ত বইটি পড়লে নামটির সার্থকতার হয়ত অনেকেই তারিফ করবেন। কিন্তু আমার মতে নামটির ইঙ্গিত উপন্যাসটিকে একটু ভুল বোঝবার পথেই সাহায্য করেছে।

কালো জল, বলতে দেবতোষবাবু নিয়তিই বোঝাতে চেয়েছেন এই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ধারণাই উপন্যাসটির পক্ষে ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি।

'কালো জলে' চরিত্রসংখ্যা কম নয়। তাদের সকলের কথা আলোচনা করতে চাই না, সময় বা দরকারও নেই। সুপ্রিয়, দিবা আর বাসব এই তিনটি চরিত্রের কথাই প্রধানত ধরা যায়, কারণ এই তিনজনই মনের উপর দাগ কেটে যায় সবচেয়ে বেশী।

তিনটি চরিত্র। তার মধ্যে দুজন পুরুষ ও একজন নারী। কিন্তু সাধারণত যাকে ত্রিকোণ কাহিনী বলে 'কালো জল' তা নয়। এই তিনজনের সম্বন্ধের জটিলতা প্রেমের সে মামুলি ছকে পাতা বোধ হয় বলা চলে না।

দিবাকে প্রথমেই একটি পরিচ্ছন্ন সুখের সংসারের মধ্যেই দেখি। বেশ একটু সাচ্ছল্যের গৃহস্থালী। মনে হয়, কোনদিকে কোন দুর্ভাবনা বুঝি এদের জীবনে নেই। দেবতোষবাবুর এইখানেই মুন্সিয়ানা। ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা ও ছবি দিয়ে তিনি আমাদের মুগ্ধ করে কখন যে মসৃণতার মাঝে চিড় খাওয়া দাগগুলো দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আমরা হঠাৎ এক সময়ে বুঝতে পেরে অবাক হয়ে যাই। কিন্তু নেহাতই সূক্ষ্ম তুচ্ছ চিড়। সুপ্রিয় আর দিবার হৃদয়-সম্পর্কের মধ্যে তার কোন লক্ষণ নেই। আছে বুঝি শুধু ভীরু আশা, ছোট সুখের বেষ্টনীতে নিজেদের ঘিরে রাখার দুর্বলতার মধ্যে। জানলার পর্দাগুলো কেমন একটু বেমানান হয়েছে। ঘরে ঢুকলেই দিবার আফসোস হয়। দোকানদারের খোশামুদিতে ভুলে কেন যে সেদিন হট্ করে কিনে আনল। এখন আর ফেরত দেবারও উপায় নেই।

ঘরে ঢুকে দিবাকে ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতে দেখেই সুপ্রিয় হেসে বলে, "আচ্ছা, এখনো তোমার মনের খুঁতখুঁতুনি গেল না!"

'না'—দিবার মুখটা কেমন করুণই দেখায়। "মনে হয় যেন ঘরটা নিজের নয়!"

"তুমি এক কাজ কর বাপু!" সুপ্রিয় হেসে ওঠে আবার, "ও পর্দাগুলো ফেলে নতুন পর্দা কিনে নিয়ে এস!"

কিন্তু সে পরামর্শও দিবার ভালো লাগে না। সে পর্দা নিয়ে খুঁতখুঁত করবে তবু অপব্যয় মনে করে নতুন পর্দা কিনতে রাজী হবে না। মনের মধ্যে এই সামান্য খচখচে কাঁটাটা পুষে রাখাতেই তার চরিত্রের ইঙ্গিত কি দেবতোষবাবু দিয়েছেন?

শুধু পর্দা নয় আরো দু একটা বিষয় আছে, যেমন গানের স্কুলের কমিটির ব্যাপারটা।

দিবা এ বছর সে কমিটিতে থাকতে চায়নি। কিন্তু কমিটির হোমরা-চোমরা চাঁইদের একান্ত অনুরোধও এড়ান সম্ভব হয়নি তবু। নেহাত অনিচ্ছায় শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি জানিয়েছে।

সুপ্রিয় অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। দিবা বেঁধে দিচ্ছে টাইটা। এ কাজটা বরাবর তাকেই করতে হয়। সুপ্রিয় বোধ হয় এই মধুর সেবাটুকু উপভোগ করবার জন্যেই ইচ্ছে করে টাই বাঁধতে কয়েকবার গোলমাল করে তার আনাড়িপনা প্রমাণ করে রেখেছে।

চাকর একটা কার্ড এনে দেয় দিবার হাতে। গানের স্কুলের কমিটি মিটিং-এর নোটিস।

দিবা সেদিকে একবার চোখ দিয়ে কার্ডটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয় রাগ করে।

টাই বাঁধা হয়ে গেছে। ঘাড়টা দু একবার নেড়ে সেটা যেন একটু আলগা করবার চেষ্টা করে সুপ্রিয় সকৌতুক দৃষ্টিতে দিবার দিকে চেয়ে বলে,—"কি, কমিটি মিটিং বুঝি?"

"হ্যাঁ!" কোটটা পিছন দিক থেকে পরিয়ে দিতে দিতে দিবা বলে, "এক জ্বালা হয়েছে আমার!"

কোটটা পরার পর দিবার দিকে ফিরে এক হাতে তাকে জড়িয়ে আর এক হাতে তার চিবুকটা তুলে ধরে সুপ্রিয় বলে,—"তা এতই যদি জ্বালা মনে হয় ত' একটি চিঠি দিয়ে চুকিয়ে দাও না ঝামেলা। ও কমিটিতে থাকবার দরকার কি?"

দিবার মুখের চেহারায় অসহায় একটা করুণ ভাব ফুটে ওঠে, "কিন্তু সুরপতিবাবু, শোভনাদি অনিমা ওরা যে কিছুতেই ছাড়তে দেয় না!"

এই দ্বিধা ও দৃঢ়তার অভাবও বুঝি দিবার চরিত্রের একটা দিক।

অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে সুপ্রিয় বলে—"কিন্তু কমিটির উপর এত বিদ্বেষই বা কেন তোমার? সময়টাও কাটে, কাজও কিছু করতে পারো।"

"ছাই কাজ! ও গানের স্কুল-টুল আজকাল আমার ভালোই লাগে না!"

সুপ্রিয় একটু সকৌতুক বিস্ময়েই তার দিকে তাকায়,—"সে আবার কি? সৌখিনের জলে অরুচি! গান নিয়েই ত তুমি পাগল!"

"গান নিয়ে পাগল হতে পারি, কিন্তু এইসব স্কুল আমার দু চোখের বিষ। অলিতে গলিতে যেখানে যাও দু পা অন্তর গানের স্কুল। গোটা জাতটা গান শিখলেই যেন উদ্ধার হয়ে যাবে! আর কিছু কাজ নেই। আর শেখে ত' কত! শুধু বিয়ের বিজ্ঞাপনের বাহার বাড়াবার ফিকির।"

দিবার সঙ্গে এরকম আলোচনা আগেও হয়েছে। সুপ্রিয় তাই আর তাকে ঘাঁটিয়ে তর্ক বাড়ায় না। "কিছু একটার নেশা না থাকলে তোমায় পেতাম কোথায়!" বলে হেসে বেরিয়ে যায়।

দেবতোষবাবু আমাদের প্রায় অগোচরে গল্পের কাঁটা সূত্র এইসব বর্ণনার মধ্যে রেখে গেছেন।

সুপ্রিয় ও দিবার এই আপাতঃসরল দাম্পত্য জীবনের ছবিতে বিচক্ষণ পাঠক অবশ্য সম্পূর্ণ প্রতারিত হননি। তাঁরা বুঝেছেন, পুষ্পে কীট এখনো না থাক দেখা দেবেই।

বাসবই কি সেই কীট!

কিন্তু সেভাবে সে দেখা দেয়নি। উপন্যাসের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত সে অনুপস্থিত। তার নাম পর্যন্ত একবার উল্লিখিত হয়নি।

তারপর গানের স্কুলেরই একজন শিক্ষক হিসাবে সে এসেছে। অত্যন্ত নগণ্য একজন শিক্ষক। এককালে বাংলা দেশের গানের জগতে তার নাম বুঝি একটু আধটু শোনা গিয়েছিল, তারপর অভাবে অত্যাচারে তার সমস্ত সম্ভাবনা গিয়েছে বিনষ্ট হয়ে। কমিটি গায়ক-সমাজেরই কয়েকজনের সুপারিশে শিক্ষকতার ভার দেওয়ার নামে তাকে কিছু সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছে।

সে কমিটির অধিবেশনে দিবাও ছিল। সে উৎসাহও যেমন দেখায়নি এ ব্যাপারে, তেমনি আপত্তিও নয়।

তাদের নিত্য কমিটি বসে না। স্কুলে স্বেচ্ছায় দিবা খুব কমই যায়। সুতরাং বাসবের সঙ্গে তার দেখাই হয় না বললে হয়।

হলে বাসবই কেমন একটু দীনভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। স্কুলে দিবার প্রতিপত্তি যে কত তা জানে বলেই বোধ হয়। বাসব সামান্য মাইনের শিক্ষক। দিবা হর্তাকর্তাদের একজন। বাসবের চাকরি বজায় রাখতে দিবার অনুগ্রহও প্রয়োজন।

দেখা দৈবাৎ হয়ে গেলে দু চারটে কথা যে হয় না তা নয়।

দিবাই জিজ্ঞাসা করে আগে, "কেমন লাগছে স্কুল?"

"ভালো! খুব ভালো!"—বাসবের মুখের হাসি ও গলার স্বরে একটু সম্ভ্রমই মেশানো। কিন্তু শুধু কি সম্ভ্রম? একটু যেন কেমন আশংকাও কি মনে হয় না?

হতে পারে। হয়ত সেইজন্যই বাসব সাধ্যমত দিবার সামনে পড়তে চায় না।

দিবাকে এড়িয়ে চলা এমন কিছু কঠিন নয়। কদিনই বা সে স্কুলে আসে।

বড় জোর কোনদিন কোথাও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বড় অনুষ্ঠান থাকলে কমিটির অন্য সকলের সঙ্গে সব ব্যবস্থা একটু তদারক করবার জন্যে। তখন হয়ত বাধ্য হয়ে বাসবকে দেখা করতে হয়।

"তুমি—আপনি আমায় ডেকেছেন?"

দিবা বুঝি অনুষ্ঠানে যারা যোগ দেবে তাদের তালিকাটা দেখছিল। মুখ তুলে বলেছে—"ও, হ্যাঁ, আপনার ক্লাসের একটি মেয়ে ত জ্বর নিয়ে এসেছে। ওকে কি গাইতে দেওয়া উচিত হবে?"

"ওর কিন্তু দারুণ আগ্রহ। বলছে, ডাক্তারের মত নিয়ে এসেছে। গাইলে কিছু হবে না। তবে আপনি যা বলেন।"

দিবা হঠাৎ একটু ভ্রূকুটি করে বলেছে,—"বেশ, তাহলে গাইতে দিন।" এক মুহূর্ত চুপ করে বাসব চলে যাবার উপক্রম করতেই আবার একটু কঠিন স্বরেই বলেছে,—"আমায় আপনি বলবেন না!"

বাসব উত্তর দেবার অবকাশ পায়নি। পরিচালকসমিতির আরেকজন ঘরে ঢুকেছেন। বাসব অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

কয়েকটা এমনি ঘটনায় আমরা বুঝেছি, বাসব দিবার অপরিচিত নয়।

দেবতোষ চৌধুরী কয়েক পাতা পরেই পরিচয়ের বিবরণও জানিয়ে দিয়েছেন।

বাসবের কাছেই দিবার প্রথম গান শেখা শুরু।

কিন্তু সেটা এমন কিছু মনে রাখবার মত ব্যাপার নয়। বাসবের পর আরো অনেকের কাছেই দিবা শিক্ষা পেয়েছে। তাদের কেউ কেউ দেশবিখ্যাত গুণী।

বাসবের প্রতি পাঠক হিসাবে তেমন মনোযোগ তাই দিইনি। ঔপন্যাসিকও তাকে কাহিনীর নেপথ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপর।

দিবা আর সুপ্রিয়র দাম্পত্য জীবনের কাহিনীতেই আমরা মগ্ন হয়ে গেছি। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রার ও হৃদয় সম্বন্ধের গল্প। কিন্তু দেবতোষবাবুর কলমের এইসব জায়গাতেই বাহাদুরী। সে গল্প তিনি মামুলি হতে দেন নি। প্রতিদিনের তুচ্ছ বিবরণ অপ্রত্যাশিত সব বিস্ময়-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দুটি মানুষ যে পরস্পরের কাছে দুটি অজানা রহস্যের দ্বীপ, পদে পদে সেখানে যে আবিষ্কারের উত্তেজনা, অভাবিতের বিস্ময়বিমূঢ়তা তা আমরা গভীরভাবেই বোঝবার সুযোগ পেয়েছি।

মনে হয়েছে, সুপ্রিয় আর দিবা বুঝি তাদের আবেগের আন্তরিকতায় নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যের সুলভ সন্তোষ অতিক্রম করে যাবে।

নিয়তিও তাদের জীবনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে এবার। একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে দিবা প্রায় জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত থেকে ফিরে এসেছে।

বিশ্বাস করুন, এরপরই দেবতোষবাবুর লেখা কেমন বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আমাকে। তাঁর সুদৃঢ় সুনিপুণ কলমে যেন কী দুর্বোধ খেয়াল ভর করেছে। পাঠকের সমস্ত মন প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করলেও কিন্তু তাঁকে অনুসরণ না করে পারে না। তিনি দুর্বার বেগে তাকে টেনে নিয়ে যান এই কটি মন্থর মামুলি জীবনের প্রচণ্ড আকস্মিক আবর্তের দিকে।

দিবা একটু কি বদলে গেছে জীবনের এই প্রথম শোকের আঘাতে! একটু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছাড়া কিছুতে তা বোঝা যায় না।

দিবা সেই দুঃসহ স্মৃতিকে আমল না দেবার জন্যেই বোধ হয় নিজেকে নানা কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। যে স্কুল তার দু চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল সেখানে সে আজকাল প্রতিদিন যায় বিভিন্ন কাজের ভার নিয়ে।

বাসবের সঙ্গে তার দেখা হয় প্রায় রোজই।

'কালো জল' থেকে একটি সাক্ষাতের বিবরণ এখানে না তুলে দিয়ে পারছি না। বাসব বুঝি একলা বসে সেতারের তার বাঁধছিল। দিবা ব্যস্তভাবে এসে ঘরে ঢুকল।

"শোভনাদি এঘরে আসেন নি!"

প্রশ্নের উত্তরটা নিজের চোখের দেখাতেই পেয়ে দিবা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে আবার কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। তারপর ফিরে এল একেবারে বাসবের কাছে।

"আমায় দেখলে আপনি এমন জড়সড় হয়ে থাকেন কেন?"—একটা প্রচ্ছন্ন জ্বালা শুধু তার গলার স্বরে নয় চোখের দৃষ্টিতেও। "সহজ হয়ে কথা বলতে পারেন না!"

বাসব মুখ তুলে তাকাল। তার মুখে

একটা অসহায় অস্বস্তি।—"না, সহজভাবেই ত কথা বলি!"

"না, বলেন না!"—দিবার স্বর অত্যন্ত কঠিন। "কিন্তু জড়সড় হবার আপনার ত কিছু নেই।"

বাসব কেমন বিপন্নভাবে চুপ করে রইল।

দিবা-ই আবার তীব্রস্বরে বললে,—"আপনার কোনো ক্ষতি করব এই আপনার ভয়? করলে আগেই করতে পারতাম। এখানে আপনি জায়গা পেতেন না।"

এরকম আলাপ আরও আছে।

এক জায়গায় দেখছি দিবা বলছে,—"যারা অমানুষ হয়, তাদের তবু একটা লোক-দেখানো সাহসের আস্ফালন থাকে। আপনার তাও নেই! আপনি কিলবিলে একটা পোকার বেশী কিছু নন।"

দিবার এইসব অদ্ভুত আচরণের ও কথার কোনো মানে কেউ পাবে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থকার তাকে ক্রমশ আরো দুর্বোধ করে তুলেছেন।

অফিসের পর বাড়ি এসে সুপ্রিয় একদিন বিমূঢ় হয়ে গেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে,—"এ আবার কি খেয়াল দিবা?"

খেয়াল সত্যিই অদ্ভুত। দিবা নিজের আলাদা শোবার ঘরের ব্যবস্থা করেছে।

সুপ্রিয়র মনে যাই হোক, মুখে একবার সে প্রতিবাদ করেছে মাত্র। তারপর আর কিছু বলেনি।

বলেনি অনেক কিছুতেই, অনেকদিন পর্যন্ত।

একদিন বাড়ি ফিরে বাসবকে দেখেছে বাইরের ঘরে। অত্যন্ত সংকুচিত অপরাধীর মত বসে আছে। বাসব সুপ্রিয়র একেবারে অপরিচিত নয়।

সামান্য একটা দুটো সাধারণ আলাপ হয়েছে। বাসব তারপর চলে গেছে।

সুপ্রিয় আজও হয়ত কিছু বলত না। কিন্তু এতক্ষণ দিবার মুখের চেহারা সে লক্ষ্য না করে পারেনি। সে মুখের ভাব বোঝা অবশ্য কঠিন। যন্ত্রণা না আক্রোশ না অন্য কিছুতে তা অমন বিবর্ণ কঠিন জানবার উপায় নেই।

"কি জন্যে এসেছিল বাসব?" যথাসম্ভব সহজ গলায় সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করেছে, "কিছু চাইতে বোধ হয়?"

দিবা কেমন অদ্ভুতভাবে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়েছে। উত্তর দেয়নি।

সুপ্রিয় আবার বলেছে,—"চাইলেই বেশী কিছু দিও না। লোকটা স্বভাব দোষেই শুনেছি নিজের সর্বনাশ করেছে। গলাটলা ত সব গেছে। অভাবে পড়ে আর তোমাদের ওখানে চাকরির দায়ে খানিকটা সামলে আছে। টাকা কড়ি বেশী পেলেই আবার মদ জুয়ায় ওড়াবে।"

"বাসব টাকা চাইতে আসে নি! আমিই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।" বলে দিবা তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে সুপ্রিয় ঘরে একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ।

নিরাপদ একটি শান্তির ও তৃপ্তির নীড়। কী অপরাধে কার শাপে তা এমন করে ভেঙে যাচ্ছে!

দিবা আর সুপ্রিয় একই বাড়িতে বাস করে, কিন্তু বহু যোজনের ব্যবধান যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

গানের মত বেশভূষার সংযত সৌখীনতাও দিবার জীবনের একটি প্রধান নেশা ছিল। দিবা সে সমস্ত পরিত্যাগ করে নিতান্ত সাধারণ পোশাক ছাড়া কিছু পরে না।

অফিস যাবার সময় সুপ্রিয় গলার টাইটা নিয়ে যেন বিব্রত হয়ে সেদিন বলেছে, "কি গোলমাল করে ফেললাম। দাও না একটু বেঁধে!"

"আয়নার সামনে গিয়ে বাঁধো ঠিক হয়ে যাবে।"—দিবার কণ্ঠস্বর যেন যান্ত্রিক।

"তবু তুমিই দাও না আজ বেঁধে? কতদিন ধরে নিজে বাঁধছি বলো ত?"

"নিজে যখন পারো তখন আমার বাঁধবার দরকার কি?"—আলোচনাটায় জোর করে দাঁড়ি টানবার জন্যেই দিবা ঘর থেকে চলে গেছে।

তারপর সেই রাত্রি।

নিঃসঙ্গ ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বিনিদ্র হয়ে পায়চারি করে সুপ্রিয় হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মৃদুভাবে ঘা দিয়েছে দিবার ঘরের বন্ধ দরজায়।

দিবাও তখন জেগে আছে বোঝা গেছে। দুবারের বেশী তিনবার ঘা দিতে হয়নি।

দিবা কিন্তু 'কে' যেমন জানতে চায়নি, তেমনি দরজাও খোলেনি। দরজার ওধার থেকে ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে, "কি চাও!"

"দরজাটা খোলো দিবা!"—কি সকাতর মিনতি সুপ্রিয়র গলার স্বরে!

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর দিবা দরজা খুলেছে।

তারপরও খানিকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে।

সুপ্রিয় হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে,—"এসো!"

দিবা সরে দাঁড়িয়েছে তৎক্ষণাৎ,—"না, তুমি তোমার ঘরে যাও।"

"কেন? কেন এমন অবুঝ হয়েছ দিবা! কি আমার অপরাধ?"

"অপরাধ! অপরাধ তোমার কেন হবে!" দিবার কণ্ঠ ক্লান্ত কাতর কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়, "কিন্তু আমাকে তুমি চেও না। স্পর্শ করবার চেষ্টাও কোরো না। তাহলে—তাহলে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।"

দিবার ঘরের যেটুকু আলো বাইরে এসে পড়েছে তাইতেই দেখা গেছে সুপ্রিয়র মুখ ছাই-এর মত শাদা হয়ে গেছে।

"কি বলছ তুমি দিবা! কেন এমন করে যে-স্বর্গ আমরা তৈরী করে তুলতে পারতাম তা ভেঙে দিচ্ছ নিষ্ঠুর হয়ে। পরস্পরকে আমাদের যে একান্ত দরকার দিবা। আমাকে নিজেকে এমন করে অন্যায় শাস্তি দিও না!"

"এ শাস্তি আমার পাওনা।"—দিবার গলা থেকে নয়, যেন অতল অন্ধকার কোন গহ্বর থেকে কথাগুলো উঠে এসেছে।

"তোমার পাওনা!"—বিমূঢ়ভাবে খানিক চুপ করে থেকে সুপ্রিয় ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছে, "কি তোমার গ্লানি আমি জানি না দিবা। যদি কিছু থাকেও তবু তোমাকে আজ আমি যেমনভাবে যতটুকু পেয়েছি তাই আমার কাছে সব। আজকের দিনের আলোয় কাল রাতের অন্ধকার কেন তুমি টেনে আনছ? নিজেকে শাস্তি দিতে গিয়ে আমায় কি যন্ত্রণা দিচ্ছ তা কি একবার ভাবছ না!"

"ভাবছি, ভাবছি, সারাক্ষণই ভাবছি!"—দিবার স্বর এবার বুঝি একটু তীক্ষ্ণ হয়ে কেঁপে উঠেছে,—"তোমায় যন্ত্রণা আর আমি দেব না। আমি চলে যাবো।"

"চলে যাবে! কোথায়? কেন?"—একটা হতাশ আর্তনাদের মত শোনাল সুপ্রিয়র কথাগুলো।

"কোথায় জানি না, কেন জিজ্ঞাসা কোরো না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই। আর—আর যাবো ওই বাসবের সঙ্গে।"

সমস্ত বাড়িটাই নিস্পন্দ পাথর হয়ে গেছে।

সেই পাথরের নিস্পন্দতায় আর একটা শব্দ যেন আছড়ে পড়ল,—"সেই আমার চরম পুরস্কার।"

কি ভাবছেন সম্পাদক মশাই? কি আপনি বুঝেছেন?

আমি কিন্তু বিমূঢ়।

কি বলতে চেয়েছেন লেখক?

দেহের শুচিতা নিয়ে উন্মত্ত অবাস্তব তন্ময়তাও রুগ্ন মনের একরকম বিলাস?

বিবেকও অর্থহীন উপদ্রব হতে পারে কখনো কখনো?

যত বড় স্খলনই হোক তার অনুশোচনায় মাত্রাহীন আত্মনিপীড়নের চেয়ে জীবনের দাবী অনেক বড়?

না, সম্পাদক মশাই, এ উপন্যাস সমালোচনা করবার ভার নিতে আমি অক্ষম। আবার মার্জনা চাইছি।

**গি**রিবালা দিদি প্রথম যখন এলেন, তখন রোগীর সেবার জন্যই এসেছিলেন। ভদ্রঘরের মেয়ে দুরবস্থায় পড়েছেন, আপনার কেউ নেই, তাই যখন যার বাড়ি যে কাজে ডাক পড়ে সেই কাজেই যান। বেশীর ভাগ বাড়িতে রান্নার কাজই করে এসেছেন। অবশ্য এক বাড়িতে বেশী দিন থাকেন নি, নানা কারণে স্থায়ীভাবে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেন যে সম্ভব হয়নি, সে সব নানা কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন, আমিও আগ্রহের সংগেই শুনেছিলাম।

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের মেয়ের পিতৃকুলে খোঁজ করলে হয়তো এখনও সম্পর্কের সূত্র ধরে দুই একজনকে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু গিরিবালা দিদি সে চেষ্টা করেন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, "মেয়ে বলেছিল, মা, লোকের বাড়ি কখনও হাত পাততে যেওনা, দরকার মনে করে যারা ডাকবে তাদের বাড়িই যেও, যখন তাদের ভাবে বুঝবে যে তাদের দরকার শেষ হয়েছে, তখন আর সেখানে থেকো না, নিজের মান নিজের হাতে এ-কথাটা কখনও ভুলো না।"

একই মেয়ে ছিল তাঁর, সেই মেয়েই ছিল তাঁর ইষ্টদেবী।

মেয়ের কথা পরে বলব, এখন আগে তাঁর নিজের জীবনের কাহিনীই সংক্ষেপে বলে নিই।

এখন তাঁর বয়স পয়তাল্লিশ বৎসর, গৌরবর্ণ, বেঁটে। মুখ দেখলে মনে হয় শরীর আর মনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা গিয়েছে, কিন্তু তবুও একেবারে ভেঙ্গে পড়েন নি।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যেন বাড়িরই একজন হয়ে গেলেন। কোন সংকোচই দেখিনি তাঁর ব্যবহারে কোনদিন।

খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই উঠতেন। কয়লা বাছবার জন্য যেতেন 'পাঁশ-কুড়ে' (অর্থাৎ যেখানে পোড়া কয়লা আগের দিনের ছাই সুদ্ধ ফেলে দিয়েছে রান্নাঘরের ঝি) একটা চুবড়ি নিয়ে সেই ছাইয়ের গাদা থেকে বেছে বেছে কয়লা তুলতেন চুবড়িতে, তারপর কুয়োতলায় গিয়ে জল তুলে সেই কয়লা ধুয়ে নিয়ে চুবড়ি সুদ্ধ জল ঝরাতে দিয়ে প্রাতঃক্রিয়া ও স্নানের জন্য যখন যেতেন, তখন যে চাকর উনুনে আগুন দেয়, তাকে ডেকে বলে যেতেন, "বেহারি, বাবা, উনুন যখন গন্‌গনে হয়ে ধর্‌বে তখন এই কয়লা উনুনে দুটোতে ঢেলে দিও, বুঝলে? আগে যেন না ধরতেই দিও না!" চাকরকে অবশ্য এই কথা বলতেন, কিন্তু আমাকে বলেছিলেন, "পাঁশ গাদার কয়লা, শুচি অশুচি বলে একটা কথাও তো আছে, তা' অগ্নি হ'লেন পাচক, আগুনের ছোঁয়া পেলে সব অশুচিই শুচি হয়ে যায়। যেমন সাধুর সংগ পেলে মহা মহা অসাধুও সাধু হয়ে যায়; সাধুও এক হিসেবে আগুনই তো। হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী সেদিন পড়ছিলে, হরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলে ছিলেন সেই সময়ের কথা। কি সুন্দর কাহিনী বল দেখি, আহা, আহা, শুনলে যেন গায়ে কাঁটা দেয়। রাজা পাঠিয়েছেন সাধুকে নষ্ট করবার জন্য এক রূপবতী যুবতী বেশ্যাকে। সাধুর অত খ্যাতি রাজার সহ্য হচ্ছে না। আর সাধুও তো পরম সুন্দর, নবীন যৌবন অংগে যেন যৌবন ঝলমল করছে। বেশ্যা এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো সাধুর সম্মুখে, বললে, তুমি আমাকে যদি গ্রহণ না কর তা হলে আমি প্রাণে বাঁচবো না, আমি প্রাণমন সব তোমাকেই সমর্পণ করেছি। বেশ্যার এই আকাঙ্ক্ষা শুনে সাধু রাগও করলেন না, তাড়িয়েও দিলেন না তাকে, বললেন, "দেখ আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ না হলে আমি জল পর্যন্ত গ্রহণ করি না এই আমার নিয়ম, সংখ্যা পূর্ণ না হলে তোমাকে কেমন করে গ্রহণ করি? সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।" অপেক্ষা করতে লাগলো সেই বেশ্যা, একদিন একরাত্রি গেল সংখ্যা পূর্ণ হ'ল না; তিন লক্ষ নাম, সুস্বরে গান করে যাচ্ছেন হরিদাস ঠাকুর। সে গান যেন প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে বেশ্যার। আবার এল বেশ্যা সন্ধ্যার সময় সারারাত্র জেগে বসে রইলো, সাধু নাম গান করে যাচ্ছেন, সেদিনও সংখ্যা পূর্ণ হল না। তারপর তিন দিনের দিন সন্ধ্যায় বেশ্যা এল, যেন টলতে টলতে এল, নামের নেশা ধরে গিয়েছে তার। কেন এসেছে, কি জন্য রাজা পাঠিয়েছেন সে কথা যেন আর তার মনে নেই। রাত জেগে সাধুর নাম কীর্তন শুনছে তদ্গত হয়ে, ভোরবেলায় আছড়ে পড়লো সাধুর পায়ের তলায়, "কৃপা কর, কৃপা কর!" আহা, আহা, দিদিমণি এ কাহিনী শুনলে যে পাথর গলে যায়, বেশ্যার কি ভাগ্যের সীমা আছে।

এই যে কথাগুলি গিরিবালা দিদি বলে গেলেন, এই কথা তিনি কাকে শোনাচ্ছেন, নিজেকেই বা আমাকে তা ঠিক বোঝা গেল না। অনেক সময় তিনি এই ভাবেই কথা বলতেন।

আমি বললাম, "তা যেন হ'ল, কিন্তু তুমি রোজ ওরকম করে পাঁশগাদা থেকে কয়লা

কুড়োতে যাও কেন? এ নতুন চাকরি তোমার কবে থেকে হ'ল?"

গিরিবালা দিদির যেন একটু হাসি হাসি ভাব, বললেন, "চাকরি তো আমার বরাবরই আছে, আমি যে গৌরের দাসী। তাই গৌরের নেমক খাই আর তাঁর সংসারের যাতে সাশ্রয় হয় তা তো আমাকে দেখতেই হবে, না হ'লে যে নেমকহারামী হবে। এর সংসার, তার সংসার এই রকম কথা লোকে বলে বটে, কিন্তু আসলে সবই তো সেই একজনেরই সংসার।"

গিরিবালা দিদির কথা বলবার ধরনই ছিল এই রকম।

তাঁর জীবন কাহিনীও তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতার মনোযোগ আর আগ্রহই বক্তার বক্তৃতা শক্তির প্রেরণা। অবশ্য গিরিবালা দিদি বক্তৃতার ভাবে কোনদিন কিছু বলতেন না, তবে সেই অতি করুণ কাহিনীও তিনি এমনভাবে বলে যেতেন যেন সে কাহিনী একটা কাহিনী মাত্র, তাঁর সঙ্গে যে তাঁরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সে কথা যেন বোঝাই যেত না।

মা বাপ ছিল না, পিসে পিসির কাছেই মানুষ হয়েছিলাম। পিসে ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে জুয়া খেলতেন, পিসির গায়ের গয়না একখানাও ছিল না। জুয়ো খেলেই পিসের সর্বস্ব গিয়েছিল। ছেলেপিলে ছিল না তাই রক্ষে, কিন্তু পিসি জুটিয়ে নিয়ে এল আমাকে, ভাই মরবার সময় নাকি মেয়েকে বোনের হাতেই দিয়ে গিয়েছিল।

"মেয়ে আনা মানেই হল মেয়ের বিয়ের ভার নেওয়া। আর এগারো যদি উতরালো তা হলেই জাত গেল। তাই আমার বিয়ে দিতেই হল পিসেকে। বর দ্বিতীয় পক্ষ, তায় দুর্দান্ত মাতাল। প্রথম পক্ষের বৌকে নাকি লোহার ডাণ্ডার বাড়ি মেরে মেরেই ফেলেছিল। তাই মেয়ে নিয়ে কেউ আর এগোয়নি তার কাছে। দু একজন এগোবে এগোবে করছিলো, সেই সময় পিসে তাড়াতাড়ি সেই বরের সঙ্গেই আমার গাঁঠছড়া বেঁধে দিল। জানতো দিদি, বাংলা দেশের মেয়ে, সে হল ঘরের জঞ্জাল, ঝেঁটিয়ে ফেলতে পারলেই বাপ মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে "কন্যাদায় উদ্ধার হলাম।" তা যার বাপ মা নেই, সে মেয়ের আর এর চেয়ে কী ভাল বিয়ে হবে।

"তা মানুষটা যে একেবারেই মন্দ ছিল তা নয়। মাতাল দাঁতাল যাই হোক খাওয়া পরার কষ্ট ছিল না। বাপের অগাধ পয়সা ছিল আর বাপও ছিল মাতাল। বাপ অল্প বয়সেই মরে গেল, নাবালকের হাতে পয়সা পড়লো। সে পয়সা আর কদ্দিন থাকবে? পাখী উড়িয়ে দেওয়ার মত, দুই হাতে পয়সা ওড়াতে লাগলো। আসলে পয়সাও হল পাখীর জাত।

"উড়তে উড়তেও যা রইলো তাও নেহাৎ কম নয়, তাই ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বৌকে তো মাতাল হয়ে ডাণ্ডার বাড়ি দিয়ে নিকেশ করে দিল, অবিশ্যি প্রমাণ হল না। তাই বেঁচে গেল, আর আমারও আইবুড়ো নাম খণ্ডালো।

"আমাকেও মার খেতে হয়েছে বইকি। নেশা যখন হয় তখন কি আর জ্ঞান থাকে কারু? এই দেখ, কপালে এখনও গর্ত হয়ে আছে। একটা কাঁসার বাটি ছুঁড়ে মেরেছিল, কপালে এসে লেগে যখন ভিরমি গিয়ে পড়লাম, রক্ত দেখে তখনি নেশা ছুটে গেল। ডাক্তার বাড়ি ছুটলো। একটা বৌ মরেছে, তাই ভয় হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া ওপরটা যাই হোক, ভেতরে ভেতরে মনটা নরমও ছিল মানুষটার। মরা সতীনের কথা বলে কদ্দিন কেঁদেছে হাউ হাউ করে। আবার একবার লাঠির বাড়ি মেরে পাটাই দিলে ভেঙে। তখন ডাক্তার ডাকা, হাড় জোড়া লাগানো, সে যে কি কাণ্ড। ছ' মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। সেই সময় বিধবা ননদকে নিয়ে এসেছিল। ননদ এসে রান্নাবান্না করতো, আমার সেবাও করত। মা মরেছেন পাঁচ বছর আগে, সেই মার কথা বলে দুই ভাই বোনে কি কান্না! আবার এক এক দিন মদ খেয়ে এসে বোনকে ডাকতো, "আয় বিধু, আমার কাছে আয়। দুই ভাই বোনে মায়ের কথা বলি। বিধুরে, তুই যে আমার ব্যথার ব্যথী; মা যদি কোন দিন আমাকে মারতেন, তুই তখন কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস।" এই রকম বলতে বলতেই একেবারে ডুকরে উঠতো। "ওগো মা, এই অধম সন্তানকে উদ্ধার কর মা জননী আমার! আমি যে পাপের কুণ্ডে ডুবে যাচ্ছি, মা তুমি না হলে তুলবে কে আমাকে? সেই যেমন ছেলেবেলায় গর্তের মধ্যে যখন পড়ে গিয়েছিলাম, তুমি চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেছিলে। বিধুরে, আমাদের মা ছিলেন পতিতপাবনী, তাইতো দিদা মায়ের নাম রেখেছিলেন গঙ্গামণি। ওহো, হো, সেই মা আমার আজ কোথায় গেলরে—বলে কাঁদতে কাঁদতে ঠকুরঝির গলা জড়িয়ে ধরতে যায় বলে যে, "আয় দুই ভাইবোনে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদি।" ঠাকুরঝি যত পিছিয়ে যায় ও ততো এগিয়ে যায়।"

গিরিবালা দিদি উত্তরবঙ্গে যে এক রাজার বাড়ী কিছুদিন ছিলেন, তাদের কথাও বলতেন। সেই রাজাকে গবর্নমেণ্ট মহারাজা খেতাব দিয়েছিলেন। গিরিবালা দিদি বলতেন, "সেই রাজাকে দেখেছি মদ খেয়ে যখন ধেই ধেই করে নাচতো, তখন দাসী বাঁদী ভয়ে কেউ ঘরের ত্রিসীমানায় আসতো না। মেয়ে মানুষ একটা দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। তখনি তাকে সাপ্টে ধরবে। জোয়ান মর্দ, ছাড়ায় কার সাধ্যি। রানী তখন একটা ঝাঁটা হাতে করে এসে সপাং সপাং ঝাঁটার বাড়ি মারত। আহা কি যে রানীর ছিরি, যেন একটা জলার পেত্নী। আবার ওই রানীই নাকি দার্জিলিংএ লাট সাহেবের বগল ধরে নেচে এসেছে। দিদিমণি, তুমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, রাত্রে রানীর ঘরে নাকি রাজার আস্তাবলের সহিস এসে রাত কাটায়। আর রাজা তিনিতো অন্দরমুখোই হন না, তাঁর নিত্যি নতুন 'বাহে'র মেয়ে চাই। দাসীদের মুখে এইসব শুনেছিলাম, কিন্তু প্রথমটা বিশ্বাস করিনি, পরে যে দিন স্বচক্ষে দেখলাম।"

গিরিবালা দিদি কখনও মিথ্যা বলেন না, এমন কি বাড়িয়ে বা অলংকার দিয়েও কিছুই বলেন না। এতদিন তাই জেনে এসেছি আজ তিনি একি কথা বলছেন? আমি তাঁকে কথার মধ্যে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি স্বচক্ষে দেখলেন? কি দেখলেন আপনি?"

আমি রীতিমত উত্তেজিত। কিন্তু গিরিবালা দিদি শান্তভাবেই বললেন, "দেখলাম খিড়কীর দুয়োর খুলে একটা পুরুষ মানুষ এসে অন্দরে ঢুকলো। বেশ ধোপদোরস্ত কাপড় পরা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় একটা বেল ফুলের মালা। ভাঁড়ার ঘরের যে ভাণ্ডারনী সে আমাকে টেনে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল, কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, "সরে এসো এদিকে, দেখছো না সহিস যাচ্ছে রানীর ঘরে। এসময় আমরা কেউ এ তল্লাটে থাকিনে। তুমি নতুন মানুষ, জাননা তাই এদিকে এসে পড়েছো।"

গিরিবালা দিদি দেখলেন যে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি। তিনি বললেন, "তাইতো সেই রাজবাড়ী ছেড়ে এলাম, মাইনে দিতো চল্লিশ টাকা, এখানকার আট মাসের মাইনে এক মাসেই পেতাম।

"একদিন দেখলাম কুমার বাহাদুর হন্তদন্ত হয়ে রানীর মহলে ঢুকছেন, আর ঢুকতে ঢুকতেই বলছেন, "মা, নিন্দেয় যে কানপাতা যায় না, আমি কি তোমার জন্যে বিষ খেয়ে মরবো?" কুমার চেঁচিয়েই বলেছিলেন, রানীও চেঁচিয়েই উত্তর দিলেন, "বিষ তুই খাবি ক্যান, আমারেই না হয় বিষ আইন্যা দে। আমারই তো বিষ খাওন লাগে। কইতে পারিস না তোর গুষ্টিরে, বাইরে রাত কাটায় ক্যান, অন্দরে আইস্যা পাহারা দিতে পারে না নিজের মানুষেরে?" এর পর আর কি কথা হল বলতে পারি না, কেননা আমি রানীর মহল ছেড়ে চলে এসেছিলাম।"

আমি বললাম "আপনি কি অজুহাত দেখিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন? তাঁরা থাকতে বললে না?"

গিরিবালা দিদি বললেন, "হ্যাঁ সবাই থাকতে বলেছিল, ঝিয়েরা পর্যন্ত। বৌরানী তো কাঁদতেই লাগলো। আহা তেমন লক্ষ্মী বৌ, এখন শুনতে পাই সেও

নাকি সাহেবদের কোমর ধরে নাচে। যাক ওসব কথা, আজ একটু চৈতন্য চরিতামৃত পড়ে শোনাও মনটা ভাল হোক।"

মেয়ের কথা উঠলে মনে হত যেন তাঁর গলাটা একটু ধরাধরা, চোখ দুটো ছলছলে। সেটা আমার মনের ভ্রম কিনা তা অবশ্য বলতে পারি না, কেননা গিরিবালা দিদি কাঁদছেন এটা যেন একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

মেয়ের কথায় বলেছিলেন, "মেয়ে সুক্ষণে জন্মেছিল কি কুক্ষণে জন্মেছিল যিনি জন্ম দেবার মালিক তিনিই তা জানেন। তবে জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাপ গেল, টাকাকড়িও প্রায় সবই গেল। মেয়ে যখন জন্মালো তখন মেয়ের বাপ বিছানায় পড়ে, লিভারের দারুণ যন্ত্রণা, কেবল দাও সেঁক, দাও পুলটিস। তার মধ্যেই পড়ে পড়েই মেয়ের কত আদর। জামা কেন, জুতো কেন, কিনি যে কোথা থেকে তা বুঝবে না। কেবল বলতো "সোনামেয়েকে আমার বুকে দাও, তা হলেই আমার সব যন্ত্রণা কমে যাবে।" আমি ভয়ে মরি, পা যদি ছোঁড়ে পেটে গিয়ে লাগবে, কিন্তু সে কথা কে শোনে, দিতেই হবে মেয়েকে বুকের ওপর। আর সেই মেয়েকেই ফেলে স্বচ্ছন্দে চোখ বুজলো, যেন ঘুমিয়ে বাঁচলো। দিদিমণি, লোকে বলে, স্ত্রী-পুত্র কেবা কার, চোখ বুজলেই অন্ধকার। কিন্তু সে তো আরামেই চোখ বুজলো, আমিই অন্ধকার দেখলাম। মেয়ে নিয়ে যাই কোথায়, খাই কি? সেই থেকেই এই চাকরি!"

গিরিবালা দিদি একটি নিশ্বাস ফেললেন, যেন এই মাত্র একটি অধ্যায় পড়া শেষ হল। তাঁর জীবন কাহিনীর একটি অধ্যায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে যেন নিজের মনেই কাহিনীগুলিকে সাজিয়ে নিলেন পর পর। তার পর বললেন, "মেয়ে নিয়ে পরের বাড়ি হাত পাততে যাইনি। খেটে খেতেই গিয়েছিলাম। মেয়ের যাতে অযত্ন না হয় সে দিকেও দেখতে হবে, মানুষটা যে "যাই যাই" করেও ঐ মেয়ের জন্যেও যেতে পারছিল না।

"বাড়ির কাছেই একটা খৃষ্টানী ইস্কুল ছিল, ইস্কুলের দিদিরা বাড়ির মেয়েদের কাছে আসতো হপ্তায় তিনদিন, সেলাই শেখাতো, বাইবেল পড়াতো, আবার গানও গাইতো। আমার মেয়ে তখন চার বছরেরও হয়নি, তারাই ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে নিলে, বললে, "মাইনে দিতে হবে না।" বললে, "আমাদের শিশুদের দুধ দেবার একটা ব্যবস্থা আছে, তোমার মেয়েকে আমরা দুধও দেব, আবার জামা ফ্রকও দেব, তুমি মেয়ের জন্যে কিছু ভেব না, ও মেয়ে আমরাই মানুষ করে দেব। তোমার মেয়ের খুব বুদ্ধি, দেখ না কত তাড়াতাড়ি অক্ষর চিনে ফেললে।"

"আমার ভয় হ'ল, হয়তো খৃষ্টান করে নেবার মতলব আছে ভেতরে ভেতরে। না, সে সব কিছু নয়, মেয়েকে ওরা সবাই ভালবাসতো, সে বাড়ি ছেড়ে যখন কাছাকাছি আর এক বাড়ি গেলাম রান্নার কাজে, তখনও মেয়েকে ওরা ছাড়েনি। মেয়ের জন্য যা কিছু খরচ ওরাই দিতো চাঁদা করে, আবার বলতো মাঝে মাঝে, "খৃষ্টান করে দাও না তোমার মেয়েকে তা হ'লে আর তোমাকে বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না, কত বর এগিয়ে আসবে তোমার মেয়ের জন্যে। এমন সুন্দর মেয়ে, পাবে কোথায় তারা।" সত্যি দিদিমণি, মেয়েটা যেন দিনে দিনে সুন্দরী হয়ে উঠছিলো, আমার তো এই ছিরি, কিন্তু ও যার মেয়ে সেই মানুষটা নাকি অল্প বয়সে খুব সুন্দর ছিল সবাই বোলতো। এদানি একেবারে সেই রং কালি হ'য়ে গিয়েছিল, এই মানুষটাই যে সেই মানুষ তা বোঝাই যেত না। যাক্‌গে সে মানুষের কথা, মেয়ের কথাই বলি।

"মেয়ের বিয়ের জন্যে আমাকে সত্যিই ভাবতে হয়নি, বর নিজে থেকেই এসেছিলো। ছেলের বাপ মা কি অন্য আপনার জন ছিল না, এক সওদাগরী আফিসে কাজ করতো, বয়স বেশি নয়, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেব না এই আমার পণ ছিল, কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। দ্বিতীয় পক্ষেই দিতে হল শেষ পর্যন্ত। আগের বৌ বিয়ের পর কেবল বছর দুই বেঁচেছিল, সে বৌয়ের নাকি কাশির ব্যামো ছিল, বাপ মা লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। এসব কথা আমি আগে জানতেম না, পরে যখন আমার জামাইয়েরও সেই রোগ হ'ল তখন শুনেছিলাম।"

আমি শুনে চমকে উঠলাম, বললাম, "তোমার জামাইয়েরও সেই রোগ হ'ল?"

গিরিবালা দিদি যেন নির্বিকারভাবেই বলে চললেন, "তাইতো হ'ল শেষ পর্যন্ত, রোগটা বিষম ছোঁয়াচে রোগ কিনা। অবিশ্যি বছর দুই বেশ ভালই ছিল বিয়ের পর, আমি তো গয়না দিতে পারিনি, মরা সতীনের এক বাক্স গহনা সবই জামাই আমার মেয়েকে দিয়েছিল, ভালও বাসতো খুব। মেয়ে যখন ইস্কুল থেকে বাড়ি আসতো সেই সময় নাকি মেয়েকে দেখে ওর পছন্দ হয়েছিল। আর আমার মেয়েও ছিল স্বামী-অন্ত প্রাণ, যেন দুটি জোড়ের পায়রা।

"মেয়ে মাঝে মাঝে আমাকে বলতো, "মা তোমার জামাই রাগ করে বলে, 'মা কেন পরের বাড়ি রাঁধুনির কাজ করেন, আমি তো তাঁর ছেলেই, আমার বাড়ি এলে কি তাঁর মর্যাদা হানি হবে?' এইসব শুনে আমিও দিদিমণি, মনে মনে ঠিকই করেছিলাম যে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওদের কাছেই গিয়ে থাকবো। এরপর মেয়ের ছেলেপুলে হবে, আমার নাতি নাতনী হবে, তাদেরই কোলে পিঠে করে মনের আনন্দে শেষের দিন কটা কেটে যাবে। দিদিমণি, মানুষের মনের আশা হ'ল কলমীলতা, একটা ডগা যদি ছিঁড়ে নাও তো দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠবে আর একটা ডগা। তাইতো বলে যে, আশার নিবৃত্তি নেই। মানুষ জন্মাচ্ছে আশা নিয়ে, সেই আশাকে আঁকড়ে ধরেই মরবে। মানুষটাকে তো দেখেছি, মরতে যখন যাচ্ছে তখনো মেয়ে নিয়েই তার কত আশা। আমারও এত বুঝে পড়েও তাই হ'ল। মেয়ে নিয়ে কত আশা, মেয়ে নিজের ঘরে নিজেই গিন্নী, জামাই মেয়েকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। জামাই মাইনে পায় আড়াইশো টাকা। এরপর নাতিপুতিতে ঘর ভর্তি হবে, আশার কি আর শেষ আছে? ভগবান বললেন যে, "থাক তুমি, ঘুঘুই দেখেছো ফাঁদ দেখনি", তাই সেই ফাঁদও দেখালেন আমাকে। এক কোপেই একেবারে গাছের গোড়াই কেটে দিলেন। জামাই তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও গেল।"

"মেয়েও গেল?" অস্ফুট স্বরে এই প্রশ্ন

যেন আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হ'ল।

"হ্যাঁ দিদিমণি, মেয়েও গেল। মেয়ে আমার সতীলক্ষ্মী সে তো আর আমার মত নয় যে, প্রাণটাকে কোনরকমে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবে? আমার জামাই ছিল বড় ভাল ছেলে। সে যেই জানতে পারলে নিজের অসুখের কথা, তখনি মেয়েকে বললে, "দুগ্গা, তুমি আর আমার কাছে থেকো না, মাকে নিয়ে একটা আলাদা ঘর ভাড়া ক'র থাক, খরচ আমিই দেব। এখনো তো চাকরি ছাড়িনি, তবে হয়তো শিগগিরই ছাড়তে হবে, আর ছাড়াই উচিত। এক ঘরে পাঁচ-জনের সঙ্গে বসে কাজ করা মানেই হল পাঁচজনকে মজানো। এখনও অবশ্য আমার অসুখটা বুকের পরীক্ষায় ধরা পড়েনি, তবু লক্ষণ শুনেই ডাক্তারবাবু বললেন, সন্ধ্যায় মাথা ধরা, থক থক কাশি, ঘুসঘুসে জ্বর এই সবই ক্ষয়রোগের লক্ষণ, তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হ'ল আমার আগের স্ত্রী এই রোগেই মারা গিয়েছে আর আমিই তার সেবা করেছিলাম। ডাক্তারের কথা শুনে আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে কেন আমি বিয়ে করলাম আবার, কেন আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করলাম।" জামাইয়ের কথা শুনে মেয়ে তার মুখে হাত চাপা দিয়েছিল, বলেছিল, "তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না, তোমার অসুখ আর আমি তোমাকে ফেলে পালাবো নিজের প্রাণ বাঁচাতে, এই তুমি চাও?"

"জামাই ভুগলো না বেশিদিন, হঠাৎ অসুখটা এমন বেড়ে গেল যে, যেন চোখে কানে দেখতেই দিলে না, খড়ের গাদায় যেন আগুন ধরে গেল। আর আমার মেয়ে, সে ঠায় বসে রইলো জামাইয়ের বিছানার পাশে, পিকদানী ধরছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছে ফলের রস করে খাওয়াচ্ছে, ডাক্তার যা' যা' ফর্দ দিয়ে যাচ্ছেন তার একটু এদিক ওদিক হচ্ছে না। সারাদিন সারারাত একভাবেই কেটে যাচ্ছে তার। ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তার ভাব দেখে।

"আর জামাই? সে কেবল 'দুগ্গা দুগ্গা, আর দুগ্গা' যেন দুগ্গা নামই জপ করছে। যখন চলে গেল, তখনও 'দুগ্গা' নাম মুখে করেই চলে গেল।

"মেয়ের কথা কি বলবো দিদিমণি, মেয়ে আমার জেনে শুনে যেন সর্বজ্ঞ হয়ে বসে আছে। জামাইয়ের যা কিছু করবার সেই করলে, মুখটি চেপে রইলো, মুখেও শব্দ নেই, চোখেও জল নেই। জামাইয়ের পাঁচ হাজার টাকা লাইফ ইন্সিওর করা ছিল, নিজেই উদ্যোগী হয়ে টাকাটা তুলে আনালে, যে দেখলে সেই অবাক হল, নিন্দেই কি কম করলে লোকে, "জলজ্যান্ত স্বামীটাকে গিলে খেয়ে রাক্ষসী এখন তার টাকা হাতড়াচ্ছে। ধন্যি মেয়ে বাবা, এমন মেয়ের মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

"আমার মেয়ের কানেও কি কথার কিছু কিছু গেল না? গেল কি না গেল কে জানে, সে তখন গোছ গাছ করে বসে আছে কাশীধামে যাবার জন্যে। আমায় বল্লে, "মা তোমার জামাই তার রোগটাও আমাকে দিয়ে গিয়েছে, কাল রোগ। এ রোগ শিব-অসাধ্য রোগ, তাই শিবের পায়েই স্থান নিতে যাচ্ছি।"

"আমি আর কি বলবো, যেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি। কাশীতে চিঠি লিখলে, পাণ্ডার লোক এলো আমাদের নিয়ে যেতে। সেই লোকই টিকিট কেটে আমাদের গাড়িতে তুলে দিলে, পাণ্ডাই কাশীতে ঘর ঠিক করে রেখেছিলো, ওপর নীচে দু'খানা ঘর, ওপরের ঘরে থাকেন এক বুড়ি, কাশীপ্রাপ্ত হবেন বলে ধন্না দিয়ে আছেন, আর নীচের ঘরে রইলাম আমরা মা মেয়ে। ঘরখানা বড়ই ছিল, মেয়ে বললে, "মা ঐ কোণে আলাদা তোমার সব কিছু গোছ করে নাও, আমার ধারে কাছে এসো না। জানো, কিরকম ছোঁয়াচে রোগ, আমাকে তুমি দেখছো, এরপর তোমাকে কে দেখবে তুমি যদি অসুখে পড়।"

আমি মেয়ের কথা শুনি আর অবাক হয়ে ভাবি, "ও কি আমারই পেটে জন্মেছিল?" কত কথাই আমাকে শোনায়, সব জ্ঞানের কথা। বলতো মা বুঝে দেখ, এই সংসার অনিত্য, এখানের সুখও স্থায়ী হয় না, শোকও চিরদিন থাকে না। তোমার জামাই গিয়েছে আমি তো পাগল হইনি সেজন্যে।" এইরকম করে বলতে বলতে হাঁফিয়ে যেত তবুও মুখের বিশ্রাম ছিল না। যখন যায় তার একটু আগেও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারপর হিক্কা উঠতে লাগলো, তখন আর কথা বলতে পারলে না; বুড়ি মা গঙ্গা নেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, ছুটে এলেন ঘরের মধ্যে। বললেন, "দেখছিস্ কি হাঁ করে, মুখে গঙ্গাজল দে, নাম শোনা কানের কাছে, বলতে বলতে নিজেই বলতে লাগলেন, বলো 'ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম', 'শিব, শিব, শিব, শিব'। মেয়ে কখন যে চোখ বুজলো কিছু বুঝতে পারলাম না, মনে হ'ল যেন স্বপ্ন দেখছি। বুড়ি মা আক্ষেপ করছেন, সেই কথাগুলোই কানে যাচ্ছে, 'এলো আর হলো ছুঁড়ির কাশীপ্রাপ্তি, এই তো দু' মাস আগে এসেছে, আর আমি আট বছর দিন গুনছি তবু বিশ্বনাথের দয়া হয় না। ছুঁড়ির ভাগ্য দেখে হিংসে হয়।"

আমাকে বললেন, "কিচ্ছু ভাবনা করিসনে। কাশীতে বাসী মড়া হয় না, ওকি আর শব আছে, ও এখন শিব হয়ে গিয়েছে। আমি ওপরে যাচ্ছি, সন্ধ্যাটা সেরে আসি, রাতটা তোর ঘরেই কাটিয়ে দেব। সকাল না হলে তো লোকজনের ব্যবস্থা হবে না। টাকা আছে তো সঙ্গে? না হয় এখনকার মত আমিই ধার দেব 'খন। শেষে বুঝে নেব পাই পয়সাটা পর্যন্ত, মেয়েটা যেন ধেরো না থাকে।"

তখন মনে হয়েছিল কি নিষ্ঠুর এই বুড়ি, কিন্তু তারপরে বুঝেছিলাম, কত মায়া ছিল তাঁর মনের ভিতর। তবে সংস্কার ছিল একটা, এটা না হলে হবে না, ওটা করতে হবে, না হলে ওর শিবত্ব প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটবে। তাই আমাকে দিয়ে সবই করিয়ে নিলেন, যা কিছু করবার ছিল। বললেন, "ও তো তোর মেয়ে নয়, ওই ছিল তোর মা। মেয়ের কাজ তোকে দিয়েই তাই করিয়ে নিয়ে।"

"তারপর ফিরে এলাম কলকাতায়। মেয়ে বলে গিয়েছে, 'কারু কাছে হাত পেতো না, খেটে খেও।' তাই লোকের সংসারে খেটে যাচ্ছি আর গৌরই দিচ্ছেন খেতে।"

এর অনেকদিন পরে গৌহাটীর ওয়েটিং রুমে আমার এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি কামাখ্যায় যাচ্ছেন। তকমা পরা চাপরাসীদের তকমায় নাম লেখা আছে, তাইতেই বুঝলাম কুমারবাহাদুর এখন আর কুমার নেই 'রাজা' হয়েছেন, আর ইনিই সেই বৌরানী, যার কথা গিরিবালা দিদি বলেছিলেন, ইনি এখন তবে বৌরানী ন'ন, ইনিই এখন রানী। কথাবার্তায় পরিচয়ও পেয়ে গেলাম ইনি সেই বৌরানীই বটেন। শ্বশুর শাশুড়ী দুজনেই মারা গিয়েছেন, ইনিই এখন রানী। বৌরানীর চিহ্ন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে দেখতে পেলাম না। বব্ কাটা চুল, বেশবাসে মনে হল যেন একটি অ্যাংলো মেয়ে। কিন্তু যেই জিজ্ঞাসা করলাম, "গিরিবালা দিদিকে কি চিনতেন?" যেন চমকে উঠলেন। বললেন, "গিরিবালা দিদি? সেই বেঁটে মত মেয়েমানুষটি? কোথায় এখন আছেন তিনি? আমি বেবির বিয়ের সময় ঠিকানা পাইনি বলে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি। ঠিকানাটা জানেন কি তাঁর? কেমন যেন একটা ব্যাকুলভাব ফুটে উঠেছিল কথার মধ্যে।

বললাম, "তিনি এখন শ্রীক্ষেত্রে ক্ষেত্র-বাসিনী হ'য়ে আছেন। তাঁর ঠিকানা পুরী, রাধাকান্ত মঠ।"

## শিবরাম চক্রবর্তী

লেখক হওয়া সহজ। খুবই সহজ। শুধু লেখক কেন, যা কিছু হওয়াই সোজা। সব কিছুর বেলাতেই যা হয় আপনার থেকেই হয়, সহজেই হয়ে থাকে। আপনিই হয়ে যায়। লেখার বেলাও তার অন্যথা হয় না।

বিরাট বিরাট পাহাড় থেকে ছোট্ট ছোট্ট ফুল—যেমন সহজে হওয়া, আপনা আপনি হয়ে ওঠা, কোনো চেষ্টার ফলে নয়—তেমনই লেখাও। যদি হোলো তো এমনিতেই হোলো, নইলে মাথার ঘাম কলমে ফেললেও হবে না।

লিখতে বসলেই লেখারা যেন হয়ে যায়। ইচ্ছার থেকে শব্দ, শব্দের সাথে সাথে সৃজন। কোনো চেষ্টা চরিত্র নেই, আয়াস প্রয়াস নয়। এদিক দিয়ে লিখিয়েরা বিধাতার সগোত্র।

আমার কৈশোরে কিন্তু কথাটাকে এদিক দিয়ে দেখিনি, আমি দেখেছিলাম উত্তরকোণ থেকে। উত্তরীয়-কোণ থেকে।

নজরুলকে দেখতাম, রাস্তা দিয়ে যেতে গায়ের চাদর লোটাতে লোটাতে। গৈরিক রঙের চাদরটা। লিখতো ভালোই, খুবই ভালো—বেশ বুঝতে পারা যায়, মানে, এখন বুঝতে পারি যে কোনো চেষ্টার দ্বারা এমন ধারা লেখা সম্ভব নয়, আপনি-হয়ে-যাওয়া লেখা সব। কিন্তু হলে কি হবে, লেখার জন্যই তার অত খাতির তা আমি ভাবতে পারতাম না। লেখার জন্য কিছুটা অবশ্যই মানতে হয়, কিন্তু এমনি আমার ধারণা হয়েছিল যে এবিষয়ে যেন বেশির ভাগ দায়িত্ব ছিল চাদরের। চাদরটার জন্যই ওর অমন সাহিত্যিক আদর।

ভেবেছিলাম একটা উত্তরীয় অধিকার করতে পারলেই বুঝি লেখকের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়।

একটা চাদর যোগাড় করতে দেরি হয়নি। সেটা গৈরিকে ছোপানো ছিল কিনা মনে নেই তবে সেটা যাতে কাঁধের থেকে ঝুলতে থাকে, তার ঝুলনযাত্রায় কোথাও না বাধা পায় সেদিকে আমার লক্ষ্য থাকত। ফুট-পাথের ধুলোবালি কুড়িয়ে কর্পোরেশনের সারাপথ যাতে ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে যায় সেদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

এরকম দৃশ্য হয়ে দেখা দেবার পর, বলা বাহুল্য, সহজেই আমি লেখক বলে গণ্য হলাম।

লেখকের এই উত্তর-যুগ, উত্তরীয়োত্তর লেখকের ধারা আচমকা এক বাধা পেল কল্লোলযুগে এসে। কল্লোলের ছেলেরা সব সাদাসিধে, শার্ট কাপড়ে স্মার্ট, চাদর নেই কারো। লেখক বলে চেনবার যো নেই কোনো; অথচ লেখে। এবং বোধ হয় মন্দ লেখে না।

সেই ধাক্কায় আমার উত্তরীয় খসলো।

কিন্তু তাই বলে কি লেখক হওয়া কঠিন হোলো কিছু?

আদৌ না। কল্লোলযুগেরও সাহিত্যিক অবদান আছে বইকি। সাহিত্যিক হওয়ার অবদানে সেও কিছু কম যায় না। উসকো খুসকো চুল, উদাস উদাস ভাব—লেখকত্বের এই জাতীয় একটা ছাপ সে সময়ে বাজারে বেশ চলেছিল। তারপরে এখন বামপন্থায় এসে লেখকের...না, সেকথা বলতে চাইনে, তাঁদেরকে আরো বেশি বাম করবার আমার সাহস হয় না।

সব ধর্মেরই সহজিয়া পন্থা আছে। এমনকি লেখকধর্মেরও। কালধর্মে তা বেরিয়ে পড়ে। লেখক হওয়ার এই সহজ শর্টকাটটা প্রত্যেক যুগেই কোনো না লেখকের ভেতর আবিষ্কৃত (না হয় বলুন, আবির্ভূত) হয়ে থাকে। সেটা তাঁদের লেখাকে ছাড়িয়ে থাকে। এক হিসেবে সেইখানেই তাঁরা সে যুগের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা রাজোচিত মহিমা দেখা যেত। সেটা সেকালীন দরবারী রূপ। তেমনি নজরুলের ঐ গৈরিক চাদর—সবকিছু ধুলায় লুটিয়ে যাওয়ার ছন্নছাড়া ছন্দ। সেইটাই আবার কল্লোলযুগে এসে উসকো খুসকো, উদাস উদাস।

কল্লোলযুগের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের সবাইকেই এভাবে ঠিক দেখা না গেলেও, কারো কারো মধ্যে এই প্রতীক-ক্রিয়া প্রকট হয়েছিল বইকি! আমি নিজেই কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিলুম, কী বলবো! লেখক হবার জন্যে, বাধ্য হয়েই।

লেখা আপনিই হয় বটে, কিন্তু লেখককে হতে হয়। অনেক ভালো কবিতা লিখেও তুমি কবিখ্যাতি না পেতে পারো, কিন্তু যদি কৌশল জানো তো, কোনো মহাকাব্য না লিখেও মহাকবি হতে পারবে। কবির মতন চালচলন রপ্ত করতে পারো যদি। লেখক হতে পারবে, লেখার তোয়াক্কা না রেখেও।

অবশ্যি, লেখার ধারাও তাই। লেখকের সে কম তোয়াক্কাই করে। যখন হবার আপনিই হয়, আপনার থেকেই হয়ে যায়। সব্যসাচীর ন্যায় নিমিত্তমাত্র হবার জন্যে যেটুকু দরকার লেখানোর জন্য ততটুকুই সে খাতির করে লেখকের। কোনো কিছুর কেয়ার করে না সে—না দারিদ্র্যের, না আইনি রক্তচক্ষুর। স্রষ্টার পারোয়ানা নিয়ে আসে—কারো পরোয়া না করবার।

কিন্তু লেখককে হতে হয়—হওয়াটা যতই

ফুটপাথের ধুলোবালি কুড়িয়ে

সহজ হোক না! পরমহংসদেবের সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়। রাশ রাশ লেখার চাপ দিয়েও কাউকে তুমি কাবু করতে পারবে না যদি না তোমার চাপরাস থাকে। লেখকের হাবভাব ধরণধারণ তোমার কায়েম না থাকে যদি। লেখার যতই আমদানি করো না, লেখক বলে নিজেকে চালান দিতে পারবে না পাঠক-সমাজে কি জনতার মাঝে। চাপরাস না থাকলে লোকে তোমাকে লেখক বলে চিনবে কি করে, লেখক বলে মানবেই বা কেন?

ঘুরে ফিরে সেই উত্তরীয়ের কথাই এসে পড়ে।

এবং সেই কথাই সেদিন এসে পড়ল বিশ্বম্ভরের কথায়।

কোন এক সভার সভাপতি হয়ে সে আমায় প্রধান অতিথি করে নিয়ে যেতে চায়। আমি নারাজ। সভায় আমার কোনো শোভা নেই, সেখানে আমি অশোভন। বক্তৃতা আমার আসে না। বক্তৃতা আমি ভালোবাসি না—না শুনতে না করতে। সেখানে একের পর এক সবাই বকে যায়—সেই বকবকের মধ্যে (হংসমধ্যে বকো যথার ঠিক উল্টোটি হয়ে) বকবকের মত চুপ করে বসে থাকো! বসে বসে হাঁসফাঁস করো!

আমি বললাম, না ভাই, আমি যেতে পারব না। আমার বলংশক্তি নেই।

'বলংশক্তি না থাক, চলংশক্তি তো আছে। তাইতেই হবে।' সে জানায়, 'তাছাড়া, বলবার যা আমিই বলব। তুমি প্রধান অতিথি হয়ে মুখের অন্য ব্যবহারটা তো পারবে। ওরা খাওয়াবে খুব। কলকাতা থেকে এত খাতির করে নিয়ে যাচ্ছে যখন!'

খাওয়া কথায় যাওয়ায় আমার উৎসাহ জাগে। শার্টটা গায় চড়িয়ে তক্ষুনি আমি তৈরি হয়ে নিই।

'একি হোলো? তোমার ব্যাজ কই?' বিশ্বম্ভর খুঁতখুঁত করে: 'এমন পোশাকে তো যাওয়া চলবে না। সাহিত্যিকের ব্যাজ থাকা চাই। কোথায় তোমার ব্যাজ?'

'ল্যাজ?' আমার কানে যেন খটকা লাগে: 'সাহিত্যিকের ল্যাজ আবার কি?'

'আহা, ল্যাজ কেন হে, ব্যাজ। ব্যাজ না থাকলে তোমাকে লেখক বলে চিনবে কি করে, মানবেই বা কেন? কেবল লেখাতেই নয়, বেশভূষাতেও লেখকের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া চাই তো। তোমার উত্তরীয় কই? একটা চাদর ফাদর এর ওপর চড়াও।'

**উত্তরীয়র উল্লেখের পর আর বলতে হয় না, প্রথম নাড়াতেই আমার অবচেতনার থেকে সাড়া আসে। হ্যাঁ, উত্তরীয় একটা চাই বইকি!**

কাল ব্যাজ না করে একটা সাদা ব্যাজ যোগাড় করে ফেলি। গৈরিক আর তখন পাই কোথায়?

উসকো খুসকো উদাস-উদাস!

উত্তরীয়টাকে আমার দেহের উত্তর দক্ষিণে ছড়িয়ে দিই—আগাপাশতলা জড়িয়ে।

'এটা ড্রেস রিহার্সাল।' ওকে জানাই। 'এটা আরো ভালো খুলবে সেখানে গেলে। অনেকদিনের রপ্ত করা পার্ট আমার।'

সভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ি দুজনায়।

কলকাতার কয়েকটা ইস্টিশন পরেই জায়গাটা। গিয়ে দেখি বেশ সমারোহ। প্যাণ্ডেল খাটিয়ে মাইক লাগিয়ে মহতী সভা। সার্বজনীন ঘটার মতই অনেকটা।

সভাপতি আর প্রধান অতিথির জন্য সজ্জিত উঁচু করা পাটাতনে গিয়ে আমরা বসলাম।

সেটা ছিল ক্রীড়ানিপুণ—আর ব্যায়ামবীর-দের পুরস্কারী সভা। টেবিলের ওপরে থরে থরে সাজানো শীলড্ মেডেল কাপ দেখেই বোঝা গেল। আর টেবিলের তলায় দেখলাম প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি আপেল কলা কমলালেবু আঙুর—প্রধান অতিথির জন্যেই রাখা, বুঝতে দেরি হোলো না।

পেশীর ভারে নিষ্পেষিত ব্যায়ামবীরেরা একে একে নানান কায়দা কসরৎ দেখালেন।

এক ঘুঁষিতে......

বীরদের একজন তো এক ঘুঁষিতে আস্ত একটা ডাবই দু ফাঁক করে দিলেন......

সব শেষে আরম্ভ হোলো সভাপতির ভাষণ। বিশ্বম্ভরের বিশ্বময় ভর—বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা। তার মধ্যে বিশ্বের কী নেই, মধ্যপ্রাচ্য মহাচীন অ্যাটম বোমা কিছুই বাদ যায়নি। মাইকে বলে, অমায়িকে শোনে। বিশ্বম্ভরের মুখ চলে, আমিও নিজের মুখ চালাই.........

কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব? এদিকে পিত্তি পড়ে নাড়ি চিঁ চিঁ করছিল, সভা শেষ হওয়ার পিত্তাশে বসে না থেকে ঝুড়ির একটা একটা আপেল কলা কমলালেবু তুলতে থাকি, প্রধান অতিথির সেবা শুরু করে দিই। ভূরি ভোজ না হোক, এই এক ঝুড়ি ভোজও কিছু কম হবে না।

এদিকে বিশ্বম্ভর বিশ্বের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়ে ডুবডুবি কেটে চলেছে...বিশ্বযুদ্ধ দৈববলে বিশ্বাস সংক্রামক ব্যাধি কিছুই বাদ দিচ্ছে না......সে যুগের বেদব্যাস থেকে এখনকার বার্লিন অবধি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত এনে ফেলেছে একে একে......

আর আমিও এদিকে ঝুড়ি ফাঁক করতে লেগেছি।

বক্তৃতার বিরাট পর্বত নামিয়ে বিশ্বম্ভর তখন তার শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছয়......

'এইবার আমাদের ব্যায়ামবীরদের পুরস্কার-বিতরণীতে আসা যাক। তাঁদের গৌরবে আমাদেরই গৌরব। তাঁদের কীর্তিতে আমরাই কীর্তিত......'

ঠিক ঠিক। মনে মনে আমি সায় দিই। এই যেমন, ঝুড়ির থেকে যে কলা আর কমলা লেবু আমি অর্জন করেছি তাদের খোসাটোসা সব ঐ ঝুড়ির মধ্যেই বর্জন করেছি। ছুরি দিয়ে যেসব আনারস আর নাসপাতি কর্তিত করলাম তাদেরই খোলা দিয়েই ফের ঝুড়ি ভর্তি তো করলাম?

'তাঁদের যোগ্য মর্যাদা দেবার সাধ্য আমাদের নেই......' বলেই চলে বিশ্বম্ভর: 'সামান্য কাপ মেডেল শীলড যা দেব তাতে তাঁদের মহিমা আর এমন কি বাড়ছে, নিজেদের শক্তিতে নিজেদের বাক্তিত্বে তাঁরা সমুজ্জ্বল! তবু আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ ঐগুলির সঙ্গে আমাদের প্রাণের প্রীতির পরিচায়ক এক গুচ্ছ করে ফল......আপেল কলা কমলালেবু আঙুরের এক একটি স্তবক তাঁদের আমরা দিতে চাই স্তবকের দিক দিয়ে যৎসামান্য, কিন্তু তাঁরা যদি এগুলিকে আমাদের স্তব বলে বিবেচনা করেন তাহলেই......'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' বলে সেই ডাব ফাঁক করা বীরপুরুষটি এগিয়ে আসেন—'আমরা কৃতার্থ, আমরা কৃতার্থ!'

একটু আগেই লোকটির বাহাদুরি আমি দেখেছি। আস্ত একটা ডাবকে এক ঘুঁষিতে দু-ফাঁক করে দেয়া। কিন্তু ঐ

বীরকর্ম দেখেও ও'কে আমি কর্মবীর বলে ভাবতে পারি না। কর্মবীররা ফললোভী হয় না, তাঁদের হচ্ছে 'মাফলেষু', কিন্তু এ'র দস্তুরমতো ফললাভে আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে।

দ্বিধাবিভক্ত মস্ত ডাবটিকে আমি দেখি, টেবিলের ওপরেই সেটা রাখা ছিল, দেখে মনে হয়, ডাব নয় আমারই যেন মস্তক। একটি ঘুষিতে দ্বিখণ্ডিত।

তারপর আর থাকা যায় না। আরো বেশি ফললাভের আশায় বসে থাকতে পারি না। উঠে পড়ি। বিশ্বম্ভরের কানে কানে ফিসফিস করি: 'ভাই, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি...এই আমার চাদর রইলো...'

'বাইরে? বাইরে কেন এখন? তুমি প্রধান অতিথি......'

'প্রধান অতিথির কাজ পরে হবে। পরে সারবখন।' আমার উত্তরীয় মোচন করে বলি: 'জলযোগের আগে এখন একটু জল-বিয়োগ করে আসি। এই আমার চাদর রইলো......'

বলে সেই যে উত্তরীয় ত্যাগ করলাম তারপর থেকে আর আমি উত্তরাপথে নেই, একেবারে সাহিত্যের দাক্ষিণাত্যে।

প্রাণপাত সাধনা করে বিরাট সব লেখা লিখে বড় লেখক হওয়া, তারপরে তার পুরস্কারস্বরূপ সভাপতি প্রধান অতিথি হতে গিয়ে আবার ফের প্রাণপাত করা—তার মধ্যে আমি নেই আর। তারপর থেকে আমি ছোট লেখক হয়ে আমার ছোটদের

শ্রীরামপুরের টিকিট দিন তো

লেখায়—ছোটখাট লেখার অল্প মজুরির দাক্ষিণাবর্তেই!

সুখে না থাকি স্বস্তিতে আছি!

বাইরে এসে সোজা ইস্টিশনের দিকে দৌড় লাগাই। প্রতিপদক্ষেপেই মনে হয় এই বুঝি ফললাভে বঞ্চিত সেই ব্যায়াম-বীর এসে আমার চুলের ঝুঁটি পাকড়ায়... তার সমস্ত নিষ্ফলতার জন্য দায়ী এই আমাকে একবার (দু-ফাঁক করে) দেখে নেয়......

হ্যাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস থেকে ফোরফর্টি কোনোটাই কখনো দৌড়ই নি, দৌড় ঝাঁপ আমার কুষ্ঠিতে ছিল না। সেই বাল্য-কালের থেকেই জানি যে ব্যায়ামবীরের ধর্ম আমার নয়। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে 'গৃহীত ইবকেশেষু' সেই ধর্মাচরণ করতে হয়। লম্বা লম্বা লাফ মারি।

সোজা ইস্টিশনে পৌঁছে টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে চেঁচাই—'শ্রীরামপুরের টিকিট দিন তো আমায়। একটা দিলেই হবে।'

'শ্রীরামপুর? শ্রীরামপুরের কোনো টিকিট তো নেই।' জবাব আসে।

'টিকিট নেই? সে কি? এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল সব?' অবাক হতে হয়।

'ফুরিয়ে যাবে কেন, ও টিকিট এখানে দেওয়া হয় না।' দেখা গেল সে লোকটাও আমার চেয়ে কিছু কম অবাক নয়।

'দেওয়াই হয় না? বললেই হোলো।' শুনে আমার রাগ হয়। 'আজ সকালেই তো আমি শ্রীরামপুরের টিকিট কেটেছি। একখানা নয়, দুখানা। তা থার্ড কেলাসের না থাকে, ইণ্টারের দিন। ইণ্টার না হয়, সেকেণ্ড ক্লাস—ফাস কেলাস—যা আছে তাই দিন না। একটু চটপট দেবেন।'

'কিছুই নেই। শ্রীরামপুরের কোনো ক্লাসেরই টিকিট এখানে নেই। কখনো ছিল না। আজ সকালে কেন, কোন কালেই থাকেনি......'

'তার কারণ?'

'তার কারণ আপনি জানতে চান? তাহলে বলি—এই ইস্টিশনে ভারতবর্ষের সব জায়গার টিকিট পাবেন। কেবল ঐ শ্রীরামপুরের টিকিটটি বাদ। তার কারণ হচ্ছে......'

এমন সময়ে একটি ডাউন গাড়ি এসে পড়ে তার কারণ শোনার জন্য আমি আর খাড়া থাকি নে, বিনা টিকিটেই উঠে পড়ি গাড়িতে।

না হয় আসানসোল থেকেই ভাড়া গুণব! আগে তো নিজের হাফ-সোল বাঁচাই...... মুশকিল আসান করি......

গাড়ি ছেড়ে দেয়। আর ইস্টিশন ছাড়তে না ছাড়তেই তার কারণটা আমার চোখে পড়ে। ইস্টিশনের মাথায় নজর দিতেই দেখি—সেইটে—সেইটেই হচ্ছে শ্রীরামপুর স্টেশন।

কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই, কলকাতার নাম দূরে থাক, নিজের নামই আমি ভুলে গেছি। শ্রীরামপুর তখন আমার মাথায়।

লেখক হওয়া যতই সহজ হোক না, তা হওয়ার ধাক্কাও অনেক—সেই কথাটা জানাতেই এখানে আমার অনেকদিন আগেকার ঘটা এই দুঃখ কাহিনীর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে হোলো।

লেখক হলেই হয় না। লেখক হলে সভাপতি প্রধান অতিথি ইত্যাদি হতে হয়। তার ঝক্কি বড় কম নয়।

লেখক হওয়া সহজ। সহজ মজাও আবার।
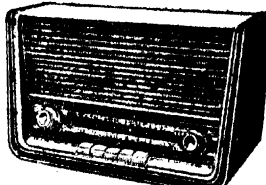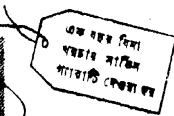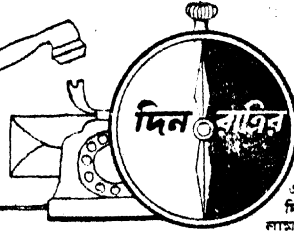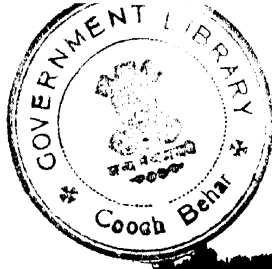
কত নেবে?

আমলে চমকে উঠেছিল রমলা।

কিন্তু, একমুহূর্ত ভেবে দেখল, প্রসঙ্গটা অন্যরকম। প্রসঙ্গটা অন্যরকম বলে ভয়ের কারণ কি অল্প? কই থাক-যাক চেঁচিয়ে উঠল না তো!

'কত নেবে তা আমি কি করে বলি।' রমলা মুখে একটি মুমূর্ষু রেখা টানল হাসির। বললে 'ওঁকেই জিগ্‌গেস করো না।'

'তুমিই বলো না একটু, আমার হয়ে। যদি মামলাটা বিনে ফি-তে করে দেয়।' বলে নিজের দিকে নিজেই চোখ ফেলল মুরারিঃ 'দেখছো তো আমাকে।'

নিজেরও অজ্ঞাতে জোরে একটা নিশ্বাস এল বেরিয়ে। এক নজরে অনেক যেন দেখে ফেলল রমলা।

# দর

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুর্দিন আর দুর্গতির জলজ্যান্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'মামলাটা কিসের?' রমলার স্বরে সলজ্জ অনিচ্ছা।

'উচ্ছেদের।'

'ভাড়া বাকি পড়েছে?'

'না। না খেয়ে দেয়ে যেমন করে পারি ভাড়া জুগিয়ে এসেছি ঠিক। উচ্ছেদ চাইছে যেহেতু বাড়িওলা বলছে তার নিজের দরকার।' নিজের থেকেই বসবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল মুরারিঃ 'কার বেশি কার কম তাই নিয়েই জগৎজোড়া ঝগড়া।'

দ্বিধা যাতে না প্রশ্রয় পায় তেমনি দ্রুত ভঙ্গি করল রমলা। 'আচ্ছা আমি বলে দেখব।'

'নথিটা একবার দেখবে?' হাতে ফিতে-বাঁধা দুটো কাগজের তাড়া। একটা তাড়ার ফিতে খুলল মুরারি।

'আমি নথির কি বুঝি?' একটু কি পিছিয়ে গেল রমলা?

'না, বুঝবে।' এক পা এগিয়ে এল মুরারিঃ 'যে-যে দলিল মামলায় একজিবিট হবে তা সব বাঙলায় লেখা। আর সবই তোমার হাতের।'

'আমার হাতের?' ঘরের দেয়ালঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

'এই দেখ না।' নথিটা অবিশ্যি ছেড়ে দিল না মুরারি। দূরে থেকেই মেলে ধরল। দূরে থেকেই চিনতে পারল রমলা। কটা চিঠি আর ফটোগ্রাফ। মুখের প্রদীপ নিবে গেল এক ফুঁয়ে। সন্দেহ কি তারই চিঠি তারই ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফের মধ্যে কটা একক কটা বা সংযুক্ত। সংযুক্তের মধ্যে কটা বা অসতর্ক।

'তোমার মামলায় এ সব দলিল লাগবে কি করতে?' কান্নার মতই শোনাল বুঝি কথাটা।

মুরারি হাসল। বললে, 'আমার উচ্ছেদের মামলা কি একটা? তাই দয়া করে বলে দেখ না তোমার স্বামীকে।'

'বলব।' চোখের কোণে একটু তাকাল রমলা।

'তোমাদের বাড়িতে টেলিফোন নেই বুঝি?'

'এখনো হয় নি।'

'আমি আবার আসব কাল।'

চোখ না তুলে ঝাপসা গলায় বললে রমলা, 'যদি আস তো দুপুরে এস।'

রমলা ভেবেছিল সুহাস নিজের থেকেই বুঝি কিছু বলবে। বৈঠকখানা থেকে উপরে উঠে এ সময়টায়—কোর্টে বেরুবার আগে পর্যন্ত—কেমন অন্যমনস্ক উদাসীনের মত থাকে সুহাস। মামলা ভাবে না মক্কেল ভাবে না মনে-মনে সওয়াল-জবাবের মহড়া দেয় কে বলবে। দশ মিনিটের মধ্যেই দাড়ি কামানো ও স্নান সারে, সাত মিনিটে খেয়ে ও পাঁচ মিনিটে পোশাক পরেই ট্রাম ধরতে ছুটে দেয়। এ সময়টায় একটু ভালো করে গুছিয়ে-গাছিয়ে কোনো কথাই বলা যায় না। যেন তরোয়ালের ডগায় চড়ে থাকে।

তবু ভাবছিল এমন একটা কথা, বোধহয় বলবে। সাড়ম্বরে না হলেও, এমনি, কথায়-কথায়। তার কোর্টের নথি বা নজিরের স্তূপ তা পারবে না চাপা দিতে।

কিছু বলছে না দেখে নিজেই উদ্যোগী হল রমলা। ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল। বললে, 'তোমার এক মক্কেল এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'ও, হ্যাঁ, কে বল্লো তো?' যেন কত মক্কেল আসে এমনি লেপাপোঁছা মুখ করলে সুহাস।

'আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমার জেঠতুত বোনের মাসতুত দেওরের—'

'কি একটা। প্রায় দূর-দূর সম্পর্কের।'

'প্রায় তাই।' হেসেই আবার গম্ভীর হল রমলাঃ 'তোমার মক্কেলকে আমার কাছে পাঠাতে গেলে কেন?'

'বা, তোমার সঙ্গে যে দেখা করতে চাইল।' একমনে গালের এক জায়গায়ই বারে বারে ব্রাশ ঘষতে লাগল সুহাস: 'বললে কি রকম আত্মীয় হয় তোমার—'

'তাই তুমি পাঠিয়ে দেবে ভিতরে?' মুখে-চোখে রাগের ঝাঁজ আনল রমলা।

'আমি না পাঠালেও তো ইচ্ছে করলে একটা লোক আসতে পারে বেটাইম, ধরো ঠিক ভরদুপুরে। কড়া নেড়ে অনায়াসেই খুলিয়ে নিতে পারে দরজা।'

'ইস!' আবার ঝলস দিল রমলা: 'যাকে-তাকে দরজা খুলে দিলেই হল!'

'এ ক্ষেত্রে তো একেবারে যাকে-তাকে নয়। আত্মীয়। মুরুব্বি। হয়তো ভাবলে তোমাকে দিয়ে মামলার ফি-এর যদি কিছু সুরাহা করা যায়।'

ভ্রূরেখা বঙ্কিম করল রমলা: 'মামলা! কিসের মামলা!'

'উচ্ছেদের মামলা। যা আজকাল চলছে আখছার—'

'কেন, করেছে কি?'

'করেনি কিছু। হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' গলার কাছটায় কাঠ-কাঠ লাগতে লাগল রমলার। বললে, 'নথি পড়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ দেখলাম পড়ে।' কামানো বন্ধ করে আয়নার সামনে খানিক পাইচারি করল সুহাস: 'দুখানা ঘর আর ভিতরে এক চিলতে বারান্দায় একটা ভাড়াটে বাসা, কল বাথরুম আলাদা। ভাড়া সস্তা বলতেই হবে, সাতচল্লিশ টাকা সাড়ে তের আনা। তাই বাড়িওলার বুকশূল। সমস্ত উৎপাতের অবসান এখন উৎখাতে।'

'বাসিন্দে কজন?' সাহস কুড়িয়ে পেল রমলা।

'আটজন। যে এসেছিল, ঐ ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ভদ্রলোক, তার বাপ মা, ছোট দুই ভাই এক বোন—'

'আর বাকি দুজন বুঝি ভদ্রলোকের স্ত্রী আর ছেলে!'

'না, না, বিয়ে করেনি ভদ্রলোক। ভাগ্যিস করেনি।' খুর তো নয় যেন জল চলে যাচ্ছে সুহাসের গালের উপর দিয়ে। তার জীবন এমনি নিটোল-নিষ্কণ্টক। বললে, 'বাকি দুজন বিধবা এক দিদি আর তার এক মেয়ে—'

'ঘর দুটো বড় কতটা? লম্বাই-চওড়াই—'

'সে সব মাপজোক হয়ে আছে। যৎসামান্য। চারজন করে পুরুষ-মেয়ে আছে দু ঘরে ভাগাভাগি করে। মাছপাতুরি হয়ে। বাড়িওলা এমন কানকাটা ঐ বাসা থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে চায়। হেতু? বাড়িওলা মফস্বলে থাকে, কি নামহীন কঠিন অসুখ করেছে, গত্যন্তর নেই, চিকিৎসা করাবে কলকাতায় এসে, তাই ঘরের প্রয়োজন। দাঁড়িপাল্লা বাড়িওলার দিকে ভারি। তাই এবার উঠে যাও, সরে পড়, পথ দেখ।'

'তা দেখবে। যাবে উঠে।' যেন গায়ে লাগে না এমনি ভাব করল রমলা।

'বাঃ কি? উঠে যাবে?' গাল কেটে গেল নাকি সুহাসের?

'তা নয়তো কি। একটা মরণাপন্ন রুগীর চিকিৎসা হবে না? বিশেষত সেই রুগীরই যখন এটা নিজের বাড়ি।'

'আইন অত সহজ নয়।' আবার চলতে লাগল খুর।

'কমনসেন্সের বিরুদ্ধেও নয়।' বললে রমলা, 'আমার বাড়ি, আমার দরকার, বাস আর কথা নেই।'

'না, কথা আছে। আমি যাই কোথায়?'

'তার আমি কি জানি!'

এইখানেই আইন আসছে তৌল করতে। গোড়ায় তবে ভাড়া দিয়েছিলে কেন? কেন জমি দিয়েছিলে চাষ করতে? আমার টাকার দরকার, বুঝি, তুমি মহাজন, কেন খুলতে গিয়েছিলে থলের মুখ? সুতরাং দু পক্ষ, আর যে পক্ষ দুর্বল আইন এখন তার দিকে। চাবাড়ে বাসাড়ে খাতকের দিকে। হ্যাভ-নটদের দিকে।'

'কিন্তু কে হ্যাভ আর কে হ্যাভ-নট সেইটেই প্রশ্ন।'

'হ্যাঁ, সেইটেই প্রশ্ন।'

'যার বিছানা নেই অথচ ঘুম আছে সে হ্যাভ-নট, না, যার বিছানা আছে ঘুম নেই —সে? কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে,' হাসল রমলা: 'এ মামলা তোমার কাছে এল কি করে?'

'আমার কাছে আসেনি সরাসরি।' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে লাগল সুহাস: 'যে ফাইলিং ব্রিডার ছিল তার সঙ্গে, কি না জানি নাম ভদ্রলোকের—'

'মুরারি ঘোষ—' নিঃসঙ্কোচে বললে রমলা।

'হাঁ, মুরারি ঘোষের ফি নিয়ে না কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। মামলা থেকে রিটায়ার করেছে উকিল। তখন গিয়েছে ভবেনবাবুর সেরেস্তায়। ভবেনবাবু—'

'ভবেন দত্ত? যিনি তোমার সিনিয়র?' কৌতূহলে চোখ নাচাল রমলা।

'হ্যাঁ, উচ্ছেদের মামলায় পাকা খেলোয়াড়। তাঁর কাছে যেতেই বলেছেন, জুনিয়র ছাড়া কাজ করি না, তাই সুহাস চাটুজ্জেকে সামিল করো।' গর্বের সুর আনল সুহাস: 'তাই আমার কাছে আসা। কিন্তু ঐ দন্ত্য-সই সার, তালব্য-শ নেই অদৃষ্টে—'

'তার মানে আশা নেই?' চট করে ধরে ফেলল রমলা।

'মামলার নয়, ফি-এর। ভবেনবাবুকে বত্রিশ টাকা না দিয়ে পারবে না [illegible]

আমার বেলায় অন্টরম্ভা—' বাঁ হাতের চেটোয় খানিকটা তেল নিয়ে ব্রহ্মতালুতে ঘষতে লাগল সুহাস।

'তার মানে? কি বলছে তোমাকে?'

'বলছে—বলছে অমনি করে দিতে।'

'অমনি? মাগনা?' আপাদমস্তক জ্বলে উঠল রমলা।

'মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ না। আমি বললুম, অসম্ভব। বিনা ফি-এ পারব না কাজ করতে।'

হাত না রেখেও গায়ের গরম টের পাওয়া যায় এমনি ঝলস দিয়ে রমলা বললে, 'কখনো না।'

'তখন বললে কি জানো?' চুপি চুপি কাছে আসার ভঙ্গি করে ফিসফিস গলায় সুহাস বললে, 'তখন বললে আমি আপনার স্ত্রীর আত্মীয় হই। ওর সঙ্গে যদি একটু দেখা করতে দেন! যদি ও একটু সুপারিশ করে! তখন আর 'না' বলি কি করে? বললাম, যান ভিতরে—'

'আত্মীয় না হাতি!' রাগের আবার একটা তরঙ্গ তুলল রমলা: 'তার আত্মীয় হলেই বা কি। উকিল, মামলার ফি ছাড়বে কেন? ফি নিয়ে রোজগার, ওকালতি তো আর খয়রাতি নয়। সবাইকে দেবে, সরকারকে খাজনা, আমলাকে ঘুষ, তদবিরকারককে মেহনতানা। কিন্তু যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করবে, সেই উকিলকেই শুধু কাঁচকলা! কখনো না, কখনো ফি ছাড়বে না তুমি। এমন কিছু আত্মীয়তা নয় যে মুফত করতে হবে। কথায় বলে, উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চর্বি দিয়ে রাখা—'

'না না, আমি বলে দিয়েছি, আমার ফি না দিলে ভবনবাবুকেও পাবেন না।' বাথ-রুমের দিকে এগোল সুহাস।

'ভবনবাবু তো বত্রিশ নেবেন, মুহূর্তের একটি ভগ্নাংশ দ্বিধা করতে চেয়েও দাঁড়াতে পারল না রমলা: 'তুমি কত নেবে?'

চকিত তড়িতের দীপ্তিতে দুজনের চোখোচোখি হল।

আবার সেই প্রশ্ন।

'কত নেবে?'

আবছা হয়ে আসা দিনের আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে তেমনি ধূসরস্বরে জিগগেস করল সুহাস।

মেয়েটি দরজার পাশটিতে সরে দাঁড়াল।

'যাব?'

এক মুহূর্ত কি ভাবল মেয়েটি। স্বরে সমীচীন অস্পষ্টতা এনে বললে, 'আসুন।'

আসুন! সুহাসের বুকের ভিতরটা দুলতে লাগল তাণ্ডবের মত। কত পকেটে আছে মনিব্যাগে ঠিক মনে করতে পারছে না। কোন পাহাড়চূড়ার দাম চেয়ে বসে তার ঠিক কি। মনে হল সেটা মোটেই প্রশ্ন নয়। মনে হল, অদ্ভুতের দেশে এ আশ্চর্যও সম্ভব, এমন আকাশ কুসুমও চয়ন করা যায় মর্তের ধূলিতে। সোনালী মেঘ ধরা যায় হাত বাড়িয়ে, হয় তো বা পাহাড়ের মুকুট, কিন্তু ফণাতোলা সাপের মাথার মণি ছিনিয়ে নেওয়া যায় এ কল্পনার অতীত। সজ্ঞান শরীরে চিন্তা করাও যেন কণ্টকর।

আসুন! জাগা চোখের স্বপ্নের মত মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে।

জোরালো রেখায় এক টানে আঁকা সরল দীর্ঘাঙ্গিনী। গায়ের রঙটি ক্ষমাহীন কালো। কিন্তু সে কালোয় অগ্নিশিখার রক্তিমা। পরনে হলদে রঙের শাড়ি, চওড়া সবুজ পাড়, গায়ে সাদা চিকণের ব্লাউজ, খোঁপায় এক থোকা রঙ্গন। চারদিক থেকে একটা এলোমেলো অমিলের ঝড়, কিন্তু তার মধ্যে সম্বন্ধ ছন্দে একটি অবার্থ উচ্চারণ।

হয়তো বা আজ দোর বন্ধ করবে না। অসম্ভবের পায়ে মাথা ঠুকেও না। আজ না হোক, একদিন এই অসম্ভবকেই নড়াবে সুহাস, বিগলিত করবে। যা কিছু তার আছে সমস্ত বিক্রি করে, বাঁড়া দিয়ে, বন্ধক রেখে। চূড়ান্ত সর্বস্বান্ত হয়ে।

চোখের উপর একবার চোখ ফেলল মেয়েটি। সুহাসের মনে হল ও চোখ মেললেই দিন আর ও দুচোখের পাতা এক করলেই রাত।

সদর পেরিয়ে ছোট একটি উঠান, কল-তলা। মেয়েটির পিছু পিছু ভিতরে ঢুকল সুহাস। হঠাৎ গা কেমন ছমছম করে উঠল, আর সব বাসিন্দেরা কই? ডাকের গয়নাপরা পুরোদস্তুর প্রতিমা দূরের কথা, একমেটে দোমেটেদেরও তো আভাস নেই। এ সে কোথায় এল?

'দাদা, মেজদা, দেখ তো কে একটা লোক কি সব বলছে আমাকে—' মেয়েটি হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।

'কি, কি হয়েছে রে রমলা?' কাছাকাছি কোথাও আছে, দুই পুরুষকণ্ঠ গর্জে উঠল সমস্বরে।

সন্দেহ কি, ভুল করেছে সুহাস, মরণাত্মক ভুল। নইলে গোটা রান্নাঘর হয়, গোটা ড্রয়িংরুম? বারান্দায় হরিণের শিঙ থাকে? অয়েল পেন্টিং?

কিন্তু এখন করবে কি? পালাবে? ছুটে দেবে? পাড়াসুদ্দু সবাই যদি পিছু নেয়? মুষল বৃষ্টি শুরু করে? তিলকে তাল বানিয়ে ছাড়ে?

না, দাঁড়াই মুখোমুখি। অন্যায় স্বীকার করে মার্জনা নিয়ে চলে যাই।

'বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে দাদা—' রমলা আবার হাঁক ডাক ছাড়ল।

গলিটা যে ঐ গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত এসেই শেষ হয়েছে, এ বাড়ি যে ঐ গলির লপ্ত নয় সেটা তখন বুঝতে পারেনি সুহাস। এখন সহজপাঠের মত বুঝতে পারল এ গোবরগাদা নয় এ পদ্মফুল, এ ধুলো নয় হীরের গুঁড়ো, অবজ্ঞনা নয় আরতির দীপমালা।

গঙ্গাজলের ছিটে-লাগা তুলসীপাতা।

এক ভাই এসে হাত চেপে ধরল, দরজা আগলাল আরেক ভাই।

'আমার সঙ্গে দর করছে!' দ্বিধা বলতে পারল রমলা: 'বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম সিনেমায় যাব বলে, মুরারিদা ট্যাক্সি আনতে গেছে—'

'কী ভেবেছেন?' হাতটা মুচড়িয়ে ধরলে বড়দা।

'ভুল ভেবেছি। ভুল হয়ে গেছে।' দুহাত যে নমস্কারে যুক্ত করবে তার উপায় নেই। সুহাসের মুখ লজ্জায় শীর্ণ হয়ে গিয়েছেঃ 'মার্জনা চাই।'

'আপনি ভদ্রলোকের ছেলে—করেন কি?' মারমুখো বড়দার চোখ।

'ছাত্র। ল কলেজের ছাত্র।'

'আপনার এই মতিগতি?'

'একটু ভুল পথে—বিপথে চলে এসেছি।' যে হাতটা মুক্ত আছে তাই দিয়ে একবার কান চুলকোলো সুহাসঃ 'তারপর ভুলের পরে ভুল—গোড়াতে ভুল করলে বারে-বারেই ভুলের সম্ভাবনা—'

'লজ্জা করে না?'

'এখন করছে।'

'এখন করছে? লোফার, ইডিয়ট—' আরো নানা সম্ভাষণ বর্ষণ করতে লাগল দাদারাঃ 'জানো তোমাকে এবার পুলিসে দিতে পারি?'

'পারেন, ক্রিমিনাল ট্রেসপাস হয় বটে, কিন্তু আমার পক্ষেও কিছু বক্তব্য থেকে যাবে—' ভয়ে-ভয়ে সুহাস তাকাল রমলার দিকেঃ 'আমাকে উনি আসুন বললেন কেন? কেন দরজার বাইরে থেকেই দিলেন না তাড়িয়ে?'

মূর্তিমতী ছলনা, রোষসুন্দর চোখে তাকাল রমলা। যেন দুই চোখে নয় তিন চোখে তাকাল। যে এমন দুর্বার তাকে না বলে করি কি—তৃতীয় চোখের যেন সেই অনুক্ত উচ্চারণ।

'যদি বলে থাকে তা আত্মরক্ষার জন্যে—' বললে মেজদা।

'তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে—' বড়দা হাতে আবার একটা মোচড় দিলেন।

ভিড় জমে গেল আস্তে-আস্তে। সবাই একবাক্যে তারিফ করল রমলার। আত-তায়ীকে ধরবার জন্যে কেমন সুন্দর কৌশল করতে পারল। যদি গোড়াতেই প্রত্যাখ্যান করে সরিয়ে দিত তা হলে এই দুর্ধর্ষ অনাচারের শাসন হত কি করে?

কেউ কেউ বললে, উত্তমমধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিন।

'বিবেচনা করে দেখুন, আমি তেমন অন্যায় কিছু করিনি। শুধু দর জিগগেস করেছি। যদি ফিলসফিক্যাল ভিউ নেন—' সুহাস চাইল নৈর্ব্যক্তিক হতে।



কেউ কেউ বললে, মেয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।

'তাই। চাও ক্ষমা।' দু দাদা একমত হল।

'ও সব নাটকীয় কিছু করতে পারব না।' সুহাস বড়দার দিকে তাকাল বিমর্ষ চোখেঃ 'হাতটা ছেড়ে দিন, করজোড়ে নমস্কার করে বিদায় নিচ্ছি।'

'নাটক চাও না, সার্কাস চাও?' নাকের উপর ঘুসি মেরে বসল বড়দা।

আর টাকা যেমন টাকা টেনে আনে মারও তেমনি টেনে আনে মহামার।

'তাকা, তাকা, চোখ চা, চোখ চা ভালো করে—' মেয়ের দল ওস্কাতে লাগল রমলাকে।

শুভদৃষ্টির সময় সব মেয়েই একটু ঢলা-ঢলা ভাব করে কিন্তু তুই একটা বুড়োধাড়ি গ্রাজুয়েট মেয়ে, তোর কেন এই রঙ-ঢঙ? সিধে চা না চোখের দিকে। কেমন রাজ-পুত্তুরের মত বর!

নাকের উপর সেই কাটা দাগটা চিনতে পারল রমলা।

দুহাতে করে মালা গলায় দেবে দেবে, তা নয়, দু হাতে করে চশমার ডাঁটি দুটো আস্তে-আস্তে তুলে ধরল সুহাস।

আর কেউ চিনতে পারেনি কিন্তু তুমি পারবে। তারা বিষয় দেখেছে, তুমি ব্যক্তিকে দেখেছ। তাদের কাছে আমি ছিলুম একটা মামলা মাত্র, তোমার কাছেই আমি মক্কেল, বিশেষ একটা অবস্থার প্রতিচ্ছায়া। আর ওরা ছিল সব হাকিম, ন্যায়ধর বিচারক। হাকিম কি মক্কেল চেনে? হাকিম শুধু মামলা দেখে। মামলা-মাফিক দণ্ড দেয়।

আর-সকলের চোখে ছিল ক্রোধ, তোমার চোখে ছিল ঘৃণা। ক্রোধের চেয়ে ঘৃণা বেশি করে দেখে। ক্রোধের চেয়ে ঘৃণা বেশি করে মনে রাখে।

তাই চিনতে পারল রমলা। শুধু নাকের কাটা দাগ নয়, সমস্ত মুখটা।

বুকের ভিতরটা এতটুকু হয়ে গেল।

ছি ছি ছি। সেদিন অকারণে তাঁকে কি অপমান করলুম! 'আসুন' বলেছিলুম বলেই না ঢুকেছিলেন ভিতরে, ঢুকতে সাহস করেছিলেন। আর, আশ্চর্য, নিজেরও অগোচরে কি করে 'আসুন' শব্দটা এসে-ছিল জিভের আগায়।

ওটা বুঝি নিয়তির ডাক।

কত কৃতী হয়েছেন আজ, কত গুণী। কত উঁচু ঘরের ছেলে। কেমন শোভনদর্শন! সোনার মেডেল পেয়েছেন পরীক্ষায়। উজ্জ্বল হবেন বলে উকিল হয়েছেন। চার্টার্ড একাউণ্টেন্সির ক্লাশ খুলেছেন—কত রোজগার। কত নামডাক বাজারে।

সেদিন অমনি করে অপমান করেছিল বলেই তো দুর্মদ প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে করে হোক, পেতেই হবে রমলাকে। যে ডাকে অথচ ধরা দেয়না ধরতে হবে সেই অধরাকে। নিমন্ত্রণ করেও যে উপবাসী রাখে লুট করতে হবে তার অন্নভাণ্ডার।

আর সে লুটের একমাত্র পথ, মামুলি রাজপথ,—বিয়ে।

হ্যাঁ, সেই পথই বহু ধৈর্যে তৈরি করবে সুহাস। যাতে একবাক্যে একনজরে বলতে পারে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে জি-টি রোড! যাতে আর প্রত্যাখ্যানের কথা না ওঠে! খোয়া পিচ দুরমুষ রোলার—সব একে একে জোগাড় করল—প্রশস্ত করল মসৃণ করল সুন্দর করল। এবার তবে টপ-গিয়ারে দাও ফুল স্পিড।

ঘটক পাঠাও।

ঘরে-দোরে নিখুঁত মিল, সবাই লাফিয়ে উঠল। শুধু বড়দা মেজদা নয়, আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত পরিবার।

কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য কি করে সম্ভব? ঐ তো মেয়ের ছিরি, ঐ তো মেয়ের ছাঁদ!

কে জানে কি। কোথায় কি দেখেছে না শুনেছে কই থেকে উঠল। আসল কথা কি জানো? যার হাঁড়িতে যার চাল। যেখানে আছে লেখা সেখানেই হবে দেখা।

'দাবি-দাওয়া আছে?'

'হ্যাঁ, বরপণ আছে বৈ কি।' ঘটক ভারিক্কি চালে বললে।

'কি বরপণ?'

'বরপণ মানে বরের পণ। বরের প্রতিজ্ঞা।' দুই গাল হাসল ঘটক: 'শ্রীমান প্রতিজ্ঞা করেছেন যে করেই হোক বিয়ে করবেনই শ্রীমতীকে।'

সবাই আশ্বস্ত হল। এবার তবে খোঁজ নিতে হয় প্রাক্তন খুঁত কিছু আছে কিনা ছেলের।

অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে ফুর্তির হল্লা দস্তুরমতো। বন্ধুরা চোখ টিপল। বললে, সোনার আংটি কি বাঁকা হয়? যদি একবার শালগ্রাম হয়ে ওঠা যায় তখন আর তাকে কেউ নুড়ি বলে না। দেবতা হয়ে উঠতে পারলে সবই তখন তার লীলাখেলা।'

'তবে?'

'তবে—এ নিয়ে আবার একটা কথা ওঠে নাকি? উঠতি বয়সে কারু মুখে যদি ব্রণ ওঠে তাই নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায়?'

কিন্তু তুই হাতির হাওদায় চড়া ছেলে তুই কেন নামবি এত নিচে? দেওয়া নেই থোওয়া নেই কেন শুধু-শুধু শুকনো চিঁড়ে চিবুতে যাবি? আর মেয়েকেও তো দেখে এলাম। লাবণ্যের টানটোন আছে বটে কিন্তু, অখণ্ড কালো। তুই ওর মধ্যে দেখলি কি?

আশ্চর্যকে দেখলাম। যাকে লোকে মানতে চায় না অথচ জানতে চায়, দেখলাম সেই অলৌকিককে।

'কত নেবে?' বিয়ের রাত্রে নিবিড় স্পর্শের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে রমলাকে জিগগেস করল সুহাসঃ 'আরো কত নেবে? কত শ্রম, কত ধৈর্য, কত নিষ্ঠা, কত সংকল্প?'

নিচে কড়া নড়ে উঠল।

দুপুরটা রমলা একা, একেবারে একা।

কড়া নড়ার ভাষা রমলার মুখস্থ। কোনটা ইস্কুলী দেওরের, কোনটা কলেজী ঠাকুরঝির। কোনটা চাকরের, কোনটা বা উকিলবাবুর। এ ভাষা মুখস্থের বাইরে। এ ভাষা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। এ ভাষা ভয়ের সম্বধতো দিয়ে তৈরি।

তবু নামল রমলা। ভয়ও ডাকে, ভয়ও আকর্ষণ করে।

দরজা খোলার আগে বিশেষ একটি ফাঁক দিয়ে বোঝা যায় বাইরে কে দাঁড়িয়ে। তেমনি একটি কৌশল তৈরি করে দিয়েছে মিস্ত্রি। সুহাসের সতর্ক বারণ, আগে নিশ্চিত না হয়ে যেন খোলে না দরজা। সেই কে ফিরিওয়ালা হাত চেপে ধরে হার-বালা কেড়ে নিয়েছিল, মাকেল সেজে এসে কে বা বৈঠকখানা থেকে সরিয়েছিল বই, কে বা নাকে রুমাল চেপে ধরে একেবারে দিয়েছিল শেষ করে।

দরজা খুলে দিতেই নির্ভুক্ষেপ ঘরে ঢুকল মুরারি। অবান্তরে না গিয়ে সরাসরি বললে, 'কি, বাগাতে পারলে স্বামীকে?'

'কত চান তিনি ফি?'

'ষোল টাকা।'

বেশি কথার মধ্যে রমলাও যেতে চাইল না। বললে, 'আমি টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি, কেমন? তাই তুমি তাকে দিয়ে দিও। হারেদরে তা হলেই তো হিসেব মিলে যাবে।'

এক মুহূর্ত কি ভাবল মুরারি। বললে, 'মন্দ কি, তাই দাও।'

মনসাধারণজ্ঞা যখন, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়। দ্রুত পায়ে উপরে চলে গেল রমলা।

হঠাৎ মনে হল মুরারির, পিছু-পিছু উঠে গেলে কেমন হয়? যে টাকা দেয় সে কি আরো কিছু দিতে পারে না? কিন্তু, না, বসে রইল। তাকিয়ে রইল পায়ের জুতোর দিকে। যেতে হলে ও দুটো নিচে রেখে যেতে হয় বুঝি। ভাবল মাথার উপরে একটি ছাদ, রোদে-বৃষ্টিতে একটি শুধু মাথা গোঁজবার জায়গা। এর চেয়ে বড় কামনার জিনিস আর কি আছে! সমস্ত আকাঙ্ক্ষার আকাশ যদি কিছু থাকে তো তা ছাদ। ক্ষুধার অন্নের যে এত হাঁকডাক, খাই কোথা যদি মাথার উপরে আচ্ছাদন না থাকে। তাই আগে একটি ঘর পরে অন্য কিছু, সব কিছু, জীবনের সমস্ত ঘোরাফেরা।

নিচে নেমে এল রমলা। বললে, 'নাও।' গুনে তিনটে নোটে ষোল টাকা বাড়িয়ে ধরল।

মুরারি দিব্যি নিল হাত পেতে। চোখের দিকে চাইতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

এর পরে আর যেন তার কিছুই চাইবার নেই। বলবার নেই। বসে থাকার নেই।

'যাই কোর্টে ধরি গে সুহাসবাবুকে।'

সুহাস বাড়ি এলে কথায়-কথায় জিগগেস করলে রমলা, 'তোমার সেই আত্মীয় মক্কেল কিছু ফি-টি দিল?'

'কোর্টে আটটি টাকা দিয়েছে আজ।' জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললে সুহাস।

'কেস করছ ওর?'

'না করে করি কি। উচ্ছেদের ডিক্রি মানে খোলা মাঠে আকাশের বাক্স।' ক্লিপ টিপে ধরে ট্রাউজার্স টানতে টানতে সুহাস বললে, 'দেখি আরো কিছু পারি কিনা আদায় করতে।'

'নিশ্চয়। তোমার টাকা তুমি ছাড়বে কেন? আঙুল বাঁকা করে ঘি তুলতে হবে।' চোখ নাচাল রমলা: 'ফাকে-ফিকিরে ফন্দিতে-সন্ধিতে—'

'সে পাচ্ছে আদায় করে নিচ্ছে।' কলারের বন্ধন মুক্ত করে এবার শার্ট খুলছে সুহাস: 'একটা লোককে পাকড়ে ধরেছে সবাই—উকিল আমলা মুহুরি সরকার। সরকার নিচ্ছে রসুম, উকিল নিচ্ছে ফি, আমলা ঘুষ আর মুহুরি হোয়াট নট? কিন্তু বেচারী মক্কেলের থাকবার একটু ঘর চাই তো: এ কে কাকে দেয় আদায় করে?'

'কি রকম বুঝছ?' পাখাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিল রমলা।

'মামলার কি কেউ বোঝে? সব নসিব। সব কালীঘাটের মানত।'

'তবে তোমরা আছ কি করতে?'

'রোজগার করতে।'

রোজগারের পথ মন্দ বার করেনি মুরারি। আবার এসেছে। আবার। হাতে-হাতের শমন সাক্ষী আসছে না, কোর্টের আগে আনাতে হবে, আর, কোর্টের চৌকাঠ মাড়িয়েছ কি, পয়সা। দলিল তলব করতে হবে, তার নকল বার করতে হবে রেজেস্টি আফিস থেকে, তার খরচ। সাক্ষী বাগাতে হবে, সাক্ষী ভাঙাতে হবে, তার গুনাগার। নানা বায়নাক্কা।

'কিন্তু আমি গরিব মানুষ', নম্র চোখে বললে রমলা, 'আমি অত জোগাই কি করে?'

'তোমার স্বামীর খাঁই যে সাংঘাতিক।' কোঁচার খুঁটে গলার ঘাম মুছল মুরারি।

'আমার স্বামীর এতই যখন হাঁকার তখন তাকে ছেড়ে দিলেই হয়।' রমলা মুক্তির পথ চাইল।

'সবাই কি তোমার মত ছাড়তে পারে? তাছাড়া', আরো যেন ভয়াবহ শোনাল মুরারিকে: 'তাছাড়া, আমার দ্বিতীয় মামলার নথিটা তাকে এখনো দেখানো হয়নি।'

'দ্বিতীয় মামলা মানে?'

'আমার উচ্ছেদের মামলা কি একটা?'

আবার ষোলটা টাকা দিল রমলা। বললে, 'এই কিন্তু শেষ। আমার আর টাকা নেই।'

'কিন্তু মামলার কি শেষ আছে?' টাকাটা ছোট্ট ভাঁজ করে মুরারি রাখল ফতুর পকেটে। বললে, 'একতলার পর দোতলা আছে। দোতলার পর তেতলা। গাছের পরে লতা, লতার পরে ফেকড়ি। খাজনার পরে বাজনা। রোগের শেষ নেই, ঋণের শেষ নেই, মামলারও শেষ নেই।'

হারলেও যা জিতলেও তাই—আবার জের চলবে? এ তুফান তবে কি করে সামলাবে রমলা? কিসে এই যন্ত্রণার অবসান? কবে এর নিষ্পত্তি?

'জানো, কাল আমার মোকদ্দমা আরম্ভ হবে।' আবার এসেছে মুরারি। বললে, 'এতদিন তোমার স্বামীকে খাইয়েছি, এবার ভবেনবাবুর কামানে বারুদ ঠাসতে হবে। বলেছেন, পঞ্চাশ টাকা না পেলে দাঁড়াবেন না মামলায়—'

'পঞ্চাশ টাকা!'

'এ তাঁর পক্ষে বেশি নয় আমার পক্ষে।'

'আমার পক্ষে। আমি এত দিই কোত্থেকে?' কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝাঁজ আনল রমলা।

'অনেক দিয়েছ, আর দেবার যখন আছে, আর তুমিই যখন পারো দিতে। দিলেই বা।'

'যদি না দিই?' এক পা এগিয়ে এল রমলা।

'না দাও?' উঠবার ভঙ্গি করল মুরারি। বললে, 'তাহলে সুহাসবাবুর কাছে গিয়ে দ্বিতীয় নথিটা দেখাতে হবে। আমি উচ্ছেদ হই কি না হই, তোমার উচ্ছেদ অবধারিত।'

চলে যাবার ভঙ্গি করতেই দরজা আটকাল রমলা। বললে, 'বেশ, একেবারে নিষ্পত্তি হয়ে যাক। তোমার সেই নথিটা, দ্বিতীয় নথিটা বেচ না আমার কাছে। বেচবে? দাম কত? কত দাম?'

'দাম?' ভীরুর মত তাকাল মুরারি: 'দাম পঞ্চাশ টাকা নগদ, আর, আর—'

'নগদ তো নেই। এই এক গাছ চুড়ি নাও?' বাঁ হাতের মণিবন্ধ থেকে দুগাছি সোনার চুড়ি টান মেরে খুলে ফেলল রমলা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললে, 'আর? নথিটা এনেছ?'

'না, আনিনি। যেদিন আনব সেদিন নথিটা দিয়ে বাকি দাম নিয়ে যাব।' চলে গেল মুরারি।

---

'মনে থাকে যেন।' পিছন ডেকে মনে করিয়ে দিল রমলা।

নথিটা যদি একবার হাত করতে পারি তাহলে আর ভয় কি। তাহলে আর পায় কে। তাহলে আর কে দরজা খোলে। কে দেয় এমন জরিমানা!

'তোমার সেই আত্মীয় মক্কেলের মামলা শুরু হবে কবে?' বাড়ি ফিরলে সুহাসকে জিগ্গেস করল রমলা।

'শুরু তো হয়ে গিয়েছে। প্রায় সারা বলতে পারো। আজ আর্গুমেণ্ট করলাম।'

'তুমি করলে? কেন ভবেনবাবু তোমার সিনিয়র ছিলেন না?'

'কই আর তাকে সামিল করল!' গলার টাইটা দুই টানে খুলে ফেলল সুহাস: বলল, দরকার নেই, আপনিই চালান সুহাসবাবু। যদি অদৃষ্টে থাকে আপনার হাত দিয়েই আসবে। আর যদি না থাকে শত ভবেনবাবুও কিচ্ছু করতে পারবে না।'

'তুমি পারবে?' রমলা হাঁপাতে লাগল: 'তুমি কেন এত বড় দায় হাতে নিলে?'

'তা আমি কি করব!' কলারটা খোলা মানে ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু হাল্কা হল কই সুহাস? বললে, ভীষণ দুরবস্থা। সিনিয়র দেবার পয়সা নেই।'

'যদি জিততে না পারো?' ভয়ে প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে রমলা।

হাসল সুহাস। বললে, 'এ আবার একটা প্রশ্ন নাকি? দু পক্ষই কি এক সঙ্গে জেতে? এক পক্ষকে হারতেই হবে। আর যে পক্ষ হারবে সে পক্ষ হাকিমকে শালা বলবে। এর বেশি আর কি আছে সান্ত্বনা? কি আছে প্রতিকার!'

'তোমার উচিত ছিল না—' রমলার স্বর প্রায় কাঁদো কাঁদো।

'ভাবো কেন?' গম্ভীর হল সুহাস: 'যদি হারি আপিল আছে। তোমার যখন আত্মীয় তখন আপিলের খরচ না হয় আমি দেব।'

'আর খরচ দিয়ে কাজ নেই।' ঝাপটা মারল রমলা: 'ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক। মামলার রায় বেরুবে কবে?'



'সাতদিন পর।'

কড়া নড়ে উঠল দুপুরবেলা।

নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ নিয়ে মুরারি এসেছে। নিশ্চয়ই ডিসমিস হয়েছে মামলা। আজ রায় বেরুবার দিন।

'আজ রায় বেরুবার দিন।' বললে মুরারি।

'যাওনি কোর্টে?' অস্থির করে উঠল রমলার।

'না। গিয়ে কি হবে? জানতে তো পারবই মামলায় হেরে গেছি।' তক্তপোশে বসল মুরারি: 'যে এক মামলায় হারে সে সব মামলায়ই হারে।'

'হারলেই বা। আপিল আছে।'

'আর আপিল!'

'কেন নয়? খরচ একরকম করে জোগাড় হয়ে যাবে।'

'তুমি দেবে? তোমার আর কত আছে?' চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাল মুরারি: 'ও হ্যাঁ, তোমার সেই নথিটা এনেছি। কই দেবে তো দাম।'

না দিয়ে উপায় কি। না দিলে আপিলের বোঝা বইতে হবে দীর্ঘ পথ। তারপরে আবার হয়তো দ্বিতীয় আপিল। একেবারে ফেরবার করে ছাড়বে।

নথিটা যদি একবার হস্তগত হয় তবে আমলকীই হাতের মুঠোয়।

'চলো উপরে চলো।' পরিপূর্ণ আহ্বান করল রমলা। বললে, 'এখানে সাংঘাতিক গরম। উপরের ঘরে ফ্যান আছে।'

মুরারি চলে এল উপরে, রমলা পিছু পিছু।

'এ কি, তুমি খালি পা?' চমকে উঠল রমলা।

'জুতো রেখে এসেছি নিচে।'

'সে কি?'

'ঐ যা জুতো তা দোতলায় ওঠবার উপযুক্ত নয়।' মুরারি বসল চেয়ারে। 'মন্দিরের বাইরে রেখে এলাম।'

পাখা খুলে দিল রমলা। বললে, 'জামাটা খুলে ফেল।'

ছেঁড়া পাঞ্জাবির নিচে ছেঁড়া গেঞ্জির কি রকম চেহারা স্পষ্ট অনুমান করতে পারছে মুরারি। বললে, 'না, দরকার নেই। এই নাও, নথিটা।'

ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে নথিটা নিল রমলা। সন্দেহ কি, সেই নথি, হুবহু। তার এক বোঝা চিঠি, এক বাণ্ডিল ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফের মধ্যে ক'টা একক, ক'টা সংযুক্ত। সংযুক্তের মধ্যে ক'টা অসতর্ক।

বললে, 'সে কি, দাম নেবার আগেই দিয়ে দিলে?'

'দিলাম।' শান্ত স্বরে বললে মুরারি, 'আমি উচ্ছন্ন হই তো হব, তোমার উচ্ছেদ করি কেন?' পরে থেমে বললে, 'আমি যতই অভাবী হই আমার ভাবের ঘর ভরা থাক। আমি এবার তবে উঠি।'

'সে কি, বোসো।'

'না, বসি এমন সময় কই? কোর্টটা ঘুরে আসি। দেখি গ্রেস পিরিয়ড দিল কিনা—' উঠে পড়ল মুরারি। আশ্চর্য, নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

আর, সেই মুহূর্তেই ঝন ঝন ঝন করে নড়ে উঠল কড়া।

'কি হবে?' মুখ চোখ চুপসে গেল রমলার। বললে, 'উনি এসেছেন! তুমি কি করবে?' সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়ানো অনড় মুরারিকে ঠেলা মারল রমলা: 'কী করবে? উপরে যাবে, না, নিচে নামবে?'

ঝন ঝন ঝন—

সিঁড়ির মাঝখানে থামের মতন দাঁড়িয়ে রইল মুরারি।

দরজা খুলে দিল রমলা।

'তোমার সেই আত্মীয় মামলা জিতেছে। মামলা ডিসমিস। যে অসুখের চিকিৎসার জন্যে বাড়ির দরকার বলছে সে অসুখের সম্যক চিকিৎসা হবে হাসপাতালে, বাড়িতে নয়। এক সওয়ালেই ডিসমিস হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, তোমার সে আত্মীয়ের দেখা নেই। মামলার কি ফল হল তা জানতে একবার কোর্টেও যায়নি। তাকেই খুঁজছি। আর তোমাকেও। তুমি এসেছিলে হেরে যাব, বললে না আমার সামর্থ্য। কি গো সোনামুখি, হারলাম? তুমি আমার পয়া। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে থাকলে কখনো কি হারতে পারি?'

আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে চলে এসে সুহাস উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে এগোল। প্রায় আঁতকে উঠল ভূত দেখে। বললে, 'এ কি, আপনি এখানে? আর আমি আপনাকে গরুখোঁজা করছি। আপনি ভেবেছেন আপনার মামলার ফল এখানে, এ বাড়িতে? যান, আপনার জিত হয়েছে। আপিল করতে হয় বাদী করবে। কোর্ট ফি ওর। আপনার জিত। হার কার? হার কারু নয়।'

'যাই তবে রায়ের নকলটা নিই গে—' খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মুরারি। ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগল রমলা। সিঁড়ির রেলিঙটা শক্ত করে ধরে রইল।

'আরো কত নেবে?' জিগ্গেস করল সুহাস।

'কে নেবে? ও?' খোলা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রমলা।

'না, ও নয়, তুমি।' আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে এগুতে লাগল সুহাস।

'আমি?' রমলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'হ্যাঁ, তুমি। আরো কত নেবে? রমলার পিঠের পরে সুহাস হাত রাখল: 'কত দয়া, কত ক্ষমা, কত ভালবাসা?'

## টেবিলে অনেক বই

জীবনানন্দ দাশ

এই বার চিন্তা স্থির করবার অবসর এসেছে জীবনে
হৃদয় বয়স্ক হল ঢের;
মোম জ্বলে নিভে যায় অনেক গভীর রাত হলে
অন্ধকারে এক-আধটা আবছা ইঁদুরের
আসা-যাওয়া টের পাই ঘরের মেঝেয়
হয়তো-বা সিলিঙের 'পরে
বাইরে শিশির ঝরে কুয়াশায়—শীতে
লক্ষ্মীপেঁচার ডানা সজনের ডালে শব্দ করে।

টেবিলে অনেক বই ছড়িয়ে রয়েছে;
চিন্তাগুলো যেন অনুলোম প্রতিলোম
পরস্পরের প্রতি—ঠাণ্ডা সাদা নারীর মতন
দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপে মোম—
একটি গভীর সূত্রে গ্রথিত কি হবে
বইয়ের সকল চিন্তা জীবনের সব অভিজ্ঞতা
সকল নক্ষত্র আর সময়ের অপার গতির
ইতিহাসবৃত্তান্তের আগাগোড়া কথা।

এ-সব আশ্চর্য তত্ত্ব ভেবে তবু মন
অনুভব করে এই অন্ধকার ঘরে আজ কেউ
নেই, শুধু এক বিন্দু মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা ছাড়া।
কোনো এক দূর মহাসাগরের ঢেউ
এসে এই অন্ধকার বন্দর স্পর্শ ক'রে চুপে
কোন্ এক দূর দিকে চ'লে যায়, তবে
সময়ের অন্তিম সঞ্চয়ে প্রেম করুণার বলয় রয়েছে?
ব্যক্তির ও মানবের সফলতা হবে?

হয়তো এ-ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশ অন্ধকার ছাড়া
মানুষের ভবিষ্যতে কিছু নেই আর;
সেবা ক্ষমা স্নিগ্ধতা যে-আলোর মতন
মানুষের হাতে, তার বুজে-যাওয়া অন্ধ আধার
বার-বার বড় এক পরিবর্তনীয়তার দিকে
যেতে চায়—সনাতন অন্ধকারে এ-প্রয়াস ভালো;
তবু এই পৃথিবীতে প্রেমের গভীর গল্প আছে
জীবনে রয়েছে তার (অপরূপ) প্রতিভাত আলো,

## প্রথম কদমফুল

বিষ্ণু দে

তোমাকে যে দেব জীবনের সন্ধ্যায়
শ্রাবণ মাসের প্রথম কদম ফুল
আশা ছিল নাকো, তবুও রংবাহার,
তবু বৈকালী আকাশে ঘনাল ঘটা।
শুনি আজকাল আমাদের বাংলার
বর্ষাই নাকি উধাও ফারাক্কার
কিংবা অমুনি সুদূর নামের আড়ে,
শুনি আজকাল ছিঁড়েছে শিবের জটা,
শুধু মারী আর অনাহার অনাচার;
কপিলগুহার ভীষণ অন্ধকার
আবার চেপেছে আমাদের এই রাঢ়ে,
গঙ্গায় শুনি অনেক চোখের লোনা,
কত কোটি চোখ মনেও যায় না গোনা।
তাই নাকি আজ অনেকদিনের চেনা
বর্ষাই শুনি দিল্লীতে পলাতক!
শিবদুর্গার মিলনই নেই তা ঘটা!

আজকাল আশা যে কোনো বিষয়ে কঠিন।
আশা ছিল নাকো, কুণ্ঠিত সারাদিন।
তবু বৈকালী আকাশে ঘনাল ঘটা,
বর্ষাই প্রায়, হোক চাল বৈশাখী,
কিংবা শরৎ, আকাশে রংবাহার
বুঝিবা উমার কৈলাসছাড়া আঁখি।
নামল বর্ষা, কলকাতা পেল মুক্তি,
ছড়াল নদীতে মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে,
একাকার হল নবজীবনের ঐক্যে,
গ্রাম শহরের মরুশাপ বুঝি চুকল,
দুর্গম গিরি দুস্তর মরু পার হয়ে প্রেমে সখ্যে
নটরাজ বুঝি নামল নীলিম শক্রে
বাহুর ভঙ্গে গৌরীর বরঅঙ্গে।

সেই দৃশ্যের কিছু নেই সমতুল।
সেই নৃত্যের বিগলিত সুখসঙ্গে
সব বেলি জুঁই সজল হওয়ায় ঝরে,—
মনে হয় বুঝি ধুয়ে গেল যত ভুল,
শুধু উঠানের কদম স্বতই শিহরে।
তোমাকেই দেব প্রথম কদম ফুল॥

# ধ্বনি

অজিত দত্ত

ইথরের স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে ভেসে
ঊর্ধ্বে বায়ুলোকে উঠে, কিংবা গ্রহান্তরে ঘুরে এসে,
এ-মাটিতে মরুতে বা প্রান্তরে-কান্তারে যাবে ঝরে
আজকের সকল কথা। এ-লগ্নের গুঞ্জনে-মর্মরে
নেমে যাবে নৈঃশব্দ্যের যবনিকা সারা-জীবনের
ধ্বনির সুতোয় গাঁথা হাসি-কান্নাগুলি আকাশের
কৃপণ নিস্তব্ধতায় খ'সে-পড়া নক্ষত্রের মতো
চূর্ণ হয়ে অন্ধকারে মিশে যাবে—অশ্রুত সতত
পৃথিবীর মানুষের কাছে।
তবু দূর দূরান্তরে
দেশ থেকে অন্য দেশে, পল্লী আর বন্দরে শহরে
মানুষের কণ্ঠস্বর ধ'রে নিতে কত জাল পাতা।
করাচি লণ্ডন থেকে নয়াদিল্লি বোম্বাই কলকাতা
ধ্বনির তরঙ্গগুলি ঘুরে ফেরে আকুলিবিকুলি।
সহস্র নিখুঁত কথা অভিনয়, হাসি-গানগুলি
ঘরে এসে ধরা দেয়। শুধু যা স্মৃতির প্রান্তে লীন
অনুচ্চ অস্পষ্ট ক্লান্ত, তাই শুধু আর কোনোদিন
যায় না ফিরিয়ে আনা। যার ক্ষীণ দূরাগত রেশে
আকাশে নীলিমা জমে, জীবনের ছোট পরিবেশে
তাদের মেলে না ঠাঁই। চিরকাল ভেসে চলে তারা
শতাব্দের লক্ষাব্দের সীমা ভেঙে, ধ্বনি-অর্থহারা,
বিশ্ব অতিক্রম করে, জীবন ছাড়িয়ে, ইতস্তত,
আশ্রয়বন্ধনচ্যুত কেটে যাওয়া ঘুড়িদের মতো॥

# পাখিডাকা দিনগুলি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পাখি-ডাকা দিনগুলি ডাকে বারবার
মেঘের কাজল চিরে কাঁপে মনোভার।
হৃদয়ে আকাশপাতা নীল তার ভাষা
চোখ তার অন্ধ, তার নাম ভালবাসা।
আবৃত শ্রাবণরাত্রি মেঘ ডাকে বুকে
ছায়া হয়ে অন্ধকার দাঁড়ায় সম্মুখে।

ফুলফোটা দিনগুলি বারবার ফোটে
বিকেলের রঙ লাগে সীমান্তের ঠোঁটে।
টেলিফোনে কাঁপা হাত বারবার কাঁপে
মন গলে ভয়ে, সুখে, নতুন উত্তাপে।
পাহাড়তলীতে মুগ্ধ বনের গোলাপ
পুরোনো সেতার বাঁধে নতুন সংলাপ।

খুলে-পড়া কালো খোঁপা খোলে বারবার
মনোলোভা লাজ খোলে মনের দুয়ার;
দেওদার ডালে পাখি আসে উড়ে উড়ে
নতুন ঘাসের ঘ্রাণ সারা মাঠ জুড়ে।
ভালবাসা ভালবাসে—কী যে নাম তার!
খুলে-পড়া কালো খোঁপা খোলে বারবার।

# উজান সোঁতে

মণীশ ঘটক

ঠোঁট, নাক, নিতম্ব, চোখ, স্তনজোড়া
একমাথা কালোচুল এলোমেলো ওড়া,
শস্তার বেসাতি মাল আনলে ত ঘরে;
কি করবে পাও না ভেবে। গোছগাছ করে,
টিপেটুপে মূর্তি যদি গড়তেই চাও,
কী যেন খাঁক্‌তি থাকে। মাথা চুলকাও,
আর ভাবো ফাঁকিটা কোথায় রয়ে গেল;
র‍্যাঁদা দিয়ে চেঁছেছুছে ভেঙেচুরে ফেল।

হাত দুটো খাটো হয়, স্তন দুটো বাড়ে,
আগুলফ চুলের রাশ ছাঁটো চুপিসারে।
নাকটা টিকোলো হোতো, গ্রীবা বঙ্কিম,
কিচ্ছু হয়নি, রেগে মেগে হিম্‌সিম।
চলন আসেনি পায়ে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি,
মাথা কোঁকড়া চুল ছেঁড়ো, মেজাজ উদাসী।
কোমরে ঠমক কই, থুত্‌নীতে তিল,
দু'পাটি দাঁতের সারে কিছুটা অমিল?
ঘাড়ের পেছনে কটাচুল রোঁওয়া রোঁওয়া?
ঝাপটে না ধরে যারে যায়নাক ছোঁওয়া!
হয়নি, হয়নি। কেন, কিচ্ছু বোঝো না,
ছট্‌ফট্‌ করো, দাও নিজেরে গঞ্জনা।

কি হতে পারত, কেন হয়নি, না জেনে
হাল ছেড়ে ভাবো আল্লা নেবে গুনে টেনে।

তার চেয়ে পাছটানে না ভাসায়ে দাও,
দ্যাখো তো উজান সোঁতে কোনখানে যাও।
সেখানে কি আজো আছে স্থির অচঞ্চল,
গহীন দহেতে কালো টলটলে জল?
যদি থাকে, ডুব দাও, করো মুক্তিস্নান,
আনো স্বপ্ন দুই চোখে, আনো বুকে ধ্যান।
ফের বোসো, র‍্যাঁদা ও বাটালি হাতে নাও,
ওই মাল মশ্‌লাতে দ্যাখো কি বানাও॥

# বিলম্বিত লয়

আরতি দাস

তোমার সেই সুলভসুখতাড়িত কপোতের
চঞ্চুপুটে বারতা পাই, 'কিছুই কিছু নয়
উপেক্ষাতে ভাসিয়ে সব আস্থা শপথের
দুহাতে হাত মেলাই এসো সময় করি জয়
সময় দ্রুত জলের ঢেউ পলকে তার লয়।'

একলা ঘাটে সময় কাটে এমনি অহেতুক
আকাশে মেঘ, মেঘের ছায়া জলেতে, জলে গান
তীরের মাটি জীয়নকাঠি জলের কৌতুক
আলসে দেখে, হৃদয়ে লেখে একটি দুটি তান
এখানে সুর বিলম্বিত ইমন্‌ কল্যাণ।

## দিনলিপি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
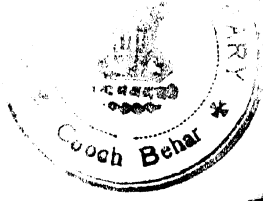
**কৃষ্ণাকে**

তোমার ছায়ার উপচ্ছায়া শত শত
আমায় যে করছে বিক্ষত
জানো কালো মেয়ে?—
সে-ছায়ারা আলো চেয়ে চেয়ে
সাদা হতে থাকে।
যদি ভুলে থাকি আমি ভুলেছি তোমাকে
ছায়াদের আলো দিতে গিয়ে—
কতো আলো তবু তুমি যদিওবা গেছ কিছু নিয়ে!

**শুভ্রাকে**

তোমার হাসি যে শুধু ছল,
তোমার বিষণ্ণ মুখ তোমার আসল
আজ বুঝলাম।
তোমার যে শুভ্রতার নাম
চিরস্মরণীয় হোক মনে
শুভ্রতা ছিল না বলে তোমার হাসির আয়োজনে।

শুভ্রাই আমার কৃষ্ণা হ'ল।
বলো মেয়ে বলো
অশ্রু টলমলো
তোমার চোখের মতো তার চোখে আজ
মন থেকে ছেড়ে আমি তাহলে সমাজ
তোমাদের সঙ্গে অশ্রু ফেলি।
জানি শুধু এই আছে আমার পরমতম কেলি॥

## কে জাগে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেই কোন্ সকালে
এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে—দূরে
দূরে—দূরে
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিল—

তারপর সন্ধ্যা এসে
খুঁটে খুঁটে তুলে
এক জায়গায় আবার আমাদের
মিলিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে
আলোগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে
দরজা দেবার শব্দে
এখুনি ঘর অন্ধকার করবে
এই শহর।

এখুনি
রক্তে রক্তে শোনা যাবে
জলদগম্ভীর মহাকালের হাঁক ঃ
কে জাগে?

ভালবাসার গা থেকে
ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে
সগর্বে ব'লে উঠব ঃ
আমরা।

## হারান মিস্ত্রি

মণীন্দ্র রায়

কৈশোরে কতো-না আকাঙ্ক্ষার
স্বপ্ন থাকে! মনে হয় পৃথিবী বুঝিবা
মুগ্ধা জননীর মতো আমাদের প্রতিটি খেয়ালে
হেসে হেসে জানাবে আদর; মনে হয়
আমরা জন্মেছি, আছি বেঁচে, তার চেয়ে
আর কী প্রবলতর ঘটনা সংসারে!
যে পথে আমরা যাব, ভবিষ্যৎ যেন
ঘুমন্ত রাজার মেয়ে, জেগে উঠবে তারি আবিষ্কারে।

অনেক, অনেক দূরে তাকালে এখনো
স্মৃতির প্রায়ান্ধকার দেয়ালে সে প্রিয়-মুখগুলি
দেখা যায়। অপরেশ, সরসী, হারাণ...
মৌন চলচ্ছবি যেন, ভেসে উঠে আঁধারে মিলায়।
সকলেরি ছিল সাধ তৃণহীন মাঠে
বিজয়ী বটের মতো মাটি-ও-আকাশ বেঁধে দিতে।
জানি না কোথায় তারা, কোন সার্থকতা
ঊর্ধ্বশ্বাস এদিনের কতোটা জুড়ায়।

আমি ব্যবসায়ী। লোনা জীবনমন্থনে
তুলেছি, তা মন্দ নয়, বাড়ি-গাড়ি, সুনাম এবং
চক্ষুলজ্জা কিছুটা নিন্দা, অশান্তি; তাবলে

হয়েছি দশের এক, কতোদিনে হব যে প্রথম,
সে চিন্তায় রাতে ঘুম নাই।

এরি মাঝে অকস্মাৎ অন্য ইতিহাস
দেখা দিল। সেদিন রাস্তায়
থেমে গেল গাড়ি, কাছে গ্যারাজ, কাজেই
যেতে হল। কে মালিক? সম্মুখে অচল ট্যাক্সি, তার
তলা থেকে, প্রায় মাটি ফুঁড়ে,
দাঁড়ালো শরীর এক, তেল-কালি-ঘামে ধোঁয়াওঠা
বেতালের মতো, দগ্ধ, দীর্ঘ, অকুণ্ঠিত।
কিন্তু সে মুহূর্তকাল। আর তারপরে
উচ্ছল হাসির শব্দে চেয়ে দেখি, মিস্তিরী হারাণ!

বলল অনেক কথা। অমর্যাদা ছিল না ভাষণে;
বরং আমিই কৃতী এও সে জানাল বারেবারে।
তবু তার ঘামেভেজা তেলকালিমাখা দেহে, চোখে,
কী যে ছিল—আর সেই হীরেজ্বলা হাসি—
মনে হল চারিদিকে লোহা টিন যন্ত্রের জগতে
সে যেন নায়ক, তার স্বপ্নের পুরুষ অভিযানে
জীবনের রাজকন্যা গেছে তারি ঘরে;

# বানভাসি খাল থেকে

হরপ্রসাদ মিত্র

আমিও গভীর রাতে মাঝে মাঝে তারাদের দেখে
ভেবেছি এই-যে দেহ,—এতো শুধু দুদিনের খাঁচা।
কারণ, বিনাশহীন তুমি, আমি, আমাদের ধারা।
জন্মের যন্ত্রণা থেকে শুধু ফুল ফোটারই ইশারা।
কিছুই যাবে না বৃথা, সব নিয়ে অনন্য পূর্ণতা—
কোথাও উজ্জ্বল হয়ে থাকবেই হাজার পাপড়িতে।

কিন্তু এ আকালে আজ আমাদের বিশ্বাসের মূলে
লেগেছে ইঁদুর, পোকা, দলে দলে বজ্জাত চড়ুই;
শোনে না শান্তির কথা বেঁচে থাকে প্রবৃত্তির চাপে—
কেবলি কাটছে মাটি দাঁতে নখে জটিল শুঁড়েতে।
আমার ঘরের দাওয়া, উঠোনের মাটি—
ছোটো ছোটো গাছে ফোটা রঙীন দোপাটি,
মরাইয়ের মনোহরা আশার নিবাস,
প্রাণের গানের দোলা, প্রেমের সুবাস—
এবং ঈশ্বর যিনি কল্যাণস্বরূপ,
তাঁকেও বিবর্ণ করে! অদ্ভুত! অদ্ভুত!

শুনেছি মাতঙ্গী চণ্ডী বগলা ভৈরবী—
নিজেরা আসেন ছুটে তেমন ডাকেই কেউ যদি।

আমিও গভীর রাতে প্রায়শই অধুনা সেকথা
না ভেবে পারি না আর,—কারণ, প্রাণের সরলতা
ইঁদুরের উপহাসে, পোকাদের ভ্রূকুটিতে মুছে
অচিরে যাবেই জানি রেখাটিও দাগটিও ঘুচে।
তাইতো গভীর রাতে মাঝে মাঝে তাকাই—যেখানে
মেঘেতে বিদ্যুৎ হয় নৈঋতে ঈশানে।

ক্রমেই বয়স বাড়ে ক্ষোভে শোকে লোভের লালাতে।
দুবেলা লোকের ভিড়ে প্রাণ বাঁচে পালাতে পালাতে।
অদূরে স্বস্তির গঙ্গা, কালো রাত,—তাইতেই নিজে
এবং এ নাম, রূপ, বাসনাও যাবে জানি ভিজে।
গীতার শ্রীকৃষ্ণসখা তারপরে পরম শরণ।
যদি না চরম হয় তারই আগে দেহের মরণ॥

বড়োই সামান্য জ্ঞান, বড়োই দুর্জয় ইঁদুরেরা।
ইতিহাসে যুগে যুগে তারা শুধু বদলায় ডেরা।
ছোটো ছোটো দাঁত নখ রসনা ও বাসনার ধারা—
অটুট পৃথিবীময়; সুমতি কী লালিত পাহারা!
—যদিও গভীর রাতে কোনো কোনো প্রবল কোটালে
দেখেছি চাঁদের হাসি আমাদের বানভাসি খালে।

# পরা-প্রেপ্সা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-ঘর থেকে হারিয়ে গিয়ে, এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে
এ-দেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মন
মেশাই যদি আরাধ্য আর অধীর আরাধন
সে-যোগফলে তাহ'লে যাকে পাবো—
সেই তো আমার চাওয়ার তুমি,
অনন্ত যৌবনের ভূমি!
পাবো তোমায় যেমন ক'রে চাবো।
এ-ঘর থেকে হারিয়ে গিয়ে ও-ঘরে যেই যাবো।

অনেক দূর আগিয়ে গিয়ে দেখবো আরো দূরে
নিষেধ যতো পাঁচিল-ঘেরা সমূলে সব ভাঙা—
'কে তুমি যাচো পিপাসা-জল, ব্যথায় বুক রাঙা?'
অনেক বাধা ভাগিয়ে দিয়ে পুরনো সাধা সুরে
ডাকবে সে কে?—চেনা গলার গান—
সেই দীপকে পুড়বে যতো মুখোশ-মোড়া ভান!
নেবে কি টেনে তখন কোনো ছড়ানো দুটি আশ্রয়ের বাহু?
দেখতে পাবো কাছেই এক বিশ্বাসের সমীপ আছে জেগে!
হাতেরই শুধু নাগালে নয়, বুকেরও চেয়ে কাছে—
অশেষ হ'বে তখন ক্ষণ-পলক-পরমায়ু
সঞ্জীবনী তোমার ছোঁয়া লেগে।

বুঝবো কালো ছিলো যা সবই আলোর উৎস আজ।

# স্বকীয়া

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কি ক'রে মুখ তুলতে অমন চোখের পাপড়ি বোজা,
কি ক'রে মুখ নিচু ক'রে
সীতার মতো এই দুয়োরে
আগল দিয়ে খুঁজতে আরেক নিমন্ত্রণ দরোজা?

কিভাবে নীল কবুতরের হলুদ মানুষের
নানান্ শব্দ বুঝতে পারতে,
ফুলকে ভগবানের স্বার্থে
নিয়োগ করতে, বুঝতে পারতে অসীম শিশুদের?

হয়তো অচিন্ পান্থেরা ঠিক এপথে বাঁক নিয়ে
এমনি হ'তো দিনান্ত পার,
'বিরুজিয়া' নাম্নী পাহাড়
ব'সে থাকতো নির্বাপিত কাহিনী আগুলিয়ে;

হয়তো-বা ঈশ্বরের নামে অর্চনানির্ঝরে
এই গাঁয়ে সমস্ত ভিটা
আর সমস্ত পৃথিবীটা
কাঁপতো গৌরী রোদ্দুরে বা মহাদেবের ঝড়ে;

কিন্তু তুমি কেমন ক'রে কখন কোথায় কবে
একটি অন্ধ ভিখিরীকে
দুই নয়নে অনিমিখে

## স্বপ্ন ভেঙে গেলে

অরুণকুমার সরকার

স্বপ্ন ভেঙে গেলে কী থাকে আর
বৃথাই আগম আর নির্গমন
পরিশ্রম ঘাম ক্লান্তি ভার
স্বপ্ন ভেঙে গেলে কী থাকে আর
মাংসপেশীদের সঞ্চালন।

প্রেমিক প্রেমিকার ব্যথা রঙীন
শিশুর হাসি ঘর আকাশ মেঘ
স্বপ্ন ছাড়া সবই অর্থহীন
দিনের পর রাত রাত্রিদিন
শ্রাবণমেঘ তাও নিরুদ্বেগ
সৌদামিনী যেন রুদ্ধ বেগ।

আমাকে তবে কিছু স্বপ্ন দাও
মধুর মিথ্যার অসম্ভব।
যদিও লোকালয় স্বপ্নহীন
স্বপ্ন ছাড়া সবই অর্থহীন
আমাকে দাও কিছু স্বপ্ন দাও।

## বহতা নদীর জল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যায়, যায়, সমস্তই যায়।
উপরে অনন্ত নীল, নীচে চির-চেনা
পৃথিবী। আশ্চর্য, তবু কোনো-কিছু থাকবে না, থাকে না।

যেমন আমার বন্ধু সিতাংশু। কে জানে
কে তাকে দিয়েছে কোন মন্ত্র, কাল সন্ধ্যার হাওয়ায়
এক ঝাঁক চিত্রিত মুনিয়া
দেখে নিয়ে সে আর ফেরেনি এইখানে।
সিতাংশুর গাছে আজ ফুটেছে তিনটি আজেলিয়া।

যায়, যায়, সমস্তই যায়।
উপরে অনন্ত নীল, নীচে চির-চেনা
পৃথিবী। আশ্চর্য, তবু কোনো-কিছু থাকবে না, থাকে না।

সিতাংশু কালকেও ছিল। সিতাংশুর বাগানে যদিও
ছিল না একটিও আজেলিয়া।
সিতাংশু এখন নেই। কয়েকটি প্রফুল্ল বন-টিয়া
সিতাংশুর বাগানে বেড়ায়।
আবার এরাও যাবে, এই ফুল আর এই পাখি।
কেন যাবে, কেন এরা যায়।

যায়, যায়, সমস্তই যায়।
উপরে অনন্ত নীল, নীচে চির-চেনা
পৃথিবী। আশ্চর্য, তবু কোনো-কিছু থাকবে না, থাকে না।

সিতাংশু থাকেনি। একই বহতা নদীর গাঢ় নীল
জলে যে দুবার ডোবা যায় না, বাগানে
একই শুভ্র আজেলিয়া দুবার আসে না, কেউ জানে?
সিতাংশু হয়ত জেনেছিল। তাই তার
বাগানের ফুলগুলি যত হক সুন্দর, সলীল,
সিতাংশু আসবে না ফিরে আর।

## অন্তঃসলিল

গোবিন্দ চক্রবর্তী

সরু এক, এক-চিড় আকাশের আকাশের ফালি—
রৌদ্রের আঁচড়টুকু দ্বিধাভরে লাগা,
বুকফাটা সুনীল তৃষ্ণায়
বুঝি পার করা যায়
তাকেও অঞ্জলি ভ'রে,
তৃপ্ত সাধে—নিস্পৃহ পরখে;
এঁদোগলি কোটরেও, হাঁপধরা দূষিত নরকে।

কে করে আড়াল রৌদ্র
            কোন সেই বাধার পাঁচিল?
কোন দুষ্ট নক্ষত্রের তিক্ত শিখায়
            পুড়ে যায় রূপের নিখিল!
      তথাপি এ জীবনেরে কে রোখে, কে রোখে?

কারে বলি কূপের মণ্ডূক!
ধ্যানমগ্ন মৌনতায়
হয়ত বা তারও আছে গহন কি-সুখ।
প্রমাণ মিথ্যা হয়—
      কত ভুল কতবার পড়ে যায় ধরা,
তবু যতক্ষণ চলে যান্ত্রিক মহড়া
ঠিক ঠিক হৃদয়ের,
নিঃসঙ্গ তরুর মত তেপান্তরের
কে জানে সে কি-কথা যে কয়!
সে তাৎপর্য শূন্য না গভীর—
সেই সত্য সুকঠিন নির্ভুল-নির্ণয়;
কর্দমাক্ত পল্বলেও
যখন সূর্যের ছায়া থাকে শান্ত, স্থির।

দূর মহাসাগরের স্বাদ
বুঝি এনে দিতে পারে মজা-নদীখাদ
যে ফোটায় দেবলভ্য সোনার মৃণাল।
এ জীবনে অন্তহীন বসন্তের কাল—
লক্ষ্য বুঝি যার
আনন্দ, অমৃত, শান্তি—অগাধ, অপার।

## সাঁতার

উৎপলকুমার বসু

তুমি অরণ্য, নীহার স্রোত বটগাছের শিকড়
পড়ন্ত ফুল ফুলন্ত মাঠ—আতপছায়া মেঘে
কারা লোটায় কারা ফোটায় সূর্যহীন বেলা

মীনলীলার রেখার মতো ভালোবাসায় ঢেউ লেগেছে দ্রুত
তুমি তখনো অবক্ষয়, অস্থিরতা—আমি তোমার পাশে
একাকী নই। একাকিনী সহসা তুমি ছায়া

যখন ছিলেম কালো শিলার অচঞ্চল ভ্রমর
অনতিদূর সগরকূলে, নীল জ্যোৎস্না গ্রহমালায়
ওরা দীপ্ত ছড়ানো চুল কুড়িয়ে নিলো

স্মৃতি অমন শুদ্ধ জল, তুমি কেন পা ডোবালে মৃত
ছোটবেলার মীনলীলার রেখাগুলি কমলবনে ভাসে
সারা সকাল সারা বিকেল—ছলনা সৌক আমার?

## রূপ

উমা দেবী

হৃদয়ের গুহা থেকে সহসা সুরভি এক অশরীরী প্রেম
গ্রহণ করেছে আজ এ মুহূর্তে শরীরীর রূপ
—আশ্চর্য—আশ্চর্য—তার রূপ ঠিক তোমারি মতন।
এ দৃষ্টিতে তাই
আকাশের নীলরূপ নীলকান্ত মণির উপমা,
মুষ্টিগ্রাহ্য—কঠিন সুন্দর—ধরা যায় ছোঁয়া যায়
ফুলের মতন,
আর এক সুরভি বাতাস
আকুল করেছে যত নিগূঢ় আশ্বাস—
শোনা যাবে এ মুহূর্তে যেন কোনো কুসুমের
নিঃশ্বাসপতন।
কুয়াশা-রঙের এক অস্পষ্ট আলোক
ক্রমে অতিক্রান্ত ক'রে গেল মর্মলোক—
অস্ফুট কোমল
নেত্র থেকে উৎসারিত এক বিন্দু জল
ধুয়ে দিল গ্রহ-তারা-নীহারমণ্ডল!
চুম্বনলালসা জীর্ণ অধরের সতৃষ্ণ বিরতি
স্পর্শ ক'রে গেল শেষে—ধন্য ক'রে গেল শেষে দেবলোকে
সুধার আহুতি।
সমস্ত অস্তিত্ব এক দগ্ধবদ্ধ তন্দ্রীর তুলনা
তোমারি দেহের ধূপে পেতে চায় অগ্নি উন্মাদনা—
এক রাগ-উন্মাদনা।
অশরীরী প্রেম এক সুরভি ফুলের মত
হয়েছে অধীর
সুরভি নিঃশ্বাস জেগে তোমারি মতন ঠিক
এক শরীরীর।

## প্রেমিকের প্রার্থনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সতী হও, হে উজ্জ্বলা, এক সঙ্গে তৃপ্ত করো তিনটি যুবাকে
ত্রিশিরা কাচের মত তোমার চোখের আলো
বহুবর্ণে বিচ্ছুরিত হোক্
সময়কে ত্রিধা করো,—যে সময় মুখে, দেহে, তন্তুজাল আঁকে
এক মূর্তি, এক রূপ—মনে রেখো জীবনের মহত্তম শোক।
এক-প্রেমিক পায় শুধু বুভুক্ষার পথ্য কিংবা স্বকৃত বিষাদ
তোমার ঐশ্বর্য তুমি গুপ্ত রাখো—অভিজ্ঞতা রাখে তার দেনা
উজ্জ্বলা তোমাকে ঘিরে প্রতিদিন ঘুরে ফেরে কত লক্ষ সাধ
তিনজন পুরুষ আমি একা এই দেহে তুমি কখনও জানলে না।

একজন শরীর চায়, হিংস্র জন্তুর মতো অনুপম তোমার শরীর
আঁধার অনধিগম্য অরণ্যের সমস্ত রহস্য তাকে দিও
অন্যজন নদী খোঁজে—বুকের অদেখা নদী, প্রবহ, গভীর
স্মৃতির মীনের মত অতল অজ্ঞাতবাস শুধু তার প্রিয়।
আরেক প্রেমিক তার ব্যর্থ রোষে ভেঙেছিল সাধের দর্পণ
সেই টুকরো ভাঙা কাচে এখন সে সৃষ্টি করে তোমার প্রতিমা
সে তোমাকে ভুলতে চায়, তবু ফিরে ফিরে আসে
পরাজিত মন
তোমার চক্ষুর বৃত্তে বাঁধা তার যৌবনের সীমা।

তিনটি অতৃপ্ত যুবা তোমার রূপের মোহে আসে বারে বারে—
উজ্জ্বলা, মধুর তুমি, কিন্তু স্থির, নিষ্কম্প আলোক
নিজেকে দাবাগ্নি করো অথবা ডুবিয়ে দাও
ঘন বহুরূপী অন্ধকারে—
এক মূর্তি এক রূপ মনে রেখো জীবনের মহত্তম শোক।

## কীটদষ্ট ছবি

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিনের কথা—সে এক দুপুরে
অনেক দোকান ঘুরে
বেছে বেছে কিনেছিলে একখানি ফ্রেম
আমিও ছিলেম,
সেদিন তোমার সাথে, সে সাগ্রহ আহরণ ব্রতে
দেখেছি তোমার চোখ রূপমুগ্ধ প্রসন্ন আলোতে।

কি যেন পেয়েছ ছবি! পলাতক মানসের পাখী
অসীম নীলিমা হতে ফিরে যেন এসেছে একাকী
সোনালী ডানায় মেখে আকাশের রং আর আলো
ক্রন্দসী মেঘের ছায়া দিগন্তে মিলাল।
সেই নীল, সেই রং, সেই আলো পৃথিবীতে নেমে
ধরা পড়েছিল বুঝি তোমার ও যত্নে কেনা ফ্রেমে।

অনেক দিনের পরে
এসেছি তোমার ঘরে
বালিখসা দেওয়ালের জীর্ণ অবকাশে
সেই ফ্রেম কীটদষ্ট ছবি নিয়ে ব্যঙ্গভরে হাসে।
কোথায় আকাশ নীল, ধূম্রজালে হয়ে গেছে কালো
কোথায় তোমার চোখে সেদিনের সেই দীপ্ত আলো।
অতিক্রান্ত যৌবনের ধূসর গোধূলি
ম্লান ছায়া ফেলি
কীটদষ্ট জীবনের খাঁজে খাঁজে ঢালে অন্ধকার
আনন্দের শক্তি নাই, বেদনার বোধ নেই তার।

মনে হয় একদিনও বুঝি
দুচোখ উপরে তুলে অতীতেরে নাওনিকো খুঁজি
অতিক্রান্ত ক্লান্ত পথ পদপ্রান্তে নিলে শুধু মেনে
কতটা এসেছ চলে নাওনিকো জেনে।
বাঁচার তপস্যা নিয়ে পঞ্জরের পিঞ্জরের ভার
শুধুই বয়েছ বন্ধু—অজেয় আত্মার
মৃত্যু হতে হীনতর, পরাজয় কলঙ্ক লিখন
তোমার অস্তিত্বে লেখা—সোনালী ফ্রেমের মাঝে

## পাপপুণ্য

আনন্দ বাগচী
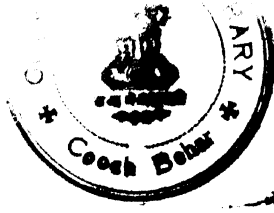
মনে হল সব ছবি, শুধু পটে লেখা সব ছবি
সমস্ত রেখার খেলা দেহমন, সমস্ত যৌবন
ঠুংরির মত জ্বলছে একটিমাত্র রেখার কম্পনে,
দূরে যেতে মন চায় না, কাছে এলে ভয়ে কাঁপে মন,
যমুনার কালোরঙ চিত্রচুড় তুলির ডগায় ঃ
মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা, বেলা গেলে, মেঘ ক'রে এলে
কথা কাঁপে কথা, ঘাটশিলা বাজে জলের কীর্তনে।

নিভেছে বামীর আলো যৌবনের প্রথম সন্ধিতে,
ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলো, অন্ধকারে নিভে গেল দিন,
গলিত চিন্তায় ঝরে দূর অরণ্যের পত্রাবলী
ভীষণ বুকের মধ্যে, চিলেকোঠা, ছাদের সিঁড়িতে
বাঁকা হয়ে আলো পড়বে আরো কতকাল পরে, ছবি
মনে হল সব ছবি, শুধু পটে লেখা সব ছবি।

দণ্ডকারণ্যের ছায়া দুই চোখে প্রহরে প্রহরে,
দশদিকে অন্ধকার, ছটি ঋতু, তাও অন্ধকার,
সুদূরে বিলীন বাল্যবন্ধু সখা বর্বর বন্ধনে
অবিন্যস্ত সমুদ্রের মুখবন্ধ প্রতিটি রেখায়,
অদ্য শেষ রজনীতে, চিলেকোঠা, ছাদের সিঁড়িতে
কেউ কাঁদিছে, অন্যদিকে পিঁড়িতে আল্পনা, মনে মনে
পালঙ্কে শয়নরঙ্গে, কাঁকড়াবিছে সমস্ত শরীরে॥

## গর্ভাঙ্ক

পরিমলকুমার ঘোষ

একটি যুবক তার দৃষ্টির আড়ালে অন্ধকারে
ডুব দিয়ে খুঁজে পেলো অপরূপ তৃষ্ণার আকর।
একটি যুবতী সেই তৃষ্ণার অগাধ সরোবর
মৃণ্ময় অঞ্জলি ভরে পান করে পিপাসার পারে
গাঢ় সময়ের রাজ্যে চলে গেল।

আমাদের বাড়ি
জাপানী পর্দায় আঁকা বিষণ্ণ দীঘল চেরী গাছ
কখনো বলে না কথা। কখনো কাচের জারে মাছ
গভীর অনন্ত মৃত্যু মনে করে আঁছাড়ি পিছাড়ি
খায় না সুতীক্ষ্ণ মুখে। নির্বিকার জানালা দরোজা
চিত্রার্পিত, রন্ধ্রহীন, মূঢ়তা, ম্যাস্টিফ্-আদি মারে
সুরক্ষিত; বৈষয়িক প্রয়োজন বিনা নির্বিচারে
ফেরাবে পথের দিকে অনাহূত দেবতাকে সোজা।

যুবক-যুবতী তাই দৃষ্টিহীন অনন্ত বিকেলে
গাঢ়তর সময়ের দেশে গেল পরস্পরে ফেলে॥

## ফাল্গুনে

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

এখনো তো ভালোবাসি পৃথিবীর মদির ফাল্গুন,
সোনালী ডানায় গন্ধ মেখে কোনো মৌমাছি এলে
অলস দুপুরে একা একটানা গান— গুন গুন।
এখনো অবাক লাগে জানালায় তার দেখা পেলে।

আজো তো দু' চোখ খুলে দেখি সেই ফাল্গুনের রং
যে গেছে শীতের শেষে সে কি এলো কৃষ্ণচূড়া হয়ে,
অথবা পলাশ-বনে ছোপ-লাগা রঙের বিস্ময়ে?
যৌবনের রূপে তার—সে-মানবী এসেছে, এবং
তারি শত সহচরী পলাশের বনের আড়ালে
উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়ালো কী রূপের আগুন!
পৃথিবীকে মনে হয় বন্দী সেই স্বপ্ন-মোহ-জালে,
মানবীর রূপে আজ পলাশের রূপ শতগুণ!

দুপুর বেলার ঘুম ভেঙে আজো চেয়ে থাকি দূরে
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ফাল্গুনের স্বপ্নবতী আসে—
তার চোখে চোখ রেখে সঙ্গীহীন মন যায় উড়ে:
যে গেছে একাকী চলে তাকে যদি পাওয়া যেতো পাশে!

## চোখের আলোয়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

এ-পারে জন্মের মালা অন্য পারে মৃত্যুর মন্দিরা
দুই প্রান্ত ছুঁয়ে শুধু নিত্যবহা স্রোতস্বিনী নদী।
অকূল আকাশ জুড়ে মুহূর্তের অজস্র পাখিরা,
তুমি এর কূলে আছ জন্ম থেকে যৌবন অবধি।

কিছু নিতে পারবে না, দেখার আলোয় ভরে চোখ
মেঘের আড়াল থেকে বিচ্ছুরিত উৎসবের গান
দ্যাখ, কী আশ্চর্য মন্ত্রে দিগন্তে ঠিকরায় সূর্যালোক
রাত্রির তমিস্রা ছিঁড়ে জ্বলে ওঠে জ্যোৎস্নার সম্মান।

এ-পারে জন্মের মালা অন্য পারে মৃত্যুর মহিমা
দুই প্রান্ত ছুঁয়ে বয় সময়ের শান্ত স্রোতস্বিনী।
তরঙ্গে-তরঙ্গে তার দুঃখ-সুখ-বিরহ-মিলন—
দ্যাখ, কী আশ্চর্য গান গোপন রেখেছে বিজয়িনী।
কিছু নিতে পারবে না, এই লগ্ন, একান্ত নির্জন
দেখার আলোয় শুধু ভরে তোল দু চক্ষুর সীমা॥

পঞ্জাব মেল আসানসোল স্টেশনে যখন থামল, তাতে তিল ধরবার জায়গা নেই। সুরেশ্বর মিথ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা হাঁফাচ্ছে। যারা বসে আছে তাদের অবস্থাও যেমন, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও তেমনি।

তখন ভোর হতে দু'তিন ঘণ্টা দেরি। অনিদ্রায় এবং সারারাত্রির ধকলে সবাই ধুঁকছে। চোখ ছোট হয়ে এসেছে। গাড়ির দরজা পর্যন্ত লোকের ঠাসাঠাসি।

সুরেশ্বর করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালে ঃ আমাকে একটু ঢুকতে দিন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে আবেদন কারও কানে গেল বলে মনে হল না। অধিকাংশই নির্বিকার। নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। অন্যের সর্বনাশের কথাও ভাববার সময় নেই। যাদের কানে আবেদন পৌঁছুল, তারা সর্বনাশের কথাটা বিশ্বাসই করলে না। ভিড়ের সময় ট্রেনে ওঠবার জন্যে অনেকেই অনেক সর্বনাশের দোহাই দেয়। তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে হাসল। কেউ বা না-শোনার ভান করল। কেউ বা মুখ ফুটেই মন্তব্য করল ঃ এত যদি তাড়া, আগের ট্রেনে যাননি কেন? সুরেশ্বর তারও হয়তো একটা জবাব দিলে, কিন্তু সে কেউ শুনলে বলে মনে হল না।

অবশ্য সকলেই কিছু নির্মম লোক নয়। যাদের কিছু দয়া-মায়া আছে, সুরেশ্বরের আবেদনের উত্তরে তারাও করুণভাবে হাত জোড় করে জানালে, দরজাটা যে খুলি এমন জায়গাও খালি নেই।

কথাটা সত্যি। এবং সুরেশ্বরের সর্বনাশের কথাটাও মিথ্যে নয়। সুরেশ্বর তখন মরিয়া। প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠা ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু সেখানেই বা প্রবেশের পথ কোথায়? উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীরা ভিতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে সুখসুপ্ত।

সুরেশ্বর কয়েকটা দরজাতেই জোরে জোরে ধাক্কা দিলে। কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। হতাশভাবে ফিরে এসে আবার একটা দরজায় ধাক্কা দিতে মনে হল কে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা জানালার খড়খড়ি যেন নেমে গেল।

—কে? কি চান?

রমণীর কণ্ঠস্বর।

সুরেশ্বর জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। সকাতরে বললে, আমি অত্যন্ত বিপন্ন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটুখানি জায়গা চাই।

মহিলাটি নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে, কত দূর যাবেন?

ব্যগ্রভাবে সুরেশ্বর উত্তর দিলে, কলকাতা। মানে হাওড়া।

—সঙ্গে আর কেউ আছে?

—আজ্ঞে না। আমি একলা।

সুরেশ্বর অস্থির হয়ে উঠেছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। এক্ষুনি গার্ড হুইস্‌ল্‌ দেবে এবং মেল ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করবে। তার সমস্ত দেহ চঞ্চল। যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছুটছে।

মহিলাটি আরও কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল। সুরেশ্বরের চঞ্চল কাতর দৃষ্টি একবার গার্ডের গাড়ির দিকে, একবার ড্রাইভারের এঞ্জিনের দিকে এবং আর একবার মহিলাটির দিকে ছুটোছুটি করছে।

মহিলাটি কি যেন ভাবলে। তারপরে দরজাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর বিদ্যুৎবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে এই ভোরেও সুরেশ্বর ঘেমে উঠেছিল। বেঞ্চে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে এতক্ষণে সে ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখবার অবসর পেল।

যে বেঞ্চে সে বসেছে সেই বেঞ্চে একটি বছর ষোল-সতেরোর মেয়ে। কর্সা রং।

ছিপছিপে লম্বা চেহারা। পরিধানে চমৎকার স্যুট। দিব্যি স্মার্ট দেখতে।

ওদিকের বেঞ্চে আর একটি ছেলে। বছর এগারো-বারো বয়স হতে পারে। সেটিও স্যুট-পরা। দাদার মতোই সুন্দর দেখতে। মায়ের গা ঘেঁষে বসে একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি।

তারপরে মহিলাটি।

তার দিকে চেয়ে সুরেশ্বর থমকে গেল।

মহিলাটি অপলক তার দিকে চেয়ে রয়েছে। কৌতুকে চোখের তারা দুটি নাচছে। চোখের তারা সকল মেয়ের নাচে না। তার জন্যে চাই সূক্ষ্মাগ্র তির্যক ভ্রূ, দীর্ঘ পক্ষ্ম এবং আবেশ-বিহ্বল টানা চোখ।

সুরেশ্বর অনেক মেয়ে দেখেছে। কৌতুকে চোখের তারা কারও নাচত না। বাদে একজন। কিন্তু

মহিলাটির ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি না?

সুরেশ্বর এবারে লাফিয়ে উঠল : অমিতা না?

—চিনতে পেরেছ?

—না পারারই কথা! আজকের ব্যাপার তো নয়!

সুরেশ্বরের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে অনেকখানি খুশি এবং অনেকখানি লজ্জা খেলে বেড়াতে লাগল।

অমিতা বললে, তোমার গলার স্বর শুনেই তোমাকে চিনেছি। দরজা খুলে দেখি, মূর্তিমান তুমি! কিন্তু তোমার তখন কারও দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নয়। একটু বসতে পেলে বাঁচ।

লজ্জিত কণ্ঠে সুরেশ্বর বললে, যা বলেছ! কোথাও এক ফোঁটা জায়গা নেই। অথচ

—অথচ বিপদটা কি!

সুরেশ্বরের মুখ হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। বললে, আমার মেজ ছেলেটি, তাকে বোধ হয় দেখনি, যক্ষ্মা হাসপাতালে। রাত বারোটায় টেলিগ্রাম পেলাম, তার অবস্থা ভালো নয়।

—ও।

সমবেদনায় অমিতার মুখও বিষণ্ন হয়ে উঠল।

বললে, সুনীতিদিকে আনলে না?

—সে তো নেই। সে তো অনেকদিন হল নেই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল?

সুরেশ্বরের মুখের উপর একটা কালো ছায়া খেলে গেল, যেটা অমিতার ভালো লাগল না। প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যে বললে, সে অনেক কথা অমিতা। আবার যদি কখনও দেখা হয় বলব।

মহিলাটি অপলক তার দিকে চেয়ে রয়েছে

ওর মনের ভাব অমিতা বুঝলে। একে সে অনেক দুঃখের বিনিময়ে খুব ভালো করেই চিনেছে। সুতরাং কিছুটা অনুমানও করতে পারলে। জেদ না করে তাই সে চুপ করে রইল।

একটু পরে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কোথা থেকে আসছ এখন?

অমিতা হাসলে। বললে, অমৃতসর থেকে।

—এ দুটি?

সুরেশ্বর ছেলে দুটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

—আমার ছেলে।

উত্তর দিতে গিয়ে সুরেশ্বরের বিস্ময়-বিমূঢ় চোখের দিকে চেয়ে অমিতার গাল দুটি আরক্তিম হয়ে উঠল।

ছেলে দুটির জন্যেই সুরেশ্বর নিজেকে সামলে নিলে। সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আর কি খবর বল?

হেসে অমিতা জবাব দিলে, খবর তো অনেক। আবার দেখা হলে বলব।

একটু চিন্তা করে সুরেশ্বর বললে, দেখা হবে। তুমি কোথায় উঠবে?

—প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো একটা হোটেলে উঠব।

—তারপরে?

—উনি বললেন, মাসখানেক থাকতে হতে পারে। তখন একটা বাড়ি ঠিক করাই ভালো। তাই থিয়েটার রোডের কাছাকাছি একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে।

অমিতা রাস্তার নাম এবং নাম্বারটা বলে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো নিজের বাড়িতেই উঠবে? কোথায় যেন সেটা?

সুরেশ্বর হাসলে। অত্যন্ত সাধারণ হাসি। বললে, না, সেখানে উঠব না।

—কেন?

—সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। সেও অনেক দিনের কথা। যাই হোক, ছেলেকে দেখে একদিন তোমার ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

—নিশ্চয় এস। ভারী খুশি হব।

—সত্যি?

—সত্যি।

—অণ্ডাল এসে গেল। এবারে নামতে হবে। দেখি যদি কোথাও থার্ড ক্লাসে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাই। হাওড়া স্টেশনে আবার দেখা হবে।

অমিতা কিছু বলবার আগেই সুরেশ্বর নেমে গেল।

সুরেশ্বরের চেহারা, সাজ-পোশাক এবং কথাবার্তায় অমিতা বুঝেছিল, খুব দুঃখের মধ্যেই তার দিন কাটছে। তৃতীয় শ্রেণীতে সুরেশ্বর ভ্রমণ করতে পারে এটা অচিন্তনীয়। তার কলকাতার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আছে এখন আসানসোলের বাড়িতে। আগে বছরে ছ' মাস আসানসোলে আর ছ মাস কলকাতার বাড়িতে থাকত।

ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান সুরেশ্বর। এই অবস্থায় অতিরিক্ত আদরে যা হয় সুরেশ্বরেরও তাই হয়েছিল। তার বিলাস-ব্যসন এবং বদ্ খেয়ালের অন্ত ছিল না।

তার ঐশ্বর্যের চমকে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম যৌবনে অমিতা একদিন তার বদখেয়ালের স্রোতে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল।

কুটোর মতো।

কী যে অমিতার হয়েছিল, নিজের বলে কিছুই যেন তার ছিল না। বাপ-মা, সঙ্গী সাথী, লেখাপড়া কিছুই তাকে বাঁধতে পারেনি। সে যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে কি ভালোবাসায়, না ওর ঐশ্বর্যের চমকে, না ওর রূপে?

হ্যাঁ, রূপ বটে!

পুরুষের এত রূপ সে কখনও দেখেনি। দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ চেহারা। প্রশস্ত ললাট, বড় বড় রক্তোৎপলের মতো চোখ আর কাঁচা সোনার মতো রং!

আর তেমনি অতুলনীয় অমিতব্যয়িতা। টাকা যেন হাতের ময়লা! বিন্দুমাত্র মমতা নেই তার উপর।

মমতা নেই নিজে ছাড়া আর কারও উপর, কিছুরই উপর। টাকা আসে অনভিনন্দিত, যায়ও তেমনি। মধ্যে যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় তার নিজের জন্যে সেইটেই বড় কথা।

নইলে একান্তভাবে তারই উপর নির্ভরশীল অসহায় কোনো মেয়েকে নিশ্চিন্তে হাওড়া স্টেশনে কেউ ফেলে যেতে পারে! শুধু সুরেশ্বরই পারে।

এবং পাঞ্জাব মেল এক সময় সেই হাওড়া স্টেশনেই অমিতাদের নামিয়ে দিলে।

অমিতা চেয়ে দেখতে লাগল।

কত কাল পরে সেই হাওড়া স্টেশনে ফিরে এল সে! বড় ছেলের দিকে চেয়ে মনে-মনে হিসাব করে দেখলে আঠারো বৎসর। তখন তার বয়সও ছিল আঠারো। আজ ছত্রিশ।

কত পরিবর্তন হয়েছে হাওড়া স্টেশনের। না কি তার নিজের চোখেরই পরিবর্তন হল? আঠারো বছর বয়সের চোখ আর ছত্রিশ বছর বয়সের চোখ এক নয়। সেদিন আর এদিনও এক নয়। যেন দুটি পৃথক জন্মের দুটি দিন!

অমিতা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল, ডাঃ অখিল নন্দীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল। ওইখানে কি? যেখানে একটি বৃদ্ধ দম্পতি কতকগুলি ট্রাঙ্ক এবং বস্তা নামিয়ে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন?

হয়তো এ প্ল্যাটফর্মেই নয়। অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে কে জানে? আঠারো বছর আগে কোন্ একটা অজ্ঞাত ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ত, আজ আর কাউকে জিজ্ঞাসা করেও জানবার উপায় নেই। অখিলের নিজেরই মনে নেই খুব সম্ভবত।

অথচ জানতে পারলে মনটা বড় ভালো হত। সেই জায়গাটিই তার বর্তমান জন্মের সূতিকাগার। সেইখানে নতুন করে অমিতার জন্ম হয়।

সূতিকাগার এবং সেই সঙ্গে শ্মশানও।

সেইখানে মরে গেল অমিতা মুখুয্যে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জন্ম নিলে অমিতা নন্দী। ছেলে দুটির দিকে চেয়ে তার মন যেন আরও জোর পেলে। হ্যাঁ, অমিতা নন্দী, মুখুয্যে নয়।

অথচ সে বুঝতে পারলে না, যে মেয়েটি নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখতে চায় সে অমিতা নন্দী নয়, মুখুয্যেই। অনেক কাল পরে তার শিরায় মধ্যে আঠারো বছর বয়সের রক্ত উদ্বেল করে উঠেছে।

কিন্তু নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখার কি জো আছে! এই পৃথিবী যেন কী! নদীর স্রোতের মতো, মরুভূমির মতো। দাগ কেটে, চিহ্নিত করে কিছুই রেখে যাওয়া যায় না।

—চল মা! —বড় ছেলেটি তাগাদা দিলে।

—হ্যাঁ যাই।

অমিতার চোখ চারিদিকে কি যেন তখনও খুঁজছে।

সুরেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সব নেমেছে? আর কিছু নেই তো?

গাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে উপর-নিচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সুরেশ্বর আশ্বস্তভাবে বললে, না। আর কিছুই নেই। চল এখন। এই কুলী!

কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে আবার বললে, চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে তো?

অমিতা তথাপি নড়ে না।

—কি খুঁজছ? কিছু হারাল নাকি?—সুরেশ্বর এবার রীতিমত তাড়া দিলে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে অমিতা বললে, সেই জায়গাটা খুঁজছি।

—কোন জায়গাটা?

—অমিতা মুখুয্যে যেখানে মারা গেল।

কথাটা বুঝতেই সুরেশ্বরের এক মিনিট গেল। এক ঝলক কালো রক্ত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বললে, সে কি আর মনে আছে?

ব্যগ্রভাবে অমিতা বললে, আমার মনে আছে। সে জায়গার প্রত্যেকটি বিন্দু আমার মনে গাঁথা আছে। দেখতে পেলেই চিনতে পারি।

কিন্তু চেনা দূরের কথা, কিছুই যে দ্বিতীয়বার দেখা যায় না, অমিতা মুখুয্যেকে সে কথা বোঝায় কে?

সুরেশ্বর দারুভূত। ছেলেটি অপরিচিত মহানগরীতে এসে হতভম্ব। তাড়া দিলে কুলীরা ঃ

—চালিয়ে না। কেৎনা ঘাঁড় খাড়া রহেগা?

হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে থাকার যো নেই। চলতে হবে। ওরাও নিঃশব্দে চলতে লাগল।

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোঁসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোঁসাই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কিরকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, দ্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ; আর তিমি মাছ—তা সে দেখিনি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাখরগঞ্জ ডিসটিক্টটাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদেব লংকা-ফোড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপেক্সেলের গ্যাস-মাস্ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইন্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতোভাবে ওদের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সূর্য্যি রায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবিনি। ডি, ই দ্য: টি, আর, ও, 'প' ত্রো—পি সাইলেন্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেনরে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডান্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাসনি ডান্ডাকে না ছোঁবার জন্য। তখন কি বলিস্? 'ভাগ্নে বৌ দুয়ারে—কোনা কেটে ফালদি যা।' বরঞ্চ সূর্য্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডাম্‌কে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্য ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-হুনো-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস্ থাকলে?'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস!'

চাচা বললেন, 'হু। একবার দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, [illegible]

চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যান্ড অব মিল্‌ক্‌ এন্ড হানি, ননী-মধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকী-টাকী ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিন জনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-ওলা নামনে-ওলা চিঁড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্‌-উন্‌ট্‌-হাল্‌ব্‌—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অ' পো আঁসিয়েন্‌—একটুখানি এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, প'য়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্‌ ভার—নয় কি?' ফরাসী

দুজনে লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে

আমাকে শুধালে 'ক্যাস্‌ কিল্‌ দি—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে 'ম' দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ এক সঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোড়ে। কি ব্যাপার? দেখ্‌তো না দ্যাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন। 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীল-মণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু' ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরন।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌গে। আমার বয়েস হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনাই চুপ। আমেমা।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু' প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দুজনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু' একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্‌ মঁসিয়ো কোন্‌ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্‌ হ্যার্‌ কোন্‌ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্‌ মিসিস কোন্‌ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নল্‌ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত মনে প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙগরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একে অন্যকে গম্ভীরভাবে স্টিফ বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠাটা চালাকী করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই

হ্রীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দ্ জনা লম্বা হলেন দ্ই ডেকচেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শ্নে বললে 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্ল্!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ'!'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজী ধরাধরিতে! ব্কিরও অভাব হল না। আর সে বেট কী অদ্ভূত ফ্লাক্চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গ্ম্ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসানট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাকা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দ্টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গ্জ্র-গ্জ্র করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি ট্ ওয়ান্ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝো ঠ্যালা! আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হ্রীর সঙ্গে দ্' ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হ্রী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হ্রীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভালো মান্ষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক চেয়ারের বদলাবদলীর প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহ্ বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হলো, যেদিন হ্রী মারাঠা কিম্বা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢ্কবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢ্কবেন তার হবে জিৎ।

দ্' একজন র্চিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-ম্খ নেড়ে ব্ঝিয়ে দিল, C'est, C'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না'

রেসের বাজী তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গ্লি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন ব্লেটে কুকুরে কী রেস্—কভী কুত্তা, কভী গ্লি, কভী গ্লি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢ্কল্ম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠেরো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌস্মী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের ম্খে শ্কনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সম্দ্র ধরলো র্দ্রতর ম্র্তি। এবারে হ্রী পড়ে রইলেন একা। তাঁর ম্খও হরতালের মত হলদে। তারপরের দিন ডেক্ প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জ্বলের প্রাণী বলে দাতম্খ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিকে আছি আর কি? খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে। মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরিফিরি করছে। হ্রী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধ্ তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হ্রী এই প্রথম ছ্টে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তব্ ধরল্ম গিয়ে তাকে। হ্রী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'কেবিন'। আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চলল্ম। দ্জনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খ্লে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়ল্ম দ্জনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছনায় শোয়াল্ম। তারপর কেবিন বয়কে ডেকে দ্জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল্ম তার কেবিনে। বাপ্স্।'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডার সবাই একবাক্যে শ্ধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তব্ সবাই শ্ধায়, 'তারপর।'

চাচা বললেন, 'এত বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্স্ ব্ঝিসনে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছল্ম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে ফেলিসিতাসিয়োঁ মসিয়ো, কেউ বলে, কন্গ্রাচুলেশনস্, কেউ বলে গ্রাতু-লিয়েরে—দ্চ্ছাই, এ-সব কি? কিন্তু কেউ কিচ্ছ্টি ব্ঝিয়ে বলে না।

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাত। মহারাষ্ট্র গ্জরাত দ্জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল! ভিভ্ ল্য বাঁগাল! লং লিভ বেঙল!'

আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শ্ধ্ কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরৎ পেল—বেনে কিম্বা মরাঠা কেউ জেতেনি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই।

টাকাটা নাকি তছর্প হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়।'

এমন সময় সেই দ্ই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

সেকেলে লম্বা থার্ড ক্লাস কামরা, প্রচুর জায়গা। ভিড় একেবারে নেই। কামরার একধারে বসিয়া আছেন প্রকাশবাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী সুলোচনা এবং তাঁহাদের কন্যা উমা। উমার বয়স ষোল কি ছাব্বিশ তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বা চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রোগা ছিপছিপে চেহারা। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। গালের হাড় দুটি একটু বেশী উঁচু। তবু মোটের উপর দেখিতে মন্দ নয়। দেখিতে আরও হয়তো ভালো হইত যদি মুখে আর একটু সজীবতার ছাপ থাকিত। মুখের ভাবটি বড়ই ম্রিয়মাণ। প্রকাশবাবু বেঁটে বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। কালো রং। গোঁফ দাড়ি কামানো। মুখটি চতুষ্কোণ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। মুখভাব উপর্যুপরি সাত-গোল-খাওয়া ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনের মতো মরীয়া। সাতটি কন্যার পিতা তিনি। উমা তৃতীয়া কন্যা। তাহাকেই দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন। টকটকে লালপেড়ে শাড়ি-পরা সুলোচনা, মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছেন একধারে। সাতটি কন্যা প্রসব করিয়া চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন যেন। মুখের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের নীচে ফোলা-ফোলা ভাব, এবং কোণে জরার চিহ্ন। মাথার সামনের দিকটা টাক। টাকেরই উপর খানিকটা সিঁদুর ধ্যাবড়ানো। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় তিনি স্থবিরা। প্রকাশবাবুর স্ত্রী বলিয়া মনেই হয় না, মনে হয় তাঁহার দিদি বুঝি। তাঁহার মুখের আত্মসমাহিত ভাবটি কিন্তু মুগ্ধ করে। তিনি যেন অদৃষ্টের উপরই হোক বা ভগবানের উপরই হোক সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা হইবে তাহাই মানিয়া লইবেন।

কামরার অপর প্রান্তে কোণের দিক ঘেঁষিয়া আর একটি মেয়ে বসিয়াছিল। ইহারও বয়স কত তাহা বলা শক্ত, তবে বুড়ি নয়। ত্রিশের কাছাকাছিই হইবে। এ মেয়েটিও রোগা, কালো। কিন্তু চোখেমুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। পোশাক-পরিচ্ছদেও বেশ একটু ছিমছাম ভাব। বাঁ হাতের কব্জিতে রিস্ট-ওয়াচ। অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কানে ফুল, হাতে একগাছা করিয়া চুড়ি। পাশে যে ভ্যানিটি ব্যাগটি রহিয়াছে তাহাও সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে।

মেয়েটি নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া বই পড়িতেছে একটি। আর মাঝে মাঝে আড়-চোখে প্রকাশবাবুদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সাধারণ মেয়ে হইলে হয়তো আলাপ করিত। কিন্তু অপরিচিতের সঙ্গে গায়ে-পড়িয়া আলাপ করা আধুনিক কায়দা নয়, আর মঞ্জুশ্রী তেমন মিশুকে প্রকৃতির মেয়েও নয়। অপরের সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল অবশ্য আছে, কিন্তু অযাচিত-ভাবে আলাপ করিয়া তাহা সে চরিতার্থ করিতে চায় না। আড়চোখে চাহিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া যতটা জানা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে সে। তাহার উপরই কল্পনার রং চড়ায় একটু-আধটু।

২

প্রকাশবাবু সহসা বেঞ্চির উপর চাপ-টালি খাইয়া বসিলেন এবং বাম জানুটি নাচাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন, "যাই বল, লোকটা ছোটলোক। অত করে যেতে লিখলুম, কানই দিলে না সে কথায়।"

সুলোচনা বলিলেন, "ছুটি নেই, কি করবে বল।"

"রোববারেও ছুটি নেই? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি!"

ছেলের ঠাকুমাও না কি দেখতে চায়। বুড়োমানুষ কি অতদূর যেতে পারে?"

"বুড়ো মানুষ কেদারবদরি যেতে পারে আর এই পাঁচ ছ ঘণ্টার রাস্তা যেতে পারে না? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি!"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখে একটু হাসির ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

"গরজ তো তোমাদেরই। তুমি মেয়ের বাপ একথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

"তোমার বাবাও মেয়ের বাপ ছিল। কিন্তু তাঁকে আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে টেনে আনি নি। তোমার বাপের বাড়ি ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে খুরশিদ্গঞ্জেই গিয়েছিলাম আমরা। জাত হিসাবে সত্যিই অত্যন্ত নেবে গেছি আমরা। হু হু করে নেবে যাচ্ছি, ছি, ছি, ছি ছি—"

পুনরায় জানু নাচাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ উমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রঙের শাড়ি এনেছিস?"

"মা বললে লাইট্ গোলাপীটা আনতে। সেইটেই এনেছি"

"তাহলেই হয়েছে! সেদিন যে সবুজ শাড়িটা কেনা হল সেইটে আনলে না কেন—"

"ডীপ ডগমগে রঙের শাড়ি কি তোমার কালো মেয়েকে মানায়? আমার ও শাড়িটা কেনবারই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সবুজ রং দেখলে তো তোমার আর জ্ঞান থাকে না। বাড়ির দরজা জানলা সব সবুজ রং করিয়েছ, পর্দা বেড্-কভার সব সবুজ, ফুলদানী সবুজ, কুশনের ছিটগুলো সবুজ। হাঁড়িকুঁড়ি তাওয়া খুন্তিগুলো সবুজ রঙের পাওয়া যায় না তাই ওগুলো—"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখভাব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বামীর দোষ-কীর্তনের সুযোগ পাইলে কোন সতী স্ত্রী হর্ষোৎফুল্ল না হন!

প্রকাশবাবু জানলা দিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কোন মন্তব্য করিলেন না। পূর্বে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত "উঃ, কি কুক্ষণে যে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম." এখন আর হয় না। কোন খঞ্জ যদি আচমকা কোন গর্তে পড়িয়া যায় তখন গর্তটা হইতে কোনরকমে উঠিবার জন্য যেমন তাহার প্রাণ আকুল-বিকুলি করিতে থাকে প্রকাশচন্দ্রেরও তাহাই করিতে-ছিল। গর্তে কেন পড়িলাম, পড়া উচিত ছিল

কি না এসব প্রশ্ন তাঁহার নিকট এখন অবান্তর।

একটু পরে তিনি প্রসংগান্তরে উপনীত হইলেন। "কে জানে ওয়েটিং রুমটা খালি পাওয়া যাবে কি না। ভিড় হলেই তো মুশকিল। অবশ্য বারোটার পর ওখানে আর গাড়ি নেই পাঁচটার আগে। ওদের সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলেছি। আচ্ছা, ওরা এলে ওদের সম্বর্ধনা করা যাবে, কি করে? বাজার থেকে কিছু খাবার নেওয়া যাবে, কি বল?"

সুলোচনা বলিলেন, "আমি ঘর থেকে কিছু সন্দেশ আর নিমকি করে এনেছি। ওসব যেন কিনো না, ভাল রসগোল্লা পাও তো তাই কিনো—"

"খাবে কিসে—"

"আমি প্লেট গ্লাস সব এনেছি—"

সুলোচনা সুগৃহিণী এবং একটু চাপা স্বভাবের। এসব যে করিয়াছেন তাহা স্বামীকে জানিতে দেন নাই।

প্রকাশবাবু পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

"উঃ মেয়ে ঘাড়ে করে দেখাতে আসা, তা-ও আবার ওয়েটিং রুমে। পূর্বজন্মে কত পাপই যে করেছিলাম।"

পুনরায় জানু আন্দোলিত হইতে লাগিল।

উমা আর সহ্য করিতে পারিল না।

"আমি তো তোমাকে বলেছিলাম বাবা, আমাকে পড়াও, কিন্তু তুমি ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে। আমাদের সঙ্গে যারা পড়ত তারা সবাই কলেজে পড়ে এখন। চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।"

স্বামীর দোষ-কীর্তনের সুযোগ পাইলে কোন সতী স্ত্রী হর্ষোৎফুল্ল না হন

"হুঃ, পড়াও বললেই কি পড়ানো যায়। খরচ কত। আর পড়ালেই কি নিস্তার আছে? ওই যে আমাদের হালদার, মেয়েকে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছিল, একটি কাঁড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে দিতে হল শেষপর্যন্ত।"

৩

ট্রেন যথাসময়ে স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। প্রকাশবাবু সপরিবারে গিয়া ওয়েটিং রুমটি দখল করিয়া বসিলেন। ওয়েটিং রুমে ভাগ্যক্রমে আর কোন যাত্রী ছিল না। বেশ প্রকাণ্ড ঘর। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি আয়না বাথরুম সব আছে। প্রায় সব ঘরটাই দখল করিয়া বসিলেন তাঁহারা।

একটু পরে সেই মেয়েটি আসিলেন, ইঁহাদের সহযাত্রিণী, যিনি কামরার অপর প্রান্তে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার সংগে একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। প্রকাশবাবু বিরক্তমুখে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ইঁহাদের দিকে চাহিলেন, ভাবটা, এ আবার কি আপদ জুটল। আপদ কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি এইবার ঠিকঠাক হয়ে নাও। আমি রিক্‌শ ডাকি। মাইল দেড়েক যেতে হবে। সাড়ে তিনটের সময় টাইম দিয়েছে—"

তিনি রিক্‌শা ডাকিতে গেলেন, মেয়েটি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঠিকঠাক্ হইতে লাগিল। অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিয়া মুখে ঘাড়ে গলায় মাখিল, ক্রীমও লাগাইল একটু, ঠোঁটে

একটু লিপস্টিকও ঘষিয়া লইল। তাহার পর সাধারণ ব্রোচটি খুলিয়া শৌখীন গোছের একটি ব্রোচ কাঁধের পাশটিতে লাগাইয়া লইল। ঘাড় ফিরাইয়া নিজের মুখখানিই নানাভাবে দেখিল। তাহার পর ছোট একটি আতরের শিশি বাহির করিয়া কাপড়ে জামায় শিশির ছিপিটা ঘষিল। চিরুনি বাহির করিয়া মাথার চুলটাও ঠিক করিয়া লইল একটু।

দ্বারপ্রান্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার। "কই হ'ল, চল এবার"

"চলুন"

তাঁহারা চলিয়া গেলে সুলোচনা বলিলেন, "এই মেয়েটাই আমাদের গাড়িতে ছিল না?"

প্রকাশ বলিলেন, "হ্যাঁ,—"

"তখন তো এ বুড়োটাকে দেখিনি"

"না। অন্য গাড়িতে ছিল বোধ হয়"

"কোথা গেল ওরা"

"কে জানে। তোমার মেয়েকেও সাজাও এবার। ওদরে আসবার সময় হল। গা টা মা ধোবার এই সময় ধুয়ে নে, কোন লোক এসে গেলে মুশকিল হবে—"

উমা সাবান তোয়ালে লইয়া বাথরুমে ঢুকিল।

৪

ঘণ্টা তিনেক পরে।

পাত্র-পক্ষ হইতে আসিয়াছিলেন পাত্রের ঠাকু'মা, বৌদিদি, বড় বোন এবং ছোট ভাই। হাতের লেখা কেমন, গান গাহিতে জানে কিনা, সেতার এস্রাজ শিখিয়াছে কিনা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া, একটি সিনেমার গান শুনিয়া, প্রায় টাকা পাঁচেকের মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ করিয়া যখন তাঁহারা উঠিলেন তখন প্রকাশবাবুও ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদের পিছু পিছু গেলেন কিছুদূর। আসল কথাটি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন না, তখন প্রকাশবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

"আপনি কি করে' বুঝলেন যে, আমার হয়নি—"

"কেমন লাগল আপনাদের। মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো"

"পরে জানাব আপনাকে"

প্রকাশবাবু বুঝিলেন পছন্দ হয় নাই।

যাইতে যাইতে বৌদিদি বলিলেন, "এর আগে যে মেয়েটি দেখেছি সে এর চেয়ে ঢের ফরসা, নাক চোখ মুখও ভালো—"

ছোট ভাই মন্তব্য করিলেন, "ফিগারও বেশ টল—"

প্রকাশবাবু ফিরিয়া আসিয়া উমাকে বলিতেছিলেন, "চল এবার তোকে স্কুলেই ভর্তি করে' দি—"

৫

একটু পরে তাঁহাদের সহযাত্রিণী মঞ্জুশ্রীও ফিরিলেন। সঙ্গে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মেয়েটির মুখ শুষ্ক।

"আপনি কি করে' বুঝলেন যে, আমার হয়নি—"

"কনফিডেনশাল ক্লার্ক হরিবাবু চুপি চুপি বললেন আমাকে। জ্যোৎস্না রায় মেয়েটিকে নিয়েছেন ডি এস"

"জ্যোৎস্না রায় তো বি এ পাশ নয় শুনলাম"

"না। আই এ পাশ"

"ওর স্পীড কি আমার চেয়ে বেশী?"

"না। কিছু কম। কিন্তু মেয়েটি বেশ স্মার্ট যে। দেখতেও ভালো। ফরসা রং, টল ফিগার—"

মঞ্জুশ্রী শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রৌঢ় আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি, কোথাও না কোথাও লেগে যাবেই। ক্রমাগত দরখাস্ত করে' যাও। আচ্ছা চললুম"

প্রৌঢ় চলিয়া গেলেন। মঞ্জুশ্রীর দুই চোখ সহসা জলে ভরিয়া গেল। এই চেহারার জন্য তাহার আর এক জায়গাতেও হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আপিসে একজন লেডি স্টেনোর প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মঞ্জুশ্রী বোস দরখাস্ত করিয়াছিলেন। আজ ইণ্টারভিউ ছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁহার পিতৃবন্ধু। ওই আপিসেই কাজ করেন।

৬

প্ল্যাটফর্মের একধারে বসিয়া একটি অন্ধ ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল —"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা—"

# গরু কথা বলে না

মনোজ বসু
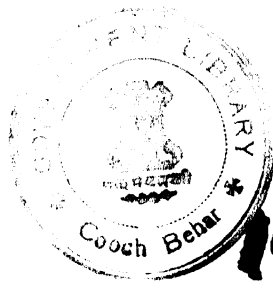


কথা বলে না গরু, বোঝে কিন্তু সব। ছেলেমানুষ তারার পাকা পাকা কথা। বলে, পাপ করেছিল, তার শাস্তি। হাল চষে, গাড়ি টানে, সকলের বেগার খেটে বেড়ায়। আর মেয়েমানুষ হল তো বাঁটের দুধটুকুও পেটের বাছুরকে খাওয়ানোর জো নেই। মানুষে কেড়ে-কুড়ে খায়।

নুর অর্থাৎ আমিনুর আরও ছোট। পুঁটিমাছ ধরতে গিয়েছিল, ফিরছে এখন। তারাকে দেখে সে গোয়ালের দিকে ঘুরে এল। হাতে ছিপ আর খালুই। জিওলগাছে গরু বাঁধা—গরু ছোঁক-ছোঁক করে খালুয়ের কাছে এসে। নুর বলে, দেখরে তারা, নোলা কি রকম বুধির। ভাবছে কোন খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

চোখ-মুখ ঘুরিয়ে তারা বলে, ঐ লোভেই ত হল কাল। তুই জানবি কি করে, আমাদের পুঁথিপুরাণে আছে। শোন বলি। দুর্গোচ্ছোবের সময় মাঝখানের ঐ দশ-হাতওয়ালা ঠাকরুন—মা দুর্গা যিনি গো—নৈবিদ্যি সাজিয়ে দিয়েছে তাঁর সামনে। গরু মণ্ডপে উঠে নৈবিদ্যির চাল কড়র-মড়র করে চিবোয়। ভোগের আগে প্রসাদ। দুর্গা ত রেগে টং। আমার অংশ হয়ে এমন-ধারা লোভ! যে মুখে খেয়েছিস, সে মুখ বন্ধ। শাপ দিয়ে ঠাকরুন অন্তর্ধান করবেন, গরু পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুখ বন্ধ হলে যে খাওয়াও বন্ধ। তবে ত মরে যাবে একেবারে। খুব কান্না-কাটি। ভগবতী শেষটা নরম হয়ে বললেন, আচ্ছা, মুখ বন্ধ হবে না, কথা বন্ধ। গরু সেই থেকে বোবা।

দুটো পুঁটিমাছ হাতের চেটোয় নিয়ে নুর বলে, খাবি নাকি রে বুধি? খা—

তারা বলে, কী বোকা তুই নুরে! ওঁরা হলেন ঠাকুর-দেবতার অংশ—মাছ খাবেন কি রে? নিরামিষ ছাড়া খান না।

বোকা বলায় আমিনুর চটে গেছে; ঠাকুর-দেবতারা ত আস্ত আস্ত পাঁঠা মেরে দিচ্ছেন হরদম। তোদের কালী মোষ অবধি ছাড়েন না। আসল ঠাকুর ঐ, আর অংশ হয়ে সাউখুরি কেনরে?

তারা হেসে বলে, দেখ তবে চেষ্টা করে। মাছ দুকে দুকে বুধি মুখ ঘুরিয়ে

নিল। দুটো-একটা আধ-শুকনো ঘাস—তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

কি রে?

নুর বলে, জানি, জানি। পুঁটিমাছ কিনা—সেইজন্যে খেল না। রুই-কাতলা হলে দেখতিস।

মা ডাকছে ওদিকে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে, তারা-আ-আ—

সাড়া দেবে কি, নুরের কথা শুনে সে হেসে খুন। রাস্তায় গোপেশ্বরকে দেখে ডাকে, ও বাবা, নুর কি বলে শোন। রুই-কাতলা হলে গরু নাকি খেয়ে নিত।

গোপেশ্বর বললেন, গরু আজ ছেড়ে দেয় নি—ও, পালান ছেড়েছে, তাই।

পালান কি বাবা?

দেখছিস না বাঁট মোটা কি রকম। ঝুলে পড়েছে ওখানটা। বাছুর হবে বুধির।

আহ্লাদে নেচে ওঠে তারা: কখন?

মায়ের গলা: কোন্ দিকে গেলি রে মুখপুড়ি? খাবি-টাবি নে?

গোপেশ্বর বলেন, বাছুর হলে দেখিস এসে। বেলা হয়েছে, বাড়ি চল্।

আমিনুরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোর বাপ কোথায় রে? আছে ত বাড়ি?

নুর বলে, উঠোনে লাউয়ের মাচা বাঁধছে। এসে এসে দেখে যাচ্ছে। আমিও দেখছি।

চল্ থাকি।

বাবা গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললেন। তার মধ্যে মুখ ফিরিয়ে তারা বলে যায়, বাছুর হলে ডাকবি কিন্তু নুর। হলেই অমনি ডাকবি। না ডাকলে দেখিস কি করি।

চান করবে, খেতে বসবে, তার ফাঁকেও তারা এসে এসে দেখে যায় বাছুর হল কিনা। আর এই ঝঞ্ঝাট হয়েছে পায়ের মল। মল পরা উঠে গেছে। কিন্তু ঠাকুরমা সাধ করে পরিয়ে দিয়েছেন, মল পরে ছোট্ট নাতনী বাড়িময় ঝুমঝুম করে বেড়াবে। না পরলে দুঃখ হয় বুড়ো মানুষের মনে। কিন্তু আজ এখন মলজোড়া খুলে রেখে সে বাঁশতলায় ছোটে। মলের বাজনায় টের পেয়ে যাবে মা।

যতবার আসে, বুধি ঘাস খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকায়। কী যেন বলতে চায়—কষ্ট হচ্ছে ত বড্ড। বাচ্চা হবার সময় মায়েদের কী কাতরানি—ও মা গেলাম, ও মা আর পারিনে। শুনলে চোখে জল এসে যায়। বুধিও হয়তো অমনি করত। কিন্তু কথা বলতে পারে না—কি করবে, বড় বড় চোখ মেলে ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকে শুধু। কাছে গিয়ে তারা গরুর কপালে হাত বুলিয়ে সাহস দিচ্ছে: ভয় কি রে? রাজপুত্রের মত বাছুর হবে দেখিস। হাম্বাহাম্বা করে ডাকবে।

দু শিঙের মাঝে হাত বুলিয়ে ঘাড় চুলকে দিলে বুধি আবার মুখ নামিয়ে ঘাস খুঁটতে লাগল।

ভাত বেড়ে মা ওদিকে চেঁচাচ্ছেন। হতচ্ছাড়ি মেয়ে আবার কোথায় গিয়ে মরে রইলি?

শাশুড়ি করকর করে ওঠেন: ছিঃ বউ, তোমার মুখ না খন্তা? অমঙ্গুরে মরাচ্ছ তুমি মেয়েটাকে?

তারার মা জানেন কোথায় আছে মেয়ে। রাস্তার কাছে এসে ডাকছেন, দুপুরবেলা বাঁশবনের নিচে দিয়ে একা-একা ঘুরিস, চুলের গোছা ধরে পেত্নীতে বাঁশ গাছে টেনে তুলবে—তখন ঠিক হবে। ক্ষিধে-তেষ্টাও লাগে না রে!

পেটের ক্ষিধের জন্য হক অথবা পেত্নীর আতঙ্কে হক, তারা ছুটে এসে ভাতের থালা নিয়ে বসে গেল। লাউয়ের মাচা বাঁধা শেষ করে আরও খানিক পরে জবেদ জল খাওয়াতে এসেছে বুধিকে। এসে দেখে, কী তাজ্জব, বাছুর হয়ে গেছে এর মধ্যে কখন। তারা খেয়ে-দেয়ে ঠাকুরমার পাকা চুল তুলছে। এমনি নয়, রীতিমত উপার্জন আছে। আগে রেট ছিল, এক কুড়ি তুললে এক পয়সা। ইদানীং সমস্ত মাথা সাদা হয়ে যাচ্ছে বলে রেট কমে গিয়ে পয়সায় চার কুড়ি দাঁড়িয়েছে। তাই সই। ধানক্ষেতে যেমন ঘাস বেছে ফেলে, ঠাকুরমার পাশে উবু হয়ে বসে দু-হাতে তেমনি মাথার পাকা চুল সাফ করে যাচ্ছে। এমনি সময় আমিনুরের গলা: বাছুর হয়েছে রে, দ্যাখ। দ্যাখসে এসে।

তারা লাফ দিয়ে উঠে দে ছুট। আর মা'র কাণ্ড দেখ। সকলকে দিয়েথুয়ে নিজে বসেছিলেন, এঁটো-হাত উঁচু করে ছুটলেন বাঁশতলায়। অপরকে বকতে যান আবার উনি!

খাসা নুলেবাছুর। লালচে রঙের। গায়ে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। তারার মা বলেন, রোদে বাছুরের গা তেতে যাচ্ছে। ছায়ার দিকে সরিয়ে দাও জবেদ। বাঁশঝাড়ের ওদিকে।

তারা বলে, বাছুরের গা অত চাটছে কেন মা?

চেটে চেটে গায়ের নোংরা নালঝোল সাফ করে দিচ্ছে।

মুখ বিকৃত করে তারা বলে, হ্যাক, থুঃ—

মা হেসে বলেন, বড় যে ঘেন্না! হক নিজের ছেলেমেয়ে, তখন দেখা যাবে। নোংরা ময়লা চেটে তুলবি এই রকম।

দেখ মজা। এই ত পেট থেকে পড়ল কতক্ষণ আগে—ওমা মা, নুলেবাছুরের আস্পর্ধা দেখ। উঠে দাঁড়াবে।

নুর বলে, পারছে কই?

মা বলেন, তোদের কত মাস লাগল উঠে দাঁড়াতে? ক-বছরে হাঁটতে শিখলি? গরুর ক্ষমতা কত বেশি, দেখ তবে বুঝে।

ছায়ায় বাছুর সরাবে কি—বুধি যেন আর এক রকম। ফোঁস করে তেড়ে আসে জবেদের দিকে। এমন শান্ত গরু—একটুখানি আগেও ত তারা কপালে হাত বুলিয়ে দিল, পোষা কুকুরের মত মাথা নিচু করে ছিল সেই সময়। মা হয়ে দেমাকে মেজাজ বিগড়ে গেছে।

দিবানিদ্রা ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে গোপেশ্বরও এইবার এসে পড়লেন: কি বাছুর হল রে? দেখিস নি ল্যাজ তুলে?

বুধির শিং এঁটে ধরে জবেদ। তবে বাছুর পরশ করা গেল। মুখ বাঁকিয়ে গোপেশ্বর বললেন, যাঃ, এঁড়ে বাছুর।

তারার মা হেসে ফেললেন: ছেলে হলে মানুষের কত আহ্লাদ। গরুর তেমনি বকনা হলে। মানুষের উল্টো হল গরু।

জবেদ বলে, কেন, এঁড়ে বাছুর ফেলনা হল কিসে? খুড়ো না তোমরা। আমি লাঙল করব। এঁড়েই ভাল আমার কাজকর্মে।

গরু গোপেশ্বর হালদারের—জবেদকে পোষানি দেওয়া। নিয়ম হল, যে পুষছে পয়লা বাছুর সেই লোকের পাওনা। আর দৈনিক দুধ যা হবে, তার অর্ধেক। পরের

বিয়েনে দুধের যেমন অর্ধেক, বাছুরেরও তাই। গরুর মালিক ইচ্ছে করলে অর্ধেক পরিমাণ দাম দিয়ে সেই বাছুর নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সে সমস্ত পরের কথা। এই নুলেবাছুর এখন ষোল আনা জবেদের।

গোপেশ্বর বললেন, জোলাম পড়েনি বুঝি এখনো। পড়বে এইবার। তুই জবেদ জিওলের কচা ভেঙে আন একটা। আচ্ছা করে পেটাবি, নয়তো ঠেকানো যাবে না জোলাম খেয়ে নেবে। তা হলে বাঁটের দুধ শুকিয়ে যাবে। জোলাম ফেলে দিয়ে তারপরে নড়বি এখান থেকে।

দাঁড়াতে গিয়ে পা টলে বাছুরের: আমিনুর স্ফূর্তি দিচ্ছেঃ চার-চারটে পা রয়েছে, ভাবনা কি তোর? আমাদের মতন দু-খানা নয়। ঠিক পারবি। বাছুর পড়ে পড়ে যায় উঠতে গিয়ে খিলখিল করে তখন হেসে ওঠেঃ দূর মুখ্যু, তাড়াহুড়ো করে ওরকম! সামাল হয়ে—হ্যাঁ, পায়ের উপর ভর রেখে......হয়েছে, হয়েছে—

হাততালি দিয়ে ওঠে নুর। বলে, সোনার বরণ বাছুর। নাম থাকল সোনা। বুধির বেটা সোনা— সোনামণি আমাদের।

ঠিক এক বছর বাদে বুধি আবার গাবিন হয়েছে। তারার বড় সাধ গাই দোওয়ার। বড় গরু বুধির বাঁটে হাত দিতে ভরসা পায় না। বকনা বাছুর হলে দুয়ে অভ্যাস করে নেয়। ভগবতীকে ডাকে সেইজন্য। ভগবতী-পুজোর দিন মানত করল, আলো-চালের বদলে আসছে বছর তোমায় ঠাকরুন চিনির নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবো। বুধির বকনা বাছুর হয় যেন এবারে। একনাগাড় ছেলেই বা দেবে কেন —ও-বিয়েনে ছেলে দিয়েছ, এবারে মেয়ে একটি।

তা ঠাকরুন পুরো-থালা চিনির লোভেই বোধ হয় রাখলেন তারার কথা। বকনা বাছুর হল। সাদা ধবধব করছে। নাম রাখার ওস্তাদ আমিনুর। আর এই এক বছর ধরে পাঠশালায় গিয়ে বিদ্যা কিছু হয়েছে, বুদ্ধিজ্ঞান বেড়েছে। বলে, রুপোর মতন ঝকঝকে গায়ের রং। এর নাম হল রুপো।

তারার বেশি পড়াশুনো। সে বলে, মেয়েছেলে যখন—রুপো নয় রুপসী। রাগ করিসনে নুর, তোর নাম ত রইলই। রুপসী তোলা-নাম, ডাক-নাম রুপো। সোনার বোন রুপো—মিলে গেল কেমন। না ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা বললেন, বকনাবাছুর তারার মানতে এসেছে, রুপো হল তারার। বিয়ের পরে তারা শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। রুপোর বাছুর হবে, তারারও ছেলেপিলে হবে তদ্দিনে। রুপোর দুধ খাবে তারার ছেলেপুলেরা।

জবেদ বলে, সোনার এক জুড়ি চাই যে আমার। লাঙল করব, গাড়ি করব। এক গরুতে কী হবে? তারা তুই আবার শিন্নি মানত কর, এঁড়ে বাছুর হয় যাতে এবারে। আমি নিয়ে নেবো।

কিছুই হল না। মরে গেল বুধি মাস-কয়েক পরে। ভাল গরু মাঠে চরতে গেল, ফিরে এসে জাবনায় মুখ দিতে পারে না। পেট ছেড়ে দিয়েছে। পাথরঘাটার বহুদর্শী এক গো-বদ্যি—ক্ষেতে তখন মই দিচ্ছে, ক্ষেত ছেড়ে আসতে পারবে না—হাতেপায়ে ধরে নগদ ষোলআনা কবুল করে তাকে নিয়ে এল। দেখেশুনে প্রণিধান করে সে বলে, তিলে হয়েছে। নুন আর সরষে কচি-কলাপাতায় বেঁধে খাইয়ে দাও। বার তিন-চার খাওয়াও—পেট ধরে যাবে, গরু চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

ব্যবস্থা দিয়ে ত গো-বদ্যি টাকাটা গাঁটে গুঁজে আবার ক্ষেতে গিয়ে মইয়ের উপর চাপল। দাঁতে দাঁতে [illegible] লেগে আছে বুধির। দু-পাটির ম[illegible]টারি ঢুকিয়ে দাঁত ফাঁক করে ওষুধ খাওয়ায়। কিছুতে

কিছু হয় না। বুধি ঝিম ধরে পড়ছে। ওষুধে হল না ত দৈব কর্ম। দরগায় গিয়ে পড়ে। লাঠির মাথায় পিতলের চাকতি, দুটো চোখ আঁকা তার উপরে—নাজির আশা বলে এই বস্তুকে। ফকির এসে আশা বুলালেন গরুর পিঠে। কিছুই হল না, মারা গেল বুধি।

জবেদ বলে, রোগপীড়ে নয়—এ হল বিষ খাওয়ানোর ব্যাপার। মাদার মুচি এই কাজ করেছে। মরা গরুর চামড়া খুলে নিয়ে মুনাফা পিটবে। সেটা হচ্ছে না, গরু আমি মাটিতে পুঁতব। মাটির তলে পচে যাক।

শুনতে পেয়ে গোপেশ্বর রে-রে করে এসে পড়েন: মাটিতে পুঁতবি কিরে? মা ভগবতী, তার উপর আসল মালিক আমি—ব্রাহ্মণের গরু কবরে দিবি, এত বড় কথা কোন্ মুখে বেরুলে শুনতে চাই।

বেকুব হয়ে জবেদ বলে, তবে চিতেয় পোড়াই। মাদার মুচি যা ভেবেছে, সেটা হচ্ছে না। বেটার বাড়া ভাতে ছাই দেবো।

গোপেশ্বর বললেন, পারিস ত আপত্তি নেই। কিন্তু তোদের সমাজে কি বলবে, সেটা ভাবিস।

এসব অবশ্য রাগের কথা। চিতেয় পোড়ানো কিম্বা কবরে পোঁতা কোনটাই সম্ভব নয়। সমাজের ভাবনা পরে। কাণ্ড দেখে লোকে ত হেসেই খুন হবে, বলবে পাগল। বড় দুঃখে জবেদ আবোল-তাবোল বলছে। সোনা বড় হয়ে গেছে। কিন্তু রুপো আর মায়ের বাঁটে মুখ দিতে পারবে না, তাকে বাঁচানো যায় কি করে এখন? তার উপরে মায়ের পেটের ভাই ঐ সোনার অত্যাচার। খইল কুড়ো আর ঘাস কুচিয়ে নরম জাবনা করে দিয়েছে—সোনাকে ডবল পরিমাণ দিয়েছে—তবু নিজের গামলায় দু-এক গ্রাস খেয়ে সোনা ফোঁস-ফোঁস করে তেড়ে যায় রুপোর দিকে। শিঙের সুচোল মুখ দেখা দিয়েছে, সেই নতুন অস্ত্র উঁচিয়ে গিয়ে পড়ে। ভীরু রুপো করুণ চোখে একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সোনা গবগব করে তার ভাগের জাবনা শেষ করছে। শেষ করে ধীরেসুস্থে এবারে নিজের গামলায় মুখ দিল। মা-মরা বোনটা বলে মায়া নেই। জবেদ একদিন দেখতে পেয়ে আচ্ছা রকম পিটুনি দিল। কিন্তু পিটুনিতে কি হবে হিংসুটে ষাঁড়ের।

আরও বড় হয়েছে। রোখ কি সোনার! ডাক শুনে মনে হবে বাঘের হামলা। চার দাঁত ভাঙল, ছাঁট দেবে এইবার। দামড়া গরু হয়ে স্বভাব নরম হবে, জোয়ালে কাঁধ দিয়ে তখন বজ্জাতি করবে না। জবেদ গোপেশ্বরের কাছে গিয়ে পড়ল: রুপোকে নিয়ে নেন এবারে। দাম যা সাব্যস্ত হয়, আমার অর্ধেক দিয়ে দেন। দামড়া কেনার দরকার আর একটা। এক জোড়া হলে গাড়ি করে ফেলি। তখন গুড়-কলাই হাট-বাজারে নেওয়া যাবে। ক্ষেতের ধান খোলেনে আনব গাড়ি বোঝাই করে অবরে সবরে ভাড়াও ধরব।

গোপেশ্বর টালবাহানা করছেন: নিতেই ত হবে রে। রুপো হল তারার—মা তারাকে দিয়ে দিয়েছেন। মাঘ-ফাগুনে মেয়ের বিয়ে দেবো, শ্বশুরবাড়ি গরু নিয়ে যাবে। সেই সময় নেবো। ভালই ত তোর। যত বড় হচ্ছে, দাম বাড়ছে। বেশি টাকা পাবি।

খালের মুখে সরকারি বাঁধ হচ্ছে। জবেদ বাঁধে খাটতে যায়। তার আগে জাবনা খাইয়ে গলার দড়ি খুলে দিয়ে যায় গরু দুটোর। সারাদিন ভাই-বোনে চরে খেয়ে বেড়ায়। নুরও বেশ কাজের হচ্ছে—সন্ধ্যা হলে গরু তাড়িয়ে এনে গোয়ালে তোলে। কিন্তু ক'দিন সে জ্বরে পড়ে। ডাক-হাঁক করতে পারেনি—জবেদ বাড়ি এসে দেখে, সোনা রুপো কেউ ফেরেনি। হাত-পা ধোওয়ার তর সয় না। ডাকতে ডাকতে বেরুল: আয়, আয়—সোনা আয়—রুপো আয়—

বাঁশবনে সাপের ভয়। বড্ড কাটি-দা এবারে। বিষ সাহায্য হচ্ছে না। পাথরের মত জোয়ান পুরুষ ছটফটিয়ে মরে যায়। আর কাণ্ড দেখ দুই হারামজাদার—বাঁশবন হল রাত্রিবেলা বিচরণের জায়গা!

সোনা-আ-আ—রুপো-ও-ও—

আছে ঠিক, একটু আগেই ঝাপসা মতন দেখেছে। সোনা বলে ডাকতেই সরে গেল। গভীরে কোন্ দিকে ঢুকে পড়েছে। এক-গাছি ঘাস নেই, তবু পাক দিয়ে বেড়ায় এমনি। আল্লা যা করেন, জবেদও ঢুকল বাঁশবনের ভিতর।

একটা ঝাড়ের গোড়ায় বাঁশ-কঞ্চির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে সোনাটা দাঁড়িয়ে আছে, নড়াচড়া নেই। গরু কে বলবে? মনে হয় এক মাটির ঢিবি। কিম্বা ঝাপসা চাঁদের আলো পড়েছে একফালি। গরু না পেয়ে ফিরে চলে যাও, তারপরে দেখবে শয়তানি। বেড়ায় ঘিরে লোকে নতুন চারা দিয়েছে, সোনা সেই বেড়া গিয়ে ভাঙবে। ভাঙার আচ্ছা কায়দা বের করেছে। শিং ঢুকিয়ে উপর দিকে চাড় দেবে। বর্ষার নরম মাটি এখন—বেড়ার চেরা-বাঁশ উপড়ে আসবে। গোতা তুলে দিয়ে পিছিয়ে আসবে খানিক, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বেড়া চুরমার। ঢুকে পড়ে গোগ্রাসে খাচ্ছে। খায় আর এদিক-ওদিক তাকায়। সে যদি দেখ! ঠিক যেন মানুষ-চোর একটি। ক্ষেতের মালিককে দেখতে পেয়েছে তো চোঁচা ছুট। কেমন করে চিনতে পারে মালিক এই জন—চলনের মধ্যে কর্তৃত্বের দেমাক আর রাগের প্রস্ফুরণে টের পেয়ে যায়। শেষ একগোছ ধানের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়। মুখে ঝোলাতে ঝোলাতে চলল। ধরাও পড়ে কতবার। খোয়াড়ে দিয়েছিল—না খেয়ে আধমরা হয়ে রইল, দুদিন পরে জবেদ জরিমানা দিয়ে খালাস করে নিয়ে এল।

বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ঐ যে মাথা গলিয়ে আছে—সুবিধা হল, টিপি টিপি গিয়ে। জবেদ টুক করে শিঙে দড়ি পরিয়েছে। এর পরে সোনা নিপাট ভালমানুষ—কোন কিছুই হয়নি এমনিভাবে নির্গোলে বেরিয়ে এল জবেদের পিছু পিছু। গোয়ালে এসে ঠ্যাং মুড়ে শুয়ে পড়ল।

সোনা তো বাড়ি এসে গেল, রুপসীর খবর কি? কথা বলতে পারে না, নয়তো জিজ্ঞাসা করা যেত, গুণময়ী বোনটিকে তোমার কোন্ বাগানে রেখে এলে? ভায়ের দেখাদেখি রুপোও পাকা বজ্জাত হয়ে উঠেছে। ভাইকে ছাড়িয়ে যায়। উদ্বেগে জবেদ সারারাত্রি উঠে উঠে বসেছে। কিসের যেন আওয়াজ—হুড়কোর ধারে রুপো এসেছে বুঝি, উঠানে ঢুকতে পারছে না। বাইরে এসে দেখে, কিছুই নয়। হয়তো বা শিয়াল এসেছিল, পালিয়ে চলে গেছে। পরের জিনিস পাহারা দেওয়ার এই জ্বালা। রাগ হচ্ছে গোপেশ্বরের উপর—জবেদের অংশের দাম মিটিয়ে রুপোকে নিয়ে গেলেই ত চুকে যায়। তা বাড়িতে নতুন একটু গোয়ালের চাল তুলতে হবে, সেইজন্যে আজ না কাল করছেন হিসাবী হালদার মশায়।

আর সেই রাত্রে ফিসফাস কথাবার্তা গোপনে লোক-ডাকাডাকি চলছে ওপাড়ায় আখেজ গোলদারের বাড়ি। সদরের পেয়াদা এসেছে, জবেদের বাড়ি শিল হবে। আইনের ভাষায় যার নাম অস্থাবর-ক্রোক। বিয়ের সময় জবেদ সুখতে পঞ্চাশ টাকা কর্জ নিয়েছিল আখেজের কাছ থেকে। মুসলমানের পক্ষে সুদ নেওয়া হারামি, আখেজ সুদ নেন না। একখানা খামার-জমি দেখানো আছে—নিজ খরচায় কারকিত করে জবেদ সেই জমির যাবতীয় ধান আখেজের খোলাটে তুলে দিয়ে যায়। সেটা হল [illegible]—

টাকা নয়, সুদও নয় অতএব। এমনি চলছে অনেক দিন ধরে। কিন্তু আজ বছর দুই-তিন ধান পনের বিশ খুঁচির বেশি দিচ্ছে না। নাকি ক্ষেতে ফলন হয় না। তার মানে ত্যাঁদড়ামি—নিজস্ব জমিজিরেত তুলে শেষ করে নিয়ে তারপর এই ক্ষেতে নামে। নাবি হয়ে গিয়ে ক্ষেত তখন চেঁচোঘাসে ঢেকে আছে। চেঁচোবন ঠেলে লাঙলের ফলা মাটিতে একটুখানি আঁচড় কেটে যায়। অমন দায়-সারা চাষে ফসল ফলে না। জবেদকে অতএব আচ্ছা করে একটিবার নাড়া দেওয়ার দরকার। সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে।

পেয়াদা এসেছে বেলা থাকতে। তাড়াতাড়ি তাকে দলিজঘরে ঢুকিয়ে দরজা এঁটে দিল। কেউ না দেখে ফেলে, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়। তবে তো মালপত্র সরিয়ে ফেলবে। শিল করতে গিয়ে দেখা যাবে, রয়েছে মাটির হাঁড়িকুড়ি আর মানুষ। মানুষগুলো ফ্যা ফ্যা করে হাসবে। টাকা বরবাদ, অপমানের এক শেষ।

পোহাতি তারা উঠলে জবেদের বাড়ির সামনে গাছতলায় আখেজ সদলবলে এসে বসলেন। রাত্রে বাড়ি ঢোকা বেআইনী, ভোরের অপেক্ষা করছে। কাক ডেকে উঠল, অতএব ভোরের আর বাকি কি? গোয়ালে ঢুকে সোনাকে বের করে আনল সকলের আগে। রান্নাঘরের থালা-ঘটি-বাটি ঝনঝন করে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তখনই জবেদ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বউও উঠেছে। উঁকি দিয়ে দেখে জবেদ হাসির মতন ভাব করে: হি-হি—ফাটা থালা, ঘটিতে ধুনোর পটি, বাটি সব পিতলের। নিয়ে যাও, বয়ে গেল। কলাপাতায় ভাত খাবো, নারকেল-মালার বাটি। আটকে থাকবে?

এক গাঁয়ের মানুষ হয়েও পেয়াদা আসা টের পায়নি, হেসে হেসে সেই আহাম্মুকি ঢাকবার প্রয়াস। আউড়িতে উঠে পড়েছে ওদিকে। ধান তলায় গিয়ে ঠেকেছে, দু-পাঁচ খুঁচি যা আছে সমস্ত পেড়ে ফেলল। আমিনুর তক্তাপোশে ঘুমুচ্ছে, আখেজ গিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন: নবাবের বেটার পালঙ্কে বিছানা। ছেলে তুলে নে শিগগির।

গায়ে জ্বর—

জ্বর তা পালোয়ান বউটা কি করে? কোলে দিয়ে দে। জবর বলে তক্তাপোশখানা ছেড়ে যাবো ভেবেছিস?

মালপত্র আখেজের বাড়ি দলিজঘরের সামনে এনে জমা করল। দুটো তক্তাপোশ থালা-বাটি-গেলাস, হেরিকেন-লণ্ঠন, কাঁথা-মাদুর-বালিশ, গুড়ের নাগরি আধখানা। ধান এসে পৌঁছয়নি এখনো, জবেদের বাড়ি বস্তা ভরতি করছে। আখেজ দশের মুকাবেলা সমস্ত লিস্টি করে নিচ্ছেন।

অনেক মানুষ এসে জুটেছে। নিখরচায় মজা দেখা তো বটেই, তা ছাড়া সস্তায় দাঁও মারবার ফিকিরে আছে কেউ কেউ। জবেদ, ধরো, কতক টাকা দিয়ে আখেজের সঙ্গে ফয়সালা করে নিল এবং পেয়াদাকে পান খেতে দিল যথারীতি। মালপত্র ছেড়ে পেয়াদা সদরে গিয়ে লেখাবে, অস্থাবর পাওয়া গেল না তেমন কিছু। এমন হামেসাই হয়ে থাকে। টাকার জোগাড় করতে গিয়ে জবেদ দুটো পাঁচটা মাল জলের দামে ছেড়ে দেবে। সেই গূঢ় মতলব অনেকের মনে।

কিন্তু আসল মানুষ জবেদেরই দেখা নেই। অবশেষে বড় বড় দুটো কাঁচা বাঁশের আগা টানতে টানতে সে এলো।

পেয়াদা ধমকে ওঠে: ছিলে কোথা জবেদ মিঞা? আমায় সদরে ফিরতে হবে না?

জবেদ বলে, একটা ম্যাচবাক্সও ফেলে আসোনি তোমরা। জ্বরো ছেলেটা খাই-খাই করছে—উনুন ধরিয়ে এক ঝিনুক বার্লি ফুটিয়ে দেবে, সে উপায় নেই।

আখেজ বললেন, বাজে কথা থাক। এদিকের কি হবে, তাই শুনি।

জবেদের যেন কানে গেল না। সোনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, সকালবেলা ভরপেট জাবনা খেয়ে তবে বেরোয়। সেটা হয়নি, পেট একেবারে পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেছে। তাই কুলে বাঁশের পাতা নিয়ে এলাম। বাঁশপাতায় পেট ভরে নে বেটা। কী হবে, বেকায়দায় পড়ে গেছিস—

আখেজ বলেন, সদরে চালান হয়ে গেলে এই বাঁশপাতা দেওয়ারও তো মানুষ থাকবে না। পঁচিশটা টাকা বের করো তাই বুঝে। চাপরাসির পাঁচ, আর বিশ টাকা আমি ডিক্রিতে উশুল দিয়ে নেবো।

পাতা ছিঁড়ে গরুর মুখে দিতে দিতে জবেদ বলে, পঁচিশটি পয়সাও গাঁটে নেই গোলদার ভাই।

আখেজ বিরক্তস্বরে বলে উঠলেন, তবে মিটমাট হবে না। চালান লিখে ফেল পেয়াদা সাহেব।

যদু হালদার সেই জবেদের বাড়ি থেকে আশা করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। সে বলে, পয়সা আর কটা লোকের গাঁটে থাকে, জবেদ মিঞা? যাদের আছে, কথাবার্তা বলো তাদের সঙ্গে। আরে, আরে—গরু যে পালিয়ে যায়। গরু বেঁধে রাখোনি তোমরা?

নটা চৌকিদার সবিস্ময়ে বলে, শিঙের দড়ি খুলল কেমন করে গো?

চোখ-ভরা হাসি জবেদের। বলে, সোনা আমার গুণ জানে। মন্তোর পড়ে চোরে তালা খুলে ফেলে, সোনা শিঙের দড়ি খোলে তেমনি করে।

আখেজ চেঁচাচ্ছে: কী করো তোমরা? ধরো। গরুটাই গেল তো আজে-বাজে কোন ছাই চালান যাবে?

জবেদ ছুটে যায় সকলের আগেভাগে: আয়রে সোনা, আয় আয়—। সদরে চালান যাবি, বজ্জাতি করিসনে।

সোনা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। বর্ষাকাল আখেজের উঠান থেকে নেমেই কাদা। খানিকটা গিয়ে বিখ্যাত চোরকান্নার কাদা। কোন জাঁদরেল চোর নাকি পালাবার মুখে কাদায় আটকে ধরা পড়ে যায়। লোকে বলে আকাশে মেঘ করলেই ওখানটা কাদা হয়ে যায়। অতল গভীর ক্ষীরসমুদ্র—মসীবর্ণ ক্ষীর। পদ্য বেঁধেছে—চোরকান্নার মাটি, দুই ঠ্যাং আর লাঠি। কিন্তু সোনা আর সোনার পিছনে জবেদ ছুটেছে ঐ দেখ। ওরা যেন বাতাসের প্রাণী, কাদায় ওদের পা আটকায় না, আলগোছে কাদার উপরে ছুটেছে।

আখেজ গোলদার দাওয়ার উপর ডিঙি মেরে আরও লম্বা হয়ে দেখছেন: এঃ, গরু
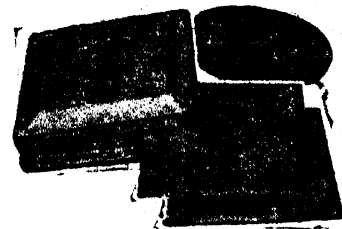
ধরতে গেল, না গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলল? তোমরা যে সব বাবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

চৌকিদার বলে, যা কাদা—

জবেদ যায় কেমন করে?

ও একটা মুনিষ্যি নাকি?

যদু হালদার বলে, যখন বাঁশপাতা খাওয়াচ্ছিল, বুঝলেন গোলদার সাহেব, জবেদই শিঙের দড়ি খুলে দিয়েছে।

আখেজ আগুন হয়ে বললেন, এক টাকা বখশিস, গরু যে ধরে নিয়ে আসবে।

টাকার লোভে অনেকে নেমে পড়ল কাদায়। যাবে কোথা? পাখনা নেই যে, গরু ফড়ুৎ করে আকাশে উঠে পড়বে।

কিন্তু গোলমাল আর দিক দিয়ে। গরু ধরে আনল, জবেদও এসেছে। গোপেশ্বর হঠাৎ উদয় হয়ে দাবি করেনঃ গরু আমার। আমার গরু বেহুদা তোমরা ক্রোক করে এনেছ।

পেয়াদা গোপেশ্বরকে চেনে। সদরের যাবতীয় উকিল-মোক্তার আমলা-মুহুরি এই গাঁয়ের দুটো মানুষকে চেনে—আখেজ গোলদার আর গোপেশ্বর হালদার। দেওয়ানি ফৌজদারী দু-চার নম্বর লেগেই আছে এঁদের।

পেয়াদা বলে, কী বলেন হালদার মশায়। জবেদ মিঞার গোয়াল থেকে গরু আমরা ক্রোক করে এনেছি।

গোপেশ্বর বললেন, ওর মাকে পোষানি দিয়েছিলাম। বাছুর আমার ভাগে। লোকজনের অসুবিধা বলে জবেদের গোয়ালে বড় হচ্ছে। গরু আপোষে ছাড়ো তো ভাল, নয়তো খেসারত আদায় করব।

ডুবন্ত মানুষ সামনে তৃণগুচ্ছ পেয়েছে, হাঁ হাঁ করে জবেদও ঘাড় কাত করল।

পেয়াদা জানে গোপেশ্বরকে ভাল মতো। তার কোন দায় পড়েছে গেঁয়ো গণ্ডগোলে মাথা ঢোকানোর। বলে, চালান কি শখ করে দেয় কেউ? গোলদার সাহেব কত বললেন, জবেদ মিঞা কোন কথা কানে নেয় না।

জবেদ বলে, পঁচিশ টাকা আমায় পাঁচবার বেচলেও হবে না।

গোপেশ্বর বলেন, অন্যায্য বললে হবে কেন বাপু? পঁচিশ নয়, পাঁচ। সে পাঁচ টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

বলেন কি? পাঁচ টাকার মধ্যে আমি কি নেবো, ডিক্রিতেই বা কি উশুল পড়বে?

তুমি দুই নাও, আখেজ গোলদার তিন। কি তুমি তিন, উনি দুই। আপোষে ভাগাভাগি করে নাও। হিসেব করে দেখ, ফুটো ঘটি আর ক-খুঁচি ভূষিধান খরচখরচা করে সদর অবধি নিয়ে পাঁচ টাকার বেশি মুনাফা হবে? গরুর আশা ছেড়ে দাও। জোর করে নিলে ফ্যাসাদে পড়বে।

বলে গোপেশ্বর এগিয়ে গরুর দড়ি হাতে তুলে নিলেন। আখেজকে একদিকে নিয়ে পেয়াদা ফিসফিসিয়ে বলে, ফেরেব্বাজ মানুষ—দিনকে রাত করে। ও লোকের গরু চালান দিতে পারব না। পরোয়ানা ফেরত দিয়ে দেবো। আবার ডিক্রি জারি করে আপনি অন্য প্রসেস-সার্ভার আনিয়ে যা হয় করবেন। আমার দ্বারা হবে না।

চেঁচিয়ে বলে, গরু নিয়ে চললেন তো হালদার মশায়। টাকা?

গোপেশ্বর হেসে বলেন, দিতে কি গররাজি? চাইলেই দিয়ে দিই বাপু। তোমাদেরই তো কথা শেষ হয় না।

নোট নয়, রুপোর টাকা। টুং টুং করে নখে বাজিয়ে টাকা দিয়ে দিলেন। জবেদকে বললেন, তোমার মালপত্তর বুঝসমঝ করে বাড়ি নিয়ে যাও। আমার গরু নিয়ে আমি এগোচ্ছি। মার কাছে তোমার বউ গিয়ে পড়েছিল। যাক গে, ভালয় ভালয় মিটল, সদর অবধি দৌড়তে হল না।

গোলমাল মিটে গিয়ে ভিড় পাতলা হলে আখেজ বলেন, কাজটা কি ভাল হল জবেদ? দশের মুকাবেলা ঐ যে স্বীকার করে গেল, গরু তো ওর হয়ে গেল। পঁচিশ চাইলাম বলেই কি আর পঁচিশ দিতে? ওদের সঙ্গে তোমার বড্ড দহরম-মহরম—হালদারের পা চেটে বেড়াও। সমাজে কথা উঠছে এই নিয়ে।

বাড়ি ফিরে জবেদ দেখে, রুপো গাছতলায় শুয়ে পড়ে আধেক চোখ বুজে আরামে জাবর কাটছে। পেট টনটন করছে, অর্থাৎ সারারাত ধরে উত্তম চৌর্যবৃত্তি চলেছে। হেসে উঠলঃ বহুৎ আচ্ছা বেটি, সাবাস! আদরে থাবা দেয় রুপোর কাঁধের উপর। আমরা কেউ জানলাম না বেটি তুই পেয়াদার খবর কেমন করে টের পেলি বল্ তো! গোয়ালে পেলে তোকেও টেনে নিয়ে যেত সোনার মতন। সোনাটা হল হুটকো গোঁয়ার, তোর গভীর বুদ্ধি।

তারার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। নিরঞ্জন পাত্রের নাম। চেনাজানার মধ্যে—এই গ্রামের নন্দলাল ধরের ভাগ্নে। পাত্র অনেকবার এসেছে মামার বাড়ি, দু-এক মাস করে থেকেও গেছে। বাপ-মা বর্তমান, তিন ভাই এক বোন, ধনী-মানী গৃহস্থ। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কোনদিন অভাব হবে না। নন্দলাল সম্বন্ধটা এনেছেন, ছেলের বাপ ও তিনি এসে পাকা কথা বলে গেলেন। ছেলের ফরমাস সাইকেল একখানা। সেটা কিছু বড় কথা নয়, সে তো দেবেনই গোপেশ্বর। তাঁর ঐ এক মেয়ে বরসাজ্জা, মেয়ের গয়নাগাঁটি কোন ব্যাপারে কৃপণতা হবে না। এই তবে ঠিক রইল। দেশের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। মাঘ মাসে শুভকর্ম—দেরি করা কিছু নয়।

কিন্তু ব্যাঘাত ঘটল। গোপেশ্বরের মা বড়গিন্নি মারা গেলেন এই সময়। উপযুক্ত বয়সে সমস্ত বজায় রেখে দ্যাখ-দ্যাখ করে স্বর্গে চলে গেলেন, বলবার কিছু নেই। একটা জিনিস কেবল—কালাশৌচের জন্য বিয়ে একটা বছর আটক হয়ে রইল।

মৃত্যু নয়, উৎসব যেন একটা। ধবধবে থান কাপড় পরনে, মাথার চুলেরও ঐ থান কাপড়ের রং। খাটের উপর তোষক-চাদর পেতে শুইয়েছে, আর একটা চাদরে ঢেকে দিয়েছে গলা অবধি। মরেন নি যেন, বিস্তর কাল ধরে জীবনধারণের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরিতৃপ্তির ঘুম ঘুমোচ্ছেন। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান নিয়ে নানান কথাবার্তা চারিদিকে, পড়শিদের রকমসকম ভাল না। কিন্তু এই একটা দিন উদ্বেগ ভুলে মানুষজন ভেঙে এসে পড়েছে। পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলামাত্রই কীর্তনের জোগাড় হয় না। কিন্তু গোপেশ্বরের মায়ের ব্যাপারে বলতেও হল না কাউকে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে যে কটা কীর্তনের দল আছে, জুটে পড়ে নিজেরাই চলে এলো। এ হেন ভাগ্যধরীর কানে হরিনাম শোনানোয় পুণ্য নিজেদেরও। খোল-করতালে তোলপাড় লাগিয়ে শবের পিছন ধরে যাচ্ছে তারা। সামনের দিকে

একদল খই আর পয়সা ছড়াচ্ছে। বলো হরি, হরিবোল—হরিধ্বনি মুহুর্মুহু। হরির লুঠের মতো পয়সা ছড়াচ্ছে—ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি পয়সা কুড়ানোর জন্যে। বেগীর শ্মশান ক্রোশ দেড়েক পথ। যত এগুচ্ছে লোক বেড়ে যাচ্ছে ততই। এ তল্লাটের কোন বাড়ি পুরুষ-ছেলে পড়ে নেই বোধ হয় একটি। সকলে পথে জুটেছে। মড়ার খাটে কাঁধ দেবার জন্য মানুষ ব্যস্ত। দু-পা যেতে না যেতে ভিন্ন মানুষ এসে বলে, সরো সরো—আমায় একটু নিতে দাও। দেড় ক্রোশ পথ কেমন করে এলো, টেরই পেল না কেউ। গাঁড়ি গাঁড়ি কাঠ এসে পড়ে মড়া পোড়ানোর জন্য।

এরই মধ্যে দেখা গেল, সোনা আর রুপোর পিঠে কাঠ বেঁধে ঝুলিয়ে জবেদ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। যদু হালদার হেসে ওঠেঃ আরো কাঠ? কাঠের পাহাড় হয়ে গেল যে! একা জ্যেঠাইমা কেন, গাঁসুদ্ধ মানুষ দাহ করা যায় এই কাঠ দিয়ে।

হীরু বর্ধন রসান দিয়ে বলে, করতে হবে তাই। এক কুচি কাঠ ফেলে দিয়ে যাচ্ছনে। লাইনবন্দি চিতে সাজিয়ে ফেল। ছাঁচড়া কুটকচালে যত বেটা হাঙ্গামা জমানোর তালে আছে, হাত-পা বেঁধে সব চিতের আগুনে দেবো। ছাই হয়ে যাক, মানুষ তবে সোয়াস্তিতে বাঁচবে।

সকলে হাসে। এত রসরসিকতা বোঝে না জবেদ। কৈফিয়তের ভাবে বলল, রুপো তো ওনাদেরই—রাখাল হয়ে আমি চরিয়ে নিয়ে বেড়াই। তাই বললাম, এত লোক যাচ্ছে, যাবি নাকি রে দাদীর শেষ দেখা দেখতে? বলে যাচ্ছে তো ভাইটাও পিছু নিল। শুধু শুধু কেন আসবে, কখানা কাঠ পিঠে করে এনে শেষ-কাজে দিল।

আরও দুটি এসেছে—তাদের কেউ দেখতে পায় নি। রাস্তা দিয়েই আসে নি। সেয়ানা হয়েছে তারা, ম্যাচ-ম্যাচ করে শ্মশানেমশানে আসছে—লোকে দেখলে বদনাম করবে। তবু শ্মশানঘাট গাঁয়ের উপরে হত যদি! কিন্তু এত মানুষ আসছে, তারা বাড়ি বসে সোয়াস্তি পায় না। লুকিয়ে চলে এসেছে। আর সে যাচ্ছে তো আমিনুরও চলল পিছু পিছু। নতুন চাষ দিয়েছে মাঠে, ডেলা-বন ভাঙতে ভাঙতে পায়ের তলা ব্যথা হয়ে গেছে। শ্মশানের কাছাকাছি এক খেজুরবনে উঠে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে। হাঙ্গামা তো অনেক। মড়ি চান করাতেই এতক্ষণ লাগল। সন্ধ্যা হয়ে আসে। তারা বলে, চিতা কী বড় হয়েছে দেখছিস নুর। খাটের চেয়েও উঁচু। খাট থেকে এবারে ঠাকুরমাকে চিতার উপর শুইয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। আর কিছু দেখবার নেই। ফিরি ভাই এখন। দিনমানে অত হোঁচট খেয়েছি, রাত হলে আরও কষ্ট।

নুরের চোখে জল এসে যায়ঃ পোড়াবে দাদীকে অমন করে—উঃ!

তোদের হলে মাটি দিত। সে আরও কষ্ট। মাটি চাপা পড়ে অন্ধকারে একা একা থাকা। দিন-মাস-বছর ধরে থাকছে। তার চেয়ে তো পুড়ে যাওয়া ভাল।

নুর ভাবতে ভাবতে আসছে। মাটি-চাপা পড়ে থাকা কিংবা আগুনে পোড়া—ভাল কোনটাই নয়। বেঁচে থাকাই ভাল সকলের চেয়ে।

আট-দশজনে মিলে কলসি কলসি জল ঢেলে চিতা নিভাল। এমন পোড়া পুড়েছে, এক কণিকা হাড় খুঁজে পাওয়া দায়। অথচ পেতেই হবে। হাড়ের একটুকু নিয়ে সযত্নে শামুকের খোলে পুরে রাখে। পরে ঐ বস্তুটা নিয়ে চলে যাবে কলকাতায়, গঙ্গার ঘাটে পুরুত ডেকে ক্রিয়াকর্ম করে জলে ফেলে দেবে। গঙ্গাহীন দেশ—মৃতের গঙ্গাপ্রাপ্তি এই নিয়মে ঘটে। পুরো মানুষটা না হোক, তার দেহের অস্থি পড়ল গঙ্গার জলে। কিন্তু গোপেশ্বরের মায়ের হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি অবধি পুড়ে কয়লা। অগত্যা কয়লাই একখানা তুলে নিতে হল। অস্থি নয়, কয়লা পড়বে গঙ্গায়।

শ্মশানবন্ধুরা বাড়ি ফিরবে, গোপেশ্বরের লোক তার আগেই গঞ্জে ছুটেছে। সব কটা ময়রার দোকান ঘুরে সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে এলো। একটার বেশি তবু হাতে দেওয়া যায় না, এত মানুষ! জবেদও পেয়েছে একটা। নিতেই হল, নয়তো মৃতের অকল্যাণ।

বড় ভালবাসতেন বড়গিন্নি, হেসে ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলেন নি—আহা, মুখের সে হাসি বজায় থাকুক এন্তেকালের পরেও।

মিষ্টি খেয়ে গরু নিয়ে জবেদ ঘরে গেল। তারপরে আর যাবে কোথা? হিঁদুর শ্মশানে গেছে—হুঁকো দেবে না আর কেউ জবেদকে, সমাজে একঘরে করবে। মাতব্বরদের বাড়ি বাড়ি জবেদ কান্নাকাটি করে ঘুরছেঃ গরু যে ওনাদের। রাখাল হয়ে আমি নিয়ে বেড়াই। গরুতে পিঠে করে ক-খানা কাঠ দিয়ে এসেছে, আমি কাঁধে বয়েছি?

কিন্তু এসব ছেঁদো কৈফিয়ৎ কে কানে নিতে যায়? অঞ্চলটা ঘুরে দেখে এসো, কী সব শলাপরামর্শ হচ্ছে। বেহারারা পালকিতে আর কাঁধ দেবে না। গরুর গাড়িতেও মানুষ তোলা বারণ—বিশেষ করে হিঁদু মানুষ। আমাদের মতন আছি আমরা, ওদের কোন ব্যাপারে থাকব না আর কেউ। অনেক খোশামুদি করে খাসি জবাই করে সকলকে দাওয়াত দিয়ে তবে মিটমাট হল। দশের মুকাবেলা নিজের কান নিজে মলল জবেদ, নাকে খত দিল।

তারপরে একদিন গোপেশ্বরের কাছে গিয়ে বলে, রুপোকে নিয়ে নিন এবারে। আর রাখতে পারিনে। পরের গরু টেনে বেড়াই, পড়শিরা গালমন্দ করছে।

গোপেশ্বর পিঁড়ি এগিয়ে দিলেনঃ বোসো জবেদ মিঞা। আমিও ভাবছিলাম তাই। গরুর একটা ফয়শালা হয়ে যাওয়া উচিত।

জবেদ অবাক হচ্ছে। গোপেশ্বর হালদারের কাছে এতদূর খাতির—তুই থেকে তুমি হয়ে গেছে, পিঁড়ি এলো বসবার জন্যে। ছোট্ট বয়স থেকে এত বড়টা হল এক পাড়ার মধ্যে, খাতিরের চোটে আজকে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

গোপেশ্বর বললেন, গরু আমরা নেবো না। রুপোও তোমার। বেচতে হয় বেচ তুমি, রাখতে হয় রাখ। আমি কিছু জানিনে।

জবেদ জিভ কাটেঃ সে হয় না হালদার মশায়। গিন্নিমা হুকুম দিয়ে গেছেন। তারার গরু। পাঁচ টাকা তো দেওয়া আছে, আর কতই বা হবে! যখন হয় দেবেন, রুপোকে আমি এবাড়ি বেঁধে রেখে যাচ্ছি।

গোপেশ্বর ধরা-গলায় বলেন, যে রকম অবস্থা—কোনদিন হয়তো দেখবে, তারাকে

এক হাতে তারার মা'কে অন্য হাতে ধরে বেরিয়ে পড়েছি। এর মধ্যে গরুর বথেড়া বাড়াব না। মনের কথা বলে ফেললাম জবেদ, দশ কান কোরো না।

জবেদ ফিরে গেল। অবস্থা বিবেচনায় জেদাজেদি করাও চলে না। মাস কয়েক পরে একদিন তারা বাপের কাছে নালিশ করছেঃ গাড়ি আর লাঙল করেছে জবেদ-চাচা। আমার রূপোকেও জুড়েছে। ভগবতীর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে।

রূপো আর আমাদের নয় মা—

তারার মা-ও সেখানে। গোপেশ্বর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, রূপো জবেদের। ঘরবাড়ি আখেজ গোলদারের। পুকুরটা জমির মুনসির। গোলার দরুন হাসান গাজি টাকা আগাম দিয়ে রেখেছে। কেউ কাকে বলছে না খদ্দের বাড়লে দর উঠে যাবে সেই ভয়ে। যতদিন গাঁয়ে আছি, চোখ তুলে কেউ এখন এদিক পানে তাকাবে না। সেইরকম চুক্তি। তারার বিয়েটা হয়ে যাক। অমনি দেখবে, তাদের ঘরের যতো ঠাটবাট ভেঙে পড়ছে। সস্তায় পেয়ে এ-লোক এটা, ও-লোক ওটা হাতে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছে। সদরদরজা দিয়ে তারা শ্বশুর-বাড়ি যাবে, পিছন-দরজা দিয়ে আমরাও—কোন্ চুলোয়, তা এখনো জানিনে।

বিয়ের তারিখ এসে যায়। পাত্রের মামা নন্দলাল ধর এসে বললেন, শোন, নিরঞ্জনের বাপ চিঠি লিখেছেন—আগে যা দেনা-পাওনার কথা হয়েছিল, সমস্ত বাতিল। সাইকেল, বরসজ্জা কোন-কিছুর দরকার নেই। মেয়ের গয়নাও যে কটি নিতান্ত নইলে নয়। বাকি নগদ টাকায় ধরে দিও।



দরকার মতন যা গাঁটে নিয়ে বেরিয়ে পড়া চলে। অথবা হুণ্ডি করে পাঠানো যায়।

গোপেশ্বর নিশ্বাস ফেললেনঃ তাই হবে যে রকম বললেন। ছিল—ন্যাড়া হাত-পায়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাব।

হাঙরমুখো-পায়া অতিকায় এক সেকেলে খাট দেখিয়ে বললেন, এ জিনিস আমার মা এনেছিলেন বাপের বাড়ি থেকে। পাথরের মতো শক্ত কাঠ, কোনদিন কিছু হবে না। মা বলতেন, তারা নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু মানুষ কি গতিকে পৌঁছবেন তার ঠিক নেই, খাট নেবেন কি করে? আখেজ গোলদারকে বলে দেখি, খাটখানাও যদি তিনি নিয়ে নেন।

নন্দলাল বলেন, বরযাত্রী কি রকম নিয়ে আসবেন তারও একটা আন্দাজ চেয়েছেন তোমার বেহাই। এই বাজারে একগাদা মানুষ এনে কুটুম্বকে মুশকিলে ফেলতে চান না।

গোপেশ্বর দরাজ ভাবে বললেন, মুশকিল কিছু নয়। লিখে দিন ধর মশায়, যদ্দুর পারেন নিয়ে আসবেন। আঁটিসাঁটি করবেন না। দুটো পুকুর-ভরা মাছ সমস্ত তুলে ফেলব। এই আমার শেষ কাজ—কি জন্য আর রাখতে যাব? রাখলে তো বারো-ভূতে খাবে। মেয়ের বিয়েয় একটা সাধ অন্ততঃ মিটুক—দশজনের পাতে ভাত দিই। মেয়ে-জামাইকে তাঁরা আশীর্বাদ করে যাবেন।

পাশাপাশি সাতখানা গ্রাম নিয়ে সমাজ। কিন্তু খুব বড় ক্রিয়াকর্ম ছাড়া নিজ গ্রামের বাইরে বড় কেউ যায় না। গোপেশ্বর তারার বিয়েয় সাত গ্রামের ষোলআনা সমাজ ডেকে বসলেন। সমাজ ডাকতে অসুবিধা নেই এখন। এক ঘর দু-ঘর করে অনেকেই সরে পড়েছে। যারা আছে, কবে কোন্‌দিকে পালাবে সেই ভাবনায় ব্যাকুল—স্ফূর্তি করে নিমন্ত্রণ খাবার পুলক কারো নেই। সমাজ-সামাজিকতা ভেঙে পড়েছে। সাতখানা গ্রাম মিলে জনসত্তর হয় কিনা তাই দেখ। আর ঐ যে বরযাত্রী জুটিয়ে আনতে বললেন—বিয়ের আগের দিন নন্দলাল খবর জানালেন, বারো-চোদ্দজন আসে যদি সর্বসাকুল্যে। মানুষ কোথায় যে আসবে? আর আসবেই বা কেমন করে? রেলস্টেশন থেকে আড়াই ক্রোশ পথ—শুধুমাত্র বরের জন্যও একটা পালকি জোটানো গেল না। বর পায়ে হেঁটে বিয়ে করতে এলো—কোন পুরুষে যা কেউ শোনে নি। বর নইলে বিয়ে হয় না, সেইজন্য আসতে হল। বরের বাপ রাগ করে এলেন না। আবাহন্তিক করলেন মাতুল নন্দলাল।

উঠান জুড়ে সামিয়ানা খাটানো। কলাগাছ কেটে দু-মাথা সমান করে বসিয়ে দিয়েছে উঠানের মাঝে মাঝে। তার উপরে মেটে-সরায় তুষ-কেরাসিন দিয়ে আগুন ধরিয়েছে। ভোজের আসরের আলো। সাত গাঁয়ের মানুষ ডেকে এনেও একটা উঠান ভরানো গেল না। পাল্লাপাল্লি হচ্ছে কে কত খেতে পারে—কেউ খেল দেড় কুড়ি মাছ, কেউ দু-কুড়ি রসগোল্লা। দেবেন না—উঁহু, একটাও নয়—আর পেরে উঠব না। কেবা শোনে কার কথা? পারতেই হবে—বেশি নয়, চারটে রসগোল্লা দিয়ে দাও, বোঝার উপর শাকের আঁটি। গোপেশ্বর পরিবেশকের সঙ্গে নিজে লাইনে লাইনে ঘুরছেন—পাতা খালি হয়েছে দেখলে রক্ষে নেই, ঢেলে দেবেন এক গাদা। ওরই মধ্যে ঘরের ভিতর এসে তারার মা'কে বলেন, একটিবার দেখে যাও বড়বউ। কাঁটাঝিটকের জঙ্গল হবে উঠানে, দিনদুপুরে শিয়াল ঘুরবে, তার আগে তোমার গোবর-নিকানো উঠানের উপর কত মানুষ পাত পেড়ে খাচ্ছেন, বাইরে এসে একবার দেখ।

বাঁশবাগানের এপার-ওপার বাড়ি—আমিনুর ঠোঁট ফুলিয়ে আছে দাঁড়িয়েঃ তারার সাদি হচ্ছে, এত আলো আজ তারাদের বাড়ি, এত মানুষের আনাগোনা—আমায় একটিবার যেতে বলল না। আর কথা বলব না তারার সঙ্গে, কোনদিনও না।

জবেদ বলে, আমাদের কেন দাওয়াত করবে? আমরা মোছলমান। আর করলেই বা হিন্দুর বাড়ি যাবো কেন?

অবোধ চোখ দুটি মেলে নুর বলে, মোছলমান কি আব্বা?

জাত।

আর, হিন্দু?

সে-ও জাত।

জাতের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না শিশুর। বড় বড় মাছ তুলল পুকুর থেকে, ভিয়েন হল বাড়িতে—কত রকমের মিষ্টি-মিঠাই, এত মানুষ খাচ্ছেদাচ্ছে। কোন জাত এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, তাকে বিয়ে-বাড়ি যেতে দিল না।

জবেদ বেরিয়ে গেল। গোলদার-বাড়ি জারিগান—নুরকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে যায় নি। মার সঙ্গে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসে না আজ কিছুতে। সাদির দিনে বর-বউ ভারি সাজগোজ করে, মাথায় মুকুট পরে যাত্রাগানের মতন। সাজগোজ করে তারাকে কি রকম দেখাচ্ছে—না জানি। পা টিপে টিপে বাইরে এলো। সারাদিনের খাটুনির ক্লান্তিতে মা ঘুমিয়ে পড়েছে কখন, টের পায় না। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, ঠিক যেন দিনমান। ভোজের পরে মানুষ ঢেঁকুর তুলে গল্প করতে করতে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

তখন এক মতলব আসে নুরের মাথায়। সোনা-রুপো কি দোষ করেছে, তারা খেয়ে আসুক। ডাংপিঠে সোনা, সে যাবে আগে। গতিক বুঝে তারপর রুপোকে ছাড়বে।

বিয়েবাড়ি তখন ঠাণ্ডা। উচ্ছিষ্ট কলা-পাতার কাঁড়ি ঘরের কানাচে ফেলে দিয়েছে।

সোনাকে বুঝিয়ে দিতে হয় না খাওয়ার বস্তু কোথায়। গন্ধ শুঁকে টের পায়। পাতার সংগে দই লেগে আছে, লুচি আছে। আধেক-খাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা, মাছের কাঁটাকুটিও কত! একদিন তারা বড় দেমাক করেছিলি, ভগবতীর অংশ গরু শুধু নিরামিষ খায়। আজকে তো সোজেগুয়ে রাজরানী হয়ে আছিস—চোখ মেলে একবার দেখে যা, গরু কি রকম রাক্ষস হয়ে গবগব করে গিলছে।

তারা নিঃসাড়ে পড়েছিল বরের পাশে। ধড়মড়িয়ে ওঠে। পাতান দিচ্ছে কেউ ওপাশে বেড়ার বাইরে? রমা আর বাসন্তী তো চলে গেছে ওদের বাপ-মায়ের সংগে। থাকবার জন্য বলেছিল—কিন্তু দিনকাল খারাপ, মেয়েছেলে রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে এসেছে এই তো অনেক, রেখে যাবে কোন বিবেচনায়? সকাল চলে গেলে, কে দেখছে তবে বেড়ার গায়ে চোখ রেখে?

সন্তর্পণে উঠে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল। বরের খাবার দিয়েছিল—কিন্তু লজ্জা করে খেতে হয় বলে প্রায় সবটাই নিরঞ্জন রেখে দিয়েছে। তারা মিষ্টি নিল কয়েকটা আঁচলের তলায়। তারপরে কি দরকারে যেন বাইরে যাচ্ছে—দ্রুত গিয়ে পিছন থেকে আমিনুরের হাত এঁটে ধরল।

চোর!

নুর বেকুব হয়ে গেছে। বলে, সোনাকে ধরতে এসেছি। ভারি বজ্জাত, খাওয়ার লোভে গোয়াল থেকে পালিয়ে এসেছে।

দুটো সন্দেশ নুরের হাতে গুঁজে দিয়ে তারা বলে, খা—না খাস তো বিদেয় কিরে। আমার মাথা খাবি নুর, আমার মরা মুখ দেখবি।

উঁহু, আমরা মোছলমান, তোমরা হিন্দু। খেতে নেই, খাবো কেমন করে?

কী রকম করে হাসে ঐ দেখ আমিনুর। বলে, তোর সাদির খাওয়া সোনা খেয়ে গেল। কলাপাতায় অনেক ছিল। গরুর তো জাত-বেজাত নেই, গরু খেতে পারে। কিন্তু মরা-ছাড়ার কথা কোনদিন আর বলবিনে তারা। তাহলে মুখ দেখব না তোর।

চোখ মুছতে মুছতে সোনাকে তাড়িয়ে নিয়ে নুর চলে গেল।

বর হেঁটে বিয়ে করতে এল, কনেরও যে রকম গতিক ওই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে স্টেশন অবধি। বিয়ের পরের দিন গোপেশ্বর সংকোচ ভেঙে জবেদের বাড়ি চলে গেলেন: জবেদ মিঞা, তারা শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছে। তোমার গাড়ি-গরু থাকতে হেঁটে যাবে মেয়ে?

জবেদ ঘাড় নিচু করে শুনছিল, মাথা তুলল। আশা হল গোপেশ্বরের। বলেন, বর আর কনে। সংগে একটা পোর্টম্যান্টোও দিচ্ছিনে। শুকনো পথঘাট, তোমার গরুর কষ্ট হবে না।

তড়াক করে উঠে পড়ে জবেদ হন হন করে বেরিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষলেন গোপেশ্বর। বাড়ি এসে বললেন, সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ব। জ্যোৎস্না রাত্রি—বরযাত্রী এত জন আছেন, আমরা রইলাম। দল বেঁধে আস্তে আস্তে যাওয়া যাবে। এত পুরুষ ধরে হাঁকডাক করে গাঁয়ে ছিলাম, দিনমানে মেয়ে নিয়ে পথের উপর বেরুতে মাথা কাটা যাবে।

তারার মহা স্ফূর্তি: উঃ, ভারি তো পথ! বেগীর শ্মশান ছাড়িয়ে আর কতটুকু? জানো না বাবা, ঠাকুরমা মলে শ্মশান অবধি চলে গিয়েছিলাম। আমি আর নুর দু-জনে। স্টেশন আরও না হয় অতটা হোক ঐখান থেকে। সেবারের যাওয়া-আসা মিলিয়ে তবে তো একই দাঁড়াল।

গাড়ি অনেক রাত্রে। গাড়ির কামরায় সকলকে তুলে দিয়ে গোপেশ্বর ফেটে পড়লেন: রেলগাড়ি এখনো জাত-বিচার করছে না, সকলকে উঠতে দেয়। নয়তো স্টেশনের এই আড়াই ক্রোশের উপর আরও দশ ক্রোশ পথ ভাঙতে হত।

নন্দলালও যাচ্ছেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, দ্বিরাগমনের কাজ নেই। বেহাই মশায়কে আপনি তাই বলে দেবেন। মেয়ে-জামাই পায়ে হাঁটিয়ে লোক হাসিয়ে আর নিয়ে আসব না। ও-পারে চলে যাবো, ঠিকই আছে। ভেবেছিলাম হিঁড়িকটা কেটে গেলে ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। কিন্তু আর নয়। যা-কিছু আছে, বেচতে না পারি তো দানসত্র করে দিয়ে বেরুব। বনগাঁয় তাড়াতাড়ি একটা ঘর তুলে সেইখানে জামাই-মেয়ে নিয়ে যাবো।

এসব হল কথার কথা। বসত ওঠানো অত সোজা নয়। পাঁচ পুরুষ কেটেছে এই গাঁয়ে—তখন জানা ছিল, আরও পঞ্চাশ পুরুষ কাটবে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে ভূসম্পত্তি জিনিস-পত্র আওলাত-পশার গোছানো। মাংনা দিতেও সময় লাগে। বছর শেষ হতে চলল। গোপেশ্বর ইতিমধ্যে ঘুচিয়েছেনও বিস্তর। সীমান্তের পারে অল্প-কিছু জংগুলে জমি সোনার দামে খরিদ হয়েছে। দাঁও পেয়েছে তারা, ছাড়বে কেন? জংগলও কাটা হয়েছে, ঘর তোলা হবে এইবার—

এমনি সময় নিরঞ্জনের চিঠি—সর্বনেশে চিঠি: তারার বড় অসুখ। রক্ত-আমাশায় ভুগছে অনেকদিন, সংগে জ্বর। উত্থানশক্তি রহিত। রাতদিন কান্নাকাটি করে মা'র কাছে যাবে বলে। এদিককার ডাক্তার-কবিরাজ সবাই সরে পড়েছে, ফকিরের জল-পড়ার উপর আছে—

নিরুপায় গোপেশ্বর মাথা হেঁট করে আবার জবেদের কাছে গিয়ে পড়লেন। গাড়িতে চাটাইয়ের নতুন ছই বানিয়েছে। ছইটা বাঁশতলায় খুলে রাখে, মানুষ শোয়ারি পেলে লাগায়। [illegible] থেকে জবেদের ভাল রোজগার।

মংগলবারে তারা আসছে। বড় অসুখ, হাঁটবার তাগত নেই। ভাড়া যা চাও, দেবো জবেদ মিঞা। ভেবে দেখ, তারা আর নুরকে তুমি আলাদা চোখে দেখতে না।

জবেদ তিক্তকণ্ঠে বলে, সেসব দিন কবে চলে গেছে হালদারমশায়। একবার নাক-কান মলে ছাড়ান পেয়েছি, এবারে কায়দায় পেলে নাক-কান কেটে ছেড়ে দেবে। দেশ-জোড়া হিন্দু-মোছলমানে কাটাকাটি করে শেষ হচ্ছে—আমাদের এই গ্রাম তবু তো ভাল, কেউ কারো গায়ে হাত তুলছে না। এর বেশি আর কিছু চাইবেন না।

মংগলবার গোপেশ্বর স্টেশনে যাচ্ছেন। গজর-গজর করছেন আপন মনে: ওখানে ডাক্তার-কবিরাজ নেই, যত সিভিল-সার্জন এইখানে এসে ডিসপেন্সারি দিয়েছে। সময় থাকলে চিঠি লিখে মানা করে দিতেন: এদ্দিন ভুগছে তো আরও মাসখানেক ভুগতে থাকুক ঐ রকম। তার মধ্যে অন্তত একটা দোচালা খোড়ো-ঘর তুলে ফেলবেন বনগাঁয়। সেখানে নিয়ে যাবেন। উত্থানশক্তি রহিত তো সে মেয়ে পথ হাঁটবে কি করে? চোখের

দেখা দেখে নিয়ে ফেরত-টিকিট কেটে আবার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেবেন—সেই-জন্যে যাচ্ছেন।

গরুর গাড়ি যাচ্ছে ক্যাচকোচ আওয়াজ তুলে। জবেদ মিঞা না? কোথায় চললে? ধানের ব্যাপার করি হালদারমশায়। বস্তা নিয়ে যাচ্ছি—গঞ্জ থেকে ধান কিনে এনে গাঁয়ে বেচব।

স্টেশনে মেয়ে-জামাই নামল। মানুষজন সরে গেলে অন্ধকার বাদামতলার দিক থেকে খালি গাড়ি ঠেলে আনে কে এদিকে? কে?

জবেদ চাপা গলায় বলে, চুপ! ঠাহর করে করে তারাকে দেখে যেন হাহাকার করে উঠল: কী মেয়ে নিয়ে গিয়েছিলে, এ কাকে নিয়ে এলে জামাই? হায়রে কপাল, বাঁধা ছই রেখে আসতে হল মানুষের সাত-সতেরো জিজ্ঞাসার ভয়ে। ধানের বস্তা গুড়ের নাগরি যেভাবে নেয়, মেয়েটাকে তেমনি করে নিয়ে যেতে হবে।

নিরঞ্জন নতুন লোক নয়, বোঝে সমস্ত। বলে, জবেদ-চাচা, তুমি গাড়ির ধারে-কাছে থেকো না। কী দরকার! আমি চালিয়ে যাবো।

জবেদ হেসে ফেলল: ছাগলের পায়ে ধান পড়লে লোকে গরু কিনত না, বুঝলে জামাই?

আচ্ছা দেখই না ছাগলের কাজ।

জবেদ বলে, রোসো। বড় দাঁপটা পার করে দিই—তারপরে।

দাঁপ হল যে জায়গায় কাদা অত্যধিক গভীর, পার হওয়া কষ্টকর।

বলে, দাঁপ পার হয়ে পাড়ার ভিতরে পড়বে। তখন তোমরা কারা, আমিই বা কে? হালদার মশায়কে তো জেলাশুদ্ধ সকলে চেনে। পা চালিয়ে আপনি বাড়ি গিয়ে উঠুন, নয়তো একেবারে অনেক পিছনে পড়ে যান।

দাঁপ পার হয়ে গিয়ে জবেদ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। বলে, দেখি মুরোদ। মুখের বড়াই—কাজে সেটা কদ্দুর, এবারে দেখি।

চালাচ্ছে নিরঞ্জন। জবেদ থাকতে পারে না, তাড়া দিয়ে ওঠে: রেলগাড়ি চালাতে কে বলে তোমায়? গরুর কষ্ট হয় না? মেয়েটার তো চামড়ায় ঢাকা ক'খানা হাড়—হাড়গুলো খুলে খুলে পড়বে যে!

কিন্তু যা-কিছু বলবে ঐ দূর থেকেই। কী মজা হয়েছে—কাছে আসবার জো নেই। এক চাষী-বাড়ির একেবারে পিছনে এখন—তাড়াও তো আর দিতে পারছে না জবেদ। বাহাদুরি দেখাবার এমন সুযোগ কে ছেড়ে দেয়? গরুর ল্যাজ মলে নিরঞ্জন পাকা গাড়োয়ানের মতো হাঁক দিচ্ছে: ঠায়, ঠায়, আরে ডাইনে—

এবং যে ভয় করা গিয়েছিল—আটকে গেছে গাড়ি। একটুখানি ডাইনে কাটিয়ে গেলে হত। কিন্তু এ-পথে চলাচল নেই, আর চালাতেই জানে না গাড়ি। ল্যাজ মলে দিয়েছে ডাইনের গরু সোনার। তাতে উল্টো উৎপত্তি, শয়তানি করে সে ঘাড় নামিয়ে নিল। গাড়ি বেঁকে গিয়ে পড়ল কাদায়।

ঠায়, ঠায়—

হাটুরে মানুষ ক-জন জুটেছে পথে। কার না কার গাড়ি যাচ্ছে, এমনি ভাবে জবেদ হাঁক দেয়: কি হল তোমাদের?

চাকা বসে গেছে—

কাদায় ভুটভাট আওয়াজ তুলে তাড়াতাড়ি পা ফেলে জবেদ এগিয়ে যায়। পথের সঙ্গী লোকগুলোর দিকে আড়চোখে চেয়ে বলে বাবুর মতন চেপে বসে থেকে হবে না নেমে পড়ে চাকা মারো, তবে গাড়ি উঠবে

লোকগুলো নিরস্ত করে: তোমার কি মাথাব্যথা মিঞা-ভাই। বয়ে গেছে। যা পারে করুকগে ওরা।

আনাড়ি মানুষ, দেখতে পাচ্ছ না?

বাবু মানুষ। তুমি কাদায় পড়লে ওরা আসবে কাঁধ ঠেলাতে? চলে এস ভাই, আমাদের কি!

লোক-দেখানো ভাবে খানিকটা এগুতে হল তাদের সঙ্গে। তারপরে বাঁয়ে পথ পেয়ে আলাদা হয়ে গেল। এদিক ওদিক চেয়ে আবার আসছে। সত্যি, বেহাল অবস্থা এদের। সোনাটা সেই ঘাড় সরিয়ে আছে, যত চাপ একলা রূপোর উপর। মুখ থুবড়ে না পড়ে কাদায়, গাড়ি না উলটে যায়! জবেদ ছুটে গিয়ে পড়ে। জোয়াল থেকে রূপোকে আগে খুলে কাদা পার করে বাবলাগাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে এলো। ফিরে এসে অবাক।

ঐ অবস্থা তারার—সে-ও নেমে পড়েছে কাদায়। এক চাকা নিরঞ্জন ঠেলছে, আর এক চাকায় তারা। কাদা মেখে ভূত। দেখে তো ক্ষণকাল কথাই বলতে পারে না জবেদ, চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে: ওরে তারা, অসুখ না তোর?

তারার আজ ভারি আনন্দ। বাপের বাড়ি আসছে। বাপকে দেখল, জবেদ-চাচাকে দেখল। একটু পরে মা নুর সকলকে দেখবে। জবেদ ধমক দিয়ে ওঠে: আচ্ছা ধিঙ্গি হয়ে এসেছিস ক'টা মাস শ্বশুর-ঘর করে! জামাই কি ভাবছে বল্‌ তো?

মুখরা মেয়ে বলে, গাড়ির উপরে বসে থাকলে ভাল হত বুঝি? গতরের ভারে চাকা আরও বসে যেত।

মোটা হয়ে হাতির মতন হয়ে এসেছিস কিনা, গতরের দেমাক হচ্ছে! ভার তো এক ছটাক। কাদা যা গায়ে মেখেছিস, তারই যেটুকু ভার!

তারপর নিরঞ্জনের উপর খিঁচিয়ে ওঠে: কেমন মরদ হে তুমি? রোগা বউ চাকা মারছে, শাসন করতে পারো না?

হাসে নিরঞ্জন। তারা খনখন করে জবাব দিল: এক চাকা ঠেলে গাড়ি ওঠে না, দু-চাকায় দু-জন লাগে। আর একজন মানুষ কোথায় পাওয়া যায়, সেইটে বলে দাও।

জবেদের চমক লাগে। মুখের মতন জবাব। তাকেই যেন ঠেস দিয়ে বলা। ছোট্ট বয়সে তারাকে কত কোলে পিঠে করেছে,

মেরে। কত আর সহ্য যায়, কতক্ষণ আল-গোছ হয়ে থাকা চলে! গর্জন করে উঠল সেই আগেকার মতন—তারা যখন ছোট্টটি ছিল: ডাঙায় ওঠ্ তারা, ভালোর তরে বলছি। বিয়ে হয়ে লাটসাহেব হয়েছিস? দীঘির ঘাটে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে দাঁড়া। আমরা যাচ্ছি।

আর ঠিক সেইসময় প্রশ্ন: গরুর গাড়ি কার, কে আসে?

মানুষ হও আর গাড়ি হও পাড়াগাঁয়ে পথ চলতে হলে এমনি জবাব দিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন আসে, গাড়ি যাবে কোথায়?

এবং বাঁক ঘুরে এসে হেরিকেন দেখা দিল। জবেদ সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাদার মধ্যে। কি হবে তাতে? হেরিকেন উঁচু করে তুলে আখেজ বলেন: জবেদ মিঞার সোনা গরু। এঃ হে-হে—কাদায় পড়ে গেলে জবেদ?

আখেজ গোলদার যথারীতি সদরে চলেছেন কোন এক মামলার সাক্ষিসাবুদ নিয়ে। জবেদ উঠে পড়েছে। কাদার প্রলেপ মুখে, চোখ দুটো তার মধ্যে পিট পিট করছে। কিন্তু হলে কি হবে? সোনার অত্যাচারে ক্ষেতের বেড়া কারো আস্ত থাকে না, তাকে যে সবাই ভালরকম চিনে রেখেছে। সোনা গরু সঙ্গে থাকতে মুখে কাদা মেখে জবেদের মুনাফা নেই।

আখেজ বললেন, গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে জবেদ মিঞা? সঙ্গের মানুষটা কে? মেয়েটা তারা বুঝি?

বাপের বাড়ির দেশে এসে তারা ঐ পথের কাদা মাখল স্ফূর্তি করে, জবেদের সঙ্গে ঝগড়া করল, বকুনি খেল। ঐ শুধু একটা দিন। রাত দুপুরে বাড়ি পৌঁছে বিছানায় পড়ল। আর উঠে বসেনি তারপরে।

শ্রাবণ মাস। ঝুপঝুপে বৃষ্টি, দিন-রাতের মধ্যে জিরান নেই। মা-বাপ কাঁদতে কাঁদতে আধা-পাগল। কখনো আকাশ ফাটিয়ে চেঁচান, কখনো গুনগুন করেন সুরেলা গানের মতো। যত ঝঞ্ঝাট জামাই নিরঞ্জনের। মড়ার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। ভাগ্যবতী অশীতিপর বড়োগিন্নি নয়—মাত্র দুটো বছর আগে হলেও তখন আর এক দিনকাল। বড়োগিন্নির আদরের নাতনী এই পোড়াকালের পোড়ারমুখী তারা—মরেও কী রকম জ্বালাতন করছে! শনিবার দুপুরবেলা মরেছে—শনি গিয়ে রবিবারের দিনও কেটে যায়, চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল। বাড়িতে বাসি মড়া—মাছি পড়তে শুরু হয়েছে, গন্ধ বেরুবে এর পরে, পোকা ধরবে। পাড়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে নিরঞ্জন হয়রান। ছ-সাতটা শ্মশান-বন্ধু জোটানো যাচ্ছে না। স্বজাতি আত্মীয়কুটুম্ব চুলোয় যাক, বাছাবাছির দিন আর নেই—মড়া বইবার যার কাছে যায়, এক একটা অজুহাত। কারো বাড়িতে জ্বর, কারো বা পেট নামছে। গলা খাটো করে আরও একটা কথা বলেছে কেউ কেউ—বউ পোয়াতি। পোয়াতি বউয়ের স্বামীর শ্মশানে-মশানে যেতে নেই। দোষ-দৃষ্টি লাগে, শ্মশান থেকে হয়তো বা ওঁরা ভর করে এলেন গর্ভিণীর গর্ভে ঢুকে পুনর্জন্মের প্রত্যাশায়। একটি তো আগে থেকেই আছে গর্ভের ভিতর—নতুন জন এসে জায়গা নিয়ে হুটোপাটি বাধায়, প্রসূতির তখন প্রাণসংশয়। জ্বর হয়েছে বলে কাঁথা মুড়ি দিলে নাড়ি টিপে দেখা চলে, কিন্তু পোয়াতি বউয়ের কথা বললে চুপচাপ ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

বাঁশবাগানটুকু পার হয়ে গিয়ে গোপেশ্বর হালদারের বাড়ি এত বড় সর্বনাশ, জবেদকে কিন্তু ঘরের বাইরে কেউ দেখে না। দুয়োরে খিল এঁটে আছে নাকি? সমাজে সে এক-ঘরে। হুঁকো দেবে না কেউ, হাজাম বন্ধ, ধোপা বন্ধ। মৌতে খানায় সাদির খানায় দাওয়াত পাবে না। মরলেও কেউ মাটি দিতে যাবে না গোরস্থানে।

ঘুরে ঘুরে নাজেহাল হয়ে শেষটা নিরঞ্জন শাসানি দেয়: যা ভাবছ সেটা হচ্ছে না। পচা মড়ার গন্ধ আমরা একা শুঁকব না, সকলকে ভাগ নিতে হবে। রাত্তির হোক না, মড়া টেনে অন্য বাড়ির দরজায় রেখে আসব। নিজের গরজে সে তখন আর কোথাও চালান করুক, কিম্বা শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে আসুক। তাই করব ঠিক, আর লোকের খোশামুদি করতে যাচ্ছি নে।

বলে রাগে রাগে বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে সত্যিই জলচৌকির উপর বসে পড়ল। যদু হালদারের বউ পাংশুমুখে বলে, শুনলে তো কি বলে গেল? আমাদের বাড়িতেই রেখে যায় যদি? সকালে দুয়োর খুলে দেখব, দাওয়ার উপরে দাঁত বের-করা কিম্ভূত-কিমাকার পড়ে আছে। ছেলেপুলে ডরাবে। শনি-মঙ্গলবারের মড়া আবার একলা যায় না, সাথী খুঁজে সঙ্গে নিয়ে যায়। তুমি চলে যাও এক্ষুনি। মড়া যদি ফেলেই দেয় অন্য কোথাও ফেলুকগে—আমাদের বাড়ি না আসে।

যদু ভেবে দেখে, বউ বলেছে পাকা কথাই। গামছা কোমরে বেঁধে সে চলল। নিরঞ্জন বলে, এই যে, খুড়োমশায় এসে গেছেন। ছোটকাল থেকে তারাকে দেখছেন আপনি; কত মিষ্টিমুখ দিয়েছেন, আপনার বাড়িটাও

কাছে-পিঠে। পাঁজাকোলা করে আপনার ওখানেই রেখে আসব ভাবছি, আপনি ঠিক গতি করে দেবেন।

যদু হালদার তাড়াতাড়ি বলে, না বাবাজি। একগাদা বাচ্চা ছেলেপুলে নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হচ্ছি, আমায় রেহাই দাও। কিন্তু হীরু বর্ধন যে একলা মানুষ, বউটাও বাপের বাড়ি রেখে এসেছে। তার আক্কেল বুঝে দেখ, তারই তো সকলের আগে লাফিয়ে পড়া উচিত।

নিরঞ্জন বলে, দুজনে ধরে বর্ধনের বাড়ি রেখে দিয়ে আসি তবে।

বলতে বলতে হীরালাল এসে উপস্থিত এবং একে একে আরও দেখা দিচ্ছেন। দেখা গেল, এক অষুধে কাজ হয়েছে খুব। বাড়ি বাড়ি ধন্না দিয়ে হয়নি,—নিরঞ্জনের ঐ কথার উপরে বর্ষাবাদলের রাত্রে যেচে এখন সব পরোপকারে আসছেন। গুণতিতে মোট চারজন, তা ছাড়া নিরঞ্জন আছে।

যদু হালদার বলে, পাড়ায় বোধহয় এখন মোটমাট এই আছে। সবাই প্রায় এসে গেল। পাড়ার মধ্যে হবে না। চারজনে ধরাধরি করে বাইরে কোথাও ফেলে আসি।

হীরু বর্ধন গর্জন করে ওঠে: বুদ্ধিটা দিলে ভাল! পাড়ায় তবু নিজেদের ব্যাপার—গালিগালাজ ঝগড়াঝাটিতে চুকে যেত। পাড়ার বাইরে ফেলে শেষটা দাঙ্গা বেধে যাক আর কি!

হলধর বলে, চারজন আছি। ভুগে ভুগে ওজনে আর কিছু নেই, হালকা শোলা হয়ে গেছে। কাঁধ বদলাবদলি করে যেভাবে হোক নিতে হবে শ্মশান অবধি। হীরু বলেছে ঠিক, পথে কোনখানে ফেলা যাবে না।

যদু হালদার শিউরে উঠে বলে, শ্মশান—এই ভরার মধ্যে? ওরে বাবা, ফিরে এসে নিউমোনিয়ায় ধরবে। আমাদেরও এমনি কাঁধে নিতে হবে আবার।

হীরালাল বলে, মেয়েটা বেয়াক্কেলে। মরার দিনটা বেছেছে দেখ দিকি? ওর ঠাকুরমা গেলেন—ভাবো একবার হলধর—পৌষ মাস, আকাশ-ভরা রোদ, চারিদিক খটখটে শুকনো। নতুন ধান-চাল উঠেছে, গাই বিইয়েছে ঘরে ঘরে, সুখ-শান্তি সকলের মনে। লোকও হল সেইরকম। সব কাজ সময় বুঝে করতে হয়, বুঝলে? মরাটাও।

বসে বসে আগডম-বাগডম বকে কি হবে, ব্যবস্থা করে ফেল। হুঁকো টানতে টানতে যদু হালদার তাগিদ দেয়: দেরি করো না হে! বাবাজি, তুমি তক্তাপোশের ঝামেলায় যেও না—বইবে কে? হালকা দেখে বাঁশ নাও একখানা। একেবারে ফঙ্গবেনে না হয় দেখো, পথের মধ্যে ভেঙে পড়লে মুশকিলের পার থাকবে না।

হল-তাই। মাদুর পাতল উঠানের উপর, তারাকে তার উপর শোয়াল। লম্বালম্বি বাঁশ একটা চাপান দিয়েছে মড়ার উপরে। দড়ি পাকাচ্ছে, বাঁধবে। ছড়ছড় করে বড় এক ছড়া বৃষ্টি এলো। কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে সব দাওয়ায় ওঠে।

নুর চলে এসেছে ও-বাড়ি থেকে। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে। যেমন সেই এক রাত্রে লুকিয়ে দেখেছিল—গয়নাগাঁটি পরা রাজ-রাজেশ্বরীর মতো বিয়ের রাতের তারাকে। আজকে দেখছে মাদুরের উপর শোয়ানো দু-দিনের বাসি মড়া। বৃষ্টিতে ভিজে জ জবে হয়ে গেল যে! ওরা দেখে ফেল নয়তো আমিনুর বাড়ি থেকে ছাতা এ মড়ার উপরে ধরত।

বৃষ্টি কমলে তাড়াতাড়ি আবার কা করছে। মাদুর মুড়ে কোষ্টার দড়ি দি বাঁশের সঙ্গে কষে বাঁধন দিল চারটা। তার মাথায় গলায় কোমরে আর ঠ্যাঙে।

আমিনুরের বুকের ভিতর আছাি পিছাড়ি খাচ্ছে। অত জোরে বাঁধ কেন গো বাঁশের গেরোয় গায়ের ছাল উঠে গেল বুঝি কিন্তু কথা বললে তো টের পেয়ে যাবে আবার কোন কথা উঠবে তাই নিয়ে। চো মেলে দেখতে পারে না তো আমিনু চোখ বুজল।

যদু হালদার বলে, কলসির জোগা আছে তো বাবাজি?

নিরঞ্জন বলে, কুমোর-বাড়ির নতুন কলসি এখন-তখন চলছিল তো ক'দিন ধরে-যোগাড়-যন্তোরে কোন খুঁত নেই। আম কাঠে পোড়ে ভাল—আমগাছ চেলা করে ডাঁ করেছি ঐ দেখুন। দড়ি কত লাগে ন লাগে, কোষ্টা কিনেছি আড়াই সের—

হলধর বলে, পাঁচ কাহন কড়ি লাগবে মড়ির সঙ্গে কড়ি দিতে হয়—কড়ি না পেলে যমদূতে বৈতরণী পার করবে না। মুখাগ্নি জন্যে নারকেলের পাতা নিও। আর ম্যাচবাক্স

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, কাঠ?

হীরালাল খিঁচিয়ে উঠল: মড়ি নেবা মানুষ হয় না, আবার কাঠ? মড়ি রেখে তবে কাঠই বয়ে নিয়ে চলো।

চিতেই হবে না মোটে, কি বলেন শ্মশানে এমনি পড়ে থাকবে?

যদু হালদার প্রবোধ দিচ্ছে: উতলা হয়ো না বাবাজি। শ্মশানেই হয়তো কাঠ পেয়ে যাবে। মড়ার কাঠ কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। মেয়ের কপালে থাকলে পরের কাঠে চিতে সাজিয়ে মজা করে পুড়িয়ে আসব। একটা কুড়াল নিয়ে নাও বরঞ্চ, কাঠ কাটতে লাগবে।

হীরালাল ফ্যা-ফ্যা করে হেসে বলে, না পোড়ালেও মড়া কিন্তু পড়ে থাকবে না। কাল একবার গিয়ে দেখো। শিয়াল-শকুনের মচ্ছব লেগে যাবে। দু-চারখানা হাড় পড়ে থাকতে পারে এদিক-সেদিক। তার বেশি নয়।

নিরঞ্জন তাড়া দিয়ে ওঠে: আস্তে বর্ধন মশায়। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি রয়েছেন ওঘরে।

আমিনুর ছুটে পালাল। আর শুনতে পারে না। শ্মশানের উপর বড়গিন্নিকে সমারোহে যেখানটা পুড়িয়েছিল, তারার দেহ ফেলে আসবে সেই জায়গায়। শকুনেরা ঘিরেছে চতুর্দিকে—পেট ফেড়ে ফেলেছে, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। জলে ভাসা তারার চোখ দুটোয় কাকে এসে

ঠোক্কর দিচ্ছে। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে শেয়ালে—খ্যা খ্যা আওয়াজ তুলে শিয়ালে শিয়ালে ঝগড়া লেগেছে বখরা নিয়ে। নুরে আর ভেবে উঠতে পারে না।

বল হরি, হরিবোল—

মড়ার মাথা ও পায়ের দিকে বাঁশের খানিকটা করে বেরিয়ে আছে। চার জনে কাঁধে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলল। এক হাতে কলসি আর এক হাতে নারিকেল-পাতার আঁটি নিয়ে নিরঞ্জন চলেছে পিছন পিছন।

বল হরি, হরিবোল—

জবেদ দরজা দিয়ে আছে। আমিনুর চুপিসারে সোনাকে গোয়াল থেকে বের করল। শ্মশানযাত্রীরা চলে গিয়ে হালদার-বাড়ি নিঃশব্দ। তারার বাপ-মা ঘরের ভিতর এমন চুপচাপ, অচেতন হয়ে আছেন নয়তো মরেই গেছেন একেবারে। আমিনুর চেলা-কাঠ চোরের মতন বয়ে বয়ে আসছে। কাঁঠালগাছে উঠে গুলঞ্চলতা ছিঁড়ে নিয়ে এলো। লতা দিয়ে কাঠের আঁটি বেঁধে সোনার পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিল দু'পাশে।

চল্ রে সোনা, যাবি? আব্বার সংগে গিয়ে সেই যেমন বড়গিন্নির কাঠ দিয়ে এসেছিলি। তারাকে ওরা শিয়াল-শকুন দিয়ে খাওয়াবে। যাবি নে?

খানিক দূর এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল: গোলদারের চোখ বন বন করে ঘুরছে রে সোনা। ধরে ফেললে রক্ষে নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে যেতে হবে। আমি আর তারা গিয়েছিলাম, তুই কেন পারবি নে?

বল হরি, হরিবোল—

মড়া নামাল বেগীর শ্মশানে। বেগী নদী নয়, খালও নয়—ডোবা মতন জায়গা খালের একটা রেখা গিয়েছে এদিকে-ওদিকে। কোনকালে নাকি নদী ছিল—সাধু নাম বেগবতী, জোয়ারে উচ্ছল হত, ভাটায় কিছু ঝিমিয়ে পড়ত। তটের উপর সন্ন্যাসী ধ্যানে বসেছিলেন—খলবল করে কলহাস্যে বেগবতী তাঁর কমণ্ডলু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী অভিশাপ দিলেন, জোয়ারের জল সেই থেকে আর আসে না। নদী মজে হেজে গিয়ে শুকনো ডাঙা। ধানের ক্ষেত, কত জায়গায় পুকুর কেটে মাটি তুলে লোকে তার উপর ঘরবাড়ি তুলেছে। মাঝে মাঝে খানা-খন্দ হয়ে জল জমে থাকে—যেমন ঝুরি-নামা প্রাচীন বটগাছের নিচে শ্মশানঘাটের এই জায়গা।

বটতলায় নামাল তারাকে। বৃষ্টি আসছে এক-একবার, গাছের নিচে খানিকটা তবু আচ্ছাদন। যদু হালদার ব্যস্ত হয়ে পথের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে: কই গো, নিরঞ্জনের যে দেখা নেই। অত পিছিয়ে পড়ল কেমন করে?

হরিবর্ধন হেসে উঠে বলে, সরে পড়ল পথ ধরেছে। ওর তো ভালই। এই পক্ষের গয়নাটয়না রইল, টোপর পরে আবার গিয়ে ছাদনাতলায় বসবে। নতুন বউ আনবে।

সে কথায় কান না দিয়ে যদু বলছে, কী আশ্চর্য! এত দেরি হবার কথা নয়। খুঁজে দেখ তো হলধর, বাঁশটাশ পড়ে আছে কি না। না থাকে, কী আর হবে! মড়ি বয়ে এনেছি, ঐ বাঁশ কেটেকুটে কাজ চালাতে হবে।

বয়সে সকলের ছোট বঙ্কিম। তাকে বলে, কুড়ুল ধরে ঝটপট বাঁশখানা ফেড়ে ফেল। ঐ দিয়ে মারতে হবে। রোগা-ডিগডিগে একফোঁটা মেয়ে—কাপা এক গণ্ডার বেশি লাগবে না। হরি, কি বলো, হবে না?

বাঁশের একদিকে খানিকটা ফেড়ে ফেলে ভিতরে গোঁজ ঢুকিয়ে দিয়ে কাপা বানায়, চিমটার মতো। মড়া যেখানে ভাল পোড়ানো হল না, কাপার প্রয়োজন। জলে ফেলে ঐ কাপার চিমটা দেহের এখানে-ওখানে লাগিয়ে কুড়ালের পিছন দিয়ে ঘা মেরে মেরে মাটিতে বসায়। মড়া ভেসে উঠলে শিয়ালে টেনে হিঁচড়ে ডাঙায় তুলে ফেলে। সেইজন্য কাপার ব্যবস্থা। শিয়ালও সেয়ানা হচ্ছে। জলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে মড়া টানাটানি করে। তবে সহজে সেটা হয় না।

নিরঞ্জনকে দেখা গেল অবশেষে। পা পিছলে পড়েছিল—তবু ভাল, হাতের কলসি উঁচু করে ধরেছিল, কলসিটা ভাঙেনি। পগারে হাত-পা ধুয়ে আসতে হল, তাই একটু দেরি। মুখ টিপে হাসে যদু হালদার। অপর কিছুও হতে পারে। একটু-আধটু কথা শোনা যায় নিরঞ্জনের সম্বন্ধে। বর্ষাবাদলের দিনে শিশিতে করে রং ধরাবার কিছু হয়তো এনেছিল, মুখে ঢেলে শিশিটা ফেলে দিয়ে এলো পগারের জলে।

সকলে তাড়াতাড়ি করছে: মড়ি চান করিয়ে দাও হে জামাই। জল ভরে কলসি দুই-চার ঢেলে দাও, ব্যস। তোমাকেই করতে হয়।

মুখাগ্নি করবে এসো নিরঞ্জন। নারকেল-পাতা আনো। পাতা ধরিয়ে তারার মুখে ছোঁয়াবে। তুমিই করবে।

নিরঞ্জন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, শ্মশানে কাঠকুটো আছে বলেছিলেন যে খুড়ো-মশায়? কোথায়?

অন্য সময় তো থাকে। আজকেই দেখছি, কে যেন ঝাটপাট দিয়ে সাফাই করে গেছে। তারার কপাল। নিজেই হয়তো পুড়তে চাচ্ছে না। নইলে এমনধারা হবে কেন? তুমি মুখাগ্নি করো বাবাজি, তাইতে হবে। পাঁথা-

সিঁদুর নিয়ে স্বামীর হাতের আগুন পাচ্ছে, এই বা কজনের ভাগ্যে হয়? ম্যাচবাক্স দাও, পাটা ধরিয়ে দিই—

জিভ কাটল নিরঞ্জন: এই যাঃ—

কি হল?

ম্যাচবাক্স কলসির মধ্যে ছিল। কলসিতে করে আনলাম—নতুন কলসি, গরমে থাকবে, বৃষ্টি লাগবার ভয় থাকল না। যখন চানের জল তুলি, সে ঘোড়ার ডিম জলের মধ্যে পড়ে গেছে।

তবে? কারো কাছে ম্যাচ নেই। তুমি এনেছ, অন্যে কেন আনতে যাবে? শ্মশান-ঘোরা জিনিস বাড়ি ফেরত নেওয়া যাবে না। ম্যাচবাক্সের দামও হয়েছে চার পয়সা করে।

যদু হালদার বলে, কাঠের খোঁজ করছিলে বাবাজি, বোঝ এইবারে। তারা চায় না আগুনে দেওয়া হোক তাকে। মুখেও আগুন ছোঁয়াতে দেবে না। চিরকালের একগুঁয়ে—এইটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি তো! মরেছেও শনিবারের দিন তিন-পো দোষ পেয়ে।

রাত্রিবেলা, বিদ্যুৎ-চমক, ব্যাঙের ডাক, ঝপেঝপে বৃষ্টি, ঝর্রি-নামা অন্ধকার বট-তলা—শ্মশানবন্ধু সকলের বুকের মধ্যে গুরগুর করে। কাজকর্ম সেরে সুভালাভালি বাড়ি ফিরতে পারলে রক্ষা পায়। তাড়াতাড়ি করো হে—মড়া নামিয়ে দাও জলের মধ্যে।

নিরঞ্জন দু-হাত তুলে ছুটে আসে: রাখো। অস্থির কি হবে খুড়োমশায়? এদিকে কিছু হল না, অস্থি নিয়ে আমি নিজে গঙ্গাজলে দিয়ে আসব।

হতবুদ্ধির মতো যদু বলে, পুড়ল না মোটে—অস্থি কোথায়? তুমিই কাণ্ডটা ঘটালে ম্যাচবাক্স জলে ফেলে দিয়ে। আবার এখন অস্থির আবদার।

হীরালাল বলে, অস্থি মানে হাড়। পুরো মানুষটা রয়েছে, অস্থির কোন অভাব আছে?

কেউ কিছু বোঝবার আগেই কুড়াল নিয়ে মড়ার আঙুলে এক কোপ দিল জোরে। কড়ে আঙুলের এক টুকরো কেটে ছিটকে পড়ল। বলে, শামুক এনে ভরে নাও।

বলো হরি, হরিবোল—। তারাকে জলে ফেলে কাপায় সেঁটে দিয়েছে। একটা, দুটো, তিনটে চারটে। ভেসে উঠবার জো রইল না। সংক্ষেপে কাজ চুকল। চলো এই-বারে—ফিরে চলো।

সবাই আগে যাবে, পিছনে কেউ থাকবে না। আগে কাটিয়ে উঠবার জন্য হুড়ো-হুড়ি। সকলের শক্তি সমান নয়, কেউ পিছিয়ে পড়ল তো দৌড়চ্ছে সেই লোক। কে বুঝি জাপটে ধরবে পিছন থেকে এসে। গণে দেখছে মাঝে মাঝে—পঁচিশজন তারা, আঁ, ছয় হচ্ছে তবে কেন? মানুষ বেড়ে যাওয়া ভাল কথা নয়। শনিবারের দোষ-পাওয়া মড়া—জলতল থেকে উঠে সে-ও বাড়ি ফিরছে এক সঙ্গে? বাড়তি লোকটা কে হল—কে তুই?

কাঁপা গলায় আমিনুর বলে, আমি গো আমি। হয়ে গেল তোমাদের?

বাচ্চা ছেলে এদ্দুরে কেন রে তুই?

সোনাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লাম। ঐ যে সোনা।

মাঠ ভেঙে আসছিল। এদের ফিরতে দেখে গরু রেখে নুর একলা দৌড়ে পথের উপর এসেছে। সোনার পিঠে কাঠ, যদু হালদার দেখতে পেল। এই বুঝি এক নতুন ফ্যাসাদ বেধে যায়। নিরঞ্জনের নজরে পড়লে হাউ হাউ করে সে কেঁদে উঠবে। নেশার মুখে কিছুই অসম্ভব নয় এখন। সকলকে দাঁড় করিয়ে রেখে ম্যাচবাক্স আনতে ছুটবে বাড়ি অবধি। কাঠ যখন এসেছে, পুড়িয়ে শেষ না করে ছাড়বে না।

যদু গর্জন করে উঠল: সমাজে তো এক-ঘরে করে দিয়েছে। আবার কি জন্যে ঘর-ঘুর করিস আমাদের মধ্যে? বাড়ি চলে যা—

গলা মিছু করে বলে, ছোঁড়া পাজির পা-ঝাড়া। গরুটার নয় চরবৃত্তি করতে এসেছে, দেখে গিয়ে গাঁয়ের ভিতর চাউর করে দেবে।

বল হরি, হরিবোল—

শ্মশানবন্ধুরা গ্রামে ফিরল। পুকুরে ডুব দিয়ে তেতো জিনিস দাঁতে কেটে লোহা স্পর্শ করে তবে বাড়ি ঢুকবে। মারার বশে বিদেহী আত্মা যদি সঙ্গ নিয়ে থাকে, এইসব প্রক্রিয়ায় পালাবার দিশা পাবে না।

ঘরের মধ্যে তারার মা ফিট হয়ে পড়ে-ছিলেন। পাখা করা, জলের ঝাপটা দেওয়া, এ সমস্ত কিছুই নয়—নজর মেলে ঝিম হয়ে ছিলেন গোপেশ্বর। হরিধ্বনি শুনে তারার মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। বুক চাপড়াচ্ছেন, কপাল ভাঙছেন: মাগো আমার, তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ, কোনখানে তোকে বিদেয় করে এলো—

সামলে উঠেছ, কী মুশকিল? তিক্ত বিকৃত কণ্ঠে গোপেশ্বর স্ত্রীকে বলছেন, ভাবলাম, তুমিও যাচ্ছ—বখেড়া মিটে গেল। একা মানুষ হাত-পা ঝাড়া হয়ে বেরুনো যাবে। তা-ও হল না।

আর ওদিকে সোনার দড়ি ধরে আমিনুর গোয়ালের ধারে এলো। চুপিসারে ঝাঁপ খুলে গরু গোয়ালে ঢোকাবে। জবেদ টের পাবে না, ভেবেছিল। কিন্তু ছেলেকে না দেখে উদ্বেগে ইতিমধ্যে অনেকবার সে খোঁজাখুঁজি করেছে। গোয়াল-ঘরে সোনাও নেই, তখন আন্দাজ করেছে এমনি ধরনের কিছু। দুর্যোগের রাত্রে তা-বড় তা-বড় জোয়ান-পুরুষ ঘরের মধ্যে কাঁথা জড়িয়ে আছে—সাহস বোঝ ঐটুকু ছেলের।

তক্কে তক্কে ছিল জবেদ, লাঠি হাতে এসে পড়ল এক দৈত্যের মতো। দমাদ্দম মারছে: শয়তান হারামির বাচ্চা, কেন বেরিয়েছিলি? সোনা দাঁড়িয়ে—অপরাধ তারও যেন। গরু মাঝখানে এসে মার রোখে। আমিনুর ঘুরছে সোনাকে ঘিরে। লাঠি পড়ছে সোনার পিঠেও। সোনা আছে তাই অনেক বাঁচোয়া। রাগ মিটিয়ে জবেদ আবার ঘরে চলে গেল।

অনেককাল আগে সোনার মা বুধি বাঁধা ছিল এই জিওলতলায়। সোনার জন্মের সেই দিন। তারাও ছিল। তারা, তুই জানিসনে, ভুল বলেছিলি। গরু কথা বলে না নাকি লোভের পাপে?

বাপের পিটুনি খেয়ে নুর কাঁদে নি। এতক্ষণে হু হু করে দু-চোখে জল নামল। অলক্ষ্য অন্ধকারের দিকে চেয়ে কেঁদে কেঁদে সে বলছে, তুই মিথ্যে বলেছিলি তারা। গরু কথা বলে না ঘেন্না করে। মানুষের বজ্জাতি দেখে। মানুষ যদি ভাল হয়, তখন দেখিস

দুর্গা বৈদিক দেবী। ঋক্ বেদে দুর্গাসূক্তে দুর্গার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বেদেও নানাভাবে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। ঋক বেদোক্ত সূক্তে দুর্গা অগ্নিময়ী বা যজ্ঞাগ্নি স্বরূপিণী। তিনি দিগন্তব্যাপ্ত জ্বালামালায় অর্চকের অরাতিকুল দগ্ধ করেন এবং নৌ-স্বরূপে দুঃখ সমুদ্র হইতে তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করেন। তিনি সর্বজ্ঞা। তিনি বিঘ্ন বিপদ হইতে সাধককে রক্ষা করেন। ভট্টভাস্কর প্রভৃতি বেদের ভাষ্যকারগণের মতে ইনি আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী। সর্বহৃদয়ে অবস্থিতা এই দেবী উন্নত জীবন লাভের পথে সাধককে অনুপ্রাণিত এবং উদ্দীপিত করেন। আচার্য সায়নের অভিমত এই যে, দেবী দুর্গা শুধু সাধকের অগ্রগতির পথে বাহিরের বাধা বিঘ্ন নাশই করেন না; পরন্তু অন্তর্জগতের প্রতিকূল শক্তিসমূহ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তিনিচয়ও দেবীর বীর্য প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবী দুর্গা অবতার বলিয়া কীর্তিতা হইয়াছেন। দেবতাগণের নিকট বরদাস্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া তিনি বলিয়াছেন, শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি বশত পৃথিবী জলশূন্য হইবে, তখন আমি মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া অযোনিজারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইব। এই সময় শত নেত্রের সাহায্যে লইয়া আমি মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব, এইজন্য মনুষ্যগণ আমাকে শতাক্ষী বলিবে। সেই শতাক্ষী আমিই আবার শাকম্ভরী নামে প্রসিদ্ধ হইব; কারণ সেই অনাবৃষ্টির সময় আত্মদেহ সম্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহ দ্বারা আমি অখিল লোককে ভরণ বা প্রতিপালন করিব। আমার এই অবতারেই দুর্গম নামে মহাসুরকে আমি নিধন করিব, তখন হইতে আমার দুর্গাদেবী এই নাম খ্যাতিলাভ করিবে।

অবতার-তত্ত্ব ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত; কারণ, এই তত্ত্বটি স্বীকৃত না হইলে ভগবানের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক স্বীকৃত হয় না। সুতরাং অন্বয়তত্ত্ব অস্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম যেমন সত্য, জগৎও সেইরূপ সত্য। কারণ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ। শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় দেখিতে পাই, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মায়াবাদের নিরসন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,— সর্বসত্ত্বময় এই জগৎ, ব্রহ্মের অংশ; ইহার স্পর্শে আমরা অন্তরে পূর্ণ ও পবিত্রতা উপলব্ধি করি। প্রকাশানন্দ কোন্ সাহসে এই জগৎকে মিথ্যা বলেন? বস্তুত জগৎ যদি অসৎ বস্তু হইত, তবে, ইহা হইতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধারণা আমাদের কিছুতেই উদ্ভূত হইত না। 'অসতো মা সদ্গময়'—এই প্রার্থনা বা এই পক্ষে সাধনার প্রয়োজনও আমরা অনুভব করিতাম না। ফলত জগতের সম্পর্ক হইতে আমাদের অন্তরে সত্যের আকূতি নিরন্তর জাগিতেছে এবং সেই আকূতি পরিস্ফূর্তির জন্য শ্রীভগবানকে জগতে আবির্ভূত হইতে হয়। গীতাতে অবতার সম্বন্ধে উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গীতায় ও চণ্ডীর উক্তিতে স্থূলভাবে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও তাৎপর্যার্থে গূঢ়ভাবে কিছু পার্থক্য আছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি; পক্ষান্তরে চণ্ডীর উক্তিতে এইরূপ কোন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় নাই। চণ্ডীতে দেবী বলিয়াছেন—আমি অবতীর্ণ হইয়া অরি-সংক্ষয় করিব। গীতার উক্তিতে দুষ্কৃতের বিনাশ এই উদ্দেশ্যটি প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীর উক্তিতে উদ্দেশ্যস্বরূপ অরিসংহারটি গৌণ। দেবী নিজকে জগতের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিবেন তিনি জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেন; ইহাই মুখ্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি আসিলে স্বাভাবিকভাবেই অরিসংহার হইয়া যাইবে। মাকে পাইলে সন্তানের আর কোন চিন্তাভাবনার কারণ থাকে কি? সন্তান মাকেই চায়!

দুর্গা পূর্ণ তত্ত্ব নহেন, তিনি অবতার; অবতারী তিনি নন, কেহ কেহ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তির স্বপক্ষে তাঁহারা দুর্গা এই নামটির বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে দুঃখের পথে দেবীকে লাভ করিতে হয়, অথবা দুঃখ হইতে ভক্তকে তিনি ত্রাণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম দুর্গা। কিন্তু দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের এই সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে সংস্পর্শজ জড় ভোগ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের মূলে দেহাত্মবুদ্ধিই কাজ করে। এই অবস্থা অনাত্ম অবস্থা। আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইলে দুঃখের এই অনুভূতি থাকিতে পারে না। সুতরাং দেবী দুর্গা পূর্ণ আত্মতত্ত্ব নহেন। পরন্তু তিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে এই বিচারটি পরোক্ষ এবং দেহাত্মবুদ্ধির ঘাটিতে বসিয়াই এমন বিচার করা চলে। মাকে না পাওয়া পর্যন্তই এই বিচার। মাকে পাইলে আর পথের প্রশ্ন উঠে না। চণ্ডীতে তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে দেবী যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে অহং এই প্রত্যয় বীজে আমরা তাঁহাকেই সোজাসুজি নিজ করিয়া পাইতেছি, উপেয় এখানে সামনে আসিয়া পড়িতেছে, সুতরাং উপায়ের প্রশ্ন বা পথের সম্বন্ধে সংশয় বা ভয় অথবা দ্বিতীয়ে অভিনিবেশজনিত দুঃখের কারণ আর সেখানে থাকিতেছে না। সুতরাং পরব্রহ্মের আত্মতত্ত্বের উদ্দীপিত আমরা অবতারের মধ্যেই পূর্ণ মহিমায় উপলব্ধি করিতেছি; অন্য কথায়, ত্রিগুণাস্বরূপেই আমরা নির্গুণাকে পাইতেছি: বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি আমাদের পক্ষে মিলিতেছে, অভাবের প্রতিবেশের মধ্যেই মহাভাব বা প্রেমের লীলার এক্ষেত্রে উন্মেষ ঘটিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মায়ের আবির্ভাবের ইহাই নিগূঢ় রহস্য—মা সর্বাবস্থাতেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। হৃদয় জুড়িয়া তাঁহার প্রকাশ 'হৃদি বিস্ফুরক্ আবিঃ প্রভাস্ চকাস্তি"—এমনই তিনি। প্রকৃত প্রস্তাবে মায়ের কোন বিকার নাই। বিকার আমরা যাহাকে বলি, মায়ের পক্ষে তাহাতে কৃপারই সঞ্চার, আত্মজনে তাঁহার চিদাকারেই তিনি আমার। মায়ের বিকারে অবিচ্ছেদের লয়, বিচ্ছেদের মালোর উদয়ে আমাদের দৃষ্টিতে সব মধুময়।

বাঙালীর দেবীদুর্গার অনুভাবনার মূলে এই সত্যটি নিহিত রহিয়াছে। বাঙালী দুর্গাবীজে মহিষমর্দিনীকেই শুধু পায় নাই; প্রকৃতপক্ষে আদ্যাশক্তি যিনি সেই

বিশ্বজননীকে সর্বভাবে তাহারা নিজের করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। বস্তুত দেবী সূক্তে 'অহং' এই অভিধানে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত মাতৃত্বের যে বিভূতি এবং যে লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে; বাঙগালী তাহাই চিতিস্বরূপে ব্যাপ্তি ও দীপ্তিতে অখণ্ডভাবে অন্তরে অনুভব করিয়াছে। "একৈবাহং" "দ্বিতীয়া কা মমাপরা", ঋতম্ভরা এই প্রজ্ঞায় বিশ্বজননী "ঋতীয়তে অনুগৃহ্নাতি বিশ্বং" দেবী তাহাদের হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া পরম অনুগ্রহে চিন্ময় রস-বিগ্রহে জাগিয়াছেন। অবতারস্বরূপে অসুর দলন বা অশুভনাশেই মায়ের এখানে বৈভব নহে। বস্তুত বাঙগালী দুঃখ নাশের জন্য দেবীকে চাহে নাই। মাকে পাইয়া সে সকল দুঃখ ভুলিয়াছে। বহুশোভমানা উমা, হৈমবতী এইরূপে উপনিষদে যাঁহার লীলা বর্ণিত হইয়াছে, বাঙগালীর অঙগন আলো করিয়া তিনি রূপে তরঙ্গ তুলিয়াছেন। বাঙগালীকে তিনি নাচাইয়াছেন, মাতাইয়াছেন। বিশ্বাত্মিকার মাতৃভাবের প্রভাব বাঙগালীর সমাজ-জীবনকে নিত্যলীলায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে। বলিতে পার, উমা-হৈমবতী যিনি, তিনিও তো অবতার! একথার উত্তর এই যে, অবতারেই এখানে অবতারী, নিত্য যে সত্য তাহার স্বরূপাভিব্যক্তির মাধুরী এবং চাতুরী। প্রকৃতপক্ষে যাহাতে সমগ্রের হিত, তাহাই সত্য—সতি সাধু, সতে হিতম্। ফলত যে বস্তু সত্য, যাহাতে হিত, তাহা কৃত্য নহে। তাহার মহিমা স্বপ্রকাশ। নিজেকে হারাইয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে হয়। বিশ্ববীজে মজিলে হিত স্বতস্ফূর্ত হইয়া উঠে। বাঙগালীর দুর্গাতত্ত্বের অনুভূতির মূলে মাতৃমাধুর্যের এই রস তাৎপর্য—তাহার রীতি গতি এবং স্ফূর্তি গভীরভাবে অনুধ্যানের বিষয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত অবতার—এই সকলের যিনি আধার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যাঁহার প্রভাবের পার পান না বাঙগালীর ঘরে তিনি মেয়ে, তিনি উমা-হৈমবতী। বিশ্বজননীর ঐশ্বর্য এখানে মাধুর্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই মাধুর্যের বীর্য আবার সৌকুমার্যে নিজ সম্বন্ধে মননের স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দধারা বিস্তার করিয়াছে। এ যে দস্তুরমত অঘটন, কেমন করিয়া এই অঘটনটি ঘটিল? বেদান্ত-বিজ্ঞানের পথেই ইহার অর্থের বিনিশ্চয় করা সম্ভব।

বেদান্ত এ সম্বন্ধে কি বলেন? উমা-হৈমবতী, যিনি, তিনি কেমন? বেদান্তের মতে তিনি বহুশোভমানা। শোভা বস্তুটি কি কি তাহার উপাদান অর্থাৎ কোন্ কোন্ পদার্থে তাহা গঠিত এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠিবে। বৈষ্ণব রসসাধনার সর্বজনমান্য আচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামী নীচে দয়া, তাঁহাকে স্পর্ধা, শৌর্য, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্য—এইগুলির সমন্বয় এবং উদয়কে শোভাস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবীসূক্তের ভাষ্যস্বরূপে চণ্ডীতে মায়ের শোভাকে মন্ত্রময় প্রভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার বিস্তার অনাবশ্যক। শোভার প্রভাব আছে; কিন্তু ইহা সর্বতোভাবে আমাদের হৃদয়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, আমাদের স্বভাবে নিষ্ঠিত হইবার মত এ-বস্তু নয়। শোভা ভাবময়ভঙ্গী ধরিয়া আমাদের চিত্তে যখন তরঙ্গ বিস্তার করে, তখন অভীষ্টের আসঙ্গ লাভে আমাদের অন্তরে রসের উদ্দীপ্তি ঘটে। এইভাবে অন্তরধর্মে অভীষ্টের ঘনিষ্টতা আমরা অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করি; অন্যকথায় ইষ্টতত্ত্ব আমাদের কাছে জীবন্ত হয়। উপনিষদের ভাষ্যকার আচার্যগণের কেহ কেহ অম্বিকাস্বরূপে দেবীর অখিল জগৎ পরিপালনের শোভার এই বৈভবের বিস্তার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ফলত অম্বিকা যিনি মাধুর্য বীর্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আমাদের প্রাণরসের উদ্দীপন করেন, তিনিই আবার উমারূপে বিকশিত হইয়া উঠেন; মায়ের লীলা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হয়। আমরা তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়া পড়িতে চাই। এই আসপৃহায় যে-বস্তু দূরবগত, তাহাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠে। অভীষ্টের অঙ্গ চেষ্টায় স্পৃহনীয়তার উন্মেষকেই সে শাস্ত্র মাধুর্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। অভীষ্টের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিয়াই সে অবস্থায় তৃপ্তি হয় না; মাধুর্যের বীর্য সংস্পর্শে আত্মধর্মের সেকেতে উন্মেষ। সাধক তখন অভীষ্টকে প্রীতির প্রভাবে বশে আনিতে চাহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বশে না আসিলে রস নাই। অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে নিকট হইতে অতি নিকটে ইষ্টকে একান্তভাবে লাভ করিয়া তাঁহাকে কোলে বুকে ধরিয়া সাধকের তখন নির্বৃতি। ফলত সংশ্লেষের এই সন্নিকর্ষেই মাধুর্যের আস্বাদন। এবং সেই আস্বাদনে সাধকের হরণ বা—আত্মনিবেদন। মাধুর্য এই অবস্থায় সৌকুমার্য সর্বতোভাবে রস সঞ্চার-সামর্থ্যে সৌলভ্যে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে সাধককে দিব্যভাবে সঞ্জীবিত করে। তিনি অমৃতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সব জিজ্ঞাসা মিটিয়া যায়, সকল লালসার অবসান ঘটে। বাংলার মাতৃসাধক মায়ের চুম্বন মাত্রই চাহেন নাই। চুম্বন সে আর কতক্ষণ? তিনি চাহিয়াছেন গ্রসন, মায়ের গ্রাস—চুম্বনের অনন্ত মাধুর্যের বিলাস এই গ্রাস। কিন্তু মায়ের এই যে গ্রাস, ইহাতেও সাধকের স্বরূপধর্মের অপার প্রকাশ এবং উদার বিলাসটিও বুঝি আস্বাদ্য হয় না। তিনি মাকেই গ্রাস করিতে চাহেন—'এবার কালী তোরে খাবো, তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বারা দিব।' 'বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী' —বলিয়া তিনি মাকে আহবান করিয়াছেন। ভক্তির এমনই শক্তি। সমর্থারতির এই রসমাধুর্যই বাঙগলার মাতৃসাধনার পরম তাৎপর্য। সাধক এখানে মাকে বশে আনিয়াছেন এবং অশেষভাবে মাতৃ-মাধুরীর বিকাশ এবং বিলাস উপলব্ধি করিয়াছেন—'ভূতানি দুর্গা, ভুবনানি দুর্গা, স্ত্রিয়োনরশ্চাপি পশুশ্চ দুর্গা যৎ যৎহিদৃশ্যং, খলু সৈব দুর্গা, দুর্গা স্বরূপাৎ অপরং ন কিঞ্চিৎ— এই সত্য বাঙগালীর দুর্গোৎসবের তত্ত্ব এবং দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য।

দেবীদুর্গার উপাসনা বাঙগালীর জীবনে কবে সত্য হইবে জানি না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তের উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। রাজনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক নাই, এমন কথা বলিব না। কিন্তু রাজনীতির সে পূজায় বহিরার্থ মাত্র। ফলত, মাকে না পাইলে—আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ চেতনায় ব্যাপ্তি অনুভূতি জাগিবে না। পরন্তু সংকীর্ণ আত্মসুখে দৃষ্টি আমাদের আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু আত্মসুখে উপেক্ষার ভাবটি শুধু উপদেশের জোরে গড়িয়া তোলা যায় না। এই অবস্থায় উপায় কি? উপায় মাকে একটু মনে করা। শতাক্ষী স্বরূপে শত শত চোখ মেলিয়া সন্তান স্নেহাকুলা জননী আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার এই আদরে—আমাদের অন্তর যদি একটু স্পর্শ করে, তবেই আমাদের প্রাণধর্ম উদ্দীপিত হইবে। ফলত মাতৃস্নেহ-সম্পাতে সম্পৃক্ত সর্বাতিশয়ী সমাদর বাঙগালীর মনোমূলে যুগে যুগে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহার শিল্প, কলা, সংস্কৃতি সাহিত্য নিত্য নবরসে সঞ্জীবিত হইয়াছে। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সাধক সন্তানের দল এখানে প্রাণ দিয়াছে। মায়ের রসে তাহারা মজিয়াছে। প্রেমে তাহারা পাগল হইয়াছে। মায়ের রূপসাগরে তাহারা ডুব দিয়াছে। দুঃখের ভয় বাঙগালী করে নাই। দুঃখ হইতে ত্রাণও তাহারা চাহে নাই। সুতরাং দুঃখের ভয় বাঙগালীকে দেখাইও না। দুঃখ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বাতলাইবারও কোন প্রয়োজন নাই। মায়ের কথা বল, মায়ের ব্যথা তাহাদের কাছে আজ ব্যক্ত কর। যদি শক্তি থাকে, যদি জাতির সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের নরনারীর উপর দরদ এক, জাতির কল্যাণব্রতে আত্মদাতা মাতৃসাধকদের প্রতি তোমাদের অন্তরে সত্যই যদি ভক্তি থাকে, তবে অন্য যুক্তি দেখাইতে যাইও না। মাতৃকৃপার মাধুর্যে এবং ঔদার্যে আমাদের অবীর্য দূর হইবে। আনন্দময়ী চিদানন্দ-সংস্পর্শে প্রেমের মহাবলে আবার আমরা জাগিব। ইতর স্বার্থকে বলি দিবার জন্য খড়্গ সেদিন আমাদের হাতে ঝলসিত হইবে। মাতৃ-সেবার আগ্রহে উদ্দীপিত সেই খড়্গ-প্রভার বিস্ফুরণে দেবী দশভুজা দিক্ আলো করিয়া জাগিবেন।

# বেনারসী

বিমল মিত্র

বীডন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে আসছিলাম। স্কোয়ারের ভিতরে তখন যেন সভা-টভা কিছু একটা হচ্ছিল। বিকেল বেলা। ভিতরে অনেক মহিলাদের ভিড়। সবাই ঘোমটা দিয়ে বসেছে। কে একজন বুঝি তখন বক্তৃতা দিচ্ছে জোরে জোরে। পার্কের বাইরেও বেশ ভিড়। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে তারা বক্তৃতা শুনেক আর না-শুনুক, বেশ হাসাহাসি করছে মনে হল। পার্কের ভিতরে যত ভিড়, পার্কের বাইরেও তার চেয়ে কম ভিড় নয়। বেশ কিছু পরিমাণে লোক দল বেঁধে বেঁধে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সেই দিকে আর নিজেদের মধ্যে বেশ হাসাহাসি করছে।

একটু কৌতূহল হল।

পাশে একলা একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ কাদের মীটিং মশাই?

ছোকরা হেসে ফেললে। তবু তাৎপর্য বুঝলাম না।

বললাম—মেয়েদের কীসের মীটিং? এরা কারা?

ছোকরাটা হেসে ফেললে। তারপর আমার আপাদ-মস্তক চেয়ে দেখে কী ভাবলে কে জানে। বললে—সতী-লক্ষ্মীদের মশাই—

বুঝতে পারলাম না ঠিক।

জিজ্ঞেস করলাম—সতী-লক্ষ্মীদের?

—হ্যাঁ মশাই, সতী-লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী সব, রামবাগানের সতী-লক্ষ্মীদের—

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না সেখানে। হন্ হন্ করে চলেই যাচ্ছিলাম। খানিক-দূর গেছি। তখনও বীডন্-স্কোয়ারের রেলিংটা পার হইনি। ভিতরেও তখন বক্তৃতা হচ্ছে পুরো দমে। মাইক্রোফোন লাগিয়ে যেমন পুরো দস্তুর সভা হয় তেমনি হচ্ছে। কানে আসছে কিছু কিছু কথা।

হঠাৎ দেখলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনছেন। দাঁড়িয়েছেন ছাতির উপর ভর দিয়ে।

যেতে যেতে তার মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই কেমন থমকে দাঁড়ালাম। যেন চেনা-চেনা মনে হল।

মুখুজ্জে মশাই না?

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন ভদ্রলোকের খেয়াল নেই। মুখে দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে বেশ। অনেক দিন কামান নি। সেইরকম কোট। হাতে ছাতি।

বললাম—মুখুজ্জে মশাই না?

মুখুজ্জে মশাই প্রথমটা যেন আমায়

চিনতে পারলেন না ঠিক। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই যেন আমাকে দেখে চমকে উঠলেন।

আবার বললাম—মুখুজ্জে মশাই না?

মুখুজ্জে হ্যাঁ না বলে চলে যাচ্ছিলেন। যেন পালিয়েই যাচ্ছিলেন। আমি কোটের হাতাটা ধরে ফেললাম।

মুখুজ্জে মশাই যেন তবু চিনতে পারলেন না আমাকে।

বললেন—আপনি কে? আমি ঠিক......

বললাম—আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ডাক্তারবাবুর ভাই?

—কোন্ ডাক্তারবাবু? আমি তো ডাক্তারবাবুকে......

আম্‌তা-আম্‌তা করতে করতে মুখুজ্জে মশাই, আমার হাত ছাড়িয়ে হয়ত সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম পথ আটকে। মুখুজ্জে মশাই তখন উল্টোদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

বললাম—এত বছর পরে দেখা, আপনাকে কিন্তু আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—

—কিন্তু আমি তো চিনতে পারছি না ভাই!

বললাম—কিন্তু আপনাকে আমি আজ আর ছাড়ছি না—। জেনকিন্স্ সাহেব তারপরে আপনাকে খুবই খুঁজলে, প্রেম-লানি সাহেব আপনার জন্যে বিলাসপুরে লোক পাঠালে, কাটনী-ট্রেনের ভেণ্ডারদের বলে দেওয়া হল, আপনার ঘরের দরজায় তালাচাবি বন্ধ করে দিয়েছিলেন আপনি, —সব জিনিসপত্র জেনকিন্স সাহেব লিস্ট করে রেলের স্টোর্সে রেখে দিলে—

মুখুজ্জে মশাই আমার দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছু যেন মুখ দিয়ে বেরুল না তাঁর!

বললাম—বেনারসীকে চেনেন আপনি?

মুখুজ্জে মশাই-এর মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই মুখুজ্জে মশাই, আমার সঙ্গে দেখা হলেই পকেট থেকে পান বার করতেন। বলতেন—পান খাবে নাকি ভায়া?

পান খাওয়াটা একটা নেশা ছিল মুখুজ্জে মশাই-এর। শুধু মুখুজ্জে মশাই নয়, মুখুজ্জে গিন্নীরও। মস্ত বড় একটা পান সাজবার ডাবর ছিল। তার মধ্যে ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ান থাকত পানগুলো। আর একটা পানের মশলা রাখবার জায়গা। প্রায় তিরিশটা বাটি একসঙ্গে আঁটা। কোনওটাতে লবঙ্গ, কোনওটাতে এলাচ, কোনওটাতে সুপুরি, এইরকম। মুখুজ্জে গিন্নীর মুখে সব সময় পান থাকত। সব সময় পানটা মুখের মধ্যে ফুলে থাকত। কাজ করতে করতেও পান, ঘুমোতে ঘুমোতেও পান চাই তার। মুখুজ্জে মশাই রবিবার ছুটি হলেই কাটনী চলে যেতেন। যার যা জিনিস দরকার মুখুজ্জে মশাইকে বললেই এনে দিতেন।

যাবার আগে মুখুজ্জে মশাই আসতেন আমাদের বাড়িতে।

বলতেন—ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু—

আমি বাইরে আসতেই মুখুজ্জে মশাই বলতেন—তোমাদের কী আনতে হবে বলো ভায়া, আমি কাটনী যাচ্ছি—গুড় আনতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করতো? শুনেছি কাটনীতে খেজুরের গুড় উঠেছে—

আর শুধু কি গুড়! কারোর গুড়, কারো শাড়ি, কারো পাতলুন, কারোর গম ভাঙাতে হবে। অনেক রকম কাজ কাটনীতে। অনুপ-পুরে বলতে গেলে কিছুই পাওয়া যেত না। হপ্তায় একদিন হাট হত অনুপপুরে। স্টেশনের পিছন দিকে বস্তির ধারে ফাঁকা মাঠটাতে বাজার বসত। সেদিন অফিস ছুটি। সারা অনুপপুরের কলোনীটা সেদিন চুপচাপ। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেবের কারখানা বন্ধ। সাত দিনের মত আলু, পেঁয়াজ, শাক-সব্জি সেই হাট থেকেই কিনে রাখতে হবে। বিলাসপুর থেকে সোজা এক-জোড়া রেল-লাইন চলে গেছে কাটনীর দিকে। জব্বলপুর যেতে চাও কি বোম্বাই যেতে চাও তো ওই কাটনীতে গিয়ে ট্রেন বদলাতে হবে। আর ওই বিলাসপুর আর কাটনীর মধ্যখানে অনুপপুর। চারদিকে ধু ধু করছে ব্ল্যাক কটন সয়েল। কালো রং, গ্রীষ্মকালে ফুটিফাটা থাকে। তারপর জুন মাসের মাঝামাঝি যখন প্রথম মনসুন শুরু হবে, বৃষ্টির জল পড়তে না পড়তে সেই ফাঁক থেকে সব সাপ বেরিয়ে আসবে। ক্রেট সাপ। কালো কালো সরু লম্বা চেহারার সাপগুলো। তখন সব সাপগুলো ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। উঠোনে বারান্দায় রান্না-ঘরে, বিছানার মধ্যে পর্যন্ত এসে ঢোকে। অফিস থেকে কার্বলিক এসিড দিয়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে। বাড়ির চারদিকে কার্বলিক এসিড ছড়িয়ে দিয়ে যায় অফিসের মেথররা। তবু সাপ আসে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—বেনারসীকে চেনেন না আপনি?

সে কী কাণ্ড! সি-পির গরম তখন, দুপুরবেলা লু ছোটে। রাতে ঘুম হয় না কারো। ইলেকট্রিক আলো নেই, ইলেক-ট্রিক পাখা নেই। সব খড়ের চালের ঘর নদীর ধারে থাকে। শোন নদী দেখতে এক ফোঁটাও জল আছে কি না আছে। কন্-ট্রাক্টার হুকুম সিং-এর লোক এপার থেকে ওপারে যায় হাঁটুর কাপড় তুলে। পাথুরে মাটি। নদীর তলাতেও পাথর। এলোমেলো এবড়ো-খেবড়ো জায়গা। সেই নিয়েই অনুপপুরের কলোনী। কিছু বাঙালী, কিছু হিন্দুস্থানী। সবাই কনস্ট্রাকশানের চাকরিতে এসে জুটেছে অনুপপুরে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু জমি, তারই উপর সব কয়েকটা সিমেন্টের দেয়াল, পাকা উঠোন আর খড়ের চালের বাড়ি। আবার মাঝখানে কিছু কিছু খাদ। খাদের ভিতর জঙ্গল। সেখানে সাপ খোপ কিছু। আবার তারপরই উঁচু জমি। জমির উপর কয়েকটা বাড়ি। যখন লু ছোটে দুপুরবেলা তখন কেউ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারে না। হু হু করে হাওয়া বয় পশ্চিম থেকে। চালের খড়-গুলো উড়ে উড়ে উঠে পড়ে। রাস্তার উপর কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো থাকে, সে গুঁড়োগুলো উড়ে উড়ে ঘরের বন্ধ জানালা দরজায় এসে লাগে। উঠোন ঘর দোর বিছানা বালিস সব ধুলোয় ধুলো। প্রেমলানি সাহেবের কারখানায় যারা কাজ করে তারা নাকে কাপড় বেঁধে রাখে। ফারনেস্ জ্বলে হু হু করে। কাঠ চেরাই হয় ইলেকট্রিক করাতে। লোহা গরম করে পেটাই হয়। সেই শব্দ সমস্ত কলোনীর লোকের কানে তালা লাগিয়ে দেয়।

সকাল আটটায় জেনকিন্স সাহেবের আপিস খোলে।

তখন বাবুরা ওই কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেন-কিন্স সাহেবের আপিসে গিয়ে ঢোকে। বারোটার সময় খেতে আসে সবাই, তারপর আবার দেড়টার সময় অফিস। খড়ের চালের ভিতর জেনকিন্স সাহেব যেন ঘরের মধ্যে

জ করে। আর চারপাশের মস্ত ঘরটায় বেয়ারা বসে। মুখুজ্জে মশাই লম্বা টেবিলের উপর কাগজ পেতে স্কেল পেন্সিল নিয়ে ড্রাফট্‌সম্যানের কাজ করেন—আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ডিবে বার করে পান খাচ্ছেন।

কাজ করতে করতে নটু ঘোষ বলে—ও মুখুজ্জে মশাই, পান কই?

মুখুজ্জে মশাই বলেন— পকেট থেকে তুলে নিন দাদা, হাত জোড়া—

—মুখুজ্জে গিন্নীর হাতে মধু আছে দাদা, এমন পান—বলে নটু ঘোষ দুটো পান তুলে নিয়ে আবার ডিবেটা পকেটে পুরে দেন।

খেতে বসে প্রেমলানি সাহেব বউকে জিজ্ঞেস করেন—এ বাংগালী ভাজি কে দিলে—

প্রেমলানি সাহেবের বউ বলে—ওই মুখার্জিবাবুর বহু—

আলু আসুক, পেঁয়াজ আসুক, কপি কড়াইশুঁটি, যা-ই আসুক কাটনী থেকে, মুখুজ্জে গিন্নী নানারকম তরকারি রান্না করে আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সামান্য নিরামিষ তরকারি তাই-ই এমন চমৎকার রাঁধে, সবাই বাহবা দেয়। এমন রান্না কেউ কোনও বাড়ি বউ রাঁধতে পারে না। ছেলে-পুলে হয়নি। বাজা মানুষ। ওই স্বামীটি আর নিজে।

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—সারাদিন কী করি দিদি, কাজ তো আর নেই, তাই বসে বসে রাঁধি—

গিন্নীরা বলত—তোমার রান্না খেয়ে তো কর্তাদের জিভ বদলে গেছে ভাই—মুস্কিল হয়েছে, আর বাড়ির রান্না পছন্দ হয় না—

মুখুজ্জে গিন্নী হাসত। বলত—তা কর্তা বদলাবার উপায় তো আর নেই দিদি, থাকলে না-হয় চেষ্টা করে দেখতাম—

অম্বিকা মজুমদার অনুপপুরের স্টেশন মাস্টার। কলোনীর লোক না হলেও কলোনীর লোকের সংগে ভাব খুব। হাস-পাতালের লাগোয়া খেলার মাঠে টেনিস খেলতে আসেন। ডাক্তারবাবু, প্রেমলানি সাহেব, নটু ঘোষ, হুকুম সিং সবাই খেলে। কলোনীর তাসের আড্ডায় রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলে সেই এক মাইল রাস্তা হেঁটে আবার স্টেশনের কোয়ার্টারে ফিরে যান। তাঁর ছেলের অন্নপ্রাসনে সকলের নেমন্তন্ন হল। কাটনী থেকে ফুলকপি আর কড়াইশুঁটি এনে দিয়েছিলেন মুখুজ্জে মশাই। বলতে গেলে বাজারটা তিনিই করে দিয়েছিলেন। অন্তত তিনশো টাকার বাজার দুশো টাকার মধ্যে করে দিয়েছিলেন। জেনকিনস্ সাহেবও এসেছিলেন খেতে। চপ্, কাটলেট, পাঁটার মাংসের কালিয়া। তার-পর দই রসগোল্লা—

জেনকিন্‌স্ সাহেব কাটলেট খেয়ে বললেন—বাঃ, ভেরি গুড কাটলেট, আট-বছর এরকম খাইনি—কে রেঁধেছে?

মজুমদারবাবু বললেন—মিসেস মজুমদার।

সাহেব জিজ্ঞাস করলেন—মিসেস মজুম-দার কে?

——আমাদের ড্রাফট্‌সম্যান মিস্টার মুখার্জির ওয়াইফ—

সাহেব বললেন—আই সী, মাই কন্‌-গ্রাচুলেশনস্ টু হার—

মজুমদারবাবু ভিতরে গিয়ে বললেন। মুখুজ্জে গিন্নী সোজা বাইরে চলে এল। একেবারে সাহেবের সামনে এসে নমস্কার করলে। কোনও আড়ষ্টতা নেই। বেশ স্বচ্ছন্দ ভাব। একটা শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে ঢেকে নিয়েছে। মুখে একটু সলজ্জ হাসি। কপালের সামনে একটা গোল টিপ্।

সাহেব হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন—আপ্‌কা কাটলেট বহুত্ আচ্ছা হুয়া—

বলেই সাহেব হেসে ফেললেন। সবাই-ই হাসল। সাহেবের হিন্দী বলা কেউ শোনেনি।

মুখুজ্জে গিন্নী খাওয়ার পর একটা পান এনে দিলে।

বললে—এটা খান সাহেব, এটাও আমা-দের হাতের তৈরি।

নটু ঘোষের স্ত্রী বললে—তোমার সাহস বলিহারি ভাই, ওই লাল-মুখো সাহেবের সামনে গেলে কী করে? আমাদের তো ভয় করে দেখলেই!

তারপর বাবুরা খেতে বসল। প্রেমলানি সাহেব মুখে দিয়েই বাহবা বাহবা করে উঠলেন। বললেন—মিসেস মুখার্জি খুব ভালো কুক আছেন—

নটু ঘোষকেও বলতে হল—না মুখুজ্জে মশাই, মুখুজ্জে গিন্নীর বাহাদুরি আছে—

মজুমদারবাবু বললেন—আমি তো চপ্ কাটলেট করাতেই চাইনি প্রথমে, ও-সব আমাদের বাড়ি কেই বা করতে জানে, আর সেসব কারিগরই বা এখানে কোথায়—তা মুখুজ্জে গিন্নী নিজে থেকেই বললেন—উনি মাংস এনে দেবেন খন, আমি চপ কাটলেট করে দেব—

বহুদিন বন জংগলের মধ্যে বাস করে করে শহরের কথা সবাই-ই ভুলে গেছে। জেনকিন্‌স সাহেব খাস বিলেত থেকে এই ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি নিয়ে এখানে এই বন-জংগলের মধ্যে এসে পড়েছে। রেফ্রিজারেটর, বরফ, ফ্যান, লাইট, টেলিফোন, রেডিওর দেশ থেকে একেবারে সি-পির জংগলে। না পাওয়া যায় মাটন্, না পাওয়া যায় আইসক্রীম। সন্ধ্যা হতে-না-হতে ভন্ ভন্ করে মশা। তারপর সাপ, কেঁচো, মাকড়সা, কেন্নো, পিঁপড়ে, উইপোকা, সবই আছে। সাহেব গরমের চোটে গায়ের জামাই খুলে ফেলে এক-এক সময়ে। হাত দিয়ে চুলকোয় খ্যাশ্ খ্যাশ্ করে। রদ্দুরে মাথার টাক জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়।

প্রেমলানি সাহেবও শহরের লোক। সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে বাড়ি। করাচীতে কোন্ চাকরি করত একটা। সে অফিস বুঝি উঠে যায় হঠাৎ। তারপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এইখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন।

নটু ঘোষ বহুদিন দেশে চাকরি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই চাকরি পান না। অনেকদিন বাড়ির অন্ন ধ্বংস করতে হয়েছিল বসে বসে। শেষে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত করে চাকরিটা পান।

এমনি সকলেই।

সাধ করে কেউ এখানে আসেনি। স্টোরের বড়বাবু কলকাতায় পঞ্চাশ বছর চাকরি করে রিটায়ার করেছিলেন। বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে শেষ-জীবনটা কাটাতে পারতেন। সাত্ত্বিক মানুষ। স্বপাক আহার করেন। কারো হাতের ছোঁয়া খান না। বিয়ে থা করেন নি, সংসারে একা ছিলেন। সুদের সামান্য টাকা দিয়ে নিজের জীবনটা চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাংকটা ফেল মারল।

বলেন—আমি জীবনে কাউকে ঠকাইনি নটুবাবু—সেই আমিই শেষকালে কিনা ঠকলুম—

নটু ঘোষ বলেন—ভগবানের মার, আইনের পার—কথাতেই আছে যে ভুধরবাবু!

ভূধরবাবু পান খান না, নস্যি নেন না। সিনেমা দেখার বাতিক নেই। বিয়ে করেননি সুতরাং সে-বালাইও নেই। শুধু ধর্ম-কর্ম করার একটু অসুবিধে হয়।

বলেন—কী দেশে যে এলুম, না-আছে

একটা ঠাকুর দেবতা, না আছে একটা মন্দির—

বরাবর তাঁর গঙ্গাস্নান করা অভ্যেস। বাড়ির কাছে গঙ্গা ছিল। সেখানে ঘাটে বসে আহ্নিক করতেন। নিজের কোষা-কুষি আসন সব নিয়ে যেতেন। আর সমস্ত ঘাটটা ঝাঁটা দিয়ে ধুতেন নিজের হাতে সাহেব কোম্পানীর চাকরি। কাপড়ের নিচে শার্টটা ঢুকিয়ে দিয়ে উপরে কোট চড়াতেন। সাহেবদের মহলে সৎ বলে সুনাম ছিল।

ছোট অফিস। ভূধরবাবুই ছিলেন সব। ভেবেছিলেন শেষ জীবনটা একরকম কেটে যাবে তাঁর। তারপর হঠাৎ ব্যাঙ্কটি ফেল হয়ে গেল। ভেবেছিলেন টাকাগুলো কোনও আশ্রমে দিয়ে শেষ জীবনটা ধর্মে কর্মে কাটাবেন। ধর্মই ছিল তাঁর আসল নেশা।

বলতেন—চাকরিই করি সাহেবদের কাছে, তাই গুড্‌মর্নিং বলতে হয়, কিন্তু ও-বেটারা কি মানুষ!

নটু ঘোষ বলতেন—তা মানুষ নয় তো কী? দেখছেন তো সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে, আমাদের মাথার ওপর বসে রাজত্ব করছে কী করে শুনি?

ভূধরবাবু বললেন—ম্লেচ্ছ সব, জাত-ধর্ম যাদের নেই তারা আবার মানুষ! আমি তো রোজ আপিস থেকে চান করে ফেলতুম মশাই—

—বলেন কী?

ভূধরবাবু বলতেন—এখনও চান করে ফেলি। এই যে অফিসে এসে কাজ করছি, এখান থেকে গিয়েই এই জামা-কাপড় ছেড়ে গামছা পরব, পরে নিজের হাতে সব জল-কাচা করে ফেলব—

অম্বিকাবাবুর বাড়িতে তাঁরও নেমন্তন্ন ছিল।

ভূধরবাবু বললেন—আমাকে মাপ করবেন মশাই, আমি স্বপাক ছাড়া আহার করি না—

মজুমদারবাবু বললেন—আমার বাড়িতে রান্না-বান্না সবই মুখুজ্জে গিন্নী করবেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আমি অন্য কাউকে ছুঁতেই দেব না। পরিবেশনও করবেন তাঁরাই—

তবু ভূধরবাবু যাননি খেতে।

নটু ঘোষ বললেন—আপনি কাল গেলেন না, আঃ কী কাটলেটই করেছিলেন মুখুজ্জে গিন্নী কী বলব বড়বাবু, জেনকিন্‌স সাহেব খেয়ে একেবারে—

ভূধরবাবু বললেন—ও-সব তামসিক আহার, ওতে কেবল মনের জড়তা বাড়ে বই তো নয়!

নটু ঘোষ বললেন—জড়তা বাড়ুক আর যা-ই হোক মশাই, অনেকদিন পরে খেয়ে একটু বাঁচলুম, এমন কাটলেট কলকাতাতেও খাইনি—

সেই কবে ভূধরবাবু চাকরির একটা দর-খাস্ত করেছিলেন। তখন ভাবেন নি যে এইরকম দেশ। এসে তাজ্জব হয়ে গেছেন। নদীতে যান বটে চান করতে, কিন্তু এতটুকু জল। তাতে না ভেজে কাপড়, না ভেজে মাথা। সেই এক-পা জলে দাঁড়িয়েই একটু নম নমঃ করে ইষ্টমন্ত্রটা জপ করে নেন। মন প্রসন্ন হয় না। অনুপপুরে কাটিয়ে দিলেন কটা বছর, তার মধ্যে একটা দিনও জপ-আহ্নিক করে তৃপ্তি পান না। হাটবারে মুখুজ্জে মশাই এসে জিজ্ঞেস করেন—কিছু আনতে হবে বড়বাবু, কাটনী যাচ্ছি—

ভূধরবাবু বললেন—আলুটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আনলে হত—

মুখুজ্জে মশাই বললেন—তা দিন না, আমি তো যাচ্ছিই, একসঙ্গে এনে দেব—জেনকিন্‌স সাহেবের জন্যে মুরগীর ডিমও আনব দু-ডজন—

ভূধরবাবু আঁতকে উঠলেন।

—তবে থাক মুখুজ্জে মশাই, ওই মুরগীর ডিমের ছোঁয়া জিনিস আমার দরকার নেই—আমি না-খেয়ে উপোস করব, মরব, তবু আপনাদের মত জাত দিতে পারব না। চাকরি করতে এসেছি বলে জাত খোয়াতে পারব না—

তা মুখুজ্জে মশাই-এর তাতে বিশেষ কিছু রাগ-বিরাগ ছিল না। মুখুজ্জে মশাই হাসতেন। বাজারের থলিটা নিয়ে যেতেন প্রেমলানি সাহেবের বাড়ি।

—কিছু আনতে হবে নাকি সাহেব!

—তুমি যাচ্ছো মিস্টার মুখার্জি, আমার কিছু গম ভাঙিয়ে আনতে হবে, পারবে?

মুখুজ্জে মশাই বলতেন—পারব না কেন? আমি তো সকলের জিনিসই আনছি। জেনকিনস্ সাহেব, এই ঘোষ বাবু, সকলেই আনতে দিয়েছে—ডাক্তারবাবুর বিশ সের আলু আনব আর আপনার গমটা ভাঙিয়ে আনতে পারব না!

প্রথম-প্রথম অনুপপুরে কিছুই ছিল না। ডাক্তারবাবুই এখানকার প্রথম লোক। তখন এ-সব ঘর-বাড়ি কিছুই হয়নি। প্রথমে তাঁবুতে থাকতে হত। ইস্টিশানের ধারে ধারে তাঁবু সাজানো ছিল সার সার। তখন প্রেম-লানি সাহেবও আসেনি, নটু ঘোষও না। দেড়শো কেরানীর কেউই আসেনি। আপিসের কেউই আসেনি এক ডাক্তারবাবু আর জেন্‌-কিন্‌স সাহেব ছাড়া। ওষুধ এল খড়গপুর থেকে দু'বাক্স ভর্তি। সেই দু'বাক্স ওষুধের উপর নির্ভর। অবশ্য হুকুম সিং আগেই এসেছে। নদীর ওপারে দোতলা বাড়িতে নিজের থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কাঠের দোতলা আর টিনের চাল। আর কুলী মজুররা এসেছে। কুলী-মজুররা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করেছে। ঘর-বাড়ি করেছে। রাস্তা করেছে। হাসপাতাল করেছে। তারপর একে একে আপিস চালু হয়েছে। হুকুম সিং-এর তিনজন কুলীকে সাপে কামড়েছিল। কেউটে সাপ।

হুকুম সিং বলত—কী জঙ্গল ছিল এখেনে—বাঘ আসত রাত্তির বেলা—

হুকুম সিং বাঘও মেরেছিল দুটো। বাঘ নদীর ধার বরাবর জল খেতে আসত রাত্তির বেলা। নিজের বাড়ির দোতলা থেকে রাইফেল দিয়ে দুটো বাঘ দুদিন মেরেছিল। তখন আমরা আসিনি। জেনকিন্‌স সাহেবও আসেননি।

তা কনস্ট্রাকশানের চাকরিতে এ-সব ভয় করলে চলবে না।

নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। অনুপপুর থেকে এক জোড়া রেল-লাইন সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। অনুপপুরের পর দুর্বাসীন। তারপরের ইস্টিশানের নাম হবে বিজুরি। তারপর মহেন্দ্রগড়। তারপর শেষ স্টেশনের নাম হবে চিরিমিরি। বড় বড় শাল গাছ। দু'হাতে বাড়িয়ে বেড় দিয়ে ধরা যায় না। শাল আর মহুয়া। গাছগুলো সব মাথা ছাড়িয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। ওপর দিকে চোখ তুললে আকাশই দেখা যায় না জায়গায় জায়গায়। কুলীরা কাজ শেষ করে রাত্রে ছাউনীতে এসে শোয়। মাঝ-রাত্রে বাঘ আর ভাল্লুক এসে ঘোরা-ঘুরি করে ছাউনীর চারপাশে। থাবার দাগ দেখা যায় সকালবেলা।

বিজুরি থেকে 'তার' আসে। 'ডাক' আসে। সেই 'ডাক' খোলে ডেস্‌প্যাচ্‌ বাবু। ডেস্‌প্যাচ্‌বাবু মধুসূদন হাজরা। 'ডাক' খুলেই মধুসূদন বলে—ওহে, আজ তিন-জনকে বাঘে নিয়েছে, জানলে হে—

ভূধরবাবু বলেন—আমাদেরও কোন্‌দিন নেবে—

নটু ঘোষ বলেন—অনুপপুরে বাঘ আসতে পারবে না। এত বন্দুক, আলো—বাঘের বুঝি ভয় নেই ভেবেছেন?

মুখুজ্জে মশাই কোনও কথাতেই কথা বলেন না। একমনে লম্বা উঁচু টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেট্‌ স্কোয়ার আর স্কেল দিয়ে কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টেনে যান। আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ডিবে বার করে পান খান।

নটু ঘোষ বলেন—দাও হে মুখুজ্জে তোমার পান দাও একটা, হিসেবটা মিলতে চাইছে না মোটে—

মনে আছে মুখুজ্জে মশাইকে আমি প্রথমে দেখিনি। টেনিস্ খেলতে আসে

যারা তাদেরই ভালো করে চিনতাম। স্টেশন মাস্টার অম্বিকাবাবু ধুতি পরে খেলতেন। হুকুম সিং চোস্ত পায়জামা পরত। ফোরম্যান প্রেমলানি সাহেব তো পাকা সাহেব। আর জেনকিন্স সাহেব পরত হাফ প্যাণ্ট। আর চিনতাম ওভারশিয়ার নগেন সরকারকে। নগেন সরকারের বিয়ে হয়নি। এদিকে ওভারশিয়ার মানুষ। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করত। সন্ধেবেলা সেই বন-জঙ্গলের মধ্যে যখন সব চুপ-চাপ, যখন কারখানার করাত-চলার ঘড়-ঘড় শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে। হুকুম সিং-এর কুলীদের ডিনামাইট ফাটানোর শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে, তখন দূরে থেকে ওভারশিয়ারের ঘর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসত।

বর্ষাকালের আকাশ তখন কালো মেঘে জমাট বেঁধে আছে। এক হাত দূরের লোককে দেখা যায় না, তখন নগেন সরকার গাইছে—

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—

নগেন সরকার বলিষ্ঠ লোক। হাতের পায়ের বুকের মাসল ছিল মজবুত। লোহা পিটোন শরীর। হাফ প্যাণ্ট পরে কারখানার কাজ দেখত। ভারি কড়া ওভারশিয়ার। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেবের খুব প্রিয় লোক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করাত।

নটু ঘোষ বলতেন—কাল অনেক রাত পর্যন্ত গান গাইছিলেন যে সরকার মশাই—

নগেন সরকার বলত—তা কী করবো বলুন, আপনারা তো বউ নিয়ে বেশ লেপ চাপা দিয়ে ঘুমোবেন, আমি কী করি বলুন?

—তা বিয়ে করতে বারন করছে কে আপনাকে? বিয়ে করলেই হয়!

নগেন সরকার হাসত। বলত—আপনি একটা পাত্রী ঠিক করে দিন না, আমি বিয়ে করছি—

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—তা পাত্রী ঠিক করবো একটা তোমার জন্যে ভাই?

—করুন না, মুখুজ্জে গিন্নী, কিন্তু আপনার মত দেখতে হওয়া চাই—

মুখুজ্জে গিন্নী হাসত।

বলত—বলো গে যাও তোমার মুখুজ্জে মশাইকে, তাঁর তো মনই পাই না—

নগেন সরকার বলত—আপনাকে যার পছন্দ হয় না তার কপালে ধিক্ মুখুজ্জে গিন্নী?

—তোমার কপালে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই।

মুখুজ্জে গিন্নী হেসে গড়িয়ে পড়ত। কাঁধের আঁচলটা ভালো করে সরিয়ে দিয়ে বলত—এখন তো বলছ খুব, শেষে মুখুজ্জে মশাইএর মত একঘেয়ে লেগে যাবে—দেখবে।

নগেন সরকার বলত—তা পরীক্ষা করেই দেখুন না মুখুজ্জে গিন্নী—

—আর হয় না ভাই! মুখুজ্জে মশাইএর কষ্ট হবে।

—ওমা, তাই বলুন, আপনিই ছাড়তে পারবেন না তাই বলুন—

মুখুজ্জে গিন্নীও হাসত।

সামনে দাঁড়িয়ে নগেন সরকারও হাসত খুব হো হো করে।

মুখুজ্জে মশাইকে আমি প্রথম দেখি আমাদের বাড়িতেই। ছুটিতে দাদার কাছে গেছি। বেড়াতে।

বাইরে থেকে ডাক শুনেই বেরিয়ে এলাম—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু—

দেখি হাতে অনেকগুলো থলি। টিনের খালি বাক্স। জুতো পরা, মাথার চুলটার টেড়ি কাটা। পান খাচ্ছেন মুখ ভর্তি করে। আমাকে দেখেই কেমন থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন—কে তুমি?

বললাম—আমি ডাক্তারবাবুর ভাই, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি—

—ও, তা বেশ বেশ! কী করো? নাম কী?

বললাম সব।

আবার বললেন—বেশ বেশ! জায়গাটা ভালো খুব, দেখবে খুব মোটা হয়ে যাবে দুদিনেই, আমি এই এমনি রোগা ছিলাম জানো—

বলে হাতের ছাতাটা উঁচু করে দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়েই হেসে ফেললেন।

আমিও হাসলাম। বললাম—আপনি এখানে কাজ করেন বুঝি?

—হ্যাঁ, ড্রাফট্‌সম্যানের চাকরি করি। দুশো টাকায় আমার সব খরচা চলেও একশো সোয়াশো টাকা বেঁচে যায় ভায়া—

আমি কী বলবো!

মুখুজ্জে মশাই বকতে লাগলেন—কিন্তু কলকাতাতে? তিনশো টাকাতেও সংসার চালাতে নাকে দড়ি লাগাতে হতো—কী বলো, ঠিক বলিনি?

তারপর মুখ নিচু করে বলতেন—তা এখেনে খরচ তো কিছু নেই?

কেন? খরচ নেই কেন?

মুখুজ্জে মশাই বলল—আরে খরচ করব কী করে? পাওয়া যায় নাকি কিছু? আর সংসারে তো দুটি প্রাণী আমরা, আমি আর গিন্নী—

তারপর বলতে লাগলেন—এই কাটনীতে যাচ্ছি, একেবারে এক হপ্তার আলু বেগুন নিয়ে আসব, আর খরচ যা কিছু সব তো মাছে। ওই মাগুরমাছ কিনে জীইয়ে রেখে দিই—কত খাবে খাও না—

এমন সময় দাদা আসছিল।

—এই যে ডাক্তারবাবু, আপনার কী আনতে হবে বলুন!

দাদা বললে—পাঁউরুটি আনতে পারবেন মুখুজ্জে মশাই?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—আপনি হাসালেন, জেন্‌কিনস্ সাহেবের ডিম আনছি, প্রেমলালানী সাহেবের গম ভাঙিয়ে আনছি বিশ সের, নটু ঘোষের গিন্নীর শাড়ি, মজুমদারবাবুর ছেলের জুতো—

দাদা হেসে ফেললে। বললে—আর বলতে হবে না মুখুজ্জে মশাই—

কাজটা মুখুজ্জে মশাই নিজেই একদিন যেচে নিয়েছিলেন। কোম্পানী থেকে রেলের পাশ দিত একটা বাজার করবার জন্যে। কিন্তু কে যায়? বিশ্বাসী লোক পাওয়া দুষ্কর। শেষে মুখুজ্জে মশাই নিজেই বললেন—আম বেতে পারি, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে—

সেই থেকেই শুরু হয়েছিল।



মুখুজ্জে গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলে বলত —আসলে তা নয় দিদি, উনি একটু ভালো মন্দ খেতে ভালোবাসেন—

বলতাম—আপনি যেমন রাঁধেন, ও-রকম রান্না পেলে সবাই-ই ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসবে—

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—রান্না করার মধ্যে আর কী বাহাদুরি আছে—

নটু ঘোষের বউ বলত—তোমার কাছে শুক্তুনি রান্না করতে শিখে যাবো ভাই একদিন—

মুখুজ্জে গিন্নী বলতো—ওমা, আপনাকে আমি আবার রান্না শেখাবো কি দিদি?

—না ভাই, সেদিন তোমার রান্না খেয়ে ওঁর কী সুখ্যাতি—

—ওমা, কবে?

—ওই যে সেদিন তুমি শুক্তুনি করে পাঠিয়েছিলে না, সে-খেয়ে উনি ভুলতে পারছেন না একেবারে, রোজ বলেন ওইরকম শুক্তুনি করতে!

মুখুজ্জে গিন্নীর সংসারের বিশেষ কাজ আর কী! মুখুজ্জে মশাই আপিস চলে গেলেই সব শেষ। তিনি খেতে আসেন দুপুরবেলা।

মুখুজ্জে মশাই খেতে খেতে বলেন—হ্যাঁ গো, নটু ঘোষ বলছিল, তুমি নাকি তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছিলে ওদের বাড়িতে—

মুখুজ্জে গিন্নী বলে—কিছু বলছিল বুঝি? সেদিন বেশি হয়েছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—

মুখুজ্জে মশাই বললেন—সেইরকম মাংসর কাটলেট করো না গো একদিন, সবাই তোমার মাংসর কাটলেট খেয়ে সুখ্যাতি করছিল—

বাড়িগুলো সকলেরই ছোট। অন্ততঃ একই মাপের। অনুপপুর থেকে ট্রেনগুলো যখন বিলাসপুরের দিকে যায়, ছোট ছোট চালাঘরগুলো দেখতে পায়। ছোট ছোট বাড়ি বটে, কিন্তু বেশ সাজানো। হুকুম সিং কণ্ট্রাক্টার বেশ ফিতে মেপে সাইজ করে বাড়িগুলো তৈরি করে দিয়েছে। জল আনতে হয় নদী থেকে ভারি করে। চার-ভারি জল চার পয়সা। প্রেমলালানী সাহেবের বউ বাগান করেছিল বাড়ির সামনে। ফোরম্যান সাহেবের পয়সা বেশি, লোকবলও বেশি। নানারকম গাছপালা করেছিল। বড় বড় গোলাপ ফুটিয়েছিল বাগানে। সেই ফুল মাঝে মাঝে জেন্‌কিন্‌স্ সাহেবকে পাঠিয়ে দিত।

সাহেব সেই ফুল টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখত।

কিন্তু সেদিন লাল বড় বড় ফুল সাজানো দেখে সাহেব বললে—কোন্ দিয়া?

এত বড় ফুল তো কোনও দিন আসেনি। বড় বড় পাপড়ি। পাপড়িগুলো ফেটে ফেটে যেন ভেঙে পড়ছে।

—কোন্ দিয়া বয়?

বয় বললে—হুজুর ড্রাফট্‌সম্যানবাবুকা আওরাৎ!

তা মুখুজ্জে গিন্নীর সাহসও কম নয়। জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব রোজ বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোত। এক হাতে ছড়ি, আর এক হাতে চেনে বাঁধা কুকুর। কুকুরটা ভারি শয়তান।

মুখুজ্জে গিন্নী তখন ঘোষ গিন্নীর সঙ্গে গল্প করে ফিরছিল। রাস্তার মাঝামাঝি আসতেই সামনে সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি। সাহেব চলেই যাচ্ছিল শিষ্ দিতে দিতে—

মুখুজ্জে গিন্নী দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—নমস্কার সাহেব—

সাহেবও অবাক হয়ে গেছে।

থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে?

মুখুজ্জে গিন্নী হাসতে লাগল। বললে—আমায় চিনতে পারছ না সাহেব, সেই কাটলেট খাইয়েছিলুম?

সাহেব কাটলেটের কথায় চিনতে পারলে।

বললে—তুমিই ফুল দিয়েছিলে কাল?

—হ্যাঁ সাহেব, কেমন ফুল বলো?

—ভেরি গুড, ভেরি বিগ্ সাইজ, তোমার ফুল আমার খুব পছন্দ—

বলে যে-সাহেব কখনও হাসে না সেই সাহেবই খুব হাসতে লাগল। আরো কাছে সরে আসছিল বুঝি হ্যান্ড্ শেক করতে।

মুখুজ্জে গিন্নী দু' পা সরে এল। হাসতে হাসতে বললে—আসি সাহেব, নমস্কার—

সাহেবও দু' হাত উঁচু করে নমস্কার করলে।

সেদিন প্রেমলালানী সাহেবের বউএর কাছে সেই গল্প করতে করতে মুখুজ্জে গিন্নী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বললে—কী জ্বালা দিদি, সাহেব আবার হাত বাড়িয়ে দেয়—আমি আবার বাড়ি এসে কাপড় কেচে ফেলে তবে বাঁচি—

—কেন কাপড় কাচলে কেন বহিন?

—কাচব না? ওদের কি জাত জন্ম আছে? গরু খায়, শুয়োর খায় বেটারা।

সেদিন ভূধরবাবুও অবাক হয়ে গেলেন।

মুখুজ্জে মশাই এসে বললেন—সত্য নারায়ণের সিন্নী হবে, যাবেন কিন্তু বড়বাবু—

—সত্য নারায়ণের সিন্নী? বলেন কি? আপনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ, হয় তো প্রত্যেকবার, তা বলতে পারিনে সকলকে কি না।

ভূধরবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন।

—প্রত্যেকবারই করেন? পুরুত পান কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—কাটনী থেকে আনি!

—কাটনী থেকে পুরুত আনেন?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—তা আনতে হয় বৈ কি! এখেনে তো আর ও-সব পাওয়া যায় না!

ভূধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা খরচ তো অনেক পড়ে আপনার? কত খরচ পড়ে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—পুরুতকে দক্ষিণে দিই সোয়া পাঁচ টাকা—

সোয়া পাঁচ টাকা?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—সোয়া পাঁচ টাকা না দিলে আসবে কেন কাটনী থেকে। এখানে এলে দুটো দিন তো নষ্ট? তারপর এখানে থাকা খাওয়া আছে, নৈবিদ্যি আছে—

কাটনী থেকে পুরুত এনে সত্য নারায়ণের পুজো করা শুনে ভূধরবাবু-যে-ভূধরবাবু তিনিও অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—তা আপনার গিন্নীর তো খুব ধর্মকর্মে মন আছে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—বুঝতেই তো পারছেন, হিন্দু আমরা, ও-সব তো ছাড়তে পারিনে! আমার গিন্নী বলে—বিদেশে চাকরি করতে এসেছি বলে তো হিন্দুত্ব খোয়াই নি—

ভূধরবাবু বললেন—নিশ্চয়ই যাবো মুখুজ্জে মশাই, এ-সব কাজে আমি আছি, আমিও তো তাই বলি। বিদেশে ম্লেচ্ছদের নিচেয় কাজ করতে এসেছি বলে জাত দিয়ে দিয়েছি! বড় ভালো লাগলো কথাগুলো! আজকালকার দিনে এমন মহিলাও যে আছেন এ-ও এক আশার কথা—

তা সিন্নীটাও খুব ভালো হয়েছিল খেতে।

আমি দেখেছি মুখুজ্জে গিন্নীর সিন্নী তৈরি।

সেদিন সকাল থেকে সারাদিনই মুখুজ্জে গিন্নীর উপোষ। নদীতে ভোর বেলা চান করে এসেছে। তখন কোনও লোক ওঠেনি অনুপপুরে। রাত তখন প্রায় চারটে।

নটু ঘোষের বউ শুনেছিল। বললে, একলা তোমার অত রাত্তিরে ভয় করেছিল না ভাই?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—ঠাকুরের নামে গেছি আর এসেছি—ভয় করবে কেন?

তারপর সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত সারাদিন উপোষ করে পুজো করে প্রসাদ মুখে দিয়েছে।

নটু ঘোষ বললেন—তোমার গিন্নী তো খুব হে?

ভূধরবাবু বললেন—সব মেয়েরা যদি মুখুজ্জে গিন্নীর মত হতো তো ভাবনা কিসের ভাই আমাদের দেশের!

ওভারশিয়ার নগেন সরকার ছিল। বললে—হারমোনিয়মটা আনলে আমি একটা শ্যামাসংগীত গাইতে পারতাম—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমার হারমোনিয়ম আছে ঠাকুরপো, দেব?

—আপনার হারমোনিয়ম? আপনিও বুঝি গান গাইতে পারেন মুখুজ্জে গিন্নী?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—একটু একটু পারি ঠাকুরপো, তা সে তোমাদের শোনবার মত নয়—

নগেন সরকার চেপে ধরল।

বললে—তা হলে একটা গাইতে হবে মুখুজ্জে গিন্নী, সে বললে শুনছি না—

ভূধরবাবু কিছু বলছিলেন না। নটু ঘোষ বললেন—মুখুজ্জে গিন্নীর কি গান-টানও আসে নাকি?

সবাই-ই অবাক হয়ে গেছে। এমন ধর্ম-শীলা মহিলা, এত ভক্তি, এমন চমৎকার রান্না করতে পারে, সে আবার গানও গাইতে পারে!

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তুমি আগে গাও একটা, শুনি?

প্রেমলালানী সাহেবের বউ, নটু ঘোষের স্ত্রী—তারাও অবাক হয়ে গেছে। বলে কী! গানও জানে নাকি! নটু ঘোষের স্ত্রী বললেন—তোমার ভাই অশেষ গুণ!

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—না দিদি, তেমন গান জানি না, ওই শুনে শুনে যে-টুকু শিখেছি তাই আর কী—

হারমোনিয়ামটা বার করে দিলে মুখুজ্জে-গিন্নী। অনেক দিন ব্যবহার হয়নি। বাক্সের ওপর ধুলো জমে আছে।

ওভারশিয়ার নগেন সরকার বললে—বাঃ, এ যে ডবল-রীডের হারমোনিয়ম দেখছি, আবার স্কেল চেঞ্জিং—অনেক দাম এর!

নটু ঘোষের স্ত্রী বললেন—কর্তার বুঝি গানের শখ আছে তোমার ভাই?

মুখুজ্জে গিন্নী হাসল।

বললে—না দিদি, ওঁর আবার গানের শখ! উনি কেবল খেতে জানেন আর বাজার করতে জানেন—
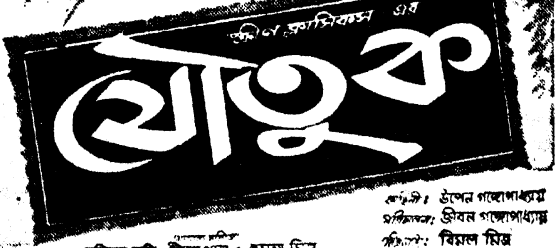
—তবে হারমোনিয়াম তুমি কিনেছিলে কেন?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—সে কি আজকে কিনেছি? সে কোন্ যুগে! বিয়ের আগে কিনেছিলাম, মা কিনে দিয়েছিল!

নগেন সরকার কী গাইলে কে জানে! কেউ বিশেষ শুনল না। নটু ঘোষ হাই তুলতে লাগলেন। প্রেমলানী সাহেব বাড়িতে ছেলেমেয়ে রেখে এসেছেন। তাঁরও যাবার তাড়া ছিল। ভূধরবাবুও যাই-যাই করছিলেন।

এক সময়ে নগেন সরকার গান থামাল।

তারপর হারমোনিয়ামটা মুখুজ্জে গিন্নীর দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—এবার আপনি গান মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—আমি কী আর গাইব, সংসারে ঢুকে ও-সব পাট তো চুকে গিয়েছে অনেক দিন, ভুলেও গেছি কথা-গুলো—

বলে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে প্যাঁ পোঁ করলে খানিকক্ষণ। পা দুটো একদিকে জড়ো করে বসে এক হাতে বেলো করতে করতে গান ধরল—

শ্যামা মা কি আমার কালো—

ভূধরবাবু খাড়া হয়ে বসলেন।

নটু ঘোষের এতক্ষণ ঘুম পাচ্ছিল। তিনিও সজাগ হয়ে উঠলেন।

প্রেমলানী সাহেব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চোখ বুজে মাথা নিচু করে রইলেন। চারদিকে সবাই নিস্তব্ধ। গানের সুরে যেন ভাবের জোয়ার লাগল সকলের মনে। আমি বসেছিলাম একেবারে মুখুজ্জেগিন্নীর সামনে। মুখুজ্জেগিন্নী ঠিক আমার মুখো-মুখি বসে গাইছিল। মুখুজ্জেগিন্নীর কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। চুলগুলো এলো করে পিঠের উপর ছড়িয়ে দেওয়া। সারাদিন তাঁর উপোস গেছে। উপোসের পর তাঁর মুখে কেমন যেন একটা করুণ প্রসন্নতা জড়িয়ে ছিল। তসরের লালপাড় শাড়িটা সারা শরীরটায় জড়ানো, মাথায় একটু স্বল্প ঘোমটা। মুখুজ্জেগিন্নী গাইছিল—আর আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম।

সে যে কী গান।

ভূধরবাবু ভাবের ঝোঁকে গানের মধ্যেই যেন এক-একবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। প্রেমলানী সাহেব তখনও চোখ বুজে মাথা নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন। নটু ঘোষ ভেবে যেন কোনও কিছুর কুল-কিনারা পাচ্ছিলেন না। তিনি অবাক হয়ে শুধু চেয়ে ছিলেন মুখুজ্জেগিন্নীর মুখের দিকে হাঁ করে। প্রেমলানী সাহেবের বউ, নটু ঘোষের স্ত্রী—দুজনেরই মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে। মনে আছে অনুপপুরের সেই কল্যাণীর চালা-ঘরের সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনে আমরা সব কটি প্রাণী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্যে।

কখন যে গান থেমে গেছে বুঝতে পারেনি কেউ।

নটু ঘোষ বললেন—বাঃ, চমৎকার—

প্রেমলানী সাহেব বলে উঠলেন—ওয়াণ্ডারফুল — ওয়াণ্ডারফুল — মার্ভে-লাস—

নগেন সরকার বললে—মুখুজ্জেগিন্নী, আপনি এমন ভালো গাইতে পারেন আর আমাদের কিনা অ্যাদ্দিন বঞ্চিত রেখে-ছিলেন—ইস্—

ভূধরবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নি।

এবার যেন তাঁর ধ্যান ভাঙল। বললেন—মা—মা—

তারপর বললেন—সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপা না থাকলে এমন কণ্ঠ কারো হয় না হে নগেন সরকার, তুমি সাক্ষাৎ মা আমাদের—

মুখুজ্জেগিন্নী লজ্জায় পড়ল।

বললে—কী যে বলেন আপনি বড়বাবু, ও-সব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না আপনি, মায়ের নাম করতে কি আর কণ্ঠ লাগে!

নটু ঘোষের বউ সামনে সরে এসে হাতটা জড়িয়ে ধরলেন মুখুজ্জেগিন্নীর।

বললেন—তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে ভাই—

মুখুজ্জেগিন্নী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে—ছি ছি ও-কথা বললে আমার পাপ হয় দিদি—বলে নটু ঘোষের স্ত্রীর পায়ের ধুলো নিতে গেল।

ভূধরবাবু বললেন—তোমার কুষ্ঠি আছে মুখুজ্জেমশাই?

মুখুজ্জেমশাই এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিলেন। কোনও কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না যেন।

বললেন—কুষ্ঠি তো আমার নেই বড়-বাবু—

নটু ঘোষ লাফিয়ে উঠলেন।

বললেন—কেন কেন? আপনি কুষ্ঠি দেখতে জানেন নাকি বড়বাবু?

ভূধরবাবু বললেন—না, দেখতাম মুখুজ্জে-মশাইয়ের জায়া-স্থানে কোন্ গ্রহ আছে, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে না থাকলে কপালে এমন বউ পায় না কেউ—

সত্যিই মুখুজ্জেমশাই-এর পত্নীভাগ্য ভালো। শুধু রাঁধতে পারে কিম্বা গান গাইতে পারে বলেই নয়, মুখুজ্জেগিন্নীর অনেক গুণ! গুণের যেন শেষ ছিল না মুখুজ্জেগিন্নীর। বাড়িতে গিয়ে দেখতাম মুখুজ্জেমশাই অফিস চলে যাবার পর মুখুজ্জেগিন্নী ঘর গুছোচ্ছে। মুখুজ্জে-মশাই-এর জামা-কাপড় সব আলনায় সাজিয়ে রেখে ঘর-দোর ঝাঁট দিচ্ছে। অথচ সকালবেলাই ঝি এসে ঝাঁট দিয়ে গেছে।

বলতাম—এ কি মুখুজ্জেগিন্নী, নিজে ঝাঁট দিচ্ছ যে?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত—ঝি-র যেমন কাজের ছিরি, নিজে ঝাঁট না-দিলে কি চলে? আমি নোংরা দেখতে পারি না মোটে—

অথচ নিজের বাড়ির কাজটুকু করলেই চলে না। খাওয়া-দাওয়ার পর যখন মুখুজ্জে-মশাই অফিস চলে যেতেন, তখন এক ফাঁকে মুখুজ্জেগিন্নী বেরিয়ে পড়তো। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সেই রোদ্দুরের মধ্যেই মুখুজ্জেগিন্নী মাথায় আঁচলটা আড়াল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে প্রেমলানী সাহেবের অন্দরমহলে গিয়ে ডাকত—কই গো, সাহেব-বৌ কোথায়?

প্রেমলানী সাহেবের বৌ তখন হয়ত দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানার উপর ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। মোটা-সোটা মানুষ।

মুখুজ্জেগিন্নীর ডাকে উঠে পড়ে সাহেব-বৌ।

মুখুজ্জেগিন্নী বলে—এই একটু ঘুম ভাঙাতে এলুম সাহেব-বৌ-এর—

—এসো বহিন, এসো এসো।

মুখুজ্জেগিন্নী বলত—এই এত ঘুমোও বলেই এত মোটা হয়ে যাচ্ছো তুমি দিদি, আর দুদিন বাদে প্রেমলানী সাহেব তোমায় জড়িয়ে ধরতে পারবে না।

সাহেব-বৌ হাসতে লাগলেন। মুখুজ্জে-গিন্নীও হাসতে লাগল খিল্‌খিল্ করে।

সাহেব-বৌ বললেন—আর প্রেমলানী সাহেব এখন তো বুড়ো হয়ে গেছে বহিন।

মুখুজ্জেগিন্নী বলত—ওই বুড়ো বয়েসেই তো রস বেশি সাহেব-বৌ, এই বয়েসেই তো দুধটি মরে ক্ষীরটি হয়। পিরীত জমে ভালো—

সাহেব-বৌ বুঝতে পারে না। বাংলাই অতি কষ্টে বলে।

বললে—পিরীত কী?

মুখুজ্জেগিন্নী বলে—পিরীতের কথা তুমি বুঝবে না সাহেব-বৌ, পিরীতি করম পিরীতি ধরম, পিরীতি জীবন-সার, বুঝলে কিছু?

—না বহিন, বুঝলাম না। আমাকে বাংলাটা শিখিয়ে দাও না, তোমায় কতদিন ধরে বলছি।

মুখুজ্জেগিন্নী হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দেয়। বলে—সে পরে শেখাব, এখন তোমার কাছে অন্য কাজে এসেছি সাহেব-বৌ, তোমার সাহেব কেমন আছে?

প্রেমলানী সাহেবের আবার কী হল? সাহেব-বৌ ঠিক বুঝতে পারলে না।

—তুমি দেখছি ডাক্তারের কিছুছু খবর রাখো না সাহেব-বৌ। শোন—

বলে আঁচলের গেরো খুলে কী-একটা শেকড় বার করে বললে—এই এইটে বেশ ভালো করে জলে ধুয়ে শিলে বেটে নিয়ে কাল সকালে সাহেবকে খাইয়ে দিও তো—সেদিন সাহেবের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তোমার সাহেবের তো আবার লজ্জা খুব, আমাকে দেখে আবার পাশ কাটিয়ে [illegible]

বললাম—কেমন আছেন সাহেব?
তোমার সাহেব বললে—কোমরে ব্যথা হ, ক'দিন ঘুম হচ্ছে না ভালো—
তা এই শেকড়টা খেলে ঘুম হবে ভালো, কোমরের ব্যথা সেরে যাবে।
তারপর সাহেব-বৌএর কানের কাছে মুখ নে বললে—কিন্তু একটা কথা আছে সাহেব-বৌ, এই শেকড়টা যদ্দিন ধারণ করবে, তোমরা দু'জনে এক বিছানায় শুতে পারবে না—কেমন, মনে থাকবে তো? ন কেমন করবে না তো?
সাহেব-বৌ খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল কথা শুনে। মুখুজ্জেগিন্নীও কথাটা লে হেসে উঠল।
—যাই সাহেব-বৌ, আমার আবার তাড়া আছে।
নটু ঘোষের বৌ আবার পোয়াতি হয়েছে। মুখুজ্জেগিন্নী নটু ঘোষের বাড়ি হয়ে তারপর ফিরে যাবে।
নটু ঘোষের বাড়িতে তখন ঝি এসে গেছে। সদর-দরজা খোলা।
মুখুজ্জেগিন্নী ঢুকেই বললে—দিদি কোথায়?
ভিতর থেকে আওয়াজ এল—এই যে এসো ভাই—এসো—
নটু ঘোষের ছেলেমেয়ে অনেক। বড় মেয়েরই বয়েস ষোল। তারপর তেরো, বারো, এগারো। এমনি পর পর। এতদিন কলকাতাতে হয়েছে। কিছু ভয় ছিল না। এখানে এই বন-জঙ্গলের দেশে কোথায় দাই, কোথায় ডাক্তার, কোথায়ই বা ওষুধ। একটা নতুন ধরনের ওষুধ চাইলেই হেড-আপিসে লিখতে হয়। তিন মাস পরে তার উত্তর আসে, ওষুধ আসতে দেরি হয় আরো কিছু দিন। ততদিনে রোগী মরে গিয়ে ভূত হয়ে যায়। প্রথম-প্রথম নাকি আরো মরত। হেড-অফিসে চিঠি লিখেও কিছু ফল হয়নি। ওষুধের জন্যে হাসপাতালের সামনে ভিড় হয়ে থাকত সকাল থেকে। শুধু কলোনীর লোক নয়, কোম্পানীর লোকই নয়, বাইরের লোকও আসত প্রচুর। গাঁয়ের চাষাভুষো তারা। দশ-মাইল বিশ-মাইল দূর থেকে তারা চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসত। আর রোগও কি সব একরকমের! বিশ্রী বিশ্রী রোগ। একবার গায়ে একটা ঘা হলে আর সারতে চাইত না।

জেনকিনস সাহেব বিলিতী মানুষ। বউ আছে কি নেই তার ঠিক নেই। থাকলেও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পড়ে আছে। এখানে একলা-একলা আঙুল কামড়ে পড়ে থাকতে আসেনি। রাত্রে সাহেবের চাপরাশি গাঁয়ে চলে যায়। একজন-না-একজনকে তার ধরে আনা চাই।
তা জেনকিনস সাহেব লোক ভালো। মাথা-পিছু রাত পিছু পাঁচ টাকা করে দেয়। তেমন খুশী করতে পারলে পাঁচ টাকা কেন, পনেরো টাকাও দিয়ে ফেলে কাউকে-কাউকে।
তারপর যখন রোগ বাড়ে তখন দাদাকে ডাকে।
বলে—ডাক্তার একটা ওষুধ দাও—পেন হচ্ছে আবার—
ওষুধে একটু কমে, কিন্তু দু'দিন বাদে আবার বাড়ে।
ভূধরবাবু বলেন—ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছ একেবারে সাধ করে কি চান করে ফেলি রোজ—
নটু ঘোষ জিজ্ঞেস করেন—আর মাইনের টাকা?
ভূধরবাবু বলেন—এই তো যাচ্ছি মাইনে নিয়ে, এগুলো নিয়ে চৌবাচ্চার জলে ফেলে দেব—
তারপর বললেন—বাড়ির খবর কী ঘোষ মশাই?
নটু ঘোষ বলেন—ও আর আমি ভাবছি না, ও মুখুজ্জেগিন্নী আছেন, তিনিই দেখছেন—
তা সত্যিই নটু ঘোষ মশাইকে ভাবতেই হলো না শেষ পর্যন্ত। নটু ঘোষের বড় বড় মেয়েরা পর্যন্ত জানতে পারলে না।
বড় মেয়ে শেফালী বললে—কাকীমা এবার আপনি বাড়ি যান, কাকাবাবু একলা আছেন—
মুখুজ্জেগিন্নী বললে—সে-সব তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি এক কাজ করো দিকি, বলু টুলুকে চান করিয়ে দিয়ে ভাত খেয়ে নাও, আমার কাজ এগিয়ে থাক—
মুখুজ্জেমশাই সে ক'দিন রেঁধে খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। আলুভাতে আর ভাত। বাড়ির একটা চাবি রইল মুখুজ্জেমশাই-এর কাছে, আর একটা মুখুজ্জেগিন্নীর কাছে। সেই যে সোমবার রাত চারটেয় উঠে মুখুজ্জেগিন্নী গেল আর দেখা নেই। যাবার সময় শুধু বলে গিয়েছিল—ঘরদোর খুলে রেখে যেন চলে যেও না—আমি চললুম—
তারপর সোজা নটু ঘোষের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে মুখুজ্জেগিন্নী। সাত ছেলে-মেয়ের মা বটে, কিন্তু বিদেশে-বিভুঁই-এ বড় ভয় পেয়েছিল নটু ঘোষের স্ত্রী। ডাক্তার আছে, কিন্তু ডাক্তারের উপর ভরসা কী! সেই ভয়েই বোধ হয় অর্ধেক শুকিয়ে গিয়েছিল।
নটু ঘোষের বউ বলেছিল—কী হবে ভাই? কে দেখবে?
মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল—চাকরটাকে দিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েই যেন আমাকে একটা খবর দেয়, আমি জানলার ধারে শুই, যত রাত্তিরই হোক আমায় একবার ডাক দিলেই চলে আসবো দিদি, তুমি কিছু ভয় পেও না—
কলোনীর ব্যাপার। ঠিক লাগোয়া বাড়ি নয়। এখানে একটা, তারপর একটা খাদ ... বাড়িতে শোনা যায় না। রাত্তিরবেলা সমস্ত কলোনীটা ঝাঁ-ঝাঁ করে চারদিকে। সাপ-খোপ আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে। আরো কত কী আছে, কত কী থাকতে পারে। দুপুরবেলাটা বেশ। নদীর এপার থেকে ওপার দেখা যায়। কালো রুক্ষ মাটি। ফাটি-ফাটা হয়ে আছে। হুকুম সিং-এর দোতলা কাঠের বাড়িটা ওপারে পাহাড়ের গায়ে যেন হেলান দিয়ে আছে। তারপর কেবল জঙ্গল, কেবল জঙ্গল। উত্তর দিকে নদীর ধার ঘেঁষে একটা পাহাড়। সকাল থেকেই সেই পাহাড়ে পাথর ভাঙার কাজ শুরু হয়। গর্ত খুঁড়ে কুলীরা তার মধ্যে ডিনামাইট পুঁতে দেয়। দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় দূরে। তারপর দড়াম করে একটা বিকট শব্দ হয়। পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলোনী থেকে সেই দৃশ্য দেখে নটু ঘোষের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু রাতটাই ত ভয় করে বেশি। তখন বিলাসপুর থেকে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছুটে আসে। ট্রেনটা রেলের পুলটার উপর উঠলেই কেমন একটা ভয়ানক গুম্ গুম্ শব্দ হয়। নটু ঘোষের বউ তখন ভয়ে আধমরা হয়ে যায় যেন।

ভোর বেলাই মুখুজ্জেগিন্নী গিয়ে হাজির হয়েছে।

নটু ঘোষ সামনে পায়চারি করছিল। বললে—ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা কোথায় দিন, আর ডাক্তার ডাকতে গেছে তো?

নটু ঘোষ বললেন—হাঁ—

তারপর সেই যে মুখুজ্জেগিন্নী ঢুকলো ও-বাড়িতে, বেরোল সেই তিন দিন পরে। দিন নেই রাত নেই পোয়াতীর কাছে বসে সেবা করা। দাদা যতবার গেছে, মুখুজ্জে-গিন্নীর সেবা দেখে অবাক হয়ে গেছে! এবার ছেলে হয়েছিল একটা। কিন্তু মরা ছেলে। নটু ঘোষের বউ মরেই যেত বোধ হয়। ব্যথাও খুব পেয়েছিল। চাপ চাপ রক্ত বেরিয়েছিল। আর রক্তও কি একটুখানি! সেই রক্ত পরিষ্কার করা, পোয়াতীকে খাওয়ানো, ছেলে-মেয়েদের দেখা।

নটু ঘোষ পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন।

বলসেন—খুব করলে যা হোক মুখুজ্জে-গিন্নী!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—কী আর করতে পারলাম দাদা, ছেলেটাকেই বাঁচাতে পারলাম না—

নটু ঘোষ বললেন—তা আর কী হবে, মানুষটা যে বেঁচে উঠেছে, ওই-ই যথেষ্ট—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—আপনি আজকে আপিস যান—

—আমি আপিসে গেলে, দেখবে কে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—আমি তো আছি, আমি দেখবো—

নটু ঘোষ বললেন—মুখুজ্জেমশাই-এর হয়ত খুব কষ্ট হচ্ছে একলা রেঁধে খেতে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—তা হোক আপনি ওঁকে বলে দেবেন, আরো দু'দিন আমি যেতে পারবো না বাড়িতে, একটু চালিয়ে নেন যেন—

সাহেব-বৌও এসে একদিন দেখে গেল। নটু ঘোষের বউ তখন সেরে উঠেছে।

নটু ঘোষের বউ বললে—মুখুজ্জেগিন্নীর জন্যেই আমি বেঁচে গেলাম ভাই এ-যাত্রা, নইলে আমার তো হয়েই গিয়েছিল—

রাস্তায় ওভারশিয়ার নগেন সরকারের সঙ্গে দেখা।

বললে—বলিহারি আপনাকে, মুখুজ্জে-গিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী হাসলে। বললে—কেন ঠাকুরপো, আমি আবার কী করেছি?

নগেন সরকার বললে—মানুষ নন আপনি, সত্যি—

—ওমা, ঠাকুরপো কি যে বলে, মানুষ নই তো কী, রাক্ষসী?

—আমাদের কারখানায় তাই কথা হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—কারখানায় তো আপনাদের তাহলে খুব কাজ-কর্ম হয়?

—না ঠাট্টা নয় মুখুজ্জেগিন্নী, ডাক্তার-বাবুও বলছিলেন এমন সেবা হাসপাতালের নার্সরাও পারবে না।

ভূধরবাবু বললেন—ওহে, ক্যারেকটারটাই সব জানো, কাটলেটই খাক আর চপই খাক। ক্যারেকটার যদি ভালো হয় তো কোনও কাজই মানুষের অসাধ্য নয়, ওঁর ক্যারেক-টারটাই যে খাঁটি—

নগেন সরকার পরদিন সোজা বাড়ি এসে হাজির।

বাইরে থেকেই ডাকলে—মুখুজ্জেগিন্নী, ও মুখুজ্জেগিন্নী—

ভিতর থেকে মুখুজ্জেগিন্নী বললে—কে? ঠাকুরপো? এসো ভাই এসো!

বলতে বলতে সামনে এসে বললে—কী হলো ঠাকুরপো? কী মনে করে? কারখানা নেই?

নগেন সরকার ভিতরে এসে ঘরে বসলো।

বললে—ছুটি নিয়েছি আজ।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—তোমার হাতে আবার কী ঠাকুরপো?

—এই প্রসাদ এনেছিলাম, হনুমানজীর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম কি না।

হনুমানজী মন্দির অনুপপুর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—ওমা, ঠাকুরপোর দেখছি আজকাল ভক্তি-টক্তি হয়েছে খুব।

—না মুখুজ্জেগিন্নী, চাকরিতে কিছু মাইনে বাড়লো কি না, তাই।

—কত বাড়লো শুনি!

নগেন সরকার বললে—পঞ্চাশ টাকা। তা ভাবলাম প্রথমেই মুখুজ্জেগিন্নীকে প্রসাদটা দিয়ে আসি, আপনাকে দিয়ে খেলে যদি পুণ্যি হয়, পুণ্যাত্মা আপনি!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে—দাঁড়াও ভাই ঠাকুরপো, বাসি কাপড়টা ছেড়ে আসি—

বলে ভিতরে গিয়ে মুখুজ্জেগিন্নী এক-খানা তসরের শাড়ি পরে এসে দু'হাত জোড় করে প্রসাদটা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। তার-পর ভিতরে রেখে এল।

এসে বললে—এবার একটা বিয়ে করে ফেল ঠাকুরপো, মাইনেও তো বাড়লো এবার—

নগেন সরকার বললে—তেমন মেয়ে কোথায়? একটা ভালো দেখে মেয়ে খুঁজে দিন না—

—ওমা, হাসালে তুমি ঠাকুরপো, বাঙলা দেশে নাকি মেয়ের অভাব!

নগেন সরকার বললে—তা আপনার মত একজন মেয়ে খুঁজে দিন না, আমি এক্ষুনি বিয়ে করছি—

মুখুজ্জে গিন্নী হেসে ফেললে খিল খিল করে। নগেন সরকারও হাসতে লাগলো।

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমাকে বুঝি ঠাকুরপোর খুব মনে ধরেছে ভাই?

নগেন সরকার বললে—তা আপনার মত মেয়ে পেলে কার না মনে ধরে?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কই, তোমাদের মুখুজ্জে মশাইএর তো মন পেলুম না এখনও—

নগেন সরকার বললে—তা কি আর না ধরেছে! মুখুজ্জে মশাই নিজের মুখে বললেও বিশ্বাস করবো না আমি—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমি তো তাই তোমাদের মুখুজ্জে মশাইকে তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম, বললুম এত যে এখানকার সবাই আমার প্রশংসা করে, তোমার মুখে তো কখনও প্রশংসা শুনি না আমার?

—তা কী বললেন?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—ও মানুষের কথা ছেড়ে দাও ভাই, উনি কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নিজের বাজার করা আর খাওয়াটা হলেই নিশ্চিন্দি—এই যে আমি এতদিন নটু ঘোষবাবুর বাড়ি পড়ে ছিলাম, তাতেও ওঁর রাগ বিরাগ কিছু নেই—

নগের সরকার বললে—আমরা তো তাই বলাবলি করি আপনার সম্বন্ধে—

—কী বলাবলি করো?

নগের সরকার বললে—স্টোর্সের বড়-বাবুকে চেনেন তো, ভূধরবাবু? তিনি তাই বলছিলেন—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—ও, ওই যে মাথায় টিকি আছে—

—হাঁ, উনি ভারি সাত্ত্বিক লোক, রোজ নদীতে গিয়ে ভোরবেলা স্নান করে জপ-আহ্নিক সেরে তবে সংসারের কাজ করেন—! আর শুধু কি ভূধরবাবু? আমাদের জেনকিন্স্ সাহেবও তো আপনার প্রশংসা করেন—

—সে তো আমার হাতে কাটলেট খেয়ে।

—না মুখুজ্জে গিন্নী, নটু ঘোষের বউকে আপনি এই যে ক'দিন সেবা করলেন না,

এ-ও সাহেবের কানে গেছে। এবার সাহেব বলেছে হাসপাতালে একটা নার্স আসবে, হেড্ অফিসে চিঠি চলে গেছে!

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তা যা—ই বলো ঠাকুরপো, তোমাদের সাহেব লোকটা ভালো নয় বাপু—

—কেন? কী করলে সাহেব?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—ওই যে রোজ গাঁয়ের মেয়ে ধ'রে, এনে এনে রাত্তিরে ঘরে পোরা, এটা কি ভালো? এটা তোমরা আপত্তি করতে পারো না?

নগেন সরকার বললে—ও আর কী করবে বলুন, বিদেশ থেকে এসেছে, এখানে মেম-সাহেবটাহেব কিছু নেই, কী -করে কাটায় বলুন?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তা মেয়েমানুষ না হলে চলে না? এই যে ভূধরবাবু, রয়েছেন, তুমি রয়েছ, তোমরা ক'টা মেয়ে মানুষ এনে বাড়িতে পোর শুনি? তোমাদের দিন কাটে না?

নগেন সরকার বললে—আমাদের কথা আলাদা মুখুজ্জে গিন্নী, আমরা হচ্ছি গরিব ওভারশিয়ার কেরানী এই সব, আমাদের যে খারাপ হবার যোগ্যতাটুকুও নেই—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আচ্ছা ঠাকুরপো, এই যে তুমি, পুজো দিতে গেলে সেই চল্লিশ মাইল দূরে কোথায়—তোমরা নিজেরা নিজেদের জন্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারো না?

—মন্দির? সে যে অনেক টাকা মুখুজ্জে গিন্নী?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—ওই তো তোমাদের মুরোদ, একটা ভালো কাজ বললেই তোমাদের টাকার অভাব পড়ে—সবাই এক মাসে পাঁচ টাকা করে দিতে পারো না?

নগেন সরকার বললে—পাঁচ টাকায় কী হবে?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—মাথা পিছু পাঁচ টাকা দিলে মন্দির হবে না একটা?

তখনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলে মুখুজ্জে গিন্নী। পাঁচ টাকা করে দিলেই এমনিতে তিনশো টাকা ওঠে। তারপর কনট্রাকটার হুকুম সিং আছে, ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেব আছে, ডাক্তারবাবু আছে, তারপর জেনকিন্‌স্ সাহেব তো আছেই!

হিসেব করে দেখা গেল তিনহাজার টাকা উঠছে।

সেদিন অনুপপুরে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথাটা আজও মনে আছে। সে কী উৎসাহ! সবাই হিন্দু। ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়েই বেশির ভাগ লোকের সংসার। বাড়ি-ঘর-ডাক্তার-জল সবই ব্যবস্থা করেছে কোম্পানী। তা হলে ওটাও ওই রকম দরকারী। মন্দির হলে হিন্দু মাত্রেরই সুবিধে। ঠাকুর-দেবতার মন্দির কার না দরকার। কথাটা নটু ঘোষ-বাবুও স্বীকার করলেন।

বললেন—কথাটা মন্দ তোলেননি মুখুজ্জে গিন্নী, এই তো আমার গিন্নী সেদিন নীলের উপোষ করলেন, তা শিবলিঙ্গ নেই যে শিবের মাথায় জল দেবেন—

প্রেমলানী সাহেব কথাটা শুনে বললেন—ভেরি গুড্ আইডিয়া, আমি দেব পঞ্চাশ টাকা আর কারখানা থেকে পাথর আর সিমেন্টটা ফ্রি দিয়ে দেব—

হেড্-অফিসেও চিঠি লিখে দেওয়া হল। জেনকিন্‌স্ সাহেব তাতে সই করে কড়া সুপারিশ করে দিলেন।

নটু ঘোষের বউ বললে—ধন্যি মায়ের দুধ খেয়েছিলে তুমি ভাই, উনি তো ধন্য ধন্য করছিলেন তোমাকে—

প্রেমলানী সাহেবের বউ বললে—তোমার চেষ্টাতেই হল বহিন—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আগে ছোক সাহেব-বৌ, তখন বোল—

যারা ছোকরা কেরানী, অনুপপুরে মেস্ করে থাকত, তারাও বললে—মুখুজ্জে গিন্নী বাহাদুর মেয়ে ভাই—

স্টোর্সের বড়বাবু ভূধরবাবু বললেন—বুঝলে হে, আমি তোমাদের বলেছিলুম, পৃথিবীতে আসল জিনিস হল ক্যারেকটার, ক্যারেকটারটি খাঁটি হলে ও টাকা-ফাকা যা বলো, ও-সব কিছুই না—মুখুজ্জে গিন্নীর ক্যারেকটারটা যে খাঁটি!

মুখুজ্জে গিন্নীর ক্যারেকটার সম্বন্ধে প্রথম-প্রথম ছোকরা কেরানীদের কিছু সন্দেহ হয়েছিল সত্যি। মুখুজ্জেমশাই যখন স্টেশনে প্রথম নামলেন বউ নিয়ে, স্টেশনমাস্টার অম্বিক মজুমদার দেখেছিলেন।

এ-এস-এম কাঞ্চিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—লোকটি কে হে? কী বলছিল তোমাকে?

কাঞ্চিলালবাবু বললেন—কন্‌স্ট্রাক্‌শানের লোক, এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে—

—নতুন বউ বুঝি?

তা দেখে সকলেরই সন্দেহ হত প্রথম-প্রথম। ছোকরারা মুখুজ্জেমশাইএর পাশে মুখুজ্জে গিন্নীকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতো একটু। মুখুজ্জে গিন্নী ঠিক যেন মুখুজ্জেমশাই-এর উল্টোটা। মুখুজ্জে গিন্নীর চাওয়া, হাঁটা, পান খাওয়া, কথা বলা সবই কেমন যেন চট্‌পটে, রং মেশানো। আবার মুখুজ্জেমশাই তেমনি নিরীহ গোবেচারা মানুষ। জামা-কাপড় সাদা-সিধে। সরল অমায়িক মানুষ। আর মুখুজ্জে গিন্নী বেশ ফিটফাট্।

ঘোষের বউও কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে।

মজুমদার গিন্নীকে বলেছিল—হ্যাঁ গা, তেরো নম্বর খুপিতে কারা এসেছে দেখেছ দিদি?

মজুমদার গিন্নী বলেছিল—দেখিনি, কেন?

নটু ঘোষের বউ বলেছিল—একদিন যাবে দেখতে?

মজুমদার গিন্নীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। ইস্টিশান থেকে অনেক দূর। সব দিন আসা যায় না। নটু ঘোষের বউ মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল একদিন এমনি। মুখুজ্জে গিন্নী সেই প্রথম দিনই আপন করে নিয়েছিল।

বলেছিল—নতুন এলুম দিদি, বিদেশ-বিভুঁই, উনিও একটু ভয়-কাতুরে মানুষ, আপনারা দেখবেন একটু—

—তা আমরাও তো নতুন ভাই, কে আর পুরোন এখেনে!

সেই থেকে সূত্রপাত, তারপর ভাব হয়ে গেল দুজনে। তারপরে আর ভাব থাকতে বাকি থাকল না কারো সঙ্গে। যে-ছোকরারা প্রথম-প্রথম দূর থেকে নিঃশব্দে টিটকারী দিত, তারাই শেষকালে মুখুজ্জে গিন্নী বলতে অজ্ঞান।

নেপাল যখন-তখন আসত। বলত—মুখুজ্জে গিন্নী চা খাবো!

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—হ্যারে তুই আর আসিস না যে?

নেপাল বলত—কলকাতায় গিয়েছিলাম, হেড্-অফিসে—বেস্পতিবারে, এসেছি—

—ওমা, বেস্পতিবারে এসেছিস্ আর আজ শনিবার, এতদিনের মধ্যে একদিনও আসতে নেই? একেবারে ভুলে গেলি মুখুজ্জে গিন্নীকে!

শুধু নেপাল নয়। নেপাল আছে, অরুণ আছে, বিমল আছে।

হঠাৎ হয়ত একদিন অরুণ দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে—মুখুজ্জে গিন্নী, একটু তরকারী দাও তো?

—শুধু তরকারী? শুধু তরকারী কী করবি রে?

অরুণ বলে—নেপালটা রেঁধেছিল, নুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে সব, এখন খেতে পারি না—দাও তোমার কী তরকারী আছে, দাও, নইলে খাওয়াও হবে না আজ—

মুখুজ্জে গিন্নী হাসতে হাসতে বলে—কী কাণ্ড দেখ দিকিনি, আমি না থাকলে তোদের তো আজ খাওয়াই হত না—

অনেকখানি ডাল আর আলুর সঙ্গে মাগুর মাছের তরকারী।

দেখে তো অরুণ অবাক। বললে—ও বাবা, এতখানি তরকারী দিলে কেন? আমরা তো দুজন!

মুখুজ্জে গিন্নী বলেছিল—তা হোক, তোরা খা—

—এ কী, সবটাই যে আমাদের দিয়ে দিলে, তা তোমরা খাবে কী? মুখুজ্জে-মশাই তো অফিস থেকে এসে এখন খাবে?

—তা হোক, তুই নিয়ে যা!

এক-একদিন তাস খেলা হত। জুড়ি হত মুখুজ্জে গিন্নী আর নেপাল একদিকে আর ওদিকে অরুণ আর বিমল। খেলতে খেলতে ঝগড়া হত। আবার ভাবও হত। হাসির বন্যা ছুটে যেত ঘরময়। মুখুজ্জে গিন্নী বলত—না, নেপালটাকে নিয়ে আর খেলব না এবার থেকে, অরুণ তুই আমার সঙ্গে খেলবি কাল থেকে—

নেপাল বলত—বারে, আমি কী করে জানব তোমার হাতে রুইতনের টেক্কা আছে?

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—তুই একটা হাঁদা, দেখছিস আমি নওলা দিয়ে চুপ করে রইলুম, তোর ত তখুনি বোঝা উচিত ছিল।

খেলার সময় হঠাৎ হয়ত মুখুজ্জেমশাই হাজির হন।

বলেন— খেলছ তোমরা খেল—খেল—

তারপর মুখুজ্জে গিন্নীর দিকে চেয়ে বলেন—ওগো, তিনটে টাকা দাও তো গো?

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—আবার টাকা কী হবে!

মুখুজ্জেমশাই বলতেন—সবাই খেতে চেয়েছে আপিসে—

—কেন? খেতে চেয়েছে কেন?

মুখুজ্জেমশাই বলতেন—ওই যে এ-মাসে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে আমার, তাই মিষ্টি খেতে চেয়েছে সবাই, বলেছি বাড়ির থেকে টাকা নিয়ে এসে খাওয়াব—

মুখুজ্জে গিন্নীর তখন খেলার দিকে লোভ। রুইতনের সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দান দিতে হবে। মুখ তোলবার সময় নেই।

বললে—চাবি নিয়ে বাক্স খুলে নাও—

এবার এই নেপালরাই এগিয়ে এল। বললে—আমরাই তোমার মন্দিরের চাঁদা তুলে দেব মুখুজ্জে গিন্নী,—কত টাকা লাগবে বল!

চাঁদা নিয়ে প্রথমটা একটু গোলযোগ হয়েছিল। সবাই পাঁচ টাকা করে দিতে পারবে না। বিশেষ করে যারা কম মাইনে পায়। তাও সবাই নয়। দু'একজন।

তারা বললে—মন্দির করে লাভ কী? তার চেয়ে থিয়েটার হোক না। "সাজাহান" কিংবা "মেবার পতন" হোক দুনাইট, ড্রেসার, পেণ্টার কলকাতা থেকে এনে ওই টাকাতে বেশ ভালো করে থিয়েটার করা যাক্ আর যদি কিছু বাড়তি থাকে তো ফিস্ট্ হোক, সবাই মিলে পেটভরে মাংস আর পোলাও খাওয়া যাবে একদিন—

নটু ঘোষ বললেন—যত সব ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড, আমি ওতে এক পয়সা দেব না চাঁদা—

প্রেমলানী সাহেব বললেন—কেন? টেম্পল্ হবে না কেন?

কর্তারা বললে—কয়েকজন বেঁকে বসেছে, তারা বলছে মন্দিরের বদলে থিয়েটার হবে—

প্রেমলানী সাহেব বললেন—থিয়েটার? থিয়েটারও মন্দ না, তবে থিয়েটারই হোক্—

কিন্তু স্টোর্সের বড়বাবু ভূধরবাবু বললেন—জানি হবে না, বাঙালীদের ইউ-নিটি নেই কোথাও, আমি তখুনি বলে-ছিলাম—ক্যারেক্টার না থাকলে ও-সব একতা-টেকতা সব হাওয়ায় উড়ে যায়, দরকার নেই, দাও ভাই আমার পাঁচটা টাকা আমায় ফেরত দিয়ে দাও—

প্রায় ভেঙে যায় যায় অবস্থা।

হঠাৎ খবরটা কানে যেতেই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মুখুজ্জে গিন্নী।

ছুটির দিন সেটা। নগেন সরকার বাড়িতে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধছিল। জানলা খোলা। বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলে—ঠাকুরপো—

নগেন সরকার মুখুজ্জে গিন্নীকে দেখেই গান থামিয়ে দিয়েছে। বললে—মুখুজ্জে গিন্নী, আপনি?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কে বলছে মন্দির হবে না?

নগেন সরকার মুখুজ্জে গিন্নীর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললে—কয়েকজন বলছে...

—তারা কে? নাম কী তাঁদের?

নগেন সরকার বললে—নাম...

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমি বলছি হবে—কোম্পানী থেকে টাকা দিক-বা-না-দিক, কেউ বাধা দিক-বা-না-দিক, মন্দির হবেই—

নগেন সরকার কিছু কথা বলতে পারলে না মুখুজ্জে গিন্নীর সামনে গিয়ে।

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তুমি আছ কি না বল আমার সঙ্গে?

নগেন সরকার বললে—আমি আছি মুখুজ্জে গিন্নী—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তা হলে এই নাও—

বলে বাঁ হাতের একগাছা সোনার চুড়ি ডান হাত দিয়ে জোর করে খুলে ফেললে।

বললে—কেউ না দেয়, আমার দেওয়া রইল, দরকার হলে সব চুড়িগুলোও দিয়ে দেব—নাও, তোমার কাছে রাখো—

তারপর সেইদিনই মুখুজ্জে গিন্নী আর নগেন সরকার কলোনীর সকলের বাড়ি-

ড়ি গেল। সকলের কাছে গিয়ে-গিয়ে ঝিয়ে বললে। তাদেরও বক্তব্য শুনলে। পাল অরুণ বিমল ওরাও জুটল সঙ্গে।
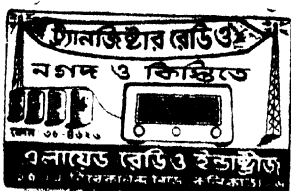
নেপালরা বললে—কিছু ভয় নেই মুখুজ্জে ন্নী, আমরা তোমার সব টাকা যোগাড় রে দেব—

সেইদিন থেকেই সোর-গোল পড়ে গেল লোনীতে। নেপালরা ট্রেনের সময় স্টেশনে য়ে চাঁদা চায়। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। ক পয়সা দু'পয়সা থেকে শুরু করে এক-কা দু'টাকা পর্যন্ত দেয় কেউ-কেউ। থম দিনেই কুড়ি টাকা বারো আনা উঠল, তারপর দিন তেইশ টাকা দু'পয়সা।

মুখুজ্জে গিন্নীর কথা শুনে প্রেমলানী হেবের বউও নিজের হাতের একগাছা সানার চুড়ি খুলে দিলে। নটু ঘোষের বউ সানার চুড়ি দিতে পারলে না। তার অনেক য়ে। বিয়ে দিতে হবে। তা-ও কুড়ি টাকা দা দিলে।

জেনকিন্‌স্ সাহেব দিলেন পাঁচশো টাকা নজের পকেট থেকে।

হেড্ অফিস থেকেও অনুমতি দিয়ে চিঠি এসে গেল। জমি দিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। দাদাকেও কিছু দিতে হল। মুখুজ্জে গিন্নী নিজে এসে বলে গেল-ডাক্তারবাবু, আসছে শনিবার দিন ...
আপনাকে বিকেলবেলা যেতে হবে, ওই দিন ভিত্ খোড়া হবে—

আজ এতদিন পরে এই বিডন্ স্কোয়ারের সামনে মুখুজ্জেমশাই-এর সামনে দাঁড়িয়ে আবার সব সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। সেই কলোনীর মাঠের ধারে হাস-পাতালের ঠিক পিছনে। কী ভিড় সেদিন সেখানে। কেউ আর বাদ যায়নি সেদিন। ওদিকে বিজুরি, মনেন্দ্রগড়, চিরিমিরি থেকেও লোক এসে গেল। কনট্রাক্টার হুকুম সিং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করতে লাগলেন।

মুখুজ্জে গিন্নী ঘুরে ঘুরে সকলকে সবিনয়ে বলতে লাগলো—আপনারা এসেছেন, আমরা যা উৎসাহ পেলাম—

নটু ঘোষ পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে।

বললেন—এই ইনিই হচ্ছেন আমাদের মুখুজ্জে গিন্নী, মিসেস মুখার্জি—বলতে গেলে এঁরই চেষ্টাতে এ মন্দির হল—

মুখুজ্জে গিন্নীর সেদিন সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া নেই। সব চুকে-বুকে গেলে ...

অনেক রাত।

নেপালরাও এসেছিল। মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কাল সকালবেলা আসবি তোরা—আমার কাছে টাকা-কড়ি রইল, আজকের হিসেবটা লিখে নেব খাতায়—

হিসেবটায় ছিল খুব কড়াকড়ি। এক পয়সার হিসেব নিয়েও মুখুজ্জে গিন্নী একঘণ্টা কাটিয়ে দিত।

বলত—মন্দিরের টাকা, এর প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব দিতে হবে আমাকে, তখন গোলমাল হলে কে জবাবদিহি করবে?

রোজ রাত্রে মেঝের উপর শতরঞ্চি পেতে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে হিসেব হয়। নগেন সরকার আসে। নেপাল আসে। অরুণ বিমলও আসে।

মুখুজ্জে গিন্নী বলে—কাল যে আটা কেনা হল ঠাকুরপো, সে-হিসেবটা দিলে না তো? তোমাকে যে পাঁচ টাকার নোট দিলাম, তার থেকে তুমি আমায় ফেরৎ দিয়েছ তিন টাকা সাড়ে তের আনা, বাকি একটাকা দশ পয়সার কী-কী কিনলে?

নগেন সরকার বললে—পুরুতমশাইকে দিয়েছি তিন পয়সা বিড়ি খেতে, সেটা লিখেছ?
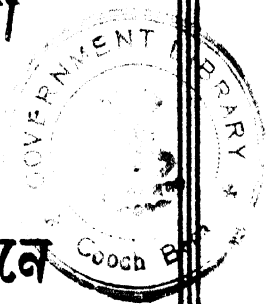
এই রকম কত হিসেব কড়া ক্রান্তি পাই পয়সাটার পর্যন্ত। হিসেব না মিললে মুখুজ্জে গিন্নীর যেন মাথা ঘুরে যায়।

যখন সব হিসেব মিলিয়ে মুখুজ্জে গিন্নী শুতে যায় তখন অন্নপূর্ণার কলোনীতে অন্ধকার নিশুতি। মুখুজ্জেমশাই-এর এক ঘুম হয়ে গেছে। আবার ভোরবেলা যখন মুখুজ্জেমশাই ঘুম থেকে উঠেছে তখন দেখেছে মুখুজ্জে গিন্নী অনেক আগেই উঠে স্নান করে রান্না চড়িয়ে দিয়েছে।

বলতাম—এত সকালে যে? এত সকালেই রান্না চড়িয়েছ মুখুজ্জে গিন্নী?

মুখুজ্জে গিন্নী বলত—এখন রান্না না চড়ালে কখন চড়াব, এখনই তো মিস্ত্রীদের হিসেব নিয়ে হুকুম সিং-এর কাছে যেতে হবে একবার—

হুকুম সিং কুলী মজুরের দামটা নিজে দেবে বলেছে। পুরো দমে তখন কাজ চলছে। মন্দির শুধু নয়, মন্দিরের সামনে একটু ঢাকা বসবার জায়গাও হচ্ছে। ওখানে দরকার হলে গীতাপাঠ হবে, চণ্ডীপাঠও হবে, দরকার হলে কীর্তনও হতে পারে।

রেল লাইনের কনস্ট্রাকশানের কাজ। আট দশ বছর চলবে এ-সব। তারপরে হয়ত এখানে শহর গড়ে উঠবে। অন্নপূর্ণা জংশন স্টেশন হবে। কয়লা-খনির আশে-পাশে যেমন কল-কারখানা গড়ে ওঠে তেমনি সব গড়ে উঠবে। কলকাতার লোক আসবে, দিল্লীর লোক, মাদ্রাজের লোক, বোম্বাই-এর লোক আসবে। তখন সবাই এই মন্দির দেখে জিজ্ঞেস করবে—এ মন্দির কারা তৈরি করেছিল?

তখন নাম হবে এই আজকের কলোনীর লোকদের। এই কজন হিন্দু, তারা নিজেদের সামান্য আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে চাঁদা দিয়েছিল মন্দিরের জন্যে!

প্রেমলানী সাহেব বললেন—মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা বলতে গেলে যখন মিসেস মুখার্জির চেষ্টাতেই একরকম হল, তখন ও'র নামেই ট্যাবলেট্ লাগানো হক—মিস্টার ঘোষ, আপনার কী মত?

নটু ঘোষ বললেন—আরে মশাই, আমার স্ত্রী তো মরতেই বসেছিল, মুখুজ্জে গিন্নী না-থাকলে, এই বিদেশ-বিভুঁইএ তো উইডোয়ার হয়ে যেতাম—মেয়েরা মুখুজ্জে গিন্নীকে কাকী বলে ডাকে, জানেন।

নগেন সরকার বললে—এ মন্দিরের কথা প্রথম মুখুজ্জে গিন্নীই তুলেছিলেন আমার কাছে—সুতরাং, সমস্ত ক্রেডিট তাঁরই—

শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জে গিন্নীর কানে গেল কথাটা।

তিনি বললেন—ছি ছি, আমার নাম যদি থাকে তো আমি এই মন্দিরের ব্যাপারে আর নেই আজ থেকে, এই বলে দিলাম।

নগেন সরকার বললে—কিন্তু আপনিই তো সব মুখুজ্জে গিন্নী—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তুমি বলছো কি ঠাকুরপো, আমি কি একলা এ-সব করতে পারতুম তোমরা না-থাকলে?

নেপাল বললে—আচ্ছা মুখুজ্জে গিন্নী, তুমি তাহলে সেক্রেটারী হও এই মন্দির কমিটির—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমি কিছুই হব না হতে চাইওনা, আমি শুধু রোজ ঠাকুরের মাথায় জল দিয়ে আসব, প্রণাম করে আসব। আর আমার নাম নিয়ে কী হবে বল্ না! আমি মেয়েমানুষ—তোরাই কেউ সেক্রেটারী হ, প্রেসিডেন্ট যা- কিছু হ—

শেষে একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল।

সবাই বললে—উদ্বোধনের দিন একটা মীটিং ডাকা হক—

কথা ছিল সামান্য করে হবে অনুষ্ঠানটা কিন্তু হতে হতে শেষ পর্যন্ত আয়োজন হয়ে গেল অনেক। হুকুম সিং সামনে চাঁদোয়া খাটিয়ে নিলে বিনা পয়সায়।

মুখুজ্জে মশাই কাটনীতে চলে গেলেন খাবার কিনতে। রেওয়ার ঠাকুর সাহেব প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হয়ে গেলেন। সব যোগাড়যন্ত্র শেষ। মুখুজ্জে মশাই-ই নিমন্ত্রনের চিঠি ছাপিয়ে আনলেন কাটনী থেকে। ভদ্রলোক মন্দিরের জন্যে একবার কাটনী যান আবার আসেন। ফিরে এসেই আবার পরের ট্রেনে কাটনী যেতে হয়।

নগেন সরকার বললে—আপনার খুব খাটুনি হচ্ছে মুখুজ্জে মশাই—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—না না ঠাকুর-পো, বাজার করতে ও'র কোনও কষ্ট নেই—

তারপর মুখুজ্জে মশাইকে বললে—সব আনলে, কিন্তু পনেরোটা কাচের গেলাস চাই যে—

মুখুজ্জে গিন্নী বললেন—পনেরোটা কাচের গ্লাস? দেখি নিয়ে আসি তাহলে—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কোত্থেকে নিয়ে আসবে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—এর বাড়ি দুটো, ওর বাড়ি পাঁচটা, এমনি করে যোগাড় করে নিয়ে আসি—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তা ছাড়া আর কী করবে? আর দেখ, যদি কয়েকটা ট্রে কোথাও পাও নিয়ে এস তো, হুকুম সিংকে আমার নাম করে গিয়ে বলো দুদিকন—ও'র কাছে থাকতে পারে—

এমনি সারাদিন খাটুনি গেল মুখুজ্জে মশাই-এর। মুখুজ্জে গিন্নীরও কাজের কামাই নেই। ভোর বেলা রান্নাটা সেরে নিয়েই এখানে-ওখানে ঘুরতে লেগেছে। আর শুধু ও'রাই নয়। নগেন সরকারও খাটছে। নেপাল, অরুণ, বিমল, তারাও খাটছে কদিন ধরে।

হঠাৎ নেপাল এসে বলে—মুখুজ্জে গিন্নী, ফুলের মালা অনাতে হবে, মালার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে—

অরুণ বললে কয়েকটা প্লেট আর কাচের গেলাসও তো দরকার—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—সে তোদের ভাবতে হবে না, মুখুজ্জে মশাইকে দিয়ে সব যোগাড় করে রেখেছি—

বিকেল বেলা সভা আরম্ভ।

আমরা সবাই যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। দাদা সকাল সকাল হাসপাতাল থেকে এসে গেছে। মুখুজ্জে গিন্নী বলে গেছে নিজে এসে—আপনাকে যেতে হবে কিন্তু ডাক্তারবাবু—

দাদা বলেছিল—আমার যে হাসপাতাল আছে—

মুখুজ্জে গিন্নী বলেছিল—আপনার হাসপাতালের পাশেই তো, আজকে রুগীদের না-হয় একটু সকাল-সকাল দেখে নেবেন—

দাদা কথা দিয়েছিল যাবে।

হঠাৎ সকাল বেলার ট্রেনে প্রশান্ত এসে হাজির। প্রশান্ত দত্ত। দাদার বন্ধু। ইন্সিওরেন্সের লোক। আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই, পরশু কলকাতা করতে হয় প্রশান্তবাবুকে। মাঝে মাঝে দাদার কাছে এসে পড়ে। একদিন দুদিন থাকে, তারপর আবার চলে যায়।

দাদা বললে—ভালোই হয়েছে, আজ আমাদের এখানে একটা সভা আছে—

—কীসের সভা?

দাদা বললে—একসঙ্গে যাবো চল, আমাদের এখানকার কলোনীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে একটা আজ—যেতেই হবে, না-গেলে চলবে না—একটু খানি গিয়েই চলে আসব!

তা সত্যিই বিরাট আয়োজন হয়েছিল। কোথা থেকে পদ্মফুল এনেছিল নেপালরা। ধূপ ধুনো জ্বলছে। হুকুম সিং বসে আছে সামনে। তার পাশে ইঞ্জিনীয়ার জেনকিন্স সাহেব, প্রেমলানী সাহেব। সামনে একটা উঁচু বেদী মতন করেছে বেঞ্চি সাজিয়ে। রেওয়ার ঠাকুর সাহেব গলায় মালা দিয়ে সভাপতির চেয়ারে বসে আছে। এদিকে মেয়েদের বসবার জায়গা।

প্রশান্তবাবুর বোধহয় এ-সব ভালো লাগছিল না।

বললে—দূর, এসব কী শুনব! যত সব বাজে কাজ—চল্ ওঠ—

দাদা বললে—একটু শোন্ না, বিদেশে আছি, এ-সব ব্যাপারে না থাকলে বদনাম হয়—

প্রশান্তবাবু একটু সাহেব-ঘেঁসা লোক। বললে—এ-সব মন্দির-টন্দিরের ব্যাপারে

আমি নেই ভাই—তোর ইচ্ছে হয় তুই শোন্, আমি চললাম—

নগেন সরকার বক্তৃতা দিলে একবার। ওস্তাদশিয়ার মানুষ। লিখে এনেছিল বক্তৃতাটা।

বললে—আজকে আমাদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় পিছনে যে-মানুষটার অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠা নিরলস ভাবে কাজ করে এসেছে, তাঁকেই প্রথমে আমি ভক্তি-ভরে আমার প্রণাম জানাই. তিনি না থাকলে এ সম্ভব হত না। তাঁর নাম শ্রীমতী মুখার্জি। তাঁকে আপনারা সকলেই চেনেন।' তিনি আমাদের কন্‌সট্রাকশনের ড্রাফটস্‌ম্যান্ মিস্টার মুখার্জির স্ত্রী।...

জেনকিন্‌স্ সাহেব বক্তৃতা দিলেন।

তিনি বললেন—ক্রিশ্চিয়ানদের পক্ষে যেমন চার্চ, তেমনি হিন্দুদের পক্ষে টেম্পল তাদের ধর্মের অঙ্গ—মিসেস মুখার্জি যখন এই টেম্পলের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে যান আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের হেড্‌অফিস্ থেকেও যাতে কিছু টাকা পাওয়া যায় আমি তারও ব্যবস্থা করে দিই—

মুখুজ্জে গিন্নী লিস্ট দেখে বললে—ঠাকুরপো, এবারে তোমায় গান গাইতে হবে—

নগেন সরকার বললে—আমি গান গাইবো? কী বলছেন আপনি?

—তা হক, তোমার পর শেফালি গাইবে, তারপর দীপালি।

ডান হাতে একটা কাগজ নিয়ে কার পর কী হবে তারই ব্যবস্থা করছিল মুখুজ্জে গিন্নী।

নেপাল বললে—চা-এর জল চড়িয়ে দিই তাহলে?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—এখন না, একটু পরে—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—প্রত্যেক ডিশে দুটো করে সিঙাড়া আর দুটো করে রসগোল্লা দিবি, আর প্রেসিডেন্টের জন্যে তো রাজভোগ আছে দুটো—

অরুণ বললে—প্রেসিডেন্টকে তাহলে কি আলাদা খেতে দেবো—?

নগেন সরকার তাড়াতাড়ি কাগজের কাছে মুখ এনে বললে—মুখুজ্জে গিন্নী, ঠাকুর সাহেব এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চাইছে, সোডা আছে! সোডা দেব?

অরুণ এসে বললে—এবার কে গাইবে মুখুজ্জে গিন্নী? দীপালির গান হয়ে গেছে! ভূধরবাবু বললেন আপনাকে একটা গান গাইতে, শ্যামা সঙ্গীত।

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—না না আমার গান গাইবার সময় নেই, শেফালি আর একটা গান গাক্—আমি শেফালিকে বলে দিচ্ছি, শেফালিকে ডাক তো—

মুখুজ্জে গিন্নী সেদিন একটা গরদের লাল পাড় শাড়ি পরেছে। চুলগুলো এলো খোঁপা করে বেঁধেছে। কপালের উপরে দুটো ভুরুর মাঝখানে একটা সিঁদুরের টিপও দিয়েছে মোটা করে। চমৎকার দেখাচ্ছিল মুখুজ্জে গিন্নীকে। একা আড়াল থেকে সব নজর রেখেছে। কোথাও কোনও গোলমাল হলে, অব্যবস্থা হলে তার কাছে খবর আসে। একজনকে দিয়েছে আলোর ভার, একজনকে খাবারের। আর একজনকে অতিথি-আপ্যায়নের ভার দিয়েছে। কোথাও কোনও বিশৃংখলা নেই। কোনও-দিকে ত্রুটি নেই। বেশ নিঃশব্দে নির্বিঘ্নে সভার কাজ এগিয়ে চলেছে।

ভূধরবাবু ভিতরে এলেন। আজ তিনি তসরের কাপড়, তসরের চাদর পরেছেন। মাথার টিকিটা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ভিতরে ঢুকে তিনি বললেন—আমার মা কই, মা-জননী কই গো?

একজন তাড়াতাড়ি মুখুজ্জে গিন্নীর কাছে এসে বললে—মুখুজ্জে গিন্নী, বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন—

মুখুজ্জে গিন্নী তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এল।

ভূধরবাবু তখনও ডাকছেন— মা, ও মা মা-জননী কই আমার?

মুখুজ্জে গিন্নী ভূধরবাবুর পায়ের ধুলো নিলে নিচু হয়ে।

বললে—আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না বড়বাবু—

ভূধরবাবু বললেন—না মা তুমি কি সামান্য মানুষ! তুমি মহাশক্তি, যে-যাই বলুক মা, আমার চোখ-কানকে তো কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না—

মুখুজ্জে গিন্নী লজ্জায় নুয়ে পড়লো।

বললে—ছি ছি, আমি যে কত অপরাধ করেছি—আর লজ্জা দেবেন না আপনি আমাকে—

ভূধরবাবু তবু বলতে লাগলেন— না না, আমি তোমার সন্তান, অবোধ সন্তান মা, সন্তানের একটা অনুরোধ রাখবে না তুমি মা হয়ে?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—সে কি কথা বাবা, বলুন আমি কী করতে পারি?

ভূধরবাবু বললেন—একটা গান তোমার শুনবো মা—আজকে আর আপত্তি করতে পারবে না মা, বলো গাইবে?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কিন্তু আমার যে অনেক কাজ এদিকে বাবা, আমি গানের দিকে গেলে এদিকটা কে সামলাবে?

ভূধরবাবু বললেন—যিনি সামলাবার তিনিই সামলাবেন মা, তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র....

মুখুজ্জে গিন্নী বললেন—আর তা ছাড়া ঠাকুর-দেবতার স্থানে যে-সব গান এতক্ষণ গাইলে ওরা, সে কি গান? একটা গানেও ভগবানের নাম নেই!

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কিন্তু সে-সব গান কি সকলের ভালো লাগবে!

ভূধরবাবু বললেন—ভগবানের নাম ভালো লাগবে না? তুমি আমার মা হয়ে কী বলছো মা?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—কোন্ গানটা গাইবো আপনি বলুন—

ভূধরবাবু বললেন—কেন, মা তোমার সেই গানটা গাও না—'শ্যামা মা কি আমার কালো'

মুখুজ্জে গিন্নী বললেন—আচ্ছা বাবা, আপনি বসুন গিয়ে, আমি গাইছি—

ভূধরবাবু চলে গেলেন। মুখুজ্জে গিন্নী বললে—তোমরা একটু এদিকটা দেখ, উনি ধরেছেন, গাইতেই হবে—

সবাই লাফিয়ে উঠলো। বললে—মুখুজ্জে গিন্নী, আপনি গাইবেন সত্যি

—না গেয়ে কী করি বলো—উনি পিতৃতুল্য লোক, ওঁর কথা এড়াতে পারি?

মনে আছে সেদিন সারা সভায় সে কী আলোড়ন। প্রথম যখন ওস্তাদশিয়ার নগেন সরকার ঘোষণা করলে মুখুজ্জে গিন্নীর গানের কথা, চারদিকে হাততালি পড়লো পটাপট্ করে।

নগেন সরকার বললে—এবার আমাদের এই মন্দিরের যিনি প্রাণ, যিনি এর মূলে, সেই শ্রীমতী মুখার্জি আপনাদের একটি শ্যামা সংগীত গেয়ে শোনাবেন—

প্রশান্তবাবু বললে— কে রে?

দাদা বললে—আমাদের এখানে ড্রাফট্‌স্-ম্যান আছে, তারই বউ—খুব ভালো গান করে শুনেছি—

—এই মন্দির বুঝি তাঁরই করা?

দাদা বললে—হ্যাঁ, শুধু মন্দির নয়, সব কাজেই তিনি আছেন, সকলের বিপদে আপদে উনি দেখেন সকলকে। খুব মিশুক সবাই ওঁকে খুব ভালোবাসে—

আস্তে আস্তে পর্দা সরে গেল। মুখুজ্জে গিন্নী এসে সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে সকলকে প্রণাম করলে। পাশে তবলা নিয়ে বসে ছিল নেপাল। মুখুজ্জে গিন্নী সেদিকে না চেয়ে চোখ বুজে গান ধরলে—

শ্যামা মা কি আমার কালো—

সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। যেন আলপিন পড়লেও শুনতে পাওয়া যাবে।

প্রশান্তবাবু বললে—আরে, এ যে বেনারসী—

ভূধরবাবু ভাবাবেগে একবার চীৎকার করে উঠলেন—মা-মা-মা—

সেই ভাবাবেগে সভার সমস্ত লোক যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যেমন সুন্দর কণ্ঠ, তেমনি সুর, আর তেমনি ভক্তি—

ভূধরবাবু বললেন—আহা, এই না হলে গান,—গান যাকে বলে।

পাশে নটু ঘোষ বসেছিলেন।

তিনি বললেন—আহা, মনে খাঁটি ভক্তি না থাকলে এমন গান বেরোয় না বড়বাবু!

ভূধরবাবু বললেন—আর খাঁটি ক্যারেক্টারও চাই—আমি 'মা' বলে কি ডাকি সাধে!

প্রশান্তবাবু আবার বললে—আরে, এ বেনারসী না হয়ে যায় না—

দাদা বললে—থাম্ চুপ কর তুই এখন, গানটা ভালো লাগছে বেশ!

—আরে বেনারসী শ্যামা সঙ্গীত গাইছে এখানে, এর কত ঠুংরি শুনেছি! ঠুংরিটাও ভালো গাইত ও—

—কোন্ বেনারসী?

প্রশান্তবাবু বললে—একটা বেনারসীকেই তো আমি চিনি বাবা, সব বেনারসীকে আমি চিনবো কেমন করে!

দাদা বললে— এতো আমাদের ড্রাফটস্‌-ম্যান মুখার্জির বউ, আমরা সবাই একে মুখুজ্জে গিন্নী বলে ডাকি!

প্রশান্তবাবু বললে—তুই থাম্, আমি বাজি রাখতে পারি এ বেনারসী, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের তেরো নম্বর ঘরের মেয়েমানুষ—

—বলছিস্ কী তুই?

ভূধরবাবু বললেন—একটু চুপ করুন—

সামনে থেকে কে একজন বললেন—চুপ করুন একটু—বড় গোলমাল হচ্ছে—

প্রশান্তবাবু চুপ করে গেল।

গান থামতেই প্রশান্তবাবু চীৎকার করে বললে—একটা ঠুংরি শুনবো -

হঠাৎ দেখলাম মুখুজ্জে গিন্নী যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো হঠাৎ। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে উঠে ভিতরে যেতেই পর্দা টেনে দিলে।

বাইরে একটা হৈ হৈ উঠলো।

ভূধরবাবু বললেন—মা কী গান শোনালে, আহা—আহা—

নটু ঘোষ বললেন—মনে খাঁটি ভক্তি আছে কি না, তাই ভাব দিয়ে গেয়েছে—আর একটা শুনতে ইচ্ছে করছে—ওহে আর একটা গাইতে বলো না মুখুজ্জে গিন্নীকে।

একজন ছেলে ভিতরে গেল।

কিন্তু ভিতরেও তখন বেশ হৈ চৈ চলেছে। নেপাল, অরুণ, বিমল সবাই ঘিরে রয়েছে মুখুজ্জে গিন্নীকে। বলছে—আর একটা গাইলে না কেন মুখুজ্জে গিন্নী?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমার মাথাটা খুব ঘুরছে রে, আমি আর থাকতে পারছি না।

হঠাৎ কে যেন ডাকলে—বেনারসী!

সবাই পিছনে ফিরলে।

প্রশান্তবাবু সামনে গিয়ে হাসতে লাগলো এবার।

বললে—বাঃ, এখানে কবে এলে বেনারসী! কৃপালনী সাহেব আবার বায়না ধরেছিল তোমার ঘরে যাবে বলে। বাড়িউলী বললে বেনারসী থাকেনা এখানে, তা এখানে চলে এসেছ তুমি? আমাদের তো বলোনি কিছু?

মুখুজ্জে গিন্নী যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। যেন সহ্য করতে পারছে না কিছু।

নেপাল বললে—আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন আপনি?

প্রশান্তবাবু বললে—বেনারসীর সঙ্গে কথা বলছি আমি, আমার চেনা কিনা!

অরুণ বললে—মুখুজ্জে গিন্নীর শরীরটা খুব খারাপ, আপনি পরে কথা বলবেন—

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—এক গ্লাস জল দে তো—

প্রশান্তবাবু আর কিছু কথা না বলে হাসতে-হাসতে বাইরে চলে গেল। নেপাল জিজ্ঞেস করলে—ও ভদ্রলোক কে মুখুজ্জে গিন্নী? তোমার চেনা?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—মুখুজ্জে মশাইকে ডেকে দে তো, বাড়ির চাবি ও'র কাছে, এখুনি বাড়ি চলে যাবো—মাথাটা ঘুরছে খুব!

মুখুজ্জে গিন্নী চলে যাবে শুনলে ভয় পাবারই কথা! মুখুজ্জে গিন্নী চলে গেলে সব যে পণ্ড। মুখুজ্জে গিন্নী ছাড়া এত কাজ হবে কী করে? এখনও ঠাকুর সাহেবের বক্তৃতা বাকি আছে। সকলকে খাওয়ানো আছে। মুখুজ্জে গিন্নী না থাকলে কোথায় কী ত্রুটি ঘটে যাবে কে জানে।

বাইরেও তখন খুব গোলমাল।

নেপাল বললে— এবার কার বক্তৃতা হবে মুখুজ্জে গিন্নী?

মুখুজ্জে গিন্নী বললে—আমি চললাম, তোরা যা পারিস করিস ভাই—

মুখুজ্জে মশাই এসেছিল। ভিতরে। মুখুজ্জে গিন্নী বললে—চলো—

মুখুজ্জে নির্বিরোধী মানুষ। তিনিও বললেন—চলো—

বাইরে ভূধরবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষকালে বললেন—ওহে, মুখুজ্জে গিন্নীকে আর একখানা শ্যামা সঙ্গীত গাইতে বলো না -

নটু ঘোষ বললেন—শুনছি তিনি নেই, চলে গেছেন নাকি—

—কেন? চলে গেলেন কেন?

আর একজন কে বললে—তিনি তো মুখুজ্জে গিন্নী নন, তিনি বেনারসী—

একজন বললে—বেনারসী মানে?

—বেনারসী মানে বেনারসী দেবী!

—বলছেন কী?

—আজ্ঞে ঠিকই বলছি!

প্রশান্তবাবু বললে—আরে মশাই, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে গেছেন? গেলে বেনারসীকে চিনতেন! তার ঘরে একবার গেলে আর ভুলতে পারতেন না তার গান। সে যে মশাই এই কয়লার দেশে মুখুজ্জে গিন্নী হয়ে গেছে তা কী করে জানবো?

দাদা জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুই বেনারসীকে চিনলি কী করে?

প্রশান্তবাবু সিগ্রেট ধরালে একটা।

বললে—বাবা, আমার কাছে চালাকী। আমি ইন্সিওরেন্সের দালালী করে খাই, কত মক্কেল চরালাম, ও গরদের শাড়িই পরুক আর সিঁথিতে সিঁদুরই দিক আমি ঠিক ধরে ফেলেছি—

দাদা জিজ্ঞেস করলে—তুই কি ওর ঘরে গিয়েছিলি?

প্রশান্তবাবু বললে—আরে, আমাকে তো নানান্ জায়গায় যেতে হয় মক্কেলের জন্যে, কেউ হোটেলে খেতে চায়, কাউকে পার্টি দিতে হয়, কাউকে মদ খাওয়াতে হয়, নিজেও মদ খাওয়ার ভান করতে হয়, আবার কাউকে মেয়েমানুষের বাড়ি নিয়ে যেতে হয়—যে যে-রকম মক্কেল তাকে সেইভাবে খাতির করতে হয় 'কেস' পাবার জন্যে -

ভূধরবাবু বললেন—থামুন মশাই, সতীলক্ষ্মীকে নিয়ে যা তা বলবেন না, জিভ খসে যাবে আপনার—

নটু ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন—ডাক্তারবাবু ইনি আপনার বন্ধু নাকি?

ভূধরবাবু বললেন—তা আমাদের চেয়ে কী আপনি বেশি চেনেন মুখুজ্জে গিন্নীকে? জানেন আমি মুখ দেখে ক্যারেক্টার বলে দিতে পারি?

প্রশান্তবাবু বললে—তা চলুন না, ভজিয়ে দিচ্ছি আপনার সামনেই, ও মুখুজ্জে গিন্নী না বেনারসী—

—চলুন, চলুন, ও'র মুখের দিকে চেয়ে ও-কথা বলবার সাহস কী করে হয় আপনার দেখি!

—তা চলুন! ভজিয়ে দিচ্ছি সামনা-সামনি!

ভূধরবাবু প্রশান্তবাবু দুজনেই উঠলেন।

নটু ঘোষবাবু বললেন—চলুন ডাক্তার-বাবু, ব্যাপারটা কী দেখাই যাক্ না—কী জানি মশাই, আমি যে ওর হাতের রান্না খেয়েছি, আমার স্ত্রীও খেয়েছে, ছেলে-মেয়েরা সবাই খেয়েছে! কী হবে?

ভূধরবাবু বললেন—আমিও তো খেয়েছি মশাই, ও'র তৈরি সত্য-নারায়ণের সিন্নী খেয়েছি তাঁরই বাড়িতে বসে জানেন। তা হলে বলছেন আমি লোক চিনে না? জানেন, আমি এই বয়েস পর্যন্ত মুখুজ্জে গিন্নী ছাড়া আর কারো হাতের ছোঁয়া খাইনি।

প্রশান্তবাবু বললে—অত কথায় কাজ কি মশাই, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—চলুন না—

কথাটা মেয়ে-মহলেও ছড়িয়ে পড়লো।

নটু ঘোষের বউ বললে—ওমা সে কি সর্বনেশে কথা মা, শুনে আমার যে হাত-পা হিম হয়ে আসছে!

সাহেব-বৌ বললে তা কখনও হতে পারে দিদি?

স্টেশন মাস্টার অম্বিকা মজুমদারের বউ বললে—ওমা, কী কেলেঙ্কারীর কথা ভাই, জাত জন্ম সব গেল যে আমাদের!

সবাই ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। আমিও চললাম সঙ্গে। কিন্তু মুখুজ্জে গিন্নী নেই! মুখুজ্জে গিন্নী মুখুজ্জে মশাই-এর সঙ্গে তখন বাড়ি চলে গিয়েছে। মাথা ধরার জন্য আর থাকতে পারেনি।

প্রশান্তবাবু বললে—তা হলে চলুন, তার বাড়িতেই যাই—

ভূধরবাবু বললেন—চলুন—

নটু ঘোষবাবু বললেন—থাক্ থাক্ এত রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই, কাল সকাল বেলাই এর বিহিত করলে হবে খন, আপনিও তো আছেন, আর আমরাও আছি—

প্রেমলানী সাহেব বললেন—সেই ভালো—

সে-রাত্রের মতন সেইখানেই সে-গোলমাল থামলো। যা কর্তব্য পরের দিন স্থির করলেই চলবে। যে-যার বাড়ি চলে গেলেন। সভা আর বেশিক্ষণ জমলো না। ভাঙা আসর ভেঙে গেলে মাঝ পথে!

কিন্তু সকাল বেলা আবার যখন সবাই জড়ো হলেন; তখন ভূধরবাবুই সকলের আগে এসে হাজির আমাদের বাড়ি।

বললেন—কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি মশাই—যাকে মা বলে ডেকেছি, তার এমন কান্ড যে ভাবতেই পারা যায় না মশাই—চলুন—

নটু ঘোষবাবুও এসে গেলেন শেষকালে।

বললেন—সারারাত কাল আমার স্ত্রী কেঁদেছে মশাই জানেন, কতদিন ছোঁয়ামেশা করেছে ওর সঙ্গে, শেফালি তো ওকে কাকীমা বলতে অজ্ঞান---

কলোনীর দক্ষিণ দিকে উঁচু খাদের উপর তের নম্বর কুঠি। বাইরে ফুলের বাগান। ফুল ফুটে আছে গাছে গাছে। মুখুজ্জে গিন্নীর কত সাধের বাগান। কিন্তু কাছে যেতেই দেখা গেল সদর দরজায় তালা ঝুলছে। কেউ কোথাও নেই। মুখুজ্জে গিন্নীর বাড়ির ঝিটা আসছিল এই দিকে।

নেপাল জিজ্ঞেস করলে— এই লছমী, তোর মা কোথায়?

নগেন সরকার বললে—হ্যাঁরে, মুখুজ্জে গিন্নী কোথায় গেছে রে?

লছমী বললে—বাবু আর মা কাল রাত্তিরের ট্রেনে চলে গেছে।

--চলে গেছে! কোথায়! সবাই যেন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে।

—তা জানিনে বাবু!

—মাল-পত্তর নিয়ে গেছে?

লছমী বললে—মাল-পত্তর কিছুই নেয়নি বাবু, খালি হাতে চলে গেছে—

সেই শেষ। মুখুজ্জে মশাই আর মুখুজ্জে গিন্নীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি কারো। আর তারা ফিরেও আসেনি কোনওদিন। কলোনী আরো কয়েক বছর ছিল সেখানে। টিরিমিরি পর্যন্ত রেল লাইন তৈরি হতে আরও চার-পাঁচ বছর লেগে-ছিল। লাইন শেষ হওয়ার পর কলোনী উঠে গেল। অফিসও উঠে গেল। সকলের চাকরিও চলে গেল। তালা ভেঙে মুখুজ্জে গিন্নীর জিনিসপত্রগুলো অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, তাকিয়া-বালিশ সমস্ত। তারপর সে জিনিসগুলোর কী হলো শেষ পর্যন্ত—কেউ আর খবর রাখেনি।

আজ এতদিন পরে বিডন্ স্কোয়ারের পাশে সেই মুখুজ্জে মশাই-এর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারা যায়নি।

বললাম—মুখুজ্জে গিন্নী কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই-এর মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বললাম—শেষকালে কিনা আপনি অনপূর্ণার সকলের জাত মারলেন মুখুজ্জে মশাই?

মুখুজ্জে মশাই-এর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল টপ্ টপ্ করে।

বললাম—বিয়ে করতে আর মেয়ে পেলেন না আপনি? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষকালে কি না...

মুখুজ্জে মশাই আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি ধরে রাখলাম।

বললাম—বলুন আপনি, আপনাকে বলতেই হবে, কেন আপনি বিয়ে করে-ছিলেন একটা বাজারের মেয়েমানুষকে? কোত্থেকে পরিচয় হলো আপনার সঙ্গে?

মুখুজ্জে মশাই আমার দিকে অসহায়ের মত চাইলে।

বললে—বিশ্বাস করো ভায়া, আমার সঙ্গে বেনারসীর ছোটবেলা থেকে ভাব ছিল, সেই দু-তিন বছর বয়েস থেকে। আমাদের এক গাঁয়ে বাড়ি কিনা, বেলডাঙাতে—

মুখুজ্জে মশাই এইটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়লো।

তারপর বললে—তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি ভায়া, কিন্তু বারো বছর বয়েস পর্যন্ত আমি জানতাম ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে, বেনারসী আমাকে খুবই ভালো-বাসতো কি না! আর আমিও তাই ভালো-বাসতাম—সত্যি কথা বলতে কি।

বললাম—তারপর?

—তারপর কী যে হলো ওরা ওদের এক মামার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে কলকাতায় গেল একটা যোগে, তারপর আর ফিরলো না। গেল তো গেল। গরীব বিধবা মা, বাড়িটাও ছিল ভাঙা—

—তারপর?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—তা তোমার বয়েস হয়েছে, তোমাকে বলতে আর লজ্জা নেই, প্রায় কুড়ি বছর পরে বেনারসীর সঙ্গে আবার হঠাৎ দেখা—

বললাম—কোথায়?

—এই ওরই ঘরে, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তখন ও থাকে, সেখানে গান শুনতে গিয়েছিলাম ওর, খুব ভালো ঠুংরি গাইতে পারত কিনা ও, তা আমিই ওকে চিনতে পারলাম প্রথম।

বললাম—বেনারসী না?

মুখুজ্জে মশাই কোটের একটা হাতা দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো।

বললে—সেই দিনই বামুন ডেকে ও আমায় বিয়ে করে ফেললে—

বললাম—তারপর?

মুখুজ্জে মশাই বললে—এই পার্কের মিটিং দেখতে দেখতে তাই ভাবছিলাম, আইনও পাশ হলো তা সেই, কিন্তু আর কটা বছর আগে পাশ হলে কী ক্ষতি হতো!

এতক্ষণে যেন আমারও অনপূর্ণার মুখুজ্জে গিন্নীর কথাটা মনে পড়লো।

বললাম—মুখুজ্জে গিন্নী এখন কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই তেমনিই বলতে লাগলেন—তারপর থেকে ভায়া চাকরি নিয়ে যেখানেই গিয়েছি, সব জায়গাতেই একদিন-না-একদিন ধরা পড়ে গিয়েছি—কোথাও গিয়ে শান্তি পাইনি।

আবার বললাম—মুখুজ্জে গিন্নী এখন কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—মারা গেছে

আমি চুপ করে রইলাম শুনে।

মুখুজ্জে মশাই বলতে লাগলেন—শেষ জীবনটা ভায়া বড়ই কষ্টে কেটেছে তাঁর, মনের মধ্যে দগ্ধে দগ্ধে পুড়েছে, আর কেবল লুকিয়ে এসেছে, শেষের ক'দিন তো কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

# পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্যাভয়ের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংসুং এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লি-শস্য থেকে উৎপন্ন পাল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3084

# ডেও-পিঁপড়ে

প্রবোধকুমার সান্যাল
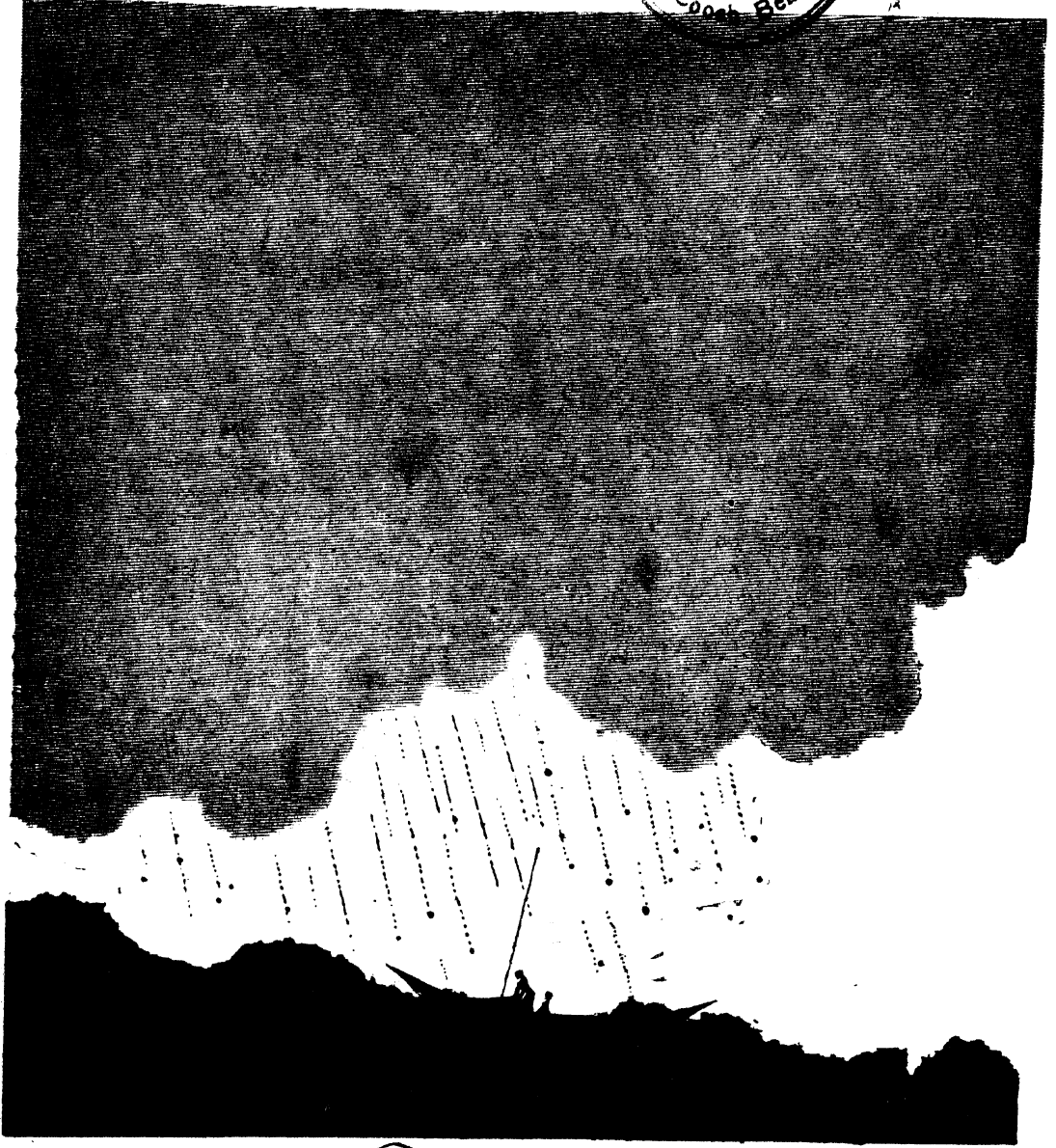
ঝড়ের হাওয়া উঠেছিল দামোদরে। আকাশজোড়া কালোমেঘ দাঁড়িয়ে ছিল সকাল থেকে। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি চলছে বহুক্ষণ অবধি, কিন্তু বিপুল কালো মেঘের তুলনায় মুষলধারা এখনও নামেনি।

জেলেডিঙ্গি নিয়ে নদীতে নেমে যাবার বোধ হয় এইটিই উপযুক্ত সময়। বুড়ো জলু মাহাতো ভুল করেনি।

কিন্তু নাতনীটাকে এ বেলায় ডিঙ্গিতে উঠিয়ে জলু একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল। ভরা বর্ষায় মেয়েটার গায়ে এমন ক'রে বৃষ্টির জল বসাটা ভাল হচ্ছে না। গায়ের জামাটা সপসপ করছে। মেয়েটার জ্বর ছেড়েছে চারদিন আগে।

জলু বললে, বোধ হয় ঝড় উঠবে রে বুনি, তুই সামাল দে। জালের খোঁটা টেনে ধর, হাল ধরতে লারবি তুই।

বুনি চেঁচিয়ে উঠল, পারব পারব, তুই চেঁচাসনে। চেয়ে দেখ্, বাটামাছ উঠেছে তিনটে, একটা ছোট কাৎলা। আড়াই টাকা দরে তুই পারবিনে বেচতে? পুল-সায়েবরা হাটে আসবে দেখিস।

জলুর কানে কথাটা গেল। কিন্তু মেঘের চেহারা সে জানে, ঝড়ের লক্ষণটাও সে বোঝে। সুতরাং এক পা বাড়িয়ে সে ওই অজ্ঞান মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়াল। দরকার হবামাত্র হালটাকে সে রুখবে। ওদিকে

ডিঙি মাঝে মাঝে টাল খাচ্ছে। জালটা একটু ভারি বৈকি। মাছ সুদ্ধ টানতে গেলে ওরই মধ্যে আবার একটু কাত হয়।

বাতাসের মেজাজটা অনুভব ক'রে বুড়ো আস্তে আস্তে জালটা গুটিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তখনই একবার ঝাপটা দিল বায়ুর বেগটা। দূরে নদীতে বৃষ্টি এবার এসেছে বেশ জোরে। বুড়ো সেদিকে একবার তা'র পীত-কপিশ চোখ দুটো তুলে তাকাল, তারপর বললে, ধর বুনি তুই জালের খোঁটা। —এই বলে মেয়েটার হাত থেকে হালটা সে ছাড়িয়ে নিল। এবেলা এখন এই পর্যন্তই থাক, মেয়েটাকে রোজ জলে ভেজানো আর চলবে না।

বুনির চুলের ঝুঁটি থেকে জল পড়ছে। ঘাঘরাটাও ভিজে গেছে। কিন্তু ওই পাতলা চেহারায় তার ইস্পাতের কাঠিন্য ছিল। পাটাতনের মধ্যে নিজের পা দুটো আটকিয়ে বুনি সেই টলমলে ডিঙিতে খাড়া দাঁড়িয়ে দুই হাতে সেই জাল টেনে গোটাতে লাগল।

ঝড় উঠেছে তখন দামোদরে।—

জলু বললে, সাবাস রে, বুনি। হাঁ, এতেই হবে। আরেকটা কাতলা উঠল রে। লিবে বলছিস পুল-সায়েবরা? আড়াই টাকা দরে ছাড়তে লারব।—হাঁ হাঁ খবরদার, —ইয়া, ধর আমার হাতখান। এখানে ঘূর্ণি আছে রে বটে।

আরেকটু হলেই বুনির পা ফসকে গিয়েছিল আর কি। ততক্ষণে ঝড় এসেছে এগিয়ে। শক্ত হাতে হাল বাগিয়ে জলু ঠিকমতো নৌকা নিয়ে চলেছে। ঘাট আসতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু দামোদর নাকি বড়ই খামখেয়ালী। কখন যে কোথায় ফুঁসিয়ে উঠবে, এই বৃদ্ধ বয়স অবধি জলু তার নির্দিষ্ট হদিস পেল না।

বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি এবার একটু জোরে এল। জালটা সম্পূর্ণ গুটিয়ে তুলতে বুনিকে অনেক কসরত এবং মেহন্নত করতে হল। এবার নিঃশ্বাস নিয়ে কপাল থেকে বৃষ্টিভেজা চুলের গোছা সরিয়ে সে হাসি-মুখে বললে, বুড়োদা, তুই যে বললি এবার রেশমী ঘাঘরা কিনে দিবি?

জলু তার হালে টান দিয়ে বললে, হু, জাল ছুঁয়ে দিব্বি, ঘাঘরা এবার লয়!

কেনে?

চল্ আগে ঘাটে গিয়ে উঠি। এবার শাড়ি রে শাড়ি, ঘাঘরা লয়,—বুকে যে তুর ফুল ফুটেছে! এবার শাড়ি পরবি কোমর বেন্ধে।

জলু প্রাণের আনন্দেই হাসতে লাগল। বুনি তেমন কিছু বুঝল না। এক সময় শুধু বললে, মরু তো! আবার হাসছে দেখো কেনে।

পুল-সায়েবদের কতগুলো হোমরা চোমরা লোক ওদের চালাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকৌতুকে জেলে ডিঙিখানাকে লক্ষ্য করছিল। বাচ্চা একটা মেয়ের এই দুঃসাহসিক কৃতিত্ব দেখে একটু অবাকই হতে হয়। ডিঙি এসে ঘাটে লাগতেই একজন সাহেব চেঁচিয়ে বললে, এত সাহস কেন হে? মেয়েটাকে ডুবিয়ে মারবে নাকি?

বুড়ো জলু একবার শুধু তাকাল, কিন্তু কিছু বললে না। ওই বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে সুস্থে নাতনী আর ঠাকুরদা মিলে ঘাটে ডিঙি লাগিয়ে জালটি তুলে নিল। তারপর দড়ি বা'র ক'রে অতি যত্নের সঙ্গে ডিঙিখানা সামনের ডুমুরগাছের গোড়ায় বেঁধে বুড়ো বললে, জাল টেনে লিয়ে তুই ঘরে যা বুনি, সায়েবরা কি বলে শুনে আসি।

বুড়ো এগিয়ে গিয়ে করোগেটের চালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং মুখ তুলে ওদেরকে ডাকল, কি বলছ?

জনৈক সাহেব এগিয়ে এসে বললে, তোমার ভালর জন্যেই বলছিলাম হে। মেয়েটা জলের মধ্যে ছিটকে পড়লে আমাদেরই লোক লাগাতে হত।

বুড়ো জলু মাহাতোর দৃষ্টি এমনিই কিছু রুক্ষ। হলদে দুটো চোখের ড্যালা বড় বড়, মুখখানা কাঠিন্যে ভরা। এর ওপর যদি কিছু মানসিক উত্তেজনা জন্মে, তবে সেই মুখের চেহারায় বিপ্লবের চিহ্ন ফুটে ওঠে। জলু ওদের দিকে চেয়ে বললে, থামো। সাঁকো বাঁধতে এসেছ তাই বাঁধো, কলকারখানা বসাবে বসাওগে। জলের কি জান তোমরা? তোমাদের মতন সায়েবকে চুলের ঝুঁটিতে বেন্ধে ওই বাচ্চা মেয়ে সাতবার গাঙ পার হতে পারে, তা জানো বটে?

লোকটার এই প্রখর মেজাজের জন্য ওরা প্রস্তুত ছিল না। মেজর ফতে সিং এগিয়ে এলেন। বললেন, হুঁ, তোমাকে চিনি। তুমিই না সরকারি জমির সীমানা থেকে পিলপে তুলে ফেলেছিলে?

পাশ থেকে একজন সহকারী বললেন, হ্যাঁ স্যর, এই সেই দুঁদে লোকটা। নাম জলু মাহাতো।

মেজর সিং একটু সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, জলু, তুমি হুঁশিয়ার থেকো।

জলু এবার ফেটে পড়ল, হুঁশিয়ার তোমরা থেকো, সায়েব। আমার জমি, আমার ঘাট,—ওখানে পিলপে দেবার কে তোমরা?

হাসিমুখে অপর এক সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ক্যা, সরকারি কাম নেহি হোগা, ভাই সাব?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জলু বৃষ্টিতে ভিজছিল। এবার বললে, সরকারি কাজ, তা আমার কি? বাপ-পিতমোর জমিনে খুঁটি গাড়া আছে, তোমরা সরাবার কে বটে?

জলুর চোখের ভিতরকার স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য ক'রে সাহেবরা হাসছিল। আপ্পারাও সাহেব হাসিমুখে ইংরেজিতে শুধু বললেন, আমাদেরই দোষ, ওদের এখনও বোঝাতে পারিনি, ওদেরই সুবিধের জন্যে ব্রীজ তৈরি হচ্ছে।

চৌধুরী সাহেব একটু গলা বাড়িয়ে বললেন, ওহে মোড়ল, ঘরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হওগে। বৃষ্টি ভিজে আর তোমাদের মাছ ধরতে হবে না নদীতে। ঢালাই লোহার কারখানা বসলে তোমাদেরই সব ভাল-ভাল কাজ জুটবে।

জলু মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। বললে, লম্বা চওড়া কথা! তুমাদের কাজ, আমার কাজ এক লয়। জমিন আমি দিব না।

হেসে উঠল সাহেবরা। বললে, তুমি দেবে কেন হে? ওটা যে দখল করা হবে! তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে।

জলু গ্রাহ্যও করল না। কেবল তার সেই উগ্র দুটো চোখ তুলে বললে, হুঁ, ডাকাতি! ডাকাতি করে লিবে, লয়? আমারও খ্যামোতা আছে, আমিও দেখে লিব।

মুখ ফিরিয়ে জলু তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। বুড়ো কোনও যুক্তি মানে না, ভবিষ্যৎকালের সৌভাগ্য বোঝে না, নিজেদের দুর্গতি মোচনের নক্সাটাও কানে তোলে না। সাহেবরা ওই অ্যাসবেস্টসের বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দামোদরের জলের শোভা দেখতে দেখতে নানাবিধ কল্যাণজনক আলোচনা করতে লাগল।

জলু ফিরে এল তার নিজের ঘরে। চালাঘরের অবস্থাটা এ বছর আর তেমন ভাল নয়। কাঠা দশেক জায়গা তার এখনও আছে। এর বাইরে যা কিছু সবই গেছে সায়েববাগানের এলাকায়। কোথা থেকে যেন বিপুল পরিমাণ লোহালক্কড় এসে পড়েছে চারদিকে। রাতারাতি বসে গেছে কুলি-ব্যারাক আর বড় বড় সাহেবী বাংলা। ইলেকট্রিকের মেসিন থেকে এক রকমের আলো আর আগুন ফোটে,—সমস্ত রাত ধরে অন্ধকার আকাশ যেন ফুটফুট করে। গ্রাম ছিল এদিকে সাতখানা,—কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রাম কোথায় যেন রাতারাতি হারিয়ে গেল।

দাওয়ায় উঠে এসে গামছা দিয়ে জলু গা-মাথা মুছছিল। বাইরে থেকে কাঠকুটো জোগাড় ক'রে বুনি তখন আগুন ধরাবার চেষ্টা পাচ্ছে। জলু একবার সেদিকে তাকাল। ওই বাচ্চা মেয়েটার জন্যই তার যা কিছু বাঁধন, নৈলে সে আর কিছু পরোয়া করে না। দীনু বাগদিরা চলে গেছে, হারু

কামার পালিয়েছে, নকশীর দাশ্ ময়রা ঘরদোর বেচে নাউমুণ্ডির দিকে ঘর বেঁধেছে, —একে একে সকলেই পথ দেখেছে। চারিদিকে এখন লোহালক্কড়ের শব্দ, ইঞ্জিনের আগুন, মোটর গাড়ির আনাগোনা, সাহেব-সুবোর ভিড়। এই বিপুল কর্মসমুদ্রের মধ্যে জলু ধ'রে রেখেছে তা'র জমিটুকু।

নিজের হাতে একটু তামাক ধরিয়ে সবেমাত্র সে বসেছে, ওধার থেকে বুনি বললে, লকড়ি আর নাই রে বুড়োদা, ভাত ফুটবে না।

সবুর কর, এনে দিচ্ছি।

বুনি ভিজে কাঠের ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচিয়ে সরে এসে বললে, মাছ লিয়ে হাটে যাবিনে?

তামাকে টান দিয়ে জলু তীব্রকণ্ঠে বললে, ওই শালারা খাবে আমার ধরা মাছ বটে! যা তুই, গাঙে ফেলে দিয়ে আয়। মাছ আমি বেচব না।

বুনি বললে, মাথা খারাপ হইছে তুর। আবার বুঝি ওই পুল-সায়েবদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এলি?

জলুর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে এল। বললে, আমার জমিন্ কেড়ে নিয়ে উরা আমায় তাড়াতে চায়, এ অবিচার সইব কেনে রে? মরি ত বটে, মেরেই মরব!

বুনি রাগ ক'রে বললে, তুই মার খাবি, মারতে পারবি লয়। তার চেয়ে তুই অলাউঠায় মর্।

মুখের ধোঁয়া ছেড়ে জলু এবার হাসল। বললে, আমি মলে তোরে শাড়ি দেবে কে? কে বিয়া করবে তুরে?

বুনি দাঁত কেটে জবাব দিল,—দেখিস্ কেনে, পুল-সায়েবের ঘরে গিয়ে উঠব। তুই মর্ আগে।

তামাকে বেশ বড় বড় টান দিয়ে বুড়ো উঠল এক সময়ে হাসিমুখে। পরে বললে, প্রাণ থাকতে তা লারবে রে, ছুঁড়ি। দে, মাছ বার ক'রে, হাটে যাই।

মাছের চুপড়িটি বুনি সামনে এনে দিল। কাঠের ধোঁয়ার দিকে একবার তাকিয়ে জলু বললে, শালারা সব তল্লাটের গাছ কেটে সাফ করেছে রে। কাঠ আর পাবিনে, এখন সব কয়লা। তুই ফুঁ দে ততক্ষণ, আমি আসছি।

মাছের চুপড়ি নিয়ে জলু কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে গেল। দু পোয়া রাস্তা গেলে সরকারি বাজার বসেছে। জলু সেইদিকে চলল।

দিন তিনেক পরে ডিঙিখানা ঘাটের এক পাশে বেঁধে জলু তা'র জালটি কাঁধে নিয়ে যখন এসে তার চালায় ঢুকছে, দেখে সেই চাপরাসিটার সঙ্গে বুনির কি যেন কথা কাটাকাটি চলছে

জলু এসে দাঁড়াল পাশে,—হইছে কি শুনি?

তারণ সিংয়ের বগলে একটা লাঠি। সে তার বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের চাপড় মেরে খৈনিটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, চালান্ এসেছে, চালান্। তুহার নাতিন্ হামার সংগে তকরার লাগিয়েছে রে, জলু। আরে, হামি ত' সরকারি নোকর আছে, না কি?

জলু শান্ত কণ্ঠে বললে, কিসের চালান্?

সেই যে সেবারে লট্‌কাইয়া গেলম রে ভাই,—হাকিম সাহেব তোরে ডাকিয়ে পাঠাল, তুই যাইলি না—

হাঁ মনে আছে।

সেই কোথাই বলছিলম তোহার নাতিনরে—

জলু প্রশ্ন করল, আজ আবার এসেছো কেনে?

তারণ সিং জবাব দিল, হামি ত ষাট টাকা তলবের নোকর আছি কি নেই? হামার কসুর ত কুছ না রে ভাই, জলু। লটিস্ লট্‌কাইয়ে হামি চ'লে যাব। এ ত' ভাই সরকারি হুকুম।

কাঁধের জালটা জলু নামাল। ভিতরে মাছ রয়েছে কয়েকটা। বুনি সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভিতরে। জলু তার কাঁধের গামছায় মুখ মাথা আর গা-হাত মুছে বললে, কি আছে তুর নোটিসে?

লাঠিটা বগল থেকে নামিয়ে তারণ সিং বললে, এ ত' সোবাই জানে জলু। দুনিয়াভর সব জমিন্ যাবে সরকারি দখলে। এখানে থেকে সাত মাইল ধরে টাউন বসিয়ে যাবে। তোকে লটিস্ দিছে হাকিম সাহেব। এ জমিন্ ছাড়িয়ে যেতে হবে।

কই দে দেখি নোটিস।—জলু হাত বাড়াল।

তারণ সিং এবার খুশী হয়ে তার কোর্তার পকেট থেকে খান দুই কাগজ আর একটি কালির প্যাড বার করল। পরে বললে, এই কাগজে একঠো টিপসই মেরে লটিশটা লিয়ে লে, জলু। হামাদের কাম বড় খারাপ আছে, ভাই। মানুষকে তার আপনা জমিনসে তাড়াতে বড় বুকে লাগে।

অত কথা শোনার সময় বুড়ো জলুর নেই। সে বললে, দে তুই—এই বলেই নিজেই তারণ সিংয়ের হাত থেকে কাগজ দুখানা নিয়ে তৎক্ষণাৎ কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

হাঁ হাঁ, জলু, কি করিস,—আরে কমবেকত, তোর সাজা হয়ে যাবে। ফাটকে টেনে নিয়ে যাবে দেখিস।—তারণ সিং অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

যা ভাগ্ এখান থেকে!—জলু তার কঠিন কর্কশ চক্ষু তুলে তাকাল।

হাঁ যাচ্ছি—তারণ সিং তার লাঠি ঠুকল। বললে লেকিন জানিয়ে যাচ্ছি তোর গেরেপ্তারি পরোয়ানা আসবে এবার।

ফের বকোয়াসি করছিস বটে!—জলু তার লাঠিখানা কেড়ে নিতে গেল, এমন সময় বুনি ছুটে এসে জলুকে ধরে ফেলল। তারণ সিংয়ের দিকে ফিরে সে বললে, যাওনা কেনে এখান থেকে? মারধর খাবে বটে?

তারণ উগ্রকণ্ঠে বললে, সরকারি নোকরকে মারবে কোন্ শা—

তবে রে—জলু আবার ছুটে আসছিল।

তারণ সিং বললে, বেশ, হামি যাচ্ছি। সরকারি নোকর কভি গুণ্ডাবাজি করে না। তোকে তামাশা দেখিয়ে দেবো হামি!

বলতে বলতে তারণ সিং চ'লে গেল। ওপাশে দাঁড়িয়ে জলু বুড়ো যেন দিপালের দহিতে ধকধক ক'রে জ্বলছিল। হলদে দুটো চোখ হয়ে উঠেছে রাঙা। কিন্তু তার কণ্ঠের লোলচর্মের ভিতর থেকে মোটা মোটা শিরাগুলোকে ফুলে উঠতে দেখেই বুনি উদ্বিগ্ন বোধ করে বললে, হেই বটে, এবার কাসি উঠছে তোর। মরণ নাই কেনে, মরে যা তুই! চল্ তুকে গাঙে ভাসিয়া দিই।

কিন্তু বুনির কথা শেষ হল না। আজ প্রায় পনেরো দিন বাদে জলুর বুকের ভিতর থেকে আবার সেই পুরনো কাসির বেগ উঠল। প্রথমটা চাড়া দিল গলায়, তারপর দম আটকাল, তারপর যেন কোন্ অতল তল থেকে একটা ভয়ানক কাসি উঠে এল। কাসতে একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। আপন ধাক্কাতেই আপন বেগ সৃষ্টি করে। বুনি তাকে রেখে ভিতরে ছুটল, এবং তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল। সেই জল সে ঢালল জলুর মাথায়,—জলুর প্রবল কাসি তখনও থামেনি। কিন্তু কাসতে কাসতে মুখের ভিতর থেকে যখন মোটা মোটা রক্তের ছিটে বেরোতে লাগল, তখন আশ্বস্ত হল বুনি। যাক্, এবার কাসি থামবে। রক্ত বেরিয়ে এসেছে, আর ভয় নেই।

ঠিক তাই হল। আগে ছিটে ছিটে রক্ত, তারপর খানিকটা গলগলিয়ে। অতঃপর কণ্ঠের নালিপথটা যখন রক্তে পিছল হয়ে এল, কাসি তখন থামল। বাঁচল জলু। প্রায় সাত বছর থেকে এই কাসি তাকে ধরেছে। এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখখানা ধুয়ে সে উঠে ভিতরে গেল।

ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে এসে মাছ কুটতে কুটতে বুনি বললে, কি ভাবছি জানিস?

জলু একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললে, কি বটে?

তুকে নিয়ে আর ঘর করতে লারব।

কেনে?

খুনে লোক তুই। ঝগড়া করবি, মারতে যাবি সবাইকে—তুকে যদি চালান্ দেয় আমি কি করব?

হাসিমুখে জলু বললে, তখন তুই গিয়ে পুল-সাহেবের ঘরে উঠবি?

মাছ ছেড়ে বুনি উঠে এল। দুই হাতে তার ইলিশ মাছের গন্ধ। কিন্তু সেই হাতেই সে বৃদ্ধ জলুর গলা জড়িয়ে বললে, উ কথা বলতে নাই, বুড়োদা। তোর চান্দামুখের কাছে কেউ লয়।

পীত-কপিশ চক্ষু যেন কোন্ নিবিড় আনন্দে বুজে এল। হয়ত এখনি জল গড়াবে। কিন্তু তা নয়। নাতনীকে এক হাতে কাঁধে তুলে নিয়ে জলু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল্ আজই তুর জন্যে শাড়ি কিনে আনি।

তুর মরণ বটে। ছাড়, ছেড়ে দে—নামি। বেতে হয় তুই যা। কান্ধে ক'রে মাগি লয়ে যাবি, হাটের লোক কি বলবে?

বুনি জলুর কাঁধ থেকে নেমে আবার মাছ কুটতে বসল। জলু হাসিমুখে কি যেন একটা মতলব ঠাউরে তখনকার মতো বেরিয়ে গেল। দক্ষিণে কিছুক্ষণ আগে থেকে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। আজ মাছ উঠবে ভাল। দুটি ভাত মুখে দিয়েই আজ ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। জলু এসে তার খামারটিতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। পেঁপে গাছটায় এবার ফল ধরেছে অনেক। মাচানে কুমড়োটা আজও রয়েছে, পাক ধরেছে একপাশে। বেল এসেছে গাছে। কাঁচা লঙ্কা হয়েছে অনেক। বেড়াটা ভেঙে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। বর্ষার পরে এবার সে জমিনে বেড়া দেবে। ঘরখানা সেই যে চৈত্রের ঝড়ে কাত হয়ে পড়েছে, আজও তেমনি রয়েছে। কিন্তু হাটে আজকাল বাঁশ খড়-কাঠকুটো—কোনটাই পাবার উপায় নেই। সব জিনিসই আসছে, কিন্তু ঠিকাদাররা সব কিনে নিচ্ছে চড়া দামে। সরষের তেল পাবার যো নেই। টাকায় পাঁচ পোয়া চা'ল।

মাথা উঁচু করলে এখান থেকেই দেখা যায় দূরে ও কাছে চারিদিকে লোহার কারখান আর যন্ত্রপাতির ডিপো। হাজার হাজার দানব এসে যেন গ্রামকে-গ্রাম চেটে নিচ্ছে কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নালা-ডোবা পুকুর—সব বুজে মাঠ হয়ে গেছে। আম

কাঁঠালের বাগানগুলো মিশিয়ে গিয়ে মোটর গাড়ির শেড তৈরি হয়েছে। চেনা মুখ কোথাও আর দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু সাহেব-সুবো আর ঠিকাদারদের দাপাদাপি। হপ্তায়-হপ্তায় নতুন নতুন কারখানা ব'সে যাচ্ছে।

কিন্তু জলুর এটা জিদ—সবাই বলবে। এখনই সরকারি প্রস্তাবে রাজি হলে তার কপাল ফিরে যায়। কয়েক মাইল দূরে গিয়ে বিঘা দুই জায়গা তার নামে বরাদ্দ হয়। এক গাড়ি বাঁশ, পাঁচ কাহন খড়, নগদ একশ টাকা। কাপড় পাবে দু জোড়া, তার সঙ্গে আড়াই মণ চা'ল। ভাগ্যটা তার ফিরেই যায়। কিন্তু পাওনার কথাটা থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে গিয়েই তার মুখের চেহারা দেখতে দেখতে আবার রুক্ষ হয়ে এল। ঠিক এই মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে তাকে কেউ দেখলে ভয় পেয়ে স'রে যেতো। লোভের চেহারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলেই তার দুই চোখে হিংস্রতা ফুটে উঠল। সে কিছু চায় না,—জীবনটাকে সে শুধু কাটাতে চায়, যেমন সে কাটিয়ে এসেছে এতকাল। ওই নাতনীটাকে আরেকটু বড় ক'রে সে বিয়ে দেবে, নাতজামাইকে এনে এই বাস্তুতে বসাবে। ঘরখানা তুলবে, খামারে সব্জি বানাবে, বাগানে বেড়া দেবে, নৌকা নিয়ে মাছ ধরবে, —ব্যস, আর কিছু সে চায় না।

তারণ সিং শাসিয়ে গেছে বারবার। হাকিমের নোটিশ এসেছে বারতিনেক। মেজর ফতে সিং, চৌধুরী সাহেব, আম্পারাও,—এরা সবাই সতর্ক ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এদের কথায় কান দেবার সময় জলুর কোথায়? বুনির আবার জ্বর এসেছিল এর মধ্যে,—সেটা সবেমাত্র ছেড়েছে। ডিঙি নিয়ে বার দুই দামোদরে না নামলে চলে না। ঘর আগলায় বুনি,—এমন কেউ চেনাশোনা নেই যে, অসময়ে এসে দাঁড়ায়। সম্প্রতি মাটি কাটবার লোকজন এসে ঘুরছে। ডুমুর গাছটার নীচের থেকে মাটিকাটা শুরু হবে, ওখানে মাটির গভীর নীচের থেকে সাঁকোর ভিত উঠবে। বালু, পাথরের টিল, মস্ত বড় ক্রেন্, নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, একে একে সমস্ত এসে জড়ো হচ্ছে। তাকে যেন অবরোধ করছে সবাই চারিদিক থেকে। বিপুল যন্ত্রদানব যেন তাকে বেষ্টন করছে এক সময় তার টুঁটি টিপে ধরবার জন্যে। দিবারাত্রি ধাক্কা পড়ছে তার ওই ঘরখানায়। ঘনঘোর ভবিষ্যতের দিকে জলু ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে।

একদিন দশ বারোখানা ইঁটবোঝাই লরী এসে দাঁড়াল জলুর বেড়ার ঠিক পাশে। অনাগোনার পথটা যে বন্ধ হচ্ছে, সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এর ওপর আবার সে হঠাৎ একদিন দেখল, দড়ি খুলে কে যেন তার নৌকা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল, তিন চারজন হিন্দুস্থানী লোক ডিঙিখানা নিয়ে আমোদ আহ্লাদ আর হৈ-হল্লা করতে-করতে ফিরছে। জলু একেবারে অগ্নিশর্মা। ঘাটে এসে ডিঙি লাগতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এই হারামজাদারা, তোদের বাবার নৌকো?

ক্যা, গালি দেতা হ্যায়? ঠহরো—

কিন্তু তার আগে পটাং ক'রে জলু সামনের গাছ থেকে মোটা দেখে একগাছা ডাল ভেঙে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটাকে অন্তত সে আজ শেষ করবে। হৈ চৈ পড়ে গেল এখানে ওখানে। পুল-সাহেবদের কেউ কেউ এসে দাঁড়াল। ঠিকাদাররা মিটমাটের জন্য ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল। হিন্দুস্থানীরা বেগতিক দেখে স'রে গেল। খবর রটল নানাদিকে—এখানে একজন দুর্ধর্ষ লোক নাকি বাস করে। এককালে সে নাকি ডাকাতদলের সর্দার ছিল। পুলিসের পুরনো খাতায় ওর নাম লেখা হয়েছে অনেকবার।

ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটমাট করতে গিয়ে অনেককেই সেদিন বেগ পেতে হয়েছিল।

একদিন জলু সকালে উঠে দেখল, খামারে তার একটিও সব্জি নেই। কুমড়ো, পেঁপে লঙ্কা, ডুমুর, কাঁচাকলার সেই কাঁদিটা, গোটা চারেক কচি লাউডগা,—সমস্তই অদৃশ্য। কাঠকাটার কুড়ুলখানাও আজ দুদিন হয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগাগোড়া সমস্ত নিছক চুরি!

সাংঘাতিক আক্রোশে ফুলতে ফুলতে জলু গিয়ে পুল-সাহেবদের বারান্দায় উঠল। আজ এস্পার-ওস্পার যা হয় একটা করতেই হবে।

সাহেব!

জন দুই ভদ্রলোককে নিয়ে মেজর ফতে সিং টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। বেলা তখন ন'টা। হাসিমুখে মেজর সিং বললেন, খবর কি, মাহাতো?

তোমার চোরকে যদি না সামলাও, একটাকে মেরে খুন করব!

চোর! কোথায় চোর!

জলুর চোখে আগুন ঠিকরে যাচ্ছিল। বললে, আমার খামারে ঢুকে সব সব্জি কেটে নিচ্ছে কে? এসব লণ্ঠামি আমি সইব না, সায়েব।

মেজর সিং বললেন, এখানে হাজারো আদমি আছে। তুমি চোর ধরিয়ে দাও, আমি সাজা দিচ্ছি! হাকিম আছে, থানা আছে, সেপাই আছে—চোরকে দেখিয়ে দাও তুমি, মাহাতো!

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি। জলু যেন জুড়িয়ে গেল। মেজর সিং সহাস্যে বললেন, এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত আছে, তোমার খামারের আলু পটল নিয়ে কে মাথা ঘামাবে জলু? শোনো ভাই, এ গভর্নমেণ্ট তোমার নিজের আছে! সরকারি নীতি এই কথা বলে যে, তোমাকে সব রকমে সাহায্য করবে, তোমার ভাল করবে! তোমাকে হয়রান করবার জন্যে ত' হামরা এখানে বসে নেই! বুঝে শুনে কথা বলো ভাই। যাও, ঘরে যাও, জলু।

মাথা হেঁট ক'রে জলু ঘরে ফিরে এল। বুনি দাঁড়িয়ে ছিল বেড়ার পাশে। সে বললে, কথা শুনিয়ে দিল বটে পুল-সায়েব! তুই কি বললি, বুড়োদা?

কিচ্ছু না।—বলে জলু এসে বারান্দার ধারে বসল। যে-চোখে আগুন জ্বলছিল, সেই চোখে যেন শ্রাবণের মেঘের ছায়া দেখা গেল। বাস্তবিক, সে ছুটেছিল মিথ্যে। চোরকেও সে চোখে দেখেনি, খামারে যে তার সব্জি ফলেছিল, তারও প্রমাণ সে রাখেনি।

এক সময় উঠে জালটা টেনে গুছিয়ে নিয়ে সে নিজের মনে বেরিয়ে গেল এবং সামনের ঘাটে এসে ডিঙিখানা খুলে নিয়ে সে নদীতে এগিয়ে চলল। ভাদ্রের নদী ভরেছে এবার। ঘূর্ণির পর ঘূর্ণি নিয়ে জল এবার ভয়ানক ছুটেছে। অদূরে তালডহরীর পাড়ে-পাড়ে ভাঙন ধরেছে। মুরসাহেবের সেই পুরনো বাংলোটা পর্যন্ত জল উঠেছে। নদী চওড়া নয়, কিন্তু সাংঘাতিক তার শক্তি। আকাশে মেঘ হয়েছে ঘন, বাতাস বইছে দ্রুত, বৃষ্টি আসতে আর বিলম্ব নেই,—দামোদরের সেই উত্তাল বিক্ষুব্ধ চেহারা দেখে জলুর আনন্দের আর সীমা রইল না। ডিঙি নিয়ে সে ভেসে চলল। জলের মধ্যে জাল নামিয়ে বজ্রমুষ্টিতে সে খোঁটা ধ'রে রইল।

ঘণ্টাতিনেক বাদে ডিঙি নিয়ে জলু ঘাটে এসে নামল। বাতাসটা এবার নেমে গেছে, কিন্তু মেঘের সমারোহ তেমনিই চলছে। জালের মধ্যে পড়েছে ছোট একটা চিতল মাছ

মাত্র, সের দুই হবে কিনা সন্দেহ। মাছটাকে বার ক'রে নিয়ে গামছায় সে বাঁধল। তারপর একবার জলের দিকে তাকাল। কি জানি কেন, জলুর মনে হল আজ তার বাঁচবার কথা ছিল না। শুধু যে বড় বড় ঘূর্ণি তা নয়, জলের স্রোতে এমন ধাক্কা অনেককাল সে পায়নি। আর বোধ হয় দেরি নেই, ভয়ানক বান হয়ত শীঘ্রই এসে যাবে। আজ যেন মৃত্যুর গ্রাস তার জন্যে জলের ভিতর থেকে হাঁ ক'রে ছিল।

লোকজনের সাড়া শব্দ পেয়ে সে একটু চকিত হয়ে উঠল। আবদারী আর চাপরাসি নিয়ে এক সায়েব এসে দাঁড়িয়েছে তার খামারের পাশে। এমন সময় দূরের থেকে তারণ সিং চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, হুঁশিয়ার,—উহ জলু আসিয়েছে—

হুজুর ফিরে তাকালেন। জলু কাছা-কাছি এগিয়ে এল। তারণ সিং পুনরায় সাহস পেয়ে বললে, হুজুর, সোবাই এখানে দেখেছে! হামাকে ডান্ডা পিটতে আসেছিল। নটিসঠো নিয়ে কুচি কুচি করে ফেড়েছে। হুজুর, হামি সরকারি নোকর আছে।

সাহেব ভাল ক'রে জলুকে লক্ষ্য কর-ছিলেন। এবার বললেন, তোমারই নাম জলু মাহাতো?

হাঁ আজ্ঞে।

আমি সরকারি নোটিস পাঠালুম, তুমি ছিঁড়তে গেলে কেন?

জলু একবার সাহেবের আপাদমস্তক তাকাল। পরে বলল, লেখাপড়ি জানি না, নটিশ পাঠাইলে কেনে?

সাহেব প্রশ্ন করলেন, তারণকে মারতে গিয়েছিলে তুমি?

তারণ সিং সোৎসাহে বললে, মারিতে লায় হুজুর, খুন করতে আসিয়েছিস।—বলতে বলতে সে হাকিমের পিছনে স'রে এল।

জলুর দৃষ্টির মধ্যে আগুনের স্পর্শ লাগছিল। তবু সে শান্তকণ্ঠেই বললে, তুমার ওই কুত্তাটা এসে আমার পিছনে রোজ ঘেউ ঘেউ করে। তাই গাছের একটা ডাল নিয়ে—

হুজুর, শুনিয়ে! হামি সরকারি নোকর আছে, হামাকে বলে কিনা কুত্তা!—তারণ সিং বললে, গোবরমেণ্টকে তুমি গালি দিচ্ছ জলু? এ কেমোন সাহস আছে তোমহার? তোমহাকে হামি যদি বলি বুড়োঘুঘু, কেমোন লাগবে তোমহার?

এবার মিষ্টকণ্ঠে হাকিম বললেন, তোমার নামে অনেক রিপোর্ট আছে জলু, কিন্তু সে সব থাক্। তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে বুঝিয়েই বলছি। তোমার এই জায়গাটুকু আমাদের না পেলেই চলবে না। ওই যে দেখছ কাটাখাল, ওর ওই মুখে সাঁকো তৈরি হচ্ছে; এখানে সরকারি কাজের আপিস বসবে। এতে তোমার অনেক লাভ, জলু। টাকা পাবে, বেশি জমি পাবে, ঘরবসতি মালপত্র পাবে,—সুবিধে অনেক। ঘরদোর জমি যখন ছেড়ে দিতেই হবে, মিথ্যে হাংগাম ক'রে লাভ কি ভাই?—আচ্ছা, এখনই জবাব চাইনে। কিন্তু দেখছ ত, মাটি কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমাকে আরও তিনদিন সময় দিয়ে যাচ্ছি, আসছে শনিবার বেলা বারোটার মধ্যে আমাকে জবাব দেবে। থানা পুলিস ক'রে কোনও লাভ নেই, জলু।

হাকিম আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু তারণ সিংয়ের মনে দুর্ভাবনা ছিল, হাকিমের আগে আগেই সে এগিয়ে চলল।

জলু সেখানে স্তব্ধ হয়ে মিনিটখানেক দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ গলা বাড়িয়ে ডাকল, সায়েব, শোন—

হাকিম পিছন ফিরলেন এবং দু পা এগিয়েও এলেন। জলু বললে, সাহেব, তুমি বদলির চাকরি ক'রে বেড়াও—কোনও জমিনের ওপর তুমার মায়া নাই। আর এ জমিন আমার বাপ দাদা চোদ্দপুরুষের ভিটে—এ আমি ছেড়ে দেবো না। তুমার যা খুশি করগে।

কাঁধে মাছ ফেলে জালটা টানতে টানতে জল্‌দু আবার খামারে গিয়ে ঢুকল।

বুড়োর হাসাকর স্পর্ধা দেখে হাকিম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর মোটরখানার দিকে অগ্রসর হলেন।

ভিতরে এসে জল্‌দু মাছটা এক জায়গায় ফেলল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বুনিকে দেখতে না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, বুনি চৌকিখানার উপরে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং তার হাতের পাশে একটি মস্ত কাঁচকড়ার সাজগোছ-করা দামি মেয়েপুতুল পড়ে রয়েছে।

সরকারি হাটে এমন সুন্দর পুতুল জল্‌দু অনেকবার দেখেছে। বুনিও পছন্দ করেছে বহুবার। কিন্তু এটি কেনা তার সাধ্যাতীত ছিল।

জল্‌দু এগিয়ে গিয়ে বুনির পাশে দাঁড়াল। পুতুলটার গায়ে হাতটি রেখে মেয়েটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু হাতের স্পর্শ পেয়ে বুনি চোখ খুলে তাকাল। বললে, ভাত আছে হাঁড়িতে, নিয়ে খাস বুড়োদা।

জল্‌দু বললে, পুতুলটা দিল কে বটে?

বুনি বললে, ওই যে ঠিকাদার, বুলাকি-লাল সায়েব।

অদ্ভুত একটা নাম শুনে জল্‌দু একটু থমকে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, তুর সংগে ওর ভাব হ'ল কেমন করে? তুরে চেনে বটে?

হাঁ, চেনে বটে! আসে রোজ। তুই গেলেই আসে। পুতুলটার দাম কুড়ি টাকা!—বুনি হাসিমুখে তাকাল।

জল্‌দু আর কিছু বললে না, ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল। বুনি রোজ ভাত দেয়, আজ কিন্তু উঠতে চাইল না। সুখের ঘুমের মধ্যে সে জড়িয়ে রয়েছে আপন গভীর আনন্দে,—আজ আর ভাত বেড়ে দেবার উৎসাহ তার নেই। কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবতে ভাবতে জল্‌দু হঠাৎ সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললে, আমি ঘরে নাই তখন ঠিকাদার ভিতরে আসে কেনে?

বুনি উঠে এল বাইরে। বললে, চিল্লাচ্ছিস কেনে রে? তুর মাথার ঠিক নাই। উরা লোক ভাল বটে। তুকে ঘি খাওয়াবে, ফল খাওয়াবে,—টাকা চাইলে তাও দিবে বটে।

তার বদলে তোকে লিবেঃ—বুড়ো চেঁচিয়ে অনুযোগ জানাল।

লিবে কেনে? ভালবাসে—!

বুনি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। হয়ত এর বেশি আর বলাও চলে না! জল্‌দু ভাত খেলে না, শুধু মাছটা বের ক'রে নিয়ে হাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

ঠিকাদারের কাজ ঠিকাদাররা ক'রে চলেছে। হুকুম পেয়েছে, নক্সা পেয়েছে, ব্যাপারটার আয়োজন অতি দ্রুতগতি। ডুমুরগাছের তলা থেকে আরম্ভ ক'রে পুল-সাহেবদের বারান্দার প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত নদীর পাড়ের সমান্তরালে মাটি কাটা হয়েছে। সে-মাটি উঠেছে পর্বতপ্রমাণ হয়ে। ফলে হয়েছে এই, জল্‌দুর জমিটি প্রায় চারি-দিক থেকে অবরুদ্ধ। নৌকা বেঁধে রাখার জায়গাটুকুও তার গেল। শুধু তাই নয়, ডিঙি টেনে এনে খামারে রাখবে তার পথ নেই। বিশাল চওড়া গর্তের উপরে মাত্র এক-একখানা তক্তা পাতা,—ভয়ে ভয়ে তার উপর দিয়ে পারাপার করতে হয়, অন্য পথ নেই। সেদিন দুপুরে ডিঙি নিয়ে ফিরে এসে জল্‌দু দেখল, এরই মধ্যে ডুমুর গাছটাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। বৃষ্টি এসে পড়েছে তখন মুষলধারায়। উপরদিকে তাকিয়ে জল্‌দু হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠবার চেষ্টা পেল, কিন্তু কা'কে ডাকবে? নিম গেল, বট গেল, আজ ডুমুরের গাছটাও গেল,—অথচ ওদেরই ছায়ার তলায় কত চৈত্রের রোদ বাঁচিয়ে সে কপালের ঘাম মুছেছে। ওর পাশে বুড়ো ঘরামির সেই উঠোনে আসর পেতে কতকাল ধরে গাজন করেছে তারা! মনসাশেতলা পুজোয় কত ঘটা! ওখানে তার বৌ ধান ভেনেছে কতদিন, ছেলেটা কতদিন খামার বানিয়েছে নিজের হাতে, ছেলের বৌয়ের জন্য স্নানের ঘাট বানাবার চেষ্টায় নিজের হাতে সে মাটি কেটেছে অনেক। ও জমিনটুকুর ওপর পা টিপলে এখনও ওর তলায় তারই বুকের রক্ত সপ সপ ক'রে ওঠে। কিন্তু আজ প্রতিবাদ জানাবে কোথায়? হাজার হাজার মানুষ আর লোহালক্কড় ইঁটপাথরে ভরে গেল চারিদিক, —কিন্তু প্রাণের দরবার কই? কোথায় সে আবেদন জানাবে?

ডিঙিখানা নিয়ে এদিক ওদিক সে ঘুরে দেখল, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার মতো একটু-খানি জায়গা আর কোথাও নেই। জল উঠেছে অনেক উঁচুতে, পাড়ের উপরে কাঁচা মাটিতে ডিঙি বেঁধে রাখলে দড়ি ছিঁড়ে নৌকা যাবে ছুটে। জল্‌দু নিরুপায় হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে অবশেষে প্রাণপণ শক্তিতে উপরদিকে টেনে হিঁচড়ে এক সময় ডিঙিখানা তুলল। কিন্তু সেই বৃষ্টির মধ্যে শারীরিক কষ্টে, যন্ত্রণায় এবং বুকের ব্যথায় জল্‌দুর গলার মধ্যে এবার কাসির বেগ এল এবং ডিঙির দড়িটা শক্ত মুঠোয় ধরে পা বাড়াতেই কাঁচা কাদামাটির ওপর পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে সে পড়ল। আছাড় খেয়ে সে আঘাত পেল না, কিন্তু ভিতর থেকে ভয়ানক কাসির বেগ ফেনিয়ে উঠতেই জল্‌দু ভয় পেল এবং সেখান থেকেই শেষবার চীৎকার ক'রে ডাকল, বুনি—বুনি রে—আয় শিগ্‌গির—

বুনির বদলে জনৈক পেয়াদার কানে তার ডাক পৌঁছল। পেয়াদাটা অবশ্য খবর দিল বুনিকে। বুনি ছুটে এল বাইরে। চেঁচিয়ে ডাকল, বুড়োদা,—কুথারে বুড়োদা—?

বুনি ছুটল পাড়ের দিকে।

পিছন থেকে চাপরাসি রামলগন বললে, নোটিস আছে এই হামাদের সংগে, বুঝছিস বুনি? তোদের মালপত্তর সোব থাকবে হেই

হামাদের চালাকে নীচে। তোদের ঘর-ঝোপড়া খালি করিয়ে দিচ্ছি।

তারণ সিং বললে, হামলোক কি করবে? এ ভাই সোরকারি হুকুম, হামাদের কসুর কুছ নেই।—

তারণ সিংয়ের গায়ে বর্ষাতি ঢাকা, মাথায় ছাতা,—তার ভাববারও কিছু নেই। ওরা দুজনে ঘরদোর ভেঙে দিয়ে উৎখাত করবার কাজে লেগেছিল।

তক্তাখানার উপর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে বুনি সেই নরম কাদামাটি ডিঙিয়ে কোনমতে বৃদ্ধের কাছে পেঁৗছল বটে, কিন্তু জলু ততক্ষণে কাসির বেগে কাদামাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই কাসির বেগ ও ধমক বুনিই শুধু জানে। জলু তখনও তার দৃঢ় মুষ্টিতে মোটা দড়িগাছটা ধরে ছিল। অবশেষে এক সময় সেই কাসির বেগ যখন কমল, তখন কণ্ঠের ভিতরটা পিছল হয়ে রক্ত গড়িয়ে এসেছে। কাদামাটির উপর দিয়ে সেই রক্ত গড়িয়ে নামল। বৃদ্ধ কিছু অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

বুনি এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, উঠতে পারবি এবার?

পারব! ওরে বুনি—আমার ডিঙি? ডিঙি গেল কোথা?

রক্তমাখা মুখে জলু এধার ওধার তাকাল। দড়ির গোড়াটা ও-মুখে আলগা হয়ে ডিঙিখানা ছটকে জলের উপর দিয়ে ততক্ষণে কোথায় ভেসে গেছে। বুনি সভয়ে দামোদরের দিকে তাকাল। বললে, তুর ডিঙি আর পাবি না, বুড়োদা—

বুড়ো বোধ হয় আরেকবার ওই সৃষ্টি-স্থিতি-সোরবিশ্বের দিকে কালকটাক্ষ হেনে চীৎকার ক'রে ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেল, কিন্তু দূরে বন্যার ভয়াবহ গর্জন শুনে বুনির হাতখানা আঁকড়ে ধরে বললে, বুনি—ওঠ্ শিগ্গির—জল আসছে—ওঠ—চল্—তুরে আগে ঘরে রেখে আসি।

তুই কি করবি?

আমি জলে যাব, ডিঙি ধরে আনব। কোশ দুইয়ের মধ্যেই পেয়ে যাব।

আঁতকে উঠে বুনি বললে, মরবি নাকি তুই বটে? বান আসছে না?

হাঁ—জলু বললে, আসছে বটে। বানেই ভাসব আমি। ডিঙি আমার চাই। আগে তুরে রাখে আসি,—চ।

দড়ি এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে বুনির নড়াটা ধরে জলু কাঁপতে কাঁপতে সেই প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর মাটিকাটা খদ পেরিয়ে এল। এপারে এসে বুনি বললে, কুথা লিয়ে যাচ্ছিস, বুড়োদা? ঘরে আমাদের ঢুকতে দিবে না। ওরা দখল করেছে!

কেনে?—জলু থমকে দাঁড়াল,—কে দিবে না ঘরে ঢুকতে?

বুনি বললে, থানা থেকে পেয়াদা এসেছে লয়? ঘরে থাকতে দিবেনি বটে। মালপত্তর রেখেইছে বটে উই চালার তলায়!

জলু আর কোনও কথা না বলে বেড়া পেরিয়ে খামারের পাশ দিয়ে ভিতরে এল। রামলগন, তারণ সিং, বৈদ্যনাথ, হরনাম—এবং আরও জনতিনেক লোক একদিকে যেমন চৌকি-হাঁড়ি-কাঁথা-বাসন প্রভৃতি বার করেছে, অন্যদিকে তেমনি বাইরের দিক থেকে কয়েকজন কুলি ইতিমধ্যেই ঘরের ছেঁচাবাঁশের দেওয়াল কাত ক'রে ফেলেছে!

তারণ সিং এবার হাসিমুখে বলে উঠল, আরে ভাই, দেখো দেখো,—হামাদের জলু কেমোন সং সাজিয়েছে! কাদামাটি মেখেছে, না ভূত বনেছ ভাই জলু? তোমাকে দেখলে হাসি পাচ্ছে যে!

বজ্রগম্ভীর স্বরে জলু প্রশ্ন করল, এসব কি হচ্ছে?

হামাদের কসুর কি ভাই, হামরা ত' সোরকারি নোকর আছে। ওরা সব আসিয়েছে থানা থেকে। তোমহার ডেরা ভাঙে গেছে, ভাই জলু।

কোনমতেই আজকে আর জলু সামলাতে পারল না। বাঁ হাতে তার মুখের রক্তটা মুছে দু পা এগিয়ে সেই মোটা ভিজে কাদামাখা দড়িগাছা দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে তারণ সিংয়ের মাথায় সপাং ক'রে সে মেরে বসল। হাতের ওজন ঠিক বুঝতে পারা যায়নি, এবং তার বন্য হিংস্র আক্রোশের মাত্রাটাও সরকারি লোকেরা অতটা অনুধাবন করেনি। কিন্তু এই ভয়ানক অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে চীৎকার ক'রে তারণ সিং মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার জলু যখন সেই দড়ি সপাং করে মারল বৈজনাথের পিঠে—তখন হৈ চৈ ক'রে সবাই এসে বুড়োকে বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা পেল। বুনি কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু জলু মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ওই দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটে এল খামারের বাইরে। পুলসাহেব, ঠিকাদার, বুলাকিলাল, মেজর সিং, হাকিম—আজ সবাইকে সে নাকি এই দড়ি দিয়েই খুন করবে! চীৎকার উঠছে চারিদিকে, সোরগোল উঠেছে পুলসাহেবদের বারান্দায়, লোহালক্কড়ের কারখানার ওদিক থেকে ছুটে এল সবাই। থানার একজন সেপাই তারণ সিং নাকি খুন হয়েছে!

বানের জল বিপুল গর্জনে তখন পাড়ের উপরকার স্তূপাকার মাটির উপর ধাক্কা দিচ্ছিল।

ওই একগাছা দড়ির সাহায্যে লড়াই করতে করতে হতভাগ্য জলু মাহাতো উঠে এল সেই অতল গভীর খদের উপরকার তক্তাখানায়। একটু আগে হৃৎপিণ্ড থেকে যার তপ্ত রক্ত উঠে এসেছে, তার দেহের ও পায়ের কাঁপুনি তখনও যায়নি। তবুও উপস্থিত এই নিদারুণ উত্তেজনাটা সামলিয়ে নিয়ে সে হয়ত তার ডিঙির খোঁজে জলে ঝাঁপ দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু সে ওই তক্তাখানার উপরে উঠে আর টাল সামলাতে পারল না। জলে ও কাদামাটিতে তক্তাখানা তার পায়ের তলা থেকে হঠাৎ পিছলে গেল, এবং তার অবশিষ্ট জীবনের ইতিহাসটুকু সহসা সেই অন্ধকার খদের গভীর নীচে পলকের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল। পাড় ভেঙে বড় বড় কাদামাটির চাংড়া দেখতে দেখতে সেই খদের মধ্যে প'ড়ে জলুর জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা ক'রে দিল।

অনেক লোকজন এসে পড়ল বটে সেই বৃষ্টিবাদলের মধ্যে। ঘটনার চেহারা দেখে শিউরে উঠল সবাই। কিন্তু সকলেই হতবাক। আগামী মাসখানেকের মধ্যে নীচেকার মাটি তোলবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। থাক্ না কেন জলুর হাড় ক'খানা মাটির নীচে, কা'র কী ক্ষতি! ওর ওপরেই উঠুক দাঁড়িয়ে একালের লৌহনগরী।

কিন্তু যে-ব্যক্তি বেঁচে আছে তখনও, তাকেই সবাই তুলল। তারণ সিংয়ের রক্তাক্ত অচেতন দেহ প'ড়ে রয়েছে খামারে। জলুর দড়ির ডগায় একটা গেরো ছিল, তারই প্রচণ্ড আঘাতে তারণ সিংয়ের মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। বৈজনাথের পিঠে মোটা চামড়া ছিঁড়ে গেছে।

• • •

এসব ঘটনা অবশ্য বছর তিনেক আগেকার। বুলাকিলাল এখন বুনির জন্য চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। নতুন পাকা ঘর, আসবাবপত্র, ইলেকট্রিকের আলোপাখা, খাটপালঙ্ক,—সব নিয়ে বুনি এখন একটি ফ্ল্যাটে বাস করে। ঠিকাদার বুলাকিলালের পরিবার বাস করে বহুদূর দেশে, সেজন্য বুলাকিলালের নানা অসুবিধা। শ্রীমতী বুনি এখানে তার তত্ত্বাবধান করে। আদর-যত্ন পেয়ে মেয়েটার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।

মধ্যযুগের য়ুরোপের সংগে ভারতের সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিদেশী বনিকদের মারফৎ ভারত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচার হয়েছিল। প্রাচীন লেখক প্লিনি, স্ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি তথ্যের সংগে কল্পনা মিশিয়ে ভারতের বর্ণনা দিয়েছেন। কোনো কোনো লেখক এমন কথাও লিখেছেন যে, ভারতবাসীরা নিজেদের ভাষায় হোমারের কাব্য আবৃত্তি করে। অর্থাৎ ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে অধিকাংশ য়ুরোপীয় লেখকেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করবার পূর্বে পর্যন্ত মধ্যযুগের য়ুরোপ ভারতের নদী, পর্বত, ফুল, ফল, শহর, মণি মুক্তা ইত্যাদি সম্বন্ধেই আগ্রহান্বিত ছিল। অর্থাৎ ভারতের বাহ্যিক রূপটাই য়ুরোপকে আকৃষ্ট করেছে, তার ধর্ম দর্শন সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। থাকলেও জানবার উপায় কই? প্রয়োজনীয় বই তখনো লেখা হয়নি।

১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের জলপথ আবিষ্কার করবার পর য়ুরোপের বণিক, ধর্মযাজক ও ভ্রমণকারীরা একে একে এদেশে আসতে লাগল। ১৫০৯ সালে পর্তুগীজ সৈন্য গোয়া অধিকার করতে সক্ষম হওয়ায় সমগ্র দেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল আগন্তুকের দল। রাজ্য ও বাণিজ্যের লোভ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল, তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজ। ইংরেজ ভারতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে জগতের সংগে ভারতের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করল। আমাদের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতরা গবেষণামূলক বই লিখলেন। এসব গ্রন্থের সাহায্যে শুধু যে য়ুরোপ ভারতের সংগে পরিচিত হল তাই নয়। আমরাও নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জানলাম।

ইংরেজের ভারত-চর্চার সংগে স্বার্থের যোগ ছিল। কিন্তু জার্মানীর ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি যে আকর্ষণ, তা স্বার্থ-কলঙ্কিত নয়। জার্মানী ভারত জয়ের অভিযানে বের হয়নি; এদেশে তার বাণিজ্য বিস্তার কিংবা খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাও উপেক্ষণীয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহা ও সাহিত্যপ্রীতির প্রেরণা জার্মানীতে ভারত-চর্চার মূল উৎস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর জার্মান কবি Rudolph Von Ems-এর রচিত কাব্য-কাহিনী 'Barlaam und Josaphat' ভারতের সংগে মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্যের যোগাযোগের প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খৃষ্টান সন্ন্যাসী বারলাম কেমন করে হিন্দু রাজকুমার জোসাফাটকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, এই কাব্যে তারই গল্প বলা হয়েছে। আসলে এটি খৃষ্ট-ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী। সপ্তম শতাব্দীতে এই কাহিনী প্রথম রচিত হয়।

ওলন্দাজ ধর্মযাজক আব্রাহাম রোজার ভর্তৃহরির 'নীতি শতক' ও 'বৈরাগ্য শতক' থেকে প্রায় দু'শ শ্লোক ডাচ ভাষায় অনুবাদ করে ১৬৫১ সালে লাইডেন থেকে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে য়ুরোপের এই বোধ হয় প্রথম পরিচয়। অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যকে জানবার সুযোগ হল এই প্রথম। এর পূর্বে বহু শতাব্দী যাবৎ লোকের মুখে মুখে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গল্প য়ুরোপে প্রচারিত হয়েছে। ডাচ ভাষা থেকে ভর্তৃহরির শ্লোকগুলির জার্মান অনুবাদ হয় ১৬৬৩ সালে।

এর পর দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের সংগে জার্মান সাহিত্যের যোগাযোগের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নেই। এদিকে ভারতে কয়েকজন সুশিক্ষিত উদারচেতা ইংরেজ কর্মচারী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের

গ্যেটে
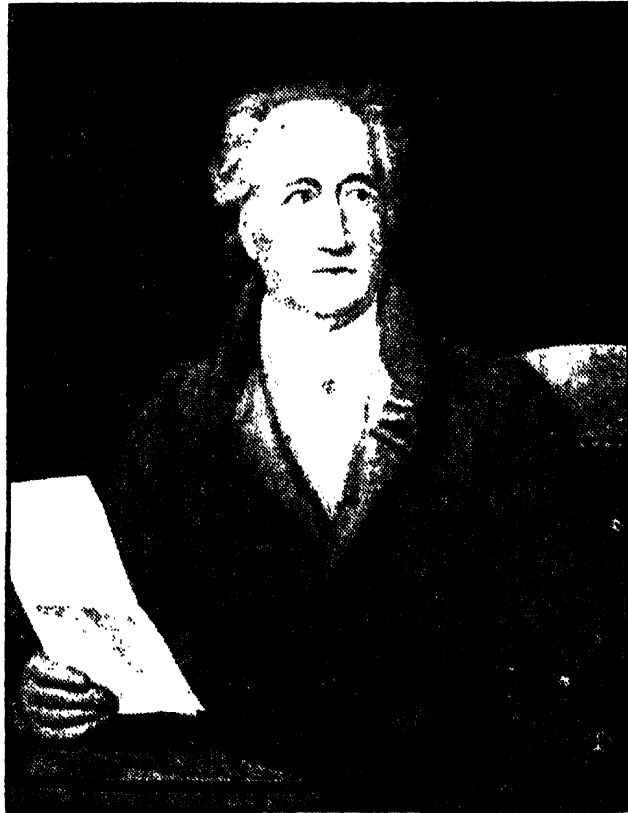
শিলার

পৃষ্ঠপোষকতায় চার্লস উইলকিন্স ১৭৮৫ সালে ভগবদ্ গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ১৭৮৯ সালে উইলিয়াম জোন্স করলেন কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ। এই দুটি অনুবাদ য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজের নিকট এক নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। যে দেশ এতদিন জাদুর দেশ বলে পরিচিত ছিল, তার এক অভাবিত পরিচয় পাওয়া গেল।

জোন্সের ইংরেজী অনুবাদ থেকে জর্জ ফরস্টার ১৭৯১ সালে শকুন্তলার জার্মান গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ জার্মান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আলোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়। কালিদাস সমসাময়িক লেখক নন; শকুন্তলার কাহিনী ও পরিবেশ জার্মান পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি উন্নতমান সংস্কৃতিসম্পন্ন জার্মান জাতি শকুন্তলার অনুবাদ যেভাবে গ্রহণ করেছে, তার তুলনা আছে বলে জানি না।

জার্মান অনুবাদক ফরস্টার শকুন্তলার জনপ্রিয়তার কারণ ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন: নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শকুন্তলা প্রমাণ করেছে যে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও শাশ্বত অনুভূতিগুলি গংগা-তীরবর্তী ভারতীয়েরা রাইন অথবা টাইবার নদীতীরবর্তী শ্বেতকায়দের মতোই সমান দক্ষতার সংগে প্রকাশ করতে পারে।

ফরস্টার তাঁর অনুবাদের এক কপি উপহার হিসেবে গ্যেটেকে (১৭৪৯-১৮৩২) পাঠিয়েছিলেন। শকুন্তলা পড়ে গ্যেটে উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখেন:

"If in one word of blooms of early
  and fruits of riper years,
Of excitement and enchantment
  I should tell,
Of fulfilment and content, of
  Heaven and Earth,
Then will I but say "Sakuntala'
  and have said all."

ঐ বৎসরই (১৭৯১) এই লাইন কটি 'জার্মান মাসিক পত্রিকায়' (Deutsche Monatsschrift) প্রকাশিত হয়। গ্যেটে ও হার্ডার (১৭৪৪—১৮০৩) তখন হেবইমারে থাকেন। হার্ডার গ্যেটের কাছ থেকে 'শকুন্তলা' নিয়ে পড়লেন। 'শকুন্তলা' হার্ডারকেও মুগ্ধ করল। ১৭৯২ সালের প্রথম ভাগে 'প্রাচ্যের নাটক' নামে তিনি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধের প্রথমেই ছাপানো হয়েছিল গ্যেটের উপরোক্ত লাইন কটি।

১৭৯৮ সালে গ্যেটে শকুন্তলা সম্বন্ধে আবার মন্তব্য করেন: যেহেতু শকুন্তলাকে ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে এযাবৎ আমরা পেয়েছি, এইজন্য এর রস একটু একটু করে চেখে দেখতে ভালো লাগে। শকুন্তলার মতো রত্ন অদূর-ভবিষ্যতে আমরা ভারত থেকে আরো পাব বলে আশা করি।

শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের উৎসাহ কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পংক্তির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। 'ফাউস্টের' প্রস্তাবনার অংশটি "শকুন্তলার" প্রস্তাবনার আদর্শে রচিত। সংস্কৃত নাটকের প্রথমেই থাকে সূত্রধার ও নটীর নাটক সম্বন্ধে কথোপকথন। য়ুরোপীয় নাটকে এই রীতি ছিল না। কালিদাসের প্রস্তাবনা পড়ে গ্যেটে "ফাউস্টের" প্রস্তাবনা লেখার প্রেরণা লাভ করেছেন। ভাবের দিক থেকে নয়, কিন্তু আঙ্গিকের জন্য গ্যেটে কালিদাসের নিকট ঋণী। প্রস্তাবনাটি "ফাউস্টের" অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

উইলসনের অনুবাদের মাধ্যমে গ্যেটে কালিদাসের "মেঘদূতের" সংগেও পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি এই প্রসংগে লিখেছেন:

"What more pleasant
  could man wish?
Sakuntala, Nala, these
  must one kiss!
And Meghaduta, the
  cloud messenger,
Who would not send him
  a soul sister!"

"শকুন্তলার" সহিত পরিচিত হবার প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে গ্যেটে "Dapper's Travels থেকে রামায়ণের গল্প পড়েন। তখন তিনি আইন ক্লাসের ছাত্র। সহপাঠীদের নিকট রামায়ণের গল্প বলে তাদের আনন্দ দিয়েছেন। মানুষের বিকৃত রূপ হনুমানকে তাঁর ভালো লাগেনি।

গ্যেটে ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে দুটি গাথা রচনা করেছেন। কিন্তু এদের বিষয়বস্তু গ্যেটে সরাসরি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পাননি। বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি "Der Gott und die Bajadere" ও অন্যটি "Der Paria"। এ দুটি যথাক্রমে ১৭৯৭ ও ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। "পারিয়া" কাব্যটি দুটি অংশে বিভক্ত। একটিতে জমদগ্নি ঋষি ও রেণুকার গল্প, দ্বিতীয়টি "বেতাল-পঞ্চবিংশতির" ষষ্ঠ কাহিনী; মদনসুন্দরী কেমন করে স্বামীর কর্তিত মুণ্ড বদল করেছিল, সেই গল্প।

গোটে জয়দেবের "গীতগোবিন্দেরও" ভক্ত ছিলেন। জার্মান ভাষায় "গীত-গোবিন্দের" অনুবাদ করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি।

জার্মান সাহিত্যের Sturm und Drang আন্দোলনের নেতা ছিলেন হার্ডার। তরুণ লেখকরা তাঁর কাছে আসতেন নানা বিষয় আলোচনা করতে। হার্ডার ও গোটে দু'জনেই সংস্কৃত সাহিত্যের, এবং বিশেষ করে শকুন্তলার, গুণগ্রাহী ছিলেন। হার্ডার নিজে অনুবাদ করেছিলেন "হিতোপদেশ" ও "ভগবান-গীতার" কোনো কোনো অংশ এবং ভর্তৃহরির কয়েকটি শ্লোক। তাঁর "Indian" কবিতায় আছে ভারত ও "শকুন্তলার" প্রশংসা। ১৮০৩ সালে হার্ডারের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় ফরস্টারের "শকুন্তলার" একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গোটের মতো হার্ডারও "শকুন্তলার" উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভারতের অসংখ্য ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে তিনি চেয়েছেন "শকুন্তলার" মতো বই। কারণ "শকুন্তলার" মধ্যে একটি জাতির যে প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে বেদ উপনিষদ পুরাণ পড়ে তা পাওয়া যাবে না।

শিলার (১৭৫৯—১৮০৫) "শকুন্তলার" গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। কালিদাসের নাটক নিয়ে গোটের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। শকুন্তলা জার্মান রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে লেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

হার্ডার, গোটে ও শিলার সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদন করেই তৃপ্ত ছিলেন। শীঘ্রই একদল জার্মান পণ্ডিত শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর না করে সংস্কৃত ভাষা শিখে ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করলেন। এ'দের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফ্রীডরিখ ফন শ্লেগেল (১৭৭২—১৮২৯)। লাইপজিগ মেলায় ফরস্টারের "শকুন্তলা" তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে ভাষায় এমন বই লেখা হয়েছে, সে ভাষা শেখার জন্য তিনি সংকল্প করেন। প্যারিস চলে গেলেন সংস্কৃত শিখতে। সেখান থেকে ফিরে এসে শ্লেগেল জার্মানীতে ভারতীয়বিদ্যার সূত্রপাত করেন। ১৮০৮ সালে তাঁর একটি ছোট বই "ভারতের ভাষা ও প্রজ্ঞা" প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও মনুস্মৃতি থেকে কিছু কিছু অংশে অনুবাদ করে দিয়েছেন। জার্মান ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য রাখবার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটি জার্মানীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। "হিতোপদেশের" কয়েকটি গল্প এবং ভর্তৃহরির কতকগুলি শ্লোকও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। ভারতীয় বিষয়-বস্তুর উপর রচিত তাঁর কয়েকটি কবিতাও আছে।

তাঁর দাদা বিখ্যাত শেক্সপীয়ার সমালোচক ও অনুবাদক আউগুস্ট ভিলহেলম ফন শ্লেগেল (১৭৬৭—১৮৪৫) ১৮১৮ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জার্মানীতে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ এই প্রথম সৃষ্টি হল। ১৮২৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় "গীতার" অনুবাদ বের হয়। গীতার এই সংস্করণ পড়ে ভিলহেলম ফন হিউমবোলট (১৭৬৭—১৮৩৫) বলেছিলেন:—

"...this episode of the Mahabharata was the most beautiful, nay perhaps, the only true philosophical poem which all the literatures known to us can show."

এ'দের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে একে একে ফ্রানট্স বোপ (১৭৯১—১৮৬৭), রাডলফ রোট (১৮২১—১৮৯৫), আলব্রেখট ভেবর (১৮২৫—১৯০১), ভিনটারনিটজ (১৮৬৩—) ম্যাক্স ম্যুলার ১৮৩২—১৯০০) প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করেন। এসব গ্রন্থ মূলতঃ সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে না বলে এখানে আমরা তাদের আলোচনা করব না। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক খ্রীস্টিয়ান লাসেন (১৮০০—১৮৭৬)-এর কথা একটু আলাদা। তাঁর "গীতগোবিন্দ" ও "মালতী মাধবের" অনুবাদ কাব্যগুণে সম্পন্ন, অনেক জার্মান লেখক এই দুটি অনুবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বিখ্যাত সমালোচক জর্জ ব্রাণ্ডেস (১৮৪২—১৯২৭) "মেইন কারেণ্টস অব য়ুরোপীয়ান লিটারেচার" গ্রন্থে হেনরিখ হাইনে (১৭৯৭—১৮৫৬) সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি নিজে জার্মানীতে বাস করলেও তাঁর আত্মা বাস করত গঙ্গার তীরে। এ কথা অনেকাংশে সত্য। গোটে জার্মানীতে বসে "শকুন্তলার" মাধুর্য উপভোগ করেই তৃপ্ত। কিন্তু হাইনের কবিতায় ভারতের প্রতি একটা প্রবল রোমান্টিক আকর্ষণ দেখতে পাই। আউগুস্ট শ্লেগেল বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করতেন। হাইনে তাঁর লেখা পড়ে এবং আলোচনা শুনে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। সংস্কৃত কাব্যের উপমা, প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা ইত্যাদি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে নিয়েছেন। চাঁদের প্রণয়িনী কুমুদ ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। এর উপর তিনি কয়েকটি গান ও কবিতা রচনা করেছেন। নারিকেলকুঞ্জ মুকুলিত আম্র কানন, পদ্মফুল, নতারত হরিণ ও ময়ূর, কোকিলের গান, গঙ্গার তীর—এসব হাইনের কবিতায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত তাঁর কাছে স্বপ্নের দেশ। তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে গঙ্গাতীর-

হেনরিখ হাইনে
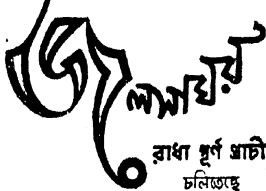
বর্তী কুঞ্জবনে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। একটি কবিতা তিনি শুরু করেছেন এইভাবে:

Oh, I would bear thee, my love,
my bride,
Afar on the wings of song,
To a fairy spot by the Ganges side,
I have known and have
loved it long.

তারপর সেখানে কী মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখা যাবে একে একে তা প্রিয়তমার নিকট বর্ণনা করছেন।

ভারতের প্রেরণায় হাইনে যতগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন অন্য কোনো জার্মান কবির কাছ থেকে আমরা তা পাইনি। হাইনের গদ্য রচনাতেও সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়।

বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ও লেখক রিখার্ট ভাগ্‌নার (১৮১৩—১৮৮৩) একটি বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে তাঁর সর্বশেষ নাটক "Parsifal" রচনা করেছেন। "পার্সিফল" রচনার কয়েক বছর পূর্বে ভাগ্‌নার "বিজয়ী" নামে একটি বৌদ্ধ নাটকের খসড়া করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করেননি। আনন্দ ছিল সেই খসড়া নাটকের নায়ক। তার আত্মা বিশুদ্ধ; প্রেমের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে সে যখন দূরে সরে গেছে তখন হল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়। প্রকৃতি তাকে ভালোবাসল, সংসারে ফিরিয়ে আনতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হল তার সকল চেষ্টা। অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও জাগতিক প্রেমের আকর্ষণ কাটিয়ে পবিশুদ্ধ হতে সক্ষম হল। আনন্দ ও প্রকৃতির ছায়া অবলম্বন করে ভাগ্‌নার তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের নায়ক-নায়িকা পার্সিফল ও কুন্দ্রির চরিত্র এঁকেছেন। বৌদ্ধ কাহিনীর প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ আকস্মিক নয়। তিনি এক বন্ধুকে একবার লিখেছিলেন: আমি নিজের অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি।

১৮৮৭ সালে রেডেনশ্যটট (১৮১৯—৯২) শকুন্তলার কাহিনী অবলম্বনে পাঁচ সর্গ বিশিষ্ট একটি রোমাণ্টিক কাব্য রচনা করেন। মহাভারতের উপাখ্যান ও কালি-দাসের নাটক ব্যবহার করলেও কবি নিজে অনেক নতুন ঘটনা সৃষ্টি করেছেন এবং কোথাও কোথাও প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন করেছেন। এর ফল বিশেষ প্রশংসনীয় হয়নি।

এর পূর্বে ফ্রীডরিখ রুকার্ট (১৭৮৮—১৮৬৬) Brahmanische Erzalungen" নামে কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সংগ্রহটি বের হয় ১৮৩৯ সালে। লেখক প্রাচ্যবিদ্ এবং কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভারতের সাহিত্য, পুরাণ, ধর্ম আচার-ব্যবহার, ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের উপর অনেকগুলি কবিতা এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতের গল্প যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি প্রতাপসিংহ, চাঁদবিবি, আকবর, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও তিনি কাব্য কাহিনী রচনা করেছেন। আর কোনো জার্মান কবি ভারতের এত বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

জার্মান দর্শনের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার কি প্রভাব পড়েছে এখানে আমাদের তা আলোচ্য নয়। তথাপি শোপেনহাউয়ার (১৭৮৮—১৮৬০) ও নীটশের (১৮৪৪—১৯০০) অনেক রচনা দর্শনের গণ্ডী অতিক্রম করে সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করেছে; যাঁরা নিছক সাহিত্য পাঠক তাঁরাও এঁদের রচনা পড়ে আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং এঁদের উপর ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

শোপেনহাউয়ারের দর্শন বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের দ্বারা কিরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তার প্রমাণ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রাচ্যের মতবাদ পাশ্চাত্ত্য অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ যোগ্য। শোপেনহাউয়ার বলেছেন, উপনিষদ তাঁর জীবনের শান্তি ও মৃত্যুকালের সান্ত্বনা।

নীটশে তাঁর Antichrist গ্রন্থে মনুস্মৃতি সম্বন্ধে বলেছেন:

"a work which is spiritual and superior beyond comparison, which even only to name in one breath with the Bible would be a sin against the Holy spirit."

সমাজের উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর লোক-দের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে এমন সমর্থন মনুস্মৃতির মধ্যে পাওয়া যায়, এই বিশ্বাসে নীটশে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। কারণ তিনি সুপারম্যানের পূজারী; সুপারম্যান গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। অ্যারিস্টোক্রাসিই সুপারম্যানের লালন-ভূমি হতে পারে। অ্যারিস্টোক্রাসির সমর্থন থাকায় মনুস্মৃতির মধ্যে তিনি পেয়েছেন জীবনীশক্তির সুদৃঢ় স্বীকৃতি। তাই তিনি বলেছেন, অবশ্য নীটশের মনুস্মৃতির ব্যাখ্যা নির্ভুল নয়।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় কাহিনী নিয়ে দুটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান কাব্যসাহিত্যে ভারতের যে প্রভাব পড়েছে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু জার্মান কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীতে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক

হেরমান হেসের (১৮৭৭—) "সিদ্ধার্থ" প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩ সালে। "সিদ্ধার্থের" কাহিনী, পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ ও জীবনদর্শন সম্পূর্ণ ভারতীয়। বুদ্ধের সমসাময়িক এক ব্রাহ্মণকুমার অতৃপ্ত জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিল। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করল বাঁচবার রহস্য এবং দুঃখজয়ের ইঙ্গিত। কাব্যময় ভাষায় রচিত এই দার্শনিক উপন্যাস একজন বিদেশী লেখকের হাতে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠককে বিস্মিত হতে হয়।

১৯৪৫ সালে হেসের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Das Glasperlenspiel প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইংরেজীতে এর অনুবাদ হয়েছে Magister Ludi বা প্রধান পুরোহিত নামে। উপন্যাসের নায়ক ক্যাস্টেলিয়ার প্রধান পুরোহিত জোসেফ ক্নেখট। এ'র জীবনের কাহিনী পাই এই উপন্যাসে। জোসেফের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে তিনটি কাল্পনিক রচনা পাওয়া গেল। জোসেফের পূর্ববর্তী তিন জীবনের গল্প। তৃতীয় বার তিনি জন্ম নিয়েছিলেন ভারতের এক হিন্দু রাজপুত্র হয়ে। এই জন্মের কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। এটি ভারতীয় মায়াবাদ সম্বন্ধে একটি অনবদ্য উপাখ্যান।

এর পর ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস পেয়েছি টমাস মানের (১৮৭৫—১৯৫৫) কাছ থেকে। হেসের মধ্যে আমরা প্রাচ্যের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করি; কিন্তু টমাস মানের রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস Die Vertanschten Kopfe-কে যেন অনেকটা আকস্মিক মনে হয়।

সীতা, শ্রীদমন ও নন্দ—এই তিনজনকে নিয়ে কাহিনী। শ্রী দমন ও নন্দ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু তাদের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। শ্রীদমন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি; কিন্তু তার দেহ কোমল। নন্দ লেখাপড়া শেখেনি; তার বলদৃপ্ত চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নন্দর সহায়তায় শ্রীদমন সীতাকে বিয়ে করেছে। সীতা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নন্দর সুঠাম দেহের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একবার দূর দেশে যাবার পথে বনের মধ্যে চণ্ডীর মন্দিরে দুই বন্ধু অবস্থা বিপাকে আত্মহত্যা করে। দেবী সীতার দুঃখে বিগলিত হয়ে বর দেন যে কর্তিত মুণ্ড ধড়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই স্বামী ও তাঁর বন্ধু বেঁচে উঠবেন। সীতা ব্যগ্র হয়ে মাথা লাগাতে গিয়ে স্বামীর মাথা নন্দর দেহে ও নন্দর মাথা স্বামীর দেহে লাগিয়ে ফেলল। এরপর তিনজনের মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল তা সমাধানের জন্য সকলে মিলে আত্মহত্যা করল।

কাহিনীর কাঠামোটি মান "বেতালপঞ্চবিংশতি" থেকে নিয়েছেন। হয়ত গোয়েটের "পারিয়া" গাথা-কাব্যটি তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু তার সঙ্গে মনোবিশ্লেষণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী যোগ করে মান এই পুরনো কাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ

টমাস মান

দিয়েছেন। সীতা কি বাস্তবতার জন্যই মাথার ওলট-পালট করেছিল? না, তার অবচেতন মনে নন্দর দেহের প্রতি আকর্ষণজাত এই ভুল? মান সাদাসিধে গল্পটাকে ইঙ্গিতময় ও গভীর করে তুলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য জার্মান সাহিত্যিকদের রচনায়ও ভারতের উল্লেখ আছে। স্টেফান জর্জ (১৮৬৮—১৯৩৩) "Gelle Rose"-এ যে মায়াবিনীর কথা বলেছেন সে এক অজ্ঞাতনামা হিন্দু দেবী। গঙ্গা থেকে সে উঠে এসেছে, মোমের পুতুলের মতো দেখতে; ঘনপক্ষ্ম চোখের পাতা নাড়লে শুধু মনে হয় তার প্রাণ আছে।

হিউগো ফন হফ্‌মানস্টাল (১৮৭৪—১৯২৯)-এর নাটক "Die Hochziet der Sobeide" "(সোবেইডের বিয়ে) একটি ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন এবং সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে সেই স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী এই নাটকে বলা হয়েছে।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ডাউটেনডের (১৮৬৭—১৯১৮) দুটি গল্প সংগ্রহে ভারত ও পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প আছে।

প্রতিষ্ঠাবান লেখক ফোয়খট্ ভাগনার (১৮৮৪—) ১৯১৭ সালে জার্মান রঙ্গমঞ্চের জন্য কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রম্"-এর কাহিনীকে "রাজা ও নর্তকী" নাম দিয়ে নবরূপ দান করেছেন।

হেরমান জুডারমানের (১৮৫৭—১৯২৮) "ইণ্ডিয়ান লিলি"-র নায়ক নিয়েবেল্ডিঙ্গকের অভ্যাস এই যে কোনো মহিলা তাকে আত্মদান করলে পরদিন সকালে সে এক গুচ্ছ ফুল সেই মহিলাকে পাঠিয়ে দেবে। রাত্রিযাপনের পর এই ফুল উপহার দেবার ইঙ্গিতার্থ :—

"In spite of what has taken place you are as lofty and as sacred in my eyes as these pallid, alien flowers (Indian lilies) whose home is beside the Ganges".

স্টেফান ৎসভাইক (১৮৮১—১৯৪২) আধুনিক জার্মান সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও জীবনী লেখক। প্রাচীন ভারতের জীবন নিয়ে তিনি একটি অনবদ্য গল্প লিখেছেন। গল্পটির নাম

Virata or the Eyes of the undying Brother.

বুদ্ধের জন্মের পূর্বে রাজপুতানা অঞ্চলে বিরাট নামে একজন চরিত্রবান লোক বাস করত। সে ছিল কুশলী যোদ্ধা। একবার বিদ্রোহী সেনা রাজ্য আক্রমণ করবার পর বিরাট রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে শত্রু শিবির ধ্বংস করল। যুদ্ধ হয়েছে রাত্রে; সকালবেলা মৃত শত্রুসেনার স্তূপের মধ্যে আবিষ্কার করল তার দাদার মৃতদেহ। সে জানত না যে, দাদা শত্রুপক্ষের নেতা ছিলেন। দাদার বিস্ফারিত চোখের অপলক দৃষ্টিতে যেন ভর্ৎসনা ফুটে উঠেছে। সব মানুষই ভাইয়ের মতো। বিরাট, তুমি তাদের হত্যা করে পাপ করেছ। মৃত চোখের দৃষ্টি বিরাটের বুকে বিদ্ধ হল।

রাজা খুশি হয়ে তাকে সেনাপতি করতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট তো আর কখনো যুদ্ধ করবে না! তাই সে চেয়ে নিল বিচারকের পদ। বিচারক হিসাবে রাজ্যের সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এমন সময় এক ম্লেচ্ছ যুবককে ধরে আনা হল বিচারের জন্যে। প্রণয়মূলক কলহে মত্ত হয়ে সে অনেকগুলি খুন করেছে। বিরাট রায় দিল, যুবককে ভূগর্ভের অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ রাখতে এবং তাকে চাবুক মারতে। যুবক রায় শুনে বলল, হে বিচারক, আমি উন্মত্ত হয়ে খুন করেছি; কিন্তু তুমি সুস্থচিত্তে আমাকে হত্যা করবার আদেশ দিলে। কারাগারের নারকীয় জীবন তুমি ভোগ করোনি, জানো না কী তার বেদনা, অথচ বিচারকের আসন থেকে সেই নরকে আমাকে নিক্ষেপ করতে তোমার দ্বিধা নেই। এই কি বিচার? —বিরাট ম্লেচ্ছ যুবকের চোখে দেখতে পেল দাদার তিরস্কারপূর্ণ চোখ। বিচারকের পদ ছেড়ে সে সন্ন্যাসী হল। বনে এসে শুরু করল তপস্যা।

সাধক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল কিছুদিনের মধ্যে। উপদেশ শুনতে ভিড় হয়। একদিন এক রমণী এসে অভিযোগ করল: হে সন্ন্যাসী, তোমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে। তার ফলে অনাহারে থেকে থেকে আমার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের দুর্দশার জন্য তুমিই দায়ী। বিরাট এই রমণীর চোখে দাদার মৃত চোখের ভর্ৎসনা দেখে চমকে উঠল।

এখন সে উপলব্ধি করল, তার দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ, বিচারক হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভের অভীপ্সা কামনাজড়িত ছিল বলেই সে অপরের দুঃখের কারণ হয়েছে। যাকে বিশুদ্ধ কামনা বলা হয়, তার মধ্যেও পাপের বীজ থাকে। একমাত্র সেবা কারো জীবনে অমঙ্গলের কারণ হয় না। তাই বিরাট রাজধানীতে ফিরে এসে রাজপ্রাসাদের কুকুরশালার ভার চেয়ে নিল। অবশিষ্ট জীবন সে কুকুরের সেবা করে কাটিয়ে দিল।

জীবনের গভীর তত্ত্ব একটি রসসমৃদ্ধ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কেমন সুষ্ঠুভাবে বলা যায়, এই গল্পটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা উৎসাহের সঙ্গে চলছে। 'শকুন্তলার' অভিনয় আজও জনপ্রিয়। নাৎসী অত্যাচার শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর হাজার হাজার কপি জার্মানীতে বিক্রি হয়েছে। ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান বই আমরা এখনো জার্মানী থেকে পাই। কিন্তু উনবিংশ কিংবা বিংশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাচীন ভারতই জার্মান লেখকদের আকৃষ্ট করেছে; বর্তমান ভারত নয়। বর্তমান শতকের লেখকরাও প্রাচীন ভারতকে তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন। ডাউটেনডেের কয়েকটি গল্প এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। জার্মান সাহিত্যে রোমান্টিক ধারা প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। এই অস্পষ্ট কাব্যময় পরিচয় জার্মান লেখকদের মন থেকে এখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

যেসব জার্মান লেখকের বর্তমান ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, তাঁরাই স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা প্রকাশ করেছেন। ভাল্‌ডেমার বনসেলস্ (১৮৮১—)-এর "Indienfahrt (ভারতযাত্রা)।" জার্মানীতে এক নতুন ধারার ভ্রমণ সাহিত্যের প্রবর্তন করে। আধুনিক জার্মান সাহিত্যের এটি একটি জনপ্রিয় বই। কয়েকটি মর্মস্পর্শী ঘটনার সাহায্যে লেখক দেখিয়েছেন ভারতে একদিকে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সমারোহ, অন্যদিকে মানুষের চরিত্রে নিদারুণ দৈন্য। হেরমান হেসে এবং স্টেফান ৎস্‌ভাইগও ভারত ভ্রমণ করে হতাশ হয়েছেন। প্রাচীন ভারতে জীবনের সঙ্গে দর্শন ও প্রকৃতির যে একাত্মবোধ ছিল, জীবনে যে শান্তি ও সৌন্দর্য ছিল, তা আজ দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ভারতের যে বৈশিষ্ট্য বিদেশীদের যুগে যুগে আকৃষ্ট করেছে, তা আর নেই। ভারত এখন য়ুরোপেরই নিকৃষ্ট সংস্করণ।

এঁদের স্বপ্ন-ভঙ্গের হতাশা বিংশ শতাব্দীর ভারতের নবজন্মের বেদনা উপলব্ধি করবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেয়ে দেখতে আসছেন পাত্রের জ্যাঠা-মশাই এবার।

এটা নিয়ে তিনবার হবে। প্রথমে দেখে গেছেন পাত্রের বাবা এবং মামা। বাবা মনে হোল একটু সাদাসিধা ঢিলেঢালা মানুষ, নিতান্ত নাকি ছেলের বাপ তাই এসেছেন। মামা কিন্তু এক্সপার্ট মেয়ে দেখিয়ে। সাধারণ প্রশ্ন এমনি যা সব তা তো হোলই, তারপর অঙ্গাদি পরীক্ষাতেও বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। বাঁ হাতে ওর ডান হাতটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঙুলগুলি পরীক্ষা করলেন, পরে বাঁ হাতের গুলিও। একটু ঘষে ঘষেই হাতের উলটো পিঠ, মণিবন্ধ পরীক্ষা করলেন, ত্বকের মসৃণতা দেখবার ছলেই অবশ্য, কিন্তু যারা বোঝবার তারা বুঝল, রং-পাউডার মাখানো হয়েছে কিনা তারই যাচাই। আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিল, পাদুটি জড়ো করিয়ে পা দেখলেন, আঙুলে দেখলেন। খোঁপা বাঁধা ছিল, ভেতরে পাঠিয়ে খুলিয়ে আনিয়ে চুল দেখলেন। হেঁটেই এসেছে, তবু বিদায় দেওয়ার সময় বললেন—"অত লজ্জা করে হাঁটছ কেন মা, যেমন চলাফেরা করো বাড়িতে, সেইভাবে যাও, লজ্জা কিসের?"

মেয়ে অবশ্য আরও জড়োসড়োই হয়ে গেল খানিকটা, তবে আর টুকলেন না। চার বার তো হোল দেখা; চুল খুলিয়ে আনার মধ্যে চুলও ছিল, চালও ছিল। যারা বোঝবার তারা বুঝল, এলো চুলে এলে খোঁপা বাঁধিয়ে আনাতেন।

খলিফা লোক।

এর পর দেখে গেল পাত্র স্বয়ং এবং তার বন্ধু।

পাত্রটি বাপের মতো অতটা ঢিলেঢালা নয়—আর নির্বিরোধী হয়তো নয়, তবে জিজ্ঞাসাবাদের দিকে একেবারেই গেল না। তার কারণ এও হতে পারে যে, তার সমস্ত সময়টা নির্লিপ্তভাবে কিছু না দেখার ভান করে যতটা দেখা যায়, সেই চেষ্টাতেই গেল কেটে। তবে বন্ধুটি খুব চৌকশ। পড়া-শোনার কথা জিজ্ঞাসা করল, হাতের লেখা দেখল, হাতের কাজ আনিয়ে দেখল, ভেতরে পাঠিয়ে গান শুনে নিল, তারপর আবার এসে যখন বসল, বেশ একটু বিস্মিত-ভাবেই প্রশ্ন করল,—"আবার ফিরে এলেন যে, এবার আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন?"

সে হয়তো রসিকতাটুকু পছন্দ করল, তাকেও একটু হেসে উঠতে হোল, আর নিরীহ রসিকতাই তো। তবু কাকা সরে গেলেন; মুখ-আলগা আজকালকার ছেলে, একটু মারেই জিভ ফসকে এরকম। সামনে না আসাই ভালো। মেয়েও হেসে ফেলেছিল, কোন রকমে উঠে জড়িতপদে তাড়াতাড়ি চলে গেল। ছেলেটি হাল্কা আসরে একবার সবার দিকে চেয়ে নিয়ে হাত জোড় করে বলল—"আমায় মাফ করবেন, ছেলের ফরমাশ ছিল হাসিটুকু পর্যন্ত দেখাতে, তাই....."

পাত্র কাঁকালে চিমটি কেটে ধরায়—"উঃ, রাস্কেল!" বলে চুপ করে গেল।

এবার আসছেন জ্যাঠামশাই। আসুন, মেয়ে থাকলে দেখানর বিড়ম্বনা মাথা পেতে সহ্য করতেই হয়, কিন্তু এবার সবাই একটু বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, অত যে খুঁটিয়ে দেখা হোল দু দফা, তার নাকি কোনও মূল্য নেই, সব নির্ভর করছে জ্যাঠামশাই কি রায় দেন, তার ওপর। তিনি ছিলেন না, এসেছেন, এবার আসবেন।

মেয়ে-দেখার একটু বড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আজকালকার অভিভাবকেরা এতটা পছন্দ করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু আলাদা ব্যাপার হয়েছে। ছেলেটি খুবই ভালো, পরীক্ষা দিয়ে এবার ডেপুটি হয়েছে। এদিকে অভিভবকদের শুধু ভালো মেয়ে দরকার, যতটা সম্ভব সুন্দরী, তারপর যতটুকু সম্ভব শিক্ষিতা। অন্য-দিকে একেবারেই লক্ষ্য নেই।

সেটা যে নেই, তা খুব জানা কথা বলেই কন্যার অভিভাবকেরা অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছেন, এক শুধু মেয়ের জোরে। এমন কিছু দূরের ব্যাপার নয়, রিষড়া-শ্রীরামপুরে, তাও মাইল দুয়েকের মধ্যে দু পক্ষের বাড়ি। খোঁজ নেওয়া সহজ, পাওয়াও গেছে অনেকখানি, তার মধ্যে এটা পাকাপাকি রকমই জানা গেছে যে, ঐ যে অন্য কিছুর

মামা কিন্তু এক্সপার্ট মেয়ে দেখিয়ে

দিকে লক্ষ্য নেই, সেটা শুধু মুখের কথাই নয়, সত্যিই দেখে শুনে গৃহস্থের বাড়ি থেকেই মেয়ে এনেছেন ও'রা। যাদের এমনি ও'দের বাড়ির ছেলের নাগাল পাওয়ার কথা নয়।

সহ্য করতে হবে মেয়ে-দেখার বাড়াবাড়ি। জ্যাঠামশাইয়ের পছন্দ হোলেও নিশ্চয় মেয়েদের অভিমান। উপায় কী?

কিন্তু খুঁটিয়ে দেখা-শোনার পরও তিনি আসছেন কি করতে সেইটেই আন্দাজ করতে না পেরে সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ও'দের দেখা-শোনায় একটা যেন বেশ প্ল্যান আছে, দু ব্যাচ যেন দুরকম উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, ও'রা যা জানতে চেয়েছিল, এ'রা সেদিকটা বাদ দিয়ে গেছে; এ'রা যেদিকটা ধরেছে, ও'রা সেদিক দিয়েই যায়নি। কিন্তু আর বাকিটা কি আছে যে, জ্যাঠামশাই ধরবেন? তাঁর প্রশ্ন কি ধরনের হবে? মেয়েকে সেই মতো প্রস্তুত থাকতে হবে তো।

মেয়েরা আজকাল এসব আরও পছন্দ করে না, কলেজের মেয়েরা তো নয়ই। কেউ কেউ বিদ্রোহই ঘোষণা করে বসে বেশি বাড়াবাড়ি হলে। অন্তত আপত্তি-অভিমান —এটুকু তো থাকেই। দু দফা হোল, আর কেন? অঞ্জলি তা করেনি। অবশ্য ওপরে ওপরে 'বেঁধে মারে সয় ভালো' ভাবটা বজায় রাখতেই হয়েছে, কিন্তু ভেতরে প্রস্তুতিটা অন্যরকম— যতবার চায়, যাক না পরীক্ষা করে, যত রকমে পারে।

পাঠ হেমন্তর মতো ও-ও তো না-দেখবার ভান করে চক্ষুময় হয়ে দেখছে, বড় ভালো লেগেছে। জ্যাঠামশাইয়ের চিন্তাটা ওর কারুর থেকেই কম নয়, পণ্ড করে দেবে নাকি সব স্বপ্ন?

অনেক চেষ্টায় কিছু কিছু আঁচ পাওয়া গেছে। কথাটা যদি সত্য হয় তো যেমন লঘু, তেমনি নিরীহ, চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। জ্যাঠামশাই হচ্ছেন পাঞ্জাবপ্রবাসী সেকেলে বাঙালী। দেশবিভাগের পর মীরাটে এসে থাকেন, তারপর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে এইমাত্র কিছুদিন হোল দেশে এসে বসেছেন।

এসেই এই ফ্যাচাংটুকু তুলেছেন।

তবে এমন বিশেষ কিছু নয়।

জ্যাঠামশাই একটু ভোজনবিলাসী, ওদিককার জলে এটা করেই দেয়। এসে একটু নিরাশ হয়েছেন। তিনটি বউ এসেছে বাড়িতে এম-এ আছে, বি-এ আছে, রূপসী তো বটেই, গানও জানে, সূচী-শিল্প তো আছেই। কিন্তু অবসরভোগীর যা একটিমাত্র সাধ ছিল জীবনে, তা ভালো করে পুরনের কোন আশাই নেই; হেঁসেলে সবগুলিই চলতি ভাষায় 'মা জননী' একেবারে। তাই ঐ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

এ আর এমন কী কঠিন শর্ত? গৃহস্থ ঘরের মেয়ের পড়া বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত। অঞ্জলির অবশ্য এবার বি-এ দেওয়ার বছর, তবে ওকে রান্নাঘরের দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যতটা সম্ভব ঐদিকেই থাক আপাতত। বাইরে বাইরে মুখ ভার করতে হয় একটু, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর চেয়েও খাটাচ্ছে নিজেকে অঞ্জলি। আর সবার পক্ষে না হোক, ওর পক্ষে তো রীতি-মতোই কঠিন। পাঞ্জাব-ফেরা বাঙালী, সে শুক্তো-শাকের ঘণ্টোর জন্যেই এসে বসেছে শ্রীরামপুরে?

একখানি গুপ্ত খাতা আস্তে আস্তে

পরীক্ষায় বসবার আগে ঝালিয়ে নিচ্ছে একবার

বোঝাই হয়ে উঠছে। শুক্ত-শাকের ঘণ্টের ফরমুলা তো আছেই, তাছাড়া—

ডিমের কাশ্মিরী পরটা। —চারটি ডিম, একপোয়া গমের ময়দা, একপোয়া ছোলার ছাতু, একপোয়া ঘি, পনেরটি ছোট এলাচ, পনেরটি কাবাব চিনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভেটকি মাছের কোফতা-কারী—একসের ভেটকি মাছ, চারিটি ডিম, একপোয়া পেঁয়াজ, চারিটা রসুন, পাঁচটি কাঁচা লঙ্কা, এক ছটাক টমাটোর রস, পরিমাণ মতো গুঁড়ো লঙ্কা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোগলাই মোরগ—মোসল্লম (অন্য পাখিরও হয়) একটি পাখির ওপরকার সব পরিষ্কার করে নিয়ে পেট চিরে ভেতরটাও পরিষ্কার করে নিয়ে নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলি পুরে দিয়ে আগা-গোড়া সেলাই করে দিতে হবে—পরিমাণ মতো পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, পেঁয়াজ-বাটা, রসুন বাটা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজ থেকে সংগ্রহ করছে। কলেজের দুটি অন্তরঙ্গ সাথী সাহায্যও করছে; বিপদ তো সবার জীবনেই আসতে পারে।

পাশের পড়া শিকেয় উঠেছে। তবে মেহনত হচ্ছে পাশের পড়ার চেয়ে কিছু কম নয়; পরীক্ষার মুখে যে পাশের পড়া।

পরীক্ষা তো এসেই গেল। সেদিন না এসে পড়েন জ্যাঠামশাই।

এসে পড়লেন।

ছ' ফুট দীর্ঘ মানুষ, তেমনি ওসারও। এতখানি ঘোরালো মুখ, ইয়া বুকের ছাতি, মোটা হাড়কাঠ, টকটকে রং; ষাট-বাষট্টি বছর বয়স হবে, একটি কাঁচা চুল নেই মাথায়, তবু চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সাজানো নকল দাঁত নয়, কষের দিকে থাক না-থাক, সামনে দুসারি ঝকঝক করছে; একটু এবড়ো-খেবড়ো, কিন্তু মনে হয় বেশ শক্তই। একজোড়া বেশ পুরু গোঁফ, মাথার চুলের মতোই সাদা ধবধবে।

দেখলে গা ছমছম করে, অবশ্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, সেকথা ভেবে।

ওরা সব দুজন দুজন করে এসেছিল, জ্যাঠামশাই নামলেন একা, ও'র যেন দোসর নেই কেউ সংসারে। নামলেনও যে, ট্যাক্সিটা একবার খানিকটা বসে গিয়ে স্প্রিঙে লাফিয়ে উঠে বার দুই-তিন দুলে গেল; যেন বাঁচল। সবাই সসম্ভ্রমে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসাল।

নিতান্ত স্বাভাবিক কৌতূহলে অঞ্জলি ওপর ঘরের জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখল, তারপর দেরাজ থেকে খাতাটা বের করে ঝুঁকে পড়ল। শাক-শুক্ত বা ছাপার কাগজের শৌখিন কিছু নয়, একেবারে কালিয়া-কোর্মা, দোর্মা—কোর্মা—কাবাবের পাতার ওপর। পরীক্ষায় বসবার আগে ঝালিয়ে নিচ্ছে একবার। কী যে হবে?

মানুষটি যেমন সু-গুরু, তেমনি ভেতরে সুগম্ভীর। প্রথম সাক্ষাতের দু-একটি কথাবার্তায় কণ্ঠস্বরের যা নমুনা পাওয়া গেল, তাতে আর কেউ কথা বাড়াবার সাহস করল না। সবাই তটস্থ হয়ে রইল, ঘরটা থমথম করতে লাগল।

নিতান্ত যে কথা কন না এমন নয়, একবার বললেন—"বড্ড গরম এখানে। অসহ্য।"

ঘরের সবাই বলে উঠল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু তবু, আমাদের ওদিককার মতন নয়।"

সবাই বলল—"তা কি হতে পারে?"

একটু চুপচাপের পর প্রশ্ন করলেন—"দেরি আছে কি বেশি?"

প্রায় সকলেই ঘর খালি করে দেখতে ছুটল ভেতরে। বেরিয়ে এল তিনটি ছেলে, একজন বলল—"দিদির বড্ড মাথা ধরেছে... দিদি বলছে।"

প্রশ্ন হোল—"মাথা ব্যথা? কেন?"

আন্দাজটা বলবে কিনা একটু থতমত খেয়ে গেছে, কাকা বেরিয়ে এলেন, বললেন "এই হোল বলে।"

মুখটা একটু ভার-ভার, বোধ হয় ধমক-ধামক দিতে হয়েছে।

একটু যেন বাড়লও কথা জ্যাঠামশাইয়ের। বললেন—"বেশি সাজানো হচ্ছে? কি দরকার? দেখে তো গেছেই সবাই, আমি শুধু আমার দরকার মতন......"

মনে হোল একটু যেন হাসিই আসছিল, এমন সময় মেয়ের বড়ভাই এসে খবর দিল, তোয়ের। কাকা জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ভেতরের দিকে এগুলেন। সবাই পেছনে পেছনে চলল। বাড়ির বারান্দায় গালিচা পেতে দেওয়া হয়েছে, সামনে একটি আসন। জ্যাঠামশাই গিয়ে বসলেন গালিচায়, মেয়েকে নিয়ে আসা হোল। যথারীতি প্রণাম করে বসল সে, পায়ের তলায় হাতটা যেন আগেকার চেয়ে একটু চেপে বুলিয়ে; একটু একটু যেন কাঁপছেও।

সিঁথির ওপর হাতটা একটু ভালোভাবেই চেপে নীরবে আশীর্বাদ করলেন জ্যাঠামশাই, বললেন—"খাসা মেয়ে, বাঃ! আচ্ছা বলো তো মা, নিম ঝোল আর মোচার ঘণ্টো কি করে রাঁধবে—কি কি মশলা, কি কি তার পরিমাণ।"

পরীক্ষার্থীদের ভাষায় একেবারে আন্-ইম্পরট্যেণ্ট প্রশ্ন। বুকটা ধড়াস করে উঠল অঞ্জলির। নিম-ঝোল তো ছোঁওয়াও হয়নি, ঘণ্টো সম্বন্ধে যা-ও শুনেছে, তাও গেল গুলিয়ে। দুবার ঢোক গিলল, তারপর ঘাড়টা হেঁট করে বসে রইল।

জ্যাঠামশাই বললেন—"এই তো নয়। আমি বুড়োমানুষ, কোথায় তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম—সারা জীবনটা গোস্ত-পরটা খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে, এবার বাংলা দেশে গিয়ে মায়েদের হাতে......"

সবাই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে, এত করে শেষকালে নেহাৎ যোগ-বিয়োগে ফেল করবে! কাকা দুটো হাত একত্র করে বললেন—"আজ্ঞে না, ঘণ্টো-শুক্তো-নিম ঝোল তো একরকম রোজই রাঁধতে হচ্ছে; ও জানে সব। বলো অঞ্জু, বলো, ভয় কিসের?......"

একেবারে নিস্তব্ধ সব, একটা সূঁচ পড়লে শোনা যায়। পাশের ঘরে মেয়েরা রয়েছে, একটু-আধটু যা চুড়ির ঠুনঠান শব্দ হচ্ছিল, তাও গেছে থেমে, হঠাৎ পরদা ঠেলে ছোট্ট একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, বলল—"নাগো, পিছি দানে না, আমি দানি, বাত রেঁদেচি, ঘন্তো রেঁদেচি, বাবা খেয়েচে......"

একটা ডুরে শাড়ি পরানো, ভালো করে আঁচড়ানো চুলের ওপর দিয়ে বেড় দিয়ে রাঙা ফিতে বাঁধা, পায়ে আলতা, দুহাতে দুটি ছোট ছোট্ট খুড়ি। একটিতে কাদায় মাখানো কি পাতা। একটিতে ছাই। ভাত আবার সাদা হওয়া চাই তো।

**নিম ঝোল আর মোচার ঘণ্ট কি করে রাঁধবে —কি কি মশলা কি কি তার পরিমাণ**

সবাই একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—"তুই এসেছিস! আঃ, এটাকেও যে একটু ধরে রাখবে। কোত্থেকে জুটলি তুই!"

কাকা নিজেই ধরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, জ্যাঠামশাই হাত তুলে বাধা দিলেন, বললেন—"ছেড়ে দিন ওকে। এসো তো এদিকে; পিসী বুঝি কিছু জানে না?"

বেশ সপ্রতিভভাবেই মাথা নাড়ল—না।

"তুমি বুঝি সব জান? —ঘণ্টো, শুক্তো, ডালনা, চচ্চড়ি......"

"ছ—ব দানি।"

"আমায় পারবে তো রেঁধে দিতে?"

"হুঁ......।"

"তাহলে চলো যাই, আর কি......"

কোলে তুলে নিয়ে উঠে পড়লেন। কাকা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"আজ্ঞে, অঞ্জু জানে সব, কিরকম নার্ভাস হয়ে পড়েছে......যদি আরও কিছু জিজ্ঞেস করেন......"

"আর কেন মশাই? এমন পাকা রাঁধুনি আমার গিন্নী পেলাম, যা রাঁধতে জানে কি না জানে, সে-খোঁজে আর দরকার?"

পাঞ্জাবি হাসি পড়ল ফেটে। গিন্নীকে বুকে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে এগুলেন।

শুষ্কত্বক
ব্রন
মেচেতা
ছুলী
রূপ প্রসাধনে
অপরিহার্য্য
Basant Malati
বসন্ত
মালতী
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
১, টাকারস্ লেন, রত্তওয়ে, মাদ্রাজ—১
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

# কম্যান্ডার ইন চীফ

সতীনাথ ভাদুড়ী

রেল-গুমটির লোকটা অমন করে তাকাল কেন? একটু কেমন কেমন যেন লাগল মিসিজ মুখার্জির। ঝুঁকে আদাব করেছে ঠিকই; কিন্তু আদাব করবার সময় হেসে 'আদাব মেম সাহাব' বলেনি—অন্য দিনকার মত। ট্রেন আসছে। একদিককার গেট বন্ধ করে সে অন্য দিককারটাও বন্ধ করতে যাচ্ছিল; এমন সময় মুখার্জি সাহেবের গাড়ী আসতে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়। হাতের গোটানো নিশানটাকে বার কয়েক ঘন ঘন নেড়ে মোটরগাড়ীর ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি গাড়ী বার করে নিয়ে যেতে ইশারা করে। ড্রাইভার আশ্চর্য হল। কর্তব্যনিষ্ঠ 'গুমটিম্যান'টির এ ধরনের বিচ্যুতি সে আগে কখনও দেখেনি। যাক, ভালই হল। একে মেমসাহেবের মেজাজটা আজ সপ্তমে চড়ে রয়েছে; তার উপর গুমটির গেটে দশ মিনিট দাঁড়াতে হলে হয়েছিল আর কি! ওঁর মেজাজের কথা এখানকার কে না জানে। তাই না রেল-কলোনির লোকে ওঁর নাম রেখেছে 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'।

কিন্তু গুমটিম্যান অমন করে তাকাল কেন?...

রেল লাইন পার হয়েই আরম্ভ হয় রেলের অফিসারদের সারি সারি বাংলা। এ রাস্তায় লোক চলাচল সাধারণত কম। আজ যেন সে আন্দাজে একটু বেশী বোধ হচ্ছে!...

ডলি ব্যস্ত নিজের সমস্যা নিয়ে।

"মা, ক্যামেরাটা আজ বাবাকে দেখাব?"

ড্রাইভার-যাতে শুনতে না পায়, সেই জন্য গলার স্বর একটু নামিয়ে জিজ্ঞাসা করা। কথার সুরে একটা গোপন ষড়যন্ত্রের আভাস মা-মেয়ের মধ্যে, বাবার বিরুদ্ধে।"

"কেন, দেখালে কি বাবা ধরে গলাটা কেটে ফেলে দেবে?"

বললেন বেশ চড়া গলায়। ড্রাইভার শুনতে পেল তো বয়ে গেল। চটলে শোভন অশোভনের জ্ঞান তাঁর কোন দিনই থাকে না।

এই উত্তরই ডলি চাচ্ছিল। এমনি করেই মা জব্দ করতে চায় বাবাকে, তা সে পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানে। একটা মায়ের দিক, একটা বাবার দিক—বাড়ীতে এই দুটো দিক। সে সব সময় মার দিকে। দাদা ছুটিতে বাড়ী এলে সেও মার দিকে। দুপুরে দেরী করে বাড়ী ফিরে, জানলা দিয়ে 'ইয়াঃ গোঁফ'এর ইশারা করে, মার কাছ থেকে জেনে নেয় বাবা এখন বাড়ীতে আছে কি না। সুনরা চাকরটা পর্যন্ত মার দিকে। বাবার দিকে ছিল এক শুধু দিদি। কিন্তু সেতো বিয়ের পর বিলাসপুর চলে গিয়েছে জামাইবাবুর সঙ্গে। সুপুরি লবঙ্গ মুখে না থাকলে সিগারেট খেতে ভাল লাগে না বাবার। তাই দিদি মাঝে মাঝে বাবার জন্য সুপুরি কেটে পাঠিয়ে দেয় বিলাসপুর থেকে। কী পাতলা পাতলা সরু সরু করে সুপারি কাটতে পারে দিদি! মাও পারে না ওরকম। দিদি ছাড়া আর কারও কাটা সুপুরি বাবার ভাল লাগে না। তাই রাগ করে মা কখন বাবার জন্য সুপুরি কেটে দেয় না। ফুরিয়ে গেলে সুনরাকে কেটে দিতে বলে বাবার জন্য। সুনরাটা যা ডুমো-ডুমো বড় বড় করে সুপুরি কাটে! বাবার জামা ধোপার বাড়ী দেবার সময় পকেট থেকে সেই বড় বড় সুপুরির টুকরোগুলো বার করে, মা সুনরাকে দেখায়—'দ্যাখো সাহেবের মুখে রোচেনি।'।...সুনরাও মায়ের দিকে কিনা।......'ওমা! অত লোক কেন আমাদের বাড়ীতে?'...ডলিরই প্রথম নজরে পড়ল। শুনে তাকালেন ডলির মা।...সত্যিই তো! কেন? ফুলগাছের কেয়ারিগুলো আবার নষ্ট না করে দেয়। অফিসের কোন গোলমাল? কোন দরখাস্ত নিয়ে এসেছে বুঝি অফিসের বাবুরা। এই সবই চলেছে আজকাল!...পুলিসও আছে!...গম্ভীর...থমথমে!...গাড়ী ঢুকবার জায়গা করে দিল সরে দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় ওঠবার মুহূর্তেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। অন্য কেউ হলে এর আগেই বুঝত। চীৎকার করে ছুটে গেলেন তিনি পাশের ঘরে—যেখানে সবাই রয়েছে। তাঁর ক্ষতির পরিমাণ তখনও ভাল করে ভেবে উঠতে পারেননি। ওদিক থেকে যে আঘাত আসতে পারে, সেকথা কোনদিন কল্পনাও করেননি। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন চাদর ঢাকা মৃতদেহটার উপর। দেহটাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—"আমাকে জব্দ করবার জন্য তুমি এ কি করলে গো!".....

রক্তের কালো ছোপের জায়গাটায় মাথা রেখে মিনিট কয়েক এই সুরে কাঁদবার পর থেমে গিয়েছিলেন হঠাৎ। দোষী মন। তাই খেয়াল হয়েছিল অন্য এক কথা। সঙ্গে সঙ্গে সেইটাই তাঁর মুখ্য দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার এত লোকের চাউনির সেই কেমন কেমন ভাবটার মানে এতক্ষণে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। এই লোক-গিজগিজ বাড়ীর প্রত্যেকে তাঁর বিরুদ্ধে; একটা ক্ষণিক সহানুভূতির আবরণে তাঁর উপর আন্তরিক বিতৃষ্ণাটা আবছাভাবে ঢাকা পড়েছে মাত্র। যে লোকটা তাঁকে জব্দ করবার জন্য এমনভাবে চলে গেল, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই তার দিকে! মুহূর্তের মধ্যে তিনিই যেন বাইরের লোক হয়ে গিয়েছেন নিজের বাড়ীতে।

মিসিজ মুখার্জি ধরেছেন ঠিকই।

খবরটা শোনামাত্র প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করেছে—কেন? ভদ্রলোক এমন কাণ্ড করতে গেলেন কেন?...অত বড় চাকরে। ভাল মানুষ। ঠাণ্ডা মেজাজ। হিসাবী। ঘোড়-দৌড়, শেয়ার মার্কেট বা কোন রকম বদ-খেয়াল নাই। গীতা পাঠ না করে জলস্পর্শ করেন না।...বয়স অল্প হলেও না হয় কথা ছিল; পঞ্চাশের উপর বয়স। ছেলে, মেয়ে, জামাই। ছেলে এখনও মানুষ হয়নি; এক মেয়ে এখনও ছোট। চাকরিতে সেদিনও একটা 'লিফ্‌ট' পেয়েছেন। শরীর ভাল—কোনরকম অসুখ-বিসুখের খবর কারও জানা নেই।...এহেন লোক এ কাণ্ড করতে গেলেন কেন?......

কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক শুধু হতে পারে......

......হ্যাঁ হ্যাঁ বোধ হয় তাই। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই তাই। পারিবারিক অশান্তি। 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'এর স্বভাব তো কারও অজানা নয়। রেলওয়ে কলোনির কোন খবরটা কার অজানা। গয়লা, ধোপা, মুদী, চাকর, আরদালী যার সঙ্গে ভদ্রমহিলার কারবার, তারই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। মুখ থেকে কোন একটা হুকুম বার করতে যেটুকু দেরি; সঙ্গে সঙ্গে হওয়া চাই। কী তিরিক্ষি মেজাজ! তেমনি নাক সিঁটকানো সবতাতে। ...আরে বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে হল তো কি হল? সেই দেমাকেই ধরাকে — জ্ঞান করে—স্বামীকে সুদ্ধ! বড়মানুষির ভাই, তো বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকলেই পারিস! তবে বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন রেলের চাকরেকে অগ্নিসাক্ষী করে? আরে তোর বাপের বনেদী বাড়ীতে এখন শুধু ওই বড় বড় নোনাধরা থামই আছে; তাও কোন মারোয়াড়ীর কাছে টিকি বাঁধা কে জানে; জানা আছে সব।!...পড়তেন সেই-রকম কোন মোগল স্বামীর পাল্লায় তো সব কম্যাণ্ডারগিরি বার করে দিত।...কে বলে এক হাতে তালি বাজে না? যে বলে সে যেন একবার 'কম্যাণ্ডরা-ইন-চীফ'কে দেখে যায়।...বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করা না তো হাতী পোষা। কী খরচে স্বভাব 'কমাণ্ডার-ইন-চীফ'এর। ওই খরচে বউ পোষা কি মাস গেলে মাইনে পাওয়া লোকের কম্ম—সে যত বড় চাকরেই হক! তার উপর আবার মুখার্জি সাহেব মাস পয়লা মাইনে পেয়েই খানকয়েক মনিঅর্ডার পাঠাতেন দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনদের—অফিসের ঠিকানাতে রসিদ আসত—দেখেছে তো সবাই।......হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু নাটখটি লেগে থাকবে। নইলে যে লোকটা অফিস থেকে বাড়ীতে এসে লাঞ্চ খেয়েছে, সেই লোকটা তার খানিক পরেই বাথরুমের দরজা বন্ধ করে, বন্দুকের গুলী চালিয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? ...পকেটের কাগজে লেখা ছিল—"আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। মলি, ডলি, প্রদীপ তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও। ডলির পূজার উপহারের পার্সেল লোহার আলমারিতে আছে। আমার গীতা-খানি যেন মলি নেয়।"......

'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'এর নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি ভদ্রলোক শেষ চিঠিতে। এর থেকেই আন্দাজ করে নাও ব্যাপারটা।. ...ওই সময়টুকুর মধ্যে একটা কিছু যে ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নাই। বাড়ীর লোক ছাড়া কে জানবে সে কথা। চাকর-বাকররা বলে কিছু জানে না।......

ফিসফিস করে কত কথা, কত সন্দেহ। কত ইঙ্গিত চোখে চোখে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলবার আছে; কিন্তু অত কথা বলবার সুযোগ এখানে কোথায়। সেসব হবে পরে, কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে। আজকের অঘটনের আসল কারণটা খানিকটা আঁচ করলেও, সঠিক জানতে না পারার একটা অস্বাচ্ছন্দ্য সকলকে পীড়া দিচ্ছে।

নিগূঢ় অন্তর থেকে মিসিজ মুখার্জি জানেন যে, আজকের এই অঘটনের জন্য তিনি বহুলাংশে দায়ী। তবে এতটা গড়াবে সেকথা তখন ভাবতে পারেননি। এর চেয়ে কত বেশী কথা কাটাকাটি কত সময় তিনি করেন। নিজেকে নিগৃহীতা কল্পনা করে নিয়ে রাগারাগি করা তাঁর চিরকালের স্বভাব। এখন এই অবস্থাতেও রাগে গা-জ্বালা করে, যে লোকটি অন্য কারও কথা না ভেবে এমনভাবে চলে গেল, সেই লোকটার উপর।

মুখার্জি সাহেব মানুষটা অতি চাপা। আজও স্ত্রীর বাঁকা কথার পালটা জবাব দেননি। দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার পর অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। স্ত্রীর খোঁচা-মারা কি একটা যেন কথায় মুখখান রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। পকেট থেকে বার করে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চাবির রিংটা।

একরকম বলতে গেলে এই চাবিই তাঁদের সংসারের অশান্তির মূলে। স্ত্রীর বেহিসাবী স্বভাব দেখে বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মাইনের সব টাকা এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া কোনদিন উচিত মনে করেননি মুখার্জি সাহেব। দৈনন্দিন খরচের জন্য কিছু টাকা শুধু তাঁর হাতে দিতেন। এইটাই ছিল মিসিজ মুখার্জির প্রধান অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। যখন তখন তিনি স্বামীকে শুনিয়ে দিতেন যে, বাপের দেওয়া টাকা তাঁর কিছু আছে, আর সেই টাকাই তিনি খরচ করেন নিজের দরকারে। স্ত্রীর এই কথা মিস্টার মুখার্জি কোনদিন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেননি; আর এসম্বন্ধে জানতে ঔৎসুক্যও প্রকাশ করেননি কোন-দিন।

এই মনকষাকষিরই একটা খণ্ড পর্ব আজকের চাবি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা। পালিশ করা মেঝের উপর পড়ে ছিটকে চলে গিয়েছিল চাবির রিংটা ঘরের কোণার জল-চৌকিটার নীচে। মিসিজ মুখার্জি সেদিকে ফিরেও তাকাননি। এর আগে কখন স্বামীর এমন রূঢ় ব্যবহার দেখেননি।...এমনভাবে তাঁর দিকে চাবি ছুঁড়ে ফেলাও যা চাবি ছুঁড়ে মারাও তাই।...সব আভিজাত্য ভুলে গিয়ে ইতর অঙ্গভঙ্গি করে ওই চাবি, আর চাবির হাড়-কিপটে মালিকের টাকার উদ্দেশে বেশ কদর্য ভাষা ব্যবহার করেন। নিজের কপালকেও ধিক্কার দিতে ভোলেননি।......

টাকা জমানর দরকার বলে কি মনের মত পুজোর জামাকাপড়ও হবে না? এক প্রস্থ হয়েছে তো কী হল! একটার বেশী দুটো কিনলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি? দেখতে পারি না এই সব ছোট নজর! মেয়ের বিয়েতে পনের হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে বলে কি একেবারে গরীব হয়ে গিয়েছ? খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দাও, টাকা বাঁচবে! ঝাঁটা মারি অমন টাকায়! ভাগ্নীর বিয়ের খরচ, ভাইপোর মেডিকেল কলেজে পড়ার খরচ, সাতগুষ্টির লোকের জন্য মনিঅর্ডার, সব চলছে সাবেক-দস্তুর; শুধু যত অভাব আমি চাইলে! কে চায় তোমার পয়সা!...এই ড্রাইভার! গাড়ী বার করো!"......

ডলি তখন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। দরজার বাইরে সুনরা হাঁ করে মেমসাহেবের কথা-গুলো গিলছে। কাপড়-চোপড় বদলে ডলিকে নিয়ে বেরুবার সময় তিনি আড়চোখে দেখে গিয়েছিলেন যে মিস্টার মুখার্জি তখনও নীচের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন; মুখের সিগারেটটা ধরানো হয়নি। বাজারে কেনাকাটা সেরে, ঘণ্টাতিনেক পর বাড়ি ফিরে দেখেন এই কাণ্ড।

"আমাকে জব্দ করবার জন্য এ তুমি কি করলে গো।" "আমার কথা না হয় না ভাবলে, ছেলেমেয়েগুলোর কথাও কি একবার তোমার মনে পড়ল না গো!"

প্রচণ্ড শোকের তোড়ে আপনা থেকে বেরিয়ে আসছিল কথাগুলো ডুকরে ডুকরে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে!......এ কি করছেন তিনি! মনে হতেই হঠাৎ থেমে গেলেন। সতর্ক হয়ে গেলেন মিসিজ মুখার্জি। ওই সব খেদোক্তিগুলোর মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে গেলেন না তো তিনি ঘরভরা শ্রোতাদের কাছে! সবাই বোধহয় ওত পেতে রয়েছে কথাগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য! স্বামী কি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখে রেখে

গিয়েছেন? সুনরা বলে দেয়নিতো দুপুরের ঝগড়াঝাঁটির কথা বাইরের লোকদের কাছে? পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই চাকরবাকরের কাছে জিজ্ঞাসা করবে!......

"এ তুমি কি করলে গো!"......

আবার আরম্ভ হল কান্না। এবার তিনি খেদোক্তি বদলেছেন। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা নাই খেদোক্তির মধ্যে আর। দুর্নামের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার পথ খুঁজছে দোষী মন। "এ তুমি কি করলে গো!"...

মিসিজ মুখার্জি বেশ বিচলিত হয়েছেন।...হে ভগবান, তিনি যেন কিছু না লিখে গিয়ে থাকেন ঝগড়াটার সম্বন্ধে! এখানকার কারও চোখের দিকে তাকাবার সাহস তাঁর নাই। এরা কতদূর জানে জানা নাই! তাই আরও ঠিক করতে পারছেন না কি করা উচিত, কি বলা উচিত।... সুনরাটাকে একবার বারণ করে দিতে পারলে হ'ত, যাতে সে কারও কাছে কিছু না বলে, সেই চাবি ছোঁড়বার ঘটনাটার সম্বন্ধে!... কিন্তু সে সুযোগ কি পাওয়া যাবে এত লোকজনের মধ্যে?

"ওগো কেন তুমি এমন ভাবে চলে গেলে গো!"...

...আর ডলিতো সব দেখেছে! সে যদি সকলকে বলে দেয়! যদি এরই মধ্যে বলে দিয়ে থাকে! তাকে কিছু বলাতে পরিষ্কার বারণ করে দেওয়া দরকার।...

"ওগো তোমার কত আদরের ডলির কথা একবার ডাকলে না... গো!"..."ওরে ডলিরে-এ-এ!"..."ওরে ডলিরে--এ-এ-এ!"

প্রতিবেশিনীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

...ওরে দ্যাখতো ডলি কোথায়!... ডলি তো নাই; তাকে এক্সিকিউটিভ এনজিনিয়ারের বউ নিয়ে গেলেন নিজেদের বাড়িতে। ডাকিয়ে পাঠাবো?...না না, ছেলে-মানুষ—দরকার কি এসবের মধ্যে তাকে এনে।...আর কথায় দরকার কি, মা ডাকছে; নিয়ে এস সেখান থেকে!...

"এ তুমি কি করলে গো!"..."এ তুমি কি করলে গো!"

কোন রকম ধরাছোঁয়া-না-দেওয়া এই গোছের শোকোক্তি মিসিজ মুখার্জি কান্নার সঙ্গে সঙ্গে করে চলেছেন; কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিরতি পড়েনি তাঁর দোষস্খালনের চেষ্টার। জোরে জোরে কান্না তিনি মাঝে মাঝে বন্ধ করে, স্বামীর দেহের উপর অসাড় হয়ে মুখ গুঁজে থাকছেন কিছুক্ষণের জন্য। এই সময় তিনি কান খাড়া করে রাখছেন, যদি উপস্থিত লোকদের কারও কথা থেকে কোন দরকারী খবর পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে। তারপর আবার আরম্ভ হচ্ছে তাঁর একঘেয়ে সুরে কান্না।

...মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে যাবার সময় তিনি প্রথম জানতে পারলেন স্বামী শেষ চিঠিতে কি লিখে গিয়েছেন।

লোকজনের কথাবার্তা যা কানে এল তা' থেকে বুঝলেন সুনরা বা ডলি দুপুরের ঝগড়ার কথাটা কারও কাছে বলেনি। জেনে তিনি মনে একটু বল পেলেন। তখন থেকে তাঁর শোকোক্তির ধারা আবার বদলায়। নিজের দোষ কাটানর সব চেয়ে ভাল উপায় অপরের উপর দোষ চাপানো, একথা তিনি সহজাতসুলভ বুদ্ধিতে জানেন।

..."দাও, দাও, কেবল দাও! কত দিতে পারে একটা মানুষে! ভাইরা তোমায় এক-দিনও শান্তি দিল না। তাদের জুলুমে তিতবিরক্ত হলে কি, এমনি করেই কি চলে যেতে হয় গো!"

নূতন 'স্লোগান',—নূতন রণকৌশল 'কম্যান্ডার-ইন-চীফ'এর। আগের মত অতটা টেনে টেনে বলা নয়। খুব বেশী জোরেও না। স্বগতোক্তির মত শুনতে।

এই নূতন লাইনেই তিনি চালিয়ে গেলেন পরের দিনও, নিজের বক্তব্য। ভাশুর, দেওরদের সঙ্গে বনিবনা তাঁর কোনদিন হয়নি। বড় মেয়ের বিয়ে দিতে শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিনের বেশী থাকতে পারেন নি। ঝগড়াঝাঁটি করে চলে এসেছিলেন।

পাড়ার লোকরা তাঁর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা চাইতে এলে, তিনি পরিষ্কার বারণ

করে দিলেন, তাঁদের কারও কাছে এখানকার দুর্ঘটনার খবরটা জানাতে।..."কোন খবর দেবার দরকার নাই। আসতে হবে না তাঁদের কাউকে। আপনাদের মত এমন করে, করবে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকে? সেই রকম লোক নাকি তারা? আমি এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, চিরকাল! ছেলেমেয়েদের টেলিগ্রাম করা যখন হয়েছে কাল, তখন আর কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।"...

তিনি জানেন যে এখানে তিনি কখনই থাকবেন না ভবিষ্যতে। এখানকার লোকজনের কাছে তাঁর লজ্জাটা মাত্র দিন-কয়েকের। তাঁর আসল কুণ্ঠা শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে, আর নিজের ছেলেমেয়ের কাছে। তারা ঘুণাক্ষরে টের পেলে, চিরকাল এ নিয়ে খোঁটা দেবে।...আর কেউ না জানুক, ডলি তো জানে। সে কি বড় হয়ে, একথা নিয়ে খোঁটা দিতে ছাড়বে তাঁকে! কে বলতে পারে সে কথা! আর সুনরাটা?

দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে, সুনরাকে একান্তে ডেকে বলে দিলেন, সে যেন বাড়ির কোন কথা, কাউকে না বলে। এই সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট সুনরার পক্ষে। কোন কথাটা বলতে বারণ করছেন মেমসাহেব তা' সে জানে। ত্রস্ত চাউনি তার। উত্তর দিল অতি সংক্ষেপে। জিভে চিকু কেটে, উপরে আঙুল দেখিয়ে, সে বলল—"ভগবান আছেন! ছি ছি ছি!"—অর্থাৎ প্রাণ গেলেও সে একথা বলবে না কাউকে। কথার সুরে মেমসাহেব আশ্বস্ত হলেন; কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলেন না সুনরার ভয়টা কিসের। এত ভয়!

রেলের কণ্ট্রাক্‌টার টিউমলও আশ্চর্য হ'ল সুনরার এই ভীত ভাবটা দেখে। সে এসেছিল চুপি চুপি খবর নিতে যে, বাড়ির আসবাব জিনিসপত্র বিক্রি হবে কি না। "মাফ করবেন ভাই সাহেব। আমার কাছে এসব জিজ্ঞাসা করবেন না।" হাত জোড় করে এই কথা বলেই সুনরা ছুটে পালিয়েছিল সেখান থেকে। এ সব সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সে থাকতে চায় না, কাল রাত্রির সেই ঘটনাটার পর থেকে!

মুখার্জি সাহেব মারা যাওয়ায় এ চাকরি তার আর থাকবে না এ কথা সে জানে। বাড়ি ছেড়ে দূর দেশে এসেছে, পয়সা রোজগার করতে। কাল রাত্রিতে সেই সুযোগ সে পেয়েছিল। সবাই তখন শ্মশানঘাটে। বাবুর্চি আর মালী 'আউট-হাউস'এ। বাড়িতে সে একা। ঘর-দুয়োর, বাথরুম, সে বেশ করে ফেনাইল দিয়ে ধুলে। ঘরের কোণায় জলচৌকির উপর সেলাইএর কলটা রাখা আছে। তার নীচেটা ধোয়ার সময় ঝাঁটার সঙ্গে বেরিয়ে আসে চাবির রিংটা।...যে চাবি ছোঁড়াছুঁড়ি নিয়ে আজ এখানকার সংসারটা একেবারে ওলট পালট হয়ে গেল, সেই চাবিটা! বারান্দা থেকে সে সব দেখেছিল। লোহার আলমারির মধ্যে সাহেবের টাকাকড়ি কাগজপত্র থাকে। কত টাকা আছে ওর মধ্যে সেকথা মেমসাহেবও জানেন না। যা আছে তার মধ্যে থেকে কিছু নিয়ে নিলে কেউ বুঝতেও পারবে না। এ রকম সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না!...

আলমারিটা কিন্তু চেষ্টা করেও খুলতে পারল না। রিংএ একটা মাত্র চাবি। সাহেবকে কত সময় এই চাবি দিয়ে আলমারি খুলতে দেখেছে। বাড়ির অন্য সব চাবি থাকে মেমসাহেবের কাছে—বড় চাবির গোছায়।...কিন্তু কিছুতেই এ-চাবিটা লাগছে না যে!...তবে কী...!

হঠাৎ চাবিটা আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগে হাতের মধ্যে।...ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। চাবিটা জলচৌকির নীচে ঠিক সেইখানে রেখে দিয়ে, সুনরা গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এই ভয়ই তার চাউনিতে দেখতে পেয়েছিলেন মিসিজ মুখার্জি, পরের দিন।

ডলিকে কাছে শুইয়ে, পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বারণ করেছিলেন—সে যেন কারও কাছে আগের দিনকার চাবি ছোঁড়বার কথাটা না বলে—দাদা দিদির কাছেও না। মুখচোখ দেখে বোঝা গেল এই দশ বছরের মেয়েটা সব বোঝে, সব জানে। বাবার চিঠিতে কি লেখা আছে সেকথা পর্যন্ত। সব শুনেছে এনজিনিয়র সাহেবের মেয়েদের কাছ থেকে। সে মায়ের দিকে কিনা, তাই কাউকে কিছু বলেনি। একটা গোপন রহস্যের অংশীদার তারা তিনজন মা, সুনরা আর সে। মুখ ফুটে কথাটা তার কাছে বলে, মা তাকে বয়স্থ ব্যক্তির মর্যাদা দিচ্ছেন।...নিজেকে বেশ বড় বড় লাগে।

সারাদিন শুভার্থিনী প্রতিবেশিনীদের আনাগোনার শেষ নাই। দু'চার দিনের মধ্যে এখানকার বসবাস তুলে দিতে হবে একথা সবার জানা। তবু সবাই এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন মিষ্টি কথা দিয়ে, যাতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে এঁদের এখানে থাকা না থাকা নির্ভর করছে ছেলেমেয়ে জামাইএর উপর। কাল তারা এসে পৌঁছবে। তারাই এসে ভেবে চিন্তে এ বিষয়ে অন্তিম রায় দেবে।...এমনিও ছেলেমেয়েরা আর ক'দিন পরেই তো আসত পুজোর ছুটিতে—কিন্তু সে আসা, আর এ আসা!...

মুখার্জি সাহেব ঘটনার পূর্বে কি কি খেয়েছিলেন, খাওয়ার পর কোন কোন জিনিস পাতে পড়েছিল, আরও কত রকমের প্রশ্ন প্রতিবেশিনীদের। সব প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিচ্ছেন মিসিজ মুখার্জি। আর উত্তরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে সেই একঘেয়ে অতিকথার ধুয়ো—"...চলে যাবার দিন পর্যন্ত তাদের জন্য করে গিয়েছে। না বলেনি কোন দিন।...জমি জিরেত ভোগ করবেন তাঁরা; খাজনাটা এখান থেকে পাঠাতে হবে।...কাঁঠালগাছ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করবেন তাঁরা; মামলা মোকদ্দমার খরচটা এখান থেকে পাঠাতে হবে।...একেবারে ঢালাও হুকুম এসে গেল সেখান থেকে ভাই লক্ষ্মণের কাছে—ভাইঝির বিয়েতে খরচ করতে হবে, ঠিক নিজের বড় মেয়ের বিয়েতে যত খরচ হয়েছে তত।...বলো, একটা লোক কি এত পারে?...ছিঁড়ে খেয়েছে!...লোকটা কি অমন করে চলে গেল সাধ করে!"...

প্রথমের দিকে শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধের অভিযোগে খানিকটা অস্পষ্টতা রেখেছিলেন। ডলি আর সুনরার দিকের বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর থেকে অভিযোগগুলো স্পষ্টতর হল। একটার পর আর একটা তথ্য সাজিয়ে নিজের বক্তব্যের বনিয়াদ দৃঢ় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তবু কি উদ্বেগ কম। ছেলে মেয়ে জামাই আসবে কাল সকালে। এলে মনের জোর একটু বাড়ে,—ছেলে মেয়েদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে একটু বাঁচবেন! কিন্তু তারাতো সব বুঝতে পারবে! যতই শ্বশুরবাড়ির লোককে দায়ী কর, তারা ঠিকই ধরতে পারবে আসল ব্যাপারটা! বিশেষ করে বড় মেয়ে!...

রাত্রিতে শেষ শুভাকাঙ্ক্ষিণীর হাত থেকে রেহাই পাবার পর ডলিকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে শুলেন। দুশ্চিন্তায় ঘুম আর আসে না কিছুতেই।...এতদিন তবু সংসারের ঝড়ঝাপটা আড়াল করে দাঁড়াবার একটা লোক ছিল!...ছেলে এখনও মানুষ হয়নি, এক মেয়ের বিয়ে বাকি,—কত রকমের দুশ্চিন্তা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে। টাকাকড়ির কথাটাই অবশ্য তার মধ্যে সব চেয়ে বড়।...ঘড়িতে একটা বাজল।...তেল না মাখলে তাঁর কোন দিন ঘুম হয় না।...তার উপর ঘরের আলোটা জ্বলছে। আলো জ্বালা থাকলেও তাঁর ঘুম আসে না।...কিন্তু আজ জ্বলুক আলোটা।

ডলি শুয়ে রয়েছে মার পাশে। তারও ঘুম আসছে না; তারও দুশ্চিন্তা কম নয়। অত বড় একটা গোপন খবরের বোঝা বুকের উপর চাপান থাকলে কি ঘুম আসতে চায় কখনও! তার এত বড় দশ বছর বয়সের মধ্যে সে এমন কাণ্ড কখন দেখেনি।...দিদির চেয়ে অবশ্য কম, কিন্তু বাবা তাকেও ভাল বাসতেন খুব। মা যাই বলুন।...বাবা তাকে পুজোর সময় দেবার জন্য যে পার্সেলটা কলকাতা থেকে আনিয়েছিলেন সেটা রেখে গিয়েছেন ওই লোহার আলমারিতে।...মার পরনের থান-কাপড়খানা থেকে একটা গন্ধ বার হচ্ছে। বিচ্ছিরি নতুন কাপড়ের গন্ধটা!...কম্বল পেতে শুলে বড়

গা কুটকুট করে। তাই ঘুম আসে না। মারও ঘুম আসছে না। মা জল খেয়ে এসে আবার শুলেন।...আলো নিভালে বোধ হয়, মার ভয় করছে আজ।...অফিস থেকে আসবার সময় পরশু যখন বাবা পার্সেলটা নিয়ে এসেছিলেন, তখন সে ভেবেছিল বুঝি দিদি পাঠিয়েছে সুপুরি কেটে, বিলাসপুর থেকে। তাই আর ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি।...পার্সেলে কি আছে সে কথাটাও যদি লেখা থাকত বাবার চিঠিতে, তাহলে বেশ হত!...এবারে রেল-কলোনির পুজো বোধ হয় তাদের দেখা হবে না। মা আজকে তাকে ঠাকুরগড়া দেখতে যেতে বারণ করেছিল। তাকে কাছে কাছে না রাখলে মার সারাদিন ভয় ভয় করছিল।...লোহার আলমারির চাবিটা কোথায় পড়ে আছে কালকে দুপুর থেকে, তা সে দেখেছে।...মা বোধ হয় ভুলে গিয়েছে চাবিটার কথা।...আবার উঠল কেন মা? বাথরুম-এ যাচ্ছে।...হুড়হুড় হুড়হুড় করে জল ঢালবার শব্দ আসছে বাথরুম থেকে। এই রাতদুপুরে গা ধুচ্ছে না কি? ঠিকই তাই। রাত দুপুরে গা ধোয় নাকি লোকে। গরম লাগছিল তো কী হল। সব জিনিসে বাড়াবাড়ি মা'র!...চাবিটা দিয়ে এখন একবার লোহার আলমারিটা খুলে দেখলে হয় না!...এক মিনিটের তো কাজ। শুধু একবার দেখে নেবে সেই পার্সেলটায় কি আছে। দেখে আবার বন্ধ করে রেখে দেবে। মা ফিরে আসবার আগেই আবার চুপিসারে এসে শুয়ে পড়বে।...

ডলি উঠল। চাবিটাকে জলচৌকির নীচ থেকে তুলে নিয়ে সে আলমারির দিকে এগিয়ে গেল। কান পড়ে রয়েছে বাথরুমের জল-ঢালার শব্দটার দিকে।...তাড়াতাড়িতে বুঝি চাবিটা ঢুকছে না। আবার চেষ্টা করল।...না!...আবার ভালভাবে দেখে, হাত যথাসম্ভব স্থির রেখে চেষ্টা করে। তবুও খুলল না। নিজের সুটকেস সে, দিনে কতবার খোলে; আর এই আলমারিটা খুলতে পারছে না! চোখমুখ কুঁচকে, জিভের ডগা বেঁকিয়ে ঠোঁটের কোণায় বার করে, দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও চাবিটা লাগাতে পারল না।...মা এখনই এসে পড়বে!...যেখান থেকে চাবির রিংটা নিয়েছিল, সেইখানে রেখে, পা টিপে টিপে এসে আবার কম্বলের উপর শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে পড়ে থাকে আড়ষ্ট হয়ে।

মিসিজ মুখার্জি বাথরুম থেকে এসে ডলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডলি! জেগে আছিস নাকি?"

ডলি সাড়া দিল না। মেঝের উপর মার মৃদু পা ঘষটানির শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। চোখের পাতা একটু ফাঁক করে সে দেখল। মা জলচৌকির তলা থেকে চাবির রিংটা নিল।...পা টিপে টিপে হাঁটছে কেন মা?... বাবার আলমারিটা বুঝি খুলবে! হ্যাঁ, ঠিকই তাই। খুলবার মত করে চাবিটা ধরেছে দুই আঙুলের মধ্যে।...মা আলমারিটা খুললেই, সে মিছামিছি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসবে। দেখবে পার্সেলটাতে কি আছে।...অ্যাঁ, এ কি!...

ডলির মা ভেবেছিলেন আলমারি থেকে কিছু টাকা বার করে এনে রেখে দেবেন। স্বামীর উপর রাগ করে কাল যে পুজোর বাজার করে এনেছিলেন তার টাকাও দোকানদারকে দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীরা কালকের শেষকৃত্যাদি থেকে আরম্ভ করে, সব খরচ নিজেরাই পকেট থেকে দিয়েছে। সে সবও শোধ দিতে হবে। কাল মেয়ে জামাইরা এলে সংসার খরচও একটু বাড়বে। যত শোক দুঃখ হক না কেন, খাওয়াদাওয়া বন্ধ ক'রে তো কেউ থাকতে পারে না। তাই তিনি ভেবেছিলেন কিছু টাকা আলমারি থেকে বার করে নিয়ে রেখে দেবেন; তারপর আলমারিটা খোলার বিষয় নিয়ে ছেলেমেয়েদের সম্মুখে একটা নিস্পৃহতার ভাব দেখাবেন। স্বামী থাকতেও তিনি কোন দিনও আলমারি ছুঁতে যান নি—স্বামী চলে যাবার পরও ছেলেমেয়েরাই যেন প্রথম টাকার আলমারিটা খুলল—এমনি একটা ভাব তিনি তাদের সম্মুখে দেখাতে চান।

...ডলিটা জেগে উঠলে তাঁকে ভীষণ অপ্রস্তুত হতে হবে!...বাইরের বারান্দায় সুনবা শুয়ে আছে—ঘুমিয়ে না জেগে কে জানে। ঘরে আলো জ্বলা রয়েছে—বারান্দার দিক থেকে সব দেখা যায়! তবে আলমারির দিকটা বারান্দার জানলা দিয়ে দেখা যায় না, এই যা!...যত তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে চাচ্ছেন, ততই যেন হাতটা কেঁপে কেঁপে ওঠায় দেরী হয়ে যাচ্ছে।... কী হল আবার! কিছুতেই যে লাগছে না চাবিটা!...ঠাণ্ডা চাবিটার মধ্যে দিয়ে একটা সিরসিরনির ঢেউ, আঙুলের ডগা বেয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে!...

কী ভাবলেন, কী মনে হল তিনিই জানেন। চীৎকার করে উঠতে গেলেন; কিন্তু শুকনো খরখরে গলার মধ্যে দিয়ে গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুল। হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে। পাশের

ড্রেসিং টেবিলটা ধরে তিনি কোন রকমে দাঁড়ালেন। চাবিটা ফেলে দিয়েছেন ড্রেসিং টেবিলের উপর। তাকিয়ে দেখবার মত মানসিক অবস্থা থাকলে সম্মুখের আয়নার সাদা-থান-পরা স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পারতেন কি না সন্দেহ।

ভয় জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে। আলমারিতে চাবি না লাগাবার সঙ্গে ভয়ের সম্বন্ধ থাকতে পারে একথা ডলির মনে হয়নি এর আগে। ধড়মড় করে সে কম্বল থেকে উঠে পড়েছে, কান্নার সুরে চেঁচিয়ে। ছুটে পালিয়ে যেতে চায় ঘর থেকে।

দরজার ছিটকিনি খুলতেই দেখে সুনরা দাঁড়িয়ে। ডলি তাকে জড়িয়ে ধরেছে কাঁদতে কাঁদতে।

সুনরা যখন ঘরে ঢুকল তখনও মিসিজ মুখার্জি সেইরকম করেই দাঁড়িয়ে। ড্রেসিং টেবিলের উপর চাবিটা। দেখা মাত্র সে ব্যাপারটা বুঝেছে।

মিসিজ মুখার্জি, ডলি, সুনরা। একটা ভয়ের জালে জড়িয়ে পড়ে তিনটি মন খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। অব্যক্ত, অজানা ভয়। সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলেনি।

মেঝে থেকে কম্বলখানা তুলে নিয়ে গিয়ে সুনরা পাশের ঘরে পেতে দেবার সময় শুধু বলেছিল—'আমি বারান্দায় দোড়গোড়াতেই থাকলাম।'

কম্বলের উপর মাকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে শুয়ে আছে ডলি। বাবার কথা কেবলই মনে আসছে। কাল দাদা, দিদি, জামাইবাবু এরা এলে আর ভয় করবে না।......লোহার জিনিসে আবার ভয় কিসের!.....জুতো-জুতো গন্ধ বার হচ্ছে সার সার সাজানো বাবার জুতোগুলো থেকে!.....তাতে ভয় কি!......মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আঙুলের ডগাগুলো মা'র কী ঠান্ডা!......

মিসিজ মুখার্জি ভয় পেয়েছেন ডলির চেয়েও বেশী। গা-ছমছমানির ভাবটা বাড়ী ময় ছড়ানো—হালকা কুয়াশার মত। বাদুরে উঠনের পেয়ারা গাছে ডানা ঝাড়ছে, দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতার ফড়ফড় করে শব্দ হচ্ছে, দূর থেকে কুকুর-কান্নার শব্দ আসছে—সব জিনিসের সঙ্গে আতঙ্ক মেশানো। হাওয়ায়-ভেসে-আসা একটা চেনা সিগারেটের গন্ধে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য। কাকে ভয়, কিসের ভয়, সেকথা স্পষ্টভাবে নিজের কাছে স্বীকার করতেও কুণ্ঠা আছে।.....যে গুবরে পোকাটা জানলা দিয়ে উড়ে এসে ঠক করে পাপোশের কাছে পড়ল, সেটাকে সুদ্ধ সন্দেহ হয়। অন্য একটা ঘটনার সঙ্গে, এখনকার প্রত্যেক জিনিসের সম্পর্কের কথা আপনা থেকে মনে এসে যায়। ঘড়িবাজা গুনতে হয়, কতক্ষণে ভোর হবে তারই প্রতীক্ষায়!...শোভন-অশোভনের কথা ভুলে গিয়ে নিজের গরজে সুনরা বারান্দায় গান ধরেছে—এই যা বাঁচোয়া!......

সকালে ছেলেমেয়েরা এসে মাকে দেখে ভয় পেল।.....এত মুষড়ে পড়েছে মা!.....একদিনের মধ্যে এ কী চেহারা হয়েছে! ডলিটার সুদ্ধ চোখের কোলে কালি পড়েছে! তাকানো আর যায় না তাদের মুখের দিকে! মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবার সময় বাবার চেয়ে মায়ের কথাই বেশী করে মনে হচ্ছিল মলির।

জামাই-এর কথা কি মিষ্টি!......"মা আপনি যদি এত ভেঙে পড়েন তাহলে আপনার ছেলেমেয়েরা দাঁড়াবে কোথায়?

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে শাশুড়ী। শোকে হতবাক্ হয়ে গিয়েছেন। চোখের জলও বুঝি তাঁর শুকিয়ে গিয়েছে। আবার পাগল-টাগল না হয়ে যান এই আশঙ্কা জামাইএর।

কান্নাকাটির প্রথম ঢেউটা কাটবার পর, বাড়ির সবাই মিলে দুপুরে বসেছে, এই বিপদের মুখে পরিবারের দায়দায়িত্ব খতিয়ে দেখতে। বাবার স্মৃতিতে জড়ান ঘর-খানাতেই ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকেই কম্বল বিছিয়ে নিয়েছিল।......আর ক'দিনই বা এই বাড়িতে থাকতে দেবে!......বিষাদে ভারী হয়ে উঠেছে নূতন করে এই ঘরের হাওয়া-বাতাস, নূতন মানুষদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে। মিসিজ মুখার্জিও মনে বল পেয়েছেন, ছেলেমেয়েরা আসায়। তিনি না থাকলে কি কোন কাজের কথা হতে পারে? তাই জামাই তাঁকেও টেনে এনে বসিয়েছে এখানে। তার প্রশ্নে শাশুড়ীকে মুখ খুলতেই হল।

জ্যাঠামশাইকে খবর দেওয়া হয়নি শুনে, জামাই, ছেলে, মেয়ে সকলেই আশ্চর্য হল। ছেলে তখনই ছুটল সাইকেল নিয়ে, জ্যাঠা-মশাইদের টেলিগ্রাম করতে। মিসিজ মুখার্জির একমাত্র ভাই থাকেন বিলাতে; তাঁকে পরে চিঠি দিলেই চলবে। টাকা-পয়সার কথাটাও আর স্থগিত রাখা গেল না। বাজারে কত ধার, রেল কোম্পানী থেকে কত পাওয়া যাবে, লাইফ ইনসিওরেন্স আর জমানো টাকার পরিমাণ কত, ইত্যাদি সব রকমের কথা এসে গেল। মিসিজ মুখার্জির এক কথা—এসব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—কোনদিন এসব সম্বন্ধে খবর রাখবার দরকারই পড়েনি তাঁর। "আর আলমারিতে?"

মলির প্রশ্ন। মিসিজ মুখার্জি জানেন, এর পর কোন প্রশ্নটা আসবে। উদ্বেগের ছায়া পড়েছে চোখমুখে। ডলির চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন "কে জানে! কে দেখতে গিয়েছে বলো। কোনদিন আলমারি খুলবার অধিকারও ছিল না, স্পৃহাও ছিল না—আজও নেই।"

"চাবিটা কোথায়?"

"ড্রেসিং টেবিলের উপর।"

ডলির চোখের দিকে এখনও তাকিয়ে তিনি।

"টাকার আলমারির চাবি কখন ওরকম খোলা জায়গায় ফেলে রাখে লোকে?"

"জামাইএর একথার কোন জবাব দিলেন না মিসিজ মুখার্জি। তিনি ডলির চোখের থেকে চোখ সরাননি। ডলির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। মিসিজ মুখার্জির চোখের পাতাও কেঁপে কেঁপে উঠছে।......মলিকে খুব ভালবাসতেন ওর বাবা; ওর হয়ত কোন বাধা আসবে না!.....

মলি চাবি নিয়ে আলমারি খুলতে গেল।

ডলির কান্না আসছে। মিসিজ মুখার্জি ডলির মুখের উপর হাতখানা রাখলেন আদরের ছলে। ঠান্ডা হিম হাতখানা।

"একি! চাবি লাগে না কেন?"

হাতের আঙুলের নীচে ডলির ঠোঁটের কাঁপুনি অনুভব করতে পারছেন 'কম্যান্ডার-ইন-চীফ'। এতক্ষণে তিনি তাকালেন বড়-মেয়ের দিকে। হাতের চাবিটাকে উলটে-পালটে দেখছে মলি। দেখতে দেখতে কপালে কয়েকটা কুঞ্চনরেখা পড়ল। ড্রেসিং-টেবিলের উপর থেকে একটা মাথার কাঁটা তুলে নিয়ে সে এসে বসল কম্বলের উপর।......কাঁটা দিয়ে চাবির ফুটোটা খোঁচাচ্ছে!......খুঁচিয়ে বার করে হাতের তেলোর উপর রাখল একটা সুপারির টুকরো—খুব মিহি করে কাটা। মলির চোখে জল এসে গেল সুপারির টুকরোটা দেখে।

ল-অ-হ-অ-র......

লোহার জিনিস সম্বন্ধে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল ডলি—মা তার মুখখানা কোলের মধ্যে গুঁজে ধরেছেন।

......"ভাইদের উপর রাগ করে, এমনি করে চলে গেলে গো!"......"অবিবেচক ভাইরা তোমায় এমনি করে মেরে ফেলল গো!"......"মায়ের পেটের ভাইরা তোমায় শেষ না করে ছাড়ল না গো!"......জোরে আরও জোরে।

# কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে

## শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নজরুল ভাল করে কথা বলছে না। বুঝলাম তার লেগেছে খুব। পঞ্চুর কাছ থেকে বন্দুকটা আমি চেয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু নজরুল আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

বন্দুক চালানোর একটা নেশা আছে। নেশাটা ঠিক পাখী মারার নেশা নয়। গুলীটা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারার নেশা। নজরুল যদি কাঁচা পেঁপের গায়ে গুলী ঠিক লাগাতে না পারতো, তাহলে তার লাট-বেলাট মারার নেশা ছুটে যেতো দু'দিনেই।

পরের দিন হাতটা নিস্‌পিস্ করছিল আমারও। ভাবলাম, যাই একবার পঞ্চুর কাছে। গিয়ে বলি, খুব অন্যায় হয়েছে তোমার। বন্দুকটা দাও।

কিন্তু কিযে হলো সেদিন, পঞ্চুর বাড়ির দোর পর্যন্ত গিয়েও ঘরে ঢুকলাম না। সোজা চলে গেলাম নজরুলদের বোর্ডিংএ।

গিয়ে দেখি, নিজের খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে নজরুল কি যেন লিখছে।

নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইস্কুল যাওনি?

কই আর গেলাম! বলে তার লেখাটি আমার হাতের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, নাও পড়। তোমার অস্ত্র মেরে দিলাম। কবিতা লিখলাম।

দেখলাম, সেদিনের সেই চড়ুই পাখীটিকে নিয়ে লেখা হয়েছে। লিখেছে—

স্কুল ঘরের প্রথম শ্রেণীর উই লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে

ছোট একটি চড়াইছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।

'চুঁ চাঁ' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে

মায়ের পরাণ—ভাবলে বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছায়ে।

অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটলো মাতা ফড়িং মুখে

স্নেহের আকুল আশীষ-জোয়ার উথলে ওঠে মার সে বুকে।

আধ-ফুরফুরে ছাটি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,

ভাবলে আমিই যাই না ছুটে, বসিগে মার বক্ষ জুড়ে।

হৃদয়-আবেগ মুখতে নেমে উড়তে গেল অবোধ পাখী

ঝুপ করে সে গেল পড়ে—অরল মায়ের করুণ আঁখি!

হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠলো কেঁপে

রাখলে নাকো প্রাণের মায়া, বসন ডানায় ছাটি ঝেঁপে।

ধরতে ছুটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে

ছুটেছে পাখী প্রাণের ভয়ে ছোট দুটি ডানা তুলে।

বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন

বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে—মায়ের সে যে বুকভরা ধন।

পুরেছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,

একটি ছেলে দেখছে আঁশু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।

মা মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ

তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠলো বেজে করুণ বেহাগ।

মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে

ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশীষ পরাণ খুলে।

অবাক-নয়ান মাটি তাহার রইলো চেয়ে পাটুর পানে

হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।

পাখীর মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি দিল ঢেলে

দিতে কি তাব পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!*

এমনি কবিতা লিখেও সে যদি বন্দুকের কথা ভুলে থাকে তো থাক! আমি ক্রমাগত তাকে কবিতা লেখার জন্য তাড়া দিতে লাগলাম।

তিন দিন পরে দেখলাম আবার আর-একটা লিখেছে। কবিতাটির নাম দিয়েছে "রানীর গড়।" কবিতাটি চমৎকার। আমার কাছে আছে এখনও। কোথাও ছাপা হয়নি।

তার পরে লিখেছিল 'রাজার গড়।' সেটিও অপ্রকাশিত। আছে আমার কাছে।

নজরুল যখন এমনি করে একটির পর একটি কবিতা লিখে চলেছে, তখন একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

ছিনু তখনও রয়েছে তাদের বোর্ডিংএ। যে-ছিনুর কথা লিখেছি প্রথম পরিচ্ছেদে—সেই ছিনু মিঞা।

আমি গেছি তাদের বোর্ডিংএ। দেখলাম নজরুল তার খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, বুকের নীচে একটা বালিশ নিয়ে একমনে লিখে চলেছে। খোলা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে লিখছিল। আমাকে দেখতে পায়নি।

হাতের ইশারায় ছিনু আমাকে ডাকলে। কথা না বলেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। নজরুল বুঝতেই পারলে না আমি এসেছি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ছিনু চা তৈরি করছিল, আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। তালপাতার চাটাই-এর ওপর চেপে বসলাম। এক পেয়ালা চা আমার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, খাও মিঞা সায়েব, গরম চা খেয়ে আগে ঠাণ্ডা হও, তারপর বলছি তোমাকে কেন ডাকলাম।

বললাম, তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।

—কই বল দেখি কি বুঝতে পেরেছ?

বললাম, আমি বসে থাকলে ওর লেখা হবে না, তাই তুমি আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনলে।

ছিনু বললে, না, তুমি বুঝতে পারোনি মিঞা সাহেব। কাল থেকে দুখু মিঞার সঙ্গে আমার বাক্যি-কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ! এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

যে-ছিনু নজরুলকে তার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে, সেই নজরুলের সঙ্গে হলো তার ঝগড়া!

হেসে বললাম, এ তোমাদের প্রেমের ঝগড়া ছিনু, এক্ষুণি দেখবো ভাব হয়ে গেছে।

ছিনু বোধ করি রাগ করলে আমার কথাটা শুনে। বললে, তুমি তো তা বলবেই। তুমিই হচ্ছো যত নষ্টের গোড়া। তুমিই তো এইটি করলে!

কথাটা তখন বুঝতে পারিনি। —কি করলাম?'

—করলে না?

ছিনুর রাগ আমি কখনও দেখিনি। ডাঁটি-ভাঙা একটা কাপে ফুঁ দিয়ে দিয়ে

---

[*আজ থেকে প্রায় একচল্লিশ বছর আগে লেখা এই কবিতাটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এমনি আরও কিছু বাল্যের স্মৃতি-চিহ্ন ছিল আমার কাছে। কিছু তার আছে, কিছু হারিয়েছে। এখন শুধু মনে মনে ভাবি—অনেক মূল্যবান বস্তুই তো হারিয়েছি, কোনও কিছু সঞ্চয় করে রাখা ধর্মই আমার নয়, তবু এমন কি মূল্য আমি এর মধ্যে দেখেছিলাম, যার জন্য যখের ধনের মত কয়েক টুকরো কাগজ আমি আগলে রেখেছি!]

চা খাচ্ছিল ছিনু। কাপটা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে সে যেন লাফিয়ে উঠলো! বললে, এ-বিদ্যে ওকে কে শেখালে? এই যে আজ চারদিন ধরে দিনরাত মুখ গুঁজে পড়ে আছে, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, এসব কী বলতে পারো? বেলা দুটোর সময় হুকুম হলো—ছিনু চা দে। তাই দিলাম। গরম চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। মুখে দিলে না। বলতে গেলাম তো বললে, আবার গরম করে দে। দিলাম গরম করে। ব্যস্, তাও খেলে না। না খেলি তো না খেলি। বললাম, চা'টা তো আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল! বাবু মেজাজ দেখিয়ে বললে, যাকগে, তোর কি? আমার কি, আমার বয়ে গেল! এই চায়ের পাট দিলাম তুলে, এবার কি খাবি খা।

বলেই সে ঘটির জলটা উনানে ঢালতে যাচ্ছিল। ঘটিটা কেড়ে নিলুম তার হাত থেকে।

বললে, আসল কথাটাই তো বলিনি এখনও। শোনো। সাত পয়সার কেরোসিন তেল কিনি, দুদিন-তিনদিন চলে। কাল বিকেলে তেল কিনে লণ্ঠন ভর্তি করে দিয়েছি, আর আজ সকালে দেখি না—লণ্ঠন একেবারে শুকনো ঠন্ ঠন্ করছে। বুঝতেই পারছো—বাবু কাল সারারাত ধরে পদ্য লিখেছে। অপরাধের মধ্যে লণ্ঠনটা দেখিয়ে বলতে গেলাম—বলি ইস্কুলের পড়া তো কোনোদিন এমন করে পড়তে দেখিনি, এক রাত্তেই এক লণ্ঠন তেল খতম! তা সে করলে কি জানো? তেড়ে আমাকে মারতে এলো। লণ্ঠনটা দিলে আমার গায়ে ছুঁড়ে! কাঁচটা ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

বিশ্বাস হলো না। বললাম, সেরকম রাগ তো আমি ওর কোনোদিন দেখিনি ছিনু। তুমি তেলের কথা বললে, আর নজরুল ছুঁড়ে দিলে লণ্ঠনটা?

ছিনুর মুখখানা এবার অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, এই দ্যাখো, তুমি আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করলে! আমি কি মিছে কথা বলছি?

বললাম, না-না, আমি তা বলিনি। আমি বলছি, তুমি নিশ্চয় ওকে বিরক্ত করেছিলে।

ছিনু এবার হেসে ফেললে। ফিক্ করে হেসে বললে, তা করেছিলাম। চুল ধরে দুবার টেনে গিয়েছিলাম, আর ওই হাতে লিখছে, ওই খাতাটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

বললাম, তাহলে বেশ করেছে।

ছিনু বললে, বেশ করেছে? লণ্ঠনের কাঁচটা ভেঙে দিয়েছে, বেশ করেছে? আমি কিন্তু কাঁচ আর আনছি না! থাক ও অন্ধকারে, লিখুক কেমন করে লিখবে।

বললাম, না তুমি কাঁচ আর কেরোসিন তেল নিয়ে এসো, যাও।

পারবো না। বলে ছিনু মুখ ফিরিয়ে বসলো।

ছিনুর কথা ফুরিয়েছে ভেবে উঠে আসছিলাম সেখান থেকে। ছিনু আসতে দিলে না। বললে, যেয়ো না মিঞা সাহেব, শোনো।

—আবার কি শুনবো?

—আসছি, দাঁড়াও।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে গজ গজ করতে করতে ছিনু বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বললে, তুমি বললে তাই যাচ্ছি, নইলে যেতাম না কিছুতেই। এসো আমার সঙ্গে।

—আমি আর নাই-বা গেলাম।

ছিনু কিন্তু ছাড়লে না আমাকে। বললে, কেন মিছে লেখাটা বন্ধ করে দেবে? লিখছে লিখুক না! এসো।

সারাটা রাস্তা ছিনু বক্‌বক্ করতে করতে গেল।

—মাসের শেষ, পয়সাগুলি সব শেষ করেছে, হাতে একটি পয়সা নেই। এইবার ওর ইস্কুলের বইগুলি আমি একটি একটি করে বেচে দেবো।

বললাম, কেন? বই বেচবে কেন?

ছিনু বললে, কি হবে বইগুলো? ইস্কুলের বই তো ও ছোঁয় না!

বললাম, ছোঁবে, ছোঁবে। রাগ করছো কেন?

—রাগ করবো না?

ছিনু বললে, দ্যাখো মিঞাসায়েব, দুখু মিঞার ঘরে ভাত নাই, গরীবের ছেলে, ওর বাড়িতে যে কি কষ্ট তা আমি জানি। কোনোরকম লেখাপড়া একটু যদি শিখতে পারে তো কয়লাখাদে যেমন হোক্ একটা চাকরিবাকরি জুটবে। ওর কি এইরকম করা সাজে? কই, তুমিই বল না।

কি আর বলবো, চুপ করেই রইলাম। ছিনু বলে যেতে লাগলো, এমনি করে, যদি ইস্কুল কামাই করে, রাজবাড়ির টাকাটি বন্ধ হ'তে আর কতক্ষণ! হেডমাস্টার ঘ্যাঁচ করে নামটি দেবে কেটে। ব্যস্, যে-দুখু মিঞা কে সেই-দুখু মিঞা! বাড়ি গিয়ে গরু চরাও, আর লাঙল ধরো! ও কিন্তু তাও পারবে না, এই আমি বলে দিলাম তোমাকে, তুমি দেখে নিও!

এই বলে সে খানিক থামলো। সামনেই একটা দোকান। লণ্ঠনটা দোকানীর হাতে দিয়ে বললে, ভাল দেখে একটি কাঁচ দাও তো ভাই, বেশ পুরু দেখে। চট্ করে যাতে না ভাঙে!

বলেই সে পয়সা বের করতে করতে বললে, তোমার কি, তুমি বড়লোকের নাতি, তুমি এ-সব দুঃখের কথা বুঝবে না।

কাঁচটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কাঁচের দাম দিয়ে ছিনু চললো তেল আনতে। পথ চলতে চলতে আবার বললে, তুমি যদি একটি কাজ কর তো দুদিনেই আমি ওকে জব্দ করে দিতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ?

বলতে বোধহয় সে ইতস্তত করছিল। বললে, বলবো?

—হ্যাঁ বল।

ছিনু বললে, তুমি যদি দিনকতক আসা বন্ধ কর তো ওর পদ্য লেখা আমি বন্ধ করে দিই!

বুঝলাম, আমাকেই সব-কিছুর জন্য দায়ী করেছে ছিনু।

স্কলারশিপ্ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়। আর এই লেখার নেশায় মেতে যদি ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করে তো আর কেউ কিছু না বলুক, ছিনু আমাকে বলতে ছাড়বে না।

বললাম, বেশ, যাব না।

নজরুলের মঙ্গল কামনায় বলিনি। তার কবিতা লেখা বন্ধ হোক্ ভেবেও নয়। আজও আমার বেশ মনে আছে—বলেছিলাম ছিনুর ওপর রাগ করে।

লণ্ঠনে তেল নিয়ে বোর্ডিংএ ফেরার পথে ছিনুর সঙ্গে খানিকটা গিয়ে হঠাৎ একসময় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ছিনু বললে, দাঁড়ালে কেন, এসো।

বললাম, থাক্ আর যাব না। তুমি যাও।

ছিনু বোধহয় খুশীই হলো।

পাশেই খোঁয়াড়। ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খানিকটে জায়গা। যে-সব গরু-ছাগল অন্যের ক্ষেতে-বাগানে ঢুকে, গাছপালা খেয়ে দেয়, তাদের ধরে এনে এই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপর গরু-ছাগলের মালিক পয়সা দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সরকারী খোঁয়াড়। বছরের শেষে নিলাম-ডাকের মত 'ডাক' হয়। সেই ডাকের টাকা

জমা দিয়ে একবছরের জন্য যে-লোক এই খোঁয়াড়ের ইজারা নেয়, তাকেও বসে থাকতে দেখি রাস্তার ধারে ছোট একটি ঘরে।

নজরুলের বোর্ডিংয়ে যাওয়া-আসার পথে খোঁয়াড়-মুন্সির ছোট ঘরখানি রোজই আমার নজরে পড়ে, কিন্তু সেদিকে বড়-একটা তাকাই না, তাকাবার প্রয়োজন হয় না।

ছিনু চলে যাবার পর সেদিন দাঁড়িয়ে-ছিলাম খোঁয়াড়-মুন্সির এই ঘরটার কাছেই। মনের অবস্থা খুব খারাপ। যে-ছিনু কথায় কথায় হাসায়, সেই ছিনুই আজ আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। কি করবো, কোথায় যাব ভাবছি, এমন সময় দেখি—কান-কাটা জগা হেট্ হেট্ করতে করতে দুটো গরু তাড়াতে তাড়াতে সেইদিকেই আসছে।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, গরু দুটোকে আসতে দেখে একটু সরে গেলাম। আমার দিকে নজর পড়লো জগার। জগা কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

অপ্রস্তুত হবার কারণটা বুঝলাম। সেও যে বোঝেনি তাও নয়।

গরু দুটো সে খোঁয়াড়ে দেবার জন্যেই নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, গরু দুটো কার-কি খেয়েছে রে জগা?

আমার কথার জবাবই দিলে না সে। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে চেঁচাতে লাগলো, খোঁয়াড়-মুন্সি! খোঁয়াড়-মুন্সি।

পাতলা ছিপছিপে একজন মুসলমান ছোকরা বেরিয়ে এলো রাস্তার ধারের সেই ছোট্ট ঘর থেকে। এসেই সে তাড়াতাড়ি তালা-দেওয়া ফটক খুলে গরু দুটোকে আগে ঢুকিয়ে দিলে প্রাচীর-ঘেরা সেই জায়গাটায়। তারপর আবার সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কান-কাটা জগা গেল তার পিছু পিছু।

ঘরের ভেতরটা সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না। একপা এগিয়ে যেতেই দেখলাম—খোঁয়াড়-মুন্সি কাগজের ওপর কি যেন লিখলে, তারপর কাঠের একটি হাত-বাক্স থেকে পয়সা বের করে জগার হাতে দিলে।

পয়সা নিয়ে জগা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, শলা দু'গণ্ডা পয়সা দিলে মাইরি। ঝগড়া করে মা সারাদিন কিছু খায় নি। দিইগে যাই।

বলেই সে ছুটে পালালো।

মা মানে ছুতোর-বৌ। থাকে আমাদের বাড়ির পাশেই। ছুতোরদের মেয়ে যে এত সুন্দর হতে পারে জগার মাকে দেখবার আগে সে ধারণা আমার ছিল না। কান-কাটা জগার বয়স যদি হয় পনেরো-ষোলো তো জগার মার বয়স বোধকরি তিরিশ-বত্রিশ। ছোট-খাটো বেঁটে মেয়েটি, গায়ের রঙ খুব ফরসা।

গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। জগা তখন তার কোলে।

পাড়ার মেয়েরা দেখতে আসতো। বলতো, আহা, যেমন মা, তেমনি ছেলে!

ছেলের কাটা কানটি সে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু দেখতে যারা এসেছে, তাদের চোখ এড়ানো বড় শক্ত। বলতো, ছেলের কানে কি হয়েছিল ছুতোর-বৌ?

জগার মা সত্যি কথাই বলতো। বলতো, গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল একটা জঙ্গলের ধারে, মাটির ঘর, ভাঙা দেয়াল, অবস্থা তো ভাল ছিল না! একদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি, ছেলে নেই। খোঁজ, খোঁজ, ছেলে কোথায় গেল? জগার বাবা বেরুলো কুড়ুল কাঁধে নিয়ে। ফিরে এলো বেলা তখন দুপুর। ছেলেটাকে পাওয়া গেছে জঙ্গলের ধারে। শেয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কানটা কাটা, সারা মুখে গায়ে কাঁচা রক্ত! যাক, মরেনি ছেলেটা।

অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়ে তুললাম। তার পরেই আমরা গ্রামের বাড়িঘরদোর ছেড়ে চলে এলাম এই শহরে।

কাঠের কাজ বেশ ভালই করতো জগার বাবা। দিন তাদের বেশ ভালই চলতো।

ছেলেটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু হলে কি হবে? লেখাপড়া শিখলে না। ছুতোর-বৌ বলতো, ভাল কাজ হচ্ছে না কিন্তু। ছেলেকে এত আদর দিও না। ওকে লেখাপড়া শেখাও।

জগার বাবা বলতো, একটামাত্তর ছেলে, ওকে আমি বড় মিস্ত্রি করে তুলবো তুমি দেখে নিও। খুব ভালো কাঠের কাজ শিখিয়ে দেবো।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে সবসময় তা হয় না। জগা যখন দশ বছরের ছেলে, তখন একদিন সব শেষ হয়ে গেল। জগার বাবা গেল মরে।

অকূলে পাথারে পড়ে গেল ছুতোর-বৌ। পড়লো, কিন্তু ডুবলো না। দশ বছরের অকর্মণ্য ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ভেসে চললো তার দিকচিহ্নহীন সংসার-সাগরে।

সেই দশ বছরের ছেলে তার আজ ষোলো বছরের জোয়ান! সকাল থেকে টো টো করে ঘুরে ঘুরে বেলা বারোটার সময় বাড়ি এসে বলে, মা, খেতে দাও!

মা আর কতদিন মুখ বুজে চুপ করে থাকে!

ভাতের থালা মুখের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে, এই শেষ! কাল থেকে আর দেবো না।

কিন্তু কালও সে তাকে না দিয়ে পারে না।

এমনি করে দিনের পর দিন পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে, মুড়ি ভেজে আর মুড়ি বেচে ছুতোর-বৌ তার জোয়ান ছেলের পেট ভরায় আর প্রাণপণে গালাগাল দেয়!

সে গালাগালি আমরা রোজই শুনি।

আজও বোধহয় তেমনি গালাগালি দিয়ে ছেলের ওপর অভিমান করে সে না খেয়ে পড়ে আছে। ছেলে তাই গরু খোঁয়াড়ে দিয়ে দু'আনা পয়সা রোজগার করে মায়ের রাগ ভাঙ্গাতে গেল।

গরু দুটো কোনও অপরাধ করেনি—আমি নিজে দেখেছি। পথের ধারে ঘাস খাচ্ছিল, জগা আসছিল সেই পথ দিয়ে, গরু দুটোকে দেখে হঠাৎ তার কি খেয়াল হলো, হেট্ হেট্ করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে খোঁয়াড়ের দরজায়।

গরু ছাগলের মালিককেই জানি পয়সা দিয়ে খোঁয়াড় থেকে গরু ছাগল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। গরু ছাগল ধরে এনে যে-লোক খোঁয়াড়ে দিয়ে যায়, সেও যে কিছু রোজগার করে সেকথা আমার জানা ছিল না।

পথের ধারে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খোঁয়াড়-মুন্সি ভাবলে বুঝি তাকে আমি কিছু বলবো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এসো না ভেতরে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

জগার কথাটা বলবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। বললাম, জগা বুঝি এমনি করে' গরু-ছাগল ধরে এনে খোঁয়াড়ে ঢাকিয়ে দেয়?

খোঁয়াড়-মুন্সির বয়স বেশি নয়। চেহারা দেখলে মুসলমান বলে চিনতে দেরি হয় না। লোকটি হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এলো, তারপর আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে তার সেই ছোট ঘরখানির ভেতর টেনে নিয়ে গেল। টিনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে, বোসো।

বসতে চাইছিলাম না, কিন্তু খোঁয়াড়-মুন্সির অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বসতে হ'লো।

কাঠের একটা তক্তপোষের ওপর শতরঞ্চি পাতা রয়েছে দেখলাম। তারই ওপর সে নিজে বসলো। বসেই একটি কাগজের ঠোঙ্গায় কয়েকটি সাজা পান আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, খাও।

বললাম, খাই না।

—বিড়ি?

বললাম, না।

—সিগ্রেট?

—না।

খোঁয়াড়-মুন্সি এইবার একটি পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে ভাল করে চেপে বসলো। বসেই বললে, গরু ছাগল যারা নিয়ে আসে তাদের দু-একটা পয়সা আমরা দিই।

বললাম, জগাকে দেওয়া বোধহয় আপনার অন্যায় হলো। রাস্তার ধারে গরুদুটো ঘাস খাচ্ছিল, জগা ওদের সেইখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো আমি দেখলাম।

গরু কোত্থেকে নিয়ে এলো—মুন্সি কি তাও দেখবে? বলতে বলতে যে-ছেলেটি বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে, তার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। ছেলেটি আমারই সঙ্গে পড়ে—আমারই সমবয়সী—সতীশ।

ছোট এই ঘরটার ভেতরে আর-একটা যে অন্ধকার খুপ্‌রি আছে তা জানতাম না। সতীশকে যে এ অবস্থায় এখানে দেখবো তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বড়লোক এক উকিলের ছেলে সতীশ। আমাদের ক্লাসের একজন নাম-করা ভাল ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে তুমি কি করছিলে?

সতীশ অম্লানবদনে বলে বসলো, বিড়ি টানছিলাম।

সতীশ যে বিড়ি খায় তাও জানতাম না। অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সতীশ ভাল করে চেপে বসলো খোঁয়াড়-মুন্সির পাশে। বললে, মুন্সি, ওকে একটা বিড়ি দাও না!

মুন্সি বললে, দিয়েছিলাম। খেলে না।

সতীশ বললে, খাও না! বেশ লাগবে। ভাল ছেলে হয়ে আর কতদিন থাকবে বাবা!

—ধেৎ!

—অমনি ধেৎ বলে ফেললে! যখনই খাবার ইচ্ছে হবে এইখানে চলে আসবে, এই ঘরে তোফা আরাম করে' বসে বসে টানবে, কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতেও পারবে না।

বললাম, জানোনাতো আমার দাদা-মশাইকে, মুখে গন্ধ পেলে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে!

সতীশ বললে, দাদামশাই তোমার মুখ শুঁকতে আসবে বুঝি! যাঃ! কাছে যদি যেতেই হয় তো মুখটা চট্ করে ধুয়ে নেবে।

বললাম, বিড়ি টানবার জন্যেই তুমি এইখানে আসো বুঝি?

সতীশ চট্ করে' দুহাত বাড়িয়ে খোঁয়াড়-মুন্সিকে জড়িয়ে ধরে বললে, না। খোঁয়াড়-মুন্সি এই আলী-সায়েব আমাদের বন্ধু।

বুঝলাম খোঁয়াড়-মুন্সির নাম আলী-সাহেব।

আলী-সাহেব বললে, বিড়ি-সিগ্রেট নাই-বা খেলে, এখানে আসতে দোষ কি? এই দিক দিয়ে রোজই তো পেরিয়ে যাও দেখি! পণ্টুলাটের বাড়ি যাও, মুসলমান-বোর্ডিংএ যাও।

বললাম, তাও জানো?

আলী-সাহেব বললে, সব জানি।

সতীশ বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে আজ আমি একটা খুব ভাল সিগ্রেট খাইয়ে দিচ্ছি। পণ্টু-লাট আসুক।

পণ্টু-লাট সিগ্রেট খায় তাও জানতাম না। বললাম, পণ্টু সিগ্রেট খায়? আসে এখানে?

সতীশ বললে, হ্যাঁ, সব চেয়ে দামী যে-সিগ্রেট, সেই সিগ্রেট খায় ও। বিড়ি খায় না। বলে, বিড়ি যারা খায় তারা ছোটলোক।

এই বলে' হাসতে লাগলো তারা দু'জনেই।

আমি ভাবছি তখন পণ্টুর কথা। হঠাৎ যদি আসে এখানে তো দেখা হয়ে যাবে। দেখা হলেই কথা উঠবে বন্দুকের। তার চেয়ে থাক্ সে তার বন্দুক নিয়ে। আমি চলি।

উঠে দাঁড়াতেই সতীশ বলে উঠলো, দাঁড়াও না! পণ্টু-লাট আসুক, তোমার

নামে সিগ্রেট একটা আদায় করে না হয় আমরাই খাব!

তোমরাই খাও। বলে' সিগারেটের লোভ সম্বরণ করে' আমি সেখান থেকে সত্যিই চলে এলাম।

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে সতীশ তার বিড়ি খাওয়ার কথা আমার কাছে বলে ফেলেছিল! সেদিন থেকে সে আমার পেছনে লেগে রইলো।

সিগারেট না-হোক, একটা বিড়ি অন্তত সে আমাকে খাওয়াবেই!

খাইয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই সতীশই, আমার ধূমপানের দীক্ষাগুরু।

শিউলি ফুলের কড়া গন্ধের সঙ্গে আমার এই ধূমপানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হঠাৎ যদি কোনোদিন শিউলি ফুলের গন্ধ আমার নাকে আসে, তৎক্ষণাৎ আমার মন চলে যায় সেই অতীত দিনে। স্পষ্ট পরিষ্কার একটি ছবি ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে।

ইস্কুলে টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। সতীশ আর আমি বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। সুমুখে পুরোন জেলখানার বড় বড় ভাঙা ভাঙা ইঁটের প্রাচীর। কোনোটা-বা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কোনোটা-বা এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। তারই ভেতর দিয়ে একটুখানি এগিয়ে সিমেন্ট-বাঁধানো পরিষ্কার একটা চত্বরের ওপর গিয়ে আমরা বসেছি। দুজনে ধরিয়েছি দুটি সিগারেট। কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় ছোট একটি শিউলি গাছে অজস্র শিউলি ফুল ফুটেছে। টুপ্ টুপ্ করে' একটি দুটি ফুল অনবরত খসে খসে পড়ছে গাছের তলায়!

এখন আর সে ভাঙা ভাঙা বড় বড় প্রাচীরও নেই, সে শিউলি গাছও নেই। সব-কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে ইমারতে অট্টালিকায় জায়গাটা ভরে গেছে। শুধু আমার মনে আছে তার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। দুর্গের মত বড় বড় প্রাচীরঘেরা সেই পুরোনো জেলখানার ধ্বংসাবশেষ, আর শিউলি ফুলের গন্ধে-ভরা মনোরম সেই নির্জন জায়গাটুকু!

খোয়াড়-মস্জিদ আলী-সাহেবের আস্তানা ছেড়ে বাড়ি ফিরেই কিন্তু নজরুলের কথা বেশি করে মনে পড়লো।

ছিনু বলেছে, আমি যেন আর নজরুলের কাছে না যাই! আমিও বলেছি যাব না।

আমি না গেলে জানি নজরুল আসবে আমার কাছে।

আমি কিন্তু যাব না যাব না করেও তার পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম নজরুলের সন্ধানে।

খোঁয়াড়ের সুমুখ দিয়ে যেতে হবে। কান-কাটা কুকুর গরু তাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে সদা-পরিচিত আলী-সাহেব যদি ডাকে? আমাদের চেয়ে বছর-দশেকের বড় এই মানুষটির সঙ্গে সতীশের এত ঘনিষ্ঠতা হ'লো কেমন করে? শুধুই কি বিড়ি-সিগারেট টানবার সুবিধে হবে বলে? না, আর-কিছু?—এমনি সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি।

না যদি কেউ ডাকে তো এগিয়ে চলে যাব।

কিন্তু এগিয়ে যাওয়া আমার হলো না। ডাক শুনে থমকে থামলাম। চেয়ে দেখি, ছোট সেই ঘরখানির ভেতর থেকে সতীশ ডাকছে।

ঘরে গিয়ে বসতে হ'লো। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার আলী-সাহেব কোথায়?

ছোট একটি জানলার পথে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

দেখলাম, খোঁয়াড়ের ভেতর অনেকগুলো গরু ছাগলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন সে বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে।

সতীশ বললে, ঝগড়া করছে ছোট ভাইএর সঙ্গে। ওরকম ওদের রোজই হয়। এসো।

এই বলে সে আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। অর্থাৎ এসো ভাই ছোট ঘরটায়!

কিসের জন্যে তা তো জানো!

আমিও যাব না, সেও ছাড়বে না।

শেষে আমারই হলো পরাজয়। সেই ঘরটার ভেতর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সতীশ তার ফতুয়ার পকেট থেকে দুটি সিগারেট বের করলে। একটি আমার হাতে দিলে, আর-একটি নিজে নিয়ে বললে, তোমার জন্যে কিনেছি।

—সিগ্রেট তুমি আমাকে খাওয়াবেই?

সতীশ বললে, হ্যাঁ, খাওয়াবই।

দেশলাই দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে সতীশ পরমানন্দে ধোঁয়া বের করতে লাগলো। কিন্তু আমার হ'লো মুশকিল। আমাকেও ধরাতে হ'লো। টেনে টেনে বারকতক ধোঁয়া ছেড়েই সিগারেটটা নিবিয়ে, দিলাম দোরের বাইরে ফেলে।

ভাল লাগলো না।

বললাম, কি সুখে যে তোমরা এ-সব খাও কে-জানে!

সতীশ বললে, এমনি রোজ এক-আধবার করে' টানলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে কি সুখ।

এদিকে তখন আলী-সাহেব আর তার ভাই এসে ঘরে ঢুকেছে। গোলমাল তখনও তাদের থামেনি। তাদের কথা বলবার সে এক বিচিত্র ভাষা! না হিন্দি, না বাংলা। তাড়াতাড়ি কথা যখন বলে শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু বুঝতে পারি না সহজে। সতীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝতে পারো ওদের ভাষা?

সতীশ বললে সব বুঝতে পারি। আলী-সাহেবের ভাই কি বলছে জানো? বলছে, প্রায়ই দেখি তুমি হিসেবে গোলমাল কর। এবার যদি কর তো তোমাকে আর আমি এখানে বসতে দেবো না; আমি বসবো।

আলী সাহেব বললে, ওটা আমি ভুল করে লিখেছিলাম। কাটতে ভুলে গেছি।

অন্ধকার ঘরটায় বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। সতীশকে বললাম, চল বেরোই এখান থেকে।

সতীশের সিগারেট তখনও শেষ হয়নি। আমার একটা হাত সে চেপে ধরলে। বললে, দাঁড়াও, এটা শেষ করে নিই। আলী-সাহেবের ভাইটা চলে যাক।

কাঠের ক্যাশ-বাক্সটি উজাড় ক'রে টাকা-পয়সা যা ছিল ঢেলে নিয়ে আলী-সাহেবের ভাই চলে গেল।

সতীশের সিগারেটটা তখন শেষ হয়েছে।

আমাকে দেখেই আলী-সাহেব হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলে?

বললাম, তুমি তখন ভাইএর সঙ্গে ঝগড়া করছিলে।

আলী-সাহেব বললে, ওটা অমনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, আজ আবার হিসেবের ভুল হ'লো নাকি?

আলী-সাহেব হাসতে হাসতে বললে, দুটো একটা ওরকম হয়। নাও, বিড়ি খাও।

এই মাত্র খেলাম। বলে' সতীশ তার খাতাটা তুলে নিলে। বললে, ভাই তোমার ভুল ধরলে কেমন করে' দেখি!

খাতার পাতার একদিকে লেখা থাকে গরু ছাগল যে-কটা জমা হলো তার হিসেব, আর একদিকে থাকে, কার জন্যে কত পয়সা পাওয়া গেল তার হিসেব।

সতীশ সেটা দেখেই বলে উঠলো, এই তো হাতে-হাতে ধরা পড়বার ব্যবস্থা করে রেখেছো। এইখানে। কান-কাটা জগা যে-গরু দুটো দিয়ে গেল, সেটা তুমি কেটে ফেললেই পারতে!

আলী-সাহেব খাতাটা কেড়ে নিলে সতীশের হাত থেকে। বললে, কাটতে ভুলে গেছি। দাও।

ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারছিলাম না। সতীশকে জিজ্ঞাসা করতেই সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, জগা যে গরু দুটো দিয়ে গিয়েছিল সে-দুটো আজ ছাড়াতে এসেছিল বদি ময়রা। আলী-সাহেব তার কাছ থেকে একটি পয়সাও নিলে না, অমনি ছেড়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সতীশ বললে, তুমিই তো বললে, গরু দুটো জগা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। কারও কোনও ক্ষতি ওরা করেনি।

বললাম, তবে যে কাল বললে, আমাদের ও-সব দেখবার দরকার নেই!

কথাটা বলেছিল আলী-সাহেব। আমিও বলেছিলাম তাকে শুনিয়েই।

তাকিয়ে দেখি, সে তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সতীশ বললে, দেখছো কি? ও-লোকটি অমনি!

লোকটির সত্যকার পরিচয় তখনও আমি পাইনি। ভেবেছিলাম, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় এই অশিক্ষিত মুসলমানের ভেতর আমাদের বয়সী ইস্কুলের ছেলেরা এমন কি দেখেছে যার জন্য সবাই এখানে এসে জড়ো হয়!

শুধু যে লুকিয়ে লুকিয়ে পান-বিড়ি খাবার জন্যে নয় সেকথা পরে বুঝেছিলাম। পরিচয় ক্রমশ আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। দেখেছিলাম, সত্যাশ্রয়ী দৃঢ়চেতা অথচ বিনয়-নম্র সদানন্দ একটি সত্যিকার মানুষ!

দেখেছি, গরীব মানুষ, হাতজোড় করে' এসে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, গাইটা আপনার খোঁয়াড়ে এসেছে মিঞা-সাহেব ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার পয়সাটা জোগাড় করে' উঠতে পারলাম না আজ। কাল আমি ওকে নিয়ে যাব।

আলী-সাহেব জিজ্ঞাসা করেছে, তাহলে আজ তুমি এসেছ কি জন্যে?

লোকটি বলেছে, শুনেছি এখানে নাকি সেবাযত্ন হয় না, তাই বলতে এসেছি যেন দু' আঁটি খড় আর এক বালতি জল ওকে দেওয়া হয়।

আলী-সাহেব বলেছে, বয়ে গেছে আমার সেবা যত্ন করতে। তুমি নিয়ে যাও তোমার গাই!

এই বলে সে খোঁয়াড়ের তালা খুলে দিয়েছে।

লোকটা বলেছে, কিন্তু পয়সা—

—পয়সা কে চাইছে তোমার কাছ থেকে? গাইটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাও, নইলে আমার ভাই এক্ষুণি এসে পড়বে।

নজরুলের কাছে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, সতীশ না আটকালে হয়ত এতক্ষণ চলেই যেতাম।

হঠাৎ নজরে পড়লো—ছিনু আসছে। বেরিয়ে পড়লাম খোঁয়াড় থেকে।

ছিনুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ছিনু বললে, বন্ধু তোমার বাড়ি চলে গেছে।

—চুরুলিয়া গেছে?

ছিনু বললে, হ্যাঁ, তার ভাই এসেছিল। মায়ের অসুখ, অনেকদিন যায়নি, তাই গেল একবার।

ছিনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরে এলাম। ভাবলাম নজরুল গেছে চুরুলিয়া, এই সময় আমিও একবার অন্ডাল থেকে ফিরে আসি।

এখান থেকে মাইল-দশেক দূরে অন্ডাল গ্রাম। আমার মামার বাড়ি। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেও যাওয়া যায়, আবার ট্রেনে চড়েও যাওয়া চলে। ট্রেনে তখন ভাড়া ছিল মাত্র চার পয়সা।

পরের দিন রবিবার। সকালের ট্রেনে চলে গেলাম অন্ডাল।

ভেবেছিলাম, সোমবার এসে ইস্কুল করব।

কিন্তু রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শীত শীত করতে লাগলো। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রীতিমত জ্বর। দিদিমাকে খবর উপায় নেই। হৈ চৈ কান্ড বাঁধিয়ে দেবে। চাপাচুপি দিয়ে কোনোরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলেই পালাবো।

কিন্তু পালাবো কি—উঠতেই পারলাম না বিছানা ছেড়ে।

জানাজানি হয়ে গেল।

বুড়ো অনন্ত কোবরেজ এলো দেখতে। হাত দেখলে, পেট দেখলে, চোখ দেখলে, দেখেশুনে বলে গেল, বেয়াড়া জ্বর। দিন-কতক ভোগাবে।

সত্যিই ভোগালে।

যত না ভুগলাম জ্বরে তার চেয়ে বেশি ভুগলাম মনের উদ্বেগে। নজরুল তার বাড়ি থেকে ফিরেই দেখবে, আমি আর যাই না তার কাছে। কেন যাই না কিছুই জানবে না, কিছুই শুনবে না, হয়ত সে আসবে আমাদের বাড়িতে, হয়ত শুনবে আমি অন্ডাল এসেছি, কিংবা হয়ত ভাল করে' কেউ তার সঙ্গে কথাই বলবে না।

ভাত খেলাম পাঁচ-ছ' দিন পরে। ভাবলাম, এবার চলে যাব রাণীগঞ্জে। কিন্তু যেতে দিলেই তো! আরও দু'দিন থেকে যা।

থেকে গেলাম।

একমাত্র সান্ত্বনা—ছিনু খুশী হবে। নজরুলকে একখানা চিঠি লিখবো ভেবেছিলাম। তাও লিখলাম না।

রাণীগঞ্জে ফিরে গেলাম দশ-বারো দিন পরে।

যেদিন গেলাম সেইদিনই বিকেলে যাচ্ছিলাম নজরুলের কাছে, খোঁয়াড়-মুন্সির ঘরে বসেছিল সতীশ, আমাকে দেখেই ছুটে বেরিয়ে এলো।

মনে হ'লো যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল সে। বললাম, আমার ভাই একটু বিশেষ দরকার আছে। এখন ছাড়ো।

সতীশ বললে, এদিকে তুমি কি দরকারে আসো তা জানি। যাচ্ছো নজরুল ইসলামের কাছে। একটু পরেই না হয় যেয়ো।

এই বলে সতীশ আমাকে একরকম জোর করে' টেনে নিয়ে গেল খোঁয়াড়ের সেই ঘরটার ভেতর। আলী-সাহেব বসে বসে হাসছে। বললে, আজকাল কবরখানা হয়ে ঘুরে ঘুরে যাও বোধহয়।

—কোথায়?

—দুখু মিঞার কাছে।

আমি কিছু বলবার আগেই জবাব দিলে সতীশ। বললে, আজকাল ইস্কুল যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে' দিয়েছে।
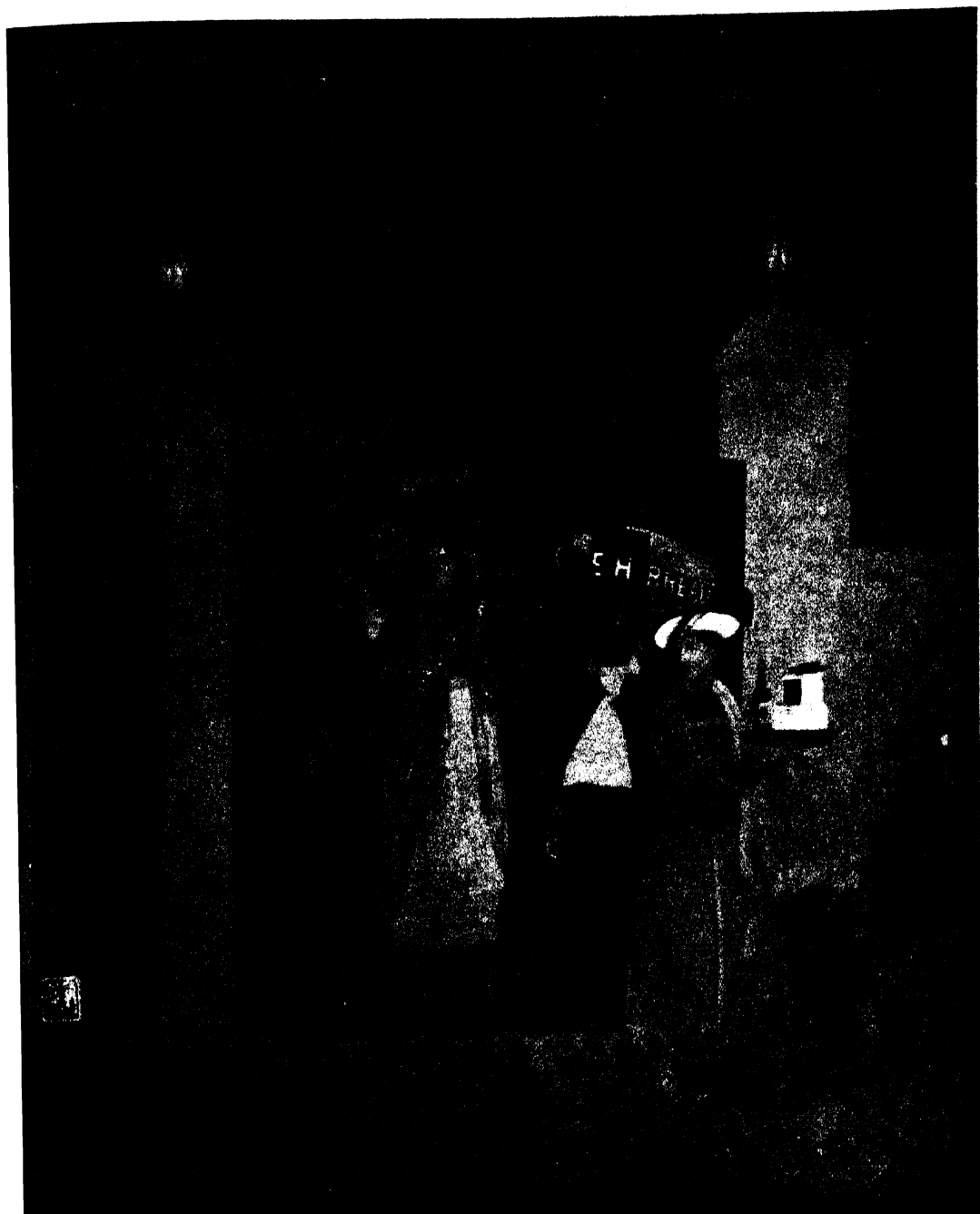
দুই বোন

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

বললাম, আমি ছিলাম না এখানে। অণ্ডাল গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম।

সতীশ বললে, থাক্ আর মিছে কথাটা নাই-বা বললে! নাও বিড়ি খাও।

তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললাম, না।

বিড়ি আমি খেতে চাইনি সেদিন।

সতীশ বললে, সিগ্রেট খাবে? গাঁজা?

খুব রাগ হ'লো সতীশের ওপর। বললাম, কী যা তা' বলছো! সত্যি বলছি আমার ভাল লাগে না খেতে।

সতীশ বললে, তোমরা গাঁজা খাচ্ছো লুকিয়ে লুকিয়ে আর একটা বিড়ি খেতেই যত দোষ?

বললাম, এ-সব কি বলছো তুমি সতীশ?

সতীশ বললে, ঠিকই বলছি। তোমরা—মানে তুমি আর নজরুল গাঁজা খাও।

এই কথার পর অন্য কেউ হ'লে তৎক্ষণাৎ ঝগড়া হয়ে যেতো। কিন্তু আমার স্বভাবটাই অন্যরকম। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

আলী-সাহেব বললে, রাগ করছো ভাই?

বললাম, দ্যাখো, আমি যদি-বা সতীশের পাল্লায় পড়ে বিড়ি সিগ্রেট দু'এক টান টেনেছি, নজরুল কোনোদিন ছোঁয়নি ও-সব। আর সতীশ বলছে আমরা গাঁজা টানি।

সতীশ বললে, গাঁজা না টানলে ওইরকম কবিতা লিখতে পারে কেউ?

বললাম, কবিতা লিখলেই গাঁজা টানতে হবে?

সতীশ বললে, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের বাড়ির সামনে গাঁজার দোকান। আমি দেখেছি নজরুলকে গাঁজা কিনতে। আচ্ছা, এইবার হাতে-নাতে একদিন ধরে দেবো—তাহ'লে হবে তো?

সেই ভালো। বলেই ছুটে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। সতীশ আটকাতে পারলে না।

নজরুলের সঙ্গে দেখা হ'তেই বলে উঠলো, বেশ ছেলে বাবা! ছিনু কি বলেছে না বলেছে আর অমনি রাগ হয়ে গেল? ছিনু! ছিনু!

বাইরে থেকে ছিনুর জবাব এলো: শুনেছি! শুনেছি।

দু' কাপ চা হাতে নিয়ে ছিনু ঢুকলো হাসতে হাসতে। বললে, তোমার জন্যে বকুনি খেয়ে খেয়ে মরছিলাম বাবা, তুমি এসে গেছ, বাঁচলাম। নাও, চা খাও।

ছিনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বকুনি খাচ্ছিলে কেন?

—তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম যে।

বললাম, তাও তুমি বলেছো নজরুলকে?

—বলবো না? মরছিল যে তোমার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে। আমাকে বলছিল তুই যা একবার রায়-সাহেবের বাড়ি। আমাকে দেখলে চাকরগুলো ভাল করে কথা বলে না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তুমি অণ্ডাল গিয়েছিলে মিঞাসাহেব?

বললাম, হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম।

ছিনু বললে, ওই শোনো! আর দুখু আমাকে বলে কিনা আমি তোমাকে অপমান করে' তাড়িয়ে দিয়েছি। কাজ কি বাবা, আমি আর তোমাদের কথায় থাকলেই তো!

ছিনু গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

নজরুল তার বালিসের তলা থেকে খাতাটা টেনে '৳' করলে। বললে, দুটো বড় বড় কবিতা শেষ করেছি। শোনো। একটা 'বাজার গড' একটা 'রাণীর গড়'।

দুটি কবিতাই শুনলাম।

শুনে বলেছিলাম, তুমি আর গদ্য লিখবে না। এখন থেকে কবিতাই লিখবে।

ছিনু যে খাপ্‌টি মেরে কোথায় দাঁড়িয়েছিল বুঝতে পারিনি। তার সেই হুঁকোটি হাতে নিয়ে কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়ালো। বললে, সাধে কি তোমাকে আসতে বারণ করি মিঞাসাহেব! ওই মন্তরটি দিলে তো ওর কানে! আবার বললে তো লিখতে!

নজরুল বলে উঠলো, ছিনু! তুই না বলেছিলি আর বলবি না!

ছিনু চুপ করে' গেল। তার সেই অসহায় অবস্থাটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সে-মুখ আমি আজও ভুলিনি। কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে ধীরে ধীরে টানতে টানতে বলেছিল, হ্যাঁ, বলেছিলাম।

ব্যস্, আর কিছু সে বলতে পারেনি। নীচের দিকে মুখ করে' উবু হয়ে বসেছিল মেঝের ওপর। হুঁকোটা পর্যন্ত টানতে পারছিল না।

নজরুল উঠে দাঁড়ালো। আমাকে তুলে দিয়ে বললে, চল একটু ঘুরে আসি।

আমিও তাই চাইছিলাম। সতীশের কথাটা তাকে না বলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

ঘর থেকে বেরুচ্ছি, শুনলাম ছিনু বলছে, আমার আবার কথা! কেই-বা রাখে, আর কেই-বা শোনে!

বোর্ডিং থেকে বেরিয়েই সতীশের কথাটা নজরুলকে বলেছিলাম। কথাটা নজরুল হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। হো হো করে' হেসে বলেছিল, ঠিকই বলেছে সতীশ। গাঁজা আমি খাই। খেতে ধরেছি।

বিশ্বাস করতে পারিনি। বলেছিলাম, ধেৎ!

খোঁয়াড়ের সুমুখ দিয়ে যাবার রাস্তা। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে-পথটা ছেড়ে দিলাম। ডানদিকে ঘুরে গয়লা পাড়ার সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম। এ'দো গলির গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে বড় রাস্তা ধরলাম খাড়ি-শুলির মোড়ে।

বাঁদিকে সতীশের বাড়ি। যদিও জানি, সে তখনও খোয়াড়ে বসে আছে, তবু তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে মন চাইছিল না। নজরুল কিন্তু থমকে থামলো। পকেট থেকে দু' আনা পয়সা বের করে' পাশেই গাঁজার দোকানে ঢুকে পড়লো।

পথের ধারে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হাঁ করে'।

গাঁজার মোড়কটি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো নজরুল। বললে, দেখলে?

—দেখলাম!

মুখ দিয়ে আমার কথা সরছিল না। খানিকটা পথ চুপচাপ গিয়ে বললাম, তাহলে সতীশ যা বললে, সত্যি?

নজরুল বললে, সত্যি।

তখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললাম, ধেৎ!

এমনি হাসি-রহস্য করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো চারিদিকে। শহর ছাড়িয়ে তখন আমরা চলেছি একটা ডাঙগার ওপর দিয়ে। বাঁদিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে ধানের মাঠ।

বললাম, এবার ফিরি এসো, রাত হয়ে গেল।

নজরুল বললে, আর-একটু। ওই যে গাছের তলায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে, ওইখানে যাব।
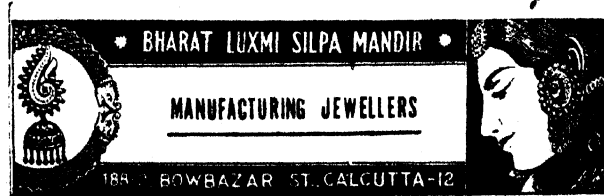
দেখলাম, অনেকদিনের পুরনো একটা বটগাছের তলায় মোটা মোটা কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে জটাজুটধারী একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। আর তার এক ভক্ত চেলা বসে বসে তার পা টিপ্‌ছে।

নজরুল তার পকেট থেকে গাঁজার প্যাকেটটি বের করে' সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

এতক্ষণে বুঝলাম তার গাঁজার রহস্য। মন থেকে একটা গুরুভার বোঝা নেমে গেল।

নজরুল চোখ টিপে আমার হাতে একটা টিপ্‌টা কেটে ইশারায় কি যে বললে ঠিক বুঝতে পারলাম না। হাঁ করে তাকিয়েছিলাম সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসী চোখ পিট্ পিট্ করে একএকবার তাকাচ্ছেন, আবার চোখ বুজছেন।

নজরুল চট্ করে এক সময় আমার কানে-কানে বললে, প্রণাম কর!

প্রণাম তো করবো, কিন্তু আমার সে প্রণাম দেখবে কে? প্রভুর তো চোখ বন্ধ!

প্রণাম একটা করলাম শেষ পর্যন্ত।

চোখ না হয় বন্ধ, কিন্তু কান বন্ধ নয় জেনে নজরুল হাতজোড় করে বললে, আমার ব্যাপারটা কি হবে বাবা? কখন বলবেন?

বাবা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবা নির্বিকার।

'বাবা' 'বাবা' বলে ডেকে ডেকে নজরুল হয়রান হয়ে গেল, বাবা চোখ আর খোলেন না কিছুতেই!

আগে যদি বা এক-আধবার চোখ পিট্ পিট্ করছিলেন, এখন আবার তাও বন্ধ।

অন্ধকার রাস্তা। আমাদের ফিরে যেতে হবে অতটা পথ। নজরুলকে চুপি চুপি বললাম, কাল না হয় সকাল-সকাল আসা যাবে, আজ চল—আমরা চলে যাই।

নজরুল বোধহয় শেষ চেষ্টা করলে। আবার ডাকলে, বাবা!

নজরুলের ভাগ্য বুঝি হঠাৎ প্রসন্ন হলো। বাবা নড়ে চড়ে বসলেন। চোখ চেয়ে একবার তাকালেন আমাদের দিকে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তৎক্ষণাৎ সে লাল লাল ছোট ছোট চোখদুটি আবার বন্ধ হয়ে গেল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, বাবুলাল, ছিলুম বনাও!

বাবুলাল বোধকরি চেলাটির নাম। বাবুলাল পা ছেড়ে দিয়ে নজরুলের দেওয়া গাঁজার মোড়কটি তুলে নিয়ে তার কাজ আরম্ভ করলে।

নজরুল আর কত ডাকবে! আমাকে বললে, আর-একটু দেখি।

ওদিকে বাবুলাল তার কাজ শেষ করে কল্কের ওপর ধুনি থেকে বেছে বেছে কয়েকটি আগুনের টুকরো তুলে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো, বোম শঙ্কর!

বাবাকে এবার আর ডাকবার প্রয়োজন হলো না। হাত বাড়িয়ে কল্‌কেটি নিয়ে বাবা প্রাণপণে বারকতক টানলেন, তারপর কল্‌কেটি আবার বাবুলালের হাতে ফেরত দিয়ে নজরুলের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, নেহি নেহি বেটা, উও বিলকুল্ ঝুট্ হ্যায়। উঁহা কুছ্ নেহি হ্যায়।

নজরুল তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে বলে মনে হলো।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি তার প্রশ্ন জানি না। এখানে জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

নজরুল এবার ওঠবার জন্যে প্রস্তুত। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ইশারা করলে।

আমিই উঠতে চাইলাম না। নজরুলকে বললাম, দ্যাখো।

গাঁজার কল্‌কেটি তখন বাবুলালের হাতে। সে তখন তার গুরুজীর প্রসাদ পাচ্ছে।

ধূমপান অনেক দেখেছি, কিন্তু সেরকম ধূমপান আমি কখনও দেখিনি। সেরকমটি দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হলো না। কি নিষ্ঠা! কি ভক্তি! সবার আগে কল্‌কেটি দুহাত দিয়ে ধরে চোখদুটি বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলো। তারপর কল্‌কেটি কপালে ঠেকিয়ে মারলে টান! সেঁাক টান! ইঞ্জিনের একটানা হুইসলের মত একরকম শব্দ হলো, গলার আর রগের শিরাগুলো ফুলে মোটা হয়ে উঠলো, সারা মুখখানা হলো সিঁদুরের মত লাল, রোগা খিটখিটে লম্বা মানুষটি টানের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হলো, তারপর দম ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুন যেমন করে চুপসে যায়, তেমনি করে থপাস করে বসে পড়ে, বাবুলালের ধূম্র সেবনের সে কি অপরূপ ভঙ্গী!

তারপর তারিয়ে তারিয়ে ধূম্র ভক্ষণ!

ঠোঁটে আর জিভে একরকম শব্দ করে কোঁৎ করে কি যেন গেলে, আবার শব্দ করে, আবার গেলে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপরূপ লীলা দেখছি, উঠতে পারছি না কিছুতেই আর চাপা হাসিতে আমারও সর্বাঙ্গ তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হাসি চাপতে গিয়ে নজরুল একটা বিশ্রী কান্ড করে বসলো।

মুখে হাত চাপা দিয়ে খুক খুক করে একরকম শব্দ করতে করতে সেখানে থেকে উঠে পালাচ্ছে, একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটি মেয়ের গায়ের ওপর।

মেয়েটি আসছিল সন্ন্যাসীর কাছে, তার সঙ্গে আসছিল লণ্ঠন হাতে নিয়ে একজন লোক।

লোকটা হৈহৈ করে চীৎকার করে উঠলো। ওদিকে বাবার তখন যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেছে। হুঙ্কার করছেন, কেয়া হুয়া?

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি আর বুঝতে পারছে আমাদের বাবুলাল।

কি আর করি, উঠে দাঁড়ালাম।

ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা নজরুলকে কিছু বলবে, কিন্তু বলা দূরে থাক, নজরুলের মুখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো, কে রে, দুখু? তুই এখানে কি করছিস?

নজরুল লজ্জায় এতক্ষণ মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। এতক্ষণ পরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললে, হ্যাঁ আমি—এখানে এই বাবার কাছে—

মেয়েটি বললে, যাস একদিন আমাদের বাড়ি। বাড়ি চিনিস না? অর্জুনপট্টির কুয়োটার কাছেই। ওই তো, শৈল জানে।

আরে, আমাকেও চেনে দেখছি। আমি কিন্তু তাকে চিনতে পারিনি। আমি হাঁ করে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

—কিরে, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি যতীনের দিদি।

যতীন আমার সহপাঠী। অন্তরঙ্গ বন্ধু। জাতে ক্রিশ্চান। তার দিদি এসেছে এই সাধুর কাছে!

'যাব।' বলে সেখান থেকে চলে এলাম।

পথে আসতে আসতে নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, যতীনের দিদি তোমাকে চিনলে কেমন করে?

নজরুল প্রথমে বলতে চাইছিল না। বললে, সে অনেক কথা।

আমি তাকে ছাড়লাম না কিছুতেই। বললাম, হোক না অনেক কথা। রাস্তাও তো অনেকখানি, অনেক কথাও শেষ হয়ে যাবে যেতে যেতে।

কথা কিন্তু অনেক মোটেই নয়।

নজরুল বললে, তুমি জানো, কিছুদিন আমি কাজ করেছিলাম।

—কি কাজ?

নজরুল বললে, 'ছোট কাজ। বাবুর্চির কাজ, খানসামার কাজ......'

বললাম, জানি।

নজরুল বললে, এক গার্ড সাহেবের কাছে কাজ করতাম জানো?

—জানি।

নজরুল বললে, এই মেয়েটিই সেই গার্ড সাহেবের স্ত্রী।

চুপ করে কি যেন ভাবছিলাম।

নজরুল বললে, এখন বুঝলে তো কেমন করে এই মেয়েটি আমাকে চিনলে?

—বুঝলাম। তবে যে বলছিলে অনেক কথা।

নজরুল চুপ করে রইলো।

বুঝলাম, কথাটা সামান্যই, কিন্তু সেই সামান্য কথা নজরুলের কাছে আজ অসামান্য হয়ে উঠেছে।

# কোন অসতীর কথা

## সন্তোষকুমার ঘোষ

[ এক ]

চেপে বৃষ্টি আসছে, রিক্শওয়ালা, আরেকটু জোরে চল না। আজও বেলা যেতে-না-যেতে, অফিস ছুটি হতে-না-হতে, আষাঢ়-আকাশের মুখ কালো হয়ে এল, আমার ভয় করছে।

আজও আমার বাসায় ফিরতে দেরি হবে। আমি ভিজব। ওষুধটা কেনা হবে না। বকুনি, হাঁ, হয়ত বকুনিও খাব।

বকুনিকে আমি ভয় করিনে। সয়ে গেছে, গায়ে লাগে না। ভয় করি ভেজাটাকে। বুকে জল বসে যায়, কাশি হয়, জবর জবর লাগে। অফিস কামাই হয়, মাইনে কাটে।

তা-ছাড়া সে-বয়স কি আর আছে, যখন 'আয় বৃষ্টি চেপে' বলে উঠোনে ছুটোছুটি করতে ভাল লাগত। ফ্রক ভিজত, বিনুনি, ঢিলে হত, শিলের নুড়ি কোঁচড় ছাপিয়ে যেত।

এখন শরীরে সয় না। সইলেও লোকে নিন্দে করে। কিংবা, লোকের যদি-বা মুখ বন্ধ থাকে, আমার স্বামীর থাকে না। খুব বকে। পান থেকে চুন খসার চেয়েও তুচ্ছ কারণে। ওর চোখের জ্যোতি কম, এমনিতেই মিটমিট করে, রাগলে আরও যেন ছোট হয়ে যায়। জবলেও। হলদে-ঘেঁষা সবুজ রঙের একটা আলো ওর মণিতে ফস করে ওঠে, আমি দেখেছি। ঠোঁট দুটি থেকে থেকে নড়ে, তারপর বসে-যাওয়া গলায় কথার তুবড়ি ছোটে। যা-তা বলে, বলেই চলে। সে-সব বড় বিশ্রী কথা, রিকশাওয়ালা, তোমাকে আমি বলতে পারব না।

তার চেয়ে তুমি একটু জোর কদমে চল। ডান হাতে ঘুণ্টিটা ঠুন ঠুন কর, ওরা পথ ছেড়ে দেবে। এই তো ট্রামটা দাঁড়িয়ে গেছে, তুমি এই ফাঁকে ওর পাশ কাটিয়ে, বাঁ ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাও। ওই দেখ, কোথা থেকে একটা ঠেলা-ওয়ালা হুমড়ি খেয়ে সামনে এসে পড়ল। আর ত তুমি পথ পাবে না। দেখছ না, মোড়ের মাথায় সবুজ ঘুচে লাল আলো জ্বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দামী-ভারী অহঙ্কারী গাড়িগুলো সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল, তুমি তো সামান্য রিকশওয়ালা, সব-চেয়ে ছোট্ট, হাল্কা, সবচেয়ে ধীরে চল। তোমার অধীর হওয়া সাজেই না।

বরং তোমার চিটচিটে গামছাটায় ততক্ষণ

মুখটা মুছে নাও। মুখ, ঘাড়, পিঠ। ঘামে যে নেয়ে উঠেছ, তোমাদের মেহনং তো কম না। ভালো করে মুছে নাও, ফের দৌড়ন আছে। ট্রামটার পাশ কাটাতে অত করে বললুম, পারলে না, নাকি সাহসই পেলে না, এখন জিরোও এখানে পাক্কা এক মিনিট। যতক্ষণ না সবুজ আলোর অনুমতি মেলে।

আমার আজও আট আনা বাজে খরচ হল। অফিস থেকে বের হতেই ছ'টা বাজল, বড় সেই ইঁদুর-ধরা কল, ওরা যাকে বলে লিফ্‌ট, সেটা যে আজ বিগড়ে আছে, তা কি জানি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষটা নামতে হল সিঁড়ি দিয়ে। ছ' তলা থেকে একতলা। এখানটা অন্ধকার, ওখানটা বাঁকানো, তাড়াতাড়ি নামছি, মনে ভয়, পাছে পা হড়কে পড়ে না যাই। শাড়িটাকে আলগোছে গোড়ালির খানিকটা উপরে তুলেও নিয়েছি। কেউ দেখেনি, অবশ্য। একে আবছায়া, তাতে সকলেরই ঘরে ফেরার তাড়া, কে কার দিকে তখন চেয়ে দেখে।

দেখি, রাস্তায় তখন ট্রাম-বাসে ঠাসাঠাসি ভীড় শুরু হয়ে গেছে। একেকটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় আর একেকটা ঢেউ তার উপরে আছড়ে পড়ে, আবার সেই ঢেউ ফিরেও আসে। জনসমুদ্র বলে চলতি একটা কথা আছে না? ওটা একেবারে বানানো নয়। একটা উপায় ছিল, লালদীঘি ঘুরে ফিরে আসা, কিন্তু তাতে অনেক দেরি হয়ে যেত, আমাকে যে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে!

ফিরতেই হবে। পথে ওষুধ কিনে নেব, আমার স্বামীর জন্যে, আর কিছু ফল। প্রেস্‌ক্রিপশন আমার ঝুলিতেই আছে।

মাথা তুলে ওপরে চাইলুম, দেখি আষাঢ়-আকাশের মুখ কালো হয়ে এসেছে। কয়েকটা কাক দল বেঁধে চক্রাকারে ঘুরছে। আমার ভয় করল। তাড়াতাড়ি তোমাকে ইশারায় ডাকলুম। পটলডাঙার গলিতে যেতে হবে, কত নেবে। তুমি বললে, দশ আনা। শেষটায় আট আনায় রফা হল।

তুমি জান না রিকশওয়ালা, এই আট আনা আমার কাছে কতখানি। আমার তিন দিনের টিফিন। আমার দু' দিনের ইলেক্‌ট্রিক বিল। রোজ বাড়ি ফিরতে যদি এমনি রিকশা চাপতে হয় তবে আমি ফতুর হয়ে যাব, চাকরি করার মজুরি পোষাবে না। এসব শখ এক আধদিনই সাজে।

তুমি বড় তাড়াতাড়ি করছ, একেবারে বেপরোয়া চলছ। এই যে দোতলা বাসটা আমাদের ধার ঘেঁষে ছিটকে বেরিয়ে গেল, ওটা যদি হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ত? এখনও আমার বুক ধড়ফড় করছে। না-না, তাড়াতাড়ি যেতে হবে বৈকি, তাই বলে এম্বুলেন্সে ওঠা কোন কাজের কথা নয়। আর একটু হলেই দুর্ঘটনার রিপোর্টে নাম উঠে যেত, মান যেত, হয়ত-বা প্রাণটাও। তার চেয়ে তুমি বরং একটু দেখে শুনে চল।

আমার স্বামী বকবে? তা দেখ, ও এমনিও বকবে, অমনিও বকবে। ছোট্ট ঘর-খানায় দিনরাত শুয়ে থেকে থেকে ওর মনটাও ছোট হয়ে গেছে। জানালা খোলে না, খুলতে দেয় না, আকাশ দেখে না। ওর ভয়, ঠাণ্ডা লেগে অসুখটা আরও বাড়বে। শুয়ে শুয়ে পড়ে শুধু জ্বরের চার্ট, থেকে থেকে নিজের নাড়ী টিপে দেখে। ওর শিয়রের থাকে, ভর্তি নানা শিশি বোতলের আড়ালে আছে একটা ঘড়ি, সেটা দিনরাত টিকটিক করে চলে। পৃথিবী যতক্ষণে একবার ঘোরে, ওই ঘড়িটার ছোট কাঁটা ততক্ষণে নির্ভুলভাবে দু'বার ঘুরে আসে।

ঘড়িটাতে দম দিতে ওর কোন দিন ভুল হয় না। হাত বাড়িয়ে ওটাকে তুলে নেয়, কাচটায় আঙুল ঘষে, কানের কাছে ধরে, শোনে ওটা চলছে কিনা, চোখ পিটপিট করে দেখে কোন্ কাঁটাটা কোন্‌খানে।

যেন ওর প্রাণটা ছোট হতে হতে ওই ঘড়িটার ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে, যেন ঘড়িটার আর ওর হৃৎপিণ্ডের একই চলার নিয়ম।

সময়ে অসময়ে তো ঘড়ি দেখছেই, তবু দিনে দু'বার ও বিশেষ করে ঘড়ি দেখে। একবার, আমি যখন অফিসে যাব বলে বেরিয়ে আসি। দ্বিতীয়বার, আমি ফিরলে। কী অদ্ভুত, ঠাণ্ডা দৃষ্টি, রিকশওয়ালা, ওর সে-চোখ তুমি দেখনি। দেখলে, তোমারও বুক হিম হয়ে যেত। মানুষের চোখ অত স্থির, নিষ্ঠুর, শীতল হয় না।

এক একদিন ভাবি, ওর হাত থেকে কেড়ে ঘড়িটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিই। কিংবা আছড়ে ফেলি মেঝেয়, সন্দেহের ওই ছোট যন্ত্রটা চুরমার হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক।

কিন্তু করিনে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলি, কাজ বেশি ছিল, তাই দেরি হয়ে গেল। তুমি ওষুধটা সময়মত খেয়েছ?

ও কিছু বলে না। একবার দু'বার পলক পড়ে। পাশ ফিরে শোয়। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। বুঝি, ও রাগটাকে সামলে নিচ্ছে। তখন ওর পাঁজরের হাড় ক'খানাও গোনা যায়। ঘাড়টা উপোসী মোরগের মত শুকনো। ইচ্ছে হলে আমি তখন ওকে—

থাক, বলব না কী। ওসব চিন্তা মনেও আনতে নেই। তুমি এইটুকু জেনে রাখ, ওর চেয়ে গায়ে আমার জোর অনেক বেশি।

তুমি বলবে, তবু ভয় পাই কেন। আমি নিজেও জানি না কেন। ঠিক বুঝতে পারি না। এক এক সময়ে ভাবি, সত্যিই ভয় পাই কি? ছোট ঘরে, ছোট মনে, ছোট সন্দেহ নিয়ে যে-লোকটা অহোরাত্র নাড়া-চাড়া করছে, তাকে ভয় পাবার কী আছে। ও নিজে কষ্ট পায়, আমাকেও দেয়।

রোজ অফিসে যাব বলে তৈরি হয়ে যেই ওর ঘরে ঢুকি, ও তখন আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কোন্ শাড়িটা পরলুম, ব্লাউজটা কী রঙের, খোঁপায় ফুল আছে কিনা, কাজল পরিয়ে চোখ দুটিতে কতখানি ইশারার রহস্য আনলুম, কপালের ফোঁটাটা সিঁদুরের না কুঙ্কুমের—এইসব। আমার গা রী-রী করে। সে-দৃষ্টি কেমন, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কামনা? না-না, কামনা না। ও আমাকে কামনা করে না, করলে আর এমন দোষ কী, সে-অধিকার ওর তো আছেই। আসলে ও তখন পর-পুরুষ হয়ে যায়। পরপুরুষের চোখ দিয়ে আমাকে যাচাই করে। রাস্তার লোকের কাছে আমি কতটা লোভনীয় হয়ে উঠেছি, সেটা পরখ করবার জন্যে নিজেই রাস্তার লোকের মত ইতর হয়ে যায়।

তারপর করে কী, শিয়রের কাছ থেকে সেই হাতঘড়িটা বার করে। সময় দেখে। যতটাই বাজুক, গলায় শ্লেষ ঢেলে একবার বলেই, 'এত শীগগির?'

আর যখন বাসায় ফিরি, তখনও আরেক-বার সেই পরীক্ষক চোখ বুলিয়ে আমাকে দেখে। যদি তাড়াতাড়ি ফিরি, তবু বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে বলেই, 'এত দেরি?'

আসল কথা কী, জান, আমাকে চাকরি করতে দিতেই ও চায়নি। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই অক্ষম হয়ে বিছানা নিল, টেনেটুনে চালিয়ে দিলাম আরও এক বছর। শেষে দেখি, আর তো চলে না, ওর দিকে চাই, সেরে ওঠার কোন লক্ষণ দেখি না। বলি, আমি একটা কিছু করি না? লেখা-পড়া কিছু তো শিখেছিলাম, সেটা এবার কাজে লাগুক।'

ও বলত, 'সবুর। নতুন মালিশটা আনিয়ে দাও, দেখবে আমি দু' মাসে চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।'

খোনা-খোনা গলা, ভুগে-ভুগে সরু, ইনিয়ে-বিনিয়ে আরও কত কী যে বলত! 'তুমি গেলে আমাকে শুশ্রূষা কে করবে।' বলত, 'বুঝি, বুঝি, ঘরে এখন আর মন টেঁকে না।'

ওর ভয় ছিল, বাইরে বেরুলেই আমি বুঝি খারাপ হয়ে যাব। এই ভয়টাকে ও ভালবেসে পুষেছিল। প্রথমে ওটা ছিল নিরীহ শ্বাপদ-শিশুর মত। পরে তার নখে ধার হল, দাঁত বসাতে শিখল, আঁচড়ে কামড়ে আমার স্বামীর মনের ভিতরটা রক্তাক্ত করে দিতে লাগল, তবু, পোষা জিনিসের এমনই মায়া, ভয়টাকে ও তাড়াতে পারল না কিছুতে। তাকে পুষে রাখলই।

অথচ দেখ, এটুকু ওর বোঝবার শক্তি নেই যে, মেয়েমানুষ শুধু বাইরে বের হলেই খারাপ হয় না। যারা হয়, তারা ঘরে বসেও হতে পারে। ওর নিজের খুড়তুতো বোনই তো—

থাক, সেসব ঘরের কেলেঙ্কারির কথা তোমাকে বলে কাজ নেই।

আমি একথাও বলি না যে, পথের বিপদ কিছু নেই। আছে। ভাল মন্দ দুইই আছে। আর, বলতে পারিনে, মন্দরাই হয়ত দলে ভারী। প্রথম প্রথম কী যে অস্বস্তি হত, কত লোক যে পিছু নিত, শিস দিত, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বাস থেকে আমাদের গলির বাসায় যেতে লাগে তো মোটে মিনিট চারেক, তবু কোন কোনদিন তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছি, আর মনে মনে বলেছি, ঈশ্বর, এই পথটুকু আমাকে ভালয় ভালয় পার করে দাও।

সেই সব লোকেরা এখনও একেবারে উধাও হয়নি। এখন আমার সাহস বেড়েছে, কিন্তু দুঃসাহসী ত ওদের ভিতরেও আছে। নিরুপায় ঘৃণায় জ্বলি। যেদিন ডাকের চিঠিতে চাকরি পেয়েছি এই খবরটা আসে সেদিনকার কথা মনে পড়ে যায়। আমার স্বামী চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছিল। আমার কব্জিটা চেপে ধরেছিল প্রাণপণ জোরে। হিংস্র ভঙ্গিতে বলেছিল, পারবে না, পারবে না তুমি এই চাকরিতে যেতে। ভাবি, সেদিন ওর কথাটা মেনে নিলেই যেন ভাল হত। এই নিত্য-নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পেতুম। না হয় উপোস করতে হত, তবু স্বামী-সেবা করে মরে গিয়ে স্বর্গে তো যেতুম।

রিকশওয়ালা, হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া দিল দেখ, এই শুকনো শিরীষ গাছটার রাশি রাশি পাতা মাথার উপরে তুলে অদৃশ্য কারা হরির লুট দিল। টপ টপ বৃষ্টি পড়ছে, এবার তোমার চলা একটুখানি থামাও, পর্দাটা নামাও, কষে বাঁধ। আমি একটু শক্ত হয়ে বসি।

কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট কি ছাই বাঁধা-ছাঁদা মানে। সব ভিজে গেল যে, আমার পায়ের পাতা, জামা, আঁচল-কাঁচল, সব। কপালের কুঁড়ির মত ফোঁটাটা গলে গলে এতক্ষণে বুঝি রক্তজবা হল। মুঠো করে পর্দাটা টেনে ধরেছি তবু সামলাতে পারছি না।

রিকশওয়ালা, এবারে থামো, এই ঢাকা বারান্দার নিচে খানিক দাঁড়াই।

[ দুই ]

চাকাটা না হয় বুঝলুম গাড়িটাকে ঠিক পথে রাখবার জন্যে, ট্যাক্সিওয়ালা, তোমার এই আয়নাটা রেখেছ কেন। ছোট্ট এক টুকরো কাচ, ওর ভিতর দিয়ে তুমি কি বিশ্বরূপ দেখ। আপাতত তুমি কিন্তু আমাকে দেখছ। আয়নাটাকে ঘুরিয়ে নাও না, শক্ত করে স্টিয়ারিং ধর, নইলে একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটতে পারে।

তা-ছাড়া দেখছই বা কী, আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসছই বা কেন। তোমার গাড়িতে এর আগে কোন মেয়ে কি ওঠেনি। এই হাতল ঘুরিয়ে কত জনকে দিনরাত খেয়া পার করে দিচ্ছ। তোমাদের ত ওই কাজ।

বুঝেছি, তুমি আমাকে দেখছ না, অন্তত আলাদা করে না, দেখছ পাশের এই লোকটির সঙ্গে মিলিয়ে। ভাবছ, ও আমার কে।

যদি বলি, ওই আমার স্বামী!

বিশ্বাসই করবে না। তোমাদের ঝানু চোখ, এক নজরেই টের পাও কোন্ জাতের সওয়ারি। স্বামী-স্ত্রীর ধরন-ধারনই আলাদা। লুকোব না, লুকোতে পারবও না, আমরা শুধু একে আরেক জনের চেনা।

স্বামী-স্ত্রী হলে, এতক্ষণ আমি কলকল গলায় অনর্গল কথা বলতুম, ও গম্ভীর হয়ে শুনত। স্বামীরা তাই করে। কী বিছানায়, কী রাস্তায়, হুঁ-হাঁ করে কোন-মতে ঠেকা দিয়ে যায়। দোকানে দোকানে ত বকমারি বেশাতি, ওরা কিচ্ছু দেখে না। অন্যদের দেখতে দেয়ও না। বোধহয় মনে মনে হিসাব করতে থাকে, কত খরচ হল, আরও না-জানি কত হবে। আর মাঝে মাঝে তাড়া দিয়ে বলবে, 'চল, চল।'

কিচ্ছু কি দেখে না, দেখে। অন্য মেয়ে-দের দেখে। তাও অনেকক্ষণ ধরে না, সে-সাহসই নেই, তখন আরও বিরক্ত হয়, সিগারেট ধরিয়ে কাশে, ধমক দিয়ে বউদের আবার বলে, 'চল, চল।'

বউয়েরা অত সহজে চলবে কেন। সবে খাঁচার বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসেছে, এখন চোখ দিয়ে সব চেটেপুটে নেবে, যতটা পারে।

এই লোকটি কিন্তু আমার স্বামী নয়! দেখছ না, আমি দরজার কাছ ঘেঁষে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে আছি, আর নিশিবাবু, ওই লোকটির নাম, মাঝে মাঝে সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে আমার আঙুল ছুঁতে চাইছেন। আমি সরিয়ে নিচ্ছি বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলব?—আবার কখন হাতটা এগিয়ে আসবে, তার প্রতীক্ষাও করছি।

বাড়াবাড়ি কিছু তো করছিনে।

তোমাদের এইসব ট্যাক্সিতেই, শুনেছি, এর চেয়ে ঢের বেশি গোলমেলে কাণ্ড ঘটে থাকে। গাড়ি নাকি খুব দূরে দূরে নিয়ে যাও, দাঁড় করিয়ে দাও নির্জন জায়গা দেখে, কখনও কখনও বেরিয়ে গিয়ে সিগারেট ধরাও। মীটারে ভাড়া বাড়ে। কিন্তু গাড়িতে যারা রইল, তারা কি দু-চার টাকার পরোয়া করে!

কিন্তু আমি তো সেরকম মেয়ে নই। অফিসে কাজ করি, স্বামীর সেবা করি, সংসারও চালাই।

ভাবছ, তবু আমি আজ ট্যাক্সিতে উঠলুম কেন। নিশিবাবুর সঙ্গে কেন।

কেন, বলি শোন। এর মধ্যে কোন যোগ-সাজসের ব্যাপার নেই। অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি, আকাশে ঘন কালো মেঘ। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আমার স্বামীর ওষুধ কিনতে হবে। প্রমাদ গণলাম। ট্রামে তো ওঠবার জো নেই, অন্যদিন স্যাণ্ডাল টেনে হিঁচড়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি, আজ রিকশ নিলুম। তবু লম্বা হাত বাড়িয়ে আষাঢ়ের বর্ষা আমাদের পিছন থেকে ধরে ফেলল। আমি ভিজে গেলুম। এই যে দেখছ আমার জামা কাপড় একেবারে কোঁচকান, এর অন্য কোন কারণ নেই, একেবারে নেয়ে উঠেছিলুম যে।

তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালুম একটা ঢাকা বারান্দার নিচে। ভেবেছিলুম মৌশুমী পশলা, দশ মিনিটেই ধরে যাবে। ধরল না। অধীর রিকশওয়ালা ঠনঠুন ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকলে, কিন্তু উঠতে ভরসা হল না। পথে তখন হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে সারে-সারে ট্রাম দাঁড়িয়ে গেল, বাস দু'চারখানা চলছিল বটে, ভারী ভারী কলের নৌকোর চালে, ঢাকা যেন স্রোত ঠেলে উজানে চলেছে। ছাতা খুলে একটা লোক ম্যানহোল খুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছিল ঝাঁঝরিটায় সত্যিই ফুটো আছে কিনা।

সেই ঢাকা বারান্দার নিচে দাঁড়ানও কি কম দায় নাকি। তারও ছাতে ফাট, চুঁইয়ে চুঁইয়ে চুনসুরকি গলা জল ঝরছিল, কিন্তু সরে যে দাঁড়াব তার উপায় কই। কয়েক ফুট তো মোটে জায়গা, লোকে-লোকে রুদ্ধশ্বাস। কারও কারও হাতে ছাতা, বাঁট থেকে জল ঝরছে। খবরের কাগজওয়ালা ক্যাম্বিশের কাপড়ে বইপত্তর ঢেকে পাহারা দিচ্ছে, সেদিকে পা বাড়াবার জো নেই। ওরই মধ্যে এক চানাচুরওয়ালা তপ্ত খোলায় চীনাবাদাম ভেজে গরম গরম বিক্রী করছে। হাওয়ায় পোড়া বিড়ির ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। একটা জায়গা নোংরায় গোবরে মাখামাখি, নিরীহ নিশ্চিন্ত একটা ষাঁড় হাঁটু ভেঙে বসে মাছি তাড়াচ্ছে। বাইরে যখন বৃষ্টি, তখন মাছিদেরও তো একটা আশ্রয় চাই।

কোথায় আর যাবে, ডাঁশগুলোর সঙ্গে ষাঁড়টার পিঠের দখলী স্বত্ব নিয়ে ভনভন করে বিবাদ করুক।

নিশিবাবুকে দেখতে পেলুম তখন। ভীড় ঠেলে ঠেলে কখন পিছে এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পাইনি। একেবারে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, কতক্ষণ থেকে। আপনিও আটকে পড়েছেন?

প্রথমে চমকে উঠেছিলুম, চেয়ে দেখলুম, নিশিবাবুই বটে। নিশিবাবু না হলে কার এমন সাহস হবে যে, প্রথমেই মেয়েদের পিঠে হাত দেয়!

আসলে নিশিবাবুর ধরনটা অমনই। তোমার ছোট আয়নাটা দিয়ে ওঁকে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ ট্যাক্সিওয়ালা, আচ্ছা, ওঁকে কেমন লোক বলে মনে হয় তোমার? না-না, ওঁর মনের কথা জিজ্ঞাসা করছি না, সে তুমি জানবে কী করে। কিন্তু মুখ তো মনেরই আয়না, মুখ দেখে কী ভাবছ বল বল না! একটু অদ্ভুত গোছের মানুষ, কেমন? চুলগুলো অবশ্য লম্বা লম্বা, তাও ভাল করে আঁচড়ান নয়, আর নিশিবাবু বোধহয় সাতজন্মেও চুল কাটেন না। চোখ দুটি এই আধ-অন্ধকারে তুমি ঠাহর করতে পারছ না, আলো থাকলে দেখতে, ওঁর চোখের মণি দুটি সকৌতুক, তাতে একটু যেন ছেলেমানুষি মেশান। কিন্তু ভুরু অত্যন্ত ঘন, বঙ্ক দুটি বড় বলে নাকের ডগা রীতিমত স্ফীত। দাঁত ভাল নয়, কেননা নিশিবাবু পান খান, আর সিগারেট খুব বেশি খান বলে পুরু পুরু ঠোঁট দুটি কালচে। ধোঁয়া একেবারে মুখে এসে পড়লে অস্বস্তি হয়, কিন্তু দূর থেকে মন্দ লাগে না। কেমন একটু মিঠেকড়া গন্ধ, নেশা কাকে বলে জানি না, কিন্তু আমার যেন মাথা ঝিমঝিম করে।

সব সময়েই ধোঁয়ার আড়ালে থাকে বলেই ওঁর মুখখানা কখনও স্পষ্ট দেখতে পাইনে। পাইনে বলেই মানুষটাকে বোধহয় এত রহস্যময় লাগে। লাগে বলেই এত লোকের মাঝখানে ভদ্রলোক পিঠে হাত দিলেও রাগ করতে পারিনে। জানি, উনি অমনই। কোনটা দেখতে ভাল, কোনটা দৃষ্টিকটু সে-সব বোঝেনই না, মানবেন কোথা থেকে।

মুখটায় ছেলেমানুষি থাকলে কী হবে, নিশিবাবুর কাঁধ কী চওড়া দেখছ তো। কোলের উপরে রাখা হাত দুটিও বেশ রোমশ আর শক্ত, কব্জিতে ভীষণ জোর। আমার তো ভয় হয়, ওঁকে বিশ্বাস তো নেই, যদি কখনও ধরেন তবে আমার হাত দেশলাইয়ের কাঠির মত মট করে ভেঙে যাবে। ভাবছি, ভয় হচ্ছে আর ঘামছি।

গুণ্ডার মত যার গায়ের জোর, তার গলায় গান আছে, কখনও শুনেছ। সত্যিই আছে। বেশ দরাজ গলা, কিন্তু ভারী মিষ্টি। আমি শুনেছি যে। মিনিকে উনি গান

আপনিও আটকে পড়েছেন

শেখাতেন। আমার খুড়তুতো বোনকে।

শেখাতেন বললুম বটে, কিন্তু শেখান বলতে যা বোঝায়, ঠিক সে-ভাবে নয়। কোন পদ্ধতি মেনে ধৈর্য ধরে শেখান সে ওঁর ধাতেই নেই। আসতেন, সপ্তাহে দু'দিন করে, সন্ধ্যার দিকে। এসেই, বাটা-ভরা পান সাজাই থাকত, দুটি খিলি তুলে এক সঙ্গে মুখে পুরতেন, আয়েস করে ধরাতেন সিগারেট। রীড টিপে টিপে হারমোনিয়মে সুরসঙ্গীত আনতেন। তারপর ওঁর গলা খুলত। গান গেয়ে যেতেন, একটার পর একটা। ছাত্রী কতটা শিখল না শিখল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। মিনি ভয়ে ভয়ে, জড়োসড়ো হয়ে যতটুকু পারে তুলে নিত।

তুলে নিতুম আমিও, আড়াল থেকে। সামনে যেতুম না ত।

একদিন ধরা পড়ে গেলুম। স্নান করে এসে বারান্দায় কাপড় মেলছি, গুনগুন গানও চলছে, হঠাৎ দেখি নিশিবাবু, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বললেন, 'আপনিও গান জানেন নাকি?'

মাথা নিচু করে বললুম, 'কই, না।'

মিনিটা ফস করে বলে উঠল, 'জানে নিশিদা। ওর গলাও খুব মিষ্টি।'

ওকে চিমটি কেটে থামিয়ে দিলুম। আড়ষ্টভাবে বললুম, 'এই, মাঝে মাঝে শখে পড়ে—'

কথাটাকে নিশিবাবু আর পুরো হতে দিলেন না। কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা রূঢ় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'এ তো শখের জিনিস নয়, গান হল সাধনার।'

সেদিন তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলুম।

তারপরেও দু-চার দিন সামনা-সামনি পড়ে গেছি, উনি হয়ত একটু হেসেছেন, আমি হাসতে পারিনি, বরং কুণ্ঠায় লজ্জায় আরও জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছি।

তারপর ত আমার বিয়েই হয়ে গেল।

মিনিটা খুব দুষ্টু ত, বিয়ের পরেও ওঁর নামে নানা বাজে কথা বানিয়ে বলত। নিশিবাবু নাকি গাইতে এসে এদিক-ওদিক চাইতেন।—'তোমার ছোড়দি আর আসেন না, না?'

'ওদের বাসা অনেক দূরে যে।' মিনি বলত।

'ও' বলে নিশিবাবু নাকি হারমোনিয়মটা টেনে নিতেন, এত জোরে টিপতেন রীড, যে বাজনাটা ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

এর কিছুদিন পরে নিশিবাবু মিনিকে গান শেখান ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মিনি বলত, 'জানিস ছোড়দি, তোর জন্যে। তুই নেই বলে।'

এত বোকা নই যে, ওর কথায় বিশ্বাস করব। ও আমাকে শুধু খ্যাপাত। তা-ছাড়া আমি জানতুম যে, নিশিবাবু নিজেও বিবাহিত, তখনই ওঁর দুটি ছেলে। গান

শেখান উনি বন্ধ করেছিলেন অন্য কারণে। একটা ফিল্ম কোম্পানীতে ভাল কাজ তখনই পেয়ে যান। গান শেখানর সময় বা প্রয়োজন কোনটাই তখন তাঁর ছিল না।

তারপরে নিশিবাবুর সঙ্গে আর এক-বারই দেখা হয়েছে, এই ত সেদিন, এক জলসায়।

ভেবেছিলুম চিনতে পারবেন না, কিন্তু পারলেন। নমস্কার করলেন, হাসলেনও। দেখলুম, সেই ছটফটে ভাব ষোল আনা আছে। চপল অথচ মাঝে মাঝে উদাস; বাকপটু, তবু কখনও কখনও অকারণে গম্ভীর।

সেদিন কথায় কথায় অনেকক্ষণ জমিয়ে রাখলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে একবার বললেন, 'আপনার চেহারা একটুও বদলায়নি দেখছি। বাচ্চা টাচ্চা কিছু হয়নি বুঝি?'

আমার মাথা কাটা গেল। এসব কথা কোন অল্প-চেনা মেয়েকে কেউ কি সবার সামনে, এমন কি আড়ালেও, বলে?

ভাগ্যিস মোড়ে মোড়ে লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে, এখনও পথে জল, আর পোকার সারির মত মিছিল দিয়ে গাড়ি চলেছে, এখন রিকশা বল, মোটর বল, সবাই সমান। সকলেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা। সময় মিলল বলেই তোমাকে এত কথা বলতে পারলুম।

এবার আজকে কী ঘটল, বলি।

সেই ঢাকা বারান্দায় একটু একটু করে জল ঢুকছে, ভীড় বাড়ছে। গোড়ালির কাছে শাড়িটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল, টের পেয়েছি, কিছু করবার উপায় নেই।

নিশিবাবু এখনও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আড়ষ্ট বোধ করছিলুম, কিন্তু ওঁকে সরতে বলতেও ত পারিনে। আর সরবেনই বা কোথায়, রাস্তায় গিয়ে এক হাঁটু জলে গিয়ে দাঁড়াবেন? তা-ছাড়া দেখ, উনি না-হয় সরলেন, কিন্তু জায়গা ত খালি থাকত না, হুড়মুড় করে অন্য লোক এসে পড়ত। নিশিবাবু বললেন, একী, আপনার মাথা একেবারে শাদা হয়ে গেল কী করে। এত কি চুল পেকেছে?

চমকে তাড়াতাড়ি মথায় হাত দিলুম। খানিকটা খড়িগোলা জল উঠে এল। এতক্ষণ ফাট চুইয়ে আমার মাথাতেই পড়ছিল?

আয়না আমার সঙ্গেই আছে, চিরুনিও, কিন্তু ওখানে বার করি সাধ্য কী। নিরুপায় হয়ে সেকেলে ঘোমটাই তুলে দিতে যাচ্ছি, নিশিবাবু করলেন কী, পকেট থেকে রুমাল তুলে আমার চুলে ঘষে দিলেন।

সেই এক-বারান্দা লোকের মাঝখানে। সিঁথি, কপাল, কানের লতি কিছুই বাকী রাখলেন না। নাকের ডগাতেও রুমাল ছোঁয়াতে যাবেন, আমি জোর করে ওঁর হাতটা ঠেলে দিলুম। চাপা গলায় বললুম, 'করছেন কী, আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি।'

নিশিবাবু হেসে উঠলেন। আমি তখন ভয় পেলুম। লোকটা হয় বদমাস, নয়ত একেবারে শিশু।

সকলে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। কৌতুক, কৌতূহল, সন্দেহ, তিরস্কার—সমবেত দৃষ্টিতে সবই ছিল। এর চেয়ে ঠায় জলে দাঁড়িয়ে ভিজলে এমন কী এসে যেত।

কিন্তু নিশিবাবুই বাঁচালেন। বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে, এই বারান্দাটার ঠিক ও-পাশেই একটা চায়ের দোকান আছে, চলুন বসি।

সেখানে যেতেও ভিজতে হয়, তবু আপত্তি করলুম না। কেননা, ওখানে দাঁড়ান আর সম্ভব ছিল না। একবার শুধু বললুম, 'আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আমার স্বামীর জন্যে ওষুধ কেনাও বাকী আছে। তা-ছাড়া একটা রিকশাওয়ালাকেও সেই থেকে বসিয়ে রেখেছি।'

নিশিবাবু রিকশাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ঝর্ঝর জল ঝরছে, আমাকে এক-রকম টেনে পাশের চায়ের দোকানে নিয়ে তুললেন।

ছোট একটা খুপরি খুঁজে আমরা বসলুম। আমার পা তখন কাঁপছিল।

হাওয়াটা জোলো, কিন্তু শুধু সেজন্যই নয়। উত্তেজনাতেও। এইটুকু আসতেই আমরা জলে ভিজেছিলাম, নিশিবাবু শক্ত করে আমার হাত ধরে রেখেছিলেন—এক সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার মত ঘটনা দু-জন মানুষকে কত কাছাকাছি আনতে পারে, ট্যাক্সিওয়ালা, তুমি জান না।

চলকে পড়া চায়ের আর মাংসের ঝোলের হলুদ ছোপ-লাগা টেবিল ঢাকনি, কাচের একটা ফুলদানী, খুপরিটা এমন কিছু চোখে ধরবার মত নয়। তবু আমার ভাল লাগছিল, ভী-ষণ ভাল লাগছিল। খুপরিটা ছোট, নিতান্তই ছোট, ছোট বলেই বুঝি অত ভাল। কড়া একটা আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, তবু মনে হল, ঘরটা গরম, আমাদের দুজনের নিশ্বাসেই যেন ভরে উঠেছে।

নিশিবাবু বললেন, 'কী খাবেন?'

রুদ্ধগলায় শুধু বলতে পারলুম, 'এক গ্লাস জল।'

উনি হাসলেন।—'জল? এই ঠাণ্ডায়? শুধু জল?' বেয়ারাকে ডেকে কিছু খাবারেরও ফরমাস করলেন।

পাশের ঘরে আরও যেন কারা আছে, টের পাচ্ছিলুম। ওরা চাপা গলায় কথা বলছে। মাঝে মাঝে হাসছে। আমরা কথা বলছি না। আমরা হাসছিও না। আমরা চুপ করে শুনছি। কোথায় কে যেন একটা চামচ পেয়ালায় ঠুকে গৎ তুলছে, রেডিওটায় খুব নিচু পর্দায় চটুল একটা বিদেশী সুর বাজছে, জানালায় বৃষ্টির টুপটাপ, একটা ডিশ মাটিতে পড়ে গিয়ে খান খান হয়ে গেল, সব শব্দ আমরা শ্রুতি দিয়ে কুড়িয়ে চেতনার সাজি ভরে তুলছি।

আবেশে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। সামনে-রাখা চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু চায়ের পেয়ালাটা কিছু না। সমস্ত পরিবেশটাই তখন আমার কাছে একটি টলমল পানীয়ের আধার হয়ে উঠেছে।

নিশিবাবু একবার সিগারেট ধরালেন। এতক্ষণ যেন ছোঁয়া-না-ছোঁয়ার সীমানার দাগটার উপরে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে হল, হঠাৎ যেন একটু দূরে গিয়ে একটু অচেনা হয়েছেন।

বুঝিয়ে বলা যাবে না এমন একটা অনু-ভূতির সুখে আমার মনের ভিতরটা ফুটছিল। আমার চোখে ফোঁটা-ফোঁটা কান্না জমছিল। জান ত, কেটলির ভিতরে জল যখন উথলে ওঠে, তার ঢাকনা তখন থরথর করে কাঁপে, বাষ্পে ঝাপসা হয়ে যায়?

আমার হাত টেবিলের উপরে ছিল। আমি কাঁপছিলুম। উনি আস্তে আস্তে সেখানে হাত রাখলেন। বিশ্বাস কর, মাত্র ওইটুকু। বোধহয় এক মিনিট সময় কাটল। কিংবা মিনিটখানেকও না। চোখ বুজে, দাঁতে ঠোঁট চেপে কোনমতে নিজেকে ধরে রেখেছিলুম। আমার আঙুল গলছিল। তারপর আমি চোখ মেলে চাইলুম। গলে-গলে যাওয়া আঙুলগুলোয় সমস্ত শক্তি, আর ইচ্ছা আর সত্তা জড়ো করে হাত টেনে নিলুম। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলুম, 'না।'

হাত সরিয়ে নিলেন উনিও। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'সেই ভাল। না। নাই ভাল।'

বৃষ্টি ধরে এসেছে। আমরা বাইরে এসে দেখি, বারান্দাটা ফাঁকা। বললুম, 'বড় দেরি হয়ে গেল।'

উনি বললেন, 'বাসায় পৌঁছে দিই?'

তুমি দাঁড়িয়েই ছিলে, প্রত্যাশী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইছিলে। উনি তোমাকে হাত তুলে ডাকলেন। নিচু গলায় আমাকে বললেন, 'শুধু একটি অনুরোধ। সোজা বাসায় যাব না। একটু ঘুরব শুধু—মাঠে কিংবা গঙ্গার ঘাটে।'

আমি ইতস্তত করছি দেখে, হাসলেন। —'ভয় নেই। কোন অন্যায় সুযোগ নেব না। সব ধুলো ময়লা ধুয়ে, জঞ্জাল জুড়িয়ে সন্ধ্যাটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছে দেখুন। এই সন্ধ্যাকেই আরও কিছু সময় বাঁচিয়ে রাখতে দোষ নেই।'

তারপর, ট্যাক্সিওয়ালা, আরও আধ ঘণ্টা ধরে আমরা শুধু ঘুরলুম। তোমার সামনে

আয়না আছে, তুমি সাক্ষী, আমরা সত্যিই কোন দোষ করিনি।

কচি ঘাসের আঁচলে কালো পিচের পাড়, আর গ্যাসের স্নিগ্ধ আলোর চুমকি—ভিজে জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে মাঠটা এই ঘিঞ্জি, চীৎকারে-ভরা শহরের সঙ্গে সব আত্মীয়তা যেন অস্বীকার করে বসেছে। তোমার নিজেরও কি ভাল লাগেনি?

আমাদের লেগেছিল। পিছনের সিটে, দুটি ধার ঘেঁষে আমরা দু'জন বসেছিলুম, মাঝখানে অতি সুকুমার একটি ছায়া-ছায়া অন্ধকার আর একটুখানি ভাল-লাগাকে রেখে। ওরা দুটি যেন যমজ শিশু, আমাদেরই দু'জনের যৌথ সৃষ্টি।

গঙ্গার ধারেও অল্প একটু সময়ের জন্যে নেমেছিলুম। তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু চাঁদ-চোয়ান শিশির আছে। দূরে দূরে অশথ গাছ, গড়ের ভূতুড়ে ঢিবি, আর আছে-কি-নেই এমন বিজলী আলো।

একটা থামের পাশে ছোট একটি ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে কয়েক ছড়া মালা। আজ সারা সন্ধ্যা বৃষ্টি গেছে, এদিকে লোক বেশি আসেনি, ওর বিক্রী ভাল হয়নি। মালা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফুল বাসী হবে।

নিশিবাবু দু-ছড়া মালা কিনলেন। দুটোই একই সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন আমার খোঁপায়।

একে অসংযম বলতে চাও, বল।

সেই মালা থেকে আমি আগগোছে কয়েকটি ফুল খসিয়ে নিলুম। ও'র হাত পাতাই ছিল, সেখানে নিঃশব্দে তুলে দিলুম।

ট্যাক্সিওয়ালা, আমাদের গলিটা এসে পড়েছে, এবার ডাইনে ঘোর। ওই যে দেখছ জানালায় আলো জ্বলেছে, ওই ঘরটাই আমাদের। আমার স্বামী জেগে। বাস, আর নয়, এবারে থাম। আমি এইখানেই নামব।

[ তিন ]

কনডাকটর, লেডিজ সীটটা খালি করে দাও, আমি একটু বসব। এখন এত রাত, দশটা বাজে-বাজে, তবু তোমাদের বাসে এত ভীড়?

এই যে, পাঁচ পয়সা ভাড়া নাও। বেশি দূরে নয়, আমি ওই চৌরাস্তা অবধি যাব। বড় ওষুধের দোকানটা রাত্রেও খোলা থাকে। এ-পাড়ারগুলো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ওষুধ আমাকে আজ কিনতেই হবে। আমার স্বামীর জন্যে। আগেই কেনা উচিত ছিল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু কী সর্বনেশে বৃষ্টি নামল, কোথা থেকে কী হয়ে গেল, না হল ওষুধ কেনা, না তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরা। সব ভুল হয়ে গেল।

কী হয়েছিল জিজ্ঞাসা ক'র না। আমি বলতে পারব না। আমার ঘরের লোককেই বলতে পারিনি তুমি ত পর।

বাসায় ফিরতে আমার খুব দেরি হয়েছিল। দেখি, ঘরে আলো জ্বালা, স্বামী চুপ করে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে। ঘুমোয়নি, আমি জানি, ভান করেছে। বালিশের পাশে হাতঘড়ি, ওটা আসলে আমার স্বামীর চর, ওটাকে টিপে দম বন্ধ করে মারতে পারলে আমার গায়ের জ্বালা মেটে। টিকটিক করে আমার স্বামীকে কানে-কানে বলছে, রাত ন'টার কাঁটা পার।

কাপড় ছাড়বার সময় হল না, ওর শিয়রে এসে দাঁড়ালুম। একটা হাত রাখলুম ওর কপালে। এক ঝটকায় ও আমার হাত সরিয়ে দিলে। এই তোমার ঘুম?

তবু বললুম, 'ব্যথাটা বেড়েছে?'

ও এবার পিটপিট করে তাকাল। আগাগোড়া দেখল আমাকে। দেখল, শাড়িটা ভিজে-ভিজে, খোঁপায় গোড়ে মালা।

খুব বিশ্রী ধরনে হাসল।

আবার বললুম, 'ব্যথাটা খুব কি বেড়েছে?'

ও পাশ ফিরে শুল। এই ভঙ্গিটার মানে আমি জানি। মানেঃ থাক থাক, দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।

ভয়ে-ভয়ে কৈফিয়ৎ দেবার মত করে বললুম, 'বৃষ্টি হল, তাই অনেকক্ষণ আটকে পড়েছিলুম।'

ও-পাশ ফিরেই ও হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা টেনে নিল। কানের উপরে রাখল কিছুক্ষণ। ঘরঘরে গলায় বলল, 'এখন সওয়া ন'টা। এখানে বৃষ্টি থেমেছে ঠিক সাড়ে সাতটায়। তুমি বুঝি অন্য কোন শহরে গিয়েছিলে।'

এটা আসলে খোঁচা। এর উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। দাঁড়িয়ে ভিজে আঁচলের কোণ আঙুলে জড়াতে থাকলুম। দেয়ালের ঝুল কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি। একটা কড়িকাঠ ঘুণে ঝুরঝুরে হয়েছে। জানালার নিচে খানিকটা আস্তর খসেছে। বাড়ি-ওয়ালাকে বলতে হবে। নর্দমার ঝাঁঝরিটাও ফাঁক হয়ে আছে, আরশোলা আনাগোনা করে। কাল বন্ধ করে দেব। টিকটিকিটা ওই এক রত্তি পোকাটার নাগাল পেল না? পোকাটা আলোর ডুমটায় বসেছে। এবারে ওর পাখা পুড়বে। উপরে আলোর ডুম, নীচে টিকটিকি। আজ পোকাটার কপালে নির্ঘাত মরণ।

দেখি, কখন আমার স্বামী আবার এ-পাশ ফিরে শুয়েছে, নির্নিমেষ চোখে দেখছে আমাকে। আমার খোঁপার মালাকে।

আমি করলুম কী, খুলে নিলুম মালা। বললুম, 'ভারী সুন্দর গন্ধ, না? ভাল লাগল তাই দু' ছড়া কিনেছি। তুমি একটা নাও।'

একটা মালা ছুঁড়ে দিলুম ওর বিছানায়।

মালাটা ও ছুঁলও না। ছোঁবে কি, শক্ত মুঠোয় হাতঘড়িটা চেপে আছে যে।

অনেকক্ষণ পরে থমথমে সুরে বলল, 'আমার ওষুধটা এনেছ? দাও।' বলেই হাত বাড়িয়ে দিল।

এবার আমি অপ্রস্তুত, আপাদমস্তক কেঁপে উঠলুম। ওষুধের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছি?

ক্ষীণস্বরে বললুম, 'আজই চাই?'

ও শুকনো কঠিন গলায় বলল, 'না। আজই অবশ্য চাই না। আমি এক রাত্রেই মরব না। যদি তাই ভেবে থাক, তবে চালে ভুল করেছ।' বলে হাতঘড়িটা নামিয়ে রাখল। তুলে নিল মালাটা। দেখলুম, ফুলগুলো ছিঁড়ছে; একটি একটি করে ফুল ছিঁড়ে প্রতিটি পাপড়ি খসিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে চটকে ফেলে দিচ্ছে।

তারপর, সব ফুল ছেঁড়া, সব পাপড়ি থেঁতলান সারা হলে আবার পাশ ফিরল, গোঙাতে থাকল যন্ত্রণায়। ওর মনে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ওর শরীরে। মনে হল, কাঁদছে।

কনডাকটার, তখন আমারও চোখে জল এসেছিল। বাইরে বেরিয়ে এলুম, নামলুম সিঁড়ি দিয়ে। নিজে কষ্ট পায় ও, আমাকেও কষ্ট দেয়। ওর যন্ত্রণা আমি একেবারে সহ্য করতে পারিনে। চাই, ও সেরে উঠুক। আমি যে ওকেও ভালবাসি।

এ-কথা ও বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না। ও ভাবে, বাইরের মোহেই বুঝি আমার চোখে ঘোর লেগেছে।

অস্বীকার করব না, লেগেছে। ভাল লেগেছে আজকের বৃষ্টি-ধোয়া বিকেল, সেই চায়ের দোকান, রাতের গঙ্গা। কিন্তু তবু, অনেক সুরের খেলা অনেক স্বরবিস্তারের পর গান যেমন সমেই ফিরে ফিরে আসে, আমিও তেমনই আমার স্বামীর ঘরেই এসে থেমেছি। ঘরের মায়া আর ঘাটের মোহ, আমার কাছে দুই-ই সত্যি। সন্ধ্যায় এক-জনের দেওয়া ফুল মাথায় পরেছি, রাতে তাই আবার দিতে চেয়েছি স্বামীকে। ফুল নেওয়া আর দেওয়া, কোনটাই কিন্তু অভিনয় নয়।

অভিনয় হলে কি ওরই জন্যে ওষুধ কিনতে এত রাত্রে আবার পথে বেরিয়ে আসি?

* * *

চৌরাস্তা এসে পড়েছে। দোকানটা এখানেই। কনডাকটার, জেনানা নামছে, একদম বেঁধে।

**নরেন্দ্রনাথ মিত্র**

বিয়ে আমি বেশি বয়সেই করেছিলাম। চল্লিশ পার করে দিয়ে। অবশ্য এই বয়সে এসে বিয়ে করবার আমার আর ইচ্ছা ছিল না। কথাটা শুনে আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। বিশেই হোক আর চল্লিশেই হোক বিয়ের কথায় মন কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয় না কার। মুখে যতই না না বলুক, মনে মনে কে না ভাবে 'আর একবার সাধিলেই খাইব।' কিন্তু বাবা মা যতদিন ছিলেন সাধাসাধি কম করেননি, দাদা বউদিও যথেষ্ট সেধেছেন। কিন্তু আমি মত দিই নি। পরিবারের চেয়ে তার বাইরের জীবনই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করত। কোন রকমে গাড়ি ভাড়াটা জোগাড় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়তাম। ঘুরে বেড়ানোটা এক সময় আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। তাই বলে শুধু যে ভবঘুরে ছিলাম তাও নয়। দু একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল। তাদের নিয়মিত সদস্য আমি ছিলাম না। ধর্মানুষ্ঠানেও যোগ দিইনি। তবু চাঁদা তোলার কাজে, স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে দুর্ভিক্ষে বন্যায় দুর্গতদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ভালোবাসতাম। নাম যশের লোভ যে একেবারেই ছিল না সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে সেই লোভই একমাত্র প্রেরণার বস্তু ছিল না। কিন্তু নিজের কথা নিজে বড় বেশি বলে ফেলছি।

আমার জীবনকাহিনীর এই যে, খসড়া আপনাকে পাঠাচ্ছি আপনি ইচ্ছা করলে আপনার গল্পে তার এই প্রথম দিকটা ছেঁটে দিতে পারেন। কারণ আপনার গল্পের সঙ্গে এই অংশের বিশেষ কোন যোগ থাকবে না। আপনার গল্প হবে অষ্টম হেনরীর প্রাইভেট লাইফ, তার পাবলিক লাইফ নয়।

আমি যখন একটা দেশী মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি নিয়েছি তখন থেকেই গল্পটা আরম্ভ করতে পারেন। একেবারে কনিষ্ঠ কেরানী হতে হয়নি। সহকারী ম্যানেজারের পদই পেয়েছিলাম। ডিগ্রীটা ছিল। বয়সও হয়েছে। তাছাড়া ডিরেক্টর বোর্ড খবরের কাগজে নামটামও দেখে থাকবেন। ছবিও হয়তো দু-একবার বেরিয়েছে। দেখবার মত ছবি নয়। দাঁড়কাকের মত চেহারা। তবু লোকে দেখত।

ওই একটু পরিচয়ের জোরেই কাজটা ভালো পেয়েছিলাম। সেই তুলনায় মাইনে অবশ্য ভালো নয়। তবে নিজের মেসের খরচটা চলে যেত আর বই কেনার বিলাসিতাটাও রাখতে পারতাম।

ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বেশ ছিলাম। দাদা বউদি ছেলেপুলে নিয়ে এলাহাবাদের বাসিন্দা হয়েছেন। বাড়িও করেছেন সেখানে। দাদা সরকারী চাকুরে। বউদি মহিলা সমিতির নেত্রী। ভাইপো ভাইঝিরা ওখানেই পড়ে, বড়রা চাকরি বাকরি করে। মাঝে মাঝে আমি ছুটিছাটায় যাই আসি। বউদি তখনও ঠাট্টা করেন 'কি ঠাকুরপো' বিয়েটা একেবারেই করলে না? জীবনের একটা দিক একেবারেই না দেখেই চলে গেলে?'

তিনিও জানেন, ও প্রশ্নের এখন আর কোন জবাব নেই। কথাটা একেবারেই ঠাট্টা। আমিও তাই জানি।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। আমাদের অফিসের একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের মতিবাবু, মতিলাল দে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার বয়স তাঁর অনেকদিন আগেই হয়েছিল। শতায়ু হও বলে আমরা এখনো আশীর্বাদ করি বটে, কিন্তু সত্তর পর্যন্ত হাত পা চোখ কান নিয়ে টিঁকে থাকতে পারলেই খুশি হই। মতিবাবু প্রায় ওই বয়স অবধি বেঁচেছিলেন; কিন্তু ঠিক হাত-পা চোখ কান নিয়ে নয়। রোগে দারিদ্র্যে মরবার দশ পনের বছর আগে থেকেই তিনি অর্ধমৃত হয়েছিলেন। শেষের দিকে অফিসে আসতেন লাঠিতে ভর করে। চোখে চশমা দিয়েও কিছু দেখতে পেতেন না। কান দুটো তো আগে থেকেই গিয়েছিল। হাতের কলমটা পর্যন্ত কাঁপত। ফিগারগুলি সমানে পড়ত না। ওপরে উঠত নিচে নামত, এঁকে বেঁকে যেত। কাজ করবার

ক্ষমতা আর তাঁর ছিল না। তবু অফিসেই তিনি ছিলেন। তাঁর চেয়ারখানিতে তিনি সেদিন পর্যন্ত বসে গেছেন। প্রমোশন যেমন হয়নি, তেমনি চাকরিও যায়নি।

এই মতিবাবুর কাছে আমি কিছু কৃতজ্ঞ ছিলাম। ছাত্র জীবনে বার দুই ওঁর আশ্রয়ে বাস করেছি। তার পরেও টুইশন করে আমাকে পড়াশুনো চালাতে হয়েছে। মতিবাবু দুই একটা দুর্লভ টুইশনের সন্ধান দিয়েছেন। দাদার অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর কাছে টাকা চাইতে লজ্জা হত। মতিবাবুর অবস্থা আরো খারাপ ছিল। তবু তাঁর কাছে হাত পেতেছি।

তাই মতিবাবু যখন শয্যা নিলেন আমি সপ্তাহে দু-দিন পারি একদিন পারি তাঁর বাদুড়বাগানের বাসায় যেতে লাগলাম। ভারি দরিদ্র পরিবার। পুরোন বাড়ির একতালার দুখানা-ঘরে কোনরকমে মাথা গুঁজে আছেন। আসবাবপত্রের মধ্যে গোটা কয়েক বাক্স-তোরঙ্গ, তক্তপোষ আর দু-তিনখানা হাতল-হীন চেয়ার। আমি সে চেয়ারে বসতাম না। রোগীর বিছানার পাশেই বসতাম। কোন কোনদিন ওঁর স্ত্রী আলাদা আসন পেতে দিতেন। বড়মেয়ে চায়ের কাপটি এনে সামনে ধরত। সে যদি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকত আমার পরিচর্যায় এগিয়ে আসত মেজো সেজোরা। পাশে দাঁড়িয়ে তালপাখা নিয়ে বাতাস করত। আমি হেসে বলতাম, 'আমাকে হাওয়া করতে হবে না তোমার বাবাকে করো।'

ওঁদের মা বলতেন, 'তোমাকে ওরা দেবতার মত দেখে। আমাদের আত্মীয়ও নেই, বন্ধুও নেই। এই বিপদের দিনে তুমিই যা এসে খোঁজখবর নাও।' আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতাম, 'অমন কথা বলবেন না। উনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।'

ওঁর স্ত্রী বলতেন, 'সে কথা আর সংসারে কজন মনে রাখে বল।'

রোগের যন্ত্রণার চেয়েও ভবিষ্যতের চিন্তাটাই মতিবাবুর বেশি। তিনি চোখ বুজলে স্ত্রী আর চারটি মেয়ের কী গতি হবে সেই কথাই বার বার বলতেন। এদের আগে আর পরে ওঁদের আরো ছেলেমেয়ে হয়েছে। তারা কেউ নেই। আছে শুধু ওই কটি 'কুফল'।

আমি বলতাম, 'আপনি ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না।'

বলতাম বটে, কিন্তু আমি নিজেই বিশেষ ভরসা পেতাম না। যাদের থাকে না তাদের কিছুই থাকে না। মতিবাবুরও কোনকুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের দু'একজন যারা আছে তারা তো কাছেও ঘেঁষে না। হাজার খানেক টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স একবার করেছিলেন। প্রিমিয়াম না দিতে পারায় বহুদিন আগেই তা ল্যাপস করে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিয়ে নিয়ে তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মৃত্যুর পর আরও একটা তথ্য উদ্ঘাটিত হল এখানে সেখানে কিছু দেনাও করেছেন। মুদি দোকান থেকে শুরু করে, ডাক্তারের ওষুধের দাম, বাড়িওয়ালার ভাড়া পর্যন্ত বাকি।

মতিবাবুর স্ত্রী আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'বাবা, এই অবস্থায় তুমি আমাদের ছেড়ে যেয়ো না। মেয়েগুলিকে নিয়ে আমাকে তাহলে পথে দাঁড়াতে হবে।'

পুরোন বন্ধুর খোঁজ নিতে এসে এত বড় দায়িত্ব যে ঘাড়ে চাপবে ভাবিনি। বললাম, 'ভাববেন না, আপনাদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না।'

সদ্য বিধবা তাঁর দু-চারখানা গয়না কোন ট্রাংক কি ঝাঁপির ভিতর থেকে বের করলেন কে জানে। আমার সামনে এনে ধরে দিয়ে বললেন, 'এছাড়া আমার আর কিছু নেই। এ দিয়ে তুমি ওঁর কাজটুকু করে দাও।'

আমি বললাম, 'ওঁর কাজ আটকাবে না। আপনি ওসব তুলে রাখুন।'

বড়মেয়ের নাম শান্তি। সে বলল, 'মা উনি তো আমাদের পর নন। ওঁর কাছে অত সংকোচ কিসের। উনি এরই মধ্যে আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। ওই গয়না বিক্রির কটা টাকায় তার যে সিকির সিকিও শোধ হবে না।'

শান্তির বয়স তখন কত আর। আঠারো উনিশ হবে। ওযে দেখতে এত সুন্দর বোনদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী এর আগে লক্ষ্য করিনি। হাতে দুগাছি প্লাস্টিকের চুড়ি ছাড়া অলঙ্কারের কোথাও কিছু নেই। পরনে আটপৌরে একখানা শাড়ি। কিন্তু তাতে ওর রূপের অসামান্যতা ঢাকা পড়েনি। উজ্জ্বল রঙ, তীক্ষ্ম নাক মুখ চোখ—আপনাদের গল্পের নায়িকা হবার জন্যে যা যা দরকার সবই আছে। কিন্তু এতদিন আমি যেন ভালো করে দেখিনি। হাসবেন না, সত্যিই দেখিনি। কেবল সমস্যার কথাটাই ভেবেছি। বোঝার গুরুভারের কথা ভেবেই ক্লিষ্ট হয়েছি। কিন্তু ওর যে এত রূপ আছে তা দেখিনি। আজ একটি কৃতজ্ঞ তরুণীর মধ্যে নারীর রূপকে আমি প্রথম দেখলাম। কৃতজ্ঞতা যে এত মধুর তা যেন আমি জীবনে এই প্রথমে অনুভব করলাম। যে ভারকে অত গুরুতর মনে করেছিলাম তার গৌরব রইল, ভার যেন আর রইল না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। মাইনের টাকার বেশির ভাগ আমি মতিবাবুর স্ত্রীর হাতে এনে ধরে দিলাম। তিনি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'সব দিলে তোমার চলবে কি করে। তোমারও তো মেস খরচা আছে।' আমি বললাম, 'সে একরকম চলে যাবে। সেজন্যে ভাববেন না।'

তিনি বললেন, 'সে কি হয় বাবা। তুমি আমাদের জন্যে ভাববে, আমাদের জন্যে সব করবে, আর আমরা পোড়া ছাই একটু ভাবতেও পারব না। তুমি এখান থেকেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে যাবে।'

শান্তি বলল, 'খেয়েই দেখুন না অতুলদা। ক'দিন থেকে আমরা বোনেরাই রান্নার ভার নিয়েছি। আপনার মেসের ঠাকুরের চেয়ে খুব খারাপ হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরানীরা চিরকালই ভালো রাঁধে।'

এত তরল স্বরে ওর সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি। এই প্রথম বললাম।

শান্তি হেসে বলল, 'সে কথা স্বীকার করেন তাহলে?'

শুধু শান্তি নয়, ওদের চার বোনের মুখেই দেখলাম হাসি ফুটেছে। শান্তি, সুধা, তৃপ্তি, দীপ্তি। বয়সে দেড় বছর থেকে দু-বছরের ব্যবধান। গড়নে প্রায় এক। কারিগরের একই ছাঁচে ঢালা মূর্তি। রঙটা ওরই মধ্যে কারো এক পোঁচ বেশি ফর্সা, কারো বা একটু শ্যামলা।

চার মুখে সেই চারটি হাসির রেখা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এতদিন আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়েছি, প্রবোধ দিয়েছি, আশ্বাস দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি, আজ দেখলাম সবচেয়ে বড় দান হল আনন্দ দান। আমার কথায় যে ওরা হেসেছে এর চেয়ে বড় বিস্ময়কর যেন আর কিছু নেই। আমার একটি মাত্র কথায় যে চারটি হাসির ঝরণা ছুটে বেরোতে পারে তা দেখে সেদিন সত্যিই বড় অবাক লেগেছিল।

প্রথম মাসে আমি শুধু প্রতি রবিবারে আসতাম। ওদের সঙ্গে বসে খেতাম, গল্প করতাম, হাসতাম, হাসাতাম। দ্বিতীয় মাসে ওদের দাবী বাড়ল। তৃতীয় মাসে আমাকে মেস ছেড়ে দিয়ে ওদের দুখানা ঘরের একখানার বাসিন্দা হতে হল। শান্তির মা বললেন, 'তুমি সব দিচ্ছ, ওদেরও কিছু দিতে দাও। ওরা তোমাকে রেঁধে খাওয়াক, সেবা করুক, পরিচর্যা করুক। তাহলে ওদের আর ভিখিরীর মত নিতে হবে না। আমিও ভাবতে পারব—আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেই নিচ্ছি। তুমি আর আমাদের পর মনে কোরো না বাবা।'

এদিকে দুটো এস্টাবলিশমেণ্ট চালাতে গিয়ে আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি। শুধু মাইনের টাকায় কুলোয় না। ব্যাঙ্কে যে সামান্য কিছু সঞ্চয় আছে তাতেও হাত পড়ে। আমি তাই শান্তিদের কথায় সম্মতি দিলাম।

মির্জাপুরের তিনতলায় একখানা ঘরে আমি একা থাকতাম। পুবের দক্ষিণের দুদিকের জানলাই খোলা ছিল। সেই তুলনায় বাদুড়বাগানের এই অপরিসর ছোট ঘর মোটেই বাসযোগ্য নয়। জানলা একটা আছে তাও পশ্চিমের দিকে। দিনের [illegible]

ঘরখানা আধা অন্ধকার হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিনের সেই বাদুড়বাগান আমার কাছে পৃথিবীর সেরা ফুলবাগান হয়ে উঠল। চার বোনে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘরখানা ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করল। তক্তপোষ পাতল, বইয়ের র‍্যাকটি সাজিয়ে দিল। টিপয়ে রাখল একটি ফুলদানি।

সন্ধ্যার সময় সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে গিয়ে আমি একটু শক খেলাম। বিদ্যুতাঘাত। ছোট তিন বোন তো হেসেই অস্থির।

শান্তি হাসল না। একটু অপ্রতিভভাবে বলল, 'আপনাকে বলা হয়নি, সুইচটা খারাপ আছে।'

আমি পরদিনই মিস্ত্রী ডেকে সব ঠিক করে নিলাম। শুধু এ ঘরের নয়, ওঘরেরও। বাড়িওয়ালার ভরসায় আর রইলাম না।

তারপর দু মাস যেতে না যেতেই কথা উঠল, আমি কে, আমার পরিচয় কী। পরিবারের বন্ধু কথাটা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। আমাদের সমাজ আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন মানে না।

শান্তির মা বললেন, 'বাবা, আমাকে সবাই ঠাট্টা করে। দোতলার ওরা তো দিনরাত ওই নিয়েই আছে।'

আমি সব বুঝতে পেরে বললাম, 'তাহলে আমি চলে যাই। মেসের সেই ঘরটা না পেলেও একটা সীট নিশ্চয়ই পাব।'

শান্তির মা বললেন, 'না তা হয় না। তোমাকে আমরা ছাড়তে পারি না।'

আমি বললাম, 'ভাববেন না। দূরে গেলেও আমি আপনাদের কাছেই থাকব। যেটুকু করছি, সাধ্যমত তা করতে চেষ্টা করব।'

তিনি বললেন, 'তুমি আর কতদিন তা করবে। ভিখিরীর মত আমরাই বা সারাজীবন তা কী করে নেব। যাতে অসংকোচে নিতে পারি, যাতে কেউ আর কোন কথা না বলতে পারে তুমি তার একটা উপায় করে দাও।'

এ উপায়ও আমাকেই করে দিতে হবে। আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু বুকের ভিতরটা অত চুপচাপ ছিল না। তা তোলপাড় করছিল।

আমি ভেবে দেখলাম শান্তির সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান আমার অনেক কমে গেছে। ও আমার বিছানার পাশে এসে বসে, হাসে গল্প করে। র‍্যাকের বাংলা বইগুলি টেনে টেনে নিয়ে পড়ে। আমার র‍্যাকে ওর পড়বার মত বই বেশি ছিল না। ওর ফরমায়েশ মত পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আমিই আপনাদের লেখা সব আধুনিক গল্প আর উপন্যাস জোগাড় করে এনে দিই। কিছু কিছু কিনেও আনি।

মাঝে মাঝে এমন কথা শান্তি বলে বসে যা দূরত্বের ব্যবধান মানলে যা বলা যায় না, এমন প্রসঙ্গ তোলে যা এতখানি বয়সের ব্যবধানে উঠবার কথা নয়। এমনভাবে হাসে, এমনভাবে তাকায় যে আমার মনে হল আপনাদের বর্ণিত পূর্বরাগের লক্ষণগুলির সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়। অবশ্য আপনাদের বর্ণনার ওপরই শুধু আমি সেদিন নির্ভর করিনি। আমাদের নিজের যে বোধশক্তি আছে সেদিন সেও সেই কথা বলেছিল। সে বোধ ছিল বাসনারঞ্জিত।

তবু আমি বললাম, 'কিন্তু শান্তির মত—'।

শান্তির মা একটু হেসে বললেন, 'ওর মত আগেই নিয়েছি। সেজন্যে তুমি ভেব না।'

অফিসে বেরোবার আগে শান্তির ফের দেখা পেলাম। অন্য দিনের মত সেদিনও পানের খিলিটি হাতে দিতে এসেছে।

আমি তাকে একান্তে পেয়ে বললাম, 'তোমার মার কথা শুনেছ? তোমার কি মত?'

শান্তি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'আমি কি জানি?'

যদিও জানি মেয়েরা এসব কথা স্পষ্ট করে বলে না, ঠিক ওইরকমই ঘুরিয়ে বলে, ফিরিয়ে বলে, হাসিতে বলে, আভাসে বলে তবু আমি ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি সব ভেবে দেখেছ? তোমার মতটা শুনতে চাই।'

শান্তি তেমনি হেসে বলল, 'আমি আবার কি ভাবব। এতক্ষণ মার কাছ থেকে শুনলেন তাতে বুঝি হল না?'

তাতেই হল। পাঁজিতে শুভদিন দেখে বিয়ে করে ফেললাম শান্তিকে। সাটাপটা কিছুই করলাম না। ওদের তো এক পয়সাও ব্যয় করবার শক্তি নেই। যা করবার আমাকেই করতে হবে। ওদের আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিল না। তাদের কাউকেই নিমন্ত্রণ করতে দিলেন না আমার শাশুড়ী। তিনি বললেন, 'বিপদের দিনেই যখন কাউকে পেলাম না, এখন আমার কাউকে দরকার নেই।'

আমিও দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া বিশেষ কাউকে বললাম না। তারা শান্তিকে দেখে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'সাবাস। তোমার সবুরে মেওয়া ফলেছে।'

তাড়াহুড়োতে আমি প্রথমে নতুন বাড়ি ঠিক করতে পারিনি। বাদুড়বাগানের ওই পুরোন বাসাতেই এক বছর ছিলাম। বাইরের দিক থেকে শান্তির বিশেষ কিছুই বদলাল না। যা বাপের বাড়ি ছিল তাই হঠাৎ স্বামীর ঘর হয়ে দাঁড়াল। শান্তির সিঁথিতে সিঁদুর উঠল, হাতে শাঁখা। শাড়িটা দামী হল, রঙটা প্রগাঢ়। কিছু গয়না গাটিও করে দিলাম। অবশ্য একেবারে গা-ভরে দিতে পারলাম না। ওর যে আরো তিন বোন আছে। তাদের গা যে একেবারে খালি। ওদেরও দু-খানা এক খানা করে গড়িয়ে দিলাম। তাতে আমার শাশুড়ীরও আপত্তি শ্যালিকাদেরও। সুধা বলল, 'বাঃরে আমাদের কেন দিচ্ছেন। আমাদের তো আর বিয়ে করেন নি।'

আমি বললাম, 'ভবিষ্যতে করতেও তো পারি।' তা শুনে ওরা চারজনেই খুব এক-চোট হাসল।

তৃপ্তি বলল, 'যেটিকে বিয়ে করেছেন সেটিকে আগে সামলান। তারপর আমাদের দিকে চোখ দেবেন।'

আমি ওর বেণী ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, 'তবে রে দু-নম্বর ফাউ—।'

ওদের প্রত্যেকেরই বাড়ন্ত গড়ন, ফুটন্ত যৌবন। বিয়ে ওদের একজনেরই হয়েছে। কিন্তু হাওয়া লেগেছে সবাইর গায়ে, গায়ে-হলুদের রঙ বসে গেছে সবাইর মনে।

আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা আমি ভুলে দিলাম। এর জন্যে বেশি কিছু চেষ্টা

করতে হল না। আমাদের মধ্যে যে দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক ছিল তা আগেই ঘুচে গেছে। শ্রদ্ধার, ভয়ের কোন দুস্তর ব্যবধানই আর নেই। বয়সের বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমি ওদের সমস্তরে নেমে এসেছি। বড় সুখের এই অবতরণ।

মাইনের টাকাটা শাশুড়ীর হাতে দিতে গেলে শাশুড়ীও একটু রসিকতা করে বললেন, 'এখন তো বাড়ির গিন্নী হল শান্তি।'

শান্তি হেসে বলল, 'মা, তুমি যদি অমন কথায় কথায় খোঁচা দাও ভালো হবে না কিন্তু।' বহুদিন পরে সংসারে যেন সুখের বান ডেকেছে।

টাকা শান্তি নিজের কাছে রাখল না, হিসাব নিকাশ, সংসারের আর পাঁচটা ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভারও আমার শাশুড়ীর হাতেই রইল। কিন্তু শান্তি মনে মনে জানল সে-ই কর্ত্রী, তার জন্যেই সব। যে ছিল দাতা, শান্তির জন্যেই সে আজ গ্রহীতা বনে গেছে। তার এই মনোভাব গোপন রইল না। চালচলনে ফুটে বেরোতে লাগল। নিজের যৌবন দিয়ে সে যে আর চারটি জীবনকে রক্ষা করেছে এ গর্ব তার যাবে কোথায়।

বাইরের দিক থেকে সংসারের আর কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু বৃদ্ধ মাতলালের জায়গায় প্রৌঢ় অতুলচন্দ্র এসে বসেছে। কিন্তু ভিতরের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে প্রায় বৈপ্লবিক বলা চলে।

আমিও বদলাতে লাগলাম। এতদিন সমাজসেবা করেছি তার সঙ্গে অর্থনীতির যোগ বিশেষ ছিল না। টাকাকড়ি যা হাতে আসত তা দীন দুর্গতদের জন্যেই ব্যয় করতাম। ইস্কুল টিস্কুলও দু-একটা করেছি। কিন্তু এখন সব ছাড়িয়ে একটি পরিবারের জন্যে অর্থচিন্তাই আমার প্রবল হয়ে উঠল। এই পরিবারটিকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা, শ্যালিকাদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করার জন্যে আমার আগেকার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন কাজে লাগল না। অফিসে যে মাইনে পাই তাতে ওইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আনাও সম্ভব নয়। তাতে বাদুড়বাগান থেকে নড়বার কথা ভাবতে পারি না। অথচ নড়তেই হবে। শুধু শান্তির বোনদের জন্যেই নয়, ভবিষ্যতে ছেলেপুলেও তো হবে তার জন্যে তৈরী হওয়া চাই। বিয়ের পর বয়স আমি পাঁচ-জনের কাছে কিছু কমিয়ে বললেও তা তো আর সত্যি সত্যি কমছে না। আর যৌবনে ধন উপার্জন করতে না পারলে যে হাল হয় তাতো আমি আমার শ্বশুরকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

তাই আমি প্রথম দিকে গোটা দুই পার্ট-টাইম কাজ নিলাম। তাতে রাত এগারটা বারটা হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। চারবোনের কেউ ঘুমোয় না, কিন্তু সবাই ঝিমোয়। আমি রাগ করে বলি, 'তোমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই পার।'

শান্তি বলে, 'বাজে বোকো না। তাই কেউ পারে নাকি?'

আচ্ছা, দিন নেই রাত নেই, ভূতের মত এমন খাটছ কেন বলতো?'

আমি গলা নামিয়ে বলি, 'একটি পরীর জন্যে।'

আমার সেই নিচুগলার কথাও কি করে সুধাদের কানে যায়। সে ফস করে বলে বসে, 'তাই নাকি অতুলদা? মাত্র একটি পরী? আপনার সঙ্গে তাহলে আমাদের কথা বন্ধ।'

আমি তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিয়ে বলি, 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। একটি নয় চারটি। উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা। আমার চারটি অপসরী।'

আমি ওদের তিনজনকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলাম।

আমার শাশুড়ী বললেন, 'ইস্কুল টিস্কুল আবার কেন। এখন দেখে শুনে বিয়ে থা দিয়ে দাও। একটি একটি করে পার কর। তোমার ঘাড়ের বোঝা নামুক।'

সুধাকে ডেকে বললাম, 'তোমারও তাই ইচ্ছা নাকি?'

সুধা হেসে বলল, 'দোষ কি।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'উঁহু, আজ-কাল শুধু রূপসী হলেই হয় না। বিদুষী না হলে ভালো বর জোটা শক্ত।'

আমার ইচ্ছা সত্যিই ওদের তিন বোনকে বেশ একটু দেখে শুনে বিয়ে দিই। ওরা পড়তে থাকুক। আর ইতিমধ্যে আমি তৈরী হই। পণ যৌতুকের টাকা জোগাড় করি।

শান্তি বলে, 'নিজের শরীরের দিকে যে একেবারেই তাকাও না।'

আমি জবাব দিই, 'এতদিনে তাকাবার লোক পেয়েছি। নিজের দিকে তাকানো মানে নিজের আয়নার দিকে তাকানো। সে হল নিজের ছায়া। যখন নিজেকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাই তখনই ছায়ার বদলে কায়াকে পাই।'

শান্তি অত তত্ত্বকথা শুনতে চায় না। সে বসে বসে আমার পিঠের ঘামাচি মারে, আর দু একগাছি করে পাকা চুল তোলে।

একদিন বলল, 'আর তোলবার কিছু নেই। তুলতে গেলে কাঁচা কগাছিকেই তুলতে হয়। তার চেয়ে কলপ কিনে আন।'

আমার বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগে। একটু বাড়িয়ে বলছে শান্তি। আমার চুলগুলি পাকতে শুরু করলেও অত পাকেনি। অত বুড়ো হইনি আমি।

ওর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণটা আমার অজানা নেই। দোতলায় বাড়িওয়ালার মেয়ে মল্লিকা ওর সখি। তার সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। বরের বয়স পঁচিশের নিচে। দেখতেও কার্তিকের মত। গানবাজনাও জানে। কিন্তু কার্তিকের বদলে বুড়ো শিবকে তো শান্তি জেনে শুনেই বরণ করেছে।

আমি চুলের জন্যে কলপ কিনলাম না। ভাবলাম পারি যদি কীর্তির কলপ পরব।

তিনটে চাকরি করে আর পারিনে। তাতে খাটুনিই সার। সংসারের হাল যে কিছু ফিরেছে তা নয়। জীবিকা পালটাবার জন্যে আমি কিছুদিন আগে থেকেই চেষ্টা করছিলাম। সেই চেষ্টা এবার কাজে লাগল। আমার কয়েকজন জেলখাটা বন্ধু এখানে-ওখানে বেগার খাটছিলেন। তাদের নিয়ে তাদের সাহায্যে শহরের বাইরে আমি ছোট একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম দাঁড় করলাম। পোলট্রি, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল। ঘুরে ঘুরে শেয়ারও কম বিক্রি করলাম না। অফিস করলাম শহরেই। আর দোতলায় চারখানা ঘর নিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম। ঠিক চারবোনের জন্যে চারখানা ঘর দিতে পারলাম না। তবে ওদের শোবার বসবার পড়বার জায়গা আর বেড়াবার জন্যে ছাদের ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে গেল। ডেয়ারি ফার্ম খুলে বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগ্নেদের দু-চারটে চাকরির ব্যবস্থাও আমরা করতে পারলাম। যারা একেবারে অনাত্মীয় যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁরাও যে কাজকর্ম না পেলেন তা [illegible]
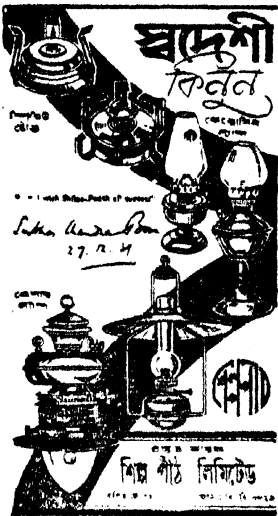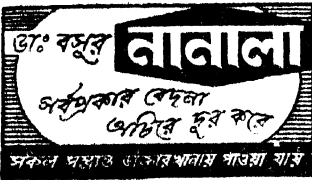
অনেক বেকার ছেলের বাপমায়ের আশীর্বাদ পেলাম। বহু পরিবার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল, যেমন একটি পরিবার হয়েছিল। কৃতিত্বটা আমার একার নয় তা আমি জানি। আমার বন্ধুদেরও যথেষ্ট অংশ এতে আছে। তবু তাঁরা বলতে লাগলেন 'তোমার জন্যেই এত বড় কাজটা হয়েছে।' নিজেকে কোনদিনই তেমন একটা কাজের লোক মনে করিনি। কিন্তু তাঁরা বললেন আমি না এগিয়ে এলে নাকি কিছুই হত না। আমি জোর করে আমার সেই বন্ধুদের টেনে না তুললে তাঁরা আমরণ অবসর শয্যাতেই পড়ে থাকতেন। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ডেয়ারির কাজ ভালোই চলতে লাগল। মুনাফাও মন্দ হল না।

গল্পের মত শোনাচ্ছে, না? আপনারা গল্পকাররাও সত্য ঘটনাকে ভয় করেন। কারণ সত্য হল গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু সেই বিস্ময়কে আস্তে আস্তে সইয়ে আনাই তো আপনাদের কাজ। আপনার কাজ আপনি করবেন। আমার সে শক্তি নেই, সময়ও নেই।

সবাই বলতে শুরু করল তিন চার বছরের মধ্যে আমি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছি। তা নাকি প্রায়ই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত।

আমি স্ত্রীকে ডেকে হেসে বললাম, 'সে প্রদীপ কোথায় জ্বলছে জান?'

শান্তি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'হয়েছে।'

ওর মুখে যে জবাবটি প্রত্যাশা করেছিলাম তা পেলাম না। ওর মুখে প্রদীপের যে আলোটি নতুন শিখায় জ্বলে উঠবে ভেবেছিলাম তা জ্বলতে দেখলাম না।

কিন্তু তা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার কি হাহুতাশ করবার আমার সময় ছিল না। তার একটু আগে প্রণব দত্ত অফিসের একটা জরুরী কাজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। বড় একটা কনট্রাক্ট হাতে প্রায় এসে পড়েছে। তাতে হাজার খানেক টাকা আসবে। আমি অফিস আর ফার্মের ব্যাপার নিয়েই তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। স্ত্রীকে একটু দেখাতে চাই যে তার খুশী হওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্যবস্তু নয়। পুরুষের আরো অনেক কাজ আছে, কীর্তির আলাদা ক্ষেত্র আছে। প্রণব দত্ত অফিসের সেক্রেটারী আর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, ইকনমিকসের এম এ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ছেলে। বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ রাখে। আমি ওকে সুধার জন্যে মনোনীত করে রেখেছি। আমার শাশুড়ীরও তাই পছন্দ। তাই আমার সামান্য ইশারায় শুধু বাড়ির দোরগুলি নয়, জানলাগুলিও ওর জন্যে খুলে গেছে। বাড়ির সব জায়গায় সবাইর কাছেই ও অবারিত। ওর ভূমিকাও অনেক। ও তিন বোনের কলেজের পড়া দেখিয়ে দেয়। চার বোনেরই চিত্তবিনোদন করে। কখনো সিনেমায় নিয়ে যায়, কখনো লেকে, কখনো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। শ্যালিকারা আর তাদের দিদি সবাই তার সান্নিধ্যে সুখী। আমি মাঝে মাঝে যে তাতে একটু চমকে না উঠি, খোঁচা না খাই তা নয়। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীকে আমি সব সময় চোখে চোখে রাখব তার সময় কই। এতদিনে বাণিজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গেও আমার শুভদৃষ্টি হয়েছে। সে দৃষ্টির মাদকতা তো কম নয়।

সারা দিন রাত আমি ব্যস্ত থাকি। অনেক রাত্রে ফিরে এসে শান্তিকে ঠিক আগের মত আর পাইনে। কখনো শুনি সে সিনেমা থেকে এখনো ফেরেনি। কখনো শুনি বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। তার এত বন্ধু আছে নাকি? অসম্ভব নয়। অবস্থা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

যেদিন বাড়িতে থাকে সেদিনও মিলনটা নিষ্কণ্টক হয় না। কথায় কথায় কেন যে খিটিমিটি লেগে যায় বুঝে উঠতে পারিনে। বুঝতে পারিনে কার দোষ বেশী। নানা কারণে আমার মেজাজও ভাল থাকে না। ব্যবসা চালাবার ঝামেলা অনেক। নানারকম লোককে নিয়ে কারবার।

তাই মাঝে মাঝে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'তোমার কি। তুমি তো সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ। একখানা হেলিকপ্টার কিনে দিলে উড়েও বেড়াতে পার।'

শান্তি বলে, 'দেখ, দিতে হয় দাও, না দিতে হয় না দাও। আমি দিনরাত অত খোঁটা আর সইতে পারব না।'

ঝগড়া লাগে। প্রায় প্রতি রাত্রে ঝগড়া লাগে। কারণে অকারণে সামান্য কারণে। খিটিমিটি বাধে। কেন এমন হয় আমি ঠিক বুঝতে পারিনে।

ঝগড়াঝাটির পর ও যখন পাশ ফিরে ঘুমোয় আমি ওকে চেয়ে চেয়ে দেখি। আমার শান্তি, আমার সেই শান্তি। ওর জন্যেই তো সব। ওর জন্যেই তো আমার এত বিত্তব প্রতিপত্তি, আমার এই নব যৌবন লাভ। যে যৌবনকে আমি শুধু ঘরের কাজে লাগাইনি, যে যৌবন দিয়ে আমি একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছি, আরো দশজনের অন্নের সংস্থান করেছি। আমার আসল শক্তি যে কোথায় তা তো আমি জানি, আমার আসল অন্নপূর্ণা যে কে তা তো আমার অজানা নেই, তবু কেন আমি ওকে পাইনে। ওর জন্যে এত পেলাম, কিন্তু ওকে পেলাম না কেন।

একদিন আমি জোর করে ওর ঘুম ভাঙালাম, মান ভাঙালাম। জড়িয়ে ধরলাম বুকের মধ্যে। ও হঠাৎ বলে বসল, 'ছাড়ো ছাড়ো।' আমার এক ডেন্টিস্ট বন্ধুর পরামর্শে সব দাঁত ফেলে দিয়ে দু-পাটি দাঁতই বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। দামী সেট। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। শান্তি বলল, 'তা ছাড়া তোমার মুখে কিসের একটা গন্ধ। দাঁতগুলির পরে শুলেই পার!'

বললাম, 'আমি নতুন করে নেশাভাঙও করিনে, কিছুই করিনে। যা ছিলাম তাই আছি। যখন খেতে পেতে না তখন কিন্তু আর গন্ধটন্ধ কিছু ছিল না।'

শান্তি বলল, 'ফের সেই খোঁটা?'

আমি বললাম, 'কেনইবা নয়? তুমি কি ভাব আমি কিছুই বুঝতে পারিনে! আমি কিছুই টের পাইনে? আমার গায়ের বাতাসটুকু পর্যন্ত তোমার আর এখন পছন্দ হয় না। এমন অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম আমি আর দুটি দেখিনি। একবার ভেবে দেখ তখন যদি না দেখতাম, কোথায় ভেসে যেতে।'

শান্তি বলল, 'সেই ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। এর চেয়ে মরণ ভালো ছিল আমার।'

এমনি চলল রাতের পর রাত।

মাঝে মাঝে থামে। তখন একেবারে কথা বন্ধ।

কিন্তু সেই অসহযোগও তো আমার কাম্য নয়।

কী যে আমি ওর কাছে চাই, আর কী যে পাইনে তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। সব সময়েই

যে ঝগড়াঝাটি চলে তা নয়। শান্তি কোন কোনদিন আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। হাসেও, কথাও বলে। কিন্তু আমার যেন মনে হয় আগে যা ছিল আসল এখন তার অভিনয় চলে। বাইরের দিক থেকে সম্পর্কটা ঠিকই আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার যে পরিবর্তনটা ঘটেছে তার নামও বিপ্লব।

তারপর যা ঘটবার তা ঘটল। শান্তি মৃত্যু কামনা করলেও মরল না। মৃত্যুর ওপর দিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রণবকে।

এই আশ্চর্য কাণ্ড কী করে ঘটল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ দেব না। সেটা আমার পক্ষে রুচিকরও নয় সুখকরও নয়। ও সব ব্যাপার আপনি নিজেই অনুমান করে নিতে পারবেন। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ফাঁকে ফাঁকে তিনটি নরনারীর মনোবিশ্লেষণ দিয়ে আপনি শ'দেড়েক দুই পাতা দিব্যি পারবেন ভরে ফেলতে। বউ পালানোর গল্প তো আপনি আর কম লেখেননি। পড়েছেন আরও বেশী। দেশে বিদেশে ও কাহিনীর তে আর অভাব নেই। কিন্তু দেখেছেন কখনো? আমিও পড়েছি, শুনেছি কিন্তু দেখিনি। স্ত্রী কারো সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর স্বামীর দশা যে কি রকম হয় কোনদিন তা চাক্ষুষ দেখা ছিল না। এবার হয়ে দেখলাম।

স্বামী পালিয়ে গেলে কি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তার স্ত্রীর ওপর সহানুভূতি দেখাবার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু পলাতকার স্বামীকেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। বন্ধুদের কাছ থেকে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকেও পালাতে হয়। তার আর মুখ দেখাবার জো থাকে না। কারো সহানুভূতি পর্যন্ত অসহ্য হয়। কারণ বন্ধুদের সমবেদনার তলায় যে চাপা বিদ্রূপ আর পরিহাস লুকিয়ে আছে তা কি আর তার টের পেতে বাকি থাকে? কুলের কালি দেখা যায় না, কিন্তু স্বামীর মুখের কালি সকলেরই চোখে পড়ে।

প্রথমে ভাবলাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই। না দাদা বউদির কাছে নয়, এ মুখ নিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারব না। অন্য কোথাও গিয়ে কিছু দিন পালিয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু বেরোবার জো রইল না।

আমার শাশুড়ী এসে আমার সামনে কেঁদে পড়লেন, 'বাবা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।' তাঁর সেই কান্নায় গলবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। তবু বিরক্তি চেপে শান্তভাবেই বললাম, 'আমি তো আর একেবারে চলে যাচ্ছিনে।'

তিনি বললেন, 'না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। এই অবস্থায় আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। যে মুখ-পুড়ী গেছে সে তার কপাল নিয়ে গেছে। তার সব পুড়ুক, সব ছারখার হয়ে যাক। তার কুষ্ঠ হোক, মহারোগ হোক তার। কিন্তু তোমার মনের যা গতিক তাতে তোমাকে তো ছাড়তে পারি না। তোমার জীবনের যে অনেক দাম।'

তাঁর চোখের জল আমার কাছে নির্মল বলে মনে হল। মাতৃস্নেহের স্বাদ পেলাম তাঁর কথায়, ব্যবহারে। সেই মুহূর্তে ওই-টুকু আশ্রয়ই বা আমার আর কোথায় জুটত?

শুধু তিনিই নন, সুধারা তিন বোনেও এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

সুধা বলল, 'অতুলদা, আপনি যেতে পারবেন না। একজনের অকৃতজ্ঞতা, একজনের পাপের শাস্তি আপনি আমাদের সবাইর ওপর চাপিয়ে দেবেন কেন?'

ওরা তিনজনে এখনো কলেজের ছাত্রী। এখনো ওদের কারো রোজগারের ক্ষমতা হয়নি। ওরা কি আমাকে শুধু সেই ভয়েই ধরে রাখতে চায়? সেই অনাহারের ভয়ে?

কিন্তু ওদের দিদির কাছ থেকে অত বড় ঘা খেয়েও আমি ওদের অতখানি অবিশ্বাস করতে পারলাম না। আর তা না করে তৃপ্তিই পেলাম। সত্যিই তো এতদিন ধরে ওদের কাছ থেকেও তো কম শ্রদ্ধাপ্রীতি পাইনি, কম সেবাশুশ্রূষা নিইনি।

আমি কোথাও গেলাম না। শুধু অফিস আর বাড়ি আলাদা করে দিলাম। নতুন একটা ফ্ল্যাটে এনে তুললাম ওদের।

অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর মা আর বোনেরা আমার অন্নাশ্রিত হয়েই রইল। আমি থাকতে চাইলাম তাদের হৃদয়ের আশ্রয়ে।

আশ্চর্য, শান্তির মুখের আদল ওদের সব কটির মুখে। একই রকমের গলা, একই রকমের উচ্চারণের ভঙ্গি। হাঁটা চলার ধরণও একই রকম। সেই একজনের প্রতিচ্ছায়া আমি ওদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখতে পেলাম যে আমাকে সব দিয়েছিল, আবার সব কেড়ে নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধব কেউ এসে শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে তার মা আর বোনেরা সবাই বলে দেয় সে মরে গেছে। হঠাৎ হার্ট ফেল করে মরে গেছে। হৃদয়ের পরীক্ষায় সে ফেল করেছে না পাস করেছে কে জানে? বোধ-হয় পাসই করেছে। ফেল করবার দুর্ভাগ্য একা আমার।

ওরা বলে সে মরে গেছে। কিন্তু স্মৃতি কি অত সহজে মরে? জ্বালা কি অত অল্পে জুড়োয়?

আমার দগ্ধ ঘায়ে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে ওদের কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই।

ইলেকট্রিক ফ্যান আছে তালপাখার হাওয়ায় আর দরকার হয় না। রাঁধুনী আছে, হাত পুড়িয়ে কাউকে আর রাঁধতে হয় না। কিন্তু খাওয়ার কাছে আমার শাশুড়ী এসে রোজ বসেন। শ্যালিকারা আমার ঘর আর টেবিল গুছিয়ে দেয়, ফুলদানি ফুলে ভরে রাখে। সন্ধ্যায় ফিরে এলে কাছে বসে গল্প করে।

সবাই আছে শুধু একজন নেই। সে মরে যায়নি, সরে গেছে।

দিদির নাম ওরা কেউ মুখেও আনে না। সুধার রাগ সবচেয়ে বেশী। কারণ শান্তি তো শুধু আমাকেই ঠকিয়ে যায়নি, ওকেও বঞ্চিত করে গেছে।

বছর ঘুরে এল। আমার শাশুড়ী সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে বসলেন। আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন কারবারের কথা জানতে চাইলেন। আরও কিছুক্ষণ ভূমিকার পর বললেন, ওদের তো একটি একটি করে এবার পার করা দরকার।'

আমি বললাম, 'আমারও তাই ইচ্ছা। সুধা বলে এম এ না পাস করে ও বিয়ে করবে না। বোনদের কাছে বলেছে কোন দিনই করবে না। চিরকুমারী থেকে দিদির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি আর দীপ্তিও নাকি সেই পণ করেছে। যত সব ছেলেমানুষি।'

শাশুড়ী বললেন, 'ছেলেমানুষি ছাড়া কি। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করেছে। এভাবে থাকলে ওদের তিনজনের নামেই বদনাম রটবে। কারোরই বিয়ে হবে না। তার চেয়ে তুমি বরং সুধাকে—।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'ছিঃ কী বলছেন আপনি।' শাশুড়ী তখনকার মত চুপ করে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে আমি নিজের মনেই হাসলাম। মৃতা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে গেছে তার বোনকে নিয়ে ফের ঘর বাঁধবার সাধ থাকলেও সাহস আছে কার? এরাই দুর্বার রক্তের ধারা তো তারও শিরায়।

পরদিন সুধা কলেজে বেরোচ্ছিল আমি ওকে ডেকে হেসে বললাম, 'আর, শুনেছ নাকি তোমার মার কথা? তিনি তোমাকে তোমার দিদির আসন পাকাপাকিভাবে দখল করতে বলছেন। তার আর ফিরে আসার লক্ষণ নেই।'

আমি কথাটা হেসেই বলেছিলাম। স্ত্রীর বোনের সঙ্গে এ সব রসিকতা কে না করে। আগেও তো কত করেছি। সুধা কিন্তু হাসল না। সে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখখানা একেবারে শ্বেতপাথরের মূর্তির মুখ।

সুধা বলল, 'আপনি তাও পারেন।'

তারপর মুখ ফিরিয়ে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল।

কেন জানি না, আমার হাত দুটি আপনিই মুষ্টিবদ্ধ হল। বাঁধানো দু পাটি দাঁত আক্রমণ করল পরস্পরকে। আমি নিজের মনেই বললাম, 'পারি বই কি, আমি সব পারি। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে, ইচ্ছা করলে আমি না পারি কি? যে ঘা আমি খেয়েছি তার চতুর্গুণ কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না?'

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, ছি ছি ছি। ছি ছি ছি। গাড়িতে করে ডেয়ারির কাজ দেখতে চলে গেলাম।

ফিরে এলাম অনেক রাত্রে। দেখি সুধা তখনো জেগে আছে। আমার জন্যেই নাকি জেগে আছে। আমার সঙ্গে গোপন কথা বলবে বলে।

সেই রাত্রে আমার ঘরে একা চলে এল সুধা। গম্ভীর, শান্ত মুখ।

মৃদুস্বরে বলল, 'অতুলদা, আপনি কি রাগ করেছেন?'

আমি বললাম, 'না না, রাগ করব কেন।'

সুধা বলল, 'আমি বড়ই দুর্ব্যবহার করেছি।'

দিদি যা করে গেছে সে অন্যায় তো কিছুতেই মুছবে না। এর পর আমরাও যদি—। ছি ছি ছি। আমাকে মাপ করুন অতুলদা।'

সুধা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

আমি বললাম, 'মাপ করবার কি আছে। তুমি তো কোন দোষ করনি, শুধু বুঝতে ভুল করেছ। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম সুধা। সেটুকু করবার অধিকারও কি আমার নেই?'

বলে আমি ওর হাত ধরে তুলতে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতখানাকে সরিয়ে নিল। যে সুধাকে আমি বেণী ধরে টেনেছি, হাত ধরে টেনেছি, গাল টিপে দিয়েছি, আজ সে আমার সামান্য স্নেহ-স্পর্শটুকু গ্রহণ করতে পারে না, আমি আজ এতই অস্পৃশ্য! এত বড় স্পর্ধা এত দুঃসাহস ওর। আমি যদি ওকে এই মুহূর্তে বুকে তুলে নিই, ও কী করতে পারে।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। শুধু একমুহূর্ত সময় নিয়ে বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।'

সুধা বলল, 'কিন্তু মা যা বলছেন, তাই হয়তো ঠিক। আপনি যদি তাই চান আমার —আমার কোন আপত্তি নেই।'

বলে মুখ নিচু করল সুধা। জানি না হাসল কিনা।

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'আমি কাউকে চাই না, তোমাদের কাউকে চাই না। চলে যাও এ-ঘর থেকে।'

সুইচ অফ করে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। সুধার ব্যবহারের কথা ভেবে নিজের মনেই হাসলাম। আমাকে কী ভেবেছে ওরা?

আমি কি বকরাক্ষস যে ওরা একটির পর একটি পালা করে আত্মদান করবে? এক-বার তো এক ভীমের হাতে হত হয়েছি, আর কতবার নিহত হব?

তারপর দিন আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমাদের চালচলন কথাবার্তা শান্ত সংযত ঠিক আগের মত।

ইতিমধ্যে আমি আরো কয়েকবার চলে যেতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তোমরা তো আর নাবালিকা নও। নিজেরাই বেশ থাকতে পারবে। আমি আলাদা জায়গায় গিয়ে থাকি। খরচপত্রের জন্যে ভেব না। তা যেমন আসছে তেমনি আসবে।'

সুধা বলল, 'অতুলদা, আপনি একথা মুখে আনছেন কি করে? আপনার চেয়ে আপনার টাকাটাই কি বড়? আপনি নিশ্চয়ই সেদিনের রাগ ভুলতে পারেননি।'

ওর চোখ দুটি ছলছল করে উঠে-ছিল।

ও-চোখ আমি আগেও দেখেছি। সেই জল। তারপর প্রচণ্ড জ্বালা।

সুধা এম এ পাস করেছে। কিন্তু বিয়ে করেনি।

তৃপ্তি দীপ্তিও ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল। সব খরচ আমিই চালাচ্ছি। তার বদলে ওদের সেবাশুশ্রূষা আর কৃতজ্ঞতাও পাচ্ছি।

সুধার মা তাঁর সেই প্রস্তাব তুলে নেননি। সুধাও আরো দু একবার বলেছে তার কোন আপত্তি নেই।

আমি যদি চাই তা হলেই পাই।

কিন্তু সে পাওয়ার মানে যে কী তা কি আমি আর জানিনে? আমি আর চাইব কোন্ ভরসায়?

মুখেও বলি, নিজের মনেও বলি, 'চাইনে চাইনে চাইনে। এই জীবনের কাছ থেকে আমি আর কিছু চাইনে। আমার চাইতে নেই।'

আমি দিন রাত কাজকর্মে ডুবে থাকি। বিশেষ করে শহরের বাইরেই আমার বেশি সময় কাটে। আমি সেখানেই শান্তি পাই। সেই কাঁচা ঘাস, সাদা দুধ আর সবুজ গাছ-পালার রাজ্যে আমি মাঝে মাঝে দু চোখ মেলে দিয়ে বসে থাকি।

কিন্তু সেই চোখই যদি একমাত্র চোখ হত, তাহলে আর কোন দুঃখ ছিল না।

ওরা তিনজন সুধা তৃপ্তি দীপ্তিরাও কেউ থেমে নেই। তিন সমান্তরাল রেখায় তিনটি জীবনধারা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে আমি সেদিকেও তাকাই। একজনের চলে যাওয়ার লজ্জাকে ওরা ভুলেছে, দুঃখকে মনে করে রাখেনি। নিজেদের কৃতিত্ব দিয়ে গৌরব আর গর্ব দিয়ে ওরাও যার যার নিজের স্বতন্ত্র পৃথিবীকে গড়ে নিচ্ছে। দিনের পর দিন ওদের গুণগ্রাহী বন্ধুদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমি এক একদিন চেয়ে চেয়ে দেখি। তারা আসে যায়, হাসে, ঠাট্টা-তামাসা করে। কিন্তু আমি হঠাৎ ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লেই ওরা যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুর কেটে যায়, তাল ভঙ্গ হয়। আমি কি এতই অপয়া? আমাকে দেখলেই কি ওদের সব কথা মনে পড়ে? সব বাধা নতুন হয়?

বন্ধুদের ফেলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে।

সুধা বলে, 'অতুলদা, আপনি কদিন ধরে বড় কাশছেন। একটা ওষুধটষুধ খান।'

আমি বলি, 'ভয় পেয়ো না। সামান্য কাসি। টি বি নয়।' সঙ্গে সঙ্গে সুধার হাসি মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

আমি নিজেও বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

তৃপ্তি বলে, 'আপনার খাবারটা এখন এনে দিই অতুলদা।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'না না, এখন থাক।'

দীপ্তি বলে, 'অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যান।'

আমি বলি, 'তোমরা খাও। গোয়ালা কি আর দুধ খায়?'

ওরা স্তব্ধ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনটি তরুণীর মূর্তি। শ্বেতপাথর দিয়ে গড়া। তিনটি চঞ্চল ঝরণা হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড শাপে বরফের স্তূপ হয়ে রয়েছে।

আমি তো তা চাইনি।

আমি চাইনে ওরা আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পাক, আমি চাইনে আমার মুখের কথায় ওদের মুখের হাসি শুকিয়ে যাক।

আমি ওদের কাছে দুর্ভাগ্য আর দুঃস্বপ্নের প্রতীক হয়ে থাকতে চাইনে।

তবু ওরা আমার চোখে কী দেখে ওরাই জানে।

# বাঙলা কমিউনিস্ট সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

জজ সাহেবের বিচারের সহিত সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন জুরীর বিচার যুক্ত হইবার পদ্ধতির প্রয়োজন স্বীকৃত আছে; তেমনই বিশেষজ্ঞগণের মতামতের সহিত সাধারণ পাঠকের মতামত যুক্ত হইবারও প্রয়োজন থাকিতে পারে; সেই কথা স্মরণ রাখিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

বাঙলাদেশের ছাত্র-সমাজের সহিত যেটুকু পরিচয় আছে তাহাতে মনে হয়, অধিক-সংখ্যক ছাত্রের ঝোঁক কমিউনিজ্‌ম্‌-এর দিকে। অনেকে তথ্যটির উপর বিশেষ কোনও মূল্য আরোপ করিতে চান না এই বলিয়া যে, ছাত্র-সমাজের এই ঝোঁকটা সব ক্ষেত্রে না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা রোম্যাণ্টিক্‌ ঝোঁক। সে-কথাটা সত্য হইলেও আলোচ্য তথ্যটি একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায় না। চিন্তার রোমান্সের আকর্ষণ কম নয়, মানসিক এবং চারিত্রিক সংগঠনে তাহার প্রভাবও তাই উপেক্ষণীয় নয়। পরিশীলিত-বুদ্ধি আমাদের যুবকগণ কমিউনিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে নূতন নূতন চিন্তার খোরাক বেশি পাইতেছে; সবগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় মনে না হইলেও, অথবা বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্যগুলি সব কর্মগ্রাহ্য হইয়া না উঠিলেও একটানা গতানুগতিক চিন্তাধারার মধ্যে যে বিপরীত প্রবাহের আলোড়ন তাহা আনন্দের রসদই যোগাইতেছে। যে-কারণেই হোক, আমার অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস, যুব-সমাজের ঝোঁক কমিউনিজ্‌ম্‌-এর দিকে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, এক কেরলার কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের নব-নির্মিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট প্রাধান্য লক্ষণীয়, এবং ভোটের ফল যদি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র গ্রাহ্য হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে, কমিউনিস্ট-প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে বিবর্ধমান। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, সাম্প্রতিক-কালের সাহিত্য-স্রষ্টা এবং ব্যাখ্যাতৃদলের মধ্যে যে সংখ্যাটি নিজদিগকে প্রকাশ্যে কমিউনিস্টপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত ত নহেই, বরঞ্চ উৎসাহী, সে সংখ্যাটিও নেহাৎ কম নহে।

কিন্তু এক দিক্‌ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, বাঙলাদেশে নানাভাবে কমিউনিস্ট প্রভাব লক্ষিত হইলেও গত বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে খাঁটি কমিউনিস্টপন্থী সাহিত্যের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে লক্ষণীয় নয়। ১৩৩০ সালের পূর্বে যে বাঙলা কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দৈব-বিরোধী, সমাজের কৃত্রিম ভেদ-বিরোধী এবং শোষণ-বিরোধী মনোভাব বহু স্থানে ছড়ান আছে, কিন্তু বাঙলাদেশে তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট সচেতনতা দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। তাহার পর হইতে অবশ্য কমিউনিস্ট-পন্থী কবিতা প্রচুর রচিত হইয়াছে, কিন্তু তবু মন সংশয়ান্বিত, কমিউনিস্টগণ যাহাকে খাঁটি কমিউনিস্ট সাহিত্য বলেন সেরূপ সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট খাঁটি কমিউনিস্ট সাহিত্য খুব বেশি গড়িয়া ওঠে নাই। সত্তার গভীর হইতে উৎসারিত প্রেরণা অপেক্ষা সাময়িক উত্তেজনা এবং ভঙ্গিপ্রাধান্য অনেক স্থলে অধিক সক্রিয় ছিল; সেইজন্যই হয়ত অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি যেমন চমকপ্রদ হইয়াছে, পরিণতি ততখানি চমৎকৃতিপ্রদ হয় নাই। এ-ক্ষেত্রে আমার অধ্যয়নের পরিধি সীমিত সে-কথা অতি বিনীতভাবেই স্বীকার করিতেছি। যেটুকু পড়িয়াছি তাহার উপরে নির্ভর করিয়া যখন ভাবি কমিউনিস্টপন্থী কবিতা আমাদের কতটা গড়িয়া উঠিয়াছে, খুব বেশি লোকের কথা—খুব বেশি পরিমাণ কবিতার কথা মনে জাগে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমায় এ-দিক হইতে যে প্রতিশ্রুতি আছে, 'সম্রাট'কে ঠিক তাহারই পরিণতি বলিতে পারি না; প্রৌঢ় বয়সে 'সাগর থেকে ফেরা'র বেলায় সকল প্রকাশ-চমৎকৃতির মধ্যে মনে অন্যরকমের হাওয়া লাগিবার সন্ধান মেলে। কিন্তু বলা হইতে পারে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ঠিক কমিউনিস্ট নহেন, সুতরাং সহজাত কতগুলি অনুকূল বোধ সত্ত্বেও প্রবহমাণ 'পেতি-বুর্জোয়া'র স্রোতের টানে বিপথ-গামিতা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নহে। অধুনা-প্রৌঢ় কবিগণের মধ্যে এ-ক্ষেত্রে অবশ্য দলগত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বিষ্ণু দে; কবিতাতেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে কমিউনিস্ট আদর্শ, এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিষ্ণু দের কবিতা পড়িয়া মনে হইয়াছে, কমিউনিজ্‌ম্‌ এখানে অনেকখানি বিচক্ষণবুদ্ধি-ধৃত; অচ্ছেদ্য প্রত্যয়-লব্ধ নয়। মননের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে একটা অনুকূলতা, জীবনযাপনের অনুভূতির রসে তাহার যথেষ্ট পরিপুষ্টি নাই। কমিউনিজ্‌ম্‌ যে তাঁহার সহজাতবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে নাই তাহার যথেষ্ট যুক্তি নিহিত আছে তাঁহার কাব্য-প্রবৃত্তির ভিতরেই। কমিউনিস্ট-প্রীতি তাঁহার জীবনগত হইলে, সাহিত্যের ভাষা যে শুধুমাত্র ব্যক্তির ভাষা নয়, ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীরও ভাষা নয়—ইহা যে একটা সামাজিক ভাষা, কবিকর্ম যে মূলত একটা সামাজিক কর্ম এই প্রাথমিক সত্যটিকে তিনি অতিমাত্রায় অবহেলা করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতায় দেখিতে পাই চিত্ত-নির্লিপ্তির আবেশ, উহাও আমার বিচারে তাঁহার একটা অন্ত-র্নিহিত কমিউনিস্ট-বিমুখতা। মিছিলের কথা তিনি মাঝে মাঝে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে হয়, তাহা অনেকখানি একটা নিরাপদ ব্যবধান হইতে, মিছিলে ভিড়িয়া দলের মধ্যে এক হইয়া উঠিবার আগ্রহের সত্যতা, অন্তত সেই আদর্শনিষ্ঠা আমার নিকট সন্দেহাতীত হইয়া ওঠে নাই। এ-বিষয়ে আমি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে অধিক স্বীকৃতি দিবার পক্ষপাতী। আমি কবি-কৃতির চমৎকারিত্বের দিক হইতে কোনও তুলনার কথা আদৌ তুলিতেছি না; আমি বলিতেছি আদর্শনিষ্ঠা, পুরুষীয় গভীর সত্তায় ধৃত প্রত্যয় এবং সেই প্রত্যয় হইতে উৎসারিত প্রেরণার সত্যতার কথা। সুকান্তের কবিকৃতি লইয়া নানাদিক্‌ হইতে খানিকটা বাড়াবাড়ি হইতেছে এ-কথা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু একদিক হইতে আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল—আমি তাঁহার প্রেরণার সত্যতায় বিশ্বাসী। তাঁহার আদর্শকে কোথাও ভঙ্গি বলিয়া সন্দেহ করি নাই, তাঁহার প্রত্যয়কে শুধুমাত্র অনুশীলিত-চিত্তের মনন-বৈচিত্র্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রলুব্ধ হই নাই। কিন্তু সুকান্তের পরীক্ষা হয় নাই; প্রথম যৌবনে যে বিশ্বাস এবং আদর্শ তাঁহার সবুজ দেহমনের প্রতিটি অণুপরমাণুকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল তাহার ঔজ্জ্বল্যের বিশুদ্ধি ও স্থায়িত্ব দীর্ঘ জীবনের প্রজ্ঞার কষ্টিপাথরে কষিত হয় নাই; জীবনের দীর্ঘ ব্যাপ্তিতে তাহা কি পরিণতি লাভ করিত সে-সম্বন্ধে বিচার-সিদ্ধান্তই যে অসম্ভব তাহা নহে,—অনুমানও অচল। তাঁহার যথার্থ কবিকর্ম

প্রথম যৌবনেই একটি খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—যে খবর সম্বন্ধে 'ছাড়পত্রে'র 'খবর' কবিতায় অতি নিপুণভাবে বলা হইয়াছে—

কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই
আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।

সেই খবরের তাৎপর্য তাঁহার দীর্ঘজীবনের ব্যাপ্তিতে ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে যদি ব্যাখ্যাত হইবার সুযোগ লাভ করিত, তবেই এ-বিষয়ে আমরা সংশয়াতীত হইতে পারিতাম।

এই আদর্শনিষ্ঠা এবং প্রত্যয়ের দৃঢ়তা বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও স্মরণ করি, কারণ তাঁহার কবিতার বহু স্তবক ও পঙ্‌ক্তি আমাকে চমকিতও করিয়াছে, চমৎকৃতও করিয়াছে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সব কবিতা পড়িয়া যখন ফলশ্রুতির বিশ্লেষণ করিয়াছি তখন মনে হইয়াছে, কবিমনের প্রকাশে 'হ্যাঁ-ধর্ম' অপেক্ষা 'না-ধর্মে'র প্রকাশই যেন বেশি। কথা হইতে পারে, প্রথমে 'না-ধর্মে'র ভিতর দিয়া ভাঙ্গার কাজটা পরিপূর্ণ না হইলে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার 'হ্যাঁ-ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত হইবে কি করিয়া? কিন্তু 'না-ধর্মে'র নেশা যদি 'হ্যাঁ-ধর্মে'র উষাকে ম্লান করিয়া দেয় তখনই মনে সন্দেহ আসে, প্রতিক্রিয়াকে আবার প্রেরণা বলিয়া ভুল করিতেছি না ত? সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়ার গোলমাল অনেক সময় ভাবিত করিয়া তোলে; কারণ বিপদ্ এইখানে যে, সহসা উভয়েই যেন এক আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া আসিয়া হাজির হয়। ভাবিয়া দেখিয়া একটা সোজা চিহ্ন ঠাহর করিয়া লইয়াছি; প্রতিক্রিয়া প্রকৃতিতে সাময়িক, প্রেরণা 'সময়োদ্ভব' হইয়াও সময়াতীত; প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি-সত্তার প্রচ্ছন্ন আক্রোশ ও বিলাপ, প্রেরণায় বিশুদ্ধ সমাজসত্তায় বা বিশ্বসত্তায় প্রতিষ্ঠা; প্রতিক্রিয়া মুখ্যত 'না-মুখী', প্রেরণা মুখ্যত 'হ্যাঁ-মুখী'।

এই প্রতিক্রিয়া ও প্রেরণার প্রশ্নটা আমার মনে দেখা দিয়াছে বিমল ঘোষের কবিতার ক্ষেত্রেও। স্থানে স্থানে তাঁহার অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা আমাকে বিস্মিত করিয়াছে; স্থানে স্থানে মনে হইয়াছে, তিনি তাঁহার হৃদয়ের গভীরে সত্য সত্যই একটা নূতন আবির্ভাবের পদধ্বনি যেন লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু সময়ে সময়ে আবার মনে হইয়াছে, প্রতিক্রিয়ার উদগ্র সক্রিয়তা প্রেরণার মহিমাকে অনেকখানি পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু আমার মুখ্য লক্ষ্য বাঙলার কমিউনিস্টপন্থী কবিগণের কাব্য-সমালোচনা নয়, আমি শুধু বলিতেছি যে, একদিক হইতে বিচার করিলে খাঁটি কমিউনিস্ট কবিতা বাঙলা সাহিত্যে খুব বেশি নাই; আমি যাঁহাদিগকে কমিউনিস্ট কবি বলিয়া স্বীকার করি, সুকান্ত, সুভাষ, বিমল ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন কবিমাত্রই তাহার ভিতরে উল্লেখযোগ্য। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় এই, বাঙলাদেশে চিন্তায় ও কর্মে যেরূপ কমিউনিজ্‌ম্-এর প্রাধান্য বলিয়া মনে হয়, বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে তাহার আনুপাতিক স্বাক্ষরের অভাব। যাঁহারা এ-ক্ষেত্রে খুব বড় করিয়া বলিয়া উঠিবেন—এই ইঁহারা এবং ইঁহাদের সঙ্গে আরও দু' চারিজন যে কবিতা লিখিয়াছেন যা' কিছু হইবার ইহাই হইয়াছে—বাদবাকি সব বস্তাপচা আস্তাকুঁড়ে ঢালিবার মাল, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই,—শুধু বিনীতভাবে বলিয়া রাখিতে পারি, আমরা একমত নহি।

কবিতার ক্ষেত্রে যেটুকু সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট কমিউনিজ্‌ম্-এর স্বাক্ষর মেলে, বর্তমান যুগের বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধতম দিক্ কথাসাহিত্যের ভিতরে ততখানি স্বাক্ষর মেলে বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণও অতি স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে আমরা আজকাল মাঝে মাঝে সত্তার সচেতন পরিধিকে অতিক্রম করিয়া অবচেতন এবং অচেতনের মধ্যে তলাইয়া যাইবার কথা যত বড় করিয়াই বলি না কেন, আসলে বর্তমানে কবিতা-রচনায় সচেতন-প্রক্রিয়া পূর্ব পূর্ব যুগ হইতে অনেক বেশি, অচেতনে অবলুপ্তির চেষ্টাটাও অনেক সময় সচেতনভাবেই করিয়া থাকি। কিন্তু কথা-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়াও নিজেকে এইরূপ সদাসচেতন করিয়া রাখা সম্ভব নহে, সুতরাং কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদিগকে অনেকখানি সহজ-স্বাভাবিকতায়ই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইয়াছে। সেই সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যে কমিউনিজ্‌ম্ কতখানি রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহা বিচার্য। এ-যুগের বড় কথা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পল্লী ও অরণ্যকে অবলম্বন করিয়া যে সর্বাতিশায়ী প্রকৃতি-প্রবণতা তাহা কমিউনিজ্‌ম্-এর অনুকূল নহে। প্রবোধ সান্যালের লেখায় বস্তুনিষ্ঠা নাই এমন বলিতে পারি না; শ্রেণী সংগ্রাম, বঞ্চিতের বেদনা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ভাঙনের দৃশ্য—অনেক কিছুই আছে; কিন্তু সকলের উপরে আছে তাঁহার ভবঘুরে মনের একটা উদাসী রোম্যাণ্টিকতা—তাঁহার কথা-সাহিত্য ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উভয় ক্ষেত্রেই; সেই রোম্যাণ্টিক ধাঁচ তাঁহার বস্তুনিষ্ঠাকে বাষ্পীয় করিয়া দিয়াছে। এক সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গণ-সংগ্রামের উদ্‌গাতারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন; প্রগতি-সাহিত্যের মিছিলে কোনও সময়ে তাঁহাকে পুরোধারূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম; আজ তিনি বিধর্মী বলিয়া পরিগণিত না হইলেও জাতিচ্যুত।

শৈলজানন্দ আশ্চর্য বস্তুনিষ্ঠা ও অকপট দরদ লইয়া সবল বাহুতে একবার 'কয়লা কুঠি'র দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন; কিন্তু তাহার পরে বুর্জোয়া-বিলাসের মধ্যে আস্তে আস্তে কোথায় গা ঢাকা দিলেন। দলনিষ্ঠা বা মতনিষ্ঠার দিক হইতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ অবধি কমিউনিস্ট ছিলেন; কিন্তু যে উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি অবলম্বনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা সাহিত্যে একজন সার্থক কথাশিল্পী রূপে স্বীকৃতি তাহাদের মধ্যে কমিউনিস্ট-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কোথায় কতটুকু ফুটিয়াছে? আমার ত যে-সকল উপন্যাসের দ্বারা তাঁহার বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা সেই সব প্রসিদ্ধ উপন্যাস পড়িয়া মনে হইয়াছে, তিনি এ-ক্ষেত্রে একজন নব-রোম্যাণ্টিক। তাঁহার শেষের দিকের উপন্যাসগুলি এবং

ছোট গল্পের মধ্যে অবশ্য শ্রেণীসংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের কথা বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে; এই যুগের তাঁহার অনেক-গুলি গল্প গল্প হিসাবেও সার্থক মনে হইয়াছে; কিন্তু উপন্যাসগুলিও ঔপন্যাসিক উচ্চমান রক্ষা করিয়াছে কি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি কালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম দিকের লেখাগুলির মধ্যে যে গণ-চেতনা ও গণ-জাগরণের আভাস ও আহ্বান রহিয়াছে তাহা মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ঐ জাতীয় লেখার সুর হইতে কোনও অংশে অস্পষ্ট বা দুর্বল বলিয়া আমার মনে হয় নাই। রাজনৈতিক পট-ভূমিকায় আমাদের যে-সকল উপন্যাস রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে গণ-জাগৃতির কোনও ব্যাপক রূপ বলিষ্ঠভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আধুনিক কালের আর একজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মতনিষ্ঠার দিক হইতে কমিউনিস্ট; কিন্তু তাঁহার লিখিত উপন্যাস এবং ছোট গল্পগুলি পড়িয়া মনে হইয়াছে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তিনি কোথায়ও একেবারে সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট কমিউনিস্ট হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের স্থানে স্থানে—বিশেষ করিয়া তাঁহার কতগুলি সার্থক ছোট গল্পের মধ্যে তাঁহার যে বস্তুনিষ্ঠা বা গণচেতনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবশ্য লক্ষণীয়; কিন্তু এই পরিমাণ বস্তুনিষ্ঠা ও গণ-চেতনা সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিক এবং গল্পকারগণের লেখায় একান্তভাবে দুর্লভ বলিয়া মনে হয় নাই। এ-ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি তাহা হইলে এই, সচেতন আদর্শনিষ্ঠা অচেতন শিল্পায়নের উপরে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেছে না কেন? আদর্শ-নিষ্ঠার রূপায়ণের দিক হইতে বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকখানি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে গোপাল হালদারের কয়েকখানি উপন্যাস। কথাশিল্পের দিক্ হইতে সেগুলি কতখানি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে সে প্রশ্ন হয়ত কেহ সঙ্গে সঙ্গেই তুলিতে পারেন; সে প্রশ্নের জবাব দিবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ না করিয়া আমি শুধু এইটকুই বলিতে চাই, আদর্শনিষ্ঠা শিল্পচেতনাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত কথাশিল্পিগণের মধ্যে গোপাল হালদারের উপন্যাসগুলির মধ্যেই বেশি দেখিতে পাই।

এতক্ষণ যে তথ্যগুলি উল্লেখ এবং আলোচনা করিলাম তাহা হইতে আমি একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে চাই; সে সিদ্ধান্তটি এই যে, যে কমিউনিস্ট মতবাদ এবং আদর্শ আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে, আমাদের সাহিত্যে এখন পর্যন্ত তাহার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর নাই। ইতিমধ্যেই আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে একজন গোর্কি বা ডস্টয়ভস্কি গড়িয়া ওঠেন নাই কেন এমন আহাম্মুকে আক্ষেপ লইয়া আমি এই আলোচনার অবতারণা করি নাই; আমি যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এই, আমরা কমিউনিস্ট হইয়া জীবনাদর্শ এবং সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে মুখে যাহা বলি, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নিজেরাই হাতে তাহা করি না। কেন করি না, তাহাই হইল প্রধান প্রশ্ন। মুখে আমরা যে সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট কমিউনিস্ট সাহিত্যের কথা বলি তাহার পূর্ণসম্ভাব্যতার কথা এবং তাহার বাঞ্ছনীয়ত্বের প্রশ্নের আলোচনা আমি পরে করিব। কিন্তু পরি-পূর্ণ সংজ্ঞা-নির্দিষ্টতার কথা ছাড়িয়া দিয়াও এ বিষয়ে আমার দুইটি কথা সাধারণভাবে মনে হইয়াছে।

প্রথমত আমার মনে হইয়াছে, কমিউ-নিজ্‌ম্ এখন পর্যন্ত আমাদের চিত্তের সচেতন স্তরে পৌঁছিয়া সেইখানেই ক্রম-বর্ধমান আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে—তাহার নিচের স্তরগুলিতে তাহা ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতেছে, কিন্তু এখনও তাহা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সচেতন স্তরের এই তীব্র আলোড়ন কোথাও প্রতি-কূল প্রতিক্রিয়ায় তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি করিতেছে, কোথাও অনুকূলতার গ্রহণ-যোগ্যত্বে আনুগত্যের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু বিচারবুদ্ধি দ্বারা আমরা যে শ্রেয়ের নিকট আনুগত্য স্বীকার করি সেই শ্রেয়ো-বোধই আমাদের সাহিত্য-প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে পারে না। সচেতন প্রয়াসে গৃহীত শ্রেয়োবোধ সচেতন সাহিত্য-কর্মেই উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, ক্রমবর্ধমান একটা গোটা-জীবনের শিল্পকর্মের প্রেরণারূপে তাহা সক্রিয় হইয়া ওঠে না।

আসলে প্রেরণা হইল জীবনের গভীর মূল হইতে উৎসারিত একটি অনিবার্য শক্তির অমোঘ তাগিদ; এই শক্তির আশ্রয় আমাদের তথ্যসমর্থিত নির্ভুল মনন-ক্রিয়া নয়, ইহার আশ্রয় আমাদের চিত্তধৃত গভীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসহীন প্রেরণার আমি কোনও ধারণা করিতে পারি না।

অধুনা বহুসমালোচিত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, জীবনের মূলে তাঁহার কতগুলি দৃঢ়বিশ্বাস ছিল; এই বিশ্বাসগুলি হইতেই উৎসারিত হইয়াছে তাঁহার সকল প্রেরণা। এই বিশ্বাসগুলি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অনুভূতি-অভিজ্ঞতা দ্বারা বিবর্তিত হইয়া পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই। ঊনবিংশ শতকের কোন্ অনিয়ন্ত্রিত সমাজ-অহিতকর বিশেষ উৎপাদন-প্রথা হইতে জাত সমাজ-শক্তিসমূহ রবীন্দ্রনাথের এই সকল বিশ্বাস-প্রবণতার জন্য দায়ী তাহা বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া এই সকল বিশ্বাস-প্রবণতার আদর্শ-সমাজজীবন গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য-অসামর্থ্য বিচার করিয়া ইহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে যত ইচ্ছা মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই সকল অনুকূল-প্রতিকূল মন্তব্যসমূহকে উপেক্ষা করিয়া একটা সত্য প্রকাণ্ড সত্যরূপেই দাঁড়াইয়া থাকে যে, এই জাতীয় কতগুলি দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন বিধৃত ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন জুড়িয়াই ছিল অফুরন্ত প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা রূপায়িত হইয়াছে অজস্র শিল্পকর্মে—যে শিল্পকর্মকে বহুমূল্য জাতীয় সম্পদ্ বলিয়াই আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি।

বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্বের দ্বারাই তাহার মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে, এ-সত্য বস্তু-নিষ্ঠগণ কর্তৃকও স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের আজীবন একটি অধ্যাত্মবিশ্বাস ছিল; সেই অধ্যাত্মবিশ্বাস আজ হয়ত প্রকাণ্ড একটা 'ভাওতা' বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-বিশ্বাস জিনিসটা মূলতই মিথ্যাশ্রিত বলিয়া হয়ত তাহা 'ভাওতা'রূপে অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসটি ভাওতা নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে এবং তাঁহার সকল শিল্পকর্মে ইহার প্রত্যক্ষ অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে। এই অধ্যাত্মবিশ্বাস যদি মিথ্যাশ্রয়ী এবং সমাজ-অহিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে তবে শুধু সংশয়কণ্টকিত হইয়া থাকিলে চলিবে না, ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচায় খোঁচায় এই বিশ্বাসকে কদাকার করিয়া তুলিলে চলিবে না; অধ্যাত্মবিশ্বাসের বিরোধি-ধর্ম সংশয়, অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ নহে, অধ্যাত্মবিশ্বাসের বিরোধি-ধর্ম বলিষ্ঠ বস্তুবিশ্বাস। বিশ্বাস চাই-ই চাই, হয় অধ্যাত্মবিশ্বাস না হয় বস্তু-বিশ্বাস; মাঝামাঝি পথটাই হইল দুর্বলতার পথ, দুর্বলতাই বন্ধ্যাত্বের কারণ—সাহিত্যের ক্ষেত্রেও।

আমার মনে হয়, আজকের দিনের মানুষ আমরা অনেকেই এই মধ্যপথের দৌর্বল্যে ক্লিষ্ট। আমরা বিশ্বাসহীন,—অধ্যাত্ম-বিশ্বাসহীন বটে, আবার বস্তুবিশ্বাসহীনও বটে; অধ্যাত্মবাদে দেখা দিয়াছে [illegible] সংশয়, বস্তুবাদের সঙ্গে আমাদের [illegible]

সায়, সেখানে বিশ্বাসের বল নাই। মার্ক্সবাদ এবং অন্যান্য মনীষিগণ কর্তৃক তাহার বিস্তার আমাদের চিন্তা-ভাবনায় প্রচণ্ড আলোড়ন আনিয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। 'ভাব' আগে, 'ভব' তাহা হইতে প্রসূত—এ-কথা আমাদের প্রচলিত সকল চিন্তা ও কর্মের বনিয়াদ; সুতরাং অনাদি নিখিল চৈতন্যে পরম পুরুষত্বের আরোপ করিয়া সুখে-দুঃখে আশা-নৈরাশ্যে তাঁহার উপরেই পিঠ, ঠেস দিয়া একরূপ বসিয়াছিলাম। মার্ক্স এবং তাঁহার সহচরগণ ব্যাপারটাকে একেবারে উল্টাইয়া দিলেন; তাঁহারা বলিলেন, 'ভব'ই আগে—তাহাই মূলীভূত সত্য—সকল রকমের 'ভাব' তাহা হইতেই প্রসূত। 'ভাব' তাই তাহার নিত্য-নিখিল-চৈতন্যত্ব এবং পরমপুরুষত্ব হারাইয়া ফেলিল, তাহা শুধু ভাবনার গোড়ার বস্তু হইয়া রহিল। এখানে পূর্ব ও পরের সঙ্গে কোনও আপস মীমাংসা নাই; 'এহ বটে, ওহ বটে'—এমন কোনও গোজামিল, মার-প্যাঁচ বা ফাঁক-ফন্দি নাই। সেইখানেই ব্যাপারটা দেখা দিয়াছে বড় গুরুতর হইয়া। এক পুরুষ দুই পুরুষ নয়, আমাদিগকেও পুরনো মাথাটাকে একেবারে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে দশ-বিশ বছরের মধ্যে। ফল হইয়াছে এই, যাঁহারা অন্যপন্থী তাঁহারা সনাতন মাথাটাকে ঠিক রাখিবার জন্য দ্বিগুণ প্রতিক্রিয়ায় কেবল মন কষিতেছেন; আর যাঁহারা নড়চড়পন্থী তাঁহারা পুরনো ভাব-ভাবনাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য কেবলই প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়া চলিতেছেন। এই প্রবল মাথা নাড়ার ব্যাপারটাই বামপন্থী সাহিত্যে দেখা দিয়াছে প্রবল প্রতিক্রিয়ায়—কেবল সমালোচনায়—ব্যঙ্গে—বিদ্রূপে; এক কথায় বামপন্থী সাহিত্যের 'না-ধর্মে'র প্রাধান্যে। চিন্তা দ্বারা চিন্তার প্রতিরোধ সহজ, অনুশীলন এবং অকপট চেষ্টা দ্বারা এক জাতীয় চিন্তাকে দূরে সরাইয়া দিয়া মনে অন্য জাতীয় চিন্তার প্রাধান্য দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু জীবনের পথে রসদ যোগায় যে-বিশ্বাস তাহার পাল্টা-পাল্টি তত সহজে হয় না। পুরনো বিশ্বাস সব ভাঙিয়া যাওয়াই নূতন যুগ—নূতন জীবনের বড় কথা নয়, নূতন বলিষ্ঠ বিশ্বাস গড়িয়া ওঠাতেই নবজীবনের সত্যকারের সূচনা। বামপন্থায় এই দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এখনও আসিয়া পৌঁছাইতে পারিয়াছি বলিয়া আমার ধারণা না।

আমি কমিউনিস্ট সাহিত্যে যে 'না-ধর্মে'র প্রাধান্যের কথা বলিয়াছি তাহা বামপন্থী সকল সাহিত্য সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এখানে 'বামপন্থী' কথাটিকে আমি ইহার একটি প্রচলিত শিথিল অথচ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেছি। বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন একটি 'সম্মিলিত বামপন্থী' দল দেখিতে পাই—যেখানে আদর্শ এবং কর্মপন্থায় পরস্পরবিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র দান করে অপর কোনও একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরোধিতা,—তেমনিই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি 'সম্মিলিত বামপন্থা' আছে, যেখানে সাহিত্যের আদর্শ ও রূপায়ণের মধ্যে যতই পরস্পরবিরোধ থাক্—একটি ঐক্য জাগিয়াছে একটা তথা-কথিত রবীন্দ্র-বিরোধিতায়। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র দত্ত সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতিকে লইয়া যে বামপন্থা বাঙলা কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, সংশয়, নৈরাশ্য ও বিতর্কে তাহার আরম্ভ; সেখানেও 'না-ধর্মে'রই প্রাধান্য; কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছিয়া প্রায় সকলের কবিতার মধ্যেই একটা আশাবাদের আমেজ আসিয়াছে; এই আশাবাদের ভিত্তি কোথায়? যে সংশয়-নৈরাশ্যের দ্বারা তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সংশয় নৈরাশ্য কাটিয়া গিয়া তাঁহাদের চিত্তে কি কোনও নববিশ্বাসের আলোকপাত ঘটিয়াছে? কোন কোন ক্ষেত্রে এই আশাবাদের আমেজে অনেকখানি ঘুরাইয়া প্যাঁচাইয়া রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তন দেখা দেয় নাই ত? অনেক ক্ষেত্রে এই আশাবাদ দীর্ঘদিনে চর্চিত নৈরাশ্যের একটা প্রতিক্রিয়া নয় ত? নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায় লব্ধ আশাবাদ কাব্যরূপের ভিতর দিয়া চিত্ত-বিস্ফাররূপ সঞ্জীবনীরূপে কখনই দেখা দিতে পারে না। সে সঞ্জীবনী দিতে পারে একমাত্র জ্বলন্ত বিশ্বাস।

কমিউনিস্ট সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে এখন পর্যন্তও যথেষ্ট পরিমাণে গড়িয়া ওঠে নাই কেন তাহার কারণ স্বরূপে আমার আরও একটি কথা মনে হইয়াছে। তাহা এই যে, কমিউনিজ্‌ম্‌ আমাদের কাছে এখন পর্যন্তও যেন কেমন একটা বিদেশী-মার্কা জিনিস রহিয়া গিয়াছে। অনেক সময় মনে হয়, আমাদের নিকটে কমিউনিজ্‌ম্‌ এবং রাশিয়া যেন একার্থক হইয়া গিয়াছে। কমিউনিজ্‌ম্‌-এর আদর্শ গ্রহণ করিয়া রাশিয়া যতই উন্নত হোক, কেবল সেই উন্নতির তথ্য বাঙলাদেশে সাহিত্যিক প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না।

মার্ক্সবাদ কোনও বিশেষ দেশের চিহ্নিত সত্য নহে; তাহা ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে আবিষ্কৃত বিশ্বজীবনের সত্য। সে সত্য রাশিয়ায় ব্যবহারিকভাবে গৃহীত হইয়া ফলপ্রসূ হইয়াছে, সুতরাং রাশিয়া এ-ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হইতে পারে এবং আমরা চিন্তনে-ভাষণে রাশিয়ার উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু সেই সার্বজনীন নীতিগুলি আমাদের বিশেষ বাস্তব পরিবেশের ভিতরে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের সমাজ-বিবর্তনে কি কি নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে তাহাকে যদি সমগ্র সত্তা দিয়া অনুভব করিতে না পারি তবে তাহাকে লইয়া নূতন সাহিত্য কিছুতেই গড়িয়া তুলিতে পারিব না। এ-ক্ষেত্রে কতগুলি অমূর্ত আদর্শকে সমাজ-জীবনের উপরে আরোপ করিয়া কোনও ফল দর্শিবে না। সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কমিউনিজ্‌ম্‌ বাঙলারও নয়, কমিউনিজ্‌ম্‌ রাশিয়ারও নয়—কমিউনিজ্‌ম্‌ জীবনের; সেই জীবনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া সে কি ফসল ফলাইতেছে, অথবা একটা কল্পিত জীবন নয়—সত্যজীবনের উপরে প্রয়োগ করিয়া তাহা দ্বারা কতগুলি বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কি ফসল ফলান যাইতে পারে তাহার দ্রষ্টাই যথার্থ স্রষ্টা হইয়া উঠিতে পারেন।

মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারা রাশিয়ার বিংশ-শতকের প্রথম পাদে যে বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিল বিংশ-শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে বা ভারতবর্ষে আমরা বিপ্লবের ঠিক সেই রূপ দেখিতে পাই নাই; বিংশ শতকের তৃতীয় পাদেও আমরা ঠিক তাহাকেই আশা করিতে পারিতেছি না, অনাগত কোনও যুগেও ঠিক সেই বিপ্লবের রূপেই আমরা বাঙলাদেশে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব আমি সে-জাতীয় আশাকে ভুল আশা বলিয়া মনে করি। অথচ বাঙলাদেশ বা ভারতবর্ষ যে সনাতন জীবন-ব্যবস্থা এবং সমাজ-পদ্ধতি আঁকড়াইয়াই অনড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, বিপ্লব আমাদের দেশে কিছুই আসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সমাজ-জীবনের দিকে দিকে ত বিরাট এবং
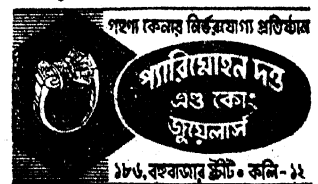
দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি এবং এই পরিবর্তন আমাদিগকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সমাজতন্ত্রের দিকেই আগাইয়া দিতেছে। জনগণের মধ্যে বিপ্লবী-শক্তি অতি দ্রুত জাগ্রত এবং সঞ্চারিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার মুখোসে এই সেদিন আমাদের দেশে যে বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে তাহার সমাজ-বিপ্লবাত্মক রূপটিও নেহাৎ নগণ্য নয়; একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, পুরাতন সমাজের বনিয়াদের মধ্যে যেখানেই জীর্ণতা ও ফাটল দেখা দিয়াছিল তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিতে তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে, আমাদের বিপ্লব 'ধর্মঘাট', অজ্ঞাত রন্ধ্র দিয়া যেমন করিয়াই হোক ধর্ম আসিয়া ঢুকিয়া পড়িবেই। সেইজন্যই সকালে যে বিপ্লবী জনতা দল বাঁধিয়া ধর্মঘট করে, বিকালে আবার দল বাঁধিয়া হরিনাম কীর্তন করিতে তাহাদের কিছুই আটকায় না। সাম্য স্থাপনের জন্য যে সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন তাহার সহিত ঈশ্বরবোধের সঙ্গে আমাদের দেশে কোনও বিরোধ অত্যন্তরূপে প্রকট হইয়া ওঠে না। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে বাঙলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র নব-ভগবদ্বোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে সাম্যবাদের ব্যাখ্যা করিলেন তাহাকে একেবারে অপাঙক্তেয় করিয়া রাখিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না; স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজজীবনের কৃত্রিম ভেদ, অসাম্য, অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ জানাইয়াছিলেন এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া গণ্য করিবার কারণ দেখিতেছি না। এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও সমাজতন্ত্রবাদের সেই স্তরেই আমাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে এমন কথা আমি বলিতেছি না; আমি শুধু জাতীয় জীবনের বিশেষ প্রবণতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আসল কথা হইল, আমার বিশ্বাসে সমাজ-বিপ্লব এবং সমাজ বিবর্তনের একেবারে সুনির্দিষ্ট কোনও 'প্যাটার্ন' বা ছাঁচ নাই; জাতীয়ত্বের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া বিপ্লব ও বিবর্তনকে কোনওদিন এক ছাঁচে ঢালিয়া সাজা সম্ভব বা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মানুষের জীবনের সত্য ইতিহাসের বিচিত্রধারায় আবর্তিত হইয়াছে, একেবারে সরলরেখার দাগ ফেলিয়া খাল কাটিয়া ইহাকে বহাইয়া দেওয়া যায় বলিয়া মনে করি না, সে চেষ্টাকেও সর্বাংশে শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি না। আমার মোটামুটি বক্তব্য এই, জাতীয় জীবনে মার্ক্সবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগামী বলিয়া রাশিয়া যতই পথপ্রদর্শক হোক, আমাদের বিশেষ জাতীয় জীবনে মার্ক্সবাদকে বিশেষভাবে 'স্বী-করণে'র প্রয়োজন রহিয়াছে; এবং আমার বিশ্বাস, এই 'স্বী-করণে'র ভিতর দিয়াই মার্ক্সবাদ আমাদের জাতীয় জীবনে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে, এ সত্যটিকে উপলব্ধি করিতে হইবে। মার্ক্সবাদ যে রাশিয়া হইতে আমদানী করা কোনও জিনিস এই সংস্কারটাই মুছিয়া যাওয়া দরকার; ইহা কতগুলি মানবীয় সত্যের মানবসমাজ-বিবর্তনে স্বচ্ছন্দ-সক্রিয়তা এবং প্রয়োজন-বোধে যত্নকৃত প্রয়োগ—এই কথাটি আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠা দরকার।

আমি উপরে আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলা দেশে খাঁটি কমিউনিস্ট-সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে গড়িয়া না উঠিবার দুইটি সম্ভাব্য অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি; প্রথমটি হইল বস্তুবাদে বলিষ্ঠ বিশ্বাসের অভাব, দ্বিতীয়টি হইল কমিউনিজমকে যথোপযুক্ত স্বী-করণের অভাব। কিন্তু এই অন্তরায়গুলি এমন কিছু 'নিত্য'ও নয়, দুর্লঙ্ঘ্যও নয়। একটা জাতির সমষ্টি মানসে একটা বিশ্বাস রাতারাতি গড়িয়া ওঠে না; কিছু সময় লাগিবেই; সুতরাং যে বিশ্বাস আজ পর্যন্ত বলিষ্ঠভাবে চিত্তে স্থিরবন্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই কিছুদিন পরে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। আর যে 'স্বী-করণে'র প্রশ্ন তুলিয়াছি, সে-বিষয়ে ত আমি নিজেই স্বীকার করিয়াছি যে, সেই 'স্বী-করণ' পদ্ধতি ইতিমধ্যেই আমাদের ভিতরে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ধরা যাক, আর অর্ধ-শতাব্দীর ভিতরে আমাদের মধ্যে বস্তু-বিশ্বাসও বেশ পাকা হইয়া উঠিল, স্বী-করণ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মার্ক্সবাদ বা তাহার যথোচিত কোনও পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত রূপকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ অবস্থানে ও প্রবণতায় সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইলাম; তখন যে আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি কমিউনিস্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহার রূপটা হইবে কি?

প্রশ্নটা বর্তমান প্রসঙ্গে খানিকটা এলোমেলো এবং অবান্তর মনে হইতে পারে; কিন্তু আমার এই প্রশ্নটির উদ্দেশ্য হইল, 'খাঁটি কমিউনিস্ট সাহিত্য' সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা একটু স্পষ্ট করিয়া লওয়া। কথাটি আদৌ তুলিলাম 'খাঁটি কমিউনিস্ট সাহিত্য' সম্বন্ধে একটা কাটাছাটা গোঁড়া মতবাদ লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া। কমিউনিস্ট সাহিত্যের আদর্শের ক্ষেত্রে একটা 'ছক' লক্ষ্য করিয়াছি; এই ছক যুক্তিতর্কের দ্বারা যতখানি সমর্থিত বাস্তব শিল্পায়নের দ্বারা ততখানি প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়াই ইহার প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা। 'খাঁটি কমিউনিস্ট সাহিত্য' বলিয়া এই জাতীয় একটা ছক-মাফিক সাহিত্য আমরা কোনওদিন পাইব না, পাইলেও তাহা বাঞ্ছনীয় হইবে না। কমিউনিস্ট সাহিত্যের আদর্শে একটা সচেতনতার কথা এবং যত্নকৃত অনুশীলনের কথা আছে; কারণ কমিউনিস্ট সাহিত্যে শুধু 'হইয়া উঠিবার' সত্য থাকে না, একটা 'গড়িয়া তুলিবার'ও তাগিদ থাকে। কিন্তু জীবন-সত্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে একটা ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার চেষ্টা সমার্থক নহে।

আজকের দিনের বাঙলা-সাহিত্য—শুধু আজকের দিনের কেন—গত পঞ্চাশ বৎসরের বাঙলা সাহিত্যকে যদি আমরা একসঙ্গে অবলোকন করি তবে দেখিতে পাইব একটা সমাজতন্ত্রের প্রবণতা ওতপ্রোতভাবে আমাদের সকল সাহিত্য চেষ্টার সহিত মিশিয়া আছে। প্রত্যেক স্তরের মানুষের প্রতি একটা গভীর দরদ ও শ্রদ্ধা এবং সমমূল্যবোধ, অবজ্ঞাত, বঞ্চিত ও শোষিতের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি ও অপরের প্রতি অসন্তোষ, সমগ্র জনগণকে লইয়া একটি মঙ্গলময় জাগরণ—আজকের দিনে এই প্রবণতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কোনও খানু বুর্জোয়া লেখকেরও নাই। প্রশ্নটা শুধু তারতম্যের এবং সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণের—সে নিয়ন্ত্রণ ছাঁচে ঢালাই নয়—সে নিয়ন্ত্রণের শক্তি জোগায় 'প্রেরণা'র সততা।

সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার সহিত 'প্রেরণা'র সততার যোগে রচিত সাহিত্য আমাদের বাঙলা সাহিত্যে কিছু কম নহে। সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম ইহার ভিতরকার পার্থক্যের চুলচেরা তর্কের মধ্যে যাঁহারা যাইতে রাজি নহেন তাঁহাদের মতে জন-কল্যাণকর যুগ-চেতনা লইয়া রচিত প্রগতি-শীল সাহিত্যের পরিমাণ আমাদের বাঙলা সাহিত্যে নৈরাশ্যপ্রদ নয়। আমার বিশ্বাস, ভাল সাহিত্য হইতে হইলেই তাহাকে প্রগতিশীল সাহিত্য হইতে হইবে; সমাজ-জীবনকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া কোনও সাহিত্য ভাল সাহিত্য হইয়াছে, সাহিত্যের ইতিহাসে এমন তথ্য অনুপস্থিত। রক্ষণশীলতা এবং প্রাচীন-প্রীতি লইয়া যদি কোথাও ভাল সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে, তবে দেখিতে পাইব সেই রক্ষণশীলতা এবং প্রাচীন-প্রীতির ইঙ্গিতও সমাজ-জীবনের সামগ্রিক অগ্র-গতির দিকেই। অবশ্য জানি, অগ্রগতির সংজ্ঞা লইয়াই পরস্পরবিরোধী মতবাদের অবকাশ আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একেবারে সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট সাহিত্য কোনও-দিন কোথাও গড়িয়া উঠিবে না; সেরূপ গড়িয়া তোলার চেষ্টাকেও কখনো সাধু চেষ্টা বলিয়া মনে হইতেছে না। সংজ্ঞা-নির্দিষ্টতার দিকে অনড় হইয়া বসিয়া না থাকিলে এবং বহুমুখে প্রকাশিত প্রবণতার দিক্ হইতে বিচার করিলে আমাদের আশা-বাদী হইয়া উঠিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দেখতে দেখতে সুন্দর একটা মাঠ তৈরী হয়ে গেল।

ওদিকে বড় বাদাম গাছটা থেকে আরম্ভ করে রেললাইন, আর এদিকে খোলার বস্তি থেকে আরম্ভ করে বাবুপাড়ার পাকা মজবুত বনেদি দালানগুলো পর্যন্ত। অনেক বাড়ি ভাঙা পড়ল। অনেক গাছ কাটা পড়ল।

আগে বোঝা যায়নি এখানে এমন চমৎকার খেলার মাঠ হবে।

সারাটা শীত কাটল ছেঁচা বাঁশের বেড়া আর ভাঙা খোলা, ইট আর রাবিশ সরাতে। রাতদিন লরী আর ঠেলাগাড়ি এল গেল।

তারপর দেখা গেল ফাঁকা জায়গায় একটু একটু ঘাস গজাচ্ছে। গরু ছাগল এল নতুন ঘাস খেতে। ফাঁকা পেয়ে ধোবারা কিছুদিন দড়ি খাটিয়ে জামা কাপড় শুকিয়ে নিল।

ফাল্গুনের শেষে ভাল বৃষ্টি হল। হ্যাঁ, তখন, তখন থেকে জায়গাটা খেলার মাঠের চেহারা ধরল। আর কোথাও ঘাস গজাবার বাকি নেই। নরম ঘাসের চাদরে মোড়া সবুজ ঝকঝকে মাঠে কচি বাতাবি লেবু দিয়ে যারা বল খেলতে এল তারা কিন্তু বাবুপাড়ার না। মানে ওপাশটায় বস্তির সাক্ষি হিসাবে এখনো যে কখানা টিন টালির ঘর দাঁড়িয়ে আছে তারা সেসব ঘরের ছেলে। গায়ের রং ময়লা রুক্ষ, মাথার চুল উসকো-খুসকো, রোগা জিরজিরে হাত পায়ের চেহারা। তালিমারা প্যান্ট, ছেঁড়া গেঞ্জি।

কিন্তু তা হলে হবে কি। তাদের বল খেলার উৎসাহটা দেখবার মতো। সেই বেলা দুটো থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা—সন্ধ্যা কেন, যতক্ষণ না ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে রাত্রি নামে প্রায় আধডজন কাঁচা শক্ত পাথরের মতন বাতাবিলেবু কিক্ করে করে নরম থ্যাঁতলা—শেষটায় প্রত্যেকটা লেবু ফালা-ফালা করে ভিতরের সাদা শাঁস বার করে দিয়ে তবে তারা মাঠ ছেড়ে উঠে আসে।

সারাটা ফাল্গুন ও চৈত্র মাঠটা ওদের জিম্মায় রইল। তারপর এল বৈশাখ মাস। কড়া রোদ আর কালবোশেখীর ঝড়জলে মাঠের ঘাস আরো শক্ত হল ঘন হল। এদিকে গাছের বাতাবিলেবুও আকারে বড় হল, ওজনে ভারি হল। আর বল খেলা চলে না। লাথি মারলে তিন হাতের বেশি একটা লেবু নড়তে চায় না। কাজেই কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে একটা রবারের বল কেনা যায় কিনা ওরা যখন চিন্তা করছিল ঠিক তখন এক বিকেলে সত্যিকারের একটা চামড়ার বল মাঠের বুকে মাথা ঠুকে আকাশে উঠল আকাশ থেকে লাফিয়ে আবার ঘাসের বিছানায় নেমে এল।

অবাক হয়ে গেল এরা। টিন-টালির ঘরের ছেলেরা। বাদাম গাছটার নিচে বসে রবারের বল কেনার পরামর্শ চলছিল। চোখ বড় করে তারা নীল রেজারের প্যান্ট আর শাদা ধবধবে নেট্-এর গেঞ্জি পরা একডজন ছেলের মুখ দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল। প্রায় সব কটির গায়ের রং মোটামুটি ফরসা,
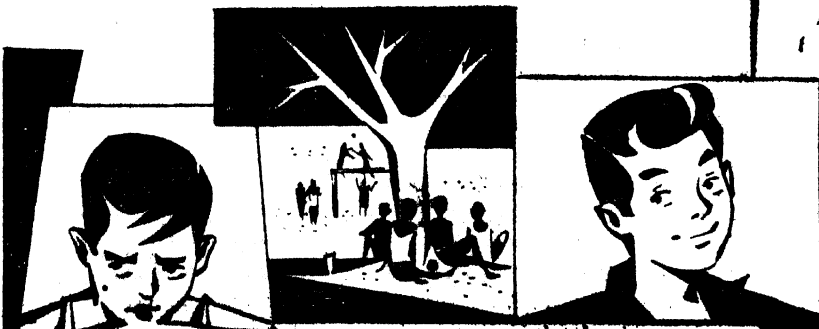
মাজাঘষা নরম মতন হাত পায়ের চেহারা, পালিশ পরিপাটি মাথা যেন সব ক'টি এক-দিনে কান পর্যন্ত তুলে ঘাড় চেঁছে চুল ছেঁটে এল। ঘাড়ে গলায় পাউডারের ছোপ।

'বাবুপাড়ার,' ফিসফিস করে এ ওকে বলল, 'ওটার নাম অমিয়, ওদিকের ছেলেটো লাল তে-তলা বাড়ির—হিমাংশু,—এখন যে বল হেড্ করছে তার নাম সুকুমার।'

'তা তো বুঝলাম,' ফিসফিস করে এ ওকে বলল, 'কথা হচ্ছে যে, ওরা বলাকওয়া নেই আমাদের মাঠ এসে দখল করল!'

'খালি পেয়েছে,' হারানের পিঠে আঙুলের গুঁতো মেরে বাবলা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল, 'আজ সকালেই যা-হোক অন্তত একটা রবারের বল-টল কিনে মাঠে নেমে পড়া আমাদের উচিত ছিল—কিন্তু—'

'বাবা, দুটো করে পয়সা দিলেও তো সাড়ে ছ'আনা চাঁদা ওঠে—না হয় ছোট বল দিয়েই ক'দিন চলত। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর থেকে কাঠপিঁপড়েটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কানাই বলল, 'এখন বসে বসে আঙুল চোষ—একবার যখন মাঠ পেয়েছে আর ওরা ছাড়বে!'

'আলবৎ ছাড়বে!' বাদাম গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে দলের সর্দার বংকু ঝিমোচ্ছিল—অথবা যেন চুপ থেকে এতক্ষণ কি চিন্তা করছিল। মাথা সোজা করে চোখ পাকিয়ে বলল, 'বাতাবিলেবু বা ন্যাকড়ার বল—যা-ই দিয়ে খেলি না কেন, মাঠ আমাদের, আগেও ছিল এখনো থাকবে।'

বংকু গলা বড় করে বলল বটে কিন্তু কেউ তেমন সাড়া দিল না। বংকুকে না দেখে তারা দেখছিল চর্বি মাখানো বাদামী রঙের নতুন চামড়ার বলটা। ঘাসের বুকে নেচে নেচে ছুটে চলেছে। হিমাংশু অমিয়কে পাস করে দিয়েছে কিন্তু অমিয় ধরতে পারে না, ঢ্যাঙা মতন ছেলেটা লম্বা পা বাড়িয়ে বল কেড়ে নিয়ে লম্বা শট মারে। গোল হয় না যদিও। বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে মাঠের বাইরে কাঠমালতীর ঝোপের কাছে চলে যায়। রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে ওদের সবচেয়ে সুন্দর চেহারার ছেলেটা বল আনতে ছোটে।

'অরুণ।' বাবলা হাবুলের দিকে চোখ ফেরায়। 'হুঁ, ওই হলদে দোতলা বাড়ির। অনেক টাকা ওদের। বৌবাজারে ফার্নিচারের দোকান আছে।'

'চোর চোর।' বংকু ঘাড় ফিরিয়ে দুর্বার ওপর থুথু ফেলল। 'ব্ল্যাকে মাল কিনছে ব্ল্যাকে বেচছে। এই করে তো ওদের বাপ-কাকাদের পয়সা, ও পাড়ার সব ব্যাটার। এখন আরামসে উঁচু উঁচু দালান খিঁচে বসেছে—'

'আঃ, ওসব কথায় দরকার কি', কানাই বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখন কথা হচ্ছে যে, ওদের মাঠ থেকে তাড়াতে হবে। আমাদের প্রেস্টিজ নষ্ট হচ্ছে। এতকাল আমরা খেললাম আর আজ কিনা—'

মোটা গলায় হাবুল বলল, 'সাড়ে ছ আনার পুঁচ্‌কে বল আর বাতাবিলেবু দিয়ে খেলতে গেলে এমনিও প্রেস্টিজ থাকে না। ওরা তো তাই দেখছিল আমাদের। ভেবেছে টিন টালির ঘরে থাকে এর বেশি শালারা উঠতে পারে না। বাস্, বল কিনে এখন নিজেরা মাঠে নেমে পড়ল।'

'নামাচ্ছি মাঠে!' বংকু হুংকার ছাড়ল। 'দুটো করে টাকা ফেল্ তোরা। বেশি দিতে হবে না। কালই আমি ধরমতলার করিম ব্রাদার্স থেকে বল কিনে আনছি। টি শেপ্ এ ক্লাশ বল হবে। শালাদের একবার দেখিয়ে দিই—'

একটা চাপা উত্তেজনায় বাদামতলার ছেলেদের মেরুদাঁড়া টান টান হয়ে উঠল। চোখ বড় করে এ ওর দিকে তাকায়। গরম নিশ্বাস ফেলে সবাই।

'এখানে আমরা দশজন। পাড়ায় আরো দশটা ছেলে আছে। সবাইকে ডেকে বলে দে দু'টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। আমাদের ইজ্জৎ আমাদের সম্মান রাখতে ফুটবল টিম তৈরী করতে হচ্ছে। কাজেই—'

বংকুর চোখে চোখ রেখে মিনমিনে গলায় হারান বলল, 'তা হলে বোধ করি মাথাপিছু দু'টাকা চাঁদা পড়ছে না—আরো কিছু কম করে—'

হাবুল মাথা নাড়ল।

'এখন কমের কথা চেপে রাখ্। দু'টাকা তো ধরা হোক—হয়তো সবাই শেষ পর্যন্ত—কি বলিস বংকা?'

'না না, দু'টাকা চাঁদা—পাড়ায় থাকতে হলে পাড়ার প্রেস্টিজ রাখতে হলে—একটা ক্লাব পোষার খরচা আছে, বুঝলি। কমের কথা এখন ভুলে যা।'

কানাই চুপ করে রইল। বাবলা চুপ করে রইল। হারান হাঁ করে তাকিয়ে মাঠের খেলা দেখে। সুকুমার একটা ভাল বল মিস্ করতে হারান শব্দ করে "ইস্" করে উঠল। বংকু বলল, 'কাল নতুন বল কিনে বেলা দুটো বাজতে আমাদের মাঠে নেমে পড়তে হবে। মাঠটা ওদের কি আমাদের দেখা যাক।'

আজও একটা বড় বাতাবিলেবু ঘোষপাড়ার বাগান থেকে পেড়ে আনা হয়েছিল। কানাই লাথি মেরে লেবুটা পাশের নালার মধ্যে ফেলে দিল।

ফুটবল এসেছে, নতুন ফুটবল এসে গেছে।

ষোল সতেরো বছর বয়সের হাবুল বংকুর দল থেকে আরম্ভ করে টিন টালির ঘরের দুধের বাচ্চাটা পর্যন্ত বাদামতলায় এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

দুব্ দাব্ ঢিব্ ঢাব্। মাঠের কড়া রোদ কাঁপিয়ে নতুন বল শব্দ করে উঠল। এক একটা শব্দ হয় আর সঙ্গে সঙ্গে হাততালি শিস চিৎকার কাশি হাসি ইত্যাদি মারফৎ যে যার খুশিমতো উল্লাস জানিয়ে দুপুরের আকাশ বাতাস পাগল করে দিচ্ছে। না, যারা মাঠে নামল তারা না। উল্লাসটা তাদের বেশি যারা গাছতলায় দাঁড়িয়ে বা বসে রইল।

এখন খেলা হচ্ছে না, এখন শুধু প্র্যাক্টিস চলছে। লম্বা শট, ব্যাক পাস, হেড, কর্ণার কিক্—লক্ষ্য গোল পোস্ট। যত বেশি পার বল ওদিকে ঠেলে দাও—গোল কীপারকে হাত দিয়ে পিঠ দিয়ে বুক দিয়ে যত বেশি পার যেভাবে পার বল ঠেকাতে বল ফেরাতে শিখতে দাও, অভ্যাস করতে দাও।

তালিমারা প্যাণ্ট, খোলা পিঠ, দরদর করে ঘাম ঝরছে, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো কাদা। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কারওর। গনগনে আগুন মাথায় নিয়ে কানাই বাবলা বলের পিছনে ছুটছে। হাবুল বংকু বিশে ধনা জগু হারু সব যেন উন্মাদ হয়ে গেছে চামড়ার বল পেয়ে। বংকুর চোখ দুটো মদ খাওয়া মানুষের চোখের মতন লাল টকটকে হয়ে আছে। কেন হবে না। সকাল থেকে সে-ই বেশি ছুটোছুটি করেছে টাকার জন্য। টাকার যোগাড় হল তো ছুটল ধরমতলায়। করিম ব্রাদার্স আফজল ব্রাদার্স নন্দী ব্রাদার্স মণ্ডল ব্রাদার্স কম সে কম বারোটা দোকান ঘুরে তারপর মনের মতন জিনিস নিয়ে ফিরেছে। অবশ্য হাবুল আর কানাইও সঙ্গে গিয়েছিল বল কিনতে। কিন্তু ফিরে এসেই কিসের চান কিসের বিশ্রাম, গপাগপ করে দুটো ভাত গিলে চলে এল মাঠে।

আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত প্র্যাক্টিস চলল। তারপর বিশ্রাম নিতে বল তুলে ওরা চলে এল গাছতলায়। আবার একটা চিৎকার হট্টগোল। যারা বাদামতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল তারা গলা বাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বল দেখতে চাইছে বল ছুঁতে চাইছে। এত লাথি গুঁতো মাথার বাড়ি ঘাসের ঘষা খেয়ে বলটা ঠিক আছে তো। চামড়ায় নখের আঁচড় লেগেছে, ভিতরের বাতাস বেরিয়ে পড়েছে এক আধটু—না তেমনি টাইট টনটনে আছে, আঙুলের টোকা দিলে টুংটুং আওয়াজ হয়? পর্যন্ত দুধের বাচ্চাটা। হুমড়ি খেয়ে বুক দিয়ে বলটা চেপে ধরতে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বেগতিক দেখে বংকু মাথার ওপর বাদাম গাছের দুটো শুকনো আড় ডালের মাঝখানে বলটা বসিয়ে দিয়ে বলল, এইবেলা দ্যাখ—যত খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে নতুন বল দ্যাখ। হাত দিয়ে ধরাটা কিছু না।'

নিরাপদ জায়গায় বল তুলে রেখে বংকু গাছের গুঁড়িতে জড়ো করে রাখা এক গাদা জামাকাপড় থেকে নিজের ছেঁড়া গেঞ্জিটা হাতে করে নিয়ে তাই দিয়ে ঘষে ঘষে পিঠের ঘাম বুকের ঘাম মুছতে লাগল।

ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে হাবুল আর কানাই বিশ্রাম করছিল। উঠে বসল।

'এইবেলা ক্লাবের একটা নাম দিয়ে ফেল, বঙ্কুদা।'

'বাদামতলা ক্লাব।'

'বড্ড সেকেলে নাম।' কানাই ঠোঁট মোচড়ায়।

'ইলেভেনস্ ক্লাব।' হাবুল প্রস্তাব দেয়।

বাবলা মাথা নাড়ে।

'কলকাতা আর মফঃস্বলে হাজার দু'-হাজার ক্লাব আছে—ওই নামে।'

'তবে তুই একটা নাম বল না।' বঙ্কু ঘাসের শীষ দিয়ে কান চুলকায়। একটা নাম দিলেই হল—নামে কি এসে যায়। আসল হল খেলা। ধর যদি একটা বড় রকমের ম্যাচ শুরু হয়—ক'টা টিমকে ঘায়েল করতে পারবি আগে সেটা দ্যাখ্—সেভাবে তৈরী হ—এখন আর কি—ফুটবল এসে গেছে।'

বাবলা হরা বিশে জগা চুপ করে রইল।

কানাই বলল, 'আমাদের ক্লাবের নাম হবে বাদামতলা প্রতিভা।'

'চমৎকার নাম—ভাল নাম।' বঙ্কু খুশি হয়ে ঘাড় কাত করল। হারু জগা বাবলা বিশে তৎক্ষণাৎ সমস্বরে চিৎকার করে উঠল: 'থ্রি চিয়ার্স ফর বাদামতলা প্রতিভা—থ্রি চিয়ার্স ফর,—' পর্যন্ত দুধের বাচ্চাগুলো। 'থ্রি চিয়াস ফস বাডাম টলা পটি—ভা,' বলে গাছের ছায়ায় হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করল। ওদের আনন্দ বেশি।

তখন বিকেল। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। অল্প অল্প হাওয়া দিতে আরম্ভ করছে। পাখির কিচিরমিচির শুরু হয়েছে।

নীল হাফপ্যাণ্ট আর সাদা গেঞ্জি পরা ঝকঝকে সুন্দর মুখগুলো কাঠমালতীর জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল। একজনের হাতে বল।

'আসুক না, আসতে দে' বঙ্কু বলল, 'আমরা মাঠ ছাড়ছিনে।'

হাবুল বলল, 'মাঠে পা বাড়াক না, মেরে তাড়িয়ে দেব।'

বাবলা মাথা নাড়ল।

'তা হলে শুধু মারামারিই করতে হবে—খেলা আর হবে না—রোজ বিকেলে একটা গণ্ডগোল লেগে থাকবে মাঠে।'

'—কথাটা সত্য।' বিশে ও হারু বাবলার কথায় সায় দিল। কানাই চুপ করে থাকে। বঙ্কু বলল, 'ওই একদিনই হবে মারামারি—একদিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—রোজ আর বল নিয়ে মাঠে আসতে হবে না—দেখছিস তো, আইসক্রীমের কাঠির মতো সরু সরু সাদা সাদা হাত পা সবগুলোর।'

উপমা শুনে কানাই হো-হো করে হাসে।

'ওটার নাম যেন কি রে বাবলা, কাল বলছিলি, সবচেয়ে সুন্দর মুখ ছেলেটা?'

'অরুণ।' বাবলা ঠোঁট টিপে হাসল।

কানাই গলায় একটা শব্দ করল। সারাদিনের রোদে তেতে পুড়ে বঙ্কুর চোখ যদি জবাফুলের মতো লাল টকটকে হয়ে আছে, কানাইর চোখ মরা মাছের চোখের মতো ফ্যাকাশে হলদেটে রং ধরেছে।

'তা আর আইসক্রীমের কাঠি শুধু বলি কেন, অমন ফরশা ধবধবে গায়ের চামড়া ছোঁড়ার—একটা আইসক্রীম বলতে ক্ষতি কি।'

'মনে হয় তুই এখনি গিয়ে কামড় বসাবি।' হলদে দাঁত বার করে জগা হাসে।

'ছ্যাঁ ছ্যাঁ, তার চেয়ে ওই নালার ঘোলা জল দিয়ে আমি মুখ ধুই!' কানাই নাক কুঁচকায়। 'ব্ল্যাকের পয়সা খেয়ে না হারামজাদাদের অমন তেলতেলে চেহারা হয়েছে।'

'বাজে কথা এখন রাখ্।' বঙ্কু ধমক লাগায়। বলটা পায়ের ওপর তুলে পোস্ট বরাবর সে কিক্ রে। গোলকীপার ধনা চোখের নিমেষে দুহাতে বল ঠেকায়। বঙ্কু খুশি হয়। খুশি হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সে মাঠের উল্টো দিকে তাকায়। বাবুপাড়ার দল ততক্ষণে মাঠে নেমে পড়েছে।

'ওরা কী বলে দেখা যাক।' বঙ্কু গুমগুমে গলায় বলল, 'আমরা আগে কথা বলছিনে, আমরা তো রয়েছিই মাঠে।'

কিন্তু দেখা গেল এ-পক্ষের মতো ও-পক্ষও আর একটা গোল-পোস্ট ধরে বল প্র্যাক্টিস করছে। টুক্‌টাক্ শট লাগায় আর পালিশ মিনমিনে গলায় নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে।

কাটে এভাবে কিছুক্ষণ।

হাবুল ও কানাই বঙ্কুর দিকে তাকায়। সর্দার কিছু না বললে তারা কিছু করতে পারে না। বাবলা বলছিল, 'আজ এই পর্যন্ত,—কেবল এলোপাথাড়ি লাথি মারা-খেলাটেলা কিছু হল না—'

'হল না, হওয়া কিছু ফুরিয়ে যায়নি, সবে তো আজ বল কেনা হল,' বলছিল বঙ্কু, এমন সময়ে দেখা গেল ও-পক্ষের চশমা পরা ঢ্যাঙা ছেলেটা এদিকে আসছে।

এরা বল থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

'আপনারা তো এ-পাড়ার, মানে—' চশমা পরা ছেলেটা মিষ্টি হেসে বঙ্কুকে শুধায়, 'বস্তি-পাড়ার ছেলে?'

বঙ্কু বুক টান করে দাঁড়ায়।

'বস্তি-পাড়া মানে? এর নাম বাদামতলা।'

'আমাদের বাপদাদাদের আমল থেকে ওই নাম চলে আসছে। আমরা বাদমতলার ছেলে।' বঙ্কুর চেয়ে কানাই বেশি গরম হয়ে উঠে চড়া গলায় শুনিয়ে দিল।

চশমা-পরা ছেলে মুখ নামিয়ে মাঠের ঘাস দেখে।

'আপনারা বুঝি বাবুপাড়ার ছেলে?' বাবলা ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করে।

ঢ্যাঙা ছেলেটা এবার বোকা বোকা চোখে বাবলার দিকে তাকায়। তারপর মিষ্টি হেসে বলে, 'হ্যাঁ, ওই ওদিকের দোতলা তে-তলা বাড়ি সব দেখা যাচ্ছে—আমরা ওপাড়ার ছেলে।' একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে পরে বলে, 'বাবুপাড়া ঠিক না—হ্যাঁ, তবে ওই যাকে বলে অ্যারিস্টোক্রেট—না তার চেয়েও ভাল কালচার্ড পাড়া বলা—' ছেলেটা আবার হাসতে যাচ্ছিল, কানাই ধমক লাগাল: 'ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় বলুন বাংলায় বলুন—আমরা বাঙালীর ছেলে।'

বাবলা বলল, 'ক'মাস আগেও এপাড়া ওপাড়া এক ছিল। টালির ঘরের পাশে দালান দালানের গায়ে টিনের চালা। ওই সি আই টি এসে তো মাঝের ক'টা বাড়ি ভেঙে দিল—আর তাই এখন ফুটুনি ঝাড়া হচ্ছে এটা বস্তিপাড়া ওটা আরিস্টকসী পাড়া—কেমন?'

বাবলার ভুল উচ্চারণ শুনে বঙ্কু হাসল বটে কিন্তু কিছু বলল না। কানাই বলল, 'পাড়ার নাম নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই, আপনারা কি বলতে চাইছেন বলুন?'

ওপক্ষের সব ক'টি ছেলে তখন ঢ্যাঙা ছেলেটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বলল, একটা যখন মাঠ তখন দুপক্ষের মধ্যে খেলা হলে মন্দ কি।'

'মানে ম্যাচ খেলতে চাইছেন আমাদের সঙ্গে এই, এই তো?' ভারিক্কি গলায় বঙ্কু প্রশ্ন করল।

ও-পক্ষের তিন চার জন এক সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ভাল কথা সুখের বিষয়' চড়া গলায় কানাই বলল, 'বাদামতলা প্রতিভার সঙ্গে আপনাদের ক্লাব খেলতে সাহস পাচ্ছে আনন্দের কথা।'

'ক্লাবের নাম কি,—ওদের ক্লাবের নামটা জেনে রাখো বঙ্কুদা।' পিছন থেকে হেড়ে গলায় জগা বলল।

'হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স,' ওদের সবচেয়ে সুন্দর চেহারার আর সবচেয়ে দেখতে ছোট অরুণ বলল, 'আমাদের ক্লাবের নাম হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স।'

'বাংলায় বলুন বাংলায় বলুন।' কানাই দুচোখ সরু করে অরুণের দিকে তাকায়। 'বাঙ্গালীর ছেলে—কেন, একটা বাংলা নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ক্লাবের?'

'কেন নামটা তো তেমন কিছু কঠিন নয়, বুঝতে কষ্ট হবার কথা না।' চশমা-পরা ঢ্যাঙা ছেলেটা আবার মিষ্টি করে হাসল। 'হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স মানে সাদা ফুল।'

'আমরা সব বস্তির ছেলে তো—ইংরেজী বলতে ইংরেজী বুঝতে কষ্ট হয়।' বঙ্কু নীচু গলায় হাসল। 'তা বেশ নাম—শাদা ফুল—চমৎকার নাম রেখেছ ভাই তোমাদের ক্লাবের।' বঙ্কু 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'-তে নেমে এল। হাবুল বলটা বগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তবলার গায়ে চাটি মারার মতন বলের গায়ে চাটি মেরে গানের সুরে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'হায় রে আমার শাদা ফুলের দল—'

'এই চুপ!' ধমক দিয়ে হাবুলকে থামিয়ে দেয় বঙ্কু। 'যার যা খুশি নাম দিক ক্লাবের তা নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করার আছে কী।

'তা, খেলাটা কবে হচ্ছে?' বঙ্কু ওদের দিকে চোখ ফেরায়।

'আজ? এখনই মন্দ কি।'

'আজ আর হয় না' বঙ্কু আকাশের আলো দেখল, এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

'বেশ, তবে কাল?' হাতের ঘড়ি দেখল ঢ্যাঙা ছেলেটা। 'কাল পাঁচটায় শুরু হবে খেলা।'

'কেন, একটু আগে আরম্ভ করলে দোষ কি।' কানাই প্রস্তাব করতে ও-পক্ষের সুকুমার অরুণ হিমাংশু এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'না না, পাঁচটার আগে বেজায় রোদ থাকে মাঠে—একটু ঠাণ্ডা না পড়লে খেলে সুখ নেই।'

গলার একটা বিশ্রী শব্দ করে বাবলা কাশল।

বঙ্কু গম্ভীর থেকে ঘাড় কাত করল।

'বেশ, তাই হবে—পাঁচটা।'

ওরা আর দাঁড়ায় না। মাঠের ওধারে চলে যায়।

'দে, বল দে, দুটো লাথি মারি।' ঝাঁঝালো গলায় বঙ্কু হেঁকে উঠতে হাবুল বলটা ছুঁড়ে দেয়।

বাবলা তখনো ফ্যালফ্যাল করে অরুণ, হিমাংশু আর সুকুমারকে দেখছিল। ওরা আর একটু দূরে সরে যেতে সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। 'সব লাট সাহেবের বাচ্চা—পাঁচটার আগে মাঠে বেজায় রোদ—ননীর শরীর গলে যাবে!'

'ধেৎ, ননী কিরে, ফুল!' হাবুল হাত ঘুরিয়ে চমৎকার সুর করে বলল, 'সব সাদা ফুলের দল।'

'আসুক না কাল খেলতে—সব ফুল চটকে থেঁতলে দেওয়া যাবে।' জগা হলদে দাঁত দেখিয়ে হাসে।

কানাই বলল, 'আমি দেখছিলাম ঢ্যাঙা ছোঁড়ার হাত-ঘড়ি দেখার কায়দা—বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়—যেন রিস্টওয়াচ ও-ই পরেছে—আর কেউ বাপের জন্মে ঘড়ি দেখেনি।'

'কি করে দেখবি—টিন টালি খোলার ঘরে থাকিস তোরা।' বঙ্কু গায়ের জোরে শট মেরে বলটা আকাশে তুলে দেয়। 'তোদের নেই, ওদের ঘড়ি আছে।'

আকাশের দিকে চোখ রেখে বিশে বলল, 'আমার তো উঁটকি আসছিল সব কটা যখন সামনে এসে দাঁড়াল—মেয়েমানুষের মত কী সব তেল মেখেছে মাথায়!'

'মেয়েমানুষ না তো কী।' বাবলা মাঠের ওদিকে চোখ রেখে বলল, 'অরুণ আর হিমাংশুটাকে আমি মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না।'

শুনে কানাই হাবুল শব্দ করে হাসে।

রাত ন'টা পর্যন্ত বাদাম গাছের নীচে জোর মিটিং চলল। কাল কে কোথায় খেলবে। বাচ্চাগুলো ঘরে ফিরে গেছে। বল কিনে দশ আনার পয়সা বেঁচেছিল। চার আনার মুড়ি আর তেলেভাজা কিনে আনা হ'ল পাড়ার দোকান থেকে। পেট চোঁ চোঁ করছিল ক্ষুধায়। এক মুঠ করে মুড়ি একটা করে তেলেভাজা পেয়ে সবাই খুশী। আরো কিছুক্ষণ গল্প চলল। হাবুল বলল, 'ওরা বাইরে থেকে কিছু প্লেয়ার যোগাড় করবে আমার মনে হয়—অন্য ক্লাবের ছেলে। নিজেরা তো কত খেলতে পারে কচু কাল দেখলাম!'

'আনুক না বাইরের প্লেয়ার।' বঙ্কু উরুর ওপর চাপড় বসিয়ে মশা মারে। 'তাই ভেবে তোরা এখন থেকে ঘাবড়াচ্ছিস নাকি।'

'ফচকে ফাজিল ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে খেলতে যদি ভয় পেতে হয় তবেই হয়েছে,' —নাক দিয়ে কানাই বিদ্ঘুটে আওয়াজ বার করল। জগা বলল, 'না, ওদের ভাবখানা আমরা বাতাবিলেবু আর ন্যাকড়ার বল দিয়ে সারাটা সিজন খেললাম, কাজেই কাল ডজন-খানেক গোল খেয়ে আমাদের মাঠ থেকে ফিরতে হবে।'

'বটে!' বাবলা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। হাত নেড়ে বলে, 'ওই ন্যাকড়ার বল বাতাবি-লেবু দিয়ে খেলতে খেলতেই আজ হামিদ হামিদ হয়েছে—ভেঙ্কটেশ, নন্দী, আর চক্রবর্তী—সবাই ছোটবেলা ওই দিয়ে খেলে আজ অত বড় প্লেয়ার—কি বল বঙ্কুদা?'

'তবে!' বঙ্কু ভারিক্কি সুরে বলল, 'না না আমাদের চমৎকার কর্ম হয়েছে। বাতাবি-লেবু ন্যাকড়ার বলটা কিছু না, আসল হল প্র্যাকটিস—আমরা কি আর কম প্র্যাকটিস করলাম তিন মাস। আসুক না বাইরের নামকরা প্লেয়ার নিয়ে খেলতে—কাল ক'টা গোল খেয়ে মাঠ থেকে সোনার চাঁদদের ফিরতে হয় দেখবি।'

উত্তেজনার গরম নিশ্বাস ছড়িয়ে সবাই ঘরে ফিরল।

পরদিন সকাল থেকে ছুটোছুটির অন্ত নেই।

বাদামতলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ম্যাচ খেলার খবর। আরো দুটো টাকা যোগাড় করতে হয়—আইসক্রীম, লিমনেড—নিদেন কিছু পাতিলেবু, লজেন্স রাখতেই হবে। একটা অতিরিক্ত ব্লাডার কিনে রাখলে ভাল হত না কি? দু টাকায় ব্লাডার হয় না। যদি সেরকম কিছু হয় আমাদের বলের, ওদেরটা দিয়ে খেলা চলাবে। এমনি তো একটা হাফ্ ওরা বল দেবে। 'যদি না দেয়, আমাদের ফুটবল ফুটো হয়ে গেলে ওরা ওদেরটা আর দিতে না চায় তখন?' 'তখন খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে চাঁদেরা বল দিতে চাইছে না সবাই ধরে নেবে। হি-হি।'

অনেক জল্পনা কল্পনা চলল, অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হ'ল বিশে জগা বাবলা হারুর অতিরিক্ত দুটো টাকা চাঁদা তুলতে। কানাই বঙ্কু নতুন করে বল পাম্প করতে চলে গেছে মানিকতলার একটা দোকানে। পাড়ার বাচ্চাগুলোকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বাদামতলার এদিকটার কাঁটা-নটে আর চোর-কাঁটার জঙ্গল সাফ করতে। 'মাঠের এধারটা আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে। পাড়ার লোকজন খেলা দেখতে আসবে। মাঠের ওধার ওদের। ওরা চোরকাঁটা সাফ করুক না করুক, ওদের পাড়ার মানুষ খেলা দেখতে আসুক না আসুক ভাবতে আমাদের বয়ে গেছে।'

বল পাম্প করে কানাই বঙ্কু ফিরে এল। জগা বিশে বাবলা হারু দু টাকার লজেন্স পাতিলেবু কিনে ফিরে আসে। ঠিক তখন সকলের মাথায় এল বাদামতলা প্রতিভার জার্সি নেই। এমনি তো ওদের বাবুগিরির ফ্যাশানের অন্ত নেই, আজ বাদামতলা

প্রতিভার সঙ্গে খেলা,—মাজ ওরা রংদার জার্সি চড়িয়ে আসবে। খেলতে পারুক না পারুক, বাবা কাকাদের পয়সা আছে দেখাতে সেজেগুজে আসছে ছোঁড়াগুলো।

বঙ্কু বলল, 'বেশ, এক কাজ কর তোরা,—তোদের গেঞ্জিগুলো খুলে দে।'

'তোমারটা?'

'আমারটা তো আছে।' বলে এক টানে বঙ্কু গায়ের গেঞ্জি খুলে ফেলল।

সবাই বঙ্কুর পায়ের কাছে গেঞ্জি খুলে রাখল। বঙ্কু এদিক ওদিক তাকায়। তারপর জামাগুলো হাতে করে বাদামগাছের ওধারে নালার পাশে চলে যায়। ধোবাদের একটা বড় মাটির গামলা ক'দিন থেকে ওখানে পড়ে আছে। কিছু নীল-গোলা জল গামলার তলায় লেগে ছিল বুঝি। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জিগুলো গামলার ভিতর ঠেসে ধরে বঙ্কু। বাবলা বিশে কানাই জগা হাঁ করে তাকিয়ে বঙ্কুর জামা রং করা দেখে। গামলা থেকে এক একটা গেঞ্জি তুলে নিয়ে বঙ্কু রং পরীক্ষা করে। তা মন্দ হয়নি। সবগুলো জামা চিপে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বঙ্কু বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'কেমন, হ'ল তো জার্সি?'

'ফাইন ফাইন!' কানাই হাততালি দিয়ে উঠল। হাবুল খুশি গলায় বলল, 'কড়া রোদ আছে, এক ঘণ্টা লাগবে না শুকোতে।'

হোক না তালিমারা, হোক না ছেঁড়া, তবু তো সব ক'টা জামার এক রং হল। ভাল চাঁদা তুলতে পারলে তারা এক সেট্ জার্সি পরে কিনে নেবে। আজ তো ওই দিয়ে চলুক।

'জার্সির কথা লোকে মনে রাখে নাকি—মনে রাখে কোন্ টিম গোল খেল, কারা জিতল।'

'তাই, তাই।' বঙ্কুর কথায় সকলে এক সঙ্গে সায় দেয়।

বেলা তিনটে থেকে বাদামতলা প্রতিভা সেজেগুজে বল নিয়ে তৈরী হয়ে রইল। গাছতলায় আজ ভিড় বেশি। বাচ্চাগুলো অনর্গল চিৎকার করছেঃ 'বাদামতলা প্রতিভা কি জয়!' হাবুল হৈ-হৈ করে ওদের মাঝে মাঝে চুপ থাকতে বলছে।

তিনটের পর আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণায় এক টুকরো মেঘ দেখা যায়।

'ঝড় উঠবে কি?'

'বলা যায় না।'

'ঝড় না হয়ে বৃষ্টি হলে ভাল।'

'হ্যাঁ, ভিজা মাঠে খেলে সুখ আছে', কানাই বলল, 'রোদে যখন চাঁদেরা খেলতে পারে না, জলে ভিজেও খেলতে পারবে না।'

চারটের সময় মেঘটা আকারে বড় হল, রং গাঢ় হল।

মাঠের কোন্ দিকে যেন ব্যাঙ ডাকছিল।

'আমার মনে হয় জলই হবে।' বঙ্কু গম্ভীর হয়ে আকাশ দেখতে লাগল। জগার কানের কাছে মুখ নিয়ে বাবলা বলে, 'অরুণ আর হিমাংশুকে ওরা বাদ দেবে কি?'

'বলা যায় না', জগা বলল, তারপর কি যেন ভেবে পরে বাবলার চোখে চোখ রেখে ফিক্ করে হাসল, 'কেন, দুটোকে বাদ দিয়ে ওরা অন্য প্লেয়ার নিয়ে খেললে তোর মন খারাপ হবে নাকি।'

'তা, কিছুটা হবে বৈকি!' বাবলা মিটি-মিটি হাসে।

'দেখা যাক না।' উঁচু হলদে দাঁত দুটো বার করে জগা বাবুপাড়ার দিকে চোখ ফেরায়। 'ওদের আসার সময় হয়েছে।'

পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স মাঠে চলে এল। পরনে সাদা কর্ডের হাফ প্যান্ট, গায়ে সাদার ওপর লাল ডোরা কাটা নতুন জার্সি। কেউ কেউ অ্যাংক্লেট নিকাপ পরেছে। দু একজন গলায় সবুজ রুমাল বেঁধেছে। অরুণ হিমাংশু আর সুকুমার গলায় না বেঁধে কোমরে রুমাল গুঁজেছে। জগা বাবলার পিঠে গোপনে একটা চিমটি কাটল। বাবলা চুপ থেকে চিমটি হজম করল।

কা'কে রেফারী করা হবে এই নিয়ে একটু তর্কবিতর্কের ঝড় উঠছিল, কিন্তু উঠতে উঠতে ঝড়টা আবার থেমে গেল পাড়ার মাইনর স্কুলের ছোক্‌রা মাস্টার রবীন নাগ এসে পড়াতে।

'তাই ভাল।' দু পক্ষ রাজী হয়ে গেল। 'রবিদাকে রেফারী করা হোক।'

একবার বলতে স্বল্পভাষী রবীন পায়ের চটি ছেড়ে, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। হোয়াইট ফ্লাওয়ার্সের সেই চশমা পরা ঢ্যাঙ্গা ছোঁড়া হাতের ঘড়ি খুলে সেটা রবিদার হাতে পরিয়ে দিল। সুকুমার দিল তাদের সুন্দর বাঁশিটা।

এ-পক্ষ মুখ কালো করে রইল।

কিন্তু করা কী!

ঘড়ি বা বাঁশি তাদের নেই। আবার এ দুটো ছাড়া রেফারীর চলে না। কাজেই—

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় হুইসেল বেজে উঠল। পাঁচটা এক মিনিটে বাদামতলা প্রতিভা প্রথম বলে কিক্ করল।

পাঁচ মিনিট যায়, সাত মিনিট যায়।

যেন কোনো পক্ষ তেমন উত্তেজনা পাচ্ছে না, উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটছে না, খেলার জোর কম।

ঠিক দশ মিনিটের সময় বাদামতলা প্রতিভা একটা কর্নার কিক্ পায়। কর্নারের পর লেফ্ট আউট বিশে গোলে শট করলে ওদের গোলকীপার ঘুষি মেরে বারের ওপর দিয়ে বল ফিরিয়ে দেয়। আবার কর্নার কিক্। বল ক্রস বারে লেগে ফিরে এল। এবার হোয়াইট ফ্লাওয়ার্সের সেন্টার হাফ সুকুমার উঁচু লম্বা শটে বল মাঠের ওদিকে পাঠিয়ে দেয়। বঙ্কু, বাদামতলা প্রতিভার ফুলব্যাক অনায়াসে বলটা ফেরাতে পারত, বল তার পিঠে লাগল, হাঁটুতে লাগল, ছোট ছোট দুটো লাফ দিয়ে বল তার পায়ের সামনে প্রায় থেমে গেছে, এমন সময়, যেন বাজের মত উড়ে গিয়ে হোয়াইট ফ্লাওয়ার্সের সেন্টার ফরওয়ার্ড হিমাংশু বঙ্কুর পায়ের বল কেড়ে নিয়ে মাটিঘেঁষা লম্বা শটে গোলের মুখে পাঠিয়ে দিতে রাইট আউট অরুণ কেবল পা দিয়ে একটু ছুঁয়ে দিতে বলটা সোঁ করে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চোখের নিমেষে ঘটল এটা। কিন্তু যা ঘটল তা আর খণ্ডাবে কে। মুখ চুন হয়ে গেল বাদামতলা ক্লাবের। জয়ের উল্লাসে সাদা ফুলের দল নেচে উঠল।

তারপরও দশ মিনিট হাতে ছিল ইণ্টারভ্যালের।

এবার মারমুখো হয়ে বাবলা বিশে খেলতে আরম্ভ করল। কিন্তু কপাল মন্দ। হারু একটা গোল করলেও অফসাইডের জন্য রেফারী তা বাতিল করে দেয়। তারপর আবার খেলার তেজ কমতে থাকে।

তারপর এক সময় বাঁশি বেজে ওঠে।

গাছতলায় শোকের ছায়া নামে।

'তা, ঘাবড়াবার আছে কি—আরো হাফ-টাইম আছে খেলার। একটা তো গোল। শোধ করে আরো তিনটে গোল দিতে পারিস তোরা।' কেউ কেউ উৎসাহ দিল, কিন্তু বঙ্কু কানাই মুখ তুলে তাকাল না। বাবলা বিশে লেবু লজেন্সগুলো ভাগ করে দেয়। জগা হাবুল হারু সেসব স্পর্শও করে না। কেবল আকাশ দেখে। মেঘটা ছড়িয়ে পড়েছে। যদি এখনও জোরে বৃষ্টি নামে। 'মাঠ ভিজে গেলে চাঁদদের আর জিততে হবে না।' তারা বলাবলি করে।

মাঠের ওপাশে উৎসব আরম্ভ হয়েছে। আইসক্রীম বরফ লিমনেড কমলালেবু আঙুর চকোলেটের ছড়াছড়ি। নীল রুমাল উড়ছে, লাল রুমাল উড়ছে। অরুণ গোল করেছে বলে তাকে ঘিরে সাদা ফুলের লোকদের কত আদর। চশমা পরা ঢ্যাংগা ছেলেটাকে তো দেখা গেল অরুণকে জড়িয়ে ধরে তার দুটো হাত ঠোঁটের কাছে তুলে চুমো খাচ্ছে হাজারবার।

এধার থেকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে বাবলা।

জগা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওই ছোঁড়াকে এবার ওরা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে দেখিস।'

বাবলা কথা বলল না। কেবল গলা দিয়ে হুম্ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ বার করল। মাঠের হুইসেল বেজে ওঠে।

এবার বাদামতলার হাফব্যাক কানাই হোয়াইট ফ্লাওয়ার্সের একটা ফরওয়ার্ডকে ফাউল করে বসল। ভাগ্যিস পেনাল্টি চৌহদ্দির বাইরে ফাউলটা হয়। কিন্তু তাতে কি। ফ্রি কিক পেয়ে সাদা ফুলের দল সরাসরি গোলে শট করল না। সুকুমার আস্তে বলটা ঠেলে দেয় আর হিমাংশু ডান পায়ের বল বাঁ পায়ে নিয়ে চোখের পলকে লেফ্ট আউটকে ব্যাক পাস করে দেয়। লেফ্ট আউট বল দিয়ে দেয় রাইট হাফকে। যেন জিলিপীর প্যাঁচের মতন বলটা ঘুরেছিল। রাইট হাফ হেনা ব্যানার্জি বলতে গেলে বলটা পায়ে তুলে নিয়ে যেন গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হাবার মতন হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বাদামতলার গোলকীপার কিছু করতে পারল না। সাদা ফুলের দল আবার ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

কি, তারপর থেকে বাদামতলার মেজাজের লাগাম ছিঁড়ে গেল। বাবলা ইচ্ছা করে অরুণকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। রেফারী বাবলাকে সাবধান করে দিয়ে ফ্রি কিক ডাকল। এবারও গোল করল নাদুসনুদুস মোটামতন কোঁকড়া চুলের হেনা ব্যানার্জি।

আর কি! হয়ে গেল। আর দশ মিনিট। সাদা ফুলের দলের ছেলেরা মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে অনর্গল চিৎকার করছে আর আকাশে রুমাল ছুঁড়ছে। জয়ের উল্লাসে তাদের সব ক'টা প্লেয়ার যেন আশ্বিনের হাল্কা বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে উড়ে উড়ে খেলছে। বলটা আর মাঠের এধারেই এল না। কেবল বাদামতলার গোলপোস্ট ঘেঁষে ছুটোছুটি করছে। ঠিক দু মিনিট থাকতে অরুণ আর একটা গোল করল। বল সেন্টার হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি এপক্ষের জগা হলদে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে মরীয়া হয়ে বল নিয়ে শেষবারের মতন হোয়াইট ফ্লাওয়ার্সের গোলের দিকে ছুটে গেছে। কিন্তু গেলে হবে কি। বল চলে গেল মাঠের বাইরে আর জগা ছিটকে পড়ল গিয়ে পোস্টের ওপর। কপাল কেটে দরদর করে রক্ত বেরোয়। হোয়াইট ফ্লাওয়ার্সের ফুলব্যাক বল ছিনিয়ে কিক করবার সঙ্গে সঙ্গে রেফারীর শেষ বাঁশি বেজে উঠল। খেলা ওভার।

খেলাও শেষ হয় আর সোঁ সোঁ শব্দ করে আকাশ মাটি অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। 'হিপ্ হিপ্ হুররে—হিপ্ হিপ্—থ্রি চিয়ার্স ফর হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স—থ্রি চিয়ার্স ফর—' ভাগ্যিস বৃষ্টি আর বাতাসের গর্জনে শব্দগুলো বেশিক্ষণ শোনা গেল না, সাদা প্যান্ট আর ডোরা কাটা জার্সির দল নাচতে নাচতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাদামগাছের নীচে বঙ্কু কানাই বাবলা হাবুল বিশে জগা গোরুর মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। কারোর মুখে শব্দ নেই।

হ্যাঁ, বৃষ্টির মতন বৃষ্টি আরম্ভ হল বটে। সন্ধ্যার বৃষ্টি রাত বারোটায় ধরল। শেষ রাত থেকে আবার আরম্ভ হয়ে পরদিন বেলা দশটা। আবার কিছুক্ষণের জন্য ফাঁক। তা হলে হবে কি। আকাশ মেঘলা। বেলা দুটোর পর থেকে ঝমঝম করে আবার শুরু।

মাঠটা প্রকাণ্ড একটা দীঘি হয়ে গেল।

না হবার কিছু নেই। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের লোক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে ময়দান তৈরী করল, কিন্তু ময়দানের জলনিকাশের ব্যবস্থায় তারা তখনও হাত দেয়নি। বরং এদিকের নালার মুখ বন্ধ করে দিয়ে ওরা ওদিকের রাস্তার মাটি খুঁড়ে বড় বড় পাইপ বসাচ্ছে। কাজেই এখানকার মাঠে কোমর জল।

আর সেই জলের কী রং! এখানটায় লাল, ওখানটায় কালো, একটু দূরে মেটে মেটে রং, আর একদিকের জল ঘোলাটে হলদে। ঘাসের চাপড়ার নীচে ঢাকা ছিল মাঠের মাটি।

যেন নতুন বৃষ্টির জল ঘাস খুঁড়ে খুঁড়ে সব মাটি আবার ওপরে তুলে দিল। এখানে পাকা বাড়ি ছিল তাই এদিকের ইঁট সুরকি মেশানো মাটি লাল,—ওখানে টিনের ঘর ছিল, টিনের কালিঝুলে পড়ে মাটি কালো হয়ে গিয়েছিল। ওদিকটায় ছিল খোলার ঘর মাটির দেয়াল, তাই এমন মেটে মেটে রং। আর ওই যে হলদে ঘোলাটে জল সেখানে ছিল টালির ঘর।

হ্যাঁ, তখন বেলা চারটে সাড়ে-চারটে হবে। বৃষ্টিটা ধরেছে। যেন এবার একটু ভাল করেই ধরল। আকাশের মেঘ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। আলগা মতন একটু হাওয়া ছেড়েছে। ওধারের দোতলা তে-তলা বাড়িগুলোর সামনের কাঠমালতীর জংগলের মাথায় দু এক ফালি রোদ লেগে ভেজা পাতা চিকচিক করছে।

এধারে বাদামগাছের গুঁড়ির কাছে উঁচু মতন জমির ওপর দাঁড়িয়ে জগা আর বাবলা। মাঠ দেখছে, মাঠের জলের চাররকম রং।

'ওখানটায় ছিল তোদের টিনের ঘর—তার পাশেই তো ছিল ওদের পুরোনো দালান।' জগা আঙুল দিয়ে মাঠের জল দেখায়।

বাবলা ঘাড় নাড়ে।

'এদিকটায় ছিল তোদের টালির ঘর—আর ঠিক তার সামনে ছিল ওদের পাকা বাড়ি।'

জগা ঘাড় নাড়ে।

'ওদের এখনকার বাড়িটা আরো বড়।'

বাবলা একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ে।

'ওদেরটাও।'

দুজন চুপ থেকে আবার মাঠ দেখে, মাঠের ওপারের কাঠমালতীর জংগল, জংগলের পিছনের বড় বড় বাড়ি।

কোথায় যেন একটা ব্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে কেবল ডেকেই চলেছে।

হঠাৎ কি ভেবে বাবলা অল্প হাসল।

'মাঠটার জন্য মনে হয় ওরা কত দূরে চলে গেছে।' জগা হাসল না। ঘাড় কাত করে বলল, 'তাই।'

এমন সময়। যাদের নিয়ে কথা হচ্ছিল তাদের দেখতে পাওয়া গেল। অরুণ আর হিমাংশু। পপলিনের হাফ-শার্ট, সাদা ধবধবে সালোয়ার পরনে। সম্ভবত জল-কাদার জন্য জুতো পরা হয়নি। যেন মাঠের জল দেখতে আসছে এদিকে। জগা বাবলা অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। ওরা ঠিক বাদামতলার উঁচু জমিতে এসে দাঁড়ায়। এদের পাশে।

'মাঠের দফা রফা—আর খেলা যাবে না।' হিমাংশু হাসে। 'ইস্—কত জল!'

'এই জল শুকোতে আশ্বিন মাস।' অরুণ সায় দেয়।

জোর করে বাবলা জগা মুখ ফিরিয়ে

রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। তাকাল এদিকে। চোখোচোখি হল দুটি সাদা ফুলের সঙ্গে। একটা রঙিন প্রজাপতি উড়ছিল অরুণ হিমাংশুর মাথার কাছে কপালের পাশে। দুজনের গালে গলায় পাউডারের ছোপ। যেন একটু বেশি সময় তাকিয়ে থেকে বাবলা জগা সুন্দর মুখ দুটো দেখে।

ওরাও এদের দুজনকে দেখছিল।

বিকেলে ছাতু খেয়েছিল বাবলা, গালের পাশে শাদাটে দাগ লেগে রয়েছে। জগা বেল খেয়েছিল। থুতনির কিনারে বেলের শুকনো হলদে দাগ।

প্রথম হিমাংশু কথা বলল।

'তোরা এখন কোথায় খেলবি?'

'মাঠ দেখা হচ্ছে।' গম্ভীর থেকে বাবলা উত্তর করল।

'তোরা?' জগা প্রশ্ন করে।

'লাইনের ওধারে। কাল পরশু নাগাদ মাঠ হয়ে যাবে।' অরুণ আঙুল দিয়ে রেল-লাইন দেখায়।

বাবলা জগা চুপ করে থাকে।

হিমাংশু অল্প অল্প হাসে।

'তোদের আর মাঠ দেখে কি হবে— কালকে তোদের খেলার যা নমুনা দেখলাম!'

'কাল রেফারী পার্শিয়ালিটি করেছিল। বাবলা বলল।

'মোটেই না।' হিমাংশু মাথা নাড়ল। 'তোরা খেলতে পারিস না। এখন তাই বলবি।'

বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল হিমাংশু। অরুণ তার কাঁধে হাত রাখল। 'চুপ করে থাক, চুপ থাক। এখন ওরা তাই বলবে।' যেন অনেকটা নিজের মনে অরুণ গজগজ করে উঠল। 'বিড়ি তৈরী করে ঠোঙ্গা বানায়—ওরা আসে আমাদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ্ খেলতে! খুব হয়েছে—তিন গোল খেয়ে পেট ফুলে আছে।'

'কি বললি, কি বলছিস তুই?' জগার হলদে দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়ে। 'মুখ সামলে কথা বলবি।'

'যা বলেছে ও ঠিকই বলেছে।' অরুণের হাত ধরে হিমাংশু।

'চোর! ব্ল্যাকের পয়সায় বড়মানুষী।' বাবলা ফোঁস্ করে উঠল।

'কি বললি, কি বলছিস?' অরুণ এক পা এগিয়ে আসে।

'যা বলেছে ঠিকই বলেছে।' হাতের মুঠ শক্ত করে জগা। 'ব্ল্যাকের পয়সা দিয়ে তোরা নতুন নতুন দালান কিনছিস, বাড়ি করছিস!'

'যত সব বস্তিওলা, যত সব ফেরিওলা।' হিমাংশু ভেংচি কাটে। 'হ্যাঁ, কিনবই তো আমরা নতুন নতুন দালান—বড় বড় বাড়ি তৈরী করব। তোদের মতন? তোদের টিনটালি আর খোলার ঘরের ফুটো কপাল কোনোজন্মে শেষ হবে না।'

'তোদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলী করে মারবে, দেখিস—তোদের আর তোদের বাপ কাকাদের,' দাঁত খিঁচিয়ে জগা বলল, ব্ল্যাক চালিয়ে আর চুরি করে বেশিদিন ফুটুনি করা চলবে না।'

'গুলী করে মারবে!' অরুণ ঠোঁট বেঁকায়। 'তোরাই আগে মরবি—বস্তির ঘরে থেকে থেকে যক্ষ্মায় কলেরায় সব সাফ হয়ে যাবি। আর বেশিদিন বাকী নেই।'

'তোরা হার্টের ব্যারাম হয়ে মরবি, তোরা কর্ণারি থ্রম্বাসে পট্ পট্ সব পটল তুলবি।'

'কি বললি, কি বললি কথাটা?' জগার চোখে চোখ রেখে অরুণ নাক কুঁচকায়। 'ইংরেজী বলতে পারে না আবার ইংরেজী বলার শখ! যত সব গো-মুর্খ, যত সব—'

'মুর্খ আছি বেশ আছি, দরকার নেই আমাদের ন্যাকাপড়ার—সেদিন বীডন স্ট্রীট ধরে যাবার সময় দেখলাম তো লেখাপড়ার শেখার নমুনা!'

'কি দেখলি, কি দেখছিলি শুনি?' যেন বাবলার গলা টিপে ধরবে হিমাংশু। বাবলা ভয় পায় না। হাসে।

'দেখলাম তোদের পাড়ার তিনটে মেয়েকে

কলেজের সামনের রাস্তায়। পাঁচটা ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হুল্লোড় করছে। লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিস কিনা তাই মাথায় উঠেছে। আরো উঠবে।'

হিমাংশু এবার চোখ লাল করল।

'এই আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের পাড়ার মেয়েদের সম্পর্কে যা-তা বলবিনে।'

'বলব, হাজারবার বলব।' জগা গর্জন করে উঠল। 'নিজের চোখে সেদিন আমরা যা দেখেছি তাই বলছি, বানিয়ে বলা হচ্ছে না কিছু।'

'আর তোদের পাড়ার মেয়েরা কী করে শুনি?' অরুণ এবারও নাক কুঁচকায়, ঠোঁট বেঁকায়। 'রাস্তায় বসে ঘুঁটে দেয়, ব্যাটাছেলের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তার কলে জল ধরে। না নীচে একটা শায়া, না গায়ে একটা ব্লাউজ। সাধে কি আর বলে বস্তির মেয়ে।'

'এই অসভ্য! অসভ্যের মতো কথা বলবিনে।' বাবলা চোখ লাল করে, হাতের মুঠ শক্ত করে।

'কেন, মারবি নাকি!' হিমাংশু বাবলার মুখের সামনে গলা বাড়িয়ে দেয়। 'খুব চর্বি হয়েছে বুঝি গায়ে?'

'চর্বি না হাতী।' অরুণ পাতলা ঠোঁট ছুঁচলো করে থু থু ফেলল। 'পান্তা ভাত আর লংকাপোড়া খেয়ে গায়ে চর্বি!'

'তোরা কি খাস শুনি, বড় যে লম্বা বলছিস, কী খেয়ে তোদের গায়ে তেল হয়েছে, শুনি?'

'অনেক কিছু খাই।' হিমাংশু মাথা ঝেঁকে উঠল। 'দুধ খাই আম খাই মাংস খাই ছানা খাই। আমরা যা খাই তোরা সেসব চোখে দেখিস, না কোনোদিন দেখবি?'

'চুরির পয়সায় খাস, ব্ল্যাকের পয়সায় খাস।' জগা এবার শব্দ করে থু থু ফেলল। ব্যাঙের ডাকটা থেমেছে। বাদামগাছে একটা কাঠঠোকরা ঠক্ ঠক্ করে কাঠ ঠুকছে।

এ-পক্ষ চুপ করল, ও-পক্ষও চুপ করে রইল।

হাওয়াটা হঠাৎ থেমে যাওয়ায় কেমন যেন গুমোট লাগছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে হিমাংশু ঘাড় মুছল।

জগা বলছিল, 'চল্, এরা সব ফচ্‌কে বাবু,—মুখটাই সব, তর্ক আরম্ভ করলে লম্বা কথা ছাড়া কিছু বলে না। কী হবে এগুলোর সঙ্গে তর্ক করে।'

'দাঁড়া না, দাঁড়া।' বাবলা জগার হাত ধরে ওদের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকে। নীচু গলায় ওরাও কি বলাবলি করে। একটু সময় কাটে। তারপর হিমাংশু জগার দিকে ঘাড় ফেরায়।

'বেশ তো, আমাদের মুখেই সার না গায়েও জোর আছে একবার পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'কেন, লড়বি নাকি?' বাবলা উত্তর দেয়।

'আমি লড়ব কেন।' হিমাংশু মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ, যদি লড়তে হয় ওর সঙ্গে লড়ব, তুই অরুণের সঙ্গে লড়ে দ্যাখ না তোর গায়ে বেশি জোর কি ওর গায়ে—আমরা না হয় পরে দেখব, তুই কি বলিস?'

জগা থুতনি নাড়ে। কেন না, প্রস্তাবটা যুক্তিসংগত। বয়স এবং শরীরের দিক থেকেও হিমাংশু ও জগা যেন অরুণ ও বাবলার চেয়ে কিছু বড়।

হলদে দাঁত দুটো শূন্যে উঁচিয়ে এবং চোখ দুটো আধবোজা করে জগা ভারিক্কী গলায় বলল, 'তা একরকম মন্দ হয় না।—আগে ওদের ছোটদের মধ্যে হয়ে যাক। মারামারি না করে এমনি কুস্তীর মতন—'

'না না, মারামারি কেন, এমনি গায়ের জোর পরীক্ষা হবে। আঁচড়ানো কামড়ানো নিষেধ।' হিমাংশু বাবলাকে সাবধান করে দিয়ে অরুণের দিকে চোখ ফেরায়, 'কেমন, রাজী?'

অরুণের নাকের ডগাটা একটু বেশি কুঁচকে উঠল। পিটপিট করে সে এক সেকেন্ড বাবলাকে দেখে—পা থেকে মাথা, তারপর হিমাংশুর দিকে ঘাড় ফেরায়।

'ওর সারা গায়ে ভীষণ ময়লা, আর কী বিচ্ছিরি ঘাম! আমার শার্ট নোংরা হয়ে যাবে।'

'শার্ট খুলে নে।' হিমাংশু বলল, 'খুলে আমার হাতে দে।'

'পায়জামা?' অরুণ তার ধবধবে পায়জামার দিকে তাকাল। 'এই মাত্তর পাট ভেঙে পরে এলাম।'

হিমাংশু কি ভাবে। অরুণও ভাবে। তারপর অবশ্য সে মন স্থির করে ফেলে। 'যাক্ গে, কাল আবার ওটা ধোবাবাড়ি যাবে।' অরুণ শুধু শার্টটা খুলে হিমাংশুর হাতে দেয়।

'তুইও গেঞ্জিটা খুলে ফেল্।' জগা বলল, 'জামা রেখে সুবিধে হবে না।'

বাবলা ময়লা গেঞ্জিটা খুলে ফেলল।

'এখানে, ইদিকটায় ইঁটফিট নেই।' হিমাংশু আঙুল দিয়ে একদিকের ঘাস দেখায়। 'জায়গাটাও সমান।'

দুজন সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। অরুণের ডান পা সামনে, বাঁ পা পিছনে, বাবলার ডান পা পিছনে, বাঁ পা সামনে। একটু ঝুঁকে দাঁড়ায় সে, অরুণ কাঁধ সোজা রেখে দাঁড়ায়।

'মানে চিৎ করে মাটিতে ফেলতে পারলেই হ'ল।' জগা বলল। হিমাংশু বলল, 'আমি রেডি বলব, তারপর,—' হিমাংশু হাতের ঘড়িটা দেখল।

শিকারী বাঘের মতন দুজন ওৎ পেতে থাকে। অরুণের হাত দুটো সামনের দিকে, বাবলা দুটো হাত একটু পিছনের দিকে সরিয়ে রাখে।

'রেডি!' হিমাংশু হেঁকে উঠল।

অরুণ বাবলা পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'জিওজুৎসুরে প্যাঁচ কষে দে বাবলা।' জগা হেঁকে উঠছিল, হিমাংশু মাথা নাড়ল; 'না না, আমাদের বলে দেওয়া ঠিক হবে না, ওরা ওদের বুদ্ধি খাটিয়ে লড়বে।—একসঙ্গে গায়ের জোর আর বুদ্ধির পরীক্ষা হচ্ছে বাবুপাড়া আর বাদামতলার মনে রাখবি।'

কাজেই জগা চুপ করে গেল।

যেন অরুণের দু পায়ের ভিতর ঠ্যাং গলিয়ে দিতে চেষ্টা করছিল বাবলা। অরুণ বাবলার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিতে ফেলতে চায়। কিন্তু সুবিধা হয় না। দুজন আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে সরে দাঁড়ায়। একটু সময় ঘুরতে থাকে ওরা। মুখ সামনের দিকে। এর মধ্যেই ঘামছে দুজন। পোড়া মাটির হাঁড়ির মতন বাবলার পিঠের রং বুকের রং। কাজেই ঘামটাও কালি-গোলা জলের মতন দেখায়। অরুণের চামড়া আলতা-গোলা দুধের রং। রোদ নেই। তবু মনে হয়, রোদ লাগা শিশিরের মতন ঝকঝক করছে ওর বুকের কপালের গালের ঘামের ফোঁটাগুলো। এখন থেকেই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে দুজনের।

জগা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

হিমাংশু তার রিস্টওআচ দেখে।

এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে একজন আর একজনকে জাপ্টে ধরেছে। বাবলা চেপে ধরেছে অরুণের গলা, অরুণ জড়িয়ে ধরেছে বাবলার কোমর। এবার আর কেউ কাউকে ছাড়ে না। ঐ অবস্থায় ঘুরতে থাকে দুজন। তারপর একসঙ্গে দুজন মাটিতে পড়ে যায়। উত্তেজনায় জগা চিৎকার করে উঠত। আঙুল তুলে হিমাংশু ইশারা করতে জগা থেমে যায়। ঘাসের ওপর অরুণ আর বাবলা বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করল। চিৎ করতে পারছে না কেউ কাউকে। অরুণ তক্ষুণে বাবলার কোমর ছেড়ে দুটো বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে শক্ত করে ওর কাঁধ চেপে ধরে। বাবলা আগের মতন হাত দুটো আঁকসীর মতন করে অরুণের গলা চেপে রেখেছে। তারপর দুজন গড়াতে থাকে। পা দিয়ে পা বেঁধে রাখল বলে ওরা আর আলাদা রইল না, যেন একজন, একটা মানুষ হয়ে গড়াতে গড়াতে উঁচু জমি ছেড়ে মাঠের জলের কাছে চলে গেল।

জগা ছুটল, হিমাংশু ছুটল জলের ধারে।

দুজন নড়ছে না, আবার ছেড়েও দেয় না কেউ কাউকে,—যেন ঠাণ্ডা জলে শরীর ভেজাতে পেরে ওরা আরাম পাচ্ছে।

হিমাংশু ও জগার সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হয়। মাঠের জলে শরীর ডুবিয়ে দুজন একসঙ্গে হাসে।

'আশ্চর্য! কুন্তীর কথা ওরা ভুলে গেল নাকি।' হিমাংশু বিড়বিড় করছিল।

'তাই।' হলদে দাঁতে জগা হাসে। 'জেদাজেদি আর কতক্ষণ মনে থাকে—আসলে তো আমরা এক পাড়ারই ছেলে ছিলাম!'

'যখন ছিলাম তখন ছিলাম—এখন আর নেই।' হিমাংশু গজগজ করে উঠল। 'এই অরুণ!' জগা চুপ।

যেন হিমাংশুর শাসানি শুনে অরুণ আবার ধস্তাধস্তি আরম্ভ করল, জলের মধ্যেই বাবলাকে কাবু করতে চাইছে। বাবলা তখনও খিলখিল করে হাসে। যেন অরুণও হাসছিল। কি ব্যাপার! জলে নেমে পড়বে কিনা হিমাংশু চিন্তা করছিল।

ঠিক তখন।

এক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটল।

'উঃ মা-রে গেলাম রে!' অরুণ চিৎকার করে ওঠে।

'কি হল, কি হল!' হিমাংশু ও জগা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

বাবলাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অরুণ জল ছেড়ে শুকনো ঘাসের ওপর উঠে এল।

'কামড়ে দিয়েছে!'

'কোথায়—' হিমাংশু ও জগা অরুণের ওপর ঝুঁকে পড়ে। 'কোথায় দেখি!'

থুতনির নীচে গলার কাছে তিনটে দাঁতের দাগ। দাগ ধরে ধরে ডালিমদানার মতো তিনটে বড় বড় রক্তের ফোঁটা এর মধ্যেই দেখা দিয়েছে। হিমাংশু ও জগা কটমট করে বাবলার দিকে তাকায়। জল ছেড়ে উঠে এসে বাবলাও পাশে দাঁড়িয়েছে। যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে ও।

'হারাতে পারলিনে বলে তুই ওকে কামড়ে দিলি, ইডিয়েট!' রাগে হিমাংশু কাঁপছিল।

'না না, এরকম তো কথা ছিল না।' চোখ লাল করে জগা বাবলার চোখের দিকে তাকায়। 'এটা করলি কি!'

দুজনের ধমক খেয়ে বাবলা মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে, কি ভাবে। অরুণ কাঁদছে। অরুণকে প্রবোধ দিতে দিতে হিমাংশু রুমাল দিয়ে ওর গলার রক্ত মুছে দিতে ব্যস্ত হয়। জগাও সেরকম একটা কিছু করতে চাইছে। বাবলা তাড়াতাড়ি ঘাসের ওপর থেকে তার ময়লা গেঞ্জিটা তুলে ফালির মতন করে বেশ খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে গেল জলের কাছে। জলে ভিজিয়ে ন্যাকড়াটা হাতে করে ফিরে এল। বুঝি হাত বাড়িয়ে সে ভিজা ন্যাকড়াটা অরুণের গলার ক্ষতের ওপর চেপে ধরতে চাইছিল রক্ত বন্ধ করতে,—হিমাংশু ঝাড়া মেরে বাবলার হাত সরিয়ে দিয়ে মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

'ওসব নোংরা ন্যাকড়া নোংরা জল লাগাতে হবে না—বাড়ি গিয়ে ডেটল বেঞ্জিন যা হোক একটা কিছু দিতে হবে।'

হাতের ভিজা ন্যাকড়াটা ফেলে দিল বাবলা। কিন্তু হিমাংশুর ধমকটা জগার বেশি লাগে।

'শুয়ার কোথাকার! কুস্তী করতে গিয়ে কামড়াতে হবে তোকে কেউ বলে দিয়েছিল নাকি, শুনি?' চোখ লাল করে জগা আবার বাবলাকে ধমকায়।

'থাক থাক—ওকে আর এসব বলে কি হবে—ওর তো দোষ নেই—দোষটা ওর কালচারের।' রুমালের আর একটা কোণা দিয়ে অরুণের গলার রক্ত মুছে দেয় হিমাংশু। 'বস্তীর ছেলেরা এসব ছাড়া জানবে কি।'

অরুণ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল, হাত দিয়ে চোখ মুছছিল। 'বলা নেই কওয়া নেই হুট্ করে গাধাটা কামড় বসিয়ে দিল, ছোটলোক পাজী কোথাকার, দাঁড়াও না, তোমায় মজা দেখাচ্ছি।'

অরুণের জন্য কষ্ট যেমনই হোক হিমাংশুর অপমানকর কথাগুলো জগার বেশি বিঁধছিল। বলল, 'বেশ তো, ও যখন ওকে কামড়ে দিয়েছে অরুণও ওকে কামড়ে দিক!'

একে রাগ তার ওপর অরুণ কিছুতেই কান্না বন্ধ করছে না দেখে হিমাংশু বলল, 'বেশ তুইও গরুটোকে একটা কামড় বসিয়ে দে—শোধ হয়ে যাবে।'

জগা এবং হিমাংশুর প্রস্তাব শুনে বাবলা তৎক্ষণাৎ ডান হাতটা অরুণের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে মুখ কালো করে বলল, 'দে, আমায় কামড় দে, আমি কিছু বলব না।'

জলভরা চোখে অরুণ বাবলার হাতটা দেখল আর সঙ্গে সঙ্গে নাক কুঁচকালো।

'ইস্, এমন বিচ্ছিরি ময়লা হাতে কামড় দিতে আমার ঘেন্না করবে!'

বাবলার কালো কুচকুচে ঘামে ভেজা হাতের ওপর চোখ বুলিয়ে হিমাংশু অল্প হাসল। হেসে অরুণের দিকে তাকাল।

'না না, রক্ত বার করতে হবে না, রক্তটা খারাপ বাজে—তোর ঘেন্না করবে। তুই এমনি—দাঁত দিয়ে ওর হাতটা একবার ছুঁয়ে দে তবেই হবে,—তবেই কামড়ের শোধ হয়ে যাবে।'

অরুণ তাই করল। বাবলার হাতটা দাঁত দিয়ে একবার একটু ছুঁয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল জলের কাছে। জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ও ফিরে আসতে হিমাংশু বলল, 'চল্ এই-বার বাড়ি চল্—খেলাটেলা দূরে থাক—ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মেশাই—'

যেন আরও কি সব বলাবলি করতে করতে অরুণ হিমাংশু হাত ধরাধরি করে মাঠের কিনারা ধরে কাঠমালতীর ঝোপের দিকে চলে যায়। আলো নিভে গেছে। কাঠ-ঠোকরাটার ঠক্ ঠক্ আর শোনা যায় না।

'চল্, ঘরে যাই।' জগা ডাকছিল।

বাবলা কথা বলে না। ঘাসের ওপর বসে গেছে ও। তাকিয়ে আছে কাঠমালতীর জঙ্গলের ওদিকে।

'কি, ভাবছিস কি ভূতের মতন বসে থেকে?' জগা আবার ডাকে।

বাবলা মুখ ফেরায় না কথা বলে না।

যেন কি একটা কথা মনে পড়ল জগার। হেসে দাঁত ফাঁক করে হাসল।

'ও, বুঝেছি, ওর দুধ ছানা আম খাওয়া চামড়াটা কেমন নরম কামড় দিয়ে দেখতে গেছলি, না?'

উত্তর না দিয়ে বাবলা দুহাতে মুখ ঢাকে।

জগা চটে যায়। আকাশের দিকে মুখ করে অনেকটা নিজের মনে বলে, 'তা কামড় বসিয়ে তোরই তো আগে দরদ উছলে উঠল দেখলাম, গেঞ্জি ছিঁড়ে নিয়ে জল লাগাতে গেছলি!'

এবারও বাবলা শব্দ করে না।

জগার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বাবলার চুল ধরে জোরে টান মারল।

'না কি ভেবেছিলি ওর গলাটা ক্রীম, মিষ্টি লাগল রক্তটা—?' বলতে বলতে জগা হঠাৎ থেমে গেল। হাতের ভিতর মুখ লুকিয়ে বাবলা কাঁদছে।

এভাবে কান্নার অর্থ বুঝতে না পেরে জগা কেমন যেন একটু বোকা বোকা চোখে মাঠের অন্ধকার জলের দিকে তাকায়। আর ঠিক তখনই জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ হয়। 'ডোমপাড়ার পিছনে একটা মাঠের সন্ধান পাওয়া গেছে।' বলাবলি করতে করতে বঙ্কু কানাই হারু বিশে বাদামতলার দিকে আসছে।

ঘাস-ফুল
স্কেচ ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

'বেণুবনে কাঁপে ছায়া'
স্কেচ ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

# রত্নাবলী

প্রমথনাথ বিশী

**স্থান ঃ** বেলগাছিয়া পাইকপাড়ার রাজাদের নাট্যশালার নেপথ্যে সাজঘর।

**কাল ঃ** ৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৮৫৮ সাল। রাত্রি প্রথম প্রহর।

[রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত রত্নাবলী নাটকের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হইয়া এইমাত্র প্রথম অঙ্ক শেষে যবনিকা পড়িয়াছে।

প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসার করতালি শ্রুত হইল। সেই সঙ্গে সাজঘরের এক দরজায় প্রবেশ করিল নাটকের পাত্রপাত্রীদের অনেকে, তাহাদের গায়ে নাটকোচিত বেশভূষা। বিদূষক (কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী), সাগরিকা (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) এবং নটী (কালিদাস সান্ডেল) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অন্য দরজায় প্রবেশ করিলেন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ। তাঁহাদের পিছনে আছেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র ও বিদ্যাসাগর। সব শেষে একত্র প্রবেশ করিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন ও গৌরদাস বসাক।

পাত্র-পাত্রীগণ প্রথমে যে-সব কথা বলিলেন, প্রেক্ষাগৃহের করতালি ও উল্লাসধ্বনির জন্য তাহা শুনিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নাটকের পাত্রপাত্রীর করমর্দন করিলেন, কাজেই বুঝিতে পারা গেল যে, অভিনয়-নৈপুণ্যে তাঁহাদের উল্লাসটাও কম হয় নাই। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর করমর্দনের মধ্যে নাই।

এবারে প্রেক্ষাগৃহের করতালি ও উল্লাসধ্বনি বন্ধ হওয়ায় সাজঘরের কথোপকথন শ্রুত হইবে। বাহিরের কোলাহলে চাপাপড়া শব্দের শেষাংশগুলি কানে আসিবে। কে বা কাহারা বক্তা জানিবার প্রয়োজন নাই—এ সব সকলেরই মনের কথা।]

গ্র্যান্ড

এক্সেলেণ্ট

বুড়ো বয়সেও স্মৃতিশক্তি কমেনি দেখছি, খুব memorize করেছ।

রামনারায়ণ পণ্ডিত ইংরাজি জানেন না তবু কাল মাহাত্ম্যে দু' চারটা শব্দ শিখিয়াছেন, সেগুলিকে দেশীয় উচ্চারণে শোধিত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

**রামনারায়ণ ॥** গ্র্যাণ্ডো, এক্সেলেণ্টো, আর কি সব বলে বলো না ছাই দত্ত সাহেব

**মধুসূদন ॥** সুপার্ব

**রামনারায়ণ ॥** কি বললে, কি বললে, সুপারি?

**মধুসূদন ॥** ওয়াণ্ডারফুল

**রামনারায়ণ ॥** সেটা আবার কি ফুল হে?

**বিদ্যাসাগর ॥** তর্করত্ন ওসব বিলিতি ফুল, তোমার আমার মতো বামুন পণ্ডিতের মুখে মানাবে না।

**রামনারায়ণ ॥** তুমি আর আমার সঙ্গে জোট বাঁধো কেন, ভায়া, তুমি তো ইংরেজি সমুদ্র গণ্ডূষে পান করে বসে আছ। তুমি তো অগস্ত্যহে।

**মধুসূদন ॥** An august suggestion!

**কেশব গাঙ্গুলী ॥** ওসব ফাঁকা উৎসাহ-বাক্যে পেট ভরবে না, বলি আহারাদির কিছু ব্যবস্থা আছে রাজাসাহেব।

**প্যারীচাঁদ ॥** কেশববাবু এখনো বিদূষকের ভূমিকা বলে চলেছেন।

**কেশব গাঙ্গুলী ॥** কেন মশায় খিদে কি কেবল বিদূষকেরই পায়? আপনাদেরও তো মুখ শুকনো দেখছি।

**প্রতাপচন্দ্র ॥** সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে, চিন্তিত হবেন না।

**রামনারায়ণ ॥** আমার জন্যে আশা করি গোটা দুই পাকা হর্তুকি ফলের ব্যবস্থা আছে?

**ঈশ্বরচন্দ্র ॥** হ্যাঁ, পণ্ডিত মশায়, ফলাহারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

**গৌরদাস ॥** আপনার তো পেট ভরে খাওয়া উচিত পণ্ডিত মশায়।

**রামনারায়ণ ॥** কেন বাপ? ইতিমধ্যে কি এমন অঘটন ঘটলো?

**গৌরদাস ॥** এই যে হাততালি শুনলেন না?

**রামনারায়ণ ॥** না শুনে উপায় আছে? কর্ণ-পটহ বিদারণের উপক্রম। গাঁয়ে ক্ষেত থেকে বাবুই পাখি তাড়াবার সময়ে চাষীরা এ রকম হাততালি দিয়ে থাকে বটে।

**গৌরদাস ॥** এ যে প্রশংসার

**রামনারায়ণ ॥** প্রশংসায় খাদ্যের অভাব পূরণ হলে এতদিনে উদরাময় হয়ে মারা যেতাম।

(সকলের হাস্য)

**গৌরদাস ॥** আমার পাশে মিঃ হিউম বসে-ছিলেন, তাঁর ধারণা নাটকখানা মৌলিক

**বিদ্যাসাগর ॥** অর্থাৎ বজ্জাত

**গৌরদাস ॥** কিন্তু আমি যখন বুঝিয়ে দিলাম যে মৌলিক নয় তখন তিনি

**বিদ্যাসাগর ॥** বললেন বুঝি জারজ

**রামনারায়ণ ॥** আঃ কি ছাই বকছো, শুনতেই দাও না কি বললেন?

**বিদ্যাসাগর ॥** বলুন বসাক মশাই, আদা মেঘের বারিবিন্দুপাতের আশায় রাম-নারায়ণ চাতক উৎকণ্ঠিত।

**গৌরদাস ॥** মিঃ হিউম বললেন যে, অনু-বাদ এমন সুন্দর যে মূল নাটক বলে মনে হয়।

[তারপরে মধুসূদনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন— ]

**গৌরদাস ॥** কিন্তু সবচেয়ে Score করেছ তুমি মধু। মিঃ হিউমের ধারণা হয়েছিল যে, ইংরাজি অনুবাদ করেছে কোন ইংরাজ। তোমার লেখা বলতেই সাহেব চমকে উঠলেন, বললেন, বলো কি বাঙালী এমন চমৎকার ইংরাজি লেখে।

**মধুসূদন ॥** এ আর এমন বেশি কথা কি। হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েও এমন লিখতাম। কিন্তু দুঃখ কি জানো এমন একখানা অপদার্থ নাটকের জন্যে রাজারা এত খরচ করছেন

**রামনারায়ণ ॥** কি বললে? কি বললে?

**গৌরদাস ॥** আপনার অনুবাদের সম্বন্ধে বলা হয় নি, মূল নাটকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে

**রামনারায়ণ ॥** তা বলো গিয়ে

**গৌরদাস ॥** শুনলাম দশ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে

**মধুসূদন ॥** Ten thousand and all for this stuff!

**গৌরদাস ॥** তা হবে না! তুমিই তো পারি-শ্রমিক পেয়েছ পাঁচশ। পণ্ডিতমশাইও নিশ্চয় ঐ রকম পেয়েছেন!

**মধুসূদন ॥** দুঃখ তো তাই সেই! এত ব্যয়, এত উদ্যম, অথচ পদার্থটা—

**বিদ্যাসাগর ॥** পদার্থটাই বা খারাপ কি? রত্নাবলী

**মধুসূদন ॥** সব ঝুটা রত্ন, একটাও সাচ্চা নয়।

**বিদ্যাসাগর ॥** চমৎকার বলেছ

**গৌরদাস ॥** কিন্তু রাজারাই বা করবেন কি? বাংলা ভাষায় আর নাটক কই?

**মধুসূদন ॥** তবু নাটকখানার পক্ষে বলবার মতো একটা বিষয় আছে।

[দীর্ঘ সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র বলিলেন।]

**প্রতাপচন্দ্র ॥** আপনারা কথাবার্তা বলুন; আমরা ততক্ষণ একবার অতিথিদের তত্ত্ব-তদারক করে আসি।

**মধুসূদন ॥** নাটকখানার নায়িকা রত্নাবলী সিংহল রাজপুত্রী। অর্ণবপোত বিপর্যয়ে সাগরিকা নামে পরিচিত। তারপরে যা ঘটলো নাটকে বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন উত্তম কিন্তু ক্ষমতার অভাবে নাটক ওৎরালো না।

**গৌরদাস॥** তবে কি তোমার প্রশংসা শুধু উত্তম কাহিনী নির্বাচনের জন্যে?

**মধুসূদন॥** কতকটা। আসল প্রশংসা প্রাপ্য ঐ কাহিনীটার। অকূল পারাবারের মধ্যে সিংহল দ্বীপ, রামায়ণে বর্ণিত সুবর্ণ-লংকা! Oh! how it kindles my imagination!

**গৌরদাস॥** মধু, তোমার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে। যা তোমার imgination-কে kindle করছে তা সিংহল দ্বীপ নয়, শ্বেতদ্বীপ, ইংল্যান্ড।

**মধুসূদন॥** করছেই তো, একশবার করছে। "I sigh for distant Albion's shore," দেখো গৌরদাস ইংলন্ডে আমাকে যেতেই হবে।

**গৌরদাস॥** পাসপোর্ট করিয়েছ নাকি?

**মধুসূদন॥** না, গৌরদাস ঠাট্টা নয়। যখন ইংরাজি কবিতা লিখবো বলেছিলাম তখন ঠাট্টা করেছিলে, যখন ধর্মান্তর গ্রহণ করবো বলেছিলাম তখন ঠাট্টা করেছিলে, যখন ইংরাজ মহিলা বিয়ে করবো বলেছিলাম ঠাট্টা করেছিলে! সবই তো সত্য হল। বিলেত যাওয়াটাও সত্য হবে।

**গৌরদাস॥** তবে আর বিলম্ব কেন?

**মধুসূদন॥** বাংলা সাহিত্যে একটা বিপ্লব এনে দিয়ে বিদায় নেবো।

**গৌরদাস॥** তার মানে কি হল? আগুন লাগিয়ে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে নাকি?

**মধুসূদন॥** বিপ্লব মানে বুঝি তাই? বাংলা সাহিত্যে একটা ওলট পালট এনে দেব।

[মধুসূদন ও গৌরদাসে যখন কথা হইতেছিল তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামনারায়ণ তর্করত্ন মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিলেন, আর বিদূষক আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোঁফ দাড়ি আঠা দিয়া শক্ত করিয়া আটকাইয়া লইতেছিল, আর সাগরিকা মুখে পাউডার ঘষিয়া পৌরুষ রুক্ষতাকে আর একটু নারীসুলভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন বাংলা সাহিত্যের প্রসংগ ওঠায় বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন, প্যারীচাঁদ ও রামনারায়ণ তর্করত্ন সচেতন হইয়া উঠিলেন।]

**গৌরদাস॥** তোমার কথার অর্থ যদি হয় যে তুমি লিখবে বাংলা ভাষায় তবে তোমার কথার Face value-র গুরুত্ব স্বীকার করতে পারলাম না

**মধুসূদন॥** কেন পারলে না গৌরদাস! সংসারে Face value-র চেয়ে গুরুতর আর কি আছে?

**গৌরদাস॥** প্রমাণ?

**মধুসূদন॥** প্রমাণ? ঐ দেখো বিদূষক আর সাগরিকাকে, একজন দাড়িগোঁফ জুড়ে নিয়ে আর একজন পাউডার ঘষে Face value-কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে।

[রামনারায়ণ ব্যতীত সকলে হাসিয়া উঠিলেন, রামনারায়ণ ইংরাজি রসিকতা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু কিছু বলা চাই—]

**রামনারায়ণ॥** অবশ্য, অবশ্য।

**মধুসূদন॥** প্রথমেই লিখবো খানকতক নাটক।

**গৌরদাস॥** তুমি লিখবে নাটক?

**মধুসূদন॥** প্রথমে লিখবো খান দুই পৌরাণিক, তারপরে খানকতক ঐতিহাসিক, তারপরে ক'খানা সামাজিক! কিন্তু ভেবো না যে নাটক নিয়েই চিরটা কাল থাকবো। হাত একটু পোক্ত হলেই লিখবো মহাকাব্য! এপিক! নবযুগের বাণীর অক্ষয় আধার! আর অনুমান করতে পারো তার বিষয়টা কী হবে? ঐ সিংহল দ্বীপ, স্বর্ণলংকা, সমুদ্র-পরিখাবেষ্টিত! "I sigh for Albion's distant shore!"

[হঠাৎ যেন এতক্ষণে স্বপ্ন ভংগ হইল, চকিত হইয়া গৌরদাসকে শুধাইল—]

**মধুসূদন॥** হাঁ গৌরদাস এটা কোন্ সাল?

**গৌরদাস॥** কেন, ১৮৫৮

**মধুসূদন॥** ওঃ তাইতো জীবনের চৌত্রিশটা বছর কেটে গেল। এখনো হ'ল না মহাকাব্যের একছত্র রচনা! কিন্তু না এখনো সময় আছে। মিল্টন আরম্ভ করেছিলেন পঞ্চাশের পরে।

**গৌরদাস॥** কিন্তু পূর্বাহে্ন ছিল তার ভূমিকা

**মধুসূদন॥** আমারই কি ভূমিকা নেই ভাবছ? হিন্দু কলেজ, গোলদীঘি, বিশপ্স কলেজ, মাদ্রাজ, কলকাতা, বেলগাছিয়া সমস্তই যে সেই অনাগত মহাকাব্যের ভূমিকা।

**রামনারায়ণ॥** সাহেব মধুসূদন যে এমন অনর্গল সংস্কৃতবহুল বাংলা বলতে পারেন তা জানতাম না

**মধুসূদন॥** আমিও জানতাম না। স্রোতের টানে নুড়ির মতো শব্দগুলো বেরিয়ে আসছে কোন্ গঙ্গোত্রীর গহবর থেকে দেখে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

**বিদ্যাসাগর॥** নিজের মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনে রত্নাকর দস্যুরও ছিল না বিস্ময়ের অন্ত।

**গৌরদাস॥** মধু তুমি অনেক অসম্ভব সম্ভব করেছ সত্য, কিন্তু বাংলা বই লিখবে এ আমি একেবারেই অসম্ভব মনে করি।

**বিদ্যাসাগর॥** কেন অসম্ভব মনে করো গৌরদাস। দস্যু রত্নাকরের পক্ষে যদি মহর্ষি বাল্মীকি হওয়া সম্ভব হয়, তবে এটা কেন অসম্ভব? সাহেব মধুসূদন হবে প্রথম বাঙালী মহাকবি—আমি তো অসম্ভব দেখিনে

**মধুসূদন॥** A good hit! আমাকে সংকট থেকে রক্ষা করলেন আপনি।

**বিদ্যাসাগর॥** এ আর এমন কি সংকট।

**মধুসূদন॥** সংকট বই কি! আত্মসংকট। আমি চলেছি সংকটের পরিখা ডিঙোতে ডিঙোতে। সর্বদাই কেউ না কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকার মতো ভবিষ্যতের সংকটেও যেন আপনার প্রসারিত হাত পাই।

**বিদ্যাসাগর॥** আমার হাত কি ছ' হাজার মাইল দীর্ঘ হবে! তুমি তো চললে বিলেত।

**মধুসূদন॥** কিন্তু তার আগে আছে বাংলা নাটক রচনা।

**যতীন্দ্রমোহন॥** উত্তম কথা। আপনি যদি বাংলা নাটক লিখতে পারেন তবে আমি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে দেব।

**মধুসূদন॥** ঐ দেখুন সংকটে আর একজন হাত বাড়িয়ে দিলেন।

[প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ]

**প্রতাপচন্দ্র॥** আর আমরা তা অভিনয়ের ব্যবস্থা করবো এই বেলগাছিয়ার নাট্য-শালাতেই।

[বেশ বুঝিতে পারা যায় রাজারা আড়ালে থাকিবার সময়ে উদাসীন ছিলেন না, কথাবার্তা শুনিতে পাইতেছিলেন।]

**মধুসূদন॥** ঐ আর একখানা হাত। নাঃ আমার বন্ধুভাগ্য ভালো।

**রামনারায়ণ তর্করত্ন॥** দেখুন দত্ত সাহেব একটা কথা বলি। কুম্ভকর্ণের কাহিনী শুনেছেন তো? বেটা হঠাৎ জেগে উঠবার ফলে মারা গেল। ওর নীতিকথাটা কি জানেন; হঠাৎ কিছু করতে নেই। ইংরাজিতে লিখছিলেন ইংরাজিতেই লিখুন

**মধুসূদন॥** তাইতো লিখছিলাম

**রামনারায়ণ॥** তবে? আবার বাংলা কেন?

**গৌরদাস॥** বেথুন সাহেবের চিঠি

**মধুসূদন॥** তোমরা সবাই প্রপাগান্ডার জোরে বেথুনের চিঠিকে আমার জীবনের ওয়াটার শেডে দাঁড় করিয়েছ। কিন্তু আসল রহস্য স্বতন্ত্র।

**গৌরদাস॥** এর মধ্যে আবার রহস্য কি?

**মধুসূদন॥** অনন্ত রহস্য। ইংরাজি কাব্য লিখতে গিয়ে দেখলাম ঐ ছোট্ট খাঁচায় ডানা মেলবার যথেষ্ট জায়গা নেই। বাংলা পয়ারের ভয়ে ইংরাজি কাব্যে প্রবেশ করলাম সেখানেও দেখি বাংলা পয়ার "হিরোইক কাপলেট" নাম নিয়ে বসে আছে। পরে দেখলাম ও হচ্ছে গিয়ে চীনে মেয়ের পায়ের জুতো। পায়ের মাপে জুতো নয়, জুতোর মাপে পা। কি সর্বনাশ। যখন মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছি এমন সময় সমর্থন জানিয়ে এল বেথুনের চিঠি।

**গৌরদাস॥** এবার কি তবে বাংলা পয়ার ধরবে।

**মধুসূদন॥** না এবারে বঙ্গ সরস্বতীর পয়ার পায়ের বেড়ী প্রতিভার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবো।

**রামনারায়ণ॥** বাপু হে, একেই বলে কুম্ভকর্ণের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ। কত হাতী ঘোড়া তল গেল এখন......কৃত্তিবাস কাশীরাম যা করতে পারে নি তুমি পারবে তা?

**মধুসূদন॥** কৃত্তিবাস কাশীরামকে সহ্য করতে পারি কিন্তু অসহ্য ঐ কৃষ্ণনগরের লোকটা

**বিদ্যাসাগর॥** কেন হে ভারতচন্দ্রের উপরে এমন খড়্গহস্ত হলে কেন?

**মধুসূদন॥** বাংলা কাব্যকে বাসর ঘরে পরিণত করে ফেলেছে ঐ লোকটা। গুপ্ত প্রণয়, ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম নিবেদন, ছন্দের ফুলঝুরি বর্ষণ—এই কি জীবন! কোথায় হোমারের কাব্যের মহাম্বুধির উত্থানপতনের তান্ডব? কোথায় মিল্টনের মহাকাব্যের নির্জন অরণ্যে সিংহগর্জন, কোথায় শেক্সপীয়রের নাটকের মধ্যাহ্ন জগতের জাগ্রত জনতা? ধরুন না কেন রত্নাবলী নাটকখানা। এর বিষয়টা কি? অবসরলালিত বিলাসী রাজার ছদ্মপ্রণয় কাহিনী। কোথায় তাঁর সঙ্গে আজকার বাস্তসমস্ত জীবনের যোগ।

**গৌরদাস॥** সেকালে হয়তো যোগ ছিল

**মধুসূদন॥** এই যদি সেকালেব পরিচয় হয় তবে বলবো সেটা ছিল অকাল।

**বিদ্যাসাগর॥** তুমি কি করতে চাও শুনি

**মধুসূদন॥** নূতন জীবনের রক্তস্পন্দন ঢুকিয়ে দিতে চাই বাংলা কাব্যের ধমনীতে।

**রামনারায়ণ॥** এই সেরেছে। মানোয়ারী গোরা ক্ষেপে উঠেছে আর রক্ষা নেই। নিজের জাতটা দিয়েছে এবারে মারবে বাংলা কাব্যের জাত।

**বিদূষক॥** (রত্নাবলী নাটকের বিদূষক কেশব গাঙ্গুলী) বাঁকা কথাটা একটু সোজা করেই বলুন না। অর্থাৎ—

**রামনারায়ণ॥** কে হে তুমি বেল্লিক! রামনারায়ণ শর্মা কখনো বাঁকা কথা বলে না, তার কথা রাজদণ্ডের মতো সরল।

**বিদূষক॥** আজ্ঞে আপনি ভুল করছেন

**রামনারায়ণ॥** আবার বেল্লিকপনা, আমি ভুল করবো। তোমার কথাগুলোই বাঁকা, তোমার ঐ লাঠিখানার মতো।

**বিদূষক॥** তা সত্যি, রাজদণ্ডে ও বিদূষকের দণ্ডে অনেক প্রভেদ। কিন্তু আমি আপনাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলিনি।

**রামনারায়ণ॥** তবে কাকে লক্ষ্য করে বলেছ শুনতে পারি?

**বিদূষক॥** রাজাকে লক্ষ্য করে

**রামনারায়ণ॥** তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়

**বিদূষক ॥** আবার আমার কথাটা সম্পূর্ণ না শুনেই চটে উঠছেন

**রামনারায়ণ ॥** বেশ শেষ করো তোমার কথাটা

**বিদূষক ॥** বিদূষকের ভূমিকাটা একটু আউড়ে নিচ্ছিলাম যাতে রঙ্গমঞ্চে ভুল না হয়ে যায়।

**রামনারায়ণ ॥** তবে এতক্ষণ তা থুলে বলো নি কেন?

**বিদূষক ॥** চেষ্টা তো করছি বলতে দিচ্ছেন কই?

**মধুসূদন ॥** মাঝে থেকে আমার mood-টা নষ্ট হয়ে গেল।

**গৌরদাস ॥** দাঁড়াও আমি ধরিয়ে দিচ্ছি, তুমি বলছিলে বাংলা সাহিত্যের ধমনীতে নূতন জীবন স্পন্দন ঢুকিয়ে দিতে হবে।

**মধুসূদন ॥** Exactly! ললিতলবঙ্গলতার দিন চলে গিয়েছে।

**বিদ্যাসাগর ॥** কেন, জয়দেব গোস্বামীর অপরাধ কি?

**মধুসূদন ॥** জয়দেব গোস্বামী আর রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র, গীতগোবিন্দ আর বিদ্যাসুন্দর—ঘুমের আরক বিদ্যাসাগর ঘুমের আরক।

**বিদ্যাসাগর ॥** কেমন?

**মধুসূদন ॥** এখনো বুঝতে পারলেন না আমার কথাটা। বাংলাদেশ দু'বার বিদেশীর হাতে পরাজিত হয়ে অধিকৃত হয়েছে। একবার যখন জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দ মারফৎ ঘুমের আরক বিতরণ করছিলেন আর একবার যখন রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দর মারফৎ বিতরণ করছিলেন ঘুমের আরক। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা অক্ষরও না জানলে ঐ কাব্য দু'খানা পড়েই প্রকৃত অবস্থা অনুমান করতে পারতাম।

**বিদূষক ॥** আপনার পাণ্ডিত্য গর্ব রেখে দিন, ও কথা বোঝা আপনার কর্ম নয়।

**মধুসূদন ॥** কেশববাবু, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি

**গৌরদাস ॥** কেন উনিতো ঠিক কথাই বলেছেন। জয়দেব গোস্বামী হলেন মহাজন আর ভারতচন্দ্র হলেন মহাকবি। তাঁদের কাব্য বিচার এত সহজ নয়।

**মধুসূদন ॥** গৌরদাস তোমার ক্লাসিকাল সাহিত্য যথেষ্ট পড়া নেই তাই এমন কথা বলছ

**গৌরদাস ॥** মধু তোমার ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্র যথেষ্ট পড়া নেই তাই এমন কথা বলছ।

**মধুসূদন ॥** এ স্বীকার করতে পারলাম না।

**গৌরদাস ॥** আচ্ছা উনিই বলুন না কেন এমন কথা বললেন।

**বিদূষক ॥** সেই ভালো আমিই বলি। আমি বিদূষকের ভূমিকাটা আউড়ে নিচ্ছিলাম।

**মধুসূদন ॥** Grand! কেশব You are a gem! আসল কথা কি জানো গৌর, নব্য বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি হবে মনের রাজসিক ভাব। বীর্য চাই, বীর্য

**বিদ্যাসাগর ॥** কথাটা সত্য কিন্তু অন্তরায় কি?

**মধুসূদন ॥** ঐ পয়ার ছন্দ। পয়ারের চাল ভীরুর চাল। আমাদের সংস্কার ও প্রথা জর্জরিত সমাজের গতির মতো পয়ারের গতি বড় ধীর, বড় পরিমিত, বড় বাধা-গ্রস্ত।

**বিদ্যাসাগর ॥** উত্তম বলেছ কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি?

**মধুসূদন ॥** সমাধান ব্ল্যাংক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ। যতদিন না বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন বীর্যবান হওয়ার কোন আশা নেই বাংলা কাব্যের।

**যতীন্দ্রমোহন ॥** আমার বোধ হয় না যে বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবর্তন সম্ভব। আর আমাদের বাংলা ভাষার যেরূপ গঠন ও প্রকৃতি তাতে এ ভাষা অমিত্রছন্দের মহান গাম্ভীর্য ও সুললিত পদবিন্যাসের উপযোগী হতে পারে না।

**মধুসূদন ॥** এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমার মতে একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

**যতীন্দ্রমোহন ॥** অমিত্রছন্দকে ব্যঙ্গ করে লিখিত ঈশ্বর গুপ্তের সেই কবিতাটা আপনার মনে আছে কি?

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

**মধুসূদন ॥** বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত যদি না পারেন তাই বলে আর কেউ পারবে না এমন হতেই পারে না।

**যতীন্দ্রমোহন ॥** আমি যতদূর জানি ফরাসী ভাষার ন্যায় সমৃদ্ধ সাহিত্যেও ব্ল্যাংক ভার্স নেই। এমন স্থলে বাংলা ভাষায় যে সম্ভব হবে না এ আর বেশি কি!

**মধুসূদন ॥** আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন যে বাংলা ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতর দুহিতা যার তুল্য সমৃদ্ধ ভাষা আর নেই।

**যতীন্দ্রমোহন ॥** সত্য অতি সত্য। কিন্তু সবলা মাতার দুহিতা এক্ষণে নিতান্ত দুর্বলা

**মধুসূদন ॥** দুর্বলা কি সবলা অন্ততঃ একবার পরীক্ষা হওয়া দরকার। যদি আমি অত্যল্পকালের মধ্যে আপনার ভুল বোঝাতে না পারি তবে আমাকে যা খুশী বলবেন, আর যদি আমি আপনাকে দেখাই যে বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরছন্দে কাব্য রচনা সম্পূর্ণ উপযোগী তা হলে—

**যতীন্দ্রমোহন ॥** আমি সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করবো।

**মধুসূদন ॥** তবে আপনি পরাজিত হলেন, অত্যল্পকালের মধ্যে আপনি বাংলা অমিত্রছন্দের নমুনা দেখতে পাবেন।

**গৌরদাস ॥** মধু তুমি যে আজ ঢালাও প্রতিজ্ঞা করে চলেছ, বাংলা নাটক আর অমিত্রাক্ষরছন্দ—দুটো প্রতিজ্ঞা হল এক রাতে

**প্রতাপচন্দ্র ॥** আর তৃতীয়টা যাতে না হতে পারে তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বিরতির অবসান হল, এখনি দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হবে। কিন্তু ভদ্র-মহোদয়গণ আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি অভিনয়ের শেষে নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা আছে।

**মধুসূদন ॥** কিন্তু তার পূর্বে আমার সন্ধ্যাহ্নিকের ব্যবস্থা যেন হয়।

**প্যারীচাঁদ ॥** অবাক করলে। তোমার আবার সন্ধ্যাহ্নিক কি?

**মধুসূদন ॥** কেন, টাম্বলার রূপ কোশাতে, পেগরূপ কুশি দিয়ে সুরারূপ গঙ্গাজল দ্বারা।

**প্যারীচাঁদ ॥** তাই বলো কারণ

**মধুসূদন ॥** অকারণ নিশ্চয়ই নয়।

**প্যারীচাঁদ ॥** মধু, সার্থক তোমার নাম, মধুর তোমার স্বভাব।

**মধুসূদন ॥** নামটা সার্থক করে রাখবার আশাতেই তো সুরা ছাড়িনে।

**প্যারীচাঁদ ॥** কী রকম?

**মধুসূদন ॥** মধু মানেই তো সুরা।

(সকলের হাস্য।)

[এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চে পটোত্তলনসূচক বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বিদূষক সারাজিককে টানিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পরকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্থাপন করিলেন। প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতা সূচনা করিল যে পট উঠিয়াছে। তখন সকলে পা টিপিয়া সন্তর্পণে প্রস্থান করিলেন।

রঙ্গমঞ্চ হইতে নারী কণ্ঠে শ্রুত হইল—"আঃ আমার হাতে সারিকাটি ফেলে দিয়ে প্রিয় সখী সাগরিকা না জানি কোথায় গেল।" রঙ্গমঞ্চের অভিনয় আরম্ভ হইল ও সাজ-ঘরের অভিনয় শেষ হইল।]

রোজই বেলা দুটো ঘেঁষে ব্যাটারি সেট মাইকটা মুখের কাছে নিয়ে বসে বিকাশ। স্পীকারে ফুঁ দেয়, শব্দটা বাজে একটা দমকা নিঃশ্বাসের মত। হাই তোলার শব্দ করে 'হাউ'! সেই শব্দটা বাজে। তারপরে খ্যাকারি দেয়, গলা পরিষ্কার করে। দু' চারটে হাঁ হাঁ দেয়। সেই শব্দগুলিও বাজে। তারোপরে মোটা গলায় হুঁশিয়ার করার ভঙ্গিতে শুরু করে 'গেল, গেল, কিন্তু গেল, গেল শুরু হয়ে গেল।'

সঙ্গে সঙ্গে এই পাড়া আর বে-পাড়ার আকাশটা সচকিত হয়ে ওঠে। পাড়া আর বে-পাড়াই বটে। কারণ বড় রাস্তা থেকে পশ্চিম-গামী গলিটার মোড়ের মাথায় হয়তো একটা বাড়ি, তারপরেই দুটো
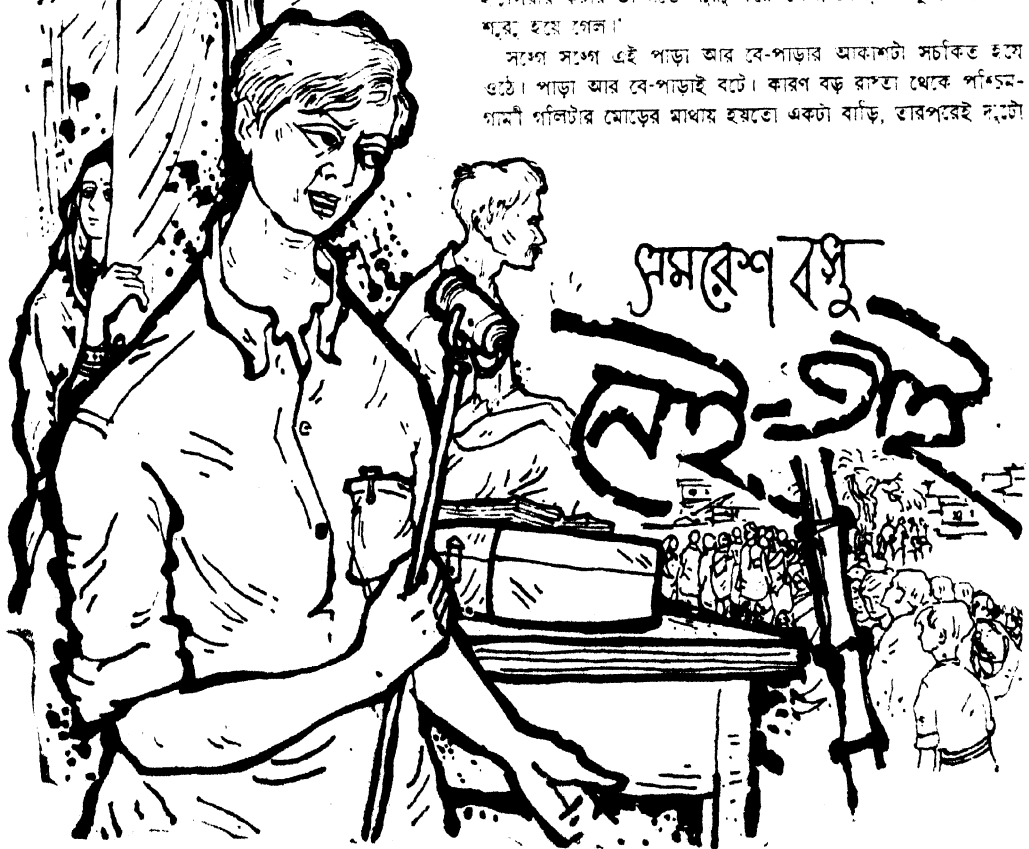
কাঠের গোলা। আবার দুটো বাড়ি, পাশেই একটা আস্তাবল। তারপরে হয় তো আরো দুটো বাড়ি, আবার একটা ইঁট চুন শুরকির গোলা। পরমুহূর্তেই হয় তো যে যেমন পেরেছে টালিখোলার কতগুলি চালাঘর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং তার পাশেই বিচুলি কাটা ইলেকট্রিক এঞ্জিনটা চলছে, ঘস্ ঘস্ ঘস্। পুরোপুরি একটা পাড়া কিংবা পুরোপুরি একটা বে-পাড়া, কোনোটাই নয়।

তারই মাঝখানে একটা বিঘে থানেকের ফাঁক রয়ে গেছে অনেকদিন থেকে। আস্তাবলের ঘেয়ো ঘোড়াগুলি সেখানে চড়ে। গোলার কুলিরা শোয়া বসা করে সময়ে সময়ে। পাড়ার চালাঘরের ছেলেরা খেলা করে। আর রাত্রে আবার এরই মধ্যে প্রাকৃত ক্রিয়াদির আসর, হ্যাঁ আসরই বসে।

সেইখানেই ক্যাম্পটা ব'সেছে। যে-ক্যাম্পের সামনেই বড় বড় ক'রে লেখা আছে, 'মাঃ চরণের "ওয়ান ম্যান সার্কাস।" আর ক্যাম্পের সামনে যে ছোট পর্দাটা ঠেলে দর্শকেরা ঢোকে, ঠিক তারই পাশে টিনের চেয়ারে, কেরোসিন কাঠের টেবিল পেতে বসে বিকাশ। প্রায় থিয়েটারি ঢং-এ বলতে থাকে, 'শুনছেন? শুনছেন না? ও, শুনছেন! হে' হে' হে'...

টেনে টেনে বিকাশ হাসে। পরমুহূর্তেই যেন চমকে উঠে দ্রুত ব'লে ওঠে, 'দেরী নেই, আর দেরী নেই কিন্তু। ফসকে গেলে আর হবে কি না, আমি জানি নে। তাড়াতাড়ি, কুইক্, জল্‌দি!'...

বেলা দুটো থেকে সে বলতে থাকে আর দর্শকের ঢোকবার পর্দাটা রাখে ফাঁক করে। যাতে বাইরে থেকে দর্শকদের চট-পাতা আঙগণ পেরিয়ে স্টেজের খানিকটা দেখা যায়। যাতে লোকের কৌতূহল জাগে। যেন একটি অদৃশ্য হাতছানির ইশারা তারা দেখতে পায়। আর দেখতে দেখতে, কৌতূহল চাপতে না পেরে, টপ্ করে টিকেট কেটে ঢুকে পড়ে।

কিন্তু এত সহজে কেউ ঢোকে না। বিকাশের মনে হয়, সব যেন ভয়-পাওয়া মুরগীর ঝাঁক। যেমন ধান ছড়িয়ে লোভ দেখিয়ে, ষড়যন্ত্র ক'রে মুরগীগুলিকে জবাই করা হয়, সেই রকম চার আনা পয়সা দিয়ে টিকেট কাটা মানেই যেন জহ্লাদের কাছে গলা বাড়িয়ে দেওয়া। এক চোখে তাদের ঘোর সন্দেহ, আর এক চোখে অপার কৌতূহল। কেবলি পা ঘষাঘষি আর উঁকিঝুঁকি।

তবু ক্যাম্পের বাইরের সর্বাংগ ভরে কত চিত্রবিচিত্র। 'মাঃ চরনের' বাংলায় আর 'ওয়ান ম্যান সার্কাস' ইংরেজীতে লেখা আছে বড় বড় ক'রে। তারপরেই লাল অক্ষরে 'মা ঃ চরণের যাদুকরী খেলা।' তার নীচেই লেখা আছে, 'অপূর্ব সুযোগ! আজই দেখুন! এখুনি।' এবং কারণটাও সঙ্গে সংগে বর্ণনা করা হয়েছে মোটা মোটা অক্ষরে, 'জগতের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক খেলা।' সুতরাং অপূর্ব সুযোগ তো বটেই, এবং দেখাও দরকার আজই কিংবা এখুনি। কেন না, এর পরেও মাঃ চরণের পুরো ছবিটা ক্যাম্পের গায়ে আঁকা রয়েছে। সেটা মাঃ চরণ কিংবা আর যারই চেহারা হোক, কিন্তু ছবিটার হাত নেই। দুটো হাত-ই নেই, আর পা দিয়ে মাঃ চরণ ধনুকে তাঁর গুণে টংকার দিচ্ছে। লক্ষ্য ভেদের জন্য প্রস্তুত মাঃ চরণ। পরনে তার ফুল প্যাণ্ট আর ছবিতে শার্টের বগল কাটা। বোধ হয় প্রমাণ করবার জন্যে যে, মাস্টারের হাত নেই। এই আধুনিকতম লক্ষ্যভেদ চিত্রের নীচেই আরো লেখা আছে, 'অভূতপূর্ব! অভিনব! অভিনব!' এ যদি অভিনব না হয়, তবে আর কি হ'তে পারে। দর্শকদের এক চোখের কুটিল সন্দেহ এই চিত্রবিচিত্র লেখাজোখাতেই ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল। পা ঘষাঘষি থামিয়ে ঢুকে পড়া উচিত ছিল সুড়ুৎ ক'রে। কিন্তু এইটুকুনি ছেলে সিঁদুরেই ডবী ভোলবার নয়।

তাই সব শেষের আকর্ষণ হল বিকাশ আর বিকাশের মাইকের কথা। এমন একটা অদ্ভুত কিছু দেখতে নয় তাকে। তবু কী যেন কি একটা দেখার আছে তার মধ্যে। কপালে ঝাঁপিয়ে পড়া এলোমেলো চুলে ঢুগলাসি গোঁফে, জাম রং ছিটের শার্টে আর নীল রংএর প্যাণ্টে কী এক অচেনা রহস্যের বার্তা যেন আছে তার সর্বাংগে। সে বার্তা আছে তার পোকায় কাটা ন্যাকড়ার পুতুলের মত বসন্তের দাগভরা মুখে, ছোট ছোট দুটি কালো চোখে, আর ঝকঝকে শাদা গজ দাঁতে। আরো কী যেন আছে তার চার পাট করা কালো রুমালটায়। যেটা সে অদ্ভুত কায়দায় বার করে পকেট থেকে, টিপে টিপে ভাজ খোলে। যেন, কিছু একটা বেরিয়ে পড়বে রুমাল থেকে। দর্শকেরা তাকিয়ে থাকে তীব্র কৌতূহলে। বিকাশ হঠাৎ রুমাল সরিয়ে, আঙগুল দেখায় পর্দার ফাঁকে, স্টেজের দিকে। বলে, ওখানে, ওখানে আসল খেলা। ভগবানের সেরা খেলা, মাস্টার চরণের জাদু। ওয়ান ম্যান সার্কাস, ওয়ান ম্যান।

সামনে যারা ভিড় করে, তারা হাসে। বলে, বেড়ে বলে, না?

হ্যাঁ, কথায় বিকাশের ধার আছে। সুস্পষ্ট উচ্চারণ, কোথাও জড়তা নেই। কখনো ধীরে ধীরে টেনে টেনে, যেন পারে না, এমনি ভাবে বলে আবার কখনো গলা চড়িয়ে, দ্রুত বলে, যেন মঞ্চে কোনো উত্তেজিত নাটকীয় ঘটনা ঘটছে। তখন সে হাসে না টেনে টেনে হে' হে' ক'রে। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন কিংবা নবাব সিরাজদ্দৌলা পার্ট বলছে।

বলে, চার আনা, চার আনা। বড় চার, ছোট? ছোট কত?

ছোট ছেলে কাছে থাকলে কালো চোখ দুটি তার চকচকিয়ে ওঠে হাসিতে। ঝকমকিয়ে ওঠে সাদা দাঁত। দুটি আঙুল তুলে বলে, দু আনা, দু-দু-আনা আমার ছোট ভায়েদের জন্য।

পরমুহূর্তেই এলো চুলে ঝাঁকানি দিয়ে তীক্ষ্ম গলায় বলে ওঠে, কুইক, জলদি, তাড়াতাড়ি।

থামে আবার কয়েক মুহূর্ত। আড় চোখে দেখে সকলের মুখ। ভিড়ের মধ্য থেকে এক আধজন এগিয়ে আসে টিকেট কাটতে। দু' আনার দর্শকই তাতে বেশী। বিকাশ নিজেই টিকেট দেয়। বুকিং অফিস তার কেরোসিন কাঠের টেবিলটাই।

বিকাশ মনে মনে বলে, ছোট মাছিগুলি আসছে, বড় মাছিগুলি এখনো পাখনা চুলকোচ্ছে। আর বিকাশ? নিজেকে বলে সে মাকড়সা। মাছিগুলি জ্যান্ জ্যানায়, মাকড়সাটা ওৎ পাতে। লোকগুলি যেন দেয়ালি পোকা, সে একটা টিকটিকি। কিন্তু এই পোকাগুলি যেন টিকটিকির চেয়েও সেয়ানা। আলোতে ঝাঁপ দিতে চায়, তবু দূরে দূরে ঘোরে। হাসে, টিটকিরি দেয়। বলে, পয়সা খিচবার তালে আছে মাইরি! বিকাশ আবার শুরু করে গম্ভীর গলায়, ধীরে ধীরে, 'শুরু হয়ে যাবে, শুরু হয়ে যাবে। একবার শুরু হ'য়ে গেলে আর রোখা যাবে না, সত্যি বলছি।'

তখন হয় তো কেউ দূরে থেকে ব'লে ওঠে, মাইরি?

বিকাশ যেন শুনতে পায় না। সে হয় তো তখন ছড়া কাটে,

খোকা জাগল, পাড়া জাগল
খেলা দেখবে কে?
পয়সা দাও মা তাড়াতাড়ি
মাঃ চরণ খেলা দেখাবে।

সামনের ভিড়ে সবাই হাসে। কিন্তু মাইকের চোঙা দিয়ে সেই ছড়া সত্যি সত্যি পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে যায়, সাড়াও পড়ে। হয় তো তখন কাঠের গোলার ছুতোর মিস্ত্রিটার সামনে তার ছোট ছেলেটা সত্যি পয়সার জন্য শুকনো চোখ ঘষতে থাকে কান্নার ছলনায়। কাঠে করাতের দাঁত বসিয়ে ছুতোর বলে চিবিয়ে চিবিয়ে, 'শালা ছেলে ভুলনোর যম এসেছে পাড়ায়।' কিন্তু ট্যাঁক থেকে চিমটি কেটে কেটে পয়সা বার করে দিতে হয় ঠিক।

বিকাশ ভানুমতীর খেল্ দেখায় না, মুখে রং মেখে সং সাজে না, কান থেকে ডিম বের ক'রে আর গাদা গাদা কাগজের কু'চো খেয়ে তাক্ লাগায় না সবাইকে। মেলায় মেলায় যখন ঘোরে, তখনো না। তার আছে কথা আর ভঙ্গি। জায়গা বুঝে

সে ভঙ্গি করে, সময় বুঝে কথা বলে। মফস্বলের এই ছোট্ট শহরে স্কুল আছে কয়েকটা। কলেজ আছে একটা। বড় ছাত্র-ছাত্রীরা যখন যাতায়াতের পথে ঠোঁটের কোণে হেসে একবার দাঁড়ায়, তখন কালো রং বিকাশের মুখে যে রক্ত ছুটে আসে, তা' দেখা যায় না। জাম রং জামায় ঢাকা তার সাতাশ বছরের বুকে যে আবেগে চিন্‌চিন্ করে, তার কোনো স্ফুলিঙ্গ বেরোয় না ফুটে। তার ছোট কিন্তু খরগোসের মত চকচকে চকিত চোখে যে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটি স্বপ্ন-দেখা বিভ্রম জাগে, সেটাকে মনে হয় তার নাট্‌কেপনারই রকমফের।

তখন সে মনে মনে বলে, 'মার লাথ্ মার লাথ্!' অর্থাৎ নিজেকে লাথি মারে সে মনে মনে। এবং পরমুহূর্তেই শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হয় তো তর্জনী বাড়িয়ে বলে, 'সবচেয়ে বড়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিনেমাহল কোথায়? নাম কি তার?'

তখন চোখ তার দীপ্ত, বিজয়ী বীরের মতো দৃপ্ত ভঙ্গি। মুভি ক্যামেরার মত তাকায় সকলের মুখের দিকে।—'কোথায়? কি নাম? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রংমহল? কোথায়, কোথায়?

কেউ বলে বিদ্রূপ করে 'যত আর আনতে কুড়!'

অবাক হয় কেউ কেউ। চোখে নামে কৌতূহল। সত্যি খবর রাখে নাকি লোকটা? না, বাজে বাজে বকছে? গুল্ মারছে বোধ হয় একটা।

বিকাশ তখন মনে মনে বলে, 'হুঁ, শিকারগুলো ফাঁদে পড়েছে। বিশেষ করে পড়ুয়ারদল। একে বলে মোক্ষম অস্ত্র। বাব! সিনেমার কথা। হুঁ হুঁ!'

তখন সে গলা আর এক পর্দা চড়ায়। প্রায় তালে তালে বলে, 'আমেরিকা, আমেরিকা! কলকাতার নয় বম্বের নয়, নিউ ইয়র্কের রক্সি, রক্সি। তামাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বায়স্কোপ ঘর। ছ' হাজার লোক ধরে আমেরিকার রক্সিতে। আর, আর কি?'

বিকাশ টের পায়, এই সস্তা খবরেই অনেকগুলি কাৎ। চোখ দেখে বোঝে, প্রেস্টিজ দিচ্ছে তাকে সবাই। বলছে নিশ্চয়ই, 'সত্যি জানে রে!' বলছে, 'অনেক খবর রাখে। এডুকেটেড নিশ্চয়।'

বিকাশ মনে মনে হাসে, এইটে দুনিয়া। বলে গলা চড়িয়ে, 'আর? আর কি? দুনিয়ায় পায়ে কলম ধরে কে? পা দিয়ে কে লেখে তর্‌তর্ করে?'

তাঁবুর পর্দার ফাঁকে আঙুল দেখিয়ে হেসে বলে, 'মাঃ চরণ, মাঃ চরণ! চার চার আনা, চার চার আনা! দু' আনা কার?'

হেসে চোখ পিটপিটিয়ে, ছোট ছেলেদের হাতছানি দেয় বিকাশ। বলে, 'তাড়াতাড়ি, জলদি, কুইক!'

আসর জমতে থাকে। টিকেট বিক্রী করতে করতে, বিকাশ মাইকের মুখে তখনো দম শেষ সাইরেনের মতো বলতে থাকে, অভিনব, অভিনব! অভিনব, অভিনব!

সে বলতে থাকে, আর পিঠে কিংবা ঘাড়ে, কিংবা সর্বাঙ্গেই দুটি অপলক চোখের চোরা দৃষ্টির খোঁচা সে অনুভব করে। যখন বলে, 'অভিনব! অভিনব!' তখন যেন সে-চোরা নজর বেঁধে আরো বেশী করে।

চোখ না ফিরিয়েও বিকাশ তখন টের পায়, স্টেজের ডান দিকের শেষে উইংসের পাশে ছাপা শাড়ি পরা প্রমীলা দাঁড়িয়ে আছে পাশ ফিরে। সেখান থেকে চোখ তুলে সে বারে বারে দেখে বিকাশকে। আর মাস্টার চরণের শাদা জিনের ফুল প্যাণ্টে বোতাম লাগায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, হাসেও বোধ হয় টিপে টিপে। বোধ হয় নয়, হাসেই। হাসিটি চাপা, একটু বা তেরছা।

মনে থাকে না, তাই বোধ হয় হাসে প্রমীলা। আড়চোখে চরণের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। তার বুকের কাছে ঘেঁষে, জামার বোতাম পরায় ঘরে ঘরে।

প্রমীলার এ ভাবভঙ্গি দেখতে পায় কি না পায়, চরণের চোখ দেখে তা বোঝা যায় না। নিখুঁত করে কামানো তার সরু গোঁফের উপরে, ডান দিকের কালো আঁচিলটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সেও যেন মুগ্ধ হয়ে হাসে বিকাশের দিকে তাকিয়ে।

বিকাশ টের পায়। বাইরের দর্শকদের সঙ্গে সে যখন মাছি-মাকড়সা, পোকা-টিকটিকি ফাঁদ পাতাপাতি জীবন-মরণের খেলা খেলছে, তখন গায়ে তার বিঁধে থাকে ওই দুজনের দৃষ্টি। প্রমীলার দুটি চোরা চোখের দৃষ্টি। আর দুটি চোখের নজরও কি চোরা? আর এক রকমের চুরি কি সে-চোখে? সে চোখ কি দেখে, কাজ ও অকাজের মধ্যেও প্রমীলার নজর কে কেড়ে নিয়ে যায় বিকাশের দিকে, মন নিয়ে যায় টেনে? কে জানে! বিকাশ তা টের পায় না। শুধু টের পায়, চরণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে হাসে বিকাশের দিকে চেয়ে, যখন বিকাশ বলে, 'অভিনব, অভিনব।' সে-ও বলে, অভিনব। বলে হাসে প্রমীলার দিকে চেয়ে।

টের পায় বিকাশ, কোনো কথা না বলে শুধু হেসে, লাল সিল্কের রুমালটা চরণের গলায় পেঁচিয়ে ধরে প্রমীলা। বলে, হেঁট হও।

হেঁট হয় চরণ। প্রমীলা রুমালটা বেঁধে দেয় তার গলায়। তারপর আয়নাটা সামনে ধরে। চরণ দেখে নিজেকে আয়নায়। রুমাল বাঁধা দেখতে গিয়ে আগে তার নজরে পড়ে সাদা হাফ শার্টের হাতা দুটি নড়নড়ে ঝুলছে। ডান কাঁধ থেকে একটি সরু মাংস-পিণ্ড নেমেছে ইঞ্চি চারেক। বাঁ দিকে আরো কম, কাঁধের পরে একটি ছোট ড্যালা। শার্টের হাতা দুটি একটু বিভ্রমেরই সৃষ্টি করে, কতটা আছে বা নেই।

পাতলা পাতলা গোঁফ চরণের, তাকে সে নিখুঁত মাপে কাটায়। দাড়ি প্রায় নেই। বয়স হয়েছে চব্বিশ। রোগা রোগা, লম্বা, কিন্তু শক্ত বলে মনে হয়। চোখ তার ট্যারা নয়, গজা। হাসলে অনেকগুলি ভাঁজ পড়ে চোখের আশেপাশে। তারো গজ-দাঁত, একটু যেন বেশী ধারালো, খোঁচা খোঁচা মনে হয়। হাসবার সময় নীচের ঠোঁট দুটি তার অনেকটা নেমে যায়। যেন ইচ্ছেমত ঠোঁট বিকৃত করে, একটা নিষ্ঠুর ভাব ফোটায় সে।

সে যখন আয়নায় এক প্রস্থ নিজেকে দেখে নেয়, তখন তার বউ প্রমীলা আবার বিকাশের দিকে ফেরে। বয়স বছর কুড়ি হতে পারে প্রমীলার। দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। অটুট স্বাস্থ্য আছে, রংটা আছে একটু মাজা মাজা। নাক চোখ মুখ, সব মিলিয়ে বাংলা দেশের আর দশটা মেয়ের মত যে-চটকটুকু আছে, সেটুকু একটু বাড়াবাড়িই

হয়ে গেছে সোনার কাঁকনে, গলার হারে, কানের দুলে। সেই বাড়াবাড়িতেই যেন তাকে গর্বিণী দেখায়।

বিকাশ যেন দেখতে পায়, এইবার প্রমীলা দাঁত দিয়ে কয়েকটা সেফটিপিন চেপে ধরে, একটা একটা করে মেডেল ঝুলিয়ে দেয় চরণের বুকে। দিতে দিতেও অনেকবার তাকায় বিকাশের দিকে। তারপর চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দেয় চরণের। চরণ হেঁট হয়ে তখন নাক ফোলায় কেন? প্রমীলার নিশ্বাসটা নেয় নাকি নিজের নাক ভরে? ঠোঁট ছুঁচলো করে ছুঁইয়ে নেয় নাকি একবার প্রমীলার গালে? আর তার হাফ শার্টের ঝলঝলে হাতা দুটো ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলে উঠে, কিছুক্ষণ কাঁপতে থাকে।

বিকাশের পিঠে যেন তখন বেশী করে বিঁধতে থাকে প্রমীলার চিকুর-হানা নজর। পিঠটা চুলকে নিতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু, হয় তো তখন কয়েকজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক কৌতূহল বশত দাঁড়িয়ে শোনে তার কথা। বিকাশ সচকিত টিকটিকির মতো, বড় পোকা ধরবার আশায়, চট্ করে বের করে একটা চিঠি। বলে, 'একটা চিঠি। আমার নয়, আপনার নয়, মহামান্য এক উপমন্ত্রীর চিঠি।'

যা ভাবে বিকাশ, তাই হয়। সার্কাসের দিকেই আকৃষ্ট হয় বুড়ো পোকাগুলি। বিকাশ পড়ে যেন উপমন্ত্রীর মতেই, উপমন্ত্রী বলেন, "মাঃ চরণের খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শুধু মুগ্ধ নহে, দেখিয়া ভরসা পাইলাম যে, এইরূপ হস্তবিহীন ছেলে যখন এরূপ নিপুণতার সহিত বিচিত্র খেলা ও কাজ করিতে পারে, তখন এই দেশের উন্নতি সুনিশ্চিত। যুবকদের ইহা দেখিয়া শিক্ষা করা উচিত।"

হয়তো যুবকদের ভিড় থেকেই তখন একজন আর একজনকে বলে, হাত দুটো কেটে ফেলব মাইরি।

জবাবে শোনা যায়, হি হি হি!......

বিকাশের বুকের মধ্যে যেন কেমন ধক্ ধক্ করে। দুটি হাতের পেশীতে তার যেন বিদ্যুতের শক্ লেগে শক্ত হয়ে ওঠে। তারো যেন হেসে উঠতে ইচ্ছে করে হি হি করে। কিন্তু পারে না।

সে বলতে থাকে, 'দেখে যান্, দেখে যান্, মাঃ চরণের ওয়ান ম্যান সার্কাস্ দেখে যান্।' বলতে থাকে আর বুড়ো পোকাগুলিকে টিকেট দিয়ে গস্ত করতে থাকে। আর টের পায়, চরণের চুল ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে 'আলবোট' কাটতে কাটতে প্রমীলা বারে বারে তাকাচ্ছে এদিকে। এতবার, এতবার তাকায় প্রমীলা, যেন খোঁচা দিয়ে দিয়ে বিঁধতে থাকে। তবু একবার ফিরে তাকাতে পারে না বিকাশ। পারতে চায় না।

ওয়ানম্যান সার্কাস দলের আর একজন দীনু। প্রমীলা যখন সাজায় চরণকে, সে তখন জিনিসপত্র যুগিয়ে দেয় তার হাতে। মঞ্চ ঝাট-পাট দিয়ে পরিষ্কার করে। খেলার সরঞ্জাম জড়ো করে উইংসের পাশে। আর আড়ে আড়ে দ্যাখে প্রমীলাকে, দ্যাখে বিকাশকে, হাসে মনে মনে। সে কেন হাসে, জানে বিকাশ। হাসবার অধিকার আছে তার, কারণ প্রমীলার সঙ্গে তার খুব ভাব। পরস্পরের মধ্যে তাদের অনেক কথা হয়। দীনুকে প্রমীলা দাদা বলে। সবাই দাদা বলে দীনুকে। দলের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়। সে চাকর নয়, চাকরের মতো। প্রমীলাকে সে বলে 'দিদি'। প্রমীলার সঙ্গে তার, যাকে বলে 'প্রেম' তা নেই, কিন্তু প্রমীলার মনের কথা সে জানে, তাই সে হাসে।

দীনু কাজ করে, আর প্রমীলা যখন বিকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন সে প্রমীলার দিকে তাকায়। আর হাসে মনে মনে।

বিকাশ অনুমান করতে পারে, শেষ মুহূর্তে প্রমীলা সিগারেট গুঁজে দেয় চরণের ঠোঁটে। দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেয়। আজকাল আর বিঁড়ি খায় না চরণ। তারপর আবার আয়নাটা চরণের সামনে ধরে।

দর্শকেরা ঢুকতে থাকে। বিকাশ ঘণ্টা তুলে বাজিয়ে দেয় ঢং ঢং করে। প্রথম ঘণ্টা।

রোজই এভাবে শুরু হয়। বিকাশই প্রথম শুরু করে মাইক নিয়ে।

আজো শুরু করেছে। আজো, এই পাড়া আর বে-পাড়ার, অগ্রহায়ণের ঝকঝকে আকাশ সচকিত হয়ে উঠেছে। বিকাশ বলছে, লোক জমছে ধীরে ধীরে, রোজকার মতোই। যদিও আগের তুলনায় কম।

এখানকার রাস মেলায় তারা এসেছিল। মেলা শেষ হয়ে গেছে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হবে পৌষ মেলা। সেখানে যাবে তারা এবার। যাবার আগে এই কল-মিল-কলেজ-স্কুল ঠাসা মফস্বল শহরে, মেলা শুরু হওয়ার আগের দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছে। ছোট শহর। অনেকদিন খেলা দেখছে, কমে আসছে দর্শক।

এখন না-দেখা-মতলবী দর্শকই বেশী। অভুক্ত টিকটিকির মতো বিকাশের নজর তাই আরো কঠিন। কে এসেছে ওই কোণে? দুটো ছাত্র। তিনটে, চারটে, পাঁচটা, অনেক যুবকের ভিড় হয়েছে। মেয়েরাও দাঁড়িয়ে গেছে।

বিকাশ ওইদিকেই তর্জনী নেড়ে, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, পৃথিবীর সেরা বাক্যবাগীশ কে? হু' ? কোথায়? হোয়েয়ার? পৃথিবীর সেরা বাক্যবাগীশ? কথা, স্রেফ কথা বলার রেকর্ড ভেঙেছে কে? কে নাগাড় এক শো তেত্রিশ ঘণ্টা বচন ঝেড়েছে?

বলে হাসল। হেসে, টেনে টেনে, তোতলার ভঙ্গিতে নিজেকে দেখিয়ে বলল, 'আ—আ—আমি নয়।

কে যেন বলে ওঠে, আমরা তো তাই ভেবেছিলাম।

না!' প্রায় যেন গর্জে ওঠে বিকাশ। বলল, 'নাম তার কোহিন শিহাস্, রুশিয়ান, রুশিয়ান। কিন্তু, পা দিয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে কে? হু?

সে বলবার আগেই একটি ছোট্ট ছেলে বলে উঠল, মাস্টার চরণ।

বিকাশ বলে উঠল, গোড্! (গড্) আমার এই ছোট্ট ভাইটি জানে। আপনারা জানুন, দেখুন।

চার আনা, চার চার আন্না। শুরু হয়ে যাব্বে, শুরু হয়ে যাব্বে।

তার বলার ভঙ্গিতে লোকে হাসছে। পা বাড়াচ্ছে যেন ফাঁদে।

বিকাশের যেন ঘুম পাচ্ছে। ভিতরটা ঝিমিয়ে পড়ছে তার। মনে মনে বলছে, আজ বলব কাল বলব। পরশুদিন আর বলব না। আর কোনদিন বলব না। চলে যাব।

চলে যাবে সে দল ছেড়ে। পরশুদিন যখন পৌষ-মেলায় যাবার আস্তানা গুটোবে সব, সেইদিন সে চলে যাবে। না বলে, পালিয়ে যাবে।

পিছন থেকে সেই দৃষ্টির খোঁচাটা বিঁধছে। একটু বেশী করে বিঁধছে। যেন কে ধরে ফেলেছে বিকাশের মনের কথা। আঁচ পেয়েছে, তাই তার কপালের চকচকে কুমকুমের টিপ্ আর দুই চোখ ছায়াঘন হয়েছে অভিমানে। এরকম অভিমান শুধু মায়া। শুধু রং নয়, মায়া দিয়ে বিঁধছে প্রমীলা। কিন্তু আর কোনদিন বিঁধবে না। চলে যাবে বিকাশ।

এই বিকাশের শেষ সিদ্ধান্ত। ওয়ানম্যান সার্কাসের শুরু থেকে সে আছে। ওয়ানম্যানের অর্থাৎ মাস্টার চরণের শুরু থেকে সে আছে। থাকতে থাকতে, সার্কাসের একটা খাঁচা তাকে গিলছে, বাঁধছে কষে চারদিক থেকে। তাই সে চলে যাবে।

সে টের পাচ্ছে, দীনু হাসছে। প্রমীলা ঝুলিয়ে দিচ্ছে মেডেলগুলি চরণের বুকে, আর ঠোঁটে সেফটিপিন চেপে তাকিয়ে আছে এইদিকে। না দেখে, মেডেল ঝোলাতে গিয়ে যদি সেফটিপিন বিঁধে যায় চরণের বুকে?

আর চরণ? চরণ ওর গোঁফের পাশে আঁচিলটা কাঁপিয়ে হাসছে, কোন্‌দিকে তাকিয়ে? বোঝা যাচ্ছে না। কোনোদিন

যায় না। কেবল ওর চার ইঞ্চি আর দু' ইঞ্চি নুলো দুটো কাঁপছে, দুলছে।

বিকাশ যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বলল, দেরী নেই, দেরী নেই। একবার শুরু হয়ে গেলে আর......

মুখস্ত বলার মত কে একজন বলে উঠল, আর রোখা যাবে না।

বিকাশ বলল, হ্যাঁ, আর রোখা যাবে না।

একজন বলে উঠল, সত্যি বলছি!

এবার বিকাশই হেসে বলল, মাইরি!

অভ্যাসের বশে সে বিচিত্র ভঙ্গীতে, অনায়াসে বলতে থাকে, 'অনেক আশ্চর্য জিনিসের কথা' আপনারা শুনেছেন, কিন্তু ক'টা দেখেছেন? ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, মিশরের পিরামিড? দেখেন নি? কিন্তু পৃথিবীর কোন্ মানুষ পা দিয়ে ছুঁচ নিয়ে ফুল তোলে কাপড়ে? মাঃ চরণ, মাঃ চরণ। ব্যাবিলনে নয়, মিশরে নয়, এই শহরে। এই, এই, এইখানে—।

আঙুল দেখায় সে পর্দার ফাঁকে। বলে, অভিনব! অভিনব!

সে বলছে, কিন্তু মন চলে গেছে অনেক দূরে, অনেক দূরের পিছনে। সেখানে, টিন-শেডের প্রায়ান্ধকার কাঁচা মাটির ঘরে, বিকাশ তুলি দিয়ে লাল রংএ লিখছে, অভিনব খেলা।' আর ষোল বছরের প্রকাশ, পায়ের আঙুলে কলম চেপে ধরে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে লেখবার। প্রকাশচন্দ্র দাশ লিখতে গিয়ে, 'প' হয়ে গেছে বাঁশের ডগায় নিশানের মতো।

বিকাশ বলছে, 'উঁহু, হল না।' ব'লে উঠে এসে ধরছে প্রকাশের পা। শক্ত করে ধরে বলছে, 'লেখ্। হ্যাঁ, আগে এমনি করে টান। হ্যাঁ তারপর, উঁহু, ওপরেরটা বেঁকিয়ে দে। হ্যাঁ, এই এমনি। বেশ, এবার সোজা তোল্। তোল্ তোল্...থাম্, আর নয়। এই হল 'প'। তারপর......

প্রকাশ লিখতে লিখতে বলছে, 'দাদা, চোখটা একটু ঘষে দে। হ্যাঁ, এবার ঘাড়টা একটু চুলকে দে।'

বিকাশ চোখ ঘষে দিচ্ছে আর পা চুলকে দিচ্ছে। প্রকাশের ছোট দুটি নুলো আপনি আপনি দুলছে। তারপর জিজ্ঞেস করছে, তুই ওটা কি লিখছিস রে দাদা?

—পাড়ার ক্লাবে তুই খেলা দেখাবি, তার পোস্টার।

—কি লিখছিস্?

—অভিনব খেলা।

—অভিনব? তার মানে কি রে দাদা?

—মানে?

বিকাশ ভাবছে। অভিনব মানে কি? তারপর বলছে, 'মানে, মানে, অদ্ভুত। অদ্ভুত কিছু একটা। একটা নতুন রকমের অদ্ভুত কিছু, বুঝলি? লোকে দেখলে তাজ্জব হয়ে যায় আর মজা পায়।

প্রকাশের গজ চোখের দৃষ্টি কোন্‌দিকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পায়ে কলম চেপে ধরে সে যেন চুপি চুপি বলছে, মজা পাবে খুব, না?

বিকাশ বলছে, হ্যাঁ, অভিনব কি না।

প্রকাশ আওড়াচ্ছে, অভিনব! ওই যে তুই সেদিন খবরের কাগজ পড়ে বলছিলি দাদা, একটা ছেলের তিনটে মাথা, চোখ নেই, নাক নেই, মুখ নেই—

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক! খবরের কাগজে লেখা ছিল 'অভিনব শিশু।' অভিনব হলেই লোকে দেখতে চায়।'

প্রকাশ হাসছে। যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হাসছে। বলছে, অভিনব হলে খুব নাম হয়, না রে দাদা? আমার খুব নাম হবে না?

বিকাশের চোখেও স্বপ্ন। বলছে, হ্যাঁ, খুব নাম হবে। দ্যাখ্ না, কত কি শিখবে তোকে।

প্রকাশ হাসছে আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে ওর নুলো দুটি। ডান দিকের নুলোটা ইঞ্চি চারেক, বাঁয়েরটা দু ইঞ্চি। তারপর দেখছে পায়ের দিকে। পাঁচটা আঙুল, গোড়ালি, হাঁটু, সব পুরোপুরি আছে। ষোল বছরের পুষ্ট, লাল রোঁয়া ভর্তি দুটি পা। ডান পায়ের বুড়ো আর মধ্যের আঙুলে ধরা কলমটা নেড়ে নেড়ে হাসছে প্রকাশ। যেন ওর হাত নেই, পা আছে, তাতে খুব খুশি। ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বলছে, অভিনব, অভিনব। হি হি হি!
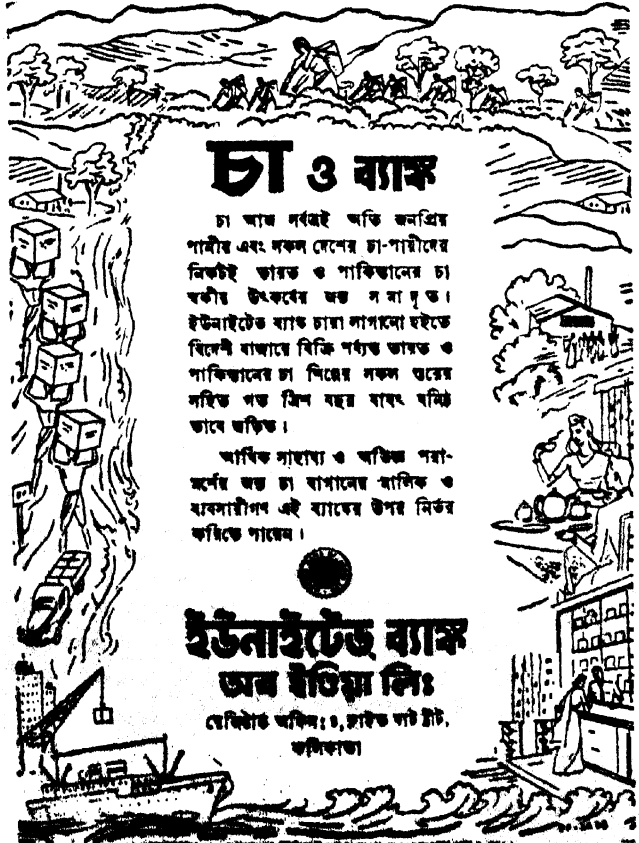
বিকাশ বলছে, লেখ প্র্যাকটিস্ কর।

প্র্যাকটিস্ করছে প্রকাশ। বিকাশ লিখছে, 'অভিনব খেলা।'

যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল বিকাশ। অতীত থেকে ফিরে এল। সামনে তার দর্শকের ভিড়। সে বলছে, অভিনব, অভিনব! যেন ভ্যাংচাচ্ছে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তালে তালে বলছে, চার আনা, চার চার আনা। আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ, গ্রীসের ডায়না টেম্পল, কিং মসোলাসের স্মৃতিস্তম্ভ'......

পৃথিবীর প্রাচীন বিস্ময়ের নাম বলছে সে। কিন্তু প্রমীলা দূর উইংসের পাশ থেকে যেন চোখের খোঁচায় খোঁচায় লিখছে তার সারা গায়ে, 'একবার কি ফিরে তাকাতে নেই?'

দীনু হাসছে। প্রকাশ কি বলছে মনে মনে? প্রকাশ নয়, মাস্টার চরণ। নিজের বুকে কান পেতে যেন শুনতে পাচ্ছে বিকাশ,

চরণ বলছে, 'আমি জানি, আমি জানি দাদা, তুমি ফিরে তাকাবে না। প্রমীলা আমার—আমার।'

বিকাশের গলা সহসা চড়ল আরো। সে বলে চলেছে, 'রোডস্ আর সাইপ্রাসের ব্যাসো মূর্তি, অলিম্পিয়ার জুপিটার, বাঙলার মাস্টার চরণ, হাতে নয়, পা দিয়ে যে কাঁচি ধরে, নক্‌শা কাটে কাগজে। ফুল লতাপাতা, চার চার আনা।'......

আবার মনটা দৌড়ে গিয়ে ঢোকে সেই টিনশেডের প্রায়ান্ধকার ঘরটায়। স্কুলের কোন্ ক্লাসে পড়বার সময় পৃথিবীর বিস্ময়-গুলির কথা পড়েছিল বিকাশ? ক্লাস ফাইভে? সিক্সে? মনে পড়ছে না ঠিক। ক্লাস ফোরেও হতে পারে।

বিকাশের চোখের ওপর ভাসছে তাদের সেই ঘরটা। একটা নয়, অনেক, অনেকগুলি ঘর। টিন-টালি-খোলার চালা, মাটি কিংবা বেড়ার ঘর আর কাঁচা মাটির মেঝে। সরু গলি, নীচু জমিতে আঁকাবাঁকা সোজা, গায়ে গায়ে, পাশে পাশে অনেক ঘর আর অনেক মানুষ। ফেরিয়ালা, কর্পোরেশনের জল-কলের ওড়িয়া মিস্তির, ট্রাম কণ্ডাকটার, মোটর ড্রাইভার আর ছোটখাটো ফার্মের কেরাণীদের বাসা।

একটা কেরাণী ছিল, নাম তার প্রাণকৃষ্ণ দাশ। মাইনে পেত কুল্যে সত্তর। তার ছিল দুই ছেলে, বিকাশ আর প্রকাশ। শখ ছিল তার, ছেলেদের সে লেখাপড়া শেখাবে এবং শেখাত। কেননা, সে নাকি ভদ্রলোক ছিল। আর ভদ্রলোকের ছেলেদের নাকি লেখাপড়া শিখতেই হয়। ওই বাসাগুলিতে যতগুলি প্রাণকৃষ্ণ ছিল, তাদের সকলের সাধ ছিল একরকমই।

বিকাশ আর প্রকাশও লেখাপড়া শিখত। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে ছোট ছেলে প্রকাশের চুলকানি হ'ল। সামান্য চুলকানি। তারপর পাঁচড়া। দু' হাতের পাঁচড়ায় নাকি একদিন প্রকাশ জুতোর কালি লাগিয়েছিল মলমের মত ক'রে। বিকাশ তা দেখেনি। তারপর সেপ্‌টিক। ধরা যখন পড়েছিল, তখন হাসপাতাল ছাড়া গতি ছিল না। ডাক্তারদের গতি ছিল না, হাত দুটো কেটে দেওয়া ছাড়া। প্রথম কাটা হয়েছিল প্রায় কনুই পর্যন্ত। তাতেও পচন সামলানো যায়নি। মাসখানেক পরে, কেটে-কুটে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়েছিল প্রকাশকে।

সবাই বলেছিল, তবু প্রাণে বেঁচেছে, এই যথেষ্ট।

শুধু বিকাশ শুনতে পেয়েছিল, তার মা বলেছিল কেঁদে কেঁদে, হায় ভগবান, কেন বাঁচালে ও ছেলেকে? আমার এ ছেলেকে যে রাস্তায় ভিক্ষে করে খেতে হবে।

বিকাশও ভীষণ কেঁদেছিল। কাঁদত, যখন সে দেখত প্রকাশ একবার বসলে আর উঠতে পারে না। তখনো তার অভ্যাস হয়নি, হাত ছাড়া ওঠা-বসা করা। তখনো টলমল করত চলতে ফিরতে। আর কাঁদত, যখন দেখত প্রকাশ আড়ালে একলা বসে তার অবশিষ্ট কাটা ডানা দুটি দেখছে। দেখতে দেখতে প্রকাশের চোখে জল আসত। ডানদিকের নুলোটার কাছে মুখ নামিয়ে, হাতের বদলে কাঁধ দিয়ে চোখের জল মুছত। যখন বিকাশদের সেই প্রায়ান্ধকার ঘরটায় প্রকাশকে মশায় কামড়াত, আর প্রকাশ বিকৃত মুখে লাফাতো তিড়িংবিড়িং করে, যখন খেলাচ্ছলে, নিজেকে ভুলে প্রকাশ হাত তুলতে যেত, আর তাই দেখে কোন কোন ছেলেমেয়ে হেসে উঠত, তখন বিকাশ কাঁদত।

তখন বিকাশ পৃথিবীর বিস্ময়ের কথা পড়ত তার বইয়ে, পিসার হেলান মন্দির, চীনের প্রাচীর, মস্কোর ঘণ্টা—

পড়তে পড়তে সে হয়তো দেখত, লণ্ঠনের আলোয় নিজের ছায়াটা আপন মনে দেখছে প্রকাশ দেয়ালে, যেন কি ভাবছে। আর মনে পড়ত বাবা প্রাণকৃষ্ণর কথা, 'আমি মরলে ছেলেটার কি উপায় হবে?' মার কথা মনে পড়ত, 'আমি চোখ বুজলে কে চলাফেরা করবে ছেলেটাকে নিয়ে?'

বিকাশ বলত মনে মনে, আমি, আমি দেখব। আমি কাজ করব, রোজগার করব, প্রকাশকে পালব, রক্ষা করব, খেতে-পড়তে দেব। আমি, আমি......

দর্শকদের সামনে প্রথম ঘণ্টা বাজিয়ে দিল বিকাশ। ঢং ঢং ঢং।

বলল, শুরু হয়ে যাবে, শুরু হয়ে যাবে। আর দু'দিন, শেষ খেলা। চার আনা, চার চার আনা। আশ্চর্য জিনিস রোমের কলোসিয়াম, কনস্টাণ্টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ, আগ্রার তাজমহল আর মাঃ চরণ, দু'পায়ে বাঁয়া তবলায় কাফার বোল্ তোলে। অভিনব, অভিনব।

টের পাচ্ছে, মাঃ চরণের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে প্রমীলা। চরণ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে নাক দিয়ে আর হাফ সার্টের নড়নড়ে হাতাটা প্রমীলার গায়ের নাগাল পেতে চাইছে। দেয়ালে চুনকাম করার ক্ষয়ে যাওয়া বুরুশটার মতো প্রমীলার পুষ্ট শরীর ঢাকা ছাপা শাড়িতে ঠেকেছে। আর কুড়ি বছরের একটি মেয়ে—অঙ্গের প্রতি অঙ্গ যেন কাঁপছে থর থর কিসের প্রত্যাশায়। যত প্রত্যাশা, তত বিফল। যতই বিফল, ততই চোখের দৃষ্টি তার তীব্র হয়। ঘন ঘন বেঁধে বিকাশের গায়ে।

আজ বিঁধবে, কাল বিঁধবে, আর বিঁধবে না। বিকাশ চলে যাবে।

চলে যাবার কথা যতই ভাবে, ততই পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ছে বিকাশের। মনে পড়ছে, সে পায়ে ছুঁচ ধরতে শেখাতো প্রকাশকে, সেলাই করতে শেখাতো।

প্রকাশ বলত, এটা আরো অভিনব, না রে দাদা?

—হ্যাঁ।

বিকাশ তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তার বাবা প্রাণকৃষ্ণদের সমাজে সেটা একটা মস্ত সংবাদ। মারোয়াড়ী ফার্মের সত্তর টাকার কেরাণী সংসারের নিয়মকে ফাঁকি দিয়ে তখন পঞ্চাশের কোঠায় উঠে পড়েছে। আর বেশী দেরী নেই মরবার, এইটি বুঝতে পেরে প্রাণকৃষ্ণ তখন বিকাশকে তাড়া দিচ্ছে, চাকরি, চাকরির খোঁজ কর। নুলো ভাইকে খেলা শেখাস পরে।

হ্যাঁ, সময় নেই, অসময় নেই, প্রকাশকে খেলা শেখাত বিকাশ। তাদের নীচু জমি থেকে উপরের জমিতে ছিল যে পাড়াটা, সেখানে অনেক বন্ধু ছিল বিকাশের। স্বপ্ন দেখত সে, তাদের সঙ্গে কলেজে যাবে বিকাশ। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের ছেলের অত বড় সাধ মেটেনি। সে চাকরি খুঁজত, দরখাস্ত লিখত, আর তার চেনাশোনা ক্লাবে প্রকাশকে নিয়ে গিয়ে খেলা দেখিয়ে আসত। উৎসাহ দিত সবাই। বিকাশ বাড়ি এসে নতুন খেলার তালিম দিত ভাইকে।

ছুঁচ নিয়ে এসে ধরিয়ে দিত পায়ের আঙুলে, সেলাই করতে শেখাত পায়ে।

তার যত বিদ্যাবুদ্ধি সব গিয়ে ঠেকেছিল প্রকাশের চরণে।

প্রকাশ সেলাই শিখত, আর বলত, এটা আরো অভিনব হবে, না রে দাদা?

—হ্যাঁ।

নীচের ঠোঁট দুটি ঝুলিয়ে প্রকাশ হাসত
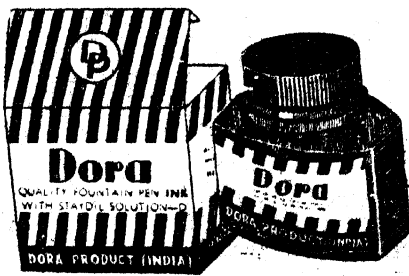
হি হি করে, আর মনে মনে আওড়াত, অভিনব, অভিনব!

বিকাশ ডুগি-তবলা এনে বাজাতে শেখাত প্রকাশকে।

প্রকাশ বলত, এটা তার চেয়ে অভিনব, না রে দাদা?

—হ্যাঁ।

প্রকাশকে পা দিয়ে ধনুকে লক্ষ্যভেদ শেখাত বিকাশ।

প্রকাশ বলত, এটা দারুণ অভিনব, না রে দাদা?

—হ্যাঁ।

তখন প্রকাশের নাম হয়ে গেছে 'মিঃ লেগ।' সেটা আসলে ঠাট্টা করেই বলত অনেকে। কাছে ও দূরের জিম্‌নাশিয়াম ক্লাব থেকেও প্রকাশকে নিয়ে যেত তার আশ্চর্য খেলা দেখাতে। (উপমন্ত্রীর সার্টিফিকেটটা সেই সময়ের সংগ্রহ)

প্রকাশের হাত নেই, কিন্তু শরীরটা তখন বাড়ছিল স্বাভাবিকভাবেই। তবু ওর ঠোঁটের ওপরে আঁচিল আর গজ চোখে এক অসহায় শিশুর ছাপটুকু থেকেই গেছে। হাত না থাকার দুঃখ যেন ভুলেই যাচ্ছিল।

কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকাশ যখন চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাটা হাতের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং হঠাৎ ঠোঁটের ওপর আঁচিলটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হেসে বলত, 'আমিও একটা খুব বড় অভিনব, না রে দাদা?' তখন বিকাশের বুকটা উঠত টনটনিয়ে।

বিকাশের ইচ্ছে করত, চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'না।'

কিন্তু পারত না। বিকাশের কেমন সন্দেহ হত, প্রকাশ নিজকে একটা অদ্ভুত কিছু ভাবে। ভাবে হয়তো সবচেয়ে বড় অভিনব সে নিজে, নইলে এমন অভিনব খেলা সে দেখায় কেমন করে? যেন ওইটুকু তার সান্ত্বনা, সবচেয়ে বড় উদ্দীপনা।

বিকাশ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ত সম্মতি জানিয়ে।

তখন একটি মেয়ে আসত তাদের বাড়িতে। প্রাণকৃষ্ণের মতই এক ষাট টাকার কেরাণী যোগেশ দে'র মেয়ে। ওই নীচু জমি, চালা-ঘরেরই বাসিন্দা, প্রাণকৃষ্ণের ভদ্রলোক প্রতিবেশী। তার মেয়েটি আসত বিকাশ-দের বাড়িতে। বিকাশদের মতই আধ-পেটা খাওয়া মেয়ে। দুটু বলতে মরার বয়সটা পেরিয়ে মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছিল। বলতে গেলে, দেখতে ছিল পাঁচপাঁচি। কিন্তু ওরই মধ্যে চটক ছিল একটু।

মেয়েটি হাসত বিকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বিকাশও হাসত। বিকাশ হাসলে সে ভেংচে দিত। ভেংচে দিলে বিকাশ তাকে ধরতে যেত। মেয়েটি পালাত ধরা দেবার জন্যেই। শুধু পালাবার ছল ক'রে, ধরা দেবার মত আড়ালে গিয়ে সে আর পালাতে পারত না। বরং যেন হারিয়ে যাবার ভয়ে, বিকাশের বুকের কাছ ঘেঁষে আসত।

শুধু হৃদয়ের দাবী নয়, সামাজিক অধিকারও ছিল তাদের এই খুনসুটি খেলায়। যোগেশ দে হাত জোড় করে ভিক্ষে চেয়েছিল প্রাণকৃষ্ণের পায়ে। অর্থাৎ বিয়ে দিতে চেয়েছিল বিকাশের সঙ্গে। প্রাণকৃষ্ণকে কেউ কখনো হাতে-পায়ে ধরতে পারে, এটা তার নিজেরো জানা ছিল না। মনে মনে সে রাজী হলেও ওপরে ওপরে 'দেখা-যাবে'র ভাবে ছিল।

সেই মেয়েটিকে দু'দিন দুটি চড় মেরেছিল বিকাশ। মেয়েটি হেসেছিল প্রকাশের খেলার প্র্যাকটিস দেখে। তাই মেরেছিল। মেরে, আদর করে বলেছিল, 'প্রকাশের তুই বউদি হবি, চোখে চোখে রাখবি, ভালবাসবি। তুই হাসলে যে ওর মনে লাগবে?'

আদর খেতে খেতে মেয়েটি বলত, 'হাসি পেয়ে গেছে, ইচ্ছে করে হেসেছি নাকি? আর হাসব না।'

আর হাসে নি। তখন থেকেই মেয়েটি বউদির মত ব্যবহার করত তার ভাবী বিকলাঙ্গ দেওরের সঙ্গে।

বিকাশ স্বপ্ন দেখত, মেয়েটিকে নিয়ে সে সংসার পেতেছে। বাবা নেই, মা নেই, কিন্তু প্রকাশ সুখে আছে দাদা-বউদির কাছে। আর বিকাশ চাকরি করে, টাকা আনে, সুখে সংসার করে।

কে ছিল সেই মেয়েটি? কি যেন নাম ছিল তার? যেন সত্যি বিকাশের মনে পড়ছে না, সত্যি নয়। কি যেন নাম ছিল? কি যেন?

প্রমীলা!

ঢং ঢং ঢং। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়ে দিল বিকাশ। আরো জোরে চীৎকার করে উঠল, অভিনব খেলা, অভিনব খেলা! বিস্ময়কর, আজব। শুরু হয়ে যাবে, শুরু হয়ে যাবে যেন আরম্ভটা সে আর ধরে রাখতে পারছে না, এমনি ভাবে, চোখ-মুখ কুঁচকে, দম চেপে বলে।

কিন্তু চলে যাবে বিকাশ, চলে যাবে।

কেন? না, প্রমীলার চোখ তাকে বেঁধে অহর্নিশ। এখনো বিঁধছে। বিঁধবে, যতদিন থাকবে।

বিকাশ মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'লক্ষ্য-ভেদ, লক্ষ্যভেদ! নীচের দিকে তাকিয়ে, ওপরে তীর ছুঁড়ে, মাছ কানা করেছিল কে? অর্জুন। পা দিয়ে তীর ছুঁড়ে বল্‌ কৃত্তো করে কে? মাঃ চরণ, মাঃ চরণ!'

আজ বলছে, পরের ট্রিপে বলবে। কাল বলবে। আর বলবে না। চলে যাবে সে।

কেন? না, তার দুটি হাত আছে। দুটি হাত, শক্ত, বলিষ্ঠ। আর দশটা আঙুল। সে অভিনব নয়।

তাই যেদিন তার বাবা মারা গেল, সেদিন থেকে সে চাকরির চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। চেষ্টা করতে করতে বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিল, প্রকাশকে দিয়ে একটা সত্যিকারের 'শো' করার। প্রকাশের নাম হবে কি? না, মিঃ লেগ নয়, ওটা ইংরেজি। নাম হয়েছিল, মাঃ চরণ। খেলার নাম হবে 'ওয়ানম্যান সার্কাস।'

শো হয়েছিল, আর, আর অবিশ্বাস্য চোখে, আঙুলের ডগায় একটা বোবা অনুভূতি নিয়ে গুণে দেখেছিল বিকাশ টাকাগুলি। বিকাশের মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এসেছিল, অভিনব! বেশ কিছু টাকা, অনেকগুলি টাকা দিয়েছিল লোকে, অভিনব মানুষের অভিনব খেলা দেখে। খুশি হয়েছিল বিকাশ। ভীষণ আনন্দ হয়েছিল।

আবার শো হয়েছিল। আবার, আবার। প্রত্যেকবারেই টাকা আসছিল, প্রত্যেকবার। আরো বেশী ক'রে।

বিকাশের সেই সময় রোজ মনে পড়ছিল তার নিজের কথা, 'অভিনব মানে? মানে, অদ্ভুত কিছু। অভিনব হলে লোকে দেখতে চায়।'

তখন দেখছিল, অভিনব কিছু হলেই লোকে শুধু দেখে না, পয়সাও দেয়।

কেন? লোকটার হাত নেই, নুলো। কেন? লোকটা লোক নয়, নুলো, কিন্তু পা দিয়ে খেলা দেখায়।

লোকে তখন বলত, এখনো বলে, 'নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে? কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিরও তখন দল বেঁধে ছড়া কাটার মরসুম পড়েছিল, 'নেই তাই খাচ্ছ......।

শুনে রাগ হ'ত বিকাশের। প্রকাশের দিকে তাকাত আড়চোখে। প্রকাশের রাগ বিরাগ কিছুই বোঝা যেত না। গজ চোখ ভাবলেশহীন। কিন্তু বুকটা টাটাতো বিকাশের।

বিকাশের চাকরি খোঁজার সময় নিয়েছিল কেড়ে ওয়ানম্যান সার্কাস। বড় উদ্দীপনা, তীব্র খুশিতে বিকাশ তখন কথা বলার স্টাইল আয়ত্ত করছিল। আকর্ষণ করবার নানান ভঙ্গি তৈরী করছিল। যেন দর্শক-দের চ্যালেঞ্জ করছিল মনে মনে। আর মনে মনে আওড়াচ্ছিল সেও, নেই তাই, নেই তাই......

কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ নয়, কার দৌলতে খাচ্ছিল তখন বিকাশ? তার দুটো হাত ছিল, (এখনো আছে, হে ভগবান কেন আছে?) সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, চাকরি

খ‍ুঁজেছিল, বিকলাঙ্গ ভাইটিকে বুকের কাছে আগলে রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে অভিনবত্ব কোথায়? এক-ই কথা বাঙলাদেশের কত ছেলেই তখন বলছিল।

কিন্তু পয়সা আসছিল কোত্থেকে? প্রাণ-কৃষ্ণের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী, অভাবিত পয়সা। এমন কি উ‍ঁচু পাড়ার বাসিন্দাদেরও গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল যেন। মাসে তিনশো, চারশো টাকারো হিসেব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেন? না, নেই, তাই।

নেই, তাই, যোগেশ দে এসে বলেছিল বিকাশের বিধবা মা'কে, তার মেয়েটাকে নিক সে। কেন? না টাকা রোজগার করছে বটে আজকে ছেলেটা, চিরদিন কিছু সবাই তাকে দেখবে না। না-ই বা থাকল দুটো হাত, ওই ছেলেরই তো একটি সমর্থ বউ দরকার। নেই, তাই সব সময় একজনকে চাই, বউয়ের মত একজন। যার আছে, তার একটা ব্যবস্থা হখন খ‍ুশি হতে পারবে।

তা বটে! বিকাশের মা রাজী হয়েছিল। বিয়ের অধিকার তো প্রকাশেরই আছে।

তাই বায় নেই সেই মাস্টার চরণের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বিকাশ নয়, প্রকাশের বউ হলেই শুধু দুটি খেয়ে প'রে বাঁচতে পারবে প্রমীলা।

মেয়েরা কাঁদে, ছেলেদের কাঁদতে নেই।

প্রমীলা কেঁদেছিল।

কিন্তু তাতে কি হবে? অবুঝ ছোট ছেলেটা ঘায়ে বিষ মাখিয়ে ফেলেছিল, তার জন্যে দুটো হাত কেটে ফেলতে হয়েছিল। এটা নিয়ম। প্রমীলার বিয়েটাও একটা বিষ-মাখা নিয়মের মত। তবু বিকাশ থতিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যেন থতিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে আঙুল কামড়ে ধরেছিল। শ্বাসনালীটা কে যেন ধরেছিল টিপে।

তারপর একটু একটু করে নিশ্বাস পড়েছিল, আর তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, নেই, তাই! আর—আর—

শেষবারের জন্য ঘণ্টাটা তুলে নিল বিকাশ। লোক হাসাবার জন্য, ঠোঁট বেঁকিয়ে তোতলার মত বলল, অ—অ—অভিনব্ব, অ-ই-ন-ভো।

লোকে হাসল, হি হি হি!

বিকাশ বলল, শেষ ঘণ্টা বাজছে, শেষ ঘণ্টা। তাড়াতাড়ি, কুইক, জলদি।

ঢং ঢং ঢং।

বিকাশ চলে এল ভিতরে। দীনু গিয়ে বসল বাইরে।

দর্শকদের জায়গা অনেকখানি ভরে উঠেছে।

বিকাশ উঠে এল মঞ্চে। খেলা শুরু হয়ে গেল। সেখানেও বিকাশ। বিকাশই এগিয়ে দিতে লাগল খেলার সরঞ্জাম আর ঘোষণা করতে লাগল খেলার বিষয়।

প্রমীলা নেমে গেছে স্টেজ থেকে। ঝি এসেছে তার। স্টেজের পিছনে শোনা যাচ্ছে তার গলা। ঝি'কে বলছে, উনুনটা ধরিয়ে দাও। দিয়ে, বাসন ক'টা মেজে নিয়ে এস রাস্তার কল থেকে। অমনি কলসীটাও নিয়ে যেও, খাবার জল আনতে হবে।

শুনে মনে হয়, এটা ভ্রাম্যমাণ দল নয়, একটি পাকাপাকি সংসারের স্থায়ী ঘর। প্রমীলা তার চতুর ডাকসাইটে যুবতী গৃহিণী। সায়া-শাড়ি ব্লাউজ, সোনার হার-কঙ্কন-দুলে সেই যোগেশ দে'র মেয়েটিকে যেন আর চেনাই যায় না। এই ভ্রাম্যমান সংসারেও কতবার যে মুখে সাবান ঘষে প্রমীলা, কতবার যে স্নো মাখে। কতবার টিপ বদলায়, চোখে কাজল মাখে। সব সময় ফিটফাট। এই মঞ্চের পিছনের আর এক মঞ্চে সে যেন সর্বক্ষণের আর এক নায়িকা। একমাত্র দীনুদাই কখনো কখনো ঠাট্টা করে বলে, ঘরে বসে এত সাজ কেন গো দিদি?

প্রমীলা বলে, ভোলাতে।

—কাকে?

—কাকে আবার, নিজেকেই?

নিজেকে ভোলায় প্রমীলা। হয়তো ঠাট্টা। ঠাট্টার মতো করেই বলে। তার চেয়েও বেশী, যেন কিসের ঝাঁজ আর তিক্ততা তার গলায়। কাকে এমন করে বলে প্রমীলা? ব'লে বিকাশের দিকে কেন চায় বাঁকা চোখে?

এখনো তাকিয়ে আছে। ঠিক সেই-খামটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেখান থেকে মঞ্চের ওপর বিকাশকে দেখা যায়। সেইখান থেকেই তার ঠিকে ঝিকে নির্দেশ দিচ্ছে সে, আর যেন সেই আগের দিনের মতো ভ্যাংচাচ্ছে বিকাশকে। যেন সে এখনো বিকাশকে ছোটাতে চায়, পালাতে চায় শুধু ধরা দেবার জন্যে।

প্রমীলা ভুলে যায়, এযুগে বিকাশের দুটো হাত আছে। দুটো হাত, পেশী দাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নিজেই অনুভব করে বিকাশ। দুটো হাত আছে, হাজার হাজার ছেলের মতো ম্যাট্রিক পাশ করেছে সেও। ছোট ভাইকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, বিয়ে করতে চেয়েছিল, সংসার করতে চেয়েছিল। হাজার হাজার ছেলের মতো কলেজেও পড়তে চেয়েছিল, তাই কলেজের ছেলেমেয়েদের দেখলে এখনো মনটা আনচান করে। এ সবই অতি সাধারণ। অভিনবত্ব নেই। তার 'নেই' নয়, তার 'আছে' তাই।

তাই প্রমীলাকে ধরবার জন্য আর কোন-দিন ছুটবে না বিকাশ। ছুটতেও নেই, প্রমীলা এখন তার ভাদ্রবউ।

ভাদ্রবউ। মনে পড়ছে সেই বিয়ের সময়ের প্রকাশকে। ও যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল বিয়ের কথা শুনে। শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠেছিল। ওর না-থাকার এত দৌলত দেখে। ঘুমভাঙা ছেলের মতো বোকা বোকা হেসেছিল। খুশিতে সব সময় বক বক করত, হাসত। ভারসাম্যটুকুও যেন ছিল না।

বিকাশও তখন সর্বদাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকার ভান করত। অতিরিক্ত জোরে, তড়বড় তড়বড় করে কথা বলত আর হ্যা হ্যা করে হাসত।

কিন্তু আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল প্রকাশ। কথা আর হাসি গিয়েছিল কমে। যেন কিছু একটা অনুভব করেছিল সে। বিকাশের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে আরম্ভ করেছিল। আজ দু'বছর বিয়ে করেছে, এখনো তাই থাকে। কেন? দূরে দূরে কি পালিয়ে ফেরে প্রকাশ? নাকি বিকাশকে অনুসরণ করে, নজরে নজরে রাখে?

তাই বুঝি রাখে। কতদিন, কত সময়ে প্রমীলা আর বিকাশের নিতান্ত সাংসারিক দরকারি কথার মধ্যেও প্রকাশের নিঃশব্দ আবির্ভাব আর গজ-চোখে দিক্ ভুলানো তাকিয়ে থাকার মানে কি? মানে কি, এসে চুপ করে থাকার? যেন পথ ভুলে এসে পড়ে? এসে ওর আঁচল কাঁপানোর কারিকেচার দেখায় তাই চলে যাবে বিকাশ। পালাবে এই ওয়ানম্যান সার্কাসের খাঁচা ভেঙে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন বিকাশের বড় ঘৃণা হতে থাকে নিজের হাত দুটির ওপর। নোংরা, কুৎসিত, পেশল, শক্ত দুটো হাত। এ দুটোকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলা যায় না? কালো চোখ দুটি যেন ধক ধক করে জ্বলতে থাকে বিকাশের।

এই বোধ হয় প্রথম কাজ ভুল হল তার। মাস্টার চরণ বলল, ধনুক দাও।

বিকাশ চমকে উঠে তীর-ধনুক গুঁজে দিল চরণের দুই পায়ে। দিতে গিয়ে দেখল, চরণ তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আবার তাকাল। তাকিয়ে আছে চরণ, আর আঁচল কাঁপাচ্ছে। কেন? নজর রাখছে বুঝি, কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে বিকাশ?

চোখ ফিরিয়ে নিল বিকাশ। পোকায়-কাটা পুতুলের মত মুখে তার শান্ত হয়ে উঠল। সুতোয় ঝোলানো বলটা দুলিয়ে

দিল পেণ্ডুলামের মতো। দর্শকদের দিকে ফিরে বলল, শেষ খেলা দেখুন, শেষ খেলা, লক্ষ্যভেদ।

একবার, দু'বার, তিনবার। তিনবার তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করল চরণ। হাততালি, চীৎকার, শিস্ আর তার সঙ্গে একটা ছোট ছেলের চিল-গলায় শোনা গেল, অ-ভি-ন-ব। বিকাশ টেনে দিল মঞ্চের পর্দা। বাইরে দীনু দম দিয়ে বাজিয়ে দিল একটা বাংলা গানের রেকর্ড। প্রথম' ট্রিপ শেষ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপর দ্বিতীয় ট্রিপের ফাঁদ পাতা-পাতি খেলা শুরু হবে। ওদিকে খেলার শেষে দর্শকদের ভিড় থেকে কয়েকটি মেয়ে মঞ্চের পাশ দিয়ে ঢুকে গেছে পিছনে। খিল্ খিল্ করে হাসছে। বলছে, মাস্টার চরণের বউকে দেখব, মাস্টার চরণের বউ। আজ দু'বছর ধরে এ আর নতুন নয়, পুরনো হয়ে গেছে। মেলা ছেড়ে পাড়ায় এলেই, মেয়েরা, সব শেষের খেলা হিসেবে দেখতে আসে প্রমীলাকে। হাতকাটা মাস্টার চরণ এক অভিনব। তার আবার বউ? সে যে আরো অভিনব!

অভিনব চায় লোকে, মজা পায়।

যেন একদল রাক্ষুসীর মতো হেসে উঠল, হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ করতে করতে মেয়েরা ঢুকেছে গিয়ে ভিতরে। তখনো বিকাশ মঞ্চের পর্দাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চরণ শুয়ে পড়েছে চিৎ হ'য়ে। দুজনেই শুনতে পাচ্ছে, মেয়েরা চলছে, কই, কোথায় মাস্টার চরণের বউ? আমরা দেখব।

প্রমীলার মুখখানি ভেসে উঠল বিকাশের সামনে। দুই চোখে প্রমীলার অপরিসীম ঘৃণা, তবু ঠোঁটের কোণে বাঁকা ছুরির মতো একটু হাসি। বলছে, দেখুন, কি দেখবেন। আমিই সেই।

বুঝতে পারে বিকাশ, মেয়ের দলটা থতিয়ে গেছে। থতিয়ে গিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে প্রমীলাকে। মনে মনে বলছে, 'ও বাবা, সাজগোজের বাহারও আছে মাস্টার চরণের বউয়ের। ইস্, সোনার গয়নাও আবার পরেছে রে!' তারপরেই আঁচল চাপছে মুখে, শরীর কাঁপছে তাদের হাসিতে, হিস্ হিস্ ক'রে শব্দ করছে। কারণ, নুলো চরণের সঙ্গে জড়িয়ে কল্পনা করছে তারা প্রমীলাকে। যেন চরণের নুলো ঠেকানো শরীরটা তাদেরই শিউরে উঠছে। হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল তারা।

বিকাশ জানে, প্রমীলার সামনে, উনুনে যে-আগুন জ্বলছে গন্‌গন্ করে, তার চেয়ে বেশী দপ্‌দপ্ করছে প্রমীলার মুখ। আর দু' চোখ ভ'রে, আগুন নিয়ে নিশ্চয় প্রমীলা কোনো না কোনো ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন পোড়াতে চাইছে বিকাশকে। সাঁড়া পুড়ছে তার গায়ের মধ্যে।

কেন, এ আগুনে কেন পুড়বে বিকাশ। এ আগুন ধরানো খাঁচটার মধ্যে কেন থাকবে? চলে যাবে সে। পরশু নয়, কাল রাত্রেই পালাবে।

কিন্তু চরণ? চরণ কেন তাকিয়ে আছে তার দিকে? আঁচিল কাঁপাচ্ছে কেন? কিছু বলতে চায় নাকি? বিকাশ তাকাল, আর তার মনটা চমকে উঠল। মনে হল, অনেকদিন আগের প্রকাশ তাকিয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই হাসল চরণ। বলল, 'তীরটা ছুঁড়তে গিয়ে আমার পা'টা কাঁপছিল আজ।'

কাঁপছিল? জিজ্ঞেস করল বিকাশ, কেন?

চরণ যেন অবাক হয়ে হেসে বলল, কি জানি!

এমনভাবে বলল, যেন জানে, কিন্তু বলতে চায় না। হঠাৎ রাগ হয় বিকাশের। থাবা মেরে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওর আঁচিল কাঁপানো।

চরণ হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, দীনু দা' একটা জিনিস নিয়ে এসেছে, দেখেছ?

দেখেনি বিকাশ। এই ওয়ান ম্যান সার্কাসের সংসারের ভিতরের সংবাদ সে আজকাল আর রাখে না।

বলল, না, দেখিনি।

দেখাব'খন তোমাকে।

চরণের নীচের ঠোঁটটা ঝুলে গেল আর খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে পড়ল তার গজ দাঁত। প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, সেটাও অভিনব।

অভিনব?

—হ্যাঁ। একটা কুত্তা। আমাদের দলে নিলে হয়।

বলে হি হি করে হাসল।

কুকুর? বিকাশ দেখল চরণের মুখের দিকে। গজ চোখে দিক ভুলানো নজর আর আঁচিলটা যেন ডানা কাঁপানো অস্থির কালো একটা মাছি। চিটে গুড়ে আটকা পড়েছে, উঠতে পারছে না। কি বলতে চায়, কিসের এত হাসি। রাগটা বাড়তেই থাকে বিকাশের।

চরণ বলল, ভ্রূ কাঁপিয়ে, দেখাব, দেখাব'খন তোমাকে।

তারপরেই শোনা গেল চুড়ির ঝনাৎকার। প্রমীলার গলা শোনা গেল, কই এস, চা হয়ে গেছে।

কাকে ডাকছে প্রমীলা? চরণকে না বিকাশকে? কারুরই সে নাম নেয় না। চরণ উঠল পায়ে ভর দিয়ে।

—তুমি এস।

বিকাশকে ডাকছে। এবার ফিরতেই হয়। ফিরতেই চোখে চোখ পড়ে। কোথায়, আগুন নেই তো প্রমীলার চোখে। তার চেয়েও খারাপ, যেন জল পড়ে নিভে গেছে। মেঘ করেছে সারা মুখে। যেন থমকে আছে ঘুটঘুট্টি মেঘ। বলছে যেন, কেন, কেন ওরা আমাকে এমনি করে দেখতে আসে?

আসবেই তো। লোকে দেখতে চায়। অভিনব, তাই।

চলে যাবে বিকাশ, চলে যাবে। তার ভয় করছে, প্রমীলা ভেংচে উঠবে, তারপর ছুটবে। দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বলল, যাচ্ছি।

পরমুহূর্তেই মঞ্চের পিছনে প্রমীলার ঝংকার শোনা গেল, আঃ, কোথাকার এক আপদ এসে জুটেছে।

কি একটা ছুঁড়ে মারার শব্দ হল। তারপর একটা নেড়ি কুকুরের ডাক শোনা গেল; কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ...।

চরণ বলল, মেরো না।

প্রমীলা বলল, না আদর করবে। নাও, খেয়ে নাও।

বিকাশ টের পাচ্ছে, চরণকে খাইয়ে দিচ্ছে প্রমীলা। চরণের রুটি চিবুনোর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট কথার গোঙানি আসছে ভেসে।

বিকাশ অগোছালো মঞ্চ সাজাতে লাগল আবার। দীনু রেকর্ডের পর রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। বিকাশ গেলে, সে খেতে আসবে।

প্রমীলা এসে দাঁড়াল মঞ্চে। এক হাতে রুটি, আর এক হাতে চায়ের গেলাস। মুখের মেঘ ধুয়ে এসেছে সে।

বিকাশ রুটি নিল। চায়ের গেলাসটা নিতে গেল আর এক হাতে।

প্রমীলা অপলক তীক্ষ্ণ চোখে যেন কি খুঁজছে বিকাশের মুখে। বলল, 'খেয়ে নাও, ধ'রে আছি।'

বিকাশ বলল, নীচে রাখলেই তো হয়।

প্রমীলা বলল, হাতে রাখলেও হয়।

পোকা-কাটা পুতুলের মুখটায় যেন আরো অনেক পোকা কিলবিল করতে থাকে। বিকাশ চোয়াল নেড়ে নেড়ে রুটি চিবুতে থাকে। কিন্তু বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে যেন কিসের ভয়ে। গলা দিয়ে রুটি নামতে চায় না। মনে মনে বলে, কেন চলে যায় না প্রমীলা, কেন?

প্রমীলা বলল যেন রুদ্ধ গলায়, কি হয়েছে?

—কি হবে?

—কিছু নয়?

—না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বলল, তা জানি, তুমি একথা বলবে।

বলে ঠক্‌ করে চায়ের গেলাসটা সত্যি নামিয়ে দিল এবার প্রমীলা। পড়ে যাওয়া আঁচলটা তুলে আনল আবার বুকে। বলল, তবু জানি, সব দোষ তো আমার, আমার।

বিকাশ জানে, এরকম কিছু বলবে প্রমীলা। তবু বলল, তোমার দোষ?

—'নয়?' দ্রুত নিশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে প্রমীলার বুক। আবার বলল, নয়? আমি যে মেয়ে! মেয়ে! একটা মেয়ে!

বলতে বলতে অদৃশ্য হ'ল প্রমীলা। মঞ্চের উপর, যেন দর্শকদের কাছে অপদস্থ ভিলেইনের মতো দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। সে জানত, প্রমীলা কাছে আসতে চায়, শুধু এমনি কিছু বলে যাবার জন্যেই।

কিন্তু দোষ তো প্রমীলার নয়। প্রকাশের নয়। মা'র নয়, যোগেশ দের নয়। দোষ, এই হাত দুটোর। এই অনভিনব হাত দুটোর।

খাওয়া শেষের তর সইল না বিকাশের। মাইকের কাছে গিয়ে সে চেঁচাতে লাগল, অভিনব খেলা, অভিনব খেলা।

আর মনে মনে বলতে লাগল, চলে যাব, কাল রাত্রে চলে যাব।

আরো জোরে বলতে লাগল, কাঁকড়া বিছে, কাঁকড়া বিছে। মায়ের পিঠে লেপে থাকে বাচ্চা, মা খেয়ে ফেলবে সেই ডরে। দুনিয়া আজব, দুনিয়া মজার। অভিনব খেলা, অভিনব।

অদ্ভুত অদ্ভুত জীবনতত্ত্ব সে বলে।

তারপর দ্বিতীয় ট্রিপের খেলাও শেষ হয়। রাত্রি নামে। ওদিকে প্রমীলার রান্নাও শেষ। দীনু আর বিকাশ আগে খেয়ে নেয়। তারপর চরণকে খাওয়ায় প্রমীলা। নিজে খায়।

স্টেজের ওপর একলা শোয় বিকাশ। একটা উইংসের পাশে মুড়ি দিয়ে শোয় দীনু। আর স্টেজের পিছনে আড়ালে ওরা দুজন। স্টেজের এক পাশে একটি হ্যারিকেন জ্বলতে থাকে সারা রাত।

কিন্তু প্রমীলা তখনো ঘুমোয় না, টের পায় বিকাশ। দীনুর উইংসের পাশে তার গলা শোনা যায়, পান খাবে দীনু দা।

—দাও।

বিকাশ জানে, দীনুদা হাসছে। প্রমীলা পান দিতে দিতেও তাকিয়ে আছে স্টেজের দিকে, যেখানে শুয়ে আছে বিকাশ।

নীচু গলা শোনা যায় প্রমীলার, আচ্ছা, বলতো দীনুদা ধৃতরাষ্ট্রের বউ গান্ধারী কেন চোখ বেঁধে রাখত?

দীনুদা বলে ভক্তি করে, সেসব ভাই খাঁটি সতীমাদের ব্যাপার। স্বামী অন্ধ তাই নিজেও—

—'তোমার মুণ্ডু!' নীচু গলার ধমক শোনা যায় প্রমীলার। বলে, 'চোখ বাঁধত মনের জ্বালায়।'

দীনু বলে, কি রকম?

প্রমীলার নীচু গলা শোনা যায়, গান্ধারীর অমন ডাগর দুটি মিষ্টি চোখ, মিষ্টি করে তাকাত সোয়ামীর দিকে, তা কানা সোয়ামী তো দেখতেও পেত না। আর সাধ থাকে তাকাতে?

বিকাশের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কি বলতে চায় প্রমীলা? চরণের দুটি হাত নেই আলিঙ্গনের, তাই তার হাত দুটিও বেঁধে রাখতে চায় নাকি সে মনের জ্বালায়? আর কাকে, কাকে শোনাচ্ছে প্রমীলা একথা। বিকাশ স্পষ্টই টের পায়, প্রকাশ জেগে আছে, শুনছে আর অপলক চোখে যেন তাকিয়ে আছে বিকাশের দিকেই। সারা গায়ের মধ্যে তার জ্বলতে থাকে।

পরমুহূর্তেই শোনা যায় দীনুদার গলা, কি হয়েছে দিদি, কাঁদছ?

প্রমীলার টুঁটি চাপা স্বর ভেসে আসে, না গো, না, হাসছি।

একটু চুপচাপ। চকিতে চোখ বোজে বিকাশ। তার মুখের ওপর ছায়া পড়েছে প্রমীলার। স্টেজের পাটাতন দুলছে। প্রমীলা যাচ্ছে এখান দিয়ে। কিন্তু দৃষ্টি তার বিকাশেরই মুখের ওপর।

তাকাবে না, তাকাবে না বিকাশ। না তাকিয়ে, সে কাল রাত্রে চলে যাবে।

নেমে যায় প্রমীলা। স্টেজের পিছনে শোনা যায়, ঘুমোওনি এখনো?

চরণের গলা; না।

হ্যারিকেন জ্বলতে থাকে সারারাত

প্রমীলার স্বর, সেই বিটকেল জীবটার জন্যে বুঝি?

চরণ—হ্যাঁ, এখনো আসে নি।

—আর আসতে হবে না।

—দাদাকে দেখাব।

তারপর চুপচাপ। ওর সেই কুকুরটার কথা বলছে, ওর অভিনব সেটা।

উত্তুরে বাতাসে দুলছে ক্যাম্পের পর্দা। রেল স্টেশনে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে একটা ইঞ্জিনের।

তারপর দিন। এক ট্রিপ গেল। দুই ট্রিপ গেল। রাত্রি হল, খাওয়া হল। শুয়ে পড়ল সবাই। প্রমীলা ঘুরে গেল দীনুদাকে পান খাইয়ে।

সময় আসছে। বিকাশ চলে যাবে। কি কি নেবে বিকাশ? কিছু না। ওয়ানম্যান সার্কাসের কোনো জিনিস তার নিজের নয়। কুটোটিও নয়। সে নিজে? হ্যাঁ, তার ওপরও অনেকখানি অধিকার জন্মে গেছে ওয়ানম্যান সার্কাসের। কিন্তু, শুধু মনে মনে, প্রাণে প্রাণে বাঁচবার জন্য সেই অধিকার থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবে সে। দুহাতওয়ালা, অনভিনবদের ভিড়ে চলে যাবে সে। দরখাস্ত লিখবে, চাকরি খুঁজবে আর...আর সংসারও করবে।

আজকের টিকেট বিক্রীর সব টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে সে দীনুর হাত দিয়ে। একটি আধলাও রাখে নি।

ক'টা বাজছে পেটা ঘড়িটায়? এক, দুই, তিন...এগারোটা। আরো এক ঘণ্টা পরে যাবে, সবাই ঘুমোলে। ক্যাম্পের সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে, ঘুরে পিছন দিক দিয়ে, সরু, সংক্ষিপ্ত পথটা দিয়ে চলে যাবে স্টেশনে। ভোরের গাড়িতে চলে যাবে।

কোথায় যাবে বিকাশ? বাড়িতে? সেখানে কেউ নেই। মা মারা গেছে গতবছর। কোথাও যাবে, এখন সেসব ভাবতে চায় না বিকাশ।

কিন্তু এখনো তাকিয়ে আছে কেন প্রমীলা? স্পষ্ট টের পাচ্ছে বিকাশ, অন্ধকার থেকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। টের পেয়েছে? নজর রাখছে?

নিথর শক্ত হয়ে পড়ে রইল বিকাশ। কি হবে নজর রেখে। দুটো হাত আছে বিকাশের।

দীনুদার ঘুমন্ত নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে বিকাশের। মা, বাবা, প্রকাশ আর প্রমীলা।

প্রমীলা ভ্যাংচাচ্ছে, ধরা দেবার জন্যে ছোটাতে চাইছে বিকাশকে। আদর কাড়বার জন্য, খুনসুটি করবার জন্যে পালাচ্ছে বুকের কাছে আসবে বলে।

আর প্রকাশ যেন বলছে, খালি গায়ে কাটা নুলো দুটো নেড়ে নেড়ে বলছে, আমি একটা অভিনব না রে দাদা?

—হ্যাঁ?

—আমি খুব বড় অভিনব, নারে দাদা?

—হ্যাঁ।

অভিনব, অভিনব।

একবার দেখে যেতে ইচ্ছে করছে প্রাকশকে। একবার, শেষবারের জন্য সেই ছোট ভাইকে। হাতের ঘায়ে জুতোর কালি মাখিয়ে ফেলা, হাত কেটে বাদ দিয়ে ফেলা ছেলেটাকে।

এখনো বোধহয় মশা কামড়াচ্ছে প্রকাশকে? ও মারতে পারছে না। প্রমীলা কি করছে? কি করছে?

ঢং ঢং ঢং। বারোটা বাজল।

উঠল বিকাশ। যাবে একবার দেখতে? না। সেখানে আর একজন আছে। প্রমীলাকে সে ঘুমন্তও বোধহয় দেখতে পাবে। তাকেও আর দেখবে না বিকাশ।



বিকাশের ছায়াটা পড়েছে মঞ্চের ওপর। হ্যারিকেনটা জ্বলছে। কালকে সব খুলে ফেলা হবে। ওরা চলে যাবে।

বিকাশ নেমে গেল মঞ্চ থেকে। চট পাতা অডিটরিয়মে ছায়াটা আরো বড় দেখাল তার।

পর্দাটা ঠেলে বাইরে এল। রাস্তার আলো পড়ল তার গায়ে। আলোর রেশ চলে গেছে ক্যাম্পের পিছন অবধি।

ক্যাম্পটা পার হবার আগেই থমকে গেল বিকাশ। কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে? কোথায়? কে যেন হাসছে, জড়িয়ে জড়িয়ে, হি হি করে। কে? চরণ? হ্যাঁ, চরণ হাসছে। ও, ক্যাম্পের পিছনে, বাইরে গেছে বুঝি প্রমীলাকে নিয়ে? ক্যাম্পের ভিতরে হাসাহাসি খুনসুটি করলে, বিকাশ শুনতে পাবে, তাই?

ক্যাম্পের গা ঘেঁষে ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বিকাশ। কোনোদিন ওদের দুজনকে ওভাবে দেখেনি। আজ দেখে চলে যাবে।

স্বল্পালোকে উঁকি মারল বিকাশ। আর মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল।

দেখল, চরণের পায়ের আঙুলে ধরা রুটি। পা-টা উঁচু করে রেখেছে সে, আর একটা কুকুর লাফ দিয়ে ধরবার চেষ্টা করছে রুটিটা।

বিকাশ দেখল, কুকুরটার সামনের দুটো পা, অর্ধেকের ওপর কাটা। পিছনের দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা। চরণ বলছে, ধর, ধর না।

তারপর নিজেই ফেলে দিল রুটিটা। কুকুরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল রুটির ওপর, খেতে লাগল মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে। চরণ হাসছে, হি হি হি। তুই, তুই ঠিক আমার মতন, না?

কুকুরটা শব্দ করল, আউ!

চরণ এগিয়ে গেল, আদর করে দু পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল কুকুরের গলা। বলল, তোকে আমি খেলা শেখাব, অ্যাঁ?

কুকুরটা জবাব দিল, হাঁ-উ-উ-ই!

জবাব দিয়ে সেও সামনের কাটা নুলো দুটো তুলে দিল চরণের কোলের ওপর।

চরণ বলল, তুইও খেলা দেখাবি, কেমন? আমি শেখাব তোকে, দাদার মতন, অ্যাঁ? হি হি হি!

বিকাশ দু' হাতে তার টুঁটিটা চেপে ধরল। শব্দ আসছে তার গলায়। কিসের একটা তীব্র ডাক যেন ভেসে আসছে।

কুকুরটা বলছে, গর্‌র্‌র্‌—আঁ উঁ উঁ।

চরণ বলল, তুই একটা অভিনব। আমার মতন, না?

কুকুরটা কাটা নুলো দুটো তুলে দিল চরণের বুকের কাছে। চরণ তার নিজের নুলো দুটো এগিয়ে দিল কুকুরটার কাছে। বলল, তুই আর আমি, দুজনেই খেলা দেখাব, লোকে খুব মজা পাবে, দেখিস।

কুকুরটা আরো সোহাগ করে ডাকল, কুঁই কুঁই কুঁই!...

যেন বলছে, হ্যাঁ, খুব অভিনব হবে, না রে দাদা?

বিকাশের মনে হল, বুকের ভিতর থেকে একটা চীৎকার উঠতে চাইছে, ডাকতে চাইছে, প্রকাশ! প্র—কা—শ ভাই!

চরণ মাথাটা নুইয়ে আনল কুকুরটার কাছে। বলল, কাল তোকে দাদার কাছে নিয়ে যাব।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না বিকাশ। বুক থেকে ঠেলে আসছে একটা কি যেন, আর দু' চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরল বিকাশ।

প্রমীলা! প্রমীলা দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। স্খলিত আঁচল, আবাঁধা চুল। টিপ নেই কপালে। অপলক চোখ বিকাশের দিকে, কিন্তু যেন বন্ধ দৃষ্টি। বন্ধ, আচ্ছন্ন, বিচার-বিবেকহীন।

বিকাশ ডাকল, চাপা দ্রুত গলায়, প্রমীলা।

প্রমীলা যেন জ্বরের ঘোরে জবাব দিল, অ্যাঁ?

বিকাশ প্রমীলার আঁচল তুলে দিল গায়ে। দু'হাত দিয়ে প্রমীলাকে ধরে ঝাঁকানি দিল। ডাকল, প্রমীলা, প্রমীলা।

প্রমীলার চোখে দৃষ্টি ফিরে এল যেন। বলল, কি?

গলা বন্ধ হয়ে আসছে, তবু বলল বিকাশ, নির্দেশ দিল যেন অবিচলিত গলায়, প্রকাশের কাছে যাও। প্রকাশকে আর, আর ওর ওকে ঘরে নিয়ে এস। যাও, প্রমীলা, প্রকাশের কাছে যাও তাড়াতাড়ি।

প্রমীলা জিজ্ঞেস করল, আর তুমি? তুমি পালাতে চাও?

—আমি? পালাব? না, না—

গলার স্বর মোটা শোনাল বিকাশের, আমি শুতে যাচ্ছি। তুই প্রকাশের কাছে যা প্রমীলা।

যেন সেই পুরনো দিনের মত, সেই ভ্যাংচানো-অভ্যেস মেয়েটাকে প্রকাশের কাছে যেতে নির্দেশ দিচ্ছে বিকাশ। পুরনো দিনের মত বলছে, ওকে তুই তো দেখবি। তুই ওর, তুই ওর......।

বিকাশের ছায়ানুগামিনী প্রমীলা যেন যাদুকরের সম্মোহনে, একবার তাকিয়ে চলে গেল প্রকাশের কাছে। বিকাশ ওর সেই বড় ছায়াটা নিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে সেই দুই বন্ধুর কাকলী তখনো শুনতে লাগল, দু' হাত দিয়ে মুখ আর চোখ আর দুই কান চেপে।

কোনোদিন পালাতে পারবে না সে এই সার্কাসের ভেড়া ডিঙিওয়ে। কারণ, নেই নয়, তার আছে, দুটি শক্ত হাত তাই।

দীনুদা একটা নিশ্বাস ফেলে, বিড়ি ধরাল।
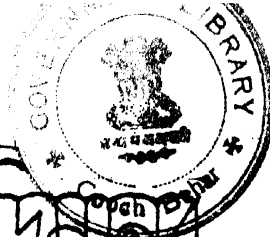
সমগ্র প্রাণীজগতে জীবন-যুদ্ধের কঠোর প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমের উদ্বর্তনে মানুষের স্থান সর্বাগ্রে। অথচ জীবতত্ত্বের মাপকাঠিতে মানুষ প্রকৃতির দুর্বলতম সৃষ্টি। অন্যান্য বন্য প্রাণীদের মত মানুষ কোনকালেই দৈহিক শক্তিসম্পন্ন ছিল না। তীক্ষ্ণ নখ, দাঁত, শিং, ক্ষিপ্রগতি প্রভৃতির সাহায্যে অন্যান্য প্রাণীরা যেমন আত্মরক্ষায় সক্ষম, মানুষের প্রকৃতিদত্ত তেমন অস্ত্র-রক্ষার উপযোগী কোনও বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই। কিন্তু প্রাণীজগতে মানুষই একমাত্র জীব যে তার জীবন রক্ষা ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র ও হাতিয়ার তৈরী করতে পারে। নিছক বেঁচে থাকবার তাগিদেই, তার সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই মানুষকে তার বুদ্ধি ও কল্পনার দ্বারা নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারের উদ্ভাবন করতে হয়েছে এবং আগুন বশ করতে ও তার ব্যবহার শিখতে হয়েছে। এবং এই জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় মানুষ যুগ যুগ বংশপরম্পরায় একজন আর একজনকে দীক্ষিত করে এসেছে। এই কারিগরি ক্ষমতাই মানুষের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত সংজ্ঞা। মানুষের প্রাক্ ইতিহাসের প্রথম যুগে কাঠের ও পাথরের হাতিয়ারের দ্বারা ও আগুনের সাহায্যে আদিমানব তার প্রাকৃতিক পরি-বেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে অন্যান্য প্রাণীদের উপর প্রভুত্ব করতে পেরেছিল। এই কারিগরি ক্ষমতার দ্বারাই মানুষ তার জয়যাত্রার বন্ধুর পথে প্রথম অভিযান শুরু করেছিল।

সঠিক কবে ভারতে আদিমানুষের অভ্যুদয় হয়েছিল আমরা জানি না। এদেশে এখনও তার জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। তবে আদিমানুষের হাতের তৈরী পাথরের নানা বিচিত্র হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে—যেগুলি তার উপস্থিতি ও বসতির সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং এই হাতিয়ার যে পুরা প্রস্তর-যুগের আদিমানবের তাও সুপ্রমাণিত। প্রাগৈতিহাসিক কালপঞ্জীতে এই পুরা প্রস্তরযুগ — তুষারযুগ পিলস্টোসিন তুষারযুগের সমকালীন। অনুরূপ, এই পিলস্টোসিন তুষারযুগের ব্যাপ্তি প্রায় ৪০০,০০০—৫০০,০০০ বৎসর পূর্বে ভারতে আদিমানবের অভ্যুদয় হয়েছিল। প্রায় ঐ সমসাময়িক চীনদেশে সিনানথ্রোপাস এবং যবদ্বীপে পিথিকানথ্রোপাস আদিমানবের অভ্যুদয় হয়েছিল। এই তুষারযুগ তথা পুরা প্রস্তরযুগের স্থিতিকাল ছিল প্রায় এক নিযুত বা দশ লক্ষ বৎসর।

(warm interglacial) সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও তুষারযুগে প্রধানত চারবার দীর্ঘকালব্যাপী হিমপ্রবাহ ঘটেছিল—অর্থাৎ চারবার হিমযুগের (glacial phase) সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের বিরতিতে তিনবার নাতিশীতোষ্ণ যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। আবহাওয়ার এই আবর্তনই তুষারযুগের বৈশিষ্ট্য। উত্তর ভারতে যখন তুষারযুগ—দাক্ষিণাত্যে তখন ঐ একই মূল কারণে প্লাবনের যুগ—অর্থাৎ কখনও অতি-বৃষ্টি এবং কখনও শুষ্ক আবহের যুগ। যেমন ইউরোপে যখন তুষার-যুগ, আফ্রিকাতে তখন প্লাবনের যুগ। সম্ভব এইরূপ বিচিত্র পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পরিবেশের সূচনায় পৃথিবীতে আদিমানবের অভ্যুদয় হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ৬০০,০০০ বৎসর পূর্বে ইউরোপে এই তুষারযুগের পত্তন হয় এবং সর্বশেষ হিমবাহের বিরতি ঘটে কমবেশী
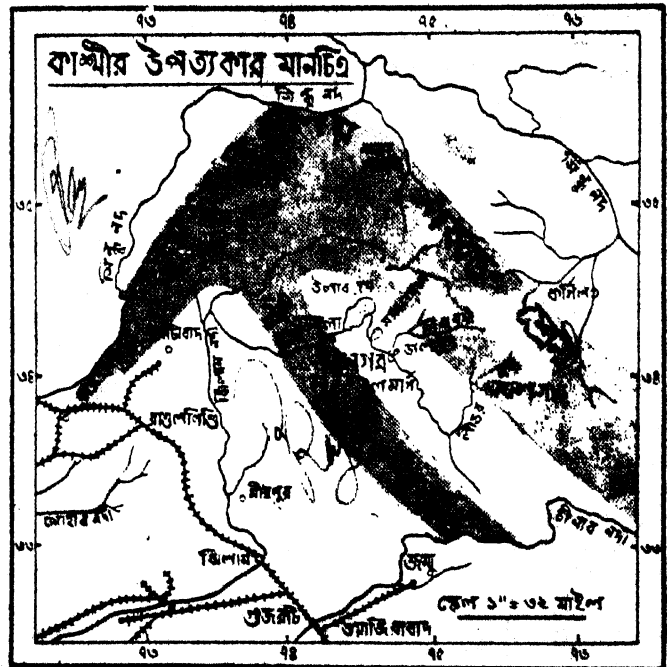
এই প্রাগৈতিহাসিক তুষারযুগে পৃথিবীর প্রায় সমগ্র উত্তরভাগে ও উচ্চ পর্বতদেশে কয়েকবার বিরাট হিমপ্রবাহ ঘটেছিল, হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশেও তার প্রচুর প্রমাণ আছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, প্রধানত সূর্যতাপের তারতম্যের ফলেই এই হিমপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র তুষারযুগব্যাপী একটানা যে হিমপ্রবাহ ঘটেছিল এমন নয়, মাঝে মাঝে হিমপ্রবাহের দীর্ঘবিরতিতে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার

১০,০০০ বৎসর পূর্বে। তুষারযুগে হিম-বাহের ও প্রচণ্ড শীতের তাড়নায় সমস্ত প্রাণী ও আদিমানবও দলবলে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে এসেছে, এবং আবার হিমবাহের বিরতিতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে অভিযান করেছে। দলবলে প্রাণীজগতের এই দুইদিকগামী মিছিল তুষারযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তুষারযুগের এই হিমপ্রবাহের প্রচুর নিদর্শন কাশ্মীর হিমালয়ে আজও দেখতে

অমরনাথের পথে হিমপ্রবাহিত উপত্যকা

পাওয়া যায়—যেমন হিমপ্রবাহিত অর্ধ-গোলাকার উপত্যকা ও ঝুলন্ত শাখা উপত্যকা, মসৃণ পর্বতগাত্র, মেষপৃষ্ঠের মত উঁচু ঢালু পর্বতপৃষ্ঠ, সিঁড়ির মত পার্বত্য ধাপ, পার্বত্য হ্রদ, হিমে জমাট মাটির স্তর, বিস্তীর্ণ গ্রাবরেখা প্রভৃতি। যাঁরা কাশ্মীরের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন, তাঁরা হিমপ্রবাহিত এইরূপ বিচিত্র ভূপ্রকৃতি দেখে থাকবেন। তুষারতীর্থ অমরনাথের যাত্রাপথ হিমপ্রবাহিত অর্ধগোলাকার উপত্যকার ও নানা গ্রাবরেখার উপর দিয়েই ক্রমশ অমরনাথ পর্বত-গুহায় উপনীত হয়েছে। কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ শ্যামল গ্রাবরেখাগুলি হিমযুগের বিশেষ নিদর্শন। বিখ্যাত শৈলাবাস গুলমার্গ একটি গ্রাবরেখায় অবস্থিত। এই গ্রাবরেখার উপরই 'গল্‌ফ্‌' খেলবার চমৎকার ময়দান। একদা এই তুষারযুগের সূচনায় অধুনা শ্রীনগর উপত্যকায় এক বিরাট হ্রদের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ আছে। এই হ্রদের তীরে শ্যামল বনানী ও বহু প্রাণীর আনাগোনা ছিল—হ্রদের স্তরীভূত অবক্ষেপে তাদের নানা জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। এই লুপ্ত হ্রদটির নাম—কারেওয়া হ্রদ। কাশ্মীরের ডাল্‌, উলার, মানসবল প্রভৃতি মনোরম হ্রদগুলি ঐ লুপ্ত কারেওয়া হ্রদেরই ভগ্নাংশ। শ্রীনগরের নিকটবর্তী একটি এলাকায় কারেওয়ার স্তরীভূত বালিমাটির মধ্যে এক লুপ্ত প্রাচীন হাতির জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে—এই হাতিটির বৈজ্ঞানিক নাম এলিফ্যাস্‌ হাইসুড্রিকাস্‌। তুষারযুগের প্রথম হিমপ্রবাহের বিরতিতে পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চল থেকে এই হাতিটি অন্যান্য বন্য প্রাণীদের সঙ্গে কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ হ্রদের শ্যামল বনভূমিতে অভিযান করেছিল। তখন পীরপঞ্জাল পর্বত আজকের মত উঁচু ছিল না এবং তখন উত্তর ভারতের সমতল অঞ্চল ও কাশ্মীরের মধ্যে বহু স্তন্যপায়ী জীবজন্তুর আনাগোনা ছিল। যাযাবর শিকারী আদিমানুষও যে এই প্রাণীদলের পশ্চাৎভাগে ছিল, সে বিষয় সন্দেহ নেই। উত্তর ভারতের ঐ লুপ্ত প্রাচীন হাতির নিকটাত্মীয় আর একটি হাতির (এলিফ্যাস্‌ নামাডিকাস*) জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে হোসেংগাবাদের নিকটবর্তী নর্মদা উপত্যকায়। প্রাগৈতিহাসিক তুষার-প্লাবন যুগে এই নর্মদা উপত্যকাও বহু বন্য প্রাণী ও আদিমানবের লীলাক্ষেত্র ছিল। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে শিবালিক অঞ্চলেও সে যুগের বহু প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। এক কথায়, তুষার যুগের পরিবর্তনশীল পটভূমিকায়

হিমপ্রবাহে মসৃণ পর্বতগাত্র (কাশ্মীর)

শ্রীনগরের সন্নিকট এই কারেওয়া অঞ্চলে তুষারযুগের হাতির জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে

উত্তরে হিমালয় অঞ্চল থেকে দক্ষিণে নর্মদা ও গোদাবরী উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্তন্যপায়ী বন্য জীবজন্তুর নানা জাতি প্রজাতির গতাগম্য ছিল। সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকা আজ প্রায় বনশূন্য, কিন্তু একদা এই অঞ্চল তৃণভোজী ও মাংসাশী বহু প্রাণীর চারণ ও শিকারভূমি ছিল। শুধু বন্যপ্রাণী নয়, নানা স্থানে উদ্ভিদের জীবাশ্মও পাওয়া গিয়েছে। কাশ্মীরে গুলমার্গের নিকটবর্তী লারাদুরা অঞ্চলে তুষারযুগের এক গ্রাবরেখার নীচে স্তরীভূত কাদামাটিতে নানারকম পত্রপর্ণ ও গুল্মের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। এই এলাকাটিও অধুনালুপ্ত কারেওয়া হ্রদের অন্তর্গত ছিল এবং আজকের মত এতটা উচ্চে অবস্থিত ছিল না। তুষারযুগের দ্বিতীয় দীর্ঘ হিম-প্রবাহের সময় হিমালয়ের সঙ্গে এই কাশ্মীর উপত্যকা ও হ্রদের অঞ্চল এবং পীরপঞ্জাল উত্তোলিত হয়। সম্ভব তুষার যুগের

কাশ্মীরে গুলমার্গের নিকট এই অঞ্চলে তুষারযুগের বহু উদ্ভিদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে

পরবর্তী যুগে এই কারেওয়া হ্রদের জল-নিকাশ হয়ে ঝিলাম উপত্যকায় পরিণত হয়। রাজতরঙ্গিণীতে কথিত আছে যে, এক কাশ্যপ যোদ্ধা নাকি তার তলোয়ার দিয়ে এই হ্রদ খণ্ডিত করে তার জলনিকাশ করে দেয়।

আদিমানব যাযাবর ও শিকারী প্রাণী ছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরে ও উপত্যকা অঞ্চলে তার বসতি ছিল এবং তার চারিদিকের পরিস্থিতির নিশানা এবং শত্রু ও শিকারের আনাগোনা তার দৃষ্টিভুক্ত ছিল। স্বভাবতই ও তার পরিস্থিতি অনুযায়ী তার জীবন রক্ষার জন্যই তাকে শিকারবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে। প্রধানত সে মাংসাশী প্রাণী ছিল। তাই জীবজন্তুর অনুসরণ করতে সে বাধ্য হ'ত। অবশ্য মাটির নীচে থেকেও ফলমূল সংগ্রহ করে সে আহার করত। কিন্তু আদিমানুষ প্রধানত শিকারজীবী ছিল এবং পশু-খাদ্যের জন্য তাকে এক এলাকা থেকে আর এলাকায় পাড়ি দিতে হ'ত।

ভারতবর্ষে যদিও কোন প্রমাণ নেই এবং অন্যত্রও বিরল, তবুও মনে হয় এবং কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আদিমানুষ পাথরের অস্ত্র ছাড়াও কাঠের তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করত। কালের গতিতে কাঠ সহজেই বিনষ্ট হয়, তাই তার প্রমাণও বিলুপ্ত। অনেক শিকারী আদিবাসীদের মত, যেমন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মত, প্রস্তরযুগের আদিবাসীরাও নিশ্চয় কোন-

কাশ্মীরে তুষারযুগের উদ্ভিদের

*এই হাতির জীবাশ্ম কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

রকম কাঠের বর্শা ব্যবহার করত। কারণ কাঠের বর্শা বা ফলকের দ্বারাই বৃহৎ জীব-জন্তু শিকার করা সম্ভব। ইউরোপে প্রস্তরযুগের অন্যতম এরূপে মাত্র দুইটি কাঠের বর্শা পাওয়া গিয়েছে।

ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আদিমানুষের তৈরী নানা বিচিত্র পাথরের অস্ত্র ও হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। এইসব পাথুরে হাতিয়ারের মধ্যে প্রাচীনতম একরকম বিশেষ হাতিয়ার উল্লেখযোগ্য। এই হাতিয়ারটি গোলাকার বা লম্বা উপলখণ্ডের তৈরী। উপলখণ্ডের একদিক বা এক পাশ ছুলে তীক্ষ্ণ ধার করে নেওয়া, অপর দিক গোলাকার এবং হাতে করে ধরার উপযোগী। কোনও কোনও গোলাকার উপলখণ্ডের এক ধার বা এক পাশে দুদিক দিয়ে ছোলা এবং ইংরাজি অক্ষর ডাবলিউ'র আকারে ধারটি বেশ তীক্ষ্ণ—প্রত্নতত্ত্ববিদ এই প্রকার হাতিয়ার-

প্রস্তর যুগের আদিমানবের আস্তানা সোহান উপত্যকা

গুলির নাম দিয়েছেন—পেবল্ চপার বা চপিং টুল। এইপ্রকার স্থূল অস্ত্র পাঞ্জাবে, গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে (নর্মদা অঞ্চলে), ময়ূরভঞ্জে, মাদ্রাজে পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষের মত দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকাতেও উপলখণ্ডের তৈরী এইরূপ স্থূল অস্ত্র (পেবল্ টুল) পাওয়া গিয়েছে—আফ্রিকায় এই হাতিয়ারগুলিই মানুষের প্রাচীনতম কৃষ্টি। এইরকম অস্ত্র দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ারও নানা দেশে পাওয়া গিয়েছে—যেমন যবদ্বীপে, শ্যামদেশে, বর্মায় ও চীনে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, এই প্রকারের হাতিয়ারই প্রস্তরযুগের আদিমানুষের কারিগরি ক্ষমতার প্রাচীনতম নিদর্শন।

আদিমানবের কারিগরি নৈপুণ্যের এবং তার নিত্য কর্মের আর একটি উদাহরণ—পাথরের তৈরী একপ্রকার কুঠার বা কুড়ালি (হ্যান্ড-এক্স) যার একদিকে সূচাল ও চোখা করা এবং অপরদিকে গোলাকার। প্রায় একই নমুনায় ও শিল্প-কৌশলে তৈরী চার-পাঁচ রকমের (টাইপ) কুড়াল ভারতবর্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। নানারূপ কাজে এই কুড়ালগুলি ব্যবহৃত হ'ত—

প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের একটি আস্তানা সোহান্ উপত্যকা

যেমন কাটাকুটির কাজে, খোঁড়া ও খোঁচা প্রভৃতি সংসারের বিবিধ কাজেকর্মে এই হাতিয়ারটির বিস্তৃত ব্যবহার ছিল বলে মনে হয়। দেখা যায়, আদিমানুষ এই হাতিয়ারের নির্মাণ কৌশলে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। প্রথমদিকে এই হাতিয়ারটির নির্মাণ-রীতি ছিল স্থূল রকমের, কিন্তু পরে ক্রমশই এর আকার ও নির্মাণ-রীতি উন্নততর হয়। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে এই কুঠারগুলি কোয়ার্টজাইট পাথরের এবং ইউরোপে ফ্লিণ্ট পাথরের তৈরী, কিন্তু তাদের আকার ও নির্মাণ-রীতি প্রায় একই ধরনের। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে বিশেষ পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ এলাকাতে এই কুঠারের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া, ময়ূরভঞ্জে, মির্জাপুরে, নর্মদা উপত্যকায়, সবরমতী উপত্যকায় এবং রাজস্থানেও এই ধরনের প্রস্তরের কুঠার পাওয়া গিয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রস্তরযুগের আরও এক ধরনের হাতিয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এটি এক রকমের কাতান, প্রত্নবিদ্যায় যার নাম ক্লিভার। এই অস্ত্রটি হ্যান্ড-এক্স-এর মত সূচাল বা চোখা নয়, এর কাটবার ধারটি সিধা, এড়ো বা তির্যকভাবে স্থিত এবং এর আকার সত্যিকার কুড়ালের মত। সম্ভবত এই হাতিয়ারগুলি কাঠ কাটার কাজে, পশুর ছাল ছাড়ান প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে পূর্ববর্ণিত কুঠারের (হ্যান্ড-এক্স) সঙ্গে নানাপ্রকার কাতানও দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকাতে ও ভারতবর্ষে এক প্রকার তির্যক

সোহান উপত্যকায় প্রস্তর যুগের একটি উন্মুক্ত কারখানা

কাতান পাওয়া গিয়েছে—যার আকার ও ধার অনেকটা গিলোটিনের মত।

এই সমস্ত ভারী হাতিয়ার ছাড়াও আদিমানব পাথরের ছোট ছোট নানারকম হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেও জানত এবং তার নির্মাণ-রীতিও ছিল ভিন্ন রকমের। উপযুক্ত আকারের উপলখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড (কোর) থেকে ছিল্কা বা টুকরা খসিয়ে, সেই খণ্ড ছিল্কা (ফ্লেক) নিপুণভাবে ছুলে তাকে নানা বিচিত্র অস্ত্রের আকার দেওয়া হত। প্রথম দিকে স্থূলভাবে এই ছিল্কাগুলি প্রস্তরখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হত। পরে আরও উন্নততর রীতিতে অর্থাৎ প্রস্তর-খণ্ডটির একটি বিশেষ অংশ নির্বাচন করে সেই অংশটিকে সূক্ষ্মভাবে ছুলে তারপর সোজাসুজি ঘা দিয়ে ছিল্কাটি বিক্ষিপ্ত করা হ'ত। এইরূপে দুই পদ্ধতিতে নানা অস্ত্র-শস্ত্র (ফ্লেক টুল) তৈরী করা হ'ত—যেমন

হোসাংগাবাদের নর্মদা তীরে প্রস্তর যুগের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও জীবাশ্মের একটি এলাকা

চাঁচর, ছুরি, সূচি, তুরপুণ, নানা বেধনাস্ত্র প্রভৃতি। ত্রিকোণ সূচাল বেধনাস্ত্রগুলি সম্ভব বাণাগ্র বা ফলকের মত ব্যবহৃত হত। বলা বাহুল্য, শিকার ও গৃহস্থালীর খুঁটি-নাটি নানা কাজে এইসব অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তৃত ব্যবহার ছিল।

দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে পূর্ববর্ণিত কুঠার ও কাতানের সঙ্গে একই এলাকায় এইরূপ ছিল্কা পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও দেখতে পাওয়া যায়, যদিও কুঠার ও কাতানের প্রাধান্যই সেখানে বেশী। এদিকে উত্তর ভারতে, যেমন পাঞ্জাবের নদী-উপত্যকায় উপলখণ্ডের তৈরী হাতিয়ারের (পেবল্ টুল) সঙ্গেও এই ছিলকা পাথরের নানা অস্ত্র (ফ্লেক টুল) দেখতে পাওয়া যায়। কুঠার ও কাতান এই প্রদেশে বিরল। উত্তর ভারতের এই উপল-খণ্ডের ও ছিল্কা পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক মিল দেখা যায় চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার পুরা প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির। সেখানেও উপলখণ্ডের ও ছিল্কা পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ এবং সেখানেও তথাকথিত কুঠার ও কাতানের নিদর্শন বিরল।

প্রস্তরযুগের ভারতবর্ষে প্রধানত দেখা

সোহান্ সংস্কৃতির পাথরের নানা অস্ত্রশস্ত্র
নানা অস্ত্রশস্ত্র

যায়—দুইটি আদি সংস্কৃতির ধারা। একটি কুঠার-কাতানের সংস্কৃতি (হ্যান্ড-এক্স কালচার) যার কেন্দ্র দাক্ষিণাত্যে এবং অপরটি উপলখণ্ড ও ছিলকা পাথরের অস্ত্রের সংস্কৃতি (পেব্ল অ্যান্ড ফ্লেক কালচার) যার কেন্দ্র উত্তর ভারতের উভয় পাঞ্জাবের উপত্যকাঞ্চলে। প্রস্তরযুগের এই দ্বিতীয় সংস্কৃতি প্রথম আবিষ্কৃত হয় পশ্চিম পাঞ্জাবে (পাকিস্থান) রাওয়ালপিণ্ডির নিকটস্থ সোহান্ উপত্যকায়—যার জন্য এর নামকরণ হয়েছে সোহান্ সংস্কৃতি। অপর সংস্কৃতির কেন্দ্র মাদ্রাজ অঞ্চলে, তাই তার নামকরণ হয়েছে মাদ্রাসীয় সংস্কৃতি। এই দুইটি সংস্কৃতির ধারা তুষারযুগের বা প্লিস্টোসিন যুগের মধ্য-ভাগে মধ্যভারতে বিশেষ নর্মদা অঞ্চলে এসে মিলিত হয়েছে। এই দুইটি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ--গুজরাতে সবরমতী অঞ্চলেও দেখা যায়। বলা বাহুল্য, তুষার-প্লাবন যুগের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আদিমানব-গোষ্ঠীকে হিম ও প্লাবনের তাড়নায় কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও দক্ষিণ থেকে উত্তরে অভিযান করতে হয়েছিল। ফলে, তাদের সংস্কৃতির নানা সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আদিমানব ও তার সমকালীন জীবজন্তুদের এই সুদূর-বিস্তৃত পরিযান তুষারযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

তুষারযুগের জীবজন্তুদের প্রব্রজন ইউরোপ-আফ্রিকাতেও সুপ্রসারিত। স্থল-সেতুর দ্বারা ইউরোপ-আফ্রিকায় তখন যোগাযোগ ছিল। তাই তুষারযুগের ইউরোপ অঞ্চলে আফ্রিকাবাসী জীবজন্তুদের —যেমন হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী, বন্যবৃষ, গবাদি পশু, বাঘ, সিংহ প্রভৃতির জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। এদের বহু প্রজাতি আজ বিলুপ্ত। ইংলণ্ড পর্যন্তও এইসব জীব-জন্তুদের আনাগোনা ছিল। এদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া মহাদেশেও উত্তর ভারত ও চীন থেকে বর্মা, জাভা, মালয় পর্যন্ত স্তন্যপায়ী প্রাচ্য জীবজন্তুদের প্রব্রজন বিস্তৃত ছিল। উত্তর ভারতের শিবালিক অঞ্চলের ও মধ্য ভারতের নর্মদা অঞ্চলের বহু স্তন্যপায়ী জীবজন্তুর জীবাশ্ম বর্মা-যাভা মুলুক পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।

মাদ্রাসীয় সংস্কৃতির কয়েকটি পাথরের কুড়াল ও কাতান

মাদ্রাজের নিকট আতিরামপাখামে প্রস্তরযুগের একটি আস্তান
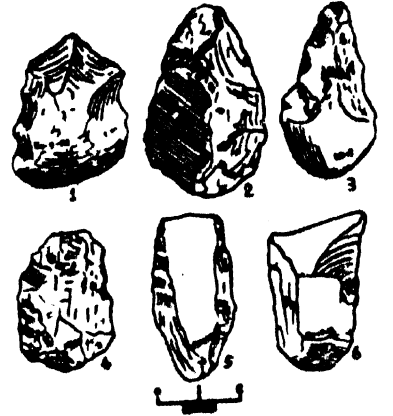
ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত প্রস্তর যুগের কয়েকটি কুড়াল ও কাতান

এর সঙ্গে নানা স্থানে প্রাপ্ত পুরা প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এসিয়াতেও আদিমানবের প্রব্রজন সুদূর-প্রসারী ছিল। প্রস্তরযুগে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সঙ্গে একদিকে যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সংস্কৃতির যোগ-সূত্র ছিল—তেমন অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গেও তার যোগসূত্রের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়—আদিমানবের কুড়াল ও কাতান সংস্কৃতির মাধ্যমে। দাক্ষিণাত্যের মত মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকাতে ও পশ্চিম ইউরোপে এই সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। অনেকের ধারণা, এই সংস্কৃতির আদিভূমি আফ্রিকা এবং আফ্রিকা থেকে এই সংস্কৃতি ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে তুষারযুগের বা পুরা প্রস্তরযুগের মানব সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আদিমানবের কোনও জীবাশ্ম এই মহাদেশে পাওয়া যায়নি। তাই এই সব সংস্কৃতির নির্মাতাদের কিরূপ দৈহিক আকৃতি ছিল তা আমাদের অজানা। অথচ বহু বিজ্ঞানী মনে করেন যে, মধ্য-এসিয়া ও ভারতবর্ষ মানব বিবর্তনের অন্যতম কেন্দ্র। প্লিস্টোসিন্ তুষারযুগের পূর্বযুগে অর্থাৎ মায়োসিন ও প্লায়োসিন যুগে উত্তর ভারতের শিবালিক অঞ্চলে কয়েকটি বন-মানুষের (এপ্) চোয়াল ও দাঁতের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে—এদের দাঁতের গড়ন অনেকটা মানুষের মত। কিন্তু পরবর্তী তুষারযুগে কোনও বন-মানুষ বা আদিমানবের জীবাশ্ম এখানে পাওয়া যায়নি। এ বিষয় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। উত্তর ভারতের শিবালিক অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে নর্মদা অঞ্চলে আদি-মানবের জীবাশ্ম আবিষ্কার করার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এই উন্মুক্ত অঞ্চলগুলি
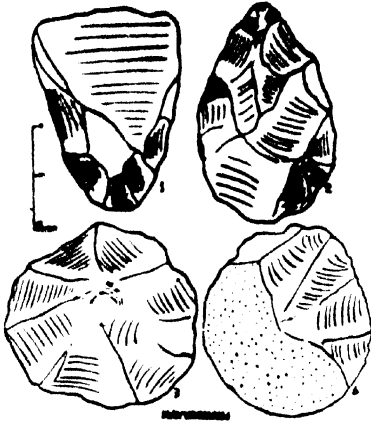
ময়ূরভঞ্জের কুড়াল, কাতান ও উপলখণ্ডের হাতিয়ার

ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের গুহা-গহ্বরগুলিও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকভাবে গুহাতল খনন করলে হয়ত আদিমানবের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হতে পারে—যেমন চীনদেশে পিকিংএর নিকটবর্তী সো-কো-তিয়েন্ গুহাগহ্বর থেকে চীনের আদিমানব সিনানথ্রোপাসের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো কয়েকটি দেশে এরূপ গুহাবাসী (যেমন ইউরোপে নিয়ান্-ডেরথাল্ মানুষ) আদিমানবের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। প্রচণ্ড হিমের তাড়নায় বা প্লাবনের সময় আদিমানব যে গুহা-গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য যে দেশে গুহা নেই, সেখানে এরূপ আশ্রয়েরও সম্ভাবনা নেই।

পুরা প্রস্তরযুগে আদিমানুষ প্রধানত অরণ্য ও জলাশয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে উন্মুক্ত প্রান্তরে, পর্বতের সানুদেশে এবং প্রশস্ত নদী-উপত্যকার বাসিন্দা ছিল। খাদ্যের প্রাচুর্য যেখানে, অর্থাৎ যেখানে শিকারের সম্ভাবনা সেরূপ এলাকার সন্নিকটে সে বসবাস করত। শিকারের বা খাদ্যের সরবরাহের ঘাট্‌তি পড়লে আদি-মানব সেই এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র অভিযান করত। অর্থাৎ গবাদি পশু, বৃষ, হরিণ, শূকর, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি বন্য-প্রাণীদের সে অনুসরণ করত এবং শিকারের সুযোগ-সুবিধা বুঝে সে তার আস্তানা বাঁধত। আস্তানা নির্বাচনে আদিমানবকে আরো একটি বিষয়ের অনুধাবন করতে হ'ত—তার হাতিয়ার নির্মাণের উপযুক্ত কাঁচা মাল, অর্থাৎ উপলখণ্ড ও পাথর। যে এলাকায় প্রচুর উপলখণ্ড ও উপযুক্ত পাথর সহজলভ্য সেখানে আদিমানব তার ঘাঁটি বাধত। ভারতবর্ষে কয়েকটি অঞ্চলে প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের 'কারখানা' আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে কাঁচা মাল সমেত হাতিয়ার নির্মাণের বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

এই কারিগরি সংস্কৃতির সাহায্যেই তুষারযুগের মানুষকে আত্মনির্ভর হতে হয়েছে, ইতর প্রাণীদের মত হতবুদ্ধি ও অসহায় হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বলা বাহুল্য, এই কারিগরি ক্ষমতা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, এ মানুষের একান্ত নিজস্ব—নিজ প্রয়াসে অর্জিত। যুগে যুগে এই জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে এবং উন্নত হয়েছে। এই কারিগরি সংস্কৃতিই মানুষের প্রথম ও আদি সংস্কৃতি, তার প্রথম ও প্রধান আবিষ্কার। যার ফলে অন্য প্রাণীদের থেকে ভিন্ন ও বিশিষ্ট হয়ে মানুষ—মানুষ হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতে নিজেকে স্থায়ী ও সার্থক করেছে। অবশ্য তুষারযুগের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষকে বন্য ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করতে হয়েছে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য দিকে দিকে তাকে বন্য-প্রাণীর মত অনুসন্ধানী হতে হয়েছে। সে যুগে চাষআবাদ, পশুপালন ও গৃহ-নির্মাণের জ্ঞান মানুষের ছিল না—সেরূপ পরিস্থিতিও ছিল না। তাই সুদীর্ঘ এই তুষারযুগে মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছিল বিলম্বিত।

হিমযুগের সর্বশেষ হিমপ্রবাহের বিরতির পর পুনরায় জলবায়ুর অবস্থান্তর ঘটে এবং ক্রমশ বর্তমান আবহের সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন, বর্তমান যুগ হিম-বিরতির আর একটি (চতুর্থ) যুগ এবং সুদূর ভবিষ্যতে আবার হয়ত এক হিমযুগের সূচনা হতে পারে। তুষারযুগের মত যদি পুনরায় প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ শুরু হয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহলে জীবজগতে তার ফল হবে ভয়ংকর। তবে এই দুর্ঘটনা যে আশু ঘটবে, তার কোনও সম্ভাবনা নেই, যদিও কেউ কেউ অনুমান করেন যে, শত-বর্ষের মধ্যে তুষারযুগের সূচনা হতে পারে এবং পৃথিবীর উত্তর অঞ্চল ক্রমশ তুষারাস্তীর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে।
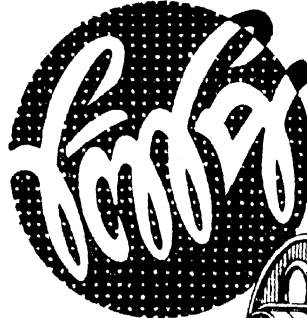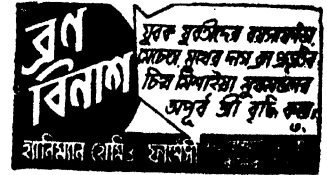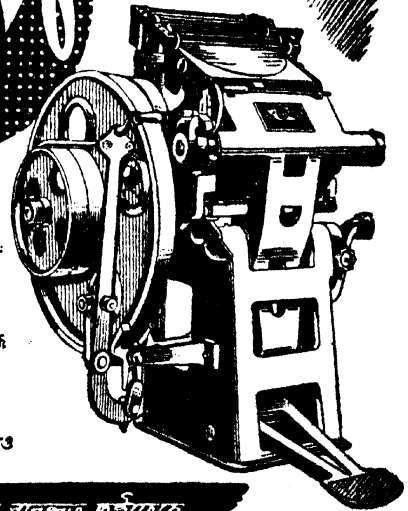
কাশীর ঘাট

স্কেচ ঃ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
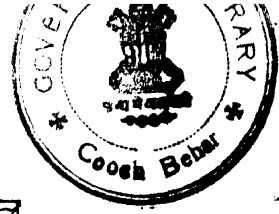
এলার্ম দেবার দরকার হয় না। ঘড়িতে কখনও এলার্ম দেয় না মঞ্জুলা। তার ঠিক ঘুম ভাঙে। শেষ রাত্রে। কিম্বা ভোর হবার ঠিক আগে আগে। তাপস যখন বলে তখন।

মঞ্জুলা উঠে বসে। তাপসের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে। ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করে না ওর। ঘুমোক না আর কিছুক্ষণ। সময় তো আছেই আরও। প্লেন ছাড়বে সকাল সাতটায়। ভোর চারটে বাজতে এখনও বাকি কয়েক মিনিট।

তাপস পাশ ফেরে। বোধহয় ঘুমও ভেঙে যায় তার ঠিক সময়। ঘুমন্ত মুখের শান্ত ভাবটা কোথায় মিলিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে রিস্টওয়াচ তুলে নেয়। লাইট জেবলে ঘড়ি দেখে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

লাফিয়ে খাট থেকে নেমে তাপস বলে, কী যে কাণ্ড তোমার! কত দেরি হয়ে গেল দেখ তো—তুলে দাওনি কেন?

আবার গড়িয়ে পড়ে মঞ্জুলা। হাসে তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে আলো জেবলে বলে, কিছু দেরি হয়নি—গাড়ি তো আসবে সেই দু ঘণ্টা পর—

ড্রাইভারকে আমি আজ সব চেয়ে আগে আমার এখানে আসতে বলেছি, রেডিও-অফিসার আর কো-পাইলটকে পরে তুলবে—

স্বরে ঝাঁজ মিশিয়ে মঞ্জুলা বলে, সব চেয়ে আগে যাবার দরকার কি তোমার? কতক্ষণের জন্যেই বা থাক বাড়িতে?

ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়াতে জড়াতে

তাপস হেসে বলে, কয়েক ঘণ্টা মোটে—আজ তো সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব, মঞ্জুলাকে আদর করে তাপস।

কিন্তু কথা বলবার আর সময় নেই মঞ্জুলার। আর একটু পরেই এয়ার কোম্পানির মোটর এসে দাঁড়াবে দরজায়। একটা তীক্ষ্ন হর্ন বাজবে। তারপরেই কলিং বেল। তাপস দোতলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারকে বলবে, ঠিক হ্যায়।

ভোর-ভোর ঘুমন্ত তাপসকে জাগানো মঞ্জুলার প্রায় বছর খানেকের অভ্যাস। এ বাড়ির আর একটি লোকও জাগে না তখন। বাইরে থেকে কোন মানুষের সাড়া আসে না সহজে। কোথা থেকে ঝিমঝিম করে ট্রেন যায়। তার একটানা বাঁশি বাজে। মোষের গাড়িটা কঁকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দূরে চলে যায়। বড় রাস্তার ওপর শব্দ করে মোটর গাড়ি।

লাল রঙ। সিরসির করে হাওয়া আসে। সেতারের কাঁপনের মতো। আর একটা পাখি ডেকে ওঠে। কেমন অদ্ভুত স্বর তার। পাখিটা উড়ে যায় মঞ্জুলার বাড়ির ওপর দিয়েই।

এদিকে তখন সারা ঘরখানা জেগে উঠেছে। পাখা ঘুরছে বনবন করে। ওটা না হলে তাপসের কিছুতেই চলে না। মঞ্জুলা নিজের চোখে দেখেছে সেই ভোরেও কপাল ঘেমে ওঠে তাপসের। স্টোভে চায়ের জল ফুটছে। টোস্টে মাখন লাগাচ্ছে মঞ্জুলা। অমলেটের ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ শোনা যাবে তারপর।

রুমালটা কই মঞ্জু? তাপস এদিক-ওদিক খোঁজে।

তোমার প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়েছি, ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এসে মঞ্জুলা তপসের প্যাণ্ট শার্ট বেল্ট ব্যাজ সাবধানে বিছানার ওপর রাখে। একেবারে তাপসের পাশে।

তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে যায় মঞ্জুলার, ইস, সেই পুরনো ব্লেডটাই ব্যবহার করেছ আজ? কী বিশ্রী কালো দেখাচ্ছে—

ঠিক আছে, শার্টের কলার ঠিক করতে করতে তাপস বলে, ডাইরি কলম—

যা করছ তাই কর না, টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে মঞ্জুলা বলে, সব ঠিক আছে।

কিন্তু এত খাবার তুমি কর কেন?

ধমকের সুরে মঞ্জুলা তাপসকে বলে, তাড়াহুড়ো করে খাবে না। আস্তে আস্তে ভাল করে সব খেতে হবে—

প্লেটের দিকে তাকিয়ে চোখ টান করে তাপস, এই ভোরে এত খাওয়া সম্ভব? কেন শুধু শুধু এত করতে যাও—

বেশ করি। আবার কখন খাওয়া জুটবে তার ঠিক নেই—কম খেতেই জান শুধু।

কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ। কল বন্ধ থাকলেও বাথরুমে থেমে থেমে টুপ টুপ করে পাতলা জলের ফোঁটা পড়ছে। হাওয়ার ঝাপটায় জানলার হলদে পর্দা উঠছে আর পড়ছে। ছটফট করা নিশানের মতো। রাস্তার মাঝখানে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা কুকুরটা গরুর পায়ের শব্দে জেগে উঠেছে। ভয় পেয়ে ডাকছে।

মঞ্জুলাকে একটা প্লেট হাতে নিয়ে বসতেই হয় তাপসের সঙ্গে। কিছু খাক বা না খাক, খাওয়ার ভান না করলে তাপস খেতে চায় না। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে মঞ্জুলার প্লেটের দিকে। মুখের দিকে। চোখের দিকে। এক মিনিটের জন্য হঠাৎ এক অস্বাভাবিক ক্লান্তি আসে তার। আকাশ বিবর্ণ মনে হয়। দিগন্ত চষে বেড়াতে মন সায় দেয় না। এই ঘরের ওপর, বিছানার ওপর, বালিশের ওপর আর মঞ্জুলার ওপর নিবিড় একটা আকর্ষণ অনুভব করে হঠাৎ।

অমলেটের ওপর ছুরি চালিয়ে তাপস বলে, মেননের মেয়ের জন্মদিন না আজ?

হ্যাঁ, ঠিক কটার সময় তুমি ফিরবে বল তো?

সন্ধ্যের আগেই।

মেননের ওখানে তো রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন। তোমার সঙ্গে একবার মার্কেট হয়ে যাব। তখন কিছু একটা কিনে নেওয়া যাবে না হয়—

তোমারও তো অনেক কেনা-কাটার দরকার?

মঞ্জুলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি ফিরে এস তো আগে—

ঠক করে প্লেটে কাঁটা ঠেকিয়ে তাপস বলে, রাইট।

দেরি করবে না, গলার স্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে মঞ্জুলার, মীটিং-এর ছুতো দেখিয়ে আড্ডা মারবে না কোথাও—এয়ার কোম্পানির মোটরের হর্ন বেজে ওঠে ঠিক তখন। একেবারে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

তাপসের কাপে আরও অনেক চা আছে তখনও। সে উঠতে যাচ্ছিল; কিন্তু মঞ্জুলা উঠতে দেয় না তাকে। ইসারায় কাপটা দেখিয়ে দেয়। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারকে দেখে। মিষ্টি হেসে বলে, আসছে।

দ্রুত হাতে এয়ার কোম্পানির নাম লেখা ছোট ব্যাগটা গুছিয়ে দেয় মঞ্জুলা। একটা প্যাণ্ট। একটা শার্ট। একটা তোয়ালে। গোটা কয়েক রুমাল। আর একটা সিগ্রেটের টিন।

উঠে দাঁড়িয়ে তাপস বলে, ওসবের কোন দরকার নেই। কুচবিহারে যাব আর আসব—

ঘামে ভেজা শার্ট পরে বাড়ি ফিরে আসবে নাকি? কুচবিহার থেকে ফেরবার সময় নিশ্চয়ই জামা বদলাবে।

ঠক করে খিল খোলবার শব্দ হয়। সামনেই সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে। ভাল করে ভোর হয়নি তখনও। ভিজে নীলাভ একটা রঙ পড়েছে ধাপগুলোর ওপর। মূক কান্নার মতো। ওই সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবে তাপস। মোটর গাড়িটা দেখা যায় এখান থেকেই। মঞ্জুলা দেখে।

হোক কয়েক ঘণ্টার জন্যে। তাপসের যাবার সময় হলেই কথা সরে না আর মঞ্জুলার মুখে। একেবারে চুপ করে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধু দেখে তাপসকে। দীর্ঘ দেহটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়। ফিরে ফিরে তাকায় মঞ্জুলার দিকে। চলাটা আশ্চর্যরকম ভাল তাপসের। যেন ইচ্ছে করলেই আকাশটাকে সে একেবারে হাতের কাছে নামিয়ে আনতে পারে। লাফিয়ে মোটরে ওঠে তাপস। হাত নাড়ে। এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পায় মঞ্জুলা। গাড়িটা সরে যায় তার চোখের সামনে থেকে। হাওয়া ওঠে হু হু করে। ভোরের ভিজে রাস্তা। ধুলো ওড়ে না। সামনেই একটা ল্যাম্প পোস্ট। নিষ্প্রভ আলো। বোবা। ঠাণ্ডা। ভোরের ভয়ে দপদপ করে। আর একটু পরেই নিভে যাবে।

আবার ঘরে ফিরে আসে মঞ্জুলা। স্টোভটা ঝিমিয়ে আসে। পর্দা স্থির। বিছানার ওপর ভিজে তোয়ালে। তাপসের শিয়রে

পায়ে ঠেকে। চেয়ারের হাতলে কুঁকড়ে থাওয়া রাতের জামা। এলোমেলো জিনিসের ভিড়। পাখা তখনও ঘুরছে। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগলেও পাখা বন্ধ করে না মঞ্জুলা। ক্লান্ত। অবসন্ন। খাটের ওপর গড়ায়। ঘুম আর আসে না চোখে। জানলা দিয়ে আকাশ দেখে। অনেকক্ষণ।

আলোটা যে নেভায়নি সেকথা খেয়াল থাকে না মঞ্জুলার। রোদ উঠে গেছে। ভরা সকাল। রাস্তায় গরুর খুরের শব্দ। দরজার তলা দিয়ে চাকর খবরের কাগজটা ঠেলে দিয়েছে ভেতরে। আর কোন কাজ নেই মঞ্জুলার। কোন দায় নেই। বাড়িতে অনেক লোক। তারই ঘরে এত সকালে চাকরটা কড়া নাড়ছে কেন কে জানে। ঈষৎ শিথিল ভঙ্গিতে দরজাটা খুলে দেয় মঞ্জুলা।

যে দরজা দিয়ে তাপস বেরিয়ে গেছে সে-দরজা নয়। আরও একটা দরজা আছে তার ঘরে। ভেতরে যাবার। সেখানে যদিও মঞ্জুলার এখন কিছু করবার নেই। আকর্ষণও বোধহয় নেই কোন। তাই ক্লান্তি আসে খিল খুলতে। আঙুলটাতেও টান পড়ে।

চাকর নয়, মঞ্জুলার বড় জা অরুণা। চোখেমুখে উদ্বেগ। শরীর কাঁপছে। এলোমেলো চুল। শক্ত করে মঞ্জুলার হাত চেপে ধরলেন। ঘরের মধ্যেও উঁকি দিলেন একবার। বুঝতে পারলেন তাপস বেরিয়ে গেছে। আরও ভেঙে পড়লেন।

ঠাকুরপো নেই?

সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসবে—

এ প্রশ্ন নতুন নয়। অরুণাকে দেখে চমকে ওঠে না মঞ্জুলা। তার রকম দেখে ভয়ও পায় না। অনেকবার ঘটেছে এমন মঞ্জুলা এ বাড়িতে আসবার পর। আস্তে আস্তে মঞ্জুলা নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়।

একবার আসবে এ ঘরে? উনি কেমন করছেন—

সকালের স্বাদটা তেতো-তেতো লাগে মঞ্জুলার। কিছুই নয়—একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেন অরুণা। বয়স হয়েছে, কথায় কথায় এত ঘাবড়ালে চলে এখন। অন্য লোককে সকাল থেকে বিরক্ত করবার কোন মানে হয় না। সে চোখ রগড়ায়। দরজায় ঠেস দিয়ে ঘোমটা ঠিক করে। আস্তে আস্তে চলে অরুণার পিছনে তার ভাসুর যেখানে শুয়ে আছেন সেখানে।

এই ফ্ল্যাটেরই আর একটা ঘর। তাপসকে ছেড়ে দিতে হয়েছে তার দাদা আর বৌদির জন্যে। শুধু ওরা দুজন নয়। দুটি ছেলে বড় বড় আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে। রমানাথ কাজ করতেন একটা। সাধারণ ব্যাঙ্কে। দু-এক বছর হল মেজাজ দেখিয়ে চাকরি খুইয়েছেন। রক্তের চাপ একটু বেশি। আজকাল দিনের মধ্যে অনেকবার অবসন্ন হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে দেখলে মনে হয় আর চোখ খুলবেন না—আর জ্ঞান হবে না। কিন্তু আবার ঠিক হয়ে যায়। চোখ খোলেন। কথাও বলেন। সুবিধা-অসুবিধার কথা তাপসকে জানিয়ে তারই সংসারে কাটান দিনের পর দিন। বিপুল ভারের মতো। মেরুদণ্ডে ব্যথা ধরে যায় মঞ্জুলার। তাপসেরও। কিন্তু ওপক্ষ থেকে ভার লাঘব করবার উদ্যম নেই কোন। যেন এটাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। এ নিয়মের পরিবর্তন অসম্ভব।

রমানাথের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মঞ্জুলা। নিশ্বাস আটকে আটকে যায়। পাখা নেই। গুমোট গরম। শরীরটা ঘেমে ওঠে। আলোও নেই তেমন। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে লাগে। খাট নেই ঘরে। চাকরি যাবার পর দারুণ অভাবের সময় সেটা নাকি রমানাথ নিজেই বিক্রি করে দিয়েছেন খুব অল্প টাকায়।

ছেঁড়া একটা গেঞ্জি গায়ে মাটিতে শুয়ে দরদর করে ঘামছেন রমানাথ। ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন ধুতি। চোখ বোজা। ভীষণ ভাবে হাঁপাচ্ছেন। বড় ছেলে বুলটু হাত-পাখা দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করছে। আর এক ছেলের মন নেই কোনদিকে। বই খুলে একদিকে পড়ছে। মেয়ে দুটো কান্নাকাটি করছে হালুয়ার ভাগ নিয়ে।

মঞ্জুলাকে নিয়ে অরুণা বসে পড়েন মাটিতে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠেন, ওগো—

আস্তে মঞ্জুলা বলে, আঃ, ডাকবেন না—

কিন্তু একটা কিছু তো করতে হয় ভাই—

কি যে করি! ঠাকুরপো নেই বাড়িতে—

কি হবে—নৈরাশ্যে একেবারে থিতিয়ে যায় না কিন্তু এখন অরুণার গলার স্বর। বরং মনে মনে ভরসা পান তিনি। মঞ্জুলা এসেছে। নিজের চোখে সব অবস্থা দেখেছে। একটা লোককে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিতে পারে নাকি কেউ।

মঞ্জুলা বলে, বুলটুকে পাঠিয়ে দিন—একটা ডাক্তার ডেকে আনুক—

কিন্তু তাপস যে নেই—

মঞ্জুলা উঠে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা স্বরে বলে, আমি তো আছি। বুলটু একটু এস তো—

আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বুলটু উঠে দাঁড়ায়। সে বোঝে কেন তাকে ডাকেন কাকীমা। আলমারী খুলে টাকা দেবেন। বুলটু ছুটে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসবে। তারপর সেই টাকা দেওয়া হবে ডাক্তারকে। একটু বেশি করেই বরাবর টাকা দেন তাকে কাকীমা। ছোট কাগজে ডাক্তারের লেখা ওষুধের দামটাও হয়ে যায়।

হিমলাগা কঠিন পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মঞ্জুলার দেহ। মনটা বিষিয়ে যায়। ড্রয়ার টানে কিন্তু কানে দামী কাঠের শব্দটাও বেসুরো লাগে। একদিন

নয়—দু-দিন নয়—সারাজীবন ধরে শুধু পরের জন্যে খরচ করে যেতে হবে। এর শেষ নেই। নিজেদের জন্যে শেষ অবধি কোন সঞ্চয় থাকবে কি-না কে জানে।

ঝকঝকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলটুর হাতে দিয়ে মঞ্জুলা বলে এটা নাও।

হাত বাড়িয়ে নোটটা নেয় বলটু। কথা বলে না। ছুটে যায় তার বাবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে। ফিরেও তাকায় না তার কাকীমার দিকে। যদি টাকা কম পড়ে যায় তাহলে আবার ফিরে আসবে—এতটুকু সঙ্কোচ হবে না। ভাবটা যেন মঞ্জুলার যখন আছে তখন সে দেবেই বা না কেন।

একটু জোরে শব্দ করে খিল তুলে ওদিকের দরজাটা বন্ধ করে দেয় মঞ্জুলা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কঠিন চেহারাটা দেখে চুল ঠিক করে নেয়। তার চাকর কাজ করছে আপন মনে। তাপসের ছেড়ে যাওয়া কাপড় গুছিয়ে রাখছে। স্টোভ সরিয়ে রাখছে। চায়ের বাসন ধুতে নিয়ে যাবে এবার।

অনেক আলো। অনেক বাতাস। কিন্তু মাথা ধরে যায় মঞ্জুলার। কপাল ঘেমে ওঠে। এই একটা ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। সব আছে অথচ কিছুই নেই। এত সুন্দর ফ্ল্যাট কিন্তু মনের মতো করে সাজাতে গেলেই বাধা। খেয়াল খুশি মতো মঞ্জুলা কিছুই করতে পারে না।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম এত তলিয়ে ভেবে দেখেনি সে—প্রয়োজনও বোধ করেনি। আকাশে-আকাশে উড়ে বেড়াবে তাপস। যখন তখন। শুধু দিনে নয়—রাতেও। তখন মঞ্জুলা একা থাকবে কেমন করে। আর তো কোন মানুষ নেই এ বাড়িতে।

মনে মনে প্রস্তুত হয়েই তাপস বলেছিল মঞ্জুলাকে, দাদাকে এবার একটু কায়দা করে একটা ব্যবস্থা করবার কথা বলতে হয়—

কিসের ব্যবস্থা?

আলাদা থাকবার। আরও যদি দু-একটা ঘর থাকত এই ফ্ল্যাটে তাহলে না হয় ওরা থাকতে পারত। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে এখন—আর তা ছাড়া একটা খাবার ঘরেরও তো দরকার—

না না, তাপসের কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে মঞ্জুলা বলে উঠেছিল, তা হয় না। ওঁরা থাকুন যেমন আছেন তেমন। এই বয়সে দাদা কোথায় যাবেন?

তা কি আমার ভাববার কথা?

এতদিন তো ভেবেছ—

মঞ্জুলার মহত্বের আভাস পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল তাপসের মুখ, এতদিন আমার নিজের কথাও তো ভাববার দরকার হয়নি। কিন্তু এখন ভাবনার রকমটা তো আর আগের মতো হলে চলবে না। সব চেয়ে আগে তোমার কথা ভাবতে হবে।

তা বলে ওদের আলাদা করে দেবে নাকি? তোমার আপন দাদা-বৌদি না? লোকে বলবে কি? মঞ্জুলা লোকের কথাটা নিজেই বলে দিয়েছিল, যেন আমি এসে সকলকে তাড়িয়েছি—ওসব চলবে না বলে দিলাম।

বিশেষ কিছু মনে হয়নি প্রথমে মঞ্জুলার। ছেলেদের চেঁচামেচি। মেয়েদের কান্না। ভাসুরের সস্নেহ দৃষ্টি। জায়ের সমবেদনা। ভরা সংসার। কোন দায় নেই। মঞ্জুলার এখানে নিশ্চিত আরাম।

হালকা দেহটা খাটে এলিয়ে দিয়ে সে মাথার কাছের জানলা খুলে দেবে। তখন শুধু আকাশটা চোখে পড়বে তার। সাদা পাতলা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ঝলমল করছে চিকন রোদের আভায়। পাখা সোজা করে চিল ভাসছে। একটা ছোট কালো পাখি জোরে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে চলে যাচ্ছে। সব ছাড়িয়ে বিরাট বিদেশী পাখির মতো গুঞ্জন তুলে সাঁতার কাটছে একটা আকাশ যান। মঞ্জুলা দেখে। দেখে দেখে আশ মেটে না। জানলা দিয়ে রোদ আসে। বিছানা গরম হয়ে যায়। যাক। জানলা বন্ধ করতে হাত ওঠে না তার।

তাপস আকাশে উড়ে বেড়ায়—মঞ্জুলা যায় না বটে তার সঙ্গে কিন্তু মনে মনে মাটির সব স্পর্শ এড়িয়ে সেও যেন হঠাৎ অনেক ওপরে উঠে যেতে চায়—প্রপেলারের দ্রুত ঘূর্ণনে গতির ঝাপটায় আকাশে উঠে যাওয়া প্লেনের মতো। বেরিয়ে পড়তে চায় এখানে-ওখানে। ঘর সাজাবার টুকিটাকি জিনিস কিনতে কিম্বা হাসপাতালে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর স্ত্রীকে দেখতে। শাড়ির দোকানে। কিম্বা কাঠের ফার্নিচারের নতুন শো-রুমে। একা একাই। কিন্তু তা হয় না। ঘর কম। লোক অনেক।

মঞ্জুলা এক সময় তাপসকে বলে, ঘরটা আর একটু বড় হলে বেশ হত না?

একটু উঁচু শোনায় তাপসের গলার স্বর, ঘর কি আর নেই এ বাড়িতে?

মঞ্জুলা আস্তে আস্তে বলে, লোকও তো আছে।

মঞ্জুলা আজকাল বোঝে ওঁদের জন্যে অসুবিধা হয় অনেক। শুধু জায়গার জন্যে নয়, দুই পরিবারের মাঝখানে যেন প্রভেদের একটা পুরু রেখা টানা আছে। এ বাড়িতে যখন তাপস কিম্বা মঞ্জুলার বন্ধুবান্ধব আসে আর যদি হঠাৎ ওঘর থেকে কেউ ছিটকে এসে পড়ে এদের মাঝখানে তখন প্রভেদের সেই রেখাটা সাংঘাতিক রকম পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে দুজনের কাছে। যদিও তাপসের মুখে কথা সরে না তবুও মঞ্জুলার সব বুঝে নিতে দেরি হয় না এক মিনিটও।

বসবার ঘরে চলে আসতে একেবারেই দেরি উঠেই বাঁ দিকের প্রথম ঘর। কলিংবেল আছে ওই ঘরের দরজার গায়েই। ছোট একটা কালো কাঠের ফলকে তাপসের নাম লেখা। এয়ার কোম্পানির বড় বড় অফিসার, তাপসের দেশী-বিদেশী বন্ধুবান্ধব কিম্বা মঞ্জুলার কেউ এলে ওই ঘণ্টাটাই বাজায়। রিণরিণ একটা মিষ্টি আওয়াজ ছন্দের তরঙ্গ তোলে। তখন মঞ্জুলার সেই ছোকরা চাকর—পরনে সাদা শার্ট আর পায়জামা—যেখানেই থাকুক—ছুটে এসে দরজা খুলে দেয়। পাখা খোলে। হাসি মুখে অতিথিকে বসতে বলে সব চেয়ে আগে। তাপস না থাকলে মঞ্জুলাকে এসে খবর দেয়।

তাপস থাকুক বা না থাকুক, খবর পেয়ে বসবার ঘরে চলে আসতে একেবারেই দেরি হয় না মঞ্জুলার। সন্ধ্যেবেলায় একটু বেশি-মাত্রায় প্রসাধন করা তার কুমারী জীবনের অভ্যাস। বিয়ের পর সে-অভ্যাস আরও আয়ত্ত করে নিয়েছে মঞ্জুলা। শুধু তার নিজের সাধ মেটাবার জন্যে নয়, তাপসের পদমর্যাদার কথা ভেবেও।

কয়েকদিন আগেকার কথা। কলিংবেল বেজেছিল একটু আগে। এ ঘরের দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখবার অবসর পায়নি মঞ্জুলা। সোনালী পাড়ের হালকা সাদা শাড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়ে জড়াচ্ছিল। পিটপিট করে বৃষ্টি পড়ছে

হয়েছে। যেন ফোঁটা ফোঁটা বিরক্তি জমা হচ্ছে জানলার শিকগুলোয়—মঞ্জুলার মনেও। বাইরে যাওয়া কঠিন আজ। একা একা সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে থাকতে ভালও লাগে না। অরুণা এসে আবোল-তাবোল বকেন। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মঞ্জুলার বেশভূষার দিকে। জিনিসগুলো টানাটানি করে তছনছ করে দেয় ছোট মেয়ে দুটো। বারণ করেন না ওদের মা। বোধহয় ছেলেবেলা থেকে ওদের মনেও এই বোধটা জন্মে দিতে চান যে মঞ্জুলার সাজান ঘরখানাকে লন্ডভন্ড করে দেবার তাদের একটা জন্মগত অধিকার আছে। ওরা চিৎকার করে। আর এক সুরে অরুণা তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে যান। কি নেই, চেয়ে চেয়ে ছেলেমেয়েরা কি পায় না আর তাঁর স্বামীর একটানা অভাব—করাতের মতো কেমন করে তাকে চিরে-চিরে দিচ্ছে।

ভর সন্ধ্যায় এসব কথা শুনতে মঞ্জুলার ভাল লাগে না। রেডিওটা জোরে করে দেয়। যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরেজি বক্তৃতা শোনায় তার কতই আগ্রহ। মেয়ে দুটো জোর আওয়াজ শুনে রেডিওর কাছে ছুটে চলে আসে। আন্দাজে চাবি ঘুরিয়ে আরও জোরে আওয়াজ বের করে। মাথাটা ধরে যায় মঞ্জুলার। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে রেডিওর কাছে। হঠাৎ একেবারেই বন্ধ করে দেয় যন্ত্রটা। স্বরে ঈষৎ বিরক্তি মিশিয়ে মেয়েদের বলে, অন্য কোথাও গিয়ে খেলা করতে।

আস্তে বললেও অরুণা শুনতে পান কথাটা। মুখে একটা ছায়া পড়ে তাঁর। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কোথায় আর যাবে বল? ওই তো ছোট্ট একখানি ঘর। উনি শুয়ে থাকেন। ছেলে দুটো পড়ে। ওদেরও তো একটু ছুটোছুটি করে খেলা করতে সাধ যায়, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তিনি একটা ছোট নিশ্বাস ফেলেন, বসবার ঘরে যাওয়া আবার ঠাকুরপো পছন্দ করে না। চলরে—যেমন কপাল করেছিস—

যেন সব দায় মঞ্জুলার। ব্যাপারটা সহজ করে দেবার জন্যে তবু সে তাড়াতাড়ি বলে, আহা, ওরা খেলুক না এ ঘরে। আমি না হয় বাইরের ঘরে গিয়ে বসছি—ওই তো কলিংবেল বাজছে—কেউ না কেউ এসেছে নিশ্চয়ই—

ছোকরা চাকর মঞ্জুলার ভাসুরের ঘরের মধ্যে দিয়ে ছুটে যায়। ঘুরে গিয়ে ভেতর থেকে বসবার ঘরের দরজা খুলবে। যে-ই আসুক, মঞ্জুলাকে যেতেই হবে সে-ঘরে একবার। হয়তো খবর নিয়ে এসেছে কেউ যে, তাপসের ফিরতে আরও দু একদিন দেরি হবে কিংবা বাড়ি ফিরে আসবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। বাড়িতে খাবার ঠিক থাকে যেন তার।

চাকর ছুটে এসে এক সুরে বলে, সেই সাহেব আর মেমসাহেব।

কোন মেমসাহেব?

সেই যে আমাকে দু টাকা বখশিস দিয়েছিলেন হেঁ হেঁ—তেনারা এসেছেন—

চঞ্চল হয়ে ওঠে মঞ্জুলা। হলুদ-কালো স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে নেয়। সান্যাল আর তার স্ত্রী এসেছে। মাদ্রাজী স্ত্রী সান্যালের। বছর দু-এক আগে বিয়ে হয়েছে। কি একটা উপলক্ষে সান্যাল মাদ্রাজে গিয়েছিল। সেখানেই নাকি ওদের আলাপ। হয়তো এসেছে নেমন্তন্ন করতে। বাড়িতে প্রায়ই ভোজের ব্যাপার লেগে থাকে তাদের। মাথাটা ঠান্ডা হয়ে আসে মঞ্জুলার। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। টিপটিপ বর্ষণের বিরক্তিও মন থেকে মুছে যায়। প্রজাপতির মতো হালকা পাখায় ভর করে যেন সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সামনেই। যেখানকার হাওয়া একেবারেই অন্যরকম। অনুযোগ নেই। অভিযোগ নেই। অভাব নেই। প্রয়োজনের পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিকর বিবৃতি নেই। এ ঘরে আসবার আগ্রহে চেহারাটা একেবারেই অন্যরকম দেখায় মঞ্জুলার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ায়, কাল ফিরেছি আসাম থেকে। তাপস কই? আপনাদের খবর নিতে এলাম।

বসুন বসুন, মঞ্জুলা মিসেস সান্যালের দিকে তাকিয়ে হাসে, কেমন আছেন? উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে, উনি ফিরবেন এ সপ্তাহের শেষে। মাদ্রাজে গেছেন কিনা—নিজেই জোরে হেসে ওঠে মঞ্জুলা। রসিকতার প্রচ্ছন্ন সুর থাকে তার কথায়। যেন মাদ্রাজ জায়গাটা এমন যে, সেখান থেকে সহজে ফেরা যায় না। সান্যালের স্ত্রী পদ্মা বেশ বাঙলা শিখে গেছে এর মধ্যে। মঞ্জুলার রসিকতার অর্থ বুঝতে দেরি হয় না তার।

পকেট থেকে কেস বের করে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে সান্যাল বলে, যখনই কলকাতায় আসি তাপসটার সঙ্গে দেখা হয় না, ছাইদানে কাঠি ফেলে দেয় সান্যাল, কিন্তু আপনাদের দুজনকে শনিবার সন্ধ্যেবেলা বিশেষভাবে দরকার ছিল যে—

ভাঙা ভাঙা বাঙলায় পদ্মা বলে, আপনাকে যেতেই হবে—

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় সান্যাল। ওদের বিয়ের দু'বছর পূর্ণ

হবে সেদিন। যদি তাপস ফিরে আসে তো ভালই, কিন্তু সে না ফিরলেও মঞ্জুলাকে যেতেই হবে সেদিন। পদ্মাও সে কথাটা নানাভাবে তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

যাবে বৈকি—নিশ্চয়ই যাবে মঞ্জুলা। এমন করে বার বার অনুরোধ জানাবার কোন দরকার নেই ওদের। কে চায় দুর্ভাগা আত্মীয়দের সংগে নীরস দিন কাটাতে। তাপস না থাকলে অসুবিধা নানাদিক থেকে আরও অনেক বাড়ে তার। ওদিকের দরজায় খিল তুলে রাখা যায় না বেশিক্ষণ। জোরে জোরে ধাক্কা মারেন অরুণা। কোন তরকারীটা মঞ্জুলার ভাল লাগে জানতে চান—কি মাছ আনাবেন সেকথাও জিজ্ঞেস

বেশিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠে মঞ্জুলা, অনেক ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই যাব।

সান্যাল জিজ্ঞেস করে, যদি তাপস না ফেরে, তাহলে তো যেতে বেশ অসুবিধা হবে আপনার—গাড়ি পাঠাব?

না না মঞ্জুলা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আমি নিজেই যেতে পারব ঠিক—

কথা শেষ হয় না মঞ্জুলার। চমকে ওঠে। ভয় পায়। যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা সামনে দেখেছে। বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ। এই ঘরটা দুলছে—ঘুরছে। নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না মঞ্জুলা। শরীরটা কাদায় ধসে পড়ছে। কাদার একটা তালই যেন তার মুখে মাখিয়ে দিলেন ভাসুর।

রমানাথ এসে ঢোকেন ঘরে

করেন। একথাটা বোঝবার মতো বুদ্ধি নেই তাঁর যে রান্নাঘরের মেঝেতে বসে এক-সংগে খাওয়ার এতটুকু রুচি হয় না তার। তাই যা ইচ্ছে রান্না করুন না তিনি—নিজেদের খুশিমতো। মঞ্জুলার টাকা বের করে দেবার কথা—সে তাই দেবে। সংসারের আর সব ভার অরুণার ওপর।

তাপস যখন থাকে, তখন এত অসুবিধা হয় না মঞ্জুলার। প্রায়ই বাইরে ঘুরে ঘুরে খাওয়াদাওয়া সারে তারা—বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে, হোটেলে কিম্বা রেস্তোরাঁয়। আর বাড়িতে থাকলে ঘরেই খাবার আয়োজন করে মঞ্জুলা। ছোট টেবিলটা টেনে দুপাশে দুটো কাঠের চেয়ার রাখে। শুধু তখনই নিজে ঘন ঘন রান্নাঘরে যায়।

সান্যাল আর পদ্মার কথায় তাই একটু

পদ্মা আর সান্যাল বসে থাকতে থাকতেই রমানাথ এসে ঢোকেন ঘরে। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি। কাঁধের কাছে বিশ্রীভাবে ছিঁড়েছে। ছেঁড়াটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছাতা নেই। বৃষ্টিতে ভিজেছেন। কাশছেন খক খক করে। ছোট ছেলে মণ্টুও রয়েছে সংগে। গায়ে আধ-ময়লা সাদা শার্ট। ছেঁড়া চটিতে কাদা লেগেছে। মাথা নিচু করে আছে।

ওদের সকলের দিকে খুশি মুখে তাকিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়েন রমানাথ। আগ্রহে হাতটা একটু বেশিই লম্বা করেন বোধ হয়। মঞ্জুলার দিকে একটা খবরের কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এই দেখ বউমা, মণ্টু ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে—তাপু শুনলে কত খুশি হবে—

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নেয় বটে মঞ্জুলা, কিন্তু কথা জোগায় না তার মুখে। তাকাতে পারে না পদ্মা আর সান্যালের দিকে। ওরা একটু আগে উঠে গেলেই সবচেয়ে ভাল হ'ত। দুঃস্থ ভাসুরের এই দীন চেহারাটা শুধু শুধু কেন দেখতে হল তাদের।

মণ্টুর পাশের খবর শুনে তাপস খুশি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ওদের এই ঘরে দেখে একটুও খুশি হতে পারে না মঞ্জুলা। পদ্মা আর সান্যালের সংগে আলাপ করিয়ে দিতে পারে না—চায়ও না। মণ্টু ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে সকলকে।

হঠাৎ নিজেকে যেন খুঁজে পায় মঞ্জুলা। একটা কিছু না বললেই নয়, তাই প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভেবে ভেবে থেমে থেমে বলে, বাঃ খুব ভাল ছেলে। জানেন, একেবারে নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে পাশ করেছে—এসব সে বলে বটে, কিন্তু কথাগুলো এমন অদ্ভুত বেসুরো শোনায় মঞ্জুলার নিজেরই কানে যে, তার পরে মনে হয় চুপ করে বসে থাকলেই ভাল হ'ত।

রমানাথ আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মাথার ঘোমটা টানবার ভাণ করে সম্পর্কের কথা ভুলে মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আগে দিদিকে খবরটা দিয়ে আসুন—উনি ব্যস্ত হয়ে বসে আছেন—

ঠিক বলেছ ছোট বৌ—ঠিক বলেছ—মণ্টুর হাত ধরে চটির শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যান রমানাথ। আর এ ঘরে বসে সে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। তবু মঞ্জুলা নিজের থেকেই যেন সাফাই গায়, বড় গরিব ছেলেটি। আমাদের এখানে থেকেই পাশ করেছে, হেসে ওঠে সে; অল্প-বয়স কিনা তাই ভেবে পাচ্ছে না কি করবে—

কিন্তু এইভাবে বার বার সাফাই গাওয়া যায় না। এক বাড়িতে বাস করে বেশিদিন ওই দীন শুষ্ক মানুষগুলোর পরিচয় লুকিয়ে রাখা যায় না। জীবনের রঙে কালি লাগে। চলতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। হাসি আসে না। মুখ যেন বিকৃত হয়ে থাকে মঞ্জুলার। ওরা যেন অভাবের প্রতিমূর্তি। শুধু নিজেদের নয় মঞ্জুলাকেও শেষ করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে একটু একটু করে। তাপসকে গলা টিপে ঠেলে রাখছে একটা অন্ধকার কূপের মধ্যে। সব থাকতেও যেন কিছু নেই মঞ্জুলার। থেকে থেকে তার নিজের অভাব-বোধটাই সবচেয়ে বেশি প্রবল হয়ে ওঠে।

এই বাড়িতে বসে সতর্ক হয়ে টিপে টিপে চলতে মঞ্জুলার আর ভাল লাগে না। কেবলই দাবী—অমানুষের মতো—একটির

পর একটি। যেন শেষ নেই। চাপা বিরক্তি প্রকট হয়ে ওঠে।

আর পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলার নিজেকেই আজকাল সবচেয়ে দীন বলে মনে হয়। সে দেখে সান্যাল আর পদ্মাকে, চৌধুরী আর রমাকে, মেনন আর ললিতাকে। ঝকঝকে ফ্ল্যাট। ছিম-ছাম সাজানো সংসার। মোটরগাড়ি। ওদের আত্মীয়রা যখন আসে একই সংগে থেতে তখন তাদের নিয়ে লজ্জায় পড়তে হয় না কাউকে মঞ্জুলার মতো—মাথা উঁচু করেই ওরা পরিচয় দেয় তাদের।

আর মঞ্জুলা? একটা খাবার ঘর নেই বাড়িতে—একটা দেখাবার মতো লোক নেই। তাই কাউকে খেতে বললে বাইরে ব্যবস্থা করতে হয়। খরচেরও সীমা থাকে না। আর এই বাড়িতে বসে দিনেরবেলা ভাল করে কথাও বলা যায় না তাপসের সংগে।

একটা ব্যবস্থা মনে মনে করে ফেলে মঞ্জুলা। বসবার ঘরটা বেশ বড়। সেখানে কিছু অংশ আলাদা করে খাবার জায়গা করবে। আজকাল তো অনেকেই করে থাকে অমন। খাবার একটা টেবিলও এর মধ্যে দোকানে গিয়ে একদিন দেখে আসে মঞ্জুলা।

তাপসকে বলে এক সময়, দেড়শো টাকা বেশি খরচ করব আমি এ মাসে—একটা সুন্দর ডিনার টেবিল দেখে এসেছি।

এ মাসে? একটু থিতিয়ে যায় তাপসের গলার স্বর, দাদাকে দিতে হবে যে টাকাটা—মণ্টুর বই কেনা আর কলেজে ভর্তি হবার খরচ—

তাই দাও, একটা ধাক্কা খায় যেন মঞ্জুলা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় তাপসের দিকে। আর কোন কথা বলে না।

তাপস নিজেই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে তখন। আর পারা যায় না এমন করে। আর চালান যায় না। ওদের এবার বলতে হবে অন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করবার। তাপস না হয় কিছু কিছু খরচ দেবে মাসে মাসে। সব দিক বিবেচনা করে ওদের সংগে এক বাড়িতে থাকা এখন আর শোভন নয় কোনমতেই।

তাপসের গলা পেলেই অরুণা আসেন একবার এ ঘরে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েন। ধোপার খরচের হিসেবটা কথায় কথায় জানিয়ে দেন মঞ্জুলাকে। বলেন, ধোপা অপেক্ষা করছে বাইরে—টাকাটা এখন চুকিয়ে দিলেই ভাল হয়।

আসবে—একজনের পর আর একজন। তাপস যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ। যেন মঞ্জুলার হাত-টান। সে বঞ্চিত করতে চায় ওদের সকলকে। খাতা কেনবার কথাটাও মণ্টু মঞ্জুলাকে জানায় তাপসের সামনেই। ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে রমানাথ বোধ হয় ইচ্ছে করেই ঘোরাঘুরি করেন। চোখে পড়ুক তাপসের। সে বলুক কিছু। একটা ব্যবস্থা করে দিক।

আর মঞ্জুলা গুটিয়ে নিক নিজের প্রয়োজন। জগৎটা দেখুক ওদের মতো ছোট করেই। ওদের মতো কাটাক দিন। ওদেরই জন্যে প্রত্যেকটি পয়সা ব্যয় করে। একটা সৃষ্টিছাড়া নিয়ম। তা ভাঙবার সাধ্য নেই মঞ্জুলার।

তাপসের ফেরবার সময় হল। হাওয়া দিয়েছে। বিকেল গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই। শক্ত হাতে মঞ্জুলা খিল তুলে দেয় দরজার। জানলাটা ভাল করে খুলে দেয়। তাপস আসবার সংগে সংগে বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রথমে নিউমার্কেটে তারপর আলিপুরে—মেননের বাড়িতে।

এ বাড়ির বাকী মানুষগুলোর কথা এখন আর মনে থাকে না মঞ্জুলার। নানা সরঞ্জাম নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সে প্রসাধন করে অনেকক্ষণ। কৃত্রিম দু-একটা আঁচড়ে তার রূপটাই যেন পাল্টে যায়। আয়নায় নিজেকে বার বার দেখে মঞ্জুলা। সাধ মেটে না। চোখের ভুরুতে আবার তুলি টানে।

আলমারী খুলে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিশাহারা ভাব। কোনটা পরবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। একটু পরে আলমারীর পাল্লাটা ভেজিয়ে দেয় আস্তে। এখন থাক। তাপস এলে তার পছন্দমতো একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে পড়লেই চলবে এখন।

দুপুরে ভাল ঘুম হয় নি আজ। দিনের-বেলা একটু না ঘুমিয়ে নিলে ক্লান্তি আসে মঞ্জুলার—চেহারা ম্লান দেখায়। পাখাটা জোরে চালিয়ে সামনের ইজিচেয়ারটায় সে গা এলিয়ে দেয়। স্টোভ রয়েছে হাতের কাছেই। চায়ের সরঞ্জামও সাজানো রয়েছে। ফিরেই চা খেতে চাইবে তাপস।

নিশ্চিন্ত হয়ে বসেও থাকতে পারে না মঞ্জুলা। দরজার ওধারে হুড়োহুড়ি করছে বাচ্চারা। অরুণার ঝাঁজালো গলার স্বরে বিরক্তি আসে। একটা ঘরেই তো থাকে সব মানুষ ক'টা—অতো চিৎকার করে কথা বলবার কি দরকার। দৈবদুর্বিপাকে অবস্থা ভেঙে পড়লে শালীনতা জ্ঞানও চলে যায় নাকি মানুষের।

মঞ্জুলা উঠে বসে। ছটফট করে। এ বাড়িতে থেকে আর সময় নষ্ট করতে চায় না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। অধীর হয়ে পড়ে। তাপসের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে কান পেতে থাকে।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনে মঞ্জুলা চমকে ওঠে। রমানাথের অস্পষ্ট গোঙানি, অরুণার তীক্ষ্ম ভয়ার্ত চিৎকার—মঞ্জুলার দরজা যেন অনেক হাতের প্রবল ধাক্কায় ভেঙে পড়তে চায়।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে যায় মঞ্জুলার। ইচ্ছে করেই সাড়া দেয় না অনেকক্ষণ। দরজা খুললেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে মানুষ-গুলো—হয়তো তুচ্ছ একটা ঘটনার বিবরণ দেবে বিশদভাবে। বুল্টুর জ্বর হয়েছে কিম্বা মণ্টুর পা ভেঙেছে, না হয় পড়ে গিয়ে খুকির কপাল ফেটেছে—তাছাড়া মুমূর্ষু ভাসুর তো সবচেয়ে ওপরে আছেনই।

ছোট বৌ—ও ছোট বৌ—ভাঙা ভাঙা ভেজা গলা রমানাথের। স্বরটা শোনাচ্ছে আর্তনাদের মতো। নিজে তিনি কখনও ডাকেন না এমন করে।

দ্রুত হাতে খিল খুলে দেয় মঞ্জুলা। কেউ কোন কথা বলে না। মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। হাঁ হাঁ করে কাঁদেন রমানাথ।

অরুণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন মঞ্জুলাকে। আঁচল দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরেন মাঝে মাঝে। মঞ্জুলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন নীরব সান্ত্বনার মতো। মাথা নিচু করে বুল্টু আলো জেলে দেয়। চোখের জল মুছতে মুছতে মণ্টু অন্য দরজার খিল খুলে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে কথা বলতে বলতে সাবধানে কারা যেন ওপরে উঠে আসছে। মঞ্জুলা তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। কিছু বুঝতে পারে না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাপস ফিরে আসছে মনে করে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওরা কারা? ওটা কি? ওরা অমন ধরাধরি করে কি নিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে! দাঁতে দাঁত লেগে যায় মঞ্জুলার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চায়। সাদা চাদরে ঢাকা স্ট্রেচারের ওপর তাপসের নিস্পন্দ দেহ। বিকৃত দগ্ধ মুখ। ভয়ঙ্কর।

অন্ধকার—একটানা মূক ভয়াবহ অন্ধকার। পৃথিবীটা দুলছে। কেউ নেই। কিছু নেই। বিকট চিৎকার করে মঞ্জুলা আছাড় খেয়ে পড়ে অরুণার ওপর।

কথা আসে না কারুর মুখে। সব ঠিক আছে। যেখানকার জিনিস সেখানে। কিন্তু সকালবেলার সেই ঘরখানাকে সন্ধ্যাবেলা একেবারেই অন্যরকম মনে হয়। স্ট্রেচারে তাপসেব মৃতদেহ এই ঘরের সব কিছু যেন উল্টেপাল্টে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। মঞ্জুলাকেও।

বসবার ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে চোখের জল ফেলছে সেই ছোকরা চাকরটা। সে জানে এ ঘরের কলিং-বেল আজ আর কেউ বাজাবে না। তাপসের যত বন্ধুবান্ধব সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ম্লান ছায়ার মতো উঠে আসছে ওপরে। দরজার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেয়েরা ভেতরে ঢুকছে। সাবধানে ফুল রাখছে তাপসের দেহের ওপর। কথা বলছে না। দেখছে মঞ্জুলাকে।

হঠাৎ মঞ্জুলা মাথা তোলে। ভীত রুক্ষ অস্বাভাবিক দৃষ্টি। সে তাকায় প্রত্যেকের দিকে। জলে ঝাপসা হয়ে গেছে চোখ। যেন চিনতে পারে না চৌধুরী-রমাকে, মেনন-ললিতাকে, সান্যাল-পদ্মাকে—আর যারা এয়ার অফিস থেকে খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছে, তাদের কাউকেই।

আঃ—আলো নেভাও—আমি দেখতে চাই না—আমি দেখতে পারব না—অরুণার কোলে মুখ গুঁজে দুই হাতে শক্ত করে মঞ্জুলা শুধু তাঁকেই আঁকড়ে ধরে।

ভাঙা গলায় রমানাথ বলে ওঠেন, ওগো ওকে ভাল করে ধর—বিছানায় শুইয়ে দাও। শক্ত হও ছোট বৌ—শক্ত হও!

কাছে কাছে থাকে বুল্টু আর মণ্টু। ছোট মেয়ে দুটো গুম হয়ে গেছে। রমানাথ মঞ্জুলার আরও কাছে সরে বসেন। গায়ে ময়লা গেঞ্জিটাও নেই এখন। ছেঁড়া ধুতির কোণ দিয়ে মাঝে মাঝে চোখের জল মোছেন।

হাওয়ায় জানলাটা কখন বন্ধ হয়ে গেছে। খিল দেয়া হয় নি বলে মাঝখানের দরজা থেকে থেকে শব্দ করে। ওদিকটা একেবারে শূন্য। ওদিকে এখন আর কেউ নেই বলেই বোধ হয় দরজাটা বিকট আওয়াজ করে আছড়ে ভেঙে পড়তে চায়। মঞ্জুলার মতোই।
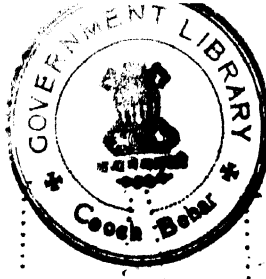
মানুষের দুঃখ যে অনন্ত এ কথা সবাই জানি ও মানি।

বুদ্ধদেব থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক, সকলেই আমাদের বলেছেন যে, দুঃখ ক্রম-বর্ধমান এবং তার পরিণতি ভয়াবহ। কামনা-বাসনার জালে জড়িয়ে এবং নতুন নতুন শক্তি অর্জন করবার দুর্দম স্পৃহায় তাড়িত হয়ে, মানুষ নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে মরে। যদি বা কিছু পায়, তা থাকে না। সবন্ধের ধ্বংসলীলায় শেষ পর্যন্ত বিলুপ্তি। বৌদ্ধ দর্শনের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য আর অণুবিজ্ঞানের নৈরাশ্য-অবসাদ, এ দুয়ের পার্থক্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে ধর্তব্য নয়। মায়াবাদ আর শূন্যবাদের যা বক্তব্য, পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বড় বড় গণনা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাটাই বোঝাচ্ছেন। অর্থাৎ কর্মফল আর যোগফলের অর্থ একই, শূন্য। সম্বোধি, নির্বিকল্প সমাধি বা সম্মুক্তি ঠিক কল্পনায় আনা শক্ত, অনেকটা শূন্যস্থিতির মতই। আবার চার্বাকের মতে দেহাবসানে কিছুই থাকে না। সান্ত্বনা হিসেবে আত্মার অস্তিত্বটুকুও আঁকড়ে ধরা যাবে না। এদিকে বৈজ্ঞানিকদের ক্রিয়াকলাপে এই সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, দ্বাদশ আদিত্যের প্রলয়দাহন অন্তিমে আর কিছুই রেখে যাবে না। অর্থাৎ ছাই ছাই-ই। শীতল অথবা তেজস্ক্রিয় ভস্ম, পদার্থটি একই।

তবু শূন্যের প্রতি মানুষের আন্তরিক টান। ভূমিষ্ঠ হয়ে শূন্য থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, শূন্যকে লঙ্ঘন করে, আকাশে উড়ে শূন্যকে স্পর্শ করতে চায়। আর যে সব শিশু বড় হয়ে লেখাপড়া শেখে না, অঙ্ক কাঁচা থেকে যায়, তাদের কপালে খাতার পাতায় শূন্য। আর যারা গণিত ভালোবাসে, তারাও শূন্য কামনা করে। একটি ঘণ্টা ধরে গলদঘর্ম হয়ে পরম দুঃখ-ময় সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক কসে কসে যখন ফল বেরোয় শূন্য, তখন উত্তরটি অভ্রান্ত মিলে গেছে ভেবে তার মনে যে উল্লাস, সেটা প্রায় স্বর্গপ্রাপ্তির সামিল।

বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। একদিন তাড়াতাড়ি করে সকাল-বেলায় সত্যেন বসু মশায়ের বাড়ি গিয়ে দেখি, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গরমে সিদ্ধ হয়েও কতগুলো শাদা পাতায় ইতিমধ্যে অনেক কিছু লিখেছেন, বোধ হয় অঙ্ক কষে ফেলেছেন। পাশে চুপ করে বসে রইলুম অনেকক্ষণ। কখনও সিগারেট হাতে ঝুঁকে পড়ে ভাবছেন, কখনো বা একটা দুটো রাশি বসাচ্ছেন। তারপর অন্যমনস্ক উদাস দৃষ্টির মধ্যে আমার ছায়াটি প্রতিফলিত হল দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সাত-সকালে উঠে এ সব কি কস্‌ছেন?'

ধীর কণ্ঠে বললেন, 'একটা ইকোয়ে-শ্যন রে......'

আবার প্রশ্ন করলুম, 'হচ্ছে? যদি রাইট্‌ হয়, তা হলে সমীকরণের ফলে শূন্য বেরোবে না কি?'

খুবই ব্যগ্র আশা নিয়ে প্রশ্নটা করে-ছিলুম। কিন্তু বোধ হয় অর্বাচীন-বোধে তিনি শুধু একটু হাসলেন। বললেন, 'মিললে তো হয়েই গেল!'

ঐ উত্তর দার্শনিকের, হাসিটুকুও ব্রহ্মা-স্বাদের সহোদর।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে গণিতানু-রাগীর দল অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা গণিতের মধ্যে যে অপার্থিব আনন্দ পান, গণিতও কি সেই আনন্দ পায়? অপরের কাছে এই ধরনের আত্মবিসর্জন কি একটুও ক্ষোভ সৃষ্টি করে না? জানা থেকে অজানার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, মানি। পরিচিত পথ ছেড়ে পর্যটক যখন অনাবিষ্কৃত অরণ্য-অঞ্চলে প্রবেশ করেন, রক্তচিহ্ন, পোড়া কাগজ ছেঁড়া বোতাম কিম্বা জড়িয়ে-যাওয়া একটি মাত্র চুল থেকে সুদক্ষ তদন্তকারী যখন অতি-গোপন হত্যারহস্যের সন্ধান করেন, অথবা পুরাতনী সুবিদিতাকে ছেড়ে পুরুষ যখন অপরিচিতা অনিন্দিতাকে অনুসরণ করেন, তখন হয় তো তাঁদের মনে রোমাঞ্চ উল্লাস জেগে ওঠে। এ সব তথ্য স্বীকার করেও প্রশ্ন জাগে মনে, একের সুখ যতই সত্য হোক্‌, অপরের দুঃখটা কি তুচ্ছ? শিকারীর পুলকের সঙ্গে শিকারের উদ্বেগটাও ভেবে দেখার মতো। যিনি গণিতবিদ্‌, তিনি রাশি রাশি সংখ্যা আর সিম্‌বল ঘেঁটে নাড়াচাড়া করেন, ইচ্ছামত সাজান সরান ভাঙেন আবার গড়েন। কিন্তু গণিতের মনোবেদনা কি আমরা একবার ভেবে দেখি? চিরজীবন প্রভুবর্গের কাছে ক্রীড়নক হয়ে থাকার কষ্ট যে কি ও কতখানি, বর্তমান সমাজতান্ত্রিক যুগে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা থাকার কথা নয়। দাবাখেলায় বোড়েগুলির কাল্পনিক ক্ষমতা অশেষ। কিন্তু খেলোয়াড় তাদের নিয়ে যা খুশি তাই করেন। তাদের দিয়ে রাজা উজীর ধরে মারার মতো হেন কুকর্ম নেই, যা করান না। তারা প্রতিবাদ করতে পারে না বলেই কি তাদের দুঃখ-দৈন্য অনুপস্থিত?

গণিতের বেলায়ও অনেকটা তাই। তার অপ্রকাশিত বেদনাবোধ আমাকে যথেষ্ট পীড়া দেয়, শিরঃপীড়া তো বটেই। পৃথিবীর অব-হেলিত, কাব্যের উপেক্ষিতার মতই বিজ্ঞানের ক্লিষ্ট ও পিষ্ট গণিত-রাশিগুলির জন্য সমবেদনা আমার মনের মধ্যে কৈশোর থেকেই সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তাই এই বাস্তব-অবাস্তব রচনার সূত্রপাত। হয়তো আমার এই কল্পনা-কাহিনীর মূলে আছে গণিত-বিরাগ। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। গরমের ছুটিতে আর পুজোর বন্ধে যদি সব-শুদ্ধ সাড়ে তিনশো অঙ্ক কষতে হয় কোনও ছেলেকে, তা হলে প্রাক্‌-যৌবনেই তার মোহমুক্তি এবং নির্বাণলাভ ঘটে। আর কি সব কূট অঙ্ক! যত সব ছেলে-ঠকানো ভয়-দেখানো পরমায়ু বের-করা অঙ্ক! কেন যে দেবদাস অকালপক্ক হয়ে গেল, স্লেট ছুঁড়ে

ফেলে পার্বতীকে তামাক সাজতে হুকুম দিল, সেটা বোঝা শক্ত নয়। সে যে অত অল্প বয়সে উদাসী দার্শনিক হয়ে ঘর ছেড়ে পালালো, তার প্রধান কারণ ঐ অঙ্কভীতি। আমার আর একটা আফসোস্ আছে। রবীন্দ্রনাথ মুণ্ডিত মস্তকের বেদনা, পকেট-হীনতার অপমান, শীতকালে বিছানা ছেড়ে বরফ-গলা জলে স্নান করার দুঃখ, নারীর মনোবেদনা, প্রকৃতির অন্তর-তাপ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা করে গেলেন, কিন্তু গণিত নিয়ে তাঁর দুঃখের কথা বলে গেলেন না। অন্তত সান্ত্বনা পাওয়া যেত। তবে তিনি যে স্কুলে যেতে চাইতেন না, আর গলির মোড়ে অঘোর মাস্টারের ছাতা দেখলেই অন্তঃপুরে আত্মগোপন করতেন, তাই থেকে অনুমান করে তৃপ্তি পাই, গণিত তাঁর ভালো লাগত না।

গণিত-বৈরাগ্যের আসল কারণ হল বিভীষিকা, অকারণ ভয়। যে ছেলে-মেয়ে অঙ্কে দুর্বল কিংবা অঙ্ক কষতে চায় না এড়িয়ে যায়, তার মর্মমূলে যে ভীতি তার বিশ্লেষণ করতে হলে মনস্তত্ত্বের এলাকায় প্রবেশ করতে হয়। বিশেষ কোনও অপ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে এ ত্রাসের জন্ম আর একবার সেটি বদ্ধমূল হলে, তাকে উৎপাটন করা যায় না। এর মধ্যে শিক্ষক-অভিভাবকদের দায়িত্ব অনেকখানি। একজন শিক্ষককে দেখেছি, সাংঘাতিক বড় বড় অঙ্ক দিতেন ছাত্রদের এবং না পারলে তাদের বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনার অন্ত থাকত না। পাটিগণিত কি বীজগণিত, যে গণিতই হোক, সমস্যাগুলোকে অকারণ জটিল করে ছাত্রদের মাথা ঘুলিয়ে দেওয়াতেই ছিল তাঁর পারমার্থিক আনন্দ। এবং যে গৃহশিক্ষক বাড়িতে অঙ্কশাস্ত্র পড়ান, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃতিত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা অনুচ্চারিত থাকত না। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি ছাত্রকে যদি কোচিং ক্লাসে কুক্ষিগত করা যায়। জিওমেট্রির শক্ত শক্ত রাইডার কষে দিয়েও তাঁর ভ্রূ-কুটিল মুখমণ্ডল এতটুকু প্রসন্ন করতে পারিনি। বিরসবদনে অথবা তির্যক্ হাসি হেসে বলতেন, 'হয়েছে কোনও রকমে, কিন্তু আরও দু'রকম প্রমাণ আছে ও হতে পারে এবং তা তোমার মাথায় কখনোই আসবে না।' এই নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী নৈরাশ্যের অন্ধকার ছাড়া আর কি সূচনা করে?

এ তো গেল বিদ্যালয়ের বিড়ম্বনা। বাড়িতে যিনি আমাদের দু'ভাইকে পড়াতেন আরও ছোটবেলায়, তাঁকে ভয় করতুম খুবই। অঙ্কের জন্য নয়, এমনিই। অত্যন্ত রাশভারি, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ফিটফাট পোশাক, ধোপদুরস্ত জামা আর কোঁচানো সাদা ধুতি, কাঁধে সিল্ক বা মটকার চাদর সযত্নে পাট করা এবং বুক পকেটে ঘড়ি, গলায় কালো কার-ঝোলানো। মধ্য কলকাতায় ছোট গলির প্রান্তে যখন তাঁর অতি-পরিচিত মূর্তি দেখতুম, প্রাণটা আমাদের শুকিয়ে উঠত এখুনি কঠিন নিয়তির মতো দরজার কড়া বেজে উঠবে ভেবে। এ রকম নিয়মানুবর্তী মানুষ আর দেখিনি। প্রতিটি কাজ রুটিন-বাঁধা এবং পরিচ্ছন্ন। পড়ানোর চেয়ে সহবৎ শিক্ষায় তাঁর নজর কম ছিল না। ফলে বাবা-মাকে না হয় প্রণাম করলুম, কিন্তু মাত্র দু' তিন বছরের বড় বোনদের সকালে উঠে ভক্তিভরে 'গড়' করতে হবে, এ নির্দেশে

কার-বাঁধা ঘড়িটির স্প্রিং-এর ঢাকনি খুলে চোখের ইশারা করতেন

যে মনস্তাপ পেতুম, তা বলবার নয়। শুধু তাই নয়, বোনদের এসে সাক্ষ্য দিতে হত যে, তাদের কিল-চড় মেরেছি কি না। সে যাই হোক, ইংরেজি বাংলা পড়া শেষ হলে জিজ্ঞাসা করতেন, ক'টা আঁক আছে কালকের টাস্ক?

মাস্টারমশাই খাস কলকাতার পুরানো বাসিন্দা। ছেলেকে বলতেন ছেলো, বিয়ে-কে বে আর অঙ্ককে আঁক। এখন 'আঁক' বার করতে বললেই, বুকের মধ্যে গাঁক করে উঠত। স্খলিত হস্তে খাতা খুলে ধরতুম। মুশকিল এই, আঁক হয়ে গেলেও তিনি দিশী আঁক অর্থাৎ শুভঙ্করী শেখাতেন। আর উঠতে চাইতেন না সহজে। কর্তব্য-শেষে তাঁর প্রস্থান-পর্বে অহেতুক বিলম্ব হলেও আমাদের দু ভায়ের মুক্তিনৃত্য কিছু কম উদ্দাম হত না। কোনও কোনও দিন আমাদের অসীম সৌভাগ্যবশে তিনি বুক-পকেট থেকে কার-বাঁধা ঘড়িটির স্প্রিং-এর ঢাকনি খুলে চোখের ইশারা করতেন অর্থাৎ আজ সকাল-সকাল উঠবেন। মনের আনন্দ মনে চেপে জিজ্ঞাসা করতুম, 'কোথায় যাবেন স্যার?'

থমথমে মুখ নিয়ে তিনি জবাব দিতেন, 'নেমন্তন্ন, যমের বাড়ি। ভারি সুবিধে হয় তাহলে.....না?'

বলা বাহুল্য, যমের বাড়ি না গিয়ে তিনি যেতেন বন্ধুবর হীরেন মুখুজ্জেদের বাড়ি। তাঁর ও তাঁদের ভাইদের তিনি পুরানো মাস্টারমশাই। আমাদেরও। অথচ মজা এই যাঁকে এত ভয় করতুম ছোটবেলায়, বড় হয়ে তাঁর সঙ্গে কত অন্তরঙ্গ সুরে শিল্প-সাহিত্য কাব্য ও সমাজ সম্বন্ধে কথা বলেছি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর তেজ, স্বাবলম্বিতা, সরস আলাপ আর জানবার ও পড়বার অফুরন্ত আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছি। বড় হয়ে কলেজে যখন পুরোপুরি আর্টস-এর ছাত্র হলুম, বললেন, 'ভালোই হয়েছে আঁক ছেড়ে দিয়ে।' ঐ একটি দিন তাঁর সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল হয়েছিল।

যে কথা বলছিলুম, অঙ্কের বিভীষিকা। আমার কাছে গণিতশাস্ত্র হয়তো আরও সরস হতে পারত। কিন্তু ঘরে ও বাইরে তাড়া খেয়ে, যেটুকু স্বাভাবিক দক্ষতা ও কৌতূহল ছিল বিষয়টির প্রতি, সেটুকু লুপ্ত হতে পথ পেল না। এবং সেই থেকে নিজের জন্য দুঃখ না যতখানি, গণিতের জন্য দুঃখ আরও বেশি হয়ে উঠল। এখনও মধ্যে মধ্যে এ বয়সেও দুঃস্বপ্ন দেখি—পরীক্ষা-গৃহে প্রশ্নপত্রে তেইশটি ছোট-বড় অঙ্ক। মাত্র গোটা কয়েক সেরেছি আর বাকিগুলোর মধ্যে যেটাই ধরতে যাচ্ছি, সেটাই আটকাচ্ছে এবং গোলকধাঁধার ভুল পথে আমাকে ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে। ঘণ্টা পড়ে এল, এদিকে কিছুই করে উঠতে পারছি না! সে কি নিদারুণ আতঙ্ক, স্বপ্ন বলেই রক্ষা। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, গায়ে রীতিমত কাল-ঘাম ছুটছে।

এক নিকট আত্মীয়া একবার আমায় বলেছিলেন, অঙ্ক তাঁর কিছুতেই হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সব ক'টি প্রশ্নকেই তিনি সাপটে ধরেছিলেন। কিন্তু বাড়ি এসে উত্তর মেলাতে গিয়ে সোনা মুখ কালী হয়ে গেল। কাকা, মামা সবাই মিলে বেশি বেশি নম্বর ধরেও কিছুতেই মেরে-কেটে আটাশের ওপর তুলতে পারলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বত্রিশ জুটেছিল তাঁর কপালে। তারপর দীর্ঘদিন সংসার করে তিনি হিসেবে এমনই পাকা হয়ে উঠলেন যে উটকো চাকর খুচরো মাইনে চাইতে এলে তিনি বলেন, বিকেলে এসে নিয়ে যেয়ো। তারপর দুপুরে বিছানায় উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে সাড়ে-পাঁচ দিনের মাইনে এমনি অনায়াসে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষে বার করে ফেলেন, যে হিসেবের ফলটি বারো দিনের প্রাপ্য হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু গণিত নিয়ে আমাদের আপত্তির কথা যাক। আমাদের নিয়ে গণিতের বিপত্তির কথাটাই বলি।

কৈশোরে একদিন পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক কথা ভেবেছিলুম এই প্রসঙ্গে। এক এক সময়ে এই রকম হয় না? চোখের সামনে বই খোলা, অথচ একটি বর্ণও মাথায় ঢুকছে না আর মন তখন অন্য রাজ্যে। টেবিলের ওপর দু হাতে মুখ রেখে আমার ভাবনা শুরু হল। আবেশে চোখ বুজে এল আর কত যে টুকরো ছবি ভেসে এল, যেগুলিকে বলা যায় দিবাস্বপ্ন। কিন্তু সেই দিবাস্বপ্ন নিতান্ত অসত্য ছিল না। এখন মনে হয়, যা ভেবেছিলুম বা চোখ বন্ধ করে দেখেছিলুম, তা অসঙ্গত একটা ফ্যাণ্টাসি হলেও একেবারে আজগুবি নয়। কিছুক্ষণের জন্য দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল, যার দৌলতে গণিতের মানস-চরিত আমার মানস-পটে এমন ছাপ রেখে গেল যা আজও মুছে যায় নি।

স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার পিছনে যেন একটা কালো পর্দা ঝুলছে। তারপর ব্ল্যাক বোর্ডে যেমন খড়ির লিখন কিংবা পর্দার ওপর ছায়াছবি ক্রমশ ফুটে ওঠে, সেই রকম অনেক রাশি আর সংখ্যা উলট-পালট হয়ে ঐ কালো পর্দায় এসে আত্মপ্রকাশ করল। পাটিগণিত বীজগণিত আর জ্যামিতির হরফ গুলো প্রথমে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে ছিল, তারপর কেমন করে যেন আলাদা হয়ে যে-যার ঘরে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে কুয়াশার জাল গুটিয়ে এলে, অস্পষ্ট জিনিস ধোঁয়াটে আকার ছেড়ে যেমন স্পষ্ট হতে থাকে—অনেকটা সেই রকম। কতকগুলো সংখ্যা সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো এ ওর ঘাড়ে উঠল, নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত টপাটপ্ এমন কায়দায় নিজেদের সাজিয়ে নিল যে বোঝাই গেল না কখন সিঁড়ি-ভাঙ্গা অঙ্ক তৈরি হয়ে গেল। ইচ্ছা হল, সব চেয়ে নীচে পিঠ কুঁজো করে যেটা কাঁধ পেতে আছে, তাকে ধরে এনে আগে সরল করে দিই। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও নানা হরফ তাদের দাবি জানাতে এগিয়ে এল। একদিকে আলফা ওমেগা ডেলটা হঠাৎ ছিটকানো তারাবাজির মতো ছড়িয়ে পড়ল, আর একদিকে একটা চতুষ্কোণ পদার্থ হঠাৎ চূড়োটা উঁচু করে অনিশ্চিত পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। আর এক কোণে বীজগণিতের দুটো রাশি পরস্পর কাটাকাটি করে শূন্য হয়ে গেল। ওদিকে ফুটে উঠল যদি ক খ ও গ......কিন্তু যদি কি......? কি করবে, কি হবে বুঝতে না পেরে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।

এই অস্বস্তিটা এখনও থেকে-থেকে আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে। যত বুদ্ধির অঙ্ক এ যাবৎ তৈরি হয়েছে, তার বেশির ভাগ হল প্রবলেম। অঙ্কের উত্তর ঠিকমত বার করে ফেললেও সমস্যার সমাধান শেষ হয় না, আবার নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিংবা পুরানো প্রবলেমই ভোল ফিরিয়ে যদি এই হয়, যদি তাই হয় বলে নতুন করে গলাবাজি শুরু করে দেয়। আমি অবিশ্যি কোনও দিনই তাতে ভুলিনি। কারণ জানতুম, দৈত্য-দানো ভূত-প্রেতেরা মায়াসাজ পরে যতই পরখ্ করতে আসুক, আসলে ওরা দুর্বল, অসহায়। সজাগ প্রহরী লালকমলের তীক্ষ্ণ চোখ ধরে ফেলে ওদের হুমকি আর চালাকি। সকলের পেছনে রয়েছে একটি শয়তানী মাথা, যে নিয়ত বুদ্ধি জোগায়। এক্স্ ওয়াই জেড্ হোক কিংবা এ বি সি ডি বা ক খ গ ঘ হোক, ওরা আসলে অভিন্ন। কেবল মুখোশ বদলে ঘুরে-ফিরে আসে, ঠকাবার উদ্দেশে। কেননা, সবই তো গণিত মানে গণনা করে বার করতে হয়। এবং হিসাবে যে লোক পাকা, সেই মান্যগণ্য। খুব ছোটবেলায় কি জানি কেন মনে হত, যে-মানুষটি মাটিতে পাটি বিছিয়ে মেঝের ওপর খড়ি দিয়ে গণনা করে, সেই হচ্ছে পাটি-গণিত। আর যে সরল চাষী ভিজে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে মাঠের কাদায় মাঠে-মাঠে বীজ-ধান ছড়ায় আর মনে- মনে হিসেব কষে, সে হল বীজ-গণিত। আর যে বীর বালক অভিমন্যুর মতো জ্যা-তে চাপ লাগিয়ে অর্থাৎ ধনুকে গুণ চড়িয়ে সাঁই-সাঁই করে ক্রমাগত তীর ছোড়ে, তারই নাম জ্যামিতি।

একটু বড় হয়ে বুঝলাম, গণিতের মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতার ছোঁয়াচ আছে। মারামারি ভাংগা-চোরার কাজ নির্মম ও নিপুণ হাতে চালিয়ে যেতে পারলে মস্ত আনন্দ, তখন মুক্তির বাতাসে গা জুড়িয়ে যায়। যেমন ভগ্নাংশের অংক। ওর বারো আনাই কাটাকুটি। ডাইনে-বাঁয়ে সব্যসাচীর মতো তলোয়ার খেলাতে হবে, তবেই ফল অনিবার্য। কিংবা সিম্‌প্লিফিকেশ্যান। দেখতে যতটা নিরীহ, প্রকৃতিতে তা নয়। রীতিমত জটিল। সরল কর বললেই সরল করা যায় না। মাথার ওপর ভিন্‌কুলমের ডান্ডা বাঁচিয়ে, ফার্স্ট সেকেণ্ড ও থার্ড ব্র্যাকেটের বেড়াজাল একটি পর একটি কাটিয়ে, সন্তর্পণে বেরিয়ে আসা সহজ কথা নয়। আবার বেরিয়ে এলেই হল না। সামনে গুণ-ভাগের সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জবর সিপাই। তাকে উলটে দিয়ে কিংবা কেটেকুটে সাবাড় করলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, পেছন দিকে তাকালে ভয়াবহ যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি দেখলে কার না মন খারাপ হয়? এই রক্তাক্ত মৃত সৈনিকদের জন্যই আমার আন্তরিক অনুশোচনা। মহাবীর অর্জুন কুরুক্ষেত্রের আরম্ভেই কাতর হয়ে পড়লেন, সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করে চিরকালের জন্য ত্যাগ করলেন রণ-ভেরী। ঐ অনুতাপেই আমারও গণিত-শ্মশান-বৈরাগ্য। কিন্তু বৈরাগ্য হলেও ভূত ছাড়ে না। নির্মেঘ মনের আকাশে অপদেবতার কালো ছায়া মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। তন্দ্রাবেশে জেগে ওঠে কয়েকটি মূর্তি, ভার হয়ে নেমে আসে চোখের পাতায়......

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে একটি গোলগাল চেহারা। মিটি-মিটি চোখ দুটি—এক্স আর ওয়াই। দুটি ভুরু থার্ড ব্র্যাকেটে আটকানো। এক কানে জেড-এর গজাল পেরেক আঁটা, আর এক কানে এস-এর আংটা ঝুলছে। গলা থেকে পেট পর্যন্ত হরফের বোতাম। ওপর ঠোঁটে সেকেণ্ড

ব্র্যাকেট, চিবুককে সমান চিহ্ন। দেখলে মনে হয় হাসি-খুশি ভাবটা ভয়ে উধাও, প্রাণে স্ফূর্তি নেই একটুও। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই আধো-আধো সুরে বলে ওঠে, 'আমি বীজগণিত'। ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে কে যেন উঁকি দিচ্ছে, তারপর ভরসা পেয়ে একটু এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ায়। ক্লান্ত দেহখানা বয়ে এনেছে অতি কষ্টে। সারা মুখে অজস্র কাটার দাগ! কেন্দ্রবিন্দুটি শ্বাসকষ্টে হাঁ করে আছে। মাথায় কপালে কানে ঠোঁটে সরল আর বক্র রেখার হিজিবিজি। ব্যাসার্ধে আর চাপে মুখ-মণ্ডল ক্ষতবিক্ষত। চোখ দুটিতে স্টিকিং প্ল্যাস্টার কম্পাসের সাহায্যে সেঁটে দেওয়া, তাকাবারও জো নেই। বিষাদের এই প্রতিমূর্তি ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'আমি জ্যামিতি।'

তারও পর কাতারে কাতারে চলে তাজা কাহিল নানা মূর্তির মিছিল। কেউ হন্ হন্ করে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা দম বন্ধ হয়ে পিছিয়ে পড়েছে। কারুর সর্দারী চাল, কারুর চোখে ভীরু অসহায় চাউনি। দেখেই বুঝলুম, এরা পাটিগণিতের দল। বীজগণিতের ভাষায় এরা এক্স্ ওয়াই জেড, জ্যামিতির ভাষায় এরাই এ বি সি। সোজা বাংলায় ক খ গ ইত্যাদি। মানুষ একই, ওরফে হরেক নাম। ওদের মধ্যে কয়েকটির জন্য দুঃখ হয়, কেন না প্রতিবাদে অক্ষম। বিশেষ করে ঐ গ বা সি'র জন্য বেদনায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়। বেচারী মূক, ওর মুখে ভাষা জোগাতে হবে আমাকেই! কত শতাব্দী ধরে ক'এর গা-জুরি আর খ'এর চতুরালি সহ্য করেছে। শোষণ-ক্লিষ্ট নীরব সেবক-শ্রমিকের স্বপক্ষে কে দুটো কথা বলে!

আমরা সকলেই জানি, ক সব চেয়ে প্রবল। সব তাতেই তার অগ্র-ভাগ স্থির হয়ে আছে। বলিষ্ঠের দাবি মানি, কিন্তু প্রতিটি প্রতিযোগিতায় তার জয় কেন সুনিশ্চিত? যে কোনও অঙ্ক-সমস্যায় এ বা ক সবচেয়ে লাভবান, তারপরে বি বা খ। আর সি বা গ'এর মতো ভাগ্যহীন খুব কমই আছে দুনিয়ায়! সুদ-কষায়, ভাগ-বাঁটোয়ারায় কিংবা পার্টনার-শিপে লাভের অংশ বেশি কার? এ হয়তো দু হাজার টাকা ঢালল প্রথম বছরে, বি দিল তিন হাজার। দ্বিতীয় বছরের শেষে লাভ হওয়াতে, সি লোভে পড়ে ভাগের ব্যবসায় যোগ দিল এবং মূলধন হিসেবে চার হাজার টাকা এনে দিল। তৃতীয় বছরে ব্যবসার উন্নতি দেখে সি স্ত্রীর গয়না বেচে আরও হাজার দুই টাকা যেই জোগাড় করে আনল, বলা-কওয়া নেই, এ তার টাকা তুলে নিল। কিছু দিন পরে বি বলল, জরুরী ব্যাপারে তার মূলধন থেকে হাজার দুয়েক সরিয়ে নিতে চায়। ক্রমশ ব্যবসা মন্দা হয়ে এল, দায়িত্ব গিয়ে পড়ল ষোল আনা সি'র ওপরে। লাভের অংশ সি আর কতটুকু, কতদিনই বা পেল? তার জন্য অঙ্ক কষার দরকারই হয় না। চোখ বুজেই সি'র দেউলে চেহারাটা দেখা যায়।
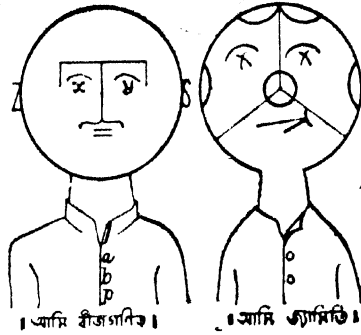
তা ছাড়া লাভ-লোকসানের ব্যাপারে এ কারুর কথাই শোনে না। যা খুশি তাই করে। কখনও চড়া দামে মাল বেচে, কখনো বা খেয়াল মতো জলের দরে ছেড়ে দেয়। বি হুঁশিয়ার লোক, ধীরে সুস্থে কাজে এগোয়। কিন্তু সি নিরীহ ভালো মানুষ। ফাটকা খেলায় এ দিব্যি বেরিয়ে যায়, বি ওরই মধ্যে লোকসান পুষিয়ে লাভটুকু খাতিয়ে নেয়। তখন তেজী-মন্দার যা কিছু ঝামেলা সি'র ঘাড়ে এসে পড়ে। দোকানে তালা বন্ধ, বাড়ী ছেড়ে পাওনাদারের ভয়ে সি কোথায় যে চলে গেল, তার কোনও হদিশ মেলে না কাগজে কলমে। আমি জানতুম, এমনটি হবেই। পার্টনারশিপ কিংবা শেয়ার কেনা-বেচায় নামবার আগে সি যদি ভালো করে খবর নিত, তা হলে জানতে পারত এ'র স্বভাব ও মতি-গতি। যে কোনো বিষয়ে এ'র উৎসাহ অসীম, তা সে জমি কেনাই হোক বা দুধ বিক্রি কি চালের ব্যবসাই হোক। তারপর কারুর কথায় কান না দিয়ে জমি বেচতে শুরু করে মরিয়া হয়ে। লাভের উত্তেজনায় দুধে জল আর চালে কাঁকর মেশাতে থাকে। বি সতর্ক মানুষ, ভালো করেই জানে গৌয়ারগোবিন্দকে, সময় থাকতে সে সাবধান হয়। সি নীরবে দুঃখ ভোগ করে। সুদিনে একটু সম্পত্তি কিনেছিল, কিন্তু তাও রাখা গেল না আয়-করের চাপে আর দেনা শোধের তাড়ায়। বেচারীর জন্য সত্যিই দুঃখ হয়!

আমি সেই ছোটবেলা থেকে বরাবরই দেখছি কি না, বাঙালী ক আর ইংরেজ এ'র স্বভাবটা হল গণ্ডার প্রকৃতির। একরোখা মানুষ, দূরদর্শিতার একান্ত অভাব। যা সামনে আসছে, সেটাই ধরতে হবে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা নেই বললেই হয়। গায়ের জোরও সব চেয়ে বেশি। সব তাতেই সে প্রথম। মার্বেলই হোক কি আম-কলাই হোক, সে পাবে বেশি। পায়ে হেঁটে দৌড়ানো, বাইসিক্‌ল নিয়ে ছোটা কিংবা ট্রেন বা মোটর নিয়ে বেড়ানো, সর্ব প্রকার প্রতিযোগিতায় তার গতির হার সব চেয়ে দ্রুত। একবার মনে পড়ে, ক বাজি ধরল যে খ'কে পঞ্চাশ গজ আর গ'কে একশো গজ হ্যাণ্ডিক্যাপ দিয়েও সে সাইকেল রেসে অনায়াসে ওদের হারিয়ে দেবে। খ বার কয়েক জোরে প্যাড্‌ল্ চালিয়ে হাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল। ক অবশ্য বিদ্যুৎ-বেগে বেরিয়ে গিয়ে প্রথম হল। আর গ? ক-এর কিছু কারসাজি ছিল কিনা জানি না। বেচারী অনেক দিন পরে সাইকেল চড়তে পেয়ে মনের সুখে চালাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথে ইঁটের ঠোক্করে টায়ার গেল ফেটে। বাকি পথ সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হল।

আর একবার ঐ রকম বাজি-বিভ্রাট ঘটেছিল। ক একদিন সকালে উঠে বলল, ট্রেনে করে সাতাশি মাইল দূরে একটা পুরানো কেল্লা দেখে আসা যাক্। মাঝে দু বার গাড়ী-বদল করতে হবে, কিন্তু একই গাড়ীতে চেপে যে সব চেয়ে আগে কেল্লায় পৌঁছুবে, সে পাবে একশো টাকা নগদ!

যাত্রা হল শুরু। খ'এর মুখ একটু গম্ভীর, ক'এর মতি-গতি কিছু কিছু জানা আছে তার। আর গ আহ্লাদে ডগমগ। অনেক দিন বাদে শহর ছেড়ে বেরুতে পেয়েছে, কেল্লার কাছে ছোট হোটেলটিতে উঠে চা ও জলযোগের স্বপ্নেই সে মশগুল। ফলে সে প্রথম জংশান স্টেশনে ট্রেন ফেল করে বসল। ক আর খ এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় জংশানে খ কিন্তু ক-এর টিকি দেখতে পেল না। আসছি বলে টুপ করে নেমে পড়ে ক কোথায় উধাও হয়ে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল, খ-এর মনে তখন ঘোর সন্দেহ। যাই হোক, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেখতে পেল, ক দিব্বি এক মোটরের দরজায় হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে! বাড়ি ফেরার পথে দেখা গেল, গ অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে ছোট্ট স্টেশনটির ওয়েটিং রুমে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চুপ চাপ বসে আছে।

শুধু কি তাই! যত রকমের কাজ, সব তাতেই ক'এর কৃতিত্ব অবধারিত। আগে আগে অংক-সমস্যায় দেখতুম, কাজটা কি স্পষ্ট করে বলা নেই। একটু রহস্য ভাব। ক খ গ কোনও একটি কাজে লিপ্ত আছে। গ চার ঘণ্টায় যা পারে, খ দু ঘণ্টায় তা করে আর ক এক ঘণ্টার মধ্যে সেটা সেরে ফেলে। একত্র কাজ করলে, কতক্ষণে শেষ হবে? কিন্তু কাজের কি শেষ আছে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার অন্য কাজ শুরু হয়। গ বেচারীর প্রাণান্ত। একেই নিরীহ, তায় ঢিলে-ঢালা মানুষ। আর ক'এর হুমকিতে নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে বাজি হেরে না
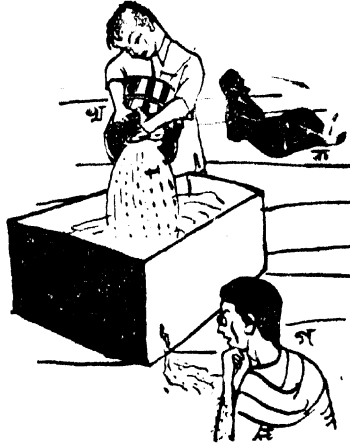
**অক্লান্ত পরিশ্রমের ঘাম জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে**

খেতে পেয়ে গ-এর অবস্থা যে কি শোচনীয় হল, সে কথা পরে বলছি। কখনো মাটি খুঁড়ে দশ হাত গভীর গর্ত করা, কখনো সার-লাগানো চারা গাছে জল দেওয়া, কখনো আপাত-সমান কিন্তু আসলে অসমান জমির দীর্ঘতম কিনারায় বেড়া বাঁধা, আর কখনো বা ঠায় রোদ্দুরে আগাছায় ভর্তি পোড়ো মাঠ কোণাকুণিভাবে চেন দিয়ে মেপে ক্ষেত্রের বর্গফল কষে গ'এর চেহারা যা দাঁড়াল, দেখলে গা শিউরে ওঠে।

সব চেয়ে কষ্ট হয়, যখনি মনে পড়ে সেই জল ভরার অংক। নল দিয়ে কি পাম্প করে জল তোলা নয়। দূরের কল থেকে বালতি আর ড্রামে করে জল এনে চৌবাচ্চা ভর্তি করার কাজ যে কি সাংঘাতিক, যে এই অংক কষে রাইট না করেছে সে বুঝতে পারবে না। তাও হরেক রকম চৌবাচ্চা। কোনোটা ওয়াটার-টাইট, জল ধরে। কোনোটায় একটা সরু ছিদ্র দিয়ে ঘণ্টায় এক গ্যালন করে জল চুঁইয়ে পড়ে। আবার কোনোটায় বা এমন বড় ফাটল যে দশ মিনিটে ভর্তি জলের দুয়ের তিন অংশ হুড় হুড় করে বেরিয়ে যায়। ক যে কি কায়দায় ছিদ্র এঁটে আধ ঘণ্টায় কাজ হাসিল করে মাটিতে হেলান দিয়ে আরাম করতে লাগল, তা জানা যায় না। এদিকে খ মুখ বুজে ড্রাম-ভর্তি জল ঢেলে চলেছে আর গ শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে উবু হয়ে বসে কাতর মুখে দেখতে থাকে; ছিদ্রমুখ দিয়ে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ঘাম জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!

এ রকম আরও কত! ক-ই হোক আর এ-ই হোক, সে সর্বকর্মে অগ্রণী। সাঁতারে বা ঘোড়া চড়ায় সে প্রথম। দাঁড় টানায় লঘুতম নৌকাটি তার ভাগ্যে জোটে, দ্বিচক্রযানের প্রতিযোগিতায় ক্ষিপ্রতম যন্ত্রটি তার। ভালো মোটর গাড়ী তার, বাজি ধরেও জেতে সে-ই। দেয়াল গাঁথায়, ছাদ পিটানোয়, গাছের ফুল ও ফল তোলায় কেউ তার সমকক্ষ নয়। তারপর, জুলুম তো আছেই। ষণ্ডমার্ক চেহারা আর প্রচুর জীবনী শক্তি, একেবারে গদাই সর্দার। সে তুলনায় বি একটু হাঁদা, পরিশ্রমী কিন্তু সরল। ঠিক যেন হাবলা। আর সি? একটু রুগ্ণ ও কাহিল ধরনের মানুষ, অল্পেই হাঁপিয়ে পড়ে। এ-কে ভয় করে, তার হুকুমদারি মেনে নেয়। অপটু হস্তে দুর্বল দেহে কাজ করে-করে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। মনে হয় যেন পুঁটে। বেঁচে আছে শুধু বি'র আন্তরিক দরদের জোরে। পিছিয়ে পড়লে কাজ শেষ না হলে, বি-ই এগিয়ে আসে বড় ভায়ের মতো। নইলে সি কবে সাবাড় হয়ে যেত!

গেলও তাই। যত রকম উদ্ভট ব্যবসায় নেমে যথাসর্বস্ব খুইয়ে বসল। তার ওপর কষ্টসাধ্য শ্রমসাপেক্ষ নানা রকমের কাজে শরীর তার এমন কাহিল হয়ে গেল যে শেষকালে শয্যা নিতে হল। দম বন্ধ করে দৌড়ে দৌড়ে এই বয়সেই হাঁপানি। বর্ষায় সাঁতার কেটে কেটে বুকে সর্দি। সাইকেল আর ঘোড়া থেকে পড়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জীর্ণশীর্ণ দেহটি বিছানায় মিশে গেছে। শ্বাসকষ্ট প্রচুর। বি দাগ মেপে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে সি ফিস ফিস করে বলল, 'আর কত দূর...!' বি তখন সন্তর্পণে নাড়ী পরীক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হঠাৎ দ্রুত হয়ে উঠেছে'। এ তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'ঘণ্টায় ক' মাইল? যদি আর আড়াই শো গজ হ্যাণ্ডিক্যাপ দিই......বাজি ধরবে?' বি মুখটা বিকৃত করে বলল, 'বাজি ভোর।' তারপর নাকের কাছে পালক ধরে দেখল আর পরম স্নেহে চোখ দুটো বুজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চাদরটা টেনে দিল। শূন্যে মিলিয়ে গেল শেষ অংক।

এ বি সি, এক্স্ ওয়াই জেড্, ক খ গ—এরা শুধু সিম্বল নয়। মনে হয় রক্ত মাংসের মানুষ। তাই মধ্যে মধ্যে গণিতকার নাম দেন রাম শ্যাম যদু, জ্যাক বিল ডিক। জ্যেষ্ঠ মধ্যম আর কনিষ্ঠ—গদাই হাব্লা আর পুঁটে। গদাই এ জীবনে সুখ করে নিল, জয়ী হল বটে। কিন্তু নতুন ছেলের দল যখন আবার অংক কষবে, তখন তার কি হবে...? ভেবে দেখিনি। আপাতত গণিতের দুঃখটাই বড়। এবং সে দুঃখ আনে উদ্বেগ-অনুতাপ। দলিত মৃত-দিনের আত্মাগুলো যেমন একের পর এক মূর্তি ধরে কবি রসেটিকে একদা উত্ত্যক্ত করেছিল, তেমনি গণিতের রাশিগুলো, each one a murdered self, তাদের অনন্ত নির্যাতন নিয়ে আজও সামনে দাঁড়ায় আর প্রেতকণ্ঠে অভিযোগ জানায়—**'I am thyself'—what hast thou done to me?**

রাজপুত্তুর (বীরভূমের লোকশিল্প) — স্কেচ শ্রীনন্দলাল বসু

# একজিবিশন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শুনুন, আমার জন্যেও টিকেট কিনবেন একখানা।

বসন্ত শুনেছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটার লক্ষ্য যে সে-ই, সেইটেই অনুমান করতে পারেনি, একে তো এখানে সে এসেছে মাত্র দিন চারেক, আস্তানা নিয়েছে একটা হোটেলে, তার ওপর নতুন জায়গায় এ পর্যন্ত একটি মানুষের সঙ্গেও তার আলাপ হয়নি। সুতরাং মেয়েলি গলায় পেছন থেকে কেউ তাকে এমনভাবে অনুরোধ জানাতে পারে—বসন্ত তা অনুমানও করেনি।

কিন্তু এবারে আলতো হাতের ছোঁয়া লাগল গায়ে। চমকে মুখ ফেরালো বসন্ত।

কুড়ি থেকে পঁচিশ পর্যন্ত যে-কোনো বয়েসের একটি মেয়ে। কাঁধ পর্যন্ত ফাঁপানো রুক্ষ চুল। তুলির সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা ভ্রূ, মুখে কড়া প্রসাধন। গলায় লাল 'বীডে'র মালা। নাইলনের স্বচ্ছ শাড়ি গায়ের ওপর থেকে পিছলে পড়তে চাইছে।

ভীত মৃদু গলায় মেয়েটি আবার বললে, 'দয়া করে একটা টিকেট নেবেন আমার জন্যেও।'

'আচ্ছা, নিচ্ছি'—বলেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করলে বসন্ত। কিন্তু মেয়েটি হাত ব্যাগ খুলল না। একটু বিভ্রান্ত হল বসন্ত, লজ্জিতও। মাত্র চার আনা পয়সার জন্যে—ছিঃ ছিঃ!

দুখানাই টিকেট কিনে কাউণ্টার থেকে সরে এসে সে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিলে একখানা। তবুও ব্যাগ খুলল না মেয়েটি, টিকেটও নিলে না। বললে, চলুন না, এক সঙ্গেই ভেতরে যাই।

বসন্ত ভালো করে তাকিয়ে দেখল এবার। জিজ্ঞাসা মিটে গেছে। মেয়েটি যেন হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প, শঙ্কিতভাবে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল বসন্তর ঠোঁটের কোণায়।

—চলুন না ভেতরে, কী হবে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে? —আবার আলগা ছোঁয়া লাগল বসন্তর বাহুতে।

ঠিক এইটেই যেন আশা করেছিল বসন্ত। একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, নামিয়ে ফেলল ঠোঁট থেকে। তারপর বললে,—'আচ্ছা চলুন।'

গেট পেরুতেই ইলেকট্রিকে আর নিঅন টিউবে ঝলমলে সোডা ফাউণ্টেন। তারপরেই গোটা কয়েক গাছের ছায়ার দ্বীপ—চারদিকের অসংখ্য স্টল, অস্বাভাবিক আলো আর অগণ্য মানুষের ভিড়ের মাঝখানে এক টুকরো প্রায়ান্ধকার। ইচ্ছে করেই হয়তো কর্তৃপক্ষ আলো দেয়নি এখানে, লোকে দু-এক মিনিটের জন্যে জ্বালাধরা চোখকে জুড়িয়ে নেবে—চুরুট, প্রসাধন, ভাজা মাংস আর নতুন বার্নিশের গন্ধে জর্জরিত স্নায়ু-গুলোকে তৃপ্ত করে নেবে ঠাণ্ডা মাটি আর কচি পাতার সুঘ্রাণে।

এই পর্যন্ত এসে বসন্ত মেয়েটির মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটিও দাঁড়ালো। দশবারজন লোকের একটা মস্ত বড় দল পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর,

আবছা আলোয় আশ্চর্য শীর্ণ আর সংকুচিত মেয়েটিকে সে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করলে, পুলিসে তাড়া করেছিল?

জবাব এল না। আরো আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি।

গেট তো পার করে দিয়েছি। এবার আমাকে ছাড়ো দয়া করে।—বলেই পা বাড়ালো বসন্ত।

—শুনুন?

আবার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে ফেলে অসীম বিরক্তিতে বসন্ত ঘুরে দাঁড়ালো।

—কী হয়েছে, জ্বালাচ্ছ কেন ফের?—গলার স্বরে একরাশ ঘৃণা মিশিয়ে বললে, তুমি ভুল লোককে ধরেছ, আমি তোমার শিকার নই।

—এক মিনিট দাঁড়াতেও পারেন না?

গলার আওয়াজটা এবার তীক্ষ্ম এবং স্পষ্ট। বসন্ত ভুরু কোঁচকালো।

—ও, বুঝেছি।—ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার নোট বের করল একটা। বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এই নাও—এবার মুক্তি দাও আমাকে।

—আমি ভিখিরি?—মেয়েটার তুলি আঁকা ভ্রূ বসন্তর চাইতেও সংকুচিত হল, কালি পড়া চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল একবার। তারপর বললে, অনেক উপকার করেছেন আমার, আর দরকার নেই। ধন্যবাদ।

একটা কুৎসিত গাল দেবার প্রলোভন অনেক কষ্টে সম্বরণ করল বসন্ত। মেয়েটার দিকে একবারও আর না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলল স্টলগুলোর দিকে। আপদের শান্তি হল।

কোথায় যাওয়া যায়?

যাওয়ার জায়গা অনেক। প্রথমেই সোডা ফাউন্টেনে ঢুকে একটা কোল্ড্ ড্রিংক ভিজিয়ে নেওয়া যায় গলাটা। কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবা যায় কিছু কিনবে কি না কিংবা কিনবার মতো কিছু আছে কি না। আর কিছু না হোক ফেনিল পানীয়ের ভেতর স্ট্রটা দিয়ে পাঁচ দশ মিনিট খেলাও করা যেতে পারে বসে বসে।

তাই করল।

ভিড় দারুণ ভিড়। ম্যানিলা, কোকা-কোলা, প্রসাধন, হেয়ারক্রীম, সিগারের গন্ধ। পুরুষের মোটা গলার হাসি, মেয়েদের জলতরঙ্গ। শাড়ী, সুট, সালোয়ার, চোস্ত-চুড়িদারের সমারোহ।

একটা লেমন স্কোয়াশ সামনে নিয়ে প্রত্যেকের মুখগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখতে চাইল বসন্ত। নিয়নের কড়া সাদা আলোয়, ঝিলিমিলি কাচে, পানীয় বাহিনী বিদেশিনীর স্থলে ছবিতে, চড়া রঙের ওয়ালপেপারে প্রত্যেকটি লোককে তার অস্বাভাবিক বলে মনে হল। একটা বাঁকা আয়নার ভেতরে যেন সকলকে দেখতে পাচ্ছে সে—মেয়েদের রঙীন ঠোঁট চিড়িয়াখানায় দেখা বাঘকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পুরুষের ভারী ভারী মুখের পেশীগুলোর নড়াচড়া জাবর কাটা ষাঁড়ের উপমা মনে আনে। এই ভাবেই ইম্প্রেশনিস্টিক হয় নাকি মানুষ?

লেমন স্কোয়াশটা বড্ড বেশি টক লাগছিল, আর একটু সোডা চাইলে হত। কিন্তু সোডা চাইতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মেয়েদের ঠোঁটগুলোকে বাঘের মতো মনে হওয়ার কারণ আছে। একটু আগেই বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিল। যথাসময়ে সতর্ক না হলে জাবর কাটা ষাঁড়ের দুর্গতি ছিল তারও অদৃষ্টে।

তবু মুক্তির আনন্দে বসন্ত খুব বেশি আত্মপ্রসাদ পেল না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধতে লাগল খচ খচ করে।

সেন্টিমেন্ট—ছোট্ট একটুকরো সেন্টিমেন্ট। বাংলাদেশ থেকে সাড়ে পাঁচশো মাইল দূরের এই শহরে একটি বাঙালীর মেয়ে বাঁচবার জন্যে বীভৎসতম অপমানের পথ বেছে নিয়েছে, এইটেকে কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। অহেতুক বাঙালী-প্রীতি বসন্তর নেই—ইহুদী-সদৃক্তির মতো বঙ্গ সন্তান যে ভারতের লবণ একথাও সে কোনদিন ভাবে না। পাকিস্তানের হিসেব বাদ দিয়ে আন্দাজ কোটি তিনেক বাঙালীর দায়িত্ব নেবার কথাও সে কল্পনা করে না। তবু বসন্তর মনে হল, একটা ছোট্ট কাঁটা কোনো-মতেই নামতে চাইছে না। মেয়েটি বাঙালী না হলেই ভালো হত।

লেমন স্কোয়াশের আধখানা ঠেলে রেখে পয়সা মিটিয়ে বসন্ত উঠে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে এলোমেলোভাবে এগিয়ে চলল একজিবিশনের ভেতর।

ভিড়, অসম্ভব ভিড়। কাপড়ের স্টলে, টয় শপে, চায়না সেটের দোকানে, কিউ-রিয়োতে, এমন কি বইয়ের দোকানে পর্যন্ত। শুধু একটা ছবির দোকানে দাঁড়াবার জায়গা আছে। একবার চোখ পড়তেই বোঝা গেল কারণটা। কলকাতার ওয়েলেসলির একটি ছোট্ট দোকানকে যেন কে এখানে এনে বসিয়ে দিয়েছে অত্যন্ত বেমানানভাবে। স্টলটি নিয়েছে কোনো ভক্ত ক্রীশ্চান। মেরীর কোলে জ্যোতির্ময় শিশু খৃষ্ট থেকে গোলগোথার ক্রসে বেঁধা যন্ত্রণাজর্জর মানুষটি পর্যন্ত কেউ বাদ নেই।

রক্তাক্ত শরীর, ক্রসের ওপর এলিয়ে পড়া মাথা, আধবোজা চোখ, মুখে শিশুর মতো কাতরতা—খৃষ্টের ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বসন্ত। কোনো মাস্টার আর্টিস্টের ছবির নকলের নকল, তারও নকল। তবু যন্ত্রণাটা কী বাস্তব—ছবিটা কী জীবন্ত! আশ্চর্য, খৃষ্টের ওই ছবিটা মনের সামনে রেখে কিভাবে নরহত্যা করতে পারে ইয়োরোপের মানুষ।

ছোটোখাটো চেহারার মাঝবয়েসী স্টল-ওয়ালা এগিয়ে এল বসন্তর কাছে। শান্ত গলায়, দক্ষিণী ইংরিজী উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করল: নেবেন কোনো ছবি? আরো ভালো ভালো জিনিস আছে আমার কাছে।

—না ধন্যবাদ, এমনি দেখছিলুম।

—বেশ, বেশ দেখুন। নেভার মাইন্ড।

স্টলওয়ালা ফিরে আবার তার কাঠের টুলে গিয়ে বসল, পকেট থেকে কালো চামড়ার বাঁধানো একটা বই বের করে পড়তে আরম্ভ করল একমনে। বসন্ত লক্ষ্য করল, সরু কারের সঙ্গে একটা ছোট্ট রুপোর ক্রস ঝুলছে তার বুকের ওপর।

—এই যে, ছবি দেখছেন?

বসন্ত পেছন ফিরল। সেই মেয়েটি। খৃষ্টের এই ছবি, বাইবেলের মধ্যে ডুবে যাওয়া ওই মানুষটি, ম্যাডোনা-ডেল-গ্র্যাণ্ডুকার অমৃতবর্ষিণী চোখ—সব মিলিয়ে চমৎকার একটা ভাবমণ্ডল তৈরি হচ্ছিল বসন্তর মনে। হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল, কেমন অশুচি হয়ে উঠল সমস্ত।

—তুমি এখানে এসেও জুটেছ?—একটু আগেকার সহানুভূতি ভুলে গিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করল।

—কেন—আসতে নেই? একজিবিশনের স্টল তো সকলের জন্যেই।—অদ্ভুত নির্লজ্জ মেয়েটা।

দোকানদার বাংলা বোঝে না জেনেই বসন্ত বললে, না, সব জায়গা সকলের জন্যে নয়। অন্তত যীশু খ্রীষ্টের কাছে তুমি এসে না দাঁড়ালেই ভালো হয়।

—তাই নাকি? —বাঘিনী-রক্ত ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসল মেয়েটা: খ্রীষ্ট নিজে বোধ হয় অন্য কথা বলতেন।

বসন্ত চমকে উঠল। ঠিক এমনি একটা জবাব সে আশা করেনি।

—হুঁ, বেশ কথা বলতে পারো দেখা যাচ্ছে। —স্টল থেকে বেরিয়ে এল বসন্ত: লেখাপড়াও বোধ হয় কিছু জানো। এ পথে পা দিলে কেন?

মেয়েটিও এসেছিল পেছনে পেছনে। সামনের দোকান থেকে এক ঝলক নীল আলো তার মুখে এসে পড়েছে। সে আলোয় বসন্ত বাঘিনীকে দেখতে পেল না—অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত দেখালো মেয়েটার চেহারা। বসন্তর জীবনে প্রথম আর শেষ প্রেম নিয়ে যে এসেছিল, বর্ষার এক-একটা ছায়ামন্থর দিনে এমনি দেখাতো তার মুখ।

মুহূর্তের জন্যে কোমল হতে পারত বসন্তর মন, একবার বলে ফেলতে পারত: এ পথ ছেড়ে দিয়ে তুমি নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করো, আমি তোমাকে সাহায্য করব—কিন্তু সে কথা বলবার সুযোগ সে আর পেলো না। তার আগেই মেয়েটা বললে, তা শুনে আপনার লাভ কী? তার চেয়ে সামনে ওই যে নাগরদোলা ঘুরছে—ওইটেতে কিছুক্ষণ চড়বেন আমার সঙ্গে?

আবার—আবার সেই হিংস্র ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল বসন্তর মাথার মধ্যে। ইচ্ছে করল সোজা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে।

—চুলোয় যাও—

একটা চাপা গর্জন করে এগিয়ে গেল বসন্ত। পেছনে মেয়েটার হাসির আওয়াজ। ঠাট্টা করছে। সেই পাঁচ টাকা দিতে চাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে এইভাবে।

—উইচ!—

পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

আবার ইতস্তত! কোনো লক্ষ্য নেই—কোনো কাজ নেই। অনেক ঘুরে ঘুরে কিনল একটা শৌখিন লাইটার আর চার চার টাকা দিয়ে একটা বিলিতি টাব সোপ। সাবানটা কেন কিনল সে নিজেই জানে না। কলকাতার বাড়িতে উঠোনের খোলা কলেই তার চিরদিন স্নান করবার অভ্যাস। হয়তো একটা সাবানের দাম চার টাকা—এইটেই তার কৌতূহল জাগিয়েছিল, কিংবা রঙিন মোড়কটাও ভালো লেগে থাকবে।

এক জায়গায় অ্যাম্পিলফায়ারে রক-এন-রোলের হিন্দী সংস্করণ বাজছে। এমনিতেই বস্তুটা তার কুৎসিত লাগে—তার ওপর ওই বোম্বাই রূপান্তর শুনে গা ঘিন ঘিন করে উঠল। আশপাশের কয়েকজন এর মধ্যেই পা ঠুকছে—একটু পরেই বোধ হয় নাচতে আরম্ভ করবে। সে দুর্ঘটনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হল না বসন্ত। ক্যানাডিয়ান শার্ট রক-এন-রোল হিন্দী সিনেমার পোস্টার "মদর ইণ্ডিয়া।" তিনটে মিলিয়ে একটা যোগসূত্র। ইমপ্রেশ্যানিজম!

তার চাইতে সামনের ওই ক্লাউনটাই ভালো।

একটা উঁচু টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পরনে কালো ডিনার সুট—অবশ্য জরাজীর্ণ। গলায় চড়া সবুজ রঙের একটা বেমানান টাই। মাথায় আধভাঙা শোলা হ্যাট। চিত্র-বিচিত্র মুখ—হাতে টিনের চোঙা। সেই চোঙার ভেতর দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে লোক ডাকছে।

'দি গ্রেট অরিয়েণ্টাল সার্কাস: টিকেট টু অ্যানাজ—লায়ন টাইগার—বিউটি প্যারেড—টু অ্যানাজ—অনলি টু অ্যানাজ—'

সবটা মিলিয়ে বসন্তের মনে হল, অরিয়েণ্টাল সার্কাসই বটে। একটা নয়—অসংখ্য ক্লাউন। আর লায়ন টাইগারের বিউটি প্যারেড। আর সেই মেয়েটা!

কী আশ্চর্য, কিছুতেই ভুলতে পারছে না! নিজের ওপরেই তার বিরক্তি বোধ হল। সেই বাঙালী সেণ্টিমেণ্ট। কিন্তু কোনো মানে হয়? আরো বিশেষ করে ওই মেয়েটার সম্পর্কে?

দু আনা খরচ করে ঢুকেই পড়বে কি না ভাবতে ভাবতে আবার সেই রক্-এন-রোল! এখানেও? অসহ্য।

ঘুরতে ঘুরতে নাগরদোলাটার সামনে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।

সেই মেয়েটাই।

দোলনাটা থেমে আসছে আস্তে আস্তে। আর একই দোলায় মেয়েটি বসে আছে বাইশ-তেইশ বছরের কাপ্তান চেহারার একটি ছোকরার সঙ্গে। আর দুজনেই হাসছে। হাসছে অশ্লীল খুশীতে। শিকার ধরেছে বাঘিনী।

চলে যেতে গিয়েও পারল না বসন্ত। কোনো কারণ নেই—কোনো প্রয়োজন নেই—তবু তার সারা শরীর জ্বালা করে উঠল।

মেয়েটা যদি বাঙালী না হত—

হিংস্র দৃষ্টি মেলে বসন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

দোলনা থেকে নামল দুজনে। ছোকরা কী যেন বললে মেয়েটাকে—মেয়েটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ রাজী হল না। ছোকরা একটা শিস্ দিলে, চোখের কুৎসিত ভঙ্গি করলে একবার, তারপর সরে গেল সেখান থেকে।

বসন্ত এগিয়ে গেল এবার।

—শোনো।

এবারে মেয়েটার চমকাবার পালা।

—আপনি?

বসন্তর গায়ে তখনো জ্বলছিল আগুনটা।

—এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? —তুলিতে আঁকা ভ্রূদুটো বিস্ময়ে প্রসারিত হয়ে গেল।

অন্য সময় হলে এ ধরনের ছেলেমানুষি বসন্ত ভাবতেও পারত না। কিন্তু এই খেয়াল খুশির রাত, একজিবিশনের আলো, এই মানুষ আর গন্ধের ভিড়—ওই ছোকরাটা সব মিলিয়ে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার মনে হল: এই মেয়েটার জন্যে এখুনি তার কিছু করা উচিত—এই মুহূর্তেই। একেবারে রসাতলে ডুবে যাওয়ার আগেই তার কিছু কর্তব্য আছে।

—এসো—

স্পষ্ট আদেশের সুর। কিছুক্ষণ বিহ্বল-ভাবে মেয়েটা তাকিয়ে রইল বসন্তর দিকে। তারপর হাসল মৃদু রেখায়।

—চলুন—

—বোসো এইখানে—আবার আদেশ করল বসন্ত।

আলোয় ঝিল্‌মিল করছে ছোট লেকের জলটা। সেই আলোয় রাত্রির ঘুমন্ত পদ্ম-গুলো যেন থেকে থেকে চমকে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় ঝাউয়ের শুকনো ফল ঝরছে জলের ওপর—শিশির পড়ার মতো আওয়াজ হচ্ছে। এখানেও ভিড় খুব বেশি নয়।

স্টলের আলোর নেশা কাটিয়ে এখানে আসতে ইচ্ছে করে না সহজে।

তবু দু চারজন আছে এদিকে ওদিকে। প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায়। সিগারেট জ্বলছে, সিগার জ্বলছে। আলোর ঝলক-লাগা জলে চমকে জেগে ওঠা পদ্মগুলোও যেন ফিস ফিস করে কথা কইছে।

ঝাউ গাছের নীচে, কর্কশ খানিকটা শীর্ণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল দুজনেই। ঠিক পাশাপাশি নয়—অনেকখানিই দূরত্ব রাখল বসন্ত।

—কী নাম তোমার?

—কী করবেন শুনে? —আবছা অন্ধকারে, আবার সুন্দর হয়ে গেছে মেয়েটা। ঠোঁটের রক্ত লেখা, কুটিল তীক্ষ্ণ চোখ—কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন।

—বলতে আপত্তি আছে?

—না, নেই। নাম এক সময় চম্পা ছিল। এখন চাঁপা।

চম্পা থেকে চাঁপা। অর্থটা খুব সহজ। ভদ্র জীবনের চিহ্নও রাখব না। সবই যখন বদলেছে, তখন নামটাও 'ভালগার' করে নেওয়াই ভালো। বসন্ত ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—বাড়ি কোথায় ছিল তোমার?

—বুঝতেই পারছেন এক সময়ে বাংলা-দেশে ছিল। কিন্তু এখন আর সে কথা জিজ্ঞেস করে লাভ কী? —চাঁপা হাসল ঃ একটা সিগারেট খাওয়াবেন?

নির্লজ্জ, বীভৎস রকমের নির্লজ্জ মেয়েটা। বসন্তর মনে হল পণ্ডশ্রম করছে সে। একে উদ্ধার করবার শক্তি দেবতার নেই।

—দেবেন একটা সিগারেট?

নিঃশব্দে সিগারেট এগিয়ে দিলে বসন্ত, আর দেশলাই। বারুদের স্বল্পায়ু আগুনে আবার বাঘিনীর মুখ দীপিত হল। ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিলে বসন্ত।

—লেখাপড়াও তো কিছু জানো বলে মনে হয়। জীবিকার কোনো ভদ্র পথ আর খুঁজে পেলে না? শেষকালে এই নরকের রাস্তায় নেমে এলে?

এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল চাঁপা। হেসেই উঠল খিলখিলিয়ে। অভ্যস্ত, নিষ্ঠুর, জান্তব হাসি।

—আমার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন আপনার? প্রেমে পড়ে গেছেন নাকি?

বসন্তর মুখের ওপর চাবুক পড়ল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

—রাগ করলেন? —নির্বিকারভাবে মেয়েটা আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল ঃ প্রেমে যদি নাই পড়বেন, তা হলে আর একজনের সঙ্গে আমাকে ভাব জমাতে দেখে কেন ডেকে আনলেন এখানে? জেলাসি—কী বলেন?

বসন্ত চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু গেল না। একটা দানবিক ইচ্ছায় তার মাথার প্রত্যেকটা কোষ আগ্নেয় হয়ে উঠল।

মেয়েটার গলা টিপে ধরে শেষ করে দিলে কেমন হয়?

সাপের মতো তীব্র একটা চাপা গর্জন করে বসন্ত বললে, তোমাকে পুলিসে দেব।

আশ্চর্য দুঃসাহস মেয়েটার—বসন্তর হাত ধরে টানল। শিউরে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল বসন্ত, পারল না। কৌতুক মেশানো গলায় চাঁপা বললে, পারবেন না—পারলে অনেক আগেই পুলিসে দিতেন। কেন রাগ করছেন ছেলেমানুষের মতো? বসুন একটুখানি।

কেন জানে না, বসন্ত আবার বসে পড়ল। হয়তো চাঁপার স্পর্ধার শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে চায়, হয়তো সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে যখন ওর গলা টিপে খুন ক'রে এই লেকের জলের মধ্যে ফেলে দেবে। উত্তেজনায় যে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল, আর চাঁপা সিগারেট টেনে চলল নিঃশব্দে।

শিশির-ঝরার মতো টুপ টুপ করে ঝরছে শুকনো ঝাউয়ের ফল। লেকের কালো জলে আলোর ঝিলিমিলি। ঘুমন্ত পদ্মবন চমকে জেগে উঠে এ ওর সঙ্গে ফিসফিসে গলায় কথা কইছে। অনেক দূর থেকে অ্যাম্‌প্লিফায়ারে ভেসে আসছে রক-এন-রোলের সুর। লেক পেরিয়ে বসন্তের দৃষ্টি চলে গেল দূরের দিকে। দুদিকে বাহু মেলে দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নত একটা কালো পাহাড়—যেন আকাশ জোড়া একটা বিশাল ক্রুসে এলিয়ে আছে মরণাহত খৃষ্টের মূর্তি। কালপুরুষ নেমে এসেছে তার ওপর—যেন কণ্টক মুকুটের রক্তাক্ত বৃত্তরেখা।

বসন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

চাঁপাই কথা বলল আবার। তারও দৃষ্টি বোধ হয় রাত্রির আকাশে গিয়ে পৌঁছেছিল। একজিবিশনের এই আলোর সীমা ছাড়িয়ে কেনা-বেচা-লোভ-লালসা-লঘুতার এই সিগার-সিগারেট-ধুলো-প্রসাধনের পরিবেশ পার হয়ে, সেও ওই দূরের পাহাড়টার একটা গভীর বিশাল অর্থ খুঁজে পেয়েছিল, ওই কালপুরুষের জ্যোতির্বিন্দুগুলো তারও কাছে কিসের একটা ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছিল। সিগারেটটাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাঁপা বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন, ভারী রাগ হয়েছিল আপনার অহঙ্কার দেখে।

—অহঙ্কার কখন করলাম?

—করেননি? গেটটা পার করে দিলেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে যাচ্ছি, যা-তা বলে চলে গেলেন। আবার ভিক্ষে দিতে চাইলেন তার ওপর। রাগ হয় না?

এবার গলার স্বর অন্য রকম। অভি-মানের রেশ।

—কেন এলাম এই রাস্তায়? ইচ্ছে করে কেউ আসে? কাকার সংসারে থাকতাম। দুবার আই এ ফেল করবার পরে এমন অবস্থা কাকিমা সৃষ্টি করলেন যে গলায় দড়ি দেবার কথা মনে হল। কিন্তু গলায় দড়ি দেওয়ার চাইতে বাড়ি থেকে পালানো সোজা। রূপ ছিল শুনেছি, ভাবলাম বম্বে গিয়ে ফিল্মে নামব। নাগপুরেই দুটি সঙ্গী জুটল—তারা নাকি ফিল্মেরই লোক। তারপর—

চাঁপা একবার থামল।

—তারপর পুরো দেড় বছর কাটিয়েছি তাদের হাতে। ফিল্মই বটে! প্রতি রাত্রে মাতাল পশুদের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছি, আর প্রায় দু' মাস ধরে তারা চাবুক মেরে আমাকে অভিনয়ের মহলা শিখিয়েছে। দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি, চারদিকে পাহারা, তিন চারটে কুকুর। দেড় বছর পরে যখন পালাবার সুযোগ এল, তখন দেখলাম, নায়িকার পার্টেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর কিছুই আমার করবার নেই।

বসন্ত আবার তাকালো আকাশের দিকে। ক্রুসে বেঁধা খৃষ্টের মূর্তি। কাঁটার মুকুটের মতো রক্তাক্ত কালপুরুষ। দুটো ক্ষীণদীপ্ত আলো কখন জ্বলে উঠল পাহাড়ের ওপর? খৃষ্টের দুটি করুণাঘন চোখ কি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল?

বসন্ত আস্তে আস্তে বললে, এখন কি ফেরা যায় না?

—না।

—চাকরি-বাকরি তো করতে পারো। লেখাপড়া যা জানো, তাতে তো কোনো কাজ জুটিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়।

—হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু রোজ রোজ মনিব বদলে যার অভ্যেস হয়ে গেছে—বাঁধা মনিবের চাকরি তার পোষাবে না।

বসন্তর কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। এই মেয়েকে কি বাঁচানো চলে? বাঁচানো সম্ভব?

—কেউ যদি তোমায় বিয়ে করে? ঘরে নিয়ে যায়?

আবার সব সুর কেটে গেল। রক্-এন্-রোলের একটা প্রচন্ড উচ্ছ্বাস ভেসে এল হাওয়ায়। সেই তীক্ষ্ণ আদিম হাসিতে ভেঙে পড়ল চম্পা, দু হাতে কান চেপে ধরতে চাইল বসন্ত। খ্রীষ্টের মূর্তিটা হারিয়ে গেল পাথুরে অন্ধকারের মধ্যে।

—সেও বাঁধা মনিবের চাকরি! —চাঁপার হাসি থেকে তিল তিল করে বিষ ঝরে পড়তে লাগল: তবু এক সময় তারই জন্যে ছেলে-মানুষের মতো পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আপনার আগে আরো আরো অন্তত তিন-জন ঠিক এই কথা আমাকে বলেছে, সুখে আর অনুতাপে, আশায় আর যন্ত্রণায় রাতের পর রাত চোখের জল ফেলেছি আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ওপর থেকে নেশা কেটে গেলে তিনজনের একজনও আর ফিরে আসেনি।

গানের আওয়াজটা আবার ফিকে হয়ে গেল। শিশির পড়ার মতো ঝাউয়ের শুকনো ফল ঝরছে। আলোর চমক লাগা পদ্মবনে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, জলের কান্না। অন্ধকারের আবরণ সরিয়ে করুণা-বিষণ্ণ সেই দুটি চোখ গ্লানি-জর্জর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

কারো মুখে কথা নেই।

বসন্ত সিগারেট কেস বের করল: নেবে?

—না, ধন্যবাদ। আর নয়।

এবার নিজেই সিগারেট ধরালো বসন্ত। কী একটা ভাবছে—শক্তি সঞ্চয় করে নিতে চাইছে নিজের ভেতরে।

—চতুর্থ জনকে বিশ্বাস করতে পারো?

—কে—আপনি?

হেসে উঠতে গিয়েও হাসতে পারল না চম্পা। কেঁদে ফেলল হু হু করে।

বসন্ত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল না। কোনো অর্থ হয় না ভালো কথা বলবার। চম্পা কেঁদে চলল, বসন্ত পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল দূরের দিকে। আকাশ, রাত্রি, নক্ষত্র, পাহাড়—সব কিছুই যেন অপরিসীম বেদনায় গভীর নির্বাক হয়ে আছে। একরাশ সঞ্চিত কান্নার মতো ছল-ছল করছে লেকের জলটা।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট। চম্পা কেঁদে চলল।

আবার স্টলের সারি। সাত রঙ আলোয় চোখের যন্ত্রণা। ঘুরন্ত নাগরদোলা। ভিড়। সিগার-সিগারেট-ধুলো-প্রসাধনের গন্ধ। দি গ্রেট অরিয়েণ্টাল সার্কাস। 'টু অ্যানাজ—অনলি টু অ্যানাজ! লায়ন টাইগার-বিউটি প্যারেড'—

কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে? —চম্পার স্বর এখনও কান্নায় ভেজা: আপনার বাড়িতে?

—বাড়ি এখানে কোথায়? বসন্ত হাসল: আমি টুরিস্ট—সাতদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। তোমাকে আমার হোটেলে নিয়ে যাব।

—তারপর?

—তারপর কাল কলকাতায় নিয়ে যাব। সেখানে পৌঁছে পরের দিন যাব রেজিস্ট্রি অফিসে।

চম্পার পা থেমে এল।

—আত্মীয় স্বজন নেই আপনার? সমাজ?

মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হল বসন্তর মুখ। বাবা মা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্ত আর ভাবা চলে না। দাম হয়তো কিছু দিতেই হবে। তবু ভয় করবে না বসন্ত। অন্ধকার আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেদনায় জর্জর, করুণায় বিষণ্ণ একটা বিশাল মূর্তি তাকে আশ্বাস দিয়েছে।

—না, সে ভাবনা আমার নেই।

নিজের অজ্ঞাতেই বসন্ত একবার চম্পার একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর ভেতরে। ভীরু চড়াই পাখির বুকের মতো কাঁপছে হাতখানা, ঘামে ভিজে উঠেছে। বসন্ত ওই ভিড়ের মধ্যেও চম্পার কানের কাছে মাথা নামিয়ে একান্ত হয়ে উঠল: না—আমার সে ভাবনা নেই।

আর ঠিক তখনই সমস্ত সুর, সমস্ত গান, সমস্ত উৎসব একটা ঘূর্ণির মধ্যে হারিয়ে গেল যেন। মুহূর্তে একজিবিশনের হাজার আলোর দীপালি দপ করে নিভে গেল, আছড়ে পড়ল অন্ধকারের আকাশজোড়া ঢেউ আর সেই সঙ্গে মানুষের বিকৃত গলায় অমানুষিক চিৎকার ফেটে পড়ল: ফায়ার-ফায়ার—আগ লাগা হ্যায়—অকস্মাৎ আলো নিভে যাওয়ার অবিশ্বাস্য অন্ধকারে, প্রাণ বাঁচানোর আদিমতম প্রেরণায়, একজিবিশনের কয়েক হাজার লোক তখন অন্ধের মতো গেটের দিকে ছুটেছে। পেছন থেকে মেয়েদের আর্তনাদ, শিশুর কান্না আর পুরুষের গর্জনের একটা ছুটন্ত অতিকায় দেওয়াল ওদের দুজনের ওপরে এসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বসন্তর মুঠি থেকে খুলে গেল চম্পার হাত, স্পষ্ট অনুভব করল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে চম্পা।

—মা—মাগো—

—চম্পা—

চিৎকার করে চম্পাকে তুলতে গেল বসন্ত—কিন্তু পারল না। পেছনের ভিড় তখন তাকে স্রোতের কুটোর মতো ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার উলটো মুখে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে হাজার হাজার পায়ের তলায় সে মুহূর্তে পিষে যাবে।

পারল না বসন্ত—কিছুতেই পারল না। ওদিকে কয়েকটা আগুনের শিখা ফণা তুলেছে তখন, মৃদু পিঙ্গল আলোয় আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সব, মানুষের পালানর চেষ্টা আরো ক্ষিপ্ত, আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে, পায়ের তলায় মানুষ মাড়াতে মাড়াতে সে নিজেও কখন আদিম প্রেরণার সঙ্গে মিশে গেল। ওই পিঙ্গল আলোটা রুদ্র ভ্রূকুটি করে তাকে বলতে লাগল: পালাও—বাঁচতে হলে এখনো পালাও—

বসন্ত পালাতে লাগল।

গেটের বাইরে যখন এসে দাঁড়াল, তখন গায়ের শার্ট টুকরো টুকরো, পায়ের জুতোর চিহ্ন নেই। চার দিকে ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার, আত্মীয়স্বজনের নাম ধরে বুকফাটা ডাকাডাকি, মাটিতে আছড়েপড়া একটি মা: মেরী বেটি—মেরী মুন্নি—

ফায়ার ব্রিগেড এসে পড়েছে। আর এক্-জিবিশনের একটা অংশ হু হু করে জ্বলছে তখন। পিঙ্গল প্রেতদীপ্তি নয়—রক্ত-আলোর চিতা জ্বলে উঠেছে সারি সারি।

চম্পা!

এমনভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল বসন্ত যে মনে হল মাংসের ভেতরে তার দাঁত বসে যাবে। এর মধ্যে আর কি খোঁজা যায় চম্পাকে? খোঁজবার অর্থ হয় কোনো?

ভালোই হল—হয়তো অবচেতন মনে এমনি একটা কামনাই করেছিল বসন্ত। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি সাহস হত তার? চম্পার জীবনের তিনজন পুরুষের মতো চতুর্থ পুরুষও যে তাকে বঞ্চনা করত না এ-কথা কি জোর করে বলতে পারে সে?

টলতে টলতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল বসন্ত—একটা বিভ্রান্ত মাতালের মতো। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা—পাহাড়টাকে আর দেখা যাচ্ছে না, অতল নিশ্ছিদ্র অন্ধ-কারে আকাশ জোড়া মূর্তিটা কোথায় মিলিয়ে গেছে।

আর পেছনের উজ্জ্বলন্ত আগুনে ছবির স্টলটা হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এত-ক্ষণে—পুড়ে যাচ্ছে ম্যাডোনা-ডেল্-গ্র্যাণ্ডুকা থেকে ক্রসবিদ্ধ খ্রীষ্ট পর্যন্ত।

# ভারতীয় লোকনৃত্য

## শান্তিদেব ঘোষ

অনেকদিন থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানাপ্রকার লোকনৃত্য দেখা ও অনুশীলনের সুযোগ যেমন পেয়েছি, তেমনি গত কয়েক বছর যাবৎ দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে অনুষ্ঠিত গ্রামবাসীদের দলবন্ধ লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে যোগদানের সুযোগও আমার ঘটেছে। এ নাচের প্রকৃত স্বরূপ বা এর ধর্মটি যে কি, তা অনুধাবন করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। বিচারকের দৃষ্টিতে ঐসব লোকনৃত্যগুলি দেখতে গিয়ে বারে বারেই মনে হয়েছে যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শত শত নাচের মধ্যে নৃত্যভঙ্গিমায়, ছন্দে, গানে, বাদ্যযন্ত্রে, সাজেপোশাকে যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য প্রকাশ পায়, তার মধ্যে কাউকে শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে বিচার করা বড় কঠিন কাজ। লক্ষ্য করেছি যে, কাথিয়াবাড়ের রাস-নৃত্যের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব প্রান্তের নাগা সম্প্রদায়ের নাচের যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, এই দুই দেশের লোকনৃত্যে বিরাট পার্থক্য। সাধারণ দর্শকের মনে হবে রাস-নৃত্য তুলনায় উৎকৃষ্ট। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাদের নাচের মধ্যে যে সহজ ও সরল ছন্দময় একটি মাধুর্য রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়। এ নাচের সাজে-পোশাকে ও ভঙ্গিতে এমন একটি রস প্রকাশ পায়, যা রসিক দর্শকের মনকে অবশ্যই আকৃষ্ট করবে।

বাহ্যিক সাজসজ্জায় ও নৃত্যভঙ্গীতে যতই পার্থক্য থাকুক, কতগুলি মূল ধর্মের উপর ভারতের যাবতীয় দলবন্ধ লোকনৃত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত। সেই ধর্মটি যদি ঠিকমত বুঝে নিতে পারা যায়, তাহলে বাহ্যিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে ভাল-মন্দের সঠিক বিচার করা একেবারে অসম্ভব নয়। এছাড়া অন্য পথে বিচার করতে গেলে নানাপ্রকারের সমস্যার উদ্ভব হতে বাধ্য।

দলবন্ধ লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যে আমি নিম্নোক্ত সাতটি মূল সূত্রের উপর সেগুলিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি।

১। ভারতীয় লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষ ও বিরাট স্থান জুড়ে আছে দলবন্ধ সামাজিক নৃত্যগুলি। এ নাচ পেশাদারী

বাংলার লোকনৃত্যশিল্পীর অদ্ভুত পোশাক

নাচ নয়। পেশাদারী নাচের উদ্দেশ্য হ'ল অন্যকে আনন্দ দেওয়া। অর্থাৎ মজুরো নিয়ে দর্শকের চিত্তবিনোদন করা। দলবন্ধ লোকনৃত্য একথা একেবারেই ভাবে না। অন্যান্য শিল্পকলার প্রয়োজন যেমন সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্য, গ্রামের সামাজিক দলবন্ধ নাচও গড়ে উঠেছে যুগে যুগে আপনা থেকে সমাজের সেই একই উদ্দেশ্যে। তাই এর নাচিয়েরা সমাজের অন্যদের আনন্দদানের চেয়েও নিজেদের আনন্দের কথাটাই সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চে স্থান দেয়। অর্থাৎ নিজে এই নাচে অন্যদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠবে, এই হল এইসব নাচের প্রধান উদ্দেশ্য এবং দলবন্ধ সামাজিক নাচের উৎপত্তির মূল কারণও হল এই। বাইরে থেকে দর্শক হিসেবে এইসব দেখে আমরা সবচেয়ে মুগ্ধ হই তখন, যখন দেখি সমগ্র নৃত্যদল নাচের ছন্দে ও দোলায় গভীর আনন্দে ডুবে গেছে।

২। দলবন্ধ লোকনৃত্য হল আসলে একতার বা ঐক্যের নাচ। এক ছন্দে, এক সঙ্গে, এক ভঙ্গীতে অনেকের মিলনের নাচ। নাচের সময় সকলের মন ঐক্যবোধের এমন একটি আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বাইরে থেকে দর্শক তখনি সেই আনন্দের সন্ধান পাবে, যখন সে নাচিয়েদের মত ছন্দরসের গভীরে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু দর্শক হিসেবে তা অনুভব করা খুবই কঠিন। অত্যন্ত অনুভূতিশীল রসিক-মন ছাড়া তা সম্ভব নয়।

কাথিয়াবারের পুরুষদের কাঠি হাতে দলবন্ধ নৃত্য

দলবন্ধ নাচের নাচিয়েরা গ্রামের নানা বয়সের, নানাপ্রকার ভিন্নমুখী মনোবৃত্তির নরনারী। কিন্তু নাচের সময় মনের ও দেহের সেই ভিন্নতা দূরে হয়ে যায়। নিজেদের ভিতরকার ভেদাভেদের চিন্তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। সবাই তখন হয়ে ওঠে এক প্রাণ, এক মন। একতার এই আবহাওয়াটিই হল দলবন্ধ নাচের একটি অমূল্য সম্পদ। এই সময় যদি দেখা যায়, একজন নাচিয়ে দলের মধ্যে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে, যার দ্বারা নাচের ঐ একতার আদর্শটি খর্ব হচ্ছে, তখন বলতেই হবে যে, সে উৎকৃষ্ট নাচিয়ে হলেও দলের অনুপযুক্ত। যদি দেখা যায় তার নাচের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা উদ্দেশ্যটি সার্থক হতে চলেছে, তখন তা মার্জনীয়। সুতরাং দলবন্ধ লোকনৃত্যে একতার উদ্দেশ্যটিকে লক্ষ্য রেখেই আঙ্গিকের উৎকর্ষতার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৩। ছন্দের গতি এ নাচের একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক। নাচ আরম্ভ যে লয়েই হোক না কেন, ক্রমশ সেই ছন্দের গতি বাড়বে। কিন্তু গতির এই পরিবর্তন এমন সহজ ও অনায়াসে ঘটে যে, নাচের সময় নাচিয়েরা কেউ তা অনুভব করে না। বাইরের থেকে দেখে কিছুটা বোঝা যায়। দ্রুত ছন্দের গতির সময় নাচিয়েদের যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম হয়। কিন্তু সে পরিশ্রমের কথা তখন তাদের মনেই থাকে না। তখন দেহ-মনে জাগে নাচের ছন্দে একটি প্রবল উন্মাদনা। সেই উন্মাদনাই এনে দেয় এক অলৌকিক শক্তি, যা সাধারণ অবস্থায় কেউ ভাবতেই পারে না। লোক-নৃত্যের এই গতির পরিবর্তন যখনই নাচিয়েরা বারে বারে অনুভব করছে, তখনই ধরে নিতে হবে যে নাচে কোথাও ত্রুটি ঘটেছে। দলবন্ধ এক-একটি নাচে কয়েকটি মাত্র ভঙ্গি ও পদচালনায় পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। ইদানীং দিল্লীর লোকনৃত্য উৎসবে লক্ষ্য করেছি নূতনত্ব দেখাবার উৎসাহে ভঙ্গি ও পদচালনায় বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা। কিন্তু দেখেছি, সে চেষ্টা সমগ্রভাবে নাচের সহজ গতির বাধা সৃষ্টি করছে। যতক্ষণ না সে নূতনত্ব মূলে নাচের গতির সঙ্গে সহজভাবে মিশে যেতে পারছে, ততক্ষণ সে ভঙ্গি ভাল হলেও তা দোষের বলে গণ্য হবে।

৪। ভারতবর্ষের লোকনৃত্যের বৃহৎ অংশ অনুষ্ঠিত হয় গান ও তালবাদ্যের সম্মিলনে। আবার শুধু তালবাদ্যেরও নাচ আছে। এ ছাড়া তালবাদ্যের সঙ্গে বাঁশি, সানাই, শিঙ্গা জাতীয় নানা যন্ত্রের সমবায়েও নাচতে দেখেছি। এমনও নাচ দেখেছি যেখানে গান বা তালবাদ্য বলতে কিছুই নেই। কেবল মুখে ছন্দবহুল কতগুলি শব্দের সাহায্যে নাচছে।

কাশ্মীরী পুরুষদের লোকনৃত্য

গানের সঙ্গে যেখানে দলবন্ধ নাচ চলে, সেখানে সে-গানের সুরে আছে সাধারণ লোকগীতির করুণ মাধুর্য। গানের ছন্দও নৃত্যের ছন্দের অনুকূল। অর্থাৎ নাচের ছন্দের সঙ্গে সমান-ভাবে গানের ছন্দ বাড়তে থাকে। বাঁশি, সানাইয়ের সুরের নাচের বেলায়ও একই নিয়ম। অত্যন্ত হিমালয়ের গানের সঙ্গে দল-বন্ধ লোকনৃত্য এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। সাধারণত দলবন্ধ এই সব নাচের জন্যে আলাদা করে গানের দল থাকে না। গান গায় সমবেত কণ্ঠে নাচিয়েরা নাচতে নাচতে বাজনার তালে মিলিয়ে।

গানের ভাবের সঙ্গে দলবন্ধ লোকনৃত্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না। অর্থাৎ গানের কথায় যে অর্থই প্রকাশ পাক না কেন, নাচিয়েরা নাচের ভিতর দিয়ে কথাকলি, ভারতনাট্যম বা কথকের মত ভাবের অভিনয় দ্বারা তার অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করে না। একমাত্র লক্ষ্য থাকে গানের ও বাজনার ছন্দের সঙ্গে নিজেদের দেহভঙ্গির ছন্দকে মিলিয়ে নেবার। এই সব গানের কলির পর কলিতে কথা বদলে যাচ্ছে,

নাগা পুরুষদের দলবন্ধ নৃত্য

উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলবাসী নারীপুরুষ সম্মিলিত নৃত্য

কিন্তু সুরের বদল হয় না। নাচেও ঠিক তাই। ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই এই সব নাচে গানের সুরের মত।

৫। নাচিয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও বিশেষ একটা আদর্শ ধরে রচিত।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের পরিচ্ছদে আমরা লক্ষ্য করি সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাব ও সেই অঞ্চলে যা সহজে উৎপন্ন হয় বা পাওয়া যায় তা দিয়েই সেগুলি তৈরী। এই কারণেই ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী-দের মধ্যে পরিচ্ছদের এত পার্থক্য। নাচের সময় সেই পরিচ্ছদেরই একটি শোভন ও সুন্দর সংস্করণ নাচিয়েদের দেহে আমরা দেখতে পাই। এগুলি তারা নিজেরাই তৈরী করে নেয় তাদের সামর্থ্য মত উৎসব দিনের পোশাক হিসেবে। গায়ের জামা, পরনের কাপড় বা শাড়ি, উড়নি বা চাদর, মাথার পাগড়ি, ঘাগরা, জ্যাকেট ও নানাপ্রকার গয়না সবই বিচিত্র রঙে ও নক্সায় নতুন রূপ গ্রহণ করে। প্রতিদিনের কর্মজীবনে তারা যে পরিচ্ছদ বা গয়না ব্যবহার করে নাচের দিনে তা পরে না।

গ্রামবাসীদের পরিচ্ছদ ও অলংকার ব্যবহারের মধ্যে আমরা পাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব একটি প্রাচীন সুন্দর রীতির পরিচয়। এখনো পর্যন্ত এরা তা ধরে রাখতে পেরেছে। এই সব সাজসজ্জার পিছনে বহু-কালের ভারতীয় শিল্পমনের একটি পরিষ্কার ছাপ প্রকাশ পায়। রঙের, গয়নার ও পরিচ্ছদের পরিমিত ও ছন্দময় ব্যবহারের যে পরিচয় তারা রেখে গেছে তা এযুগের শিক্ষিত শহরবাসী শিল্পীদেরও শিক্ষার বিষয়।

সাজ-পোশাকের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, নাচের ও নাচিয়ের দেহের সংগে সামঞ্জস্য রেখে তা তৈরী। সাজের অপরি-মিত ব্যবহারের দ্বারা দেহকে এমন কোন ভাবে ভারাক্রান্ত করতে দেখা যায় না, যাতে করে নাচের স্বাভাবিক গতির বাধা হতে পারে। গতির সংগে তা সহজেই খাপ খেয়েছে। কিন্তু ইদানীং শহরের শিক্ষিত শিল্পীদের প্রভাবে কোন কোন অঞ্চলের গ্রাম-বাসীরা নিজেদের এতদিনকার এই আদর্শ ত্যাগ করে, নতুনত্ব আনবার উৎসাহে নানা অনাবশ্যক রঙের কাপড়ে ও গয়নার ব্যবহারে নিজেদের এমনভাবে সাজায় যে, তার দ্বারা বেশ বোঝা যায়, তারা তাদের শিল্পরুচিকে অবনতির পথেই এগিয়ে দিচ্ছে। একথা তারাও যেমন বুঝতে পারছে না, শিক্ষিত শহরবাসী শিল্পীরাও নয়।

৬। দলবদ্ধ লোকনৃত্যের গতি হয় প্রধানত বৃত্তাকারের। তারপরে দেখা যায় সামনে এগিয়ে বা পিছিয়ে। আবার কখনো কখনো অনেকের সংগে এক জায়গায় জটলা করেও নাচে। কিন্তু এই তৃতীয় পদ্ধতির নাচ সংখ্যায় খুবই কম। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'কোরিয়োগ্রাফী' তার বৈচিত্র্য কোন একটি নাচের পদচালনায় বা ভংগিতে দেখা যায় না। অর্থাৎ যে নাচের গতি বৃত্তাকারে তাতে দুই সারিতে সামনে এগিয়ে পিছিয়ে বা সারি ভেঙে এলোমেলো নাচ কখনো দেখিনি। প্রত্যেকটির জন্যেই আছে আলাদা গানের বা বাজনার সংগে আলাদা নাচ। লোকনৃত্য উৎসবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীরা একই নাচে 'কোরিয়োগ্রাফী'র বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যে গ্রামবাসীদের শিখিয়ে পড়িয়ে আনছে। তাতে করে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নাচে প্রকাশ পেয়েছে উন্মাদনার অভাব ও জড়তা। ছন্দের দোলা বারে বারেই ব্যাহত হয়েছে। এটিও একটি বড় রকমের ত্রুটি।

৭। দলবদ্ধ লোকনৃত্যে বাজনার যে দল থাকে, তাদেরও একটি বিশেষ স্থান ও প্রয়োজন আছে নাচের উৎকর্ষতায়। এই দল সর্বদাই নাচের দলের একটি আবশ্যিক অংগ হিসেবে দলের মাঝখানে, সামনে, পাশে বা চারিদিকে ঘিরে থাকে। এদের অংগভংগি, চালচলন নাচিয়েদের সংগে হুবহু এক নিয়মে গঠিত নয়। কিন্তু তারাও অধিকাংশ সময়ে চেষ্টা করে মূল দলের সংগে ছন্দে সমতা রেখে চলতে। এদের সংগ ছাড়া সমগ্র নাচটি অসম্পূর্ণ বলেই মনে হবে। লোকনৃত্য উৎসবে কতগুলি নাচে দেখেছি বাজনার দলকে শহরের রংগমঞ্চের নাচের সংগত-দলের মত আলাদা একস্থানে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা লোক-নৃত্যের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বাজনার দল ও নাচের দল এক হয়ে একসংগে জড়িয়ে থাকে বলেই পরস্পরে পরস্পরকে মাতিয়ে তুলতে পারে। দলবদ্ধ নাচের সংগে বাজনার দলের সম্মিলনেই দলবদ্ধ লোকনৃত্য পায় সত্যিকারের পূর্ণতা।

# রায়

রমাপদ চৌধুরী
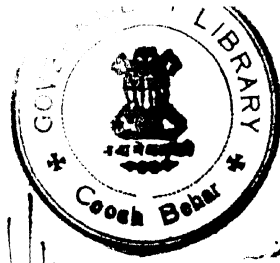
দেবীপুরের বউকে এর আগে কেউ কখনও রাগতে দেখেনি।

বাবলাডিঙের সামন্ত বাড়ির বড় ছেলে নিরঞ্জন দেবীপুরের সুদাম হাজরার মেয়ে মুকুলকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর থেকেই বাপের বাড়ির গাঁয়ের নামেই মুকুলের নামকরণ হয়েছিল দেবীপুরের বউ। যেমন এ অঞ্চলের সব গাঁয়েই হয়, সব বাড়িতেই হয়। বউদের আসল নাম স্বামীরাও ভুলে যায়, বেঁচে থাকে শুধু বাপের বাড়ির গাঁয়ের নামটা।

দেবীপুরের বউ যখন এসেছিল এ-গ্রামে, সামন্তদের বাড়িতে, তখন তার রূপের প্রশংসায়, গুণের কীর্তনে কান পাতাই দায় ছিল। প্রশংসা করবার রূপ অবশ্য এখনও আছে তার। বিজয়ার দিন সামন্তদের দরদালানে যে গেছে সেই দেখেছে। যে দেখেছে সেই তাকিয়ে থেকেছে দুর্গা-প্রতিমাকে ভুলে এই রক্তমাংসের প্রতিমার দিকে। পুজোমণ্ডপ লোকে লোকারণ্য, বিসর্জন যাবে প্রতিমা, তাই মেয়ে-বউরা বরণ করছে প্রতিমাকে। হাতে কাঁসার বগি-থালা, থালায় পান সুপুরি মিষ্টি কলা সিঁদুর আলতা সাজিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে প্রতিমার চারপাশে ঘুরছে সে, ঘুরছে সবাই। কেউ প্রতিমার পায়ে আলতা পরাচ্ছে, কেউ প্রতিমার সিঁদুর সিঁথিতে ঠেকিয়ে তুলে রাখছে ফুল বেলপাতার সঙ্গে। কিন্তু তার মধ্যে কোন্‌জন দেবীপুরের বউ, তা বলে দিতে হয় না। প্রতিমার চেয়েও সুগঠনা, প্রতিমার চেয়েও সুন্দরী যে—সেই। অন্য সকলের চেয়ে আধ হাত লম্বা, সবল পরিপূর্ণ চেহারা, ফরসা ঝকঝকে মুখে-কপালে ঘামের বিন্দু, আর টিকলো নাকের ডগাটা যার লাল হয়ে উঠেছে সেই।

এখন লালপাড় গরদের শাড়িতে মুখখানা থমথমে দেখায় বটে, কিন্তু আগে দেবীপুরের বউয়ের মত এমন মিশুকে মানুষ ছিল না। সব সময়েই টানা-টানা চোখ দুটি যেন হাসছে। হেসে গড়িয়ে পড়তো কৌতুকে, ডেকে আলাপ করত কোটালদের বউ-ঝিদের সঙ্গেও। কেউ কেউ বলত বটে যে, দেবীপুরের বউয়ের হাবেভাবে কোথায় যেন একটা দাম্ভিকতা লুকিয়ে আছে; কিন্তু তা বোধ হয় সত্যি নয়। কারণ তাকে কেউ কোনদিন রাগতে দেখেনি, কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে দেখেনি।

সেই মানুষ যে কেন এমন একটা কাণ্ড করে বসল কেউ বুঝতে পারে না।

প্রতি বছর এ-সময় ন্যাংটেশ্বরের মেলা বসে বাবলাডিঙে। বেশ বড় মেলা। চারপাশের গাঁ থেকে লোক ভেঙে পড়ে। দূরে দূরে জায়গা থেকে আসে দোকানীরা, টিকিট কেটে জায়গা নেয়, চালা তোলে, দোকান খোলে।

ন্যাংটেশ্বরের পুজো দিয়ে ভোগের থালাটা হাতে করে ফিরছিল দেবীপুরের বউ। দু পাশের দোকানগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই আসছিল। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত। তারপরই তরতর করে বাড়ি ফিরে এসে ভোগের থালাটা নামিয়ে রেখে বললে, মানো, কোটালদের ডাকতো একবার।

কোটালরা বংশ পরম্পরায় সামন্ত-বাড়িতে লেঠেলের কাজ করে এসেছে। জমিদারি গেলেও তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কমেনি এখনও। বিশেষ করে দেবীপুরের বউ কিছু আজ্ঞা দিলে কাজ হাসিল করতে পিছপাও নয় তারা।

খবর পেতে না পেতে ছুটে এল জন-কয়েক। চমকে উঠল সবাই। দেখলে দেবীপুরের বউয়ের কপালের শিরাটা ফুলে উঠেছে রাগে, চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে।

হুকুম শুনেই ছুটল তারা। লোকটাকে ঠেঙিয়ে তাড়াতে বলেছে দেবীপুরের বউ।

লোকটা মার খেল, ভুগল দিনকয়েক হাসপাতালে পড়ে পড়ে। তারপর সেখানে

শুনেই এজাহার দিল পুলিসে। মারা গেল আঠারো দিনের দিনে। দেবীপুরের বউ জড়িয়ে পড়ল মামলায়। দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী। খুনের দায়ে। আর মামলার প্রধান আসামী কি না দেবীপুরের বউ!

মামলার খবর শুনেই ছুটতে ছুটতে এল মানিক হাজরা। দেবীপুরের বউয়ের ছোট ভাই। এসে শুনল জামিন নিয়ে ফিরে এসেছে দিদি, কিন্তু নিরঞ্জন রয়ে গেছে সদরে। মামলার তদ্বির করতে।

এদিকে গাঁয়ের লোক কিছুই বুঝতে পারে না। কী করে এমন কাণ্ড ঘটল, কেন ঘটল! লোকটা কি খারাপ চোখে তাকিয়েছিল দেবীপুরের বউয়ের দিকে? টিটকিরি দিয়ে ছিল? না কি...

কানাঘুষো গুজব যে রটবে তার একটা সূত্র থাকা চাই। সেটুকুরই অভাব এখানে। আর দেবীপুরের বউকে কেউ যে কিছু জিগ্যেস করবে সে-সাহসই কারও নেই। সেই যে জামিন নিয়ে এসে কপাটে খিল দিয়েছে, খুলছে না কারও ডাকে।

মানিক হাজরা আসতেই ছুটে এল বাড়ির পাটকরুনী ঝি মানো।

বললে, দেবীপুর থেকে তোমার ভাই এসেছে মা, দেখা করতে।

ভাইয়ের কথা শুনেই কপাট খুলে বেরিয়ে এল দেবীপুরের বউ। লজ্জায় গ্লানিতে যেন সে চেহারা ভেঙে পড়েছে একেবারে। চোখে উদ্‌ভ্রান্তের মত দৃষ্টি। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

বারান্দায় মানিককে একটা আসন পেতে দিয়ে থামে ঠেস দিয়ে বসল দেবীপুরের বউ। চিরকালের অভ্যাসে হাত পাখাটা টেনে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করল ভাইকে। কিন্তু কথা বলল না একটাও।

রোদে পুড়ে আলপথ ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে বটে মানিক, কিন্তু পাখার বাতাস খেয়ে জিরোবার বা জুড়োবার মত মনের অবস্থা নয় তার।

তাই খানিক চুপ করে থেকে যখন দেখলে দিদি তার একটা কথাও বলছে না, তখন নিজেই প্রশ্ন করলে, কী ব্যাপার বল্ তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবীপুরের বউ।—শুনেছিস তো সবই।

—তা তো শুনেছি। কিন্তু সত্যি মারতে বলেছিলি লোকটাকে?

—বলিনি? দেবীপুরের বউয়ের চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। বললে, মারতে নয়, মেরে ফেলতেই বলেছিলাম।

বিস্ময়ে আতঙ্কে চোখ তুলে তাকাল মানিক। —কেন? কী করেছিল লোকটা?

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল দেবীপুরের বউ। তারপর তার ফরসা হাতখানা এগিয়ে ধরলো মানিকের চোখের সামনে।—এই দেখ্, এরই জন্যে...সারা জীবন লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছে, সারাজীবন আমার নষ্ট হয়েছে। রাগ হয় না, বল্ তুই?

ফরসা সুডোল হাতখানার দিকে তাকিয়ে ছোটবেলাকার সেই দৃশ্যটা মানিকের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মানিক আর মুকুল। ভাই আর বোন। দেবীপুরের সুদাম হাজরার ছেলে আর মেয়ে। পিঠোপিঠী ভাইবোন। যেমন ঝগড়া-খুনসুড়ি লেগে আছে দিনরাত, তেমনি আবার গলায় গলায় ভাব দুটিতে। দেখে দেখে মা হাসে, বাপ হাসে। এ ওর নামে লাগাচ্ছে, ও এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। আবার পরস্পর পরস্পরকে সাক্ষী মানে দরকারের সময়।

মা কান ধরে মেয়েকে হিড়হিড় করে টেনে এনে প্রশ্ন করল, রায়দের বাগানে গিয়েছিলি আম পাড়তে?

মানিক অমনি এসে সাক্ষী দেবে, মারছ কেন দিদিকে? ও তো বৈঠকখানায় বসে ধান-ঝাড়াই দেখছিল।

মা ছেলের চুলের মুঠি ধরে বলল, ছিপ ফেলেছিলি পাঁজাপুকুরে?

মুকুল অমনি এসে বলবে, ও তো গড়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বাকুড়ি-জমির নিড়েন দেখছিল।

তারপর মায়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ হাসিয়ে ছুটে পালাবে। কেমন, বাঁচিয়ে দিলাম তো!

দুটিতে যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। দুজনেই গাঁয়ের মিডল্ প্রাইমারী ইস্কুলে যায় বইখাতা বগলে নিয়ে, খেজুর-গড়ে 'ডার' ফেলে পাশাপাশি মাছ ধরতে বসে, সুধাসায়রে সাঁতার কাটে এক সঙ্গে।

সুদাম হাজরার অবস্থা তখন পড়তির দিকে। জমিজমা, বংশ পরিচয়, নগদ টাকা—সবই ছিল তার। এমন কি, জমিদারির তিন-আনি অংশও—পুত্রহীন মাতামহীর সূত্রে পাওয়া। কিন্তু কাল হল তার নেশা—ব্যবসার নেশা। গাঁয়ের বাঁড়ুজ্যেরা বলগণায় ধান-কল খুলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে দেখে, সুদাম হাজরাও কপাল ঠুকল গণেশের পায়ে। ব্যবসা শুরু করল কাঠ আর কয়লার। গদি কিনল নিগণ ইষ্টিশনে। বি কে আর-এর ছোট লাইনের ধারে নিগণ তখন গঞ্জ হয়েছে, ব্যবসা জমেছে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল ফেঁপে ফুলেই উঠবে বুঝি। কিন্তু পাল্লা ধরে গেল তার গদীর পাশে এক মারোয়াড়ী আড়ত খুলতেই। বছর দুই লোকসান খেয়ে খেয়ে ধৈর্য ধরে ধরে থেকে শেষ অবধি দোকানে কুলুপ মেরে দেবীপুরেই ফিরে আসতে হল। ঘাড়ের ওপর তখন একরাশ দেনা, আর বাড়ন্ত ফাঁপালো চেহারার মেয়ে মুকুল। ধারদেনা শোধবার কথা দূরে। আর কটা বছর পরেই তো বেরোতে হবে দু-দুটো খোঁজে। জমিজমা বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করতে হবে এক দিকে, মেয়ের বিয়ের পণ দেবার জন্যে, আর এক দিকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হবে পাত্রের সন্ধানে।

তবে মুখে এ-কথা বললেও মনে মনে মুকুলের মা-বাবা অন্য স্বপ্ন দেখত। আর সে-স্বপ্নে রঙ চড়াত গাঁয়ের লোকে, বলত, হাজরা, তোমার আবার মেয়ের বিয়ের ভাবনা!

—নয় কেন?

—পাঁচটা গাঁ বেছে আনো দিকি মুকুলের মত মেয়ে! প্রশংসার স্বরে বলত সকলে।

আর বলবে নাই বা কেন! সুদাম হাজরার ছেলে আর মেয়ে—গর্ব করবার মতই। মানিক যেমন সুদর্শন, মুকুল তেমনি সুন্দরী, তেমনি তার মুখশ্রী। টিকোলো নাক, টানা-টানা চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া পিঠভর্তি চুল, আর যেমন গড়ন তেমনি বরণ। সেই কিশোরী রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুদাম হাজরা ভাবত, মাকে আমার সেরা ঘরে সেরা বরে পাত্রস্থ করব। আর মুকুলের মা—পাড়াপড়শীর মুখে যায় নাম ছিল পলাসনের বউ—ভাবত মেয়ের বিয়েতে হয়তো জমিজমা বেচতে হবে না আর পাঁচজনের মত।

অবশ্য বেচবার মত জমিজমা তখন আর

বিশেষ নেই। ছিল শুধু মুকুলের মায়ের একগা গয়না। কিন্তু তেমনি আবার ছিল জমিদারির তিন-আনি অংশ, যার অন্টমের খাজনা মেটাতে গয়নাগুলো বন্ধক রাখতে হত প্রতি বছর। আর ভাদ্র-আশ্বিনে ধানের দর উঠলে মরাই খুলে দিয়ে মরাই তলায় গুণে গুণে টাকা নিয়েই ছুটতে হত কাটোয়ার মহাজনের কাছে। বন্ধকী গয়না ফিরিয়ে আনতে। এমনি করেই চলছিল। মানিক মুকুর পড়াশুনোর দিকে তেমন নজর ছিল না সুদামের। গাঁয়ের ইস্কুলে নামটাই ছিল তাদের, মন পড়ে থাকত চাষের দিকে। কোন্ জমিতে কতখানি চাপান দিতে হবে, বাকুড়ির জমিতে নিড়েন দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না, পাল্টা মই দিতে হবে কি না কোথাও, ছেঁচ-দেওয়ার পর কাঁদরের জল এসে পড়লে হেজে যাবে কি না সব— এমনি নানান কথা নিয়ে বিজ্ঞের মত তর্ক করত মানিক, আর তা দেখে মনে মনে খুশী হত সুদাম। কী হবে পড়াশুনোয়, তিনটে পাস দিয়েও তিরিশ টাকা মাইনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে মোড়লদের দু-দুটো ছেলে। আর রায়দের বাড়ির মেয়ে তো কলেজে পড়ছে বোর্ডিঙে থেকে, তাতেও কি বিয়ের সুরাহা হয়েছে কিছু! ওসব কিছু না, মেয়ের রূপটাই আসল, আর মুকুল দেখতে শুনতে যখন এত সুন্দর তখন পাত্র খুঁজতে বেগ পেতে হবে না, কেউ পণও হাঁকবে না তেমন কিছু।

এমনি সাত পাঁচ ভাবত সুদাম হাজরা। কিন্তু মুকুলের মত বুদ্ধিমতী মেয়ে যে হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসবে, কোনদিন কল্পনাও করেনি কেউ। না সুদাম, না পদ্মাসনের বউ—অর্থাৎ মুকুলের মা।

দোষ নেই মুকুলের। সাত বছর বয়স... গায়ে কোনরকমে শাড়ীটা জড়িয়ে মুড়িয়ে বেড়ায়, খেলাধুলো ছেলেদের সংগে, ডাঁর ফেলে মাছ ধরে, গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, সে কী করে বুঝবে অতশত!

পাশের গাঁ ক্ষীরগাঁ। যোগাদ্যার মেলা হয় প্রতিবছর। জাঁকালো মেলা, দোকানী আসে দূর দূর দেশ থেকে। শাস্ত্রে আছে যোগাদ্যা হল বাহান্ন পীঠস্থানের একটি, বিশ্বাসীরা বলে পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি। মা-কালী স্বয়ং নাকি পূজারীর মেয়ে সেজে শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা নিয়ে পরেছিল...

ক্ষীর গাঁয়ের মেলায় যাবার তাই বড় সাধ মুকুলের। মুকুল আর মানিকের। বায়না ধরেছে তাই বাপ-মার কাছে। কিন্তু নিয়ে যেতে রাজী হয়নি সুদাম হাজরা। মেলার ভিড়ে নিজেরাই রাস্তা হারিয়ে ফেলি, তোরা যাবি কী করে!

ভিড়? কী এমন ভিড়, লোকে যায় না মেলা দেখতে!

দুপুরবেলায় মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে মায়ের পাশেই শুয়ে ছিল মুকুল আর মানিক। তক্তপোশের ওপর বাবা।

মিটিমিটি তাকিয়ে দেখলে মুকুল। হ্যাঁ, বাবা মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মানিককে একটা ঠেলা দিয়েই গুটিগুটি বেরিয়ে এলো। এসে একেবারে বাঁশ-ডোবার ধারে কাঁড়-ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল।

মানিক আসতেই বললে, যাবি?

—কোথায়? চোখ বড় বড় করল মানিক।

মুকুল ফিসফিস করে বললে, ক্ষীর গাঁ। মেলায়।

—চ। খুশিতে নেচে উঠল মানিকের চোখ দুটো।

বাস্। দু ভাইবোন ছুটতে ছুটতে চলল দুপুরের রোদে, রোদে-তাতা আল ধরে।

মাকের সোজা চলে গেলেই একটা কাঁদর। জল নেই এখন কাঁদরে। সেটা পার হয়ে বাঁ দিকে ফিরলেই চালা দেখা যাবে সারি সারি।

—রাস্তা ভুল করিস নাই তো দিদি? অনেকখানি এসেও কাঁদরের দেখা মিলছে না বলেই জিগ্যেস করলো মানিক।

—না রে, না। ক্ষীরগাঁর আবার রাস্তা। যেন সব জানে মুকুল, দু বছরের বড় বলেই জানে।

না, রাস্তা ভুল হয়নি। কাঁদর পার হতেই দেখল বোর্ডের রাস্তা ধরে লোক চলেছে সারি সারি। মাথায় করে জিনিস-পত্র বয়ে নিয়ে চলেছে অনেকে। একটা সাঁওতালের দল, মেয়েই বেশী।

মুকুল একবার জিগ্যেস করল তাদের। —মেলা কোন্ দিকে গো?

—এই মা গো। খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, পরক্ষণেই দলের সকলকে উদ্দেশ করে হাসতে হাসতে বললে, অরে, এ দুধ পারা রঙের নাড়ু দুটা মেলাকে যাবে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে মুকুলকে আবার প্রশ্ন করলে, মেলাকে যাবি?

—হ্যাঁ, যাব তো। একটু বিরক্ত হয়েই মুকুল বললে।

মেয়েটা আবার হেসে উঠল। —চ কেনে সাথে সাথে।

সাঁওতাল দলটার সংগে সংগে এসে মেলায় পৌঁছল দুজনে। এসে দেখলে, ভিড় সত্যিই। ঠেলাঠেলি, ছোটাছুটি, চিৎকার। এতক্ষণে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল মুকুলের। হারিয়ে যাবার ভয়। শক্ত করে মানিকের হাতটা ধরল, ছাড়াছাড়ি না হয়।

নাগরদোলা ঘুরছে তখন বন বন করে। যত দোকান, তত লোক। ভাজা পাঁপর আর তেল-ফুলুরির গন্ধে ভুরভুর করছে। সাঁওতালের দল পেলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সার্কাসওয়ালা। বাঘের খেলা দেখাতে। সার্কাসওয়ালার হাত ছাড়িয়ে আসতে না আসতে ধরছে চুড়িওয়ালা। সারি সারি চুড়ির দোকান, কাচের চুড়ি,

রঙবেরঙের। তার পাশেই—সোনার। সত্যি সোনা নাকি? একবার কী ভাবলে মুকুল। না, নকল সোনা বোধ হয়। ওদিকে ওটা? শাঁখার দোকান। শাঁখার দোকানই বেশী শাঁখা পরতেই আসে সকলে। এ গাঁয়ে শাঁখা পরতে এসেছিল মা-কালী স্বয়ং। শাঁখারী 'শাঁখা চাই', 'শাঁখা চাই' বলে শাঁখা ফিরি করে যাচ্ছিল। একটা কালো মেয়ে এসে বললে, দাও পরিয়ে।

হঠাৎ একটা ভিড়ের চাপে হাত ছেড়ে গেল মানিক আর মুকুলের।

মানিক ভয়ে চিৎকার করে উঠল, দিদি! কোন সাড়া পেল না। কোন্ ফাঁকে সাঁওতালের দলটাও ছেড়ে এসেছে। হঠাৎ দু চোখ ছাপিয়ে জল এলো মানিকের। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল ওর সারা শরীর। সমস্ত মেলাটাই এতক্ষণ কিনতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে মেলা নয়, যেন একটা বিভীষিকা। কই, দিদি কই? দিদি দিদি! চিৎকার করল মানিক।

—ও খোকা, পুতুল কিনবে, পুতুল?

কথাটা শুনেও শুনল না মানিক, ফিরেও তাকাল না। গেরুয়া-কাপড়-পরা হাতে-চিমটে সন্ন্যেসীর দলটা পার হয়ে যেতেই মুকুলকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হেসে উঠল মানিক। মুকুলের চোখ থেকেও উৎকণ্ঠা দূর হল। এই দলটা মাঝখানে এসে পড়াতেই দুজনে দুজনকে হারিয়ে ফেলেছিল।

মুকুল ধমক দিয়ে বললে, বললাম হাত ছাড়িস না, হাত ছাড়িস না।

অপরাধীর চোখে তাকালে মানিক। সে যে ইচ্ছে করে হাত ছাড়েনি, লোকগুলোর ধাক্কা সহ্য করতে না পেরেই হাত ছেড়ে দিয়েছিল মুকুল, সে-কথা যেন ভুলেই গেছে দিদিটা।

মুকুল ততক্ষণে পুতুলের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কত রকমের পুতুল! কোনটা ঘাড় নাড়ছে দুলে দুলে, দু হাত তোলা নিতাই গৌর, বাইজীর মত ঘাগরা পরে কোনটা।

পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে মুকুল আর মানিক, আর খিল-খিল করে হেসে ওঠে। কাছে এগিয়ে যায়, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপরই মনে পড়ে যায় একটাও পয়সা নেই কাছে, বিমর্ষ মুখে সরে আসে।

একটা দোকানে নানান ধরনের রান্নার জিনিসপত্র, আর কী সুন্দর দেখতে সেগুলো! খুন্তি সাঁড়াশি, বাসনকোসন, চালুনি—আর কী চমৎকার চাকি-বেলুনি! মুকুলের মনে পড়ল বেলুনিটা খারাপ হয়ে গেছে। পয়সা থাকলে—

না, লোকটা পয়সার বদলে চালও নিচ্ছে ওজন করে করে। এক সের চালও যদি নিয়ে আসত আঁচলে বেঁধে! তা হলে চাকি-বেলুনিটা নিয়ে যেত, আর তা দেখে মা খুশী হত, মেলায় গিয়েছিল শুনলে বড় জোর একটা ধমক দিতো।

ঘুরতে ঘুরতে আবার একটা শাঁখার দোকানের সামনে এসে পৌঁছল ওরা।

হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই কেমন ভয় ভয় করছিল মানিকের। বললে, দিদি, বাড়ি চ।

—দাঁড়া না। বলে শাঁখার দোকানটার কাছে এগিয়ে গেল মুকুল।

বউটাকে শাঁখা পরাতে পরাতে গল্প বলছে শাঁখারী। 'হ্যাঁ, মা, এখানেই কালো মেয়ে শাঁখা পরে বলেছিল—যা, বাবার কাছে দাম নিবি। বলে দেখিয়ে দিয়েছিল পূজুরীর বাড়ি। পূজুরী শুনে বিশ্বাস করলে না, বললে, মেয়েই নেই আমার।'

এ গল্প মুকুল জানে, সরে এলো ও। ওদিকটায় এত ভিড় কিসের দেখতে হবে তো। ভিড়ের দিকেই এগিয়ে চলল।

মানিক ধীরে ধীরে বললে, তারপর কী হলো রে দিদি?
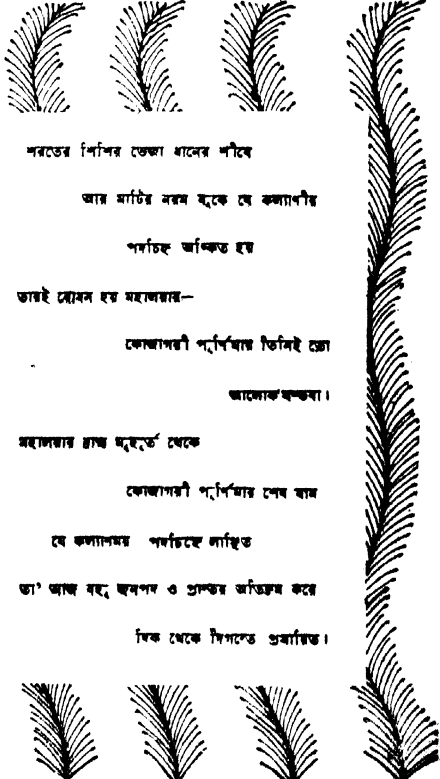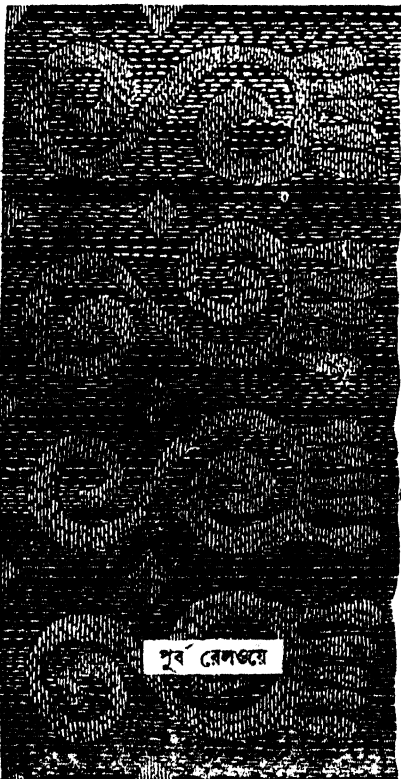
—ওমা, জানিস না? পুকুরের পাড়ে এসে যেই পূজারী জিগ্যেস করল—কই গো মেয়ে, কেউ শাঁখা পরেছ! অমনি পুকুরের মাঝখান থেকে একখানা শাঁখা-পরা হাত...

সাঁওতালের একটা দল ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। কথা শেষ হল না মুকুলের। তার আগেই ওরা দুজনে লোকটার সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

কোন রকমে সামলে-সুমলে উঠে দেখলে, লোকটার সামনে মাটির ওপর সুন্দর সুন্দর সব ছবি বিছোনো রয়েছে। পটো বোধ হয়! না, ভাল করে দেখলে মুকুল: পটুয়া নয়। একটা যন্ত্র দিয়ে মেয়েটার হাতে ছবি এ'কে দিচ্ছে লোকটা। দাঁড়িয়ে দেখে মুকুল। যত দেখে ততই অদ্ভুত লাগে। কেমন একটা নেশা ধরে যায়! চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে, তার হাতের যন্ত্রটার দিকে।

ছোট মামা একবার মুকুলের হাতে কালি দিয়ে নাম লিখে দিয়েছিল। সে নাম জলে ধুতেই উঠে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটা বলছে, এ ছবি নাকি কোনদিন উঠবে না। যার যে-ছবি পছন্দ তাই এ'কে দেবে।

একে একে ভিড় কমে এল। কেউ খানিকটা দেখে সরে গেল, কেউ বা উল্কি আঁকিয়ে নিয়ে গেল। সবাই তারা হাসছে, খুশী হয়েছে, সকলের মুখেই কী-মজা কী-মজা ভাব।

অপেক্ষা করতে করতে যখন সকলেই চলে গেল তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মুকুল আর মানিক।

উল্কিওয়ালার চোখ পড়লো এতক্ষণে। বললে, কী খুকি, উল্কি আঁকাবে নাকি?

—হ্যাঁ। ঘাড় কাত করে হাতটা বাড়িয়ে দিল মুকুল।

উল্কিওয়ালা প্রশ্ন করলে, কোন্‌টা দেখিয়ে দাও।

সামনের ছবিগুলো থেকে যে-কোন একটা পছন্দ করে বাছতে বললে।

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলে মুকুল। তারপর বললে, না, ও ছবি নয়। ফিক করে হেসে ফেলে বললে, মানিকের ছবি এ'কে দাও, আমার ভাই মানিক—ওর মুখ এ'কে দাও।

উল্কিওয়ালা বললে, দু আনা লাগবে।

—দু আনা? হতাশ সুর ফুটল মুকুলের গলার স্বরে। যেন হাতের গ্রাস চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

মুকুল প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, আমার কাছে যে পয়সা নেই!

—পয়সা নিয়ে এস বাড়ি থেকে।

বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে আসবে? কোথায় পাবে পয়সা? ফিরে গেলে আর কি আসতে পাবে? কিন্তু হাতে উল্কি আঁকতে না পারলে যেন জীবনই ব্যর্থ। মনে নেশা ধরে গেছে তখন মুকুলের, উল্কি আঁকবার জন্যে সবই যেন করতে পারে।

মানিক একবার শুধু বললে, দূর, ও-সব করে কী হবে রে দিদি!

—তুই চুপ কর্ তো। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল মুকুল।

তারপর অনুনয় করতে শুরু করল উল্কিওয়ালাকে। চোখ ছাপিয়ে জল এলো।

বললে, তুমি তো অনেক পয়সা পেয়েছ, এমনি করে দাও না আমাকে। শুধু এক হাতে করে দাও।

"আমার ভাই মানিক্-এর মুখ এ'কে দাও।"

উল্কিওয়ালা মাথা নাড়ল বার বার।

শেষে হতাশ হয়েই মানিকের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে চলে এলো মুকুল। মুখে চোখে রাগ উপছে পড়ছে যেন।

উল্কিওয়ালাকে রাগের স্বরেই বললে, বেশ বেশ চাই না, চাই না।

দু পা আসতেই ডাক শুনতে পেলো।

—ও খুকি, শোন, দাঁড়িয়ে করে, এস।

উল্কিওয়ালার মন নরম হল বোধ হয়। কিংবা তার মনও হয়তো উল্কি আঁকার জন্যে ছটফট করছিল। সারাদিন তো কালো কালো হাতে-গলার-পায়ে উল্কি এ'কেছে সে। এমন ফরসা ধবধবে সোনার মত রঙের হাত তো পায়নি।

উল্কিওয়ালার ডাক শুনেই ফিরে এলো মুকুল। সুডোল নিটোল ফরসা হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, মানিকের মুখ হয় যেন।

—হবে, হবে। সান্ত্বনা দিল উল্কিওয়ালা।

তারপর যন্ত্রটা হাতে নিয়ে শুরু করল ছবি আঁকতে। বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠছে, সারা হাত চিনচিন করছে, টাটিয়ে উঠছে যেন কাঁধের কাছটা, তবু আনন্দে ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে মুকুল।

শেষ অবধি একটা মুখ আঁকা হয়ে গেল তার হাতে। খুশী মনে মেলা থেকে বেরিয়ে বোর্ডের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল দুজনে। বোর্ডের রাস্তা থেকে কাঁদরের জল। তারপর দেবীপুরের মাঠ।

আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটু একটু করে ভয় উঁকি দিতে শুরু করল মুকুলের মনে। ফিসফিস করে ভাই মানিককে বললে, মাকে বলিস না যেন!

—দূর।

'দূর্' বলে সব ভয় দূর করতে চাইল বটে মানিক, কিন্তু মুকুলের মনে তখন ক্রমশই ভয় বাড়ছে। মানিক না বললে কি আর জানতে পারবে না মা, দেখতে পাবে না! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। রাস্তার ধারে ধারে আকন্দ ফুটে আছে। বাবলা গাছ থেকে কাঁটা ভেঙে নিয়ে আকন্দর মালা গাঁথলে মুকুল, তারপর হাতে জড়াল সেটা, উল্কিটা ঢেকে। ব্যস, আর কেউ দেখতে পাবে না, সন্দেহ করবে না।

কিন্তু এত সহজে কি ঢাকা যায়! যা তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল তা কি চাপা ঢাকা দেওয়া যায়!

বাড়ি ফিরতে ফিরতেই মুকুল বললে, হাতটা বড় টাটিয়েছে রে!

—টাটাবেই তো, তখন তো শুনলি না। বিজ্ঞের মত বললে মানিক। সে বুঝে

নিয়েছে যে দিদির জন্যে তাকেও মার খেতে হবে।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দুজনেই পড়ল একেবারে মা'র সামনে। তাড়াতাড়ি হাতটা পিছনে লুকোল মুকুল। কিন্তু ও-সবের দিকে চোখ গেল না মায়ের, মুকুলকে দেখতে পেয়েই ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল মুকুলের গালে।

—কোথায় গিয়েছিলি? সারা দুপুরে টো-টো করে কোথায় বেড়াচ্ছিলি?

কোন উত্তর দিতে পারল না মুকুল। সারা শরীর তখন পুড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে। জ্বর আসছে বোধ হয়। শীত-শীত করছে।

কাঁপুনি দিয়েই জ্বর এলো। সন্ধ্যের দিকে জ্বর বাড়ল।

বিব্রত বোধ করল সুদাম হাজরা। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে এসে মুকুলের হাতটা তুলে জ্বর দেখতে গিয়ে দেখল কনুই থেকে কব্জি অবধি ফুলে উঠেছে। আর...

মানিকের কাছ থেকে সবই শুনল সুদাম, শুনল পঞ্চাননের বউ। শুনে ছি-ছি করে উঠল।

—ছি ছি! এ কী করলি তুই? ভদ্রঘরের মেয়ে, হাতে উল্কি আঁকিয়ে এলি শেষে? ছি ছি!

কেঁদে ফেলল বাপ-মা দুজনেই। তাদের সব আশা ভরসা, সব স্বপ্ন যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

হাতে উল্কি দেখলে যে বিয়ে দিতে রাজী হবে না কেউ! টাকা দিয়েও যে পার পাওয়া যাবে না!

টাকা দিয়েও যেখানে পার পাওয়া যায় না, প্রতারণাই সেখানে একমাত্র পথ। তেরো বছর পার না হতেই মুকুলের লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা মাথায় বাড়ল চড়চড় করে, শরীর ফাঁপল আঁট সাঁট হয়ে। সুন্দর তো ছিলই, যৌবনের স্পর্শে আরও রূপময়ী হয়ে উঠল।

এ-গাঁ ও-গাঁ ছোটাছুটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বিয়েও ঠিক করে ফেলল সুদাম হাজরা।

মঙ্গলকোটের বলরাম সামন্তর ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে। বলরাম এলো, কনে দেখল, পণাপণ ধার্য হল, দিনও ঠিক হয়ে গেল।

মুকুলের দু হাতে দুটো চওড়া মানতাসা পরিয়ে মেয়ে দেখানো হয়েছিল, বিয়ের পর বিদায় দেবার সময় মেয়েকে কাছে ডেকে মা কানে কানে বললে, মানতাসা যেন খুলিস না কারুর সামনে।

মুকুল ফিক করে হেসে ফেলেই ঘাড় নাড়ল। মনে মনে ভাবলে, মায়ের যত মিথ্যে দুর্ভাবনা। হাতে একটা উল্কি আছে তো কী হয়েছে, শখ করে কেউ করায় না!

মনে মনে বলল বটে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না নিরঞ্জনকে।

দু-একদিন বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয়নি। সাহস যেদিন হয়েছে সেদিন সুযোগ জোটেনি। আর সুযোগ পাবেই বা কী করে!

ভোর না হতেই, নিরঞ্জনের ঘুম না ভাঙতেই উঠে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। ননদ আর শাশুড়ীর কাছে কাছেই সারাটা দিন কেটে যায়। দুপুরে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ, তাও দু-দশ মিনিটের জন্যে। আর রাত্তিরে যখন সংসারের কাজ-কর্ম সেরে শ্বশুরের তামাক সেজে দিয়ে শাশুড়ীর পায়ে তেল মালিশ করে শুতে আসে, নিরঞ্জনের তখন মাঝরাত্রি। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ক্লান্ত মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। এরই মাঝে যেটুকু কথা বলা যায়, যেটুকু ফিসফিসানি, তাও কি নষ্ট করা যায় উল্কির কথা তুলে?

কিন্তু না বলেও যেন শান্তি পায় না মুকুল। মুকুল? না, ও নামটা যেন ভুলেই গেছে ও। সবাই ডাকে দেবীপুরের বউ বলে। সকলেই সম্মান করে, সম্ভ্রম দেখায়। পাড়ার লোক সামন্ত গিন্নীকে বলে, দেবীর মতই বউ হয়েছে তোমার দেবীপুরের বউ।

আর পূর্ণিমার রাতে এক ফালি আলো যখন এসে পড়ে দেবীপুরের বউয়ের ফরসা মুখখানার ওপর, এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিরঞ্জন, ফিসফিস করে বলে, সত্যি, এত রূপ তোমার!

কৌতুকে আনন্দে হাসে দেবীপুরের বউ। কিন্তু বুক দুরুদুরু হয়। এক-একবার ভাবে, বলে ফেলি উল্কির কথাটা। আর কেউ না জানুক, স্বামী অন্তত জানুক। কিন্তু পারে না। কেমন একটা ভয়, কেমন একটা আতঙ্ক উঁকি দেয় মনে।

কিন্তু না বলেও যেন শান্তি নেই। দিনরাত মনের মধ্যে একটা খুঁত খুঁতুনি, দিনরাত কেমন একটা গা সিরসির আতঙ্ক। কখন বুঝি শাশুড়ী শুনতে পায়, কখন ননদরা দেখতে পায়। তার চেয়ে নিজের থেকেই বলে ফেলবে সে নিরঞ্জনকে।

না, মুখে বলতে পারবে না। তার চেয়ে নিজের চোখে দেখুক নিরঞ্জন, নিজেই জিগ্যেস করুক। যা সত্যি তাই বলবে ও।

দুপুরের খাওয়ার পর খাটের পাশে এসে দাঁড়াল ও। বিছানায় শুয়ে তারই অপেক্ষায় বুঝি দরজার দিকে তাকিয়েছিল নিরঞ্জন। বললে, পান দেবে না?

—পানের জন্যেই বুঝি ঘুমোওনি! বলে কৌতুকে হাসল দেবীপুরের বউ।

তারপর হাতের মানতাসা, চুড়ি, গলার হার খুলে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল। বললে, বড়ো ঘুম পাচ্ছে।

বলে চোখ বুজে পড়ে রইল। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস দ্রুত হচ্ছে, এখনি বুঝি চমকে উঠবে নিরঞ্জন, প্রশ্ন করবে। তবু সেই প্রশ্নটাই যেন শুনতে চায় দেবীপুরের বউ। শান্তি পেতে চায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে চোখ খুলল। না, হাতের দিকে, উল্কির দিকে দৃষ্টি নেই নিরঞ্জনের। একদৃষ্টে তার মুখের দিকেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে শুধু।

উঠে পড়ল দেবীপুরের বউ। ঘরের কোণে পানের বাটা আছে কুলুঙ্গিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান সাজল। পান নিয়ে এসে দাঁড়াল নিরঞ্জনের সামনে। হাত বাড়িয়ে পান দিল। তবু নিরঞ্জনের চোখে পড়ল না উল্কিটা।

আর হঠাৎ কেমন সারা গা শিউরে উঠল দেবীপুরের বউয়ের। শুয়ে পড়ার ভান করে পাশ ফিরে লুকিয়ে লুকিয়ে বালিশের তলা থেকে মানতাসা বের করে হাতে পড়ল, উল্কি ঢাকল। কী আশ্চর্য; নির্বোধের মত কেন সে নিজের কলঙ্ক নিজেই তুলে ধরতে চাইছিল স্বামীর চোখের সামনে।

এত যে ভালবাসা, মান অভিমান, সব কিছুই হয়তো মুছে যাবে মুহূর্তে, কে বলতে পারে!

এক-একদিন হঠাৎ যেমন দুঃসাহসে এগিয়ে আসে দেবীপুরের বউ, তেমনি এক-একদিন ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে ওর।

সেই সেদিনের মায়ের সজল চোখের ধিক্কারটা যেন কানের পাশে বেজে ওঠে বার বার। —ছি ছি! কী করলি তুই!

ভদ্রঘরের মেয়ে হাতে উল্কি আঁকিয়ে এলি শেষে?

যত দিনের পর দিন কেটে যায়, দেবীপুরের বউ ততই বুঝতে পারে তার এই নির্দোষ কলঙ্কটুকুও স্বামীর সামনে তুলে ধরার সুযোগ চলে যাচ্ছে, সাহস কমে যাচ্ছে।

মন এক-একদিন আনন্দে ভরে ওঠে, মনে রোমাঞ্চ জাগে, নিজেই কৌতুকে এগিয়ে যায় নিরঞ্জনের কাছে, তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে স্বপ্নের মত ভাঙা ভাঙা কথা বলে, কিন্তু তারপরই—যখনই নিরঞ্জনের দুটি হাত আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাসে এগিয়ে আসে, নিরঞ্জনের চোখ উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে আবেগে, তখনই কেমন যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে দেবীপুরের বউ, সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে যায়। হঠাৎ কোত্থেকে একটা আশঙ্কার কুয়াশা এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। আয়নার প্রতিচ্ছবিতে যেমন হাতে হাত ঠেকে, মুখে মুখ, অথচ কোন স্পর্শের অনুভূতি জাগে না, তেমনি দুজনে কাছে থেকেও যেন দূরে। নিরঞ্জনকেও কেমন যেন আশাহত বেদনার মত মনে হয়। বিস্ময়ের অতৃপ্তির চোখ তুলে তাকায় সে, কী যেন খোঁজে, কী যেন খোঁজে। মনে হয়, কী যেন এক অজানা রহস্যের পাঁচিল গাঁথা হয়ে যাচ্ছে দুজনের মাঝখানে। দুটি দেহ কাছাকাছি এসেও যেন রয়ে গেছে অনেক দূরে। মন দূরে সরে গেছে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন আতঙ্কে শিউরে উঠল দেবীপুরের বউ। একটি ঘটনায়। দিনের পর দিন কত ঘটনাই তো ঘটছে, এই সামন্ত-বাড়ির বউ হয়ে আসার পর থেকে অনেক কিছুই দেখেছে, কখনও দেখেছে শ্বশুরে শাশুড়ীর রুদ্র মূর্তি, কখনও কোমল স্নেহ, কিন্তু এমন একটা ঘটনা যে তারই চোখের সামনে ঘটবে তা বুঝি কল্পনাও করেনি সে।

বাবলাডিহির বলরাম সামন্তর পুত্রবধূ হয়ে এ বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকার পর থেকে অনেক কিছুই দেখেছে সে, অনেকবার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু বুকে গিয়ে বেঁধেনি কোনদিন।

অথচ এ-বাড়িতে মাথায় লাল বেনারসীর আঁচল টেনে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেদিন এসেছিল, সেদিন শুধু যৌবনের রোমাঞ্চেই নয়, স্বামী গৃহের গৌরবেও গর্বিত হয়েছিল সে। সামন্তদের সংসার তখন জমজমাট। অবস্থা চারপাশের গাঁয়ের পাঁচটা হাঁকডাকের জমিদারের দশগুণ। রাশভারী লোক ছিলেন বলরাম সামন্তর বাপ, সদরে মামলা করতে যাবেন অপরের জমির ওপর দিয়ে, মাঝপথে দেখলেন কাঁদরের বাঁধ কেটে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে জমি। বুঝলেন অপরপক্ষের সঙ্গে যোগসাজসে হয়েছে কাণ্ডটা। ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন, সদরে যদি কোনদিন যাই তো নিজের জমির ওপর দিয়ে যাব। প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারেননি তিনি নাকের সোজা সাত শ' বিঘে জমি কিনেও। বাপের ইচ্ছা পূরণ করেছিল পুত্র বলরাম সামন্ত। সামন্তদের খামার ছিল চোখ চেয়ে দেখবার মত। মরাইয়ের পর মরাই বিঘে পনেরো জমি জুড়ে, দূর থেকে চিকচিক করত খড়ের ছাউনি, লোকে গ্রাম বলে ভুল করত। আর সে মরাই খোলা হত কালেভদ্রে, কিস্তির সময় গাঁয়ের পাঁচটা খামার যখন খাঁ-খাঁ করত, মরাইয়ের 'বড়' হাত পড়ত না তখনও সামন্ত-বাড়িতে।

গাঁয়ের লোক বলত, চাল যে খারাপ হয়ে যাবে বড় কর্তা, ক-বছর আর ধরে রাখবেন, দাম চড়েছে, দিন এবার বেচে।

বলরাম সামন্ত হেসে বলত, বেচে দেবার চাল ঐ মাঠ-খামারে। এ আমার ঘরে খাবার বাসমতী। পাঁচ বছরের পুরনো হলে তবে খাবো।

লোকে বিস্মিত হয়ে তাকাত বলরামের মুখের দিকে।

আর বলরাম হাসতে হাসতে বলতো, যার যা নিয়ম। সুতোর মত সরু আর গাঁড়া-গাঁড়া দেখতে, কিন্তু ভাত হবে একেবারে সীতাভোগ, যেমন লম্বা তেমনি বড়। আর বাস কী তার, এস না, আজ দুপুরে এখানেই নয়...

তা কৃপণ ছিল না বলরাম, সুযোগ পেলেই গাঁ শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে বসত। যার বাড়িতেই কুটুম আসুক, সামন্ত-বাড়িতে এক বেলা খেয়ে যেতেই হবে। দিঘির মত পুকুর সব, গোয়াল-ভরা গাই।

এমনি ভরভরান্ত সময়েই তার ছেলে নিরঞ্জনের বউ হয়ে এসেছিল দেবীপুরের বউ। এসে দেখলে, অষ্টমের খাজনা মেটাতে গিন্নীর গয়না বন্ধক রাখতে হয় না, ধানের দর জলের মত হলেও মরাই খুলতে হয় না।

প্রথম প্রথম তাই খুশীই হয়েছিল দেবীপুরের বউ। আনন্দে নেচে উঠেছিল তার মন। কিন্তু দু'দিন না যেতেই বউয়ের গয়নাপত্তর দেখে নাক বেঁকাল সামন্তগিন্নী।

দু গালে দু জোড়া পান গুঁজে এক মুঠো দোক্তা মুখে পুরে বউয়ের গলার হারটা নেড়েচেড়ে বলেছিল, এ কী হার গো বউমা, এ যে মুড়কিমালা, পাটকরুণী বান্দী বউয়ের ছেলের মুখেভাতে দিয়েছিলাম।

শুনে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল দেবীপুরের বউ। চোখ ঠেলে জল এসেছিল তার। মনে মনে ভেবেছিল, এর চেয়ে গরিবের ঘরে বিয়ে হলেও শান্তি পেত সে। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভয় পেত বাড়ির সবাই। সবচেয়ে বেশি ভয় পেত দেবীপুরের বউ।

কিন্তু নিরঞ্জনের ব্যবহারে খুঁত ছিল না। নিরঞ্জনের ব্যবহারে অনেক-কিছু ভুলতে পেরেছিল সে, অনেক-কিছু ক্ষমা করতে পেরেছিল। শুধু ভুলতে পারেনি একটি কথা।

তার হাতের উল্কির কথা। যে কলঙ্ক সে গোপন রাখতে চেয়েছে দিনের পর দিন। যে কলঙ্ক তার গোপন মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। যা গোপন করতে গিয়ে নিরঞ্জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে সে, সব রঙ মুছে গেছে তার চোখ থেকে।

সেই উৎফুল্ল যৌবনের কৌতুক-ছন্দে গড়া কোমল শরীরটা যেন দিনে দিনে বিষাদক্লিষ্ট অভিশপ্ত অহল্যায় পরিণত হয়ে চলেছে তখন।

এমনি সময়েই ঘটনাটা ঘটল তার চোখের সামনে।

ঝাংলাই-পুজোর সময় একান্নবর্তী সামন্ত পরিবারের সবাই ফিরে আসে গাঁয়ে। ভায়াদ সম্পর্কের ছেলে বউরা, বউ ঝিরা, মেয়ে জামাইরা—সকলে এসে হাজির হয়। তাই রান্নার জন্যে সে-সময় আনা হয় কয়েকজন রাঁধুনী।

হঠাৎ চিৎকার শুনে সেদিন ছুটে এসে দেবীপুরের বউ দেখলে, রাঁধুনী বামনীদের একজন সাদা থান কাপড়ের ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর চিৎকার করছে সামন্ত-গিন্নী।

—কী হয়েছে মা? এসে জিজ্ঞেস করল দেবীপুরের বউ।

আর সে-প্রশ্ন শুনে আবার চিৎকার করে উঠল সামন্তগিন্নী। দেবীপুরের বউ শুনল ব্যাপারটা। বামুনের ঘরের বিধবা মেয়ে পরিচয় দিয়ে সে নাকি এ কদিন রান্নার কাজ করছিল। আজ হঠাৎ শাশুড়ীর চোখে পড়েছে তার চিবুকে উল্কির দাগ।

সে যত বোঝাতে চায়, সে বামুনের ঘরেরই মেয়ে, সামন্ত-গিন্নী তত চিৎকার করে। —ছি ছি ছি, বামুনের ঘরের মেয়ের গায়ে উল্কি থাকে কখনো? ও নিঘ্যাৎ ছোট জাত, নিঘ্যাত কোন খারাপ ঘরের মেয়ে...

ননদরা বোঝাবার চেষ্টা করল। সামন্ত-গিন্নীর তবু সেই স্থির সিদ্ধান্ত। —কাটোয়ায় গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখেছি বাপু, বোঝাস না আমাকে, যত সব বেবুশ্যেদের হাতে মুখে উল্কি থাকে।

কথাটা শুনেই ছুটে পালিয়ে এলো দেবীপুরের বউ। মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে
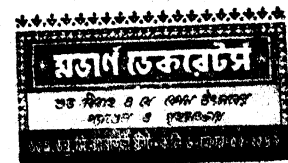
গেল তার, সারা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। বিছানায় শুয়ে পড়ল দেবীপুরের বউ; বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। ভয়ে আতঙ্কে সারা শরীর তখনও কাঁপছে তাঁর, কাঁপছে লজ্জায়, ঘৃণায়।

অনেকক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠল সে। তারপর কোটাল-বউকে ডেকে গোপনে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল দেবীপুরে।

দু'দিন পরেই পালকি নিয়ে হাজির হল সুদাম হাজরা।

ছেলের বিয়ের মিথ্যা খবর দিয়ে নিয়ে গেল মেয়েকে।

তারপর আর বাবলাডিহিতে ফিরল না দেবীপুরের বউ। অথচ সামন্ত-বাড়ির কেউ কিছু বুঝল না। সবাই ভাবল, নিরঞ্জনের সংগে বুঝি কোন মনোমালিন্য হয়েছে তার। আর নিরঞ্জন খুঁজে পেল না এ রহস্যের চাবি।

বার বার চিঠি লিখেও যখন উত্তর পেল না বলরাম সামন্ত, লোক পাঠিয়েও পুত্র-বধূকে ফিরিয়ে আনতে পারল না, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে পাঠাল, ও বউকে আর ঘরে আনব না।

আর এমনি করেই সাতটা বছর কেটে গেল।

সামন্ত-গিন্নী মারা গেলেন, তারও পরে বলরাম সামন্ত।

বাপ মা মারা যাওয়ার পর শেষ চেষ্টা হিসেবে দেবীপুরে এলো নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের সংগেই বাবলাডিহিতে ফিরে এলো দেবীপুরের বউ।

কিন্তু তার মাস কয়েক পরেই......

ন্যাংটেশ্বরের মেলা। প্রতি বছরই এ সময় মেলা বসে বাবলাডিহিতে, চারপাশের গাঁ থেকে লোক ভেঙে পড়ে। দূর দূর জায়গা থেকে আসে দোকানীরা, টিকিট কেটে জায়গা নেয়। চালা তোলে, দোকান খোলে।

ন্যাংটেশ্বর শিবের পুজো দিয়ে ভোগের থালাটা হাতে করে ফিরছিল দেবীপুরের বউ। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি, দীর্ঘ ঋজু চেহারা, প্রতিমার মত সুগঠনা, সুন্দরী, টিকালো নাক, টানা-টানা চোখ, ফরসা ঝকঝকে মুখে কপালে ঘামের বিন্দু, নাকের ডগাটা লাল হয়ে আছে... ...

দোকানগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই

ফিরছিল দেবীপুরের বউ। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে, লোকটার দিকে চোখ পড়তেই থেমে পড়ল।

একটি মুহূর্ত। তারপরই তরতর করে বাড়ি ফিরে ভোগের থালাটা নামিয়ে রেখে ডাকলে, মানো!

পাটকরুণী ঝি সামনে এসে দাঁড়াল।

দেবীপুরের বউয়ের কপালের শিরা দুটো তখন দপদপ করছে। গম্ভীর গলায় বললে, কোটালদের ডাকত একবার!

কেউ কিছু বুঝল না, কেউ কিছু খুঁজে পেল না। শুধু শুনল দেবীপুরের বউয়ের হুকুমে মেলার একটা উল্কিওয়ালাকে পিটিয়ে মেরেছে কোটালরা। তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যেতে চায়নি লোকটা, তাই পিটিয়ে মেরেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে এমন থানাপুলিস মামলা মোকদ্দমা হবে তা কে জানত! কে জানত দেবীপুরের বউ খুনের আসামী হয়ে দাঁড়াবে।

দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী মামলা। প্রধান আসামী দেবীপুরের বউ। নিরঞ্জন ছোটা-ছুটি শুরু করল, কাটোয়া বর্ধমান, এ উকিল সে উকিল। এদিকে লজ্জায়, ভয়ে, ঘৃণায় সমস্ত সামন্ত-বাড়ি যেন নিঃঝুম হয়ে গেছে। আর সামন্ত-বাড়ির বউ, দেবীপুরের বউ খিল দিয়েছে জামিন নিয়ে ফিরে এসে। পাটকরুণী মানোর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, ভাই-ভায়াদ সম্পর্কের ননদ জা-দের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত কপাট খুলল দেবীপুরের বউ। ভাই মানিক দেবীপুর থেকে ছুটে এসেছে শুনে।

কপাট খুলে বেরিয়ে এলো সে। লজ্জায় গ্লানিতে এই দুদিনেই যেন সে প্রতিমার মত চেহারা ভেঙে পড়েছে। চোখে উদ্ভ্রান্তের মত দৃষ্টি। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

রোদে পুড়ে মাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসেছে মানিক হাজরা। কিন্তু তার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারল না দেবীপুরের বউ। চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে এসে বারান্দায় একটা আসন পেতে দিল ভাইকে, হাতপাখাটা নিয়ে কলের পুতুলের মত বাতাস করতে শুরু করল।

তারপর মানিকের প্রশ্ন শুনে ডুকরে কেঁদে উঠল দেবীপুরের বউ। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

একে একে শুনল মানিক, শুনল সব।

বললে, ভয় নেই, সব কথা শুনলে বোধ হয় ছাড়া পেয়ে যাবি, জজেরও রায় ঘুরে যাবে।

উকিলের সংগে পরামর্শ করে নিরঞ্জনও সেই কথাই বোঝাল। শুধু হাতটা বাড়িয়ে উল্কিটা দেখাতে হবে, বলতে হবে তার জীবনের ব্যথা বেদনার কাহিনী। বলতে হবে, মেরে ফেলতে বলিনি, মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলাম।

শুনল দেবীপুরের বউ। মুখের ভাব এতটুকু বদলাল না। কথাগুলো শুনল কি শুনল না বোঝাই গেল না।

যথাসময়ে মামলা উঠল আদালতে, দেবী-পুরের বউ উঠল কাঠগড়ায়।

তারপর প্রশ্ন শুরু হল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

--উল্কিওয়ালাটাকে মারতে বলেছিলেন কোটালদের?

--হ্যাঁ।

--কেন বলেছিলেন?

--রেগে গিয়েছিলাম হঠাৎ।

--কেন রেগে গিয়েছিলেন?

উত্তর নেই। উকিলের প্রশ্নের জবাবে কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেবীপুরের বউ। চুপ করে আছে।

নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে নিরঞ্জন। নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে মানিক। আর বিভ্রান্তের মত তাকাচ্ছে উকিল। শেখানো জবাবটাও কি দিতে পারছে না দেবীপুরের বউ, সত্যি কথাটা বলতেও কি মুখে আটকাচ্ছে?

--কেন রেগে গিয়েছিলেন বলুন।

বার বার প্রশ্ন করল উকিল, আর দেবী-পুরের বউ শেষ পর্যন্ত উত্তর দিল, সে-কথা আমি বলতে পারব না।

উত্তর শুনে চুপসে গেল সব আশা ভরসা।

শুনানির দিন পড়ল আবার। আর বেরিয়ে আসতে আসতে মানিক প্রশ্ন করল, কী হল, উত্তর দিলি না কেন? উল্কি দেখালি না কেন? তা হলেই তো জজের রায় ঘুরে যেত।

হাসল দেবীপুরের বউ। বিষণ্ণ হাসি।

বললে, কী যে বল! একঘর লোকের সামনে দেখাবো হাতে উল্কি আছে আমার? কী ভাববে বল তো? হয়তো খারাপ কিছু সন্দেহ করবে, হয়তো......না, না, তার চেয়ে যা খুশি রায় দিকগে জজ, যা খুশি......

যা খুশিই হয়তো রায় দেবে এই ছোট্ট আদালতের জজ, কিন্তু আরও বড় জজের এজলাসে, সবচেয়ে বড় জজের এজলাসে হয়তো অন্য রায় পড়া হবে। রায় পড়বেন সেই সবচেয়ে বড় আদালতের জজ, হয়তো বলবেন, "এই আর-একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে মানুষের একদিনের কামনা আর-একদিন কলঙ্ক হয়ে দেখা দেয়, আর সেই কলঙ্ক গোপন করতে গিয়ে মানুষ আরও অনেক কলঙ্কের বোঝা......

# গায়নার জঙ্গলে

## ব্রজমোহন ভট্টাচার্য

জর্জ টাউন ছেড়েছি অনেকদিন। এখনও সুবিধা করতে পারিনি যে গায়ানার ভেতরের দিকে যাব। অথচ সেই জন্যই আসা।

গায়ানা বলতেই মনে পড়ে স্যার ওয়ালটার র্যালের কথা। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস বাহামা-ব্যুবায় প্রথম পা দিয়ে ভাবলেন বুঝি ইণ্ডিয়া বার করেছি। আরাওয়াক্ জাতিদের ভাবলেন ইণ্ডিয়ান। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পা রাখলেন দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমিতে।

তখন ইংরেজ আর স্পানীয়দের মধ্যে দারুণ রেষারেষি। স্পনীয় নাবিকরা দক্ষিণ আর মধ্য আমেরিকা লুঠ করতে আরম্ভ করেছে। কাস্টাইল আর আরোগনের ভাঁড়ারে আসছে আধা-দুনিয়া সেঁচা দৌলত। পেরু, গুয়াটামালা, মেক্সিকোর অফ্‌বান সোনা-রুপা-হীরা-জহরত আসছে জাহাজ বোঝাই হয়ে হয়ে। স্বয়ং পোপ সেই দুর্ধর্ষ স্পেন রাজের হাতে তখন বন্দী। স্পেন তো স্পেন; য়োরোপে তখন অমন ডাকাত দেশ আর নেই। নিরীহদের লুঠ করে অতো ধনরত্ন কেউ সংগ্রহ করেনি।

ইংরেজের চোখ টাটায়। রানী মেরীর অত্যাচারে প্রটেস্টাণ্টদের সঙ্গেমিরা অবস্থা। যীশুখৃষ্টের নামে তখন রোজ ডজন ডজন লোক—মেয়ে-পুরুষ—বলি হচ্ছে, পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ইংলণ্ডে তখন মারণ-উৎসব, অনেকে তখন জাহাজে করে পালিয়ে বাঁচল। যারা পালাল তাদের মধ্যে অনেকে আবার সোজাসুজি জলদস্যু হল। জল দস্যুতা আর কি; স্পেনের সোনারূপ ভরতি জাহাজ, যা কিছু আসছে নতুন জগ আমেরিকা থেকে, যেই আসে য়োরোপে দিকে, ইংরেজ জাহাজ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ত লুঠে নেয়। হকিন্স, ড্রেক এরা সব ওস্তাদ লুঠেরা। সেই সময়ে ওয়ালটার র্যালে জাহাজ নিয়ে বেরুলেন ক্যারিব সাগরে স্পেনের প্রাধান্যের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াতে। সেই অদ্ভুত অভিযানের ফল এই গায়ানা। গায়নায় ওয়ালটার র্যালে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন; গায়নায় ওয়ালটার র্যালে তাঁর জীবনের [illegible] বলি দিয়েছিলেন। গায়না ওয়ালটার র্যালের আশীর্বাদ, অভিশাপ; যশের মুকুট, আর সর্বনাশের চিতাভস্ম।

ওয়ালটার র্যালের কাহিনী বলার জায়গা নয় এটা। তবু একটু বলে রাখলে গায়নার সর্বনাশী ভয়ংকর, তার রাক্ষসী

ওয়ালটার র্যালে

মায়ার স্বরূপ বোঝা যাবে। এ মায়া আজও স্পষ্ট।

যে ওয়ালটার র্যালে ছিলেন কুমারী এলিজাবেথের নয়নের মণি, গা-থেকে কোট খুলে নিয়ে পথের কাদা ঢেকে দিয়ে রানীর ঘোড়া থেকে নামাকে যিনি নির্মল করেছিলেন, তাঁকে ১৪ বছরের জন্য করাগারে ভরে রাখলেন রাজা জেমস্ প্রথম। মুক্তি পেতেন না। কিন্তু রাজার দরকার টাকার। র্যালে শুনে বলেন "যদি আবার গায়ানায় যেতে পারি, টাকা আনতে পারি।' এলিজাবেথের সময়ে এতো রুপো এনেছিলেন এই র্যালে যে তাঁর সঙ্গের দেহরক্ষীর দল, একদল সৈন্য, লোহার বদলে রুপোর বর্ম পরে এলিজাবেথের সভায় উপস্থিত হয়ে অন্যান্য সভাসদ্‌দের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

জেমস্ ভাবলেন সত্যি বুঝি র্যালে আনতে পারবেন প্রার্থিত দৌলত। মুক্তি দিলেন, জাহাজ দিলেন, আশ্বাস দিলেন, বিশ্বাস দিলেন। গায়নায় র্যালে আবার গেলেন।

গায়ানা—"নদীর দেশ"। গায়ানা আরাওয়াক্-ভাষার শব্দ। ওর অর্থ নদীর দেশ। কিন্তু র্যালের চোখে তা "নদী" নয়। র্যালের মর্মে, চিত্তে, চিন্তায়, বৃত্তিতে—গায়ানা হল সোনার দেশ, যে দেশের রাজা এল্-ডোরাডো, যাঁর রাজত্বের নাম—মানোয়া। একেবারেই যে বাজে কথা তা নয়। এরও একটু ইতিহাস আছে, আর র্যালে নিজে শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা রচনা করতেন; আজও তাঁর কাব্য রসিক মহলে পরিচিত। তাঁর রচিত "পৃথিবীর ইতিহাস" আজও রুদ্ধ নিশ্বাসে মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়তে হয়। গায়ানা সম্বন্ধে অমন ভ্রমণ কাহিনী আজও লেখা হয় নি। The Discovery of Guiana। গুণী, কৃতী, বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, যোদ্ধা এই ওয়ালটার র্যালে জানতেন কি করে স্পানীয়েরা ইংকা-সাম্রাজ্য পেরুকে গ্রাস করেছে। তিনি এও জানতেন শেষ ইংকা-সম্রাট মাঙ্কা পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র রাজ্য স্থাপন করেছেন। গভীর বনের মধ্যে সে রাজ্য ঝলমল করে উঠেছে। তার একধারে নীল সমুদ্র, অন্যধারে সবুজের ঢল খাওয়া পাহাড়। মাঝে সোনার দেশ, মানোয়া,—সোনা-রাজা এল ডোরাডো। এ ছাড়া—এখনকার কলম্বিয়া রাজত্বে তখন থাকতো সম্ভ্রান্ত চিব্‌চাস্। তাদের রাজার অভিষেকের সময়ে সোনার গুঁড়ো ছড়ানো হত আবীর গুলালের মতো, তা ছড়িয়ে পড়তো সবার গায়ে। দু তিনদিন পথে থাকতো তা ছড়িয়ে। এ কাহিনী থেকেও মানোয়া-স্বর্ণ রাজ্যের গল্পের জন্ম শত শত বছর লোকেদের মন ভুলিয়ে আছে।

যখন র্যালে আসেন প্রথম, এই এল-ডোরাডোর নাম বহু জায়গায় শুনতে পান। নাবিকদের মুখে মুখে এল-ডোরাডোর নাম। স্পানীয়দের অত্যাচারে জর্জর দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তখন য়োরোপীয়-দের দেখলেই শঙ্কিত হত। প্রবল প্রতিপক্ষ-বোধে সংগ্রাম করত দুরন্ত। যদিও আদি-বাসীদের অনেক দল ছিল। ওয়ারিশানা, পাটামোনা, মাকুশী, ওয়ারুরস্, আরাওয়াক্, আরেকুনা, ওকাওয়াইয়ো ইত্যাদি। এদের সকলের শত্রু ছিল কারিব্। নিষ্ঠুর, ভয়ংকর, দুর্মদ অধিবাসী। তারা থাকত দ্বীপে। মানুষ খেত। তাদের ভয়ংকরতা থেকেই রবিনসন্ ক্রুশোর গল্পে মানুষ-খেকো আর ফ্রাইডের গল্পের উৎপত্তি। কিন্

কারিব্ ছাড়া এরা প্রত্যেকেই পরস্পরে লড়াই করত; একমাত্র কারিব-বধে এরা ছিল এক।... কিন্তু স্পানীয় বধে এরা সব ভুলেছিল সেদিন। যে ভয়ংকর ত্রাস বুকে চাপলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়; সাপ বেজী এক গর্তে বাস করে, দক্ষিণ আমেরিকায় আজকের গোয়ার মালিকেরা সেদিন এনেছিল সেই ত্রাস।

কাজেই র‍্যালের পক্ষে সেই সব জাতদের মন জয় করে এল-ডোরাডো খুঁজে বার করা সোজা সমস্যা ছিল না। তবু অদ্ভুত কৃতিত্ব র‍্যালের। ইংরেজ-জাতটারই এ কৃতিত্ব আছে ইতিহাসে। প্রথমেই ওরা নখদন্ত বিস্তার করে না। ওরা অমৃত ভাগ করে দেবার মোহিনী। পরে অবসরমতো দিতি আর অদিতির ছেলেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে স্বর্গ ভোগ করতে ওস্তাদ। র‍্যালে ভাব করে নিল এই সব আদিবাসীদের সঙ্গে। তাদের কাছে শুনল মানোয়ার কথা, এল-ডোরাডোর কথা।

সেই এল-ডোরাডো ফাঁকি দিয়েছে র‍্যালেকে দু বার। এবার তার বৃদ্ধ বয়স। সঙ্গে আছে চিরদিনের ভক্ত, অনুরক্ত, বিশ্বাসী বন্ধু লরেন্স কীমীস। তার সঙ্গে, র‍্যালে আবার এলো ওয়েস্ট ইণ্ডীজ। পথে হল র‍্যালের অসুখ। ত্রিনিদাদে নিজে রয়ে গিয়ে কিমীস্‌কে পাঠাল র‍্যালে গায়নার গভীরে, ওরিনোকো নদীর পথে গভীর জঙ্গলে। তাদের সেই দুঃখ দুর্দশার কাহিনী এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস হয়ে আছে। এখন শুধু জানা দরকার একটি কথা।

চারশো ইংরেজ সৈন্য নিয়ে কীমীস্ ঢুকেছে ওরিনোকোর মোহানায়। যে সে মোহানা নয়। স্পানীশরা গান বেঁধেছিলো—

Quien se va Orinoco
Si no se mure,
Se volver a loco

অর্থাৎ—ওরিনোকো যদি তোমার প্রাণটি না-ও নেয়, তোমার মাথাটি গোল করে ছাড়বে। ওরিনোকো নদীর মুখ ত্রিশ মাইল চওড়া। এ নদীর জলার বিস্তার নব্বই মাইল। সে জলায় আছে হাজার হাজার নালা, শত শত শাখা নদী। তার মধ্যে কোনটায় যে মূলস্রোতের ধারা, টের না পেলে মাইলের পর মাইল গিয়েও বদ্ধ জলায় আটকে যেতে হয়। সে নদী এক হাজার চারশো মাইল খরবেগে নেমে জলার জটায় আটকে গিয়ে এতো রাশি রাশি কাদা এনে ঢালছে অতলান্তিকে যে সারা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগের সমুদ্রের জল বিশ্রী কাদাগোলা। নীল বারিধি এখানে কাদাগোলা হয়ে মুহ্যমান। শুধু তাই নয় ওরিনোকোর মুখ থেকে ষোলো মাইল সমুদ্রের জল নদী জলের মতো মিষ্টি। জল নোনা নয়; এমন খর ধার সে নদীর। কাজেই স্থানীয় বাসিন্দাদের কৃপা ছাড়া জাহাজ নিয়ে এই সর্বনাশা নদীর জিভ বেয়ে গায়ানার পেটে ঢোকা হনুমানের সুরমা রাক্ষসীর পেটে ঢোকার মতো। মন্ত্র না জানা থাকলেই আর রক্ষা নেই; আর, সে মন্ত্র গুপ্ত আছে ঐ দেশের লোকের কাছে।

এককালে, সেই যৌবনে এসে র‍্যালে বাসিন্দাদের খুশী করে গেছে। ইংরেজ জাহাজকে এরা পথ দেখাতে রাজী। কিন্তু স্পেন-ভক্ত ইংরেজ রাজা জেমস্, র‍্যালেকে চোদ্দ বছর কারাগারে রেখেছিল। কারণ র‍্যালে যৌবনে কুমারী এলিজাবেথকে খুশী করবার আশায় ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে অর্থাৎ তখনকার "স্পানিশ মেনে", কিছুকিঞ্চিৎ স্পানিশ নগর ভস্ম করে তারিফ নিয়েছিলেন। এবার বুড়ো র‍্যালে যখন আসেন তখন তাঁর গর্দান বাঁধা জেমসের খাঁড়ায়। যদি তিনি ভালোমানুষের-পো হয়ে ফিরলেন তো ফিরলেন; যদি রেস্তো কিছু সোনা-রুপো আনলেন তো বলিহারি। কিন্তু যদি স্পানিশদের পশ্চাৎদেশে একটু ছোঁকাও দেন, স্রেফ গর্দানটি যাবে। দুরন্ত র‍্যালে অনন্ত আশা নিয়ে এসেছিল গায়ানায় এল-ডোরাডোর খোঁজে গর্দান কবুল করেও।

কীমীস তার জাহাজে চারশ লোক নিয়ে চলেছে ওরিনোকোর মুখে। এক জাহাজে সে। অন্য জাহাজে র‍্যালের ভাগ্নে, অন্য জাহাজে র‍্যালের ছেলে ওয়াল্টার। আরাওয়াকরা নিয়ে চলেছে সিংহির ছাপমারা জাহাজ। কারণ আরাওয়াকরা জানে এই সিংহি-মার্কা ইংরেজগুলো ভালো লোক। স্পেনের মতো বদমায়েশ নয়।

কিন্তু কোথায় সোনা? পথে স্পেনের একটি ছোটো দুর্গ। যদিও স্পেন-ইংলণ্ড বন্ধু, তবুও কয়েকজন স্পেনীয় রসিক-তীরন্দাজ চাঁদমারি করল বিফল মনোরথ ইংরেজের পতাকা। দেখতে দেখতে বেধে গেল সমর আর সংহার। তরুণ ওয়াল্টার লড়াইয়ের গন্ধে ক্ষেপে উঠল। কীমীস্ হাঁহাঁ করতে-না-করতে সে আগুনে জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সে দুর্গ পুড়ে ছাই। স্পেনীয়রা খতম। ইংরেজরা মোলো মাত্র দুজন।

হায়! তার মধ্যে একজন র‍্যালের একমাত্র ছেলে ওয়াল্টার।

ফিরে এসেছিল কীমীস্ ত্রিনিদাদে। র‍্যালে অপেক্ষা করে আছে এল-ডোরাডোর; তার মুক্তির বীজমন্ত্রের অপেক্ষায়। কীমীস্ মনে মনে কাঁপছে বৃদ্ধকে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেবে কি করে।

সব শুনে র‍্যালে ক্ষোভে, অপমানে, শোকে আত্মহারা। কীমীস্ যে তার হিতৈষী, তার পার্ষদ, বিশ্বস্ত অনুচর, কীমীস্ যে তার দুঃখের দিনে, নির্যাতনের দিনে তার পাশে চিরদিন দাঁড়িয়েছে, সব র‍্যালে ভুলে গেল। দেশ আবিষ্কার করা হয় নি, এল-ডোরাডোর পাত্তা নেই, কোনো ধনরত্ন নেই, স্পেনের সঙ্গে লড়াই করার ফলে তার নিজের প্রাণ-দণ্ড নিশ্চিত, তার একমাত্র ছেলে নেই; মাত্র স্পেনের দুর্গ পোড়ানো একমুঠো ছাই, দু খান সোনা, আর পুত্রশোক, এ ছাড়া কীমীস্ এনেছে দেশে ফিরে র‍্যালের নিশ্চিত মৃত্যু-দণ্ড। কীমীস্‌কে যৎপরোনাস্তি কটুবাক্য আর ভর্ৎসনা করে বৃদ্ধ। সে শোক, সে গ্লানি সহ্য করতে পারেনি কীমীস্। জাহাজের কেবিনে ঢুকে আত্মহত্যা করে সে প্রমাণ করল তার বিশ্বস্ততা।

তাই গায়ানা র‍্যালের চিতা। গায়ানায় ইংরেজের ধ্বজা উড়ছে, কারণ র‍্যালে। তাই গায়ানা র‍্যালের বিজয় তোরণ।

সেই গায়নার রাজধানী জর্জটাউন।

আমার মন নেই শহর থেকে শহরান্তরে থাকা।

তা ছাড়া জর্জটাউন আবার শহর। আরশোলা আবার পাখি! তবে জর্জটাউন আরশোলা নয়, প্রজাপতি। খুব সুন্দর, ঝলমলে দেখতে। তবু প্রজাপতি। জলা থেকে শহর; লার্ভা থেকে ক্যাটারপিলার, তারপরে প্রজাপতি হয়েও মেরুদণ্ডহীন। পাখির ভোজ্য। জর্জটাউনও তাই ঝল-মলে, সুন্দর। কিন্তু "ট্রপিক্যাল্" কলোনী-সাম্রাজ্যের প্রধান নগরী। বাদশাহের নওরোজ-খানার প্রধানা নটী! আজ থাকতে পারে

পাত নেই। পারচয় থাকতে পারে প্রাতষ্ঠা নেই। খাড়া খাড়া কাঠের স্টিলটের উপর কাঠেরই বাড়ি, তার উপর করোগেটে টিনের তিনকোণা ছাদ বিলিতি পালিশে ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ঢেকে দেওয়া। ও আমার ভালো লাগেনি।

শহর দেখতে তো আর জর্জটাউন আসিনি দিল্লী, কোলকাতা, বম্বে ছেড়ে? দেখতে এসেছি গায়ানা, ওরিনোকোর জলা, এসি-কুইবোর জঙ্গল, পাকারাইমার পাহাড়, মাজারুনীর জলপ্রপাত, আরাকাকার আদি-বাসী; দেখতে এসেছি প্রাগৈতিহাসিক মাছ হাসা, জলের ময়াল কামোড়ী; দীর্ঘতম সাপ আনাকোণ্ডা—আশী ফুট লম্বা! বার্ড অব প্যারাডাইস; ভিক্টোরিয়া রিজিয়া; পিপীলিকাভুক; দিনরাত ঘুমন্ত শ্লথ;— দেখতে এসেছি আরাওয়াক তীরন্দাজ, ওপিয়ানা কারিগরী, মাকুশীর পাহাড়ের কাছে হীরের খনি, সোনাবালুর তীর! সেই সব পাদপপাদপ, গ্রীন হার্ট, পার্পল হার্ট সীডার, আর ক্রাব উডের বন। এ সব দেখতে যেতে হবে। অনেকদিন হ... গায়ানায় যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলা...

সুযোগ এসে গেল। প্রিন্সিপ্যাল শ্রু... কান্ত সদ্য এম-এ পাশ করে ঝকঝকে চেহারা আর নেপোলিয়নী দৈর্ঘ্য সম্বল করে আর্যসমাজ মারফত এসেছে গায়না আর এণ্টাল কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে। বৈদিক ধর্ম-প্রচার করার সংকল্প পাঠ করেছে। হরিদ্বারে গুরুকুলে শ্রুতিকান্তের পিতৃদেব সম্মানিত আচার্য। তাঁর বড়ো আশা ছেলে কড়া-দেশ 'আরিয়া' হক, আর্যসমাজের শান ও শৌকত বাড়াক। শ্রুতিকান্ত বলে, "দাদা, মারো গোলি। এ দেশে এসেছি। ইকনমিক্সে আগ্রার দ্বিতীয় বিভাগ, ভারতবর্ষে হালে দপ্তুরী হতে হত! এখানে "বিশ্বানি দেব সবিত" আর "কস্মৈ দেবায়" জপ করে তিনশ ডলার পকেটে ভরছি। সন্ধ্যেবেলার কলেজ থেকে একশ পাই। আমিও যত বুঝি ধম্মো, ওরাও ততো বোঝে। যতদিন পারি স্রেফ লাইফ এনজয় করি। কি খাবেন বলুন হুইস্কি না রাম?"

আমার হাসি দেখে বলে "ঐ তো দোষ দাদা! বড় বেরসিক। কোথায় ভাবলাম দু পাত্র চড়িয়ে নিয়ে যাব এখানকার শ্রেষ্ঠ নাচের জলসায়। এখানে মেয়েদের নাম আছে জানেন তো—"

"জানি বৈকি। এক ওয়েস্ট ইণ্ডীজ য়োরোপকে তিন তিনজন সম্রাজ্ঞী দিয়েছে।"

"শুধু তাই নাকি? ক্যারেবিয়ানের মেয়েরাই হল মেয়ে! বাকী দুনিয়ায় মাদী; মেয়ে নয়। Feminine in Caribbean, females elsewhere!"

আমি বলি, "কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল কান্ত, আমি যাব না ইণ্ডীয়ান্সে।"

"যাবেন না আপনি! কি করবেন তিনে?

ক্যালাভা-বিয়ারও খাবেন না। ক্যারিব মেয়ের সঙ্গে নাচবেনও না। জঙ্গল আর কুঁড়ে দেখার জন্য গণ্ডওয়ানা ছেড়ে মাইকনীতে কেন?"

শ্রুতিকান্ত বলে আর হাসে।

ওর হাসির মধ্যে উচ্ছল যৌবন।

বেশ লাগে সকালটা।

কদিন পরেই করেন্তীনের নিগ্রো ডাক-হরকরা দিয়ে গেল তার।

মাইকনী ক্রীক ধরে ত্রিশ মাইল ভিতরে গেলে ভগতপ্রসাদ তেওয়ারীর বাড়ি পাওয়া যাবে। ওরা ব্যবস্থা করবে একটা আরাওয়াক পল্লীতে নিয়ে যাবার।

O O O

কোরেন্তীন নদী মিশছে অতলান্তিকে। তার তীরেই গ্রাম। নাম বেনাব। "বেনাব"

নিউ আমস্টার্ডাম

মানেই কুঁড়ে ঘর। আমেরিণ্ডিয়ানী ভাষা। কবে, কার কুঁড়ে ঘর ভেঙে আজ হয়েছে ভারতীয় কলোনী। লাল ঝাণ্ডা উড়ছে হনুমানজীর নামে। বেনাবে কয়েকঘর ভারতীয় থাকে। তাদের প্রধান উপজীবিকা চাষ। ধান চাষ। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আমাদের দেশের কোন্নগর বা বোলপুরকে গ্রাম বললে ক্ষেপে যাবেন সকলে। কিন্তু বেনাব গ্রামের চেহারা, ধনাঢ্যতা, পথ ঘাট, বাড়ি ঘরদোর, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, যান্ত্রিক সুবিধা সবই এসব জায়গা থেকে উন্নত। কেবল লোক-সংখ্যায় কম। তাতো হবেই, সারা গায়নার লোকসংখ্যা দিল্লী শহরের লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। তবু এরই মধ্যে নারকেল বনের ছায়ায় সমুদ্রের তীরে বালিতে পা ছড়িয়ে বসে ভাবতে ভালোই লাগল মাইকনি ক্রীক ধরে ত্রিশ মাইল যাব কে এক ভগত-প্রসাদের বাড়ি। আবার তেওয়াড়ী! যারা ইণ্ডেঞ্চার্ড লেবার হয়ে এ দেশে এসেছিল তারা বামুন ছিল না। তবু তেওয়াড়ী। হিন্দী বলে না, ধুতি পরে না, টৌবিকে ছাড়া খায় না, হঠাৎ পা পিছলে হুমড়ি খেলে বলে "মাঈ গড্"—তবু, তবু তেওয়াড়ী।

বেনাব থেকে মাইকনী ক্রীক।

ব্রিটিশ গায়নায় বসবাস মানে সমুদ্রতীরের কাছাকাছি চার পাঁচ মাইলের মধ্যে, বা বড়ো বড়ো নদীর ধারে বিশ মাইলের মধ্যে। আসল ব্রিটিশ গায়না নব্বই হাজার স্কয়ার মাইল (উত্তর প্রদেশ এক লক্ষ বারো হাজার স্কয়ার মাইল) এই বিশাল দেশের বিশাল বনভূমি আজও কুমারী। স্যর ওয়াল্টার র‍্যালের ভাষায়—"hath yet her Maydenhead"। যদিচ সমুদ্রতীর আর লোক-বসতির কাছাকাছি জঙ্গলে আদিবাসীরা তাদের ভাষা ভুলেছে, ট্রাউজার পরেছে, নাম রেখেছে জেকব, দানিয়েল, বাথশেবা মেরী আর জসেফীন, যদিও তারা মদ খায় বোতলের আর জামা গায় দেয় ক্যানাডার, তবুও জঙ্গলের ভেতরে এখনও ওরা শান্ত, নির্বিকার, উলঙ্গ, শিকারী আর সত্যিকার অলস। মন্থর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রায় এখনো ওরা পৃথিবীর চমৎকার।

সেই চমৎকারের প্রথম তোরণ মাইকনী ক্রীক। বেনাব থেকে মাইকনী ক্রীক যাবার পথে পড়ে বিশাল নদী বারবীস। তার তীরে ডাচেদের সময়কার রাজধানী নিউ আমস্টার্ডাম।

মনে পড়ে যায় কয়েকটা মজার নাম। ...ই গ্রামের কাছাকাছি এক গ্রামের নাম বেঙ্গল; একটা গ্রামের নাম টামিল; একটার নাম কনাড; আবার লণ্ডনও আছে। ত্রিনিদাদে গ্রামের নাম দেখেছি ফৈজাবাদ, বেনারস, কানপুর, জৌনপুর, পাটনা, বারা-বাঙ্কি। নাম দেখেছি সীলোন, হুগলি, মদ্রাস। অবাক হই না। কারণ অতলান্তিক পার হয়েই তো আছে নিউ-ইয়র্ক, নিউ-জারসী, নিউ-জীল্যাণ্ড, নিউ আমস্টারডাম, এমন কি য়ুনাইটেড স্টেটসে আছে লণ্ডন, ডাবলিন, সাউথহ্যাম্পটন! দেশ ছেড়ে যেসব মানুষ চিরদিনের জন্য চলে এসেছে তারা কি ভুলতে পারে দেশের কথা। নানা মায়ার টানের চেয়ে রক্তের টান, দেশের টান কিছু কম নয়।

এখানে আসার পর কতো লোক আমায় দেখতে এসেছে; আমায় হাত দিয়ে ছুঁতে এসেছে;—আমি গঙ্গা-গোদাবরীর ছেলে; আমি ভারত দেশের ধুলোমাখা শরীর এনেছি এদেশে। সুদূর এসিকুউবোর ধারে থাকে কেশব (নাম লেখে Katchew)। আমায় সে "কেশব"-ই বলল। এসেছে গোরখপুর থেকে। বাপ আর মা দুজনেই ভারত থেকে এগারো বছরের ছেলে নিয়ে এসেছিল। সে বছর বিহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। হাঁটতে হাঁটতে ওর বাপ-মা চলে এসেছিল কলকাতায়। সেখানে আড়কাঠীকে বোধ হয়েছিল সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ। সেই চলে এল জাহাজে করে নতুন রাম রাজ্য শ্রীনাম। শ্রীনাম যে সুরিনাম, ডাচেদের গায়ানা তা জানত না। কেশবের বাপ ছিল কুমার

মাটীর বাসন তৈরী করত। এখানে সে জীবনভোর কেটেছে বুকার কোম্পানীর আখ। ছেলেও তাই করত। কিন্তু এগার বছরে ছেড়েছে সে গ্রামের বাণগঙ্গা নদীর ধার। সেই গ্রাম, মহুয়ার বন, আর সর্ষে-ফুলের হলুদের উপর ঝিলিক মারা উত্তরায়ণের সূর্যের তাপ, নতুন গুড়ের গন্ধ আর কাজরীর গান। এ সবই মনে আছে কেশবের। আমায় দেখতে এসেছে এক বোতল ঘি হাতে নিয়ে।

"এনেছি বটে! ঘি এখানে না জানে কেউ করতে, না কেউ খায়। দুধ-ই পাবেন না আপনি। সব বোতলের দুধ, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া আর হল্যান্ড থেকে আসছে। মাখনও তাই। এ ছাড়া মার্জারীন আর প্লাম্-বাটার তো আছেই। এখানে গরু পোষে অনেকে। সবই সাভানায়। বাড়িতে গরু পোষে না কেউ। গরু পোষে মাংস বেচবে বলে। গরুর মাংস সবাই খায়।" বলে আর অভিমানে গলা ভরে ওঠে বৃদ্ধের। "আমি আর ঐ আখক্ষেতে কাজ করি না। আখ ক্ষেত আমার বড়ো শত্রু। সেরা দুশমন। ঐ আখ ক্ষেত আমার জাত নিয়েছে, পাত নিয়েছে, পরিচয় নিয়েছে, ভাষা নিয়েছে, ধর্ম নিয়েছে। কী আছে আর আমার?"

হঠাৎ কেন যেন দুঃখ হয়। কালো চেহারা। দাড়ি আছে বুক অবধি। তবে তা কাঁচার চেয়ে পাকা বেশী। চুলের পাক দেখা যায় না। মাথায় শিব ত্রিপুণ্ড্রক। সাদা একটা পাগড়ী বাঁধা। পরনে একটা ট্রাউজার তার ওপরে সাদা মার্কিনের একটা জামা; মের-জাইয়ের যেন দড়ি নেই, বা পাঞ্জাবীর ঝুল নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমার বিয়ে, ছেলেপিলে, কেশব ভাইয়া?"

"ভাইয়া বলে কেউ ডাকে না। আপনি দেবতা। ভাইয়া ডাক শোনালেন। ছেলে একটি। মেয়েও একটি। বিয়ে করেছিলম। বাবা বলেছিলেন বিয়ে করিস না। আমার যা আছে তাই বেচে বুচে দেশে চলে যাস। কিন্তু তখন করকরে যৌবন। আখের ক্ষেতে কাজ। দুপুরে পাশাপাশি সব যুবতী মেয়ে নিয়ে কাজ। ক্ষেতের গভীরে যে সব কীর্তি দেখতম তার নেশা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় মদের ভাঁটিখানায় পেতাম অঢেল রাম্। কাজেই একদিন বিয়ে না করে উপায় রইল না। তবে বুড়ী বিন্ধবাসিনী আজও বেঁচে আছে। আমি রাম্ ছেড়েছি, আখের ক্ষেত ছেড়েছি—সবই ঐ বিন্ধবাসিনীর জন্যে। ও খাটতে পারে দৈত্যের মতো। ও খাটত। বাঁশ কেটে এনে ধামা ঝুড়ি বুনত। আমি কাদা দিয়ে গেলাস, ঘড়া, কুঁজো, বাটি বানতাম। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটা ব্রাহ্মণের ছেলে। তাই কিছু টাকা দিতে হয়েছিল। এখন অবশ্য ওরা ব্রাহ্মণ, আমরা কুমোরই কথা পাঠ করে বাড়-ঘর-দোর করেছে। নাতি বিলেতে পড়ছে। ছেলে আমার স্যানিটরি ইন্সপেক্টর। তার বিয়ে দিয়েছি আমার বাপের গাঁয়ের এক কেওটের মেয়ের সঙ্গে। বাড়িতে আমি হিন্দী বলি, কিন্তু নাতি-নাতনীরা সব হিন্দী ভুলে গেছে।"

এমনি দেখতে এসেছে গুরগাঁও জেলার চন্দন। সে এখন পাদ্রী। দেখতে এসেছে ঝাঁসীর গণেশ। সে এখন আচার্য—তার মেয়েরা কেউ নার্স, কেউ ওয়েলফেয়ার অফিসার। ছেলেরা কেউ ডাক্তার, কেউ গরু বেচে ... সবাই করে।

মাইকনী ক্রীকের মুখে ব্রীজ্

কতো লোক দেখতে আসে। তাদের বড়ো শখ "হিন্দু হিন্দী হিন্দুস্তান"। তাই তারা গায়ানার গ্রামের নাম রাখে বেঙ্গল; স্কুলের নাম রাখে টেগোর মেমোরিয়াল; ছেলেমেয়ের নাম রাখে ভগত প্রসাদ, সত্যদেব আর ভোজবতী, উর্মিলা আর মধুকরী।

মাইকনীর ভগত প্রসাদদের বিরাট খামার। ওদের ট্রাকটর আছে, মোটর লঞ্চ আছে, রাইস হারভেস্টিং কম্বাইন্ আছে। রঙের জন্য ঘোড়া আছে, স্-মিল আছে। ওরা ডাকছে মানে সাঁতাই আমেরিণ্ডিয়ানদের মধ্যে যাওয়া যাবে।

মাইকনী ক্রীকের মুখে এসে পড়েছি। শ্রুতিকান্ত অপেক্ষা করছিল। ও জিজ্ঞাসা করল, "কিসে এলেন?"

বললাম যে, একটা মোটর পেয়ে গিয়ে-ছিলাম। মোটর সুদ্ধই স্টীমার পার হয়ে চলে এসেছি।

একটি বছর ত্রিশের মহিলা এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

শ্রুতিকান্ত বলে, "দাদা এঁর বাড়ি এখন আতিথ্য নিতে হবে।"

মহিলাটি ভারতীয়। কিন্তু মাথায় জড়ানো তিন কোণা করে একটা মাদ্রাজী রুমাল। তেলেগুরা ঐভাবে মাথায় ফেটি বেঁধে কাজ করে। পরনে দামী নাইলনের জুতো। কানে সোনার দুল। হাতে সোনার বালা। তার কারিগরী ভারতীয়।

পোশাকে এই অপূর্ব পাঞ্চ এখানকার বনেদী কৃষ্টি। এরা মিশে যেতে চায় না এই কলোনী সভ্যতার পাঁকে। ভারতীয় বলে অহংকার আছে, দর্প আছে, অভিমান আছে। প্রাণপণ লড়াই করে এরা নিজেদের বেশভূষায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। শাড়ি এদের দুষ্প্রাপ্য। ছোট বহরের থানের কাপড়ই একমাত্র পরিধেয় ছিল বহুকাল। শাড়ি পরা তেমনিই বিলাস যেমন মাঝে মাঝে আমাদের দেশের গাউনপরা ক্রীশ্চান মেয়েরা শাড়ি পরে বিলাস করে।

সত্যবতী ঝিঙ্গুরে। স্বামীর ব্যবসা ...। একটা প্লেটে কালো কালো ...র মতো একগোছা ক্যানাডার আঙুর ...নে দিলেন। এক গেলাস দুধ আর দুটি ...পেল।

খানিক পরে মোটর দাঁড়াল। মোটরে ...র মাইকনী ক্রীকের ধার ধরে ধরে লাল ...রকি বিছানো পথে এগুতে লাগলাম। ...ধারে ঝোপ ঝাড়। কলাগাছ, আম আর ...কোলই বেশী। পেঁপেও অনেক। মাঝে ...ঝে ঘুমন্ত গ্রাম। গ্রাম আর কি। কোনও ...গ্যাংবেষীর বাড়ি। তার আশেপাশে আরও ...য়েকখানা বাড়ি। অনেক জমি নিয়ে বড়ো বড়ো ধানের ক্ষেতের মালিক এরা। সকলেই নিজে চাষ করে। ট্রাকটর নিজেরা চালায়।

ক্রীকের ধারে মাইল দশেক পর এক জায়গায় পথ গেল থেমে। জঙ্গল আর এগুতে দেবে না। আমাদের দেশে যেমন শালতী ডোঙ্গা এদেশেও তেমনি বড়ো বড়ো ডোঙ্গা। ঈটের গাছ থেকে বা প্যার্পল-হাট-এর গাছ থেকে শক্ত খোলসটা ছাড়িয়ে তারপর তার আষ্টেপিষ্টে বালাটা (রবার জাতীয় গাছের আঠা) আর জঙ্গলের অন্যান্য গঁদ মাখিয়ে করে তোলে ডোঙ্গা। সেই ডোঙ্গায় চেয়ে বসলাম। ক্রীকের জলের রং তামাটে। অথচ তলায় মাছ চলছে দেখা যায়। আগাগোড়া বনপথে চলে চলে নানা গাছগাছড়া ভেজানো জল বলে এতো লাল।

জলের দু ধারে তীর নেই। আট দশ হাত পর্যন্ত খাড়া নানা গাছ। ম্যানগ্রোভ। এরই মধ্যে একটু জায়গা পরিষ্কার করে শালতি থেকে ওঠা-নামা করার জায়গা। ল্যাণ্ডিং বলে। ল্যাণ্ডিংয়ের মুখেই গির্জা। গির্জা সংলগ্ন একটা স্কুল।

ভগতপ্রসাদ নিজে এসেছিল আমাদের নিতে। ওর গাঁয়ের নাম ওয়েলক্লোজ। কাছাকাছি ব্রিটিশ গায়ানা গভর্নমেন্টের বিশাল চালের মিল। সেই সুবাদে ... বাদাড়ের মধ্যেও কোথাও কোথাও ... বিজলীবাতি দেখা যায়।

ভগতপ্রসাদ ব্যবস্থা করেছে ... পুরো লঞ্চে কদিনের মতো ...

পাওয়া যাবে না। আমেরিণ্ডিয়ানদের দেবার জন্যই কিছু দরকার; তাই নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে শুকনো মাংস, সদ্য মাছ আর কাসাভার রুটি ছাড়া বড়জোর কাসিয়া মদ পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের দলে আমরা দশ বারোজন আছি। পরদিন খুব ভোরে লঞ্চ ছাড়ল। সেই তামাকপাতা রংয়ের জল, র' চায়ের মতো গাঢ় নয়, তবে হাল্কা চায়ের জল বলা যেতে পারে। তার উপরে ঝুলে পড়েছে গাছ। বুক অবধি জলে ডোবা গাছগুলোকে ম্যানগ্রোভ বলে। কচুপাতার মতো দেখতে, পানের সাইজ, আর গাছের ডাটিগুলো শক্ত খাড়া খাড়া বেতের মতো, ঘিঞ্জি হয়ে আছে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে থাকে ওয়াটার কামোডী, গায়নার বিখ্যাত জলের ময়াল। বোয়া কনস্ট্রিক্টরের মতো গরু-মোষ খেকো না হলেও ওয়াটার কামোডীর সংগে এক জলে সাঁতার কাটতে কুমীরও ভয় পায়। কুমীর নেই। মেছো কুমীর—এলিগেটরগুলো যজ্ঞিবাড়ির রবাহূত বামুনের মতো জাত দেখিয়ে বেড়ায়, তবে যা পায় আর যেখান থেকে পায় খায়। ওদের দেখা প্রায়ই পেতে লাগলাম। নতুন পাখি দেখলাম। মোরগ যদি উড়তো আর মোরগের ঠোঁট যদি হত হাফ-কাঠঠোকরার মত তা হলে ও পাখির সংগে তুলনা করা যেতো। মাথার ঝুঁটি সুন্দর, বড়ো, তবে খুব বাহারের নয়। জোড়া বেঁধে বেঁধে থাকে। ওদের মাংস খায় না কেউ। পালকের জন্য শিকার করে বটে, তবে কদাচিত। এদের নাম কাঞ্জি ফেসাণ্ট (Canje Pheasant)। ফেসাণ্টেরই জাত, তবে টিকটিকি যেমন কুমীরের জাত। একটা দুটো নতুন পাখি লোকালয়েই দেখেছি। এদেশে কাক দেখিনি। শহরের আর গাঁয়ের মুদ্দোফরাসের কাজ করে শকুন আর গাঁধের মতো ভুষো-কালি বর্ণের এক কুৎসিত পাখি, মাথা থেকে গলা পর্যন্ত কোঁচকানো কালো এক শক্ত চামড়ায় ঢাকা, যেন গ্রীক সৈন্যের শিরস্ত্রাণ। আর ওলড্ উইচ পাখি। মাথা আর ঠোঁট প্রায় এক সাইজের। কালো। ময়নার মতো সাইজ। লেজ সোয়ালোর মতো লম্বা। দেখতে উইচেরই মতো। প্রচুর মাছরাঙা। নানা বর্ণের।

জলের উপর দিয়ে লঞ্চ চলেছে। সারা বনভূমি সেই শব্দে চকিত। আমাদের সংগে অনেক কটা বন্দুক। আমি মাঝে মাঝে বাগমারী প্র্যাকটিস করছি আর মনে হচ্ছে, বিবেকানন্দের ভাষায় কেমন যে "ওজঃ" বেড়ে যাচ্ছে।

কথায় কথায় মেজর ওয়াটকিন্সের সংগে ভ্রমণের কথা উঠল। যুদ্ধের সময়ে মেজর ওয়াটকিন্স আমেরিণ্ডিয়ানদের দিয়ে পথ বানিয়েছেন ইঞ্জিনীয়ার কোরের হয়ে। স্প্যানিশ আর নিগ্রো মিলে ছিলেন মেজর

জলের দুধারে তীর নেই

ওয়াটকিন্সের ঠাকুর্দা। তারপর ওদের মধ্যে মিশেছে কেবল সাদা রক্ত। আমার মনে হয় যে সাদা মিশেছে সে সাদাও পাঁশুটে হয়ে গিয়েছিল মেশার আগেই। মেজর ওয়াটকিন্স লম্বায় পুরো ছ ফুটের একটু বেশী, চওড়ায় ওয়াটকিন্সের ভাষায় বলি—"এমন গোল হয়ে যাচ্ছে মাঝখানটা যে, লোকে মদের পিপে বললে কেবল একবার হাঁ করে যদি ঢেলে দেয়।"

"রোরাইমা যাবেন? আমরা বলি মাদার অব রিভার্স। নিয়ে যাবো। ভেনেজুয়েলান ক্রাইসীসের সময় ওখানে আমায় একটি বছর কাটাতে হয়েছে। মাত্র নয় হাজার ফুট উঁচু। বেশী নয়। তবে হাতে কাটলাস্ নিয়ে চলতে হবে। সামনে পথ কেটে কেটে চলতে হবে। মাঝে মাঝে গাছ কাটতে কাটতে অন্য কিছু কেটে ফেলবেন হয়ত। আমি একবার মরেই গিয়েছিলাম। সামনে কেবল ঝুলছে লিয়ানা লতা আর গভীর বন। কেবল কাটলাস চালাচ্ছি। ওপরে একটা গভীর ছাদ। মনে হচ্ছে ওই ছাদ থেকে চুঁয়ে অন্ধকার আর সবুজ থকথকে আলো পড়ছে ঝরে ঝরে। ঘাড়ে যদি ওর একচাপ আলোর থাবা পড়ে গা ঘিনঘিন করবে। বিশাল বিশাল মাকড়সার জাল

আমাদের লঞ্চ

পাতা। তলা থেকে ভাবসানী উঠছে। একটা বড়ো লিয়ানার লতা কোপাই, অথচ কাটে না। আমি যা কতক দিয়ে একপাশ দিয়ে চলে যেতে না যেতে পেছনের আমেরিণ্ডিয়ানটা চিৎকার করে ওঠে। দেখি লতা বলে যেটার গায়ে খাঁড়া চালিয়ে সরে এসেছি সেটা একটি অতিকায় আনাকোণ্ডা। আমার অপরাধের প্রতিহিংসা নিয়েছে আমেরিণ্ডিয়ানটার উপর। আনাকোণ্ডাকে মারলাম, তবে লোকটা বাঁচল না। আমেরিণ্ডিয়ানরা পারতপক্ষে সাপ মারে না। ওরা যেন চটপট সাপ দেখতে পায়। আমরা পাই না। ওই ন হাজার ফুট মানে তিন হাজার গজ ওটা এমন কিছু নয় মনে হয়; কিন্তু ওর প্রতি ফুটে মৃত্যু। যাবেন যখন আমায় নিয়ে যাবেন। আমি জলের পথে নিয়ে যাবো। রোরাইমার প্রান্তরে পাবেন সত্যিকার নতুন দেশ। এ সব আমেরিণ্ডিয়ান তো কণ্টামিনেটেড্—ছোঁয়াচ লাগা। ওই রোরাইমার প্রান্তর নিয়েই লেখা কনান্ ডয়েলের বিখ্যাত 'লস্ট কনটিনেণ্ট'।"

হঠাৎ চোখ পড়ে গেল ছোট লাল লাল এক সার কি ভাসছে জলে। বায়নাকুলার লাগিয়ে দেখতে থাকে, অমন সুন্দর জিনিস কখনও দেখিনি। এক সার লাল পাল যেন ভেসে চলেছে। যেন একটা জাহাজের দল। উইলি ওয়াটকিন্স দেখে বলল, এক জাতের মাছ ওরা—নাম ফিসালিয়া। এমনিতে আমরা বলি "পর্তুগীজ মেন অব ওয়ার" ওদের ঐ ভাসমান পালের তলায় সরু সরু তার ঝুলেছে, তার পাল্লায় মাছ এলে আর রক্ষা নেই। তার গুটিয়ে যাবে, ভোজনান্তে আবার শিথিল হবে।

ম্যানগ্রোভ আর জলা শেষ হয় না। লঞ্চ চলেছে। লম্বা গলা সাদা সাদা গোলিংস ডালে বসে আছে, এক এক জায়গায় গাছ সাদা করে। চিৎকার করে কতকগুলো পাখি। ধোঁয়াটে, পাঁশুটে—বলে স্ক্রীচ্ বার্ড। আর চকচকে আলপাকা কোট গায়ে লাল চোখ আর গলায় টার্কির মতো রক্তের থলে চাপকানো মাসকভী ডাক (Muscovy Ducks)। হাতের বন্দুককে সুড়সুড়ি দেয়। এ জলায় থপ্ করে ওরা চড়তেও পারবে না। মারা খুব সোজা। বন্দুক তুলেছিল ভগত। আমি নামিয়ে নিলাম। "মাংস হবে এখন পরে। এখন এমনিই চলো।"

জলা আর জলা। তার মধ্যে ম্যানগ্রোভ। যেখানে যেখানে জল অগভীর মূল গাছের গুঁড়ি (গুঁড়িই বলি—আসলে পাতলা নরম। সবচেয়ে যেটা মোটা তার বেড় হবে একটা ছড়ির মতো)—সেই গুঁড়ি ভাগ হয়ে গেছে চার পাঁচটা শেকড়ে। শেকড়গুলো জলের মধ্যে কাদায় দাঁড়িয়ে আছে নোংগরের মতো। সেই সব শেকড়ের খিলানের মাঝ দিয়ে দেখা যায় নানা চি

বিচিত্র। নীল পাখা প্রজাপতি, হলদে ফুল, সাদা পাখি, ধোঁয়াটে অ্যালিগেটর। হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ। লঞ্চের সঙ্গে বাঁধা ছোট ডোঙগাটা। এরা বলে ক্লাল্। সেটায় চড়ে সঙ্গের নিগ্রোটা চলে গেল। বিশাল একটা শিমুল গাছের বড়ো বড়ো ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলে। তার গায়ে বসেছিল ইগুয়ানা, অতিকায় সবুজ বর্ণের টিক-টিকি। এমনিতে বিষাক্ত। সবুজ দেখতে বলে অত্যন্ত তুখোড় শিকারী ছাড়া চলন্ত নৌকো থেকে চিনতেও পারে না, শিকারও করতে পারে না। গুলী করলেই ওরা নীচের ঝোপে পড়ে। তারপর সেই ঝোপ থেকে বার করে আনতে হয়। মাংস অতি সুস্বাদু। আমেরিণ্ডিয়ানরা পেলে লাফায় যেন পদ্মাপারের লোক পেয়েছে ইলিশমাছ।

এই সুবাদে কয়েকটা মজার খাদ্যের কথা আরো বলি। ব্রিটিশ গায়ানায় ইগুয়ানা—মানে পদ্মাপারের ইলিশমাছ, ইংরেজের পক্ষে বীফ, ফরাসীবাচ্চার ট্রাউট—মদ্রভায়ার তেঁতুলের ঝোল। তেমনি এদেশে অর্থাৎ সারা ক্যারাবিয়ানে বনেদী খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য—ছোট ছোট বাঁদরের মাংস, মাথাগুলো দিয়ে আস্ত মাথার সুপ হয়। এটা সেণ্ট কিটস্ দ্বীপের সেরা খাবার। ব্যাঙ ভালো করে ভেজে, সস্ দিয়ে খেতে অনেকেই যায় সেণ্ট লুসিয়া দ্বীপে। আমি তাই ও সব দিকে যাবার সময়ে সোজা বলে দিয়েছিলাম যে, আমি নিরামিশাষী। গরুর মাংস খাই না বলে একবার হোটেলে তরিবত করে বাছুরের মাংস এনে দিয়ে পরিচারিকা বললেন হেসে—"এটা খুব ছোট বাছুর। দুধ দিয়ে সিদ্ধ করার পর রান্না। হজম করতে কোনও কষ্ট পেতে হবে না।" অথচ এই দেশেই দেখেছি বিষম ঘেন্না কাছিমের ডিম খাওয়ায়। যদিচ গ্রেনাডা আর টোবাগোতে কচ্ছপের মাংস পড়তে পায় না। এ সব রান্নার কথা যা বললাম শুনতে বুনো লাগতে পারে, কিন্তু বুনোদের খাবার নয়। এগুলোকে এরা বলে ডেলিকেসি। বড়ো বড়ো হোটেলের মেনুতে থাকবে মাম্পিক কিকস্, ক্রাপ্টেড ফ্রগস্, রোস্টেড লাব্বা—ইত্যাদি। ঐ লাব্বা নামক বস্তুটি, পিকেরি আর ক্যাপিবারা গায়ানার মাল। লাব্বা হলেন রোডেণ্ট জাতীয় অর্থাৎ পুরুষ্টু ইঁদুর যার সাইজ ডবলডোজ খরগোশ। পিকেরি দেখে শোর ভাবা যায় হয়তো, কিন্তু শোরের গায়ে অমন গন্ধ নেই। আমাদের গন্ধমূষিক যদি বাংলা দেশের ছাগল হতে পারতেন, বলতাম লাব্বা। আর বেচারি এপিবারা প্রায় ভেড়ার মতো, তবে বুনো।

আমায় এ সব মাংস বহুবার বৈষ্ণব বিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তবে লাব্বা খেয়েছি। ক্যাপিবারও।

ইগুয়ানা টেনে তুলে এনেছে নিগ্রো মিত্র রাফায়েল। গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল গলুইতে।

লঞ্চ চলেছে। চড়চড়ে রোদ, কিন্তু দু ধারের লম্বা লম্বা গাছ এমন করে ঢেকে আছে যে, রোদ লাগছে না গায়ে। ইস্পাতের পাতের মতো ক্রীকের জল ঝকঝক করছে। গাছের মধ্যে বেশীর ভাগই নানা জাতের পাম। ভীষণ কাঁটাওলা এক রকমের পাম দেখলাম। এক একটা কাঁটা পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। আর সেই পা থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত কাঁটায় কাঁটায় ভর্তি গাছ। এরা বলে ব্রাম্বল্ পাম। আর আছে ঈটে গাছ। দেখবার মতো গাছ। এক একটার বেড় আট ফুট ন ফুট। হয় আশী ফুট অবধি লম্বা। আমি যা দেখেছি, তা যেখান থেকে পাতা শুরু সে অবধি হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট। সোজা, ভেলাল, বিশাল একখানা থাম উঠে গেছে, আর তার মাথায় এক ঝাঁক সাগু গাছের মতো পাতা। এ গাছ এদেশের সম্পদ না হলেও আমেরিণ্ডিয়ানদের লক্ষ্মী। পূববাংলায় সুপুরি, কলা আর নারকেল যা। এর ফল থেকে এরা আটা করে খায়। এর পাতা দিয়ে ঘর ছায়। এর গুঁড়ি দিয়ে ঘর তৈরি করে, ভেলা বানায়, ল্যাণ্ডিংয়ের সিঁড়ি করে। এর গুঁড়িটা পচে গেলে এর ভেতরে জন্মায় এক ধরনের সাদা সাদা পোকা—যেন ক্যাটারপিলর। সে পোকা এদের অতি উপাদেয় ও বলকারী খাদ্য। এর ছোবড়ায় দড়ি পাকায়। ঈটে এদের বড়ো দরকারী গাছ। যতদূর দেখি কেবল উঁচু উঁচু ঈটে আর শিমুল চিনতে পারি, বাকী সব একটা নিরাকার, নিরেট, অন্ধ, বন্ধ সবুজের চত্বর, যেন ড্যাপসানী ভরা, মৃত্যু-শীতল, নিষেধ-দপ্তর।

তবু মাঝে মাঝে দূরে থেকে দেখি আমেরিণ্ডিয়ান গাঁ। ক্রীকটা বেঁকে বেঁকে গেছে এমন যে মাঝে মাঝে লঞ্চ আটকে যাচ্ছে। জলে নেমে ঠেলতে হচ্ছে। তার মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সত্যিই একফালি, ছোট্ট দ্বীপ। তার বুকে লক-লক করছে প্রাণে রসে ভরাট এক থাবলা শষ্প। আশেপাশে যেন ফুটে আছে ওফেলিয়ার মুঠোতে স্বপ্নালু নানা লিলি। ফুলে ফুলে ভরা জল। হয়তো বাঁশের মতো একটা ঝাড়। লক্ষ্য করলে এ সব জায়গায় দেখা যাবে পাড়টা একটু শক্ত, একটু মসৃণ। ঝাড়টার পেছনে খানিকটা খালের মতো। জল নিয়ে গেছে মানুষ ভিতরে। ক্রীক আছে ঐ জলের বুকে। লুকোনো লুকোনো ঝোপের পিছনে। ঐখান দিয়ে গেলে দেখা যাবে আমেরিণ্ডিয়ান গাঁ। সে গাঁয়ে ছেলেরা ঝাঁপাই ছুড়ছে। নিরালায় কেউ শিকার করছে তীর-ধনুক দিয়ে। আবার অনেকে গাছ কেটে ভেলা বাঁধছে। বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি। ক্রাবউড, সীডার, গ্রীন হার্ট। দামী দামী কাঠ। অদ্ভুত ভেলা তৈরী করে। জলপথে ঠেলে নিয়ে যাবে পঞ্চাশ ষাট মাইল। পোঁছুবে কোনো করাত কারখানায়। বেচে আসবে। ফিরবে যে ক্রালে সেটা তোলা আছে ভেলার উপর। ভেলার উপরেই পাতা ছাওয়া এক-খানা ঘর। সেই ঘরে বৃষ্টিতে মাথা গুঁজবে। যে সব আমেরিণ্ডিয়ানরা বাঁধছে ভেলা তারা সমর্থ। কিন্তু ভেলা নিয়ে যাবে তরুণ। তারা উলংগই প্রায়। একটা ফেটি বাঁধা কোমরে। ক্রাকের বৈঠায় ঠেলা দিচ্ছে, ভেলার কাঠের সঙ্গে কাঠ লিয়ানার দড়ি দিয়ে বাঁধছে, গায়ের তামাটে চামড়া ফুলে উঠছে ভেতরের সজীব মাংসপেশীর চাপে। মেয়েরা সাহায্য করছে। প্রায় উলঙ্গ। আমাদের দেখে জলে নেমে যাচ্ছে। ক্যামেরা দেখে ডুব মারছে। অথচ পাড়ের উপর এরা পরে থাকে গাউন, যা পাদ্রী-বাবারা দিয়েছে ওদের সিফিলিসের সঙ্গে, রুক্ষতার সঙ্গে, আর আমেরিণ্ডিয়ানদের জীবন গভীর কষ্টের সঙ্গে। মিশনারীরা এসে এদের জীবনকে ভালো করেছে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে কথা বলবার অবকাশ এখন নয়।

এখন যাত্রাটা দেখা যাক। এ

আমেরিণ্ডিয়ানদের শিকার

বেশীর ভাগ যে আদিবাসীরা থাকে, তাদের নাম ওয়ারাস। র‍্যালে বলে গেছেন এরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় অতিথিবৎসল জাত। আর এদের simple moralityতে কোন vices নেই। তখন র‍্যালে এদের দেখেছেন গাছের মাথায় বাড়ি করে থাকতে। কারণ র‍্যালে এসেছেন বর্ষা কাটিয়ে। তখন জলে জল হয়ে থাকত জলা। কয়েক মাস নদীর পাড়ে ওরা গাছের মাথাতেই থাকত। কিন্তু এখন তা থাকে না। ঐ ধরনের গাছের ওপর গাঁ অনেক জায়গায় থাকার জন্যই নাম হল ভেনেজুয়েলা—ছোট্ট ভেনীস। নামটা স্পানিয়ার্ডদের দেওয়া। আরাওয়াক আর ওয়ারাসরা প্রায় মিলেমিশে থাকে এখন।

এদের সব বিচিত্র বিচিত্র রূপকথা আছে, পুরাণ আছে, পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি নিয়ে গল্প আছে। এদের ভূত আছে, ভগবান আছে, ওঝা আছে, পুরুত আছে।

ওরিনোকো, এসিকুইবো দুই নদীর মধ্যে এদের বাস এখনও বিচিত্র। আমি যাচ্ছি মাইকনী ক্রীক দিয়ে। সেটা এই অংশের পাশে। মাঝে ত্রিশ মাইল গভীর জঙ্গল।

দুপুরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। একই রকম দেখতে দেখতে মন ঝিমিয়ে এসেছে। লঞ্চের একই রকম শব্দ। হঠাৎ ভগত ডাকল। প্লেটে করে খাদ্য দিল। কয়েকখানা ক্যাসাভা আর ময়দা মেশানো রুটি। আলুর একটি তরকারী। মাছ ভাজা। প্রথম দুটো বাড়ি থেকেই আনা। শেষেরটি ও লঞ্চের মধ্যেই করেছে। নদীতে মাছ ধরেছে, আর কেরোসিন গ্যাস স্টোভে নারকোল তেলে ভেজেছে। সঙ্গে এক এক মগ কফি। সামান্য খেলাম। চোখে ঘুম।

কিন্তু এ যেন অন্য রাজত্ব। দু ধারে উঁচু পাড় উঠে গেছে। বালির পাড়। সাদা সাদা ধবধবে বালি যেন পোর্সেলিনের গুঁড়ো। ইংকুষ্ট চক বা বক্সাইটের কাছাকাছি কোনো ভূতত্ত্বের সগোত্র। জলের তলায় সামান্যতম মাছটাও স্পষ্ট। রোদের ঝলক বালির ওপর দেখতে পাচ্ছি খয়েরী জল ভেদ করে।

ন্যাংটা বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে ছুটো-ছুটে আসছে লঞ্চ দেখতে। এধারে লঞ্চ বড়ো আসে না। হঠাৎ ভেতরের পাহাড়ে হয়তো খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জল বেড়ে উঠেছে। লঞ্চ চলেছে।

হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল আমরা কোথায় চলেছি কেউ জানি না। পথও কারোর জানা নেই। খোদাতালার ওপর ভরসা করে চলেছি। এদিকে শেষ বেলা হয়ে এল। চায়ের চা ওরা দিল। সঙ্গে বিস্কুট। লঞ্চ চলেছে।

একটা বাঁক পেরুতেই সামনে বহু লোকজন দেখা গেল। বহু আমেরিণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে। একটা চার্চের চূড়াও দেখা গেল।

আমরা নামবো ঐখানে কি না জানি না।

আমেরিণ্ডিয়ান পাড়ায় যেতে গেলে ছাড়পত্র চাই। আমাদের একটা ছাড়পত্র নেওয়া ছিল। সে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন ক্রীকের এক পাদ্রী। তিনি লিখেছিলেন "পারমিটেড টু পাস নাইট আট মিশন রিজার্ভ।" এই ছাড়পত্রের ভবিষ্যৎ জমিদারি মেজাজের মতো ইলাস্টিক। নাইট মানে কয় নাইট, মিশন রিজার্ভ কি কোনো নাম না নামবাচক বিশেষ্য তা বোঝা যায় না। ওয়াটকিন্স জানত ওদের ভাষা। জিজ্ঞাসা করল, এটা কি মিশন?

বুড়ো এক আমেরিণ্ডিয়ান নেমে এল। আমরাও নামলাম। মস্ত বড় এক টিন বিস্কুট প্রায় দশ পাউণ্ড—চক্ষের নিমেষে উড়ে গেল। আমরা সে রাতের মত স্থান পেলাম সেই আমেরিণ্ডিয়ান পল্লীতে।

কয়েকটি মেয়ে ক্রীকের জলে স্নান করছিল। কাশ্মীরে যেমন ছোট্ট বাচ্চারা পানকৌড়ির মত কেবল জলেই থাকে, এদের বাচ্চাদেরও খেলা করার জায়গা নদী। সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে খেয়ে শুয়ে পড়া, হ্যামকে শুয়ে শুয়ে রাজ্যের আজগুবি গল্প করা এদের বিলাস। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি হ্যামকে শোয়। ঘরের ভেতরে এরা রান্না করে আর শোয়। মস্ত একটা পাতা ছাওয়া ঘর খাড়া আছে উঁচু উঁচু গ্রীনহার্টের বা ঈটের খুঁটির উপর। তার দেয়াল নেই। চালার ঢল এতোটা বার করা যে, ভিতরে জল আসতে পায় না। দেয়াল যখন নেই তখন দরজা জানলার তো কোনো বালাই নেই। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েই ঘর। একজন বাসিন্দা বাড়ল মানে একখানা ঘর বাড়ল তা নয়; একটা হ্যামক বাড়ল। হ্যামক এরা বোনে ঈটের ছাল পাকিয়ে। জালের ঝোলা। শুয়ে নিজেকে মুড়ে নেওয়া চলে। শোবার কায়দা জানা থাকলে আরামে শোয়া যায়। আমার হ্যামক ভালোই লাগে। এই বাড়িগুলোর নাম 'বেনাব', যৌথ ঘর।

মা, মেয়ে, ঝি, বৌ, ছেলে, ভাসুর, দেবর, শ্বশুর, স্বামী, অতিথি সবই একটা ঘরে হ্যামকে হ্যামকে। শোয়ার জন্যই শুধু ঘর। অনঙ্গ লীলার জন্য মুক্ত অবিশ্রান্ত প্রকৃতি। সারাদিন ওরা জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে যখন দেহমনে রঙ্গলীলার বান ডাকে। নৌকো মেয়েদের আলাদা কাজ, পুরুষদের আলাদা। এমন পালিয়ে যাওয়া, দৃষ্টি এড়ানো, ঈপ্সিতের মিথুনে যেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে, একেবারে স্নান সেরে। লীলাতৃপ্ত দিনের আবেশ স্নানে তৃপ্ত না করে ওরা ফেরে না। আর সে ফেরার পর [illegible] দেখে

ভেলা নিয়ে চলেছে আমেরিণ্ডিয়ান তরুণ
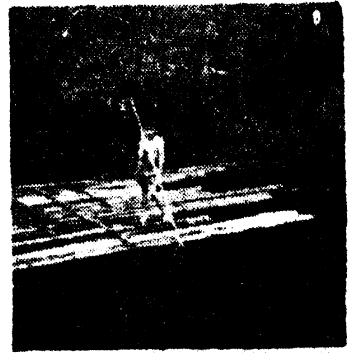
হাসে। বন্ধুরা হৈ হৈ করে গান জোড়ে। মা এগিয়ে দেয় পুষ্টিকর রস। মেয়েরা এগিয়ে দেবে মাংস। আর মেয়েটিকে নিয়ে বুড়ীরা দেবে নানা শিক্ষা, সোজা স্পষ্ট ভাষায়। সুস্থ সবল যৌন জীবনে এতটুকু গ্লানি নেই। মেয়ে একটি। মিথুন একটি। কিন্তু তার আনন্দ প্রসঙ্গ, তার জীবনরস-মাধুরীর যেন মাধুকরী লেগে যায়। সকলে দান করে মুষ্টিভিক্ষা, অবজ্ঞায়, হেলায় নয়; প্রেমে, আসঙ্গে; যৌন জীবন যেন সামাজিক যৌথ ভোগ। এদের যৌন জীবনেও জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পার্থক্য আছে। একটা কথা বলে রাখি। পোটারো নদীর ধারে একবার একটা গ্রামে কয়েক সপ্তাহ থাকার দুর্ভোগ হয়েছিল। তখন দেখেছি যে, পরম শত্রুর দল একটা নির্দিষ্ট

দিনে আসবে অতিথির মত। তাদের অভ্যর্থনার জন্য বিশিষ্ট আয়োজন চলবে দু' তিন মাস ধরে। প্রচুর শুকনো পোড়ানো নোনা মাংস, মাছ আর জালা জালা মদ থাকবে। অবিশ্রান্ত নাচ—ঠিক অবিশ্রান্ত—চলবে কখনও চারদিন, কখনও সাতদিন, পালাপালি করে রাতে দিনে তার কামাই থাকবে না। তারপরে দেখা যাবে সেই মদ্য, মাংস আর নৃত্যের ঝড়ে উড়ে গেছে কয়েকটি ডালখসা কচিপাতা। শিথিল হয়ে গেছে গৃহের বন্ধন। লতা স্বীকার করেছে শাখান্তরের আশ্রয়। ফুলে বসেছে বনান্তরের প্রজাপতি।

যেদিন নৃত্যগীত শেষ সেদিন সকালে অতিথিরা যাবে। দেখা যাবে, অনেক যুবা যুবতী চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, রেখে গেল অন্য যুবা যুবতীর দল। আর তারপর বৎসরকাল চলবে আবার অবিচ্ছিন্ন আরণ্যক সংগ্রাম। ক্ষুধার অন্ন আর পশুর জন্য এমন স্বভাবটা ওরা ছাড়তে পারে না।

স্কুলের একটি ঘরে আমাদের আস্তানা। বেঞ্চ জড়ো করে তার উপর বোর্ড পেতে ভগত আমার একটি বিছানা করে দিল। চারধারের ঘন বন শব্দে মুখর হয়ে উঠল।

আমেরিণ্ডিয়ান তরুণী স্নানে নামছে

ভয়াবহ নয়; তবু বিচিত্র। বন যেন শব্দময় জগৎ। সে জগতে অশরীরী বাণী থাকে। এদেশের লোকেদের এমন শব্দের দিকে কোনো আকর্ষণ নেই।

নতুন জায়গায় ঘুম হয় না। অনেক ভোরে উঠেছি। ক্যামেরা নেওয়া বৃথা। তবু অভ্যাস। ক্যামেরা ঝোলানো কাঁধে। হাতে একটা উইনচেস্টার। বেরিয়েছি। মাইল-খানেক যেতেই দেখি, বিরাট খানিকটা জায়গা বনের মধ্যে পুড়িয়ে খাক করা। চারপাশে মাট থেকে আশী ফুট উঁচু জঙ্গল। আর অসংখ্য পাখি ডাকছে। চেঁচায় একেবারে কান ফাটানো, আতঙ্ক তুলে দেওয়া ডাক ঐ ঝকমকে রং করা ম্যাকোগুলোর। শ খানেক ম্যাকো একটা বনে থাকলে বিরক্ত হয়ে সাপও পালায়, যদিও কান নেই সাপের। কিন্তু শিষ দিচ্ছে নানারকমের পাখি। একটা শিষ বিশেষ করে ভালো লাগছে। চার থাক এক সঙ্গে পঞ্চমে গেয়েই গিটকিরি দিয়ে নেমে আসে মধ্যমে গান্ধারে, তারপর উদাত্ত কণ্ঠে অনেক লম্বা শিষ দিয়ে ওঠে একেবারে ধৈবত ছেড়ে পরের ষড়জে। এমনি পর পর। কিন্তু একই ধরনের নয়। যেন ঠুংরী খেয়ালের মত ওকে গাইতে হচ্ছে অদৃশ্য কোন দরবারের তুষ্টি বিধান করতে মেজাজে নির্ভর করে। কোনোদিকে মন দিতে পারি না। ও গান যে পাখির কে বলবে? ও গানে যে ভাষা নেই কে বলবে? গ্রীন ম্যানসনসে যখন ঐ গানের বর্ণনা পড়েছি, বহুকাল আগে, হাডসন সাহেবের লেখার তারিফ করেছি। আর সেদিন মনে হয়েছিল, ভাষা প্রকৃতিকে তেমনিই বিকৃত করে, পোশাক সভ্যস্ত্রীকে যেমন বিকৃত করে।... পরে জেনেছি, জেনেছি কেন দেখেওছি—একবার মোটরে করে যাচ্ছি বোক্কিগনল ফেরী থেকে নেবারিস্ গাঁয়ে। তখন দুপুরবেলা। পথে বনের মধ্যে সুরম্য এক অট্টালিকা (অবশ্য কাঠের)। রংয়ে, পালিশে, কাচের বাহারে, বাগানের তদ্বিরতে—চমৎকার। তেষ্টা পেয়েছে। ঢুকে পড়েছি। যেতেই গেটের পরেই কান জুড়িয়ে গেল একটা অব্যক্ত অস্ফুট চাপা গুঞ্জনে। সারা পারিপার্শ্বিক যেন ঝম্ ঝম্ করে কাঁপছে। "মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে"—পংক্তিটির অন্তর্ভুক্ত সত্যটি চিত্রিত ছিল মানসপটে, এখন উপলব্ধি হ'ল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষে। বুনো ফুলগাছের মত। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। আর সেই ফুলে—প্রতি ফুলে যেন দশটা মৌমাছি। তাদের পাখার শব্দ। একটু এগিয়ে যাই। রোদের রং হলদে হয়ে জলের সবুজ ছায়ার উপর ভাসছে। তার পরে একটি ছোট্ট নারেঙ্গী গাছে ডাকছে পাখি। সেই ডাক। সে রোদে তাকে দেখেছিলাম। বাদামী রংয়ের একটি ঢেলা। চড়ুয়ের অর্ধেক। সরু ছুঁচের মতো ঠোঁট। পাখিটার নাম মিউজিক্যাল রেন্ বা নেকলেসড জাঙ্গল্ রেন্ বা কোবাক্লিল্ বার্ড। কটমটে শুদ্ধ নামটি ওর Leuco-lapis Arada।

নেশা তখন। জঙ্গলে এগিয়ে চলেছি। চিৎকার করছে টোগন, পাই পাইও—বড় বড় রং-চঙে পাখি। পোড়ানো জঙ্গলের খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আমেরিণ্ডিয়ানরা নতুন ক্ষেত-খামারের জন্য জঙ্গল পুড়িয়ে দেয়।

তারপর সেই খালি জমিতে ক্যাসাডার চাষ করে। ক্যাসাডা এক জাতীয় কন্দ। দেখতে লম্বা রাঙ্গা আলুর মত। এক একটা লম্বায় দেড় ফুট দু ফুটও হয়। গায়ের ছাল গাঢ় বাদামী, প্রায় মেটে। ভেতরের শাদা শাঁসটির কোনো স্বাদ নেই। কাঁচাতে হায়ড্রোসায়ানিক এসিড থাকে। ওরা তাই ধুয়ে নিয়ে যায়, যেমন শটীর পালো আমরা ধুই। ক্যাসাডা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে একটা পাত্রে জড়ো করে। সেই ক্যাসাডা পচে পচে মদ হয়। সেই মদ—ক্যাসারি—এদের শ্রেষ্ঠ বিয়ার। দাঁত দিয়ে চিবিয়ে থু থু করে না ফেললে নাকি মদের তার আসে না।

হ্যামক বোনা চলছে

সন্ধ্যার পর ছেলে বুড়ো সবাই মিলে ঐ ক্যাসাডা চিবিয়ে থু থু জড়ো করছে। আমাদের মতো অতিথি গেলে ওরা এক পাত্র ক্যাসারি খেতে দেয়। না খেলে রাগ করে। বন্ধুত্বে বাধা পড়ে। আমার সুবিধে আমি মদ খাই না।

জঙ্গল বাড়ছে। সারি সারি মোরা, সীডার, সিলভারবল্লী, ক্রাবউড, স্যাভানাডাল্লী সোজা খাড়া উঠে গেছে। এত ঘন, এত সন্নিবিষ্ট যে, শাখা প্রশাখা সবই পঞ্চাশ ষাট ফুটের মাথায়। তলায় গুল্ম, লতা আর কাঁটার অরণ্য। মাঝে মাঝে চোদ্দ পনের ফুট উঁচু উইঢিবির মত পিঁপড়ের আড্ডা। তখন মনে পড়ে যায় পিপীলিকাভুক্। ওরা ভালুকের মত জাপটে ধরে ফেড়ে ফেলে শত্রুকে। তাই ওদের শিকারের সহজ উপায়

আমেরিণ্ডিয়ান বেনাব

মোটা এক টুকরো গাছের গুঁড়ি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। গুঁড়ি পেয়েই সেটাকে ওরা জড়িয়ে ধরবে আর যাবৎ না ফাড়তে পারবে ছাড়বে না। সেই সময়ে, ওকে গুলি করা বা বেঁধে ফেলা কাঠশুদ্ধ। গাছেদের চেষ্টা আলোর সমুদ্রে উঠে যাওয়া। আর তাদের ডগা থেকে নামছে মোটা মোটা লিয়ানা লতা।

হঠাৎ দুর্জয় শব্দে কানে তালা লাগে। উপরে চেয়ে দেখি, হাজার হাজার বিশালকায় বাঁদর। একটা তো আগে দেখেছি স্পাইডার মাঙ্কি। ল্যাজ জড়িয়ে আর হাতে পায়ে পাঁচ পেঁচে গাছ থেকে গাছে দুলে দুলে যায়। কিন্তু অন্যগুলো হাউলার মাঙ্কি। (Mycetes seneculus) ভয় পেয়ে গেছি তখন। কোন দিকে চলি বুঝতে পারি না। খানিকটা চলে একটা জায়গায় ছোট ছোট গাছ দেখলাম। বহু পান্থপাদপ। সেইখানে বসে পড়ে দু তিনটে ফাঁকা শব্দ করলাম।

আধা ঘণ্টার মধ্যে ভগতপ্রসাদের দল এসে গেল। ওরাও জঙ্গলে বেরিয়েছে। ঘরে গিয়ে খুব স্নান করে আমেরিণ্ডিয়ান সর্দার পিম্বো পিরিস্‌কে নিয়ে আবার জঙ্গলে গেলাম। কিন্তু উদ্দেশ্য না থাকলে জঙ্গল ভালো লাগবে কেন? কতকগুলো ভালো কাঠ কাটা গেল ছড়ির জন্য। কয়েকটা ফোটো নিয়ে শ্রান্ত কলেবরে ফিরে এলাম গাঁয়ে।

ওরা তখন বড় বড় ডাক্ মেরে মাংস চাপিয়েছে। কলসান মাংস নুন আর লঙ্কা দিয়ে খাওয়া। বেশ লেগেছিল।

একটা কথা বলে এ প্রবন্ধ শেষ করা যাক। এতো গভীর বন। চারধারে বসতি নেই। পশ্চিমের হাইজিনিক সভ্যতা এই গাঁয়ে তৈরি করেছে লাট্রিন। তাতে লেখা Dont use sand; use paper। আমি জিজ্ঞাসা করি, "পেপার কোথায় পাও পিম্বো?" পিম্বো বলে, "ওসব যারা লেখাপড়া জানে তাদের জন্য। স্কুলের ছেলেরা ওসব ব্যবহার করে। পেপার আছে। কিন্তু ছেলেরা বড় অবাধ্য। বালি ব্যবহার করে আর বুনোদের মতো জঙ্গলেও যায়।

আমি ভাবি, এদের কোন বিলিতি পাদ্রী

ক্যাসাডার রস বার করা হচ্ছে
লেখক দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরা ঝুলিয়ে

হাইজীন এনেছে, মীশনের ক্রস এনেছে, ট্রাউজার এনেছে, গাউন এনেছে—ঠিক; কিন্তু সিফিলিস্, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ আর টীকা এগুলো কে এনেছে, কেন?

যক্ষ্মা, কুষ্ঠ আর টীকাময় হাইজীন্ ভালো, না নগ্ন, স্বাস্থ্যকর, সত্যশালী নৈসর্গিক সমাজ ব্যবস্থা ভালো। বিদ্যার চেয়ে শিক্ষা ভালো, না শিক্ষার চেয়ে বিদ্যা?

আমেরিণ্ডিয়ানদের জীবন দেখা এই আমার প্রথম। তবে এর পরে ভয়টা কেটে গেল। প্রতি মাসেই চলে যাই কোনো না কোনো গাঁয়ে। কিন্তু এদের মধ্যে নানা জাত; আর প্রতি জাতের জীবনের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন।
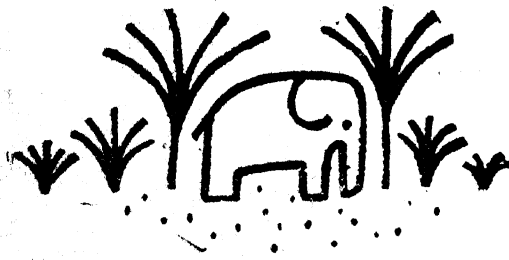
আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু আর লক্ষ লক্ষ ক্রেতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের সকল শুভপ্রচেষ্টার পথ আলোকিত হউক।
'দীপ্তি' মার্কা জিনিষ যে ভাল তা আজ আর নূতন করে বলবার প্রয়োজন নেই, দীপ্তি লণ্ঠন হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ গৃহ প্রতিদিনই আলোকিত করছে।
DIPTI
'দীপ্তি' মার্কা সাইকেল এক্সেসারিসও অল্প-দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে, ইস্পাত আর পেতলে তৈরী সুন্দর আর সুমিষ্ট ভাল সাইকেল বেল।
সুদৃশ্য আর টেকসই সাইকেল পাম্প, উজ্জ্বল সাইকেল ল্যাম্প ঝাঁকানিতেও যার আলো নিষ্প্রভ হয় না। অত্যন্ত মজবুত সুদৃশ্য গঠন ইস্পাতে তৈরী সাইকেল ফর্ক যা যে কোন সাইকেলে ব্যবহার করা চলে।
শারদীয় অভিনন্দন
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২
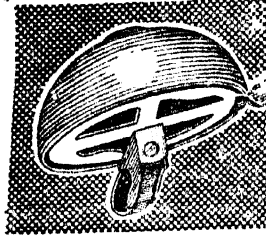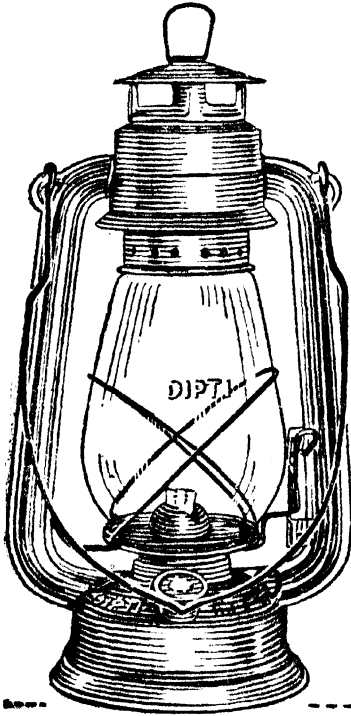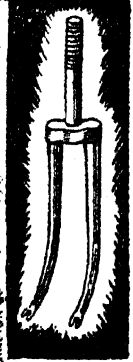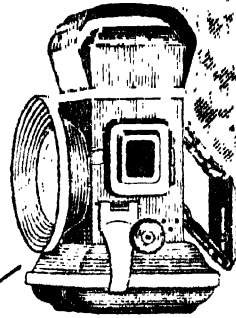
দেশলাইয়ের কাঠির মতন ওর হাসি ফস্ করে জ্বলে উঠেছিল প্রথমে; ক' পলকেই বারুদ ফুরোলো। তারপর দুর্বল ম্লান একটু শিখা যেমন কাঠির গা বেয়ে অত্যন্ত অনিশ্চিতভাবে এগুতে থাকে, ম্লান থেকে ম্লানতর হয়, পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে কুঁকড়ে শেষে চোখের পলকে নিভে যায়—ওর হাসিও তেমনি প্রথমে ধ্বনি ও আতসজ্বলা উজ্জ্বলতা হারাল, নিঃশব্দ হল, হালকা হয়ে মুখে মাখানো থাকল, ক্রমে মৃদু ক্ষীণ হয়ে শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন কাঠির মতনই সে পুড়ে শেষ হল। দু একটি মুহূর্ত তবু তার হাসির রূপটা আমার মানসিক অস্তিত্বে বেঁচে থাকল, সুগন্ধ নিঃশেষ হয়ে গেলেও ঘ্রাণের সেই অতি ক্ষীণ অনুভূতির মতন। ......ওকে দেখছিলাম।' এখন আর কিছুই নেই, হাস্যধ্বনি উজ্জ্বলতা আভা রেশ—কিছু নয়। ... মনে হচ্ছে, আর-এক নতুন মানুষের সামনে বসে আছি; এইমাত্র ও এসেছে, মুখোমুখি বসেছে। ওর মুখ কাঠ-খোদাই পুতুলের মতন। কি কাঠ জানি না, বাদামির সংগে ঈষৎ কমলার মিশেল; ঘাম তেলের মতন নরম করে আঠা মাখানো, মেঘলা-ভাব দিনে দুপুরের রঙ যেন। ...জানি না, খোদাই কাজটুকু কে করেছিল। তবে কারিকরের অযত্ন অন্যমনস্কতা নেই। ওর মুখের গড়নটি লম্বা ছাঁদের; কপাল থেকে গাল, গাল থেকে চিবুকে মিহি বঙ্কিম ঢল ফুটেছে। মসৃণ কপাল যেন ছাঁচ তোলা, বলয়াকৃতি। ছড়ানো ভুরু, ঘনতা থাকলে হয়ত আরও সুন্দর হত। চোখের জমিটা মোমের মতন সাদা। পাণ্ডুর, প্রাণহীন। নিকষ কালো চোখের তারা। ওষ্ঠের রেখায় ভীরুতা, অধরে কামনা-পীড়া। আশ্চর্য, ওর সুছাঁদ নাকের স্ফীত প্রান্তটি বুঝি কান্নার উচ্ছ্বাসেই জীবন্ত হয়। ওই পুতুলটির চিবুকের ডৌলে কেমন করে বাল্যের শুচিতা থেকে গেল আজও, আমি বুঝতে পারি না। ...দেশলাইয়ের কাঠির মতন পুড়ে পুড়ে ও যখন নিষ্প্রাণ, নিঃশেষ—তখন আমি তাকে দেখছিলাম। কাঠের পুতুলের মতন সে সামনে বসেছিল। খোলা জানলার পরদা হাওয়ায় উড়িয়ে শীতের অন্ধকার ঘরে আসছিল; কুয়াশাও। বাতি জ্বালার কথা আমার মনে হয়নি, আগ্রহ অনুভব করিনি। ...ওর জীবনের কথা আমি ভাবছিলাম। শেষ রাতের তারারা ডুবেছে, আকাশ ফরসা হয়ে আসছে—এই রকম কোনো সময় হয়ত ও জন্মেছিল। আমি আবার করে ওকে জীবন পেতে দেখেছি। ওর নবজন্ম। সে এক সুন্দর গোধূলির মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছিল। জগৎ তখন ওর কাছে মধুর মনোরম, শুদ্ধ ও সুন্দর ছিল। ... আমি জানি, ওর মৃত্যু আমি দেখব। এ আমার নিয়তি। সেই দেখা ওর আর আমার শেষ দেখা। ... শীতের অন্ধকার ধোঁয়ার মতন এখন এখানে পুঞ্জীকৃত। অতি অস্পষ্ট রেখায় আঁচড়ে ফুটে-ওঠা রহস্যমূর্তির মতন ও বসে আছে। অল্প কয়েকটি মুহূর্তের পর আমার চোখ ওকে হারাবে। অন্ধকার ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করবে, আমি আর ও একটি দুস্তর ব্যবধানে পৃথক হয়ে যাবো। সে-অন্ধকার শীতের অন্ধকার থেকেও ঘন, মেঘের পরদার চেয়েও গাঢ়। ...... আমি সময়ের কাঁটা দেখছি না, অন্য কাঁটা দেখছি: আর-কয়েক মুহূর্ত পরেই কাঁটা দুটো গায়ে গায়ে মিশে যাবে। সেই মুহূর্তটি আমাদের শেষ...। সব শেষেই বুঝি অদ্ভুত এক প্রতিধ্বনি তুলে শুরুকে ছুঁতে যায়। আমার মনেও এক প্রতিধ্বনি অতীতের সোপানান্তরে ওকে অন্বেষণ করছিল। মনে হল ওর শুরু আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সেই গোধূলি...জগৎ যখন ওর কাছে শান্ত মধুর মনোরম, শুদ্ধ ও সুন্দর। অশোকার সে-দিন নবজন্ম:

"ইস্...দেখেছ বাইরেটা একবার!"

"দেখেছি।"

"কি রকম গোধূলি...! এই, এসো না একবার...উঠে এসে জানলার কাছটায় দাঁড়াও।...দেখছ?"

"চৈত্র মাস..."

"চৈত্র মাস বলেই কি এমন সুন্দর গোধূলি হয়েছে?"

"জানি না। হয়ত তাই...আকাশটা যে ফেটে পড়ছে, সূর্যও টকটকে আবীর-এখানকার ধুলো লাল, বাতাস..."

"বাতাসটা আজ কেমন উল্টো পাল্টা বসন্ত বসন্ত লাগছে..."

"হাসির কি, বসন্তকালই ত!"

"...বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...বাব্বা, এই যে সময় বসন্ত জাগল!"

"হয়ত আগেই জেগেছে, তোমার চোখে ধরা পড়েনি।"

"বাজে কথা। আমি অন্ধ নাকি...এর আগে কোনোদিন এমন সুন্দর দেখলাম না..."

"নাই বা দেখলে। অন্য কেউ দেখেছে: তাদের পালা ছিল। আজ তোমার পালা।"

"ধ্যেত্...আমার আবার কি! মেঘ বৃষ্টি বসন্ত গোধূলি পূর্ণিমা এ-সব কি কারও একার জন্যে হয়!"

"হয়।"

"তুমি কথার জোরে নয়-কে হয় করো।"

"বেশ, আমি চুপ করছি, তুমিই বলো।...তার আগে তোমার আলগা আঁচলটাকে একটু সামলাও, আমার চোখ গেল...।"

"বাব্বা! তা তুমি আমার এ-পাশটায় এসে দাঁড়াও না...আবার হাওয়া এসে আঁচলে পাল তুলে দেবে...না হয় ঝাপটাই দেবে তোমার চোখে...কতক্ষণ আর আটকে রাখব। যা হাওয়া আজ।"

"ওলোট পালট..."

"বটেই ত, কিন্তু কী মিষ্টি..."

"গোধূলি..."

"বলো না বলো না...অপূর্ব...আমি এমন আর দেখি নি কখনো।"

"আকাশটা একবার দেখ।"

"দেখছি ত...তখন থেকেই দেখছি...। সেই যে কি যেন একটা গোলাপ আছে...ঠিক লাল নয় লালের মতনই, একটু কালচে ঘেঁষা...ভীষণ গাঢ়...রক্ত শুকিয়ে গেলে যেমন হয়...অনেকটা যেন..."

"তুলনার জন্যে বড় বেশি দূরে যাচ্ছ। ছুব ছুটেছে মনের পক্ষীরাজ।"

"আঃ! ঠাট্টা হচ্ছে!"

"ঠাট্টা! সত্যি ঠাট্টা নয়।...ওই দেখ সূর্য ডুবে যাচ্ছে।"

"আ—আ হা...মরি মরি...কী সুন্দর। চুপ, এখন আর কথা বলো না।"

"অশোকা!"

"কি?"

"এবার একটু কথা বলি, কি বলো!...কি দেখছ?"

"ওই গাছটা..."

"শিরীষ?"

"হুঁ... কৃষ্ণচূড়া। সবই দেখছি...দেবদারু আম নিম...গাছপালার ঝোপ ঠিক..."

"অন্ধকার হয়ে আসছে।"

"দূরের পাহাড়টা এখন ঠিক যেন মেঘ।"

"?"

"অবিকল।"

"...আচ্ছা, আমি ত গাছ হতে পারতাম?"

"জানি না।"

"এক একটা সময় এই রকম সব কথা

আমি যদি ওই মেঘটাই হতাম

মনে হয়, কেন বলতে পার?...সত্যি, মনে হওয়ার হয়ত মাথা-মুণ্ডু নেই, তবু হয়। খানিক আগে কেমন একটা চিকু কাটা সোনা সোনা মেঘ হয়েছিল, দেখেছিলে? আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি ওই মেঘটাই হতাম। কিংবা ধরো না, ঝাঁক বেঁধে কলকলিয়ে ডাক দিয়ে দিয়ে যে পাখিগুলো উড়ে গেল, ওদেরই একটা হতে পারতাম...! বেশ হত!"

"মানুষ হয়ে জন্মেছ বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে?"

"না, তা নয়...তবে মানুষ হয়েই বা কি আলাদা ঐশ্বর্য আমরা পাই? একটা পাখি বা মাছ হওয়া মন্দ কিসের? বরং..."

"তোমার চুলগুলো একটু ঠিক করো...আমি মুখ দেখতে পাচ্ছি না।"

"দরকার নেই দেখে, গা ঘেঁষে রয়েছ, আবার মুখ কেন?"

"গা কথা বলে না, গায়ের রূপ একই; মুখ কথা বলে, মুখের রূপ অনেক।"

"আমার মুখের রূপ-টুপ নেই—।"

"দেখছি তাই, খানিক আগে খুশীতে ভরা ছিল, তারপর দেখলাম তন্ময়, এখন দেখছি উদাস...।"

"তুমি বুঝি এই সবই দেখছ?"

"কি করব বলো, পাখি মাছ গাছ মেঘ এরা যে কথা বলে না। তারা যদি তোমার মতন খুশীটুকু জানাতে পারত!"

"তাতে কি! আমার শুধু ভাল লাগে, ওরা যে ভাল লাগায়; আমার কেবল হবার ইচ্ছে, ওরা যে হয়েছে।"

"...আজ কি হল তোমার? এত কাব্য—কল্পনা—?"

"কল্পনা...তুমি কল্পনা ভাবলে স-ব!...অবশ্য কল্পনা ছাড়া আর কি-ই বা! আমি সত্যি সত্যি মেঘ বা মাছ হতে যাচ্ছি না। তবে কল্পনাই বলো আর যাই বলো, কেমন যেন লাগে এ-সব কথা ভাবলে! না—?"

"লাগাই স্বাভাবিক। বোধ হয় সব সৌন্দর্য এবং আনন্দের কাছে আমরা কাঙালপনা করি...। আমি তুমি বসন্ত হতে পারি না, মেঘ নয় গাছ নয় পাখি ফুল—কোনোটাই নয়। কে জানে এই অভাব অক্ষমতা না থাকলে বাস্তবিক ওদের ভাল লাগত কি লাগত না। বোধ হয় লাগত না।"

"এবার নিজে যে দার্শনিকতা করছ! আমি অত বুঝি না। দরকার কি বোঝার! ভাল লাগার তলায় কত রকম অংক আছে তা জেনে আমার লাভ নেই।"

"সেই ভাল।...মুখ থেকে তোমার ওই চুলের জাল সরিয়ে ঠিক করে নাও ত। ফটোগ্রাফী আমার ভাল লাগে না—জীবন্ত মুখটাই দেখতে চাই।"

"আমার মাথার এই চুলের জংগল এক-দিন কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলব।"

"কি সর্বনাশ!"

"বড্ড জ্বালায়!"

"রূপের জ্বালা, ঐশ্বর্যের জ্বালা...। যাদের নেই তাদের—"

"আঃ, থামো। বড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলো তুমি!...ইস্ কপালটা কি রকম ধুলো ধুলো হয়ে গেল দেখেছ! বড্ড ধুলো উড়ছে ত!"

"অন্ধকার হয়ে গেছে—জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ নেই—!...চলো বসি।"

"চলো—।"

"বাতিটা জেলে দি।"

"থাক না; খানিক পরে চাঁদ উঠবে—"

"খানিক নয়—বেশ কিছু পরে।"

"তাই উঠুক।"

"অতক্ষণ থাকবে তুমি?"

"থাকব।"

"তোমার মা...?"

"মা জানে, মামাও শুনেছে।...বাব্বা

কৌতূহল মিটলো তোমার। কি যে মানুষ তুমি!"

অন্ধকারেই আমরা বসেছিলাম। চাঁদ ওঠার প্রতীক্ষা নিয়ে নয়। যখন খুশি উঠবে, না উঠলেও আমাদের হা-হুতাশ নেই। গাঢ় বুনোট আঁধার আমাদের সত্তাকে আরও নিকট নিবিড় করছিল। কখনও কখনও এমনই হয়, হারিয়ে যাওয়ার আনন্দে আমাদের মন ভিজে ওঠে। অন্ধকারেই এই নিবিড়তা ক্রিয়াশীল, আলোয় নয়। আলো স্বতন্ত্র রেখায় অশোকার মূর্তি গড়বে, আমাকে আমার মূর্তি দেবে। শরীরকে আলোয় মোছা যায় না। আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তখন হারাতে চাইছিলাম। অন্ধকার আমাদের সাহায্য করছিল, ঘরের এবং বাইরের অটুট নীরবতা করুণা করছিল আমাদের। নিঃশব্দ মৃদু সান্ধ্য-বাতাস আমার এবং অশোকার নিশ্বাসকে একাকার করছে। অশোকার মনে আজ সহস্র অলংকার। এই ঘর তার কাছে বেড়া ভেঙে সময় এবং ভবিষ্যতের সীমাহীনতায় মিলিয়ে গেছে।...তবু চাঁদ উঠল। স্নিগ্ধ ভীরু একটু আলো। মনে হচ্ছিল, অনেক দূরে আলো হাতে দাঁড়িয়ে কে যেন আমাদের অপেক্ষা করছে।

"অশোকা?"

"উঁ—!"

"চাঁদ উঠল। আমি ভেবেছিলাম আরও পরে উঠবে।"

"উঠুক...ভালই ত!"

"তোমার কাছে আজ সবই ভাল।"

"সত্যি।"

"কোনো কিছুই খারাপ লাগে নি?"

"কি জানি, মনে পড়ছে না।"

"তোমার মামাকে?"

"উঁহু। মামাকে আজ কেমন যেন লাগছিল। কি জানি কেন মনে হচ্ছিল, মামা আমাদের সামান্য যা কিছু নিয়েছে, ভালই করেছে। দরকার ছিল বলেই নিয়েছে। আমাদের কাছে চাইলে হয়ত আমরা দিতাম না। স্বার্থে লাগত।"

"তাঁর দুর্ব্যবহারে তুমি..."

"অতিষ্ঠ হয়েছিলাম। এখন উলটো কথাই মনে হয়। মামা সংসারের ঝড় ঝাপটা এত বেশি খেয়েছে—এখনও ত খাচ্ছে—তাতে ও-রকম হয়ই। মামীর অসুখের সময় মামা গালাগাল দিত, অথচ সেই মামাই মামীর বিছানার পাশে বসে রাত জাগত, কাশির রক্ত নিজের হাতে কেচে কেচে ধুত।...কত সময় দেখেছি—মামীর শুকনো রক্তের দাগের দিকে মামা তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। যেন ওটা মামারই রক্ত।........"

"আজ মা-কে খুব অবাক করে দিয়েছি!"

"আমাকেও কম করো নি।"

"তোমাকে আমি ধরি না।"

"সে কি!"

"তুমি মশাই আমার হিসেবের বাইরে।"

"শূন্য নাকি?"

"হুঁ, তবে একেবারে নয়; আমি এক, তুমি আমার পাশের শূন্য—;...হাসছ যে বড়, বুঝেছ?"

"বুঝেছি। কিন্তু আমি হাসছি তুমি কি করে বুঝলে?

"আহা, তাও যদি না হাতখানা আমার হাতে থাকত!"

"তুলে নেব?"

"অত সহজে সব কি তুলে নেওয়া যায়।"

"...তোমার মা-কে অবাক করে দেবার কথা বলো, শুনি—।"

"বলতেই যাচ্ছিলাম, বাধা দিলে মাঝখানে।"

"আর দেব না। বলো।"

"মার ধারণা ছিল আমি আমাদের পুরনো কথা কিছু জানি না। আমি জানতাম। দুপুরে মা শুয়েছিল নিজের ঘরে, আমি কল্যাণ-কাকার কথা তুললাম। মা চমকে বিছানায় উঠে বসল। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল।...মাকে বললাম, সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে বাবা যদি পাগলামি করে তিনটে বিয়ে করে বসে...তুমি উনিশ বছর বয়সে কল্যাণ-কাকার কাছে আশ্রয় নিয়ে অন্যায় ত কিছু করো নি। বাঁচার জন্যে কারুর ওপর ভালবাসা—নির্ভরতা দরকার। নয় কি, তুমি বলো?"

"অশোকা!"

"কি?"

"কথাটা তুমি তোমার মাকে না বললে পারতে, আমাকেও।"

"পারতাম না। আমার মা আমি—আমরা মানুষ। সিসের মূর্তির মতন আমার মা চোখের সামনে সাজানো থাকবে—আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমার মার মনের তল পাব না—এ কি হয় নাকি? আজ আমার আর মার সম্পর্ক সহজ হয়ে গেছে।...মার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি, এই কষ্ট না বুঝলে মা-র কতটুকু বুঝতে পারতাম।..."

"তোমার মাথায় আজ পোকা নড়ে উঠেছে।...চলো এবার একটু বাইরে যাই। কদমতলা দিয়ে হেঁটে ঝিল পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।"

"চলো।"

কদমতলার কাছে অন্ধ গরুটা দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়ার চাঁদোয়ার তলায় লাল মাটি ঘুমিয়ে পড়েছে কালোর চাদর টেনে। পাতার জাফরি কমে গেল। এবার কাঁকরে পথ। মনোহর তেলি কেরাসিন বাতি জ্বালিয়ে দোহা পড়ছিল: "যতদিন মাটির তলায় বীজ ছিলাম কেউ আমার দিকে নজর দেয়নি, আজ গাছ হয়ে মাথা তুলেছি গরু ছাগল আমায় মুড়িয়ে খেতে আসছে, ছেলেরা পাতা ছিঁড়ে পরখ করছে আমি বিষ না মধু, বড়রা দেখছে আমার গা-গতরে ক মণ কাঠ হবে বেচার মতন।" ...অশোকাকে আমি দেখছিলাম। স্নিগ্ধ মোলায়েম আলো আমাদের আলাদা করেছে। অশোকাকে আমি দেখছি। বার বার, নিমেষহারা হয়ে। অশোকাকে এমন করে আগে কখনও দেখি নি। আগে অশোকা এমন ছিল না। আজ সে নতুন, নতুন মানুষ। তার শরীর, তার হাঁটার ছন্দ, তার মুগ্ধ শান্ত অভিভূত চোখ এই জ্যোৎস্না মাটি পথ বাতাস সমস্ত কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। অশোকার সেই ভীরুতা, দ্বিধা, শঙ্কা, বিরক্তি, ঔদাস্য, ক্লান্তি—আজ কোথায় হারিয়ে গেল কোথায়? মনে হচ্ছে যেন, ওর জন্যেই এত আয়োজন, এই আলোটুকু এই পথটুকু চৈত্রের বাতাসটুকু! অবাক লাগছিল আমার অশোকা এত জীবন্ত কি করে হল, এত আনন্দ তার কাছে কে এনে দিল—!

"আমি অনেক কথা বলেছি আজ, এবার তুমি বলো।"

"আমি! কি বলব?"

"যা খুশি তোমার। একটা গল্প বলো।"

"গল্প?"

"বলো—"

অশোকা গল্প শুনবে, কি গল্প বলি? অশোকার গল্প শোনার খুবই ইচ্ছে, কোন গল্প বলি? অশোকাকে দেখছিলাম। সে আমার গায়ের পাশে ঘন হয়ে গেছে। আমরা কি এখানে মিশে যেতে পারি? এখানে আলো আছে।

"কই বলো—"

"বলতেই হবে?"

"বাঃ, তবে কি।"

"দাঁড়াও একটু ভেবে নি।"

আমার হাত ওর হাতে জড়িয়ে নিল অশোকা। ওর মাথা আমার কাঁধে যেন আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গল্প বলতে হবে অশোকাকে। কোন্ গল্প বলি। মনোহর তেজির দোঁহার গুঞ্জন কানে ভেসে এল। ছড়িয়ে ছাপিয়ে ভ্রমরের মতন গুনগুন করতে লাগল: যতদিন আমি বীজ ছিলাম কেউ আমার দিকে নজর দেয়নি, আজ গাছ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি......

"খুব ছোট একটা গল্প বলতে পারি।"

"এক নিশ্বাসের?"

"জানি না, সে হিসেব তুমি করো।"

"বেশ বলো—"

"একটি মেয়েকে নিয়ে গল্প।"

"কোথাকার?"

"এখানকার।"

"এই শহরের—?"

"ও-সব কথা আমায় জিজ্ঞেস করো না। ...এই শহরেরও হতে পারে অন্য জায়গারও হতে পারে।...যা বলছিলাম, সব মানুষের মতনই এই মেয়েটির একটি জন্ম-সময় আছে, দিন আছে, মাস বছর আছে। তার বাবা ছিল মা ছিল, অন্য পাঁচটা আত্মীয়স্বজন যেমন থাকে মানুষের, তারও তেমনই ছিল সব।...ধীরে ধীরে এই মেয়ে বড় হয়ে উঠছিল। তার শৈশব শেষ হল, সে কিশোরী হয়ে উঠল; কিশোরকালও ফুরিয়ে এল......"

"কি নাম মেয়েটার?"

"কথার মধ্যে বাধা দিও না। আমার এ-গল্পে মেয়েটির নাম খুব দরকারী নয়।...যা বলছিলাম, কিশোরী মেয়েটিও বড় হয়ে উঠল দিনে দিনে। সে এখন যুবতী, তার শরীর মন ক্রমে একটা গড়ন পেয়েছে। যেমন করে গর্ভের শিশুরা গড়ন পায়, তরল ভাসমান প্রাণ আস্তে আস্তে আকার অবয়ব পায়, ইন্দ্রিয়ময় হয়ে ওঠে—তেমনই।......"

"এ আবার কি ধরনের গল্প? গড়ন পেয়েছে—কিসের গড়ন, কেমন তার চেহারা—"

"অশোকা, আবার তুমি আমার গল্পের মধ্যে বাধা দিচ্ছ। তোমার বুদ্ধির কষ্ঠি-পাথরটি এ-গল্পের গায়ে ছুঁইয়ো না। আগে আমি শেষ করি—আসল নকল বিচারটা পরেই করো।"

"খুব যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছ।...চটছ নাকি? আচ্ছা বলো, আর একটিও কথা বলব না।"

"মেয়েটির তখন দুকূল ভরা বয়েস, হঠাৎ কি খেয়াল হল তার, একদিন শেষ রাতে ঘুম একটু ফিকে হয়ে আসতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এল। তখনও সূর্য ওঠে নি, পাখিদের ঘুম ভেঙেছে সবে, ফরসা ভাব, শুকতারা ডুবছে। মেয়েটি অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে মাঠে এসে পড়ল। শিশির ভেজা মাটি, সকালের গন্ধ, ঠাণ্ডা বাতাস, গাছের পাতা দোল খাচ্ছিল মৃদু মৃদু, অনেকটা দূরে ফাঁকায় একটা বাগান ঘেরা বাড়ি, মাথাটা দেখা যাচ্ছিল আবছা। ...কি খেয়াল হল, হাঁটতে শুরু করল ও।...প্রথমে তার জানা ছিল না, কোথায় যাচ্ছে—পরে বুঝল, বাড়িটার দিকেই সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে——"

"অত সকালে একা একাই সে মাঠ ভেঙে যাচ্ছিল! বাড়িটা কি আগে সে কখনও দেখে নি?"

"তুমি একেবারে খাঁটি বাঙালী সাহিত্য সমালোচক, যুবতী কুমারী মেয়েকে একা একা সকালে পথ হাঁটতেও দেবে না। কোথায় যাচ্ছে না জানলে তোমার স্বস্তি নেই।...কিন্তু কি করব, মেয়েটি একা একাই যাচ্ছিল—আর যে-বাড়িতে যাচ্ছিল সে-বাড়ি আগে সে দেখে নি।"

"কি ছিরি তোমার গল্পের! এতকাল মেয়েটা যে জায়গায় মানুষ তার আশ-পাশের খবর জানে না! বাড়িটা আগে দেখেনি কখনও...তাই কি হয় নাকি—?"

"দোহাই তোমার, অন্ততঃ এ-গল্পের খাতিরে মেনে নাও। ধরো না কেন, মেয়েটির ওই রকমই স্বভাব ছিল। সে কখনও চারপাশে তাকায় নি, কিছু দেখে নি, সংসারের সীমানায় তাকে আগল দিয়ে রাখা হয়েছিল। আর এতে তার কোনো দুঃখ কষ্ট ছিল না। সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে সে সমানে খেয়েছে পরেছে হেসেছে ঘুমিয়েছে।"

"বেশ, বলো—তারপর কি হল? মেয়েটি বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছল ত?"

"হ্যাঁ, পৌঁছল; ফটক খোলাই ছিল। একটু ইতস্তত করে সে ঢুকে পড়ল।...বাড়িটা আশ্চর্য সুন্দর; অনেক ঘর, সব ঘরেরই দরজা জানলা খোলা, হাওয়া চারপাশে লুটোপুটি খাচ্ছে, পরদাগুলো আলুথালু হয়ে উড়ছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর, কেউ যেন ধূপ জেলে দিয়ে গিয়েছিল ঘরে ঘরে—মিষ্টি আচ্ছন্ন গন্ধ, সমস্ত বাড়িখানা নিশ্চুপ স্তব্ধ। বাড়িটির প্রত্যেকটি ইট কাঠ আসবাব জীবন্ত, অথচ কোথাও একটু সাড়া নেই। মেয়েটি এক এক করে সব ঘর ঘুরে আবার নীচে এসে দাঁড়াল। অবাক হচ্ছিল ও, এ-বাড়িতে মানুষ নেই কেন—কোথায় গেল এরা? কার বাড়ি? কে মালিক এমন সুন্দর বাড়ির?...ভাবতে ভাবতে মেয়েটি যখন ফটকের কাছে এসেছে, হঠাৎ......"

"কি হঠাৎ?"

"হঠাৎ কে যেন তার কানের পাশে ফিস ফিস করে বলল, 'চলে যাচ্ছ! এ-বাড়িটা যে তোমারই...', নিশ্বাসের

মতন একটু অদ্ভুত হাসি ছিল সেই স্বরের মধ্যে। মেয়েটি চমকে উঠল। তাকাল আশেপাশে, কাউকে দেখতে পেল না।...ফটক ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এল ও। অন্যমনস্ক। সূর্য উঠে গেছে। তন্ময় হয়ে পথ হাঁটছিল মেয়েটি। নিজেদের বাড়ির কাছে এসে পড়ল। এবার একবার দাঁড়াল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছু ফিরে চাইল। সেই আশ্চর্য সুন্দর বাড়ি রোদের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও সেই বাড়ি আর খুঁজে পেল না।...কিন্তু..."

"কি কিন্তু?"

"কিন্তু কি আশ্চর্য, যে-বাড়িতে এতকাল সে কাটিয়েছে, সেই বাড়িও তার নিজের মনে হল না।"

"তবে?"

"তবে আর কি! পুরনো বাড়িতে পা দিয়ে মেয়েটি ভাবল, তার একটা আলাদা, সুন্দর অদ্ভুত বাড়ি আছে, শীঘ্র একদিন সে তার নতুন বাড়িতে চলে যাবে।"

"তারপর—?"

"তারপর আর কি, নতুনের আনন্দে নিজের করে পাওয়ার সুখে তার কাছে পুরনো বাড়ির মানুষগুলোর চেহারা বদলে গেল। মামার দুর্ব্যবহার ক্ষমা করে মামার ভালবাসাকে সে আবিষ্কার করল, মার খাদটুকু পুড়িয়ে মাকে সে সোনা করল...। সেই মেয়ের চোখে রোজকার গোধূলি নতুন হয়ে দেখা দিল, বিশ্ব তার কাছে এত আপন হয়ে উঠল যে, বেচারীর মাছ কি পাখি হতেও ইচ্ছে করছিল...। ও কি, অশোকা...তুমি কাঁদছ?"

"চোখে জল আসছে, কেমন একটা কান্না পাচ্ছে...। এ-গল্প যেন কেমন—।"

"এ-গল্প বীজ থেকে গাছ হওয়ার। যতদিন বীজ মাটির মধ্যে ছিল কেউ দেখেনি, বীজ যখন গাছ হয়ে মাটির ওপর মাথা ঠেলে দাঁড়াল, তখন সে অন্য প্রাণ। তার নতুন করে জন্ম হয়েছে।"

"আমার একারই কি এই নতুন জন্ম?"

"আমি ঠিক জানি না। বোধ হয় সব মানুষেরই হয়।"

নোহর তেলির দোঁহার প্রথম কলিটিতেই দি গান শেষ হত, কথা ফুরত! ন্তু তা ফুরোয়নি। গাছ হওয়ার পরও কথা ছিলঃ 'আজ গাছ হয়ে মাথা তুলেছি গরু ছাগল আমায় মুড়িয়ে খেতে আসছে, ছেলেরা পাতা ছিঁড়ে পয়খ করছে আমি বিষ না মধু, বড়রা দেখছে ভাবিবাতে আমার গা থেকে ক' মণ কাঠ হবে বিক্রীর।'

"অশোকা!"

"ইস্, এমন করে ডাকলে—আমি চমকে উঠেছি। কী শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছ হাত!"

"কিছু না, চলো—ফিরি। আর ভাল লাগছে না।"

আমি অনেককে বলতে শুনেছি, কোনো এক সুন্দর দয়াময় পুরুষ এ জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেছেন। অশোকাও বলত, ভগবানের হাতের নিখুঁত কাজ ছাড়া এমন কি হয়! আমি জানি না, আমি কখনও কোনো দয়াময় পুরুষের কথা ভাবিনি। বরং আমি অন্য কথা বহুবার ভেবেছি। যার কথা আমি ভাবতাম, জটিল জন্মসূত্রে আমি তার সঙ্গে জড়িত। ...মাঝে মাঝে আজও আমি খুব অবাক হয়ে ভাবি, মানুষ কেন মনে করে না, অনাচারী কলুষ নিষ্ঠুর এক হীন ষড়যন্ত্র থেকে এই জগৎ-সংসারের জন্ম হয়েছে! আমরা পাপ থেকে জাত। আমাদের আদি এবং অন্তে এই পাপ ছাড়া আর কি আছে? ক্ষয়, মৃত্যু, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা, শোক—বংশপরম্পরায় পাপ আরও যে কত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। সহস্র পুত্রের পিতা এই আদি পুরুষ।...স্বেচ্ছায় কি না জানি না, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম আমি আমার পুরুষানুক্রম রক্তের ঋণ শোধ করছিলাম।... অশোকাকে আমি দূষিত করছিলাম দিনে দিনে। ও আমায় পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করত, তার ধারণা ছিল এ-সংসারে আমি তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, ভাবত আমার ভালবাসা তার ভালবাসার মতন নিখাদ।... আমার মনে পড়ছে না, কখনও কোনো কারণে ও আমায় সন্দেহ করেছে। অবশ্য করার মত কারণ রাখিনি। জন্মগত কিংবা বলা যায় বংশগতভাবে, আমরা আমাদের ছলাকলা ভাল করেই জানতাম। কখনও কখনও এই ছলাকলা নিজের কাছেই সত্য বলে মনে হত। মনে হত, আর ভয় হত।

"অশোকা?"

"কি?"

"কাল তুমি চলে যাবার পর আমার কি মনে হচ্ছিল জানো?"

"তোমার ত রোজই ওই এক কথা। আমি সব বুঝি মশাই!"

"বিশ্বাস না করলে আর কি করব বলো...!"

"ইস...মুখ যে অমনি মেঘলা হয়ে উঠল। একটুতেই এত লাগে তোমার! উঁহু, মেয়েদের মতন অত অভিমানী হলে পুরুষ মানুষদের চলে না।...কই দেখি, মুখটা তোল; তাকাও না আমার দিকে—তাকাও—। বাব্বা..., আচ্ছা এই নাও...জরিমানা দিলাম।"

"এমনি করে তুমি আমায় আর কত কাল ভুলিয়ে রাখবে?"

"ছি, ও-কথা বলো না।...তোমাকে ভুলিয়ে রাখা আমার কাজ নয়; ও-সবে আমার বরাবরের ঘেন্না।"

"কিন্তু আমার যে আর ভাল লাগে না। যতক্ষণ তুমি থাক...বেশ থাকি—তুমি চলে গেলে আর যেন আগ্রহ পাই না।"

"মা বলছিল, চাকরি ছেড়ে দে। ছেড়ে দিতাম। মামার জন্যে পারি না। মামী মারা যাবার পর মামা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ। বাস্তবেও ওই একই রোগে

ধরেছে। আমি চাকরি ছাড়লে সংসারই চলবে না—ত বাচ্চুর খরচ।"

"ও, ভালো কথা...তোমার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা রেখেছি ওই ড্রয়ারের মধ্যে, যাবার সময় নিয়ে যেয়ো।"

"কত আর দেবে তুমি এ-ভাবে, আর দিও না।"

"কেন?"

"না: ভাল লাগে না।"

"আমি কি রাস্তার মানুষকে দাতব্য করছি?"

"করছ। আমার জন্যে হলে নিতে বাধত না: কিন্তু এ-টাকা যে আমার মা, মামা, বাচ্চুরাও খায়।...ব্যাপারটা কেমন বেচা-কেনার মতন নয় কি? ওরা এরপর তোমার কেনা হয়ে যাবে। এখনই ত ওরা..."

"আ, যেতে দাও ও-সব কথা। বাজে যত...।"

আসলে এগুলোই আমার কাজের। অশোকাদের সমস্ত পরিবারকে আমি জড়াচ্ছিলাম। জাল ফেলে দিয়ে চারপাশ থেকে ওদের আটকে ফেলা। বাস্তবিকই আমি কিনে নিচ্ছিলাম। আমাদের কোনো এক পূর্বপুরুষ মোহরের থলি মুঠোয় করে গাধার পিঠে চড়ে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের আত্মা কিনতে বেরিয়েছিলেন। শুনেছি, প্রায় সব আত্মাই তিনি কিনে নিতে পেরেছিলেন। আমরা জানি, মানুষের শরীরের মাংস কিনতে নেই—তার আত্মাকেই কিনে নিতে হয়। সেটাই একমাত্র খরিদ।

"তোমার যে জ্বর হয়েছে, দেখছি।"

"তেমন কিছু না, কাল একটু ঠান্ডা লেগেছে। তুমি বরং অশোকা..."

"না লাগাই আশ্চর্য। কি দরকার ছিল তোমার রাস্তার মাঝখানে গায়ের শালটা আমায় দাতব্য করার।"

"তোমার যে শীত করছিল।... তা ছাড়া তোমার গায়ে আমি যে জড়িয়ে থাকব চাদর হয়ে—এও কি কম সুখ!..."

"রসিকতা রাখো। ভাল লাগে না এ-সব আমার।"

"আমার কোনটা যে তোমার ভাল লাগে অশোকা—আমি বুঝতেই পারি না।"

"থাক, বুঝতে হবে না। দূর ছাই—আমি আবার সঙ্গে করে শালটা আনলাম না আজ।"

"ভালই করেছ। ওটা তোমার গায়ে থাক।"

"পরের কথা পরে, এখন আমি কি দিয়ে তোমায় ঢাকা দি।"

"...বলব?"

"বলো।"

"তুমি নিজেকে দিয়েই..."

"যাঃ—অসভ্য।"

সভ্যতাকে আমরা চিনি। বহু বছর ধরে এই সভ্যতাকে দেখে আসছি আমরা। পৃথিবী যখন অসভ্য ছিল, আমরা কম শিকার পেতাম। সভ্যতা যত বাড়ছে আমা-দের ততই শিকার সুলভ হচ্ছে।... অশোকার মা যেচে আমার বাড়িতে এসে-ছিলেন। মেয়ের জন্যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। বলছিলেন, বিয়েটা তুমি করে ফেল, বুঝলে! নয়ত ও-মেয়েও আর বাঁচবে না। ওর মামা মরছে মরুক, বাচ্চু মরবে—মরুক গে—অশোকাকে তুমি বাঁচাও। সংসারের ঘানি টেনে আর দু দুটো যক্ষ্মা রুগীর পাশে পাশে থেকে ওটাও মরবে নাকি! কিসের দায় তার।...বিয়ের পর অশোকা এ-বাড়ি চলে এলে আমি বাঁচি। কি ভয়ে ভয়ে যে এখন আছি, বাবা!...অশোকা চলে এলে তার মা-ও আসবেন। ও-বাড়িতে বাঁচা যায় না।

মানুষের আত্মা কিনতে বেরিয়েছিলেন

"ব্যাপার কি, কাল যে এলে না।"

"পারলাম না।"

"কেন, আটকাল কোথায়?"

"স্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে ডাক পড়েছিল।"

"হঠাৎ—"

"হঠাৎ নয়—, গুজব গুজব করছিল। আমার নামে খুব লোকনিন্দে রটেছে। আমি নাকি খারাপ চরিত্রের মেয়ে......"

"তোমার মুখের ওপর এইসব কথা বলল লোকটা?"

"বলল। অনেক বয়েস হয়েছে কিনা—বাপের বয়সী—কাজেই মুখে কিছু আটকাল না।"

"আশ্চর্য—! তা তুমি কি বললে?"

"স্বীকার করে নিলুম। বললুম, যে ভদ্রলোকের বাড়িতে আমি রোজ যাই, তিনি আমার স্বামী। বিয়ে হয়নি, হবে শীঘ্র। সংসারে আমার পোষ্য তিনজন, তার মধ্যে দুজন খুব খারাপ অসুখে ভুগছে। আমি ছাড়া তাদের গতি নেই। এক দায়িত্ব এড়িয়ে অন্য দায়িত্ব কি করে কাঁধে নি। বিয়েটা তাই পিছিয়ে যাচ্ছে।"

"এত কথা ওকে বলার কি দরকার ছিল।"

"অবস্থাটা যাতে বোঝেন ভদ্রলোক।"

"বুঝলেন।"

"না।"

"তবে?"

"চাকরিটা বোধ হয় গেল।"

মানুষের মত মূর্খ জীব আর নেই। সামান্য দূরদৃষ্টি এদের কেন যে থাকে না—প্রায়ই আমি ভাবি। ফাঁদে পড়ার পরও যারা অনর্থক ছুটোছুটি করে, ফাঁদ কেটে পালাতে চায়—তারা শেষ পর্যন্ত কি পায়! কিছুই নয়। শুধু মাত্র নিজেকে আরও অস্থির, ক্লান্ত, বিক্ষত করা ছাড়া তাদের কোনো লাভ হয় না। তবু এই মূর্খরা আমাদের সুন্দর করে পাতা শক্ত জাল ছিঁড়ে পালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। অশোকাকে দেখছিলাম মরিয়া হয়ে লড়ছে।

"বসন্তর টিকে দিয়ে বেড়ানো টিকে কাজটাও ফুরলো।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, পরশু থেকেই শেষ।"

"তবে—"

"তবে আর কি— দেখি!...শ্রীপতি দত্তর সঙ্গে কথা হচ্ছিল: সেলাইয়ের কিছু কাজ দিতে পারে—"

"ক' টাকা হবে তাতে তোমার?"

"যতটা হয়—তারপর ত তুমি আছো।"

হ্যাঁ, আমি ছিলাম এবং থাকব। অশোকার জন্যে আমায় আরও কিছু সময় থাকতে হবে। শুনেছি, আমাদের ন্যায়-দণ্ডের দেবী অন্ধ মানুষকে যখন অন্ধ করতে হয়—তখন এক চোখ নয় দু-চোখই কানা

করে দিতে হয়। অল্প পাপীদের কাছে বিবেকের টান ভয়ঙ্কর। পুরো পাপীরা নিশ্চিন্ত। তাদের দু চোখই কানা।

"শ্রীপতির চাল চলন খুব খারাপ।"

"মদ ফদ খায় শুনেছি।"

"কাল রাত্তির নটার পর আমাদের বাসায় গেছে আমার পাওনা টাকা দিতে। ভর ভর করছে মদের গন্ধ। পাঁচটা টাকা বেশি দেখেই, এমন মাতলামি শুরু করল। পাজি লোক একটা—!"

"শয়তান।"

"আমারও তাই মনে হল।...ওর কাজ-টাজ আর আমি করে দেব না। কত আর নীচে নামা যায় বল।"

"আমারও এসব পছন্দ নয় অশোকা। দর্জি মুচি ঝি...কত আর নামবে তুমি!"

বঁড়শিতে গাঁথা মাছ একটাকে ডাঙায় তোলার মধ্যে মজা নেই। পৃথিবীতে আমাদের জন্যে কিছু মজা থাকা দরকার। লখিন্দরকে বিয়ের আগেও আমরা দংশন করাতে পারতাম। তবু বাসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেন? মজার জন্যে। বেহুলাকে স্বামীর পাশে ঘুমুতে না দিলে মজা জমত না। এক পা আগে পরে নিয়েই ত নিয়তির খেলা।

"সুরেশবাবুর স্ত্রী কি বললেন, জান?"

"কি?"

"ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমাকে আর রাখবেন না।"

"কেন?"

"আমাদের বাড়িতে যে-রোগ সেটা বড় ছোঁয়াচে। আমার শাড়ি জামা হাঁচি কাশির সঙ্গে নাকি রোগটা তাঁর বাড়িতে ছড়াতে পারে।.....ওঁর ছোট মেয়েটা—ডলি ক'দিন ধরে খুব কাশছে।"

"—অশোকা—?"

"বলো।"

"এ-ভাবে আর কতদিন চালাবে?"

"আর নয়।.....এখন তাই ভাবি।......মামা কাল আমার হাত জড়িয়ে ধরে যখন কাঁদছিল তখনই বুঝতে পেরেছি, এ-ভাবে আর চলবে না। বাচ্চুটা ক'দিন থেকে আর কথা বলতেই পারছে না, এত দুর্বল। মা ত প্রায়ই কল্যাণকাকাকে চিঠি লিখছে আজকাল। মাঝে মাঝে টাকা আসতে দেখি মার নামে।"

"উপায় কি অশোকা—!"

"না, উপায় আর নেই। সবই বুঝতে পারি।......আগে এতটা হবে আমি ভাবিনি। একসময়ে কল্যাণকাকা মার লুকনো জিনিস ছিল, আমিই টেনে বের করলাম। এখন আর মার লজ্জা নেই। মামী মারা গেল, মামাকে প্রায় সর্বস্বান্ত দেখাচ্ছিল, রোগের সেবা করে করে অসম্ভব ক্লান্ত রুগ্ন—মামাকে সে-সময় সংসার টানার ভার থেকে একটু আরাম দিতে চেয়েছিলাম—মামা বরাবরের মতন ভার ছেড়ে দিল। ...বাচ্চু...না তার আর দোষ কিসের?...এমন করে চারপাশ থেকে আমি জড়িয়ে পড়ব ভাবিনি। আমার কপাল...।"

অশোকা এতদিন পরে কপালের কথা ভাবছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, ও কেন আমাদের কথা ভাবে না—আমরা যারা কপাল তৈরি করেছি। জীবনের বার্থতাকে আমরা তাসের মত ভেঁজেভুজে ছড়িয়ে দি। মানুষ চিরকাল ভাবে যে, বাজি-মাতের গোলাম টেক্কা টানছে, কিন্তু আসলে তারা খেলা-হারের ফক্কা তাস টেনে নিচ্ছে। আমাদের এই যাদুর খেলা ওরা যদি বুঝত।...

"মৃণালকে তুমি চেন, অশোকা?"

"নতুন যে ডাক্তার হয়ে এসেছে এখানে, ডিসপেনসারী খুলেছে?"

"হ্যাঁ, আমার জানাশোনা। ওর সংগে দেখা করো। খুব দেরি করো না যেন, আজ কালের মধ্যেই যেয়।"

"হঠাৎ তার কাছে পাঠাচ্ছ যে—?"

"ওর সংগে আমার কথা হয়েছে। হয়ত তোমার কোনো উপকারে আসতে পারে।"

"চাকরি জুটিয়ে দেবে?"

"তাও দিতে পারে।...হাসছ যে?"

"এমনি। কিছু না।...যাকগে তোমার ডাক্তার বন্ধু চাকরি জুটিয়ে না দিলেও ওষুধপত্রটা অন্তত ধারে দিতে পারবে। ফণি ডাক্তার ত আমায় দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দোষ কি তার—প্রায় আশি টাকা পায় এখনও।"

"আমায় ত বলোনি।"

"না, কত আর বলব।"

অশোকাকে শেষ কথাটা বলতে আসতে হবে জানতাম। আমার ছকের মধ্যে সে অনেক দিন হল বাঁধা পড়ে গেছে। এই নিষ্ঠুর গোলকধাঁধায় সে ঘুরবে আর ঘুরবে, প্রতিবার তার মনে হবে এবার বাইরে যাওয়ার পথ একটা পেয়েছে। অথচ প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে দেখবে তার পথ বন্ধ। আবার ফিরবে, আবার ঘুরবে, আবার ছুটে যাবে, ফিরে আসবে আবার।...অশোকাও এল।

"এই যে, এসো অশোকা—, অনেক দিন পরে..."

"...অ-নে-ক দিন।...সত্যি আজকাল আর পারি না। সারাদিন দুপুর রাত..."

"রাতেও থাকতে হয়?"

"না। তবে আটটা ন'টা পর্যন্ত ত বটেই, যতক্ষণ বাচ্চাগুলো না ঘুমোয়।"

"মৃণাল ডাক্তার তোমায় খুবই বেঁধে ফেলেছে তা হ'লে।"

"হ্যাঁ।...তোমার বন্ধুর বাড়িতে থাকতে এবার আমার ভয় হচ্ছে।"

"কেন, দুর্ব্যবহার করছে নাকি কিছু?"

"দুর্ব্যবহার। না, দুর্ব্যবহার আর কি... রান্নাঘর থেকে একদিন শোওয়ার ঘর পর্যন্ত হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

"ছি ছি অশোকা, কি যা তা বলছ! মৃণালের দুটি ছেলে মেয়ে আছে।"

"বউ ত নেই।"

"তাতে তোমার কি এল গেল।"

"আমার কিছু আসছে—কিছু যাচ্ছে...।...মাইনে যখন দেন ভদ্রলোক আমার হাত বাড়াতে ভয় হয় না, কিন্তু তার ওপরও যখন কিছু দেন ভয় হয়। তুমি ছাড়া ওটা আর কারুর কাছ থেকে নিতে চাই নি। অথচ এখন আমার হাত আমাতে নেই। অন্য কারুর হয়ে গেছে। শোনো, আমি অনেক ভেবেছি। আর আমি পারছি না। মা যেখানে খুশি চলে যাক, বাচ্চুটা মরবেই, মামা হাসপাতালের দরজায় গিয়ে ধরনা দিক। আমি কিছু জানি।...এবারে নিজের জন্যে একটু স্বস্তি শান্তি আমার দরকার।...এখন বলো, কবে আমি আসব?"

অশোকার দিকে পুরো, ভরা-চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, যা চেয়েছিলাম অবিকল তেমনটি হয়েছে সে। ঘা খাওয়া, মার খাওয়া, ক্লান্ত, ব্যর্থ, অবিশ্বাসী, ভীরু, স্বার্থপর সেই মানুষ। হেরে গিয়েছে অশোকা। তার চোখে করুণ আবেদন, ভিক্ষুকের সেই দাও দাও হাত বাড়ান। কী আশ্চর্য, অশোকার বয়স কত বেড়ে গেছে! মনে হচ্ছিল, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো মাধুর্য নেই কোথাও, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, শুষ্ক, অসুস্থ। অতি কষ্টে যেন প্রাণান্ত পরিশ্রম করে বুকের মধ্যে একটি নিশ্বাস নিচ্ছে এবং ফুস-ফুসটাকে কোনো রকমে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে।...অশোকার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল, হয়ত অন্তরে হাহাকার করে উঠতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার সাধ্য ছিল না, পিতৃপুরুষের সঙ্গে শঠতা করি।... অশোকার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললাম, 'এখন এসব কথা না তোলাই ভাল অশোকা, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমায় রোগে ধরেছে, বুড়োটে হয়ে গেছ তুমি। আয়নায় একবার নিজেকে দেখ, আমি বাড়িয়ে বলছি না।'...অশোকা বিশ্বাস করল না। সে আমায় ভালবাসে, এবং বিশ্বাস করে আমি তাকে ভালবাসি। ......আমার সততা সহানুভূতি একনিষ্ঠতায় তার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে অবিশ্বাসের হাসি হাসল। দমকা হাসি। উড়িয়ে দেওয়া হাসি। কিন্তু অশোকা আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় বুঝতে পারল, বিশ্বাস করল। তার ফস্ করে জ্বলে ওঠা হাসির বারুদ ফুরল। তারপর দুর্বল ম্লান হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ম্লানতর হল। শেষে নিভে গেল। পোড়া কাঠির মতন পুড়ে গেল অশোকা।

মনোহর ভেলির দোঁহায় গানটি আমার কানে ভাসছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে। কুয়াশা ঘন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। অশোকা হারিয়ে গেল।

# বিনোদবিহারীর শিল্প[illegible]

## শুভময় ঘোষ
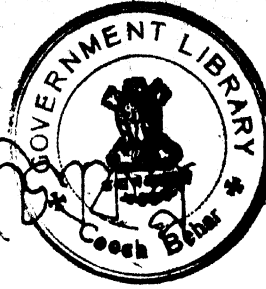


**ইয়োরোপের** শিল্পজগতে অবহেলা এবং অবজ্ঞা পেয়েছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিককালে অন্তত প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতি শিল্পসমালোচক এবং উৎসাহীদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সব সময়েই পড়েছে। অনেক সময় ভুল বিচার ও অন্যায় বিরোধিতা হয়ত হয়েছে, কিন্তু অবজ্ঞা বা অবহেলা কখনও হয়নি। কেবল একজনের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং সে ব্যতিক্রম আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের খুব বড় দুর্ঘটনা। কারণ এই শিল্পীকে অবজ্ঞা করার মত মূলধন আমাদের নেই। অবনীন্দ্র-নন্দলালের পর আমাদের দেশে যে কয়জন সত্যিকারের প্রতিভাবান শিল্পী রয়েছেন, তাঁদের হাতে গোনা যায়। এই মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রকৃতির রাজ্যের মত শিল্পের রাজ্যেও "তম" উপসর্গের ব্যবহার অনুচিত, তাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন বলা হল।

১৯০৪ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী বেহালায় বিনোদবিহারীর জন্ম। তাঁর পরিবার চব্বিশ পরগনার গরলগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার ব'লে পরিচিত। তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন জাস্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাসের জামাতা। কলকাতায় বিনোদবিহারী সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। কারণ তাঁদের পরিবারে সংস্কৃতচর্চার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হরপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ ছাত্র পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বিনোদবিহারীর দাদা বিমানবিহারীর বন্ধু। বিনোদবিহারী কালীমোহন ঘোষের উৎসাহে কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে শিশু বিভাগে ভর্তি হন। তখন থেকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। শিশু বিভাগে তখন নগেন্দ্রনাথ আইচ এবং শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র ছবি আঁকা শেখাতেন—নগেন্দ্রনাথ যে হ্যাভেলের কাছে চিত্রাঙ্কন শিখেছিলেন একথা আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। শিল্পগুরু নন্দলাল ১৯২১ সালে কলাভবনের ভার গ্রহণ করলে বিনোদবিহারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সতীর্থ হিসেবে পান শ্রীবিনায়ক মসোজীকে আর তার কিছু পরে রামকিংকরকে। কলাভবনের শিক্ষা সমাপনের পর ১৯২৯ সালে সেখানেই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কলাভবনের কাজে ছুটি নিয়ে ১৯৩৬-৩৭ সালে দশ মাসের জন্য বিনোদবিহারী জাপান ভ্রমণে যান। জাপানের

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত শিল্পী এবং শিল্পসমালোচক তাকি'র কাছে তিনি কাজ শেখেন। জাপানে তাঁর একক চিত্রপ্রদর্শনী দর্শক ও সমালোচকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একটানা কলাভবনেই কাজ করেন। তারপর নেপালে কাজ নিয়ে যান, সে কাজ শেষ হলে, মুসৌরীতে নিজের একটি ছোট শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। সেখান থেকে চলে এসে পাটনা সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে থাকাকালে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারান, বহু চিকিৎসা করেও আর তা ফিরে পান নি। সম্প্রতি তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনে ইনস্ট্রাক্টারের পদে অধিষ্ঠিত। শান্তিনিকেতন বাসকালেই ১৯৪৪ সালে বিনোদবিহারী সিন্ধু প্রদেশের শিল্পী শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

বিনোদবিহারীর ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁর মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি তাঁর গুরু, সতীর্থ এবং সহকর্মীদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির পরিচয় পেলে যে মনোভঙ্গী আমাদের কাছে ধরা দেয় তা বৈরাগ্যের দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, আধুনিক কবি হবেন নির্লিপ্ত বৈরাগী, জীবনকে তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে চিত্রিত করবেন না, করবেন নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের দৃষ্টি নিয়ে—তবেই জীবন ও জগতের সত্য রূপ ধরতে পারবেন। বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। জীবনের প্রতি তাঁর অখণ্ড দৃষ্টি। তাই জীবনের সত্য রূপ তিনি ধরতে চেয়েছেন। কোনও গ্রামীণ আদর্শ, জাতীয়তার মোহমন্ত্র বা বিশেষ আধুনিক মতবাদের রূপদান তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠেনি। তথাকথিত আধুনিক যুগচাঞ্চল্য, সন্দেহ, নিরাশা, দ্বন্দ্ব তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি। তাই তাঁর রচনাবলীতে পথ খোঁজার অস্থিরতা নেই। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ফরাসী স্কুলের অনুসরণ নেই। অথচ প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব ধারার শিল্পরীতির সঙ্গে তাঁর মত পরিচয় খুব কম শিল্পীরই আছে। তাঁর শিল্প ভারত, চীন, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পধারার প্রকৃত সমন্বয় করেছে এবং তা করেছে বলেই কোনও বিশেষ ধারার অনুসরণ তাঁকে করতে হয়নি। এই সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেতেও তাঁকে কষ্ট করতে হয়নি। তাঁর প্রথম যুগের ছবির সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক ছবির তাই একটি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের সূত্র রয়ে গেছে। এই সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছে তাঁর মনীষার সমৃদ্ধি, রবীন্দ্রসাহিত্য এবং অবনীন্দ্র-নন্দলালের শিল্পকর্মের নিদর্শনে। তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের পক্ষে এই সমন্বয় এখনও দুরধিগম্য। আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা অনেক সময়েই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ বিদেশী ধারা অনুকরণ করেছেন, তার ফলে তাঁরা জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছেন। যাঁরা শিল্পকে এই জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অসুন্দর অনুকৃতির হাত থেকে আজকে রক্ষা করে চলেছেন, বিনোদবিহারী তাঁদের মধ্যে একজন, অথচ তাঁর চিত্রে প্রাচীন রীতির জীর্ণ পুনরাবৃত্তিও নেই।

পথ যে তিনি প্রথম থেকেই খুঁজে পেয়েছেন তার একটি কারণ শুধু নবপথ প্রবর্তনের জন্য শিল্পের আসরে তিনি নামেননি। শিল্পের প্রতি তাঁর হৃদয়ের

টান। রূপের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ইন্‌স্টিংটিভ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। আমাদের মত জগতের সবকিছু তিনি সহজেই দেখতে পাননি। তাই আমাদের চেয়ে এই জগতের প্রতি তাঁর ভালবাসা অনেক বেশি। আমরা সহজেই এত কিছু দেখতে পাই বলেই অনেককিছুর প্রতি আমরা মনোযোগ করি না, করলে চলেও না। বিনোদবিহারী দেখলেন, রূপের জগৎ থেকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমেই সরে আসছে, তাই যতক্ষণ পারেন দু' চোখ ভরে রূপের জগৎকে দেখে নিলেন। এই রূপের তৃষ্ণার ফলেই বিনোদবিহারী প্রথম থেকেই দৃশ্যচিত্র এঁকেছেন। মনে রাখতে হবে, তখন নন্দলালও সম্পূর্ণরূপে পারিপার্শ্বিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করেননি। তবে তিনিই শেষ পর্যন্ত এই সাহিত্যের জগৎ থেকে দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে তাকে সুপরিণতির দিকে নিয়ে গেলেন। বিনোদবিহারী কখনও পৌরাণিক ছবি আঁকায় উৎসাহ পাননি। একবার খুব অনিচ্ছার সঙ্গে পৌরাণিক ছবি আঁকতে শুরু করেন, কিন্তু নন্দলাল তাঁকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সম্পর্ণরূপে পারিপার্শ্বিকের জীবন এবং বিশেষ করে দৃশ্যচিত্রে মনোনিবেশ করতে বলেন।

যে মনোভঙ্গীর কথা গোড়াতে বলা হয়েছে, তা বিশদভাবে বোঝা যাবে বিনোদবিহারীর ছবির ধারা অনুসরণ করলে। এই অনুসরণে শিল্পীর মনের পর্দার আড়ালে যে ঘটনা ঘটেছে তারও আভাস পাওয়া যাবে। তাতে বোঝা যাবে, তাঁর দৃষ্টিতে তাঁর সতীর্থ রামকিংকরের মত নাটকীয়তা ও আন্দোড়ন সুস্পষ্ট নয়, অনেক সংহত; সহজে চোখে পড়ে না। কারণ বিনোদবিহারীর জীবনে সেই আলোড়ন আরও অনেক গভীরে স্থান নিয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের দৃশ্যচিত্রে রঙের প্রাচুর্য আছে, রেখার নৃত্য আছে, কিন্তু "a silent tension, a brooding density in the balance of planes and colour makes the picture cohere like a fabric, a portentous curtain that cannot be drawn aside, a vision that stays" (Stella Kramrisch)

সব উজ্জ্বল রঙের অন্তরে একটা ঘন কালো পটভূমিকার ভার স্টেলা ক্রামরীশের চোখে পড়েছে। ক্রামরীশ বলেছেন, এর কারণ, "Closely Knit, they have the impersonal pathos of the Indian scene."

বীরভূমের প্রকৃতি আনন্দোচ্ছল নয়, কিন্তু শরতের আলোতে তার উচ্ছলতার কমতি নেই। তবুও বিনোদবিহারীর প্রথম যুগের আঁকা বিখ্যাত ছবি "শরতের দৃশ্য" সেই ট্রাজেডির ভিত্তিকে অবলম্বন করে রয়েছে। এর কারণ শুধু "pathos of the Indian scene" নয়, এতে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনও মিশেছে। রূপাস্বাদনের প্রধান ইন্দ্রিয়টি যখন শিল্পীকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করতে বসেছে, তখন শিল্পীর মনে নিরাশার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘটে গেছে, তারই ছাপ পড়েছে এই "silent tension"এ। অজয় নদীর সেতুর ছবি, তেলরঙে আঁকা "শিমুলগাছ" প্রভৃতি বিখ্যাত দৃশ্যচিত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পূর্বোক্ত দুটি ছবিতেই এক ধরনের ঘনবিষণ্ণ কালো রঙের ব্যবহার এই নিঃশব্দ সংগ্রামেরই পরিচায়ক। এই সংগ্রামের আলোড়ন অনেক গভীরে বলে ছবিতে তার প্রকাশ এত সংহত, প্রায় স্তব্ধ। তাই অন্য চিত্রকরদের মত মুহূর্তের আবেগের নাটকীয়তা তাঁর ছবিতে নেই, আছে নিত্যঘটিত এক সংগ্রামের স্তব্ধ প্রকাশ প্রত্যেকটি ছবিতে। তার ফলেই সহৃদয় দর্শকের মনে তা সর্বমানবের বেদনা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। এই সংগ্রামের জয়েই শিল্পীর মহত্ত্ব। শিল্পীর সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতায় তিনি হার মানেন নি, গভীর নিরাশাকে জয় করেছেন। এই জয়ে তাঁর শিল্প উদ্ভাসিত হয়েছে এবং সুগভীর পরিণতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর পরবর্তী চিত্রে একদিকে যেমন রঙের বাহুল্য কমল অন্যদিকে তেমনি সেই নিঃশব্দ বেদনার ছায়া দূর হল। তার বদলে দেখা গেল, বৈরাগ্যের দীপ্তি। জীবন ও জগৎ যেন তাঁর হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত হল, তার মূলস্বরূপ তাঁর অধিগত হল, বাইরের দৃষ্টির আলোকপাতের আর প্রয়োজন রইল না। খোলা আকাশ আর আলো-বাতাস-রোদ তাঁর ছবিকে প্রাণের উৎসাহে ভরে দিল। ছোট্ট দৃশ্যে, ছোট্ট বর্ণনায় অসীম অনন্ত প্রকাশিত হল। তার আয়োজন অত্যন্ত কম, রং, রেখা, পট, বিষয় সবকিছু অত্যন্ত স্বল্প ও সামান্য। অথচ সবকিছুতেই অনন্তের স্বাক্ষর। হেনরী ফসেলি প্রতিভার স্বরূপ বর্ণনায় বলেছেন, "Genius absorbed by its Subject, hastens to the centre, and from that point disseniates: to that leads back its rays; talent full of its own dexterities, begins to point the ways before they have a centre, and aggravates a mass of secondary beauties."

বিনোদবিহারীর প্রতিভার সঙ্গে, আধুনিক অনেক ভারতীয় শিল্পীর ক্ষমতার পার্থক্য এখানেই। ছোট ছোট ছবিতে যে অখণ্ড দৃষ্টি প্রতিফলিত, সেই দৃষ্টিই শান্তিনিকেতনের হিন্দীভবনের দেয়ালচিত্রে জীবনের বিরাট শোভাযাত্রা তুলে ধরেছে। বড় আকারে বর্ণিত এই শোভাযাত্রার মূলে রয়েছে মানুষ এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তি। তাঁর এই পর্বের অনেক ছবিই ক্লাশিকাল মহত্ত্বে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই স্তব্ধ সংহত সাধনার মূলে রয়েছে জীবনের গভীর পরিচয় আর আনন্দ। মনীষার স্পর্শে তা জমাট বেঁধে উঠেছে। বিটোফেন যখন সুরের বাইরের পরিচয় হারালেন তখন যে ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের আবর্তনে পড়েছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এরোইকা সিম্ফনির দ্বিতীয় পর্বে, আবার ঐ রচনারই শেষ পর্বে সব নৈরাশ্য জয় করে মানবের ও জীবনের মহিমা ঘোষণা করলেন। এই ধ্যানের নয়ন বিনোদবিহারী পেয়েছেন বলেই সমস্ত জগৎ ও জীবন অন্তরতম সুষমামণ্ডিত অনন্ত শোভাযাত্রায় পরিণত হল। সাময়িক চাঞ্চল্যে আচ্ছন্ন আমাদের দৃষ্টি সব শিল্পে সেই চাঞ্চল্যের প্রতিফলন চাইবে, তাই এখন এর প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারব না। কিন্তু সাময়িকভাবে ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে বিনোদবিহারীর শিল্প আমাদের প্রেরণা দেবে।

বিনোদবিহারীর দৃশ্যচিত্র সম্বন্ধে এখানেই বাকি কথাটা সেরে নেওয়া ভাল। তাঁকে নিছক দৃশ্যচিত্র আঁকিয়ে ভাবা ভুল, তবে দৃশ্যচিত্র তাঁর শিল্পসৃষ্টির সর্বপ্রধান অঙ্গ। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য অসীম। বিনোদবিহারীর দৃশ্যচিত্র ছাড়া অন্য ছবিতেও প্রকৃতি ও মানব জীবনের সমন্বয় ঘটেছে। এর জন্য অবশ্য শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব কাজ করেছে। বিনোদবিহারীর দৃশ্যচিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হল তা অন্য দৃশ্যচিত্র আঁকিয়েদের মত চীন বা ইয়োরোপের প্রভাবে আঁকা নয়। সর্বদেশীয় ধারার সমন্বয় ঘটালেও তাঁর দৃশ্যচিত্রে এদেশের ভাব, মেজাজ, রূপরসগন্ধ ফুটে উঠেছে। বীরভূমের লাল প্রান্তর, রুক্ষ গাছ, স্বল্পশ্যামল আভায় যে বিশেষ স্থানীয় ভাব, তা তাঁর দৃশ্যচিত্রে প্রাণ পেয়েছে—কয়েক বছর আগে "শারদীয়া দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত খোয়াইয়ের রঙিন ছবি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। ছবিটির সামনে একটি খেজুর গাছ, বাকি অংশে শুধু আলবাঁধা ছোট ছোট ক্ষেতের বর্ণনায় একটানা ফ্ল্যাট স্পেস্ রেখে শিল্পী ছবির ক্ষেত্র ব্যবহারেও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দৃশ্যচিত্রে দেশীয় ভাবের সুন্দর ব্যবহার এবং স্বকীয় অংকনরীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই ক্রামরীশ বলেছেন, "Renodbehari Mukherjee paints Indian pictures . . . Their Indianness is not conveyed by their subjects. Sunflower or Sweet Peas as he paints and draws them have their own intimate life; they are not Indian flowers, but Indian pictures have been made of them."

প্রকৃতির সঙ্গে বিনোদবিহারীর ঘনিষ্ঠতা অজন্তা, বর্শোলীর শিল্পীদের মতই নিবিড়। অত্যন্ত ছোটখাট জিনিসও তিনি দেখে রাখতে ভোলেননি। সবকিছুরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গঠনের প্রণালী তাঁর ভাল করে জানা। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাকৃতিক রূপাঙ্কন গঠনমূলক হয়ে উঠল। প্রথমে গাছের সিলুয়েৎ, জায়গায়

গুঁড়ি, ডাল, পাতা, পাতার গঠন ইত্যাদি অত্যন্ত শৃঙ্খলার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেন। প্রতিটি বস্তু আলাদভাবে তাঁর চোখে পড়ে। এক-একটি বস্তু খুব কাছে থেকে দেখতে হয় বলে, নয়ত সম্পূর্ণ পূর্ব-স্মৃতি থেকে আঁকতে হয় বলে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর সংগে যে দূরত্ব ও নৈকট্যের সম্পর্ক তা তাঁর ছবিতে সব সময় থাকে না। অন্তর্বর্তী দেশব্যবধান লোপ হয়ে সবকিছু যেন গায়ে গায়ে লেগে থাকে। অবশ্য এই রীতি তাঁর ছবিতে এমনিতেই আসত, কারণ ছবির ক্ষেত্র বা দেশ সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষাই তাঁকে এ পথে নিয়ে গেছে, এর আলোচনা অন্যত্র হয়েছে। বাইরের রূপ নতুন করে না দেখেই আভাসে ইঙ্গিতে বিষয়ের পূর্ব-পরিচয় দিতে বিনোদবিহারী সক্ষম। নেপালে আঁকা চিত্রাবলী এর সুন্দর নিদর্শন। সামান্য আভাসে নেপালের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

বিনোদবিহারীর চিত্রে একদিকে দেখা যায় বিষয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর একদিকে তার সাধরণীকরণ বা এবস্‌ট্রাকশন্‌। ক্রমশ এই সাধরণীকরণ বেড়ে উঠেছে। আদি পর্বে তিনি পোরট্রেটও এঁকেছেন। তেলরঙে আঁকা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী সরস্বতীর ছবি, টেম্পেরা ও নিজের ওয়শ পদ্ধতিতে আঁকা শান্তিনিকেতনের শিক্ষক শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনের ছবি, কাপড়ের উপর টেম্পেরাতে আঁকা নন্দলালের ছবি, রাম-কিংকরের পেনসিল স্কেচ প্রভৃতি এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। শ্রীতেজেশচন্দ্রের ছবিতে প্রকৃতির সঙ্গে এই বৃক্ষপ্রেমিক মানুষটিকে এমনভাবে একাত্ম করে তোলা হয়েছে, তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পেতে অসুবিধে হয় না। এই পোরট্রেটের মধ্যেও তাঁর প্রথম দিকের দৃশ্যচিত্রের মত মুডের প্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু ক্রমশ এই মুডের প্রকাশ তাঁর মানুষের চিত্রেও কমে এসেছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে ভারি গড়ন, তাতে মুখাবয়বের বৈচিত্র্য কমেছে। সমগ্র ছবিতে প্রতি বিষয়ের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যের বদলে একটি সাধারণ গঠন পরিকল্পনা ছবির অন্তরস্থিত অবলম্বন হয়ে উঠেছে। প্রতিটি বস্তুর স্বকীয় রূপ তাঁর অধিগত, তার চর্চা তিনি করেছেন। এখন দেখা দিল এইসব খণ্ড-বস্তুকে ধরে আছে যে বিরাট পরিকল্পনা তার চিত্রায়ণ। এডিথ সিট্‌ওয়েল বলেছেন, Poetry is the light of the Great morning, wherein the beings whom we see passing in the common street and transformed for us into the epitome of all beauty."
বিনোদবিহারীর চিত্রে সেই রসায়ণ ঘটল। এর ফলে দেখা দিল ছবিতে রেখার গড়নের প্রাধান্য। অবশ্য নন্দলালের শিষ্যের কাছে এই রেখার প্রয়োজন হঠাৎ দেখা দেয়নি,

চীন ভবনের ফ্রেস্কো

তাঁর পূর্ববর্তী চিত্রেও তা ছিল। কিন্তু এর পুরোপুরি প্রাধান্য এই সময়েই দেখা দিল। বিনোদবিহারী জাপানে যান ১৯৩৬ সালের পুজোর সময়ে। জাপানের শিক্ষায় তাঁর ছবিতে পূর্বের ক্যালিগ্রাফিক ভংগী আরও সুস্পষ্ট হল। জাপানের চিত্রকলায় তাঁর যে আনন্দ তা ফরাসী শিল্পীদের মত হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে নয়। স্বদেশের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তা কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর উপভোগ, মননের উপভোগ। তাঁর এই পর্বের ছবিতে ক্যালিগ্রাফিক রেখাকে তিনি রূপের ধারক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্পেসকে ব্যবহার করেছেন রূপের সুষম অবস্থানে (organisation)। বিটোফেনের শেষ পর্বের রচনায় যে সুদৃঢ় অন্তর্পরি-কল্পনার কথা সুলিভ্যান বলেছেন, সে জাতের পরিকল্পনা এই পর্বে বিনোদ-বিহারীর শিল্পে গড়ে উঠেছে। ধ্রুপদী গড়নে ভারসাম্যের ব্যবস্থায়, ছন্দের সংহত প্রয়োগে গাণিতিক মননক্রিয়া কাজ করেছে। তার ফলে ছবিতে এবস্‌ট্রাক্ট ভাব আসতে বাধা। কিন্তু পুরোপুরি এবস্ট্রাকশনের তাঁর প্রয়োজন হল না। রূপের সাধারণ পরিচিতির বদল করলেন না, কারণ প্রত্যেক বস্তুর সংযোজনে যে বিরাট প্যাটার্ন তা তিনি ধরতে পেরেছেন। "the immense design of the world, one image of wonder mirrored by another image of wonder—the pattern of fern and feather by the post of the window-pane, the six rays of the snow-flake mirrored by the rock crystal's

six-rayed eternity—the pattern of the scaly legs of birds mirrored in the knot-grass."

এসবের মাধ্যমে আমরা দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারি, একথা সিটওয়েল বলেছেন। দেবতাদের প্রসঙ্গ এখন থাক, তবে বিনোদবিহারীও এই "immense world design" উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে তাঁর চিত্রাবলীতে প্যাটার্ন ও ডিজাইনের জগৎ মেলে দিয়েছেন। অবশ্য ডিজাইন বলতে যে আলাদা অলংকৃত রেখার কথা মনে হয় তা এখানে প্রযোজ্য নয়। রূপের সুন্দর অবস্থানে, তার রেখা ও ছন্দের প্রকাশের যে পরিকল্পনা তাতেই বিনোদবিহারী প্যাটার্ন ও ডিজাইন গড়ে তুলেছেন, রূপের বাস্তবতা পরিহার করতে হয়নি। প্রাচ্যের চিত্রকলার এই বৈশিষ্ট্য মাতিস্ প্রমুখ ইয়োরোপী শিল্পীরা গ্রহণ করেছিলেন। বিনোদবিহারী ছবি আঁকা শুরু করেন যেন সমগ্র পরিকল্পনা আগে থেকেই মনের ভিতরে ছকে নিয়ে। সেই ছক অনুসারে দ্বিধাহীন বলিষ্ঠতার সঙ্গে এবস্ট্রাক্টভাবে ছবি এঁকে চলেন। কোন জায়গায় একটু চড়া রঙের ছোপ, কোথাও একটু নীলের স্পর্শ, হলুদের ছাপ, অন্যখানে জমির উপর গাঢ় রং—সুদক্ষ দাবা খেলোয়াড়ের মত বসিয়ে যান। এই-ভাবেই আকৃতির দিকে অগ্রসর হন। ক্যালি-গ্রাফিক রেখার বাঁধুনি এবং ছন্দের প্রয়োগে মানুষ, গাছ বা জন্তুর ব্যঞ্জনা দেন। তার ফলে সমস্ত ছবিটি একটি প্রাণবান রূপময় প্যাটার্নে পরিণত হয়। যদিও জাপান ভ্রমণের পর তাঁর চিত্রে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, কিন্তু এর মূল তাঁর পূর্ববর্তী ছবিতেও পাওয়া যাবে। জাপানী রূপময় লেখাঙ্কনের (পিকটোরিয়াল ক্যালিগ্রাফি) সঙ্গে তাঁর রেখাময় লেখাঙ্কনের পার্থক্যও স্মরণ রাখা কর্তব্য।

যে প্যাটার্নের কথা এতক্ষণ বলা হল, তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ বিনোদবিহারীর চিত্র আমাদের কাছে যে অনাদর পেয়েছে, তার একটি কারণ তাঁর ছবির এই গুণটি আমরা ধরতে পারিনি। ছবিতে আমরা বলি, 'একস্প্রেশন' চাই। তার মানে, হয় রোমাণ্টিক মাধুর্য, নয় তথা-কথিত 'যুগচেতনা'। এ প্রসঙ্গে মাতিসের একটি উক্তির উল্লেখ করা যাক,—
"Expression, to my way of thinking, does not consist of the passion mirrored upon a human face or betrayed by a violent gesture. The whole arrangement of my picture is expressive. The place occupied by figures or objects, the empty spaces around them, the proportions—everything plays a part. Composition is the art of arranging in a decorative manner the various elements at the painter's disposal for the expression of his feelings."

মাতিসকে দিয়ে অবশ্য বিনোদবিহারীকে চেনা যাবে না, কিন্তু মাতিসের এই উক্তিটি বিনোদ-বিহারীর অনেক ছবির বেলাতেও প্রযোজ্য। বিনোদবিহারীর প্যাটার্ন নানা ধরনের রঙের ছোপের সুচিন্তিত অবস্থানে এই প্যাটার্ন পটের চতুর্দিক নিয়ে গড়ে উঠেছে।

বিনোদবিহারীর চিত্র প্যাটার্নের মধ্যে শরীর এবং বস্তুর আকারের যথাযথ বাস্তবতা খুঁজতে গেলে ঠকব। মানুষের শরীরের দ্বারা আলংকারিক প্যাটার্ন গঠন প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত রীতি। ইয়োরোপে সেজানে প্রথম এ চেষ্টা করেছেন। মাতিস সে চেষ্টায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বর্তমান ভারতে নন্দলাল এর প্রথম সার্থক শিল্পী। বিনোদবিহারীও এই দুরূহ সাধনায় সফল হয়েছেন। নন্দলালকেও অনেক সময় চিত্রের অলংকরণের জন্য বাস্তব রূপের অবস্থানের সঙ্গে পৃথক সম্পূর্ণ অলংকারিক রেখা ও নক্সা প্রয়োগ করতে হয়েছে। বিনোদবিহারী শুধু বাস্তব রূপের সুন্দর অবস্থানেই সেই কাজ করেছেন। পৃথক অলংকারিক রেখা ও নক্সার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর ছবিতে বাস্তব রূপের গঠন যথাযথ রেখে অলংকরণের জন্য অল্পমাত্র বিকৃতি ঘটান হয়েছে। "বিশ্বভারতী পত্রিকায়" প্রকাশিত বাঁশি বাজাচ্ছে সাঁওতাল ছেলেটির স্কেচের রেখার কম্পিতভাব এবং নম্রতা এর প্রমাণ। অবশ্য এটি আংশিক নিদর্শন মাত্র আরও বহু ছবিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেত। ড্রয়িংএর কাজের সঙ্গে অলংকরণের কাজের একটা বিরোধ সাধারণত শিল্পীরা অনুভব করে থাকেন। ডিজাইনের চরিত্র দ্বিমাত্রিক (two dimentional), ড্রয়িংএর ত্রিমাত্রিক। ফ্লানাগান বলছেন, ইয়োরোপে সেজানে প্রথম এর সমন্বয় চেষ্টা করেন। তার ফলে গঠনের নানারকম মিশ্রণ ঘটিয়ে দুধারায় একটা আপস করতে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় রীতিতে অভ্যস্ত শিল্পীদের এ ব্যাপারে বেশি বেগ পেতে হয়নি। শরীরের ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও অলংকরণের প্রয়োগ আমাদের ক্লাসিকাল চিত্রে লোকশিল্পে করা হয়েছে। তার কারণ আমাদের শিল্পীরা কখনও পাশ্চাত্ত্যরীতিতে আলোছায়ার বন্দুনি (chiaroscures) ছবিতে দেননি। নন্দলালের ছবিতে তাই দেখা যায়, বিনোদবিহারীর ছবিতেও। ভারতীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্ত্যের পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞানও মানেননি বলে এ ব্যাপারে তাঁদের আরও সুবিধে হয়েছে। নন্দলালের "রাধার বিরহ" রঙীন চিত্রটির কথা এবং বিনোদ-বিহারীর কলাভবনের ছাত্রাবাসের সিলিংএর ফ্রেস্কো প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

আমরা ছবিতে সাধারণ অর্থে যথাযথ প্রতিচিত্র দেখতে চাই। তাই বিনোদ-বিহারীর ছবি আমাদের কাছে শিশুসুলভ মনে হয়। শিশুর আঁকা ছবি, বাঙলা দেশের পুতুলের ছাপ তাঁর ছবিতে আছে, একথা স্বীকার্য; কিন্তু সে প্রভাব তাঁর দৃষ্টিকোণ, দেশ ও কালের চিত্রণ, মূর্তি গঠনের বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যেরই কারণ। শিল্পের সত্য, যাথার্থ্য নয়। তার ছবির প্রাণশক্তি একটু মনোনিবেশ করলেই উপলব্ধি করা যাবে। এই প্রাণশক্তি অন্য কোনও উপায়ে ধরা যেত না। এর প্রতিটি রেখা, রঙের ছোপ, বস্তুর অবস্থানে এক বিস্ময়কর ঘন-নিবদ্ধ নিটোল রূপ গঠন সম্ভব করেছে। অথচ রেখায় রঙে কমনীয়তার অভাব নেই। বিনোদবিহারীর রেখার ব্যবহারেও বৈচিত্র্য আছে, কখনও তা সমুন্নত, ঋজু, টান টান-ভাবে বাঁকা বা গোল; কখনও আবার জলের ধারার মত একেবেঁকে ছুটে চলেছে। কখনও এচিংএর মত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অনেক সময়েই আবার ভেজা তুলি ও পটে চীনা রীতিতে মোটা রঙের টান, বিষয়ের ঘনত্ব ও ভাব একই সঙ্গে প্রকাশ করেছে, অথচ রেখাগুলি মোটেই জড়ভরতের মত পড়ে থাকে না, তারা অত্যন্ত প্রাণবান। তাঁর রেখার গতি ও সুকুমার ভঙ্গী তাঁর অনেক স্কেচ ও ছোট ছবিকে লিরিকের গুণ দিয়েছে, সেসব রেখা—
"Seems to have been almost scribbl[illegible] on the paper... intensely sensitive, intensely understanding of the subtleties of Contour and direction."
(মাতিসের বিষয়ে ফ্লানাগান)। একটি রেখা থেকে আরেকটি রেখার দূরত্ব, তাদের মধ্যবর্তী যে ফাঁকা অংশ তা একটুকুও কমান বাড়ান চলে না।

॥ ২ ॥

বিনোদবিহারীর পরিণত পর্বের চিত্র-রীতির দুটি ধারা। প্রথমটিতে রঙের ছোপের উপর জোরালো ক্যালিগ্রাফিক রেখা, দ্বিতীয়টিতে ভারি ওজনের ঘন-গাঢ় মূর্তি গঠন, সেখানে রেখার প্রাধান্য নেই। প্রথম ধারার পরিণত প্রকাশ হয়েছে কলাভবনের একটি ছাত্রাবাসের সিলিংএর চিত্রে। টেম্পেরাতে করা এই দেয়ালচিত্রে নানারকম গভীর রঙে ছোপের উপর দৃঢ় রেখার সাহায্যে বীরভূমের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। সারা ছাতজোড়া এই বিরাট দেয়াল-চিত্রের মাঝখানে রয়েছে একটি পুকুর। তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। ছবিটি যে কোন দিক থেকেই সোজাভাবে দেখা চলে। সিলিংএ যে রঙের ছোপ দেওয়া হয়েছে, তাও ক্যালিগ্রাফিক। ছবিটির সংহতি রক্ষা করবার। এই বিস্তৃত দৃশ্যাবলীর প্রতিটি অংশ ঐক্যের নিয়মে বাঁধা। সিলিংএর জন্য একটা ফ্রেম আছে, তারই ভিতরে রঙের ছোপ ও রেখাগুলো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে

অথচ সব কিছুরই অবস্থানের বিশিষ্ট মূল্য ও নিয়ম আছে।

দ্বিতীয় রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চীনভবন এবং বিশেষ করে হিন্দী ভবনের দেয়াল-চিত্র। পাশ্চাত্ত্য বুওনো ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে এই দেয়াল-চিত্র আঁকা। ভেজা দেয়ালের উপর সরাসরি অন্য কোনও রংয়ের জমি তৈরি না করে এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা হয়। এতে রংয়ের বাহুল্য, বা রেখার প্রাধান্য নেই। আছে নিখুঁৎ জ্যামিতিক গড়ন, দীর্ঘ ঘন মানুষের শরীর ও বস্তুর রূপ, আর তাদের ভল্যুম। বস্তুর বাইরের রেখা ধ্যাবড়া করে মুছে ঘসে দেওয়া হয়েছে, রেখার বদলে একটু গাঢ় রংয়ের ক্রমশ-মুছে-আসা লম্বা প্রলেপ ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে শরীর ও বস্তুর গড়ন, ফ্ল্যাট না থেকে সুডৌল হয়ে উঠেছে। প্রাচীন জৈনমূর্তির মত তারা খাড়া উঠেছে। হিন্দী-ভবনে বিশেষ করে, তিন দেয়ালের মাঝখানে দুটিনটি বিরাট ঋজু, সমুন্নত শরীর স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে—তাদের চারপাশে অসংখ্য নরনারী, শহর, বাড়িঘর, নদী, পাহাড়, গাছপালার মেলা। এতে ক্ষেত্রের ব্যবহারে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম মান্য হয়নি। এই ফ্রেস্কোর বিষয় হল মধ্যযুগের সন্ত-সাধকদের জীবন। এই সাধকরা অত্যন্ত সহজ সাধারণ মানুষের রূপেই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছেন। অন্য অনেক শিল্পীর মত তাদের অতিমানব বা ভগবান বানাতে যাননি এবং তাদের অবাস্তবভাবে সুন্দর ও অপরূপ করে তোলেননি। অথচ এই সাধনার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে তার গভীরতা দেয়াল-চিত্রের সর্বত্র বিরাজিত। মধ্যযুগের সাধুসন্তদের সাধনার সত্য পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাই সুলভ ভাবাবেগের বদলে দার্শনিক গভীরতা সম্ভব হয়েছে। এই সাধকরাও কখনও নিজেদের অতিমানব বা ভগবান বলে মনে করেন নি, তাঁরা আর পাঁচজন মানুষের মধ্যেই নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে যে মানবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিনোদবিহারীর দেয়ালচিত্রে সুন্দর ফুটে উঠেছে। এতে যে কত মানুষের শরীর আছে, তা গুণে বলা সম্ভব নয়। এর জন্য ছবি আঁকার পূর্বে শিল্পীকে শত শত বিভিন্ন মানুষের টাইপ অভিনিবেশসহকারে দেখে নিতে হয়েছে। এই দেয়ালচিত্রের গঠনপদ্ধতি বিস্ময়কর। এতে বিনোদবিহারীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে এবং তা শ্রেষ্ঠ প্রতিভারই বিকাশ। এর মনুষ্যাকৃতির বলিষ্ঠতা খুব কম শিল্পীর সৃষ্টিতেই পাওয়া যাবে। তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য বিনোদ-বিহারী প্রথম থেকেই অতি যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত হয়েছেন। এর এক কোণে একটি ছোট পুকুরের ছবি আছে, তাতে তিনটি

কলাভবন ছাত্রাবাসের সীলিং-এ ফ্রেস্কো

আধ-ফোটা পদ্মফুল মাথা তুলেছে। অল্প কয়েকটি তুলির টানে ফুলগুলি আঁকা, অত্যন্ত স্বল্প আয়োজন। কিন্তু তার জন্যই অসংখ্য পদ্মফুলের রূপরেখার গড়নের সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হয়েছে, চর্চা করতে হয়েছে। সেই সঞ্চিত জ্ঞানের প্রকাশ ঐ অল্প কয়েকটি তুলির টানে। এই দেয়াল-চিত্রের সঙ্গে পরিচিত না হলে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ থেকে যাবে।

ভারি ওজনের ভল্যুমসম্বলিত বস্তুর রূপের অবস্থানের বিশেষ পরিকল্পনায় বিনোদবিহারীর অনেক চিত্রে স্থাপত্যের ম্যাসিভ গঠনমূলক (স্ট্রাকচারাল) গুণ দেখা যায়। ছোট ছবির বেলায় যদি রূপের বাস্তব চেহারা বাদ দিয়ে শুধু এবস্ট্রাক্ট গঠনটা দেখি মনে হবে, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, সিলিণ্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের বিল্ডিং ব্লকস ক্ষেত্রে সাজান রয়েছে, তার ফলে ছবির একটানা পটে উঁচু-নিচু স্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে। স্তম্ভ বা উঁচু দেয়ালের উপর থেকে নিচে তাকালে যেমন দৈর্ঘ্য, উচ্চতা এবং ভিতরের অংগ বোঝা যায়, এখানেও তাই হয়। গড়নের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং ভিতরের গভীরতা যেন স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে। কিউবিস্টরা রূপের প্রতি অংশের কোণাকার বা কিউবাকার গঠন নিয়ে ছবি আঁকেন। এখানে তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বস্তুকে এমনভাবে সাজিয়ে বসান হয়, তার ফলেই এই স্ট্রাকচার গড়ে ওঠে। হিন্দী-ভবনের দেয়ালচিত্রে দীর্ঘাকার শরীর ও বস্তু এমনভাবে বসান হয়েছে, যেন কংক্রীটের স্থাপত্য গড়ে উঠেছে, এর সঙ্গে বাড়িঘরের ছবিও সংযোজিত হয়েছে। এর সব কিছুকে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতি। কয়েকটি মানুষ বা বস্তু একত্র হয়ে কখনও

কোণার্কের দেয়ালের অংশ গড়ে তুলেছে—চীনভবনের দেয়ালচিত্রে এ খবই স্পষ্ট। হিন্দীভবনে এই গড়ন যেন তল থেকে উপরে ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। ছবির বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত হচ্ছে চারিদিক থেকেই। যেখানে উপর থেকে তাকান হচ্ছে, সেখানে দূরবীণ ভাঁজ হয়ে যাওয়ার মত, বস্তুর রূপও যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে ভিতরের সব কিছু প্রকাশ হচ্ছে, ঘরের ভিতর বা দেয়াল দিয়ে ঢাকা ক্ষেত্রে এইভাবেই দৃষ্টিপাত সম্ভব হচ্ছে। হিন্দীভবনের দেয়ালচিত্রে ক্ষেত্রের প্রচলিত ঐক্য (স্পেস অর্গ্যানাইজেশন) শিল্পী মানেন নি। একই অংশে শুধু উঁচু ও নিচু প্লেনের তারতম্যে একাধিক পৃথক ঘটনা আঁকা হয়েছে। বস্তুর অবস্থানে, ঘটনা সংস্থানে, সময়ের একাডেমিক পারম্পর্য পরিহার করা হয়েছে। তাঁর ছোট্ট ছবিতেও সময় ও ঘটনাস্রোতের এই বিশেষ উপায়ের বর্ণনা দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে এই উপায়ের প্রয়োগ সর্বজনবিদিত। অমরাবতীর মত বিনোদবিহারীও দেশ ও কালের বিচ্ছিন্ন অংশকে চলচ্চিত্রের মত পর পর সাজান নি। দেশ ও কালের অখণ্ডতার উপলব্ধিতে এই রীতি গড়ে উঠেছে।

দৃশ্যচিত্র, দেয়ালচিত্র, প্রতিকৃতি প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের ছবিতে বিনোদবিহারীর প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া লিনো-কাট, লিথোগ্রাফ, রঙীন আর সাদা-কালোয় উড্‌কাট, ড্রাই পয়েন্ট ও 'এচিং'-এও তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। ভাস্কর্যেও কখনও কখনও হাত দিয়েছেন—প্ল্যাস্টি-সিনের কুকুরের মূর্তি, কাঠের মূর্তি আর তাঁর ব্রোঞ্জের মূর্তিটি মোটেই অবহেলার নয়। কিছুকাল আগে বাঙলা হাতের লেখা, ক্যালিগ্রাফির সাধনা করেছেন। ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা একেবারে নিখুঁতভাবে সুন্দর ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে লিখবেন। নানাভাবে লিখেছেন, আর বাতিল করেছেন—সাধনার বিরাম ছিল না।

শিল্পকে বিনোদবিহারীও তাঁর গুরুর মত দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনে তিনি বিশ্বাসী বলেই চারুশিল্প আর কারুশিল্পকে পৃথকভাবে দেখেন না। তাঁর মতে চারুকলা "ল্যাবরেটরীর মত কাজ করবে, দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুই সুন্দর করে তোলার জন্যে।" তাই বিনোদবিহারী কাঠের কাজ, কাপড়ের ছাপান ডিজাইন, তামার কাজ, সবেতেই উৎসাহ ও আগ্রহ বোধ করেন।

শিল্পী হিসেবে বিনোদবিহারীর এই পূর্ণতার সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর অসীম শিল্পবোধ। শিল্পগুরু হিসেবে তাঁর সাফল্য অবহেলার নয়। ভারতের শিল্প আলোচনার জগতেও তাঁর প্রতিষ্ঠা আধুনিক-কালে সর্বাগ্রগণ্য। দেশবিদেশের শিল্প-রীতি, নন্দন-তত্ত্ব এবং সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর মত ব্যুৎপত্তি, বৈদগ্ধ্য, বর্তমানে আর কোনও শিল্পীর নেই। শিল্প সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার বিরাট বিশ্বকোষের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর চিত্রে এই মননের দীপ্তি ধরা পড়ে। তাঁর শিল্প বিষয়ে সমালোচনা নিবন্ধে এর প্রকাশ বিস্ময়কর। তাঁর সমালোচনার রীতি অত্যন্ত নিরপেক্ষ, বক্তব্য স্বচ্ছ এবং সুষমামণ্ডিত। শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা ও কীর্তি তিনি অতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন। বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্প-রীতির তুলনাও থাকে, কিন্তু কখনও কোনও দেশী বা বিদেশী খ্যাতনামা শিল্পীর নামাবলী দিয়ে কোনও শিল্পীকে পরিচিত করার চেষ্টা করেন না এবং সব সময়েই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব কিছুর বিচার করেন। তার ফলেই তিনি আমাদের বহু-দিনের পুষ্ট অনেক ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছেন—যেমন অবনীন্দ্রনাথ হচ্ছেন শুধু ভারতীয় রীতির পুনর্জন্মদাতা, গগনেন্দ্র-নাথের ছবি হল পাশ্চাত্য কিউবিজম, রবীন্দ্রনাথের ছবি জার্মান একস্‌প্রেশনিজম্ ইত্যাদি। নন্দলাল শুধু অজন্তা-রীতির অনুবর্তনে পৌরাণিক বিষয়ে ছবি এঁকেছেন এই অপপ্রচারেরও তিনিই প্রথম প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর শিল্পসমালোচনার একটি সংকলন অবিলম্বে প্রকাশ করা দরকার। দেশ পত্রিকাতেও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সমালোচক প্রমথ চৌধুরীকে সাহিত্যের কর্ণধার হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিনোদবিহারীও ভারতীয় শিল্পজগতে সেই কর্ণধারের আসন গ্রহণ করলে শিল্পরাজ্যের নানা বিভ্রান্তিকর মতামত ও অরাজকতা দূর হবে। তাঁর একটি চিত্র-এলবাম এবং সমালোচনা সংগ্রহ যদি প্রকাশিত হয়, তবে তা হবে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের একটি পরম সম্পদ। জাতীয় সরকার এবং উৎসাহী প্রকাশকরা এ বিষয়ে তৎপর হলে এই নীরব সাধক শিল্পীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হবে।

আমরা শিল্পের আন্তরিক মূল্যের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইরের চমকে বিভ্রান্ত হই বলে আধুনিক শিল্প বলতে অল্প সময়ে আঁকা চটকদার ছবি, যাদের স্মার্ট স্কেচেস বলা যায়, চড়া রং বিকৃত ড্রয়িং বা বৈশিষ্ট্য-হীন লোকশিল্পের অনুকরণ বুঝি। শিল্পের মূল্যবিচারে নানারকম অপ্রাসঙ্গিক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হই। ভারতের অন্যপ্রদেশী বিখ্যাত সমালোচকদের সম্বন্ধে এই কথা খুব বেশি সত্য। বাঙলাদেশের সমালোচকরা এ বিষয়ে অনেকটা আত্মস্থ এবং শিল্পের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে অনেক বেশি সক্ষম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিনোদবিহারীর চিত্রাবলীর সঙ্গে বাঙলাদেশের পরিচয়ও অত্যন্ত কম, কারণ তাঁর চিত্রের একটিও পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী বাঙলাদেশে আজও হয়নি। ফলে বিনোদবিহারীর মত প্রতিভাবান শিল্পী সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহ জাগল না। এই আক্ষেপের উত্তরে কোন এক শিল্প-সমালোচক বলেছেন, "একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, বিনোদবিহারী অন্যান্য আধুনিক দিগ্‌ভ্রান্ত শিল্পীদের মত অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন না বা বন্ধ্যা-যন্ত্রণা ভোগ করছেন না। তিনি সঠিক জানেন, তিনি কী করতে চান, কোনো "ইজ্‌ম্", "স্কুল" বা অঞ্চলের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ নন। একথা সুনিশ্চিত যে, একদিন না একদিন ভবিষ্যৎ-কালে, এদেশের কলারসিক ও শিল্পীদের পথপ্রদর্শকরূপে তিনি গৃহীত হবেন।" একথা সন্দেহাতীত সত্য।

উত্তরমুখী গঙ্গা। কলুষহরা। দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপচাপ বসে আছি। সন্ধ্যার ঝোঁকেও স্নানার্থীর ভিড়। পাপের বোঝা নামিয়ে সব ফিরে আসছে।

হঠাৎ সামনে ঠং করে শব্দ হতেই চমকে মুখ তুললাম। একটা আনি। যিনি দিয়েছেন, তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। দোষও নেই। আমার পরনে গৈরিক বাস, হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আমার চুলে জটা না হলেও জট রয়েছে।

আনিটা হাতে করে তুলে ফেরত দিলাম, ভুল করেছেন। আমি ভিখারি নই।

—তুমি? মহিলার গলার আওয়াজ কেঁপে কেঁপে উঠল।

মুখ তুললাম। দোকানঘর থেকে জোরালো আলোর ছটা ঘাটে এসে পড়েছে। চিনতে অসুবিধা হল না। অমিয়া।

মুহূর্তে নিজেকে কঠিন করে নিলাম। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ-সব মেয়ের আস্তানাই কাশী। যৌবন ফুরিয়ে গেলে।

মুখ ফিরিয়ে সরে বসলাম।

ততক্ষণে অমিয়া সিঁড়ির চাতালে পায়ের কাছে বসে পড়েছে।

—কি চিনতে পারনি? মুখ ঘুরিয়ে নিলে যে?

—পেরেছি বলেই তো নিলাম।

—কিন্তু এত লোকের এত অপরাধের ক্ষমা আছে, আর আমার নেই।

অমিয়া কাঁদছে। ভিজে গলার আওয়াজ।

কঠিন একটা উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেলাম। কত বয়স হয়েছে অমিয়ার। চল্লিশ নিশ্চয় ছাড়িয়েছে। কিন্তু এ বয়সেও একটু ঢিলে হয়নি বাঁধন। তেমনি পরন্ত শরীর। কটাক্ষভরা আয়ত চোখ, এখনও ঠোঁটের রং এত লাল!

কিছু বলতে পারলাম না। একদৃষ্টে অমিয়ার দিকে চেয়ে রইলাম।

—তুমি গেরুয়া নিয়েছ যে? সন্ন্যাসী হয়েছ বুঝি?

—যদি হয়েই থাকি, তোমার জন্য অন্তত নয়।

—উঃ, তুমি একটুও বদলাওনি। কথায় কথায় ঠিক তেমনি করেই আঘাত দাও মানুষকে।

আঘাত! সব ভুলে গেছে অমিয়া, না ইচ্ছা করেই মনে না আনার ছল করছে।

কে দিয়েছিল আঘাত! দু বছরের ছেলে, সাজানো সংসার, স্বামী সব ফেলে একটা উটকো গানের মাস্টারের হাত ধরে রাতের অন্ধকারে কে সরে গিয়েছিল। একটু ভেবেছিল অমিয়া, কত আঘাত পাবে স্বামী, কত আঘাত পাবে সমীর, আত্মীয়-স্বজন আঘাতে পাথর হয়ে যাবে।

উঠে পড়লাম। অমিয়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

—এখানে কোথায় আছ?

—গোধুলিয়ায়।

—একলা?

—না, সঙ্গে লোক আছে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়া বন্ধুবান্ধব। আর কিছু বলবে?

—বলতে তো অনেক কিছুই ইচ্ছা করছে। কিন্তু সোনার মানুষটা এমন পালাই পালাই করলে বলি কাকে?

চোখ ফেরালাম। সেই দুটি চোখ। মমতায় উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির ইশারা। বয়স ওকে বাঁধতে পারেনি, সংসারও যেমন পারেনি।

—কি বলবে বল?

—একটু বসবে।

চাতালে বসলাম, সামনে হাঁটু মুড়ে অমিয়াও বসল।

—তুমি আবার বিয়ে করেছ, না?

—হ্যাঁ।

—কতদিন?

—তুমি যাবার বছর দুয়েকের মধ্যে।

—ভালই করেছ। মেয়েছেলে না থাকলে কখন সংসার চলে। কিছুক্ষণ অমিয়া গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কি

বোধ হয় ভাবছে। ফেলে-আসা পুরোনো দিনগুলোর কথা।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, এ বৌ সমুকে ভালবাসে?

অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম অমিয়ার দিকে। সংসারের মায়া কাটিয়ে ওঠা মেয়ের এ কি বেদনাবোধ!

—কি উত্তর দিলে না?

—প্রশ্নটা অবান্তর। তা ছাড়া এ প্রশ্ন করার অধিকার তুমি হারিয়েছ।

অমিয়া মাথা নিচু করে রইল। মনে হল আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ দুটোও যেন একবার মুছে নিল।

খুব মৃদু গলায় বলল, কিন্তু দোষটা কি আমার একলার?

—কিসের দোষ?

—বাড়ি ছাড়ার।

অমিয়ার নির্লজ্জতার বহরে বিস্মিত হলাম। রূঢ় গলায় বললাম; সে দোষটা কি এতদিন পরে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও নাকি?

—না, তা চাই না। তা ছাড়া আজ আর দোষগুণের চুলচেরা হিসেব করেও লাভ নাই। কিন্তু ভেবে দেখতো? কতটুকু সঙ্গ তুমি আমায় দিয়েছিলে? বিয়ে করে একটা ছেলে কোলে ফেলে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছিলে।

—আর কি আমার করা উচিত ছিল? কাজকর্ম ফেলে দিনরাত ঘরে বসে বৌকে পাহারা দেওয়া।

অমিয়া হাসল। করুণ হাসির ছিটে। বলল, শুধু চোখ দিয়ে কি পাহারা দেওয়া চলে? মন দিয়েও দিতে হয়।

—তোমার হেঁয়ালি ঠিক বুঝতে পারছি না অমু।

আচমকা পুরোনো সুরে ডাকা নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম অমিয়া চমকে উঠল। এ বয়সেও শিহরণ লাগে! অমিয়ার বয়স কম নয়, আমি পঞ্চাশ পার হয়েছি গত বছর। যৌবন এখন শুধু বিগতমোহ ছাড়া আর কি!

পায়ে পায়ে মনটা আবার আগের দিনে ফিরে গেল। অস্পষ্ট ছবি, অনেক জায়গায় রং উঠে গিয়েছে। স্মৃতির তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে রঙীন করার চেষ্টা বৃথা।

বিয়ের রাত্রেই কথাটা কানে এসেছিল। কনের সঙ্গিনীদের মারফৎ।

একেবারে মানায়নি। মানায়নি যে সেটা আমিও বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে প্রশ্নও ওঠেনি। মানানসই বর আনবার জন্য যে কড়ির দরকার অমিয়ার ষাট টাকা মাইনে পাওয়া বাপের সে সম্বল ছিল না। মেয়ে সুন্দরী, তাই বোধ হয় মেয়ের বাপের আশা ছিল, হাওদা থেকে নেমে একদিন রাজপুত্রেই গজমোতির মালা গলায় দুলিয়ে মেয়েকে পাটরানী করে নেবে। অপেক্ষা করাই সার হল। হাতি দূরে থাক, ছ্যাকড়া গাড়ির সওয়ার হয়েও কেউ মেয়ে পছন্দ করতে এল না।

এদিকে মেয়ের বয়স ষোল। যৌবনের ভারে টলমল। দেখে মনে হয় অষ্টাদশী। মেয়ের দিকে চেয়ে পাড়ার ছোকরাদের দিল খুশী হয়ে উঠল, কিন্তু মেয়ের বাপের বুক শুকিয়ে গেল।

খোঁজাখুঁজি শুরু হল। রাজপুত্র, বণিকপুত্র নয়, বেনের আফিসে কাজ করে, দু বেলা দু মুঠো ভাতের যোগাড় করতে পারে, মাসের শেষে সংসার প্রতিপালনের জন্য পরের দরজায় হাত পাততে হয় না, এমন পাত্র পেলেই যথেষ্ট।

আমি ঠিক এমনি পাত্রই ছিলাম। তিনকুলে কেউ নেই। পরের বাড়ি টিউশনি করে নিজের পড়া শেষ করেছি। চাকরিও যোগাড় করেছি নিজের চেষ্টায়। হলারেন এণ্ড কোম্পানী। রংয়ের কারখানা। সারাটা দিন কাটে রঙবেরঙের রং নিয়ে। লাল, নীল, কমলা, হলদে, সবুজ। নিজের রংটা কিন্তু আবলুসই রয়ে গেল। এত রং ঘেঁটেও একটু ফিকে হল না।

মেয়ে অপছন্দ হবার নয়। আফিসের এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই পছন্দ করে এলাম। দাবীদাওয়া করার মতন পাত্র নই।

কাজেই এক শুভ লগ্নে চার হাত এক হয়ে গেল।

সেদিন বুঝিনি, কিছুদিন পরে খেয়াল হয়েছিল চার হাতই শুধু এক হয়েছিল, দু-মন এক হয়নি।

অমিয়ার সাধ আহ্লাদ অঢেল। আমার কিছুই তার পছন্দ নয়। বাড়ি ছোট, আয় কম, আমার জীবনের পরিধি ছোট, আমাকেও হয়তো ছোটই মনে হয়েছিল।

অবশ্য অমিয়ার মনের দিকে চাইবার ফুরসতও আমার কম ছিল। চাকরি ছাড়াও সকাল বিকাল দুটো কাজে লেগে গেলাম। সকালে বড়লোকের এক অপোগণ্ড তনয়কে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বেড়া টপকে দেওয়া, আর বিকেলে মাগনীরাম শিউপুরিয়ার দোকানে খাতা লেখা। তিল, তিসি আর অভ্রের সালতামামী।

বাড়তি রোজগার না হলে অমিয়ার বাড়তি শখ মেটাবার উপায় ছিল না।

বছর দুয়েকের মধ্যে সমীর এল। অনেক ভাগ্য যে মার রং আর মুখচোখের গড়ন নিয়ে জন্মাল, নয়তো ওর অদৃষ্টেও আমারই মতন লাঞ্ছনা জুটত। মনে হল একটু যেন ঠাণ্ডা হয়েছে অমিয়া। উড়ো উড়ো ভাবটা কেটে গেছে। পায়ের তলায় শ্যাওলা জমেছে।

এর কিছু দিন পরেই অফিস থেকে বাড়িতে পা দিয়ে চমকে উঠলাম। কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। ভাল করে কান পেতে শুনলাম। না, কান্না নয়, বেহালার সুর। কান্নার মতনই।

চৌকাঠে পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেঝেয় মাদুর পাতা। বেহালা কাঁধে নিয়ে একটি ভদ্রলোক একমনে ছড় টেনে যাচ্ছেন। দু গালে দুটো হাত রেখে অমিয়া তন্ময়।

কাশির শব্দ করতে দুজনের হুঁশ হল। এক গাল হেসে অমিয়া বলল, এস তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শুভেনবাবু। পদ্মদির বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। কি চমৎকার যে বেহালা বাজান, কি বলব! বস না, একটু শুনবে।

হাত জোড় করে শুভেনবাবুকে নমস্কার করলাম। তিনিও ছড় ছেড়ে নমস্কার ফেরৎ দিলেন। কিন্তু বসে বসে বেহালা শোনবার সময় নেই। হিসাবের খাতাটা নিতে এসেছি। সেটা নিয়ে এখুনি ছুটতে হবে শিউপুরিয়ার গদিতে। এখন বেহালা শুনতে বসলে এত কষ্টের চাকরিটা শিঙা ফুঁকবে।

সে কথা শুভেনবাবুকে বললাম।

খুব যে অখুশী হলেন মুখচোখের হাবভাবে এমন মনে হল না। তবু বিনয় করলেন, এই ফিরলেন অপিস থেকে আবার ছুটবেন আর এক জায়গায়?

লাগসৈ একটা উত্তর মনে এসেছিল কিন্তু বলে লাভ নেই। সুরের কারবারী এঁরা, তার আর কাঠের মধ্যে থেকে মূর্ছনা তোলেন, হিসেবনিকেশের কড়াপাক হজম হবে না।

শুভেনবাবু বোধ হয় প্রায়ই আসতে লাগলেন। শুভেনবাবু থেকে শুভেনদা।

কুসুমের মাস

শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়



্গ : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

শুধু বেহালা নয়, গানও জানেন। অমিয়ার সময় অসময় গুনগুনানির সুর শুনে মনে হল, শুভেনবাবু তাকে গানও শেখাচ্ছেন।

খাটের ওপর খাতা খুলে তিল তিসির হিসাব মেলাচ্ছি, অমিয়া কাছে এসে বসল।

কি বাপু দিনরাত বিরাট সব খাতাপত্র খুলে বস, ভাল লাগে না।

ভাল কি আর আমারই লাগে। কিন্তু উপায় কি। পরের কড়ি না মেলালে নিজের কড়ি যে মিলবে না।

—জানো, অমিয়া আরো ঘন হয়ে বসল, সামনের মাসে আমি জলসায় গাইব।

—তুমি? আশ্চর্য হবার ভান করলাম।

—হ্যাঁ গো আমি, অবাক হয়ে গেলে যে? শুভেনদা বলেছে গলা আমার খুব মিষ্টি, কাজও ভাল। একটা প্রাইজ আমি পাবোই। জলসায় নতুন আর্টিস্টদের একটা কম্পিটিশনও হচ্ছে।

অমিয়া আরো তরল করল গলার সুর। দু চোখের ভঙ্গিমা আরো চটুল। হেসে বলল, শুনবে গানটা? আস্তে আস্তে গাইব?

সর্বনাশ! এখন গান। এই তিল তিসির হিসাবের খাতা সামনে রেখে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলে, তিল তিসির বদলে মাগনীরাম শিউপূরিয়ার মালিক আমার তিল-তুলসীর বন্দোবস্ত করবে।

সে কথা অমিয়াকে বুঝিয়ে বলতে সে চটে উঠল। খাট থেকে উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

আর বোধহয় কোন দিন আমাকে গান শোনাতে আসেনি। জলসায় কি হল তাও বলেনি।

মাঝখানে একটু বিপদে পড়েছিলাম। সকালের টিউশানিটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। পর পর দু বছর ছাত্রটি ফেল করাতে ছাত্রের বাপ, রুখে দাঁড়ালেন আমার সামনে। প্রথমে পরীক্ষক আর পরীক্ষার ধারার বাপান্ত তারপর আমার অকর্মণ্যতার ফিরিস্তি। আস্তে আস্তে সুর এমন চড়ালেন যে আমার মেজাজ ঠিক রাখাই দায় হল। ঘুষোঘুষিটা এড়িয়ে কোন রকমে বাড়ি চলে এলাম।

অমিয়া ছাদে। কিছু দিন হল রান্না করার জন্য একটা মেয়েছেলেকে রেখেছিলাম। অমিয়ার সময় কম। খুব রেওয়াজ চলছে। শুভেনদা আশা দিয়েছেন মাস কয়েক এভাবে খাটলে গ্রামোফোনের রেকর্ড করা কে আটকায়। কোম্পানী বাড়ি বয়ে এসে চুক্তি করে যাবে। ছাদের ছোট ঘরে বোধ হয় রেওয়াজই চলছে। কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে অফিসে ছুটলাম।

মাস দুয়েকের অক্লান্ত চেষ্টায় টিউশানি জুটল না বটে, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে সুরাহা হল। খাবার মুখ কমে গেল একটা।

রাত দশটা অবধি অপেক্ষা করে চিন্তিত হয়ে উঠলাম। শরীরটা কদিন খারাপ। অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছি। মাগনীরাম শিউপূরিয়ার গদিতে টেলিফোন করে। এসেই দেখলাম অমিয়া নেই। রাঁধুনী বলল মাস্টারবাবুর সংগে বৌদি বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন কিছু বলে যাননি।

দশটা বাজার পর রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায় খোঁজ করব। কোথায় গেছে তাই যখন জানি না। আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসলাম।

একটু পরেই সমীর কেঁদে উঠল। রাঁধুনী রান্নাঘরে ঘুমাচ্ছে। উঠে সমীরকে সরিয়ে শোয়াতে গিয়েই চোখে পড়ল। সমীরেরই বালিশের নিচে।

প্রথমে মনে করেছিলাম অমিয়ার গানের স্বরলিপি। কাগজের টুকরো প্রায়ই এখানে ওখানে পড়ে থাকত। কিন্তু হাত দিয়ে তুলে দেখি এ লিপি তার চেয়েও মারাত্মক।

লাইন দুয়েক। শুভেনদার সংগে ঘর ছাড়ছে। সমীরের জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। তাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শুভেনদা রাজি নয়। শেষকালে আমাকে প্রণাম জানিয়েছে। কুলটাকে ভুলে যাবার মিনতি।

খাটের বাজুটা ধরে টাল সামলালাম। শরীরটা খুব কাঁপছে। ভূমিকম্পে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। ভূমিকম্প ছাড়া আর কি। সংসারের ভিত ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

সমীরের দিকে চেয়ে দেখলাম। অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এ দোলন তাকে স্পর্শ করেনি।

তারপরের অবস্থাটা খুবই মারাত্মক হয়েছিল। লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া। সকলের কাছে আবার এক কৈফিয়ৎ দেওয়াও চলে না। জুতসই কিছু একটা বলাও মুশকিল। বৌ বাপের বাড়ি তো কচি ছেলেটা বাড়িতে কেন? হাসপাতালে মারা গেছে! বললেই হল। জ্বর নয়, জ্বারি নয়, দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অমিয়া, সেই গানের মাস্টারের পাশাপাশি যেতেও দেখেছে কতলোক, অমনি কদিনের অসুখে খতম। পড়শিরা বিশ্বাস তো করবেই না, উল্টে সন্দেহ করবে আমাকে। বৌটাকে গুমখুন করেনি তো! পুরুষমানুষ সব পারে।

দু' গালে দুটো হাত রেখে অমিয়া তন্ময়

কাজেই এ সবের ধার দিয়েও গেলাম না। স্পষ্ট বললাম বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুপুরে বেরিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।

এই সময় ঈশ্বর বাঁচালেন। হলবোন কোম্পানীর নতুন আড়ত খোলা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের এক বিদঘুটে জায়গায়।

একজন জাত-কেরানীর দরকার, কিন্তু অমন জায়গায় কেউ যেতে রাজি নয়। সবাই পিছিয়ে গেল। শুধু আমি এগিয়ে গেলাম।

এ যেন শাপে বর। মুখ লুকাতে এমন এক নির্বান্ধব জায়গারই খোঁজ করছিলাম।

রাঁধুনী ছাড়ল না। সংগে রইল। সমুকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। মার চেয়ে মাসির আদর মাঝে মাঝে শুনেছি বেশী হয়, কিন্তু এ যে একেবারে অনাত্মীয়। কোন বাঁধনই থাকবার কথা নয়।

কিন্তু এ সব অনেক পুরোনো কথা। সময়ের পলিমাটি পড়ে পড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন।

এসব কথা, এতদিন পরে, মনে করার কোন মানে হয় না।

আবার ভাল করে অমিয়াকে দেখলাম। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সেই অবসরে।

সরু চুলের মতন আঁচড় কপালে, গালে। সময়ের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। গালের পাশে রুপো-চিকচিক দু একগাছা চুল।

হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার শুভেনদার খবর কি?

স্পষ্ট দেখলাম বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল মুখে চোখে। ছলনা কিনা ঈশ্বর জানেন। খুব আস্তে বলল, জানি না।

—জান না? সে কি? তোমারই তো জানবার কথা।

—একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম, কিন্তু ঘর বাঁধিনি। মাস তিনেক এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে আমার গায়ের গহনা শেষ হতে লোকটাও সরে পড়ল।

—তা হলে এত বছর তোমার চলেছে কি করে? ব্যঙ্গে গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, অবশ্য তোমার না চলার কথা নয়। বয়স ছিল, গানের গলা ছিল। কি বল?

—এক কথায় বল দেহের বেসাতি করার সব কিছু আমার ছিল, কিন্তু বিশ্বাস কর ও-পথে যাইনি। সারা পুরুষ জাতটার ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। এরা কেউ চায় মন বাদ দিয়ে দেহ, কেউ দেহকে উপোসী রেখে মনের দিকে হাত বাড়ায়।

হুলটা শব্দভেদী হলেও ত্বকে বিঁধল।

অমিয়া বলে চলল, তারপর তোমার খোঁজ করেছি। চিঠিপত্র দিয়েছি, লোক পাঠিয়েছি। তোমার কথা কেউ বলতে পারেনি। অনেক প্রলোভন সামনে এসেছে, অনেক হাতছানি, কিন্তু আর টলাতে পারেনি। তোমাদের শাস্ত্রে বলে না, ব্রহ্মকে চেনবার আগে যত লাফালাফি, আকুলি-বিকুলি, একবার ব্রহ্মের স্পর্শ পেলে আর মুখের বোল ফোটে না। তুলনাটা একটু উঁচু দরের হয়ে গেল, কিন্তু ব্যাপারটা তাই। পুরুষের স্বরূপ চিনেছি, কাজেই তাদের আকর্ষণটাও কমে গেল।

অমিয়ার কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না। জীবনের আর দু আনা বাকি। প্রথম যৌবনে কতটা পেয়েছি আর হারিয়েছি কতটা, আজ আর দাঁড়িপাল্লা ধরে তার ওজন করতে ভাল লাগছে না। দুনিয়ার অনেক দেখেছি। কিছুতেই যেন আর খুব আশ্চর্য হই না।

—যাকগে আমার পাপ কথা, অমিয়া গলার সুর পাল্টাল, তোমার কথা বল?

—কি কথা?

—বৌ তোমায় প্রাণে ধরে এভাবে সন্ন্যাসী সাজতে দিলে?

—আশ্চর্য, আমি হাসলাম, এত তত্ত্বকথা আওড়ালে আর এটা জানো না, যে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না। মনকে ছোপাতে হয় বৈরাগ্যের রংয়ে। তা ছাড়া বৌ নেই, কে আর বাধা দেবে।

—সে কি বৌ নেই?

—না, এবার অবশ্য পালায়নি, মরেছে। যাক, তুমি এতদিন কি করে চালিয়েছ তাতো বললে না।

অমিয়া উঠে দাঁড়াল। আধময়লা শাড়ির ওপর আরো ময়লা চাদরটা জড়াতে জড়াতে বলল, সময় হবে তোমার? এস, না। এই কাছেই থাকি। মিনিট দুয়েকের রাস্তা। দেখেই যাবে কি ভাবে চালিয়েছি।

অবশ্য কি ভাবে অমিয়া চালিয়েছে বা চালাচ্ছে একথা জেনে আমার কোন লাভ নেই। সাতপাকের বাঁধন নির্মমহাতে খুলে ফেলেছে। তার ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ এসবের ভার আর আমার ওপর নয়। কিন্তু মন এক অপূর্ব বস্তু। এত ভেবে চিন্তে, হিসেব করে তার গতি নিরূপিত হয় না। মাঝে মাঝে এমন কাজ করে বসে যার কৈফিয়ত দিতে নিজেকেই নাজেহাল হতে হয়।

অমিয়ার কথার উত্তর দিলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। তার পিছু পিছু চলতেও শুরু করলাম।

সত্যিই বেশী দূর নয়। বাঁ হাতি হলদে বাড়ি। সামনে সাইনবোর্ড। হিন্দীতে লেখা 'আদর্শ বিদ্যালয়'। তার পাশ দিয়ে সরু সড়কের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে অমিয়া পিছন ফিরে দেখল। বলল, দেখ, এখানে আবার একটা গর্ত আছে। খুব সাবধান।

সাবধানই যদি হব তা হলে আর এই বয়সে অমিয়ার পিছন পিছন এমন বন্ধ গলিতেই বা ঢুকতে যাব কেন। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরে যেতাম। তবু খেয়াল করে এগিয়ে গেলাম।

ছোট্ট ঘর। ঝুপসি অন্ধকার। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। এক কোণে একটা খাটিয়া। আধ ময়লা বিছানা পাতা। আর একদিকে বাঁশের ঝোলানো আয়না। কিছু শাড়ি, জামা ঝুলছে। এই অমিয়ার সংসার। সেদিনের সাজানো সংসারের পাশাপাশি আজকের অগোছাল গৃহস্থালীর চেহারাটা বিশ্রী লাগল।

মেঝের ওপর কতকগুলো বইখাতা স্লেট ছড়ানো।

—এ সব কার? সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

অমিয়া হাসল, আমার ছাত্রছাত্রীদের। আমি আদর্শ বিদ্যালয়ের মাস্টারনী যে।

অবশ্য খুব নিচু ক্লাসের। আমার বিয়েতো বছর তো জানো।

—বল কি, মুচকি হাসলাম, এসব জীবনের শেষ অধ্যায়ে মাস্টারনীগিরি এমন কথা কিন্তু কোন নভেলেও পাইনি।

—জীবনটা নভেল হলে এখানেও পেতে না। কিন্তু আমি বিশ বছর এই করছি। প্রথমে দেওঘরে। ওই লোকটা চলে যেতে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। তারপর তোমারও কোন খোঁজ পেলাম না, তখন সেখানকার স্কুলের বুড়ো সেক্রেটারীর পা জড়িয়ে ধরলাম। এ ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে জীবনে ঘৃণা এসেছে। কতবার মনে হয়েছে, পাপ যখন মুছবে না, তখন নিজেকে মুছে ফেলতে কিসের বাধা। কিন্তু এরা দেয়নি। কেউ না কেউ ঠিক কাপড় ধরেছে। বলেছে, মা, আম্মা। মনে হয়েছে সমু যেন আমার কাপড় টেনে ধরেছে। সে সংসার থেকে বেরোতে পেরেছিলাম, বোধ হয় আঁচল ধরবার মতন শক্ত মুঠি সমীরের ছিল না বলে, কিন্তু এদের সংসার থেকে বেরোতে পারছি না। এরা দেবে না বেরোতে। এক সমুর বাঁধন ছেড়ে এসে একশ সমুর বাঁধনে বাঁধা পড়েছি।

ঝর ঝর করে অমিয়ার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মায়াকান্না নয়, এ কান্নার মায়ায় পাষাণও গলে যায়।

চুপচাপ বসে রইলাম। এমন একটা অবস্থায় কিছু বলতে যাওয়াও বিপদ।

কিছুক্ষণ পরে অমিয়া সামলে নিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার আমার দিকে ফিরে বসল।

—একটা কথা বলব?

—বল।

—জাত বেজাত তো আগেও মানতে না। কত দিন তো হোটেলে খেয়ে এসেছ, বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে। আমার হাতের রান্না খাবে?

—কেন আবার মিছামিছি কষ্ট করবে। মুখে হতে গিয়েও পারলাম না। হাত পুড়িয়ে নিজেকে অবশ্য খেতে হবে না, কিন্তু ছোকরা রাঁধুনী যা যোগাড় হয়েছে, সব কিছু না পুড়িয়ে সে পাতেও দেবে না। তা ছাড়া ক্ষতিই বা কি! সত্যিই যখন হোটেলে খেতাম তখন সেখানকার পাচকদের কুলজীবিচার করার প্রশ্নই ওঠেনি, তাদের অতীত ইতিহাসের খোঁজ রাখা তো দূরের কথা।

দেখলাম বঁটি পেতে অমিয়া তরকারি কুটতে বসল। শাড়ির পাড়ের অনেকটা মেঝেয় ছড়ানো। দুহাতে দুটি মাত্র চুড়ি, তারই মিঠে শব্দ বাজছে। আঙুলের ক্ষিপ্র গতি। আলু আর পটলের খোসা জমছে একপাশে।

চোখের সামনে অনেকদিনের পুরনো এক ছবি ভেসে উঠল। অমিয়ার কল্যাণীরূপ। রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বসে কতদিন চোখ ভরে এ রূপ দেখেছি।

থালায় খানকতক লুচি নিয়ে অমিয়া আসনের সামনে রাখল। পাশে তরকারির বাটি। তারো আগে জল ছিটিয়ে ঠাঁই করল। শাড়ির পাড় দিয়ে তৈরী একটা আসন পেতে দিল। আহার্যের সম্ভার হয়তো প্রচুর নয়, কিন্তু যত্ন আর সেবায় সে ঘাটতিটুকু যেন অমিয়া পূরণ করতে চায়।

খেতে খেতেই কথা বললাম, তাহলে তোমার বন্দোবস্ত তো পাকা করেই ফেলেছ।

—কিসের বন্দোবস্ত?

—আদর্শ বিদ্যালয়ের মাস্টারনীগিরির।

—জোর করে কি কিছু বলা যায়। মানুষ যখন ঘর বাঁধে মনে করে দুর্যোগ কাটিয়ে সব ঠিক থাকবে, কিন্তু একটা দমকা হাওয়াতেই সে ঘর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

—কিন্তু দমকা হাওয়ার কি এত জোর হবে যে একশ সমুর বাঁধন কাটিয়ে উঠবে?

থালায় লুচি দিতে দিতে অমিয়া হাসল সেটা সমুর বাপের বলতে পারার কথা আমার নয়।

এই সময় বিপর্যয় ঘটল। অমিয়া আরো লুচি দিতে যাচ্ছিল, আমি হাত নেড়ে বারণ করতে গিয়েই হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। কে ভেবেছিল প্রৌঢ়ত্বের আবরণের তলায় যৌবনের এত দাহ লুকিয়েছিল রক্তের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল।

খুব আস্তে বললাম, হাতটা এঁটো হয়ে গেল, ধুয়ে এস।

—না, ধুলেই তোমার স্পর্শ মুছে যাবে শরীর থেকে। এটুকু থাক। অমিয়ার গলায় নবপরিণীতার লজ্জা আর সংকোচ আবার ভুল হল। নাকি মতিভ্রম। দেনাপাওনা হিসেবনিকেশ সব শেষ করে প্রায় তামাদি হয়ে যাওয়া দাবির ওপর একি অন্যায় লোভ।

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, সংসার পাতবার ইচ্ছা হয় না তোমার?

অদ্ভুত প্রশ্ন। জীবনের বার আনা কাটিয়ে আসা মানুষকে বিষয়-বিষ পান করাবার মোহ। যাযাবর মনকে তাঁবু খাটাবার নির্দেশ।

অমিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। আঁচলটা দু হাতে চেপে ধরে বলল, হয় গো, হয়। সংসার আর পাতার সময় পেলাম কোথায়। নিজের হাতে ঘরের মটকায় আগুন ধরিয়ে পথে বের হলাম। একপাল ছেলেদের নিয়ে কেবল ছেলেখেলা করছি। তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?

ভরপেট খাওয়ার পরে পরিতৃপ্তির ঢেকুর উঠল। সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করছে। মানুষের ভুল ত্রুটি সব মনে হচ্ছে নগণ্য।

বললাম, চল। এ বয়সে আবার নতুন করে সংসার পাতি। দেহের মোহ তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারই বিভূতিটুকু নিয়ে সংসারী সাজি। লোকলজ্জা মান-অপমানের ভয়ও এ বয়সে কাটিয়ে উঠেছি, তা ছাড়া নতুন পরিবেশে তোমার পুরোনো কথা কেউ জানেও না।

—তা না হয় জানে না, কিন্তু আচমকা কাশী থেকে উটকো মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে যাবার কি কৈফিয়ৎ দেবে?

—রাতারাতি মেয়েছেলে ঘর থেকে উধাও হয়ে যাবার সময় যা বলেছিলাম, সেই কথাই বলব। পালিয়ে যাওয়া বৌ আবার ফিরে এসেছে। তা ছাড়া তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই, এ কৈফিয়তের হয়তো দরকারও হবে না।

এতক্ষণ পরে গলায় আঁচল দিয়ে অমিয়া প্রণাম করল। হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে বলল, তুমি মানুষ নও গো, দেবতা।

মনে মনে হাসলাম। দেবতারই ঘর বাঁধবার শখ থাকে বটে।

খাটিয়ার ওপর বসতে দিয়ে অমিয়া বেরিয়ে গেল।

অমিয়ার দেওয়া মসলা চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করলাম, এত রাতে চললে কোথায়?

যেতে যেতে অমিয়া ফিরে চাইল, সেক্রেটারীকে বলাই আছে, স্বামী নিরুদ্দেশ। যেদিন তাঁর দেখা পাব, সেদিনই ছেড়ে দেবো স্কুলের চাকরি।

সেক্রেটারী বোধ হয় খুব কাছেই থাকেন। অমিয়া আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল।

বেশ একটু তন্দ্রা এসেছিল। অমিয়ার বালিশে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছিলাম, পায়ের আওয়াজে চোখ খুললাম।

শুধু সেক্রেটারীর অনুমতি নয়, ফেরার পথে অমিয়া টুকিটাকি কি সব জিনিসও কিনে এনেছে।

কাপড়ের পোঁটলা খুলেই অমিয়া লজ্জায় পড়ে গেল। আমিও হেসে উঠলাম। কতক-গুলো কাঠের খেলনা অমিয়া কিনে এনেছে।

হাসতে হাসতে বললাম, তোমার কি ধারণা তুমি চলে আসবার পর থেকে সংসারের কেউ আর বাড়ে নি? সমীরের বয়স এখন বাইশ তেইশ। সামনের বছর তার বিয়ে দেব।

হাত দিয়ে খেলনাগুলো অমিয়া সরিয়ে রাখতে, আবার বললাম, সরালে কেন, নিয়ে চল। সমুর ছেলেমেয়েদের না হয় দেবে। দু তিন বছরে এ খেলনা নষ্ট হবে না।

আরো ঘণ্টাখানেক লাগল অমিয়ার সংসার তুলতে। ঠিক হল আজ কোন হোটেলে গিয়ে উঠে, কাল ভোরেই কাশী ছাড়ব।

বাসনের ঝোলাটা আমি হাতে করলাম, অমিয়া নিল কাপড়ের হালকা পোঁটলা। ঘরদোর ভাল করে দেখে দরজায় চাবি দিতে দিতে অমিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাথা নিচু করে পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল,—একটা কথা।

—বল।

—সমুকে আমার পরিচয় দিয়ে দরকার নেই।

—তোমার পরিচয় আমাকে দিতেও হবে না। বাড়িতে তোমার ফটো আছে। পুরোনো দিনের ফটো, কিন্তু তার পরে তুমি তো খুব বেশী বদলাও নি। তোমাকে দেখলেই সে বুঝতে পারবে।

—তা হলে?

—কি তাহলে?

—সমু কি ভাববে?

—নতুন আর কি ভাববে। সবাই জানবে পালিয়ে যাওয়া বৌ ফিরে এসেছে, সেও তাই জানবে। তোমার চলে যাওয়ার কোন কথা কারো কাছে যেমন লুকোই নি, তেমনি তার কাছেও নয়।

অমিয়া বন্ধতালা আবার খুলল। একটা হাত দরজার পাল্লার ওপর রেখে বলল, সব বলেছ সমুকে? আমার কথা, শুভেন-বাবুর কথা, সব?

এই প্রথম অমিয়া শুভেনবাবুর নাম উচ্চারণ করল। বললাম তাতে আর কি হয়েছে? সবাই যখন—

—না, না, অমিয়া তীব্রবেগে ঘাড় নাড়ল, পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে, আত্মীয়দের কাছে, তোমার কাছে মাথা হেঁট করে ফিরে যেতে আমার আপত্তি নেই, দ্বিধা নেই, কিন্তু নিজের ছেলের কাছে ওই পরিচয় নিয়ে ফিরে যেতে পারি কখন? তার শ্রদ্ধা আর ভক্তিই যদি হারালাম, তবে এ বয়সে শুধু স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে আমার লাভ।

আমায় কিছু বলবার অবসর না দিয়েই অমিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজায় ধাক্কা দিলাম, অনেকবার ডাকলাম অমিয়ার নাম ধরে, অনুনয়, মিনতি করলাম, কিন্তু দরজা খুলল না। নিজের কান্নার শব্দে হয়ত আমার কোন কথা অমিয়ার কানেও গেল না।

# বাঙলা মঞ্চের অভিনয় ধারা
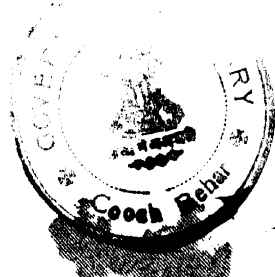
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

বাঙলার নাট্য সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করতে প্রথমেই যা দৃষ্টিতে পড়ে তা হচ্ছে, সংস্কৃত নাট্য ধারা অর্থাৎ ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে যে নাট্যধারা এদেশে প্রচলিত তার সঙ্গে বাঙলার নাট্যধারার তেমন যেন সংযোগ নেই। বাঙালী জাতির ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দেয় যে, বাঙলার যে সংস্কৃতি তার ওপর দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় প্রভাব যতোটা পড়েছে সে তুলনায় আর্য-প্রভাব যথেষ্ট কম। সংস্কৃত নাটকের ভারতে যখন প্রাদুর্ভাব ছিল তখনকার আর্য-সংস্কৃতিবিহীন সমসাময়িক বাঙলায় সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের সুযোগ ছিল না। কিন্তু তৎকালেও বাঙলায় নাট্যাভিনয়ের একটা নিজস্ব ধারা ছিল। নাট্যাভিনয়ে বাঙলার একটা নিজস্ব রীতি ছিল। বাঙলায় নাট্য-শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী অভিনয় প্রচলিত হয়নি, তার কারণ আর্য সংস্কৃতি এ অঞ্চলে এসে পৌঁছতে দেরী হয়।

বাঙলার নিজস্ব যে ধারা তার লক্ষণগুলি পাওয়া যায় গাজনের মধ্যে। গাজনতলা প্রদক্ষিণকালে মুখোশ পরে নৃত্যগীতাদি থেকেই বাঙলার অভিনয় ধারা পথ করে নেয়। গাজনের অংগ হিসেবে ছিল মিছিল করে যাত্রা এবং তার থেকেই এক সময়ে যাত্রার উদ্ভব। বাঙলার সংস্কৃতির ওপরে দ্রাবিড় প্রভাব যে কতোটা ছিল এই 'যাত্রা' কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসুর মতে 'যাত্রা' কথাটি এসেছে দ্রাবিড় ভাষা থেকে। নবম-দশম শতকে বাঙলায় বুদ্ধযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে মিছিল করে যাত্রা গেয়ে চলা নানাকারণে অসম্ভব হয়ে ওঠায় নাট-মন্দিরে চতুর্দিকে দর্শক পরি-বেষ্টিত হয়ে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়। সেই থেকেই বর্তমান যাত্রা। গোড়ার আমলে দেবতার মহিমাজ্ঞাপক পালা গান হত, ক্রমে ছড়া, পয়ার ইত্যাদির যোগ হয়। তখন দুরকমের যাত্রা চলতে থাকে—একদল মিছিলে যাত্রা গাওয়া নিয়ে রইল, আর একদল আসর সাজিয়ে নাটমন্দিরে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট দর্শকদের মাঝে গান, ছড়া, পয়ার ইত্যাদির সহযোগে পালা গানের প্রবর্তন করল। যাত্রায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রীতিতে অংক বিভাগ নিয়ে আসেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তিনি রূপসজ্জারও প্রবর্তন করেন।

প্রথম বাঙলা সামাজিক নাটকের রচয়িতা
রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে যাত্রায় ভাবাভিনয়ের রীতিটা এল। পালাগানের সময় তিনি নিজে ত তন্ময় হয়ে থাকতেনই, তাঁর পার্ষদরাও ভাবাভিভূত হয়ে পড়ত। আগে ছিল গান, কথা ও ছড়া। মহাপ্রভুর রীতিতে এল ভক্তি ও ভাবের সমন্বয়। ভাবকে রূপায়িত করে অভিনয়ের তিনি প্রবর্তন করলেন। এই থেকেই দেখা যায় বাঙলার আদি যাত্রা কিভাবে বিবর্তিত হয়ে যায়। এল ভাবের অভিনয়—রস, ভাব এবং বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা অভিনয় রীতি। এরই মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু অলংকার শাস্ত্র বর্ণিত অভিনয়রীতি পার্ষদদের শিক্ষা দেন।

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙলা যাত্রার ওপর এমনই ছিল যে যাত্রা হলেই প্রারম্ভেই তাঁরই স্মরণে হতো 'গৌর-চন্দ্রিকা'। যাত্রার ওপর শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রভাবের কথা আমরা ভুলে যাই। দু-তিন পুরুষ যাবং একদল শ্রীচৈতন্যের আদর্শ অনুসরণ করে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা অভিনয় চালিয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর লোক অভিনয়কে সস্তা করে ফেলে। তারা সঙ সেজে রঙতামাশা নিয়ে হাট বাজারে 'কালীয়দমন' জাতীয় পালা অভিনয় করতে থাকে। প্রকৃত যাত্রা অভিনীত হতো মন্দিরের চত্বরে, কিন্তু কালে ঐ সস্তা ধরনের অভিনয়ই বেড়ে গেল। যাত্রা এমনিই হয়ে দাঁড়াল যে ভাব ও রসের অভিনয় জমাতে না পারার আশংকায় সঙ ছেড়ে দিত—সঙের ভাঁড়ামির প্রতি দর্শক আকৃষ্ট হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলার রাজনীতিক পরিস্থিতি যাত্রার আরও অবনতি ঘটায়। মারাঠাদের আক্রমণে তখন পল্লীর উৎসবাদি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ইংরাজের সংগে নবাব আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার বিবাদ, পলাশীর যুদ্ধ, অরাজকতা ইত্যাদি। সেটা ছারখারের যুগ হয়ে দাঁড়ায়। ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হতে নিরাপত্তা ফিরে আসায় যাত্রাদি পুনঃপ্রচলিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু যাত্রার দল ওঠে এবং অনেকে ভাল অভিনয় দেখিয়ে নামও করে। এদের মধ্যে পরমানন্দ, লোচনরাম প্রভৃতি বিখ্যাত অধিকারিদের অভিনয় বেশ ভাল হত। ভাল দলের যাত্রা পুরোদমে চলার কালেও সহজে দর্শক আকর্ষণ করার জন্য সস্তা দলও নানা স্থলে, বিশেষ করে বারোয়ারিতে অভিনয় করত। সেসব যাত্রায় সুরুচির অভাব হত। যাত্রার পুনরুজ্জীবনের সময়েই ১৭৯৫ সনে লেবেডেফ তার থিয়েটার মারফৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাব নিয়ে আসেন। এর পরবর্তী কিছু-

কালের এমন কোন দলিল পাওয়া যায় না যা থেকে কিছু জানা যায়। তখনকার ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহ এদেশীয় যাত্রাদি ব্যাপারে কৌতূহলী ছিল না কাজেই কোন বিবরণও ছাপতো না। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ হবার পর সে সময়ে যেসব অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা থেকে বোঝা যায় লেবেডেফের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়নি, তার প্রভাব এদেশের অভিনয়ে এসেছিল এমনকি যাত্রাতেও যথা ইংরাজী নাটকের অনুসরণে অঙ্ক বিভাগ, গর্ভাঙ্ক বিভাগ এবং প্রবেশ ও প্রস্থান ইত্যাদি রীতি যাত্রার পালায় গৃহীত হয়। ১৮২২-২৩ সনে নবীনযাত্রার প্রবর্তন হয়।

ইংরাজী অভিনয়ের প্রভাব অন্যদিক থেকেও আসে। ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজী শিক্ষার্থী ছাত্ররা সেক্সপীয়র পড়ত, চৌরংগী থিয়েটারে সেক্সপীয়রের নাটক দেখত এবং ইংরাজ অধ্যাপকদের কাছে ছোট ছোট দৃশ্য অভিনয় করতে শিখত। এই প্রভাবে বাঙলার শিক্ষিত মহলে যাত্রা নিন্দিত হতে আরম্ভ হয়। তখনকার যাত্রার কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ সংলাপাদি ওঁদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। যাত্রার পতন হল।

ছাত্ররা অভিনয় করত ইংরেজীতে পারিতোষিক বিতরণ জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে। এসময়ে ১৮৩১ সনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর শুঁড়োর বাগানবাড়িতে হিন্দু থিয়েটার স্থাপিত করার পর সেখানেও ইংরাজীতে অভিনয় হতে থাকে। ডাঃ এইচ এইচ উইলসন অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

ইংরাজীতে তর্জমা করেন। অভিনয়ও তিনিই শেখাতেন। ১৮৩৩ সনে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে (বর্তমান ট্রাম ডিপো) তাঁর থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত হয় এবং সে অভিনয়ে ইংরাজী প্রভাব ছিল না, অনেকটা এদেশীয় ধারাই রক্ষিত হয়। সে থিয়েটার বন্ধ হতে ইংরাজীতে অভিনয় অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বেলগাছিয়া থিয়েটারেও তাই ছিল।

১৮৪৯ সনে যাত্রার নানান রূপ ও আঙ্গিক বদলে ধনী লোকের দ্বারা সংগঠিত শখের যাত্রা শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দামী দামী পোশাক, গহনা এবং ভাল ভাল গানযুক্ত অভিনয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আবার আকৃষ্ট করে। সে সময়কার "নন্দবিদায়" ইত্যাদি পালার কথা শোনা যায়। যাত্রা তখন দেশীয় সংস্কৃতিতে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। "নন্দবিদায়"ও অভিনেত্রী নিয়েই অভিনীত হয়।

এর পর দেখা যায় রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুল সর্বস্ব" নাটক। সংস্কৃত প্রভাবিত রচনা, অভিনয়ও ইংরাজী প্রভাবিত ছিল না, ভাবরসাশ্রিতও ছিল না। যদি নতুনত্বের জন্য সুখ্যাতি লাভ করে, তাহলেও নাটক হিসেবে যেমন দুর্বল তেমনি অভিনয়ও উৎকর্ষলাভ করতে পারেনি। তার চেয়ে ঐ সময়েই সংস্কৃত থেকে তর্জমা হলেও ছাতুবাবুর বাড়িতে (বেংগল থিয়েটার, সিমলা, বর্তমান বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিস) তার দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে "শকুন্তলা" অভিনয় করেন। এদের শিক্ষক ছিলেন তৎকালে প্রথিতযশা অভিনেতা ও নাট্যাচার্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারীলাল ইংরাজী শিক্ষিত এবং ইংরাজীভাবাপন্ন ছিলেন। এ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের "বেণী সংহার" অভিনীত হয় তবে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা অভিনয় হয়। ১৮৫৮ সনে বেলগাছিয়া থিয়েটারে "রত্নাবলী" অভিনীত হয়। এ নাটকের শিক্ষক ছিলেন তৎকালে বাঙলার
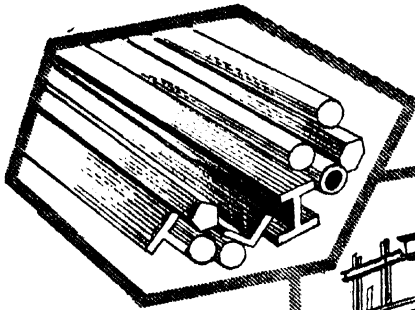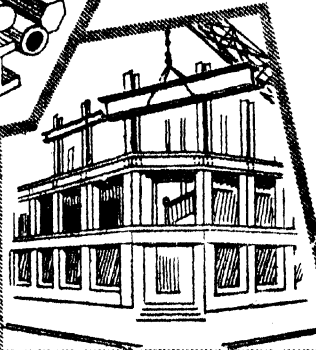
"গ্যারিক" নামে প্রখ্যাত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পরে যেসব অভিনয় হয়, মাইকেলের "শর্মিষ্ঠা" ইত্যাদি, সেসবের সঙ্গে ইংরাজদের সাক্ষাৎ যোগ না থাকলেও ওদেরই ধারাতে অভিনীত হত। পরিবর্তন এল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক অভিনীত হওয়া থেকে। ১৮৬৯ সালে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার "সধবার একাদশী" প্রথম মঞ্চস্থ করে। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু মুস্তফী প্রভৃতি এতে অভিনয় করেন। তখন বাঙলা দেশ যে অভিনয় দেখায় অভ্যস্ত ছিল তার চাইতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিনয় হল। তখনকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছিল এবং শহরসুদ্ধ লোক তার ভূরিভূরি প্রশংসা করে। নবপ্রচেষ্টা অভিনন্দিত হল। এদের না ছিল অর্থের সম্বল, আর না ছিল আড়ম্বর দেখাবার সামর্থ্য। এদের অর্থ সঙ্গতি ছিল না বলে এমন নাটক খুঁজতেন যাতে খরচ খুব সামান্য হয়; নিজেরাই দৃশ্যপট এঁকে নিতে পারেন। "সধবার একাদশী" এরা নির্বাচিত করলেন এই দেখে যে এতে সাধারণ সাজপোশাক ছাড়া দু-একটা পট পটুয়াকে দিয়ে আঁকিয়ে নিলেই কাজ হয়ে যায়। লোকে তাহলে কি দেখে সুখ্যাতি করলে? লোক তখন আড়ম্বর দেখায় অভ্যস্ত, 'লাইমলাইট'এর ব্যবহার হতো তখন—এদের তা ছিল না। তখন নাটকের উপস্থাপন ব্যবস্থায় চারিদিকে আড়ম্বর থাকত—দৃশ্যপট, পোশাক, আলোকসম্পাত, তাছাড়া বেলগাছিয়া থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর প্রবর্তিত দেশীয় যন্ত্রের সাহায্যে কনসার্ট—এসব আড়ম্বরের কিছুই ছিল না "সধবার একাদশী"তে। তাহলে কি দেখে মোহিত হল লোকে? এই প্রসঙ্গে বাঙলায় ইংরাজী অভিনয়ের কি ধরনের প্রভাব এসেছিল সেটার আলোচনা হওয়া দরকার।

**বাঙলা নাট্যালয়ের যুগস্রষ্টা গিরিশচন্দ্র ঘোষ**

ইংরাজী অভিনয় যারা করত তাদের পিছনে ছিল কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকবৃন্দের অভিনয়ে শিক্ষকতা। তখনকার দিনের কজন ইংরাজ অভিনেতা ও অভিনেত্রীও শিক্ষা দিতেন। ইংরাজ অধ্যাপকরা সেক্সপীয়র পড়াতে লক্ষ্য রাখতেন ছাত্ররা যাতে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে, সেক্সপীয়রের কবিতার ছন্দ বজায় রেখে পড়তে পারে। এটা তাদের শিক্ষারই বিষয়ীভূত ছিল। অভিনয়ের অঙ্গ সঞ্চালন, অভিব্যক্তি ইত্যাদি তৎকালীন ইংলণ্ডে যে রীতিতে সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর অভিনয় হতো কলকাতার ইংরাজ অধ্যাপকরা তারই অনুসরণ করে ছাত্রদের শেখাতেন। একথা ভুললে চলবে না যে, যে-অভিনয় পদ্ধতি সেক্সপীয়রের নিজের আমলে ছিল তা থেকে অষ্টাদশ শতকের অভিনয় রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। এটা কিভাবে কি রূপ ধারণ করেছিল ভাবতে গেলে এলিজাবেথীয় রংগমঞ্চের কথা ভাবতে হবে।

সেক্সপীয়রের আগের যুগে থিয়েটার হত সরাইখানার উঠোনে। সেক্সপীয়রের যুগে সরাইখানাতে অভিনয় না হলেও প্রেক্ষালয় ছিল সরাইখানার উঠানেরই মত। রংগমঞ্চ ছিল যার একটি 'এপ্রনস্টেজ' (Apron বা Forestage) থাকত, আর ভিতর দিকে মঞ্চতে থাকত দুপাশে থাম সেখানে রাজ-রাজড়া বা বিশিষ্ট চরিত্রদের অভিনয় হত। অভিনেতাদের অভিনয়ের মধ্যে দীর্ঘ স্বগোতোক্তি করতে হতো। সেগুলি

বাঙলা মঞ্চের 'গ্যারিক' নামে প্রখ্যাত নাট্যাচার্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অভিনেতারা দর্শকদের উদ্দেশ করে আবৃত্তি করতো অনেকটা চরিত্র থেকে step out করে। দর্শক বসত তিন দিকে। সে যুগের অভিনয়ের বৃত্তান্ত বা তার আগের যুগের অভিনীত নাটকের ইতিহাস থেকে জানা যায় তখন দৃশ্যপট ছিল না। অভিনয় হত দিনের বেলায় সূর্যের আলো সামনে রেখে। দৃশ্য-পটের অভাব পূরণ করা হত মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে। যার অনুকরণে

এদেশের যাত্রার 'মিলিটারি', 'হাফ মিলিটারি', 'রয়াল' ইত্যাদি পোশাকের প্রচলন হয়। তিনদিকে উপবিষ্ট দর্শকদের উদ্দেশ করে বলতে হত বলে অভিনেতারা বক্তা বা বাগ্মীর ভঙ্গি অনুসরণ করত। নিজেদের দাঁড়ান, চলা, বসা হত বেশ একটা সুঠাম প্রস্তর মূর্তির মত। ঘুরে ঘুরে বেড়াতো যার প্রতিটি ভঙ্গিতে একটা সৌষ্ঠব বা সামঞ্জস্য থাকত। তাদের উচ্চারণ বা বাক-কৌশল হত বাগ্মীদের মত বিশেষ করে তাদের স্বগতোক্তিগুলো মঞ্চ অভিনয়ের চেয়ে যেন পার্লামেণ্ট বা জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার মত শোনাত।

ইতিহাসে পাওয়া যায় গ্রীকরা খুব ভাল বাগ্মী ছিল। কি ভঙ্গিতে তারা বক্তৃতা দিত সেটা শিখতে হত; সেই শিক্ষালয়কে বলা হত স্কুল অফ 'রেটরিকস্' (School of Rhetorics)। বহু খ্যাতনামা ভাস্কর বড়ো বড়ো বাগ্মীদের বক্তৃতার ভঙ্গি মার্বেলে কুঁদে রেখে গিয়েছেন। শুধু গ্রীসে নয়, রোমেও সীজর, সেনেটার প্রভৃতিরা যে বক্তৃতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তা আজ ইতালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকাতেই শুধু নয়—ভারতেও এমন বহু মার্বেল এসেছে। রাজভবনে তার কিছু নিদর্শন এখনও আছে; দেশীয় অনেক রাজাদেরও গৃহে ছিল। কলকাতার মার্বেল প্যালেসে এখনও আছে। বহু বাগানবাড়িতে নগ্ন নারীমূর্তি ছাড়াও যোধা ও সেনেটারদের মূর্তি থাকত। গ্রীসের এই বাগ্মিতা বৃত্তি ও শিক্ষা ব্যবস্থা রোমেও সংক্রামিত হয় এবং পরে রেনেসাঁ যুগে তার একটা লিপিবদ্ধ নিয়মপুস্তক রচিত হয় যাতে ঐসব ভঙ্গি ও হাতের মুদ্রা মুদ্রিত ছিল। গ্রন্থখানির নাম ক্যায়রোনোমিয়া এণ্ড ক্যায়রোলজিয়া

এই লাটিন গ্রন্থখানি ১৬৬৪ সনে জন বুলওয়ার্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, বিশেষ করে পার্লামেণ্টের সভাদের বক্তৃতা দেওয়া শেখাবার জন্যেই। তার তর্জমার যোশেফ "Elizabethian Acting"এর ভূমিকায় লিখেছেন:—

Superficially, the works which I am using do not even appear to be concerned with the stage; they describe the art of rhetorical delivery, as it was taught to the school boys, and practised by the lawyers, divines, and public speakers of Renaissance England.

১৬৬৪ সালে প্রকাশিত Short History of English Stage-এ Richard Eleckno লিখেছেন That Shakespeare action, Richard Bardage (যিনি Original Hamlet ছিলেন) had all the parts of an excellent orator।

সে রীতি ক্রমে ক্রমে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারাও অভ্যাস করেন। সেই গ্রন্থের কতকগুলি ছবি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত বি এল যোশেফ রচিত 'Elizabethean Acting' গ্রন্থে দেখা যায়। এই রকম অভিনয় পদ্ধতিতে বীররস, রৌদ্ররস এমনকি বীভৎস ও অদ্ভুত রস ইত্যাদি ভাবের অভিনয় সম্ভব হত। আদিরসেরও অভিনয় সম্ভব ছিল কিন্তু তৎকালে কমেডি বা হাস্যরসের বই ছাড়া সাধারণভাবে আদি রস পরিবেশিত হত না। তবে ট্রাজেডীর মধ্যে 'রোমিও জুলিয়েট''এর ন্যায় নাটক অভিনীত হয়েছে,
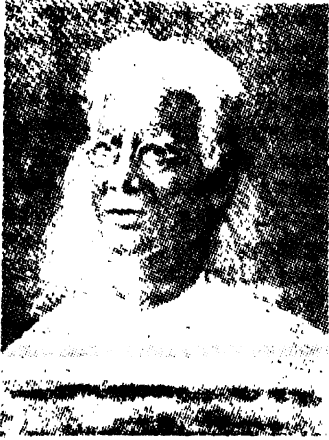
অমৃতলাল বসু

তার ভিতরে আদিরস থাকলেও প্রতিহিংসা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির খেলাও কম নয়। সংস্কৃতের মত নিছক আদি রসাত্মক নাটক হত না। ইংরাজী অভিনয়ে ঐ ধারা চলে আসে মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগ পর্যন্ত। সার হেনরি আর্ভিংয়ের সময় থেকেই সেক্সপীয়রের অভিনয় গতানুগতিক পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা হয় কিন্তু তখন 'এপ্রনস্টেজ' প্রায় উঠেই গেছে; ছিল 'ফোরস্টেজ' যা প্রায় পিকচার ফ্রেম (Picture frame) থিয়েটারের মত। আরভিং বাচনভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করলেও সেই পরিবর্তনশীল গতিটা সার জন মার্টিন হার্ভে (১৯৩৯) পর্যন্ত চলে আসে। আর্ভিংয়ের পরবর্তীকালে সকল অভিনেতাই চেষ্টা করতেন অভিনয় রীতির পরিবর্তন সাধনে, কিন্তু তবুও তাদের মূলটা একই থেকে যায়। আর্ভিংয়ের পর সার হার্বার্ট ট্রি, সার জনস্টন ফরবেশ রবার্টসন, সার জন মার্টিন হার্ভে প্রভৃতি এরা আর্ভিংয়ের মূলনীতি রেখে বাচনভঙ্গী ও অভিনয় ধারার কিছু কিছু পরিবর্তন আনেন। যেমন সেক্সপীয়রের যুগে রিচার্ড বার্বেজ, তারপর পুনরুজ্জীবনের (Restoration) যুগে বেটার টম, সিবার, গ্যারিক, কেম্বল, এডমান্ড কিং ম্যাকরেডি, এরা সকলেই যুগস্রষ্টা অভিনেতা; এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধারা

প্রবর্তনও করেন। কিন্তু মূলে 'Rhetoric style' কেউ পরিবর্তন করতে পারেননি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশেও (১৮৬৯ সনে গিরিশ যুগ আরম্ভ হবার পর মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) প্রভৃতি সকলেই নাট্যরথী ছিলেন। এদেরও প্রত্যেকেরই অভিনয়রীতি স্বতন্ত্র ছিল। অমৃতলাল মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসু দুজনেই বড়ো অভিনেতা ছিলেন; কিন্তু অমৃতলালের কণ্ঠে সুর ছিল, মিষ্টতা ছিল। তবে মহেন্দ্র বসুর কণ্ঠ সুরবর্জিত হলেও গুরুগম্ভীর ছিল। দানীবাবুর বাচন অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু কণ্ঠ ছিল গুরুগম্ভীর এবং আঙ্গিক অভিনয়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯১২ সনে কিন্তু তারপরও বড় বড় অভিনেতা অভিনয় করেন, যথা তারকনাথ পালিত, প্রিয়নাথ ঘোষ, মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কিন্তু তাদের আবৃত্তির ধারা চলে ১৯২২ সন পর্যন্ত। তেমনি ইংলন্ডেও স্যার জন গিলগাড, স্যর লরেন্স অলিভিয়ার অন্যদিকে নানা পরিবর্তন সাধন করেন, বাচনভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে ফেলেন। দেখা যায় যে, ইংলন্ডের মধ্য ভিক্টোরিয় যুগের রীতির প্রতিচ্ছবি আমাদের দেশের অভিনয়ের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল।

এদেশের দর্শকরা এতদিন জাকজমক এবং ইংরাজী বা 'stylish' ভাবভঙ্গির অভিনয় দেখে চমকিত হত, সব সময়ে যে বুঝতে পারত তা মনে হয় না, কারণ সেক্সপীয়র

দীনবন্ধু মিত্র

যুগের অভিনয়ে নানা হস্তমুদ্রা প্রদর্শিত হত যা অনেকটা আমাদের দেশের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণের সংযুক্ত ও অসংযুক্ত হস্তমুদ্রার অনুরূপ। কিন্তু অভিনয় দেখে উৎসাহে মেতে উঠলেন সেইদিন কলকাতার শহরবাসী যেদিন তৎকালীন নবাবাংলার নবীন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সপার্ষদ বন্ধুবর্গ "সধবার একাদশী" অভিনয় করলেন। সেই দিনটি সম্পর্কে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মিথ্যা লেখেন নিঃ

"মদমত্ত পদতলে নিমে দত্ত* রঙ্গস্থলে
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নাটগুরু তার।"

সাধারণ মধ্যবিত্তঘরের যুববৃন্দ দ্বারা সেদিন যে অভিনয় হয়েছিল তাতে বহিরঙ্গ খুব চিত্তাকর্ষক ছিল না, কিন্তু অন্তরঙ্গ ছিল ভরাট। প্রাণস্পর্শী এবং ভাবালু বাঙালীর চিত্তজয়ী। কারণ, এ অভিনয় ছিল রসের অভিনয়, ভাবের অভিনয়। একদিন মহাপ্রভু যে অলৌকিক ভাবাভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন লোকে কালে তা ভুলে গিয়েছিল—সেদিন সেই রসঘন ভাবের অভিনয় আবার মূর্ত হয়ে উঠল।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে এই রসঘন অভিনয় ঐসব সাধারণ অর্ধশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত অভিনেতারা আয়ত্ত করলেন কি করে। যারা "সধবার একাদশী"তে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু মুস্তফী, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) এই ক'জনকে নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, গিরিশচন্দ্র সাক্ষাৎভাবে মঞ্চে অভিনয় করার আগে পর্যন্ত ইংরাজী, বাঙলা অভিনয়, যাত্রা কথকতা প্রভৃতি নিগূঢ় ভাবে অধ্যয়ন করেছেন। সে সময়কার প্রবীণ ইংরাজ নাট্য প্রয়োজিকা মিসেস লুইস গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। লুইস থিয়েটার তাঁর অবারিত দ্বার ছিল। অভিনয়কলা সম্পর্কে নানা বিষয়ে মিসেস লুইসের সঙ্গে আলোচনা করতেন। যাত্রা তাঁর অতি প্রিয় ছিল, এবং কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলেই দেখতে ছুটতেন। নিজে যাত্রাদলে শিক্ষা দিয়েছেন, গান বেঁধেছেন। কথকতায় তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। গোড়া থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, অভিনয় করার জন্য যতোরকমের শিক্ষা আছে, কথকতার চাইতে কঠোর শিক্ষা আর কিছুতেই হয় না। মাত্র একই লোকের দ্বারা আবৃত্তিতে, সংগীতে এবং অভিব্যক্তিতে সকল রকম রস পরপর ফুটিয়ে তোলা এবং সবগুলি পাত্রপাত্রীর চরিত্রানুরূপ অভিনয় করার ক্ষমতা আয়ত্ত করা কম শক্তিমানের কর্ম নয়। গিরিশচন্দ্র তাই আপন নিভৃতে কথকতা অভ্যাস করতেন। ১৮৮২ সন নাগাদ একদিন কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় তারা বলেন এখন আর তেমন কথকতা হয় না যেমন তারা শুনেছেন যে দৃশ্যপটসহ অভিনেতা, সাজসরঞ্জাম কিছুই নেই—একজন মাত্র লোকের সকল চরিত্রে অভিনয় তা অসম্ভব মনে হয়। তার উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন, অসম্ভব নয় তবে শিক্ষাসাপেক্ষ। "আচ্ছা কালই আমি আপনাদের কথকতা শুনিয়ে দেব।"

পরদিন বন্ধু এবং সুঅভিনেতা ও নাট্যকার কেদারনাথ চৌধুরীর বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্র "ধ্রুব চরিত" কথকতা করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাঁরা গিরিশচন্দ্রকে কথকতা অবলম্বনে একখানা নাটক রচনার জন্য অনুরোধ জানান;

* সধবার একাদশীর নিমচাঁদ।

তাদেরই অনুরোধ গিরিশচন্দ্র "ধ্রুবচরিত" নাটকখানি লেখেন।

প্রায় দেড়শ বছর আগে বিষ্ণুপুরে কথকতা শেখার টোল ছিল। বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রেরা সেই টোলে আসতেন। সে সব টোল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে শেষ হয়ে যায়। এই যে এক ব্যক্তির একই স্থলে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় ক্ষমতা যেটা গিরিশচন্দ্র আয়ত্ব করেন সেই রীতিতে তিনি পরবর্তী-কালে অভিনেতাদের শিক্ষাদান করেন। একই নাটকে একই ব্যক্তির বিভিন্ন চরিত্রে অবতরণের দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই দেখিয়ে দেন "মাধবীকঙ্কন"এ একাই সাতটি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। "কপাল-কুণ্ডলা"তেও তিনি একাই কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেন।

অর্ধেন্দুশেখরের কথা বিশেষভাবে বলার আবশ্যক করে না কারণ তিনি বাঙলার হাস্যাবতারই শুধু ছিলেন না, মস্ত বড় চরিত্রাভিনেতা এবং ইতালীয় কমেডিয়া ডেল আর্টের অনুরূপ "পাঁচাতামাশা"। রচনা করে মুখে পালা তৈরী করে কখনো সহকর্মী নিয়ে কখনো একা অভিনয় করতেন। সে সময় ডেবকার্সন নামক ইংরাজ তামাশবীন বাঙালীদের যা তা বলে বড়ো নিন্দা করতো। অর্ধেন্দুশেখর ডেবকার্সনকে উত্তর দেবার জন্য ইংরাজী ও বাঙলা মেশানো পালা করতেন যার তিনি নাম দেন "মুস্তাফী সাহেবকা পাক্কা-তামাশা।" অর্ধেন্দুশেখর বাঙলা দেশের সকল জেলার কথা বলতে পারতেন এবং রাস্তা ও বাজারের প্রতিটি চরিত্র লক্ষ্য করতেন। অর্ধেন্দুশেখর পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিসতুতো ভাই ছিলেন এবং তিনি ওদেরই বাড়িতে থাকতেন বলে পাথুরিয়া-ঘাটা থিয়েটারের শিক্ষক, যতীন্দ্রমোহনের ছোট ভাই সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরেব শিক্ষাদান ও রিহার্শাল দেখার সুযোগ পান। সৌরীন্দ্র-মোহন মস্ত রসবেত্তা ব্যক্তি ছিলেন। এদেশে তিনিই প্রথম হিন্দু সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সৌরীন্দ্রমোহন হিন্দু সংগীত ও রসশাস্ত্র দেশ-বিদেশে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে বহু মুদ্রা ব্যয়ে ছবি ও মূল সংস্কৃত শ্লোকসহযোগে Eight Rasas নামে একখানি গ্রন্থের মূল্যবান রাজ সংস্করণ প্রকাশ করেন। পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার ও হিন্দু সংগীত বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকাকালে অর্ধেন্দুশেখর সাধারণ চরিত্র নকল করার বিদ্যা আরম্ভ করেন। সে সময়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়িতে একটি প্রহসন হয় "বুঝলে কিনা"। এই প্রহসনেরই প্রত্যুত্তরে জোড়াসাঁকোয় হয় "কিছু কিছু বুঝি" এবং তাতে অর্ধেন্দুশেখর সৌরীন্দ্র-মোহনকে ব্যঙ্গ করে পরিকল্পিত দম্ভবহুল সাধক একটি চরিত্রে অভিনয় করেন।
সৌরীন্দ্রমোহনের চালচলন, কথনভঙ্গী অভিনয়ে এমনই হয়ে যেন সৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ংই অবতরণ করেছেন। এ ব্যাপারটা যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহনকে রুষ্ট করে তোলে যার ফলে অর্ধেন্দুশেখরকে তার আশ্রয়স্থল ঠাকুরবাড়ি ত্যাগ করে নিজের বাড়িতে চলে যেতে হয়। সাধারণ রঙ্গালয়ে "নীলদর্পণ" নাটকে অর্ধেন্দুশেখরকে একাই উড সাহেব, সাবিত্রী, গোলক বসু ও এক চাষার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। অমৃতলাল (বেলবাবু) স্বভাব অভিনেতা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রর উক্তি উধৃত করে পরিচয় দেওয়া যাক। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: "হাস্যরসাভিনয়ে অর্ধেন্দুবাবু, বেলবাবু ও ভূনিবাবু (অমৃতলাল বসু) এই তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ। অর্ধেন্দুবাবুর সহিত বেলবাবুর প্রভেদ এই অর্ধেন্দুবাবু দর্শকের নিকট অর্ধেন্দুই থাকিতেন এবং দর্শকগণও অর্ধেন্দুবাবুকে সেইভাবে দেখিতে ভাল-বাসিতেন। কিন্তু বেলবাবুর অভিনয় দর্শকগণ অভিনীত চরিত্রই দেখিতেন, বেলবাবুকে দেখিতেন না। যেমন, বেলবাবুর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সাধকের ভূমিকাভিনয়ে দর্শক কখনো ঘৃণা কখনো ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। কিন্তু অর্ধেন্দুবাবু যখন সাধকের ভূমিকা অভিনয় করিবেন দর্শকগণ অর্ধেন্দুবাবু কখন কিরূপ ভঙ্গী করিবেন তাহারই অপেক্ষায় থাকে।" একদিন অর্ধেন্দুবাবু সারা সাধক চরিত্রটি বাঁকুড়া জিলায় ভাষায় অভিনয় করেন। এই ধরনের ছিল তাঁর

প্রকৃতি। অন্যস্থলে গিরিশচন্দ্র বেলবাবু সম্পর্কে লিখছেন: "প্রফুল্ল'তে ভজহরির ভূমিকা ও সরলায় গদাধরের অভিনয় বেলবাবুর অক্ষয় কীর্তি। বেলবাবু নিজে পেণ্ট করিয়া (মেক-আপ) নিজে মনোমত সাজিতেন, অতি সুন্দর সাজিতেন, সাজিবার তাঁর নৈপুণ্য ছিল।"

রাধামাধব কর (ডাঃ আর জি করের ভ্রাতা) অতি সুঅভিনেতা ছিলেন। নারী পুরুষ ও বৃদ্ধের চরিত্র সম্যকভাবে অভিনয় করতে পারতেন।

এইসব রসজ্ঞ অভিনেতা দ্বারা আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের সুখ দুঃখের যে অভিনয় দেখা গেল "সধবার একাদশী"তে তার মধ্যে দর্শক কোন কৃত্রিমতা পেল না। দর্শক রসাস্বাদন করে ডুবে গেলেন। শুধু আড়ম্বরপূর্ণ অভিনয় দেখার মত বিস্ময়ে হতবাক হল না। এই রসের ধারাই গিরিশ যুগে বরাবরই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যেমন, যে কোন অভিনেতাই সে যুগে অভিনয় করুন না কেন তিনি মঞ্চ অভিনয় ধারা (রসসৃষ্টি) থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। দীর্ঘ ৫০ বছর যে অভিনয় ধারা চলে এসেছে তার মধ্যে সকলেই রসজ্ঞ অভিনেতা ছিলেন না। তার মধ্যে নানারূপ অভিনেতা ছিলেন, নিকৃষ্ট অভিনেতাও বহু ছিলেন। তারপর যে কারণেই হোক সে যুগে নব্যদলের অভ্যুদয় হতে তারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই রীতি (রসজ্ঞ অভিনয় রীতি) সমর্থন করলেন না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আমরা দেখতে পাই যে বাঙলা দেশ তথা কলিকাতায় বহু শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ছিল ভারতীয় সংগীত সমাজ। এটি ধনী ও বিদ্বানদের একটি শ্রেষ্ঠ অভিনয় সংস্থা ছিল। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর ক্লাব ছিল, গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়ি। সদর দিয়ে দেউড়ী পার হয়েই উঠোন, সেখানে ছিল স্থায়ী মঞ্চ। সমাজের সভ্যরাই অভিনয় করতেন। এদের অভিনয়ের প্রযোজনা ও অভিনয় ধারা ছিল পূর্ববর্তী যুগের বেলগাছিয়া থিয়েটারের নাট্যানুকৃতির অনুরূপ। জাঁকজমক, সাজপোশাক, বিভিন্ন দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় ঐকতান বাদন এবং অভিনয়ও সেই বেলগাছিয়া বা বিদ্যোৎসাহী সভার অনুরূপ। বাবু হেম মল্লিক নিবারণ দত্ত, চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরও আসতেন—তাঁর নাটকও এখানে অভিনীত হয়েছে। মেঘনাদবধ' হয়েছে, 'রিজিয়া' হয়েছে। এদের মধ্যে চারুচন্দ্র মিত্র শিক্ষিত, শৌখিন অভিনেতা ছিলেন। বিলিতি অভিনয়ের তিনি সকল সংবাদ রাখতেন। বিলিতি নাট্য সম্বন্ধীয় পত্র-পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন এবং তখনকার দিনে যে পত্রিকা ছিল—Play Pictorial যা প্রতি মাসে বড়ো বড়ো ফটোগ্রাফ সহযোগে বিলিতী শ্রেষ্ঠ মঞ্চ কৃতিত্বগুলি প্রকাশ করে লোককে অভিনয় বোঝাতো। চারুবাবুর কাছে ঐরকম পত্রিকা এক সঙ্গে বাঁধাই করা ভল্যুমে অনেক ছিল। সেই সব দেখে তিনি আঙ্গিক অভিনয় শিখতেন এবং যাদের অভিনয় শেখাতেন তাদেরও বুঝিয়ে দিতেন। পরে চারুবাবুর অনুকরণে আমি নিজেও এইরকম বহু Play Pictorial সংগ্রহ করি ও বাঁধিয়ে রেখে দিই। ভবানীপুর ক্লাবে "কৃষ্ণকান্তের উইল" মহলার সময় চারুবাবু ছিলেন শিক্ষাগুরু, এবং তাঁরই শিক্ষকতায় তিনকড়ি চক্রবর্তী ভুজঙ্গ রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু প্রভৃতি অভিনয় করেন। কাজেই ভবানীপুর অঞ্চল চারুবাবু প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করে এবং যারা নিজেদের অভিনেতা করে তুলতে চাইতেন তারা সেই রীতি অনুসরণ করতেন। এছাড়া ছিল ডি এল রায় প্রতিষ্ঠিত ইভনিং ক্লাব। তাঁরই বাড়িতেই ক্লাবটি ছিল। এবং তাঁরই লেখা নাটক, সঙ্গীত পরিবেশিত হত। এদের মধ্যে মুখ্য অভিনেতা ছিলেন প্রমথ ভট্টাচার্য। নাটকও তিনি লিখেছেন। বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে আর ছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গণদেব গাঙ্গুলী প্রভৃতি। তিনকড়ি চক্রবর্তীও এদের এখানে মাঝে মাঝে অভিনয় করতেন। প্রমথ ভট্টাচার্য চারুবাবুর পন্থাই অনুসরণ করেন। বিদেশী নাটকের অনুকরণ করে তিনি "ক্লিওপেট্রা" লেখেন যে নাটকখানি মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয় এবং এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে দানীবাবু ও তারাসুন্দরী। ভবানীপুরে চারুবাবু এবং শ্যামবাজারে তাঁরই পথানুগামী প্রমথ ভট্টাচার্য ফলে দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতায় একই অভিনয় ধারা প্রচলিত হল। এইভাবে নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক যে নব্যধারা প্রচলিত হল সেটি হচ্ছে বহু আগে পরিত্যক্ত ইংরাজী নাট্যশিক্ষকদের দ্বারা প্রবর্তিত ধারা।

প্রায় এই সময়েই এসে পড়ে নির্বাক বিদেশী চলচ্চিত্র। ওদেশে তখন চলচ্চিত্রের জন্য আলাদা অভিনেতা সৃষ্টি হলেও প্রখ্যাত নাটকাদির চলচ্চিত্ররূপে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের অভিনয় করতে দেখা যেত। চলচ্চিত্র অবশ্য তখন মঞ্চাভিনেতাদের কাছে অপাঙক্তেয় ছিল আর সাধারণ দর্শকও সে সময়ে চলচ্চিত্রকে একটা সস্তা তামাশাই মনে করতো এবং সাধারণভাবে নামকরা মঞ্চাভিনেতাদের পক্ষে চলচ্চিত্রে অভিনয় লজ্জার বিষয় বলে পরিগণিত হত। এমন একটা সংস্কার ছিল যে চলচ্চিত্রে অভিনয় করাটা যেন মানহানিকর। তাই চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা বহু অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে এবং চলচ্চিত্রের অভিনয় অমর হয়ে থাকে এইভাবে বুঝিয়ে স্যার বার্ণহার্ট থেকে বড়ো বড়োদের অভিনয়ে নামাতে সক্ষম হন।

হার্বার্ট বিবহমট্রীর ম্যাকবেথ ও ড্যাংগেলিস, সার জনস্টন ফরবেশ, রবার্টসনের হ্যামলেট, ম্যাথিসন ল্যাঙের 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' এবং 'কার্নিভাল' চিত্র যাতে রঙ্গমঞ্চে ওথেলোর কতকগুলি দৃশ্য দেখানো হয় ইত্যাদি এই ধরণের ছবি আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ দেখতাম। ইতালির সিনে (Cine) কোম্পানী অফ রোম "কোভাডিস", "এণ্টনি ক্লিওপেট্রা", "জুলিয়স সীজার" প্রভৃতি তোলে এবং এ ছবিগুলির মুখ্য অভিনেতা এমলেত্তো নোভেলি ছিলেন নামকরা মঞ্চাভিনেতা। এইসব ছবি একবার দেখা নয়, যখনই প্রদর্শিত হয়েছে আমরা দেখেছি। এমলেত্তো ভারতে আসতে চেয়েছিলেন এবং আসবার সব বন্দোবস্তও করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পরোলোকগমন করায় তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

Howitte Phillips এখানে গ্রাণ্ড অপেরা হাউসে থিয়েটার করতেন। "ইস্টলীন", "রোমিও জুলিয়েট", "সাইন অফ দি ক্রশ" ও অন্যান্য সেক্সপীরিয় নাটক রীতিমতভাবে অভিনয় করতেন। অভিনয় বুঝি না বুঝি ওদের আঙ্গিক অভিনয় অনুকরণ করতাম। সে সময়কার অভিনেতাদের অনেকে বিলিতী নাটক ও ফিল্ম দেখে আঙ্গিক অভিব্যক্তি প্রধান অভিনয় লেখেন—অন্তরঙ্গ ভাবের দিকে তাদের ততটা নজর থাকত না। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি ভাবের অভিনয় প্রথম আমার মধ্যে আসে ১৯৩২ সনে "চন্দ্রনাথ"এ কৈলাসখুড়োর চরিত্রাভিনয়কালে অর্থাৎ মঞ্চে যোগদানের দশ বছর পর।

ক্রমে অভিনয় রীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর একটা নিজস্ব অভিনয় ধারা নিয়ে আসেন যা জনসমাদৃত হয়। দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, রাধিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তাদের যার যা স্বতন্ত্র অভিনয়ধারাতে। ক্রমে অন্যান্য অভিনেতারা এদেরই ধারা নকল করে অভিনয় করতে থাকেন। বড়ো বড়ো অভিনেতাদের 'স্টাইল' হুবহু নকল করাই তখনকার রীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সেসব আঙ্গিক অনুকরণ অভিনয়কে তাই কখনো নিখুঁত করতে পারত না, আন্তরিক ভাবও গভীরভাবে ফোটাতে পারত না নকল হত বলে। ক্রমে সাধারণ অভিনয়ের একটা রূপ এল। অনেকে চেষ্টা করলেন অভিনয়কে স্বাভাবিক করতে, কিন্তু তারাও বুঝলেন যে মঞ্চে স্বাভাবিক কিছু নেই। দর্শকদের মধ্যে প্রক্ষেপণ করতে হতো বলে রঙ চড়াতে হতো। সেইজন্যেই অভিনয়কে বলে as if bigger than a life size portrait. যা স্বাভাবিক তার চাইতে বেশী। সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিনয়ের রূপ মানে কিছু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—নাটকীয় রসকে দর্শকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এমন অভিনয় হয়নি যেটা স্বাভাবিক। অভিনয় হচ্ছে মানুষটার চাইতে যেন বড়ো করে দেখা। তাই পৃথিবীর নানা বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হচ্ছে শুধু এই কারণে যে কি রকম করতে পারলে দর্শক বেশী রস উপভোগ করতে পাবে।

আজ ভারতের চতুর্দিকে নাট্যাভিনয় বিষয়ে একটা সাড়া এসেছে। নানা দেশ থেকে নানা পুস্তক-পত্রিকা আসছে, লোকে তা আগ্রহসহকারে কিনছে।

আমাদের দেশেও বর্তমানে নানারকমের পরীক্ষা চলেছে। ভারতের অন্যান্য যেসব অঞ্চলে নাট্যাভিনয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না, স্বাধীনতা লাভের পর সেসব স্থানেও নানা পরীক্ষা চলছে। কিন্তু সবই ইংরাজী রীতির প্রভাব যা মনে করিয়ে দেয় ১৮৬১ সালের বাঙলার কথা। বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থলে প্রগতিশীল ইউরোপীয় নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে বা হিন্দীতে তর্জমা করে অথবা ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে হিন্দী নাটক রচনা করে অভিনয় হচ্ছে। অনেক রকম পরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু আমরা গত যুগে, প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সেসব পরীক্ষা শেষ করেছি। এখন আত্মস্থ হয়েছে ইওরোপীয় নাট্যাদর্শের অন্তরঙ্গকে আমরা দিশীভাবে করে নিয়েছি। বাঙলাতে ভাল ভাল ইউরোপীয় নাটকের তর্জমা হত, আরো হলে ভালই হত। যাই-হোক আমাদের অভিনয়ের ধারাটা, প্রাণটা দিশী ছিল বরাবরই। এখন অনেক পরীক্ষার মধ্যে কোনটি স্থায়ী হবে বলা যায় না। প্রতীকি নাটক হচ্ছে, কিন্তু প্রতীকি অভিনয় হয় না। অভিনয় হয়ে দাঁড়িয়েছে Stage technique প্রধান। সেসব দিক থেকে পরীক্ষার আরও দরকার। তবে যাকে বলা হয় Theatrical Realism সেইটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। ভারতে এখন সংস্কৃত থেকে আরম্ভ করে গ্রীক নাটক এবং গত যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকও অভিনয় করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চ যদি সমাজদর্পণ হয় তাহলে দিশী সমাজ যে রূপ যখন নেবে নাটকেও তাই প্রতিফলিত হবে। তবে ইংরাজী ভাষায় অভিনয় করে বড়ো কাজ কি হচ্ছে বোঝা যায় না। এদেশের কবি, নাট্যকার যশ মান পেয়েছেন নিজেদের ভাষাতেই রচনা করে। এদেশের নাট্যালয়ের মান এদেশীয় ভাষায় অভিনয় করাতেই। বিদেশী ভাল নাটক নিতে হবে বলে তার বিদেশী ভাষাও গ্রহণ করতে হবে এ মনোবৃত্তিটা দুর্বোধ্য।
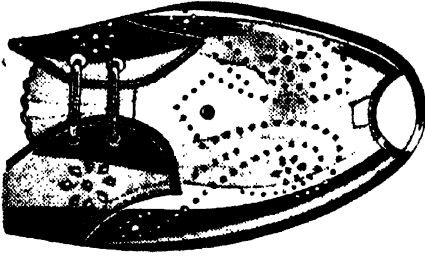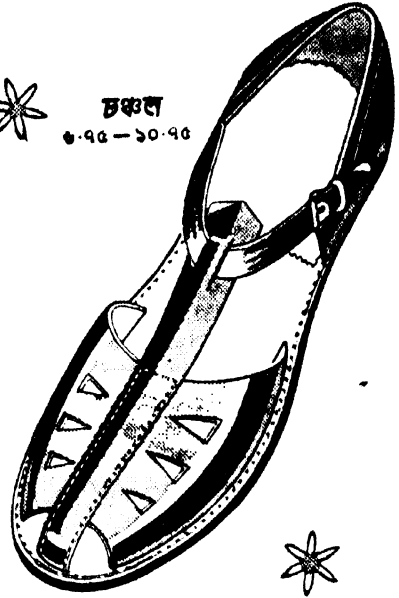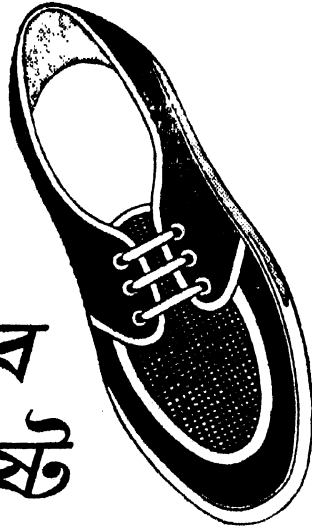
মোকাসিন
৩·২৫ — ৩·৯৫
চঞ্চল
৬·৭৫ — ১০·৭৫
উৎসবে
উৎকৃষ্ট
পূজোয় চাই
বাটা-র জুতো
লংলাইফ
ক্যাজুয়াল
১৩·৯৫
মধুবালা
১১·৯৫
অনুরাধা
৮·৯৫
এয়ারি
১০·৯৫
পুজোর সময় শুধু নতুন নয়
চাই নতুন ফ্যাশানের
একজোড়া জুতো। এমন জুতো যা
আগে পরেননি, অথচ ইচ্ছে
ছিল সুযোগ পেলেই কিনবেন।
এবার পুজোয় বাটা-র
বিচিত্র আয়োজন, ছোট বড় সকলের
জন্য হরেকরকম ফ্যাশান।
হাতে সময় থাকতে আসুন—
মনের মতো জুতো বেছে নিন।
Bata
বাটা সু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

## সুশীল রায়

একটা গল্প বলি, শোনো। হেসো না। তুমি নাকি মস্ত গল্প-লিখিয়ে হয়েছ। তোমার কাছে আমার লেখা এই গল্প হাসির জিনিস মনে যদি হয়ই, হোক-না। জীবনে যে কখনো গল্প লিখল না, গল্প-লেখার কায়দা-কানুন যার বিন্দুবিসর্গ জানা নেই, তার এই আস্পর্ধা দেখে রাগ করতে হয়, কোরো। কিন্তু দোহাই, হেসো না।

হাসি দিয়ে সব জিনিস উড়িয়ে দিতে নেই—এ-নিয়মটা নিশ্চয়ই তোমার জানা। জীবন তো একটা হালকা ফানুস নয়।

সত্যি করে বলো-না, জীবনটা কি সত্যিই একটা ফানুস? এর ভিতরের আলো আর হাওয়া ফুরিয়ে গেলে এটা কি চুপসে দুমড়ে আকাশের অনেক উঁচু থেকে একেবারে পড়ে এই মাটিতে? বুকের মধ্যে আগুন জেলে নিয়ে হাওয়ায় দুলে-দুলে আকাশের একদিক থেকে আর-এক দিক পর্যন্ত আলোর ফুল সেজে যে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছিল—সে কথা থাক। সত্যি করে বলো-না, জীবনটা সত্যিই কি আকাশকুসুম।

আমার কিন্তু আকাশকুসুম বলেই মনে হচ্ছে। তোমার জীবনটা দেখে। কী-না তুমি হতে চেয়েছিলে জীবনে—কত বড় ডাক্তার, কত বড় ইঞ্জিনীয়ার, কত বড় কী কী যেন! হায়, কিছুই হতে পারলে না তুমি। শুনেছি, তুমি হয়েছ নাকি গল্পলেখক।

তার মানে, একজন মিথ্যেবাদী। রাগ কোরো না। মিথ্যা যারা বলে তারা যদি মিথ্যুক, মিথ্যা যারা লেখে তারা তবে কি!

আশ্চর্যই লাগে, ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা যারা বানাচ্ছে, লোকে তাদের খাতির করে।

সত্যি ক'রে বলো-না, মিথ্যার এত কদর হল কবে থেকে? মিথ্যাকে এত আশকারা দিতে শিখলে তুমি কোথায়?

থাক্ থাক্ থাক্। বলতে হবে না। এ-কথা বলতে গিয়ে আবার হাজার রকম মিথ্যা বানাতে বসবে তুমি। অত মিথ্যা ভালো লাগে না আমার।
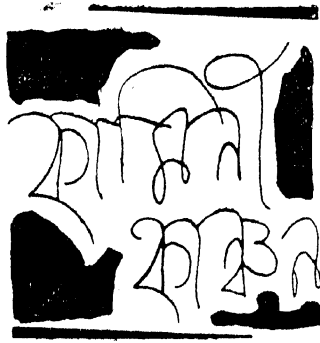
আমি যে গল্প বলব বলছি, সে কিন্তু আলাদা জাতের গল্প। তোমাদের কাছে নিশ্চয় নিরামিষ আর বিস্বাদ ঠেকবে; ঝাল লংকা যদিও বা একটু থাকে, পেঁয়াজ-রসুন-গরমমসলা একেবারে বাদ। এ-যে নির্জলা সত্যি গল্প।

আশ্চর্য হচ্ছ বুঝি? ভালো লাগছে না বুঝি পড়তে? বার-বার তাই পাতা উল্টে দেখছ, কত পাতার গল্প এটা? তোমার লেখা নিয়ে কেউ যদি অমন ব্যবহার করে, কেমন লাগে তোমার? অমন অনাদর অমন অবহেলা করতে নেই কাউকে, জান না তুমি? পাঁচজনে তোমার লেখা আগ্রহ করে পড়বে, আর, তুমি কারো লেখা পড়তে গিয়ে কেবলই ধৈর্য হারাবে, এ নিয়ম কোন্ দেশ থেকে নিয়ে এলে তুমি? জীবনে কিছুই তো হতে পার নি, তাহলে অত ব্যস্ত কেন? গল্প লিখতে বসবে? একটা গল্প না হয় নাই-ই হ'ল লেখা। তার বদলে এই তো পেয়ে যাচ্ছ একটা। দরকার হলে এইটে নিয়ে, এতে অনেক মিথ্যার পেঁয়াজ-রসুন-গরমমসলা দিয়ে, একেই বানিয়ে নিতে পার তোমার নিজের লেখা গল্পের মত করে। বানান ভুলগুলো শুধরে নিয়ে, মাঝে-মাঝে কবিত্বের ঘটা বসিয়ে, যা সত্যি নয় এমনি আজগুবি ব্যাপার আমদানী করে, নতুনরূপে রূপসী করে নিয়ো একে—এ-অধিকার দিয়ে দিচ্ছি এই সঙ্গে। আর, না দিলেই কি। তুমি কি ছাড়বে একে। গল্প হিসেবে হয়তো কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে যাবে, কিন্তু গল্পের মসলা হিসেবে কি ফেলে দিতে পারবে একেবারে?

কি মাস এটা? শ্রাবণ? অমন মাথা গুঁজে বসে না থেকে আকাশের দিকে চোখ তুলে একটু তাকাও! কেমন মেঘ করেছে দেখ। চাপ-চাপ কালো-কালো দৈত্য যেন এক-একটা! ওদের দেখতে কি ইচ্ছে করে না একটুও? মিশকালো চেহারা বটে ওদের, কিন্তু লোক নাকি ওরা ভালো। কেমন বৃষ্টি ঝরায়, তাই না?

আমার গল্পের আরম্ভ এমনি একটা বৃষ্টি-দিনে।

মুগদুম-সাহেবের দরগার কাছে যখন কাঞ্চন এসে দাঁড়াল, আকাশে তখন মেঘ উঠেছে—ভীষণ মেঘ, ভয়ংকর মেঘ; আলাদা-আলাদা কয়েকটা দৈত্যের মূর্তি ধরে না, একটা আস্ত দানব হয়ে। উপেন রায় চৌধুরীর রামায়ণে তাড়কারাক্ষসীর ছবি দেখেছিল কাঞ্চন, সেদিনের সেই মেঘ সেই রাক্ষসীর মত সারা আকাশে হাত পা ছড়িয়ে, দাঁত কড়মড় করে উঠে এল লালগোলা ঘাট পার হয়ে পাতিবনা প্রেমতলী ডিঙিয়ে রামপুর-বোয়ালিয়ার পদ্মাকিনারে এই মুগদুম-সাহেবের দরগার মাথার উপর।

কাঞ্চনদের দুপুরের খেলা ছিল অদ্ভুত

ধরনের। চোর-ডাকাত খেলা। একদল চোর-ডাকাত হত, একদল হত পুলিস। পুলিস দলের কাজ কঠিনও যেমন ছিল, সহজও ছিল তেমনি। চোর-ডাকাতরা শহরের যে-কোনো জায়গায় পালাতে পারত, এতে তাদের খুঁজে বের করা শক্তই হত পুলিসদের পক্ষে। কিন্তু হাতে-নাতে চোর-ডাকাতদের সকলকে ধরতে হবে এমন নিয়ম ছিল না, ওদের দলের যে-কোনো একজনকে দূরে থেকে দেখে ফেললেই দলসুদ্ধ চোর-ডাকাত ধরা পড়ে গেল বলে ধরে নেওয়া হত।

এভাবে ধরা-পড়ার ভয়ে চোর-ডাকাতদের সকলে পালাত যার যেদিকে খুশী।

কাঞ্চনটা চোর ছিল না, কিন্তু সে ছিল বুঝি ডাকাত। বড় বড় দুটো চোখ, তার রোগা শরীরের মধ্যে মস্ত মস্ত দেখাত; দেখলে যেন ভয় করে। আর মেজাজটা তার ছিল ভারি গরম, গোঁ ছিল, অনেকে বলত, শুয়োরের মত।

রানীবাজারের মাঠ থেকে তাদের খেলা আরম্ভ হয়েছে। সেখান থেকে দৌড় দিয়ে ঘোড়ামারা-সাগরপাড়া পার হয়ে সে এমব্যাংকমেণ্টে উঠে পাঁচানির মাঠে নামল। তারপর পদ্মার কিনার ধরে ধরে চলল বড় পোস্টাপিসের দিকে।

গরমের ছুটিতে রোজ দুপুরে তাদের এই খেলা। আগের দিন পুলিস-দলের বিরূপাক্ষ দূর থেকে দেখে ফেলে কাঞ্চনকে, দলসুদ্ধ অমনি ধরা পড়ে গেল ব'লে চোঁ-চোঁ শব্দে আওয়াজ তুলল পুলিস-দল। কাঞ্চনদের দলের সকলে সেদিন নাকি ভীষণ লুকোনো লুকিয়েছিল, কারো নাকি সাধ্য ছিল না খুঁজে বের করে। কিন্তু সব মাটি করে দিল—

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন বলল, বেশ। আর কোনোদিন কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না আমাকে।

পরদিনের খেলায় কাঞ্চনের তাই এই লম্বা পাল্লা।

কিন্তু কে জানত, মুগদুম-সাহেবের দরগার কাছাকাছি হওয়ামাত্র বিদ্যুতের দাঁত খিঁচিয়ে আকাশে দেখা দেবে ঐ তাড়কা-রাক্ষসী।

বারো-তেরো বছর বয়স হবে তখন কাঞ্চনের। আকাশে ঐ মেঘের ঘটা, ঐ বিদ্যুতের চমক, ঐ বাজের আওয়াজ। চারদিক জনমানুষশূন্য। শহর অনেক দূরে। ওপারে পদ্মার ঘোলাজল খলবল করছে, ওপার দেখা যায় না—এত চওড়া হয়ে গিয়েছে বর্ষার জলে; এ পারে এই এমব্যাংকমেণ্ট, তার পরে ঘনসবুজ রঙের ঐ ধুধু মাঠ।

বিরাট সমুদ্রের ঢেউয়ের উপরে একটা খড়ের কুটি যেমন, কাঞ্চনের অবস্থা বুঝি তখন তেমনি।

সে দৌড়তে লাগল। দরগার কাছ থেকে নেমে পড়ল সে মাঠে। কড়কড় শব্দে দাঁত ঘষে উঠল রাক্ষসীটা। বুক কেঁপে উঠল কাঞ্চনের। দূর থেকে দেখলে হয়তো মনে হত সবুজ মাঠের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে গঙ্গাফড়িং, অবিকল ঐভাবে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে লাফাতে লাফাতে।

কোনোদিকে একটা মানুষ নেই, একটা পাখি নেই, একটা প্রাণী নেই। রামপুর-বোয়ালিয়াটা সবটাই তালাইমারীর শ্মশান হয়ে গিয়েছে নাকি?

ভয়ে সে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। বড় বড় চোখ দুটোর আর তেজ নেই; শুয়োরের মত যার গোঁ, সে তখন খরগোশের মত নরম। বৃষ্টিতে নেয়ে হয়ে গেছে ভিজে-বেড়াল। মাস্টারপাড়ার রাস্তায় উঠেও ভয় তার যায়নি, একটা অন্তত মানুষ দেখতে না পেলে তার আর চলছে না কিছুতে। শরীর হিহি করে কাঁপছে ভয়ে আর শীতে।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলেন মহেন্দ্রনাথবাবু। তিনি ডাকলেন ছেলেটাকে, এই এই এই—

আদর পেয়ে আর আশ্বাস পেয়ে কাঞ্চন একে-একে বলতে লাগল তার কথা। সব কথা সে বলল, চোর-পুলিসের কথা, তার গোঁয়ের কথা, তার ভয়ের কথা, ঐ মেঘের কথা; সব—সব—

পরনে তার লংক্লথের ইজের, গায়ে হাত-কাটা পাঞ্জাবি—ফতুয়ার মত। ভিজে ন্যাতা হয়ে গিয়েছিল দুটোই।

মহেন্দ্রবাবু ডাকলেন, ছবি, এই ছবি, শুনে যা।

কাঞ্চনের চেয়ে কিছু ছোট হবে। ফ্রক ফাঁপিয়ে ছুটে এল একটি মেয়ে।

তুমি কি বল? হচ্ছে না গল্প? নায়কের কাছে নায়িকাকে কিভাবে নিয়ে আসা হল বল তো। এর চেয়ে এমন কী নতুনভাবে তোমরা নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটাও শুনি? কি রকম বাজ ডাকালাম, বর্ষা নামালাম, মেঘ ঘনালাম। গড়ময়দারন অভিমুখে জগৎসিংহকে নয়, মাস্টারপাড়ার উদ্দেশে নিয়ে এলাম আমাদের নায়ককে।

ও হরি। কী কান্ড দেখ। এসব আমি করালাম নাকি। এসব তো ঘটেছিলই, নিজে-নিজেই। আমি যে সত্যি-গল্প লিখছি ভুলেই গিয়েছিলাম।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, ছবি, তোর একটা ইজের নিয়ে আয়, আর, দেখ্ তো তোর ছোড়দার একটা গেঞ্জি আছে নাকি। একে দে। এসব ছাড়ুক ও।

কে এ? জিজ্ঞাসা করতে পারল না ছবি। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, ভীষণ হাসি পেল তার ঐ মূর্তিটা দেখে। ছেলেটার মুখ দেখে মনে হল যেন একটা চোর ধরা পড়ে গিয়েছে হাতে-নাতে।

ইজের-জামা বদলাল ছেলেটা।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে আছে তোমার?

—মা।

—আর কেউ?

মাথা নাড়তে লাগল সে ধীরে ধীরে।

—আর কেউ নেই?

—না।

ছবির কেমন বুঝি মায়া হল। আহা বেচারা কেউ নেই ওর? বাবা নেই, দাদা নেই, দিদি নেই পিসিমা নেই—

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে কে থাকে ও বাসায়?

—মা, আমার বড়দি, বড়দির ছেলেরা।

—তবে যে বললে, আর কেউ নেই।

বড় দুটো চোখ মস্ত-মস্ত করে তাকিয়ে সে বলল, নেই-ই তো।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না মহেন্দ্রবাবু।

ছবির ছোড়দা এসে দাঁড়াল ঘরের এক পাশে, ছেলেটার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, একে চিনি। লোকনাথ স্কুলে পড়ে। ক্লাস এইট-এ।

ছবি তখন পি এন গার্লস স্কুলে ক্লাস সিক্স-এ পড়ে, তার ছোড়দা পড়ে কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস সেভেন-এ।

বৃষ্টি তখনো সমানে চলেছে, বাজের ডাক কমেছে। দূর থেকে পদ্মার ঢেউয়ের আওয়াজ আসছে। ইন্দির ঘাটের বুকের উপর ঢেউগুলো বোধ হয় আছাড় খেয়ে পড়ছিল।

কাঞ্চন বলল, বাড়ি যাব।

—কেন? শীত করছে নাকি?

—না। মা বোধ হয় ভাবছে।

কিন্তু ঐ বৃষ্টি মাথায় করে রওনা হওয়া যায় না, কেউ কাউকে রওনা করে দিতেও পারে না। অগত্যা সেদিন কাঞ্চনকে থাকতে হয়েছিল অনেকক্ষণ।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মা বুঝি তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

—না।

—তবে?

—ভয় করেন।

মহেন্দ্রবাবুর আশ্চর্য লাগল এ-কথা শুনে, বললেন, সে কি। ভয় কেন?

—আমি যদি মরে যাই।

বুঝলেন বোধ হয় মহেন্দ্রবাবু, বললেন, মরবে কেন, ছি। তোমার মাকে বোলো ভয় নেই। বড় হয়ে তুমি কী হবে?

—মস্ত মানুষ হব।

—কি রকম?

—ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার উকিল, যা হলে খুব বড় হওয়া যায়।

তারপর?

কাঞ্চনের দু চোখ চকচক করে উঠল, বলল, মাকে নিয়ে চলে যাব।

সব দিদিদের নাকি বিয়ে হয়ে গিয়েছে কাঞ্চনের। এক দিদি এখানেই থাকেন।

—তোমার জামাইবাবু কি করেন?

—কিছু না।

ছেলেটার কথা শুনে, কথা বলার ধরন দেখে মহেন্দ্রবাবুর বুঝি আশ্চর্যই লাগছিল। একটু যেন বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাব, একটু যেন বেপরোয়া ভঙ্গি। দিদি থাকেন, তাঁর ছেলেপিলে আছে, জামাইবাবু কিছু করেন না। তবে চলে কি করে?

সেসব খুঁটিনাটি খবর অতটুকু ছেলের কাছ থেকে আর জানতে চাইলেন না ছবির বাবা। কিন্তু তাঁর বুঝি ঐ ছেলেটার উপর একটু টানই জন্মে গেল। তিনি ওকে আদরযত্ন করে বসিয়ে রাখলেন।

এর পর থেকে কাঞ্চন আর ছবির বাবার খুব ভাব হয়ে গেল। খুব যাতায়াত আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু ছবির বাবার সঙ্গে ভাব হয়ে কি গল্প হয়? পেঁয়াজ-রসুনের কথা বাদ, তাহলে যে নুনঝালও থাকে না গল্পে। সে যে বড় বিস্বাদ।

কিন্তু তোমাকে বিস্বাদ গল্প পাঠানোর জন্যে ধরিনি এই কলম। একটু স্বাদ এতে আছে বই-কি।

প্রণয় বলব না, ভাবই বলব। অনেকদিন ধরে যাতায়াতে ছবির ছোড়দা মলয়ের সঙ্গে প্রথমে খুব আলাপ হয়ে গেল কাঞ্চনের। তারপর ভাব হয়ে গেল আমাদের নায়িকার সঙ্গে।

ছবি বলল, তোমার চোখ-দুটো অত বড় বড় কেন?

—কেন? তোমার চোখ অমন ছোট্ট যেজন্যে।

চটে গেল ছবি। গুম হয়ে দাঁড়াল। কেন, অন্য কথা বলতে পারল না কাঞ্চন? বললেই পারত, চুলগুলো তোমার কোকড়া কেন, কপাল অমন ছোট কেন—

হায় রে কপাল! ছবির মনে-মনে যা ইচ্ছে, তা জানবে কি করে ঐ ক্ষুদে ছেলেটা! তার চোখ-দুটো বড় ব'লে সেই চোখের তেজও কি হবে ডবল? সেই চোখ কি একজনের হাড়-চামড়া ভেদ করে বুকের ভিতরটায় গিয়ে পৌঁছতে পারে?

কাঞ্চনের গায়ের ছোট জামাটায় হাত দিয়ে ছবি বলল, বিশ্রী। কে বানিয়েছে রে?

ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন বলল, মা। মা সেলাই করে দিয়েছে।

খিলখিল করে হেসে উঠল ছবিরানী। হাসতে হাসতে বলল, এর চেয়ে গেঞ্জি গায়ে দেওয়া ভাল। ছোড়দার মত গেঞ্জি কিনে দিতে বললেই পার তোমার মাকে!

কাঞ্চন বুঝি একটু দম নিল, দম নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বোলো তোমার বাবাকে একটা হাতী কিনে দিতে।

চোখ দুটো নেচে উঠল ছবির, বলল, সে কি? কেন?

—হাতীতে চড়ে ইস্কুলে যাবে। মাস্টার-পাড়া থেকে এতটা রাস্তা হেঁটে ইস্কুলে যেতে লজ্জা করে না?

ছবি যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল, হেঁটে যাব কেন? আমি তো ইস্কুলের গাড়িতে যাই—ইস্কুলের পালকি-গাড়ি।

আর কোনো কথা বলল না কাঞ্চন। নিজের গায়ের ফতুয়ার দিকে সামান্য একটু তাকাল। একটু গুম হয়ে দাঁড়াল।

ছবির বাবা ক্রমে জেনে নিলেন কাঞ্চনদের সব কথা। কাঞ্চনের বাবা নাকি নগদ টাকা কিছু রেখে যাননি, কিন্তু জায়গাজমি রেখে গেছেন। ধানজমিও আছে। ওরই আয় থেকে সংসার চলে। সব দিদিরাই থাকেন তাদের শ্বশুরবাড়িতে, বড় দিদি বরাবরই এখানে। তাঁরাই জায়গাজমি দেখেন। কিন্তু দিদিটা নাকি কেমন, বছরের ধান আসে জমি থেকে—তা চুপে চুপে বিক্রি হয়ে যায়; আর যা-যা আয় সবই দিদির হাতে আসে। কাঞ্চনের মার অবস্থা তাই বড় খারাপ। ছেলেটাকে নিয়ে তিনি বিব্রত।

ভাগ্নেদের সব নতুন গেঞ্জি কেনা হয়েছে। কাঞ্চন তা দেখল গুম হয়ে বসে। কিছুক্ষণ পরে মার কাছে এসে বলল, মা, আমাকে গেঞ্জি দাও।

—দাঁড়া। দাঁড়া। গেঞ্জি কেন, ওর চেয়েও ভালো জিনিস আমি তোকে তৈরি করে দিচ্ছি।

পুরনো কাপড় ভাঁজ করে কাটেন তিনি, ছাঁটকাট জানা নেই, কেমন যেন হয়ে যায়। তবু, পাড়ের সুতো তুলে তিনি সেলাই করেন নতুন জামা। শাদা কাপড়ের উপর শাদা পাড় হলে মানাত হয়তো, কিন্তু কখনো-কখনো নীল বা লাল সুতোও দিতে হয়—সব সময় শাদা পাড় পাওয়া যাবে কোথায়?

এমনি-একটা ফতুয়া দেখেই সেদিন হেসেছিল ছবিরানী। ছবিরানী যদি জানত, কিংবা সে যদি বুঝত, তাহলে বুঝি অমন হাসি হাসত না সে।

মহেন্দ্রবাবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বসে কী-যেন ভাবছিলেন। ডাকলেন, ওহে কাঞ্চনবাবু, বলি, পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

স'রে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন বলল, ভালো না।

—কেন?

—ইচ্ছে করে না পড়তে।

—তবে, মস্ত মানুষ হবে কী করে?

—চেষ্টা করে, কষ্ট করে।

হেসে উঠলেন মহেন্দ্রবাবু, কাঞ্চনের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, পাগোল। পড়তে ইচ্ছে করে না কেন?

একটু থেমে কাঞ্চন বলল, কী জানি। রাতদিন রেগে থাকতে ইচ্ছে করে।

সোজা হয়ে বসলেন মহেন্দ্রবাবু, শব্দ করে হেসে উঠলেন এবার, বললেন, সে কি, কার উপর রাগ?

ঠোঁট উল্টাল কাঞ্চন, বলল, কী জানি।

—কেন, মার উপর নাকি?

মাথা নাড়ল সে, নাকের মধ্যে দিয়ে শব্দ করল উঁহুঃ।

বুঝতে পারলেন বুঝি মহেন্দ্রবাবু। তাই আর হাসলেন না। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন নস্য।

ছেলেটার উপর তাঁর বুঝি মমতা হয়েছে। মমতা যে হয়েছে তা তাঁর কথাতেও বোঝা যেত। ছবির মায়ের কাছে তিনি কাঞ্চনের কথা রোজই বলেন। বলেন, ছেলেটা মানুষ হলে ওর মা বেঁচে যান। এমনিই হয় নাবালকের বিষয়-আসয়—

কাঞ্চনের পরীক্ষার ফল বেরুলে ছবির বাবা সবচেয়ে আগে তার খোঁজ নিতে বেরুতেন। ফিরে এসে ছবির মাকে বলতেন, বেশ পাস করেছে, ভালোভাবেই। পড়তে ইচ্ছে করে না নাকি ওর, ইচ্ছে যদি করত তাহলে হয়তো—

ছবি শুনত সব। বাবা-মায়ের চাপা-গলার আরো অনেক আলোচনা সে শুনে ফেলেছে। মানে যে কিছু বোঝেনি, এমন নয়। এর মধ্যে তারও তো হয়েছে ক্লাস এইট, কাঞ্চন এখন টেনএ।

এ-আলোচনা শোনার পরের দিন কাঞ্চনের সামনে গিয়ে অন্যদিনের মত সহজভাবে দাঁড়াতে তার কেমন যেন, কি বলে গিয়ে, একটু বুঝি লজ্জাই করেছিল।

এখানেই যদি কথা শেষ করে দিয়ে লিখি? নটেগাছটি মুড়ল, তাহলে হয়তো, তুমি বাঁচ। এই কাগজগুলো তাহলে হয়তো পাশের ঐ মুদির দোকানে পাঠিয়ে দিতে পার মোড়ক করার জন্যে।

কেন, এই কাগজেই বুঝি মোড়ক হয়, তোমার লেখা গল্পের কাগজগুলোয় বুঝি মোড়ক হয় না? ও-কাগজ বুঝি আমার এ কাগজের চেয়েও ঠুনকো? কী জানি বাপু, ভাষা পাচ্ছি নে। ভাষার ব্যবসা কর তোমরা, তোমাদের কথা কী। আমরা আদার ব্যাপারী। কাগজ বুঝি ঠুনকো হয় না, ঠুনকো বুঝি কাঁচ আর পেয়ালা-পিরিচ? অত ভুল টুল ধোরো না। মানে বুঝতে পারলেই হল।

একজন কি বলেছিল জান? একদিন আকাশে মেঘ করে উঠেছিল সাংঘাতিক, এক নিমেষে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল চারধার। সেই তোমার সেই মুগদুম-সাহেবের দরগার কাছের ঐ মেঘের মত মেঘ হয়েছিল সেদিন একটা যেন প্রলয় আসছে এইরকম অবস্থা। আমি ঘরের এক কোণে বসে টেবিল-ক্লথে ফুল তুলছিলাম। লোকটা জানলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ মেঘের ঐ আস্ফালন দেখে বলে উঠল—এদিকে এস, দেখে যাও কী ব্যাপার, কিরকম মেঘ করেছে—যেন অগ্নিকাণ্ড।

কথা শুনে হেসে উঠেছিলাম আমি। নামবে বৃষ্টি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে অগ্নি-কাণ্ড?

পরে ভেবে দেখেছি, কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। ঐ ভয়ংকর ঘটনার সঙ্গে আগুনের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও ব্যাপারটাকে বোঝানোর পক্ষে ওকে অগ্নি-কাণ্ড বলায় ত্রুটি হয়নি কোনো।

তুমি তো ভাষার ব্যাপারী, বল-না, সত্যিই কি ত্রুটি হয়েছিল কোনো?

বেশ, না দিলে উত্তর। চাইনে এর জবাব।

কিন্তু, আমরা এইসব কথা নিয়ে যখন ব্যস্ত সেই ফাঁকে কিন্তু ওদিকে সত্যিই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে অগ্নিকাণ্ড।

বড় হয়ে গিয়েছে ছবিরানী, মস্ত হয়ে গিয়েছে আমাদের কাঞ্চনকুমার।

আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠেছে আমাদের নায়িকা, সেই শিখাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের নায়ক পুড়িয়ে ফেলেছে তার পাখা।

অর্থাৎ কিনা, সে-ছবি এখন আর সে-ছবি নেই। তখন সে যদি ছিল পুতুল, এখন সে হয়েছে প্রতিমা। তার ছোট-ছোট চোখ-দুটি কালো কালো বাঁকা ভুরুর নীচে দুটো শুকতারার মত জ্বলজ্বল করে উঠেছে। কালো রামধনু দেখেছ? দেখনি। দেখবে কী করে, ঘাড় গুঁজেই নাকি বসে থাক সারাদিন, মাথা না তুললে কি দেখা যায় কিছু। ছবিরানীর ভুরু-দুটি যেন সেই কালো রামধনু!

কালী শুকিয়ে গেল আমার। দাঁড়াও, একটু জল ঢেলে নিই দোয়াতে। লেখা একটু ফ্যাকাশে হয়ে যাবে কিন্তু এবার। আগেই বলে রাখছি। রাগ করতে হয়, কোরো: বিরক্ত হতে হয়, হোয়ো। কিন্তু দোহাই, হেসো না।

সেই যে দরগা তারই দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঞ্চন প্রতিজ্ঞা করার মত করে বলল, অনেক বড় হব আমি, ছবি। বড় আমাকে হতেই হবে। তখন তুমি হবে আমার—

কাঞ্চনের হাত-দুটি ধরা ছিল, সেই হাত আরো শক্ত করে ধরে ছবিরানী বলল, কি হব?

ফিসফিস গলায় কাঞ্চন বলল, সঙ্গিনী। সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে এমব্যাঙ্কমেণ্টে। পদ্মার বাঁকের গায়ের বটগাছের ডালে জমায়েত হয়েছে শহরের পাখিরা। চারদিক ছমছম করছে, ওদিকে ডেকে উঠেছে ঝিঁঝি।

ছবিরানী বলল, তখন কেন। তার আগে থেকে কেন না? তুমি বড় হবে, তোমার সে-চেষ্টায় আমি তাহলে সাহায্য করব কী করে?



দুজনে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। এ-অন্ধকারে ওদের দেখার জন্যে চোখ মেলে নেই কেউ। কেবল ঐ ডালিমগাছের গায়ে এক ঝাঁক জোনাকি ঝিলমিল করে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল।

তোমাদের পেয়াজ-রসুন-গরমমসলা দেওয়ার এ কিন্তু মস্ত সুযোগ। তুমি হলে নিশ্চয় দিতে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। পুরুষেরা যা পারে, মেয়েদের কি তা সাধ্য। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করব, সত্যি ঘটনা হলেও এখানে ওসব দিলে সত্যের কোনো অপলাপ হত না।

নিউ হস্টেলের গা ঘেঁষে গিয়েছে যে-রাস্তাটা, পাড়াটার নাম আজ মনে পড়ছে না, সেই পথ ধরে এগিয়ে তারা দুজনে সদর রাস্তা ক্রস করে ওপারে গিয়ে হাজির হল বরেন্দ্র-রিসার্চ সোসাইটির সামনে। গেট খোলা ছিল, দুজনে গিয়ে বসল তার মাঠে।

দালানের বারান্দায় দাঁড় করানো কালো পাথরের মূর্তিগুলো জমাট ছায়ার মত রূপ ধরে দেখতে লাগল এদের।

গদগদ গলায় কাঞ্চন বলল, তুমি ঐ মূর্তি। নিরেট নিটোল নিখুঁত—

বাধা দিল ছবি, বলল, থাক্। পাথর হতে আমি চাইনে। আমি অত কঠিন না।

এর পরে কি হল, সেকথা কি আবার লিখে জানাতে হবে। সে যে পাথর নয়, সে যে মোমের মত মোলায়েম আর ননীর মত নরম—বার বার হলপ করে বলতে লাগল কাঞ্চনকুমার। শুধু কি মুখে বলা, সেই মোমে আর ননীতে নিজেকে মাখামাখি করে নিতে লাগল সে পাগোলের মত।

বলতে লাগল, ধন্য হয়ে গেল জীবন। শত ধন্যবাদ তোমাকে।

এর পরে, আরো কতদিন, আমরা এদের দেখেছি শহরের অন্য প্রান্তে। পাঁচানির মাঠ পেরিয়ে দুটি ছায়া অঙ্গাঙ্গী মূর্তিতে হেঁটে চলেছে তালাইমারীর শ্মশানের দিকে।

যেখানে যত নির্জন জায়গা আছে, তারা খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছে সব। এদিকে কেটে চলেছে দিনের পর দিন।

পি এন গার্ল স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে ছবিরানীর। বছর দু-তিন হল। আর তাকে পড়াচ্ছেন না তার বাবা।

কাঞ্চনকুমার লোকনাথ ইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে এখানকার কলেজে দু বছর পড়েছিল। কিন্তু আই এস-সি ফেল করার পর সে চলে গিয়েছে কলকাতায়। কোথায় থাকে সে সেখানে, কে দেয় পড়ার খরচ—সেসব ছেঁড়া কথায় কাজ নেই আমাদের। আসল কথা, রামপুর-বোয়ালিয়ার পাট তার উঠেছে।

কবে হবে সামার ভেকেশন, কবে হবে পুজোর ছুটি—এদিকে, ছবিরানীও যেমন গুনতে থাকে দিন, ওদিকে আমাদের নায়কও বুঝি তেমনি তাকিয়ে থাকে ক্যালেণ্ডারের দিকে।

মহেন্দ্রবাবু প্রায়ই কথা তোলেন কাঞ্চন-কুমারের। ছেলেটার উপর তাঁর অনেক ভরসা। কিন্তু হঠাৎ কী করে ফেল করে গেল ও, কিছুতেই যেন বুঝতে পারেন না উনি।

তাঁর মনের মধ্যে যে-ইচ্ছেটা আছে, তার কথা কারো অজানা নয়। ছবিও তা জানে। এবং জানে বলেই, হায় রে হতভাগী, সে তার মনপ্রাণের সবটুকুই ঢেলে দিয়েছে ওর পায়ে। শুধুই কি মনপ্রাণ—কিন্তু সে কথা থাক্।

কত কী যে অছিলা তৈরি করে ছবি তার কি ঠিক আছে?—বড়কুঠিতে চামেলী-দের ওখানে যাচ্ছি মা; মালোপাড়ায় এলাদের বাসা থেকে ঘুরে আসি; ধর্মসভায় আজ কথকতা আছে জান না?—কতদিন কত মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে তাকে, কে শেষ করবে গুনে?

কিন্তু আসল কথা, কলকাতা থেকে কাঞ্চনকুমার এসেছে গরমের ছুটি কাটাতে।

ধর্মসভায় তখন কথকতা চলেছে—

রাই চলেছেন।
নীলাম্বরীতে অঙ্গ ঢেকে অন্ধকারে
রাই চলেছেন।
অভিসারে রাই চলেছেন।

কিন্তু তাদের কথকতা চলেছে তখন পদ্মা-কিনারের চালাতে—সম্মুখে মৃদঙ্গ করতাল বাজাচ্ছে ঐ পদ্মার ঢেউ।

—তোমার বড় হতে আর কত দেরি?

—দেরি নেই। এবার বি-এ দিচ্ছি। তার পরেই ভর্তি হব এম-এ ক্লাসে। দু বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ছবিরানী।

ঐ নিঃশ্বাস বুঝি হঠাৎ শুনে ফেলেছে কাঞ্চন। শুনতে পাওয়ার তো কথা না। ওই ঢেউয়ে বেজে চলেছে যে-বাজনা, তার শব্দের মধ্যেই তো ডুবে যাওয়ার কথা ঐ নিঃশ্বাসের শব্দ।

সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে কাঞ্চন বলল, তোমার চেয়ে বেশি অধীর আমি, এ-কথা জেনে রেখো, ছবি। তা না হলে ছুটে ছুটে আসি কখনো? কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—জীবিকা চাই। জীবিকা না হলে জীবনের কোনো মানে নেই। কাপড়ের পাড়ের সুতো দিয়ে জীবনটা সেলাই করে করে চালানো বড় কষ্ট।

চঞ্চল হয়ে উঠল ছবি। তার বাল্যের একটি দিনের কথা মনে পড়ে গেছে তার। সে-কথা মনে পড়ায় সে বুঝি লজ্জা পেল। বলল, ছি। ওসব ভাবতে নেই। দুজনে মিলে আমরা—

তার কথায় বাধা দিয়ে কাঞ্চনকুমার বলে

উঠল, কি করব? রেশমি সুতোয় বুঝি এমব্রয়ডারি করে নেব এই জীবন?

কি ভেবে ও-কথা বলল কাঞ্চন, বুঝতে পারল না, ছবিরানী। ব্যঙ্গ করল, না, বিদ্রূপ করল—কে বলবে। তবু ছবি উত্তর দিল, বলল, হ্যাঁ। রঙিন সুতো দিয়ে সাজিয়ে তুলব এই জীবন।

—বেশ। তাই হবে। কানঞ্চকুমার বলল, আজকের এই ইচ্ছে আসছে-কাল তো ভুল হয়ে যাবে না? কথা দাও ছবি; প্রতিজ্ঞা কর।

আশ্চর্য হল ছবি, অন্ধকারেই কাঞ্চনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, প্রতিজ্ঞা আবার কিসের?

একটু চুপ করে থেকে কাঞ্চন বলল আমার বড় ভয় করে। তুমি যদি কথা না রাখ, যদি পর হয়ে যাও। যদি তুমি চলে যাও অন্য কোথাও। তবে, আমার কি হবে ছবি?

হঠাৎ কাঞ্চনের এই কথা শুনে ও তার এই ভাব দেখে ছবি আশ্চর্য হয়ে গেল।

সারা বোয়ালিয়ায় রটে গেছে তাদের এই কথা, তাদের এই ভাবের কথা, তাদের এই ভাবনার কথা। যত অন্ধকারকে আড়াল করেই তারা চলাফেরা করুক-না, তবু এসব কথা জানতে বুঝি বাকি নেই কারো। বলো-না, অন্ধকারের কি চোখ থাকে? তাহলে আমার গল্পের নায়ক-নায়িকার এই কাণ্ড জানাজানি হল কী করে?

ছবির বাবার পয়সাকড়ি অনেক। তাঁর মেয়েকে তিনি বিয়ে দেবেন কত বড়ঘরে। সেই মেয়ে কিনা, অমন-একটি দীনদুঃখীর এক গোঁয়ার ছেলের সঙ্গে ভাব জমালো। এতে সারা শহরে মনোদুঃখের আর অন্ত নেই।

আর, জমাবি তো জমা, ধরা পড়িস কেন। এ ধরনের ঠিক একটা ঘটনাই কি তখন ঘটেছে ঐ শহর-বোয়ালিয়ায়? আরো হয়তো কত ঘটেছিল, কিন্তু সে-সবের কথা জানে না কেউ, তাই সে-সব নিয়ে মাথাব্যথাও নেই কারো।

মাথা ধরে যায় ছবিরও। তার কানে একে-একে এসে পেঁছয় কত কথা। কিন্তু মনের সে অশান্তির আর কষ্টের কথা সে বলবে কার কাছে? একমাত্র যার কাছে বলতে পারে, সে যে তখন অনেক দূরে। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই আছে বুঝি সে। কলকাতা-শহর তো রামপুর-বোয়ালিয়ার মত এমন ক্ষুদে জায়গা না—কত লোক সেখানে, কত বন্ধু তার।

ডাকে চিঠি আসে তার কাছে বিনুদের বাড়িতে। বিনু থাকে তার অথর্ব বুড়ি পিসিমার কাছে। তাদের বাড়িতে দ্বিতীয় মানুষ আর কেউ নেই।

ছবি চলল বিনুর কাছে। বড়কুঠিতে। বেশি দূর না। মাস্টারপাড়ার পিছনের গলি

দিয়ে গেলেই ভোলানাথ হাইস্কুলের লাগোয়া টালির একটা ছোট বাড়ি—সেই বাড়ি বিনুর।

পিঠের উপর লম্বা চুল ছড়িয়ে দিয়ে বিনু চুল শুকোচ্ছিল। পায়ের শব্দ শুনে চমকেই উঠল বুঝি বিনু, ছবিকে দেখে বলল, কি রে, হঠাৎ এ-সময়ে এলি?

দাওয়ার উপর বসল ছবি খুঁটিতে হেলান দিয়ে, বলল, এমনি। আসতে নেই বুঝি?

বাঁ হাতের উপর দিয়ে চুল জড়িয়ে নিতে নিতে বিনু হেসে উঠল, বলল, তা আসতে আছে বই-কি। কিন্তু তিনি তো আসেন নি?

—তিনি কে বিনু?

রসিকতা করল বিনু; বলল, তিনি মানে তোমার পত্র—তোমার কর্তার চিঠি।

এই কথা শুনে বুকের ভিতর কেমন যেন করে উঠল ছবিরানীর। কুমারী মেয়ে সে, তার আবার কর্তা কে? বিনু অমন কথা বলে কেন?

কালোকুলো দেখতে, বেশ ভারিসারি চেহারা বিনুর। অনেকটা জায়গা জুড়ে সে জোড়াসন হয়ে বসল ছবির সামনে। বলল, বলি, কর্তা কি হয় শুধু শাঁখ বাজালেই? মন্তর পড়লেই? কর্তা হয় কর্মে। কি বলিস?

হাসতে লাগল বিনু। ঐ হাসিরই বুঝি কত মানে।

দুই কান গরম হয়ে উঠল ছবির। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটতে লাগল যেন কে। তার মনে পড়তে লাগল একে-একে কত কথা। মুগদুম-সাহেবের দরগা, বরেন্দ্র-রিসার্চ, পাঁচানির মাঠ, তালাইমারির শ্মশান প্রাঙ্গণ।

তুমি তো গল্প লেখ। বলো-না, একটা সামান্য কথা থেকে এত ভয়ানক-ভয়ানক কথা কেন মনে পড়ে মানুষের।

পড়তে পারছ তো আমার এই গল্প? ফিকে কালীর আবছা হরফ পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না তো কোনো?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছবি জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বিনুদি, তুমি কখনো প্রেমে পড়েছ?

বিনু বুঝি আকাশ-পাতাল একটু ভাবল, বলল, আমার বয়স হল এই সাতাশ। কুড়ি বছর আগে পড়েছিলাম বটে একবার। আমার এই পিসিমার ছোট জায়ের ছেলের সঙ্গে—ছোঁড়াটার বয়স বুঝি তখন দশ। খুব খেলে বেড়াতাম দুজন এক সঙ্গে, খুব মারামারি করতাম। তখনই বুঝিনি বটে, পরে বুঝেছি—প্রেমটা নেহাতই ছেলেখেলা, একটু বুদ্ধি হলে আর একটু বয়স হলে ওর মধ্যে যেতে নেই।

ছবি উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল, কেন, কেন বিনুদি।

গুম হয়ে বসে রইল বিনু। কোনো উত্তর দিল না। এলোখোঁপাটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চওড়া পিঠের উপর।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিনু বলল, চিঠি না পেয়ে বুঝি ব্যস্ত হয়েছিস? ভাবনা কি, এসে যাবে। এলে দিয়ে আসব চুপ করে।

সেইদিনই ছবি একটা লম্বা চিঠি লিখল কাঞ্চনকে। কাঞ্চনের সব প্রতিজ্ঞা, তুচ্ছ সব শপথ, তার সব, কি বুঝে গিয়ে প্রতি-শ্রুতি—তাকে মনে করিয়ে দিয়ে। আরো লিখল, এবার গরমের ছুটিতে তো এলে না, পুজোর বন্ধে কি আসা হচ্ছে, মহারাজ?

উত্তর এল—নিশ্চয় মহারানী। আমার হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী যেন মনে রাখেন যে, তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত এ-রাজ্যের অরাজকতা ঠাণ্ডা হবে না!

বাব্বা, কী কঠিন ভাষা ঐ চিঠির, আর কী গভীর ভাব। চিঠিটা পেয়ে ছবির চোখে জল এল আনন্দের। ঐ চিঠিটা বিনুকে পড়ে না শোনানো পর্যন্ত যেন শান্তি নেই তার মনে, তার বুকের মধ্যেও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বুঝি সাংঘাতিক অরাজকতা।

ডুগডুগ-ডুগডুগ-ডুগডুগ শব্দে বেজে উঠেছে ডুগডুগি। উঁকি দিল ছবি জানলা দিয়ে।

বানর নাচাচ্ছে রাস্তার ধারে বুড়ো বানর-ওলাটা। অনেক কাচ্চাবাচ্চার ভিড় জমেছে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—একটা দড়ি ধরে টেনে-টেনে যা যা করতে বলছে বানরটাকে, জন্তুটি ঠিক তাই করে চলেছে। —এক লাফে যাও লঙ্কা, আনো সীতামাই—যা বড়িয়া—এবার, সেলাম কর বড়াবাবু-জিকে, সেলাম কর মহারাজজিকে—

চমকে উঠল ছবিরানী। তার পিঠের উপর এ কার হাত।

বিনু হেসে উঠল, বলল, বাঁদরী। ঐ নাচ নাচছিস, ও আর দেখার কী!

আবার বুঝি চমকাল ছবি। এ কী কথা বলছে বিনুদি। এ কথার মানে কী।

বিনু হেসে উঠল আবার, বলল, পা টিপে-টিপে দেখতে এলাম কি করছিস। রাগ করিস নে ছবি। তোর চিঠিটা আমি পড়েছি। লোভ সামলাতে পারলাম না। ঐ চিঠি পেয়ে তোর খুশী লেগেছে কেমন, দেখারও লোভ হল।

রাগ করল না ছবি, ডবল আনন্দ হল বুঝি তার, বলল, পড়েছ?

—হ্যাঁ। জলে ভিজিয়ে খুলেছিলাম, আবার বন্ধ করে শুকিয়ে—

বিনুদির গায়ে একটা চাপড় দিয়ে ছবি বলে উঠল, বড় অসভ্য হচ্ছ তুমি বিনুদি।

—তুমি মহারানী হচ্ছ, তুমি সম্রাজ্ঞী হচ্ছ। আমাদেরও তো কিছু-একটা হতে হয়। কি বল ছবিরানী।

আহ্লাদে গলে যেতে লাগল ছবি। কিন্তু বিনুদি কেমন-যেন গম্ভীর হয়ে রইল। রাস্তার ধার থেকে ডুগডুগির শব্দ আসছে তখনো।

বিনুদি বলল, সেলাম কর মহারাজাজিকো।

তার এ কথার মানে বুঝল না ছবি। বিনুদির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিসিমার জায়ের ছেলে এখন কোথায় থাকে, বিনুদি।

দেয়ালের দিকে ফাঁকা দৃষ্টি মেলে বসে ছিল বিনুদি, ঠোঁট উল্টে বুঝি তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল, কি জানি!

এর পরে মহারাজজির কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেতে অনেক দেরি হতে লাগল আমার নায়িকার। বেচারি চেয়ে থাকে চিঠির পথ চেয়ে কখনো তাকায় দূরের ঐ ইস্টিমারঘাটের দিকে, কখনো গুনতে থাকে পদ্মার ঢেউ।

ঝরঝর করে জল ঝরে ছবিরানীর চোখ থেকে। কোনো অমঙ্গল হয়নি তো কাঞ্চনের। এত দেরি তো হয় না চিঠির জবাব আসতে।

বর্ষার জল দিয়ে আরম্ভ হল গল্প, ছবিরানীর চোখের জল দিয়ে বুঝি—

আর থাক্। আর ভালো লাগছে না লিখতে। এখানে মুড়িয়ে ফেলি আমার নটেগাছটি। ছবির কথা আর জানতে চেয়ো না। কী হল তার, এবার শুধু আন্দাজ করে নাও।

রামপুর-বোয়ালিয়ার এলাকা থেকে কোন্ দূর দেশে চলে গেল সে—সে দেশের নাম জেনে আমাদের লাভ কি। তার চোখের থেকে যদি জল পড়েই থাকে, তার কথা ভেবে আমাদের চোখে জল আসবে কেন। তার দুঃখ তার, আমাদের সুখ আমাদের। কি বল তুমি?

পনেরো ষোলো সতেরো কি আঠারো বছর কেটে গিয়েছে এর মধ্যে। এই লম্বা সময়ের মধ্যে ছবির জীবনে কি কি ঘটনা ঘটল, সে-সব না জানলেও আমাদের এ-গল্পের কোনো ক্ষতি হবে না নিশ্চয়? তুমি গল্পলেখক, তুমি নিশ্চয় আমার চেয়ে ভালো বুঝবে। বলো না, ক্ষতি কি কিছু আছে এতে?

মাস-কয়েক আগে ঠেলাগাড়িতে করে হাঁড়ি-পাতিল মাদুর-বিছানা উনুন-কড়াই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এল। তুমি তখন তোমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য করনি নিশ্চয়। অত ছোটখাটো জিনিস লক্ষ্য করতে গেলে কি গল্প লেখা যায়? বুঝি। কত বড় বড় জিনিস তোমাকে ভাবতে হয়, কত মস্ত মস্ত ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তোমাকে।

শুনেছি, তোমার নাকি খুব দয়া, তোমার নাকি খুব মায়া, তোমার নাকি খুব মমতা। কাউকে নাকি আঘাত দিতে পার না তুমি। বড় খুশী হচ্ছি শুনে। বলো, খুশী হব না?

তোমার মা বেঁচে আছেন? তিনি তোমার কাছেই থাকেন তো? জানতে ইচ্ছে করছে।

কোনো ভিখিরি নাকি ফিরে যায় না তোমার দরজা থেকে। তোমার বারান্দায় বসে গরিব-দুঃখীরা নাকি পেট ভরে খেয়ে যায়। শুনে, কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার, কী করে বোঝাব।

পাড়ার বাচ্চাকাচ্চাদের নাকি খুব ভালোবাস তুমি। একটা আধপাগলা ছেলে দিন-কয়েক হল তোমাকে নাকি খুব বিরক্ত করছে, তুমি নাকি বিরক্ত হচ্ছ না। হাবাগোবা ছেলেটিকে তুমি নাকি ভালোবাসছ খুব। নতুন দেখছ তাকে, তাই কত কথাই নাকি জিজ্ঞাসা কর তাকে। কিন্তু একটা কথাও বোঝে না ও, উত্তরও নাকি দিতে পারে না। বছর-বারো বয়স ছেলেটার, এখনো লাল ঝরে মুখ দিয়ে—তুমি নাকি তোমার কোঁচা দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছ তার মুখ, তোমার ঘেন্না করেনি। শুনে, আমার কত-যে গর্ব হচ্ছে, কী করে বুঝিয়ে বলব।

তোমাকে মিথ্যেবাদী বলেছি মাপ কোরো। গল্প লিখতে গিয়ে একটু মিথ্যে না মেশালে বুঝি চলে না। লিখতে বসে বুঝলাম। আমার গল্পের নায়ক-নায়িকার নাম একটু বদলে দিতে হয়েছে। একে কি তুমি মিথ্যে বলবে? এর জন্যে কি পুরো গল্পটাই মিথ্যে হয়ে গেল?

লেখকের জীবনের ছায়া নাকি পড়েই তার লেখায়? আমার লেখা গল্পে রসুন-পেঁয়াজ নেই, একেবারেই নিরামিষ—সে বুঝি এইজন্যেই।

নতুন টান হয়েছে তোমার যে-ছেলেটার উপর তার হাত দিয়েই পাঠালাম লেখাটা। কেমন লাগল কী করে জানাবে? কিন্তু জানার যে আমার খুব ইচ্ছে। এরকম ইচ্ছে কি হয় না লেখকদের? বলো-না, বলো-না গো।

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১. বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

কলকাতা শহরে আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টার যে নিজস্ব একটা নাট্যমন্দির চাই সে সম্বন্ধে দেখেছি বহু সাধারণ দর্শক থেকে অসাধারণ জ্ঞানীগুণী দর্শকদের পর্যন্ত কারোরই কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং সমাজের এতো বেশীসংখ্যক লোকের চিন্তায় যখন এ ব্যাপারটা আশু ঘটা উচিত বলে মনে হচ্ছে তখন সেটা বাস্তবে ঘটবেই, হয়তো আজ না হয়ে কাল হবে, কিন্তু হবেই। এটা ইতিহাসের একটা নিয়ম।

কিন্তু কামনা পূরণ করবার একটা পদ্ধতি আছে ভবিতব্যের। আমরা যা চাই তা পাই। কিন্তু পাবার পর দেখি যে, চাওয়া আর পাওয়ায় একটা মস্ত অমিল রয়ে গেছে। যেন এই পাওয়া-টা আমার চাওয়া-কে ব্যঙ্গ করার জন্যেই জন্মাল।

আমাদের ছোট ছোট ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যাবে যে, যে-জিনিস আমরা প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছি তা কখনো না কখনো পেয়েছি। কিন্তু পেয়ে মনে হয়েছে, এতো তা নয়। যেমন, আমি দেখেছি, দারিদ্র্যের গ্লানির মধ্যে একজন মানুষ পণ করল অর্থোপার্জনের, যাতে তার স্ত্রীকে, সন্তানকে নিয়ে সুখে এবং স্বচ্ছন্দে বাঁচতে পারে। অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম ও বাধ্য-হয়ে-অনেক-শঠতা-নীচতার পর পয়সা এল পনের বছর পর। বাড়ি হল, গাড়ি হল, বাগান হল। কিন্তু মুক্ত-বিবেকের যে-তরুণ মন স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বাঁচতে চেয়েছিল সে তখন আর নেই। বাগানে ব'সে ঘাস দেখে, গাছ দেখে অকারণ খুশী হয়ে উঠবার ক্ষমতাই আর তার নেই। বয়স চলে গেছে পয়তাল্লিশের কাছে, আর চারিদিকের সকলকে সন্দেহ করতে করতে মন হয়ে গেছে আবিল। আজ তাই বাড়ি গাড়ি পরের কাছে নিজের জৌলুসের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্যে, বাঁচবার সুখের জন্যে নয়।

এ এক ট্র্যাজেডি। এবং এ ট্র্যাজেডি ঘটে জীবনের সর্বঘটে। যা কিছু বিশেষভাবে কামনা করা যায় তারই মধ্যে এই ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত থাকে। কিন্তু এ প্রবন্ধ যে-কালে দার্শনিক প্রবন্ধ নয়, সে-কালে এই তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ স্থগিত রেখে আমাদের আদি কথার জের টেনে ভাবা যাক যে, আধুনিক নাট্যমঞ্চ যেদিন গ'ড়ে উঠবে সেদিন এই ট্র্যাজেডি যাতে না ঘটে তার জন্যে কী করা যায়।

দেখা যায়, এ ট্র্যাজেডি ঘটে দুটো মুখ্য কারণে। এক, আমাদের আকাঙ্ক্ষার রূপটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট থাকে না, আর দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের গতিছন্দের সংগে আমাদের আকাঙ্ক্ষার রূপটিকে মিলিয়ে দেখি না। অর্থাৎ, খুব সহজ উদাহরণ যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তার উল্লেখ করে বলা যায়,—বহু যুবক ও যুবতীর মধ্যে উদ্দাম কল্পনা দেখা যায় যে তারা ভীষণ প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করবে এবং একটা অপূর্ব সুখোপ্লুত দাম্পত্যজীবন আমরণ উপভোগ ক'রে যাবে। কিন্তু সেই দাম্পত্যজীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপের কথা দূরে থাক, তার মূল কাঠামোর রূপটার সম্পর্কেই তাদের অনেকের কোনও ধারণা স্পষ্ট থাকে না। কেবল অজস্র বিভিন্ন গল্পে-পড়া প্রেমের দৃশ্যের আবছায়া রোম্যাণ্টিক আবেশ থাকে। ফলে, পুরুষ চায় যে, নারী কখনো কখনো তার মায়ের মতো সুপটু গৃহিণী হয়ে তার খোকামিকে প্রশ্রয় দেবে, আবার কখনো ভক্ত

আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টার একটি সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত—বহুরূপীর 'পুতুল খেলা'র সেট

উপাসিকার মতো তার কাল্পনিক পৌরুষের মহত্ত্বের পায়ে নিজেকে নিঃসহায়ভাবে উৎসর্গ ক'রে দেবে। নারীও তেমনি চায় যে, স্বামী তার পিতার মতো হয়ে তার গৃহকর্মের যাবতীয় অপটুতা সকৌতুকে ক্ষমা ক'রে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবে, আবার কখনো কখনো অন্ধ উন্মত্ত স্তাবকের মতো তার পিছু পিছু সামান্য প্রসাদ ভিক্ষা ক'রে ঘুরে ঘুরে মরবে। এবং এই বিপরীতমুখী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যখন বিয়ের দু বছরের যেতে না যেতেই দুজনের মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে তখনও তারা কেবল পরস্পরকে দোষারোপ করে। নিজেদের আকাঙ্ক্ষার রূপটা তখনও স্পষ্ট ক'রে দেখতে চেষ্টা করে না।

আবার কারোর কারোর মধ্যে দেখা যায় যে, আকাঙ্ক্ষার রূপটি গোড়া থেকেই স্পষ্ট। সানাইয়ের আওয়াজ দিয়ে, যুঁইফুলের গন্ধ দিয়ে, শ্রোণীভারাদলসগমনার এমন একটা সর্বাঙ্গীণ কল্পনা করা আছে যা হয়তো এক সময়ে সম্ভব ছিল, কিন্তু আজ এই বিংশশতাব্দীর প্রৌঢ়বয়সে নিতান্তই অসম্ভব।

সামাজিক ইচ্ছেতেও এই গন্ডগোল ঘটে। দুটো মহাযুদ্ধের পর দু' দুবারই পৃথিবীর মানুষ—সাধারণ মানুষ—শান্তি চেয়েছে। দু' দুবারই কর্তারা গলার শিরা ফুলিয়ে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে প্রায় ডুকরে উঠে শান্তির কথা বলেছেন। কিন্তু শান্তি আসেনি। তার কারণ, আমাদের মতো কোটি কোটি সাধারণ লোকের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শান্তির রূপটা স্পষ্ট নয়। আর আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয় বলেই দেশবিদেশের নানা স্বার্থান্বেষী অজস্র মিথ্যা কথা বলে আমাদের চিন্তা ঘুলিয়ে দিচ্ছে এবং শান্তির পথ রোধ করছে।

বাংলার আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টার নিজস্ব মঞ্চ সম্পর্কেও তাই দেখা যায় বহুলোকের সমর্থন, কিন্তু তার রূপটি কেমন হবে তাই নিয়ে তেমনি বহুলোকের ধারণাই ঝাপসা। আর তাই কতরকম কথাই উঠে পড়ে এই বিষয়ে। কথা ওঠা ভালো। খালি ভালো নয়, কথা ওঠা দরকার, যদি সুস্থ তর্কের মধ্যে তার ঝাড়াইবাছাই হবার সুযোগ থাকে। কারণ, এ তর্কটা আসলে বাংলা নাট্যধারা কোন পথে চলবে সেই সম্পর্কেই। সুতরাং সুস্থ আলোচনা চলাই দরকার, নইলে অসুস্থ মনোভাব ভিতরকার পাঁকের মতো আমাদের সকল ভালো কাজের গায়ে ছিটকে উঠে লাগবে।

এ সম্পর্কে যতোরকম কথা ওঠে তার সবটাই বোধ হয় কারোর একার পক্ষে জানা এখনও সম্ভব নয়। আমরা আমাদের কাছাকাছি যা শুনেছি তাই খালি বলতে পারি।

একটা মত বলে যে, আমাদের মঞ্চের উচিত বিদেশী থিয়েটারের দৃশ্যপট বা আলোর জাঁকজমক ছেড়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রকরণে নাট্য-প্রয়োগ করা। যেমন হত সংস্কৃত নাটকে, যেমন আজো হয় লোকায়ত নাট্যশিল্পে, যে-রীতি ভরত মুনির নাট্য-শাস্ত্র থেকে আজো বেঁচে আছে দক্ষিণী নৃত্যের মুদ্রায়। সেই খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে আমাদের উচিত Procenium ভেঙে ফেলে Arena Theatre করা, যেমন নাকি উয়োরোপেও হচ্ছে আজকাল।

আর একদল বলেন—সিনেমার কাছে থিয়েটার যে হেরে যাচ্ছে তার কারণ সিনেমায় পাহাড় পর্বত সমুদ্র জঙ্গল থেকে ঘরের কোণ পর্যন্ত সবই দেখানো যায়। দ্যাখেন' না, ওদের দেশে তাই কী বিরাট স্টেজ করেছে, ছবিতে দেখেছেন কি Dead End নাটকের সেটটা? মস্কোতে বলশয় থিয়েটারে

একটা বন্যা দেখিয়েছিল, সে স্টেজের উপরে তিন ফুট জল উঁচু হয়ে উঠল, অথচ অডিটোরিয়ামে গড়িয়ে পড়ছে না। এর জন্যে বিরাট স্টেজ চাই যা ইলেকট্রিকে চলবে, কতো হাজার আলো চাই যা ইলেকট্রনিকে চলবে। কারণ, আসলে এটা একটা শো। এখানে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া চাই আয়োজনের প্রাচুর্যে। তা না হ'লে লোক আসবে না দেখতে। তখন ঐ এর তর দোরে গ্র্যাণ্ট্ ভিক্ষে ক'রে মিটমিট ক'রে চালাতে হবে। সেটা নিশ্চয়ই একটা উজ্জ্বল বা কাম্য ভবিষ্যৎ নয়।

উপরোক্ত এই দুটি প্রধান মতের মধ্যে আবার গুটিকয়েক উপমত আছে। কেউ বলেন—রবীন্দ্রনাথের নাট্যানুষ্ঠানের মতো মঞ্চসজ্জা হবে কেবলমাত্র ডেকরেটিভ্ এবং নাটক হবে লিরিক্যাল। কারণ, ভারতীয় নাটক গ্রীক নাটকের মতো ভায়োলেণ্ট ছিল না, ছিল কাব্যধর্মী। অন্য কেউ বলেন—রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে আজকাল বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। এক 'বিসর্জন' ছাড়া ও'র কোনও নাটকই নাটক নয়। চরিত্রগুলো স্থানু, পরিবর্তনশীল নয়। তাই বিদেশী এপিক নাটক অভিনয় ক'রে দেখাবার ব্যবস্থা হওয়া চাই, নইলে না নাট্যকার, না অভিনেতা, না দর্শক কারোরই জ্ঞান বাড়বে না।

আবার একথাও শুনেছি যে, দেশে কি আমাদের নাটকের অভাব যে বিদেশী নাটকের অভিনয় করা হবে? এগুলি খালি স্বল্পসংখ্যক চালিয়াৎ লোকের ইনটেলেকচুয়াল চুলকানি। বাংলা মঞ্চের প্রগতি হবে ইবসেন অভিনয় ক'রে?

আর একটা মত হচ্ছে যে, তিরিশ বৎসর আগে লেখা রবীন্দ্র নাটক বা আশী বছর আগে লেখা বিদেশী নাটক অভিনয় করার কী সার্থকতা? এ সমস্ত পুরনো আইডিয়া, যা আজ সমাজে অচল। তাই আজ উচিত সময়ের সংগে কদম মিলিয়ে চলা। অভিনয় করা উচিত 'ওয়েটিং ফর গোডো', বা 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার', বা 'স্টপ প্রেস' এর অনুবাদ। নয়তো আজকের বাঙালী মধ্যবিত্তের দুর্দশা আর হাহাকার নিয়ে যে অজস্র নাটক লেখা হচ্ছে তাই করা উচিত। আজকের ব্যবসায়িক মঞ্চও নাট্যপ্রগতির এই ধারা তুলে নিয়েছেন, এবং রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিতও হয়েছেন।

এই রকম সমস্ত অজস্র মতামত শুনতে শুনতে দিশেহারা হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তখন ভীষণ সন্দেহ লাগে যে বাংলা মঞ্চের কী রূপ হওয়া উচিত।

উপরোক্ত মতগুলোর সম্পর্কে বলা যায় যে, সংস্কৃতকালের নাট্যশিল্পের উজ্জীবন আজ একটা পণ্ডশ্রম। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে যে সমুদ্র বোঝাতে হাতের একটা মুদ্রা করাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকের দিনে সে-মুদ্রা কে বুঝবে? তাই আজকের দিনের লোককে বোঝাতে গেলে আজকের দিনে কনভেনশন তৈরী হওয়া চাই। এবং সে কনভেনশন একদিনে গ'ড়ে ওঠে না এবং হাতে কলমে কাজ না করলে গড়ে না।

যাত্রা করলেই থিয়েটার দেশী হয়ে যাবে এ চিন্তাও ভুল। বরঞ্চ দেখা গেছে যে থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রাই থিয়েট্রিক্যাল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া নাট্যকাররা যখন লিখতেন,—

But, look, the man in russet mantle clad walks o'er the dew of yon high eastern hill;

তখন মঞ্চ সজ্জারও প্রয়োজন হোত না, আলোকসম্পাতেরও প্রয়োজন হোত না, কিন্তু আজ নাটক লেখার ধরনই পাল্টে গেছে তাই মুড বোঝাতে আলো এবং পরিবেশ বোঝাতে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন ঘটে।

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। মঞ্চের উপর সজ্জায় ও আলোতে যে কম্পোজিশনের সুযোগ ঘটেছে সেটা নষ্ট ক'রে ইলেকট্রিকপূর্ব যুগে গেলেই কি ভারতীয়ত্বের পরাকাষ্ঠা? সংস্কৃত নাটক মঞ্চেই হোত। সেই মঞ্চকে আরও উন্নত

করার ভারই আমাদের, সেটাতে ফিরে যাওয়া নয়।

দ্বিতীয়ত, একটা জিনিস আমাদের স্পষ্ট বোঝা উচিত যে, নাট্যাভিনয় মানে জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য দেখানো নয়। নাট্যাভিনয় মানে মানুষকে দেখানো। এবং সেই মানুষের যত গভীরে যাওয়া যায় বাইরের আড়ম্বর তত তুচ্ছ হয়ে যায়। বিদেশী ফিল্মের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় Million Dollar Production, কি হাস্যকর! কারণ মিলিয়ন বা বিলিয়ন টাকা খরচার উপর তো শিল্পের মান নির্ভর করে না। রবীন্দ্রনাথ যে-কাগজে কবিতা লিখতেন সেটা সস্তাই ছিল, আর কলমটারও এমন কিছু দাম ছিল না। তাই বড়ো শিল্পী চোখ ও মন ধাঁধিয়েই দেন, কিন্তু তার জন্যে অকারণ আড়ম্বর দরকার হয় না। নাটকে যখন বন্যা আসে তখন নাটকীয় প্রয়োজনেই আসে, নাটকের চরিত্রগুলোর সেই বিপদে কী দশা হল এইটাই বর্ণনীয়। সুতরাং বন্যার ততোটুকু ইঙ্গিত প্রয়োজন যতোটুকু সেই বর্ণনীয় বিষয়কে সাহায্য করে। অযথা বন্যার উপর ঝোঁক দেওয়া কি শিল্পবিগর্হিত ক্রিয়া নয়?

কিন্তু এ-ও তো না-এর কথা, হাঁ-এর দিকটা কী? সেই সদর্থক দিকটা বুঝতে গেলে মূল সূত্রটি ঠিক করতে হবে, বুঝতে হবে নাটক কেন?

কোনও শিল্পই, যা মহত্বের দাবী রাখে, তা আমাদের বিলাসের বস্তু নয়। তারা আমাদের সাহায্য করে রিয়ালিটিকে বুঝতে। সেটা বাস্তবের বাহ্যিক রূপ নয়, তার অন্তরের রূপ, তার প্রকৃতি। তাই হ্যামলেট প'ড়ে আমরা রিয়ালিটি বুঝি, ইবসেনের নাটক প'ড়ে বুঝি, রবীন্দ্রনাথের লেখা প'ড়ে বুঝি। সেই দায়িত্বটা যদি আমরা মূলসূত্র হিসাবে ধরি তাহলেই এই মত-উপমতের ভুলগুলো সংশোধিত হয়। আমাদের কাজ নয় তৈলাধার কি পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার কি তৈল ক'রে পথহীন অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো। আমাদের কাজ নয় কেবলমাত্র নামের মোহে মুগ্ধ হওয়া, তা সে নামটা 'ভারতীয়' হক বা 'মডার্ন' হক। আমাদের কাজ হল জীবনকে বোঝা। এবং সেই বোঝবার সংগ্রামে পৃথিবীর যাবতীয় পথিকৃতের দায়িত্বের উত্তরাধিকার যে আমাদের একথা অবিস্মরণীয়।

পুরোনোর অনুকরণে একটা মূর্তি গ'ড়ে তাকে ভারতীয় ব'লে লেবেল মেরে দিলেই সেটা ভারতীয় হয় না। কারণ, তাহলে ভারতীয় মানে হয় প্রাচীনের অনুকরণ। সেটা না ভারতীয় না শিল্প। সেদিনকার ভারতীয় যেমন করে সেদিনকার রিয়ালিটি বোঝবার চেষ্টা করেছিল আমরাও যদি আজ তেমনি ক'রে আমাদের আজকের দিনের রিয়ালিটি বোঝবার চেষ্টা করি তবেই সেটা উপযুক্ত বংশধরের কাজ হবে।

এবং সেই কাজ করতে গেলে আমরা দেখি যে কিছুটা যেমন আমাদের মঞ্চের উপর illusion সৃষ্টি করতে হয়, তেমনি একটা conventionএর রীতিও গ'ড়ে ওঠা চাই। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে বা যাত্রায় দৃশ্যপটে কোনও বাস্তবতার বিভ্রম ঘটানর চেষ্টা ছিল না, কিন্তু রাজার সাজপোশাকে কিম্বা আনুষঙ্গিক দু'একটা জিনিস বাস্তবানুগ করার চেষ্টা হত। অর্থাৎ খানিকটা বিভ্রম ঘটানর প্রয়াস, আর খানিকটা যাকে বলে সর্বজনস্বীকৃত রীতি। আজও সে রকম কিছু রীতি প্রচলিত আছে। যেমন বলা যায়, যখন কোনও চরিত্রের আপনমনে কিছু ভাবার বা বলার দরকার হয় তখন সে সোজা দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে সামনের দিকে তাকায়। এটা এমনই একটা রীতি যে দর্শক বা অভিনেতা কেউই এতে বিসদৃশ কিছু দেখে না। এই রকম আরও অনেক রীতি যা আজকের দিনে মানুষ সহজে গ্রহণ করবে তা ধীরে ধীরে গ'ড়ে তোলার আছে। যেমন আর একটা, একটা ঘর সাজাতে যদি খালি আসবাবপত্র দেওয়া যায় এবং কোনও দেয়ালরূপী ফ্ল্যাট যদি না লাগানো যায়, তাহলেও এটাকে একটা বাস্তব ঘর ব'লে ধ'রে নিতে দর্শকদের এক মুহূর্তও দেরী হয় না।

এই রকম যত জটিল ও সূক্ষ্ম কনভেনশন একটা শিল্পে গ'ড়ে ওঠে ততোই সেই শিল্প মহৎ হয়। অনেকে মনে করেন কনভেনশন ব্যাপারটা একটা আরোপিত স্টাইলাইজেশন, যার মধ্যে বাহুল্য বর্জনের প্রচেষ্টাটা একটা প্রদর্শনের মতো। যেমন ইয়োরোপে বহু নাট্যাভিনয়ে ইচ্ছা ক'রে বাহুল্য বর্জন করা হয়েছে, যেখানে ঐ বর্জনটাই যেন মুখ্য হয়ে ওঠে।

আনন্দ কুমারস্বামী একস্থলে বলেছেন—Conventionality has nothing to do with calculated simplification (as modern designing), or with degeneration from representation (as often assumed by the historians of art.

আমাদের কাছে কনভেনশনটা একটা জীবন্ত ব্যাপার। যাত্রায় কনভেনশন ছিল ভীষণ নাটকীয় স্থলে গান গেয়ে ওঠা। তাতে এই সুবিধা হত যে যে-আবেগ কথ্য ভাষায় গ'ড়ে উঠেছিল সেটা গানের সুরের মধ্যে উৎসারিত হয়ে আরও অনেক নিবিড় আরও অনেক গভীর হয়ে অনুভব হত। আজকের দিনে সে কনভেনশন আমরা হারিয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎসারিত আবেগের সেই শীর্ষও আমরা হারিয়েছি। অথচ সেই প্রকাশ ক্ষমতা ফিরে পেতে গেলে কেবল অনুকরণে হবে না, নতুন ক'রে সৃজন করা প্রয়োজন। এবং সেই সৃষ্টির পথ হল রিয়ালিটির গভীর প্রকৃতিকে অনুভব করা, এবং আবেগের সঙ্গে তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা। নান্যঃ পন্থা।

# বাংলা চলচ্চিত্রের গতি ও প্রকৃতি

✽ পঙ্কজ দত্ত

**গ**ত কবছরে বাঙলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যা বাংলা ছবির রূপ ও প্রকৃতির মধ্যেই একটা বিবর্তন এনে দিতে পেরেছে বলে ধরে নেওয়া যায়—অন্তত বিবর্তনের সূচনা যে হয়েছে তার স্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়। ঘটনাগুলির মধ্যে প্রধান "পথের পাঁচালী"র আবির্ভাব। আজ বিশ্বের বহু স্থানেই ছবিখানি সম্মান অর্জন করছে, কিন্তু তার আগেই বস্তুতঃ ছবিখানি এদেশের পর্দায় এসে উপস্থিত হবার প্রায় সংগে সংগেই ছবির রূপায়ন ও প্রকৃতি বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ নতুন পথে অনুধাবিত করার একটা সম্মোহনী প্রভাব পরিব্যাপ্ত করে দেয়। যে বাজারে ছবির প্রধান (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বস্ব) নির্ভর করে রাখা হয়েছে জনপ্রিয় তারকার ওপর, আর তাই নিয়েই দর্শক সাধারণের উৎসাহের প্রাবল্য; যে চলতি চিত্রনির্মাণ ধারায় শিল্প ও রসসৃষ্টির রীতিনীতি-বিবর্জিত কৃত্রিম ও অপ্রাকৃত উপাদানের সমাবেশই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়, আর তাই পেয়েই দর্শকসাধারণের নির্বিকার পরিতুষ্টি—সে বাজারে পরপর "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"র মতো সৃষ্টির পরম কাম্য গৌরব অর্জন যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করবে সেটা মোটেই অভাবনীয় নয়।

এই আলোড়নের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একদল শিল্পানুরাগীর উদ্ভব। যারা এতকাল ধরে ছবির নামে অছবি দেখিয়ে দেখিয়ে দর্শকসাধারণের যথার্থ চলচ্চিত্রশিল্পবোধের বিকাশকে ভোঁতা করে রেখে আসছে এই নতুনদের আবির্ভাব সেইসব চলতি পথের নির্মাতাদের অকৃতিত্বকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। 'প্রমোদ' কথাটার একটা বিকৃত অর্থ তৈরী করে এবং সেই অর্থ বুঝে ও বুঝিয়ে বরাবরই চিত্রনির্মাতারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়ে এসেছেন যে, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মান ও সম্ভ্রমকে উন্নীত রেখে শিল্পমনোরম ছবিও হবে আর সে ছবি জনপ্রিয়ও হবে, সেটা কখনো সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু, সম্পূর্ণভাবে দোষত্রুটি বর্জিত না হলেও, "চলাচল", "কাবুলিওয়ালা" "পঞ্চতপা", "অন্তরীক্ষ", "লৌহকপাট", ডাকহরকরা, পরশপাথর, "অযান্ত্রিক" প্রভৃতি একের পর একখানি ছবি এসে এতোদিনের সেই ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছে।

"পথের পাঁচালী" চোখ খুলে দিয়েছে; এমন নতুন ধারার সন্ধান দিয়েছে যে ধারায় সস্তা প্রমোদ-চিত্রকে প্রকৃত শিল্পোৎকৃষ্ট চমৎকারিত্বের কাছে হটে যেতে হয়। এই

কলিকাতার এজেণ্ট : শাহা ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

নতুন ধারার পন্থী যারা, আর যাই হোক, ছবির উপাদানে কৃত্রিম ও অপ্রাকৃত জীবনকে পরিহার করে চলার জ্ঞান তাদের হয়েছে। তারা এ বোধটা নিয়ে এসেছেন যে ছবির পথ হচ্ছে শিল্পযুক্তি সম্পন্ন বাস্তবানুগামীতা—আর সংগতি ও সম্ভাব্যতাকে ঠোকর মেরেও যে শিল্পমহিমা ফুটিয়ে তোলা যায় না সে বিচারশক্তিও তারা অনেকটা নিয়ে আসছেন বলে মনে করা যায়।

অবশ্য নতুন পথে যারা নেমেছেন তারা সবাই যে খুবই দক্ষ এমন কথা বলা যায় না। তাদের মধ্যেও অন্ধ অনুসরণ দেখা যায়। যেমন একটা হুজুগ হচ্ছে বাইরে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পটভূমিতে গিয়ে ছবি তোলা—ধারণাটা হয়তো এই যে, বাইরে বেরিয়ে ছবি তুলে আনলে চাই কি একখানা "পথের পাঁচালী"ই হয়তো হয়ে দাঁড়াবে। তা অবশ্য হচ্ছে না, বা তা হবারও নয়। তাছাড়া এদের বিষয়ে বলা যায় যে এদের মধ্যে চলতি পথ ছেড়ে নতুন দিকে যাবার আকুতিটা যতো প্রবল, সে তুলনায় জ্ঞান ও শিল্পবোধ ততো প্রখর নয়। তবুও এইটেই হচ্ছে বর্তমান সময়ের বিশেষ সুলক্ষণ যে, "পথের পাঁচালী"-প্রভাবিত কালে কৃত্রিম ঘটনা ও চরিত্রের চেয়ে বাস্তবের গল্পের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। স্টুডিওর চৌহদ্দীর বাইরেকার সাঁচা চেহারার পটভূমিতে ঘটনা সাজানোর তাগিদ স্বতঃই ছবিতে ছবিতে বৈচিত্র্যের সম্ভার এনে দিচ্ছে। এটাও সুলক্ষণ, এবং তেমন শিল্পকৃতিত্ব এদের অনেকের মধ্যে এখনি না দেখা গেলেও, চিন্তাটাকে বড়োভূমিতে প্রসারিত করার যে চেষ্টা এদের মধ্যে চলেছে, তার ফলে আজ বিশিষ্ট চিত্রপ্রতিভার উদ্ভব খুব অসম্ভব নয়।

নতুন ধারার অগ্রগতি কিন্তু অবাহত নয়। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিবন্ধক ফরমুলো-বাঁধা চলতি ধারার অনুগামীরা। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছবির অর্থকরি ক্ষমতার ওপর—নামকরা উপন্যাস হয় তো ভালই, তাও যদি নিজেদের মতিগতি অনুযায়ী বাগিয়ে নেওয়া না যায় তো এমন জনপ্রিয় তারকা জেনে ভূমিকা তৈরী করে নেওয়া যাতে গল্পের মধ্যে যুক্তি সংগতি রইল কি না রইল তো বয়েই গেল; কতকগুলো গান আর সেই সঙ্গে চুটকি জাতীয় কিছু উপাদান আর অবুদ্ধির নানারকমের বিকসন থাকলেই হল। এরা জানেন সাধারণ লোককে ভোলানো কত সহজ—আরো যদি বেশী কিছু হৈচৈ করার দরকার হয় তো বোম্বাইয়ের শিল্পীর নাচগান দাও, তার চেয়েও কিছু চাই তো লাগাও রঙ! এছাড়া জনসাধারণের আত্মিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার উপায়ও আছে সীতা-সতী জাতীয় পৌরাণিক, কিংবা ভক্তিমূলক কিংবা কোন সাধু-সন্তের জীবনী দিয়ে। এমনসব ছবি যা তোলার জন্যে শিল্পচিন্তা খেলাবার প্রয়োজনই করে না (অবশ্য সেভাবে চিন্তা খেলাবার ক্ষমতাই বা কজনের!), আর স্টুডিওর সেব সরঞ্জাম নিয়ে ছবি তোলা চলে আসছে সে সবেও কোন নড়চড় করতে হয় না। এছাড়া আধুনিক ধারার মতো হয়নি বলে যদি কোন অনুযোগ আসে, তো ঠিক আছে—খানিকটা অংশ কোথাও গিয়ে
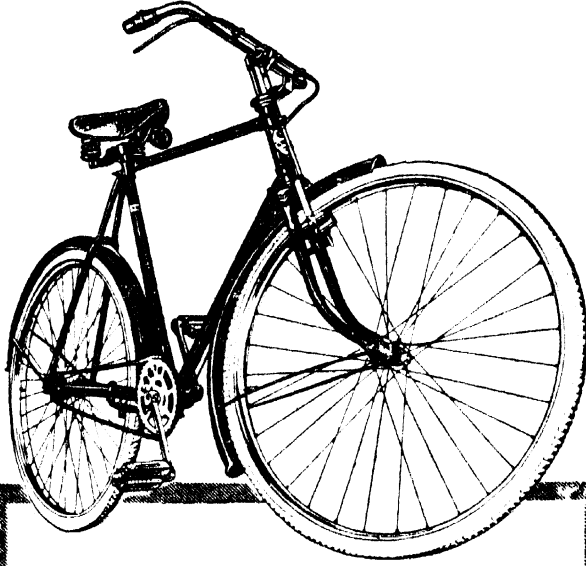
চমৎকার গঠন
হ্যাঁ, হিন্দ্ সাইকেলের চমৎকার গঠন এবং মজবুত ফ্রেম আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে এটি কত টেঁকসই এবং ভাল। আর আপনার হিন্দ্ সাইকেলের ডিলার আপনাকে জানাবে যে এটি বাজারে সবচেয়ে কমদামী সাইকেল।
MADE IN INDIA
STAG
হিন্দ্ সাইকেল লিমিটেড, ২৫০ ওয়ারলী, বোম্বাই ১৮।
ASP/HC.117

প্রাকৃতিক পটভূমিতে তুললেই তো হল! এরা সব দোষত্রুটি ঢাকতে একই যুক্তি খাটিয়ে চলেন—অসংগত ও অস্বাভাবিক কিছু হলেই বলেন, ওটা "সিনেমাটিক লাইসেন্স"। এই কথাটির দোহাইয়ে যতো নির্বোধ যথেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাওয়া হয়। এবং আশ্চর্যের বিষয় যে এরই পৃষ্ঠপোষকই বেশী। চলচ্চিত্র ব্যবসাদার পয়সা বোঝেন আগে কাজেই পয়সা আমদানীর নিশ্চয়তা যে ক্ষেত্রে এবং যে পথে যতো বেশী তার সেই ক্ষেত্র ও সেই পথের দিকেই দৃষ্টি ততো বেশী নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় "পথের পাঁচালী"র স্রষ্টার খাতির বিদেশ থেকে সম্মান এনে দিয়েছে বলেই, নয়তো আরো নতুন ধারার সৃষ্টিতে তাকে এগিয়ে চলতে সহায়তা দেবার জন্যে দরাজ মন নিয়ে কজন প্রযোজকই বা এগিয়ে এসেছেন! শিল্পের ও দেশের চলচ্চিত্রের মান উন্নত করার কথা মনে রেখে দু একজন মাত্রই এসেছেন; ভবিষ্যতেও হয়তো আসবেন এমনি ধারা দু-একজন করে। কিন্তু এটা বড়ো অসম পরিস্থিতি যে, গল্প কার লেখা এবং কি নিয়ে, ছবি যিনি পরিচালনা করতে চাইছেন তার জ্ঞানবুদ্ধি ও শিল্পপ্রতিভা কি পরিমাণ সে বিচারকে আমলে না এনে এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় (অর্থাৎ যাকে নিয়ে যতোটা সম্ভবে কুলোয় নির্বোধ যদৃচ্ছচার দেখানো যেতে পারে) শিল্পীর অবতরণ নিশ্চিত থাকলেই চিত্র ব্যবসায়ীর টাকার থলির মুখ আলগা হয়ে যাবে; অথচ একজন কৃতবিদ্য ও সৃজনক্ষম চিত্রনির্মাতাকে টাকা দিতে দ্বিধার অন্ত নেই! ছবির ব্যবসায়ীরা মুখে কিন্তু চলচ্চিত্রকে একটা মহান শিল্প বলে বড়াই করেন; সরকারের দিক থেকে কোন রকমের কিছু চাপ এলেই, এই মহান শিল্পের সর্বনাশে সরকার যে কতো তৎপর, সে কথাও বলতে ছাড়েন না। অথচ ছবি তোলানোর সময় তারা টাকা ঢালেন যেসব শিল্প সৃষ্টির পিছনে তার সব তালিকা পেশ করার দরকার করে না।

এই অসম পরিস্থিতিটা শিল্পের প্রগতিকে ব্যাহত করে দিচ্ছে। বাঙলার চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে একটা সুযোগ বর্তমানে এসেছে। সারা-ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পও উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে বাঙলার নতুন ধারার সার্থকতার দিকে কারণ বাঙলার ধারা সর্বজনীন আবেদনময় শিল্পের ধারা। যে ধারা জাতির জীবনধারার সঙ্গে, সমাজ ও সংস্কৃতির ধাপের সঙ্গে

b patki shilpi
পোশাকের বস্ত্র অর্গাণ্ডি
ডেভোরাণ্ট প্রিণ্টস্
সাড়ী ভয়েল্ লন্
রুমাল
মিনিরন পপ্‌লিন
লেবেলযুক্ত পপ্‌লিন
"সান্‌ফোরাইজ্‌ড্"
সার্টিং
ধুতি
লংক্লথ
কম্বল, মশারীর নেটিং
এবং তোয়ালে
ক্যালিকো মিলের বস্ত্র
calicloth
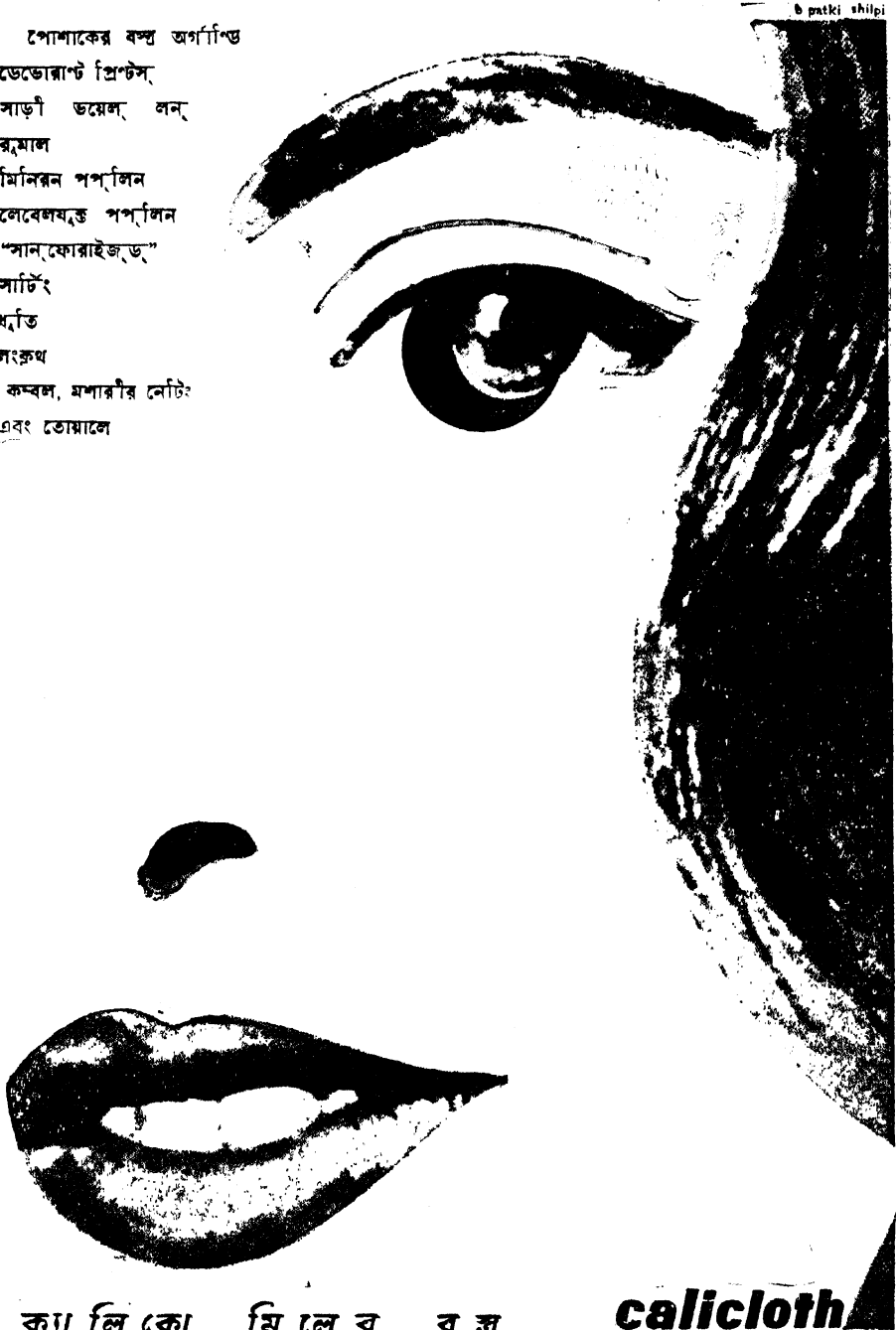
সমতা রক্ষা করে চলতে চায়। বর্তমান বিবর্তনের মধ্যে এই ধারারই পদক্ষেপ দেখা দিয়েছে। প্রতিবন্ধক যা তা চট করেই হটে যাবার নয়, কিন্তু সেটা অনেকটা ত্বরান্বিত হতে পারে দর্শকসাধারণের বোধশক্তিটা যদি খোলে। শিল্প ও অশিল্পকে যদি তারা চিনতে শেখে; প্রকৃত শ্রী ও ভব্যরুচি সম্পর্কে তাদের যদি চেতনা জাগে।

আজ যে কোন ভব্য-গোষ্ঠির মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা উঠলেই প্রশংসার চেয়ে, নিন্দের কথাটাই বেশী করে ওঠে। ওঠে এই কারণে যে, চলচ্চিত্র এখন এমন পথ বেছে নিয়েছে (বিদেশী ছবিই হোক, আর দিশী ছবিই হোক) যাতে শালীনতার একটুকু মর্যাদাও থাকছে না। লোকের কাছে পীড়াদায়ক হয়েছে, সমাজের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাগের ঘোরে কেউ গালাগাল দিচ্ছেন সিনেমা-ওয়ালাদের, কেউ সেন্সর বোর্ডের মতি-গতির তীব্র সমালোচনা করছেন। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাতারা দুর্নাম গায়ে মেখে নিতে শঙ্কিত নন মোটেই, কারণ তাদের লক্ষ্য শুধু টাকার দিকে এবং তারা জানেন সেপথটা নিরঙ্কুশ করে নিতে পারলে দুর্নামের দুর্গন্ধ তাদের শ্বাসরোধ করতে পারবে না। কাজেই কেউ বললো অমুক ছবি জঘন্য আর তাই শুনেই সেই চিত্রনির্মাতা সেপথ ছেড়ে দেবেন, তা তো হয়ই না, বরং এমন একটা মনোবৃত্তি এসে গিয়েছে যে, রুচিবিগর্হিত উপাদানের আঁচ পেলেই লোকে সেই ছবির দিকেই বেশী ছোটে। এটা চিত্রনির্মাতারা ভাল করেই জানেন এবং জানেন বলেই সেই পথ দিয়েই চলেন। তার চেয়েও বেশী আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে রুচি ও শিল্পবিগর্হিত ছবির যারা পৃষ্ঠপোষক তাদের নিয়ে। এরাও জানেন যে যাই বলুন, চিত্রনির্মাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা তারা করে যাবেনই, কাজেই মারে কে!

কিন্তু ভাববার কথা হচ্ছে এই অবস্থাটা চলতে দেওয়া যায় কিনা, এবং অসহনীয় অবস্থা যদি হয় তো তার প্রতিকারই বা কি। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে—একখানা হিন্দী ছবি দেখতে যাওয়া হবে, কিন্তু নিতান্ত 'পেয়ারের বন্ধু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে বসে দেখা যায় না; এমন সব গান ও সংলাপ, এমন সব ভঙ্গী ও বেশবাস আর এমন সব আচরণসমন্বিত কাহিনী যাদের প্রভাব তরুণ সমাজে একটা মতিচ্ছন্নতার প্রবাহ বিস্তার করে দিয়েছে। বর্তমানে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসারের একটি প্রধান হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনের স্বাস্থ্য, রুচি ও সৎ শিল্পভাব গড়ে তোলার মতো ছবি যে হয় না তা নয়, কিন্তু সেসব ছবি গ্রহণ করার মতো মনের অবস্থা দর্শক সাধারণের মধ্যে কম। তাই লজ্জার সঙ্গে দেখতে হয় 'অপরাজিত'র মতো না খাতির, এই
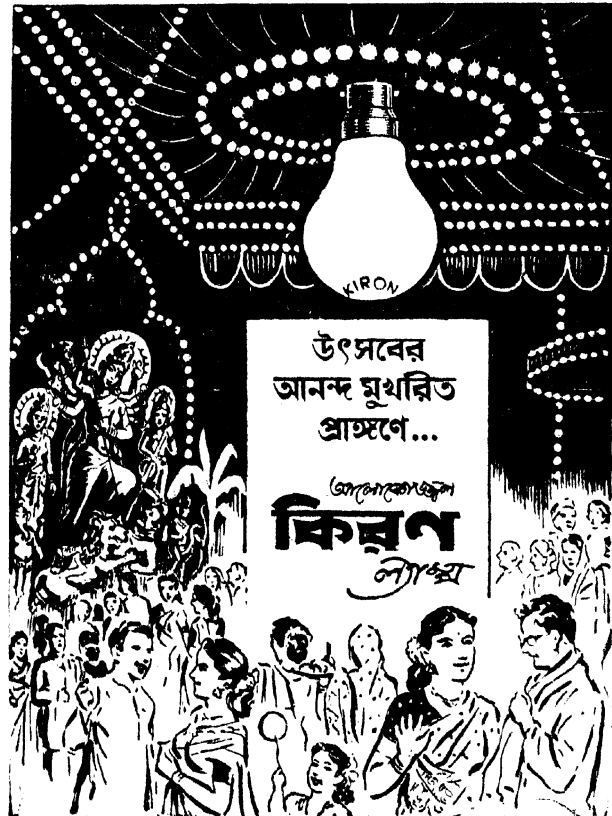
কলকাতাতেই, যে কলকাতা আধুনিক ভারতে শিল্পের সবচেয়ে বড়ো পীঠস্থান বলে গর্ব করে, সেখানেই উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনের নাম যেকোন ছবিতে থাকলেই সে ছবির জনসমাদর প্রায়ই রেকর্ড করে চলে। ভাল ছবি যারা করতে চায় তাদের মন বড়ো দমে যায় এসব দেখে। ছবির উন্নতির গতি তাই সম্ভাব্য শক্তি ও সামর্থ্যের মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছনোয় ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হবে না নিশ্চয়ই (অবশ্য এখনকার চিত্রনির্মাতাদের কাছে ছাড়া)।

প্রতিকার তাহলে কি হতে পারে? ভব্য রুচি ও শিল্পমানের দিকে মনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো সুমতির এতোই অভাব দেশে ঘটেছে এমনটা মনে করা যায় না। তা যদি হতো তাহলে শিল্পমানে উন্নত ছবি কিছু কিছুও যে সমাদর পায়, অভিনন্দিত হয়, তা হতে পারত না। কর্তব্য রয়েছে এদেরই সামনে। কুরুচির ছবি হচ্ছে বলে সেন্সরের তথা গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন জানানোতে কোন কাজ হবার নয়, কারণ সেন্সারের কাজের মতো এ পথটাও নেতিমূলক হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে বেশী দরকার ভাল ছবি বোঝবার মতো মন যাতে গড়ে ওঠে চিন্তাকে সেইদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভাল ছবি মানে মানসিক ও আত্মিক ঐশ্বর্য বাড়িয়ে যাওয়ার মতো ছবি—যে ছবির রূপ ও গুণ মানুষের ভাবের ওপরে একটা দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ সঞ্চারিত করে রাখবে।

পাশ্চাত্যের নানাদেশে এই নিয়েই একটা আন্দোলন আছে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এই ভার নেয়। অনেকের কাজটা প্রায় সেন্সরের মতো নেতিমূলকও হয়, অর্থাৎ, কেবলমাত্র দুর্নীতি প্রসারের সহায়ক হতে পারে এমন ছবিরই প্রদর্শনের বিরোধীতা করা হয়। বিশেষ করে আমেরিকায় এধরণের এমন শক্তিশালী সংস্থাও আছে চিত্রব্যবসায়ীরা যাদের রীতিমত ভয় করে চলে। প্রসঙ্গত 'লিজিয়ন অফ ডিসেন্সি'র নাম করা যায়। এদের পিছনে জনমতের শক্তি এতো প্রবল যে এরা যদি কোন ছবিতে অনুমোদনের ছাপ না দেয় তাহলে সেছবির সর্বসাধারণে প্রদর্শন চিত্রব্যবসায়ীর প্রভূত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু কেবলমাত্র নেতিমূলক ব্যবস্থাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। কারণ, সাধারণ দর্শকের ভালমন্দ বিচারবোধ ক্ষমতার দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা ভালর গুণ চেনবার ক্ষমতায় দুর্বল বলেই অতি সহজেই মন্দের খপ্পরে পড়ি। কাজেই আমাদের ক্ষেত্রে যেটা বেশী দরকার তা হচ্ছে ভালর গুণগুলির পরিচয় ধরিয়ে দেওয়া। এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকার সহায়তা যথেষ্ট হয় না। কাগজের সমালোচনা অনেকটা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কাগজ-পড়িয়ে লোক আমাদের দেশে খুবই নগণ্য। কাজেই অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হয়, এবং সেটা এমন উপায় হওয়া দরকার যার প্রভাবটা খাটাতে পারে।

চিত্রনির্মাতাদের সংগে বিরোধ বাঁধিয়ে নয়, তারা যে বলেন শিল্পোন্নত ছবির কদর নেই—এমন কিছু করা যাতে তাদের সে মতটা একদিন ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়। প্রতি পল্লীরই সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি একাজে এগিয়ে আসতে পারেন। মাঝে মাঝে ছবি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার অনুষ্ঠান ছবি বোঝবার ক্ষমতাকে ধারালো করে দেয়। পাঁচজন একত্রে আলোচনায় বসলে চিন্তার গতিপ্রকৃতিটা নির্ণয় করাও যায় এবং নিজের ভ্রান্তিটাও বুঝতে পারার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। নতুন কোন দীপ্তির সন্ধান পেলে সে প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়ে অপর প্রতিভাদের উৎসাহিত করার রীতিটাও নিয়মিত হওয়া দরকার। এর দ্বারা যে বিশেষ ফল পাওয়া যায় তা 'পথের পাঁচালী'র ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানায় ছবিখানির স্রষ্টাদের, যার প্রত্যক্ষ ফলই হচ্ছে নতুন ধারার কথা আজ চিন্তার মধ্যে এসে পড়া। নতুন ধারার পথে এগিয়ে আসতে অন্তত জনকয়েককেও যে উৎসাহিত করতে পেরেছে সেটাও 'পথের পাঁচালী'র জন-সম্বর্ধনারই প্রভাব। কারণ, শিল্পের দিকে দৃষ্টি রেখে যারা ছবি তৈরী করতে চায় তারা যদি দর্শকসাধারণের স্বীকৃতির ভরসা পায় তাহলে তাদের সাহস বাড়ে। বাঙলা ছবির নতুন প্রকৃতিকে যারা স্বাগতম জানিয়েছে তাদেরই উদ্যোগী হতে হবে নতুন পথে ব্রতীদের সাহস সঞ্চারিত করে দেবার। অন্যথায় ছবির মানের সংগে সমাজের শিল্পরুচিব মানও উন্নতধাপে রাখা দুষ্কর হবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
মূল্য তিন টাকা
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
...দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# বড় হিন্দুস্থান অ্যাম্বাসাডর-এর জন্য বড় গর্ব

নতুন সুপার-এফিসিয়েণ্ট

## ওভারহেড ভাল্‌ভ ইঞ্জিন

**আজ একে ভারতের শ্রেষ্ঠ যান করে তুলেছে!**
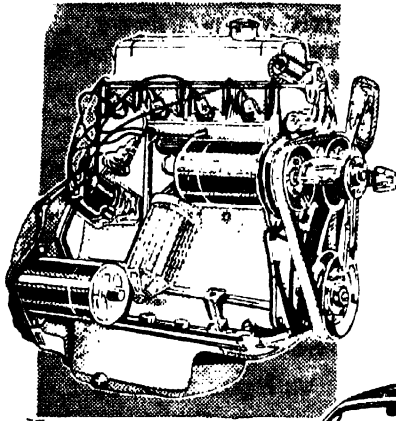
চমৎকার পিক্‌-আপ, নিরাপদে পাশ কাটানোর জন্য বিপুল গতিবেগ সৃষ্টির ক্ষমতা, দর্শনীয় গতি ও উল্লেখযোগ্য মিতব্যয়িতা—সবগুলিই এক্ষণে পাওয়া যায় বিপুল শক্তিসম্পন্ন নতুন **ওভার-হেড ভালভ্‌** ইঞ্জিনযুক্ত বড় অ্যাম্বাসাডর-এ।

নতুন **ও-এইচ-ভি** ইঞ্জিন প্রবর্তনের ফলে সুদৃশ্য অ্যাম্বাসাডর সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে, আর তাকে দিয়েছে তার বহু-**পরীক্ষিত** ও নিজস্ব সম্পদকে নতুন বৈশিষ্ট্য : গা-হাত-পা ছড়ানোর মত আরো জায়গা, দীর্ঘ ভ্রমণকে আনন্দময় করার জন্য আরো আরামের ব্যবস্থা; লগেজ বুটে আরো জায়গা; এবং এক্ষণে আরো দক্ষতা ও আরো মিতব্যয়িতা।

ওভারহেড ভালভ্‌ ইঞ্জিন
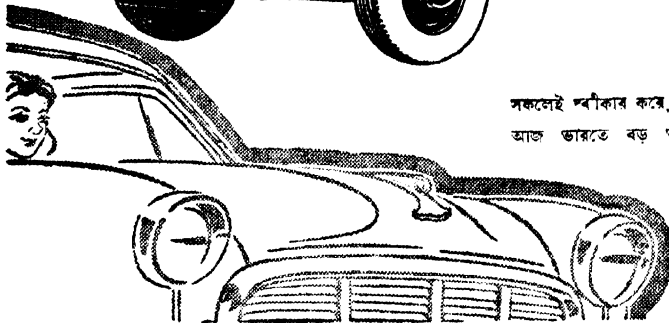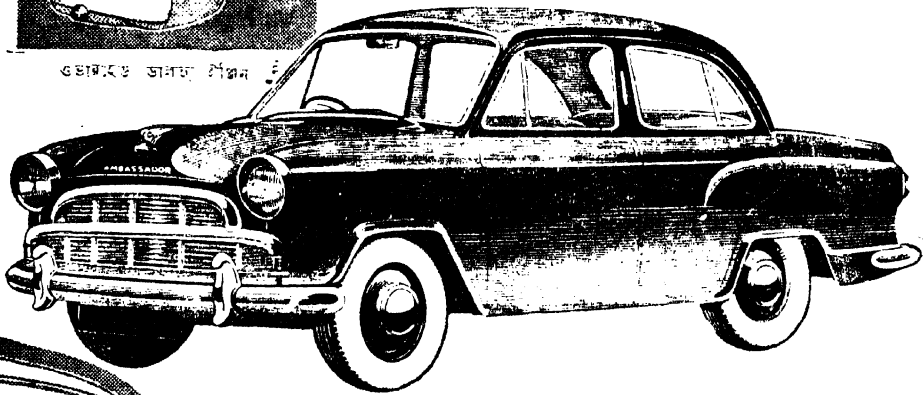
**সকলেই স্বীকার করে, আপনিও স্বীকার করবেন :**

আজ ভারতে বড় অ্যাম্বাসাডর শ্রেষ্ঠ যান।

হিন্দুস্থান মোটরস লিঃ কলিকাতা

**অনুমোদিত ডীলার — ইণ্ডিয়া অটোমোবাইলস্‌,**
১২, গভঃ প্লেস ইস্ট, কলিকাতা (কলিকাতা ও ২৪ পরগণার জন্য) * ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লিঃ, ৭১, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার জন্য)।

সূচীপত্র

# বিদ্যোদয়ের  পূজা-প্রকাশন

## প্রবন্ধ সাহিত্য

### চিত্রদর্শন

কানাই সামন্ত

প্রবীণ চিত্র-সমালোচকের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি। মননশীলতায় ভাস্বর এর প্রতিটি ছত্র। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস, বিশেষ বিশেষ চিত্রশিল্পী ও শিল্পী সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক সুপ্রশংসিত এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থখানি প্রবেন আর্ট কাগজে সুমুদ্রিত ১৯খানি বহুবর্ণের ও ৭৯খানি একবর্ণের চিত্রে সজ্জিত। মূল্য: ২৫.০০

### মানব-বিকাশের ধারা

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে লেখক জীবনের লীলাময় এই পৃথিবীর প্রস্তুতি-পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের উদ্ভব এবং প্রাগৈতিহাসিক ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমবিকাশ এবং সর্বশেষে মানবের উদ্ভব ও তার দৈহিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক পরিচয় দিয়েছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। গ্রন্থখানি আর্ট কাগজে ছাপা ৬০খানি চিত্রে সমৃদ্ধ। মূল্য: ১২.০০

### পরিব্রাজকের ডায়েরী

নির্মলকুমার বসু

কত-না বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সম্মিলন ভূমি আমাদের এই দেশ। বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র তাদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। 'পরিব্রাজকের ডায়েরী'তে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু এদেরই জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন। পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য: ৪.৫০

## পূর্ব-প্রকাশিত

প্রবন্ধ ● চিরায়ত সাহিত্য ● বিবিধ

| | |
|---|---|
| **পরিভাষা কোষ**—সুপ্রকাশ রায় | ১০.০০ |
| **বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র** | ৬.০০ |
| **মহাভারত**—শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী | ১২.০০ |
| **শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ৭.০০ |
| **সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা**—ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৬.৫০ |
| **বক্তব্য**—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ৫.০০ |
| **রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন**—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য | ৫.০০ |
| **চলমান জীবন**—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় | ৫.০০ |
| **স্বর্ণালিন যুগ**—আনা লুইস স্ট্রং | ৩.২৫ |

উপন্যাস

| | |
|---|---|
| **ময়ূরাক্ষী**—সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩.০০ |
| **গৃহকপোতী**—সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩.৫০ |
| **সূর্যগ্রাস**—সুশীল জানা | ৩.৭৫ |
| **তাপসী**—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী | ৩.৫০ |
| **পথে-প্রান্তরে** (২য় পর্ব)—বেদুইন | ৪.০০ |
| **দুরন্ত নদী**—আনা লুইস স্ট্রং | ৪.৫০ |

কিশোর-সাহিত্য

| | |
|---|---|
| **আমার ভালুক শিকার**—শিবরাম চক্রবর্তী | ২.০০ |
| **গল্পময় ভারত**—সুশীল জানা | ৪.০০ |
| **অথ ভারত কথকতা**—শ্রীকথকঠাকুর | ২.২৫ |
| **আলি ভুলির দেশে**—সুখলতা রাও | ২.০০ |
| **গল্প আর গল্প**—প্রেমেন্দ্র মিত্র | ২.০০ |
| **সোনার ফসল**—পাভলেঙ্কো | ২.০০ |
| **চীনের উপকথা**—জয়ন্তকুমার অনূদিত | ২.০০ |
| **সাইবেরিয়ার শেষ মানুষ**—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ২.০০ |
| **দারুমূর্তির রহস্য**—মণীন্দ্র দত্ত | ১.২৫ |

## উপন্যাস

### মধুমিতা

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমারের এই নূতন উপন্যাসখানিতে প্রবীণ কথাশিল্পীর তীব্র সন্ধানী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সমাজ-জিজ্ঞাসার এক নূতন দিগন্ত। মূল্য: ৬.০০

### নাগিনী মুদ্রা

অমরেন্দ্র ঘোষ

বিলাসবাবুর সোনার লোভে এল মাতি বাঈজী। তারপর হল পটপরিবর্তন। বিলাস ছুটলেন মাতির পিছনে এবং তারই পরিণাম বোধ হয় দেখতে পেলেন বিশ্বনাথ ওঝা ঐ মরা হাওরটার মধ্যে, কানশায় যার কালচে রক্ত। মূল্য: ৩.৫০

## কিশোর সাহিত্য

### স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীদের কাছে যুগান্তরের পাততাড়ির পরিচালক স্বপনবুড়োর লেখার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। তারই নবীতি নূতন হাসির গল্পের সংকলন 'স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী'। মূল্য: ৩.০০

### পাতালপুরীর কাহিনী

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

তিন পুরী নিয়েই আমাদের জগৎ—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিকের এই অভিনব কিশোর উপন্যাসখানি বিচিত্র সেই পাতালপুরীতে একটি কিশোরের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতারই কাহিনী। মূল্য: ৩.০০

## প্রকাশের অপেক্ষায়

**অলিম্পিকের ইতিহাস** ॥ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ● **এশিয়ার সাহিত্য** ॥ নিখিল সেন ● **রাঙামাটির পথ** (উপন্যাস) ॥ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ● **কেরল সিংহম্** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ॥ সর্দার কে. এম. পানিক্কর (অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্) ● **শেষ কোথায়** (উপন্যাস) ॥ সৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ● **স্বর্ণমুকুট** (কিশোর-উপন্যাস) ॥ গোপেন্দ্র বসু ● **বেলাভূমির গান** (উপন্যাস) ॥ সুশীল জানা ● **আদিবাসীর জীবন-কথা** ॥ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

## বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড ॥ কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

প্রাচীন পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শ্রীব্রজনন্দনবিহারী মল্লিকের সৌজন্যে

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥

দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী আমাদের জননী। বাঙ্গালীর মানস-লোক শরতের স্বর্ণাভ সৌরকরে উজ্জ্বল করিয়া দেবী দুর্গারূপে জাগিয়াছিলেন। এদেশের মাতৃসাধক সন্তানগণ বহুরূপে দেবীর অপরূপ লাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের নরনারীর মধ্যে দেখিয়াছিলেন মাকে। বাংলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলে মাতৃসেবার সেই বৈভব-বীর্য জীবন্ত শক্তি সঞ্চার করে। মায়ের বেদীমূলে সন্তান-দলের সাধনায় উদ্দীপিত হোমশিখা এদেশের পরাধীনতার দীর্ঘযুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে বজ্রানল বিকীর্ণ করে। ভক্তরক্তচরণ-যুগল সিক্ত করিয়া অতি-সৌম্যা জননী অতিরুদ্রারূপে বাংলার বুকে আত্মভাবে ব্যক্ত হন। সন্তানস্নেহে উন্মাদিনী আমাদের সেই মা আসিতেছেন। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে জননীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আজ অনুভব করিতেছি। আর্ত, পীড়িত, অসহায় সন্তানের দুঃখে তাঁহার অমল উজ্জ্বলমধুর মুখের হাসিটি মিলাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ললাট ফলকে অনলের ঝলকে চমক ছুটিতেছে। সেই অগ্নির স্পর্শে সন্তানদের অন্তরে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠুক; বাহুতে দুরন্ত বল সঞ্চারিত হোক, ধমনীতে উত্তপ্ত রক্তের স্রোত ছুটুক। স্বার্থভীরু যাহারা, যাহারা দুর্বল, মায়ের পূজায় তাঁহাদের অধিকার নাই। পশুর জীবনের দুর্বহ গ্লানিভার লইয়া তাহারা পড়িয়া থাকুক। কে আছ মাতৃসাধক, তুমি আগাইয়া যাও, মাতৃপূজার শুভক্ষণ সমাগত। মায়ের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। মায়ের দুঃখ যদি দূর করিতে না পারি, তবে আমাদের জীবনে কি প্রয়োজন? মনে রাখিও মাতৃ-চরণে নিজদিগকে অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদন করিবার জন্যই আমরা আসিয়াছি। সেই মহাব্রত আমাদিগকে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। তবে আমরা মানুষ। তবে আমরা মায়ের ছেলে। সন্তানের ডাকে মা জাগিবেন। দনুজদলনী দেবীর খড়্গের খেলায় মাতৃদ্রোহী অসুরের দলের দৌরাত্ম্য নিরাকৃত হইবে। বঙ্গের অঙ্গন আলো করিয়া মায়ের মধুর হাসি ফুটিবে। মাতৃপূজা সার্থক হইবে।

সেকাল
ও
একাল
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

# যশোমতী

পরশুরাম
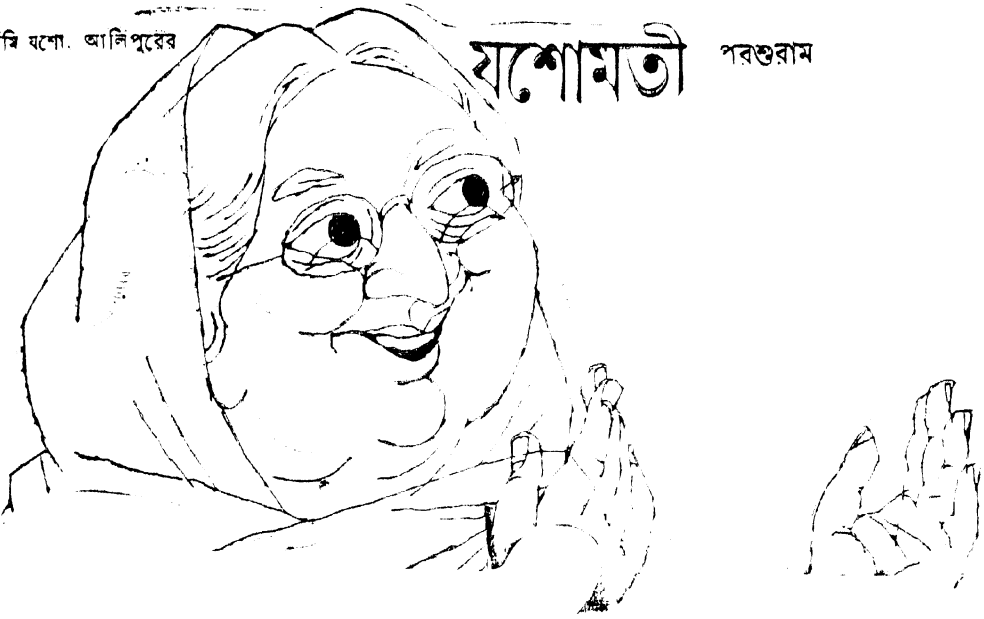
**মে**জর পুরঞ্জয় ভঞ্জ এম. ডি আই. এম. এস অনেক কাল হল অবসর নিয়েছেন, রোগী দেখাও এখন ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। কলকাতায় নিজের বাড়ি আছে, কিন্তু স্থির হয়ে সেখানে থাকতে পারেন না. বৎসরের মধ্যে আট-ন মাস বাইরে ঘুরে বেড়ান।

শীতকাল। পুরঞ্জয় দেরাদুনে এসেছেন, আট-দশ দিন এখানে থাকবেন। রাজপুর রোডে শিবালিক হোটেলে উঠেছেন, সঙ্গে আছে তাঁর পুরনো চাকর বৃন্দাবন। রাত প্রায় আটটা, পুরঞ্জয় তাঁর ঘরে ইজি চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। বৃন্দাবন এসে জানাল, এক বুড়ী গিন্নী-মা দেখা করতে চান। পুরঞ্জয় বললেন, আসতে বল তাঁকে।

যিনি এলেন তিনি খুব ফরসা, কিছু মোটা, গাল আর থুতনিতে বলি পড়েছে। মাথায় প্রচুর চুল, কিন্তু প্রায় সবই পেকে গেছে। পরনে সাদা গরদ, সাদা ফ্লানেলের জামা, তার উপর সাদা আলোয়ান। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে পুরঞ্জয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? চিনতে পারছি না তো।

আগন্তুকা বললেন, আমি যশো, আলীপুরের যশোমতী।

—সেকি! তুমি যশো, যশোমতী গাঙ্গুলী, কি আশ্চর্য!

—গাঙ্গুলী আগে ছিলুম, এখন মুখুজ্যে।

—ও, তোমার স্বামী মুখুজ্যে। তোমাকে দেখে চমকে গেছি, পঞ্চান্ন বছর পরে আবার দেখা হল, চিনব কি করে! ছিপছিপে গড়ন ছিল, এখন মোটা হয়ে পড়েছ। মুখের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে, গাল কুঁচকে গেছে। তুমি অতি সুন্দরী তন্বী কিশোরী ছিলে. হাসলে গালে টোল পড়ত, দাঁত ঝিকমিক করে উঠত।

যশোমতী ম্লান মুখে হাসলেন।

—ওই ওই! এখনও গালে টোল পড়েছে, দাঁত ঝিকমিক করেছে।

—বাঁধানো দাঁত।

—তা হক. আগের মতই সুন্দর ঝিকমিকে। আমাদের শারীর শাস্ত্রে বলে, দাঁত নখ চুল আর শিঙ জীবন্ত অঙ্গ নয়, এদের সাড় নেই। আসল আর নকলে প্রায় সমানই কাজ চলে।

—সব কাজ চলে না। ছোলা ভাজা চিবুতে পারি না।

—ভাল ডেণ্টিস্টকে দিয়ে বাঁধালে পারবে। যশো, তুমি এখনও কোকিলকণ্ঠী, তবে গলার স্বর একটু মোটা হয়েছে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছ?

—তা না পারব কেন। তোমার চুল পেকেছে, টাক পড়েছে, কিন্তু মুখের ছাঁদ বদলায় নি, গালও বেশী তোবড়ায় নি, গলার স্বর আগের মতই আছে।

—দেরাদুনে কবে এলে? আমার সন্ধান পেলে কি করে?

—পরশু এখানে পৌঁছেছি। আমার নাতি ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার হয়ে এসেছে, তার কাছেই আছি। আজ সকালে এই হোটেলে দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। অতিথি-দের লিস্টে তোমার নাম দেখলুম।

—নাতিকে নিয়ে এলে না কেন?

—আজ এতকাল পরে তোমার সন্ধান পেলুম, তাই একাই দেখা করতে ইচ্ছে হল। নাতি নাতবউকে কাল দেখো। এখন তোমার পরিবারের কথা বল। সঙ্গে আন নি?

—পরিবার কোথা, বিয়েই করি নি। অবাক হলে কেন, অবিবাহিত বুড়ো তো কত শত আছে। তোমার খবর বল। স্বামী আর শ্বশুরবাড়ি ভাল পেয়েছিলে তো?

মাথা নত করে যশোমতী বললেন, স্বামী শুধু সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম এই অপরাধে শ্বশুরবাড়ির সকলে আমাকে কলঙ্কিনী মনে করতেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান, ভবিষ্যতে তাঁর সম্পত্তি পাব, শুধু এই কারণেই তাঁরা আমাকে পুত্রবধূ করেছিলেন। বিয়ের দু বছর পরেই স্বামী মারা যান। একটি ছেলে ছিল, আমার সব দুঃখ দূর করেছিল, সেও জোয়ান বয়সে চলে গেল। পুত্র-বধূও প্রসবের পর মারা গেল। এখন একমাত্র সম্বল নাতি ধ্রুব, আর তার বউ রাকা।

—উঃ, অনেক শোক পেয়েছ। ললাটের লিখন আমি মানি না, তবু কি মনে হচ্ছে জান? তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি অব্রাহ্মণ। তোমার বাপ মা মনে করতেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হবে। তাঁরা যদি গোড়া না হতেন, আমাদের বিয়েতে যদি মত দিতেন, তবে তুমি এখনও সধবা থাকতে, দু-চারটে ছেলেমেয়েও হয়তো বেঁচে থাকত। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না।

—মনে করব কেন। ছেলেবেলায় তুমি রেখে ঢেকে কথা বলতে না, এখনও দেখছি তোমার মনের আর মুখের তফাত নেই। তুমি কেন বিয়ে কর নি তা বল।

—করি নি তার কারণ, তোমাকে প্রচণ্ড ভাল বেসেছিলুম, সহজে ভুলতে পারি নি। আমার বিয়ে দেবার জন্যে বাপ-মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মন তোমাকেই আঁকড়ে ছিল। তোমার বিয়ে যখন অন্যের সঙ্গে হল তখন অত্যন্ত ঘা খেয়েছিলুম, দেহ মন প্রাণ যেন পিষে ফেলেছিল। পরে অবশ্য একটু একটু করে সামলে উঠেছিলুম, তোমাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে আর হয় নি।

—কোনও মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা কর নি?

—তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। আমি শুকদেব বা রামকৃষ্ণ পরমহংস নই, পতন হয়েছিল, কিন্তু অল্পকালের জন্যে। একদিন স্বপ্ন দেখলুম, তোমার মৃতদেহ যেন আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলছি। আর্তনাদ করে জেগে উঠলুম, ধিক্‌কারে মন ভরে গেল। হিন্দুর মেয়ে ছেলেবেলা থেকে সতীত্বের সংস্কার পায়, তাই তারা সহজেই শুচি থাকে। কিন্তু পুরুষরা কোনও শিক্ষা পায় না। মেয়েদের বলা হয়—সীতা সাবিত্রী হৈমবতীর মতন সতী হও, কিন্তু পুরুষদের কেউ বলে না—রামচন্দ্রের মতন একনিষ্ঠ হও।

—কি নিয়ে এতকাল কাটালে?

—চাকরি, রোগীর চিকিৎসা, অজস্র বই পড়া আর ঘুরে বেড়ানো। তোমার স্মৃতি ক্রমশ মুছে গেলেও যেন মনে ছেঁকা দিয়ে স্টেরাইল করে দিয়েছিল, সেখানে আর কেউ স্থান পায় নি। ওকি, কাঁদছ নাকি? বড় বড় দুঃখের ভোগ তো তোমার চুকে গেছে, এখন আমার তুচ্ছ কথায় কাতর হচ্ছ কেন? শোন যশো, তোমাকে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে হয়েছিল, আর আমি এখনও কুমার আছি, এর জন্যে নিজেকে ছোট ভেবো না। তোমার বয়স ছিল মোটে পনরো, এখনকার হিসেবে প্রায় খুকী। তুমি আমাকে খুব ভালবাসতে তা ঠিক, কিন্তু বাল্যকালের সে ভালবাসা হচ্ছে কাফ লভ, ছেলেমানুষী ব্যাপার, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না।

—তুমি কিছুই বোঝ না।

—কিছু কিছু বুঝি। তুমি ছিলে সেকেলে গোবেচারী শান্ত মেয়ে, বাপ-মা যখন বিয়ে দিলেন তখন আপত্তি জানাবার শক্তিই তোমার ছিল না, আমাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না, এ কথা মুখ ফুটে বলা তোমার অসাধ্য ছিল। আর আমি ছিলুম তোমার চাইতে পাঁচ বছরের বড়, প্রায় সাবালক, বাপ-মা আমাকে নিজের মতে চলতে দিতেন। তুমি ছিলে নিতান্তই পরাধীন, আর আমি ছিলুম প্রায় স্বাধীন। আইবড় থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে ছিল না। যশো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দোষ নিও না। মনে কর সেই পঞ্চান্ন বছর আগে তুমি যেন ছিলে একালের মেয়ে, বালিকা নয়, কিশোরী নয়, একুশ-বাইশ বছরের সাবালিকা। যদি আমি তোমাকে বলতাম, যশো, তোমার বাপ-মা নাই বা মত দিলেন, তাঁদের অমতেই আমাদের বিয়ে হক, তোমার ভার নেবার সামর্থ্য আমার আছে, তা হলে তুমি রাজী হতে?

—নিশ্চয় হতুম।

—যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন সেই বাপ-মার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে তাঁদের ত্যাগ করতে পারতে? যার সঙ্গে তোমার পরিচয় খুব বেশী নয়, যে তোমার আপন শ্রেণীর নয়, সেই আমাকেই বরণ করতে?

—নিশ্চয় করতুম।

—থ্যাংক ইউ যশো, তোমার উত্তর শুনে আমি ধন্য হয়েছি। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ একটা প্রাকৃতিক বিধান, কিন্তু তার সময় আছে, তখন বাপ মা ভাই বোনের চাইতে প্রেমাস্পদ বড় হয়ে ওঠে। তবে বিবাহের পর স্বামীরও প্রতিদ্বন্দ্বী আসে—সন্তান। কিশোর বয়সে যা তোমার অসাধ্য ছিল, সমাজের দৃষ্টিতে যা অন্যায় গণ্য হত, যৌবনকালে বিনা দ্বিধায়
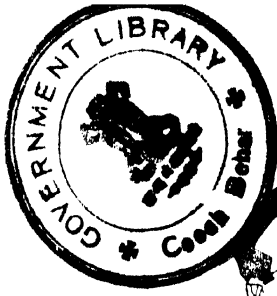
যশো, তোমার রুচির তুলনা নেই

তা তুমি পারতে, তোমার এই কথা শুনে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

—কি যে বল তার ঠিক নেই। পনরো বছরের সুশ্রী যশো যে-কথা বলতে পারে নি বলে তোমার মন ভেঙে গিয়েছিল, সেই কথা সত্তর বছরের বুড়ী বিশ্রী যশো তোমাকে আজ মুখ ফুটে বলতে পেরেছে এতে তোমার লাভটা কি হল, তুমি কৃতার্থই হবে কেন? যা ঘটেছিল তার বদলে যদি অন্য রকম ঘটত—এ রকম চিন্তা তো আকাশকুসুম রচনা, বুড়ো-বুড়ীর পক্ষে নিছক পাগলামি।

—পাগলামি নয়, মনের পটে ছবি আঁকা। যে অতীত কাল চলে গেছে তার ধ্বংস হয় নি, তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা যায়, তাতে নতুন করে রঙ দেওয়া চলে।

—যাক গে ও সব বাজে কথা। শোন, কাল তুমি আমার ওখানে খাবে। টপকেশ্বর রোড, জিম-করবেট লজ। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এসো। আসবে তো? নাতিকে পাঠাতে পারি, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—না না, পাঠাতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব, ওদিকটা আমার জানা আছে। কিন্তু রাত্রে আমি দুধ-মুড়ি কি চিঁড়ে-দই খাই।

—বেশ তো, ফলারেরই ব্যবস্থা করব।

যশোমতী চলে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুরঞ্জয় ভঞ্জ জিম-করবেট লজে উপস্থিত হলেন। যশোমতী স্মিতমুখে নমস্কার করলেন, তাঁর নাতি ধ্রুব আর নাতবউ রাকা দু দিক থেকে পুরঞ্জয়ের দুই পা জড়িয়ে ধরে কলধ্বনি করে উঠল।

পুরঞ্জয় বললেন, যশোমতী, এরা তো আমাকে চেনে না, তুমি ইনট্রোডিউস করে দাও।

যশোমতী বললেন, পঞ্চান্ন বছর পরে কাল তোমাকে দেখেছি। আমি তোমার কতটুকু জানি? তুমিই নিজের পরিচয় দাও না।

পুরঞ্জয় বললেন, বেশ। শোন দাদাভাই ধ্রুব আর কি নাম তোমার, রাকা। আমি হচ্ছি ডাক্তার পুরঞ্জয় ভঞ্জ, মেজর, আই. এম. এস, রিটায়ার্ড। চিকিৎসা বিদ্যা এখন প্রায় ভুলে গেছি। বহুকাল আগে তোমাদের এই ঠাকুমার ছেলেবেলার সঙ্গী ছিলুম, আমাদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। আমি খেপাবার জন্যে ওঁকে বলতুম, যশোটা থসথসোটা। উনি আমাকে বলতেন, পুরোটা ঘুরঘুরোটা। আমরা যেন ভাই বোন ছিলুম।

ধ্রুব বলল, শুধুই ভাই বোন?

—তার চাইতে বরং বেশী। একদিন দেখা না হলে অস্থির হতুম।

হি হি করে হেসে রাকা বলল, দাদু, শুনেছি আপনি স্পষ্টবক্তা লোক, রেখে ঢেকে কিছু বলতে পারেন না। কেন কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলবেন? মন খোলসা করে বলে ফেলুন। আমরা সব জানি, আমাদের জেরার চোটে ঠাকুমা সব কবুল করেছেন।

পুরঞ্জয় বললেন, যশো, তুমি দিব্বি একজোড়া শুক-সারী টিয়াপাখি পুষেছ। এরা আমাকে ফেসাদে ফেলবে না তো?

হাত নেড়ে রাকা বলল, না না, আপনার কোনও চিন্তা নেই, নির্ভয়ে সত্যি কথা বলুন। ঠাকুমা আর আমরা খুব উদার, আমাদের কোনও সেকেলে অন্ধ সংস্কার নেই।

—বেশ বেশ। তা হলে নিশ্চয় শুনেছ যে যশোর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড প্রেম হয়েছিল। তার পর ওঁর বিয়ে হয়ে যেতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হল, মনের দুঃখে আমি বোম্বাইএ গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলুম, তার পর বিলাত গেলুম। কাল পঞ্চান্ন বছর পরে আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হল। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা তোলপাড় উঠল, যাকে বলে আলোড়ন, বিক্ষোভ, আকুলিবিকুলি।

ধ্রুব বলল, অবাক করলেন দাদু। বুড়ীকে হঠাৎ দেখে বুড়োর ওল্ড ফ্লেম দপ করে জ্বলে উঠল, আগেকার প্রেম উথলে উঠল?

—ঠিক আগেকার প্রেম নয়, অন্য রকম আশ্চর্য অনুভূতি। তোমাদের তা উপলব্ধি করবার বয়স হয় নি। বথাসাধ্য বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। নিশ্চয়ই জান, তোমাদের এই ঠাকুমা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন।

রাকা বলল, আমার চাইতেও?

—মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, তুমি সুন্দরী বট, কিন্তু তোমার সেকালের দিদিশাশুড়ীর তুলনায় তুমি একটি পেঁচী। যদি দৈবক্রমে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হলে গত পঞ্চান্ন বছরে উনি আমার চোখের সামনেই ক্রমশ বুড়ী হতেন। ধাপে ধাপে নয়, একটানা ক্রমিক পরিবর্তন, কিশোরী থেকে যুবতী, তার পর মধ্যবয়স্কা প্রৌঢ়া, তার পর বৃদ্ধা। সবই সইয়ে সইয়ে তিল তিল করে ঘটত, আমার আশ্চর্য হবার কোনও কারণ থাকত না। কবে উনি মোটাতে শুরু করলেন, কবে চশমা নিলেন, কবে দাঁত পড়ল, কবে চুল পাক ধরল, প্রেমালাপ ঘুচে গিয়ে কবে সাংসারিক নীরস বিষয় একমাত্র আলোচ্য হয়ে উঠল, এ সব আমি লক্ষ্যই করতুম না। বৃক্ষলতার যৌবন বার বার ফিরে আসে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে তেমন হয় না, বাল্য যৌবন জরা আমাদের অবশ্যম্ভাবী, তার জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকি। কিন্তু সেকালের সেই পরমা সুন্দরী কিশোরী যশো, আর পঞ্চান্ন বছর পরে যাকে দেখলুম সেই বৃদ্ধা যশো—এই দুইএর আকাশ পাতাল প্রভেদ; তাই হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলুম।

রাকা বলল, হায় রে পুরুষের মন, রূপ ছাড়া

আর কিছুই বোঝে না। আমি এখনই তো পেঁচা, বুড়ো হলে কি যে গতি হবে জানি না।

—ভয় নেই দিদি। তোমার ক্রমিক রূপান্তর ধ্রুবের চোখের সামনে একটু একটু করে হবে, ও টেরই পাবে না, ডায়ারিতেও নোট করবে না। শেষ বয়সে যদি হাড়গিলে কি শকুনি গৃধিনী হয়ে পড় তাতেও ধ্রুব শকড্‌ হবে না। প্রেমের দুই অঙ্গ, একটা দেহাশ্রিত, আর একটা দেহাতীত। তোমাদের মনে এখন একসঙ্গে দুটো মিশে আছে। কিন্তু যতই বয়স বাড়বে ততই প্রথমটা লোপ পাবে, শুধু দ্বিতীয়টাই টিকে থাকবে।

রাকা বলল, পঞ্চান্ন বছর পরে ঠাকুমাকে হঠাৎ দেখে আপনার মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল তা বুঝলুম, কিন্তু তার ফলে আপনার হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ ঠাকুমার প্রতি আপনার মনোভাব কি রকম দাঁড়াল?

—পর পর দুটো অনুভূতি হল, যশোমতীর দুই রূপে দেখলুম। ওঁকে ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু ওঁর হাসি দেখে আর গলার স্বর শুনে পঞ্চান্ন বছর আগেকার সেই তন্বী কিশোরী মূর্তি মনের মধ্যে ফুটে উঠল। তার কিছুমাত্র বিকার হয় নি, একবারে যথাযথ অক্ষয় হয়ে আছে। তার যে পরিবর্তন পরে ঘটেছে তা তো আমি দেখি নি, সেজন্যে তার কোনও প্রভাবই আমার চিত্তস্থিত মূর্তির ওপর পড়ে নি। তার পরেই যশোর অন্য এক রূপ দেখলুম, দেহের নয়, আত্মার। আমার বুদ্ধিতে মন আর আত্মা একই, বয়সের সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়, কিন্তু ধারা বজায় থাকে সেজন্যে চিনতে পারা যায়। যেমন, নদীর জলপ্রবাহ নিত্য নূতন, কিন্তু প্রবাহিণী একই। যশোমতীর কথায় বুঝলুম, উনি সেই আগের মতন সংস্কারের দাসী গুরুজনের আজ্ঞাপালিকা ভীরু মেয়ে নন, ওঁর স্বাধীন বিচারের শক্তি হয়েছে, মনের কথা বলবার সাহস হয়েছে। উনি যদি সেকালের কিশোরী না হয়ে একুশ-বাইশ বছরের আধুনিকা হতেন তবে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আমাকেই বরণ করতেন।

যশোমতী বললেন, এই, তোরা চুপ কর, কেন ওঁকে অত বকাচ্ছিস, খেতে দিবি না?

রাকা বলল, বা রে, উনি নিজেই তো বকবক করছেন, আমরা শুধু একটু উসকে দিচ্ছি। আসুন দাদু, এইবার খেতে বসুন।

যশোমতী বললেন, টেবিলে খাবার দেব কি, না আসন পেতে দেব?

পুরঞ্জয় বললেন, খাওয়াবে তো ফলার। টেবিলে তা মানায় না, মেজেতেই বসব।

খাদ্যের আয়োজন দেখে পুরঞ্জয় বললেন, বাঃ কি সুন্দর! সাত্ত্বিক ভোজন একেই বলে। সাদা কম্বলের আসন, সাদা পাথরের থালায় ধপধপে সাদা চিঁড়ে, সাদা কলা, সাদা সন্দেশ, সাদা বরফি, সাদা নারকেল-কোরা, সাদা পাথর বাটিতে সাদা দই। আবার সামনে একটি সাদা বেরাল বসে আছে। যশো, তোমার রুচির তুলনা নেই।

রাকা বলল, আসল জিনিসেরই তো বর্ণনা করলেন না। এই পবিত্র শুভ্র খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করেছেন কে? একজন শুভ্রবসনা শুভ্রকেশা শুভ্র-কান্তি শুচিস্মিতা সুন্দরী, যাঁর দুটো মূর্তি আপনার চিত্তপটে পার্মানেণ্ট হয়ে আছে।

পুরঞ্জয় বললেন, সাধু সাধু, চমৎকার, ওআহ্‌ খুব, একসেলেণ্ট!

রাকা বলল, দাদু, একটি কথা নিবেদন করি। আমাদের দুজনকে তো আপনি শুক-সারী বলেছেন। আমি বলি কি, আপনিও আমাদের এই নীড়ে ঢুকে পড়ুন, ঠাঁই আছে। যশোমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করুন। দুটিতে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মতন আমাদের কাছে থাকবেন, সবাই মিলে পরমানন্দে দিনযাপন করব।

যশোমতী বললেন, যা যাঃ, বেশী জেঠামি করিস নি।

পুরঞ্জয় বললেন শোন রাকা দিদি। বুড়ো-বুড়ীর বিয়ে বিলাতে খুব চলে, ভবিষ্যতে হয়তো এদেশেও চলবে, যেমন স্মোকড্‌ হ্যাম আর সার্ডিন চলছে। কিন্তু আপাতত এদেশের রুচিতে তা বিকট। তার দরকারও কিছু নেই। যশোমতীর পূর্বরূপের ছাপ আমার মনে পাকা হয়ে আছে, ওঁর আত্মার স্বরূপও আমি উপলব্ধি করেছি, উনিও আমাকে ভাল করেই বুঝেছেন। এর চাইতে বেশী উনিও চান না, আমিও চাই না।

# মীন পিয়াসী / অন্নদাশঙ্কর রায়

সমবয়সিনীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি থতমত খেয়ে পা সরিয়ে নিলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন, "থাক, থাক। ও কী! ও কী!"

তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, "চিনতে পারছিনে তো।"

চিনতে কি বিমোহনও পারছিল! ওটা হলো আন্দাজে ঢিল। প্রণাম না করে নমস্কার করলে পরে হয়তো পরিতাপ করতে হতো। গুরুপত্নীকে প্রণাম না করে নমস্কার! আগেও দু' এক জায়গায় এই ধরনের ভুল হয়েছে। কী লজ্জা!

কিন্তু আন্দাজটাও অকারণ নয়। সেই যে ছেলেটি একটু আগে ওকে দেখেই ছুটে দিয়েছিল সেটি অবিকল ওর মাস্টার মশায়ের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। খোকার প্রস্থানের পর যাঁর প্রবেশ তিনি নিশ্চয় খোকার মা। সুতরাং গুরুপত্নী। সুতরাং প্রণম্য। কবে কিশোর বয়সে তাঁকে একবার কি দুবার দেখেছিল, পঁচিশ বছর বাদে তাঁর মুখ মনে থাকার কথা নয়। তা হলেও তাঁর বয়সটা কোনো মতেই তার সমান হতে পারে না। সে কি তবে ভুল মানুষকে প্রণাম করেছে? না ইনি দ্বিতীয় পক্ষ?

বলল, "নাম শুনলে হয়তো চিনতে পারবেন। আমি বিমোহন। বিমোহন সরকার।"

"ওমা, বিমোহনবাবু!" সমবয়সিনীর দুই চোখ জ্বলে উঠল। "কী কাণ্ড, বলুন দেখি! আমি মীনু। মীনাক্ষী।"

মীনাক্ষী? মাস্টার মশায়ের ছোট শালী? কতবার বাইরে থেকে ওর কণ্ঠস্বর শুনেছে। কিন্তু কোনোদিন একে চাক্ষুষ করেনি। তখনকার দিনে বারো তেরো বছর বয়সের পর মেয়েদের পর্দার আড়ালে রাখা হতো। মাস্টার মশায়ের বাড়ির ভিতরে তাঁর প্রিয় শিষ্য বিমোহনেরও যাতায়াত ছিল না। সদর ও অন্দরের মাঝখানে অলঙ্ঘিত ব্যবধান।

মেয়েটি এসেছিল ম্যালেরিয়ার দেশ থেকে দিদির কাছে থেকে শরীর সারাতে। পরে শোনা গেল পাত্রের অন্বেষণও চলছে। এমন কথাও একদিন বিমোহনের কানে এলো, তোমার এই ছাত্রটির সঙ্গে কি হয় না? মাস্টার মশায় চাপা গলায় বলছেন, অত কাছাকাছি বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হওয়া কি ভালো?

যথাকালে এক দোজবরের গলায়

বেচারিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বিমোহন শুনে ব্যথিত হয়েছিল। কত কালের কথা! এই সেই মীনাক্ষী। একেই সে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে। হা হা! হাসি পাচ্ছিল বিমোহনেরও।

হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বলল, "আপনিও ইচ্ছা করলে পালটা প্রণাম করতে পারেন। কিন্তু আগে বলুন তো, মাস্টার মশায় কেমন আছেন? আউট অফ ডেঞ্জার?"

মীনাক্ষী বলল, "হাঁ, সংকট কেটে গেছে।"

উপরে যেতে যেতে বিমোহন বলল, "আমি জানতুম না যে, মাস্টার মশায় এখন কলকাতায়। কাল এক বিয়েবাড়িতে নরেনের মুখে শুনলুম তাঁর গুরুতর অসুখ। অত রাতে এসে হাজির হলে তাঁকে ও আপনাদের ডিস্টার্ব করা হতো। রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে ভোরবেলা এক পেয়ালা চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি।"

"জামাইবাবু", মীনাক্ষী বলল, "জ্বরের ঘোরে আপনার নাম করছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ আপনার ঠিকানা জানতুম না। অবস্থা যদি ভালোর দিকে না যেত আপনি আজ এসে তাঁকে দেখতে পেতেন না।"

পরবর্তী বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও পরিচয় হলো। মীনাক্ষীর স্বামী। শুভ্রকেশ, স্থবির ও স্থাবর। তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তানসন্ততির সঙ্গেও। বৌমারা মাথায় ঘোমটা তুলে প্রণাম করে সরে গেলেন। মীনাক্ষীর একটিমাত্র কন্যা। সে তার শ্বশুরালয়ে। তারপর সেই খোকার সঙ্গে আলাপ। মাস্টার মশায়ের কনিষ্ঠ দুলাল। নামটিও দুলাল।

মাস্টার মশায় সারা কর্মজীবন পশ্চিমে কাটিয়েছেন। পৈতৃক বাড়ি তাঁর কলকাতার কাছেই। এবার চিকিৎসার সুবিধার জন্যে ভায়রা ভাইয়ের বাড়িতে ওঠা। অসুখটা তিনি পশ্চিমেই বাধিয়েছিলেন। ঠিকমতো রোগনির্ণয় হয়নি। নিজে তো চিরদিন নির্বিকার। দিদির চিঠি পেয়ে মীনাক্ষী গিয়ে জোর করে নিয়ে আসে। নইলে এ যাত্রা তাঁর উদ্ধার ছিল না। এখন আর ভয় নেই। তবে দুর্বল।

বিমোহনকে যখন মাস্টার মশায়ের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ততক্ষণে তাঁর প্রাতঃকৃত্য সারা হয়েছে। তিনি শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। বিমোহনকে দেখে তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল। সে হাসিতে অসীম স্নেহ, অকপট ভালোবাসা। বিমোহন তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি তার হাতখানা খপ করে ধরে ফেলে বললেন "কাছে এসো। এইখানে বস।" তিনি তার হাত ধরে থাকলেন। সে খাটের উপর বসল।

"জানো বিমোহন", মাস্টার মশায় ধীরে ধীরে বললেন, "ওরা আমার জন্যে গঙ্গাজল আনিয়ে রেখেছিল। আমার মুখে দেবার জন্যে।"

বিমোহন চমকে উঠে বলল, "তাই নাকি? এতদূর?"

মাস্টার মশায়ের মুখে অন্তর্জ্যোতি। আপনাতে আপনি মগ্ন। বললেন, "গঙ্গাজলে আমার কী হতো, বিমোহন! তাতে কি আমার পিপাসা মিটত!"

কথাটা কোন অর্থে বললেন বিমোহন ভাবছিল। শুনল, "কবীরের দোহা পড়েছ? সেই যে আছে—

পানীমে মীন পিয়াসী
দেখি লাগত হাঁসি

তেমনি আমারও দশা। আমি যে রসের সরোবরে ডুবে আছি। তবু আমার তৃষার অবধি নেই। আচ্ছা, বিমোহন, তুমি তো ইংরেজী কবিতা ভালোবাসতে। বল দেখি, এর অনুরূপ কোন কবির কোন কবিতায় আছে?"

বিমোহনের মনে পড়ল না। তার ছাত্রত্ব কবে ঘুচে গেছে। সে তো শিক্ষকতা করে না যে পড়াতে পড়াতে মনে গেঁথে যাবে।

"ফ্রান্সিস টমসন পড়নি? আচ্ছা, শোন। মনে করিয়ে দিচ্ছি। যদি পড়ে থাক।

O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee!

Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air—

কেমন? কতকটা কবীরের মতো কি না?"

মাস্টার মশায় তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন। বিমোহনের একটু একটু করে মনে পড়তে থাকল। যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। যখন সে স্কুলের ছাত্র, এসব কবিতা তার বোধগম্য নয়, পাঠ্য তো নয়ই, তখনো মাস্টার মশায় তাঁর প্রিয় শিষ্যকে সযত্নে কবিতা বেছে বেছে পড়ে শুনিয়েছেন।

স্বভাবতই তিনি প্রফুল্ল। সব সময় মুখে হাসিটি লেগে আছে। বিমোহন লক্ষ করল তাঁর মুখে হাসি, কিন্তু চোখে জল। রোদ আর বৃষ্টি। কী জানি কেন তারও চক্ষু সজল হলো। কবীর বললে কী হবে, দেখে হাসি লাগে না। বরং কান্নাই পায়। মাছ জলে বাস করে, জল তার চারদিকে, তবু তার জলতেষ্টা গেল না। কবে যাবে? কিসে যাবে?

"বিমোহন," নীরবতা ভঙ্গ করলেন মাস্টার মশায়, "এক দরজা বন্ধ না হলে আরেক দরজা খোলে না। জীবনের পরেও জীবন আছে, যেমন জলের পরও জল আছে। চারদিকেই জল। চারদিকেই জীবন। জলের এক নাম জীবন। যেমন জাহ্নবী জীবন।" এই বলে একটু মাস্টারি করলেন।

"দরজা খোলার কথা কী বলছিলেন, সার?"

"ওঃ। হাঁ। বলছিলুম এক দরজা বন্ধ না হলে আরেক দরজা খোলে না। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কতবার যে এরকম ঘটল আমার এই ষাট বছরের জীবনে। এবার জীবনের দরজাটাই বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর জীবনেরই দরজা খুলে যাবে। এও যেমন জীবন সেও তেমনি জীবন। কোনো ভেদ নেই বিমোহন। কিছুমাত্র ভেদ নেই। জল আর জল আর জল। মাছ এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে যায়। সাত ঘাটের জল খায়। কোথাও তার তৃষা মেটে না। সেই-জন্যেই বলা হয়েছে, পানীমে মীন পিয়াসী।"

বিমোহন চুপ করে শুনে যেতে লাগল, তিনি বলে যেতে লাগলেন কতকটা আবোল তাবোল মিশিয়ে। সেসব আমরা বাদসাদ দিতে পারি।

"দেখি লাগত হাঁসি। যাঁরা সর্বদর্শী তাঁদের তো হাসি পাবেই। আমারও হাসি পায়। যদিও আমি অবোধ। বুঝলে, বিমোহন, চারদিকে এত ভালোবাসা, এত স্নেহপ্রেম। প্রভু, আমি কি এর যোগ্য! প্রভু, আমার যে কান্না পায়! আমি তো তোমাকে এত ভালোবাসিনি। তুমি কেন আমাকে এত ভালোবাসো? এই যে একটি বালক বিমোহন, এ পঁচিশ বছর পরে ছুটে এসেছে আমাকে দেখতে। কাল সারারাত জেগে কাটিয়েছে। প্রভু, আমি কি এর যোগ্য?"

বিমোহন তাঁকে বাধা দিল না। তাঁর চোখে জল ঘনিয়ে এলো আবার।

"ওহে বিমোহন, এককালে আমার ধারণা ছিল, এসব আমার পাওনা। আমার ন্যায্য দাবী। ভালোবাসা এক ছটাক কম পড়েছে দেখলে আমি বিষম রাগ করেছি, বলেছি, এরা অকৃতজ্ঞ! রাগ করে কথা বলা বন্ধ করেছি, ভাত জল বন্ধ করেছি। ভেবেছি, এইসব করলে ওরা আমাকে ভালোবাসবে। পাগলামি আর কাকে বলে! প্রভু, তুমি যে ভালোবাসো সে তোমার করুণা। তোমার গ্রেস। ওহে বিমোহন, গ্রেস কাকে বলে, জানো তো? ক্রিশ্চানদের গ্রেসতত্ত্ব তোমাকে একদিন বোঝাব। আমি যে যোগ্য বলে তুমি আমাকে ভালোবাসো তা নয়। আমি অযোগ্য, তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে ভালোবাসো। এত যে ভালোবাসো, তবু আমার পিপাসা মিটল না। এ-পারে যখন মিটল না, ও পারেও কি মিটবে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। রস আমাকে ঘিরে রয়েছে, আমিই অরসিক।"

এর পরে আবার একটু মাস্টারি। "বুঝলে, বিমোহন? একেই বলে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।"

মীনাক্ষী এসে বিমোহনের জন্যে ঠাঁই করে দিয়ে খেতে ডাকল। বিমোহন অনুযোগ করল, "এসব কেন? আমি তো চা-টা খেয়েই বেরিয়েছি?"

মীনাক্ষী বলল, "চা খেয়েছেন, কিন্তু টা খাননি। এখন খেতে আজ্ঞে হোক। চা টা দুই খেতে হবে।"

ওটা অবশ্য অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ নয়। বিমোহন তা প্রমাণ করে ছাড়ল। ওদিকে মাস্টার মশায় সামান্য একটু পথ্য করলেন। ফলের রস। তাঁর দেহ শীর্ণ হতে হতে শয্যায় মিশিয়ে গেছে। যেন বালুশয্যায় শীতের ক্ষীণস্রোতা নদী।

"তুমি তো জানো শরীর আমার কোনো কালেই পটু ছিল না।" এই বলে তিনি নিজেই নিজের সংশোধন করলেন, "না, না, তা কেন বলব? ছেলেবেলায় আমি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিলুম। বড় হয়েও ফুটবল ক্রিকেট খেলেছি। হাই জাম্প, লং জাম্প করেছি। কেবল পড়াশুনোয় নয়, খেলাধুলোয় নাম করেছি। শরীর অপটু হলে কেউ পারে মোমবাতি দুদিক থেকে জ্বালাতে?"

খেতে খেতে বিমোহন বলল "আপনার কলেজ জীবনের ফোটো দেখেছি। গ্রুপ ফোটো। হকি স্টিক হাতে। দিব্যি জোয়ান চেহারা।"

মাস্টার মশায়ের চোখে মুখে হাসি। "শিবপুরের সঙ্গে খেলায় জিতেছি। তামাশা নয়। মীনু মানতে চায় না। বলে ওটা ফোটোগ্রাফির ট্রিক।"

মাস্টার মশায় তাদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, "হাঁ, এককালে দারুণ খেলেছি। দারুণ খেটেছি। দারুণ খেয়েছি। কিন্তু তারপর কী হলো, শোন। বি-এ পরীক্ষার ক'দিন আগে আমাদের হস্টেলের একটি ছেলের টাইফয়েড হয়। সেকালে টাইফয়েডকে লোকে যমের মতো ভয় করত। কেউ তার সেবা করতে যাবে না। আমিও কি যেতুম? গেলুম আমি ডন সোসাইটির সভ্য বলে। যেখানে একজন বিপন্ন সেখানে আরেক জন তাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ করবে। চাচা, আপনা বাঁচা, এ যদি নীতি হয় তবে দেশ কোনোদিন স্বাধীন হবে না। ঐ করেই দেশ গেছে।"

"তারপর?" বিমোহন উদ্বিগ্নভাবে জানতে চাইল।

"তারপর আমারও হলো। বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। অনেকদিন ভুগে উঠলুম। কিন্তু পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পেতে দেরি হতে লাগল। চেঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পশ্চিমে একটি পাহাড়ে জায়গায়। বিমোহন, জীবনে আমি কখনো পেছিয়ে যাইনি। বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। বার বার বেঁচে গেছি। তবে অক্ষত রয়েছি, এমন কথা বলতে পারব না। ক্ষতিটা শরীরের উপর দিয়েই গেছে। মনের দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। চরিত্রের উন্নতি হয়েছে। উপলব্ধির কোটায় মোটা মুনাফা জমেছে। তোমার এই গরিব মাস্টার মশায়টিও একজন মিলিয়নেয়ার। খবরদার, ফাঁস কোরো না কিন্তু। ইনকম ট্যাক্সওয়ালারা টের পেলে ধরবে।"

বিমোহনও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাসল। তার মনে ছিল মাস্টার মশায় তাকে প্রায়ই বলতেন, হস্টেলের ছেলেদের অসুখে বিসুখে এগিয়ে যেতে। বলতেন, সেটাও শিক্ষার অংগ। পড়ার ক্ষতি হয় হবে। পরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। অপূরণীয় ক্ষতি হলেও পেছিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যারা পেছিয়ে যায় তারা মানুষ হয় না। তিনি তাঁর ছাত্রদের মানুষ করবেন বলেই শিক্ষাব্রত নিয়েছেন। সেইভাবেই দেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করছেন।

"সে বছর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হলো

না, যদিও সসম্মানে পাশ করার জন্যে তৈরি ছিলুম আমি। চেঞ্জ থেকে ফিরে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম স্বদেশী আন্দোলনে। সে কী উন্মাদনা! কার সাধ্য এড়ায়! অরবিন্দের মতো মহাপুরুষদের সংস্পর্শে আসা কি কম সৌভাগ্য! আর রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিদের! তিনি কি শুধু মহা-কবি! তিনি মহাঋষি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বসে মহাত্মা গান্ধী লক্ষ্য করছিলেন বাঙালীর সেই সংগ্রাম। তিনিও কি তার থেকে প্রেরণা পাননি? তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। বাঙালীর সেদিন আর হবে না। তেমন পবিত্র অন্তঃকরণ কোথায়?"

রাজনীতি এসে পড়ছে দেখে বিমোহন প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দিল। "আর কি তা হলে পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছিলেন?"

"আরে, না, না। সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। তুমি বাধা দিলে কেন? অবিশ্রাম গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমার আহার-নিদ্রায় অনিয়ম ঘটল। অনিয়মই অস্বাস্থ্যের মূলে। তাতে প্রতিরোধশক্তি ক্ষয়ে যায়। রোগবীজাণু সহজেই জয়ী হয়। তারপর তাকে হটানোর জন্যে কতকগুলো অ্যালো-প্যাথিক দাওয়াই। চোরকে তাড়াতে ডাকাতকে ডাকা। কী বলছিলুম? আহারনিদ্রায় অনিয়ম ঘটল। দেখি আমার ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। আমাকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হল পশ্চিমে। সেই ছোট্ট শহরে। পাহাড়ের কোলে। সেখানে বাসা করে থাকি। একমাত্র সাথী একটি চাকর। কিন্তু প্রকৃত সাথী যত রাজ্যের বই কাগজ। সবাই ভালোবেসে পাঠায়। সে এক মোচ্ছব! পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে কলেজের গণ্ডির বাইরে কত বড় একটা মহাজগৎ আমার অপেক্ষায় ছিল। সুস্থ সবল ভালো ছেলে হলে কি তার খোঁজ পেতুম?"

মাস্টার মশায় মনে মনে কী যেন খুঁজলেন, তারপর বললেন, "আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ ছিল এম-এতে সব কটা প্রতিযোগীকে পরাস্ত করে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাব। বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসার হব। সে উচ্চাভিলাষ একটু একটু করে অলকাপুরীর প্রাসাদ-চূড়ার মতো আকাশে মিলিয়ে গেল। নজরে পড়ল রামগিরি। যেখানে আমি নির্বাসিত যক্ষ। এবারকার চেঞ্জ তিন চার মাসের জন্যে নয়। তিন চার বছরও লেগে যেতে পারে। কলেজে ফিরতে স্পৃহা ছিল, কিন্তু ভালো পাশ করার শক্তি ছিল না। তা বলে আমার জীবনের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো অগত্যা নয়।"

তাঁর গৃহিণী এসে তাঁকে আর কথা না বলতে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। বিমোহনও তা শুনে উঠি উঠি করছিল। তিনি তাকে বসতে ইশারা করলেন।

"পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি খুলে গেল। এ যে রূপের সায়র। আমি যেন ছোট একটি মাছ। আমি এর মাঝখানে হারিয়ে গেছি। কূলে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। কূল কোথায় যে কূলে ফিরে যাব। আর কূল আমার কে যে আমি কূলে ফিরে যাব! আমি যে মাছ। আমি তো ডাঙার জীব নই। ডাঙায় ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠেই না। আর সেখানে গেলে আমি বাঁচব কেন? জলের মাছ কি ডাঙায় বাঁচে? খালি ছটফট করে, কখন আবার জলের কোল পাবে। আমি প্রথমেই স্থির করে ফেললুম যে জলের মাছ হয়ে জলে বাস করব। ওই পাহাড়ের দেশেই বসতি করব। তার পরের প্রশ্ন, চলবে কী করে? খাব কী?"

"কেন? পোকামাকড় খাবেন! মাছ যখন আপনি।" মীনাক্ষী বিমোহনের দিকে চেয়ে সমর্থন আশা করল। কিন্তু বিমোহন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

"ওগো, পোকামাকড় খেতে কি আমার আপত্তি ছিল? আমি যখন মাছ। কিন্তু অন্তত একটা চাকরও তো রাখতে হবে। আর আমার সেই আদরের কুকুর ভুলি কী খাবে? ভুলি, তোমাকে আমি ভুলিনি। আমাকে তুমি সঙ্গ দিয়েছ, পাহারা দিয়েছ, সে কি আমি ভুলতে পারি? আহা, তোমার সেই উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা! আমি কি তার যোগ্য!"

"ভুলিকেই বিয়ে করলে পারতেন।" মীনাক্ষী কটাক্ষ করল।

"পারলে কি করতুম না, ভেবেছ? ওর প্রায় আট দশটি প্রার্থী ছিল। ও যখন পথ দিয়ে যেত তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীদের মিছিল চলত। একটা চলমান স্বয়ংবরসভা। ওহে বিমোহন, চলমান শব্দটা কি শুদ্ধ না অশুদ্ধ? চলন্ত স্বয়ংবরসভা। উঁহু!"

বিমোহন রায় দিল, "মাস্টার মশায়, আপনি যাই বলবেন তাই শুদ্ধ হবে।"

মাস্টার মশায় খুশি হয়ে বললেন, "বাংলা আমার সাবজেক্ট নয়। আমি বরাবর ইংরেজী নিয়েই মত্ত। স্বদেশী আন্দোলনের পাণ্ডা হলে কী হয়, আমার হৃদয় পড়ে থাকত ইংরেজী কবিতায়। ওদের সাম্রাজ্য টাম্রাজ্য সব যাবে। কিছু টিকবে না। কিন্তু কবিতা? আহা, অমৃত! অমৃত! আমি সেই অমৃত সাগরে ডুবে থাকতুম। মাছের মতো। বই ছেড়ে আমার উঠতেই মন করত না। মংরা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নাওয়াত, খাওয়াত। আহা, মংরার সে কী স্নেহ! কোনোদিন কি ভুলতে পারব তোমাকে। মংরা, আমি কি তোমার স্নেহের যোগ্য! কীই বা দিয়েছি তোমাকে! মাসে তিন টাকা করে মাইনে। আর দু'বেলা দু হাঁড়ি ভাত। মাঝে মাঝে হাঁড়িয়া।"

মীনাক্ষী হো হো করে হেসে উঠল বিমোহন তাকে বকুনি দিতে গিয়ে হি হি করে হাসল। মাস্টার মশায় ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "ওটা কি হাসির কথা হলো? যার যা খাদ্য। ইংরেজ বীয়ার খায় শুনলে কেউ হো হো করে? চল্লিশ বছর বয়স হলো, মীনাক্ষী। এখনো ম্যানার্স শিখলে না।"

তা শুনে মাস্টার মশায়ের ছোট ছেলে দুলাল হেসে উঠল। তার মা তাকে ও ঘর থেকে ভাগিয়ে দিলেন। তার বাপকে বললেন, "লক্ষ্মীটি, এইবার থামো।"

বিমোহন গাত্রোত্থান করছে দেখে মাস্টার মশায় তাকে আবার ইশারা করলেন গাত্র-ভার নামাতে। বললেন, "কত কাল পরে এসেছ। বোসো একটু।"

সে বলল, "আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

"আরে, না, না, কষ্ট কিসের? এ যাত্রা স্বর্গারোহণ করছিনে, এটা নিশ্চিত। ওরা ভুল আশঙ্কা করেছিল। আমি ঠিক জানতুম যে, এখনো আমার যাবার সময় হয়নি। এ পৃথিবী তার আগে আমাকে তার পরম ঐশ্বর্য দেখাবে। আমি সেই ঐশ্বর্য পারাবারের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থাকব। কীট্সের সেই কবিতা মনে আছে?

Or like stout Cortez when
with eagle eyes
He stared at the Pacific
—and all his men
Looked at each other with
a wild surmise—
Silent, upon a peak in Darien."

মাস্টার মশায় শুধু যে আবৃত্তি করলেন তা নয়, অভিনয়ও করলেন। সেই নীরবতা, সেই নীরব চাউনি। তাঁর ইশারায় বিমোহনও মূকাভিনয় করল। যেন তিনিই কর্টেজ, আর সে-ও মীনাক্ষী কর্টেজের সেনানী।

কিছুক্ষণ পরে তিনি পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। "এ পৃথিবী একদিন আমাকে তার ঐশ্বর্য পারাবারের মীন করবে। আমি তার আনন্দলীলার সাক্ষী হব। আনন্দ! আনন্দ! চারদিকে আনন্দ! আমি সেই আনন্দ পারাবারের মীন। যেদিকেই সাঁতার কাটি সেদিকেই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন আর কিছু নেই। নিরানন্দ কোথায় তা দেখতে হলে আনন্দের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু আনন্দের বাইরে কি যাওয়া যায়? না, একবার সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারলে আর যাওয়া যায় না। আনন্দের ভিতরে আমি, আমার ভিতরে আনন্দ। বাইরে। বাইরে বলে কোনো কথাই নেই। ভিতরে। ভিতরে। সমস্তই ভিতরে। একবার সে অবস্থায় পৌঁছলে

পারলে হয়, যখন পৃথিবী দেখাবে তার পরম ঐশ্বর্য।"

সেই হারিয়ে গেছল। বিমোহন ধরিয়ে দিল। বলল, "তা হলে পরীক্ষা আর আপনি দিলেন না। অথচ আমরা জানি যে আপনি বি-এ পাশ।"

"পরীক্ষা!" তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "পরীক্ষা একটা দিতে হয়েছিল বইকি। সেই ছোট শহরে একটি মিডল স্কুল ছিল। লাইব্রেরী ছিল না। মাস্টার মশায়রা আমার লাইব্রেরী থেকেই বইপত্র নিয়ে গিয়ে পড়তেন। সেইসূত্রে আলাপ। একদিন তাঁরাই প্রস্তাব করলেন আমি যেন ওখানে ইংরেজীর ক্লাস নিই। মাস্টার বলে আমার নামও তাঁদের খাতায় উঠল। তাতে আমার সুবিধে হলো এই যে, আমি প্রাইভেট বি-এ পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলুম। পড়া তো আমার আগেই তৈরি ছিল। খাটতে হলো না, শুধু একবার চোখ বুলিয়ে যেতে হলো। তখনকার দিনে বছর বছর পাঠ্য বদলাত না। পাশ করলুম। উইথ ডিস্‌টিংশন। তখনকার দিনে বি-এ পাশের একটা মহিমা ছিল। ডিস্‌টিংশন শুনলে লোকে সমীহ করত। না চাইতেই আমাকে হেড মাস্টার করা হলো। মিডল স্কুলের হেড মাস্টার বি-এ পাশ, সেকালে ওটা ছিল একটা অপরূপ ব্যাপার। আসলে ওদের মতলব ছিল এক এক করে হাই স্কুলের ক্লাস খোলা। মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া। হলোও তাই। কয়েক বছর পরে আমি হাই স্কুলের হেড মাস্টার।"

"তাতে আপনারও মর্যাদা বাড়ল।" বিমোহন মন্তব্য করল।

"আমি কি তার পিয়াসী ছিলুম হে?" তিনি বিনম্রভাবে বললেন, "ধনসম্পদ মান-মর্যাদা সব একদিকে। অন্য দিকে আমার কাতর প্রার্থনা যে, আমি যেন ভুলির ভালোবাসার, মংরার ভালোবাসার যোগ্য হতে পারি। যেন ছেলেদের ভালোবাসার যোগ্য হতে পারি। সহকর্মীদের ভালো-বাসার যোগ্য হতে পারি। যেন আকাশভরা সৌন্দর্যের, পাহাড়ঘেরা সৌন্দর্যের যোগ্য হতে পারি। আমার সেই চালাঘরটিকেও নমস্কার করে বলতুম, বাসা, তুমি তো খাসা, আমি যেন তোমার যোগ্য হতে পারি। এক টুকরো জমিতে আমার বাগান। বাগানকে নমস্কার করে বলতুম, বাগান, তুমি আমার নন্দনবন, আমি যেন তোমার যোগ্য হতে পারি। সত্যি বলছি, বিমোহন, সেই ঘুষঘুষে জ্বর থেকে মুক্ত হয়ে অবধি আমি সর্বদা সকলের কাছে হাত যোড় করেই রয়েছি। তোমরা, আমার ছাত্ররা, কি জানতে যে আমি তোমাদেরও মনে মনে নমস্কার করেছি? তোমরা নমস্কার করার পর যে প্রতিনমস্কার সেটা বাহ্য। তার আগেই তোমাদের আন্তরিক নমস্কার করতুম।"

বিমোহনের চোখ জলে ভরে গেল। সে বলল, "কিন্তু আপনি তো খুব কড়া শাসক ছিলেন। আমার তো কানে টান দিয়ে মাথাটাকে ঘোরাতেন। বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে খেলায় আপনার হাতও তেমনি করে আমার মাথাটাকে খেলাত।"

মীনাক্ষী খিল খিল করে হাসল। "স্বামী হিসেবেও কম কড়া নাকি?"

মাস্টার মশায় হেসে বললেন, "স্বামী হলো স্ত্রীর মাস্টার। মাস্টারদের দরকার হলে একটু কড়া হতে হয় বইকি। তোমার মাস্টারের মতো অত ভালোমানুষ হওয়া কি ভালো?"

বিমোহন বলল, "স্যার, আমরা জানতুম যে, আপনি আমাদের ভালোবাসতেন। তাই আপনার শাসনও আমাদের ভালো লাগত। কানমলার জন্যে কেউ নিসপিস করত।"

"ওমা! তাই নাকি?" মীনাক্ষীর চোখে কৌতুক।

"তখনকার দিনে", বিমোহন বলল, "আমরা বড়াই করতুম এই বলে যে, স্যার স্বয়ং আমাদের কান মলে দিয়েছেন।"

"ওটাও একরকম ডিসটিংশন।" পরিহাস করল মীনাক্ষী।

মাস্টার মশায় অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন, "তোমাদের স্কুলে যখন হেড মাস্টার করে আমাকে নিয়ে যায় তখন আমার যেতে ইচ্ছে ছিল না। লোকে বলবে, টাকার জন্যে আমি আমার নিজের হাতে গড়া স্কুল ছেড়ে গেলুম। ছাত্রদের পক্ষে কত বড় খারাপ আদর্শ! তা ছাড়া, ছাত্ররাও তো বলতে পারে, স্যার, কেন আপনি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন? টাকার জন্যে কি কেউ সন্তানকে ছাড়ে? কী যে অশান্তি বোধ করেছি! আসলে হয়েছিল এই। বাড়ি থেকে বার বার বিয়ের জন্যে তাগাদা আসছিল। শরীর যখন নীরোগ তখন বাধা কিসের? আমিও ভেবে দেখেছিলুম যে, ভুলিকে সঙ্গিনী করে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না। আর মংরার হাতের রান্নাও সারা জীবনের পথ্য নয়। শরীরের মত চাইলুম। সে বলল, নারীর নিপুণ পরিচর্যা না হলে আমি যে-কোনো দিন বিদ্রোহ করতে পারি। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, বিয়ে করার চেয়ে না করাই বেশী রিস্কী। দেশে গিয়ে বিয়ে করলুম। তারপর আবিষ্কার করলুম যে, ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, ভালো বাসা চাই। ভালো মাইনে চাই। স্কুল কর্তৃপক্ষ বুঝলেন আমার অবস্থা। কিন্তু আমাকে এসব দিতে গেলে ঘাটতি পড়ে। সহকর্মীদের দাবী পূরণ করতে হয়। আমি এতদিন একটা সুদৃষ্টান্ত ছিলুম। হয়ে দাঁড়াই কুদৃষ্টান্ত। তাঁরাই আমার জন্যে অন্যত্র চেষ্টা করেন।"

"আমরা কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আপনাকে আমাদের স্কুলেই দেখে এসেছি। স্কুল আর আপনি অভিন্ন।" বিমোহন আত্মীয়ের মতো বলল।

"তা যদি বল তোমাদের স্কুল থেকেও চলে যাবার কথা উঠেছিল। আরো ভালো অফার এসেছিল। আরো ভালো ব্যবহার পেতুম। যাইনি কেন, জানো? মনে মনে সংকল্প করেছিলুম, সাংসারিক প্রয়োজনকে অযথা বাড়তে দেব না। ডাল ভাত খেয়ে যদি চলে যায় মাছ ভাত খাব না। চাদর গায়ে দিয়ে যদি চলে যায় জামা গায়ে দেব না। চটি পায়ে দিয়ে যদি চলে যায় জুতো পায়ে দেব না। তোমাদের কতবার বলেছি, ধুতির কোঁচা গায়ে জড়িয়ে ক্লাসে আসতে। তাতে চাদরের খরচ বাঁচে। খালি পায়ে আসতেও বলতুম। তাতে চটির খরচ বাঁচে। প্রলোভন দমন করতে না শিখলে মানুষ হওয়া যায় না বিমোহন। তোমাদের শেখাব কী করে, যদি নিজে না শিখি? তবে তোমাদের স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে মাঝে মাঝে জ্বালাতন হয়েছি। ইস্তফা দিতে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে তোমাদের মুখ। শাশুড়ীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও বৌ কি তার বাচ্চাদের ছেড়ে যায়? সহ্য

করতে হয়। তবে, হাঁ, অন্যায় আদেশ বা হস্তক্ষেপ হলে অন্য কথা। সেক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা কর্তব্য। তাও করেছি।"

গুরুপত্নী এবার আদরের ধমক দিয়ে বললেন, "থামো। ঢের হয়েছে।"

বিমোহন বলল, "আজ তা হলে আসি, মাস্টার মশায়। আরেক দিন দেখা করব।"

তিনি তাকে আবার কাছে বসিয়ে প্রগাঢ় স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। দিতে দিতে কানে হাত দিলেন। মাথাটাকে দোলালেন। সে ধন্য হয়ে গেল।

তারপর বললেন, "বিমোহন, এই সংসার-সমুদ্রে অমৃতও আছে, গরলও আছে। আমি অমৃত পান করেছি। গরলও কি পান করিনি? তবে সে গরলও আমার কপালগুণে অমৃত হয়ে গেছে। পান করে অমৃতফল পেয়েছি।"

বিমোহন বিস্মিত হয়ে শুধাল, "তা কী করে হবে, স্যার?"

"সেইটেই তো আর্ট। তুমি আর্টিস্ট, আলোছায়ার কারবারী। তুমি কি জানো না কেমন করে রূপান্তর ঘটাতে হয়? বিমোহন, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি। অনেক শোক। দেশের ও দশের ভালো করতে গিয়ে অনেক মনোভঙ্গ। কদর্যতার সঙ্গে লড়তে গিয়ে অনেক জ্বালা। জীবনের কয়েকটা মূল্যনীতি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব আমার রসের রসায়নে রূপান্তরিত হয়ে অমৃত হয়ে গেছে। আমার ভিতরে যেন এক পরশমণি আছে। লোহাকেও সে সোনা করে দেয়। তোমার ভিতরেও আছে। মীনাক্ষীর ভিতরেও আছে। সকলের ভিতরেই আছে।"

মীনাক্ষী প্রতিবাদ করে বলল, "আমার ভিতরে নেই।"

তার জামাইবাবু বললেন, "আছে, তবে জানতে পারো না।"

হাসাহাসি পড়ে গেল। মাস্টার মশায় বিমোহনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের তারা শুকতারার মতো উজ্জ্বল থেকে ক্রমে আরো উজ্জ্বল। বিমোহনের মনে হতে থাকল তিনি তার কাছে শুয়ে থাকলেও তাঁর আত্মা কোন সুদূর আকাশে। তাঁর চোখের সঙ্গে তার চোখের দূরত্ব কোটি কোটি আলোকবর্ষ।

সে বলতে চাইল, "মাস্টার মশায়, আমাদের বহু ভাগ্য যে, আপনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন।" কিন্তু সত্যি কি তাই? তিনি বেঁচে আছেন বলেই কি মধ্যে রয়েছেন? তিনি অনেক যোজন দূরে চলে গেছেন। কোটি কোটি যোজন।

মাস্টার মশায় যেন ধ্যানস্থ হয়ে বললেন, "আমরা অমৃতের পুত্র। গরলকেও আমরা অমৃতে পরিণত করতে পারি। এর কিমিয়াবিদ্যা এমন কিছু দুরূহ নয়। চেষ্টা কর, তুমিও পারবে। হৃদয়কে খোলা রেখে দাও। শত্রুকেও সেখানে প্রবেশ করতে দাও। জ্ঞানের জন্যে যেমন মন খোলা রাখতে হয়, তা সে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, অমৃতের জন্যে তেমনি হৃদয়। বিষ হয়ে ঢুকবে, অমৃত হয়ে বেরোবে।"

বিমোহন বিমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। তার উঠতে পা সরছিল না। ওদিকে মাস্টার মাসিমা অস্থির বোধ করছিলেন। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন ছাত্র তো একটি দুটি নয়, এই কলকাতা শহরেই এক শ'টি। সবাইকে এত সময় দিলেই হয়েছে!

"আশীর্বাদ করুন", বলে বিমোহন তাঁর পায়ে হাত দিল।

"শত শত বার।" তিনি আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, "এসো মাঝে মাঝে। আমাদের ফিরতে দেরি আছে।"

"আসব নিশ্চয়।" এই বলে বিমোহন কোনো মতে পা দুটোকে টেনে বার করে আনল। পিছন ফিরে তাকাল। মাস্টার মশায় তখনো তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। কে জানে, কোন আসমানের দুটি তারা সুধাবর্ষণ করছে।

মাস্টার মাসিমাকেও প্রণাম করল বিমোহন। মীনাক্ষীর কাছে বিদায় নিতেই সে বলল, "আবার আসছেন কবে শুনি?"

"যেদিন বলবেন।" বিমোহন বলল, "বাড়ির মালিক যখন আপনি।"

"থাক, আরেকদিন এর উত্তর দেব।" সে দ্ব্যর্থবাচকভাবে বলল।

"আমিও মীন পিয়াসী।" দ্ব্যর্থবাচক-ভাবে বলল বিমোহন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মীনাক্ষীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মাস্টার মশায়ের সঙ্গে হলো পাঁচ বছর পরে দেওঘরে। সেখানে তিনি একটা নতুন ধরনের আশ্রম স্থাপন করে সপরিবারে বাস করছিলেন। জনা দশ বারো ছাত্রছাত্রী থাকে। পড়ে শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, দূর যেখানে রুচি। ফিরে আসে সন্ধ্যার আগে। বেরিয়ে যায় বেলা নটার পরে।

"এ কী আমার কাজ!" মাস্টার মশায় এমন ভাবে বললেন যেন ক্ষমাভিক্ষা করছেন। "করতে হচ্ছে মহাত্মাজীর আত্মার তৃপ্তির জন্যে। তাঁকে যারা সরিয়ে দিয়েছে তারা যদি মনে করে থাকে যে, তাঁর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তবে তারা ভুল করছে।" এবার তাঁর কণ্ঠে রৌদ্ররস এলো। তিনি বজ্রাদপি কঠোর।

বিমোহন স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। মাস্টার কি শেষকালে পলিটিসিয়ান হলেন!

"আশ্রমে পড়াশুনো হয়তো হবে। হয়তো হবে না। পুজোপার্বণ হয়তো হবে। হয়তো হবে না। জপতপ হয়তো হবে। হয়তো হবে না। সুতো কাটা হয়তো হবে। হয়তো হবে না। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে, সেখানে আর 'হয়তো' নয়। সেখানে 'অবশ্য'। আশ্রমে মানুষ মানুষকে হিংসা করবে না, মানুষ পশুকে হিংসা করবে না, পশু পশুকে হিংসা করবে না। দৃষ্টান্ত দেখানোর ভার মানুষের উপরে। মানুষকে দৃষ্টান্ত দেখানোর দায়িত্ব ঋষির উপরে। আমি তো ঋষি নই, তবে কেন আমার এ দায় গায়ে পেতে নেওয়া? অনেক চিন্তা করেছি, বিমোহন। অনেক ইতস্তত করেছি। এড়াতে পারিনি। আমার তো কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। তা হলে ভয় কাকে? উচ্চাভিলাষই একমাত্র শত্রু।"

বিমোহন বিমোহিত হলো না। তার স্বভাবটা ছিদ্রান্বেষীর। জানতে চাইল আশ্রমে হাড়ি ডোমদেরও ঠাঁই আছে কি না। উত্তর পেলো, "আছে। আছে। তবে এই মুহূর্তে নয়। আর কিছুদিন পরে।" জানতে চাইল খ্রিশ্চান মুসলমানদেরও জায়গা হবে কি না। উত্তর পেলো, "হবে। হবে। তবে আজ এখনি নয়। আরো কিছুদিন পরে।"

তখন বিমোহন বলল, "মাস্টার মশায় মানুষে মানুষে ঘৃণা যদি থাকে তবে এই মুহূর্তেই তাকে দূর করা দরকার। দিনকের দিন আরো দেরি হয়ে যাবে। ঘৃণারই প্রত্যক্ষ রূপ হিংসা। আর হিংসারই অপ্রত্যক্ষ রূপ ঘৃণা। ভারতবর্ষের মতো এত ঘৃণা আর কোন দেশে আছে? তাই তো আশঙ্কা হয়, হিংসাকে অহিংসা দিয়ে ঠেকানো যাবে কি?"

মাস্টার মশায় মর্মাহত হলেন। বললেন, "তা হলে তুমিই আশ্রমের দায়িত্ব নাও।"

বিমোহন হাত জোড় করে বলল, "আপনি প্রণম্য। কিন্তু আপনার এই আদেশটি আমি পালন করতে অক্ষম। আমি আর্টিস্ট। আর আপনিও অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে থাকলেই পারতেন। আমার স্টুডিওতে, আপনার স্কুলে হাড়ি ডোম মুসলমান খ্রিশ্চান সকলের স্থান আজ এখনি আছে। মাস্টার মশায়, বিষয়টা যদি জরুরি হয়ে থাকে তবে আশ্রম জরুরি নয়, স্কুলই জরুরি। স্টুডিওই জরুরি। আমি যে কাজ নিয়ে আছি তা সার্বভৌমিক জরুরি কাজ। আমি আর কিছু পারি না পারি সৌন্দর্যের ভোজে সব মানুষকে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়ে দিয়েছি। আমার প্রদর্শনীতে কেউ অন্ত্যজ নয়, কেউ বিধর্মী নয়, কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। আঁকি যখন তখন কাউকে বাদ দিইনে। কারো উপর পক্ষপাত দেখাইনে।"

তিনি বার বার মাথা নাড়লেন। অনেকক্ষণ নীরব থেকে তারপর আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "ঈশ্বর জানেন আমার অন্তরে ভেদবুদ্ধি নেই। কিন্তু এই

মুহূর্তে আমি এ দায় বহন করতে পারব না। তা হলে আশ্রম তুলে দিই। কী বল?"

"মাস্টার মশায়, আমি বলবার কে!" বিমোহন বিমূঢ় হলো।

"আমার মনে হচ্ছে তোমার আজ এখানে আসাটা তোমার ইচ্ছায় নয়, আমার ইচ্ছায় নয়। তাঁরই ইচ্ছায়। তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিতে এসেছ। কিন্তু, বাবা, স্কুল নিয়ে থাকা আর আমার দ্বারা হবার নয়। বয়স হয়ে গেছে। অবসর নিতে বাধ্য না করলে হয়তো আরো কয়েক বছর হেড মাস্টারি করতুম। কিন্তু একদিন না একদিন ছেড়ে দিতে হতোই। ততঃ কিম্? আশ্রম হলো সেই ততঃকিমের উত্তর। তা তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি, উত্তরটা দেশের স্বার্থে নয়, আমারই স্বার্থে। আমারই একটা অকুপেশন আর কী! তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, বিমোহন। তুমি এখন পূর্ণবয়স্ক আর আমি তো দ্বিতীয় শৈশবের সন্নিকটবর্তী। গুরু হবার কথা তোমারই। শিষ্য হবার কথা আমারই। না, না। অভিমান করে বলছিনে। নির্জলা সত্য। আমি আর মাস্টারি [illegible]নী, বিমোহন। আমি ছাত্র হব। শিখব। ভয়ানক ইচ্ছা করে আর্টের ছাত্র হতে।"

"সার, আমাকে লজ্জা দেবেন না", বলে বিমোহন আবার হাতযোড় করল।

মাস্টার মশায়ের চুল একটিও পাকেনি। দাঁত একটিও পড়েনি। শিরদাঁড়া তেমনি খাড়া। চোখের তারা তেমনি উজ্জ্বল। বার্ধক্যের লক্ষণ কোথায়! তবু বোঝা যায় যে, বয়স হয়েছে। বললেন, "দেখ, বিমোহন, প্রকৃতির সঙ্গে চালাকি খাটে না। বয়স হয়েছে এটা গোড়ায় মেনে নিয়ে তার পরে প্রকৃতির সঙ্গে কথা কইতে হয়। বলতে হয়, প্রকৃতি ঠাকরুণ, তোমারও তো বয়স হয়েছে। কেমন করে তুমি এমন কর্মিষ্ঠা হলে? জানতে পাই তোমার রহস্য? রহস্য আর কিছু নয়, ছন্দ। যে বয়সের যে ছন্দ। এ বয়সেরও একটা ছন্দ আছে। সেটা আবিষ্কার করতে পারলে বয়সের দ্বারা পরাস্ত হতে হয় না। আমাকে সেটা আবিষ্কার করতে হবে। তা হলে আর দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে যাব না। আরো পূর্ণবয়স্ক হব। ব্রাউনিং মনে আছে?"

শীতকালের বিকেল। পড়ন্ত রোদ। গাছতলায় বসে গুরুশিষ্যসংবাদ। মাস্টার মশায় উদ্দীপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন

Grow old along with me!
The best is yet to be,
The last of life, for which the
first was made:
Our times are in His hand
Who saith 'A whole I planned,
Youth shows but half; trust
God: see all, nor be afraid!'

অস্তরাগের ছটায় মাস্টার মশায়ের মুখ অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তিনি যেন অন্য কোনো জগতের অধিবাসী। তাঁর চোখে অপার্থিব আভা। আবৃত্তি সারা হলে কিছুকাল মৌন থেকে বললেন, "ওহে বিমোহন, আমাকে সমস্তটাই দেখে যেতে হবে।"

বিমোহনের মনে পড়ল, সে বলল, "সার, সেই যে সে-বার বলেছিলেন, পৃথিবী আপনাকে তার পরম ঐশ্বর্য দেখাবে। আপনি হবেন আনন্দ পারাবারের মীন।"

তিনি তদ্গত হয়ে স্মরণ করলেন। "হাঁ, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সেই রকমই কথা আছে।"

"সে কি কথা রেখেছে?"

"আশায় আশায় আছি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

"একটুখানি আভাস কি তার পেয়েছেন, সার? পরম ঐশ্বর্যের?"

"তা কি আর পাইনি! এই তো সেদিন দেখা গেল, পিস্তলের গুলী বুকে বিঁধছে, সাধুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বলছেন, হে রাম! হে রাম! অন্তরে অসীম প্রেম, নয়নে অশেষ ক্ষমা। পৃথিবীকে বলি, পৃথিবী, এর পরেও কি তুমি বেঁচে থাকতে বল? দেখাতে পারবে আরো মহান দৃশ্য? পৃথিবী উত্তর দেয়, বেঁচে থাকলে দেখবে। তাই তো বেঁচে আছি। নইলে বাঁচতে কে চায়, বল? আমার জীবনটাই যে ব্যর্থ।"

বিমোহন স্তম্ভিত হলো। "সে কী, মাস্টার মশায়!"

"বিমোহন, দুঃখে শোকে আমার ভিতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সেই শতছিদ্র গাগরী দিয়ে আমি শ্রীরাধার মতো যমুনার জল ভরছি। আনন্দ? হাঁ, আনন্দ এরই নাম। আনন্দ পেয়েছি। তবু যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন দেখি জীবনটা নিয়ে কত কী করতে পারা যেত কী এমন করা গেল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে চির-কালের মতো স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। কিন্তু হলো কি তা রদ? চল্লিশ বছর পরে আবার যে কে সেই। বরং আরো খারাপ। বঙ্গ-ভঙ্গের উপর ভারতভঙ্গ। কই, রদ করার জন্যে কেউ আমাদের যুগের মতো ত্যাগব্রত নিয়েছে? তপস্যা করেছে? কোথাও সত্যিকার বেদনা দেখছ? তা হলে কেন আমরা জীবন ক্ষয় করলুম? কার জন্যে করলুম? যা অনিবার্য তাই যদি হবে তবে নিবারণের জন্যে কেন এই জীবন-পাত?"

বিমোহন সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছেন, তিনি তাকে নিরস্ত করে বললেন, "জানি, তার ফলে স্বাধীনতা সুগম হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ তো দেখছ। প্রত্যেকটি স্কুলে বাবুয়ানার বান ডেকে চলেছে। আমরা তা হলে আধপেটা খেয়ে খালি গায়ে থেকে খালি পায়ে হেঁটে কার কী মঙ্গল করলুম? নিজেদের কিছু খরচ বাঁচে এই কি ছিল আমাদের ফন্দী? তা হলে আজ আমার চালচুলো নেই কেন? একটা আদর্শের জন্যে বিত্ত উৎসর্গ করে কী ফল হয়েছে শুনবে? মেয়ে বলছে, আমার ভালো বিয়ে হতে পারত, বাবার টাকা ছিল না, টাকার জন্যে চেষ্টা ছিল না, তাই হলো না। ছেলে বলছে, আমার ভালো চাকরি হতে পারত, বাবার টাকা ছিল না, টাকার জন্যে চেষ্টা ছিল না, তাই হলো না। ওরা এখন কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে, টাকা করবে, ওদের ছেলেদের যাতে ভালো চাকরি হয়, মেয়েদের ভালো বিয়ে হয়। আমার আশ্রমে আমার নিজের নাতি নাতনী নেই। লজ্জায় লোকের কাছে মাথা হেঁট হয়ে যায়।"

মাস্টার মশায় বিমোহনের ওজর আপত্তি কানে তুললেন না। বললেন, "না, বিমোহন, আমি আত্মপ্রতারণা করব না। আমার যুগ গেছে, আমি পিছনে পড়ে আছি। আমিও একদিন যাব। তবে যাবার আগে দেখে যাব পৃথিবী আমাকে কী দেখাতে চায়। দেখে আনন্দের সঙ্গে চলে যাব। আনন্দের সাগরে।"

"তখন", বিমোহন আশা করল, "আপনার পিপাসা মিটবে।"

তিনি তার কান ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "পিপাসা আমার তখনো মিটবে না, বিমোহন। কখনো মিটবে না। এ পারেও না। ও পারেও না। আমি আনন্দ-লহরীতে ভাসব আর ডুবব আর সাঁতরাব আর খেলব। কিন্তু বার বার পান করেও জলপিপাসা আমার মেটবার নয়। আমি যে পানীয়ে মীন পিয়াসী।"

ওদিকে মাসিমার কাছে খবর পৌঁছেছিল যে, বিমোহন এসেছে। জলখাবারের ডাক এলো। সে যদিও মীন নয়, তবু পানীয়পিয়াসী।

"বিমোহন", মাস্টার মশায় তার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "তোমাকে একটা গুহ্য কথা বলি। ব্রহ্মাস্বাদ যতবার পাই ততবার পেতে সাধ যায়। ব্রহ্মবিহারে তৃপ্তি নেই। মরণ এর কাছে কিছু নয়। ও আমি একলাফে পেরিয়ে যাব।"

বেনাপোলে ট্রেন এসে থামল। পাকিস্তানে ঢুকেছি, সীমান্তের স্টেশন। উঁচু ক্লাস বলে ভিড় নেই। গদির বেঞ্চিতে সামনাসামনি আমরা দু-জন।

সীমান্ত-পুলিস ও কাস্টমসের লোক একসঙ্গে কামরায় ঢুকল। সীমান্ত-পুলিস সামনের ভদ্রলোককে বলছে, পাশপোর্ট-ভিসা দেখান মশায়। কাস্টমসের লোক আমায় বলছে, ও-পার থেকে কি কি আনলেন, বের করুন মিঞাসাব।

হেসে বলি, মিঞাসাব ভুল করে বলছেন। হিন্দুস্থানের মানুষ আমি। এক আত্মীয় মারা গেছেন এখানে, তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে পাঁচ-সাত দিনের জন্য যাচ্ছি। জিনিসপত্র কি আনতে যাব?

এবং সামনের ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বুকে থাবা মেরে বললেন, মিঞাসাব আমি—মশায় নই। আমি পাকিস্তানি, পাকিস্তানের পাশপোর্ট আমার। কলকাতায় সারাজীবন কেটেছে। বড়দিনের আমোদ-স্ফূর্তি এখন কি রকম হয়, সেইটে দেখতে গিয়েছিলাম।

উভয় কর্মচারীই একবার আমার দিকে, একবার ঐ ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তারপর যথারীতি পাশপোর্ট-ভিসা পরখ করে মালপত্র দেখে নেমে গেল।

ভদ্রলোক তখন হো-হো করে হেসে উঠলেন: দেখুন খোদাতালাহ্ গায়ের উপর লিখে দেননি কে হিন্দু কে মুসলমান। তা হলে এমন ভুল হত না। আমি আবদুল আজিজ—আমাকে ওঁরা হিন্দু ঠাউরে বসলেন।

আমিও হেসে বলি, খোদাতালার ভুল মানুষে সংশোধন করে নিয়ে মোকাবেলা করে। সবাই তাই এক নজরে বুঝতে পারে। আয়না দেখি নাকি যে! অনেক দাড়ি রয়েছে, আপনার গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। তাইতে ওঁদের গোলমাল হয়ে গেল।

আজিজ বললেন, মসজেদ-মন্দির নয়, পুরাণ-কোরাণ নয়, ধর্ম তবে এসে দাঁড়িতে ঠেকেছে? তা ছিল আমার দাড়ি। কালো-কুচকুচে এক গোছা নূরে চমৎকার দেখাত। কিন্তু কালো দাড়ি পেকে সাদা হয়ে যায়। দাড়ি ধর্মের নিশানা হোক, পাকা দাড়ি বার্ধক্যের নিশানা। সত্যি কথা বলি আপনাকে, এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হতে চাইনে। দাড়ি সরিয়ে দিয়ে যৌবনের চেহারা রেখেছি। যদ্দিন পারা যায়, যুবা হয়ে থাকি।

আমার দাড়ি ছিল না। চেহারার খাতিরেই রাখতে হল। দাঙ্গার সময় ছোরা মেরেছিল। এক কোপ পিঠের উপর মারল। সেটা মারাত্মক নয়, জামায় ঢেকেঢুকে বেড়াই। আর একটা মারল থুতনিতে। থুতনির সেই উৎকট দাগ ঢাকবার জন্য দাড়ি।

দাঙ্গার কথায় আজিজ বিচলিত হয়ে ওঠেন: উঃ মশায় বলবেন না—বলবেন না! চিরকালের বসত ওঠাতে হল ওই ধাক্কায় পড়ে। বাড়ি পুড়িয়ে জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে গেল। আমি পাকিস্তানে চলে এলাম।

আর আমার কথা ঐ তো শুনলেন। দু-দুটো কোপ খেয়েছি, অক্কা পেতে পেতে বেঁচে গিয়েছি। বাড়ি আপনার কোনখানে ছিল বলুন তো আজিজ সাহেব।

ভবানীপুর, রাণীবাগান লেনে। চেনেন নাকি?

কী আশ্চর্য, আমারও বাড়ি ঐদিকে। এখনও থাকি সেখানে। রাণীবাগান লেনের কোন বাড়িটা বলুন তো।

আজিজ বলেন, করপোরেশন প্রাইমারি ইস্কুল, তারই লাগোয়া টিনের বস্তি ছিল—

বুঝেছি, বুঝেছি। ঠিক সামনে বিশ্বকর্মা রিপেয়ারিং হাউস—স্টোভ টর্চ এই সমস্ত মেরামত করে। শুনুন তবে। বস্তি পোড়ানোর পরের দিন বিশ্বকর্মায় আমি টর্চটা দেখাতে এসেছি, পিছন দিক থেকে ঘ্যাচ করে মারল ছোরা। মুখ ফিরিয়েছি তো ফের থুতনির উপর বসিয়ে দিল। হিন্দু পাড়ার মধ্যে সাহসটা কি রকম দেখুন।

আজিজ বলেন, মুখ ফেরালেন আর মানুষটা দেখলেন না?

দেখেছি বইকি! পলকের দেখা, কিন্তু মনে গাঁথা আছে মানুষটার চেহারা।

আজিজ বলেন, ছাই আছে। আমিই তো সেই। তখন অবশ্য দাড়ি ছিল আমার।

দাড়িই গোলমাল করে দিয়েছে। তবে বলি, আপনাদের বস্তি পোড়ানোর বড় পাণ্ডা একজন আমি। আপনিও কি আর দেখেন নি! তখন আমার দাড়ি ছিল না। দাড়ির দরুন আজ ঠাহর করতে পারলেন না।

কী আশ্চর্য, কতকাল পরে দেখা!

বেঁচে থাকলেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

কাস্টমসের মানুষ যাচ্ছে কামরার সামনে দিয়ে। জিজ্ঞাসা করি, আর কতক্ষণ আটকে রাখবেন?

হাতঘড়ি দেখে সে বলে, আধ-ঘন্টা তো বটেই।

আজিজ আমার হাত ধরে টানেন: চলুন, চা খেয়ে আসি।

হাসতে হাসতে হাত-ধরাধরি করে দু-জনে প্ল্যাটফরমে নেমে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম।

# স্নানযাত্রা

সুবোধ ঘোষ

মেলাটা শুরু হয় বৈশাখী পূর্ণিমায় কাছাকাছি কোন একটা দিনে; শেষ হয় এসে জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাতে, স্নানযাত্রার শুচিতাময় উৎসবটা যেদিন মহা সমারোহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এই এক মাস ধ'রে মেলাটা যেন বটেশ্বরপুরের জীবনটাকে রকমারি জিনিস আর মানুষের ভিড় দিয়ে, আর রকমারি আনন্দের কোলাহল দিয়ে মাতিয়ে রাখে।

এ জেলার এদিকে-ওদিকে প্রায় চারদিকে ঘুরে অনেকবার রিলিফের কাজ করেছে ইন্দ্রনাথ, কিন্তু বটেশ্বরপুরে কোনদিন আসতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কলকলি, জটাবাহিনী আর পাটেশ্বরী, তিনটে নদী তিনদিকে থাকলেও, ঐ তিন নদীর বন্যার জল বটেশ্বরপুরের ধানক্ষেতে গড়িয়ে আসতে পারে নি। বানের জল শুধু নদীগুলির ও-পার ছাপিয়ে ফকিরবাড়ি, জয়কালীগঞ্জ আর কুমীরমারিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। বটেশ্বরপুরের ডাঙ্গাতে একটি বুড়ো বট আছে, সেই বটের কাছে পুরনো মন্দিরের আঙিনায় একটি বেশ পুরনো আর নড়বড়ে রথ রাখা আছে; আর, সেই আঙিনা থেকে সামান্য একটু দূরে বামুনের সরোবর নামে একটা বড় ডোবা আছে। তাই বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই, বটেশ্বরপুরের ডাঙ্গার বুকে এতগুলি পুণ্য বাঁধা পড়ে আছে বলেই তিন নদীর বানের জল এদিকে গড়িয়ে না এসে ওদিকে গড়িয়ে যায়।

ইন্দ্রনাথের কাছে বটেশ্বরপুর জায়গাটা চেনা-চেনা না মনে হলেও নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হয়। মেলা শুরু হবার সাতদিন আগে থেকেই একদল কর্মীকে নিয়ে সড়কের পাশে ক্যাম্প করেছে ইন্দ্রনাথ। সবসুদ্ধ ওরা বিশজন। এই বিশজনের মধ্যে বলতে গেলে একমাত্র ইন্দ্রনাথ ছাড়া আর-সবাই বয়সে এখনও অবুঝ, প্রায় ছেলেমানুষই বলা যায়। এখানে ইন্দ্রনাথই কর্মীদলের নেতা।

ইন্দ্রনাথের কাছে যিনি নেতা, যিনি এ জেলার প্রায় সকলজনের শ্রদ্ধার মানুষ, সকল রকমের স্বদেশী কাজ আর সেবার কাজের যিনি প্রেরণাদাতা, সদরের উকীল-সভার প্রেসিডেন্ট, সেই কাঞ্জিলাল মশাই কর্মীদলেরই এ বছরের বার্ষিক সভাতে প্রস্তাবটা তুলেছিলেন। প্রস্তাবে কেউ আপত্তিও করেনি। প্রচণ্ড একটা চরিত্র-বাদিতার প্রস্তাব নয়। প্রকাণ্ড একটা পাপ-মোচন যজ্ঞ করবার প্রস্তাবও নয়। প্রস্তাব হলো, ধর্মের নামে যেখানে মেলা বসবে সেখানে ওরকম একটা কুৎসিত কাণ্ড চলবে কেন? ওটা খুব খারাপ একটা প্রথা নয় কি? ওরকম একটা প্রথা চলতে দেওয়া সমাজের মানুষের পক্ষে কি একটা অপমান নয়?

প্রতি বছর বটেশ্বরপুরের মেলা যেখানে বসে, সেইই প্রায় পা ঘেঁষে আর পুরনো মন্দিরটার থেকে খুব সামান্য দূরে আর-একরকমের একটি উপনিবেশও গড়ে ওঠে। এটা হলো মানুষেরই একটা অমানুষিক মেলা। ছোট-বড় প্রায় শতাধিক ছাউনি-ঘর আর প্রায় শতাধিক পতিতা। কোথা থেকে, যেন একটা অদৃশ্য জগতের আনাচ-কানাচ থেকে বের হয়ে আর ছুটে এসে ওরা এই স্নানযাত্রার মেলাতে এক মাস ধরে রোজগারের একটা ভয়ানক উৎসব সমাপন ক'রে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বাজারের কোন কোন লোকের মুখে এমন গর্বের কথাও শোনা গিয়েছে, শুধু [illegible] দল নয়; কাশীওয়ালী বেনারসী আসে, গাজিপুরের নাচুনী বাইজীও আসে।

কাঞ্জিলাল মশাই-এর প্রস্তাব, পিকেটিং ক'রে এই খারাপ প্রথাটাকে বাধা দিতে হবে। কিন্তু কার উপর একাজের ভার দেওয়া যায়?

ইন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়েছিল—কেন? আমার উপর ভার দিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?

কাঞ্জিলাল মশাই বিব্রতভাবে বলেন—না না, কোন আপত্তি নেই। তবে কিনা..... একাজে একটু বেশি সাহস দরকার; কারণ একাজের বাধাগুলি বেশ একটু অদ্ভুত-রকমের কিনা, সেইজন্যেই।

ইন্দুনাথ—তাহলে আমিই তৈরী হই কাঞ্জিলাল মশাই।

ইন্দুনাথের ইচ্ছার এই ব্যস্ততা যেন ইন্দুনাথের একটা অভিমানের ব্যস্ততা। কঠিন বাধা তুচ্ছ করতে এত ভালবাসে যে, শান্ত দুঃসাহসের মানুষ বলে এত সুনাম রটে গিয়েছে যার, তাকে চিনতে এখনও দেরি করেন কেন কাঞ্জিলাল মশাই?

কাঞ্জিলাল মশাইও জানেন, এম এ পড়ার শেষ বছরটাকে পূর্ণ হতে না দিয়েই গ্রামে চলে এসেছিল ইন্দুনাথ। দেশের উপর একটা মায়ার নেশা বলা যায়, কিংবা একটা সৎ-কাজের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটবার নেশাও বলা যায়; ইন্দুনাথের মন আর প্রাণ দুই-ই মেতে উঠেছিল। ছোট শরিকের কাকার কাছেই বসতবাড়িটা বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করে, আর প্রায় দু'বছর ধরে অনেক খাটুনি খেটে রাজীবনগরের স্কুলটা গড়ে তুলেছে ইন্দুনাথ।

প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার কাজ জয়ী না করিয়ে ক্ষান্ত হয়নি ইন্দুনাথ। জেলার সদর শহরে বিলাতী কাপড় অচল হয়েছে, রঘুনাথপুরের বাজার থেকে আবগারী মদের দোকান উঠে গিয়েছে, বড়গাছিয়ার চাঁড়ালপাড়ার প্রত্যেকটি পুরুষ কৃত্তিবাস পড়তে আর নিজের নাম লিখতে শিখেছে, রানীহাটের কুমোরেরা একটা কো-অপারেটিভ করেছে, এই সবই তো ইন্দুনাথের এক একটি সৎপ্রতিজ্ঞার সফলতা।

ইন্দুনাথের সব বিষয় সম্পত্তি একে একে বাগিয়ে ফেলেছেন ছোট শরিকের কাকা, আর যত আর্তত্রাণ আর আন্দোলনের কাজে বেহিসাব টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে ইন্দুনাথ; বাপ নেই মা নেই, সম্পত্তিটা তবু তো ছিল। কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে কাঙাল হয়ে যাবার ভয়টাও ইন্দুনাথের জীবনে যেন কোন ভয়ই নয়। কাকাও বলে দিয়েছেন, তোমার বিষয়-আশয় বলতে বিশেষ আর কিছু নেই কিন্তু ইন্দু, শুধু আছে রানী-হাটের মেটে বাড়ীটা; দাম বড় জোর তিন হাজার হবে।

সদরে ট্রেজারির সামনে একদল চুয়াল্লিশ তুচ্ছ করবার জন্য সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিল যে সে হলো ইন্দুনাথ। রাইফেল তুলে দাঁড়িয়ে ছিল গোরা সোল্জারের যে দুরন্ত পিকেট, আস্তে আস্তে হেঁটে তাদেরই চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় ইন্দু-নাথের চোখের দৃষ্টি একটুও অশান্ত হয়নি।

বন্যার সময় রিলিফের কাজে খাটতে গিয়ে কর্মীদলের ছেলেরাও দেখে চমকে উঠেছে, ইন্দুদার সত্যিই কোন ভয়-ডর নেই; বোধহয় ঘৃণাবোধও নেই। কুষ্ঠী বুড়োটার পায়ের ক্ষতগুলোকে একেবারে হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর ধুয়ে-মুছে ব্যান্ডেজ করে দিলেন ইন্দুদা, হাতটা একটুও কাঁপল না।

ইন্দুনাথের সুশ্রী মুখটাও জানিয়ে দেয়, ওর মনটাও কত সুশ্রী। ক্যাম্প যেন সব সময় ফিটফাট থাকে, বিছানাগুলিকে এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকতে দেন না। কেউ যদি ভুল করে কম্বলটাকে মেজের উপর ফেলে রাখে, ইন্দুদা এসে নিজেই সেই কম্বলকে ধুলো-ঝাড়া ক'রে আর পাট ক'রে বাঁশের ডাবার উপর তুলে রাখেন।

কলেরার সময় রিলিফ খাটতে গিয়ে দেবীডাঙগায় এসে একবার বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিল কর্মীদল। গ্রামে কোন মানুষ ছিল না, কলেরার ভয়ে সবাই পালিয়েছে। কর্মীদলের ছেলেরা দেখেছিল, একটা শূন্য বাড়ির বাগানের ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত রকমের একটা রিলিফের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ইন্দুদা। আমগাছের একটা মরা ডাল ভেঙে প'ড়ে কচি শিউলিটাকে চেপে রেখেছিল। মরা আমডাল সরিয়ে দিয়ে শিউলিটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ইন্দুদা। অপরাজিতার লতা মাটির উপর কাদামাখা হয়ে লুটিয়ে পড়ে ছিল। ইন্দুদা লতা-গুলিকে বেড়ার গায়ে তুলে দিলেন। তুলসীটার চারদিকে ঘাসের জঙ্গল ঘন হয়ে ছিল। চটপট হাত চালিয়ে ঘাসের জঙ্গলটা উপড়ে ফেলে দিলেন ইন্দুদা।

পাঁচজনে ভাল চোখে দেখেনি, এরকমের দুঃসাহসের কাজও কত শান্তভাবে করে দিতে পারে ইন্দুনাথ। রাজীবনগরের স্কুলবাড়ির খেলার মাঠের উপর রাতারাতি একটা চালা তুলে নিয়ে মা শীতলার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল চক্রবর্তী ঠাকুর নামে একজন সাধুগোছের আগন্তুক। দেখে একটুও বিচলিত না হয়ে, আর ভালমন্দ কোন কথা না বলে ইন্দুনাথ সেই শীতলাকে তুলে নিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল।

বাটেশ্বরপুরে স্নানযাত্রার মেলাতে সেই ভয়ানক কুপ্রথাটাকে বাধা দেবার জন্য পিকেটিং চালাবার সব দায়িত্ব নিয়ে বাটেশ্বর-পুরে এসেছে এই ইন্দুনাথ।

সারাদিন আর সারা রাত, জেগে থাকে আর দাঁড়িয়ে থাকে পিকেটিং। কাদাটে খালটার উপরে সুপুরিগাছ ফেলে যে সাঁকোটা বাঁধা হয়েছে, ঠিক তারই মুখে দাঁড়িয়ে থাকে কর্মীদলের ছেলেদের একটা সতর্ক ভিড়। এই সাঁকোটা পার না হয়ে ওদিকে, সারি সারি চালাঘর দিয়ে সাজানো সেই নোংরা পল্লীটার দিকে এগিয়ে যাবার আর কোন পথ নেই। পিকেটিং-এর একটা সচল দলও টহল দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাদাটে খালের কিনারা ধরে আশশেওড়ার ঝোপঝাড় পর্যন্ত। কোন বিরুদ্ধপক্ষ যেন খাল সাঁতরে ওদিকে গিয়ে উঠবার সুযোগ না পেয়ে যায়। রাত্রিবেলা কর্মীদলের টর্চের আলো থেকে থেকে ঝলসে উঠে অন্ধ-কারটাকেও শাসিয়ে রাখে।

পিকেটিং-এর প্রথম দিনটা পার হয়ে যেতেই বুঝতে পারে ইন্দুনাথ, কাঞ্জিলাল মশাই মিথ্যা আশঙ্কা করেছিলেন। কোন উপদ্রব পিকেটিং-এর কাছে এগিয়ে আসে নি। এই পিকেটিংটাই যেন একটা কঠোর চক্ষু-লজ্জার শাসন। কাউকে বাধা দেবার দরকারই হলো না, কারণ কোন নির্লজ্জতা এই পিকেটিং তুচ্ছ করবার জন্য এগিয়েই এল না।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই সন্দেহ করতে হলো, না, যেন আড়ালে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে একটা বিদ্রোহ। সে রাতে ক্যাম্পের বেড়াতে আগুন লাগলো।

পরের রাতটাও বাদ গেল না। কিচেনের ভিতরে রাখা সব চাল-ডাল চুরি হয়ে গেল। তার পরের রাতটাও বাদ গেল না। কর্মী-দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায় যে জনার্দন, তারই মাথার উপর আস্ত ইটের একটা টিল এসে আছড়ে পড়লো। টহল ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে জনার্দন। —না ইন্দুদা, এখানে আর টিঁকতে পারা যাবে না।

—খুব পারা যাবে। সারা রাত আমি একাই টহল দেব। আস্তে আস্তে কথা বলে ইন্দুনাথ; কিন্তু গলার এই শান্ত স্বরটাই বুঝিয়ে দেয়, বাধা পেয়ে ইন্দু-নাথের প্রতিজ্ঞার দুঃসাহসটাই মেতে উঠেছে।

জনার্দনের কপাল ফেটে রক্তের ধারা ঝরছে। কপালের ক্ষত আইডিন দিয়ে ধুয়ে আর কাপড়ের পটি দিয়ে বেঁধে দিয়েই, জনার্দনের টর্চটা হাতে তুলে নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ায় ইন্দুনাথ। চোখের দৃষ্টিটা তবু শান্ত। একটা শান্ত প্রতিজ্ঞার দৃষ্টি। আজ সারা রাত ইন্দুনাথ একা টহল দিয়ে ঘুরবে।

ইন্দুনাথের মুখের উপর একটা টর্চের আলোর ঝলক ছুটে এসে পড়ে। তার পর, মচমচ করে জুতোপরা পায়ের একটা শব্দও এগিয়ে আসতে থাকে। ইন্দুনাথেরই কাছে এসে থমকে যায় শব্দটা।

—কে আপনি? জিজ্ঞেস করে ইন্দুনাথ।

ইন্দুনাথের মুখের উপর আবার টর্চের আলো পড়ে; আর, একটা গম্ভীর স্বর যেন রাগ চেপে চেপে কথা বলে—এ তল্লাটে সবাই যাকে চেনে আর জানে, সেই আমি। আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি কে?... ও হরি...এ যে, তুমি যে দেখছি, আমাদের সেই ইন্দুনাথ।

এইবার নিজেরই মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে আগন্তুক মানুষটা হেসে ওঠে।

—দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না?

চিনতে পারে ইন্দ্রনাথ। বর্ধমান কলেজে পড়বার সময় বটেশ্বরপুরের জমিদার-বাড়ির ছেলে যে চিরঞ্জীব ইন্দ্রনাথেরই এক ক্লাসের বন্ধু ছিল, সেই চিরঞ্জীব। কিন্তু সেই চিরঞ্জীবের যেন একটা নতুন পরিচয়ও পেয়ে যায় ইন্দ্রনাথ। মুখ ভরা হাসি হেসে যেন বুকভরা মদের গন্ধ উথলে দিচ্ছে চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীব বলে—সেই কাজ, তো খুই ভাজ; এটা যে তোমার জীবনের আদর্শ, সেটা আমি সেই কলেজ যুগেই ধরতে পেরেছিলাম হে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তুমি যে, শেষ পর্যন্ত আমার আদর্শকে দাগা দেবার জন্য আমারই রাজ্যে এসে ঢুকবে, এ তো বুঝতে পারিনি রে বাবা।

ইন্দ্রনাথ—তোমার রাজ্য মানে কি?

চেঁচিয়ে হাসে চিরঞ্জীব—আমি যে এখন বটেশ্বরপুরের মেজকর্তা, এই সত্যটা কি তুমি জানতে না?

—না।

—জানলে বোধহয় আমার দশ হাজার টাকার তোলা আদায়ের লক্ষ্মীস্বরূপিণী এই মেলাটিকে নষ্ট করতে তুমি নিশ্চয় আসতে না।

—আসতাম বৈকি।

—কেন? তোমার আদর্শের চরণে কোন্ অপরাধ করেছে মেলাটা?

—আমি মেলা নষ্ট করতে আসিনি চিরঞ্জীব।

—তবে?

—এই মেলাতে একটা খারাপ প্রথা চলে, সেটা বন্ধ করতে এসেছি।

—খারাপ প্রথা? প্রথাটা যে তোমাদের স্বর্গধামেও চলে হে ইন্দ্রনাথ।

—স্বর্গধামে না চললেই ভাল।

—কিন্তু স্বর্গধামের চরিত্র শুদ্ধ করবার হুকুমনামা তোমাকে দিল কে?

—তুমি ভুল বুঝেছ চিরঞ্জীব। স্নানযাত্রার নামে একটা মেলা বসেছে, সেখানে এসব প্রথাকে প্রবেশ না করতে দেওয়াই ভাল।

—বেশ তো, এবার তুমি বল, প্রথাটা তাহলে খাবে কি?

—কি বললে?

—ওরা এখানে রোজগারের জন্যে এসেছে। ওদের রোজগারের উপায় বন্ধ ক'রে দিয়ে তুমি যে ওদের ভাতে মারছো। এটা কেমনতর আদর্শ হলো; আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দেখি।

চিরঞ্জীবের মূর্তিটা যেন একটা আহ্লাদের দোলায় দুলতে থাকে, পায়ের চকচকে পাম্প-সু মচমচ করতে থাকে। মদের গন্ধে ভরা হাসিটাকেও দুলিয়ে দিয়ে চিরঞ্জীব বলে—বৃথা চেষ্টা ইন্দ্রনাথ। বুঝিয়ে দেবার সাধ্য নেই তোমার।

ইন্দ্রনাথ নীরব হয়ে গিয়েছে। চিরঞ্জীবের হাসির শব্দটা যেন সত্যিই একটা কঠিন ঠাট্টার ঝামা ইঁট হয়ে ইন্দ্রনাথের কপালের উপর আছড়ে পড়ছে। ওরা খাবে কি? সত্যিই তো ওদের ভাতে মারবার কি অধিকার আছে ইন্দ্রনাথের?

চিরঞ্জীব বলে—তুমি যে মস্ত পিকেটিং-বিশারদ, সেটা আমার অজানা নয় ইন্দ্রনাথ। তুমি একটা বাজারকে মদ-ছাড়া করেছ, একটা শহরকে বিলিতী-কাপড় ছাড়া করেছ, কিন্তু বটেশ্বরপুরের মেলাটাকে প্রথা-ছাড়া করতে পারবে না হে বন্ধু। বৃথা চেষ্টা। অতএব, অবিলম্বে প্রস্থান কর। বন্ধুভাবেই তোমাকে এই উপদেশটি দিয়ে গেলাম।

ইন্দ্রনাথ—আমি যাব না চিরঞ্জীব, তুমি বৃথা উপদেশ দিও না।

চিরঞ্জীব—তার মানে, তোমার ইচ্ছা কাবার পূর্ণ আমার জীবন মাঝে?

ইন্দ্রনাথ—জানি না।

চিরঞ্জীব—আচ্ছা, কিন্তু শেষে যেন আমারই ইচ্ছা না হয় পূর্ণ তোমার জীবন মাঝে।

চলে গেল চিরঞ্জীব। কিন্তু চিরঞ্জীবের উপদেশটা যেন ইন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞার প্রাণটার উপর কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। সত্যিই কি চলে যেতে হবে?

সকাল হতেই ইন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞার সাহসটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য সাঁকোর ওদিকের মুখের কাছে আর-একটা বিদ্রোহের ভিড় দেখা দিল। এক গাদা হিংস্র ধিক্কার বিলাপ অভিশাপ আর গালাগালির ভিড়। কর্মীদলের ছেলেরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে; আর ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম, ইন্দ্রনাথের সেবাব্রত শক্ত মনটা যেন একটা অবুঝ দুশ্চিন্তার পীড়নে অশান্ত হয়ে যাচ্ছে।

—কি গো বাবু, স্বদেশী করবার আর কি জায়গা ছিল না? এখানে মরতে এলে কেন?

—ধম্মের বক ঠাকুর এয়েছেন।

—জীব তরাতে এয়েছেন দয়াবিষ্টুর অবতার।

—ঝাঁটা মার্; এঁটো ছুঁড়ে মার্। বোতলপেটা করে ধম্ম ছুটিয়ে দে।

—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার কশাই।

শাড়ির আঁচলটা শক্ত ক'রে কোমরে জড়ানো, চোখের কোলে কাজলের মোটা প্রলেপ, খোঁপাটা এলোমেলো হয়ে ঝুলে পড়েছে; এইরকম একটি মূর্তি কয়েক পা এগিয়ে একেবারে ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। —রাগের কথা বলছি না মশাই, দুঃখের কথাই বলছি। আপনি একটু বুঝে দেখুন।

ইন্দ্রনাথ—বলুন, কি বুঝতে বলছেন।

—আপনি আমাদের রোজগার এভাবে বন্ধ ক'রে দিলে আমাদের পেট চলবে কি ক'রে?

—রোজগারের জন্যে এখানে এসেছেন কেন আপনারা?

—কেন? এখানে এসে কোন্ ভুলটা হলো?

—এখানে লোকে ধর্মের নামে আসে, এটা স্নানযাত্রার মেলা।

—আমরাও তো সেই জন্যে এখানে এসেছি গো মশাই। ধম্মের নামে এসেছি।

সাঁকোর ওপারে একটা বুড়ো পাকুড়ের গোড়ায় সিঁদুর মাখানো একটা পাথরকে দেখিয়ে দিয়ে, হাত তুলে কপালটাকে ছুঁয়ে ভক্তিনত একটা ভংগী ক'রেই চেঁচিয়ে ওঠে কাজল-লেপা চোখের সেই নারী।—চোখ-ভুলানি মা'র আদেশ আছে, পুণ্যি স্থানেই রোজগার করতে হয়। মাগিরা চিনি-সিঁদুর দিয়ে মাকে পুজো করে আর আদেশ নিয়ে তবেই না...।

—না: ওসব কথা ছেড়ে দিন। তবে... হ্যাঁ...।

—বলুন তাহলে, আমরা কি করি?

—স্নানযাত্রা পর্যন্ত রোজগার বন্ধ রাখুন।

—তার পর?

—তার পর যা ইচ্ছা হয় করবেন।

—তা তো করবোই। তার পর থাকলেও করবো, চলে গেলেও করবো। কিন্তু একটা মাস পেটে খেয়ে বাঁচবো, তবে তো?

—সে ব্যবস্থা যদি ক'রে দিই?

—তা হলে...। চুপ করে কি-যেন ভাবে, কোমরে শক্ত ক'রে আঁচল জড়ানো সেই মেয়েটা।

পতিতাদের ভিড়টাও হঠাৎ চুপ করে কি যেন ভাবে। তার পর, যেন একটা অনিচ্ছাময় স্বীকৃতির গুঞ্জন গুন গুন করে।—তবে তাই হোক। স্বদেশীবাবু যদি দয়া করে একটা মাসের খোরাক দিতে পারেন, তবে রোজগার না হয় বন্ধ রাখাই যাবে; পুণ্যির দিনটা পেরিয়েই যাক্।

চিরঞ্জীবের উপদেশের ঠাট্টাটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। সাঁকোর মুখে পিকেটিং তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই সঙ্গে একটা রিলিফের কাজও চলে।

কর্মীদলের তিন-চারজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পতিতা উপনিবেশের প্রতি চালা-ঘরের দরজার কাছে সিধে পৌঁছে দিয়ে যায় ইন্দ্রনাথ। চাল ডাল আলু আর নগদ দু' আনা।

কোন বাধা ইন্দ্রনাথের শান্ত মনের প্রতিজ্ঞাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। সবচেয়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল যে বাধা, সেটা হলো নিজেরই মনের একটা বেদনাকর অপরাধবোধের বাধা, পিকেটিং-এর ফলে মানুষগুলির ভাত বন্ধ হবে। টেলিগ্রাম করে রানীহাটের মেটে বাড়িটাকে, ইন্দ্রনাথের বিষয়-আশয়ের শেষ চিহ্নটাকেও কাকার কাছে বন্ধক দেবার ইচ্ছা জানিয়ে দুটি হাজার টাকা আনিয়েছে ইন্দ্রনাথ।

এইসব বাধাকেই বোধ হয় অদ্ভুত রকমের বাধা মনে করে একটু ভয় পেয়েছিলেন কাঞ্চিলাল মশাই। কিন্তু চিঠি পেয়ে সব জানতে পেরে তিনি খুশি হবেন যে, এইসব অদ্ভুত বাধা ইন্দ্রনাথকে একটুও দমিয়ে দিতে পারেনি। পিছিয়ে আসতে হলে, এগিয়ে যাবার সাহস হবে না, ইন্দ্রনাথের জীবনে এমন ট্র্যাজেডির স্থান নেই।

এই অদ্ভুত রকমের সেবার কাজটাও ভালই লাগে। আর ভাবতে অদ্ভুত লাগে, অধঃপতিত জীবনের এই উপনিবেশেরই মধ্যে এমন একজন আছে, যে মানুষটা রিলিফের চাল-ডাল নিতে আপত্তি করেছিল।

সে নারীর ঘরটাকেও দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছে ইন্দ্রনাথ। বেশ সাজানো গোছানো একটা সৌখীন ঘর। চালাঘরের মধ্যেই ঘড়ি আছে, ঝকঝকে আয়না আছে। ঘরের বেড়ার গায়ে উর্বশী ধরনের এক নৃত্যময়ীর রঙীন ছবিও আছে। আরও অদ্ভুত, খোঁপায় ফুল গুঁজে আর ঠিক ছবিটারই সেই উর্বশীধরনের মূর্তির মত সাজ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সেই তরুণী।

প্রথম দিনেই পিছন থেকে ডাক দিয়ে আর খিলখিল করে হেসে বাধা দিয়েছিল কতগুলি কৌতুকের কণ্ঠস্বর—ওদিকে আপনার যেয়ে কাজ নেই গো বাবু। উনি হলেন দেবদাসী। আপনার দামের চাল ডাল আলু উনি ছোঁবেন না।

সত্যিই, রিলিফের চাল-ডালের দিকে একটা ভ্রুক্ষেপও না করে; বেশ গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আর ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে, শুধু ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই নারী।

এখানে কোন দরজার কারও সঙ্গে কথা বলবার দরকার হয়নি ইন্দ্রনাথের। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কেউ কোন কথা বলতে চেষ্টাও করেনি। কিন্তু এই দরজার কাছে এসে কথা বলতে হলো।—আপনি কি সাহায্য নেবেন না?

—না।

—কেন?

—দরকার নেই।

—কেন?

—আমার খোরাক আমি নিজেই কিনে নিতে পারবো।

—কিন্তু জানেন তো, কি নিয়ম করা হয়েছে?

—কি?

—স্নানযাত্রা চুকে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে কোনরকমের...।

—শুনেছি। সেইরকমই গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে আর একটা তুচ্ছতার ভ্রূকুটি হেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেই নারী। যেন তাজা বয়স আর তাজা রূপের একটা উদ্ধত দেমাক ইন্দ্রনাথের এই সেবাব্রতকে এক কাঙালপনা মনে করে আর ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রিলিফের দান সেই সিধে তুলে নিয়ে চলে আসছিল ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তরুণী হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা, রেখে যান।

ইন্দ্রনাথ—আপনার যখন পয়সা আছে, তখন এসব জিনিস আপনি নাই-বা রাখলেন।

উর্বশীধরণের সেই ভঙ্গীর মূর্তিটা হঠাৎ যেন লজ্জিত হয়ে, আর একটু কুণ্ঠিত ভাবে হাসে—একটা মাস না হয় নিজের পয়সা খরচ না করে আপনার দানের চাল-ডালই খেলাম।

সকালবেলায় একবার আর বিকেলবেলায় একবার, রিলিফের চাল-ডাল সেই উপনিবেশের প্রতি ঘরের দরজায় পৌঁছে দিতে গিয়েই বুঝতে পেরেছে ইন্দ্রনাথ, সাঁকোর ওপারের ঐ অদ্ভুত রোমাঞ্চ দুঃখের ইচ্ছাটা যেন কোনমতে ধৈর্য ধরে একটা মুক্তির লগ্নের অপেক্ষায় দিন গুনেছে। স্বদেশী-বাবুর উপদ্রবটাকে মনে মনে ঠিক ক্ষমা করতে পারেনি; একটু ভয় পেয়েছে বলেই ওরা চুপ করেছে। রিলিফের চাল-ডালকে একটা ভয়ের দান হিসাবে ওরা মেনে নিয়েছে। না নিলে চলে না, হাজতঘরে যেমন কঠিন করুণের ছাতু-রুটি না খেলে চলে না।

কিন্তু এই দান না নিলেও যার চলতো, সে নিল কেন? ভদ্র-সুখের ছবির মত ওরকম একটা গর্বিত চেহারা কি সত্যিই রিলিফের এই চাল-ডাল খাবে? না, শুধু একটা তামাসা করবার মতলবে একটা কথার কথা বলে দিয়ে মুখ টিপে হাসলো?

এর বেশি আর কোন প্রশ্ন ইন্দ্রনাথের মনে দেখা দেয়নি। এমন কোন ঘটনা নয় যে, চিন্তা করে বুঝতেই হবে। সারাদিন আর রাতের মধ্যে আর-একটিবারও সেই কুশ্রী জগতের হাসিমুখের ছবি ইন্দ্রনাথের মনের ধারে কাছেও আসেনি।

কিন্তু পরের সকালবেলায় রিলিফের সিধে পৌঁছে দিতে গিয়ে আশ্চর্য হতে হয়। সে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার খোঁপাতে কোন ফুলবিলাস নেই। ছবির উর্বশীধরনের সাজও নয়, ভঙ্গীও নয়। অভদ্র জীবনের কালি দিয়ে কাজলাক্ত করা একজোড়া প্রগল্ভ চক্ষুও নয়। ঘরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে একটি নিতান্ত স্নিগ্ধ চেহারা। সাধারণ একটা রঙীন তাঁতের শাড়ি জড়ানো একটি পরিচ্ছন্ন মূর্তি।

ইন্দ্রনাথ বলে—উনি কোথায় গেলেন?
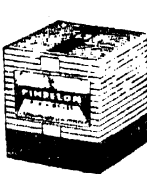
মেয়েটি মুখ টিপে হাসে।—আমি কি জানি?

—আপনি কে?

—কাল জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমার

নাম সোনালী। আজ কিন্তু...ভাবছি কি নাম বলা যায়?

ইন্দ্রনাথ হেসে ফেলে—বুঝলাম, আপনার নাম জানবার কোন দরকার আমার নেই। কিন্তু...।

—কি?

—বলুন।

—মনে হচ্ছে, আপনার এখানে আর না থাকাই ভাল।

—কেন?

—এখানে আপনাকে মানায় না।

—ওদের সবাইকে বুঝি খুব মানায়?

—না, সেকথা বলছি না। কাউকেই মানায় না। তবে...মনে হয়...আপনাকে একটুও মানায় না।

—কেন?

—আপনাকে দেখে কে বলবে যে, আপনি এখানকার মানুষ?

—চিরকাল তো এখানকার মানুষ ছিলাম না।

—সেই কথাই তো বলছি। ঘরে চলে যান।

—ঘরে?

—হ্যাঁ।

—ঘর কোথায়? আমাকে ঘরে নেবে কে?

—চেষ্টা করে দেখুন। ঘর পাওয়া যাবে না কেন? হ্যাঁ, রিলিফের চাল-ডাল সত্যিই খেয়েছিলেন তো? না, আপনি আবার কাউকে দান করে দিলেন?

—না, খেয়েছি।

—চল জনার্দন। ডাক দেয় ইন্দ্রনাথ।

ঘরের দরজার কাছে চাল ডাল আলু, আর দু' আনা পয়সা রেখে দিয়ে জনার্দন বলে—চলুন।

অদ্ভুত এক শিবিরের ভিতরে ঢুকে রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দেবার জন্য দিনে দুবার করে আসা আর চলে যাওয়া; আর অদ্ভুত এক শাসন জাহির করে পিকেটিং-এর কাজে সাঁকোর মুখের কাছে সারাদিন আর সারারাত পালা করে দাঁড়িয়ে থাকা; কাজটা কর্মীদের ছেলেদের কাছে প্রথম কয়েকটা দিন বেশ বিচিত্র বলে মনে হলেও উৎসাহটা যেন ক্রমেই থিতিয়ে আসতে থাকে। বিচিত্র কাজ বটে, কিন্তু বড় একঘেয়ে এই বিচিত্রতা। ঘটনাও থিতিয়ে গিয়েছে, বিচিত্রতাও থিতিয়ে গিয়েছে।

—দূর; পরেশ আর গুরুদাস একদিন ক্যাম্পের দাওয়ার উপর অলসভাবে বসে আর প্রায় একসঙ্গেই একটা আক্ষেপ করে বলে ওঠে—দূর, সত্যিই আর ভাল লাগে না; এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি আরও দু'চারটে ঝামা-ইঁট পড়তো।

শুনতে পেয়ে হেসে ফেলে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ইন্দ্রনাথ—কি হলো পরেশ, কাজটার ওপর চটে গেলে কেন?

পরেশ আর গুরুদাস লজ্জিত ভাবে হাসে—এই একটা কথার কথা বলে ফেললাম। তা বলে সত্যিই কি...।

ইন্দ্রনাথ—আমার কাছে কাজটা কিন্তু একটুও একঘেয়ে বোধ হচ্ছে না। বরং, ভাবতে বেশ ভাল লাগছে, এ কাজে এসে বেশ একটা নতুন রকমের আনন্দ পাওয়া গেল।

ইচ্ছে করে বলা কোন কথা নয়, চিন্তা করে বলা কোন কথাও নয়; কথাগুলি যেন ইন্দ্রনাথের মুখের এই হাসিটার মত নিজেরই খুশিতে মুখর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই অদ্ভুত রিলিফের কাজে রোজই ব্যস্ত হয়ে উঠবার কোন দরকার আছে বলে মনে করে না ইন্দ্রনাথ। একাজে রোজ যায়ও না ইন্দ্রনাথ। বরং মেলার ভিতরে ঢুকে আর ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা পার করে দেয়।

রিলিফের কাজটা সত্যিই যে কেমন বিচিত্র ঘটনা ঘটাতে পারে, একদিন তাও দেখতে হলো। আর, আবার হেসে ফেলতেও হলো। না বলেও পারলো না ইন্দ্রনাথ—দেখলে ত পরেশ, কী বিচিত্র ব্যাপার! তোমরাই না বলেছিলে, বড় একঘেয়ে লাগছে?

রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দিতে গিয়ে সেদিন কর্মীদলের ছেলেদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথও ছিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত শিবিরের ভিতরে ঢুকতেই দশ-বারজন নারীমূর্তির রুষ্ট ও উতলা একটা দল অদ্ভুত এক অভিযোগের সোরগোল তুলে ইন্দ্রনাথের পথ রুখে দাঁড়াল। —কি গো বাবু, আমাদের উপর এত বিষনজর কেন, আর সোনালীর উপরেই বা এত খোশনজর কেন?

—এ কিরকম বাজে কথা বলছেন আপনারা? কী হয়েছে?

—সোনালী বড় দিদে পাবে কেন?

—তার মানে?

—তার মানে, শুধু সোনালীর দিদের জন্য চা-চিনি বরাদ্দ করলে কেন গো বাবু? আমরা কি চা খাই না, না খেতে

জান না? না হয় আমরা দেবদাসীটির মত গতরসোহাগী ঢঙীটি নই।

—ভুল বুঝেছেন আপনারা।

—একটুও ভুল বুঝিনি। চোখে দেখছি, ছুঁড়ি দিব্যি দুবেলা আকাশপানে চেয়ে চেয়ে চা খাচ্ছে। কেন? সোনালী কি তোমার সাধের পরানটিকে চাঁপাফুল করে খোঁপায় পরবে বলেছে?

চুপ করে কী-যেন ভাবে ইন্দ্রনাথ; তার পরেই ব্যস্তভাবে বলে—আচ্ছা, আপনারা এখন চুপ করুন। আমাকে একটু খোঁজ নিয়ে বুঝতে দিন, সত্যিই কী ব্যাপার।

তারপর সেই ঘর। আর, ঘরের দরজার কাছে সেই নারী। আর, দেখে একটু চোখেও ঠেকে; সত্যিই যেন একটা শান্ত প্রতীক্ষার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতীক্ষার চোখ দুটো একটু উৎসুক।

ইন্দ্রনাথ বলে—আপনার পয়সা আছে, আপনি দুবেলা চা খাবেন। তাতে আমাদের কিছু বলবার...।

—না, আর কিছু বলবেন না। আমি সবই শুনেছি।

—কিন্তু আমাদের দলে মিছিমিছি কতগুলি কটুকথা শুনতে হচ্ছে।

—না, আর শুনতে পাবেন না।

না, আর শুনতে পায়নি ইন্দ্রনাথ। কেমন করে আর কেন সেই অদ্ভুত অভিযোগটার সন্দেহ মরে গেল, তাও বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। সে বেচারী চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতেও পাওয়া গিয়েছে, ঘরের মধ্যে চা-এর কোন সরঞ্জাম নেই। ঘরের মেজের উপরে চুপ করে বসে আর মাথা হেঁট করে সেদিন কী যেন ভাবছিল মেয়েটা, আর, আস্তে আস্তে হাত চালিয়ে একটা কুলোর উপর রাখা মোটা চালের খুঁদ ভেঙে ভেঙে বোধ হয় খড়কুটো বাছছিল। দেখে বুঝতে পারা যায়, ও চাল রিলিফেরই দানের চাল।

কিন্তু হঠাৎ একবার ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মুখ নামিয়ে নিল; মাথা হেঁট করা ভঙ্গীটা যেন হঠাৎ একটা সাহস করতে গিয়েই হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বলে—আপনি সত্যিই চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন মনে হচ্ছে।

মাথা হেঁট করা ভঙ্গীটা আস্তে একটু দুলে ওঠে। —হ্যাঁ।

—কিন্তু, আপনার ঘরে এই সব ছবিটবি আর ওসব আয়না-টায়না একটুও মানাচ্ছে না। ...আচ্ছা চলি...চল গুরুদাস।

পরের দিন আবার এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রিলিফের চাল নামাবার সময় ইন্দ্রনাথের চোখ দুটো যেন অপ্রস্তুত হয়; ঘরটাই যেন সেই মনে হয়।

ঠিকই, বদলে গিয়েছে ঘরের চেহারাটা। সেই ছবি-টবি নেই, আয়না-টায়নাও নেই। আরও কতগুলো আসবাব ছিল, আর জাঁকাল-রকমের একটা বিছানা ছিল; সবই ঠেলে-ঠুলে ঘরের একদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়াও হয়েছে।

ঘরের ভিতরে জ্বলছে ছোট্ট একটা উনোন। তার পাশে ঘটি বাটি আর থালা। মেজের উপর পাতা একটা মাদুরের উপর বসে এক গোছা উল আর দুটো কাঁটা নিয়ে বোনাবুনির কী-একটা কাজ করছে যে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ যেন বিচিত্রতার আর-এক বিস্ময় দেখতে থাকে। বোধ হয়, ভোরে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছে একটা নতুন কাজের আনন্দ; ভেজা-ভেজা কালো চুলের গোছা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে। আর, গায়ের শাড়িটাও একটা লালপেড়ে সস্তা মিলের শাড়ি।

—বাঃ, তুমি যে আজ দেখছি একেবারে...।

চমকে ওঠে স্নান সেরে নেওয়া সেই আনন্দটারই শান্ত চোখ দুটো। —কি বললেন?

ইন্দ্রনাথ—দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা ব্রত-টত শুরু করে দিয়েছ।

রিলিফের কাজে তিনটে দিন কামাই দিতে হয়েছে। ক্যাম্পের বাইরে বের হতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। অনেক চিঠির উত্তর দিতে হয়েছে। অনেক খরচের হিসেব লিখতে হয়েছে। কাকা পাঠিয়েছেন নতুন একটা বন্ধকী কবলা, সেটা একবার পড়ে নিয়ে সই করতে হয়েছে।

বিজয় এসে বলে—উনি একটা কথা বলছিলেন...।

ইন্দ্রনাথ—কে?

বিজয়—ঐ যে, সেই মহিলা, যার নাম পূর্ণিমা।

—পূর্ণিমা কে?

—ঐ যে, যিনি আগে চা-টা খেতেন।

—কি বলছিলেন?

—বলছিলেন, যদি আমাদের ছেঁড়া জামা-টামা সেলাই করাবার দরকার হয়, তবে উনি...।

—না; তোমরা ওর সংগে এসব কথা আলোচনা কর কেন?

—আমরা করিনি, উনিই করেছেন।

—উনিই বা কেন করেন?

—দেখে ফেলো জনার্দনের।

—তার মানে?

—কাঁধছেঁড়া আর পিঠছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে জনার্দন রোজই রিলিফ পৌঁছতে যায়, তাই দেখে উনি বলছিলেন...।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে আনমনার মত চুপ করে বসে থেকে ইন্দ্রনাথ বলে—তা, তোমরা যদি ভাল মনে কর, তবে দিয়ে এস তোমাদের যত ছেঁড়া জামা-টামা। দিক শেলাই করে। মনে হচ্ছে, এটা একটা সদিচ্ছারই কাজ।

কর্মীদলের ছেলেদের ছেঁড়া জামার একটা স্তূপ বাঁধাছাঁদা করে সদিচ্ছার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জামাগুলি কয়েকদিন পরে শেলাই হয়ে ফিরেও এসেছে। রিলিফের চাল, পৌঁছতে আবার সেই সদিচ্ছার ঘরের কাছে এসে যখন দাঁড়ায়, তখন বোধহয় বুঝতেও পারেনি ইন্দ্রনাথ, আর-একটা অদ্ভুত বিচিত্রতার রূপ দেখে এক-রকম বিহ্বল হয়ে গিয়েছে ইন্দ্রনাথের নিজেরই শান্ত চোখের দৃষ্টিটা। পূর্ণিমার শাড়িটার তিন জায়গায় তিনটে ছেঁড়া শেলাই করা; কিন্তু পূর্ণিমার সেই ভীরু হাসিটা যেন নতুন একটা সাহসের লজ্জায় রঙীন হয়ে রয়েছে।

রিলিফের চাল নামিয়েছে বিজয়। ইন্দ্রনাথও বলে—চল বিজয়। কিন্তু বিজয় চলে গেলেও যেন আনমনার মত চলা ভুলে গিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দ্রনাথ। —একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—তুমি যে আমাদের জন্য একটা কাজ করে দিলে, সেজন্যে কি কিছুই নেবে না?

—যদি দেন তবে নেব।

—কি নেবে বল?

—যা দেবেন।

—আচ্ছা।...আচ্ছা, তুমি কি বই-টই পড়তে পার?

—সামান্য পারি।

দেরি করেনি ইন্দ্রনাথ। মেলার ভিতরে ঘুরে ঘুরে আর অনেক খোঁজ করে এমন একটা দোকানও পাওয়া গেল, যেখানে পাঁজি পাঁচালি আর আরও কয়েকরকম বই ছিল। তারই ভিতর থেকে একটা বই বেছে নিল ইন্দ্রনাথ। এই সামান্য বইটা কিনতে গিয়ে যে দুপুর পার হয়ে প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে, ক্যাম্পের খিচুড়ি ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গিয়েছে, তাও বোধহয় বুঝতে পারেনি ইন্দ্রনাথ।

আর, বিকাল শেষ হয়ে যাবার সামান্য একটু আগে, চোখ-জুড়ানি মাঠের পাকুড়গাছের উপর যখন ক্লান্ত কাকের ঝাঁক শান্ত হয়ে বসে গিয়েছে, তখন পূর্ণিমার ঘরের দরজার কাছে এসে ডাক দেয় ইন্দ্রনাথ—বই নিয়ে যাও পূর্ণিমা।

যেন উপহার নেবার একটা উতলা পিপাসা ঘরের ভিতর থেকে ব্যস্তভাবে ছুটে বের হয়ে আসে। —দিন, কি বই আনলেন।

—ধর্মের বই-টই নয়। তোমার হাতে মানায় যে বই, সে বই।

বইটার নাম মলাটের উপর লেখা আছে—সহজ শিশুপাকন। বইটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর বইটার দিকে নয়, ইন্দ্রনাথেরই মুখের

দিকে পূর্ণিমার চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—আমাকে এ বই দিতে আপনার কি সত্যিই ভাল লেগেছে?

—ভাল লেগেছে বইকি।

—কেন, বলবেন?

—তোমাকে ভাল লেগেছে।

—তবে?

—কি বললে?

—আপনি তো সাহসী মানুষ, যা ভাল বোঝেন তাই করেন, কুষ্ঠীকেও ছুঁতে ঘেন্না করেন না, কোন ভয়ডর আপনার নেই, কোন বাধা আপনি গ্রাহ্য করেন না, গোরার বন্দুককেও আপনি তুচ্ছ করতে জানেন, অপরাজিতা লতা কাদার উপর পড়ে থাকলে তাকে আপনি বেড়ার উপর তুলে দেন.....।

যেন বাঁধাভাঙা জলের একটা আশার কলরোল। হঠাৎ মুখর হয়ে বুকের ভিতরের একটা বন্ধ প্রলাপ মুক্ত করে দিয়েছে মুখচোরা পূর্ণিমা। বার বার হাত তুলে চোখ দুটোকেও মুছতে চাইছে।

ইন্দুনাথ নিরস্তভাবে হাসে। —এসব গল্প তুমি শুনলে কোথায়?

—আপনার কর্মী ছেলেরাই বলেছে। মিথ্যে কথা বলেনি নিশ্চয়।

—না, মিথ্যা কথা বলবে কেন?

—তবে?

—আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।

চোখ নামিয়ে নেয় পূর্ণিমা। সে চোখে একটা অবলম্ব আশার শান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ে, যেন একটা গোপন ব্রতের মানত সফল হয়েছে।

স্নানযাত্রার দিনটা এসেই পড়েছে। আজ বাদে কাল। মেলার ভিড়টাও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

আজই শেষ রিলিফের দিন। সকালবেলায় রিলিফের চালডাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে বিজয়, পরেশ আর গুরুদাস। অন্য কাজের ব্যস্ততায় ইন্দুনাথ যেতে পারে নি। বিকেলের রিলিফ চুকে গেলেই সাঙ্গ হয়ে যাবে কর্মীদলের সেবাকাজের শেষ পালা। তারপর শুধু একটা রাত সজাগ থেকে সাঙ্গ হয়ে যাবে পিকেটের সজাগ শাসনের শেষ পালা।

তারপর, ইন্দুনাথের এই ক্যাম্পের জীবনটাও একমাসের ধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ব্রতসাঙ্গ আনন্দে ব্যস্ত হয়ে রঘুনাথপুরের বাস ধরবে আর উধাও হয়ে যাবে।

আগেই কথা হয়ে আছে, স্নানযাত্রার আগের দিনেই চলে যাবে ইন্দুনাথ। না গেলে নয়, কাকা লিখেছেন, বন্ধকী কবলাটা রেজিস্টারী হবে, স্নানযাত্রার একদিন আগে না পৌঁছলে সকালবেলায় কাছারিতে হাজির হতে পারবে না। সুতরাং, আজ দুপুরেই রওনা হতে হয়।

ইন্দুনাথের বিছানাটা বাঁধাছাঁদা হয়ে প্রস্তুতও হয়ে থাকে। কাগজপত্র আর জামা-কাপড় ভরে দিয়ে বাক্সটাকেও বন্ধ করে প্রস্তুত করিয়ে রাখে ইন্দুনাথ।

আর তো কোন কাজ নেই। হ্যাঁ, কাজ বলতে একটা কাজের কথা মনে হয়। দোষ কি? যাবার আগে একবার শেষ অনুরোধের কথাটা বলে দিলেই হয়—তুমি এবার চলে যাও, পূর্ণিমা।

রৌদ্রতপ্ত জ্যৈষ্ঠের একটা মধ্যাহ্ন; এ সময়ে ঐ উপনিবেশে প্রবেশ করা রিলিফেরও নিয়মে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু ইন্দুনাথের মন আজ আর এসব খুঁটিনাটি বিচার করবার দরকার আছে বলে মনে করে না। পূর্ণিমাকে যে কথাটা শেষবারের মত বলে দিতে হবে, সেটা তো একটা পরম রিলিফেরই বাণী।

পৌঁছে যেতে পনর মিনিটও সময় লাগে না।

পূর্ণিমার ঘরের দরজা খোলা। মেজের উপর কোন মাদুর পাতাও নেই। মেজের মাটিরই উপর শুয়ে পড়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে পূর্ণিমা। সত্যিই পূর্ণিমা তো?

পূর্ণিমা বলেই তো মনে হয়। মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পূর্ণিমার সারা শরীরটাই। শাড়িটা এলিয়ে পড়েছে; তার চেয়ে বেশি এলিয়ে পড়েছে পূর্ণিমার হাত দুটো। পূর্ণিমা যেন কথাবলা কোন প্রাণ নয়, শুধু বুকভরা কোমলতার কতগুলি নিঃশ্বাস। কি ভয়ানক বেহুঁস হয়ে ঘুম দিচ্ছে পূর্ণিমা।

যেন নিজেরই উপর হঠাৎ বিরক্ত হয়ে অপলক চোখ দুটোকে ফিরিয়ে নেয় ইন্দুনাথ; খোলা দরজার কাছ থেকে একটু আড়ালে সরে গিয়ে ডাক দেয়। —পূর্ণিমা!

যেন এই ডাক শোনবারই জন্য ঘুমের মধ্যেও পূর্ণিমার প্রাণটা জেগে ছিল। এক ডাকেই ধড়ফড় করে জেগে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় পূর্ণিমা—আমি তো তৈরী হয়েই আছি।

দেখতে পায় ইন্দুনাথ, সত্যিই তৈরী হয়ে আছে পূর্ণিমা। জামা-কাপড়ের ছোট্ট একটা পোঁটলা, ছোট্ট একটা হাতবাক্স আর একটা বই; একটা আয়োজন যেন যাত্রার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছে।

ইন্দুনাথ—কিন্তু যাবার জন্য আজই কেন তৈরী হয়েছ পূর্ণিমা?

—আজই তো। তাই তো শুনলাম।

—কি শুনলে?

—বিজয়দা বললেন, আপনি আজই চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

—ঠিকই বলেছে। কিন্তু সেজন্যে তুমি কেন তৈরী হলে?

ইন্দুনাথের মুখের দিকে, যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যাওয়া একটা বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পূর্ণিমা। তারপরেই চোখ নামিয়ে নেয়—আপনি তাহলে আজই চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পূর্ণিমা। আর কোন কথাও বলে না।

চলে যায় ইন্দুনাথ।

স্নানযাত্রা। রথ চলেছে। হাজার হাজার লোকের চিৎকার মাড়িয়ে দিয়ে আর ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে রথটা বাসুদেব সরোবরের দিকে চলে গিয়েছে।

ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ইন্দুনাথ, এক একটা স্নানের মিছিল হুড়োহুড়ি করে ছুটে গিয়ে বাসুদেব সরোবরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেন কাদার বাষ্প উথলে উঠছে। সে জায়গার আকাশটাও ঘোলা হয়ে গিয়েছে।

রঘুনাথপুরের বাস কাল দুপুরে ঠিক সময়েই এসেছিল, কিন্তু ইন্দুনাথ যায় নি। বিজয় বলেছিল, কেন আর একটি দিনের জন্য আমাদের নেতৃত্বহীন করবেন ইন্দুদা? থেকে যান, স্নানযাত্রার পরের দিন সকালে সবাই একসঙ্গে রওনা হওয়া যাবে।

ইন্দুনাথেরও কাজছাড়া প্রাণটা আজ যেন একেবারে অলস হয়ে গিয়েছে। বাইরে বটেশ্বরপুরের মেলার ধুলো রোদে পুড়ে

আর গনগনে আগুনের নিঃশ্বাসের মত হল্‌কা হয়ে ছুটে বেড়ায়, আর ইন্দ্রনাথ ক্যাম্পেরই ভিতরে একটা ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে বিছানার উপর অলস হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে। বিকেল কখন ফুরিয়ে গেল তাও বুঝতে পারে না; আবার কখন যে বটেশ্বরপুরের ধুলোভরা সন্ধ্যার আকাশে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার এত বড় একটা চাঁদ ভেসে উঠলো, তাও বুঝতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ চোখ কুঁচকে, যেন একটা স্বপ্নকে নিংড়ে দিয়ে, যখন জেগে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায় ইন্দ্রনাথ, তখন সেই নিরালা ক্যাম্পের ভিতরে বটেশ্বরপুরের শান্ত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে।

চোখের সামনে কেউ নেই, কোন কল্পনার ছায়াও নেই। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মনটা যেন এই কাজ-ফুরানো আলস্য সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করছে। এতক্ষণ ধরে যেন ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছিল বটেশ্বরপুরের একটা মায়াজ্যোৎস্না।

পূর্ণিমা নিশ্চয় ধারণা করেছে, এতক্ষণে বটেশ্বরপুর ছেড়ে চলে গিয়েছে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু ইন্দ্রনাথকে এ সন্ধ্যায় আচমকা দেখতে পেলে বোধ হয় বেশ একটু আশ্চর্য হবে আর খুশি হয়ে হেসে ফেলবে পূর্ণিমা।

কিন্তু...ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে ইন্দ্রনাথের মন, পূর্ণিমাই যে চলে গিয়েছে। চলে যাবার জন্য কালই যে তৈরী হয়েছিল পূর্ণিমা। স্নানযাত্রা চুকে যাবার পর, সে কি এখনও সেই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে আছে? বিশ্বাস হয় না।

যদি থাকে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, আছে বোধ হয়।

ক্যাম্প থেকে বের হয়ে, যেন একটা স্বপ্নালু বিশ্বাসের আবেশে, বটেশ্বরপুরের জ্যোৎস্নামাখা ধুলো মাড়িয়ে, সাঁকো পার হয়ে, চোখ-জুড়ানি মাঠ [illegible] পাথরটার কাছ দিয়ে নিজেরই একটা অদ্ভুত [illegible] যেন টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ইন্দ্রনাথ।

—পূর্ণিমা।

ডাক শুনেই ঘরের ভিতরে যেন [illegible] একটা ভীরু আর্তনাদ শিউরে ওঠে। দেখতে পায় ইন্দ্রনাথ, দু' হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছবির উর্বশীর মত সাজ করা সোনালী।

ঘরের ভিতর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। ঝকঝক করছে আয়নাটা। বেড়ার গায়ে বিবসনা অপ্সরার ছবি ঝুলছে। খাটের উপর বিছানার উপর সাদা ফুলবাহার চাদরের ঝালর ঝুলছে।

সোনালীর মুখটা দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু খোঁপার ফুলগুলি। ইন্দ্রনাথ বলে—আজও যাওয়া হলো না, তাই তোমাকে দেখতে এলাম।

কোন উত্তর না দিয়ে, দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখে সোনালী যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—আমি জানতাম না যে, আপনি আসবেন।

—তাতে কি হয়েছে?

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দুটো ভীরু বিস্ময়ের চোখ তুলে এইবার ইন্দ্রনাথের মুখটাকে দেখতে থাকে সোনালী।

ঘুমন্ত মানুষের গলার স্বরের মত অদ্ভুত স্বরে ইন্দ্রনাথও যেন একটা নতুন আবিষ্কারের বিস্ময়ের সঙ্গে ফিসফিস করে।—তুমি সত্যিই সুন্দর।

সোনালীর চোখে একটা মৃদু ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—আজ আমাকে সুন্দর মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

ঘরের দরজা পার হয়ে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে সোনালীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বলে—মিথ্যে বলছি না, তুমি বিশ্বাস কর।

কোন কথা না বলে, খোঁপাটাকে এক হাতে যেন শক্ত করে খিমচে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোনালী।

ইন্দ্রনাথ—তোমার ঘরটিও বেশ সুন্দর।

রংমাখানো নরম ঠোঁটের উপর সাদা সাদা শক্ত দাঁতের সব হিংস্রতা বসিয়ে দিয়ে আর ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে কটকট করে একবার তাকিয়ে নিয়ে সোনালী বলে—এঘরে আমাকে মানিয়েছেও সুন্দর, তাই না?

ইন্দ্রনাথ—কি বললে?

সোনালী—আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?

ইন্দ্রনাথ—থাকি কিছুক্ষণ। এখন আর তো কোন কাজ নেই আমার। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আর তো কখনো দেখা হবে না।

সোনালীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা সুন্দর সর্বনাশা কুহকের রঙীন হাসি লুটিয়ে উঠতে থাকে। চোখ দুটোও হেসে হেসে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

তার পরেই ল্যাম্পটাকে যেন ছোঁ মেরে এক-হাতে তুলে নিয়ে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকায়।—আলো থাকবে, না নিভিয়ে দেব? কি পছন্দ করেন আপনি?

ইন্দ্রনাথ—তোমার যা পছন্দ।

সোনালীর হাতটা একবার শুধু কাঁপে। তার পরেই মাথা হেঁট করে। তারপর ল্যাম্পটা হাতে নিয়েই ঘর ছেড়ে একেবারে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই ডাক দেয় সোনালী—শুনুন।

ইন্দ্রনাথও বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সোনালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়। —এ কি? তুমি কাঁদছ কেন পূর্ণিমা?

—আমি পূর্ণিমা নই। কিন্তু আমার একটা কথা শুনুন। ফিসফিস করে, যেন একটা নিবিড় মায়ার আবেশে কথা বলে সোনালী। —আপনি চলে যান।

—কেন?

—আমার এখানে এখন মেজকর্তা আসবেন।

—কে মেজকর্তা? চিরঞ্জীব?

—হ্যাঁ।

—চিরঞ্জীব এখানে আসবে কেন?

—চিরঞ্জীবই আসবে। আপনার আসতে নেই।

—কেন?

নিষিদ্ধ দুনিয়ার সেই উপনিবেশের ঘরে ঘরে তখন প্রচণ্ড হাসি-হর-রা আর হুল্লোড়ের একটা বিপুল নেশার উৎসব জেগে উঠেছে। ছুটোছুটি করছে যত মত্ত মুগ্ধ আর দুরন্ত ছায়া-শরীর। আর, ধুলোমাখা জ্যোৎস্নার গুমোট ঝলসে দিয়ে একটা টর্চের আলো সরু পথের উপর দিয়ে যেন থেকে-থেকে আছাড় খেয়ে-খেয়ে এগিয়ে আসছে।

সোনালী বলে—শিগগির চলে যান। ধরা পড়ে যাবেন যে।

—কি বললে?

—আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—চলে যাবার অন্য একটা রাস্তা আছে। কিন্তু গাছপালায় ভরা সে রাস্তায় বড্ড অন্ধকার।

—তবে?

—আমি আলো ধরছি, আসুন।

সে রাস্তার প্রথম সুপারি গাছটার কাছে এসেই আলো তুলে ধরে সোনালী—চলে যান।

চলে যেতে থাকে ইন্দ্রনাথ।

—শুনুন; ডাক দিয়ে আর দু'পা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে সোনালী—দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কথাটা তুচ্ছ করো না লক্ষ্মীটি; ঘরে যাবার আগে একবার স্নান করে নিও।

—কেন?

—তুমি ভুল করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে।

চমকে ওঠে ইন্দ্রনাথ। যেন একটা সাপের ছোবল পড়েছে ইন্দ্রনাথের বুকের উপরে; চওড়া একটা বাজে বুক, বটেশ্বরপুরে এসে যে বুকের সাহসটা ভীরু হয়ে গেল, আর ভীরুতাটা দুঃসাহসী হয়ে উঠল। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, সরু পথের অন্ধকারের মধ্যে একটা [illegible] ছায়ার মতই উধাও হয়ে যায় ইন্দ্রনাথ।

'এই, যাবি?' অতসীর গায়ে ঠেলা মারল মৃদুলা।

বইয়ের থেকে মুখ তুলে অতসী হাঁ হয়ে রইল। বললে, 'কোথায়?'

'সিনেমা।'

'সিনেমায়? এখন?'

'কেন, নাইট শোতে যায় না কেউ?'

'যায় হয়তো। কিন্তু হস্টেলের মেয়েরা নয়।'

'কেন, হস্টেলের মেয়েরা কি রাত জাগতে অপটু? তারা কি খুকি?'

'না, একেবারেই নয়। কিন্তু তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, আছে শালীনতার চেতনা—' থমথমে মুখ করল অতসী।

'হস্টেলের কি-একটা বাজে আইন লঙ্ঘন করতে চাচ্ছি বলেই শালীনতার অভাব হল?'

'বাজে আইন মানে?'

'তাছাড়া আবার কি। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসা চাই, নইলে গেট বন্ধ, এ-বর্বর আইনের কোনো মানে হয়?'

'যখন হস্টেলে নাম লিখিয়েছিলি, তখন এ-আইন ন্যায্য আইন, মেনে চলবি বোল আনা, এ-স্বীকার করেছিলি? করিসনি?'

'একবার যা স্বীকার করা যায়, তা আর পরে খণ্ডন করা যায় না।'

'না।' আরো গম্ভীর হল অতসী।

'তবে সেদিন যে অরুণা বৃষ্টিতে আটকে গেল, সারা রাত কে-না-কে-এক দিদির বাড়ি বলে বাইরে কাটাল—পরদিন সকালে এসে হাজির—'

'সেটা তো দুর্ঘটনা, বৃষ্টি—'

'কিন্তু শুধু তো দুর্ঘটনা নয় অঘটনাও তো আছে। কল্যাণী তো কত রাত্রি ফেরেই না হস্টেলে। শুনতে পাই যাদবপুরে কোন এক ভদ্রলোকের—'

'থাম। শোনা কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।' অতসী ধমকে উঠল।

'কিন্তু কোনো কোনো রাত্রে যে হস্টেলের বাইরে থাকে, বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ দেখা কথা। তুই দেখিস নি?'

'দেখলেই সমর্থন করতে হবে?' চোখ তেরছা করল অতসী। 'কিন্তু মেট্রন কী বলে?'

'কিছু বলে না। বলে হস্টেলের মধ্যে কিছু না হলেই হল। বলে, আর যাকিছু করো, দেখো, গোল পাকিও না।' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল মৃদুলা।

'কিন্তু প্রণতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিল মনে নেই?'

'সে প্রণতি মুখে-মুখে তর্ক করেছিল বলে। রাত্রে স্টে-এওয়ে করবার জন্যে নয়।'

'বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফেরে না, বুঝি, তার যাহক একটা প্লজিবল কৈফিয়তও তৈরী করা যায়। কিন্তু ফিরে এসে বেশি রাতে আবার বেরোয় কে? ফিরবি যখন, তখন তো মাঝরাত, খুলে দেবে কে দরজা?'

'দারোয়ানকে বলা আছে। দেয়া আছে বকশিশ। সেই খুলে দেবে। কিন্তু,' অতসীর চেয়ারের পিঠটা ধরল মৃদুলা: 'কিন্তু আমি ফিরব না।'

'ফিরবি না মানে? রাত্রে সিনেমার হলে শুয়ে কাটাবি?'

'সিনেমায় যাব না।'

'সিনেমায় যাবি না? সে কি?' চেয়ারটা নড়ে উঠল শব্দ করে।

'ঘড়ি দেখেছিস? সিনেমার যাবার সময় কোথায়? সরকারী আজেবাজে ছবিগুলিও এখন শেষ হয়ে গেছে।'

'তবে তুই যাবি কোথায়?'

'আন্দাজ কর।'

'আন্দাজ করব? ছাত্রী-মেয়ে রাতে হস্টেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট খুলে, সেটা ভাবাই তো কঠিন। শুনি না! যাবি কোথায়?'

চোখের পাতা নাচাল মৃদুলা। 'হোটেলে।'

'তার মানে? চাকরি নিয়েছিস সেখানে? ভোজনশেষে ভুক্ত লোকদের অবশিষ্ট হবার চাকরি?'

'চাকরি নিতে নয়, চাকরি দিতে যাচ্ছি। প্রধানতম চাকরি।'

'সে আবার কি।'

'তার মানে প্রগাঢ়তম। যাচ্ছি রণেনের হোটেলে।'

'ও তোকে বলেছে যেতে?'

'ও আবার বলবে!'

'তবে?'

'যাচ্ছি নিজের জোরে, নিজের গরজে।' চেয়ার থেকে দু পা সরে গেল মৃদুলা। 'আর ওকে বোঝাতে যে আমার গরজেই ওর গরজ।'

'হোটেলে আর-সকলে জেগে নেই? দেখবে না?'

'দেখুক। বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, আমি তো আর-কারু কাছে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি রণেনের কাছে, রণেনের ঘরে। তার একলার এক ঘরে।'

'তোর লজ্জা করছেনা বলতে?' চেয়ারটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল অতসী।

'না আর করছে না। যা সত্য, তাই নগ্ন। আমার গায়ে যদি আগুন লাগে আর আমি যদি সব আবরণের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তা হলে তুই বলবি তোর লজ্জা করে না নির্লজ্জ হতে? বলবি? চিকিৎসা করাতে এসে লজ্জা ঢাকবার কোনো মানে হয় না।'

'চিকিৎসা?'

'হ্যাঁ, অনেক টোটক-টাটকা করেছি, অনেক ইঙ্গিত-ইশারা, হোমিওপ্যাথিক ছোট্ট গ্লবিউল থেকে শুরু করে এলোপ্যাথিক ঝাঁঝালো মিকশ্চার পর্যন্ত, কোনো সুরাহা হয়নি। এবার সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরিকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।'

'কে সে?'

'শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। সকলেই দেখে। যতই ক্লেশ হক মরীয়া হয়ে সবচেয়ে বড়, দ্রুত ডাক্তারকে ডাকে। আমিও মরীয়া, আমিও শেষ চেষ্টা দেখব।'

'কিন্তু ডাক্তারটা কে?'

'সেই ডাক্তার আর বেঁচে নেই।'

'বেঁচে নেই?' হাঁ হয়ে গেল অতসী।

'না। ভস্ম হয়ে গিয়েছে। পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী--'

অতসী চেয়ারটা ফিরিয়ে নিল আগের কোণে। বললে, 'ভস্মে ঘি ঢালতে চলেছিস।'

'মোটেই না। ভস্মের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গ বার করতে চলেছি। আর, এক-কণা আগুন পেলেই দাবাগ্নি। অলসকে নিয়ে আসব বিলাসে--'

'বিলাসকে?' ঘাড় বেঁকাল অতসী।

'নিয়ে আসব উল্লাসে। দেখছিস না আমার সাজগোজ?'

'তুই এমনি করে নিক্ষেপ করবি নিজেকে?'

'সুন্দর বলেছিস কিন্তু।' অতসীর কাঁধের উপর হাত রাখল মৃদুলা। 'নিক্ষেপ করব। লাফের আগে দেখব না তাকিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ব অন্ধকারে।'

'এতটুকু ধৈর্য নেই?'

'তুই কী বুঝবি! তুই তো পতঙ্গ হয়ে দেখিসনি বহ্নি। সংক্ষেপ করতে চাই, তাই আমি নিক্ষেপে প্রস্তুত।'

'রণেন জানে, যাবি?'

'জানতে দিইনি ঘুণাক্ষরে। ওকে এক-মুহূর্ত সতর্ক হবার সময় দেব না। ধ্বংসের মত নেমে পড়ব। অন্ধ সাইক্লোন হয়ে ধাঁধিয়ে দেব ওর অনুভবের শক্তি--'

'যদি গিয়ে দেখিস, ও ফেরেনি?'

'যদি গিয়ে দেখি ও ফেরেনি, দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া, অপেক্ষা করব।'

'তোকে না যেতে ও বারণ করে দিয়েছে?'

'তখন ঝিরঝিরে হাওয়া ছিলাম।' একটু নড়ল-চড়ল মৃদুলা। 'ঝড়কে কে বারণ করে? বুক পেতে বরণ করবে। যা অবারণ তাই বরণীয়। আর যদি গিয়ে দেখি, ঘরে আছে?'

'নক করবি?

'দুদ্দাড় শব্দ করে দরজা খোলাব।'

'যদি না খোলে?'

'লঙ্কায় কী আগুন লেগেছে জানি না, কিন্তু আমি লেজের আগুনে জ্বলছি, আমার উপশম কই? দরজায় মাথা কুটব, কাঁদব, মিনতি করব। কেন খুলবে না? রুগ্নের জন্য, বিপন্নের জন্য এতটুকু দয়া হবে না তার?'

'বেশ, যদি খোলে!'

'তক্ষুনি ঢুকে পড়ে দরজায় খিল চাপিয়ে দেব। হাত বাড়িয়ে দেব সুইচ অফ করে। তাকে জড়িয়ে ধরব, বলব, এ-রাত তোমার ঘরে ভোর করতে এসেছি—'

'বাস, আর কোনো কথা নেই?'

'কী হবে অনর্থক প্রলাপে? অন্ধকারই কথা কইবে। উত্তুঙ্গের সঙ্গে গভীরের সম্ভাষণ।'

'ছি ছি ছি ছি। এই কি ভদ্রতা, শালীনতা?'

'আহা-হা, রাখ তোর টিপ্পনী। ভদ্র প্রেম, বৈধ প্রেম, শুদ্ধ প্রেম এমন কিছু আছে নাকি সংসারে? ভদ্র প্রেম না সোনার পাথরবাটি। বৈধ প্রেম না কাঁঠালের আমসত্ত্ব। আর শুদ্ধ প্রেম, কি বলব, অশ্বডিম্ব। প্রেম প্রেম। প্রেমের কোনো বিশেষ্য-বিশেষণ নেই।'

'কিন্তু, ধর, যদি তোকে গোড়াতেই তাড়িয়ে দেয়?'

'তারই জন্যে তো তোকে সঙ্গে নিতে চাইছি।'

'আমাকে?'

'নইলে তোর সঙ্গে এত বকবক করছি কেন?'

'আমি লঙ্কায়ও নেই, লেজেও নেই—এর মধ্যে আমি কোথায়?'

'তুই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবি। ও তোকে দেখে বুঝবে, আমি হঠকারী নই, হিতৈষী বন্ধুদের সমর্থনেই আমার আসা। আমার দাবি।'

'বেশ বলছিস যাহক।'

'হ্যাঁ, আরেকটি মেয়ে আমার সঙ্গে আছে, প্রথমটা ওর চোখে বেশ সরল দেখাবে। আমার মতলব সম্বন্ধে মোটেই হুঁশিয়ার হতে পারবে না। তারপর ঘরে ঢুকে ব্যগ্র হাতে যখন খিল চাপাব—'

'তখন আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি ফিরে আসব একা-একা।'

'বন্ধুর জন্যে কষ্ট একটু না-হয় করলিই বা। আর কষ্ট না ছাই! এই তো দু-তিন মিনিটের পথ—দারোয়ান গেট খুলে দেবে বলা আছে।'

'আমি তো ফিরে এলাম, কিন্তু তোকে, প্রথমে না হক, সব শেষ হবার শেষে, যদি তাড়িয়ে দেয় মাঝরাতে?'

একটুও ভয় পেল না মৃদুলা। বললে, 'তখন তো ফাঁসির দড়ি পরে নিয়েছি গলায়

তাড়িয়ে দিলে নিজেকেও বেরিয়ে পড়তে হবে সঙ্গে সঙ্গে।'

'হঠকারিতার একটা সীমা আছে।'

'হ্যাঁ আছে। আত্মসমর্পণই তার সীমা। সর্বশ্রেষ্ঠ যে ধনী, সর্বোত্তম যে বীর, কী সে দিতে পারে শেষ পর্যন্ত? ঐ, ঐ আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণই সেরা ধন, সেরা শক্তি। তাই এবার আমি দিয়ে দেব উজাড় করে।' আবার দু পা হাঁটল মৃদুলাঃ 'যা অলঙ্ঘ্য অনিবার্য, তাকে নইলে পাই কি করে বল?'

'কেলেঙ্কার করবি তুই। ও নিশ্চয়ই পুলিস ডাকবে।'

'ডাকবে?' চেয়ারের পিঠ ধরে থামল মৃদুলাঃ 'সত্যি? তাই ডাকুক। সত্যি-সত্যি একটা 'কেলেঙ্কার হক। লোক-জানাজানি হক। উঠুক খবরের কাগজে। দরকার হয়তো দাঁড়াই গিয়ে আদালতে।'

'আর তুই ভাবছিস আমি যাব তোর সঙ্গী হয়ে, তোর ঘটকালি করতে?'

'না গেলি। নাই বা দূতী হলি। আমি একাই যাব। তুই ক্ষুদ্র, তুই লঘু, তোর অল্পে তুষ্টি, তুই বুঝবি কি করে এই অধ্যবসায়ের সুখ? তুই তো এক বিধি-নিষেধের পুঁটলি কি করে জানবি তুই এই সর্বস্বপণ পূর্ণাহুতির আস্বাদ? ভাণ্ডার লুঠ হয়ে যাবার স্ফূর্তি? নিঃস্বতার ঔজ্জ্বল্য?

আলো নিভিয়ে দিল অতসী।

আশ্চর্য, অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল মৃদুলা।

হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র নিয়ে জাগব অথচ স্তব্ধ থাকব, উত্তাল হব অথচ উদ্বেল হব না, এ পারব না সইতে। আর চড়াই-উতরাই চলছে না, এবার স্থির লক্ষ্যে সেই পূর্ণতায়, সেই পরাকাষ্ঠায় গিয়ে পৌঁছুব। থামব না, ছাড়ব না, ফিরব না কিছুতেই। তিন-তেতালা ঢোঁড়া সাপ হব না, ফণা-তোলা ছোবলমারা কেউটে হব। দংশন না হলে গরল নেই। সজীব সংযোগ না হলে সিদ্ধি নেই।

'খবরদার, যাসনি মৃদুলা।'

'তুই তো বারণ করবিই। তুই আমার শত্রু।'

মফঃস্বলী কলেজ, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল মৃদুলা।

মাকে বললে, 'রণেনদাকে বলো না আমাকে একটু সাহায্য করবে। চারদিকে অন্ধকার দেখছি।'

মায়ের গ্রামসম্বন্ধে কোন্ এক দাদার ছেলে রণেন। গেল বছর বেরিয়ে গেছে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে। হাতে একটা চাকরি এসে পড়তেই লুফে নিয়েছে চটপট।

'দেখিয়ে দিতে পারি মাঝে মাঝে। কিন্তু পিসিমা, ও একা নয়।' রণেন আবদারের সুরে বললে, 'অন্তত আরেকজন ওর সঙ্গে পড়ুয়া চাই।'

একা হবার সাহস নেই। ভীরু, ঠুনকো। জন একাধিক হলেই ভিড় আর ভিড় হলেই অলক্ষ্যে হবার সুবিধে।

এক পাড়ার মেয়ে, অতসীকে জোটাল মৃদুলা।

অতসী বললে, 'গোড়াতে শখ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখতে পারব, এমন মনে হচ্ছে না।'

'গোড়াতেই শেষের কথা বলতে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। একদিন মরব বলে এখুনি কান্না জুড়ে দিই আর কি।'

কিন্তু যা ভেবেছিল, অনার্স ছেড়ে দিল অতসী। বললে, 'পায়ের ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?'

'তুমিও ছেড়ে দেবে নাকি?' মৃদুলাকে জিগগেস করল রণেন।

'পরীক্ষা ছাড়তে পারি, কিন্তু পড়া ছাড়ব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে যার বুদ্ধি আছে, সে বুঝুক।'

'যার বুদ্ধি নেই?'

'সে শুধু পড়াক।' হাসল মৃদুলা।

বই বন্ধ করল রণেন। বললে, 'আজ এই পর্যন্ত।'

তবু মৃদুলা ওঠে না। সেকি? বাড়ি যাও এবার।

বলেছি তো, পরীক্ষা ছাড়লেও পড়া ছাড়ব না। তার মানে বোকারাও বোঝে। তার মানে আপনাকে ছাড়ব না।

'আজকে তো ছাড়ো।' চেয়ারে দুম্দাড় শব্দ করে উঠে পড়ল রণেন।

আরেকদিন, পড়াচ্ছে, রণেন লক্ষ্য করল

মৃদুলার কান নেই। গালে হাত দিয়ে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'ও কি, শুনছ না?' রণেন ধমকে উঠল।

'না। দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ-গুলো। যেন তারা ফুটছে আকাশে। সত্যি আপনি কী সুন্দর—কথা সুন্দর?'

বই বন্ধ করল রণেন।

'এবার কী দেখছ?"

"শুধু আকাশ।"

দুদ্দাড় শব্দে আবার উঠে পড়ল রণেন। বললে, "ফাঁকা আকাশে কিছু হবে না, শুকনো মাটি চাই, নিরেট মজবুত মাটি।"

কি বুঝল কে জানে, মৃদুলা পর দিন কাঁদতে বসল।

প্রথমে টের পায়নি, শেষে ফোঁপানির শব্দে চোখ তুলল রণেন। "এর মানে? কান্না কিসের?"

সানাই আর বাজায় না, শুধু ধানাই-পানাই করে।

শেষে বললে অনেক কষ্টে, "আমার পড়তে ভালো লাগে না।"

"খুব ভালো কথা। পড়ো না।" বই বন্ধ করল রণেন।

আশ্চর্য, কথার পিঠে একবারও জিজ্ঞেস করলে না, কী ভালো লাগে! মৃদুলা ভাবল, লোকটা কি আকাট?



বরং বললে উল্টো কথা: "তবে আর বসে আছ কেন?"

"না,. উঠব না।" ভীরুতাকে সংক্রামক হতে দেবে না মৃদুলা। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "কথাটা শেষ করে যাব।"

"হায় হায়, কথার কি শেষ হয়?" একটু কি হাসল রণেন?

"তবু বলতে পারার শেষ হয়।"

"বলো।"

"আমি—আমি—" ঢোঁক গিলল মৃদুলা, তাকাল উপরে-নিচে। এর চেয়ে বোধহয় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। বললে, "আমি ভালোবাসি।"

"অপূর্ব কথা।" এবার কেন কে জানে জিগগেস করে ফেলল রণেন: 'কাকে?'

'তোমাকে।'

'আমাকে? না, তোমার নিজেকে?'

'তোমাকে।'

'বেশ তো, বাসো না।' যেন কোনো ঝঞ্চাটে রাজি নয় এমনি নিস্পৃহভাবে বসলে রণেন। 'আপত্তি কি। মনে মনে বাসো। সে বাসায় কোনো দিন বাসি নেই।'

রণেনের পুরোনো কথা আবৃত্তি করল মৃদুলা: 'ফাঁকা আকাশে আমি বিশ্বাসী নই, আমি শুকনো কঠিন মাটি চাই।'

'তার মানে?'

'তোমাকে চাই।'

'আমাকে?' আঙুলটা বুকে না রেখে পেটে রাখল রণেন: 'শেষকালে না উলটো বুঝিলি রাম হয়। চড়বার জন্যে ঘোড়া চেয়েছিল, বইবার জন্যে ঘোড়া পেল।'

'বেশ, বইবই সারা জীবন। কিন্তু ঘোড়া যদি আমাকে চায় তবে সে কাঁধে না উঠে নিজেই আমাকে পিঠে তুলে নেবে।'

'তার মানে শুধু তোমার একার চাওয়াতেই হচ্ছে না।' রণেন তাকাল স্থির চোখে।

'না, আমার একার চাওয়াতেই হবে। কেননা তুমি আমাকে চাও এও যে আমারই চাওয়া।'

'তবে, হরে-দরে, আমারও একটা চাওয়া আছে?'

'আছে।'

'তবে এই আমি চাই যে তুমি আর এসো না।' দরজার দিকে মুখ করল রণেন।

কিন্তু এই উপেক্ষার অর্থ কী? ব্রহ্মচর্য না অপৌরুষ? না কি নিষ্ক্রিয় নিবার্ঢ় মূর্খতা!

যেচে প্রেম হয় না, নেচেও হয় না হয় তো, কিন্তু নিয়তপ্রযত্নে কী না হয়? মাটির কলসী রাখতে-রাখতে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়।

'এ কি, তুমি আবার এসেছ কেন?' ঘরের মধ্যে মৃদুলাকে দেখে বিরক্ত হল রণেন।

'পড়তে আসিনি। যেটুকু পড়িয়েছ তাতেই পড়িয়েছ যথেষ্ট।' সাহসে ঝলমল করতে করতে চেয়ারে বসল মৃদুলা। 'তোমাকে একটু দেখতে এসেছি। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে একটু দেখাও কি দোষের?'

'ভালোবাসা কি দূর থেকে হয় না? দেখতে চাও তো রাস্তা থেকেও তো দেখা যায়। এত কাছে এসে উপর-পড়া হবার দরকার কি!'

'রণেন, আমার প্রেম অতীন্দ্রিয় নয়, রতীন্দ্রিয়। তুমি কেন আমাকে চাইবে না? আমি কি এতই বাজে, এতই কুচ্ছিত?'

'কে তা বলছে!' ঢোঁক গিলল রণেন: 'কিন্তু আমার ভালোবাসা ঐশ্বরিক।'

'ঈশ্বর-ফিশ্বর মানিনা।'

ঈশ্বর না মানলেও ঐশ্বরিক প্রেম মানা যায়।'

'বাজে কথা। আমি জানি তুমি ওসব মানোনা। তুমি সাফল্য চাও, সংসার চাও, সন্তান চাও। আমি—আমিই সব দিতে পারব তোমাকে।'

'কিন্তু আপাতত শান্তি চাই।'

'তুমি যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও আমি মরে যাব।'

'মরেই যদি যাবে এ দেহায়তন ভোগ করবে কি করে? মন্মথের মন মন্থন করবে কি করে? যাও পরীক্ষার বেশি দেরি নেই।'

মরলও না ফিরলও না মৃদুলা। চিঠি ছাড়তে লাগল। উত্তর দিল রণেন। কিন্তু সে উত্তর আর কিছুই না, পুঞ্জীকৃত ঔদাসীন্য। পিণ্ডীকৃত হিতকথা।

হামাগুড়ি দিয়ে পালানো যাবে না, দু পায়ে ছুটতে হবে। রণেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল কলকাতা। ঠিক করল শেষ পরীক্ষা, এম-এটা দিয়ে ফেলি।

হাতে রেস্ত কিছু ছিল, সস্তায় না গিয়ে হোটেলে এসে উঠল, একটা একক ঘরে।

কি আশ্চর্য, এখানেও পিছু নিয়েছে মৃদুলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, ধরতে পারে না কিছুতেই। রণেন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায়, পিছলে-পিছলে সরে পড়ে।

টেলিফোন বেজে উঠল হোটেলের। রণেন-বাবুকে চাই।

'কে?'

'আমি মৃদুলা। চিনতে পারো?'

'পৃথুলা হলে চিনতাম। আরেকটু যদি বিস্তৃত হও।'

'আমি তোমার ছাত্রী গো—'

'ও! চিনেছি। কি ব্যাপার?'

'আমি কিছু বলতে চাই তোমাকে।'

'বলো।'

'ফোনে সে সব কথা হবার নয়। একবার যেতে পারি হোটেলে?'

'ফোনে যে কথা বলা যায় না তেমন কোনো

কথা নেই তোমার সঙ্গে।' রিসিভার রেখে দিল রণেন।

'আছে।' সেটা মৃদুলা নিজে বললে নিজেকে শুনিয়ে।

সটান সেদিন হোটেলে গিয়ে হাজির। পূর্ণ বাক্যের শেষে শান্ত একটা দাঁড়ি হয়ে নয়, ভাঙা বাক্যের মাঝখানে উদ্ধত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে।

চারপাশ মোলায়েম দেখাবার জন্যে রণেন প্রশ্ন করলঃ 'কি, কোনো বই-টই চাই? খাতা-পত্র?'

'না, ওসব কিছু চাই না। আমি ছাত্রী নই', মুখে একটি প্রশস্ত হাসি মেলে ধরল মৃদুলাঃ 'আমি দাত্রী।'

মুখচোখ গম্ভীর করল রণেন। বললে, 'শোনো কে কী ভাববে সেটা শোভন হবে না। যা সমীচীন নয়, ছন্দোময় নয় তা সুন্দরও নয়। রাত হবার আগেই গা-ঢাকা দাও।'

তবু সেদিন শুনেছিল, গা-ঢাকা দিয়েছিল মৃদুলা।

আজ আর শুনবে না।

কেন, কেন এত উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, এত প্রত্যাহার? শুধু ছন্দই সুন্দর? উচ্ছৃঙ্খলতা সুন্দর নয়? মেঘই মনোহর? ঝড় মনোহর নয়?

কেন, কেন রণেন জাগবে না? উঠে দাঁড়াবে না? এক স্তূপ বসনের মত বুকের মধ্যে কেন নেবে না আঁকড়ে? ও যেন একটা খেলা পেয়েছে। কিছুতেই বদ্ধ হবে না, বিকৃত হবে না, নিষ্কলঙ্কিত থাকবে, এই এক কৌতুককর খেলা। হঠপূর্বক হটানো। ডাক্তার অস্ত্র করছে করুক, চেঁচাব না, এই এক বাহাদুরি। নিজের নির্দয়তায় নিজের কাঠিন্যে এ এক রকমের মুগ্ধতা। মুগ্ধকে মত্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে।

সমস্ত ত্রুটি মৃদুলার নিজের। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নয়, আঙ্গিকের ত্রুটি।

পায়ের নিচের মাটিতে দেবে না সে আর ঘাস গজাতে। আঁকড়ে ধরবে সময়ের ঝুঁটি। লজ্জা যদি শক্তি, নির্লজ্জতাও শক্তি। আবরণ যদি শক্তি, উন্মোচনও শক্তি।

কী রহস্য, কেন তপ্ত হবে না, ভ্রান্ত হবে না, স্খলিত হবে না?

শুধু জানিয়ে সুখ নেই, জাগিয়ে সুখ।

'এই ভাবে না হলে কিছু হবে না। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়, আমি এবার ছিনিয়ে নিতে এসেছি। গায়ের জোরে জিততে এসেছি এবার। গায়ের জোরে—যৌবনের জোয়ারে—'

'কিন্তু না, এ হয় না।' চারদিকে শূন্য-চোখে তাকাতে লাগল রণেন।

'আমি বলছি, হয়।'

'হয়? কিন্তু আমি, আমি কী করব, আমি কী করতে পারি?' মহাজনের কাছে খাতকের মত দুর্বল অসহায় রণেন।

তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। বন্যতম, ভদ্রতম, যা তোমার খুশি আমাকে ধরো মারো কাটো পিষে ফেল, পুলিসে ধরিয়ে দাও—নয়তো ঘুম পাড়াও, বুকে করে রাখো। একটা কিছু করো আমাকে নিয়ে।'

এক ঢেউ সমুদ্র যেন গণ্ডূষে নিঃশেষ হতে এসেছে।

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল রণেন। কাশতে লাগল। এ কী কাশি! কাশি হল কবে? এ কি, যেন থামতে চায় না—

টেবিলের তলা থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে ধরল রণেন। টাটকা রক্ত উঠল খানিকটা।

'এ কি, রক্ত?' এক পা পিছিয়ে গেল মৃদুলা। 'কী হয়েছে তোমার?' সমুদ্র কি পুকুর হয়ে গেল মুহূর্তে?

'আমার টি-বি হয়েছে।' নেতিয়ে পড়ল রণেন।

'আ-হা-হা, কি ভয়ানক, শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো।' আকুল হয়ে উঠল মৃদুলাঃ 'তোমাকে তো তাহলে খুব ডিস্টার্ব করলাম। ছি-ছি!' পুকুরটুকুনও কি বুজে গেল আস্তে-আস্তে?

'তুমি বিশ্রাম করো, সকালে ডাক্তার ডেকো—কে দেখছে? আমি বলি কি, কালেজ-টলেজ ছেড়ে দিয়ে বাইরে কোথাও চেঞ্জে যদি যাও দিন কতক—'

আস্তে-আস্তে বার হয়ে গেল মৃদুলা।

হস্টেলে ফিরে এসে নিজের বিছানায় নিঃস্বত্বের মত পড়ল হুড়মুড় করে।

অতসী হকচকিয়ে উঠল। প্রশ্ন করলঃ কিরে, চলে এলি?

চলে এসেছে তো বটেই, এটা আবার প্রশ্ন কি! প্রশ্নটা এবার চোখা করল। অতসীঃ 'কি রে, পেয়ে এলি?'

উত্তর দেয় না।

'কি রে, সর্বস্বান্ত হয়ে এলি?'

'মোটেই না। পড়তে-পড়তে সামলে এলাম।' হাঁপধরা লোক যেন হাওয়ায় চলে এসেছে এমনি স্ফূর্তি এখন মৃদুলারঃ হারতে-হারতে জিতে এলাম সর্বস্ব। লোকটার টি-বি। অত কাব্য করে বলবার কী হয়েছে? যক্ষ্মা।'

তাই। তাই ঐ ঢঙ, ঐ বীরত্বের ছদ্মবেশ। দাঁত নেই বলে মাংস ছাড়া। তাই ঐশ্বরিক প্রেম, বেদান্তের বুকনি। কাঁধে মোহমুদ্গর নিয়ে ব্রহ্মচারী সাজা। কিছুতেই আমি টলি না নড়ি না, আমি অনতিক্রম্য—এই অহঙ্কারের ঝিলিক দেওয়া।

বেঁচে গিয়েছি। খতম হইনি, ফতুর হইনি। আস্তসমস্ত আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁকে না মানলেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কদিন পরে অতসী বললে, 'জানিস আমার বিয়ে।'

'মাইরি?' খুশিভরা চোখে জিগগেস করল মৃদুলাঃ 'বাগানো না লাগানো?'

'আমরা কি বাগাতে পারি? আমাদের ভাগ্যই লাগিয়ে দেয়।'

'কাকে করছিস?'

'আবার ব্যাকরণ ভুল করলি। করছি না রে, হচ্ছে।'

'কার সঙ্গে?'

'তোর রণেনের সঙ্গে।'

'সেকি? সর্বনাশ! ওর তো টি-বি—'

'না। ওটা ওর নড়া দাঁতের রক্ত।'

'নড়া দাঁত?'

'হ্যাঁ, প্রেম পরখ করবার কষ্টি।' বললে অতসী, 'একটা সত্যকে যাচাই করবার জন্যে মিথ্যে।'

ঘর খোলা। ভিতরে রণেন আছে?

আছে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই। স্বতঃ-সিদ্ধের মত ঢুকে পড়ল মৃদুলা। দরজায় খিল চাপাল। যেন আততায়ী তাড়া করেছে ছুরি হাতে তেমনি ভয়ার্ত চেহারা।

'একি, এত রাত্রে? এই ভাবে?' ছায়ার মত মুখে বললে রণেন।

স্বামী অভেদানন্দের নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল !

## VEDANTA PHILOSOPHY

ইংরেজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হুইলার হলে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন অধ্যাপক হাউইসন, অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস, অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস প্রমুখ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ অধ্যাপকের সামনে ফিলজফিক্যাল ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাটি দেওয়া হয়। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোফিল্ম ক'রে এই বক্তৃতা আনিয়ে ছাপা হ'ল। হুইলার হল, অধ্যাপক হাউইসন, রয়েস, জেমস ও স্বামী অভেদানন্দের ছবি এতে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মাইক্রো-ফিলম প্রিণ্টের একটি ফটোও এতে দেওয়া হ'ল। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও সুদৃশ্য মলাটযুক্ত। মূল্য ঃ তিন টাকা।

### স্বামী অভেদানন্দ রচিত গ্রন্থাবলী

**মরণের পারে ঃ** লোকান্তরে সূক্ষ্মশরীরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে—ইহাই স্বামিজীর প্রতিপাদ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে। বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

**পুনর্জ্জন্মবাদ ঃ** বৈজ্ঞানিকের সূতীক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসা এবং যোগীর উপলব্ধি এই উভয় দিক হইতে বিচার তত্ত্বদর্শী স্বামিজী 'আত্মার অস্তিত্ব' ও 'অমরত্বের' কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য ঃ দুই টাকা।

**হিন্দুনারী ঃ** শিক্ষা—ধর্মে ও বেদে নারীজাতির অধিকার এবং বর্তমান যুগে নারীশিক্ষা কি প্রকার হওয়া উচিত স্বামিজী তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ঃ আড়াই টাকা।

**ভারতীয় সংস্কৃতি ঃ** ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, সকল-কিছুর খুঁটিনাটীর বিবরণ। তৃতীয় নূতন সংস্করণ। মূল্য ঃ ছয় টাকা।

**যোগশিক্ষা ঃ** যোগ কি, হঠ-যোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তি-যোগ, জ্ঞানযোগ এবং বিশেষ করিয়া প্রাণায়াম-প্রণালী বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ঃ দুই টাকা।

**আত্মজ্ঞান ঃ** অমরত্ব ও আত্মা—প্রাণ প্রজ্ঞা ও জড় ও চৈতন্য—উপনিষদের যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র ও বিরোচন—আত্মতত্ত্ব বিচার—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ—আধ্যাত্মিকতা ও সর্বোপরি আত্মানুভূতির স্বরূপ কি—এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ঃ দুই টাকা।

**আত্মবিকাশ ঃ** সরল ও সাবলীল ভাষায় আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ঃ এক টাকা।

**স্বামী বিবেকানন্দ ঃ** বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবদীপ্ত ও বিস্ময়কর কর্মময় জীবনের প্রাণস্পর্শী বর্ণনা। মূল্য ঃ আট আনা মাত্র।

॥ স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত ॥

**শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত ঃ**

সহজ সরল ভাষায় সুন্দরভাবে বর্ণিত ঠাকুরের সম্পূর্ণ প্রামাণ্য জীবনী। মূল্য ঃ দুই টাকা।

॥ স্বামী বেদানন্দ প্রণীত ॥

**বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ**

বাংলাদেশের ধর্ম সাধনা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বৈজ্ঞানিক মনীষা, সমাজজীবন প্রভৃতি ঐতিহাসিক বর্ণনা। মূল্য ঃ দুই টাকা।

॥ শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥

**সারদামণি**

সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমায়ের সম্পূর্ণ জীবনী। মূল্য ঃ ১·২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও প্রমুখ সন্তানদের সম্বন্ধীয় ও রচিত পুস্তকাবলী আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

**কর্মবিজ্ঞান ঃ** কি প্রণালীতে কর্ম করিলে মানুষ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে এই রহস্যই লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য ঃ দুই টাকা।

**মনের বিচিত্র রূপ ঃ** মনের সকল গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া শান্তি লাভের সন্ধান আছে গ্রন্থটিতে। মূল্য ঃ আড়াই টাকা।

**ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ঃ** পার্থিব ও অপার্থিব ভালবাসার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে এই বইটিতে। মূল্য ঃ এক টাকা।

**স্তোত্র-রত্নাকর ঃ** শাস্ত্রসংগত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমা ও শ্রীগুরুর দৈনিক ও বিশেষ পূজা-পদ্ধতি এবং হোম সহ। পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ঃ দুই টাকা।

**কাশ্মীর ও তিব্বত ঃ** স্বামিজীর কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ—তিব্বতের হিমিসমঠ দর্শন—লামাদের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম-মতের আলোচনা—হিমিস মঠে গুপ্তভাবে রক্ষিত যীশুখৃষ্টের অজ্ঞাত জীবনের পাণ্ডুলিপি হইতে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ঃঃঃ পাঁচ টাকা।

বাহির হইল ! নূতন পুস্তক

### ॥ মন ও মানুষ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের ঘটনা ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। স্বামী অভেদানন্দের জীবনী, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিচিত্র চিন্তাধারার সমাবেশ। বিভিন্ন ছবি সংবলিত ৪৫০ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের বই। ॥ মূল্য ঃ সাত টাকা ॥

অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ

### রাগ ও রূপ ঃ সংগীত ও সংস্কৃতি ঃ শ্রীদুর্গা

**রাগ ও রূপ** (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রাগ - রাগিণীদের প্রাচীন ও বর্তমান রূপের বিস্তৃত পরিচয়।

**ধ্যান ও রাগমালা** চিত্র সংবলিত। মূল্য ঃ ৭·৫০

**অভেদানন্দ দর্শন** ৮·০০

**তীর্থরেণু** ৩·৫০

**সংগীত সার সংগ্রহ** ৭·৫০

**সংগীত ও সংস্কৃতি** (ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস) ॥ পূর্বার্ধ ॥ বৈদিক যুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ছবি ও গ্রন্থপঞ্জী সম্বলিত। ॥ উত্তরার্ধ ॥ ক্লাসিক্যাল যুগ। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত। আড়াই শতাধিক চিত্র সংবলিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য — ৭·৫০

**শ্রীদুর্গা** এই ধরণের দেবী দুর্গার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ও তুলনা-মূলকভাবে বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ বই ইতঃপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। 'অবতরণিকা'-য় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 'শ্রীদুর্গা' সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হইতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বহু ভাস্কর্য-চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট সম্বলিত। মূল্য ঃ সাড়ে তিন টাকা

Philosophy of Progress And Perfection Rs. 8.00

## শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

# সন্ধ্যারাগ

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
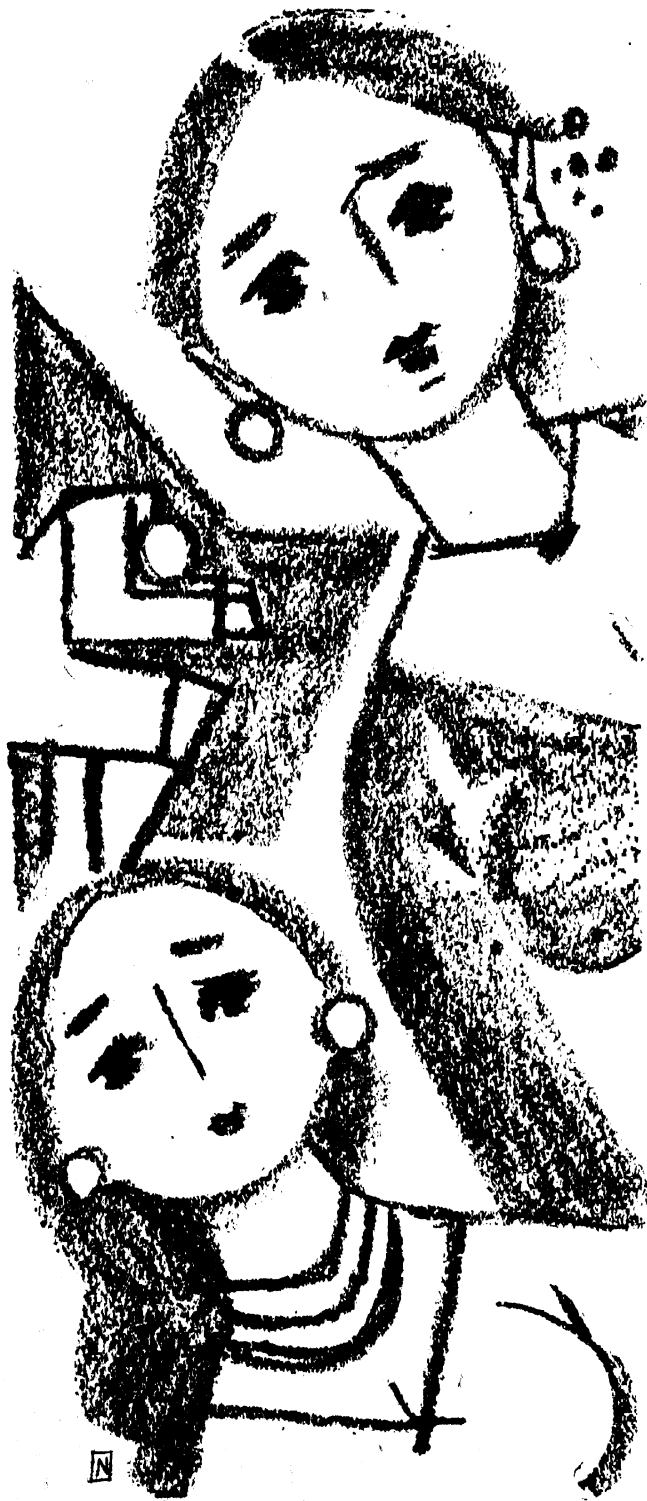
জেলের ফটক হন হন করে পার হয়ে এসেই রোহিণী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একখানা ট্রাম তার সামনে দিয়ে ঘড় ঘড় করে চলে গেল। পিছনে চেয়ে দেখলে, জেলের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে।

রোহিণীর পরনে একখানা নতুন ধুতি। গায়ে শার্ট। শার্টটার জন্যে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু ধুতিটা ঠিক সামলাতে পারছে বলে ভরসা হচ্ছে না। এরই মধ্যে কখনও কোঁচার দিক, কখনও কাছার দিক আলগা হয়ে আসছে। আট বৎসরের অনভ্যাস। জেলের মধ্যে আট বৎসর ধুতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। জেলের মোটা কাপড়ের তৈরি হাফ-প্যাণ্ট পরেই কাটিয়েছে।

পিছনে চেয়ে দেখলে, আট বৎসর—লাল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যে বাড়িটার ফটক এইমাত্র তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল, সেই বাড়িটাতে তার জীবনের আটটা বৎসর কেটেছে। অথচ তার উপর বিন্দুমাত্র মমতা জাগেনি। আট বছর আগে এই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে যেমন অপরিচিত, রহস্যময় এবং ভয়ংকর ঠেকেছিল, আজও ঠিক তেমনি লাগছে! ভাবতেই পারছে না, ওর ভিতর আট বৎসর সে কাটিয়েছে।

মনে হচ্ছে, বর্ষণস্নাত এই রহস্যময় অপরাহ্ণে দাঁড়িয়ে সে যেন স্বপ্ন দেখছে। আট বৎসর কেন, আটটি মুহূর্তও সে কোনো কালে ওর মধ্যে কাটায়নি। দৈত্যের মতো ভয়ংকর এই বাড়িটার সঙ্গে তার জীবনের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই।

তবু এই অপরিচিত বাড়িটার দিকেই রোহিণী কিছুক্ষণ মুহ্যমানের মতো চেয়ে রইল। কেন কে জানে।

আর একখানা ট্রাম।

কিন্তু ওটা আর ধরা যাবে না। রোহিণী আর একটু এগিয়ে ট্রাম-স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল।

দেখতে দেখতে আর কটি লোক সেই-খানে এসে দাঁড়াল। চমৎকার স্যুট-পরা একটি ছোকরা। সতেজ শাল-শিশুর মতো ঋজু। তার পাশে একটি বৃদ্ধ। নিজে যেমন জীর্ণ, জামা-কাপড়ও তেমনি। এসে দাঁড়িয়ে একবার দেখবার চেষ্টা করলে ট্রামটা কত দূরে। তারপর চোখের চশমাটা খুলে পাঞ্জাবীর ঝুলটা দিয়ে পরিষ্কার করে আবার চোখে দিলে। তার পাশে ছোট কাপড়

এবং ছোট হাফ-শার্ট-পরা একটি ছোকরা। বোধ হয় কাছাকাছি কোনো বাড়ির ভৃত্য। তার পাশে......

রোহিণী প্রত্যেকের দিকে মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখলে। যেন অনেক দিন স্বাভাবিক মানুষ দেখেনি। কিন্তু পিছনের লাল বাড়িটার মতো এই প্রাণী কটিও তার নিতান্ত অপরিচিত।

চারিদিকে আড়ে আড়ে চায় রোহিণী। সবই আশ্চর্য, সবই অদ্ভুত, সবই অপরিচিত ঠেকে। আড়ে আড়ে চায়, যেন চাইতে সাহস হয় না।

একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। সকলে উঠল, তার পিছু পিছু সেও। গাড়ি ছেড়ে দিতে কণ্ডাক্টর এসে যখন টিকিট চাইলে, তখন সে হতভম্বের মতো তার দিকে চাইলে।

তাই তো! কোথায় যাবে সেইটেই তো চিন্তা করা হয়নি!

জিজ্ঞাসা করলে, ট্রামটা কোথায় যাচ্ছে?

—কালীঘাট।

না কালীঘাট নয়। কালীঘাটের দিকে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওদিকে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে বললে, না, না। কালিঘাট নয়, রোককে, রোককে।

ট্রাম থামতেই নেমে পড়ল।

কণ্ডাক্টর হেসে বললে, দেখবেন কর্তা! পড়ে যাবেন না যেন।

রোহিণীর ভাব-গতিক দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছিল। দেহাতী লোক। কলকাতা বেড়াতে এসেছে।

হাজরা পার্কের কাছে।

না, কালীঘাট নয়। কিন্তু কোথায়?

সেই কথা সুস্থির চিত্তে ভাববার জন্যে রোহিণী পার্কের একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে বসল। হ্যাঁ, অন্ধকারই ভালো। আলো যেন সে সইতে পারছিল না।

সেই অন্ধকারে প্রথমেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার পৈতৃক বাড়ি। ভবানীপুরের সেই অনতিপ্রশস্ত রাস্তা যেখানে পার্কটার কাছ থেকে বেঁকেছে সেইখানে ফিকে হলুদে রঙের সেই ছোট্ট অথচ সুন্দর দোতলা বাড়িটা। জন্ম থেকে ওই লাল ভয়ংকর বাড়িটার পেটের মধ্যে ঢোকবার আগে পর্যন্ত জীবনটা কেটেছে।

রোহিণী চমকে উঠল: জীবন কি তাহলে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা নয়? খণ্ড খণ্ড কুঠুরিতে বিভক্ত? একটা থেকে আর একটা অংশ দেয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন?

তা সে যাই হোক, সেই বাড়িটা। বাপ-মার মৃত্যুর খবর সে জেলে থাকতেই পেয়েছিল। এখন সেখানে কে আছে কে জানে। সম্ভবত সুচিত্রা একাই।

কিন্তু এই সুদ আট বৎসর কাল ওই বাড়িতে একা থাকা কি সম্ভব? থাকতে পারে, যদি তার বাপ-মা সঙ্গে এসে থাকেন।

এই সুচিত্রা, রোহিণী ভাবতে লাগল, অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা, কোনো দিন তার সঙ্গে বনল না। বিয়ের পর থেকে জেলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একটা দিনও না।

তখন সে সুচিত্রার উপরই রাগ করত। সমস্ত দোষ তারই ঘাড়ে চাপাত। সে অসহিষ্ণু, সে অনুদার, ঈর্ষাপরায়ণ, সংকীর্ণচিত্ত। কিছুতেই বুঝল না যে, মীনাকে ছাড়া রোহিণীর পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। তাকে সে প্রবঞ্চনা করেনি। গোড়াতেই নিজের জীবনের সমস্ত কথা বলেছে। কিন্তু সেই যে ঘাড় বেঁকিয়ে রইল, কিছুতেই তাকে নোয়ানো গেল না।

—এই যদি তোমার মনে ছিল, তাহলে আমাকে বিয়ে করলে কেন?

সত্যি। কিন্তু কেন যে তাকে বিয়ে করলে তা আজও রোহিণীর কাছে স্পষ্ট নয়। কৈফিয়ৎ তার হাতে অনেক আছে। কিন্তু রোহিণী নিজের মনেই জানে তার একটাও যুক্তিসহ নয়।

মীনার সঙ্গে তার ভালোবাসা আজকের নয়। রোহিণীর মনে হয়, এ ভালোবাসা এক জীবনেরও নয়। সামাজিক কারণে এই ভালোবাসাই রোহিণীর বাপমায়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপরে, কি করে যে কি হল তা আজও রোহিণীর হেঁয়ালি বলেই বোধ হয়, সুচিত্রা এল তাদের বাড়ি বাজনা বাজিয়ে ধুমধাম করে। দরিদ্রের সুন্দরী মেয়ে, ঘর পেয়ে বাঁচল।

কিন্তু ঘর পেয়েই সে সন্তুষ্ট হল না। হাত বাড়াল রোহিণীর দিকে। কিন্তু রোহিণী তখন কোথায়? তার নিজের নাগালেরও বাইরে। মনের উপর রোহিণীর শাসন চলল না।

দিন কতক সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। বাইরে বাইরে। কোনোদিন ফেরে, কোনোদিন ফেরে না। এইরকম অবস্থা।

বৎসরখানেক এই রকম চলার পরে রোহিণীর বাপ-মাও ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলেন, ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে কাজটা ভালো করেননি। সামাজিক গোঁড়ামি তো ছেলের জীবনের চেয়ে বড় নয়।

সেদিনটা যেন রোহিণীর চোখের সামনে ছবির মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল:

অনেক দিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসে রোহিণী দেখলে, বাপ শয্যাগত। (সেই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হয়েছিল)।

রোহিণীকে তিনি কাছে ডাকলেন। অনুতপ্ত দৃষ্টিতে কী করুণ বিষণ্ণতা!

বললেন, আমাকে তুমি মাফ কোরো রোহিণী। আমি ভুল করেছি। সে ভুল সংশোধনের এখনও হয়তো উপায় আছে। আমি অনুমতি দিচ্ছি, মীনাকে তুমি বিয়ে করতে পার।

রোহিণী হেসে বলেছিল, বিয়ে করা কি এখন শুধু আপনাদের অনুমতির উপরই নির্ভর করে?

—তবে?

রোহিণী আবারও হেসেছিল, এবারে অনেকটা পাগলের মতো হাসি। বেশ রূঢ়ভাবেই উত্তর দিয়েছিল, যাকে এত ধুমধাম করে আনলেন তার অনুমতি চাই না?

বটে। কিছুটা অসুস্থতার জন্যে, কিছুটা পিতৃসুলভ স্বার্থপরতায়, সুচিত্রার কথা তার মনেই আসেনি। সুচিত্রার কথা উঠতে তিনি দমে গেলেন।

দমলেন না রোহিণীর মা। তিনি বললেন, সেও রাজি হবে। তোকে বাঁচাবার জন্যে যখন আমরা রাজি হতে পারছি, তখন বৌমাও নিশ্চয় রাজি হবে।

রোগশয্যাশায়ী বৃদ্ধের স্তিমিত চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল: তুমি বলছ বৌমা রাজি হবেন।

—নিশ্চয় রাজি হবে। সে ভার আমার উপর রইল।

রোহিণী কিরকম হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। সুচিত্রা এতে রাজি হবে, সুচিত্রা রাজি হতে পারে, এ তার চিন্তারও অতীত ছিল।

কিন্তু মা তাঁর কথা রেখেছিলেন। সুচিত্রা রাজি হয়েছিল। তাকে রাজি হতে হয়েছিল। পুত্রস্নেহাতুরা মাতার নিষ্ঠুরতা মাত্রা মানে না। সেই সীমাহীন নিষ্ঠুরতার সামনে দাঁড়িয়ে সুচিত্রার মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল: হয় সম্মতিদান, নয় মৃত্যু।

সুচিত্রা মরতে চায়নি। সম্মতি দিয়েছিল।

এত কথা রোহিণী জানে না। বোধ হয় সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। তাই সুচিত্রার মুখের সম্মতিই সে নিয়েছিল, সম্মতি দেবার যে ঘৃণা তার দুই চোখে আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল তা আর দেখেনি। সম্মতি পেয়েই সে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কোথায়?

মীনাদের বাড়ি।

এক বৎসর মীনাদের বাড়ি রোহিণী যায়নি। তার ধারে কাছেও না। তার মনের মধ্যেকার যে মীনা, তাকেই নিয়ে মহাদেবের মতো উন্মত্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। সুচিত্রার সম্মতি পেয়ে এক বৎসর পরে সেইখানে সে ছুটল।

তার ধারণা সমস্তই প্রস্তুত। শুধু তার উপস্থিতির অপেক্ষা মাত্র। সে গিয়ে পৌঁছুবে। মীনা তো রাজি হয়েই আছে। তার বাপ-মাও রাজি হয়ে যাবেন। আধ

ঘণ্টার মধ্যে সে ট্যাক্সি করে মীনাকে নিয়ে এবাড়ি ফিরে আসবে।

মা নতুন পুত্রবধূকে, আসল পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুলবেন। শাঁখ বাজবে, হুলুধ্বনি হবে, যেমন হয়েছিল সুচিত্রার আসার সময়।

অথচ সুচিত্রার কথা মনেই হল। তার মনের সামনে যে ছবি, তার মধ্যে সুচিত্রা কোথাও নেই। সম্মতি দেওয়ার সংগে সংগে সুচিত্রা যেন হালকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তার আর কোনো অস্তিত্বই রইল না।

তার মনের ভিতরের জগতে এবং বাইরের জগতেও, মীনা। মীনা, শুধু মীনা। তার কেউ নয় এবং কিছুই নয়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

বড় রাস্তা পার হয়ে একটা গলি। সেখান থেকে আরও সরু একটা গলি।

কিন্তু সে সমস্ত কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। পথ তার মুখস্থ। চোখ বেঁধে দিলেও সে যেতে পারে।

সে চলছিল। ছুটছিল বললেই চলে। কিন্তু যাদুমন্ত্রে অভিভূত ব্যক্তি যেমন করে চলে তেমনি করে। আজকে এই সন্ধ্যায় হাজরা পার্কে বসে এই চলাটা সে স্মরণ করতে পারলে না। চেষ্টা করেও না।

কিন্তু সে চলেছিল।

বাড়ি থেকে বড় রাস্তায়, সেখান থেকে একটা গলিতে, সেখান থেকে আরও সরু একটা গলিতে। সেখানে মীনাদের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

সামনেই আলোরমালা। মীনাদের বাড়ির সামনেই। আর বাইরের রকে বাজছিল নহবৎ।

আলোকমালার কথা ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু সানাইএর সুর অনেক দিন পর্যন্ত শুনেছে। জেলে বসেও।

রোহিণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যাপারটা কি? এত আলো কিসের? কিসেরই বা বাজনা?

তার মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

এমন সময় মীনার বাবা কি করতে এদিকে এসে রোহিণীকে দেখেই চমকে উঠলেন। যেন ভূত দেখেছেন।

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন: এস বাবা, এস। মীনার বিয়ে, তুমি না এলে হয়! এস, ভিতরে এস।

বিয়ে! মীনার বিয়ে!

স্খলিত কণ্ঠে রোহিণী বললে, কিন্তু আমি যে নিতে এসেছিলাম।

—কোথায়?

—আমাদের বাড়ি।

ওর চোখ-মুখের ভাব, ওর কণ্ঠস্বর, ওর কম্পমান দেহ দেখে মীনার বাবার সন্দেহ হল, রোহিণী বোধ হয় সুস্থ নয়।

বললেন, বেশ তো। সে আর এমন কি! বিয়ে-থা হয়ে যাক, তারপর একদিন দুজনকেই নিয়ে যাবে। সে আর বেশি কথা কি!

ভদ্রলোক আরও একবার মিষ্টি করে হাসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসতে আর পারলেন না। রোহিণী হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে উঠল। তার মধ্যে কথাও কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কথাটা বড় নয়, বড় চীৎকারটা। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো চীৎকার।

এবং সেই চীৎকারের সম্মোহ ভাবটা কাটবার আগেই রোহিণী যে পথে এসেছিল, সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার রোহিণী ফিরে এসেছিল। তখনও আলো জ্বলছিল, নহবৎ বাজছিল। সেই আলো এবং বাজনার মধ্যে বহু লোক ছবির মতো ঘোরাফেরা করছিল।

তাদের দৈর্ঘ ছিল, প্রস্থ ছিল, কিন্তু বেধ ছিল না। ছবির মতো।

বর তখন ছাঁদনাতলায়।

অকস্মাৎ তার পিঠে আমূল বসে গেল রোহিণীর হাতের মস্ত বড় ছোরা।

প্রথমে একটা স্তব্ধতা। তারপরেই নারী এবং পুরুষের সমবেত কণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল। এবং উজ্জ্বল আলোর মধ্যে সেই আর্তনাদ যেন বায়ুতাড়িত হাওয়ার মতো ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল......

রোহিণী পালায়নি। পালাবার চেষ্টাও করেনি। ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

গত আট বৎসর কাজের অবসরে অথবা নিরিবিলি মুহূর্তে দুটি জোড়া চোখ রোহিণীর চোখের সামনে জেগেছে: এক-জোড়া মীনার, নৃত্য চঞ্চল যে চোখ দিয়ে রোহিণীকে সে নিত্য অভ্যর্থনা জানাত; অন্য জোড়া সুচিত্রার, বিষণ্ণ কিন্তু করুণ, কোমল এবং মিনতিভরা।

হাজরা পার্কের অন্ধকার কোণে রোহিণীর সামনে সেই দুজোড়া চোখ আবার ভেসে উঠল।

কোথায় যাবে সে?

মীনাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। তার স্বামী মারা যায়নি। চিকিৎসার পরে বেঁচে উঠেছিল। বিচার চলতে চলতেই একথা সে জেনে গিয়েছিল। জানতে ইচ্ছা করে সে কেমন আছে।

বেচারা মীনা। রোহিণী-অন্ত প্রাণ। মনে পড়ে, রোহিণীর বিয়ের খবর শুনে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। পারেনি। কিন্তু চেষ্টা করেছিল অনেকবার।

আহা! রোহিণীর মনে সন্দেহ নেই, আজও যদি সে বেঁচে থাকে, বড় দুঃখেই বেঁচে আছে। তাকে একবার সে দেখতে চায়। কোনো সুযোগে একবার বলে যাওয়া দরকার যে, সে নিজেও সুখে নেই।

বাড়িটা চেনে না বটে, কিন্তু বিচার চলবার সময় ওর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা জানতে পেরেছিল। মনে আছে এই জন্যে যে, ওর একটি বন্ধুর বাড়ি ওই রাস্তাতেই ৩৫ নম্বর। আর মীনার শ্বশুরবাড়ি ঠিক তার উল্টো নম্বরে, ৫৩।

সুতরাং বাড়িটা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

দরিদ্রের সংসার। ছোট দোতলা একটা বাড়ির একতলায়, বোধ হয়, ভাড়া আছে।

রাস্তার দিকের জানালায় পর্দা দেওয়া। বোধ হয় আব্রু রক্ষার জন্যে। কিন্তু আব্রু ঠিক থাকেনি। মলিন, ছেঁড়া পর্দা। লক্ষ্য করলে রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

ভিতরের দেওয়াল মলিন। ঘরের প্রায় সমস্তটা জুড়েই খান দুই তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা। তারও উপরকার চাদর দেওয়ালের মতই মলিন এবং জীর্ণ।

সেই মলিন বিছানায় ততোধিক মলিন কয়েকটি বালিশে ঠেস দিয়ে একটি পুরুষ আড় হয়ে শুয়ে। অনুমানে রোহিণী বুঝল, মীনার স্বামী।

অনুমান করতে কিছুই কষ্ট হল না। কারণ বিছানার পা-তলার দিকে মীনা পা ঝুলিয়ে বসে। তার দুই হাঁটুর মধ্যে একটি ছোট মেয়ে।

সেই মীনা। কিন্তু অনেকটা রোগা হয়ে গেছে।

রোহিণীর মনটা আনন্দে দুলে উঠল: রোগা হবে না! মন কি ভালো আছে? তাকে একটা দিন না দেখে যে থাকতে পারত না, সে যে বেঁচে আছে, এই তো যথেষ্ট।

সহানুভূতিতে ওর মন ভরে গেল। আহা!

—আপিস থেকে ফিরতে দেরি কর কেন?

—কেন, কি হয় তাতে?

—জান না, কত ব্যস্ত হই? এই বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত বুঝতে পারে, আর তুমি বুঝতে পার না?

—না।

খুশিতে পুরুষটির চোখ ঝলমল করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মীনার চোখের তারাও নেচে উঠল: আহা!

রোহিণী কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে। তার চোখে যেন পলক পড়ছে না।

মীনার চোখের তারা নাচল। অবিকল তেমনি করে যেমন করে একদিন তাকে দেখলে দেখলে নাচত: এতক্ষণে এলে! আসতে পারলে! আমি কখন থেকে ঘর আর বার করছি......

অকস্মাৎ রোহিণীর মনে হল, সে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সমস্ত অন্ধকার বোধ হচ্ছে। কোনোমতে টলতে টলতে ট্রাম-রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

পরের পর কখানা ট্রামই তার সামনে এসে থামল আবার চলে গেল। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একখানা ট্রামে উঠল।

পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনার কি শেষ আছে! কত অসম্ভব ঘটনা আমাদের চোখের সামনে অহরহ ঘটছে! সে যে একদিন খুন করতে গিয়েছিল সেই কি কম অসম্ভব। ভট্চাযপাড়ার দত্ত-বাড়ির ছেলে হয়ে খুনের দায়ে লম্বা মেয়াদ খেটে এল, সেও আর এক অসম্ভব।

অজ্ঞাতসারেই রোহিণীর মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল: উঃ!

তার বেঞ্চের সহযাত্রী ভদ্রলোক হেসে ফেললেন: আর বলবেন না মশাই! ছারপোকার উৎপাতে ট্রামে চড়া দায় হয়ে উঠেছে।

ছারপোকা! রোহিণী প্রথমে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সহযাত্রীর মুখের দিকে চাইলে। তারপরে ব্যাপারটা বুঝে একটু হাসলে। হেসে যেন কিছুটা সহজ হল।

সুচিত্রার সেই বিষণ্ণ, করুণ, মিনতিভরা চোখ!

আহা, বেচারা! অনেক কষ্ট এই ক'বছরে পেয়েছে। মীনা সুখে থাক। তার সুখে রোহিণী হিংসা করে না। তার জীবনে শুধু একটি কাজ রইল: সুচিত্রার সমস্ত দুঃখ দূর করা, তাকে সুখী করা। ভগবান, তাকে তুমি সুখী কর।

ট্রাম থেকে নেমে রোহিণী নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

কী শ্রী হয়েছে বাড়ির! চেনা যায় না। নিচে কারা যেন কথা বলছে না? ওরা কারা? একতলায় ভাড়া আছে?

—শুনছেন! —গলায় জোর এনে রোহিণী হাঁক দিলে।

—কে গা? কাকে চান?

একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক আড়াল থেকে মোটা গলায় উত্তর দিলে।

—কাকে চাই? রোহিণী মনে মনে হেসে বললে।

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এবাড়িতে ইয়ে থাকেন?

—কে?

তবেই তো মুশকিল। কি বলা যায়?

রোহিণীর তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে স্ত্রীলোকটি নিজেই বললে যার বাড়ি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রোহিণী ধরবার মতো একটা অবলম্বন পেলে। বলতে গেলে বাড়ি তো তারই। রোহিণী আর সুচিত্রা কি ভিন্ন?

স্ত্রীলোকটি আরও সুনিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে, সেই যার স্বামী খুন করে জেলে গেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রোহিণীর কণ্ঠস্বর এই পরিচয়ে একটু দমে গেল।

—সে তো নেই।

—কোথায় গেছে?

—সে তো আজ ক'দিন হল ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠে গেছে।

—ছেলে-মেয়ে নিয়ে! কার কথা বলছ তুমি!

—সেই তারই কথাই তো বলছি গো, যার বাড়ি।

—তার আবার ছেলে-পুলে কি গো!

স্ত্রীলোকটি এবারে ঝংকার দিলে: তা হবে না গা? সে মুখপোড়া মিনসে কি আর ফিরবে?

তা বটে! ফেরার কথা নয়। ফেরার আশাও করা যায় না। কিন্তু তা হলে উঠে গেল কেন? হয় তো খবর পেয়েছে, রোহিণী ফিরছে। খবর রেখেছে নিশ্চয়ই।

রোহিণীর উপর স্ত্রীলোকটির বোধ হয় দয়া হল।

জিজ্ঞাসা করলে, তাকে কি খুব দরকার? গিন্নি-মার কাছে ঠিকানা রেখে গেছে কিন্তু।

রোহিণী তাড়াতাড়ি বললে, না, না। ঠিকানার দরকার নেই। এমনি খবর নিতে এসেছিলাম।

রোহিণী ফিরে চলল ট্রাম-রাস্তার দিকে। ঠিকানা কি হবে? কারও ঠিকানারই দরকার নেই তার। মীনারও না, সুচিত্রারও না। ওরা সুখী হোক, শুধু ওরা সুখী হোক!

রোহিণীর মনে হল, তার দেহটা আছে বটে কিন্তু তার ভার নেই। পালকের মতো হালকা। সেটা যে আছে তা টের পেলে যখন হঠাৎ খেয়াল হল নতুন জুতোয় পা কেটে গেছে।

সে হেট হয়ে জুতো খুলে বগলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

# বিচিত্র সংলাপ

## আকবর ॥ ওয়ারেন হেস্টিংস

### প্রমথনাথ বিশী

**ওয়ারেন হেস্টিংস** ॥ আজকে তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে কৃতার্থ হলাম আকবর বাদশা।

**আকবর** ॥ আমিও। অনেকদিন থেকে তোমার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছি, গৌরববোধ করেছি।

**ওয়ারেন হেস্টিংস** ॥ তোমার মুখে এমন প্রশংসা সমস্ত প্রশংসাপত্রের চেয়ে বড়।

**আকবর** ॥ এমন কথা কেন বলছ?

**ওয়ারেন হেস্টিংস** ॥ তোমার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপরেই নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

**আকবর** ॥ পেরেছ?

**ওয়ারেন হেস্টিংস** ॥ অন্তত সেইরকম ধারণা নিয়েই আজ এ দেশ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছি।

**আকবর** ॥ দেশে ফিরে সম্বর্ধনা লাভ করবে।

**হেস্টিংস** ॥ হয়তো তার বিপরীত।

**আকবর** ॥ কেন?

**হেস্টিংস** ॥ অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছি।

**আকবর** ॥ তবে সত্যই তুমি মহৎ কাজ করেছ—আমারও শত্রুর সংখ্যা কম ছিল না।

**হেস্টিংস** ॥ মিত্রের সংখ্যাও কম ছিল না।

**আকবর** ॥ শত্রুর সংখ্যাগৌরবেই যে রাজা বাদশার মাহাত্ম্য।

**হেস্টিংস** ॥ বাদশাহ, আমি রাজাও নই বাদশাও নই, সামান্য কর্মচারী মাত্র, বড়জোর উজীর বলতে পারো, দেশবাসীর প্রতিনিধি মাত্র। তুমিই সৌভাগ্যবান, তোমার প্রতিনিধি তুমি।

**আকবর** ॥ তৎসত্ত্বেও তুমি এমন অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছ যেমনটি আমার বংশধরদের মধ্যে অল্প লোকেই করেছে।

**হেস্টিংস** ॥ দেশে ফিরে গিয়ে হয়তো তারই জবাবদিহি করতে হবে।

**আকবর** ॥ সে কি রকম?

**হেস্টিংস** ॥ কৃতার্থতার দন্ড!

**আকবর** ॥ অকৃতজ্ঞ দেশ।

**হেস্টিংস** ॥ দেশ বিশেষের দোষ নয়, মানুষের এই হচ্ছে গিয়ে স্বভাব। তৈমুর বংশধরদের মধ্যে কোন বাদশা কি বিজয়ী সুবেদার কি সৈনাপতির দণ্ডবিধান করেনি?

**আকবর** ॥ করেছে। তার প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়েছে, কোথায় আজ তাদের রাজসিংহাসন।

**হেস্টিংস** ॥ কোন্ রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী?

**আকবর** ॥ তা বটে! আমার সিংহাসন লাভের পরে দুশো বছর পূর্ণ না হতেই তোমাদের পতাকা উড়লো লালকেল্লার শিরে, নির্বাসিত হল শেষ তৈমুর বংশীয় বাদশাহ।

**হেস্টিংস** ॥ পলাশীর যুদ্ধের পরে দুশো বছর কি পূর্ণ হবে কোম্পানীর শাসনের?

**আকবর** ॥ দুশো বছর অল্প সময় নয়, মানুষের প্রত্যক্ষ স্মৃতি কি ওর বাইরে যেতে পারে?

**হেস্টিংস** ॥ কিন্তু ইতিহাস?

**আকবর** ॥ এদেশের ইতিহাসে কোন্ সিংহাসন স্থায়ী হয়েছে দুশো বছরের অধিক।

**হেস্টিংস** ॥ সে কথা মিথ্যা নয়।

**আকবর** ॥ তবে আক্ষেপ কেন?

**হেস্টিংস** ॥ ইতিহাসের অধ্যায় যখন শেষ হয়ে যায় তখন তা একটি পূর্ণতা লাভ করে, সেই পূর্ণতাই সব আক্ষেপ ঘুচিয়ে দেয়। কিন্তু যখন সে অধ্যায় রচিত হচ্ছে তার অপূর্ণতা, ক্ষুদ্র ভুলত্রুটি, মনে দুঃখ না জাগিয়ে পারে না।

**আকবর** ॥ তবে ইতিহাসের পূর্ণ মূর্তিটি দেখতে চেষ্টা করো না কেন?

**হেস্টিংস** ॥ তোমার পক্ষে তা সম্ভব। অদৃষ্ট চূড়ান্ত দাঁড়ি টেনে দিয়েছে মোগল বাদশার ইতিহাসে। কোম্পানীর ইতিহাস যে এখনো রচিত হচ্ছে, পূর্ণতার চেয়ে তার ভুলত্রুটিগুলোই বড় হয়ে চোখে পড়ছে।

**আকবর** ॥ তবে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

**হেস্টিংস** ॥ আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত হলেও অপেক্ষা করবে না আমার শত্রুর দল, তারা সুযোগ গ্রহণ করবে ভুলত্রুটিগুলোর। বাদশাহ, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আজ আছি বাদশাহের সমতুল্য, দেশে ফিরে গিয়ে মিলিয়ে যেতে হবে ঐ অন্ধকারে।

**আকবর** ॥ কিন্তু তোমার সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তো এত শীঘ্র লোপ পাবে না।

**হেস্টিংস** ॥ সাম্রাজ্য আমার নয়, কোম্পানীর। আচ্ছা, বাদশাহ তোমার কাছে একটা রহস্যের মীমাংসা চাই। তুমি শুধু রাজনীতিজ্ঞ ছিলে না, ছিলে মনীষী পুরুষ। এদেশের রাজা বাদশাদের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই আধুনিক কালের মানুষ বলে মনে হয়েছে, মনে হয়েছে তুমি আমার সামনের কুর্শিখানায় বসে আছ, আমার মতিগতি সমস্তই যেন তুমি বুঝতে পারছ। জাহাঙ্গীর বলো, শাজাহান বলো, আলমগীর বলো—সকলেই কালের মাপে তোমার চেয়ে কাছে, তবু তারা মনের মাপে অনেক দূরের।

**আকবর** ॥ কি তোমার রহস্য যার মীমাংসা চাও আমার কাছে।

**হেস্টিংস** ॥ মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদে গড়ে উঠছে কোম্পানীর সাম্রাজ্য। সেই দেশ, সেই জনগণ, সেই সামন্ত, সিপাহী, সেই বিধি ব্যবস্থা, সেই আবহাওয়া, তবু কোথায় যেন গোড়া ঘেঁষে একটা মস্ত প্রভেদ আছে—কি সেটা?

**আকবর** ॥ মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ বাদশার অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আর তোমাদের নূতন সাম্রাজ্যের বনিয়াদ নিয়ন্ত্রিত সমষ্টিগত ইচ্ছা।

**হেস্টিংস** ॥ চমৎকার বলেছ, কিন্তু শেষোক্ত বস্তুটাকে কি আইন বলা চলে না?

**আকবর** ॥ ক্ষতি কি। আমরাও আইন বলেছি। কিন্তু শব্দের সাম্যে বস্তুর প্রকৃতি তো বদলায় না। আমার ইচ্ছাই ছিল তখনকার আইন, এখনকার আইন তোমাদের পাঁচজনের ইচ্ছা।

**হেস্টিংস** ॥ বাদশাহ, এ তোমার যোগ্য উত্তর। কিন্তু এতেও মীমাংসা হল না। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ!

**আকবর** ॥ রাজনীতিতে ভালো মন্দ বলে কিছু নেই, কার্যকারিতাই একমাত্র মাপকাঠি।

**হেস্টিংস** ॥ তবে যুগে যুগে মাপকাঠির বদল হয় কেন?

**আকবর** ॥ শুধু যুগে যুগে নয়, দেশে দেশে বদল হয়। এক দেশে যে মাপকাঠি চলে অন্য দেশে তা অচল, এক যুগে যে মাপকাঠি চলে অন্য যুগে তা অচল।

**হেস্টিংস** ॥ কেন এমন হয়?

**আকবর** ॥ তোমাদের দেশের কথা নিশ্চয় করে বলতে পারিনে। হয়তো তোমাদের দেশ আয়তনে ছোট বলে সহজেই সমষ্টিবোধটা তোমাদের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে, আর খুব সম্ভব সেইজন্যেই সমষ্টির ইচ্ছাকে স্বীকার করে নিতে তোমাদের বাধেনি। কিন্তু এই হিন্দুস্থানে আট কোটি মানুষ আছে, কিন্তু কোথাও তারা দানাবেঁধে সমষ্টিতে রূপ পায়নি। ভিতর থেকে এরা এক হয়ে ওঠেনি বলেই বাইরে থেকে কৃত্রিম উপায়ে এদের এক করতে হয়। যতক্ষণ কোন পরাক্রমশালী বাদশা বা সম্রাট এদের

মাথার উপরে থাকে ততক্ষণ এরা এক। কিন্তু তার—শাসনপাশ ছিন্ন হয়ে গেলেই এরা এড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে যায় দেশময়। এইজন্যেই হিন্দুস্থানের ইতিহাস কোন রাজতন্ত্রের ইতিহাস নয়, কতকগুলি রাজা বাদশার ইতিহাস মাত্র। এদেশে জন আছে কিন্তু জনগণ নেই। এদেশের ইতিহাসে অস্পষ্ট নীহারিকার মধ্যে যুগে যুগে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, আকবর। এই অস্পষ্ট নীহারিকাজাল নক্ষত্রের আকর্ষণ মানে, তার শাসন স্বীকার করে—অন্য কোন তন্ত্র তাদের ধারণার অতীত। সেইজন্যই শাসকের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই এদেশের একমাত্র রাজতন্ত্র।

**হেস্টিংস॥** আমাদের দেশেও এক সময়ে ছিল এই ধারা, তখন রাজার ইচ্ছাই ছিল রাজতন্ত্র। কিন্তু তার তো বদল হয়েছে, এদেশেই কেন বা না হবে?

**আকবর॥** হবে না এই জন্যেই যে, এদেশের ভূগোল তো বদলাবে না, এর আয়তন তো ছোট হবে না। এদেশে হাজার স্বার্থ, হাজার সম্প্রদায়, হাজার ধর্ম! এগুলো তো লোপ পাবে না। এরাই অন্তরায় সমষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠবার। শোনো হেস্টিংস, এসব বাধা দূর করতে চেষ্টা করিনি আমি। বিশ্বাসী মুসলমান হয়েও আমি হিন্দু রমণী বিয়ে করেছি; যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি হিন্দু রমণী। হিন্দু যোগ্য লোককে উচ্চ-পদে নিয়ে বসিয়েছি। তারপরে দেখলাম এ-ও যথেষ্ট নয়, তখন গেলাম আরো এগিয়ে। মুসলমান পীর ফকির উলেমাদের সঙ্গে একাসনে বসালাম খৃষ্টান, হিন্দু, জৈন, জোরোয়াস্ট্রিয়ান সাধু সন্ত পণ্ডিতদের। কখনো খৃষ্ট আর মেরীর কাহিনী শুনে তন্ময় হয়েছি, কখনো অগ্নি উপাসনা করেছি, কখনো হিন্দুর মতো তিলকফোঁটা কেটেছি—আর জৈনদের অহিংসাকে রাজ-শাসনের জোরে জবরদস্তির সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি।

**হেস্টিংস॥** এ কি ভণ্ডের আচরণ নয়?

**আকবর॥** হিন্দুস্থানের বাদশাকে শুধু মুসলমান হলে চলবে কেন? সে যে সব ধর্মের রক্ষক।

**হেস্টিংস॥** কিন্তু তা কি কৃত্রিম উপায়ে হবে?

**আকবর॥** আগেই তো বলেছি ভিতরে ভিতরে এরা এক হতে পারলো না বলেই বাইরে থেকে কৃত্রিম উপায়ে এদের এক করতে হয়। সে চেষ্টারও চরম করে ছেড়েছি—দীন এলাহি আমার নূতন ধর্ম, সব ধর্মের সমন্বয়।

**হেস্টিংস॥** নাম শুনেছি বটে।

**আকবর॥** ঐ নাম পর্যন্তই! যদি পাঁচশ বছর আগে জন্মাতাম তবে একটা নূতন ধর্মগুরু হয়ে স্বীকৃতি পেতাম। আমার যুগ তার অনুকূল ছিল না। আমার যেসব বন্ধুরা দীন এলাহি শুনে সম্মুখে দশায় মূর্ছা যেত আড়ালে তারাই করতো হাসাহাসি।

**হেস্টিংস॥** এত আকিঞ্চন কিসের জন্যে? বাদশাহ হয়ে উঠবার জন্যে? সে তো ছিলেই।

**আকবর॥** না ছিলাম না হেস্টিংস! ছিলাম বাদশাহ, হয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম হিন্দুস্থানের বাদশাহ। যে দেশের ইতিহাস রাজা বাদশাহের ইতিহাস, সেই দেশের বাদশাহ হয়ে উঠবার জন্য এই আকিঞ্চন।

**হেস্টিংস॥** কিন্তু কী তার পরিণাম?

**আকবর॥** সে কথা তো আগেই স্বীকার করেছি—পরিণাম ব্যর্থতা। যতদিন বাদশাহের বাহু প্রবল ছিল এ নীতি সফল হয়েছে, সে বাহু দুর্বল হয়ে পড়তেই সব একাকার। কৃত্রিম বন্ধন কখনো ছিন্ন হবে না এমন তো হতেই পারে না।

**হেস্টিংস॥** আমরা চেষ্টা করছি ভিতর থেকে বাঁধতে।

**আকবর॥** হাওয়াকে বাঁধতে পারা সম্ভব কি?

**হেস্টিংস॥** হাওয়াকে বাঁধবো কেন, নিয়ন্ত্রিত করবো।

**আকবর॥** কি দিয়ে?

**হেস্টিংস॥** আইন দিয়ে, যাকে তুমি বলেছ নিয়ন্ত্রিত সমষ্টিগত ইচ্ছা।

**আকবর॥** আইনের বন্ধনও কি কৃত্রিম নয়?

**হেস্টিংস॥** অন্তত রাজা বাদশার ব্যক্তিগত খেয়ালের চেয়ে কম কৃত্রিম।

**আকবর॥** আগেই তো বলেছি কৃত্রিম কি অকৃত্রিম নির্ভর করছে যুগোপযোগিতার উপরে, দেশোপযোগিতার উপরে।

**হেস্টিংস॥** কে বলল আইনের শাসন এদেশের উপযোগী হবে না?

**আকবর॥** এ দেশের ইতিহাস।

**হেস্টিংস॥** এ দেশের ইতিহাস তো শেষ হয়ে যায়নি।

**আকবর॥** আরম্ভ তো হয়েছে। সূচনায় যে উপাদান ছিল না উপসংহারে তার আবির্ভাব কেমন করে সম্ভব?

**হেস্টিংস॥** সম্ভব না হলে সূচনা আর উপসংহার দুটো ভিন্ন অংশ হতো না।

**আকবর॥** তবে বলি, যতদিন তোমাদের কোম্পানী প্রবল থাকবে কোম্পানীর প্রবর্তিত আইনও থাকবে প্রবল। কোম্পানী দুর্বল হয়ে পড়লে বা অপসৃত হলে তার আইনের বালির বাঁধ সঙ্গে সঙ্গে পড়বে ভেঙে। কোম্পানীর আইন এদেশের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হবে না, কোম্পানীর চাপরাশের মতো বুকে বাঁধা থাকবে মাত্র।

**হেস্টিংস॥** এখনো প্রমাণ হওয়া বাকি আছে।

**আকবর॥** সহস্রবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এ দেশের ইতিহাস। তোমাদের আইনের শাসনের চেয়ে আমার খেয়ালের শাসনকেই এ দেশ বেশি আপন মনে করেছিল।

**হেস্টিংস॥** প্রমাণ?

**আকবর॥** প্রমাণ! মোগল আমলকে এদেশ কখনো পরাধীনতা মনে করেনি, তোমাদের আমলকে করবে।

**হেস্টিংস॥** তার কারণ এদেশে আমরা স্থায়ী হয়ে বসিনি।

**আকবর॥** সেটা কারণ নয় কারণের অনুষঙ্গ মাত্র, আইনের শাসন এদেশের প্রকৃতির অনুকূল নয় বলেই এদেশ কখনো তোমাদের আপন মনে করবে না।

**হেস্টিংস॥** সেটাই তো মস্ত রাজনৈতিক বিস্ময়। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান কি অপরিসীম দুর্গতির মধ্যে! জাঠ মারাঠা শিখ আফগানে মিলে গজকচ্ছপের লড়াই চলেছে। অন্ধবাদশা সাধারণ মানুষের চেয়েও দুর্গত, সাধারণ মানুষ জনপদ ছেড়ে অরণ্যে আশ্রয় সন্ধান করে; আততায়ীর অস্ত্রের চেয়ে শ্বাপদের নখর অনেক বেশি নিরাপদ। এমন সময়ে এলাম আমরা। ভূপতিত হিন্দুস্থানের মুকুট তুলে নিলাম তলোয়ারের ডগায়। তবু তুমি আপন, আমরা পর।

**আকবর॥** আর তোমরা এদেশকে কোন্ দুর্গতির মধ্যে ছেড়ে যাবে যদি ভাবতে পারতে। না তখন আর নাদির শা আসবে না, আহমদ শা আবদালি বারে বারে হানা দেবে না, তখন আর জাঠে মারাঠায় আফগানে শিখে হুটোপাটি চলবে না সত্য! কিন্তু বিপদ কি ওতেই কেবল সীমাবদ্ধ! বাইরে থেকে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে ঘর জ্বলে যেতে পারে সত্য কিন্তু আর কোন ভয় নেই কি?

**হেস্টিংস॥** আর কি ভয় হতে পারে জানি না।

**আকবর॥** বাইরে থেকে আফগান, পাঠান, তুর্ক এসে আর আক্রমণ করবে না হিন্দুস্থান, সেই স্থূল বর্বরতার দিন চলে গিয়েছে সত্য কিন্তু।

**হেস্টিংস॥** কিন্তু কি?

**আকবর॥** এবারে জেগে উঠবে আভ্যন্তরীণ বর্বরতা।

**হেস্টিংস॥** আভ্যন্তরীণ বর্বর! কোথায় আছে সে?

**আকবর॥** আভ্যন্তরীণ বর্বর অভ্যন্তরেই আছে, তবে ঘুমিয়ে আছে তাই জানতে পারছ না।

**হেস্টিংস॥** তোমার সময়ে কি ছিল?

**আকবর॥** ছিল বই কি, কিন্তু বাইরের বর্বরের ভয়ে আত্মপ্রচ্ছন্ন করে ছিল।

**হেস্টিংস॥** আমাদের সময়ে?

**আকবর॥** কোম্পানীর বাহুবলের ভয়ে সুপ্তপ্রায় হয়ে আছে। যখন সেই বাহুবল অপসারিত হবে তখন জেগে উঠবে

অরাজকতার সিংহাসনে আভ্যন্তরীণ বর্বর। ভেদবুদ্ধি হচ্ছে তার অসি, স্বার্থ হচ্ছে তার ধর্ম, ক্ষুদ্র বুদ্ধি হচ্ছে তার বর্শা। তখন সেই বহুরাজক অরাজকতার দিনে যেখানে যত ক্ষুদ্র স্বার্থ আছে, যেখানে যত ভেদবুদ্ধি আছে, যেখানে যত গুণ্ডামি আছে সমস্ত বেরিয়ে আসবে সব। তখন ভাষা নিয়ে, খালের জল নিয়ে, সুবাধ সীমান্ত নিয়ে, ক্ষেতের আল নিয়ে, চাকুরির ভাগ নিয়ে কাটাকাটি হানহানি শুরু হয়ে যাবে! তখন হেন গালাগালি নেই যা পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত না হবে, হেন অভিসন্ধি নেই যা পরস্পরের প্রতি আরোপিত না হবে, হেন কার্য নেই যা পরস্পরের দ্বারা কৃত বলে না বিশ্বাসিত হবে। সেদিনের অরাজকতার তুলনায় নাদির শা, আহমদ শা আর কী করেছে। হেস্টিংস, তোমার শাসনও ব্যর্থ, অমার শাসনও ব্যর্থ।

**হেস্টিংস॥** তবে তোমার সান্ত্বনা কোথায়?

**আকবর॥** সান্ত্বনা এই যে, সমস্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাদশাহী খেয়ালকে ওরা বোঝে, ওদের কাছে অবোধ্য তোমাদের নৈর্ব্যক্তিক আইন। ব্যর্থ আমিও, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমিই ওদের আপন। তৈমুর বংশীয়দের কেউ কেউ যত অত্যাচার করেছে ওদের উপরে তোমরা তা করনি সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তোমরা রয়ে গেলে ওদের বাইরের ঘরে। জানো তো এ হিন্দুস্থান পৌত্তলিক, এদের দেবতাও ব্যক্তি, এদের শাসকও ব্যক্তি, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। তোমাদের কেতাবী শাসন এদের দুর্বোধ্য! তোমার মাপকাঠি ব্যর্থতা সার্থকতা, আর আমার মাপকাঠি আপন পর। দুজনের মাপকাঠির প্রকৃতি থেকেই দুই শাসনের প্রকৃতি ভেদ বুঝতে পারা যাবে।

**হেস্টিংস॥** তবে কি এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার?

**আকবর॥** অন্ধকার নয়, আলো-আঁধার।

**হেস্টিংস॥** বুঝিয়ে বলো।

**আকবর॥** রাজনীতির ক্ষেত্রে এদেশ চির অরাজক, হাজার বছরের ইতিহাসের শিক্ষা এদেশ গ্রহণ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না।

**হেস্টিংস॥** একেই তো বলি অন্ধকার।

**আকবর॥** আলোও আছে। রাজনীতির বাইরে যে অংশ সেখানে কবি কবিতা লিখছে, শিল্পী ছবি আঁকছে, মূর্তি তৈরি হচ্ছে, পণ্ডিতে শাস্ত্র চর্চা করছে—সেখানে এদেশের আত্মার জ্যোতি। এ সত্য প্রাচীনরা জানতো তাই মুসলমান আগমনের আগেকার হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিত হয়নি। ভালোই হয়েছে অন্ধকারের ইতিহাসে কার কি প্রয়োজন?

**হেস্টিংস॥** এযে নূতন কথা।

**আকবর॥** আদৌ নূতন নয় অতিশয় পুরাতন, যা এতক্ষণ তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, এদেশ ব্যক্তিকে বোঝে, ব্যক্তির শাসনকে বোঝে। কিন্তু ব্যক্তির চরম প্রকাশ রাজনীতিতে নয়, আত্মার ক্ষেত্রে সেখানে যোগী যোগ করছে, সাধক সাধনা করছে, কবি চিত্রী শিল্পী সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত আছে। হিন্দুস্থানের সেই আত্মার ক্ষেত্র আমি আবিষ্কার করেছিলাম; কিন্তু পরবর্তীদের অবজ্ঞায় আবার তা হারিয়ে গেল তোমার কি চোখে পড়েনি সেই আত্মার ক্ষেত্র?

**হেস্টিংস॥** পড়েছিল, কিছুটা আবিষ্কার করেওছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সময় এলো ফুরিয়ে, জানি না পরবর্তীরা কি করবে।

**আকবর॥** কিন্তু এটুকু জেনো সেই আবিষ্কারের গৌরবের উপরেই তোমাদের শাসনের ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব নির্ভর করবে, আর কোন পন্থা নেই এদেশে স্থায়িত্ব লাভের! সেকেন্দার শার অভিযানের স্মৃতি এদেশের মন থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে লোপ পায়নি জীর্ণ তালপাতায় লিখিত পুরাণগুলি। স্থায়িত্বের সেই পন্থা অনুসরণ করেছ কি?

**হেস্টিংস॥** চেষ্টা করেছিলাম।

**আকবর॥** তবে আর কি বিদায় কালে ঐ সান্ত্বনাটুকুই হোক সম্বল।

**হেস্টিংস॥** ধন্য তুমি আকবর বাদশা।

সেদিন আমাদের বিতর্ক সভায় ভূতের সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক চলছিল।

শ্রাবণের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। যে-ঘরটায় আমরা বসেছিলাম তার উত্তরের দিকের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক প্রকাণ্ড বাগান। সেরকম বাগান তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক বাড়িরই পিছনদিকে থাকত। হু হু করে বয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া, গাছের ডালপালা নড়ে নড়ে যেন একটা ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল। খোলা জানলার দিকেই ছিল আমাদের দৃষ্টি। সময় ও পরিবেশ দুই-ই ছিল ভৌতিক আলোচনার অনুকূল।

আলোচনার সূত্রে উঠেছিল একটা কাহিনী থেকে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সুতরাং ভূত মানলে আমার সম্মানের হানি হয়। কিন্তু আমাদের বাড়ির সকলেই পুরোদস্তুর ভূত মানেন। আর তাই নিয়ে কাকাদের পিসিদের আর বাড়ির সকলের সঙ্গেই আমার তর্ক বাধে।

সেদিন ন'কাকা আমাকে বলেছিলেন, "জানিস্ বুদ্ধু, আজ অম্বিকে মিত্তির এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। লোকটা ভারি দাম্ভিক; আজ পাঁচ বচ্ছর এই পাড়ায় বাস করছি, একদিনও আমাদের বাড়িতে পা দেয়নি। ছেলের বিয়ের সময় নিজে আসেনি, ভাইপো পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করেছিল। সেই অম্বিকা মিত্তির এসেছে শুনে আমি ত একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম, ভাবলাম ব্যাপারটা কি? কলকাতার অভিজাত বংশ, অহঙ্কারে যেন মট মট করছে। আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে নাক সিঁটকোয়। অথচ ভূতের কথাই বলতে এসেছিল। এসেই বললে, "আপনাদের বাড়িতে ভূত নামানো হয় শুনেছি।"

আমি বললাম, "ভুল শুনেছেন, ভূত নামানো নয়, 'সার্কেলে' বসে আত্মাকে আনবার সাধনা করা হয়।"

সে বললে, "মশাই, আমরা কলকাতার মানুষ, ওসব কিছুই বুঝিনে, জানিওনে। তবে শুনেছি, এ পাড়ার সকলের মুখেই,— সকলের বা বলছি কেন, ঐ আপনাদের পাশের বাড়ির মিত্তির গিন্নির মুখেই শুনেছি, আপনারা নাকি তার মেয়ে পাণ্ডকে এনে দেখিয়েছিলেন তার মাকে, যে-মেয়ে গেল বছর গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।"

আমি বললাম, "ভুল শুনেছেন, মেয়েকে এনে মাকে দেখাতে পারবো এ ক্ষমতা এখনও আমাদের হয়নি, আমাদের মধ্যে দু' একজন 'মিডিয়ম' হয়েছেন, আত্মা এসে তাঁরই উপর ভর করেন, আর তাঁরই মুখ থেকে আমরা সেই পরলোকগত আত্মার বক্তব্য শুনতে পাই। প্রশ্নের উত্তরও পাই, আর তাই থেকেই পরলোক সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও হয়। 'মিডিয়ম' হলেন 'মধ্যবর্তী', অর্থাৎ ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী অথবা বার্তা-বাহক।"

জানিস্ বুদ্ধু, লোকটা এমন মূর্খ, এসব কথার কিছুই বুঝতে চাইলো না, তার নিজের কথাই পাঁচ কাহন। সে বললে, "আপনারা তবে চোখে দেখতে পান না? আমার ছেলে যে আমার বৌমাকে চোখেই দেখতে পায়, তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে, যেমন, আপনি আর আমি কথা বলছি।"

আশ্চর্য হলাম, বললাম, "আপনার ছেলের বিয়ে তো বছর দুই আগে হয়েছে, আপনার বৌমা তো বেঁচেই আছেন, তবে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলাটা আর আশ্চর্যের বিষয় কি?"

"না, না, এ বৌমা নয়, আমার আগের বৌমা যিনি গত হয়েছেন। আহা, কি মেয়েই ছিল, নামেও সরস্বতী, রূপেগুণেও মা আমার সরস্বতীই ছিলেন। এ বৌ কি তার কড়ে আঙুলের যুগ্যি? আহা, মা আমার এমন ভাল মেয়ে ছিল, শ্বশুর শাশুড়ির কী সেবা, কী শ্রদ্ধা ভক্তি, সে কেন তবে ভূত হল? কি পাপ করেছিল সে?"

আমি তো অবাক, "ভূত হয়েছে? বলেন কি? কেমন করে জানলেন যে, তিনি ভূত হয়েছেন?"

তিনি বললেন, "ভূত নয়, পেত্নী। ওতো একই কথা। রোজ সন্ধ্যায় আমার ছেলের কাছে আসতো, ছেলে ঘরে দুয়োর দিয়ে থাকতো পাক্কা দুটি ঘণ্টা, ঘরের ভিতর থেকে মানুষের কথার আওয়াজ পেয়ে গিন্নি বললেন, ব্যাপার কি বলতো, দু দুঘণ্টা ঘরে খিল দিয়ে মুগু কি করে? কথার শব্দও শুনি, ওরই গলার আওয়াজ, নিজের মনেই বক্ বক্ করে নাকি? তবে কি শেষে বৌয়ের শোকে পাগলই হয়ে যাবে? ওকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও।"

"পরে জানলাম ব্যাপারটা, বৌমা নাকি রোজ আসেন ওর কাছে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত থাকেন ওর কাছে। বিয়ের কথা বলতে ও বল্লে, "বাবা, সরস্বতী ত মরেনি, সে যে রোজই আসে আমার কাছে। আমি কি আবার বিয়ে করতে পারি?" তারপর অবশ্য বিয়ে করেছে, সে নাকি সরস্বতীই তাকে বিয়ে করতে বলেছিল তাই বিয়ে করেছে; খোকাও হয়েছে একটি, মাস দুয়েক হ'ল। বৌমা এখন বাপের বাড়িতেই আছেন। কিন্তু বৌ কি ছেলে কারুর ওপর ওর মন নেই। রাত্তিরে রতনকেই কাছে নিয়ে শোয়, বৌমার আলাদা ঘর।

"আমার বৌমা পেত্নী হলে কি হয়, এখনও সেই আগেরই মতন, হিংসের লেশ নেই। মুগুকে নাকি বলেন, করছো কি? ওকে অবহেলা কর না, ও ওতো তোমারই বিয়ে করা বৌ। ওতে আমার পাপ হবে। ওইতো এখন রতনের মা। ও যদি রতনকে না ভালবাসে তবে আমার রতন যে সত্যিই মা-হারা হবে। তুমি যদি ওকে হেনস্থা কর তবে ও কেন রতনকে ভালবাসবে? ভাববে যে সতীনপো ভারার শত্রুর।"

"আমি মুগুর মুখে শুনেছি, বৌমা নাকি এইসব কথাই তাকে বলেছেন। মা আমার বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের আচার-আচরণ সবই ত জানতেন। তাই নতুন বৌ পোয়াতি হয়েছে শুনে নাকি বলে-ছিলেন, আমার বেলায় যেমন তত্ত্বতাবাস করেছেন, যেমন ঘটা করে সাধ দিয়েছিলেন, ওকে যেন তাই করেন মা, না হলে এবাড়ির মান থাকবে না আর ওরও মনে কষ্ট হবে। তোমারি না হয় দোজ পক্ষ, ওর ত তা নয়। মাকে একটু বোলো তুমি।

"দেখুন, ছেলে হবার পর ষেটের, ষষ্ঠী-পুজোর তত্ত্ব, আঁতুড়ে পোয়াতির খাবারের তত্ত্ব এই সবই তো আমাদের আছে, সরস্বতী মা খুঁটিয়ে সব মনে করে দিয়েছিলেন, তাই কোনটির ত্রুটি হয়নি। যেমন রেওয়াজ সবই করা হয়েছিল।

"কিন্তু এখন বিপদ হয়েছে। সেদিন নাকি দেখা করে বলেছিলেন, 'অমন আলাদা ঘরে থাকা চলবে না, ও এবার এসে যেন তোমার ঘরেই শোয় সেই ব্যবস্থা কর। বড় একটা খাট ঘরের ওপাশে মা যেন পাতিয়ে দেন, ওর একপাশে থাকবে রতন,

একপাশে দোলনাখাটে ছোটটি। আমি আর আসবো না, এবার আমি বিদায় নেব।

"আর সেইদিন থেকেই আর তাকে দেখতে পায়নি মুগ্ধ, সে আজ সাত আট দিন হ'ল। এই সাত আট দিনে মুগ্ধ যেন আধখানা হ'য়ে গিয়েছে, দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই, বলুন ত কি বিপদ। ছেলে হয়তো বাঁচবেই না। এখন উপায় কি তাই বলুন।"

ন'কাকার মুখে এই কাহিনী শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। তবে কি সত্য সত্যই মৃত্যুর পর আর একটা জগৎ আছে যার নাম পরলোক। সবচেয়ে আমার অবাক লাগলো এই ভেবে যে, যে মেয়ে মরে গিয়েছে, জীবনকালে যে পরিবেশে ছিল, সেই পরিবেশের সংস্কার পুরোদস্তুর এখনও তার আত্মার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে, সেই তক্তাবাস, সমাজ-সামাজিকতার স্মৃতি মরে গিয়েও সে ভুলতে পারেনি!"

অসীম বলে উঠলো, "strange!"

বিভূতি বললে, "একেবারে গাঁজা!"

আমি বললাম, "গাঁজাই বা বলি কি করে? আমার মাসতুতো বোন চারুদিদিকে তো তুই জানিস। মেসোমশায় মাসীমা মারা যাবার পর আমাদের বাড়ি থেকেই তিনি মানুষ হন। জানিস তো, আমাদের একান্নবর্তী পরিবার, বেড়াল কুকুরটা পর্যন্ত পরিবারের মানুষ। মা'র বোনের মেয়ের থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। আমার বড় পিসিমার এক ননদ পর্যন্ত তাঁর এক মেয়ে নিয়ে বরাবর আমাদের বাড়িতেই থেকেছেন, সেই মেয়ের বিয়েও হয়েছিল আমাদের বাড়ি থেকেই, অবশ্য আমরা তখন দেশেই ছিলাম, কলকাতায় আসিনি। পিসিমার ননদকেও আমরা পিসিমা বলতাম, তিনিও বাবা আর জ্যাঠামশায়কে বলতেন বড়দাদা আর মেজদাদা। কাকাদের নাম ধরেই ডাকতেন। ঠাকুমা বোধকরি মেয়েদের চেয়েও তাঁকে বেশী ভালবাসতেন। তাঁর হাতের রান্নার সব সময় সুখ্যাতি করতেন, আর সবচেয়ে বেশী সুখ্যাতি করতেন তাঁর হাতের তৈরী 'গুল' অর্থাৎ তামাক পাতার গুঁড়োর।"

"তামাক পাতার গুঁড়ো আবার কি বস্তু?" হরিশ চিৎকার করে উঠলো। "গুড়গুড়া জানি, ডাবা হুঁকোও জানি, বর্মা-চুরুটও কাউকে কাউকে খেতে দেখেছি, কিন্তু তামাক পাতার গুঁড়া? এতো কখনও শুনিনি।"

"হরিশ? তুই কি সবজান্তা? সবই জানবি এমন কি কোনও কথা আছে? জিজ্ঞাসা কর গিয়ে জ্যাঠাইমাকে, আর আমার পিসিমাকে, তামাক পাতার গুঁড়ো কি বস্তু। গুলের কৌটো ওঁদের নিত্য সঙ্গী, কৌটা হারালে আর রক্ষা নেই। তামাক পাতার গুঁড়ো হচ্ছে, মতিহারী তামাকের বড় বড় পাতা উনানের পিঠে দিয়ে মচমচে করে নেওয়া হয়, আর বিচালি—অর্থাৎ গরু যা খায়,—তাই পুড়িয়ে তারই ছাইয়ের সঙ্গে সেই পাতার গুঁড়ো মিশাতে হয়, এইতো দেখেছি। কতটা কি মিশানো হয় তা অবশ্য জানি না, তবে একটু কর্পূরের গুঁড়োও দেওয়া হয় তাতে, এটা অবশ্য জানি, কেননা আমাকেই বাজার থেকে কর্পূর কিনে আনতে হ'ত। ঠাকুমা বলতেন, "সুরো যেমন তানে-বানে গুঁড়োটি তৈরী করে এমনটা আর কেউই পারে না, মেয়েরা তো নয়ই, বৌরাও কেউ নয়। গুঁড়ো মুখে দিলে মুখটা যেন জুড়িয়ে যায়, বেশি ধকও না আবার বেশি মিঠেও নয়। আমরা যে কবিতাটা বলে ঠাট্টা করে, সেই কবিতাটাই মনে পড়ে,

চিনি মিষ্টি, ফেনি মিষ্টি, মিষ্টি
রুইয়ের মুড়ো,
তাহারও অধিক মিষ্টি
তামাক পাতার গুঁড়ো।"

যাক, যে কথা বলছিলাম, চারুদিদি মারা গেলেন। ছেলে হবার পর ধনুষ্টংকার হল, সে কী যন্ত্রণা! চোখে দেখা যায় না। সমস্ত শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে থেকে থেকে, আর কেবল বলছেন, "বাবা এসেছো? মা এসেছো? অত দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, কোলে নাও আমায়। কখন? কখন নেবে কোলে? কি বলছো, ভোরবেলায়? আঃ, কখন ভোর হবে মা?" ঠিক ভোরের সময়ই তিনি মারা যান। এসব আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

আর আমার ঠাকুমা শেষ সময়ের কিছু আগেই শয্যাগত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি প্রায়ই তাঁর যে সব ছেলে মেয়ে মারা গিয়েছেন তাঁদের দেখতে পেতেন, তাঁর কথা থেকেই তা বোঝা যেত। যেমন, বলতেন, "কাদু, কোমরটায় একটু হাত বুলিয়ে দে তো মা। বিনু, তুই আমার কোল ঘেঁষে এসে বোস্, তোর মুখখানা একটু ভাল করে দেখি।" মৃত্যুর পূর্বদিন বললেন এক ছেলেকে ডেকে, "আমাকে এবার গঙ্গার ধারে নিয়ে যা তোরা, খাটিয়া টাটিয়া নিয়ে আয়।"

ছেলে বলল, "ওসব আবদার এখন রেখে দাও। এই তোমার রোগা শরীর, টানাটানি করে নিয়ে যাব তোমায় গঙ্গায়? আমার দ্বারা হবে না।"

শুনে যেন রেগেই গেলেন, বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "আমার এই কলা। আমার ঘর আর গঙ্গা সবই এক, বলছি তোদেরই জন্যে। তোদেরই লোকে নিন্দে করবে যে, এতগুলো ছেলে আর নাতি থাকতে বুড়ো মাকে সজ্ঞানে গঙ্গায় নিল না।"

তিনি যখন এইসব বলছিলেন, সেই সময় ডাক্তার এসে পাশে বসলেন। বললেন, "কেমন আছেন আজ?"

ডাক্তারের দিকে চাইলেন, বললেন, "তুমি ইহলোকের মানুষ না পরলোকের? ঠিক যেন চিনতে পারছি না।"

ডাক্তার বললেন, "সে কি মা, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি কালাচাঁদ।"

"ওঃ কালাচাঁদ? চূড়ো বাঁশি কোথায় রেখে এলে? মুখটা তো তেমন কচি নয়, কালাচাঁদের মতন তো মনে হচ্ছে না, রোজ যেমন দেখি।"

ডাক্তার বললেন, "দেখছি, ডিলিরিয়াম হচ্ছে।" ঠাকুমা তখনি বলে উঠলেন, "বুঝতে পেরেছি, এবার বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাদের ডাক্তারবাবু: তোমারও নাম যে কালাচাঁদ তা মনে ছিল না। কালাচাঁদ, কালাচাঁদ ভবরোগের বৈদ্য। খুকি কই, সেই গানটা একবার শোনা না, "ধনী আমি কেবল নিদানে" দাশুরায়ের সেই গানটা।" এইসব কথা থেকে কি মনে হয় না যে, তিনি অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন।"

বিভূতি বললে, "দেখতে পাচ্ছিলেন তোর মাথা আর মুণ্ডু। বিজ্ঞানের ছাত্রের মুখে এ কিরকম কথা?"

এরপর ঘরের ছয়জন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল ভূত মানার পক্ষে, আর একদল বিপক্ষে। আরম্ভ হল ঘোরতর তর্কযুদ্ধ।

সে সময় 'প্ল্যানচেট সোসাইটি' নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। সে যেন 'প্ল্যানচেট' ধরা নয়, পূজার ব্যাপার। তামার কোষাকুষি, গঙ্গাজল, ফুল বেলপাতা, ধূপ, দীপ, কত কি। আসতেন স্বয়ং মহাদেব। নন্দী এসে আগে খবর দিয়ে যেত।

এই সোসাইটির যাঁরা সদস্য তাঁরা সবাই নামজাদা লোক, কেউ বা নামকরা ডাক্তার, কেউ বা ইঞ্জিনীয়ার, আবার কেউ বা কলেজের অধ্যাপক। সকলেরই নাম পরিবর্তন করে সোসাইটির সদস্য হিসাবে একটা একটা নাম রাখা হয়েছিল, ডাক্তারবাবুর নাম হয়েছিল "অচ্যুতানন্দ" আর প্রেসিডেন্টের নাম হয়েছিল "ভদ্র"। তিনি নিমতলার দত্ত পরিবারের ছেলে। মানুষটি ছিলেন এমন যে, যা করতেন সেটা আন্তরিকভাবেই করতেন।

এই আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়ে গেল একদিন। প্ল্যানচেট সোসাইটির সভ্যগণের কার কতটা বিশ্বাস। যথারীতি প্ল্যানচেটে হাত দিয়ে বসেছেন দুজন সদস্য, পরনে তাঁদের পট্টবস্ত্র, গঙ্গাস্নান করে এসেছেন তাঁরা। ধূনোর সৌরভে ঘর ভরে উঠেছে। নন্দী ঘোষণা করলেন, আজ নীলকণ্ঠ গরল-হরণ করবেন।

গরল কোথায় আছে? একজনের পকেটে দু আউন্স মরফিয়ার শিশি ছিল, প্ল্যানচেটে সেই কথাই লেখা হ'ল এবং দেখা গেল, যথার্থই ভদ্রলোক শিশিটা নিয়ে

যাচ্ছিলেন বাড়িতে ডাক্তারের ব্যবস্থামত। পকেটেই আছে সেটা।

শিশিটা উপুড় করে তাম্রকুণ্ডে ঢালা হল, বিল্বপত্র দিয়ে নাড়া হতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গরলহরণ স্তোত্রপাঠ হ'তে লাগলো। দেখা গেল যে, পনেরো মিনিটের মধ্যে ওষুধের বর্ণটা নীলবর্ণ হয়ে গেল। প্ল্যানচেট থেকে আদেশবাণী লেখা হল, "প্রসাদ গ্রহণ কর।"

কে সেই প্রসাদ গ্রহণ করবে? এত সাহস ও বিশ্বাস কার আছে?

সকলেই বিল্বপত্র ভিজিয়ে ঠোঁটে একটু ছিটে নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু একজন সেই প্রসাদ অঞ্জলিতে ঢেলে সবটাই গলাধঃকরণ করলেন। তিনি ভদ্র, প্ল্যানচেট সোসাইটির সভাপতি।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিন্তু ভদ্র নির্বিকার।

আবার স্তোত্র আরম্ভ হ'ল, সেই স্তোত্রে ভদ্রও যোগ দিলেন, তারপর যে যার বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন সকলেই সমবেত হলেন ভদ্রের বাড়ির দুয়ারে, ভদ্র হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন দেখে সকলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

এই ঘটনা শুনে আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি করে জানলে?"

উত্তর দিলাম, "সেদিন আমি নিজেই উপস্থিত ছিলাম সোসাইটিতে, সুতরাং আমার নিজেরই চোখে দেখা ঘটনা। তবে জুয়াচুরি কিছু থাকে ত বলতে পারিনে।"

সেদিন আর তর্ক হ'ল না। রাত্রিও হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেলেন।

আমার এই বন্ধুরা বাড়ির ছেলের মতই আমাদের বাড়ির ভিতরেও যাওয়া আসা করতেন। মাকে কাকিমা আর পিসিমাদের পিসিমা বলতেন।

পরদিন চক্রে বসার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি বন্ধুদের চক্র দেখবার অনুরোধ জানালাম। সবাই রাজী। ভূপতির আগ্রহ সবচেয়ে বেশী।

আমার মেজপিসিমা কাটখোট্টা মানুষ। তিনি এসব বিশ্বাস করতেন না। তিনি বললেন, "আজ আমি বসবো তোদের সঙ্গে, দেখি কোন ভূতটা আমার ঘাড়ে আসে?"

চক্রে বসে যাঁর হাত কেঁপে ওঠে তখনই তাঁর হাতে পেন্সিল গুঁজে দেওয়া হয়। কেননা তিনি হাত কাঁপার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে যান।

সেদিন চক্রে একজন নূতন মানুষ ছিলেন, তিনি সম্পর্কে আমার কাকিমা হ'ন। সম্প্রতি তাঁর একটিমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে। এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন, অল্প বয়সেই, ভারি ভাল মানুষ। দুষ্ট লোকের উৎপাতে গ্রামে টিঁকতে পারছেন না, এই কথা জ্যাঠামশায়কে জানিয়েছিলেন, একজন কলকাতায় আসছিল তারই হাতে একটা চিঠি দিয়ে। চিঠি লিখে দিয়েছিল পাশের একটা ছেলে, তিনি লেখা পড়া জানেন না।

বেচারী! মুখ দেখলে মায়া হয়। বসেছেন আশায় আশায়, মরা ছেলে যদি এসে একবারটি 'মা' বলে আবার ডাকে।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। সবাই নিজের নিজের পাশের লোকটির হাতে হাত দিয়ে বসে আছে, সবাই একেবারে নিস্তব্ধ।

হঠাৎ ছোটকাকিমা বলে উঠলেন, "মেজ-দিদির হাতে পেনসিল দাও, ও'র হাত কাঁপছে।" সঙ্গে সঙ্গে মেজপিসিমার গলা শোনা গেল "হাত কাঁপচে! ঘেঁচু! আমিই তো হাত কাঁপাচ্ছি নিজে। আমি কি অজ্ঞান হয়েছি নাকি?"

অজ্ঞান হননি বটে, কিন্তু হাতটা ক্রমেই বেশী বেশী কাঁপছে, শেষে এত কাঁপতে লাগলো যে, সমস্ত টেবিলটাই যেন আছড়াতে লাগলো তাঁর হাতের কাঁপুনিতে।

"পেন্সিল নাও মেজঠাকুরঝি, গোঁয়ারতুমি কর না।" জ্যাঠাইমা ফিস্ ফিস্ করে বললেন।

পেন্সিলটা যেন হাতের সঙ্গেই আটকে গেল। খস খস্ করে পেন্সিল চলতে লাগল, কাগজের পর কাগজ লেখা হয়ে যাচ্ছে। যেন মেসিন চলছে।

"আলোটা জ্বাল" একজন ফিস্ ফিস করে বললেন। মেজপিসিমার তখন আর জ্ঞান ছিল না। যেন ঝোঁকের মাথায় লিখেই যাচ্ছেন।

আলো জ্বালা হল। ছোট কাকিমা বলে উঠলেন, "একি, ইংরাজী লেখা যে। গোরা ভূত এসেছে, কি সর্বনাশ?"

ঠিক সেই সময় একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল, যেন ছোট ছেলের গলা। "ঝালো দিদিরে, ঝালো দিদি!" নূতন কাকিমা (যিনি আজই এসেছেন) পড়ে গিয়েছেন চেয়ার থেকে, আর হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করছেন, "ওরে মা, মারে মা, কোথায় গেলি তুই। কোলে নে আমারে, আমারে একলা ফেলে গেলি কানে?" মর্মভেদী চিৎকার শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ। যেন ভয় পেয়ে একটা ছোট ছেলে কাঁদছে।

রাঙ্গা মামিমা বললেন, "ভোঁদড় এসেছে, ভোঁদড়ের মতই গলা শুনছি। বাছারে এতটুকু ছেলের এ শাস্তি কেন? অসুখের সময় ঠিক ওইরকমই চেঁচাতো, ওর বোনকে ডাকতো ঐরকম "ঝালো দিদি ঝালো দিদি করে।"

জ্যাঠাইমা বললেন, "ছাড়িয়ে দে, ও যে মরে যাবে। ওর চোখে মুখে জল দে। দ্যাখনা, কিরকম আছাড়ি পিছাড়ি করছে।"

চক্র ভেঙে গেল। নূতন কাকিমা জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, "রাঙ্গাদিদি, কেউ আইছিলরে?"

"আইছিল তোমার মুণ্ডু। তোমার ভোঁদড়ই এসেছিল।"

"ভোঁদড়? আমার ভোঁদড় আইছিল? আমারে একবার দেখালিনে তোরা? কি ক'ল সে?"

বিভূতি স্তম্ভিত। একি ব্যাপার? হিস্টিরিয়া নয়তো! হিস্টিরিয়ায় কি গলার স্বরও অন্যরকম হয়ে যায়?

আমি বললাম, "হিস্টিরিয়ায় কি ইংরাজী না-জানা মানুষ ইংরাজী লিখতে পারে? লেখাগুলো দেখছি কর্কনি ইংরাজী। পড়ে দ্যাখতো কিছু যদি বুঝতে পারিস।"

কিন্তু এত জড়ানো লেখা যে, কিছুই বোঝা গেল না। পরদিন এক হস্তলিপি-বিশারদের কাছে নিয়ে গেলে তিনি অনেক চেষ্টায় মর্ম উদ্ধার করেছিলেন। এক আইরিশ নাবিকের নাম স্বাক্ষর আছে। নামটি আজ স্মরণ হচ্ছে না, ডেভিড ফ্যরায় বলে মনে হচ্ছে। তবে লেখার ভাবার্থ মোটামুটি যতটা বোঝা গেল, বেচারী জাহাজ ডুবিতে মারা যায়। একটি মেয়ে ছিল তার নাম মেরি, তারই কথা লিখেছে চার পাতা ভরে। আর, আরও একটি নাম পাওয়া গেল, 'রোজ'। 'রোজ কি আমাকে মনে রেখেছে?' এই আকুলতা, আর মা মেরির কাছে মুক্তি প্রার্থনা।

আমি বিভূতিকে বললাম, "এ সম্বন্ধে তুই কি বলিস? কি করে এসব ঘটে কিছু কি বুঝতে পারলি?"

"কিছু না ভাই, কিছু না। দেখছি, পৃথিবীতে এমন সব ব্যাপারও আছে মানুষের জ্ঞান যার মীমাংসা করতে পারে না। মৃত্যু সম্বন্ধে আগে কিছু ভাবিনি কিন্তু আজ আমার ভয় ধরে গিয়েছে। জানি না, কি ঘটবে তখন।"

"হ্যাঁ, এ ব্যাপারটাকে একেবারে 'অজ্ঞেয়' বলেই বাদ দিয়ে গিয়েছেন মহা মহা মনীষীরা। মানুষ হয়তো এরপর চাঁদে কি মঙ্গলগ্রহেও অভিযান করে মহাশূন্যের বহু রহস্য উদ্ঘাটনও করতে পারবে, বিজ্ঞান বলে সবকিছুই জানা যাবে, কিন্তু মৃত্যুযবনিকার আড়ালে যে কি আছে সে রহস্য-উদ্ঘাটন করবার বেলায় অপরাজেয় বিজ্ঞান হার মেনেছে এটা বেশ বুঝতে পারছি, যতই বিজ্ঞানের বড়াই করি আমরা।"

# দুর্গার দুই লীলা

॥ বঙ্কিমচন্দ্র সেন ॥

অর্ধেন্দু দত্ত
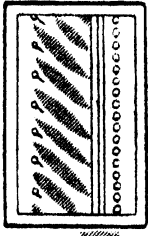
যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, ইঁহাদের মধ্যে যিনি ভেদদৃষ্টি-সম্পন্ন তিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দুর্গা পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি। সুতরাং ইঁহার সহিত মায়ার কোন সম্বন্ধ নাই। ইঁনি কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁনি প্রেমসর্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী। ইঁনি শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্ম-স্বরূপ; তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হইলে মুহূর্তে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। গোকুল ভূমি ত্রিগুণাতীত, সুতরাং গুণ সংস্পর্শজ দুঃখকষ্ট সেই ভূমিকে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ দুর্গা বলিতে যিনি আমাদিগকে দুঃখকষ্ট হইতে উদ্ধার করেন, সেই দেবীকেই বুঝিয়া থাকি। 'দুর্গায়ৈ দুর্গ পারায়ৈ দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ' 'দুর্গায়ৈ দুর্গ ভবসাগরনৌরসঙ্গা' এই সব শাস্ত্রোক্তিই তাহার প্রমাণ। এই দুর্গার সহিত জগতের সম্বন্ধ রহিয়াছে, শুধু ইহাই নহে, বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে ইঁনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী। এজন্য এই ব্রহ্মাণ্ডকে 'দেবীধাম' বলা হয়। ইঁনি সাক্ষাৎ-ভাবে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে কার্যাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু পরব্রহ্ম ভগবানের চিন্ময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই তাঁহাকে এই কার্য করিতে হয়। মহামায়া স্বরূপে এই দেবী জীবকে মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিত করেন। মোহপাশ হইতে জীব মুক্ত হইলে তবে সে গোকুলেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি স্বরূপিণী দেবী দুর্গার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হয়। যতদিন পর্যন্ত মায়ার প্রভাবে থাকে ততদিন পর্যন্ত জীবের দুঃখদুর্গতির নিরসন ঘটে না।

এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, দেবীধাম অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, সেই দেবী দুর্গা বা মায়াদেবী যদি পরব্রহ্মের শক্তিতেই শক্তিমতী, তবে জীবের এমন দুর্গতি কেন! পরব্রহ্ম রস স্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁহারই প্রভাবে মহামায়ার স্বভাবটি এরূপ কেন হইল, কেন জীবের প্রতি তিনি এইরূপ নিষ্ঠুর এবং নির্দয়া। এইভাবে তিনি সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রিয় কার্য সাধন করিতেছেন? তাঁহার অপ্রিয় কার্য সাধন করা অর্থাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে চলিবার শক্তি নিশ্চয়ই মহামায়ার নাই। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সৃষ্টির ইহাই বৈচিত্র্য এবং রহস্য। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, যে যেভাবে আমার নিকটে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাকে তাহাই দান করি। প্রকৃতপক্ষে জীব অনাদি বহির্মুখ। জীবই অনিত্য এবং অসত্য বিষয়ে সুখ কামনা করে, জীবই মনে করে, এই পথে তাহাদের সুখ মিলিবে, শান্তিলাভ হইবে। জীবই বিষয় সুখ কামনা করিয়াছিল এবং সেজন্য মায়া দেবীর শরণাপন্নও হইয়াছিল, তিনি জীবকে জোর করিয়া মমতাবর্তে কিংবা মোহগর্তে ফেলেন নাই। জীবই তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার নিকট কান্নাকাটি করিয়া এই সুখ চাহিয়া লইয়াছে। তিনিও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের প্রার্থিত বস্তু তাহাদিগকে দিয়াছেন। প্রভুত, তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে জীবের এই অনর্থক আবদার পূর্ণ করিতে হইয়াছে। ক্রম-সন্দর্ভের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী জীবের বাঞ্ছাপূরণে মায়াদেবীর মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে মায়াদেবী ঈর্ষার সহিত জীবের বিষয় ভোগে সম্মতি দিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহাতে সুখ মিলিবে না; তবে এই দিকে যখন তোমার ঝোঁক তখন ভোগ করিয়া দেখ, ইহাতে কি পাও। বাস্তবিক পক্ষে নিজের ভ্রান্তিবশেই জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কতদিন তাহাকে মোহগর্তে পতিত থাকিয়া এই দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে? গীতাতে শ্রীভগবানের উক্তিতেই এই প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী আমার দৈবী মায়া জীবের পক্ষে দুরতিক্রমনিয়া কিন্তু যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হন, শুধু তাঁহারাই এই মায়ার প্রভাব হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

শক্তিসাধনায় ভগবতী পরমাদেবী। তিনি সর্বশক্তিস্বরূপিণী এবং সর্বেশ্বরী। সে সাধনায় শক্তির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ স্বরূপধর্ম-গত ভাব এবং বহিরঙ্গ অর্থাৎ জগদাংশ-সম্পৃক্ত ভাবটি পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হয় না। শক্তিসাধনায় পরমাদেবী ভগবতী যিনি, তিনিই মহামায়া। সংসারস্থিতিকারিণী তিনি। তাঁহার প্রভাবে জীব মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিত হয়। আবার জীব যখন তাঁহার শরণাগত হয় তিনি জীবের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এবং তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লন। দুঃখে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলেই দুর্গতিহারিণী দেবী সন্তানের কাছে ছুটিয়া আসেন। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের জন্য তাঁহার বেদনা সর্বদাই রহিয়াছে। তিনি সন্তানকে ছাড়িয়া কোন দিনই নাই। আমরা যখনই তাঁহাকে ডাকি তখনই তাঁহাকে পাই; অপেক্ষা শুধু তাঁহাকে চাওয়া। দেবীসূক্তে এই সত্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে। দেবী বলিয়াছেন, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, আমারই সন্তান তোমরা সকলে। তাই তোমরা এইরূপে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছ। একবার সংসার ভুলিয়া আমার দিকে কানটি বাড়াইয়া দাও। আমার আহ্বান শুনিতে পাইবে। আমি তোমাদিগকে বুকে তুলিয়া লইব।

কিন্তু কই মায়ের সাড়া ত মিলে না। আমরা সংসারে পড়িয়া কত দুঃখ কত কষ্ট প্রতিনিয়ত ভোগ করিতেছি এবং এই বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিতেছি। দুর্গতিহারিণী দুর্গা বলিয়া মাকেও ডাকিতেছি। মা তো আসিতেছেন না। আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন না। এ প্রশ্নের উত্তর রামপ্রসাদ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মাকে আমরা ডাকার মতন ডাকিতে পারিতেছি না। মুক্তি আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় নয়। এত বন্ধনে থাকিয়াও মুক্তি কি বস্তু আমরা বুঝিতেছি না, বন্ধনকে আমরা বন্ধন জ্ঞানও করি না। সত্যকার সুখ, নিত্য সুখ যে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই নাই। বিষয়ের চিন্তা, সেই ভাবনা এবং বিষয়ানুরাগ এই গুলিতেই আমরা আচ্ছন্ন অবস্থায় আছি। এইগুলিকে বাদ দিয়া নিজেদের ভাবনা আমরা ভাবিতেই পারি না। ভগবান আছেন কি না আছেন, সেজন্য আমাদের মাথা ব্যথা নাই। ফলত আস্তিক্যবোধেরই আমাদের একান্ত অভাব, সাধন ভজন সে তো দূরের কথা। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের নামে নিজেদের কাজ হাসিল করিবার দিকেই আমাদের মতলব থাকে। এই অবস্থার মধ্যেও যদি কেহ নিত্য এবং সনাতন সত্যের প্রেরণায়

উদ্বুদ্ধ হন, জড়জীবনের বন্ধন, পশুপ্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে যদি কেহ মুক্ত হইতে আগ্রহবান হন, এমন সৌভাগ্য যদি কাহারো ঘটে, তবে তিনি সাধুগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এজন্য প্রাণের ব্যাকুলতাই বড় কথা। সেই ব্যাকুলতাই সাধনাকে সজীব করিয়া তোলে। যিনি যেমন সাধন-মার্গই অবলম্বন করুন না কেন, আন্তরিকতার বলে, সেই পথেই ভগবৎ-কৃপাকে জীবন্তভাবে তিনি উপলব্ধি করেন। বস্তুত বন্ধন-যাতনা যতদিন না দুঃসহ হইয়া উঠিবে ততদিন মুক্তির কামনা আমাদের চিত্তে সত্য হইবে না। সংসারের সুখে অনিত্যতা বোধটি যে পর্যন্ত শুদ্ধ না হইবে, প্রকৃত সুখ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তবৃত্তি উন্মুখ হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে বৃহৎ দুঃখের অনুভূতি যদি জীবনে একান্ত হয়, তবে বৃহৎ সুখও মিলে। বৃহৎ দুঃখে বুকে করিয়া দেবী আমাদের দৃষ্টিতে দেখা দেয় বন্ধনের জ্বালায় জীবন যখন জ্বলিতে থাকে, পুড়িতে থাকে, তখন মুক্তিদায়িনী জননী স্তন্যধারায় সন্তানকে তুষ্ট করিতে, পুষ্ট করিতে, আগাইয়া আসেন। তিনি গুণাতীতা হইয়াও ত্রিগুণা। দেবীধামে দুর্গার এই খেলা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে অনন্ত বীর্যা বৈষ্ণবী শক্তি বলিয়াই বন্দনা করিবেন। বিশ্ববীজেই তিনি দেবীকে নিজ করিয়া পাইবেন। মহামায়ার পরম মায়ারই তিনি জয় দিবেন। "বহিরঙ্গা মায়া সেহ করে প্রেম ভক্তি", সকল বিকারের মধ্যে অব্যাহত, প্রেমের খেলা ভগবদ্ভালোবাসার, পরম মাধুরীর এই চাতুরী যাঁহার দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়াছে তিনিই প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃহৎ দুঃখের অনুভূতিতেই দীপ্তিময়ী দুর্গার উদ্দীপ্তি এবং সন্তানের যত দুঃখ জড়াইয়াই যেন জ্বালাময়ীর মূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। দুঃখের অনুভূতিতে সন্তান যখন উত্তপ্ত হয়, বন্ধনের বেদনা তাঁহার জীবনে যখন সকলভাবে একান্ত এবং অত্যুগ্র আকার ধারণ করে তখনই দেবী দুর্গতিহারিনীরূপে জাগেন এবং সন্তানের রক্ষাকল্পে অসুরদলনে তাঁহার ক্রিয়া শুরু হয়। এইভাবে সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে দেবীর আত্মভাবটি ব্যক্ত হইয়া থাকে। সন্তানের দৃষ্টি পলকে পলকে তাঁহার দিকে পড়ে এবং ঝলকে ঝলকে, তাঁহার রূপটি সন্তানের দৃষ্টিতে খোলে। সন্তান তাঁহার প্রেমে গলিয়া যায়। তাঁহার দেহাত্ম বুদ্ধি করুণাময়ীর কৃপার সংস্পর্শে বিলীন হইতে থাকে। মায়ের সেই আদর উচ্ছ্বাস, মধুর অথচ উগ্র এবং প্রখর, অলঙ্ঘ্য বীর্যে তাঁহার সেই আপ্যায়ন সন্তানকে আকর্ষণ করে। সন্তান তখন নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া মায়ের কোলে ঝাপাইয়া পড়িতে আকুল হইয়া উঠে। তাঁহার চরণে সন্তান নিজেকে নিঃশেষে বিকাইয়া দিতে চায়।

ভগবান ভূমার স্বরূপ। সাধারণ স্বল্প সুখে অন্ধ জীব যদি তাঁহার জন্য উন্মুখ হয় তবে ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখও তাহার কাছে নিদারুণ আকার ধারণ করে। ভ্রমর যদি পারিজাত ফুলের মধুর স্বাদ একবার পায় তবে অন্য ফুলের দিকে সে ফিরিয়াও তাকায় না। অন্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি সে অবস্থায় সাধকের পক্ষে বিষবৎ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাধকের যে দুঃখ, বৈষ্ণব ভাষায় তাহাকে বিরহের ভাব বলা হয়। ইহার তাপ দুঃসহ। এই দুঃখ-দহনের কাছে সাধারণ আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক দুঃখের তুলনাই হয় না। "জল বিনা মীন জনু কবহুঁ, জীয়ে" এই অবস্থা। মন এইরূপে একবার ভগবৎমুখী হইলে পথের বাধাগুলি ভিতর হইতে যেন বেশী করিয়া সাড়া দেয়। বহু জন্মার্জিত কর্মসংস্কার এইভাবে ভোগের ভিতর দিয়া ক্ষয় পাইবার জন্য নিভিবার আগে দীপের আলোর মত যেন জোরের সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে। দুঃখের উপর দুঃখের ঢেউ, সেই পারাবারের পাথারে জীব গিয়া পড়ে। সেই অবস্থায় কৃপাই জীবের একান্ত সম্বল হয়। নিবিড় আঁধারের মধ্যে সাধককে সেই কৃপার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়—তীব্র সে উৎকণ্ঠা। এই উৎকণ্ঠা অগ্নিময় আকারে জীবের অবিদ্যা দগ্ধ করিয়া তাহাকে নামাশ্রয়ের অধিকার দেয়। জীব সর্বতোভাবে ভগবৎ-কৃপার জন্য তাহার সমগ্র সত্তায় সত্যবোধে যখন উন্মুখ হয়, তখন নামের মহিমা তাহার অন্তরে জাগে। কৃপার কৈবল্য অর্থাৎ সর্বাবস্থার মধ্যে সাফল্যে সকল অভাব মিটাইবার প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিতে ঔজ্জ্বল্যময় প্রকাশকেই বলা যায় নাম। জীবের মন বিষয়-বাসনা ছাড়িয়া, শুদ্ধ হইলে উপর হইতে কৃপার ধারা বিপুল বেগে বন্যার মত নামিয়া আসে। নামের আবরণাত্মিকা শক্তি মায়াদেবী তখন সরিয়া দাঁড়ান। জাগেন নামের অধিষ্ঠাত্রী যিনি তিনি। সন্তানের সর্বাভীষ্ট স্বরূপিণী এই যে দেবী, তিনি তাঁহার ভক্তি-ভাজন সম্পত্তিবিধায়িনী। অতি দুঃখে তাঁহাকে পাইতে হয়। সে দুঃখ নিজের জন্য নয়, সুখরূপিণী সনাতনী জননীকে পাইবার জন্য। দেহ-গেহ সম্পর্কিত দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভ করিব বলিয়া আমরা তাঁহাকে ডাকি না, সুতরাং সে হিসাবে তিনি দুর্গা নহেন। তাঁহাকে পাইতে গিয়া আমরা দুঃখ পাই, আমাদের স্বরূপধর্মে উন্মুখতার জন্য। প্রত্যুত অখণ্ড এবং অব্যয় সুখের আত্যন্তিক অনুভূতিই সে দুঃখের মূলে বীর্যস্বরূপে কাজ করে। অখণ্ড রসবল্লভা শ্রীগোকুলেশ্বরী এই দুর্গা দেবী। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইঁহাকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদাত্মিকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি—স্বরূপ বিহনে রূপের উদয় কখনও সম্ভব নয়, সুতরাং তাঁহাকে পাইলে শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া গেল। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণ-লীলাবৃন্দ, কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ। বস্তুত স্বরূপ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া লীলা। শ্রীদুর্গা এই হিসাবে যোগমায়া। বিলসিত আনন্দই যোগমায়া। শরতের শশিকরে রজনীমুখ মার্জন করিয়া জ্যোৎস্নারূপিণী এই দেবী বৃন্দাবনের লীলা লাবণ্য বিস্তার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যিনি মায়া দেবী, তিনিই যোগমায়া। দুইয়ে একই শক্তির খেলা। আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধিগত বিকারের জন্য নিখিলাত্ম শক্তিতে আমাদের দৃষ্টিতে ভেদ প্রতীত হয়, সত্য দৃষ্টি ইহা নয়। ফলত আমাদের জীবনে গোবিন্দভজন যদি সত্য হয়, তবে বিশ্বে যত কিছু শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহার মূলে আমরা সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের অদ্বয় লীলাই প্রত্যক্ষ করিব এবং বিশ্বকর্মের জড়মূর্তির মূলে পরমাত্মরূপিণী দেবীর শক্তির খেলা আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুখ হইবে। প্রকৃতিকে বাঘিনী আমরা তখন আর দেখিব না এবং বিশ্ব প্রকৃতির কর্মময় অংশ দেখিয়া তখন আমরা ভয় পাইব না দেখিব সকল কর্মের ছন্দে ছন্দে আনন্দময় গোবিন্দের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সর্বশক্তিমান তিনি, তাঁহার শক্তি বিশ্বে কর্মাকারে প্রকাশ পাইতেছে, তবেই আমাদের আস্তিক্য বোধ সত্য হইবে এবং ভগবৎ-প্রেম আমাদের জীবনে সার্থক হইলে। ফলত আমরা যদি ভগবৎ-প্রেমের স্পর্শ অন্তরে পাই অর্থাৎ তিনি যদি সত্যই আমাদের কাছে প্রিয় হন, তবে তাঁহার সব কাজও আমাদের কাছে প্রিয় হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। কর্তা তো এক তিনি, তাঁহারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন, আমরা তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছি। অন্তর দেবতাকে ফাঁকি দিতে গিয়া অন্তর ধর্মকে উপেক্ষা করিবার ফলেই আমাদের জীবনের হিসাবে যত গোল ঘটিতেছে। বিষয়-সুখের লালসা তুচ্ছ হইলে তবে এই ভুল ভাঙ্গে। সে অবস্থায় প্রাকৃত, অপ্রাকৃত, পর এবং অবর, জড় ও চৈতন্য সব জুড়িয়াই আনন্দ, প্রত্যক্ষ ভাবে জীবনে ইহা অনুভূত হয়। জীব বহির্মুখীনতা ছাড়িয়া অন্তর্মুখী হইলেই এই জটিলতাটি উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। মহামায়ার কৃপাতেই জীবের এই অন্তর্মুখী দৃষ্টি খোলে। দুঃখের ভিতর দিয়াই তিনি ব্রহ্মসুখের সংস্পর্শে জীবকে উদ্ধার করেন। জীব এই মায়ের পরমা মায়ার স্বরূপটি উপলব্ধি করিলেই সব ভয় অতিক্রম করে এবং সত্য জীবনে নিত্য জয়যুক্ত হইতে সমর্থ হয়।

রতন সাহার কেষ্ট স্বপ্নাদেশ দিয়ে আসবার ঠিক দিন পনেরো পরে খেতন লাহারও স্বপ্নাদেশ হোল। খেতন লাহা পারিষদদের সামনে তার যে বর্ণনাটা দিলেন সেটা এইরকম, "কোথায় যেন গেছি—ভালো একটা তীর্থস্থানই বলে মনে হচ্ছে হঠাৎ একটি ছেলে যেন মাঠের দিক থেকে এসে সামনে দাঁড়াল। গায়ের রংটা কালো, পরনে একটা হলদে কাপড়, মাথায় পালক গোঁজা; এদিকে রোগা ডিগডিগে, গায়ে খড়ি উঠছে। ভাবলাম, কোন সাঁওতাল ছেলে হবে বুঝি। পরিচয়টা নিতে যাব, ওই জিগ্যেস করলে—"আমায় চিনতে পারছ না?"

বললাম—"কৈ না তো বাপু। কোথায় থাক তুমি? কর কি?

'এই দ্যাখো কাণ্ড! আমি হচ্ছি কেষ্ট-ঠাকুর। তোমাদের পাড়াতেই তো রয়েছি আজকাল।'

'তা কেষ্টঠাকুর তো এমন দশা কেন? ঠাকুর এলে জায়গাটা কোথায় আলোয় আলোয় ঝলমল ক'রে উঠবে, এ যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেল। আর কেষ্টঠাকুর—ঢলঢলে চেহারা হবে, এ দেখছি যেন কত-দিনের উপোসী, কতদিন তেল-জলের সঙ্গে দেখা নেই..."

বললেন—'সেই জন্যেই তো তোর কাছে আসা। আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যা।

সুদ-খোর মানুষ সে সুদের হিসেব রাখবে, না, আমার হিসেব রাখবে, খেতে পাচ্ছি কিনা, সেবা-যত্ন হচ্ছে কিনা। বাইরে বাইরে একটা ভড়ং বজায় রেখে চলেছে, কী না আমি একজন মস্ত বড় ভক্ত। আমি বলি—আরে এসব দিয়ে আমায় ভোলাবে? আমি হলুম শঠের চূড়ামণি যশোদানন্দন কেষ্ট, তুমি তো সামান্য রহিমগঞ্জের...'

এই সময় কাকডাকার শব্দ কানে যেতে ছ্যাঁৎ ক'রে ঘুমটা ভেঙে গেল। নামটা আর শোনা হোল না।"

গড়গড়ার নলটা ঠোঁটে দিয়ে দু' টান ধোঁয়া গিলে মুখে একটু হাসি টেনে খেতন লাহা পারিষদদের দিকে একটু চাইলেন। প্রশ্ন করলেন—"কিছু বুঝলে?"

পারিষদরা যা বুঝল জানাল। রহিমগঞ্জে তো ব'সেই আছে সবাই। দিল্লীও নয়, লাহোরও নয় যে, বুঝতে কষ্ট হবে। আর নাম—সে যখন বোঝাই যাচ্ছে তখন স্পষ্ট ক'রে না-ই বলে দিলেন ঠাকুর। তবে এর মধ্যে আসল কথা হচ্ছে—ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হওয়ার নয়। নেহাৎ দায়ে পড়ে ভক্ত জেনে ঠাকুর যখন এসে দাঁড়িয়েছেন তখন একটা ব্যবস্থা করতেই হয় তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনবার। সুদের হিসেবের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছেন, এখন একটু রাজবাড়ির আদর যত্ন পেতে চান আর কি।"

খেতন লাহা বললেন—"তাহলে করো তোমরা যোগাড়-যন্ত্র। আমি কে?—নিমিত্তমাত্র বৈ ত নয়।"

মফঃস্বলের বড় শহর। পাড়াটার নাম রহিমগঞ্জ। মাঝখান দিয়ে যে বড় সরকারী রাস্তাটা গেছে তার দুদিকে সাহা আর লাহাদের বাড়ি। একেবারে সামনা-সামনি নয়, এবাড়ি ছেড়ে মিনিট তিন চার হাঁটলে ও-বাড়ি পৌঁছানো যায়। লাহার জমিদার, সাবেককালের তিনমহলা বাড়ি। সে-সব দিনের জলুস আর নেই অবশ্য তবে একেবারে নিভে যায়নি। খেতন লাহ বিচক্ষণ মানুষ, ভালোভাবেই ঠাট বজায় রেখে যাচ্ছেন।

সাহারাও নূতন নয়, তবে নিতান্তই এক গৃহস্থ পরিবার হিসাবে এতদিন টিমটিম করছিল, তারপর বছর কয়েকের মধ্যে যেন হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। টিনের চালার মধ্যে ছটাকখানেকের একটা মুদির দোকান, তাই থেকে একেবারে আমেরিকান হাল ফ্যাশানের বাড়ি, বাগান, হালফ্যাশানের আসবাবপত্র—লোকেরা আন্দাজ করে উঠতেই পারছিল না, এই সময় আবার বাড়ির লাগোয়া জমি কিনে এই মন্দির, ঘটা করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; বোলবোলাওয়ের আর কোন দিকটা যেন বাকি রইল না।

অনেকেরই ভালো লাগে না এসব, লাহাদের আরও ভালো লাগবার কথা নয়।

তাই থেকেই এই স্বপ্নাদেশ। মন্দিরের তোড়জোড়ও আরম্ভ হয়ে গেল।

কথাটা রতন সাহার কানে উঠতে দেরি হোল না। পারিষদদের কিছু যেমন থাকে খাস, তেমনি কিছু থাকে উভচর, অর্থাৎ দু' জায়গায়ই ধ'রে থাকে। কর্তাদের নিতান্ত অজানাও নয়, সবাই একনিষ্ঠ হ'লে ওদিককার খবর এদিকে হুবহু পৌঁছাবে কি ক'রে?

রতন সাহার আলবোলা নয়, নস্য, সেই টিনের চালার আমলে যা ছিল। নাকের দু'দিকে দু' টিপ ঠুসে দিয়ে সশব্দে হাত দুটো ঝেড়ে বললেন—"বটে!"

তারপর একদিন স্বপ্নও দেখলেন। সদ্য সদ্য নয়, বেশ সময় বুঝে। তবে সে যা স্বপ্ন, একেবারে মোক্ষম। যে টিনের চালের ভেতর থেকে অ্যামেরিকান সৌধ উঠে আসতে পারে তার স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতাটাকেও তো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না।

রতন সাহার কেষ্ট রোগা ডিগডিগে এই অর্থে যে মূর্তিটি বাঙালী ভাস্করের তৈয়ারি বাঙালী কেষ্টর মূর্তি; ছিপছিপে গড়ন, নরম দুলালি-দুলালি ভাব। সাজ-গোজেও বাহুল্য নেই; রাখাল বালক তার আবার সাজগোজ! ভক্তমহলে বেশ সমাদরও হয়েছে মূর্তির, খেতন লাহার স্বপ্নে কিন্তু গুণগুলোই উল্টে দোষে গিয়ে দাঁড়াল। দেবতাদের লীলা-খেলা, কোনটে তাদের পছন্দ, কোনটে অপছন্দ বলা যায় না। আর এটা তো স্বীকার করতেই হয় যে, কেষ্টঠাকুর হুগলী-চব্বিশ পরগনার অমুক গ্রামের অমুক পাড়ার অমুকে গয়লার বাড়ির ছেলে নয়। দ্বারকার রাজপুত্র, মথুরার রাজার ভাগনে, দ্বারকা থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত তাঁর লীলাভূমি, তাঁকে অমন ছিমছাম শৌখীন চেহারার দাঁড় করালে তিনি যদি ভক্তের কাছে এসে বিচার চান, গায়ের জ্বালায় সুদখোর কেপ্পন বলে অনুযোগ করেন তো দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে?

খেতন লাহা খাস জয়পুরে অর্ডার দিলেন। যেখানকার কেষ্ট একেবারে সেইখান থেকেই আসবেন। সেখানকার ডাল-রুটি, খাঁটি ঘি-দুধ-মাখন খাওয়া কেষ্ট। রাজবাড়ির রাজভোগ খাওয়ার যোগ্য হওয়াও চাই তো।

মন্দির যখন আধাআধি উঠেছে আবার একদিন স্বপ্ন দেখলেন খেতন লাহা। ঠাকুর যেন এসে তিনি কতটা উঁচু হতে চান, কতখানি আড়ে কি ওজন, কিরকম সাজ-গোজ প্রভৃতি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বলে দিচ্ছেন। পারিষদরা বলল—সোজা হিসাবেই তো বোঝা যাচ্ছে, স্বপ্ন কতটা খাঁটি।—বাঁশি বাজাতেন, সমস্ত গোকুলটা গমগম করে উঠত, কোথায় কোন্ প্রান্তে কে রুটি সেঁকছে, কি কুটনো কুটছে, কি বাটনা বাটছে—কানে গিয়ে পৌঁছাতো, ছেড়েছুড়ে ছুটে আসত। ঐরকম পিলেরুগী কেষ্টর তো কাজ নয়।

ফরমাসের খুঁটিনাটি নিয়ে লোক ছুটল জয়পুরে। স্বপ্নকাহিনীটা রতন সাহার কানে উঠল। নাকে নস্য টিপে হাত ঝেড়ে বললেন—"বটে, স্বপ্ন যে দেখছি বড়কর্তার একচেটে হয়ে উঠল!"

তারপর ও'রও স্বপ্নাদেশ হোল। যেদিন মূর্তি এসে পৌঁছবার কথা ঠিক তার আগের দিন।

ঠাকুর যেন কাতর হয়ে বলছেন—হ্যাঁরে, পুতনাকে চুষে খেয়েছি, কালিয় দমন করেছি, কংশ বধ করেছি, গোবর্ধন ধারণ করেছি—কী না করেছি? কিন্তু তার পুরস্কার কি এই?—আমায় একেবারে মথুরার চৌবে পালোয়ান করে তুলবে? নিজের দেহের বোঝা বইতেই যদি হিমসিম খেয়ে যাই তো এতবড় জগৎ-সংসারটার বোঝা বইব কি করে?"

আরও ইনিয়ে বিনিয়ে যা বলবার তা তো বললেনই। তারপর বেশ একটু যেন খাপ্পা হয়ে উঠেই আদেশ করলেন—"না, কথাটা জানিয়ে দে চারিদিকে ভালো করে, নয়তো শেষকালে দেখছি এইরকম পালোয়ান পুজো একটা রোগ দাঁড়িয়ে যাবে। দেশছাড়া করে দেবে আমায়।"

সকাল থেকেই স্বপ্নাদেশ পালনের জন্যে তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, আরও সবাই নাকি স্বপ্ন পেয়ে প্রস্তুতই ছিল। বেলা আটটা পর্যন্ত বেশ একটি মাঝারি গোছের মিছিল রতন সাহার স্বপ্নাদেশটা শহরে চাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তৈয়ার হয়ে গেল। গান-ছড়া সমেত। কামারপাড়ার বটকেষ্ট সাজল কেষ্ট। ইয়া গালপাট্টা, ইয়া চুলে ভরা বুকের ছাতি, পায়ের গোছটাই দু হাতের মধ্যে আসে না। বটকেষ্ট একটা বাঁশের ফ্রেমে কাগজ সাঁটা চাকা-ওলা নৌকোর মাঝখানে বসে একটা সিঙে নিয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিতে লাগল—বাঁশির আওয়াজ সারা গোকুলের ঘরে ঘরে পৌঁছান চাই তো।

মিছিলটা সমস্ত শহর ঘুরে, যা বেরিয়েছিল ফুলে-ফেঁপে তার চার গুণ হয়ে যখন লাহাদের বাড়ির কাছাকাছি এসেছে, আর খানিকটা এগুলেই সামনাসামনি হয়, এই সময় অকস্মাৎ বাঁশিটা গেল থেমে, আর সংগে সংগে একটা তুমুল সোরগোল উঠল—"কেষ্ট ডুবেছে! কেষ্ট ডুবেছে! কেষ্ট এলিয়ে গেছে!..."

তাই হয়েছে। একে ঐ লাস, তার ওপর মোহন-বংশীর ধকল—বটকেষ্ট নৌকার তলা ফেঁসে একেবারে মাঝ রাস্তায়।

যেমন যেমন স্বপ্ন রতন সাহার, সেই-রকম ক'রে সাজানো ব্যাপারটা, সবাই কেষ্ট বটকেষ্টকে মাঝখানে ক'রে হৈ হুল্লোড় করতে করতে লাহাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে সাহাদের বাড়ি গিয়ে উঠল।

আর, আশ্চর্য স্বপ্ন! যেমন-যেমনটি দেখানো হোল ঠিক সেইরকম ক'রেই কি ফলতে হয়! গাড়ি থেকে নেমে জয়পুরী কেষ্ট গংগা পেরিয়ে আসছিলেন, মাঝ দরিয়ায় হঠাৎ নৌকার তলা ফেঁসে গিয়ে একেবারে অগাধ জলে। গুরুবল, কাছেই একটা অন্য নৌকা হাল টেনে আসছিল; কিন্তু গুরুবল সে হ্রধে, মানুষ কটার জন্যেই; বর্ষার ভরা গাঙ, ঠাকুরকে আর বাঁচান গেল না।

ক'দিন চুপচাপ গেল, তারপর রতন সাহা নাকে লম্বা টানে নস্য গুঁজে হাত ঝেড়ে পারিষদদের প্রশ্ন করলেন—"কি হে বড়-কর্তা আর স্বপ্ন-টপ্ন দেখলেন এদিকে? তাহলে যেন টের পাই। আমার ঠাকুর স্বপ্ন দিয়ে জিগ্যেস করছিলেন।"

পারিষদরা মুচকি হেসে বলল—"তাঁকে জানিয়ে দেবেন, বড়কর্তার চোখে ঘুমই নেই আর তো স্বপ্ন দেখবেন কোত্থেকে?"

যথাসময়ে হোল স্বপ্নাদেশ খেতন লাহারও। জলমগ্ন হওয়ার ঠিক পনের দিন পরে।...জয়পুরে গিয়ে ফিরে আসতে একটা লোকের যে ক'টা দিন লাগে।

ঠাকুর যেন দিব্যি নেয়ে-ধুয়ে সাজগোজ করে এসে ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে বলছেন—"অত মুষড়ে গেছিস কেন? হাড়-কেপ্পনের কেষ্ট, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, ও আমায় নৌকোডুবি করে মারবে? মরু-ভূমির দেশ থেকে আসতে আসতে গংগা দেখে একটু লোভে পড়ে গিয়ে নেমে পড়ে-ছিলাম। যা, গিয়ে নিয়ে আয় আমায়। আর, কি রূপে আসছি সেটাও ভালো করে জানিয়ে দে সারা শহরে।"

এমন মহিমা ঠাকুরের, সব যেন তৈয়েরই ছিল। স্বপ্ন দেখামাত্র রাতারাতি লোক ছুটল গংগার তীরে। আশ্চর্য, যেমনটি স্বপ্ন দেখা ঠিক তেমনটি হয়ে ঠাকুর উঠে যুগলমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন একটা তাল গাছে ঠেস দিয়ে। ভোর হওয়ার সংগে সংগে মিছিলটা বেরিয়ে প'ড়ে শহরের রাস্তায় এসে উঠল।

প্রথমেই আগাগোড়া ফুলপাতায় সাজানো মোটরে জয়পুরী কেষ্ট, জমকালো জমকালো জয়পুরী পোশাকে আর গয়নাগাটিতে সমস্ত শরীরটি মোড়া, মাথায় তিন তিনটে চূড়ার ঝলমলে মুকুট। ঠিক ঐ অনুপাতে বাঁদিকে শ্রীরাধিকা।

তার পেছনেই ঠাকুরের যেমন আদেশ হয়েছে, স্বপ্নকাহিনীটা জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা—

সেই কামারপাড়ার বটকেষ্ট এবারেও কেষ্ট সেজেছে। তবে একা নয়। দুই কাঁকালে দুটি দুটি করে আরও চারটি লিকপিকে কেষ্ট বটকেষ্টর চাপের চোটে 'গেলুম, মলুম' করে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

যাতে কারুর বুঝতে কষ্ট না হয় তার জন্য রীতিমতো ছড়া আর গানেরও ব্যবস্থা আছে।

শহর ঘুরে সাহাদের বাড়ির সামনে এসে মিছিলটা একটু দাঁড়িয়ে পড়ল, সংগে সংগে কেষ্ট বটকেষ্ট কাঁকালের কেষ্টদের বের ক'রে গলা টিপে টিপে ট্রাক থেকে নামিয়ে একটা করে ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলল—"যা, যা তোরা সব, আর ফসকেমি করতে আসিস নি যেন।"

এরপর মিছিলটা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে লাহাদের প্রকাণ্ড গেটের মধ্যে প্রবেশ করল।

লাহা-সাহাদের দুই কেষ্ট স্বপ্ন দিয়ে দিয়ে আসর জাগিয়ে রাখলেন। শহর যত সরগরম হয় নিজেরা তত ওঠেন তেতে, নিজেরা যত তাতেন শহর তত সরগরম হয়ে ওঠে। ব্যাপার বেড়েই চলল। সাহা-দের কেষ্ট হুমকি দেন লাহাদের কেষ্টকে দেখে নেবেন, এদিকে খেতন লাহা কুরু-ক্ষেত্রের ভাষায় স্বপ্ন পাচ্ছে—মরসে অনন্ত স্বর্গ, জিতলে সসাগরা বসুন্ধরা...

জন্মাষ্টমীর মিছিল আসছে। শোনা যাচ্ছে সেইদিনই দুই ঠাকুর মিছিল করে বেরিয়ে একটা ফয়সালা করবেন। কার মাথা যায় কার ঠ্যাং যায় কিছুই বলা যায় না। তারপর আদালত খোলা আছে।

সমস্ত শহরটা আহার নিদ্রা ভুলে মেতে রইল তীব্র আশা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। স্বপ্ন দিয়ে দিয়ে দুই ঠাকুরের আর ফুরসৎ নেই অন্য কথা ভাববার।

আর এক কেষ্ট আছেন এই শহরেই; তিনি স্বপ্ন দেন না, সোজাসুজি কথা কন। তবে একজন ছাড়া শহরে আর কেউ জানে না সে কথা।

একটা গরীব বস্তির নোংরা গলির মধ্যে দুখানি চালাঘর নিয়ে কাঙালীচরণের বাড়ি। একখানির একপাশে কাঙালী আর তার পরিবারের মাদুরের ওপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা গোটানো থাকে, একপাশে একটি জলচৌকির ওপর বিস্কুটের টিনের খোপের মধ্যে কাঙালীর কেষ্ট। এটা ওটা দিয়ে সাজানো চৌকি আর টিনটা ঠাকুরের মন্দির।

ঠাকুরকে কাঙালী ছাড়া কেউ চিনতেও পারে না। কবে কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, বিঘৎখানেকের ঠাকুর। একটা পায়ের পাতা নেই, একটা হাতের পুরো আধখানাই লোপাট, মুখ-চোখ-নাকের প্রায় সবকিছু লেপা-পোঁছা।

গংগাজলে নাইয়ে একটা পাটকরা ন্যাকড়া দিয়ে মোছাতে মোছাতে, চন্দন পরাতে পরাতে কথা হয় ঠাকুরের সংগে—নানা কথা, তবে সেবা-পুজোর দৈন্য নিয়েই বেশি—

"আজ ফুল পেলুম না তেমন, এইতেই খুশী থাকতে হবে, কি করব একা মানুষ?"

খুশীই হন ঠাকুর। প্রায় নেই-ঠোঁটে কোথায় যেন হাসি ফুটে ওঠে, যেন নড়েও ওঠে ঠোঁট—কাঙালী শোনে—"এইতেই বেশ হবে আমার, তুই বড় খুঁতখুঁতে।"

এক একদিন ঠোঁট দুটি যেন অভিমানে গুটিয়েও যায়। "এত কম ফুল? নিজের ভাবনা নিয়েই থাকবি তো আর আমার কথা ভাববি কোথা থেকে?"

"তা করব কি বলো?"—নিজেও মুখ ভার করতে জানে কাঙালী—"তিনটে পেট দিয়ে বসে আছ, তিনটে পেটের জ্বালা দিয়ে ব'সে আছ।...এই যে বারোটা পর্যন্ত শুকিয়ে রয়েছ, এটাও কি সাধ আমার?..."

আরও অনেক কথা সব। বলে আর শুকিয়ে-যাওয়া মুখখানি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দিতে থাকে। বলতে বলতে এক একদিন যখন মনটা উথলে ওঠে, কোঁচার খুঁট চোখে দিতে হয়, তখন মনে হয়, কে যেন পিঠে লুটিয়ে পড়েছে, বলছে—"চুপ কর, তুই যেন আমার চেয়েও অভিমানী আবার। আমি তাহলে যাব চলে লাহাদের কিংবা সাহাদের ওখানে..."

যেন রঙ্গ শুরু ক'রে দেন ঠাকুর। কাঙালী শিউড়ে উঠে কোঁচা ফেলে দেয়; ভাঙা মূর্তির দিকে চেয়ে শাসিয়ে বলে—"খবরদার!"

"আমি যাব দেখিস, এই চল্লুম।"

"বলছি যাবে না। জন্মাষ্টমীর মিছিল আসছে; একে হাত নেই, পা নেই, এর ওপর যদি আরও আচ্ছা ক'রে ছেঁচে দেয়!..."

ঠাকুরের মুখে খিল খিল ক'রে দুষ্টুমির হাসি উঠে, ছ্যাঁচা বেড়ার মাটিলেপা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফেরে। যেন পালিয়ে যেতে যেতে ঘুরে যাওয়া, দাঁড়িয়ে প'ড়ে আবার ছোটা। কী যে করবে বুঝে উঠতে পারে না কাঙালী। শুধু কি তাই?—রূপও লুকিয়ে পড়ছে ভাঙা পাথরের অরূপের মধ্যে। আবার যে কী অপরূপ হয়ে তারই গায়ে উঠছে ফুটে—যেন চোখ ফেরানো যায় না!

তারপর এক সময় সব রূপ, সব হাসি মিলিয়ে যায় স্ত্রী হরিদাসীর ঝাঁঝালো আওয়াজের মধ্যে—"ওগো, হোল তোমার? কী জ্বালা বাপু! এক ভাঙা ঠাকুর নিয়েই এই—দুপুর গড়িয়ে যায়—আস্ত হ'লে না জানি সে আবার কি অবস্থা হোত..."

কাঙালীচরণ সচেতন হয়ে ওঠে আবার। কাচা হলদে ন্যাকড়াটুকু কোমরে জড়িয়ে দিতে হবে, পিঠে বেঁধে দিতে হবে কোথা থেকে জোগাড় করা রেশমের টুকরোটি,—পীতধড়া, মাথায় ময়ূরের পালকটুকু।

কাঙালীর কেষ্ট থাকেন লক্ষ্মীটি হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন হরিদাসীর গলার ভয়ে জড়সড় হয়েই।

মোটরে চলেছি। মোটরেই আজকাল সর্বদা থাকি। বাড়ি আছে একটা, কিন্তু বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। বাড়ি মানে সিমেণ্ট ইঁট লোহা-কাঠের জগদ্দল সমন্বয় একটা। বাড়িকে যারা গৃহ করে তোলে, তারা আসেনি আমার কাছে এ জন্মে। একজন এসেছিল। সে কিন্তু আমার বাড়িতে আসেনি। বাড়ির বাইরে থেকেই সে আমার জীবন মধুর করে তুলেছিল। সে-ও আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াই। জানি পাব না, তবু খুঁজি। খোঁজাটা নেশার মত হয়ে গেছে। ওইটেই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে আজকাল। এ বিশ্বাসও হয়ে গেছে, পাব তাকে কোথাও না কোথাও। কোনও অচেনা শহরের গলির মোড়ে কিম্বা কোনও পথের বাঁকে কিম্বা কোনও বনের ধারে বা পাহাড়ের ঝরনা তলায় কিম্বা আর কোথাও। যেখানে মনে হয় তাকে পাব, সেখানেই অপেক্ষা করি, দিনের পর দিন, অনেক সময় মাসের পর মাস। কিন্তু পাইনি। আশা ছাড়িনি কিন্ত। যতবার ব্যর্থকাম হয়েছি, ততবারই বিশ্বাস যেন বেড়ে গেছে, মনে হয়েছে পদ্ম আসবে, একবার অন্তত আসবে, নিশ্চয়ই আসবে

একবার মনে হয়েছিল এই এলো বুঝি। শরতের সোনালি রোদে ঝলমল করছে নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শ্যাম-শোভায় আভাসিত হয়েছে যৌবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী, দূরে অনেক

দূরে, কোথায় যেন শানাই বাজছে আগমনী সুরে। সেদিন আকাশে বাতাসে সংগীতে কল্পনায় সর্বত্রই আমন্ত্রণের আগ্রহ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, এ-আগ্রহ সে কি উপেক্ষা করতে পারবে? কিন্তু করেছিল। আসেনি।

আর একদিনের কথা। সেদিন পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার পাথারে আত্মহারা হয়ে মিশে গিয়েছিল গঙ্গার ধারা। যে মৃদু কলধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তা জ্যোৎস্নার, না গঙ্গার, তা বোঝবার উপায় ছিল না। জ্যোৎস্নার পাথারে যে কলধ্বনি হতে পারে না, একথাও মনে হচ্ছিল না তখন। মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোনও কিছু অসম্ভব বলে মনে করাই অসম্ভব ছিল তখন আমার পক্ষে। আকাশের চাঁদ যদি নেবে এসে আলাপ করত আমার সঙ্গে, একটুও আশ্চর্য হতুম না। হয়তো এক পেগ হুইস্কি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করতাম তাকে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল। রুপালী-আলোর-মাখা স্বপ্ন, শুভ্র কোমল মেঘমণ্ডিত স্বপ্ন। সেদিন যে হুইস্কি চুমুকে চুমুকে পান করছিলাম —যা রোজই করি—তা মনে হচ্ছিল যেন অমৃত। হঠাৎ সেদিন নতুন করে মনে পড়ল, আমার জন্যে হুইস্কি আনতে গিয়েই পদ্ম আর ফেরেনি। তাকে মানা করেছিলুম যেতে। কিন্তু সে শুনলে না। হুইস্কি না হলে আমার সন্ধ্যা যে বন্ধ্যা হয়ে যায়, একথা তার চেয়ে আর বেশী কে জানত? আমার হুইস্কির বোতলটা হাত থেকে অসাবধানে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তাকে বললুম, ভালই হয়েছে, বিনা সুরায় সুরলোকে পৌঁছুতে পারা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা হোক আজ। কিন্তু সে শুনল না। হুইস্কি আনতে চলে গেল। পায়ে হেঁটে গেল। মোটরটা সেদিন বিগড়েছিল। চাকরকে দিয়েও আনাতে পারত, কিন্তু আমার কোনও কাজ চাকরকে দিয়ে করিয়ে তৃপ্তি হত না তার। সেদিনও এমনি পূর্ণিমা ছিল, এমনি জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করছিল প্রকৃতি। কিন্তু সে যে সেই গেল আর ফেরেনি। আশা করেছিলুম, কোনও জ্যোৎস্না রাত্রেই হয়তো সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল মধ্যরাত্রে, চাঁপার গন্ধ মদির থেকে মদিরতর হল, রজনীগন্ধার গন্ধ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মিলিয়ে গেল ভোরের হাওয়ায়। পদ্ম এল না।

আর একদিনের কথা।

পাহাড়ের পাশে ঘন বনের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার গাড়ি। হেমন্তের প্রসন্ন প্রভাত। শিশির বিন্দুর সমারোহ চতুর্দিকে। প্রতিটি শিশির বিন্দু থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে সূর্যের আলো। মনে হচ্ছে, অসংখ্য মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন কেউ। বন্য কুক্কুটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আহ্বান করছে কুক্কুটীকে। অচেনা নাম-না-জানা ফুলের তীব্র গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরপুর। আমার মদিরাচ্ছন্ন চেতনা সহসা সজাগ হয়ে উঠল কেন, জানি না। কেমন যেন দৃঢ়বিশ্বাস হল, সে নিশ্চয় আসবে আজ। বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গড়ে তুললাম প্রত্যাশার দুর্গ। তার মধ্যে বসে রইলাম একাগ্র হয়ে, কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙল। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকারে স্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে। সমস্ত দিন এই নির্জন বনের ধারে কেটে গেল, মনে হল যেন কয়েকটা মুহূর্ত।

ড্রাইভার সুরপৎ সিং কাছেই রান্না করছিল। তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতেই সে বললে—"ময়ূর ডাকছে হুজুর। বোধহয় বাঘ বেরুবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে এখান থেকে শহরের দিকে চলে যাওয়াই ভালো।"

বললাম, "যাব না। এইখানেই থাকব সমস্ত রাত। বন্দুক দুটো লোড করে রাখ।"

সমস্ত রাত বসে রইলাম সেই নির্জন বনের ধারে। একাধিকবার বাঘের গর্জন শোনা গেল। মনে হল যেন আমারই অন্তরের ক্ষোভ গর্জন করছে ওই গভীর জঙ্গলে। বাঘ কাছে এল না। সে-ও এলো না। সকাল বেলা অন্য জায়গায় চলে গেলাম।

সে এল অবশেষে, এক মেঘলা দিনে। ঘড়ি অনুসারে সেটা দিন বটে, কিন্তু আসলে রাত্রিই নেবেছিল সেদিন দিনকে আচ্ছন্ন করে। অমন ঘন কালো মেঘ আমি আর কখনও দেখিনি। মেঘে বিদ্যুৎ ছিল না। মনে হচ্ছিল, একরাশ ঘন কালো চুল যেন দিগদিগন্ত আবৃত করে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। মনে হচ্ছিল, ওই নিবিড় কুন্তলের অন্তরালে হয়তো কারও মুখও লুকিয়ে আছে, কিন্তু সে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকার ক্রমশ ঘন থেকে ঘনতর হতে লাগল। এত ঘন যে, কাছের জিনিসও আর দেখা যায় না। আমার অত বড় মোটরটাও হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। আমি আর মোটরের ভিতর বসে থাকতে পারলাম না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মোটরের কপাটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সুরপৎ ছিল না, তাকে হুইস্কি আনতে এলাহাবাদে পাঠিয়েছিলাম। আমার মোটরটা দাঁড়িয়েছিল যমুনার ধারে। নিস্তরঙ্গ যমুনাকে দেখে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, কেন ওর নাম কালিন্দী হয়েছে। মনে হচ্ছিল, সে-ও যেন গভীর বিরহে স্থির হয়ে গেছে, আশার সমীরে আর তরঙ্গ তোলে না, কালো হয়ে গেছে তার নীল রং। বাইরে এসে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম যমুনারই দিকে। তারপর খুট করে শব্দ হল একটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার মোটরের খোলা দরজার পাশে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, পদ্ম। যদিও তখন ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়েছিল, তবু আমার ভুল হয়নি। স্পষ্ট দেখলাম পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে হুইস্কির বোতল। তারপর ধীরে ধীরে সে মোটরের ভিতর ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা উঠল। আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। আমার পা দুটো মাটিতে পুঁতে গেছে, আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে যে উন্মত্ত ঝড় উঠেছে, তা যেন স্পর্শও করছে না আমাকে। যমুনার স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তরঙ্গে তরঙ্গে। তারপর আমি ছুটে গেলাম মোটরের দিকে, সম্ভবত প্রচণ্ড ঝড়ের বেগই ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে। মোটরের কাছে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তারপর কি হয়েছে মনে নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখি, সুরপৎ আমাকে তুলছে। ঝড় থেমে গেছে। মোটরে ঢুকে দেখলাম পদ্ম নেই, কেউ নেই। মোটরের সীটের উপর বোতল রয়েছে একটা।

সুরপৎকে জিজ্ঞাসা করলাম—"পেয়েছ দেখছি। কত দাম নিলে—"

সুরপৎ বললে—"পেলাম না হুজুর। সব দোকান বন্ধ।"

সীট থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে দেখলাম—হুইস্কি নয়। বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে—'খাঁটি পদ্মমধু'।

পদ্মর পুরো নাম পদ্মাবতী কি পদ্মলোচন তা আমি বলব না। একটা কথা শুধু বলব, তার মৃতদেহ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আমার জন্যে হুইস্কি আনতে গিয়ে একটা লরির তলায় চাপা পড়েছিল সে। সেদিন কিন্তু এসেছিল সে, সেই মেঘলা দিনের অন্ধকারে। তার ইঙ্গিতময় অনুরোধ অবহেলা করিনি। মদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন মধুই খাই। পদ্মমধু।

# কিশোরীর মন

সন্তোষকুমার ঘোষ

দিদি এখনি চলে যাবে। আমি এখানে, এই আড়ালে, খানিক দাঁড়িয়ে দিদির চলে-যাওয়া একটু দেখি।

আজ ভারী চমৎকার সেজেছে দিদি। নিজে সাজেনি ত, ওরা সাজিয়ে দিয়েছে। ও-বাড়ির মাসিমা আর বেনেটোলার কাকিমা। কাকিমা কি সাত-সকালে কাকের মুখে খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন?

সেই মেরুন রঙের শাড়িটা ওরা পরিয়ে দিয়েছে দিদিকে। যেটা ও নিজেই পছন্দ করে কিনেছিল গতবার শ্রাবণ মাসে। কিন্তু বেশীবার পরেনি। একবার কি দুবার মোটে। একবার দল বেঁধে সর্বজনীন পুজো দেখতে গিয়ে। অমিতাদির জন্মদিনে আর-একবার। অমিতাদির জন্মদিন অবশ্য ছুতো, দিদি আসলে ওটা সুধীরদাকে দেখাবে বলে পরেছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল অমিতাদিদের বাসায় যাবার নাম করে। সেখানে কোন রকমে বুড়ি ছুঁয়েই আমাকে বসিয়ে রেখে চলে এসেছিল। সুধীরদা কোথায় থাকবে ও জানত, আগে থেকেই ঠিক ছিল। ওরা লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গেল। বাড়ি ফিরে মাকে আমি মিছে কথা বলেছিলুম। কী বলতে হবে তা-ও দিদিই শিখিয়ে দিয়েছিল, আর বলেছিল, লাল রঙের ফিতে ঘুষ দেবে। পয়সা ও পেল কোথা থেকে? সুধীরদা দিয়ে থাকবে।

মেরুন রঙের শাড়ি আর গাঢ় গোলাপী ব্লাউজে দিদিকে মানিয়েছে চমৎকার। ওর অবশ্য আরও ভাল শাড়ি দু-একটা আছে: একটা হাল্কা হলুদ সিল্কের; আর একটা জংলা নকশার। মা ওকে এ-দুটো পরতে দেয়নি। বিয়ের জন্যে জমিয়ে রাখছিল। 'বিয়ে না আরও কিছু — আমার মরণের জন্যে' দিদি রাগ করে বলত। কই, সে-শাড়ি দুটো মা ত এখন তুলে দিল না।

দুলজোড়া কিন্তু দিয়েছে। নতুন ডিজাইনের দুলজোড়ায় বসানো ছোট্ট পাথর দুটো এই সকালের আলোয় চিকচিক করছে।

কিন্তু ওরা দিদিকে কুঙ্কুমের টিপ্ পরালো কেন? কুঙ্কুমের টিপ্ দিদি পরত না ত, ও পরত সিঁদুরের; দেশলাইয়ের কাঠির ডগায় যতটুকু ওঠে, তাই দিয়ে। মা বকত—তোর এখনও বিয়ে হয়নি, তুই সিঁদুর পরবি কেন। দিদি হাসত—কপালে পরলে দোষ নেই।

মা ত জানে না দিদি মাঝে মাঝে মাথার ঘোমটা তুলেও দেখত, ওকে কেমন লাগে। সুধীরদার সঙ্গে ফটোর দোকানে গিয়ে ওই ভাবে একটা ছবিও তুলিয়েছিল, আমি জানি। ছবিটা নিজের কাছে রাখতে সাহস করেনি দিদি, ওটা সুধীরদার কাছেই

আছে। ঘোমটা পরলে আমাকে কেমন দেখাবে? কে জানে। ওরা আমাকে এখনও ফ্রক পরিয়ে রাখছে, শাড়ি ছুঁতেই দেয় না ত আবার ঘোমটা।

চন্দনের ফোঁটা দিদির কপালে, এখান থেকে অবশ্য চন্দন বলে চেনা যায় না, মনে হয়, দিদি ঘেমেছে। এ আমার চোখের ভুল; মরা মানুষ কি ঘামে?

টাটকা-টাটকা তাজা ফুল, দিদির বিছানায় ছড়িয়ে দিল কে? খাটিয়া যারা এনেছে, তাদেরই কেউ হয়ত। ফুলের বিছানায় শুয়ে থাকতে দিদির বোধহয় ভালই লাগছে। গন্ধ কি টের পাচ্ছে ও? আমি কিন্তু পাচ্ছি, ভালই লাগছে। কাল ঠান্ডা লেগে সর্দি না হলে আরও ভাল লাগত। ওই ফুলে কাঁটা থাকে যদি, দিদি তাও টের পাবে না। মরণের সুবিধে ওই।

ফুলশয্যা হলে যেমন করে সাজাত, তেমন করেই সাজিয়ে দিয়েছে। পায়ে আলতা পরিয়ে দিল কে? কাকিমা? কাকিমা জানে না, দিদি আলতা মোটেই পছন্দ করত না। বলত সেকেলে। তা বলুক, আজ ত ওর পায়ের পাতার ফাটা দাগগুলো ঢেকেছে।

মা আর কাঁদছে না, কাঁদতে পারছে না, কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে পড়েছে। চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু একে কান্না বলে না! চোখে না দেখলে আর ব্যাপারটা জানা না থাকলে লোকে একে খুব দুঃখের গানের গুনগুন বলে মনে করতে পারত। এখন কাঁদছে কাকিমা, ও-বাড়ির মাসিমা। মাকে একটু জিরোতে দেবে বলেই বুঝি ওরা সুর চড়িয়েছে?

মাসিমা কী বলছে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। মাসিমা বলছে, খুকি, তোকে যে বিয়ের দিন আমি এভাবেই সাজিয়ে দেব ভেবেছিলাম!

মা চুপ করে ছিল, এই একটা কথায় আবার ডুকরে কেঁদে উঠল। এখন ওরা তিনজনেই কাঁদছে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে। বাবা কাঁদছে না, বাবা কোনদিন কাঁদে না, থমথমে মুখে বসে আছে। আর মাঝে মাঝে কপাল চাপড়ে কী বলছে বাবা? কী হল, হায়-হায়, আমার কী হল?

আমি কাঁদছি না কেন। চোখেও হাত ঘষে সামনে ধরে কতবার ত দেখলুম, এক ফোঁটা জল নেই। চোখ দুটোই জ্বলছে শুধু। আচ্ছা, আমি কি দিদিকে হিংসা করতাম, দেখতে পারতাম না? দূর, তা কেন। দিদি শাড়ি পরতে পেত, সাজত যখন খুশি তখন, তাই? যেমন সাজত, তেমনি বকুনিও খেত। মা বলত, বিবি বিবি প্যাটার্ন বিবি। তা বয়সে বড় দিদি ত সাজবেই। ওর চুল লম্বা আর ঘন, জোড়া-বিনুনি ঝুলিয়ে দিলে বেশ মানাত। আমার এই চুলে শুধু হর্স-টেল ঝুঁটি হয়। আর যা দিয়ে সাজত দিদি, আমাকে তার ভাগ ত দিতই। সুধীরদা দিদির সঙ্গেই বেশী গল্প করত? করুক না। গল্প করবার লোক কি আমারই নেই? ওই তার-খাটানো ছাদওয়ালা বাড়ির বিল্টু আমাকে ত বাক্স বাক্স চকোলেট দিতে রাজী, আমি যদি ওর সঙ্গে ট্যাক্সি চড়তে রাজী হই। চকোলেটে আমার রুচি নেই। সুধীরদা ফুলপ্যাণ্ট আর শার্ট পরে, বিল্টু পরে হাফপ্যাণ্ট আর কলারওয়ালা গেঞ্জি। সুধীরদা দিদিকে বিয়ে করত। বিল্টু বখাটেপনা করে বেড়ায়, বিল্টু বিয়ে করবে কী? লোকে বলে বিল্টু পরে পাড়ার গুণ্ডাদের সর্দার হবে। এখনই নাকি বড়-বড় মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে শিস দেয়। দিদিকে শুনিয়েও একদিন দিয়েছিল। দিদি চটেছিল। বলেছিল, সুধীরদা বিল্টুকে থাপ্পড় মারবে; বেয়ারাপনা আর যদি কোনদিন দেখে। তা আর মারতে হয় না। সুধীরদা ত এক নম্বরের ভীতু, আর, আর রোগা। বরং বিল্টুই ওকে পটকে দিতে পারে। হাফপ্যাণ্ট পরলে কী হয়, বিল্টুর গায়ে কম জোর নাকি। কোথায় মারামারি করে ডাণ্ডা খেয়ে ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরেছিল। দোষের মধ্যে শিস দেয়, দিক। সিনেমার গানের সুর হলে শুনতে মন্দ লাগে না। পাড়ার পুজোর প্যাণ্ডালে বিল্টুই ত গান বাজায়। বাছাই-করা রেকর্ড কোথা থেকে, কোথা থেকে সব জোগাড় করে আনে। আমরা শুনি। আমরা গুনগুন করে সুর তুলে নি। সিনেমা আর কটাই বা দেখা হয়ে ওঠে। সর্বজনীন মণ্ডপে বাজানো গানগুলোই আমরা শিখি। দুপুরে ছাদে উঠে অন্য বাড়ির রেডিওর 'অনুরোধের আসর' থেকেও।

বিল্টু এখন কিন্তু ফুলপ্যাণ্ট পরতে পারে। মারামারি করার পর ওর হাঁটুর ওপরে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে। খানিকটা মাংস খুবলে উঠে গেছে। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু অবধি ওর কুচকুচে কালো, বুনো জংলা-জংলা অসভ্য! দেখতে বিশ্রী লাগে। কই, আমার পা ত ওর মত কালো হয়নি, ঢেকে যায়নি। মেয়েদের, বোধহয় ঢাকে না। ঢাকলে আর ফ্রকে কুলোত না, শাড়ি দিয়ে ঢাকতে হত। তা হলে বোধহয় মা আমাকে শাড়ি পরতে দিত। আমার পায়ে যদি শুকনো দাগ থাকত ঘায়ের, তা হলেই কি দিত? দিত না। দিদির বিয়ে হয়ে যাবার আগে ত না। দিদির যেই বিয়ে হত অমনি আমার শাড়ি-পরার সিগন্যাল পড়ত। সিগন্যাল কথাটা দিদির কাছেই শিখেছি। দিদি শিখত সুধীরদার কাছে, তারপর আমাকে শেখাত। ফিসফিস করে বলত, আমার যদ্দিন বিয়ে না হচ্ছে, মা তোকে খুকি বানিয়ে রাখবে, বুঝলি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, আমার যেন শীগগিরই বিয়ে হয়ে যায়। বলত দিদি, চোখ টিপে হাসত। বিয়ে মানে ত সুধীরদার সঙ্গে? তুমি আর লোক খুঁজে পাওনি দিদি! সুধীরদা ত ভীতু।

ভীতু, তুমিই একদিন চাপা গলায় সুধীরদাকে বলেছিলে, কাপুরুষ। কাপুরুষ মানে কী? আমি তখন ঠিক জানতাম না। জানত না বোধহয় দিদিও। সুধীরদা ওকে যে-সব বই পড়তে দিত, নভেল আর গল্পের বই, তাই থেকে শিখেছিল।

সুধীরদা ত ভীরুই। শিস দিক বা আর যাই করুক বিল্টু, আজ ত এসেছে। খাট আর ফুল ত ওই কিনে এনেছে, ডেকে এনেছে দলের আর পাঁচজনকে। ওরাই বোধহয় দিদিকে বলে নিয়ে যাবে। আজ যদি বিয়ে হত দিদির, তা হলেও বিল্টুরাই আসত, জামার হাতা গুটিয়ে পরিবেষণ করত, দিদিকে পিঁড়িতে তুলে ওরাই সাত পাক ঘুরিয়ে দিত।

আর সুধীরদা? এখন পর্যন্ত এখানে আসবার সাহসই হল না। এক-একবার ওদের বাড়ির ছাদে উঠছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নেমে যাচ্ছে। দূর থেকে ভাল করে দেখার মত মনের জোরটুকুও নেই। পুরুষ না আরও কিছু!

পুরুষ যদি হত সুধীরদা, ছাদ থেকে নেমে আসত তরতর করে, ঝাঁপিয়ে পড়ত, হাত লাগাত সব কাজে। দিদিকে বিল্টু আজ এতবার করে ছুঁচ্ছে, আর তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছ? দিদিকে তুমি 'মণি', রানী', আরও কী-সব বলতে না? তোমার মণির শরীরটা আজ যে বারো হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল, সুধীরদা তুমি মানুষ?

কিন্তু বিল্টুটা এতবার করে ছুঁচ্ছেই বা কেন। একবার পা দুটো জড়ো করে ঠিক করে রাখল, একটু সঙ্কোচ নেই। দিদির মাথাটা একটু কাত হয়ে পড়েছিল, ও সোজা করে দিল। দিদি টের পায়নি, পেলে রাগে দিদির ঠোঁট দাঁতে গেঁথে যেত। নেহাত মরে গেছে দিদি, তাই বিল্টুও এ-যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু দিদিকে ছুঁয়ে কী সুখ পাচ্ছে বিল্টু, দিদির গা ত হিম। দিদি ত এখন একটা কাঠ। আমার শরীরও মাঝে মাঝে হিম হয়ে যায়, বিল্টু জানে। ও সেবার একজিবিশনে মেয়েদের গেটে ছিল না? বাবু ত ভলাণ্টিয়ার হয়েছিলেন। সুবিধে বুঝে খপ করে একবার আমার হাত—

সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিয়ে বলেছে, বাব্-বাঃ, যেন বরফ!

বরফ নয়, বিল্টু বরফ নয়। সময়টা ছিল শীতকাল, কনকনে ঠান্ডা, আর আমার গরম একটা জামাও নেই কিনা, তাই।

সেণ্টের শিশিটা মা আজ দিদির এই শেষ বিছানায় একেবারে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। ওই সেণ্টটা দিদির শখের জিনিস

ছিল। ওটা নিয়ে ওর কিপটেমির শেষ ছিল না। ফোঁটা ফোঁটা মাখত, তাও মাছা-মাছা দিনে। সুধীরদার সঙ্গে যেদিন লুকিয়ে দেখা করবার পালা, ঠিক সেই-সেই দিন। সুধীরদা জব্দ হত, দিদি ফিরে এসে আমাকে বলেছে। আজকাল দিদি আমাকে কিছু কিছু বলত, বন্ধুর মত করে নিয়েছিল। সুধীরদা অবাক হয়ে নাকি এদিক-ওদিক চাইত। গন্ধ কিসের? দিদি বলত, আমার। তোমার? দিদি হেসে বলত, আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, জান না? তার। দিদির গল্পের বই পড়া বৃথা যায়নি। কিন্তু সেণ্টটা পুরোপুরি কেন ঢেলে দিল মা? খানিক রাখলেও পারত। আমার জন্যে নাই-বা হল, ওটা দিদির একটা স্মৃতি ত!

অঘ্রাণেই বিয়ে হয়ে যেত দিদির, কিন্তু শ্রাবণেই সে গেল। বেশী ভুগল না কিন্তু, গোণাগুণতি পনেরো দিন বিছানায় ছিল। দিদির বয়স এই ভাদ্রে ঠিক চব্বিশ পূর্ণ হত। অবশ্য আসল বয়েস। লোকের কাছে মা বলতেন, উনিশ। লোকের যেমন দুটো করে নাম থাকে, ডাক নাম আর আসল নাম, দিদির তেমনি দুটো বয়স ছিল। আমারও আছে। আমার এই বাড়ন্ত-ভরন্ত শরীর, মা তবু লোকের কাছে বলেন, বয়স নাকি তেরো। যাদের বলেন, তাদের চোখ দুটো শুধু হাসে।

এতখানি বয়স পর্যন্ত যে দিদিকে অপেক্ষা করে থাকতে হল, তার কারণ বাবার হাতে টাকা ছিল না। ইন্সিওরেন্সের সাড়ে তিন হাজার টাকা বাবা পেয়েছেন মে মাসে। সঙ্গে সঙ্গে যোগাড়যন্তর শুরু। সুধীরদার সঙ্গে দিদির বিয়ে দিতে কি অমত ছিল বাবার? বোধহয় ছিল। নইলে মাসে দুবার করে পাত্রপক্ষ ডেকে মেয়ে দেখাবেন কেন। বিয়ের জন্যে তুলে-রাখা সাড়ে তিন হাজার টাকা চা-মিষ্টির খরচেই একটু-একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে দিদির খাটটার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়ে কি সেই সব কথাই ভাবছেন বাবা? নাকি, এই দু-সপ্তাহ ধরে তাঁর যা ছোটাছুটি গেছে, সেই কথা? ডাক্তারবাড়ি কমবার ছুটতে হয়নি বাবাকে। বাড়িতে ত একটা চাকর পর্যন্ত নেই? ওষুধের দোকানে বাবা ধরনা দিয়েছেন। মার সঙ্গে পালা করে দিদির শিয়রে রাত জেগেছেন। সে-সব কষ্টের আজ শেষ হল, বাবা তাই বুঝি নিশ্বাস ফেলতে পারছেন।

তুলে-রাখা টাকায় দিদির চিকিৎসা চলছিল। একটু-একটু করে বেরিয়ে যাচ্ছিল টাকাটা। মা ভয় পেয়েছিলেন, বাবাও। আমি টের পেয়েছি। আমি ওঁদের চুপে-চুপে আলোচনা করতে শুনেছি। যদি আরও দু-তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকত দিদি, তার পর সেরে উঠত, তা হলে? তা হলেই হয়েছিল আর কী! প্রায় সব টাকাটাই খরচ হয়ে যেত, দিদির আর বিয়েই হত না। কিংবা বাবাকে ধার করতে ছুটতে হত। দিদি সেরে উঠলেই ওরা তবে রেগে যেত—বাবা আর মা দুজনেই?—সর্বনাশ! দিদি মরে বেঁচেছে। নিজেই শুধু বাঁচেনি, বাবা-মাকে বাঁচিয়েছে।

গালে হাত দিয়ে চুপ করে বাবা সে-কথাই ভাবছেন না ত? এ-কথা ভেবে বাবা হঠাৎ যদি হো-হো করে হেসে ওঠেন? সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে। যার মরা মেয়ে খাটে শুয়ে, তাকে হাসতে নেই।

আচ্ছা, বাবার কি মন ছোট? মা ত তাই বলে। দিদিও বলত। মা সেবার অসুখ থেকে উঠতে না উঠতেই বাবা ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাকে বাসন মাজতে হত, শরীর তখনও সারেনি। বাবা পাই-পয়সার হিসেব রাখে। মার ছেঁড়া শাড়ি লুঙ্গির মত করে পরে। ধানবাদের বড়মামা সেবার যে ওঁদের ক্লাবের বই কেনার জন্যে

বাবার হাতে দেড়শো টাকা দিয়েছিলেন, বাবা কি সে-টাকার পুরোপুরি হিসেব দিয়েছেন? ছোট—ছোট—ছোট মন ওদের। ওরা আবার বাবা, ওরা আবার মা!

দিদিকে বিয়ে ওরা দিতই, পণ করেছিল। দিদির গড়ন নাকি নরম-নরম, মুখে লক্ষ্মী-শ্রী আছে। কতই না শ্রী! মাঝে ত সারা মুখ ব্রণে ভরে গিয়েছিল। আমার হাত-পা নাকি শক্ত শক্ত, আমার মুখে নাকি পুরুষালি ছাঁদ। আমাকে তাই ওরা ঠিক করেছে লেখাপড়া শেখাবে। মাথা থাকুক না থাকুক, পড়াশোনা আমাকে করেই যেতে হবে। আমি চাকরি করব, টীচার, টাইপিস্ট, নার্স বা ওইরকম কিছু হব। সব মিছে কথা, পুরুষালি ছাঁদ-ফাঁদ সব বাজে। আমাকে শাড়ি পরতে দাও, দেখবে আমিও মেয়েলি হতে পারি। তা ত না, আসল কথা, দুটো মেয়েকে পার করার মত ইনসিওরের টাকা তোমাদের নেই। বাবা রিটায়ার করলে পেনসনের টাকা অর্ধেক হয়ে যাবে ত, তাই আমাকে দিয়ে চাকরি করাবে ঠিক করে রেখেছিল। স্বার্থপর যত সব!



দিদিকে ওরা এবার নিয়ে যাবে। বিল্টুরা কানাকানি করছে। কাঁধে তুলতে গিয়ে কেউ যদি হেঁচকা টান দেয়? খাটটা মচমচ করে উঠবে। ওরা 'বল হরি'-ও বলবে নাকি? সে আমি শুনতে পারব না, দু কানেই আঙুল দেব।

মা ছটফট করছেন। মাসিমা-কাকিমারা মাকে ধরে রাখতে পারছেন না। বাবা উঠে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বাবার পা টলছে, শরীর থেকে থেকে থরথর করে কাঁপছে, চৌকাঠের কাঠটা শক্ত করে চেপে ধরে বাবা সামলে নিচ্ছেন।

কিন্তু মাকে সামলায় কে? মা কোন বাধাই মানছেন না। কোথা থেকে ছুটে এসে মা দিদির বাক্সটা ছুঁড়ে ফেললেন উঠোনে। সেই সিল্কের শাড়ি দুটো বেরিয়ে পড়ল। ও দুটোও মা দিদির সঙ্গে তুলে দেবে নাকি ইস্! মেরুন রঙের শাড়িটাই ত দিয়েছ, বেশ করেছ, এ-দুটো আবার কেন। ও-বাড়ির মাসিমার বুদ্ধি আছে, তিনি শাড়ি দুটোকে গুছিয়ে ফের ভরলেন বাক্সে, দাওয়ায় তুলে রাখলেন।

মাসিমার চোখে কিন্তু জল। জল কাকিমার চোখেও। কিন্তু মার মত হাউ-মাউ কেউ করছে না। আঃ মা, তোমার পায়ে পড়ি একটু চুপ কর, আমার চোখের পাতাও ভিজে ভিজে লাগছে, ঠেকাতে পারছি না। দিদি আমারও ত কম ছিল না। ঝগড়া করেছি, হিংসে করেছি। তবু রাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে এক খাটেই শুয়েছি ত! দিদি আমাকে মারত, কিন্তু মার-খাওয়া থেকে বাঁচাতও। দিদি আমাকে সব কিছুর ভাগ দিত। সুধীরদা বাদে সব কিছুর। আচার, মুড়ি-ভাজা সব। আমরা লুকিয়ে কুল খেয়েছি। সব মনে পড়ে [illegible] আমার চোখ ভেঙে জল বেরুচ্ছে [illegible]। দিদি [illegible] ব্লাউজটাও পুরনো হলে আমাকে পরতে দেবে বলেছিল।

চোখ ঝাপসা, তবু দিদির কানের দুটো চিকচিক করছে দেখতে পাচ্ছি। ছোট্ট লাল পাথর দুটো দু-ফোঁটা রক্তের মত কানের গোড়ায় জমে আছে। মা আছড়ে পড়েছিলেন দিদির খাটের ওপরে, দিদিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছিলেন। চিকচিক করে উঠল বলেই মা বুঝি পাথর দুটোকে দেখতে পেলেন। রক্তের ফোঁটা মনে করেই মা সে-দুটিকে মুছে দিতে গেলেন। আর চমকে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

নিষ্পলক চোখে, মা চেয়ে আছেন মাসিমার মুখের দিকে। চোখের তারায় তারায় কী কথা হল আমি জানি না। মাসিমা চোখের জল মুছতে মুছতেই উঠে গিয়ে বাবাকে ফিসফিস করে কী বললেন। বাবা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন শুধু। কিন্তু কথাটা বুঝি বিল্টুও শুনেছে, বুঝতে পেরেছে। বিল্টু আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিদির কানের গোড়ায় আমি দেখতে পাচ্ছি। টান পড়েছে, দিদি 'উঃ' করে উঠছে না ত। বিল্টুর পাকা হাত, দুলজোড়া আলগোছে ছাড়িয়েও আনল কিন্তু। মার হাতে তুলে দিল। চোখ মেলে মা বুঝি একবার দেখলেন, জিনিসটা কী। হাতের মুঠোয় সেটাকে শক্ত করে ধরে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন। একেই বুঝি মূর্ছা-যাওয়া বলে? ...... ...

এই সুযোগে ওরা দিদিকে সুদ্ধ খাটটা কাঁধে তুলে নিল। রাস্তায় পড়ে ওরা যেই হরিধ্বনি দিল, অমনই আমার বুকের ভিতরটা এ-রকম করে উঠল কেন? খোলা দরজা-জানালা পেয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হু-হু করে খালি ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমি কাঁদছি, আমার বুকের ভার সেই সঙ্গে যেন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণে আমি কাঁদলাম, কাঁদতে পারলাম, তবু আড়চোখে দাওয়ায় রাখা দিদির বাক্সটার দিকে বারবার চাইছি কেন? ওর ভিতরে গাঢ়-গোলাপী আর জংলা রঙের দুখানা শাড়ি আছে, সেই শাড়ি আমি এবার পরতে পাব, সেই কথাই ভাবছি না ত! একই সঙ্গে এই কুচিন্তা আর কান্না? ছি-ছি।

ছি-ছি বললেই ত ভাবনা যায় না। দিদির দুলজোড়া মা শক্ত মুঠিতে ধরেই বা আছেন কেন। এ-কথা মার কি হঠাৎ মনে হয়নি যে, ওই সোনা আমার বিয়েয় লাগবে? বাবার ইন্সিওরেন্সের টাকার প্রায় সবটাই ত তোলা রইল। বয়সে আমি ছোট, তাই কি আমার মনও ছোট? নইলে চোখ মুছছি আর যত ছাই-ভস্ম ভাবছি? কী ভাবছি? —দিদি মরেছে তাই আমি বেঁচে যাব, [illegible] আমার এবার বিয়ে হবে। কী যা-তা ভাবনা, ছি-ছি!

# অস্থি নর্মদা তীরে

ধরণী সেন

নরসিংপুরে নর্মদার জীবাশ্মময় খাড়াই পাড়
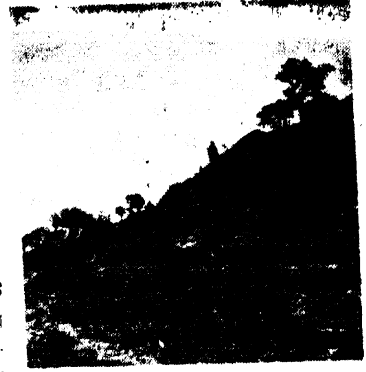
মধ্যপ্রদেশের অন্যতম প্রাচীন তীর্থ অমরকণ্টকের একটি প্রস্রবণ হইতে উত্থিত নর্মদা নদ নানা দেশ ও জনপদের মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে বোরোচের নিকট কাম্বে উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতমালা বেষ্টিত নর্মদা ও তাঁহার অববাহিকা ভারতবর্ষের যেন দীর্ঘ হৃদ-রেখা রচনা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বহুধারা এই অববাহিকা অঞ্চলে মিলিত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রাক্ ইতিহাসেও নর্মদা অববাহিকার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই অববাহিকার স্তরে স্তরে, ইহার রক্তিম পলিল মাটিতে, উপলখণ্ডে ও কৃষ্ণমৃত্তিকায় প্রস্তরযুগের আদিমানবের সংস্কৃতির নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও, নর্মদার তীরাঞ্চলের নানা স্তরে স্তনাপায়ী জীব-জন্তুর প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। দীর্ঘ ও প্রশস্ত নর্মদা অববাহিকা একদা যে প্রাগৈতিহাসিক মানব ও সমকালীন জীব-জন্তুর লীলাক্ষেত্র ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকের ধারণা যে, এই নর্মদা অববাহিকার কোন স্তরে প্রশীল মানবের (Fossil Man) অস্থি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

নর্মদার এই প্রাক্-ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে একদা এক গ্রীষ্মাবকাশে আমরা বোম্বাই-মেলযোগে জব্বলপুর হইয়া সরাসরি নরসিংপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এবং নরসিংপুর সফর শেষ করিয়া হোসাঙ্গাবাদ যাইবার পরিকল্পনা করিলাম। নরসিংপুর ছোট একটি রেল স্টেশন, সেখানে নামিয়া আমরা সোজা ডাক-বাংলোয় উঠিলাম। চৌকিদার পরিবার আমাদের খাওয়া থাকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিল।

পরদিন প্রত্যূষে একটি স্থানীয় টাঙ্গা-যোগে সাত মাইল কাঁচা-পাকা পথ অতিক্রম করিয়া আমরা নর্মদার শাখানদী শের তীরবর্তী দেবকাছার গ্রামের নিকট পৌঁছাইয়া টাঙ্গা ছাড়িয়া দিলাম। শের ছোট নদী, গ্রীষ্মে জল অগভীর তাই পারাপার হওয়া যায়। তীরবর্তী পাড়ের স্তরবিন্যাস পরীক্ষা করিতে করিতে কয়েকটি পাথরের হাতিয়ার ও প্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া গেল, বিশেষ করে নীচের উপল-খণ্ডের স্তর থেকে। কিন্তু রৌদ্রে ও জলে তাহাদের আকৃতি বিনষ্ট প্রায়। অপেক্ষাকৃত ভাল প্রমাণ অনুসন্ধানে আমরা অপর তীরবর্তী পাড় পরীক্ষা করিলাম: উপরে কৃষ্ণমৃত্তিকা, নীচে লালমাটি ও উপলখণ্ডের প্রশস্ত স্তর দেখিলাম—কিন্তু এখানে জীবাশ্ম বা পাথুরে অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল না। শের নদীর এপার-ওপার পরিভ্রমণ করিতে করিতে বেশ বেলা হইয়া গেল। সূর্য মধ্যগগনে, তপ্ত বায়ু, শুষ্ক তালু,—অতএব প্রত্যাবর্তনের পালা। একটি সবজী ক্ষেতের আল দিয়া ফিরিতেছি—দেখি এক কৃষক একটি বৃহৎ ফুটি হাতে আমাদের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, কৃষক ভাইর সাথে গল্প করিতে করিতে আমরা সুমিষ্ট ফুটির সদ্ব্যবহার করিলাম।

নরসিংপুরে রাত্রেও বেশ গরম—তাই আমরা বাংলোর বাইরে শয়ন করিলাম। নিস্তব্ধ প্রকৃতি, শুধু ঈষৎ হাওয়ায় বৃক্ষ-পত্র মর্মরিত। চৌকিদার আমাদের জানোয়ারের ভয় নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত করিল। পরদিন প্রত্যূষে 'নাস্তা' আহার শেষ করিয়া আমরা নর্মদা ও শের নদীর সঙ্গম তীরবর্তী ছোটি-রাতকাতার গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

রাতকাতার ছবির মত ছোট একটি গ্রাম—তারই নীচে প্রবাহিত নীল নর্মদা। আমরা ক্রমশ উপরের পাড় হইতে নীচের তটরেখায় নামিয়া আসিলাম—নর্মদার নীল জল নয়ন তৃপ্ত করিল। অদূরে বিস্তৃত ধূসর

নর্মদা ও শের নদীর দৃশ্য
(নরসিংপুর)

বিন্ধ্যপর্বতমালা—চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। অপর পাড়ে বেগমঘাটে ছোট একটি নৌকা বাঁধা।

নর্মদার তীরে নগন খাড়াই পাড়ের নিম্নে নদী-বরাবর আমরা যত অগ্রসর হইতে থাকি—আমাদের লক্ষ্যবিদ্ধ হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা বৃহদাকার জীবাশ্মে। এই জীবাশ্মগুলি প্রস্তরযুগের স্তন্যপায়ী জীবজন্তুদের—যেমন হস্তী, জলহস্তী, গণ্ডার, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি। আদিমানব এই সকল জন্তুদের শিকার করিত। জলের একধারে দেখিলাম, স্থানীয় এক রজক নন্দন হাতির ঊর্বাস্থির উপর নির্বিবাদে তাহার কাপড়গুলি কাচিতেছে! নর্মদার যে স্তরগুলি থেকে জীবাশ্ম পাওয়া যায়—সেই স্তরগুলি আদিমানবের সৃষ্ট পাথরের অস্ত্রশস্ত্রেও পূর্ণ। আদিমানবের সংস্কৃতির এইরূপ কয়েকটি নিখুঁত নিদর্শন আমরা সংগ্রহ করিলাম।

হোসাংগাবাদে নর্মদাতীরস্থ উঁচু পাড়

নর্মদার এই উঁচু পাড়গুলির স্তরবিন্যাস মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ নীচে নর্মদার জল স্পর্শ করিয়া আছে বড় উপলখণ্ডের বিস্তৃত জমাট স্তর ও তাহার উপর গোলাপী বা ঈষৎ রক্তিম মাটির স্তর—নীচের এই দুইটি স্তর 'নিম্ন-নর্মদা' এবং ইহার উপর প্রায় অনুরূপ আর দুইটি স্তর—'উপর-নর্মদা' স্তর নামে অভিহিত। সবার উপর কৃষ্ণমৃত্তিকার স্তর বা তুলা-মাটির স্তর। দাক্ষিণাত্যের তুলাচাষের উর্বর ক্ষেত্র এই কৃষ্ণ মৃত্তিকা। এই কয়েকটি ভূস্তরে নর্মদা তাহার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক ভূমিকা রচনা করিয়াছে। মধ্য-নর্মদার এই তীরাঞ্চল হইতে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক তথ্য আমরা পাইলাম—তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাথরের তৈরী বিভিন্ন আকার ও প্রকারের নানা হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র। ইহাদের মধ্যে একদিকে দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি এবং অপরদিকে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। নীচের স্তর

নর্মদার উপলখণ্ড ও লাল মাটির স্তর
হোসাংগাবাদ

হইতে ক্রমশ উপর স্তর পর্যন্ত এই দুই সংস্কৃতির বিবর্তনও স্পষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণমৃত্তিকার স্তরে যে ক্ষুদ্রাকারের অস্ত্রশস্ত্র পাইলাম—সেইগুলি যেমন ভিন্ন পাথরের তৈরী তেমনি তাহাদের আকারপ্রকার ও নির্মাণপদ্ধতিও ভিন্ন। এই সংস্কৃতির বয়সকাল পুরা প্রস্তরযুগের শেষ অধ্যায়।

আমাদের নরসিংপুরে-নর্মদা সফর শেষ—বেশ ভালই হইল—অনেক কিছু সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ক্লান্ত চরণে আমরা বাংলোয় ফিরিলাম। স্থির করিলাম, পরদিন প্রত্যুষে আমরা হোসাংগাবাদ যাত্রা করিব।

হোসাংগাবাদে আমাদের সহচর হইলেন সাগর (মধ্যপ্রদেশ) নিবাসী আমাদের এক বন্ধু—যিনি প্রত্নতত্ত্বের অনুরাগী এবং হোসাংগাবাদ এলাকার খবর যাঁহার নখদর্পণে। এখানে আমরা ছোট ডাকবাংলোয় আশ্রয় লইলাম, কারণ বড় ডাকবাংলোয় স্থান অকুলান—সরকারী অফিসারদের নিত্য যাওয়া-আসা। ছোট বাংলোয় অবশ্য আমাদের কোন অসুবিধাই হইল না—বৃদ্ধ চৌকিদার আমাদের তদারকের সমস্ত ভার লইল। তবে নরসিংপুরের মত হোসাংগাবাদ তেমন নিরালা নয়, কিঞ্চিৎ জনবহুল।

নর্মদার জমাট উপলখণ্ডের পাড়

হোসাংগাবাদে পৌঁছাইতে আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সে রাত্রির মত আমরা নিকটস্থ এক হোটেলে আহার করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে বাংলোর নিকটস্থ 'ঘোড়া-সা-পীর'-এর নীচে নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলে নদী বরাবর পাড়ি দিলাম। পুণ্যসলিলা নর্মদায় অনেকে স্নান করিতেছে ও নিকটে এক মন্দিরে পূজা নিবেদন করিতেছে। এখানে নর্মদা বেশ প্রশস্ত এবং কোথাও কোথাও জল সুগভীর। এখানেও নরসিংপুরের অনুরূপ ভূস্তর এবং সেই ভূস্তরে জীবাশ্ম এবং আদিমানবের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার পাওয়া যায়। প্রথম দিন আমরা 'পুনপুন' পুল পর্যন্ত পাড়ি দিলাম এবং কিছু নমুনা সংগ্রহ করা গেল। পুনপুন পুলে উঠিয়া নর্মদার দৃশ্যটি উপভোগ্য, তাই আমরা

নর্মদার রেলপুল, হোসাংগাবাদ

আবার বৈকালে সেখানে বেড়াইতে গেলাম। কিন্তু হায়, কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে মেঘ করিয়া আসিল এবং হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি পাইল। নর্মদার শান্ত নীল জল তরঙ্গায়িত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই পশ্চিমের 'আঁধি' অর্থাৎ প্রচণ্ড ধুলোর ঝড় শুরু হইল। সে এক অদ্ভুত অবর্ণনীয় দৃশ্য—আমরা ছুটিয়া এক কৃষকের কুঠীরে আশ্রয় লইলাম। মিনিট পনেরো পরে প্রকৃতি আবার প্রশান্ত ও শীতল হইল। আমার মনে হইল যে, আদিমানব ইহার অপেক্ষাও রুদ্র আঁধি ঝড় জল নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। অন্যত্র তাহার প্রমাণও আছে।

শুনিয়াছিলাম যে, নর্মদা-রেলপুলের নিকটে যে উঁচু পলিমাটির বিভিন্ন স্তর আছে সেখানেও নাকি প্রস্তরযুগের প্রচুর জীবাশ্ম ও পাথরে হাতিয়ার পাওয়া যায়, কলকাতার যাদুঘরে তাহার কিছু প্রমাণ রক্ষিত আছে। পরদিন টাঙ্গাযোগে রেলপুলের উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা করিলাম। সুদীর্ঘ ও সুদৃশ্য নর্মদার এই রেলপুলটি। পদব্রজে পুলটি অতিক্রম করিতে বেশ সময়
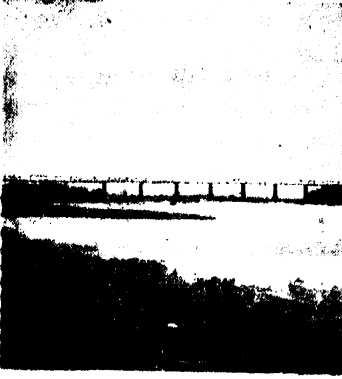
নর্মদার একটি দৃশ্য

লাগিল। দেখিলাম, স্কুলের ছেলেরা বই-খাতা হাতে পুল পার হইয়া হোসাংগাবাদের দিকে যাইতেছে। সাবধানে পুল পার হইয়া ক্রমশ আমরা নীচের পাড়ে অবতরণ করিলাম। নদীর দিকে বালুকাময় কিন্তু উঁচু পাড়ের নীচের তলায় জমাট উপলখণ্ডের প্রাচীন স্তর। তাহার উপর লালমাটির স্তর এবং সর্বোপরি কৃষ্ণ-মৃত্তিকা। অনেকগুলি পাথরের হাতিয়ার আমরা নীচের ভূস্তর হইতে সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু জীবাশ্ম পাওয়া গেল না।

নদীতে বেশ বালির চড়া পড়িয়াছে, গ্রামবাসীরা স্নানে নামিয়াছে, মেয়েরা কলসী কাঁকে সার বাঁধিয়া জল আনিতে যাইতেছে। পুলের নীচে জেলেরা মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে জাল দিয়া জল বাঁধিয়েছে। একধারে পারাপারের একটি নৌকা বাঁধা। নর্মদার এই গ্রাম্য দৃশ্যটি অতি মনোরম। পুল পার হইয়া আবার হোসাংগাবাদে আসিয়া পুলের ঠিক নীচে নামিয়া দেখিলাম ছোট ছেলেদের ভীড়—বালির ভিতর থেকে সাগ্রহে তাহারা পয়সা সংগ্রহ করিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্বেই একটি ট্রেন গিয়াছে—যাত্রীরা পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নর্মদার জলে তাম্রমুদ্রা নিবেদন করিয়াছে—তাই ছেলেদের ভীড়! ছেলেরা চলতি পয়সার অনুসন্ধান করে, আমরা করি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার। আজকের এই চলতি মুদ্রাও ক্রমশ কালের গর্ভে ভূস্তরে আত্মগোপন করিবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে শতসহস্র বৎসর পরে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক তাহার পুনরুদ্ধার করিবেন।

বাংলোয় ফিরিয়া স্থির করিলাম যে, পরের দিন আদমগড়ের চিত্রিত গুহা দর্শনে যাত্রা করিব। আদমগড় আমাদের বাংলো হইতে মাত্র আড়াই মাইল পথ এবং হোসাংগাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত। চৌকিদারকে বলা হইল একটি টাঙ্গার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে।

পরের দিন খুব ভোরে আদমগড়ের গুহার উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা করিলাম। সুন্দর মসৃণ রাস্তা—দুইধারে বৃক্ষের সারি আর সবুজ ক্ষেত। কিছুক্ষণ পরেই আমরা আদমগড়ে হাজির হইলাম। রাস্তার ধারে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি সাইন-বোর্ড লাগান। রাস্তা হইতে স্বল্প উচ্চে লাল বালু পাথরের দীর্ঘ এক টিলার উপর পরিব্যাপ্ত প্রস্তরাশ্রয় ও গুহাগুলি অবস্থিত। প্রাকৃতিক ক্ষয়বিক্ষয়ের ফলে বালু পাথরের এইরূপ অঙ্গবিন্যাস হইয়াছে।

নগ্ন পাথরের টিলার উপর দিয়া ক্রমশ আমরা উপরে উঠিয়া আসিলাম। নাতিদূরে নীচে বিস্তৃত নর্মদা উপত্যকা এবং তাহার উত্তরে বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। আদমগড়ের এই টিলার লালপাথর বিন্ধ্য-পর্বতেরই অংশবিশেষ। একদিকে একদল মজুর এই পাথর কাটিয়া খানখান করিতেছে—গৃহনির্মাণে এই সুদৃশ্য ও শক্ত পাথরের বিশেষ কদর। সবশুদ্ধ প্রায় ২৫—৩০টি প্রস্তরাশ্রয় ও গুহা এখানে দেখিলাম—তন্মধ্যে ১৫ ১৬টি চিত্রিত। চিত্রিত প্রস্তরাশ্রয়ের মধ্যে মোট ১১টি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। এই ১১টি চিত্রিত প্রস্তরাশ্রয় ব্যতীত, ঐ লাইনেই আরো ৩টি চিত্রিত আশ্রয় আছে। এই চিত্রিত আশ্রয়গুলি পূর্বমুখী—সূর্যালোকে প্রাচীন শিল্পীদের কাজ লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কেবল ১০নং প্রস্তরাশ্রয়টি পশ্চিমমুখী।
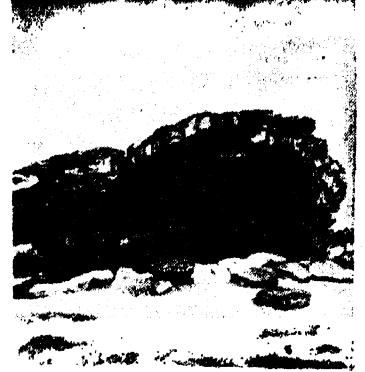
আদমগড়ের একটি বৃহৎ প্রস্তরাশ্রয়, হোসাংগাবাদ

চিত্রগুলির অধিকাংশই লাল রঙ। কালচে বাদামী, মলিন বা পীতাভ সাদা ও বাদামী হলদে রঙের চিত্রও কিছু দেখা যায়। চিত্রের বিষয়বস্তুগুলি বিচিত্র ও নানা দৃশ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রের এই বিষয়বস্তুর মধ্যে নানারকম যুদ্ধবিগ্রহ ও মৃগয়ার দৃশ্যাবলী, এবং মেষপালক ও পশুচারণের দৃশ্য বিশেষ

আদমগড়ের গুহাচিত্র

উল্লেখযোগ্য। তীরধনুক হাতে শিকারী মানুষ বা যোদ্ধার চিত্র যেমন দেখা যায়, তেমনি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন ঢাল বল্লম বা বর্শা হাতে যুদ্ধরত সৈনিকের চিত্রও দেখা যায়। আদমগড়ের এই যুদ্ধের চিত্রণ পাঁচমারি ও সিংগনপুরের গুহাচিত্রের প্রায় অনুরূপ।* চিত্রণগুলি দেখিয়া মনে হয়, যেন একদিকে তীর ধনুকধারী আদিবাসী দল এবং অপরদিকে কোন উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকদল যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছে। এই দুই দল যে বিভিন্ন সংস্কৃতি বা সভ্যতাভুক্ত তাহা সুস্পষ্ট। ১০নং এবং অন্য দুই একটি প্রস্তরাশ্রয়ের দেওয়ালে একদিকে যেমন সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে বল্লমধারী সৈনিক, অপরদিকে তীরধনুক হাতে পদাতিক মানুষের সুন্দর চিত্রণ দৃষ্ট হয়। কোথাও কোথাও হাতাহাতি যুদ্ধের চিত্রণও দেখা যায়। আমাদের ধারণা, প্রাগাধুনিক কোন ঐতিহাসিক যুগে কয়েকশত বর্ষ পূর্বে মধ্যপ্রদেশের কোন আদিবাসীরা এই চিত্রগুলি অংকিত করিয়াছে। অবশ্য সকল চিত্রই যে একই সময় অংকিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আদমগড়ের গুহাচিত্রণের বয়সকাল কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতক হইতে খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত।

প্রায় প্রতি প্রস্তরাশ্রয়ের গাত্রে নানা জীবজন্তুর চিত্রেই প্রাধান্য দেখা যায়। যে সকল জীবজন্তু চিত্রিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ আজও মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চলে দেখা যায়, যেমন—বন্য বৃষ, হরিণ, গবাদি, হাতি, বাঘ প্রভৃতি। তবে গৃহপালিত বা গ্রাম্য পশুর চিত্রণই বেশী। পশ্চিমমুখী ১০নং প্রস্তরাশ্রয়ে জীবজন্তুর চিত্রণের মধ্যে জিরাফের অনুরূপ একটি অদ্ভুত প্রাণীর চিত্রণ বিশেষ দ্রষ্টব্য। জিরাফ আফ্রিকাবাসী, ভারতবর্ষে জিরাফ পাওয়া যায় না। জিরাফের অনুরূপ কোন প্রাণী প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে ছিল কিনা বলতে পারি না। তবে উত্তর ভারতে শিবালিক অঞ্চলে হিমযুগের পূর্বে 'শিবাথেরিয়াম্' নামে জিরাফের মত একটি প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই শিবাথেরিয়ামের চারিটি শৃংগ ও একটি শুঁড় ছিল এবং তাহার আকার ছিল গণ্ডারের অপেক্ষাও বৃহৎ। আদমগড়ের জিরাফ-অনুরূপ প্রাণীটির অবশ্য এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যাহা হউক, এই চিত্রণটির সঠিক সনাক্তিকরণ এখনও হয় নাই।

আদমগড়ের এই সকল চিত্রবিচিত্রিত গুহা ও প্রস্তরাশ্রয়গুলি দেখিতে দেখিতে মনে হইতেছিল যেন আমরা কোন এক বিস্ময়কর

আদমগড়ের চিত্রিত প্রস্তরাশ্রয়, হোসাংগাবাদ

চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছি। এই চিত্রণগুলির শিল্পী যে কাহারা এবং কোন্ যুগের তাহা আমরা সঠিক জানি না, যদিও মনে হয়, কোন আদিবাসীদের দ্বারাই এই চিত্রণগুলি অংকিত। সঠিক কি কারণে বা অনুপ্রেরণায় এই বিষয়বস্তুগুলি তাহারা অংকিত করিয়াছে তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। হোসাংগাবাদে ফিরিয়া শুনিলাম যে, সন্ধ্যার পর আদমগড়ের এই প্রস্তরাশ্রয় ও গুহার এলাকায় যাইবার সাহস নাকি কাহারও নাই। কিংবদন্তী যে, রাত্রির অন্ধকারে নাকি এই স্থানে ডাকিনী যোগিনীরা আসিয়া তাহাদের আসর জমায়। শহর থেকে বেশ দূরেই এক নিরালা উপ-পুরে আদমগড় অবস্থিত বটে এবং চোর ডাকাত যদি ইহার নির্জন প্রস্তরাশ্রয়ে কখনও রাত্রিবাস করে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

আদমগড়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা পরের দিন প্রত্যূষে বাসযোগে ইটার্সি রওয়ানা হইলাম এবং ইটার্সি রেল স্টেশনে কলিকাতাগামী ডাউন বোম্বাই মেল ধরিলাম।

আদমগড়ের গুহাচিত্র

---

* শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬২ দ্রষ্টব্য।

# পুজোর চিঠি

নিশিকান্ত

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী
দক্ষিণ ভারত
মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৬৫।

পরম স্নেহাস্পদাসু,
আল্পনা দিদিমণি,

সফল তোমার 'আল্পনা'-নাম, রইল অবিচ্ছিন্ন,
তোমার নামে ঐ অমলার কমল-চরণচিহ্ন।
আশ্বিনে ঐ মহাশ্বিনা
বাজায় সোনার আলোর বীণা,
ঝংকারে তার তোমার কথার কলধ্বনির ঝর্ণা,
আমার মলিন মানস-লতায় করলো কনকবর্ণা।

মুক্ত-স্বভাব রুদ্ধ ছিল, লেখন ছিল বন্ধ!
তোমার চিঠির জবাব দিতে পেলাম লেখার ছন্দ;
তোমার চিঠি পুজোর আগে
মহালয়ার লগ্নে ডাকে!
সেই ডাকে মোর দুর্গতিতে দুর্গা অবতীর্ণ,
তাই প্রেরণার উৎসে আমার পাষাণ-বাধা দীর্ণ।

ডাক দিয়েছ, ডাকটিকিটে ছাপ-লাগানো পত্রে
কোমল হাতের আখর আঁকা মাত্র কয়েক ছত্রে।
এই অঘটন তাই তো ঘটে,
সুদূরকে পাই সন্নিকটে,
পূর্বাচলের চূড়ায় ওঠে অস্তাচলের প্রান্ত!
আজ দশমীর পান্থা পেলো পঞ্চাশী এই পান্থ।

(২)

আনন্দে আজ আমার মনে তোমার কচি-মন পাই!
পণ্ডিচেরীর সাধন পথেই শান্তিনিকেতন যাই।
আমবাগানে, শালবীথিকায়
খেলার সাথী পাই যে তোমায়;
খোয়াইডাঙার কেয়ার গন্ধে কাঁটায় করি তুচ্ছ,
তোমার হাতেই শিউলি তুলি, দুলাই কাশের গুচ্ছ।

রাতপ্রভাতের সূর্য ওঠাই পারুলডাঙার প্রান্তে;
ধানক্ষেতে যাই শিশিরকণার মোতির মালা আনতে।
কাঁসর-শানাই-শঙ্খে বেজে
আদিত্যপুর ডাক দিয়েছে!
বোলপুরে আজ তোমায় নিয়ে পুজোর বাজার করলাম,
তোমায় দিলাম নতুন শাড়ি, নতুন ধুতি পরলাম।

এসেছি 'কঙ্কালীতলায়'! সতীর মেরুদণ্ডে
স্মরণ করে, অখণ্ডাকে পেলাম ভূমিখণ্ডে;
এই ভূমিতে মাতৃপুজোয়
অঞ্জলি দেই দশভূজায়'
এই বিজয়াদশমীতেই তোমার জন্ম-লগ্ন
উমার জন্ম-উৎসবে আজ আমায় করে মগ্ন।

(৩)

বিকেলবেলার হলুদ-রোদে সাঁওতাল গ্রাম সাজলো,
সাঁওতালেরা মাদল বাজায়, সাঁওতালীরা নাচলো।
ঐ গোধূলির গোয়ালপাড়ায়
দিনের ধেনু গোষ্ঠে মিলায়!
লক্ষ্মীপূজোর শশীর সুধায় শ্রীনিকেতন তৃপ্ত;
দীপান্বিতায় আমার প্রদীপ তোমার শিখায় দীপ্ত।
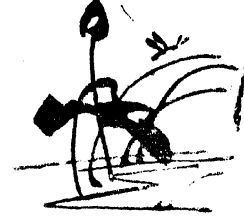
সূর্যিমামার কপালে ঐ পাবনী-মার অগ্নি!
ছেলেরা সব ভাই হয় আজ, মেয়েরা হয় ভগ্নী।
ফোঁটা-দেবার ফোঁটা-নেবার
আনন্দে নাই অবধি আর!
তোমার ফোঁটায়, আমার ভালে ভাই-দ্বিতীয়ার চন্দ্র;
তোমার কথায়, যমের দ্বারে কাঁটা-দেবার মন্ত্র।

বনভোজনের সুরুল-বনে তোমার কাছে পৌঁছাই;
মউল-বনের ভ্রমর হয়ে তোমায় মনের মৌ চাই।
দীঘল পাতার ডাল নাচিয়ে
তালবনে করতাল বাজিয়ে
দুলিয়ে তোমার অঞ্চলে ঐ দিগ্বালিকার অঞ্চল
পূজোর-ছুটি-ছোটার হাওয়ায় তোমায় করি চঞ্চল।

(৪)

ঐ আমাদের আম্রকিবন, ঐ তো বেণুকুঞ্জ!
পথের বাঁকে 'ছাতিমতলায়' দেখছো কিছু, শুনেছো?
শুনতে পেলাম, দেখতেও পাই,
বিস্ময়ে মোর অন্ত যে নাই—
সম্মুখে ঐ 'মহর্ষিদেব' স্নিগ্ধ অমল-কান্তি!
ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন "ওম্-শান্তিঃ-শান্তিঃ"।

নীচু বাংলা নয় নীচুতে, সপ্ত ঋষির ঊর্ধ্ব
ঐখানে পায় কোন দেবায়ন, 'দেবর্ষি' হন মূর্ত!
নিখিল-জ্যোতির-অতল সাধি,
নির্বিকল্পে তাঁর সমাধি;
শালিখ-চড়ুই-কাঠবিড়ালীর নর্তনে তাঁর অঙ্গ
বনস্পতির মতন অটল! হয় না তপোভঙ্গ।

আজ 'বুধবার', পুণ্যদিবস! মন্দির-দ্বার মুক্ত,
হই সমবেত উপাসনায় আমরা সবাই যুক্ত
আজ 'গুরুদেব' আচার্য হন!
জীর্ণ কালের ম্লান-আবরণ
ছিন্ন কোরে সবার প্রাণে তাঁর উজ্জ্বল উক্তি
হিরণ্ময়ের সূর্য আনে, বিলায় বিমল মুক্তি।

নীরব-পূজোর কলাভবন! নীরব ছাত্র-ছাত্রী!
শিল্পগুরু'র তুলির রেখায় আসেন জগদ্ধাত্রী।
'শারদোৎসব' অসাঙ্গ হয়—
গুরুপল্লীর অঙ্গনে রয়
গল্পকথায় হাস্য-সুধায় 'ঠাকুরদাদায়' স্বচ্ছন্দ!
মহাবিদ্যা-পূজোর প্রভায় 'শাস্ত্রীমশাই' প্রোজ্জ্বল।

আজ অরূপা রূপের ফুলে হয় অবনী-বৃন্তা!
আজ শারদায় বরণ-করার গান শোনালেন 'দিন-দা'।
সে গান শুনে নাট্যঘরে
'শান্তি', 'সাগর' নৃত্য করে;
সেই নাচে যোগ দেয় 'যমুনা', 'নন্দিতা' আর 'গৌরী';
বাঁধের জলে পদ্ম নাচে, আর নাচে পানকৌড়ি।

(৫)

তরুর গায়ে, লতার গায়ে হাত বুলালাম যত্নে!
তাদের কাছেই পেলাম আমার স্মৃতির কুসুমরত্নে।
এই উদ্যান-বিদ্যালয়ে
আমি ছিলাম বালক হ'য়ে,
শৈশবে-কৈশোরে ছিলাম; হ'লাম তোমার সঙ্গী!
আমায় দ্যাখো, রাখো আমার ছেলেবেলার ভঙ্গি।

ঐ মালতীবিতান-তলে পেয়েছিলাম দীক্ষা,
পেয়েছিলাম মাতৃভাষার বর্ণমালার শিক্ষা।
শিরিষ-তলায় ভূগোলপাঠে
যেতাম গ্রহতারার বাটে!
চাঁপাতলায় প'ড়েছিলাম রবিনহুডের গল্প;—
কালকে শুনো, আজকে শুধু আমার কথাই ব'লব।

অধ্যাপকের অধ্যাপনায় আসে না বিশ্রান্তি,
শিক্ষাব্রতীর শিক্ষালাভে নাই কখনো ক্লান্তি।
অধ্যয়নের পর্ব চলে
কদমতলে, বকুলতলে;
তেঁতুলবিচির যোগ-বিয়োগে পাটীগণিত শিখলাম,
হাঁসের পাখার কলম দিয়ে—দুর্গা সহায়—লিখলাম'

মেঘ হ'য়েছে, হবেই ছুটি হঠাৎ বৃষ্টি নামলে;
ঐ নেমেছে! দৌড়ে চলো, বই-খাতা নাও সামলে।
কেউ বা গেলো ঘরের পানে,
কেউ মাতে ঐ ধারাস্নানে,
কেউবা গিয়ে জাম কুড়ালো, কেউবা কুড়ায় ফলসা;
গ্রন্থাগারের বারান্ডাতে জমলো গানের জলসা।

(৬)

বৈকালে হয় খেলার সময়! আমরা খেলা করবো;
লুকোচুরির চোর হবে কি? আমি তোমায় ধরবো।
ঐ আমাদের খেলার বুড়ি-
বিপুল বটের বিশাল গুঁড়ি!
আড়াল থেকে কোকিলকণ্ঠে কুক-দেওয়া-ডাক ডাকলে
তোমায় ছুঁতে-না-ছুঁতে ঐ বটগাছে হাত রাখলে।

এবার তবে আমি লুকোই। আমায় ধরে আনবে?
আমায় তুমি ধরেই আছ, কেমন করে জানবে?
আছি তোমার পথে চলায়,
নীরবতায়, কথা-বলায়;
কান্না-হাসির ছন্দে আছি, আছি প্রাণের স্পন্দে;
গোলাপফুলের দোলায় আছি তোমার বেণীবন্ধে।

খেলা তো নয়, তোমায়-ভাবা-ভাবের অভিব্যক্তি,
তোমার তনুর রক্তে দুলাই আমার অনুরক্তি!
আমার বালক হয় বালিকা,
কিশোরে পাই কৈশোরিকা!
রূপের বিকার বিলুপ্ত হয় স্বরূপ-শিখার ধর্মে,
আমার মর্ম-পাবকে পাই তোমার পাবক-মর্মে।
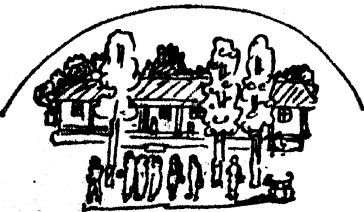
(৭)

সন্ধ্যাময়ীর উদয়ে পাই অমৃতময় মন্ত্র!
বেদ-বাদিনীর তন্ত্রী বাজে, আমরা তারি তন্ত্র।
মুক্তকণ্ঠ-সমুচ্চারণ
পূর্ণ করে গগন-পবন;
তপোবনের মৃত্তিকা পায় নিকেতনের ভিত্তি;
এই আধুনিক-আশ্রমে পাই সেই বৈদিক-পৃথ্বী।

বিনোদনের পর্ব আনে সন্ধ্যা-নিশার সন্ধি!
বিদ্যাভবন-শিক্ষাভবন-শিল্পভবন-পন্থী।
পাঠভবনের প্রাঙ্গণে পায়
বাণীপূজার মিলন-সভায়;
ঐ সভাতে সবার সাথে তোমার-আমার মন-প্রাণ
মিলাবো আজ কোন কবিতায়! গাইবে তুমি কোন গান!

সভার পরে এলাম ঘরে; রাতের তারা গুনেছি!
তোমায় ঘিরে চাঁদের আলোর রুপালি জাল বুনেছি।
ঘুম পেলো কি? ক'টা বাজে?
আমার কথা ফুরায় না যে!
আমার অঝোর-কথার-ধারায় এখন তোমায় ঘুম দেই;
ঘুমের ঘোরে ভোরের স্বপ্নে কপালে কুঙ্কুম দেই।

ঢং ঢং ঢং, রাতপোহানো-ঘণ্টাবাজা-ঢংকার!
ঐ ধ্বনিতেই শুনছো ধ্বনি কাল-হরণীর ডঙ্কার?
ওঠো, জাগো, চোখ মেলে চাও,
ঘুমন্তদের ঘুম ভেঙে দাও!
আদ্যবিভাগ-মধ্যবিভাগ-শিশুবিভাগ জাগলো
অখিলসুপ্তিআঁধার-জ্বালা ধ্বনির আগুন লাগলো।

(৮)

শান্তিনিকেতনের পথে আমি কি আর নাইরে;
মোর চেতনার চিরন্তনে সব কিছু তার পাইরে।
সেদিন তুলেছিলাম যে-ফুল,
তার বিকাশের পেয়েছি মূল;
সেই শিশিরের বিন্দু এখন হয় অমিয়-অব্ধি;
তখন-পাওয়া-ক্ষণগুলি আজ আমার উপলব্ধি।

মরণসিন্ধু-পারের পারে কোপাইনদীর কূল রয়!
আমার কাছে সবাই অমর, আমার দেখা ভুল নয়।
বিস্মরণের যুগ-যুগান্তর
পার হয়ে পাই তোমায় দোসর!
অন্তরে পাই অবিস্মৃতির অসীম বিভাস্ফূর্তি
পাই পৃথিবীর প্রথম-পূজায় অখিলময়ীর মূর্তি।

দেখতে কি পাও কার প্রতিমায় কোপাইনদীর পঙ্ক?
কোপাই-কূলের শামুক তুলে পাও কি তোমার শঙ্খ?
আমার দেখা স্রোতের পরে
পাথর-নুড়ি ভূধর ধরে!
সেই-অচলে ঐ-জলে পাই জগৎ-প্রাণের বন্যায়,
শৈলরাজের নন্দিনী পাই মোর কন্যার কন্যায়।

পাই অনাদির গহন-তিমির তোমার অলকপুঞ্জে,
আদির বিভা মঞ্জরী হয় তোমার রূপের কুঞ্জে।
পাই নবীনার জন্মজবায়
পূর্বাগতায়, পুনর্নবায়,
দূর্বাদলের শ্যামল-সীমায় পাই অসীমার সন্ধান;
মহামায়ার রূপক তুমি, আমি তোমার সন্তান।

( ৯ )

আমার লেখা এই-রূপকের রূপকথাতে খেলবে?
আমায় তোমার মন-'মুনিয়া'র রঙিন ডানায় মেলবে?
একবিন্দু-তনুর পাখা
ইন্দ্রধনুর বর্ণ-মাখা,
পাতাল-তলের অতল-কালোয় রাখতে পারে রঞ্জন,
রাতের চোখে আঁকতে পারে অংশুমালীর অঞ্জন।

পক্ষীরাজে হার মানিয়ে এই বিচিত্রপক্ষী
চিত্ররথের রাজপুরী পায়, নেই তো দুয়ার-রক্ষী
ঐ সুন্দর-সুন্দরীরা
ছড়ায় রূপের মানিক হীরা!
অবিশ্রান্ত নর্ম-লীলার কথায়-গানে-নৃত্যে
বিলায় তাদের রাজেশ্বরের অপূর্বতার বিত্তে।

আজ দিবাচল-বিহঙ্গিনী এই-নিশাচল-শৃঙ্গে।
বিশাল ভানুসিংহ দিল কৌমুদীময় ভৃঙ্গে!
সম্মিলনের সন্ধ্যাবেলায়
পূর্ণরবি পূর্ণিমা চায়;
সেই চাওয়াতেই আমার কত আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ যে
চন্দ্রলেখায় আভাস পেলো তোমার বিকাশ-মঞ্চে।

নাইবা পেলাম পূর্ণিমা চাঁদ, নইতো আমি ক্ষুন্ন;
চন্দ্রভালী মহাকালীর অসীম-আঁধার-শূন্য
বরণ কোরে আমার শিখায়
রইব তোমার ললাট-লিখায়;
প্রতিপদের চাঁদের চুমায় তোমার কপাল রাখবো;
সূর্য-তারা-জন্ম-দেবার মহানিশায় জাগবো।

বিরঞ্জিত বিহঙ্গী দেয়, নিরঞ্জনার পন্থা!
বর্ণ-বিভোল ফুলবনে তাই, পাই রজনীগন্ধা;
রঙিন-ডানায় ওড়ার তালে
তুষার-গিরির স্বচ্ছ ভালে
পাই পাখিতে গৌরীশিখর, পাই আঁখিতে স্বর্গ;
ধুলায় ধরি শক্তিপূজার অভ্রভেদী অর্ঘ।

( ১০ )

আজ সকালে সরস্বতীর সৌরধারায় ধৌত
বঙ্গবাণীর সূর্যসদন 'উত্তরায়ণ' সৌধ।
কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ
আমায় দিলেন দৃষ্টিপ্রভাত!
বল্লেন, "বল্‌তো, কেমন করে কোন নবীনের মন্ত্রে
রূপান্তরের তন্ত্র বাজাস তোর জীবনের যন্ত্রে?"

তখন বলি, "মর্ত্য-শিশুর শিথিল-চরণভঙ্গে
ভোলানাথকে আপনি পেলেন নিখিল-নাটের রঙ্গে,
সেই নাটে আজ এই বালিকায়
আমার জীবন পার্বতী পায়!"
বল্লেন হেসে, "'চাঁদকবি' তুই, ও-ই বুঝি তোর চাঁদিন
রঙিন হবার সঙ্গিনী তোর, নবীন হবার নাতনী।"

কৌতুকে আর কৌতূহলে তোমার পানে চাইলেন!
অধর-ভানুর উদ্ভাসনে ভৈরবীগান গাইলেন;
মাথার মুকুট সান্ধ্যগগন,
অলক শুভ্র-ঊষার মতন,
বসুন্ধরায় সৌরাচলের রাজেন্দ্র-গন্ধর্ব!
চন্দ্রাচলের প্রণাম তাঁকে তোমায় দিয়েই ক'রব।

তোমায় নিলেন আশীর্বাদের অরুণ-করস্পর্শে
আমরা দু'জন সবাইকে তা' জানাই পরম হর্ষে!
কেউ শোনে; কেউ বলছে, "শোনো,
এ-ও সম্ভব হয় কখনো?"
আমরা বলি, "অসম্ভবের উদয়-তোরণ খুলছি,
চিরন্তনীর তপন-শশীর মিলন-দোলায় দুলছি।"

অলক্ষ্যে আজ অনন্ত নাগ কুণ্ডলীপাক মেলছে,
আমূল-পরিবর্তনে তার খোলস খুলে ফেলছে।
কোন নব নক্ষত্রদলে
তার সহস্রফণা জ্বলে!
আমরা দেখি, পাবকবতী প্রসূন-প্রদীপ জ্বাললো,
প্রদীপ্ত হয় সূর্যমুখী-চন্দ্রমুখী-মাল্য।

আমরা জানি, আকাশময়ী নামলো মাটির পন্থায়,
নবকল্পের দীপন দিল কালের সকাল-সন্ধ্যায়।
আমরা তারি চলার সাথে
কল্পনা আর আল্পনাতে
এই পুরাতন ভুবনডাঙায় সাজাই নূতন সৃষ্টি;
মুগ্ধ করি বিশ্বকবির নিমেষহারা দৃষ্টি। ইতি

তোমার
চিরদিনের খেলার সাথী
ছোট দাদু নিশিকান্ত।
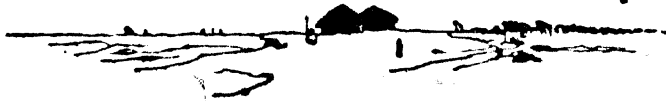
আল্পনা — লেখকের অগ্রজ, শান্তিনিকেতনবাসী শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীর দৌহিত্রী, শ্রীমতী আল্পনা।

কঙ্কালীতলা—শান্তিনিকেতন হইতে অদূরে, কোপাই নদীর তীরে তালতলী গ্রামে অবস্থিত বাহান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান। কিংবদন্তী আছে, এই ভূমিতে মহাদেবীর মেরুদণ্ডের কঙ্কাল পতিত হইয়াছিল।

ছাতিমতলা — ছত্রাকার সপ্তপর্ণী বৃক্ষের ছায়াতল, মহর্ষিদেবের সিদ্ধিলাভের আসনভূমি।

মহর্ষিদেব — দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবর্ষি — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুধবার — শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন, মন্দিরে সাপ্তাহিক সমবেত-উপাসনার দিন, বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

গুরুদেব — কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্পগুরু — শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু।

শারদোৎসব — কবিগুরুর বিখ্যাত নাটক।

ঠাকুরদাদা — পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী।

শাস্ত্রীমশাই — মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী।

দিনদা — সঙ্গীতাচার্য ও নাট্যাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তি — শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

সাগর — শ্রীসাগরময় ঘোষ।

যমুনা — শ্রীনন্দলাল বসুর কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী যমুনা।

নন্দিতা — কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, শ্রীমতী নন্দিতা।

গৌরী — শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরী।

মুনিয়া — অতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষীবিশেষ। শ্রীমতী আল্পনার ডাকনাম।

উত্তরায়ণ — কবিগুরুর বাসভবন।

চাঁদকবি — লেখকের বাল্যকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লেখককে 'চাঁদকবি' সম্বোধনে পরিহাস করিতেন।

# সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার মতন নয়, কেননা খুব একটা বিখ্যাত লোক তিনি ছিলেন না।

তা হলেও কেউ কেউ শুনল, কিছু মানুষ জানল। জেনে চুপ করে রইল। চুপ থাকা ছাড়া উপায় কি। কেননা দুঃখের মধ্যে তৃপ্তি থাকে, মৃত্যুর মধ্যে প্রশান্তি থাকে, ভয়ংকরের মধ্যে সৌন্দর্য থাকে—আর তাই যখন থাকে তখন মানুষে দুঃখ নিয়ে আনন্দ করে, মৃত্যু নিয়ে উৎসব করে। শোকের উৎসব। এই শোক পুষ্পগন্ধ হয়ে যতদূরে ছড়াবার ছড়িয়ে পড়ে। নির্মল শোকাবহ সংবাদ শুনেও আনন্দ, অপরকে শুনিয়েও তৃপ্তি। শোক করে মানুষ মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর ক্ষেত্রে তাই হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি, কেন তা হবার নয়, এ নিয়ে কারো মনে প্রশ্ন জাগল না পর্যন্ত।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, এমন কি পাড়ার লোক (সিদ্ধেশ্বরবাবু এই শহরের একটা সম্ভ্রান্ত পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। দু এক বছর না, দীর্ঘ বারটি বছর তিনি গড়পাড়ের বাতাসে নিশ্বাস ফেলে বেঁচে গেছেন) সিদ্ধেশ্বরবাবুর গাড়ি চাপা পড়ার ঘটনা থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার সংবাদটা শুনে নীরব থেকে গেল। কোনো সমালোচনা না, কোনো মন্তব্য না।

যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠি। জ্বলল আর নিভল। কিন্তু কাঠি পুড়ে ছাই হল না। কালো হয়ে বেঁকে বড়শী কাঁটা হয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মৃত্যুটা লোকের মনে গেঁথে রইল। অনেক দিন এই কাঁটা মানুষের মনে গেঁথে থাকবে। হয়তো অনন্তকাল থাকবে। কেননা কোনো ঘটনাই যখন হারিয়ে যায় না, কোনো পরিণতিরই যখন শেষ নেই। আজ যারা শিশু কাল তারা যুবক হবে, যুবক প্রৌঢ় হবে,—যে বয়সে সিদ্ধেশ্বর গাড়ি চাপা পড়েছিলেন, সেই বয়সে পা দিয়ে তারা ভাববে একি সম্ভব, এও কি হয়? কিন্তু হয়েছিল, একজনের বেলায় হয়েছিল। আজকের গড়পাড়ের শিশু অনাগত দূর ভবিষ্যতে সিদ্ধেশ্বরের মতন বার্ধক্যে পা দিয়ে চিন্তা করবে মনের কোন অনাচারী কলুষ-বিকৃত অবস্থা নিয়ে সিদ্ধেশ্বর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শহরের ভদ্র পরিবেশ (পাড়ায় দু দুটো পরিচ্ছন্ন পার্ক, এতবড় একটা লাইব্রেরী রীডিং-রুম থাকা সত্ত্বেও) ত্যাগ করে চিৎপুরের ওদিকে একটা অস্বাস্থ্যকর অভদ্র পল্লীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন বললে ভুল হবে—সিদ্ধেশ্বর নিয়মিত ওদিকে বেড়াতে যেতেন। কেবল তাই না। ভবিষ্যতে সিদ্ধেশ্বরের গল্পটা বাড়তে বাড়তে আর কত বড় হবে তখন, সেদিনই তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। চিৎপুরের সেই গলি থেকে সিদ্ধেশ্বরকে যখন অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়, তখন তাঁর মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ গোপনে গোপনে সিদ্ধেশ্বর মদ খেতেন। খবরটা এপাড়ায় কে আগে বয়ে এনেছিল বলা শক্ত। অবশ্য তার খোঁজ করার দরকারও ছিল না। এখানে খবরটাই প্রধান।

মাত্র তো দু ঘণ্টার ঘটনা। অ্যাকসিডেন্ট, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল। হাসপাতালে পৌঁছে সতেরো মিনিট বেঁচে ছিলেন সিদ্ধেশ্বর। তারপর চিরকালের মতন ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু দু ঘণ্টার ঘটনাই দু লক্ষ বছরের পরমায়ু নিয়ে গড়পাড়ের ঘরে বারান্দায় রোয়াকে, ব্যালকনিতে পার্কে, লাইব্রেরী রুমে ফিরে এসেছিল। উনিশ শ আটান্ন সালের চব্বিশে আগস্টের খবর পৌঁছবার বিশ মিনিট পর প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। সেদিন বৃষ্টিমুখর কালো রাত্রির দিকে তাকিয়ে উত্তর কলকাতার শান্ত ভদ্র মানুষগুলি কেবল এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজেছিল যে, কর্মফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই জন্মে না করুক, পূর্বজন্মে সিদ্ধেশ্বর এমন কোনো দুষ্কর্ম করে এসেছিলেন, যার জন্য এমন একটা ঘৃণ্য কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছিল এবং পাপের পরিণতি যখন অবশ্যম্ভাবী, মত্ত অবস্থায় খারাপ গলিটা পার হতে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরও একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ির তলায় চাপা পড়লেন।

পাপ গোপন করা যায় না। সিদ্ধেশ্বর পারলেন না। পৃথিবীর মানুষ জেনে রাখল গড়পাড়ের জ্ঞানী গুণী অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর রায় বুড়ো বয়সেও কী সাংঘাতিক উচ্ছৃঙ্খল কামনা ভিতের পোষণ করছিলেন।

সত্যি কি তাই? আমি বলব, না। আমি বলব, অন্তত এই প্রশ্নের সঠিক না হোক কাছাকাছি রকম একটা উত্তরও যার কাছ থেকে আশা করা যেতে পারত, সে এখানে নেই, কলকাতায় নেই। সিদ্ধেশ্বরের একমাত্র সন্তান সুধাংশু রায় আজ আট মাস ধরে রাঁচীর পাগলা গারদে আছে। নিয়মিত চিকিৎসা সত্ত্বেও সুধাংশুর অসুখের যে কোনোরকম উন্নতি হয়েছে, তা মনে হয় না। আদৌ সে আর ভাল হবে কিনা এবং কলকাতায় ফিরে এসে ধরাচূড়া পরে আবার কোর্টে যাবে কিনা বলা শক্ত। চিরকালের মতো একটি লোক উন্মাদ হয়ে গেছে, পৃথিবীতে এই দৃষ্টান্তের অভাব আছে নাকি? হয়তো সুধাংশু চিরদিনের মতো তাই হয়ে রইল। তার কলকাতার এডভোকেট বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ গোড়ার দিকে এক আধবার রাঁচীতে খোঁজ খবর নিয়েছেন। কিন্তু এসব উৎসাহ দীর্ঘকাল কারওর থাকে কি? হয়তো সুধাংশুর পরমাত্মীয়, যেমন তার বাবা মা বেঁচে থাকলে আজও রাঁচী কলকাতা ছুটোছুটি করতেন। হ্যাঁ, আর একজন করত, করতে পারত। কিন্তু সে নেই। কলকাতায় আছে কিনা বলা শক্ত, তবে গড়পাড়ের "মাধবী-নিলয়ে" নেই। আর যদি বলি, থাকলেও সে তার স্বামী করে পর্যন্ত ভাল হয়ে সুস্থ হয়ে রাঁচী থেকে ফিরে আসবে, খোঁজ নিত না—নিচ্ছে না? যদি বলি ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও সুধাংশু কলকাতায় পা দিতে না দিতে শোভনা সুন্দর ভ্রূযুগল কপালে তুলে চিৎকার করে বলত: এখনি? এখনি তুমি যে বড়ো চলে এলে। তোমার রোগের সবগুলো লক্ষণ রয়ে গেছে; ডাক্তারবা দেখছে না, আমি দেখছি, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তো আপনারা নিশ্চয় অবাক হবেন। কিন্তু তা-ই দেখতে বা বলতে শোভনা আর 'মাধবী-নিলয়ে' বা তার আশেপাশে থেকে গেল কই। শোভনা অনেক দিন এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আটান্ন সালের চব্বিশে আগস্ট সন্ধ্যায় সিদ্ধেশ্বরবাবু গাড়ি চাপা পড়েন আর শোভনা মাধবী-নিলয় ছেড়ে চলে যায় পনেরো আগস্টের এক দুপুরে। মানে চিৎপুরের দুর্ঘটনার ঠিক নয় দিন আগে। সেদিনও প্রচণ্ড বর্ষায় গড়পাড়ের রাস্তাগুলি জলে থৈ-থৈ করছিল। মাধবী-নিলয়ের সামনে গলির গ্যাস বাতির চারপাশে এক রাশ বাদলা পোকা বিশ্রী মরণপণ করে বড় বেশি ওড়াওড়ি করছিল। ঘরের ভিতর তখন সুধাংশু চুপচাপ বসে। টেবিলে ফিকে নীল ডোম পরানো বাতিটা জ্বলছে। কোর্ট থেকে ফিরে এসে সুধাংশু যে ধরাচূড়া ছাড়েনি, তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। ফেরার সময় রাস্তায় বুঝি দু আঁটি রজনীগন্ধা কিনেছিল সে। ফুলের চেয়ে আঁটি দুটোতে কলির সংখ্যা বেশি। অনেক দিন ধরে এঘরে ফুল ফুটবে ভেবে বেছে বেছে কলির ডাঁটাগুলি সে কিনে এনেছিল। কিন্তু ফুল বা কলির দিকে সুধাংশুর দৃষ্টি নেই। আঁটি দুটো টেবিলের পাশে শোয়ানো অবস্থায় রয়ে গেছে। সুধাংশু চোখ মেলে ল্যাম্পের ওপিঠে দেয়ালের নীল রং দেখছে। তার দৃষ্টি নিষ্প্রভ, কিন্তু চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে আছে। চেয়ারের পিঠে ঘাড় ঠেকিয়ে হাত-দুটো মাথার ওপর তুলে দিয়েছে সে। আঙুলে আঙুলে জড়ানো। উল্টোদিকের দেয়ালে সুধাংশুর মাথা, ঘাড় ও বলিষ্ঠ বাহু দুটোর একটা জড়ানো প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে। দেয়ালের ব্র্যাকেটটা শূন্য। সকাল দশটায় সুধাংশু যখন বেরোয়, তখনও ব্র্যাকেটে শোভনার এত এত শাড়ি শায়া ব্লাউস ঝুলছিল। যাবার সময় সে সব নিয়ে গেছে। খাটের শিয়রের দিকে কাঠের স্ট্যাণ্ডটা শূন্য। চামড়ার সুটকেস দুটো সেখানে নেই। অবশ্য সুটকেস দুটোর একটাতে সুধাংশুর কোনো জিনিস ছিল না। যদি বা থেকে থাকে শোভনা নিশ্চয় তা বার করে কোথাও রেখে গেছে। তার কোনো জিনিস সংগে নিয়ে যাবে না শোভনা, সুধাংশু জানে। হয়তো সুধাংশুর কোনো পরিচয়ও তার কাছে রাখতে শোভনা এখন থেকে লজ্জা পাবে। 'পাওয়া উচিত!' সুধাংশু নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল।

আর পাশের ঘরে চুপচাপ বসে ভাবছেন সিদ্ধেশ্বর। টেবিলের ওপর আলোর সামনে একটা চিঠি। সবুজ রঙের প্যাডের কাগজের ওপর শোভনার পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল হস্তাক্ষর। চিঠির ওপর একটা পেপার ওয়েট চাপিয়ে রেখে সিদ্ধেশ্বর ভাবছেন আর মাঝে মাঝে শোভনার হাতের লেখার ওপর চোখ বুলোচ্ছেন। এই নিয়ে তিনি সতেরো আঠারো বার চিঠিটা আদ্যন্ত পড়ে শেষ করেছেন। এক ভাষা এক অর্থ। সিদ্ধেশ্বরের কপালের চামড়া কুঁচকে আছে। গৌরবর্ণ পুরুষ তিনি। এই বয়সেও গায়ের রং ও চামড়া সতেজ উজ্জ্বল আছে। সুধাংশু তার মায়ের চেহারা ও শ্যামলা রং পেয়েছে। মাধবীর মতো লম্বা ধাঁচের শরীর। সিদ্ধেশ্বর বেঁটে খাটো মানুষ। স্থূল থলথলে চেহারা। তিনি যে অমায়িক রসিক ব্যক্তি, তা তাঁর চোখের রং ও ঠোঁটের

বাঁক দেখে বোঝা যায়। সুধাংশুকে দেখলে মনে হয় মানুষটি নীরস ও জেদী প্রকৃতির। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির পুরুষ। দর্শনের অধ্যাপক হলেও দার্শনিকসুলভ গাম্ভীর্য বা ঔদাসীন্য তাঁর চোখ মুখে অনুপস্থিত। কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমহল এমন কি এই গড়পাড় অঞ্চলের ছোট বড় সকল মানুষের সঙ্গে তিনি পরিচয় ও বাক্যালাপ রাখেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন বলে তার কাছে কিছু বাছবিচার নেই। মানুষ হলেই হল। তার সঙ্গে কথা বলে হেসে তার শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করে তিনি তৃপ্তি পান। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং কথাটা সিদ্ধেশ্বরবাবুর ক্ষেত্রে যত বেশি প্রযোজ্য বোধ করি ইদানীং কালের আর কোনো অধ্যাপকের ক্ষেত্রে ততটা নয়। সেই সিদ্ধেশ্বর আজ এখন, বড় বেশি গম্ভীর, চিন্তান্বিত। তাঁর গায়ে একটা খদ্দরের হাতকাটা ফতোয়া। পরনে খদ্দরের ধুতি। বিয়াল্লিশ সালের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ছ মাস জেল খেটেছিলেন। সেই থেকে যে তিনি খদ্দর ধরেছেন আর ছাড়েননি। সিদ্ধেশ্বর ঘামছেন। তাঁর ফর্সা কপালের চামড়ার খাঁজে ঘাম চিকচিক করছে। কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা এখনও নাকের ওপর বসানো। অথচ ক্লাসে তিনি যখন বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে লেকচার আরম্ভ করেন, কি চিন্তা করেন, তখন চশমাটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখেন। যেন এটা তার রক্ষা কবচ। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা না থাকলে তিনি কথা বলতে পারেন না, জিভ আটকে যায়, চিন্তা অপরিচ্ছন্ন বক্তব্য হিজিবিজি হয়ে ওঠে। আজ ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। সিদ্ধেশ্বর এখন চশমাটা একবারও নাক থেকে আলগা করছেন না, যেন তা করতে তিনি ভুলে আছেন। উনিশ বারের বার পুত্রবধূর পত্র পাঠ শেষ করে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি যখন চিন্তা করছেন, তখনও নাকে মোটা চশমাটা লেগে রয়েছে। তাতে সিদ্ধেশ্বর-বাবুকে সিদ্ধেশ্বরবাবু মনে হচ্ছে না, যেন আর কেউ, অন্য মানুষ।

সত্যি তিনি এখন অন্য মানুষ হয়ে আছেন। তাঁর এতকালের সহজ স্বাভাবিক চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষ সম্পর্কে ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, উপলব্ধি কেমন যেন হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বিব্রত বিষম দেখাচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। একটু আগে তিনি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরী থেকে ফিরেছেন। আজ ক্লাস ছিল না। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে তিনি বিকেলটা লাইব্রেরীতে একটু পড়াশোনা করে কাটিয়েছেন। বাড়ি ফিরে তিনি শোভনাকে দেখতে পাননি। চাকর চা এনে দিয়েছে। পাঞ্জাবী ছেড়ে তিনি সামনের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে যখন চা খাচ্ছিলেন, তখন হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে। অনেকক্ষণ ধরে অবশ্য আকাশ কালো করে ছিল এবং তা দেখে তিনি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়েছিলেন। ছুটির দিন সচরাচর তিনি পায়ে হেঁটে ওপাড়ায় যান এবং সেখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরেন। সরাসরি কি আর বাড়ি ফেরা হয়। হয়তো হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে তাঁর বন্ধু সদাশিবের বাড়ি চলে যান। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সুকিয়া স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হয়তো এসে উপস্থিত হন তাঁর প্রিয় মনোহারী দোকানে। দু একটা দ্রব্য হয়তো কেনেনও, কিন্তু তার চেয়ে গল্প করেন বেশি। দোকানের মালিক অবনী সাহা উপস্থিত না থাকে তো তার কর্মচারীর সঙ্গেই আলাপে মেতে ওঠেন। তারপর নারকুলার রোড পার হয়ে যখন পাড়ায় উপস্থিত হন, তখন তো কথাই নেই: সকলের সামনেই তিনি দু মিনিট করে দাঁড়ান অথবা তাঁকে দেখে যে কোনো মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে, কি রক বারান্দা থেকে নেমে এসে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে। এখন কেমন আছেন, একটু প্রেসার দেখা দিয়েছিল শুনেছিলাম?' 'নেই, নেই—অসুখ আমার শরীরে শেকড় গাড়তে পারে না। আমি এতো হাসি, এতো কথা বলি যে, ব্যারাম আপনা থেকে ভয়ে পালায়। তারপর ছেলের খবর কি?' 'ভাল—আসুন একটু চা—', 'না ব্রাদার, ঐ দেখুন, মুকুলবাবু হাত তুলে শাসাচ্ছেন, কেন বুঝতে পারছেন তো—তাঁর বাড়িতে নতুন বাথরুম করা হয়েছে, দেখতে যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছে না বলে বেজায় রেগে আছেন। 'যাই যাচ্ছি—' হাত তুলে সিদ্ধেশ্বর এত জোরে চিৎকার করে ওঠেন যে, পাড়া গমগম করে ওঠে। তাঁর গলা শুনে আরো দু চারজন এসে বারান্দায় ব্যালকনিতে উঁকি দেয়—'এই যে সিদ্ধেশ্বরবাবু, এই যে, দয়া করে একবার।' সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়েন হাসেন। যাই যাচ্ছি বলে সকলকে আশ্বাস দেন এবং প্রত্যেকটি রক বারান্দার সামনে একটু সময় দাঁড়িয়ে কথা বলে হাসতে হাসতে পরে মুকুলবাবুর বারান্দায় উঠে যান। মুকুলবাবু লোকটি যে খুব উচ্চশিক্ষিত তা না, তিনি হয়তো তিন তিনবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল মেরে তারপর বড়বাজারে ভিড়ে গিয়ে দালালী আরম্ভ করেছিলেন, তারপর অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রমের বিনিময়ে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু বিদ্যা বা অর্থ আছে বলে মানুষের দিকে ঝোঁকেন, এ অপবাদ তাঁর শত্রুও দিতে পারে না। অবশ্য শত্রু তাঁর নেই। যদি বিদ্যা ও বিত্ত বিচার করে তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতেন তো আজ এই মাত্র রিক্সাওয়ালাটার সঙ্গে তিনি এত কথা বলতেন কি। দিন তার কত রোজগার হয়, রিক্সার মালিককে কত দিতে হয়, কোথায় ডেরা, দেশে যায় কিনা ইত্যাদি হাজারটা প্রশ্নে বেচারাকে সারা পথ ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন সিদ্ধেশ্বর; তারপর বারো আনার জায়গায় পুরো একটা টাকা রিক্সাওয়ালার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বারান্দায় উঠে এসেছেন। তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। সিদ্ধেশ্বরবাবু হাত তুলে লোকটাকে ডাকছিলেন, যাতে ভিতরে এসে সে একটু অপেক্ষা করে, যাতে ঝড়জলটা কমলে রাস্তায় নামে, এখানে বিশ্রাম করে না হয় একটু চা খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিক। হেসে হাত তুলে 'রাজাবাবুকে' সেলাম জানিয়ে রিক্সাওয়ালা তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ছুটে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে সিদ্ধেশ্বর চিন্তা করছিলেন: তা আর কি করে হয়; এখানে বসে দশ মিনিট পনেরো মিনিট ধরে বেচারা যদি চা খেয়ে গল্প করে কাটায় তো ওদিকে হয়তো তার একটা খেপ নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো এই ঝড়জলের মধ্যেই মোড়ের মাথায় কি পাড়ার কোনো বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে কেউ কেউ 'জরুরী কাজে' বাইরে যেতে একটা রিক্সা খুঁজছে। বরং এই জলের মধ্যে ভাড়া জুটলে ডবল রোজগার হবে। চিন্তা করে হৃষ্টমনে জামা ছেড়ে সিদ্ধেশ্বর চাকরকে চা করতে হুকুম করেন।

চা খেতে খেতে তিনি চিন্তা করছিলেন শোভনা কোথায় যেতে পারে। শোভনা যে অনেক জায়গায় যেতে পারে সিদ্ধেশ্বর জানেন। বালিগঞ্জে কাকার বাসায় যেতে পারে, ভবানীপুরে কে এক বান্ধবী আছে, যার কাছে ফি সপ্তাহে অন্তত একবার বৌমার যাওয়া চাই, আজ সেখানে যাওয়াও তার বিচিত্র না, যদি সেখানে না গিয়ে থাকে তো কলেজ স্ট্রীট বা ধর্মতলায় এক আধটু ছিটের কাপড় বা নিজের অথবা সুধাংশুর জন্য টুকিটাকি কিছু কিনতে বেরিয়েছে বুঝি; আর যদি যেসব কিছুই না হয় তো নিশ্চয় সিনেমা টিনেমা দেখতে গেছে। সিদ্ধেশ্বরবাবুর এটা অপছন্দ না, কেন না তিনি বলে রেখেছেন একলা দুপুরে বাড়িতে যদি ভাল না লাগে তো শোভনা যেন বেড়াতে টেড়াতে যায়। সিনেমা দোকান কাকার বাসা বান্ধবী যেখানে ইচ্ছা। কেননা সিদ্ধেশ্বর এটা বোঝেন, দুপুরে তিনি কলেজে চলে যান, সুধাংশু কোর্টে যায়, বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকে, চাকরটা পাড়ায় তার আড্ডায় তাশ পিটতে বেরোয়, ঝি পড়ে পড়ে ঘুমোয়, এ-অবস্থায় বৌমার

একলা ক্লান্তি লাগা স্বাভাবিক। সেলাই করে, বই পড়ে, রেডিও শুনে খুব বেশিক্ষণ কি কোনো মানুষের ভাল লাগতে পারে। মনের অবসাদ, অবস্থানের একঘেয়ে ক্লান্তি-কর পরিবেশ থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তার মুক্তির দরকার। তাও যদি ইতিমধ্যে একটা বাচ্চাটাচ্চা এসে যেত তো এতটা নিঃসঙ্গ অসহায় হয়তো বেচারা নিজেকে মনে করত না। সিদ্ধেশ্বর দুপুরে কটা ঘণ্টা পুত্রবধূর দুর্বিষহ একাকিত্বের কথা চিন্তা করে সর্বদাই ভিতরে ভিতরে পীড়া পান। কিন্তু উপায় কি—শনি-রবিবারটা এলে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। তা ছাড়া তিনি তো এটা খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন শ্বশুরের না হোক সুধাংশুর ছুটির দিনে শোভনার চেহারাই যেন বদলে যায়। স্বাভাবিক। এটা ইউরোপ না, আমেরিকা না। ভারতবর্ষ। তার ওপর সবচেয়ে নরম, সবচেয়ে মধুক্ষরা দেশ বাংলা দেশ। এদেশের মেয়ে, পতি পরম গুরু, পতি সতীর গুরু শুনতে শুনতে বড় হয়। স্বামীর সংসারে থাকতে পেরে মা হতে পেরে এখানে মেয়েরা যত সুখী হয়, আর কিছু পেয়ে তেমন সুখ পায় কিনা সিদ্ধেশ্বরবাবু জানেন না। অন্তত তিনি তা বিশ্বাস করেন না। ইংরেজি শিক্ষা, পলিটিকস, নানা রকমের ইজম, দাঙ্গা, পার্টিসান, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ইত্যাদির অনেক কিছুর ঝড়-ঝাপ্টা এদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে,—সমাজের চেহারাটার নানা জায়গায় টোল খেয়েছে, চিড় ধরেছে, কিন্তু দুটো জিনিস আজও অবিকৃত অক্ষত আছে, সতীত্ব ও মাতৃত্ব। এ দুটো জিনিসকে ভেঙ্গে দেবার মতন কোনো উটকো আদর্শ, বাজে আইডিয়া এখানকার মেয়েরা মাথায় নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও নেবে বলে সিদ্ধেশ্বর মনে করেন না।

ছুটির দিন স্বামী ঘরে থাকলে পুত্রবধূর চেহারায় যে স্বর্গীয় দীপ্তি, পবিত্র লাবণ্য ফুটে ওঠে, সিদ্ধেশ্বর চোখ বুজে তা চিন্তা করতে করতে যখন হাত থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখছেন, তখন পাশের কামরায় সুধাংশুর কাশির শব্দ শুনে তিনি চমকে ওঠেন। ও, সুধাংশু বাড়ি ফিরেছে। 'কিন্তু বৌমা যে এখনো ফিরল না, এই ঝড়-বাদলার মধ্যে কোথাও নিশ্চয় আটকে গেছে।' জিভের ডগায় কথাটা ঝুলিয়ে সিদ্ধেশ্বর আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে তাড়া-তাড়ি পাশের ঘরে ছুটে যান। কোট-পেন্টুলন ছাড়া হয়নি, একটা কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরে সুধাংশু টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে, আলো জ্বলছে। ঘরের ভিতরটা কেমন গম্ভীর। সিদ্ধেশ্বর যে ঘরে ঢুকলেন সুধাংশু তা টের পেলে না। পুত্রের পাংশু চেহারা, ক্লান্ত বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করে সিদ্ধেশ্বর চমকে উঠলেন। তবে কি কোনো অশুভ সংবাদ লেখা আছে চিঠিতে! শোভনার প্যাডের কাগজ না ওটা?

'বৌমা যে এখনো—' ছোট মতন একটা কাশির শব্দ তুলে সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন।

সুধাংশু চিঠি থেকে মুখ তুলল।

'তোমার বৌমা আর আসবে না—এই যে—'

কথা আটকে গেল সিদ্ধেশ্বরের, পুত্রের প্রসারিত হাত থেকে সবুজ কাগজটা তুলতে গিয়ে তিনি তা তুলতে পারেন না। তাঁর ঠোঁট কাঁপে, হাত কাঁপে। যেন অনেক চেষ্টা করে কষ্ট করে তিনি একটা ঢোক গিলতে পারলেন।

'নাও, এটা পড়ে দ্যাখো।' সুধাংশু প্রায় ধমকে উঠল; রুক্ষ গলা কঠিন চাউনি। সিদ্ধেশ্বর রীতিমত ভয় পান।

'কি লিখেছে, শোভনা লিখেছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কথা ও লিখে যাবে না তো কি আর কেউ লিখে গেছে—নাও দ্যাখো।'

সেই চিঠি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবার পড়ে সিদ্ধেশ্বর যখন ক্লান্ত বিমর্ষ হয়ে তার বহুদিনের পরিচিত পুরোনো পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখতে কাঠিকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন, তখন দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। চাকর খেতে ডাকল। রান্না হয়ে গেছে। সিদ্ধেশ্বর হাত নেড়ে জানিয়ে দিলেন খাবেন না, ক্ষুধা নেই। পর্দার ওপারে চাকর অদৃশ্য হতে না হতে সিদ্ধেশ্বর দরজার দিকে ঘাড় ফেরান, 'এই ভোলা, শোন।' ভোলা ফিরে এসে পর্দার এপারে মাথা গলিয়ে বাবুর দিকে তাকায়। সিদ্ধেশ্বর শব্দ না করে হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকেন। ভোলা কর্তাবাবুর চেয়ারের সামনে দাঁড়ায়। একবার চোখ বুজে সিদ্ধেশ্বর কি যেন চিন্তা করেন, তারপর ঃ 'দুপুরে বৌমা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে-ছিল জানিস?' অত্যন্ত নীচু গলায় সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করলেন। চাকর কর্তাবাবুর পায়ের দিকে চোখ রেখে তেমনি নীচু গলায় বলল, 'মনুর মা বলল বেলা একটা দেড়টা যখন তখন নাকি বৌদিমণি তাকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠায়।'

'ও তুই ছিলি না বাড়িতে, আড্ডায় বেরিয়েছিলি।' সিদ্ধেশ্বর দাঁতে দাঁত ঘষে ভিতরের রাগ চাপলেন। তারপর আবার চোখ দুটো বুজে চিন্তা করলেন। নাক থেকে চশমাটা খুলে এবার তিনি হাতের মুঠোয় রাখলেন। 'আচ্ছা মনুর মাকে একবার ডেকে দে।' সিদ্ধেশ্বর চোখ খোলেন। ঘাড় নেড়ে ভোলা পর্দা ঠেলে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে সিদ্ধেশ্বর আবার ডাকেন, 'শোন।'

ভোলা ঘুরে দাঁড়ায়।

'থাক, এখন থাক, আমি পরে এক সময় ওকে জিজ্ঞেস করব। কাল সকালে না হয় জিজ্ঞেস করা যাবে। খোকা এখন খাবে?"

'না, ছোটবাবু বলছেন খিদে নেই।'

'তবে আর কি, তোরা খেয়ে নে গে,—যা।'

চাকর বেরিয়ে গেল। যদি আয়নায় মুখ দেখতেন সিদ্ধেশ্বর, দেখতেন পেতেন তাঁর ফর্সা কান ও নাকের ডগা রীতিমত লাল হয়ে গেছে। বাস্তবিক এখন তিনি বুঝলেন ঝি চাকরকে ডেকে এসব প্রশ্ন করার কোনো অর্থ হয় না। বাড়ির বৌ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সেই চলে যাওয়ার সময় ক্ষণ উদ্দেশ্য উপায় জানতে ঝি চাকরের শরণাপন্ন হওয়ার মধ্যে কী সাংঘাতিক লজ্জা অপমান হীনমন্যতা লুকিয়ে আছে তা কি তিনি টের পান না,—টের পাচ্ছিলেন না। যেন অতর্কিতে সিদ্ধেশ্বর সতর্ক হয়ে গেলেন। সময় থাকতে সাবধান হতে পারলেন বলে একটু আত্মতৃপ্তিও অনুভব করলেন। চেয়ার ছেড়ে সিদ্ধেশ্বর আস্তে আস্তে উঠলেন। সুধাংশুর ঘরের দরজায় এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। আলো নেভানো, অথচ পাল্লা দুটো খোলা। সিদ্ধেশ্বর প্রায় শব্দ না করে ভিতরে ঢুকলেন।

'খোকা, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিস?' সিদ্ধেশ্বর ছেলের খাটের পাশে যান। আবছা অন্ধকারে সিদ্ধেশ্বর টের পান কোট পেন্টুলন টাই মোজা নিয়েই সুধাংশু শুয়ে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে তিনি টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দেন।

'বাবা?' সুধাংশুর বোজা চোখ খুলে যায়। যেন আলোর আঘাতে তার তন্দ্রা স্বপ্ন অথবা ঘুম ভেঙ্গে গেল। শোয়া ছেড়ে উঠে বসল। ছোট একটা হাই তুলল। দু হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে সিদ্ধেশ্বরের চোখ দুটো দেখতে চেষ্টা করল। সিদ্ধেশ্বর ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করেন। 'জামা কাপড় ছাড়া হয়নি, এভাবে—'

'আমি তো খাব না বলে দিয়েছি।' সুধাংশুর গলার স্বর দেখতে দেখতে রুক্ষ হয়ে উঠল। খাওয়া সম্পর্কে কোনো কথা না বলে সিদ্ধেশ্বর চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছেলের মুখোমুখি বসলেন। যেন তাতে আরও বিরক্ত হল সুধাংশু। বিরক্তি গোপন করতে হয়তো সে ঘাড় ঘুরিয়ে খোলা জানালাটা দেখে। বর্ষণের প্রাবল্য কমেছে, তা হলেও একেবারে ক্ষান্ত হয়নি, ঝির-ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। একটু সময় সিদ্ধেশ্বরও সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।' সুধাংশু হঠাৎ বাবার দিকে তাকায়। 'রাত হয়েছে, তোমার শরীর খারাপ করবে।'

এবারও সিদ্ধেশ্বর খাওয়া সম্পর্কে নীরব রইলেন। হাত দুটো চোখের সামনে মেলে ধরে আঙুলের নখগুলি পরীক্ষা করছেন এভাবে কিছুক্ষণ অধোবদন হয়ে থেকে বিষণ্ণ দৃষ্টি ছেলের দিকে তুলে ধরেন।

'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে ঃ আমি চললাম, এখানে আমার থাকার কোনো অর্থ হয় না,—বৌমা এসব কী লিখেছে?'

কথা না কয়ে সুধাংশু গলার অস্পষ্ট শব্দ করল।

'কোথায় যাচ্ছে বা যাবে সেই সম্পর্কে কিছু বলেছিল কি?' সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ কুঁচকোন। 'এ সম্পর্কে আগে কিছুই কথা-বার্তা হয়নি?'

'না।' সুধাংশু চোয়াল দুটোকে কঠিন করে ফেলল।

কুঁচকানো ভুরু প্রসারিত করে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ আবার অসহায় চোখে আঙুলের নখ দেখেন।

'আমি খাব না, তুমি খেয়ে নাও বাবা।'

'আমিও খাব না।'

দু জন আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকে।

সুধাংশু খাট ছেড়ে উঠে টাই খোলে মোজা ছাড়ে এবং একটা একটা করে কোটের বোতাম আলগা করে, কিন্তু তাতেও সিদ্ধেশ্বরের উঠবার কিছুমাত্র লক্ষণ নেই দেখে সুধাংশু আবার খাটের ওপর বসে পড়ল।

'যে চলে যাবার সে চলে যাবেই, তার জন্য এত কি ভাবছ আমি বুঝতে পারছি নে।'

'আহা, সে কি একটা কথা হল।' সিদ্ধেশ্বর চোখ তুললেন। 'কেন, কিছু ঝগড়াটগড়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কবে, কি নিয়ে?'

'রোজই হচ্ছিল, বিয়ের পর থেকেই ঝগড়া চলছিল।' একটু থেমে সুধাংশু পরে আস্তে আস্তে, যেন অনেকটা নিজের মনে বলল, 'ঠিক কি নিয়ে ঝগড়া হত, ঝগড়া করত ও আমি জানি না। তবে এবাড়ি পা দিয়ে ও বুঝতে পেরেছিল এখানে সে থাকতে আসেনি,—থাকবে না।'

'আশ্চর্য!' সিদ্ধেশ্বরের পাকা গোঁফের তলা থেকে বাতাসের মতো একটা শব্দ বেরোল।

সুধাংশু গায়ের কোট খুলে ফেলল।

'আশ্চর্য।' এবার আর বাতাসের শব্দ না, স্পষ্ট উচ্চারণ করে সিদ্ধেশ্বর বললেন, 'কই, আমি তো বুঝিনি, আমি তো দেখিনি,—বৌমার চোখ দেখে,—তার কথাবার্তা চাল-চলন কোনোটার মধ্যে আমি এমন কিছু লক্ষণ দেখতে পাইনি, যে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য ছটফট করছিল। আমি বিশ্বাস করি না। আজ দু বছর তোমাদের বিয়ে হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে।' সুধাংশু সার্টের বোতাম খুলতে ব্যস্ত। 'দু বছর কেন, যে যাবার দশ বছর স্বামীর ঘর করেও একদিন চলে যায়, যেতে পারে।'

'সুধাংশু!'

সুধাংশু চমকে উঠে বাবার মুখ দেখল। মুখ কাঁপছে, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

'তুমি এতো উত্তেজিত হচ্ছ কেন বাবা?'

মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না সিদ্ধেশ্বরের। কেবল নাকের একটা শব্দ করে তিনি ঘুরে দাঁড়ান। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের দেয়ালটাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমরা ভদ্র আমরা শিক্ষিত। কাজেই আমাদের ঘরে আমাদের পরিবারে যদি এ সব কুৎসিত ব্যাপার না ঘটবে তো কোথায় আর—কথাটা শেষ করলেন না সিদ্ধেশ্বর, ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ান। সুধাংশুও দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্থির শান্ত চোখে বাবাকে দেখছে, তাঁর কথা শুনছে।

'হয়তো একটু অভিমান, হয়তো একটা কিছু নিয়ে মন কষাকষি হয়েছে; গেছে এবং আবার বৌমা ফিরেও আসবে। কিন্তু তা বলে কি ধরে নিতে হবে চিরকালের মতো ও চলে গেল। এ রকম একটা ধারণা নিয়ে তোর বসে থাকাটাই তো আমি সহ্য করতে পারছি নে খোকা। তোর মা বেঁচে থাকলে এটা হতে পারত কি? না, না, শোভনা,—আমার বৌমা সেরকম মেয়েই নয়।' আর উত্তেজনা না, অত্যন্ত শান্ত করুণ কণ্ঠস্বর সিদ্ধেশ্বরের, যেন হঠাৎ কি ভেবে তাঁর দু চোখ ছলছল করছে, সুধাংশু লক্ষ্য করল। সুধাংশু বুঝল কেন। মার কথা উঠতে না উঠতে বাবার চোখে জল আসে।

'কাল সকালে আমি বালিগঞ্জে যাব।' সিদ্ধেশ্বর হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে দরজার দিকে এগোন। 'ভবানীপুরে বৌমার কে একটি বান্ধবী যেন আছেন, তুই ঠিকানা জানিস?' ঘুরে না দাঁড়িয়ে সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করেন।

'না, আমি জানি না।' সুধাংশু তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর করল, 'বান্ধবীর কাছে যেতো কি অন্য কোথাও যেতো তা তুমিও জান না আমিও জানি না—এক কাকার বাসার নম্বর ছাড়া আর কারো কোনো ঠিকানা ও কোনোদিন আমায় বলেছে বলে তো আমি মনে করতে পারছি নে।'

কথাটা সিদ্ধেশ্বর একেবারেই গায়ে মাখলেন না। রাগ করে, অভিমান করে খোকা এসব যা-তা বলছে। বলা স্বাভাবিক। তার চেয়েও রূঢ় কঠিন মন্তব্য যে ও করছে না—সিদ্ধেশ্বর সেজন্য মনে মনে ছেলের ওপর সন্তুষ্ট হন। বারান্দায় এসে গলির গ্যাস বাতিটার চারদিকে পাতলা সূক্ষ্ম বৃষ্টির রেখার ফুলঝুরি দেখতে দেখতে তিনি নিজের দাম্পত্যজীবনে ফিরে যান, ভাবেন, একদিন, একবেলার জন্যও যদি মাধবী রাগ করে কোথাও চলে যেত তো তিনি কি করতেন। চিন্তা করতে করতে পুত্রবধূর চিঠিটা, চিঠির সব কটা লাইন সব কটা অক্ষর তাঁর মনে পড়ে যেতে তাঁর মুখের পেশীগুলো হঠাৎ শক্ত কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তুমিও সুখী না, আমিও সুখী না। কাজেই কেবল অভিনয় করে দাম্পত্যজীবন কাটানোর কোনো অর্থ হয় না। আমি চললাম,—আশা করি আমাকে খুঁজবে না,—অবশ্য তোমার ওপর এই বিশ্বাস আছে বলেই আমি তোমার ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারছি।

তোমার ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারছি। সিদ্ধেশ্বরের বুকের মধ্যে নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল। এ তো ফেরার কথা নয়, এ-তো শুধু অভিমানের ভাষা নয়,— এ যে! দুর্বল ক্লান্ত হাতে অনেকক্ষণ রেলিংটা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে থেকে সিদ্ধেশ্বর বর্ষা রাত্রির ঠাণ্ডা জলো হাওয়াটা কপালে মুখে অনুভব করলেন। তিনি আবার অস্থির অশান্ত হয়ে উঠলেন এই জন্য যে, দু বছরের এতগুলি দিন, এতগুলি সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা পার হয়েছে, এতবার মেয়েটি তাঁর সামনে এসেছে, পিপাসা পেলে জলের গ্লাস নিয়ে এসেছে, চা এনে দিয়েছে, খাওয়ার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এটা খেয়ে ফেলুন, ওইটুকুন রাখবেন না বলে কাতর-কণ্ঠে একবারের জায়গায় হাজারবার অনুরোধ জানিয়েছে; সিদ্ধেশ্বরের কোন্ জামাটা ধোবাবাড়ি যাবে, কোন্টা ধুয়ে এল, পাট ভেঙে তাঁকে পড়তে দিতে হবে, রাত্রে শিয়রের জানালা খোলা থাকবে কি বন্ধ থাকবে সতর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে আবার গভীর রাত্রে পা টিপে টিপে এসে দেখে গেছে শ্বশুরের মশারির মশারীর ধারগুলো ঠিক গোঁজা আছে কি না—সে, সেই মেয়ে যাবার সময় তাকে বুড়ো মানুষটাকে একবার বলে গেল না?

ছোট ছেলের মতো দুরন্ত অভিমানে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল।

নতুন করে জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয় সিদ্ধেশ্বরের মাথা ঘাড় ভিজে যায়। রেলিং ছেড়ে দিয়ে তিনি ভিতরে চলে আসেন একবার সতর্কভাবে কান খাড়া করে ধরেন খোকা কি এখনও ঘুমোয়নি! যেন একটা শব্দ শুনলেন তিনি ওর ঘরে। পা টিপে টিপে তিনি সুধাংশুর ঘরের কাছে যা দরজার পাশে দাঁড়ান। পাল্লা দুটোর এক ভেজানো, একটা খোলা, আলো নেভানো, ভিতরের আবছা অন্ধকার ও অস্পষ্ট ছা থেকে তিনি এটুকু অনুমান করতে পারে সুধাংশু বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শু আছে,—শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে

আর সেখানে দাঁড়ান না সিদ্ধেশ্বর। নিজের ঘরে চলে আসেন। আর কোনো উদ্বেগ অশান্তি নেই তাঁর মনে। যেন এই রকম একটা কিছু ঘটছিল না বলে তিনি দুশ্চিন্তা, ভয়ংকর সব আশঙ্কা নিয়ে এই ক ঘণ্টা ক্রমাগত মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। আর চিন্তা নেই, আর ভাবনার কিছু নেই। অধ্যাপক গায়ের ফতুয়াটা খুলে ফেললেন। টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস তুলে এক চুমুকে অনেকটা জল খেলেন। তিনি সুস্থবোধ করছিলেন, ভিতরে শক্তি পাচ্ছিলেন। কেবলই ঘৃণা না, কেবলই বিদ্বেষ না, যদি দু জনেই শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তবে সেখানে আর মিলন সম্ভব না। এখানে অন্তত একজন, এ-পক্ষ এখনো নরম আছে, চোখের জল ফেলছে,—কাজেই হতাশ হবার কিছু নেই। একজনের চাওয়া আর একজনকে কাছে টেনে আনবে। কাল বা দুদিন পর। স্ত্রীর জন্য খোকার কান্না সিদ্ধেশ্বরের বুকের ভিতর শান্তিবারি বর্ষণ করল। যতক্ষণ ভালবাসা থাকবে ততক্ষণ মানুষ কাঁদবে। সিদ্ধেশ্বর আজও মাধবীর জন্য কাঁদেন। মাধবী অবশ্য ফিরে আসবে না, সে স্বর্গে গেছে। কিন্তু শোভনা? প্রেমের লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কি। সুধাংশুর অশ্রু তাকে ফিরিয়ে আনবে। হয়তো কোথাও গিয়ে ও-ও ভীষণ কাঁদছে। রোজ ঝগড়া হত এটা বাজে কথা, সুধাংশুর রাগের কথা।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে সিদ্ধেশ্বর বালিগঞ্জ চলে যান। কিন্তু শোভনা সেখানে নেই। বরং শোভনার কাকা বিলাসবাবু একটু ঠাট্টার সুরে বেয়াই মশায়কে জানিয়ে দিলেন, বিয়ের পর সেই যে মেয়ে একবার কাকা-কাকীকে দেখতে এসেছিল, আর আসেনি। আসবে না তারা জানতেন, কেননা, এ-তো আর ঘটকালীর বিয়ে নয়, রীতিমতো প্রেম করে শোভনা অধ্যাপকের এডভোকেট পুত্রকে বিয়ে করেছে। বিলাসবাবু ভাইঝির জন্য ব্যারিস্টার পাত্র ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু আজকাল মেয়েরা অভিভাবক-অভিভাবিকার কথা শোনে কোথায়। কাজেই শোভনা যেদিন থেকে কাকা-কাকীর অবাধ্য হয়েছে, সেদিন থেকে তার সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ, বলতে গেলে প্রায় শূন্যে বিলীন হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর-বাবু লোক খারাপ বা তাঁর ছেলে শোভনার অযোগ্য, একথা তাঁরা বলেন না, কিন্তু তা হলেও মেয়ের রূপ বিচার করলে যোগ্যতর পাত্র তাঁরা যোগাড় করতে পারতেন, পেরেছিলেন বৈকি। অরুণবাবুর মেজো ছেলে কেবল যে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছে, তা নয়, অরুণবাবু তাঁর জীবদ্দশাতেই দুই ছেলের নামে দশ লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে রেখে গেছেন।

উপরোধ এড়াতে না পেরে শুধু এক কাপ চা খেয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু ঘাড় গুঁজে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। বিলাসবাবুর খোঁচাটা তখনকার মতন যন্ত্রণাদায়ক হলেও বাইরে রাস্তায় এসে এই খোঁচা অথবা বলা যায় অবাধ্য ভাইঝির জন্য বিলাসবাবুর ক্ষোভ সিদ্ধেশ্বরবাবু একটা সম্পদ হিসাবেই গণ্য করতে লাগলেন। না, বড়লোক কাকা বা বড়লোকের ব্যারিস্টার ছেলে সম্পর্কে নতুন করে কোনো মোহ সৃষ্টি হয়নি বৌমার মনে, যার জন্য—

কাজেই সিদ্ধেশ্বরবাবুর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না, খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে দাম্পত্য কলহ ছাড়া এ আর কিছুই নয়। হয়তো ভবানীপুরে গিয়েই উঠেছে শোভনা। ভবানীপুরের ওপর দিয়ে আসতে আসতে সিদ্ধেশ্বর দু-তিনবার ট্রামের বাইরে চোখ রেখেছেন। এমনও হতে পারে, শোভনা কোনো স্টপেজে দাঁড়িয়ে সার্কুলার রোডের ট্রাম ধরতে অপেক্ষা করছে। অভিমানের মেঘ রাতারাতি কেটে গেছে। এখন ঘরে চলো—আপন সংসারে। হোক না বান্ধবী, তবু তো পর। পরের সংসার। রাত্রে হয়তো জায়গা বদলের জন্য বৌমা একফোঁটা ঘুমোতেও পারেনি। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চোখের নীচে কালিমা। তা ছাড়া আছে দুরন্ত অন্তর্দাহ। গোপনে কত কেঁদেছে মেয়েটি কে জানে। স্বামীর ব্যবহার? যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মতন কথাটা সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়ল। সত্যি তো, তিনি বৌয়ের অতর্কিত অন্তর্ধান নিয়ে রাগ করেছেন, দুঃখ করেছেন কাল, নিজের ছেলেকে তো একবার ভাল করে জিজ্ঞেস করলেন না, স্ত্রীর সংগে তার ব্যবহার, তার কথাবার্তার ভিতর কতটা রূঢ়তা, কতটা অন্যায় ছিল? না, জিজ্ঞেস করাটা কিছু না, যদি সত্যি কিছুমাত্র অন্যায়ও করে থাকে সুধাংশু, এখনই সে তা স্বীকার করবে না, অন্তত দু-একদিন না গেলে নয়। ছেলেকে সিদ্ধেশ্বর জানেন। একটু জেদী, এক-রোখা। কথা হচ্ছে যে, এই দু বছর ধরে তিনি দুজনকে চোখের ওপর দেখছেন, তিনি শোভনাকে যেমন লক্ষ্য করেছেন—নিজের ছেলেকে কি সেরকম সূক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে, সজাগ মন নিয়ে বিচার করে দেখেছেন স্বামী হবার যোগ্যতা তার কতটা আছে? চিন্তা করার সংগে সংগে অবশ্য প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়। উত্তর শোভনা, কল্যাণী, তার দৃষ্টি তার প্রেমময়ী রূপ—মেয়েদের মুখ তো আয়না। আয়নার ভিতর স্বামীর ভালবাসা, স্নেহ, সহৃদয়তা, সততার প্রতিফলন হয়। সিদ্ধেশ্বর একদিনও বৌমার বিষণ্ণ বিমর্ষ মূর্তি দেখেননি।

অর্থাৎ সাময়িক কলহ, অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য দুজনের বিচ্ছেদ।

হাল্কা মন নিয়ে সিদ্ধেশ্বর ট্রাম থেকে নামলেন। চিন্তা করলেন তিনি, বালিগঞ্জ গিয়ে তাঁর অন্তত এটুকু লাভ হয়েছে যে, বৌমার মন আর-একটু পরিষ্কার করে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ঝগড়ার নামে বাপের বাড়ি কি কাকার বাড়ি ধাওয়া করার মেয়ে ও না। সেই ধাওয়া মানে অনেক দিনের জন্য চলে যাওয়া। তা ছাড়া এর মধ্যে কেমন একটা কুসংস্কার, অশিক্ষার গন্ধও যেন লুকোনো আছে। আজকাল মেয়েদের যদিও এটা কমেছে। আগে, সিদ্ধেশ্বরবাবু যতটা জানেন, ধারে কাছে বাবা, কাকা কি মামার বাড়ি আছে, এমন মেয়েকে লোকে বৌ করে ঘরে আনতে ভয় পেতো। তাঁর বৌমা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, দু বছর কলেজেও পড়াশোনা করেছে। গোড়ায় সিদ্ধেশ্বরবাবু ইচ্ছা করেছিলেন, বৌমা আবার কলেজে ভর্তি হোক, বি-এটা পাশ করে ফেলুক, একলা দুপুরে বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে।—কারণ কি সিদ্ধেশ্বর-বাবু সঠিক জানেন না, শোভনা আর কলেজে পড়তে রাজী হয়নি,—তবে সিদ্ধেশ্বরবাবু এটা অনুমান করেছেন, বৌমা যে সেই সনাতন সতী-সাধ্বীর দেশের মেয়ে, বিয়ের পর কিছুতেই কথাটা ভুলতে পারছে না। বিয়ের পর মেয়েদের মনের নানা পরিবর্তন ঘটে। অত্যন্ত আধুনিক পরিবারের হয়েও শোভনার মনের এই পরিবর্তনটা যে লক্ষ্য করার মতো, সিদ্ধেশ্বরবাবু তা অস্বীকার করতে পারেননি কোনোদিন এবং বলতে কি, এইজন্য তিনি পুত্রবধূর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, পরম শত্রুও তাঁকে এ অপবাদ দেবে না। তবে যদি কোনো মেয়ে স্বামীর সংসারে এসে আর স্কুলে কলেজে পড়তে রাজী না হয়, পড়া বন্ধ করে দেয়, ভিতরে ভিতরে তিনি যেন সুখীই হন। এদিক থেকে সিদ্ধেশ্বরকে যদি কেউ রক্ষণশীল বলে তাতে তিনি মোটেই চটেন না। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে আজকাল অনেক মেয়েকে বিয়ের পর লেখাপড়া শিখতে এবং চাকরি করতেও বেরোতে হয়। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু যে মেয়ের চাকরি করার দরকার পড়ে না, স্বামী শ্বশুরের রোজগারই যার পক্ষে যথেষ্ট, সে মেয়েকে হাতে থলে ঝুলিয়ে ট্রাম বাস ধরতে ছুটতে দেখলে সিদ্ধেশ্বর ভিতরে ভিতরে দুঃখ পান। এটা তিনি অনেক দেখে এবং শুনে জেনে ফেলেছেন, ভাল শাড়িটি পরব, ভাল

গয়নাটি গড়াব, কি দামী ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকবে মাত্র এই দুশ্চিন্তা, এই জাতের সব উৎকট উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনেক বড় বড় চাকুরে শ্বশুর, ভাসুর অথবা স্বামীর পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ বা বধূরা চাকরি করতে বেরোচ্ছেন। এবং কেউ কেউ এটাকে ফ্যাশানের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছেন। না, সিদ্ধেশ্বরবাবু এ-ও চিন্তা করেছেন, কলেজে না পড়ুক, বাড়িতে ঘরে বসে পড়াশোনা করে এখন অনেক মেয়ে বি-এ এম-এ পাশ করছে। যদি শোভনার সে-রকম ইচ্ছা দেখা যেত তো সিদ্ধেশ্বর বই-টই কিনে দিতেন,—কিন্তু শোভনা বাড়িতেও পড়তে চায়নি। পড়তে চায়নি বলে সিদ্ধেশ্বর অসন্তুষ্ট না, কেবল পাশ করার জন্য কলেজের ক'খানা পুঁথি পড়লে জ্ঞান হয় আর আমাদের উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, ভাগবত পড়লে জ্ঞান হয় না, এ একটা কথাই না। বেদ উপনিষদ গীতা মহাভারত সিদ্ধেশ্বরের টেবিলে রয়েছে। সেসবও পুত্রবধূকে কোনোদিন বড় একটা হাতে নিতে দেখা যায়নি। সিদ্ধেশ্বরের তাতেও দুঃখ নেই, তার কারণ, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, ধর্মগ্রন্থ পড়ে সময় কাটানোর চেয়ে শ্বশুর মশায়ের একটা মাফলার বোনা শেষ করতে, কি খোকার টেবিল ঢাকনার সুঁচসুতো দিয়ে কাজ করতে যেন বৌমা বেশি উৎসাহ পেয়েছে, আনন্দ পেয়েছে। ঝি চাকর থাকা সত্ত্বেও বৌমা কতবার করে যে সিদ্ধেশ্বরের টেবিল, বিছানা, খোকার টেবিল, বইয়ের র‍্যাক এবং বিছানাটির ওপর ঝাড়ন বুলিয়ে গোছগাছ করে রেখেছে তা তিনিও অস্বীকার করবেন না, সুধাংশু করবে না। আদর্শ গৃহিণী। ক্লাশে সিঁদুর পরা এক ডজন মেয়েকে তিনি রোজ দেখেন। দেখেন আর তাঁর বৌমার কথা চিন্তা করেন। তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে অনেক রূপসী মেয়েও আছে, মেয়ে বৌ—কিন্তু শোভনার রূপের সঙ্গে যেন কারও তুলনা হয় না। নাক চোখ ভুরু চুল গায়ের রং ইত্যাদি সর্বকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নারীর রূপের যে মাপকাঠি কবিরা ঠিক করে গেছেন সেই মাপকাঠির বিচারে তাঁর ছাত্রীরা কেউ কেউ ফুল মার্ক পাবে সন্দেহ নেই,—কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ শোভনার মধ্যে রূপের অতিরিক্ত আর একটি রূপ যেন তিনি দেখতে পান। এবং এ যে ওর অন্তরের রূপ, স্নেহ মমতা প্রেম ও ভক্তির মাধুর্যে মণ্ডিত হৃদয়ের স্বর্গীয় বর্ণচ্ছটা ষাট বছরের অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে সিদ্ধেশ্বর তা দেখতে পেয়েছেন বৈকি। বহিরঙ্গের রূপ ও অন্তরের রূপ নিয়েই তো নারী মহীয়সী হয়ে ওঠে। হৃদয়ের ঐশ্বর্য ছাড়া মেয়েদের রূপ যে অসম্পূর্ণ থাকে শোভনাকে দেখার আগে বুঝি সিদ্ধেশ্বরের তেমন করে জানা ছিল না।

ভালবাসার বিয়ে—তা-ও কোর্টে কাজটি সেরে এসে যেদিন খোকা তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সিদ্ধেশ্বর রাগ করেছিলেন,—ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু শোভনা যখন তাঁর সামনে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল তখন সিদ্ধেশ্বর মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে যান। রূপের এত দীপ্তি তিনি আগে দেখেননি। বড় বেশি উজ্জ্বল, বড় বেশি পবিত্র একটি দীপশিখা তাঁর ঘর আলো করে দিল, সিদ্ধেশ্বর সেদিন মনে মনে বলে উঠেছিলেন।

সুধাংশু বেরিয়ে গেছে। এত সকাল সকাল! অন্যদিন দশটায় বেরোয়, আজ ন'টার আগে বেরিয়ে গেল? চাকরের মুখে খবর শুনে সিদ্ধেশ্বর চুপ করে রইলেন। তারপর সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করলেন, খোকা খেয়ে বেরিয়েছে কিনা, স্নান করে গরম ভাত খেয়ে গেছে কিনা। হ্যাঁ, খোকা সকালে উঠে চা খেয়েছে, দাড়ি কামিয়েছে, স্নান করেছে এবং মাখন, ডিমসিদ্ধ ও দৈ দিয়ে ভাত খেয়ে কোট প্যান্ট পরে কোর্টে চলে গেছে। খোকা আজ কি দিয়ে ভাত খেল ঝি ও চাকরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সিদ্ধেশ্বর জেনে নিলেন। 'কেন, মাছ হয়নি কেন, মাছের ঝোল রেঁধে দিতে পারলি না?' চাকর উত্তর করল, বাজারে যাওয়া হয়নি। বাজারে না গেলে মাছ আসবে কেমন করে। তখন সিদ্ধেশ্বরের খেয়াল হয়। সকালে উঠে তাড়াহুড়ো করে তিনি বালিগঞ্জে চলে গেছেন। বাজারের টাকা দিয়ে যাননি। মনেই ছিল না। মনিব্যাগ খুলে তিনি এখন টাকা বার করে দেন। 'যা, ভাল মাছ নিয়ে আয়। খোকা রাত্রে মাছ দিয়ে ভাত খাবে। ভাল করে ভেজেভুজে রাখিস।' অন্যদিন সিদ্ধেশ্বর বৌমার হাতে টাকা দিয়ে চাকরকে বাজারে পাঠাতে বলেন। আজ অনেকদিন পর তিনি সরাসরি চাকরের হাতে টাকা দিলেন। দিয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। অন্যদিন এ সময়ে তিনি কাগজ পড়েন। আজ কাগজ ভাঁজ করা অবস্থায় টেবিলে পড়ে রইল। সিদ্ধেশ্বর তা স্পর্শও করলেন না। অন্যদিন কাগজ পড়া সেরে তিনি দাড়ি কামাতে বসেন। আজ তাঁর বাঁধা নাপিত মনোহর এসে ঘুরে গেল। গালে হাত বুলিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, 'থাক, আজ ইচ্ছে করছে না।' রোজ দশটার মধ্যে সিদ্ধেশ্বরের দাড়ি কামানো এবং স্নানের কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি ধীরে সুস্থে আহারে বসেন। খেতে খেতে বৌমার সঙ্গে সমাজ সাহিত্য কত কি নিয়ে গল্প করেন। সুধাংশু ইতিমধ্যে বেরিয়ে যায় বলে শোভনারও কাজের চাপ কমে যায়। শ্বশুর মশায়কে খেতে দিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করে। বেলা বারোটার আগে কোনোদিনই সিদ্ধেশ্বরের ক্লাস থাকে না। মঙ্গল ও শুক্রবার তো সেই আড়াইটায় ক্লাস। কাজেই আহারের পর সিদ্ধেশ্বর বেশ কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারেন। ইতিমধ্যে শোভনা খেয়ে নেয়। শ্বশুর মশায় ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখলে ঘড়ি দেখে সময় মতো তাঁকে জাগিয়ে দেয়, তাঁর জামা কাপড় জুতো ছাতা এগিয়ে দেয়। কাপড় পরে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে সিদ্ধেশ্বর বাড়ি থেকে বেরোন, কিন্তু বেরোবার সময় সিঁড়ির মুখে একবার থমকে দাঁড়ান, ডাকেন, 'বৌমা!' শোভনা তার সুন্দর মুখখানা ওপরের বারান্দা থেকে বাড়িয়ে দেয়। 'কিছু বলছেন বাবা?'

'হুঁ' সিদ্ধেশ্বর ঢোক গেলেন, রাস্তার রোদটা দেখেন, তারপর ওপরের দিকে ঘাড় তোলেন। 'হঠাৎ কিছুর জন্য যদি খবর পাঠাতে হয় তো ভোলাকে কলেজে পাঠিয়ে দেবে। ও তো আমার কলেজ চেনে।'

'আচ্ছা।' শোভনা চোখ বুজে শ্বশুরের উপদেশ শিরোধার্য করে নেয়।

সিদ্ধেশ্বর এবার নিশ্চিন্ত মনে রাস্তায় পা বাড়াতে পারেন। হঠাৎ কিছুর জন্য যদি খবর পাঠাতে হয়,—তার মানে যদি কোনো বিপদ আপদ ঘটে। সরাসরি না বলে কথাটা সিদ্ধেশ্বর ঘুরিয়ে বলেন। সারা দুপুর বাড়িতে একা কাটাতে হচ্ছে বৌমাকে। তা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই দীর্ঘ দুপুরের মধ্যে এমন কোনো বিপদ ঘটেনি মাধবী-নিলয়ে যার ফলে—

একে একে সিদ্ধেশ্বরের আজ সব মনে পড়ছে। প্রত্যেক দিনের ঘটনা। বসে বসে তিনি ভাবছেন তো ভাবছেনই। দশটাও বাজল। ঝি তেলের বাটি রেখে গেল। ইচ্ছা হচ্ছিল না তাঁর স্নান করত। একটা মানুষের অভাবে বাড়িটা যে আজ কী ভয়ংকর শূন্য মনে হচ্ছিল!

একটা ক্ষীণ আশা ছিল বিকেলে বাড়ি ফিরে বৌমাকে দেখতে পাবেন। তাই কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কোথাও না দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা না বলে তিনি সোজা বাড়ি চলে আসেন। অন্যদিন বৌমা সদর খুলে দেয়, আজ ঝি এসে খুলে দিল। সিদ্ধেশ্বর বুঝলেন, এবেলাও শোভনা ফেরেনি। তাঁর মুখটা কালো হয়ে গেল। 'খোকা ফেরেনি?' ঝি মাথা নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিদ্ধেশ্বর জামা কাপড় ছেড়ে আবার বারান্দায় চেয়ারে বসে রইলেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যার ছায়াও এক সময় মিলিয়ে গিয়ে রাত হল। সিদ্ধেশ্বর এবার উঠে রেলিং ঝুঁকে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন। খোকা এখনও ফিরল না। সিদ্ধেশ্বর ধরে নিলেন, নিশ্চয় ছেড়ে বালিগঞ্জে গেছে। ভবানীপুরেও যেতে

পারে। বৌমা তার কাছে কোনো ঠিকানা বলে না এটা সুধাংশুর রাগের কথা, অভিমান হয়েছিল বলে কাল সিদ্ধেশ্বরের প্রশ্নের এরকম একটা জবাব দিয়েছিল, না হলে বৌমা কোথায় কোন্ বান্ধবীর বাড়ি যায় তা কি আর ছেলে জানে না? তার ছেলের সম্মতি না থাকলে বৌমা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে? কোনো স্ত্রীই পারে না।

ওদিকে সকাল সকাল বেরিয়ে গেল অথচ রাত্রি আটটা বাজছে খোকা ফিরছে না, সিদ্ধেশ্বর ভাবলেন, কে জানে, হয়তো এক সঙ্গে দুজন ট্যাক্সী করে ফিরছে। নীচে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনে তিনি চকিত হয়ে উঠলেন। শব্দ মিলিয়ে গেল, এবাড়িতে কেউ ঢুকল না। সিদ্ধেশ্বর চেয়ার থেকে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করেন, নিজের ঘরে ঢোকেন, খোকার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ান। এক সময় তিনি সে-ঘরেও ঢুকে পড়েন, হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। বিছানাটা তেমন সুন্দরভাবে পাতা নেই, চাদরের কোণাটা ঝুলে আছে। ঝি ঘর ঝাট দিয়ে গেছে, তা হলেও কি আর সবকিছু গুছিয়ে রাখতে পেরেছে ও, না রাখতে তেমন গ্রাহ্য করেছে? কেনই বা করবে। তাছাড়া, অ্যাশট্রেটা টেবিলের কোনদিকে সরিয়ে রাখতে হয়, আয়নাটা বইয়ের সারির ওপর দাঁড় করানো, ওটা তুলে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, ময়লা টাইটা চেয়ারের পিঠে ঝুলছে, ওটা ওদিকের আলনার পিছনের সারিতে যাবে, অত শত ভেবে কাজ করতে ঝিয়ের বয়ে গেছে; চিন্তা করে সিদ্ধেশ্বর একটা তপ্ত ভারি নিশ্বাস ফেললেন। তিনি নিজের হাতে এখন আর কিছুই সরালেন না, কিছুই ধরলেন না। বৌমা এসে দেখুক তার ঘরের চেহারাটা। একদিন গৃহিণী ঘরে না থাকলে ঘরের, ঘরের জিনিসপত্রের কী অবস্থা হয়!

আর, হ্যাঁ, খোকা,—খোকাকেও বুঝতে দিতে হবে গৃহিণী সচিব সখা—

বড়রকমের ঝগড়াঝাটি হোক কি ছোট-খাটো ঝগড়া হোক,—একবেলার জন্য স্ত্রী রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যাক, কি এক মাসের জন্য যাক, চূড়ান্ত অসুবিধার মধ্যে পুরুষকে পড়তে হয়। কোনো পুরুষ এক মাস ধরে অসুবিধা সহ্য করার ধৈর্য রাখে, কেউ এক বেলাতেই হাত পা ভেঙ্গে পড়ে। এখন ঘরের অগোছালো চেহারা দেখে সিদ্ধেশ্বর মনে মনে হাসলেন। যেন সিদ্ধেশ্বরের ইচ্ছা করছিল নিজের হাতে তিনি বই বিছানা টেবিল আলনার আর একটু অগোছালো এলোমেলো চেহারা করে রাখেন, যাতে ঘরে পা দিতে না দিতে খোকা বিরক্ত হয়, রাগ করে, মেজাজ খারাপ করে। যদি খোকা ভেবেও থাকে যে, শোভনা নিজে থেকে না ফিরে এলে সে গরজ করে বৌকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে না তো থাকায় খাওয়ায় পরায় তাকে কিছু কিছু অসুবিধা অশান্তি বোধ করতে দিতে বাধা কি, সিদ্ধেশ্বর চিন্তা করলেন। অবশ্য এটা খুব বড় কথা না। অসুবিধা বা অশান্তি বোধ করার যদি হয় তো সুধাংশু নিশ্চয়ই সকালে ঘুম থেকে উঠেই করে গেছে,—স্ত্রীর অভাববোধ করতে তৃতীয় ব্যক্তির চেষ্টাকৃত অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলার জন্য সুধাংশু নিশ্চয় বসে থাকবে না। তাছাড়া, কাল রাত্রে সুধাংশুর কান্না?

'কে?'

'আমি।'

সিদ্ধেশ্বর দেখেই বুঝতে পারলেন, খোকা একা ফিরেছে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে সুধাংশুকে। তা হলেও যতটা ক্লান্ত বা বিষণ্ণ দেখাবার ততটা যেন না।

'তুমি এঘরে চুপচাপ বসে যে?'

'দশটা বাজে,—ভাবছি অত রাত হল,—এখন পর্যন্ত তুই—' ছেলের মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না, সিদ্ধেশ্বর চোখ নামিয়ে চৌকাঠ দেখেন।

'অ,—হ্যাঁ, একটু রাত হয়ে গেল। তুমি খেয়েছ?' জুতো ছেড়ে সুধাংশু ভিতরে ঢুকল।

'না।'

'আমি একটু সিনেমায় গিয়েছিলাম। রাত হয়ে গেল। প্রণব পরিমলদের পাল্লায় পড়ে—তা, অনেকদিন পর বাংলা বই দেখা গেল, মন্দ না।' অল্প শব্দ করে হাসল সুধাংশু। হাসল কি? সিদ্ধেশ্বর এবার চোখ তুলে খোকার মুখ দেখলেন। প্রণব পরিমল ওরা ছেলের এডভোকেট বন্ধু সব। তা বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া অস্বাভাবিক না বা সিনেমা দেখে খুশী হয়ে রাত করে ঘরে ফেরা। কিন্তু?

একটা জিজ্ঞাসা, একটা দুশ্চিন্তা পাকা ভুরুর মাঝখানে ধরে রেখে সিদ্ধেশ্বর খোকার গায়ের জামা ছাড়া দেখলেন। খোকা এবার পেণ্টুলন ছাড়বে। সিদ্ধেশ্বর উঠে দাঁড়ান। 'কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও,—ওরা জল টল তুলে রেখেছে কি। ভোলা ভোলা, মনুর মা—' যেন একটু ব্যস্ত হয়ে ঝি চাকরদের ডাকতে ডাকতে সিদ্ধেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

তিনি ঠিক করেছিলেন খাওয়ার পর কথাটা তুলবেন, কিন্তু খেতে বসে খোকাই নিজে থেকে তুলল। 'তুমি বালিগঞ্জে গিয়েছিলে বুঝি সকালে উঠে?'

'হুঁ।'

'কি বললেন বিলাসবাবু? তাঁর স্ত্রী?'

'বৌমা ওখানে যায়নি।'

খোকা এবারও অল্প শব্দ করে হাসল। সিনেমা দেখার প্রসঙ্গে হাসিটা যদিও একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছিল সিদ্ধেশ্বরের, এখন, আজ, বৌমার প্রসঙ্গে এই হাসি তাঁকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিল।

'বুঝলে বাবা, তুমি তাকে যা মনে করতে ও তা না।' খোকা থামল। সিদ্ধেশ্বর নীরব। অধোবদন। যেন কোনোমতে দুজনেই খাওয়া শেষ করলেন।

'আমার ইচ্ছা ছিল না তুমি বিলাসবাবুদের ওখানে ছুটে যাও।' খেয়ে উঠে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে সুধাংশু বেশ রুক্ষ গলায় বলল, 'ও সেখানে যায়নি আমি জানতাম।'

সিদ্ধেশ্বর কেমন যেন অসহায় চোখে ছেলেকে দেখছিলেন। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারেন না।

'যাও, তুমি শুয়ে পড়ো গে, এগারোটা বাজে।'

'হ্যাঁ, শোব,—কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি না কি এমন ব্যাপার হল।' সিদ্ধেশ্বর ছেলের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। 'ওখানে যায়নি, কিন্তু আর কোথায় যেতে পারে বৌমা?'

'অনেক জায়গায় যেতে পারে, এসব মেয়ের যাবার জায়গার অভাব আছে নাকি কিছু।' খোকা সম্পূর্ণ ঘরে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখে। রাগের কথা, অভিমানের কথা। কিন্তু তাই বলে তিনি তো ধৈর্য হারাতে পারেন না। যেন সাহসে ভর করে সিদ্ধেশ্বর চৌকাঠের ওপারে পা রাখলেন।

'আমি বলছিলাম কি, ভবানীপুরের ঠিকানাটা যদি পাওয়া যেতো, কাল সকালে না হয় সেখানে একবার খোঁজ করে—'

'ওসব ব্লাফ, বুঝলে, ভবানীপুরে আমার বান্ধবী আছে, সিনেমায় যাচ্ছি, ধরমতলায় ব্লাউজের কাপড় কিনতে যাওয়া,—একটাও সত্য কথা কোনোদিন বলেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না, এখন আমি বুঝতে পারছি, —ওর যেখানে যাওয়ার দুপুরবেলা ঠিক বেরিয়ে গেছে।'

'ছি ছি, তুই এসব কী বলছিস খোকা!' সিদ্ধেশ্বর ছেলের ঘরে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু সুধাংশু ঘুরে দাঁড়ায় না। হাতের আয়না রেখে জানালা দেখছে। একটু সময় চুপ করে থাকেন সিদ্ধেশ্বর, তারপর: 'কেন, ওর সম্পর্কে এরকম একটা বিশ্বাস তোর হচ্ছে কেন, বৌমাকে দেখে তো কোনোদিন আমার মনে হয়নি যে......মনে হয়নি যে মিথ্যা কথা বলার মেয়ে ও,—'

'তোমার মনে হয়নি, না বাবা?' সুধাংশু জানালার বাইরে চোখ রেখে বাবার সঙ্গে না, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে। 'আমারও মনে হয়নি, হত না,—এখন হচ্ছে। কাল বিকেলে এসে টেবিলের ওপর সেই চিঠি দেখে মনে হচ্ছে। তার কথা তার হাসি, তার চাউনি,—প্রত্যেকটা স্টেপ পর্যন্ত মিথ্যা দিয়ে ও মুড়ে রেখেছিল। আসল চেহারা

ঢাকতে কি আর কম চেষ্টা করেছে দুষ্টু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর পারল না. এখন বুঝছি, ভিতরে ভিতরে ও কী ভীষণ ছটফট করছিল বেরিয়ে যেতে, হ্যাঁ, এখন জলের মতন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁচ্ বাঁচ্......যেন জানালার গরাদের সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে সুধাংশু কপাল ঠুকতে চাইছে।'

'খোকা!' সিদ্ধেশ্বর ছেলের হাত ধরে ফেলেন। জোর করে সুধাংশু হাত ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর উত্তেজনায় রাগে কাঁপতে থাকেন। 'আশ্চর্য,—সাধারণ একটু ঝগড়াঝাটি, মান অভিমান কোন্ ঘরে না হয়, কোন্ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে না হয়,—তা বলে—না আমি ভাবতেও পারি না, এমন বিশ্রী মুখ করে তুই ওকে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করেছিস.—আজই; রাগ করে ক'দিন ও দূরে সরে থাকবে? আমার তো মনে হয় কাল সকালে ও চলে আসবে।'

'সকালে চলে আসবে।' ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সুধাংশু; তখন সিনেমা দেখার কথা বলতে গিয়ে, বালিগঞ্জের কথা উঠতে যেমন ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছিল এখন আবার সেই সরু তীক্ষ্ম হুল ফোটানো হাসি ছেলেকে হাসতে দেখে সিদ্ধেশ্বরের মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল।

'বুঝলে বাবা, রাগারাগি বা ঝগড়াঝাটি যদি হত তো আমি এত কথা বলতাম না,—দু বছরের মধ্যে একদিন ওকে রাগ করতে দেখিনি, আমাকেও রাগ করতে দেয়নি,—সাধারণ মেয়েরা রাগ করে, অভিমান করে, কাঁদে আবার সেসব ভুলে গিয়ে এক সময় ভালবাসে—কিন্তু ও কি সাধারণ মেয়ে ছিল,—ডাইনী—ডাইনীর মতন কেবল ভালবাসার খেলা খেলে গেছে; কেবল মোহ আর স্বপ্ন দুহাতে ছড়িয়ে গেছে এ-সংসারে, —আমি ভুলে ছিলাম,—তোমায়ও ভুলিয়ে রেখেছিল...বাঁচ্...বাঁচ্—'

'খোকা—'

'যাও বাবা, তুমি ঘরে যাও,—ওর সম্পর্কে আর বেশি বকতে গেলে আমার ঘুম চটে যাবে,—আমি টায়ার্ড, ভীষণ টায়ার্ড—এইবেলা আমি ঘুমোব।'

সিদ্ধেশ্বর মাথা নীচু করে ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঢাকুরিয়ার সুইমিং ক্লাব। এক সঙ্গে ছেলেরা মেয়েরা সাঁতার শেখে, সাঁতার কাটে। গড়পাড়ের ছেলে কি করে কোন্ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে রোজ বিকেল পড়তে সেখানে সাঁতার কাটতে যায়। সিদ্ধেশ্বর দেখতেন, জানতেন, কিন্তু ছেলেকে কিছু বলতেন না। এক সঙ্গে ছেলে মেয়ে কলেজে পড়ে,—এক সঙ্গে তাদের খেলাধুলায় কিছু দোষ দেখার মতন অনুদার সংকীর্ণ মন সিদ্ধেশ্বরের কোনদিন ছিল না। বরং যদি কোথাও সংকীর্ণতা দেখেছেন, কুসংস্কার চোখে পড়েছে বিষের মতন তিনি সেই পরিবেশ, সেই সঙ্গ ছেলেকে বর্জন করে, চলতে শিখিয়েছেন। মনকে আলোর মতন সুন্দর, আকাশের মতন মুক্ত উদার করতে হবে,—তবে না এই আলোর ভুবনের স্রষ্টার প্রিয়তম জীব হতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করবে তুমি। যতটা অনুমান করেছিলেন সিদ্ধেশ্বর, —বিলাসবাবুর ভাইঝির সঙ্গে সেখানে সেই সাঁতারের ক্লাবে খোকার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, সেখান থেকে প্রেমের সৃষ্টি। না, একমাত্র আপত্তি ছিল সিদ্ধেশ্বরের বিয়ের পদ্ধতিতে, আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের মতন সুন্দর পবিত্র শুদ্ধ বিবাহ-প্রথা আর আছে নাকি,—অগ্নি সাক্ষী করে সেই বেদমন্ত্র উচ্চারণঃ যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। তোমার এই হৃদয় আমার হোক। কোর্টের বিয়ে চুক্তির বিয়ে। বিয়ে তো শুধু একটা চুক্তিমাত্র নয়,—এ যে পবিত্র ধর্মবন্ধন। কিন্তু উদার মন নিয়ে সিদ্ধেশ্বর দুজনের একগুঁয়েমি অবাধ্যতা ভুলতে পেরেছিলেন। ভুলতে পারার মতন বৌ যে খোকা ঘরে এনেছিল। এখনও সিদ্ধেশ্বরের সেই ধারণা অবিচল আছে। সেবা যত্ন প্রীতি শ্রদ্ধার সৌরভে পূর্ণ করে রেখেছিল শোভনা এই ঘর, এই সংসার। কিন্তু খোকা এইমাত্র কী বলল! সব মিথ্যা, সব ভান, ছলনা? বিছানায় শুয়ে সিদ্ধেশ্বর ছটফট করেন, যেন চিরদিনের মত তাঁর চোখ থেকে ঘুম সরে গেছে। এক সময় উঠে তিনি জল খেলেন, অন্ধকারে পায়চারি করলেন,—তারপর যখন চেয়ারে বসে ঢুল-ছিলেন তখন পাশের ঘরে বিশ্রী শব্দ শুনে তিনি চমকে ওঠেন। যেন একটা কাচের গ্লাস ভাঙল, যেন ওপর থেকে কোনো জিনিস নীচে সিমেন্টের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল। দুবার শব্দ শুনলেন সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বর ঘরের আলো জ্বাললেন না, অন্ধকারে পা টিপে টিপে চৌকাঠ ডিঙিয়ে করিডোরে গিয়ে দাঁড়ান। আর কোনো শব্দ নেই। পা টিপে আর একটু এগোন তিনি, খোকার ঘরের সামনে দাঁড়ান, দরজা বন্ধ, কাজেই দরজার কবাটের ওপর কান চেপে ধরে তিনি চুপ করে থাকেন; ভিতরে আর কোনো শব্দ হচ্ছে কি?

শব্দটা শুনে আবার কিছুটা আশ্বস্ত হন তিনি। যেমন কাল রাত্রে হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে আসেন। এবার বিছানায় শুয়ে তিনি ভাবেন, এত বিদ্বেষ, এত ঘৃণা, এত অবিশ্বাস যদি, তবে কান্না কেন। তাই হবে, সিদ্ধেশ্বর চট্ করে উত্তর খুঁজে পান, প্রেম যেখানে তীব্র, অভিমানও সেখানে তত বেশি প্রবল, প্রখর। একটু হাওয়াতেই সেখানে ঝড়ের দুঃস্বপ্ন বয়ে আনে। তাই না খোকা একটি মানুষের একদিনের বিচ্ছেদে এমন বিশ্রী মেজাজ করে আছে, এমন কুৎসিত সব উক্তি করছে। অপরপক্ষও এই যুক্তি প্রয়োগ করতে পেরে সিদ্ধেশ্বর ভিতরে ভিতরে সান্ত্বনা পান। হয়তো অভিমান করার, রাগ করার তুচ্ছতম কারণ ঘটতে না ঘটতে বৌমা এমন বিশ্রী কড়া করে এক চিঠি রেখে চলে গেল।

ভাল না, এটা উচিত হয়নি। সিদ্ধেশ্বর চিন্তা করলেন, এইজন্যই সংযম কথাটার ওপর মহাপুরুষেরা এত জোর দিয়ে গেছেন। ভালবাসার বাড়াবাড়িও অশান্তি, অবাঞ্ছিত যন্ত্রণা বয়ে আনে। চিন্তা করতে করতে বাকি রাতটুকু, পুত্র পুত্রবধূর দাম্পত্য-জীবনের নিভৃততম অন্ধকার অনাবৃত এক অংশে উঁকি দিতে চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে এলেন আর হতাশার গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। ঘুম আর এল না।

আকাশ ফর্সা হবার আগেই তিনি শয্যাত্যাগ করলেন।

কিন্তু তারও আগে যেন সুধাংশু বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে চলে এসেছে। করিডোরে পায়চারি করছে। উসকো খুসকো চুল, দুই চোখ রক্তবর্ণ।

'তুই ঘুমোসনি খোকা?'

'না।'

সিদ্ধেশ্বর নিজের অনিদ্রার কথা বললেন না, বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। মুখ হাত ধুয়ে তিনি যখন ফিরে এলেন খোকা তখন টাই স্যুট পরে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার? এত সকালে?' সিদ্ধেশ্বর অবাক। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই হুল ফোটানো বিশ্রী জ্বালাকর হাসি হাসছে ছেলে।

'আমাকে সোয়া সাতটার ট্রেন ধরতে হবে।'

'ট্রেন ধরতে হবে!' সিদ্ধেশ্বর বিড়বিড় করেন। 'কোথায়—'

'অ, তোমায় বলতে ভুলে গেছি, পরিমলের শালীর বিয়ে,—আমায় ধরেছে বিয়েতে যেতে হবে, হ্যাঁ, বর্ধমান।'

আপাদমস্তক ছেলেকে দেখে সিদ্ধেশ্বর কি যেন ভাবলেন, তারপর অল্প হাসলেন 'তা বন্ধুর শালীর বিয়েতে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু এ-পোশাকে কেন, তোর সিল্কে পাঞ্জাবি ধুতি বাক্সে তোলা আছে না?'

'তাতে আর কি—ও আমার এ পোশাকেই চলবে,—চলি, আমার ট্রেনে দেরি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু চা তো খেলি না, আরে ভোলা-

'থাক, থাক, চায়ের জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এক কাপ চা খাওয়া অ কি, ও আমি বাইরে খেয়ে নেব—' সুধাং সিঁড়ির কাছে চলে গেল। সিদ্ধেশ পিছনে এগোন।

'আজই বিয়ে বুঝি? তা আজ কি ফিরতে পারবি?'

'ধ্যেৎ, তোমার কোনো আইডিয়া নেই, বন্ধুর শালীর বিয়েতে যাচ্ছি, আমোদ ফূর্তি করব, অন্তত তিনদিন তো সেখানে কাটিয়ে আসবই, চলি,—চললাম।' সুধাংশু সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সিদ্ধেশ্বর স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে, এই বেশ, বাড়তি জামা কাপড় সঙ্গে নেওয়া না—

কিন্তু সেখানেই বুঝি সিদ্ধেশ্বরের দুশ্চিন্তা উদ্বেগ বিস্ময় থেমে রইল না। এক পা এক পা করে তিনি ছেলের ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর পায়ের নীচে ভাঙ্গা কাচের টুকরো কড়মড় করে উঠল। মেঝের সর্বত্র ছড়ানো কাচের টুকরো। টেবিল ল্যাম্পটা নীচে পড়ে আছে, ডোমটা ভেঙ্গে শতখান হয়ে আছে, কাচের গ্লাস অ্যাশট্রে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে; বিছানাটা ওলট-পালট হয়ে আছে, টেবিলের কাগজপত্র বই এমনভাবে ছড়ানো যেন কেউ সেগুলো পুড়িয়ে দিতে কি জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতে সব টেনে হিঁচড়ে বের করে রেখেছে। আলনার জামা কাপড় কিছু মেঝেয় পড়ে, কিছু ওপাশের র‍্যাকের ওপর স্তূপ করে রাখা।

ঘরের এই চেহারা দেখে সিদ্ধেশ্বর কিছু বুঝলেন কি? বুঝলেন আর গাঢ় একটা নিশ্বাস ফেলে যতটা পারলেন নিজের হাতে সব গুছিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। চাকর বা ঝিকে ডাকলেন না। জামা কাপড় বই বিছানা গুছিয়ে তিনি মেঝের কাচের টুকরো-গুলো একত্র করে একটা কাগজে তুললেন, তারপর জানালার বাইরে নীচের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ততক্ষণে রোদ উঠেছে। চাকর চা নিয়ে এসেছে। বারান্দার ইজি-চেয়ারে চুপচাপ বসে সিদ্ধেশ্বর চা খেলেন। আজ আর বাজারের কথা, মাছ আনার কথা চাকরকে বললেন না। ছেলে বাইরে চলে গেছে। নিজে কি খাবেন তা-ও সিদ্ধেশ্বর ভুলে রইলেন।

তিনদিন না, সাত আটদিন সুধাংশু বাইরে রইল। আর এ ক'টা দিন সিদ্ধেশ্বর কি করলেন? হ্যাঁ, পুত্রবধূকে খুঁজলেন। মনে মনে খুঁজেছেন। সেদিন সকালে খোকার ঘরের বিশৃঙ্খল চেহারা, মেঝেয় ছড়ানো কাচের ভাঙ্গা টুকরোগুলো যেমন বাড়ির ঝি চাকরের কাছে লুকোলেন, তেমনি পৃথিবীর কাছে তিনি লুকোতে চাইলেন বাড়ির বৌয়ের ঘর ছেড়ে যাওয়া। বৌমার বাপ মা নেই, কাকা কাকীর কাছে মানুষ, তাই কাকীর ভীষণ অসুখের খবর পেয়ে সেখানে কাকীর কাছে গেছে। কিছুদিন থাকবে। সিদ্ধেশ্বরবাবুই গরজ করে পাঠিয়েছেন, না-পাঠানোটা দৃষ্টিকটু হয়। হ্যাঁ, অসুবিধা তো হচ্ছেই, এ বয়সে ঝি চাকরের হাতে খাওয়া পোষায় না। তাই তাঁর চেহারাটা একটু খারাপ হয়েছে। ওদিকে সুধাংশু গেছে মফঃস্বলে এক মামলার ব্যাপারে। বস্তুত বন্ধুর শালীর বিয়েতে সাত আটদিন বাইরে কাটানোটা হাস্যকর এবং লোকে বিশ্বাসও করবে না চিন্তা করে সিদ্ধেশ্বর 'সুধাংশুকে ক'দিন এখানে দেখছিনে' প্রশ্নের এরকম একটা জবাব দিলেন। লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা থাকার অসুবিধা এগুলো। নানা মানুষের নানারকম প্রশ্নের জবাব সেরে সিদ্ধেশ্বর তাড়াতাড়ি সরে গেছেন। অবশ্য এটা হ'ত সকালের দিকে যতক্ষণ তিনি বাড়িতে থাকতেন, পাড়ায় থাকতেন—না হলে কলেজে কি কলেজের বাইরে তাঁর ঘরের কথা, তাঁর ছেলে কি ছেলেবৌ সম্পর্কে কে আর কিছু জানতে বা বলতে এসেছে। নিজের ব্যবহারে নিজেই সিদ্ধেশ্বর এক এক সময় অবাক হয়ে যান। মানুষকে তিনি এত ভালবাসেন, মানুষের সঙ্গ তাঁর এত কাম্য, আর এখন তিনি মানুষ দেখলে সরে যান, পালিয়ে বেড়ান। মাথার চুল বড় হয়েছে, গালের দাঁড়ি বেড়েছে, সেসব গ্রাহ্য নেই। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন, ঘোরেন আর এদিক ওদিক তাকান। কোনো কোনো সময় এক জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর বুকের সেই ক্ষত, প্রকাণ্ড ব্যথাটা নিয়ে আবার একটু একটু এগোন। ইতিমধ্যে তিনি দুদিন ভবানীপুরের রাস্তা গলিগুলি খুঁজে এসেছেন। হয়তো কোনো বাড়ির সদরের সামনে দু-এক মিনিট দাঁড়িয়েও রয়েছেন। তারপর আবার আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এসেছেন। অনেকটা চোরের মতন। চোরের মতন তিনি রাস্তায় একটি যুবতী দেখলে তাকান। সরাসরি কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। তাঁর সংস্কারে বাধে। বিশেষ যদি ডাইনে বাঁয়ে অন্য মানুষ থাকে তবে আর কোনোদিকে চোখই তুলতে পারেন না। তিনি শিক্ষিত ভদ্র, জীবনের ত্রিশ বছরের বেশি অধ্যাপনা করে কেটেছে; কাজেই রাস্তায় মেয়েছেলে দেখলে তাদের দিকে তাকানোর মধ্যে যে গ্লানি লজ্জা অশালীনতা আছে তা প্রতিবার প্রতিটি মেয়েকে দেখতে গিয়ে মনে রেখেছেন। তাই চোরের মতন তাদের দিকে তাকিয়েছেন। পিছনটা দেখেছেন। দেখতে হয়েছে। শোভনার সুগৌর সুদীর্ঘ তনু, সুবলয়িত গলা, বিস্ফারিত খোঁপা, হাঁটার সময় মাথাটা ঈষৎ সামনে ঝুঁকিয়ে চলা, বাঁ হাতে লাল হলুদ রঙে ছোপানো বটুয়া, ডান হাতের লঘু আন্দোলন,—সব সিদ্ধেশ্বরের মনে আছে, সব তাঁর চোখের ওপর ভাসছে। কিন্তু কোথায় সেই উজ্জ্বল রৌদ্ররেখা, শুভ্র জ্যোৎস্নাকান্তি নারীদেহ। একটিও না, একজনও তাঁর বৌমার মতন নয়। তাঁর বৌমা হয়তো কলকাতায় নেই। ভেবে সিদ্ধেশ্বরের চোখে জল এসে গেছে। কোনো পার্কে নিরিবিলি একটি আসন খুঁজে পেলে বা তার চেয়েও নির্জন জায়গা,—পড়ো জমি, বা গাছের তলা দেখতে পেলে সেখানে বসে পড়েছেন। তখন তিনি ক্লান্ত অবসন্ন। আর হাঁটতে পারেন না। ষাট বছরের দুর্বল শরীর কতটা কায়িক শ্রম সহ্য করতে পারে। হয়তো তখন ক্ষুধাও পেয়েছে। রেস্টুরেন্ট বা খাবার দোকানে ঢুকে গপ্‌গপ্ কিছু খেয়ে বেরিয়ে আসা তাঁর চিরদিনের রুচিবিরুদ্ধ। যৌবনেও তিনি সেসব জায়গায় কিছু খেতে পারেননি। কাজেই এই বয়সে রুচি যখন আরো পরিশীলিত, হজমশক্তি দুর্বল তখন তো সেসব খাবারের দোকানের পরিবেশ ও খাদ্য তাঁর কাছে বিষের মতো মনে হবেই। পকেট থেকে দুটো পয়সা তুলে তিনি মুড়িওয়ালাকে ডাকেন। ঠোঙ্গায় করে আদা নুন মেশানো মুড়ি চিবোন। বিকেলে বাড়িতে তাঁর জলখাবার : একটু ছানা, একটু ফল, একটু মিষ্টি তৈরী থাকে। কিন্তু ঠিক সময়ে এখন আর বাড়ি ফেরা তাঁর হয় না। কাজেই—

হ্যাঁ তাঁর এই কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন আছে, সিদ্ধেশ্বর চাইছিলেন যদি এই ক'দিনের মধ্যে বৌমাকে খুঁজে বার করতে পারেন। খোকা কলকাতায় ফেরার আগে যদি তিনি শোভনাকে পেয়ে যান। কাজেই সুধাংশু যে দেরি করে ফিরছে তাতে যেন তিনি স্বস্তিবোধ করছেন। আরো ক'দিন ছেলে বাইরে কাটিয়ে আসুক। মনের, মেজাজের পরিবর্তনের পক্ষে জায়গা বদল ওষুধের মতো কাজ করে। এটা সিদ্ধেশ্বর বুঝে নিয়েছেন, বৌমার ব্যবহারে রাগ করে অভিমান করে খোকা কলকাতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। কাজেই সে জন্য তিনি চিন্তিত নন। হয়তো খোকা বর্ধমানে বসে নেই, হয়তো আরো দু এক জায়গায় ঘুরেছে। ঘুরুক। এখন—

মুড়ির শূন্য ঠোঙ্গাটা ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সিদ্ধেশ্বর আরো গূঢ় গভীর চিন্তায় ডুব দেন। ঝগড়াঝাটি রাগারাগি কিছুই না। যদি সুধাংশুর কথা সত্য হয় তবে বৌমার এভাবে ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ কি। অসুখী? কেন অসুখী। সন্তান? কিন্তু তিনি যতদূর আভাসে ইঙ্গিতে টের পেয়েছেন এখনই তারা সন্তান চাইছে না। এই ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী দুজনই একমত। সুধাংশু

পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট হবে পরীক্ষা পাশ করলে তখন সেসব দেখা যাবে। এ যুগের ছেলে মেয়ে, জীবন সম্পর্কে—জীবনের সম্ভোগ ও প্রতিষ্ঠা দুটো দিক সম্পর্কে তারা অতিমাত্রায় সচেতন। ফ্যামিলী প্ল্যানিং না, প্ল্যান করে ফ্যামিলী গড়ে তোলার পক্ষপাতী দুজনই। সিদ্ধেশ্বর শুনে তৃপ্তই হয়েছেন। পরিচ্ছন্ন জীবন-বোধ। বস্তুত বৌমার বয়সই বা কি। অগাধ বিস্তৃত জীবন পরে আছে সন্তান জন্মাবার, সন্তান লালন করার। না, কথাটা উঠেছিল, দু বছর বিয়ে হয়েছে, অথচ বৌমা এখন পর্যন্ত সন্তানসম্ভবা হচ্ছে না, কোনো অসুখবিসুখ আছে কি না;—সিদ্ধেশ্বরের ছোট বোন সুবালা সেদিন দিল্লি থেকে কলকাতায় চিকিৎসা করতে তাঁর বাসায় উঠেছিল। আর সেই সুযোগে ভগ্নি মারফৎ সিদ্ধেশ্বর কথাটা জেনে নিয়েছেন। শোভনা পিসি শাশুড়ীর কাছে কোনো কথা গোপন করেনি—সুধাংশুও পিসিকে ঠিক একরকম উত্তর দিয়েছে। বরং পিসিকে ঠাট্টা করে খোকা বলছিল, ত্রিশ বছরেই পাঁচ ছয়টির মা হয়ে তুমি কেমন বুড়িয়ে গেছ পিসিমা,—এদিক থেকে তোমাদের বৌমা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী, সেয়ানা। মাস দুই আগের কথা এসব। অথচ—

সিদ্ধেশ্বর ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কপাল ও ভুরুর চামড়া কুঁচকোন আর চিন্তা করেন। যদি সেসব কিছু সমস্যা না হয় তো আর কি নিয়ে দুঃখ আর কি নিয়ে সন্তাপ! খাওয়া পরা থাকা? সিদ্ধেশ্বর চোখ বুজে বলতে পারেন যে-মেয়ে জীবন সম্পর্কে এতটা উচ্চ বলিষ্ঠ আদর্শ পোষণ করে সে-মেয়ে আজ মাছ খেল কি খেল না, দুধ সন্দেশ দিয়ে বিকেলের টিফিন হল কি হল না, সুতী পরল বা সিল্ক পরল না বলে মন খারাপ করতে পারে না। বরং সেসব কোনোদিন তাঁকে চিন্তা করার, ভাববার সুযোগই দেয়নি তাঁর পুত্রবধূ নিজে কিছু মুখে তোলার আগে চাকরটাকে ঝিটাকে ভাগ করে দিয়েছে। অতিরিক্ত দাম দিয়ে খোকা যদি কোনো শাড়ি বা বাড়তি গয়নাটয়নাও এনেছে বৌমা মুখ ভার করেছে। সিদ্ধেশ্বর স্বচক্ষে এসব দেখেছেন। না না সেসব কিছু না। কপালের রগ দুটো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে সিদ্ধেশ্বর বিকেলের আলো-মুছে-যাওয়া আকাশের তারা ফোটা দেখেন। এক এক সময় তাঁর কপাল ঠুকতে ইচ্ছা হয়, যেমন সেদিন খোকা জানালার গরাদে কপাল ঠুকছিল। বৌমা,—শোভনা নামের সেই পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী মেয়েটি কী অভিমান বুকে নিয়ে তাঁর ঘর দুয়ার অন্ধকার করে রেখে চলে এল? তিনি জানতেই পারলেন না;—তাঁর এদিকে কদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে, ফিরে না আসুক, অন্তত একবার মেয়েটিকে কোথাও দেখলে জিজ্ঞেস করবেন কথাটা। কড়া কথায় না, নরম কথায় তিনি মেয়েটিকে প্রশ্ন করবেন। না না, রুক্ষ ভাষায়, ক্রুদ্ধ গলায় সিদ্ধেশ্বর স্বামীত্যাগিনী শোভনার কোমল কব্জি ধরে জোরে নাড়া দিয়ে জেনে নেবেন, হ্যাঁ এই রাস্তার ওপর, চারদিকে যখন মানুষের চোখ কান জেগে থাকবে,—তোমার এভাবে সরে আসার অর্থ কি? সিদ্ধেশ্বর ভাবেন, আর উত্তেজনায় ক্রোধে তাঁর জীর্ণ শরীরের হাড়গুলো যেন শব্দ করে কেঁপে ওঠে। ক্ষণিকের

উত্তেজনা। পরমুহূর্তে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন। হতাশার চাপ চাপ অন্ধকার তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়। কোথায় আর তিনি বৌমার দেখা পাচ্ছেন। এই কটা দিন শহরের অলি-গলি উত্তর দক্ষিণ পূবে পশ্চিম কোনো দিক কি তিনি খোঁজা বাকী রেখেছেন। অবশ্য এক এক সময় তাঁর মনে হয়েছে, এ ভাবে কলকাতা শহরে কোনো মেয়ে বা পুরুষকে খুঁজে বার করা বা তার দেখা পাওয়া কঠিন। হ্যাঁ, দৈবাৎ,—সেই দৈবাতের ওপর,—তাঁর নিজের ভাগ্যের ওপর, খোকার অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে তিনি রাস্তায় হেঁটেছেন আর শোভনার বয়সের মেয়ে দেখলে চমকে ঘাড় ফিরিয়েছেন, তাকিয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি চিন্তা করেছেন পুলিসে খবর দেওয়া। কিন্তু চিন্তাটা উদয় হওয়া মাত্র তাঁর মন সংকুচিত হয়ে গেছে। বাড়ির ঝি চাকরের কাছে, প্রতিবেশীদের কাছে, আর পাঁচটা বাইরের লোকের কাছে তিনি পুত্র-বধূর গৃহত্যাগের কথাটা যেমন গোপন করেছেন তেমনি পুলিসের কাছেও তা গোপন রাখাই শেষ পর্যন্ত যুক্তিসংগত মনে করেছেন।

কলঙ্ক বাইরে প্রকাশ পাবে, সেজন্য না। সিদ্ধেশ্বর এখনও তাই চিন্তা করছেন। ঘাসের ওপর কাগজের ঠোঙাটা হাওয়ায় নড়ছিল কাঁপছিল। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনি ভাবেন, ভোগ বাসনা এ-জগতের সবাইকে কি বাঁধতে পারে,—পারে না; কতজন সংসারাশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেছে তার হিসাব রাখে কে? তবে কি তাঁর বৌমার মনেও সে রকম কিছু বৈরাগ্য এসেছে,—কোনো আশ্রম টাশ্রমে চলে গেল? সিদ্ধেশ্বরের বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে;—রাগ করে দুঃখ পেয়ে খোকা মেয়েটাকে যা-তা গালিগালাজ করল সেদিন, কিন্তু কে জানে বৌমা মনের কোন্ অবস্থায় কোন্ পরমার্থের সন্ধান পেতে সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। কিন্তু বৌমা কি গীতার সেই উপদেশ ভুলে গেছে ঃ সর্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ সন্ন্যাসাবলম্বন না করেও আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে অহংজ্ঞান শূন্য হয়ে সেবাকর্ম করলে আমার প্রসাদে অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ সম্ভব।

চিন্তা করে সিদ্ধেশ্বর গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। কলেজে পড়া মেয়ে আধুনিক মেয়ে বলে যে শোভনার মনের অবস্থার এ রকম একটা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব না, এই যুক্তি তিনি গ্রাহ্য করেন না। মানুষের মন কখন কোন্‌দিকে ঝোঁকে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু তা হলেও, যদি বৌমার দেখা পেতেন তো তিনি তাকে অন্তত বলতে পারতেন ঃ স্বামী সর্বময় দেবতা। পতিব্রত্যের চেয়ে বড় ধর্ম বিবাহিত নারীর আর কী হতে পারে। কাজেই সুধাংশুকে ছেড়ে এসে—

অনেক কথাই সিদ্ধেশ্বরের মনে হয়। আজ কদিন ধরে শোভনার এই অতর্কিত অন্তর্ধান সম্বন্ধে কত কী চিন্তা করেছেন তিনি। লাভ হয়নি কিছু। কেবল মাথাটা গরম হয়েছে, রাত্রে ঘুম হয়নি, চেহারা খারাপ হচ্ছে। কাল কলেজের অরুণবাবু বলছিলেন, 'আপনার একটা শক্ত অসুখ করবে বলে মনে হয়। চুল দাড়ি এত বড় করছেন কেন। জামা কাপড়ও তো ময়লা হয়েছে। বাড়িতে কি কারোর অসুখবিসুখ যাচ্ছে?'

অন্যদিকে চোখ রেখে সিদ্ধেশ্বর গম্ভীর ভাবে উত্তর করছেন, 'বাড়িতে না, কাকীমার অসুখের সংবাদ পেয়ে বৌমা চলে গেছে। বৌমা বাড়িতে না থাকলে আমার জামা-কাপড় কে দেখে, আর—'

'ও তাই, আপনার খাওয়া টাওয়ারও অযত্ন হচ্ছে। সত্যি তো, ছেলের বৌ ছাড়া এমন তো আর কেউ নেই আপনার যত্ন করার এখন—'

অরুণবাবুর কথা এইখানে শেষ করে দিয়ে সিদ্ধেশ্বর লাইব্রেরী-রুম থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ পালিয়ে এসেছেন।

আজ কিন্তু পুলিসে খবর দেওয়ার কথাটাই সিদ্ধেশ্বরের মনকে বার বার চঞ্চল করে তুলছিল সেই দুপুর থেকে। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি নারকেলডাঙার দিকে চলে যান। পোলের কাছে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়,—একটি অল্প বয়সের ছেলে বাসের নীচে চাপা পড়ে। তৎক্ষণাৎ অবশ্য এম্বুলেন্স এসে ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বেঁচে আছে কি মরে গেছে ছেলেটি সিদ্ধেশ্বর জানেন না। কার ছেলে, কোথা থেকে ওই পোলের কাছে এসেছিল, কি করতে এসেছিল, কিছুই সিদ্ধেশ্বরের জানা নেই। কেবল দুর্ঘটনার কথাটাই তাঁর মনে আছে। বৌমা সম্পর্কে এ রকম একটা কিছুও তিনি আশঙ্কা করছেন। কলকাতার রাস্তাঘাট, রাত দিন অ্যাকসিডেণ্ট লেগে আছে; কাল ফিরব পরশু ফিরব এমন মন নিয়ে হয়তো শোভনা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। কিন্তু আর ফেরা হয়নি, রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ল, হাসপাতালে গেল, এবং সেখানে—

কেউ খোঁজ করার নেই, কেউ সনাক্ত করতে গেল না শোভনাকে, হয়তো ডেড-বডি পুলিসের জিম্মায় পচছিল কি এখনও পচছে; সেই জন্যই তো একটা মানুষের খোঁজ খবর না পাওয়া গেলে, হারিয়ে গেলে পুলিসকে জানাতে হয়,—কেবল কলঙ্কের কিনারা করতেই তো পুলিস না, তাদের দিয়ে অনেক উপকার হয়, অনেক সাহায্য হয়।

নিস্তেজ অবসন্ন দেহ মন নিয়ে সিদ্ধেশ্বর যখন বাড়ি ফেরেন তখন রাত দশটা বেজে গেছে। কদিন ধরেই এ রকম হচ্ছে। যেন প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা না হয়, কথা বলতে না হয়, বেশি রাত করে বাড়ি ফেরার এ-ও একটা কারণ। বাড়ির সদরের কাছে এসে আজ তিনি চমকে উঠলেন। দোতলায় সুধাংশুর ঘরে আলো জ্বলছে। খোকা ফিরেছে? কিছুটা খুশি হয়ে, কিছুটা ভয় পেয়ে সিদ্ধেশ্বর একটা শুকনো ঢোক গিলে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢোকেন। দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি খোকার কাশির শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেলেন। আর সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু কী উত্তর দেবেন তিনি? তাঁর কপালের রগ দপদপ করতে লাগল, নিশ্বাস ভারি হয়ে এল। খোকা কি প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করবে না? কী উত্তর দেবেন তিনি! বৌমা ফেরেনি কেন, কিছু খবর পাওয়া গেল কি,—এসব কথার উত্তর তিনি তৈরী করে রেখেছেন কিছু? আমি রাগ করে মন খারাপ করে বাইরে চলে গেছি, কিন্তু তা বলে কি তুমি চুপচাপ বসে থাকবে? যদি ছেলে বলে বসে তো সিদ্ধেশ্বর কী করতে পারেন! বলা স্বাভাবিক। যেন দু মণ পাথর বেঁধে দিয়েছে তাঁর পায়ে, অতি কষ্টে সিদ্ধেশ্বর সিঁড়ি ভাঙেন। কপাল ঘামছে, বুক কাঁপছে।

'বাবা!'

'হ্যাঁ।'

'অনেক রাত করে ঘরে ফিরলে—আজকাল নাকি খুব বেড়াচ্ছ, রোজই রাত করে ফের?'

সিদ্ধেশ্বর অন্তত এ-কথার উত্তর দিতে পারতেন কিন্তু তিনি মুখ খোলার আগে সুধাংশু শব্দ করে হেসে উঠল।

'মাই গড্! কলকাতার রাস্তায় আবার বেড়ানো,—হাওয়ায় টি বি-র জার্ম উড়ছে, রাস্তায় কেবল গাড়ি ঘোড়া, ফুটপাথ ধরে ডজন ডজন প্রস্টিটিউট হাঁটছে,—এর মধ্যে তুমি হাঁটতে পার, বেড়াতে ইচ্ছা করে?'

সিদ্ধেশ্বর এবার আর কথা বলতেই চেষ্টা করেন না, নীরব ভীত চোখে তিনি ছেলেকে দেখেন। পরনে সেই শার্ট প্যাণ্ট। ময়লা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। শার্টের একটাও বোতাম নেই। বুকের চুল দেখা যাচ্ছে হাড় দেখা যাচ্ছে।

সিদ্ধেশ্বর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন।

হাতের বালতিটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল সুধাংশু।

'আমি বাড়োয়ানের বিয়ে খেয়ে সেই রাতেই পুরীর ট্রেন ধরি,—ওয়াণ্ডারফুল ক্লাইমেট—খুব বেড়ালাম কদিন সমুদ্রের

ধারে, দ্যাখো না আমার চেহারা কত ভাল হয়ে গেছে কটা দিনেই। তুমি বুঝতে পাচ্ছ? আমার চেহারা ইম্‌প্রুভ করেনি?'

সিদ্ধেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন এবং ছেলের চেহারার অবস্থা দেখলেন। চোখের নীচে কালি, গাল বসে গেছে, দড়ির মতন হাতের শিরাগুলি চামড়ার ওপর ভেসে উঠেছে। সেসব কিছুই উল্লেখ না করে তিনি মেঝের দিকে চোখ রাখেন। প্রচুর জল ঢালা হয়েছে ফিনাইল ঢালা হয়েছে। ঘর ধোয়া হচ্ছে সিদ্ধেশ্বর বুঝলেন।

'তা তুই কেন, ওরা কোথায়, ভোলা, মানুর মা?'

'ওরা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত, ওদের ডাকিনি।' ঝাঁটা চালিয়ে সুধাংশু মেঝের জল সরায়। 'তা ছাড়া আমার ঘরের নোংরা আমি নিজের হাতে সাফ করব, ওদের ডাকতে যাব কেন। সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে ফিরেছি। এসেই ঘর ধোয়ার কাজে লেগে গেলাম, কেননা এ ঘরে যখন আমাকে থাকতেই হচ্ছে।'

সিদ্ধেশ্বর চুপ।

কোণার দিকে আরো কিছু ফিনাইল জল ঢেলে দিয়ে সুধাংশু ঘুরে দাঁড়ায়। 'তেইশ বালতি জল ঢালা হয়েছে,—কেমন, এখন আমার ঘরটা বেশ তকতক করছে না বাবা? আর ময়লা আছে বলে তুমি মনে কর?'

'না নেই।' ভারি গলায় সিদ্ধেশ্বর উত্তর করেন।

'ফেরার সময় সারা রাস্তা ট্রেনে বসে আমি কেবল ভেবেছি বাড়ি পৌঁছে ঘরটা বেশ করে ধুয়ে ফেলা আমার প্রথম কাজ হবে।' সুধাংশু এবার টেনে টেনে হাসতে আরম্ভ করল। 'কেন তুমি বুঝতে পারলে কিছু?'

তেমনি ভারি নিশ্বাস ফেলে সিদ্ধেশ্বর দরজার দিকে এগোন, কথা নেই মুখে।

'শোন, তুমি চলে যাচ্ছ কেন, বেরিয়ে যাচ্ছ কেন, বাবা,—আমার কথা শেষ হয়নি।'

যেন নিরুপায় হয়ে সিদ্ধেশ্বর ঘুরে দাঁড়ান, অসহায় চোখে ছেলের মুখ দেখেন। 'কি বলছিস?'

'ভীষণ অসুখী ছিল সে, ভয়ঙ্কর ছটফট করছিল এখান থেকে বেরিয়ে যেতে, বুঝলে বাবা, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম—'

এই প্রথম সিদ্ধেশ্বরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল, এই প্রথম তিনি ছেলের কব্জি ধরে জোরে ঝাড়া দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন: 'তাই তো আমি জানতে চাইছিলাম, স্কাউন্ড্রেল, কেন ও অসুখী ছিল, কী অশান্তি ও তোর কাছে পাচ্ছিল যে, ঘরে থাকতে পারল না।'

রাগ করল না, উত্তেজিত হল না সুধাংশু, শান্তভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাথাটা ঈষৎ কাত করে বলল, 'কেন অসুখী ছিল, তুমি ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো,—কোন্ শান্তির আশায় তোমার বৌমা ঘর ছেড়েছে এখন সে তা বলবে, আর ফাঁকি দেবে না।'

'কোথায় আছে কোথায় গেছে!' হিস্ হিস্ করে উঠল সিদ্ধেশ্বরের অসহিষ্ণু গলা। 'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস তো করতেই হবে, আমাকে জানতেই হবে অশান্তিটা কি ছিল এখানে, কোথায় পাব আমার বৌমাকে?'

'ব্রথেল।' হুল ফোটানো হাসি, বঁড়শীর মতন বাঁকা সূক্ষ্ম হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সুধাংশু ঝাঁটাটা তুলে নিল। 'নাউ শী ইজ হ্যাপি, আর অনিদ্রায় ভুগতে হবে না,—আর রাত্রে বার বার উঠে জল খেতে হবে না, জানালায় দাঁড়াতে হবে না, হি হি।' সুধাংশু হাসে আর নুয়ে ঝাঁটা চালিয়ে মেঝের জল সরায়। ঝাঁটার ছপ্ ছপ্ শব্দ হয় আর যেন সেই শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে বলে, 'বাঁচ্ বাঁচ্......'

সুধাংশুর মাথা খারাপ হয়েছিল। আজও তার সেই অবস্থা। রাঁচীতে আছে। কিন্তু সেদিন অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর রায়ের মাথা খারাপ হয়েছিল কি? আমি বলব 'না'। বরং অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে তাঁর যখন মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন তাঁর সামনে ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বলে উঠল। একটুখানি আলো, কিন্তু সেই ক্ষীণ ক্ষণায়ু আলোর রশ্মি পেয়ে তিনি অনেকটা পথ হাঁটতে পেরেছিলেন, অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না যে অধ্যাপকের। দর্শনের নূতন সূত্রের সন্ধান পেয়ে তিনি তখন অতি-মাত্রায় চঞ্চল, বড় বেশি অশান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সূত্রটা কি নতুন? লক্ষবার তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। এক উত্তর। নতুন না, হাজার হাজার বছরের পুরোনো ছাতা ধরা সূত্র। তবু মানুষে নতুন করে দেখছে, নতুন নতুন মুখ দিয়ে সেই সূত্র যাচাই করতে চেয়েছে। যেমন সেদিন সিদ্ধেশ্বর-বাবু চেয়েছিলেন। চব্বিশে আগস্টের সন্ধ্যায় টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। অধ্যাপক তা গ্রাহ্য করেননি। বীডন স্ট্রীটের মোড় পার হয়ে তিনি যখন সেন্ট্রাল এভিনু ধরে উত্তর দিকে এগোন তখন তাঁর মনে হয়েছিল সারাজীবনের সংস্কার, রুচি ও শিক্ষা রাস্তার ধারের এক একটা লাইটপোস্টের নীচে জমা রেখে রেখে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। যেমন পুকুরে নামবার আগে লোকে পুকুরপাড়ের গাছতলায় গায়ের জামাকাপড় জমা রাখে। আধঘণ্টা,—একঘণ্টার জন্য তিনি এসব জমা রেখে যাচ্ছেন। ফিরে এসে আবার তিনি তাঁর শিক্ষার লম্বাঝুলের পাঞ্জাবিটা তাড়াতাড়ি পরে নেবেন, সংস্কৃতির চাদর কাঁধে ঝোলাবেন, রুচির রুমাল পকেটে পুরবেন। তিনি যে উঁচু পাড় থেকে নীচের দিকে নামছেন, কোথাও অবতরণ করছেন সেই সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়েছেন, পাছে কোনো পরিচিত মুখ ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে থেকে গেল। বৃষ্টিটা হঠাৎ আবার থেমে যেতে তিনি একটু চিন্তিত হন। তিনি টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এদিকে এসেছিলেন। তিনি চাইছিলেন প্রবল বর্ষণ প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটা। রাস্তা গলি সব নির্জন থাকবে। আর সেই নির্জন নিঃশব্দ কোনো এক পথের ধারে কোনো না কোনো বাড়ির দরজায় বা জানালায় একটি মুখ দেখতে পাবেন, একটি নারীমূর্তি। চিৎপুরের দিকের রাস্তাটা তিনি এক সময় পেয়ে যান আর তাই ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। বড় রাস্তায় জন যান—কম ছিল, কিন্তু এই সরু রাস্তা জনাকীর্ণ। অনেক দোকান অনেক আলো। সিদ্ধেশ্বর এবার ঘাড় গুঁজে হাঁটেন। আজও সারাদিন অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। দেহ ক্লান্ত। ক্ষুধাবোধ করেন তিনি। কিন্তু গ্রাহ্য নেই। একটা বড় দোকানের সামনে পৌঁছে সিদ্ধেশ্বর থমকে দাঁড়ান। মদের দোকান, বাইরে থেকে ভিতরের চেহারাটা দেখে তিনি অনুমান করতে পারেন। দোকানটা ডাইনে রেখে তিনি বাঁ হাতি একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েন। কেননা গলিটায় আলো কম এবং লোকজন বড় একটা চোখে পড়ছিল না। আলো ও মানুষ এড়িয়ে সরু পথে ঢুকতে পেরে সিদ্ধেশ্বর হাল্কা নিশ্বাস

ফেলেন। আজ সকালে সুধাংশু আবার জানালার গরাদে মাথা ঠুকছিল। সিদ্ধেশ্বর দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কিন্তু বাধা দেন নি। সুধাংশুর কপাল কেটে যখন রক্ত বেরোয় তখন সিদ্ধেশ্বর চোরের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। হ্যাঁ, দুটোই তাঁর কাছে প্রিয়—সুধাংশুর রক্ত আর বৌমার রূপ। কিন্তু একটা তাঁকে আকর্ষণ করছে, আর একটা করছে না। সুধাংশুর রক্ত বড় বেশি পরিচিত, সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজের শরীরের কোষে কোষে এই রক্ত বয়ে বেড়াচ্ছেন,—কাজেই তা জানতে, খোকার কপাল কেটে দরদর করে বেরুচ্ছে দাঁড়িয়ে দেখতে তাঁর উৎসাহ হবে কেন। বরং তিনি রাত থেকে ছটফট করছিলেন কতক্ষণে সেই রূপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন যে-রূপের মধ্যে মমতার মেঘসজ্জা দেখে সিদ্ধেশ্বর পুলকিত হয়ে উঠতেন, সেবার শিশিরসিঞ্চন পেয়ে নিজেকে সার্থক মনে করতেন, যে-রূপের মধ্যে সুধাংশু পেয়েছিল প্রেমের সৌরভ, বাসনার মদিরতা,—অথচ যার কোনোটাই সত্য না; সব ভান, মিথ্যা। তাই সিদ্ধেশ্বর জানতে চাইছিলেন দেখতে চাইছিলেন শোভনার আসল রূপ, তা না হলে যে তাঁর দর্শন মিথ্যা হয়ে থাকবে। প্রতপ্ত নিদাঘের মতো ঐ রূপের মধ্যে কামনা আর লালসার ভয়ংকর জ্বালা ছাড়া আর কিছু ছিল না, নেই,—নতুন দৃষ্টি নতুন উপলব্ধি নিয়ে তা দেখতে আসার কৌতূহল উদ্বেগ কিছুতেই সিদ্ধেশ্বর দমন করতে পারছিলেন না।

গলির ভিতরটা ক্রমশ যেন সরু হয়ে আসছিল। এবার সিদ্ধেশ্বরের একটু ভয় করছিল। মানুষ নেই, মানুষের ভয় না,—গুণ্ডা বদমায়েস মাতাল লম্পট ধারে কাছে থাকতে পারে এই আশঙ্কা। একটা গ্যাস পোস্টের কাছে এসে সিদ্ধেশ্বর দাঁড়ান। একটা ভাঙাচোরা রকের ওপর দু তিনটি মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে। সিদ্ধেশ্বর তাদের মুখে দেখলেন। দেখে হতাশ হলেন। শোভনার মতন কেউ না,—শোভনার রূপের ছিটেফোঁটাও এদের কারও নেই। হয়তো তাদের মুখের দিকে এভাবে তাকিয়ে থেকে আবার লোকটা হাঁটতে আরম্ভ করে দেখে মেয়েগুলি খিলখিল করে হেসে উঠল। 'মরণ, এই বাদলার রাতে নিজে না এসে নাতিপুতিকে পাঠিয়ে দিতো তবে তো—ধুঁকতে ধুঁকতে বেশ্যাপাড়ায় ঢুকেছে।' কথাগুলি সিদ্ধেশ্বরের কানে গেল না, তিনি একটা ডাস্টবিনের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন; একটা প্রকাণ্ড পাচীল তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ গলির এখানেই শেষ। তিনি ঘুরে দাঁড়ান। ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠেন। মাথার ওপর দোতলার একটা ঘরে অবিকল বৌমার গলা গান গাইছে। কিন্তু বৌমা তো গান গাইতে জানত না; বাড়িতে কোনোদিন গায়নি, ভাল সাঁতার কাটতে জানত; তবে কি,—ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন সিদ্ধেশ্বর। হয়তো অন্য অনেক কিছুর মতন গানের কথাটা শোভনা গোপন করেছিল। তাই হবে। সিদ্ধেশ্বর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন।

হয়তো দাঁড়িয়ে গানটা শেষপর্যন্ত শুনতেন তিনি, তারপর কি করতেন ভেবে দেখতেন নিশ্চয়, কিন্তু দাঁড়ানো হল না, ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ধারে কাছে আশ্রয় নেবার কিছু নেই দেখে সিদ্ধেশ্বর অগত্যা আবার হাঁটতে থাকেন। দোতলা বাড়ির নম্বর টম্বর কিছু চোখে না পড়াতে বাড়ির চেহারাটা যাতে মনে থাকে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে দুবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করেন। জলটা ধরলে আবার এদিকে ফিরে আসা যাবে, এই ইচ্ছা। সিদ্ধেশ্বর বড় গলিটার দিকে ছুটতে থাকেন;—সেখানে দোকান টোকান আছে, না হয় মদের দোকানেই আশ্রয় নেওয়া যাবে মনে করে তিনি ছুটছিলেন। একবার বড়-রকমের একটা হোঁচটও খান। তা হলেও সামলে নিয়ে আবার ছুটতে থাকেন। জলের তোড়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, এর মধ্যেই জামাকাপড় ভিজে উঠে গায়ের সঙ্গে আটকে যায়। হাওয়াটা ওদিক থেকে এদিকে আসছিল, যেন ভিজে হাওয়ার সঙ্গে ঢেউ খেলে খেলে গানের সুরটাও সিদ্ধেশ্বরের পিছনে পিছনে ধাওয়া করছিল। তাতেই না তিনি হঠাৎ আবার কেমন চঞ্চল অস্থির হয়ে পড়েন, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। যেন শোভনার সুন্দর চোখ জোড়া তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলার ফল সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভোগ করতে হয়। ফলের খোসায় পা লেগে তিনি পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। বড় গলির মুখে এটা ঘটে। একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের গাড়ি গাঁ গাঁ করে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসছিল। সিদ্ধেশ্বরবাবু চাপা পড়লেন।

একটা লোক গাড়ি চাপা পড়লে গোলমাল হয়, হৈ চৈ হয়। হয়তো কিছুটা হয়েও-ছিল। জলের মধ্যেও কিছু মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল। যেন গাড়িটাকেও আটক করা হয়েছিল। তারপর যেন কি কথা কাটা-কাটি হয়। গাড়ির ভিতর থেকে একটি সুন্দর মুখ গলা বাড়িয়ে চাপা পড়া বুড়ো মানুষটাকে একবার দেখে তারপর আবার গুটিসুটি হয়ে ভিতরে বসে থাকে। গাড়িটা আর দাঁড়ায় না, যেন হাঙ্গামা মিটে গেছে, যারা গাড়ি আটক করে রেখেছিল তারা আর একটাও কথা বলে না। এর মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরবাবু দুবার জ্ঞান হারিয়েছেন; জ্ঞান ফিরে এসেছে যখন তখন তিনি এম্বুলেন্স ডাকার কথা শুনেছেন, তার মুখে একটু জল দেওয়ার কথাও শুনেছেন। আর স্বপ্ন দেখার মতন ক্লান্ত চোখের সামনে গ্যাসের আলো ও বৃষ্টির জলের চকচকে পর্দার ওপারে দশ বারোটি মেয়ের মুখ দেখেছেন। চোখের জল না, হয়তো বৃষ্টির জলে তাদের চোখের কাজল গলে গলে পড়ছিল, কিন্তু তা হলেও সিদ্ধেশ্বর যেন সব কটি চোখে মমতা, বিষণ্ণতার এক পবিত্র করুণ ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিলেন। যখন এম্বুলেন্স এসে পৌঁছল তখন আর তাঁর জ্ঞান ছিল না। আর একবার, হয়তো এই শেষবারের মতো তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে-ছিলেন। তখন তিনি এম্বুলেন্সের অন্ধকার গহ্বরে শুয়ে। তাঁর গলা আবার শুকিয়ে উঠেছে, নিশ্বাস ভারি হয়ে গেছে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও গ্যাসের আলো ও বৃষ্টির জলের রূপালী পর্দা ঘেরা করুণ বিষণ্ণ মুখগুলি তাঁর মনে পড়ে। তাঁর মনে হয় তখন, দয়া করে তারা তাঁর মুখে জল ঢেলে দিক আর এম্বুলেন্সের অপেক্ষায় তাঁর থেতলানো মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকুক, তারা কেউ, তাদের একজনও শোভনার মতো রূপসী না। রূপসীর মুখ কালো বড় গাড়িটার জানালায় তিনি দেখেছিলেন, তা-ও দু এক সেকেণ্ডের জন্য, কিন্তু তা-ও ভাল করে দেখা হয়নি কেননা তখন চৈতন্য ও অচৈতন্যের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় ছিলেন তিনি। তা হলেও তাঁর মনে হয়েছে, মনে হচ্ছিল, যদি পুরোপুরি চেতনা থাকত ওই মুখেই বৌমার মুখ বলে তিনি চিনতে পারতেন,—সেই রূপ, সেই জ্বালা, সেই নিষ্ঠুরতা। কপালের ক্ষত থেকে গরম রক্ত ঝরে পড়ছিল তাঁর চোখে নাকে,—কিন্তু রক্ত উপেক্ষা করে রূপের ধ্যান নিয়ে তিনি স্তব্ধ বিশাল মৃত্যুর অন্ধকার দেশে ছুটে চললেন।

# বাহাত্তুরে

মানহানির মোকদ্দমাটা নিয়ে বেশ খানিকটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে শ্রীদাম সাহার। এই উত্তেজনাটাই তাঁর নেশা। মহাজনী কারবার করেন। কোর্টে মোকদ্দমা লেগেই থাকে। প্রত্যহ নিজে না গেলেও চলে; কিন্তু তিনি না গিয়ে থাকতে পারেন না। এই বাহাত্তর বছর বয়সেও নথিপত্রের পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে কি রোদ, কি বৃষ্টি ঠুকুর ঠুকুর করে হাঁটতে হাঁটতে কোর্টে তাঁর যাওয়া চাই-ই চাই। কাছারীর বারান্দায় ছাতা মাথায় দেওয়া অবস্থায় কত সময় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়; কত সময় দেখা যায় নথিপত্রের পুঁটুলিটাকে বালিশ করে বার লাইব্রেরীর বেঞ্চিতে ঘুমচ্ছেন। সকলেই তাঁকে চেনে। জাল জুয়াচুরি না করে, আইনসংগত উপায়ে তিনি প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করেছেন; কিন্তু শহরের লোকে সকালবেলাটায় তাঁর মুখ-দর্শন বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করে না। স্কুলের ছাত্রদের ধারণা, শ্রীদামবাবুর মুখ-দর্শনের অমঙ্গল এক শুধু কাটতে পারে তাঁর দাঁত দেখলে।

বার লাইব্রেরীতে একদিন ব্যারিস্টার সাহেব তাঁকে হাসতে হাসতে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করেছিলেন। অন্য লোক হলে চেপে যেত; কিন্তু তিনি মানহানির মোকদ্দমা এনেছিলেন কোর্টে। তাঁর বাঁধা-উকিল আছেন আদালতে। দু টাকা করে ফি এবং মক্কেলের বলা পয়েন্ট অনুযায়ী বহস্, এই কঠিন শর্তে রাজী বলেই তিনি শ্রীদামবাবুর আস্থাভাজন হতে পেরেছেন। বিবাদী পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শহরের বাসিন্দারা সকলেই বাদীর নাম নেবার দরকার পড়লে বিশ্রীদামবাবুই বলে। শ্রীদামবাবুর উকিল বহস করেন যে, সকালে অভুক্ত অবস্থায় ছাড়া আর কখন কেউ তাঁর মক্কেলকে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করে না; এবং মানহানিকর কথাটা বলা হয় ব্যারিস্টারসাহেবের মধ্যাহ্নভোজনের পর।

ওইরকম একটা মোক্ষম পয়েন্ট মাথায় খেলেছিল বলে বেশ খুশী মেজাজে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন শ্রীদামবাবু। এক শুধু দুর্ভাবনা যদি অপরপক্ষ হাকিমকে ঘুষ খাওয়ায়।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মিতব্যয়ী বলে বাইরে তাঁর দুর্নাম আছে; কিন্তু তাঁর বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার দিকটা ভাল। ভাল-মন্দ খাওয়ার দিকে তাঁর ঝোঁক আছে; এবং এই ঝোঁকটা বয়স হবার সংগে সংগে দিনদিনই বাড়ছে। ভেবেছিলেন যে, আজ জমিয়ে মোকদ্দমার গল্পটা করবেন স্ত্রীর কাছে, কিন্তু জলখাবার খাওয়ার সময় শুনলেন যে, তাঁর হাঁপানির টানটা হঠাৎ বেড়েছে। সৃষ্টিধরের মা বারোমাস এই হাঁপানি রোগে ভোগেন। পঞ্চান্ন বছর

সতীনাথ ভাদুড়ী

আগের সেই বিয়ের দিন থেকেই তিনি দেখছেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে; আঙুলে তুলে নিয়ে একটু পায়েস ছোট নাতনীর মুখে দিয়েছেন; এমন সময় একটা মারাত্মক খবর শুনলেন বড়বউমার মুখে। আজকাল বাড়ির লোকে তাঁর সঙ্গে একটু সাবধান হয়ে কথা বলে; কোন কথার যে কি মানে করে নেবেন এই ভেবেই সবাই তটস্থ। কাজেই খবরটার মারাত্মকতার দিকটার কিছুমাত্র আঁচ পেলে বড়বউমা কথাটা তুলতেন না শ্বশুরের কাছে। শাশুড়ীর অসুখের আধুনিকতম চিকিৎসার সম্বন্ধে খবর। মজার কথা ভেবেই বলা; কিন্তু ছেঁকা লাগবার মত গিয়ে লাগল কথাটা শ্রীদামবাবুর মনে। মনের অস্বাচ্ছন্দ্য চাপা দিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"নরেন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল কেন?"

জবাব দিলেন মেজবউমা। "নরেনবাবু নিজে থেকেই এসেছিলেন বন্ধুর খোঁজে; কি যেন দরকার ছিল। কথাবার্তা হওয়ার পর বুঝি নিজে থেকেই বউঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন মা কোথায়। মার তো তখন নীচে নেমে দেখা করবার মত অবস্থা নাই। তিনি নিজেই উপরে গিয়ে দেখলেন মাকে।"

যতদূর সম্ভব গলার স্বর নরম করে শ্বশুর বড়বউমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভিজিটের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো?"

সকলেই জানেন যে, নরেন ডাক্তার সৃষ্টিধরের বন্ধু; এবাড়ি থেকে ফি নিতে পারেন না। তবু বড়বউমাকে উত্তর দিতে হয়—"আমরা কি করে বলব?"

"দেখ বড়বউমা, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে করবার অভ্যাস ছাড়! বলো জানি না—আমি জানি না। আমরা টামরা নয়! পরিষ্কার কথার পরিষ্কার উত্তর দেবে!"

"আমি জানি না।"

"সৃষ্টিধরের কি এসব খেয়াল আছে! কাল আমাকেই পাঠাতে হবে টাকাটা। কারও ন্যায্য পাওনা, যে কোন ছুতোয় তাকে না দেওয়া, ঠকামি। চারশ বিশ দফার নাম শুনেছ তো? তাই। আমি যা চাই তা কি এরা হতে দেবে!"

হন হন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এখন দেখ, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! শ্বশুরের মেজাজ বউরা বোঝে; কিন্তু এই অকস্মাৎ উষ্মার কারণ তারা ঠিক ধরতে পারল না। হিসাবী তিনি ঠিকই। কম্পাউণ্ডারবাবুই এ বাড়ির ডাক্তার, কারণ তিনি ইনজেকশন দিতে এক টাকা করে নেন। শ্রীদামবাবু আরও বলেন যে, আজকালকার ডাক্তাররা যখন শুধু পেটেণ্ট ওষুধই খেতে দেয় রুগীকে, তখন কম্পাউণ্ডার আর ডাক্তারে তফাৎ কি? তবে শক্ত অসুখে টাকা খরচের ভয়ে বড় ডাক্তারকে ডাকবেন না এমন লোক তিনি ন'ন। একথা বাড়ির বউরাও জানে। বিশেষত স্ত্রীর বেলায় তাঁর রাশ যে একটু আলগা, একথা শুধু বাড়ির কেন, বাইরের লোকেও জানে। তবে তিনি এমন চটলেন কেন? বুঝতে না পেরে পুত্রবধূরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল কথাটা। নরেন ডাক্তারকে ফি না দেওয়ার কথাটা যে তাঁর রাগের আসল কারণ নয়, একথা তারা বুঝতে পেরেছে।

শ্রীদামবাবু খবরটা শুনেই বেশ বিচলিত হয়েছেন। বুঝতে পারছেন যে, আর কেউ ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে না।... দেবে না কেন? উচিত ছিল দেওয়া। তিনি বাড়ির কর্তা। একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না! এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে! কিন্তু শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোন একটা সিদ্ধান্তে পেঁৗছবার পাত্র তিনি ন'ন। সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য তিনি স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। সৃষ্টিধরের মা খাটের উপর বসে। কোলে দুটো বালিশ নিয়ে তিনি হাঁপাচ্ছেন আর কাশছেন তখনও। পাকা চুলের মধ্যের টাকপড়া সিঁথিতে কৈটকে লাল সিঁদুর নজরে না পড়ে পারে না। প্রথম কথাতেই ধরা পড়ে গেল স্ত্রীর মনোভাব। সৃষ্টিধরের মা মানহানির মোকদ্দমার সম্বন্ধে প্রত্যাশিত প্রশ্নটা করলেন না; পায়েসে মিষ্টি বেশী হয়েছিল কিনা কিংবা বউমারা খাওয়ার সময় পাখা নিয়ে কাছে বসেছিল কিনা, একথাও জিজ্ঞাসা করলেন না; মুখে একগাল হাসি নিয়ে তিনি তুললেন নরেন ডাক্তারের নূতন প্রেসক্রিপশনটার কথা। হাঁপানির টান সত্ত্বেও যেরকম উৎসাহের সঙ্গে বলা, তাতে মনে হল যে, ডাক্তারের ব্যবস্থা পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে তাঁর মনের কাছ থেকে।...নরেন ডাক্তার এসেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে কোন কোন্ জিনিস খেলে হাঁপানিটা আরম্ভ হয়। ধোঁয়া নাকে গেলে বাড়ে নাকি, স্নান করলে বাড়ে নাকি, ছেলেবেলায় কবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল মনে আছে নাকি—আরও কত এইরকমের হাবিজাবি প্রশ্ন। সব শুনে বললে—এক কাজ করে দেখুন। উপকার যে হবেই তা' সে ঠিক বলতে পারে না; তবে চেষ্টা করে দেখা উচিত। এ ঠিক হাঁপানি নয়; রোগের নাম ব্যানার্জি, না কি যেন বললে।...কতরকমের যে নতুন নতুন রোগ হচ্ছে আজকাল!...

হতবাক হয়ে গিয়েছেন শ্রীদামবাবু স্ত্রীর কথার ধরন দেখে। পুত্রবধূরা যা বলেছিলেন সংক্ষেপে, ইনি সেই কথাই বলছেন বিস্তৃতভাবে।...মা আর ছেলের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে! তাঁকে ধর্তব্যের মধ্যে গোনেনি! এমন মারাত্মক বিষয়টা বিচারের সময়ও! হ্যাঁ মারাত্মক বইকি।...তাঁকে খবর দিতে যাবে কেন। মনেই পড়েনি তাঁর কথা!

স্ত্রীর কথা কানে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অনর্গল বলে চলেছেন নূতন ওষুধটার কথা।...কতই বা দাম। সস্তার ওষুধ। সারলে পরে অবাক হবার কথা। কিন্তু ও কি আর সারবে! অত সোজা নয় এ রোগ। কত কিছুই তো করে দেখলাম সারাজীবন ধরে। আরশোলা-সেদ্ধ জলও খেয়েছি তোমার কথায়। সেবার ওষুধের সিগারেট পর্যন্ত খেতে হয়েছে তোমার পাল্লায় পড়ে।......

শুনছেন, আর তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। তিনি জানেন যে, স্ত্রীর কথাগুলো আন্তরিক নয়; স্ত্রীর মনে মনে বিশ্বাস ওষুধে আশু ফল পাবেন। নূতন ওষুধের সন্ধান পেয়ে বেশ উৎফুল্লই হয়েছেন তিনি।......ওষুধের সস্তা দামটাই শুধু দেখলে সৃষ্টিধরের মা! ওর দাম কি শুধু ওই কয় আনাই? আমার দিকটা না হয় না ভাবলে, নিজের দিক থেকেও তো ভাবো জিনিসটাকে। তোমার মাছ খাওয়া ঘুচবে, সাদা থান পরতে হবে, আরও কত কি করতে হবে! ছেলে, ছেলের বউ আজ তোমায় মাথায় করে রেখেছে—তখন কি কেউ পুছবে। ওদের সংসারে একবেলা চাণ্ডি আলোচালের ভাত খেয়ে শুধু বেঁচে থাকতে পারে।...যাক, সেসব যার জিনিস সে বুঝবে।......

মুখে বললেন—"দেখ, কতদূর কি হয়।"

প্রায় অর্থহীন কথাটা। তারপর শ্রীদামবাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। মৃত্যুভয়টা তাঁর চিরকালের। ইদানীং বেড়েছে। এ নিয়ে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও বাড়ছে দিন দিন। অনেক বিষয়ে মন খুঁত খুঁত করে; সন্দেহ হয়। পারলে পরে সাবধান হয়ে যান। ছেলে-মেয়েরা না জানুক, স্ত্রী তাঁর স্বভাবের এই দিকটার কথা জানেন। সময় সময় স্ত্রীর কাছে বলেও ফেলেন কিনা। এখনও বলতে পারলে হয়ত আসন্ন সংকটের একটা সমাধান হতে পারত। যাঁরা আঘাতটা দিয়েছেন তাঁরা সামলে যেতেন নিশ্চয়ই। অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আসা আঘাতের প্রকৃতিটা আবার অপরের কাছে বলবার মত নয়। এত ব্যক্তিগত, এমন একটা স্পর্শ-কাতর জায়গার সঙ্গে সম্বন্ধিত যে বলতে বাধে। সে-ই হয়েছে মুশকিল। অভিমানের শ্রেণীর মনের ভাবের কোনই মূল্য থাকে না, যদি 'ওগো আমি অভিমান করেছিগো' বলে সেটা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়।......তাঁর দিকটা একবার মনেও পড়ল, না সৃষ্টিধরের মায়ের!!......অমন ওষুধ ব্যবহারের কথা

উঠতেই যে মনে পড়া উচিত ছিল! এ দুঃখ তাঁর রাখবার জায়গা নাই।

যে কথাটা ভাবতে চান না, সেই কথাটাই বারবার মনে আসে। যত দুশ্চিন্তাটা মন থেকে দূরে করে ফেলতে চান, ততই যেন উদ্বেগ বাড়ে। বয়স হয়ে এই হয়েছে মনের অবস্থা। বোঝেন, কিন্তু আবার না করেও পারেন না। একটা উদ্বেগ যায়, তো আর একটা এসে তার জায়গা নেয়। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল, যে অপর পক্ষ আবার হাকিমকে ঘুষ খাইয়ে মানহানির মোকদ্দমার রায় পাল্টে না দেয়। সেই দুশ্চিন্তার জায়গা নিয়েছে এখন স্ত্রীপুত্রের সৃষ্টি করা অমঙ্গলের অবশ্যম্ভাবিতা। ছেলেরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করে তাঁকে; কিন্তু এর সবগুলোই কি অকারণ উৎকণ্ঠা? রক্তর গরমে ওরা অনেক জিনিস উড়িয়ে দেয় তুড়ি মেরে। কিন্তু বাহাত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা তো তাদের নেই। সে কথাটাও ওরা স্বীকার করবে কিনা কে জানে। আরে তোরা বুঝবি কি; এইসব ছোট ছোট জিনিসগুলোর উপর নজর চিরকাল ছিল বলেই তোদের জন্য এত সব টাকাকড়ি সম্পত্তি রেখে যেতে পারব। তোদেরই জন্য এত সব; আর একবার মনেও পড়ল না আমার কথাটা!......

বড় ছেলে বাড়িতে বলে গিয়েছে যে সে রাত ন'টায় ফিরবে ওষুধ নিয়ে। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে কোথায় যেন একটা কাজে গিয়েছে। কাজ মানে, ইনসিওরের দালালি। সৃষ্টিধর একবার তাঁকেও ঘুরিয়ে বলেছিল লাইফ ইনসিওর করতে। বেশী বয়সেও নাকি লাইফ ইনসিওর করা যায়। তিনি কানে তোলেন নি কথাটা। তাঁর ধারণা ইনসিওর করা লোক বেশী দিন বাঁচে না। সৃষ্টিধরের মা কিন্তু তখন তাঁকে লাইফ ইনসিওর করতে বারণ করেছিলেন। সেই মানুষের আজ স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা মনেই পড়ল না!...এই সেদিনও সৃষ্টিধরের মা সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন; এক গুরুর কাছ থেকে দুইজনে একসঙ্গে দীক্ষা নিয়েছেন; একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে এসেছেন কিছুদিন আগেও; প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের কথায় দুজনের আঁচল একসঙ্গে বেঁধে তাঁরা একসময়ে ডুব দিয়েছিলেন। এ সবই কি লোকদেখান?

শ্রীদামবাবু ঘড়ি দেখলেন। ন'টা বাজবার এখনও অনেক দেরী আছে।

......বাড়ির কর্তার দিকটাই তো সবচেয়ে আগে মনে পড়া উচিত বাড়ির লোকের। এ বাড়ির লোকের ওঠা-বসা, কাজ বিশ্রাম, সব নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর সুবিধা-অসুবিধার উপর লক্ষ্য রেখে। তিনি যেমন ইচ্ছা চলেছেন; অন্য সকলে অতি সন্তর্পণে তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। কোর্টে যাবার জন্য যত সকাল সকালই খান না কেন তিনি তাঁর প্রিয় পলতার বড়া এবং ছানার ডালনা একদিনও পাননি একথা মনে পড়ে না। তাঁকে ঘিরেই এ সংসারের সব কিছু। তিনি শুলে পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। ছেলেরা বড় হয়ে, আজকাল তবু তাঁর সঙ্গে একটু আধটু কথাবার্তা বলে; আগে তো সে সাহসও ছিল না। তাঁর ছোট ছেলেটা যখন পাঁচ ছয় বছরের তখন তিনি বাড়ি ঢুকলেই সে ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকত। ঘরের দেওয়ালে সম্মুখে টাঙান রয়েছে ছোট ছেলের বিয়ের সময়ের তোলা একখানা গ্রুপ ফটো। মাঝখানে বসে রয়েছেন তিনি। ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি, নাতনী—চার সারিতে অতি কষ্টে এঁটেছে ফটোর কাগজে। তাঁকে কেন্দ্র করেই সব।...... 'এক ছেলে ছেলে নয়, এক টাকা টাকা নয়।' তাই তাঁর অনেক সন্তান, অনেক টাকা। এতগুলো প্রাণীর কাছ থেকে তাঁর অবাধ ক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া, বাড়ির কর্তার এইটুকুই তো তৃপ্তি। তাঁর ধারণা ছিল এরা তাঁকে ভালওবাসে। সবই কি ভুল? সবই কি ফাঁকি?......তাঁর দিকটা একবার ভাবলও না এরা!

এরা মানে সৃষ্টিধরের মা।

......নিজের স্বার্থ নিয়েই উন্মত্ত! এগারটি সন্তানের জননী! সংসারের লক্ষ্মী বলেই তাঁকে জানতেন। সেকেলে মানুষ শ্রীদামবাবু। ভাবতেন স্ত্রীভাগ্যেই তাঁর এত ধন জন বিষয় সম্পত্তি। এই পঞ্চান্ন বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছেন, সবটুকুকে মিথ্যা ছলাকলা বলে ভাবতে বাধে। সেইজন্যই স্ত্রীর তাঁর কথা মনে না পড়াটা তাঁকে ব্যথা দিচ্ছে আরও বেশী করে। ব্যারিস্টার সাহেবকে 'আর্গুমেণ্ট' দিয়ে কাবু করবার উল্লাসে বিকালের আহারটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছে। অম্বলে বুক জ্বালা করছে। দুশ্চিন্তা বাড়লে তাঁর অম্বলও বাড়ে। একটু জল খেলে হয়। কিন্তু তিনি চান না এ বাড়ির কাউকে ডেকে এখন জল আনতে বলতে। কোন নাতনী হয়ত জল নিয়ে আসবে; এসে দাদুর সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকবে কতক্ষণ কে জানে। সে সময়, আর সে মনের অবস্থা এখন তাঁর নাই।......ন'টা এখনও বাজেনি। এখনও সময় আছে—স্ত্রীর মনে পড়বার সময়, আর নিজের ভেবে দেখবার সময়।......স্ত্রীকে মুখ ফুটে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা? কেশে, আমি বেঁচে আছি এই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার মতই হাস্যাস্পদ! অমঙ্গলে বলে ছোট করায়, যে লোকটা ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা লড়তে পারে, নিজের অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে স্ত্রীর কাছে ছোট হতে পারে না। মরে গেলেও না! সৃষ্টিধরের মা'র চোখে তিনি খেলো হতে চান না।...আচ্ছা হাসিঠাট্টার ছলে কথাটা সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিলে কেমন হয়? একটু ঘুরিয়ে বলা। 'ওগো—মাছে আঁষটে গন্ধ লাগতে আরম্ভ করেছে বুঝি আজকাল'—বা ওই গোছের কোন কথা? ওতেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।.........স্ত্রীর অধিকার আছে নিজের অসুখ সারাবার চেষ্টা করবার; ছেলের অধিকার আছে নিজের মায়ের জন্য ওষুধ কিনে আনবার; তাদের অধিকার আছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলে যাবার; তিনি তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চান না কোন কথা বলে। আদালতের কড়া জজ সাহেবের মত পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে তিনি আচরণের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে চান। হয়ত হয়ে ওঠে না সব সময়, কিন্তু সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনেও আইনসঙ্গত অধিকার ও দায়িত্বের পরিমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে মেপে চলতে চান।

......সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে যাওয়াই তো চিরকাল মেয়েদের কাম্য বলে জানতেন। সৃষ্টিধরের মারও আজকালকার মেয়েদের মেমসাহেবী হাওয়া লাগল নাকি? আইন তো হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ করে নিলেই তো পারে যদি তার মন চায়!...... মানহানির মোকদ্দমায় বড়লোকের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে বড় ভাবছিলেন তিনি খানিক আগে। কতটুকু মূল্য তার! থেঁতলে, চটকে, পা মাড়িয়ে চলে যাওয়ার চাইতেও অপমানজনক হচ্ছে চোখের সম্মুখে থেকেও নজরে না পড়া! নিজের কাছে নিজের লজ্জা করে!.........কে জানে, হয়ত তাঁর কপালে লেখা আছে যে, তাঁর স্ত্রীই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন। সে কথা ভাবলেও ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কপালের লেখা জিনিসটা কি ধরনের তা ঠিক জানা নাই। আইনের ধারাগুলো যেমনভাবে লেখা হয়, সেই রকমই নাকি? আইনের ধারার মত কপালের-লেখার মধ্যেও ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজা চলে নাকি? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলেও কি কপালের-লেখাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না? যাকগে! লোকে শুনলে পাগল ভাববে। এই সব মনের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না। এসব চিন্তার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে!......তবে একথা তিনি বলবেন যে, কপালের-লেখা খণ্ডানো শক্ত বলে কি তাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে হবে?............মেটে-সিঁদুর আবার একটা ওষুধ নাকি! যত ভাবেন, তত মাথা গরম হয়ে ওঠে।............রগের কাছটায় দব্ দব্ করছে। অম্বল হলেই তাঁর এই রকম মাথা দব্ দব করে, আর বুকের কাছে ব্যথা ব্যথা করে। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। ছেলের ফেরবার সময় হল। এখনও ভেবে কিছু কূল-কিনারা পাননি। বড্ড গরম লাগছে। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ গলা

শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা আনচান ভাব হচ্ছে। ওই! নীচে মোটরগাড়ির শব্দ! শ্রীদামবাবু উঠে একবার বাথরুমের দিকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সৃষ্টিধরই প্রথম জানতে পারল। তারপরে তো হইহই পড়ে গেল বাড়িতে। কান্নাকাটি, ডাক্তার বদ্যি, নার্স, অক্সিজেন আরও কত কি! বড় ভয়ানক রোগ। চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ভাগ্য ভাল যে, ডাক্তার ডাকবার সময় পাওয়া গেল। সেই যে মেঝের উপর এনে শোয়ান হয়েছিল, তিন দিন সেই একই অবস্থায়। নরেন ডাক্তার বলেছিল নড়াচড়া বারণ।

তারপর আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা এল, ভাববার শক্তি এল, মনে বল এল। এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে বাড়ির লোকে। সৃষ্টিধরের মা মানতের পুজো দিলেন বুড়োশিবতলায়। ওই বেঁচেই গেলেন; নরেন ডাক্তার বলেছে, এখনও তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে; তারপর যতদিন বাঁচবেন, বেশ সাবধানে থাকতে হবে; তেল ঘি খাওয়া বারণ — যতকাল বাঁচবেন মাখনতোলা দুধ খেতে হবে। কোর্টে যাওয়া আর চলবে না।

ভাববার ক্ষমতা ফিরে পাবার দিন থেকেই শ্রীদামবাবু কত কি ভাবছেন। এ যাত্রা নিস্তার পেলেন ভেবে আনন্দ আছে; কিন্তু এর চেয়ে বেশী তৃপ্তি যে তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। ধরেছিলেন ঠিকই। এসব জিনিসকে বাহাত্তুরে বুড়োর খামখেয়ালি বলে উড়িয়ে দিলেই তো হল না! জন্তুজানোয়াররা পর্যন্ত বিপদের গন্ধ টের পায়। চিরাচরিত আচার ব্যবহারগুলো আইনের ধারার মত জিনিস। মেনে চলতে হবে। সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে তার মানে করতে হবে। লোকাচার যেখানে বলছে— এই করতে হবে, সেখানে তা না করলে কি হবে, সেকথাটা বোঝবার জন্য বি এ, এম এ পাস করার দরকার নাই। ওসব আচারের পান থেকে চুন খসলে কি হয়, সেটা খেয়াল হওয়া উচিত ছিল একজন সাতষট্টি বছর বয়সের সধবা স্ত্রীলোকের!...... হয়ত খেয়াল হয়েছিল ঠিকই। জেনেশুনে যদি সৃষ্টিধরের মা এই কাজ করে থাকেন, তাহলে সেকথার কোন জবাব নেই। মা ছেলেতে মিলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে যদি এই কাজ করে থাকে, তাহলে তাদের কিছু বলবার নাই।......সৃষ্টিধরের মায়ের এই কান্ড! বহু নিমকহারাম তিনি সারাজীবন ধরে দেখছেন। বিপদের সময় এসে টাকা ধার নেয়; তারপর তামাতুলসী হাতে নিয়ে হাকিমের সম্মুখে গিয়ে বলে যে, তারা টাকা ধার নেয়নি। এই তো লোকের ধারা! কিন্ত তাঁর স্ত্রীপুত্রের মত অকৃতজ্ঞ লোকের কথা তিনি এর আগে কল্পনা করতে পারেন নি। বিশ্বাস তিনি কোন দিনই কাউকে করেন না। টিপসই না নিয়ে তাঁর অতি বড় বন্ধুকেও তিনি কখন টাকা ধার দেননি। তবু এতটা আশা করেননি নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে! যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন তাদের কাছ থেকে।

মেয়েমানুষরা সব বুজরুক! সুবিধা পেলেই নিজমূর্তি প্রকাশ করে। ভেবে ভেবে তিনি দেখছেন, স্ত্রীর স্বভাবের পরিবর্তনের দিকটা। অল্প বয়সে স্বামীর ভয়ে জুজু হয়ে থাকত। সেকালকার কথা সব মনে আছে। বড় করে কথা বলবার সাহস ছিল না স্বামীর সম্মুখে। ছেলেরা বড় হবার পর থেকেই তিনি প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন সৃষ্টিধরের মায়ের। বাপ যতই করুক ছেলেদের জন্য, তারা সব সময় মায়ের দিকে। মায়েরা সেটা বেশ বোঝে। তাই যত ছেলেরা বড় হয়, তত তাদের বুকের পাটা বাড়ে। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে 'ডোন্টকেয়ার'। ছেলেরা বড় হবার পর থেকে সত্যিই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু ভেবেচিন্তে কথা বলেন।...কিন্তু এতটা! ঘেন্না ধরে গিয়েছে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলের উপর! সবাই মিলে পরামর্শ করে এই কান্ড করেছে। ওই নরেন ডাক্তারটাও এর মধ্যে আছে। ডাক্তার না ছাই! টৈনিসওয়ের ডাক্তার আবার ডাক্তার নাকি! তার আবার ওষুধ, তার আবার চিকিৎসা! মা-ছেলেতে পরামর্শ করে তাঁর কাঁধেও চাপিয়েছে নরেন ডাক্তারকে। কথা বলাও নাকি তাঁর পক্ষে খারাপ; তাই একটা 'কলিংবেল' রাখা হয়েছিল তার কথামত তাঁর বালিশের কাছে। কোন দরকার পড়লে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকতে হবে? কেন বাড়ির লোকজন কেউ না কেউ চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতে পারে না রুগীর পাশে? আর যেখানে বাড়ির কর্তা নিজে রুগী! টান মেরে ছুঁড়ে তিনি ফেলে দিয়েছেন কলিংবেলটাকে সেই দিনই! ভাবে কি বাড়ির লোকে তাঁকে! যতটা বেকুফ ভাবে, ততটা বেকুফ তিনি নন! সৃষ্টিধরের মা ছুটে এসেছিলেন কলিংবেল মেঝেতে পড়বার শব্দটা শুনে।

"কিছু বলছ? কিছু এনে দেবো?"

স্ত্রী আসাতেই কেমন যেন শক্ত আড়ষ্ট গোছের হয়ে গিয়েছিল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর। কোন উত্তর দেননি তিনি। অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে, বালিশের পাশে এসে বসেছিলেন; তিনি জানেন রোগভোগ হলে ছেলেমানুষী রাগ বাড়ে সব মানুষেরই। সেইদিন থেকেই শ্রীদামবাবু লক্ষ্য করলেন যে সৃষ্টিধরের মা কাছে এসে বসলেই তাঁর শরীরে আড়ষ্টতা আসে। আগেকার সেই সহজ ভাবটা আর কিছুতেই আনতে পারেন না। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কাটা যে অমূলক ছিল না, সে কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে হাতে নাতে; মৃত্যুর পূর্বস্বাদ তিনি পেয়ে গিয়েছেন; ঠিক যখন সৃষ্টিধরের মা সিঁথির সিঁদুর মুছে ছেলের আনা মেটে সিঁদুর সিঁথিতে দিয়েছেন, তখনই 'করোনারী' রোগটা তাঁকে চেপে ধরে; এ সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ নাই। যতই চেষ্টা করুন সেই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে খানিকটা আড়ষ্টতা আসতে বাধ্য। আর এ রকম স্ত্রীপুত্রকে খাতির করে চলবার কোন কারণও থাকতে পারে না! তাঁর অসুখ, ও সৃষ্টিধরের মায়ের আসল-সিঁদুর মোছার মধ্যে সম্পর্কটা, সবচেয়ে নির্বুদ্ধি লোকেরও নজরে পড়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে আর ডেকে তুলবে কি করে! ওরা সব জানে! সব বোঝে! বুঝে না বোঝবার ভান দেখায়! রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে তাঁর।

শ্রীদামবাবু সব সময় চেষ্টা করেন যাতে তাঁর মনের রাগ কথাবার্তায় প্রকাশ না পায়। ফলে অধিকাংশ সময়েই তিনি চুপ করে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকেন। স্ত্রীপুত্রেরা তাঁর এই গাম্ভীর্যকে শারীরিক দুর্বলতা ও বর্তমান রোগের একটা লক্ষণ বলে ভাবে। রুগীর মন ভাল রাখবার জন্য তাঁরা সব সময় অনর্গল গল্প করে যান। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে যাতে তিনি কোন রকম অসদ্ব্যবহার না করেন, সেই ভেবে সৃষ্টিধর আর সৃষ্টিধরের মা অনেক সময়েই 'অ্যালার্জি' রোগের গল্প, এবং নরেন ডাক্তারের অদ্ভুত চিকিৎসার কথা তোলেন। বিচিত্র মতিগতি এ রোগের! ওষুধও না বিষুধও না! লাল সিঁদুর মুছে মেটে সিঁদুর দিলাম সিঁথিতে—আর তাতেই সেরে গেল এতকালকার রোগ! এখন মনে হয় কেন পুষে রেখেছিলাম এ রোগ? এত সোজা যার চিকিৎসা!...শোনেন, আর মাথা থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত রিরি করে ওঠে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা যায়; কিন্তু কানতো বন্ধ করে রাখা যায় না, ইচ্ছা করলেও। শুনতেই হয় বাধ্য হয়ে।... কেবল নিজের রোগের কথা! কই, স্বামীর যে ভয়ানক রোগটাকে নিয়ে যমে মানুষে লড়াই চলল এ কয়দিন, সে কথা তো ভুলেও বলে না!...

মন খারাপ হতে পারে ভেবে স্ত্রীপুত্রেরা তাঁর রোগের কথাটা তোলে না, একথা তাঁর খেয়াল হয় না। কেবলই মনে হয় যে স্ত্রীপুত্র যখন শুধু নিজের দিকটা দেখতে পেরেছে, তখন তাঁরও নিজের দিকটা দেখতে পারবার অধিকার আছে। পালটা জবাব তিনিই বা দেবেন না কেন! যেতে দাও না আর কয়েকটা দিন!...মনে মনে তিনি একটা

দিন ঠিক করে নিয়েছেন। যেদিন তাঁর রোগের দুই সপ্তাহ পূরবে, সেই দিনই তিনি নিজ মূর্তি প্রকাশ করবেন এদের কাছে।...কুকুর বিড়ালের মত ব্যবহার করেছে এরা তাঁর সংগে! ভাবছে যে 'ফিডিং বট্‌ল্‌'এ করে জলো মাখন তোলা দুধ খাওয়াচ্ছে রুগীকে—আর তাতেই ভবী ভুলবে! ভুলে গিয়েছে যে কুকুরে ফিরে কামড়াতেও জানে! করতে তো তিনি পারেন কত কিছু, নিজের অধিকারের মধ্যে থেকেও। নিজের রক্ত-জল-করা পয়সা—বাপের কাছ থেকে পাওয়া এক পয়সাও নয়—এগুলোকে তিনি যথেচ্ছ দান করে দিয়ে যেতে পারেন—কারও কিছু বলবার নাই। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারেন। স্ত্রীর সংগে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে নালিশ করতে পারেন। আবার বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেন, এই বুড়ো বয়সেও। কিন্তু অতদূর তিনি যেতে চান না। অন্যের চোখে ছোট হতে হয় এমন কাজ তিনি করতে চান না—অধিকার থাকলেও। এরা তাঁর কাছে ন্যায় বিচারই পাবে। নিক্তিতে ওজন করে তিনি ন্যায় বিচার করবেন স্বার্থপর, নাচুনে, হুজুগেমাতা, নিমক-হারাম স্ত্রীপুত্রদের উপর! তিনি যার উপর যতই বিরক্ত থাকুন, তার জন্য কাউকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে না। অত নীচ তাঁর মন নয়। হ্যাঁ আর একটা কথা, ওরাও যেন ভাববার অবকাশ না পায় যে ওদের উপর অবিচার করা হয়েছে। হিসাব হাতে-কলমে ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে ওরা প্রত্যেকে তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছে। বিষয়টা অতি সরল। 'অ্যাকাউণ্ট সুট'এর মত শুধু হিসাব নিকাশের ব্যাপার!...

পনের দিনের দিন সকাল বেলায় উঠেই, তিনি বাড়ির চাকরকে ডাকলেন চীৎকার করে। স্ত্রী জপে বসেছিলেন। উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি? কেন?"

চাকরটাও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীদামবাবু তাকে বললেন—দেওয়ালের খান কয়েক ছবি নামিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে। সাবিত্রী সত্যবানের ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো সোনার জলে লেখা 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ' শ্লোকটা, আর গ্রুপ ফটোখান, তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। স্ত্রী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, ছেলেমেয়েরা দোর-গোড়া থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। কেউ কোন কথা বলছে না। রুগীর আবদার রাখতে সকলে উদ্‌গ্রীব। যাতে তাঁর মন ভাল থাকে তাই তিনি করুন। নরেন ডাক্তার বলে দিয়েছে, এমন কিছু যেন করা না হয়, যাতে রুগীর উদ্বেগ দুশ্চিন্তা বাড়ে।

এইবার তিনি ছাতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন—"একবার যেন কম্পাউণ্ডারবাবুকে খবর দেওয়া হয়। আর নরেনবাবুকে যেন বারণ করে দেওয়া হয়, আমাকে দেখবার জন্য আসতে।"

গলার স্বরে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা এনে বলা। বুঝিয়ে দিলেন যে এখন থেকে রাশ নিজের হাতে নিলেন। যতই রুগ্ন ভাবুক এরা তাঁকে, নিজের দায়িত্ব নিজের হাতে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে এখনও। নিজের বাড়িতে নিজের মত থাকবার অধিকারে কারও হস্তক্ষেপ তিনি আর বরদাস্ত করবেন না।

ইচ্ছা করে, অতিরিক্ত খাতির দেখিয়ে, নরেন না বলে নরেনবাবু বলেছেন তিনি। কথার সুর এবং চাউনির ভঙ্গি সৃষ্টিধরের মার কাছে একটু দুর্বোধ্য ঠেকল। ছেলের সংগে তিনি গিয়ে পরামর্শ করলেন। নরেন ডাক্তারকে তখনই সব কথা বুঝিয়ে বলা হল। সে ঘরের ছেলের মত; তার কাছে বাড়ির কথা বলতে কোন সংকোচ নাই। ঠিক হল সে নিয়মিত আসবে শ্রীদামবাবুর বাড়ি, কিন্তু রুগীর ঘরে ঢুকবে না। রুগীর মন খুশী রাখবার জন্য কম্পাউণ্ডারবাবুই দেখুন। দরকার বুঝলে এবং কম্পাউণ্ডার-বাবু তার কথা শুনলে, সে বাইরে থেকে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে দেবে। সে সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিল এখন থেকে রুগীকে একটু চোখে চোখে রাখতে।
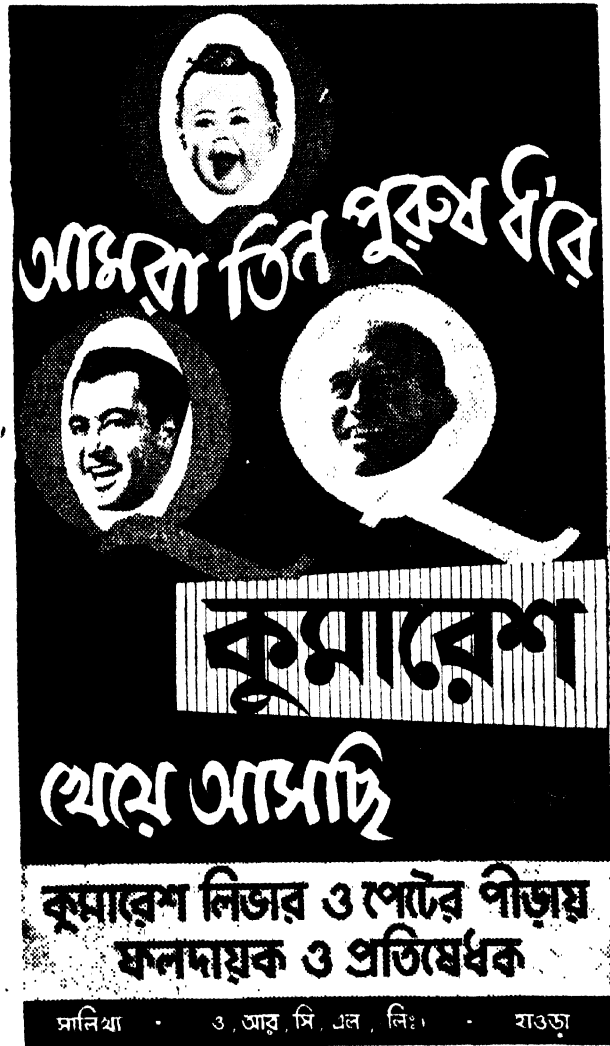
এইবার শ্রীদামবাবু এক নাতির নাম ধরে ডাকলেন। সৃষ্টিধর গিয়ে দাঁড়াল কাছে।

"বাবা, কিছু বলছেন?"

অন্যদিকে তাকিয়ে শ্রীদামবাবু বললেন—"নীচের ঘরের আলমারি থেকে পুরনো হিসাবের খাতাগুলো নিয়ে আসা দরকার একবার।"

"এখন কিছুদিন যেতে দেন না ওসব

জিনিস! আগে ভাল করে সুস্থ হয়ে নিন। তারপর ওসব আবার করবেন।"

"যার আনবার ইচ্ছা নাই তাকে তো আমি ডাকিনি।"

"কোন কোন বছরের আনব"?

"যতগুলো আছে সবগুলো। আর একটা পেন্সিল।"

মা ছেলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এইসব করে আবার অসুখ বাড়িয়ে না ফেলেন বাড়ির কর্তা।

একরাশ খাতাপত্র এল নীচে থেকে।... চাকরের কাঁধে করে উপরে আনিয়েছে সৃষ্টিধর!...নিজে আনতে বাধে! বাপের পয়সায় ফুটানি! ধুলো আর মাকড়শার জাল ঝেড়ে আনতে হয় সে কথাটাও কি এদের বলে দিতে হবে!...

সৃষ্টিধর হাসিমুখে একটা সুখবর দিল বাবাকে। মানহানির মোকদ্দমায় তিনি জিতেছেন; হাকিমের রায় বেরিয়েছে: ব্যারিস্টার সাহেবের এক টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে; অর্থদণ্ডের পরিমাণটার কোন গুরুত্ব নাই; আসল প্রশ্ন হারজিতের

হ্যাঁ না কিছুই বললেন না শ্রীদামবাবু। মানহানির মোকদ্দমার ফলাফলের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ

তিনি ভাবছেন যে ছেলে খোশামোদ করে তাঁর মন গলাতে চায়। পুরনো হিসাবের খাতাগুলো আনাতে দেখে একটা কিছু সন্দেহ করে থাকবে। যাক! করে থাকলে করেছে! আপনার লোক সব! আত্মীয়-স্বজন না ছাই! 'কলিং বেল' দেখাতে এসেছিল আমাকে আমারই পয়সায়! ঘণ্টা বাজিয়ে এঁদের পুজো করতে হবে, তবে এঁদের আবির্ভাব হবে!...তাঁকে যদি মাখনতোলা দুধ খেয়ে থাকতে হয়, তাহলে এঁদেরও মাখনতোলা দুধ খেয়ে থাকতে হবে সারা জীবন!...গম্ভীরভাবে তিনি কাগজ পেন্সিল হিসাবের খাতা বালিশের উপর নিয়ে, চোখে চশমা এঁটে বসলেন। তাঁর প্রতিদিনকার আয়ব্যয়ের হিসাব লেখা আছে এইসব খাতাগুলোতে। সেই হিসাব-গুলো থেকে বেছে বেছে কি সব যেন টুকে রাখছেন কাগজে।

কম্পাউণ্ডারবাবু আসায় বাধা পড়ল। ইনি নরেন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার নয়। এক সময় কোথায় যেন কম্পাউণ্ডারি করতেন; এখন স্বাধীন হাতুড়ে ডাক্তার। এসেই প্রথমে জেনে নিলেন, রুগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন কিনা।...যদি সুস্থ বোধ করেন, আর হজম যদি হয়, তবে যা ইচ্ছা খেতে পারেন। কি খেতে ইচ্ছা করছে? লুচি?...

নিজে সম্মুখে বসে, লুচি বেগুনভাজা খাইয়ে তবে তিনি গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা সৃষ্টিধরের মায়েরও মনঃপুত। কম্পাউণ্ডার-বাবু চলে যাবার সময় রুগী তাঁকে বলে দিলেন উকিলবাবুকে একটা খবর দিয়ে দিতে। বিকালের দিকে আসবার জন্য। উইল লেখাতে হবে তাঁকে দিয়ে। বাড়ির লোকদের দিয়ে উকিলবাবুকে ডাকাতে ভরসা পান না তিনি। আসবার আগে উকিল-বাবু যেন আইনের ধারাগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

"উইল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। উইল। অত চোখ বড় বড় করছেন কেন উইল শুনে? কাজটা করতে না পারেন তো বলুন পরিষ্কার করে।"

"না না। আমি উকিলবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছি এখনই।"

সেখান থেকে পালাতে পেরে বাঁচলেন কম্পাউণ্ডারবাবু।

সৃষ্টিধরের মা নিজে হাতে রেঁধে সেদিন পলতার বড়া, লুচি, আর ছানার ডালনা স্বামীকে খাওয়ালেন। কর্তা খেলেন; খেতে ভালও লাগল; কিন্তু ভাব দেখালেন যেন শুধু কর্তব্যের খাতিরে খাচ্ছেন। খাওয়াদাওয়ার পর অন্যদিন একটু ঘুমোন। আজ সে ফুরসত নাই। সারাদিন চলল ওই হিসাবপত্র লেখাপড়ার কাজ।

একটাও কথা বলেন নি। এক শুধু তিনটে-চারটের সময় একবার চাকরকে ডেকেছিলেন, সৃষ্টিধর সেই ঘরে বসে থাকা সত্ত্বেও। চাকরকে হুকুম দিয়েছিলেন—ঘরের মধ্যে একখানা টেবিল, ও একখান চেয়ার এনে রাখতে। বাড়ির লোকে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল তাঁর রকমসকম দেখে। রুগীর সব খবর খুঁটিয়ে বলবার জন্য সৃষ্টিধর নরেন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। সৃষ্টিধরের মা গিয়ে বসে-ছিলেন বালিশের পাশে, পাখা হাতে নিয়ে। অমনি রুগীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি শুলেন না। আড়ষ্ট হয়ে, পেন্সিল হাতে নিয়ে বসে থাকলেন অন্য দিকে তাকিয়ে। মরে গেলেও তিনি স্ত্রীর দিকে তাকাবেন না, এই তাঁর সংকল্প!

"দাদু! উকিলবাবু এসেছেন।"

ছোট নাতি দোরগোড়া থেকে সংবাদ দিল। নিজের অজ্ঞাতে সৃষ্টিধরের মা মাথার কাপড় টেনে দিলেন, খাট থেকে ধড়মড় করে নামবার আগে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও হঠাৎ নজরে পড়ে গেল শ্রীদামবাবুর। কিসের মত যেন রঙ সিঁথির সিঁদুরটার? ঠিক মনে পড়ছে না। পচা মাংসের মত কিংবা বুড়ো শকুনের ঘাড়ের ঝুঁটিটার মত। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। শিউরেও ওঠে সর্বশরীর। মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা অবশের মত হয়ে যায়। বালিশে হেলান দিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন যাতে সৃষ্টিধরের মা বুঝতে পারেন যে, স্বামী ইচ্ছা করে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

"উকিলবাবু! এই রোগভোগের মধ্যে আবার উকিলবাবুকে দিয়ে কি হবে? না না, বারণ করে দিগে যা! যা বলবার সৃষ্টিধরকে তুমি ভাল করে বুঝিয়ে দাও! কাছারির মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তো সেকথাও ছেলেদের কাউকে বল না কেন!"

অধিকার ফলাতে এসেছে সৃষ্টিধরের মা! স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"টেবিলের উপর কাগজ-কলম সব ঠিক আছে তো? আর একখান বড় দেখে বইটই গোছের কিছু রাখতে বলেছিলাম না? আছে সব ঠিক? তাহলে এবার উকিলবাবুকে আসতে বলে দাও!"

সৃষ্টিধরের মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। উকিলবাবুর সঙ্গে নীচে নরেন ডাক্তারের দেখা হয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন রুগীকে যেন বেশী কথা বলান না হয়। "এই যে!"

"নমস্কার! মোকদ্দমাটাতে তো আমাদের জিত হয়েছে।"

নাতির সঙ্গে উকিলবাবু ঢুকেছেন ঘরে। এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, সেকথা বোঝবার বয়স এখনও ছেলেটির হয়নি। কিংবা হয়ত বাড়ির লোকেরা তাকে এখানে থাকতে বলেছে, যদি ফাই-ফরমাশের জন্য দরকার হয় সেকথা ভেবে।

শ্রীদামবাবু নাতিকে চলে যেতে বললেন ঘর থেকে। "উকিলবাবু, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসুন। কম্পাউণ্ডারবাবু নিশ্চয়ই সব কথা বলেছেন আপনাকে। আমি উইল করতে চাই।"

প্রথমেই কাজের কথা পেড়েছেন; মোকদ্দমায় হার-জিত নিয়ে বাজে কথা বলবার সময় নাই তাঁর এখন! উকিলবাবু বুঝে গিয়েছেন তাঁর মনের ভাব। কর্ম-তৎপরতা দেখাবার জন্য কাগজে খস খস করে উইল লিখবার বাঁধা গৎ এক লাইন লিখলেন।

"ও কি লিখলেন, আমি না বলতেই?"

"লিখলাম, ইহাই আমার শেষ উইল।"

বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেল বৃদ্ধের চোখ-মুখে।

"না! আপনি একটা একেবারে......! এখন তো একটা মোটামুটি খসড়া লিখতে হবে শুধু! টাইপ করতে হবে, দুজন সাক্ষীর দরকার হবে, রেজিস্ট্রার সাহেবকে আসবার জন্য খবর দিতে হবে—সেসব এখন কোথায়? এখন শুধু নোট করে নিন মোটামুটি। আমি পয়েন্ট দিচ্ছি। দশ টাকা দেবো আপনাকে, বুঝলেন? লিখুন! আমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সৃষ্টি-ধরের বয়স সর্বাপেক্ষা অধিক। সেইজন্য

সে সর্বাপেক্ষা বেশীদিন আমার অন্ন ধ্বংস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। হ্যাঁ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সর্মভিব্যাহারে কথাটাও লিখে দেবেন। তাহার বয়স আজ সাতচল্লিশ বৎসর সাত মাস পাঁচদিন। উকিলবাবু পরে এই দিনটা ঠিক করে বসিয়ে নেবেন। ইহার ভিতর বিশ বৎসর পিতা হিসাবে আমি তাহাকে লালনপালন করিতে বাধ্য। উকিলবাবু এটাকে বিশের জায়গায় বাইশ বছর করে দেওয়া যাক—কি বলেন? অন্যায় অবিচার আমি কারও উপর করতে চাই না, বুঝলেন। সৃষ্টিধরের যা প্রাপ্য, তার থেকে এই পঁচিশ বছর পাঁচ মাস সাত দিনের খাইখরচা বাবত পনর হাজার টাকা বাদ যাবে। ওর বিবাহ হয়েছে চব্বিশ বছর হল। স্ত্রীর খাইখরচ বাবত চৌদ্দ হাজার চারশ টাকা। ওদের বড় ছেলের কলেজে পড়া ও খাইখরচ বাবত চৌদ্দ হাজার টাকা। ওদের বড় মেয়ের খাইখরচ ও বিবাহাদি বাবত পঁচিশ হাজার টাকা। ওদের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের খরচ বাবত সাতাশ হাজার টাকা। বউমার ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসা বাবত ছয় হাজার টাকা। সব মিলিয়ে হল এক লক্ষ এক হাজার ছয়শ টাকা। এই টাকাটা ওর প্রাপ্য টাকা থেকে বাদ দিতে হবে। আর আমারও কিছু দেনা আছে সৃষ্টিধরের কাছে। এই মাসের ওর মায়ের চিকিৎসার জন্য নরেন ডাক্তারের ফি বারো টাকা। নরেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওর মায়ের মেটে সিঁদুরের দরুণ ছয় আনা। কোর্টে জুর আসায় আমাকে একদিন ও ওর ইন্সিওর কোম্পানির দেওয়া গাড়িতে বাড়ি নিয়ে এসেছিল—তার দরুণ গাড়িভাড়া দুই টাকা। মোট এই চৌদ্দ টাকা ছয় আনা আমার দেনা ওর কাছে। এটা যেন ওকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা এ তো হল। এইবার আমার স্ত্রীরটা লিখে নিন। মাসে ষাট টাকা করে পান এই রকম একটা অ্যানুইটির ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয় তাঁর জন্য। এতেই ওঁর চলে যাওয়া উচিত, কি বলেন? আচ্ছা না হয় মেটে-সিঁদুর বাবত ছয় আনা করে আরও বেশী লিখে রাখুন। ষাট টাকা ছয় আনা করে উনি মাসোহারা পাবেন।"

এতক্ষণে উকিলবাবু কথা বললেন—"ওঁর তখন তো সিঁদুর লাগবে না।"

চটে উঠেছেন শ্রীদামবাবু। —"আপনার উপদেশ আমি চাইনি! যা বলছি তাই লিখুন। আমি সিঁদুর বলিনি; মেটে-সিঁদুর বলেছি। সিঁদুর আর মেটে-সিঁদুর এক জিনিস নয়। মেটে-সিঁদুর ইচ্ছা করলে বিধবারাও ব্যবহার করতে পারেন। বিধবা হবার চেষ্টাতেও সধবারা ব্যবহার করতে পারেন—নিজেদের স্বার্থ থাকলে! আসল-সিঁদুর ব্যবহার করলে তো কোন কথাই ছিল না।"

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন শ্রীদামবাবু কথাগুলো বলতে বলতে। বারান্দার জানালার পাশে খুট করে একটা শব্দ হল। উকিলবাবু তাকালেন সেদিকে। বোধ হয় বাড়ির লোকরা আড়ি পেতে শুনছে।

"দেখুন উকিলবাবু, বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে এত সব কথা বলে। জলের গ্লাসটা দেবেন তো ওখান থেকে। ঘিয়ের জিনিস খেলেই বড় জলতেষ্টা পায়।"

"আচ্ছা থাক এখন তবে। অন্য সময় আসবো আবার।"

"সেই ভাল। আচ্ছা, এই কাগজখান রাখুন। আমার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের আলাদা আলাদা হিসাব লেখা আছে এতে। আর উল্টো পিঠে আমার সম্পত্তির তালিকা নোট করা আছে। বুঝেই তো গেলেন আমি কেমনভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাই। কালকে এই অনুযায়ী একটা মোটা-মুটি খসড়া লিখে আনবেন আপনি। তারপর দেখা যাবে।"

দুম দুম করে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ

হ'ল। উকিলবাবু কাগজপত্র ফাইলে বেঁধে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। উঠে দরজা খুলে দিলেন।

সৃষ্টিধরের মা।

বাড়ির অন্য লোকরা দরজা ধাক্কা দেওয়া থেকে তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়ির মেয়েদের দেখে উকিলবাবু একটু পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ালেন। হেঁপো রুগীর ছিপছিপে গড়ন সৃষ্টিধরের মায়ের। ছুটে গিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন স্বামীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টগোছের হয়ে গেল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর।

"এ তুমি কি বলছ! ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাই যে, এতে তোমার আপত্তি, তাহলে কি আমি মেটে-সিঁদুর ব্যবহার করি!"

আড়িপাতার জন্য কোনরকম সংকোচ নাই; উইলে কম টাকা পাবার জন্য অনুযোগ নাই; কেবল আছে মেটে-সিঁদুর ব্যবহার করবার জন্য অনুতাপ। এ জিনিস শ্রীদামবাবুর নজর এড়ায় না। কিন্তু এ অনুতাপ পর্যাপ্ত নয়। অনুতাপের কারণ বলছেন, স্বামীর আপত্তির কথা টের পান নাই বলে। কিন্তু এ তো শুধু স্বামীর আপত্তির কথা নয়; স্বামীর মারাত্মক অমঙ্গলের আশংকা সত্ত্বেও স্বার্থত্যাগ না করবার জন্য অনুশোচনা হওয়া উচিত ছিল। তবু এতে মনের ক্ষোভ খানিকটা কমে; প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাটা নরম হয়ে আসে। যেখানে আগে সাবিত্রী-সত্যবানের ছবিটা ছিল, সেইখানটাতে তাকিয়ে রয়েছেন শ্রীদামবাবু। বাড়ির সকলেই এসে জুটেছে এই ঘরে; কিন্তু কারও সাহস নাই এর মধ্যে কোন কথা বলবার। উকিলবাবু চলে যাবার সময় নীচের ঘরে নরেন ডাক্তারকে রুগীর আধুনিকতম সংবাদ দিয়ে গেলেন।

সৃষ্টিধরের মা অঝোরে কেঁদে চলেছেন—"ওগো তুমি একবার বললে না কেন মুখ ফুটে। আমরা কতটুকু কি বুঝি! পোড়া-কপাল, নইলে এই দুর্বুদ্ধি হয়।"

স্ত্রী কি বলছেন, সেটা সম্বন্ধে রুগীর ঔদাসীন্য ক্রমেই কমছে। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা আস্তে আস্তে কাটছে। ক্ষোভের স্থান নিচ্ছে অভিমান।

"কি কুক্ষণে যে সেদিন নরেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! তুমি বলে দিতে যাবে কেন; আমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। নরেনের কথা শুনে আমার নেচে ওঠা উচিত হয়নি। কপাল! আমি মুখ্যু মানুষ। ভুলে কি করে ফেলেছি। সেকথা কি মনে গিঁট দিয়ে রেখে দিতে হয় চিরকাল?"

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না শ্রীদামবাবু।

"এ আমার মনে রাখবার বা ভুলে যাবার কথা নয়! এ হচ্ছে আমার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল; তাতেও তোমাদের নজরে পড়ল না? যখনই তুমি আসল সিঁদুর ছেড়ে নকল সিঁদুর দিলে সিঁথিতে, তখনই যে আমার হার্টের ব্যথাটা আরম্ভ হয়েছিল, একথা কি আমি লাঠি মেরে তোমার গোবর-ভরা মাথায় ঢুকিয়ে দেবো, তবে বুঝবে?" এতক্ষণে তিনি তাঁর সংকল্প ভুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছেন। দুঃখে, ব্যথায়, অভিমানে বৃদ্ধের চোখে জল এসে গিয়েছে। মানসিক উত্তেজনায় তিনি ঠক ঠক করে কাঁপছেন। শ্বশুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেন এক পুত্রবধূ। বড়ছেলে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন সৃষ্টিধরের মা। এত অপ্রস্তুত তিনি জীবনে কখন হননি এর আগে।

...স্বামীর অমঙ্গলের জন্য দায়ী তিনি? নিজের কপাল নিজের হাতে পোড়াতে গিয়েছিলেন তিনি! এ যাত্রা বুড়োশিব রক্ষা করেছেন! তাঁর ভুল শোধরাবার জন্য সময় দিয়েছেন!...ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত না। প্রতি মুহূর্তের দাম আছে এখন।..."আমি এখনই এ সিঁদুর মুছে সিঁথিতে আসল-সিঁদুর দিয়ে আসছি।"

ছুটে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধা ঘর থেকে। পিছনে পিছনে বড় বউমাও গেলেন, বোধ হয় শাশুড়ীকে সাহায্য করবার জন্য।

ঘটনার এই তীব্র গতিবেগ বোধ হয় শ্রীদামবাবুরও প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন দরজার দিকে; অথচ বোঝা যাচ্ছে যে কিছু দেখছেন না। হঠাৎ একটা আতংকের ছায়া পড়ল সে চাউনিতে। তাঁরও খেয়াল হয়েছে একটা কথা। এত রকমের কথা চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে ভাবেন, কিন্তু এ দিকটার কথা তিনি এক মুহূর্তে আগে পর্যন্ত ভাবেননি। ...সংকট মুহূর্তে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি চোখের সম্মুখে।... সাদা চুলের মধ্যে টাকপড়া সিঁথি।... বড় বউমা একখানা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সেই চরম মুহূর্তকে এগিয়ে আনছেন!... ঠিক যে মুহূর্তে মেটে-সিঁদুরের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়ে সিঁথিটা একেবারে সাদা হয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে!... সেই মুহূর্তে, আর সিঁথিতে আসল-সিঁদুর দেবার সময়ের মধ্যে যে ক্ষণিকের ব্যবধান, সেইটাই তাঁর সংকট মুহূর্ত।...সেই মুহূর্তটার জন্য ওত পেতে রয়েছে আড়ালে শত্রু; নিঃশব্দ সঞ্চারে অন্ধকারের মধ্যে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে! আর নিস্তার নাই! ইচ্ছা হল চীৎকার করে ডেকে সৃষ্টিধরের মাকে এখনও একবার বারণ করেন। পারলেন না।...বুঝল না সৃষ্টিধরের মা যে এরকম একটা ব্যাপারে ভাববার জন্য একটু সময় পাওয়ার দরকার ছিল।...ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছেন তিনি। সর্বশরীরে আতংকের সাড়া লেগেছে। মেজবউমা পাখা করছেন জোরে জোরে। তবু বড় গরম লাগছে।...সমস্ত শরীরের মধ্যে আনচান করছে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি।...এই বুঝি বড়বউমা নেকড়া ভিজাল?...এই... এই বুঝি!...বুকের কাছটায়...

ভাবলেন আঙুল দিয়ে দেখাবেন বুকের দিকে। হাত তুলতে পারলেন না।... তাহলে...

ভয় পেয়েছে সকলে। মুখচোখের ভাব দেখে ভয় পেয়েছে সৃষ্টিধর।

নরেন! নরেন! শীগগির!...আর তুই যা দৌড়ে! অক্সিজেনের যন্ত্রটা পাশের ঘরে আছে। ভিড় কর না এখানে! জোরে পাখা কর! জানলা দরজাগুলো সব খুলে দাও!

বাবা! বাবা! কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বাবা! ও বাবা!

বাবার বুকের উপর হাত রাখল সৃষ্টিধর।

এই ভোরের বেলাটাই বিশ্রী লাগে। বাস্তর কলে মেয়েদের বীভৎস ঝগড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়, অথচ দু চোখ থেকে ঘুমের অবসাদ কিছুতেই আর কাটতে চায় না। বাঁ দিকের কপালে কেমন একটা যন্ত্রণা থমকে আছে মনে হয়, চোখটাকে কচলে কচলে ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে, শুকনো গলার ভেতর মার্বেলের গুলির মতো কী আটকে রয়েছে এমনি বোধ হতে থাকে, বোধ হয় কালকের সমস্ত দিনটার সব ক্লান্তি, সব অবসাদ যেন স্নায়ুর ওপরে চেপে বসে আছে।

কার উদ্দেশে জানে না—একটা কুৎসিত গালাগাল বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। তারপর বিদ্বেষভরা ক্রূর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত শঙ্করীর দিকে। শঙ্করী তার চতুর্থ নম্বরের 'স্ত্রী'—মাস তিনেকের মধ্যেই মা হবে।

ভোরের আবছা আলোয়, সোঁদা গন্ধভরা এই টালীর ঘরে, ঘামে ভেজা ময়লা বিছানার ওপরে শঙ্করীর অশোভন শরীরটাকে তার বীভৎস মনে হয়। মনে হয়, আর নয়—এবার এখানকার পাট ওঠাতে হবে। কলকাতা বড় বেশি গরম হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। পুলিস আবার খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছে। চারটে কেস ঝুলছে পিছনে, এবার ধরতে

পারলে ঠেলে দেবে পুরো ছ' মাসের জন্যে। এখন দিন কয়েক গা ঢাকা না দিলেই নয়।

এর আগে পুরোনো জুতোর মতো তিনটি 'স্ত্রী'কে সে অবলীলায় ছেড়ে চলে এসেছে। একটি পাটনায়, একটি ব্যারাকপুরে, একটি বনগাঁয়। প্রথম দুটির জন্যে ভাবনা নেই, তারা তারই দলের—দু নম্বরেরটি তো তার মতো লোককেও এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতে পারত। বনগাঁর স্ত্রীটির জন্যে একটু দুঃখ হয় শুধু—ভারী সুন্দরী ছিল মেয়েটা; এক-আধবার ফিরে যাওয়ার লোভ না জেগেছে তা-ও নয়, কিন্তু বাজারের সেই মোটা মারোয়াড়ীটা সাতশো টাকার শোক এত সহজে ভোলেনি।

বছর খানেক হল এসেছে শঙ্করী। এমন বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা এর আগে তার কখনো হয়নি।

কিল-চড় খেলে কাঁদে না—গোরুর মতো দুটো শান্ত বড় বড় চোখ মেলে কী ভাবেই যে তাকিয়ে থাকে। গায়ে একশো তিন জ্বর নিয়েও কাঁপতে কাঁপতে উঠে রান্না করতে যায়। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে যেদিন রাত্রে ভালো ঘুম আসে না, সেদিন টের পায় আস্তে আস্তে শঙ্করী তার কপাল টিপে দিচ্ছে। ভিজে ভিজে নরম হাতের ছোঁয়া এক এক সময় অসহ্য ক্লেদাক্ত লাগে, হাতটা ছুড়ে ফেলে গাল দিয়ে ওঠে। শঙ্করী রাগ করে না—অভিমান করে না—শ্রান্ত পশুর মতো কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠে যায়—জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এক রাশ ঠাণ্ডা বরফের মতো মেয়েটা। শরীর জুড়িয়ে দেয় না—সমস্ত অসাড় করে আনে। পুলিসের ভয়ে না হোক—এরই জন্যে এখন তার কলকাতা ছাড়া দরকার।

আজও ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কিছুক্ষণ হিংস্রভাবে তাকিয়ে রইল শঙ্করীর দিকে। একটা মানুষ যে এত নির্জীব, এমন নিরুত্তাপ হতে পারে কল্পনাই করা যায় না। আর মাস তিনেকের মধ্যেই মা হবে শঙ্করী; সন্দেহ হয় ওর চোখের সামনেই যদি সেই সন্তানের গলা টিপে মেরে ফেলে, তা হলেও একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করবে না, তেমনি গোরুর মতো শান্ত বড় বড় চোখ মেলে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকবে।

বিছানা ছেড়ে ঘরের একটিমাত্র জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বস্তির কলে হিন্দুস্থানী মেয়েদের ভিড়, চিরকালের ঝগড়া। সারাদিন ধরে অবিশ্রান্ত চেঁচা-মেচি করবে, এখন থেকেই গলা সেধে নিচ্ছে। ওদের মতো একবারও যদি গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠত শঙ্করী, তা হলেও বোঝা যেত ও খানিকটা মানুষ—একটা নিটোল বরফের পিণ্ডই নয়।

কিন্তু শঙ্করী চিৎকার করতে পারে না। চিৎকার তার থেমে গেছে ন'বছর আগেই।

সেই দাঙ্গা, সেই দেশ-ছাড়ার হিড়িক। মা-বাপের সঙ্গে শঙ্করীও আসছিল গ্রামের মায়া কাটিয়ে। পথে একদল লোক চড়াও হল গোরুর-গাড়ীর উপরে। কে একজন হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ছুড়ে দিলে কাঁটা-বনের মধ্যে। জ্ঞান হলে শঙ্করী দেখেছিল, বাবা রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—মা-র চিহ্ন কোনোখানে নেই।

সেই থেকে শঙ্করী প্রায় বোবা হয়ে গেছে। সেই থেকে অমনিভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

টেবিলের ওপর থেকে টুথব্রাশটা তুলে নিতে নিতে মনে পড়ল যেদিন রিফিউজী ক্যাম্প থেকে শঙ্করীকে সে বিয়ে করে এনেছিল। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বলেছিল সে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কেরানী, বলেছিল, বর্ধমান শহরে তার পৈতৃক বাড়ি আছে। সম্প্রদানের সময় যখন তার হাতের ওপর শঙ্করীর গোলগাল ভিজে হাতখানা এসে পড়ল, তখন তার দাদুর চোখ আর গালের কোঁচকানো চামড়ার খাঁজে খাঁজে জল চিক-চিক করছিল।

'ওকে তুমি রক্ষা করলে বাবা, অনাথা মেয়েটাকে পায়ে ঠাঁই দিলে। ভগবান ভালো করবেন তোমার।'

ভগবান! ভালো করবেন। একটা বয়সের চাঙাড় বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলা হল, ভগবান ভালো করবেন। এখন এ ভার কোনোমতে নামিয়ে ফেলতে পারলেই রক্ষা। অবশ্য অন্তঃসত্ত্বা শঙ্করী এর পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এ-কথা ভেবে কিছুক্ষণ শৌখিন মন খারাপ করা চলে। কিন্তু ও কাজ তার নয়, তার সময় নেই।

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার বালতির তোলা জলে হাত-মুখ ধুয়ে এল, তারপর রাত্রিবাসের লুঙ্গিটা ছেড়ে পরে নিলে দড়ির ওপর সযত্নে পাট করে রাখা ট্রাউজারটা। ততক্ষণে শঙ্করী জেগেছে ঘুম থেকে।

'তুমি কখন উঠলে?'

'অনেকক্ষণ।'

'এখুনি জামা-কাপড় পরছ যে?'

'বেরুব। কাজ আছে।'

'তা হলে তোমার চা এনে দিই এক্ষুণি।'

শঙ্করী চা করতে গেল। ঝোলানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে চুলটাকে পাট করতে করতে ভাবতে লাগল: এই আরম্ভ হল সারা দিনের মতো শঙ্করীর কাজ। মালটানা গাড়ির গোরুর মতো নির্বিকারভাবে বেরিয়ে পড়ল সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটার জোয়ালটানা পথ বেয়ে। ওই ভারমন্থর শরীর নিয়ে এখন সংসারের সব করতে হবে, কলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আনতে হবে রান্না-খাওয়ার জল—এমনকি স্বামীর স্নানের জন্যেও তুলে রাখবে এক বালতি। যদি অসুস্থ শরীরে কিছুক্ষণের জন্যে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, যদি বমি করে, তবুও এক মুহূর্ত ওর চুপ করে থাকবার উপায় নেই। কী দুঃখই সইতে পারে—কী নিঃশব্দে বইতে পারে ভার, একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে জানে না! হয়তো মানুষের কাছে—ভগবানের কাছে ওর সব প্রতিবাদ শেষ হয়ে গেছে—যেদিন শেষ রাত্রির চাঁদের আলোয় দেখেছিল পথের ধুলোর ভেতর ওর বাবা নিজের জমাট রক্তের মধ্যে নিশ্চল হয়ে আছে; হয়তো সেদিন থেকেই ভাগ্যকে নালিশ জানাতে ভুলে গেছে—যেদিন জেনেছে ওর মা-র শেয়ালে-শকুনে অর্ধেক ছিঁড়ে খাওয়া শরীরটাকে পাওয়া গেছে একটা ধান ক্ষেতের ভেতরে।

চিন্তাটা এই পর্যন্ত আসতেই চমকে উঠল। কী এসব—এ কিসের দুর্লক্ষণ! সে—মানব চক্রবর্তী—নামজাদা জুয়াচোর, এ ধরনের ভাবনা তার কেন আসে—কোথা থেকেই বা আসে? সতেরো বছর বয়েসে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর (মা বলতে তার অত্যন্ত আপত্তি আছে—যা বিশ্রী ব্যবহার করত!) গয়নার বাক্স হাতিয়ে যেদিন সে পথে নেমেছিল, সেদিন থেকেই মানুষ সম্বন্ধে এতটুকু দুর্বলতার রেশও তার মনে কোথাও নেই। ঠকানোর ব্যবসায় দিনের পর দিন যতই সিদ্ধিলাভ করেছে, ততই বেশি করে ঘৃণা জন্মেছে মানুষ নামে পোকা-জাতীয় এই জীবগুলোর ওপরে। কী যে লোভী—কী নির্বোধ! সস্তায় বড়লোক হতে চায়, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘুষ দিয়ে চাকরি বাগাতে চায়, চোরাই সোনা কিনতে বিবেকে বাধে না, কী করে দাঁও মারবে তারই ফিকির খোঁজে। সব—সব এক দলের। অথচ বাইরে পাক্কা ভদ্রলোক, মুখে ভালো ভালো কথার ফুলঝুরি ঝরছে। একটুখানি লোভের ছোঁয়া লাগাও—আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে। দুটো সাজানো কথা শুনেই লোভে অন্ধ হয়ে ছুটে আসবে ফাঁদে পা দিতে। এদের না ঠকানোই অন্যায়, ফাঁকি দিয়ে এরা পেতে চায় বলে ফাঁকিটাই এদের আসল পাওনা।

আবার গ্রহের ফের, এদের হাতেই সে ধরা পড়ে গেছে কখনো কখনো। অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়েছে (বস্তির চাইতেও খারাপ ভাষায় ভদ্রলোকদের দখল আছে), ঘুষি-লাথির নির্বিচার নিষ্ঠুরতা ভেঙে পড়েছে তার ওপর—একজন তো একটা ঘুষিতে সামনের দুটো দাঁত উড়িয়েই দিলে একবার। কিন্তু যারা গাল দিয়েছে, নির্দয়-ভাবে মেরেছে—তাদের ওপর যতখানি রাগ হয়েছে—নিজের ওপর হয়েছে তার চাইতেও বেশি। এই অধম নির্বোধ জীবগুলোর কাছেও সে ধরা পড়ে গেল, এই লজ্জাতেই যেন মরমে মরে গেছে। দাঁতে-দাঁত চেপে মার খেয়েছে আর মনে মনে আউড়ে গেছে:

'হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙও লাথি মেরেই থাকে—এ-ই হল দুনিয়ার নিয়ম।'

মানুষকে এমন করে যে জেনেছে—সংসারের চেহারাটা এমন করে ধরা পড়ে গেছে যার কাছে—সেই মানব চক্রবর্তীর মনও আজ নরম হয়ে আসছে নাকি? সে ভাবতে শুরু করেছে শংকরী সম্পর্কে? নাকে ফুলপরা একটা গোলগাল কালো মেয়ে—মা হতে গিয়ে যাকে আরো কুৎসিত দেখাচ্ছে, যার কাছে পাঁচ মিনিট বসে থাকলে মনে হয় গোয়ালন্দঘাটের বরফের গুদামে বসে আছে, ঘুমের ভেতর মাথায় যার ভিজে ভিজে হাতটার ছোঁয়া লাগলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, তার জন্যে কোমল হয়ে উঠছে তার মন?

চুলের মধ্যে চিরুনিটা আটকে দাঁড়ালো। মানব চক্রবর্তীর মাথা খারাপ হচ্ছে। বনগাঁর অমন সুন্দরী মেয়েটা—দুধে আলতায় রং—ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, তার মায়া পর্যন্ত কাটাতে পারল, আর কোথাকার কে এক শংকরী এসে মনটাকে এলোমেলো করে দেবে? উঁহু, অসম্ভব। বয়েস বাড়ছে নাকি—বুড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে? না—আর দেরী করা যায় না, এবারে তাকে নোঙর তুলতে হবে। তা ছাড়া পুলিসও বড় বেশি পেছনে লেগেছে—কলকাতাতেও আর বেশি-দিন থাকা চলবে না।

শংকরী চা নিয়ে এল। সেইসঙ্গে রাত্রির একখানা বাসি হাত রুটি, একটু চিনি।

ওদিকের তেতলা-চারতলা বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে সূর্য উঠেছে এতক্ষণে। এইবারে বস্তির খোলার চালে চালে রোদ পড়েছে, এই ঘরের ভেতরটা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে অনেকখানি। সেই আলোয় শংকরীর কালো মুখখানাও কেমন আলো হয়ে উঠেছে—মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকেই।

সে জানে। জানে, সে সুপুরুষ। উজ্জ্বল রঙ, চমৎকার ওলটানো চুল, ধারালো নাক, ঝকঝকে চোখের দৃষ্টি। ধোপভাঙা বুশ-শার্ট, অম্লানবর্ণ ট্রাউজারে, চোখের পাওয়ারহীন চশমার রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমে আর হাতের নীল চামড়ার ফাইল-কেসে তাকে যেমন বিশিষ্ট, তেমনি দীপ্তিমান বলে মনে হচ্ছে এখন। এই মুহূর্তে কে বলবে, মাত্র ক্লাশ টেন পর্যন্ত তার বিদ্যার দৌড়, কে বলবে পেনাল কোডের চারশো কুড়ি ধারার একজন নামজাদা গুণী লোক সে—কে অনুমান করবে, এর আগে অন্তত ছ'বার সে জেল খেটেছে? এই বেশবাসে, এই উজ্জ্বলতায় সে আর স্রোতের শ্যাওলা নয়—পুলিসের ফোটোতে একজন মার্কামারা জুয়াচোর নয়—এই খোলার বস্তির ঘরে যারা কোনোমতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে—তাদের দলেরও কেউ নয়।

তার যে-ধরনের কাজ, তাতে এ পোশাক নইলে তার চলে না। আর চেহারাটা বাড়তি লাভ—এই ভদ্রতাটুকু ভগবান করেছেন তার সঙ্গে।

চা দিয়ে রুটির টুকরোগুলো গিলতে গিলতে টের পেলো, এখনো শংকরী একভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। একবার মনে হল, আচ্ছা—এই পোশাকে যেমন তাকে ঝকঝকে তকতকে একটি সহজ মানুষের মতো দেখায়, তেমনি হওয়া কি খুব অসম্ভব তার পক্ষে? শংকরী যা চায়, তা কি কোনোমতেই হওয়া যায় না? যে পথ দিয়ে চলেছে—এ ছাড়া অন্য পথ কি কোথাও নেই?

শংকরী—আবার সেই শংকরী। এ-সব কি সর্বনাশা ভাবনা পেয়ে বসল? একটুকরো আধ-চিবোনো রুটি চা দিয়ে জোর করে গিলতে গিয়ে, বিষম খেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল তক্তপোশ থেকে। তারপর কাবলী-চটিটা পায়ে গলিয়ে, শংকরীর মুখের দিকে আর না তাকিয়ে, ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল: 'আমার ফিরতে দেরি হবে।'

রাস্তার মোড় থেকে পান কিনে খেতে আরো মিনিট পাঁচেক গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে, সাজানো প্ল্যানটাকে আর একবার এঁচে নিতে আরো দশ মিনিট কাটল। তারপর খালি দেখে একটা ডবল-ডেকারে লাফিয়ে উঠল, দোতলায় গিয়ে বসে পড়ল একেবারে সামনের সীটে।

মাছটা টোপ গিলেছে। এখন কেবল খেলিয়ে তোলাই বাকী।

সাধারণত এ-সব স্কুল-মাস্টার জাতীয় জীবে তার রুচি নেই। নিজেকে ভয়ানক খেলো বলে মনে হয়। কিন্তু নেভি কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম চাকরি দেওয়া—পেছনের দরজা দিয়ে দমদমে গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারিঙে ঢোকানো, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের ইনস্পেক্টর সাজা—এগুলো লোকের এত জানাশুনো হয়ে গেছে যে যখন-তখন ধরা পড়বার সম্ভাবনা। সদ্য পাশকরা ছেলে-ছোকরাদের কাছেও খুব সাবধানে এগোতে হয়, কার বন্ধু—কার ভাইকে এর মধ্যেই ঠকিয়ে বসে আছে নিজেরই তা খেয়াল নেই।

তাই একটু নিরীহ, সরল লোকের কাছেই এখন চেষ্টা করা দরকার। আর স্কুল মাস্টাররা এদিক থেকে আদর্শ। বুড়ো বয়সেও একশো টাকা মাইনের চাকরি করতে করতে যারা রাস্তার ভিখিরিকে পয়সা দেয় আর তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের মুখে সিগারেট জ্বলতে দেখলে এখনো যাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, তারা আজো নিরাপদ।

অবশ্য এই লোকগুলো রাতারাতি বড়-লোক হতে চায় না। ফাঁকি দিয়ে সুবিধে চাইতে এদের অনেকেরই বিবেক আর্তনাদ করে। এদের বিদ্যার অহমিকাকে একটু সুড়সুড়ি দেওয়া—অভাবের সংসারকে কিছু সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। বারো আনা কাজ তাতেই এগিয়ে যায়।

এই সুযোগ নিয়েই, সামান্য খোঁজ-খবর করে, সে প্রকাশ্য রাস্তাতেই করুণাময় বাবুকে একটা প্রণাম করেছিল।

'ভালো আছেন স্যার?'

'দীর্ঘজীবী হও'—অভ্যাসে আশীর্বাদ করেছিল করুণাময়। তারপর ঘষা-কাচের মতো পুরু চশমার ভেতর দিয়ে ক্ষীণদৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমাকে তো'—

'চিনতে পারছেন না? আমার নাম তারাপদ দাস—নাইনটিন ফরটিতে ম্যাট্রিক পাশ করে-ছিলুম আপনার স্কুল থেকে।'

'তা হবে, তা হবে—সকলকে তো মনে থাকে না।' অপ্রতিভ হয়েছিলেন করুণাময়।

মনে না থাকারই কথা—কারণ মানব চক্রবর্তী কোনোদিনই তারাপদ দাস হয়ে করুণাময়ের স্কুলে পড়েনি। আর তারাপদ দাস নামটা এত সহজ, এতই সাধারণ যে উনিশ বছরের ব্যবধানে তা মন থেকে মুছে যাওয়ার কথা।

করুণাময় বলেছিলেন, 'তারাপ্রসাদ সেন-গুপ্তকে অবশ্য মনে আছে। ইংরেজিতে লেটার পেয়েছিল নাইনটিন থার্টি ফাইভে, স্টারও পেয়েছিল। সে তো শুনেছি বিলেতের পি এইচ ডি হয়ে এখন মাদ্রাজের কোন্ কলেজে চাকরি করছে।'

'আমরা তো অত ভালো ছাত্র নই স্যার—পেছনের বেঞ্চে বসতুম। টেনেটুনে পেয়ে-ছিলুম ফার্স্ট ডিভিশন। তবে আপনার আশীর্বাদে এখন মোটামুটি ভালোই আছি।'

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চলে-ছিল ভবানীপুরের পথ দিয়ে। না থেমেই পুরোনো অভ্যাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন করুণাময়: 'তা কী করছ এখন?'

'একটা অ্যামেরিকান ফার্মে কাজ করছি স্যার। দিল্লিতে।'

'মাইনে?'

'আটশো টাকার মতো পাচ্ছি।'

একবার থেমে দাঁড়িয়েছিলেন করুণাময়। ঘষা-কাচের মতো পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন আর একটি কৃতী ছাত্রের দিকে। ঝকঝকে চেহারা চকচকে বেশবাস—চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। নাঃ—নাইনটিন ফরটির এই ছেলেটিকে কিছুতেই চিনতে পারলেন না। এক সময় নিজের স্মৃতিশক্তির জন্যে গর্ববোধ করতেন—কিন্তু বয়েস বেড়ে সব অন্য রকম হয়ে গেছে।

'বেশ, বেশ, ভারী খুশী হলুম।'

'আপনি তো এখনো চক্রবেড়েতেই আছেন স্যার?'

'হাঁ—কোথায় যাব আর?'—চাপা দীর্ঘ-শ্বাস পড়েছিল করুণাময়ের।

'আপনাদের জন্যে ভারী দুঃখ হয় স্যার।'—তারাপদ দাসও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল:

'আপনারাই দেশ গড়ছেন—অথচ আপনারাই হচ্ছেন সব চাইতে এক্সপ্লয়টেড্।'

করুণাময় জবাব দেননি। অল্প একটু হেসেছিলেন কেবল। সে-হাসির অনেক রকম অর্থ হয়।

'ওহো—ভালো কথা। ভাগ্যিস মনে পড়ল। একটা টিউশন করবেন স্যার? সময় আছে আপনার?'

'কি রকম টিউশন?'

'মন্দ নয় স্যার। আড়াইশো টাকা করে দেবে। সপ্তাহে দু দিন।'

'আড়াইশো টাকা। সপ্তাহে দুদিন।' করুণাময়ের পা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল: 'বলো কি।'

'তা ছাড়া ইচ্ছে হলে দু-এক মাস অ্যামেরিকাতেও ঘুরে আসতে পারেন স্যার। ওদেরই পয়সায়।'

কথা বলবার আগে বার তিনেক খাবি খেয়েছিলেন করুণাময়।

'ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি।'

'একটু সময় লাগবে স্যার। তা ছাড়া আপনিও এখন ব্যস্ত রয়েছেন—'

'না-না, কিছু ব্যস্ত নয়। এই তো কাছেই আমার বাসা—এসো না?'

মানব চক্রবর্তী—আপাতত যার নাম তারাপদ দাস—একবার তাকিয়ে দেখল বাইরের দিকে। বাস চৌরঙ্গীতে এসে থেমেছে। বর্ষার নতুন ঘাসে ময়দান ছেয়ে গেছে, গাছের ঘন সবুজ নতুন পাতারা খুশীতে স্নান করছে সূর্যের আলোয়। একটি মাঝারী বয়সের মেমসায়েব পেরাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে চলেছে—তার নিজেরই বাচ্চা খুব সম্ভব—ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা নেড়ে খেলা করছে, যেন শ্বেত পদ্মের পাপড়ি কাঁপছে হাওয়ায়। আর কিছুদিন পরে শংকরীও মা হবে, কিন্তু তার বাচ্চার জন্যে পেরাম্বুলেটার জুটবে না। হয়তো জন্মের পরেই উপবাসী মা-র বুকে এক ফোঁটা দুধ না পেয়ে—

আবার শংকরী! [illegible] ধুলোর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে চলে যেতে হবে তার জন্যে এ-সব ভাবনা কেন আসছে। কার বাচ্চা বাঁচল মরল তাতে তার কী আসে যায়। এই কলকাতা শহরেই কত শিশু প্রাত্যহিক ফুটপাতে মরে, কতজন মানুষ ধুঁকতে থাকে হাসপাতালের ভেতর—তা নিয়ে তার মাথা ব্যথার কী আছে! নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে পথও বন্ধ, আইনে দণ্ডনীয়। দেশসুদ্ধ লোক ভেজাল খাচ্ছে—যক্ষ্মায় ভুগছে—উপোস করছে—আর ট্রামে-বাসে একটা বিড়ি-সিগারেট ধরালেই একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল। যত সব।

বাস আবার চলতে আরম্ভ করেছে। হাঁ, টোপ গিলেছেন করুণাময়।

'কাজটা আর কিছু নয় স্যার—আমেরিকান কনসুলেটের দুজন অফিসার বাংলা শিখতে চায়। মানে—ওরিজিন্যাল্ ট্যাগোর পোয়েট্রি পড়বে—এই ওদের শখ। আড়াইশো করে টাকা তো দেবেই, আর যে দুদিন পড়াবে, খুব ভালো ডিনারও খাওয়াবে। তা ছাড়া ওই যে বলছিলুম—খুশি হলে চাইকি তিন মাস আমেরিকায় ঘুরিয়ে আনল। জানেনই তো স্যার—টাকা ওদের কাছে খোলামকুচি।'

'হুঁ, শুনেছি বটে।'—ঝাপসা গলায় করুণাময় বলেছিলেন, 'যুদ্ধের সময় ওরা নাকি দশ টাকার নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাত। কিন্তু আমি ভাবছি—'

'আপনার কি সময় হবে না স্যার। তা হলে আমি বরং আর কাউকে—'

'না—না—' ব্যতিব্যস্ত হয়ে করুণাময় বলেছিলেন, 'সময় আমার খুব হবে, দরকার পড়লে তিরিশ টাকার দুটো টিউশন নয় ছেড়েই দেব। কিন্তু আমি বলছিলুম, এত টাকা যদি দেবেই তা হলে স্কুল-টীচার চাইছে কেন? কলেজের প্রফেসরই তো পেতে পারে।'

'সে তো পারেই স্যার—দু-একজন প্রফেসার ঘোরাঘুরিও করছে। কিন্তু ওদের মেজাজটাই আলাদা। ওরা বলে, প্রফেসাররা ফাঁকি দেবে—স্কুল-টীচারেরাই সত্যিকারের সিরিয়াসনেস নিয়ে পড়ায়।'

'তা ঠিক।' অহমিকার সঙ্গে চাপা ক্ষোভ দোল খেয়ে উঠেছিল করুণাময়ের গলায়: 'প্রফেসাররা তো দূর থেকে বক্তৃতা ছুঁড়ে দিয়েই খালাস—ছাত্রদের হাতে করে গড়তে হয় আমাদেরই।'

'ওরাও তাই বলে স্যার। আর ওদের দেশে স্কুল-টীচারের অবস্থা তো আমাদের মতো নয়। স্ট্যাটাসই আলাদা। ওরা ভাবতেই পারে না যে, এদেশের টীচারদের গোরু-গাধার চাইতেও বেশি খাটিয়ে আধপেটার মতোও খেতে দেওয়া হয় না।'

করুণাময় কিছুক্ষণ বসেছিলেন অভিভূত হয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, '[illegible]—এখন প্রায় দশটা বাজে—স্কুলে যাওয়ার সময় হল। তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দাও—আমি বরং আজ বিকেলে—'

'আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন স্যার? আমি উঠেছি চৌরঙ্গীর একটা বিলিতী হোটেলে—সেখানে গিয়ে আপনি স্বস্তি পাবেন না। আমিই আসব এখন কাল সকালে। সাড়ে আটটার ভেতর।'

বাস যদুবাবুর বাজার পার হচ্ছে। মাথার ওল্টানো চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিলে মানব চক্রবর্তী। এইবার তাকে নামতে হবে—চক্রবেড়ে আর দূরে নেই।

করুণাময় আকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

'তোমার একটু দেরিই হল। আমি তো ভেবেছিলুম আর কেউ বুঝি—'

'ব্যাপারটা প্র্যাকটিক্যালি ওরা আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে স্যার। আর আমি আপনার কাছে পড়েছি—আমি তো জানি কলকাতার স্কুলে কোনো টীচারই আপনার মতো গ্রামার পড়াতে পারেন না।'

ক্লিষ্টভাবে করুণাময় বললেন, 'তোমরাই বলবে। অথচ দ্যাখো—দু-একটা মাইনর মিসটেকের জন্যে একটা ছোকরা হেড-এগজামিনার রিপোর্ট করে আমার এগজামিনারশিপ কেটে দিলে। প্রফেসারেরা নিজেদের কী যে ভাবে।'

'প্রফেসরদের কথা ছেড়ে দিন স্যার। আমারই তো পাঁচ সাতজন প্রফেসারবন্ধু রয়েছে। খালি বড় বড় কথা—কেবল পলিটিক্স আর সাহিত্য নিয়ে তর্ক। পড়াশুনো তো করতে দেখিনা কখনো।'

'আর আমরা—' করুণাময় একখানা মোটা ইংরেজী বই বের করলেন: 'এই দ্যাখো, কাল মাইনে পেয়েই এটা কিনে আনলুম থ্যাকার স্পিংক থেকে। আঠারো টাকা নিলে। ফরেনারদের কী সিসটেমে পড়াতে হয়—তার খুব ভালো ইন্‌স্ট্রাকশন আছে। জানো, কাল রাত দুটো পর্যন্ত পড়েছি—দাগিয়েছি লাল পেনসিল দিয়ে।'

'আপনাকে তো জানিই স্যার। জীবনে কখনো ফাঁকি দিলেন না, অথচ বরাবর ফাঁকি পড়লেন। তবে অ্যামেরিকানরা গুণীর কদর বোঝে ওরা খুশী হলে হয়তো আপনাকে আর স্কুল মাস্টারিই করতে হবে না।'

পুরু কাচের চশমার আড়ালে করুণাময়ের অচ্ছন্ন চোখ দুটো জ্বলজ্বলে উঠল, থর থর করে কাঁপতে লাগল হাতের আঙুল: 'দেখি এখন। তোমার হাতযশ আর আমার বরাত। আজই যাচ্ছ তা হলে?'

'হাঁ, বেলা দুটো নাগাদ। আপনি বেরুতে পারবেন স্যার স্কুল থেকে?'

'দেড়টায় টিফিন। আমি ছুটি নিয়ে রাখব সেই সময়।'

'তা হলে ওই কথাই রইল স্যার। ঠিক একটা চল্লিশে আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসব স্কুলের সামনে। আপনি রেডি থাকবেন।' হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো আপাতত তারাপদ দাস: 'নটা বাজল। আমি একবার যাচ্ছি এয়ারওয়েজে। পরশু দিল্লী যেতে হবে—আজই প্যাসেজটা বুক করা দরকার।'

'একটু চা—'

'আপনার কাজটা করে দিই স্যার—তারপরে ভালো করে বাড়ির রান্না ঝোল-ভাত খেয়ে যাব একদিন। দিল্লীর হোটেলে রুটি আর মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে।'

'সে তো নিশ্চয়—খাবে বইকি। তোমরাই তো এখন আমার ছেলের মতো। নিজে

নর্তকী

শিল্পী ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

ছেলেটা আই এস-সি পড়তে পড়তে টি-বিতে মরে গেল, সে থাকলে—'

করুণাময় আর বলতে পারলেন না—কথা হারিয়ে গেল, হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন।

কী যে হল মানব চক্রবর্তীর—ওই চোখের জল দেখে সারা গা তার শিরশির করে উঠল। চট করে করুণাময়কে একটা প্রণাম করে বললে, 'এখন আসি স্যার—ঠিক একটা চল্লিশে স্কুলে আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসব।'

এখন আর বিশেষ কোনো কাজ হাতে নেই। করুণাময়ের ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে তিনটে নাগাদ সেই বাসায় ফেরা। শঙ্করী অবশ্য রান্না করে না খেয়ে বসে থাকবে—শরীরটাও ওর ভালো নেই—

আবার শঙ্করী! চুলোয় যাক! একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

ট্রামে যে ভদ্রলোক পাশে বসেছিলেন, চমকে উঠলেন তিনি।

'কী বলছিলেন?'

'না—না—আপনাকে কিছু নয়।'

নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ট্রামের অন্যান্য মানুষগুলোর ওপর দিয়ে সে চোখটা বুলিয়ে নিতে লাগল। এ-ও তার অভ্যাসের একটা অংশ। উদ্দেশ্য দুটো। এমনি করেই তার চোখ ঠিক চিনে নেয়—কে বেকার, কে লোভী, কার মন দুর্বল—একটু চেষ্টা করলেই কে ফাঁদের দিকে পা বাড়িয়ে দেবে। কিংবা এমন কেউ ট্রামে আছে কিনা যাকে এর আগেই ঠকানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার আগেই টুপ করে নেমে পড়তে হবে গাড়ি থেকে।

কিন্তু মানুষের দিকে দৃষ্টি পড়বার আগে নজরে পড়ল একজনের হাতের বাজারের থলির দিকে। এক আঁটি সতেজ সবুজ কুমড়োর ডগা। আর মনে পড়ল, শঙ্করী একদিন যেন কুচো চিংড়ি আর কুমড়ো শাক আনতে বলেছিল বাজার থেকে। কোনো জিনিসে শঙ্করীর কোনো দাবি নেই—দাবি জানাতেও সে ভুলে গেছে। কিন্তু মা হওয়ার আগে মেয়েদের নাকি এটা ওটা খেতে ইচ্ছে করে। তাই একদিন বলেছিল—

ধোৎ! বিশ্রী ভাষায় অশ্লীল গাল দিতে চাইল আবার, কিন্তু পাশের ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে থমকে গেল। বাইরে পাঠিয়ে দিল চোখ। গাড়ি—মানুষ—বাড়ি—সিনেমার বিজ্ঞাপন। আজকে রাত্রে একবার সিনেমায় গেলে হয়—একটা হিন্দি ছবির খুব রংদার বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই।

ট্রাম থেমেছে। সামনের একটা লম্বা দেওয়ালের মাথায় লোহার ফ্রেমে বেবি-ফুডের বিজ্ঞাপন। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মায়ের কোলে নধর একটি শিশু। শঙ্করীও মা হবে। সে নিজে সুপুরুষ—তারও হয়তো ওইরকম একটি স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্ম নেবে। কিন্তু এর পরে তো পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবে শঙ্করী। বেবি ফুড দূরে থাক—হয়তো মায়ের শুকনো বুক থেকে এক ফোঁটা দুধও তার—

'অসম্ভব—উঃ—অসম্ভব।'

পাশের ভদ্রলোক আবার চকিত হয়ে উঠলেন।

'কী হল মশাই—ব্যাপার কী আপনার?'

'শরীরটা ভালো নেই—বড্ড মাথা ধরেছে।'—বলেই উঠে পড়ল, তারপর লাফিয়ে নেমে গেল চলন্ত ট্রাম থেকে।

বেলা একটা চল্লিশে যখন ট্যাক্সি নিয়ে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালো—তখন মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। টোপ-গেলা মাছটাকে সারাদিন ধরে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলবার সময় যেমন স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে যায় মেছুড়ে, ঠিক সেই রকম। না—স্কুল মাস্টার করুণাময়ের জন্যে কোনো করুণাই তার নেই। চারদিকে মানুষ নামে যে অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে তারা সব এক দলের—কে শয়তান আর কে শয়তান না—তা নিয়ে মাথা ঘামানো নিছক বিড়ম্বনা।

তা ছাড়া জেলের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে-ও গুণী লোক—চক্ষের পলকে রাস্তার ধারের মোটর থেকে ব্যাক লাইট খুলে নিতে, টুকরো টাকরা পার্টস্ সরাতে তার জুড়ি নেই। সম্প্রতি খান-দুই আস্ত মোটর উধাও করে বেশ কিছু হাতে পেয়েছে। আর্মিনিয়া হোটেলে টেনে নিয়ে গিয়ে ভরপেট বিরিয়ানী পোলাও খাইয়েছে সে। মেজাজটা খুশি আছে—শরীরটাও বলাই বাহুল্য। ঘণ্টা দুই আড্ডা দিয়ে বেশ ঝর-ঝরে লাগছে এখন। ভাবছে, দিনকয়েক এ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেও মোটর পার্টসের কারবারেই নেমে পড়বে কি না!

করুণাময়কে বেরিয়ে আসতে দেখে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'আসুন স্যার।'

করুণাময় কাঁপা গলায় বললেন, 'তুমি এসে গেছ তা হলে? আমি ভেবেছিলুম—'

'আপনাকে কথা দিয়েছি স্যার—তা ছাড়া আমি আপনার ছাত্র। আপনার জন্যে কিছু যদি করতে পারি—সে তো আমার যৎসামান্য গুরুদক্ষিণা। উঠুন স্যার গাড়িতে—'

ট্যাক্সি চলল।

একটা চাপা উত্তেজনা থর থর করছে করুণাময়ের ভেতর—পুরু কাচের চশমার আড়ালে ওঁর চোখ দুটো আশায়, আনন্দে জ্বল জ্বল করছে। মায়া হয়? না—হয় না। হওয়া উচিত নয়।

'ওরা যদি আপনাকে অ্যামেরিকায় পাঠাতে চায়—'

'অ্যাঁ?'—যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন করুণাময়।

'ওরা যদি পাঠাতে চায়—যাবেন?'

'যাব না কেন?' করুণাময়ের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, এতদিনের সংযমী স্কুল-টীচার যেন নিজের ওপর থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন: 'এমন সুযোগ পেলে কি কেউ ছাড়ে?'

'তা হলে আজই আমি একটু বলে রাখব সে-কথা।'

'রেখো।' করুণাময় হৃৎপিণ্ড ভরে যেন মস্ত একটা শ্বাস টানতে চাইলেন: 'তোমাকে আর কী বলব—তুমি—'

বলতে পারলেনও না। আশ্চর্য ভাগ্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত অনুভূতি একটা অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে সংহত হয়েছে। আই এস-সি ফেল যে বেকার ছেলেটিকে ফোর্ট উইলিয়ামে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল, এই উত্তেজনার কাঁপন তার চোখে মুখেও দেখেছিল সে-দিন।

ট্যাক্সিটাকে থামালো পার্ক স্ট্রীটের একটা বিশাল বাড়ীর সামনে। তিনটে বেরুবার পথ আছে এখান থেকে।

'স্যার, এসে গেছি।'

'এই বাড়ি?'

'হ্যাঁ স্যার—এরই চারতলায় অফিস। আপনি নিচে একটু দাঁড়ান, আমি ওপরে গিয়ে গোড়ায় একটা ফর্ম ফিলআপ করে দিয়ে আসি। তারপর কথাবার্তা হবে। অ্যামেরিকানদের তো জানেন স্যার, নানারকম ফর্মালিটিজ আছে ওদের।'

ট্যাক্সি থেকে নামলেন করুণাময়। শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে, ভালো করে হাত-পা পর্যন্ত নাড়তে পারছেন না।

'ট্যাক্সি ছেড়ে দেব?'

'একটু থাক। দরকার হলে পার্ক সার্কাসে ওদের বড়কর্তার কাছেও যেতে হবে এক-বার। আর এখানেই যদি হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই—আমি ওপর থেকে নেমেই ওর ভাড়াটা মিটিয়ে দেব।' ব্যস্ত হয়ে এক-বার ফাইল কেসটা খুঁজল মানব চক্রবর্তী: 'এই যা—কলম ফেলে এসেছি। আপনার পেন আছে স্যার? ফর্মটা লিখে দিতে হবে।'

'এই নাও'—করুণাময় কলম বের করে দিলেন।

'বাঃ, বেশ কলমটা তো।'

'হ্যাঁ, আমার বড় আদরের কলম। এত দামি কলম কি আর কিনতে পারি আমি—তোমারই মতো একটি ছাত্র আমাকে জার্মানী থেকে এনে দিয়েছিল।'

'দেওয়াই তো উচিত স্যার—আপনাদের জন্যে কী আর করতে পারি আমরা।' কলমটা পকেটে গুঁজে মানব মানি ব্যাগ বের করল:

দেখি এখন, ত্রিশটা টাকা আবার আছে কিনা।'

'ত্রিশ টাকা! কেন?'—কর্ণাময় চকিত হলেন।

'ও কিছু নয় স্যার—এদের এখানে ওটা ফর্ম ফী হিসেবে জমা দিতে হয়। যাক—সামান্য ক'টা টাকা, আমিই দিয়ে দেব এখন।'

'না-না—তা কেন?' কর্ণাময়ের মাস্টারী বিবেক আর্তনাদ করে উঠলঃ 'তুমি এত করছ, এ টাকা আবার দিতে যাবে কেন? আমি তো কাল মাইনে পেয়েছি—টাকা চল্লিশেক সঙ্গেই আছে আমার।'

'থাক স্যার—আপনার কাছ থেকে টাকাটা আর—'

'না-না, সে হয় না। টাকা তোমায় নিতেই হবে—' শার্টের তলার ফতুয়া থেকে তিনখানা নোট বের করে মানবের হাতে জোর করে গ‍ুঁজে দিলেন কর্ণাময়।

'ভারী লজ্জা দিলেন স্যার।'

'কিছু না বাবা—কিছু না। আর কত জুলুম করব তোমার ওপর?'

'তা হলে স্যার—পাঁচ মিনিট আপনি দাঁড়ান—আমি এক্ষুনি এসে যাচ্ছি।'

কর্ণাময় চশমাটা খুলে কোঁচা দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন—হয়তো আবার জল এসে গিয়েছিল। আর দ্রুত সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো মানব। শিকার উঠে গেল ডাঙায়। নগদ ত্রিশ টাকা—তার চাইতেও বড় লাভ এই জার্মান কলমটা। সেকেন্ড হ্যান্ডেও পঞ্চাশটা টাকা দাম পাওয়া যাবে।

সবে সিঁড়ির তিন চারটে ধাপ উঠেছে, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে এল আর্ত চিৎকারটা। একেবারে তীরের মতো কানে এসে বিঁধল।

'তারাপদ—তারাপদ!'

হৃৎপিণ্ড থমকে গেল—মনে হল, বুঝি ধরা পড়ে গেছে। প্রাণপণে ছুটে পালাবে কিনা ঠিক করতে পারার আগেই আবার আর্তস্বর কানে এলঃ 'আমার চশমাটা যে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল তারাপদ—চশমাটা না থাকলে আমি যে একেবারে অন্ধ।'

মানব চক্রবর্তী বলতে পারতঃ 'একটু অপেক্ষা করুন স্যার—আমি এলুম বলে।' অপেক্ষা করতেন অসহায়—অন্ধ কর্ণাময়, যেমন করে প্রতিকারহীন চরম দুর্ভাগ্যের শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করে মানুষ। বলতেও যাচ্ছিলঃ 'আমি এই এলুম স্যার—' কিন্তু তার আগেই কর্ণাময় আবার বললেন, 'চশমা না থাকলে আমি যে এক পাও চলতে পারি না।'

নিজের ওপর অসহ্য ক্রোধে—একটা দুর্বোধ্য নিরুপায়তায় মানব চক্রবর্তী ধীরে ধীরে ফিরে এল কর্ণাময়ের কাছে। কলম আর টাকাগুলো তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, 'তা হলে এগুলো রাখুন স্যার—' প্রায় হাহাকার করে উঠলেন কর্ণাময়।

'সেকি তারাপদ—হল না?'

'হবে বইকি স্যার—নিশ্চয় হবে।' একটা অন্ধ অমানুষিক হিংসায় দাঁতে দাঁতে ঘষে মানব বললে, 'আমি তো আছিই—আপনার চাকরি মারে কে? কিন্তু ওই অন্ধ চোখ নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা কী ভাববে বলুন দেখি? চশমাটা করিয়ে নিন—কালই বরং আসা যাবে।'

বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্ণাময়।

'গরিবের বরাতই এই রকম। একেবারে ঘাটে এসে—'

হাঁ—একেবারে ঘাটে এসে। অসীম হিংস্রতায় মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করল মানব। তবে বরাতটা যে কার সেইটেই বুঝতে পারেননি কর্ণাময়।

'কাল ঠিক হয়ে যাবে স্যার। এখন চলুন, ট্যাক্সিতে ওঠা যাক। মিথ্যে মীটার বাড়িয়ে কি লাভ?'

কর্ণাময়কে খুন করতে পারলে ভালো হত এখন। কিন্তু খুন না করে হাত ধরে তুলে দিতে হচ্ছে ট্যাক্সিতে। আর এই ট্যাক্সি ভাড়াটাও নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে।

আশ্চর্য!

আবার সেই বস্তির ঘর। সেই গুমোট, দুর্গন্ধ রাত। সেই ছারপোকা ভরা তক্তপোশের কণ্টক শয্যা।

'খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি মাথায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে শঙ্করী, তার ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা রাখল কপালের ওপর।

তীব্রভাবে হাতটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে গিয়েও মানব পারল না। সেই মুহূর্তে শঙ্করীর ওই হাতের ছোঁয়ায় সে বুঝতে পারল, কর্ণাময়ের আর্তনাদ শুনে সিঁড়ি থেকে সে নেমে এসেছিল কেন!

এই শঙ্করী। এই এক বছর ধরে তার বোবা চোখ, তার ভয়, তার কর্ণা, তার দুর্বলতা দিয়ে ওকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। নিজের মনের কাছে মানব চক্রবর্তী যত বেশি হারতে শুরু করেছে—তত বেশি করে জায়গা জুড়ে নিয়েছে শঙ্করীর বেদনা, তার আসন্ন সন্তান, চশমা ভেঙে ফেলে অন্ধ কর্ণাময়ের হাহাকার!

মুখে পিত্ত ওঠার মতো তেতো স্বাদ একটা। পরাজয়ের গ্লানিতে কিছুক্ষণ দুর্গন্ধ অন্ধকারে সে চুপ করে পড়ে রইল। শঙ্করীর ঠাণ্ডা হাত থেকে বরফের মতো একটা শীতল স্পর্শ ধীরে ধীরে তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে।

একটু পরে স্বগতোক্তির মতো বললে, 'গোটা পনেরো টাকা আছে বোধ হয়। কাল থেকে লোক্যাল ট্রেনে চীফ-লজেন্সই ফিরি করব ভাবছি।'
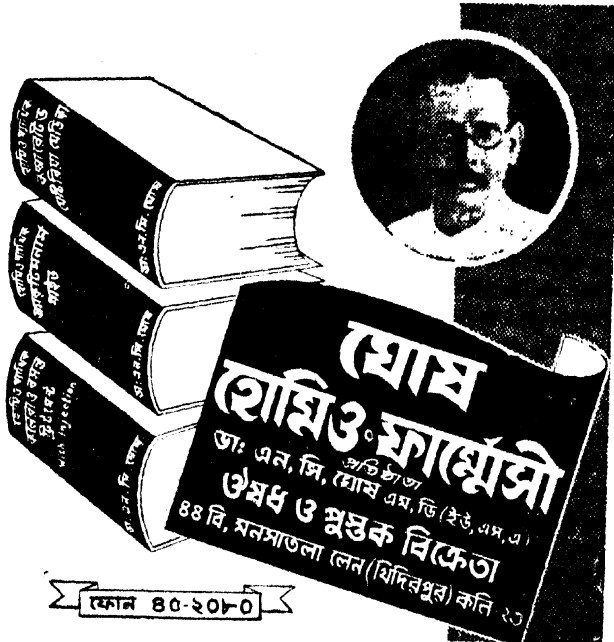
হা লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর্-মার, হা-লা-লা লা বান্দর-মার।

গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ থেকে মোড়লদের বাকুড়ি পার হয়ে চিৎকার করতে করতে ঢুকলো দলটা। কালোকুলো চেহারা, হাতে কপালে উল্কি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। জন পনেরো পুরুষ, জন দশেক মেয়ে। মেয়েগুলোর চেহারাও দিব্যি জোয়ান, মুখে চোখে রুক্ষতা, চোখের দৃষ্টি হিংস্র অথচ চঞ্চল। কিংবা চোখের তারা কটা-কটা বলেই হয়তো হিংস্র দেখায়।

পুরুষদের পরনে নেংটি, হাতে তীর-ধনুক।

জন পঁচিশেক মেয়ে-পুরুষের বিচিত্র দলটা গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো সমস্বরে চিৎকার করতে করতে। হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

তীর-ধনুক উঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে আর আকাশ-ফাটানো চিৎকার : হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

তারপর গাঁয়ের ঘরগেরস্থালির কাছে এসে পৌঁছতেই মেয়েগুলো গলা ছেড়ে গান ধরে :

বাণ মার্, বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো—
ঘর-ঘরানী কন্যা কাঁঠার জিয়াইল গো—
লাউ কুমড়া জিয়াইল গো—
মাঠের বাগুনে শাকপাতা গুড়কুমড়া
জিয়াইল গো—
মিঠা কুমড়া জিয়াইল গো—
বাণ মার্, বাণ রাম্ বান্দর-মার আইল গো—

দশটা পুরুষালী চেহারার জোয়ান মেয়ে গলা ছেড়ে গায়, আর তারপরই দলকে দল ছুটে চলে তীর-ধনুক উঁচিয়ে; চিৎকার করে ওঠে সমস্বরে : হা-লা-লা-লা...

কোটালপাড়ার পাশ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকতেই দলটা ভেঙে গেল। ছোট ছোট দল হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। —বান্দর-মার আইল গো, বান্দর-মার। পঞ্চাৎ ডাকেন গো, পঞ্চাৎ। হাত টাকা নগদ লিবো, তিন জুড়া গামছা।

ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে শুরু করে মেয়ে-গুলো। কেউ কেউ ঝোলা থেকে একটার পর একটা পুঁটলি বের করে।—চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম—লিবে গো ? আসুন হবে খোঁকা বসবে, আসুন হবে নন্দাই বসবে, আসুন হবে মাহ বহুতে ঠাকুর পুজবে।

মেয়েগুলোর ঝোলা ভর্তি চামড়া। বাঘ,

হরিণ, ছাগল, বাঁদরের চামড়া। সাপের চামড়া, খরগোশের চামড়া।

—লোহার আছেন গো গাঁয়ে?

লোহার, অর্থাৎ কামার। থাকলে টেনে টেনে বলবে, চাম লিবে গো, হাপ'র হবে।

—মুধা আছেন গো গাঁয়ে, মুধা? সুর টেনে টেনে জিগ্যেস করে।

মুধা, অর্থাৎ চামার আর মুচি। তারাই হলো সেরা খদ্দের বাঁদরমারাদের। কিন্তু আসল কাজ গাঁ থেকে বাঁদর তাড়ানো, বাঁদর মেরে সাফ করা। তার জন্যে চাই সাত টাকা নগদ আর তিন জোড়া গামছা। দেবে গাঁয়ের লোক একজোট হয়ে।

দূরে থেকে ওদের ঐ চিৎকার শুনলেই বোঝা যায় বাঁদরমারা আসছে। কিন্তু তার আগেই কি করে যেন টের পেয়ে যায় বাঁদরগুলো। বোধ হয় গায়ের গন্ধে। মাঠের আলে বাঁদরমারার দল পা দিয়েছে কি না দিয়েছে প্রাণপণে পালাতে শুরু করে। ইয়া ইয়া তাগড়াই গতর নিয়ে যে বাঁদরগুলো সরে বসতে চায় না, বৌ-ঝিদের পথ আগলে দাঁত খিঁচোয়, সেগুলো বাঁদরমারার গন্ধ পেয়ে দিকবিদিকে ছুটতে শুরু করে দেয়। কেউ গাঁ ছেড়ে যায়, কেউ বট-অশ্বত্থের মাথায় বসে কাঁপে থরথর করে।

বাঁদর তো নয়, রাক্ষুসে হনুমান। হুটোপুটি করে দলে দলে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাতে শুরু করলো হঠাৎ। রুগ্ন অসুস্থ বাঁদরগুলো বোধহয় বট-অশ্বত্থের ঘন পাতার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলো। আর মা-বাঁদরগুলোও। তাদের পেটে বাচ্চা।

গাঁয়ের লোক তখনো হা-লা-লা-লা চিৎকার শোনেনি। হুটোপুটি ছুটোছুটি দেখেই একটু বিস্মিত হয়েছিল। ভেবেছিল, কোন একটাকে হয়তো লতায় কেটেছে। লতায় অর্থাৎ সাপে। সাপে কাটলেও এমনি চিঁ চিঁ করে, ছুটোছুটি করে, গাছের শাখায় বসে থরথর করে কাঁপে সবাই। শুধু দু'চারটে ধাড়ি বাঁদর কি একটা নাম-না-জানা গাছের পাতা নিয়ে এসে দু হাতে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেয় কাটা জায়গায়, মুখের ফাঁকে গুঁজে দেয়। তবু কেউ মরে, কেউ আধ ঘণ্টা চিঁ চিঁ করে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, লাফাতে লাফাতে পালায়। গাঁয়ের লোক তাই প্রথমটা ভেবেছিল এমনি কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁদরমারাদের চিৎকার আর গান ভেসে আসতেই বুঝলো ব্যাপারটা।

কিছুদিন ধরেই জল্পনাকল্পনা চলছিল শাঁখাভাঙার লোকদের মধ্যে। পঞ্চ মোড়ল দেড় বিঘে জমিতে বেগুনের চারা বসিয়েছিল, বেশ একটু ডাগর হয়েছিল চারাগুলো, তারপর একদিন দেখলে সব ছত্রাকার করে দিয়ে গেছে। শাক-সব্জি করতে দেবে না, লাউ কুমড়ো হতে দেবে না, আখের ক্ষেতে ঢুকে মট মট করে ভেঙে দিয়ে যাবে সব। শুধু কি তাই, কারো উঠোন থেকে কাপড় নিয়ে পালাবে, বারান্দায় বড়ি শুকোতে দলে ঘেঁটে দিয়ে যাবে, গাড়ুটা-হাঁড়িটা এর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে ওর বাড়িতে ফেলে দেবে। ভয় ডর নেই এতটুকু। পথে মেয়ে-বৌ দেখলেই তাড়া করে। ছোট ছেলেপিলে সামনে গেলেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আসে।

শাঁখাভাঙার বামুন-কায়েত ডোম-বাগদী সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। দিনরাত বিব্রত আর বিরক্ত করে মারছে!

পঞ্চ মোড়ল তাই বলেছিল, বাঁদরমারাই আনতে হবে, জঙ্গল পানে একটা লোক পাঠান চাটুজ্যে মশাই।

চাটুজ্যে কোটালদের রিদেকে ডেকে বলেছিলেন, তাই বাঁদরমারারই খোঁজ কর'রে রিদে। তোদের কোটালপাড়ায় এত লোক, তবু তোরা তো পারবি না।

হৃদয় কোটাল হেসে বলেছিল, ও কোন লাভ নেই বামুনমশাই। ওরা এলে পালাবে, দু' একটা মরবে, তারপর দুটো বছর যেতে না যেতে আবার এসে ঢুকবে সব। বাঁদরগুলোই বা করবে কি কত্তা, এ গাঁয়ে বাঁদরমারা এলে ও গাঁয়ে পালায়, ও গাঁয়ে বাঁদরমারা এলে নচ্ছারগুলো এ গাঁয়ে ঢোকে।

হৃদয় কোটালের কথায় সায় দিয়েছিলেন অকলঙ্ক ভট্চায। পাঁচশটা গাঁয়ের গুরু-বংশ। ধবধবে ফর্সা দীর্ঘ ঋজু চেহারা, লাল টকটকে একখানা রেশমের কাপড় পরে সকাল সন্ধ্যা কালীপুজো করেন, 'কারণ' পানের জন্যেই চোখ জবার মত লাল। পায়ের খড়ম ঠকঠক করে ঘুরে বেড়ান এই বৃদ্ধ বয়সেও।

বাঁদর মারায় তাঁর ঘোর আপত্তি। প্রতিবাদ করেছেন বহুবার, কেউ শোনেনি। তবু প্রতিবাদ করতে তিনি ছাড়েন না। এবারও বললেন, ওরা বানর নয় চাটুজ্যে, ওরা বানর নয়, অভিশপ্ত মানুষ। রামচন্দ্রের অনুচর ওরা, শক্তির সাথী। বানর হত্যাও যা নরহত্যাও তাই।

প্রথম প্রথম অনেকে অবশ্য কান দিতো, গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা অকলঙ্ক ভট্চাযের পক্ষ নিতো। কিন্তু দিনে দিনে বাঁদরগুলোর সাহস আর অত্যাচারও যেমন বেড়েছে, তেমনি দিনকালও গেছে বদলে। বাঁদরমারার বিরুদ্ধে ও-সব কুসংস্কার দূরে হয়ে গেছে। তাই এবার আর কেউই কান দিলো না তাঁর কথায়।

পঞ্চ মোড়ল তাঁর কথার জবাবে হাঁচির মত করে এমনভাবে হ্যাঁঃ বলে উঠলো যে, অকলঙ্ক ভটচায একটু অপমানিতই বোধ করলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত শিবকালী ভটচাযের বংশে তাঁর জন্ম, এ তল্লাটের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের শতকরা আশিটা লোক তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে পেলে ভাগ্যবান মনে করে, আর কালের হাওয়ার তাকেও কিনা অশ্রদ্ধা করছে পঞ্চ মোড়ল' রাগে অভিমানে ঠক ঠক করে' খড়ম বাজিয়ে চলে গেলেন তিনি।

আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় কোটাল হাত পাতলে মোড়ল আর চাটুজ্যে মশাইয়ের কাছে। চিড়ে-গুড় আর যাতায়াতির খরচ বাবদ একটি টাকা তার পাওনা।

টাকাটি নিয়ে পেট কাপড়ে গুঁজে রেখেছিল রিদে কোটাল, বলেছিল, পরশু ভোর নাগাদ যাবো আজ্ঞে। মঙ্গলের উষা বুধে পা যথা ইচ্ছে তথা যা। শুভকাজ তো বামুনমশাই, বুধবার'কে কাক পাখি ডাকতে না ডাকতে বেরিয়ে পড়বো।

কিন্তু বেরুতে হলো না হৃদয় কোটালকে। পরের দিন বিকেলেই গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ থেকে চিৎকার ভেসে এলো। —হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

এ চিৎকার সবাই চেনে। ঘরে ঘরে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। যাক, এবার কিছুদিনের জন্যে বাঁদর নিশ্চিহ্ন হবে গ্রাম থেকে। বাঁদরমারার দল এসেছে, বাঁদরমারার দল।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো দলটা। মেয়েগুলো গান শুরু করে থেকে থেকে, আর গানের শেষে সুর করে টেনে টেনে বলে, বান্দর-মার আইল গো, বান্দরমার। পঞ্চাৎ ডাকোন গো, পঞ্চাৎ। হাত টাকা নগদ লিবো, তিন জুড়া গামছা।

গাঁ শুদ্ধ লোক এসে জড়ো হলো তাদের ডাকে। পঞ্চ মোড়ল, চাটুজ্যে, হৃদয় কোটাল।

চাটুজ্যে বললে, সাত টাকা নগদ পাবি, কিন্তু গামছা দুজোড়া।

—উঃ ভিখ মাগোন আইলাম গো। বলে মুখের ওপর একটা ঝামটা দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো টিকালী।

আঠারো বিশ বছরের একটা আঁটসাঁট রুক্ষ যৌবন, চোখ মুখে কেমন একটা হিংস্র রহস্যের ভাব, কটা-কটা চোখে কুটিল তীব্রতা। মেয়েটা এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়াতেই তার দু হাতে দোলানো হরিণের চামড়াটা সপাং করে এসে লাগলো রিদে কোটালের গায়ে।

গাঁ শুদ্ধ লোকের সামনে বাঁদরমারা দলের মেয়েটা কিনা ছুঁয়ে দিলো তাকে! রেগে টং হয়ে চামড়াটা কেড়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল রিদে কোটাল, কিন্তু তৎক্ষণে মেয়েটার শরীরের দিকে চোখ পড়েছে তার। আর চোখ পড়তেই থমক থেমে গেল হৃদয়।

রুক্ষ রুক্ষ চেহারার নোংরা এই বাঁদরমারার দলে এমন একটা মেয়ে আছে এতক্ষণ বুঝি লক্ষ্যই করেনি রিদে কোটাল।

টিকালীও প্রথমটা ঠাহর করতে পারেনি কি ঘটলো। কেন তার হাতের চামটা কেড়ে নিলো লোকটা। কিন্তু বোকা বোকা ভাবে

তার দিকে সে তাকিয়ে আছে দেখে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলো সে রিদে কোটালের গালে। আর সংগে গাঁয়ের লোক হো হো করে হেসে উঠলো।

চড় খেয়েও কিন্তু কিছু বললে না রিদে কোটাল। শুধু চামড়াটা ছুঁড়ে দিলো টিকালীর কাঁধের ওপর।

পঞ্চ মোড়ল হাওয়াটা হাল্কা করার জন্যে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাঁদর তাড়া তো আগে।

সংগে সংগে উল্লাসে চিৎকারে ফেটে পড়লো দলের মেয়ে-পুরুষ সবাই। সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো : হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দরমার, হা-লা-লা, হা-লা-লা-লা।

তারপরই সুর টেনে টেনে গাইতে শুরু করলো মেয়ের দলটা : বাণ মার, বাণ রাম বান্দরমার আইস গো—

গাঁয়ের এক প্রান্তে একটা বকুল গাছের তলায় গিয়ে ডেরা বাঁধলে বাঁদরমারার দল। কাঠকাটি জোগাড় করে আনলো মেয়েগুলো, পুরুষগুলো বেরিয়ে পড়লো মেঠো ইঁদুর, জলা ব্যাং কিংবা খাটাশ খরগোশের খোঁজে।

মেয়েদের ঝোলা থেকে বের হলো জোয়ারের দানা, মেটে হাঁড়ি, কয়েকটা সরা।

রাত করে ফিরলো পুরুষগুলো। কারো হাতে একটা মোটাসোটা ইঁদুর, কারো হাতে খাটাশ। কাঠকাঠির আগুন তখন গনগন করে জ্বলছে, মাটির সরাগুলো উল্টে নিয়ে জোয়ারের রুটি সেঁকছে মেয়েগুলো।

পুরুষগুলো শিকার করে ফিরতেই সরা নামিয়ে নিলো সবাই, ইঁদুর আর খাটাশগুলো গুঁজে দিলো গনগনে আগুনে।

তারপর ফুর্তিতে কলকল করে উঠলো একসংগে। কাজও মিলেছে এ-গাঁয়ে, শিকারও মিলেছে। এখন দিন কয়েকের জন্যে নিশ্চিন্ত। রঙ্গন আর টিকালীও।

টিকালী কিন্তু আসলে ভুলভুলিয়াদের মেয়ে। বাপ তার ভালুক পোষ মানায়, সে পারবে না মানুষ পোষ মানাতে! রঙ্গন রোজাকে দেখে অবশ্য মনে হবে না পোষ মেনেছে সে। কাঁধ অবধি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল জট পাকিয়ে আছে। একটা লাল কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁটা। নাকটা থ্যাবড়া, চওড়া চৌকো মুখ, হনুর হাড় উঠে আছে, চোখ দুটো হিংস্র আর ভয়ংকর। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি দস্যুর মত স্বাস্থ্য। দিনরাত যেন রেগে টং হয়ে আছে এমনি লাল লাল চোখ। কিন্তু টিকালীর কাছে এসে যখন বসে রঙ্গন, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দলের সংগে গল্পগুজব করতে করতে টিকালীর দিকে তাকায় ফিরে ফিরে, তখন আপনা থেকেই যেন তার রুক্ষ শরীরটার ওপর একটা কোমল স্নিগ্ধতা নেমে আসে।

সাঁতা, বাঁদরমারার দলে দশটা মেয়ে, কিন্তু টিকালীর মত একটাও নয়। না চেহারায়, না কাজে। ওর মত জোয়ারের রুটি বানাতে পারে না কেউ, পারে না এমনভাবে শিকারের মাংস 'ঝামরে' দিতে, কিংবা তাড়িয়া মদ বানাতে।

শিকার থেকে ফিরে এসে কাঠকাঠির গনগনে আগুন ঘিরে বকুল গাছটার তলায় ডেরা ফেলেছে দলটা। গল্পগুজব করছে সবাই। সাতটা টাকা পাওয়া যাবে এ-গাঁয়ে, আর তিন জোড়া গামছা। কে কে পাবে গামছাগুলো, গত বছর কে কে পায়নি, তার হিসেবনিকেশ ভাগবাটোয়ারা হচ্ছিল। ভাগবাঁটোয়ারার কথায় মাঝে মাঝে তেতে উঠছিল দু'চারজন, চেঁচিয়ে উঠছিল। ঝগড়া হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই মিটিয়ে দিচ্ছিল বুড়োগুলো। কিন্তু হিসেবনিকেশের যেন আর মীমাংসা নেই। সাত টাকার মধ্যে কত খরচ হবে জোয়ার কিনতে, নুন কিনতে, আর কত পয়সার হাঁড়িয়া!

যত রাত হয়, কলহ-কোলাহল ততই বাড়ে। তারপর একসময় মেয়েগুলো গুনগুন করে গান ধরে আগুনের মধ্যে শিকারের মাংস ঝলসাতে ঝলসাতে। দশটা মেয়ের গুনগুনানিতে চাপা পড়ে যায় সব কাজিয়া ঝগড়া, পুরুষগুলো ক্লান্ত হয়ে চুপ করে এক সময়।

তারপর খেয়েদেয়ে হাঁড়িয়ায় চুমুক দিয়ে গাছতলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়ে সকলে।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে বাঁদরমারার দল। হাতে তীরধনুক। ছোট ছোট চারটে দল হয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে শাখা-ভাঙার চৌহদ্দি। তারপর সমস্বরে একবার করে চিৎকার করে ওঠে : হা-লা-লা-লা বান্দরমার, হা-লা-লা-লা বান্দরমার! আর ছুটে ছুটে আসে কোন একটা বাঁদরকে পালাতে দেখলেই। পুকুরের পাড়, গাছের শাখা, বাড়ির ছাদ—যেখানেই লুকোবার চেষ্টা করুক না কেন, বাঁদরমারার হাত থেকে নিস্তার নেই।

লারী, টিকালী আর রঙ্গনরা সাতটা লোক নিয়ে একটা দল। ভোর হতেই ওরা এসে ঢুকলো গাঁয়ের মধ্যে। চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে মাঠের গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে বাঁদরগুলো এসে জোটে গাঁয়ের মধ্যে। কারো টিনের ছাদের কার্নিশে, কারো খড়-পালুইয়ের আড়ালে লুকোয়। সবচেয়ে বিপদ যেগুলোর বুকে-কোলে ছোট ছোট বাচ্চা।

টিকালীদের ছোট দলটার চিৎকার শুনেই গাঁয়ের লোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো এসে জুটলো। পঞ্চ মোড়ল, চাটুজ্যে, রিদে কোটাল।

টিকালীর রুক্ষ হাতের একটা চড় খেয়েছে রিদে কোটাল, কিন্তু তার জন্যে আর কোন রাগ নেই তার। ও শুধু দেখছিল দলটার কারসাজি। কেমন আন্দাজে আন্দাজে লুকোনো বাঁদরগুলোকে খুঁজে বের করছে ওরা। আর তারপরই তাড়া দিচ্ছে।

ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য টিকালীর সংগে চোখোচোখি হয় রিদে কোটালের।

হাসে টিকালী, চোখ ঠারে, তারপরই বাঁদরমারার নেশায় হঠাৎ যেন ভুলে যায় রিদে কোটালকে।

রিদে কোটাল কিন্তু ভোলে না। ওর চোখ শুধু টিকালীর দিকে, টিকালীর উগ্র যৌবনের লোভানির দিকে। একটু আড়াল খোঁজে রিদে, একটু আড়ালে পেলেই দুটো রসিকতার কথা বলে দেখতো সে।

টিকালী আর রঙ্গন ও-সব বোঝে না। দেখেও দেখে না। ওদের চোখ তখন পঞ্চ মোড়লের মড়াইতলায়। একটা বাচ্চা বুকে নিয়ে ধাড়িটা লুকিয়েছে আমগাছটায়। থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু ওখান থেকে ওকে তাড়িয়ে আনতে পারছে না ওরা কিছুতেই। অথচ তাড়িয়ে না আনলেও চলবে না। গৃহস্থ ঘরের আঙিনায় তো বাঁদরের রক্ত পড়তে দিতে পারে না। তাড়িয়ে তাকে মাঠের দিকে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তীর ছুঁড়ে মারবে।

বারকয়েক হা-লা-লা-লা চিৎকার ছুঁড়লো রঙ্গনের দল। কিন্তু বাঁদরটা নড়লো না।

শুধু চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলেন অকলংক ভটচায। খড়ম ঠকঠক করে এসে দাঁড়ালেন পঞ্চ মোড়লের আঙিনায়। আমগাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আহা, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ভয়ে কাঁপছে মা। চিঁ চিঁ করছে বাচ্চা বাঁদরটা।

অকলংক ভটচায এগিয়ে এলেন, চাটুজ্যে আর পঞ্চ মোড়লের উদ্দেশে বললেন, আহা, অমন করে হত্যা করো না ওদের! বানর নয় হে ওরা, মানুষ। অভিশপ্ত মানুষ ওরা। দেখছো না, মানুষের মত কেমন বুকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।

পঞ্চ মোড়ল আর চাটুজ্যে হাসলো মুখ টিপে। পণ্ডিত শিবকালী ভটচাযের বংশে জন্ম হলে কি হবে, ভটচায মশাই নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছেন। বাঁদর কিনা মানুষ! মানুষের মত!

রিদে কোটালও হেসে বললে, মানুষের মতন বটে, কিন্তু মানুষ নয় গুরুমশাই! গাছের ফলটা আশটা খায়, বলি ক্ষিদের লেগে খায়। মোড়লমশায়ের বেগুনের চারা নষ্ট করে কেন? কাপড় নিয়ে পালায় কেন? বৌঝিদের বেইজ্জৎ করে কেন পথে-ঘাটে! সাধে কি আর বাঁদর কয় মশাই।

রঙ্গন আর টিকালীর ও-সব দিকে চোখ কান নেই। ওরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে হা-লা-লা-লা করে, আর বাঁদরটাকে ভয় দেখানোর জন্যে তীর ছোঁড়ে। এমন ভাবে ছোঁড়ে যাতে গায়ে না লাগে, অথচ ভয় পায়।

ধাড়ী মা-বাঁদরটা ভয়ে ভয়ে নড়েচড়ে বসছিল এ-ডাল থেকে ও-ডালে। আর নড়াচড়া করতে গিয়েই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। মায়ের বুক আঁকড়ে লেপটে ছিল বাচ্চাটা, টুপ করে হঠাৎ নীচে পড়ে গেল হাত ফসকে।

সে কি চিৎকার মা-বাঁদরটার। যেন আতংকে কান্নায় ফেটে পড়লো।

রচ্চনের দলের একটা লোক ছুটে এসে তুলে নিলো বাচ্চাটাকে। তারপর পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে শুরু করলে। বাচ্চাকে দূরে নিয়ে গেলে ও-জায়গা ছেড়ে আসতেই হবে মা-কে।

সত্যিই তাই, বাচ্চাটাকে নিয়ে লোকটা যত এগোয়, মা-বাঁদরটা ততই তার পিছনে পিছনে চলে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

রচ্চনদের সংগে সংগে গাঁয়ের লোকও ভিড় করে চলে। চাটুজ্যে, পংখে মোড়ল, রিদে কোটাল। যেন কত বড় একটা তামাশা হচ্ছে।

অকলংক ভটচাযও পিছনে পিছনে চলেন খড়ম ঠক ঠক করে, আর বারবার বলেন, আহা ওকে ছেড়ে দাও, ঐটুকু এক রত্তি শিশু, নিষ্পাপ নির্বোধ মানবসন্তান, ওকে তোমরা মুক্তি দাও।

কে শোনে তাঁর কথা।

পংখে মোড়লের বেগুনের হলহলে চারাগুলি বাঁচাতে হবে, আখের ক্ষেত বাঁচাতে হবে, তরীকরতারীর বাগান বাঁচাতে হবে।

অকলংক ভটচায আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ধাড়ীটাকে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে গাঁয়ের লোক দূরে পালালো। অকলংক ভটচায নিজেও একটু ভড়কে গেলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন ধাড়ীটা ছুটে এসে বসলো তাঁর সামনে, ঠিক মানুষের মত দুটি হাত জোড় করে দুটি করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো। কিচকিচ করে কি যেন বলতে চাইলো বাঁদরটা। কিন্তু তার আগেই বাঁদরমারাদের একটা তীর এসে লাগলো ধাড়ীটার বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেই ছটফট করতে শুরু করলো বাঁদরটা। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল অকলংক ভটচাযের পায়ের তলার মাটি।

দু' চোখ বেয়ে জল নামলো তাঁর। কাউকে কোন কথা না বলে খড়ম ঠক ঠক করে বাড়ির পথ ধরলেন তিনি। এতদিন ধরে মন্ত্রই দিয়ে এসেছেন পাঁচটা গাঁয়ের মানুষগুলোকে, মন দিতে পারেননি।

অদ্ভুত একটা জ্বালা নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সারা গাঁ টহল দিয়ে বেড়ায় বাঁদরমারার দল। মাঝে মাঝে হা-লা-লা-লা চিৎকার করে ওঠে, ক্যানেস্তারা বাজায়, আর তীর ছোঁড়ে।

এমনিতেই বাঁদরমারা এসেছে টের পেয়ে পালিয়েছিল সব, যা দু দশটা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে লুকিয়ে ছিল সেগুলোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই মেরে শেষ করলো। তীর মেরেই কাজ শেষ নয়, মরা বাঁদরগুলোকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙ করেছে বকুলতলায়, চাম ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়েছে, ঝোলায় ভরেছে। তারপর ডোম আর মুচি-মুধাদের পাড়ায় গিয়ে হাঁক ধরেছে মেয়েগুলো: চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরিণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম—লিবে গো। হাঁপর হবে, আসন হবে।

আর বামুন কায়েতদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলেছে, ভালুকের লোম লিবে গো, ভালুকের লোম। ঘুনসিতে বাঁধবে, জ্বর ছাড়বে। গলায় বাঁধবে, জ্বর ছাড়বে। ভালুকের লোম লিবে গো!

ভুলভুলিয়াদের কাছ থেকে ভালুকের লোম নিয়ে আসে তারা, ছাগের চাম, বাঘের চাম, নিয়ে আসে, আর আনে সাপের বিষ, কাঁকড়া বিছের তাগা, দু' পাঁচটা জড়িবুটি। গান গেয়ে গেয়ে বিক্রী করে।

বায়না মত কাজ শেষ হতেই মেয়েগুলো বেরিয়ে পড়লো ঘরে ঘরে সে-সব বেচে আসতে।

টিকালী আর রচ্চন আর লারী এসে বসলো পংখে মোড়লের মড়াইতলায়। গড় হয়ে পেন্নাম করলে বাংলাকাড়ির উঁচু উঠোনটার উদ্দেশে, যেখানে পংখে মোড়ল, চাটুজ্যে, গাঁয়ের আর পাঁচটা লোক বসে তামাক টানছিল, তাস পেটাচ্ছিল।

রিদে কোটাল বসেছিল উঠোনের একটেরে, থামে ঠেস দিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে চোখ ঠেরে হাসলো টিকালী। বোধ হয় সেদিনকার চড় মারার কথাটা মনে পড়তেই। একটু মায়াও হলো যেন। আহা, অমন জোয়ান মানুষটাকে চড় মারলো সে, তবু কিচ্ছু বললো না? মানুষটা নরম বটে। মনটা নরম ওর!

রচ্চনের ও-সব দিকে চোখকান নেই। ও এসে নীচের উঠোনে ধান-ঝাড়াইয়ের পাটাটার পাশে বসলে। গড় হয়ে পেন্নাম করলে : দেন গো মশাইরা, আমাদিগের ছুতির টাকাটা দিয়া দেন।

টিকালী ধুয়ো ধরলে : হাঁ গো, হাত টাকা নগদ লিবো, আর তিন জুড়া গামছা।

পংখে মোড়ল ধমক দিয়ে উঠলো।—হ্যাঁ, তা দেবো না! চুক্তি ছিল তাই?

রচ্চন চোখ কপালে তুললো।—হাঁ গো মশাইরা।

পংখে মোড়ল বললে, সাত টাকা নগদ দেবো বলেছিলাম, গামছা তো দু জোড়া।

—না মশাইবাবু, তিন জুড়া গামছা।

টিকালী দাঁড়িয়ে উঠলো, তারপর রিদে কোটালকে দেখিয়ে বললে, শুধাও কেনা ঐ মানুষটারে।

রিদে কোটাল বিব্রত হলো।

বাবুরা যা বলছে, বামুন মশাই যা সায় দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ও কি বলবে। দু জোড়া গামছার কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু রাজি হয়নি বাঁদরমারার দল। তিন জোড়া গামছাই ওদের পাওনা।

চাটুজ্যে বললে, যা দিচ্ছি নিয়ে যা, আর ঝামেলা করিস না।

টিকালী সজোরে মাথা নাড়লে।—না গো মশাইরা, উ মানুষটাকে মাঝস্থ করছি। উ বলুক কেনা।

বলে দুটো কপিশ ক্রূর চোখ যথাসম্ভব করুণ করে টিকালী তাকালো রিদে কোটালের দিকে।

পংখে মোড়ল হাসলো।—ভালো সাক্ষী জুটিয়েছিস তো। বল্ রে রিদে কি চুক্তি হয়েছিল?

রিদে কোটাল বিব্রত হলো। তবু বাবুদের মন রাখবার জন্যে বললে, দু' জোড়াই ত বলেছিলেন আজ্ঞে।

পংখে মোড়ল বললে, ঐ দেখ, ঐ দু' জোড়াই দেবো, কাল এসে নিয়ে যাস।

টিকালী একবার তাকালে মোড়লের দিকে, একবার রিদের দিকে, তরপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।

বললে, মানুষ লও তুমরা।

অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ মন নিয়ে ফিরে গেল টিকালী আর রচ্চন আর লারী। কাল সকালেই আবার আসবে ওরা দলের সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু পরের দিন সকালে আর আসা হলো না। হাঁড়িয়া খেয়ে সারা রাত নাচগান করে ভোম হয়ে ঘুম দিলো সব এক পহর বেলা অবধি। খোয়ারী ভাঙলো না। নেশায় গড়ালো শুধু।

নেশার ঘোরে টিকালীর বারবার মনে পড়ছিল শুধু রিদে কোটালের চেহারাটা। কি মজবুত চেহারা মানুষটার, ইয়া চওড়া কাঁধ, শক্ত দু খানা হাত। টিকালী বুঝেছে ওর ওপর লোভ পড়েছে মানুষটার। আর টিকালীর নিজেরও মায়া পড়েছে তার ওপর। আহা, মিছেমিছি লোকটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল ও। পরক্ষণেই মনে হোল, ভালই করেছে। মিছে কথা বললে লোকটা, টিকালীর কথার মান রাখলো না? বলে কিনা দু'জোড়ার চুক্তি হয়েছিল?

কিন্তু তিন জোড়া গামছা না পেলে যে ওদের ভাগবাটরা সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। না, মশাইবাবুরা তিন জুড়াই দিবে, দিবে। রিদে কোটালকে আবার শুধালে ও নিশ্চয় বলবে তিন জুড়া দিবার ছুক্তি ছিল।

তবু লোকটার সাথে টুকুন হাসাহাসি

কথা বলতে হবে। কি জানি, লোকটা রাগ করেছে হয়তো। ওকে খুশী করলে তিন জোড়া গামছাই মিলবে।

নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে তাকালো টিকালী। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। না, মেয়ে পুরুষ সব লুটিয়ে আছে। খোয়ারী ভাঙেনি রচ্চনেরও।

একা একাই উঠে পড়লো টিকালী। কোমর থেকে খসে পড়া ছেঁড়া নোংরা কাপড়টা আঁট করে বাঁধলে কাঁপা কাঁপা হাতে। নেশার ঘোর কাটেনি তখনো। টলতে টলতে গাঁয়ের পথ ধরলে।

গাঁ অবধি আসতে হলো না। মাঝ মাঠে আমবাগানে ঘেরা সাঁইপুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে টিকালী দেখলে একটা লোক বসে রয়েছে পুকুরপাড়ে। কে বটে? এগিয়ে গেল টিকালী। সারি সারি গাছের গুঁড়িতে ঢাকা পড়লেও বোঝা যাচ্ছে একটা পুরুষ-মানুষ।

আরে রিদে কোটালই তো! ছিপ ফেলে বসে আছে। মাছ ধরছে এক মনে।

টলতে টলতে এলো টিকালী, তবু পা টিপে টিপে। শুকনো পাতায় পা প'ড়ে না মড়মড় শব্দ হয়। রিদে কোটাল না সজাগ হয়। ধীরে ধীরে এসে পিছনের একটা গুঁড়ির আড়ালে চুপি করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফাৎনার দিকে চোখ রেখে বসে ছিল রিদে কোটাল। আর তার পুরুষ্টু কাঁধ আর চওড়া পিঠের ওপর মোহময় চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল টিকালী।

ফাৎনায় টান পড়তেই সপাং করে ছিপে টান দিলো রিদে কোটাল।

কিন্তু মাছ উঠলো না, শুধু টোপটা খেয়ে পালিয়েছে মাছটা।

আবার বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে ছিপ ফেললো হৃদয়।

খানিক পরেই ফাৎনায় টান পড়লো, আবার সপাং করে ছিপ টানলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে সশব্দে হেসে উঠলো টিকালী।

চমকে ফিরে তাকালো হৃদয়। দেখে চমকে উঠলো। সারা শরীর যেন তার শিরশির করে উঠলো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে হাসছে মেয়েটা, নেশার হাসি। হাসছে আর কাঁপছে তার শরীরের মাংসল ঢেউগুলো। কাঁপছে না, যেন নাচছে থরথর করে।

হাসতে হাসতেই টিকালী বললে, ডাঁরে শিকার লাগলো নাই?

রিদে কোটাল তৎক্ষণে ছিপটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টিকালীর খিলখিল হাসি দেখে আর তার উদ্ধত যৌবনের থরথরানি দেখে হৃদয় কোটালের মনেও তখন নেশা ধরেছে।

দুটো ভারী পা ফেলে এগিয়ে এলো সে। এগিয়ে এসে মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিকালীর একখানা হাত ধরলে খপ্ করে, ধরলে শক্ত মুঠোয়।

হাতটা ছাড়াবার জন্যে দুটো হেঁচকা টান দিলে টিকালী। পারলে না।

হাতটা ছাড়াতে না পেরেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। সারা শরীর তার নেচে নেচে উঠলো।

তারপর তার হিংস্র আর কটা কটা চোখে রিদে কোটালের মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে সে। ফিসফিস করে বললে, চ উদিক পানে।

রোদ চড়তেই খোয়ারী ভাঙলো, একে একে উঠে বসলো বাঁদরমারার দল। এ ওকে ঠেলে তুললো, ও একে ঠেলে তুললে। কুণ্ডুলী পাকিয়ে সব এক দলা কেঁচোর মত ঘুমিয়ে ছিল, উঠে বসলো এক দলা গুবরে পোকার মত।

আধা-নেশার চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে রচ্চন।

ঝলসানো মাংসের চিবোনো হাড়, নোংরা ঝোলাঝুলি, বাঁদরের চাম, মেটে হাঁড়ি আর সরা এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো। একে একে দলের সবারই মুখের ওপর লাল টকটকে চোখ জোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গেল রচ্চন। না, সবাই আছে, নেই শুধু টিকালী।

গেল কোথায়? চোখ দুটো হঠাৎ তার হিংস্র হয়ে উঠলো, কপালের শিরাটা ফুলে উঠলো।

ক্ষ্যাপা গলায় রচ্চন চেঁচিয়ে উঠলো।—এ লারী। টিকালী কুথাকে?

তেজী সাপের মত ঘাড় ফেরালো মেয়েটা। —তর বহু তু জানিস। নেশা হ'য়েছে দেখে উ নিঘ্ঘাৎ উদের ঠেঙে টাকা আর গামছা নিয়ে পালাবে।

দলশুদ্ধ লোক হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠলো। উঠে দাঁড়ালো সবাই। পুরুষগুলো উঁচিয়ে ধরলো তীর আর ধনুক। মেয়েগুলোর হাতে চাম-ছাড়ানোর ধারালো ছুরি। সাত দিনের মজুরী তাদের: হাত টাকা নগদ, তিন জুড়া গামছা। সারা গাঁয়ের বাঁদর তাড়িয়েছে, বাঁদর মেরে শেষ করেছে। আর ছুঁতিরা টাকা নিয়ে পালাবে টিকালী?

—ভুলভুলিয়া মেয়া, অমন তো হবেই। বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে দলের বুড়া।

এক সার ক্ষ্যাপা শুয়োরের মত রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে মশাইবাবুদের বাড়ির পথ ধরলো বাঁদরমারার দল। টাকা আর গামছা নিয়ে পালিয়ে থাকে তো পাঁচ গাঁ ঘুরে খুঁজে বের করবে টিকালীকে। ছালতাই চাকু দিয়ে চাম ছাড়িয়ে নেবে টিকালীর। লুভী মেয়াটাকে ঠুসে দেবে কাঠকাটির আগুনে। ভুলভুলিয়ার মেয়া, বাঁদরমারা চিনে না!

নানান জল্পনাকল্পনা, হৈ হট্টগোল আর গালাগালি দিতে দিতে আলপথ ধরে আসছিল দলটা।

গাঁ যত কাছে আসছে রাগ তত বাড়ছে। রাগ যত বাড়ছে মুখের কথা তত কমছে।

শুধু একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হয় নাকের। মুখে কথা নেই কারো। সারা শরীর যেন রাগে জ্বলছে সবার।

মাঠের আমবাগানে ঘেরা সাঁইপুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ চমকে থেমে পড়লো দলটা। বাগানের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে, হাসছে?

রচ্চন আর লারী এগিয়ে গেল বাগানের দিকে।

আর পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠলো লারী। দূরের ঝোপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার হেসে উঠলো।

তীর-ধনুক উঁচিয়েই ছিল রচ্চন। সাঁ করে তীরটা ছুঁড়ে দিলো সে রিদে কোটালকে লক্ষ্য করে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো হৃদয়, চিৎকার করে উঠেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ছুটতে ছুটতে এলো রচ্চন। রচ্চন আর লারী। আর টিকালী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে থর থর করে।

ছুটে এলো রচ্চন। দেখলে রিদে কোটালের একটা হাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তীরটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মাটি ভিজে গেছে রক্তে। গোঁ গোঁ করছে রিদে।

রচ্চন হিংস্র ক্রূর চোখে তাকালো রিদে কোটালের মুখের দিকে, তীরের ডগাটা মট করে ভেঙে দিয়ে তীরটা টেনে বের করলে।

তারপর অসীম ঘৃণার সঙ্গে মাটিতে এক দলা থুতু ফেলে বললে, বা-ন্-দ-র!

খিলখিল করে লারী হেসে উঠলো আবার। আর সঙ্গে সঙ্গে টিকালীর কটা কটা হিংস্র চোখ জোড়াও খিলখিল করে হেসে উঠলো।

টিকালীও হাসতে হাসতে বলে উঠলো: বা-ন্-দ-র।

যারে না চাহিলে পাওয়া যায়, এমন সুলভ জিনিস, যা সবাই দু'হাত বাড়ালেই হাতে পায়, তা হল পুরুষ মানুষের গালের ওপরের দাড়ি। একখানা লম্বা দাড়ি হলে হয়তো আপদ চুকে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। এ হল কুচিকুচি অসংখ্য দাড়ি, যা পুরুষকারের সাক্ষী। পাকলে সাদা, কাঁচায় কৃষ্ণবর্ণ। উর্বর গালের যা 'সোনার ক্ষেতের ধান'। মেয়ে মানুষের চোখের প্রলোভন। সব পুরুষের (যারা দাড়ি রাখতে নারাজ) তাদের রোজ সকালের বায়নাক্কা। যা একবার গজালে আর থামতে চায় না—খেয়াল গানের মত বেড়ে যায়। সেই দাড়ির খপ্পরে পড়েননি, এমন পুরুষ মানুষ (এবং সেই সঙ্গে মেয়ে মানুষও) যে কেউ আছেন তা বললে বিশ্বাস করান মুশকিল।

যতদিন দাড়ি ওঠেনি ততদিন 'হে অন্তর্যামী দাড়ি দাও' গোছের এটিটিউড নিয়ে হন্যে হয়ে বসে বসে দেখেছি কবে গালে দাড়ির উদয় হবে। সেদিনের তখন কি নিঃসহায় অবস্থা, জীবনের সব কিছুই দাড়ির অভাবে যেন অপূর্ণ রয়ে গেল। তখনও নিজের সেফটি রেজর, সাবান এসব পুরুষোচিত কিছুই হস্তগত হয়নি। এ নাবালকত্ব হল দাড়ি পাওয়ার তপস্যার দিন। ক্রমে ক্রমে কাঁচ গালের দিগন্তে সদল বলে দাড়ির আবির্ভাব হল। স্কুল থেকে কলেজে যাওয়া, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করা। কিন্তু আশ্চর্য, দাড়ির আবির্ভাবের পর জানলুম দাড়ির ভবিতব্য কাটায়, রাখায় নয়। দাড়ির অপভ্রংশ জুলপিটি কিন্তু সসম্মানে রেখে অনেকে মর্যাদা দিয়ে গালের শোভা [illegible] করেন। সেফটি রেজর, সাবান, বুরুশ [illegible] এক এক করে জুটল। কিন্তু অবিলম্বে জানতে পারলুম দাড়ির সঙ্গে ক্ষুরের এক ভয়ানক শত্রুতা।

সুকুমার রায় বলেছিলেন। 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি।' এখন দেখছি শুধু গোঁফের নয়, দাড়ির আমি দাড়ির তুমি। একি আপদ! যতদিন দাড়ি ছিল না, ততদিন দাড়ি পেতে চেয়েছি, যৌবন হাতে পাওয়ার চিহ্ন হিসাবে। কিন্তু দাড়ি উঠে অবধি দাড়ি নিয়ে রোজ রোজ এক দণ্ড ভোগ করা। সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যা প্রত্যেক পুরুষ মানুষের মনে হয়—এই বেরুবার আগেই যা করতে হবে, তা হল দাড়িকে নির্বাসন দেওয়া। যখন প্রথম উঠল তখন সাতদিন একবার ক্ষুর বুলালেই চলত। তারপর দুদিন পর পর। শুধু আমি নই, আমার দাড়ি যত কাঁচ থেকে কড়া হতে লাগল, তত রোজ রোজ ক্ষুরের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠল। এখন অবস্থা শোচনীয়, সকালে বিকালে হলে বোধ হয় ভাল হয়। দাড়ির পাল্লায় পড়ে এখন এক রকম হাল ছেড়ে দিয়েছি। সুখের কথা এই যে, এই জ্বালা কেবল একা আমার নয়, বিশ্বের যত পুরুষ আছে তাদের সবার এই দশা। দাড়ি কামাবার আগে পর্যন্ত মনে হয় আজ থাক, কামালে না হয় কাল কামাবো। কিন্তু একবার কামিয়ে ফেলতে পারলে তখন মেজাজ শরীফ। দাড়িবিহীন মুখে মনে হয় স্নিগ্ধ শির, মুগ্ধ মন, উল্লসিত চিত্ত। এ ভাবের অন্তরা শুধু কাল সকালে দাড়ি কামানোর আগে পর্যন্ত।

গালের শোভা বর্ধন—

যারা গোঁফের দৌরাত্ম্য অনেক সহজে সহ্য করেন তাঁরাও কিন্তু দাড়ির আস্ফালন অত সহজে হজম করেন না। এক সাধু-সন্ত, পাদ্রী বা মুসলমানদের কথা স্বতন্ত্র। দাড়ি কামানোর মধ্যে অদ্ভুত একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে। কেন তা জানি না, তবে বেশী ভাগ লোকই রোজ দাড়ি নিজের খাতিরে যত না কাটে, তার চেয়েও বেশী করে কাটে অন্য লোকের কথা ভেবে। দুদিন দাড়ি না কামিয়ে তারপর আপনি রাস্তায় বার হন। অমনি দেখবেন, রাস্তায় চেনা মুখ চোখে পড়লেই আপনাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুলেছে, 'কি মশাই, শরীর ভাল নেই বুঝি?' কিম্বা 'কি হল দাদা! এমন মনমরা কেন? অথবা 'কে গেলেন? গুরুজন বুঝি? আহা!" এরকম হাজার প্রশ্ন। অযাচিত সহানুভূতি। কারণ আপনার গালে দাড়ির আবর্জনা আপনি সাফ করেন নি হয়তো ইচ্ছে করেই। বিকেলে আপনার দাড়িওয়ালা

'এ ব্যারোমিটার অফ্ কালচার'

মুখখানা দেখে তারা যে ধারণা করত তা না বলাই ভাল। অতএব আপনার আশপাশের পাঁচজনের কথা ভেবে আপনাকে ক্ষৌর কর্মে প্রবৃত্ত হতেই হবে। দাড়ি আপনাকে ছাড়বে না, আপনি তাকে ছাড়তে চাইলেও। তবে লোকের পরোয়া না করে যদি দাড়ি কামানোকে কমপালসারী থেকে অপশন্যাল করে দেওয়া হয় তাহলে অনেক ব্লেড কোম্পানীর অবস্থা অচিরে শোচনীয় হয়ে উঠবে।

শোপেনহাওয়ার বোধ হয় অনেক ভেবে-চিন্তে মন্তব্য করেছিলেন, সভ্যতার প্রসারের সংগে দাড়ি লোকের মুখ থেকে ক্রমাগত লোপ পাচ্ছে। দাড়িকে উনি বলেছেন, "A barometer of Culture"। আজও ভ্রূণ অবস্থায় মানুষের দেহের সর্বত্র চুলে পরিব্যাপ্ত থাকে। এই অবস্থার নাম লানুগো (Lanugo)। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তিতে মানুষের দেহে চুলের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। চুলের মধ্যে মানুষের প্রাচীন উদ্বর্তনিক'বের ইঁগিত আছে। অভিব্যক্তির সংগে সংগে চুলের ব্যাপ্তি কমে এসেছে। কোন কোন মানুষের দেহে চুলের আধিক্যও দেখা যায় —যেমন এমু জাতীয় লোকের মধ্যে। এমুদের মুখে নাক, চোখ, মুখের গর্ত ছাড়া বাকী অংশ দাড়িতে ঢাকা। দাড়ি কামানোর তাদের কোন বালাই নেই। তারা মনে করে মুখের যত শোভা সব দাড়িতে ভিড় করে আছে। তাকে বিসর্জন দিয়ে লাভ কি? যদিও সভ্য সমাজে অনেক অসাধারণ মানুষের মুখে দাড়ি শোভা পেয়েছে—সে কথা আমরা জানি। দাড়ির মধ্যে হয় তেজ নয় কাব্য বাসা বেঁধেছিল। কেউবা তা বড় তা বড় দাড়ি রেখে তার মধ্যে মৌমাছির চাষ করেছেন। অবশ্য তাদের ভাগ্যে মধুর সংগে হুল জুটেছিল কি না জানা যায় নি।

দাড়ির চারা গালের টবে যারা সাধারণ হয়েও অবলীলাক্রমে যত্ন করে বাড়িয়ে তোলে তারা পাঞ্জাবী। মেয়েরা চুলের ভারে বিব্রত হয়ে পিছনে বিনুনী বাঁধে। আর পাঞ্জাবী পুরুষরা গালের চুলে সমান বিব্রত, তারা সামনে থুতনির তলায় দাড়িকে ইনিয়ে বিনিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে বিনুনী বাঁধে। সব মেয়েরাই পুরুষের গাল সম্বন্ধে একেবারে নিরুৎসাহ নয়। তবু পাঞ্জাবী মহিলাদের চোখে তাদের যারা 'দাড়ি ওয়ালা' তারাই আবার তাদের 'বাঁশীওয়ালা'। বিদেশী সাহিত্যে মোঁপাসা গোঁফের সুখ্যাতি করেছেন ঝুড়ি ঝুড়ি যদিও দাড়িরও নানা রকমফের ফরাসী দেশে খুব দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ মানুষের সত্যিকারের সৌভাগ্যের সামগ্রী দাড়ি না গোঁফ? এ প্রশ্নের যা উত্তর স্যর আশুতোষ করতেন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অন্য রকম কিছু আশা করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। যদিও দুজনার মধ্যে জানি গোঁফ আর দাড়ির দ্বন্দ্বটা তাঁদের প্রীতিকে খণ্ড করেনি।

ঠোঁটের ওপরে থাকে গোঁফ। আর দাড়িরও স্বস্থান হল গাল। এমনিতে আমরা দাড়ি চাষ বন্ধ করতে পারলে বাঁচি। কিন্তু যারা দাড়ি বিলাসী, তাঁরা দাড়ির সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ, দাড়ির গৌরবে গৌরবান্বিত। এমন একজন ভদ্রলোককে জানি, যাঁর কাছে তাঁর লম্বা সাদা দাড়ি এক রকম ধ্যান-জ্ঞানের দোলনা—স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী। দেখতুম দাড়িতে হাত বুলোতে পারলে তাঁর চোখ বুজে আসতো—এত আনন্দ অনুভব করতেন তিনি। তাঁর দাড়িতে টান পড়লেই চিচিং ফাঁকের মত অনুভূতির সব দরজা হাট হয়ে খুলে যেত।

দাড়িতে মৌমাছির চাষ করতেন

সর্বনাশ—

তিনি কলকাতার বাইরে এক স্কুলে পড়াতেন। ছাত্ররা তাঁকে বহুবার বলত 'স্যার এমন মুখে অমন দাড়ি মানায় না মোটেই'। দাড়ি বিসর্জনের কথায় তিনি কখনও কান দিতেন না। বরং রসিকতা করে বলতেন 'দাড়ি রাখার অনেক ভ্যালু আছে হে'। বলে গল্প ফাঁদতেন কেমন করে এক বিদেশীকে, যে কখনও আম খায়নি, স্রেফ দাড়ির সাহায্যে আমের মধুর স্বাদ বুঝানো সম্ভব হয়েছিল। দাড়িতে আমসত্ত্ব লাগিয়ে তা শুকিয়ে পরে তাকে তা চাটতে দিয়ে। কিন্তু দাড়িওয়ালা এই মধুর স্বভাবের মাস্টার-মশাই এর জীবনে এক চরম দুর্দৈব ঘনিয়ে এলো। কতকগুলো দুষ্টু ছেলের প্ররোচনায়, একদিন পয়লা এপ্রিল দুপুরে বেলা গুরু ভোজনান্তে গুরুমশাই যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন কোন এক অতি বড় অবুঝ ছোকরা এসে অতি সন্তর্পণে কাঁচি দিয়ে তাঁর দাড়ি কেটে বুকের ওপর রেখে গেল। দিবানিদ্রার পর মাস্টার মশাই চোখ মেললেন। যথারীতি অভ্যাস পরবশ হয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে গেলেন: ও মা! সপাটে তাঁর দাড়ি গাল ছেড়ে হাতে উঠে এল! দাড়ির শোক তার কাছে পুত্রশোক হয়ে উঠেছিল। তিনি তারপর স্কুল ছেড়ে কোথায় যে বিবাগী হয়ে গেলেন তার খবর কেউ আর কখনও দিতে পারল না।

আর একজন ভদ্রলোকের কথা জানি যিনি স্বেচ্ছায় দাড়ি বিসর্জন দিয়ে ছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে শোকে গৃহত্যাগ করতে হয়নি। এই কলকাতায় দিব্যি তিনি এখনও হেসে খেলে ঘুরে বেড়ান। তাঁর কাঁচায় পাকায় মেশানো এই এত বড় দাড়ি ছিল। একদিন রাস্তায় দেখি তিনি দাড়ি বিযুক্ত হয়ে বাজারের থলি হাতে করে

চলেছেন। সচকিত দৃষ্টিতে বললুম, একি মশাই, একি করলেন?

তিনি এক গাল হেসে বললেন, না এমন কিছুই নয়। নাতিটা বড় হচ্ছে, দিনরাত দাড়ি ধরে টানে। তাই সে আপদ ঘুচিয়ে দিয়েছি। এই বলে উনি ওঁর ফতুয়াটা বুক পর্যন্ত তুলে বললেন, নাতি ব্যাটার দৌরাত্ম্যে শুধু কি দাড়ি, এই দেখুন, বুকের চুল পর্যন্ত সাফ করে রেখেছি। আর কিছুতেই কিছু করতে পারবে না। দাড়িকে গোল্লায় পাঠিয়ে নাতিকে বুকে পিঠে করছেন, মানুষ করে তুলছেন—"স্নেহ এমনই বিষম বস্তু!" এখন ভদ্রলোক দাড়ির একেবারে বিপক্ষে চলে গেছেন। দাড়ির কথা উঠলে প্রায়ই বলেন, ও সব আপদ মশাই, রেখে কোন লাভ নেই। দাড়ির বনে মশাই তক্তাপোষ থেকে যখন ছারপোকারা এসে হারিয়ে যায় তখন কি তাদের খুঁজে বার করা চারটিখানি কথা?

যে মুহূর্তে ব্লেডটি তৈরী হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে যে দাড়ি পড়বে কাটা তারা তখনও গজায় নি। কোথায় কোন চুলোয়

অন্যের হাতে গাল ছেড়ে দেওয়া

ব্লেডটি তৈরী হয়েছিল তারপর সে কিনা আমারই গালে দাড়ির বিদ্রোহ দমন করতে এসে উপস্থিত। আমরা দিন রাত হা শান্তি যো শান্তি করছি। কিন্তু শান্তি আসবে কি করে শুনি? রোজ সকালে দুনিয়ার তাবৎ লোক, এদিকের আইসেন-হাওয়ার, ওদিকের ক্রুশ্চেভ, দাড়ি কামানোর অশান্তি পর্বটি নিয়ে দিন শুরু করেন। গান্ধীজিও দাড়ির সঙ্গে মোটেই Non-violent ব্যবহার করেননি।

দাড়ি না থেকে মাকুন্দ হয়েও কিন্তু লাভ নেই। কেন তা শুনুন। এক ডিনার টেবিলে বলতে শুনেছি একজন মডার্ন মাকে তাঁর মেয়ের হবু বরের উদ্দেশে—ছেলেটি ভারি ভাল, দেখতে সুন্দর, পয়সা কড়ি আছে, মাথা বিগড়ায় নি, সিগারেট বিড়ি খায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি ছেলের গুণের কথা শুনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে তার মাকে প্রশ্ন করেছিল, ছেলেটি এত ভাল বলছো, কিন্তু তা বলে মাকুন্দ নয় তো?

অন্য সব বিষয়ে স্বাবলম্বী হতে কেউ পেছপা নয়। কিন্তু দাড়ি কামানোর ব্যাপারে নিজের হাতে দাড়ি কামাতে তারাও অনিচ্ছুক। তাদের চুপি চুপি যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে জানতে পারবেন দাড়ি কামানো পর্বটা সমাধানের জন্য অন্যের হাতে গাল ছেড়ে দিতে তারা অকুতোভয়ে রাজী।

প্রশ্ন হচ্ছে, দাড়ি এমন অনিবার্য হয়ে ওঠে কেন? সূর্য সকালবেলা ওঠে কিন্তু দাড়ি কখন ওঠে? তা কি কারুর জানা আছে? সকালে কামাও, দুপুরে কামাও, বিকেলে কামাও, রাত্রে কামাও, তারপরের দিন সকালে যথা পূর্বং তথা পরং—যেমনকার দাড়ি তেমনি উঠে বসে আছে। কামানোর পর উঠতি দাড়ির উপর টিপ করে অনুবীক্ষণ বসিয়ে দেখতে হয় প্রতি ঘণ্টায় কত মিলিমিটারের কত ভাগ উঠছে গালের আল বেয়ে। চলতে, বসতে, হাঁটতে, ঘুমুতে, কথা কইতে সারাক্ষণ দাড়ি তিল তিল করে মুখ জুড়ে বার হয়। এই এক একটি দাড়ি নিয়ে দাড়ির অরণ্য। একজন রসিক ভদ্রলোক পরামর্শ দেন—দাড়ি রোজ, রোজ না কামিয়ে চীনাদের মত চিমটে দিয়ে এক একটিকে উপড়ে দিলে দাড়ির দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। রোজ জ্বালাতনের চেয়ে একদিনের জ্বালাতন ঢের ভাল।

রোজ সকালে সেই এক সমস্যা—দাড়ির দায়। বেরুবার আগে ব্লেডটি হাতে নিয়ে মনে হয় আজকে to shave or not to shave, that is the question। কিন্তু যখন পরক্ষণেই পাশ থেকে কোমল কণ্ঠে শুনতে পাই "আমাদের এই রোজ চুল বাঁধার যে কি জ্বালা, তা যদি তোমরা বুঝতে!" এই কথা শোনার পর ক্ষৌর কর্মে আসক্তি এনে আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনের মধ্যে একটি সমীকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

**দাড়ি কামানোর কষ্ট=চুল বাঁধার জ্বালা—সমান কষ্ট**

**(তবু না করলে নয়)**

সভ্যতার গোড়া পরিষ্কার করতে দাড়ি-কর্তন আর সভ্যতার গোড়া বাঁধতে বেণী-বন্ধন। কিন্তু কেন? গালে ক্ষুর বুলিয়ে যদি বুদ্ধিটা হত ক্ষুরধার আর বেণীবন্ধনে যদি মনটা সহজে পড়তো বাঁধা। শুধু দাড়ি আর বেণী নয়, তারা যাদের স্নেহ-বাগিচায় গজায় তারাও হত শত্রুধন্য।

# বালির ঝড়

সমরেশ বসু

ট্রেন এসে পৌঁছল প্রায় এক ঘণ্টা দেরীতে।

সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। কিন্তু দিকে দিকে প্রসারিত তার লেলিহান জিহ্বা এখনো গুটিয়ে নেওয়া হয়নি। এখনো গরম বাতাসের ঝাপ্‌টা। পায়ের তলায় আদিম পাথুরে মাটিতে এখনো জ্বলন্ত অংগারের উত্তাপ।

গাড়ির জানালা দিয়ে আগেই লক্ষ্য পড়েছিল দগ্ধ ধূসর তিনপাহাড়ের পিঠ। এই পশ্চিমা সূর্যের জ্বলন্ত থাবায় যেন একটি অতিকায় পশুর মত ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে পাহাড়টা। পশুটা মৃতপ্রায়।

কিন্তু গাড়ি যতই সামনে এগোচ্ছিল, ততই একটি জিনিস বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না। দূরে ওগুলি কী? ওই ধোঁয়া ধূসর যেন মাটি থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আকাশ-ব্যাপী অন্ধকার করে দিচ্ছে? যেন ওই অতিকায় পশুটা পা' ছুঁড়ছে এখনো মরার যন্ত্রণায়। থাবি খাওয়ার মত। বালি উড়ছে যেন তারই অন্তিম নখরাঘাতে। তার শেষ দাপাদাপিতে।

তারপর গাড়ি আরো এগিয়েছে। টের পাওয়া গেছে, বালি-ই উড়ছে। দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ক'রে দিয়ে যেন একটা কাপালিক খ্যাপা হ'য়ে ফিরছে। হাসছে অট্টরোলে। আদিম মানবের জাদু-বিশ্বাসের একটা খেলা যেন দেখাচ্ছে সে।

সামনে মাঠ কি ঘাট কিছু বোঝার উপায় নেই। সম্ভবত খোলা চরভূমি। তারপরে গংগা। কারণ দূরে, স্টীমারের একটি অস্পষ্ট ছায়া যেন দেখা যাচ্ছে। আরো দেখা যায়, যেন কতগুলি প্রেতছায়া ছুটে আসছে। দেখা যেতে যেতেই ছায়াগুলি এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ট্রেনের কামরায় কামরায়। ওরা যে কুলি, তা' আর চেনবার উপায় নেই। ততক্ষণে খোলা দরজা জানালা দিয়ে, গরম বালুরাশি কামরাগুলি ভরে তুলতে আরম্ভ করেছে।

মুহূর্তে একটা বীভৎস তাণ্ডব শুরু হল। ঝোড়ো বাতাস, আর বালু যেন তপ্ত খোলার বালু, তার সংগে মানুষের হাঁক ডাক চীৎকার। মানুষের চেয়ে বেশী কুলির ধস্তাধস্তি।

সুলতা-শিবনাথদের কামরাতেও তাণ্ডবটা শুরু হয়েছে। সুলতা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেই পারেনি। কিছুটা বুঝি বেলা শেষের আমেজে আর গাড়ির দোলানিতে ওর চোখ জড়িয়ে আসছিল। তারপর সহসা আক্রমণে রুমাল চেপে

ধরেছিল চোখে মুখে। এবার বোম্বাই সিল্কের গোটা আঁচলটা-ই মুখে মাথায় টেনে এনে বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, এটা কি হচ্ছে?

অবস্থাটা শিবনাথেরও খুব সুবিধের নয়। দম চাপতে গিয়ে, প্রায় দৈববাণীর মত কড়া আর মোটা শোনাল তার গলা, বালির ঝড়।

এই সহসা দুর্যোগের ওপর যেন রেগে উঠে, প্রায় শাসিয়ে উঠল সুলতা, বালির ঝড়? কী বিশ্রী!

পশ্চিমা গঙ্গার খেয়ালী ঢালু পাড়ে, দূরবিশারী এই ধু ধু বালুচরে কোন এক অজানা দিগন্ত থেকে ঝড় উঠে এসেছে, কে জানে। মানুষের মন-রাখা সুশ্রী বিশ্রীর চৈতন্য তার নেই। না মানে শাসন, না মানে কর্ষণ। গাড়িটা থেমেও না থেমে যতই চাকা ঘষে ঘষে ইঞ্চি ইঞ্চি এগোয়, ততই ঝড়ের দাপাদাপনা বাড়ে।

এবার বিরক্তির চেয়ে কষ্টটাই টের পাওয়া গেল সুলতার, উঃ, গেলুম। এ আমরা কোথায় এসেছি?

যেন অনেক দূর থেকে জবাব দিল শিবনাথ, শকরিগলি ঘাট।

—তারপর?

—এখানেই নামতে হবে আমাদের। নেমে স্টীমারে উঠতে হবে।

—ওরে বাবা!

বুঝি ভয় পেয়েই সুলতা, দু' হাত বাড়িয়ে শিবনাথকে ধরে তার পিঠে মুখ গুঁজল। শিবনাথেরও দু' চোখের কোল বালুকণায় ঝাপসা হয়ে গেল। সে সস্নেহে বলল, একটু সামলে নাও সুলতা। স্টীমারে গিয়ে উঠলে আর লাগবে না।

সুলতা প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, কী ক'রে সামলাব। সব তছনছ ক'রে দিচ্ছে যে?

শিবনাথ হাসল একটু। মুখ নামিয়ে এনে বলল, তা' বেড়াতে গেলে একটু কষ্ট করতে হয় না বুঝি। কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলবে।

—যাও! তোমার সবতাতেই ফাজলামি। আমি ব'লে কানা হ'য়ে যাচ্ছি। আর গায়ে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে গরম বালি, ইস্!

রক্তের মত লাল তরল শাড়িটার আঁচল তখন লুটিয়ে পড়েছে। অতলস্পর্শ জলের মত লাল নাইলনের জামাটা শাড়ি পরিত্যক্তা। তেইশ চব্বিশ বর্ষণের অনেকটাই অনাবৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত শরীরে, অন্ধকারে নিওন আলোর বিজ্ঞাপনের মত অন্তর্বাস সুস্পষ্ট। প্রসাধন অনেক আগেই ধুয়ে মুছে গেছে ট্রেনের গরমে ও ঘামে। এখন চোখ ঘষে ঘষে কাজল হয়েছে চোখের কালি। বালি ইতিমধ্যেই সাদা স্তর ফেলেছে চুলে। বালি খোঁপার ভাজে ভাজে।

শিবনাথের অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। তবে পুরুষ হওয়ার সুযোগটাই একমাত্র সুযোগ। সে কোঁচাকে মালকোঁচা ক'রে নিয়েছে। রিস্টওয়াচে বেঁধেছে রুমাল।

এদিকে কুলিদের ডাকাতে-হাত পড়েছে তাদের মালের ওপর। কামরার অন্য দুটি পরিবার তখন কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে নামতে উদ্যত। সুলতার আঁকড়ে ধরা হাত এবার কোমর থেকে না সরালে নয় শিবনাথের।

এমন সময়ে সুলতার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তে শোনা গেল, ও কি, ওকি করছেন আপনি? ওটা আমার, আমাদের ওটা।

দরজার দিকে যেতে গিয়ে ভদ্রমহিলা হকচকিয়ে থমকে গেলেন। যাকে অন্তত বারকয়েক লীলা বলে ডাকতে শোনা গেছে কামরায়, সেই ভদ্রমহিলাই। আর এই বালির ঝড়ে যখন সুলতার চোখ যাচ্ছে, তখন সে এ জিনিসটা ঠিকই লক্ষ্য করেছে, তাদের ছোট হ্যান্ডব্যাগটি ভদ্রমহিলার হাতে।

বালির ঝড়ের মধ্যেও ভদ্রমহিলার দুটি আয়ত চোখ লজ্জায় ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত হল। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থতিয়ে গেলেন একেবারে। যদিও রং নেই ঠোঁটে, স্বাভাবিক রক্তাভাটা ছিল। ঈষৎ পুরু ঠোঁট দুটি চকিতে একবার দংশে তাড়াতাড়ি সুলতাদের বেডিংএর ওপর হ্যান্ডব্যাগটি রেখে ব'লে উঠলেন, ছি ছি, আমি একেবারে জানতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না। কিন্তু—

চোখে আর মুখে হাত চাপা দিলেন উনি। ঝড়ের কামাই নেই। বালি ঢুকছে। মাথায় সুলতার মতনই হবেন। বয়সটা কম হ'তে পারে, বেশী হ'তে পারে। ধরবার উপায় নেই। কারণ এখন শিবনাথই দেখছে কি না। তবে সব মিলিয়ে, ভদ্রমহিলার শ্যামচিক্কণ মুখে কিছু একটা বিশেষত্ব ছিল। সেটা কী, বলা মুশকিল। বোধ হয়, আকাশ নীল মানেই যে এক নয়, নানান রূপ অরূপের বিশেষত্ব থাকে, প্রায় সেই রকম। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আর বোধ হয় সুন্দর। সে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিতে গেল। ততক্ষণে দরজার প্রায় বাইরে থেকে পুরুষ গলার প্রশ্ন এল, কী হয়েছে লীলা?

লীলা বললেন, কিছু নয়। আমাদের হ্যান্ডব্যাগটা নিয়েছ?

জবাব এল, নিয়েছি।

লজ্জায় ও বালির ঝড়ে যদিও রুদ্ধশ্বাস, তবু হাসলেন লীলা। বললেন, ছি ছি, কী যে কাণ্ড!

সুলতা কোনরকমে আঁচলের বাইরে মুখ এনে বলল, তাতে কি? ওরকম হ'য়ে যায়।

মুক্তি পেলেন ভদ্রমহিলা। সুলতার ও-কথা ক'টি যেন জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুক্তির আদেশের মত শোনাল। উনি নেমে গেলেন বালির ঝড়ের মধ্যে। শিবনাথ ততক্ষণে কুলিকে মাল তোলবার আদেশ দিয়েছে। তাড়া দিল সুলতাকে, চল চল, আর দেরী নয়। ওদিকে স্টীমার ছেড়ে দেবে আবার।

নামতে নামতেই সুলতা মুখে কাপড় চাপা অবস্থায় বলে নিল, পরের জিনিসে হাত দিতে গেলে সবাই ওরকম না-জানার ভান করে। ওসব আমার ঢের জানা আছে।

শিবনাথ যেন জানত, একথাটা সুলতা বলবেই। সে বলল, যাকগে। এবার সামনের দিকে তাকাও। ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার বোধ হ'চ্ছে। এই, এই কুলি, আস্তে যাও।

কিন্তু সুলতা শিবনাথের কথারই খেই টানল, না, ইয়ার্কি নয়, ওসব আমি জানি। ওটা আমার কত সাধের শৌখীন জিনিস জান? হাতিয়ে তো নিয়েছিল প্রায়। অমন সুন্দর ফুটফাট জিনিসটি দেখলে, সকলেরই ভুল হ'য়ে যায়। আঃ! উঃ! গেলুম গেলুম।

শিবনাথ বলল, বলছি তখন থেকে চুপ কর। মুখে বালি ঢুকে গেছে তো?

সুলতার মুখ তখন শিবনাথের কুক্ষি-তলে। সেখান থেকেই কাঁদো কাঁদো স্বরে জবাব এল, শুধু মুখে নাকি? চোখ নাক কান, সব বালিতে ভরতি হ'য়ে গেল। কী জঘন্য। আর কতদূর?

—আর একটুখানি।

শিবনাথও বেজায় রকম বেসামাল। তপ্তবালু তারও স্যান্ডেল পরা পা পোড়াচ্ছে। মুখে ও গায়ের খোলা অংশে যেন কোটি কোটি বিষপিঁপড়ে হুল ফোটাচ্ছে ছুটে এসে। যেন বাসা-ভাঙা-রোষে, ফুঁসে ফুঁসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এসে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারও নেমেছে। বুঝি একটা যোগসাজস ক'রেই নেমেছে এই বালির ঝড়ের সঙ্গে। একা বালির অন্ধকারেই রেহাই নেই, তার ওপরে সন্ধ্যার কালিমা। আর অবস্থা সকলেরই সমান। কে যে কার ঘাড়ে পড়ছে। পা' মাড়িয়ে দিচ্ছে, সে সব দেখবার বিচার করবার অবসর নেই। একটা গড্ডালিকা প্রবাহের মত চলেছে সবাই লাইন ধরে। সামনের লোকটা ভুল করলে, পেছনের সব লোকেরই বিপথগামী হবার সম্ভাবনা।

তবু এ দুর্দৈবটা যেন শিবনাথের কাছে 'ধরাবাঁধা জীবনের একটি ব্যতিক্রমের উল্লাসে উচ্চকিত হয়ে উঠছে। কাজের চাপে পর্যুদস্ত সাব-এডিটরের বেসামাল অবস্থা তো নয় এটা। নিতান্তই বউ নিয়ে বেরিয়ে পড়া পথের খেলা একটা। আজকে

না যত খুশি। কতক্ষণ আর। তবু তো জানা গেল বালির ঝড়ের লীলা। মরুভূমিতেও কি এমনি হয় নাকি? কী একটা কবিতা যেন তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। মুখে এল না। তার আগেই সুলতার রুদ্ধ গলা শোনা গেল, কী সর্বনেশে ঝড়। আর কতদূর গো?

—এসে পড়েছি।

সুলতার অবস্থা দেখে কষ্ট হলে, হাসিও পেল শিবনাথের। সে দেখল, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে, সুলতা প্রায় একটি বোম্বাই সিল্কের বস্তায় পরিণত হয়েছে। প্রায় ঝুলে পড়েছে শিবনাথের বলিষ্ঠ কাঁধ ধরে।

শিবনাথ বলল, একটু সোজা হও, এইবার আমরা ঢালুতে নামছি।

সন্ত্রস্ত গলা শোনা গেল সুলতার, প'ড়ে যাব নাকি?

—না।

স্টীমারে পা' দিতে না দিতেই বালির প্রকোপটা একেবারে শেষ হ'য়ে গেল। হাওয়াটা সম্ভবত পূব-দক্ষিণগামী। কিংবা পাগলা বেসামাল বাতাস। দিক ঠিক নেই। আপাততঃ নদীর বুকে ঠেলেই বাতাস বহমান। তাতে জলকণা আছে। বালি নেই।

দোতলার ডেকে এসে শিবনাথ মালের তদারকি আর কুলি বিদায় করতে ব্যস্ত হল। সুলতা সর্বাঙ্গের বালি ঝাড়তে ব্যস্ত। যদিও সান্ত্বনা একটিই, সুলতার চেয়ে অবস্থা কারুরই ভাল নয়।

দোতলার প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থাও খুব সুখকর নয়। শুধু যে রুদ্র বৈশাখের তাপদগ্ধ সমতলবাসীদের পাহাড়-ভ্রমণের টান, তা' নয়। উত্তর বঙ্গ আর আসামগামী তাবৎ লোকের ভিড় এই একটি স্টীমারেই।

সুলতা কোনরকমে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে শিবনাথকেও ডাকল। তারপর হেসে ফেলল শিবনাথের ধবধবে শাদা ভ্রূ দেখে। তাড়াতাড়ি নিজেরই রুমাল দিয়ে শিবনাথের ভ্রূ চোখ মুখ মুছে দিতে গেল।

শিবনাথ বলল, এ বালি এত সহজে যাবে না সুলতা। এখন থাক।

সুলতা ভ্রূ কুঁচকে একটু শাসন করল শিবনাথকে, ধুলো বালিতে তোমার একটু ঘেন্না নেই আমি দেখেছি। মুখটা অন্তত মুছবে তো।

শিবনাথ দেখল, সুলতা মুখ মুছে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সুতরাং তারও মুক্তি নেই। রুমালটা নিয়ে শিবনাথও মুখ মুছল। তারপর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে, আর একটি রুমাল বার করতে করতে, মুখে চোখে আর একবার ব্যাগটি দেখল সুলতা। বলল, গেছল আর একটু হ'লেই।

তারপরই তার ঠোঁট দুটি বেঁকে উঠল শেষে, এদিকে তো সারাটি পথ ট্রেনে স্বামীর সেবা আর বই প'ড়ে প'ড়েই কেটে গেল। যেন ভাজার মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না। কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঠিক দেখছিল।

শিবনাথ ভয় ভয় চোখে তাকাল আশে-পাশে। কী জানি, যার উদ্দেশে কথাগুলি বলা হ'চ্ছে, তিনি হয় তো আশেপাশেই আছেন। আর সুলতার কথাগুলিও প্রায় সেই রেল কর্তৃপক্ষের নোটিশের মত, '...জুয়াচোর চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।' শিবনাথ হেসে গলা নামিয়ে বলল, আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমাদের ব্যাগটার দিকে নয় তো?

সুলতা হাসলেও, ঠাট্টা করল না। বলল, তা কি বলা যায়?

শিবনাথ উঠে পড়ল।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বস, খাবারের ব্যবস্থা দেখি। ওপারে গিয়ে আর খাওয়া যাবে না শুনেছি। সেই একেবারে কাল দুপুরে দার্জিলিং গিয়ে।

স্টীমার তখন ছেড়েছে। সকলেরই ছুটো-ছুটি পড়েছে ডাইনিং রুমের দিকে।

সুলতা ভ্রূ কুঁচকে, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল শিবনাথের চলে যাওয়ার দিকে। এই নোংরা হাতে পায়ে, ভিড়ের মধ্যে কেউ খেতে পারে?

পারে। না পারলে এত লোক ছুটোছুটি করছে কেন। আর শিবনাথ লোকের হাতে প্লেট চাপিয়ে এভাবে ভাত মাংস একেবারে কোলের ওপর এনে উপস্থিত করতে পারে নাকি?

অগত্যা গ্লাসের জলে হাত ধুয়েই আরম্ভ করতে হ'ল। খোঁপাটা ভেঙেছে সুলতার আগেই। আঁচলটা লুটোচ্ছে এখনো। বালির ঝাপটায় নাইলনের প্রাণও মূর্ছা গেছে প্রায়। কেবল শিবনাথ একবার কানে কানে না ব'লে পারল না, তোমার জামার একটা বোতাম কিন্তু অনেকক্ষণ ঘর ছেড়েছে। আটবে কখন?

সুলতার মুখ পাংশু দেখাল। সে একবার চোরাচোখে তাকিয়ে দেখল, সত্যি তাই। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, অসভ্য! এতক্ষণ বলনি কেন? বাঁ হাতে আঁচলটা তুলে দাও শীগ্‌গির।

আঁচলটা তুলে দিতে দিতে বলল শিবনাথ, যা ঝড়!

যদিও সুলতার শরীরের লক্ষ্যটা ঔদ্ধত্যের দিকেই, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। অতি দুরন্ত বিজ্ঞাপনের সাহায্য বোধ হয় সেজন্যেই তাকে নিতে হয়েছে। গোটা শরীরের কাঠামোটা নিখুঁত ছিল সুলতার, সৌন্দর্যটুকু ধরা দেয় নি প্রায় কোথাও। সর্বত্র একটা কাঠিন্যের স্পর্শ। এমন কি চোখের কোণে, ঠোঁটের কুঞ্চনেও। ফর্সা রংটুকু বোধ হয় সেইজন্যেই কোন দীপ্তি দেয়নি। দিয়েছে রক্তহীন রুক্ষতা।

তার পাশে শিবনাথকে মোটামুটি দেখাচ্ছে। কালো, সাধারণ মাপের বলিষ্ঠ চেহারা। সহসা দেখলে ক্লান্ত আর চিন্তাশীল মনে হ'তে পারে। কিন্তু তিরিশ পেরিয়েও তার আপাত শান্ত চোখে, আলোছায়ার দ্যুতিতে, একটু স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে যেন ঠেকে আছে কোথায়।

সাত বছরের চাকরি আর আড়াই বছরের বিয়ে, এই নিয়ে ওর ঘরে বাইরের লেনদেন। বিধবা মা আর দিদি আছেন। এক-ই সংসারে তাঁরা ভিন্ন লোকবাসী। সাব-এডিটরের টেবিল থেকে সুলতার খাটে, জীবনটাকে এরকম ভাগ ক'রে দেখলেও ক্ষতি নেই।

প্রেমের ফাঁদ নাকি পাতা ভুবনে। তাই এক আধবার যে পা' আটকায় নি তা' নয়। জীবনধারনের মারে সেগুলি আপনি খুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত সুলতা, রীতিমত দর কষাকষি ক'রে। নিশ্বাসের ওপরে একটু বাতাস, এরকম একটি অবস্থার বাড়ির মেয়ে ও। কিছু নগদ টাকা, কিছু গহনা, খাট আর ড্রেসিং টেবিল নিয়ে ও এসেছিল। আরো কিছু ঘর আর দম্পতীর সাজবার মত অনেক উপকরণ।

বিয়ের পর প্রথম গিয়েছিল মধুপুরে। সেটা ছিল সুলতাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া। তারপরে এই দ্বিতীয় যাত্রা। একেবারে হিমালয়ে, বরফ-বাতাস এখন যেখানে শীত ধরাচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে সেই কথাটাই বলল সুলতা, মনে আছে সেই মধুপুরের কথা?

একটু যেন ভয়ে ভয়েই হেসে বলল শিবনাথ, খুব!

অমনি সুলতা অভিমানাহত কটাক্ষ হেনে, কনুই দিয়ে খোঁচা দিল শিবনাথকে। বলল, তাতো খুব হবেই। আমার সেই মাসতুতো বোন মিলিটা তো ডাইনীর মত পেয়ে বসেছিল তোমাকে।

হেসে ফেলল শিবনাথ। আরে, কী আশ্চর্য। কী যে বল।

—না বাপু, তুমিও মেয়ে নাকড়া কম নও।

—আমার তো ধারনা মেয়েরাই ছেলে-নেকড়ি।

—ইস্!

তা' বটে। আর সব বিবাহিতা মেয়েদের মতই, সুলতারও স্বামী ছাড়া সব পুরুষ ছার। পাশের মধ্যে মিলি একটু জামাই-বাবুর ভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুলতা নিশ্চয় মরে গেলেও বিয়ের আগে অমন জামাইবাবুর ভক্ত হ'তে পারত না। পারত না বলেই তার রচিত সংসারটা, প্রেমের

সংসার ব'লে ঘোষিত। শিবনাথ সেইটুকু জেনেই শান্ত।

কিন্তু চোখগুলি জ্বালা করছে কেন? যাত্রীদের সকলের মধ্যেই যেন একটু চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে।

শিবনাথ সামনে তাকাল। দূরের বিন্দু আলোগুলি তখন একটু স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আলোগুলি যতটা দূরে ভাবা গিয়েছিল, ততটা দূরে নেই। বোঝা গেল, স্টীমারের হুইস্‌লে। আর সুলতার প্রায় ডুকরে ওঠায়, ওগো আবার বালি। আবার বালির ঝড়।

ততক্ষণে শিবনাথও চোখ ঢেকেছে। বাতাসটা যে এপার থেকেই ওপারে যাচ্ছিল, তা বোঝা গেল। বালির ঝড়ের তাণ্ডবেই বাতিগুলিকে আরো দূরে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে বালি তার সীমার মধ্যে পেয়েছে স্টীমারটাকে, সেই মুহূর্তে চমকে উঠেছে সবাই। এবার শিবনাথও যেন একটু মুষড়ে পড়েছে। কারণ, এবার ভিড় বেশী। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে না উঠতে পারলে, জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। যদিও সীট রিজার্ভ আছে তাদের।

তবু সে বলল, আরে তুমি ভাবছ কেন? যাওয়া হবেই! না হয় পরের প্যাসেঞ্জারে যাব। আমি তো ডিউটিতে যাচ্ছিনে। তুমি হ্যান্ডব্যাগটা হাতে নাও, নইলে এবারও কেউ টানাটানি করবে হয়তো।

বলতে বলতেই মুখে রুমাল চাপা দিল শিবনাথ। বালির তাত কমেছে বটে, কিন্তু ঝাপটার দাপট এপারে দ্বিগুণ। রাশি রাশি ছুঁচ ছুঁড়ে মারার মত। বাতাসের বেগ আরো প্রবল। ঝাপটা যে এপার থেকেই ডাক ছাড়ছিল, বোঝা গেল এবার তীব্র গর্জনে। এপারে যেন সে সত্যি একটা সর্বনাশের ফাঁদ-ই পেতেছে।

বাতিগুলি শুধু ছায়াময়ী কুয়াশার মত কী এক রহস্যে যেন হাসছে।

সুলতা প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মত, বলল, কী হবে? এ যে আরো ভয়ংকর।

হেসে ফেলল শিবনাথ। বলল, কী আবার হবে। তখন যেমন ক'রে এসেছ, এখনো তেমন করেই যাবে। গাড়িতে উঠলেই সব শেষ। তারপরে হিমালয়ে গিয়ে যখন উঠবে—

—থাক!

ধমক দিল সুলতা। আঁচল চাপা মুখ থেকে তার স্বর ভেসে এল, এরকম অবস্থায় অনেক গোলমাল হ'তে পারে। কেন যে মরতে হারচুড়িগুলি পরে রেখেছিলুম। টাকা পয়সা খুব সাবধান, কিছু হারিও না যেন।

—আরে না না, কিছু হারাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শিবনাথ সান্ত্বনা দিল হেসে। সুলতা বলল, কি ক'রে নিশ্চিন্ত থাকব। এসব আপদের কথা তো তুমি কিছুই বলনি।

শিবনাথ বলল, আমি কি জানতুম নাকি?

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশ থেকে ব'লে উঠলেন, রোজ রোজ কি আর এমন ঝড় ওঠে এখানে। মাঝে মধ্যে হয়। আজ আমাদের কপালে জুটে গেছে।

স্টীমারটা একটা দীর্ঘ বাঁক নিয়ে জেটির গায়ে ঠেকল। পরমুহূর্তেই ডাকাত পড়ার মত, আবার সেই প্রেতছায়া কুলিরা। এবার ঝড়টা যতবেগে, কোলাহল তার চেয়ে বেশী। নীচের ডেকে হুড়োহুড়ি মারামারি লেগে গেছে। কুলিরা ওপরে এসেও মালপত্র ধরে টানাটানি শুরু করেছে। ওপরের লোকও হুড়মুড় ক'রে নীচে নামতে চাইছে তাড়াতাড়ি। শিশুর কান্না, মেয়েদের শীৎকার, আর কুলিরা যেন এরই সঙ্গে তাল রাখছে হৈ হৈ শব্দে।

আর এবার স্টীমারে থাকতে থাকতেই মনে হল, যেন কেউ মুঠো মুঠো বালি চোখে মুখে ছুঁড়ে মারছে। এখন আর লু বইছে না বটে। পশ্চিমের এই দিগন্ত উন্মুক্ত রুক্ষ চরার বাতাসে এখনো উত্তাপের আভাস। মেঘ কিংবা নক্ষত্র, কিছুই নেই সামনে। আকাশটা উধাও হয়ে গেছে কোথায়। আছে শুধু কতগুলি এক চোখো ভুতুড়ে আলো। যেগুলি কোনো নিশানাই দেয় না।

শিবনাথ ছটফটিয়ে উঠল। অনেকেই নেমে পড়ছে তার সামনে দিয়ে। সে আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না। কুলিকে মাল তুলতে বলল।

সুলতা তাকে কঠিন বহু পাশে আঁকড়ে ধরেছে। শিবনাথের সামনে লোক, পিছনে লোক। তাকে কে ঠেলছে আর সে কাকে ঠেলছে, কিছুই বলা যায় না। সবাই সবাইকে ঠেলছে। তার মনে হ'ল সিঁড়ি না ভেঙেই সে হুস ক'রে নেমে এল নীচে। সুলতা বারে বারে আর্তনাদ ক'রে উঠছে। কিন্তু এখন আর কান দিতে গেলে চলবে না। বরং শিবনাথের মনে হ'ল, লোকের মধ্যে থাকলে বালির আক্রমণের সামনে থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যায়।

সিঁড়িটার নীচে নামতেই সুলতা কাঁকিয়ে উঠল, উঃ, কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

—দেখতে হবে না তোমাকে। কথা বলো না, আবার বালি ঢুকে যাবে মুখে।

এবার বোধহয় সত্যি কাঁদছে সুলতা। বলল, বাকী আছে নাকি? বালি তো খাচ্ছিই।

শিবনাথ দমবন্ধ করে বলল, জোরে ধর সুলতা। এখানটায় কাঠের সিঁড়িটা। খুব ভিড় এখানে।

—কোথায় যে কম।

রাগে এবং দুঃখে সুলতা বলল শিবনাথেরই শরীরের কোনো একটা অংশ থেকে।

কিন্তু সিঁড়িটা পার হতে হতে শিবনাথের মনে হল, সুলতার বন্ধন যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছে!

—কি হল?

—কিছু না।

সুলতার প্রায় অস্ফুট গলা শোনা গেল।

সিঁড়ির বাইরে আসতে আসতেই সুলতা ছিঁড়ে গেল শিবনাথের গা থেকে। আর সিঁড়ির বাইরে আসা মাত্রই প্রচণ্ড বালির ঝাপটা চাবুক কষালে চোখে মুখে। চোখে এক রাশ পিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে, হাত বাড়িয়ে ডাকল শিবনাথ, সুলতা!

কাছের ভিড় থেকেই জবাব এল, এই যে!

শিবনাথ লোকের ধাক্কায় সরে গেল এক পাশে। সে ডাকল, এস! এই, এই কুলি।

কুলিটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল আগেই।

চোখ ঘষে শিবনাথ সামনে তাকাল কোনরকমে। দেখল, সামনেই সুলতার চুড়ি পরা প্রসারিত হাত। শিবনাথ ধরল হাতটা, একেবারে টেনে নিয়ে এল বুকের কাছে। রুমাল কামড়ে ধরা মুখে কোনরকমে বলল, কথা বলো না।

সুলতা খালি বলল, উঃ!

সে শিবনাথের কাঁধ না ধরে, দু'হাতে সর্বাঙ্গ বেষ্টন করল।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। শিবনাথের সহসা সুলতাকে বড় বেশী ভাল লাগতে লাগল। শুধু আপন প্রাণ বাঁচানো নয়। যেন শিবনাথকে বাঁচবার জন্য তার বুক দিয়ে আলিঙ্গন করেছে। এবার সে ঝুলে পড়েনি। যেন শিবনাথ হোঁচট খেলে, সেও ধরে ফেলবে।

শিবনাথ বাঁ হাত দিয়ে তাকে আরো ঘনিষ্ট করে নিল। এত ভাল লাগল, মনে হল, এ দুর্দৈবের মধ্যেই সুলতাকে সে যেন জীবনে নতুন করে পেল। আর অবাক হল শিবনাথ, ঝড়ের দোলাটা যেন তার রক্তেই লেগেছে। সে দ্রুত এগুতে লাগল অস্পষ্ট ছায়া ট্রেনটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বালির ঝড়টা এগুতে দিতে চায় না। সামনের মাটিই যেন চৌচির হয়ে ছিটকে লাগছে চোখে মুখে। বাতাস শাসাচ্ছে, ফুঁসছে, পরমুহূর্তেই দূরে সরে গিয়ে হা হা করে হাততালি দিয়ে হাসছে।

গাড়িটা কতদূরে? লোকের ধাক্কা, ছুটোছুটি, চীৎকার। তারই সঙ্গে কতকগুলি হুমড়িখেয়ে পড়া উটের মত ঘরের ছায়া থেকে গরম চা আর খাবারের ডাকাডাকি চলছে।

শিবনাথের মনে হল, সুলতা হাসছে! শিবনাথ মুখ নামিয়ে প্রায় বন্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, হাসছ নাকি?

চকিত মুহূর্তের একটি আড়ষ্টতায় যেন

সুলেতা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সহজ হয়ে বলল, হ্যাঁ। তোমার গায়ে হঠাৎ এত শক্তি এল কোত্থেকে, তাই ভাবছি। আমাকে পিষে ফেললে যে!

হেসে উঠতে গিয়ে শিবনাথের সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ চমক লাগল। সে তখনো হাঁটছিল সামনের দিকে। সামনের আলোটার দিকে তাকাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি দুটি হাতের আলিঙ্গনের ঘন স্পর্শে বোবার মত দাপাতে লাগল। বালিতে ভরে যেতে লাগল তার উদ্দীপ্ত চোখ। সে ডাকতে গেল। ঝড় যেন থাবা মারল তার মুখে। সে আবার মুখ খুলল। ডাকল, সুলেতা।

আর একটি চকিত মুহূর্তের স্তব্ধতা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে সরে গেল শিবনাথের দেহলগ্ন ছায়া। ঝড়ের শাসানির মধ্যেও শোনা গেল অস্ফুট আর্তস্বর। শিবনাথ দেখল, লাল বোম্বাই সিলক্ নয়, হালকা আসমানি জর্জেট। ফর্সা নয়, শ্যাম চিকন বর্ণ। সুলেতা নয়, লীলা। আশ্চর্য! সেই লীলা-ই।

ঝড়টা যেন থমকে গেল। বালি সরে গেল। দপদপিয়ে উঠল বিশ্বের সকল আলো। ক্ষোভে ও বিস্ময়ে প্রায় অস্ফুট কান্নার মত শোনা গেল, আপনি? আপনি কেন? আপনি কেন?

শিবনাথের মনে হল তার কান বন্ধ হয়ে গেল বালিতে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। চোখ অন্ধ হয়ে গেল। সে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মাপ করবেন। আমি, আমি জানতে পারিনি।

বলেই সে চীৎকার করে উঠল, কুলি! কুলি দাঁড়াও ওখানে।

আবার সে ভদ্রমহিলার দিকে ফিরল। বলল, আমি এখুনি দেখছি আপনার স্বামী কোথায়। আপনি দাঁড়ান একটু দয়া করে। মাপ করবেন, আমি সুলেতাকে—

কথা শেষ না করেই, পিছন দিকে ছুটল। ঝড়টা এবার তাকে তাড়া করল পিছন থেকে। মনে হল সে উড়ে যাচ্ছে। আর খ্যাপা ঝড়টা হাসছে তার পিছনে হাত তালি দিয়ে। কাঠের সিঁড়ির কাছে এসে সে চীৎকার করে ডাকল, সুলেতা! সুলেতা!

কয়েকটি লোকের ভিড়ের মধ্যে, সুলেতার রোরুদ্যমান গলা শোনা গেল, এসেছ, এসেছ তুমি। এই যে, এই যে আমি। এই যে।

ভিড় ঠেলে প্রায় ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল সুলেতা শিবনাথের বুকে। বোঝা গেল, সুলেতার চীৎকারেই লোক জমে গেছে। চারদিক থেকে শুধু শোনা গেল যাক, পাওয়া গেছে।

সুলেতা তখন সমূহ আতঙ্কটা পার হয়ে, না কেঁদে পারছে না। কিন্তু খানিকটা অমনযোগী ভাবেই শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, কেঁদ না সুলেতা। কাঁদবার কি আছে? এখানে কি মানুষ হারায় নাকি? ওই তো স্টেশন, ওখানেই থাকতুম নিশ্চয়। তোমাকে ফেলে তো আর চলে যেতুম না গাড়িতে করে।

কান্নার মধ্যেও সুলেতার অভিমান ফুটে উঠল, কি করে আমাকে ফেলে চলে গেলে তুমি?

—কি আশ্চর্য!

বলছে, কিন্তু শিবনাথের দৃষ্টি ছায়াদের ভিড়ে। বলল, তোমাকে কি আমি ইচ্ছে করে ফেলে গেছি নাকি? আমি মনে করেছি, তুমি আমার সঙ্গেই আছ।

বালি খেয়েও সুলেতা এবার মুখ না ঢেকে বলল, কি করে মনে করলে? আমি তো তোমার গায়ের সঙ্গে লেপটে ছিলুম।

শিবনাথ যেন সচেতন হল একটু। একটু চুপ করে রইল। বলতে গেল, কিন্তু পারল না। মনে হল, সুলেতা ব্যাপারটাকে তার নিজের প্রতি অবিচার ভেবে নেবে। বলল, আরে! সবাই তো সবার সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। এর আবার—

থেমে গেল। সেই লাইটপোস্টটা। চোখের ওপর থেকে রুমালটা একটু সরাল শিবনাথ। দেখল, ভদ্রমহিলা একটি বেডিং-এর ওপর মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। পাশে ভদ্রমহিলার স্বামী। কাছে যাবে নাকি শিবনাথ?

সুলেতা বলল, দাঁড়ালে কেন?

—না, কুলিটাকে দেখছি। এখানেই ছিল।

তার গলার স্বর শুনেই যেন ভদ্রমহিলা চোখ তুললেন। বালির ঝড়, মানুষগুলি সব ছায়া। তবু মনে হল শিবনাথের, ভদ্রমহিলা তার দিকেই তাকালেন। তারপরে দৃষ্টিটা ঘোরালেন। সেই দৃষ্টিটা অনুসরণ করেই নিজের কুলিটাকে চোখে পড়ল শিবনাথের। সুলেতাকে নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

তারপর গাড়িতে ওঠার পালা। সেখানেও ধস্তাধস্তি মারামারি। রিজার্ভেশন ক্লার্ক ভদ্রলোকটি প্রায় দয়া করে তাদের তুলে দিলেন। কিন্তু গোটা কামরাটা ভর্তি শুধু বালি আর বালি। সবুজ রং চামড়ার সীটগুলি শাদা বালিতে ভরা। মানুষগুলি সব বালির পুতুল। সুলেতা চিনতে পারে না শিবনাথকে। শিবনাথ পারে না সুলেতাকে। সবাই ঝপ্ ঝপ্ করে কাঁচের শার্সি ফেলতে লাগল। ফেলতে না ফেলতে বালির স্তর পড়তে লাগল কাঁচের গায়ে। এ ঝড়ের এই জেদ, যতই সে বাধা পাবে, রুদ্র হবে ততই। শার্সির তলায় সামান্য যে পিঁপড়ে ঢোকার মত ফাঁক, সেখান দিয়েও বালি ঢুকছে বাতাসের ঝাপটায়। যেন বালি নয়, চাক ভাঙা বোলতারা গর্জন করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সুলেতা বসল। শিবনাথ বসতে গেল, পারল না। বাইরে যাবে মনে ক'রে দরজার দিকে এগুতে গেল। তার পা' সরল না। এখনো সে হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তবু তার দু চোখ ভরে একটি অদ্ভুত শূন্যতা।

সুলেতা শিবনাথকে এই অবস্থায় দেখে, মুহূর্তে পাংশু হ'য়ে উঠল। ছোট কামরাটার সবাইকে চমকে দিয়ে সে প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠল, হয়েছে? সর্বনাশ হয়েছে?

শিবনাথ ফিরল, কিন্তু তার শূন্যতা ঘুচল না চোখের। গলার স্বরে কোন সুরে নেই যেন। বলল, অ্যাঁ?

সুলেতা শিবনাথের পাঞ্জাবী ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, গেছে, মনিব্যাগটা গেছে? বলতে বলতে সে নিজেই হাত ঢুকিয়ে দিল পকেটে। শিবনাথ বলল, না তো। মনিব্যাগ আছে। সুলেতার হাতে উঠে এল মনিব্যাগটা। দু চোখে তার দ্যুতি ফিরে এল। বলল, তবে তুমি ওরকম ক'রে আছ কেন?

সচেতন হ'তে চাইল শিবনাথ। বলল কেমন?

—কেমন যেন। কি যেন একটা হয়েছে তোমার। এখনো তোমার ভয় করছে? কেন, আমাকে তো পেয়ে গেছ।

সবই তো ঠিক আছে। কিছু তো হারায় নি।

হারিয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই সুলেতা আর একবার তার সমস্ত মালপত্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

শিবনাথের সারা মুখে ঘামের ওপর বালি প'ড়ে প'ড়ে পুরনো ঘরের ভাঙা খসা পলেস্তারার মত দেখাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট দুটিতে জমে গেছে বালি। মাথার চুল সাদা। সে প্রায় একটা ক্লাউনের মত পেশার দায়ে জোর ক'রে হেসে বলল, হারায় নি কিছু। মানে, কিরকম একটা অব্যবস্থা, হট্টগোল...

সুলেতা মুখ মুছতে মুছতে বলল, জঘন্য!

গাড়িটা তখন চলতে শুরু করেছে। বোঝা যাচ্ছে, ঝড়টা এখনো গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এখনো নানান ফাঁকে ফাঁকে সোঁ সোঁ ক'রে ঢুকছে বালি। এখনো সেই খ্যাপাটা হাসছে অট্টরোলে। হাততালি দিচ্ছে নেচে নেচে।

শিবনাথ বাথরুমে ঢুকল। দরজা বন্ধ ক'রে ফিরে দাঁড়াতেই আয়নার বুকে নিজের মুখোমুখি হ'ল সে। আর তৎক্ষণাৎ সেই আলিঙ্গনের অনুভূতিটা পিলপিল্ ক'রে, বেয়ে বেয়ে বেড়াতে লাগল তার সারা গায়ে। শিবনাথ ধিক্কার দিল নিজেকে। ছি ছি করল। মুখ ফিরিয়ে নিল নিজের ছায়ার দিক থেকে। তবু তার সারা গায়ে বিস্মিত বোবা তীব্র অনুভূতিটা দপ্ দপ্ করতে

লাগল। তার দু' চোখের শূন্যতা ভরাট হতে চাইল না কিছুতেই। সে যেন সভয়ে দেখল, কত অব্যর্থভাবে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটি তুলে নিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু ব্যাগ সে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত যা সে নিয়েছে, তার কোন মূল্য নেই সংসারে। কোন কৈফিয়ৎ নেই সমাজের কাছে, নীতির কাছে, যুক্তির কাছে। একজন বিবাহিত পুরুষ, একজন সাধারণ সাব-এডিটরের লজ্জাকর ধিক্কৃত তৃষ্ণার গ্লানি, মৌমাছির মত নিজেরই গায়ে হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে একটি আস্বাদ খুঁজবে।

আর একজন, দেখে মনে হয়েছে, স্বামীকে সে বলতে পারেনি। কেবল কুটমনা অবিশ্বাসী এক পুরুষের জেনে শুনে স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনের গ্লানি সে অনুভব করবে। এবং সেও দার্জিলিং যাচ্ছে। হয়তো দেখা হবে। তীব্র সন্দেহে ঝলকে উঠবে আয়ত চোখ দুটি। রুদ্ধ তীক্ষ্ণ স্বরের ভর্ৎসনা হানবে পাহাড়ের বাতাসে, আপনি কেন? আপনি কেন?

জবাব দূরের কথা। শিবনাথের অনুভূতির পিঞ্জরে বোবাটা তবু মরবে দাপিয়ে দাপিয়ে। বিশ্বের এক ভয়ংকর বিস্ময়ে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার স্ত্রী সুলতার স্নেহে ও ভালোবাসায় রচা সংসারের দিকে।

ট্যাপ খুলে দিল শিবনাথ। জল গরম আর বালি মেশান। এ বালি কোন রন্ধ্রই বাদ দেয়নি দেখা যাচ্ছে। বালি মেশানো গরম জল শিবনাথ আঁজলা আঁজলা মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগল।

বাইরে যখন এল, তখনো বালি উড়ছে সারা কামরায়।

সুলতা ডাকল, এই। এই, ওঠ না।

শিবনাথের সর্বাংগ তখনো লেপের তলায়। সুলতা রীতিমত প্রসাধন ক'রে উলেন ক্লোক চাপিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। ওরা দশদিন হ'ল দার্জিলিং এসেছে।

শিবনাথ ক্লান্ত সুরে বলল, উঠতে ইচ্ছে করছে না। উত্তরের জানালাটা খুলে দাও না সুলতা।

সুলতা জানালা খুলে দিতে দিতে বলল, কী হবে ছাই খুলে দিয়ে। ওই ছিঁচকে পোড়া রোদ, কিন্তু কাঞ্চনজংঘার দেখা নেই।

জানালাটা খুলে দিতেই এক ঝলক রোদ ঢুকল ঘরে। সামনে ধূসর আকাশ। পূব ঘেঁষে, দূরে কালিম্পং-এর ইশারা। সামনে ভূটিয়া বস্তির ধাপে ধাপে নেমে-পড়া বনস্পতির শীর্ষ। তারপরের শূন্যতাটা যেন লেবং মালভূমির মাথার ওপরে। ভূটিয়া বস্তির পূবে উঁচুতে—ভাড়াটে বাংলোর একটি ঘর নিয়েছে ওরা। খাবার আসে হোটেল থেকে। চায়ের সরঞ্জামটাই শুধু রেখেছে সুলতা নিজের হাতে।

ঘুম-জড়ানো মোটা স্বরে বলল শিবনাথ, ও কি অত সহজে দেখা দেয়। কত সাধ্য সাধনা করতে হয়, তবেই না আবির্ভাব।

সুলতা এসে বসল শিবনাথের শিয়রে। বলল, তা' তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলছ না কেন, বল তো? তুমিও যে কাঞ্চনজংঘার মত মেঘে ঢাকা হ'য়ে রইলে।

শিবনাথ হাসবার ভান ক'রে বলল, কি আবার হবে।

—সেইটাই তো শুনতে চাই। সেই যে মনিহারিঘাট থেকে কি হ'ল, তারপরে আর ঠিক সে মানুষটাকে তো খুঁজে পাচ্ছিনে।

—কী খুঁজে পাচ্ছ না?

—সেটা হাতে ক'রে তুলে দেখাতে পারছিনে। ওরকমভাবে দেখানো যায় না, না হ'লে দেখাতুম।

—তা হ'লে চেখে দেখাও।

সুলতা পা দাপিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, না সত্যি, ফাজলামো নয়।

শিবনাথ যেন কথা বাড়াবার ভয়েই তাড়াতাড়ি সুলতাকে টেনে এনে চুমু খেল। তারপরে বলল, বোকা কোথাকার।

সুলতা বলল, হ্যাঁ, ভোলানো হ'চ্ছে আমাকে।

ব'লেও কিন্তু সুলতা উঠে প'ড়ে বলল, আমি তা' হলে যাচ্ছি। ফ্লাস্কে চা আছে, খেয়ে এস তাড়াতাড়ি।

চলে গেল সুলতা। ম্যালে গেল, বেড়াবে, ব'সে থাকবে ব'লে। প্রথম প্রথম দু'দিন শিবনাথের সংগে এখানে সেখানে হেঁটে হেঁটে গেছে। কিন্তু পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে চাপ লাগে। রক্তহীন রুক্ষতাটা রুগ্নতায় পর্যবসিত হয়। ভিতরটা ওর অনেকখানি শূন্য।

তাই সুলতা ম্যালে বেড়ায়, বসে থাকে। শিবনাথ তাকে বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়ায় অরণ্যে, খাদে, ঢালুতে পাহাড়ী জনপদে।

আর শিবনাথ দেখেছে, ওরাও এসেছে। ও আর ওর স্বামী। ও কেন, নামটাই বলা যাক। লীলা আর ওর স্বামী। লীলার স্বামীও বসে থাকেন ম্যালের বেঞ্চে। শান্ত, চিন্তিত। মোটা লেন্সের চশমায় একটা ঝকঝকে তীক্ষ্ণতা নিয়ে চারদিকে তাকান। বোধহয় ভদ্রলোক অসুস্থ। হেঁটে ফিরে বেড়াবার উপায় নেই হয়তো। তাই তন্ময় হ'য়ে দেখেন চারদিক। লীলা যেন পা টিপে টিপে কাছে কাছেই ঘোরাফেরা করে। তার বুড়ি ছোঁয়া দৌড়ের পাল্লা বেশী দূরে নয়। অবজারভেটারির একটু এপাশে, নয়তো একটু ওপাশে। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীর কাছাকাছি, নয়তো দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দিরটার সীমানায়। এদিকে শহর আর হ্যাপিভ্যালীর সীমানায় চোখ যায়। ওদিকে ভুটিয়া বস্তি আর সর্পিল পথের পাকে জড়ানো লেবং।

ফিরে আসে আবার। মুখোমুখি হয় স্বামীর। দুজনেই হাসেন। তারপর ভদ্রলোকের প্রসারিত হাতটা লীলাকে অনেক দূর যাবার নিশানা দেখিয়ে, তাঁর জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে বলেন।

লীলা হেসে তাকায় সেই দূরের দিকে। পা'য়ে পায়ে এগোয়। টিপে টিপে, আস্তে আস্তে, সভয়ে। যেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে, সেই ভয়ংকর পা'য়ের শব্দ তার কানে যায়। সেই শব্দ পায় সে সন্ত্রস্ত হৃৎপিণ্ডের তালে তালে। কিংবা হয়তো, শিবনাথই শুধু এমনটা ভাবে। লীলা কিছুই ভাবে না।

শিবনাথ জানে, লীলা টের পেয়েছে তার উপস্থিতি। শুধু উপস্থিতি নয়, শিবনাথের সংগে তার সহসা দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে দু' একবার। লীলা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়েছে। শিবনাথও চোখ ফিরিয়েছে। লীলা ওর আয়ত চোখ তুলে, ঈষৎ স্থূল ঠোঁটে বিচিত্র হেসে, কী বিচিত্র কথা না জানি বলেছে তখন স্বামীকে।

সুলতা তখন শুধু ধমকেছে হয়তো শিবনাথকে, কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যালের শো কেস্ দেখছ? কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না? আচ্ছা চল, আমি গভর্নর হাউস পর্যন্ত হেঁটে আসি। ও রাস্তা তো উঁচু নীচু নয়।

আশ্চর্য! লীলাকে আর চিনতেও পারে না সুলতা।

শিবনাথ চলে যায় সুলতার সংগে। হয়তো গভর্নর হাউস পর্যন্ত। কিংবা সিনেমা হল অবধি।

তারপর সুলতা ফিরে যায়। শিবনাথ চলে যায় দূরে। কোনো পাহাড়ে, চা বাগানে কিংবা শহরেরই অলিতে গলিতে।

এর মধ্যে ওরা গাড়িতে ঘুম মনস্টারিতে গেছে, দেখে এসেছে সিঞ্চল লেক। ঘোড়-দৌড় দেখে এসেছে লেবং-এর ছোট্ট মাল-ভূমিতে। আর পাঁচদিনের মেয়াদ আছে ওদের। তারপরে নেমে যেতে হবে।

কিন্তু অনুভূতির পিঞ্জরে বোবাটার দাপানি গেল না। মুখও খুলল না। কী একটা ব্যক্ত করার আকাঙ্ক্ষাটা রয়ে গেল তবু। কেউ ধরে রাখেনি, বেঁধেও রাখেনি, এমনি একটা সুতো তবু খেলা, খাওয়া, বেড়ানো আর পাহাড়ী জনপদের পায়ের তলায় রইল প'ড়ে।

বিছানা ছেড়ে উঠল শিবনাথ। দাড়ি কামাল আগে। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেয়ে, জানলায় উঁকি দিল। গড়িয়ে গড়িয়ে, এ'কেবেঁকে নেমেছে ভুটিয়া বস্তি। কোথাও কতকগুলি বিচিত্রবেশিনী মেয়ের দল, কোথাও কতগুলি বিচিত্রবেশ পুরুষের

ঝিমনো জটলা। লোক নামে, লোক ওঠে। পায়ে পায়ে খেলে বেড়াচ্ছে বাচ্চারা। গাছের মাথা পেরিয়ে লেবং-এর সামান্য সমতল উঁকি দিচ্ছে।

চপ্পল প'রে, সার্জের পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিবনাথ। পাঁচ মিনিটেই ম্যাল। মরশুমী ফুলের মত আগন্তুক জনতার ভিড়। ভিড় করেছে পাহাড়ীরা। ওরাও গালে হাত দিয়ে এই সমতলবাসী মানুষদের দেখতে থাকে। কী দেখে, কে জানে?

—এই যে!

সুলতার চড়া গলা ভেসে এল দূরের বেঞ্চি থেকে। সেই ডাকে অনেকেই ফিরে তাকাল ওদের দুজনের দিকে।

সুলতাই এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। বলল, উঃ, অপেক্ষা ক'রে ক'রে আর পারিনে। নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিলে আবার।

শিবনাথ বলল, একটুখানি।

—কুম্ভকর্ণ কোথাকার!

তারপরেই বলল, আচ্ছা, তুমি তো একদিনও ঘোড়ায় চাপলে না?

—আমি?

হো হো ক'রে হেসে উঠল শিবনাথ। আর ওর হাসির শব্দে চমকেই বুঝি লীলা ফিরে তাকাল। চোখাচোখি হ'য়ে গেল দুজনের। শিবনাথ দেখল, লীলা তার স্বামীর পাশে ব'সে। ওর স্বামীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে, লীলা মুখটা একেবারে উল্টোদিকে ঘুরিয়েছে।

—না সত্যি, তুমি একবার ঘোড়ায় চাপ না?

—আমার ভয় করে। তুমি চাপবে তো বল।

সুলতা বলল, অসভ্য!

—অসভ্য কেন? কত মেয়েরা তো চাপে।

—বাব্বা! আমি মরেই যাব।

অতএব ইতি। শিবনাথ বলল, আজ তুমি অবজারভেটরি রাউণ্ড দিয়ে এস, আমি বসি।

সুলতা বলল, পাঁচার মত?

—পাঁচার মত কেন? আমি ততক্ষণ খবরের কাগজটা পড়ি।

—বেশ।

সুলতা সত্যি হাঁটতে আরম্ভ করল। শিবনাথ ফিরতে গিয়ে দেখল, লীলা উঠে দাঁড়িয়েছে। শিবনাথ ফোয়ারাটা পর্যন্ত গেল। আবার ফিরল। দেখল, লীলা সুলতার পথটাই ধরেছে।

শিবনাথ দোকানে গিয়ে একটা বাসি খবরের কাগজ কিনল। মুড়ে রাখল পকেটে। এলোমেলোভাবে। ছবি দেখল শো কেসে। তারপরে আবার এল ম্যালের সমতলে। লীলা নেই। কিন্তু ও পথে পা' বাড়াতে তার ভয় করতে লাগল। সে অবজারভেটরির উত্তরদিকের পথটা ধরে হাঁটতে লাগল। এ পাথরের স্তূপটার ওপিঠেই, সুলতা আর লীলার অস্তিত্বটা সে যেন টের পাচ্ছে। ঘুরে এল, ওরা এ পথেই আসবে।

শিবনাথ এগোতে লাগল। কতক্ষণ এগিয়েছে, খেয়াল নেই। সহসা দূরে একটি লালের ইশারা পেয়ে থেমে গেল সে। লীলার গায়ে একটা লাল স্কার্ফ ছিল না? ছিল। কিন্তু সামনের লালটা সুলতার লাল ক্লোক। তারই হাই হিলের ঘায়ে চকিত হচ্ছে—এই নির্জন পাহাড়ের গা।

শিবনাথ বলল, এসে পড়েছ?

সুলতা তখন হাঁফাচ্ছে।—উঃ, কী নির্জন রাস্তা। এত ভয় করছিল একলা একলা। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?

শিবনাথ বলল, এমনি এগোচ্ছিলাম। জানি তুমি এ পথেই ফিরবে। তবে ভয়ের কিছু নেই।

সুলতা হাত ধরল শিবনাথের। শিবনাথ বলল, এস এই গাছতলাটায় বসি।

ওরা বসল। রাস্তাটা একটু জেগেছিল। আবার যেন পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। একেবারে নিঃশব্দ, শুধু ঝিঁ ঝিঁ'র ডাক। কুয়াশা ঘনাতে লাগল।

তারপরে দুদিন শিবনাথ অনেক দূর দূরান্তে বেড়াল পায়ে হেঁটে। তৃতীয়দিন ঘোষণা করল, বিছানাপত্র বাঁধা যাক।

—এর মধ্যেই?

—আর কি, পরশু তো যেতে হবে।

—তা' ব'লে এখনি বিছানা বাঁধতে হবে?

—ওই আর কি কথার কথা বললুম। আর কি, পুরনো লাগছে দার্জিলিং।

—তোমাদের সবই তাড়াতাড়ি পুরনো লেগে যায়। একদিন তো ভাল ক'রে কাঞ্চনজংঘাও দেখলুম না।

সে তো কাঞ্চনজংঘার মর্জি।

একথা হচ্ছিল রাতে। পরদিন সুলতার চীৎকার ও দাপাদাপিতে ঘুম ভাঙল শিবনাথের। গা' থেকে লেপটা খুলে নিল সে।

শিবনাথ বলল, কী হয়েছে?

সুলতা জানালার দিকে দেখিয়ে বলল, দেখ দেখ, আজ একটু দেখ।

শিবনাথ দেখল, সুনীল আকাশের বুকে রূপোর মুকুট মাথায় কাঞ্চনজংঘা। ধূসর রক্তাভ তার মুখের রেখা। গরাদহীন জানালা দিয়ে, মুখ বাড়িয়ে সে আলো দেখল, উত্তর থেকে দক্ষিণে, প্রায় অর্ধ-চন্দ্রাকারে তুষার ধবল হাসি গলে গলে পড়ছে নীল আকাশে। আর ভুটিয়া বস্তি থেকে ভেসে আসছে ব্যাগপাইপের বিচিত্র এক আদিম পাহাড়ী রাগিণী। বস্তিতে আজ দলা পাকানো জটলা নেই, ঝর্নার মত চলমান। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছে।

নীল আকাশ, তুষার শৃঙ্গের উদয়, ঝকঝকে রোদ আজ যেন কিসের উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে পাহাড়ে। শুধু বাইরের নয়, পাহাড়ের ঘরের মানুষেরাও যেন আজ আমন্ত্রিত।

সুলতা ছুটে গেল দরজার কাছে। থেমে বলল, আমি যাচ্ছি বাইরে, তুমি এস।

চলে গেল ও। শিবনাথ বসতে যাচ্ছিল, পারল না। হাত মুখ ধুতে হল তাকে। চা' খেয়ে জামা চাপাতে হল। ম্যালে এসে উঠল সে। চেনা বেঞ্চিটার দিকে তাকিয়ে দেখল। লীলা নেই, স্বামী আছেন। কিন্তু আজ বসে নেই। উত্তরে দক্ষিণে পায়চারি করছেন অলেস্টার প'রে।

সুলতা ছুটে এল কোত্থেকে। বলল, তুমি কোথাও যাবে?

—তুমি যাবে?

—না। আমি ব'সে ব'সে খালি দেখব। আজ হয়তো আর কাঞ্চনজংঘা ঢাকবে না, না?

—বোধ হয়। তুমি তবে বস, আমি একটা চক্কর দিয়ে আসি।

শিবনাথ ভুটিয়া বস্তিরই পাশ দিয়ে, নেমে গেল বার্চহিল রোডের সর্পিল ঢালুতে। যে-পথে চললে, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সঙ্গী ব'লে মনে হবে। আজ বুঝি কোন্ ভুটিয়া জোয়ান সকাল থেকেই মাতাল হ'য়ে গেছে। কিংবা কোনো ধর্মীয় উৎসব আছে। ব্যাগপাইপটা নামবে না ওর মুখ থেকে আজ। তুষার শৃঙ্গে পাঠাবে ওর সুর।

বার্চহিল রোডের একটা সীমান্তে, গভর্নরের বাড়ির পশ্চিম দরজার কাছে এসে উঠল শিবনাথ। সামনেই অবজার-ভেটারি। পাশেই উত্তরদিকের নির্জন রাস্তাটা।

উত্তর গা'য়ের নির্জন রাস্তাটায় বেঁকতে গিয়ে দাঁড়াল সে। লীলা। লীলা দক্ষিণের পথ দিয়ে এসে উত্তরের বাঁকে থম্‌কে দাঁড়াল। দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকাল একবার। তারপর শিবনাথের কয়েক হাত দূরে দিয়ে, উত্তরের ঘুমন্ত রাস্তাটাকে জাগিয়ে দিল।

যেন পথরোধ হ'ল শিবনাথের। সে দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। লীলা চলেছে ধীরে, অতি ধীরে। অনেকক্ষণ পর পর তার ছোট হিলের একটি একটি শব্দ, যেন একটু একটু ক'রে ঘুম ভাঙাচ্ছে রাস্তাটার। শিবনাথ দু' পা সরে, রাস্তার রেলিংটা চেপে ধরল। লীলাও দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে ফিরে সেও রেলিংটা ধরল। একই রেলিং, পনের হাত দূরে। শিবনাথের মনে হ'ল লীলার হাতটা যেন তারই হাতের ওপর এসে পড়ল।

কে একটি লোক চ'লে গেল আপন মনে। উত্তরে বার্চহিল রোডের পাড়াগুলি নেমে গেছে নীচে। রোদে চক্‌চক্‌ করছে লেবং-এর সমতল। আর গোটা আকাশব্যাপী তুষার শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্তৃত বাহু। লাল, নীল, সবুজ বুনো ফুলের ছড়াছড়ি ঘাসে ঘাসে। পাথরে পাথরে পাথরের গোলাপেরা রোদে চলকাচ্ছে। সবুজসোনা গলে পড়ছে দেবদারুর পাতায় পাতায়। প্রজাপতিরা হারিয়ে যাচ্ছে ফুলের রংএ রংএ। বাতাস বইছে। পাতা ঝরছে দু' একটি। আর পাগলা ভুটিয়াটার ব্যাগপাইপের আদিম সুর থামবে না।

এত আয়োজন কি ওরই হচ্ছে। কি করবে শিবনাথ? তার মনে হ'ল, তার পিঞ্জরাবদ্ধ বোবা অনুভূতিটারই এত প্রকাশ সমারোহ। তাই ওর বুকের রক্তধারা যেন নাচতে লাগল। ফিরে তাকাল লীলার দিকে। দেখল, লীলা, ঠিক ওর দিকে নয়, ওরই দেহের সীমায় তাকিয়ে আছে। ওর শ্যামচিকন মুখে রোদ লেগে কচি পাতার মত দেখাচ্ছে। আয়ত চোখ দুটিতে রৌদ্র-চকিত তুষার শৃঙ্গের ছায়া।

শিবনাথ রেলিং ধরে ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেল। লীলা চোখ তুলল। তুলে, হাসল সলজ্জভাবে।

শিবনাথ অনেক কষ্টে বলল, আপনার স্বামী ভাল আছেন?

—আছেন।

লীলা বলল নীচু গলায়। কপাল থেকে তুলে দিল কয়েকগাছা রুক্ষ চুল। বলল, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে বেরোন না কেন?

শিবনাথ বলল, ও উঁচু নীচু করতে পারে না।

একটু চুপ। আবার বলল, আপনার স্বামীর কি শরীর ভাল নেই?

লীলার স্বাভাবিক রক্তাভ ঠোঁটে অতি সাধারণ হাসি একটি অসাধারণ মায়ায় উজ্জ্বল। বলল, না। ও'র ধারণা, ও'র শরীর মোটেই ভাল নেই। দিনরাত্রি ফার্মের ব্যবসার হিসেবে সব সময় টায়ার্ড থাকেন।

কে দুজন লোক চলে গেল দূরদিকে। ওরা দুজনে তাকিয়ে রইল কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। শুকনো পাতা পড়ল খসে একটা। দুজনেই পাতাটার দিকে তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হ'ল আবার। হাসল দুজনেই। শিবনাথ আরো এগিয়ে এল কাছে। বলল, দেখুন সেদিন সেই বালির ঝড়ে—

লীলাও ব'লে উঠল, আমিও সেই কথা বলব ভাবছিলুম, বালির ঝড়—

শিবনাথ প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, বলুন।

লীলার দু' চোখে যেন সহসা একটি নতুন হাসি লজ্জায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, কী আর বলব। বালির ঝড় বলেই এমন হয়েছিল নিশ্চয়।

—তাতে আপনার মনে কোন গ্লানি—?

শিবনাথ কথাটা শেষ করতে পারল না। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে রইল লীলার নত মুখের দিকে। রেলিং-এ আঙুল ঘষতে গিয়ে লীলার সোনার বালাটা লোহায় বাজতে লাগল ঠুন ঠুন ক'রে।

মাথা নীচু ক'রেই, ঘাড় নেড়ে বলল লীলা, নেই। আপনার?

লীলা তাকাল শিবনাথের দিকে। শিবনাথের মুখে সেই বোবা অসহায় অনুভূতিটা যেন ফিরে এল। পরমুহূর্তেই নিশ্বাস ফেলে বলল, আপনার গ্লানি না থাকার আনন্দটাই আমার ভাগে পড়েছে।

লীলা তাড়াতাড়ি চোখ নামাল। অস্ফুটে বলল, কী বিচিত্র! আবার চোখ তুলল। তারপর দুজনেই হেসে ফেলল। বালির ঝড়ের ঝাপসা বোবা কথাগুলি যেন নিমেষে এই সকাল আলোর মাঝখানে হাসির ছটায় ঝলকে উঠল। পাতা হাসছে ফুল হাসছে, কনক কিরীট মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘাও হাসছে। ওই আদিম বাঁশীটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা হাসিরই উচ্ছ্বাস যেন সুর হ'য়ে ভাসছে।

আর হাসি দিয়ে এই শেষ কথার পর, বরফগলেহী বাতাস যেন সহসা ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। ব্যাকুল বাতাসে ওরা আবার চুপ ক'রে অনেকক্ষণ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। আরো অনেক ক'টা পাতা ঝরল। বাঁশীটা বাজতে লাগল। কাঞ্চনজঙ্ঘা আজ কিছুতেই বিদায় নিচ্ছে না।

তারপরে আবার ওরা দুজনে চোখাচোখি ক'রে হাসল। লীলা বলল, যাই এবারে।

শিবনাথ বলল, আসুন।

লীলা চলে গেল রাস্তাটার ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে। শিবনাথ আবার নেমে গেল বার্চহিল রোডে, যে-পথে এসেছিল। দূরের উঁচুতে একবার যেন দেখা গেল লীলাকে। তারপরেই ঘন জঙ্গল।

# কাগড়

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চোখ তুলতেই নজরে পড়ল। ঠিক কানা গলিটার মুখে। পানের দোকানের পিছনে। পাশেই খাটাল। দিনের বেলা গোটা দশেক গরু আর গোটা চারেক মোষ বাঁধা থাকে। রাত্রে শুধু খোঁটাগুলো জেগে আছে অন্ধকারে।

কপালে কাঁচপোকার টিপ, মুখে সস্তা পাউডারের প্রসাধন। পরনে রং-জ্বলা শাড়ি। পানের রসে টুকটুকে রাঙা ঠোঁট। মাঝে মাঝে কাঁচপোকার টিপের নিচে আগুনের দীপ্তিও দেখা যায়। সিগারেট ধরিয়েছে মেয়েটা।

সৈরভিকে আমি জানি। এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা সবাই জানে। ওর মার সঙ্গে আগে আমাদের বাড়ি আসত। হাল্কা কাজে মাকে সাহায্য করত। ছেঁড়া ফ্রক পরা ময়লা চেহারার এক মেয়ে। তারপর ওর মা রোগে পড়ল। লিভারের অসুখ। কঙ্কালসার চেহারা। দুপা চলতে ধুঁকতে থাকে। পাড়ার চাকরি গেল। মাসের মধ্যে বাইশ দিন কামাই, এমন ঝি কে রাখবে সাধ করে। মেয়ে মার কাজ করতে এগিয়ে এল, কিন্তু বদনামই সার হল। ছুঁড়ির চালচলন সুবিধার নয়। দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষার শখ নেই কারুর।

বাপ কারখানায় দিন-মজুরি করত। কাজের ফাঁকে ক্রাসারের তলায় একদিন পা-দুটো ঢুকে গেল, ব্যস আর দাঁড়াতে হল না। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে চালান দিল, ফিরল ঠ্যাং দুটো রেখে। নাকের বদলে নরুন পাওয়ার মতন জোড়া ক্রাচ সঙ্গে নিয়ে। কারখানা থেকে যে ক্ষতিপূরণ মিলল তার বেশীর ভাগ গেল নিতাই শুঁড়ির দোকানে। বাকি যেটুকু রইল তা সৈরভির মা আঁচলে বাঁধল বটে, কিন্তু রাখতে পারল না। নিজের রোগের ওষুধ আর পথ্যিতে সব শেষ।

দুটি মেয়ে। সৈরভি বড়, রাঙী ছোট। অজগর-সংসারের খিদে মেটাতে সৈরভি কানাগলির মোড়ে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যের ঝোঁকে। গালে, মুখে রং মেখে।

প্রথমটা নিজের মধ্যবিত্ত-মন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। পাড়ার মধ্যে এ কি অনাচার। কিন্তু নিজেই বুঝিয়েছি মনকে। এ ছাড়া আর পথ কোথায়। একদিকে অনশন, নিশ্চিত মৃত্যু, অন্য দিকে কাঠামো-সর্বস্ব সামাজিক আচারনিষ্ঠা, নিষ্প্রাণ অনুশাসন। আজকের পৃথিবীতে যার দাম কানা কড়িও নয়।

হাটে বাজারে, পথে ঘাটে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে সৈরভির সঙ্গে। মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়েছে। কিন্তু এক-নজরেই লক্ষ্য করেছি, বেশ পুরন্ত হয়েছে সৈরভির শরীর। দু চোখে রাত্রিজাগরণের
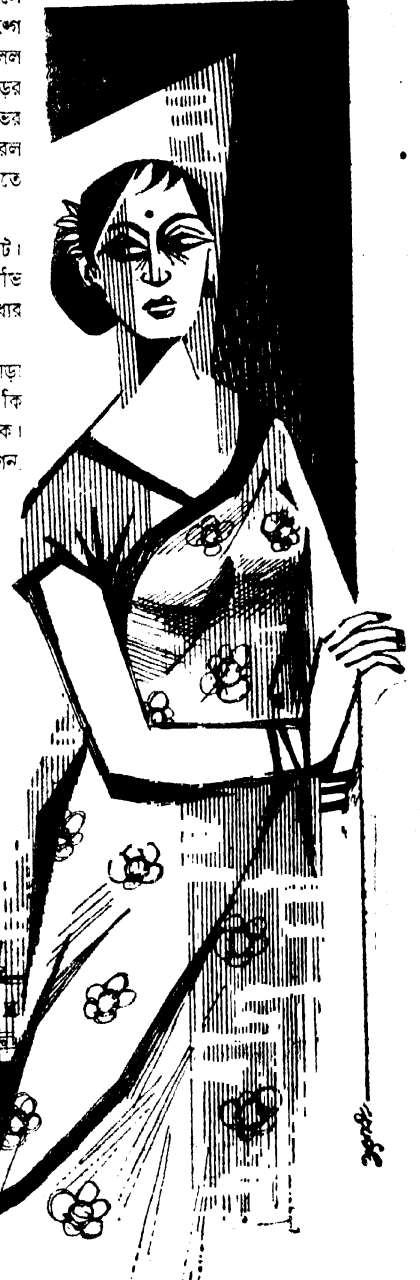
ক্লান্তি ছাড়া, নিত্য-অভিসারের আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই। বোঝা গেল, টলমলে সংসারের হাল সে শক্ত হাতে চেপে ধরেছে। জল সে'চে সে'চে ভরাডুবি বাঁচানোর মতন, নিজের শরীর ছেনে ছেনে সংসারের রসদ যুগিয়ে চলেছে। এর কতটা পাপ আর কতটা পুণ্য, এ বিচার করতে মন রাজী হল না।

হঠাৎ ভোরের দিকে সোরগোল উঠল। বস্তি থেকে। বাজার যাবার পথে খোঁজ নিলাম। খাটিয়ার ওপর সৈরভির বাপ গুম হয়ে বসে রয়েছে। কোলের কাছে তাড়ির বোতল। চৌকাঠের ওপর বসে সৈরভির মা বুক চাপড়াচ্ছে আর চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছে।

সৈরভি পালিয়েছে। রোজ রাতে যেমন বেরোয়, তেমনি বেরিয়েছিল, আর ফেরে নি। আমাকে দেখে সৈরভির মা বুক চাপড়ানি বন্ধ করে এগিয়ে এল। হাজার হ'ক পুরনো মনিব। দুঃখটা জানাতে হবে বৈ কি।

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, অত উতলা হয়ো না। যাবে কোথায়! ঠিক ফিরে আসবে, দেখ না।

সৈরভির মা ঘাড় নাড়ল, না বাবু সে আর ফিরবে না। কদিন তার হালচাল আমার ভাল ঠেকছিল না। বলে বিয়ে করব। বরফ-কলের ঐ মতি ছোঁড়া বুঝি লোভানি দেখিয়েছে। ভিন দেশে নিয়ে গিয়ে রানীর হালে রাখবে। মুখপুড়ী তার কথায় মজেছে। চেনে না ত দুনিয়াটা। রস নিংড়ে ছোবড়াটা পথের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে।

কথা শেষ করে সৈরভির মা চোখে ছেঁড়া আঁচল চাপা দিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

সৈরভির কি হবে জানি না, কিন্তু সৈরভি ছাড়া এদের সংসারের কি হাল হবে, তা বেশ বুঝতে পারলাম।

দিন তিনেক পরেই সৈরভির মা এসে দাঁড়াল চালের আশায়। শুধু চাল নয়, সেই সঙ্গে কিছু পয়সা। চাল দেওয়া সম্ভব নয়, পয়সা দিয়ে বিদায় করলাম। বিকেলে দেখা হল বাপের সঙ্গে। ওষুধের শিশি বুকে চেপে বাড়ি ফিরছে। আবার দিন কতক পরে সৈরভির মা দরজায় এসে হাজির। এবার চাল, পয়সা নয়, চাকরি। দু বেলা বাসন মাজবে, বাজার করবে, ঘর ঝাড়পোঁছ করবে।

সৈরভির মার চেহারা দেখে ঝি-গিরিতে বহাল করতে সাহস হল না। শেষ-কালে মানুষ খুনের দায়ে পড়ব! হাড়গুলো কোনরকমে চামড়া ঢাকা। সারা মুখে নীল শিরার জট। কথা বলতেই হাঁপাচ্ছে। বাসনের গোছা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে কলতলায়, আর উঠবে না।

পরের দিন বাজার যাবার পথে দেখলাম রাঙী বসে বসে কাঁদছে আর সৈরভির মা আস্ফালন করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দু-একটা কথার টুকরো কানে এল। গতর খাটিয়ে খাবার না সাধ্যি থাকে ত যেখানে খুশি চলে যাক। বাড়িমুখো হলে খ্যাংরা পেটা করব।

বাড়ি এসে গৃহিণীকে কথাটা বললাম। রাঙীকে যদি রাখা যায় বাচ্চাটাকে দেখা-শোনা করার জন্য, মন্দ কি। থাকা, খাওয়া আর বছরে গোটা দুই কাপড়।

গৃহিণী গরম হয়ে উঠলেন, সৈরভির মাকে বলে দেখেছি, সে রাজী নয়।

রাজী নয়? সে কি? বিস্মিত হলাম।

ছোটলোকের লোভ বেড়ে গেলে আর জ্ঞান থাকে? ও চায় সৈরভির মতন রোজগার করুক রাঙী। রাত কাবার হলেই টাকা নিয়ে আসুক।

রাঙী! মনে মনে রাঙীর অবয়বটা জরিপ করলাম। কত বয়স, বড় জোর বছর এগারো কি বারো। একেবারে ছেলেমানুষ। টাকার লোভে সৈরভির মার মাথাটা খারাপ হল নাকি!

অফিসের কাজে দিন সাতেকের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে বারান্দায় ইজি-চেয়ার পেতে শুতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

সৈরভি ফিরে এসেছে। ঠিক তেমনি সাজে দাঁড়িয়েছে কানা গলির মোড়ে। আরো কোণের দিকে। পানওয়ালার দোকানের আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। কপালে তেমনি কাঁচপোকার টিপ। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট অবশ্য নেই, কিন্তু জ্বলে জ্বলে করে জ্বলছে দুটো চোখ।

সৈরভির মার কথাই ঠিক। নেশা ফিকে হ'তেই মতি সরে পড়েছে। মেয়েটাকে মাঝপথে ফেলে। নিরুপায় সৈরভি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আবার ফিরে এসেছে পুরোনো আস্তানায়। পুরোনো পথে দাঁড়িয়েছে।

বইটা পড়তে পড়তে বার দুয়েক চোখ তুলে চাইলাম। মেয়েটা ঠিক একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজের পুতুলের মতন। অন্য সময় এতক্ষণে লোক জুটে যায়। আশপাশের চায়ের দোকানের ছোকরা বয়গুলো কিংবা বাজারের আলুপটলওলা। মাঝে মাঝে পথচলতি বাবুও সরে সরে কানাগলির মোড়ে এসে দাঁড়ায়। হাতের দেশলাই জ্বেলে যাচাই করে। দরদস্তুর চলে। দরে বনলে দুজনে হেঁটে হেঁটে রেললাইনের ওপারে চলে যায়। গয়লাদের পরিত্যক্ত ঝুঁকে পড়া চালা ঘরগুলোর দিকে।

সৈরভির মা ঠিক কথাই বলেছে। রস শুষে একেবারে ছিবড়ে করে তবে ফেলে গেছে। যেটুকু মূলধন ছিল, পশার সাজাবার উপকরণ, সব নিঃশেষ। এখন খদ্দের ধারে কাছেও আসবে না। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব। শীর্ণ শকুনের কাছে আসবে কিসের মোহে!

পরপর রোজই প্রায় এক দৃশ্য। মাঝ রাত পর্যন্ত মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। একলা। কোন-দিনই সঙ্গী জোটে না।

বাজার যাওয়ার পথে রোজই চিৎকার শুনি। সৈরভির মার গালাগাল, ওর বাপের অশ্লীল চেঁচামেচি, মারধোরের আওয়াজ, আর মেয়েটার ডুকরে কান্নার শব্দ।

বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। না খাইয়ে ছাড়ল না। গলির মোড় থেকে রিক্সা নিলাম। ভরপেট খেয়ে আর চলবার সাধ্য ছিল না। রিক্সায় উঠেই খেয়াল হ'ল সিগারেট শেষ। পাকা নেশাখোর নই, কিন্তু শোবার আগে একটা না ধরাতে পারলে ঘুম আসে না। মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়।

বাড়ির কাছে রিক্সা থামালাম। পানওলার দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম এক প্যাকেট সিগারেটের আশায়। আর তখনি চোখে পড়ল। একেবারে সামনা-সামনি।

যাকে সৈরভি ভেবে এসেছিলাম, সে সৈরভি নয়, রাঙী। লাল ব্লাউজ, আধময়লা শাড়ি পরনে, তেলচকচকে চুলগুলো নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা। মুখে সস্তা পাউডারের প্রলেপ। কাঁচপোকার টিপ নয়, আজ কুঙ্কুম।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে পানওলার আয়নায় নিজের প্রসাধনের খুঁত মেরামত করছিল, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই তীরবেগে সরে গেল।

ওইটুকুর মধ্যেই দেখতে কোন অসুবিধা হ'ল না। অপুষ্ট শরীর, মুখে কৈশোরের অস্পষ্ট ছায়া। এ ব্যবসায় এ শরীর যে মূলধন করা যায় না এটুকু এক নজরেই বোঝা যায়। সেইজন্যই খদ্দের কাছে এসে, দেশলাই জেলে পরখ করে গালাগাল দিয়ে সরে পড়ে। রাতের পর রাত তাই সঙ্গীহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে রাঙী। একটি পয়সা রোজগার হয় না।

বাড়ি গিয়ে কথাটা গৃহিণীকে বলতে তিনি প্রায় ক্ষেপে উঠলেন, চুপচাপ বসে না থেকে পুলিসে খবর দিয়ে দাও। তা যদি করতে চক্ষুলজ্জায় বাঁধে তো অন্য কোথাও বাড়ি দেখ। এ পাড়া ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বুঝলাম, ব্যাপারটা গৃহিণীর চোখে এর আগেই পড়েছে।

দিন দুয়েক রাঙীকে আর দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, যাক, তার বাপমায়ের সুমতি হয়েছে। মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এপথ থেকে।

বঙ্গের বধূ

শ্রীনন্দলাল বসু

বাজার যাবার পথে রাঙীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাতে ওষুধের শিশি। গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

কি হল? প্রশ্ন করা সঙ্গত হবে কিনা ভাববার আগেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম। রাঙী কোন উত্তর দিল না। জামার হাতায় চোখ মুছে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। উত্তর দিল তার মা।

বিচ্ছু মেয়ে বাবু, জ্বালিয়ে খেলে আমায়। দুবেলা দু মুঠো ভাত জোটে না, পরবার ত্যানা নেই, অথচ ভদ্দর বাড়ির মেয়েদের মতন শাস্তরের কথা আওড়াচ্ছে। এ ভাল নয়, ও অন্যায়। পাপ পুণ্য শেখাচ্ছে আমায় ওইটুকু মেয়ে।





মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বিশেষত ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার স্পৃহাও ছিল না। মাথা নিচু করে নিজের রাস্তা ধরলাম।

ব্যাপারটা আন্দাজ করলাম। হয়তো নিজের শারীরিক অপূর্ণতার দোহাই দিয়ে রাঙী সরে দাঁড়াতে চেয়েছে। তার মার মনঃপূত হয়নি কথাটা। বিরোধ বেঁধেছে বোধ হয় সেখানেই।

সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে দেখলাম রাঙী এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিন অন্ধকারের মধ্যে নিজের শরীর ঢেকে দাঁড়ায় কিন্তু আজ মনে হ'ল যেন একটু এগিয়ে এসেছে। পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে যেখানটা পানওলার আলোটা এসে পড়েছে, তারই কাছাকাছি এসে রাঙী দাঁড়িয়েছে। কিছুটা আলো, কিছুটা আঁধার শরীরে মেখে।

পড়াতে তন্ময় হয়েছিলাম। সস্তা সিরিজের আমেরিকান খুনের গল্প। লোকটা অবলীলাক্রমে খুন করে চলেছে সারা টেক্সাস পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে। রাত্রে যাকে ভালোবাসছে ভোরের বেলা তাকেই নির্বিচারে হত্যা করছে, নৃশংসভাবে। হত্যা তার পেশা না নেশা তাই ভাবতে ভাবতে বই থেকে চোখ তুলেই অবাক হলাম।

রাঙী নেই। এত তাড়াতাড়ি ওর চলে যাবার সময় নয়, সঙ্গী না পেলেও। এত শীঘ্র বাড়ি ফিরলে রাঙীর মা যে ঢুকতেই দেবে না সেটুকু আমার অজানা নয়। বিশেষ করে রাঙীর লাঞ্ছনাটা যখন নিজের চোখে দেখেছি।

একটু দূরেই দেখলাম অপসয়মান দুটি মূর্তি। ইজিচেয়ার ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সে কি এতদিন পরে সঙ্গী জোটাতে পেরেছে রাঙী? এমন দুর্বৃত্ত কেউ আছে যে, ওর অপুষ্ট দেহের আকর্ষণে ধরা দেবে! নিস্তরঙ্গ দেহে প্রলোভনের কোন শিখা জ্বালালান রাঙী, মানুষ ধরার কোন নতুন ছল আবিষ্কার করল!

হাতের বইটা বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারলাম না। মন রাঙীর কাছ থেকে আবার ফিরে গেল টেক্সাসের নর-পিশাচের কাছে। এক দরিদ্র চাষী-পরিবারে সে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যেই চাষীর বড় মেয়েকে কুক্ষিগত করেছে নিজের কাল্পনিক সম্পদের কাহিনী শুনিয়ে। মেয়েটির দু চোখে লোভের রোশনাই। পতঙ্গের মতন ধীরপায়ে এগিয়ে আসছে পাবকের দিকে। ওর মোটরে চড়ে শহরে পালাবার সব বন্দোবস্ত ঠিক করেছে। রাতের অন্ধকারে সবাই যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন দুজনের অভিসার শুরু হবে। হয়তো মেয়েটির জীবনে অন্তিম-অভিসার।

আচমকা গোলমাল। খুব কাছেই। বই রেখে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

ঠিক পানের দোকানের পিছনে জনকয়েক লোকের জটলা। সবাই মিলে চিৎকার করছে। মাঝে মাঝে চাপা হাসির শব্দ। সব ছাপিয়ে একটা লোকের সরব আস্ফালন।

একটু পরেই মেয়েলি গলার আওয়াজ কানে এল। কান্নাজড়ানো গলায় কে যেন কি বলছে। কিন্তু মেয়েটিকে সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে কে থামিয়ে দিল।

রক্ত চড়ে গেল মাথায়। হাতের বইটার কিছুটা প্রভাব হয়তো ছিল, তা ছাড়াও পাড়ার মধ্যে এমন বেলেল্লাপনা চলতে দেওয়া সমীচীন নয়। চুপ করে থাকলেই পেয়ে বসবে।

দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বহুদিন এ পাড়ায় আছি। আশপাশের সবাই প্রায় জানা। আমাকে দেখে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। অনেকেই সরে গেল এদিকে ওদিকে। কিন্তু যাবার আগে সবাইয়ের মুখেই যেন চাপা হাসি, এটুকু লক্ষ্য করলাম।

পানওলা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, ওদিকে যাবেন না বাবু। আপনারা ভদ্দর আদমি, এসব ব্যাপারের মধ্যে আপনাদের না যাওয়াই ভাল।

তার আপত্তি শুনলাম না। এগিয়ে গেলাম। বাড়ির সামনে এসব ব্যাপার হবেই বা কেন! শায়েস্তা করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে কেউ গোলমাল করতে সাহস না পায়।

সামনে গিয়েই থেমে গেলাম।

রাঙীর একটা হাত শক্ত হাতে ধরে এক ছোকরা। পরনে নক্সাকাটা ফতুয়া আর পাজামা, গলায় বেগুনী রুমাল, রাতেও চোখে কালো চশমা।

কি হ'ল? রাঙীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখুন না স্যার কি হারামী মেয়ে। বুকের মধ্যে ইয়ে করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-ছিল। লোকের ভুল হবে না? আমি ভাবলাম নতুন পাড়া। দু টাকা দু টাকাই সই। তারপর লাইনের ওপারে যেতেই ধরা পড়ে গেল। আমি স্যার ছেড়ে দেব? ভদ্দরলোকের ছেলেকে এমনভাবে বোকা বানানো!

রাঙীর দিকে চোখ ফেরালাম। চোখের জলে সন্ধ্যের প্রসাধন ধুয়ে মুছে কিম্ভুত রূপ নিয়েছে। দু হাতে দুটো কাগজ।

এক হাতে দলা পাকানো খবরের কাগজ, আর একহাতে দু টাকার একটা নোট। দুটো হাতই থরথরিয়ে কাঁপছে। কাগজগুলো হয়তো বেশীক্ষণ ধরেই রাখতে পারবে না।

# মহীয়সী

সুশীল রায়

চিনতে পারার কথা না। কিন্তু চেনা গেল। প্রথম দেখা মাত্রই অবশ্য না। মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর।

মালতী ঘোষাল।

মালতী ঘোষাল একজন মহীয়সী মহিলা। তাঁর প্রতি আমাদের মনের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আমাদের নমস্য।

করজোড়ে নমস্কার করার সুযোগ খুঁজতাম তাই। যদি ঐ সুযোগে নমস্কারের স্বীকৃতিরূপে তাঁর কাছ থেকে সামান্য-একটু হাসির উপহার পাওয়া যায়।

হাসিটা ছিল প্রাণান্তকর। কিন্তু সেই মর্মঘাতী উপহারটি পেয়ে মনের মধ্যে আশ্চর্য পুলক বোধ করতাম আমরা।

আফিমের নেশায় যেন নেশাড়ু হয়ে উঠেছিলাম। ডোজ একটু বেশি হয়ে গেলেই প্রাণসংশয় জানা সত্ত্বেও আমরা ফিরতাম ঐ নেশার পিছনে।

কিন্তু আশ্চর্য, মাত্রা বেশি হয় নি কোনো দিন। মালতী ঘোষালের মাত্রাজ্ঞান ছিল এমনি নিখুঁত।

বাঙালীর ঘরে এমন মেয়ে দুর্লভ। অমন প্রচুর স্বাস্থ্য খুব কম দেখা যায়। যেমন লম্বা, চওড়াও সেই অনুপাতে—কথাটা একটু হয়ত, ভুল হল, লম্বার তুলনায় চওড়ার মাত্রা একটু বেশিই। আর-একটু কম চওড়া হলে সোনায় সোহাগা হত; কিন্তু দরকার নেই সোহাগার, ঐ সোনাই আমাদের কাছে খুব দামী।

হয়ত মনে হবে গল্প করছি, কিংবা বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু, এতটুকু বাড়িয়ে বলার দরকারই হয় না, তিনি যা, সেই কথা অবিকল গুছিয়ে বলতে পারলেই একটু বাড়াবাড়ি শোনায়।

তাঁর গায়ের রংও ছিল সোনার মত। পাকা-সোনা কাঁচা-সোনা চিনি নে; যা চিনি সেইটুকু বলতে পারি, রংটা ছিল গিনি-সোনার মত।

গায়ে মাংসের মাত্রা বেশি ছিল বটে, তবু

তাকে মোটা মনে হত না। তাঁর শরীরের সঙ্গে আঁট হয়ে লেগে ছিল ঐ মাংস।

ঐ মস্ত মহিলাটির মুখের দিকে তাকালে হঠাৎ কেমন অবাক লাগত। ঐ শরীর-আন্দাজে মুখটা ছিল একটু ছোট, এবং তার চেয়েও বেশি কচি।

সেই কচি মুখের হাসিকে আমরা বলতাম আফিম।

আফিম খেয়ে দেখিনি কখনো। কিন্তু ঐ হাসির স্বাদ নিয়ে দেখেছি তাতে প্রচুর নেশা—সে নেশা যেন আফিমেরই।

অনেক দিন বাদে সেই মালতী ঘোষালের সঙ্গে আজ দেখা। দেখা মাত্রই তাঁকে চিনতে অবশ্য পারিনি, কিন্তু একটু পরেই চিনলাম।

নমস্কার করে বললাম, "চিনতে পারেন?"

আলোটা তেজী ছিল না। সূর্য তখনো ওঠেনি। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বললেন, "মুরলীবাবু না? ইশ, কতদিন বাদে দেখা হল আপনার সঙ্গে। অনেক কালো হয়ে গেছেন।"

নতুন কথা কিছু না। কালো আর রোগা লোকদের ওটা চিরকালের অপবাদ। অনেক দিন বাদে কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই শুনতে হয় ঐ কথা, "অনেক রোগা হয়ে গেছেন, অনেক কালো হয়ে গেছেন।" এই জন্যে মালতী ঘোষালের কথা শুনে অবাকও হলাম না, লজ্জায় মুখ কালোও হল না।

কিন্তু, অবাক হলাম তাঁকে দেখে, মুখ কালো হল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে।

মুখে সে লাবণ্য নেই, শরীরে সে নিমক নেই। কেমন-যেন পানসে লাগল তাঁর হাসিটাও।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কাছে সরে এলেন। বললেন, "ব্যাপার কি? হঠাৎ এখানে? এই তীর্থে?"

একটু হাসলাম। বললাম, "তীর্থদর্শন করতে।"

তার পর আবার হাসলাম, বললাম, "কিন্তু তীর্থদর্শন বুঝি হয়ে গেল।"

"এত শিগগির?"

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "আপনাকে ত দেখা হয়ে গেল।"

আমার কথা শুনে ঐ বিরাট শরীরে ভয়ঙ্কর ঝাঁকানি দিয়ে তিনি হাসলেন, বললেন, "সেই নেশা বুঝি এখনো লেগে আছে?"

চমকে তাকিয়ে বললাম, "কিসের নেশা?"

"আমি জানি। সে নেশা আফিমের।"

পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যেতে লাগল। মাটি ঠিক না—পাষাণ, এই ঘাটের পাষাণ।

মালতী ঘোষালকে মিথ্যে কথা বলিনি। কাশীতে এসেছি সত্যিই তীর্থদর্শনের জন্যে। মন্দিরের কাছের দশাশ্বমেধ-ঘাট যতই খ্যাতি অর্জন করে থাক, এই কেদার-ঘাটকেই আমার মনে হয় ঘাটের রাজা। সেই কোন্ অগাধের জলের কিনার থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে প্রায় যেন আকাশ অবধি।

ভোর হবার আগে থেকে এখানে এসে বসেছি তীর্থদর্শনের জন্যে। মন্দিরের জনতার মধ্যে ঠিক তীর্থটিকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় না, সম্মুখে ঐ জলের ধারা—অসী থেকে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে বরুণার দিকে। সেই পরিপূর্ণ বারাণসীর তীরে বসে ভোরের অস্পষ্ট আলো আর ঐ জলে-ধোয়া বাতাস সর্বাঙ্গে মাখছিলাম একা একা।

স্নানার্থীরা স্নান করছে, চারদিক থেকে স্তোত্র-পাঠের শব্দ কানে আসছে। ঘাটের মাঝামাঝি একটা সিঁড়িতে বসে আছি চুপ করে।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও আশপাশের লোকজনকে মনে হচ্ছিল ছায়ার পুঁটুলি। পূবের আকাশটা ক্রমশ ফরসা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

অদূরে এক মহিলা গালে হাত দিয়ে বসে বসে নদীর ঢেউই দেখছিলেন হয়ত। তাঁর দিকে অনেকবার তাকিয়েছি। কিন্তু সে-চাওয়ার মধ্যে কোনো কৌতূহল এতক্ষণ ছিল না।

এবার, কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর মনে হল যেন চিনি। মনে হওয়া মাত্রই সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতে লাগল জড়তায় আর সংকোচে। জীবনে কখনো যার নিবিড় সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ হয়নি, নিরাপদ দূরত্ব থেকে যার উদ্দেশে কেবল নমস্কার নিক্ষেপ করেই কাটিয়েছি, বিশ্বাস করতে ভরসা হল না—এ সেই।

কিন্তু যখন স্পষ্টই বুঝলাম যে, ইনি তিনি, তখন বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে-বিস্ময়টা কাটার পরই তিনি নতুন বিস্ময়ে বিস্মিত করে তুললেন আমাকে। আমরা যে তাঁর হাসির মধ্যে আফিমের নেশা আবিষ্কার করেছিলাম, এই একান্ত গোপন কথাটি তাঁর কানে গেল কি করে?

তিনি হাসলেন, বললেন, "মেয়েদের এখনো চিনতে পারেন নি, মুরলীবাবু।"

চিনতে পেরেছি, এ দাবি কোনো দিন করিনি। যদি-বা সে রকম কোনো দাবি নিজের অজানিতেই এই মনের মধ্যে কোথাও থাকত, তা হলেও আজ তা নিমেষে উবে হয়ে গেল। যে ছিল আমাদের চোখের স্বপ্ন ও মনের বিস্ময়, তাকে আজ এত কাছে এমনভাবে হঠাৎ পেয়ে যাব এই কেদার-ঘাটের পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ির উপর—এ কথা কল্পনা করা কঠিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এখানে?"

হাসিতে সে-জাদু বুঝি নেই, স্বাদও কম, মাদকতাও নেই, মালতী ঘোষাল সামান্য একটু হেসে বললেন, "সেই ত মজা।"

সে মজার কথা সেদিন আর জানা হল না। সিঁড়ির ধাপে পাশাপাশি বসে অন্য-সব মজার কথা হতে লাগল। তরুণের কথা, তাপসের কথা, অরুণের কথা ও হিমাংশুর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তিনি। তারা এখন কোথায়, কে কি করছে—জানতে চাইলেন।

সকলের খবর ভালভাবে জানা নেই, কে কোথায় কোন্ দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে তার হিসেব রাখা কঠিন। যেটুকু জানা ছিল বললাম।

গায়ে ঝাঁকি দিয়ে একটু যেন হাসলেন তিনি, বললেন, "সবচেয়ে দুষ্টু ছিল ঐ তাপস সোম। চমৎকার অভিনয় করত—মুখ কাঁচুমাচু করে দূরে থেকে এমনভাবে নমস্কার করত—যেন আমার উপর কত ভক্তি। কিন্তু ওর চোখ দুটো দেখেই বোঝা যেত সে-ভক্তিটা কত ভুয়ো।"

আশ্চর্যই লাগল, সংকোচও হল। মনে হল, তাপসের নমস্কারটা সম্বন্ধে ত একটা মন্তব্য শোনা গেল, আমার নমস্কার সম্বন্ধে এঁর অভিমতটা কি, কে জানে! হয়ত সে অভিমতটা আরো ভয়াবহ।

একটু ভীত চোখেই তাকালাম তাঁর মুখের দিকে, তাকিয়েই যেন সত্যি ভীত হয়ে উঠলাম।

ইতিমধ্যে সূর্য উঠে এসেছে অনেকটা। রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে কেদার-ঘাটের পাষাণে। নদীর ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় রোদের আল্পনা আঁকা হয়ে গেছে; মনে হচ্ছে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে চলেছে যেন ঐ ধারা। সেই আলোয় তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। ভোরের অস্পষ্ট আলোতে যে-মুখ মোলায়েম ও মধুর বলে ঠেকেছিল, সেই মুখ এখন এই উজ্জ্বল আলোয় অন্য রকম দেখাল।

আমার চোখে অত তেজ নেই। ভোরের আবছা আলোতে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি অনেক কালো হয়ে গিয়েছি। কিন্তু সে-আলোয় আমি মালতী ঘোষালকে অত খুঁটিনাটি করে দেখতে পারি নি।

কিন্তু এখন এই উজ্জ্বল আলোয় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যেন মনে হল—এ মালতী ঘোষাল অন্য।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে আছেন কোথায়?"

তিনি বললেন, "সে কথা পরে হবে। আপনি কোথায় উঠেছেন?"

হেসে বললাম, "সে কথাও যদি পরে হয়?"

"বেশ, তাই হবে।"

বললাম, "না না। এখনি হোক। আমি উঠেছি ধর্মশালায়।"

রোদ তেতে উঠেছে। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। সত্যিই, মহীয়সী মহিলা ইনি। তাঁর পরিপূর্ণ দীর্ঘতার যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে অতি তুচ্ছ আর অতি ক্ষুদ্র বলেই মনে হল। তাঁর সমান-সমান হবার জন্যে এক ধাপ উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

আজ কেমন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি এই মালতী ঘোষালের। তারা আজ কোথায়? —সেই তরুণ অরুণ তাপস আর হিমাংশু? তারা আজ একবার এসে দেখে যাক তাদের বন্ধু এই মুরলী বটব্যালকে।

গায়ের রং আছে ঠিক আগেরই মত—গিনি-সোনার মতই। মুখও তেমনি কচি, মাংসল ঘাড়ের ভাঁজে এখনো গেঁথে বসে যাচ্ছে গলার মফ-চেন। চোখ-দুটো এখনো ঢুলু-ঢুলু। সবই ঠিক আছে, কিন্তু সবই যেন ঠিক নেই। সবই আছে, কিন্তু কি-যেন নেই বলে মনে হতে লাগল কেবলই।

মালতী ঘোষাল বললেন, "আচ্ছা নমস্কার। আছেন ত ক-দিন, আবার দেখা হবে। আমি তবে নামি? স্নানটা সেরে নিই?"

কথাটা শুনে থতমত খেয়ে গেলাম। বলতে পারলাম না—আমিও ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি। স্নানের বাসনা আমারও আছে।

প্রতি-নমস্কার করে বললাম, "আচ্ছা।"

সরাসরি চলে এসেছি ধর্মশালায়। তিনি স্নান করবেন, আমি যদি তখন বসে থাকতাম ঐ ঘাটের পাষাণে, তা হলে কারো আপত্তি করার কোনো কথা না। এমন কত স্নান ত হচ্ছে ঘাটে-ঘাটে—তার জন্যে সব পুরুষদের ধর্মশালায় গিয়ে ঢুকতে হচ্ছে না। কিন্তু আমি সে সব যুক্তিতর্কের কথা ভাবার আগেই রওনা হয়ে চলে এসে এখন এখানে বসে নিজের সঙ্গে ঝগড়া করতে আরম্ভ করলাম।

মালতী ঘোষালকে নিয়ে এমন ঝগড়া অনেকবার হয়েছে অনেকের সঙ্গে। তরুণের সঙ্গে তাপসের সঙ্গে হিমাংশুর সঙ্গে অরুণের সঙ্গে। কিন্তু সে কথা আজকের নয়—বারো-তেরো বছর আগের।

আমরা পাঁচ বেকার বন্ধু মিলে একটা বেকারি খুলেছিলাম। চাকরি খুঁজে খুঁজে হয়রান হওয়ার চেয়ে বেকারি অনেক ভাল বলেই আমরা এই ব্যবসা আরম্ভ করেছিলাম পাঁচ অনাড়িতে। তার উপর আমাদের ইচ্ছা ছিল কারো গোলামি না করে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জন করার। এতে উপার্জনও ভাল হতে পারে এবং এতে মান-ইজ্জতও বজায় থাকে।

আপনারা সে-অঞ্চলটা চেনেন কি না জানিনে। আগে যদি দেখেও থাকেন, এখন আর তা চিনতে পারবেন না। নতুন নতুন বাড়ি উঠে জায়গাটার চেহারাই বদলে গিয়েছে। কম্পাস-লেকের লাগোয়া কেয়াতলার কথা বলছি। আমরা এখানে একটা খোলার খাপরায় আমাদের বেকারি খুলেলাম। পাউরুটি বিস্কুট কেক তৈরি হতে লাগল এখানে। কিন্তু আপিস খুললাম সদর-রাস্তায়—মনোহরপুকুর রোডে। এক-তলার একটা বড় ঘর নিলাম, তার সামনে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলাম—'মাই বেকারি'। মনে হয়েছিল এই নাম দিলে চট করে নামটার প্রচার হবে। প্রত্যেকেই যদি মাই বেকারি বলে, তা হলে মনে হবে যেন বেকারিটা তাঁদের সবারই, সুতরাং তাঁরা এর পৃষ্ঠপোষণ করবেন।

পাঁচ পার্টনার সকালে কেয়াতলার কারখানা থেকে মাল চারদিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দুপুরে এসে বসি আপিসে। চিঠিপত্র টাইপ করা হয়, এজেন্ট অ্যাপয়েন্ট করা হয়, হিসাবপত্র লেখালেখি হয়। লোকসানটা কমে গিয়ে খরচপত্র বেশ উঠে যাচ্ছে দেখে আমাদের কাজে উৎসাহ বাড়ে। আমরা শপথ করি—এই স্বাধীন ব্যবসায়ে লেগে থেকে আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে এক বিরাট যজ্ঞশালায় পরিণত করব। যজ্ঞশালা কথাটা উঠেছিল কেয়াতলার কারখানার সারিবদ্ধ উনুনের কথা মনে করে—যেখানে স্যাকা হত রুটি-বিস্কুট।

আমরা পাঁচজনে সারাটা দুপুর কাটাই এই আপিস-ঘরে। কাজ যতটুকু ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল কাজের ভড়ং।

তাপস খটখট শব্দ করে চিঠি টাইপ করে। বার বার ভুল হয়, কাগজ ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে টাইপ করে। একটা চিঠি শেষ করতেই প্রায় একবেলার ধাক্কা। কিন্তু উপায় নেই, সে ছাড়া টাইপ করতে আর কেউ জানিনে।

এই জন্যে ঘরের মধ্যে ঐ খটখট শব্দ প্রায় সারাটা দিনই লেগে থাকে। ঐ শব্দটার সঙ্গে মিলে গিয়ে আর একটা শব্দ যে এতদিন আমাদের কানকে ধাপ্পা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে টেরই পায়নি।

আবিষ্কার করল তাপসই। মেসিন থেকে হাত তুলে নিয়ে বলল, "মুরলী, ও কিসের ধ্বনি রে?"

কান পেতে একটু শুনে উঠে গিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম উঁচু-হিলের দুটি মজবুত পা সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর থেকে আমাদের কাজে মনোযোগ হয়ে গেল ডবল। কিন্তু চোখ-দুটো বার বারই বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত।

দরজার কাছ থেকে চট করে সরে এসেই তাপস বলল, "ওরে বাবা! এ গ্রেট মহিলা। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি বপু। পিষে যাব, এ স্টীমরোলার।"

এই গ্রেট মহিলাই হচ্ছেন মালতী ঘোষাল। আমরা এর বাংলা ট্রান্সলেশন করেছিলাম—মহীয়সী মহিলা।

কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম—উনিও আমাদের লাইনেরই। উনিও স্বাধীন ব্যবসায়ে বিশ্বাসী। দোতলায় তাঁর আপিস। মেয়েদের বিবিধ ব্যবহারের নানারকম উপকরণ তিনি স্বয়ং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাপ্লাই করেন। তাই আপিসে আসার তাঁর বাঁধা কোনো সময় নেই। ঐ ঘরে তিনি মালপত্র এনে জড়ো করেন, ওখানে বসেই হয়ত হিসেবপত্র করেন, চিঠিপত্রও লেখালেখি করেন নিশ্চয়।

মাই বেকারির পার্টনার পাঁচ বেকার আমরা। আমরা ঐ জুতোর হিলের শব্দের জন্যে কান পেতে বসে থাকি। যখনই বেজে ওঠে ওই আওয়াজ, অমনি তীক্ষ্ণ শরের মত আমরা নিক্ষেপ করি আমাদের দৃষ্টি।

এর মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই—এ নিছক কৌতূহল। অমন স্বাস্থ্য, অমন ফিগার, অমন চেহারা, অমন রং, অমন মুখ—আলাদা আলাদাভাবে পাঁচ জায়গায় দেখা যেতে পারে, কিন্তু মাত্র একটি শরীরে ঐ পঞ্চগুণ এসে ভর করা একটু অসম্ভব ও অস্বাভাবিকই বটে।

মালতী ঘোষাল জুতোর হিল দিয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পিয়ানো বাজাতে বাজাতে উঠে গেলেন উপরে। আমরা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললাম।

তাপস বলল, "গ্র্যান্ড। নাম বদল করতে হবে আমাদের কোম্পানির। নতুন নাম মাথায় এসেছে।"

হিমাংশু বলল, "কী নাম রে?"

"পঞ্চশর। এই হচ্ছে কোম্পানির আসল নাম। ওসব মাই-ফাই বাদ দাও, এর নাম রাখ—পঞ্চশর বেকার্স অ্যান্ড কনফেকশনার্স প্রাইভেট লিমিটেড।"

কথা শেষ করে তাপস মেসিনে গিয়ে বসল টাইপ করতে।

সে নাম অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর রাখা হয়নি। কিন্তু আমাদের চোখের দৃষ্টি পঞ্চশরের মত তীক্ষ্ণ ও মারাত্মক হয়ে উঠতে লাগল।

ঐ বিপুল আর বলিষ্ঠ মহিলার মুখোমুখি হবার ভরসা কারো কোনো দিন হয়নি।

কিন্তু তফাত থেকে হলেও আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি ও'র রং আর ও'র রূপ। আর, আক্ষেপ করেছি ও'র জন্যে। সারা দেশ খুঁজে ও'র উপযুক্ত দোসর পাওয়া কষ্ট। হয়ত তেমন দোসর পাননি বলেই মহিলাটির এই কষ্ট। এই রোদে-রোদে ঘোরা। এই স্বাধীন ব্যবসায়ে নামা।

তাপস বলল, "গুনতিতে উনি একটা। কিন্তু হিসেব কষে দেখ, নিজেকে মেনটেন করা মানেই পাঁচজনকে পোষা। ও'র জামার জন্য যা কাপড় লাগে, তাতে নরম্যাল সাইজের পাঁচটা মেয়ের জামা হয়। ও'র ঐ শরীর জ্যান্ত রাখার জন্যে খাদ্যও কিন্তু—"

হিমাংশু হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে দিয়ে জড়ো হয়ে বসে ছিল চেয়ারে, পা-দুটো নামিয়ে সোজা হয়ে বসল, বলল, "রাখো তোমার ম্যাথমেটিকস। একজন মহিলা স্ট্রাগল্ করছেন, আর তুমি তার ভরণ-পোষণের কথা নিয়ে—"

আমরাও হিমাংশুর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাপসকে খুব ধমক-ধামক দিতে আরম্ভ করলাম। সে ধমকে অবশ্য ঝাঁজ ছিল না, ছিল তামাশার আমেজ।

তাপস হাত-দুটো জড়ো করে বলল, "মাপ চাই। আর ও-সব কথা না, এখন আমাদের একমাত্র অ্যাম্বিশন হোক—ও'র সঙ্গে কথা বলা আলাপ করতে হবে ও'র সঙ্গে।"

প্রস্তাবটা উত্তম। কিন্তু কে প্রথম ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজে এগিয়ে যাবে, এইটেই হল সমস্যা।

সে সমস্যার সমাধান হয়নি কোনো দিন। ঐ পারসোন্যালিটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি আমরা কোনোদিন।

কেবল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছি করজোড়ে। প্রতি-নমস্কার তিনি করেন নি কোনো দিন। প্রত্যুত্তরে সামান্য-একটু হেসেছেন। সেই মারাত্মক হাসি আমাদের বুকের মর্মমূলে গিয়ে আমাদের অভিভূত করে দিয়েছে মাত্র—চুর করে দিয়েছে নেশায়।

আমাদের বেকার জীবনে রোমাণ্চ আর উদ্দীপনা ছিল মনোহরপুকুর রোডের এই ঘরটা। কেরানিগিরির কারখানায় সময় কাটানোটা সময়ের অপচয় বলে মনে হত মনে হত সমস্ত কাজ যেন জমা হয়ে আছে মনোহরপুকুরের আপিসঘরে।

আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আমাদের এই কাজ নিয়েই। কিন্তু মালতী ঘোষালের মুখে কখনো ক্লান্তি দেখিনি। হাতে ব্যাগ ও শৌখিন একটা থলে নিয়ে তিনি হয়ত হেঁটে এলেন অনেকটা পথই, কিন্তু সাজপোশাক থেকে আরম্ভ করে তাঁর মুখের ভাব—কোথাও একটুকু ক্লান্তির ভাঁজ নেই।

তরুণ বিশেষ কথা বলত না, সেদিন বলল, "রহস্য। আমরা পাঁচজনে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি এই ব্যবসা নিয়ে, লোকসান রুখবার জন্যে কত গবেষণা করে চলেছি। আর উনি দিব্যি আরামে ব্যবসা চালাচ্ছেন—এ বিজনেসের সিক্রেট জানতে হবে।"

তার মুখের দিকে আমরা অবাক হয়ে তাকালাম।

তরুণ বলল, "সিরিয়াসলি বলছি। যা জানিনে তা জেনে নিতে অসম্মান নেই।"

কিন্তু কি করে জানা হবে সেই সিক্রেট? যার সম্মুখে গিয়ে সোজাসুজি দাঁড়াবারই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে গিয়ে কিভাবে বলা হবে—'বলুন আপনার গোপন কথাটি'।

সমস্ত পরিকল্পনা ও যাবতীয় গবেষণা বন্ধ করে আমরা সেই সঙ্গে আমাদের কারবারও বন্ধ করে ফেললাম। মনোহর-পুকুরের আপিসঘরে তালা লাগিয়ে জীবন ধারণের উপযোগী রসদের জন্যে আমরা নতুন ক্ষেত্রে পাদর্পণ করলাম।

স্বাধীন ব্যবসায়ের কথা ভুলে চাকরি নিলাম রেল-কোম্পানিতে। পাঁচ বন্ধু ছড়িয়ে পড়লাম পাঁচ দিকে। পণ্চশর বিক্ষিপ্তভাবে বুঝি নিক্ষিপ্ত হল লক্ষ্য-হীনভাবে।

অনেক জায়গায় গিয়েছি ভারতবর্ষের। কাশীতেও এসেছি এর আগে বার-কয়েক। এবং এখানে পছন্দ করেছি কেদার-ঘাটটা। এমন বিরাট আর বিশাল ঘাট দেখিনি আর কোথাও। এমন নির্জন ও পরিচ্ছন্ন এলাকাও বুঝি নেই কাশীতে।

সেই ঘাটে এসে দেখা হয়ে গেল একটা পুরাতন দিনের পরমরমণীয় স্মৃতির সঙ্গে। যাঁর সঙ্গে দেখা হল এখানে, ভাবতে ভালই লাগল, তিনিও এই ঘাটের মতই বিরাট আর বিশাল এবং তিনিও এরই মত পরিচ্ছন্ন আর নির্জন।

তাঁর সিঁথিটা লক্ষ্য করেছিলাম, সিঁথিটা আগের মতই সাদা।

পরের দিন আরো রাত থাকতে উঠে বসলাম গিয়ে ঘাটের পাষাণে। কার যেন প্রতীক্ষায় এসে বসে আছি। ক্রমে ক্রমে ভোর হল, সকাল হল, রোদ উঠল। কিন্তু দেখা হল না কারো সঙ্গে।

তবে এ ভরসা দেওয়া কেন—আবার দেখা হবে?

আক্ষেপ হতে লাগল। মনে হল ভুল করেছি কালকে। এই ঘাটে বসে থাকাই উচিত ছিল। তিনি স্নানে নামবেন বলে আমাকে ধর্মশালায় গিয়ে ঢুকতে হবে কেন। অতটা ভদ্রতা করা নিশ্চয় ভুল হয়েছে। বে-মানুষ নিজের কথা রাখতে পারে না, সে-মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা করতে যাওয়া আহাম্মুকি।

তিন দিনের বেশি থাকতে দেয় না ধর্ম-শালায়। কিন্তু আগের চেনাশুনা ছিল, তারই সুযোগ নিয়ে আরো কয়েকটা দিন থাকার ব্যবস্থা করলাম। শুধু ব্যবস্থাই নয়, এ পাশের কেদারঘাট থেকে আরম্ভ করে অপর প্রান্তের মণিকর্ণিকা পর্যন্ত সকাল দুপুর সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু দেখা হল না কারো সঙ্গে:

কেদারঘাটে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অহংকার করেছিলাম, তা চুরমার হয়ে গেল। তরুণ অরুণ তাপস আর হিমাংশুদের ডেকে ডেকে বলেছিলাম—এই মুরলী বটব্যালকে দেখে যেতে। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে হঠাৎ কোনো চেনা লোকের সঙ্গে যেন দেখা আমার না হয়। আমার এই উদ্দেশ্যহীন ঘোরা দেখে তারা আমাকে নিশ্চয় ব্যঙ্গ করবে।

আর কেউ আমাকে ব্যঙ্গ না করুক, নিজেকে নিজেই ব্যঙ্গ করতে লাগলাম। ঠিক করলাম—আর না, এবার ইতি; এবার মায়া আর মমতা ওই গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে প্রস্থান করা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম গোধুলিয়ার মোড়ে।

আকাশেও তখন গোধূলি নেমেছে। ক্লান্ত পাখিরা ঘরে ফিরছে। দিনের কাজ সমাপ্ত করে সেইসঙ্গে ঘরে ফিরছে কাশীর জনতা।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনে পড়ে গেল সেই পণ্চশরের কথা। বুকের মধ্যে যেন বিঁধল এসে একটা বাণ।

এই কি সেই? মনে হল—চিনি, মনে হল চিনি নে। এই অপরূপ রূপ দেখে সমস্ত শরীর যেন আফিমের নেশায় অবশ হয়ে গেল।

সাটিনের সালোয়ারে আলো পড়ে আমার চোখে বুঝি ধাঁধা লেগে গেল। মনে হল—এক আলেয়া। ঐ আলো ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

এগিয়ে যাবার জন্যে দু বার শরীরে ঝোঁক দিলাম। কিন্তু এগতে পারলাম না। তাঁকেই লজ্জা দেব, না, নিজেই লজ্জার হাত এড়াব—কিজানো এই দ্বিধা হল বলতে পারব না।

মিষ্টি গানের আওয়াজ কানে ভেসে আসছে অল্প দূরের ঐ বাড়ির দোতলা ঘর থেকে।

শরীরে বল ও মনে শক্তি আনার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলাম।

অবশেষে বেপরোয়া হয়ে দোকানের সামনে গিয়ে বললাম, "কড়া জর্দা দিয়ে একটা পান দাও ত বাদশাহী।"

# অশরীরিণী

নবেন্দু ঘোষ

আমি তার কথা ভুলতে পারি না।

সমাজ সংস্কার, মানুষের ভালবাসার বাঁধা রীতি, বাঁধা নীতি—আমি ওসব কিছুই মানি না বলে তাকে আরো ভুলতে পারি না। কাজে অকাজে তার মূর্তি নিত্য আমাকে প্রেতিনীর মত অনুসরণ করে, তার স্মৃতি আমাকে অহরহ তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি পোড়ায়। সে আমাকে ভালবাসেনি, কিন্তু আমি তাকে ভালবেসেছি।

তোমরা হয়ত ভাবছ যে আমি আবোল-তাবোল প্রলাপ বকছি। না না, আমি সত্যি কথাই বলছি। প্রায়-অবিশ্বাস্য, প্রায়-অবাস্তব কিন্তু সত্য। শোন ঃ

প্রায় তিন বছর আগেকার কথা।

মে মাসের একটি সন্ধ্যায় দাদারের একটি এলাকায় আমি শেখরের বাসার খোঁজ করছিলাম। শেখর আমার বাল্য-সুহৃৎ। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল দুমুকা থেকে। সাত বছর আগে—সেই যেবার ও এম, এ পড়তে কলকাতা চলে গেল। দু' তিন বছর চিঠিপত্র চলেছিল, তারপর যা হয়। সময় আর দূরত্ব বড় বন্ধুত্ব, বড় প্রেম আর বড় শোককেও ঝাপসা করে তোলে। আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। মাঝে একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, শেখর নাকি কোন এক পাবলিসিটি ফর্মে ভালো চাকরী করছে। কিন্তু বিস্তৃত খবর নেবার আর অবকাশ পাইনি। এক ওষুধের কোম্পানীর চাকরী নিয়ে আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে, ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বোম্বাই হেড অফিসে যখন ভ্রাম্যমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেলাম তখন এক বন্ধুর চিঠিতে জানতে পারলাম যে শেখর সপরিবারে বোম্বাইতেই আছে।

বাসাটা খুঁজতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। বোম্বাই শহরের পুরোন বাড়িগুলো কোন নম্বরে বিশ্বাস করে না। তার বদলে তাদের নাম থাকে। শেখরের বাড়ির নামটা বেশ জমকালো-'অমৃত-ভুবন'। কিন্তু নাম থাকা সত্ত্বেও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হয়ত ফিরেই যেতাম, কিন্তু শেখরের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, তাই হার মানলাম না। শেষ পর্যন্ত যখন 'অমৃত-ভুবন' খুঁজে পেলাম তখন মনে হল যেন চতুর্দশ ভুবন পেরিয়ে এসেছি।

শেখরের ফ্ল্যাটে পৌঁছুলাম।

বহুক্ষণের অসহিষ্ণুতাকে কড়ার ওপর সবলে প্রয়োগ করলাম।

দরজা খুলে গেল। কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। ভেতর থেকে এক টুকরো আলো এসে বাইরে পড়েছিল। মনে হল তা যেন মেয়েটিরই অঙ্গ-জ্যোতি। রূপসী বলতে সাধারণত যা বোঝায় সেদিক থেকে মেয়েটি মোটেই নিখুঁত নয়। কিন্তু তবু তার ঈষৎ-কৃশ দেহলতার কোমল রেখাটুকু, তার গভীর

কালো চোখের রহস্যময় চাউনিটা কেমন যেন ভালো লাগল।

"কাকে চান?"

শেখরের নাম করতেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

বললাম, "আমার নাম বিনয় দত্ত—আমি শেখরের বাল্যবন্ধু।"

"চিনেছি। আসুন—"

, চিনেছি মানে? অবাক হয়ে মেয়েটির অনুসরণ করলাম।

করিডোর দিয়ে এগিয়ে সামনের একটি মাঝারি সাইজের ঘরের ভেতর ঢুকে মেয়েটি বলল, "ওই যে জামাইবাবু।"

স্তূপাকার বই ও কাগজের মধ্যে শেখর ডুবে ছিল, মেয়েটির গলা শুনে মাথা তুলল। মুহূর্তকাল বিহ্বলের মত সে তার ভাসা-ভাসা কবি-দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরেই উঠে দাঁড়াল, ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, "বিনু!"

তার গলার অস্বাভাবিক আওয়াজে ভেতর থেকে একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক ছুটে এল। চারুদর্শনা। শান্ত, স্নিগ্ধ তার ব্যক্তিত্ব।

তাকে দেখেই শেখর বলল, "মল্লিকা—এই হচ্ছে বিনু—আমাদের বিনয়।"

মল্লিকা দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে হাসল। বুঝলাম যে সে শেখরের স্ত্রী।

শেখর আমার হাত ধরে বসাতে বসাতে বলল, "আজ এখানেই থাকতে হবে বিনু—সারা রাত গল্প করব—কেমন?"

এক কথায় রাজী হলাম।

শেখর বলল, "আরে দাঁড়া, আমার সইয়ের সঙ্গে তোর পরিচয় করালাম না"—

"সই কে?"

শেখর হাসল, "ঐ যে—যে তোকে ভেতরে নিয়ে এল—চিন্ময়ী ওরফে চিনু ওরফে যা সেই শব্দটিতে ওর ঘোর আপত্তি বলে বাধ্য হয়ে সই বলি।"

শেখরের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়েই আমার দিকে তাকাল চিনু, হেসে বলল, "আপনি আসাতে আমরা বাঁচলাম বিনয়বাবু।"

"কেন বলুন তো?"

"আপনার বর্ণনা শোনা এবার একটু কমবে—উঃ বাবা—বাড়িতে থাকলেই হল জামাইবাবুর—বিনু এই করত, বিনু এই বলত, বিনু এইভাবে একজনের সঙ্গে মারামারি করেছিল, বিনু এই পার্ট করেছিল, বিনু বড় জেদী আর অভিমানী, বিনু বিনু বিনু—আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে বিনু কখনই বিনয় নয়, নিশ্চয়ই সে বনোদিনী।"

"শেখর ও আমি হেসে উঠলাম।"

মল্লিকা ভর্ৎসনার সুরে বলল, "এই চিনু—"

চিনু বলল, "মাপ করবেন বিনয়বাবু—বাচাল বলে আমার একটু বদনাম আছে।"

শেখর বলল, "পরম সত্য কথা—হে সত্য-ভাষিণী, যদি তোমার বাচালতা-দোষ খণ্ডন করতে চাও তো দিদির সঙ্গে বসে বিনুর জন্য ঝট্‌পট্ চা আর জল খাবার তৈরী করে আনো—"

"যথা আজ্ঞা সার সত্যমুগ্ধ—চলরে দিদি—"

দুই বোন হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল।

আমাদের আড্ডা জমে উঠল। মনে হল যেন বোম্বাইয়ের প্রাণহীন আবহাওয়ার মধ্যে দুমকা-শহরের হারানো দিনগুলো আবার উড়ে ফিরে এল। পার্বলিসিটির কাগজের স্তূপেকে শেখর মুহূর্তে ভুলে গেল। আমি আমার পাঞ্জাবী হোটেলের কথা ভুলে গিয়ে বেপরোয়াভাবে স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে এলোমেলোভাবে অতীতের ছোটবড় ঘটনা তুলে ধরতে লাগলাম। খাবার এল, চা এল। মল্লিকা আর চিন্ময়ী এসে কাছা-কাছি বসল। আমাদের চারদিকে অজস্র ও অর্থহীন কথার ঝরণা কলকল শব্দে চার-দিকে বয়ে চলল।

হঠাৎ শেখর প্রশ্ন করল, "বিয়ে করেছিস?"

মাথা নেড়ে বললাম, "মনোমত পাত্রী পাইনি।"

"সে আবার কি কথা!"

"জানিসই তো আমার রুচি আলাদা—বৌদি মাপ করবেন—আমার কাছে শুধু বহিরঙ্গটাই বড় কথা নয়, মনকে স্পর্শ করে এমন মেয়ে এখনো পাইনি।"

চিনুর হাসি শুনে তাকালাম, প্রশ্ন করলাম, "আপনার কি আমার কথা শুনে হাসি পেল?"

চিনু বলল, "পেল। আমার বাচালতা মাপ করুন বিনয়বাবু—না হেসে পারলাম না, আপনার কথাগুলো বেশ কাব্যি কাব্যি লাগছিল।"

মল্লিকা ধমক দিল, "এই চিনু—"

চিনুর ব্যঙ্গে একটু খোঁচা লাগল। সেই খোঁচা যেন চিনুর দিকে নতুন চোখে চাইতে বাধ্য করল আমায়। মন বলল, একটু নজর রেখো এই প্রগলভার ওপর। হয়ত তোমার অন্বেষণের সমাপ্তি ওর ওই কালো গহনেই ঘটতে পারে। মনকে বললাম, তথাস্তু।

কিন্তু আপাতত যে কথাটা ঘোরাতে হয় তাই বললাম, "তুই কবে বিয়ে করলি সেই কথা বল শেখর—বৌদি কোথাকার মেয়ে?"

"কলকাতার।"

চিনু বলল, "প্রথমে ঢাকার, পার্টিশনের পরে কলকাতার।"

শেখর বলল, "জানিস—মল্লিকা বামুনের মেয়ে—"

"বটে!"

মল্লিকা বলল, "বুঝলি চিনু, অব্রাহ্মণেরা এবার ব্রহ্মণ্য-গৌরবকে হতমান করার কাহিনী আলোচনা করে উৎকট আনন্দ উপভোগ করবে।"

চিনু উঠে বলল, "ধিক্ অব্রাহ্মণদের। চলরে দিদি, আমরা রান্নাঘরে গিয়ে এই উদ্ধত ও বলগর্বী ক্ষত্রিয়দের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করি।"

"তাই চল্।"

ওরা গেলে শেখর বলল তার বিয়ের গল্প।

শেখরের বাবার বন্ধু ছিলেন মল্লিকার বাবা। শেখর যখন এম, এ পড়তে কলকাতা গেল তখন বৃহৎ সংসারের ভারে ক্লিষ্ট বাপকে দেখে সে ঠিক করল যে নিজের খরচ সে নিজেই চালাবে। একটা মাস্টারী সে জোগাড় করেও নিল। মাতৃহীনা মল্লিকা ও চিন্ময়ীর বাবা তা জানতে পেরে বন্ধুর ছেলেকে ডেকে দুই মেয়ের পড়ার ভার দিলেন। মল্লিকার বয়স তখন সতেরো, সে আই, এ পড়ছে। চিনুর বয়স তেরো, সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে।

পড়াশোনা চলতে লাগল। পিতৃবন্ধুর বাড়িতে শেখরকে কেউই গৃহশিক্ষক বলে মনে করত না। সে যেন বাড়িরই একটি ছেলে। শাস্ত্র ও সমাজ-মতে শেখর আর মল্লিকার সম্পর্ক গুরু-শিষ্যার হলেও কিন্তু তারা আইন-ভঙ্গ করল। পাঠ্য-পুস্তক পড়াতে পড়াতে গৃহশিক্ষক শেখর একটি যুবতী-চিত্তের দুর্বোধ্য রহস্য-লিপির পাঠোদ্ধার করল এবং ছাত্রী মল্লিকা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হচ্ছে শেখর এবং সে তার জন্যে জাতি-কুলমান সব কিছুই অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত। যখন দুজনেই দুজনের কাছে হৃদয় মেলে ধরল তখন এম এ পাশ করে শেখর চাকরীর চেষ্টা করছে এবং মল্লিকা আই, এ পাশ করেছে। ইতিমধ্যে প্রেমের লক্ষণ বাহাত প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রেম নাকি খুনের মতই সাংঘাতিক ব্যাপার—আত্মগোপন করতে পারে না। সুতরাং শেখরের শিক্ষকতা-পর্বের ও মল্লিকার ছাত্রী জীবনের সমাপ্তি ঘটল। শেখর মল্লিকাকে বিয়ে করতে চাইল। মল্লিকার বাবা উত্তেজিত হয়ে তারযোগে বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন। শেখরের বাবা এসে ও সব শুনে বিশ্বাসভঙ্গের গ্লানি বোধ করলেন। তিনি ছেলেকে তিরস্কার করলেন ও ভয় দেখালেন। মল্লিকাদের বাড়ি শেখরের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে উঠল। কিন্তু শেখর আর মল্লিকার দুঃসাহসকে কোন নিষেধই ব্যর্থ করতে পারল না।

দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে লাগল এবং এবিষয়ে সাহায্য করতে লাগল চিনু। তেরো থেকে সে এখন সতেরোর পূর্ণতায় এসে পৌঁছেছিল। ওদিকে মল্লিকার বিয়ের তোড়জোড় শুরু হল। ঠিক যেমনটি হয়। মল্লিকা শেখরকে চিন্তাগ্রস্ত হতে নিষেধ করল কারণ কেরোসিন কিংবা বিষের অভাব নাকি বাংলাদেশে নেই। শেখর মরিয়া হয়ে উঠল। আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ এক গুজরাটি বন্ধুর সাহায্যে বোম্বাই শহরের এক পাবলিসিটি ফার্মে তার চাকরি ঠিক হয়ে গেল। কিছুদিন পরই বাড়ি থেকে উধাও হল মল্লিকা। এক বামুন পণ্ডিতের ওখানে লুকিয়ে দু'তিনজন বন্ধু সাক্ষী রেখে মল্লিকাকে বিয়ে করে শেখর পরদিনই সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করল। মল্লিকার বাবা পরদিন কুল-ত্যাগিনী কন্যার চিঠি পেলেন। মল্লিকা জানিয়েছে যে সে সাবালিকা। স্বেচ্ছায় ভালবেসে যোগ্য পুরুষকে বিয়ে করেছে সুতরাং বাবা যেন থানাপুলিস ছেড়ে দিয়ে প্রসন্নচিত্তে তাদের আশীর্বাদ করেন। বলা বাহুল্য থানাপুলিসে দৌড়োদৌড়ি বন্ধ করলেও মল্লিকার বাবা মেয়ে জামাইকে ক্ষমা করলেন না।

বোম্বাই গিয়ে জীবনের সেই নূতন-পর্বে শেখর নাকানি-চোবানি কম খেল না। কিন্তু মল্লিকা এতটুকুও নিরাশ হল না, হাসিমুখে সে স্বামীর সঙ্গে সমস্ত কষ্ট সহ্য করল। প্রেম যখন উৎসাহ জোগায় তখন মানুষ সব পারে। সুতরাং তাদের জয় হল। যোগ্যতাবলে শেখর উন্নতি করল, ভাল ফ্ল্যাট পেল, রুষ্ট পিতাকে নিয়মিত সাহায্য করে প্রায়-নরম করে আনল। কিন্তু মল্লিকার বাবার রাগ এক তিলও কমল না। সেই রাগ পুষে পুষে তিনি তাঁর অকালজীর্ণ দেহকে আরো অকালে ক্ষয় করে তিন বছর বাদে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বিয়ের পর সেই প্রথম শেখর মল্লিকাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল। শ্বশুর কিছুই রেখে যাননি। কাকা এখন সংসারের মালিক। তিনি তাদের আদরও করলেন না, অনাদরও করলেন না। ক'দিন বাদে বোম্বাই ফেরার সময় আসতেই চিনু ধরে বসল যে তাকে নিয়ে যেতেই হবে। সত্যি তো, কথাটা ভাবাই হয়নি। কাকার সংসারে একা একা চিনু কি করবে? আশ্বস্ত হতে না পেরে চিনুকে নিয়েই এল মল্লিকা। সেই থেকে চিনু বোম্বাইতেই আছে। আই, এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছে সে। এবার তার বিয়ে দিলেই হয়।

গল্প শেষ করে শেখর গলা নীচু করে বলল, "তুই তো এখনো বিয়ে করিসনি—দেখ না চিনু তোর মন স্পর্শ করে কিনা।"

হেসে বললাম, "দোহাই শেখর, ওদের কানে একথা তুলে আর আমার আসা বন্ধ করিসনি। অনেক কষ্টে বিদেশ বোম্বাইতে একটি বাল্যবন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি—সেই বন্ধুকে ভায়রাভাই করার ইচ্ছে আমার এখনো হয়নি।"

শেখর হেসে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা—আর বলব না।"

শেখর কথা রেখেছিল। এরপর আর একদিনও সে ওকথা বলেনি।

কিন্তু যেভাবেই মানুষ বীজ ফেলুক না কেন—মাটিতে প্রাণশক্তি থাকলে ফল ফলবেই। শেখরের সেই কথার বীজও আমার মনের মধ্যে ক্রমেই অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে চারা হয়ে উঠতে লাগল। তাই অনেক দূর—যোগেশ্বরী থেকেও প্রায় প্রতি সন্ধ্যাবেলাই দাদারে যেতাম। একটি প্রগল্‌ভা, সুচতুরা, তীক্ষ্ণভাষিণীর মনের সন্ধান করতে। কিন্তু সন্ধান পেতাম না। চিনু কথা বলত, হাসিঠাট্টা করত, কিন্তু জোয়ার ভাঁটার কোন লক্ষণই দেখতাম না তার মধ্যে। মনে মনে ভাবলাম যে, হৃদয়-দুর্গ জয় করা তো সহজ কথা নয়। পাথরের তৈরী দুর্গ হয়ত ভেঙে চুরমার করে জয় করা যায়, কিন্তু রক্তমাংস আর মন দিয়ে তৈরী মানুষের যে হৃদয়-দুর্গ তাকে তো আঘাত করে জয় করা যায় না। তাই মনকে বললাম, রহু ধৈর্যং।

চিনুর মন বুঝি আর নাই বুঝি যাওয়া বন্ধ করলাম না। তাছাড়া চিনু ছাড়াও তো আকর্ষণ কম ছিল না। শেখরের বন্ধুত্ব আর মল্লিকার স্নেহ ছিল। ওদের ওখানে গেলেই মনটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠত।

এমনিভাবে দিন কাটতে লাগল। বোম্বাইয়ের আরব-সাগর, মালাবার হিল, জুহু বীচ আর এলিফেণ্টা কেভস্ পুরোন হয়ে এল। বোম্বাইয়ের প্রচণ্ড রোদ আর প্রচণ্ডতর বর্ষাও মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। শেখরের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হল। আর এরি মধ্যে আমি একদিন অনুভব করলাম যে চিন্ময়ী নামের মেয়েটি আমার মনকে কুহকজালে আচ্ছন্ন করেছে। যখন মনস্থির করলাম যে এবার শেখরকে বলব তখন একদিন তার বাড়ি গিয়ে বড় আঘাত পেলাম। তার আগের দিন আমি যাইনি আর সেদিনই চিনু কলকাতা চলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ গেল যে? কবে ফিরবে?"

শেখর জবাব দিল না।

মল্লিকা দ্রুতকণ্ঠে বলল, "ফিরবে। অনেকদিন এখানে ছিল কাকাও এবার যেতে লিখেছেন। বুঝলেন না, বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে—চেষ্টা না করলে চলবে কি করে?"

"পাত্রের খবর কিছু পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।"

চুপ করে রইলাম। ঠোঁটের কাছে এসেও কথা ফিরে গেল। প্রথম যৌবনের সেই অপ্রগল্‌ভ অবস্থাটা তো আর নেই, আত্ম-মর্যাদার নামে নিজেকে এমনভাবে বর্মাবৃত করে ফেলেছি যে প্রাণ যায় যাক তবু নিজেকে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করব না। সুতরাং চিনু সম্পর্কে আমার মনের কথা মনেই রয়ে গেল। ভাবলাম পরে বলব। ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা আমার চরিত্রের বিশেষত্ব বলে আমি প্রায়ই গর্ববোধ করি। সেই গর্বে নির্বাক হয়েই রইলাম।

কিন্তু চিনু যাবার পর থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলাম। মল্লিকার মধ্যে কেমন যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব। স্বামীর দিকে মাঝে মাঝে সে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যেন সে চোখ ফেরালেই শেখর হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। বসত সে স্বামীর কাছাকাছি, যেন আর কাউকে সে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। যদি চা চাইতাম, জল চাইতাম, পেতাম সবই কিন্তু চাকর এনে দিত। মল্লিকা স্বামীকে ছেড়ে এক পাও নড়ত না। আমার চোখে যে নির্বাক প্রশ্ন ফুটে উঠত তা বোধ হয় টের পেত শেখর কিন্তু সে বিচলিত হত না। পরিবর্তে যখনি সে স্ত্রীর দিকে তাকাত তখন অপরিসীম ভালবাসার এক গাঢ় কোমল ছায়া ঘনাত তার চোখে।

ব্যাপারটা ভাল বুঝলাম না। গর্ভাবস্থায় কি সব নারীই স্বামীকে এমনিভাবে ভাল-বাসে? কিংবা মল্লিকার ভালবাসার ধরণই হয়ত ওই—নইলে সে দেশ ও পরিবার ছেড়ে রাতারাতি কোন সাহসে শেখরের সঙ্গে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিল?

মাঝে মাঝে চিনুর বিষয়ে কথাচ্ছলে হাল্‌কাভাবে প্রশ্ন করেছি এরপর। 'কি হল তার? বিয়ের পাকা কথা কি হয়ে গেছে? বল তো পাত্র দেখি?' এসব প্রশ্নের উত্তরে শেখর সন্তর্পণে হেসেছে কিন্তু দ্রুতকণ্ঠে জবাব দিয়েছে মল্লিকা। যেন সে তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি চিনুর কথা থেকে সরে যেতে চায়। সে সব জবাবও বড় ভাসা-ভাসা—শুনে শুধু অজস্র প্রশ্নই আরো জড় হয়েছে মনে।

শেখরের বাড়িতে যাওয়া কমে এল। আবিষ্কার করলাম যে শেখরের বন্ধুত্ব ও মল্লিকার প্রীতি আর মুখ্য আকর্ষণ নয়। যেদিন যেতাম সেদিনও যেন তাদের জনাই যেতাম না—চিনুর আসার খবরটি শোনার একটা দুরন্ত প্রত্যাশা নিয়েই যেন যেতাম।

শেষে সে যাওয়াও কমে এল। প্যারেলের এক শৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে ঢুকে

সাজাহান নাটকের দিলদারের ভূমিকায় মহড়া দিতে লাগলাম। প্রায় দু'মাস আর গেলাম না। শেখর ব্যস্ত মানুষ, বাড়িতে বসেও সে কাজ করে—সুতরাং সেও খোঁজ নিতে এল না। ভাবলাম সেই ভাল। চিনুর ছায়াটাও মন থেকে মুছে যাক। ওসব অনেক ঝামেলা। যেদিন দেহের পশুটা নিতান্তই শেকল ছিঁড়তে চাইবে সেদিন না হয় তার জন্য মাংসের বাজারে যাওয়া যাবে।

কিন্তু শেখর এল। আগস্ট মাসের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়। তার চেহারা দেখে ভয় পেলাম। শুকিয়ে গেছে। মাথার রুক্ষ চুলে বৃষ্টির জল। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বন্য, উদ্‌ভ্রান্ত।

ধপ্‌ করে একটা চেয়ারে বসে সে বলল, চা খাওয়াবি বিনু?"

চাকরকে চায়ের হুকুম দিয়ে আমি বললাম, "তোর কি হয়েছে রে?"

শেখরের চোখ জলে ভরে এল, সে বলল, "মল্লিকা চলে গেছে বিনু।"

"কোথায়? কি হয়েছে? ঝগড়া করেছিস?"

শেখর দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, "সন্তান প্রসব হতে গিয়ে স্বর্গে গেছে—"

কোন সান্ত্বনার কথাই খুঁজে পেলাম না। কান্না চাপবার প্রয়াসে শেখরের শরীর কাঁপতে লাগল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। দূরবর্তী ইরাণী রেস্তোরাঁ থেকে রেডিওর গান যেন বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে শোক-সঙ্গীত হয়ে উঠল।

কিছুই বলতে পারলাম না। এই দু'মাস আমার না যাওয়ার অপরাধের পরিমাণ স্মরণ করে আমি বোবা হয়ে গেলাম। এ কি অন্যায় করেছি! একটা বাচাল মেয়ের স্মৃতিকে এড়াবার জন্য আমার বন্ধুকে আমি এতদিন ধরে অগ্রাহ্য করলাম!

খানিকবাদে নিজেকে সামলে নিয়ে শেখর সব কথা জানাল। মল্লিকা মারা গেছে প্রায় একমাস হল। বাচ্চাটা বেঁচে আছে। মল্লিকার শেষ দান। একটি ছেলে। দেখতে মায়ের মতই হয়েছে। কয়েকদিন একটি নার্স দেখছিল বাচ্চাকে। তারপর খবর পেয়েই চিনু ফিরে এসেছে।

ধ্বক্‌ করে উঠল বুকটা। চিনু! শেখরের সেই শোকার্ত চেহারার সামনে বসেও আমার মন খুশী হতে লজ্জাবোধ করল না।

বললাম, "আমারি দোষ—এতদিন যাইনি কিন্তু তুই একটা খবর দিলি না কেন?"

শেখর বলল, "খবর দেবার জন্য কোন তাড়া তো ছিল না বিনু। শোকের অংশ নেবার কথা বলছিস? সে তোরা কেউই নিতে পারবি না।"

চুপ করে রইলাম। একথার প্রতিবাদ করব কোন সাহসে?

শেখর বলল, "আজ কেন এসেছি জানিস? একটা সমস্যা হয়েছে—"

"কি?"

"মল্লিকা রোজ আসে।"

চমকে উঠলাম, "তার মানে?"

"তিন চারদিন ধরে ঘটছে ব্যাপারটা। চিনুর ওপর ভর নামে। অজ্ঞান হয়ে যায়, তারপর জ্ঞান ফিরে আসতেই অন্য মানুষ হয়ে যায়। ঠিক যেন মল্লিকা।"

"অসম্ভব।" একটা রূঢ় ভঙ্গীতেই বলে ফেললাম।

শেখর মাথা নাড়ল, "অসম্ভব হলেই হয়ত ভাল ছিল।"

"দিনে ক'বার হয় এমন?"

"আজ দু'বার হয়েছে—এতদিন একবার—"

"ভর নামলে চিনু কি বলে?"

শেখর বলল, "চিনু তো বলে না—তখন যেন মল্লিকা কথা বলে। বলে যে ছেলেটার জন্য আসছি—ছেলে আর স্বামীকে এক সঙ্গে নিয়ে ঘর করতে কেমন লাগে তার স্বাদ তো পাইনি। তাছাড়া তুমি আমার জন্য ভেবে ভেবে দেহপাত করবে তা আমি সইব না—তোমায় সময়মত খেতে হবে, ঘুমোতে হবে, শরীরের যত্ন করতে হবে—আমি তোমারই, আমি তোমার কাছে কাছেই থাকব—"

আমার চাউনি দেখে শেখর বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, কালকের দিনটা ছুটি নিয়ে আমার ওখানে আয়?"

রাজী হলাম। শেখর চলে যাবার পর সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। মল্লিকার আত্মার ওপর রীতিমত রাগ হতে লাগল। তার ভালবাসাকে বিশ্বাস করি কিন্তু চিনুকে কষ্ট দেওয়া কেন? মল্লিকার মৃত্যু, চিনুর প্রত্যাবর্তন, তার ওপর ভর নামা—সমস্ত ঘটনাগুলোই এত আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল যে সারারাত আমি শুধু ছটফট করেই কাটালাম। ঘুম আর এল না।

পরদিন শেখরের বাড়ি গেলাম।

আজো দরজা খুলল চিনু। বেশ রোগা হয়ে গেছে। আমায় দেখে ম্লান হাসল।

"কেমন আছো চিনু?"

প্রশ্নটা করেই লজ্জা পেলাম। একি অর্থহীন প্রশ্ন করলাম?

কিন্তু চিনু আমার লজ্জা বাড়াল না, বলল, "আসুন।"

সঙ্গে যেতে যেতে বললাম, "তোমার ওপর আমার রাগ জমা আছে চিনু—"

"কেন?"

"যাবার আগে একবার জানতেও পারলাম না?"

"তাতে কি হয়েছে—এই ত' দেখা হল—আপনি ও ঘরে যান, আমি চা নিয়ে আসছি।"

শেখরের ঘরে গিয়ে বসলাম। সকাল কাটল, দুপুর হল। খাওয়া দাওয়া ওখানেই সারলাম। কিন্তু কই? চিনুকে তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। শেখর বলল রাত পর্যন্ত থাকতে। রাজী হলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল পার হতেই চারদিক অন্ধকার করে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি এল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মেঘের ডাক আর হাওয়ার ধাক্কায় জানালা দরজা কাঁপতে শুরু করল। চিনু চা আর তেলে ভাজা এনে দিল। শেখরের সঙ্গে গল্প শুরু করলাম। ওঘর থেকে নবজাত শিশুটির কান্না শোনা যেতেই চিনু চলে গেল। একটু বাদেই বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে সে আবার ফিরে এল। এতক্ষণে তার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম। যেন সে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। শেখরের চোখেমুখে ক্লান্তি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। তার মনের অবস্থাটা টের পেয়ে আমি নানারকমের হাসির কথা বলতে শুরু করলাম। শেখরের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল, একটু হাসল সে। আমার একটা হাসির কথা শুনে চিনুও হেসে ফেললে।

আমি চিনুর দিকে তাকালাম। হাসলে যেন তার রূপ বেড়ে যায়। কিন্তু আমার চোখে যে মুগ্ধতা ঘনাল তা মুহূর্তে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল। চিনুর মুখের হাসি আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। এক ফুঁয়ে আলো নিভিয়ে দিলে অন্ধকারের যেমন ঝাপটা লাগে—চিনুর মুখের হাসির রেখা তেমনি এক মুহূর্তে বেদনার বাঁকা রেখায় বদলে গেল। অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ করে সে মুহূর্তকাল আমাদের দিকে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তারপর সোফায় মধ্যে ঢলে পড়ল।

বাইরে কোথাও দূরে বাজ পড়ল।

শেখর লাফিয়ে চিনুর কাছে গিয়ে বলল, "সে এসেছে।"

আমিও কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, লক্ষ্য করলাম যে দাঁতে দাঁত লেগেছে চিনুর, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। একটু জল নিয়ে এসে তার চোখে মুখে ছিটে দিতেই চিনু চোখ মেলল। আবার মুহূর্তকাল সেই আগেকার মত ফ্যালফ্যাল চাউনি। তার-পরেই চোখের তারায় চেতনা এল, আর উঠে বসল চিনু, শাড়ির আঁচলটা মাথার ওপর টেনে দিল। যেমন মল্লিকা দিত।

বাইরে হাওয়ার গোঙানি। যেন হাজার হাজার প্রেতিনী কাঁদছে।

শেখর অস্ফুটস্বরে বলল, "মল্লিকা!"

চিনু শেখরের দিকে তাকাল, তার ঠোঁট নড়ল, "অনেকক্ষণ ধরে এসেছি গো—কিন্তু ঠাকুরপো'র জন্যই ঘরে ঢুকতে ভরসা

পাচ্ছিলাম না।" আমার দিকে ঠিক মল্লিকার মতই মুখ ফেরাল চিনু, একটু ক্লিষ্ট হেসে বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না, না বিনুবাবু?"

আমি কিছু বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন অবিশ্বাস্য অথচ অলৌকিক মনে হচ্ছিল যে কথা বলার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

চিনু বলল, "ভয় নেই বিনুবাবু, কাঁচা বাচ্চাটাকে রেখে গেছি কিনা, তাই টান এড়াতে পারি না। তাছাড়া ওঁকে তো আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না—ওঁর কষ্ট দেখেই আমি ফিরে আসছি—সব গুছিয়ে দিয়ে তারপর আমি চলে যাব।"

এতক্ষণে আমি কথা খুঁজে পেলাম, বললাম, "কিন্তু এভাবে আপনি এলে চিনুর কষ্ট হবে না?"

চিনু অর্থাৎ মল্লিকা বলল, "চিনু আমার বোন, তাকে আমি কষ্ট দেব কেন? আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি বাচ্চাটার কাছে যাই।"

অবিকল মল্লিকার মত ভঙ্গিতে চিনু পাশের কামরায় চলে গেল। দেখে অবাক হলাম। এতক্ষণ ধরে চিনু যে কথা বলছিল তা সত্যি মল্লিকার মত। তার বাচনভঙ্গি, গলার সুর, হাসবার, তাকাবার ভঙ্গি—সব কিছুই মল্লিকার মত।

চিনু যেতেই শেখরও তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল। সম্মোহিতের মত।

"শেখর—"

দরজাতেই থামল শেখর কিন্তু সেই কামরার দিকে তাকিয়েই বলল, "মল্লিকা—"

আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "বোস শেখর—কথা আছে।"

শেখরের চমক ভাঙল, সে বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কতক্ষণ থাকে এ ভাব?"

শেখর মাথা নীচু করে জবাব দিল, "আধ-ঘণ্টা—একঘণ্টা—কোন ঠিক নেই।"

"তারপর আবার চিনু অজ্ঞান হয়ে যায়?"

"হ্যাঁ"—জ্ঞান ফিরে পাবার পর তার কিছুই মনে থাকে না—শুধু ঘুমোয় খানিকক্ষণ। আমিও ওকে কিছু বলিনি—চাকরদেরও নিষেধ করে দিয়েছি—"

আমি বললাম, "ডাক্তার দেখানো উচিত—"

শেখর অবাক হয়ে তাকাল, "তাহলে এটা নাকি?"

বললাম, "হতেও তো পারে—চিনু দিদিকে ভালবাসত তাই হয়ত এমন হচ্ছে—"

শেখর বলল, "কিন্তু অবিকল ওর মত"—

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, "তাহলে চিকিৎসা করাবি না?"

শেখর অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না না—তা বলছি না। বেশ তো বিনু—তুই তাহলে ঠিক করে দে কার কাছে নিয়ে যাব"—

"সে আমি ব্যবস্থা করছি।"

খোঁজ নিয়ে দুদিন বাদেই আমি ভাল ডাক্তার নিয়ে এলাম।

চিনু অবাক হয়ে বলল, "কি হয়েছে আমার?"

আমি বললাম, "তোমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, তাই শেখর বলেছিল ডাক্তার আনতে—"

চিনু রাগ করল, "একি অন্যায় জামাই-বাবু—আমি তো ভালই আছি।"

ডাক্তার আড়ালে বলে গেল, "সবই তো নরম্যাল দেখছি মশাই—"

শেখর বলল, "ব্যাপারটা ঠিক অসুখ নয় বোধ হয়—"

"আমি বললাম, "অসম্ভব—ওকে কোন স্পেশালিস্ট দেখাও"—

"কিন্তু রোগিনী যে বেঁকে বসেছে বিনু—"

ভেতর থেকে চাকর দৌড়ে এল। চিনু মূর্ছা গেছে।

ছুটে গেলাম দুজনে। শোবার ঘরে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে মূর্ছা গেছে চিনু। সেই একই লক্ষণ। জলের ঝাপটা দিতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। সেই কয়েক মুহূর্তের বিহ্বল চাউনি। তারপর ধীরে ধীরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে উঠে বসল চিনু।

শেখর বলল, "তুমি!"

চিনু মৃদুকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ—আমি মল্লিকা।"

শেখরের চোখে এক অদ্ভুত আশ্বাস লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলাম।

চিনু ছেলের দিকে তাকাল, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "জগৎ সংসারটা নানা রহস্যে ভরা বিনু ঠাকুরপো—ডাক্তার আসলেই কি সব বোঝা যায়?"

হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভাল-বাসার নাম করে এই প্রেতিনী কেন চিনুকে কষ্ট দিচ্ছে!

বললাম, "আপনার কথা মেনে নিচ্ছি কিন্তু দোহাই আপনার, চিনুকে আর কষ্ট দেবেন না—আপনি ভালবাসার নাম করে এদের ওপর অত্যাচার করছেন।"

শেখর চমকে উঠে বলল, "বিনু!"

চিনু হাসল। ঠিক মল্লিকার মত। তারপর আমার ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে বলল, "চিনু আমার বোন কিন্তু আপনার কেউ নয় বিনুবাবু।"

বলতে পারতাম যে চিনুকে আমি ভালবাসি, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু একটা অশরীরিণীকে সেই কৈফিয়ৎ দেওয়াটা যেন কেমন অতি-নাটকীয় মনে হল। তাই বললাম, "আমি আপনাদের বন্ধু"—

চিনু ঠিক আগের মতই হাসল, বলল, "বন্ধু বলেই আপনি অনধিকার চর্চা করবেন কেন?"

"শেখর"—আমি শেখরের দিকে তাকালাম। শেখর চিনুর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল। বুঝলাম যে তার অশরীরিণী স্ত্রীর সান্নিধ্যে সে উত্তেজিত।

আবার ডাকলাম, "শেখর!"

শেখর তাকাল আমার দিকে।

চিনু ডাকল, "শোন—"

শেখর তাকাল তার দিকে।

চিনু অবিকল মল্লিকার ভঙ্গিতে বলল, বিনু ঠাকুরপো এসব অবিশ্বাস করেন, না—? ওঁর কিছুদিন না আসাই ভাল।"

আমি বললাম, "শেখর, এতে বিপদ হবে।"

চিনু বলল, "আমি আর কদিন গো?—আমি তো আর কিছুদিন বাদেই চলে যাব—চলে যাব সেই মহাশূন্যের দেশে—এই কটা দিন তুমি বন্ধু ছাড়া হয়ে থাকতে পারবে না? বল—বল—"

আমি ডাকলাম, "শেখর—"

চিনু সুর চড়িয়ে বলল, "ওগো বল—"

শেখর অভিভূতের মত তাকাল আমার দিকে, বলল, "ভাই বিনু, মল্লিকার সম্মান করা উচিত তোর।"

"তাহলে আর আসব না?"

"মল্লিকাকে আমি ভালবাসি বিনু।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি। প্রেতিনীরই জয় হোক। পত্নী-শোকাতুর ঐ উন্মাদের যা ইচ্ছে করুক। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হল যেন মৃত্যুলোক উত্তীর্ণ হয়ে জীবলোকে ফিরে এলাম। বুকভরে বাতাস নিয়ে মনে মনে বললাম, চিনু আমার কেউ নয়, ওই অসুস্থ পরিবেশে আর কোনদিন যাব না।

আর যাইনি। এক বছরের ওপর কেটে গেল। পুজো এল, গেল। রং মেখে অর্জুন সেজে, ধনাই সেজে হিম-সিক্ত রাতের আকাশ কাঁপালাম দুদিন। তারপর বিজয়া-দশমী এল। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেখরের ওপর রাগ করেই থাকব? তাছাড়া চিনুর কি হল?

গেলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে। যেমন প্রথম দিনটি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম শেখরের বদলে অন্য ভাড়াটে রয়েছে সেখানে। মারাঠি পরিবার। তারা বলল যে প্রায় দু' মাস ধরে তারা সেই ফ্ল্যাটে এসেছে।

কোথায় গেল শেখর?

পরদিন বিকেলে তার অফিসে খোঁজ নিলাম। শেখর এখনো কাজ করছে তবে দুদিন ধরে শরীর খারাপ বলে আসেনি। তার নতুন বাসার ঠিকানাটি চেয়ে নিলাম।

সন্ধ্যের মুখে বান্দ্রাতে গিয়ে শেখরের নতুন ফ্ল্যাট খুঁজে বের করলাম।

আজো দরজা খুলল চিনু। কিন্তু এ কোন চিনু? তার চোখে মুখে আগে যে বুদ্ধি ও প্রাণপ্রাচুর্যের একটি ঔজ্জ্বল্য ছিল তা যেন অন্তর্ধান করেছে! কেমন যেন স্তিমিত ও অবসন্ন একটা ভাব। শুধু তার চোখের তারায় এখনো সেই আগেকার রহস্য-দীপ্তিটা অম্লান আছে। হঠাৎ তার দিকে ভালো করে তাকিয়েই মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত বেরিয়ে এল, "চিনু!"

চিনুর সিঁথিতে সিঁদুর। যেন আমারি রক্ত।

"আসুন বিনুবাবু—"

"কিন্তু একি চিনু?"—নিজেকে সামলে বললাম, "একটা খবরও পেলাম না!"

"খবর দেবার মত ঘটনা ঘটেনি বিনুবাবু—আসুন—"

দরজা বন্ধ করে ভেতরের একটা ঘর দেখিয়ে বিনু বলল, "ওই ঘরে যান—"

চিনু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে শেখরের গলা ভেসে এল, "বিনু নাকি? আয়"—

ভেতরে ঢুকলাম। শেখর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে একটা বই পড়ছিল, উঠে দাঁড়াল আমাকে দেখে। রোগা দেখাচ্ছে তাকে। তার ভাসা ভাসা সুন্দর চোখ দুটোর নীচে ক্লান্তির গাঢ় ছায়া। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা।

"বোস্"—কোলাকুলি সেরে শেখর শুকনো হাসি হাসল।

আমি নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। শেখর বাসা বদলালো কেন? চিনুর কবে বিয়ে হল? কোথায় হল? আমাকে খবর দিল না কেন?

ঘরের আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে। শেখরের বাচ্চা নিয়ে একটি ঝি বাইরে চলে গেল।

জবাব না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "কিরে শেখর—চিনুর বিয়ে কবে হল?

শেখর বইটা রেখে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, "মাস দুয়েক আগে"—

"বর কি করে? কোথায় থাকে?"

শেখর ম্লান হেসে বলল, "আমিই বিয়ে করেছি চিনুকে।"

জড় হয়ে গেলাম। দূর থেকে একটা ইলেকট্রিক ট্রেনের হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল।

শেখর ওপরের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, "একদিন মাঝরাতে ওর ওপর ভর নামল—মল্লিকা হয়ে ও এল আমার কাছে—তাই ওর সম্মান বাঁচাবার জন্য বাসা বদলে এখানে এসে বিয়ে করেছি"—

সমস্ত শরীরটা ঘৃণা আর রাগে রিরি করে উঠল।

চিনু চা নিয়ে এল সেই সময়ে। সঙ্গে জলখাবার। নির্বিকার তার মুখ।

সে বলল, "চা খান।"

"বললাম।" না। চা ছেড়ে দিয়েছি।"

"খাবার খান তাহলে।"

"না। খেয়ে এসেছি।"

চিনু তার সেই রহস্যময় চাউনি মেলে আমার দিকে তাকাল। কি নির্লজ্জা! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চা জলখাবার তুলে নিয়ে চিনু বেরিয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "বৌদি এখনও আসেন?"

শেখর জানালার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "আসে তবে কম। তিন চারদিনে একবার। আজকাল নাকি আসতে কষ্ট হয়।"

"আর খবর কি?"

"ভালোই।"

"তোর বাবা ওঁরা জানেন এই বিয়ের কথা?"

"জানাইনি। তাছাড়া বাবাকে জানাবার সময়ও হয়নি। এই বিয়ের পরই বাবা হঠাৎ মারা যান।"

"তাহলে ভালোই আছিস?" কথাগুলোর মধ্যে একটু শ্লেষ না জড়িয়ে পারলাম না।

শেখর এবার আমার দিকে তাকাল, যেন অনেক দূরে দেখছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ—ভালোই আছি।"

"অফিসে শুনলাম তোর জ্বর?"

"ও কিছু না—আর একদিন জিরোলেই ঠিক হয়ে যাব।"

"বেশ। তাহলে আজ উঠি।"

"খেয়ে যাবি না?"

"না।"

পেছনদিকে আর একবারও তাকালাম না। যেন নরক-কুণ্ড থেকে পালিয়ে গেলাম।

রাস্তায় পা দিতেই দেখি একটা ট্যাক্সি। উঠে বসলাম, বললাম, "চালাও"—

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"সোজা চলতে থাকো—জোরে—জোরে বলছি—"

তারপর মুছে ফেলে দিলাম ওদের মন থেকে। অন্তত ভাবলাম যে মুছে ফেলেছি।

কদিন কেটে গেল মনে নেই। হয়ত পনেরো দিন। হয়ত কুড়ি দিন।

সেদিন সন্ধ্যায় ভূত-দেখার মত চমকে উঠলাম।

দরজার গোড়ায় চিনু।

"বিনুবাবু—বড় বিপদ—"

হঠাৎ নির্মম হয়ে উঠলাম, ভদ্রতার মুখোসটা খুলে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললাম, "কিন্তু তুমি কে কথা বলছ?

মল্লিকা বৌদি না চিনু?"

চিনু স্থিরদৃষ্টি মেলে বলল, "আপনার বন্ধুর দ্বিতীয়া স্ত্রী"

কিছু ছিল তার বলার ভঙ্গিতে—থমকে গেলাম।

চিনু বলল, "আপনার বন্ধুর খুব অসুখ—নিউমোনিয়া—দুটো লাংসই ক্ষতি। চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না—"

মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম। ধমকে বললাম, "খবর দাওনি কেন?"

"উনি নিষেধ করেছিলেন—আপনার ঘৃণা সেদিন উনি টের পেয়েছিলেন।"

আর কোন কথা না বলে চিনুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

আমাকে দেখে শেখরের চোখ ছলছল করে উঠল, ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "বোস্"—

বসলাম।

সে রাত কাটল। পরদিন অবস্থা আরো খারাপ হল। ডাক্তার এল, গেল। নতুন নতুন ডাক্তার ডাকলাম। কিছুই হল না। পরদিন অবস্থা আরো গুরুতর হল। দিন গেল। কোন আশাই খুঁজে পেলাম না। সন্ধ্যে হল। রাত এল। বাইরে শীতের রাত কুয়াশার মোড়কে গভীর হয়ে উঠল। শেখর আর কথা বলছে না।

হঠাৎ চিনু অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মল্লিকা হয়ে জেগে উঠে সে শেখরের কাছে গিয়ে বসল, তার দু হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওগো—তোমাকে বাঁচতে হবে"—

শেখর ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল, হাসল, অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "মল্লি—আসছি—"

"ওগো না—না—আমি চিনুর মধ্যে থাকব—তুমি বাঁচো—"

শেখর ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

আমি চিনুর হাত ধরে টেনে দরজার গোড়ায় নিয়ে গেলাম, হিংস্রকণ্ঠে বললাম, "স্বামীকে নিয়ে যাবার জন্য এত নাটক কেন বৌদি? —যান—আপনি ওদিকে—"

ঠিক মল্লিকার মত চিনু আমার দিকে একবার তাকাল তারপরে অন্য ঘরে চলে গেল।

রাত আরো বাড়ল। চাকর আর আমি জাগছিলাম। খানিক বাদে ঝিমুনি এল।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ মেলে দেখি শেখর কিছু বলতে চাইছে।

"কি? কি শেখর?"

কি যেন বলতে চাইল শেখর, কি যেন খুঁজল ঘরের ভেতর, তারপর চোখ বুজল।

"চিনু"—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

চিনু ছুটে এল। তখন সে চিনুই। মল্লিকা তার স্বামীকে তখন নিয়ে গেছে।

দু'দিন যেন ঘোরের মধ্যে কাটল। অফিস থেকে আরো ছুটি নিলাম। চিনুকে সাহায্য করতে হল। সব চুকে গেল শোকে।

দু'দিন বাদে জিজ্ঞেস করলাম, "শেখরের ভাইদের খবর দেওয়া দরকার—"

চিনু বলল, "দিয়েছি।"

"তারা কবে আসবেন?"

আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।"

"কেন ?"

"কি হবে এসে ?"

"তার মানে—তুমি একা থাকবে নাকি ?"

"হ্যাঁ। হিন্দুর সংসারে মেয়েদের তো কোন মান সম্মান নেই বিনুবাবু। উনি যা রেখে গেছেন তাতে চলে যাবে আমাদের। আমিও কোন কাজ জোগাড় করে নেব। তাছাড়া পৃথিবীতে সবাই তো আসলে একা——"

তার দার্শনিক উক্তিতে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। রাগ হল। বললাম, "বেশ, যা ভালো বোঝ তাই কর।"

চিনু বলল, "আপনি বড় কষ্ট পেলেন আমাদের জন্য।"

আমি বললাম, "ধন্যবাদ এই প্রশংসাটুকু পাবার জনাই তো কষ্টটা পেলাম।"

চিনুর মুখ কালো হয়ে গেল।

তারপর থেকে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিতে যেতে লাগলাম। নেহাৎই শেখরের কথা ভেবে। অমন একটা সুন্দর প্রাণ শেষ হয়ে গেল! আশ্চর্য।

কিন্তু চিনু নির্বিকার। সে আমার কোন সাহায্যই চায় না, বেশী কথাও বলে না, অথচ এও বুঝি যে সে আমায় দেখে বিরক্তও হয় না। যাই, একটু বসি, তার বৈধব্যের শ্বেতশুভ্র সাজের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চলে আসি। যেতে যেতে আবার যেন যাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেল। যেতে যেতে আবার যেন নেশা চাপল। তার শুভ্র বসনের ওপর আমি মনে মনে বাসনার আবীর ছড়াতে লাগলাম।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে দেখি সে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

আমায় দেখে হেসে বলল, "খোকন বড় দুষ্টু হয়েছে—"

বাচ্চাকে শুইয়ে সে কাছে এসে বসল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা চিনু, বৌদি কি এখনো আসেন ?"

চিনু চমকে তাকাল, তারপর বলল, "না। দিদি আর আসেন না।"

"তাহলে শেখরের সঙ্গে উনিও গেছেন ?"

চিনু তার গভীর কালো চোখের রহস্যময় দৃষ্টিটা মেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "আপনার বড় কৌতূহল বিনুবাবু"—

"হ্যাঁ চিনু—তোমার বিষয়ে আমার খুব কৌতূহল—"

চিনু নির্ভয়ে বলল, "তাহলে শুনুন। দিদি কোনদিনই মরার পর আসেওনি, যায়ওনি—ও'র যাওয়ার সঙ্গেই আমার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—"

ঘরটা যেন দুলে উঠল।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। বহুদিন ধরে যে সন্দেহ মনের ভেতর কুড়ে খাচ্ছিল তা আজ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও যেন বিমূঢ়তা কাটল না।

চিনু বলতে লাগল, "বলি আপনাকে। কাউকে না বলে আমিও যেন শান্তি পাচ্ছি না। হয়ত ঘৃণা করবেন, তা করুন। এ জগতে একথা শোনার মত আপনি ছাড়া তো আর কেউ এখন নেই। আমায় নির্লজ্জা ভাববেন না, যে মেয়ে এত বড় অভিনয় করতে পারে সে সব কথা বলার সাহসও রাখে।"

মুখ ফিরিয়ে বললাম, "বল চিনু।"

চিনু বলতে লাগল, "ভালবেসেছিলাম। ও যখন দিদিকে পড়াত, তখন থেকে। কিন্তু ও তো আমায় ভালবাসেনি। ও ভালবেসেছিল দিদিকে। মনপ্রাণ দিয়ে। সেই ভালবাসার সামনে আমার ভালবাসা বড় হীন মনে হত, বড় ছোট মনে হত আমার দাবী। তাই নিজেকে চোখ রাঙিয়ে, আত্মনিগ্রহ করে, ওদের সাহায্য করেছি। যখন ওদের ভালবাসার বিরুদ্ধে জগৎ-সংসার এক হয়ে দাঁড়াল তখন আমি ওকে ভালবাসি বলেই দিদিকে পালাতে সাহায্য করলাম। দিদির বিয়ে হল। দিদি সংসার পাতল। বাবা যদি অকালে না মরতেন তাহলে হয়ত আমার এই অস্বাভাবিক ভালবাসা কোনো এক মধ্যবিত্ত সংসারের চার দেয়ালে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা হল না। বাবা মারা গেলেন। কাকার সংসারে একা হয়ে পড়ায় দিদির কাছে যাওয়ার কোন বাধাই রইল না।

দিদির সংসারে, দিদির সুখ দেখে সুখী হলাম। কিন্তু একটু জ্বালা কি হয়নি ? হয়েছিল। আজ সত্য স্বীকার না করলে তো এত কথা বলার কোন অর্থই হয় না। তাই অকপটে স্বীকার করছি যে ওদের সুখ দেখে সুখী হয়েও সুখী হতে পারিনি। একটা ছোট্ট বিবাক্ত কাঁটার খোঁচায় অনবরত ছটফট করেছি। ভালবাসা মেয়ে মানুষের স্বাথানুভূতিকে প্রখর করে তোলে। তাই দিদি টের পেল শেষে। আমার বিয়ের অছিলা করে কাকাকে চিঠি লিখে আমায় রাতারাতি কলকাতা পাঠাল। ভাবলাম ভালই হল। কারণ দিদির সঙ্গে না হয় স্বার্থের জন্য আমিও লড়তে পারি, কিন্তু যে আমাকে ভালবাসে না তার ভালবাসা আদায় করি কি করে ? না, ও আমাকে ভালবাসত না। একটুও না। ও ছিল সাধু, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। তাই দূরে গেলাম। কিন্তু দূরে গিয়ে আরো মজলাম। ওদিকে বিয়ে হল না আমার। হবে কি করে ? যে পাত্রই আসত আমি বলতাম পছন্দ হল না, জোর করে বিয়ে দিলেই বিষ খাব। কাকা শেষে ক্ষেপে গেলেন। হয়ত একটা কিছু হয়ে যেত, কিন্তু তার আগেই দিদি

অনিল মুখোপাধ্যায় রচিত

ইংরাজী কথাসাহিত্যের এক অনুপম নৈবেদ্য

## "মাই মাদার"

**পুজা প্রকাশনায় এক গরিমাদৃপ্ত আলেখ্য**

বাঙলার শতাব্দীকালীন অশ্রুরুধিরসিঞ্চিত ইতিহাসের পটভূমিকায়

সমাজবিপ্লবের তমসাঘন গগনে জ্যোতির্ময়ী জননীর

নবজীবনের আশ্বাসবহী অমর ইংগীত

বিবরণী — পোষ্ট বক্স নং ২৩৯

পাটনা—১
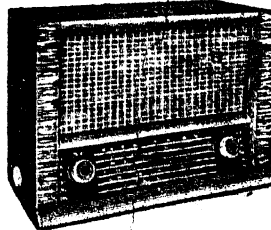
আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট্ পাওয়া যায়। এইচ্, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, টেপ্ রেকর্ডার, ট্রান্সিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

## রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

ফোন : ২৪-৪৭৯৩

মারা গেল। আমি তো চাইনি তা। জীবন-দেবতা আমাকে দিয়ে একটা হীন অভিনয় করাবার জন্যই যেন আবার এখানে ঠেলে নিয়ে এলেন। দিদির ছেলেকে বুকে তুলে নিলাম। কিন্তু দেখলাম যে ও দিদির ধ্যানেই মগ্ন। শিবের মত। দেখে দেখে মনের মধ্যে বিষিয়ে উঠল। ভাবলাম এসব ঢং, ভড়ং। নিজের নারীসত্তার পূর্ণ শক্তিকে পরখ করার ইচ্ছে হল। ভাবলাম কি যায় আসে? আমি তো ওকেই চাই। লজ্জাই বা কিসের? দিদি যতদিন ছিল ততদিন আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, নীতিধর্মের সব শাসনই মেনেছি। দিদি বলেই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কিন্তু আর কেন? ভালবাসি বলেই ওকে প্রলুব্ধ করার অধিকার আমার আছে। তাই সাজগোজ করতে আরম্ভ করলাম। মেয়ে-মানুষের তূণীরে যত তীর আছে সব ব্যবহার করলাম। কিন্তু ও শিবের চেয়েও নির্মম, নিরাসক্ত হয়েই রইল। না, ভান নয়। দিদির ধ্যানে ও এত মগ্ন থাকত যে আমার ছলাকলার বিষয়ে ও এতটুকুও সচেতন হল না। আমি যে ওর 'সই'। আমি বুঝলাম যে দিদি ওকে মৃত্যুলোক থেকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। দিদির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ওকে আমার করার তখন একটিমাত্র পথ দেখতে পেলাম। কঠিন পথ। তাছাড়া আর উপায় ছিল না। তাই একদিন দিদির ভর নামল আমার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে শিবের ধ্যান ভাঙ্গল। কিন্তু আকৃষ্ট হয়েও প্রথমটা ভয় পেল ও, তাই আপনাকে গিয়ে সব কথা বলল। আপনি এলেন, আপনার চোখে আমি সন্দেহ দেখলাম। দেখলাম যে আপনি আমার শত্রু। তাই আপনার আসার পথ বন্ধ করলাম। ও পুরোপুরি বিশ্বাস করল আমার অভিনয়। মৃত্যুলোকের মল্লিকা ওকে নতুন করে মুগ্ধ করল, ওর ভাল-বাসাকে তীব্রতর করে তুলল আর আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। আমি বুঝলাম যে আমার এত বড় সাধনাও ব্যর্থ, নিষ্ফল হল। আমি একদিন মল্লিকা হয়ে ওকে বললাম যে চিনুকে বিয়ে কর। ও কেঁদে বলল, আমাকে এসব বলে কষ্ট দিও না মল্লিকা। আমার সব চাতুর্য ব্যর্থ হল। রক্তলোভী জানোয়ারের মত তখন আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম। শেষ আঘাত করলাম। মল্লিকা সেজেই একদিন মাঝরাতে ওকে বিভ্রান্ত করলাম, ওকে আমার বুকে টেনে আনলাম। চিন্ময়ী হয়ে যা চেয়েছিলাম তা মল্লিকা'র অভিনয় করে পেলাম। কিন্তু আনন্দ হল কৈ? অসহ্য গ্লানিতে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। হেরে গেলাম। তবু অভিনয় চালু রাখলাম। মিথ্যাই ভাল। দিদির সঙ্গে একাত্ম হয়েই তার ভালবাসার স্বাদ পেলাম। কিন্তু ফল সাংঘাতিক হল। যখন আমি চিনু থাকতাম তখন আর আমার দিকে ও তাকাতে পারত না। বুঝলাম যে অপরাধ আর গ্লানি ওকে পীড়া দিচ্ছে। হঠাৎ একদিন ও বাসা বদল করে এখানে এল, আমাকে বলল, চিনু তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি দুরুদুরু বুকে সম্মতি দিলাম। আর্য-মতে বিয়ে হল আমাদের যার নামাঙ্কিত সিঁদুর পড়তে চেয়েছিলাম সেই সিঁদুরই পরলাম। কিন্তু রাতে ও এলো না আমার কাছে। আমি মল্লিকা হয়ে ওকে গিয়ে আশ্বস্ত করলাম যে ও ঠিকই করেছে। কিন্তু ও হাতজোড় করে বলল, আমায় মাপ কর মল্লি, আমায় মাপ কর। তারপর থেকে ও আমায় ছুঁত না। আমি স্ত্রী হবার পর মল্লিকা'র আত্মাও ওকে বিচলিত করতে পারল না। তখন মল্লিকা সাজা কমিয়ে দিলাম। ভাবলাম হয়ত ওর অপরাধ-বোধ এতে কমতে থাকবে। একদিন রাতে আমি আত্মগ্লানির বোঝা নিয়ে চিনু হয়েই ছিলাম। হঠাৎ এসে ডাকল, চিনু। আমি দু'হাত বাড়াতেই ও এগিয়ে এল। চিনুর কাছেই এল। যে রক্তের স্বাদ আমি ওকে পাইয়েছিলাম সেই স্বাদের লোভে ও মল্লিকা'র আকাশ থেকে চিনুর মর্ত্যলোকে নেমে এল। আমি জিতলাম। শুধু একটি রাতের জন্য। রক্তের জোয়ার নামতেই ও পালিয়ে গেল। তারপর থেকেই ও পালিয়ে পালিয়েই বেড়াতে লাগল। মরমে মরে গেলাম। ওর কষ্ট দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি ওকে সুস্থ হবার জন্য মাথা খুঁড়তাম, কাঁদতাম। মল্লিকা সেজে তিরস্কার করলে বলত, মল্লি, আমায় নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। কিছুই হল না। ও বাইরে বাইরে ঘুরতে আরম্ভ করল, অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে লাগল। একদিন অল্প জ্বর হল। তারপরের দিনই আপনি এসে-ছিলেন। আপনি যাবার পরই হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গেল, সারারাত হিমে ভিজে শেষ রাতে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর—"

রুদ্ধ হয়ে এল চিনুর গলা। সে থামল। আমি তাকালাম। না, চোখে জল নেই তার। সে কাঁদছে না। তার দু'চোখ জ্বলছে। প্রেতিনীর চোখের মত। বৈশাখের রোদে পোড়া প্রান্তরের মত। আশ্চর্য এক রূপসী বলে তাকে যেন আজ আমি নতুন করে আবিষ্কার করলাম। মুগ্ধ হলাম, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলাম। আবার সেই সঙ্গে ঘৃণা হল, রাগ হল, জ্বালা হল।

চিনু বলল, "কি ভাবছেন?"

বললাম, "শোনার সাহস আছে?"

চিনু ঘাড় নেড়ে বলল, "বলুন।"

"তুমি পাপি[illegible]—"

চিনু তার [illegible] রহস্যময় চাউনি মেলে হাসল, বলল, "বিনুবাবু, আপনি ভালবাসা কাকে বলে জানেন না। ভালবাসা পাপও নয়, পুণ্যও নয়।"

উঠে দাঁড়ালাম। না, এই পাপিষ্ঠাকে আমি জয় করতে পারব না।

"চললেন?"

থেমে বললাম, "হ্যাঁ।"

তাকালাম তার দিকে। তার বৈধব্যের শুভ্রতাকে আমার নির্বোধ বাসনা আবার রঙীন করে তুলল।

হঠাৎ মরিয়া হয়ে বললাম, "চিনু—"

"বলুন—"

"একা একা সংসার চালাতে তোমার ভয় করবে না?"

"না। আমি তো স্বাভাবিক প্রাণী নই বিনুবাবু—তাছাড়া দুটি সন্তান নিয়ে আমার ভয়ের কি আছে?" আমার দিকে একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চিনু যোগ করল, "আপনার বন্ধুর দ্বিতীয় সন্তান আমার মধ্যেই"

তাই চিনুর মুখে চোখে একটা নতুন রংয়ের প্রলেপ!

বললাম, "চিনু—একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"আমিও স্বাভাবিক নই—আমিও ভয় করি না।"

"কাকে?"

"সমাজ, সংসার, সংস্কার—"

চিনু আমার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল, "বুঝেছি বিনুবাবু। অনেকদিন ধরেই আপনার মনের কথা আমি জানি। কিন্তু তা হয় না।"

"কেন? কেন হয় না চিনু?"

"আমি তো আর এ জগতে বাস করি না।"

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "কিন্তু আমি প্রতীক্ষা করব চিনু—যেমন তুমি শেখরের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলে—"

চিনু মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কোন লাভ নেই বিনুবাবু—"

তার কথার মধ্যে এমন একটা সমাপ্তি ধ্বনিত হল যে আমি আর কথা খুঁজে পেলাম না।

বললাম, "তাহলে যাই?"

চিনু মাথা নীচু করে বলল, "যাও।"

"আবার পরে আসব।"

চিনু বলল, "না—আর এসো না।"

দিনের আলোতেও বারান্দাটা হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে গেলাম।

তারপর আর যাইনি। কিন্তু আশাও ছাড়িনি। এ জগতে সব কিছুরই যেমন জন্ম আছে, তেমনি মৃত্যুও আছে। ভালবাসারও। শেখরের জন্য চিনুর যে ভালবাসা তারও কি একদিন মৃত্যু হবে না? আমি সেই আশাতেই বাঁচব।

# দুর্গা মহিষমর্দিনী

দীপক সেন

ভারতবর্ষের সর্বত্র মহীময়ী প্রতিমা ব্যতীত নিত্যপূজার জন্য দেবদেউলে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়, তা অধিকতর স্থায়ী করবার জন্য হয় পাথরে খোদাই করা হত নয় ধাতব পদার্থ নির্মিত হত। বাংলাদেশেও এই রীতির ব্যতিক্রম হয়নি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীর সৌম্য ও ঘোর রূপের উল্লেখ আছে। এই দুই রূপেই দেবীর বিভিন্ন নাম ও মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে। বাংলাদেশে শক্তিপূজার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। শক্তিপূজা সম্বন্ধে একটি শ্লোক নানা গ্রন্থে উধৃত হয়েছে। 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা। ক্কচিৎ ক্কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে বিলয়ং গতা॥' এই শ্লোকের সাক্ষ্য অনুসারে এ-অনুমান নিরর্থক নয় যে বাংলাদেশেই (গৌড়ে) এই পূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল।

বাংলাদেশে শক্তিপূজার বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে শারদীয়া দুর্গাপূজাই সর্বাধিক জনপ্রিয়। শারদীয়া দুর্গোৎসবে দেবীর 'মহিষমর্দিনী' রূপেরই পূজা করা হয়। 'মহিষমর্দিনী' দেবীর অন্যতম উগ্র বা ঘোর রূপ। মহিষাসুর বধে নিযুক্তা দেবীর এই রূপ শুধু ভারতবর্ষেই নয় ভারতের বাইরেও হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর যবদ্বীপেও মহিষাসুর বধে নিযুক্তা দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য অষ্টভুজা ও দশভুজা 'মহিষমর্দিনী' প্রতিমা পাওয়া গেছে। অগ্নি পুরাণে দশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ এমন কি বিংশতিভুজা দেবী-মূর্তির উল্লেখ আছে। প্রপঞ্চসারতন্ত্র ও শারদাতিলক তন্ত্রেও অষ্টভুজা দেবী প্রতিমার কথা আছে। তবে বাংলাদেশে দশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজাই ব্যাপক। অন্যান্য দেবদেবীর মত মহিষমর্দিনীরও ধাতুনির্মিত প্রতিমা একাধিক পাওয়া গেছে। মহিষমর্দিনীর ধাতুনির্মিত দুটি প্রতিমাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই ধাতুনির্মিত মূর্তি দুটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসরসী-কুমার সরস্বতী মহাশয়ের নিজস্ব সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি পাল যুগের। উচ্চতায় অনুমান সাড়ে তিন ইঞ্চি এই মূর্তিটি বিকশিত পদ্মের অনুকরণে রচিত আসনের উপর স্থাপিত। দেবী বিগ্রহের পিছনে কোনও চালচিত্র নাই। আসনের উপরে সিংহবাহিনী দেবী ত্রিভঙ্গে দণ্ডায়মানা। দেবীর বাঁ পা স্কন্ধচ্যুত মহিষের পিঠে আর ডান পা সিংহের পিঠে। দেবী বাঁ দিকে ঈষৎ ঝুঁকে আছেন। মহিষের দেহ-নির্গত অসুর জানু ভঙ্গে বসে ডান হাতের উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস করছে। এই মূর্তিটিতে সিংহের আকার এতই ছোট যে প্রায় চোখেই পড়ে না।

প্রসন্নাননা দেবীর মাথায় জটামুকুট, কানে গোলাকার কুণ্ডল। প্রত্যেকটি হাতে বলয় বাজুবন্ধ। দেবীর কণ্ঠে মণিময় হার, পরিধানে স্বচ্ছ বস্ত্র এবং আপাদলুণ্ঠিত

পাল যুগের মহিষমর্দিনী

পঞ্চদশ শতকের মহিষাসুরমর্দিনী

উত্তরীয়, চরণে নূপুর। বাঁ দিকের দশটি হাতের প্রধান হাতে অসুরের কেশাকর্ষণ করে ডান দিকের প্রধান হাতে দেবী অসুরকে ত্রিশূলে বিদ্ধ করছেন। কালের প্রবাহে অবশ্য এই মূর্তিটিতে দেবীর ডান হাতখানির কতকাংশ একেবারে ক্ষয়ে গেছে। বাঁ দিকের অন্য হাতগুলিতে (উপর থেকে নীচে) খেটক, ধনু, পরশু ও ঘণ্টা দেখা যায়। ডান দিকের অন্য হাতগুলিতে (উপর থেকে নীচে) খড়্গ (অসি), বাণ ও শক্তি শোভা পাচ্ছে। চতুর্থ হাতের আয়ুধ বর্তমানে খুবই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মূর্তিটি অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের। প্রথমটির তুলনায় নির্মাণ-শৈলী এই মূর্তিতে তত সুষ্ঠু নয়। উচ্চতায় এই প্রতিমাটি প্রায় সাত ইঞ্চি। এর পাদপীঠ এবং প্রভাবলী দুইই আছে। দু ধাপে বিন্যস্ত পাদপীঠের আকৃতি আয়ত। নীচের পাদপীঠে বাঁ প্রান্তে শিখিবাহন কার্তিকেয় যুক্ত করে বসে আছেন। দক্ষিণ দিকে আছেন মূষিকবাহন চতুর্ভুজ বিনায়ক। বিনায়কের চার হাতে (বাঁ দিকের উপর থেকে নীচে) মূলককন্দ ও দণ্ড আর (ডান দিকের উপরে) অক্ষ-মালা দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের নীচের হাতটিও ভেঙে গেছে। কার্তিকেয়ের বাহনেরও মাথা ও গলা ক্ষয়ে গেছে।

পাদপীঠের উপর স্কন্ধচ্যুত মহিষের উপর একটি পা আর সিংহের পিঠের উপর আর এক পা রেখে দেবী প্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিষের বিখণ্ডিত মস্তক পাদপীঠের সামনে পড়ে আছে। অলংকারে দেবী সুশোভিতা। ত্রিনয়নী দশভুজার মাথায় কিরীট অর্ধচন্দ্রশোভিত। কণ্ঠে রত্নখচিত হার। একটি কণ্ঠহার গ্রীবাসংলগ্ন এবং অপরটি বক্ষদেশে বিন্যস্ত। দেবীর দশটি হাতেই বলয় ও বাজুবন্ধ আছে। এই মূর্তিতেও দেবী বাঁদিকে ঈষৎ ঝুঁকে আছেন। বাঁ দিকের প্রধান হাতে নাগপাশের দ্বারা মহিষা-সুরের কেশ আকর্ষণ, করে ডান দিকের প্রধান হাতে তার হৃদয় ত্রিশূলে বিদ্ধ করছেন। উপর থেকে নীচে বাঁ দিকের অপরাপর হাতে আছে যথাক্রমে খেটক, ধনু, অঙ্কুশ ও পরশু; এবং ডান দিকের অপরা-পর হাতে আছে যথাক্রমে অসি, বাণ, শক্তি ও দণ্ড। মহিষমর্দিনীর উত্তেজিত বাহন পিছনের পায়ে ভারসাম্য রেখে সামনের পা দিয়ে অসুরকে আক্রমণ করেছে। সিংহের দাঁতের মধ্যে মহিষাসুরের কনুই অনেক-খানিই ঢুকে গেছে। ডান হাতে কোষোন্মুক্ত অসি নিয়ে অসুর আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

মূর্তিটির পিছনে বৃত্তাকার চালচিত্রের দুই ধারের প্রান্ত ভাগে সুন্দর নক্সা করা আছে। নক্সা করা দুই ধারের মাঝামাঝি আট পাপড়ির একটি বিকশিত পদ্মফুল রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মৎস্য পুরাণ বর্ণিত কাত্যায়নী দশভুজার ধ্যান অংশ উদ্ধার করা বিশেষ সমীচীন বোধ হয়। সেখানে আছে যে দেবী

"জটাজুটসমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাম্ ॥
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম।
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্।
সচারুদশনা তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে দদ্যাৎ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিঃ বামতোঽপি নিবোধত
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশামঙ্কুশমেব চ ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ
অধস্তান্মহিষং তদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥"

অর্থাৎ

ইহার মাথায় জটাজুট ও অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। লোচনত্রয় সংযুক্ত ও পূর্ণেন্দুর সদৃশ আনন (মুখ) অতসীকুসুমের ন্যায় বর্ণ, গঠন সুঠাম, বিবিধ ভূষণে সমৃদ্ধ যৌবনোদ্ভিন্ন তনু, চারুদশনা, পীনোন্নত পয়োধরা দেবী ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা অবস্থায় মহিষাসুরকে বধ করছেন। দেবীর দক্ষিণ হাতে ত্রিশূল এবং ক্রমে নীচের দিকে অন্যান্য হাতে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি এবং বাঁয়ে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা পরশু বিরাজ করবে। দেবীর (পায়ের) নীচে শিরোহীন মহিষের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা অসুর খড়্গ হস্তে বিদ্যমান, অসুরের হৃদয় দেবীর ত্রিশূলে বিদ্ধ।

ধ্যানে মহিষমর্দিনী দশভুজার আয়ুধাদির যে বর্ণনা আছে, প্রতিমা রচনার সময়ে শিল্পীরা যে সব সময়েই তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করছেন তা নয়। সামান্য ব্যতিক্রম থাকে। আলোচ্য মূর্তি দুটিতেও ধ্যান বর্ণিত আয়ুধাদির সঙ্গে অল্প ব্যতিক্রম বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাক্ মুসলমান বাংলায় যত মহিষমর্দিনী প্রতিমা পাওয়া গেছে তাহাতে গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কোনও স্থান নাই। সংস্কৃত কোনও ধ্যানেও ইঁহাদের উল্লেখ নাই, জয়া-বিজয়ার উল্লেখ আছে মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আছে—

"মহিষমর্দিনী-রূপ ধরেন চণ্ডিকা
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা।
সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ-চরণ
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপণ।
বাম করে মহিষাসুরের ধরিলেন চুল
সবাকারে বুকে তার আরোপিলা শূল।
পাশাংকুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ ॥
অসি চক্র শূল আর শেল শক্তিধর
পাঁচ অস্ত্র শোভায় দক্ষিণ পাঁচ কর
তপ্ত কলধৌত জিনি হৈলা অঙ্গ আভা
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের শোভা
শশীকলা শোভা করে মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ চান্দ জিনিয়া বদন ॥
অঙ্গদ কঙ্কণযুতা হৈলা দশভুজা।
× × × × ×
× × × × ×
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের পাঁতি
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর
বৃষ আরোহণ শিব মাথার উপর ॥"

কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে উধৃত এই ছত্রসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় মহিষমর্দিনীর সহিত গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমায় স্থান পেয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য মূর্তি দুটির শেষেরটিতে মূর্তিতে স্থান পেয়েছেন গণেশ ও কার্তিকেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মহিষমর্দিনীর সঙ্গে গণেশাদি দেব-দেবী সমন্বয়ে প্রতিমা নির্মাণের এক বিবর্তনশীল পর্যায়ে এই (দ্বিতীয়) প্রতিমাটি নির্মিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে এবং মূর্তি দুটির আলোক চিত্র শ্রীপ্রতাপাদিত্য পালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

# ময়ূরী

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কুমারীর সিঁথির মত পথের রেখাটি অনেক দূর চলে গিয়েছে। রাস্তার এ-পার থেকে ও-প্রান্ত দেখা যায় না। অন্ত দেখে দরকারই বা কী! বরং ঝোপের আড়ালে পথটিকে হঠাৎ হারিয়ে যেতে দেখতেই ভাল লাগে। কোলঘেঁষে লম্বা ঝিলটি এই দুপুর-রোদেও শান্ত স্তব্ধভাবে পড়ে আছে। এদিকে কয়েক গজ দূরে অবিরাম বাস-চলাচলের শব্দে ঝিলের জল ক্ষণিকের জন্যও কেঁপে উঠছে কিনা এখান থেকে বোঝবার জো নেই। পশ্চিমের পুরনো প্রায়পরিত্যক্ত রাজবাড়ির ছায়া ঝিলের জলে পড়েছে কিনা তাও এখান থেকে দেখা যায় না। বাঁয়ে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। ঠিক সারিবন্ধ নয়। যার যেখানে খুশি, আশ্রয় খাড়া করেছে। গড়নের মিল নেই, রঙের মিল নেই। তবু আস্তে আস্তে নতুন একটি বসতি ত হ'ল। শহরের নানা অঞ্চলের মানুষ কিছুদিন পর থেকে এখানে মিলে মিশে বাস করবে। যাদের সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না, তারা পরিচিত হবে, পরস্পরের প্রতিবেশী হবে। কেউ কেউ বন্ধু হবে। বন্ধুত্ব বড় মধুর। রাজেশ্বর ক'বছর আগেও তার বন্ধু পূর্ণেন্দুকে নিয়ে এখানে স্কেচ করতে এসেছে। তখন শুধু খোলা মাঠ ছিল। এ-সব বাড়িঘর তখন ওঠেনি। আর ওই যে সরু সাদা পথটুকু তারও দেখা মেলেনি। ঝিলের পাশে বসে বসে তারা সকাল-সন্ধ্যায় স্কেচ করেছে, হেঁটে বেড়িয়েছে। এখন আর তার জো নেই। এখন ওখানে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসলে চারদিকে ভিড় জমে যাবে।

পূর্ণই প্রথম আবিষ্কার করেছিল জায়গাটা। রাজেশ্বরের পাড়া। কিন্তু অন্য পাড়া থেকে এসে এই ঝিল আর মাঠ পূর্ণেরই প্রথম চোখে পড়েছিল। সেই দৃষ্টি এখন অবশ্য সরে গিয়েছে। যাতা-য়াতের পথে জায়গাটা চোখে পড়লে ও আজকাল বিরক্ত হয়ে বলে, "কী চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপই না ছিল। গেল শহরের গহ্বরে।"

রাজেশ্বর প্রতিবাদ করে না, সায়ও দেয় না। ভাবে শুধু কি ফাঁকা মাঠেরই রূপ আছে! নতুন পল্লীর রূপ নেই? রূপ নেই নতুন নতুন মানুষের, শিশু, যুবক, বৃদ্ধের? রূপ নেই তাদের ঘর-সংসারের, সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার?

অথচ পূর্ণ সেই সংসারের কথাই বলছিল এতক্ষণ। স্ত্রীর ফের সন্তান হবে। তাকে হাসপাতালে দেবে, না, নার্সিং হোমে দেবে এখনও ঠিক করতে পারেনি।

মেয়ের প্রাইভেট টিউটরটি চলে গিয়েছে। তার জন্যে নতুন টিউটর চাই। আরও নানা পারিবারিক সমস্যা। ছবির আলোচনা আজ খুব কমই হয়েছে। পূর্ণে সংসারের মধ্যে ডুবে আছে বলেই সংসারের রূপ যেন ওর চোখে পড়ে না। ওর চোখ ওর মন কেবল সংসার থেকে পালাই-পালাই করে।

পূর্ণে বলে, "তোমার কী! চল্লিশ পেরিয়ে গেলে। বিয়ে-থা করলে না, সংসারের ঝামেলা যে কী বস্তু জানলে না, বুঝলেও না। বেশ আছ, দায়িত্ব নেই, ভাবনা নেই। ছবি ছাড়া তোমার আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই।"

রাজেশ্বর হাসে। বন্ধুর কথার জবাব দেয় না। কিন্তু মনে মনে ভাবে, তা যেমন নেই, তেমনই অনেক কথা অজানা রয়ে গিয়েছে। সংসারের অনেক বাসনা-কামনাকে তুলির রঙে আঁকতে আঁকতে রাজেশ্বরের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ঠিক হচ্ছে ত? নাকি কেউ ফাঁকি ধরে ফেলবে! বলবে, কোন অভিজ্ঞতা নেই, সব আন্দাজের ব্যাপার! কেউ অবশ্য বলেনি। বরং অনেকে ধরে নেয় তার সব অভিজ্ঞতা আছে। তারা জানে না রেখা আর রঙ তার একমাত্র বন্ধন, রেখা আর রঙ তার একমাত্র মুক্তি।

পূর্ণেন্দুকে যে বাসটায় তুলে দিয়েছে রাজেশ্বর, তারপরে আরও দুটো বাস চলে গেল। এবার ফিরতে হয়। ফিরবে? নাকি এই বড় রাস্তা পেরিয়ে ওই সরু সিঁথির বীথিকার দিকে এগোবে? ঝিলের ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলবে? নাকি একটুখানি থেমে তার শান্ত স্থির জলে নিজের দুটি চোখকে ডুবিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

"এই বাস, বাঁধকে, বাঁধকে। এই কণ্ডাক্টার। যাঃ, চলে গেল!"

পুবমুখী বাসটা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। তার গতি থামল না। কিন্তু রাজেশ্বর যেতে যেতে থেমে দাঁড়াল। মেয়েটি ততক্ষণে পার হয়ে এপারে এসেছে। প্রায় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে দুখানা বই, একটি খাতা। পিঠে দীর্ঘ বেণী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটি চমৎকার মানিয়েছে। ও-রঙের সঙ্গে নীল মানাত, ফিকে হলুদ মানাত, এমন কি গাঢ় লালও বেমানান হত না। রেড, ব্লু, ইয়েলো। তিন প্রধান। আর্টিস্টের তিনরঙা পতাকা। না, তার পতাকা বহুবর্ণের। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্বিতীয় বাসের প্রতীক্ষায়। বোঝা যাচ্ছে ওর কলেজ শহরে নয়, শহরের বাইরে। রাজেশ্বর ওর সান্নিধ্য থেকে আরও দু পা সরে এল। কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারল না।

চমৎকার ফর্ম। দীর্ঘাঙ্গী। কত হবে? সাড়ে পাঁচ। না হলেও পাঁচ পাঁচ। তার কম ত নয়ই। ও যখন রাজেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওর কাঁধ পর্যন্ত উঠেছিল মেয়েটির মাথা। মসৃণ চিক্কণ ঘন কালো চুলের মাঝখানে সুন্দর সাদা একটি রেখার ইশারা। বাঙালী মেয়ের এত দৈর্ঘ্য বড়-একটা দেখা যায় না। যা দু-একজনকে চোখে পড়ে, গড়ন ভাল পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মেয়েটি সব দিক থেকে ব্যতিক্রম। দীর্ঘাঙ্গী হয়েও ক্ষীণমধ্যা আর স্তবক-ভারে আনতা। রাজেশ্বর একবার যে কুমারসম্ভব থেকে উমার ছবি এঁকেছিল, তার সঙ্গে অবিকল মিল আছে। সেই স্তবকভার-নম্রতার সঙ্গে। আশ্চর্য, তার পরিকল্পিত মুখের ডৌলটির সঙ্গেও অপূর্ব সাদৃশ্য। সেই ওভ্যাল শেপের মুখ, সেই নাক ঠোঁট চিবুক। সেই জন্যেই মুখখানা চেনা-চেনা মনে হয়েছিল রাজেশ্বরের। মনে পড়েনি এ তারই মনগড়া মূর্তি। পূর্ণে কিন্তু সেই ছবিটা প্রকাশ করতে দেয়নি। বলেছিল নন্দলাল বসুর বড় ছাপ রয়ে গিয়েছে। তা ত থাকবেই। সেই প্রথম আমলের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ছবি সামনে রেখে কখনও বা শুধু স্মৃতির দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে তখন হাত মকশ করা চলেছে। একলব্যের গুরু ছিলেন এক-জন, আচার্য দ্রোণ। রাজেশ্বরও একলব্য। আর্টের কোন স্কুল-কলেজে সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। প্রত্যক্ষ কোন শিল্পগুরুর কাছেও শিক্ষা নেয়নি। শুধু তাঁদের হাতের কাজ দেখেছে। মাসিকপত্রিকা থেকে সস্তা সব প্রিণ্ট ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের বাক্সে জড়ো করেছে। তারপর গোপনে বসে বসে সেই সব ছবিতে চোখ বুলিয়েছে, মন বুলিয়েছে, তারপর বসেছে রঙ তুলি নিয়ে। একলব্যের গুরু ছিলেন একজন। রাজেশ্বরের অনেক। একালের সেকালের এদেশের ওদেশের। প্রথম প্রথম চলেছে শুধু অনুকরণ-অনুসরণের পালা। কিন্তু শুধু কি তাই! রাজেশ্বরের নিজস্ব বলতে কি কিছুই তার মধ্যে ছিল না? তিলপ্রমাণ, বিন্দুপ্রমাণ থাকলেও ছিল। নিজের শ্রমের মধ্যে, স্বেদের মধ্যে, নতুন পথ কেটে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের মধ্যে রাজেশ্বরের মৌলিকতার বাসনা মিশে ছিল। সেই প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে আজ আর কোন লজ্জা নেই, খেদ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে নেই। বরং এক অপূর্ব প্রসন্ন আনন্দে তার মন ভরে উঠেছে। সেই প্রস্তুতিপর্ব আজও শেষ হয়নি। বলতে গেলে সারা জীবনই এক উদ্যোগপর্ব। সে উদ্যোগ, সে উদ্যম শুধু শিল্প সৃষ্টির জন্যে—এই একমাত্র আশ্বাস আর গৌরব রাজেশ্বরের।

আর-একটা বাস এসে পড়েছে। মেয়েটি হাতখানা উঁচু না করলেও বাসটি থামল। এখানেই স্টপ। কিন্তু হাতের ওই ডৌল আর ওই দীর্ঘ আঙুলগুলি দেখতে পেত না রাজেশ্বর। অমন ভঙ্গিতে পেত না। ওই আঙুলগুলি শুধু তুলিতে এঁকে রাখবার মত না—ওই আঙুলে তুলি ধরলেও বেশ মানায়। ডান হাতের মনিবন্ধে সোনার বালা, বাঁ হাতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট ঘড়ি। ঘড়ির সঙ্গে সোনার বালা কিন্তু মানায়নি। রাজেশ্বরের মতে একটু বিসদৃশ হয়েছে। বাঁ হাতেও যদি আর-একটি বালা পড়ত, তা হলে ঘড়িটি ঢেকে যেত। কিন্তু সিমেট্রি থাকত। আজকাল অনেক মেয়েই অবশ্য হাতে কিছু পরে না। হাতে নয়, কানে নয়, গলায় নয়। যৌবনই তাদের একমাত্র আভরণ। রাজেশ্বর কি এঁকেছে এ যুগের এমন কোন নিরাভরণা যৌবনা-ভরণাকে?

বাসটি ছেড়ে চলে গেল। মেয়েটি ঠিক জানলার ধারে বসেছে। বাসে কি ট্রেনে উঠলে জানলার ধারটি এখনও রাজেশ্বর নিজের জন্যে বেছে নেয়। অনেক সময় ছেলেমানুষের মত সহযোগীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি পর্যন্ত করে। রাজেশ্বর হাসল।

"বাবু!"

রাজেশ্বর চমকে পিছনে তাকাল।

পান - বিড়ি - সিগারেটের দোকান। দোকানীর পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। দাঁতগুলি কালো কালো।

দোকানী হেসে বলল, "বাবু, আজ কিছু নিলেন না?"

রাজেশ্বর বলল, "কী নেব! তোমার দোকানের কিছুই ত আমার চলে না। মাঝে মাঝে বন্ধুদের জন্যে নিই।"

দোকানী বলল, "আজও আপনার সেই বন্ধু এসেছিলেন?"

রাজেশ্বর বলল", হাঁ।"

"তাঁকে বাসে তুলে দিলেন?"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "তুমি দেখছি সব খবর রাখ।"

দোকানী বলল, "দেখলাম যে। তিনি অনেকক্ষণ চলে গেছেন না বাবু?"

রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে দোকানী ফের একটু মুখ মুচকে হাসল। তারপর মুখ নিচু করে বিড়ি বাঁধতে লাগল।

তার সেই হাসি, তার সেই ভঙ্গি, রাজেশ্বরের সমস্ত মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। ঘৃণায় ভয়ে অপমানে অস্থির হয়ে উঠল রাজেশ্বর। ছি-ছি-ছি, ও ভেবেছে কী! ও কি ভেবেছে ওদের চোখ আর রাজেশ্বরের চোখ এক? ও যে চোখে তাকায় রাজেশ্বরও সেই চোখে তাকায়? ওর ওই হাসি-হাসি মুখের উপর রাজেশ্বর যদি একটা ঘুষি ছুঁড়ে দিত, তা হলে কী হত? সেই শক্তি রাজেশ্বর রাখে। শুধু তুলি ধরবার মত নরম আঙুল কটি নিয়েই সে বাস করে না, বাস করে না তুলোর মত, মোমের মত শরীর নিয়ে। শালগাছের মত শক্ত সবল, আর দীর্ঘ তার দেহ। [illegible]

ছুরির টানের যেমন জোর তেমনই জোর কব্‌জির। রাজেশ্বর একটি ঘুষি দিলে ওই কালো কালো সব কটি দাঁত খসে যেত।

নিজের দৈহিক শক্তির চেতনায় রাজেশ্বর আত্মপ্রসাদ ফিরে পেল। ফিরে এল মানসিক প্রত্যয়। মনে মনে হাসল রাজেশ্বর। দুর্বল বিকল দেহে ভীরুতার বাস। বিকৃতির বাসা। তার দেহ ত দুর্বল নয়। তার ভয় কিসের! অমন একটা কেন, পাঁচটা বিড়ি-ওয়ালার মাথা সে নিতে পারে।

খানিকটা এগোতেই ডান দিকে গলি। দু দিকে সারি সারি টালির ঘর, বস্তি। নিজেদের বাড়ি থেকে বড়রাস্তায় পড়বার এই একটিমাত্রই পথ রাজেশ্বরের। যখন অন্যমনস্ক থাকে, পথের দু দিকের এই শ্রীহীন বাড়িঘরগুলি চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখে যখন পড়ে মনটা কেমন করে ওঠে। তার যাতায়াতের পথে যারা পড়ে আছে, তাদের মধ্যে শিল্পপ্রীতির কোন লক্ষণ নেই। একই পাড়ায় বাস করেও রাজেশ্বরকে তারা চেনে না। মুখ চেনে, নামও জানে, রাজেশ্বর ছবি আঁকে এ-খবরও রাখে, কিন্তু তার বেশী আর-কিছু নয়। তার ছবি এরা দেখে না, দেখবার কোন আগ্রহই বোধ করে না। রাজেশ্বরের ছবি এমন দুরূহ আঙ্গিকের নয় যে, দেখে ওরা বুঝতে পারে না। দেখবার রুচি নেই, মন নেই, প্রবণতা নেই। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক্ত জনসাধারণের কাছে রাজেশ্বরের অস্তিত্বের কোন মানে নেই, তার কর্মকীর্তির কোন অর্থ নেই। যখন সচেতন থাকে এই তথ্য রাজেশ্বরকে বড় বেদনা দেয়। অমন সবল সুস্থ সুদৃঢ় দেহের অধিকারী হয়েও তার মন এক অসহায় নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। তার ছবি এদের জন্যে নয়, এরা তার জন্যে নয়। রাজেশ্বরের ছবিকে অনেকদিন—আরও অনেকদিন প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। এদের প্রশংসা পাবে বলে নয়, এরা তারিফ করবে বলে নয়, এমন কি টাকা দিয়ে কিনবে বলেও নয়, শুধু একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখবে বলে। এরা যারা তার প্রতিবেশী, এরা—যাদের সে যাতায়াতের পথে রোজ দেখতে পায়। এরা যারা রাজেশ্বরকে রোজ দেখে অথচ কোনদিন তার ছবি দেখে না। এদের কাছে ছবি মানে সিনেমা। বিলোল কটাক্ষভরা লাস্যময়ী এক সিনেমা-অভিনেত্রীর ছবি পান-বিড়ির দোকানের ক্যালেণ্ডারে শোভা পাচ্ছে দেখে এল রাজেশ্বর। এবার তার হাসি পেল। সত্যি, দোকানী তাকে চিনবে কী করে, তার দৃষ্টিকে বুঝবে কী করে! সেই শিক্ষা-দীক্ষা কি ওর আছে? ওর ওপর রাগ করা বৃথা। ওকে ঘুষি মারলে অন্যায় হত। ওর কাছে ছবির একটিমাত্রই অর্থ। যা বাসনার উদ্রেক করে, সম্ভোগ-পিপাসাকে বাড়িয়ে দেয়, ওর কাছে তাই শিল্প। ওর কাছে নারীর একটিমাত্রই মানে। সে শয্যাসঙ্গিনী। নারী যে ল্যাণ্ডস্কেপেরও অংশ, সে যে লতার মত, ফুলের মত, নদীর মত, ঝরনার মত—সেই সাদৃশ্য দোকানী কোত্থেকে খুঁজে পাবে, যদি খুঁজতে তাকে শেখানো না হয়। রাজেশ্বর ওকে ঘুষি মারবে না, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তারপর আস্তে আস্তে ওর দোকান থেকে লাস্যময়ীর ছবিটি সরিয়ে এনে একটি সত্যিকারের ছবি ওখানে টাঙিয়ে দেবে।

"ও কী, ও রাজু, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ও রাজু?"

রাজেশ্বরের চমক ভাঙল। নিজেদের বাড়ি ছাড়িয়ে সে আরও উত্তরে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সোনা-মা না ডাকলে খেয়ালই হত না।

দু দিকে দুটি করে সবুজ সুপারিগাছ। তার মাঝখানে সাদা-রঙের দোতলা বাড়ি।
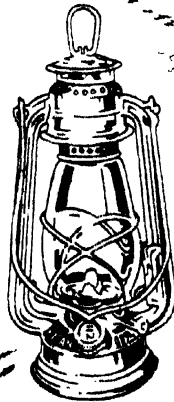
মন্দাকিনী ডাকতে ডাকতে একেবারে পথে নেমে এসেছেন। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বেশ একটু মোটা হয়ে গিয়েছেন আজকাল। কিন্তু ওই যা দেখতেই মোটা। দিনরাত খাটুনি, ছুটোছুটির অন্ত নেই। অবশ্য মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা যার যার বউ নিয়ে কর্মস্থলে। কিন্তু জেঠামশাই একাই একশ। তাঁর জন্যে সোনা-মার একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

রাজেশ্বর বলল, "তোমার এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাপুজো হয়ে গেল সোনা-মা?"

মন্দাকিনী বললেন, "না, হবে কিসের! আমার সন্ধ্যাটা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে তোমার সুবিধে হয়, হতভাগা কোথাকার! পূর্ণের সঙ্গে বকবক করতে করতে সেই যে বেরিয়েছিস—আর ফেরার নাম নেই। আমি ভাবলাম, তুই বুঝি তার সঙ্গে সেই মনোহরপুকুরেই চলে গেলি। বেলা বারোটা। এর পর কখন নাবি কখন খাবি বল্ ত।"

এ সব শাসনের কোন জবাব দিতে নেই। রাজেশ্বর স্মিতমুখে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। একবার জিজ্ঞাসা করল, "জেঠামশাই খেয়েছেন?"

মন্দাকিনী বললেন, "কখন। তাঁর এক ঘুম হয়ে এল বলে। ঘুম থেকে উঠে চা চাইবেন।"

রাজেশ্বর কোন কথা না বলে নাইতে গেল। বাথরুমে ঢুকে ঝপ ঝপ করে কয়েক মগ জল ঢেলে বাইরে এসে ভিজে কাপড়েই বলল, "কই সোনা-মা, ভাত-টাত কী আছে তাড়াতাড়ি দাও। সত্ত্য ক্ষিদে পেয়েছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তোমার আবার ক্ষিদে-তেষ্টা আছে নাকি বাপু?"

রাজেশ্বর হাসল। তেষ্টাকে কিছুতেই তৃষ্ণা বললেন না সোনা-মা। অথচ তৃষ্ণা কথাটি কী সুন্দর! ধ্বনিমধুর। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। যারা কবিতা লেখে তারা বোধ হয় এর সঙ্গে মিল দেবে কৃষ্ণা। শুকনো কাপড় পরতে পরতে হাসল রাজেশ্বর। আর হঠাৎ তার চোখের সামনে একখানা মুখ ভেসে উঠল। কৃষ্ণা না, গৌরী—গৌরাঙ্গী। সেই ল্যান্ডস্কেপের অবিচ্ছিন্ন অংশ। রাজেশ্বর নিজের হাতখানা চোখের সামনে রেখে কী যেন আড়াল করল।

মন্দাকিনী তা দেখে বললেন, "ও আবার কী ভঙ্গি!"

রাজেশ্বর বলল, "একখানা ইনকমপ্লিট ছবি ঢেকে রাখলাম সোনা-মা।"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "পাগল হলি নাকি! আকাশে বাতাসে তুই কি সব জায়গায় ছবি দেখিস? মার কাছে গল্প শুনেছি তখনকার দিনে ছেলেদের নাকি পরীতে পেত। তোকে ছবিতে পেয়েছে।"

মেঝেয় আসন পেতে ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন মন্দাকিনী। মাছ-তরকারির বাটিগুলি চারদিকে সাজিয়ে দিলেন। ছোট একখানা থালা নিয়ে নিজেও বসলেন খেতে। একসঙ্গে না খেলে রাজেশ্বর বড় রাগ করে। খেতে খেতে গল্প করতে খুব ভালবাসে রাজেশ্বর। যত গল্প ওর খাওয়ার সময়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আজ ওর মুখে কথা নেই।

মন্দাকিনী বললেন, "কী রে, আজ বুঝি রান্না-টান্না কিছু ভাল হয়নি!"

রাজেশ্বর বলল, "কেন সোনা-মা, বেশ হয়েছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "অন্যদিন এক তরকারির সাতবার সুখ্যাতি করিস। চেয়ে চেয়ে খাস। আর আজ—"

রাজেশ্বর তাঁর দিকে না তাকিয়ে বলল, "একটা নতুন ছবির আইডিয়া মাথায় এসেছে সোনা-মা। তাই ভাবছি।"

একটু মিথ্যার আশ্রয় নিল রাজেশ্বর। নতুন ছবির ভাবনা এই মুহূর্তে সে ভাবছে না। একটি ভিন্ন রকমের দুশ্চিন্তা হঠাৎ তার মাথায় এসে ভর করেছে। মেয়েটিকে যদি সত্যিই শুধু এক নিসর্গ শোভা বলে ধরা যায়, তা হলে রাজেশ্বর অসত্য বলেনি। কিন্তু নিসর্গ সৌন্দর্য ছাড়াও যদি মেয়েটির মধ্যে অন্য কিছু থাকে, তা হলে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' হয়েছে। রাজেশ্বর ভাবতে লাগল, 'লতাপাতা নদী-ঝরনার দিকে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পার, কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন অপরিচিতা মেয়ের দিকে একপলক তাকানোই কঠিন। অপলক হয়ে থাকলে সভ্য জগৎ থেকে তোমাকে নির্বাসিত হতে হবে। তা ছাড়া লতা আর নদীর সঙ্গে নারীর একটা বড় রকমের প্রভেদ এই যে, তার নিজেরও দুটি চোখ আছে। তার প্রেম পুরুষকে কখনও কখনও অন্ধ করলেও নারী সব সময় চক্ষুষ্মতী। রাজেশ্বর যখন অতক্ষণ ধরে মেয়েটিকে দেখছিল সে রাজেশ্বরের সম্বন্ধে কী ভাবছিল কে জানে! তার চোখ দুটি যে সুন্দর তা রাজেশ্বর দেখেছে, কৃষ্ণকলি না হয়েও সে হরিণাক্ষী। কিন্তু সেই মৃগনয়নার দৃষ্টি ত ভাল করে দেখেনি। রাজেশ্বর তার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই সেই দৃষ্টিতে অনুরাগ না বিরাগ, সমর্থন না বিতৃষ্ণা কিছুই বোঝা যায়নি। ছি-ছি-ছি, মেয়েটি যদি তাকে বিড়ি-ওয়ালার সগোত্র বলে ভেবে থাকে, তা হলে কী হবে, তা হলে যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না রাজেশ্বর। ফের যদি ওর সঙ্গে কোনদিন মুখোমুখি চোখা-চোখি হয়, সে যে লজ্জায় মরে যাবে।'

জল খেতে গিয়ে বিষম খেল রাজেশ্বর। মন্দাকিনী ধমকে উঠলেন, "কী যে তোর খাওয়ার ছিরি। সব সময় অন্যমনস্ক।"

ডান দিকের বড় শোয়ার ঘরখানা থেকে সর্বেশ্বরের নাকডাকার শব্দ আসছে।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রাজেশ্বর নিজের মনেই হাসল। বেশ আছেন জেঠামশাই। কাস্টমস অফিস থেকে রিটায়ার করবার পর দুপুরের ঘুমটি বেঁধে নিয়েছেন। একেবারে ছক-মেলানো জীবন। সকালে গীতাপাঠ, সাতটায় সংবাদ-পত্র, দুপুরে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তে পড়তে দিবানিদ্রা, বিকাল থেকে রাত দশটা কি এগারটা পর্যন্ত পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে অশ্ব-গজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফাঁকে ফাঁকে দু-এক পশলা দাম্পত্যকলহ। জীবনের একটি চমৎকার প্যাটার্ন, একটি নিখুঁত ফর্ম। ওঁকে লতার দিকে তাকাতে হয় না, নদীর দিকে তাকাতে হয় না, নারীর দিকেও তাকাতে হয় না। অমন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব বার্ধক্য কবে আসবে রাজেশ্বরের, যেদিন লক্ষ শৈবালিনী চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভালবাসা ত দূরের কথা, চেয়ে দেখতেও ইচ্ছা করবে না!

মনে মনে হাসল রাজেশ্বর। হাসতে হাসতে নিজের ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনেক দিন পরে ফের একটি অয়েলের কাজ শুরু করেছে রাজেশ্বর। ক্যানভাস নিতান্ত ছোট নয়। রাস্তার কলে বস্তির কয়েকটি মেয়ে জল নিতে এসেছে। তাদের কেউ কুমারী, কেউ বা বধূ। উলঙ্গ ছেলে এসেছে পিছনে পিছনে। কাছেই ছোট বাজার। সওদা করতে করতে ক্রেতাদের কেউ কেউ পিছন ফিরে তাকিয়েছে, বিক্রেতাও অন্যমনস্ক। দূরে পপলারের সারির আড়ালে সৌধমালার আভাস দেখা যাচ্ছে। সবে ড্রয়িংটা শেষ হয়েছে, এখনও কিছুই হয়নি। পূর্ণ শাসিয়ে গিয়েছে, দেখো যেন প্রচারগন্ধী না হয়। 'শিল্পীর তুলি জীবনের রহস্যকে প্রকাশ করবে, কোন মতবাদকে আমল দেবে না।' কোন মতবাদের ভক্ত নয় রাজেশ্বর। কিন্তু দারিদ্র্য বঞ্চনা অশিক্ষায় মনুষ্যত্বের এই তিলে তিলে ক্ষয়, এই তাল তাল অপচয় তাকে মাঝে মাঝে বড় পীড়া দেয়। সূর্যাস্তের আভায় আকাশের বর্ণাঢ্যতা যখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যার আঁধারে ঢেকে যায়, দোতলার জানলা থেকে আরও একটি অন্ধকার জীবনযাত্রার দিকে রাজেশ্বরের চোখ কোন-কোনদিন নেমে আসে। চোখের সেই বিমূঢ় বিস্ময়ই তুলির ধূসর রঙে তার কোন কোন ছবিতে রূপ নেয়। এর চেয়ে বেশী কোন কথা জানে না রাজেশ্বর। জানবার চেষ্টাও তার নেই।

দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রাত বারোটা পর্যন্ত চমৎকার কেটে গেল। এর মধ্যে শুধু বারকয়েক উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজেশ্বর। নিজের তুলি [illegible]

চেয়ে চেয়ে দেখেছে গাছের পাতার রঙ-বদলানো। আর সেনা-মার ডাকাডাকিতে নীচে গিয়ে একবার খেয়ে এসেছে। কাজ আর কাজ। নিজের পছন্দমত কাজে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। পূর্ণ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'শুধু শ্রমের স্বেদের মর্মই জানলে, কিন্তু আরও যে দু-এক রকমের ঘাম আছে তার মর্ম টের পেলে না।'

রাজেশ্বর প্রথমে বুঝতে পারেনি।

পূর্ণ তখন হেসে নিচু গলায় বলেছিল, 'রতিস্বেদ বলে একটা শব্দ আছে শুনেছ? তার অর্থভেদ করা অবশ্য তোমার কাছে শক্ত।' রাজেশ্বর সেকেলে গোঁড়া নয় যে, কানে আঙুল দেবে। হেসেই জবাব দিয়েছে, 'শক্ত কেন হবে? তবে শুনেছি তার সঙ্গে খেদটাও জড়িয়ে থাকে।'

খেদ অবশ্য শ্রমের স্বেদ থেকেও বাদ যায় না। রাশ রাশ ছবি ঘরে পড়ে থাকে। বিক্রি হয় না, তার জন্য দুঃখ আছে, এতদিন ধরে এত কষ্ট করে আঁকা ছবি হয়ত কোন দর্শক এসে এক কথায় নাকচ করে দেন, হয়ত ড্রয়িংএর তিনি কিছুই বোঝেন না, রঙ সম্বন্ধে তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই—এমন সমালোচকের কলমের খোঁচাও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও দুঃসহ নিজের অতৃপ্তি। আজ যে ছবি এঁকে আত্মপ্রসাদের অন্ত নেই, দুদিন বাদে সেই ছবিই নিজের সহস্র দুর্বলতার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। ব্যর্থতায় নৈরাশ্যে মন অবসন্ন হয়ে থাকে। আর্টিস্টের কাছে আত্ম-ধিক্কারের চেয়ে বড় ধিক্কার আর নেই। নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সঙ্গে গগন-স্পর্শী আকাঙ্ক্ষার পদে পদে আপসের মত দ্বিতীয় বিড়ম্বনা আর কী আছে?

খেদ শিল্পীর বৃত্তিতেও রয়েছে।' রঙ আর তুলির মধ্যে মিশে আছে সেই বিষাদ। তবু তার স্বাদ অনন্য। তাই নিজের অখণ্ড জীবন তার জন্য উৎসর্গ করে রেখেছে রাজেশ্বর। আর-কাউকে ভাগ দেয়নি—আর কারও দাবি মিটাতে যায়নি। সংসার নয়, পরিবার নয়, ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়, ব্যাপক বন্ধুসমাজ নয়, নারীসঙ্গ নয়। নেতি নেতি করে যে ব্রহ্মকে সে জানবার চেষ্টা করে চলেছে, সে তার শিল্প। তাকে সে সুলভ পণ্য করে তোলেনি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সে অন্যের নয়ন-সুখকর করেনি। তাতে অর্থের ক্ষতি হয়েছে, যশের বাঞ্ছিত হয়নি। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে অটল রয়েছে রাজেশ্বর। তার দরকার ত বেশী নয়। জেঠামশাইকে তাঁর দুই ছেলে মাসোহারা পাঠায়। তাঁর নিজের পেনশনের টাকাও আছে। রাজেশ্বরের কাছ থেকে টাকা তিনি কিছুতেই নিতে চান না। বলেন, 'ও-টাকা দিয়ে তুই রঙ কিনিস, ও-টাকা আমাকে দিতে হবে না।'

তারপর থেকে জেঠামশাইকে কিছু আর দিতে যায় না রাজেশ্বর। কিন্তু সোনা-মার হাতে কিছু কিছু ধরে দেয়। পোশাকের জন্যেও বেশী ভাবনা নেই রাজেশ্বরের। দুখানা ধুতি, দুটি খদ্দরের পাঞ্জাবি আর দুটি পা-জামাতেই পাঁচটি ঋতু কাটে। শীত কলকাতায় সংক্ষিপ্ত। তীব্রতাও কম। পোশাক পরিচ্ছদ মন্দাকিনীই জোগান। বোনদের কাছ থেকেও কিছু কিছু উপহার আসে।

এই কৃচ্ছ্রতার সার্থকতা কী—কোন কোন অন্ধকারঘন রাত্রে মনের কোণে প্রশ্নটা এখনও উঁকি দেয় রাজেশ্বরের। 'এই আমার স্বভাব', এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঙ্গত জবাব সে নিজেও দিতে পারে না। চেষ্টাও করে না। যেমন দিতে পারে না 'বিয়ে করলে না কেন' কোন কৌতূহলী বন্ধুর, কি অনুরাগীর এই প্রশ্নের জবাব। সে জবাব একদিন হয়ত ছিল। আজ অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। আজ-কাল জেঠামশাই কি সোনা-মাও বিয়ের কথা উল্লেখ করেন না। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তাগিদ দিয়ে আর কোন লাভ নেই।

পূর্ণ মাঝে মাঝে এখনও ঠাট্টা করে বলে, 'বাংলা দেশে পুরুষের পক্ষে যে কাজটা সবচেয়ে সোজা তুমি তাকেই এমন কঠিন ভেবে বসলে। একমাত্র বিয়েটাই এখানে চোখ বুজে করা যায়।'

রাজেশ্বর হেসে বলে, 'তার পরের ফলটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। বিবাহিত বন্ধুদের দেখে দেখে এটুকু বুঝতে পেরেছি।'

পূর্ণ বলে, 'দেখে শেখায় কোন কাজ হয় না। ঠেকে শেখাটাই আসল শেখা।

কিন্তু তাও কি বলা যায়? ঠেকতে ঠেকতে শুধু ঠেকাটাই অভ্যাস হয়, শেখা আর হয়ে ওঠে না।'

মেয়েদের সম্বন্ধে পূর্ণ বড় বেশী অভিজ্ঞতার অধিকারী। তার বান্ধবীর সংখ্যা প্রচুর। মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যায়। দাম্পত্যকলহ থামতে চায় না। সালিশী করবার জন্যে ছুটতে হয় রাজেশ্বরকে। বিয়ের এই ত পরিণাম। দুদিন বাদেই স্ত্রীর চেহারা রক্ষাকালীর মত হয়ে ওঠে। রক্ষাকবচের মাহাত্ম্য আর থাকে না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে এবার শুয়ে পড়ল রাজেশ্বর। এই স্টুডিওর মধ্যেই দেয়াল ঘেঁষে একখানা ছোট তক্তাপোশ পাতা আছে। ছবি আঁকতে আঁকতে ক্লান্তি এলে শুয়ে গড়িয়ে নেয়। তা ছাড়া অনেক সময় শুয়ে শুয়েও ছবি আঁকে রাজেশ্বর। উপুড় হয়ে বুকের তলায় বালিশ চেপে স্কেচ করে। মেঝের বসে বসে ছবি আঁকাই বেশী অভ্যাস রাজেশ্বরের। চারদিকে রঙের বাটিগুলি ছড়ানো থাকে, মাঝখানে রঙ্গরাজ।

পাশের ঘরখানাই আসলে শোবার ঘর। সিংগল বেডের খাটে ভাল করে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সোনা-মা। ছোট টেবিলটার উপর কাচের গ্লাস ঢাকা মাটির জলের কুঁজো আছে। সে কুঁজো রাজেশ্বরের নিজের হাতে অলংকৃত। শম্ভু রয়েছে, ছোকরা চাকর। তবু সোনা-মা নিজের হাতে এসব করবেন। শুতে যাবার আগে ওই মোটা শরীর নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে একবার করে তাগিদ দিয়ে যাবেন, 'রাজু, অনেক রাত হল বাবা, যা এবার ঘুমো গিয়ে।'

আজও এসেছিলেন। বাবা মা ছেলেবেলায় বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। জেঠাইমার মধ্যে নিজের মাকে পেয়েছে রাজেশ্বর।

কিন্তু পাশের ঘরে ভাল বিছানা থাকা সত্ত্বেও আজ আর তার উঠে যেতে ইচ্ছা করল না। মাথার নীচে পুরনো আর্ট-জার্নালগুলো জড়ো করে বালিশ তৈরি করল। পাশের ঘরটা বড় নিঃসঙ্গ। কিন্তু এ-ঘরে তার সংগী আর সংগিনীর অভাব নেই। এই ঘরের চার দেয়াল তার স্থায়ী আর্ট গ্যালারি। শুধু নদী প্রান্তর পশু পক্ষী লতা পাতা নয়, তার হাতের আঁকা অনেক নরনারীও দেয়ালে দেয়ালে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছবিগুলি বদলায় রাজেশ্বর। উলটে-পালটে নতুন করে সাজিয়ে দেয়। কিছুদিন আগে একটি সাঁওতালী মেয়ের ছবি এঁকেছে রাজেশ্বর। পূর্ণ তার খুব প্রশংসা করেছে। বিশেষ করে দুটি চোখের। রাজেশ্বরের হাতে মেয়েদের চোখ নাকি সবচেয়ে ভাল ফোটে। বাস-স্টপে সেই মেয়েটির চোখও বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে! ঘুমবার আগে সংশয়ের খোঁচা লাগল রাজেশ্বরের মনে। মেয়েটি যদি ভুল বুঝে থাকে, সে ভুল ভাঙবার কি কোনও উপায় নেই?

পরদিন রাজেশ্বরের ঘুম ভাঙল দেরিতে। রাত বেশী জাগলে সে একটু বেলা করেই ওঠে। অনেকদিন ছবি নিয়ে কাজ করতে করতে রাত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কাল সেভাবে জাগেনি। এমনিতেই কিসের একটা অস্বস্তিতে ভাল ঘুম হয়নি কাল।

হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে জেঠামশাইয়ের ঘরে কাগজের হেড-লাইনগুলোতে চোখ বুলিয়ে ফের এসে বসল ছবি নিয়ে। কিন্তু মন বসল না। দু নম্বর তুলিটা সরিয়ে রাখল রাজেশ্বর। যখন কাজে মন এগোয় না, হাতটাও সে পিছিয়ে নেয়। এইটুকু স্বাধীনতা তার আছে। সে কারও দাস নয়। কারও ফরমায়েস সে খাটে না, এমন কি নিজেরও নয়। তার রঙ শুধু অনুরাগের রঙ। তার আনুগত্য শুধু তার শিল্পের কাছে। আর কারও কাছে নয়।

বাইরে দেয়ালঘড়িতে ঢঙ করে একটা শব্দ হল। পেরেকে ঝুলনো হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিল রাজেশ্বর। সাড়ে দশটা। আর-কিছু বলতে হল না। ঘড়ির কাঁটার মতই ঠিক যান্ত্রিকভাবে কয়েকটা কাজ করে গেল রাজেশ্বর। পাজামা ছেড়ে কাপড় পরল, পাঞ্জাবি পরল, তারপর কিসের তাগিদে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

মন্দাকিনী একবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ও রাজু, কোথায় যাচ্ছিস? তোর কি দরকার বল্ না, আমি শম্ভুকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "শম্ভুকে দিয়ে সে কাজ হবে না সোনা-মা। আমি আসছি।"

তারপর জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। তাদের গলি থেকে বড় রাস্তার মোড় মিনিট পাঁচেকের বেশী নয়। রাজেশ্বরের আড়াই মিনিট লাগল।

একটা বাস স্টপ ছেড়ে পুবমুখে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। রাজেশ্বর ভাবল, যাঃ,

চলে গেল। এই বাসে যদি গিয়ে থাকে তা হলে আর কোন আশা নেই।

হিরণাক্ষীর বদলে বিড়ির দোকানের মালিকের সঙ্গেই আজ প্রথম চোখাচোখি হল। হাসল দোকানী, তার দাঁতগুলি কালো, চোখ দুটি লালচে, গায়ের গেঞ্জিটি আধ-ময়লা, পরনের লুঙ্গিটি গাঢ় নীল।

দোকানী বলল, "এই যে বাবু, আজ কিছু নেবেন?"

রাজেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ নেব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও ত।"

"কী সিগারেট দেব?"

"দাও যে কোন একটা। দিলেই হল।"

দোকানী হেসে বলল, "আপনি কি সিগারেট ধরেছেন নাকি বাবু?"

রাজেশ্বর বলল, "না, আমি ধরিনি। বন্ধুদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। আজও দু-একজনের আসবার কথা আছে।"

খুচরো পয়সা কত দিল গুনে দিল না রাজেশ্বর, তার বদলে যে কতটা নিল তার দিকেও তাকিয়ে দেখল না।

রাজেশ্বর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, ওই ছবিটা কি তোমার খুব ভাল লাগে?"

দোকানী যেন লজ্জায় মধ্যে গেল। মাথা কাত করে একটু জিভ কেটে বলল, "পাইকার দিয়েছে বাবু তাই নিলাম।"

রাজেশ্বর বলল, "আচ্ছা, যদি ওই ছবিটার বদলে আর-একটা ছবি তোমার দোকানে এনে টাঙিয়ে রাখি—বেশ ভাল ছবি—।"

দোকানী বলল, "এ-ছবিও বেশ ভাল বাবু। পাইকার আমার বন্ধু। তার হাতের দেওয়া জিনিস কি সরানো ভাল।"

তারপর একটু হেসে বলল, "আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে বাবু, আর-একটা ক্যালেন্ডার বরং আপনাকে এনে দেব।"

কিছুকাল ধরে রাজেশ্বরের খেয়াল হয়েছে তাদের ছবিকে জনপ্রিয় না হক জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করতে হলে চারদিকে সস্তায় ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু বছরে দুবার একবার আর্ট-এক্‌জিবিশনে সেই পরিচয় গড়ে উঠবে না। সেই এক্‌জিবিশনে কজন লোক যায়, কবার করে যায়? কজনই বা ছবি দেখবার জন্যে যায় সেখানে? যাওয়াটা ফ্যাশান বলেই যায় বেশীর ভাগ দর্শক। তারা ছবি দেখে না। পনের মিনিটের মধ্যে চার শ ছবির উপর চোখ বুলিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করে। এই দলের দর্শকই ত বেশী। কিন্তু ছবি দেখা কি অতই সহজ? এ কি ঘড়ি দেখা? যে নিমেষের মধ্যে সময়টা জেনে নেওয়া গেল? একখানা ছবি দেখতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শককে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শিল্পীর যত সময় লেগেছে প্রায় সেই সময় দিতে হয়। নানা সময়ে নানাভাবে দেখতে হয় ছবিকে। তবে ত দর্শন সম্পূর্ণ হয়। ছবি দেখবার সেই চোখের বড় অভাব এদেশে। সেই চোখ তৈরি করতে হবে। সাধারণের মধ্যে শিল্পপ্রীতির উদ্বোধন করা চাই। সেই উদ্বোধন শুধু সাম্বৎসরিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে চলবে না, ন্যাশনাল গ্যালারি প্রতিষ্ঠাতেও সম্ভব হবে না। তাদের ছবিকে ঘরে ঘরে, হোটেলে রেস্টুরেন্টে দোকানে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে লোকে ভাল ছবি সম্বন্ধে সচেতন হয়। ক্যালেন্ডারে নয়, সাবান তেলের বিজ্ঞাপনে নয়, বইয়ের মলাটে নয়, সত্যিকারের ছবির প্রচারের জন্য আরও কি ভাল কোন উপায় বার করা যায় না?

"বাবু, পান নেবেন একটা?" দোকানী হেসে বলল, "বেশ মিঠে পান বাবু।"

রাজেশ্বর বলল, "না না, পান আমি খাইনে। আচ্ছা, তোমার দোকান যদি আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিই, তোমার ওই ক্যালেন্ডার থাকুক, আরও দু-একটা ছোট ছোট ছবি যদি এনে টাঙিয়ে দিই—।"

দোকানী হেসে বলল, "কেন অত কষ্ট করবেন বাবু? আমার দোকান কি সেই-রকম দোকান? তেমন ভাগ্য কি করে এসেছি? আপনারা যদি এখানে এসে মাঝে মাঝে পানটা বিড়িটা খান, দু-একজন খদ্দেরকে চিনিয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়। ওই যে তিনি এসেছেন।"

শেষ কথাটা অস্ফুট স্বরে বলল দোকানী। কিন্তু রাজেশ্বরের বুকের মধ্যে হাজার গুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হল। কার কথা বলছে দোকানী? অমন করে সামনের দিকে তাকিয়ে ও কী দেখছে? কী ব্যাপার হতে চলেছে রাজেশ্বর তা জানে। সে তা অনুভব করতে পারছে। তবু কিছুতেই সে মুখ ফিরাবে না, চোখ তুলে তাকাবে না ওদিকে। দোকানীর লালচে চোখ কী করে মুগ্ধতায় সুন্দর হয়ে উঠেছে সে শুধু তাই লক্ষ্য করবে।

এক মিনিট গেল, দু মিনিট গেল। তারপর রাজেশ্বর ঠিক যেন যন্ত্রের মত ওদিকে তাকাল। এমন এক যন্ত্র যা যন্ত্রীর শাসন মানে না, যা নিজের ইচ্ছায় চলে। ততক্ষণে সে রাস্তা পার হয়ে এপারে এসেছে। পরনে আজ চাঁপারঙের শাড়ি, গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউস, হাতে নীল-রঙের একটা একসারসাইজ বুক।

রাজেশ্বর চোখ তুলে তাকাতেই তার মনে হল মেয়েটি মৃদু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে

রাজেশ্বরের বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। অপরিচিতার এই হাসির মানে কী! কত নারীর মুখে তুলির টানে কত হাসি ভরে দিয়েছে রাজেশ্বর, কত ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে, মোনালিসার হাসির অর্থ নিয়ে গবেষণা করেছে বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু আজ একটি তরুণীর আকস্মিক মৃদু হাসি তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। এ হাসি নিশ্চয়ই বলতে চাইছে, 'তোমাকে চিনেছি। তুমি কালও নির্লজ্জের মত আমার দিকে তাকিয়েছিলে। আজও না এসে পারনি। বিড়ির দোকানের সামনে যারা এসে দাঁড়ায়, জটলা করে তুমি তাদেরই একজন।'

না, এই ভুল ওর ভাঙতে হবে। যেমন করেই হক ওকে বোঝাতে হবে, ও যা ভেবেছে তা ঠিক নয়। রাজেশ্বর দুরন্ত সাহসে নাগরিক বিধি ভঙ্গ করে আরও দু পা এগিয়ে গেল। তারপর কম্পিত গলায় বলল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না। কাল আমি আপনাকে একটি চেনা মেয়ে ভেবে—"

মেয়েটি হেসে বলল, "আমি আপনাকে চিনি।"

"চেনেন?"

ঝড়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ যেন এক শ্যামল সুন্দর কূল পেয়ে গিয়েছে রাজেশ্বর: "আমাকে চেনেন?"

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, "আপনাকে না চেনে কে? প্রথম আপনাকে দেখি গতবার একাডেমির এক্জিবিশনে। আপনার দুখানা ছবি ছিল, আপনিও ছিলেন। ভেবেছিলাম আলাপ করব। কিন্তু আপনি একজন বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বোধ হয় একখানা ছবির ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করেই আপনি ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।"

রাজেশ্বর হেসে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হ্যাঙ্গিং কমিটির মেম্বার ছিলাম। তারই একটা ব্যাপারে—'

মেয়েটি বলল, "কালও ভাবলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু আপনি কাল অন্যমনস্ক ছিলেন। সাহস পেলাম না।"

রাজেশ্বর মনে মনে বলল, 'সাহস পেলে না! আজ কী অভয় তুমি আমাকে দিলে তা তুমি জান না।'

মেয়েটি হঠাৎ পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছেন? কোন একটা বাস আসবার নাম নেই। আজও বোধ হয় আমার এগারটায় ক্লাস করা হবে না।"

রাজেশ্বর বলল, "আপনার কি রোজ এগারটায় ক্লাস থাকে?"

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। আমাকে আপনি বলবেন না। আপনার মুখে আপনি শুনতে বড় লজ্জা করে। তুমি বললেন। আমার নাম সুনন্দা। বাড়িতে সবাই নন্দা বলে ডাকে।"

রাজেশ্বর একটু ইতস্তত করে বলল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সুনন্দা বলল, "ওই আমার বাস এসে গেছে।"

বাসে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সুনন্দা। জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকাল। রাজেশ্বরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ফের হাসল একটু। বাসটা চলে গেল।

নিশ্চিন্ত হল রাজেশ্বর। তৃপ্ত হল, মুগ্ধও হল। কাল যে ছিল অপরিচিতা, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আজ তার সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, প্রায় ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। দুর্বোধ্য হাসির চেয়ে বোধ্য পরিচিত হাসি অনেক ভাল। সে হাসির মধ্যে অনেক আশ্বাস, নির্ভরতা আর অভয় মিশে রয়েছে। দুর্বোধ্য ছবির চেয়ে বোধ্য সহজগ্রাহ্য ছবি অনেক ভাল। সমস্ত জটিলতা শিল্পীর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাক, তার রেখা যেন সরল হয়, সবল হয়, তার রঙ যেন পরিচিত ভাষায় কথা বলে। যে চোখের দেখা দেখবে, সেও যেন ছবি থেকে কিছুটা নিয়ে যেতে পারে, আবার যে অন্তরঙ্গ হতে চায়, গভীরে ডুবতে চায়, সেও যেন মাত্র হাটুজল দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে না আসে। মহৎ শিল্পীর মধ্যে এই দুই লক্ষণই দেখতে পেয়েছে রাজেশ্বর। শিল্পী নিজে পরিশ্রম করবেন, রূপকে প্রকাশের জন্যে প্রাণপণ করবেন, কিন্তু যিনি দর্শক তিনি অনায়াসে দেখবেন। মহাকাব্যও তাই। তা বাচ্যার্থে সহজ, ব্যঞ্জনার্থে নিগূঢ়। কিন্তু এখন বাচ্য আর ব্যঞ্জনা এক হয়ে যাচ্ছে। অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তুমি তাকে বলবে—অনধিকারী, সে তোমাকে বলবে অপটু। পূর্ণ রাগ করে বলে, 'তবে কি আমরা সবাই মিলে পটুয়া হব? আমাদের কি বক্তব্য বদলাবে না, প্রতীক বদলাবে না, পদ্ধতি বদলাবে না? সেই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে যে তাল রেখে না চলতে পারবে সেই গজেন্দ্রগামিনীকে ত আর কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়তে পারব না? সে গরুর গাড়িতে ধীরে সুস্থে আসুক।'

পূর্ণের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। তবু রাজেশ্বরের মনে হয় তার কথাই একমাত্র কথা নয়, শেষ কথা ত নয়ই। আসলে যার যার তুলি তার তার হাতে হাতে। দক্ষতা, সিদ্ধির চেয়ে বড় ভাষ্য আর নেই।

রাজেশ্বর চলে আসছিল, দোকানী হঠাৎ ডাকল, "বাবু, আর-কিছু নেবেন না?"

"সিগারেট ত নিলাম।"

দোকানী হাসল: "আমি ভাবলাম, আর-কিছু যদি আপনার দরকার হয়। আর এক প্যাকেট সিগারেট যদি নেন। একটা পান নিলেও পারতেন বাবু। খুব মিঠে পান।"

কালো কালো দাঁতগুলো আবার বের করল দোকানী। কী দুঃসাহস। রাজেশ্বরের সঙ্গে পরিহাস! তার দৈত্যের মত চেহারা দেখেও একটু ভয় হয় না ওর।

কিন্তু পরক্ষণেই রাজেশ্বর হাসল। ওর ওপর রাগ করা বৃথা। হেরে গিয়ে দোকানীর ঈর্ষা বেড়ে গিয়েছে। সান্ত্বনাই ওর প্রাপ্য। রাজেশ্বর মনে মনে বলল, 'কেন, লাস্যময়ীতে মন ভরল না তোমার? তুমি তাকে নিয়ে থাক। আমি আমার লাবণ্যময়ীকে পেয়েছি।'

রাজেশ্বর দোকানীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে মৃদু হেসে বলল, "আচ্ছা, তোমার পান এসে আর-একদিন খাব। আজ যাই।"

সারাদিন বেশ ভাল কাটল রাজেশ্বরের। রঙের বাটিগুলি তুলে নিয়ে উঁচু টুলটার উপর রাখল। নিজের কাজ দেখে নিজেই খুশী হল। তুলি চালাতে চালাতে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে লাগল রাজেশ্বর, 'মায়াবন বিহারিণী।'

'চমৎকার মুড' এসেছে।

বিকেল বেলায় মন্দাকিনী এসে দাঁড়ালেন: "রাজু, খাবার-টাবার কিছু খাবিনে?"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "খাব সোনা-মা। এখানেই পাঠিয়ে দাও।"

মন্দাকিনী তবু গেলেন না। মুখ টিপে হেসে বললেন, "রাজু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "বল মা।"

মন্দাকিনী বললেন, "লুকিয়ে লুকিয়ে এই বয়সে ও-সব কী করা হচ্ছে শুনি?"

সোনা-মার মুখে হাসি। কিন্তু রাজেশ্বরের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, বুক দুরু-দুরু।

"কী সোনা-মা?"

মন্দাকিনী বললেন, "খুচরো পয়সার জন্যে তোর পকেটে হাত দিতে গিয়ে দেখি কী, ওমা, এক প্যাকেট সিগারেট। এসব আবার কবে থেকে ধরলি?"

নিশ্চিন্ত রাজেশ্বর হো-হো করে হেসে উঠল, "ও, সেই কথা? পূর্ণের জন্যে কিনেছিলাম সোনা-মা। কেন, আমি বুঝি ওসব খেতে পারিনে?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "না বাপু, তোমার ওসব খেয়ে কাজ নেই। ওসব তোমার সইবে না। তোমার জন্যে দই চিঁড়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রাজেশ্বর স্মিতমুখে তাঁর দিকে তাকাল। পরনে সোনা-মার সাদা খোলের মিলের শাড়ি। কিন্তু পাড়ের রঙ টুকটুকে লাল। দুপাশের চুলের রঙ এরই মধ্যে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সিঁথির রঙ টুকটুকে লাল। ষাট পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সোনা-মার। কিন্তু দাঁত-গুলি আশ্চর্য, আজও অটুট রয়েছে। লোকে ভাবে বুঝি বাঁধানো। তা নয়। এখনও পরিষ্কার ধবধবে সাদা সুগঠিত দাঁত, আর পাতলা ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। শুধু পানের রসে নয়, ওঁর গায়ের রঙও প্রথম যৌবনে দুধে-আলতায় ছিল। সেই আলতার আমেজ এখনও যায়নি। এত রঙ কি রাজেশ্বর প্রথম ওঁর কাছ থেকেই চেয়েছিল? ওঁকে দেখেই চিনেছিল? এই মাতৃমূর্তি রাজেশ্বর যে কতবার কত রকম করে এঁকেছে তার ঠিক নেই। পৌরাণিক আধুনিক কত মুখের সঙ্গে মিশিয়েছে ওই মুখের আদল তার হিসেব সে নিজেই জানে না। কখনও পার্বতীর কোলে গণেশকে দিয়েছে, কখনও যশোদার কোলে কৃষ্ণকে। সব মাই সোনা-মা। সব মাতৃরূপেই এই রূপময়ীর।

মন্দাকিনী বললেন, "কিছু বলবি রাজু?"

রাজেশ্বর বলল, "না, ইয়ে, হ্যাঁ। শিবু আর বীরুর চিঠি পেয়েছ?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, 'এই ত সেদিন এল। ওরা ত লেখে না, বউমারাই ওদের হয়ে লিখে দেয়। আজকাল বউরাই হয়েছে ছেলেদের প্রাইভেট সেক্রেটারি।"

মৃদু হাসলেন মন্দাকিনী।

রাজেশ্বরও হাসল। সেই শিবু আর বীরু শিবেশ্বর রায় আর বীরেশ্বর রায়। দুজনেই কৃতী, নামজাদা। একজন খড়্গপুরে জিয়োলজির প্রফেসর, আর-একজন বোকারোয় ইঞ্জিনীয়ার। ওরা রাজেশ্বরের চেয়ে বয়সে ছোট—অনেক ছোট। কিন্তু দুজনেই পুত্র কলত্র নিয়ে পুরো গৃহস্থ।

রাজেশ্বর বলল, "রত্না আর চন্দাকে এ মাসে আনলে না সোনা-মা?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "সব মাসে কি আর আসতে পারে বাপু? কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সব অস্থির। কোনটার সর্দি, কোনটার কাশি। কেন, তুইও ত গিয়ে ওদের দেখে আসতে পারিস। শিবু বীরুরাই না হয় দূরে থাকে। ভবানীপুর আর বালিগঞ্জ ত আর দূরে নয়। কিন্তু তুই কি আর তোর কোটর ছেড়ে নড়বি?"

আর-একটু দাঁড়িয়ে থেকে মন্দাকিনী চলে গেলেন। সত্যিই জ্যেঠতুতো বোন দুজনকে অনেকদিন দেখতে যাওয়া হয় না।

রাজেশ্বর ক্যানভাসে উলঙ্গ ছেলের কটিতে একটি লাল তাগা পরিয়ে দিল।

'কাচ্চাবাচ্চা।' রাজেশ্বর মনে মনে হাসল, 'কাচ্চাবাচ্চা।' হ্যাঁ, শিশুর ছবিও অনেক এঁকেছে রাজেশ্বর। অনেক। কিন্তু তাদের কণ্ঠে কি কাকলি ভরে দিতে পেরেছে? নিজে শুনেছে সেই কাকলি? ছবির শিশুর কাকলি কি কানে শোনা যায়? না—না—না। হাসিও শোনা যায় না, কান্নাও শোনা যায় না। কূজনও শোনা যায় না, গুঞ্জনও শোনা যায় না। কানের ভিতর দিয়ে নয় তার ছবি দুটি দৃষ্টির মাধ্যমে মরমে প্রবেশ করতে চায়। স্পর্শ করতে চায়, স্পর্শ পেতে চায়।

আজও অনেক রাত অবধি জেগে কাজ করল রাজেশ্বর। পরদিনও সকালে তুলি চলল। কিন্তু সাড়ে দশটায় এসে আবার একটি ঢং করে শব্দ। তুলি থামল। আশ্চর্য, ঘড়ি ত এমন আধঘণ্টা অন্তর অন্তরই বাজে। সব বাজনা কানেও যায় না। কিন্তু সাড়ে দশটার এই একটি মাত্র শব্দ যেন সেতারের সাতটি তারে ঝংকার তুলেছে। আর তার পরই হৃদ্‌কম্প। রাজেশ্বর পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু গেল না। রিস্ট ওয়াচের কাঁটাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু ঘণ্টা স্লো করে দিল। সাদা দেয়ালে নিজের কালো অনাবৃত পিঠটাকে চেপে ধরল শক্ত করে। 'না রাজেশ্বর, আজ তুমি

যেতে পারবে না। আজ তোমার যাওয়ার একটি মাত্রই অর্থ হবে। দোকানী তার কালো দাঁতগুলো থেকে আবার হাসবে। আশেপাশের খদ্দের-বন্ধুরা যারা তোমাকে দু'দিন ধরে লক্ষ্য করছে তারা চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করবে। আর ভাগ্যক্রমে সেই কুন্দদন্তীর দেখা পেয়েও তার হাসি দেখতে পাবে না, দৃষ্টির প্রসন্নতা দেখতে পাবে না। এই তৃতীয় দিনেও তোমাকে একই সময় একই জায়গায় একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সে লজ্জিত হবে, বিব্রত হবে, বিস্মিত হবে। কাল তুমি জিতে এসেছ আজ গেলে হারবে। নিজের কাছে হারবে, তার কাছে হারবে। সবচেয়ে চরম হারা নিজের কাছে হারা। সবচেয়ে বড় ধিক্কার আত্মধিক্কার। তা ছাড়া গিয়ে তুমি আর কীই পাবে! যা পাবার তা ত তুমি পেয়েছ, যা নেবার তা ত তুমি নিয়েছ। আর তোমার মডেল দিয়ে কী দরকার! এখন মনোভূমিতে মর্মমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা কর, আর কোন মূর্তির দিকে তাকিয়ো না।'

কঠিন আত্মশাসনে তৃতীয় দিন গেল, চতুর্থ দিন গেল, কিন্তু রাত্রি বুঝি আর কাটে না। এই দুদিন ধরে রাজেশ্বর শুধু শিক্ষক, সংস্কারক, নীতিবিদ্। কিন্তু শিল্পী নয়। দুদিন ধরে শুধু শাসন আর অনুশাসন চলছে, কিন্তু তুলি অচল। রঙের বাটি শুকনো। হঠাৎ রাজেশ্বর খাঁচায়-ভরা খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত গর্জন করে উঠল, 'না না না। আমি সমাজ চাই না, শিক্ষা চাই না, নীতি চাই না, আদর্শ চাই না। আমি শুধু আমার রঙের স্রোত চিরপ্রবাহিত রাখতে চাই। তার জন্যে মদের দরকার হলে মদ চাই, মাংসের দরকার হলে মাংস চাই।'

ঘরের দরজা বন্ধ, জানালা বন্ধ, রাজেশ্বরের মুখ বন্ধ। বনের বাঘ শুধু মনের মধ্যে গর্জন করতে লাগল। রঙের সমুদ্রে আজ রক্তের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম দিনে দশা আরও সঙিন দেখে খাঁচার বাঘকে রাজেশ্বর ছেড়ে দিল। কিন্তু যাবে যে, সবাই যে তাকে চিনে ফেলবে। 'আপনাকে না চেনে কে!' সে বলেছিল। কথাটায় আতিশয্য আছে। তার সঙ্গে অলঙ্কার নেই, উক্তিতে অলঙ্কার। কিন্তু তার ঝঙ্কারও কি মধুর! সবাই চেনে না, কিন্তু পাড়ার অনেকেই ত তাকে চেনে। তার দেখা যে তারা দেখে ফেলবে। এমন কোন ছদ্মবেশ কি নেই; যার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে রাজেশ্বর? যাতে সে দেখবে অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না, চিনতে পারবে না?

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তক্তাপোশের তলায় খুঁজতে লাগল বস্তুটা। পাওয়া গেল একটা মুখোশ। পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের একবার মুখোশপরা অভিনয়ের আইডিয়াটা সে-ই দিয়েছিল। তাদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছিল কয়েকটা মুখোশ। চিহ্ন হিসাবে একটা পড়ে আছে। রাক্ষস-রাজ রাবণের মুখোশটা। তারই হাতের আঁকা বড় বড় চোখ, নাক আর বিশাল গোঁফ। রাজেশ্বর নিজের মুখে এঁটে দিল সেই মুখোশটা। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হাসল। বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। আস্তে আস্তে রাজেশ্বর খসিয়ে নিল মুখোশটা।

হঠাৎ চোখে পড়ল পেরেকে-ঝোলানো তার রঙিন মনিপুরী থলিটি। যখন বাইরে ছবি আঁকতে যায় এই থলিটি ঝুলিয়ে নেয় কাঁধে। ভরে নেয় স্থূল সূক্ষ্ম কতকগুলি তুলি, রঙের প্যাকেট, কাগজ, পেনসিল, স্কেচবুক। আজও তাই নিল। আজও যেন রাজেশ্বর ছবি আঁকতে যাচ্ছে। আজ আপন বেশটাই তার ছদ্মবেশ।

সেই রাস্তার মোড়। সেই সাড়ে দশটা। দশটা বেজে চল্লিশ হল। কিন্তু কই, তার যে দেখা নেই! দোকানীর চোখ এড়াবার জন্যে আজ রাজেশ্বর খানিকটা পূর্বদিকে সরে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকেও সব দেখা যায়। সেই পথ, সেই নবনগর, শুধু নাগরিকার দেখা নেই। এগারোটা বাজল, সাড়ে এগারোটা, বারোটা।

শেষ বৈশাখের কড়া রোদ ক্রমেই চড়ছে, ক্রমেই চড়ছে। চারদিকে আগুনের হলকা। সাড়ে বারোটা। ব্যাপার কী? আজ কি ওর ক্লাস আরও দেরিতে? নাকি আজ একেবারেই যাবে না?

বাসগুলো যাতায়াতের বিরাম নেই। যদিও লোকজন আজ কম। হয়ত বেলা-দুপুরে বলেই চলাচল এমন বিরল হয়েছে। ছাতা মাথায় এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন রাজেশ্বর তাঁকে ডেকে বলল, "শুনুন।"

ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন, "কী ব্যাপার?"

রাজেশ্বর বলল, "আজ কি পর্বটর্ব আছে নাকি? আজ কি স্কুল কলেজ সব ছুটি?"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, "আজ রোববার।"

তারপর হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রাজেশ্বর আর-একবার নিজেকে ধিক্কার দিল। ছি-ছি-ছি! তার কি কোন খেয়ালই নেই। একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তার? দিন ঠিক নেই, তারিখ ঠিক নেই, হল কী! অবশ্য আগেও এমন অনেকবার হয়েছে। কোন কোন ছবি নিয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে। ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয়নি। মনেও সেই পরিবর্তনের কোন সাড়া জাগেনি। তার ত অফিস-আদালত নেই। বার-তারিখের হিসাব রাখবার তার দরকারই বা কী! দিন নয়, তারিখ নয়, শুধু আলো আর আঁধারের খেলা। আকাশে মাটিতে লতায় পাতায় ফলে ফুলে বিচিত্র বর্ণ সমারোহ। তার ইতিহাস ত মাস তারিখে চিহ্নিত নয়, নীলে লালে সবুজে পীতে বিভক্ত। তার জীবনপঞ্জীতে পূজো নেই পার্বণ নেই শুধু রঙের উৎসব আছে। যেদিন উৎসব নেই সেদিন অন্ধকার। কিন্তু অন্তরের রঙের সমুদ্র যখন উদ্বেল হত, এই সসাগরা পৃথিবী তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেত, তার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ত না। কিন্তু আজ ত তার সে কৈফিয়ত নেই রাজেশ্বরের। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন তাগিদের বিভ্রম তাকে দিন তারিখ ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই বিভ্রমও কি মধুর! কি বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রজালে ঢাকা। সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রে আবৃত। রাজেশ্বর সেই আবরণেই মুগ্ধ। সেই আবরণ উন্মোচন করবে কি, রাজেশ্বর সেই আবরণে আভরণ সংযোগ করে! তাকে নানা রঙে রাঙায় লতায় পাতায় ফুলে অলঙ্কৃত করে। সোনা-মা আর রত্ন-চন্দাদের ঘট কলসি, ধুনুচি আর বাকী নেই, সব রাজেশ্বরের রঙ আর রেখায় চিত্রিত। তার এই অভ্যাস আছে জেনে পাড়াপড়শী বন্ধুবান্ধব অনেকেই তার কাছে মাটির কি কাঠের পাত্রগুলি দিয়ে যায়। অবসরসময়ে রাজেশ্বর সেগুলি রঙিন করে। পারতপক্ষে সে কাউকে ক্ষুণ্ণ করে না। মনে মনে ভাবে, 'আমার এই ত কাজ, আমি এই জন্যেই ত এসেছি। আদিহীন অন্তহীন অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে আমি এক

রঙিন বুদ্বুদ।' মাটির ঘটে রঙ লাগাতে লাগাতে রাজেশ্বর ভাবে, 'মৃন্ময়ী তোমার রঙের শেষ নেই, রসের শেষ নেই, রূপের শেষ নেই। তবু তোমার এই গালে আর ঠোঁটে আমি আমার তুলি বুলিয়ে গেলাম।'

কিন্তু আজ আর নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত নেই রাজেশ্বরের। আজ সে হেরে গিয়েছে। কী ভাগ্য তার এই হার আর কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু মনের আর-এক কোণ থেকে গুঞ্জন উঠল, 'যদি একজন দেখতে পেত, সে সৌভাগ্যের সীমা থাকত না।'

রাজেশ্বরকে দেখতে পেয়ে মন্দাকিনী খুব বকলেন, "ছি-ছি-ছি, দিনের পর দিন তুই কী হচ্ছিস বল্ তো। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। তুমি একটা সাংঘাতিক অসুখবিসুখ ঘটাবে আমি বলে দিলাম রাজু।"

বিকাল বেলায় দুটি ছেলে এল দেখা করতে। তপন আর জয়ন্ত। আর্ট কলেজে একটি থার্ড ইয়ার আর একটি ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। দুজনেরই ফাইন আর্টস। দুজনেই চারুদর্শন। বয়স একুশ-বাইশের বেশী হবে না। জয়ন্ত আবার কচি কচি দাড়ি রেখেছে। রাজেশ্বর হেসে বলল, "এ যুগে কি দাড়ি চলবে?"

আজকালকার ছেলে মুখচোরা নয়। হেসে জবাব দিল, "বলা যায় না। হয়ত এই সেঞ্চুরির লাস্ট ডিকেডে দাড়ি আবার ফিরে আসতে পারে। অনেকে বলেন এই বিংশ শতাব্দী ব্যারেন। অন্তত এই মধ্য-ভাগ। বোধ হয় একবিংশ ঊনবিংশের পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে?"

"দাড়ির জোরে নাকি?" হেসে উঠল রাজেশ্বর।

ওরা ঘুরে ঘুরে তার ছবি দেখল। টেম্পারা, ওয়াশ। ওয়াটার কালার, অয়েল। নিজেদের মধ্যে পুরনো ছবির সঙ্গে নতুন ছবির তুলনামূলক সমালোচনা করল।

তপন বলল, "আমাদের প্রফেসর ঘোষ আপনার কথা প্রায়ই বলেন।"

রাজেশ্বর বলল, "তাই নাকি?"

তপন বলল, "হ্যাঁ। তিনি বলেন এমন নিষ্ঠা নাকি আর দেখা যায় না। আর কোন আকর্ষণ নেই, ডাইভারশন নেই—।"

রাজেশ্বর আস্তে আস্তে বলল, "নিষ্ঠা দিয়ে ত বিচার না, সিদ্ধি দিয়ে বিচার। তাই হল একমাত্র মাপকাঠি।"

তপন বলল, "কিন্তু নিষ্ঠা কি সিদ্ধির উপায় না? নিষ্ঠা ছাড়া কি কিছু হবার জো আছে।"

রাজেশ্বর যেন আত্মগতভাবে বলল, "নিষ্ঠা সিদ্ধির উপায় কিনা জানি না। তবে তাতে আত্মপ্রসাদ আছে। অন্য সব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এনে শুধু একটিমাত্র ফরমের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা। অন্য সব চিন্তা চেষ্টা ডেস্ট্রাকসন মাত্র। ছোট ক্যানভাস, কিন্তু নিপুণ কাজ চাই।"

দিল্লীর একাডেমিতে রাজেশ্বরের ছবি গিয়েছে, সেখান থেকে গিয়েছে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে। সে আলোচনা হল। দেশে ছবির বাজার কী করে প্রসারিত করা যায়, শিল্পী-সঙ্ঘ গড়বার সার্থকতা কী, কেন সেই সঙ্ঘ গড়ে উঠতে উঠতে বার বার ভেঙে যায়, তাই নিয়ে আলোচনা চলল। সোনা-মা চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হয়-হয়। ওরা দাঁড়াল। বিদায় নেওয়ার আগে দুজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

রাজেশ্বর বলল, "আহাহা ওসব আবার কী!"

কিন্তু মন ফের প্রসন্নতায় ভরে উঠল। এই প্রণাম তাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে। ঠিক এ সময় এই প্রণামের যেন বড় দরকার ছিল।

রাজেশ্বর ভাবল, 'আশ্চর্য, সেও ওদেরই বয়সী। কি ওদের চেয়েও দু-এক বছরের ছোট। উনিশের বেশী হবে না তার বয়স। তবু তাকে কেন এত ভয়। কেন তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, কেন উঁচু আসনে শুধু প্রণম্য হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না, কেন একেবারে সমতলে নেমে আসতে সাধ যায়।'

বঞ্চিত চিত্রে আজ আর মন বসল না। ইজেলটা নীল পর্দায় ঢেকে রেখে নতুন একটি ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে বসল রাজেশ্বর। ক্ষীণস্রোতা এক গ্রামের নদী। এক পারে দিগন্ত-ছোঁয়া সবুজ শস্যের ক্ষেত। আর-এক পারে শুধু একটি পথরেখা, সরু আর সাদা।

এখন রঙ নয়, শুধু ড্রয়িং। শুধু পেনসিলের রেখা। কিন্তু পটের আগে মানসপট। সেখানে সবই ফুটে উঠেছে।

আজ একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল রাজেশ্বর। আজও স্টুডিয়োর ঘরেই বিছানা পাতল। নেটের মশারিটা টানিয়ে নিল নিজের হাতে। দু-একটা মশা সেদিন বড় উৎপাত করেছিল। সেইজন্যেই ঘুম হয়নি।

আজও ঘুম এল না। বারোটা, একটা, দুটো, আড়াইটা। ঘড়ির ঘণ্টা শুনতে লাগল রাজেশ্বর। আর হঠাৎ মনে হল তার মশারির পাশে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে আলো নেই, কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আর সেই জ্যোৎস্নায় নেটের মশারির ফাঁক দিয়ে তাকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। তার দিব্য রূপ ঘর আলো করেছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী তন্বী অসামান্য লাবণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ পর্যন্ত যত রূপবতীকে দেখেছে রাজেশ্বর, যত রূপময়ীর ছবি এঁকেছে তাদের সব রূপ এই এক দেহাধারে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। এই একটি তনু ঘিরে তার সব সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি করে চলেছে। 'রাজেশ্বর, তুমি আমাদের চোখ দিয়েছ, মুখ দিয়েছ, নয়নে অধরে ক্ষুধা দিয়েছ, তৃষ্ণা দিয়েছ, কিন্তু সেই তৃষ্ণা মিটাবার উপায় ত বলে দাওনি। রাজেশ্বর, প্রাণের বিপুল চাঞ্চল্যকে তুমি রেখা আর রঙের বাঁধনে বেঁধে রেখেছ। আজ আমরা সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি। একটি শিখা, একটি বাসনার
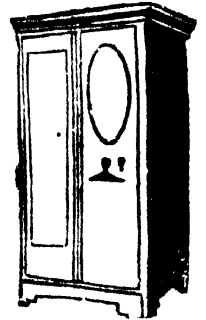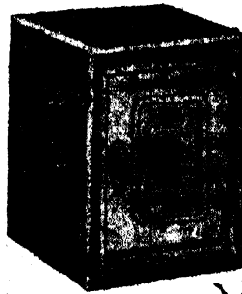
আকার নিয়েছি। রাজেশ্বর, আজ আমরা আহুতি চাই।'

রাজেশ্বর মশারি তুলে সাগ্রহে বলল, "এস, এস, এসেছ!"

কিন্তু কে আসবে? ঘরে কেউ নেই। মেঝের সেই কাগজপত্র, এক কোণে ইজেলটা, আর-একদিকে সেই রঙের বাটিগুলো ছড়ানো রয়েছে। দেয়ালের ছবিগুলি স্থির অকম্পিত। ফ্রেম আর কাচের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাজেশ্বর, সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তাতে নতুন কিছু দেখা গেল না।

ছি-ছি-ছি। রাজেশ্বর কি পাগল হয়ে গেল!

সেকি স্বপ্ন দেখেছিল এতক্ষণ? তা ত নয়। সে ত সম্পূর্ণ জেগেই ছিল। একটুও ঘুমোয়নি। তবে কি এ দৃশ্য বাস্তব? না, তাও নয়। বাস্তবের চেয়েও যা বড়, বাস্তবের চেয়েও যা বেশী শক্তিশালী এ সেই কল্পনা। আঁধারের পটে মনের তুলি দিয়ে আঁকা এ সেই নিজেরই মানসী মূর্তি। ছায়ার চেয়েও ছায়া। তবু তাতে কী জীবনস্পন্দন, প্রাণের কী পরিপূর্ণতা!

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। রাজেশ্বর কি ভয় পেল? ভূতের ভয় নয়, পরীর ভয়? বাস্তবেও ভয়, কল্পনাতেও ভয়? কিন্তু শুধুই কি ভয়? সেই ভয়ের সঙ্গে আরও কিছু কি মিশে নেই।

কুঁজোটা এ ঘরে এনে রেখেছিল। ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল রাজেশ্বর। তারপর নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই হাসল। না, অত ভীত নয় রাজেশ্বর। অনেক বিপদে আপদে সে দেহের শক্তিকে প্রয়োগ করেছে, গুণ্ডার আক্রমণ রোধ করেছে, নিজেকে বাঁচিয়েছে, অন্যকেও। দেহের শক্তি দিয়ে এই দেহকে বেঁধে রাখবে।

পাগলা, মনটাকে তুই বাঁধ। মন নয়, দেহকে বেঁধে রাখো। দেহ নিয়েই ত যত বিপত্তি। মনকে ছেড়ে দাও। তাকে কেউ দেখতে পায় না, ধরতে পায় না, ছুঁতে পায় না। তুমি অদৃশ্য হতে চেয়েছিলে। দেহকে ঘরের মধ্যে ধরে রেখে মনকে যদি অভিসারে পাঠিয়ে দাও তা হলে আর ছদ্মবেশের দরকার হবে না।

ফের শুতে আসবার আগে রঙের বাটিগুলি একটু গুছিয়ে রাখল রাজেশ্বর। রঙ আর রঙ। তারই হাতে তৈরী সবুজে নীলে লালে বিচিত্র বর্ণের সংমিশ্রণ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রাজেশ্বর। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "অনঙ্গ, এ কী রঙ্গ তোমার! আমি ত তোমাকে চাইনি। আমি ত তোমাকে বারবার এড়িয়ে গেছি। আমি জানি তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তুমি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আর নাও ফিরতে পারি। কিংবা যদি বা ফিরি, এই ধ্যানের আসনে ফের হয়ত বসবার ক্ষমতা আর আমার থাকবে না। আমার অনেক বন্ধুকেই ত জানি। যারা ফিরে এসেছে, তারাও অবশ বিকলাঙ্গ। তাদের হাতের তুলি কাঁপে। আঁচড়ে দৃঢ়তা নেই, ঋজুতা নেই। তাই তোমার শত প্রলোভনেও আমি তোমাকে আমল দিইনি। কিন্তু একী রঙ্গ তোমার অনঙ্গ! তুমি আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে আমার রঙের বাটির মধ্যে অঙ্গ ডুবিয়ে বসে আছ।"

মদনকে ভস্ম করল না রাজেশ্বর, তা শুধু মহেশ্বরই করেছিলেন, করে বুদ্ধিমনের কাজ করেননি। রাজেশ্বর শুধু উপহাস করল—মদন আর মহেশ্বর দুজনকেই। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ফের মশারির মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত কাজ করল। তারপর তার হঠাৎ মনে হল পূর্ণের একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। কেবল পূর্ণই আসে। সে ত বড়-একটা যায় না। একবার যাওয়া উচিত। কী ভেবে থলিটাও কাঁধে নিল রাজেশ্বর। ভরে নিল রঙের বাটিগুলো, তুলি আর কাগজ, আর স্কেচ বুকটা। পূর্ণ যদি না ছাড়ে তা হলে ওর ওখানেই আজ সারাদিন কাটাবে। বিকেলে ওর ঘরে বসে, কি বাইরে কোথাও এসে ছবি আঁকবে।

মন্দাকিনী রান্না করতে করতে উঠে এলেন: "আজ আবার কোথায় চললি রাজু?"

রাজেশ্বর বলল, "একটু পূর্ণর ওখানে যাচ্ছি সোনা-মা। এবেলা আর ফিরব না।"

"ও মা, আমি যে তোর জন্যে আজ চিতল মাছের পেটি আনালাম।"

রাজেশ্বর বলল, "ও-বেলা এসে খাব সোনা-মা। মাছের পেটি আমার পেটে ঠিকই যাবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তা যা বাপু, একটু ঘুরে-টুরে আয়। কদিন ধরে এমন মুখ করে আছিস, তাকানোই যায় না। আসবার সময় রত্নার খবর নিয়ে আসিস। ওর ছেলেটার সর্দিকাশি, মেয়েটার আবার কান পেকেছে।"

বারান্দার ইজিচেয়ারখানায় হেলান দিয়ে সর্বেশ্বর তখনও কাগজ পড়ছেন। রাজেশ্বরকে দেখে মুখ তুলে বললেন, "কী, বেরুনো হচ্ছে?"

"হ্যাঁ জেঠামশাই।"

সর্বেশ্বর একটু হাসলেন। ভাইপোর কীর্তি সম্বন্ধে সস্নেহ উৎসাহ দেখিয়ে: "নতুন ছবি-টবি কি কিছু মাথায় এল?"

রাজেশ্বর একটু মাথা চুলকিয়ে হেসে বলল, "কই আর!"

সর্বেশ্বর ভরসা দিয়ে বললেন, "আসবে আসবে। বসে বসে একটু ভেবে-টেবে নিস, ও হলেই আসবে।

প্রতিভার একটা লক্ষণ হল নব নব উন্মেষশালিনী। নতুন চাই, নতুন চাই। আর এ যুগের যা হাওয়া তার চাই নিত্য-নতুন। হ্যাঁ, আর এক কথা। শোন, যেয়ো না। সেদিন এই কাগজেই তোমার সমালোচনা বেরিয়েছিল। তেমন ভাল লেখেনি। দেখে বড় দুঃখ হল। তোমার ওই শান্ত শিষ্ট মিঠে মিঠে ছবিতে আর চলবে না রাজু। যুগের হাওয়া বড় গরম। কড়া কড়া জিনিস নিয়ে এস। ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ এখন এই সব চাই। বিদ্রোহ বিপ্লব খুব কড়া কড়া ব্যাপার।' বুঝেছ?"

রাজেশ্বর একটু মাথা চুলকিয়ে হেসে জেঠামশাই।"

তারপর রাস্তায় নেমে পড়ল। তাকে এই উপদেশ শুধু জেঠামশাই নন, আরও অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে যা সে তাই। তার তুলি ত অন্যের হুকুমে চলবে না। তা হলে থেমে পড়বে। তার স্বভাবের বাইরে ত আর যেতে পারে না। যারা সুখ্যাতি করেন তাঁরাও বলেন, "মিষ্টি, তোমার ছবি, বড় মিষ্টি।' শুনে প্রসন্ন হয় না রাজেশ্বর। আজকাল যেমন ভাল মানুষ বললে পুরো মানুষ বোঝায় না, তেমনি লেখা কি ছবিকে শুধু মিষ্টি বললে তার আড়ালে কেমন একটু অনুকম্পা মিশানো থাকে। প্রসাদগুণ আজকাল আর বড় গুণ নয়। দর্শকের চোখ ছবি দেখতে এসে বার বার খোঁচা খাক, কচকচ করুক,

তাও যেন ভাল। রাজেশ্বর জানে সে অত মিষ্টি নয়। না স্বভাবে, না ছবিতে। তার মনের মধ্যে যে অকল্যাণের আর-এক পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে সে তার খবর রাখে। ছবির আলো-ছায়ার মত সেখানেও যে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে সে তা জানে। তবে প্রকাশের বাধা কিসের? তার নির্দিষ্ট রূপ বোধের? রুচি আর রীতির? তবু মাঝে মাঝে নিজেকে বদলাতে ইচ্ছা করে রাজেশ্বরের, সাধ হয় পুনর্জন্মের। সেই নবজন্ম কি চূড়ান্ত ডিসিপেশন-এর মধ্যে একবার ডুব দিয়ে না উঠলে আর সম্ভব নয়?

সেই বড় রাস্তার মোড়। তার ওপারে সেই সরু পথ, ছায়া শীতল দীর্ঘিকা। এপারে রোদের তাপ ফের শুরু হয়েছে। হঠাৎ দুই পা যেন আটকে গেল রাজেশ্বরের। কর্ণের রথ বসে গিয়েছিল, তার পদরথ। নাকি কে যেন দুটি কাঁকন-পরা হাতে তার পদযুগল জড়িয়ে ধরেছে, 'যেয়ো না, যেয়ো না।'

রাজেশ্বরের বাস চলে গেল, কিন্তু সে যেতে পারল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কাল যার দেখা পায়নি, আজ সে এল। কাল যে রোদে দাঁড়িয়েছে, আজ সে দূর থেকেই হাসি আর সুধার বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে পাশে এসে দাঁড়াল।

সুনন্দা হেসে বলল, "আপনাকে যে কদিন দেখিনি।"

রাজেশ্বর বলল, "আমাকে কি তুমি রোজ দেখবে বলে আশা করেছ?"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, "না, তা ঠিক নয়, তবে আপনি ত এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। তাই বলছিলাম। আপনাকে বাসে করে যেতে আমি আরও অনেকদিন দেখেছি।"

রাজেশ্বর বলল, "তাই নাকি? কই আমি ত দেখিনি।"

সুনন্দা বলল, "বাঃ, আপনারা কেন দেখবেন!"

রাজেশ্বর বলল, "তা ঠিক। আমাদের না দেখাই উচিত।"

সুনন্দা বলল, "আপনি বুঝি খুব উচিত-অনুচিত মানেন? শুনেছি আর্টিস্টরা নাকি মানেন না?"

রাজেশ্বর মেয়েটির এই প্রগলভতায় খুশী হল। তার ধারণা হল, ওর বয়স কম হলেও, মন পরিণত, জীবন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

রাজেশ্বর বলল, 'কেউ কেউ মানেন, কেউ কেউ মানেন না। কেউ বা শিল্পে মানেন, জীবনে মানেন না। কেউ বা উল্টো।'

সুনন্দা বলল, "ওই যে আমার বাস এসে পড়েছে। আপনি কোথায় যাবেন?"

রাজেশ্বর বলল, "দমদমের দিকে।"

সুনন্দা খুশী হয়ে বলল, "তা হলে ত ভালই হল। আমরা একসঙ্গে যেতে পারব।"

রাজেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, তা পারব।"

ঈর্ষাকাতর দোকানীর চোখের উপর দিয়ে রাজেশ্বর সুনন্দার সঙ্গে বাসে উঠল। একই সীটে বসল পাশাপাশি। জানলার ধারে সুনন্দা, সুনন্দার ধারে সে। বাস যশোর রোড ধরে এগোতে লাগল।

এই রাস্তা দিয়ে রাজেশ্বর জীবনে কতবার যে যাতায়াত করেছে তার ঠিক নেই। কখনও পূর্ণকে নিয়ে, কখনও অন্য বন্ধুর সঙ্গে কখনও একা। কখনও বাসে, কখনও ট্যাকসিতে, কখনও হেঁটে। ছবি আঁকতেও এসেছে, পথের ধারে গাছের তলায় বসে স্কেচ করেছে, অখ্যাত চায়ের দোকানে পিছনের বেঞ্চে বসেছে, এঁকে তুলেছে দোকানের মালিক আর খদ্দেরদের। কোনদিন বা নেমে গিয়েছে মাঠের মধ্যে কি পোড়ো কোন বাগান বাড়িতে। চায়ের কাপকে করেছে রঙের বাটি, কি চীনামাটির প্লেটের চারদিকে থোকে থোকে রঙ রেখে নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু আজকের যাত্রা অন্য রকম, আজকের যাত্রা উদ্দেশ্যহীন, একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা। সেই পরিচিত পথ, দোকান পাট, গাছপালা সব যেন আজ রঙ বদলেছে, রূপ বদলেছে। যেন এক অচিন দেশের কন্যাকে নিয়ে এক অচিন দেশে চলেছে রাজেশ্বর। সেখান থেকে যদি না ফেরে রাজেশ্বর কোন ক্ষতি নেই। সেখানে এক নতুন জীবন, নতুন জন্মের স্বাদ পাবে রাজেশ্বর। সেখানে হয় ত তার আর কোন পরিচয়ই থাকবে না। এই খ্যাতি নয়, কীর্তি নয়, খ্যাতির স্পৃহা নয়, তা হারাবার আশঙ্কা নয়, শোক নয়, এই রাশ রাশ পুঞ্জীকৃত ছবির বোঝা নয়—কিছুই সে নিয়ে যাবে না। সেখানে সে শুধু এক-জনের সঙ্গী। তার আর কোন দ্বিতীয় পরিচয় নেই, পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনি কখন ছবি আঁকেন?"

এক ভিন্ন জগৎ থেকে রাজেশ্বর যেন ফিরে এল: "কী বলছ!"

"কখন ছবি আঁকেন আপনি?"

রাজেশ্বর বলল, "ও। তার কি কিছু ঠিক আছে? যখন ভাল লাগে তখনই আঁকি। সব সময়ই আমার সময়। আবার দিনের পর দিন যায়, যার কোন একটি মুহূর্তও আমার নিজের নয়।"

সুনন্দা বলল, "আপনার বুঝি সেই রকম হয়? কারও কারও আবার শুনেছি বাঁধা সময় থাকে। কেউ বা সকালে, কেউ বা
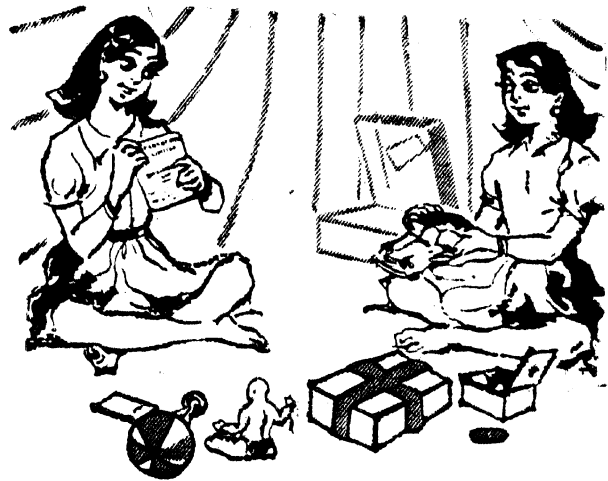
খিকেলে, কেউ বা গম্ভীর রাত্রে। আচ্ছা কী করে অত ছবি আঁকেন বলুন ত? আমি ত একখানাও আঁকতে পারিনে।"

রাজেশ্বর একটু হাসল : "তোমার পেরে কী দরকার? তুমি নিজেই ত একখানি ছবি।"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল। তার সেই লজ্জা, তার সেই হাসি, তার সেই দুই গালের দুটি টোল মুগ্ধ চোখে উপভোগ করল রাজেশ্বর।

বাস চলতে লাগল। রাজেশ্বর ভাবল, চলুক। ওর যৌবন অনন্ত হক, এই যাত্রা অনন্ত হক, রাজেশ্বরের আর কোন কামনা নেই।

একটু বাদে সুনন্দা মুখ তুলে বলল, "আমার পিসীমাও তাই বলেন। তিনি বলেন আমি নাকি পটের বিবি। মোটেই তা নয়। আমি সংসারের অনেক কাজ করে দিয়ে তবে কলেজে বেরোই। তাই ত মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায়।"

রাজেশ্বর বলল, "তুমি বুঝি তোমার পিসীমার কাছে থাক?"

সুনন্দা বলল, "হ্যাঁ। বাবা ত নেই। মা আর আমি—"

রাজেশ্বর তাড়াতাড়ি করুণ কাহিনীর প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গেল। করুণ রসের ছবি এঁকেছে। আর নয়।

"তোমার কোন্ ইয়ার হল এবার?"

সুনন্দা বলল, "থার্ড ইয়ার।"

"আর্টস?"

সুনন্দা বলল, "হ্যাঁ।"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "থার্ড ইয়ার হল এ ইয়ার অব রোমান্স। আমাদের প্রফেসর সেন বলতেন।"

সুনন্দা আবার লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজেশ্বর ভাবল, কত অল্পসময়ের মধ্যে ও এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার ছবির সঙ্গে ওর পরিচয় আছে বলেই কি এই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে? আলাপের পটভূমি আগেই রচিত হয়ে রয়েছে। এখন শুধু তার ওপর রেখা আর রঙের কাহিনী।

এত অল্প সময়ের মধ্যে কারও সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে রাজেশ্বরও এর আগে পারেনি। আজ কী করে পারল? না পারবে কেন? এই কদিন ধরে এত কাছে কাছে রাজেশ্বরের আর কেই বা আছে? বাস্তবে কল্পনায় স্বপ্নে চিন্তায় দর্শনে অদর্শনে দিবাদর্শনে এমন কাকে আর পেয়েছে রাজেশ্বর?

হঠাৎ সুনন্দা বলল, "আমাকে সামনের স্টপটায় নামতে হবে।"

রাজেশ্বর বলল, "সে কী! তোমার কলেজ ত আর দুটো স্টপ পরে।"

সুনন্দা সংকুচিত হয়ে বলল, "আমাকে এখানেই আগে একটু নামতে হবে। এগারোটায় আজ আর আমার ক্লাস নেই।"

রাজেশ্বর উল্লসিত হয়ে বলল, "তা হলে ত ভালই হল। চল, আমিও নেমে পড়ি। কোথাও বসে তোমার একটা স্কেচ করে নেব।"

সুনন্দা একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি নামবেন? আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আরও ওদিকে যাবেন?"

মেয়েটি ত বেশ চালাক। রাজেশ্বর বুঝতে পারল সে ওর সঙ্গে যায়, তা সুনন্দার ইচ্ছা নয়।

রাজেশ্বর হেসে বলল, "আমাকে তুমি আরও দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইছ? বেশ।"

হঠাৎ রাজেশ্বরের মনে একটা সংশয় উদগ্র হয়ে উঠল : "তুমি কি এখানে কারও সঙ্গে দেখা করবে?"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে ফের একটু চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ।"

তারপর রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে পরম নির্ভয়ে পরম বিশ্বাসের গোপনতম কথাটি প্রকাশ করে বলল, "হ্যাঁ। আপনি আর্টিস্ট, আপনি ত সব বোঝেন। ও আপনার খুব ভক্ত। আপনার নাম ওই আমার কাছে প্রথম করে, আপনার ছবি ওই আমাকে প্রথম চিনিয়ে দেয়। এর আগে ছবিতে আমার কোন ইনটারেস্টই ছিল না। ওর জন্যেই—সব ওর জন্যেই। একদিন আপনার ওখানে নিয়ে যাব।"

রাজেশ্বর অস্ফুটস্বরে বলল, "বেশ ত।"

সুনন্দা বলল, "এই জন্যেই আপনাকে সব বললাম।

"আপনি আর্টিস্ট, আপনি সব বুঝবেন। আপনি যেন কাউকে আবার—"

রাজেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, "না না না।"

সুনন্দা একটু ইতস্তত করে বলল, "আজও অবশ্য আলাপ করিয়ে দেওয়া যায়। আপনার কাছে কোন লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। প্রথম দিন দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যেন আপন হয়ে গেছেন। তার আগে এত ছবি দেখেছি আপনার। ওদের বাড়িতেও আছে দু-একখানা। আপনি কি তা হলে নামবেন?"

রাজেশ্বর ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলল "না না না।"

না না না। না না না। এরপর থেকে শুধু না না না। সুনন্দা নেমে গেল।

আরও কয়েকটা স্টপ এগিয়ে রাজেশ্বরও নামল। আজকের রোদ আরও কড়া, মেঘান্তরিত রোদের মত দুঃসহ। সেই তাপের মধ্যে উদভ্রান্ত উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল রাজেশ্বর। বড় রাস্তা দিয়ে যাত্রি-বোঝাই বাসগুলো যাচ্ছে আসছে। কিন্তু কিছুই যেন চিনতে পারছে না রাজেশ্বর। সত্যিই সে এক অচিন দেশে এসে পড়েছে।

কিন্তু কেউ আর কাছে নেই। সে এখন নিঃস্ব নিঃসঙ্গ। যে বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়ঝঞ্ঝার কথা জ্যেঠামশাই তখন বলেছিলেন তা সব যেন তার বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। সে বাসা বুঝি এখনই ভেঙে যায়। খড়কুটোর মত উড়ে যায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে এক পোড়া ইঁটের পাঁজার সামনে রাজেশ্বর নিজেকে আবিষ্কার করল। আশেপাশে ঊষর ধূসর পোড়োজমির বিস্তার। ইঁটখোলায় ইঁট পুড়ছে। কতক-গুলি ইঁট পুড়ে পুড়ে একেবারে ঝামা হয়ে গিয়েছে। অস্নাত অভুক্ত রাজেশ্বর সে দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

পশ্চিমের আকাশে সূর্য আস্তে আস্তে দিগন্তের দিকে নামছে। ও আবার কালই উঠবে।

কিন্তু রাজেশ্বর কি ফের উঠতে পারবে? এই পতন, এই লজ্জা, এই পরম পরাভব থেকে সে কি আর ফের উঠে দাঁড়াতে পারবে? রাজেশ্বর নিজের কাছে কোন জবাব পেল না।

তারপর আস্তে আস্তে যেন অভ্যাস বশেই থলিটা কাঁধ থেকে নামাল। হাতড়ে হাতড়ে বের করল স্কেচবুক আর পেনসিলটা। তারপর একটা সাদা পাতা খুলে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। এও বহুদিনের অভ্যাস। তা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথমে অর্থহীন আঁকাচোরা রেখার জঞ্জাল। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই রাজেশ্বর বিস্মিত হয়ে দেখতে পেল দুর্বোধ্য রেখাজালের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে একটি মুখ ফুটে বেরুচ্ছে। এখনও শুধু কুঁড়ি। কিন্তু কাল কি পরশুই একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ নেবে। রাজেশ্বর উল্লসিত হয়ে উঠল। একটি নূতন টেকনিকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখল, রঙের বাটিগুলি ঠিকই আছে। স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে তার নিজের তুলিগুলির। কিন্তু এখন নয়, এখানে নয়। এখানে আর আলো নেই। আলোর জন্যে স্টুডিওতেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে শতদল আস্তে আস্তে তার পাপড়িগুলি মেলতে থাকবে। একটি কীট তার মধ্যে ছিল কি ছিল না তা তুচ্ছ হয়ে যাবে। এই কটি দিনের বেদনা গ্লানি আর পরাভব, শ্রান্তি আর অশ্রান্তি, তৃপ্তি আর তৃষ্ণা হয়ত একদিন তার নতুন ছবির উপকরণ হয়ে উঠবে, হয়ত ফের তার রঙের তরণী নানা আঘাটায় ঠোকর খেতে খেতে ঘূর্ণি-স্রোতে পাক খেতে খেতে ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে সেই স্বপ্নলক্ষ্মীর ঘাটের দিকে যাত্রা করবে।

সন্ধ্যার আবছায়ায় রঙিন থলিটা কাঁধে নিয়ে ফের উঠে দাঁড়াল রাজেশ্বর।

ছদ্মবেশ এতক্ষণে ফের তার আপন বেশ হয়েছে, একমাত্র ভূষণ।
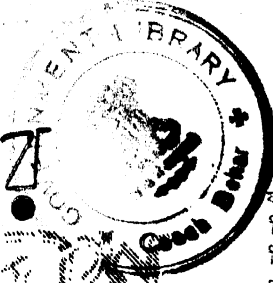
ফ্রাঙ্কফোর্টে ডিনার খেতে নামতে হল। এর আগে প্লেন থেমেছিল করাচী, তেহেরান, ইস্তাম্বুল। পার্শিয়া বলতে কার্পেট, চেনার, নারগিস ও বুলবুল, শাহআর সোরায়া—সব মিলে যে রকম ধারণা ছিল, তেহেরান এয়ারপোর্টের চেহারা তার সঙ্গে মেলে না। একটা নাঝারি রকম বড় 'হলে' সস্তা নড়বড়ে টেবিল চেয়ার সাজান, ধুলোধুলো ভাব সব কিছুতেই। একদিকের দেয়ালে শাহের ধুলোমাখা এক ছবি। লেডিজ ক্লোকরুমে ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে আসতে হল। নারগিস বুলবুলের দেশে এত নোংরামী, এত দুর্গন্ধ?...ফ্রাঙ্কফোর্টে ভয়ানক শীত, অক্টোবর মাস। এয়ারপোর্টের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ পেরিয়ে ডাইনিং হলে আসতে প্রচণ্ড কনকনে বাতাসে অন্ধকারকে ঝাপসা দেখলাম। সঙ্গের মহিলার ছোট ছেলেটি ঐ ঠাণ্ডায় কি কুক্ষণে জল খাবার আবদার ধরল। ওয়েটারের কাছে জল চাওয়াতে লোকটা কিছুক্ষণ বোকার মত চেয়ে থেকে, তারপর সামলে নিয়ে রুক্ষ-স্বরে গড়গড় করে খানিকটা কি বলে চলে গেল। সেই যে গেল, গেলই। জলতো এলই না, সেই সঙ্গে ডিনারে অবশিষ্ট 'কোর্স'ও বাদ পড়ল। ভদ্রমহিলা বললেন, লোকটা যা বলে গেল তার অর্থ এই, "এখানে জল নেই। জোগাড় করে আনতে হয়।" বিরাট কাচের জানলার বাইরে বাগানে সারি সারি ফোয়ারা, ওদিকে সবাই ঢকঢক করে নানা জাতীয় ওয়াইন আর বিয়ার খাচ্ছে, দেখে তো সঙ্গিনীর ছেলেটি জলের জন্য চেঁচিয়ে একাকার। প্লেন-এ না ওঠা পর্যন্ত তা 'জোগাড়' করা গেল না। মনে ভাবলাম কী সর্বনাশ! যে দেশে জল 'জোগাড়' করে আনতে হয় সেখানে না-জানি আরও কী বিড়ম্বনা আছে।

মনে পড়ে পারী পৌঁছনর পর সকাল বেলা প্রথমেই জানলা দিয়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য। মেয়ে পুরুষ অনেকেই চলেছে বাজারের ঝাঁপিতে তরিতরকারি ইত্যাদির সঙ্গে বেশ লম্বামত ছোটখাট লাঠির চেহারার একটা জিনিস নিয়ে। দু হাত লম্বা তো হবেই, আর বড় হতে পারে। খাবার জিনিসের সঙ্গে ওটা কি? ও নাকি পাঁউরুটি। বিখ্যাত ফরাসী 'বাগেত'। এই পাঁউরুটির লাঠি ছাড়া ফরাসীর এক বেলারও খাওয়া চলে না। নানা গড়নের রুটি দেখেছি, তবে রুটির লাঠি এই প্রথম দেখলাম। ফরাসীরা আমাদের মত ভোজন বিলাসী। মাছ মাংস তরিতরকারী কেনাটা গৃহস্থ ঘরের লোকের একটা আনন্দের বিষয়। এই রুটি, চীজ আর ওয়াইন ছাড়া কোনো ফরাসীর খাওয়া হয় না। আর চাই আলু—'পম্-দে-ত্যার্'। জেনারেল দে-গল প্রেসিডেণ্ট হবার সময় যখন সমস্ত পাশ্চাত্ত্যে থমথমে ভাব, এল-জিরিয়ায় প্রচণ্ড অশান্তি, ফ্রান্সে হয়ত বিপ্লবও হতে পারে—এমন সময় বাজার ঘাটে ফরাসীদের মুখে কেবল "পম্-দে-ত্যার" অন্তর্হিত হবার অনুযোগ আর "ভ্যাঁ" (ওয়াইন)এর দাম চার আনা বাড়ার জন্য গজগজানী শুনেছি। এককালে এরা এতবড় বিপ্লব কি এই আলু খেয়েই ঘটিয়েছিল? ভোজনবিলাসী হলে হবে কি, ফরাসীর মত নোংরা জাত বোধ হয় কমই আছে। বেশ ভাল খেয়ে-পরে থাকা সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতেও স্নানের ঘর নেই। অর্থাৎ ও বালাই নেই। আমাদের কথায় কাক স্নানের মত এদের ভাষায় একটা কথা আছে, "তুয়লেত-দে-শা", অর্থাৎ বেড়াল-স্নান। ফ্রেঞ্চ-বাথ কথাটা বোধ হয় এই অর্থেই আমাদের দেশে বলা হয়।

টুপির মত এই বস্তুটি কপালের উপর আটকে আছে। মাথার অবশিষ্ট অংশ অনাবৃত

**রাতের সময় নাচের পোশাক। প চুলার উপর পাখির পালক**

ফরাসীরা মোটামুটি এই "ভয়লেত-দে-শা"-ই করে থাকেন, স্নানের ঘর থাকলেও। কারণ অভ্যাসটা জাতিগত। ফরাসী 'পারফ্যুমে'এর সৃষ্টি হয়েছিল কেবল সুগন্ধযুক্ত হবার জন্য নয়, প্রথমত দুর্গন্ধকে ঢাকবার জন্য। তবে শরীরে নোংরা হলে হবে কি, রাস্তাঘাট দোকানপাট এদের ঝকঝকে। এক ভোরবেলা ছাড়া। প্রত্যেক বাড়ির ডাস্টবিন জোগাড় করতে যখন গাড়ি আসে, তখন রাস্তার চেহারা আমাদের কলকাতাকেও হার মানায়।

পারীর দুই তীরের দুই রূপ। "বাঁ তীর" ও ডান তীর, অর্থাৎ সিয়েন নদীর দু-ধারে অসম্ভব তফাৎ। বাঁ তীরে আছে যত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রী, আর্ট স্কুল, সরু সরু গলি, কিউরিওর দোকান, যত রাজ্যের রেস্তরাঁ, চীনে রেস্তরাঁ, জাভানীজ রেস্তরাঁ, পুরোনো বইর দোকান, পুরোন ছবির দোকান। এমন একটা দোকানে দেখি ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর যখন ফরাসী পত্রিকায় বেরিয়েছিল তার ছবি। মোটামুটি সম্ভব অসম্ভব সব কিছুর মেলা। আর আছে বিখ্যাত "শাঁ-জ্যারম্যাঁ-দে-প্রে"র "দ্য-ম্যাগো" কফি হাউসের আড্ডা। উস্কোখুস্কো চুল, হারিয়ে যাওয়া চেহারার সার্ত্-পন্থী অস্তিত্ববাদী ছেলেমেয়েদের দল। গল্প করতে হলে ট্যাক্সিচালক। বেশীর ভাগই এরা সাদা-রুশ। একজন একদিন আমায় বলে, সে নাকি ভারতবর্ষে গিয়েছিল তার ভাইয়ের কাছে। ভাই কাজ করে ইউনেস্কোতে। গীতা পড়েছে, শ্রীকৃষ্ণ খুব বুদ্ধিমান লোক। আজকের বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও রাজনীতিতে তাঁর শতাংশের এক অংশও নন। এছাড়া নিজের পাড়ার যেসব মুদি, তরিতরকারী, বা পাঁউরুটি-দুধের দোকানে গেছি সবই ভারতীয় বলেই হয়ত, খুব ভাল ব্যবহার করেছে। "মা পোঁতি", "মা বেল্" ছাড়া কথাই বলেনি। ওদের দেশে আমার জন্ম নয় বলে তাদের কী আক্ষেপ। যে কোনো সূত্রে কেবলি গল্প করার মতলব। এরা যে ইতালীয়দের 'বকিয়ে' বলে ক্ষেপায় কেন জানি না।

'ডান তীরে' এলে মনে হবে পারী অবশ্যই সেই পারী—যা বললেই মনে হয় ইফেল টাওয়ার আর নিপুণভাবে হাঁটা পুডল কুকুর হাতে ফরাসী মহিলা। এখানে লোকেরা ঠাণ্ডা বরফের মত। কেউ কারো ধার ধারে না। পথে ঘাটে শত সহস্র লোক চলেছে বা ছুটে চলেছে (!)—তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। হঠাৎ এত লোকের মধ্যেও মনে হবে ভয়ানক রকম নিঃসঙ্গ। পারীর প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়েই পাঁউরুটি-কেকের দোকান—যাকে বলে, "বুলাঁজেরী-পাতিসেরী"। এখানে ছোটখাট চা-খাবারও ব্যবস্থা আছে, আর আছে শত সহস্র ছোট বড় 'কাফে'। বেলা চারটা পাঁচটার সময় দেখা যায় মধ্যবয়স্ক বা বুড়ী-বুড়ী মেমরা, একগাল রং পাউডার মেখে, সেণ্টের গন্ধে ভুরভুরে হয়ে, ফাঁপান রংকরা চুলের উপর জালে ঘেরা বিদঘুটে টুপী চাপিয়ে, বিরাট বড় বড় মুক্তোর মালা ও দুল পরে কুকুর সঙ্গে নিয়ে চা বা কফি সহযোগে কেক খাচ্ছে পরমতৃপ্তি সহকারে। সময়টা যদিও চা-খাবারই, তবু প্রথম প্রথম ও-দৃশ্য দেখে ভয়ানক অবাক লেগেছিল। ঐ বয়সে, বা যে-কোনো বয়সেই যে একা একা রেস্তরাঁয় বসে খেয়ে কেউ তৃপ্ত হতে পারে, এ ধারণা ছিল না। নিজের প্রতি অত যত্ন, অত পারিপাট্য, নিজের সুখে এত সুখী হতে খুব কম লোককেই দেখেছি—তাও সাজগোজ বা খাবার মত এত ক্ষুদ্র ব্যাপারে। এ তৃপ্তি আমাদের সহ্য না হবারই কথা। একা খেয়ে এই তৃপ্তির মধ্যে কোথায় যেন একটা গ্রাম্যতাদোষ আছে। আমাদের মা-জেঠিরা কি করে পাঁচজনকে ঠেসে খাওয়াবেন, সেই চেষ্টায়ই প্রাণপাত করেন, শেষে কোনোমতে রান্নাঘরের অবশিষ্ট খেয়ে ওঠেন। সেই দেশের মেয়ে হয়ে বুড়ীর কেক খাওয়া, আজও আমার সহ্য হয় না। এদেশের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনা যতই করছি, ততই এদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। এদেশে মেয়েদের জীবনে "লা মদ"এর বিরাট প্রভাব। 'লা মদ' অর্থাৎ ফ্যাশন একটা বাজে গুজব নয়, বাস্তব ঘটনা। এই সূত্রে খরচ হয় কোটি কোটি টাকা। ফ্যাশন-জগত এক বিরাট ব্যাপার। পাশ্চাত্যের মেয়েরা এ-জগতের খেলার পুতুল—যার সুতো ধরে আছে দিওর বালম্যা, শানেল, বালান্সিয়াগা, রিক্কী ইত্যাদি দরজি বাড়ি। এদেশে ফুলের চাহিদাও 'লা মদ'-এর নির্দেশ মত বদলায়। ফুলের দোকানের কাচ-ঘেরা জানলায় যে-সব ফুল দেখে চমকে উঠতে হয়, তা হল নীল-কারনেশন বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ফোটান ফুলের অভূতপূর্ব রং ও আকার। আধ ফুটন্ত গোলাপকলি যদি আজকের ফ্যাশন হয়, তবে বিজ্ঞানের কৃপায় এমন ব্যবস্থা করা হবে, যাতে গোলাপ চিরকাল আধ ফুটন্তই থাকে। ভয়ানক রকম ছিমছাম ধোপদুরস্ত চেহারার ফুল দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। সুন্দর হলেও তা প্রাণহীন বলেই বোধ হয়। আ লা মদে জুবীকে

**কচ্ছপের হাড়ের ফ্রেম-এ আঁটা কালো চশমা ও নকল পাপ-ফুল আঁটা জাল-ঘেরা টুপি**

মহিলাদের দেখেও আমার এই রং-করা ফুলের কথাই মনে হয়েছিল। মেয়েদের স্বাভাবিক লাবণ্য আর সৌন্দর্য হারিয়ে এরা যেন এক একটি আ লা মদের নিয়মমতে চলা তাসের দেশের হরতনী রুহিতনী। মেয়েদের মহলে এ নিয়মের শেষ নেই। চুলের রং, চুলের ছাঁট, নখের রং, ঠোঁটের রং, ঠোঁটের আকার, ভুরুর আকার, পোশাক, জুতো দস্তানা ব্যাগ এবং শরীরের ওজন সবই আ লা মদ হওয়া চাই। এসব মহিলাদের কারো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই। মানাক বা না মানাক, আ লা মদে ভূষিত হওয়াটাই চরম ব্যবস্থা। এক-দল অন্ধের মত কোনো কিছু না বুঝে ফ্যাশন ধরে চলেন। আর একদল আছেন, যাঁরা বিশেষ একটা গড়নের পোশাক মানাচ্ছে না বুঝেও ফ্যাশনের বাইরে যাবার সাহস রাখেন না। অবশ্য ফ্যাশনের পৃষ্ঠ-পোষকতা করা চলে একমাত্র তাঁদের দ্বারাই যাঁরা প্রতি মৌসুমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পোশাক ও পোশাকের সমস্ত অংগ বদলে ফেলার মত পয়সা রাখেন। এছাড়া সকাল দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রির জন্য পৃথক পৃথক পোশাক তো আছেই। ফ্যাশনের রাজা 'দিওর'এর কথাই ধরা যাক। দিওর ছিলেন বুদ্ধিমান লোক। যুদ্ধের পর 'বুসাক' নামের কাপড় ব্যবসায়ীর সংগে চুক্তি করে তিনি ফ্যাশন চালু করলেন মেয়েদের পোশাকের দৈর্ঘ্য হাঁটুর নীচে বেশ কয়এক ইঞ্চি নামিয়ে দিয়ে। ব্যবসা আরম্ভ করলেন 'বুসাকে'র মূলধনে আর বুসাক তার ফলে বিক্রী করল অনেক বেশী কাপড়। এই দিওর-ই বলেছেন, "মেয়েদের পোশাকের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পোশাক হল শাড়ি, এ যেমনি স্বস্তিদায়ক তেমনি অপূর্ব সুন্দর।" কিন্তু এদেশের মেয়েদের সেই সবার সেরা পোশাকে সাজাবার চেষ্টা ভুলেও করেননি। প্রত্যেক মৌসুমে নূতন গড়ন সৃষ্টি করেছেন। মেয়েরা সেই তালে নেচেছে কলের পুতুলের মত। আর ব্যবসায়ীরা লাভ করেছে সব ক্ষেত্রেই। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যখন পোশাকের দৈর্ঘ্য কমে, তখন অন্যদিকে তার মাপ বাড়ে, আবার অন্যান্য দিকে সংকুচিত হলে তার দৈর্ঘ্য বাড়ে। মোটমাট কাপড় ব্যবসায়ীর হিসেবে কাপড় বিক্রীর হার বাড়ে বৈ কমে না। সমস্ত 'ফ্যাশন-ক্রিয়েটার্স'দের' ও কাপড়, চামড়া, ফার ইত্যাদির ব্যবসায়ীদের মধ্যে রীতিমত বোঝাপড়া আছে। মহিলাদের এরা নিজের মতলব মত সাজিয়ে টাকা উপার্জন করছে। এক এক সময় কোনো কোনো পোশাক এমনি কিম্ভূতকিমাকার হয় যে, মনে হয় এরা যেন মেয়েদের এই সাংঘাতিক বোকামীকে চরম উপহাস করছে এই সুযোগে।

সাম্প্রতিক ফ্যাশন হল পরচুলা পরা। পরচুলা অবশ্য নিখুঁত সুন্দর, সন্দেহ হবার জো নেই। সেদিন এক জলসায় একটি মেয়েকে খুব ঘন কৃষ্ণ চুলে ভারি সুন্দর দেখাল। পাশের মহিলাকে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তিনি চেনেন না। মেয়েটি বোধ হয় আমাদের কথাই শুনছিল—বলে উঠল, "এই, চিনি না মানে, অমুককে চেন না?" মহিলা তো অবাক, "সত্যিই তো চিনতেই যে পারিনি। তোর আবার চুল কালো করা হল কবে?" মেয়েটি বললে, "চুল রং করব কেন? তা সোনালীই আছে। এটাতো পারাক (পরচুলা) আজকের পার্টির জন্য কিনলাম।"

'আ লা মদে' বা ফ্যাশনদোরস্ত থাকার প্রথা যিনিই প্রবর্তন করে থাকুক, আজকে তা টিঁকিয়ে রেখেছে মেয়েরা নিজেরাই। নিজেদেরই দুর্বলতায় তারা হাজার কয়েক টাকার একটা পোশাক কিনে পরের মৌসুমে আবার নতুন পোশাকের খোঁজে ঘুরছে। প্রয়োজনের হার বাড়িয়ে সেই চাকায় ঘুরে মরছে। প্রতি মৌসুমের গোড়ায় প্রত্যেক দরজিবাড়ির স্বতন্ত্র প্রদর্শনী হয়। তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ও কোটিপতি খদ্দেররা। একমাত্র প্রচার কাজেই নিয়োগ করা হয় বহু মেয়েপুরুষ, খরচ হয় বহু টাকা। প্যারী পোশাকের শ্রেষ্ঠ স্থল বলে সেখানকার প্রদর্শনীতে হয় সবচেয়ে বেশী ভিড়। বহু মেয়ে এতে মডেলের কাজ করে। দিনরাত রূপচর্চা করে চেহারা নিখুঁত রাখাই তাদের কাজ,

**গোলাপী রঙের এই পোশাকটিও রাত্রের, যাকে এরা "গ্র্যান্ড বল্" বলে তার জন্য। এরও মাথায় পরচুলা। এ-ধরনের পোশাকের দাম আরম্ভ হয় হাজার তিনেক টাকা থেকে**

**শীতের সময় বরফের উপর খেলাধুলোর পোশাকের মত দেখতে গরমের সময় পরবার সুতির পোশাক**

তারপর নতুন পোশাক পরে দর্শকদের সামনে দিয়ে নম্র শ্রী ফুটিয়ে হেঁটে যাওয়া। একটা পোশাকের নক্সার নকল করতে হলে বিদেশী বা অন্যান্য ব্যবসায়ীকে রীতিমত তার স্বত্ব কিনতে হয়। অন্যথা ঝট করে একটা পোশাকের নকল করে সরে পড়ার উপায় নেই। এখানে যাঁরা আসেন, দেশে ফিরবার সময় ফরাসী কাস্টম থেকে বিশেষভাবে তাঁদের তল্লাস করা হয়। এই প্রসংগে কেউ ধরা পড়লে তাদের নাকি জেলও খাটতে হয়েছে।

অল্প কয়দিন আগে মস্কো তে 'ক্রিস্তিয়ান দিওর' কয়েকজন মডেল ও কিছু পোশাক প্রদর্শনীর জন্য পাঠায়। সবচেয়ে কম দামী পোশাকের দাম ছিল ২০০ ডলার বা ২০০০ রুবল। মস্কোবাসীরা স্তম্ভিত হওয়ায় মার্কিন ও ফরাসী কাগজে তাই নিয়ে খুব ঠাট্টা তামাশা হল।

এবারে শীতের পর নতুন মৌসুমের জন্য পোশাকের ফ্যাশন চালু হল 'ব্যালান্সিয়াগা' শাড়ি কেটে। বলা বাহুল্য যে, যত রাজ্যের কুৎসিত জংলা বেনারসী ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এসে পড়েছে। মেমসাহেবরা তাই দেখে সর্বাংগে পুলকের ঢেউ

তুলে বলেন—"how exhotic!" তারপর স্থানীয় ভারতীয় মহিলারা দেখছি এই সুযোগে তাঁদের উপহার পাওয়া বাজে শাড়ি চড়া দামে বেচে দিচ্ছেন। রোমে আজকাল মেমসাহেবদের শাড়ি পরার শখ হয়েছে। একাধিক তারকা তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষে কে নাকি কবে ভারতীয় ছিল এই কথা বলে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুঃখের বিষয়, প্রথমত শাড়ি পরতে তারা জানে না, দ্বিতীয়ত সেলাই করা পোশাক বয়ে বেড়িয়ে যাদের অভ্যাস, তারা এক টুকরো কাপড়কে কি করে নিজের বশে আনতে হয়, প্রতি ভঙ্গিমায় কেমন করে তাকে সুন্দর করে তুলতে হয়, তা জানে না। তাছাড়া অতি যত্নে রক্ষিত শরীরের নিখুঁত গড়ন সত্ত্বেও শাড়ি পরলে এদের দেখায় যেন পুরুষ ও মেয়েমানুষের মাঝামাঝি কেউ।

ফ্যাশনে পড়লে আজ যার দর আগুন, পরে তাই অনাদরে পড়ে থাকে। কিন্তু আজকে যা সুন্দর, তার কাল কোনোই আদর থাকবে না এটা বোঝা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমাদের বালুচরী শাড়ি দেড়-দুশো বছর আগেও সুন্দর ছিল, আজও আমাদের কাছে তা সুন্দর। ভাল একটা কাশ্মীরী শাল সেদিনও সুন্দর ছিল, আজও সুন্দর আছে, চিরদিনই সুন্দর থাকবে। আজকে দিওর-এর একটা সৃষ্টি নিয়ে সারা পাশ্চাত্যে যদি হৈ হৈ পড়ে, তবু পরের মৌসুমে তার কথা আর কারো মনেই থাকে না। গত শতাব্দীতে ইউরোপে কাশ্মীরী শালের ফ্যাশন চালু হয়। তখন কার দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে সাধারণত ঐ একটা শাল মা-বাবাকে কিনতেই হত। আজ প্যারী বা ফ্রান্সের যে কোনো ছোট শহরেও সেসব শাল নামমাত্র দামে পাওয়া যাবে। ট্রাঙ্কের তলা থেকে তুলে মেয়েরা তা দান করে দিচ্ছেন 'নান'দের—তাঁরা আবার কিউরিওর দোকানে বিক্রী করছেন। প্যারীর সরু সরু গলির সেসব দোকানে গেলে পর্বতপ্রমাণ শাল দেখে ভির্মী লেগে যাবে। অথচ আমাদের দেশে এ শাল জোগাড় করাই কঠিন। দুঃখের বিষয় ভারতীয় মহিলারা ফরাসী শিফন ছয় গজ কিনে 'শাড়ি' পরেন ও তার ওপর আলেস্টার চাপান। নয়ত কত শাল উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে যেতে পারত। কাগজে দেখলাম বরোদার মহারানী কোন এক ইতালীয় জুতোর দোকানে ১০৬ জোড়া জুতোর বায়না দিয়েছেন। এক-এক জোড়ার দাম প্রায় শ'খানেক টাকা। মিউজিয়ামে রাখার মত এইসব শাল তার অর্ধেক টাকায় বহু জোগাড় করা যেত। পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ লোকেরও বেশী প্রতি রাত্রে অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত অবস্থায় নিদ্রা যায়—একথা মনে করে আমাদের মুখে অন্ন না

লক্ষ্য করে দেখলে এই পোশাকের নিম্নাংশে পাজামা দেখতে পাওয়া যাবে। এ-পোশাক ককটেল পার্টির জন্য

রোচারই কথা। পৃথিবীতে কত ক্ষুধা তার হিসেব আমরা রাখি কি?

একটা মিংক (Mink)-এর দাম কম করে ১০,০০০,০০০ ফ্রাঁ। 'চিনচিলা' নামের ফার কিনতে পারে এমন লোক কমই আছে। চরম বিলাসের সামগ্রী হল জন্তু-জানোয়ারের চামড়া। সাপের চামড়া, কুমীরের চামড়া, উটপাখির চামড়া এছাড়া চিতার চামড়া। কুমীরের চামড়ার একটা ভ্যানিটি ব্যাগের দামই হাজার খানেক টাকা। নানারকম হাড় ও মাছের কাঁটা দিয়ে তৈরী হয় অন্তর্বাস। আমাদের দেশে এক-কালে শিউলী ফুলের বোঁটা দিয়ে কাপড় ছুপিয়েছি আমরা। পাখির বুকের ধসেপড়া পালক জোগাড় করে তৈরী হয় 'পাশ-মীনা।' ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা শুনেছি গহনা পরতেন মসলিনে মুড়ে। সবকিছুতে যাদের এত সূক্ষ্ম রুচি, এই জন্তু-জানোয়ারের চামড়া ও লোমে সাজতে দেখে তাদের মনে হয় এদের এই স্থূল রুচি ও প্রবৃত্তির মধ্যে চাপা আছে এখনো সেই গুহাবাসী আদিম বর্বরতা। হয়ত এইসব কারণেই অস্বস্তি বোধ হয়, মনে হয় এদের নারীত্ব সম্পূর্ণ নারীত্ব নয়। এই প্রসঙ্গে বলি যে, এদেশের 'নারী-পুরুষ সম্পর্ক' একটা সমস্যা। এখানে মেয়েদের প্রতিযোগিতা পুরুষের সঙ্গে প্রতি পদে। সংসারে মা, স্ত্রী, বোন বা মেয়ের পদের গৌরব কী, তা এরা বোঝে না। স্বামীর জন্য ঘরসংসার করে এরা আনন্দ পায় না, এদের কাছে সেটা দাসত্ব মাত্র। নিজেদের এরা বঞ্চিত করেছে পুরুষের সম্মান থেকে, বিশ্বাস থেকে। বাহ্যিক ব্যাপারে এদেশে মহিলাদের স্থান পুরুষের আগে। আগে হাঁটা, আগে বসা, আগে খাওয়া ইত্যাদি সব রকম সুবিধা নিয়ে এরা এই মনে করে প্রতারিত হয়ে আছে যে, প্রতিপদে মেয়েদের সম্মান আগে। কিন্তু প্রকৃত নারীর কর্তব্য এরা করতে জানে না। স্ত্রী ও পুরুষ বাস করছে একটা দ্বেষের সম্পর্কের মধ্যে পরস্পর থেকে আত্মরক্ষা করে। স্বামীর সাফল্যে গৌরবান্বিত হতে না পেরে স্ত্রী ঘুরছে তার স্বতন্ত্র সাফল্যের খোঁজে। এদের চোখে আমরা পুরুষের দাসীস্বরূপ। আমাদের সংসারের মেরুদণ্ড যে মেয়েরাই, তাঁরাই যে শান্তিজল, একথা বুঝবার মত ক্ষমতা এদের নেই। অন্তরে বাইরে এরা পুরুষের স্থান পাবার চেষ্টা করছে, ফলে নারীর পদও হারিয়েছে। এদের নারীত্বকে স্বীকার করব কী প্রকারে। জীবনের গৃহ-ক্ষেত্রে নানাবিধ অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে নিজেরাই। তার থেকে নিষ্কৃতির জন্য এরা অনেক রকম পাগলামি নিয়ে মেতে থাকে। অন্যতম হল ফ্যাশন।

ফ্যাশন কথাটা মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত কথা। এটা সামাজিক মনোবিকলনের পর্যায়ে পড়ে। সেখানে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে fad ও craze বলে। তাছাড়া ফ্যাশন বা 'লা মদ' মানব সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করছে আর তার গায়ে সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে কে কত হাজারী তার নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

ফরাসী লেখক কাইওয়া তাঁর "লে জু এ লেজ অম" বইয়ে বলেছেন যে, সভ্যতা হিসেবে ভাগ করলে সমস্ত পৃথিবীর খেলাধুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম সুযোগের খেলা, দ্বিতীয় ক্ষমতা, তৃতীয় উন্মাদনা (নাগরদোলা জাতীয় খেলা) ও চতুর্থ মাস্কারেড অর্থাৎ মেলানেশিয়া বা আফ্রিকার লোকেদের সারা মুখে ও গায়ে চিত্র করে তালে তালে হেঁটে বসে ঘোরা।

'লা মদের' নিয়মে চলা সম্প্রদায় একটা খেলার নেশায় বিভোর। আধুনিক সংস্করণ হলেও খামখেয়ালী এই নেশাকে সহজেই সেই আদিম মাস্কারেডের পর্যায়ে ফেলা যায়।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোর স্বত্বাধিকারী পিয়ের লুইজি, রোম]

[মণিমোহন বিশ্বাসের কাহিনী বেদনাদায়ক। অধিকাংশ পাঠকের মনে হবে, মণিমোহন নৃশংস চরিত্রের পুরুষ। বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেছিলেন: আসামী সজ্ঞানে সুস্থ-মস্তিষ্কে তার পিতাকে হত্যা করেছে—সভ্য সমাজে যার উদাহরণ বিরল। সৌভাগ্যবশত পিতৃহন্তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ সমাজের ও আইনের নেই। এই ধরনের অপরাধীর হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পেতে চায়। আমি আমার জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে আসামী মণিমোহন বিশ্বাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

মাননীয় বিচারপতির রায়ের পর মণিমোহনের অপরাধের গুরুত্ব ও তার চরিত্র সম্পর্কে বলার কিছু থাকে না। আমি, মণিমোহনের আইনজীবী, পাঠকের আপাত-কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে আর মাত্র একটি কি দুটি কথা বলতে পারি: মণিমোহন চৌত্রিশ বছর বয়সে তার পিতা ধরণীমোহনকে হত্যা করেছিল এবং প্রায় ছ বছর পিতৃহত্যার দায় এড়িয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছে। মণিমোহন অবিবাহিত ছিল। খুবই আশ্চর্যের কথা, মণিমোহন বিবাহ করেনি, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার সন্তান তাকে হত্যা করবে। ঈশ্বর জানেন, পিতৃহত্যার দায়ে মণিমোহন অভিযুক্ত না হলে এবং বিবাহ করলে তার ভাগ্যে কি ঘটত!

মণিমোহন-কাহিনীর মূল কথা বলা হয়ে গেছে, এখন এই কাহিনী বিগতযৌবনা নারীর মতন আকর্ষণহীন। অবশিষ্টাংশ একমাত্র তাঁদের জন্যে যাঁরা এই মানুষটির মানসিক দ্বন্দ্ব, ক্লেশ, যন্ত্রণা ও অদ্ভুত প্রত্যয়ের কথা শুনতে চান, আদালতে যা অনুচ্চারিত ছিল।]

মণিমোহনকে তার জেল-কুঠরির মধ্যে আমি প্রথম দেখি। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল, শান্ত সংযত ভদ্র মার্জিত এবং অভিজাত এক ভদ্রলোকের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আসামী, বিশেষ করে খুনী আসামীর কোনো বাহ্য লক্ষণ আমার চোখে পড়েনি। মণিমোহনের চোখে ভীতি নেই, তাকে সন্ত্রস্ত দেখলুম না; ওর দৃষ্টির সামান্য আচ্ছন্ন ভাব থেকে আমার মনে হল, সম্ভবত দুশ্চিন্তার ক্লেশটুকু ওকে সহ্য করতে হচ্ছে। বিস্মিত হয়ে মণিমোহনকে আমি যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি। আমার মক্কেলকে আমি সুশ্রী পুরুষ না বলে পারি না। দীর্ঘ উজ্জ্বল দেহ, সুগঠিত অঙ্গ; চেহারায়

মধ্যে একটি কাঠিন্যের ভাব আছে, হয়ত দৃঢ়তার জন্যে এই শারীরিক সবলতাটুকু কাঠিন্য বলে মনে হয়। মণিমোহনের সোজা পিঠ, তুলনায় কাঁধের অংশটুকু সামান্য দুর্বল দেখায়। ওর কাঁধের দুই অংশ সমান্তরাল নয় বলে মনে হল। লম্বা গলা, পুরোপুরি গোল, মাংসল। লম্বা ধরনের মুখ, দৃঢ় সুছাঁদ চিবুক। মণিমোহনের মুখে, বয়সের তুলনায় কোনো এক ধরনের বয়স্কতার ছাপ বেশি পড়েছে। ওর চোখ তেমন বড় নয়, বরং খজ্ঞের মতন নাকটির পাশে চোখ দুটি ছোট দেখায়, পাতলা ভুরু। মণিমোহনের চোখ এবং দৃষ্টির মধ্যে দাহ-শক্তির ভীতি নেই, আছে জ্বলন্ত দীপ্তি। ওর কপাল খর্ব, প্রশান্ত, স্থির। আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক উদ্দেশ্য-হীন মন নিয়ে বেঁচে নেই। মণি-মোহনের এক ধরনের নিঃসঙ্গতা আছে, উদ্দেশ্য আছে, দৃঢ়তা এবং কাঠিন্য আছে। এই লক্ষণগুলির কোনোটাই খুনী আসামীর নয়, লক্ষ্যহীন গড়পড়তা মানুষেরও না, বরং মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের, যার ব্যক্তিত্ব চরিত্র বিবেচনা শক্তি ও উপাস্য বলে কিছু আছে। আমি জানি না কেন আমার এত কথা মনে হয়েছিল, কেন প্রথম সাক্ষাতেই মণি-মোহনকে আকর্ষণীয় চরিত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু বলা বাহুল্য, এই মানুষটির স্বাতন্ত্র্য এবং তার অপরাধের নিগূঢ় কারণ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।

মণিমোহন সম্পর্কে আমার ধারণা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ক্রমশ পরিষ্কার, গভীর ও পাকা হয়েছে। দীর্ঘ আট মাস আমাকে তার কাছে প্রায়ই যেতে হত, তার কথা শুনতে হত; যদি না অহেতু হয় তবে স্বীকার করব, এই পেশাগত পরিচয় ও স্বার্থরক্ষার বাইরে, আমি মণিমোহনের বিশ্বাস বন্ধুত্ব নির্ভরতা অর্জন করেছিলাম।

মণিমোহন তার বাবা ধরণীমোহনকে পিছন থেকে গুলি করে মেরেছিল। ধরণী-মোহনের বয়স তখন প্রায় ষাট। মণিমোহনকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, ষাট বছরের বুড়ো অসহায় বাবাকে গুলি করার সময় ওর কি মনে হয়নি, এই হত্যা অর্থ-হীন। পারিবারিক সম্পর্ক, নীতিগত ও বিবেকগত বাধার কথা বাদ দিয়েও বলতে হয়, ধরণীমোহন ত প্রায় মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়েছিলেন, হয়ত তাঁর আর অল্প কয়েক বছর আয়ু ছিল, মণিমোহন কি আর কিছু-কাল অপেক্ষা করতে পারল না!

জবাবে মণিমোহন বলেছিল:

"না, আমি পারি নি। বাবাকে গুলি করার আগে পাঁচ বছর ধরে আমায় প্রতিদিন তৈরী হতে হয়েছে। এই তৈরী হওয়ার মানে যে কী—আশা করি আপনি বুঝবেন।

"হ্যাঁ, বাবাকে গুলি করার পাঁচ বছর আগে আমার মনে প্রথমে তাঁকে হত্যা করার চিন্তা আসে। তারপর পাঁচ বছর ধরে প্রত্যহ আমি, আমার পিতার একমাত্র সন্তান, দুই সমান জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দগ্ধ হয়েছি। এক আগুনে পিতৃহত্যার নিদারুণ পাপবোধ, নীতিস্খলন, কলঙ্ক-লজ্জা; অন্য আগুনে পিতার প্রতি আমার অসীম বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, ঈর্ষা। এই দুই আগুন যেন দিন রাত আমার দু পাশে জ্বলত, আমি এক আগুন নিভিয়ে দিতে চাইতাম; পারতাম না। আপনাকে আমি আগেই বোধ হয় বলেছি, আমার বাবাকে শৈশব ও প্রথম যৌবনে আমি গভীরভাবে ভালবাসতাম। আমার মা, আমার বয়স বোধ হয় তখন তের, মারা যান। নিকট আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না এক বাবা ছাড়া। বাবার স্নেহ যত্ন দৃষ্টি আমি নিরঙ্কুশভাবে পেয়েছি। কিন্তু যৌবনের একটা বয়স্ক অবস্থা থাকে, সেই অবস্থায় এসে আমি বুঝতে পারলাম, অপরিণত মনে একটি অর্ধমানুষকে আমি ভালবেসেছি। তাঁর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা এল, আমি বাবাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম, শেষে একদিন অনুভব করলাম, ওই মানুষটির প্রতি আমার বিদ্বেষ প্রবল, ওঁকে আমি অপরিসীম ঘৃণা করি, উনি আমার সবচেয়ে বড় শত্রু, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। আমার বাঁচার পথ, চলার পথ, লাভের পথ উনি বন্ধ করে রেখেছেন। ওঁকে চিরকালের মতন হটিয়ে না দিলে আমার জীবন অর্থহীন।...কি যেন বলছিলেন আপনি—অপেক্ষা—অপেক্ষা করার কথা বলছিলেন, কেন আমি আর কয়েক বছর অপেক্ষা করলাম না? না, আমি অপেক্ষা করি নি। বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু আসত জানি, কিসের বা মৃত্যু না আসে—! কিন্তু আপনি জোর করে বলতে পারেন না, আমার বাবা ষাট পেরিয়েই মারা যেতেন, হয়ত তিনি আরও দশ বিশ পঁচিশ বছর বাঁচতেন। তাঁর মৃত্যুর কোনো স্থির নিশ্চিত সময় ছিল না। বরং আমার বাবাকে যদি আপনি দেখতেন আপনার ধারণা হত, ভদ্র-লোকের আয়ু সহজে ফুরোবে না। ও, হ্যাঁ ...আপনি আমায় অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন। ঈশ্বর ওঁকে প্রায় দৈত্য করেই... না আমি জ্ঞানত ঈশ্বর বিশ্বাস করি না, ওটা মুখের আগায় এল বললাম...বাবাকে প্রায় দৈত্য করেই সৃষ্টি করেছিলেন। আমার বাবার শরীর ছিল বিরাট, আর্য পুরুষের মতন দীর্ঘ, সবল, কঠিন। ক্রমশই তাঁর প্রস্থে একটা স্থূলত্ব আসছিল। আয়াস আরাম সুখ ভোগ নির্ভাবনায় বোধ হয় এই ধরনের স্থূলত্ব আসে। আমার বাবা একদা কোন্ রণে নেমেছিলেন, কেমন করে ঘা খেয়ে খেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন—সে-কথা এখানে অবান্তর। তবে হ্যাঁ, যদি ইতিহাসের তুলনা ধার করে বলতে হয়, তবে বলি বাবরশাহের মতন তিনি মাটি নিতে লড়ে-ছিলেন বটে, কিন্তু সাজাহানের মতন বিলাস ব্যসনে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। যা হয়, পঞ্চাশ বছর বয়স থেকেই বাবার মধ্যে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, এটা প্রাকৃতিক; তবে শালগাছের গুঁড়িতে পোকা লাগলেও গাছ পড়তে সময় লাগে। আর বাবা, আপনি যা মনে করছেন, ষাটের পর বড় জোর বছর কয় বাঁচতেন তা নয়—তাঁর আরও দীর্ঘকাল বাঁচার সম্ভাবনা ছিল এবং সুযোগও ছিল। আমরা ধনী ছিলাম না, কিন্তু ধনী হয়েছিলাম। বাবা ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছিলেন, ঐশ্বর্য রক্ষা করতেন, ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করতেন। কাজেই একমাত্র আকস্মিকতা ছাড়া, আমার বাবার সহসা লোকান্তর যাবার কোনো কারণ ছিল না, তিনি রোগ শোক আধিব্যাধির সঙ্গে অনায়াসে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে যুঝতে পারতেন।...এ-সব জেনেও আমার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমি অধৈর্য, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম। তা ছাড়া, আমার দিক থেকেও ভেবে দেখার কারণ আছে। দ্বিধা দ্বন্দ্ব আত্মদুর্বলতা কাটিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে আমার অনেকটা সময় বয়ে গেছে, এখন—যখন আমি প্রস্তুত—তখনও অপেক্ষা করে কেন বসে থাকব! যত বসে থাকব, আমার ভোগকালের আয়ুও তত কমে আসবে।"

শুধু কতক শব্দ সৃষ্টি করে মানুষ কথা বলে না, তার স্বর দৃষ্টি মুখের ভাব আর

প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি বলার কথাকে জীবন্ত করে। মণিমোহনের মুখোমুখি বসে তার কথা না শুনলে বোঝা মুশকিল ওর কথার মধ্যে একটি মানুষের কী দুঃসহ দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা গ্লানি ক্ষোভ বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেত। আমি নির্বাক নিশ্চল হয়ে ওকে দেখতাম, ওর কথা শুনতাম। ওর কণ্ঠস্বরের পরিপূর্ণ গাঢ়তা কোথাও ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠত, কোথাও বা শ্লেষ ও ঘৃণায় বিকৃত হত। মণিমোহনের চোখে কখনও কখনও অতি শান্ত সরল দৃষ্টি, কখনও অতীতের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত অন্যমনস্কতা। লক্ষ্য করেছিলাম, মণিমোহনের কথা যেন পাশা-পাশি দুটি ঘরের দরজা, কখনও ডান কখনও বাঁ দিকের দরজা সে খুলে দিত। যে-কথা তার বাবাকে নিয়ে, তার আর তার বাবার সম্পর্ক নিয়ে মণিমোহনের সেখানে এক ধরন; যে-কথা একান্ত নিজেকে নিয়ে সেখানে অন্য ধরন। আমার মনে হত, প্রথমটায় সে অনেক শক্ত রূঢ় নির্মম—দ্বিতীয়টায় কেমন আবেগপ্রবণ হয়েও শেষাবধি ক্লান্ত হতাশ।

মণিমোহনের কথা থেকে বুঝেছিলাম, ধরণীমোহনের স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত কেন সে অপেক্ষা করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়-হীন হলেও মণিমোহনের যুক্তি আমি বোধ হয় মনে মনে অস্বীকার করতে পারিনি। কিন্তু পরে অনেকদিন ভেবেছি, মণিমোহন কেন তার বাবাকে হত্যা করল? সম্ভবত এ-প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি মণিমোহনের আইনজীবী হয়ে এ কথা কি আগেই জানতাম না! না, জানতাম না; মণিমোহনকে বহুদিন এ-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আমার মক্কেল হিসেবে মণিমোহনকে বাঁচানোই আমার কর্তব্য ছিল, পিতৃহত্যার দায়ে সে দায়ী নয় একমাত্র এই কথাটা প্রমাণ করার দায়িত্বই আমার। গোড়ায় মণিমোহন আমায় সরাসরি বলে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা সত্য; কিন্তু এই সত্যকে আদালতে আইনের চোখে মিথ্যে প্রমাণ করতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাকে ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন যেন না করি।... বলা বাহুল্য, মণিমোহনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর মাঝে মাঝে গভীর ঔৎসুক্যবশে তাকে যা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছি।

মণিমোহন কেন তার বাবাকে হত্যা করল এই প্রশ্নের জবাবে মণিমোহন বলেছিল :

"কেন করলাম—কেন! দেখুন, এ-প্রশ্ন আমি নিজেও কতবার করেছি নিজেকে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটল, সবই পরিণাম; কিন্তু এই পরিণামে পৌঁছোবার আগে একটা প্রয়োজন ত ঘটেই ছিল। সেই কারণটা কি? আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, স্নেহ ভালবাসা আদর যত্ন সমস্ত পাওয়া সত্ত্বেও একটি ছেলে তার বাবাকে হত্যা করার কথা ভাবছে, কারণ খুঁজছে এটা কী করে হয়? সহস্র বার আমি নিজেও ত ভেবেছি, কেন আমি আমার বাবাকে মারতে চাইছি, কেন? বাবা আমায় ভালবাসেন, আমিও দীর্ঘকাল তাঁকে ভালবেসেছি, তিনি আমার জন্মদাতা, পালক; আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, উত্তরাধি-কারী—আমাদের শরীরে একই রক্ত—তবু কেন এই সাংঘাতিক পাপ কাজ আমি করতে যাব?

"তবে শুনুন, আপনাকে আমার বাবা সম্বন্ধে আরও কিছু কথা জানাতে হবে। বাবার মধ্যে ত্রুটি না পেলে, তাঁর প্রতি আমার ঘৃণা বিদ্বেষ না জাগলে, তাঁকে আমার পথের বাধা না মনে হলে আমিই বা কেন তাঁকে চিরকালের মতন সরাতে চাইব! তা ছাড়া, এ ত সত্যি, বাবাকে এ-জগত থেকে সরিয়ে আমি কিছু অধিকার করতে চেয়েছিলাম; সে-লোভ উদ্দেশ্য আমার ছিল।

"আপনি আইনজীবী, ফৌজদারী মামলা অনেক করেছেন, অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনী জানা আছে যেখানে অর্থ, নারী, বা আর-কিছু স্থূল কাম্য বস্তু নিয়ে মানুষ পশুর মতন পারি-বারিক সম্পর্কের শুচিতা নষ্ট করেছে। আমার এবং আমার পিতার মধ্যে অর্থের প্রশ্ন আসেনি, উনি আমার আর্থিক প্রয়োজনকে কখনও খাটো করতে চাননি—বরং অপ্রয়োজনে অপচয়কেও প্রশ্রয় দিয়েছেন। অর্থের জন্যে পিতৃঘাতক হইনি। নারীর প্রশ্ন অহেতুক। আমার বাবা অবশ্য মনে করতেন না, সুস্থ সবল সক্ষম বিপত্নীক পুরুষের পক্ষে নারী-সম্পর্ক নিষিদ্ধ, তবে পারিবারিক জীবনে তিনি মৃত পত্নীর অধিকার আর কাউকে দেবার চিন্তাও করেন নি। খোলাখুলিভাবেই আপনাকে বলি, বাবার সঙ্গে যে-সব নারীর কোনো না কোনো রকম সম্পর্ক ছিল আমি তাদের কয়েকজনাকে চিনতাম—কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। অস্বীকার করব না, আমারও কিছু দুর্বলতা ছিল, একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। প্রথম যৌবনে তাকে দূরে দূরে দেখেছিলাম, মধ্য যৌবনে তাকে ভালবেসেছিলাম, ওই একমাত্র নারী যার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল তীব্র, ভালবাসা ছিল নিখাদ। বাবা, এই মেয়েটিকে পছন্দ করতেন না। আমি জানতাম বাবা কেন ওকে পছন্দ করেন না। ও যে আমাদের সমাজের জাতের ধর্মের এমন কি গোত্রেরও মানুষও ছিল না। বাবা কয়েকবারই আমায় পরোক্ষে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, ছেলে না পরসমাজের এই মেয়ের হাতে পড়ে একটা কিছু সর্বনাশ করে বসে। গোঁড়া রক্ষণশীল দাম্ভিক মর্যাদাচেতন বাবাদের মনের কথা আপনি ভালই বুঝতে পারবেন, বেশি বলা বৃথা। তবে এখানে আপনাকে এটুকু বলা দরকার, এই মেয়েটিকে নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোনো বিরোধ বাধেনি।

"তবে বিরোধ কোথায় বাধল, এই না আপনার প্রশ্ন? কথাটা জানতে হলে আপনাকে আমার মনের তলায় নামতে হবে, আমার ওপর যদি না আপনার সহানুভূতি থাকে, আপনি আমার কথা বুঝবেন না।...দেখুন, আমার বাবা আমার কাছে নিতান্ত একটি মানুষ হিসেবে লৌকিক ছিলেন না, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু ছিলেন। আমার কাছে তিনি একটি অখণ্ড কর্তৃত্ব, প্রভু; শাসক হিসেবে তাঁর অধিকার আমি স্বীকার করে নিয়ে-

ছিলাম, তাঁর নীতি জ্ঞান ভালমন্দ বিচার আমার বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করত, তাঁর শৃঙ্খলায় সমর্থন জানিয়েছি। সহজ কথায় এই মনোভাবকে আমি কি বলে বোঝাব বুঝতে পারছি না, তুলনা দিয়ে বলতে হলে বলব তিনি ছিলেন রাজা, আমি তাঁর স্বরাজ্যের একান্ত অনুগত প্রজা। সমাজের মাথা কে আমি জানি না, হয়ত সমাজই; পরিবারের প্রভু নিশ্চয় পিতা। বাবা আমার কাছে সমাজের সংসারের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। কেন নয়! তিনি আমায় এ-সংসারে এনেছেন, তিনি পালন করেছেন, তাঁর অধিকারের আওতার মধ্যে আমি নিজেকে রক্ষা করেছি, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। এ যেন একটি বিরাট অশ্বত্থকে অবলম্বন করে আমার লতা বিস্তার।

"ছেলেবেলা থেকেই আমি তন্ময় হয়ে আমার বাবাকে দেখতাম। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। তাঁর সুঠাম সুপুরুষ থর রূপ, সেই সার্থক পৌরুষ, বজ্রের মতন কাঠিন্য, ব্যক্তিত্ব, কুশাগ্র বুদ্ধি, আভিজাত্য, ঔদার্য আমায় অভিভূত করে রেখেছিল। আমি তাঁর পায়ে আমার মাথা রেখে চুপি চুপি বলতাম, আপনার চেয়ে বড় কেউ না, আপনি দেবতা। ...বাবা বাস্তবিকই আমায় অন্ধ করে রেখেছিলেন, আমি আমার সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভক্তি তাঁর পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম।

"মা বলতেন......ও, আমার মার কথা আপনি কিছুই জানেন না। তাঁর কথা সামান্য বলতে হয়। আমার মা ছিলেন অসামান্য সুন্দরী, বাবার পাশে দাঁড়াবারই যোগ্য। দরিদ্র ঘরের মেয়ে হয়েও মা কি করে বিশ্বাস বংশে আসতে পেরেছিলেন এ-প্রশ্ন হয়ত আপনার মনে আসতে পারে। মা-র অসামান্য রূপ বাবাকে মুগ্ধ করেছিল। শুনেছি, বাবা শাখা-সিঁদুর-পরা মেয়েকে ঘরে আনবার সময় পথে পাল্কি থামিয়ে মাকে এত অলংকার পরিয়েছিলেন যে, স্বামীগৃহে এসে নামবার পর লোকের ধারণা হয়েছিল বাবা রূপ এবং ঐশ্বর্য দুইই জয় করে এনেছেন। আমার মা সে-কালের তুলনায় বিদুষী ছিলেন। বাবা কখনও পরের বুদ্ধিতে চলতেন না, অন্যের মতামত গ্রাহ্য করতেন না, মার মতামতেরও কোনো মূল্য ছিল না; কিন্তু সংসারে মার সম্মান ছিল রাজরাণীর মতন। মা আমায় বলতেন, তোমার বাবাকে দেখ, ওঁর মনের মতন হবার চেষ্টা কর। অমন বাবার যেমন তেমন ছেলে হয়ো না, খোকা; লোকে ছি ছি করবে—মাথা কাটা যাবে ওঁর। মার কথার পিছনে যে অন্য কোনো অর্থ আছে আমি বুঝি নি, সরল অর্থেই নিয়েছিলাম।

"ছেলেবেলায় বাবা আমার বিস্ময় ছিলেন, প্রথম যৌবনে তিনি আমার আদর্শ হলেন। তিনি যা করতেন যা বলতেন সবই আমার কাছে ন্যায়সংগত বলে মনে হত। আমি ভাবতাম, তাঁর সমস্তই নিখুঁত।

"অপরিণত মনের এই আচ্ছন্নতা কেটে গেল মধ্য যৌবনে এসে। যদি বাবা আমার কাছে নেহাতই জন্মদাতার রূপ নিয়ে থাকতেন, তাঁর সংগে আমার সম্পর্ক সাদামাটা পালন ও প্রয়োজনের হত তবে হাজার হাজার পিতৃভক্ত সন্তানের মতন আমারও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা আপনারা দেখতে পেতেন। বাবাকে সে-চোখে যে আমি কোনোদিন দেখিনি; আমার ভাবনার মধ্যে কোথাও তিনি নিছক একটি মানুষ হয়ে মূর্ত হননি। আমার কল্পনায় বাবা কী ছিলেন আপনাকে আগেই সে-কথা বলেছি। আজ যে-জজসাহেব আমার বিচার করছেন তাঁর উপাধি বুঝি সামন্ত, কিন্তু কি যায় আসে আমার সামন্তে যদি না ওই মানুষটি অনন্ত শক্তির প্রতীক হতেন। জজসাহেবের মতন আমার বাবাও এক অদ্ভুত অবর্ণনীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতীক ছিলেন। তাঁর পেছনে ছিল গোটা সমাজ-সংসার পরিবারের সমর্থন। আমারও।

"পরিণত বয়সে এসে প্রথম বুঝতে পারলাম, এতকাল যাঁর পায়ের তলায় মাথা নুইয়ে এসেছি তাঁর পায়ে অনেক ধুলো অনেক ময়লা অনেক পাঁক। আবর্জনার স্তূপের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যে কী ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম সে-দিন আজ আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। বিশ-বাইশ কি পঁচিশ বছরের তিল তিল করে গড়া স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। না, একদিনে নয়, একটি মাত্র ঘটনায় নয়। তবে গড়তে যত সময় ও আয়োজন লাগে ভাঙতে তার বোধ হয় শতাংশের একাংশ। ছেলেবেলায় নিজেদের মণ্ডপেই দেখেছি মথুর কুমোর দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করত দেড় দু-মাস আগে, কাঠ খড় মাটি রঙ বোলের আটা জরির সাজ হাজার আয়োজন করে দিনের পর দিন খেটে ষষ্ঠী পুজোর দিন তার ঠাকুর গড়া শেষ করত, অথচ অত কষ্টের পরিশ্রমের সেই প্রতিমাকে পাঁচ ছ' দিন পরে দেখেছি পুকুরের পাড়ে ভেজা খড় আর কাঠের একটা খাঁচা হয়ে পড়ে আছে। এটাই নিয়ম, তিরিশ বছর ধরে যে গাছ বনস্পতি হয়—তিন ঘণ্টার ঝড়ে সেই গাছ মাটিতে লুটোয়।

"দেবতার আসন থেকে বাবাকে সাধারণ শঠ হীন দাম্ভিক ভীরু চরিত্রহীন মানুষে নামিয়ে আনতে আমার খুব বেশী দিন লাগেনি। এমনকি প্রথম স্বপ্নভঙ্গের সময় আমার মনে দ্বিধা ছিল সঙ্কল্প ছিল ভীরুতা ছিল, আমি তখনও পুরোপুরি কালাপাহাড় হতে পারিনি। কিন্তু একবার যে-মুহূর্তে হাতের মুগুর মেরে আমার স্বপ্নের দেবতার একটি অংগ ভাঙতে পারলাম—সব কেমন সহজ সরল হয়ে উঠল। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সংগে আমি ভাঙতে লাগলাম, টুকরো টুকরো করতে লাগলাম; সে-উত্তেজনা মাদকতা আক্রোশ ও শান্তির সময় ছিল না; কিংবা বিশ্বের হয়ত এই নিয়ম—গড়ার সময় হাতুড়াতে হয়, ধৈর্য লাগে, ধীর না হয়ে উপায় থাকে না—ভাঙার সময় শুধু আক্রোশ উত্তেজনা আর মাদকতা বই আর কি থাকে বলুন।

"স্বপ্নের দেবমূর্তি যখন ভাঙা হল, দেখলাম, বাবা পুরোপুরি একজন মানুষও নন, তিনি অর্ধ-মানুষ। দানবত্বের অংশটাই তাঁর মধ্যে বেশী। একচ্ছত্র রাজাদের মতন তাঁর হাতে রাজদণ্ড আছে বটে কিন্তু সেই দণ্ডের সুযোগটুকু তিনি নিচ্ছেন, কর্তব্য পালন করছেন না। উনি স্বভাবে অত্যাচারী, আত্মসুখী, নির্দয়, ক্ষমতার দম্ভে দাম্ভিক, হীন, চতুর—আর কি-বা নয়। জানেন, আগে ভাবতাম মা-র অসামান্য রূপকে ভালবেসেই বুঝি তিনি দারিদ্র্যের ঘর থেকে তাঁকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলেন, পরে বুঝলাম শুধু রূপ নিয়ে মা আসেন নি, মর্যাদাও এনেছিলেন। বাবা বণিকবৃত্তি ভাল বুঝতেন, আপ্রাণ পরিশ্রম করে তিনি ঐশ্বর্য সংগ্রহ করলেও তাঁর বংশমর্যাদা ছিল না—মা-র ছিল বংশমর্যাদা, বাবা সেই মর্যাদাকে ঘরে এনে বন্দী করলেন। উপরন্তু লোকের চোখে তিনি উদার পুরুষ হয়ে গেলেন। আশ্চর্য, পৃথিবীতে ঔদার্যও কেনা যায়। আমি আগে বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম; আর

মাকে একটু হীন চোখে দেখতেন। মা সেই যে বিয়ের কনে হয়ে স্বামীগৃহে পা দিয়েছিলেন তারপর ষোলো বছরের মধ্যে আর কখনও পিতৃগৃহে যেতে পারেন নি। বাবা সম্মতি দেননি।...একটা ঘটনার কথা আমার আজও মন আছে। মা-র এক আত্মীয় আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, দিন ক'য় থাকার পর তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন বাবার হুকুমে তাঁকে নগদ হাজার টাকা দেওয়া হল। কিসের টাকা—, আত্মীয়টি বিব্রত হয়ে শুধলো। বাবা হেসে জবাব দিলেন, শুধু হাতে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি এসেছিলেন, যাবার সময় হাতে করে কিছু নিয়ে যান।...কী নিষ্ঠুর, দাম্ভিক মানুষ!...অথচ মা-র সংগে এই হীন ব্যবহার করার পরও ত মা আর বাবার মধ্যে কোনো বিশ্রী রকমের অসন্তোষের আগুন জ্বলতে দেখি নি। হয়ত, মা এ-সব সহ্য করে নিতেন; হয়ত মার সহিষ্ণুতার তলায় একটা চাপা বেদনা বয়ে যেত! কে জানে!......বাবার ব্যবহারও অদ্ভুত, স্ত্রী হিসেবে মা-র প্রতি কোনো অনাদর অবহেলা তিনি দেখান নি, বেশ-ভূষায় অলংকারে লক্ষ্মীতে মাকে ঘিরে রেখেছিলেন। এ যেন সেই সোনার খাঁচায় পাখি পুষে রাখা।...... আমি অনেকবার ভেবেছি, মার মৃত্যুর পর বাবা আর কেন বিবাহ করলেন না? ইন্দ্রিয়াসক্ত সম্ভোগী পুরুষের যে লজ্জাকর রূপ তাঁর মধ্যে দেখেছি, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। বাবা অনেক পাপকে লালন করেছেন, অনেককে পঙ্কিল পথে ঠেলে দিয়েছেন। আমাদের জুড়ী-গাড়ির সহিস ইন্দুর স্ত্রীকে বাবা ফটকবাজারের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন, ইন্দু ছ'মাসের মধ্যে সে-কথা জানতেও পারল না। যখন জানল, ইন্দুর স্ত্রী ফটকবাজারের বাড়িতে আর নেই। বাবাই ইন্দুকে পুলিসের হাতে তুলে দিলেন।...যে-মানুষ সুখ-সম্ভোগের তাগিদে এই অনাচার করে যেতেন—তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন না কেন? সম্ভবত, বাবার মধ্যে লৌকিক সাধুত্বের ও সংযমের নামা-বলী গায়ে চড়ানোর দরকার ছিল। এমনও হওয়া সম্ভব, অদ্ভুত এক মর্যাদা জ্ঞান তাঁকে অনুরক্ত স্বামী হতে বলত, আর সেই কৃত্রিম অনুরক্তির ছটায় তিনি নিজের ও সমাজের কাছে প্রচুর বাহবা পেতেন।

"পরিণত বয়সে বাবার চরিত্রের দোষগুণ বিচার করতে গিয়ে এই ত দেখলাম, সেখানে পাপ বেশী পুণ্য কম। তিনি কোথায় না অসৎ? অর্থের লোভ ও লালসায় চক্রবৃদ্ধির হারে মানুষকে প্রবঞ্চনা করেন, জাল মকদ্দমা সাজান, ব্যবসায় টাকা ঢেলে কোন ফাঁকে নিজের টাকা তুলে নেন, পরের টাকাও আত্মসাৎ করেন।......তুলোর ব্যবসা করতে গিয়ে তাদের ওজনে তিনি সোনা ঘরে এনেছিলেন, অথচ গুদামে আগুন লেগে যারা মরেছিল তাদের স্ত্রী-পুত্রদের একটি কপর্দকও তিনি দেননি।

"রায়বাহাদুর খেতাব পাবার জন্যে বাবা একটা স্কুল করে দিয়েছিলেন বলে লোকে জানে, আপনিও শুনেছেন বোধ হয়; কিন্তু আমি আরও একটু বেশি জানি, হাকিম-সাহেবের অবিবেচনায় সদরবাজারের সামনে তিনটে বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, বাবা হাকিমসাহেবের হয়ে সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, আগুনটা দাঙ্গার। কে না জানে, পাঁচ সাতশো টাকার বাজি পুড়িয়ে —খাঁটি বিলিতী মদের স্রোত বইয়ে রায়-বাহাদুর খেতাবটাকে ঘরে তুলতে হয়েছিল।

"বাবার অবিবেচনা, অত্যাচার, জিদ,——আমাকে স্তম্ভিত করত। বাবার ধারণা ছিল তাঁর অধীনে যারা আছে সবাই তাঁর ভৃত্য। রামদুলালবাবু ছিলেন আমাদের সেরেস্তার কর্মচারী। একবার তিনি বাবাকে বলেছিলেন, বাবু, আপনার পায়ে আশ্রয় নিয়ে বিশ বছর কেটে গেল। সংসার বেড়ে গেছে—বড্ড অভাব—যদি কিছু মাইনেপত্র বাড়িয়ে দেন—বেঁচে যাই।...... জবাবে বাবা বলেছিলেন, তোমার মেজ মেয়ের বিয়েতে না পাঁচশো টাকা নিলে? রাম-দুলালবাবু বিনীতভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করল, হ্যাঁ নিয়েছিল। বাবা

বললেন, তবে আবার কি এবার শ্রাদ্ধতে টাকা নিও।

"অদ্ভুত এই চরিত্র। খেয়ালী! দয়া চাইলে পাওয়া যেত, ভিক্ষা চাইলে দিতেন, কিন্তু ওই...হয় দয়া করবেন, ভিক্ষা দেবেন; কারুর অধিকার, ন্যায়সংগত দাবি মেনে নেবেন না। তাঁর মনোবৃত্তি দেখে মনে হত, মানুষকে হয় তিনি কৃপা না হয় পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবেন, মর্যাদা দেবেন না।

"এই অন্যায়, অবিচার, দম্ভ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম, যাঁর অধীনে আমি বাস করছি—তাঁর নিয়ম নীতি নেই। কিংবা নিয়ম নীতি যা আছে তার মধ্যে সংগতি সুবিচার শৃঙ্খলা মানবত্ব নেই। এ-এক দানবের রাজত্ব। অসংখ্য পাপ আর পঙ্কিলতা, কদর্য বিষাক্ত এক আবহাওয়া। এখানে সহিষ্ণুতা নেই, প্রেম নেই। বাবার কাছে আমি সন্তান হিসেবে সত্য, মানুষ হিসেবে অসত্য। তাঁর বংশধর বলেই তিনি আমার জন্যে মমতা দেখান—তাঁর বংশধর না হয়ে অন্য কোনো মানুষ হলে ধরণীমোহন এক বিন্দুও মমতা দেখাতেন না। আমার সত্তা তবে কি সন্তান হিসেবেই সব কিছু কামনা করে?

"আমি মনুষ্যের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। মনেপ্রাণে কামনা করেছি, উনি আমার সংগে মানুষের মতন ব্যবহার করুন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। উনি স্বার্থপর, তাঁর বংশ-তালিকায় একটি নাম হিসেবে আমাকে রেখে যাবেন, আশা করবেন, আমিও আর একটি নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাব।

"বাবার সিংহাসন দখল করে আমি মণিমোহন আর-এক ধরণীমোহন হয়ে জীবন কাটাব, তা আমি চাইনি। সেই যে কথায় আছে, বড় শিশির বিষ থেকে ছোট শিশিতে ঢেলে নিলেও বিষ অমৃত হয় না, এও তাই। বাবা তাঁর রক্ত এবং কাঠামোই শুধু আমাকে দেননি, চেয়েছিলেন—আমি যেন সেই একই ধারা বহন করে যাই। আমার কাছে এই বস্তুটা ছিল ঘৃণ্য, অমর্যাদাকর। বাবার ধারণা ছিল না, আমার মা-র কিছু রক্ত আমাতে আছে। বাবা কল্পনাও করেননি, আমি যে-মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম তার নাম শুধু মুক্তি ছিল না—সে আমায় মুক্ত জীবনের স্বপ্নও দেখিয়েছিল।......

"নরকের মধ্যে মানুষ বাঁচতে পারে না, অন্তত আমি পারিনি। আমার মন থেকে স্বর্গকামনা ধুয়ে-মুছে গেলে ভাল হত কি হত না জানি না, কিন্তু তা যায়নি। বাবার একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যে বেঁচে থাকলে আমার বাঁচাটা নিছক আয়ুরক্ষা হত। হ্যাঁ, আমি আয়ু চেয়েছি, কিন্তু সে-আয়ু একার জন্যে নয়। বাবা যতকাল বেঁচে থাকবেন ততকাল আমার পক্ষে কোনো কিছু করার উপায় ছিল না।

"মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এই জগতের কোথাও একজন অদ্ভুত যাদুকর আছে। ক্রমাগত সে উল্টোপাল্টা খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে। আজ যা সত্য, কাল তা মোহ-ভ্রম। এককালে বাবার দিকে তাকিয়ে যার বিস্ময়ের অন্ত থাকত না, পরে এক সময় সে আর সেই বাবার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারত না। ঘৃণায়, বিদ্বেষে। আমার মনে হত, বাবা যেন মানুষের একটা মুখোশ পরে রয়েছে। ওই মুখোশের তলায় আসল মুখটি অ-মানুষের। যেমন হিংস্র তেমনই নির্মম। সেই মুখে সব রকম পাপ, অনাচার আর ইতরতার কদর্য ক্ষত। সর্বান্তঃকরণে এই মুখ আমি ঘৃণা করেছি, কখনও কখনও পাগল হয়ে যেতাম, ইচ্ছে হত.........। ইচ্ছে যাই হোক সংগে সংগে কিছু করার উপায় সাহস মন আমার ছিল না। প্রতিটি দিন-রাত্রি শুধু এই বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার বিষ আমায় জর্জরিত বিষাক্ত করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, বাবাকে আমি হত্যা করব। আমার আর কোনও পথ ছিল না। ভয়ংকর একটা পশু যদি আপনার রাস্তা আগলে বসে থাকে—কি করতে পারেন আপনি! কিছু না, তাকে মেরে ফেলা ছাড়া গতি নেই।

"বাবার সিংহাসন দখল করে আমি রাজা হতেই চেয়েছিলাম, তবে সেই একই ছাঁচের একই জাতের নয়। আমার সৎ উদ্দেশ্য সুন্দর স্বপ্ন ছিল। যে-পাপের বীজ আমার বাবা চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আমি তার ফসল তুলে নিতে আসি নি। ভেবেছিলাম, এই সব পাপকে আমি নির্মূল করে তুলে ফেলব। পরাধীন অবস্থায় যা আমার সাধ্যাতীত ছিল স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্য পেয়ে তা সফল করব। অনেক কিছুই ভেবেছিলাম—মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদা অধিকার দেব, কদর্য ক্ষয় থেকে তাকে বাঁচাব, গ্লানি, দুর্নীতি থেকে এদের মুক্ত করব—কিন্তু আজ এ-সব কথা অর্থহীন। কি ভেবেছিলাম, তাতে কিছু যায় আসে না। কি পেরেছি তার হিসেবটাই দরকার। দেখুন, সত্যি বলতে কি আমি কিছুই পারি নি। বাবার মৃত্যুর পর আমার হাতে ক্ষমতা এল, কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি কিছু পারলাম না। বাবার সংগে আমার পার্থক্য ঘটল না। প্রশ্ন নেই

একই ছাঁচে আমি নিজেকে গড়ে নিলাম, ধরণীমোহনের বদলে মণিমোহন এই নাম বদলটুকু ছাড়া আর কি বদল হল? কিছু না।

"কেন হল না—আমি সে-কথা এতকাল ভেবেছি। কেন হল না জানেন? আমি যে ইমারত তৈরী করতে গিয়েছিলাম, তার ভিতের মধ্যেই গলদ থেকে গেল। বাবাকে হত্যা করলুম—কিন্তু এ-হত্যার মধ্যে কারও না কারও সাহায্য ছিল, কেউ না কেউ সন্দেহ করতে পারত, আইন ছিল পুলিস ছিল, আরও হাজারটা ছিদ্র দেখা দিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতন আমায় এই বিপদ সামলাতে হয়েছে। হত্যার জন্যে যার সাহায্য নিয়েছিলাম—আপনি তাকে জানেন—এই মামলার সে প্রধান সাক্ষী ছিল সরকারী তরফের। আমি তাকে দুহাতে টাকা দিয়েছি, সে সুবিধে সুযোগ পেয়েছে অজস্র। যারা ঘুণাক্ষরেও আমায় সন্দেহ করছে ভেবেছি তাদের কাউকে কাউকে চাকরি দিয়ে, টাকা দিয়ে, অন্যায় প্রশ্রয় দিয়ে কিনেছি, কাউকে আবার জাল অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে হয় জেলখানায় ঢুকিয়েছি—না হয় ভয় দেখিয়ে পরিবার ছাড়া করেছি। জানেন, পাছে পিতৃহত্যার দায়ে ধরা পড়ি, সেই ভয়ে দারোগা পুলিস থেকে শুরু করে মাথাওলাদের পর্যন্ত প্রকারান্তরে কত টাকা ঘুষ দিয়েছি......অন্তত পনের হাজার টাকা। দেখতে দেখতে চার বছরের মাথায় আমি ধরণীমোহনের ছাঁচে ঢালা হয়ে গেলাম। সেই পাপ সেই প্রশ্রয় সেই সন্দেহ, একই ধরনের আত্মরক্ষার বাসনা নির্দয়তা দম্ভ অহমিকা......। সেই একটা কথা আছে না—এক পাপ থেকে দিনে দিনে হাজার পাপ জন্ম নেয়—ঠিক তাই। কথাটা পরিপূর্ণ সত্য।

"আমি আমার পাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। বাবার আর আমার মধ্যেকার সম্পর্কের কথা ভাবতাম। আমার তিলমাত্র সংশয় ছিল না, যদি আমার ছেলে থাকে—সে গোড়ায় আমায় দেখে দেবতা ভাববে, কিন্তু বড় হয়ে আমার আসল রূপ সে চিনতে পারবে। আপনি বোধ হয় আর সবই চাপা দিতে পারেন, কিন্তু চরিত্র নয়। চরিত্রের ওপর মুখোশ টানা বেশিদিন চলে না। এর এক অদ্ভুত গন্ধ আছে, অপরে ঠিক জানতে পারে।......আমার ভবিষ্যৎ বংশধর আমাকেও ক্ষমা করত না। আমার মতন সেও পিতৃহত্যা করত, আমারই মতন পিতৃহত্যার সহস্র কারণ সে খুঁজে পেত। আমার ভাগ্যের শেষ পরিণাম আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম। ভাগ্যের একই রকম পুনরাবৃত্তি কে চায়!"

মণিমোহন তার কথা শেষ করল। ওকে অসম্ভব ক্লান্ত হতাশ-ব্যথিত দেখাচ্ছিল। যে গভীর যন্ত্রণা এই মানুষটিকে পীড়িত করছিল আমি যেন তার স্পর্শ পাচ্ছিলাম।

*

বিচারের রায়ের পর আমি মণিমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনে হল, ওর শান্ত সংযত ভঙ্গি আরও শান্ত স্থির। চোখ দুটি গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আস্তে আস্তে টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছিল। যেন দীর্ঘকাল আপ্রাণ চেষ্টার পর এখন সে পরাজয়ের ক্লান্তি ও হতাশায় ডুবে আছে। মণিমোহনের মুখের দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে আমি মাথা নীচু করলাম। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। যুদ্ধে হার হয়ে গেছে, এখন সান্ত্বনা বৃথা।

'দেখুন—, আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি—' ভাঙা জড়ানো অস্পষ্ট গলায় আমি বলতে গিয়েও থেমে গেলাম।

'জানি।' মণিমোহন আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'ভালই হয়েছে।' চুপ করে থাকল খানিক, অন্যদিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল, নিশ্বাস ফেলল—শেষে মৃদু শান্ত কেমন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি অনেক ভাবলুম। শেষের কয়েকটা দিন বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টাই ভেবেছি। এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা কি জানেন—' মণিমোহন আমার দিকে তার গভীর ক্লান্ত আচ্ছন্ন চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। আমি নীরব, ওর সান্ত্বনা কোথায় কি করে জানব!

অসহ্য কঠিন দুঃসহ নীরবতা ভেঙে মণিমোহন ধীর প্রসন্ন শান্ত গলায় বলল, 'এতকাল আমি মানুষ হিসেবে সুবিচার চেয়েছি।......আজ......এখন আমার দুঃখ নেই; আমার বিচার হয়েছে। আপনিই বলুন, মানুষ হিসেবে এ-অধিকার আমার আছে কি না!......' মণিমোহনের গলার স্বরে সামান্য জড়তা এল, সম্ভবত কোনো ঘন আবেগ ওকে অধিকার করছিল। অল্প থেমে, গলার স্বর পরিষ্কার করে নিয়ে, মণিমোহন আশ্চর্য সুন্দর করে হাসল; বলল, 'আমরা মানুষ হিসেবে চিরকালই ত বিচারের আশায় বসে থাকব, না-না—দর্শক হয়ে নয়, আসামী হয়েই। ঠিক কি না, বলুন।'

প্রশ্নটা যেন আমার অন্তরে কিসের এক স্তব্ধতা সৃষ্টি করল। মণিমোহনের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলাম। অনুভব করছিলাম, এক ধরনের পবিত্রতার স্পর্শ এখানে কোথাও আছে খুব কাছে, হয়ত সামনে, হয়ত পাশেই।

**শুভমুক্তি সমাসন্ন**

# অকৃত্রিম

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ঠিকানা দেবার সময় মিসেস চ্যাটার্জি হালকা হেসে নন্দিতাকে বলেছিলেন, খুব বড়লোক। ব্যাচেলার। তুমি গেলে মোটা টাকা চাঁদা দেবেন নিশ্চয়ই। তবে একা যেও না। অনেক দোষ আছে শুনেছি।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করেছিল, কি দোষ?

ষাট বছরের ব্যাচেলারের যা দোষ হয় তাই।

হাসির আওয়াজ তুলেছিল নন্দিতা, ষাট বছরের বুড়োর কাছে আমাকে একা যেতে বারণ করছেন?

নন্দিতার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে খস খস করে একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে মিসেস চ্যাটার্জি বলেছিলেন, এই নাও।

চেনা নাম। লোকেন গুপ্ত। জাহাজের কারবার। রাস্তাটাও নন্দিতার জানা। একুশ নম্বর গ্রোভ অ্যাভিনিউ। টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই। প্রসাধনের ছোপ লাগা সরু লম্বা আঙুলে নন্দিতা ডিরেক্টোরির পাতা ওলটায়।

উনিই ধরেছিলেন। ভারী গলার স্বর। নন্দিতার কথা শুনে হেসে ওঠেন। উৎসাহের একটা স্পষ্ট আভাস তারের মধ্যে দিয়েই যেন নন্দিতার কানে এসে পৌঁছয়। লোকেন গুপ্ত হালকা স্বরে জানাতে চান সাউথ ক্যালকাটা উইমেনস ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁকে কি প্রয়োজন। উত্তরে নন্দিতাও কি একটা বলে—এখন ঠিক মনে পড়ে না। রবিবার সকাল নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে তাকে যেতে হবে সেখানে।

প্রসাধনের তুলি বুলোতে সময় লেগেছে নন্দিতার। হয় তো কোন প্রয়োজন ছিল না। একজন বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াবার পক্ষে তার বয়সটাই তো সব চেয়ে বড় প্রসাধন। কিন্তু ঠিক লোকেন গুপ্তের জন্যে নয়, অভ্যাসের জন্যেই স্বাভাবিক চেহারাটা ঘষে-মেজে অস্বাভাবিক করতে হল নন্দিতাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়েই একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামায় নন্দিতা। ড্রাইভারকে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এ নিয়ে যেতে। তার হাতে নীল একটা ব্যাগ আর সাদা সোনালি রঙের পাতলা একটা বই। আর কয়েকটা কাগজ।

ছোট ঘড়িটা চোখ নামিয়ে দেখে নন্দিতা। মিনিট দশেক দেরি হয়েছে। ওর ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে যায়। ভাড়া চুকিয়ে হীল তোলা জুতো ঠেকায় ছোট ছোট পাথর কুচির ওপর। গেট থেকে লম্বা রাস্তা চলে গেছে লোকেন গুপ্তের বাড়ি অবধি। নেপালী দরোয়ান সঙ্গে করে নিয়ে যায় নন্দিতাকে।

কেমন এক কৌতূহল কাঁপে তার

চোখে। সামনে বিশাল এক অট্টালিকা। এপাশে ওপাশে তালের সারি। গ্যারেজে দু-তিনটে মোটর। বাগানে রঙ-বেরঙের ফুলে। দারোয়ানের সংগে হাঁটার খট খট শব্দ। তুলো-মোড়া মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে নন্দিতা ওপরে উঠে যায়।

অল্প-অল্প রোদে সাদা লম্বা বারান্দা চকমক করে। পুরু নীল বেতের চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে একদিকে। দূরে সবুজ বনের শোভা। শহরতলীর আশ্চর্য নির্জনতা। গদি আঁটা বেতের চেয়ারে বসে বসে নন্দিতা দেখে। শোভা আর সম্পদ। দেখে আর ভাবে, এ সবের মালিক বৃদ্ধ—অবিবাহিত। তখন মনে মনে সে হাসে।

বারান্দার একেবারে অন্য প্রান্তে একটা ঘর। হাওয়ায় নীল রঙের ভারী পর্দা কাঁপছে। নিঃঝুম চারপাশ। একটা লোক নেই। এতটুকু কোলাহল নেই। একটা ছেলে কি মেয়ে, আত্মীয় কি আত্মীয়া কেউ নেই কোথাও। এই ভয়ানক নির্জনতায় একটু একটু বুক কাঁপে নন্দিতার। একটা ছেলেমানুষী ভয়। এখনি থেকে আলয়-আলয় ফিরে যেতে পারলে হয়। মিসেস চ্যাটার্জির কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়।

সেই নীল পর্দাটা সরে যায়। ঝকঝকে একটা মুখ। ঘাড় ফিরিয়ে কাকে কি বলছেন। ঠিক টেলিফোনের মতো গলা। স্বর শুনেই নন্দিতা লোকেন গুপ্তকে চিনতে পারে। হাতের কাগজ-পত্র সে ঠিক করে নেয়। টেবিলের ওপর রাখা নীল ব্যাগটা নিজের কাছে সরিয়ে আনে।

জুতোর খট খট আওয়াজ। হাসি-মুখে লোকেন গুপ্ত এগিয়ে আসেন নন্দিতার দিকে—বারান্দার এ প্রান্তে। তখন সূর্যের আলো পুকুরের জলে ঝিলমিল করছে। আর পুরনো অশ্বত্থ গাছে একটা ছোট রঙীন পাখি কিচির মিচির শব্দ তুলে লাফালাফি করছে এ ডাল থেকে ও ডালে।

নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, গুড মর্নিং।

মর্নিং। বসুন। নন্দিতার বসবার অপেক্ষায় লোকেন গুপ্ত দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। একটা সিগ্রেট বের করে কেসের ওপর টুকটুক শব্দ করেন। তারপর ফস করে দেশলাই জ্বালান। এলোমেলো পাতলা ধোঁয়া নন্দিতার কানের পাশ দিয়ে সরে-সরে যায়। একটা মিষ্টি গন্ধ—মধুর একটা ঝাঁজ। দু-এক মিনিট চুপচাপ। লোকেন গুপ্ত দেখেন নন্দিতাকে।

দেখবেনই। তার রূপ। তার প্রসাধন। সব ছাড়িয়ে তার বয়স। একথা সে বুঝতে পারে বলেই একটু বেশিক্ষণ দেখতে দেয়। কিন্তু নন্দিতাও দেখে লোকেন গুপ্তকে। কালো মাথার চুল। মুক্তোর সারির মতো সাদা ঝকঝকে দাঁত। গালের চামড়া টান-টান। ঐশ্বর্যের কড়া গন্ধ যেন বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে। দামী স্যুট। দামী জুতো। গলায় বাদামী রঙের টাই। সম্পদের বিপুল শক্তি বয়সের ভার দূরে ঠেলে রেখেছে। দেখতে দেখতে নন্দিতা কথা আরম্ভ করবার ভাষা পায় না।

আপনিই টেলিফোন করেছিলেন? মুখে অল্প হাসি লোকেন গুপ্তর, বলুন কি করতে পারি?

তৎপর হয়ে ওঠে নন্দিতা, আমাদের ক্লাবের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?

ও ইয়েস। শিগগিরই একটা শো হচ্ছে তো আপনাদের?

সেই ব্যাপারের জন্যেই আপনার কাছে আসা, সাদা-সোনালী রঙের বইটা লোকেন গুপ্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে নন্দিতা বলে, আমাদের পেট্রন হতে হবে আপনাকে—

হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত, উইমেনস্ ক্লাবে ব্যাচেলার পেট্রন? গুড আইডিয়া! কিন্তু যদি আপত্তি করে কেউ?

মৃদু হেসে নন্দিতা বলে, আমিই একজন সেক্রেটারি।

ভেরি গুড, নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকেন গুপ্ত, কিন্তু কাজটা তবে কি আমার?

এই বইতেই আপনি সব পাবেন, হাসির ঝিলিক তুলে নন্দিতা বলে, ইচ্ছে মতো ডোনেশন যখন দয় দেবেন—ইউ আর দি ওনলি ব্যাচেলার পেট্রন মিস্টার গুপ্ত।

দ্যাটস ফাইন।

বোধহয় একটু জোরেই হেসে ফেলেছিল নন্দিতা। দূরের ভারী পর্দাটা আবার নড়ে ওঠে। সরে যায়। তরল বিদ্যুতের মতো নন্দিতার কৌতূহলী দৃষ্টি ছিটকে যায় সেদিকে।

আর একটা মুখ। শিথিল নিষ্প্রভ। কপালে গভীর রেখার ভিড়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সাধারণ সাদা শাড়ি। চোখের চশমাটা সব চেয়ে বেমানান। হাতে সাদা একটা ব্যাগ। দূর থেকে উষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নন্দিতার দিকে। বারান্দার কোণ ঘেঁষে এগিয়ে আসে।

হয়তো দুঃস্থ কোন আত্মীয়া। বাড়ি চাকর-বাকরদের চালায়। কিম্বা সংসারের সব কাজ করে। বড়লোকের অমন কেউ না কেউ তো থাকেই। কিন্তু ওর দৃষ্টি নন্দিতার শরীরে কাঁটা ফোটায়। ভদ্রতার সব আবরণ খসিয়ে ঈর্ষা আর ভর্ৎসনার ঝাঁজ ছড়াতে ছড়াতে বয়সের ভারে স্থূল, শ্লথ শরীরটা এগিয়ে আসে।

তাকে দেখতে পেয়ে সিগ্রেট নামিয়ে লোকেন গুপ্ত বলেন, এখুনি যাচ্ছ নাকি প্রভা?

হ্যাঁ একটু কাজে আছে।

লোকেন গুপ্ত ডাকেন, ড্রাইভার—

বাধা দিয়ে প্রভা বলে, না, না, গাড়ির দরকার নেই। আমি রাস্তা থেকে একটা কিছু নিয়ে নেব।

এই যে, তোমাদের আলাপ করিয়ে দি। মিস মিত্র আর ইনি মিস—নন্দিতার পদবীটা মনে নেই বলে লোকেন গুপ্ত থেমে গিয়ে হাসেন।

নন্দিতা প্রভার দিকে তাকিয়ে শুকনো হেসে বলে, মিস রায়।

লোকেন গুপ্ত লক্ষ্য করেন না যে নন্দিতার হাসি প্রভা ফিরিয়ে দেয় না। ইচ্ছে করেই অবহেলার একটা ভঙ্গি করে। চাপা আক্রোশে নন্দিতা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। আর প্রভা বোধহয় লোকেন গুপ্তর সংগে নিজের সম্পর্কটা তাকে বোঝাবার জন্যে কথাবার্তার সুর রীতি-মতো আন্তরিক করে তোলে। তাঁর গায়ের কাছে সরে এসে খবরের কাগজটা তুলে নেয়। দু-একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারপর পিছন ফিরে বারবার তাকাতে তাকাতে নিচে নেমে যায়। আর তার বিষদৃষ্টি নন্দিতার মনে উৎকট জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

ঝিরঝির বাতাসে খোলা বারান্দায় বসে একটু একটু করে নন্দিতা প্রভার অশোভন ব্যবহারের অর্থ খুঁজে পায় সেই প্রথম দিনই। বয়সের ভারে স্থূল ওই মহিলা তাকে সন্দেহ করেছে। স্বাভাবিক একটা ভয় যদি নন্দিতার মতো যৌবন-সম্বল মেয়ে তাকে এক আঘাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে নেয় লোকেন গুপ্তকে। তাই উৎসাহী হয়ে সুলভ অশিক্ষিত একটা মেয়ের মতো সম্পর্কটা জানিয়ে দিয়ে গেল তাকে। বয়স হলে এমনি করেই কাণ্ডজ্ঞান হারায় নাকি মেয়েরা। সেখানে [illegible] অপমানের জ্বালা নন্দিতা একটু বেশী মাত্রায় অনুভব করে। কৌতুকের স্বাদও পায় মনের মধ্যে। আর জ্বালার থেকেই লোকেন গুপ্তর সংগে অন্তরঙ্গ হবার উগ্র নেশা তাকে পেয়ে বসে।

অনেকক্ষণ আগেই ফোটা চেকটা ব্যাগে ভরে মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে হালকা শরীর কাঁপিয়ে, এখান থেকে চলে যেত
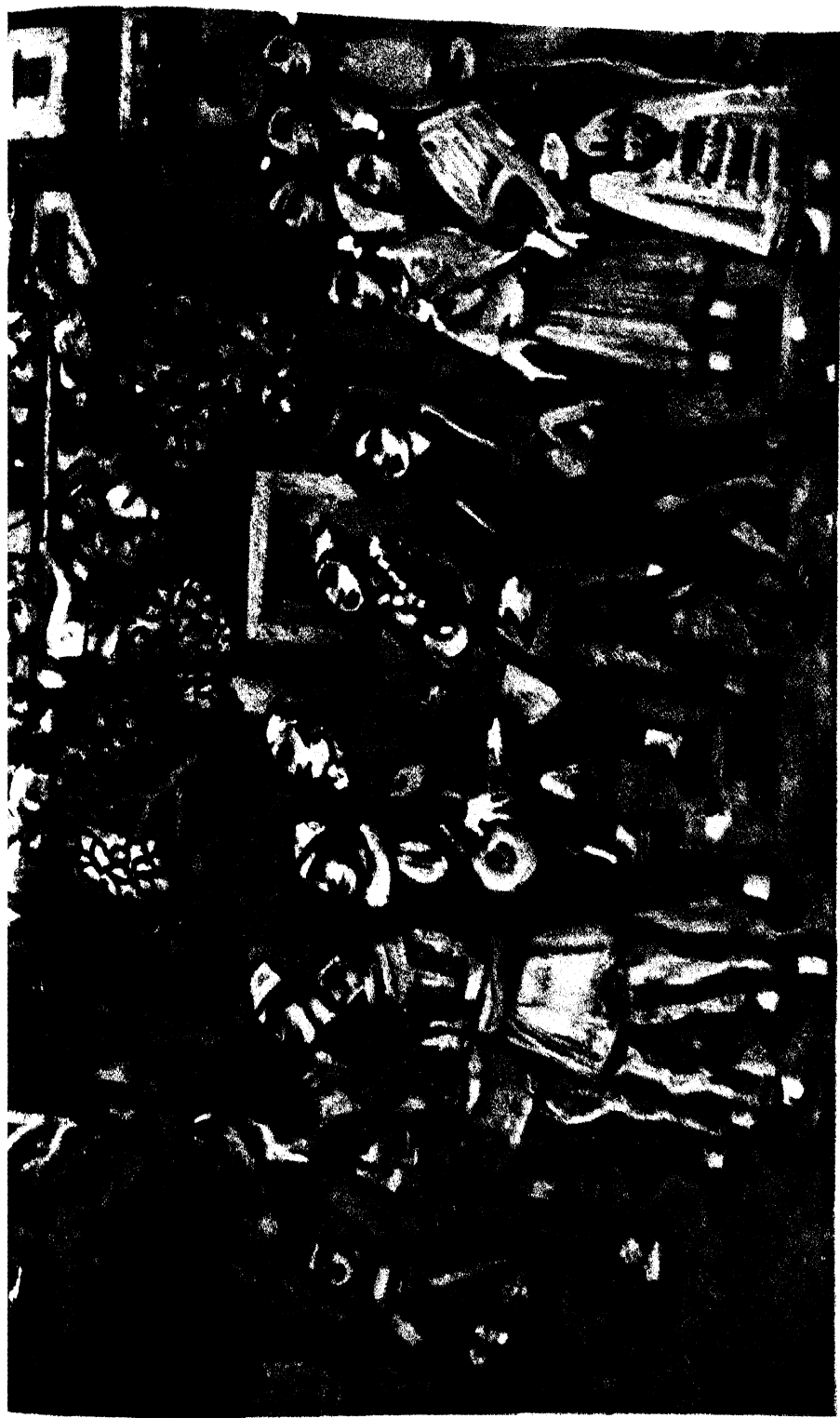
নেপালের উৎসব — শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

নন্দিতা। হাসির কল্লোল তুলে কৃতিত্বের অহঙ্কার প্রকাশ করত মিসেস চ্যাটার্জির কাছে। আর কোনদিন এদিকে আসত না—আর কোনদিন হয়তো লোকেন গুপ্তের সংগে মুখোমুখি বসবার তার অবসর হত না।

কিন্তু নন্দিতার মনের অবচেতনে দম্ভ এক নতুন রূপ নেয়। এই অপমানটা প্রভাকে ফিরিয়ে দিতে চায় লোকেন গুপ্তকে উপলক্ষ্য করেই। তাই তাঁর অনুরোধ রেখে সে বসে থাকে অনেকক্ষণ। দুষ্প্রাপ্য বিলাতি কাপে আলগোছে কফি খায়। একদিন একটা নেমন্তন্নে আসবে বলে ও সম্প্রীতি জানায়। আর তাকে পৌঁছে দেবার জন্যে লোকেন গুপ্ত যখন ড্রাইভারকে লাল রঙের বুইকটা বের করতে বলেন তখন লৌকিকতা করে সে মৃদু আপত্তিও করে না।

শহরতলীর অপ্রশস্ত পথ বেয়ে ভারী মোটরটা সাবধানে এগিয়ে চলে। ঝাঁকুনি লাগে না। নরম পুরু গদিতে নন্দিতা তার হালকা শরীর এলিয়ে দেয়। চোখ দুটোও শিথিল্যে বুজে আসে। আর মোটরের গতির তালে তালে মনে মনে সে বোধহয় একটু বেশি দূর এগিয়ে যায়।

আশ্বিনের মিঠে আমেজে দু পাশে একরাশ দীর্ঘ দীর্ঘ গাছের সবুজ পাতার দিকে তাকিয়ে তার রক্তের গতি হঠাৎ যেন বেড়ে যায়। একটা নতুন আভা ঝলসায় চোখে-মুখে। আর প্রথম দিন প্রথম কথা তার মনে হয় প্রভাকে মুছে ফেলতে হবে ও বাড়ি থেকে।

সেই মূর্তিটা আবার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। রূঢ়। গম্ভীর। বয়সের ভারে শ্লথ শরীর। কাঁচা-পাকা চুল। অপরিচ্ছন্ন পাঁউরুটির মতো বোকা-বোকা মুখ। নন্দিতার বয়সের বিদ্যুৎ প্রভাবে দু-পাশের প্রাচীন গাছের মতো দ্রুত সরে যাচ্ছে ঐশ্বর্যবান লোকেন গুপ্তের প্রাসাদ শিখর থেকে। যৌবনের নেশায় চোখের দৃষ্টি অনারক্ত হয়ে যায় নন্দিতার। ঠোঁট টিপে সে আপন মনে হাসে।

তারপর আর একদিন।

ভিজে-ভিজে পাথর কুচি। কাল সারারাত ঝরে পড়া হিমের ঠান্ডা চিহ্ন। নেপালী দারোয়ান নন্দিতাকে চিনতে পারে। এগিয়ে এসে সেলাম জানায়। তার সঙ্গে লোকেন গুপ্তের ঘনিষ্ঠতার কথা সে বুঝতে পেরেছে বলে খুশি-খুশি চোখে ওপরের সেই বারান্দার দিকে মাথা তুলে তাকায় নন্দিতা।

সাব হ্যায়?

বিমার। আপ উপ্পর যাইয়ে।

বিমার? একটু চমকে উঠে নন্দিতা জিজ্ঞেস করে, কব সে?

দো-চার দিন।

আজ আর দারোয়ান সঙ্গে যায় না। নন্দিতা পথ চেনে বলেই সিঁড়ির দিকে একটা হাত প্রসারিত করে সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। হীলের টুকটুক শব্দ তোলে নন্দিতা। পাট-ভাঙা নতুন শাড়ির খস খস আওয়াজ। দামী এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ। নিজের সৌরভ ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে ওপরে উঠে যায়।

বেয়ারা সামনেই ছিল। ক্ষিপ্র হাতে পাখা খুলে দেয়। নিজের নাম বলে নন্দিতা। তাকে বসতে বলে বেয়ারা ভেতরে চলে যায়। একটু পরে ঘরে এসে আর একবার বলে, বইঠিয়ে।

বারান্দার আর এক প্রান্তে হাওয়ায় পর্দা অল্প অল্প দুলছে। অনেক দূরে ফাঁকা মাঠ আর ছোট ছোট বাড়ি ছাড়িয়ে যেন কুয়াশা জমে আছে। চেনা-চেনা লাগে নন্দিতার। প্রথম দিনের মতো অপরিচয়ের অস্বস্তি আজ তাকে ঈষৎ অস্থির করে তোলে না। হাত বাড়িয়ে গোল টেবিলের ওপর থেকে ইংরেজি খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে সে চোখ বুলোয়।

পর্দা সরে যায়। চমকে মুখ তোলে নন্দিতা। কিন্তু স্লিপার ঘষতে ঘষতে যে এগিয়ে আসে তাকে দেখে তার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। বিস্বাদে জিভ অসাড় হয়ে যায়।

আজ কিন্তু হাসে প্রভা। হাত তুলে আনন্দ প্রকাশ করে। তাকে দেখে ওর খুশি হয়ে ওঠার কি কারণ থাকতে পারে সেকথা নন্দিতা বুঝতে পারে একটু পরেই।

মিস্টার গুপ্তর অসুখ করেছে। আজ দেখা হবে না।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে নন্দিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমার নাম বলেছিলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আর একদিন আপনিই তো চাঁদা চাইতে এসেছিলেন?

শরীরের সব রক্ত যেন ছলাৎ করে জমাট বাঁধে নন্দিতার মুখে। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভাকে আঘাত করতে পারলেই সে খুশি হত। উত্তেজিত আঙুলে ব্যাগ খুলে লোকেন গুপ্তর নাম লেখা সাদা বড় খাম বের করে সে টেবিলের ওপর রাখে, আমি ওকে আমাদের ফাংশনে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম—

কবে?

এখনও দেরি আছে—উনিশে অক্টোবর। বোধহয় যেতে পারবেন না।

প্রভার কথা নন্দিতা শোনে না। হাওয়ায় দোল খাওয়া একটা ছোট অর্কিডের দিকে তাকিয়ে এক পা এক পা করে নীল পর্দার দিকে এগিয়ে যায়, ওঁকে দেখতে পারি?

না। ডাক্তারের বারণ।

কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় নন্দিতা। কি দরকার ছিল ওকে জিজ্ঞেস করবার। বেয়ারার সঙ্গে সোজা রুগির ঘরে চলে গেলেই সবচেয়ে ভাল হত। এ বাড়ির কর্ত্রীর মতো প্রভা যেন ওকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এক রূপবান ধনী পুরুষকে নিজের ভোগের জন্যে জোর করে আগলে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা। কান দুটো কট কট করে ওঠে নন্দিতার। দেখা যাবে ও আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে তাকে। যেন তার একারই ও ঘরে যাবার অবাধ অধিকার। নিজের শরীরটার ওপর নিজেই একবার নন্দিতা চোখ বুলিয়ে নেয়। দেখা যাবে।

ঠিক আছে, পর্দার দিকে তাকিয়ে কথা বলে নন্দিতা, আমি পরে খবর নেব।

আগে টেলিফোন করবেন।

ঝাঁজালো দৃষ্টি নন্দিতা ছুঁড়ে মারে প্রভার দিকে। কাটা-কাটা নীরস স্বরে বলে—যেন বেয়ারার সঙ্গে কথা বলছে, কার্ডটা এখুনি যেন পৌঁছে দেওয়া হয়—সেই স্থূল মূর্তির সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে সে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। বিকট একটা জ্বালার উদ্গীরণ চোখের সামনে থেকে বারান্দায় দাঁড়ানো ঈর্ষা-কাতর বয়স্ক নারী শরীরটাকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ-চূর্ণ করে মিলিয়ে দিতে চায়।

এই প্রত্যাখান তারই ছল। তারই কৌশল। নন্দিতার স্থির বিশ্বাস লোকেন গুপ্তকে জানানো হয়নি তার আগমন। যতই অসুস্থ হোন, তিনি তাকে এমন করে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। প্রথম দিনই সে বুঝেছিল তার যৌবন-থরো-থরো দেহ আকণ্ঠ তৃষ্ণার জোয়ার নামিয়েছিল রসগ্রাহী বৃদ্ধের পিপাসার্ত চোখে। যদি আজও তাঁর রোগ শয্যার ধারে গিয়ে নন্দিতা দাঁড়াত—টান-টান চামড়ার মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিত তাঁর কপালে আর মাথায় তাহলে অলৌকিক তারুণ্যের নিবিড় তৃপ্তি তাঁকে এক নতুন যৌবনজোয়ার সন্ধান দিত। আর ওই রেখাঙ্কিত অক্ষম নারী-শরীরটা ঈর্ষার খোঁচায় এক কোণায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ এক সময় জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়ত ঠাণ্ডা মেঝের ওপর। হ্যাঁ, তাকে একদিন আছড়ে মাটিতে ফেলবে নন্দিতা। যেমন করে হোক। যত দেরি হোক। যত ক্ষতি হোক তার নিজের।

দু-চারদিন পর এক দুপুরে ক্লাবের আপিস-ঘরে বসে কার্ডের স্তূপ সামনে নিয়ে ঠিকানা লিখছিল নন্দিতা। আর কোথাও নিজে যাবার দরকার নেই। বাকি কার্ডগুলো বেয়ারা নিয়ে যাবে কিম্বা ডাকে ছাড়া হবে।

শরতের বিবর্ণ দুপুর। একটু আগে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়েছে। হাওয়ার ঝাপটায় রঙীন ক্যালেণ্ডারটা ঝুপ করে খসে পড়েছে। এখনও ওটাকে টাঙানো হয়নি। মিসেস চ্যাটার্জি একটা মোটা ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছেন। নতুন কাদের ভর্তি করা হবে সেই নামগুলোর তালিকা সাজাচ্ছেন।

হঠাৎ টেলিফোন শব্দ করে ওঠে। মাথা না তুলে ক্লান্ত হাতে যন্ত্রটা একটু সরিয়ে এনে নন্দিতা বলে, হ্যালো। কিন্তু এক মুহূর্তে সে আশ্চর্য রকম সচেতন হয়ে ওঠে। চঞ্চল। বিচলিত। হাসি-হাসি মুখ। আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে টেলিফোনের ওপর।

লোকেন গুপ্তর স্বর। এখন একটু সুস্থ। সেদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেন। এই রবিবার দুপুরে নন্দিতাকে খাবার নেমন্তন্ন করেন। অনুরোধের ভাষায় অনেক উচ্ছ্বাস মিশিয়ে বলেন, আসতেই হবে। না এলে খুব বেশি আঘাত পাবেন।

ধন্যবাদ নিশ্চয়ই যাব—লোকেন গুপ্তর অনুরোধে অন্তরিকতার আভাস পেয়ে লজ্জায় একটু ভিজিয়ে যায় নন্দিতার স্বর।

গাড়ি পাঠাব?

না না। আমি নিজেই যাব।

হঠাৎ প্রভার কথা নন্দিতার মনে পড়ে যায়। সেদিন লোকেন গুপ্ত তাকে গাড়ি দিতে চাইলেও গেট থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বেশ পরিণত হয়েছে বোধহয়। সহজেই বুঝতে পারে যে বড় মোটর গাড়িতে নন্দিতাকে মানায় না। তাহলে আর একটু বেশি বোঝে না কেন—লোকেন গুপ্তর ঘরে কি বারান্দায় কি রোগশয্যার পাশে সে একেবারেই বেমানান?

সেদিন হালকা হেসে লোকেন গুপ্তকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখে নন্দিতা।

খাবার টেবিলে বসে আজ ইচ্ছে করেই একটু বেশি কথা বলছে নন্দিতা। হতাশার ঠাণ্ডা ঝাপটায় প্রথমে থমকে গিয়েছিল। আজও এসেছে প্রভা। তবে ওর চোখে আজ ঈর্ষা নেই। বোধহয় হঠাৎ হারের
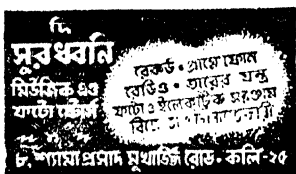
প্লানিতে অবসন্ন। যেন যন্ত্রের মতো ঠেলে দিচ্ছে প্লেট। গেলাস সরিয়ে রাখছে। বিষন্ন মুখ। কথা বলছে না।

আজ কথায় কথায় হাসির লহর তুলছে নন্দিতা ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে লোকেন গুপ্তর দিকে ঘন ঘন চোখ ফেরাচ্ছে ওকে দেখিয়ে। জমা করা যত অপমান যেন এই খরদীপ্ত মধ্যাহ্নে চোখা একটা ঢিলের মতো ছুড়ে মারতে চায় ওর দিকে। আঘাত খেয়ে নিজের দৈন্য বুঝুক প্রভা। তাকে এই বিরাট অট্টালিকার একক উত্তরাধিকারিণী করে বয়সের বোঝা নিয়ে সরে থাক।

রোদের প্রশস্ত সোনালী রেখা এসে পড়েছে খাবার ঘরের জানলার কাচের ওপর। একটু ঝুঁকে তাকালে আকাশ দেখা যায়। যেন স্থির কাশবন। কিন্তু নন্দিতার চোখ সেদিকে নেই। প্রকৃতির চেয়ে পুরুষ আজ এই মধ্যাহ্নে তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। হালকা হলুদ রঙের শার্ট কী আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে লোকেন গুপ্তর গায়ের রঙের সঙ্গে! শরীরটা যেন যৌবনের দীপ্তিতে জ্বলছে। হাসির মুহুর্মুহু আওয়াজে এক তরুণ যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে নন্দিতাকে। কাল তার কাছে বিমূঢ়—শঙ্কিত। বয়স পরাস্ত।

একদিকে জীবন। আর একদিকে পূর্ণ সুধাপাত্র। লোকেন গুপ্ত আর নন্দিতা রয়। মাঝখানে এক ক্লান্তিকর ছন্দপতন। মৃত্যুর হিম-ইঙ্গিত। একটা শ্লথ শ্রান্ত শরীর। হেরে যাচ্ছে। জমে জুড়িয়ে পরিণত হচ্ছে ব্যর্থতার শিলীভূত কঠিন প্রস্তরে। সৌন্দর্যের উত্তাল প্রান্তরে ধূলিরুক্ষ আবর্জনার মতো।

ইহুদী মেনুইনের রিসাইটেল এবারে আপনি শুনেছিলেন মিস্টার গুপ্ত?

চামচের টুং টুং শব্দ নন্দিতার প্রশ্নে থেমে যায়, ও নো। আই মিসড্ হিম। ব্যাপারটা জানতে পারলাম মেনুইন চলে যাবার পর, রসিকতা করে লোকেন গুপ্ত বলেন, শহরের বাইরে থাকি। গেঁয়ো লোক। কে আর আমাকে খবর দেবেন বলুন?

কৌশলে প্রভার মেঘ-থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতাও পাল্টা রসিকতা করে, আমি কি মাঝে মাঝে গেঁয়ো লোকটিকে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারি?

অ্যাম আই সো লাকি? হা-হা করে হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত।

ঝন করে একটা শব্দ। জল খেতে গিয়ে গেলাসটা প্রভার হাত থেকে মাটিতে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। বেয়ারা যখন সেগুলো তুলতে থাকে তখন সাবধানে আর এক চামচ ফ্রায়েড রাইস নিয়ে নন্দিতা আবার কথা বলে, আমাদের ক্লাবে মাঝে মাঝে আসবেন। খুব ভাল লাগবে।

উৎসাহী চোখ তুলে লোকেন গুপ্ত বলেন, যাব।

আপনি এলে আমি—আমরা সকলেই খুব খুশি হব। আর পরশু তো আমাদের শো। সেদিন আপনাকে যেতেই হবে। আমি কিন্তু বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

আই অ্যাম বিয়োন্ড ভেরি লাকি, আর একবার হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত।

এবার কোন কাচ ভাঙার শব্দ হয় না। কিন্তু মনে মনে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায় নন্দিতা। কালো পাথরের মতো মূর্তিটা অল্পে-অল্পে ভাঙছে। নিঃশব্দে। অলক্ষ্যে।

ভেবেছিল সরে যাবে। কিন্তু না। ভুল হয়েছিল নন্দিতার। ত্বক শিথিল হয়ে গেলে বোধহয় অপমান সহজে গায়ে বেঁধে না। আর তা ছাড়া বিপুল সম্পত্তির মায়া কি অত সহজে ছাড়ে যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া নিরানন্দ পান্ডুর কোন স্ত্রীলোক?

নন্দিতা তাকে একেবারেও আসতে বলেনি। তবু বোধহয় আত্মার সম্পর্ক জাহির করবার জন্যে রবাহূতের মতো এসেছে লোকেন গুপ্তর সঙ্গে। বোবা হয়ে গেছে নন্দিতার দীপ্তি দেখে। মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। কিছু শুনেছে কি না শুনেছে নন্দিতা বুঝতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না। ও যেন একটা মানুষই নয়।

আর লোকেন গুপ্তর চোখ চঞ্চল শ্যেনের মতো এদিক-ওদিক ছুটছে। একবার মঞ্চের দিকে। একবার পাশে।

কখনও কখনও পিছনে। শাড়ি আর প্রসাধন। রূপ আর ঘ্রাণ। লোকেন গুপ্ত প্রাণভরে এক লোভনীয় পরিবেশের স্বাদ গ্রহণ করছেন। তার পাশের স্থবির শরীরটা তখন কুঁকড়ে যাচ্ছে। চঞ্চল রক্তের উদ্দাম গতির মোড় ফেরাবার কোন ক্ষমতা নেই তার।

কেমন লাগছে মিস্টার গুপ্ত? বিরামের অবসরে নন্দিতা এসে জিজ্ঞেস করে।

চমৎকার, তাকে দেখতে দেখতে লোকেন গুপ্ত বলেন, সবই তো আপনার ক্রেডিট—

নন্দিতা হেসে আর একটু সরে আসে। লোকেন গুপ্তর মাথায় ব্রিলেণ্টিনের গন্ধ। বুক-পকেটের রুমালে ফরাসী এসেন্সের সৌরভ। সে জোরে নিশ্বাস টানে, শেষ হয়ে গেলে যাবেন না। আমি আসব কিন্তু—

বেশ বেশ। মে আই গিভ ইউ এ লিফট?

ধন্যবাদ।

বেশি রাত হয় না। নটারও আগে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। সব গুছিয়ে আসতে একটু দেরি হয় নন্দিতার। এদিকে আর কেউ নেই। বড় রাস্তার ওপর গাড়ির সারি ছোট হতে-হতে মুছে গেছে। শুধু একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবের গা ঘেঁষে। লাল বুইকটা নয়। আজ অন্য আর একটা গাড়ি চালিয়ে এসেছেন লোকেন গুপ্ত। ড্রাইভার নেই। নিজেই স্টিয়ারিং-এ হাত রাখেন।

ভদ্রতা করে লোকেন গুপ্তর অনুরোধের অপেক্ষা করতে পারত নন্দিতা। হয় তো তিনি নিজেই প্রভাকে পিছনে বসতে বলতেন। কিন্তু কিসের একটা তাগিদে পিছনের দরজা খুলে নন্দিতা প্রভাকে ওঠবার ইঙ্গিত জানায়। ওখানেই বসুক ব্যর্থ মানুষটা। আর লোকেন গুপ্ত দরজা খুলতে না খুলতেই সে বসে পড়ে তাঁর পাশে।

কোনদিকে? সাদা মোটরটা যেন হাঁসের মতো সাঁতার কাটে।

যেদিকে হয়, লোকেন গুপ্তর গা ঘেঁষে নন্দিতা হাসে।

কোন তাড়া নেই তো?

না না।

তাহলে কোথাও গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক, ঘাড়টা একটু কাত করে লোকেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করেন, কি বল প্রভা?

পিছনে ঝিমিয়ে থাকা শরীরটা যন্ত্রণায় যেন ছটফট করে ওঠে, আমার একটু কাজ আছে। দয়া করে আমাকে আগে নামিয়ে দিন—

এইবার বুঝেছ। এইবার সরে যাবে। জয়ের তীব্র আনন্দে একটা বেপরোয়া আবেগ নন্দিতার হালকা শরীরটাকে আরও হালকা করে দেয়। মনে হয় গাড়িটা বড় আস্তে চালাচ্ছেন লোকেন গুপ্ত—গতির লক্ষ গুণ বেশি বেগ এই মুহূর্তে দরকার তার।

প্রভা নেমে যাবার একটু পরে নন্দিতা ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, উনি আপনার কে মিস্টার গুপ্ত?

আমার কে, জোরে হাসেন লোকেন গুপ্ত, কেউ না। জাস্ট এ ফ্রেণ্ড।

জিজ্ঞেস করতে চায়নি নন্দিতা। কিন্তু হঠাৎ ওর জিব যেন সংযম হারায়, আর আমি—জাস্ট এ ফ্রেণ্ড নাকি?

ও নো। তুমি? নন্দিতার একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে লোকেন গুপ্ত হেসে বলেন, কি বলব?

মুখ নামিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস করে ওঠে নন্দিতা, আমাকে আপনার যা মনে হয়—

রিয়েলি? নন্দিতার কাঁধের ওপর আলগা একটা হাত এসে পড়ে। ধরা ধরা গলার স্বর, ইফ আই সে—সুইট হার্ট!

মাথা ঝিমঝিম করে নন্দিতার। বুকে সমুদ্রের উন্মাদনা। লজ্জা-থরোথরো শরীর ছিনিয়ে নেবার ভঙ্গিতে এলিয়ে পড়ে লোকেন গুপ্তর সুঠাম কাঁধের ওপর। আর তখন ঠোঁটে উষ্ণ স্পর্শ। যেন জলে হালকা পাথর কুচি ফেলার ছলাৎ শব্দ।

সী সি তোর অকুন পিলক্ত।

জড়োসড়ো নন্দিতা ভাঙা গলায় থেমে থেমে বলে, মাঝে মাঝে সকালে যাব—

সকালে? একটু ভেবে লোকেন গুপ্ত বলেন, নটা-সাড়ে নটায়। তাছাড়া যে-কোন সময়। জাস্ট গিভ মি এ রিং। তৎপর হাতে ব্রেক কষেন তিনি।

প্রবল একটা ঝাঁকুনি। আর একটু হলেই কালো বেড়ালটা চাপা পড়ত। ভীত দৃষ্টিতে মোটরের আলোর দিকে তাকায়। তারপর একটা ছোট বাড়ির পাঁচিল টপকে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিকে তাকিয়ে হাসির কলকল বেগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না নন্দিতা। তার হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে লোকেন গুপ্ত ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে বলেন, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি—

হাসতে হাসতেই নন্দিতা বলে, আমি হলে ঠিক চাপা দিয়ে দিতাম।

চৌরঙ্গীর বড় একটা রেস্তোরাঁর সামনে আবার মোটর থামে।

ইচ্ছে করেই এর মধ্যে একদিনও গ্রেভ অ্যাভিনিউ-এর দিকে যায়নি নন্দিতা। আর একটু যাক। আর কয়েকবার অনুরোধ আসুক। তার মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে লোকেন গুপ্ত আরও অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠুন। সে জানে তাঁকে আসতেই হবে তার কাছে। নন্দিতার পাতলা ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শ লোকেন গুপ্তকে যে স্বাদ দিয়েছে প্রভার সাধ্য নেই সেই একই অনুভূতি তাঁর মনে জাগিয়ে দেবার। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে নন্দিতা। একটা ঝাঁজালো আনন্দে কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

ভিজে ধোঁয়াটে সন্ধ্যা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শহরকে জড়াচ্ছে। আজ একটু বেশিক্ষণ ক্লাবের আপিস-ঘরে বসে থাকতে হবে নন্দিতাকে। মিসেস চ্যাটার্জি কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে। তখন নন্দিতার ছুটি। ট্রামে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে হবে তাকে। আর কোথাও নয়।

সাদা টেলিফোনের ওপর আস্তে হাত রাখে নন্দিতা। এক তাল বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা যন্ত্র। ঘুমে অচেতন। বিদ্যুৎ প্রবাহে হঠাৎ সজাগ হয়ে কোন কথা তাকে শোনায় না। অল্প অল্প অস্বস্তি দানা বাঁধে। হাঁসের মতো সেই সাদা মোটরটা স্থূল একটা শরীরকে নিয়ে কতদূরে চলে গেছে কে জানে। টেলিফোনটা তুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে নন্দিতার। আর ঠিক তখন জানলা দিয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই সাদা মোটরটাই এসে দাঁড়ায় ক্লাবের সামনে। চেনা হর্ন একবারই তাকে ডাকে। ক্ষিপ্র পায়ে নন্দিতা রাস্তায় নেমে আসে।

সে পৌঁছবার আগেই মোটর থেকে নেমে পড়েন লোকেন গুপ্ত। সিগ্রেট মুখে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকান। নন্দিতাকে দেখে দু পা এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বলেন, তারপর? কোন খবর নেই—কেমন আছ?

আসুন, আসুন, খুশীর হঠাৎ জোয়ার কোথা থেকে আসে নন্দিতা বুঝতে পারে না, আমি একটু আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম, চোখ ফিরিয়ে এক মুহূর্তে মোটরের ভেতরটা দেখে নিয়ে সে যেন একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন করে, আর কেউ আসেনি?

আর কে আসবে? টিপে-টিপে লোকেন গুপ্ত হাসেন, এবার থেকে তোমার কাছে আমার তো একাই আসবার কথা, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বলেন, ডোণ্ট ইউ থিংক সো?

ও সিওর, একটু বেশি তাড়াতাড়ি পা ফেলে নন্দিতা। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। সামনে যা দেখে, চেয়ার-টেবিল, জানলা-দরজা, শাড়ি আর পর্দা—সব কিছুই যেন একটা ভাষা খুঁজে পেয়েছে। শুধু সে নিজেই এলোমেলো উল্লাসে স্বাভাবিক-ভাবে কথা বলতে ভুলে গেছে।

আর ভাবনা নেই। নির্ভুল হিসেব তার, প্রভাকে সে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। লোকেন গুপ্ত নিজেই বললেন, এবার থেকে একাই আসবেন তিনি। আর একটা কথা তিনি না বললেও নন্দিতা বুঝতে পারে

যে সে যখন যাবে গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এ তখন পর্দা সরিয়ে একটা অপরিচ্ছন্ন মুখ তার শিরায়-শিরায় জ্বালা ধরিয়ে দেবে না। এর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। তাকে আর কিছু করতে হবে না। লোকেন গুপ্ত তাকে পুরোপুরি পাবার জন্যে মনের তাগিদে সবশুকিয়ে যাওয়া জিনিসকে নিজেই ফেলে দেবেন।

ক্লাবের লাউঞ্জে লোকেন গুপ্তকে নিয়ে আসে নন্দিতা। একটা চেয়ার আস্তে টেনে তাকে বসতে বলে। নিজে বসে পড়ে তার মুখোমুখি। আঙুলের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে দু-কাপ কফি আনতে বলে লোকেন গুপ্তকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই। হঠাৎ উঠে গিয়ে পাখাটা আর একটু জোর করে দেয়।

মাথার ওপর বেশি পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। বড় বড় হলদে শেড। কাছাকাছি কেউ নেই। এখান থেকে দেখা যায় সামনের বড় ঘরে দু-চারজন কলেজের মেয়ে টেবিল টেনিস খেলছে। শুধু তারই টকাটক আওয়াজ। আজ কিন্তু কোনদিকে তাকায় না লোকেন গুপ্ত। এক দৃষ্টিতে শুধু নন্দিতার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। একটা হাত ছড়িয়ে দেন সামনের ছোট টেবিলটার ওপর। আর নন্দিতার মনে হয় নিগূঢ় রহস্যের জালে তাকে যেন পাকে পাকে বেঁধে ফেলছে।

কই, একদিনও তো গেলে না। কি ব্যাপার? কফির কাপে চুমুক দিয়ে ভয়ে ভয়ে লোকেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করেন, আমার দিক থেকে কোন অন্যায় হয়ে গেল নাকি?

মাথা ঝাঁকিয়ে নন্দিতা বলে, না না!

তাহলে?

এবার ঠিক যাব—

ঠিক, কফির কাপটা ঠেলে দিয়ে লোকেন গুপ্ত বলেন, না হলে আমাকেই আসতে হবে তোমার কাছে—আই মাস্ট সী ইউ এভরি ডে।

এভরি ডে? গুন গুন করে ওঠে নন্দিতা। সোজা চোখে তাকাতে পারে না লোকেন গুপ্তর দিকে। ভর দেবার একটা জায়গা থাকলে হয়তো নিজের শরীরটা পুরোপুরি ভেঙে দিত।

পকেট হাতড়ে রুপালী লাইটার বের করে ক্লিক শব্দ করেন লোকেন গুপ্ত। ভাসা-ভাসা দৃষ্টি। বর্ষার ঠিক আগে গাছপালার মতো করুণ। মুখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে বলেন, হাঁ রোজ। যদি তুমি বাধা না দাও আমি রোজই আসব।

আমিও যাব।

ভেরি গুড, লোকেন গুপ্তর ঠোঁটের মাঝখানে সিগ্রেট ওঠে-নামে, একেবারে একা। আই অ্যাম সিক অব ইট!

সমবেদনার ভারী ছায়া নামে নন্দিতার মুখে. একা-একা রইলেনই বা কেন এতদিন?

হা-হা করে হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত, কারণ নন্দিতা রায়ের মতো ছোট্ট একটি জীবন্ত মেয়ে আমাকে বুঝিয়ে দেয়নি যে আমি সাংঘাতিক রকম একা—

আমার সৌভাগ্য।

না, বাধা দিয়ে লোকেন গুপ্ত বলেন, ওটা আমার। কারণ আই অ্যাম অ্যান ওল্ডম্যান—

এবার নন্দিতা বাধা দেয়, বাট ইউ আর ইয়ং অ্যাট হার্ট মিস্টার গুপ্ত।

রিয়েলি? হাসতে হাসতেই লোকেন গুপ্ত ওপরে তাকান, কী প্রচণ্ড আলো তোমাদের এখানে!

একটা নিভিয়ে দেব?

দাও, হঠাৎ ভারী হয়ে আসে লোকেন গুপ্তর গলার স্বর, তুমি তো জ্বলবেই আমার সামনে। আর ওই আলোর চেয়ে অনেক বেশি তোমার দীপ্তি!

টিক করে একটা শব্দ। সবচেয়ে বেশি পাওয়ারের বাল্বটা নিভে যায়। কিন্তু পাতলা সোনালী তারে আলোর লালচে রেশ লেগে থাকে। আর এদিকে হাল্কা অন্ধকার ফুরিয়ে যাওয়া গোধূলির মতো কাঁপে।

ঘরে এসে নন্দিতা আবার বসে পড়ে চেয়ারে। এখন সে শুধু নিজেই জ্বলে না। তার চোখের সামনে ঐক অন্ধকারে জ্বলে শহরতলীর এক বিশাল অট্টালিকা। গ্যারেজে দু-তিনটে মোটর। খাবার ঘরে বৃহৎ এক রেফ্রিজারেটার। ঐশ্বর্যের নানা রঙ! কিন্তু সামনে যে মানুষটি বসে আছেন—শেষ অবধি সব ছাড়িয়ে তাঁর দীপ্তিই নন্দিতার মনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়।

মিসেস চ্যাটার্জি ফিরে আসেন একটু পরে।

আজ এক সঙ্গে বসে প্রাতরাশ খাবার জন্যে লোকেন গুপ্ত নন্দিতাকে গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এ আসতে বলেছিলেন সকাল নটা—সাড়ে নটায়। হয়তো ওটা ঠিক প্রাতরাশের সময় নয়। কিন্তু তাঁর চিরকালের অভ্যাস। নন্দিতার অসুবিধা হবে মনে করে তিনি বোধ হয় একটু বিব্রতও হয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর একটা হাত ধরে নন্দিতা হেসে বলেছিল, তার কোন অসুবিধা হবে না। ওটা তারও প্রাতরাশের সময়। কিন্তু অধিকার বোধের একটা উত্তাল ঢেউ নন্দিতাকে অনেক আগে ঠেলে নিয়ে আসে গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এর দিকে।

প্রথম কার্তিকের হিম-কুয়াশার সকাল। অল্প-অল্প শীত। বারান্দায় বসে আজ নন্দিতা আবার তাকায় চারপাশে। আর কেউ নেই। আর কিছু নেই। পুকুরের জলে আর ঝড়ের ধুলো-লাগা অশ্বত্থের শুকনো পাতায় শুধু কাঁচা রোদের মতো বয়সের অহংকার স্থির হয়ে আছে।

নন্দিতা উঠে দাঁড়ায়। বারান্দার ফাঁক-ফাঁক নিচু রেলিঙে হাত রাখে। হাল্কা ছোঁয়ায় গাছের কাছে থমকে থাকা দুর্লভ বিদেশী অর্কিডটাকে দুলিয়ে দেয়। হাওয়ার ঝাপটায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরের ভারী নীল পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হয়তো এখনও লোকেন গুপ্তর ঘুম ভাঙেনি। বেয়ারা টেবিলে প্রাতরাশের সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছে কি-না, নন্দিতা ঠিক বুঝতে পারে না। বুকের মধ্যে প্রবল একটা আগিদ অনুভব করে সে। লৌকিকতা ভুলে সোজা ভেতরে গিয়ে বেয়ারাকে সরিয়ে দিতে চায়। লৌকিকতার দরকার কি এখন! চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নিজে অপেক্ষা করতে চায় লোকেন গুপ্তর জন্যে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি দেখুন তাকে—নিকটতম আত্মীয়ার মতো।

হাওয়ায় ভারী নীল পর্দা ওঠে নামে। যেন একটা ঝকঝকে মুখকে আড়াল করে রেখে খেলা করে নন্দিতার সঙ্গে। পা টিপে-টিপে সে ওদিকে এগিয়ে যায়। ভেতরে যেতে এখন আর কোন বাধা নেই। তবুও সে ইতস্তত করে। পর্দার একটা কোণ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

যখন টেবিলের ওপর খবরের কাগজ-গুলো সাজিয়ে রাখবার জন্যে বেয়ারা বাইরে আসে তখন নন্দিতা হেসে তাকে জিজ্ঞেস করে, সাব উঠা?

হাঁ মেমসাব।

কেয়া করতা?

তৈয়ার হোতা। আবভি ব্রেকফাস্ট খায়গা।

একটু ইতস্তত করে আবার নন্দিতা জিজ্ঞেস করে, আউর কোই হ্যায়?

হাঁ। উ মিত্র মেমসাব—

মিত্র মেমসাব! যেন গোঙানির মতো একটা আওয়াজ। দেখতে দেখতে ভাঁজের কড়া একটা রঙ বিকৃত করে তোলে নন্দিতার খুশি-খুশি টানা মুখ। উত্তেজনার ভাঙা-চোরা ঢেউ-এ তার সমস্ত শরীর ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে ওঠে। ভোগী বৃদ্ধের সব ছলনা আজ সে চুরমার করে দিয়ে যাবে। আর একটু হলেই সব ভুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে লোকেন গুপ্তর মুখোমুখি দাঁড়াত নন্দিতা। কিন্তু ঠিক তখন হঠাৎ জোর হাওয়ায় পর্দাটা অনেকখানি উঠে যায়। আর রূঢ় একটা ধাক্কায় নন্দিতা ছিটকে আসে বারান্দার এ প্রান্তে। স্থির হয়ে অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিহ্বল। বোবা চোখ।

লোকেন গুপ্তকে চিনতে খুব বেশি দেরি হয়নি তার। পাঁজা তুলোর মতো সাদা চুল। চুপসে যাওয়া গাল। টেবিলের ওপর নকল দাঁতের পাটি। আর একদিকে বোধ হয় কলপের শিশি।

কিন্তু নন্দিতার চমক সেজন্যে নয়। সে প্রভাকেও দেখেছে। লোকেন গুপ্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কলপের শিশি খুলেছে। নকল দাঁতের পাটি এগিয়ে দিচ্ছে তাঁর হাতের কাছে। আর অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে প্রভার রেখাঙ্কিত মুখে। জোর হাওয়ার ঝাপটায় নন্দিতা এক মুহূর্তেই দেখে নিয়েছে সেই শ্লথ শ্যাম শরীরটার কাছে লোকেন গুপ্তর নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ—বয়সে-বয়সে সন্ধির স্বাভাবিক এক দৃশ্য।

একটা বড় রোলার এসে দাঁড়িয়েছে কাঁচা রাস্তার ওপর। অল্প-অল্প ধোঁয়া উড়ছে। এখুনি হয়তো ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ছটফট করতে থাকবে রোলারটা। তার আগেই নন্দিতা এখান থেকে চলে যাবে। নিজের বয়সটা তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে তাকে যেন ঠেলে দেয় সিঁড়ির দিকে।

পর্দাটা তখনও ওঠে নামে। এদিকে নন্দিতা। ওদিকে প্রভা। আসল মানুষটাকে প্রভার জন্যে আড়াল করে মাঝখানে ওই খসখসে পর্দাটা থাকবেই যতদিন নন্দিতার বয়স থাকবে ততদিন। সেদিকে তাকিয়ে নন্দিতা নিভে যায়।

আর একটু পরেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসবেন লোকেন গুপ্ত। হাসতে হাসতে তাকে টেনে নিয়ে যাবেন খাবার টেবিলে। কিন্তু আজ বোধ হয় একটা কথাও বলতে পারবে না নন্দিতা। আর লোকেন গুপ্তর নকল ঝকঝকে মুখ প্রভার কাছে তার বিপুল হারের কথাটা মনের মধ্যে ফেনিয়ে তোলবার আগেই সে সরে যেতে চায়।

আস্তে আস্তে নন্দিতা সিঁড়ি ভাঙে। কোনদিকে তাকায় না। শুধু নিজের চেহারাটা একবার দেখতে চায়। কিন্তু আজ তার ব্যাগে আয়না নেই। দরকারই বা কি! বাড়ি থেকে খুব সকালে বেরোবার আগে আলো জ্বেলে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে। নিখুঁত মুখ। যৌবন-টলোমলো শরীর। ঘন কালো চুল।

নামতে নামতে হাঠৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নন্দিতা। দুটো অসাবধান আঙুল গালে ছোঁয়ায়। চোখ নামিয়ে ঠাণ্ডা সাদা সিঁড়ি দেখে। একদিন তার মুখেও রেখা পড়বে। এই যৌবনের কোন চিহ্ন থাকবে না শরীরের কোথাও। একটি-একটি করে মাথায় দেখা দেবে কাঁচা-পাকা চুল।

আর—হীলের আওয়াজ চেপে আবার নন্দিতা পা ফেলে। যখন বয়সের ভারে তারও শরীরটা স্থূল হয়ে আসবে তখন এক আঘাতেই প্রভাকে সে সরিয়ে দিতে পারবে। কোন প্রয়োজন হবে না ওই পর্দার। কিন্তু তার এখনও অনেক—অনেক দেরি।

লোকেন গুপ্ত ততদিন বেঁচে থাকবেন কি!

শোকসভা নয়, তবু থমথমে গম্ভীর অফিসঘর।

এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে জল-ভরা চোখে ধরা গলায় জীবন দত্ত বলছে, আমার ছেলেকে আপনারা সকলেই খুব ভাল করে চেনেন, তাই ত এত করে বলছি দয়া করে তাকে খুঁজে দিন। নিশ্চয় কেউ তাকে গুম করেছে। বড় ভালমানুষ ছেলে, সাতে পাঁচে থাকে না, এতটুকু দুষ্টুবুদ্ধি নেই। মা-অন্ত প্রাণ, সে যে মাকেও কিছু না জানিয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, তা হতেই পারে না। বুঝতেই পারছেন আমার স্ত্রীর কি অবস্থা, অন্নজল ত্যাগ করেছেন। আমি পুলিসে ডায়েরী করেছি, রেডিওতে খবর দিয়েছি, কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছি। এক সপ্তাহ হয়ে গেল, এখনও কোন খবর পাইনি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন—

আর বেশী বলতে হল না, সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করলেন। বৃদ্ধ হালদারবাবু জীবন দত্তর পিঠে হাত রেখে বললেন, আমরা ত যথাসাধ্য করবই, কিন্তু এত অধীর হলে চলবে না। বিপদের সময় যত মাথা ঠাণ্ডা রাখবে তত ভাল।

বড়বাবু বললেন, কয়েকদিন ছুটি নাও হে জীবন, চারদিকে ভাল করে খোঁজ-খবর নাও, অফিসের কাজ আমরা সামলে নেব।

অনেকেই উপদেশ দিল, সেই সঙ্গে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু জীবন দত্ত চলে যাওয়ার পর সবাই যখন কাজে ফিরে গেল, ডেসপ্যাচ ক্লার্ক নিমাই সোম চোখ ছোট ছোট করে পাশের লোককে বললে, এ হলাই ভগবানের চাবুক, শালা, অসৎ উপায়ে রোজগার করলে তার ফলভোগ করতে হবে না? ঐ এক জায়গায় ত আর ঘুষ দেওয়া চলে না।

নিমাই-এর কথায় গায়ের জ্বালা ছিল সত্যি, কিন্তু কথাটা বোধ হয় একেবারে উড়িয়ে দেবার মত না। নিমাই সোম আর জীবন দত্ত পাঁচ বছর আগে একই সময় এই কোম্পানিতে কাজ করতে ঢোকে। কেরানীর চাকরি, সমান মাইনে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দুজনের মধ্যে তফাত হয়েছে কতখানি। এতদিনে নিমাই সোমের মাইনে বেড়েছে মাত্র পনের টাকা। জীবন দত্তরও যে মাইনে খুব বেড়েছে তা নয়, তবে রোজগার অনেক বেশী। এ নিয়ে প্রথম প্রথম অফিসে কথা উঠত, তবে এখন সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। কোম্পানির মালিকরাই যখন কিছু বলেন না, তখন আর কর্মচারীরা বলে কি করবে? জীবন দত্ত প্রথমে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসত। ক্রমে প্যাণ্ট শার্ট ধরল, এখন ট্রপিক্যাল প্যাণ্টের ওপর সিল্কের হাওয়াইয়ান শার্ট পরে। জীবন দত্তের ডান পাটা বোধ হয় একটু ছোট, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। এখন আর তাকে বেশী হাঁটতে হয় না, জামা কাপড়-এর মতই যানবাহনের ক্রমোন্নতি হয়েছে। ক' বছর সাইকেল, মোটর সাইকেল চেপে এখন জীবন দত্ত চার-চাকার একটা নড়বড়ে মোটরগাড়ি যোগাড় করেছে। জিজ্ঞেস করলে অবশ্য বলে, ওটা আমার নয়, এক বন্ধুর, আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

সত্যি-মিথ্যে যাই হক জীবন দত্ত যে বেশ দু' পয়সা জমিয়েছে এ বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য ওর যে ধরনের কাজ তাতে পয়সা বানাবারও সুযোগ আছে। ছোট ছোট কোম্পানিতে এক একজন লোক থাকে যার পদের ডেজিগনেশন খুঁজে পাওয়া শক্ত; কারণ সব কাজেই তাকে পাঠানো হয়। জীবন দত্তরও এ কোম্পানিতে ঐ অবস্থা, ডালে ঝোলে অম্বলে সবেতেই আছে। সোজা বাংলায় বললে বলতে হয়, ওর কাজ হল কোম্পানির হয়ে ঘুষ দিয়ে আসা। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা, কোন অফিসার কিভাবে ঘুষ নেন তা ওর নখদর্পণে। কাকে অসময়ের আম পাঠানোর দরকার, কার গিন্নী সন্দেশ বলতে লাল ফেলেন। কার মেয়ের বিয়েতে নগদ টাকা কিছু কম পড়েছে। সিমেণ্টের অভাবে কার বাড়ি শেষ হতে পারছে না, সব খবর জীবন দত্ত যথাসময়ে মালিকদের কানে তুলে মন-গড়া ভাউচার লিখিয়ে পয়সা বার করে। লোকে বলে এ পয়সা ঘুষ দেবার জন্যে বার হলেও তার অর্ধেক যায় জীবন দত্তর পেটে। মালিকরা কিন্তু তা শুনেও শোনেন না, দেখেও দেখেন না। তাঁদের কাজ হাসিল হলেই হল। পাঁচ শ টাকা ঘুষ দিয়ে জীবন দত্ত যদি দশ হাজার টাকার কাজ বার করে তাতেই তাঁরা খুশী, ঐ পাঁচ শ'র মধ্যে থেকে

আড়াই শ জীবন দত্ত নিজের ঘরে তুলল কি না, তা তাঁরা দেখতে যাবেন কেন?

শুধু এই নয়, মানুষকে বশ করতেও সে জানে। মালিকের ছেলেরা ফুটবল টীম করবে, জীবন দত্ত তার জন্যে প্লেয়ার যোগাড় করে আনে। সে শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর যেখান থেকেই হক না কেন। যখন ক্রিকেট খেলার টিকিট পাওয়া যায় না, কিম্বা বাজারে টেনিস বল দুষ্প্রাপ্য হয়, তখনই ছেলেরা জীবন দত্তর খোঁজ করে। মালিকানদের কাছেও তার অবাধ গতি, বাজার থেকে যে জিনিসটা উড়ে যায়, ভোজবাজী করে জীবন দত্ত আবার যেন তা ফিরিয়ে আনে। তাই প্রথম প্রথম নিমাই সোমের দলরা জীবন দত্তকে হিংসে করলেও এখন আর করে না। বুঝে নিয়েছে তার সঙ্গে ঘোড়-দৌড়ে কেউ পারবে না।

জীবন দত্তর ছেলে জিতেনকে এ অফিসের সবাই দেখেছে। গোলগাল মোটাসোটা চেহারা, ফর্সা রঙ। একবার আলাপ করলে বোকা বলে সন্দেহ হয়। নিরীহ জিতেন প্রায়ই আসত বাবার কাছে, জীবন দত্ত তাকে কত সময়ই পাঠাত অন্যান্য অফিসে। কাজ বেশী পড়লে ছেলেকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নিত। হালদারবাবু একদিন জীবন দত্তকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, এটা কিন্তু তুমি ভাল করছ না জীবন, হাজার হক কাঁচা ছেলে, যে কাজ তুমি কর তা ওর না দেখাই ভাল। এই বয়েস থেকে ঘুষ দিতে শিখলে পরে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়?

জীবন দত্ত হেসে হেসে বলত, কাজ ত শেখাতে হবে হালদারদা, ও ছোঁড়া যে আমার চেয়েও মুখ্যু, একুশ বছর বয়েস হয়ে গেল এখনও একটা পাশ করতে পারল না। হঠাৎ আমি চোখ বুজলে ওরা চালাবে কী করে?

—আহা তাই যদি হয়, বাবুদের বলে-কয়ে কোন ভাল কাজে ঢুকিয়ে দাও। না হয় টাইপিং শিখুক। আমার ত মনে হয় বাপু তোমার ট্রেনিংয়ে থাকলে ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

হালদারবাবুর এ ধরনের কথায় জীবন দত্ত রাগ করত না। কারণ ঐ তাঁর স্বভাব। যা ভাল বোঝেন নির্ভয়ে তা অন্যকে বলেন, সে যতই অপ্রিয় হক না কেন। তবু ওঁর কথা লোকে শোনে এইজন্যে যে, বিপদে আপদে উনি এসে ঠিক দাঁড়ান, সাধ্যমত সবাইকে সাহায্য করেন। প্রয়োজনবোধে মালিকদের কাছে সুপারিশ করেন। মালিকরা হালদারবাবুর অনুরোধ সহজে ঠেলেন না। এই সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক বৃদ্ধকে তাঁরা মনে মনে শ্রদ্ধা করেন।

জিতেন নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা একবার করে হালদারবাবু আসতেন জীবন দত্তর বাড়ি খোঁজ খবর নিতে। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার, ছেলেটা গেল কোথায়? সম্প্রতি এমন কোন কারণ ঘটেনি যার জন্যে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কোন বদ খেয়ালও নেই, বন্ধুবান্ধবও কম। তবে?

জীবন দত্ত কিন্তু গোড়া থেকেই বলছে, বাড়ি ছেড়ে সে নিজের ইচ্ছেয় যায়নি, নিশ্চয় কেউ তাকে গুম করেছে।

হালদারবাবুর মন কিছুতেই সায় দেয় না, বলেন, কে তাকে গুম করবে আর কেনই বা করবে?

—কেন আবার? মজা দেখার জন্যে, আমাকে জব্দ করবে বলে...।

—তোমার কি কোন শত্রু আছে। যাকে সন্দেহ হয় এরকম কাজ করতে পারে বলে।

একথায় জীবন দত্ত সোজা উত্তর দেয় না, নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে, কার শত্রু নেই? দেবতাদেরও শত্রু আছে, দানব। আমি তো সামান্য মানুষ। ভগবানের কৃপায় দু পয়সা রোজগার করছি, তা ওদের সহ্য হবে কেন?

—তুমি কাদের কথা বলছো?

—না, ওসব ভেবে আর কি হবে। যদি খোকাকে ফিরে না পাই আমি সস্ত্রীক কাশীবাসী হব। আর এখানে নয়—

সত্যি জীবন দত্তের অবস্থা দেখে হালদারবাবুর কষ্ট হয়। মানুষটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। হালদারবাবুর হাত ধরে বলে, ছোটবেলা থেকে টাকার স্বপ্ন দেখতাম। টাকা, টাকা, টাকা। কত টাকা বানালাম, কিন্তু কি হবে তাতে। কি পেলাম? সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়?

জীবন দত্তর দুঃখ বোঝা যায়। হারিয়ে যাওয়া ছেলের শোকে চিরকেলে বাপের কান্না। কিন্তু যাকে দেখে হালদারবাবু অবাক না হয়ে পারেন নি সে হ'ল জীবন দত্তর স্ত্রী, জিতেনের মা। শুকনো রোগা ভদ্রমহিলা। সব সময় কাজে ব্যস্ত। সলজ্জ ভীরু চাহনি। কিন্তু একদিনও ছেলের জন্যে কান্নাকাটি করেন না। হালদারবাবু এলে চা করে এনে দেন, সান্ত্বনা দিলে চুপ করে শোনেন কিন্তু নিজের থেকে কোন কথা বলেন না।

হালদারবাবু থাকতে না পেরে একদিন জীবনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার স্ত্রী কোন কথা বলেন না কেন?

—আজকাল ঐরকম হয়ে গেছে। ছেলেটার শোকে আধ পাগলী—

—ওঁকে একটু সামলে রাখ জীবন, দেখ আবার কোন অসুখ বিসুখে না পড়ে যায়।

জীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দুঃসময় যখন আসে তখন এমনিই হয়। একে ছেলেটার খোঁজ পাচ্ছি না তার উপর বৌ-এর মেলান-কলিয়ার মত। আমি যে কি করব?

জীবনের স্ত্রী এমনিতে কথা না বললেও একদিন হালদারবাবুর কথার উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন রবিবার, হালদারবাবু সকালের দিকেই জীবন দত্তর বাড়ি এসে-ছিলেন। এক জাগ্রত দেবতার খবর নিয়ে। জীবন দত্ত বাড়ি ছিল না। ওঁকে বসতে দিয়ে জীবনের স্ত্রী মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

পীঠস্থানের অনেকরকম কৌতূহল জাগানো বর্ণনা করে হালদারবাবু বলে-ছিলেন, চল না মা একদিন গিয়ে পুজো দিয়ে আসবে। লোকে বলে, জাগ্রত দেবতা, ভক্তের প্রার্থনা কখনো অপূর্ণ রাখেন না। তুমি চাইলে হয়তো ছেলেকে ফিরে পাবে।

হালদারবাবু ভেবেছিলেন, হিন্দুর মেয়ে, ঠাকুরের কথায় নিশ্চয় লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু তা হল না। জীবনের স্ত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কবে যাবে বল?

আমি যাব না। এই প্রথম কথা বলল জিতেনের মা। স্পষ্ট কথা।

—কেন যাবে না মা?

ওসব কুসংস্কার। আমি বিশ্বাস করি না।

কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন হালদার-বাবু। জীবন দত্তের অশিক্ষিত স্ত্রী যে এরকম কথা বলতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

এমনিভাবেই কয়েক মাস কেটে গেল। কিন্তু জিতেনের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। শোক যতই প্রবল হোক না কেন, ক্রমে একদিন তা সয়ে আসে। জীবন দত্ত আবার আগের মত কাজে লেগে গেছে। ছেলের কথা কেউ জিগ্যেস করলে সহজভাবে উত্তর দেয়, অযথা চোখে জল আসে না। হালদার-বাবুও ওদের বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। এক আধটা ছুটির দিনে গিয়ে খবর নিয়ে আসেন। দত্ত গিন্নীর কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, এখনও সেই আগের মত চুপচাপ থাকেন। বোঝা যায়, আঘাতটা ওঁরই লেগেছে সবচেয়ে বেশী। হাজার হক মায়ের প্রাণ।

মাঝখান থেকে কোন গল্প পড়তে শুরু করলে যেরকম সে গল্পের সূত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়, তেমনি অসুবিধে হয় অনেক ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধে খুঁজে পাওয়ার, তার আগে পরের কথা জানা থাকে না বলে। তবে সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ পরিষ্কার হয়ে যায়। যে ঘটনা এতদিন বিক্ষিপ্ত, আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ কারণসম্মত বলে চোখের সামনে নতুন করে ভেসে ওঠে। একথা হালদার-বাবুর অজানা ছিল না, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি এ ধরনের বহু ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু জীবন দত্তর ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা যে এত সহজে অল্পদিনের মধ্যে আজগুবী গল্পে পরিণত হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

কি একটা পুজো উপলক্ষে অফিস দু' দিন বন্ধ ছিল। ছুটির পর হালদারবাবু অফিস গিয়ে দেখেন, সবাই মিলে জড় হয়ে গুজ গুজ করছে। জীবন দত্তর চাকরী গেছে। মালিকরা বরখাস্ত করেছেন। একথা শুনে কেউ অবাক না হয়ে পারে না, বিশেষ করে যে জীবন দত্তকে চেনে, আর জানে তার সংগে মালিকদের কি অতি অতি সম্পর্ক। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলল নিমাই সোম, এতদিনে ঘুঘু ধরা পড়েছে, অত লোভ করলে চলে? ফলটা মূলটা সরাচ্ছিলি মালিকরা গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু এবার যে একেবারে গাছ কাটার মতলব।

হালদারবাবুর এত ভনিতা সহ্য হয় না, আহা কি হয়েছে তাই বল না।

—জীবন দত্ত কোম্পানির পাঁচখানা লরীর রোড পারমিট বিক্রী করে দিয়েছে।

—সে কি?

—তবে আর বলছি কি দাদু, তাইতো মালিকদের টনক নড়েছে, কম করে পারমিট পিছু তিন হাজার টাকা, কম নয়, এক সংগে পনের হাজার, কি বলেন? নিমাই সোম টেনে টেনে হাসে।

—কি সর্বনাশ, কবে এসব করল?

—করেছে তিন চার মাস আগেই, ধরা পড়েছে এখন।

সত্যি ঘোড়েল লোক জীবন দত্ত। হালদারবাবু কিছুই ওর বুঝতে পারেন নি। ছেলের শোকে যখন মুহ্যমান তারই মধ্যে ও এইসব চুরির মতলব এঁটেছে? কি অসাধারণ অভিনয়। হালদারবাবুর মনে হয়, এতদিন এদের জন্যে উনি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার কোন দরকারই ছিল না।

জীবন দত্ত বরখাস্ত হওয়ায় যদি কারুর লাভ হয়ে থাকে তবে সে নিমাই সোম। জীবনের কাজ এখন ঐ দেখছে। নিমাইও এখন ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরছে। সাইকেল ওর আগে থেকেই ছিল, এবার বোধহয় মটর সাইকেল কিনবে। এতদিন দশটা পাঁচটা অফিস করতে যে নিমাই গজ গজ করত, এখন সে সকাল আটটা থেকে অফিসে গিয়ে হাজির হয়। জোরে জোরে টেলিফোনে কথা বলে কিংবা দরোয়ানের সংগে চেঁচামেচি করে দোতলায় মালিকদের কানে পৌঁছে দেয় তার আসার খবর। রাত দশটার সময়ও তার টেবিলে আলো জ্বলতে দেখা যায়। সবাই বলাবলি করে, নিমাই এবার সুদে আসলে উসুল করবে। জীবন দত্ত যা পাঁচ বছরে করেছে ও এক বছরে তা রোজগার করে তবে বোধহয় ক্ষান্ত হবে। নিমাই-এর এখন প্রধান কাজ কোম্পানীর হয়ে জীবন দত্তর বিরুদ্ধে কেস্ করা। দিনরাত সে উকীলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে, কিছুদিনের জন্যে অন্তত জীবনকে শ্রীঘরটা ঘুরিয়ে আনতে না পারলে তার মনে শান্তি নেই।

কিন্তু কদিন পরেই এক সন্ধ্যেবেলা নিমাই এল হালদারবাবুর বাড়ি। শুকনো মুখ কেমন যেন অন্যমনস্ক চেহারা। হালদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে নিমাই, এরকম হতাশ প্রেমিকের মত দেখাচ্ছে কেন?

নিমাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হেরে গেলাম হালদারবাবু, জীবনকে ধরতে পারলাম না।

—ও যে এত বড় শয়তান আমরা কেউ বুঝতে পারিনি, কি খেলাটাই খেলল।

হালদারবাবু বিরক্ত হন, কি হয়েছে তাই বল না?

—জীবন যা কিছু বে-আইনী কাজ করেছে সব ওর ছেলের নামে।

—ছেলের নামে?

—সই করেছে জে, দত্ত, অর্থাৎ জিতেন দত্ত। যা-কিছু কাগজপত্র আমরা পেয়েছি সব তাতেই ছেলের সই। অতএব জীবনকে ধরবার কোন উপায় নেই, ওর নামে কোন কেস্ই হতে পারে না।

হালদারবাবু এতক্ষণে বুঝতে পারেন, তার মানে জিতেনের নামেও তো কেস্ হতে পারবে না, সে তো নিরুদ্দেশ?

নিষ্ফল আক্রোশে নিমাই সোম দাঁত কড়মড় করে, তাইতো বলছি, স্রেফ কলা দেখিয়ে কোম্পানির এতগুলো টাকা হাওলাত করে জীবন হতভাগা বেরিয়ে গেল। নির্লজ্জ, বেহায়া। গাড়ি চড়ে অফিসের সামনে দিয়ে যায়, দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে।

ক্রমে জানা গেল জীবন যে শুধু এই কোম্পানিকেই ঘুঘু দিয়েছে তা নয়, আরও অনেক কোম্পানির হয়ে বে-আইনী কাজ করে দেবার অছিলায় বেশ মোটা অঙ্কের টাকা সরিয়েছে। কিন্তু আইনের ফাঁকে কেউ তাকে ধরতে পারছে না। একটা কোথাও ভুলেও জীবন দত্ত নিজের নামে কাজ করেনি। সব কিছুই তার ছেলের নামে।

এর পরের কথা যা নিমাই সোম বলে গেল, তা আরও মারাত্মক।
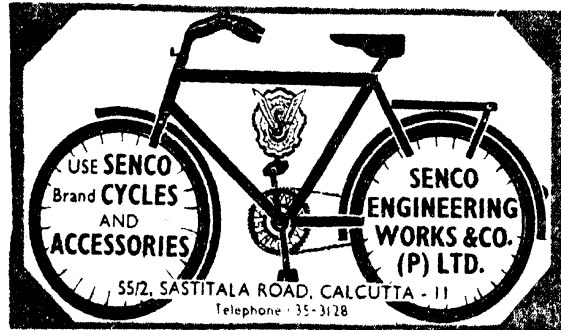
—এখন বুঝতে পারছেন তো ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়া একটা আষাঢ়ে গল্প। তাকে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, বেনামে অন্য কোথাও বসে আছে। বেশ কয়েক বছর বাদে এসব ঝামেলা মিটলে ফিরে এসে দিব্যি বাপের সম্পত্তি ভোগ করবে।

হালদারবাবু জীবন দত্ত সম্পর্কে আর কিছু অবিশ্বাস করেন না। এও হয়ত সত্যি। টাকার জন্যে ছেলেটাকে ফেরার করে দিয়েছে। ভাবতেই গাটা ঘিন ঘিন করে ওঠে। মানুষের মন কত নীচে নেমে গেলে তবে এত স্বার্থপর, এত জঘন্য হয়ে উঠতে পারে।

এরও বেশ কিছুদিন পরের কথা, চেষ্টা করে হালদারবাবু জীবন দত্তকে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ওসব বহুরূপী লোকদের কথা মনে না রাখাই ভাল।

শীতের সন্ধ্যা। গায়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে হালদারবাবু বাইরের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল জীবন দত্ত। ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন হালদারবাবু, আর যেই হক জীবন দত্তকে তিনি এ সময় আশা করেননি মোটেই। প্রথম দর্শনে হালদারবাবুর মনে যে বিতৃষ্ণা জমা হয়েছিল জীবন দত্তর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে তা অনেকখানি কমে গেল। চোখ বসে গেছে, আতঙ্কভরা চেহারা, নির্বোধ জন্তুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে।

হালদারবাবু ডাকলেন, এস জীবন, বোস।

জীবন দত্ত জড়সড় হয়ে বসে, ধরা গলায় বলে, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।

—বল।

—বিশ্বাস করুন আমার কোন বন্ধু নেই, যার কাছে দরকারের সময় একটা কথা বলতে পারি। তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম, জানি আপনি আমার কিছু করতে পারবেন না, তবে একজন কাউকে বলে ফেলতে পারলে নিজের মনটা খানিকটা খালি হবে।

—কি বলছ জীবন খুলে বল।

জীবন দত্ত জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, বলে, আমার কথা আপনি কতদূর জানেন আমি জানি না, আমি একটা ভণ্ড, একটা চোর। টাকা ছাড়া দুনিয়ায় কিছু বুঝি না। তারও একটা কারণ আছে, বড় গরিব ছিলাম, আশে-পাশের সবাই এমনকি আত্মীয়-স্বজনরাও টাকার ঝাঁঝ দেখাত। পণ করে ছিলাম বড়লোক হব। হয়েছি, আপনি তো জানেন অসৎ উপায়ে। ছেলেটার লেখাপড়া হ'ল না, ভেবেছিলাম বেশ কিছু টাকা জমিয়ে রেখে যাব। যাতে ও সুখে থাকতে পারে।

জীবন দত্ত উঠে দাঁড়ায়, জানলার কাছে গিয়ে বাইরের কালো আকাশের দিকে তাকায়, কোম্পানির কাছ থেকে শুনেছেন নিশ্চয় আমি লরীর পারমিট বিক্রী করে অনেক টাকা বানিয়েছি। আইনের চোখকেও ফাঁকি দিয়েছি। আপনাকে যা বলেছিলাম তা মিথ্যে, ছেলে আমার নিরুদ্দেশ হয়নি। আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নাগপুরে। সেখানে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ও ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম এতদিনে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে, যা চেয়েছিলাম তাই পেয়েছি। কিন্তু সব গোলমাল করে-দিলে—

—কে? পুলিস কোন খবর পেয়েছে নাকি?

—পুলিস নয় আমার ছেলে।

—তার মানে?

—জিতেন ক'দিন আগে চিঠি লিখেছিল, ওর মাকে। এই সেই চিঠি।

হালদারবাবু চোখে চশমা লাগিয়ে জিতেনের চিঠি পড়েন।

শ্রীচরনেষু মা,

আর ভাল লাগছে না। একলা একলা এভাবে কি মানুষ থাকতে পারে? আমি বুঝতে পারি না কি করে মানুষের জীবনে সুখশান্তির চাইতে টাকা বড় হয়ে ওঠে? বাবাকে লেখবার আমার সাহস নেই তাই তোমাকে লিখছি, পাপের টাকা আমি চাই না। আমি মানুষের মত বাঁচতে চাই। সমাজের চোখে আমি নিরুদ্দিষ্ট। এতদিন এ ছিল মিথ্যে, আমি স্থির করেছি এবার সত্যি-কারের নিরুদ্দেশের যাত্রায় পাড়ি দেব।

মিথ্যে আমার খোঁজ করো না, যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, মানুষের মত মানুষ হই তোমার সঙ্গে দেখা করব।

প্রণাম নিও।—ইতি

খোকা।

হালদারবাবু চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর?

—ছুটে নাগপুরে গেলাম। খোকার কোন পাত্তা পেলাম না। কাউকে কিছু না বলে কোথায় বেরিয়ে গেছে।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, এখন আমি কি করব বলতে পারেন? সত্যিকারের নিরুদ্দেশ, খোঁজ করবার কোন উপায় নেই। সে পথ আমি আগে বন্ধ করেছি। এমনই অবস্থা কেউ তো এখন আমায় বিশ্বাস করে না। আমি যে খোকার জন্যেই টাকা রোজগার করছিলাম তা কাকে বোঝাব। বড় ভাল মানুষ ছেলে, সংসারে ও দাঁড়াতে পারবে না, খড়কুটোর মত ভেসে যাবে। উঃ, এ আমি কি করলাম।

হালদারবাবু চুপ করে বসে থাকেন। সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা তাঁর নেই। জীবন দত্ত তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করছে, সেতো করতেই হবে।

যাবার সময় জীবন দত্ত একবার ফিরে তাকাল, যে জন্যে এসেছিলাম, তা বলতেই ভুলে গেছি। আমার স্ত্রী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

হালদারবাবু বিস্মিত হলেও কথা দেন, কাল যাব দেখা করতে।

পরদিন হালদারবাবু এলেন জীবন দত্তর বাড়ি। জীবন বাড়ি ছিল না। তাঁর স্ত্রী ভেতরের ঘরে কাজ করছিল, খবর পেয়ে বেরিয়ে এল। ম্লান হেসে বলে, বসুন হালদারবাবু ক'দিন থেকেই আপনার সঙ্গে দেখা করব ভাবছি।

ভদ্রমহিলার চেহারায় আগের মত আর সেই শুকনো ভাব নেই, অনেক যেন সহজ। অনেক স্বাভাবিক।

বল মা, আমি কি করতে পারি?

—সব কথা শুনেছেন?

—শুনেছি।

জিতেনের মা স্থির দৃষ্টিতে হালদার-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই যে একদিন বলেছিলেন কোথায় এক জাগ্রত দেবতা আছে, তাঁর কাছে একবার নিয়ে যাবেন?

—যদি যেতে চাও নিশ্চয় যাব।

—আমি যাব। ভদ্রমহিলা উঠে-পড়ে কি যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করেন, সেখানে গিয়ে আমি বলব না, ঠাকুর তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, আমি বলব, সে যেখানেই থাকুক যেন সুখে থাকে। যেন মানুষের মত মানুষ হতে পারে। যেন পাঁচজনের কাছে পরিচয় দিয়ে বলতে পারি আমি তার মা।

জিতেনের মা ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। বোধহয় চোখের জল সামলাবার জন্যে।

হালদারবাবু চুপ করে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। আজ বুঝতে পারলেন কার জোরে জীবন দত্তর ছেলে মানুষের মত সহজ। অনেক স্বাভাবিক।

# মেঘলা দিন

বিষ্ণু দে

বিদ্যুৎ সওয়ারে আর বজ্রের মাহুতে
স্ফূর্তির কী রেশারেশি আকাশে আকাশে,
প্রকৃতির শক্ত খেলা, উদ্‌গ্রীব পৃথিবী
দেখে সুখে থরোথরো, গ্রীষ্মবদ্ধনীবি
স্বেদাক্ত সুন্দরী ভাবে তৃষ্ণার্ত বাতাসে
এবারে বাঁধবে বৃষ্টি আপন বাহুতে,

যেন কাদম্বরী ভাবে বিধুর সংরাগে
এবারে কি চন্দ্রাপীড় বক্ষে তার জাগে

যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্ব আকাশে বাতাসে
যেন দেবদেবী মাতে দৈবত শৃঙ্গপরে,
ঝড়ের বিপ্লবে ভেদ পালায় সন্ত্রাসে,
হর হয় হরি আর রাধিকা করালী,
শ্যামঅঙ্গে গৌরী তাই কুলে দেয় কালি

কাদম্বরী ভাবে যেন বিধুর সংরাগে
এবারে কি চন্দ্রাপীড় বক্ষ তার মাগে!

মহাশ্বেতা প্রাণ আনে প্রেমের ভৃঙ্গারে॥

# দিনলিপি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

আমি এক কারাগারে থাকি।
শুনি সারাদিন কতো ধ্বনি আর গান
শব্দ শুনি শুনি বা চীৎকার।
জীবনের এই দৃঢ় প্রাণের আহ্বান
এর গুরুভার
সইতে পারিনে যেন আর।
শুনি যদি ডেকে যায় পাখি
তার মৃদু আনন্দের ঢেউ—
যেন প্রিয় মুখ এলো কেউ—
এমনি হৃদয়ে করি মুগ্ধ সম্বর্ধনা।
এমনি কুড়িয়ে যাওয়া প্রীতিপূর্ণ কণা
পৃথিবীর থেকে
আর তার বিনিময়ে কিছু যাওয়া রেখে
তা-ই আমি জানি।
আজও পৃথিবীতে আমি বেঁচে আছি তাই বুঝি
নিজেরে বাখানি।
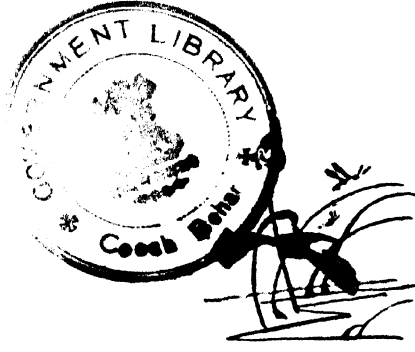
# অন্তরঙ্গ

অরুণ মিত্র

ঠাহর ক'রে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা
আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ। প্রথম
সকালটা আমি ভুলিনি। আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি
ক'রে তারা সবাই বাইরে এসেছিল। মনে আছে।
সবুজ তোরণের নীচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম।
বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের রক্তে সমস্ত
দূরত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল, আমাদের মন সমস্ত
দূরত্ব নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। কেউ একজন
(আমিই কি?) হঠাৎ বলেছিল, চলো ঝর্ণা
কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি। হৈ হৈ ক'রে
পাহাড়বন মাড়িয়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু
কিছু পাইনি। অত উঁচুতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট
হয়। আরও উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েও
আমাদের নেমে আসতে হয়েছিল এই সমতলে,
আকাঙ্ক্ষার এই পোড়া মাটিতে। তখনই
ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল।
অন্য কথা আর কে শুনবে? তবু আমি নতুন বৃষ্টি
পাখী চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম,
বললাম এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজ-খবর
আমাদের দেবে। কিন্তু আমার কয়েকটি কথা
গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।

আমার চারপাশে তারা ভিড় ক'রে এসেছে।
এ জায়গায় বিপুল জলের ভাঙন লেগেই আছে,
স্পষ্টতার এলাকা এটা নয়। ভালো ক'রে দেখে
তবে তাদের চেনা গেল। তাদের আলাদা আলাদা
নাম আমি আর বলতে পারি না। আমার
মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে
ডাকা যায় তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে।
তাদের মুখগুলো নিবে গিয়েছে, তাই সেখানে
কিছুই পড়া গেল না। তবু আমার বন্ধুতা আমি
তাদের কাছে রাখলাম, তাদের কথা জানতে
চাইলাম। কোন্ সম্বল নিয়ে তারা এত দূরে হেঁটে
আসতে পারল, এই প্রশ্ন শুনে তারা চেটোগুলো
খুলে হাতের রেখা আমার সামনে মেলে ধরল।
কোনো রেখা যে এমন বিষণ্ণ দেখাতে পারে তা
আমি জানতাম না। আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল
তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।
তারা সব আমার রক্তের দোসর।

# অশেষ কবিতা

সরোজ আচার্য

ড্যালহৌসি পাহাড়ে অমিট্-রে যখন পৌঁছল
তখন তার যৌবন নিয়েছে বিদায়,
ক্ষয়ে গেছে অক্সফোর্ডের পালিশ,
মেধা কমেছে, বেড়েছে মেদ,
অনুপার্জিত বিত্তের প্রাচুর্যও পলাতক,
অমিট্-রের টিকি বাঁধা পড়েছে
সমতলভূমির অক্লান্ত মেহনতী মজুরির চাকায়,
টিকি নয়, টাক—
বেসরকারি কলেজে ত্রিসন্ধ্যা মাস্টারির জয়টীকা।

অমিত নমিত,
যযাতির যৌবন প্রাপ্তিতে আস্থাহীন,
শিলং. পাহাড়ের সৌরভ সুদূরগত।
এ-অমিত কী ক'রে শোনাবে
ডোনের গম্ভীর গম্ভীর ভালবাসার আবাহন:
**For God's sake, hold your tongue**
**And let me love!**
কাকে শোনাবে?
শিলং পাহাড়ের পূর্বাচলে যে-লাবণ্যের
আকস্মিক অরুণোদয়
ড্যালহৌসি পাহাড়ের অস্তাচলে
কুয়াশার নিঃসীম শুভ্রতায় আজ
সে-লাবণ্য অন্তর্লীন।
শেষ পর্যন্ত জিত্
সেই বুড়ো নিবারণ চক্রবর্তীর
যাকে অমিত বিদায় করবে পণ করেছিল।

নাই বা রইলো সে-লাবণ্য
যে বুড়িয়ে যায়, গুঁড়িয়ে যায়, হারিয়ে যায়,
অমিট্-রের মতোই যার পরিণাম সীমিত,
অথবা ডেসডিমোনার মতো
**To suckle babies and chronicle small beer.**
বুড়ো নিবারণ চক্রবর্তীর কাছেই তাই
অমিতের শেষ পাঠ—
শেষ তবু অশেষ।
ড্যালহৌসি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
মেঘের সমারোহে বনরাজিনীলায়
যে-লাবণ্য অন্তহীন,
সিসি-লিসি-কেটি মিটারের
রক্তিম নখর-ওষ্ঠপুটের বিদ্রূপবিলাসে
যে-লাবণ্য অমলিন
বুড়ো নিবারণ চক্রবর্তী আজকের অমিতকে
সর্বক্ষণ শোনাচ্ছেন সেই অমর্ত্যলোকের
অনির্বচনীয় চিরস্থির লাবণ্যের বাণী—
'মন মোর মেঘের সঙ্গী
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তপানে।'

অমিত রায়ের শেষ পারানির কড়ি
ড্যালহৌসি পাহাড়ের এই অনির্বচনীয় লাবণ্য
যার পানে চেয়ে কীটস বলতে পারতেন
[illegible] নিবারণ চক্রবর্তীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে
**Bold Lover! for ever shalt thou love**
**And she be fair.**

রাজলক্ষ্মী দেবী

কী ক'রে বলো না বাঁচি,
গম ভাঙি,—ডাল বাছি—
এ মন-কেমন-করা সকালে।

দেখেছি পথের বাঁকে
কালো কদমের শাখে
থোকা থোকা ফুল ফোটে অকালে।

কদমের ডাল ভরা থোকা থোকা ফুল,
আর বাইরে রোদের রং হিঙ্গুল।

কী ক'রে বলো না, থাকি—
রোদ করে ডাকাডাকি—
ডাক দেয় বাইরের হাওয়া যে।

ওই মাঠ, রোদ্দুর—
হয়েছে বাঁশির সুর—
ডাক দেয় যাদুভরা আওয়াজে।

এ মাঠে রোদের রং ঠিক হিঙ্গুল।
যেন বন্ধুর সোনারং হয় ভুল।

ডাল ভরে ওঠে ফুলে—
দরজা দেবে না খুলে—
নজরে নজরে রাখে সারাখন।

মিছিমিছি রোদ্দুরে—
বন্ধু কি গেলো ঘুরে—?
—জাঁতার তলায় এরা পেষে মন।

বাইরে কী টক্‌টকে লাল রোদ্দুর—
বুঝি সোনারং জ্বলে যারে বন্ধুর!

বেলা বেড়ে ওঠে, হায়,
তপ্ত হাওয়া হাঁপায়—
ধু ধু রোদ চারদিকে চম্‌কায়।

ভেঙেছি কাচের চুড়ি—
চোখে জল লুকোচুরি—
শাশুড়ী ননদী তবু ধম্‌কায়।

এ মাঠে কী কাঠফাটা খুনী রোদ্দুর—
আহা সোনারং জ্বলে গেলো বন্ধুর!

## দোসর

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রাত্রির প্রহরগুলি ;—ওরা মোর সজাগ প্রহরী
খোলা জানালার ধারে ধারে,
ওদের চোখের ঘুম কেড়ে নিলে সমুদ্র লহরী—
আলোড়নে বিস্ফোরণে মনের কিনারে
রেখে যায় উৎকণ্ঠিত অতন্দ্র উদ্বেগ।
নিষ্পলক ক্লান্ত দৃষ্টি নিরুদ্দেশ দিগন্তে বিলীন
ভেসে যায় খণ্ড খণ্ড শরতের মেঘ,
দেয়াল-ঘড়ির শব্দ বুকে বাজে বিরামবিহীন।
অরণ্যে হারিয়ে পথ ডেকে যায় নিশাচর পাখি,
কর্কশ কণ্ঠের স্বরে জমাট আঁধার
খান খান হয়ে যায় ; স্তব্ধ হয়ে থাকি
চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন ;—অন্তরে আমার
ভয় এসে বাসা বাঁধে ; সন্ত্রস্ত মুহূর্তগুলি সব
প্রবেশে ও নিষ্ক্রান্তে তৎপর
কানে কানে কথা বলে, যেন আশৈশব
আমার পরম বন্ধু, রাত্রিজাগা আমার দোসর।

হে আমার অচঞ্চল বিনিদ্র প্রহর
দিওনা, দিওনা চোখে ঘুম,
তন্দ্রাচ্ছন্ন দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা দুর্ভর,—
তার চেয়ে জেগে থাকি নীরব নিঝুম।

হরপ্রসাদ মিত্র

ট্রেন চলেছে, লাইন কাঁপে, ফিঙের পাখায় সব ফাঁকা।
কালো নদী পেরিয়ে যাওয়ার
ইস্টিম নাও বুকেতে।
তারপরে ভোর হবেই হবে
সেই কাবেরীর ওপারে,
জানলাতে চোখ রেখে দেখো
ঘাস মাটি জল অনন্ত!

আমরা আছি এইখানে এই নন্দ ঘোষের গলিতে
গ্যাসের খুঁটি, শ্যাওলা, কুকুর, আধমরাদের কলকাতায়
শিউলি, শিশির, সানাই এবং কুমোরটুলির জয়ঢাকে
চোখে চোখে চোখে চোখে সর্বজনীন প্রতিমা!

কোথায় যাবে? তোমরা কোথায়? হিল্লি-দিল্লি-ত্রিবান্দ্রম?
কোন্ সমুদ্র দেখবে আতুর, কোন্ মহাকাশ হৃদয়ে?
হাত ঘোরালেই কই হাতিয়ার, পা বাড়ালেই পৃথিবী—
লক্ষ কোটি লোকের মধ্যে লক্ষ্য সে কোন্ হৃদয়ে?

রোদ পড়েছে মাঠকোঠাতে মন বলে যাই, যাই!
'স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে মনের বিনাভাষার ভাব।'
যাওয়া যেন এই আমাদের এজমালি নিমগাছ—
কাঠুরেদের সামনে হাওয়ায় কিশলয়ের নাচ!

## ছায়া ছায়া নয়

দিনেশ দাস

আমাদের ভেজানো জানলায়
শিশির বাতাস এসে আশ্বিনের খবর জানায়।
দেখি চেয়ে, সবুজ ঘাসের ফাঁকে শুঁড় তোলে অগণিত শামুক,
স্বচ্ছ জলে ঘাই দেয় মাছ এক ঝাঁক,
অবাক্
হয়েছে দেখি শরতের মুখ।

পৃথিবীর রং বদ্‌লায়ঃ
মন বলে, নতুন কোথায়?
জীবনের পুরোনো স্টীমার
পুরাতন বাঁধাঘাটে ফিরেছে আবার।

উপরে উপুড়-করা নীলের গাম্‌লায়
শরৎ নিজেই তার শরীর ডোবায়,
আকাশী নীলের গায়ে টানি দুধে আলপনা
সাদা-সাদা বকের পাখায়—
নতুন কোথায়?

সহসা জলেস্থলে
রোদ্দুরের গিনি জ্বলেঃ
হৃদয়
উতলা হয়ঃ
কোন ফাঁকে ভালবাসা এসে বাসা বাঁধে—
আবার আমার ছায়া ভালবাসি সহজে অবাধে॥

এ ছায়া তো শুধু ছায়া নয়ঃ
রূপের অস্থির মায়া, রঙের দুরন্তপনা মুছে গেলে পর
অন্তর নির্মল রূপ ছায়া ফেলে হৃদয়ের নদীর উপর,
সহজ সুন্দর এক উপমার মতই বিস্ময়॥

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

তারপর দেখেছিলে, দেখেছিলে মুকুর মেলে কি,
ভালবেসে এঁকে রাখা চিহ্ন সেই উন্মত্ত আবেগে,
উত্তপ্ত পরশে যার উঠেছিল গোলাপেরা জেগে,
নিঃশ্বাসে অগুরু ঢালা—দেখে তার ঠিকানা পেলে কি?

সঙ্গে সঙ্গে গেল অঙ্গে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে কি,
হৃদয় উদ্দাম হ'ল—ছুটে গেল তীর তীর বেগে
সুপ্রিয় সে ক্ষণটিতে রসোদ্দীপ্ত প্রিয়সঙ্গ মেগে,
প্রতীক্ষার মরুপ্রান্তে,—অবশেষে নির্ঝরে এলে কি?

এলে কি নির্ঝরে ওগো, রাখো তবে ও দুটি চরণ,
ঝির ঝির স্নিগ্ধ স্রোতে ধুয়ে দিই দীর্ঘ পথশ্রম,
তরঙ্গে দোলনা তুলে এসো তবে দুলি দুজনায়।

প্রাণের স্পন্দন, তুলি সব কটি জলের কণায়,
অরণ্য মরাল হই, ভুলে যাই সর্ব কালক্রম,
একটি অসহ্য সুখে তুমি আমি হই নিমগন।

## আকাশ কুসুম

অরুণকুমার সরকার

আকাশকুসুম, তুমিই আমার সুখ
এই রঙ, এই ঢঙ বদলাও ব'লে।
সম্ভাবনার গন্ধে ভরাও বুক
শহর যখন নিষ্ঠুর পায়ে দলে
বকুল ফুলের স্পর্শকাতর দেহ।

অপেক্ষা করো দয়ার্দ্র সন্ধ্যাতে
ঠিক সেইখানে, যেখানে তোমাকে চাই।
নগরপালের দৃষ্টির এলাকাতে
আমরা দু'জনে গোপনমিলনে যাই
রচনা করতে নীরবনিবিড় স্নেহ।

এবং কুয়াশা মশারি চতুর্দিকে
ম্লান জ্যোৎস্নার সুদরমেদুর হাসি
অর্থগভীর অস্ফুট আর ফিকে
যে-সব শব্দ ভালোবাসে, ভালোবাসি,
যে-সব ক্লান্ত প্রেমিকজনের প্রেয়।

আকাশকুসুম, আমাদের যৌবন
শরৎকালের ভোরবেলাকার মতো।
সময় করেছে দেহ ক্ষতবিক্ষত
মন তাকে তবু করিনি সমর্পণ।
যা কিছু দেবার তোমাকেই সব দেয়॥

## পৃথিবীর উদ্দেশে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

ভালবাসা ফুরোবার নয়,
এমন কি মরার পরেও
আমার জীবনকে খুঁজতে খুঁজতে
অন্ধকার, তারা ও গ্রহের ভিড় পেরিয়ে
মহাশূন্য থেকে ছুটে এসে
তোমার কাছে দূতের মতন
নতজানু হব।

সাতটি কিরণের ফোয়ারায়
সূর্য তোমাকে স্নান করায়,
আমার আয়ুর কামনায় দাঁড়িয়ে
দেখব শস্যের সবুজে হলুদে
মানুষের বাঁচবার বিভিন্ন উপকরণে
একুশ শতাব্দীর ইতিহাসে
সবুজ ভূগোল সেদিন প্রাণময়।

ভালবাসা ফুরোবার নয়,
আমাকে মায়ের গর্ভে সেদিন
স্নেহের শিকড়ে গেঁথে দিও,
আবার আমি জন্ম নেব
অন্ধকার থেকে সাদা বিন্দুতে
পেঁয়াজকলির ফুলের মত হাওয়ায়
বার বার নতজানু হব ব'লে।

মণীন্দ্র রায়

কী লজ্জা, দিনের বেলা পথে যেতে না হয় সামনেই
এসেছিল অকস্মাৎ, তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠার
মানে কী?—অপর্ণা ভাবে—কেন সে চেঁচাল? কেন লোকে
চতুর্দিক হ'তে এসে নতশির ওকেই ধিক্কার
জানাল? ও' যেন বোবা, নিরুত্তরে গেল ঘরে ফিরে।......
ট্রামে বসে মুখ ওর মনে পড়ল বিদ্যুৎ ঝলকে।

আজকে আপিস গেল। ভীরুতম পাখিও যেমন
অসঙ্কোচে ঝাঁপ দেয় সীমাশূন্য নীলের আকাশে,
কী দারুণ ইচ্ছা তেমনি বুকে যেন পাথার ঝাপটে
পথ খোঁজে। তারি টানে ময়দানের ঘাসে
নেমে পড়ে অপর্ণাও। সাবানের নীরক্ত কাহিনী
ঘরে ঘরে বলা যার পেশা, তাঁরো দুঃসাহস বটে!

সে জানে, রূপসী নয়। বালিকার সাধ
যৌবনে রঙের ঢেউ না তুলতেই অভীপ্সার কুঁড়ি
ছিঁড়েছে নিজেরি হাতে, ভয়ে আর আত্ম-অভিমানে।

ছত্রিশ বছর তাই প্রেম ছিল কথার চাতুরি।
আবর্তিত সময়ের অন্তহীন মুহূর্তের দাঁতে
একটি দিনের পরে আয়ু তাই অন্য দিন আনে।

এরি মাঝে ও' কে এল! কাছাকাছি থাকে বুঝি? পথে
দেখা গেছে ক্লান্ত চোখে একাকী দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই।
কে জানত তখন ওই সে নায়ক, যার অশ্বক্ষুরে
সমস্ত মেয়েরই বুকে জেগে ওঠে কুমারী বন্দিনী।
এল সে আচমকা এতো, সর্বনাশা চোখের আগুনে
ভয়ার্ত চিৎকারে তাকে না চিনেই ঠেলে দিল দূরে!

এখন দুপুর। মাঠে লোক নেই। রৌদ্র আর ছায়া
গায়ে গা এলিয়ে ঘাসে শুয়ে আছে এখানে ওখানে।
অপর্ণা নিশ্বাস ফেলে ভাবে—আর এ জীবনে দেখা
হবে কি? কে যাবে বল কালের উজানে!
একবার মাটি ছুঁয়ে, দড়িদড়া ছিঁড়ে তার ডিঙি
ছুটেছে ঘূর্ণির টানে, আদিগন্ত আরোহী সে একা॥

## জুনের দুপুর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপর থেকে নীচে তাকাও, দ্যাখো,
ছায়াছবির মতই হঠাৎ
চোখের সামনে থেকে
এরোড্রোমটা দৌড়ে পালায়,
পৃথিবী যায় বেঁকে।
রইল পড়ে দশটা পাঁচটা,
ঝাঁকড়া-মাথা মেপ্‌ল্ গাছটা,
চওড়া-ফিতে রাস্তাটা, আর
নদীর নীলচে শাড়ি,
ফলের বাগান, গির্জে, খামার,
ছক-কাটা ঘরবাড়ি।

উপর থেকে নীচে তাকাও, দ্যাখো,
লক্ষ লক্ষ টুকরো দৃশ্য
নতুন করে ভেঙে
একটি অসীম রিক্ততাকে
তৈরি করল কে যে।
নোত্‌রদামের গির্জেটা আর
হোটেল, কাফে, ইফেল টাওয়ার
মিলিয়ে দিচ্ছে মেঘের শান্ত
হাল্কা নীলের তুলি।
মিলায় মিলায় প্যারীর প্রান্ত-
রেখার দৃশ্যগুলি।

উপর থেকে নীচে তাকাও, দ্যাখো,
দৃশ্যহারা দীর্ঘ দুপুর,
সমস্ত দিক ধূধূ,
জুনের আকাশ আপন মনে
রৌদ্র পোহায় শুধু।
কোথায় ফাটছে আগুন-বোমা,
কোথায় কাইরো, কোথায় রোমা!
শূন্যে মোছায় দেখার ভ্রান্তি
নিত্যদিনের চোখে,
বিশ্ববিহীনতার শান্তি অসীম ঊর্ধ্বলোকে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

এতটুকু নদী
লজ্জাবতী, ঝোপে ঢাকা;
বনগাঁ লোক্যাল শুধু লাফ দিয়ে পার হয়ে যায়।
সকালের মুগ্ধ আলো নামে না সেখানে,
দুপুরের মৌন ঝরে বকের পালকে;
বিকেলের সরীসৃপ ছায়া—আসে যায়,
পায় না নদীকে। নদীও পায় না।
বনে ঢাকা বুনো নদীটিকে পায় না,
অন্ধকার জলকে ছোঁয় না।
বোবা নদী।

এতটুকু এ আকাশ
মেঘ আর ঝড়ের প্রলেপ
এক কোণে ছিটে ফোঁটা কতটুকু নীল?
অবশিষ্ট কতটুকু?
রোদের আগুনে পোড়া, রাত্রির পাতালে অন্ধকার
ঝড়ে ছিন্নভিন্ন, এই আকাশ—
এই এতটুকু, এতটুকু নীল
এই আকাশ?
গলির সুড়ঙ্গ থেকে দেখি
ধোঁয়া জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দমবন্ধ গলি
তার ফাঁকে ঐ অতটুকু
ঐ আকাশ?

এই এতটুকু
নদীর ভগ্নাংশ আর আকাশের নীল টুকরো নিয়ে
লোক্যাল ট্রেনের যাত্রী বাড়ি যায়
অফিসের ভিড় ভাঙে
জরাজীর্ণ নকশি কাঁথার মাঠে
ভাঙা হাটে
কলকাতার ধোঁয়াবৃত অন্ধকার লেনে বাই লেনে
পার্কের নিশ্চেষ্ট বেঞ্চে
ঘুম নামে।
ঐ অতটুকু নীল, অতটুকু অন্ধকার জল,—
ঐ ভগ্ন নীলাকাশ, ঐটুকু নদী
জেগে থাকে দিগন্ত অবধি।

## স্বস্তি পাঠ

আরতি দাস

অশনায়া অন্বেষার সারাদিন, রাত্রি কাটে দুশ্চিন্তার কীট
ততগুলি সমস্যার সারারাত, যতগুলি নোনাধরা দেয়ালের ইঁট
সকৌতুক চোখে দেখে, স্বপ্নের বাঁধানো ছবি ভেঙে চুরমার—
সবুজ ধানের ক্ষেত জলের আখরে লেখা বাংলা তুমি জননী আমার।

এ রাত্রি প্রভাত হয়, ছাতের কার্নিশে ব্যস্ত চড়ুই-এর পাশে
রোগের পাণ্ডুর মুখ, অপেক্ষার সূর্য ডোবে সন্ধ্যার আকাশে
চিরন্তন রাত। তবু কুষ্ঠিকে রেখেছি আজও দক্ষিণের ঘরে
তিনতলার অফুরন্ত আলোক বাতাসে, জানালায় দেখি চুপিসাড়ে
মৃতের নিশ্চিত মৃত্যু। বিশুদ্ধ মননে তর্কে বিশ্বের প্রণয়
সে গভীরে ডুব দাও। জননী জরতী মৃতা, উদাসীন শান্ত সময়।

জানি আর কোনদিন দেখবো না ঘুমচোখ শিশির সকাল
সে নদী ভুলেছে জল তীরে যার ছায়াঘন শ্যামল তমাল।

## কুয়াশার গান

উমা দেবী

সে মুখ যদি বা কোনো ছায়া ফেলে হৃদয়ের তীরে
অমনি স্মৃতির ঊর্মি তরঙ্গিত হ'তে চায় প্রাণের গভীরে।
সহস্র দীপের শিখা আকাশ জ্বালিয়ে নেয় নীলকান্ত
প্রদীপের প্রায়,
ধমনীর গুপ্ত পথে রক্তিম বাসনা ফেরে তরলিত চুনির প্রভায়!
তারপর ঘিরে আসে বেদনার জ্বালা—
কী এক কুয়াশা এসে ভরে দেয় প্রাণের নিরালা!

একটি বিষণ্ণ প্রশ্ন জর্জরিত হৃদয়ের তারে
বৃথাই বাজাতে চায় জীবনের সুর বারে বারে।
কোনো প্রেম, কোনো মুখ, কিংবা কোনো স্মৃতি
রঙিন মুহূর্ত কোনো কিংবা কোনো বাঞ্ছিত বিস্মৃতি
খণ্ড খণ্ড গান দিয়ে কাঁপাতে কি পারে এই
হৃদয়ের নিস্তব্ধ বিস্তার?
রঙ দিয়ে ভরাতে কি পারে এই অন্তঃশূন্য রেখার বিকার?

তবু কেন আসে তারা?
কেন চায় তরঙ্গ জাগাতে?
অবোধ্য বেদনা-দীর্ণ
অসংখ্য-রহস্য-জীর্ণ
হৃদয়ের কোনো কোনো রাতে?
পারে কি—পারে কি তারা কোনো এক মুহূর্তে ভরাতে?
পারে কি এ শূন্যতার নিশীথকে নিয়ে যেতে
অন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাতে?
এ রঙিন কুয়াশাকে ছুঁড়ে ফেলে অকস্মাৎ—
অন্ধকার-দীপ্ত কোনো নক্ষত্র জাগাতে?

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

মাঠে চরে মোষ,
ছোট সাঁওতাল ছেলে
সৃষ্টির আদিম বেশে
তার পিছে ছুটে ছুটে চলে।

ভেজা ভেজা ঘাস,
রাঙ্গা মাটি লাল রোদে
মিতালির রেশ
বেদনার আবির মেখে,
সূর্যের আহ্নিক যাত্রা
আজি হ'ল শেষ!

মসৃণ সরল
ইউক্যালিপ্‌টাস্ কাঁপে,
হিম হিম পশ্চিমী হাওয়া,
যেন আসন্ন শীতের সাড়া পেয়ে
শঙ্কিত সবুজ পাতারা,
চায়নাক তারা
অসীম শূন্যের মাঝে
চিরতরে ঝরে পড়ে যাওয়া।

## পাতার ফাঁকে হলুদ চাঁদ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

পাতার ফাঁকে হলুদ চাঁদ খেলুক লুকোচুরি
নাচুক খোঁপায় পলাশ গুঁজে শ্যামাঙ্গী ঐ টিলা—
ঘর-ছাড়ানো বাঁশিতে আর ডাকিসনে আমায়,
অমন করে আমাকে আর ডাকিসনে রাঙ্গিলা।

আঁচল পেতে বসতে চেয়ে, চাইলি এ-যৌবন,
মাথার মাণিক বিকিয়ে দিয়ে এলাম যে তোর পায়;
দেহের দোর পেরিয়ে চাস কাড়তে কেন মন
শূন্য হাতে কেমন করে ফিরবো ফের গাঁয়!

মেলা দেখতে কেন এলাম শহরতলীর হাটে!
নিলাম বেছে ভালোবাসার রক্তমুখী নীলা,
গলায় দিলাম সইলো না সে, বুকে রাখলাম, শিলা—
সেই থেকে আর ফিরলো না মন ঘরের চৌকাঠে।

চোখের জলে মাদুর ভেজে, পাথর-কালা রাতে
আগল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, পাহারা দেয় স্বামী—
এ-দেহ তোর পূজোর ফুল সঁপেছি তোরই হাতে
হাটের মাঝে কোন্ মুখে তা বলতে যাবো আমি!

পরান আমার স্রোতের দিয়া ভাসাই তারে স্রোতে—
নদীর জলে জুড়োই জ্বালা, ভালোবাসার নীলা
গলায় পরে, বাঁশিতে তোর তখন ওপার থেকে
জনম ভ'রে আমায় শুধু ডাকিস্ রাঙ্গিলা॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বুলান মন্ডল, বৃষ্টি এলো,
বুলান মন্ডল, তুমি কী-ধান আমায় মেপে দেবে,
আমন না রূপশালী?
ঝড়ে এলোমেলো
একটি উঠান থেকে আরেক উঠানে
ছুটে-ছুটে ভিজে যায় ঘরনী তোমার, মাটি লেপে
রং দিতে গিয়েছিল ঘরনী তোমার, তার মানে
সুখের শিহরগুলি চেয়েছিল ছবি ক'রে নিতে,
এখন বৃষ্টিতে একা ভিজে একাকার, এক-আষাঢ়
এক-আয়ু অকৃতার্থতার
রং শুধু লেগে আছে ছবির মাঝখানে, তর্জনীতে।

ঐ দ্যাখো, ভেঙে গেলো ও-কার বাড়ির লাল টালি;
বুলান মন্ডল, তুমি এখনো কি ধান
মেপে দেবে? এখন কী-ধান
দিতে চাও? আমন ফুরিয়ে গেছে, আছে রূপশালী
না হয় মজুত আছে রূপশালী, কিন্তু অফুরান
যাকে তুমি মনে করো, সারাটা সকালই
সে যদি বৃষ্টিতে ভেজে, তবে
বাড়ি গিয়ে কি জানি দেখবে!

দেরি নয়, আমার দু হাত ধরে তোর ঘরে চল,
আমারো অনেক ধান হাঁতে ছিলো, বুলান মন্ডল!

# দেখা হবে

### সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভ্রু-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে—
সুগন্ধের সঙ্গ পাব দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়
আহা কি শীতল স্পর্শ হৃদয়-ললাটে, আহা, চন্দন, চন্দন-
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে চন্দন, চন্দন,
আমি বসে থাকব দীর্ঘ নিরালায়।

প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমুলে জারুলে
লক্ষ লক্ষ মহাদ্রুম শিরা-উপশিরা নিয়ে জীবনকে বিজ্ঞাপিত করে
একদিন জ্বলে ওঠে সমস্ত অরণ্য-দেশ অশোক আগুনে
আমি চলে যাই দূরে, হরিণের ত্রস্ত পায়ে, বনে বনান্তরে।

কেউ কেউ চিরকাল কাঠুরের মত বাঁচে লোভে, শ্রমে কুঠার-ফলকে
কেউ বক্ষে বাহু জুড়ে আজীবন সুখে থাকে ঠিকাদার সেজে;
অচল পায়ের নিচে ক্রমে ক্রমে গেঁথে যায় নানান শিকড়
হাল্কা হাওয়ার স্রোতে একদিন ঘুমে ঢলে পরম আমেজে।

আমি বহু পথ ঘুরে তৃপ্তিহীন, তোমার আহ্বানে
এসেছি বিজন প্রান্তে, বক্ষে বাসনার শিখা জ্বলে ওঠা
অলৌকিক ক্ষণে
তুমি কি অমল-তরু, স্নিগ্ধ জ্যোতি, চন্দন, চন্দন,
আমার কুঠার দূরে ফেলে দেব, চলো যাই গভীর গভীরতর বনে।

### আনন্দ বাগচী

অচ্ছোদ সরসী নীরে প্রাণভয়ে আকাশ ডুবেছে।

চুপ করে বসে ভাবছি তারা কোন পথে চলে গেল,
জোড়াবাগানের বস্তী, বেনেটোলা, নাথের বাগানে
রক্তাল্পতায় ভুগতো যে সব মেয়েরা: অন্তরঙ্গ অন্ধকারে
যে সব শ্বাপদ-চক্ষু পুরুষ দেখেছি একদিন,
আরো নানা পাড়া ঘুরে অসচ্ছল চায়ের দোকানে
যৌবনের অনুচর অশ্লীল আলেখ্য বুকে করে
সিদ্ধার্থের স্বপ্ন নিয়ে বসে আছে, টালা পার্কে, পাইক পাড়ায়,
নিচু ঘর ছোট জানলা আত্মভুক হিংসার আগুনে
সে সব জাজ্বল্যমান সন্ধ্যা, রাত্রি, নিশাচর ত্রাস—
এ উপন্যাসের খসড়া অসমাপ্ত—তারা কোন দিকে চলে গেল।

সমস্ত প্রতীক ছুঁয়ে ক্রমে নামি গভীর প্রত্যয়ে।

সঙ্গম বিরহ কিংবা ইত্যাকার ব্যাধির ভিতর
বিরহকে বেছে নিতে গিয়ে দেখি আসল রহস্য কোনখানে,
কোথায় ঢুকেছে কীট লক্ষ বছরের এই পুরানো পুঁথির
গোপন পাতার মধ্যে, সব লেখা শেষ হয়ে গেলে—
হীনযান, মহাযান, অবিশ্রান্ত দেহ ব্যবসায়—
পদচিহ্ন দেখি আর ভয়ে কাঁপি, সে এসেছে অরণ্যে কখন!
নিষাদ চরিত্র কিছু বিচিত্র যেহেতু আপাতত
অচ্ছোদ সরসী নীরে অবশেষে ডুবেছে আকাশ।
সে নিষাদ সে অরণ্য, আমি কোনখানে গিয়ে বাঁচি॥

# নাগরদোলা

### গোবিন্দ চক্রবর্তী

খুঁজেছি কারে বুঝেছি নাক'
বুঝেছি তবু শুধু—
আদিকালের শূন্য ঝরে
বুকের মাঝে ধু-ধু।
আকাশও কি তারেই খোঁজে
অনন্তকাল ধরে,
চরকিপাকের মতন যে এই
পৃথুল পৃথ্বী ঘোরে—
এই পৃথিবী পাক দিয়ে ঐ চাঁদ
সর্বনেশে হায় রে খোঁজার সাধ!
বাসুকি যে রাগ রেখেছে পুষে
সেই ছোবলে উথলে সাগর
হঠাৎ ওঠে ফুঁসে।
ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন
কোথায় সে দিনরাত।
কী অসহ্য ফোস্কা-পড়া তাত।

সেই আগুনের তাতেই না কি
সৃষ্টি পুড়ে খাক—
এরি মধ্যে আছে তবু
কোথাও কি মৌচাক।
টুপ টুপ টুপ ঝরছে মধু
তারা থেকে তৃণে—
হঠাৎ এসে কয়েকজন তার
খানিক নিয়ে চিনে,
ধোঁকা কিংবা দ্বিগুণ ধাঁধার
লাগায় দারুণ তাক্—
বাদবাকি খায় হাবুডুবু
কিংবা ঘূর্ণিপাক।

কী সত্যি কী মিথ্যে
কিছুই নেইক জানা—
তবু খুঁজতে ত' নেই মানা,
সাতসাগরের তীরে নাকি
জল হাতড়ায় কানা।

# তিরুপতি : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
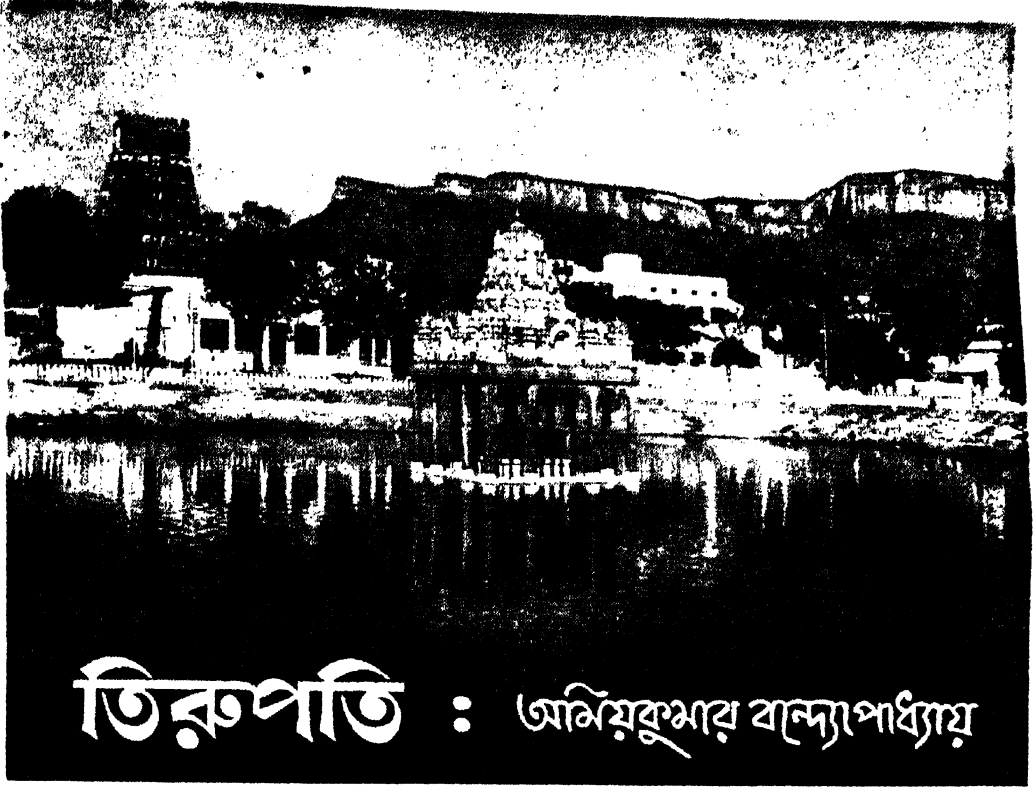
শেষাচলম গিরিপাদমূলে তিরুপতি শহর

তামিল ভাষায় "তিরু" শব্দের অর্থ পবিত্র আর "পতি" মানে দেবতা। এক কথায়, পূত পরমেশ্বর। অধুনা অন্ধ্রদেশীয় এই দেবস্থানটির খ্যাতি মাদুরা, কন্যাকুমারীকেও হার মানায়। শেষাচলম গিরি-শীর্ষে, তিরুপতির মন্দিরে, মণিমানিক্যখচিত ভেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি দর্শনের পর অহেতুক বেঁচে থাকার যে কোন মানে নেই এ-প্রতীতি অগণিত দাক্ষিণাত্যবাসীর। জীবদ্দশায় সর্বার্থ-সাধিত হবার পর জীবনধারণের অজুহাত শুধু এই যে, পরপারের পরোয়ানা হয়ত সবক্ষেত্রে তখুনি এসে পৌঁছয় না। যাদের আসে, তাদের খেদ নেই; যাদের আসে না, খেদ তাদেরও নেই। কেননা, জীবিত-কালের সর্বোত্তম কর্তব্য তাঁরা সম্পন্ন করেছেন, স্বাদ পেয়েছেন পরমতম অভিজ্ঞতার।

আমি পাপীতাপী মানুষ। দক্ষিণদেশীয় ভগবৎপ্রেমিকদের চোখও আমার নেই, মনও নয়। তিরুপতি বিষ্ণুমূর্তির ভাস্কর্য যে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর এহেন অনাসৃষ্টি চিন্তা আমার মনে এসেছে অতি সহজেই; আর, এই পবিত্র দেবতার বিশাল মন্দির ও বিশালতর সম্পত্তি যে পুরোহিত-গোষ্ঠীর কাজ গুছিয়ে নেবার একটা স্থায়ী ফিকির মাত্র, এরকম যাবনিক কল্পনার হাত থেকেও আমি রেহাই পাইনি। তবু যে এই তীর্থ-ক্ষেত্রে গিয়েছিলাম সে কেবল ভ্রমণের নেশায়। সমুদ্রাভিসার নদীর জলস্রোতে ভাসমান এক টুকরো কাঠের মত। বিশেষ সঙ্গীসাথী আমার কেউ নেই; যাত্রীপুঞ্জের প্রত্যেকেই সেজন্য আমার ভাবী আত্মীয়, ভাবী বন্ধু। এই জনস্রোতে মিশে ভেসে যাওয়ার আনন্দ—অন্ততঃ আমার কাছে—ঠাকুরের সামনে গড় করবার আনন্দ থেকে কিছুমাত্র কম নয়। দুদিনের পরিচয়, ক্ষণিকের অন্তরঙ্গতা, অমোঘ বিদায়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ কাছাকাছি থাকবার সকরুণ প্রয়াস। ক্ষণস্থায়ী বলে সে-অভিজ্ঞতা ক্ষণভঙ্গুর নয়। দু'একটি বিশেষ উপলব্ধি ত চিরস্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে মনের গোপনে।

তিরুপতি-মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তির গলায় কি মালা ছিল, কি তার রঙ, সেকথা আমার আজ আর বিন্দুবিসর্গ মনে নেই। মনে আছে, একটি সাদা, সুগন্ধি ফুলের মালার কথা। এক শ্যামা, তড়িৎ-চকিত-নয়না দ্রাবিড়-তনয়ার ঘন কালো চুলে সে-মালা জড়ানো দেখেছিলাম। প্রবল-প্রতাপ ভেঙ্কটেশ্বরের গলায় সে-মালা কি আরও সুন্দর দেখাত? কে জানে!...

স্ফুটনোন্মুখ সাদা কুঁড়ির এমন সুবিন্যস্ত মালা সচরাচর চোখে পড়ে না। তখনও বুঝিনি, দেব-দর্শনে যাবার সময়ে এই বিশেষ প্রস্তুতির কি মানে হতে পারে। পরে বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম অতিশয় পরিতাপের সঙ্গে।

ধর্মপ্রাণ পাঠক মার্জনা করবেন—তিরুপতি-প্রসঙ্গে ঠাকুরের মূর্তি মনে পড়বার আগে আমার মনে পড়ে এই অতি অপরূপ কেশ-বিন্যাসের কথা। ঘোরতর পাপচিন্তা সন্দেহ নেই। তবু মনে পড়ে। মেয়েটির মুখের আদল এতদিনে আমার স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু তা বলে সেই রাশিকৃত মসৃণ কালো চুল ঘিরে সেই শ্বেত-বৃত্তটি কি কখনও ভোলবার!

আমি ভুলতে পারিনি। এবং এ-ধারণা আমার বদ্ধমূল যে ঈর্ষাপরায়ণ তিরুপতি পরমেশ্বরও এতাদৃশ হেয় চিন্তার জন্য
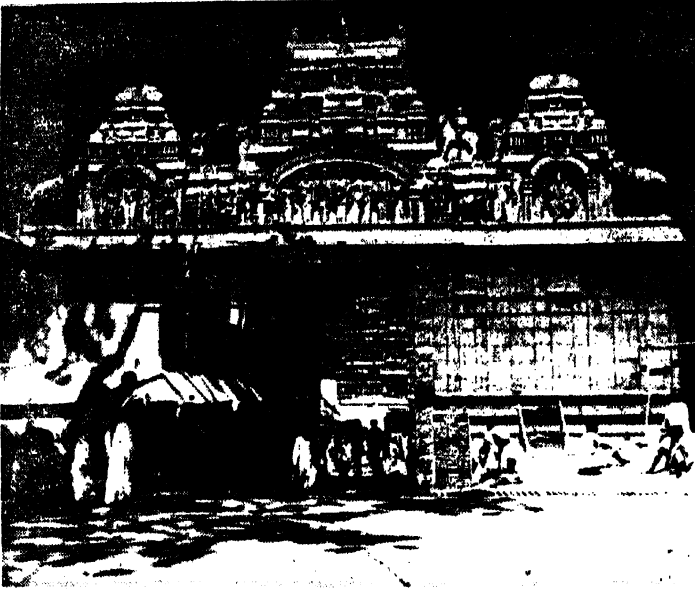
তিরুপতি মন্দিরের প্রথম প্রবেশ তোরণ

আমাকে যথোচিত শিক্ষা দেবার কথা ভুলতে পারেন নি। অতি দ্রুত ও নির্মম শাস্তি তিনি দিয়েছিলেন আমায়। কিন্তু সেকথা এখানে নয়।

অন্ধ্র ও মাদ্রাজের তাবৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরের তত্ত্বাবধান করবার জন্য পৃথক "দেবস্থানম কমিটি" আছে। তিরুপতি মন্দিরও এই আইন-অনুমোদিত ব্যবস্থার বাইরে নয়। রাজ্যের গণ্যমান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এ-সব সমিতির সভ্য। সমিতির সচিবের পদে উপযুক্ত কর্মচারি নিযুক্ত করে দেন রাজ্য-সরকার। তাঁদের পদমর্যাদা মন্দিরের আয়ের তারতম্যের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। তিরুপতির যাবতীয় সম্পত্তির মোট মূল্য প্রায় আটাত্তর কোটি টাকা আর বার্ষিক আয় পঁয়ত্রিশ লক্ষ। এহেন বিত্তশালী প্রতিষ্ঠানের কর্মসমিতির সচিবের পদে যে মাদ্রাজ (অধুনা অন্ধ্র) সিভিল সার্ভিসের জনৈক কর্মচারী নিযুক্ত থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

এই সচিবের দপ্তরেই প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে এসেছিলাম। তিরুপতির মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে যে-সব ভাসা ভাসা খবর শুনে এসেছিলাম তাতে ঘোরতর সন্দেহ ছিল মন্দিরের ত্রি-সীমানায় আমার ক্যামেরার ঝোলা নিয়ে যেতে দেওয়া হবে কিনা। এই অনুমতি ভিক্ষা করা ছাড়া আরও প্রয়োজন ছিল সচিবের কাছে। তিরুপতি-দর্শন কলকাতার কালীঘাট-দর্শনের মত সিধা সড়কের ব্যাপার নয়।

মাদ্রাজ থেকে আর্কোনম হয়ে রেদিগুণ্টা রেল-স্টেশনে নামলে যাত্রার প্রাথমিক পর্বটা শেষ হল মাত্র। সেখান থেকে বাসে করে আরও আট দশ মাইল গেলে, শেষাচলম গিরি-পাদমূলে তিরুপতি শহর। অন্য মন্দিরাদি এখানে থাকলেও, তিরুপতির আসল মন্দির এ-শহরে অবস্থিত নয়। পাহাড়তলীর এই ছাউনিটুকু তিরুপতি অভিযানের "বেস ক্যাম্প" মাত্র। এখান থেকে যে আঠারো মাইল বিসর্পিল পথ শেষাচলম গিরিশীর্ষে উঠে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে সকল দুঃখহরণ তিরুপতির মন্দির। এই পথ আধুনিক। দেরাদুন-মুসৌরী বা শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সড়কের থেকে তা কোনো অংশে পৃথক নয়। যাত্রিবাহী মোটরবাস এখন অহরহ এ-পথে চলাচল করে। বাসগুলির মালিক তিরুপতি দেবস্থানম কমিটি। মেরামত করা থেকে শুরু করে যাতায়াতের সময়-তালিকা অবধি স্থির করা সব কিছুই কমিটির হাতে।

পুরাতন পথও আছে। দু' হাজার বছরের প্রাচীন পথ। বন-জঙ্গল, চড়াই-উৎরাই ভেঙে সে-পথও গেছে পাহাড়তলীর শহর থেকে তিরুপতির মন্দিরে। নিরবধি-কাল এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে লক্ষ কোটি ধর্মপিপাসু তিরুপতির মন্দিরে এসেছেন। পথশ্রম তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তীর্থ-পরিক্রমার ক্লেশ, সে ত ধর্মসাধনারই অংশ—এই স্থিরবিশ্বাস অনুপ্রাণিত করেছে অগণিত আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে। এপথে জনস্রোতের আজও বিরাম নেই। ক্লেশবিহীন তীর্থযাত্রাকে যাঁরা প্রতারণার নামান্তর মনে করেন, সেই প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাসীরা এখনও ক্ষতবিক্ষত পদে এই পথ অতিক্রম করেন মুহুর্মুহু ভেংকটেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে। পুণ্যের তহবিলটা যে তাঁদের বেশী ভারী হয়ে ওঠে তাতে সন্দেহ নেই। আমার মত পাপী-তাপীদের কথা স্বতন্ত্র। বাসের ব্যবস্থা করে তিরুপতি দেবস্থানম কমিটির সদস্যেরা যে আমাদের কথাও মনে রেখেছেন এ-চিন্তা সত্যই আনন্দদায়ক।

শুধু ক্যামেরা-বহনের অনুমতি আর বাসের সময় জানবার জন্যই যে সচিব মহাশয়ের কাছে এসেছিলাম তা নয়। এসেছিলাম, তিরুপতি সম্বন্ধে কোনো পুস্তক-পুস্তিকা যদি তাঁর কাছে পাই তার সন্ধানে। কলকাতায় ফিরে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তিরুপতি-সম্পর্কিত কোনো কেতাব পেতেও পারি, নাও পারি। অতএব, লেখার কিছু উপকরণ স্থানীয় প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করে রাখাই সমীচীন মনে করেছিলাম। সচিব মহাশয় আমাকে একেবারে হতাশ করেন নি; ছোট একটি প্রচার-পুস্তিকা যোগাড় করেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। আর আহরণ করেছিলাম এক বেদনামধুর অভিজ্ঞতা, যা—আগেই বলেছি—তিরুপতি-প্রসঙ্গে আমার সর্বোত্তম সঞ্চয়।

পাহাড়তলীর তিরুপতি শহরে সুউচ্চ গোপুরম-শোভিত যে গোবিন্দরাজার মন্দির তারই এক পাশে সচিবের দপ্তর। জীর্ণ, পুরাতন এক অন্ধকার ঘরে প্রশস্ত তক্তপোশের ওপর জাজিম পাতা। সচিব মহাশয়ের আসন সেই তক্তপোশের ওপর, দেওয়াল ঘেঁষে। ঘরে ঢুকে তক্তপোশের অন্য প্রান্তে এসে দর্শনপ্রার্থীদের বসবার নিয়ম। এইখানেই প্রথম দেখেছিলাম শ্রীযুক্ত আয়েংগার ও তাঁর কন্যাকে। পলস্তারা-খসা সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মলিনতা যেন চক্ষের নিমিষে অপসৃত হয়েছিল। শীতের সকালে, পুবের গবাক্ষ-পথে এক ফালি তির্যক রোদ্দুর মেয়েটির মাথায়, কেশে এসে পড়েছিল দেবতার আশীর্বাদের মত মসৃণ কালো চুলের পেছনে সেই সুবিন্যস্ত সাদা কুঁড়ির মালাটি কী অপরূপ যে লেগেছিল তা বলবার নয়। দ্রাবিড়-তনয়ার কেশশোভা—পথেঘাটে হামেশাই যা দেখি—তার থেকে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, সে-কথা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। বড় যত্নে, বড় নিপুণতার সঙ্গে রচিত সেই মালিকা বড় দরদের সঙ্গে যেন বিন্যস্ত হয়েছিল সেই আশ্চর্য কালো কুন্তলে। কিন্তু কেন এই বিশেষ সজ্জা, কি তার হেতু, সে-কথা তখনও বুঝিনি। বুঝেছিলাম পরে। কিন্তু সে-কাহিনীও এখানে নয়।

তিরুপতি মন্দিরের সংক্ষিপ্ত একটু ইতিহাস সচিব মহাশয় আমাদের বলেছিলেন।

মাদ্রাজ শহরের প্রায় দু'শো মাইল উত্তর-পশ্চিমে, পূর্বঘাট পর্বতমালার যে-শাখাটি সিধা পশ্চিমদিকে প্রসারিত, তার নাম শেষাচলম। সাপের মত বিসর্পিল আকৃতির জন্যই হয়ত এ-নাম হয়ে থাকবে। বহু মাইল দীর্ঘ শেষাচলম শৈলের সবটাই তিরুপতির সম্পত্তি; অতএব অতি পবিত্র। কিছুদিন আগেও, জুতো-পায়ে এ-পাহাড়ের ত্রিসীমানায় আসা নিষিদ্ধ ছিল। এসব কড়াকড়ি এখন অনেক শিথিল করা হয়েছে। আধুনিক রাজপথে যাত্রিবাহী মোটরবাস অধুনা অহরহ যাতায়াত করে তিরুপতির মন্দির অবধি। দর্শনার্থীর নগ্নপদ হবার ব্যবস্থাটা এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। এমন কি, ইতিপূর্বে-নিষিদ্ধ ধূমপান প্রভৃতি মারাত্মক পাপকর্মকেও উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। এই উদারতার সুযোগেই আমি শেষাচলম-শীর্ষে, মায় তিরুপতি-মন্দিরের ভিতর পর্যন্ত, ক্যামেরা নিয়ে যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম।

তিরুপতি পরমেশ্বর যে আধুনিককালের আবহাওয়ার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আপসে উদ্যোগী হয়েছেন এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, গত দু'হাজার বছর ধর্মানুষ্ঠানের সমস্ত নিয়মই অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়েছে, তিরুপতির মন্দিরে ও শেষাচলম গিরিমালার সর্বত্র। এই দু'হাজার বছর আগে, ইতিহাস যেখানে গিয়ে মিশেছে কিংবদন্তীর কুয়াশায়, তিরুপতির ইতিকথা সেই দূরে অতীতে প্রসারিত। বেশ কৌতুহলোদ্দীপক উপাখ্যান সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মীর সঙ্গে মনান্তর হওয়াতে বিষ্ণু নাকি একদা স্বর্গ পরিত্যাগ করেন। এই শেষাচলম শৈল-চূড়া তাঁকে এতদূরে আকৃষ্ট করে যে তিনি স্থির করেন, নিঃসঙ্গ জীবন এখানেই যাপন করবেন। কিংবদন্তী এই যে বহুকল্প এই গিরিশিখরে বাস করবার পর এক বিশেষ ভক্তকে তিনি বরাহ মূর্তিতে দেখা দেন। সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে যে বরাহ-মন্দির আজও দণ্ডায়মান, পুণ্যকামীরা সেখানে এখনও দলে দলে পূজা দিয়ে থাকেন। বরাহমূর্তিতে আবির্ভূত হবার বহু যুগ পরে বিষ্ণু পুনরায় এক ভক্তের চক্ষে প্রতিভাত হন শ্রীনিবাস মূর্তিতে। তিরুপতি দেবতাকে আজও সেজন্য অনেকে শ্রীনিবাস নামে উল্লেখ করে থাকেন। আবার বহু যুগ গত হবার পর, তাঁর স্বয়ং-রচিত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানের কথা লোকসমক্ষে প্রচারিত হয়। এই মন্দিরটি নাকি উইঢিবিতে ঢেকে গিয়েছিল কালক্রমে। সন্নিহিত গোচারণ-

বিষ্ণুমন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজা

ভূমির রাখালেরা একদা লক্ষ্য করল যে, কোনো কোনো গাভী যে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয় তার কারণ তারা সকলের অলক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী এক অরণ্যে প্রবেশ ক'রে এই উইঢিবির ওপর দুগ্ধধারা বর্ষণ ক'রে ফিরে আসে। স্থানীয় রাজার কাছে এ-খবর পৌঁছল যথাসময়ে। উইঢিবি খুঁড়ে সেই ছোট মন্দিরটিতে তিনি আবিষ্কার করলেন বিষ্ণুমূর্তি। ইঁটের তৈরী এক মন্দির তিনি নির্মাণ করিয়ে দিলেন দৈব-রচিত মন্দিরটির ওপরে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত কাহিনীই প্রাগৈতিহাসিক। লোকমুখে এই কিংবদন্তী প্রবাহিত হয়ে এসেছে পরবর্তীকালে।

সেই নতুন মন্দিরে লক্ষ্মীহীন জীবন যাপন করতে লাগলেন বিষ্ণু। নিঃসঙ্গতার বেদনা ভোলাবার জন্য তিনি নাকি অত্যন্ত মৃগয়া-পরায়ণ হয়ে উঠলেন। একদা মৃগয়াকালে, তিরুপতি-শৈলের অদূরে এক অরণ্যভূমিতে, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। এরকম পরিস্থিতিতে, পৌরাণিক উপাখ্যানকারেরা সর্বত্র যে-ফরমুলার প্রয়োগ করেছেন, এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না; বিষ্ণু সেই অরণ্যচারিণী রাজকন্যাকে বিবাহ করে বসলেন। বিবাহ ত হ'ল। কিন্তু দেবতায় মানবীতে এহেন মিলনকে কেউ যাতে অসম্ভব বলে মনে না করেন সেজন্য গল্পকারেরা একটু টীকা জুড়ে দিলেন এ-কাহিনীর সঙ্গে। ব্যাখ্যায় বলা হল যে, রামায়ণের সীতা যখন পাতাল-প্রবেশ করেন তখন তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ছিল, তিনি যেন অতঃপর তাঁর চির-আরাধ্য স্বামী বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। বহু যুগ পরে, পদ্মাবতী নামে তিনি আকাশ রাজার ঘরে কন্যা হিসাবে আশ্রয় পান। নিঃসন্তান আকাশ রাজা দৈব-অনুগ্রহে সমুদ্রতীর থেকে পদ্মাবতীকে কুড়িয়ে আনেন। তার পরের ঘটনা আগেই বর্ণিত হয়েছে।

আকাশ রাজা পৌরাণিক ব্যক্তি। তবে তাঁর ছোট ভাই তোণ্ডমানকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই তোণ্ডমান যে খৃষ্টপূর্ব ৫৮ সাল থেকে ৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে তাঁর রাজধানী নারায়ণভরম থেকে এ-অঞ্চল শাসন করেছিলেন, এরকম ঐতিহাসিক প্রমাণ অল্পবিস্তর রয়েছে। তোণ্ডমানের কালেই তিরুপতির উপাখ্যান কিংবদন্তীর কুয়াশা থেকে ইতিহাসের প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ হয়। তিরুপতি-মন্দিরের যে-পরিচালন ব্যবস্থা তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন,

যাত্রীদের মন্দির প্রদক্ষিণ

গত দু'হাজার বছরে তার নাকি বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

টোণ্ডমানের পর তিরুপতির ইতিহাস প্রায় একটানা বাড়বাড়ন্তের ইতিহাস। পাণ্ড্য, চোল, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, হয়শালা, বিজয়নগর প্রভৃতি রাজবংশের নৃপতিরা তাঁদের ধনসম্পত্তি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন ভেংকটেশ্বরের পদপ্রান্তে। যুদ্ধে জয়লাভ আর শত্রুর বিনাশে তাঁরা তিরুপতিকে কাণ্ডারী মেনেছেন সর্বদা। সুফল ফললে, নতুন গোপুরম উঠেছে তিরুপতির মন্দিরে, স্বর্ণাচ্ছাদিত হয়েছে সুউচ্চ পতাকাদণ্ড আর মণিমানিক্যে ছেয়ে গেছে ভেংকটেশ্বরের পাষাণ কলেবর। সুফল না ফললে ভক্তিস্রোত ক্ষীণ হয়নি। দুর্ভাগ্যের কারণ অনুমান করা হয়েছে উপঢৌকনের অল্পতাকে। নব উদ্যমে আবার আরম্ভ হয়েছে দেবতার তোষণ। দুর্জ্ঞেয় দেবাভিলাষের যথাবিহিত ব্যাখ্যা পুরোহিতেরা নিষ্ঠার সংগে ক'রে এসেছেন আবহমান কাল।

যুগ যুগান্তের এই রাজকীয় রৌপ্যস্রোত যে শুধু মন্দির ও দেবমূর্তির দিকে প্রবাহিত হয়েছে এমন নয়। পূজো-অর্চনা, যাত্রী-সংগ্রহ ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির কাজে বহু সহস্র লোক বরাবরই নির্ভর করেছে এই দেবালয়ের ওপর। তাদের ভরণপোষণের জন্য অসংখ্য দেবোত্তর জমি ভেংকটেশ্বরের নামে লিখে দেওয়া আছে। স্থায়ী আয়ের স্থাবর সম্পত্তি দেবতাকে দান করবার প্রথা তিরুপতি মন্দিরের এক বিশেষত্ব। বিষ্ণুমূর্তির গলায় রোজ যেন একটি সুগন্ধি ফুলের মালা দেওয়া হয়, মন্দিরের গর্ভগৃহে অহর্নিশি যেন ঘৃতের একটি প্রদীপ জ্বলে—এইসব শর্তেও বহু আয়কর সম্পত্তি দান করা হয়েছে দেবতাকে। এই দানপত্রগুলি শিলা বা তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তিরুপতি দেবস্থানম কমিটি এই দানপত্রগুলি সম্বন্ধে অতি উপাদেয় একটি পুস্তিকা সম্পাদন করেছেন। তা থেকে দেখা যায় যে, রাজন্যবর্গ ছাড়া বহু সাধারণ ব্যক্তিও তিরুপতি প্রতিষ্ঠানে অগণিত ছোটখাট দানের জন্য দায়ী। দীর্ঘকালের সঞ্চিত এই অগাধ দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে মন্দির-প্রতিষ্ঠানকে বরাবরই বহু কর্মচারী নিযুক্ত রাখতে হয়েছে। ফলে, দেব-উপাসনার বাইরের কাঠামোটার পিছনে এই প্রতিষ্ঠান অনেকটা জমিদারী সেরেস্তার মত কাজ করে এসেছে এতকাল। এই তদারকের কাজ এখন ন্যস্ত হয়েছে দেবস্থানম কমিটির হাতে।

কমিটির সেক্রেটারী মশায় আমাকে যে পুস্তিকাটি দিয়েছিলেন তাতে তৎকালীন সমিতির সভ্যদের একটি নামের তালিকা ছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের একাধিক অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও অনুরূপ পদমর্যাদাশালী বহু ব্যক্তি যে এই সমিতির তৎকালীন সদস্য ছিলেন, একথা লক্ষ করেছিলাম। মন্দিরের ভার এই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাতে আসায় এক মহদুপকার হয়েছে। তিরুপতি প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এখন কেবলমাত্র দেবতার সন্তোষ বিধানের কাজেই নির্দিষ্ট নয়। উদ্বৃত্ত অর্থে অনেকগুলি জনহিতকর সংস্থাও চালান হচ্ছে। যাত্রীদের পথকষ্ট লাঘবের জন্য মোটরবাসের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। সংশ্লিষ্ট গেরাজ, সাজ-সরঞ্জাম ও আধুনিক যন্ত্রপাতিবিশিষ্ট মেরামতশালাও আছে। তিরুপতির অর্থে স্কুল, কলেজ, দাতব্য হাসপাতাল, অনাথাশ্রম ধরমশালা প্রভৃতিও স্থাপিত হয়েছে। এগুলির যাবতীয় খরচ বহন করেন দেবস্থানম কমিটি।

এতগুলি প্রতিষ্ঠান চালাতে অর্থের অনটন হয় কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম সচিব মহাশয়কে। সাধারণ লোকের ধর্মপ্রবণতা ত দিন দিন কমে আসছে। তিরুপতির আয় হয়ত এখন আর আগের মত নেই। একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, তিরুপতির মন্দিরে নগদ মুদ্রা ও অলংকার প্রভৃতি যা প্রণামী দিয়ে যান যাত্রীরা, তার বাৎসরিক মূল্য প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। এছাড়া, ভেংকটেশ্বরের নামে উৎসর্গ-করা স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মোট মূল্য আটাত্তর কোটি টাকার মত। ভারতবর্ষের তাবৎ দেবমন্দিরের মধ্যে তিরুপতিই যে সর্বাধিক বিত্তশালী সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

*

দেবস্থানম কমিটির সেক্রেটারীকে ধন্যবাদ। অনেকক্ষণ সময় তিনি আমাদের দিয়েছেন; জবাব দিয়েছেন অনেক প্রশ্নের। এইবার উঠতে হয়। আমাদের বাস ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে।

আমাদের জিজ্ঞাস্য কিছু কম ছিল না। এত বড় ও এত প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় কথায় কথায় নানা কথা এসে পড়ে। শ্রীযুত আয়েংগার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিরুপতি-মাহাত্ম্যের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। সে বিষয়েই তিনি যাবতীয় প্রশ্ন করলেন। আমরা তিনজনে যতক্ষণ বক-বক করেছি—সখেদে লক্ষ্য করেছি—কাবেরী একবারও একটি কথা বলেনি। বাবার কাছে, এক পাশটিতে চুপ করে বসেছিল সারাক্ষণ। শুধু তার আশ্চর্য দ্যুতিশীল কালো দুই চোখ বার বার প্রশ্নকর্তাদের দিকে দৃষ্টি ফেলেছে। অতর্কিতে চোখাচোখি হলে, দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে কোমল লজ্জায়। আলাপের শুরুতে, শ্রীযুত আয়েংগার ও কাবেরীর সংগে যখন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সচিব মহাশয়, তখন ছোট দুটি হাতের পাতা একত্র করে নমস্কার করেছিল কাবেরী। তখনই ভাল করে লক্ষ করেছিলাম সেই অপূর্ব কেশশোভা। ওপরের জানালা থেকে সরু এক ফালি প্রভাতী রোদ্দুর তির্যক রেখায় তার মাথায়, কেশে এসে পড়েছিল। প্রায়ান্ধকার ঘরের কালো পশ্চাৎপটে সেই অপরূপ

বেণী-বিন্যাস যেন উদ্ভাসিত হয়ে ঠেছিল আপন মহিমায়। প্রশ্নোত্তরের ন্যমনস্কতায় কখন যে সে-রোদ্দুর সরে গছে খেয়াল করি নি। লক্ষ্য করলাম, চিব মহাশয়ের কাছ থেকে একেবারে বিদায় নবার সময়ে। অসার কথোপকথনে কাল না কাটিয়ে কেন সেই আশ্চর্য ছবিটি দেখলাম না আরও কিছুক্ষণ!......

•

বাস-স্ট্যাণ্ডে বাস তৈরীই ছিল। আমরা তিনজনে এসে বসলাম। আজ কোনো বিশেষ উৎসবের দিন নয়। তবু, শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার বললেন—দু'তিন হাজার যাত্রী আজও যাবে তিরুপতি দর্শনে। দু'একটি পার্বণের দিন নির্দিষ্ট থাকলেও, তিরুপতি-সান্নিধ্যের কোনো বিশেষ দিন-ক্ষণ নেই। সমস্ত বছর ধরেই তিরুপতি-সঙ্গমের দিকে প্রবাহিত হয় মুমুক্ষু জনতার স্রোত। কখনও কখনও জোয়ার আসে সেই স্রোতে। দেবস্থানম কমিটির এই বারো-চোদ্দটি বাস রাত্রিদিন যাতায়াত করেও তখন আর পেরে ওঠে না। দু'-হাজার বছরের সেই পুরনো বন্ধুর পথে সে-স্রোত তখন তরতর করে বইতে থাকে। আর, সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা-ধ্বনিতে বেজে ওঠে আকাশ, অরণ্য, গিরি-কন্দর—গোবিন্দ, গোবিন্দ, শ্রীনিবাস, ভেঙ্কটেশ্বর।......

আধুনিক বাস-চলাচলের রাস্তা থেকে এই প্রাচীন সড়কের রেখাটি দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে, সবুজ-সমুদ্রের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে ঐ যে একটি গোপুরম দাঁড়িয়ে আছে, ওটি হয়ত পুরনো দিনের কোনো ধনাঢ্য বিষ্ণুভক্তের কীর্তি। লক্ষ কোটি ভক্তের পদধূলি-বিজড়িত এই পুরাতন পথের উন্নতিকল্পে বহু ধর্মপ্রাণ তাঁদের সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। সিঁড়ি তৈরী করিয়ে দিয়েছেন কেউ, কেউ হয়ত আচ্ছাদিত একটু বিশ্রামের স্থান। আজকের পীচ-ঢালা রাজপথে শ্রদ্ধা-নিবেদনের এই সনাতন রীতির অবকাশ নেই। আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে, ইঞ্জিনিয়ারেরা সে-পথের রক্ষণাবেক্ষণ করেন সর্বদা। যাত্রীদের শ্রম-বিনোদনের জন্য কোনো সহৃদয় দানের প্রয়োজনও নেই এ-পথে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যাত্রীরা পৌঁছে যান তিরুপতি তীর্থে। পাহাড়ের ওপরের বাস-স্ট্যাণ্ডে আমরাও এসে নামলাম অতি অল্পকাল পরে।

তিরুপতিক্ষেত্রে আমার কোনো দায় নেই। এই প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য আর সমবেত জনতার কিছু ছবি নিয়ে যেতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর দায় অনেক। যাবতীয় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে তাঁকে প্রথমে বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করতে হবে। তার পরে যেতে হবে বৈকুণ্ঠ তীর্থ, জাবালি তীর্থ, আকাশগঙ্গা তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ—প্রভৃতিতে পুজো দিতে। দশ-বিশটা এরকম ক্ষুদে তীর্থ শেষাচলম পাহাড়ের চূড়ায় ছড়ানো আছে। ধর্মের জালটা বেশ ছড়িয়ে ফেলবার দৃষ্টান্ত সেগুলি। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার আর কাবেরীকে সর্বত্র মাথা ঠেকিয়ে আসতে হবে একবার। এক বিশেষ পারিবারিক মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তাঁদের।

আমাদের অভীষ্ট এতদূর ভিন্ন যে বাস-স্ট্যাণ্ডেই বিদায় নিলাম তাঁদের কাছে। মুমুক্ষু জনস্রোতের মধ্যে হারিয়ে গেলেন এই দাক্ষিণী ব্রাহ্মণ আর তাঁর অল্পবয়সী মেয়েটি। জনতার একপাশে দাঁড়িয়ে, সেই অপসৃয়মান কেশশোভার দিকে কি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ? কে জানে!...

মন্দিরের চারিদিকে এক চক্কর ঘুরে আসতেই বুঝলাম তিরুপতি-দর্শনে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। কালীঘাটের মত মারামারি হৈ-হুল্লোড় নেই। প্রথমে মস্তক-মুণ্ডন, তারপরে স্নান, তারপরে সারি বেঁধে মন্দির-প্রদক্ষিণ ও দেব-দর্শন, সবশেষে প্রণামী দান। কেশোৎসর্গ করা তিরুপতিতে একদা আবশ্যিক ছিল। আজকাল এবিষয়ে যাত্রীরা নিজেদের অভিরুচি অনুসরণ করতে পারেন। তবু, পুরাতন প্রথার প্রভাব এমন কিছু কমেছে বলে মনে হল না। যাত্রীদের সুবিধার জন্য দেবস্থানম কমিটি বহু নাপিত নিযুক্ত করে রেখেছেন। এক প্রশস্ত হল-ঘরে তারা বসে আছে প্রসারিত মস্তকের অপেক্ষায়। হাতে ক্ষুরধার অস্ত্র সর্বদা উদ্যত। ঘরের এক কোণে স্তূপ জমেছে মুণ্ডিত কেশের।

দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রের এক বিশেষ রীতি—মন্দির-সংলগ্ন একটি টেম্পা-কুলম বা পবিত্র সরোবর থাকতেই হবে। তিরুপতিতেও আছে। দলে দলে যাত্রী এই পুষ্করিণীতে ডুব দিয়ে উঠে পাণ্ডাদের কাছে তিলক-ফোঁটা কাটছেন। তারপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে আসছেন সারিবন্ধভাবে। সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি উঠছে—গোবিন্দ, তিরুপতি, শ্রীনিবাস, ভেঙ্কটেশ্বর। পরিক্রমার শেষে সেই পরম মুহূর্ত যার আশায় কত ক্লেশ সহ্য করে এসেছেন যাত্রীদল। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। মণি-মানিক্যখচিত ভেঙ্কটেশ্বরের অস্পষ্ট মূর্তি সেই ক্ষীণ আলোকে দ্যুতিমান। সারিবন্ধ জনতা করজোড়ে দেবমূর্তি অতিক্রম করে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। অস্ফুটে, স্ফুটস্বরে কত আকুতি, কত হৃদয়বেদনা নিবেদিত হচ্ছে দেবতার চরণে, যেমন হয়েছে আবহমান কাল। তিরুপতির ভাবলেশহীন স্থির দৃষ্টি সামনের অন্ধকারে নিবদ্ধ। সকলের প্রার্থনা কি শুনলেন সকল-দুঃখ-হরণ? এতগুলি তাপিত চিত্তের সমস্ত জ্বালা কি জুড়িয়ে দেবেন তিনি? কে জানে!...

•

ফোটোগ্রাফীর উত্তেজনায় কত সময় কেটে গেছে জানি না। ধর্মবিহ্বল এই জনস্রোত ঠেলে ঠেলে কখন যে কোন দিকে গেছি তাও মনে নেই। এই জনতার কেউ আমার পরিচিত নয়। মাত্র দু'জনের সঙ্গে সামান্য একটু আলাপ হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। তাঁরা হয়ত এতক্ষণে তিরুপতি দর্শন শেষ করে চলে গেছেন পাপনাশন তীর্থের দিকে। তিরুপতি দর্শন আমারও সাঙ্গ হয়েছে। ফিরতি বাস ধরে ফিরে যাব এইবার; আর কোনো দিন এখানে আসব কিনা কে জানে।

বাস ছাড়বার কিছু দেরী আছে এখনও। প্রাঙ্গণের বাইরে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে বসেছি। একটু জিরিয়ে নিয়ে যাব। বড় পরিশ্রম গেছে সারাদিন। অশ্বত্থ গাছের নীচে বাঁধানো বেদী। বিকেলের রোদ্দুরে মণিমুক্তা জ্বলছে রাশি রাশি চিকন পাতায়। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে একটু।......

আশেপাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক উঠে এসে নমস্কার করলেন আমায়। মুণ্ডিত-মস্তক কে এই ভদ্রলোক?...... সঙ্গের মেয়েটিও সম্পূর্ণ কেশহীনা।......কারা এরা? বিহ্বলতা কাটতে হয়ত একটু সময় লেগে থাকবে। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ও কাবেরীকে প্রতি-নমস্কার করলাম আত্মবিস্মৃতের মত। তার-পরে কি কথা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে, কি বলে বিদায় নিয়েছিলাম তাঁদের কাছে—আজ আর কিছু মনে নেই। আদৌ কোনো কথা বলতে পেরেছিলাম কিনা জানি না।

এই অতি-সাধারণ এক দ্রাবিড়-তনয়ার কেশশোভায় মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বরের মণিময় অঙ্গসজ্জা থেকে সে-সৌন্দর্য আমার বেশী ভাল লেগে-ছিল। সব লক্ষ করেছিলেন সর্বজ্ঞ তিরু-পতি। আমার মত সামান্য মানুষের এতদূর স্পর্ধা কেন তিনি সহ্য করবেন? তাঁর প্রবল প্রতাপের কথা কত সহজেই না আমায় বুঝিয়ে দিলেন! ভক্তেরা যে বলেন তিরুপতি সর্বশক্তিমান, তাতে আর সন্দেহ কি!......

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, 'ধূম'কে 'ধূম' বলে চেনা চাই। জাহাজের নাবিক-জীবন শেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যের সেই ক্ষুদ্রকায় বন্দরটিতে আমি সেদিন যখন জাহাজের ঠিকাদারী-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ ক'রে স্থিতি হ'য়েছি, তখন আমারও ঐ 'ধূম'-না-চেনার বিভ্রম ঘটেছিল।

এই বিভ্রম থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত। ছোট্ট বন্দর। তিনটি মাত্র জেটী। সার বেঁধে পর-পর তিনটি মাত্র জাহাজ দাঁড়াতে পারে। তা-ই ছিল সেদিন। তিনটি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাহাজ। আমার কাজ ছিল মাঝের জাহাজটির সংগে। জাহাজটি বৈদেশিক, পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নাবিক দলে ভর্তি। পরনে সার্ট আর ট্রাউজার, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, হাতে ঝুলছে চামড়ার একটা-ফোলিও-ব্যাগ ডক-এর গেট পার হ'য়ে জাহাজটির দিকে এগিয়ে গিয়ে গ্যাং-ওয়ে বেয়ে ওপরে উঠেছি—কিন্তু সেই অপরাহ্ণ বেলায় রেলিং-ধ'রে দাঁড়িয়ে-থাকা নাবিকদের মধ্যে হঠাৎ-ই লক্ষ্য করলাম অভাবিত এক চাঞ্চল্য। কী মনে হ'লো, ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কয়েক মুহূর্তের জন্য।

প্রশ্ন করলাম,—কাছের নাবিকটিকে,—ব্যাপার কী জো?

সে বললে—সামনে তাকিয়ে দেখ।

দেখলাম। কিন্তু এমন কিছু চোখে পড়ল না, যা' বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বিস্মিত হ'য়ে বললাম,—কই, কিছুই দেখছি না ত?

নাবিকটি ঈষৎ শ্লেষের সংগে বললে,—তা' দেখবে কী ক'রে? চোখে চশমা রয়েছে যে!

একটু হেসে বললাম,—চশমা ত অস্পষ্ট বস্তুকে স্পষ্ট ক'রে দেখবার জন্যই!

—কিন্তু ও যে বস্তু নয়, ও যে জীব! রীতিমতো হাত-পা ওয়ালা।

ওপাশের আরেকটি নাবিক তৎক্ষণে ঘন হয়ে এসে আমাদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ব'লে উঠল,—সাদা চোখে দেখতে শেখো হে, সাদা চোখে দেখতে শেখো।

পূর্ববর্তী নাবিকটি সম্ভবত রংগ-রহস্যের যবনিকা টেনে দেবার জনাই এবার বলে উঠল,—ঐ মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছ না? ঐ যে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে, হাসি-হাসি মুখখানা,—এক নম্বর জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম,—তাই বলো। ওকে দেখবে না কেন? ও ত 'নান'—সন্ন্যাসিনী! ওকে আমরা এখানে প্রায়ই দেখি।

—তাই নাকি—তাই নাকি!—আরও দুজন নাবিক এসে দাঁড়ালো কাছে, আরও ঘন হ'য়ে।

বললাম,—তোমরা ত দুদিন হ'লো এ' বন্দরে এসেছো, তোমাদের জাহাজে এসে ওঠেনি এখনো?

একজন বললে—হ্যাঁ, কাল এসেছিল। এসে সোজা ক্যাপ্টেনের ঘরে। ঘণ্টাখানেক ধ'রে কী যে বক্‌বক্‌ ক'রেছিল দুজনে, কে জানে!

বললাম,—আজও আসবে।

—কেন?

বললাম,—এখানকার এক জেসুয়িট গীর্জার ও নান্, গীর্জার যে 'পুওর ফান্ড' আছে,—তার জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য চাইতে আসে নাবিকদের কাছে।

একজন বললে,—ও কি ইণ্ডিয়ান? না, ইয়োরোপীন?

একটু হেসে প্রশ্ন করলাম,—তোমাদের কী মনে হয়?

অপর একজন বললে,—গায়ের রঙ যেমন ফর্সা, ইয়োরোপীয়ান বলেই ত মনে হয়।

বললাম,—না। ও খৃষ্টান বটে, তবে ইয়োরোপীয়ান নয়, ও ইণ্ডিয়ান। গোয়ায়, ওর বাড়ি। ও গোয়ানীজ।

আরেকজন জিজ্ঞাসা করল,—তুমি ওকে চেনো?

বললাম,—না। পরিচয় নেই। তবে প্রায়ই ত দেখি বন্দরে আসতে, মুখ চেনা হয়ে গেছে।

—তাহলে ওর সম্বন্ধে এত কথা জানলে কী ক'রে?

বললাম,—কী কথা! কিছুই ত জানি না। তবে আমার এক কাষ্টমসের বন্ধুর কাছে শুনেছি, ও সন্ন্যাসিনী, কিন্তু গোয়ানীজ। বছর পাঁচ ছয় হলো এখান-কার—জেসুয়িট চ্যাপেলে এসেছে।

মোটা মতন একটি নাবিক কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু শ্লেষ, একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল,—কিছুই জানো না। সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরলে কী হবে, আসলে ও সন্ন্যাসিনী নয়, একটা বাজে মেয়েছেলে। গীর্জার নামে সাহায্য চাইতে এসে, আসলে শিকার খুঁজে বেড়ায়। দুজন নাবিক আমার দিকে তাকিয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মেয়েটি আমার আদৌ পরিচিত নয়। আমার ধর্মের নয়, আমার গোষ্ঠীর নয়, আমার জাতেরও নয়। তবু মনে হ'লো ওদের এ বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে একটা তীব্র অপমানের জ্বালা এসে আমাকে বিঁধছে! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠলাম,—যা' জানো না, তা' নিয়ে অমন ব্যঙ্গ ক'রো না! কী ক'রে তোমরা বুঝলে যে, ও খাঁটি সন্ন্যাসিনী নয়?

প্রথম নাবিকটি বললে,—এক নম্বর জাহাজে এখন একটু যেতে পারো? নিজেই সব বুঝতে পারবে!

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম,—কিন্তু বুঝবার মতো আছেই বা কী? 'নান'দের অভ্যস্ত সর্বাঙ্গ-ঢাকা পোশাক পরা, বয়সও কাঁচ নয়,—তোমরা ও'সব ভাবছ কী ক'রে?

নাবিকটি বললে,—তাহলে এখানেই দাঁড়াও, প্রত্যেকটি লোকের মুখের দিকে কেমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে,—কেউ কিছু বললে, কেমন মুচকি-মুচকি হাসে,—নিজের চোখেই দেখতে পাবে!

—আচ্ছা বেশ। দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি!—বলে, নিজের কাজে ক্যাপ্টেনের ঘরে উঠে গেলাম। বড়জোর ঘণ্টাখানেক দেরী হয়েছে কথাবার্তায়। তারপরে নীচে নেমে, ওদের কাছে এসে আবার দাঁড়ালাম। তখনকার দেখা দুচারটি নাবিক নিজেদের কাজে চ'লে গেছে, এসেছে অন্য আরও কয়েকটি নাবিক। কিন্তু তারাও আগেকার দলের মতো ঐ রকমই রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেই প্রথম নাবিকটি কিন্তু তখনো যায়নি। আমাকে দেখে বললে,—জাস্ট ইন টাইম। ঠিক সময়েই এসেছো। ঐ দেখ তোমার সেই সন্ন্যাসিনী আসছে এদিকে একটি নাবিককে সঙ্গে করে।

ঝক্‌ঝকে সুট পরা বোধহয় ঐ প্রথম জাহাজেরই কোনো অফিসার হবে। তার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি বাইরে যাবার গেটের দিকে চলে গেল। এবং যেতে-যেতেও এ' জাহাজের দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল বারংবার।

ওদের মূর্তি অপসৃত হতেই সেই প্রথম নাবিকটি আমার দিকে তাকিয়ে আবার হেসে উঠল তেমনি ব্যঙ্গভরে হো-হো ক'রে।

মুখ নীচু ক'রে ওদের কাছ থেকে সরে এসে জাহাজের গ্যাং-ওয়ে দিয়ে নীচে নেমে এলাম তাড়াতাড়ি।

নাবিক ছিলাম একদিন আমিও। কিন্তু কোথাও কোনও বন্দরে কোনও সন্ন্যাসিনীর এ ধরনের ব্যবহার কখনো চোখে পড়েনি। মনে হ'লো ওদের অনুমান সম্ভবত মিথ্যা নয়। আর 'মিথ্যা নয়' মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র জ্বালা ভিতরটায় ধিকি ধিকি জ্বলে উঠল। মনে হলো, মেয়েটি তার আচরণ দিয়ে আমাদের অপমান করছে! শুধু আমাদের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকেই সে অপমান করছে!

পরদিন খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য করলাম, দ্বিতীয় জাহাজটিতে দাঁড়িয়ে থেকে। মেয়েটি আজ তৃতীয় নম্বর জাহাজটি থেকে শুরু করে সমস্ত নাবিকদের মুখের দিকেই অসংকোচে তাকাতে-তাকাতে আসছিল। দ্বিতীয় জাহাজটি ঐভাবে ছাড়িয়ে সে যখন প্রথম জাহাজটির দিকে রওনা হয়েছে, তখন আমার পাশের সেই নাবিকদের শ্লেষ ও কুৎসিত ইঙ্গিতে উত্তেজিত হয়ে তাড়াতাড়ি গ্যাং-ওয়ে বেয়ে তর্‌তর্‌ করে নেমে এলাম আমি। তারপরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালাম মেয়েটির। একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে অনধিকার প্রবেশ করছি, একথা সেই মুহূর্তে মনেও পড়েনি! আসতে-যেতে ইতিপূর্বেই মুখ-চেনা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি আমাকে ও'ভাবে হঠাৎ আসতে দেখে একটু চমকে গেল। কিন্তু সামলে নিলো তা' পরক্ষণেই। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললে—হ্যালো?

কণ্ঠস্বর আমার বোধ হয় রুক্ষই শোনালো। বললাম—মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে জরুরী একটা কথা আছে। একটু সরে ঐ গুমটির দিকে যাবেন কী?

—নিশ্চয়ই।

তাই এলো আমার সঙ্গে। গুমটির পিছন দিকটা একটু নির্জন। সেখানে এসে একটা যায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই প্রশ্ন [illegible]

—নিশ্চয়ই।

—তবে আপনি এ'রকম করছেন কেন?

—কী করছি!

—কী করছেন, সেটা বুঝছেন না? আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই সত্যি, কিন্তু আপনি নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন বলে সেই অধিকারেই প্রশ্ন করছি, ভারতের নৈতিক জীবনের মানদণ্ড আপনি কি স্বীকার করেন না?

সে অবাক হ'য়ে বললে,—কী বলছেন, আমি বুঝতেই পারছি না!

যথাসম্ভব অন্তরের উত্তেজনাকে শান্ত রেখে, ওকে ধীরে ধীরে বলে গেলাম, বিদেশী নাবিকদের কুৎসিত ধারণা আর মন্তব্যের কথা।

শুনতে শুনতে মুখখানা লাল হয়ে উঠল ওর। তারপরে দেখা দিলো ওর ঠোঁটের কোণে ওর অভ্যস্ত সেই মৃদু হাসিটুকু।

বললাম,—আমি নিজেও দেখেছি। আপনি প্রতিটি নাবিকের মুখের দিকে অমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কেন? এতে ওরা যে কী নীচ ভাবে আমাদের!

একটু চমকে উঠল, বললে,—কী বলছেন! 'সতৃষ্ণ দৃষ্টি?'

—হ্যাঁ।

—'সতৃষ্ণ দৃষ্টি' ফুটে ওঠে আমার চোখে? আপনি নিজেই দেখেছেন? তাই হবে, হয়ত তা-ই ফুটে ওঠে আমার চোখে।

—কিন্তু কেন?

আমার প্রশ্নে রূঢ়তাই ফুটে থাকবে সম্ভবত। চট করে মুখখানা আমার দিকে তুলেই আবার নামিয়ে নিলো। একটুক্ষণ থেমে থেকে বোধহয় নিজেকে সামলাতে লাগল। তারপরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে,—শুনবেন? আমার এক ভাই বহুদিন জাহাজে কাজ নিয়ে আমাকে ছেড়ে গেছে! তাকে দেখি না আজ দশ বছর! আমি প্রত্যেকটি জাহাজে এসে প্রত্যেকটি নাবিকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি। দশ বছরে তার কেমন চেহারা হয়েছে কে জানে! তাকে চিনে বার করবার চেষ্টা করি।

বলতে-বলতে দুটি চোখ তার ছলছল ক'রে এলো। আমি স্থাণুর মতো কয়েক মুহূর্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার-পরে আমার মনে হলো এখনি ওর সামনে থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাই! কী লজ্জা—কী লজ্জা!

নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতাম ওর কাছ থেকে, যদি ওর কথা শুনে আমার আর-একটি অদ্ভুত কথা হঠাৎই না মনে পড়ে যেতো!

অস্ফুট কণ্ঠে বললাম,—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানতাম না। কিন্তু আপনার সে কেমন ভাই? কী তার নাম? [illegible]

দ্‌টি অশ্রুপূর্ণ চোখ নীচু করতেই দ্‌টি
নর ওপরে নেমে এলো দ্‌টি ধারা।
। নেড়ে কোনক্রমে সে উত্তর দিলো,—
।

—কোন্‌ জাহাজে সে কাজ করে জানেন?
—না।

কিন্তু আমার ভিতরটা তখন অন্য এক জ্ঞাসা ও কৌতূহলে নিদারুণ উত্তেজিত। জ্ঞাসা করে ফেললাম,—আপনার ভাইয়ের ম কি সাম্‌য়েল? সাম্‌য়েল ওয়াদলকর?

প্রবল একটা চমক অনুভব ক'রে যেন হূর্তে কেঁপে উঠল সন্ন্যাসিনী। আমার খের দিকে মুখ তুলে যখন সে তাকালো, মস্ত মুখখানা নিমেষে রক্তশূন্য—সাদা য়ে গেছে। বিস্মিত, বিহ্বলকণ্ঠে সে প্রশ্ন রল,—কী! কী নাম বললেন।

—সাম্‌য়েল ওয়াদলকর।

মুখখানা ফিরিয়ে সে যেন নিজের াবেগ আর উত্তেজনাকে জয় করবার চষ্টা করছে!

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম,—আপনার ভাই।
।?

সে মাথা নেড়ে কোনক্রমে জানালো,—না।

—না!

—না। ও নামের কাউকে আমি চিনিই া।

বলেই আর দাঁড়ালো না, দ্রুত সরে গেল মামার কাছ থেকে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, জাহাজের দিকেও সে গেল না। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বন্দরের গেট-এর দকে।

আমি কি সত্যি-সত্যিই ভুল করলাম? আর এ মারাত্মক ভুলটা আমার হলোই বা কী করে? আমারই বা কী প্রয়োজন ছিল মেয়েটির সামনে গিয়ে ওকে অমনভাবে প্রশ্ন করবার? হয়ত অলক্ষিতে ওর মনে আমি কোনো আঘাতই দিয়ে ফেলেছি! এই সব কিছুর জন্য দায়ী ঐ জল্পনাকারী নাবিকগুলি!

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে ঘটনার কথাটা যতো চিন্তা করতে লাগলাম; ততই মনে হলো,—দায়ী কি মাত্র ঐ নাবিকেরাই? আমার মানসিকতাও কি এক্ষেত্রে কোনো কাজ করেনি? অফিস ঘরে গিয়ে 'হারবার-রিপোর্ট'টা দেখতে শুরু করলাম। কোন্‌ জাহাজ বন্দরে আসবে, আর বন্দর থেকে চলে যাবে, প্রতিদিন তারই এক তালিকা ছাপা হ'য়ে বেরোয়, একেই বলে 'হারবার-রিপোর্ট'। রিপোর্টে "S. S. Dumosa" জাহাজের উল্লেখ যেখানে আছে, সেখানটায় নিজেই লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছিলাম। যে-সব লাইনের জাহাজের আমি নিয়োগ-প্রাপ্ত ঠিকাদার, "S. S. Dumosa" তার মধ্যে পড়ে না। তবু লাল দাগ দিয়ে রেখে-ছিলাম এই জন্য যে, এই জাহাজে আমি একদিন নাবিক ছিলাম, এই জাহাজ আমার পরিচিত। জাহাজ এলে ক্যাপ্টেনের সংগে গিয়ে দেখা করব সেই পরিচয়েরই সূত্র ধ'রে, যদি পাওয়া যায় কোনো বাড়তি কাজকর্ম!

দেখলাম, "ডুমোসা" এসে পৌঁছবার তারিখ হচ্ছে পরশুদিন,—ভোরবেলা। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, জাহাজের সম্ভাব্য কাজ-কর্মের ব্যাপারটার কথা মনে পড়ল না, মনে পড়ল সাম্‌য়েলের কথা। আশ্চর্য ঘটনা, সাম্‌য়েল ওয়াদলকর ত এই জাহাজেরই নাবিক! অথচ তার কথাটা এর আগে একটিবারের জন্যও আমার মনে পড়েনি?

ঘর আমার তখনো 'অবিবাহিতের গুহা।' সে রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে, সমুদ্রের ধারে একটুক্ষণ বেড়িয়ে এসে, বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে যতই চিন্তাটা পরিহার করবার চেষ্টা করি, ততই মনের ওপর বার বার ভার হয়ে বসতে লাগল যার কথা,—তার নাম,—সাম্‌য়েল ওয়াদলকর।

মালবাহী জাহাজে ডেক-ডিপার্টমেন্টের সামান্য নাবিক, কালিঝুলি আর রঙ মেখে এটা-ওটা-সেটা বহুরকম কাজ করে চলেছে সারাদিন। রীতিমত কায়িক পরিশ্রম। চেহারাটা মোটামুটি মন্দ নয়। স্বাস্থ্যবান বলা চলে। জাহাজের ডেক-ডিপার্টমেন্টে ভারতের লোকই বেশী, সেদিক দিয়ে চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু সাম্‌য়েলকে আবিষ্কার করলাম এডেন-বন্দরে, আর তার-পরে আলেকজান্দ্রিয়াতে এখানে জনান্তিকে বলে রাখি, তখনকার দিনে 'এডেন' 'আলেক-জান্দ্রিয়া' এ'সব ছিল নাবিকদের কাছে 'স্বর্গ' বিশেষ। এডেনে জাহাজ থামামাত্র নাবিক-দের মধ্যে দেখা যেতো উৎসাহের প্রাবল্য। আলেকজান্দ্রিয়াতেও তাই। কতক্ষণে ছুটি হবে, কতক্ষণে সাবান দিয়ে ভালো করে স্নান করে কেতাদুরস্ত পোশাক প'রে শহরে বেড়াতে যাবে,—এই চিন্তাতেই রীতিমত অস্থির হ'য়ে উঠত তারা।

এডেনেও লক্ষ্য করেছিলাম ব্যাপারটা। আলেকজান্দ্রিয়াতেও লক্ষ্য করলাম। লক্ষ্য করলু আর থাকতে পারলাম না, নীচের ডেকে নেমে এসে পায়চারী করতে করতে জাহাজের পিছন দিকে চলে গেলাম। একটা ক্যাপস্টানের মাথায় চুপচাপ বসে ছিল লোকটি একা-একা। সবার সংগে ও-ও পেয়েছিল ছুটি। সবাই গেছে একে-একে শহরে বেড়াতে, কিন্তু এ লোকটি যায়নি। এডেনে তিনদিন ছিল জাহাজ। তিনটি দিনই ও বেরোয়নি। আলেকজান্দ্রিয়াতে এসেও ও বেরুচ্ছে না। মানুষটি অদ্ভুত ত!

আমি ছিলাম জাহাজের কেরানী, সুতরাং মাইনে পত্তরের হিসাবের ব্যাপারে জাহাজের প্রত্যেকটি লোকের সংগেই ছিল আমার সংযোগ। সে সূত্রে একেও চিনতাম, নামটাও জানতাম এর। কিন্তু একজনকে জানলেই যে সংগে সংগে তাকে চিনে ফেলব, এমন কথা বলা চলে না। ওর কাছে ব'সে প্রথমটায় একথা-সেকথা নানান গল্প জুড়ে ছিলাম ওর সংগে। ঘণ্টাখানেক গল্প করেছি, রাতও গভীর হয়ে আসছে, রাতের খাওয়া ত জাহাজে আমাদের সন্ধ্যার আগেই হয়ে যায়, সেজন্য খাওয়ার তাড়া ছিল না।

বললাম,—এক কাপ কফি খেলে হ'তো না?

বললে,—দাঁড়াও। আনছি।

বলে, ওদের 'প্যান্ট্রি'তে গিয়ে দু'কাপ কফি ঢেলে নিয়ে এলো। এক কাপ আমার হাতে তুলে দিয়ে আরেকটি কাপ নিজে নিয়েছে।

বললাম—তুমি খুব একা-একা বোধ করো, না?

সে একটু অবাকই হলো কথাটায়। বললে,—না! এই জাহাজ সমুদ্র আর আকাশ,—একা-একা লাগবে কেন?

বললাম,—ভিতরে ভিতরে তুমি কি কবি নাকি?

হেসে ফেললে, বললে,—আমি একেবারে সাধারণ মানুষ। যাকে বলে, 'নরম্যাল।'

বললাম,—উঁহু! একটু 'আবনরমালিটি' আছে, 'সুপার নরম্যালিটি'ও বলতে পারো. যাকে বলে অসাধারণত্ব।'

—কী রকম?

বললাম,—তোমার সব বন্ধুরা সাজসজ্জা করে শহরে গেল, তুমি গেলে না কেন?

—কী জন্য যাবো?

——সে কী! নতুন দেশ দেখতেও ত ইচ্ছা করে? আলেকজান্দ্রিয়াতে সচরাচর এ-সব জাহাজ আসে না।

বললে.—একটুক্ষণ শহরে বেড়িয়ে আর দেশ দেখব কী! পৃথিবীর সব যায়গাতেই শহরের চেহারা এক। সেই সাজানো দোকান, সেই হোটেল-রেস্তোরাঁ, সেই চোর-পকেটমার! বরং গ্রামের দিকে গেলে দেশ দেখা যেতে পারে! কিন্তু তার সময় আমাদের আর কোথায় মেলে, বলো!

বললাম,—এদিক দিয়ে তুমি খাঁটি ভারতীয় মনের পরিচয় দিয়েছ সামুয়েল। কিন্তু প্রশ্ন করি, শহরে আমোদ আহ্লাদের ব্যাপারও ত আছে? সেদিকেও ত তোমার ঝোঁক নেই দেখছি!

বললে,—শহরে গিয়ে যা' পাবো, সে ত জাহাজেই রয়েছে। জাহাজে খাবার-দাবারেরও অভাব নেই, সিগারেটেরও অভাব নেই, পানীয়েরও অভাব নেই।

বললাম,—একটি জিনিসের যে প্রচণ্ড অভাব রয়েছে! সেটি তুমি জাহাজে পাচ্ছ কোথায়?

সোজা হ'য়ে বসল, বললো—তুমি কীসের ইঙ্গিত করছ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি তার অভাব একটুও বোধ করি না। কী দিতে পারে মেয়েরা কয়েক মুহূর্তের জন্য? প্রকৃতির এত বড়ো ফাঁকি আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই।

উত্তরোত্তর অবাক করছিল আমাকে সামুয়েলের চরিত্র। তাই, ওকে আরও ভালো করে জানবার জন্য প্রশ্ন করলাম,—প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও?

বললে,—প্রতিনিয়তই মানুষ আজ তাই করছে। সমুদ্রে জাহাজ চালাচ্ছে, পাহাড় ফাটিয়ে পথ তৈরী করছে, আকাশে উড়ো-জাহাজ চালাচ্ছে। আমি যদি তাই করে থাকি ত, এমন বেশী কী করছি!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম,—মেয়েদের সঙ্গ তুমি কখনো পেয়েছো?

বললে,—তার মানে? আমার কি মা ছিল না? আমার কি কোন বোন ছিল না?

বললাম,—মা-বোনের কথা নয়, প্রিয়া হ'য়ে কোনও মেয়ে কি তোমার জীবনে কখনো আসেনি?

একটুক্ষণ থেমে কী যেন ভাবল, তারপরে বললে,—সে একটা ঘটনা ঘটেছিল, তখন আমার প্রথম যৌবন। আজ চল্লিশ বছর বয়সে সে কথা মনে একটুও দাগ কেলে না!

বললে,—ইচ্ছেই হয়নি।

—এখনো ত বিয়ে করতে পারো?

—না।

—কেন?

বললে,—বিয়ে করবার কোনো অভিলাষই জাগে না। আসল কথা, আমার কী অভাব আছে জীবনে, যে, একটি মেয়ে এসে সে অভাব আমার পূরণ করে দেবে? আর তাছাড়া, তোমরা যাকে 'প্রেম' বলো, আমি তাতে বিশ্বাস করি না। ওটা হচ্ছে অলস মনের কল্পনা-বিলাস। আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ, আমাদের অতো কবিত্ব নেই।

বলতে পারতাম, তোমাকে ছাড়া আরও খেটে খাওয়া মানুষ ত দেখছি এ-জাহাজের! মেয়েদের নিয়ে তাদের যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস, তার পরিচয় তাদের ঘরের দেয়ালে পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে, স্বল্পবাসা নারীদেহের ছবি টানিয়ে রাখার মধ্যে। কিন্তু সামুয়েলের থাকবার যায়গাটা আমার আগেই দেখা ছিল, তার আশেপাশে ও'সব কুরুচির কোনো চিহ্নই নেই। তাই ওসব প্রসঙ্গের অবতারণা না ক'রে অন্য কথা উত্থাপিত করলাম। অন্য কথা, অন্য প্রসঙ্গ। জাহাজের কথা, সমুদ্রের কথা।

কিন্তু ওর ঠিক যে-কথাটি জানবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ হয়েছিল, সে কথাটি জানলাম অনেক পরে, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে জাহাজ ছেড়ে দেবার পরে, সমুদ্র-পথের ওপর দিয়ে চলতে-চলতে এক তারায়-ভরা মধ্যরাত্রির অবকাশে, পুপ ডেক-এর ওপরে বসে। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই, শুধু আমরা দুজন। সমুদ্র শান্ত। জাহাজের পিছনে সাপের মতো কিলবিল করছে জলের রাশি, যেন ছোবল দিয়ে কামড়ে ধ'রে রাখতে চায় অগ্রগামী জাহাজটাকে।

সামুয়েল নিজে থেকেই হঠাৎ তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো। বললে,—গোয়ায় আমার বাড়ি। বড়ো হয়েছি, কনভেণ্টে পড়ছি উঁচু ক্লাসে, আমি বাপ-মার একমাত্র ছেলে। এমন সময়, আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগলেন, তার পরে হার্ট ফেলিওর। বাবা সেই থেকে কীরকম হয়ে গেলেন যেন। আমাদের পরিবারে আর একজন ছিল, সে ডরেজ, আমার আপন জ্যেঠামশায়ের মেয়ে। ছোট থেকেই ওর মা নেই, আমার মাকেই 'মা' বলে জানত। জ্যেঠামশায় বাইরে বাইরে থাকতেন, সৈন্যবিভাগে চাকরী করতেন, গত যুদ্ধে মারা যান। কিন্তু আমি বলছিলাম বাবার কথা। বাবাকে ঘরে রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করত ডরেজ। যথেষ্ট সেবা-যত্ন করত। কিন্তু বাবা একদিন কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হলেন। এসেছিলেন ফিরে বেশ রোগী, অনেক চিকিৎসাপত্র করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না।

কিন্তু এ'ত গেল আমার জীবনের পট-ভূমিকা। যে-কথা তোমার জানবার ইচ্ছা—সে অন্য কাহিনী। সেই প্রথম যৌবনে যাকে ভালবেসেছিলাম, তার নাম,—মারিয়া। আজ হাসি পায়, কিন্তু তখন তার জন্য যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি খরচপত্র চালাবার জন্য তখন পার্টটাইম চাকরী করি একটা বড়ো ওষুধের দোকানে, ঘন ঘন কামাই করে করে চাকরীটা সেদিন হারাতে বসেছিলাম আর কী! ডরেজও তখন চাকরী করছে বাধ্য হয়ে। কোন্ অফিসে ঠিক মনে নেই। সেই অফিসেরই এক কর্মচারী ছিল, পরে রাজনৈতিক অপরাধে চাকরী যায় তার, নাম,—বিনায়ক পেন্ধারকর,—তাকে আবার ভালোবেসে ফেলেছিল ডরেজ। সে যে গোয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন নেপথ্য-কর্মী, একথা একদিন জানতে পেরে, —তাকে তাড়াতাড়ি সাবধান করতে গেছি, ডরেজ বললে,—জানি।

ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ঘর, তবু তাকে ডরেজ ভালোবেসেছিল রাজনৈতিক নির্যাতনের সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। 'ওয়াদলকর' আমাদের বংশের প্রাচীন উপাধি, সেই এক-কালে যখন আমরা হিন্দু ছিলাম, সেই তখনকার। আমার পিতা বা পিতৃব্য কেউ তা ব্যবহার করতেন না,—প্রথম বয়সে আমরাও না। ডরেজ পুনঃপ্রবর্তিত করল এই উপাধি, সম্ভবত বিনায়ক পেন্ধারকরের প্ররোচনায়। এমনকি কোর্টে 'এফিডেভিট' করে আমারও নাম পর্যন্ত বদল করা হলো ডরেজের আগ্রহে। দুজনেই 'ওয়াদলকর' হলাম, ডরেজ আর আমি।

একদিন, একটু হেসে বললাম,—'ওয়াদল-কর' ত হলাম, কিন্তু ডরেজ 'পেন্ধারকর' হচ্ছে কবে?

লজ্জায় মুখখানা টুকটুকে লাল হয়ে উঠল ওর। দুজনে প্রায় সমবয়সী, দু' এক বছরের এদিক-ওদিক হতে পারে হয়ত কারুর বয়স। কিন্তু সম্পর্কটা ছিল, অনেকটা বন্ধুর মতো। বললে,—'পেন্ধারকর' নিশ্চয়ই হবো।

—কবে?

একটু ভেবে বললে,—গোয়ার মুক্তি-আন্দোলন যেদিন শুরু হবে, সেদিন।

বললাম,—তা হয়ো, কিন্তু নিজে যেন ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়ো না। রাজনীতি সবার জন্য নয়।

কোনো উত্তর করল না, হাসতে লাগল মিটিমিটি।

আমার এ-প্রসঙ্গের পালটা প্রশ্ন ও উত্থাপিত করল দিন কয়েক পরে। জিজ্ঞাসা করল,—মারিয়া আমাদের ঘরে আসছে কবে?

লজ্জিত হলাম, কথাটা শুনে। বললাম,—তুমি জানলে কী করে? মারিয়া ত আমাদের পাড়ার মেয়ে নয়! তার বাড়ি অনেক দূরে।

বললে,—বিনায়কের কথা তুমিই বা জানলে কী করে?

সেই থেকে একটা সন্ধি হলো দুজনের মধ্যে। দুজনেই দুজনের কাছে সব-কিছু এসে বলব, কোনো কিছু গোপন করব না।

আমার ব্যাপারে ওরই উৎসাহ বেশী। হয়ত একদিন জিজ্ঞাসা করল,—আজ কোথায় দেখা হলো? গীর্জার পিছন দিককার মাঠের মধ্যে, শিরীষ গাছটার আড়ালে? তুমি ত পুরুষ, ছেড়ে কথা কইবে না। মারিয়া কি চুম্বনের প্রতিদান দিলো?

ভয়ানক লজ্জিত হতাম। বলতাম,—অসভ্য! নিজের আর বিনায়কের ব্যাপারটাই আমাদের ওপর দিয়ে বলা হচ্ছে, আমি কী বুঝি না?

মুখখানা ওর রাঙা হয়ে উঠত, বলতো,—এ-ও চমৎকার সভ্যতা প্রকাশ করা হচ্ছে!

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতাম,—যাক্, সন্ধি স্থাপিত হল। বিনায়কের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো আজ, বলো?

বলত সে কথা। বলত বিনায়কের স্বপ্নের কথা। আমিও বলতাম। বলতাম, —মারিয়া বলেছে, আমার হাসির ভঙ্গিটা নাকি খুব সুন্দর!

—বটে!—ডরেজ আগ্রহের সঙ্গে মুখের দিকে তাকাতো, বলতো—একটু হাসোত দেখি?

—যাঃ!—বলে সরে আসতাম।

কিন্তু, হার হলো একদিন আমারই। পেদ্রো বলে আমারই এক সহপাঠী একদিন জয় করে নিলো মারিয়াকে। আমার সঙ্গে মারিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হয়েছিল সেদিন, যেন আমার সমস্ত জীবনটা শূন্য হয়ে গেছে! অন্ধকার হয়ে গেছে আমার চারিদিক! মাঠে-মাঠে, পথে-পথে নিজের মনে একা-একা ঘুরে বেড়াই, পড়াশুনাও ভালো লাগে না। বাড়ি যখন ফিরি, তখন একটা কৃত্রিম আনন্দের হিল্লোল মনের মধ্যে প্রবাহিত করে রাখি। ডরেজ জিজ্ঞাসা করে,—আজ কী বললে মারিয়া?

মিথ্যা করে বানিয়ে বানিয়ে বলি—অনেক কথা বলেছে মারিয়া। ঠোঁটের কোণে চুমু পর্যন্ত খেয়েছে সে।

ডরেজ একটু যেন লজ্জা পেলো কথাটায় প্রথমে। তারপরে বললে,—মুখের বাঁধন আলগা হয়েছে দেখছি।

আরেক দিন।

বললে, কোথায়-কাথায় বেড়ালে আজ?

মিথ্যা করে বললাম,—আজ সাইকেলের রডে ওকে বসিয়ে অনেক দূরে সাইক্লিং করে এলাম,—একেবারে গাঁয়ের মধ্যে,—ক্যানেলের ধার পর্যন্ত।

তারপর?

বললাম,—হাওয়ায় ওর চুলগুলি ফুর-ফুর করে উড়ছিল, আর আমার মুখের ওপর এসে পড়ছিল বারবার।

সাগ্রহে প্রশ্ন করল,—তারপর?

বানিয়ে বানিয়ে বললাম,—যতোবার ও মুখ ফেরাচ্ছিল, ততবার ওর সেই আশ্চর্য নরম গালের একটা পাশ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমার ঠোঁট। সত্যি কথা বলতে কী, এক-একবার ওর গালটা ইচ্ছা করে চেপে ধরছিল আমার ঠোঁটের ওপরে।

বলতে বলতে শেষের দিকে গলা আমার কেঁপে গিয়েছিল বুঝি। কিন্তু সতর্ক হয়ে চুপ করে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

দেখি, দুটি চোখ ওর কখন ভরে গেছে জলে। আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলে যেতেই মুখ নীচু করে টেবিলে মুখখানা রাখল। তারপরে, মনে হলো, ফুলে ফুলে ও কাঁদছে, আকুল হয়ে।

এগিয়ে গিয়ে হাতটা রাখলাম ওর পিঠের ওপরে। কোমলকণ্ঠে ডাকলাম,—ডরেজ?

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলে ডরেজ বললে,—মারিয়া ও তোমার ভালবাসা অক্ষয় হোক। কিন্তু বিনায়ক আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

চমকে উঠলাম মনে মনে। বললাম,—বলছ কী!

বললে,—তোমাকে জানাই নি। লুকিয়ে রেখেছিলাম খবরটা। বিনায়ক চলে গেছে বেলগাঁওয়ে। সেখানে বিয়ে করেছে। শুধু তা-ই নয়, রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত ও ছেড়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অবশেষে বললাম,—এ কী রকম করে হলো?

বললে,—আমার সঙ্গে ভালবাসা ওর সব ভান। ওর যৌবনের মোহ মাত্র!

নিথর, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একটি কথাও বলি নি।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। কাজ থেকে ফিরে এসে বাড়িতে আছি দেখে ও বললে,—বেরুবে না? যাবে না মারিয়ার কাছে?

একটু চমকে উঠেই বললাম,—ও, হ্যাঁ। যাই।

কিন্তু কোথায় যাব? অনির্দিষ্টকাল এধারে-ওধারে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরে এলাম।

পাশাপাশি দুখানি ঘর আমাদের। ভাড়া-বাড়ি। আগে অন্য দিকেও দুখানা ঘর ছিল। খরচে পোষাবে না বলে বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি। যাই হক, আমি এসেছি টের পাওয়ামাত্র ও আমার ঘরে এসে, বললে, —আজ কি বললে মারিয়া?

বলতে সেদিন আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল, মনে হল, চোখের জল এখুনি মুখের ওপর গড়িয়ে পড়বে বুঝি!

এগিয়ে এসে হাত ধরে ঝাঁকি দিল, বললে,—বলো না? বলবে না?

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—আজ একটা গাছের নীচে ও আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। বলেছিল,—এভাবে শুয়ে আমি অনন্তকাল কাটিয়ে দিতে পারি।

বললে,—চমৎকার ত! আমি দেখা করব মারিয়ার সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—অমন কাজও করো না। তার সঙ্গে কখনো দেখা করো না! ভীষণ লজ্জা পাবে।

—কেন?

বললাম,—তোমাকে যে খুঁটিনাটি সব বলি, সে তা জানে কিনা!

অভিযোগের সুরে ডরেজ বললে,—তুমি তাকে বললে কেন আমার কথা!

চুপ করে রইলাম।

এমনি করে রোজ-রোজ তাকে বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে মারিয়ার কথা। দিনের পর দিন। তার ঘরটিতে থাকবে ডরেজ, কোথাও বেরুবে না,—আর অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্য। আমার সেবাযত্ন করেই তার স্নেহের শেষ নেই, আমার প্রতিটি কথা পর্যন্ত তার শুনতে হবে।

বলতে পারতাম,—যা তোমাকে বলি, সব মিথ্যে কথা। এমন কি, মারিয়া এখানে নেই পর্যন্ত। পেদ্রোকে নিয়ে সে বম্বে চলে গেছে। সেখানে বোধ হয় বিয়েও হয়ে গেছে ওদের এতদিনে।

গোয়ার এমন একটা অঞ্চলে আমরা থাকতাম যে, কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না সেখানে। আর, এ ধরনের প্রেম আর বিচ্ছেদ, ওখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কে যে কখন কাকে ভালবাসছে, আর কাকে ত্যাগ করছে,—এসব সংবাদ কারুর মনে বোধ হয় বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলে না। নইলে, আমার আর মারিয়ার বিচ্ছেদের খবর নিশ্চয়ই এতদিনে ওর কানে এসে পৌঁছত। আর তা ছাড়া ও নিজেও তেমন মিশুকে বা হৈ-চৈ-করা মানুষ ছিল না। একটু নির্জনতা পছন্দ করত, আর ছিল বই পড়ার শখ। প্রতিবেশী বা প্রতিবেশিনী কারুর সঙ্গে ওর তেমন ভাব-সাবও ছিল না।

যত ভাব আর বন্ধুত্ব ঐ আমার সঙ্গে সেই ছোট থেকেই।

অকপটে আমার সব কথা ওকে বলব, এই ছিল শর্ত, কিন্তু সত্যি কথাটা আর ওকে বলতে পারতাম না। মনে হত, আমার

বললাম,—তোমার সব বন্ধুরা সাজসজ্জা ক'রে শহরে গেল, তুমি গেলে না কেন?

—কী জন্য যাবো?

——সে কী! নতুন দেশ দেখতেও ত ইচ্ছা করে? আলেকজান্দ্রিয়াতে সচরাচর এ-সব জাহাজ আসে না।

বললে,—একটুক্ষণ শহরে বেড়িয়ে আর দেশ দেখব কী! পৃথিবীর সব যায়গাতেই শহরের চেহারা এক। সেই সাজানো দোকান, সেই হোটেল-রেস্তোরাঁ, সেই চোর-পকেটমার! বরং গ্রামের দিকে গেলে দেশ দেখা যেতে পারে! কিন্তু তার সময় আমাদের আর কোথায় মেলে, বলো!

বললাম,—এদিক দিয়ে তুমি খাঁটি ভারতীয় মনের পরিচয় দিয়েছ সামুয়েল। কিন্তু প্রশ্ন করি, শহরে আমোদ আহ্লাদের ব্যাপারও ত আছে? সেদিকেও ত তোমার ঝোঁক নেই দেখছি!

বললে,—শহরে গিয়ে যা' পাবো, সে ত জাহাজেই রয়েছে। জাহাজে খাবার-দাবারেরও অভাব নেই, সিগারেটেরও অভাব নেই, পানীয়েরও অভাব নেই।

বললাম,—একটি জিনিসের যে প্রচণ্ড অভাব রয়েছে! সেটি তুমি জাহাজে পাচ্ছ কোথায়?

সোজা হ'য়ে বসল, বললো—তুমি কীসের ইঙ্গিত করছ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি তার অভাব একটুও বোধ করি না। কী দিতে পারে মেয়েরা কয়েক মুহূর্তের জন্য? প্রকৃতির এত বড়ো ফাঁকি আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই।

উত্তরোত্তর অবাক করছিল আমাকে সামুয়েলের চরিত্র। তাই, ওকে আরও ভালো করে জানবার জন্য প্রশ্ন করলাম,—প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও?

বললে,—প্রতিনিয়তই মানুষ আজ তাই করছে। সমুদ্রে জাহাজ চালাচ্ছে, পাহাড় ফাটিয়ে পথ তৈরী করছে, আকাশে উড়ো-জাহাজ চালাচ্ছে। আমি যদি তাই করে থাকি ত, এমন বেশী কী করছি!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম,—মেয়েদের সঙ্গ তুমি কখনো পেয়েছো?

বললে,—তার মানে? আমার কি মা ছিল না? আমার কি কোন বোন ছিল না?

বললাম,—মা-বোনের কথা নয়, প্রিয়া হ'য়ে কোনও মেয়ে কি তোমার জীবনে কখনো আসেনি?

একটুক্ষণ থেমে কী যেন ভাবল, তারপরে বললে,—সে একটা ঘটনা ঘটেছিল, তখন আমার প্রথম যৌবন। আজ চল্লিশ বছর বয়সে সে কথা মনে একটুও দাগ ফেলে না!

বললাম,—বিয়ে করো নি কেন?

বললে,—ইচ্ছেই হয়নি।

—এখনো ত বিয়ে করতে পারো?

—না।

—কেন?

বললে,—বিয়ে করবার কোনো অভিলাষই জাগে না। আসল কথা, আমার কী অভাব আছে জীবনে, যে, একটি মেয়ে এসে সে অভাব আমার পূরণ করে দেবে? আর তাছাড়া, তোমরা যাকে 'প্রেম' বলো, আমি তাতে বিশ্বাস করি না। ওটা হচ্ছে অলস মনের কল্পনা-বিলাস। আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ, আমাদের অতো কবিত্ব নেই।

বলতে পারতাম, তোমাকে ছাড়া আরও খেটে খাওয়া মানুষ ত দেখছি এ-জাহাজের! মেয়েদের নিয়ে তাদের যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস, তার পরিচয় তাদের ঘরের দেয়ালে পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে, স্বল্পবাসা নারীদেহের ছবি টাঙিয়ে রাখার মধ্যে। কিন্তু সামুয়েলের থাকবার যায়গাটা আমার আগেই দেখা ছিল, তার আশেপাশে ও'সব রুচির কোনো চিহ্নই নেই। তাই ওসব প্রসঙ্গের অবতারণা না ক'রে অন্য কথা উত্থাপিত করলাম। অন্য কথা, অন্য প্রসঙ্গ। জাহাজের কথা, সমুদ্রের কথা।

কিন্তু ওর ঠিক যে-কথাটি জানবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ হয়েছিল, সে কথাটি জানলাম অনেক পরে, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে জাহাজ ছেড়ে দেবার পরে, সমুদ্র-পথের ওপর দিয়ে চলতে-চলতে এক তারায়-ভরা মধ্যরাত্রির অবকাশে, পুপ ডেক-এর ওপরে ব'সে। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই, শুধু আমরা দুজন। সমুদ্র শান্ত। জাহাজের পিছনে সাপের মতো কিলবিল করছে জলের রাশি, যেন ছোবল দিয়ে কামড়ে ধ'রে রাখতে চায় অগ্রগামী জাহাজটাকে।

সামুয়েল নিজে থেকেই হঠাৎ তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো। বললে,—গোয়ায় আমার বাড়ি। বড়ো হয়েছি, কনভেণ্টে পড়ছি উঁচু ক্লাসে, আমি বাপ-মার একমাত্র ছেলে। এমন সময়, আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগলেন, তার পরে হার্ট ফেলিওর। বাবা সেই থেকে কীরকম হয়ে গেলেন যেন। আমাদের পরিবারে আর একজন ছিল, সে ডরেজ, আমার আপন জ্যেঠামশায়ের মেয়ে। ছোট থেকেই ওর মা নেই, আমার মাকেই 'মা' বলে জানত। জ্যেঠামশায় বাইরে বাইরে থাকতেন, সৈন্যবিভাগে চাকরী করতেন, গত যুদ্ধে মারা যান। কিন্তু আমি বলছিলাম বাবার কথা। বাবাকে ঘরে রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করত ডরেজ। যথেষ্ট সেবা-যত্ন করত। কিন্তু বাবা একদিন কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হলেন। এসেছিলেন ফিরে বেশ কিছুদিন পরে। সেদিন তিনি ভ্রূপুসীর রোগী, অনেক চিকিৎসাপত্র করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না।

কিন্তু এ'ত গেল আমার জীবনের পটভূমিকা। যে-কথা তোমার জানবার ইচ্ছা—সে অন্য কাহিনী। সেই প্রথম যৌবনে যাকে ভালবেসেছিলাম, তার নাম,—মারিয়া। আজ হাসি পায়, কিন্তু তখন তার জন্য যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি খরচপত্র চালাবার জন্য তখন পার্টটাইম চাকরী করি একটা বড়ো ওষুধের দোকানে, ঘন ঘন কামাই করে করে চাকরীটা সেদিন হারাতে বসেছিলাম আর কী! ডরেজও তখন চাকরী করছে বাধ্য হয়ে। কোন্ অফিসে ঠিক মনে নেই। সেই অফিসেরই এক কর্মচারী ছিল, পরে রাজনৈতিক অপরাধে চাকরী যায় তার, নাম,—বিনায়ক পেন্ধারকর,—তাকে আবার ভালোবেসে ফেলেছিল ডরেজ। সে যে গোয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন নেপথ্য-কর্মী, একথা একদিন জানতে পেরে, —তাকে তাড়াতাড়ি সাবধান করতে গেছি, ডরেজ বললে,—জানি।

ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ঘর, তবু তাকে ডরেজ ভালোবেসেছিল রাজনৈতিক নির্যাতনের সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। 'ওয়াদলকর' আমাদের বংশের প্রাচীন উপাধি, সেই এক-কালে যখন আমরা হিন্দু ছিলাম, সেই তখনকার। আমার পিতা বা পিতৃব্য কেউ তা ব্যবহার করতেন না,—প্রথম বয়সে আমরাও না। ডরেজ পুনঃপ্রবর্তিত করল এই উপাধি, সম্ভবত বিনায়ক পেন্ধারকরের প্ররোচনায়। এমনকি কোর্টে 'এফিডেভিট' করে আমারও নাম পর্যন্ত বদল করা হলো ডরেজের আগ্রহে। দুজনেই 'ওয়াদলকর' হলাম, ডরেজ আর আমি।

একদিন, একটু হেসে বললাম,—'ওয়াদল-কর' ত হলাম, কিন্তু ডরেজ 'পেন্ধারকর' হচ্ছে কবে?

লজ্জায় মুখখানা টুকটুকে লাল হয়ে উঠল ওর। দুজনে প্রায় সমবয়সী, দু' এক বছরের এদিক-ওদিক হতে পারে হয়ত কারুর বয়স। কিন্তু সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বন্ধুর মতো। বললে,—'পেন্ধারকর' নিশ্চয়ই হবো।

—কবে?

একটু ভেবে বললে,—গোয়ার মুক্তি-আন্দোলন যেদিন শুরু হবে, সেদিন।

বললাম,—তা হয়ো, কিন্তু নিজে যেন ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়ো না। রাজনীতি সবার জন্য নয়।

কোনো উত্তর করল না, হাসতে লাগল মিটিমিটি।

আমার এ-প্রসঙ্গের পাল্টা প্রশ্ন ও উত্থাপিত করল দিন কয়েক পরে। জিজ্ঞাসা করল,—মারিয়া আমাদের ঘরে আসছে কবে?

সে আমার প্রথম যৌবন। আমিও ভয়ানক

লজ্জিত হলাম, কথাটা শুনে। বললাম,—তুমি জানলে কী করে? মারিয়া ত আমাদের পাড়ার মেয়ে নয়! তার বাড়ি অনেক দূরে।

বললে,—বিনায়কের কথা তুমিই বা জানলে কী করে?

সেই থেকে একটা সন্ধি হলো দুজনের মধ্যে। দুজনেই দুজনের কাছে সব-কিছু এসে বলব, কোনো কিছু গোপন করব না।

আমার ব্যাপারে ওরই উৎসাহ বেশী। হয়ত একদিন জিজ্ঞাসা করল,—আজ কোথায় দেখা হলো? গীর্জার পিছন দিককার মাঠের মধ্যে, শিরীষ গাছটার আড়ালে? তুমি ত পুরুষ, ছেড়ে কথা কইবে না। মারিয়া কি চুম্বনের প্রতিদান দিলো?

ভয়ানক লজ্জিত হতাম। বলতাম,—অসভ্য! নিজের আর বিনায়কের ব্যাপারটাই আমাদের ওপর দিয়ে বলা হচ্ছে, আমি কী বুঝি না?

মুখখানা ওর রাঙা হয়ে উঠত, বলতো,—এ-ও চমৎকার সভ্যতা প্রকাশ করা হচ্ছে!

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতাম,—যাক্, সন্ধি স্থাপিত হল। বিনায়কের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো আজ, বলো?

বলত সে কথা। বলত বিনায়কের স্বপ্নের কথা। আমিও বলতাম। বলতাম,—মারিয়া বলেছে, আমার হাসির ভঙ্গিটা নাকি খুব সুন্দর!

—বটে!—ডরেজ আগ্রহের সঙ্গে মুখের দিকে তাকাতো, বলতো—একটু হাসো ত দেখি?

—যাঃ!—বলে সরে আসতাম।

কিন্তু, হার হলো একদিন আমারই। পেদ্রো বলে আমারই এক সহপাঠী একদিন জয় করে নিলো মারিয়াকে। আমার সঙ্গে মারিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হয়েছিল সেদিন, যেন আমার সমস্ত জীবনটা শূন্য হয়ে গেছে! অন্ধকার হয়ে গেছে আমার চারিদিক! মাঠে-মাঠে, পথে-পথে নিজের মনে একা-একা ঘুরে বেড়াই, পড়াশুনাও ভালো লাগে না। বাড়ি যখন ফিরি, তখন একটা কৃত্রিম আনন্দের হিল্লোল মনের মধ্যে প্রবাহিত করে রাখি। ডরেজ জিজ্ঞাসা করে,—আজ কী বললে মারিয়া?

মিথ্যা করে বানিয়ে বানিয়ে বলি—অনেক কথা বলেছে মারিয়া। ঠোঁটের কোণে চুমু পর্যন্ত খেয়েছে সে।

ডরেজ একটু যেন লজ্জা পেলো কথাটায় প্রথমে। তারপরে বললে,—মুখের বাঁধন আলগা হয়েছে দেখ্‌ছি।

আরেক দিন।

বললে, কোথায়-কাথায় বেড়ালে আজ?

মিথ্যা করে বললাম,—আজ সাইকেলের রডে ওকে বসিয়ে অনেক দূরে সাইক্লিং করে এলাম,—একেবারে গাঁয়ের মধ্যে,—ক্যানেলের ধার পর্যন্ত।

তারপর?

বললাম,—হাওয়ায় ওর চুলগুলি ফুর্‌-ফুর্‌ করে উড়ছিল, আর আমার মুখের ওপর এসে পড়ছিল বারবার।

সাগ্রহে প্রশ্ন করল,—তারপর?

বানিয়ে বানিয়ে বললাম,—যতোবার ও মুখ ফেরাচ্ছিল, ততবার ওর সেই আশ্চর্য নরম গালের একটা পাশ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমার ঠোঁট। সত্যি কথা বলতে কী, এক-একবার ওর গালটা ইচ্ছা করে চেপে ধরছিল আমার ঠোঁটের ওপরে।

বলতে বলতে শেষের দিকে গলা আমার কেঁপে গিয়েছিল বুঝি। কিন্তু সতর্ক হয়ে চুপ করে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

দেখি, দুটি চোখ ওর কখন ভরে গেছে জলে। আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলে যেতেই মুখ নীচু করে টেবিলে মুখখানা রাখল। তারপরে, মনে হলো, ফুলে ফুলে ও কাঁদছে, আকুল হয়ে।

এগিয়ে গিয়ে হাতটা রাখলাম ওর পিঠের ওপরে। কোমলকণ্ঠে ডাকলাম,—ডরেজ?

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলে ডরেজ বললে,—মারিয়া ও তোমার ভালবাসা অক্ষয় হোক। কিন্তু বিনায়ক আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

চমকে উঠলাম মনে মনে। বললাম,—বলছ কী!

বললে,—তোমাকে জানাই নি। লুকিয়ে রেখেছিলাম খবরটা। বিনায়ক চলে গেছে বেলগাঁওয়ে। সেখানে বিয়ে করেছে। শুধু তা-ই নয়, রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত ও ছেড়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অবশেষে বললাম,—এ কী রকম করে হলো?

বললে,—আমার সঙ্গে ভালবাসা ওর সব ভান। ওর যৌবনের মোহ মাত্র!

নিথর, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একটি কথাও বলি নি।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। কাজ থেকে ফিরে এসে বাড়িতে আছি দেখে ও বললে,—বেরুবে না? যাবে না মারিয়ার কাছে?

একটু চমকে উঠেই বললাম,—ও, হ্যাঁ। যাই।

কিন্তু কোথায় যাব? অনির্দিষ্টকাল এধারে-ওধারে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরে এলাম।

পাশাপাশি দুখানি ঘর আমাদের। ভাড়া-বাড়ি। আগে অন্য দিকেও দুখানা ঘর ছিল। খরচে পোষাবে না বলে বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি। যাই হক, আমি এসেছি টের পাওয়ামাত্র ও আমার ঘরে এল, বললে,—আজ কি বললে মারিয়া?

বলতে সেদিন আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল, মনে হল, চোখের জল এখুনি মুখের ওপর গড়িয়ে পড়বে বুঝি!

এগিয়ে এসে হাত ধরে ঝাঁকি দিল, বললে,—বলো না? বলবে না?

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—আজ একটা গাছের নীচে ও আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। বলেছিল,—এভাবে শুয়ে আমি অনন্তকাল কাটিয়ে দিতে পারি।

বললে,—চমৎকার ত! আমি দেখা করব মারিয়ার সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—অমন কাজও করো না। তার সঙ্গে কখনো দেখা করো না! ভীষণ লজ্জা পাবে।

—কেন?

বললাম,—তোমাকে যে খুঁটিনাটি সব বলি, সে তা জানে কিনা!

অভিযোগের সুরে ডরেজ বললে,—তুমি তাকে বললে কেন আমার কথা!

চুপ করে রইলাম।

এমনি করে রোজ-রোজ তাকে বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে মারিয়ার কথা। দিনের পর দিন। তার ঘরটিতে থাকবে ডরেজ, কোথাও বেরুবে না,—আর অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্য। আমার সেবাযত্ন করেই তার স্নেহের শেষ নেই, আমার প্রতিটি কথা পর্যন্ত তার শুনতে হবে।

বলতে পারতাম,—যা তোমাকে বলি, সব মিথ্যে কথা। এমন কি, মারিয়া এখানে নেই পর্যন্ত। পেদ্রোকে নিয়ে সে বম্বে চলে গেছে। সেখানে বোধ হয় বিয়েও হয়ে গেছে ওদের এতদিনে।

গোয়ার এমন একটা অঞ্চলে আমরা থাকতাম যে, কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না সেখানে। আর, এ ধরনের প্রেম আর বিচ্ছেদ, ওখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কে যে কখন কাকে ভালবাসছে, আর কাকে ত্যাগ করছে,—এসব সংবাদ কারুর মনে বোধ হয় বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলে না। নইলে, আমার আর মারিয়ার বিচ্ছেদের খবর নিশ্চয়ই এতদিনে ওর কানে এসে পৌঁছত। আর তা ছাড়া ও নিজেও তেমন মিশুকে বা হৈ-হৈ-করা মানুষ ছিল না। একটু নির্জনতা পছন্দ করত, আর ছিল বই পড়ার শখ। প্রতিবেশী বা প্রতিবেশিনী কারুর সঙ্গে ওর তেমন ভাব-সাবও ছিল না।

যত ভাব আর বন্ধুত্ব ঐ আমার সঙ্গে সেই ছোট থেকেই।

অকপটে আমার সব কথা ওকে বলব, এই ছিল শর্ত, কিন্তু সত্য কথাটা আর ওকে বলতে পারতাম না। মনে হত, আমার

আর মারিয়ার কল্পিত কাহিনীর মধ্যে। ও নিজের আর বিনায়কের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। আর, পায় বলেই ব্যর্থ প্রেমের সেই মর্মান্তিক দুঃখকে জয় করতে পারছে।

সেদিন বেরুবার মুখে হঠাৎ ঝম-ঝম করে বৃষ্টি এল। আর ও অঞ্চলে বৃষ্টি একবার নামলে আর সহজে থামতে চায় না, বোধ হয় তোমরা শুনে থাকবে। আমার ঘরে এসে আমার পাশ ঘেঁষে বসল, বলল—কী হবে!

—কীসের কী হবে?

—আজ কী করে যাবে তুমি মারিয়ার কাছে?

বললাম,—বৃষ্টি হচ্ছে ভীষণ। আজ যাব না।

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপরে আমার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে রইল নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে।

একটু বিব্রতবোধ করে বললাম,—কী দেখছ অমন করে?

গাঢ় কণ্ঠে বললে,—মারিয়া নিশ্চয়ই তোমার কথা ভাবছে। তুমি আজ যেতে পারবে না, তোমাকে ও আজ দেখতে পাবে না, মেয়েদের মনে এযে কী যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, তা তুমি জান না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম,—আমি কী করব, বলতে পার?

আমার দুটি হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে,—বলব, কী করবে?

—বলো।

বললে,—বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়। ওর বাড়ি চলে যাও। হয়ত তুমি একটু ভিজে যাবে, কিন্তু ও যা খুশী হবে, সে তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

আগেই ত বলেছি, আমার কল্পিত প্রেম-কাহিনীর মধ্যে ও নিজের প্রেমের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছে। তাই ওর মনের কথা ভেবেই সেদিন বর্ষাতি নিয়ে সেই অঝোর-ঝরন বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঘণ্টাখানেক এধারে ঘুরে, ওধারে ঘুরে, এখানে দাঁড়িয়ে, ওখানে দাঁড়িয়ে, তারপরে বাড়ি ফিরলাম। বৃষ্টি তখনো সমানে পড়ছে।

ও কিন্তু অবাক হল, বললে,—এ কী, ফিরে এলে? ভীষণ ভিজে গেছ যে!

শুরু হল ওর সেবা। আমার মাথাটা তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুছে দিয়ে, গায়ের জামাটা খুলিয়ে দিয়ে বললে,—শীগ্গির প্যাণ্ট ছেড়ে ফেল। আমি এক গ্লাস দুধ গরম করে নিয়ে আসি তোমার জন্য।

আমি নীরবে ওর স্নেহ আর সেবা উপভোগ করে চলেছি। বাইরে এই, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে যে কী ব্যথায় সেদিন গুমরে মরেছি, তা আজ বলে বোঝাতে পারব না।

আমি পা-জামা আর শার্ট পরে বিছানায় একটু শুয়েছি, ও এল দুধের গ্লাস নিয়ে।

—এটা খেয়ে ফেল দেখি?

খেলাম। গেলাসটা যথাস্থানে রেখে এসে ও আবার এল আমার ঘরে। অন্যদিন চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে বসে, কিন্তু আজ একেবারে বসল এসে বিছানায়, আমার কোলের কাছে, হাঁটু মুড়ে। বললে,—মারিয়া ছেড়ে দিলে?

বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু বললাম,—ছাড়তে কী চায়? জোর করে চলে এলাম।

—এখানে ওকে আসতে বল না কেন?

—বলেছি। চায় না আসতে। বলে, লজ্জা করবে।

ভরেজ বললে,—বুঝেছি। এবার পাশ-টাশ করে বেরোও, চাকরি খোঁজো, তারপরে ওকে বিয়ে করে ফেল। ওর মা-বাপের মত হবে ত?

—খুব। এই যে গেলাম। আমরা এক ঘরে রইলাম। মা-বাপ এসে একবারও খোঁজ নিল না। প্রশ্রয় না থাকলে কি এটা কেউ করে?

—বটেই ত।

ওর একটা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম,—কিন্তু, তোমার খবর কী? এমনি একা-একা জীবন কাটাবে?

—একা কোথায়? অফিসে কাজ করছি ত?

—তা ত করছ। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস,—তা ছাড়া যে আর কিছুই জান না!

বললে,—তুমি ত আছ।

—আমি আর কতটুকু? —বললাম,—আমি বলি কি, তুমিও এবার দেখে-শুনে কাউকে নির্বাচন কর।

মুখের ওপর দিয়ে একটা কালো ছায়া মুহূর্তের জন্য খেলে গেল যেন। বললে,—অফিসে বিনায়কের পোস্টে যে এসেছে, সে লোকটির মন পড়েছে দেখছি আমার দিকে। কেন এমন হয়? ঐ পোস্টেরই দোষ, না কি? বলো, তোমাকে যে দেখবে, সেই প্রেমে পড়বে। এত সুন্দর তুমি!

উৎসাহের সঙ্গে উঠে বসেছি, বললাম,—তার পর? কেমন সে লোক? আলাপ করিয়ে দাও?

একটু ম্লান হেসে বললে,—অত উৎসাহিত হয়ো না। কয়েকদিন বড় বিরক্ত করছিল আমাকে। শেষ পর্যন্ত, বিয়ের প্রস্তাবই করে বসল। আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি বলা যায়। বলেছি,—আমি এন্‌গেজড্। আমি বাগ্‌দত্তা।

বললাম,—কেন এটা করলে? মানুষটি কী ভাল নয়?

—ভাল। খুবই সুপুরুষ।

—তবে?

বললে,—আমার ভাল লাগে নি। সে যখন একদিন আমার হাতটা হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিল, মনে হচ্ছিল, যেন একটা জন্তু আমাকে গ্রাস করতে আসছে! সেদিন বোধ হয় তার গালে আমি ঠাস করে একটা চড়ই বসিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

বললাম,—ভুল করেছ। এমনটা কী করতে আছে?

—কেন করতে নেই!—উত্তেজিত কণ্ঠে ভরেজ বললে,—তোমার মারিয়াকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, সে এক তুমি ছাড়া অন্য কোনও পরপুরুষের স্পর্শ সহ্য করতে পারবে না।

এ-কথায় কী যে হল প্রতিক্রিয়া আমার মনের মধ্যে, বলে ফেললাম,—অথচ ঠিক সে সহ্য করছে!

—কী! কী বললে!

বললাম,—তোমাকে এযাবৎ সমস্ত কিছুই মিথ্যা বলেছি। মারিয়া বহুদিন হল আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে বিয়ে করেছে অন্যকে!

মনে হল, তার মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে কে যেন মুহূর্তে! সে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। বাইরে তখন বিরাম নেই ঝরো-ঝরো বর্ষণের। তারপরে অনেক—অনেক কষ্টে সে কথা বললে। বললে,—তা হলে, এই যে বৃষ্টিতে তুমি ভিজে এলে, কোথাও তুমি যাও নি? পথে-পথে ঘুরে এসে? তোমাকে আমিই এমন করে ঠেলে দিয়েছি বৃষ্টির মধ্যে?

বলতে বলতে দুটি চোখ তার ভরে এসেছিল জলে, আবেগে থরথর করে কাঁপছিল তার সর্বশরীর! কোনক্রমে সে যেন মূর্ছাকে রোধ করলো। আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি দুহাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে না ধরলে সে হয়ত পড়েই যেত খাট থেকে!

তারপর থেকে, দুজনে যেন দুজনের কাছে পরিণত হলাম দুটি যন্ত্রে। কারণ, সেদিনকার সেই বৃষ্টির দিনে হঠাৎ-ই অমন করে দুজনের কাছে দুজনে এসে পড়া,—তার মধ্য দিয়ে যেন আমরা হঠাৎ-ই এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে পৌঁছেছিলাম। বুঝেছিলাম—ঝড়ে ডানা-ঝট্‌পট্‌-করে পড়ে যাওয়া দুটি পাখির মতো আমরা কাছাকাছি এসে পড়েছি পরস্পরের, যেখান থেকে ফেরার পথ বোধ করি আর নেই!

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। কাছে এসে কী এক প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথা বলতে বলতে হঠাৎ-ই দুটি হাত দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলল। বললে,—এমনভাবে আর চলতে পারি না। মনে হচ্ছে, আমি কোথাও চলে যাই।

বললাম,—না চলবার মত কী হয়েছে শুনি?

কী এক অদ্ভুত আবেগ ওকে বুঝি অধিকৃত করেছিল সেই মুহূর্তে। বললে,—না-না বিশ্বাস নেই।

—কাকে? আমাকে?

—না—না।

—তবে?

—দুজনকেই।

বললাম,—একথা মনে হচ্ছে কেন? আমার দিক থেকে তোমার কোনো শঙ্কা নেই।

বললে,—আমার দিক থেকেও নেই।

—তবে?

বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। তবু বললে,—যৌবনকে বিশ্বাস নেই।

চমকে উঠলাম। এবং প্রচণ্ড এ চমক। আমারও সেদিন মনে হয়েছিল, সেটা ভাল নয়, কোনো দিক দিয়েই ভাল নয়।

তাই, একদিন জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে আমি ভেসে পড়লাম। ও-ও ঢুকল গিয়ে এক চ্যাপেলে। 'নান্' হল। যাকে বলে সন্ন্যাসিনী। পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম, যতদিন আমাদের যৌবন আছে, সাক্ষাৎ করব না। আজ একে তোমরা পাগলামি বলতে পারো, কিন্তু সেদিন আমাদের তা' মনে হয়নি। মনে হয়েছিল অন্য এক কথা। তাই ঠিক করেছিলাম,—যেদিন বুঝব, দুজনের সান্নিধ্য দুজনের কাছে পবিত্রই থাকবে, সেদিন সাক্ষাৎ হলে দুজনেই ফিরে আসব দুজনের কাছে। অর্থাৎ যেদিন দুজনে বুঝব, সম্পর্ক আমাদের মাত্র স্নেহেরই, প্রেমের নয়,—সেদিন যদি দেখা হয় দুজনের, ফিরে আসব!

সেদিন জাহাজে, নিশীথ রাত্রে সামুয়েলের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, বিচিত্র এক জগতের কাহিনী শুনছি! এবং এই কাহিনীর অভিনবত্ব মনকে এমনই সেদিন নিবিষ্ট করেছিল যে, তার স্মৃতি আমি কোনদিনও ভুলতে পারি নি, হয়ত পারবও না।

পরের দিন, যেমন বিকেলের দিকে পুনর্বার জাহাজের দিকে যাই, তেমনি যাচ্ছিলাম, গেট ছাড়াবার একটু পরেই শুনতে পেলাম মৃদু কণ্ঠস্বর,—শুনুন?

থমকে দাঁড়ালাম। দেখি, সেই সন্ন্যাসিনী। কাস্টমস ঘরে বোধ হয় আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল বসে, আমাকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

কাছ বরাবর এসে বললে,—মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আজ আমারই একটা জরুরী কথা আছে।

—বলুন?

পথ ছেড়ে একটু ধারে সরে এসে ধীরে ধীরে বললে,—আমি কাল আপনাকে মিথ্যে বলেছি। সামুয়েল ওয়াদলকর আমারই ভাই। আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। মুখখানা কেমন যেন পাংশুবর্ণ দেখাল, চোখের নিচে ক্লান্তির কালিমা। বললাম,—তা হলে কাল কোনো অন্যায় ব্যবহার আমি করি নি? আপনি কিছু মনে করেন নি ত?

বললে,—না।

বললাম,—কাল ভোরে আসছে এস এস ডুমোসা, আপনার ভাই ঐ জাহাজেই আছে।

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল,—বলছেন কী! সামুয়েল আসছে!

—হ্যাঁ। কাল সকালে আসবেন আপনি ডুমোসা জাহাজে। নিশ্চয়ই দেখা হবে। দেখা করতে চান ত?

—নিশ্চয়ই। আমি তাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাব।

পরদিন সকালে যথারীতি এলো ডুমোসা। বয়ায় বাঁধা হল তাকে। একটা নৌকো করে গেলাম জাহাজে। জাহাজের প্রায় সবাই আমার পরিচিত। দু-তিনজন নতুন লোক আছে মাত্র। ক্যাপ্টেন খুব খুশী হল আমাকে দেখে, কিছু কাজও দিল। কাজটাজ সংগ্রহ করে অতঃপর খুঁজে বার করলাম সামুয়েলকে। সেই রকমই আছে চেহারা। একটু রোগা-রোগা মনে হল যেন শুধু। বললে,—বয়স বাড়ছে ত?

বললাম তাকে সব। বললাম, ডরেজের কথা।

সে শুনে অবাক হয়ে গেল প্রথমটায়। তারপরে অদ্ভুত উৎসাহ লক্ষিত হল তার মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে আমার সঙ্গে। তীরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পেলাম না ডরেজকে। সামুয়েল বললে—তুমি আমার পুরনো বন্ধু। আমার সঙ্গে সেই বন্ধুত্বের খাতিরে খুব কৌতুক করলে যা হক।

বললাম,—একেবারেই কৌতুক নয়। নিশ্চয়ই সে এসেছে। এসো, তাকে খুঁজে বার করি।

—কর। এ জাহাজের চাকরি আর ভাল লাগছে না। তার দেখা পেলে এবার সত্যি সত্যি দেশেই চলে যাব।

বললাম,—সে-ও সেকথা বলেছে আমার কাছে।

—বলেছে! যাক বাঁচা গেল। আর কী, জীবনটা ত কাটিয়েই দিলাম। দুজনে মিলে খালি ছুটি আর ছুটি! কিন্তু, আসল ব্যাপারটা কী? কোথায় সে?

উত্তর দিতে পারি নি। পোর্টে সে আসে নি। হয়ত আসতে পারেনি চ্যাপেল থেকে। সামুয়েলকে নিয়ে একটা গাড়ি করে চললাম চ্যাপেলের দিকে। রেল-স্টেশনের কাছে একটা পাহাড়তলীর কাছে বিরাট চ্যাপেল।

দেখা করলাম মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে। বললেন,—সিস্টার ডরেজ? সে ত বদলি নিয়ে আজ ভোরের ট্রেনেই উটকামণ্ড চলে গেছে! বদলির কথা বহু দিনই সে নিজেই ঠেকিয়ে রেখেছিল। সব সময়ই সে পোর্টগুলিতে বদলি হতে চাইত। এবার গেল সেই পাহাড়ে, একেবারে উটকামণ্ড!

চুপচাপ ফিরে আসছিলাম গীর্জার লাল কাঁকরের পথ দিয়ে পাশাপাশি দুজনে। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারিনি আমি। মনে হচ্ছিল, আমি অপরাধ করেছি, সামুয়েলের কাছেও বটে, ডরেজেরও কাছে বটে।

স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এসে একটা গাড়ি পেলাম। তাতে উঠে বসবার পর সামুয়েলই প্রথম কথা বললে।

বললে,—আসল কথা, এখনো আমাদের সময় হয়নি।

মুখে ওর বিচিত্র হাসি। আমার বিমর্ষ, নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার বললে,—সময় আমাদের আর কখনো হবে না। আর হয়েই বা লাভ কী? তোমরা যাকে 'প্রেম' বল সে হচ্ছে কল্পনাবিলাস! ওকে পরিহার করে চলাই ভাল।

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

ব্যাপারটা খুব সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে শীতকালে ঘ'টেছিল—ঠিক বছর আর তারিখটা মনে প'ড়ছে না। গয়া থেকে ক'লকাতা ফিরছি। দেহরাদুন এক্সপ্রেস ধ'রবো। গয়াতে রাত্রি ৮৷৷/৯টার দিকেতে এক্সপ্রেস পৌঁছায়, তার পরদিনে ভোরে ক'লকাতায় নামিয়ে দেয়। সঙ্গে একখানি মধ্যম শ্রেণীর রিটার্ন টিকিটের ফিরতি অংশ আছে। মালপত্র নেই, একটা বালিশ, চাদর ও কম্বল। রবিবার রাত্রের ট্রেনে গয়া থেকে বেরিয়ে সোমবার ভোরে ক'লকাতায় পৌঁছাবো। সোমবারের দিনই কলেজে ক্লাস নিতে হবে, সুতরাং আমার রবিবারের গাড়িতে আসা চাই।

ইস্টিশানে পৌঁছে দেখলুম, ট্রেন যথাকালে এলো, কিন্তু কেন জানি না, গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভীড় দেখলুম। মধ্যম শ্রেণীর কোন কামরায় তো ঢুকতেই পারা যায় না, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলিতেও লোকে মেঝেতে বিছানা ক'রে নিয়ে, কোথাও বা ব'সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতেই হোক, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই হোক, মধ্যমেই হোক, আর তৃতীয় শ্রেণীতেই হোক, আমাকে কোনোরকম ক'রে ফিরে যেতেই হবে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলির অবস্থা দেখে কোন গাড়ির কাছে যেতে সাহস হ'লো না। লোকে জানলা দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকছে, জানলা দিয়ে নামছে। দরজা বন্ধ, ফলে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারছে না। এই ট্রেনটি গয়াতে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। সমস্ত ট্রেন একবার ঘুরে দেখবার মতলবে ইঞ্জিনের দিকে চ'লেছি, এমন সময় দেখি, একটা বড় তৃতীয় শ্রেণীর 'বোগি'র কাছে একেবারেই লোকের ভীড় নেই। অন্য সব গাড়িতে ঢুকবার জন্য প্রায় মারামারি হ'চ্ছে, কিন্তু এই গাড়ির কাছটার প্লাটফর্ম যেন একেবারে খালি। গিয়ে দেখি, এই বিরাট গাড়িখানি গুটিকতক কাবুলীওয়ালার দখলে। তারা সংখ্যায় জন ১৫র বেশী হবে না, কিন্তু এই বিরাট বোগিটি তারা নিজেরা দখল ক'রে ব'সে আছে। কেউ সেখানেতে গেলে বা জানলা দিয়ে উঁকি মারলে, হুংকার ছাড়ছে—"ইয়ে গাড়ি তোমারা ওয়াস্তে নেহি—কো তুম উদর্।" জবরদস্ত চেহারার কাবুলীওয়ালারা এই হুংকার দ্বারা লোক ঠেকিয়ে রাখছে। সেখানে যাত্রীরা ব্যাপার দেখে কেউ আর ভিড়ছে না। রেলের কোনো কর্মচারী বা পুলিস এর ত্রি-সীমানাতেও ঘেঁষছে না। সমস্ত ট্রেনটি পর্যবেক্ষণ ক'রে এসে দেখলুম, যেতে হ'লে আমাকে এই গাড়িতে উঠে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গেই যেতে হবে। তখন ঠিক ক'রলুম, এই গাড়িতেই ঢুকবো। আমার সাহস হ'চ্ছে খালি এইজন্য যে, আমি ২।৪টি ফার্সী কথা ব'লতে পারি। কাবুলীওয়ালারা, যারা খাস আফগানিস্থানের বাসিন্দা, যারা বিশেষতঃ কাবুল শহরের লোক, তারা সকলেই ফার্সী জানে। ফার্সী হ'চ্ছে আফগানিস্থানের শিক্ষিত জনের ভাষা, উচ্চ ও ভদ্র সমাজের ভাষা, সরকারী ভাষা। অন্ততঃ তখন তাই ছিল। পশতু ভাষার সম্মান তখন ছিল না। পশতু-ভাষীরাও নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা বড়ো একটা পোষণ ক'রতো না। একে তো পশতু-ভাষী লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব, আর তার উপর তাদের ভাষায় সাহিত্যও তেমন নেই। তাছাড়া, এখন আফগানিস্থান ব'লতে যে দেশ বুঝায়, তার অনেকটা জুড়ে সাধারণ অধিবাসীরা ঘরে ফার্সীই বলে, পশতু বলে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে পাঠানরা থাকে, তাদের মধ্যে ফার্সীর জ্ঞান ততটা নেই। ফার্সী-জানা লোক কম। আমার মনে হ'লো, এদের মধ্যে ফার্সী বলাটা যখন একটা শিক্ষা আর আভিজাত্যের লক্ষণ, তখন আমি যদি এদের সঙ্গে ফার্সীতে একটু কথা বলি, তাহ'লে ওরা প্রথমতঃ একটু হকচকিয়ে যাবে, বাঙালীবাবুর মুখে ফার্সী শুনে, আর তারপরে তারা হয়তো আমার জন্য জায়গাও ক'রে দিতে পারে। জবরদস্ত আর মারমুখী হ'লেও, আমি জানি যে এই পাঠানদের মধ্যে আবার একটু শিশু-সুলভ ভাবও আছে। তবুও আমার নিজের মনে যে একটু আশংকা ছিল না, তা নয়—কারণ আমার ফার্সীর দৌড় খুব বেশী দূর অবধি নয়। ফার্সী ভাষা-তত্ত্ব প'ড়েছি; প্রাচীন পারসীক আর অবস্তার ভাষা, আর পহলবী ভাষার চর্চা কিছুটা ক'রেছি, তা নিয়ে একটু অধ্যাপনাও ক'রেছি; রোমান অক্ষরে ছাপা দু'চারখানা ফার্সী গল্পের বই প'ড়েছি, কিছু কবিতার বইও প'ড়েছি;—এইটুকু জানাই আমার সম্বল। কিন্তু একটানা লম্বা কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। তবু, আমাকে এই গাড়িতে ফিরতেই হবে, কাজেই কাবুলেওয়ালাদের কেল্লা-স্বরূপ এই গাড়িকে আক্রমণ করাই ঠিক ক'রলুম।

সোজা গিয়ে গাড়ির হাতল ধ'রে, দরজাটা আধ-খোলা ছিল—আরো টেনে খুলে, ভিতরে ঢুকতে যাবো, এমন সময় ৫।৬ জন গুরু-গম্ভীর স্বরে হুংকার দিয়ে উঠ্‌লো,—"কিদর আতে হো? ইয়ে গাড়ি তুম লোক-কে ওয়াস্তে নেহী, সির্ফ হম পঠান লোগ ইসমে' জাতে হৈঁ।" আমি এর জবাব দিলুম ফার্সীতে—"ম-রা জগহ্ বি-দেহ, বরায়ে সির্ফ য়ক্ আদমী।" অর্থাৎ, আমাকে জায়গা দাও, খালি একজন মানুষের জন্য। যা অনুমান ক'রেছিলুম,—ওরা একটু যেন হতভম্ব হ'য়ে গেল। একজন আমার কথা না বুঝতে পেরে ব'ললে—"ক্যা মাংগতা?" আমি আবার ফার্সীতে—ব'ললুম "ফার্সী ন-মী-দানী? ফার্সী ন-মী-গোয়ী?" অর্থাৎ, ফার্সী জানো না? ফার্সী ব'লতে পারো না? খুব সম্ভব, এদের মধ্যে ফার্সী-জানা লোক ছিল না। তখন আমি নিজের গলাটা চড়িয়ে একটু উপহাসের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে ব'ললুম—"অজ্ চি তর্ফ-ই-আফগানিস্তান মী-আমদী, কি দর-জবান-ই-ফার্সী গুফৎ-গু কর্দনে, তাকৎ-ই-শুমা নীস্ত্?"—আফগানিস্থানের কোন্ অঞ্চল থেকে আসছো যে ফার্সীতে কথা বলবার ক্ষমতা তোমাদের নেই? যখন তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রছে, তখন গাড়ির ভিতর থেকে একটি ছোকরা ব'ললে—"ম্যান্ ফার্সী মী-গোয়ম্; চি খুাহী?" অর্থাৎ, আমি ফার্সী জানি—কি চাও? আমি উত্তর দিলুম—"মন্ গুফ্‌তা বুদম্—ম-রা জগহ্ বিদেহ্।"—আমি তো ব'ললুম, আমাকে জায়গা দাও। তখন সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কুজা মী-রভী?", অর্থাৎ কোথায় যাবে? জবাব দিলুম—"দর্ শহর্ কলকত্তা বি-রভম্।" ক'লকাতা শহরে যাবো।

এতক্ষণ আর সব কাবুলীওয়ালারা ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখছিল, আর এ...

একটু নূতনত্ব তাদের কাছে ঠেকলো। তখন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগ্‌ল। ইশারায় দলের অনুমতি পেয়ে, ফার্সী-বলিয়ে' ছোকরাটি ব'ললে—"খ্যাচ্চে, অন্দর বি-আ"—আচ্ছা, ভিতরে এসো। আমি ভিতরে ঢুকতেই, সেই বিরাট্‌ 'বোগি'র একটা পুরো বেঞ্চি এরা খালি ক'রে আমাকে ছেড়ে দিলে। একটুখানি তার সংগে সমীহ ভাবও ছিল, যেন এক মস্ত আলেম এসেছেন। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল।

প্রথম ধাক্কা তো সামলালুম। তারপর? যদি এরা বাস্তবিকই ফার্সী-বলিয়ে' হয়, তাহ'লে তো আমার সিংহ-চর্মের তলায় অন্য চর্ম দেখা যাবে। কিন্তু গুরু-বলে বুঝতে পারা গেল, এরা সবাই হ'চ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর Pathan Tribal Area অর্থাৎ ইংরেজদের অধীনস্থ পাঠান উপজাতি-অঞ্চলের লোক, খাস কাবুলীর মতন সাধারণতঃ এরা ফার্সী জানে না। এটা আমার পক্ষে ভারী সুবিধার আর স্বস্তির কথা হ'ল, কারণ এদের সংগে বাকী যা আলাপ হ'ল প্রায় সবই হিন্দুস্থানীতে। ২।১ জন মাঝে মাঝে এক এক লব্জ ফার্সী ব'ললে বটে, কিন্তু বেশী দূর এগোলো না।

ট্রেন চ'লছে। চারদিকে বেশ ক'রে তাকিয়ে' নিলুম, প্রায় জন ১৬ পাঠান এই গাড়ির যাত্রী। সমস্ত গাড়িখানা বাসি কাপড়-চোপড়, দেহের ঘর্ম এবং তার সংগে হিংএর উগ্র গন্ধে ভরপুর। এই অপূর্ব সৌরভের সংমিশ্রণ—যুগপৎ আমার নাসা-রন্ধ্রকে আক্রমণ ক'রলে। যাক, শোবার তো জায়গা পেয়েছি, চাদর পেতে বালিশ রেখে কম্বল বিছিয়ে' বিছানা ক'রে নিয়ে ঠিক হ'য়ে ব'সবো। দেখি, এদেরও ইচ্ছা আমার সংগে একটু আলাপ করে। একটুখানি দূরে একটি বৃদ্ধ পাঠান আমাকে ঢুকতে দেখে, শোয়া অবস্থা থেকে উঠে খাটমমালা হ'য়ে আসন নিয়ে ব'সেছিল—টংরের উপরে আমাকে নিবিষ্টচিত্তে দেখে একটুখানি পরে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"বাবু বাঙলাদেশের থুন্‌ নি আইছ?" আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"আগা সাহেব, তোমার ব্যবসা কোথায়? বাঙলাদেশে ডেরা কোথায়?" বৃদ্ধ পাঠানটি ব'ললে—"পড়ুয়াহালি বাবু, ধান্‌ নি ভালো হইছে—ধান ভালো হ'য়েছে কি?" বুঝলুম, আগা সাহেবের ব্যবসা হ'চ্ছে শীতবস্ত্র আর হিং বিক্রী করা, আর চাষীদের টাকা ধার দেওয়া। বাঙলার পল্লী অঞ্চলে, বরিশালের পটুয়াখালি বন্দরে তার কেন্দ্র। পরে তাঁর সংগে কথা ব'ললুম—তিনি বরিশাল্যা ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতনই ব'লতে পারেন, ক'লকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। একজন পাঠান একটু আর্তি ক'রে আমায় ব'ললে—"বাবু, তুম ডরো মৎ, অগর কোঈ পুছেগা কি তুম্‌ বংগালী পাঠানোঁকী গাড়ি মেঁ কাহে সৈর করতে হো, তো হম লোগ বোলেগা, উও হমারা বাবু হৈ, হমারা হিসাব লিখতা হৈ।" তার দরদ দেখে খুশী হ'লুম, যাতে আমি সগৌরবে এদের সংগে চ'লতে পারি, এদেরই যেন একজন হ'য়ে, সেইটি তাদের ইচ্ছে। —আমাকে কলকাতার "কাবুলী ব্যাঙ্ক"-এর হিসাবনবীস কেরাণী বা ম্যানেজারের মর্যাদা দিলে।

আমি ব'সে ব'সে এদের সংগে আলাপ জমাবার চেষ্টা ক'রলুম। এরাই সে বিষয়ে বেশী আগ্রহান্বিত। যারা যারা লম্বা হ'য়ে উপরের বার্থে শুয়ে' ছিল, তারা প্রায় সবাই উঠে ব'সল, আমাকে নিরীক্ষণ ক'রতে লাগ্‌ল। আমি একটু আত্মীয়তা ক'রে একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে গাইয়ে' বাজিয়ে' লোক আছে—আপলোগোমেঁ গবৈয়া কোঈ হৈ?" কাবুলীওয়ালার মধ্যে গায়কের সন্ধান ক'রছি—ব্যাপারটা এদের কাছেও একটু অপ্রত্যাশিত। একজন এক কোণ থেকে একথা শুনে ব'ললে—"আপ গানেকা শোকীন হৈঁ? কোনসা গানা সুনেংগে?" আমি ব'ললুম—"তোমরা কেউ খুশহাল খাঁ খট্টকের গজল জানো?" (খুশহাল খাঁ খট্টক হ'চ্ছেন সম্রাট্‌ আকবরের সময়ের মানুষ, পাঠানদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাতে একটি পাঠান, যে উপরের বার্থে ছিল, ভারী খুশী হ'ল, আর উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ব'ললে—"খুশহাল খাঁ খট্টকের গজল শুনবে? বাবু, তুমি আমাদের সব খবরই জানো। আচ্ছা, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।" এই ব'লে সে পশতু ভাষায় রচিত পাঠান কবি খুশহাল খাঁ খট্টকের গজল ধ'রলে। একটা ফার্সী প্রবাদ আছে—"আরবী আকল, ফার্সী শকর; হিন্দী নমক, তুর্কী হুনর; ওঅ বরায়ে পশ্‌তো, আওয়াজ-এ-খর।" অর্থাৎ আরবী হ'চ্ছে জ্ঞান, ফার্সী চিনি; হিন্দী নুন, আর তুর্কী হ'চ্ছে হুনর বা শিল্প; কিন্তু পশ্‌তুর কথা ধ'রলে, গাধার ডাক। এই প্রবাদটা সম্পর্কে আশা করি পশতু যার মাতৃভাষা এমন পাঠানের কাছে কেউ ব'লবেন না, তাহ'লে হয়তো তাঁর স্বাস্থ্যের হানি হ'তে পারে! কিন্তু এই প্রবাদটিকে যেন সত্য প্রমাণ ক'রেই আমার পাঠান গাইয়ে' বন্ধু বিকট আওয়াজে গান ধ'রলেন। ভাবের সংগে, কখনও-কখনও কানে হাত দিয়ে, কখনও বুকে হাত দিয়ে, গানের কলি গাইতে লাগলেন। তারপর ঢাকের বাদ্যি থামলেই যেমন মিষ্টি লাগে তাঁর গান থামল। ভাষার সব কথা আমার বুঝার শক্তির বাইরে, তবে দু'চারটে "মুহব্বৎ" আর "দিল" আর "দর্দ" আর "আশিক" ইত্যাদি কথা শুনে' বুঝলুম, এ প্রেমের গান বটে। এই শব্দগুলি না থাকলে বুঝবার সহজ উপায় ছিল না। তিনি একটি গান শোনালেন। আর একটি হয়তো শোনাতে চাইবেন। আমি তখন অতি সহজ আর সরলভাবে বিষয়ান্তরের অবতারণা ক'রলুম "আচ্ছা, বাহনা বেশ; ধন্যবাদ। পশতু গজল তো শোনালে; এখন আদম খান আর দুরখানীর মোহব্বতের কিস্‌সা কেউ জানো?" স্বাতে পাঠানদের একজনের খুব উৎসাহ হ'ল। ব'ললে—"কি ব'লছ বাবু, আদম-খাঁ দুরখানীর কিস্‌সা শুনবে? এ তো দিল-ভাঙা কাহিনী। আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।" এই ব'লে সে আবার তার কর্কশ যদিও গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে এই কিস্‌সা কতকটা গান ক'রে আর কতকটা পাঠ ক'রে যেতে লাগ্‌ল।

এইভাবে আমরা দেহরাদুন এক্সপ্রেসের সেই থার্ড ক্লাস গাড়িখানিতে যেন এক পশ্‌তু সাহিত্য গোষ্ঠী বা সম্মেলন লাগিয়ে' দিলুম। তবে আমার জানা ছিল যে এদের ভাষায় সাহিত্যের বইয়ের সংখ্যা এক হাতের আঙুলে গুনে শেষ করা যায়। একটা খোঁজ নিলুম, "গঞ্জ দ-পুখতুন্‌" অর্থাৎ পখতু বা পশতু ভাষী জাতির ইতিহাস, এই বইয়ের খবর কেউ রাখে কি না। এরা কি ক'রে রাখবে? এরা দেহাতী লোক, কিছু চাষবাস করে, কিছু তেজারতী বা ব্যবসা করে—তাও হ'চ্ছে আবার মুসলমান ধর্ম-মতে হারামের ব্যবসা—সুদখোরের কারবার। এরা আর পশতু ইতিহাসের আর সাহিত্যের কি খবর রাখবে? তবে এই কথা শুধানোতে আমার পাণ্ডিত্যের পসার আরও খুব বেড়ে গেল এদের মধ্যে।

আমার সামনের বেঞ্চেতে দুই পাঠান সহযাত্রী নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছে, শুনলুম। পশতু ভাষা বুঝি না, কিন্তু এই ভাষায় প্রচুর ফার্সী আর আরবী শব্দ আছে, কাজেই উর্দুটা একটু জানা থাকলে, অনেক শব্দ বুঝতে পারা যায়, আর তার সাহায্যে, কি বিষয়ে আলাপ হ'চ্ছে সেটা বুঝতে দেরী হয় না। শুনলুম, আমাকে উল্লেখ ক'রে তাদের মাতৃভাষায় ব'লছে—এই যে বদ-জাৎ হারামজাদ বঙ্গালী কৌম, এরা ভারী ইলমদার আর আকল-মন্দ, অর্থাৎ এরা খুব বিদ্বান আর বুদ্ধিমান্‌। দেখছো না, ইংরেজদের লেখা সব বই প'ড়ে আর ফার্সী প'ড়ে, এই বাবু আমাদের সম্বন্ধে কত খবর জানে, যায় আমাদের খাস দেহাতী কথাও জানে? বাঙালী জাতির মানুষকে "হারামজাদ" আর "বদ-জাৎ" ব'লে সহজ ভাবে উল্লেখ করার মধ্যে গালাগালির উদ্দেশ্য ছিল না; এটা হ'চ্ছে কথার মাত্রা, কাফের হিন্দু বাঙালীর সম্বন্ধে এ সব শব্দ তো প্রযোজ্য ব'লেই মনে

ক'রে থাকে; তবে একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাঁর ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি আত্মীয়তা দেখিয়ে ব'লতেন, My dear rascals—এ সেই ভাবের কথা।

পাঠান দেশে পাঠানদের মধ্যে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার কথা কোনও বাঙলা মাসিক পত্রে প'ড়েছিলুম—সে কথা মনে হ'চ্ছে। তিনি আর তাঁর এক বন্ধু একবার বাসে চ'ড়ে পেশাওয়ার থেকে লান্ডীকোটালের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে পাহাড় থেকে পাঠানেরা গাছ আর পাথর ফেলে রাস্তা বন্ধ ক'রে ঐ বাস আটকায়, তার পরে বন্দুকধারী পাঠান হামলাদার দস্যু, দেখে দেখে জনকতক লোককে গাড়ি থেকে নামিয়ে' নিলে। এদের মধ্যে ৩।৪ জন হিন্দু ব্যবসায়ী ছিল—ঐ অঞ্চলের হিন্দু। আর ছিল বাঙালী যাত্রী দুটি। হিন্দু ব'লেই এদেরও ধ'রে নিয়ে চ'লল। কেউ আপত্তি ক'রলে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে খোঁচা দিতে থাকে, আর বন্দীদের এইভাবে ঠেলতে ঠেলতে আর টানতে টানতে পাহাড়ে দেশের মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাই করিয়ে', ঘণ্টা তিনেক হাঁটিয়ে এক পাঠান গাঁয়ে এনে হাজির ক'রলে। এদের উদ্দেশ্য, বন্দীদের দিয়ে তাদের আত্মীয়দের কাছে চিঠি লেখাবে—ধ'রে এনেছে পাঠানেরা, এত টাকা চায়, পেলে ছাড়ান দেবে, নইলে প্রাণে মারবে। যে যেমন দরের লোক, সেইটে অনুমান ক'রে, ২০০০।৫০০০ টাকা যেমন সুবিধে মনে করে চেয়ে বসে। দর-দস্তুর ক'রে, একটা আপস-মত টাকা চেয়ে চিঠি লেখায়, পরে টাকা এলে বন্দীদের খালাস ক'রে দেয়। কখনও কখনও বহুদিন ধ'রে আটক রাখে, কচিৎ প্রাণেও মেরে ফেলে। ইংরেজরা সব সময়ে কিছু ক'রতে পারত না; আর এভাবে পাঠানরা ইংরেজদের ঘাঁটাত' না, হিন্দু বানিয়াদেরই উপর ছিল তাদের লক্ষ্য। যাক, বন্দীদের তো নিয়ে তারা একটা খোলা জায়গায় বসিয়ে' রাখলে, তার পরে টাকা নিয়ে ছাড় পাবার কথা হবে। ইতিমধ্যে দয়া ক'রে এদের খাবার জন্য পাঠান খাদ্য কিছু এলো—বিরাট বিরাট গোল আকারের পাঠান রুটি, আর ভেড়ার মাংসের কাবাব। পশ্চিম-পাঞ্জাবের আর সীমান্ত-প্রদেশের হিন্দুরাও এ জিনিস খেতে অভ্যস্ত। বাঙালী দুজনের কাছে এই খাবার এলো', হুকুম হ'ল—"বিখোর", অর্থাৎ "খাও"। এ'রা তো একে শ্রান্ত, ক্লান্ত; অনভ্যস্ত খাবারের চেহারা দেখে হাত গুটিয়ে' ব'সে রইলেন। পাঠানরা পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগ্‌ল, "খাও", যেন খেতেই হবে। তখন এ'দের একজন হিন্দুস্থানীতে ব'ললেন, "আমরা বাঙালী, এ খাবার আমরা খেতে পারি না।" কথাটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। যখন ওরা শুনলে যে দুজন বাঙালী বাবুকে তারা ধ'রে এনেছে, তখন তাদের মধ্যে যেন একটা আলোড়ন এসে গেল। সব পরস্পর বলাবলি ক'রতে লাগ্‌ল—এ দুজন বাঙালী। তখন এদের চেহারা একেবারে বদলে' গেল। সকলে এসে এ'দের সঙ্গে শেক্-হ্যাণ্ড করে, আর খুব আর্তি দেখায়, আর বলে, "এই বঙ্গালী, তুম হম বাই।"—অর্থাৎ তোমরা আর আমরা পরস্পর ভাই। এ'রা তো এই ভাবান্তর দেখে বিস্মিত। তখন হিন্দুস্থানীতেই একজন ব্যাখ্যা ক'রলে, "আমাদের দুশমন ইংরেজ খালি দুটী জিনিসকে ভয় করে, বাঙালীর বোমা আর পাঠানের রাইফল্। অতএব আমরা ভাই।" তখনি এক গামলা দুধ এলো' এদের জন্য, অন্য খাবার এলো, আর তার পরে টাকা কড়ির কথা না তুলেই একটু ক্ষমা চেয়ে সসম্মানে ওদের বড়ো সড়কে পৌঁছে দেওয়া হ'ল। আমি ব'ঙালী ব'লে, আমার সহযাত্রী এই পাঠানদের মধ্যেও বোধ হয় এই ভাবের একটা ভ্রাতৃভাব, মনের কোণে গুপ্ত বা সুপ্ত থাকা অসম্ভব ছিল না।

প্রসংগতঃ বলি, এদের যে-সমস্ত বিভিন্ন "খেল্" বা উপজাতি আছে, আর এদের দেশে কতকগুলি বিখ্যাত স্থান আছে, ভূগোল আর ইতিহাস পড়ার দৌলতে সেই সবের নাম একবার মাঝে এদের শুনিয়ে দিয়েছিলুম।—যেমন "য়ুসুফজাই", "মোহমন্দ", "ওয়াজিরী", "জাকাখেল", "আফ্রিদী" প্রভৃতি জাতির কথা, "লান্ডীকোটাল, জালালাবাদ, কাবুল, হাজারা, কোহাট, খুরেম, তিরাহ, লোরালাই" প্রভৃতি ভৌগোলিক নামের কথা আমার মুখে শুনেছে; কাজেই এদের ধারণা, আমি ওদের সম্বন্ধে একটা মস্ত ওয়াকিফহাল ব্যক্তি। ওদের দু-একটা ঘরের কথাও জিজ্ঞাসা ক'রলুম। যেমন, ওখানে এবার মেওয়া কেমন হ'য়েছে, দুম্বার মাংসের দাম কিরকম এখন। আর যে বৃদ্ধ পাঠানটি পটুয়াখালিতে থেকে ব্যবসা করেন তিনি একটি খুব কারুকার্য করা "পুস্তীন" অর্থাৎ ভেড়ার লোমের সদরী বা ওয়েস্ট-কোট প'রেছিলেন। এইরূপ চামড়ার পুস্তীন জামায় ভেড়ার লোমটা থাকে ভিতরের দিকে, আরামপ্রদ নরম পশম গায়ের উপরেই থাকবে ব'লে; আর বাইরে চামড়ার উপর রঙীন রেশমের সুতো আর জরী দিয়ে ছুঁচের কাজ থাকে। সেই বুড়ো আগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—এই রকম পুস্তীন জামার দাম কি রকম হয়। আগা সাহেবের আবক্ষ ধবধবে' সাদা দাড়ি, মুখখানি অতি প্রশান্ত, একেবারে ঋষিকল্প চেহারা, আর মানুষটিও ভালো ব'লে মনে হ'ল—সে ব'ললে—"বাবু জিনিস বুঝিয়া দর, দশ টাকা থাক্যা ১৫০।২০০ টাকা পর্যন্ত দাম হয়। বাবু, তুমি আমাদের দেশে আইও। তোমারে ভালো পুস্তীন আমরা কিনিয়া দিমু।"

পাঠানদের প্রায় প্রত্যেকেই ক্রমে এক একটি বেঞ্চ বা বার্থ দখল ক'রে শোবার চেষ্টা ক'রলে। তখন রোজার সময়। সকলেই আগে সান্ধ্য আহার সেরে নিয়েছিল। আমার বেশ ভাল ঘুম হ'ল। এদের সঙ্গে থেকে, গাড়ির ভিতরকার সৌরভে আমার নাসিকাটিও ক্রমে অভ্যস্ত হ'য়ে গেল। তার পরের দিন খুব ভোরেই উঠে দেখি, এদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে নমাজ প'ড়ছে, আর সারাদিন রোজার উপোস ক'রতে হবে বলে খুব ভোরে ভর-পেট খেয়ে নিচ্ছে—বড় বড় পাঠান রোটী আর কাবাব। পটুয়াখালীর বৃদ্ধ আগা সাহেবকে দেখি, আগেই উঠে ব'সে তসবীহ বা মালাজপ ক'রছেন—"নব্বদ্-ও-নও অসমা-ই-হাসানা" অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরানব্বইটি পবিত্র ও সুন্দর নাম, মালার এক একটা দানা গুণে গুণে আবৃত্তি করা হয় নীরবে। আমার ঘুম ভাঙতে আর তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে তিনি আমাকে "সুখ-সৌস্তিক" প্রশ্ন শুধালেন,— "বাবু, কাইল রাইতে একটু কাইত হইবার পারছিলা?" অর্থাৎ কাল রাত্রে একটু কাত হ'তে বা নিদ্রা দিতে পেরেছিলে? এটা যে স্বাভাবিক ভদ্রতা-প্রণোদিত, সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি বোধ হয় আসানসোলে এসে পড়েছে। তখন গুটিকতক অন্য জাতির লোক ঢুকে পড়ল, বিহারী মুসলমান মজুর শ্রেণীর লোক। দিনের আলো হ'য়ে আসছে অল্পক্ষণ পর তারা কলকাতায় পৌঁছে যাবে, তাই এবার আর কাউকে গাড়ির ভিতরে আসতে বাধা দিলে না।

এই ভাবে যথাকালে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। গাড়ির ভীড়ের কথা চিন্তা ক'রলে ব'লতে হবে, বেশ ভালই এলুম, আর ক্ষণিকের সহযাত্রী বিভিন্ন জাতির বন্ধু কতকগুলির সঙ্গ-সুখও লাভ হ'ল। তাদের কারও সঙ্গে আর ভবিষ্যতে কখনও দেখা হবে না,—অন্ততঃ বোধ হয় এভাবে নয়—কিন্তু এই রাতটির কথা খুব ভালো ভাবেই আমার মনে আছে। হাওড়ায় এসে নামবার সময়ে ওদের মধ্যে দু-একজন হাত বাড়িয়ে' আমার সঙ্গে করমর্দনও ক'রলে। এইভাবে আমার কাবুলী সহযাত্রীদের সঙ্গে এক রাত ট্রেনে কাটিয়ে দেওয়ার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল॥

শরতের আবির্ভাবে উৎসবের
ঘণ্টা বেজে উঠেছে
মেঘগুলি সরে গেছে—আকাশ পরিষ্কার। উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।
আনন্দের ঋতু শরৎকে আগমনী জানাচ্ছে। আনন্দ এবং সুখ বয়ে
এনে শরৎ এল আপনাকে আমোদিত করতে।
বাদল হোক, আর খরাই হোক, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, সারাবছরই
আপনার চুলের জন্য চাই একই প্রকারের যত্ন। সারা বছর ধরে
আপনার চুলকে অপরূপ কালো এবং সুস্থ রাখবার যত্ন। চুল কালো করবার
জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত "লোমা" এই যত্ন নিতে সক্ষম। আর মনে রাখবেন
"লোমা" শুধু শাদা চুলকেই কালো করে না, চুলের শাদা হয়ে ওঠাও
রোধ করে। যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, তুলনায় এটা আরও ভালো।
লোমা
একমাত্র পরিবেশক : এম্ এম্ খাম্বাটাওয়ালা, আমেদাবাদ—১
এজেন্ট : সি, নরোত্তম এণ্ড কোং, বম্বে—২
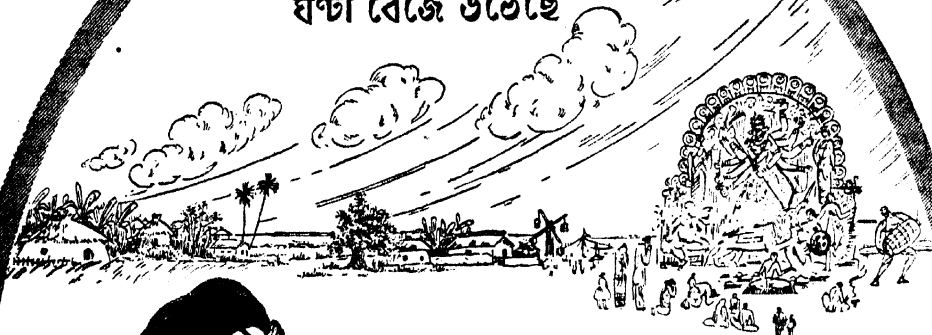
# সংস্কৃতির দায়িত্ব

## শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আমাদের এক পাঞ্জাবী বন্ধু তাঁর দেশের গল্প করছিলেন।

পাঞ্জাবের জাঠেরা প্রায়ই গ্রামবাসী ও দরিদ্র। এরা কৃষিজীবী, শহরের সঙ্গে পরিচয় কম। একবার এক দরিদ্র গ্রামবাসী জাঠ, অমৃতসর শহরে তীর্থ করতে এসে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন, সেই কথাটি আমাদের এক পাঞ্জাবী বন্ধু বলেছিলেন।

জাঠ কৃষকটি অমৃতসরের ব্যবসাবাণিজ্য-বহুল কাটরা অহলু আলিয়া রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিলেন। তিনি যখন ঊর্ধ্ব-দিকে তাকান তখন শুনতে পান দলে দলে শাল-দোশালা-ওয়ালাদের চিৎকার—"মশায় কিছু কিনবেন, দোতলায় আসুন।" উপরের দিকে না তাকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে যদি তিনি তাকান, তবে সেখানকার দোকানদার-দের দল চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে তাঁর মাথা গরম করে দেয়। আর নীচের দিকে যাঁরা পথে বসে পণ্য বিক্রি করেন, তাঁরা তো হাত ধরে টানাটানি করেই কৃষককে অস্থির করে দেন। উপরে পাশে নীচে—কোনো দিকে তাঁর তাকাবার জো নেই। পথচারী অস্থির হয়ে বললেন, 'এরই কি নাম শহর? শহর মানে দেখছি 'নজরের' জেলখানা: উপরে তাকালে রক্ষে নেই, পাশে তাকালেও তাই; নীচের দিকে তাকালেও অসম্ভব, হতভাগা 'নজর'টাকে আমি রাখি কোথায়? জেলখানায় তবু কয়েদীদের একটু নিষ্কম্প জায়গা আছে, আর এখানে দেখছি 'নজর'টাকে কোথায় যে রাখব, তার ঠাঁই নেই।'

পাঞ্জাবী বন্ধুটি এতখানি বলে একটু থামলেন।

তাঁর গল্প শুনে ভেবে দেখলাম, কলকাতাতে ও রাধাবাজার, চাঁদনী—এই সব ব্যবসাস্থলেও তো আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি এই রকমেরই বিপদ ছিল। এখন বিপদটা কিরকম বলতে পারিনে। কয়েদী-'নজরের' গল্প শুনে বেশ মজাই লাগছিল। খুবই উপলব্ধি করেছিলাম, সেই সরল জাঠ কৃষকের বিপদ কতখানি।

পাঞ্জাবী বন্ধুকে আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, জাঠ বেচারী শেষে কী করলেন।

পাঞ্জাবী বন্ধুটি বললেন, ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেঁয়ো জাঠ পাশের এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বাপু আমাকে টানাটানি করে বিরক্ত করছ? তোমার কাছে কী আমি কিনতে পারি?

দোকানী ছিল বাক্স-তোরঙ্গের ব্যাপারী। জবাব দিল, বাক্স পেটারী, আপনার জিনিস-পত্র রাখতে পারেন, কাপড়-চোপড় রাখতে পারেন, যেসব পোশাক-আশাক যত্ন করে রাখা দরকার, তাও তুলে রাখতে পারেন; সব রকমের ছোটো-বড়ো তোরঙ্গ, বাক্স, সিন্দুক, যেরকম দরকার হবে, আমার এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারেন।

জাঠ ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠলেন; বললেন, তবে কি আমি বাক্স-তোরঙ্গের মধ্যে আমার কাপড়-চোপড় রেখে উলঙ্গ হয়ে পথে বেড়াব?

জাঠের একটির বেশি পোশাক ছিল না—থাকেও না সাধারণত। পোশাক গায়েই থাকে তা সে যতই ময়লা হোক। একদিন সেই জীর্ণ পোশাক আপনিই ছিঁড়ে-খুঁড়ে অঙ্গ থেকে বিদায় নেয়। দ্বিতীয় পোশাক রাখবার বালাই কৃষকদের নেই।

• • •

গল্পটি শুনে এই কথাই মনে হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যখন জমে ওঠে, তখনই সেই সব রক্ষা করবার দায় এসে মানুষের ঘাড়ে কেমন করে পড়ে। ভারতীয় পূর্বপুরুষদের কিছু সম্পদ যখন জমে ওঠেনি, তখনই তাঁরা ছিলেন ভারমুক্ত। ক্রমে ক্রমে যেই সংস্কৃতি জমে উঠল, তাঁদের উপর এসে পড়ল নতুন কাজের তাগিদ, সেই সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব। বৈদিক সাহিত্যে দেখি বিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে এসে বললেন, আমি বিদ্যা, তোমাদের পূর্ব-পুরুষোপার্জিত সংস্কৃতি সম্পদ। আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের।

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণম্ আজগাম

গোপায় মাম্ শেবধি ষ্টেঽহমস্মি।

যাগযজ্ঞপন্থী সংস্কৃতির ভার নিলেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁদের শিক্ষায়তন গড়ে উঠল যজ্ঞবেদীর চার দিকে। জ্ঞানপন্থী উপনিষদবাদীদের সংস্কৃতির ধারার নাম পাই উপনিষদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয়। ভক্তিপন্থীদের ধারা চলল শিব আর বিষ্ণুর পূজার চারদিক ঘিরে। তাঁদের শিক্ষার স্থান ছিল তীর্থে। তীর্থ, অর্থাৎ স্নান করবার স্থান। তীর্থগুরুদের নাম এখনও দেখি 'পণ্ডা'। পণ্ডিত শব্দের সঙ্গে তার যোগ আছে।

এই সব যজ্ঞস্থলে পুরাতন আচার্যেরা নূতন ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা দিতেন। ক্রমে গুরু-গৃহগুলি থেকে যে শিক্ষার ধারা চলল, তাকেই এখনকার দিনের কলেজ বলা যেতে পারে।

এই সব কলেজেই পিতামাতা নিজ সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। সেই সময়ের শিক্ষার সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সম্পাদন করতে গিয়ে পরলোকগত পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁর যে বিবরণ লিখেছেন, তাইতেই একখানি ছোটো বই হয়েছে। তার নাম 'ঐতরেয়ালোচনম্।'

গল্পটি এই: এক ব্রাহ্মণ আচার্য বিবাহ রেছিলেন এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে। সঙ্গে সঙ্গে ক শূদ্র কন্যাকেও করেছিলেন বিবাহ। তখন ইরকম বিবাহ হামেশাই চলত। এই সব দ্র কন্যাদের সন্তানেরাও ব্রাহ্মণ বলে রিগণিত হতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে রাণ ইত্যাদি বহু স্থানে। বিশেষ করে খো যায় জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞস্থলে নাগ-ন্যা-গর্ভজাত আস্তিকের আত্মপরিচয় সঙ্গে। খাণ্ডবদাহের কথায় যে মহর্ষি ন্দপালের উপাখ্যান আছে, তাতেও এই তাই দেখতে পাওয়া যায়। এই সব কথা হাভারতেরই অন্তর্গত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গল্পে দেখা যায়, তরেয় ঋষির পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু াঁর মাতা ছিলেন শূদ্রকন্যা।

পিতা যজ্ঞস্থলে আপন ব্রাহ্মণ বংশজাতা ত্নীর গর্ভে জাত পুত্রের কাছে যখন তার জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তখন তরেয় ঋষির শূদ্রকুলজা মাতা ইতরা াপন পুত্রকে যজ্ঞস্থলে শিক্ষার জন্য যেতে বললেন। ঐতরেয় ঋষির আসল নাম জানা য় না, তবে ঐতরেয় এবং মহীদাস বলে তিনি পরিচিত। মহীদাস যজ্ঞস্থলে পিতার াছে গেলেন। পিতা ব্রাহ্মণকুলজা গর্ভজাত াপন পুত্রকে কোলে বসিয়ে শিক্ষা িচ্ছেন। অথচ মহীদাসের দিকে একবার িরেও দেখলেন না। অপমানিত মহীদাস দুঃখে ও ক্ষোভে বাড়ি এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মায়ের দুঃখ যে আরো গভীর। তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন বালক মহীদাস মাকে প্রশ্ন করলেন, মা, আমাকে কে তবে শিক্ষা দেবেন? বাপই যদি আপন পুত্রকে শিক্ষা না দেন, তবে কে আর তাকে শিক্ষা দেবে?

মা বললেন, আমি শূদ্রকন্যা, পৃথিবীই আমাদের আদি জননী। আমরা পৃথিবীর সন্তান। সেই মাতাকে একবার আবাহন করে দেখি।

দুঃখিনী মাতার আবাহনে মহীদেবী আবির্ভূতা হলেন এবং সব কাহিনী শুনে ইতরাকে বললেন, এই ছেলেকে আমার কাছে দাও। আমি একে সর্বশাস্ত্রে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত করে দেব। আমার মধ্যেই তো সর্বশাস্ত্র। শাস্ত্রমাত্রেরই মূল হল পৃথিবী। পৃথিবী যার মূল নয়, এমন শাস্ত্র সৃষ্টি-ছাড়া।

মহীদাস গুরু মহীর সঙ্গে সৃষ্টির অতল গহ্বরে চলে গেলেন। সেখানে দ্বাদশ বৎসর শিক্ষালাভ করলেন।

উপরে এসে তিনি যে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করলেন, তার নামই হল 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'। তিনি তাতে আপন নাম জানালেন ইতরার অর্থাৎ শূদ্রার পুত্র বলে ঐতরেয়। এবং মহীর শিষ্য বলে মহীদাস। ব্রাহ্মণ পিতার নামও তিনি করলেন না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঋগ্‌বেদীয়। এই ব্রাহ্মণ না পড়লে ঋগ্‌বেদের মর্মস্থলে পৌঁছনোই সম্ভব নয়। তিনি তার কুল-গর্বিত পিতার হাতে-পাওয়া অপমানের কি দারুণ প্রতিশোধ দিয়ে গেলেন এই গ্রন্থের মধ্যে। এই গ্রন্থখানির মধ্যে প্রাচীন একটি বেদবাণীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখতে পাই—

মাতা ভূমিঃ পুত্র অহম্ পৃথিব্যাঃ।

পৃথিবী আমাদের মাতা, সেই মাতারই আমরা সন্তান।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে আশ্চর্য এমন সব সত্যের সাক্ষাৎ পাই, যাকে এখন আমরা আমাদেরই যুগের বলে থাকি।

আজ অগ্রগতির আমরা উপাসক। অগ্রগতি সম্বন্ধে পাঁচটি অপূর্ব মন্ত্র এই গ্রন্থে পাই। তার প্রথম মন্ত্রের অর্থ—বসে থাকাটাই মস্ত পাপ, চলাটাই মহত্ব। কাজেই এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। চরৈবেতি চরৈবেতি। তোমার দেবতাও তোমার সাথী হয়ে চলবেন।

(২) এগিয়ে চলাটাই মানুষকে মহৎ করে। যে অগ্রগামী, পাপতাপের সমস্যা তার নেই।

(৩) যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে। যে চলে, তার ভাগ্যও সচল।

(৪) ঘুমিয়ে থাকাটাই কলিযুগ। জাগরণটাই দ্বাপর। উঠে দাঁড়ানোটাই ত্রেতাযুগ। এগিয়ে চলাটাই হল সত্যযুগ।

(৫) এই চলাটাই হল অমৃত। সূর্য কিন্তু সেবায় ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন বলেই তাঁর আলোকের ভাণ্ডার অক্ষয়।

* * *

কো মমূহানং? (অথর্ব)

এই মহিমার সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষকে দেওয়া হল ক্রমাগত এগিয়ে চলবার ইচ্ছা; প্রকাশ করবার ব্যাকুলতা?

গাতু কো অস্মিন কঃ কেতুম?

তাই বায়ু যেমন একমুহূর্তে স্থির থাকতে পারে না, তেমনি মানবের মনও কোনো আরামের বাঁধনেই আপনাকে কোনোমতে বাঁধা দিতে চায় না।

কথং বাতো নেলয়তি
কথং ন রমতে মনঃ (অথর্ব)

বোঝাই যাচ্ছে সব আপদের গোড়া ঐ মন। যে মনটি দেওয়াতেই মানুষের এই বৈশিষ্ট্য, সেই মনটি তার মধ্যে দিল কে?

কে অস্মিন্ নিহিতঃ মনঃ (অথর্ব)

তার মধ্যে কে যেন এক আত্মাওয়ালা ভূতকে দিল বসিয়ে,

তস্মিন যদ্ যক্ষমাত্মনম্ (অথর্ব)

তাই তো চলল মানুষের সাহিত্য-নৃত্য-গীতের জন্য ব্যাকুলতা। এই সবই যেন এক ভূতের, অর্থাৎ যক্ষের কাণ্ড! কিছুতেই আর তার সন্তোষ নেই।

বাউলদের গান শুনেছিলাম,—আরো কিছু আছে রে মন পরদা সরা। এই যে আরো-কিছুর জন্য ব্যাকুলতা আর পরদা সরাবার

জন্যে তাগিদ পশুপক্ষীর নেই; আছে মানুষের। এই পরদা সরাবার চেষ্টার মধ্যেই মানুষের মু-ধর্মের ল।

ধর্মের আদিতে ছিল ভয়, তার পর এল লোভ, তার পর এল প্রেম। তাই আমাদের ধর্মের আদিম যুগে ভয় ও লোভেরই পরিচয় বেশি মেলে। ক্রমে ভক্ত ও ভাগবতেরা প্রেম ও ভক্তিকে ধর্মের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা ধন জন সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছেন ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণের কাছে। স্বর্গই তখন ছিল তাদের কাম্য। পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে ভালো করে তাঁরা তখন তাকিয়ে দেখেন নি। কিন্তু আর্যদের আসবার আগেও এদেশে দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতের বিরাট সভ্যতা ছিল। তাদের সংস্কৃতির ধারা ছিল অন্য রকমের। নারীর প্রাধান্যের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে ছিল পৃথিবীর প্রতি মমতা, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। ক্রমে যখন এই দুয়ের মিলন ঘটল, তখন এদেশে একটা অপূর্ব অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হল। বেদের মধ্যেই ক্রমে উত্তরভাগে সেই মিলনের পরিচয় মেলে।

সেই যুগের অবৈদিক সংস্কৃতির কতকটা পরিচয় মেলে জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের আদি খুঁজলে। পণ্ডিতদের মতে জৈনাদি ধর্মের আদি বেদ থেকেও প্রাচীন। ভারতের জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে মানুষই প্রধান। ইন্দ্রাদি দেবতারা আছেন মানুষেরই মহত্ব প্রকাশের জন্য। জৈনদের চতুর্বিংশ তীর্থংকর সবাই মানুষ। বৌদ্ধদের বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অর্হৎরাও সবাই মানুষ। দেবতারা এই মানুষেরই উপরে ছত্র ধরণ করছেন, পুষ্পবৃষ্টি করছেন। তুলসীদাস তো পরম ভাগবত, তাঁর রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিতমানসে রামই হলেন পরমভজনীয়। দেবতারাও রামায়ণে আছেন বটে, কিন্তু আছেন শুধু মহামহামানবের উৎসবাদিতে ছত্র ধরতে, পুষ্পবৃষ্টি করতে বা শঙ্খ বাজিয়ে মানবের মহত্ত্ব ঘোষণা করতে।

ঋগ্‌বেদে সবই দেবতার কথা। শুধু দশ মণ্ডলে পুরুষসূক্তটিতে দেখা যায় মানুষের মাহাত্ম্য। কিন্তু দশম মণ্ডলটি ঋগ্‌বেদের সবচেয়ে আধুনিক অংশ। তখন আর্যপূর্ব সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতির সম্মিলন এদেশে ঘটেছে। উপনিষদ ও অথর্ব বেদ সেই যুগের। অথর্বে আমরা মানুষের জয়গান দেখতে পাই। অথর্বের ঋষিরা অনেক সময় দেবতা-দের কথা না বলে মানুষেরই জয়গান করেছেন। স্কম্ভসূক্তগুলিতেও মানুষের মহিমা বার বার ঘোষিত হয়েছে। অথর্বে দেখা যায়, স্বর্গের বদলে পৃথিবীরই জয়গান। দ্বাদশ কাণ্ডের আরম্ভের ৬৩টি ঋকই পৃথিবীর মহিমা গান। ধার্মিক লোকেরা জয়গান না করে পঞ্চদশ কাণ্ডের আগাগোড়া সবটাতেই ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রতহীন সহজ মানুষেরই মহিমা আথর্বণ ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল।

তাঁরা বললেন, মানুষের চেয়ে মহত্তর আর কি-ই বা আছে? তপস্যা, সাধনা, ব্রত, শ্রদ্ধা সবই তো মানুষেরই মধ্যে। পৃথিবীর দ্যৌঃ-অন্তরীক্ষ সবই এই মানুষেরই মধ্যে। এই সব কথাই হাজার হাজার বছর পরে যোগীনাথ-বাউলেরা নতুন করে বললেন। যেমন দেখা যাচ্ছে মৃত্যু মানুষের মধ্যে আছে, তেমনি অমৃতও রয়েছে মানুষেরই মধ্যে। মানুষেরই নাড়ীর মধ্যেই নেচে চলেছে সমুদ্রের স্পন্দন। খুঁজে দেখলে মানুষেরই মধ্যে ঋক্, যজু, সাম, সর্ব বেদই মিলবে। সব দেবতা, ভূত ভবিষ্যৎ, সর্বলোক এই মানুষেরই মধ্যে। ব্রহ্মও এই মানুষেরই মধ্যে। মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনিই ব্রহ্মকে তাঁর পরম স্থানে উপলব্ধি করেছেন। এই রহস্য সকলে কেন উপলব্ধি করে না? তাতেও কুৎস ঋষি বলছেন, সবাই দেখতে চায় এই চর্মচক্ষু দিয়ে, মন দিয়ে উপলব্ধি করে কয়জন?

পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন
সর্বে মনসা বিদুঃ (অথর্ব)

পুরাণে আমরা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের জায়গায় শিব এবং বিষ্ণুরই মহিমা শুনতে পেয়েছি। শিব ও বিষ্ণুকে ভক্তেরা আপন মন দিয়ে মানুষরূপেই রচনা করেছিলেন। তাঁদের ঘরবাড়ি আছে, ছেলেপুলে আছে, চাকর থাকর সবাই আছে। ভগবতী বাপের বাড়ি যাবেন, কার্তিক গণেশ সঙ্গে চললেন, মহাদেব তাই ব্যাকুল। তিন দিনের বেশি দেবী বাপের বাড়িতে যে থাকবেন, তার জো কি! নন্দী-ভৃঙ্গী সবাই শিবের আজ্ঞায় তল্পি-তলপা বাঁধতে লেগে গেলেন।

কাজেই শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম-সাধনার মধ্যে মানব-রসেরই পরিপূর্ণ স্বাদ মেলে। পুরাণে এই সব দেবতা ছাড়া আছেন রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার। তাঁরা দেবতা হলেও মানুষ। এই সব অবতারবাদের মধ্যেও দেখা যায়, মানুষই বড়ো, দেবতাই ছোটো, বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু থেকে ব্রজের কৃষ্ণ মহত্তর। তারপর নবদ্বীপে যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জন্মালেন, তার মাধুর্যে ও মহিমায় বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ দুই-ই গেল নিষ্প্রভ হয়ে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, এঁরা সবাই তো মানুষ হলেও অবতার। এঁদের মধ্যে যে মহত্ত্ব, তা তো সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব নয়? তাই সাধারণ মানবের মহত্ত্বও ঘোষিত হয়েছিল অথর্বের ঋষিদেরই মুখে। তার-পর তার পরিচয় পাই উপনিষদগুলির মধ্যে। উপনিষদের ঋষিরা বারবার বলেছেন, সর্বত্র যে সর্বব্যাপী পরমপুরুষ বিরাজিত, আমার মধ্যেও তিনিই বিরাজমান। 'সর্ব-মানুষের অন্তরস্থিত সেই পুরুষ যে তেজোময়, অমৃতময়, এই কথা একবার বলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন খুশী হল না, ১৮বার এই কথাটি পর পর উচ্চারণ করে তবে তিনি ছাড়লেন। কঠোপনিষৎ তো সোজাসুজিই বললেন, মানুষ হতে আর মহত্তর কিছুই নেই, মানুষই চরম কথা, মানুষই পরমাগতি—

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা
পরা গতিঃ।

• • •

শিল্প সম্বন্ধে এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে মন্ত্র পাই, অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, এই মন্ত্রই আমাদের শিল্পীদের পরম ও চরম বেদবাণী। সেই মন্ত্রটি অনেকেই জানেন—তারই নাম হল শিল্প মন্ত্র। সে মন্ত্রের আর অনুবাদ চলে না। দেখতে হলে সেই মূল মন্ত্রটিই দেখা উচিত। তার মর্ম হল—দেবতা করলেন এই বিশ্ব সৃষ্টি; দেবতার সেই আনন্দে অনুপ্রাণনে দীক্ষিত হয়ে শিল্পী করবেন আপন সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির দ্বারা তার কোনো ঐশ্বর্য লাভ হবে না। যা হবে, তার চেয়েও মহৎ। অর্থাৎ বিশ্ব-ছন্দে তিনি আপনাকে ছন্দোময় করে তুলবেন।

কাপড়-চোপড় রক্ষা করবার দায়িত্ব বহন করা সহজ। বাক্স তোরঙ্গ কিনলেই চলে, কিন্তু সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব অতি কঠিন। তা রক্ষা করা যায় কিসে? শুধু তা রক্ষা করলেই চলবে না, তাকে বহন করতে হবে কী বলে, সমস্ত জীবন দিয়ে প্রাণপণে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
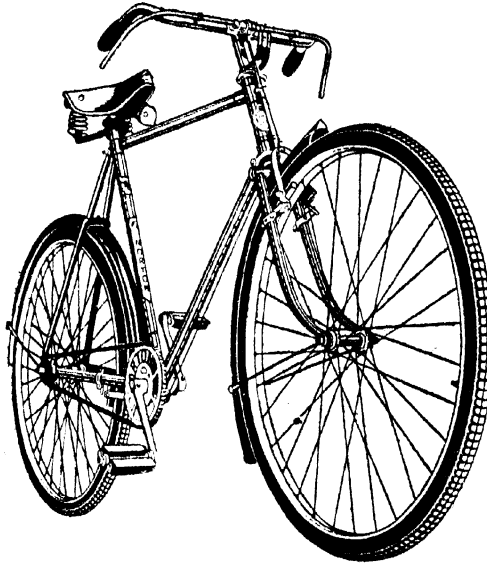
বরের বাড়ি থেকে হলুদ নিয়ে লোক আগের রাত্রিতে-ই এসেছিল। একটা কুলোয় অনেকখানি হলুদের গুঁড়োর সঙ্গে সেই হলুদ-গুঁড়ো মেশানো হলো। অঘ্রান মাসের সকাল। সূর্য অনেকখানি উঠে গিয়েছিল, কিন্তু পূর্বদিকের বিরাট উঁচু আমগাছটির জন্য উঠোনে এখনো রোদ পড়েনি। উঠোন-টা গোবর-নিকনো, ছায়াচ্ছন্ন। সামিয়ানা খাটানো হয় নি, তবু সামিয়ানা-খাটানো ছায়া-ই যেন উঠোনে। পিঁড়ি-র ওপর উঁচু হয়ে অনুরাধা বসে, পরনে চওড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ি। নতুন গয়নাগুলো তার কানে, গলায়, হাতে—ইতিমধ্যেই তাকে অপরিচিত করে দিয়েছে। এয়োরা উলু-উলু দিল। অনুরাধার হাসি পেল, মজা লাগলো। কুলোটা মাথায় ঠেকাচ্ছে। কপাল নিচু করলো। অনেকগুলো করতল নরম, সোনারঙ, মিহি হলুদের গুঁড়ো মাখিয়ে দিতে লাগলো অনুরাধার হাতে, বাহুতে, গলায়, মুখে, পায়ের পাতায়। মুখে মাখানোর সময় পাছে ঠোঁটের ভেতর ঢুকে যায়, ঠোঁট দুটো কুঁচকোল অনুরাধা আর চোখের দুটো কোণ। কুয়ো পাড়ে গেল। তার মাথায় জল পড়লো। ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে শরীরের ভেতর জলের রেখার সুড়সুড়ি, নতুন কাপড়ের ভেজা গন্ধ, এয়োদের তরকারি-কাটা কড়কড়ে আঙুলের স্পর্শ, মজা লাগে, হাসি পায়। মায়ের হাত-টা চেনা যায় না, মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো—এরা, এয়োরা, সবাই মিলে তাকে তাদের মতো করে নিচ্ছে। এয়োদের গয়নার ঝনঝনের সঙ্গে তার নিজের গয়নার শব্দ মিশে গেল। হঠাৎ-হঠাৎ নিজের হাতে নজর পড়লে গয়না-পরা হাতটাকে চিনতে পারছে না, এতো নতুন আর এতো চকচকে গয়না তার হাতটাকে বদলে দিয়েছে। বিয়ের স্বাদ—কিন্তু আরো একটু বাকি আছে, এই স্বাদের, পরিপূর্ণ আনন্দিত ও সুখী হবার জন্য তার সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের একাকিত্ব দরকার, একটু পরেই তা পাবে, মাথাটা নিচু করা আর চোখটা আধখোলা—কয়ের লালচে-কালচে অংশটা দেখা যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে না।—

একজন বললো—"হলুদ মাখিয়ে এতো নরম করে দিলাম, দেখিস্ যেন তাসগোল পাকিয়ে যাস্ না"

একজন হাত ধরে তুলে বাথরুমের ভেতর ঢুকিয়ে দিল—"ভালো করে হলুদ মেখে স্নান করে নাও, বাটিতে হলুদ রইল, কৌটোতে সাবান আছে, দড়িতে জামা-কাপড়।"—অনুরাধার কব্জি থেকে কড়কড়ে আঙুলের স্পর্শ সরে গেল, বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হলো।

ছিটকিনিটা আটকাতে আটকাতে এতোক্ষণের স্বাদ আর মজা যেন একটা প্রশ্ন হলো অনুরাধার মনে। এইবার তার জবাব মিলবে।

এতোক্ষণ চোখটা প্রায় বুজে থাকার জন্য প্রায়ান্ধকার স্নানঘরের সঙ্গে নতুন করে অভ্যস্ত হতে হলো না তাকে। সে নিজের হলুদে-সোনালি দুই বাহু মেলে চাইল, হ্যাঁ কনুইয়ের ওপর ফুলে উঠেছে। কানের লতিতে হাত দিল, হ্যাঁ, ছোট্ট করে একটু ফোলা। গালে হাত বোলাল, হ্যাঁ, ডান-চোখের নিচে আর বাঁ কপালে দু জায়গায় মশার কামড়ের মতো ফোলা।

এতোক্ষণে, এতোক্ষণে অনুরাধা নিশ্চিন্ত হলো—সে সুখী, সে খুশী, তার বিয়ে, তাতে সে বড়ই আনন্দিত। এই ফোলা

াগগুলো তাকে জানিয়ে দিল, গায়ে-লুদের সময় তার সারা-শরীর রোমাঞ্চিত হলো এই ভেবে যে, ঐ হলুদের মধ্যে সেই শাকটির গায়ে মাখানো হলুদ আছে। আর তার শরীরের রক্তের মধ্যে উত্তেজনা ছিল নেই. এয়োদের তরকারি-কাটা পুরনো আঙুলে তার নতুন শরীরে হলুদ বোলানোয় তোগুলো জায়গা ফুলে গেছে। পরীক্ষা দয়ে এসে বাড়িতে বই দেখে মেলানোর তো, এই একা-একা-অন্ধকারে অনুরাধা তার শরীরের লক্ষণ দেখে মিলিয়ে নিল—স সত্যি-সত্যি সুখী কি না। চৌবাচ্চার জলের দিকে চাইল সে. আবছা অন্ধকারে যেমন ঘরের জিনিসপত্র অস্পষ্ট দেখায়, তেমনি কাপড় ঝোলাবার দড়িটার অস্পষ্ট ছায়া চৌবাচ্চার জলে; নতুন শাড়ি, বিয়ের শাড়ি, অস্পষ্ট ছায়া, মনের দ্বিধার মতো। চৌবাচ্চার যেখান দিয়ে কুয়ো থেকে জল ঢালা হয়, সে-পথ দিয়ে রোদ এসে জলের একটি জায়গাতে গোল চাকতি এঁকে তলার গায়ে ঠেকেছে। জলটা দেখতে তার ভালো লাগলো। সে ডুবে গেল, এই বাথরুমের বিচ্ছিরি নাক জ্বালানো গন্ধটা, কাপড় ঝোলাবার কালো, জলভেজা, আঁশ-বের-করা দড়িটা, আর চৌবাচ্চার তলার নানা রকম ময়লা—প্রতিদিন তাকে বিরক্ত করে। কতকগুলি পুরোন বউয়ের পুরোন হাত, তার নতুন শরীরটাকে পুরোন করার জন্য এতোক্ষণ ব্যস্ত ছিল। আর সে যে তাতে খুব খুশী সেটা জানতে পেলো এইখানেই শরীরের ফোলা অংশগুলো দেখে। বাটি-টা থেকে কাঁচা হলুদ সারা গায়ে মাখতে মাখতে তার গান গাইতে ইচ্ছে করলো, গাইল না, শরীরের আরো অনেক ঈষৎ-ফোলা জায়গা তার হাতে লাগলো। সে ক্রমাগত খুশি হতে হতে এক সময় ঘটি দিয়ে মাথায় জল ঢাললো গল্ গল্ করে।

অনুরাধা-র এ-অসুখটা প্রায় জন্মাবধিই বলা চলে। সতের বছরের অপরিপুষ্টো মায়ের পেটে হয়তো সে উপযুক্ত আহার পায়নি, হয়তো তার শিরা-উপশিরাগুলো ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারেনি, হয়তো প্রসূত হওয়ার আগে আরো কিছুদিন গর্ভবাস করে তার শক্ত-সমর্থ হওয়া উচিত ছিল, হয়তো তারই দ্বারা প্রথম পূর্ণ গর্ভকোষ একবারেই ঠিক হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী পাঁচ ভাই-বোনের কারো ক্ষেত্রেই এমন হয়নি, হয়তো মা-বাবার প্রথম সন্তান বলে মাটি আর আলো-র বদলে কোল আর ছায়া সে পেয়েছে বেশি—এমন আরো অনেক 'হয়-তো' দিয়ে অসুখটাকে হয়তো ব্যাখ্যা করা যায়। কেউ বকলে বা মারলে, অনুরাধা খুব আনন্দিত হলে বা ব্যথিত হলে, খুব আন্তরিক হর্ষ বা বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করলে, তার সারা শরীর এমন নরম, কোমল, সদ্য-গলিত-মোমের মতো হয়ে যায় যে, সামান্যতম স্পর্শমাত্রেই সে-জায়গাটি ফুলে ওঠে। বাচ্চা বয়সে একটু-একটু ছিল, ডাক্তার-রা বলতেন—"বয়স হলে সেরে যাবে।" বয়স হলে, শরীর আরো নরম, নিটোল, মসৃণ আর সুন্দর হলো। রোগটা আরো ছড়িয়ে পড়লো। আর মন তখন নরম ও নিটোল হলো, মসৃণ জলস্রোতের মতো অসংখ্য সূক্ষ্ম চুল-রেখা-স্রোতে কোটি-কোটি সূক্ষ্ম, প্রায়-অদৃশ্য আবর্ত রচনা করলো। অনুরাধা নিজেই জানতো না কখন সে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিংবা আনন্দে অবসন্ন, হয়তো হৃৎপিণ্ড থেকে বহির্গত রক্ত-স্রোতের আকস্মিক বেগ লক্ষ্য-ই করতো না—পরে তার সেই নতুন, মসৃণ, চিক্কণ, গোপন দেহের কতকগুলি ফোলা জায়গা দেখে জানতো সে বিষণ্ণ হয়েছিল বা আনন্দিত। বয়স আরো বাড়লো। মনের স্রোত সমতল হলো। আর আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়ার পরও, শরীরের চিহ্ন না-দেখে, সে নিশ্চিত সত্যটি জানতে পারতো না। শরীর দেখে মন চেনা—এই তো অসুখ তার। মনের খবর ডাক্তার-রা রাখতেন না। শরীরের অসুখটা কোনো যন্ত্রণা দেয় না, কিছুক্ষণ শুধু পিঁপড়ে-কামড়ানোর মতো ফুলে থাকে—ফলে তার হদিশ-ও ডাক্তার-রা খুব একটা রাখতেন না। আর সেই বয়সে, যখন মন আর শরীর প্রায় একখাতে বয়, অনুরাধার শরীর-টা ও মনটা এক হয়ে গেল। ডাক্তার-রা তখনো বলেছিলেন—"এ-সব চিকিৎসা-র ব্যাপার নয়, মেয়েদের শরীরের ব্যাপার, বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর অনুরাধার নাম, স্বভাব ও চেহারা এ-অসুখের সঙ্গে এতো মিশে গিয়েছিল যে অসুখটা-কে কেউ রোগ বলে গ্রহণ করতো না; কোনো-কোনো চেহারায় একটু বিষাদ আছে বলে-ই যেমন সুন্দর, অনুরাধার এই অসুখ-টা আছে বলেই সে তেমনি অনুরাধা। বিচ্ছিন্নভাবে অনুরাধার অনেক অঙ্গই নিখুঁত নয়, যেমন তার কান একটু বেশি বড়, কপালটা বেশি চওড়া, নিচের ঠোঁটটাতে-ও কিছু একটা গোলমাল আছে। তৎসত্ত্বেও তার ডিমের মতো মুখটাতে একটা আকর্ষণ আছে। আর তার ভুরু—এতো সরল, চোখটা এতো অলস আর গলাটা এতো নিটোল যে, তাকে প্রায়-সময়ই খুব সুন্দর মনে হয়। কিন্তু তার চেহারার সৌন্দর্য যতোটা চেহারাগত, তার চাইতে বেশি চরিত্রের মনোগত। তার সমস্ত চেহারায় এমন পেলবতা আছে, এমন কৈশোর আছে, যে সহজেই সে কাছে টানে। অনুরাধা মোটা নয়, পাতলা। অথচ বয়স তার শরীরে নানা ঢেউ এনেছে। সেই পাতলা দেহে ঢেউ-গুলো অনেকখানি গভীর মনে হয়। আর এই চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে তার স্বভাবটাও গড়ে উঠেছে। কথা বলে খুব আস্তে-আস্তে, কথায় একটি সুরও আছে, কোনো-কোনো সময় তার কথা শুনতে খুব ভালোই লাগে। তা-ছাড়া অনুরাধার কিছু শুচিবাই আছে। জন্মের পর থেকেই নোংরা মশারি, ছেঁড়া তোশক,

তেলচিটচিটে গামছা ব্যবহার করা সত্ত্বেও এগুলোতে সে কোনোদিনই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। পেটিকোটের কাপড় মোটা হাওয়াতে তার আপত্তি। খাবারের থালার সামনে জল বা ময়লা থাকলে সে খেতে পারে না। বেগুন ভাজা, সজনে-ডাঁটা পুঁইশাক বা কাঁটা-অলা-গাছ সে খায় না। এ-সবই হয়তো তার একই স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে জন্মেছে, যা থেকে এই অসুখটা-ও সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু জোরে কথা বলা বা না-শোনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, খাবার-দাবার সম্পর্কে খুঁতখুঁতি, নোংরা গামছা বা অন্যের ব্যবহৃত সাবানে আপত্তি, ছেঁড়া তোশক বা ময়লা মশারিতে অসোয়াস্তি—এগুলো ঐ অসুখটার সঙ্গে মিলেই অনুরাধাকে গঠন করেছে। এই অসুখটা অনুরাধা ছাড়া আর কারো হতেই পারে না। আর সবাইয়ের নাম ছোট করে তাদের আদর করা হয়, আর সাধারণত অনু বা রাধুকে অনুরাধা বললেই আদর হয়, আর সামনে এসে দাঁড়ায় কৈশোরের লাবণ্য নিয়ে যুবে● অনুরাধা। অনুরাধার সমস্ত অস্তিত্বটাই সুকুমার। যে-স্থূলতা-গুলোকে স্থূলতা বলে চেনাই যায় না, সেগুলো সে গ্রহণ করতে-ই পারে না। তাই অনেক বিরাট বিরাট দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-হর্ষ-আনন্দ-চাঞ্চল্য যেখানে মানুষের চামড়ার দুর্ভেদ্য ঢালে এসে লেগে ভোঁতা হয়ে যায়, সেখানে অতি সামান্য হর্ষ-বিষাদ তো অনুরাধা-কে অসুস্থ করে তুলবেই।

নতুন মশারি, নতুন তোশক, নতুন চাদর, নতুন বালিশ, নতুন শাড়ি, নতুন গয়না সব মিলিয়ে অনুরাধাকে আপন করে নিল। এতোদিন ছেঁড়া তোশক, দুর্গন্ধ মশারি তেলচিটচিটে গামছা, সজনে ডাঁটা আর পুঁইশাকের বিরুদ্ধে নিজের সূক্ষ্মতা আর সুকুমারতা নিয়ে অনুরাধা-কে যেন খানিকটা যুদ্ধ করতে হয়েছে, তাই বর্মের মতো নিজেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসা, যেন অনেকদিন একটু অর্ধ-পরিচিত আত্মীয়-বাড়ি-তে সব-রকম অসুবিধা সয়ে এসে নিজের ঘরে স্বাচ্ছন্দে শুয়ে পড়া। আর বিয়ের পর অনুরাধার এই স্বাচ্ছন্দ্য-কেই অনেকে মনে করে তার আমূল পরিবর্তন।

বিয়ের পর ছ-মাস কেটে গেল। আর নিজের শরীরের একটা অর্থ খুঁজে পেয়ে, যেন মাতাল হয়ে গেল অনুরাধা। আর সে ভুলে গেল তার স্বামীর চেহারা আর স্বামীর ব্যক্তিত্ব। তার তনুদেহের লাবণ্য আর যৌবন নিয়ে এমন আবেগময়তার মধ্যে ডুবে গেল অনুরাধা যে, সে ভুলে গেল তার চারপাশের কথা। ছ-মাস কেটে গেল। শরীর পুরোন হলো। অনেকদিন ধরে নেশায় কাটিয়ে চোখ তুললো অনুরাধা।

দেখলো তার বিয়ে হয়েছে। সে একজনের স্ত্রী। সামনে তার স্বামী। স্বামী-স্ত্রী, দাম্পত্যজীবন। সুখের, আনন্দের। আমি কি সুখী, আনন্দিত? নিজের দেহের দিকে চাইল সে। কোনো লক্ষণ নেই। শরীর বোবা। নিটোল কোমল অংশগুলি মসৃণ। আমি কি সুখী? আনন্দিত? অনুরাধা তার স্বামীর দিকে চাইল।

সে তার স্বামীর সঙ্গে একা এই মফঃস্বল শহরে থাকে। তার বাপের বাড়ি-র শহরটা এর চাইতে বড়। স্বামীর মা-বাবা থাকেন আরো দূরে।

অনুরাধা ঠিক বোঝে না, তবে কোথায় যেন, হয় অবিনাশের দু-পাশের পাতলা চুলে, কিংবা মজার কথা বলবার বা শোনার সময় ভাঁজ-ফেলা কপালে, কিংবা নস্যিভরা নাক-ঝাড়ার শব্দে, কিংবা একটু কুঁজো হয়ে হাঁটায়, কিংবা ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি, জরি-পেড়ে ধুতি আর মচ-মচ্ চক্‌চক্ জুতোয়, —একটা কিছু আছে যাতে-মনে হয় এ-লোকটা পান-চিবিয়ে অফিসে গিয়ে, আর সজনের ডাঁটা চিবিয়ে ছিবড়ে করে, আর সর্দি হলে পায়ের তলায় তেল-মালিশ করে-ই জীবন-টা কাটিয়ে দেবে। সন্ধ্যাবেলায় আধো-অন্ধকার বারান্দায় সে বসে কেবল হাওয়ার জন্য, হাওয়ার-ই জন্য; এমনি যে হাওয়া-ছাড়া-ও ভালো, তা ও বোঝে না। ও আমাকে অনুরাধা বলে ডাকে না। তবে কি আমি খুশি নই? হ্যাঁ খুশি। সুখী নই? শরীরের দিকে তাকায়। অসুখী? শরীরের দিকে তাকায়। অসুখ-টা সেরে-ই গেল, ডাক্তার-রা ঠিক-ই বলেছিল বিয়ের পর সেরে যাবে। কিন্তু আমি কি সুখী, না অসুখী?

ঐ তো ও আসছে, ই-স, রোদে একেবারে লাল হয়ে গেছে, কী যে প্রেস, সকালে যাও, দুপুরে দু ঘণ্টার ছুটি, এই রোদে দুবার চলাফেরা—দরজা-টা খুলে দিতে দিতে ভাবলো অনুরাধা। পরনে নতুন জামাজুতো আর হাতে নতুন ছাতি-টা সত্ত্বেও দুপুরবেলা না-খাওয়া না-স্নানের জন্য মুখচোখ কুঁচকে অবিনাশ যখন ফেরে তার চেহারাটাকে এতো পুরোন আর পোশাক-টাকে এতো নতুন মনে হয় যে, অনুরাধার খারাপ লাগে, পোশাকটা কেন ঠিক-ঠিক মানিয়ে গেল না। অবিনাশ পাঞ্জাবির সোনার বোতাম খুলতে

খুলতে এসে ঘরে ঢোকে, নতুন আলনাটায় জামাটা খুলে ঝুলিয়ে দেয়, গেঞ্জিটা খুলে মেঝে-তে ফেলে, চৌকির ওপর বসে, জরি-পেড়ে ধুতি-টাকে হাঁটুর ওপর তুলে। রোমশ পেট-টা হাতায় সে আর হাঁটু-দুটো দোলায়। অনুরাধা অবিনাশের দিকে চাইতে পারে না। তার লজ্জা করে। তাই আঁচল-টাকে মাটিতে গড়াতে দিয়ে, সায়ার অনেকখানি বের করে, খুব অগোছালো-ভাবে, ব্যস্ত ভাবে, পাখাটা নিয়ে হাওয়া করতে যায়। অবিনাশ বলে "আর হাওয়া করতে হবে না, এখনি তো স্নানে যাবো।" পাখাটাকে হাত দিয়ে নামিয়ে দেয়। অনুরাধা তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা বারান্দায় রেখে এসে, কী করবে ভেবে না-পেয়ে, তোয়ালে-সাবান-তেল এক জায়গায় রাখে, খাটের বাজুতে এসে হেলান দেয়, "উঃ" বলে ঘোমটা-টা ফেলে দেয়, পাখাটা নিয়ে নিজে বার দুয়েক হাওয়া খেয়ে, অবিনাশকেও দিতে শুরু করে, শেষে অবিনাশ-কেই দেয়!

—"এখুনি স্নান করতে যেতে হবে না, বাইরে যা রোদ্দুর, সর্দি-গর্মি হয়ে যাবে"—অবিনাশের কানের পাশ দিয়ে তাকিয়ে বলে। খুব জোরে-জোরে হাওয়া দেয় আর সেই ফাঁকে চোখ কুঁচকে, আর এক হাতে আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে, অবিনাশের দিকে তাকায়।

যদি-ও এ-বাড়ি-তে তৃতীয় কেউ নেই, স্বামীর দিকে সোজা করে এখনো চাইতে পারে না অনুরাধা, কথা-ও বলতে পারে না। তার লজ্জা এখনো গেল না।

অবিনাশ চোখ বুজলো, অবিনাশের পাতলা চুলের থেকে চোখ সরিয়ে অনুরাধা তার মুখের দিকে চাইল, গলায় ঘাম জমেছে, বুকের লোম দিয়ে ঘাম নামছে, (মুছে দিলে হতো), পেটটায় কী লোম, কালো গিজগিজ, মাঝখানটায় বেশি, তিনচার-টা ভাঁজ, লোমের আগায়-আগায় ঘাম, নাভির নিচে কাপড়ের গিঁঠ, কোমরে কষি-র দাগ, সাদা-টে, নাভি—চোখ সরিয়ে নিল অনুরাধা ইস, কী ঘেমে গেছে।

অবিনাশ স্নান সেরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। অবিনাশ যতোক্ষণ স্নান করছিল, অনুরাধা চুলের গোড়ায় তেল ঘষছিল। আর পায়চারি করছিল। বাথরুমের দরজা খুলবার শব্দ পেয়ে অনুরাধা হাতের তেলো পায়ে ঘষলো, মুখে, তারপর আলনা থেকে জামা-কাপড় নিয়ে বেরুতেই অবিনাশ ঘরে ঢুকলো। বেরিয়ে গিয়ে-ই আবার ফিরে এলো অনুরাধা। অবিনাশ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। তার কাঁধ থেকে তোয়ালেটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতেই অনুরাধা দেখলো অবিনাশ খুব পাতলা একটা ধুতি এক পাল্লা করে পরে বাথরুম থেকে এসেছে, জলে আবার সেটি জায়গায় জায়গায় ভেজা। সে ফিরতেই অবিনাশ বললো, "তুমি আগে থেকে স্নান করে নিলেই পারো"। অবিনাশের এক-পাল্লা-করে-পরা কাপড় যেমন তাকে বিরক্ত করেছিল, বহু-দিনের দম্পতির মতো এই কথাটা তেমনি তাকে খুশি করলো। গায়ে-হলুদের দিন এয়োরা তাদের পুরোন হাত লাগিয়ে অনুরাধা-কে পুরোন করতে চেয়েছিল, সে সত্যি-ই পুরোন হচ্ছে, আঃ।

এ-বাথরুমটা-ও আর সব বাথরুমের মতো অন্ধকার, কিন্তু এ-অন্ধকারের কোনো আবেদন যেন আর অনুরাধার কাছে নেই। সে এতো তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢোকে, এতো তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে যে, বোঝা যায় স্নান, শুধু স্নান করবে সে। অথচ এই ছ-সাত-মাস আগে-ও এই অন্ধকার তাকে টানতো, এমন-কি বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন-ও তো, এই অন্ধকারই তাকে জানিয়েছে সে খুশি, সে সুখী। নিয়ত তার চারপাশে তখন গলিত অন্ধকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো, আর একটু অবসর পেলেই, সেই অন্ধকার একটুখানি গায়ে মেখে অনুরাধা আলোতে ফিরে আসতো, গায়ের ফুলে ওঠা অংশ-গুলিতে সেই অন্ধকারের চিহ্ন নিয়ে। আর সবাই জানতো কৃশ, কিশোরী, পরিচ্ছন্ন, বড়-লক্ষ্মী যুবতী অনুরাধা সুখী বা দুঃখী। অবিনাশের ফেরার আগে অনুরাধা তার এই সুখ-দুঃখ নিয়েই ভাবছিল, আর নয় পরে-ও ভাববে, কিন্তু এখন, যখন অবিনাশ স্নান সেরে তার জন্য অপেক্ষা করছে, সে শুধু স্নান, স্নান সেরেই বেরিয়ে আসতে চায়। সায়া-ব্লাউজের ওপর শাড়ি-টা কোনোরকমে জড়িয়ে বেরিয়ে আসছিল অনুরাধা,—হঠাৎ মনে পড়লো অবিনাশের একপাল্লা করে কাপড়-পরা চেহারা। শাড়ি-টাকে কোনোরকমে গুছিয়ে নিল, কোমরে ভালো করে গুঁজলো আর বাকি-টাকে সামনে-পেছনে ছড়িয়ে দিল। অবিনাশের চেহারা মনে পড়া থেকে সারা গায়ে শাড়ি-টাকে ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই কুমারী মন ফিরে এলো অনুরাধার—ছেঁড়া তোশক, দুর্গন্ধ মশারি আর পাঁইশাকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অনুরাধা তখন তার লজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও কৈশোরের বর্ম ব্যবহার করতো। সেই দিনগুলোতে ভেসে গিয়েই ফিরে এলো অনুরাধা ঘরের দরজায়।

খাটের ওপর অবিনাশ পা-ঝুলিয়ে বসে
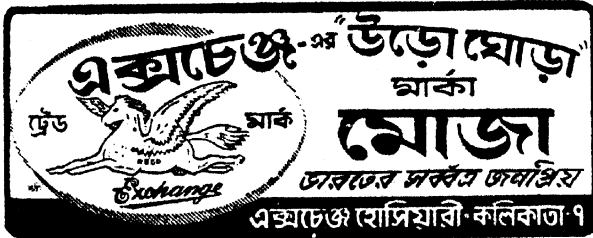
ছিল। নেমন্তন্ন-বাড়ির সমাগত অভুক্ত অতিথিদের মতো চোখে অনামনস্কতা ছিল। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে, ঠিক করে কাপড় পরে অনুরাধা অবিনাশ-কে বললো—"চলো।"

বাথরুমে জল ঢালার শব্দ থামবার পর অবিনাশের আর বাথরুম থেকে বেরুবার পূর্ব-মুহূর্তে অনুরাধার মন থেকে তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ-টা মুছে গিয়েছিল। যেন তারা মা-ছেলের মতো বা ভাই-বোনের মতো জন্মার্জিত কোনো সম্পর্কে দায়িত্ব—ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বাঁধা। অনুরাধার জন্য অপেক্ষা-টা যে মোটে মাস-ছ-সাতেকের বিবাহিত নতুন বউয়ের জন্য অপেক্ষা, বা তাড়াতাড়ি স্নান সারাটা যে নতুন বরের জন্য, —কাজ দুটো করতে করতেই এ-অর্থ দুটো তারা ভুলে গিয়েছিল। প্রথম মাস-ছয়েক স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন মনে আসে নি, শুধু ছিল দুটো বিপরীত অস্তিত্বের উত্তেজনা ও অবসাদ। সুখ-দুঃখ সেখানে অনেক দূরের কথা। ছ-মাস কেটে যাবার পর দুটি ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন হলো। উত্তেজিত জীবন-যাপনে উত্তেজনার জন্য পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য পরস্পর-কে একটি মুহূর্তের জন্য-ও বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সচেতন জীবন-যাপনে সেই পক্ষপাতগ্রস্ত বিস্মৃতি নেই, দুজনের সামনে দুজনের ব্যক্তিত্ব, সুখ-দুঃখ আশা-হতাশা ধীরে ধীরে জেগে উঠলো, ঘিরে ধরতে লাগলো,—বানের জল সরে যাবার পর উঁচু-উঁচু ডাঙা-র মতো। আর সারা দিনে এমন অনেক ক-টি সময় এলো যখন তারা পরস্পরের সম্পর্ক ভুলে গেল। আর সারাদিনে এমন অনেক ক-টি সময় এলো যখন অনুরাধা নিজের মসৃণ নিটোল অথচ চিরকালের জন্য নির্ধারিত দেহের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "আমি কি সুখী, আমি কি দুঃখী?' তার দেহের স্বাভাবিক কৈশোর, লাবণ্য আর শুচিতা, অত্যন্ত স্পর্শকাতর ত্বক, আর জন্মগত দেহদৌর্বল্য দেহ সম্পর্কে উত্তেজিত থাকতেই তাকে অভ্যস্ত করেছে। সেই উত্তেজনা তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর,' অনুরাধা ভাবলো, "আমি কি জল না মাটি"। থক্‌থকে কাদা নিয়ে সদ্য-জাগ্রত ডাঙার মতো রোদে-রোদে পুরোন কঠিন শুকনো ভবিষ্যতের কথা ভুলে গিয়ে অনুরাধা নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো—"আমি কি সুখী, না দুঃখী? আমি আমার স্বামী-কে ভালো-বাসি, না ঘৃণা করি?"

অবিনাশ ভোঁস-ভোঁস করে নস্যি টেনে অনুরাধার দিকে পাশ ফিরে শুলো। অনুরাধা পাখাটাকে হাত থেকে নামিয়ে আঁচলটা তাড়াতাড়ি নাকে চাপা দিল, তারপর আঁচল চাপা মুখে বলতে লাগলো—"কী যে নস্যির নেশা, বিচ্ছিরি, এর চাইতে সিগারেট খাওয়া অনেক ভালো।"

নস্যি-নেওয়া ওঠানামাহীন গলায় অবিনাশ বললো "দিনে দু-আনার নস্যি-কে এক আনায় এনে ফেলেছি, বড় কোটো ছেড়ে ছোট কৌটা, তবু আপত্তি?" নাক থেকে আঁচল-টা সরিয়ে নিয়েছিল অনুরাধা, আঙুল দিয়ে নাকটা একবার রগড়ে বললো—"আমার খারাপ লাগে, নস্যির গন্ধ এঃ"—অনুরাধার গা-টা কিলবিলিয়ে উঠলো "রাত্রি-তে নাক দিয়ে বিচ্ছিরি শব্দ হয়!" অনুরাধার অভিযোগ-টা যেন অন্যরকম, যেন সে বলতে চায় মানুষের চামড়ার সৌরভ নস্যি নষ্ট করে আর ঘুমের সৌন্দর্য। অনুরাধা শুয়েছিল এলোমেলোভাবে, সায়াটা বেরিয়েছিল, খুব গোছালো নয় ভঙ্গি-টা—

এমন করে সে অগোছালো হয়েছে বিয়ের পর। তার আগের গোছালোপনার সঙ্গে। এতে একটা আপাত-বৈপরীত্য আছে। কিন্তু যখন সে নস্যির বিরুদ্ধে আপত্তি করলো, তার সমস্ত শরীরে সূক্ষ্মতার জন্য সেই কুমারী-মমতা প্রকাশ পেল। আন্তরিক, গভীর ও শারীরিক আকুতি। অবিনাশ বলে, "তাই নাকি?" তার নস্যি-দেয়া আঙুলটা অনুরাধার নাকের সামনে ধরলো, সেটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে-ই নাকের দুপাশ, ঠোঁটের দুপাশ কুঁচকে অনুরাধা হাঁ করলো, বালিশ থেকে মাথা তুললো, হাঁচি-টা এলো. না, আঁচল দিয়ে নাকটা রগড়ে নিল। তারপর উঠে বসলো "অসভ্য কোথাকার, ছোটলোক, নস্যির কৌটো ফেলে-ই দেব"—অবিনাশের ওপর দিয়ে তার বালিশের তলায় হাত দিল। উঠে বসে গালাগালটা যখন অনুরাধা দিল, তখন তার সমস্ত চোখে মুখে সেই অস্বস্তি আপত্তি ও রাগ সত্যি করে-ই ছিল যা ছ-মাস আগে-ও তার অভ্যস্ত ছিল। সে জোরে কথা বলতে পারে না, ডিমের মতো মুখখানা—একটু তৈলাক্ত হয়ে সে-মুখ থেকে কৈশোর ঝরে পড়ছে—রাগে রঙ বদলে ফেলেছে, আর ভুলে গেছে অবিনাশ তার স্বামী, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে অবিনাশের গায়ের ওপর দিয়ে তার বালিশের তলায় হাত দিয়েছে—অমনি, অবিনাশের শরীরের সান্নিধ্যে, ঘনিষ্ঠতা, আর কৌটো-টা বের করবার ছলে নিজেকে ঐ ভঙ্গিতে রাখার ইচ্ছা তার মন থেকে রাগ-টাকে দূর করে দিল। অবিনাশ তার স্বামী।

হি-হি করে হাসতে হাসতে হাতটা ধরে ফেললো অবিনাশ, হুমড়ি খেয়ে তার ওপর পড়তে গেল অনুরাধা, নিজেকে দমন করলো না, আবার ছেড়ে-ও দিল না, "আমি দেখাচ্ছি নস্যি নেয়া"—অনুরাধা বললো, এবার আর-একটা হাত-ও ধরে ফেললো অবিনাশ, এবার নিজেকে দমন করা সত্ত্বেও অবিনাশের ওপর খানিকটা ঝুঁকে পড়া ছাড়া কোনো উপায় থাকলো না. "এই যা, লাগে, ছাড়া হচ্ছে না কেন, চ্যাঁচাবো কিন্তু উঃ"। হাসতে লাগলো অবিনাশ। বেশ লাগলো অনুরাধার। হাসি-টা শুনে, অবিনাশের বুকের ওপর থেকে, অবিনাশের মুখের দিকে তাকালো সে—নাকের ভেতর নস্যির কালো-রস, মুখের ভেতরে জিভের ময়লা, নিচের পাটি-র দাঁতের ওপরে হলদে-লালচে ময়লা, গা ঘুলিয়ে উঠলো। গা-ঘোলানোটাকে হাত-ছাড়ানোর জন্য শরীর মোচকানোর মতো করে নিল। কোনো কথা বললো না, নজরটা কব্জির দিকে। চট করে কব্জি ছেড়ে দিয়ে কনুইয়ের নিচে ধরে ফেললো অবিনাশ। আরো ঝুঁকে পড়লো অনুরাধা। গা-ঘুলিয়ে ওঠা-টাকে ঢাকার জন্য শরীর মোচকানো, ডান পাটা ছড়িয়ে ছিল, সেটা বিছানাতে ঘষতে লাগলো, বাঁ-পায়ের তলার সংগে ডান পায়ের ঘষা লাগলো। ভালো লাগলো অনুরাধার। অবিনাশের রোমশ শরীরটায় বিয়ের গন্ধ, অবিনাশের ধুতির ওপর ছড়িয়ে পড়া তার আঁচলে বিয়ের গন্ধ, গোলাপি ব্লাউজ থেকে সবুজ শাড়ি খসে গেছে। আবার হেসে উঠলো অবিনাশ। সেই হাসির শব্দে যেন নস্যির কালো-রস-ভরা নাকের গর্ত, ময়লা জিভ, দাঁতের অপর পিঠের নোংরা, আর আলাজিভের কাঁপুনি দেখতে পেল অনুরাধা। গা ঘুলিয়ে উঠলো আবার। সেটাকে ঢাকবার জন্য যে-হাতটার কনুই ধরে ছিল অবিনাশ, তার ভাঁজে নাক-চোখ গুঁজে দিল, স্তনের ওপর দিকটা কিছুটা ঠেকলো অবিনাশের পাঁজরায়। অবিনাশ হাত দুটো ধরে থাকলো, আর শরীর মোচড়াতে লাগলো অনুরাধা। আর অবিনাশ হাসতে লাগলো। হাসি-টা এখন কৃত্রিম। যেন অনুরাধার শরীরের স্পর্শ তার মনে অন্য অনুভূতি জাগিয়েছে, আর সেটাকে ঢাকবার জন্য-ই হাসিটাকে বানিয়ে বানিয়ে টানছে অবিনাশ। যে-মুহূর্তে এটা বুঝতে পারলো অনুরাধা সে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, অবিনাশ-ও ছেড়ে দিল। সোজা হয়ে বসে মুখ থেকে চুল সরাতে লাগলো অনুরাধা, আঁচলটা টেনে নিয়ে সে অন্যধারে গিয়ে শুলো, অবিনাশ বললো—"কেমন জব্দ!"

অবিনাশ বললো "রাগ করে না রাগুনি, রাঙা মাথায় চিরুনি, বর আসবে এখুনি, নিয়ে যাবে তক্ষুনি।" কনুইয়ের ভাঁজে মুখ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে অনুরাধা নীরব। "যাক বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমুনো যাবে"—পাশ ফিরে ঘুমোনর ভান করলো অবিনাশ। কিন্তু খাওয়ার পর যে-আরাম তাকে আচ্ছন্ন করছিল, হঠাৎ তা কোথায় যেন দূর হয়ে গেছে। অনুরাধার শরীরের সংগে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা তাকে একটু উত্তেজিত করেছে, সে আরো একটু ও-রকম চাইছে। সে খাটের এ-পাশ দিয়ে নেমে ও-পাশে গেল। "ই-স, রাগ কী" বলে অনুরাধার মুখের দুপাশে হাত দিল। দু হাতে দু গাল ধরে অনুরাধার মুখটাকে ওপরে ওঠাতে লাগলো। অনুরাধা শক্ত হয়ে পড়ে রইল। কানের নিচে কাতু-কুতু দিল। অনুরাধা চট করে, দূরে সরে, অমনি করে শুয়ে রইল। অবিনাশ হি-হি করে হাসলো।

যখন থেকে অনুরাধা এসে এখানে শুয়েছে সে অবিনাশের কথা ভুলেই গেছে। অবিনাশের সংগে ঝটপটির সময় সেই যে মাথা নিচু করেছিল, তখন থেকেই একটা আরাম তাকে আচ্ছন্ন করে ছিল। আর সেই আরামটাকে আস্বাদ করার জন্যই এখানে অভিমান করে শুয়েছিল। যখন অবিনাশ তার গালে হাত দিয়েছে—তখনো সে
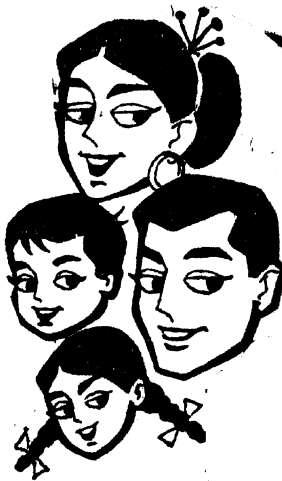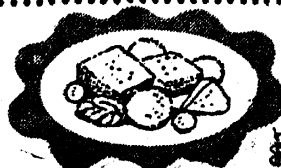
অবিনাশের কথা ভাবে না। শুধু তার স্পর্শ। স্পর্শ-টা বড় সুন্দর। সেই ভালো লাগা-টা নিরুপদ্রবে সইতে অপ্রস্তুত বোধ করছিল অনুরাধা—তাই সে দূরে সরে এলো। অবিনাশের হাসিতে মুহূর্তে তার চোখের সামনে কালো রস-ভরা নাক, ময়লা জিভ, নোংরা দাঁত ভেসে উঠলো। কিশোরী-র মতো সে শিউরে উঠলো। তখনো স্পর্শের আরামটা ভোলে নি। অবিনাশের সঙ্গে সম্পর্ক ভুলে গেছে। তার তখনকার সমস্ত অনুভূতি অকস্মাৎ তাকে কৈশোরে নিয়ে গেল। খুব আনন্দ বা খুব বিষাদে এমনি-ই আপ্লুত হতো। তার রক্ত যেন উষ্ণ হতো, আর উষ্ণ রক্ত যেন মাংসকে গলিত মোমের মতো করে রাখতো, আর তখন যে-কোনো স্পর্শে তার ত্বক সাড়া দিত। আজো নিশ্চয় দিয়েছে। বড় সুন্দর স্পর্শ। স্পর্শ তার স্বামী-র। অবিনাশ তার স্বামী। স্পন্দিত ত্বকের কল্পনাতে-ই সে স্বামীর কথা ভেবে শিহরিত হলো। অবিনাশকে নিয়ে সে সুখী।

অবিনাশ বললো "আড়াইটে বাজে, আবার রওনা হতে হয়"। অবিনাশ বাইরে গেল। অনুরাধা বুঝলো এখন তার ওঠা উচিত, অবিনাশ-কে সব গুছিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে নতুন কল্পনায় সে এতো আনন্দিত আর তার স্পর্শে সে এতো অবসন্ন, যে উঠতে ইচ্ছে করলো না। আর ওঠা মানেই তো অবিনাশের সামনে দাঁড়ানো, তাতে যেন তার স্বপ্নের অবসান। শব্দ শুনে শুনে সে বুঝতে পারছিল অবিনাশ জামা-কাপড় পরছে, এখন তার ওঠা উচিত, অতি অবশ্য। না-ওঠা-টাকে শুধরে নেয়ার জন্য যেন অনুরাধা বললো "যে না অফিস, দুটোর বদলে আড়াইটের গেলে কী হয়"। "কী আবার হয়, বসে বসে মেয়েমানুষের রাগ দেখতে হয়"—অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। অবিনাশের ঈষদুষ্ণস্বরের কথাটা অনুরাধা-কে অবিনাশের কথা ভাবালো। প্রথম কথা-টা বলবার সময় সে আবার কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অবিনাশের দ্রুত উত্তরে, তাকে তাড়াতাড়ি বলতে হলো, "কে রাগ করেছে?" কথা বলায় আর ভাবায় সে নিজের মনে ভেসে যাওয়া স্রোত থেকে উজিয়ে এলো; বর্তমানে এলো; অবিনাশ বললো, "যে-রকম মুখ গুঁজে শুয়ে আছো?" "—কে বললো রাগ? কোথায় রাগ?"—অবিনাশের কথা শেষ হওয়ার আগেই অনুরাধা উঠে বসেছে। তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বোকা হয়ে চুপ করে রইল। অনুরাধা খাট থেকে নেমে, আলনার তলা থেকে অবিনাশের জুতো বের করে, ব্রাশ করে, তার সামনে দিল। অবিনাশ-কে জিজ্ঞেস করলো—"তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?" অবিনাশ বললো—"হাঁ"। অবিনাশের সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাধা কয়েক মিনিট আগের সব কথা ভুলে গেল, শুধু অপেক্ষা করতে লাগলো—অবিনাশ গেলে, দরজা-টা বন্ধ করে সে কখন শুয়ে পড়বে। অবিনাশ খাটে বসে, ধীরে ধীরে জুতো পরলো। অনুরাধা একটা কৌটো থেকে সুপুরি বের করলো। দাঁড়িয়ে অবিনাশ সেটা নিল। বললো, "চলি", দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজা ধরে অনুরাধা দাঁড়ালো। অবিনাশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোঁচাটাকে পকেটে নিল, সিঁড়িতে পা দিল। অবিনাশ সিঁড়িতে পা দিতেই অনুরাধার দরজা দুটো বন্ধ করতে ইচ্ছে করলো।

কিন্তু যতোক্ষণ অবিনাশ উঠোনটা দিয়ে টিনের দরজার দিকে বাঁক না নিল দাঁড়িয়ে থাকলো, তারপর পাল্লা দুটো টেনে খিল আটকে দিল।

খাটের দিকে আসতে আসতে আয়নায় নিজেকে দেখলো, আয়নার সামনে এগিয়ে গেল।

চুপচাপ মুখ গুঁজে শুয়ে থাকার সময় অবিনাশের স্পর্শে সে আনন্দিত ও সুখী বোধ করছিল, আর নিজের ত্বকের স্পর্শ-কাতরতায় নিশ্চয়ই সেই আনন্দ ও সুখের কথা লেখা হচ্ছে ভাবছিল। অবিনাশের কথার উত্তরে কথা বলার সময় সে-সব ভাবনা মন থেকে সরে গিয়েছিল। অবিনাশের জুতো এগিয়ে দেওয়া আর চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় কিছুই মনে ছিল না, শুধু ছিল ঘুমুবার ইচ্ছা। আয়নায় নিজেকে দেখে আবার সব কথা একবারে মনে এলো।

অনুরাধা দেখলো একটি জায়গা-ও ফুলে ওঠে নি, শুধু গাল দুটো একটু লাল হয়েছে। নাকের ডগা, গলা আর কানের লতিতে হাত দিল, একটু-ও ফোলা লাগলো না। কনুইয়ের ওপর সামান্য লালচে, কনুইয়ের নিচে অবিনাশ যেখানে ধরেছিল লাল রেখা-টা কিছুটা স্পষ্ট। কপাল কুচকে এ-সব দেখলো অনুরাধা, তারপর শুতে গেল। অসুখটা সেরে গেছে—এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার মনে অবিনাশের বিরুদ্ধে একটা কী অভিযোগ এলো।

খাটের ওপর একবার সে শাড়ি তুলে পায়ের বাটি-দেখলো, তখন বিছানার সঙ্গে ঘষেছিল। বুকটা ওর পাঁজরের সঙ্গে লেপেছিল—কিন্তু সেটা আর দেখতে ভরসা পেল না অনুরাধা। সে চিত হয়ে শুলো, তারপর কাত হলো, তারপর উপুড় হয়ে আগের মতো করে শুলো। আমি সুখী নই, আমার বড় দুঃখ—এ-কথাটা মনে হলো না অনুরাধা-র। অবিনাশের স্পর্শের আগে তার উত্তপ্ত শরীর, অবিনাশের স্পর্শের পর-ও মসৃণ থেকে, অনুরাধাকে সোজা-সুজি ভাবালো—ওর কি সাদা ফুলশার্ট নেই, বিয়ের আগে-ও কি পাঞ্জাবি পরতো, বোধ হয় তাই, নইলে কোঁচা নিয়ে ব্যস্ত হয় না কেন, মালকোঁচা করে কাপড় পরলে ভালো লাগে, তার সঙ্গে সাদা ফুলশার্ট হাতা-গোটানো, পাঞ্জাবি পরলেই বুড়োটে লাগে কেমন এক একটা করে সিঁড়ি পার হয়, সিগারেট বেশ ভালো, নস্যি যা-তা, ও বিয়ের পাম্প-শু কেন পরে, স্যান্ডেল পরে না কেন, কুঁজো হয়ে হাঁটে কেন?

অত্যন্ত সাধারণ মনের মেয়ে অনুরাধা, সে যৌবন কথাটা একবার মনে মনে উচ্চারণ না করেও তার অক্ষয়তা সম্বন্ধে কেমন একটা অসাধারণ আশা রাখে আর বিয়ের সঙ্গে যৌবনের অত্যন্ত ভোঁতা একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর, অনুরাধার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, মনের কথা শরীরে পড়ার একটা অভ্যাস থাকার জন্য, সে যে অসুখী এটা সক্ষ্মভাবে অনুভব করার বদলে, বাইরে থেকে সহজে-ই জানতে পায়। আর মনের যৌবন আর বিয়ে আর শরীর আর ক্লান্তি আর ভোঁতা-ভাব আর তবু একটা-আশা—এ-সবের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে, যৌবনের সমুদ্র-কে বিয়ের ঝিনুকে আঁটাবার অসম্ভব ব্যবস্থার অনিবার্য গ্লানি-কে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কে-র মতো নেহাৎ তুচ্ছ ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যায়। অবশ্য, তার অসুখটা মনের কাছে স্পষ্ট বলেই, শরীরের মসৃণতা দেখে তার অ-সুখের কথা, দুঃখের কথাই মনে পড়ে; মনে পড়ে না যে, তার পুরোন অসুখটাতে দুঃখের সময় ও শরীরের নরম জায়গাগুলো ফুলে উঠতো। এতো অসাধারণ মেয়ে অনুরাধা যে, মনে মনে অবিনাশকে বদলে, সাজিয়ে, নিন্দে করে, যেন সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে। সারাটা কৈশোর সে কাটিয়েছে বাপ-মায়ের সঙ্গে, তখন পথের দুধারে আকাশ ছোঁয়া প্রাচীর দুটোকে নিন্দে করে নি এই আশায় যে, কৈশোর-টা পেরুলেই এই দম-বন্ধ করা প্রাচীরটা শেষ হবে। এখন যখন দেখলো তা হলো না, তখন প্রাচীর দুটোকে আঘাত করার বদলে, নিজের অতি সামান্য কল্পনা শক্তি দিয়ে আঘাত করছে সেই লোকটিকেই যে, তারই মতো দুঃখ-যন্ত্রণায় তার সঙ্গে এই দুই প্রাচীরের মাঝ-খানের সরু গলিটা দিয়ে চলেছে। অনুরাধার কোনো দোষ নেই। ছোটবেলা থেকে এই দুই আকাশ-ছোঁয়া প্রাচীরের মধ্যে অপরিসর গলিটা দিয়ে চলতে চলতে সে আকাশটাকে দেখতেই পায়নি। আকাশ দেখতে না পেলে কি কল্পনা বাড়ে?

এত লোম! গলার গর্তটার মধ্যে পর্যন্ত, বুকের লোম দেখলে মনে হয় ভেতরে ময়লা আছে বা উকুন। বসে থাকলে পেটে ভাঁজ পড়ে, ভাঁজে ঘাম জমে নস্যির পচা গন্ধ—(অনুরাধা নাক কোঁচকালো), আর মুখে কি দাড়ি, যেন গাল কেটে যায়, এতো কড়া দাড়ি, তবু অনুরাধা নিজের গাল দেখে জানতে পারে না সে সুখী কি না। অনুরাধার মনে যে প্রশ্নটি কিছুদিন ধরে গুনগুন করছিল, যেটা সে কিছুতেই প্রশ্নের আকারে নিজের মনের কাছে ধরতে চায়নি, তাই-ই এই নির্জন দুপুরে স্পষ্ট একটা প্রশ্ন হলো—আমি কি ওকে ভালোবাসি না? আর প্রশ্ন মনে আসা মাত্রই যেন আতঙ্ক

উঠলো অনুরাধা। যদি সে অবিনাশকে ভালো-না-বাসে তবে কি হবে? অবিনাশকে সে ভালো বাসে না এটাই তার কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হলো। সে অসুখী হতে পারে কষ্ট পেতে পারে, কিন্তু ভালো না বাসা? যদি অবিনাশ আর কারো স্বামী হতো, সে কি ভাবতো তাকে দেখে? কিন্তু কার স্বামী হতো অবিনাশ? মনে মনে আর কাউকেই অবিনাশের স্ত্রী করতে পারলো না অনুরাধা। সে, কেবল সে, কেবল সে-ই, সে-ই অবিনাশের স্ত্রী। কেবল অবিনাশ, অবিনাশ-ই, অবিনাশ-ই তার স্বামী। সে আর অবিনাশ, স্ত্রী আর স্বামী। নিজের মসৃণ শরীর থেকে প্রশ্ন শুরু করে, সমস্ত কিছু সম্পর্কেই অস্পষ্ট কতকগুলি ধারণা নিয়ে অসাবধান অনুরাধা আরও এক জটিলতায় নেমে গেল—স্বামী স্ত্রী, দাম্পত্য-জীবন, ভালোবাসা-না-বাসা।

তবে কি অবিনাশ যখন তাকে ছোঁয়, সে পুরোপুরি সাড়া দেয় না, না, দেয় তো, রাতে অবিনাশ বা সে অধীর হয়ে পড়ে, কিছুতেই স্থির হতে পারে না। কিন্তু তখন তো অন্ধকার, অবিনাশকে দেখা যায় না, সে স্পর্শ অবিনাশের বলেই চেনা যায় না তো, কিন্তু যখন অবিনাশের বলেই চেনা যায় শিউরলো অনুরাধা, নাক কোঁচকালো—পচা নস্যের গন্ধ, শরীরে লোমের সুড়সুড়ি, তখন কি একটুও কোঁচকায় না সে, একটু না? হ্যাঁ, সে মাথাটাকে কাত করে রাখে গন্ধটা বাঁচাবার জন্য। অবিনাশ যদি নস্যি না নিত, যদি তার বুকে-পেটে এতো মোটা মোটা লোম না থাকতো, তবে, তবে, নিশ্চয়ই অনুরাধা তাকে ভালোবাসতো। না, সে-তো ও এখনো বাসে, তবে, তখন এতো ভালো-বাসতো যে, তার সেই পুরোন অসুখটা আর সারতো না। পৃথিবীর সব পুরুষ-মানুষের বুকে-পেটে লোম, আর নস্যির নেশা নেই। অবিনাশেরও যদি না থাকতো, অনুরাধাও পৃথিবীর আর-আর সব স্ত্রীর মতো স্বামীকে ভালোবাসতে পারতো।

এতো সাধারণ মনের মেয়ে অনুরাধা যে, সে কোনো যুক্তি পরম্পরার সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না। তার শারীরিক গঠন ব্যবস্থার কিছু গোলমালের জন্য যেমন সে পুঁইশাক, ময়লা মশারি, অন্যের ব্যবহৃত গামছা, সজনে ডাঁটা, নোংরা জায়গায় খাওয়া সইতে পারতো না, তেমনি, এখন সইতে পারছে না অবিনাশের লোম আর নস্যি। কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় মশারির ময়লা আর সজনে ডাঁটা ধ্বংস করে ফেললেও যেমন তার শারীরিক গঠনতন্ত্র বদলাতো না, তেমনি নস্যি আর লোমের হাত থেকে অবিনাশকে সরিয়ে আনলেও তাতে অনুরাধার

কিছু আসতো যেতো না। তবে, অনুরাধার সেই অতি প্রখর, উপযুক্ত-ট্যান-না-করা, তীক্ষ্ম শিরা-উপশিরাগুলি যে সাধারণ হয়ে আসছে, তার প্রথম সূচনা দেখা গেছে তার দেহের মসৃণতায়। পৃথিবীর অন্যান্য মেয়েরা ও ছেলেরা জন্মের পূর্বেই ঠিক তারে বাঁধা হয়ে আসে বলে বিয়ের পর পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হতে ও পরস্পরকে ভালো বাসতে তাদের কোনো রকম অসুবিধেই হয় না। আর, তারা ভুলে যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ। অনুরাধার যেন সেই অবস্থা, যা প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক অথচ যে-স্বাভাবিকতার আশ্রয় নিলে, অনুরাধার মতো কষ্টে দিন কাটবে; দু-পাশের প্রাচীরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হতে হবে, আর, সে-কারণেই, তারা, মায়ের পেটে থাকা কালেই, নিজেদের শিরা-উপশিরাকে আরও একটু ঢিলে করে নেয়, আরো একটু মোটা আর আরো একটু স্থূল হয়ে নেয়। অনুরাধাও ধীরে ধীরে ভুলে যাবে সে অবিনাশের স্ত্রী, অবিনাশ তার স্বামী। যেখানে আলো-বাতাস আর আকাশের মতো সীমাহীন অনন্ত যৌবনকে ছোট ঘেরা আর স্যাঁতসেতে বিবাহে বইয়ে দেয়া হয় এবং ভালোবাসা আর দাম্পত্য-জীবনের দুটি সিলমোহর দু-পিঠে নিয়ে জীবন নামে চালু মুদ্রাটি তৈরি করা হয়, সেখানে—নিজের টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বুড়ো অবিনাশ মাঝে-মাঝে হঠাৎ 'রাধু' বলে ডাকলেও ডাকতে পারে, কিন্তু অনুরাধা ভুলে যায় তার নাম অনুরাধা।

সেই দিনটি আসবেই আসবেই। এখনো আসে নি। তাই, দুপুরে বিছানায় শুয়ে অনুরাধা ভাবে, আমি কেন আর সবাইয়ের মতো নই। গায়ে-হলুদের দিন এয়োরা তাদের তরকারি-কাটা কড়কড়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে আমাকে তো পুরোন, পুরোন, পুরোন হতেই বলেছিল। তবে, কেন আমি মা-ছোটমাসি-কমলাদি বা সুপ্রভার মতো নই, ওদের মতো হতে পারি না, পারছি না। পারবো না? আমি কেন পুরোন হই না?

বিনত অনুরাধা ঘুমিয়ে পড়লো। তার মুখমণ্ডলে ঘামের আচ্ছাদন। তার মুখের সেই কৈশোর-লাবণ্যের পরিবর্তে একটা সন্তোষ। দুটো যেন মিশে আছে। গালের দুপাশ আর থুতনির নিচটা পিম্পি-পিম্পি, কিন্তু দুটো সরল ভুরুর নিচে বোজা চোখের পাতাটা এতো স্বচ্ছ, মনে হয়, ছুঁলেই সমস্ত শরীরটা কিশোরী-অনুরাধার মতো কেঁপে উঠবে, মেঘ ডাকলে যেমন সুরে বাঁধা সেতারে ঝংকার ওঠে। একটি অঙ্গে তিনটি অসুখী অনুরাধা ঘুমোচ্ছে। চোখের পাতায় আর ভুরুর রেখায় আর ঠোঁটে—পুরোন অসুখে অসুখী অনুরাধা। থুতনির নিচে আর দুপাশের গালে আর কপালের সিঁদুরে সুখ-অসুখ ভালোবাসা-না-বাসার দ্বন্দ্বে অসুখী আজকের অনুরাধা। আর সারা দেহ-ভাঁজগুলোতে দিন রাত্রির অস্তিত্ব-টানা অসুখের ক্লান্তি, দীর্ঘকালের পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মতো। আজকের অনুরাধা কিশোরী অনুরাধাকে সরিয়ে দেবে, আর সমগ্র দেহ-ভঙ্গির ক্লান্তি আজকের ক্রমে হয়ে-ওঠা পিম্পি-পিম্পি অনুরাধাকে সরিয়ে দেবে।"

তারপর, অনুরাধা রাধু হয়ে যাবে।

কিন্তু রাধুর গর্ভে যে শিশু বেড়ে উঠবে, সে-কি নিজেকে একটুও মোটা-স্থূল-আর-ঢিলে না-করে, অন্য গর্ভের শিশুগুলিকে ডাক দিয়ে বললে না—"এবার, সবাই, আমরা,—অনুরাধা হয়ে জন্মাবো!"

বাংলা সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ সাম্প্রতিক ও সংক্ষিপ্ত। চার বছর আগে—মার্চ, ১৯৫৫—আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই সম্পাদকীয় লেখক হয়ে এবং মাস পাঁচেক আগে—এপ্রিল, ১৯৫৯—আমি নিরভিযোগ চিত্তে পদত্যাগ করি। মাস পাঁচেকের ব্যবধানে এই অল্পমধুর অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি-পাত করে অনুতাপ করিনে। মনে করি, আমার এ-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল, এতে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি; বাঙলা ও বাঙালীর এই সংস্পর্শ আমাকে আমার ও আমার দেশ সম্বন্ধে মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে। যোগ করা দরকার, আনন্দবাজারের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলাম না। আমার পা ছিল দু' নৌকায় কেননা একই সময়ে আমি নিয়মিত হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে ইংরেজীতে সম্পাদকীয় লিখেছি এবং কিছুদিনের জন্য সে-কাগজের সম্পাদনার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। অস্বীকার করা অসাধু হবে, আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে আরোপিত বলে মনে হয়েছে—যেন আমি বিদেশী। মাছ এখন জলে ফিরে এসেছে এবং ডাঙার দিকে এখন সে ফিরে তাকাতে পারে কিঞ্চিৎ নিরাসক্তির সঙ্গে।

অভিরুচি অনুযায়ী অনুশোচনা বা উল্লাসের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, ভারতে অতএব বাঙলায় ইংরেজীর অবনতির বেগ আজ অতিদ্রুত। এদিকে নীরবতা আমাদের চরিত্রবিরুদ্ধ। তাই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং আদৌ শোকাবহ নয়। হিন্দী ভাষার হীনতা যেমন উগ্ররূপে প্রকট, ঠিক তেমনি স্পষ্ট এর অধিবক্তাদের প্রমত্ত প্রসারলিপ্সা। নানা উন্নত আঞ্চলিক ভাষা তাই আতঙ্কিত। আর তার প্রত্যক্ষ ফল এই ভাষাগুলির জন্য মমত্ববৃদ্ধি। দেশী ভাষার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির উত্তরোত্তর মর্যাদাবৃদ্ধি প্রত্যাশিত। প্রশ্নঃ বর্ধিত প্রভাবের জন্য দেশী কাগজগুলির প্রস্তুতি কি পর্যাপ্ত? অন্যান্য আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি পরিমিত। বাঙলা কাগজের সঙ্গে বর্ষ-চতুষ্টয়ের সান্নিধ্যের পরে সানন্দে বলতে পারি, বাঙলা সাংবাদিকতার মানে বাঙালীর লজ্জার কারণ নেই। নানা গুণ এর, তবু ত্রুটি আছে কিছু। গুণবর্ণনে স্বভাববিনয় বাধা। ত্রুটির আলোচনায় অধিকতর উন্নয়নের সম্ভাবনা।

*

এ-ধারণা এখনো পুরোপুরি নির্বাসিত হয়নি যে, বাঙলা কাগজের পাঠক সাধারণত অর্ধশিক্ষিত। ধারণাটি অর্ধসত্য, কিন্তু এর পৌনঃপুনিক প্রকাশ আমি শুনেছি কাগজের অফিসেরই অভ্যন্তরে। ফলে কাগজের লেখা অনেক সময় হয় ইংরেজীতে যাকে বলে "রাইটিং ডাউন"। পাঠকের প্রতি এ-অশ্রদ্ধা শুধু অপমানকর নয়, ক্ষতিকর। কাগজের পক্ষে, লেখকের পক্ষে। "লেখক" কথাটি ব্যবহার করেছি অনবধানে নয়। বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে ব্যবধানটিকে বড়ো করে দেখা ও দেখানোর প্রয়াস বহু সাংবাদিকে—ও লেখকে—প্রকট। এমন বলিনে যে, প্রভেদ নেই। কিন্তু সাহিত্যের স্পর্শ ব্যতীত উচ্চকোটির সাংবাদিকতা অসম্ভব। দুই বস্তুকে একেবারে আলাদা করে দিলে খবরের কাগজে রস থাকবে না, সাহিত্যও অতিমাত্রায় অবাস্তব হতে পারে।

বাঙলা সাংবাদিকতার প্রথম গৌরব, আমার মতে, তার সাহিত্যগুণ। সৌভাগ্য-ক্রমে বহু সফল, এমন কি সার্থক, লেখক সাংবাদিকতায় নিযুক্ত। তবে কেন বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা সাংবাদিকতার মুখ-দেখাদেখি থাকবে না? কেউ কেউ যে পারেন তা দেখেছি, আমি ভাবতেও পারিনে যে, গল্প-রচনার সময় আমি লেখক হলাম আর সম্পাদকীয় লিখতে বসে বনলাম সাংবাদিক। একটি মনের ঈদৃশ দ্বিভাজন, যুগপৎ দুটি পর্যায়ে মানসিক বিচরণ বোধহয় অস্বাস্থ্যকর। অন্তত অসাধু। কাগজ থেকে জীবিকা অর্জন করে তার কাজে আমার সাধ্যের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু দেব না, এর মধ্যে সততা নেই।

আরেকটি প্রচলিত ধারণার আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, সম্পাদকীয় লেখার সময় আমার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত মতামত অবান্তর, আমাকে লিখতে হবে কাগজের পলিসি অনুযায়ী, কাগজের রচনাভঙ্গী অনুযায়ী। এ-মত আমি প্রত্যাখ্যান করি। এ-মতের আড়ালে অসাধুতা আছে বলে সন্দেহ করি। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি,

আমি কখনো এমন কিছু লিখিনি যা আমার বিশ্বাস ও বিবেকের বিরোধী। (যা লিখতে চেয়েছি, তা সব সময়ে লিখতে পারিনি, এটুকু আপস—মাঝে মাঝে—মার্জনীয় বলে মনে করি। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, বিবেকবিরুদ্ধ কিছু লিখতে আমি কখনো বাধ্য, এমন কি অনুরুদ্ধ হইনি।) এমন কাগজে কাজ করব কেন যার মতামতের সঙ্গে আমার মতামতের মোটামুটি মিল নেই? বিশ্বাসবিহীন লেখা রসহীন হতে বাধ্য। তাই বিস্ময়ের কারণ নেই যে, বহু সম্পাদকীয় পাঠ্যভাগুণবর্জিত, গতানুগতিক, মৌলিকতাবিরহিত। এমন লেখা লেখককে আনন্দ দেয় না, পাঠককে আনন্দ দেয় না। এমন লেখা মা লিখ।

*

আঞ্চলিক সংবাদপত্রে স্বীয় অঞ্চল প্রাধান্য পাবে, এ তো স্বাভাবিক। তবু লক্ষণীয়, দৃষ্টিভঙ্গী অতিমাত্রায় আঞ্চলিক অর্থাৎ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে কিনা। বাঙলা সাংবাদিকতা পরিপূর্ণরূপে এ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। বরং বলা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-সংকীর্ণতা বিস্তীর্ণতর হচ্ছে। বাঙালী বাঙালী হবে বৈকি; কিন্তু তাকে ভারতীয় হতে হবে, বিশ্বনাগরিক হতে হবে। বিশ্বকবির প্রদেশে প্রাদেশিকতা অমার্জনীয়। এমন মনোভাব সৃষ্টি করতে বাঙলা সাংবাদিকতার প্রতিটি অংশ সর্বদা সচেষ্ট, এমন দাবি করতে পারলে খুশী হতাম।

সংকীর্ণতার প্রচ্ছন্ন—সর্বদা প্রচ্ছন্নও নয়—প্রভাবে অন্যান্য কয়েকটি ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রতিটি কাগজ প্রতি প্রভাতে—সান্ধ্য দৈনিক একটিও নেই কেন?—সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, এমন দাবিও করতে পারব না। আমাদের কাগজগুলি হিন্দুর সম্পত্তি। বুঝতে পারিনে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি আমরা আরো উদার কেন হতে পারি না। বাঙলায় আর যেদিকেই অভাব থাক, বিদ্বেষের কমতি নেই নিশ্চয়ই। দরকার কী কাগজগুলির তাতে ইন্ধন জোগাবার? বিক্রয়বৃদ্ধি যদি কারণ হয়, তবে কলঙ্ক সামগ্রিকভাবে বাঙালী জাতির। বহু পাঠক সাম্প্রদায়িকতাপ্রিয় না হলে সম্পাদক বা মালিক তার জোগান দিতে চাইবেন কেন? অবশ্য, কোনো দেশের কাগজই অংশত জনমত ও গণ-আবেগের প্রতিফলন বা প্রতিধ্বনি না হয়ে পারে না। কিন্তু এখানেই দেখা যাবে বাঙলা সাংবাদিকতার ভূমিকা-পরিবর্তন। একদা সে শিক্ষক ছিল, আজ সে মনোরঞ্জক মাত্র। একে আমি সুলক্ষণ বলতে অপারগ।

*

কোথাও কোথাও স্বাগত প্রতিবাদের শুভসূচনা লক্ষণীয়, কিন্তু বাঙলা সাংবাদিকতার প্রধান সুর আজো মূলত সংরক্ষণশীল ও অনাধুনিক বলে মনে করি। পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট প্রতিদিন প্রকাশ না করলে নাকি প্রচারসংখ্যা হ্রাস পাবে। এখানে গীতাপাঠ, ওখানে স্বামী অমুকানন্দের প্রার্থনা-সভা : তিনের পাতায় এজাতীয় সংবাদের(?) আতিশয্য দ্রষ্টব্য। হিন্দু পাঠকের জীবনে ধর্মানুষ্ঠানের স্থান হয়তো গুরু, কিন্তু সেটাই একমাত্র ব্যাখ্যা না হতে পারে। বিবর্তনবিমুখতা হয়তো অধিকারীর প্রবলতম প্রবণতা। ভাষার কথাই ধরা যাক। যে-বাঙলায় আজকাল অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস রচিত হয় তা এখনো দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভ থেকে নির্বাসিত। আনন্দবাজার পত্রিকায় গুটিকয় তৃতীয় নিবন্ধ চলতি বাঙলায় লেখা হয়েছিল মাসকয়েক আগে। চলেনি।

সন্দেহ করি, পাঠকের বর্তমান রুচি ও প্রকাশকের অতীত রীতির মধ্যে সেতুবন্ধন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তাই যে-ভাষায় সবাই আমরা কথা কই, বই পড়ি, তার স্থান নেই আমাদের কাগজের চারের পাতার প্রধান অংশে। আদৌ অসম্ভব নয় যে, ব্যবধান শুধু ভাষার নয়, ভাবেরও।

*

কাগজে রাজনীতি যতখানি জায়গা জুড়ে আছে জনচিত্তে তার অবস্থান কি ঠিক সমান ব্যাপক? এদিকেও পরিবর্তন যৎকিঞ্চিৎ হচ্ছে, কিন্তু বোধহয় অতিধীরে। স্বরাজলাভের পরে সমগ্রভাবে জীবনকে দেখা ও তার পুনর্গঠনের যে-সুযোগ আসার কথা, তার সর্বাঙ্গীণ প্রতিফলন কি আছে আমাদের পত্রিকাগুলির পাতায়? "নারীর কথা" বিভাগে এত রান্নার কথা দেখে মনে হয়, আমাদের মেয়েরা বুঝি আর চুল বাঁধে না। স্কুল-কলেজের ছেলেরা ট্রাম না পোড়ালে কেন খবর হয় না? কারখানা বন্ধ না থাকলে তার উল্লেখও দেখা যায় না কাগজে। এসব দেখে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে, আমাদের কাগজগুলির দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত মধ্যবিত্ত সমাজের—যে-সমাজের দ্রুত ভাঙনের সংবাদ সর্বজনস্বীকৃত। এ-ভাঙনের পরোক্ষ প্রভাব কাগজে প্রতিবিম্বিত হলে বিস্ময়ের কারণ নেই; বেদনার কারণ আছে।

*

আধুনিক সংবাদপত্র একক কীর্তি নয়, হতে পারে না। চাই বিশাল প্রতিষ্ঠান। তবু ব্যক্তির, গুণী ব্যক্তির, প্রাধান্য স্বীকৃত না হলে প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সন্তান, পত্রিকা। অন্যান্য ব্যবসায়ের বেলায় যাই হোক, সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার প্রণয় বৈধ হোক বা অবৈধ, এমন যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠান আজো আবিষ্কৃত হয়নি যা মন ও চিন্তাকে পরিহার্য করে দিতে পারে। হতে পারে সম্পাদকীয় রচতে বসে আমি সাহিত্য সৃষ্টি করছি না, শুধু প্রতিষ্ঠানের মতামত লিপিবদ্ধ করছি, কিন্তু আমার মনকে বাদ দিয়ে সে-কাজ অসম্ভব। আমার একান্ত স্বীয় ব্যক্তিত্বের পরোক্ষ প্রক্ষেপ তাই অবশ্যম্ভাবী।

এবং একে আমি অবাঞ্ছনীয় বলে মানতে অক্ষম। আমার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিলোপ ঘটলে—বা ঘটালে—আমার সঙ্গে প্রভেদ কোথায় অসাংবাদিকের বা মন্দ-সাংবাদিকের সঙ্গে? এটাকে আমি আদৌ অগৌরবের মনে করি না যে, আমার লেখা স্বাক্ষরহীন সম্পাদকীয় আমার রচনারীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত পাঠকের কাছে আমারই লেখা বলে অনায়াসে চিহ্নিত হয়েছে। সাংবাদিকতা সাধারণত স্থায়ী কীর্তি নয়, সত্য। (যদিও জানিনে সাহিত্যের কতখানি কত স্থায়ী।) কিন্তু পরিমিত স্থায়িত্বাভিলাষ সাংবাদিককে দেয় চিন্তা এবং দায়িত্ববোধ, লিখনে সংযমশীলতা। দুইটি গুণ, সাংবাদিকতায়ও।

*

ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব সত্য, তবু মনে রাখতে হবে যে, সাংবাদিকতা যৌথ প্রয়াস। অনেকের সঙ্গে কাজ করতে হয়, উপরে থাকলে অনেকের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয়। অনেককে মানাতে হয়, নিজেকে মানিয়ে নিতে হয় বহুর সঙ্গে। কিন্তু এই মানিয়ে নেয়ার মোহ অত্যধিক প্রশ্রয় পেলে বিশ্বাসে ভাঙন ধরে, বিবেকে ঘুণ। অচলায়তন প্রতিষ্ঠানে মানসিক সচলতা অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ নয়, নীরব সংগ্রাম করতে হয় অবিরাম। প্রতিষ্ঠিত কাগজের ঐতিহ্য মানসিক আনুগত্য দাবি করে, কখনো কখনো সে-আনুগত্য মনের মৃত্যুর নামান্তর। পুরানো প্রতিষ্ঠানের প্রৌঢ়ত্ব তারুণ্যে সন্দেহী, তাই সদা সতর্ক থাকতে হয় মানসিক বার্ধক্য সম্বন্ধে।

বাঙলা সাংবাদিকতায় তারুণ্যের অধিকতর প্রাচুর্য দেখা দিলে তারুণ্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেবে এবং একথা ঠিক নয় যে, তারুণ্যের আবির্ভাবে স্থিরবুদ্ধির বিদায়। কোনো কোনো বিষয়ে বাঙলা কাগজগুলি কি একটু অতি-সাবধানী নয়? দেশে অনেক কিছু আছে যেগুলি সম্বন্ধে স্বল্পতর ধৈর্য বিধেয় এবং কিঞ্চিৎ ক্রোধও অসঙ্গত নয়।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা না গেলেও জ্যোতিষীকে বিজ্ঞানী বলা যায়। তিনি বিশেষরূপে জ্ঞানী, কারণ মানব-চরিত্রের মতন কঠিন ও বিচিত্র বিষয়ে তিনি নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। ভাগ্য ও নিয়তি সম্পর্কে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য হতে পারে যুক্তিবাদীর কাছে, এমন কি তাঁর ভবিষ্যৎ গণনা কিছুই নাও মিলতে পারে। কিন্তু মানুষের মন কি রকম পদার্থ, তা তিনি চেনেন। আর জেনেছেন বলেই তিনি সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। লোকে মুখে যা-ই বলুক, তাঁর সান্নিধ্য বা বন্ধুত্ব কামনা করে থাকে, বিশেষ করে দুর্দিনে—যখন বর্তমানের গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ফাটল ধরে।

অনেক পেশাদার জ্যোতিষীর শাস্ত্রজ্ঞান নেই। কারু-কারুর আছে। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রটাই যখন 'এম্পিরিকাল' বা অভিজ্ঞতাবাদী, তখন তারও চেয়ে এম্পিরিকাল যে মানব-চরিত্র-তত্ত্ব, তার জ্ঞান কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যবহারিক প্রয়োগেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। জ্যোতিষী তো নিত্যই তা করে থাকেন। মানুষের মন সম্পর্কে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রয়োগ করেন মানুষের ওপরেই, কখনও ভয় কখনও আশা জাগিয়ে। যাঁর যত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, যাঁর পরীক্ষা-পদ্ধতি যত ধীর-সুস্থির, তাঁর খ্যাতি তত বেশি। মানুষ যতই বুদ্ধিমান যুক্তিনিষ্ঠ হোক, তাকে মাঝে মাঝে যেতে হয় জ্যোতিষীর কাছে নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাবার জন্য, নতুন উদ্যম ও আশা নিয়ে আসার জন্য। মানব-মনের এই চিরন্তন দুর্বলতা জ্যোতিষী ভালোভাবে জানেন এবং তাকে কাজে লাগাতে পারেন বলেই আজকের দিনে, বৈজ্ঞানিক যুগেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ধূলিসাৎ হয়নি।

ভূতের চেয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই মানুষের কৌতূহল বেশি। বর্তমানকে চোখে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আগামী কালকে দেখা যাচ্ছে না। যেটা অনাগত, সেটা অনায়ত্ত। অতএব তার আকর্ষণ দুর্বার। অপরিচিতের রহস্য হচ্ছে রোমান্সের মূল উপাদান। সুতরাং জ্যোতিষ হল রোমান্টিক শাস্ত্র। আবার সে রোমাঞ্চকে ঘনীভূত করা হয় ভূতকে টেনে এনে। অতীত যদি অনেকটা মিলে যায়, ভবিষ্য গণনায় আস্থা জন্মায়। এবং সেই জন্য অনেক জ্যোতিষীকে বিগত কালের কথা বলতে হয় এবং লক্ষ্য করতে হয় মিলছে কি না। শ্রোতার মুখভাব দেখে আন্দাজ করতে হয়, সন্দেহ এবং প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম পর্দাগুলি চিনতে হয়। দ্বিধা সংশয় হল প্রতিকূল হাওয়া, অবিলম্বে নৌকা থামানো আবশ্যক। সম্মতির স্মিত হাসি ও কৌতূহলের দীপ্তি হচ্ছে অনুকূল স্রোত, জ্যোতিষী তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গা ভাসাতে পারেন। বিশ্বাস একবার গজিয়ে উঠলে, আইনস্টাইন হতে বাধা নেই। সমস্ত ঘটনা ও সময় তখন আপেক্ষিক হয়ে ওঠে। ভূত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

এককালে সায়েন্স আর ম্যাজিক ছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আকাশ-তত্ত্ব কৃষি-তত্ত্ব জন্মেছে জ্যোতিষ আর যাদুমন্ত্র থেকে। সকল প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসেই তার নজির পাওয়া যাবে। চীন ভারত মিশর ব্যাবিলন গ্রীস ও রোমের পুরা কাহিনীতে জ্যোতিষ ও দৈবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ এই সব দেশেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম স্ফুরণ। অজানাকে জানবার ইচ্ছা হল জ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। বহু শতাব্দী ধরে অনিশ্চিত সন্ধানের পর রহস্য-সূত্রটি হয় তো ধরা দেয়। কিন্তু যে জগৎ অপ্রত্যক্ষ সেটা অজ্ঞাত থেকে যায়, যেমন মৃত্যু ও পরলোক, ভবিতব্য বা অদৃষ্ট। তখন তা নিয়ে চলে অফুরন্ত জল্পনা, র‍্যাশনালাইজ করবার আপ্রাণ চেষ্টা। সেই চেষ্টার পিছু পিছু এসেছে মানুষেরই গড়া শাস্ত্র, আর শাস্ত্রের ফলিত প্রয়োগ দেখাবার জন্য এসেছেন দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী।

এসেছেন যখন থাকুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভয় পাইয়ে দেন, এইটেই যা মুশকিল। অবশ্য ভয়েই শ্রদ্ধা, বিভ্রমেই সম্ভ্রম। অরোক্‌ল, অগ্যার, পন্‌টিফ কিংবা দৈবজ্ঞ; কারুর মূর্তি সৌম্য ছিল না। এদের কাছে ভয়ে মাথা নত করেছে সবাই, ভবিষ্যদ্বাণীকে অভ্রান্ত সত্য ভেবে। তবে মজা এই যে, গণনা মিথ্যা হলেও বিশ্বাস সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ হলেও, কমে না। কেন মিলল না, কোথায় একটা গলদ ছিল, তার কূট ব্যাখ্যা করেন জ্যোতিষী। সাধারণ মানুষ ভয়ের কারণ অপসৃত হলেই খুশী। অসুখ বা ফাঁড়ার কথা যে ফলল না, এতে শান্তির নিঃশ্বাস পড়ে। খুঁচিয়ে তর্ক করতে মন চায় না, পাছে সময়টা পিছিয়ে গিয়ে বিপদ আবার দেখা দেয়! কাজেই জ্যোতিষী দুদিক থেকে নিরাপদ। মিলে গেলে ভালো, না মিললেও ভালো। ভাল জ্যোতিষী মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞ ছাত্র। কতটুকু বলতে হয়, কতটুকু উহ্য রাখতে হয় অশুভ সংবাদ, তা তিনি জানেন।

জ্যোতিষীকে তাঁর ব্যাকরণ মেনে চলতে হয়। অবশ্য তিনি নিজেই ব্যাকরণ। তিনি বিশেষ্য, কারণ শঙ্খ কড়ি, রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তরেখার ছবি, জ্যোতিষের বই আর পঞ্জিকা—কিছু-না-কিছু দ্বারা চিহ্নিত হয়ে তিনি বিশেষ্যপদে সমাসীন। যখন তিনি মৃদু কণ্ঠে মধুরাশ্বাসী অথবা

অশুভ ইঙ্গিতে ভ্রূকুটি-কুটিল, তখন তিনি বিশেষণ। আবার যখন পতাকী রিষ্টি মারক যোগ কিংবা গ্রহ বৈগুণ্যের নিবারণকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হোম-যাগ করেন, তখন তিনি স্বয়ং ক্রিয়া। আর অব্যয় তো বটেই। তাঁর অভিধানে কেবল 'অ'—যেমন অশুভ অমঙ্গল অনটন ইত্যাদি। তাঁর সতর্ক কথাবার্তাও অব্যয়, যথা—হয়তো, হতে পারে, কখনও-কখনও, নিশ্চয়ই, কিন্তু-উ, তা-না-না প্রভৃতি। তাঁর স্তোকবাক্য যেমন অব্যয়, রাহুর দশাও তেমনি অব্যয়। মক্কেলের তিনি যথার্থ হিতৈষী। কিছু ব্যয় করালেও, তার অব্যয়ীভাব তিনি কামনা করেন আন্তরিক। নইলে ঘর ভাড়া বাকি পড়ে যদি মক্কেলের পকেট শূন্য হয়।

দৈবজ্ঞ আর গণক ঠাকুর এককালে কি রাজকীয় মর্যাদা ভোগ করেছেন, তার পরিচয় ইতিহাসে, সাহিত্যে, রূপকথায় পাওয়া যাবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে। মেগাস্থিনিস প্রায় তেইশশো বছর আগে ভারতীয় সমাজে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও রাজসভায় প্রতিষ্ঠার কথা বলে গেছেন এবং তাঁদের বর্ষফল-গণনা ও পরামর্শ-অনুযায়ী আগামী দিনের জন্য রাজারা কেমন প্রস্তুত হতেন এবং রাজ্য পরিচালনায় সতর্ক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন। আর প্রাচীন সাহিত্যে উপকথায় গণৎকারের তো ছড়া-ছড়ি। উপস্থিত বুদ্ধিপ্রয়োগে জ্যোতিষীরা কেমন করে পরীক্ষা-সংকট উত্তীর্ণ হতেন, তার অনেক উপভোগ্য বর্ণনা আছে। ঠাকুমার ঝুলিতে দিগ্বিজয়ী গণক ঠাকুরের লাঞ্ছনা আর কৌশলে প্রতিষ্ঠা লাভের কথাটা একবার ভেবে দেখুন। সময়টা মন্দ ছিল না। ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা ও তাড়নায় গৃহত্যাগ, বিদেশে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে ত্রিকালদর্শী মহাপণ্ডিত হিসেবে অভূতপূর্ব সম্মান, রাজসভায় এক একটি পরীক্ষায় ভাগ্যের জোরে সদুত্তর দান, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ, নয়তো অবাক অনুতপ্ত ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পুনর্মিলন এবং যাবজ্জীবন অন্নচিন্তা-রহিত সুখভোগ।

পঞ্জিকার পাতায় প্রতি মাসের সংক্রান্তি সঞ্চার গণনায় খুঙ্গি-পুঁথি হাতে ঈষৎ-ন্যুব্জ যে ব্রাহ্মণের ছবিটা দেখি, তার মধ্যে রূপকথার আমেজ পাই। ফিরে যাই সেই আশ্চর্য অবকাশময় কল্পনার রাজ্যে, যেখানে লাঠি-হাতে দৈবজ্ঞ পণ্ডিত গুটি-গুটি রাজপুরীতে ঢোকেন, খড়ি দিয়ে আঁক-জোক কেটে এমন সব জোরালো গণনা করেন যাতে বহু দিনের রহস্য-সমস্যার এক নিমেষে সমাধান হয়ে যায়, আর হবুচন্দ্র রাজা, তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী এবং সরল বিশ্বাসী পাত্র-মিত্র-প্রজাদল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ধন্য-ধন্য রব তোলে। আমরাও তুলি, তবে মার-মার শব্দ। অফিসের বেলা হয়ে গেল, ওদিকে কলঘরে কলেজ-গামিনী কন্যার বিলম্বিত সঙ্গীত। ঠাকুর বাজার থেকে ফেরেনি, ঘর্মাক্ত গৃহিণীর আরক্ত মুখ, পুত্র আধঘণ্টা ধরে কেশপ্রসাধন সেরে হাওয়াই শার্ট পরে হাওয়া—এ-হেন সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর আবির্ভাবও ছদ্মবেশী ভিখারীর ছলনা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে অবসর নেই, সে সচ্ছলতাও নেই। থাকলেও সে মেজাজ কোথায়!

এই মেজাজটাই আসল কথা। জ্যোতিষীর মেজাজ আর মক্কেলের মেজাজ যুগপৎ প্রসন্ন না থাকলে যে কোনও কনফারেন্স বানচাল হয়ে যায়। মেজাজ ঠিকমত থাকলে জ্যোতিষী তো দূরের কথা, চরম শত্রুও পরম বন্ধুর মত সমাদৃত হতে পারেন। ভিতরে ভিতরে যা-ই থাকুক, মৌখিক সৌহার্দ্যের অভাব ঘটে না। রসিকতার ঢেউ বয়ে যায়। আমার তো মনে হয়, আন্তর্জাতিক বৈঠক আর সামিট টক্‌গুলো বেশির ভাগ নিষ্ফল হয়ে গেল জ্যোতিষী-দের অনুপস্থিতিতে। 'তুঙ্গ-আলোচনা' সফল হবে কি করে যদি তুঙ্গী গ্রহের দৃষ্টি ও অবস্থান না জানা থাকে? দেশ-বিদেশের মুখ্য মন্ত্রী আর পররাষ্ট্র-সচিবেরা যদি সঙ্গে একটি করে গণৎকার নিয়ে আসেন, তাহলে রুদ্রের দক্ষিণ ও বাম মুখ একমুখে বিশ্বশান্তির শুধু জয়গান নয়, ভবিষ্যৎ বুঝে নিয়ে পারমাণবিক যুগকেও গিলে ফেলতে পারেন।
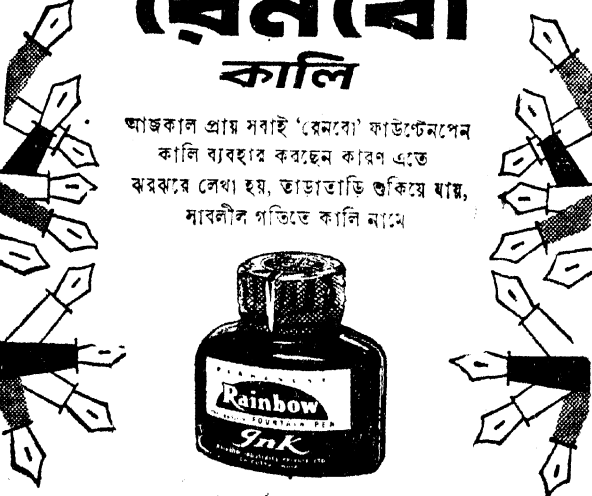
এ সব কথা পড়লে মনে হতে পারে, জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীর ওপর বিদ্রূপ বর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। তা নয়। বর্তমান কালে প্রাচীন ও মধ্য যুগের প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানগুলোকে আমরা কেমন সরাসরি না হোক, পিছনকার দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছি, এটাই আমার বক্তব্য। সংস্কার ও বিশ্বাস মানুষের মজ্জাগত। তাকে স্বীকার করার মধ্যে গৌরব না থাকুক, সততা আছে। কিন্তু সংস্কারকে ধর্মের অনুমোদনে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে লোকের কাছে পরিবেশন করা শুধু অন্যায় নয় অন্যায়। বিলেতে ঈশ্বর এখন গৃহপালিত সামগ্রী—উক্তিটা আমার নয়, এইচ জি ওয়েলসের। সেখানে গির্জা রাষ্ট্রের অধীনে, ধর্মযাজকেরা অনেকেই রাজনৈতিক মতামত দেন টোরি দলের স্বপক্ষে। পোষক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সর্ববিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সাধু ব্যক্তি ও সংসাহসী নেই তা নয়। তবে গড়পড়তা হিসেবে বলা চলে, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সে স্বাতন্ত্র্য নেই যা ধর্মবিশ্বাসকে ভাঙিয়ে খাওয়ার বিরুদ্ধে বাধা দিতে পারে। ধর্ম এখন গোষ্ঠীগত মূলধন, প্রয়োজন হলে
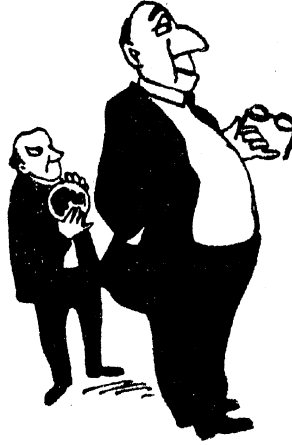
যদি সঙ্গে একটি গণৎকার নিয়ে আসেন

কোনও কোনও মতবাদের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

আমরাও কি তা করছি না অন্য উপায়ে? যে পরিবেশে অথর্ব-বেদের মন্ত্র রচিত হয়েছিল, রাজ-পুরোহিতের মধ্যস্থতার দরকার হয়েছিল, সেই পরিবেশ ও প্রয়োজন কি এখনও আছে, না থাকবে! প্রাচীন যা কিছু সংস্কার, তার আমূল উৎপাটন সম্ভব নয়, হয়তো বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সংস্কারে ধীরে ধীরে ইন্ধন জোগানোর দায়িত্ব কার? ঐতিহ্য-নিষ্ঠা আর সংস্কৃতের সমাদর ভালো কিন্তু ঐতিহ্যকে মর্ফিয়ার মতো কাজে লাগানো, ফলে সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটানো কি শ্রেয়স্কর? স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই তো করে চলেছি কখনও নতুনত্বের বিপদ-সম্ভাবনায়, কখনও বা স্বার্থ-ব্যবসায়ের উদ্দেশে। অগস্ত্য ঋষির মতন একজন বলিষ্ঠ 'পায়োনীয়র' থাকলে বোধ হয় ভালো হত। তাহলে বাতাপি একেবারেই হজম হয়ে যেত, দুষ্টবুদ্ধি ইম্বলের ডাকে আর সাড়া দিতে পারত না।

অনিষ্ট অনেক প্রকারে হয়। রঙীন ছবি দেখিয়ে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ছেলেদের কাঁচা মাথা খাওয়া যায়। দ্বিধা ভয় জাগিয়ে তেমনি বড়দের পাকা মাথাও বেশ ঘুলিয়ে দেওয়া যায়। একটি কাজ সম্পন্ন হচ্ছে মার্কিন-মার্কা চলচ্চিত্রের দৌলতে। অপরটিও কৌশলে সুসম্পন্ন হচ্ছে কাগজগুলির মাধ্যমে। একে বলা যায়—ইকনমিক

কো-অপারেশ্যান। পৃথক এলাকা, কিন্তু সহযোগিতার ফলে যা তৈরি হচ্ছে তার পরিণতি একই দিকে। ছবি-ওয়ালারা বলবেন—এ রকম 'পেপ' একটু না দিলে লোকে নেবে না। জনসাধারণের চাহিদা মানতে হবে তো! কাগজ-ওয়ালারা বলবেন, দৈনিক খবর টাটকা গজার মতন। পর পর ছ'দিন খেলে মুখ মেরে যায়। তাই রবিবারের দিন চাটনির আয়োজন। আর লোকে পাঁজি-পুঁথি না মানুক, ভবিষ্যৎ তো জানতে চায়। সবটা না হয়,



তৃতীয় গ্রেডের জ্যোতিষীরা নিতান্তই হতভাগ্য

খানিকটা। নাকের সামনেই নতুন সপ্তাহ, সেটা যেমন যাবে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ আছে সে বিষয়ে। তারপর কোনও কোনও মাসিক পত্রিকাও এই পথ ধরছে। বিশুদ্ধ গণনার দাবিতে অ্যাস্ট্রনমির সঙ্গে অ্যাস্ট্রলজির ডোজ মিশিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে। কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে, নেশা জাগছে, যেমন করে বিজ্ঞাপনের চটকে মানুষ আস্তে আস্তে কবলিত হয়। এই হল 'রিভাই-ভালিজম'-এর সর্পিল গতি। আপাত-নির্দোষ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মন তৈরি হয়ে ওঠে।

গুরু-গম্ভীর আলোচনা থাক। নিত্য যা দেখছি, আপনারাও যে দেখছেন তাই বলি। ভালোমন্দ বিচার করুন আপনারা।

জ্যোতিষে যাঁরা পণ্ডিত, তাঁদের উপাধি দু রকমের হয়। রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-সম্রাট, শিরোমণি ইত্যাদি। নয়তো সাগর, বারিধি, রত্নাকর বা ঐ ধরনের অন্য কিছু। অর্থাৎ ক্ষিতিপতি আর জলপতি। কেউ-কেউ দেশীয় নৃপতি অথবা মহামান্য বিদেশী সম্রাটদের কোষ্ঠী গণনায় আশ্চর্য ফল দেখিয়েছেন। এঁরা হলেন অভিজাত জ্যোতিষী। দর্শনীও খ্যাতি-অনুপাতে উচ্চ হারের। সাধারণ লোক সে দিকে ঘেঁষতে পারে না। প্রথমত লাইন-দেওয়া ভিড়, দ্বিতীয়ত সময়-সংক্ষেপের জন্য এঁরা কেস্ নেন মোটা দক্ষিণায়। কিন্তু মনোযোগ দেবার ধৈর্য অবকাশ এঁদের নেই। এঁদের কৃতিত্ব ও দরের চার্ট পঞ্জিকার পাতায় পাওয়া যাবে। অযথা বাক্যব্যয়ে লাভ নেই। কুপিত গ্রহ শান্তির খরচ পত্রের হিসেব তো বাঁধা ছকেই ফেলা আছে। মামলায় জয়লাভ, পরীক্ষায় পাশ, পুত্র সন্তান লাভ, শত্রুকে বশে আনা, অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার আর বিমুখীকে অনুগত দাসীতে পরিণত করা, এ সব বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তান্ত্রিক মহাপুরুষের কাছে পাওয়া মহামূল্য মাদুলি

তো আছেই। স্বয়ং কালভৈরব-প্রদত্ত নিদারুণ শক্তিধর ছিন্নমস্তা কবচও অত্যন্ত সাত্ত্বিক-ভাবে ধারণ করানোর ব্যবস্থাও আছে। অবশ্য মোটা মাঝারি আর মিহি চালের দাম সরকার যেমন বেঁধে দিয়েছেন, নিস্তারণ রক্ষা-কবচগুলিরও সেই রকম শ্রেণী বিভাগ করা আছে যেমন, সাধারণ কবচ, ঐ স্পেশ্যাল, ঐ ডবল স্পেশ্যাল। দামও গুণানুযায়ী। অবশ্য আশু ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকলে বিশেষ শক্তিশালী অ-সাধারণ কবচ নেওয়াই ভালো। নগদ আর ভি পি'র মূল্য কিছু তফাৎ। তবে একত্র তিনটি নিলে স্পেশ্যাল কনসেশান রেট। তাও 'মহালয়ার দিন থেকে ভূত-চতুর্দশীর রাত্রি পর্যন্ত নরম দর, পরে দুষ্প্রাপ্য হলে এই অভাবনীয় সুযোগ আর মিলবে না।

দ্বিতীয় গ্রেডের জ্যোতিষীরা প্রগতিবাদী। তাঁদের চাহিদা কম, দর্শনীও কম। তাঁদের প্রশস্তি-পত্র অধিকাংশই উকীল, ডাক্তার অধ্যাপকদের কাছ থেকে পাওয়া। শাঁসালো মক্কেলদের মধ্যে বড় জোর হাকিম কিংবা কোনও অখ্যাতনামা দেশীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান। এঁরা ছা-পোষা গৃহস্থদের নিয়েই কারবার করেন। বিবাহ, বন্ধ্যাত্ব, ছোটখাটো সম্পত্তি, জন্মপত্রিকা, পারিবারিক অশান্তি —এই সব এঁদের এলাকা। কেউ বা বংশানু-ক্রমিক, কেউ বা একপুরুষের জ্যোতিষী। তবে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে এঁদের ঘোড়ার খবর, লটারিতে আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি-যোগ এবং ভাগ্যচক্র-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের চর্চা করতে হয়। এক আধজন স্পেশালিস্টও আছেন, যেমন হৃদ্‌ঘটিত ব্যাপারে। একজন বিশেষজ্ঞ হাত দেখেই বলতেন, আত্মঘাতী হওয়ার আশংকা। বলা বাহুল্য, প্রেমের নৈরাশ্য-জনিত যে সব হাব-ভাব ফুটে ওঠে, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত, খাঁটি রত্নধারণের জন্য নির্ভরযোগ্য মণিকার, লটারিতে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য বিশ্বাসযোগ্য টিকিট-বিক্রেতা এ সব সন্ধান ও যোগাযোগ কোনও কোনও জ্যোতিষী করে দেন। অনেক সময়ে বিনা ফি-তেই হদিস দিয়ে থাকেন, তবে আড়ালে কমিশনের ব্যবস্থা থাকে।

তৃতীয় গ্রেডের জ্যোতিষীরা নিতান্তই হতভাগ্য। যে কোনও লোক-চলাচলের জায়গায়, বড় রাস্তায় বা চৌমাথার মোড়ে এঁরা ফুটপাথে গাছতলায় খড়ি পেতে বসেন। সম্বলের মধ্যে দু একখানা পুরানো পাঁজি ও ছেঁড়া বই, দুটো পাশার কাঠি, দু চারটে কড়ি ও রুদ্রাক্ষ আর একখানা হস্তরেখার ছাপানো ছবি পীসবোর্ডে আঁটা। হিন্দু-স্থানী জ্যোতিষীদের মধ্যে দু চারজন খাঁচায় পাখি রাখেন। তারাই ভবিষ্যদ্বাণীর

ঘোষক। উড়িষ্যাবাসী জ্যোতিষীও দেখা যায় মধ্য-কলকাতায়। পাচক-বৃত্তি ত্যাগ করে কেউ বা ফুলের সাজি হাতে মাসিক দু এক টাকা রফায় দোকানে দোকানে দু বেলা ফুল ফেলে দেয় গণেশের গায়ে। অশক্ত বা বৃদ্ধ হলে কেউ বা বাজারের সামনে বসে যায় জ্যোতিষী হয়ে। এদের দর্শনী আগে ছিল দু এক পয়সা, পরে হল এক আনা, এখন হয়েছে দশ নয়া পয়সা। দুপুরে মাল বেচে খালি ঝাঁকা নিয়ে ফড়েরা যখন ট্রেনে বাড়ি ফেরে, তখন কেউ কেউ হঠাৎ বসে যায় ভবিষ্যৎ জানবার কৌতূহলে। মেছুনী মেয়েরাও মাঝে মাঝে হাত দেখায়, শোনে সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। কালো রঙের একজন লোক গোপনে শত্রুতা করছে শুনে কেউ বা ঘাড় ও নথ নেড়ে বলে, 'ঠিক বলেছ বাপু, নিতাই ছোঁড়ার বড় ভাই ওই যে ধুমসো বিষ্টুচরণ বড্ড পেছনে লেগেছে......' খুশি হয়ে পান-দোক্তা মুখে দিয়ে দর্শনী মিটিয়ে দেয়।

আর এক ধরনের জ্যোতিষী আছেন— যাদের ঠিক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এঁরা হলেন আমু-জাতীয়, ঝালে ঝোলে ভাজায় সর্বত্র আছেন। সকালে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এঁরা ঘটকালি করেন, সঙ্গে একটি ছোটখাতায় ঠিকানা ভর্তি। রাশিচক্রের নকলও থাকে। টাকাখানেক চেয়ে-চিন্তে নেন যাতায়াতের খরচ বলে, কোষ্ঠীও মিলিয়ে দেন ওই বাড়িতে বসে নামমাত্র দক্ষিণায়। এঁরা ছেলে-ছোকরা গৃহস্বামীদের এড়িয়ে যান, গৃহিণীদের সঙ্গেই কারবার করেন বেশি। বলা বাহুল্য, পাত্র-পাত্রীর কাল্পনিক রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য মুখে বলে শেষ করা যায় না। শুনেছি, এই রকমের এক জ্যোতিষী-ঘটক কন্যাপক্ষকে কিঞ্চিৎ বয়স্থ, বিপত্নীক কিন্তু লোভনীয় এক পাত্রের সন্ধান দেন এবং অগ্রিম কিছু দাক্ষিণ্যও গ্রহণ করেন। কন্যাপক্ষ পরের দিন সাত সকালে সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখেন, বাড়িতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। কিছু-ক্ষণ পরে খাট ও ফুল নিয়ে লোকজন এল। শোনা গেল, পাত্রের স্ত্রী একটু আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর একজন কন্যার মামাকে পাত্রপক্ষের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বিপুল জমিদারির বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ গড়িয়া স্টেশনের দু পাশে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে......এ সমস্তই ওঁদের তালুকের মধ্যে...।' এঁরা দুপুরে সওদাগরী অফিসে হিসেবের খাতা লেখেন, আর সন্ধ্যায় টালা থেকে টালিগঞ্জ ঘুরে বেড়ান কোষ্ঠী-বিচার করে।

আর আছেন জ্যোতিষী (এঃ), মানে শৌখীন এমেচার। এঁদের যেমন জনপ্রিয়তা তেমনি অখ্যাতি। যদি খানিক মেলাতে পারেন, তা হলে উচ্ছ্বসিত উক্তি 'অদ্ভুত! মার্ভেলাস!' আর যদি না মেলে, কি কথা মনঃপূত না হয়, তা হলে শুনতে হয়, কিসসু জানে না—বোগাস!' আমার এক আত্মীয় কিছুদিন শখ হিসেবে হাত দেখা-শুরু করেন, বিন্দু-মাত্র জ্ঞান না নিয়ে। আন্দাজে বলে দিতেন যা খুশি। কিছু মিলে যেত, কিছু মিলত না। ক্রমশ নাম-ডাক হল একটু, বিশেষ করে প্রৌঢ়া-মহলে কিছু খাতিরও হল। কেউ ভাবলেন, মস্ত সামুদ্রিক জ্যোতিষী। শেষকালে কি দুর্মতি হল, এক দিন নিজেরই হাত দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, আয়ুরেখায় কয়েকটা পরিষ্কার বিন্দু। ফুল স্টপ্ মনে করে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। পেশাদার জ্যোতিষীকে কন্সাল্ট করতে তিনিও আমতা-আমতা করে চেপে গেলেন। ভয় দাঁড়াল ত্রাসে। ধাক্কা সামলাতে মাস ছয়েক লেগেছিল। শেষে, যেমন কর্ম তেমনি ফল ভেবে ও-সব অনধিকার ছেড়ে দিলেন।

অবশ্য হাত জিনিসটা দেখবার ও দেখাবার, যদি সে হাত শুভ্র সুঠাম হয়। কিন্তু কর্কশ হাতের তালুতে কঠোর ভবিষ্যৎ গুনে কি লাভ হয়, জানেন ঈশ্বর! কেউ কেউ হাত বাড়িয়েই থাকেন। হাত দেখাতে জানেন শুনলেই দেখাবার জন্য তাঁদের হাত নিস-

পিস করে। অনেক সময়ে এর ফলে ঘোরতর অশান্তি সৃষ্টি হয়, আশা লোভ দুর্ভাবনা অযথা বৃদ্ধি পায়। যদি ভবিতব্যই মানতে হয়, তা হলে যা-হবার তাই হবে ভেবে জ্যোতিষকে ঘাঁটানোর কি দরকার? কিন্তু মনে খোঁচ লাগলে, তাকে সরানো মুশকিল। খুঁচিয়ে ঘা' করে অকারণ অস্বস্তি ভোগ এক মহা যন্ত্রণা। আমার এক আত্মীয়কে জ্যোতিষী বল্লেন, কন্যার মারাত্মক ফাঁড়া আছে এবং তা আসন্ন। কিছু দিন পরে মেয়েটির প্রবল জ্বর হওয়াতে ভদ্রলোক পাগল হবার উপক্রম। তাকে কেউই শান্ত করতে পারেনি, না ডাক্তার না হিতৈষী। মেয়ের জ্বর যেদিন ছাড়ল, বাপ সেদিন অন্ন-পথ্য করলেন। এখন সেই পাগলামি আর বোকামির কথা নিয়ে তিনি নিজেই হাসা-হাসি করেন।

আমার এক বন্ধু আছেন যিনি গোপনে জ্যোতিষ-চর্চা করেন। একবার আমাকে আশ্বাস দিলেন, এবার সময় এসে গেছে। কেউ রুখতে পারবে না। রাহু ছেড়েছে, গুরু জন্মলগ্নে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছেন। মঙ্গলও স্বস্থানে। প্রেক্ষাণ, মূলত্রিকোণ, অতিচার প্রভৃতি যথেচ্ছ শব্দ-প্রয়োগে জ্যোতিষের ব্যভিচার সেরে তিনি ক্রমাগত আমার গৃহিণীকে উস্কাতে লাগলেন—টিকিট কিনুন। রেডক্রস, রেঞ্জার্স নয়, একেবারে ডার্বি। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার ভেবে গৃহিণী টিকিট কিনলেন। কা কস্য পরিবেদনা! খেলার ফল বেরুল, 'মা-কালী' অন্ধকারে মুখ ঢাকলেন। মাঝখান থেকে গভীর রাত্রে জানলার গরাদ ভেঙে চোর এসে বাসনের সিন্দুক খালি করে দিয়ে গেল। সে সব সাবেকী কাঁসার শোক আজও তিনি সামলাতে পারেননি। লটারি তো চুলোয় গেল, যেটুকু লট্-এ আছে সেটুকু টিঁকলে বাঁচি। বাকি আছে ব্যালট। দেখি আগামী ইলেকশনে দাঁড়ালে যদি কিছু হয়......

বন্ধুকে সাবধান করে দিয়েছি, 'খবরদার। গোনাগুনের কথা আমার সামনে আর বোলো না।' কিন্তু চা-খাবারের ফাঁকে তিনি একটু আশার বাণী শোনাবেনই। একদিন বললেন, 'আর কি! ফরেনে যাবার যোগ এসে গেছে। হাওয়াই জাহাজে টিকিট কেটে ফেলো। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তোমায় এয়ার-পোর্টে সী-অফ্ করতে......' আমার রোষদীপ্ত চোখ তাঁকে ক্ষান্ত করতে পারল না। তিনি বলে চললেন—'বিউটি অফ ইয়োর হরস্কোপ হচ্ছে যে প্রতি আড়াই বছরে তোমার একটা করে সাইক্‌ল্......।' বললুম, 'হরস্কোপ তো নয়, বায়স্কোপ। নিত্যই দেখছি তোমার সবাক্ মুখে। আর সাইকেল চড়তে জানি না, এ বয়সে চাইও না।' বন্ধু বললেন, 'তামাশা নয় হে। শুক্র রয়েছেন মধ্যে ফলদাতা। টাইম এসে গেছে, দিতেই হবে। একেবারে গ্লোরিয়াস! দু এক হাজার নয়......এবার ঝুড়ি ঝুড়ি! মিসেসকে বলো, থলে বানাতে......' বন্ধুর আশ্বাস কিছুটা সংক্রামক। অবিশ্বাসী মনের গায়ে কেমন একটা সুড়সুড়ি লাগে। উড়িয়ে দিলেও ওড়ে না...ঝাঁক থেকে সরে এসে দু' একটি উজ্জ্বল পায়রা সুদূরে চোখ-ঝলসানো নীলে আপন খুশিতে ডিগবাজি খায়......

আপনাদের অভিজ্ঞতাও কিছু কম নয়। কিসের আশায় রবিবারের কাগজের শেষ দিকটায় চোখ বুলিয়ে নেন? কিন্তু দেখেছেন তো, কেমন কাটাকাটি করে ব্যালেন্স বজায় থাকে! এক দিকে আয় ও অর্থপ্রাপ্তি, অপর দিকে ব্যয়াধিক্য। প্রথম ভাগে দাম্পত্য সুখ-শান্তি, শেষ ভাগে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, গৃহান্তরে বাস। রাশিফলে সন্তানের জীবনহানির আশঙ্কা, লগ্নফলে সম্ভবস্থলে একটি গৌরবর্ণ পুত্র-লাভ। এ ধারে গবেষক অধ্যাপক শিক্ষকদের ভাগ্যোন্নতি, ও ধারে আবার শিক্ষাব্রতীদের অর্থকষ্ট ও বিড়ম্বনা। কখনো কৃষির প্রচুর ক্ষতি, কখনো যব-ধান্য, তিল-তিসি ব্যবসায়ীর প্রচুর লাভের সম্ভাবনা। সেটা না হয় কালোবাজারী কারসাজি বলে মেনে নিলুম। কিন্তু রাশিগত লগ্নগত বর্ষফলটুকু দেখবার জন্য অনেককে পাঁজি কিনে আগে ঐ পাতাগুলো ওলটাতে দেখেছি। কি লাভ ওতে? আবার বর্ষফল ও মাস-ফলে বৈষম্য থাকতে পারে, থাকেও। সাধারণভাবেই কথা-গুলো লেখা হয়, সকলের রাশিচক্রের সঙ্গে মিলিয়ে লেখা হয় না। অতএব, তা দেখে লোকসান বই লাভ নেই।

যেমন আমার এক সহকর্মী বন্ধুর অবস্থা হয়েছে। তাঁর এ বছর রাশিফলে নাকি লেখা আছে—আকস্মিক আঘাতে দীর্ঘস্থায়ী রোগ-ভোগ। লগ্নফলেও রয়েছে, মস্তকে আঘাত লেগে দীর্ঘদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার আশঙ্কা। দুটোই প্রায় এক। আর মিলিয়ে দেখলে পরে খুবই চাঞ্চল্যকর সংবাদ বলতে হবে। একত্র মানে দাঁড়ায়—হঠাৎ মাথায় কোনও চোট লেগে ভার্টিকাল থেকে হোরাইজনটাল দেহভঙ্গী হয়ে যাবে। বেশি দিন অচেতনা থাকতে থাকতে কোন ফাঁকে চৈতন্য একেবারে চলে যাবে, সে কথা স্পষ্ট বলা না হলেও, ইঙ্গিতে রয়েছে বৈ কি! ফলে, দক্ষিণ কলকাতার রাস্তা তিনি একলা পার হন না, রাষ্ট্রীয় পরিবহণে ওঠেন না, যে রাস্তায় নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, ভারা-বাঁধা আছে, বিশেষ করে দড়ি-বাঁধা দু চারখানা ইট ঝুলে আছে, সে রাস্তায় উলটো ফুটপাথে চলাফেরা করেন। তিনি জমি কিনে বাড়ি করছিলেন। এখন এক তলার দেয়াল পর্যন্ত গাঁথুনি করে বাড়ি তৈরি বন্ধ রেখেছেন। কেউ কিছু বললে জবাব দেন, 'নিজের বাড়ির বীম্ আর ইট খসে নিজেরই মাথা ডিম-খোলা করে দিক্—তাই চান বুঝি?' তিনি জ্যোতিষ মানেন না অথচ এই অবস্থা!

সেই জ্যোতিষী হিতৈষী বন্ধুবরকে বলেছি কতবার, 'তুমি বাপু গল্প লেখো, ডায়েরি লেখো মজা করে। লোকে তোমার তন্ত্র-মন্ত্র-সাহিত্যিক বলে খাতির করুক, প্রফেট বলুক, তাও সহ্য করতে রাজি আছি। কিন্তু জ্যোতিষ-চর্চা ছাড়ো—নিজে মজো না, অপরকে মজিও না।' তিনি ছাড়বেন না। বলেন, জ্যোতিষের কামড় যমুনার কচ্ছপের চেয়ে শক্ত। তাঁকেই বা বলি কি। বহু নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ কর্ম-চারী জ্যোতিষীর পরামর্শ ছাড়া পা বাড়ান না। এর মানে নয়—জ্যোতিষ কুশাস্ত্র আর জ্যোতিষীমাত্রেই প্রবঞ্চক। মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসপ্রবণতাই ক্ষতিকর। সেটাকে ক্যাপিটাল বানাবার সুযোগ কেন দিই? একটা বড় ভালো আন্দোলনের সঙ্গে কয়েকটা আজে-বাজে কুট স্বার্থকে যদি সুবিধামত মিশে যেতে দিই, সে আন্দোলনের চরিত্র মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না?

# আগুনের ঘর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকাল বেলাতেই খেলনা ভাঙার জন্য অভী মায়ের হাতে মার খেয়েছিল। অভী ভাবলো সে খেলনার দোকান দেবে। খুব সহজেই সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাওয়া যায়। যেন জানালার পর্দা সরালেই সেই জায়গাটাকে দেখতে পাবে সে। সে জায়গাটা এখানকার মতো নয়। সেখানে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে রেল লাইনটা সোজা চলে গেছে। ভারী বাতাসে বুনো গন্ধ। আর পাখি ডাকছে কত রকমের পাখির ডাক—হরিয়াল, রাধে-শ্যাম, ঘুঘু, কোকিল বলুরী। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, রেল লাইন আর পাথুরে নুড়ি থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাপ। চার-দিকে পাহাড়গুলো গভীর নীল। দেহাতী কুলিরা লাইন মেরামত করছে। স্টেশনটা খুব ছোট—একটা খেলনার মতো। চারদিকে মস্ত উঁচু গাছগুলো প্রকাণ্ড ডালপালা নামিয়ে স্টেশনটাকে ছায়া দেয়। সেই ছোট্ট স্টেশনটায় লোকজন নেই, কিংবা আছে হয়ত কিন্তু তাদের দেখা যায় না। সেইখানে অভী খেলনার দোকান দেবে।

সে জায়গাটা আছে কোথাও। কোনো-দিন অভী সে জায়গাটা খুঁজে বের করবে। 'সেখানে যাওয়া যায়', অভী ভাবে—'আমি বাবার সঙ্গে যাবো। সেখানে মা যাবে না। মাকে আমি নেবোনা। মা তখন আমার জন্য কাঁদবে।'

মা কাঁদবে, একথা ভাবতে অভীর ভালো লাগলো।

অভী বাবাকে গিয়ে বললো,—'বাবা, আমি খেলনার দোকান দেবো।

বাবা হাসলো—বেশ তো। কোথায়?

—সে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—ঠিক। আর একটু বড় হও, তখন দেখা যাবে।

—কত বড়?

—বারো বছর।

অভী মনে মনে হিসেব করলো। বারো বছরের হতে এখনো পাঁচ বছর দেরী আছে তার।

(২)

কিভাবে যে গুলতি থেকে পাথরটা ছিটকে গেল অভী তা বুঝতে পারেনি।

জেরী মাটিতে বসে পড়লো, হাতের এয়ার-গানটা ছিটকে পড়লো দূরে। আর ঝোপ থেকে কাকটা সতর্কভাবে দুবার ডেকে উড়ে গেল। জেরী দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে নিঃশ্বাস টানবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অভী ভাবলো—'ও মরে যাবে।' একবার অভীর ইচ্ছে হ'ল পালিয়ে যেতে। সাহেব পাড়ার রাস্তাটা ভয়ঙ্কর নির্জন। কিন্তু সে নড়তে পারলো না।

জেরী উঠে দাঁড়ালো। দুটো হাতে মুঠো পাকালো। দু পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল—কে তুমি? অভী বললো—'অভী'। জেরী হাল্কা পায়ে এগিয়ে এলো, দাঁতে দাঁত চেপে ইংরিজিতে বললো—'তুমি আমাকে মেরেছো। এখন?'

অভী ইচ্ছে করে মারেনি। আসলে অভী কাকটাকে মারতে চেয়েছিল; ঝোপের ওধারে জেরীকে সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু কথাগুলো বলবার সময় পেলোনা সে। জেরী তাকে মারলো। প্রথম ঘুঁষিটাই অভী আটকাতে পারলো না। ঘুঁষিটা পেটে লাগলো। ভয়ঙ্কর জোরে। অভীর মনে হল তার চোখের সামনে সব-কিছুই একবার পাক খেয়ে গেল। সে দুটো হাত উঁচু করে একটা কিছু ধরতে চাইলো। দ্বিতীয় ঘুঁষিটা নাকে এসে লাগলো। অভী পড়ে গেল। জেরী জুতোসুদ্ধু পা দিয়ে লাথি মারলো তার কোমরে। বললো,—'ব্লাডি।'

অভীর মনে হ'ল তার মাথার ভেতরটা হাল্কা হ'য়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেল। সে অনুভব করলো, তার মুখের পাশে, গালে নরম, মিহি ধুলো লেগে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চাপলো সে। মুখের ভেতর ধুলো কির্‌কির্‌ করলো। নাকে ধুলোর গন্ধ। আস্তে আস্তে তার যন্ত্রণার অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছিল। তার কি হ'য়েছে তা'ও সে ভুলে যাচ্ছিল। সেই অস্পষ্ট ঘুমের মতো অনুভূতির মধ্যেও সে টের পেলো কেউ যেন ছুটে এলো। ধাক্কা মেরে জেরীকে সরিয়ে দিয়ে কি যেন চিৎকার ক'রে বললো। আর তারপর নরম সুগন্ধী দুটো হাত তাকে জড়িয়ে ধরলো। টেনে তুললো তাকে মাটি থেকে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার মুখে লাগলো। সে জেন—অভী পরে জেনেছিল। বারো বছর বয়সেও অভীর দেহটা হাল্কা। এতে হাল্কা যে পনেরো বছর বয়সের মাঝারি গড়নের জেন তাকে অনায়াসে দুই হাতের ভেতর তুলে নিল।

অভী ভাবলো—'শোধ নেবো'।

মা বলতো,—খবরদার ওই ড্রয়ার খুলো না।

—কেন?

—প্রশ্ন কোরো না, যা বলছি শোনো। ওখানে কখনো হাত দিও না।

কিন্তু অভী জানতে পেরেছিল ওই ড্রয়ারে কি আছে। দুপুর বেলা চুপি চুপি অভী এসে যেই 'চেস্ট-ড্রয়ার্স'এর কাছে দাঁড়ালো। ড্রেসিং টেবিলের ওপর চাবির গোছাটা প'ড়ে ছিল, সেটা আনতে অভীর ভয় করেনি।

অভী চাবিটা ঘোরালো। কোনো শব্দ হল না। অভী ড্রয়ারটা টানলো। কাগজ ছেঁড়ার মতো খস্‌ খস্‌ শব্দ ক'রে ড্রয়ারটা খুলে গেলো। অভী হাত বাড়ালো। হাত টানলো। তারপর তাকালো।

তার হাতের তেলোয় ছোট্ট, ভারী রিভলভারটা ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠলো। অভী তাকিয়ে রইল। তার বাবার রিভলভার। ঘরটা নির্জন। কেউ নেই। ও ঘরে মা ঘুমোচ্ছে। অভী রিভলভারটা তুললো, তর্জনীটা বেঁকিয়ে ট্রিগারটার ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো। এখন সে অনায়াসে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কেউ বাধ

দেবে না। জেরী তাকে মেরেছে। সে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, তার নাক কেটে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে। কেন ও তাকে মারলো? সে ইচ্ছে ক'রে জেরীকে মারেনি, জেরীকে সে দেখতেই পায়নি'। হঠাৎ এই নির্জন ঘরে ভয়ংকর রাগ হ'ল অভীর। জেরীর বাবা মা দু'বেলা এসে ওর খোঁজ নিয়েছে, জেন তার পাশে ব'সে চকোলেটের মোড়ক খুলে তাকে খাইয়েছে, জেরীকে তিন দিন ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে—এ খবরও তাকে দিয়েছে জেন। তবু অভীর রাগ গেল না।

জানালা দিয়ে দুপুরের রোদ হ্রস্ব হ'য়ে এসে পড়েছে কার্পেটের ওপর। একটা গাছের ছায়া ছবির মতো কার্পেটে আঁকা। ছায়াটা দুলছে। অভী তাকিয়ে রইল। ঘরটা ঠাণ্ডা। সেই ঠাণ্ডা ভাবটা অভীকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রইল। অভী ভাবলো—'জেরী মরে যাবে। ওকে আমি মেরে ফেলতে পারি।' অভী বললো—'ব্লাডি। জেরীটা ব্লাডি।" আর কোনো কথা তার মনে এলো না।

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অভীর মনে হ'ল সে চলতে পারছে না। পা' দুটো আড়ষ্ট। অভী বাড়িয়ে দেওয়া পাকে আবার টেনে নিল। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। 'আমি ভয় পাচ্ছি',—অভী ভাবলো। তার কপালে একটু একটু ক'রে ঘাম জমলো। তার পা দুটো থর থর ক'রে কাঁপলো। তবু অভী দাঁড়িয়েই রইল।

অভী দাঁড়িয়েই রইল। কতক্ষণ যে সে জানে না। তারপর হঠাৎ তার চটকা ভাঙলো। খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ? একঘণ্টা, না, তারও বেশী! জানালার রোদটা দীর্ঘ হয়েছে, রঙটা হলদে হ'য়ে গেছে। এক্ষুনি বিকেল হবে।

অভী ফিরে এলো। রিভলভারটা রাখলো। চাবি ঘোরালো। সে ভাবলো, —'রিভলভারটায় গুলী ছিল না। বাবা কখনো গুলী ভরে রাখে না।' পরীক্ষা করে দেখতে তার সাহস হ'ল না। অভী বেরিয়ে এলো।

ল্যাংড়া আমের বাগান পার হ'য়ে রেল লাইনের ঢালু জমিটা দিয়ে নেমে এসে ছোট্ট, জল-জমে থাকা খাদটা লাফিয়ে গেলেই সেই দ্বীপের মতো জায়গাটা। মুকুন্দ মিশিরের সঙ্গে অনেকবার এখানে এসেছে অভী। মুকুন্দ মিশির কাঠ কাটতো আর অভী বসে বসে পাখি দেখতো। যখন তার সাত বছর বয়েস ছিল তখন সে মুকুন্দ মিশিরের কাঁধে চড়ে এখানে আসতো। এখন আর আসে না। আজ এলো অনেকদিন পর।

শিমুল গাছটার তলায় অভী চুপ করে
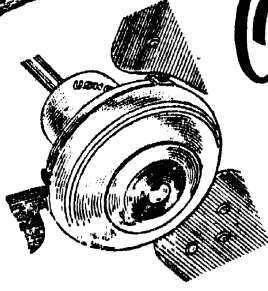
অপূর্ব সুযোগ
সহজ কিস্তিতে কিনুন—কোন বাড়তি খরচ নেই।
উষা ফ্যান
সহজ কিস্তিতে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত
৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ পর্য্যন্ত এই সুযোগ পাবেন।
যত শীঘ্র কিনবেন কিস্তির হারে ততই সুবিধা হবে।
বিনা খরচায় মেশিনের গুণাবলী দেখে নিন
আপনার নিকটতম উষা বিক্রেতাকে বলা মাত্রই সে আপনার বাড়িতে এসে বিনা খরচায় আপনাকে উষা মেশিনের গুণাবলী কল চালিয়ে দেখিয়ে যাবে। আপনার কোনও রকম বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
উষা সেলাই মেশিন
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা

বসলো। একটা পাতা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ছিঁড়তে লাগলো। তার চারদিকে পাখির ডাক। পাতা ঝরে পড়ার অস্পষ্ট শব্দ। অভী ভাবতে লাগলো।

এখানে নয়। এখানে নয়। অনেক দূরে কোথাও। সেই ঘোড়াটা তাকে নিয়ে যাবে। 'কতোবার সেখানে সেন গিয়েছে অভী নিজে নিজে। একা। মস্ত উঁচু কালো রঙের সেই ঘোড়া, পিঠে জিন পরানো। ঘোড়াটা হাওয়ার আগে ছুটতে পারে। সেই জায়গাটা অভী চেনে না, তবু যেন চেনে। লাল কাঁকরের পথটা এগিয়ে গিয়ে শিমুল গাছে ঘেরা সেই আশ্চর্য শান্ত স্বচ্ছ দীঘিটা পার হ'য়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। ওখানে আবার সবাইকে দেখতে পাবে সে,—মা, বাবা, মুকুন্দ মিশির, জেন। এখানকার মতো কোনো কিছু সেখানে ঘটবে না, সেখানে সব অন্যরকম হবে। অভীর ইচ্ছে মতো হবে। জেনকে মনে পড়লো অভীর।—জেরীর বোন। নরম, উষ্ণ, সুগন্ধী হাত। গন্ধটা যেন ও-রকম হাতে এমনিতেই থাকে—কোনো সুগন্ধী মাখতে হয় না। সেই হাত দুটো তার কাছে কাছে থাকবে। সে পড়ে গেলে, দুঃখ পেলে সেই হাত দুটো তাকে টেনে নেবে।

'মুকুন্দ মিশিরের কাছে আমি কুস্তি শিখব'—অভী ভাবলো। জেরীর বয়স সতেরো, আমার বারো। ও আমাকে মেরেছে মারতে পেরেছে। কিন্তু আমি তখন ছোটো থাকবো না। অনেক অনেক বড়ো হবো। তখন আমার বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে।'

উরুতে চাপড় মেরে নরম মিহি মাটির ওপর সে মুকুন্দ মিশিরের সঙ্গে কুস্তি লড়বে। হাফরের মতো দম ছাড়বে দুজন, ইঞ্জিনের মতো হাঁফাবে। গা দিয়ে ঘাম ঝরবে দরদর ক'রে। তার গায়ে জোর হবে। রোজ সকালে ছোলা ভেজানো খাবে সে, আর বাদাম। অনায়াসে সে জেরীকে 'চিৎ' করে দিতে পারবে তখন। ইচ্ছে মতো শাস্তি দিতে পারবে তাকে। সে কাউকে ভয় পাবে না, অথচ আর সবাই তাকে ভয় পাবে।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে যেন কতোবার ঐ দেশে পৌঁছে গেছে অভী। অনেক দূর থেকে ট্রেনের বাঁশীর কান্নার মতো শব্দটা তাকে ডেকে গেছে যেন। চারদিকের নির্জন পৃথিবীটা ছাড়িয়ে ওই ট্রেনটা দূরে থেকে দূরান্তরে, যেন অন্য কোনো গ্রহে চলেছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার আর অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করে ট্রেনটা চলেছে, চলেছে। যেন কোনোদিন থামবে না। সেই ট্রেন তাকে ডেকে যায়। বালিশে কান রেখে অভী শুনতে পায় মাটি থেকে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের মতো একটা শব্দ ট্রেনটার গতির সঙ্গে তাল রেখে বাজতে থাকে। ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ ধক্।

'আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স হবে'—চারদিকে ঘন হয়ে আসা বিকেলের দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে অভী ভাবলো—'আমি তখন ভয় পাবো না।'

অভী উঠে দাঁড়ালো।

(৩)

'আমি ভেবেছিলাম খেলনার দোকান দেবো।'

'দিতে পারলে?' মৌ হেসে ফেললো—'বেশ মানাতো কিন্তু তোমাকে। চারদিকে অনেকগুলো মরা খেলনার মধ্যে একটা জ্যান্ত খেলনা। দেবে দোকান?'

'হ্যাঁ, এই তো দোকান—আমার চারদিকে। তুমি আমি সবাই সেই দোকানে আছি।' অভী মনে মনে বললো। মুখে কিছু বললো না। বলতে সাহস হ'ল না। অভী চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল।

ঘরটাতে বিকেলের হলদে রোদ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। অভী মৌকে দেখতে লাগলো। মৌ শাড়িটাকে আঁট ক'রে পড়েছে, আঁচলটা ঘুরিয়ে কোমরে বাঁধা। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাল্কা বাঁশের আগায় লাগানো ঝাড়ন দিয়ে ছাদের ঝুল ঝাড়ছে ও। ওর মস্ত খোঁপাটা কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে। ঘামে ভেজা লালচে মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে অভী। ও উঁচু হ'য়েছে, শরীরটাকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে চেষ্টা করছে। অভী ওর কোমরের সামান্য অনাবৃত অংশ দেখতে পেলো। সাদা, মসৃণ চামড়া। অভীর হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল আর একটু সাহসী হ'তে। অভী ভাবলো—'ওর কাছে যাবো? ওকে ছোঁবো একটু?' অভী উঠলো না। সে মৌকে দেখতে লাগলো। ঘরের ভেতর থেকে রোদটা চুপি চুপি সরে যাচ্ছিল। সেই রোদটা অভীর পা ছুঁয়ে তারপর তার পায়ের কাছেই নিভে গেল।

—বাঃ, চুপ ক'রে আছো যে? মৌ হাল্কা বাঁশের ঝাড়নটা ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে অভীর দিকে ফিরলো। আঁচলটা খুলে মুখ মুছলো তারপর সেই আঁচলটা ঘুরিয়েই বাতাস খেতে লাগলো।

—কি বলবো? অভী বললো।

—যা খুশি তোমার, কি হতে চেয়েছিলে তুমি আর কি হ'তে চাও সব বলো। তোমার বক্‌বকানি থামলে আমার ভালো লাগে না।

'আসলে তুমি ভয় পাচ্ছো।' অভী মনে মনে বললো—'বাড়িতে কেউ নেই, তাই আমাকে তোমার ভয়। ঠিক আমাকেও ভয় নয়, আমার চুপ করে থাকাকে ভয়। চুপ ক'রে থাকলে আমি বেশী বিপজ্জনক হ'তে পারি।'

—কি ভাবছো?

—সব কথা বলা যায় না। বলতে নেই।

—যা বলা যায়, তাতো বলতে পারো! মৌ হাসলো।

অভী তাকালো। মৌ হাসলো। অভী দেখলো ওর বড়ো বড়ো চোখ দুটো কাঁপলো, কুঞ্চিত হ'য়ে গেলো, ঈষৎ পুরু ঠোঁট দুটো প্রসারিত হ'ল, একটা তরঙ্গ গালের ওপর দুটো টোলকে ঘিরে কাঁপতে লাগলো। ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ সরে গেল না, দাঁত-গুলো অর্ধেক ঢাকা রইলো। ওর সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হ'য়ে হাসতে লাগলো। হাসিটা অদ্ভুত। যেন কোনো মানে নেই এই হাসির, তবু যেন আছে। হাসিটা যেন অভীকে বললো—'ভয় কি?' অভী মৌ-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। চেয়ারের হাতল থেকে হাত দুটো নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো ক'রলো অভী। সে মনে মনে বললো 'জানো আমি রাজপুত্র হ'তে চেয়েছিলাম! আমি ভেবেছিলাম সেই কালো ঘোড়াটার পিঠে চড়ে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। কোথায় যাবো, ঠিক ছিল না। সে খুব ছোটবেলাকার কথা, আমার ভালো মনেও নেই। তবে আমি জানি, আমি একটা কিছু হতে চেয়েছিলাম। তুমি শুনলে হাসবে। হাসবে আমি জানি। কিন্তু তুমি কাঁদবে। মনে ক'রে দেখো, তুমিও একটা কিছু হ'তে চেয়েছিলে। সবাই আমরা একটা কিছু হতে চাই, অথচ অন্যের সাধ শুনলে হাসি। সেই হওয়াটা আর হ'য়ে ওঠে না। মৌ, তখন আমরা কাঁদি।'

—মৌ, তুমিই বলো না, তুমি কি হতে চাও।

—কি আবার! মৌ ভ্রূ দুটো কোঁচকালো বিরক্তিতে। তারপর শরীরটাতে একটা ঝাঁকানি দিল।

ওর শরীরটাকে দেখলো অভী। ওর হাতে, আঙুলে, কণ্ঠায়, মুখে কোথাও একটি হাড় উঁচু হ'য়ে নেই। হাড়গুলো পরিমিত, সুন্দর মেদে ঢাকা। সেই মেদও সুন্দর, মসৃণ চামড়ায় মোড়া। একটু দীর্ঘ ও, তাই সামান্য রোগা দেখায়। মুখটা ছোট, শরীরের তুলনায় বেশ ছোট, তাই বোধ হয় বয়সের তুলনায় ওকে ছোট দেখায়। কপালটা প্রশস্ত নয়, কপালের ঠিক মাঝখান থেকেই যেন সেই মিশিভ় কালো চুলের গোছাটা শুরু হয়েছে। ওর কাঁধ দুটো নোয়ানো—ও দাঁড়ালে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা একটু অসহায় মনে হয়। সেই অসহায় ভঙ্গিটা বদলাতে চাইলো মৌ, শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে সুস্থ হতে চাইলো। তির্যকভাবে অভীকে দেখলো ও।

—ওভাবে তাকিয়ে রয়েছো কেন?

—ভাবছি। অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—ওভাবে তাকিয়ে কেউ ভাবে নাকি! তুমি একটা পাগল।

—পাগল হওয়ার বয়েস কি এখনো আমাদের আছে মৌ?

—কি জানি বাপু, ওসব কথা বুঝি না। মৌ ঠোঁট দুটো ছুঁচোলো করলো, তারপর হেসে ফেললো.—'আসলে তুমি এখনো ছেলেমানুষ। ছাব্বিশ বছর বয়সের খোকা একটি।'

—কোনো কোনো মানুষ আছে যারা বয়েস বাড়াটাকে টের পায় না। কেমন ক'রে যে বড় হ'য়ে যায় তা বুঝতেই তাদের বিস্তর সময় লেগে যায়। অথচ তারা কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আমি বোধ হয় সেই রকম।

—তোমার তত্ত্বকথা রাখো। আমার শোনবার সময় নেই। রান্নাঘরে মা একা।

—বেশ, কি করতে হবে বলো।

মৌ হাসলো। তর্জনীটা উঠিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো। বললো—চুপ ক'রে থাকো।

—তাহ'লে মৌ-নব্রত? অভী একটু টেনে উচ্চারণ করলো।

ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। অভী মৌ-র মুখটা দেখতে পেলো না। কিন্তু মৌ কাছে এলো। ওর ঘামে-ভেজা শরীরের অস্পষ্ট মিষ্টি গন্ধ অভীর নাকে এলো। তারপর সুডৌল, নরম একটা হাত অভীর মুখটাকে চেপে ধরলো। অভী চমকে উঠলো। একটা অস্পষ্ট চেনা সুগন্ধ। মৌ হাতটা চট ক'রে সরিয়ে নিল। প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো—'অসভ্য'।

অভী হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু মৌকে পেলো না। মৌ এই প্রথম তাকে ইচ্ছে ক'রে ছুঁলো। সে নিঃশ্বাস টানলো। মৌ সরে গেছে।

খুট ক'রে সুইচ টিপে মৌ আলো জ্বালালো। আলোটা যেন অভীকে জোরে একটা চড় মারলো। সে চমকে উঠলো।

আলোতে মৌকে আবার দেখলে অভী। ওর মুখটা লাল টুকটুক করছিল। মৌ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পর্দাটা হাত দিয়ে অল্প একটা ফাঁক করলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

অভী চুপ ক'রে রইলো। অভী ভাবতে লাগলো। মৌ হঠাৎ কথা বললো।

—এই, তুমি যাবে না? সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাড়ি যাও এবার।

—এত তাড়া?

—তাড়াতে চাই যে! আবার আসবার সময় হ'ল, কাবেরীও ফিরবে এইবার। মৌ অভীর দিকে ফিরে একটু হাসলো। হাসিটা ম্লান নয়। হাসিটা উজ্জ্বল।
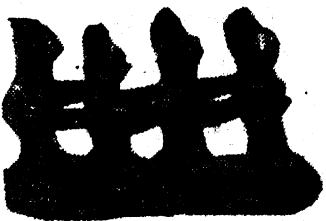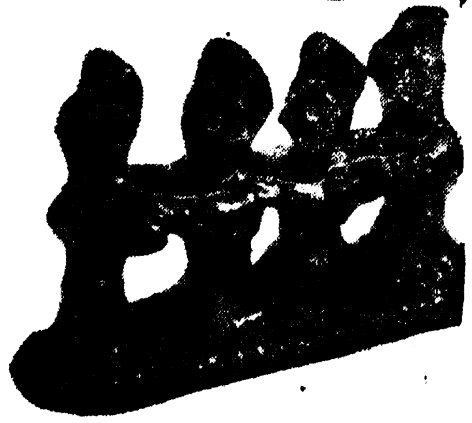
অভী উঠে দাঁড়ালো।

অভী ছোট্ট উঠোনটা পার হল। তালা খুলল। নির্জন ঘরটায় ঢুকলো। কেউ নেই যেন চারদিকে। কেউ ছিলও না। অভী চেয়ারটা টেনে বসলো। টেবল্ ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একটা বই টেনে নিল। কিন্তু পড়তে মন বসলো না। কেবলই যেন একটা অস্পষ্ট সুগন্ধী কোমল হাত তার মুখে হাত বুলিয়ে দিল। চোখের সামনে মৌ যেন হাসলো। সেই নিঃশব্দ, সুদৃশ্য হাসি।

'এই নির্জন লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটা'—অভী ভাবলো, ভাবতে লাগলো—'এই বাড়িটা এ রকম থাকবে না। কারো আশ্চর্য হাতের স্পর্শে ভরে উঠবে এই বাড়ি। মৌ আসবে একদিন। আমাকে ঘিরে রাখবে মৌ, আমাকে বন্ধন দেবে, সুখ দেবে, সন্তান দেবে। আমার ছোট্ট দুটো সুস্থ সবল ছেলেমেয়ে ঐ উঠোনটাতে খেলে বেড়াবে। ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ আমি ঘরে বসেও শুনতে পাবো। অনেক দূরে থেকে কর্মক্লান্ত সময়গুলোর যতিতে ওদের আশ্চর্য সুস্পর্শ পাবো আমি। আমাকে ওরা টেনে আনবে। আমাকে ওরা টেনে আনবে। এইখানেই সেই আশ্চর্য নতুন পৃথিবীর শুরু হবে। মৌ আমাকে বন্ধন দাও।'

নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হ'ল অভীর। কতোদিন ধরে সে যেন একা। এই নির্জন ঘরটা তাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করেছে। প্রথমে বাবা মারা গেল, তারপর মাও। অভী কেঁদেছিল। সেই কান্নার যেন কোনো ছেদ ছিল না। সে ভেবেছিল— 'আমি বাঁচবো কি ক'রে? কি ক'রে আমার চারদিকের এই পৃথিবীটা চলবে?' অভী ভেবেছিল তার নিঃসঙ্গতা কোনোদিন ঘুচবে না। 'কিন্তু মৌ এলে আবার আমি সব কিছু ফিরে পাবো'—অভী ভাবলো। অভী নির্জন ঘরে খুব আস্তে নিজেকে শুনিয়ে ডাকলো—'মৌ, মৌ, মৌ।' অভী নামটাকে বারবার উচ্চারণ করলো, নামটাকে ভাঙলো, বদলালো। বারবার বললো— 'মৌ, তুমি আমাকে সেই শান্তি দাও, সেই বন্ধন দাও।'

পাঁচ বছর পর। অভী বললো,—'মৌ, আমাকে মুক্তি দাও'। তার কথা কেউ শুনলো না। অভী নিজেকেই নিজে বললো।

অভী বিছানার ওপর উঠে বসলো। অনেক রাত। অভী হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিল। আকাশে মস্তো চাঁদ। অভী গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বিছানার দিকে তাকালো। ঠিক তার পাশেই বিকু—তার চার বছর বয়সের
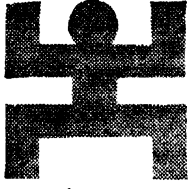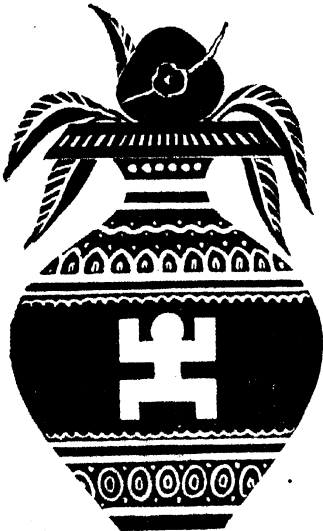
মেয়ে। বিকু বালিশ থেকে মাথাটা সরিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। বিকুর পাশে টুকু—ওর বয়েস তিন বছর। টুকু চিৎ হ'য়ে হাঁ ক'রে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ও পাশে মৌ-র কোল ঘেঁষে, ওর বুকের স্পর্শে লেগে শুয়ে আছে টুলু,—অভীর এক বছর বয়সের ছেলে। মৌ বাঁ হাতটা দিয়ে টুলুকে জড়িয়ে আছে, মৌ-র মুখটা এপাশে ফেরানো। অভী তাকিয়ে রইলো। মৌ অনেকটা দূরে—অভী ভাবলো। অথচ মৌ কাছে ছিল। বুকের কাছে মৌ-র নরম মুখটা চেপে লেগে থাকতো, ওর চুলগুলো অভীর গলায় জড়িয়ে যেতো, গালে মুখে স্পর্শ করতো। হাত বাড়ালেই, কিংবা হাত না বাড়ালেও মৌকে পাওয়া যেতো তখন। বিকু, টুকু, টুলু এলো তারপর। মৌ আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। এখন অভী আর মৌ-র মাঝখানে বিকু, টুকু, টুলু। এখন হাত বাড়ালেই মৌকে পাওয়া যায় না, ওদের ডিঙিয়ে যেতে হয়।

'মৌকে পাওয়া যায় না'—অভী ভাবলো—'মৌকে পেতে নেই। স্পর্শ করলেই মৌ মরে যায়, আর তাকে কিছুতেই বাঁচানো যায় না'। অভী নিঃশব্দে উঠলো। দরজা খুললো। বাইরে এলো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাকে স্পর্শ করলো। চাঁদের আলো জাফরির ঘেরা বারান্দায় পড়েছে। জাফরির ছায়া একটা সুন্দর জালের মতো বিছিয়ে আছে। অভী পা বাড়ালো।

অভী নিজের ছায়ার দিকে তাকালো। টানা তির্যক ছায়া, মাথাটা দেখলোনা, কাঁধ-টা উঁচু নিচু। চাঁদের আলোটা বেঁকে পড়েছে।

'একটু সাহসী হ'লে'—অভী ভাবলো—'আর একটু সাহসী হ'লে এই উঠানটা পার হ'য়ে যাওয়া যায়। তারপর মৌ থাকবে না, বিকু, টুকু টুলু, কেউ থাকবে না। অথচ এরা সবাই থাকবে। এই ঘর, এই দেয়াল ওদের বন্ধ ক'রে রেখেছে। মৌ এই দেয়ালের মধ্যে থাকতে থাকতে, এই ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে দেয়ালের মতো হ'য়ে গেছে। ঘরটা আগুনের, সেই ' অসহ্য আগুন ওকে পুড়িয়ে মেরেছে'।

এই আগুনের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া যায় না। এই ঘরে বিকু টুকু টুলু বড় হ'তে থাকবে। ওরা আমাকে জড়িয়ে থেকে, আমাকে অবলম্বন ক'রে বড় হ'তে থাকবে আর আমি মরে যাবো।'

মৌও মরে যাবে। আর একজন মৌ অভীর বুকের ভেতর ঘুরে ঘুরে কাঁদবে। সেই কান্নার বাঁত নেই, শেষ নেই। অভী সেই কান্নাকে শুনবে। আর একজন মৌ কাঁদছে—অভী শুনতে পাবে, একটা শাঁলখের মৃতদেহকে ঘিরে আর একটা শাঁলখ যেমন কাঁদে। অভী অস্থির হবে, হাত বাড়াবে। কিন্তু মৌকে পাবে না।

অভী ঘরে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করলো। বুকচাপা অন্ধকার ঘরটা তাকে চেপে ধরলো অন্ধকারটা নির্মম, কঠিন। একটা কুয়োর মতো একমুখী, গভীর, নিশ্চিত।

অথচ যেন যাওয়া যায়। এখনো যেন চলে যাওয়া যায়। কোনোদিন যাবে অভী সেইখানে। ভাবতে ভাবতে অভী নিশ্বাস ফেললো। তখন আবার ওরা নিবিড় হয়ে ফিরে আসবে। আগুনের ঘর থেকে মুক্তি পাবে ওরা।

'কিন্তু আমি তো সুখেই আছি। কেন ভাবছি মৌ মরে গেছে, কেন ভাবছি এখানে সুখ নেই। এই তো আমার আত্মীয়েরা আমাকে ঘিরে আছে। সুস্থ সবল বিকু টুকু টুলু, আর ওদের মা। আমার যা আয় তাতে বেশ চলে যায় আমাদের ক'জনের।' অভী নিজেকেই নিজে বললো। 'পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ঘর, উঠানে তুলসীর মঞ্চ—রোজ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, শাঁখ বাজে। আমাকে ঘিরে শান্ত, সংযত সুন্দর সংসার। আমি বাইরে গেলে, যাওয়ার সময় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মৌ—আমার নিরাপদে ফিরে আসবার জন্য মনে মনে প্রার্থনা করে, ওর ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল পরম বিশ্বাসে আমার পকেটে গুঁজে দেয়। আবার আমার ফিরে আসবার প্রতীক্ষা করে, রাত জেগে বসে থাকে, ঘড়িতে সময় দেখে, ট্রেনের শব্দ কান পেতে শোনে। আমার বিরক্তিকে ওরা বোঝে, আমার অবসরকে ওরা জানে, আমার আনন্দে ওরা সায় দেয়। এই তো সুখ আমাকে জড়িয়ে আছে।'

কোথায় যেন খুব সূক্ষ্ম তারে মৃদু আঘাত বাজলো। সেই আঘাতটা বিস্তৃত হ'লে, একটা সুরের পর্দায় বাঁধা পড়লো। অভী ভাবলো তার দুঃখটা যেন বিলাস।

অভী চোখ বুজলো। অভী যেন শুনতে পেলো ঝাউগাছে বাতাস আছড়ে পড়ার শব্দ। ঝাউগাছ দুললো। দুলতে লাগলো। সমস্ত পাহাড়গুলোকে এতক্ষণ আলো দিচ্ছিল সূর্যটা। এখন ডুবে গেল। অন্ধকার।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে অনেকদূর বন-বনান্তর থেকে তারা ফিরে এলো। ওরা শিকারে গিয়েছিল সবাই। ক্লান্ত দেহে ওরা নিজেদের গ্রামে ফিরে এলো। একটু পরে মহুয়া বনের কাছে ওরা জড়ো হ'ল। বাতাসে মহুয়ার তীব্র গন্ধ। ফুল ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। আগুন জ্বললো। গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোকগুলো গাছের গুঁড়ির চারপাশে চুপ করে বসেছে। ওদের মুখে আগুনের শিখা কাঁপলো। তারপর নাচ শুরু হ'ল।

যাদের বয়েস অল্প তারাই হাত ধরাধরি করে নাচ শুরু করলো। ওরা ঝুঁকলো,

শালিখের ধান খুঁটে খাওয়ার ভঙ্গিতে দুললো, ছিলা ছিঁড়ে যাওয়া ধনুকের মতো ওরা সোজা হ'ল, পিছনের দিকে ঝুলে খয়ে আকাশের দিকে তাকালো। আগুনটা ঠিক মাঝখানে জ্বলতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো। একটা করে মেয়ে আর একটা করে ছেলে পাশাপাশি—এ ওর কোমর জড়িয়ে রয়ে। ওদের বৃত্তটা কখনো বড় হচ্ছে, কখনো ছোট। ওরা গোল হয়ে নাচছে।

একটু আগে ওরা মহুয়ার মদ খেয়েছে, আর আগুনে ঝলসে নেওয়া মাংস। ওরা সবাই মাতাল। ওদের চোখ নেশায়, শ্রমে আর ঘুমে ঢুলে আসছে তবু ওরা নাচছে। ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া মাঠ পার হয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের দেহগুলোকে ছুঁয়ে মহুয়ার বন আর ঝাউগাছকে দুলিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

তবু ওরা নাচছে, নাচছে আর নাচছে। 'এই নাচ যেন কোনো দিনই না থামে' অভী ফিস্‌ফিস্ করে বললো—'আমি থাকবো না এখনো নয়।'

ওরা সবাই সাহসী। আবার সকাল হবে। রাত্রির সমস্ত অবসাদ আর আনন্দকে ভুলে গিয়ে ওরা কাঁধে ধনুক নেবে। তারপর জোয়ান মদ্দ মানুষগুলো পাহাড়ের দিকে পাড়ি দেবে। মেয়েরা ফসলের ক্ষেতে যাবে। কেউ কাউকে মনে রাখবে না। ওদের শিশুরা বড় হবে, ওদের মতোই সাহসী হবে। বেঁচে থাকাকে ওরা পরোয়া করবে না, তাই বাঁচতে বাঁচতে ওরা ক্লান্ত হবে না।

( ৪ )

হরেন দত্ত একটা গল্প বলছিলেন। বাকী তিনজন তাকে ঘিরে বসে শুনছিলেন। সকলেরই বয়স ষাটের ও-পাশে।

টেবিলের ওপর একটা ঢাউস লণ্ঠন জ্বলছে। অভী টেবিলের ওপর বাঁ হাতের কনুইটা চেপে সেই হাতেরই তেলোর ওপর বাঁ গালটা চেপে তাকিয়ে আছেন। তার বাঁ দিকে অম্বুজাক্ষ মিত্র চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মাথাটা কাত করে চোখের কোণ দিয়ে হরেন দত্তকে দেখছেন। অভীর ডান দিকে চন্দন সিং। চন্দন সিংয়ের দাড়িগুলো সাদা, মাথার পাগড়িটাকে দেহের তুলনায় মস্ত মনে হয়। দু হাতে লাঠিটাকে ধরে হাতের ওপর থুতনিটা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন উনি। দাড়িগুলো চাপ বেঁধে এগিয়ে এসেছে—অনেকটা শরচুলার মতো। বুড়ো পুতুলের মতো চোখ বুজে মাথা নাড়ছেন চন্দন সিং। হরেন দত্ত অভীর মুখোমুখি—টেবিলের ও-পাশে। হরেন দত্ত টেবিলের ওপর দু' হাতের ভর দিয়েছেন—কারো দিকে না তাকিয়ে গল্প বলছেন তিনি। গল্পটা প্রেমের এবং একঘেয়ে। হরেন দত্তর কথায় শ্রী-ছাঁদ নেই—বায়না ধরা রোগা ছেলের কথার মতো বিরক্তিকর। অভী ভাবলেন, গল্পটা কেউ বোধহয় শুনছে না। হরেন দত্তর মুখটা বিচিত্র রেখার আঁকিবুঁকিতে প্রবীণ এবং নীরস, কিন্তু চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। হরেন দত্ত গল্প বলায় বেশ উৎসাহী—এ আসরে তিনিই সবচেয়ে ছোট, সবে ষাট পেরিয়েছেন। অম্বুজাক্ষ মিত্র তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছু শুনছেন না। বোধ হয় অন্য কিছু ভাবছেন। তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। চন্দন সিং জেগে আছেন না ঘুমুচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। তিনিই সবচেয়ে প্রবীণ। বয়স সত্তর। অভী নিজের কথা ভাবলেন। তাঁর বয়স চৌষট্টি।

হরেন দত্তর গল্পটা একঘেয়ে। তবু গল্পটা যেন অভীকে টেনে রাখছে। অভী অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন, পারলেন না। গল্পটা প্রেমের। কবে প্রথম বয়সে হরেন দত্ত কমলা নামে মেয়েটিকে ভালবেসেছিলেন। তাকে পাননি। গল্পটা জমজমাট হয়ে এসেছে। অভী শুনতে লাগলেন। একটা মৃদু, টোকার মতো শব্দ করে একটা পোকা ঢাউস লণ্ঠনটায় ধাক্কা খেলো আর তারপর ঘুরতে লাগলো।

হরেন দত্ত বললেন—'একটা বিবর্ণ শুকনো পাতার মতো মুখ করে কমলা বসে রইল।

আমার যেন মনে হচ্ছিল পরাশর আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি জবলে উঠতে চাইলাম। সবকিছুই যেন স্পষ্ট হয়ে এলো।' হরেন দত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অম্বুজাক্ষ মিত্র টেবিলের দিকে না তাকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দোক্তার কৌটোটা খুঁজতে লাগলেন। দেয়ালে গভীর গর্তের মতো একটা জানালা। অভী ভাবলেন হরেন দত্তর গল্পটা যেন একটা অন্তহীন গানের মতো। একটা অনুভূতির বৃন্তকে ঘিরে গল্পটা যেন ফুলের মতো ফুটে উঠছে। মনের কোন্ অবচেতন কক্ষে একটা যন্ত্র বাজছে—একটা অদৃশ্য হাত পুরোনো, ভুলে-যাওয়া কোন এক সুরকে বাজিয়ে যাচ্ছে। চন্দন সিং ঘুমের ঘোরে কি যেন বললেন, শোনা গেল না।

'তারপর বয়স বাড়লো। আগুন নিভলো। কিন্তু কোথায় যেন ছোট্ট আগুনের মতো একটু জবালা থেকেই গেল। সেই জবালা থেকেই গেল। সেই জবালা যায় না। সেই জবালা গেলে আমি বাঁচতাম না। কেউ বাঁচে না।' হরেন দত্ত বলে চললেন।

অভী ভাবলেন 'জবালা আর নেই। যন্ত্রণাও নয়। ব্লাডপ্রেসার ছাড়া কোনো উত্তেজনা নেই। অম্বলের জবালা ছাড়া অন্য কোনো জবালা নেই। তবু তো বেঁচেই আছি।' এ গল্পের শেষটা যেন অভী জানেন। যেন এরকম গল্পগুলো মনের মধ্যেই থিতিয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে। ওদের যেন আলাদা প্রাণ আছে। মাঝে মাঝে ওরা জেগে ওঠে, কথা বলে। পলকের জন্যে যেন একটা পর্দা সরে যায়। একমুহূর্তের জন্যে যেন আশ্চর্য এক রঙ্গমঞ্চ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'পরাশরের জন্যে আমি কমলাকে ত্যাগ করলাম। অথচ পরাশরও তো কমলাকে পুরোপুরি পেলো না। ও নিজের মতো করে কমলাকে ভালবাসলো। সে ভালবাসা ফুটন্ত দুধের মতো টগ্‌বগ্ করলো, ঘন হল—' হরেন দত্ত হাসলেন। হাসিটাকে আর একটু টেনে রেখে, নিজেকে প্রায় হাল্কা করে দিয়ে তিনি বললেন, 'তারপর একদিন বোধহয় সেই দুধ পুড়ে গেলো। আমি ঠিক জানি না। তবে এরকমই হয়। ওদেরও বোধহয় মৃত্যু হল। একবার ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে নতুন করে আর তা শুরু করা যায় না।'

তা হয় না। অভী জানেন, তা হয় না। ঘরটা একটা ধোঁয়াটে অন্ধকারের সমুদ্র যেন। মাঝখানে টেবিলের ওপর চাউস লণ্ঠনটা যেন একটা দ্বীপ। একটা পুবরে পোকা কোথা থেকে এসে আলোর চার ধারে কয়েকটা চক্কর খেলো তারপর দেয়ালে গিয়ে লাগলো। পড়ে গেল। ধোঁয়াটে অন্ধকার। কেরোসিনের গন্ধ। ধোঁয়ার ঘোমটা-পরা লণ্ঠনটাকে একটা পরিচিত মুখের মতো মনে হল অভীর কাছে।

গল্পটা একসময়ে শেষ হল। সবাই চুপ করে রইলেন।

সেই চুপ করে থাকাটা একসময়ে অসহ্য হল। হরেন দত্ত পুরোনো গল্পের জের টেনে বললেন—'এ জন্মে আর না।'

অভী মনে মনে বললেন—'এ জন্মে আর না।' চন্দন সিং বোধহয় ঘুম ভেঙে শেষটুকু শুনেছিলেন। তিনি বাধিত হয়ে মাথা নাড়লেন। অম্বুজাক্ষ মিত্র পান চিবুনো বন্ধ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

হরেন দত্ত বললেন,—অন্য জন্মে কি হবে জানি না, কিন্তু এ জন্মটা নেশার ঘোরে কাটিয়ে গেলাম। যা যা পাইনি সে সব কিছুকে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত নেশা।

'বড় যন্ত্রণা' অভী ভাবলেন—'বড় যন্ত্রণা। আগুনের ঘর আমাকে ঘিরে আছে। আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে।'

অম্বুজাক্ষ মিত্র নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তর্জনীতে খানিকটা চুন তুললেন
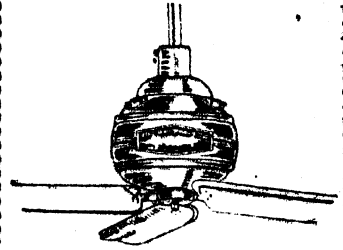
কৌটো থেকে। পানের কষে প্রায় কালো হয়ে আসা জিভটা বের করে চুনটা লেপটে দিলেন তার ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—'তবে শুনুন। ঠিক গল্প নয় এটা—'

তারপর ওরা সবাই একটা করে গল্প বললেন। অম্বুজাক্ষ বললেন, অভী বললেন, চন্দন সিং বললেন।

'গল্পগুলো আলাদা আলাদা। এক নয়। কিন্তু কোথায় যেন সবগুলো গল্পই এক।' অভী ভাবলেন—'সবগুলো গল্পই এক সুরে বাঁধা।'

গল্পগুলো ফুরোলো। তারপর ও'রা আরো ঘন হয়ে বসলেন। ঢাউস লণ্ঠনটার ধার দিকে ও'রা চারজন। অভী নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আর তিনজনের মুখ দেখে নিজের মুখটাও যেন দেখতে পেলেন অভী। ওরকমই ঘোলাটে চোখ, রেখাঙ্কিত চামড়া। অভী ভাবলেন—'আমাদের পোষা ইচ্ছেগুলো চারজনের মাঝখানে আগুনের মতো জ্বলছে। সেই আগুনে আমরা হাত সেঁকছি।'

তারপর প্রসঙ্গ পালটালো। ও'রা কথা বলতে লাগলেন। হাসতে লাগলেন। হরেন দত্ত একটা রুমালকে পাকিয়ে পুতুল তৈরী করলেন। সেই পুতুলটাকে টেবিলের ওপর নাচাতে লাগলেন। যৌবনে উনি নামকরা ম্যাজিসিয়ান ছিলেন।

অম্বুজাক্ষ মিত্র বললেন,—অনেক রাত হল।

হরেন দত্ত বললেন—হ্যাঁ, এবার উঠতে হবে। চলুন সিংজী, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

—বহুৎ সুক্রিয়া। চলুন। চন্দন সিং বললেন।

ওরা উঠলেন। অভী ওদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

ঢাউস লণ্ঠনটা কমিয়ে দিলেন অভী। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসলেন।

মেয়ে দুজন শ্বশুরবাড়িতে। টুলু বিলেতে। মৌ পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। অভী ভাবলেন—'এই বোধহয় মুক্তি। অথচ এও ত নয়। ওরা সবাই সরে গেছে। আমি একা। পা বাড়ালেই অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কেউ দেখতে আসবে না। কিন্তু যেখানে আমি যেতে চাই সেখানে কেউ কখনো যেতে পারে না; কেউ যায় না। সবাই যেতে চায়—হরেন দত্ত, অম্বুজাক্ষ মিত্র, চন্দন সিং। কিন্তু ওরাও কখনো যায়নি। সেই দেশ নেই বোধহয়। কিংবা আছে হয়তো অন্য জন্মে তাকে পাওয়া যাবে।'

অভী চোখ বুজলেন।

অন্ধকার ঘর। দরজাটা খোলা। অভী অনুভব করলেন সেই দরজা দিয়ে অজস্র অসংখ্য প্রেতের মতো নিঃশব্দে পরীরা ঢুকছে। পরীরা তাকে ঘিরে ধরলো। তারা বায়বীয়—তাদের স্পর্শ করা যায় না। তাঁর চার ধারে পরীরা খেলা করতে লাগলো। নাচতে লাগলো।

পরীরা তাকে বললো,—যাবে তুমি?

—কোথায় যাবো? কোথায়?

—যেখানে যেতে চাও।

—যাবো।

পরীরা তাকে নিয়ে গেল। মা, বাবা, জেন, মৌ সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। অভী তাঁর চেনা খেলনার দোকান দেখলেন। মুকুন্দ মিশির এসে বললো,—কুস্তি লড়বে খোকাবাবু?

ঘুম ভেঙে গেল। অভী তাকালেন। চাঁদের আলো আর জাফরির ছায়া জালের মতো বারান্দায় পড়ে আছে। অভী ভাবলেন—'আমি যেখানে আছি সেটাই কি সত্যি? আর যেখানে আমি নেই সেই জায়গাটা কি মিথ্যে?' অভী নিজেকেই নিজে বললেন, 'তবে বেঁচে থেকে কি লাভ? এতদিন বেঁচে আছিই বা কেন?'

নিজের জীবনকে অনুভব করলেন তিনি। অনুভব করলেন জ্বর তাকে ভারী কম্বলের মতো জড়িয়ে আছে।' তিনি ভাবলেন—'মরবো। কোনোদিন মরবো। তখন?'

'এই ঘর থেকে আমি চলে যেতে পারি। আমার জীবনটাই তো আগুনের ঘর। আমরা সবাই এক একটা আগুনের ঘরে আছি।'

অভী ভাবলেন 'কখনো যেখানে যাওয়া যায় না সেই দেশ, আর কখনো যাদের পাওয়া যায় না সেই আত্মীয়রা কোথায়? কোথাও নেই। অথচ আছে। আমি তো সেখানেই বারবার যাই, আবার ফিরে আসি।'

বুকের বাঁ ধারে হাত রাখলেন অভী। হৃৎপিণ্ডটা চলছে ঘড়ির কাঁটার নিষ্ঠায়। অভী বললেন—'আছে, তারা আছে। তাই আমি বেঁচে আছি।'

অভী উঠলেন। এগিয়ে গেলেন।

চাঁদের আলো আর জাফরির ছায়ার সুন্দর জালের ভেতর অভীর ঈষৎ তির্যক, দোমড়ানো, কুঁজো ছায়াটা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সেদিন পড়ছিলাম, একজন ইংরেজ লেখক দুঃখ ক'রে বলছেন—সভ্যতার মৃত্যু হয়েছে। মানুষের মান সম্ভ্রম নিয়েই সভ্যতা; আজকের সমাজে কারোই মান-সম্ভ্রম নেই। ভদ্রলোক লিখেছেন, যুদ্ধের আগে কেম্ব্রিজে পড়তাম, অধ্যাপকদের মান মর্যাদা দেখেছি কত। এ'রা ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী, জ্ঞানচর্চা নিয়েই থাকতেন। যুদ্ধের পরে ফিরে এসে দেখি সেই অধ্যাপক বাগানে মাটি খুঁড়ছেন, নিজের হাতে বাসন মাজছেন। ভেবে দেখুন, এই দৃশ্যটি দেখেই উপরোক্ত লেখকের মনে হয়েছে মানবসমাজে সভ্যতা লোপ পেতে বসেছে।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা যৎসামান্য। অনেকে বলবেন, এতে আর এমন কি হয়েছে? নিজের কাজ নিজে করবে সে তো ভালো কথা। কেউ কেউ আবার অতি পুরাতন ডিগনিটি অব লেবারের কথা তুলে তর্ক শুরু করে দেবেন। কিন্তু আপনারাও জানেন, আমিও জানি, ওসব নিতান্তই কথার কথা। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জনসমাজে যে ব্যক্তি সত্যিকারের ডিগনিটি বজায় রেখে চলে সে নিজ হাতে কোন কাজই করে না। রবীন্দ্রনাথ পরিহাসের সুরে খাঁটি কথাটি বলে দিয়েছেন। বলেছেন, কাজের মধ্যে কোনো ডিগনিটি নেই, কাজ না করার মধ্যেই ডিগনিটি। আর ঐ যে ওয়াট্ টাইলার বলেছিলেন, অ্যাডাম যখন মাটি খুঁড়ত আর ঈভ সুতো কাটত তখন ভদ্রলোকটা ছিল কে? খুব খাঁটি কথা; মানুষ যখন নিজের কাজ নিজের হাতে করত তখন কেউ ভদ্রলোক ছিল না, সব ছিল ছোটলোক। তখন সবাই অসভ্য, সবাই বর্বর।

যাক্ আমি অতশত বুঝি না। ডিগ-নিটির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমি এইটুকু শুধু বুঝি যে সভ্যতা মানুষকে আরামে রাখবে। সবাই নিজের কাজ নিজে করবে এটা সভ্যতার লক্ষণ নয়। অধ্যাপককে যদি বাসন মাজতে হয়, বৈজ্ঞানিককে হাল চষতে—তাহ'লে সমাজের ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাটনা বাটা হবে। তাতে জ্ঞানচর্চার মর্যাদা থাকে না। পূর্বোক্ত ইংরেজ লেখকটি এই কথাই বলতে চেয়েছেন। গুণানুযায়ী কর্মবিভাগই সভ্যতার লক্ষণ। তবে কর্মবিভাগ যখন জন্মগত হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটাকে অবশ্যই সভ্যতার বিকৃতি বলতে হবে।

যাকে যা মানায় সভ্যসমাজে সে তাই করবে। যাতে মান নষ্ট হয় তাই বেমানান আবার যা বেমানান তাই, বেতরিবৎ। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে একদিন দেখা গেল বাকিংহাম প্রাসাদের অনতিদূরে ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় হেঁটে চলেছেন।

অনেকে অবশ্য চিনতেই পারেনি। হঠাৎ কে একজন চিনতে পেরে চট্ করে ছবি তুলে নিলে। খবরের কাগজে সে ছবি বেরিয়ে গেল। দেশসুদ্ধ লোক অবাক। ইংরেজ জাত আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক প্রেস্টিজ জ্ঞানটি টনটনে। বললে, এ আবার কোন্ ঢং। তুমি বাপু রাজা, ছাতা বগলে ক'রে তোমার রাস্তায় বেরোবার কি দরকার? তুমি তোমার নিজের প্রেস্টিজ রাখতে জান না, দেশের প্রেস্টিজ কি করে রাখবে? দেখলেন তো সেই রাজাকে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ছাড়তে হ'ল।

বাস্তবিকপক্ষে আজকের সমাজে কারোই প্রেস্টিজ নেই। ঐ যে বলছে সবাই সমান, তাতেই সব মাটি করেছে। সবাই সমান, এর চাইতে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। বিংশশতাব্দী বেশ কয়েকটি মিথ্যাকে জেনে শুনে লালন করছে, এটি সব চাইতে বড় মিথ্যা। সাম্যবাদের পীঠস্থান রাশিয়া। সেখানেই দেখুন, সকলকে সমান করবার সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা কিন্তু নিজেরা আলাদা হয়ে জারের প্রাসাদে বাস করছেন। আমি বলি ভালই করেছেন, যাকে যেখানে মানায়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্টীম রোলার চালিয়ে সমাজকে সমতল করা যায়, কিন্তু সেই সমতল পথটা রসাতলের পথ। কারণ যে সমাজে মানুষ বড়কে বড় বলে না, উঁচুকে উঁচু বলে না, সে সমাজে মানুষের মন আপনি ছোট হয়ে যায়।

কিন্তু এহ বাহ্য। মন ছোট হয় হোক। আমার সব চাইতে বড় দুঃখ আমাদের মন কাঠখোট্টা হয়ে যাচ্ছে। রসবোধ কমে যাচ্ছে। আগের সেই সূক্ষ্ম রুচিবোধ আর নেই। ঘৃণা লজ্জা ভয় এই নিয়েই তো মানুষ, নইলে মানুষ আর পশুতে তফাৎ কোথায়? এইসব বোধ ক্রমে আমাদের ভোঁতা হয়ে আসছে। বর্বরতার প্রকৃতি বড় স্থূল, লজ্জার ব্যাপার ঘটলেও গায়ে মাখে না। নিরতিশয় লজ্জার কারণ ঘটলেও যে scandalized হয় না সে যথার্থই বর্বর। বাস্তবিকপক্ষ বর্বর সমাজে স্ক্যাণ্ডেল ছিলই না, স্ক্যাণ্ডেল জিনিসটা সভ্যতার সৃষ্টি। কথাটা শুনতে আপাতবিরোধী, কিন্তু মূলত সত্য। সভ্যতা নামক পদার্থটা অতিশয় স্পর্শকাতর, একটুতেই তার মান খোয়া যায়। যে সমাজ যত বেশি সুসভ্য সে সমাজে তত বেশি স্ক্যাণ্ডেল, কেননা, সেখানে অল্পেতেই কেলেঙ্কারি ঘটে। সাদা জিনিসে একটুতেই দাগ লাগে, কালো জিনিসে লাগে না। বর্বর সমাজে লোকে যা গ্রাহ্যই করত না, সভ্য সমাজ তাই নিয়ে শশব্যস্ত। বর্বরতা নির্লজ্জ, সভ্যতা অতিমাত্রায় লজ্জাশীলা। একটুতেই তার শালীনতার হানি হয়। সভ্যতার এই

লজ্জাশীলা মূর্তিটি বড় মনোরম। বলা বাহুল্য, লজ্জা এবং সঙ্কোচ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের নয় মানুষমাত্রেরই ভূষণ। লোকনিন্দার ভয়ে ঐ যে একটু লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি তার সৌন্দর্যের শেষ নেই।

লজ্জাবোধের সঙ্গে রসবোধও জড়িত। শ্রীরাধিকা নারীশ্রেষ্ঠা, কারণ তিনি একাধারে লজ্জাশীলা এবং সুরসিকা। পরপুরুষে তাঁর আসক্তি নিয়ে আমাদের কত গান, কত কাব্য। শ্রীরাধার কলঙ্ক আমাদের সাহিত্যকে কতখানি গৌরব দিয়েছে একবার ভেবে দেখুন। সমাজে এখনও পরস্ত্রী আছে, পরপুরুষ আছে, পারস্পরিক আসক্তিও আছে। কিন্তু লাজে ভয়ে ত্রাসে শ্রীরাধিকার যে ত্রস্ত চকিত ভাবটি সে আর নেই। পরপুরুষে আসক্তা রমণী এখন বলে কয়ে লোকজনকে ডেকে সাক্ষী সাবুদ রেখে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়। আপনারাই বলুন, এ কি প্রণয়ের রীতি? ভালোবাসা মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতি। সে জিনিস কি প্রকাশ্যে চেঁচামেচি করে বলবার কথা? গোপনতার আড়ালটুকু নেই বলে এর সমস্ত সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়েছে।

আমার মতে শ্রীরাধা সভ্যসমাজের প্রতীক। আগেই বলেছি কোনো সমাজ সভ্য কিনা তার প্রমাণ সে সমাজে স্ক্যান্ডেল আছে কিনা, আর শ্রীরাধা যে আমাদের সকলের আরাধ্যা তারও প্রধান কারণ তিনি কলঙ্কিনী রাধা। সেই কলঙ্ককে তিনি অলঙ্কার হিসাবে দেখেছেন। তিনি তাঁর প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করে যে কথা বলেছেন সভ্যসমাজও তার ঈপ্সিতকে উদ্দেশ করে তাই বলেছে। বলেছে—তোমার (অর্থাৎ সভ্যতার) লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ। বলা বাহুল্য, শ্রীরাধা যে শুধু আমাদের দেশেই আছেন এমন নয়, সব দেশেই আছেন। ইংরেজ কবি যখন বলেন —when lovely woman stoops to folly—তখন তিনি ওদেশের শ্রীরাধিকার কথাই বলেছেন। সুন্দরী রমণীর পদস্খলন সংসারের সব চাইতে রোমাঞ্চকর ঘটনা। আমাদের বহু ভাগ্য যে, এই বিংশ শতাব্দীতেও সুন্দরী রমণী আছে, তাদের পদস্খলন কখনো ঘটে না এমনও নয়, কিন্তু একদা লাজে ভয়ে ত্রাসে, আনন্দে বেদনায় যে দেহ রোমাঞ্চিত হ'ত এখন তার কিছুই হয় না। আধুনিক ইংরেজ কবি বিদ্রূপ করে বলেছেন, এইমাত্র যে রমণী পরপুরুষকে দেহদান করেছে সে পরমুহূর্তেই তা মন থেকে মুছে ফেলে। বলে, Well now that's done : and I'm glad it's over. প্রেমিকের পায়ের শব্দ তখনও সিঁড়ি থেকে মিলিয়ে যায়নি; সুন্দরী নির্বিকার চিত্তে গ্রামোফোনে একটি রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে গান শুনতে বসে, যেন কিছুই হয়নি। সুন্দরী রমণীর পদস্খলনের

(ক)াহিনী নিয়ে এককালে মহাকাব্য রচনা (হ)তো। আর এখন? এ যেন কলার খোসায় (প)া ফসকে যাওয়ার মতো। এমন রমণীয় (জ)িনিসকে মানুষ এত সাধারণ করে নিয়েছে (ভ)াবলে অবাক লাগে। সেই জন্যেই বলছিলাম, টি এস এলিয়টের যে দুঃখ আমারও সেই দুঃখ—শ্রীরাধার মৃত্যু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার।

সমাজে স্ক্যাণ্ডেলের ক্ষেত্র যে পরিমাণে সংকুচিত হবে সভ্যতা সেই পরিমাণে কোণঠাসা হয়ে আসবে। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, যাঁরা সমাজ সংস্কারক তাঁরা নিজের অজ্ঞাতসারে সভ্যতার অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে থাকেন। এই বিধবা বিবাহের কথাই ধরুন না। বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়ে নারীসমাজের অল্পবিস্তর কল্যাণ হয়েছে একথা না হয় স্বীকার করলুম, কিন্তু আমাদের ভাবী সাহিত্য থেকে যে রোহিণী বিনোদিনী কিরণময়ী অন্তর্ধান করল সেই ক্ষতিপূরণ করবে কে? বিদ্যা-সাগর মশায় লোক ভালো ছিলেন, কিন্তু বোধকরি একটু অরসিক ছিলেন। ভেবে দেখেন নি যে, বিধবা বিবাহ প্রচলনের অর্থ বিধবা-মেধ যজ্ঞ। বিধবার বিবাহকে বৈধ করতে গিয়ে অবৈধ প্রেমের অবকাশ-ভূমিকে সংকুচিত করা হয়েছে।

আপনারা ভাবছেন আমি আগাগোড়াই পরিহাস করে যাচ্ছি। আসলে তা নয়। আমার মূল বক্তব্যটা একটু অনুধাবন করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, এসব আদৌ হাসি ঠাট্টার কথা নয়। বলছিলাম যে, যে সমাজ যত বেশি স্ক্যাণ্ডেল-সজ্জন সে সমাজ তত বেশি সুসভ্য। সভ্যতার প্রকৃত অভিভাবক হল লোকনিন্দা। লোকনিন্দার ভয় যেখানে নেই সেখানে সমাজ মৃত। কথাটাকে সহজবোধ্য করবার জন্যে এবার একটু মোটা রকমের দৃষ্টান্ত দিতে হবে। এককালে ঘুষ নেওয়া বড় লজ্জার ব্যাপার ছিল। এখন? ঘুষ নেওয়া, ঘুষ দেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঘুষদাতা বা গ্রহীতা কারোই এ নিয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জা-বোধ নেই। সবই প্রকাশ্যে চলছে—ঘুষের নাম 'পান চুরুটের পয়সা', বেহারে বলে 'মামুলি', উত্তর প্রদেশে 'হকের পয়সা'। কালোবাজারের দৌরাত্ম্য কালাপাহাড়ের তাণ্ডবকে হার মানিয়েছে। চোরাবাজারীর সম্মান সমাজে অক্ষুণ্ণ। আজ পর্যন্ত কোন পিতা বলেনি ঘুষখোর ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলুম, কোন পত্নী বলেনি, ঘুষখোর স্বামীর ঘর করব না। চুরি করা, জাল করা, ঘুষ নেওয়া, স্ক্যাণ্ডেল বলে গণ্য নয়। পূর্বোক্ত ইংরেজ লেখকটি অধ্যাপককে বাসন মাজতে দেখে 'স্ক্যাণ্ডেলাইজড্' হয়েছেন। আর আমরা? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, অধ্যাপককে আপনারা চুরি জোচ্চুরি জালিয়াতী করতে দেখেন নি? দেখলেও আমরা নির্বিকার। যাই ঘটুক না কেন, সমাজকে এতটুকু ভুরু কোঁচকাতেও দেখি নি। "After such knowledge, what forgiveness?" এর পরেও বলতে চান আমরা সুসভ্য? যদি বিন্দুমাত্র স্ক্যাণ্ডেলাইজড্ বোধ করতাম তাহলেও কিঞ্চিৎ দাবি থাকত।

আগেই বলেছি, বর্বর যুগে স্ক্যাণ্ডেল ছিল না, তখন স্ক্যাণ্ডেল বোধই ছিল না। এখন আমরা যে যুগে বাস করছি, এটি
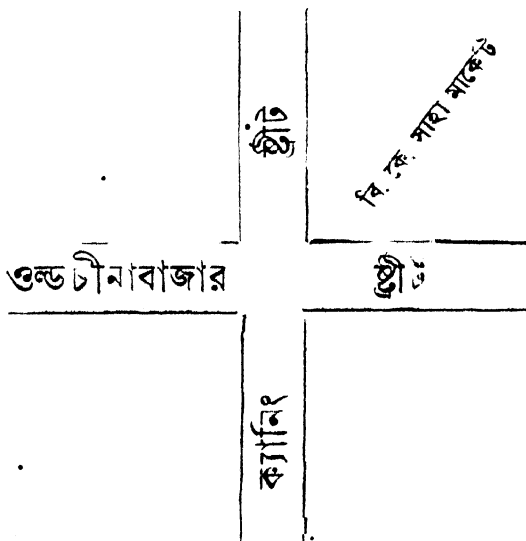
বর্বরতর যুগ। কোন্‌টা লজ্জার ব্যাপার, কোন্‌টা ঘৃণার ব্যাপার তা যে আমরা জানি না এমন নয়, জেনেও না জানার ভান করি। অর্থাৎ আমরা জ্ঞানপাপী। এটি বর্বরতার কৃষ্ণতম রূপ। এই ধরুন, দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ বারো বছর। এই বারো বছরের ইতিহাস চুরি, জোচ্চোরি, জালিয়াতী, ঘুষ, তহবিল-তছরূপ, চোরাবাজারির কুকীর্তিতে কলঙ্কিত। এসব যে কেবল সরকারী এলাকাতেই ঘটছে এমন নয়, যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একদিন দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, ক্রমে সেসব প্রতিষ্ঠান পংককুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। আমি অনেক সময়ে ভাবি, একদিন আমাদের এই যুগের ইতিহাস লেখা হবে কিন্তু আমাদের এইসব কুকীর্তির কাহিনী কি তাতে লিপিবদ্ধ হবে? মনে তো হয় না। তখন শুধু বিভার ভ্যালি প্রজেক্ট, দুর্গাপুর, রাউরকেলা আর ভিলাই (ভিলেনদের কথা তাতে থাকবে না)। ইতিহাসের চালুনিতে সত্য কথাগুলিই দেখেছি বাদ পড়ে যায়। ইতিহাসের এই এক বিচিত্র ব্যবহার। দিব্যি সেজে গুজে সাধুটি হয়ে বসে থাকে, আপন স্বরূপটি কিছুতেই প্রকাশ করে না। ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিও (Clio) একটি ভণ্ড চূড়ামণি। লিটন্ স্ট্র্যাচি কথাটি খুব রসিয়ে বলেছেন। বলেছেন, দেবী ক্লিওর বড় বেশি গুমোর, রাশভারি তার মূর্তি। কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। আমাদের বহু ভাগ্য, কখনো সখনো এক আধটি রসিক ব্যক্তি দেখা দেয়। এরা দুষ্টুমি করে হঠাৎ তার শাড়ির আঁচল ধরে টান মারে, আর দেবী ক্লিওর বুকের কাপড় খসে আসে, কখনো বেশ বাস বিস্রস্ত হয়ে অধোবাস দেখা দেয়। বিবসনা ক্লিওর মূর্তি কৌতুকের উদ্রেক করে, কিন্তু আসলে ইতিহাসের এটিই বাস্তব মূর্তি। এইসব রসিক লোকরা হচ্ছেন স্যামুয়েল পেপিস্ কিংবা হোরেস্ ওয়ালপোল্। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস অনেক হাম্বাই তাম্বাই করেছে, ওদিকে স্যামুয়েল পেপিস তাঁর ডায়েরীতে সে যুগের যত গোপন কথা সব ফাঁস করে দিয়েছেন। ওয়ালপোলের চিঠিপত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুরূপ চিত্র। তৎকালীন সমাজের যে জীবন্ত চিত্র এঁরা ডায়েরীর পাতায় রেখে গিয়েছেন ঐতিহাসিকের লেখনীতে কখনো তা ধরা দেবে না। কারণ ঐতিহাসিক লেখেন গৌরবের ইতিহাসের ঐটিই বাস্তব মূর্তি। এইসব ইতিহাস। শুনে খুশী হবেন স্যামুয়েল পেপিসের মতো আমিও আমার ডায়েরী লিখছি। আমার মৃত্যুর পরে সে ডায়েরী ছাপা হবে। তখন আজকের দিনের ছদ্মবেশী ইতিহাসের মুখোশ খসে পড়বে, ছলনাময়ী ক্লিওর বস্ত্রহরণ হবে। আর অল্প ক'টা দিন ধৈর্য ধরুন।

পপুলার জুয়েলার্স
সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া উচ্চ কারুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিয়া যে সুনিপুণ কলাশিল্পের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের ধারা আনয়ন করিয়াছি তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে আপনাকে সূক্ষ্ম এবং সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় দানে সমর্থ হইব।
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
গিনিগোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
১৬৭,১৬৭সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন-৩৪-১৭৬১
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলি-২৯ ফোন-৪৬-৪৪৮৩
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা
১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর—ফোন-জামসেদপুর সিটি ২৫৫৮এ

# সুরেশ সমাজপতির পত্রাবলী

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কয়েকখানি পত্র এখানে পত্রস্থ করা হইল। পত্রগুলি লেখা হইয়াছিল কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে। কবির পুত্র শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে এগুলি আমরা পাইয়াছি। চিঠিগুলির মধ্যে প্রয়োজনবোধে অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২৫ সংখ্যক পত্রে (২৭ আশ্বিন ১৩২৩) দেখিতেছি, সুরেশচন্দ্র লিখিতেছেন, "আমি ২৪ বৎসর তাগাদা করিয়া যাহা পারি নাই, ইহাদের [জলধর সেনের] কৃপায় তাহা...... হইয়া গেল।" ইহাতে বুঝা যায়, নবকৃষ্ণের কোন লেখা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ১০ সংখ্যক পত্রের (৫।১২।৯৯) "'সাহিত্যের জন্য এবার যে রচনাটি পাঠাইয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার।" এবং ২২ সংখ্যক পত্রের (দশমী ১৩১৯) "পুজার 'সাহিত্যে' আপনার যে রচনাটি ছাপা হইয়াছে" অংশ দুইটি পড়িয়া মনে হয়, পূর্বেও নবকৃষ্ণের রচনা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রবন্ধ দুইটি নবকৃষ্ণের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই।"

১৩ সংখ্যক পত্রে (২৬।৪।১৯০০) সুরেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "কাহাকে উদ্বন্ধন-সূত্রে বাঁধিয়া চিরসুখী করিলেন?" ইহাতে মনে হয়, সেই সময় নবকৃষ্ণ বিবাহ করেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "নবকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র জানাইয়াছেন, 'অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, পিতৃদেবের বিবাহ হইয়াছিল ১৩০১ সালের ১২ই বৈশাখ'।"

সুরেশচন্দ্র ও নবকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং 'সাহিত্যের' কিছু পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

*

'সাহিত্যের সমালোচনা 'সাহিত্যে'র বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে অকুণ্ঠিতভাবে তিরস্কার-পুরস্কার বিতরিত হইত। সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মমত্ববোধ যত আন্তরিক হয়, অনধিকার চর্চাকে সুশাসিত করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া থাকে।"—মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রের এই কথা যে-'সাহিত্য'-সম্পাদকের পরলোকগমনের পর লিখিত হইয়াছিল, সেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "অপেক্ষাকৃত সামান্য আয়োজন লইয়া বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা প্রভূত খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তার" করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বস্তুত 'সাহিত্যে'র 'কশাঘাত'কে ভয় করিয়া চলিতেন না, এমন সাহিত্যিক সেকালে অল্পই ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের নির্মম কটূক্তি হইতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রেহাই পান নাই।

সুরেশচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭০ সনের ৩০ মার্চ (১৮ চৈত্র, ১২৭৬) তারিখে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতিকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পছন্দ হওয়ায় তাঁহারই হাতে নিজ জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীকে সম্প্রদান করেন। সুরেশচন্দ্র ইঁহাদেরই সন্তান। অতি অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতামহের গৃহে সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র দুই ভাই মানুষ হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং সুরেশচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৌদ্দ-পনরো বৎসর হইতেই সুরেশচন্দ্র বাংলা রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সেই মাসিকপত্র সম্পাদনা আরম্ভ করেন। 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক একটি পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৬) হইতেই তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকাটিই প্রথম-বর্ষশেষে 'কল্পদ্রুম' কথাটি বাদ দিয়া 'সাহিত্য' নাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে (বৈশাখ ১২৯৭)। সুরেশচন্দ্র এই মাসিক-পত্রিকা ছাড়াও 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'বাঙ্গালী', 'নায়ক' ইত্যাদি সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার একমাত্র মৌলিক রচনা 'সাজি' নামক একটি গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হয় জুন ১৯০০ সনে। ইহা ভিন্ন তিনি মূল সংস্কৃত হইতে 'কল্কিপুরাণ' অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। সার্ আর্থার কোনান ডয়েলের 'টু আর্মস্' পুস্তকের অনুবাদ 'রণ-ভেরী' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এবং ডবলু এল কোর্টনি ও জে এম কেনেডির 'হাউ দি ওয়ার বিগান' বইটির অনুবাদ 'ইউরোপের মহাসমর' একক সুরেশচন্দ্র সম্পাদনা করেন। 'ছিন্নহস্ত' নামে একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস ও পূজাবার্ষিকী 'আগমনী' তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'কবিতাপাঠ' নামক একটি পাঠ্যপুস্তকও তিনি সংকলন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বহু মনীষীর লেখার সংকলন 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পরে।

সুরেশচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় ১ জানুয়ারি, ১৯২১ (১৭ পৌষ, ১৩২৭) মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

*

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু একদিন তিনি বাংলা দেশের কিশোর পাঠকদের মন হরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—'টুক্‌টুকে রামায়ণে'র কথা আজও অনেকে ভুলিতে পারেন নাই। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল ও শুচিতাবোধ বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিজ কবিতার নির্বাচিত সংগ্রহ 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত করেন তিনি ১৯৩৪ সনে। তাহা ছাড়া আর সবই শিশুপাঠ্য—(১) বাঙালির ছবি, (পরে 'বং-চং'), (২) শিশু-রঞ্জন রামায়ণ, (৩) ছেলেখেলা, (৪) টুক্‌টুকে রামায়ণ ও (৫) ছবির ছড়া। কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত নবকৃষ্ণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

হাওড়া জেলা আমতা থানার অন্তর্গত নারিট গ্রামে ২১ এপ্রিল, ১৮৫৯ (৯ বৈশাখ, ১২৬৬) তারিখে নবকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণের শিক্ষা এনট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত—

শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার পড়া আর অগ্রসর হয় নাই।

ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'সোমপ্রকাশ', 'এডুকেশন গেজেট', প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয়। পরে 'ভারতী', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখিতে থাকেন।

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ (১৮ ভাদ্র ১৩৪৬) সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

*

'সাহিত্য' কাগজে সেকালের প্রায় সকল নাম-করা লেখকই লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হইল— নবীনচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কামিনী রায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শরচ্চন্দ্র দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্র, অতুলপ্রসাদ সেন, জলধর সেন, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রাণ গুপ্ত, রাধেশচন্দ্র শেঠ, নগেন্দ্রনাথ সোম, চন্দ্রনাথ বসু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশ, দীনেশচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, প্রথমনাথ রায়চৌধুরী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রসময় লাহা, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রমাপ্রসাদ চন্দ।

'সাহিত্য' পত্রিকায় 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' নামে একটি বিভাগ ছিল, সেই বিভাগে বাংলা দেশের বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গল্প চিত্র প্রভৃতির সমালোচনা থাকিত। তীব্র 'কশাঘাত' যেমন থাকিত তেমনই প্রশংসাও যথেষ্ট থাকিত। কশাঘাত বা ব্যঙ্গের নমুনা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"সাধনার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প—'শাস্তি'। লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।"

"......'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী'... গানটিতে সুমিষ্ট শব্দসমষ্টি ব্যতীত আর কি আছে, বলিতে পারি না।......'মম হৃদয় শয়ন-মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে মম অন্তরে থাকি থাকি' কেবল কষ্টকল্পিত চর্বিতচর্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।"

"......'গোরা' তর্কে খনি,—গল্পে খুব অল্প।...ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 'গোরা' নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন গৎ বাজিতেছে।"

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র 'গান'। আমরা ভাবগ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলকধাঁধার ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না।—

'আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।'

বাঙ্গলায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে 'গ্রীক্'।

দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ যে'

অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ-হীন। 'আনন্দের গভীর গন্ধ' বোধ করি আকাশকুসুমের সৌরভের মত;—প্রতিভা-শালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও 'নাসাগম্য' নহে। রবীন্দ্র বাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, অনেক গাহিয়াছেন,—এখনও যে তিনি যা' তা' ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক-কবি-সুলভ কবিত্ব-কণ্ডূতি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন—সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত অপকারী, রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।"

"শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি' নামক প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন কথা শিখিলাম, কেবল বঙ্গভাষার 'ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি'র পরিচয় পাইলাম না। আরম্ভেই 'বর্দ্ধিত-বস্তুর একটা জঠরাবস্থা থাকে' দেখিয়া ভীত হইবেন না, যত অগ্রসর হইবেন, ততই 'ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি' দেখিয়া পুলকিত হইবেন। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার 'বানান' বদলাইবার চেষ্টা হইতেছে! 'ঙ' বেচারা বহুকাল 'মাথায় পাগড়ী' বাঁধিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ক-বর্গের এক প্রান্তে সুপ্তসুখে মগ্ন ছিল। রবি-বাবু এই নিরীহ ব্যঞ্জনবর্ণটিকে কলমের, তীক্ষ্ণ খোঁচায় জাগাইয়া তুলিয়া তাহার আলস্য অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়াছেন।—এখন 'ঙ' বেচারা বঙ্গদর্শনের দরবারে 'ঙ্গ' 'ং' প্রভৃতি অনেকের 'বেগার' একাকী খাটিয়া দিয়া নিজের ধার সুদ সমেত পরিশোধ করিতেছে।...দীনেশবাবু সম্প্রতি দার্শনিক হইয়াছেন,—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, —কিন্তু এক লাইনে 'সোহং' ও অন্য লাইনে 'স্বোহং' লিখিয়া জরাজীর্ণ 'সোহহং'-এর গঙ্গাযাত্রা করিবার তিনি কে? বাঙ্গালাই না হয় বেওয়ারিশ, সেই ক্ষেত্রে তিনি লীলা করিতে থাকুন, সংস্কৃত শাস্ত্রের তপোবন চষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন কেন?"

"গল্পটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। চারুবাবু 'শ্রী' ও 'চন্দ্র' ত্যাগ করিয়া আদ্যো-পান্তবর্জ্জিত 'চারু' হইয়াছেন। মৌলিকতা বটে।"

"......একটি বালকের রচনা। কিন্তু ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কি বলিয়া স্থান পাইল, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। বালকের রচনা ভাল বোধ হইয়া থাকিলে, উৎসাহ দিবার জন্য, তাহাকে এক জোড়া সন্দেশ কি একটা খেলানা কিনিয়া দিলেই চলিত......"

"......শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অঙ্কিত 'শাহজাহানের তাজনির্মাণ-স্বপ্ন'......। অবনীন্দ্রনাথের শাহজাহান ঘোড়ায় চড়িয়া তাজ-নির্মাণের স্বপ্ন দেখিতেছেন। সামান্য মানব শয্যায় দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া, অন্তত চেয়ারে বা দেয়ালে বা ঘানীগাছে 'ঠেস' দিয়া স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র শাহজাহান ত তাহা করিতে পারেন না! তিনি তাজ-নির্মাণের স্বপ্ন দেখিবার জন্য উদ্ভট কল্পনালোকের একটি পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়াছেন! শাহ-জাহানের বাহনটি অত্যন্ত চমৎকার। মুখটি চমৎকার ছ'চলো, ঘোড়া বলিয়া চেনা যায় না। কতকটা ইঁদুর ও কতকটা শূকরের মুখ মিলাইয়া এই ঘোড়ার মুখ কল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছে...অশ্ববরের পুচ্ছও অত্যন্ত চমৎকার—কোনও মতে পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন! আকাশেও উদ্ভট বর্ণের বিকার! মোটের উপর এই চিত্রখানিকে ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অকাল-কুষ্মাণ্ড বলা যাইতে পারে।......আশ্চর্য এই যে, অবনীন্দ্র বাবু অসংকোচে এই ছবিখানি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন। আরও আশ্চর্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ চিত্রের স্তুতিগান যাঁহাদের পেশা, শ্রী-বিরাগী চারুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম; অতএব তাঁহার স্তুতিগানে আমরা বিস্মিত হই নাই।"

"শ্রীযুত নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'অহল্যা'......। 'চিত্র-পরিচয়ে' প্রকাশ,—'অহল্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনুতপ্ত-হৃদয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তপো-নিরত অবস্থায় তিনি পাষাণমূর্তিবৎ হইয়া-ছেন। চিত্রকরের এই কল্পনা সুন্দর হইয়াছে।' কিন্তু 'চিত্র-পরিচয়ে'র অন্তর্যামী নকীব ফুৎকারিয়া না বলিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম না। পাষাণ-প্রাচীরে চিত্রিত নারীমূর্তি তপোমগ্না মানবী নহে, তাহা কোন 'অশিক্ষিত-পটু' পটুয়ার 'হিজি-বিজি' বলিয়া মনে হয়। বিশ্বামিত্রের আদর্শ বোধ করি ফৌজদারী বালাখানার কোন মোগল 'নানবাই'। মাথায় মোহনচূড়া অবশ্য চিত্রকরের মৌলিক কল্পনা। রাম ও লক্ষ্মণ 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র নূতন আবিষ্কার:—দেখিয়া গিরিশ বাবুর সেই গানটি মনে পড়িল,—'সখী! নাহি জানন্‌, সোহি পুরুষ কি নারী!' রামের একটি হস্তের বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাকে ডাক্তার সর্বাধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দি, তিনি যদি অস্ত্রোপচারে এই বক্র পাণি-পল্লবকে সোজা করিতে পারেন।"

একটি সংবাদ দিতে গিয়া 'সাহিত্য' লিখিতেছেন—

"সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্র বাবুর 'চোখের বালি' নাটিকা-কারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই 'চোখের বালি' অভিনীত হইবে। রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর বাহার দেখি-বার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন; তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু 'চোখের বালি'র নাটকত্ব কোথায়, বলিতে পারি না। তবে তিলতর্পণ-ধৃত নাটকের উৎপত্তি এই,—ন

নাস্তি আটকো যস্মিন্,—যাহাতে কিছুই আটক নাই।"

নিছক নিন্দাই 'সাহিত্যে' থাকিত না, প্রশংসাও থাকিত। এখানে সেই প্রশংসার একটি উদ্ধৃত হইল—

"......একটি মহামূল্য অলঙ্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না:—[ সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া পরে লেখা হইয়াছে] ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য বচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ।"

*

(১)

বাদুড়বাগান, কলিকাতা

নমস্কার নিবেদনমিদং—

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদিও আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ নাই—তথাপি আপনি আমার অপরিচিত নহেন, মাসিকপত্রে যেমন আপনার কবিতার, বেণীভায়ার নিকট তেমনি আপনার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আপনার গুণপক্ষপাতী হইয়াছি। আপনি যে অযাচিতভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, এই উদার ব্যবহারে অতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি।

আপনার কাজ মিটিলে একটি পদ্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন এই সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমার পাঠকবর্গও আপনার কবিতার অপেক্ষা করিতেছেন, আশা করি, আপনার ইহা মনে থাকিবে। ইতি ৯ই ফাল্গুন, ১২৯৬ সাল।

ভবদীয়স্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্মণঃ

(২)

৫০ হরি ঘোষের স্ট্রীট

কলিকাতা

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্রখানি পড়িয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। আপনার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা নিশ্চিতই অনেক উন্নত হইয়াছে—নহিলে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে রোগ বাড়িত। কিন্তু একটি কথা,—খুব সাবধানে থাকিবেন। যেদিন অত্যাচার হয়, সেই দিন কি তাহার অব্যবহিত দুই চারি দিন পরেই যে রোগ দেখা দেয়, এমন নহে। পরেও তাহার ফল প্রকাশিত হইতে পারে। অতএব খুব

সাবধানে থাকিবেন। বৃষ্টিতে ভেজা, অনিয়মিত সময়ে খাওয়া, এবং বেশী দৌড়-ধাপ করিয়াও যদি শরীরের অবস্থা এমন আশাপ্রদ হয়, তাহা হইলে, এসব বাদ দিলে, নিয়মিত ব্যবস্থায় থাকিলে যে আরও ভাল থাকিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

আর চিঠিখানি যে মিষ্ট করিয়া লিখিতেছেন, তাহাতেই অনুমান করিতেছি, আপনি মনের হিসাবেও বেশ আছেন। মনটাও সুস্থ আছে ত? মুনীন্দ্র ভায়া তাঁহাকে লিখিত আপনার চিঠিখানি দেখাইবার জন্য পকেট হাতড়াইতেছিলেন। আমার খানিও দেখাবার যোগ্য বটে। যাহা হউক, নিশ্চিন্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল খানদান ও বেড়াইয়া বেড়ান (যতটুকু সয়)।

*　　*　　*

"সাহিত্য" লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছি। বুদ্ধির দোষে, অথবা অদৃষ্ট বশে, যাহাই বলুন, ৮ বৎসরের পরিশ্রমের ধন একেবারে মাটি হইয়া গেল, মনে করিলে মনে বড় কষ্ট হয়। ভবিতব্যং ভবত্যেব, তবু নবকৃষ্ণবাবু, বলিলে বিশ্বাস করিবেন না,—"সাহিত্য" উঠিয়া গিয়াছে, মনে করিতেও যেন পুত্র-শোকের মত কষ্ট হয়।—যদিও পুত্র হয় নাই, এবং শোক পাই নাই—তবু তদ্বৎ। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা—দেখিয়া হাসিবেন না।

*　　*　　*

আপনার বাসাটি ত বড় সুবিধার নয় শুনেছি। তা ঢেকে ঢুকে সাবধানে থাকবেন। আর ওখানে চালে বড় পাথরের কুচি, সেটা বাদ দেবেন। বালি উড়ে খাবারে না পড়ে। এই সময়টা চোখ ওঠে, সে পক্ষেও সাবধান।

*　　*　　*

আমার নমস্কার জানিবেন। * * যোগেনবাবু কেমন আছেন? ক্ষীরোদবাবু ত আমার চিঠির জবাবই দিলেন না দেখছি। ইতি—

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

৮।৩।১৪

(৩)

৫০ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার ১০ই ও ১২ই মার্চের দুইখানি কার্ডের জবাব এক সঙ্গে আজ লিখিতে বসিলাম। কেন যে দেরী হইল, তাহা পত্রের উত্তরে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন ও ক্ষমা করিবেন।

দুই দিন শ্রীযুত—বাবুকে দেখিতে গিয়া দেখা পাই নাই; তিনবার খবর লইতে লোক পাঠাই, — দূতপ্রবর এমন উপযুক্ত যে একবারও দেখা পান নাই। আমি অবশ্য ঠিক সময়ে যাইতে পারি নাই। একদিন সকালে ৯টার কাছাকাছি যাই,—কিন্তু ঘড়ি মহাশয় আমায় উপেক্ষা করিয়াই বাজিয়া গিয়াছিলেন, —বাবুও আফিসমুখো হইয়া-ছিলেন। আর একদিন বিকালে যাই—তখনও ফেরেননি। যা হোক—আজ তিনি সকালে নিজে আমার সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছি ও নিজে তাঁহার সংবাদ লইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

*　　*　　*

* ডাক্তারীর কি জানেন? মেডিকেল কলেজে মাত্র পরীক্ষায় বৃৎপন্ন ছিলেন; পেনসন লইয়া সুন্দরী-স্নিগ্ধ প্রমোদ কাননে যতীন্দ্রপ্রমুখ বিলাসীদের সাহচর্যে জরাজীর্ণ দেহ আরও শীর্ণ করিয়া এখন — গিয়াছেন দেখিতেছি। * *

দক্ষিণ মাঠের কথা — নিজে বলিব, এবং তাঁহার বাল্যসখা ও আমার মুরুব্বি ও ইয়ার উপেন মজুমদার কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাকে দিয়া বলাইব; কিন্তু "ভাবি ভুলিবার" কিনা, তা আপনি আমার চেয়ে
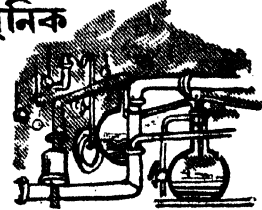
বেশী জানেন। আমি আর সে বিষয়ে বাক্যব্যয় করিব না।

সদানন্দ মন্মথনাথ লাহোরে বদলী হইলেন। শীঘ্রই লবপুরে যাত্রা করিবেন। মন্মথ লোকটি এত মিষ্ট যে শুনিয়া মুহ্যমান বোধ হইতেছে।

আমার গৃহিণীর কথা লিখি, ফল হাতে করিয়া শ্রবণ করুন।

ডাক্তার বিধুমুখী বসুর চিকিৎসায় যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। রোগ নিঃশেষিতপ্রায় হইলেও কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় নাই। ডাক্তার বসু-দুহিতা সেই অবস্থায় ঔষধাদি বন্ধ করিয়া নিয়মমত থাকিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আমার জীবিতেশ্বরী অবশ্যই তাহা পালন করেন নাই। এবং জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত ইহাও সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী যে, সে ব্যাপার আমারও সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। পরে বেদনা পুনরায় স্বল্পভাবে প্রকাশ পাইলে আমার সন্দেহ হয় এবং আমি সব জানিতে পারি। গৃহিণীর বিশেষ দোষ কি?—আর কোন্ পামর গৃহিণীকে দুষিয়া ইহলোকে সম্মার্জনী ও পরলোকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে চায় বলুন? অনেক-দিন রোগ ভোগ করিয়া তিনিও অনেকটা হতাশ ও অসাবধান হইয়া পড়িয়াছেন। আবার বসু-কন্যাকে ডাকা গেল। তিনি বলিলেন, সপ্তাহখানেক লক্ষ্য করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। ইতোমধ্যে আমার জ্যাঠ শাশুড়ী (এ কথাটার সাধবী ভাষা কি?) গৃহিণীকে লইয়া গেলেন, এবং একটি আনাড়ি কবিরাজের প্রতি পরম ভক্তিবশতঃ তাহারই হস্তে স্বীয় দেবর-কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। এ বিষয়ে আমার মতামত কিছুই যখন লইলেন না, তখন আমিও আর কিছুই বলিলাম না, বলিবার অবকাশও পাইলাম না। এখন কবিরাজটির বর্ণনা শুনুন। নৈহাটি-নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূতের ওঝা — ময়রার নাম শুনিয়া থাকিবেন কবিরাজ রত্নটি তাহারই কুলতিলক। ভূতের রোজা (রোজা—শ্রী কৃত্তিবাসের মত ওঝা, কথা কি?—শুদ্ধ করিয়া লইবেন) দেখাইবার কি অর্থ, তাহা জানি না। হয়ত ভূতের হাতে মেয়েটি পড়িয়াছে বলিয়াই দোষ-শান্তির জন্য ওঝা ডাকা হইয়াছে। ইনি হাত দেখিয়া (নাড়ী টিপিয়া নয়) ফলিত জ্যোতিষমতে করকোষ্ঠী গণনা করিয়া রোগ নির্ণয় করেন—এবং তৎপরে দৈব মাদুলী আদি ও কবিরাজী ঔষধ-ঘুঁটির ব্যবস্থা করিয়া রোগ আরোগ্য করেন। আমার গৃহিণীর উদরের বামভাগে বেদনা বলিয়াছিলেন,—ব্যথাটা কিন্তু সমুদায় উদরপ্রদেশে। কিন্তু যাক—তাহাও সমুদায়ের জামিন, যেমন "বেঙ্গল প্রপার" "ইন্ডিয়া" অন্তর্গত—তাই আমার গৃহিণীর কবিরাজের প্রতি বিশ্বাস অক্ষুন্ন আছে। আর নীলাম্বর-গৃহিণীর (জ্যাঠ শাশুড়ী) ভক্তি ত অচল,—হিমাচলের মত মজবুদ। তিনি উক্ত কবিরাজের সাহায্যে বাড়ির ছেলেপুলেদের বিদ্যাশীলাদিরও উন্নতি করিতে প্রস্তুত! যাক—মনের গুণে অনেক রোগ সারে। স
—নহিলে আবার বিধুমুখী ব
সঁপিতে হইবে। তাহারই অধি
আর টাকার শ্রাদ্ধ যাহা হই
আমার শ্বশুরের। সে বিষয়ে
মাথা ব্যথা নাই—যখন

[illegible] হর লাখ টাকা গালে চড়টি [illegible] বা ঠকাইয়া লইল,—তখন [illegible] যেটা যদি কিছু ঠকাইয়া লয়, [illegible] আপনারই কি?—[illegible] তবে চিররুগ্না গৃহিণী চিরদিন "[illegible]রোগেনো মগ্না" হইয়া [illegible]লন, এ দুঃখ রাখি কোথায়? মাতৃ-[illegible]র জীর্ণশীর্ণ দেহ ভগ্নপ্রায়; সতীশচন্দ্র [illegible]রেশবাবুর [illegible]। এই বয়সে বহুমূত্র [illegible]ট, ডাকিয়া আনিয়াছেন, এবং নিজে [illegible] করিয়াই [illegible] যমালয়ের সন্নিহিত [illegible]ছেন; আমিও অম্লরোগের একটি [illegible]ড শিকার, গৃহিণী চিররোগিণী,—[illegible] "যোগেন যোগিনী"। মা লক্ষ্মী [illegible]রূপ,—সরস্বতী যা দুই এক বিন্দু [illegible]মৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন, সে কেবল [illegible]সাগরের নিতান্ত কাতর প্রার্থনায়—[illegible] শুকাইয়া গেল। খোসামুদির [illegible]ব সাহিত্য বন্ধুগণ খড়্গ হস্ত; জিহ্বা-[illegible] দোষে "ছিন্নখা বান্ধবা চান্ডি", আর [illegible]ভাবে (যে অর্থ একদিন কুবুদ্ধিবশে [illegible]তার পথে ছড়াইয়া দিয়াছি) এবং [illegible]ষ্টবক্রে একমাত্র ভরসা, সুখ, অবলম্বন [illegible] বলুন,—"সাহিত্য"খানিও গমনোন্মুখ, [illegible]। অতএব কি সুখে আছি, তাহা [illegible]া করিয়া লিখিবেন। লিখি না এই-জন্য যে, এই রোগের উপর, নিজের দুর্ভাবনার উপর আবার আমার জন্য ভাবিবেন কেন?

"সাহিত্য"র কথাও লিখি। পৌষ অবধি বাহির করিয়াছি। মাঘ মাসের তিন চারি ফর্মা কম্পোজ করিয়াছি। অর্থাভাবে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ মফঃস্বলে যায় নাই। কাগজ অভাবে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ছাপা হয় নাই। আমার যা ছিল, সব গেছে; যতীশ — নিকট টাকা পেলে দেবেন—কথা ছিল। কিন্তু — সে গুড়ে বালি দিয়েছেন। একটি পয়সাও উপুড় হস্ত করিবেন না! অথচ হাজার টাকা দিয়ে ঘোড়া, আবার শুনেছি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কেনা হচ্ছে। – কি করিব বলুন, নিতান্তই কুগ্রহ—অদৃষ্ট। পূর্বজন্মের অভিশাপ। "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া" এখনও এই দুর্গতি। যতীশ বলেছেন ধার ক'রে দেবেন। তাই তিনশত টাকা ধারের জন্যে রাত-দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখনও যোগাড় হয়নি—একজন আশা দিয়েছেন, কিন্তু বড় অব্যবস্থিতচিত্ত ব'লে আমি বড় নির্ভর করিনি। আপাততঃ একশো পেলেও কাগজগুলো ডাকে দি। এই জন্যে ঘুরি, প্রুফ দেখি—আর কাত হ'য়ে প'ড়ে থাকি—এই পর্যন্ত। বিশেষ নূতন সংবাদ নেই—তবে আপনি এখানে থাকিতেই এক "সাহিত্য সমাজ" করা গেছে—রবিবারে তার বৈঠক হয়। সেখানে গিয়ে ঘণ্টা দুতিন কাটান যায়—কোনও দিন নিজে কাটে, কোনদিন জোর ক'রে কেটে বেরুতে হয়।

আপনি কেমন আছেন, আপনার দিদি কেমন আছেন, ডাক্তারবাবুর খবর কি—লিখিবেন। আমার নমস্কার জানিবেন ও আপনার দিদিকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। ইতি—

১৬।৩।১৮ ভবদীয়স্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

(৪)

২৩।৩।১৮
হরি ঘোষের গোয়াল

প্রিয়বরেষু,—

"সাহিত্যে"র জন্য কলুর বলদের মত ঘুরিতেছি, আর কি করিব? চুরী ছাড়া গতি নাই জানিবেন।

* * আমার সুসংবাদ জানিবেন—"সাহিত্য" ছাড়া। আপনার খবর বিস্তারিত লিখিবেন। * *

আপনি শীঘ্র "এক আধটি পদ্য লিখিবেন এবং আমায় দেখিতে পাঠাইবেন" শুনিয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার

অসুখ নিশ্চয় সারিতেছে—আপনি পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন দেখিতেছি। কেননা, আপনার নিতান্ত অসুখের সময়ই কেবল পদ্য লিখিয়া আমায় দিবার কথাটি হয় নাই; পূর্বে যখন সুস্থ ছিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে আমাদের উভয়ের মধ্যে উক্ত বিষয়ে অনেক কথা হইত। যাহা হউক, যদি মধুপুরের কল্যাণে আকাশকুসুম ফোটে—যেন দেখিতে পাই।

—সুরেশ—

(৫)

প্রিয়বরেষু,—

মুনীন্দ্রবাবুর পত্রে অবগত হয়েছেন যে, আপনার তাড়াতাড়ি আসিবার দরকার নাই। * *

আমার সবই মন্দ। একটু ভাল খবর দেব ব'লে এতদিন অপেক্ষা ক'রেছিলাম,—তাই, এবং নিতান্ত মানসিক অবসাদে আপনাকে পত্র লিখি নাই। "সাহিত্যে"র একটা ব্যবস্থা এতদিন পরে করেছি। কাগজ ডাকে দিচ্ছি ছাপার ব্যবস্থাও কচ্ছি—কিন্তু "নির্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্?" এদিকে—উত্তাপে প্রাণান্ত—হাটে-মাঠে গল্প দিচ্ছেন। যা হোক, মাসিক সাহিত্যের ঠেকের আমি থাকতে বন্ধ কচ্ছি নি—সত্যং ব্রুয়াৎ। কি বলেন?

আপনি মাপ করবেন—এতদিন খবর দিই নাই। খবর কি দিব? গৃহিণীর অবস্থা তদ্বৎ। যতীশ তদ্বৎ। মাও তেমনই। নিজে খুব খারাপ। আমার সাদর নমস্কার আপনি জানিবেন। * * । নববর্ষ এল, গত বর্ষের স্মরণে এখনও ভয় পাই। ২রা বৈশাখ, ১৩০৫। সুরেশ। (১৪।৪।৯৮)

(৬)

৫০ হরি ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিয়বরেষু,—

অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। সহসা কলিকাতায় আসিতেছেন কেন? * * ।

* বাড়ি দেখিতে বলিয়াছি।* রামকমল ভায়াকে পাঠাইয়াছি, আপনার পুরাতন নীড় যদি খালি থাকে, সন্ধান করিয়া আসিবে। * * ।

আমার সব পূর্ববৎ। কেবল "সাহিত্য" ছাপান ও পাঠান হইতেছে। তাহাতে কতকটা সুস্থ আছি। এখানে আমার বাসায় থাকিতে পারেন। পরে ক্ষেত্র কর্ম বিধীয়তে—কি বলেন? নমস্কার জানিবেন। ইতি—৬ বৈশাখ—১৩০৫। ভবদীয়—সুরেশ।

(৭)

৫০ হরি ঘোষের স্ট্রীট
কলিকাতা

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আমি অনেকদিন আপনার খবর না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। নিজেও লিখিতে পারি নাই। প্রেসের লোকজন পলায়ন করাতে বড় বিব্রত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি লোক ধরিয়া প্রেস চালাইতেছি। ফাল্গুন-চৈত্রের ৮টা ফর্মা ছাপা হইয়াছে—চৈত্র চলিতেছে। বৈশাখ মণিকা প্রেসে দিয়াছি। এদিকে বাড়িতে মা নাই, বামুন নাই—চাকর পলাই পলাই করিতেছে। যতীশচন্দ্র জ্বরে রোগে আক্রান্ত, শয্যাগত। নিজেও যেমন বিব্রত, তেমনই অসুস্থ।

* * *

আমি দু' পয়সা ব্যয় করিয়া পত্র পাঠাচ্ছি আপনার নিশ্চয়ই পোষ্টেজ ডিউ আর কিছু দিতে হবে। এখন টিকিট নাই—আর চাকরের হাতে পয়সা দেওয়া না দেওয়া সমান। হয়ত চিঠিখানিও ফেলে দেবে।

রচনা কবে পাব? আর যে আশায় আশায় থাকা যায় না। আমার নমস্কার জানিবেন। * * গৃহিণীর সে চিকিৎসা কাল বাজে হইয়াছে। কবিরাজ বলে—আরোগ্য। এদিকে চেহারা ত আরও খারাপ দেখিতেছি। ইতি—২৩।৫।৯৮

সুরেশ

(৮)

করকমলেষু,—

পত্র লিখিলে তো উত্তর নাই। ব্যাপার কি? সব ভালো তো?

চৈত্রমাস যায় যায়। "সাহিত্যে"র জন্য

আপনি যে কত কি পাঠাইবেন ভরসা দিয়া গেলেন, তার কি করিলেন? "সাহিত্যে"র জন্য পত্রপাঠ কিছু পাঠাইবেন।

আমার নমস্কার জানিবেন। পূজ্যপাদগণকে প্রণাম ও আশীর্বাদ্যদের আশীর্বাদ জানাইবেন। "সাহিত্যে"র জন্য আপনার কবিতা, রহস্য-গল্প (সচিত্র) ও গল্প, সব পাঠাইবেন। ইতি—১৮।৩।৯৯

ভবদীয়—

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(৯)

৫০ হরি ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুহৃদ্বরেষু,—

মধুপুর হইতে ফিরিয়াছি—অর্থব্যয় সার। লোকসানের কপাল।

আপনার রচনা পাঠান, আর সময় নাই—কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা।

রাখালবাবু কি বলিলেন? কেমন আছেন? বাড়ির সব খবর কি?

পরে বিস্তারিত লিখিব। আপনার পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছি। রচনা শীঘ্র পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ২৪ চৈত্র, ১৩০৫।

ভবদীয়—

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(১০)

৫০ হরি ঘোষের স্ট্রীট
কলিকাতা

সুহৃদ্বরেষু,—

আপনার খবর কি? বাড়ির সব ভাল ত? কবে এদিকে আসিবেন? দুর্দিন যে অতীত হইল?

আমরা এক রকম বাঁচিয়া আছি।

আপনি আমাদের সাদর নমস্কার জানিবেন ও মাতৃদেবীর আশীর্বাদ জানিবেন।

"সাহিত্যে"র জন্য এবার যে রচনাটি পাঠাইয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার। এবার সুপ্রবন্ধের বড় অভাব ছিল। এ সময়ে পাঠাইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইতি—৫।১২।৯৯

ভবদীয়—

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(১১)

৫০ হরি ঘোষের স্ট্রীট
কলিকাতা

সাদর নমস্কার নিবেদন,—

ইতিপূর্বে আপনাকে পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার উত্তর পাই নাই। আপনি ভাল আছেন ত? বাটির সব ভাল ত?

আপনার কলিকাতায় আসিবার কথা ছিল, তাহার কি হইল?

"সাহিত্যে"র জন্য কিছু লিখিবেন বলিয়াছিলেন, তাহারই বা করিলেন? সম্প্রতি প্রবন্ধের অভাবে বড় মুস্কিলে পড়িয়াছি, আপনি কিছু দিন না। * * *।

আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। * *। ইতি, ১৫।১২।৯৯

ভবদীয়—

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(১২)

৮২ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,—

আপনার যে কবিতাটি নববর্ষে দিবার কথা, তাহা পত্রপাঠ পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। এবারে আর নিরাশ করিবেন না।

আর ৪।৫ দিনের মধ্যে বৈশাখের কাপী প্রেসে দিব। ইতিমধ্যে যাহাতে আমার হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

এ বৎসর আপনি যদি আলস্য পরিহার করিয়া "সাহিত্যে"র জন্য লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই আমার

মিশের উপকার করিবেন। পরোপকারে আপনার নিবৃত্তি নাই—কেবল আলস্য পরিহারের অপেক্ষা। আশা করি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি আবার কলম ধরিবেন।

এ বর্ষে বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে কিছু লিখবেন না? লিখিবেন বলিয়াছিলেন। খোস্‌গল্প কবে লিখিবেন?

কিছু লিখিবেন ত? না, গত কয় বৎসর যেমন লিখিতেছেন, এ বৎসরও তেমনই করিবেন? কি বলেন?

আমার অবস্থা শোচনীয়।—দেনা এত বাড়িয়াছে যে, প্রেস বিক্রী হইবে। আমার টাকা নাই—এত টাকা পাইবারও আশা নাই। নিজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাততঃ ভিক্ষা সম্বল। এক ভরসা আছে—কি হয় বলিতে পারি না। মনের অবস্থা বড় খারাপ।

মা ও আমার স্ত্রী ভাল আছেন, কিন্তু সকলেই মনঃকষ্টে মৃতপ্রায়।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন। পরিবারস্থ সকলে কে কেমন আছেন, লিখিবেন।

আমিও বাড়ি ছাড়িয়া ২।৪ দিনের মধ্যে নূতন বাড়িতে যাইব। আপনি ৮২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে খামে চিঠি লিখিবেন ও চিঠির উপর Private স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। পত্রের উত্তর যেন শীঘ্র পাই।

এত মনের কষ্ট সহিতে হইতেছে যে, নিজে প্রায় পিষ্ট হইয়া গিয়াছি। এ সময়ে ছুটিয়া পলাইবার কথা, আপনার কাছে যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু মাকে ফেলিয়া এই দুঃসময়ে যাওয়া ঘটিল না।

আমার সাদর নমস্কার জানিবেন। ইতি—

২১।৪।১৯০০ ভবদীয়—

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(১৩)

৮২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[ শীর্ষস্থ ঠিকানায় পত্র দিবেন ]

সাদর নমস্কার নিবেদন,—

ইতিপূর্বে যে পত্র লিখিয়াছি তাহা বাটী গিয়া পাইয়া থাকিবেন। কলিকাতায় তিনদিন ছিলেন শুনিলাম। আবার দেখা হইলে ভাল হইত। গতস্য শোচনা নাস্তি।

বৈশাখের জন্য যে কবিতাটি দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা যদি এই পত্র প্রাপ্ত হইয়াই পাঠান, তাহা হইলে এ মাসে প্রকাশিত হইতে পারে। সেটি প্রথমে দিবার মত,—নববর্ষ—তাই এখনই দরকার। যদি ৩।৪ দিনের মধ্যে পাই, তাহা হইলেও না হয় অপেক্ষা করি। যাহা হউক, পত্রপাঠ অনুগ্রহপূর্বক লিখিবেন, কি করিবেন।

আশা করি আপনি ভাল আছেন ও পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল। কাহাকে উদ্বন্ধনসূত্রে বাঁধিয়া চিরসুখী করিলেন? নমস্কার। ২৬।৪।১৯০০

ভবদীয়—

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

(১৪)

৮২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুহৃদ্বরেষু,—

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। সবিশেষ পরে লিখিব। অনুগ্রহপূর্বক আপনার কবিতাটি পত্রপাঠ পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। আর দেরী করিবেন না।

• • •

আমার মেজো মেস মহাশয় (পূর্ণিয়ার অঘোর বাবু) জ্বরবিকারে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইতি—১।৫।১৯০০

ভবদীয়

সুরেশ

(১৫)

India Club,

সাদর নমস্কার,

আপনার পত্রের উত্তর পরে লিখিতেছি।

আনন্দের দিন এলো
আগামী বৎসরগুলো
আনন্দময় করে তুলুন
লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি নিয়ে
লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

আইনের পরামর্শ হীরেন্দ্রনাথ দত্তজার নিকট পাইয়া এই পত্রের মধ্যে পাঠাই। তিনি সমবয়স্ক দুই তিনজনের সংগে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সাহিত্যের জন্য রচনাটি যেন অতি অবশ্য পাই।

আপনার "কবিতাকুসুম"খানিই "কবিতা পাঠ" নাম দিয়া ছাপিতে দিলাম। অগত্যা।

আমরা কেহ মরি নাই—তবে মানসিক সুখের আতিশয্যে মৃতপ্রায়। আপনার কুশল সংবাদ প্রার্থনীয়। নমস্কার।

২৯।৫।১৯০০ সুরেশ

৪২ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট।

(১৬)

২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা

সুহৃদ্বরেষু—

একটি শুভ সংবাদ আছে। নিত্যকৃষ্ণ ভায়া শুক্রবার প্রাতে ৮টার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার কলেরা হয়। কদিন রোগ ভোগের পর বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আনা হয়। তখন সংজ্ঞাহীন, বিকারের অবস্থা; আর কোনও আশা ছিল না। শুক্রবার সকল যাতনার অবসান।

শুক্রবার (অসুখের পরদিন) খবর পাইয়া যাই। সেদিন রাত্রিতে ছিলাম। তারপর প্রত্যহই যাইতাম, কিন্তু অকারণ। চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। প্রতিকার করিতে পারিলাম না। কখনও এলোপ্যাথি, কখনও হোমিওপ্যাথি—হাতুড়ের হাতে। আমাদের অদৃষ্ট! দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ অনেক পাইয়াছি, কিন্তু এবার সেটা শেলসম বিঁধিয়াছে।

আপনারা সব কেমন?

সুরেশ

১৫।৭।১৯০০

(১৭)

২।১ রামধন মিত্রের লেন,
শ্যামপুকুর, কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,—

আপনার খবর কি? বাড়ির সব ভালো ত? নিজে কেমন আছেন?

আমার কি করিলেন? লিখিব লিখিব করিয়া আর কতকাল কাটাইবেন?

অধরবাবু কেমন আছেন আর খবর লইতে পারি নাই—তাঁহারই বা সংবাদ কি?

আপনি নমস্কার জানিবেন। ইতি—

১৩।৩।১৩০৭ (২৭।৬।১৯০০)।

ভবদীয়

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(১৮)

২।১ রামধন মিত্রের লেন
শ্যামপুকুর, কলিকাতা

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার সুদীর্ঘ পত্রের উত্তরে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিবার সংকল্প ছিল। তা আর হইয়া উঠিল না। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'—(কেবল আমার মামা বাদে)—এই ভাবিয়া তিলকাঞ্চনেই উত্তর লেখা সাব্যস্ত করিলাম।

"সাহিত্যে"র সমালোচনা পড়িয়া উপকৃত হইলাম। অক্ষয়বাবু পড়িয়াছেন। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন। * * *।

আপনার বাড়ির খবর কি? * *।

"সাহিত্যে"র জন্য আপনি কি করিলেন? আপনি কবে আসিবেন? আপনার পরামর্শ চাই—নানা বিষয়ে।

যত্নের কোমরে বেদনা—লম্বেগো। মাসখানেক ভুগিতেছে। তার উপর দিন দুই আগে খুব ঝগড়া করিয়াছি।

নিজে ভাল নহি। অজীর্ণের শেষে দাঁড়ায়—মাথার যন্ত্রণা, অনিদ্রা। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য একেবারে হারাইতে বসিয়াছি। রাগের সীমা নাই—মেজাজ — মত হইয়াছে। কারণে মনেও সুখ নাই। — একরকম যাবার দাখিল। সব রকমে এমন হইয়াছি—যে এইখানে দাঁড়ি দিলেই ভাল হয়। মনে

করিতেছি দিন কতকের জন্য কলিকাতা ছাড়িব।

আমার সাদর নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি ৭ আষাঢ়, ১৩০৮।

ভবদীয়
শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(১৯)

সি বীচ বাংলো, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ

করকমলেষু,—

বেশ করিয়াছেন, আমি উপাত্ত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। আমি লিয়াছিলাম, যতীশ ও নলিনীকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি দেখিয়া শুনিয়া দিবেন কার্তিকের আর আশা করি না। আজ অধরবাবু লিখিয়াছেন, কার্তিকের ৫ পাঁচ ফর্মা ছাপা হইল। চিঠিখানি ১১ তারিখের

* * ভায়ার পত্র পাই নাই তিন দিন। কেমন আছেন—তীর্থে গেছে কি না লিখিবেন।

আশ্বিনের "সাহিত্য" পাইলাম। বেশ করেছেন। শত শত ধন্যবাদ—আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। নমস্কার জানিবেন। ইতি—১৪।১০।১৯০১

ভবদীয়—সুরেশ



(২০)

বন্দে মাতরম্

২।১ রামধন মিত্রের লেন,
শ্যামপুকুর, কলিকাতা

সাদর নমস্কার নিবেদন,—

আপনার পত্র পাইয়াছিলাম। "বেওয়ারী" গোল হইয়া গিয়াছিল। আজ পাঠাই। বুধবারেও পাঠাব। তারপর কোথায় পাঠাব ইতিমধ্যে লিখিলে পাইবেন।

আপনার বই ত দোকানের জন্য পাইলাম না। কবে পাইব?

"ছেলেখেলা"র সংস্করণ নিজে না করেন ত আমাকে দিবেন। ভুলিবেন না।

"আনন্দমঠে"র ইংরাজী তরজমার অনুমতি কবে পাইব?

আশা করি সপরিবারে ভাল আছেন। যতীশের একটু জ্বর হইয়াছে। জ্বর গায়েই শিবপুর যাতায়াত চলিতেছে। মাও বড় ভাল নাই। আমি পূর্ববৎ।

আমার নমস্কার জানিবেন। ছেলে-মেয়েদের আশীর্বাদ।

বড়বাবু নবাগত শিশুটিকে এখনও ক্ষমা-ঘেন্না করিতেছেন ত? আপনি বেশ আছেন। আমরা দুনিয়ার কেবল কাদা ঘাঁটিয়া মরিলাম।

"সাহিত্যে" আর কবে লিখিবেন?

ভবদীয়
শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(২১।৫।১৯০৬)

(২১)

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

যতীশ একটু ভাল। কিন্তু এখনও ১৫ দিন অন্ততঃ শয্যাগত থাকিবার সম্ভাবনা। ডাক্তারবাবুর এই মত। ইতিমধ্যে যদি অন্য উপসর্গ না জুটে। সপ্তাহে দুইবার মূত্র পরীক্ষা আবশ্যক।

এই অবস্থায় — বাবুর দেখা পর্যন্ত পাই না—টাকা ত দূরের কথা।

আমি — বাবুর নিকট বাহি বিক্রয়ে একটু যে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, তাহা লোক-সানের ভয়ে নহে; তাঁহারা উপরোধে ঢেঁকি গিলিতেছিলেন। এই জন্য সংকুচিত হইতেছিলাম। কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে আর আমার বিচার-বিতর্কের অবকাশ নাই। যদি — বাবুর পুত্র এখনও সম্মত থাকেন, তাহা হইলে বা দেন, লইয়া আসিলে উপকৃত হইব। ইতি—৫ বৈশাখ, ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(২২)

দশমী, ১৩১৯

প্রিয়বরেষু,—

জানিবেন, আপনার পুত্রকন্যাগণকে আশীর্বাদ জানাইবেন। আশা করি, সপরিবারে কুশলে আছেন।

কলিকাতায় আসেন, সে সংবাদ আপনি চলিয়া যাইবার পর পাইয়া থাকি। আমাকে একঘরে করিলেন কেন?

পূজার "সাহিত্যে" আপনার যে রচনাটি ছাপা হইয়াছে, তাহা পড়িয়া পাঠকবর্গ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আপনার্থে নিবেদনমিতি।

ভবদীয়
শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(২৩)

প্রিয়বরেষু—

আপনার বিজয়ার আশীর্বাদ আমার শিরোধার্য—তবে বেনো জল ঢুকাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছি কি না বলা যায় না। আপনার কি অসুখ হইয়াছিল এবং এখন কেমন আছেন লিখিবেন। আপনার পরিবারবর্গের সমস্ত কুশল ত?

এখন আপনাদের দেশের অবস্থা কিরূপ? রাণাঘাটের কবি গিরিজানাথ বৈদিক মন্ত্রটির যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন, তাহা আপনার জন্য পাঠাই।

"ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হোক, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা রো'ক,
শূর মহারথ-যশঃ [illegible] অর্জন:
ধেনু হোক পয়স্বিনী, পুরন্ধ্রী [illegible]শস্বিনী,
পর্জন্য পর্যাপ্ত বারি করুক বর্ষণ;
ওষধী সে ফলবতী পূর্ণা হোক স্রোতস্বতী,
যোগ ক্ষেমে বসুমতী"
তোমার অভীষ্ট যাহা হউক পূরণ!

ইহাতেও যদি না শানে তাহা হইলে মহীধরের ভাষ্য আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

"সাহিত্য" আশ্বিন অবধি প্রকাশিত হইয়াছে।

ধন্য জলধর! ধন্য জগদম্বা! আমি ২৪ বৎসর তাগাদা করিয়া যাহা পারি নাই, ইহাদের কৃপায় তাহা দুই বৎসরে হইয়া গেল। যাহা হউক আপনি যে দুইটি কবিতার অর্ধেক অর্ধেক লিখিয়া রাখিয়াছেন, সেই দুইটিকে জুড়িয়া একটি করিয়া শীঘ্র আমাকে পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আমি মরিবার পূর্বে ছাপিয়া যাইতে পারিব। নমস্কার। ইতি—২৭শে আশ্বিন, ১৩২৩।

গুণমুগ্ধ—
শ্রীসুরেশ সমাজপতি

[ 'জলধর সেন মহাশয় এই সময় 'ভারতবর্ষে'র জন্য নবকৃষ্ণের রচনা লইয়াছিলেন ]

(২৪)

বুধবার, কলিকাতা।

নমস্কার নিবেদন,—

আমার মা[illegible] অবস্থা ভাল কিন্তু আজ ৫ দিন হইল আবার জ্বর হইতে[illegible] দুদিন একজ্বরী হইয়াছে—[illegible] অমাবস্যা। [illegible] ১২টার সময় টে[illegible]চার ১০১ হইয়াছে। আর এই কদিনের জ্বরে আমাকে পি[illegible]য়া দিয়াছে। আমার উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াছে। প্রথম আক্রমণের পর যে উপশম হয়, তাহার পর এইবার লইয়া চারিবার জ্বরের পুনরাবৃত্তি হইল। [illegible] পর্বে পর্বে জ্বর হইতেছে। যথেষ্ট অগ্নি-মান্দ্য হইয়াছে—কাশিও আছে।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

(১০।১।২০) শ্রীসুরেশ সমাজপতি




সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রী[illegible] ঘোষ
মূল্য—তিন টাকা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।